# বসুমতী—বিষয়সূচী

২৮৫.3

৯ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—২য় সংখ্যা ] [ ভাদ্র—১৩৪৭


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | শ্রীসচ্চিদানন্দ চট্টোপাধ্যায় | |
| "বুদ্ধু" ও "মডার্ণ" কি একার্থক ? | | ১৩৩ |
| ধর্ম্মঘটের উদ্দেশ্য কি ? | | ১৩৫ |
| পরিষদ পরিচয় : "বেঙ্গল লাইব্রেরী" পত্রিকার সাময়িক জ্ঞান এবং রাষ্ট্রনীতি জ্ঞানের বহুলা | | ১৩৮ |
| মিঃ বাটলার এবং ফ্রান্সে ব্রিটিশদের কৃষি প্রতিষ্ঠা | | ১৪৪ |
| কোন প্রকৃতি কিংবা দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের উপায় কি পশু ? | | ১৪৭ |
| উৎকৃষ্ট সমাজ এবং রাষ্ট্রের আদর্শ | | ১৪৯ |
| মানুষের মন ( গল্প ) | শ্রীপ্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায় | ১৫৭ |
| মুক্তির মূল্যশিল্প | শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায় | ১৬০ |
| এলোমেলো ( গল্প ) | শ্রীসুধাংশু মুখোপাধ্যায় | ১৭৩ |
| বিশ্বকবীর মহাপ্রয়াণ ও বৈকল লীলাবসানের প্রভাব | শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল | |
| কৃষি ও কৃষক-শিল্প | শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায় | |
| ভুল ( গল্প ) | শ্রীউৎপলাদেবী দেবী | |
| কৃষ্ণকান্ত দাস ঠাকুরের অবদান | শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় | |
| বিজলী ( উপন্যাস ) | শ্রীঅপরাজিতা দেবী | ১৮৮ |
| ডাক-টিকিট | শ্রীসুবিমলানারায়ণ সান্যা | ২০৭ |
| জোড়িয়োগা ( নাটক ) | শ্রীঅনুরূপা দেবী | ২১০ |
| সিপাহী-যুদ্ধের মুক্তর কথা | শ্রীসুশীলচন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারী | ২১৭ |
| সিন্ধু ( কবিতা ) | শ্রীরবিন্দ্র ঠাকুর | ২২৪ |
| আজন-বাজীর মাঠ ( গল্প ) | শ্রীবরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ২২৫ |
| সাময়িক-পরিচিতি | শ্রীসতীশমোহন সরকার | ২২৮ |
| অনুষ্ঠের পরিহার ( গল্প ) | শ্রীসতীশনাথ মুখার্জী | ২৩১ |
| হিমালয়ের পরিচয়ে ( সচিত্র ) | শ্রীপ্রমোদরঞ্জন রায়চৌধুরী | ২৩৭ |
| সন্ধ্যারাত্রা ( কবিতা ) | শ্রীসোরেন্দ্র সান্যা | ২৪৪ |
| অনির্ব্বাণ ( উপন্যাস ) | শ্রীহেমেন্দ্র বাগচী | ২৪৩ |
| ধূসর পৃথিবী | শ্রীবিমলকুমার ঘোষ | ২৫১ |
| ছোটো-বুধনি ( গল্প ) | শ্রীহেমান্দ্রিনী ঘোষ | ২৫৯ |
| পাহাড়িয়া ( কবিতা ) | শ্রীঅমূল্যকুমার চট্টোপাধ্যায় | ২৬২ |
| অন্ধকূপ ( সচিত্র ) | শ্রীহেমেন্দ্র দেবী | ২৬৪ |
| ভারতীয় স্বাধীন মহাসমিতির ইতিহাস | শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী | ২৭৩ |


127185


# ডোয়ার্কিনের 'সোনরা' হারমোনিয়ম

নির্ভরযোগ্য হারমোনিয়ম
কিনতে হলে
ডোয়ার্কিনের কিনবেন।

উৎকৃষ্টতর মালমসলা ও উন্নততর নির্ম্মাণ-প্রণালী এগুলির বৈশিষ্ট্য।

'সোনরা' মডেল নং ৫৪, ডবল প্যারিস রীড, ৩ অক্টেভ, ৫ ষ্টপ, ২ বৎসরের গ্যারাণ্টী দ্বারা সুরক্ষিত।

বাক্স সহ ৪০৲ টাকা।

মূল্য-তালিকার জন্য লিখুন।

**Dwarkin & Son, Ltd.**

The oldest and largest Music-House in India

14, ESPLANADE, E.
CALCUTTA.

# বঙ্গশ্রী—চিত্রসূচী—ভাদ্র, ১৩৪৭


বিবর্ণ—

পার্থ সারথি — শিল্পী—শ্রীমণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বিবর্ণ—

প্রাম-উপাস্তে — শিল্পী—শ্রীঅজয় বসু

কার্টুন—

মীমাংসা — শিল্পী—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ইউরোপের অন্তরঙ্গে — ঐ

বোডসওয়ানের বিপদ — ঐ

সংস্কার — ঐ

প্রবন্ধান্তর্গত চিত্র :

হিমালয়ের পশ্চিমে — ২৩৭

শ্রীনগরের পথে : কোহালায় ঝেলম নদী, দূরে নদীর উপর পুল দেখা যাচ্ছে ; শ্রীনগরের পথে : ধানের চিত্র দিয়ে ঝেলাম নদী পর্যটন করে করে যাচ্ছে শ্রীনগরের একটি দৃশ্য ; শ্রীনগরের অপর দৃশ্য ; শ্রীনগরের পথে : সিন্ধনের পাহাড় নিবিড় পাইন-জঙ্গলে ঢাকা ; শ্রীনগরের পথের তিনটি বিচিত্র দৃশ্য।

অন্তঃপুর — ২৬৯

সেলাইয়ের ছবি



যদি পাখা-সংক্রান্ত যাবতীয় দুর্ভোগ হইতে চির-অব্যাহতি চান—

**ইণ্ডিয়া ফ্যান্ ব্যবহার করুন**

সমগ্র ভারতে ১ লক্ষেরও উপর
"ইণ্ডিয়া" পাখা সুখ্যাতি ও সন্তুষ্টির
সহিত ব্যবহৃত হইতেছে

- ইণ্ডিয়া ডি-সি
- ভারত এ-সি
- রঞ্জিত এ-সি
- রোটাস্ ডি-সি
- তারা ডি-সি বা এ-সি

এ-সি বা ডি-সি
সিলিং
ও
টেবল্ ফ্যান্
ইণ্ডিয়া ফ্যান্ গত ১৪শ বৎসর
ভারত গভর্ণমেণ্টের ষ্টোর
ডিপার্টমেণ্টে তালিকাভুক্ত
রহিয়াছে।

প্রস্তুতকারক :

**দি ইণ্ডিয়া ইলেক্‌ট্রিক ওয়ার্কস লিঃ**

এভেনিউ হাউস, চৌরঙ্গী। ফোন কাল ৪২৩

হেড অফিস ও ফাক্টরী :
২৪, সাউথ রোড, কলিকাতা। ফোন সাউথ ৪৬।
টেলিগ্রাম : MANUFACTER

শাখাসমূহ : মাদ্রাজ, বোম্বাই, লাহোর, দিল্লী, কানপুর।
সেল্‌স্ রুম :
১০, চৌরঙ্গী রোড। ফোন কাল ১২১৪।

৮ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—৩য় সংখ্যা ] [ আশ্বিন—১৩৪৭


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য | |
| বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা ও আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি ( ২ ) | | |
| সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার ভবিষ্যৎ | | |
| রাষ্ট্রের ভাষা | | ২৮৯ |
| বিঃ গান্ধীর সংগঠন-মূলক কার্য্য-সূচী | | ২৯৪ |
| স্নেহময় পৃথিবী | ডাঃ বিশ্বনাথ ঘোষ | ২৯৭ |
| সমাজ ও সাহিত্য | শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেনগুপ্ত | ৩০৫ |
| অন্ধকূপ ( সচিত্র ) | ইরেখা দেবী | ৩১১ |
| অবিবর্ত্তন ( উপন্যাস ) | ইহেমেন্দ্র বাগচী | ৩১৭ |
| কবির জন্ম ( কবিতা ) | শ্রীবসন্তলাল পাল | ৩২৪ |
| হিমালয়ের পশ্চিমে ( সচিত্র ) | শ্রীপ্রমোদরঞ্জন রায়গুপ্ত | ৩২৬ |
| সুখ ও নদী ( কবিতা ) | ইরামকৃষ্ণ চৌধুরী | ৩৩৯ |
| পলাশের কাহিনী ( অনুবাদ-গল্প ) | | |
| হাসে হেটারটম | অনুবাদক—ইযোগেশ চৌধিক | |
| পাটীর অপেরা ও কলাশী শিল্পী | ইবিভূতিভূষণ কর | ৩৩৩ |
| কুহেলিকা ( কবিতা ) | ইকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত | ৩৪৭ |
| বিচিত্র জগৎ ( সচিত্র ) | শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় | ৩৪৮ |
| মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবন প্রধান কয়েকটি ঘটনা | ইপূর্ণেন্দু গুহরায় | ৩৫৪ |
| ভাঙ্গকুলা ( কবিতা ) | শ্রীমোহিনী চৌধুরী | ৩৫৮ |
| চিত্রলেখা ( গল্প ) | ইঅতুলা গুপ্ত | ৩৫৯ |
| খেলাধূলা-পরিচিতি | ইসুধীরেন্দুকুমার বসু | ৩৬৪ |
| বিজয়ী ( উপন্যাস ) | ইশৈলবালিকা দেবী | ৩৬৯ |
| প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যে শিল্প-প্রসঙ্গ | শ্রীকল্যাণব্রত চক্রবর্ত্তী | |
| অভিমান ( গল্প ) | শ্রীশোভনা ভট্টাচার্য্য | ৩৭৯ |
| বিজ্ঞান জগৎ ( সচিত্র ) | শ্রীনীলরতন কর | ৩৮২ |
| জ্যোতিষ্মায়া ( নাটক ) | শ্রীঅনুরূপা দেবী | ৩৮৮ |
| ভারতীয় ভাষার মহাভারতের ইতিহাস | শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায়গুপ্ত | ৩৯৪ |
| চতুষ্পদী | শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী | ৩৯৯ |
| ছন্নছাড়ী ( কবিতা ) | শ্রীবিমল চট্টোপাধ্যায় | ৪১৩ |
| পাতালপুরের টেরাকোটা ( গল্প ) | শ্রীবীরাচার্য্য | ৪১৪ |
| সংবাদ ও মন্তব্য | | ৪১৮ |



ডোয়ার্কিনের 'সোনরা' হারমোনিয়ম

নির্ভরযোগ্য হারমোনিয়ম কিনতে হলে ডোয়ার্কিনের কিনবেন।

উৎকৃষ্টতর মালমসলা ও উন্নততর নির্ম্মাণ-প্রণালী এগুলির বৈশিষ্ট্য।

'সোনরা' মডেল নং ৫৪, ডবল প্যারিস রীড, ৩ অক্টেভ, ৫ ষ্টপ, ২ বৎসরের গ্যারাণ্টী দ্বারা সুরক্ষিত।

বাক্স সহ ৪০৲ টাকা।

মূল্য-তালিকার জন্য লিখুন।

Dwarkin & Son, Ltd.

The oldest and largest Music-House in India

14, ESPLANADE, E.
CALCUTTA.

# বঙ্গশ্রী—চিত্রসূচী—আশ্বিন, ১৩৪৭


ত্রিবর্ণ—

• খাবার-থালা — শিল্পী—শ্রীসুশীল সেন

দ্বিবর্ণ—

বিজ্ঞাপ — শিল্পী—শ্রীঅজয় সেন

কার্টুন—

বিজ্ঞাপক (?) — শিল্পী—হীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী

সমাবে সমাবে — ঐ

চিকিৎসা-সঙ্কট — ঐ

প্রবন্ধান্তর্গত চিত্র :

অন্তঃপুর ৩১০

আমার প্যাটার্ণ

হিমালয়ের পথিকে ৩২৮

কাম্পিটে-তরুণী ডান দুরুহ ধারে হরিদ্রি বৃক্ষরাজ : কেলাস নদীর উপরে মহারাজার প্রাসাদ : কাম্পিটে রমণী : শ্রীবদরী কোলাস নদী : দূরে শুভ্রমাথা পাহাড় ডান দুরের পরিকল্পিত ভলাভূমি : ডান দুরের চারিটি বিভিন্ন বৃক্ষ।

বিচিত্র জগৎ ৩৩৩

কড়িংবাহীন যন্ত্র-চল মাটির বাড়ী : পোন থেকে মাটির পাত্র বার করা হচ্ছে : টাইবিসিয়ার পশ্চিম সীমান্তের বৃক্ষ পথের ধারে বাজার অঞ্চলে : কাইরোনেন-এর প্রবেশদ্বার : টিউনিসের একটি পথ : পশ্চাতে সিদি মাহরেজ মস্জিদ।

বিজ্ঞান-জগৎ ৩৩২

টেলিভিশনের জিন-টেলেসকোপের গুরু : ছাওয়া-চলমান্তক বৈদ্যুতিক মোটর-গাড়ী টেলিভিশনের চলচ্চিত্র প্রেরণের গুরু : নূতন ধরণের লৌহ-মুদ্রণ।


---

**ত্রুটি-স্বীকার**

গত ভাদ্রসংখ্যার ২৩ পৃষ্ঠার মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের শেষ লাইনে "পরিবেশক : এসোসিয়েটেড টকী ডিস্ট্রিবিউটার্স"-এর পরিবর্তে "পরিবেশক : এম্পায়ার টকী ডিস্ট্রিবিউটার্স পড়িতে হইবে।

মুদ্রাকর-প্রমাদ বশতঃ এইরূপ ভুল ছাপা হইয়াছিল। তজ্জন্য আমরা ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

---


# ঈস্‌টর্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে

পূজার ছুটি উপলক্ষে

## সুলভ মূল্যের যাতায়াতী টিকিট

( অন্যূন ৬৬ মাইল দূরত্বের জন্য )

| | | |
|---|---|---|
| ১ম, ২য় ও মধ্যম শ্রেণী | — | ১৳ ভাড়ায় যাতায়াত |
| ৩য় শ্রেণী ( ১৫০ মাইল পর্য্যন্ত ) | — | ১৳ „ „ |
| „ „ ( ১৫০ মাইলের উপর ) | — | ১½ „ „ |

২১এ সেপ্টেম্বর হইতে ২৬এ অক্টোবর পর্য্যন্ত এই টিকিট বিক্রয় হইবে। ইহার ফিরিবার অংশের মেয়াদ ৪৫ দিন, কিন্তু ২৫এ নবেম্বর মধ্যরাত্রির পর ইহার ব্যবহার চলিবে না। যাতায়াতের পথে যে কোন স্টেশনে যাত্রাবিরতি করা যাইবে, কিন্তু একই লাইনের একদিকে একাধিক বার ভ্রমণ করা চলিবে না।

ঈ. বি. রেলপথের সর্ব্বত্র ১৫ দিন ধরিয়া ইচ্ছামত ভ্রমণের জন্য

## অবাধ ভ্রমণ টিকিট

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রথম শ্রেণী | ৭৯৷৵০ | মধ্যম শ্রেণী | ১৫৮৵০ |
| দ্বিতীয় শ্রেণী | ৫৩৵০ | তৃতীয় শ্রেণী | ১০৳৵০ |

বিক্রয়ের তারিখ : ১৭ই অক্টোবর হইতে ৩০এ অক্টোবর পর্য্যন্ত।

নং পি/১৭৬/৪০।

# বঙ্গশ্রী—বিষয়সূচী

৮ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা ] [ কার্ত্তিক—১৩৪৭


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | শ্রীসচ্চিদানন্দ কট্টোপাধ্যায় | |
| বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা ও আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি ( ঃ ) | | ৪২১ |
| বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতীয় কাউন্সিল মহাসভার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ | | ৪২৪ |
| কাহারা অধিকতর সাম্প্রদায়িক মনোভাব বিশিষ্ট—হিন্দু না মুসলমান ? | | ৪২৯ |
| ভারতীয় জাতীয় মহাসভার কার্য্যকর নির্দ্দেশ | | ৪৩৪ |
| চিত্রকরের এক্‌জেকাস ( সচিত্র-গল্প ) | শ্রীপ্রমথনাথ বিশী | ৪৩৫ |
| যেখান হতেছে বিসর্জ্জনের বাঁশি (কবিতা) | শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য | ৪৩৮ |
| প্রেমের পিরিমিতি ( সচিত্র ) | শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত | ৪৩৯ |
| অনির্ব্বাণ ( উপন্যাস ) | শ্রীমেমদাস বাগচী | ৪৪১ |
| ফ্রেঞ্চ-ইণ্ডিয়ার কালেক্ট ও বাঙ্গলা সাহিত্য | শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ | |
| ভয় ( কবিতা ) | শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ | |
| ওয়া-পাকের ঝ-পড়ি ( গল্প ) | শ্রীসন্তোষকুমার গুপ্ত | |
| বঙ্গদেশে যা কি এলো হলি ! (কবিতা) | শ্রীকমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় | |
| হিমালয়ের পশ্চিমে ( সচিত্র ) | শ্রীঅমলেন্দুলাল রায়গুপ্ত | |
| জ্যোতিহারা ( নাটক ) | শ্রীঅনুরূপা দেবী | |
| ইংরেজের জাতীয়তা | শ্রীনির্ম্মলকুমার মুখোপাধ্যায় | |
| ঔষধপত্র ( গল্প ) | শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় | ৪৭১ |
| মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিণতি | শ্রীকালিদাস রায় | ৪৭৬ |
| যাদুঘরের যাদুঘর ( সচিত্র ) | শ্রীশৈলেশ্বর রায় | ৪৭৯ |
| আত্মবলী ( কবিতা ) | শ্রীশঙ্করনাথ বসু | ৪৮৯ |
| অতীতের সাথে ( গল্প ) | শ্রীঅমলা দেবী | ৪৯৭ |
| উৎসব নহে আজিকে মোর ( কবিতা ) | শ্রীসত্যনারায়ণ ঘোষ | ৫০৮ |
| হোলী ও দুর্গোৎসব-এর তুলনা ( সচিত্র ) | শ্রীচিত্তরঞ্জন কর | |
| যাত্রা সফল ( গল্প ) | শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় | |
| দুর্গাপূজার ঘরোয়াকথা | শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী | |
| পূজার কথা (কবিতা) | শ্রীমমতা ঘোষ | |
| পূজার অমরপুর ( সচিত্র ) | শ্রীরেখা দেবী | |
| বঙ্গ-সাহিত্যে ও প্রাচীন বাঙ্গালা সংবাদপত্রে বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব | শ্রীসুকুমার চৌধুরী | ৫৩৫ |
| শেষ ঘটনা ( সচিত্র-গল্প ) | শ্রীশচিন্দ্রলাল মোহান্তী | ৫৩৯ |
| শেষ অপমান ( কবিতা ) | শ্রীসরোজ গুপ্ত | ৫৭৯ |
| বিজয়ী ( উপন্যাস ) | শ্রীঅপরাজিতা দেবী | ৫৮০ |
| অনুতাপ ( কবিতা ) | শ্রীহীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য | ৫৮৫ |
| বিন্দুরের কথা | শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় | ৫৮৬ |



ডোয়ার্কিনের 'সোনরা' হারমোনিয়ম

নির্ভরযোগ্য হারমোনিয়ম
কিনতে হলে
ডোয়ার্কিনের কিনবেন।

উৎকৃষ্টতর মালমসলা ও উন্নততর নির্ম্মাণ-প্রণালী এগুলির বৈশিষ্ট্য।

'সোনরা' মডেল নং ৫৪, ডবল প্যারিস রীড, ৩ অক্টেভ, ৫ ষ্টপ, ২ বৎসরের গ্যারাণ্টী দ্বারা সুরক্ষিত।

বাক্স সহ ৪০৲ টাকা।

মূল্য-তালিকার জন্য লিখুন।

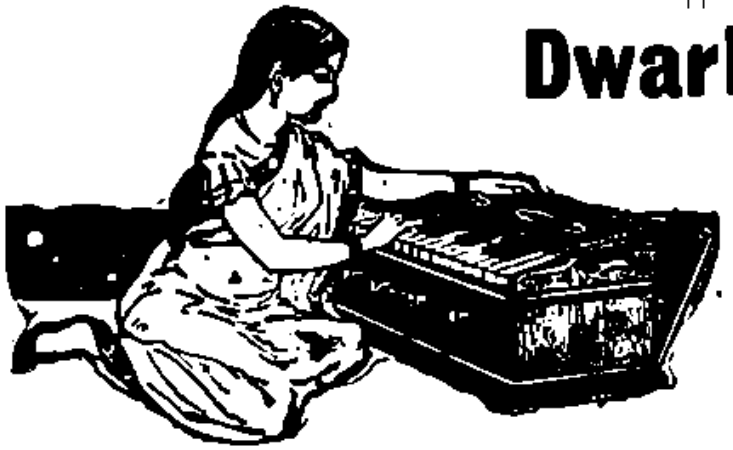

Dwarkin & Son, Ltd.

The oldest and largest Music-House in India

14, ESPLANADE, E.
CALCUTTA.

# বঙ্গশ্রী—চিত্রসূচী—পৌষ, ১৩৪৭

ত্রিবর্ণ—

পার্বত্য-দৃশ্য ( বঙ্গ-কলাশিল্পের ইতিহাস হইতে )

শিল্পী—শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

দ্বিবর্ণ—

কালীয় দমন — শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

কার্টুন—

একাদশী — শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সঙ্কের যাদুকর "

ওকেজো — শ্রীঅরবিন্দ বসু

ফলাফল "

প্রবন্ধান্তর্গত চিত্র :

বিচিত্র জগৎ ৮০৪

এরোপ্লেন হইতে মোসেলাইট উপত্যকার দৃশ্য : ফ্রেঞ্চ দুর্গের ভগ্নাংশ ; মাসের নদীর দৃশ্য ; মোসেলাইট উপত্যকার পর্ব্বতচূড়া : ঘন-সন্নিবেশের রটিকা এবং ভূমিপ্রবাহ লাভ ; ফ্রেঞ্চ দুর্গ : প্রকৃতিবিজ্ঞানবিদের বিবট প্রদর্শকারীরা ইহার কার্যবিধান প্রদর্শ করিতেছে।

অন্তঃপুর ৮১৩

মোটরের কার্বিডারের বহুধা।

কম খুন চাষ ৮০৯

কলেজোর : লাঙ্গলের ফলাকে ধনীভূত করা হইতেছে ; মোষা জল চুল্লীর উপর আল দেওয়া হইতেছে ; বেঞ্চল সল্ট কোম্পানীর কল করিবার ট্যাঙ্ক ; খাড়ি : গ্রামবাসীদের নোনা খাদি হইতে পরিত্রাণ করা।

বিজ্ঞান জগৎ ৮১৮

পরিষ্কৃত ফুল কলাল ; কীটের সাহায্যে কলাল পরিষ্কার করা হইতেছে ; নিরাপদ ফুয়োস : ফুল কলাল ভাঁড়া এই ফুয়োস কেন করিতে পারে না ; আলোকিত পুলিস প্রহরী ; কোন সময়ে সমস্তে একাগ্রভাবে চিন্তা করার ফলিত ফলের প্রকৃতি ; মস্তিষ্ক যখন নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকে না তখনকার সমাধি স্পন্দন ; চিন্তা বন্ধ করিলে স্পন্দনের স্বাভাবিক অবস্থা।


কি

# ন্যাশনাল মার্কেণ্টাইল

## ইন্সিওরেন্স কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ

হেড অফিস—৮ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন :—ক্যাল ৩২১০-৩২১৬ ] [ গ্রাম :—"টপমট"

বৃহত্তম মূলধন বিশিষ্ট ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের অন্যতম।

ব্লাহা ব্রাদার্স

ম্যানেজিং এজেণ্টস্

—অন্যান্য অফিস—

ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, পাবনা, খুলনা, রাণাঘাট; হাওড়া, হুগলী, ধানবাদ, পাটনা, রাঁচী, ভাগলপুর, দেওঘর, ধুবড়ী, গৌহাটী, শিলচর ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি এজেন্সী ভারতের সর্ব্বত্র।



উদয়নাচার্য্যকৃত

# ন্যায়পরিশিষ্ট

বর্দ্ধমানপ্রকাশ-সহিত

ইংরাজী ভূমিকা ও বিস্তৃত সূচী-সহ

ন্যায়শাস্ত্রের অপ্রকাশিতপূর্ব্ব তথ্যপূর্ণ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ।

শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ এম্-এ সম্পাদিত।

মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র।

মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড্

৪-বি, কাউন্সিল হাউস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছবি ৩৫

[ ১৩৬৭–১৩৬৮

127185
৭৫৩.৪ ০০২/৩
VERY

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

# স্বাস্থ্যসেবা

শ্রাবণ—১৩৪৭

৮ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—১ম সংখ্যা

**সম্পাদকীয়**

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

## বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা ও আধুনিক বিজ্ঞানের অসাফল্য (৩)

আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় কোন জাতীয় জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধান সম্ভবযোগ্য কি না ?

জাতীয় জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলি কয় শ্রেণীর, তৎপ্রসঙ্গে গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আমরা দেখাইয়াছি যে, জাতীয় জীবনের—শুধু জাতীয় জীবনের কেন, প্রত্যেক মনুষ্য-জীবনের—সমস্যা প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :—

(১) অর্থ-গত সমস্যা,
(২) স্বাস্থ্য-গত সমস্যা,
(৩) মন-গত সমস্যা,
(৪) যৌবন-গত সমস্যা,
(৫) মরণ-গত সমস্যা।

এই প্রসঙ্গে আরও দেখান হইয়াছে যে, উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর সমস্যার যুগপৎ সমাধান করিতে না পারিলে কোন মানুষের অথবা কোন জাতির দুঃখ সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত করা সম্ভব-যোগ্য নহে। ঐ পাঁচশ্রেণীর সমস্যার কোন এক শ্রেণীর, অথবা কোন দুই শ্রেণীর, অথবা কোন তিন শ্রেণীর, অথবা কোন চারি শ্রেণীর সমস্যার সমাধান হইলে কোন জাতীয় জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করা হয় না। জাতীয় জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতে হইলে এক সঙ্গে পাঁচ শ্রেণীর সমস্যার সমাধান করিতে হয়। ইহার নাম সমস্যার যুগপৎ সমাধান।

আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় যে, কোন দেশের অথবা কোন জাতির অর্থগত সমস্যার কোনরূপ সমাধান সম্ভব-যোগ্য হয় নাই, পরন্তু আধুনিক বিজ্ঞান যে, প্রত্যেক দেশের অর্থগত সমস্যা অপেক্ষাকৃত জটিল করিয়া তুলিয়াছে, তাহাও ঐ সংখ্যায় দেখান হইয়াছে।

কোন দেশের স্বাস্থ্য-গত সমস্যার, মন-গত সমস্যার, যৌবন-গত সমস্যার ও মরণ-গত সমস্যার সমাধান আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় সম্ভব-যোগ্য হইয়াছে কি না, আমরা এক্ষণে তাহার বিচার করিব।

ডক্টর মেঘনাদ সাহার মতে আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা জাতীয় জীবনের স্বাস্থ্য-গত সমস্যার সমাধান সম্ভব-যোগ্য হইয়াছে।

তিনি ১৩৪৬ সালের 'ভারতবর্ষে'র পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত "আধুনিক জগৎ ও হিন্দু-জাতি"-শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"বিজ্ঞান দীর্ঘজীবনের সমাধান করিয়াছে, যথা-যুগে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক যুগের পূর্ব্বে ইয়োরোপের গড় জীবনকাল ছিল ২৫ বৎসর। কিন্তু "গত ৫০ বৎসরের মধ্যে ইয়োরোপ ও

আমেরিকায় মানুষের গড়-পড়তায় জীবন বাড়িয়া প্রায় দুই গুণ অর্থাৎ প্রায় ৬৬ বৎসর হইয়াছে।"

গড়-জীবন-কালের ( average length of life-এর ) বৃদ্ধিকে যদি দীর্ঘজীবনের পরিমাপক বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে আধুনিক বিজ্ঞান যে দীর্ঘজীবনের সমাধান করিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কোন জাতির গড়-জীবন-কাল বৃদ্ধি পাইলেই যে ঐ জাতি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছে তাহা মনে করা যায় কি না, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, গড়-জীবন-কাল বৃদ্ধি পাইলেই যে কোন জাতি সর্ব্বতোভাবে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছে, ইহা মনে করা যায় না।

আমরা কেন উপরোক্ত কথা বলিলাম, তাহা বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, কতকগুলি ব্যক্তি-গত জীবন লইয়া এক একটি জাতি গঠিত হয়। যে ব্যক্তি-গত জীবন-গুলি লইয়া এক একটী 'জাতি' গঠিত হয়, সেই ব্যক্তিগত জীবনগুলির মধ্যে যত অধিকসংখ্যক ব্যক্তিগত-জীবন যত অধিকসংখ্যক বৎসর জীবিত থাকিতে পারিবে, ততই ঐ জাতি অধিক পরিমাণে দীর্ঘজীবন লাভ করিতেছে, ইহা বুঝিতে হইবে। যদি দেখা যায় যে, চল্লিশ বৎসর আগে কোন এক জাতির জন্মহার ছিল বৎসরে দুই শত, কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে ঐ জাতির ৪০ বৎসর বয়স্ক মানুষের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮০ জন মাত্র, তাহা হইলে বুঝিতে হয় যে, গত ৪০ বৎসরে ঐ জাতির শতকরা ৬০ জন মানুষই ৪০ বৎসর বয়স্ক না হইতে হইতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

আবার যদি দেখা যায় যে, ঐ-জাতির পঞ্চাশ বৎসর আগে জন্মহার ছিল বৎসরে একশত, কিন্তু ১০ বৎসর আগে ঐ-জাতির ৪০ বৎসর বয়স মানুষের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৬০ জন, তাহা হইলে বুঝিতে হয় যে, দশ বৎসর আগেও ঐ-জাতির শতকরা ৬০ জন মানুষ ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত পরমায়ু লাভ করিত এবং শতকরা ৪০ জন মানুষ ৪০ বৎসর বয়স্ক না হইতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইত।

এতদবস্থায় হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, মোট লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, গড়-জীবন-কালও বাড়িয়া যাইতেছে, অথচ জন্মহারের তুলনায় পরিণত বয়স্ক মানুষের সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে।

বাস্তবিক পক্ষে বাৎসরিক জন্মহারের কত অংশ কত দীর্ঘ জীবন লাভ করিতেছে, তাহা দেখিয়া জাতীয় জীবনের দীর্ঘ-জীবন সমাধান হইতেছে কি না, তাহার সিদ্ধান্ত হওয়া সঙ্গত। যে কোন দেশের গত ষাট বৎসরের লোক-গণনার তালিকা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, অধিকাংশ দেশেই প্রত্যেক পরবর্ত্তী দশ বৎসরের বাৎসরিক গড় জন্ম-সংখ্যা পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরের বাৎসরিক গড় জন্ম-সংখ্যার তুলনায় বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহার ফলে দশ বৎসরান্তর যে লোক-গণনা (census) হইয়া থাকে, তাহার প্রত্যেক লোক-গণনায় ঐ সমস্ত দেশে মোট জন-সংখ্যা ক্রমিক বৃদ্ধি পাইতেছে এবং গড়-জীবন-কালও (average length of life) ঐ সমস্ত দেশে বাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু প্রায় প্রত্যেক দেশেই জন্মহারের তুলনায় পরিণত-বয়স্ক মানুষের হার (ratio of mature people above the age of 40) অতি উচ্চ হারে কমিয়া যাইতেছে।

Statistical অঙ্কপাতের বহুবচন বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহা সাধারণ পাঠকবর্গের তৃপ্তিজনক হইবে না, মনে হওয়ায় আমরা এখানে census statistics উদ্ধৃত করিলাম না। মেঘনাদ বাবু এখনও আত্ম-পরীক্ষার দ্বারা নিজের চিন্তাহীনতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই মনে হইলে ভবিষ্যতে আমরা এই census statistics উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগের বক্তব্য আরও সুপরিষ্কৃত করিব।

প্রায় প্রত্যেক দেশেই বাৎসরিক জন্মের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, প্রায় প্রত্যেক দেশেই প্রত্যেক দশ বৎসরান্তর লোক-গণনায় মোট জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, গড়-জীবন-কাল বাড়িয়া যাইতেছে, অথচ জন্মহারের তুলনায় চল্লিশ বৎসরের পরবর্ত্তী পরিণতবয়স্ক লোকের সংখ্যার হার কেন হ্রাস পাইতেছে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, চন্দ্র ও সূর্য্য-সর্ব্বনিয়ন্তার গাণিতিক নিয়মানুসারে বর্ত্তমান কালে ক্রমশঃই পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তাহার ফলে পৃথিবীতে তেজ ও রসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ সমস্ত জীবের জনন-সামর্থ্য বাড়িয়া যাইতেছে। পৃথিবীস্থ সমস্ত জীবের জনন-সামর্থ্য উপরোক্ত কারণে বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়াই নানা আকারের জন্ম-নিরোধ প্রথার প্রচলন হওয়া সত্ত্বেও মানুষের

বাৎসরিক জন্মহার প্রায় প্রত্যেক দেশেই বাড়িয়া চলিতেছে। এতদবস্থায় মানুষ যদি প্রকৃতি-সম্ভবীয় বিজ্ঞান নিখুঁত ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিত এবং তদনুসারে চলাফেরা করিতে পারিত, তাহা হইলে এক দিকে যেরূপ জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব হইত, অন্য দিকে আবার পরিণত-বয়স্ক মানুষের আয়ুও বৃদ্ধি পাইতে পারিত। কিন্তু বিজ্ঞানের নামে কু-জ্ঞানের প্রচলন হওয়ায় এবং মানুষ গরলকে অমৃত বলিয়া গ্রহণ করায়, এক দিকে যেরূপ জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তি হ্রাস পাইয়া যাইতেছে এবং প্রত্যেক দেশেই অধিকাংশ সংখ্যক মানুষ অনাহারে, অর্দ্ধাহারে ও অবিধেয় আহারে নানা রকমের অস্বাস্থ্য ও যাতনা ভোগ করিতেছে, অন্য দিকে আবার জন্ম-সংখ্যার তুলনায় প্রায় প্রত্যেক দেশেই পরিণত-বয়স্ক মানুষের হার কমিয়া যাইতেছে। গত ১৯২১ ও ১৯৩১ সালে ইংলণ্ডে ও ইউনাইটেড ষ্টেটসে যে সেন্সাস হইয়া গিয়াছে, ঐ দুইটী সেন্সাসের সহিত ঐ দুইটী দেশের ১৮৮১ ও ১৮৯১ সালের দুই সেন্সাসের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, ১৮৮১ সালে পাঁচ বৎসরের অনূর্দ্ধ বয়স্ক যে লোক-সংখ্যা বিদ্যমান ছিল, তাহার শতকরা ৬০ জন মানুষ ১৯২১ সালে ৪০ হইতে ৪৫ বৎসর বয়স লাভ করিতে পারিয়াছিল। আর ১৮৯১ সালে পাঁচ বৎসরের অনূর্দ্ধ বয়স্ক যে লোক-সংখ্যা বিদ্যমান ছিল, তাহার শতকরা ৫৭ জন মানুষ ১৯৩১ সালে ৪০ হইতে ৪৫ বৎসর বয়স লাভ করিতে পারিয়াছিল। ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, ইংলণ্ড ও ইউনাইটেড ষ্টেটসে ১৮৮১ সাল হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত যে চল্লিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, সেই চল্লিশ বৎসরে শতকরা ৪০ জন মানুষ চল্লিশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার আগে মৃত্যুমুখে পতিত হইত, আর, ১৮৯১ হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত যে চল্লিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, সেই চল্লিশ বৎসরে ঐ দুইটী দেশে শতকরা ৫০ জন মানুষ অর্থাৎ অর্দ্ধেকের ও উপরে ৪০ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার আগেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও যদি ডক্টর সাহা বলিতে পারেন যে, বিজ্ঞান মানুষের দীর্ঘ জীবনের সমাধান করিয়াছে তাহা হইলে আমরা নাচার। আমাদিগের মতে, আধুনিক তথাকথিত বিজ্ঞান মানুষকে মস্তিষ্কহীন ও অধর্ম্ম দাম্ভিক করিয়া তুলিয়াছে। ডক্টর সাহা আমাদিগের এই কথার একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত। সাহা, তিনি প্রভৃতি বৈদ্যগণের মধ্যে যে-শিক্ষার দ্বারা ভারতীয় ঋষিগণ প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাহা ভারতীয় ঋষি-প্রণীত সংহিতা হইতে যথাযথভাবে অনুধাবন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঐ ঐ বংশীয় সন্তানগণের স্বাভাবিক বুদ্ধি লাভ করা খুবই সম্ভবযোগ্য। সাহা, তিনি প্রভৃতি বংশের আধুনিক সন্তানগণকে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, ইঁহাদিগের অনেকেরই স্বাভাবিক বুদ্ধি বিদ্যমান আছে, কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞানের কু-শিক্ষার ফলে ইঁহাদিগের শিক্ষিতগণ বিপথ-গামী ও কুলাঙ্গার হইয়া সমাজের হিত অপেক্ষা অহিতই অধিক পরিমাণে সাধিত করিতেছেন, এবং তাহা বুঝিতেও পারিতেছেন না। কুশিক্ষার ফলে ইঁহাদের মস্তিষ্ক এত কড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা একদিন চাকুরীর দাসত্বকে ঘৃণার্হ মনে করিতেন, তাঁহারা আজ চাকুরীর অথবা প্রস্তাবিত কারবারের কয়েক সহস্র টাকার উপার্জ্জনে স্ফীত-মস্তিষ্ক হইয়া থাকেন। ইঁহাদিগের যদি কোন মনুষ্যোচিত মস্তিষ্ক থাকিত, তাহা হইলে ইঁহারা বুঝিতে পারিতেন যে, আজকালকার টাকার মূল্য সাময়িক মাত্র এবং উহা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। ইহার জন্য যে দম্ভ ও দর্প তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ব্রাহ্মণ-বংশের সন্তানগণ যেরূপ প্রমজীবিগণের ধিক্কারের যোগ্য, এই সাহা ও তিলি বংশীয় বৈদ্য-সন্তানগণও তাহাদিগের তাদৃশ ধিক্কারের যোগ্য, কারণ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য-সন্তানগণ মিলিত হইয়াই একদিন সমাজের আর্থিক সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন এবং এই দুই শ্রেণীর মানুষের অবঃপতন হওয়ায় আজ সমগ্র মনুষ্য-জগৎ অর্থাভাবে, অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে জর্জ্জরিত হইতেছে। মনুষ্য-সমাজ যদি আবার প্রকৃত মানুষের মত হইয়া দাঁড়াইতে চায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সন্তানগণ যাহাতে বেতন-ভুক্ চাকুরী না পায়, তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। আমাদিগের কথা হয়তো অনেকেরই অবোধ্য হইবে, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম জানা থাকিলে মানস-চক্ষুর দ্বারা দেখা যাইবে যে, ডক্টর সাহার মত মস্তিষ্কযুক্ত মানুষ যদি চাকুরী না পাইতেন এবং প্রকৃত বৈদ্যোচিত ভাবে জীবিকার্জ্জন করিতে বাধ্য হইতেন, তাহা হইলে তিনি এতাদৃশভাবে অযৌক্তিকভাবে বকিতে পারিতেন না, এবং বর্ত্তমান তথাকথিত বিজ্ঞান যে সর্ব্বোতোভাবে কু-জ্ঞান-পরিপূর্ণ, তাহা তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইত। প্রাণের কত যাতনায় ভ্রূণের

এই উক্তির সাহায্যে ও তাহার শ্রেণীর মানুষগুলিকে এত গালাগালি করিতে হইতেছে, তাহা কেহ বুঝিতে পারিবেন কি? নিরপরাধ শিক্ষিত যুবকগণ—তাহাদিগের স্ফীত-মস্তিষ্ক অধ্যাপকগণের অদূরদর্শিতার ফলে ও নিম্নীয় প্রমজীবিগণ সমাজের নেতৃবর্গের নির্বুদ্ধিতার ফলে যে যাতনায় জর্জরিত হইতেছে, তাহা যদি কেহ কণিকের জন্যও অনুমান করিবার প্রয়াস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের যাতনা কোথায়, তাহা অনুভব করিতে পারিবেন এবং মেথরাদি সাধা শ্রেণীর মানুষকে কথাঘাত করিবার প্রয়োজনীয়তা কি তাহাও বুঝিতে পারিবেন। আধুনিক বিজ্ঞান যে কোন দেশের স্বাস্থ্যগত সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হয় নাই, পরন্তু প্রত্যেক দেশের স্বাস্থ্যগত সমস্যা অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছে, তাহা যেরূপ লোক-গণনার তালিকা (Census Statistics) হইতে উপরোক্ত ভাবে প্রমাণিত হইতে পারে, সেইরূপ আবার বিজ্ঞান-সেবী দেশগুলির হাসপাতালসমূহের বাৎসরিক বিবরণগুলি (annual reports) পাঠ করিলেও উহা প্রতিভাত হয়। ঐ বাৎসরিক বিবরণগুলি পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক দেশেই ব্যাধির শ্রেণী (varieties of disease), ব্যাধির মাত্রা (intensity of disease), ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা (number of diseased persons) উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের প্রধান দান যন্ত্র-শিল্প। কোন যন্ত্র-শিল্পাগারে (in any factory) মানুষের স্বাস্থ্য যে কখনও সর্বতোভাবে রক্ষা করা সম্ভব হয় না, এবং যন্ত্র-শিল্পীর স্বাস্থ্য যে কুটীর-শিল্পীর স্বাস্থ্যের তুলনায় প্রায়শঃ হীন হইয়া থাকে, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের চিকিৎসাব্যবসায়িগণ পর্যন্ত স্বীকার করিয়া থাকেন। এদিক্ দিয়া দেখিলেও আধুনিক বিজ্ঞান যে স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইতে পারে না, পরন্তু অবনতি সাধন করিতে বাধ্য, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

কাযেই আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় কোন জাতীয় জীবনের অর্থগত সমস্যার সমাধান যেরূপ সম্ভব নহে, সেইরূপ স্বাস্থ্যগত সমস্যার সমাধানও সম্ভবযোগ্য নহে, ইহা প্রমাণিত হইল।

আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় কোন জাতীয় জীবনের মন-গত সমস্যার কোন সমাধান হইয়াছে কি না এবং হইতে পারে কি না, তাহার বিচার করিতে হইলে, মন কোন্ অবস্থায় হইলে মন-গত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়, তাহা আগে আমাদিগকে জানিতে হইবে। মন কোন্ অবস্থায় হইলে মন-গত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়, তাহা জানিতে হইলে, মন কয় শ্রেণীর অবস্থায় হয়, তাহা স্থির করিতে হয়।

মন কয় শ্রেণীর অবস্থায় হইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধীয় বিস্তৃত কথা আছে ভারতীয় ঋষি-প্রণীত দর্শনে। ভারতীয় ঋষির ঐ সমস্ত কথা সূক্ষ্মতম বিষয় পর্যন্ত বিস্তৃত এবং অল্প কথায় বোধগম্য করা সম্ভবযোগ্য নহে। ভারতীয় ঋষির মন-বিষয়ক কথাগুলি প্রকাশ করিতে হইলে একে অনেক কথা বলিবার প্রয়োজন হয়, তাহার উপর আবার ঐ সমস্ত কথা অতীব দুরূহ। ইহা চিন্তা করিয়া আমরা সংক্ষেপে সারিবার জন্য পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের এতৎসম্বন্ধীয় মতবাদের আশ্রয় লইব।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের কথা ভাল করিয়া হজম করিতে পারিলে দেখা যাইবে, মানুষের ভাবগত উপাদান দুইটী, যথা :—(১) যুক্তি-প্রবণতা (rationality), ও (২) পাশবিকতা (animality)। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের উপরোক্ত মতবাদ বাস্তব সত্যের সহিত মিলাইয়া লইয়া কোন কথা বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, মানুষের যুক্তি-প্রবণতা যত বৃদ্ধি পায়, মানুষ ততই সুখ-শান্তির আধার হইয়া থাকে, আর মানুষের পাশবিকতা যত বৃদ্ধি পায়, মানুষের দুঃখ ও অশান্তি ততই বৃদ্ধি পায়। উপরোক্ত দার্শনিকতা হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, যখন মানবসমাজে পাশবিকতা অত্যন্ত প্রবল ভাব ধারণ করে, তখন মানসিক শান্তি অথবা মন-গত সমস্যার সমাধান যে সুদূরপরাহত, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। দ্বন্দ্ব-কলহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ যে পাশবিকতার অন্য নাম, ইহা বলাই বাহুল্য। এখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, ইউরোপ দ্বন্দ্ব-কলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে এতাদৃশভাবে মত্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন আধুনিক বিজ্ঞান যে বিজ্ঞানাশ্রয়ী জাতির মন-গত সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

অকাল-বার্দ্ধক্য ও অকাল-মৃত্যুর সমস্যা-সমাধান পক্ষে যে বর্তমান বিজ্ঞান কোন সহায়তা করিতে পারে নাই, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ লোক-গণনার তালিকা-সমূহ (Census

Statistics)। পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, যখন বিজ্ঞানাশ্রয়ী ইংলণ্ড ও ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ পর্য্যন্ত শতকরা ৫০ জনই চল্লিশ বৎসরে উপনীত হইবার আগে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, তখন বর্ত্তমান বিজ্ঞান যে কোন জাতির স্বাস্থ্যগত ও মরণগত সমস্যার সমাধান আদৌ করিতে সাফল্য লাভ করে নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

"আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় কোন জাতীয় জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধান সম্ভবযোগ্য কি না"—এই প্রসঙ্গে আমরা এতাবৎ যাহা যাহা বলিয়াছি, তাহা অনুধাবন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় কোন জাতীয় জীবনের কোন বাস্তব সমস্যার সমাধান সম্ভব-যোগ্য হয় নাই এবং হইতে পারে না। অবশ্য এ-কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমরা যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছি, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপন্ন মস্তিষ্কসমূহের সংস্কার-বিরুদ্ধ এবং ঐ সমস্ত যুক্তি যাঁহারা স্ব স্ব সংস্কারগুলির পরীক্ষা করিতে অসমর্থ, তাঁহাদিগের পক্ষে অনুধাবন করা সহজসাধ্য নহে।

আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় যে, কোন জাতীয় জীবনের বাস্তব সমস্যার আমূল সমাধান করা সম্ভবযোগ্য নহে, পরন্তু উহার জন্য যে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রয়োজন, তাহা অনেক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতগণের কথাতেও ব্যক্ত হইয়াছে।

আমরা আশ্চর্য্য হই যে, উইল্‌স সাহা এতৎসত্ত্বেও বেদ ও ধর্ম্মের নিন্দক এবং বিজ্ঞানের হিতকারিত্ব সম্বন্ধে গোঁড়ামী পোষণ করিয়া থাকেন। আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে যে, উইল্‌স সাহা ইংরাজী মতবাদগুলি পর্য্যন্ত অনুধাবন করিতে পারেন না?

আমরা সাধারণতঃ অপর কাহারও মতবাদ উদ্ধৃত করি না। কিন্তু উইল্‌স সাহার পড়াশুনা ও মতবাদ কত নিম্নস্তরীয়, তাহা দেখাইবার জন্য প্রখ্যাতনামা পাশ্চাত্য কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের ও পণ্ডিতের মতবাদ উদ্ধৃত করিব।

"No Sciences are better attested than the religion of the Bible," অর্থাৎ, বাইবেল-প্রোক্ত ধর্ম্ম অপেক্ষা কোন বিজ্ঞানই অধিকতর সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। এই কথাটী বর্ত্তমান বিজ্ঞানের জন্মদাতা Sir Isaac Newton-এর (স্যর আইজাক নিউটন) লেখনীপ্রসূত।

"I have lived long enough to know what I did not at one time believe—that no society can be upheld in happiness and honour without the sentiment of religion"—অর্থাৎ এককালে আমি যাহা বিশ্বাস করিতাম না, কিন্তু পরবর্ত্তী দীর্ঘজীবনকালে আমার অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ব্যতীত কোন সমাজই সুখ এবং মর্য্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে না।

ইহা Laplace (লাপ্লাস)-এর কথা।

"If men are so wicked with religion, what would they be without it!" অর্থাৎ, ধর্ম্ম সত্ত্বেও মনুষ্য যখন এরূপ পাপাসক্ত, ধর্ম্ম-হীন হইলে তাহাদের কি অবস্থা-ই না হইত!

ইহা Franklin (ফ্র্যাঙ্কলিন)-এর কথা।

"I have come to have very profound and deep-rooted doubts, whether Science, as practised at present by the human race, will ever do anything to make the world a better and happier place to live in or will ever stop contributing to our general misery,"—অর্থাৎ, বর্ত্তমানে মনুষ্যজাতি যে-বিজ্ঞানাশ্রয়ী হইয়া চলিয়াছে, তাহা কোন কালে পৃথিবীকে অধিকতর সম্পদ্ এবং সুখের আগারে রূপান্তরিত করিতে পারিবে কি না, কিংবা তাহা আমাদের সাধারণ দুঃখ-দুর্দ্দশার বৃদ্ধি না করিয়া থাকিতে পারিবে কি না, তাহাতে আমার গভীর এবং ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

ইহা Hendrik Van Loon (হেনড্রিক ভ্যান লুন)-এর কথা।

"Men sometimes speak as though the progress of Science must necessarily be a boon to mankind, but that, I fear, is one of the comfortable 19th century delusions which our more disillusioned age must discard"—অর্থাৎ, এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা এরূপ ভাবে কথা বলিয়া থাকেন, যেন বিজ্ঞানের উন্নতি মনুষ্য জাতির পক্ষে নিশ্চিতরূপে বরপ্রদ হইবে, কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় যে, ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু সান্ত্বনাজনক

মরীচিকার অন্তর্গত এবং আমাদের অপেক্ষাকৃত অনধিক মরীচিকা যুক্ত যুগে ঐ ধারণা পরিহার করিতে হইবে।

ইহা Bertrand Russell (বারট্রাণ্ড রাসেল)-এর কথা।

"The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science. He to whom this emotion is a stranger, who can no longer pause to wonder and stand rapt in awe, is as good as dead, his eyes are closed,"—অর্থাৎ, আমাদের উপলব্ধিযোগ্য সুন্দরতম বিষয় হইতেছে এই রহস্যময় পারিপার্শ্বিক। সকল প্রকৃত কলা এবং বিজ্ঞানের ইহাই আদি। যে ইহাতে বিস্মিত না হয়, যে ইহার প্রতি চাহিয়া আর বিস্ময়াবিষ্ট এবং আত্মহারা হইতে পারে না,—সে মৃতবৎ, তাহার দৃষ্টি চিরকালের জন্য সে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

ইহা Albert Einstein (আলবার্ট আইনষ্টাইন)-এর কথা।

"Science cannot determine origin, and so cannot determine destiny. As it presents only a sectional view of creation, it gives only a sectional view of everything in creation."—অর্থাৎ, বিজ্ঞান আদি-নির্ণয়ে করিতে পারে নাই, সুতরাং অন্ত নির্ণয়েও পারে না। বিশ্ব-সৃষ্টির অংশবিশেষ মাত্র ইহার গোচরীভূত হইয়াছে, সুতরাং বিশ্ব-সৃষ্টির সকল কিছুরই অংশবিশেষ সম্বন্ধেই ইহা ধারণা দান করিতে পারে।

ইহা T. T. Munger (টি. টি. মুঙ্গার)-এর কথা।

"Godless Science reads nature only as Milton's daughters did Hebrew, rightly syllabling the sentences, but utterly ignorant of the meaning"—অর্থাৎ, বাক্যের ধ্বনি মাত্র রক্ষা করিয়া কিন্তু অর্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া মিল্টন-দুহিতারা যেরূপ হিব্রু পাঠ করিতেন, এই ঈশ্বর-জ্ঞানহীন বিজ্ঞানের প্রকৃতি অনুধাবনও তদ্রূপ।

ইহা Coley ( কোলি ) এর কথা।

আমরা ডক্টর সাহাকে আর অধিক কিছু বলিব না, কারণ তিনি বেদ ও ধর্মের নিন্দক। "The first step to knowledge is to know that we are ignorant"—অর্থাৎ, আমরা যে অজ্ঞ ইহাই জ্ঞানের প্রথম সোপান। Cecil (সিসিল)-এর এই কথাটী আমরা ডক্টর সাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

বলিহারি যাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ণধার ডক্টর শ্যামাপ্রসাদকে, যিনি এবংবিধ যুক্তিজ্ঞানবিহীন বেদ-নিন্দক পদার্থটিকে ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য সায়েন্স কলেজের কেদারায় বসাইতে পারিয়াছেন!

হিন্দু-মহাসভার নেতৃত্ব-প্রয়াসী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদকে ও বেদ-নিন্দক যুক্তিজ্ঞানবিহীন ছাত্রাধম এই বৈজ্ঞানিক ডক্টর সাহাকে জনসাধারণ চিনিয়া রাখুন। অনেক কাজে লাগিবে। এক্ষণে আপনারা জার্মান যুদ্ধ দেখিতেছেন! দশ বৎসরের মধ্যে যে মহা-বিপ্লব জগতের মধ্যে দেখা যাইবে এবং যে বিপ্লবে ভারতীয় কবির ভারত তাহার স্ব-স্থান পুনরায় অধিকার করিবে—সেই মহা-বিপ্লব জার্মান যুদ্ধ হইতেও ভীষণতর। ঐ সময় ঐ দুইটী নির্লজ্জ নাস্তিক পদার্থের দৃষ্টান্ত অনেক কাজে লাগিবে। এক্ষণে আমাদিগের কথা আপনারা বুঝিতে পারিবেন না। তখন বুঝা সম্ভব হইলেও হইতে পারে।

ডক্টর সাহার যুক্তিজ্ঞান ও পড়াশুনার প্রসার কতখানি, তাহা আমরা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদকে এখনও উপলব্ধি করিয়া উঁহাকে ছাত্র-শিক্ষার কার্য্য হইতে বিদায় দিতে অনুরোধ করি।

যিনি সাধারণ যুক্তিগুলি অনুধাবন করিতে সক্ষম নহেন, তিনি বেদ ও ধর্মের নিন্দা করিতে সাহসী হন কোন্ ভরসায়, তাহা শ্যামাপ্রসাদ বাবু এই কৃপাধারকে জিজ্ঞাসা করিবেন কি?

যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় কোন জাতীয় জীবনের কোন বাস্তব সমস্যার সমাধান হয় নাই এবং হইতে পারে না, তখন "কোন্ বিজ্ঞানে জাতীয় জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধান সর্ব্বতোভাবে সম্ভবযোগ্য," তাহার আলোচনা আমাদিগকে করিতে হইবে। উহা আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় আরম্ভ করিব।

# বিশ্ব-শান্তি এবং মহাপ্রলয় দিবস

গত ১০ই জুন তারিখে কার্ল ভন ওয়েগাণ্ড ( Karl von Wiegand) নামীয় আর্কিন সাংবাদিকের হিটলারের সহিত যে সাক্ষাৎকার ঘটে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাহার বিবরণী সম্বন্ধে রাখিয়া আমরা বর্ত্তমান সন্দর্ভ রচনা করিতেছি। উহার কথোপকথনে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য বলিয়া আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে :—

(১) "জার্মান জাতির একমাত্র উদ্দেশ্য শান্তি ( The only German aim was peace )"

(২) "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস-সাধন হিটলারের কাম্য নহে, যাঁহারা এই সাম্রাজ্যের ধ্বংস-সাধন করিতেছেন, তাঁহার কামনা তাঁহাদিগের ধ্বংস-সাধন ( Hitler did not want to smash the British Empire but he would destroy those who were destroying that Empire. )"

(৩) "কেবল সন্ধি-সর্ত্তে আবদ্ধ হইলেই শান্তির উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না, পরন্তু জাতি-সমূহের কাণ্ডজ্ঞানের উদয়েই উহা সাধিত হইবে—ইহা আমি ( অর্থাৎ হের হিটলার ) পরিজ্ঞাত আছি। [ I ( i.e., Herr Hitler ) am aware that the aim of peace cannot be reached by treaties alone, but must come by the dawning of reason within nations ]"

এই কথোপকথনের প্রথম এবং দ্বিতীয় বিষয় হইতে স্পষ্ট হইতেছে যে, হের হিটলারের বর্ত্তমান যুদ্ধের লক্ষ্য হইতেছে সর্ব্বতোভাবে শান্তি-প্রতিষ্ঠা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস-সাধন তাঁহার কাম্য নহে, পরন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শীর্ষে যে ব্রিটিশ মন্ত্রীবৃন্দ এবং শাসকবৃন্দ রহিয়াছেন, তাঁহাদের ধ্বংস-সাধনই তাঁহার কাম্য, কেন না তাঁহার মতে এই ব্যক্তিবৃন্দই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস-সাধন করিতেছেন।

এই কথোপকথনে হের হিটলার যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে সুস্পষ্ট হয় যে, তাঁহার মস্তিষ্কসামর্থ্যে কোথাও কোন ত্রুটি বিদ্যমান। তাঁহার মস্তিষ্কে কোন গোল-মাল না থাকিলে তিনি অচিরাৎ বুঝিতে পারিতেন যে, পাপাশয় হউক কিংবা নিষ্পাপ হউন, কোন একটি মাত্র ব্যক্তিরও ধ্বংস-সাধন কামনার কোন কার্য্যে অগ্রসর হইলে সর্ব্বব্যাপক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

প্রকৃত প্রস্তাবে জগদ্ব্যাপী শান্তি-প্রতিষ্ঠা হের হিটলারের লক্ষ্য হইলে ব্রিটিশ মন্ত্রীবৃন্দ এবং শাসকবৃন্দের ধ্বংস-সাধন করিয়া তিনি তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না। কেন না ব্রিটিশ মন্ত্রীবৃন্দ এবং শাসকবৃন্দও জগদ্বাসী ব্যক্তি এবং তাঁহারাও মনুষ্যাংশের একাংশ। হয়তো ইহা মনে করা সমীচীন যে, বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার কার্য্যে ব্রিটিশ মন্ত্রীবৃন্দ এবং শাসকবৃন্দের সমধিক করণীয় ছিল এবং তাঁহাদের বিবিধ পাপাচরণ হেতু তাঁহারা এই দায়িত্ব পালন করিতে পারেন নাই, কিন্তু সমগ্র জগতের শান্তি-প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য হইলে, ঐ কারণে তাঁহাদের ধ্বংস সাধন কোনও কাম্য হইতে পারে না। যে-ব্যক্তির এমন শক্তি যে, তিনি বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার মনোভাব রক্ষা করেন, তাঁহাকে—কি করিয়া এই সকল পাপাশয় মন্ত্রীবৃন্দ এবং শাসকবৃন্দের ধ্বংস-সাধন না করিয়া তাঁহাদিগকে সংশোধন করা যায়—তাহাও পরিজ্ঞাত হইতে হইবে। হয় তো এই পাপাচারী মন্ত্রীবৃন্দ এবং শাসকবৃন্দের জন্য বহুবিধ শাস্তি ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে, কিন্তু এই সকল শাস্তি যাহাতে ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার কিংবা পুত্রের প্রতি পিতার আচরণ অনুযায়ী হয়, তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। এই নিমিত্ত ইহা বলা যুক্তি-সঙ্গত যে, বিশ্বব্যাপী শান্তি-প্রতিষ্ঠা হের হিটলারের লক্ষ্য, তাঁহার এই ঘোষণা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইলেও, তিনি তদ্‌ভক্তে প্রকৃত পন্থার অনুসরণে অসমর্থ হইয়াছেন।

সর্ব্বব্যাপক শান্তি-প্রতিষ্ঠার উপায় কোন প্রকার দীর্ঘ অথবা খণ্ড যুদ্ধ, এমন কি স্বল্প-কালব্যাপী নহে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। স্ত্রী কন্যা অথবা পুত্র, ভ্রাতা অথবা বন্ধুকে যদি সামান্য অসুস্থতার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় এবং তাহাতে তাহার মানসিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়, ইহা মনে রাখিয়া কেহ যদি কল্পনা করিবার চেষ্টা করেন, বর্ত্তমান যুদ্ধে বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহের অধিবাসী জন-সাধারণের অবস্থা কি হইয়াছে, তবে কোন প্রকার যুদ্ধ-সহায়তার দ্বারা যে, সর্ব্বব্যাপক শান্তি কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, এই সত্য সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে তাঁহার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হইবে না।

সুতরাং স্বভাবতঃ প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে: "যুদ্ধের দ্বারা সর্ব্বব্যাপক শান্তি প্রতিষ্ঠিত যদি না হয়, তবে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাগণ যুদ্ধ সমর্থন করেন কেন?" এই প্রশ্নের উত্তর দান করিতে হইলে আমাদিগকে নিম্নলিখিত কতিপয় সত্য উপলব্ধি করিতে হইবে।

(১) সর্ব্বপরিব্যাপ্ত কোন একটি বিশেষ দ্রব্য, চরাচর-নিহিত তথা জীবদেহস্থ রস ও তেজের সংমিশ্রণে উভয়ই যে বিদ্যমান, তাহা মানুষের উপলব্ধির যোগ্য। এই বায়ু, রস ও তেজের সংমিশ্রণরূপী কোন একটি বিশেষ দ্রব্যই মনুষ্য-জগতের এবং মনুষ্য-জীবনের মূলে বিদ্যমান। বায়ু, রস ও তেজের সংমিশ্রণরূপী সর্ব্বপরিব্যাপ্ত এই কোন একটি বিশেষ দ্রব্য হইতেই জীবকোষ এবং জীব-দেহের অণু-পরমাণুর উদ্ভব এবং তাহা হইতেই চর্ম্ম, রক্ত এবং মাংসের সৃষ্টি। মাংস, রক্ত এবং চর্ম্মের সৃজনাবধি জীবদেহ মূলতঃ বিবিধ প্রভাবে কার্য্যশীল হয়, যথা, প্রথমতঃ, ঐ বায়ু, রস ও তেজের সংমিশ্রণের ক্রিয়াকলাপে, দ্বিতীয়তঃ মাংস, রক্ত এবং চর্ম্মের ক্রিয়াকলাপে।

(২) মনুষ্য-জাতির কার্য্যকলাপ এবং অস্তিত্ব এই যে দুই প্রকার প্রভাবের অধীন, যে-ব্যক্তি স্বীয় দেহমধ্যে ইহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন, সর্ব্বপরিব্যাপ্ত কোন একটি বিশেষ দ্রব্য, যাহা মনুষ্য-শরীরের বায়ু, রস ও তেজের সংমিশ্রণে সতত বর্ত্তমান, তাহা কখনও মনুষ্যদেহের পক্ষে কখনও অনিষ্টজনক হইতে পারে না। অর্থাৎ ইহা সর্ব্বদা দেহের পক্ষে স্বাস্থ্যপ্রদ এবং কল্যাণজনক। কেবল কোন কোন অবস্থায়, মাংস, অথবা রক্ত, অথবা চর্ম্মের কার্য্যকলাপই মানুষের পক্ষে অস্বাস্থ্যপ্রদ এবং অনিষ্টজনক হয়। যে-ব্যক্তি এতদ্বিষয়ক সত্য উপলব্ধি করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, মাংস, রক্ত এবং চর্ম্মের যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক ক্রিয়াসমূহকে যদি বায়ু, রস ও তেজের সংমিশ্রণের যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক ক্রিয়াসমূহের সহিত সমানধর্ম্মী করা যায়, তবে জীবনে কখনও কোনরূপ প্রতিকূলতা সংঘটিত হইতে পারে না। কেবল মাংস, রক্ত এবং চর্ম্মের যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক কার্য্যকলাপের সহিত বায়ু, রস ও তেজের সংমিশ্রণের কার্য্য-কলাপের বিরুদ্ধতা ঘটিলেই মনুষ্য-জীবনে বিবিধ বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হয়।

(৩) তথাকথিত প্রাগৈতিহাসিক যুগের দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকগণ এই উভয় যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক কার্য্যকলাপের পরস্পর সামঞ্জস্যকেই "পুণ্য" এবং ইহাদের বিরুদ্ধতাকেই "পাপ" আখ্যাত করিয়া গিয়াছেন।

"পাপ" এবং "পুণ্য" বলিয়া যাহা অভিহিত হইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে পারিলে বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না, কেন বর্ত্তমান জগতের রাষ্ট্রনেতাগণ যুদ্ধের প্রবল সমর্থক হইয়া উঠিয়াছেন। পাপ এবং পুণ্য বলিতে যাহা বুঝা যায়, উপরিলিখিত তা[illegible] যিনি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তিনি দেখিবেন যে, বিশ্ব-প্রকৃতিগত পারিপার্শ্বিক বিধি-সমূহের আবিষ্কারকেই বিজ্ঞানের আদর্শ বলিয়া ধরিতে হইবে এবং প্রকৃত সভ্যতার আদর্শ হইবে, প্রকৃতিগত যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপের সহিত ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত কার্য্যকলাপের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য-প্রতিষ্ঠা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান বিজ্ঞান প্রকৃতিগত পারিপার্শ্বিক বিধিসমূহের একটিরও সন্ধান-লাভে সমর্থ হয় নাই এবং প্রধানতঃ এই অজ্ঞতা-বশতঃই আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার কথা ভাবিয়া থাকেন এবং ঐ সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। আধুনিক বিজ্ঞানই যে এই ভাবে ভুল, কেবল ইহাই নহে, আধুনিক সভ্যতাও মনুষ্যজীবনের প্রকৃত আদর্শের সন্ধানলাভে সমর্থ হয় নাই। ফলতঃ, বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত যুবকবৃন্দ এবং শিক্ষিত সমাজ তাঁহাদের আচার-ব্যবহারে পুণ্য অপেক্ষা পাপই সমধিক প্রকারে সাধন করিয়া থাকেন। ইহারই ফলে মনুষ্যজাতিকে সুনিশ্চিত চরমতম দুর্দ্দশার অবস্থায় উপনীত হইতে হইবে এবং প্রকৃতির নিয়মেই শেষতঃ মনুষ্যজাতি উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, বর্ত্তমানে যাহা বিজ্ঞান আখ্যাত হইতেছে, তাহা অজ্ঞতার চূড়ান্ত নিদর্শন এবং বর্ত্তমানে যাহা সভ্যতা আখ্যাত হইতেছে, তাহা পশুশক্তি এবং পশুশক্তির প্রকাশ মাত্র। অধুনা মনুষ্যজাতি যে দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যে পতিত হই-

যাহে, তাহার মধ্যস্থতাতেই একদিন সেই উপলব্ধি আসিবে এবং সে-দিন—বিগত দেড় শতাব্দী কালের মধ্যে যে নির্দ্দোষ বিজ্ঞান এবং সভ্যতা গঠিত হইয়া উঠিয়াছে—কালবিলম্ব না করিয়া মনুষ্যজাতি তাহার সমূলে উৎপাটন সাধিত করিবে।

প্রকৃতির কার্য্যকলাপের সূক্ষ্ম প্রণালীসমূহ সম্যকভাবে বিদিত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রতি যাদশ সহস্র বৎসর অন্তে মনুষ্যজাতিকে এই শ্রেণীর দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয় এবং তাহার ফলস্বরূপ মনুষ্যজাতির মধ্যে উপরি-লিখিত প্রকার উপলব্ধি উদ্ভাসিত হয়। বাইবেলে এবং কোরাণে ইহাই 'শেষ-বিচারের দিবস day of judgement' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বেদে ইহাকেই 'মহাপ্রলয়ে'র অবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ভাষানিহিত শব্দসমূহের বিজ্ঞানে যিনি প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে শেষ-বিচারের দিন এবং মহাপ্রলয়ের মধ্যে ভাবগত পার্থক্য বিন্দুমাত্রও নাই।

মনুষ্যজাতিকে প্রথমতঃ উপলব্ধি করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান বিজ্ঞান এবং সভ্যতা, সুতরাং বর্ত্তমান রাষ্ট্রনেতা এবং বৈজ্ঞানিকগণ, মনুষ্য কিংবা মনুষ্য-সমাজের কোন উল্লেখযোগ্য শান্তি-লাভের সহায় হইতে পারে না। মনুষ্য-জাতি যখন ইহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে, তখন দেখা যাইবে যে, সম্পূর্ণ শান্তি-লাভের যাহা উপায়, তাহা ইন্দ্রজালের ন্যায় তাহাদের সম্মুখে সমুপস্থিত।

মনুষ্য-সমাজে কি ভাবে সম্পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ক তত্ত্বসমূহ আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। পরবর্ত্তী কোন সংখ্যায় কোন্ বাস্তব পন্থার অনুসরণে বর্ত্তমান অবস্থায় প্রত্যেকটি ব্যক্তি এবং জাতি পুনরায় শান্তি লাভ করিতে পারে, আমরা তাহার আলোচনা করিব।

হের হিটলার বলিয়াছেন যে, শান্তি-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত "জাতিসমূহের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানের উদয় (dawning of reason within nations)" প্রয়োজন। কিন্তু যত দিন পাশবিক ভাবে অনুপ্রেরণা পাইতে হয়, ততদিন মস্তিষ্ক-ভাণ্ডারে কাণ্ডাকাণ্ড বিচার-সামর্থ্যের কার্য্য সুচারু ভাবে পরিচালিত হইতে পারে না, ইহা তাঁহার অবশ্যজ্ঞাতব্য।

এই সামান্য সত্যটি আমাদের বীরত্ব-প্রদর্শন-প্রয়াসী বন্ধুবৃন্দ কবে বুঝিতে পারিবেন, তাহা কে জানে!*

## যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-রক্ষার পন্থা কি?

এই প্রশ্নের উত্তর স্থির করিতে হইলে, যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থা কি, তাহা আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথম সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে। যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থা সুনির্দ্দিষ্ট করিতে প্রয়াসী হইলে ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, ইংলিশ-চ্যানেলের উপকূলস্থ বন্দরসমূহ অধিকার করিয়া এবং উত্তর-সাগর ও ইংলিশ-চ্যানেলের উপকূলস্থ ইউরোপ ভূখণ্ডের অঞ্চলসমূহ আয়ত্তাধীন করিয়া জার্ম্মানী ইংলণ্ড আক্রমণের পথ সুগম করিয়াছে। কেবল ইহাই নহে, জার্ম্মান সৈন্য জার্ম্মানীর সকল উল্লেখযোগ্য সামরিক এবং খাদ্য-সরবরাহকারী কেন্দ্রসমূহের মধ্যে প্রবল এবং অবিচ্ছিন্ন সংযোগ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। অর্থাৎ, ইংলণ্ড আক্রমণ কালে জার্ম্মান সৈন্যবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং নৌবাহিনীর পক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্য, অস্ত্রসজ্জা এবং রণসম্ভার সংগ্রহে বিশেষ কোন বেগ পাইবার সম্ভাবনা আর থাকিল না। উপরন্তু, ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ইতালী প্রকাশ্যে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে এবং জাপান ইণ্ডোচীনে ইংলণ্ডের স্বার্থে ব্যাঘাত উপস্থিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। ইতালী এবং জাপানের এই মনোভাবের নিগূঢ় মর্ম্ম জানিতে যিনি প্রয়াসী হইবেন, অবিলম্বে যে, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা এবং ভূমধ্যসাগরস্থ ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলসমূহের আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা বর্ত্তমান, এতৎসম্বন্ধে তিনি প্রায় নিঃসন্দিগ্ধ হইবেন।

সংক্ষেপে বলিতে হইবে যে, শত্রুপক্ষ ইংলণ্ড এবং ইংলণ্ড-অধিকৃত ভূমধ্যসাগর, আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষ প্রভৃতির

* যদি উহাদের যন্ত্রশক্তির বলের সংখ্যায় প্রধানতঃ ইংলণ্ড সমর্থ হইত।

অঞ্চলসমূহ আক্রমণের নিমিত্ত প্রবল শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে। এই সকল বিপদাশঙ্কার উপর আবার ইংলণ্ডের এবং তাহার বহিঃসাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে সর্ব্বব্যাপক অসন্তোষ এবং বেকার সমস্যা হেতু অসন্তুষ্টির অস্তিত্বও অস্বীকার করা যায় না। সংক্ষেপতঃ সমগ্র অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হইলে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যে ধ্বংসোন্মুখ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

এক্ষণে স্বদেশ এবং অধিকৃত অঞ্চলসমূহ রক্ষার্থ ইংলণ্ড কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, আমরা তাহার বিচার করিব। যদি দেখা যায় যে, ইংলণ্ড কর্ত্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা শত্রুপক্ষের মিলিত শক্তিকে প্রতিহত করিবার পক্ষে যথেষ্ট এবং সম্পূর্ণ শক্তিশালী, তবে এতদুদ্দেশ্যে অপর কোন ব্যবস্থার প্রস্তাব নিষ্প্রয়োজন, আমরা ইহা সিদ্ধান্ত করিতে পারি। ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য যে, স্বদেশ এবং অধিকৃত অঞ্চল-রক্ষার্থ ইংলণ্ড কর্ত্তৃক যে-সকল ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে, তাহার সমগ্রাংশ আমরা বিদিত নহি, কেন না স্বকীয় রণসজ্জা বিষয়ে প্রত্যেক দেশই অতিমাত্রায় গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া চলে। তাহা হইলেও ইহাও অতি অবশ্যস্বীকার্য্য যে, জার্ম্মানী এইবারে অকৃতপূর্ব্বরূপে যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে এবং এমন কি, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মিলিত শক্তি জার্ম্মানীকে এতাবৎ কোন একটি ক্ষেত্রেও প্রতিহত করিতে পারে নাই এবং এই পর্য্যন্ত যে-সকল যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে, জার্ম্মানগণকে তাহার প্রত্যেকটিতে মিলিত মিত্র-শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিতে সমর্থ দেখা গিয়াছে। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ইংলণ্ড এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৌবাহিনীর অধিকারী এবং ফ্রান্স ইউরোপখণ্ডের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থলবাহিনীর অধিকারী, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই উভয় প্রবল শক্তিমান পক্ষের সমবেত শক্তিও এবারে জার্ম্মান অভিযান প্রতিহত করিতে সমর্থ হয় নাই। শেষতঃ মিত্রপক্ষভুক্ত ফ্রান্সকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া শত্রুপক্ষের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে হইয়াছে, কিন্তু ইতালী যুদ্ধ ঘোষণা করায় অন্যদিকে শত্রুপক্ষের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থাৎ, ব্রিটিশ পক্ষকে ফ্রান্সের স্থায় শক্তির সাহায্য হারাইতে হইয়াছে, কিন্তু জার্ম্মানী কর্ত্তৃক সম্প্রতি বিজিত অঞ্চলসমূহের সংস্থানের উপর আবার ইতালীর স্থায় রাষ্ট্রের শক্তি লাভে সমর্থ হইয়াছে।

ইংলণ্ডের পরাজয়ে আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে, সুতরাং ব্রিটিশ জাতির জয়লাভ আমাদের সর্ব্বথা কাম্য, কিন্তু যুদ্ধের জন্য অধিকতররূপে প্রস্তুত না হইয়া কিংবা জয়-লাভার্থ স্বতন্ত্র কোন পন্থা গ্রহণ না করিয়া ইংলণ্ড যদি যুদ্ধ-জয়ের ভরসা পোষণ করে তবে, আমাদের মতে, তাহা অত্যধিক মাত্রায় আশা-পোষণ। ভূতপূর্ব্ব কাইজার দ্বিতীয় ভিলহেল্মের (Wilhelm II) রাজত্বকাল হইতে এই পর্য্যন্ত জার্ম্মানী ধাতু-বিদ্যা, রসায়ন এবং যন্ত্রশিল্প সম্বন্ধে যে-উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, এবং তাহার যে-অংশের সন্ধান আমরা লাভ করিতে পারিয়াছি, তাহা হইতেআমাদের বলিতে ইচ্ছা হয় যে, যদি ইংলণ্ড তাহার ধাতুবিদ্যা এবং রসায়নের সম্পূর্ণ সংস্কার সাধন না করে, তবে তৎকর্ত্তৃক কখনও জার্ম্মানীর সমকক্ষ উৎকর্ষ লাভ সম্ভব হইবে না। আমাদের মতে, জার্ম্মান জাতির অস্ত্র-শস্ত্র এবং রণসম্ভারের বর্ত্তমান শক্তিশালিতা এবং অভিনবত্বের মূলে যে ধাতুবিদ্যা এবং রসায়ন-জ্ঞান কার্য্যকরী হইয়াছে, তাহা জার্ম্মান জাতির অনেকের পক্ষেও অদ্যাবধি অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে, আমাদের ব্রিটিশ রসায়নবিদ্ এবং ধাতুবিদ্‌গণ তো তাহার অ-আ-ক-খ পর্য্যন্ত অবগত নহেন। বিবিধ বিষয়ে স্বদেশের উন্নতিকল্পে ভূতপূর্ব্ব কাইজার যে-ধাতুবিদ্যামূলক এবং রাসায়নিক গবেষণায় তৎপর ছিলেন, তাহার প্রকৃতি বিশ্লেষণে যত্নবান হইলে ইহা অনুমান করিবার সুসঙ্গত কারণ লাভ করা যায় যে, এই বিষয়ে অতি সঙ্গোপনে ভারতীয় ঋষিগণের রসশাস্ত্র কিংবা হিন্দ্র ভাষায় তাহাদের অনুবাদ তৎকর্ত্তৃক অবলম্বিত হইয়াছিল। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভারতীয় ঋষিগণের এই রসশাস্ত্র যথাযথ অর্থে পাঠ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বেদ-নির্দ্দিষ্ট যোগবিদ্যার (বর্ত্তমান কালে 'যোগ' বলিয়া যাহা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা নহে) সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত না হইতে পারিলে তন্নিহিত বিবিধ প্রণালীর যথাযথ অনুসরণ সম্ভব নহে। ইহাও দেখা যাইবে যে, ভারতীয় পণ্ডিতগণের রসশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বিভিন্ন বিদ্যা যথাযথরূপে গৃহীত হইলে মনুষ্যজাতির বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ আশ্চর্য্য রকমে সাধন সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু বেদনির্দ্দিষ্ট যোগবিদ্যায় যথার্থরূপে শিক্ষিত না হইতে পারিলে এবং অন্যায় ভাবে তৎসম্বন্ধীয় গবেষণায় অগ্রসর হইলে, তাহাতে মনুষ্যজাতির ধ্বংস-সাধনের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য প্রণালীর সন্ধান লাভ করা যায়। সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে যে,

অনেকের জার্মান অধ্যাপক—ডক্টর শ্লাবি (Slaby), ইন্‌ৎসা (Intza), হারনাক (Unrnack), এরিশ শ্মিট্‌ (Erich Schmidt) এবং শীমান (Schiemann) ইত্যাদি তাঁহারা ভূতপূর্ব্ব কাইজারের অন্তরঙ্গ ছিলেন—তাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কতিপয় পুরাতন গ্রন্থের অথবা তাহাদের ভিন্ন ভাষায় অনূদিত সংস্করণের সন্ধান লাভ করেন এবং তাহা হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া ঐ বিষয়ে কিছু গবেষণাও করেন এবং এই সকল গবেষণার কতিপয় অংশের ভ্রান্তিবশতঃ মনুষ্যপ্রাণ-সংহারার্থ কতিপয় আশ্চর্য্য উপায় আবিষ্কৃত হয়। মোটের উপর স্বকীয় জন্মভূমির সংস্থানোৎকর্ষের নূতন পন্থার সন্ধানে এই সকল জার্মান অধ্যাপক যে পরিশ্রম স্বীকার করেন, তদ্ভিন্ন তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। এই সকল জার্মান রসায়নবিদ্‌, ধাতুবিদ্‌ এবং পদার্থ-বিদ্‌ যে প্রশংসার্হ, তদ্বিষয়ে এক প্রকার সুনিশ্চিত হইতে পারা যায়, কিন্তু অন্ততঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে-সকল স্বীয়-মস্তিষ্ক ব্যক্তি রসায়নবিদ্‌, ধাতুবিদ্‌, পদার্থবিদ্‌, প্রাণিবিজ্ঞানবিদ্‌ ইত্যাদির ভূমিকা অভিনয় করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রদত্ত অর্থে নিজেদের বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিতেছেন তাঁহাদিগকে আমরা অনুকম্পাভাজন বলিয়া মনে করি। জার্মানীর, তথা বৃটিশ সাম্রাজ্যের বৈজ্ঞানিকগণের পরস্পর তুলনামূলক বিচারের অবস্থায় জগৎ যখন উপনীত হইবে—তখন জার্মানী, তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, উভয়ত্রই বৈজ্ঞানিক নামের যোগ্যতা-লাভের উপযুক্ত কোন ব্যক্তি এতাবৎ দেখা যায় নাই, ইহা প্রমাণিত হইবে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই সময়ে জার্মানীতে বৈজ্ঞানিক প্রস্তুত করিবার চেষ্টার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে, কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যে অনুরূপ চেষ্টার আভাস পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে না। এই কথা ব্রিটিশ সরকার কর্ত্তৃক স্বীকার করেন নাই, ইহা আমরা বলিতে চাহি না, আমাদের বক্তব্য এই যে, ব্রিটিশ সরকার তথাকথিত বৈজ্ঞানিকগণ এবং তাহাদের সমিতি কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছেন। যখন দেখা যায় যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রখ্যাতনামা রাসায়নিক, পদার্থবিদ্‌, প্রাণিবিজ্ঞানবিদ্‌গণ যে-প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় ভারতীয় ঋষিগণের রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা এবং প্রাণিবিজ্ঞান লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার বর্ণ-জ্ঞানে প্রবিষ্ট পর্য্যন্ত না হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে লিখিতে সাহসী হইয়াছেন, তখন আমাদের এই মত পোষণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। যে সকল রসায়নবিদ্‌ প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভারতীয় ঋষিগণের রসায়নের অ-আ-ক-খ পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত না হইয়া, হিন্দুদিগের রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস রচনার দুঃসাহস প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা যত খ্যাতিই অর্জ্জন করিয়া থাকুন, তাঁহাদিগকে 'নরাধম' আখ্যাত করিতে আমরা কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেছি না।

যাহাই হউক, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তথাকথিত যে-বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের অনবধানতা এবং ভ্রান্তিকতার ফলে যে অকল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে শোক-প্রকাশের বর্ত্তমানে সময় নহে। বাস্তব ক্ষেত্রে ঘটনাসমূহ এবং অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে, আমাদিগকে তাহারই বিচার করিতে হইবে এবং ব্রিটিশ কর্ণধারগণকে তদনুযায়ীই তাঁহাদের অভিপ্রেত কর্ম্মপন্থা স্থির করিতে হইবে।

ভূতপূর্ব্ব কাইজারের রাজত্ব-কাল হইতে জার্মান বৈজ্ঞানিকগণ ধাতুবিদ্যার এবং রসায়ন-শাস্ত্রের ক্ষেত্রে যে উৎকর্ষ-লাভে সমর্থ হইয়াছেন, মানসনেত্রে তৎপ্রতি অবহিত হইলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, ইংলণ্ডের জয়লাভ অপেক্ষা পরাজয়েরই আশঙ্কা সমধিক। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় সত্ত্বেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করিবার কি ব্যবস্থা হইতে পারে, আমরা তাহার পরিকল্পনা করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

আমাদের মতে, নিম্নলিখিত কার্য্যপ্রণালী গৃহীত হইলে ইহা সম্ভাবিত হইতে পারে :—

প্রথমতঃ, ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণকে জার্মান রাষ্ট্রের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া অনতিবিলম্বে যুদ্ধ-বিরতির জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, এমন কি যদি সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরও আত্ম-সমর্পণ করিতে হয়, তথাপি জার্মান-রাষ্ট্রে প্রস্তাবিত যে-কোন সর্ত্ত তাঁহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, জার্মানী, ইতালী, রুষিয়া এবং জাপানের সমগ্র অধিবাসীর পক্ষে প্রয়োজনীয় যথেষ্ট আহার্য্য-স্বরূপ খাদ্য-দান প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তাঁহাদিগকে বিজয়ী রাষ্ট্রসমূহের সম্মিলিত তত্ত্বাবধানের অধীনে ভারতবর্ষ সহ সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পরিচালনার নিমিত্ত কোনপ্রকার চুক্তির জন্য আবেদন জানাইতে হইবে।

চতুর্থতঃ, ভারতবর্ষ যাহাতে তাহার জমীর স্বাভাবিক উর্বরাশক্তি ফিরিয়া পায়, ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাকে তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

এই কার্যপন্থার যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যদিও ব্রিটিশ সরকারের মর্যাদার পক্ষে ইহা সাময়িক ভাবে হানিজনক, কিন্তু শেষতঃ ইহার দ্বারাই ইংলণ্ড, জার্মানী, ইতালী, রুষিয়া এবং জাপানের সমগ্র লোক-সংখ্যাসহ মনুষ্যজাতির প্রত্যেকের হৃদয়ে রাজত্ব স্থাপনে সমর্থ হইবেন।

আমাদিগের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে, আমরা সানন্দে সে প্রশ্নের উত্তর দান করিতে প্রস্তুত আছি।*

## দেশ-রক্ষার প্রকৃত পন্থা কি ইহাই ?

ভারত-রক্ষার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার সংপ্রতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং রণ-সম্ভার নির্মাণার্থ কতিপয় পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। কেবল এই সকল পরিকল্পনা নহে, জাহাজ এবং বিমানপোত নির্মাণের প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। অস্ত্র-শস্ত্র এবং রণ-সম্ভার, জাহাজ এবং বিমানপোত নির্মাণের উপর আবার ভারতীয় যুবকবৃন্দকে সৈনিক এবং সামরিক কর্মচারী হিসাবে শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থাসমূহও অবলম্বিত হইতেছে। এক কথায়, ভারতকে প্রথম শ্রেণীর সামরিক শক্তিতে রূপান্তরিত করিবার যে-উচ্চাশা, তাহা পূর্ণ হইবার সূচনা দেখা গিয়াছে। ভারতবাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা এতদিন ভারতবাসীকে নিরস্ত্র করিয়া রাখিবার দায়ে ব্রিটিশ জাতিকে দায়ী করিতেন, ভারত সরকারের সামরিক এই প্রগতি-বিধানে তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতা বোধ করিবেন। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য : "এই সকল সামরিক উৎকর্ষ-বিধান কি ভারতবাসীকে সম্পূর্ণরূপে তাহাদের স্বদেশ এবং আত্মরক্ষার বিষয়ে সহায়ক হইবে ?" কোন জাতি কিংবা দেশের সম্পূর্ণ আত্মরক্ষার বিষয়ে, সামরিক উৎকর্ষ-বিধানকেই যদি প্রকৃত পন্থা হিসাবে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফিন্‌ল্যাণ্ড এবং পোল্যাণ্ড প্রভৃতির পতন সাধিত হইল কেন এবং কেনই বা তাহাদের অধিকাংশ অধিবাসীকে স্বদেশ ছাড়িয়া অন্যত্র আশ্রয়প্রার্থী হইতে হইল ? আমাদের কৃতবিদ্য নায়ক এবং শাসকবৃন্দ কি সামান্য ক্ষণের জন্যও স্থির হইয়া চিন্তা করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিবেন যে, যদি কোন দেশ এবং কোন জাতির পক্ষে সামরিক উৎকর্ষ-বিধানই তাহার শান্তিতে আত্মরক্ষার প্রথম পন্থা বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হয়, তবে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মান আক্রমণের আশঙ্কায় ব্রিটিশ জাতি আজ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন কেন ?

আমাদের অভিমত, প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা দমনকল্পে সমর-সজ্জা কিয়ৎ পরিমাণে এবং প্রকারে প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু জার্মান জাতি সমর-সজ্জাকে বর্তমানে যে পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা কখনও কাহারও পক্ষেই কল্যাণজনক হইতে পারে না। বস্তুতঃ মনে হইতে পারে যে, জার্মান জাতি সমর-সজ্জা সর্বাধিকতমরূপে বৃদ্ধি করিয়াছে বলিয়াই তাহারা দেশের পর দেশ আক্রমণে সমর্থ হইয়াছে, কিন্তু বিশ্ব-বাসীর সমক্ষে সুনির্দিষ্ট ভাবে ঘোষণা করিবার কারণ আমাদের বর্তমান যে, পরবর্তী পাঁচ বৎসর কাল ধৈর্যসহকারে প্রতীক্ষা করিলে, তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিবেন, কি পরিমাণ দুঃখ-দুর্দশা জার্মান জাতিকে সহ্য করিতে হইতেছে। জার্মানীর অবস্থাকে উপমা-সাহায্যে বুঝাইবার পক্ষে এই উপমাই উপযোগী—রোগী নির্বিবাদে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে কি হইবে, অস্ত্র-চিকিৎসা সার্থক হইয়াছে ! জার্মানরা যদি, এমন কি সমগ্র যুদ্ধেও জয়ী হয়, তথাপি তাহারা নিজেদের অনাহার-সমস্যার সমাধান করিতে কখনও পারিবে না, এবং তাহার ফল হইবে, যুদ্ধের উত্তেজনা হ্রাস পাইলেই অনতিকাল মধ্যেই জার্মানীতে আহার্যের অনটন হেতু অভূতপূর্বরূপে গৃহ-বিবাদ সূচিত হইবে। সত্যপক্ষ যদি সমরদিগ্গজ লেলিহান্ হইয়া থাকে, তবে কোন প্রকার সমর-সজ্জার সহায়তাতেই বৈদেশিক আক্রমণের হস্ত হইতে কোন দেশ সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা করিয়া উঠিতে

* "দি মাইদুলী বঙ্গশ্রী"র এপ্রিল মে জুন সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

পারে না। অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে উভয় পক্ষেই প্রাণ হত্যা হইতে বাধ্য এবং যদি একটি মাত্র ব্যক্তিকেও নিহত হইতে হয়, তবে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা বলা চলে না। তদুপরি, জার্মানী যে-ভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছে, আধুনিক সেই প্রকার যুদ্ধ যদি দীর্ঘ কালের জন্য চলিতে থাকে, তবে তাহাতে চরাচরের অবস্থা এরূপ দাঁড়াইতে পারে, যাহার ফলে ভীষণ ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণাদি পর্য্যন্ত সংঘটিত হইতে পারে।

আমাদের এই বক্তব্যের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সর্ব্বব্যাপক বায়ুমণ্ডল বিভিন্ন যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে অসংখ্য জলবিন্দুতে ঘনিয়া পড়িয়া অতল সমুদ্রের সৃষ্টি করে। এই অতল সমুদ্র আবার বিভিন্ন রাসায়নিক এবং যান্ত্রিক ক্রিয়ার মাটি সৃষ্টি করিয়া সমগ্র পৃথিবীর উদ্ভবের কারণ হইতেছে। এই বৈজ্ঞানিক তথ্য আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা না জানিতে পারেন এবং তাঁহারা ইহা জানেনও না, কিন্তু তথাপি ইহা সত্য এবং প্রকৃত বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসু ছাত্র মাত্রই ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন। বৈজ্ঞানিকগণ যদি উপলব্ধি করিতে পারিতেন কি ভাবে পৃথিবী প্রতিমুহূর্ত্তে অতল সমুদ্র হইতে অণু-পরমাণুরূপে তাহার উপাদান সংগ্রহ করিতেছে এবং কি ভাবে আবার এই অতল সমুদ্র তাহার অস্তিত্ব এবং তাহার প্রাণ-কণিকাসমূহ সর্ব্বব্যাপক বায়ুমণ্ডল হইতে লাভ করিতেছে, তবে তাঁহারা অচিরাৎ বুঝিতেন যে, সাবমেরিন, টরপিডো, ইউ-বোট এবং মাইন প্রভৃতির ফলে সমুদ্রের অভ্যন্তরে অতি মাত্রায় আলোড়নের সৃষ্টি হইয়া ভূমির স্বাভাবিক কার্য্যক্রমে অনিয়ম নিশ্চয়ই ঘটিতে পারে এবং ফলতঃ ভূমিকম্পও ঘটিতে পারে। হইতে পারে যে, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের এই বিজ্ঞান অপরিজ্ঞাত, কিন্তু গত মহাযুদ্ধের পরে জাপান, আমেরিকা এবং ভারতবর্ষ অঞ্চলে যে ভূমিকম্প ঘটে, তাহার কথা মনে রাখিলে ইহার সত্যতা উপেক্ষা করা চলে না। সামান্য বিবেচনা-বুদ্ধি হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, মাটির অভ্যন্তরভাগে যদি তেমন কোন বিপর্য্যয় ঘটিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে আগ্নেয়গিরির উৎপাতের উদ্ভব হইতে পারে। ভূমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির বিজ্ঞান অভ্রান্ত ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, সর্ব্বব্যাপী বায়ুমণ্ডলে যদি এরোপ্লেন প্রভৃতির অনিয়মিত চলাচল-জনিত অস্বাভাবিক বিশৃঙ্খলা ঘটিতে দেওয়া হয়, অথবা ভূমির উপরিভাগ যদি রণ-সম্ভার এবং গ্যাসসমূহের বিষাক্ত কার্য্যকলাপে রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার দ্বারা বিধ্বস্ত হয়, তবে ভূমির এই স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির অঙ্ক-শাস্ত্রের সমান্তর-শ্রেণীর (arithmetical progression-এর) অনুপাতে সুনিশ্চিত রূপে হ্রাস ঘটিতে বাধ্য। এই সকল সত্য হৃদয়ঙ্গমের উপলব্ধির অতীত হইলেও, ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ যখন নিজদিগকে জ্ঞান এবং ন্যায়বিচারের মূর্ত্ত প্রতীক বলিয়া প্রচার করেন, তখন তাঁহাদের ইহা সহজবোধ্য হওয়া উচিত। এই সত্যসমূহ উপলব্ধি করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, বর্ত্তমান প্রকারের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জার্ম্মানজাতির বিপক্ষে ব্রিটিশের বিজয়ী হইবার কোন মূল্য থাকিতে পারে না, কেন না এই প্রকার যুদ্ধের ফলে ভূমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। এমন অনেকে হয় তো আছেন, যাঁহারা আমাদিগকে একপে উপেক্ষা করিবেন, এমন কি আমাদিগকে হয় তো পরিহাসও করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, স্বাস্থ্যপ্রদ আহার্য্যের আবশ্যক মত পরিমাণ উৎপন্ন করিতে হইলে ভূমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি অপরিহার্য্য রূপে প্রয়োজন এবং ইহার অভাবে মনুষ্যজাতির পার্থিব অস্তিত্ব রক্ষা পর্য্যন্ত অসম্ভব। এই সত্যের অজ্ঞতা-ক্রমেই এবং তদ্বশতঃ ইহার অবজ্ঞাহেতু গত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মনুষ্যজাতিকে বহুতর দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে।

ভারতে অস্ত্র-শস্ত্র-বৃদ্ধির পরিকল্পনা কার্য্যতঃ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ভারত সরকারকে আমরা এতদ্বিষয়ে অতিশয় সতর্ক হইবার নিমিত্ত পুনরায় অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

যদি ভারতের বড়লাট বাহাদুর জীবনের কোন সময়ে এই চিন্তায় অতিবাহিত করিয়া থাকেন যে, কেন বর্ত্তমান যুগে মনুষ্যজাতির মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহ, ঘৃণা-হিংসা এবং এই অস্বাভাবিক সমরোন্মাদনার মনোভাবের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সন্ধান প্রয়োজন,—তবে তাঁহার ইহা বুঝিতে বেগ পাইতে হইবে না যে, ইহাদের মূলে প্রধানতঃ আর্থিক অনটন এবং শিক্ষার ভ্রান্ত আদর্শ বিদ্যমান। আমাদের বড়লাট

বাহাদুর যদি এই আর্থিক অনটন এবং শিক্ষার ভ্রান্ত আদর্শের সমস্যার বিষয়ে কোন দিন কোনরূপ চিন্তা করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে ইহাও বুঝিতে বেগ পাইতে হইবে না যে, আর্থিক অনটনের সমস্যার সমাধান না হইলে শিক্ষার ভ্রান্ত-আদর্শোদ্ভূত সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। আমাদের বড়লাট বাহাদুর যদি তখনও চিন্তা করিয়া থাকেন, কি ভাবে এই সর্ব্বব্যাপক আর্থিক অনটনের সমস্যার সমাধান সম্ভব, তবে তাঁহার ইহা বুঝিতেও বেগ পাওয়া উচিত নহে যে, যদি দেশের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি হ্রাসের ব্যবস্থা করা যায়, তবে কোন দেশেই সমগ্রভাবে কোনরূপ আর্থিক অনটনের উদ্ভব হইতে পারে না। আমাদের বড়লাট বাহাদুর যদি সন্ধান-প্রয়াসী হন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তির বর্ত্তমানে কি অবস্থা, তবে অনায়াসেই তিনি জানিতে পারিবেন যে, প্রত্যেক দেশের স্বাভাবিক উৎপাদন-হার (অর্থাৎ কৃত্রিম সার ব্যবহারে বিঘাপ্রতি উৎপাদনের হার) এমন হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে যে, কৃষিকার্য্য আর চাষীদের পক্ষে লাভজনক নাই এবং প্রত্যেক দেশের সমগ্র অধিবাসীর প্রয়োজনের তুলনায় ঐ দেশের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণে ঘাটতি উপস্থিত হইয়াছে।

পৃথিবীর যাবতীয় অঞ্চলের জমীর উৎপাদিকাশক্তি এবং উৎপন্ন শস্য বিষয়ে উপরিলিখিত তথ্যসমূহ সম্বন্ধে একবার নিঃসন্দেহ হইতে পারিলে—তখন প্রত্যেকের নিকট উদ্ভাসিত হইবে যে, জাতিতে জাতিতে পরস্পর এই যে ঈর্ষা এবং বিদ্বেষ, ইহার মূলে রহিয়াছে প্রত্যেক অঞ্চলের সমগ্র অধিবাসী-সংখ্যার প্রয়োজনীয় পরিমাণের অনুপাতে ঐ অঞ্চলের কৃষিজাত প্রত্যেক দ্রব্যের উৎপাদনে ঘাটতি। প্রত্যেক অঞ্চলের সমগ্র অধিবাসী-সংখ্যার প্রয়োজনীয় পরিমাণের অনুপাতে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের এই ঘাটতির মূলে রহিয়াছে সর্ব্বত্র বিঘা-প্রতি স্বাভাবিক ভাবে উৎপন্ন ফসলের হারের হ্রাস এবং ইহার মূলে রহিয়াছে জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস। সুতরাং সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় যে, মনুষ্যজাতিকে যদি মনে প্রাণে মনুষ্যত্বসমাজের শান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টিত হইতে হয়, তবে তদুদ্দেশ্যে সূচনায় এমন কার্য্য-ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন, যাহাতে জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়—এতদ্ব্যতীত আর কোন উপায় নাই।

আমরা দেখিয়াছি যে, সময় সময় বৃষ্টি জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির পক্ষে কোন-ক্রমেই অনুকূল নহে। আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে, জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধির সহায়তা করা দূরে থাক, সময়বিশেষে বৃষ্টিতে এমন অবস্থা ঘটিতে বাধ্য, যাহাতে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং এমন কি, যাহার ফলে ভীষণ রূপের ভূমিকম্পাদি এবং আগ্নেয় উৎপাত সংঘটিত হইতে পারে।

এই জন্যই আমাদের জিজ্ঞাস্য হইয়াছে, "দেশ-রক্ষার ইহাই কি প্রকৃত পন্থা?"

ভারতের জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি কি ভাবে করিতে হইবে, আমাদের বড়লাট বাহাদুর ইহা জানিতে যদি অবহিত হন, তবে এই সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণ কি বিধান লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে আমরা সানন্দে জানাইতে পারি। কৃষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, বড়লাট বাহাদুর যদি তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করিতে পারেন, তবে সূর্য্য এবং চন্দ্রের অবস্থানে ভারতের অবস্থিতিতে অপরাপর দেশের তুলনায় যে একটি বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, তাহা তাঁহার সহজবোধ্য হইবে। সূর্য্য এবং চন্দ্রের সহিত অবস্থানের এই বৈশিষ্ট্য বশতঃই ভারতবর্ষের জমীতে স্বাভাবিক ভাবে যে-পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, অপর কোন দেশে উহা হইতে পারে না।

আধুনিক বিজ্ঞানোদ্ভূত নির্ব্বোধ কার্য্যকলাপহেতু বর্ত্তমানে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ, এমন কি তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের জমীও তাহা হইতে বাদ যায় নাই। এতৎসত্ত্বেও সূর্য্য এবং চন্দ্রের তুলনায় এই বিশেষ অবস্থান বশতঃই ভারতীয় ঋষি-গণের নির্দ্দিষ্ট পন্থায় যথাযথভাবে অগ্রসর হইলে মাত্র সাত বৎসর কালের মধ্যে তাহার সর্ব্বনিম্ন স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তির পুনরুদ্ধার সম্ভব হইবে। এবং ভারতবর্ষ যদি তাহার সর্ব্বনিম্ন স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি একবার ফিরিয়া পায়, তবে সমগ্র জগতের লোক-সংখ্যার প্রয়োজনীয় আহার্য্য এবং কাঁচামাল যে, ভারতই সরবরাহ করিতে পারে, ইহা সাধারণ অঙ্কের হিসাব হইতেই বুঝা যাইবে। জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির দিক্ দিয়া ভারতবর্ষে যাহা মাত্র সাত বৎসর

কালের মধ্যে সার্থক করা যাইবে, অন্ত কোন দেশে তাহা সত্তর বৎসর কালের মধ্যেও সম্ভব হইবে না—ইহাও বিজ্ঞান-ঘটিত কথা। এই জন্তই আমরা বলিতেছি যে, আমাদের বড়লাট বাহাদুর প্রস্তাবিষয়ে অবহিত হউন্। ভারতের জনীয় সম্ভাব্যতা বিদিত হইতে পারিলে, জার্মান রাষ্ট্রকেও, জার্মানীর অধিবাসীদিগের আহার্য্য এবং কাঁচামালের ঘাটতি পূরণ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ বোধ করিবেন না এবং আমরা জোর গলায় বলিতে পারি যে, জার্মানীর জন-সাধারণকে তাহাদের প্রয়োজনপক্ষে যথেষ্ট আহার্য্য এবং কাঁচামালের প্রাপ্তি বিষয়ে যদি নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করা যায়, তবে জার্মান রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধের বিরতি হইতেও বিলম্ব হইবে না এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা হইবে। সময় থাকিতে আমরা বড়লাট বাহাদুরকে এখনও সতর্ক হইবার জন্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।*

## মিঃ গান্ধী এবং "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান"

দৈনিক সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রেই অবশ্য জ্ঞাত আছেন যে, সংপ্রতি মিঃ গান্ধী মনুষ্যপ্রাণসংহার-নিবারণোদ্দেশ্যে ইংলণ্ড এবং ভারতকে আক্রমণকারী শত্রুহস্তে সমর্পণের প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছেন। মিঃ গান্ধীর এই প্রস্তাবে "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান"-পত্রিকার সম্পাদক অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া মনে হয় এবং মিঃ গান্ধীর এই আত্ম-সমর্পণমূলক প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন, ইহাই প্রমাণ করিবার জন্ত তিনি সচেষ্ট হইয়াছেন, কেন না তাঁহার মত হইতেছে যে, যুদ্ধ পরিচালনা ব্যতীত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজাবৃন্দের রক্ষার আর কোন উপায় নাই। "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান"-এর সম্পাদকের অভিমত এই যে, বর্ত্তমান অবস্থায় যুদ্ধ এবং মনুষ্যপ্রাণহত্যা কেবল রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক্ দিয়াই যে প্রয়োজনীয় তাহা নহে, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত সাধনযোগ্য বিষয়ও বটে। গত ৬ই জুলাই রবিবার তারিখের সংখ্যায় "এবং ভারতবর্ষে ( And in India )"-শীর্ষে উক্ত সম্পাদক লিখিয়াছেন :

"ইহা (অর্থাৎ গান্ধীজীর এই সমর্পণমূলক প্রস্তাব) হিন্দুত্বের পূর্ণ বিরোধী—অবশ্য, সৈনিকের পক্ষে অস্ত্রত্যাগ লজ্জার বিষয় এবং তাহার কার্য্যই হইতেছে ঘৃণারহিত ভাবে যুদ্ধ এবং হত্যাসাধন, নির্দ্দেশ করিয়া কৃষ্ণ যেখানে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন, গীতার এই ভাব যদি হিন্দুত্বের প্রকাশক হয়। মনোভাব এবং কার্য্যপ্রেরণার বিশুদ্ধতা সৈনিকের রক্ষাকবচ, কিন্তু যুদ্ধ করিতে না চাহিলে তাহার কোন বিষয়েই মুক্তি নাই। ইসলামেও এইরূপ অভিলাষের প্রতিবাদ দেখা যাইবে। খৃষ্টধর্ম্মের আদর্শের ভ্রান্তি হইতেই ইহার উদ্ভব। প্রকৃত নির্দ্দেশ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ( They (i.e. Gandhian creed of surrender) are the exact opposite of Hinduism, if Hinduism is truly represented in the Gita, where Krishna taught Arjuna that it is disgraceful for the warrior to lay down his arms and that his duty is to fight and kill without hate. Purity of mind and motive absolves the soldier, but nothing will absolve him, if he fails to fight. Islam too directly contradicts the teaching. It appears to be based on a mistaken understanding of Christianity. The true teaching is very difficult. )"

"ষ্টেট্‌স্‌ম্যান"-এর সমগ্র সন্দর্ভটি পাঠ করিলে মনে হয় যে, গীতা, কোরাণ এবং বাইবেল সমস্তই সৈনিকদিগকে নির্ব্বিচারে মনুষ্যহত্যার অনুমোদন দান করিয়াছেন, "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান"-এর সম্পাদক ইহাই যেন বিশ্বাস করেন।

জার্ম্মানদিগের এবং তাহাদের সহযোগীদিগের অভিযান সার্থক হইলেও বর্ত্তমান অবস্থায় যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে হয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজাবৃন্দের গৃহ, ঘাটি এবং আত্মীয়-পরিজনকে বিনাশ হইতে বাঁচাইতে হয়, তবে আমাদের মতে, তাহার একমাত্র পন্থা হইতেছে, শত্রুপক্ষের আনীত সকল প্রকার সর্ত্ত স্বীকার করিয়া লইয়া অনতিবিলম্বে যুদ্ধের অবসান সাধন এবং যুগপৎ তাহাদের সহিত বুদ্ধিগত প্রতিযোগিতার সূচনা। শত্রুপক্ষের আনীত সর্ত্ত স্বীকার

* "দি ষ্টেট্‌স্‌ম্যান"-এ ৬ই জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

করিয়া লওয়ার অর্থ যদি আত্মসমর্পণ হয়, তবে আমরা ইহা বলিতেও ইতস্ততঃ বোধ করিব না যে, বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং ব্রিটিশ প্রজাবৃন্দকে যদি সম্পূর্ণ অক্ষত রাখিতে হয়, তাহা হইলে হিটলার এবং তাঁহার সহযোগিগণের নিকট ব্রিটিশ সরকারের আত্ম-সমর্পণের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং সাম্রাজ্যাধীন প্রজাবৃন্দের রক্ষার্থ হিটলার এবং তাঁহার সহযোগীবৃন্দের নিকট ব্রিটিশ সরকারের এমন কি আত্মসমর্পণেরও প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে—আমাদের এই যে প্রস্তাব, তৎসম্বন্ধে পাঠকদিগকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কেবল নির্জ্জলা আত্ম-সমর্পণ ব্রিটিশ সরকার এবং ব্রিটিশ প্রজাবৃন্দের উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল হইবে না, ব্রিটিশজাতির পক্ষ হইতে যুগপৎ এমন প্রকৃত রাষ্ট্রনীতিবিদেরও অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন, যাঁহারা জার্ম্মাণ এবং তাঁহাদের সহযোগীবৃন্দের বিপক্ষে বুদ্ধিগত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবার সামর্থ্য রক্ষা করেন। বুদ্ধিগত প্রতিযোগিতা বলিতে কি বুঝায় এবং কি ভাবে তাহার সূচনা এবং পরিচালনা করিতে হইবে, এই বিষয়ে আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি এবং প্রয়োজন হইলে পুনরায় উহার আলোচনা করিব।

যে ভাবেই হউক, ইহা অনুমেয় যে, আমরা গান্ধীবাদের নির্জ্জলা আত্ম-সমর্পণের প্রস্তাবের সমর্থক নহি। ইহাই আশ্চর্য্য যে, একদা যে মিঃ গান্ধী ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া পুলিশের লাঠি এবং গুলীচালনার সম্মুখে নীরব আত্মসমর্পণের স্বপক্ষতা করিতেন, আজ তিনিই আবার শত্রুর নিকট সর্ব্বস্ব অঞ্জলি দান করিয়া আত্মসমর্পণপূর্ব্বক পলায়নপরায়ণের স্বপক্ষতা করিতেছেন। আমাদের সুদৃঢ় ধারণা, মিঃ গান্ধী একটি প্রথম শ্রেণীর ধাপ্পাবাজ এবং তাঁহার মধ্যে শয়তান মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভারতের পাপাচারী অধিবাসীদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার বৃদ্ধি করিতেছে।

"এবং ভারতে (And in India)"-শীর্ষক সম্পর্কে "ষ্ট্রেট্‌সম্যান"-সম্পাদক সৈনিক কর্ত্তৃক নির্ব্বিচারে প্রাণসংহার বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি অবহিত হইয়া আমাদিগকে এই অভিমত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে, সম্পাদকের এই সন্দর্ভটি সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং স্বকীয় জ্ঞানের অতিরিক্ত বিষয় সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতেও সম্পাদক বিবেক-সংশন বোধ করেন না। যুবকের এই সম্পাদকবৃন্দের অতি-অবজ্ঞাতম বিষয় হইতেছে এই যে, গীতা, কোরাণ এবং বাইবেলের অনুবাদ কিংবা সার-সংগ্রহ পাঠে মূল গীতা, মূল কোরাণ এবং মূল বাইবেলের প্রকৃত বক্তব্য পরিজ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা এবং অসম্ভাবনা দুই-ই বর্ত্তমান, কেন না এই সকল অনুবাদ ও সার-পুস্তক ভ্রান্তিহীন কিংবা ভ্রান্ত, উভয়ই হইতে পারে। প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন আরবী ভাষা এবং প্রাচীন হিব্রু ভাষায় রচিত এই সকল গ্রন্থের মূল রচনা উপলব্ধি করিবার জ্ঞানলাভ করিয়া কেহ যদি গীতা, কোরাণ এবং বাইবেলের মূল গ্রন্থে প্রবিষ্ট হইবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে পারেন, তবে তিনি মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিবেন যে, গীতা, কোরাণ কিংবা বাইবেলের কোন একটিরই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধভাবে এবং আদ্যোপান্ত অনুবাদ, অথবা সার-সংগ্রহ অপর কোন ভাষায় সম্ভাব্যতার সম্ভব নহে। ইহাদের অন্তর্নিহিত প্রত্যেকটি বর্ণ এবং প্রত্যেকটি বাক্য অর্থদ্যোতক, সুতরাং ইহাদের সার-সংগ্রহ সম্ভব নহে। এই সকল পুণ্যগ্রন্থের মূল পাঠ কি ভাবে উদ্ধার করিতে হইবে, তাহা না পরিজ্ঞাত হইয়া—এবং তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে ভাষানিহিত শব্দসমূহের উপলব্ধি এবং জ্ঞান অতি অবশ্যরূপে প্রয়োজন—ইহাদের কোন একটি বিষয়ের উল্লেখ পর্য্যন্ত পাপ। এই সকল পুণ্যগ্রন্থের মূল পাঠ করিবার উপযোগী সামর্থ্য লাভ করিতে হইলে, তদভিজ্ঞ ব্যক্তিকে স্বকীয় দেহমধ্যে উপলব্ধি করিতে হইবে, প্রথমতঃ, কি করিয়া তাঁহার শব্দোচ্চারণ-সামর্থ্যের উদ্ভব হয়; দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন প্রাচীন ভাষা যে-সকল মূল শব্দ লইয়া গঠিত তাহার কোন্‌টির কি নিগূঢ় অর্থ; তৃতীয়তঃ, ভাষান্তর্গত বিভিন্ন মূল শব্দের সংযোগ-বিয়োগজাত কোন্ শব্দের কি নিগূঢ় অর্থ। এই ভাবে অগ্রসর হইয়া বেদ, বাইবেল এবং কোরাণের মূল গ্রন্থের পাঠ উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য-লাভে যে-ব্যক্তি কৃতকার্য্য হন, তিনি সমগ্র মনুষ্যজাতিকে দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদের ত্রাণকর্ত্তা হন এবং দেবতা আখ্যা লাভ করিয়া থাকেন। অন্য পক্ষে, ভ্রান্ত অনুবাদ এবং সার-পুস্তক পাঠ করিয়া যে-ব্যক্তি বেদ, বাইবেল এবং কোরাণের জ্ঞানলাভ হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়া থাকেন এবং তজ্জন্য গর্ব্ব বোধ করেন, সে-ব্যক্তি শয়তান স্বরূপ হইয়া পড়েন। ইহা আমাদের কথা নহে—ঐ সকল পুণ্যগ্রন্থের প্রত্যেকটি ইহার দিব্য-নির্দ্দেশ

বহন করিতেছে। আখানিহিত শব্দ-জ্ঞানে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি পুণ্যগ্রন্থসমূহের কোন একটিরও মূলের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারিবেন, তিনি অচিরাৎ অবগত হইবেন যে, গত তিন হাজার বৎসর কালের মধ্যে অবতার বলিয়া কথিত শাক্যসিংহ, যীশুখৃষ্ট এবং নবী মহম্মদ—কেবল এই তিনজন ব্যক্তি এই সকল পুণ্যগ্রন্থের মূল পাঠ সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা ব্যতীত এই কালের মধ্যে এ তাবৎ কেহই এই সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। ইঁহারই নিমিত্ত অবতার বলিয়া কথিত এই তিন ব্যক্তি তদানীন্তন মনুষ্যজাতির চরম দুঃখ-দুর্দ্দশার ত্রাণকর্ত্তা হইতে পারিয়াছিলেন।

আমাদের এই বক্তব্যের লক্ষ্য হইতেছে যে, পাঠকগণ যেন বুঝিতে পারেন গীতা, বাইবেল এবং কোরাণের যে-জ্ঞান ইহাদের কোন প্রকার অনুবাদের মধ্যবর্ত্তিতায় লব্ধ হয়, তাহা নির্ভরযোগ্য নহে, সুতরাং এই পুণ্যগ্রন্থসমূহের মর্ম্ম বিষয়ে "হেট্‌স্‌ম্যান"-সম্পাদকের যে-জ্ঞান, তাহা বিশ্বাসের অযোগ্য। আমাদের লব্ধ পাঠের যাথার্থ্য সম্বন্ধেও প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। তাহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য, এই সকল পুণ্যগ্রন্থ হইতে আমরা যে-পাঠ উদ্ধার করিয়াছি, কোন ব্যক্তি তাহার উপর নির্ভর করিবেন, ইহা আমাদের কাম্য নহে—যদিও আমরা ইহা নিশ্চিত জানি যে, ইহাদের কোন প্রকার অনুবাদ পাঠ না করিয়া আমরা ইহাদের মূল গ্রন্থই পাঠ করিয়া থাকি এবং তদ্বিষয়ে সকল জীবের আত্মনিহিত মূল শব্দসমূহের বিজ্ঞানই আমাদের পথ-প্রদর্শক। পাঠকগণকে কেবল আমরা এই অনুরোধ জ্ঞাপন করিব যে, এই সকল পুণ্যগ্রন্থের সত্যতা যাহাতে রক্ষা পায়, সেই নিমিত্ত ইহাদের পাঠ ব্যবহারে তাঁহারা যেন অন্ততঃ তাঁহাদের বিবেচনা-বুদ্ধির সহায়তা গ্রহণ করেন।

আমরা সকলেই বিদিত আছি যে, কোন একটি মনুষ্যপ্রাণ সংহার অপরা হত্যা কুত্রাপি পুণ্যকার্য্য বলিয়া গণ্য হয় না। অন্যথায়, হত্যাকারীর পক্ষে প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেকটি জাতি প্রাণদণ্ড বিহিত করিত না।

স্বকীয় দেহাভ্যন্তরে যিনি স্রষ্টার ক্রিয়াকলাপ এবং মনুষ্য-দেহের রক্তমাংসের ক্রিয়াকলাপে কি পার্থক্য বর্ত্তমান, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তিনি অচিরাৎ উপলব্ধি করিবেন যে, ঈশ্বর-বিহিত কার্য্য সর্ব্বথা মনুষ্যজাতির পক্ষে কল্যাণজনক এবং এই জন্যই প্রবাদ-বাক্য প্রচলিত আছে যে, "পরমেশ্বর সর্ব্বমঙ্গলময়।" প্রত্যেক জীব-জীবনে পরম্পরা-ক্রমে জন্ম, বিকাশ, জন্ম এবং বিকাশের রক্ষা, ধ্বংস ও বিনাশ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জীবদেহের এই পাঁচটি অবস্থার আদি-কারণের অনুসন্ধান-প্রয়াসী হইলে সঙ্গে সঙ্গে বুঝা যাইবে যে, জীব-স্রষ্টাই জন্ম, বিকাশ, তথা জন্ম এবং বিকাশ-রক্ষার আদি-কারণ এবং কোন দেহের ধ্বংস কিংবা মৃত্যু সাধিত হইতে পারে, এমন কোনও কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্ভব নহে। ইহাও বুঝা যাইবে যে, মাংস এবং রক্ত ইত্যাদির কামনার মধ্যেই এমন কিছু নিহিত থাকে, যাহা মনুষ্য-জীবনের ধ্বংস এবং মৃত্যুর কারণ হয়। পরমেশ্বর মঙ্গলময় এবং জীব-স্রষ্টা জীবের জন্ম এবং বিকাশ, তথা জন্ম এবং বিকাশ-রক্ষার মূল কারণ, কিন্তু তাঁহার দ্বারা ধ্বংস এবং মৃত্যু বিহিত হয় না, ইহা যদি সত্য হয়, তবে পুণ্যগ্রন্থসমূহে দৈনিক কর্ত্তৃক কোন প্রকার মনুষ্যপ্রাণ-সংহার অনুমোদিত হইয়াছে, এইরূপ কথা বলিলে কি পুণ্যগ্রন্থসমূহের 'দিব্যত্ব'কে তাহা আহত করে না? আমাদের পাঠকবৃন্দকে আমরা অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা তাঁহাদের বিবেচনা-বোধের সহায়তায় উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করুন যে, যে-কার্য্য ঈশ্বর-বিহিত কার্য্যের সহিত সমানধর্ম্মী নহে, সুতরাং যাহা অপবিত্র, সেরূপ কোন কার্য্যে কোন শ্রেণীকে প্রেরণা-দান কি পুণ্যগ্রন্থের পক্ষে শোভন নহে? মনুষ্যমাত্রেরই বিবেচনা-বোধে ধরা পড়িবে যে, মনুষ্যপ্রাণ-সংহার কখনও কোন পুণ্য-গ্রন্থের অনুমোদিত হইতে পারে না। এতদ্‌সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি পুণ্যগ্রন্থের কোন একখানি হইতে ইহার বিপরীত কোন বিষয় সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তিনি প্রকৃত পাঠের উপলব্ধিতে সমর্থ হন নাই। বস্তুতঃ গীতা কিংবা কোরাণ কিংবা বাইবেল কুত্রাপি কোন অবস্থাতেই মনুষ্যপ্রাণ-সংহার অনুমোদন করে নাই।

গীতা যে, কোন অবস্থাতেই মনুষ্যপ্রাণ-সংহার অনুমোদন করে নাই, তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে :—

"নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।" ২য় অধ্যায়।

"ইচ্ছা-দ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।

সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥" ৭ম অধ্যায়।

এই সকল শ্লোক সম্যক্ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মনুষ্যপ্রাণ-সংহারক কোন যুদ্ধ-ঘোষণা কেবল গীতায় নিষিদ্ধ হয় নাই, উহাতে দ্বন্দ্ব-কলহ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং দ্বন্দ্ব-কলহ ব্যতীত কখনও যুদ্ধ সংঘটিত হইতে পারে না। অর্থাৎ গীতায় কেবল যুদ্ধ যে নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে, উহাতে যুযুৎসু বৃত্তির পর্য্যন্ত নিষেধ করা হইয়াছে। গীতার সমগ্রাংশ যথার্থ ভাবে অনুধাবন করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, কি করিয়া দ্বন্দ্ব-কলহের মনোভাব, তথা যুযুৎসা মনুষ্য-চিত্তে সংক্রামিত হয় এবং কি করিয়া উহা দমন করিতে হয়, তাহা প্রদর্শন করাই গীতার মূল উদ্দেশ্য।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোকে—যাঁহারা মনুষ্যসমাজের শৃঙ্খলা-রক্ষার্থ মনুষ্যদেহে স্বাভাবিক আত্মরক্ষার সামর্থ্য বৃদ্ধি করিয়াছেন—সেই ক্ষত্রিয়গণের মনোভাবের আলোচনা করা হইয়াছে। এই সকল শ্লোকে, ক্ষত্রিয়গণ, যখন তাঁহাদের স্বাভাবিক আত্মরক্ষার সামর্থ্য বৃদ্ধি করেন, তখন কি করিয়া স্বতঃই দ্বন্দ্ব-কলহের অতীত হইয়া থাকেন, এবং কি করিয়া ঐ ভাবে দমন না করিতে পারিলে তাঁহারা বহুবিধ দুঃখ-দুর্দশায় প্রপীড়িত হইয়া থাকেন—তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। কতিপয় নির্বোধ অনুবাদকার এই সকল শ্লোকের ভ্রান্ত অনুবাদ করিয়া ইহাতে যাহা বুঝানো হইয়াছে, তদ্বিপরীত অর্থ প্রচার করিয়াছেন। গীতা-অধ্যায় মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত। মহাভারতের গ্রন্থকার যদি যুদ্ধ, বৃহৎ কিংবা ক্ষুদ্র, তথা দ্বন্দ্ব-কলহের সমর্থনই করিতেন, তাহা হইলে যুদ্ধ-সংক্রান্ত পর্ব্বসমূহের শেষে তিনি সকল যোদ্ধার সম্যক্ পতন চিত্রিত করিতেন না। পুণ্যগ্রন্থ মহাভারত যথাযথ ভাবে পাঠ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ইহার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হইতেছে দ্বন্দ্ব-কলহের কুফল-প্রদর্শন। মহাভারতে যে-সকল বিভিন্ন বিষয়ক তথ্য আলোচিত হইয়াছে, তাহাদের পরস্পর সম্পর্ক যিনি সম্যক্ বুঝিতে পারিবেন, এবং তাহা আত্মস্থ করিতে পারিবেন, তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, মহাভারতের কুত্রাপি যুদ্ধ-ঘোষণা, অথবা কোন প্রকার দ্বন্দ্ব-কলহের ভাব অনুমোদন করা হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

ভাষানিহিত শব্দ-বিজ্ঞান-সহায়তায় কোরাণ এবং বাইবেলের মূল গ্রন্থ যথাযথ অর্থে পাঠ করিতে পারিলে, তাহা হইতেও বুঝা যাইবে যে, উভয়েরই অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হইতেছে দ্বন্দ্ব-কলহপ্রসূত কুফল চিত্রণ। কোরাণ এবং বাইবেল মূলতঃ যে-ভাষায় লিখিত, বর্ত্তমানে তথাকথিত মুসলমান এবং খৃষ্টানগণ তাহা বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহারা উহাদের ভ্রান্ত অনুবাদ করিয়া "ষ্টেট্‌সম্যান"-পত্রিকার সম্পাদক সদৃশ সৎ, অথচ বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদিগকে বিপথগামী করিয়াছেন।

কোরাণ-এর "আল্-ফারকুয়ান (Al Forquan)"-এর অধ্যায়ে যেখানে এক হইতে বহুর কারণ আলোচিত হইয়াছে, তাহা সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কোরাণ অনুযায়ীও ব্যক্তি এবং জাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহের মনোভাব হক এবং মাংসের স্বভাব হইতে স্বতঃই উদ্ভূত হয়, কিন্তু ঐ ব্যক্তি কিংবা জাতি যদি ইহার সমাধান না পরিজ্ঞাত থাকে, তাহা হইলে তাহাদের বিবিধ দুঃখ-ভোগ সুনিশ্চিতরূপে অনিবার্য্য।

'বাইবেল'-এর 'জেনেসিস্'-ভাগের নবম অধ্যায়ের পঞ্চম সূত্রে সম্যক্‌রূপে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বাইবেলেও সর্ব্বপ্রকার হত্যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং ইহার কুত্রাপি যুদ্ধে মনুষ্য-হত্যার নির্দ্দেশ নাই।

বর্ত্তমানে সমগ্র মনুষ্যজাতির মধ্যে প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত মুসলমান, তথা প্রকৃত খৃষ্টান একেবারে নাই বলিয়াই আমাদের মনে হয় যে, "ষ্টেট্‌সম্যান"-সম্পাদক এরূপ কথা বলিবার সাহস করিয়াছেন যে, সকল পুণ্যগ্রন্থেই যুদ্ধে মনুষ্য-প্রাণ-হত্যা অনুমোদন করা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি কেহ তাঁহাকে কশাঘাত করিতেছেন না, কিংবা পিতা যে ভাবে নির্বোধ পুত্রের সুবুদ্ধি আনয়নের জন্য তাহার কর্ণমর্দ্দন করিয়া থাকেন, সেরূপ কোন নিগ্রহ তাঁহার ভোগ করিতে হইতেছে না।

কেবল ধর্ম্ম-দৃষ্টি হইতেই "ষ্টেট্‌সম্যান"-সম্পাদক যে, এই "এবং ভারতে ( And in India" )-শীর্ষক সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অর্থহীন তাহা নহে, রাষ্ট্র এবং অর্থনীতি, এই উভয় দিক্ হইতেও ইহা অর্থহীন। আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, যুদ্ধ এবং মনুষ্য-প্রাণ-হত্যা যদি মনুষ্য-সমাজের কাহারও কোন রাষ্ট্রীয় এবং আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে পারিত, তবে ইউরোপের মহাযুদ্ধ শেষ

হইবার পর হইতে পৃথিবীর প্রত্যেক অঞ্চলকে এমন গভীর বিপর্যয় ও আর্থিক দুরবস্থা ভোগ করিতে হইতেছে কেন? এই সম্প্রদায়-পুরুষবিশেষকে অন্তঃসংজ্ঞ বুঝিতে হইবে যে, যুদ্ধ এবং মনুষ্যপ্রাণ-হত্যা মনুষ্যসমাজের কাহারও পক্ষে কোন কল্যাণ-সাধন করিতে পারে না এবং ব্রিটিশ জাতির এই সম্প্রদায়ের নির্বুদ্ধিতার জন্যই নির্দোষ ব্রিটিশ জনসাধারণকে আজ, যে-পুণ্যস্মৃতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তাহাদের পরিশ্রমী এবং পুরুষানুক্রমিক যোগ্যতায় অর্জিত হইয়াছিল, তাহার পতনাশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইতে হইতেছে।

আমরা জোরের সহিত বলিতেছি যে, ভীষণাদপি ভীষণ অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধেও বিনা অস্ত্রে জগদ্ব্যাপী সাম্রাজ্য অর্জন এবং রক্ষার উপায় বিদ্যমান। হইতে পারে যে, বর্তমান মনুষ্যসমাজের এই উপায় অবিদিত, কিন্তু তথাপি আমরা বলিতেছি যে, এই উপায় বিদ্যমান এবং কোন দায়িত্বমূলক পদাধিষ্ঠিত ব্যক্তি যদি ইহা জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে ইহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে আমরা প্রস্তুত আছি। আমরা আমাদের বড়লাট বাহাদুরকে এখনও সাবধানতা অবলম্বন করিয়া, যে উপায়ে—মিঃ গান্ধী এবং "হেরল্ডমান"-সম্পাদকের ন্যায় নাস্তিক-ব্যক্তিসমূহ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া তাহাদিগকে যাহাতে যুদ্ধ-বিমুখ করিয়া তুলিতে না পারে,—সেই উপায়-গ্রহণার্থ নিবেদন জ্ঞাপন করিতেছি।*

## ওরাণের নৌ-যুদ্ধ : ব্রিটিশের জয়লাভ-পরিচায়ক কি?

জনসাধারণের সম্মুখে প্রধান মন্ত্রী চার্চিল ঘোষণা করিয়াছেন যে, ওরাণের নৌ-যুদ্ধ জার্মানীকে ফরাসী নৌবাহিনীর অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া ইংলণ্ডের জয়লাভের একটি সোপান-স্বরূপ হইয়াছে। আমরা মনে করি, প্রধান মন্ত্রীর এই মতবাদে ত্রুটি বর্তমান। আমরা সাময়িক ভাতি নহি, সুতরাং যে-সকল বিষয় সম্পূর্ণ সাময়িক নীতির অন্তর্গত, তৎসম্বন্ধীয় কোন সমালোচনা আমরা আমাদের পরিধির বহির্ভূত বলিয়া মনে করি। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সামান্য বিবেচনা-বুদ্ধি হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, ওরাণের এই যুদ্ধ জার্মানদিগের অনুষ্ঠিত কৌশলবিশেষের ফল মাত্র এবং ইংলণ্ড আক্রমণ যদি সম্ভব হয়, তবে সেই আক্রমণ সার্থক করিবার পক্ষে ইহা যথেষ্ট সাহায্য করিবে। একাধিক ইউরোপীয় লেখক, যাঁহারা বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া হিটলারের সামরিক উৎকর্ষ-বিধানের ফলাফল-নির্ণয়ে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, বিবেচনা করিয়া গিয়াছেন যে, হিটলারের সামরিক উৎকর্ষ বিধান যে-পরিমাণ হউক না কেন, তিনি যদি ফ্রান্সকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে না পারেন, তবে ইংলণ্ড আক্রমণে তাঁহার কৃতকার্য হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এইবার হিটলার যদি ফ্রান্সকে স্বপক্ষে লাভ করিয়া প্যারী-তে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তবে কোন পার্থিব শক্তিই তাঁহার ইংলণ্ডে আগমনের পথ নিরোধ করিতে পারিবে না। এই মতবাদের পশ্চাতে যে যুক্তি বিদ্যমান তাহার সন্ধান-লাভে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। ইংলণ্ড এবং জার্মানীর মধ্যে বিবিধ ব্যবধান বিদ্যমান। একটি স্বাভাবিক, ইংলিশ-চ্যানেল; অপরটি ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থলবাহিনীর অধিকারী বিশ্বাসে প্রচারিত ফ্রান্স। আধুনিক যুদ্ধ-সজ্জাসমূহবিষয়ক কোন ছাত্রই স্বীকার না করিয়া পারিবেন না যে, ইংলিশ-চ্যানেল অতিক্রমে সহায় হইবার উপযোগী সম্ভার আবিষ্কার জার্মান জাতির পক্ষে মোটেই অসম্ভব নহে। কিন্তু শত্রুভাবাপন্ন ফ্রান্সকে পশ্চাতে রক্ষা করিয়া তাহারা যদি ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে, তবে জার্মানীর সহিত তাহাদের যোগসূত্র ছিন্ন হইবে সতত এই আশঙ্কায় থাকিতে হইবে। অর্থাৎ শত্রুভাবাপন্ন ফ্রান্সকে পশ্চাতে রক্ষা করিয়া ইংলণ্ড আক্রমণে কৃতকার্য হইবার বিষয় চিন্তা করিতে হইলে, জার্মানীকে ইংলণ্ড অপেক্ষা অন্ততঃ আটগুণ অধিক শক্তির অধিকারী হইতে হইবে—ইংলণ্ডস্থ ব্রিটিশ শক্তির পরাজয়ার্থ ইংলণ্ডীয় শক্তির দ্বিগুণ শক্তি; ইংলিশ-চ্যানেলে ফরাসীদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা শক্তি বাঁচাইবার জন্য ব্রিটিশ শক্তির দ্বিগুণ শক্তি; ফরাসীরা যাহাতে স্থলপথে আক্রমণ করিতে না পারে এবং জার্মানী ও চ্যানেলস্থ জার্মান সৈন্যসজ্জার পরস্পর যোগসূত্র-রক্ষার্থ ব্রিটিশ শক্তি অপেক্ষা দ্বিগুণ শক্তি এবং জার্মানীকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষার্থ ব্রিটিশ শক্তি অপেক্ষা দ্বিগুণ শক্তি। অর্থাৎ দাঁড়ায় এই যে, ফ্রান্সকে যদি কোন রূপে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা-রক্ষায় বাধ্য করা যায়, তবে ব্রিটিশের সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা মাত্র চারি গুণ অধিক সৈন্যসংখ্যা সংগ্রহ করিতে পারিলেই জার্মানী কর্তৃক ইংলণ্ড আক্রমণ সার্থক হইতে পারে। তদুপরি যদি জার্মানী কোন ক্রমে ফ্রান্সের নৌ-বলকে কৃতকার্য হইতে পারে, তবে ইংলণ্ডের সমান সামর্থ্য-যুক্ত সৈন্য লইয়াই ইংলণ্ড আক্রমণে কৃতকার্যতা লাভ সম্ভব হইতে পারে।

বিশ্বাস করিবার কারণ বর্তমান যে, মিঃ চার্চিলের মন্ত্রিসভার ভ্রান্ত কূটনৈতিক চাপ বশতঃ ইংলণ্ডের স্বার্থ সম্পর্কে ফ্রান্সের মনোভাব ইতিপূর্বেই উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে—

* 'দি চ্রনিক্‌ল' পত্রিকার ১০ই জুলাই সংখ্যার প্রকাশিত মূল ইংরাজী পত্র হইতে।

ওয়ালের যুদ্ধ কেবল সেই চিত্র শেষ করিল মাত্র। ফ্রান্স যেন ইংলণ্ডের শত্রুপক্ষভুক্ত না হয়, ইহা আমাদের প্রার্থনার বিষয়, কিন্তু চার্চ্চিলের মন্ত্রিসভার চালচলন সম্বন্ধে আমরা এরূপ নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি যে, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে জার্ম্মানীর সহিত ফ্রান্সও এতযোগে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে, ভবিষ্যতে এরূপ কোন ঘটনা ঘটিলে আমরা বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইব না। আমরা চার্চ্চিলের রচনাসমূহ বিশ্লেষণ সহকারে পাঠ করিয়াছি এবং তাহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কারণ লাভ করিয়াছি যে, মিঃ চার্চ্চিল বর্ত্তমান যুগের একজন খাঁটি ইংরাজ রাজনীতিবিদ্,—পরিশ্রমী এবং অকপট, কিন্তু তিনি চিন্তাশক্তিবিশ্লেষহীন এবং অতিমাত্রায় সাত্ত্বিক।

আমাদের মতে, ইংলণ্ডের ভাগ্যে চার্চ্চিল কুগ্রহ স্বরূপ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং মূলতঃ মিঃ চার্চ্চিল ও তাঁহার অনুচরবৃন্দের নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃই পূত-চরিত্র ব্রিটিশজাতি এবং তাঁহাদের অসহায় ভারতবাসী প্রজাবৃন্দকে বর্ত্তমান দুর্য্যোগের সম্মুখে হইতে হইয়াছে। আমরা জানি, আমাদের কথা কেহ কর্ণপাতযোগ্য বলিয়া মনে করিতেছেন না, কিন্তু রাজা এবং তাঁহার রাজশক্তির প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য বর্ত্তমান, ইহা বিবেচনা করিয়াই মিঃ চার্চ্চিল যখন প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে-ছিলেন, তখন আমাদের মনোভাব প্রকাশ করিব কিনা করিয়া ছিলাম, কিন্তু কাপুরুষতা হেতু সমর্থ হই নাই। কিন্তু এখন মিঃ চার্চ্চিল এবং তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা-পরিচালিত এই মন্ত্রিসভার নিকট যে-শাস্তিই আমাদিগকে লাভ করিতে হউক, আমরা গ্রাহ্য করি না। আমাদের ইহলৌকিক জাতির নির্দ্দোষ শিশু এবং রমণী সম্প্রদায়কে যে দুরবস্থা ভোগ করিতে হইতেছে বলিয়া আমরা অনুমান করিতে পারিতেছি, তাহার তুলনায় আমাদের প্রাণদণ্ডেও আপত্তি নাই। শয়তান-স্বরূপ এই চার্চ্চিলের ধ্বংস সাধন করিয়া—তাঁহার নির্ব্বোধ কার্য্য-কলাপের ফলে এই শিশু এবং রমণীদিগকে যে-দুরবস্থায় নিপতিত হইতে হইয়াছে, তাহা সহ্য করিবার শক্তি তিনি দান করুন—ভগবানের নিকট ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ভারতের এই খণ্ড-যুদ্ধের যখন ইংলণ্ডের পক্ষে সর্ব্বনাশজনক হইবার সম্ভাবনা নিরানব্বই অংশ আশঙ্কা রহিয়াছে, তখন ব্রিটিশ জাতির জয় হিসাবে ইহাকে জাহির করা কি লজ্জাকর নহে?

শক্তিশালী জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের যুদ্ধে ফ্রান্সের মৈত্রী যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ইহা কি সত্য নহে? এই মৈত্রী সূত্র করিয়া সামান্য একটি নৌ-যুদ্ধে ভারতকে কৃতিত্ব হিসাবে জাহির করা কি বুদ্ধির পরিচায়ক? ফ্রান্সের সম্পূর্ণ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া যে হিটলার এবং মুসোলিনী উভয়ে ওয়ালের সংঘর্ষস্থল হইতে স্বেচ্ছায় দূরে ছিলেন, ইহা সন্দেহ করিবার সর্ব্বপ্রকার কারণ বর্ত্তমান।

অনুকম্পার বিষয় এই যে, বর্ত্তমান কূটনীতি-বিদ্যার জন্মক্ষেত্র ইংলণ্ড কর্ত্তৃক এইরূপ অর্থহীন কার্য্য সংঘটিত হইতে পারিল।

ষ্টেট্‌সম্যানের যে নির্ব্বোধ লেখক মিঃ চার্চ্চিলের প্রশংসা-কীর্ত্তনে মুখর, আমরা তাঁহাকে অভিশাপ দান করিতেছি। তাঁহার স্মরণ থাকা আবশ্যক যে, ব্রিটিশ জনসাধারণের অধিকাংশের মত-সাম্যে মিঃ চার্চ্চিল আজ ব্রিটিশদিগের প্রধান-মন্ত্রিত্ব লাভ করেন নাই, কতিপয় কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতা আকস্মিক বিপদে অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়াই এই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

কোন সাংবাদিকের পক্ষেই এমন কোন বিষয়ের উল্লেখ অনুচিত যাহা সাধারণের পক্ষে শঙ্কার সৃষ্টি করে, ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতেও সন্দেহ থাকা উচিত নহে যে, আসন্ন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়া চিন্তাশীল জনসাধারণের বিভ্রান্তি উৎপাদন এবং তাঁহাদিগকে বিপথগামী করিবার ন্যায় সঙ্কীর্ণ রচনাও সাংবাদিকের পক্ষে অনুচিত। বিপদের জন্য প্রস্তুত হইয়া সময় থাকিতে সাবধানতা অবলম্বন কি আকস্মিক বিপদে পতন অপেক্ষা কাম্য নহে? অনেক দিক্ হইতে বিচার করিলে, পদাধিষ্ঠিত প্রধান-মন্ত্রীর কার্য্যকলাপ সমালোচনা হয়তো সমীচীন নহে, কিন্তু যে প্রধান মন্ত্রী ভ্রান্ত পথে চলিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যের সমর্থক সমালোচনা করিয়া জনসাধারণকে বিপথগামী করা অপেক্ষা নীরব থাকাই কি শ্রেয় নহে?

বর্ত্তমানের এই অভূতপূর্ব্ব বিপদক্ষণেও আমাদের বড়লাট বাহাদুর তাঁহার কার্য্যকলাপে যে পরম ধৈর্য্য এবং ধৈর্য্যের তিনি অধিকারী বলিয়া পরিচয় দান করিতেছেন, তাহাতে আমাদের তাঁহাকে বলিতে ইচ্ছা হয় যে, "ষ্টেট্‌সম্যান"-সদৃশ সমধিক প্রচারিত এবং দায়িত্বজনক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগ হইতে এই শ্রেণীর দায়িত্বজ্ঞানহীন লেখকবৃন্দ যাহাতে অপসৃত হন, তিনি তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।*

---

* "দি ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকা"। ১৩ই জুলাই সংখ্যার প্রকাশিত মূল ইংরাজী সম্পাদকীয় হইতে।

## ওকেফিনোকি বনাঞ্চল*

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স-এর অন্তর্গত জর্জিয়া প্রদেশে একটা বিরাট জলাভূমি ও বন বহুকাল থেকে উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের কৌতূহল উৎপাদন করে এসেছে। সুয়ানি নদীর স্বাভাবিক গতি-পথের মুখে সৃষ্ট এই জলাভূমি এত বিরাট যে, দু'চার জন বৈজ্ঞানিক ছাড়া এর অভ্যন্তর-ভাগে সাধারণ লোকে কখনও প্রবেশ করেনি।

ওকেফিনোকি জলাভূমি ভাল করে দেখবার জন্যে ১৯১২ সালের মে মাসে আমি যখন প্রথম যাত্রা শুরু করি, সে সময় দক্ষিণ-পূর্ব জর্জিয়া প্রদেশ সাধারণের নিকট প্রায় অজ্ঞাত। প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণের কাছে এমন একটী স্থানের মূল্য প্রায় আন্দিজ্ পর্বতমালার অন্তর্গত কোনও অজানা গুহা বা সাউথ-সী অঞ্চলের কোনও অনাবিষ্কৃত দ্বীপের সমান। নানারকম অলৌকিক কিংবদন্তী এই অঞ্চলকে আশ্রয় করে বেড়ে উঠেছিল, আরও আমার সেই হেতু কৌতূহল ছিল ওকেফিনোকি জলা ভাল করে দেখবার জন্য।

একটী লোককে আমি জানতাম—সে ঐ অঞ্চলের কাঠ ও গাছপালা নিয়ে জীবনের অনেকদিন কাটিয়ে দিয়েছে। তার নাম জন হপকিন্স্, ওকে আমি অনুরোধ করাতে সে আমার একটী উনিশ বছরের ছোকরা পথ-প্রদর্শক ঠিক করে দিলে। ছোকরার নাম ডেভিড লি।

যাবার একমাত্র পথ সুয়ানি খাল। এক সময়ে আমেরিকান্ গৃহ-যুদ্ধের দু'জন বিখ্যাত বীর মরিস্ ও উইল হেন্রি পালিয়ে এসে সুয়ানি খালের পথ দিয়ে জলাভূমিতে আশ্রয় নেয়। তখন খালের অবস্থা ছিল ভাল, এখন ভাসমান কাঠের গুঁড়িতে পরিপূর্ণ হয়ে খালে চলাচলের পথ বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে।

আমরা অনেক দূরে কাউহাউস দ্বীপ থেকে যাত্রা শুরু করলাম। বারো ঘণ্টা ধরে বন সাইপ্রেস্ গাছের বনের তলা দিয়ে নৌকা বেয়ে নিয়ে যাবার পরে রাত দুপুরের সময় আমরা বিলিস্ দ্বীপে পৌঁছলাম। এই দ্বীপগুলি জলাভূমির মাঝে মাঝে অবস্থিত। আরও অনেক দ্বীপ আছে, তাদেরও সব নানারকম নাম।

আমি প্রাণী ও উদ্ভিদতত্ত্বের দিক্ থেকে সুয়ানি খাল ও ওকেফিনোকি জলা দেখতে এসেছি, সুতরাং যে মুহূর্তে খালের ঘোলাজলে নৌকো ঢুকেছে এবং দু'ধারের শেওলা ঘোলানো সাইপ্রেস্ ও পাইন গাছ দেখেছি, সে মুহূর্তে আমার মন আকৃষ্ট হয়েছে এর সৌন্দর্য্যে, এর নির্জ্জনতায়। সেই দিনটি থেকে আমি বার বার এ অঞ্চলে এসেছি গিয়েছি।

মোট চার শ' দিন হবে, কিংবা তারও বেশী।

প্রথমে আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল এই বনাঞ্চলের পক্ষীকুল পর্য্যবেক্ষণ করা; পরে আমি জলপায়ী জীব, সরীসৃপ, উভচর প্রাণী, মৎস্য ও গাছপালা সবই দেখে বেড়িয়েছি।

বহু শিকারী লোক এখানে আসে ভল্লুক, উদ্বিড়াল, বেজি ও বনবিড়াল প্রভৃতি শিকার করতে। প্রতি বৎসর এরা আসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে—একবার ১৯১৬-১৭ সালের শীতকালে ওদের সঙ্গে নৌকোতে এখানে আসি। ওদের গল্প শুনতাম, ওকেফিনোকি জলা সম্বন্ধে কত প্রবাদ, কত অলৌকিক কাহিনীর খোঁজই যে ওরা রাখে!

১৯২২ সালের গ্রীষ্মকালে আমি এখানে অভিযাত্রিক করি উভচর প্রাণীদের পর্য্যবেক্ষণ করতে। অনেক ধরণের

* জ্যান্সিস হার্পারের বিবরণ হইতে।

127,185.

ব্যাঙের ফোটো সংগ্রহ করি সেবার। রাতে যখন জলাভূমিতে ব্যাঙ ডাকে, তখন ফ্লাশলাইটের সাহায্যে আমি স্থানীয় পাইন রকমের ব্যাঙের মধ্যে দুরকমের ছবি তুলেছি।

জলাভূমির এ অঞ্চল পৃথিবীর মধ্যে একটি দ্রষ্টব্য স্থান।

এখানে সেই আদিম যুগের অরণ্য বর্তমান, মানুষের হাতে যা নষ্ট হয় নি। বহুকাল আগে এখানেই একটী কুমীরের ডাক শুনি—কুমীর গাঁ-গাঁ করে ডাকে অনেকেই বোধ হয় জানেন না, কারণ অনেকের এ ডাক শুনবার সৌভাগ্য হয় নি।

ডাকটী শুনেছিলাম বিগ্ ওয়াটার নামক অঞ্চলে, ওকেফিনোকি জলার পূর্ব-উত্তর কোণে বনের ধারে। কিন্তু ১৯২৯ সালে সুয়ানি হ্রদে এক কোণের ধারে আমি নিজের চোখে একটী গর্জনরত কুমীরকে প্রত্যক্ষ করি, তার ফোটোও নিই।

আরও অনেক অদ্ভুত দৃশ্যের ফোটোগ্রাফ নিয়েছিলাম সেবার: দক্ষিণ অঞ্চলের নরম ঘোলাযুক্ত কর্দমের ডিম পাড়ার দৃশ্য, ছাতার পাখীর মত লেজযুক্ত চিলের উড্ডয়ন, ধানি ঘাসের পাইন-বনের মাথায় বসে একদল ফ্লরিডা কক ডাকছে, পেলুয়ারীর হিংস্রখী পাখের হাতে ফ্লেমিঙ্গো পেচক চীৎকার করছে, স্প্যানিশ শেওলার মধ্যে বাসা-নির্মাণরত সোয়ালি ইঁদুর, চেসার প্রেইরিতে মাকড়সাতে একটা জীবন্ত ব্যাঙকে টেনে নিয়ে যাওয়ার অদ্ভুত দৃশ্য।

প্রাণিজগতের যত অদ্ভুত জিনিস নিজের চোখে দেখেছি, দু একটা এখানে বলি।

সুয়ানি হ্রদের ধারে একটা চাতকপাখী তার ছানা-গুলোকে নির্ভয়ে মাটী থেকে কি খুঁজে খুঁটে খুঁটে খাওয়াচ্ছে, একটা সাইপ্রেস্ গাছের তলায়—আর আমি ঠিক একহাত দূরে বসে ধূমপান করছি। পাখীটা মাঝে মাঝে আমার দিকে চেয়ে দেখছে, আবার আপন মনে ছানাদের খাওয়াচ্ছে। আমায় গ্রাহ্যও করলে না।

'চেসার দ্বীপে একটা ব্যাঙকে জব্দ দেখাবার জন্যে আমি আমার লাঠিটাকে বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে মাটীর ওপর দিয়ে তার দিকে এগিয়ে দিচ্ছি, আর ব্যাঙটা জব্দ পেয়ে আত্মরক্ষার জন্যে লাঠিটাকে সম্ভবতঃ জব্দ দেখাবার জন্যে ফুলতে লাগলো চেসপের গল্পের বিখ্যাত ব্যাঙের মত।

আমার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হয়েছে এই জলাভূমি অঞ্চলের শিকারীদের সঙ্গে আলাপ করে। এদের ভাষা বোঝা আমার পক্ষে কঠিন হোত—কত রাত্রে ওদের সঙ্গে তাঁবুর ক্যাম্পফায়ারের চার পাশে বসে ওদের মুখে জলা-অঞ্চলের কত গল্প, প্রাণীদের বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য, কৌতুক প্রসঙ্গ ইত্যাদি শুনে রাত কাটিয়েছি, ওদের কত গান শুনেছি।

ওকেফিনোকি জলাভূমির শোভা বাড়িয়েছে তার প্রেইরি অঞ্চল। এগুলো হচ্ছে বহুদূরব্যাপী জলজ গাছের রাজ্য, ধারে ধারে সাইপ্রেসের নিবিড় বন। কি অদ্ভুত শোভা এই অঞ্চলের! যে প্রকৃতিকে ভালবাসে, সে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আনন্দে কাল কাটাতে পারে এখানকার পাখীর গান, ব্যাঙের ও কুমীরের ডাক শুনে, সাইপ্রেসের বনে বাতাসের মর্মর শুনে। তবে ওকেফিনোকি প্রেইরির সবটাই জল, এর মধ্যে মাটী নেই কোথাও।

কোথাও বা মাইলখানেক ব্যাপযুক্ত বৃহৎ চত্বরাকারে জলা-ভূমি, জলজ ঘাস ও গাছপালাহীন, সুতরাং নৌকা চলাচলের বেশ উপযুক্ত, কোথাও কয়েক হাত ব্যাপযুক্ত ক্ষুদ্র গর্ত বা ডোবা, এখানেই কুমীরের দল বাসা বাঁধে। এর মাঝে ছোট বড় দ্বীপ, পাইন ও সুইট্‌বে প্রভৃতি গাছের বন তার উপর, সমস্ত গাছে সরু সরু শেওলার কম্বল ঝুলছে।

মাঝে মাঝে বহু একর ব্যাপী সাদা জলজ লিলির বন, তাদের চকচকে সবুজ পাতায় রাশি জলকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে রেখেছে। কোথাও বা আছে হলদে ফুলওয়ালা ঘাসের বন, দূর থেকে বড় সুন্দর দেখায়। জলের ধারে পিকারেল উইডের বন, তার নীল ফুলের দল জলাভূমির প্রান্তদেশ আলো করেছে। জুন মাসে ফোটে পেন্টরুট্ নামক জলজ গাছের সাদা ফুল, আরও নানাপ্রকার জলজ গাছপালা ও ঘাসের ফুল। এদের প্রতিচ্ছবি পড়ে স্বচ্ছ জলে, ঘাসের দীর্ঘ ডাঁটা মাথা দোলায়। পিচারপ্লান্ট গাছ এখানে এত বড় হয় যে অন্য কোথাও দেখা যায় না এ রকম। জলের ওপরে এক গজ উঁচু হয়ে থাকে এর ডাঁটা। পাতার নীচেই এদের হাতির আকারের হলদে ফুল ফুটে পোকামাকড়কে আকৃষ্ট করে।

আর এক রকমের জলজ গাছের নাম 'মেডেন্ কেন্'—এদের ফুল ফোটে না, কিন্তু এদের ঘন সবুজ ঝোপের আড়ালে নানা-রকমের পাখী বাসা বাঁধে। নৌকা করে যেতে যেতে এই

[illegible]



[illegible]

ঝোপের কাছে এলে, অনেক রকমের পাখী হঠাৎ ভয় পেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উঠে এক সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি করে। পাখী ছাড়াও ফ্লরিডা অঞ্চলের ফলের ইঁদুর এই ঝোপে দেখা যায়।

শিকারীরা সোল সোল নৌকা লগি দিয়ে ঠেলে নিয়ে জলাভূমির ওপর বেড়ায়। তাদের নৌকা এমন ভাবে তৈরী, গভীর বা অগভীর সব রকম জলেই চলে। তবে এ নৌকোতে বসবার জায়গা নেই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লগি ঠেলে চালাতে হয়। নিপুণ মাঝি অতি দ্রুতবেগে জলার উপরে নৌকা চালাতে পারে। শিকারীরা জলাভূমির মধ্যে বনাবৃত দ্বীপের নিরাপদ আশ্রয় থেকে হরিণ ও ভল্লুক তাড়িয়ে নিয়ে যায় সে-দিকে, যে-দিকে তাদের সঙ্গী নৌকার ওপর ওৎ পেতে বন্দুক হাতে বসে আছে। সঙ্গীর বন্দুকের গুলিতে বেচারী হরিণ ও ভল্লুকদলের তারপর জীবলীলা সাঙ্গ হয়।

এই জলাভূমিতে একা বেশীদূর গিয়ে পড়ার মধ্যে নানা রকম বিপদ আছে।

একবার গ্রীষ্মকালে গ্রাণ্ড প্রেইরির সবুজ তৃণদল আমাকে আকৃষ্ট করে এক সপ্তাহের জন্যে তার নির্জন বক্ষে নিয়ে গিয়েছিল। আমি যখন ভ্রমণে বওনা হবার জন্যে নৌকাতে জিনিসপত্র তুলছি, তখন আমার স্থানীয় বন্ধু অ্যালেন চেসার আমায় বললে, যদি বনে ভালুকের সামনে পড়, তবে পালাতে যেও না যেন, তার সামনে দাঁড়িয়ে যাবে।

অবশ্য ভালুকের সামনে আমি পড়িনি, কিন্তু বহুপ্রকার বন্য জীবের দর্শনলাভ ঘটেছিল আমার অদৃষ্টে। জলাভূমির মাঝখানে একটা বনাবৃত দ্বীপে আমি তাঁবু ফেলি, এবং সেখান থেকে প্রত্যহ চারিদিকে নৌকা করে ঘুরে আসতাম।

রাত্রে সে কত প্রকার শব্দ! সে সকল শব্দের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হোলে অমন নিস্তব্ধ জলাভূমিতে গিয়ে রাত কাটাতে হয়। ওকেফিনোকি জলা সাধারণ জলাভূমি নয়, অত বিস্তৃত এবং অত বনাবৃত জলাভূমি ফ্লরিডা অঞ্চলে আর কোথাও নেই।

রাত্রে ডাকতো পেচা, সারস, হরিণ, কত রকমের ব্যাঙ, কুমীর—প্রত্যেকের ডাক আলাদা আলাদা, চিনে নেওয়া যায়।

ফিরে যখন আসি, তখন আর একজন স্থানীয় বন্ধু বলেন, কোথায় ছিলে এক সপ্তাহ? তোমার বুদ্ধির খুব প্রশংসা করি না। সাহস অবশ্য আছে তোমার। কিন্তু প্রেইরি অঞ্চলে এক সপ্তাহ একা কাটানোতে সাহসের চেয়ে দুঃসাহসের পরিচয় দেয় বেশী। আমি এত কাল এখানে বাস করছি, এক হাজার ডলার যদি কেউ দেয়, তাতেও আমি কিন্তু যেতে রাজী নই বলে দিচ্ছি। কত রকমের বিপদ জানো? সাপই তো কত আছে!

প্রেইরির বুকে অফুরন্ত সূর্যালোক, কিন্তু তীরবর্তী সাইপ্রেসের বনে ঘন অন্ধকার। এই সব সাইপ্রেস খুব বড় গাছ, অনেক সময় পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু, ফুট খানেক জল থেকে সাইপ্রেসের বন সাধারণতঃ শুরু হয়, দ্বীপের ভেতরে অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

অনেক সময় জলের ওপরই সাইপ্রেসের বন। মধ্যেকার সুঁড়ি-পথ দিয়ে লগি ঠেলে নৌকা নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই সাইপ্রেসের বনের তলায় আগাছার জঙ্গল এত বেশী যে সে-জায়গা দিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়াই কঠিন, নৌকা তো দূরের কথা।

সাধারণতঃ মিষ্ট গল্‌বেরি, 'হুয়া' ঝোপ ও কাঁটা বাঁশের বন। মানুষের পক্ষে এই ঘন বন ঠেলে যাওয়া অতীব দুঃসাধ্য, প্রায় অসম্ভব। একমাত্র যেতে পারে বন্য ভালুক। বাঁশের কাঁটাতে ভালুকের গায়ের পুরু লোমাবৃত চামড়ার কোন ক্ষতি হয় না।

অনেক রকমের পাখীর ডাক সারাক্ষণই পাওয়া যায়।

ক্যারিনা বেশ সকল সুরে ডাকে, 'ভিরিও' এবং 'অ্যাকেডিয়ান্' পাখী কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করে ঘন সাইপ্রেস-বনের অন্ধকারে আর আশী ফুট উঁচু বৃক্ষরাজির মাথায় ডাকে রক্তী গলা ও কাঁধ বিশিষ্ট ফ্লরিডা রাজ্ পাখী। এ সব বাদে কাঠঠোক্রার ঠক্ ঠক্ শব্দ তো সব সময় আছেই।

'আইভরি বিল' নামে একজাতীয় পাখীর আজকাল কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা অনেক অনুসন্ধান করেছেন, কোন ফল হয় নি। আমার মনে হয়, সত্তেরো বছর আগেই এই ওকেফিনোকি জলার সাইপ্রেস বনে আমি সে পাখীর ডাক শুনেছিলাম, অনেকটা খেলনা ভেঁপু বাজনার মত আওয়াজটা, কিন্তু চোখে পাখীটা আমি দেখি নি।

সাইপ্রেস-বনের ফাঁকে ফাঁকে অনেক ছোট বড় হ্রদ, এই সব হ্রদ মৎস্যশিকারীর স্বর্গ। তিনটী হ্রদ—এদের মধ্যে প্রধান,

ফিলিস্ হ্রদ, মিনিস্ হ্রদ এবং বিগ্ ওয়াটার। এই হ্রদগুলি দৈর্ঘ্যে অনেক সময় কয়েক মাইল, কিন্তু প্রস্থে পঞ্চাশ গজের বেশী নয় কোথাও।

হ্রদের জলে ঢুকলে নৌকার মাঝিকে আর লগি ঠেলতে হয় না, জল বেশী গভীর, বৈঠা দিয়ে বাইবার দরকার হয়। 'বাস্' ও 'ওয়ারমাউথ্' মাছ অজস্র পাওয়া যায় এই সব হ্রদে—নৌকা থেকে সুতো ফেলে মাছ ধরতে হয়, কারণ ডাঙা নেই, সেখানে বসবার সুবিধেও নেই। হ্রদের সব মাছই খেতে বেশ সুস্বাদু।

হ্রদের জলের ধারে সার-বাঁধা লম্বা সাইপ্রেসের সারি—তাদের সারা দেহ থেকে পাকা স্প্যানিশ্ শেওলা ঝুলছে। গাছের গুঁড়ি ঘন সবুজ কোপে ঢাকা। মে মাসে 'হার্ডউড' গাছের সাদা ফুল ফুটে যথেষ্ট শোভা হয়।

মে মাসেই এই সব কোপে ব্লাক্বেরি সুপক্ক হয়, খোলো খোলো রাঙা ব্লাক্বেরি জলের উপর ঝোলে, নৌকা করে যেতে যেতে তুলে খাওয়া যায়।

চওড়া পাতাযুক্ত বনেট গাছ এবং তাদের সোনালি রঙের পুষ্প অনেক সময় জলের ধার আলো করে থাকে। হ্রদের জলের মধ্যে থেকে প্রায়ই কুমীর মাথা বের করে আছে দেখা যায়, কারণ হ্রদের এই অংশে কুমীর অত্যন্ত বেশী।

ওকেফিনোকি জলার দ্বীপসমূহে পূর্ব্বে যথেষ্ট পাইন বন ছিল; হ্রদের বিষ সে সব পাইন বন গত পনেরো বছরের মধ্যে প্রায় অদৃশ্য হয়েছে। তাদের কথা এখন স্মৃতিতে দাঁড়িয়েছে। ওকেফিনোকি জলার মধ্যে চারটী দ্বীপ, ক্লেড, বিলিস্, হানি ও ব্ল্যাক্জ্যাক্। এই চার দ্বীপেই পাইন গাছের ঘন বন ছিল, লোভী মানুষের কুঠার থেকে তাদের মধ্যে একটি গাছ রক্ষা পায় নি।

কেবল জলার দক্ষিণ অংশে চেসার, হাই, ও নাথার ওয়ান দ্বীপে যে পাইন বন আছে, গবর্ণমেণ্ট আইন করে সেগুলি রক্ষা করছেন বলে সেগুলি এখনও আছে। শুধু আইন নয়, এই দ্বীপগুলি অত্যন্ত দুর্গম স্থানে অবস্থিত বলেও পাইন বনের দিকে মানুষের লোভাতুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি।

কোন কোন দ্বীপে পাইন ছাড়া অন্য গাছের বন আছে, এদের মধ্যে ওক্ গাছ বেশী দেখা যায়। ওক্ বলে 'আছে ম্যাগনোলিয়া, ব্লু পাইন, হোলি গাছ।'

এখানকার সব গাছেই সুদৃশ্য স্প্যানিশ শেওলা দেখতে পাওয়া যায়—আমেরিকান্ কবি সিডনি লেনিয়ার যে শেওলার সৌন্দর্য্য কীর্ত্তন করেছেন তাঁর 'The Marshes of Glynn' নামক কবিতাতে।

হ্রদের বিভিন্ন অংশে প্রায় ত্রিশ প্রকারের মাছ পাওয়া যায়। ছিপ দিয়ে যারা মাছ ধরতে চান, তারা এখানে যথেষ্ট মাছ ধরতে পারবেন। বিশেষ করে সুয়ানি হ্রদে ছিপ দিয়ে প্রতি বৎসর অনেক মাছ ধরা হয়ে থাকে। সুয়ানি হ্রদ লম্বায় এক মাইলও হবে না, চওড়ায় পড়ে ত্রিশ গজের বেশী নয়—কিন্তু ১৯২৫ সালে এই হ্রদ থেকে চল্লিশ হাজার মাছ ধরা পড়েছিল ছিপে।

শীতের পর এখানে মাছ ধরবার সময়।

আশপাশের ক্ষুদ্র গ্রাম ও খামার-বাড়ী থেকে এই সময় দলে দলে বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক ছিপ হাতে মাছ ধরতে আসে।

জর্জ্জিয়া প্রদেশের পল্লী-অঞ্চলের লোকের উপাদেয় ভোজ হচ্ছে মাছ ভাজা ও তরকারি। অনেক দুষ্প্রাপ্য জাতীয় মাছ এখানে দেখতে পাওয়া যায়। একবার বার পাউণ্ড ওজনের একটা ট্রাউট্ মাছ একজনের ছিপে উঠেছিল।

এই জলাভূমিতে পৃথিবীর মধ্যে ক্ষুদ্রতম কচ্ছপ বাস করে। এদের নাম 'ব্রেন্ ওয়াটার' মাছ—যখন খুব বড় হয়, তখন মাত্র এক ইঞ্চি লম্বা হয়—খড়কের মত সরু, সুন্দর রং-এর মাছ স্থানীয় অধিবাসীদের প্রিয় খাদ্য। তবে একসঙ্গে অনেকগুলো পাওয়া শক্ত।

সাইপ্রেস্ বনের মধ্যে যে জলার ডোবা আছে, তাতে অনেকপ্রকার সুদৃশ্য মাছ আছে—যেমন পিগমি মাছ, সান্ফিস্ ইত্যাদি।

ওকেফিনোকি জলায় প্রায় ত্রিশ প্রকারের ব্যাঙ আছে। সাইপ্রেস্ বনের অঞ্চলে অসংখ্য ডোবায় এরা বাস করে। এ অঞ্চলকে ব্যাঙের স্বর্গ বলা যেতে পারে। জর্জ্জিয়া প্রদেশে প্রাচীন দিনে একটি ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে ওকেফিনোকি জলার ব্যাঙের কথা আছে।

'একটা বুড়ো ব্যাঙ্ এক সময় ওকেফিনোকি হ্রদের ধারে বাস করত, আর সারাদিন ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ্, ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ্ করে ডাকতো।...'

গ্রীষ্মকালের গোড়ায় খুব বৃষ্টি হলেই ব্যাঙের গলার সম্মিলিত ঐকতান শুরু হবে। সে গান শুনবার জিনিস, নিজের কানে না শুনলে সে গম্ভীর ঐকতান বাদনের কোন ধারণা করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙের স্বর যারা চেনে, এমন প্রাণিতত্ত্ববিদ্ লোকে অন্ততঃ দশ পনেরো রকমের ব্যাঙের ডাক ওই সমবেত কোলাহল-ধ্বনির মধ্যে থেকে বের করবে। সবুজ ব্যাঙ, ক্রিকেট ব্যাঙ, ফ্লরিডার গেছো ব্যাঙ, সোকার ব্যাঙ, লেপার্ড ব্যাঙ, ছুতার ব্যাঙ—আরও কত ধরণের ব্যাঙ আছে—প্রত্যেক প্রকারের ডাক আলাদা আলাদা।

এই বার বলবো কুমীরের কথা। এমন এক সময় ছিল যখন কুমীরের পিঠের ওপর দিয়ে বিলিস্ হ্রদ পার হওয়া যেতো।

আজও পর্যান্ত সমস্ত ওকেফিনোকি জলাভূমির মধ্যে বিলিস্ হ্রদ কুমীরের জন্য প্রসিদ্ধ। সুয়ানি হ্রদেও কিছু কুমীর আছে। কুমীরের চীৎকার এবং অন্যান্য প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করবার উপযুক্ত স্থান।

কুমীরের আত্মীয় গিরগিটি এক রকমের। এক ধরণের নীল লেজযুক্ত বড় গিরগিটি এ অঞ্চলে বেশী। স্থানীয় অধিবাসীদের ভুল ধারণা আছে যে, এই গিরগিটি বিষাক্ত এবং এরা কুকুরের মত চীৎকার করতে পারে।

আর এক ধরণের গিরগিটি মানুষ কাছে এসে পড়লেই চুপ করে এক খণ্ড শুকনো কাঠির মত নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে—দূর থেকে সেটাকে সত্যই শুকনো কাঠি বলেই মনে হয়। আত্মরক্ষার জন্য এ এক প্রকৃতিদত্ত অভ্যাস। বহুরূপী জাতীয় গিরগিটিও এখানে আছে, তবে মানুষের চোখের সামনে তাদের গাত্রবর্ণ কদাচিৎ পরিবর্ত্তিত হয়!

এক ধরণের অদ্ভুত গিরগিটিকে এদেশে বলে 'গ্ল্যাস'(কাচ) গিরগিটি। এরা নিজেদের লেজ ইচ্ছামত তিন চার টুকরো করে ভেঙে ফেলে আবার জোড়া দিতে পারে। তবে জোড়া দেওয়ার সম্বন্ধে আমি কোনো বৈজ্ঞানিক মত দিতে পারবো না, নিজের চোখে কিছু দেখি নি। স্থানীয় লোকের মধ্যে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে বটে।

সাপও আছে নানা রকম। এ পর্য্যন্ত আটাশটী বিভিন্ন জাতীয় সাপ ওকেফিনোকি জলার সাইপ্রেস ও ওকের বনে দেখা গিয়েছে। জঙ্গলাবৃত দ্বীপগুলিতে সাপ খুব বেশী। তবে সাপ খুব বেশী নেই, এদের অধিকাংশ জাতিই ডাঙায় বাস করে। বেশীর ভাগই বিষধর।

পাইন গাছের কোটরে বা সাইপ্রেসের বনে সাপের আড্ডা। কালো সাপ বা কোচ্‌হুইপ দেখতে ঘোড়ার চাবুকের মত লম্বা সিলেটি, মাথেই চেহারার বর্ণনা আছে। এ সাপ অত্যন্ত বিষাক্ত। উত্তিপো সাপের সারা দেহ নীলবর্ণের, চমৎকার দেখায় দূর থেকে, এরাও বিষধর।

মাঝে মাঝে সাইপ্রেসের বনে সাহসী ও বীর 'কিং' বা রাজা সাপকে দেখা যায়, অন্য কোনো বৃহৎ সাপকে কুণ্ডলী পাকিয়ে জড়িয়ে ধরে চূর্ণ করে তাকে উদরস্থ করবার চেষ্টায় আছে। রাজা সাপের বিষ নেই। এ অজগর জাতীয় সর্প। অনেক রকমের র‍্যাট্‌ল বা ঝুনঝুমি সাপ আছে, এরা নড়াচড়ার সময় ঝুনঝুন শব্দ করে বলে এদের নাম র‍্যাট্‌লার বা ঝুমঝুমি সাপ।

ঝুমঝুমি সাপ অনেক রকমের। ডায়মণ্ড-ব্যাক্ র‍্যাট্‌লার তার মধ্যে একজাতীয় অতি বিষধর সাপ, কিন্তু অন্য প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ যদিও এ অঞ্চলে উপরোক্ত সাপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন, আমি এ পর্য্যন্ত একটীও দেখিনি। এমন কি সেমিনোল র‍্যাট্‌লার যা ফ্লরিডার জলাভূমিতে খুব বেশী, তাও এখানে দেখিনি। সাধারণতঃ এখানে ছোট ঝুনঝুমি সাপ দেখতে পাওয়া যায়। তাদের বিষ অত্যন্ত মৃদু, কামড়ালে মারাত্মক হয় না।

সর্ব্বাপেক্ষা বিপদজনক হচ্ছে কটনমাউথ মোকাসিন্, এক জাতীয় বড় ঝুমঝুমি সাপ, সাংঘাতিক বিষধর; এদের সংখ্যাও খুব বেশী। স্থানীয় অধিবাসীরা এই সাপকে অত্যন্ত ভয় করে। সাইপ্রেস গাছের ঘন জঙ্গলে বা দ্বীপগুলির মধ্যেকার বেঁটে ওকের ঝোপে এদের আড্ডা। তবে আমি কিন্তু এত বেড়ানো সত্ত্বেও এক মাসের মধ্যে দু তিনটী ছাড়া দেখিনি।

আর একটী কথা এখানে বলি। বিলিস হ্রদে যদিও যথেষ্ট কুমীর আছে, কিন্তু সন্তরণকারী লোকেরা সেখানে কুমীরের চেয়ে কচ্ছপকে ভয় পায় বেশী। চার পাঁচ ইঞ্চি ব্যাসের ছোট খোলাওয়ালা মৃগনাভি কচ্ছপও আছে এখানকার জলে। শেষোক্ত প্রকারের কচ্ছপ অত্যন্ত

বিপজ্জনক। বে ও ছুন মাসে এই জাতীয় কচ্ছপ সুস্বাদু ডিমের খোঁজে চড়াতে অনেক দেখা যায়।

এক ধরণের কচ্ছপ আছে তারা লাইপ্রেস্ বনের মধ্যে গর্ত্ত করে, কিন্তু গর্ত্তের মধ্যে বাদুড় প্রভৃতি বহুতর জাতীয় প্রাণীকে আশ্রয় দেয়। আমি এই ধরণের একটা গর্ত্তে তিনটী বাদুড়কে থাকতে দেখেছি।

জলাভূমির জলপায়ী জীবের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কুমির। ভালুক। এরা সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। এদের শিকার করতে যথেষ্ট সাবধান না হোলে শিকারীর প্রাণসংশয় অনিবার্য্য। এরা গৃহপালিত শূকরের প্রধান শত্রু। স্থানীয় লোকে প্রায়ই নিজেদের শূকর-দল বাঁচাবার জন্যে ভালুক-শিকারে বের হয়। এক এক জন বৃদ্ধ লোক জীবনে দু তিন শো ভালুক শিকার করেছে।

---

# প্রাচীন শাস্ত্রী

শ্রীহরিপদ ঠাকুর

মোরা প্রাচীন শাস্ত্রে শাস্ত্রী,
করি প্রাচীন মতের রক্ষা.
অনেক কষ্টে উপাধি দিলেই,
হয়ে পড়ি এক তীর্থ।

মোরা উপাধি পেলেই বিজ্ঞ,
আর সবারেই ভাবি অজ্ঞ,
সবারে শিখাই পৌরুষই বড়
নিজের বেলাই ভাগ্য।

মোরা স্মৃতিতে শাস্ত্রী যারা
তাদের ধর্ম্মেতে খুব আস্থা
অন্যের বেলা প্রায়শ্চিত্ত
ঘরে আর এক ব্যবস্থা।

যদি ইংরাজী পড়ে কেহ
বলি 'যায়, ওটা জাতনাশা।'
নিজের ছেলেটী বি-এ পাশ হলে
বলি 'ও যে রাজ-ভাষা।'

মোরা এ এক শাস্ত্রী আছি
করি ভোজনের বাছাবাছি,
ঘরেতে ভোজন যা হোক্ তা হোক,
বাহিরে নিরামিষাশী।

মোরা পরকে বুঝাতে বোঝা,
খুঁজি সুবিধার যত কর্ম্ম
যারে ঠেকিলেই বচন আড়ষ্টাই
এটা যে আপদ ধর্ম্ম।

মোরা প্রাচীন রীতিই মানি,
কেহ মাঝে মাঝে করি মাম্‌লা,
কেহ সুদের টাকাটা কম যদি দেয়
লাঠি নিয়ে বলি 'সাম্‌লা।'

মোরা সমাজ গঠনে ব্যস্ত
তাই আছে সমাজের সত্তা,
নিজের মাথাটী উঁচুতে ঢেকে
বনিয়ে র'য়েছি কর্ত্তা।

কেহ করিলে আফিসে চাকরী
তাকে সমাজে বানাই দুষ্ট,
তবে চতুষ্পাঠীতে বিলাতির খাতা
সেটা অবশ্য শ্রেষ্ঠ।

আমি বলিলাম যারা স্পষ্ট
শুনে হ'তে পারে কেহ রুষ্ট,
নিজেরা বিধান মানি বা না মানি
পাতিত* লিখে দেই তুষ্ট।

---

* পাতিত—প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা।

তুলোর বাদাম ডিম পাড়া হচ্ছে : দু পাশে যে ছোট ছোট ডিম দেখা যাচ্ছে সেগুলো কম্মাসের

মুরগি দুধের পোষা হরিণ : মানুষকে এদের ভয়-ডর নেই

এখানে উপর দিয়ে ক্যানেডিয়ান মৌকার যাতায়াত : ট্রান্সকন্টিনেন্টাল চলাচলের এই একমাত্র পথ

এপ্রিল মাসে বীজ-বপনের দৃশ্য

## জীবন-যুদ্ধ

—শ্রীরেখা দেবী

আজ আমরা এমন একটা সময়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি যে, জীবন-যুদ্ধে এগিয়ে যাওয়া হয়ে উঠেছে প্রায় অসম্ভব। দুর্যোগের মহাযুদ্ধ এনে দিয়েছে আমাদের অভাবগ্রস্ত জীবনে আরও বেশী অনটন এবং সৃষ্টি করছে প্রতিদিন নিত্য নূতন সমস্যার, যা সমাধানের অর্থ এবং সামর্থ্য দুটির একটিও আমাদের নেই, কারণ আয়ের ঘরের অঙ্কগুলো ক্রতগতিতে কেবল কমেই চলেছে, অথচ ব্যয়ের সংখ্যা কমাবার কোন উপায়ই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—বরং যত দিন যাচ্ছে ততই সেগুলো বেড়ে চলেছে।

এমন 'দুরহ' সময়ে একটি বৃহৎ সংসারের ভরণ-পোষণের ভার যাঁদের হাতে আছে, তাঁরা সকলেই অনুভব করছেন এই দায়িত্বের গুরুভার দিন দিন কত দুঃসহ হয়ে উঠছে। যাঁরা বাইরে থেকে কাজ করে অর্থ উপার্জ্জন করে আনেন, কেবল বহির্জ্জগতের সমস্যাটাই তাঁদের চোখে পড়ে, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি, কাজকর্মের অভাব, না হয় তো—সৌভাগ্যবশতঃ এখনও যাঁরা কাজে বহাল আছেন, তাঁদের অনেকেরই মাইনে দেওয়া হয়েছে কমিয়ে—অনেকের আবার যে কাজটি আছে, তাও যে-কোন মুহূর্ত্তেই হারাতে পারেন এমন অবস্থা! এই সব নানা দুর্ভাবনায় পুরুষরা হয়ে উঠেছেন উদ্বিগ্ন, কিন্তু অন্তঃপুরে এই আর্থিক সমস্যা দেখা দিয়েছে আরও বড় এবং ভীষণ হয়ে। কারণ বাড়ীর পুরুষরা অতি কষ্টে বাইরে থেকে যে সামান্য অর্থ উপার্জ্জন করে আনেন, তাই দিয়ে সারা মাস সংসার চালাবার ভার থাকে গৃহলক্ষ্মীদের ওপর, এবং সেই জন্যই তা নিয়ে চিন্তাও করতে হয় এঁদেরই।

খাওয়া-পরা ছাড়াও সংসারে যে হাজার রকমের 'টুকটাকি' খরচ অবশ্যম্ভাবী, তারই পথ বন্ধ করতে বাড়ীর গৃহিণীরা সর্ব্বদাই সতর্ক হয়ে থাকেন, যাতে এই সবের ভিতর দিয়ে কোন ফাঁকে তাঁদের স্বামী বা পুত্রের অতি কষ্টে উপার্জ্জিত অর্থের অপব্যয় না করা হয়—এবং এই সব ছোটখাটো খরচের সংখ্যা কমাতেই তাঁরা হাসি-মুখে প্রতিদিন নানা রকম কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে থাকেন—যা না করলে ঐ সামান্য আয়ে সংসার চলা সম্ভব হতো না। কিন্তু এসবের খবর বাড়ীর পুরুষরা যে জানতে পারেন না, তার কারণ তাঁদের কানে এসব কথা পৌঁছতে দেওয়া হয় না—অন্তঃপুরের নিজস্ব রহস্য হিসাবে মেয়েরা অতি যত্নে এগুলি পুরুষদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখেন—বাইরে থেকে অনেক ঝঞ্ঝাট সয়ে অর্থ উপার্জ্জন করে আনেন বলে আর সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে গৃহস্বামীদের মাথা ঘামাতে দেওয়া হয় না।

একটি মাত্র লোকের আয়ের উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করছে অনেকগুলি শিশু, আত্মীয়-পরিজন, আশ্রিতের দল, এ ছবি আমরা প্রায় বাংলা দেশের প্রতি ঘরেই দেখতে পাই। কিন্তু কি করে তা হওয়া সম্ভব হয়, তার খোঁজ নিতে গেলে দেখা যাবে যে, ঐ গৃহিণীর সুব্যবস্থার গুণই তা হওয়া সম্ভবপর হয়। নইলে ৩০৲ টাকা মাইনের কেরাণীর ঘরে পাঁচটি ছেলে-মেয়ে, বৃদ্ধা মাতা, বিধবা ভগ্নী, নিজে এবং স্ত্রী, এতগুলি লোক খেয়ে পরে, সভ্য সমাজেরই এক অংশে থেকে জীবন ধারণ করে কি করে? এসব মেয়েরা কেবল খাওয়ার জন্য চাল-ডাল কিনতে যা ব্যয় হয় তা'ছাড়া বছরে একবার নিজেদের মোটা কাপড় কেনা ছাড়া আর কোন জিনিষে এক পয়সাও ব্যয় না করে, সংসারের সব কাজ-কর্ম্ম নিজে হাতে করেও তারই ভিতর সময় করে নিয়ে আবার ছেলে-মেয়েদের জামা-কাপড়, বাড়ীর বরফা-জানালায়

পরদা, বিছানা বালিশের চাদর ও ঢাকা ইত্যাদি, আর সব প্রয়োজনীয় দ্রব্যই নিজেরা ঘরে সেলাই করে তৈরী করে নেন—তাতে কেনার চেয়ে অনেক সস্তায় জিনিষগুলি হয় এবং ভালও হয়। এমনি করে আমাদের দেশের অনেক মেয়ে দারিদ্র্যের গ্রাস হতে, অভাবের কর্কশ প্রৌঢ়ত্বের স্পর্শ থেকে, নিজেদের স্বামী, পুত্র ও সংসারটিকে যে কত করে, কত সহিষ্ণুতার সঙ্গে রক্ষা করেন, তা কেবল তাঁরাই জানেন, আর জানেন তাঁদের সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি তাদের মনে দীক্ষিত করে, মূর্ত্তিমতী শান্তি ও মঙ্গলের আধার করে এই নারী-জন্মের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।

সংসারের প্রয়োজন মেটাতেই আজকাল এই সব অন্তঃপুরিকাদের কারও কারও ঘর ছেড়ে বাইরে আসা। তাঁদের পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার নেওয়া নিয়ে এবং জগতের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তাঁদের অবতরণের সুযোগ দেওয়ার বিষয় নিয়ে—অনেক তর্ক বিতর্ক, আলোচনা হয়ে গেছে। এটা যে স্বাভাবিক অবস্থা নয়, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে—কেন না, পুরুষ নারীর শ্রম-বিভাগ পুরুষ আর নারীর স্বভাবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তথাপি অনটনের সংসারের দায়ী মেটাতে এঁদের বহু থেকে কাউকে কাউকে অন্তঃপুরের গণ্ডীর বাইরে কোপাহলময় পৃথিবীর নারামারি কাটাকাটি ও প্রতিযোগিতার মধ্যে এসে দাঁড়াতে হয়েছে। এবং সেখানে হয়তো পুরুষদের হার মানিয়ে কেহ কেহ অনেক কাজই নিজেদের সুকোমল হাতে তুলে নিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, সত্যই তাঁরা পুরুষদের চেয়ে কোন অংশে দুর্ব্বল বা ছোট নন। যে মেয়েরা আজ ঘরের বাইরে কাজে নেমেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই অবশ্য অভাবের তাড়নাতেই এসেছেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কয়েক জন আবার 'সখের প্রমিকা' হয়ে নিছক প্রতিযোগিতার নেশাতেই কাজে নেমেছেন, এবং তার জন্য অনেকেরই তাঁরা অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করেছেন। এ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে কথায় কথায় অনেক কথা বাড়বে। কেবল এই টুকুই বলবো যে, সখ মেটাতে যাঁরা দরকার না থাকতেও কাজে নেমেছেন তাঁরা শিক্ষিতা হয়েও—হয় তো বুদ্ধিশালিনী হয়েও—কেন একবার একটি কথা ভেবে দেখলেন না যে, তাঁদের এই 'সখ', এই 'প্রতিযোগিতার নেশা' তাঁদেরই আর একটি দরিদ্রা ভগ্নীর কাছ থেকে খাওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট করছে কি না! এটা একবার ভাবা কি তাঁদের উচিত নয়? যাই হোক, সুখের বিষয় এই যে, এত'র পরও, এখনও বাংলার অন্তঃপুর সম্পূর্ণ শূন্য হয়নি; এখনও সেখানে এমন কয়েক জন বিরাজ করছেন, যাঁদের সেবায় মানুষের কর্ম্মক্লান্ত দেহ-মনে আসে নূতন প্রাণ, সুমধুর সান্ত্বনার বাণী, নিরাশার অন্ধকারে জেগে ওঠে আশার প্রদীপ, তাঁদের ভালবাসা ও মঙ্গলকামনা এনে দেয় জীবন-সংগ্রামের সম্মুখীন হবার প্রেরণা ও মনোবলের শক্তি। আজ আমি এই সব অন্তঃপুরিকা মা-বোনেদের সাহায্যের উদ্দেশ্যেই একটী বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো, যা তাঁদের এক অনেকের কাজে লাগলে আমার চেষ্টা সার্থক বলে মনে করবো।

এর আগেও আমার আজকের আলোচনার বস্তুগুলি নিয়ে অনেক কথা বলা হয়ে গেছে এবং এখনও প্রায় রোজই এই সব রান্না, সেলাই, শিশু-পালন ইত্যাদি নিয়ে প্রায় প্রতি কাগজেই আলোচনা করা হচ্ছে, যাতে আমাদের দেশের মেয়েদের এর কিছুর দিয়ে সাহায্য করা যায় এবং নূতন কিছুর শেখবার সুযোগ দেওয়া হয়। আমি আর তাই কেমন করে কালিয়া বা মাছের কাট্‌লেট তৈরী করতে হয়, বা কি করে জামার হাতে-গলায় ফুল তুলতে হয়, সে বিষয় না বলে দু'একটি সাধারণ ও সহজ উপায় দেখাতে চেষ্টা করবো—যাতে দু'একটি জিনিষ আর পয়সা খরচ করে না কিনে—ঘরেই তৈরী করতে পারা যায়, যাতে সংসারের সাশ্রয় হয়; আর আবশ্যক-বোধে যা ঘরে জড়ো করে রাখা হয়েছে তা থেকে কি ভাবে আবশ্যকীয় কিছু প্রস্তুত করা যেতে পারে তাও বলবো। আমার বিশ্বাস সৌখীন হাতের কাজের চেয়ে এইগুলিই আপনাদের বেশী ভাল লাগবে, কারণ টাকা-কড়ি কিছু বাঁচাতে পারলে সেটা ফুল-তোলা জামার চেয়েও আনন্দদায়ক হয় বেশী। তাই বলে মনে করবেন না যে, আমি ফুল-তোলা জামার বিরুদ্ধে—তা নয়, কিন্তু ওটা না হলেও চলে বলে, সেটা দু'দিন পরেও বলা চলতে পারে বলে, এবারের মত বাদ দিলুম।

যে সব ঘরে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে আছে সেইখানেই খরচ হয় বেশী, কারণ বড়দের যা না হলেও চলে এমন অনেক জিনিষই ছেলেদের জন্য কিনতে হয়, কারণ সেগুলি তাদের জন্য

একান্তই দরকার, যেমন দুধ, বিস্কুট, ইত্যাদি। এই সব জিনিষ ছোটদের জন্য সর্বদাই ঘরে রাখতে হয়, নিজেরা না খেয়ে নানা রকমে কষ্ট স্বীকার করলেন, কিন্তু ছেলেদের তো আর কষ্ট দেওয়া যায় না, অবুঝ ওরা তো আর বোঝে না যে মা, বাবা,. তাদের যা দিচ্ছেন তা কত কষ্টে এবং কোথা থেকে আসছে। ওরা জানে খিদে পেলে মায়ের কাছে গিয়ে চাইতে হয়—তাই ঘরে আর কারো জন্য কিছু থাকুক আর নাই থাকুক এদের জন্য জোগাড় রাখতেই হয়—তারা যখন মায়ের আঁচল ধরে আধো আধো কথায় আব্দার ধরে—"মা বিস্কুট খাবো" বলে, তখন কেমন করে কোন্ প্রাণে মা'রা তাদের ফেরাবেন? কি করে তাদের বোঝাবেন যে, বিস্কুট কেনবার তাঁর সংস্থান নেই? এমনি করে প্রতিদিন ঘরে ঘরে কত মা যে ছেলের আব্দার না রাখতে পেরে তার কান্নার সঙ্গে সঙ্গে নিজের চোখের জল মুছছেন তার কি ঠিক আছে? কিন্তু যদি ডাল-ভাতের মতই ঘরে বিস্কুট তৈরী করা যেত,তা হলে তো অনেক মা'ই এই অক্ষমতার বেদনার হাত থেকে বাঁচতে পারতেন। অনেক জিনিষই আমরা কেমন করে তৈরী করতে হয় তা জানি না বলে বেশী দাম পড়ছে জেনেও বাজার থেকে কিনতে বাধ্য হই। যেমন এই বিস্কুট। এটি ঘরে তৈরী করতে পারলে অনেক ব্যয়-সংক্ষেপ হবে সন্দেহ নেই। তাই এই বিস্কুট কি করে তৈরী করতে হয় আজ তাই আপনাদের বলে দেব—আমি একটা সাধারণ মাপ ধরে নিয়ে বলে দিচ্ছি, আপনারা যে যার প্রয়োজন মত কম বা বেশী করে নিতে পারেন। দরকার হলে সব জিনিষেরই পরিমাণ বাড়িয়ে দুই বা তিনগুণ করে নিয়ে এক সঙ্গে অনেক বেশী প্রস্তুত করতে পারেন।

## বিস্কুট তৈরারীর প্রণালী

উপকরণ :—ময়দা ১ পোয়া, চা-চামচের ১ চামচ বেকিং পাউডার, ১টি ডিম, মার্গারিন বা ভেজিটেব্‌ল ঘি থেকে প্রস্তুত চর্বি ১ ছটাক, একটু নুন, আড়াইটাক মিহি চিনি।

প্রণালী :—প্রথমে ডিমটি ভেঙে একটি পাত্রে ফেলে বেশ করে ফেটিয়ে নিন, ইচ্ছা করলে চিনিটাও এর সঙ্গে দিয়ে মিশিয়ে রাখতে পারেন। তার পর ময়দার সঙ্গে বেকিং পাউডার এবং নুন বেশ করে মিশিয়ে নিন—নিয়ে এইবার চর্বিটা তাতে ঢেলে দিয়ে যেমন করে জল দেবার আগে লুচির ময়দায় ঘি মেখে নেন, তেমনি করে এটাও বেশ করে ময়দায় মেখে নিন—২।৩ মিনিট এমনি করে মাখবার পরে যে ডিম ও চিনি মিশিয়ে ফেটিয়ে রেখেছেন সেইটি ময়দায় ঢেলে দিন—দিয়ে এবার লুচির ময়দার মত করে ঠেসে ঠেসে মাখতে শুরু করুন। কিছুক্ষণ পরে বেশ একটু শক্ত হয়ে গেলে তখন ময়দাটা ( সমস্ত ময়দাটাই ) একখানা বড় 'চাকি' বা বারকোষের উপর রেখে বড় একখানা রুটির মত করে বেলুন—বেলবার সময় একটু শুকনো ময়দার গুঁড়ো ছড়িয়ে নিয়ে বেলতে হবে। বেলা চলে রুটিখানাকে ভেঙে ফেলে আবার মাখুন, অল্পক্ষণ পরে সেটাকে আবার আগের মত করে বেলুন—এমনি করে তিনবার বেলা এবং তাকে ভেঙে মাখার পর চতুর্থবারে বেশ বড় করে সমস্ত ময়দাটা বেলা হলে, তাকে টুকরো টুকরো করে কাটতে হবে—ময়দাটা যেন বেশ মাখামাখি করে বেলা হয়, কারণ বেশী মোটা, কিম্বা কাগজের মত পাতলা করে বেললে চলবে না; যাই হোক, চতুর্থ বার বেলার পর একখানা ছুরি দিয়ে গোল বা চৌকো করে কিম্বা ছেলেদের পছন্দ মত করতে হলে হরতন, রুইতন ইত্যাদি তাদের অনুকরণেও কাটতে পারেন—কাটবার পর টুকরোগুলি একটি বা একাধিক পাত্রে রেখে সেগুলি 'বেক' করতে বসিয়ে দিন—প্রায় ২০ মিনিট পরে যখন দেখবেন টুকরোগুলি বেশ লালচে হয়ে এসেছে, তখন বার করে নিয়ে ঠাণ্ডা হতে দেবেন—ঠিক মত বেক হয়েছে কি না বুঝতে না পারলে টুকরোগুলো লাল হবার পর একখানা তুলে নিয়ে ভেঙে দেখবেন নরম হয়েছে কি না, তাহলেই বুঝবেন হয়ে গেছে। বিস্কুটগুলি ঠাণ্ডা হলে ছেলেদের খেতে দিন—কিংবা টিনের কৌটায় ভরে বারহারের জন্য একটা আঁট টিনের কৌটায় ভরে বন্ধ করে রাখুন, যাতে হাওয়া ঢুকে বিস্কুটগুলিকে নরম করে নষ্ট না করে ফেলে।

## হাতের কাজ

আমরা অনেক জিনিষ অদরকারী ভেবে ঘরে ফেলে রেখে দিই—যেমন বাড়তি পশম, কাপড়ের ছাঁট ইত্যাদি—এই দুটি জিনিষ থেকেই কিন্তু ইচ্ছা করলে আপনারা কিছু কাজের জিনিষ তৈরী করতে পারেন। আপনারা জানেন যে, আমাদের দেশে ( শুধু আমাদের দেশেই বা বলি কেন, অনেক দেশেই তো করা হয় ) প্রতি বৎসর শীতের সময় বাড়ীর মেয়েরা ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য উলের জামা বুনে থাকেন এবং বোনা হয়ে গেলে তার থেকে যেটুকু উল বাঁচে, সেটুকু বিশেষ আপনারা সকলেই হয় একটা থলে, না হয় তো সেলাইয়ের ঝাঁপিতে ভরে রেখে দেন, যাতে পরে দরকার হলে আনতে তার থেকে নমুনা দেখিয়ে আনাতে পারেন এই ভেবে? কারণ বাড়তি পশমটি হয় সাধারণতঃ এত কম যে আর কোন

কাজেই তাকে লাগানো যায় না—এই ভাবে অল্প অল্প করে ভাবতে ভাবতে কিছু দিন পরে দেখা যায় এক কাঁপি নানা রঙের এবং নানা মাপের পশম জড় হয়েছে—তখন নিশ্চয়ই আপনাদের মনে হয় "আহা তাইতো, এতগুলো পশম বৃথাই পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে, কিছু একটা তৈরী করতে পারলে বেশ হতো"—কিন্তু কি তৈরী করা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করছি,—ঐ পশমগুলি দিয়ে ছোট ছেলে-মেয়ের গায়ে দেবার জন্য সুন্দর একখানা রঙীন ঢাকা তৈরী করতে পারেন—কি ভাবে তৈরী করতে হবে তাও বলে দিচ্ছি।

প্রণালী:- প্রথমে আপনারা ঐ পশমগুলি থেকে আট ইঞ্চি লম্বা এবং ঐ মাপেরই চওড়া একটি করে চৌকা টুকরো বুনে' ফেলুন—এগুলির জন্য কোন বিশেষ একটি প্যাটার্ণ করবার দরকার নেই বলে আমি আর এখানে কোন প্যাটার্ণ বলে দিলুম না। আপনাদের ইচ্ছামত যার যা প্যাটার্ণ ভাল লাগে তাই বুনতে পারেন,—তবে সব টুকরোগুলোই ঐ এক মাপের এবং একই প্যাটার্ণে বোনা হওয়া চাই—বোনার প্যাটার্ণ কিছু ঢাস্ এবং যা বেশ মজবুত হবে এমন কিছু পছন্দ করলেই ভালো হয়—ফাঁক-ফাঁক প্যাটার্ণ করবেন না। উলের মাপ সমান না থাকায় হয় তো কোনটি থেকে দুটটি এবং কোনটি থেকে চারটি টুকরো তৈরী হবে—তাতে কিছু ক্ষতি নেই, আগে সব পশম বুনে শেষ করে তার থেকে যত-গুলি পারেন টুকরো তৈরী করে ফেলুন—হয়ে গেলে সেগুলি একখানা মাদুর বা পরিষ্কার কাগজের উপর সাজান—লালের পর সাদা, সবুজের পর হলদে, এমনি করে রং মিলিয়ে মিলিয়ে সেগুলি একটি চৌকা ঢাকার আকারে সাজান—তার পর সেগুলি একটি একটি করে নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে ছোট ছোট করে সেলাই দিয়ে জুড়ে দিন, টুকরোগুলি জোড়া হয়ে গেলে সেই ঢাকার মাপে আর একটি পুরানো সিল্ক কিম্বা সুতী কাপড়ের টুকরো কেটে নিয়ে তার তলায় রাখুন। এইবার তলার কাপড়টি উপরের ঢাকাটির সঙ্গে সেলাই করে জুড়ে দিন—কিন্তু তাই বলে কেবল চার পাশে সেলাই দিয়ে গেলেই হবে না—ঢাকাটির ঠিক মাঝামাঝি এক লাইন লম্বা দিকে ও আর এক লাইন চওড়া দিকে 'বাণ' করে বা 'টাক' দিয়ে দু'টি কাপড়ই ভাল করে জুড়ে দিন, তা হলে আর ছেলে-মেয়েদের দুষ্টুমী ও টানাটানিতে ছিঁড়ে যাবার বা পশমের বোনা টুকরোগুলির সেলাই সেড়ে গিয়ে নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকবে না। এর পর ইচ্ছা করলে ঢাকাটীর তিন দিকে পশমের 'ঝালর' তৈরী করে দিতেও পারেন কিম্বা কাপড়ের 'ফ্রিল'ও দিতে পারেন—তিন দিকে ঠিক একই রঙের ঝালর না দিলেও মন্দ দেখাবে না, কারণ ঢাকায় অনেকগুলি রং আছে, তারই যে-কোন তিনটা রঙের পশম দিয়ে তিন দিকে ঝালর দিলে বেশ সুন্দর দেখাবে আর 'ঝালর' দেবার মত পশম যদি না থাকে তাহলে পুরানো সিল্ক, বা কোন রঙীন কাপড়ের আড়াই ইঞ্চি চওড়া করে তিন দিকে ফ্রিল দিলেও অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। এই ফ্রিল দেবার জন্য পুরণো শাড়ীর পাড়ও ব্যবহার করতে পারেন, তবে পাড়টি কোন একটি উজ্জ্বল রঙের হলেই ভালো হয়।

আমি চার দিকে না বলে কেন তিন দিকে ঝালর কিংবা 'ফ্রিল' দিতে বলছি এ কথা ভেবে নিশ্চয় আপনারা একটু আশ্চর্য্য হচ্ছেন? আমার এ কথা বলবার উদ্দেশ্য এই, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গলার কাছে কিছু না থাকাই ভালো—অনেক সময় ঐ সব গলায় লেগে কুট্‌কুট্ করে বলে ছেলেরা গায়ে ঢাকা রাখতে চায় না, যত বারই ঢেকে দেন ততবারই তা খুলে ফেলে দেয়। তার জন্যই বলছি তিন দিকে ঝালর দিতে যে দিকটা তাদের গলার কাছে থাকবে, সেদিকে ফ্রিলের কাপড়েরই একটা পাইপিং দিয়ে দিবেন, আর বাকী দিকে ইচ্ছামত ফ্রিল বা ঝালর দিলে সুবিধাজনক এবং সুন্দর দুই-ই হয়।

যে ভাবে পশমের বোনা টুকরো জুড়ে ঢাকাটি প্রস্তুত করতে বললাম, ঠিক তেমনি করেই ইচ্ছা করলে আবার কাপড়ের টুকরো জুড়ে জুড়েও ঐ ঢাকা এবং পিঠের বালিসের ঢাকা ইত্যাদি তৈরী করা যেতে পারে।

## বিবিধ প্রসঙ্গ

আমি তো এতক্ষণ কেবল বাড়ীর মেয়েরা এবং বোনেরা কার জন্য কি তৈরী করতে পারেন তারই সন্ধান দিলুম, কিন্তু যে সব মায়েরা এবং বোনেরা সংসারের সব কাজের মধ্যেও আবার সময় করে এ গুলি তৈরী করবার চেষ্টা করবেন তাঁদের পারিশ্রমিক হিসাবে, যাতে তাদের নিজেদের সুবিধা হয় এবং তাঁদের সংসারের কাজে উপকারে লাগে এমন দু'একটা বিষয় কিছু না বলেই বিদায় নিলে নেহাতই অন্যায় হবে। আমি তো বেশ বলা করে এটা-ওটা-সেটা তৈরী করা যায় কি ভাবে তাই বলে দিয়ে তাঁদের কাজের সংখ্যা আরও বাড়িয়েই দিলুম, কারণ এ-সব তৈরী করবেন বলে তো আর তাঁরা রোজকার রান্না-বাড়া, ঘর-করার কাজ ফেলে রাখতে পারেন না। সে সবের উপরই এ-গুলি এঁদের করতে হবে, কিন্তু আমাকে অতো খারাপ মানুষ ভাববেন না, আমি কেবল আপনাদের কাজ বাড়াতে আসি নি এবং এ-কথা প্রমাণ করবার জন্যই আমার 'বিবিধ প্রসঙ্গের' সৃষ্টি—এর ভিতর আপনারা হয় তো এমন দু'একটা বিষয় জানতে পারবেন, যা আপনাদের অনেক সময় ও অসুবিধার হাত থেকে অনেক সময় বাঁচাতে পারবে। আমা-দের গৃহিণীরা তাঁদের রান্নাঘরেই সব চেয়ে বেশি সময়ের

পড়েন এবং এ-গুলির সমাধানের চেষ্টায় সেখানে তাদের অনেকটা সময়ই কেটে যায়। ঐ-স্থানের দু'টি প্রধান বিপদের কথাই আমি আগে বলবো।

### ধরা গন্ধ যাওয়া

ডাল কিংবা কোন তরকারী যখন হাঁড়ির তলায় 'লেগে' যাবে, তখন সেটা আর একটুও নাড়া-চাড়া না করে আর একটা হাঁড়িতে ঢেলে ফেলবেন। আলগোছে তরকারীটা অন্য হাঁড়িতে ঢেলেও যদি দেখেন যে, তখনও একটু ধরা গন্ধ আছে তাহলে তখনই তাতে দুটো কি তিনটে 'পান' ফেলে দিলে গন্ধ একেবারে চলে যাবে—তাই বলে যেন 'সাজা'-পান দেবেন না, পানের পাতা ২।৩টি ফেলে দিলেই হবে।

### ডাল সিদ্ধ করা

অনেক সময় দেখা যায় হাঁড়িতে বহুক্ষণ আগেকার চাপানো ডাল তেমনি শক্ত রয়েছে, একটুও সিদ্ধ হয় নি, সাধারণতঃ ডাল পুরণো হয়ে গেলে ঐ রকম হয়, সহজে সিদ্ধ হতে চায় না—এই রকম ডালে যদি তিন কি চার রতি খাবার সোডা, বা পেঁপের আঠা দিতে পারেন, তা'হলে সহজেই সিদ্ধ হয়ে যাবে। কিংবা যদি চড়াবার আগেই বুঝতে পারেন যে, ডালটা একটু পুরণো, সহজে সিদ্ধ হবে না, তা'হলে সেই ডালে আগে একটু কাঁচা ঘি কিংবা তেল মাখিয়ে তার পর সিদ্ধ করতে চড়ালেও শীঘ্রই সিদ্ধ হয়ে যাবে।

### মিষ্টি লাল দই পাতা

কি করে ঘরে মিষ্টি দই পাততে হয়, তা আপনারা অনেকেই হয় তো জানেন। কিন্তু সে দই হয় সাদা। লাল দই যদি ঘরে পাততে চান, তা'হলে প্রথমে দুধে চিনির বদলে লাল বাতাসা বা গুড়ে বাতাসা দিয়ে তার পর তাকে জ্বাল দিতে হবে, বেশীক্ষণ জ্বাল দেবার দরকার নেই, তিন বলক হলেই নাবিয়ে যে হাঁড়িতে দই পাতবেন, তাতে ঢেলে ফেলুন; এই হাঁড়িটি কিন্তু দুধ চালবার পর আর নাড়া-চাড়া করবেন না তা হলে দই ভাল বসবে না, তাই আগে থাকতেই যেখানে হাঁড়িটি রাখা মনস্থ করবেন, সেইখানে রেখে তবে দুধ চালবেন। ঢেলে তার পর অল্প গরম থাকতে থাকতে কম্বল দিয়ে ঢেকে রেখে দেবেন, তা'হলেই ভাল করে বসবে।

### বিনা পেঁয়াজে পেঁয়াজের গন্ধ করা

যাঁরা নিরামিষ তরকারী রাঁধেন তাঁদের এই সব তরকারী সুস্বাদু করতে হলে অনেক কষ্ট করে ও অনেক জিনিষ দিয়ে আমিষ তরকারীর মত করে রাঁধতে হয়, কারণ নিরামিষ তরকারী পেঁয়াজহীন বলে এর স্বাদ এবং গন্ধ আমিষের মত অনেকে অতো ভালো মনে করেন না। কিন্তু যাঁরা পেঁয়াজ না দিয়েও পেঁয়াজের গন্ধ করতে চান, তাঁরা যদি খানিকটা আদার রসে একটু হিং ভিজিয়ে রেখে দেন এবং রাঁধবার সময় সেটি তরকারীতে ঢেলে দেন, তা হ'লে ঠিক পেঁয়াজের মত গন্ধ হবে।

### হাল্‌সেটে গন্ধ যাওয়া

যে সব তরকারীতে হাল্‌সেটে গন্ধ আছে সেগুলি রাঁধবার আগে যদি অল্প করে তেলে কষে নেওয়া যায়, তা হলে গন্ধটা অনেক চলে যায় এবং রাঁধবার পর আর একেবারেই থাকে না—কিম্বা যদি না কষে তরকারীগুলি জলে ভাপিয়ে নিয়ে সে জলটা ফেলে দেওয়া হয় তাহলেও গন্ধ অনেকটা চলে যায়।

### ওল এবং কচু সিদ্ধ

ওল কিম্বা কচু রাঁধবার সময় সিদ্ধ করেই ঠাণ্ডা জলে কখনও ফেলবেন না, তা হলেই খাবার সময় মুখে ধরবে—তা ছাড়া এগুলি সিদ্ধ করবার সময় যদি তেঁতুল পাতা কিম্বা তেঁতুল দিয়ে সিদ্ধ করেন, তাহলে আর কিছুতেই কুটকুট করবে না—খেতেও অত্যন্ত সুস্বাদু হবে।

### ডাল উথ্‌লান

ডাল ফুটে ফেঁপে উঠলে সেই ফেনার উপর আধ কাঁচ্চাটাক তেল বা ঘি দিলে তারপর ডাল যতই ফেঁপে উঠুক না কেন, আর উথ্‌লে পড়ে যাবে না, কিন্তু জলের ছিটে দিলে যত বারই ডাল ফেঁপে উঠবে তত বারই জল ছিটে দিতে হবে—আর তেল কিম্বা ঘি দিলে ঐ একবার দিলেই কাজ হবে আর বার-বার দিতে হবে না।

### দইয়ের হাঁড়ি

যে হাঁড়িতে দই পাততবেন, সে হাঁড়ির দই ফুরিয়ে গেলে হাঁড়িটি ভাল করে ধুয়ে ঘুঁটের আগুনে বা নিবন্ত আগুনে ভাঁড়টি বাইরে ভিতরে ভাল করে পুড়িয়ে শুকিয়ে নিলে তার পর এতে ছয় সাত দিন পর্য্যন্ত দই রাখা চলবে, ছাতা পড়বে না বা গন্ধ হবে না।

গৃহলক্ষ্মীদের প্রতিদিন যে-সব খুঁটিনাটি নিয়ে বিব্রত হতে হয়, এগুলি তাদেরই মধ্যে থেকে বেছে নিয়েছি, যাতে তাঁদের কাজের কিছু কম হয়। এগুলি জানা থাকলে অনেক সময় এবং জিনিষের অপব্যয় বাঁচানো যাবে বলে মনে হয়। এমনি আরও অনেক কথা আছে যা গৃহিণীরা জানতে চান—কিন্তু এক বারেই সব সন্ধান দিয়ে দিলে আর এর পরের বারে বলবার মত কিছু খুঁজে পাছে না পাই, তাই বাকিগুলো ভবিষ্যতে জানাবার জন্যে তুলে রাখলুম।

# ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস

—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

২

গত সংখ্যায় "বঙ্গশ্রী"তে আমরা সিপাহী বিদ্রোহের কথা বলিতেছিলাম। ইহার পর বৎসরেই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর শাসন বিলুপ্ত হয় এবং স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে প্রজাশাসন গ্রহণ করেন। লর্ড ক্যানিংই ভারতের প্রথম প্রতিনিধি (Viceroy)।

মহারাণীর ঘোষণা-পত্রে (Queen's Proclamation) ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্য সম্বন্ধে অনেক আশার বাণী পাওয়া গিয়াছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কাউন্সিল য়্যাক্ট পাশ হয় এবং পর বৎসরেই কলিকাতায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু অতঃপরও রাজ্যের বিশৃঙ্খলা বিদূরিত হয় নাই। যদিও মহারাণী স্বহস্ত-স্বাক্ষরিত বাণীতে প্রদেশে প্রদেশে, জিলায় জিলায়, মহকুমায় মহকুমায় ঘোষণা করেন যে, তাঁহার ভারতীয় প্রজার জাতি, বর্ণ ও দেশনির্বিশেষে সুশাসনে সকলের সমানাধিকার বিদ্যমান রহিয়াছে, তথাপি ইংরাজ-ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক দেশীয় প্রজার প্রতি স্থানবিশেষে এরূপ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতে থাকে যে, দেশবাসী মনে করেন—

"রাজ্ঞী ইউরোপীয়দিগকে ভূমির দারুণ ব্যয়ের ভার ছাড়িয়া দিয়া এ দেশীয়দিগকে উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত কি ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন? জগদীশ্বর এই নিমিত্ত ইংরাজ জাতিকে দুস্তর সাগর পার করিয়া এ দেশে আনিয়াছেন? ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই তাদের কর্তব্য? মুসলমান অধিকারেও এইরূপ ঘটনা বিরল ছিল।"*

এই অত্যাচারের সামান্য পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র 'চন্দ্রশেখরে' কটুর চরিত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ বঙ্গদেশই নানা-রূপ অত্যাচারের লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিল। তখন নীলকর সাহেবদের অমানুষ অত্যাচার। কুঠীয়াল সাহেবেরা চাষীকে দিয়া জোর করিয়া নীল চাষ করাইত। অর্থকষ্টে, ঋণের দায়ে, খাজনার তাগাদায় চাষা যাদন সইত। কিন্তু নীল আবাদের জন্য সাহেবদের অত্যাচারের অবধি থাকিত না। প্রজার সঙ্গে চুক্তিপত্র সাধারণতঃ এক বৎসরের জন্য হইত। কচিৎ দুই বা তিন বৎসরের জন্য হইত। হিসাব-নিকাশের সময়ে খরচের ঘরে আসিত—(১) রায়তের নামে যাদনের টাকা, (২) চুক্তিপত্রের ষ্ট্যাম্পের দাম, (৩) বীজের মূল্য। আর জমার ঘরে আসিত রায়তগণ-প্রদত্ত কয়-গাড়ী নীলের চারা। সাধারণতঃ রায়তের ভাগ্যে আর পাওনা হইত না। নীলকরের পাওনাই আবার পর বৎসরের হিসাবে সর্বাগ্রে উঠান হইত। এইরূপে রায়তের ভাগ্যে পাওনা তো কিছু হইতই না, বরং বকেয়া বাকী কি বৎসরে ক্রমেই বাড়িয়া উঠিত। এই অবস্থাই দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণে" আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—

"নীলের যাদন যোলার ভালা,
একবার লাগলে আর উঠে না।"

কেবল দীনবন্ধু নয়, ১৮৬০ হইতে ১৮৬৪ সালই বাঙ্গালা দেশে সাহিত্যিকের যুগ বলিয়া পরিগণিত। রাজনীতি ও জাতীয়তার উদ্যোগ-পর্বে যে তিনজন গ্রন্থকারের অবদানে বাঙ্গালা-দেশের জনশক্তি গড়িয়া উঠে, তন্মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। মধুসূদন, রঙ্গলাল ও নবীনচন্দ্রও গৌণভাবে তাঁহাদের সহকর্মতা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রভাকর ও তত্ত্ববোধিনী, হিন্দু পেট্রিয়ট ও সোমপ্রকাশ, বঙ্গদর্শন ও আর্যদর্শন, বান্ধব ও ভারতী প্রভৃতি মাসিকপত্রও বিশিষ্টভাবে সহায়তা করিয়াছে। ঐ যুগে সাহিত্য যদি জনমত গঠনে সহায়তা না করিত, তবে পরবর্তী কালে রাজনৈতিক আন্দোলন এত অধিক শক্তিধারণ করিতে সমর্থ হইত কি? বস্তুতঃ এই সমস্ত গ্রন্থকার এবং পত্রিকা সম্পাদকগণই যেভাবে জনশক্তি গঠন করিয়াছে, সুযোগ সহযোগে তাহাই রাজনৈতিক আন্দোলনে মহাশক্তি ধারণ করিয়াছে। তাই বলিতেছি জাতীয়

*সোমপ্রকাশ ২১শে মার্চ, ১৮৬১।

মহাসমিতি গঠনে বাঙ্গালার রাজনীতি-বিশারদগণ অপেক্ষা বাঙ্গালার সাহিত্যরথিগণের নিকটে আমরা কত ঋণী তাহা আর সেই ঋণদান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক করেন দীনবন্ধু মিত্র।

দীনবন্ধু, বঙ্কিম ও রঙ্গলাল সকলেই গুপ্ত কবির শিষ্য। ইঁহারা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে গুপ্ত কবির নিকটেই জাতীয়তা শিক্ষা করেন। স্বদেশবাসিতা, স্বাদেশিকতা ও জাতীয়-ভাব ঈশ্বর গুপ্তের প্রধান সম্পদ ছিল। তিনি যখনই লেখেন—

"আমৃতজ্ঞান জাবি জনে,　　দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ হেয় করি　　দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥"

অমনি শিষ্যগণের মধ্যেও জাতীয়তা প্রচারিত হইয়া যায়। অল্পদিন মধ্যেই (১৮৫৮ সালে) কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় "পদ্মিনী" কাব্যে ভীমসিংহের মুখে নিম্নলিখিত বাণী দিয়া উদ্দীপিত করিলেন—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে, কে পরিবে পায়?
কোটিকল্প বাস যথা নরকের প্রায় রে, নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ তায় রে, স্বর্গ-সুখ তায়।
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার রে, বাহুবল তার।
আত্মসমরণে যেই করে দেশের উদ্ধার রে, দেশের উদ্ধার
ধরণিতে ধন্য সেই তুলা তার নেই রে, তুলা তার নাই॥"

ইতিপূর্ব্বে আমরা যে-নীলদর্পণের কথা বলিতেছিলাম সেই অমূল্য গ্রন্থেরও গ্রন্থকার ঈশ্বর গুপ্তেরই অন্যতম প্রধান শিষ্য দীনবন্ধু মিত্র। আর এই গ্রন্থই সেই সময়কার একটা ঘোরতর অত্যাচার নিবারণে সহায় হইয়াছিল। এই নীলকর অত্যাচার বা প্রজাবিদ্রোহ সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ আবশ্যক।

বাঙ্গালার প্রথম ছোট লাট ফ্রেডারিক সাহেব (Sir Frederick Halliday) সাধারণতঃ নীলকরগণের পক্ষবর্ত্তী ছিলেন। তিনি মনে করিতেন নীল রপ্তানীর জন্য তাঁহাদের চেষ্টা প্রশংসার্হ। তাঁহার শাসনকালে অনেক নীলকর সাহেব অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট হইতেন। তাঁহারা জজ ম্যাজিষ্ট্রেট-গণের সহিত বসিতেন, ক্লাবে যাইতেন এবং তাঁহাদের সহিত খানাপিনায় যোগ দিতেন। তাই প্রজাগণের বিশ্বাস ছিল যে, গভর্ণমেণ্টও নীলের অংশীদার। এই ধারণা ভ্রান্ত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহারা এই নীলকরগণের সহিত ফ্রেডারিক সাহেবের সদয় ব্যবহারে। বস্তুতঃ নীলকরগণের বিরুদ্ধে কেহ অভিযোগ আনিতে সাহস করিত না, আনিলেও কোন ফল হইত না। নীলকরের অত্যাচারে দেশ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল।*

অত্যাচারের মাত্রা ক্রমে এতই বাড়িয়া উঠিল যে, গত্যন্তর খুঁজিয়া না পাইয়া প্রজাগণ বুঝিলেন আত্মশক্তিতে নির্ভর ভিন্ন কোন উপায় নাই। আর এই শক্তি তাঁহাদের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল—সম্পূর্ণ সংযত ও অহিংস ভাবে। স্থানে স্থানে অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় হাঙ্গামা হইয়াছিল বটে, কোন কোন স্থানে কুঠিও ভস্মীভূত হয় সত্য, কিন্তু এরূপ ঘটনা বিরল, আর যেখানেই হইত, অল্পসময়ের মধ্যেই সাহেবরা প্রজার সংহতি নষ্ট করিয়া ফেলিত। কিন্তু যশোহর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে কৃষককুলের সংযত, নিষ্কম্প ও ঐকাবদ্ধ আন্দোলনে গভর্ণমেণ্ট স্থির থাকিতে পারিলেন না। হুজুগ হুর্দ্দান্ত বড়লাট ক্যানিংও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ অপেক্ষাও প্রজাগণের সঙ্ঘবদ্ধতায় তিনি অধিকতর শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি লিখেন যে, কোন বুদ্ধিহীন নীলকর ক্রোধে বা ভয়ে যদি একটী গুলী নিক্ষেপ করিয়া ফেলে, তবে বোধ হয় বাঙ্গলার প্রত্যেক কুঠিতেই আগুন ধরিয়া যাইবে।

---

* Extracts from the Records of the Bengal Govt. No. III.

Page 782.—"The Police Darogahs they say had instructions from the higher authorities and that unless the petitioners submitted to the planters, they will be turned out from their habitations."

Page. 792.—"The Hakeems surrounded by the planters sit along with them while deciding cases, and the Court is crowded with Amlahs and the Mukteears of the planters"

"These oppressions are practised in the mofussil and the country is about to be ruined owing to the injustice done by the Police Amlahs and the Magistrates"

Page 805—"It is an established custom in the mofussil to allow a European a seat on the Bench, when he appears as plaintiff, besides the Judge."

Page 813.—"Sir, even the Darogahs and Deputy Magistrates are in favour of the Indian planters."

"I assure you that for about a week it caused me more anxiety than I have had since the days of Delhi, and from that day I felt that a shot fired in anger or fear by one foolish planter might put every factory in Lower Bengal in flames."

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে পিটার গ্রাণ্ট সাহেব ( Sir John Peter Grant ) লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর হইয়া আসিলেন। ১৮৬০ সালের বর্ষাগমে তিনি ভাগীরথী, যমুনা প্রভৃতি নদী ভ্রমণকালে প্রজাগণের সঙ্ঘবদ্ধতা, শৃঙ্খলা ও উপদ্রবহীনতা এবং তাহাদের আন্দোলনের গভীরত্ব ও অকৃত্রিমতা দেখিয়া এতই বিমুগ্ধ হন যে, প্রজাগণের দুর্দশা দূরীকরণে বদ্ধপরিকর হন। ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ১৮৬০ সালে লিখিত তাঁহার মন্তব্য হইতেই এই আন্দোলনের গভীরতা উপলব্ধি করা যাইবে—

I have myself just returned from an excursion to Serajganj on the Jamuna river where I went by water for objects connected with the line of the Dacca Railway and wholly unconnected with the indigo matter. I had intended to go up the Mathabhanga and down the Ganges, but finding on arriving at the Kumar and Kaliganga which rivers run in Nadia and Jessore and through that part of the Pabna District which lies south of the Ganges,.....numerous crowds of Rayats at various places whose whole prayer was for an order of Government that they should not cultivate indigo. On my return a few days afterwards along the same two rivers, from dawn to dusk as I steamed along these two rivers for some 60 or 70 miles, both banks were literally lined with crowds of villagers claiming justice in this matter. Even the women of the villages on the banks were collected in groups by themselves; the males who stood at and between the river-side villages in little crowds must have collected from all the villages at a great distance from either side. I do not know that it ever fell to the lot of any Indian Officer to steam for 14 hours through a continued double street of suppliants of justice. All were most respectful and orderly but all were plainly in earnestness. It would be folly to suppose that such a display on the part of tens of thousands of people—men, women and children has no deep meaning. The organisation and capacity for combined and simultaneous action is the cause which the remarkable demonstration over so large an extent of country proved, are subjects worthy of much consideration.

কৃষককুলের সঙ্ঘবদ্ধতায়, সমবায় শক্তি ও বিনয় এবং শান্ত ব্যবহারে স্তম্ভিত হইয়া ছোটলাট গ্রাণ্ট সাহেব আর কালবিলম্ব করিলেন না। ইতিপূর্ব্বেই তিনি বিচক্ষণ সিভিলিয়ান সিটনকারকে সভাপতি করিয়া একটি কমিশন বসাইয়াছিলেন। ইহাই 'ইণ্ডিগো কমিশন' নামে খ্যাত। কমিশনে প্রজাগণ সন্তুষ্ট হন, কিন্তু নীলকরেরা হাড়ে হাড়ে চটিয়া যান। তাই তাঁর জন বাধা হইয়া তাহাদের সন্তোষার্থ একটী নিষ্ঠুর আইনের প্রবর্ত্তনাও করেন। ইহাই ১৮৬০ সালের ১১ আইন নামে অভিহিত। ইহাতে ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে অসম্ভব ক্ষমতা প্রদান করা হয়। যদি কেহ নীলচাষে প্রজাকে বাধা দিত, তবে এই আইনে তাহার যত হইত আর তাহাতে আপিল হইত না।

যাহা হউক উপরোক্ত কমিশনে সম্রাজ্ঞী ইংরাজ সিভিলিয়ান, সম্ভ্রান্ত পাদরীমহোদয়গণ, নীলকর, দেওয়ান, জমিদার, ব্যারিষ্টার, নিরপেক্ষ ভদ্রলোক ও সাংবাদিকগণ সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং সিটনকার প্রমুখ কমিশনের সমগ্র সভ্যবৃন্দ একমত হইয়া স্বীকার করেন যে, নীলচাষে রায়তের লাভ হইতে না। ঐ কমিশনে যে-সমস্ত অত্যাচার কাহিনী বিবৃত হয়, তাহাই অবলম্বনে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তাহা সঞ্জীব করিয়া দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা করেন। ঢাকা হইতে ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উহা প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধু তখন ঢাকার সরকারী কার্য্যোপলক্ষে নিযুক্ত ছিলেন। ঢাকার একাধিক স্থানে নাটকখানির অভিনয়ও হয়।

নীলদর্পণ নাটকে উড্, রোগ, গোলক বসু, নবীন-মাধব, রেবতী, পদী ময়রাণী, সৈরিন্ধ্রি প্রভৃতি প্রধান চরিত্র। উপরোক্ত "নিঠুর আইনে" গোলক বসুর জেল হয় এবং রেবতী বলিতেছিল, 'শুনছি না কি এ মাসের শিক্ষ হয় না'। উড্ সাহেব ইহাকে 'শ্যামচাঁদের দাদা' বলিয়া উল্লেখ করেন।

রায়তগণের সঙ্ঘবদ্ধতারও ইহাতে উল্লেখ আছে। একজন রায়ত নবীনমাধবকে বলিতেছে—

"বড়বাবু, মোর ছেলে দুটোরে দেখো, তাদের খাওয়াবার আর কেউ নেই। গেল সন আট গাড়ী নীল দেলাম, তার একটা পয়সা দেল না, আবার বকেয়া বাকী বলে হাতে দড়ী দিয়েছে, আবার আজ্ঞাবোয়াদ নিয়ে যাবে—"

তাইদ—"তুই বেটা চল্, দেওয়ানজীর কাছ দিয়ে তোরে যেতি হবে। তোর বড়বাবুরও এমনি হবে!"

রাইয়ত—"চল যাব, তয় করিনে, তেলে পচে মরবো, তবু গোড়ায় নীল কর্‌বো না!"

এই ভাবই তখন সকল প্রজার মধ্যে দৃঢ় হইয়াছিল।

সিটনকারের ন্যায় আরও কয়েকজন ইংরাজ তখন নীলকরদিগের চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন। নদীয়ার মাজিষ্ট্রেট হার্সেল তাঁহাদের অন্যতম। ইনি বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্যা-বিশারদ উইলিয়াম হার্সেলের পৌত্র। ইনিই নবীনমাধবের "অমর নগরের নিরপেক্ষ মাজিষ্ট্রেট, বড় মানুষের ছাওয়াল" আর মফঃস্বলে বাহির হইলে 'নীলমাদলোর বাড়ি যাতি' যাইতেন না।

ছোটলাট গ্রাণ্ট সাহেব সম্বন্ধেও উল্লেখ আছে—তোরাব বলিতেছে—

"হালের গায়নেল সাহেবডারে খোদা বেঁচিয়ে রাকে মোরা প্যাটের ভাত কষি খাতি পারবো, আর ঘুঘুষির নীল মাদলো ঘাড়ে চাপতি পারবে না।"

এই নীলদর্পণের প্রভাবেই নীলকরগণের অত্যাচার সম্বন্ধে দেশবাসী সচেতন হইয়া উঠে, আর ইহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন সমুত্থিত করে। এই সম্বন্ধে স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রীর স্মৃতিকথাই তাৎকালীন অবস্থার একটী উজ্জ্বল চিত্র। তিনি লিখিয়াছেন,—

"যখন মানুষের মন এইরূপ উত্তেজিত, তখন দীনবন্ধু মিত্রের সুপ্রসিদ্ধ নীলদর্পণ নাটক প্রকাশিত হইল। নাটকখানি বঙ্গসমাজে কি মহা উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল তাহা আমরা কখনও ভুলিব না। আবালবৃদ্ধবনিতা আমরা সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম। ঘরে ঘরে সেই কথা,বাসাতে বাসাতে অভিনয়—ভূমিকম্পের ন্যায় এক সীমা হইতে আর এক সীমা পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। এই মহা উদ্দীপনার ফলেই নীলকরের অত্যাচার বঙ্গদেশ হইতে মন্ত্রের মত অন্তর্হিত হইল।"

দীনবন্ধু মিত্রের পূর্ব্ব হইতেই প্রকাশ্যভাবে একজন সজ্ঞবদ্ধ দেশবাসী যিনি কৃষ্ণকুলের দুর্দ্দশায় কাতর হইয়া সর্ব্বদা তার জন পিটার গ্রাণ্ট এবং লর্ড ক্যানিংকে উদ্বুদ্ধ করিয়া জাতির আশীর্ব্বাদভাজন হন, সেই প্রাতঃস্মরণীয় হরিশ মুখোপাধ্যায়ের নামও সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

ইনি হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কলমের ডোরে মৃত্যুও প্রাণভিক্ষার হইত। স্থিরবুদ্ধি হরিশচন্দ্রকে সিপাহী বিদ্রোহ-আন্দোলন কোন প্রকারে বিকৃত-মস্তিষ্ক করিয়া ফেলিতে পারে নাই, কিন্তু নীলচাষীদের জন্য সর্ব্বব্যাপী আন্দোলন তিনিই নেতৃত্ব ও পরিচালনা করেন। অবিরত সংবাদপত্রে লিখিয়া, ইংলিশম্যান ও হরকরার সহিত বিবাদ করিয়া, বক্তৃতা দিয়া, দেশবাসীকে পরামর্শ দিয়া বড়লাট, ছোটলাটকে সদুপদেশ দিয়া, হরিশচন্দ্র নিজের স্বাস্থ্য, অর্থ ও শক্তি ব্যয়িত করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। 'ইণ্ডিগো কমিশন' ও 'নিষ্ঠুর আইনের' রদ করিতে তিনি প্রাণপাত করেন, আর তাহার চেষ্টা বিশেষ ভাবে ফলপ্রসূও হয়। ১৮৬৯ সালের ৮ই অক্টোবর ভারত-সচিব, সার চার্লস উড্ এই নিষ্ঠুর আইন (১১ আইনের summary Procedure) স্থগিত করিয়া প্রজাবর্গের প্রশংসাভাজন হন।

এই প্রসঙ্গে আর একজন সদাশয় ইংরাজের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি মহানুভব পাদরী লং (James Long)। নীলদর্পণ নাটক ইংরাজীতে অনূদিত হয়-সিটনকার সাহেবের বন্ধে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার অনুবাদে

করেন এবং লং সাহেব একটি মুখবন্ধ (Preface) লিখিয়া প্রকাশ করেন। সিটনকার সাহেব বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের দপ্তরের মোহরাঙ্কিত করিয়া দুইশত খানি পুস্তক বিলাতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। ইহাতে নীলকরগণের বিক্ষোভের সীমা রহিল না। তাহারা ইংলিশম্যানের সম্পাদক গুরান্টার ব্রেটকে খাড়া করিয়া তাঁহাকে দিয়া লং সাহেবের নামে একটি মানহানি মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন।

নীলদর্পণের ভূমিকায় লিখিত ছিল, "দৈনিক সংবাদ-পত্রসমূহ তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পত্র পরিপূর্ণ করিতেছে, তাহাতে অপর লোক যে-মত বিবেচনা করুক, তোমাদের মনে কখনই আনন্দ জন্মিতে পারে না; যেহেতু তোমরা তাহাদের এরূপ করণের কারণ বিলক্ষণ অবগত আছ। রজতের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণ শক্তি! জিংশত মুদ্রালোভে অবজ্ঞাস্পদ জুডাস খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক রীসাককে করাল পাইলেট-করে অর্পণ করিয়াছিল; সম্পাদক মহোদয় সহস্র-মুদ্রা-লাভ সরল হইয়া উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ করিবে আশ্চর্য্য কি?"

ইহাতেই বিচারে লং সাহেবের এক মাস কারাদণ্ড ও দুহাজার টাকা জরিমানা হয়। স্বর্গীয় কালিপ্রসন্ন সিংহ অবিলম্বে সেই টাকা হাজির করেন। আর লং সাহেব হাসিতে হাসিতে কারাবরণ করেন। যাইবার সময় তিনি বলিয়া যান, "এইরূপ কাজে যদি সহস্রবার জেলে যাইতে হয় তাহাতেও আমি প্রস্তুত আছি।"

নীলদর্পণ নাটকে রোগ সাহেব আমদ-প্রসবা ক্ষেত্র-মণির সতীত্বনাশে অকৃতকার্য্য হইয়া তাহার উপরে পদাঘাত করে। এইরূপ ঘটনা না কি সত্যই হইয়াছিল। হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত হয় যে, আর্চিবল্ড হিলস (Archibald Hills) নামে জনৈক নীলকর হরমণি নামে একটী কৃষক যুবতীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহার জল আনিবার সময়ে বলপূর্ব্বক তাহাকে নিজের কুঠিতে লইয়া গিয়া আবদ্ধ করে এবং দ্বিপ্রহর রাত্রিতে পাল্কী করিয়া বিদায় করিয়া দেয়। কাগজে বাহির হইবার পরে হিলস হরিশ মুখোপাধ্যায়ের নামে নালিশ করে। এই হিলস ও হরিমণিই নীলদর্পণে রোগ ও ক্ষেত্রমণি।

নীলকরের অত্যাচার এক দিনেই নিবারিত হয় নাই, কিন্তু হরিশ অকালেই মানবলীলা সম্বরণ করেন, এ-দিকে লং সাহেবেরও কারাদণ্ড হইল। লোকে আক্ষেপ করিয়া গাহিতে লাগিল:

হায় রে ভাই, প্রজার এবার প্রাণ বাঁচানো ভার,
অসময়ে হরিশ ম'ল লংয়ের হ'ল কারাগার
নীলবাঁদরে সোণার বাঙ্গলা করলে
ভাই ছারখার।

যাহা হউক নিরস্ত্র, সংহত সমবেত চেষ্টাতেই যে নীলকর অত্যাচার প্রশমিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে নীলব্যবসায়ীগণের যে কত ক্ষতি হইল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। শতবর্ষ পূর্ব্বে মিরকাশিমের সহিত ব্যবসা লইয়া ইংরাজ বণিকের বিরোধ হইয়াছিল। এ-সংগ্রামে মিরকাশিম কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, তাহার সর্ব্বনাশ সাধন হয়। এবার প্রজাগণের সংহত চেষ্টায় ইংরাজ বণিকের পরাজয় মানিতে হইল। সংহত চেষ্টার ফল আজ ভারতবাসী বুঝিল। জনশক্তি এই ব্যাপারেই প্রথম ও দুর্ব্বার হইয়া উঠিল। আর ইহার মূলে ছিল সাহিত্য—এক দিকে সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায়, আর এক দিকে নীলদর্পণ ও তাহার অনুবাদ-প্রকাশক পাদরী লং। এই দুর্জ্জয় প্রভাবেই বাঙ্গলার জনমত এত শক্তিশালী হয়। বস্তুতঃ যথাযোগ্য কারণ হইলে বাঙ্গলার শক্তি অতঃপর যে কিরূপ অসাধ্য সাধন করিয়াছে, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও ১৯২১ সালে দেশবন্ধু পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবক-সম্প্রদায়বাহিনীর সাফল্য তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

নীলকর বিদ্রোহে জনসাধারণের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চয় হয়, ক্রমে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নানাভাবে তাহা প্রতিফলিত হয়। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে ধীরে ধীরে জাতীয়তা প্রবেশ করে এবং সাহিত্যেও জাতীয়তার ভাব পরিস্ফুট হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বাধীন মনোবৃত্তি, তালপাতায় চটি ও মোটা চাদর এবং দীনের প্রতি বেদনা ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে জাতীয়তার বীজ সঞ্চারিত করে। মধুসূদন বস্ত্র পরিচ্ছদ এবং আহারে ইংরাজ হইলেও, ইংরাজ মহিলার পাণি গ্রহণ করিলেও, খ্রীষ্টান সমাজে মিশিলেও হিন্দু-হৃদয় ও জাতীয়তা বিসর্জ্জন দেয় নাই। 'National Theatre' কথাটি প্রথম তাঁহারই পরিকল্পনা। আর মেঘনাদবধ কাব্যে দেশরক্ষা-ব্রত পরিকল্পনা করিয়া মেঘনাদের জন্মভূমির

প্রতি বিশিষ্ট অনুরাগেই সেন্টিমেন্টটুকু পরিস্ফুট করিয়াছেন। বর্ত্তমান 'জাতি' কথা প্রথমে বোধ হয় মধুসূদনের কাছেই শুনি। ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে বলিতেছেন—

"বর্ব্বর পামী!
হে রাক্ষসপুরাজ, বিখ্যাত ভরতে
তুমি, কোন বর্ব্বরতে, কহ দাসে, শুনি,
জাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব জাতি এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি। পাত্রে বলে, তুণাদপি যদি
পরুষ, তুণহীন করহ, তথাপি
নির্ভর পরুষ ছেদে, পাঃ পর দলা।"

মেঘনাদবধ কাব্য—ষষ্ঠ অধ্যায়।

মধুসূদনের জাতীয়তা দীনবন্ধুরও অগ্রগামী এবং তাঁহার ভীমসিংহ ও মেঘনাদ যেমন প্রকৃষ্ট জাতীয় চরিত্র, তেমনি 'একেই কি বলে সভ্যতা' নামক প্রহসনেও জাতীয়তা যেন ভাসিয়া উঠিয়াছে।

তদানীন্তন আদি ব্রাহ্ম সমাজেও কৃষ্টি ও জাতীয়তা প্রসার লাভ করে। রামমোহন রায়ের স্বাধীন ভারতের সঙ্কল্প তাঁহার গঠিত সমাজ বিস্মৃত হয় নাই। তদুপরি ঠাকুর বাড়ীর প্রধান প্রধান লোক সকলেই জাতীয়তার পতাকাধারী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথই (পরে মহর্ষি) ছিলেন British Indian Association-এর প্রথম সম্পাদক। তখনকার দিনে ইংরাজের বোধ আজিকার মত করিত না, শিক্ষিত এমন বাঙ্গালী অত্যন্ত অল্প ছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ইংরাজের নিকট হইতে সতন্ত্র দূরে থাকিতেন। এমন কি Miss Mary Carpenter পর্য্যন্ত যখন তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য কলিকাতায় আসেন তখন তিনি তাঁহার জমিদারীর নিকটস্থ কুষ্টিয়া মহকুমায় পলাইয়া যান। তিনি মনে করিতেন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত তাঁহার মতের মিল হয় না। কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল লব (Lobb) সাহেব কোন সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন :—

"The proud old man does not condescend to accept the praise of Europeans'.

রাজনারায়ণ বাবু সর্ব্বদাই বলিতেন, "দেবেন্দ্র বাবু ইংরাজের তোষামোদ করিয়া চলিলে এতদিন মহারাজা K. C. S. I হইতেন।" দেবেন্দ্রনাথই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন, আর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ছিল আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন,

"তত্ত্ববোধিনীর আমল হইতেই প্রকৃতপক্ষে স্বদেশীভাবের প্রচার আরম্ভ হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় উহাতে ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী লিখিয়া লোকের মনে সর্ব্বপ্রথম দেশানুরাগ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন; তাহার পর রাজনারায়ণ বসু মহাশয় হিন্দুমেলার কল্পনা করিয়া এবং নবগোপাল মিত্র মহাশয় উহা অনুষ্ঠানে পরিণত করিয়া এই স্বদেশীভাবের প্রবাহে সে-সময়ে প্রচণ্ড একটা বলসঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন।"

যে-বৎসরে চড়কপূজার পিঠ ফোড়া, বলসী, বুর্ণী প্রভৃতি উঠিয়া যায়, তাহারই দুই এক বৎসর পরে এই মেলার সূত্রপাত হয়। ১৮৬৭ সালে এই মেলার প্রথম সূচনা। অবশ্য ইতিপূর্ব্বেও একটি স্বদেশী সমিতি ছিল। ইহার প্রতিষ্ঠা হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উদ্যোগে এবং ইহার সভাপতি ছিলেন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়। রবীন্দ্রনাথও এই সভায় মাঝে মাঝে আসিতেন। স্বদেশী দিয়াশলাই প্রভৃতি কারখানা স্থাপনা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। রাজনারায়ণ বাবুর এই স্বদেশী সভার কার্য্যে প্রবল অনুরাগ ছিল। কিন্তু তাঁহার আত্মভোলা ভাব এবং তজ্জন্য কিছু কিছু বস্তুতন্ত্রহীনতা শিল্পী রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নাই। লেখকের মনে হয় যে "চিরকুমার সভায়" চন্দ্র চরিত্রে স্বদেশজাত দিয়াশলাই প্রভৃতি সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবুর অনুরাগের কতকটা পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তবে রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধের অনুরাগ ও একপ্রাণতা সম্বন্ধেও বেশ আন্তরিক পরিচয় দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

"দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ সে তাঁহার সেই তেজের জিনিষ। দেশের সমস্ত খর্ব্বতা দীনতা অপমানকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুইচক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে তিনি গান ধরিতেন—গলায় সুর লাগুক আর না লাগুক সে তিনি খেয়ালই করিতেন না।

একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।"

হিন্দুমেলা চৈত্রমাসে হয় এবং ইহাতে স্বদেশজাত দ্রব্যাদি

যাহাতে প্রচলন হয়, সেই উদ্দেশ্যেই মেলার প্রবর্তন হয়। রাজনারায়ণ বসু বলেন,—

"যখন সঙ্কীর্ণ গৃহে অস্পষ্ট বর্ত্তিকার আলোকে জাতীয়-গৌরব সম্পাদনী সভার কার্য্য করিতাম তখন আমরা স্বপ্নেও মনে করি নাই যে তাহা হইতে চৈত্র (হিন্দু) মেলারূপ বৃহৎ ব্যাপার সম্ভূত হইবে। মেলার ভাবটি নূতন তাহা আমাদিগের মনে উদিত হয় নাই কিন্তু মেলা সংস্থাপক মহাশয় তৎসংস্থাপন কার্য্যে আমাদিগের প্রকাশিত "Prospectus of a Society for the promotion of National Feeling among the educated natives of Bengal" (জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা) প্রস্তাব দ্বারা যে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন ও তাহা হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মেলার কোন কোন বিষয়ে ঐ প্রস্তাব অনুসারে অধিকল কার্য্য হইয়া থাকে, ইহা তিনি স্বীয় ঔদার্য্য ও মহত্ত্ব গুণে অবশ্য স্বীকার করিবেন।"

এই হিন্দুমেলার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন নবগোপাল মিত্র। তাঁহার চেষ্টা এবং গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অর্থসাহায্যেই এই মেলার প্রতিষ্ঠা হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ও গণেন্দ্রনাথ ছিলেন সম্পাদক। স্বর্গীয় শিশির ঘোষ ও মনোমোহন বসুও এ-সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন। এই হিন্দুমেলাই বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রথম জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীর পত্তন করে। এই মেলায় তখন কৃষি, চিত্র, শিল্প, ভাস্কর্য্য, স্ত্রীলোকদিগের সূচি ও কারুকার্য্য, দেশীয় ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যায়াম প্রভৃতি জাতীয় সমস্ত বিষয়ই প্রদর্শিত হইত। এই মেলায় প্রবন্ধ পঠিত হইত ও জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা ও গান গীত হইত।

প্রথম মেলার উদ্বোধনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নিম্নলিখিত গানটী গীত হয়—

মিলে সব ভারত-সন্তান
একতান মনোপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান?
কি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতবতী পুণ্যবতী
শত খনি রত্নের নিধান
হোক ভারতের যশ
গাও ভারতের যশ
কি ভয় কি ভয়
গাও ভারতের জয়।

দ্বিতীয় বারের মেলায়ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আঠারো বৎসর বয়সে নিম্নলিখিত কবিতাটী রচনা করেন।

ভাই ভাই ভাই সবে ভারত সন্তান!
তাকে তুলি কতকাল রহিবে শয়ান?
ভারতের পূর্ব্বকীর্ত্তি আছে স্থান
হবে আর কত কাল ঘুমিতে নয়ন।
দেখ দেখি জননীর দশা একবার
ভরা ছিল ফলের অধিত্যকায়;
অধীনতা অভাবতা রাক্ষস দুর্জ্জয়,
শুষিছে শোণিত তাঁর বিবশি হৃদয়;
পার্শ্বপর অনৈক্য শিশুরে গ্রসিত
সর্ব্বাঙ্গে সুক্ষত দেহ করে ক্ষত ক্ষত
মায়ের যাতনা দেখি কার কোন প্রাণে
সুস্থির থাকিতে পারে বিচিত্র ভবনে?
যে জননী পয়োধরা শত নদী-ধারে,
সিঞ্চিছে নিরবধি আমা-সবাকারে;
যে জননী দুঃখ হরি সব সুখ তুলি
উপায়ের নানা অন্ন মুখে দেন তুলি;
এমন মায়ের কোলে যে-কোন সন্তান
নিষ্কর নিষ্ঠুর হায় পাষাণ সমান।
ঐ দেখ মায়া বসি ঘোর কারাগারে
হাতে বেড়ি পায়ে বেড়ি অজ্ঞান-আঁধারে
অরিদের অস্ত্র-নীর, ঘন বহে যায়,
যাতনায় করিছেন এ-পাশ ও-পাশ।
ঐ দেখ, কাঁদিছেন জননী ছিরদা;
শুনিয়া কত কাল থাকিবে অবলা?*

১৭৮৮ শকে (১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে) এই মেলার প্রথম প্রতিষ্ঠা। ইহার দ্বিতীয় বৎসরের বিবরণীতে (১৭৮৯) সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে-বিবৃতি পাঠ করেন তাহাতে জানা যায় যে, হিন্দু জাতিকে একত্র করা ও আত্মনির্ভর শিক্ষা দেওয়াই মেলার

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় আছে প্রথম মেলায়, কিন্তু তাহা ঠিক নহে, গান গীত হয় মেলার দ্বিতীয় বৎসরে। এই কবিতা লিখিত হয় ১৭৮৯ শকের দ্বিতীয় মেলার জন্য। জ্যোতি বাবুর বয়স তখন মাত্র ১৮ বৎসর। তাঁহার কণ্ঠ ভাল ছিল, তাই তাঁহার কৃতবিদ্য সহোদর দেবেন্দ্রনাথ গম্ভীরস্বরে সুর করে এটা পাঠ করেন।

প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কাহারও কাহারও মুখে 'স্বাধীনতা' কথাটারও অস্ফুট ধ্বনি হইয়াছিল। বস্তুতঃ জাতির ঐক্য-স্থাপনেই অনুষ্ঠাতাগণ বিশেষরূপে মনোযোগী ছিলেন। উপরোক্ত কবিতাটী দ্বিতীয় বৎসরের মেলায় বিবৃতী হইতেই সংগৃহীত।

যাহা হউক স্বাদেশিকতা ও একাবন্ধনের ধ্বনি সেই সময়ে একবার ক্ষীণভাবে উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু উহার বীজ বাহিরের ঘাতপ্রতিঘাতের জন্য কোনরূপ অনুরোধপাদন করিতে পারে নাই। তবে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ইহার প্রভাব বিশেষভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন,—

"বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশী প্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল।...সেই সময় স্বদেশ-প্রেমের সময় না হইলেও আমাদের বাড়ীর সাহায্যে যে-হিন্দুমেলা বলিয়া একটী মেলা সৃষ্ট হয়, ভারত-বর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম।"

জাতীয়তার তৃতীয় ও বিশিষ্ট সুরই বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী। সব্যসাচীর ন্যায় তিনিই গাণ্ডীব ধারণ করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে জাতীয়তার বীজ প্রথম অঙ্কুরিত করেন এবং ক্রমে উহা সতেজ ও পল্লবিত করিতে কৃতকার্য্য হয়েন। তিনিই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র সত্যানন্দের ন্যায় দেশের জন্য অনেক চিন্তা করিয়াছেন, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন, "আমি একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল, মা।" তিনি জন্মভূমির উদ্ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে মাতৃ উদ্বোধন করিয়াছিলেন :

"এসো মা গৃহে এসো, ছয় কোটি সন্তানে একত্রে একস্বরে বাদশকোটি করযোড় করিয়া তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব মা প্রকৃতি অবিকে। ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্য দায়িকে...। তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা? এই ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—ঐ ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এসো মা গৃহে এসো, যার ছয় কোটি সন্তান তাঁর ভাবনা কি?"

বঙ্কিমই চিরন্তনী স্বর্ণপ্রতিমা জন্মভূমির মূর্ত্তি যেন সাক্ষাৎ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে দেশবাসীকে ডাকিয়া দেখাইয়াছিলেন—"একদিন দেখিব দিগ্‌ভুজা নানা প্রহরণ প্রহারিণী শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্র পৃষ্ঠ বিহারিণী দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিজ্ঞানমূর্ত্তি সরস্বতী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ এই আমাদের সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।"

বঙ্কিম প্রথমে দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে প্রীতি-বন্ধনের জন্য প্রথম প্রয়াসী হন। তিনিই প্রথমে উচ্চ-নীচ শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের পক্ষপাতী হন। তিনিই প্রথমে ঐক্যবন্ধনে অগ্রণী হইয়া উপদেশ দেন,—

"একণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা, মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা ধনবান এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে। উচ্চশ্রেণীর সহিত যদি পার্থক্য জন্মিল, তবে সংসর্গ ফল জন্মিবে কি প্রকারে? যে পৃথক, তাহার সহিত সংসর্গ কোথায়? যদি শক্তিমন্ত ব্যক্তিরা অপরদিগের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী না হইল, তবে কে আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে? আর যদি আপামর সাধারণ উন্নত না হইল, তবে যাঁহারা শক্তিমন্ত, তাহাদিগের উন্নতি কোথায়? এরূপ কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্রলোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বরং যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তা সম্পন্ন। যত দিন এই ভাব ঘটে নাই—যত দিন উভয়ে পার্থক্য ছিল, ততদিন উন্নতি ঘটে নাই। যখন উভয় সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য হইল, সেই দিন হইতে শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ। রোম, এথেন্স, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা ইহার উদাহরণস্থল। সে-সকল কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। পক্ষান্তরে সমাজ মধ্যে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাকিলে সমাজের যেরূপ অনিষ্ট হয়, তাহার উদাহরণ স্পার্টা, ফ্রান্স, মিসর এবং ভারতবর্ষ। এথেন্স এবং স্পার্টা দুই প্রতিযোগিনী নগরী, এথেন্সে সকলে সমান; স্পার্টায়

একজাতি প্রভু, একজাতি দাস ছিল। এখেন্স হইতে পৃথিবীর সভ্যতা সৃষ্টি হইল; যে-বিদ্যাপ্রভাবে আধুনিক ইউরোপের এত গৌরব, এখেন্স তাহার প্রসূতা। স্পার্টা কুলক্ষণে লোপ পাইল। কালে পার্থক্য হেতু ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে মহাবিপ্লব আরম্ভ হয়, অদ্যাপি তাহার শেষ হয় নাই। ধর্ষিত তাহার চরম ফল মঙ্গল বটে, কিন্তু অসাধারণ সমাজ পীড়ার পর সে-মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে। হস্ত-পদাদি ছেদ করিয়া, যেরূপ রোগীর আরোগ্য সাধন, এ-বিপ্লবে সেইরূপ মঙ্গল সাধন। সে-তত্ত্বানক ব্যাপার সকলেই অবগত আছেন। মিশর দেশে সাধারণের সহিত ধর্ম্মযাজকদিগের পার্থক্য হেতুক, অকালে সমাজোন্নতি লোপ পায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণগত পার্থক্য। এই বর্ণগত পার্থক্যের কারণে, উচ্চবর্ণ এবং নীচবর্ণে যেরূপ শুরুতর ভেদ জন্মিয়াছিল, এমত কোন দেশে ঘটে নাই এবং এত অনিষ্টও কোন দেশে হয় নাই। সে-সকল অমঙ্গলের সবিস্তার বর্ণনা এখানে করার আবশ্যকতা নাই। একণে বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা সম্পত্তির প্রভেদে অন্যতর বিশেষ পার্থক্য"—

ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও জাতীয়তা বিশিষ্ট বঙ্কিম এই ভেদজ্ঞান দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তবে তিনি সাহিত্য-সম্রাট—এই ভেদবুদ্ধি বিদূরিত করিতে প্রয়াস পান সাহিত্যের সহায়তায়। তাই প্রকৃষ্ট বাঙ্গলা ভাষার প্রবর্ত্তন করিয়া সাম্য সংস্থাপনে ব্রতী হন। তখন কৃতবিদ্যগণের মধ্যে কথোপকথন হইত অধিকাংশ সময়ে ইংরাজীতে। চিঠি-পত্র লেখা হইত ইংরাজীতে এবং বঙ্কিম বলেন, "অবস্থা দেখিয়া মনে হয় বোধ হয় অদ্যেকার দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদিও ইংরাজীতে পঠিত হইবে।"

এই ভাষার কথায় বাহুল্য এখানে খুব প্রাসঙ্গিক নয় বলিয়া আর বেশী উল্লেখ করিব না। তবে এই ভাবে শিক্ষিতমণ্ডলীতে ( Intelligentsia ) তৈয়ার করা প্রথমেই অত্যাবশ্যক হইয়াছিল। তবে একথাও ঠিক তিনি কেবল বঙ্গবাসীর সুখ-দুঃখের কথাই ভাবেন নাই। সমগ্র ভারতের কথাই তাঁহার চিন্তার মধ্যে ছিল। তাহাদের মিলন সম্বন্ধেও তিনি নীরব থাকেন নাই। নিম্নলিখিত কথায়ই জাতীয়তার একটী আদর্শ পাই।

বঙ্কিম লিখিয়াছেন,

"ভারতবর্ষীয় নানাজাতি একমত একপরামর্শী একোদ্যম না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই ঐক্যের এক-পরামর্শিত্ব, একোদ্যম কেবল ইংরাজীর দ্বারা সাধনীয়; কেন না, এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পাঞ্জাবী ইহাদিগের সাধারণ মিলন-ভূমি ইংরাজি ভাষা, এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি করিতে হইবে। অতএব যত দূর ইংরাজী চলা আবশ্যক, তত দূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না।" এই কথাই আবার তিনি স্বর্গীয় শম্ভু মুখার্জ্জির নিকটে লিখিয়াছিলেন—

> "There is no hope for India until the Bengali and the Punjabi understand and influence each other and can bring their joint influence to bring upon the English-men. This can be done only through the medium of the English and I gladly welcome your projected periodical."

এই ঐক্য—ভারতীয় ঐক্য—ভারতীয় সর্ব-জাতির সম্মিলন, প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছিল।

আর এই ভাবই বঙ্কিম-বন্ধু হেমচন্দ্রের কবিতায় চতুর্দ্দশ পদেও আমরা প্রতিধ্বনিত দেখিতে পাই—

ভারত জননী জাগিল!
পুরব, পাঞ্জাব, মরব, বিহার,
বেরাইচ্‌মাইল, হিমাদ্রির পার।
করাচি, মাদ্রাজ, বম্বা বোম্বাই,
সুরাট, গুজরাটি, মহারাষ্ট্রী ভাই
চৌদিকে মায়ের ঘেরিল।

( ১৮৮৩ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে গীত সঙ্গীত )

রবীন্দ্রনাথও এই বঙ্কিমের ও হেমচন্দ্রের ভাবই যেন প্রতিধ্বনিত করিয়া গাহিয়াছিলেন —

নমো হিন্দুস্থান।
যত বিদ্যে উৎকল মাদ্রাজ
গায় হিন্দুস্থান
হিন্দু পার্শি জৈন
মুসলমান
নমো হিন্দুস্থান।

লোকমত গঠনে অন্যান্য বিষয়ের প্রভাব সম্বন্ধে আগামী বারে আমরা আলোচনা করিব। বঙ্কিমের বন্দেমাতরম্ সম্বন্ধেও যথাস্থানে উল্লেখ করিব।

# নদীয়ার কথা

—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য

## ভাষা ও সাহিত্য

জাতীয় জীবন প্রতিফলিত হইয়া উঠে জাতির সাহিত্যে, কারণ জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাহিত্য কখনও বাঁচিতে পারে না। সুতরাং জাতির রুচি ও সংস্কৃতির সূক্ষ্ম ক্রম-বিকাশের ধারা তাহার সাহিত্যের ইতিহাসেই সার্থকভাবে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিবার কথা।

বর্ত্তমানে সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিবার পূর্ব্বে সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধেও দু'একটা কথা এখানে উল্লেখ করিব, কারণ ভাষাই সাহিত্যের বাহন। সকল দেশের সাহিত্যেই এই ভাষা সাধারণতঃ দুই প্রকার,—লিখিত ও কথ্য। লিখিত ভাষার একটা সুনির্দ্দিষ্ট ও নিয়মাবদ্ধ রূপ আছে, স্থানান্তর ঘটিলেও যাহার রূপান্তর ঘটে না। কিন্তু কথ্য ভাষা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার। এই বিভিন্ন প্রকার কথ্য ভাষার মধ্যে কোন্‌টি সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়া লোকচিত্ত জয় করিয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য। বাংলার কথ্য সাহিত্যে নদীয়ার কথ্য ভাষাই অবিসংবাদিত-রূপে গৃহীত এবং 'নদে শান্তিপুরের' সুমার্জ্জিত ও প্রাদেশিক দোষমুক্ত, অবিকৃত মিষ্ট ভাষাই আজ বাংলার কথ্য ভাষার আদর্শরূপে পরিগণিত। নদীয়ার ইহা কম গৌরবের কথা নহে। অনেকের ধারণা দক্ষিণ বঙ্গের, তথা কলিকাতার প্রচলিত ভাষাই বর্ত্তমানে সাহিত্যের কথ্য ভাষা, কিন্তু তাহা সত্য নহে, কারণ কলিকাতার নিজস্ব ভাষা বলিয়া যাহা প্রচলিত তাহা যেমন বিকৃত তেমনি অমার্জ্জিত, সাহিত্যে তাহার স্থান নাই। যাহা সাহিত্যে চলিয়া থাকে তাহাতে উক্ত 'নদে শান্তিপুরী' ভাষার প্রভাব পুরামাত্রায়। বাংলা সাহিত্যে কথিত ভাষা প্রচলনের প্রধান নায়ক প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের মতামত এই সূত্রে উল্লেখ করিতেছি: "নির্ভয়ে বলা যায় যে, কৃষ্ণনগরের কথা ভাল কথা। তার সেই ভাল কথাই আজ পর্য্যন্ত আমার মৌখিক ভাষা। আর ভাষার এই মূলধন কালক্রমে সুদে বেড়েছে। সুতরাং আমার ভাষার জন্য আমি কৃষ্ণনগরের কাছে ঋণী। আমি এখন কলিকাতাবাসী, কিন্তু আজও কলকত্তাই ভাষা আমার মুখের ভাষা নয়।...আমার বিশ্বাস যে বাঙ্‌লার গদ্য-সাহিত্য নেই, শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগরের মৌখিক ভাষার উপরেই গড়ে উঠেছে—অবশ্য সাহিত্যিকদের হাতে pungata হয়ে—"

সাহিত্য-সাধনাতেও নদীয়ার দান অপরিমিত। বাংলার সাহিত্য খুব বেশী দিনের প্রাচীন নহে। আনুমানিক মাত্র পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্য-প্রেরণার যে ক্ষীণ স্রোতোধারা লোকচক্ষুর অন্তরালে আপনি উৎসারিত হইয়াছিল তাহাই পরে নব নব ভাবের ও সাধনার সুদীর্ঘ বন্ধুর পথ বাহিয়া আজ উত্তাল-তরঙ্গায়িত রূপে মহামানবের সাগরকূলে উপনীত হইয়াছে। ইহা বাংলার গৌরব, বাংলা সাহিত্যের গৌরব এবং আরও একটু সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব যে, এই গৌরবমালা অর্জ্জনের সমধিক কৃতিত্ব নদীয়ারই প্রাপ্য। সুচনা হইতে শুরু করিয়া যুগে যুগে এই নদীয়াই ভগীরথের মত সাহিত্যধারাকে বিভিন্ন অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার নূতন পথে পরিচালিত করিয়া আসিয়াছে। নদীয়াতেই এই অতি সমৃদ্ধ সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি। কথাটা আরও বিশদ করিয়া বলিবার প্রয়োজন। বাংলার প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যিকমণ্ডলীর জন্ম বা কর্ম্মস্থান হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক্ দিয়া নদীয়ার এই দাবী আমি উপস্থিত করি নাই।

সাহিত্যের 'স্টাইল' ও আদর্শ দেশ-কাল-পাত্র ভেদে পরি-বর্ত্তনশীল। বিভিন্ন যুগের রুচি ও পারিপার্শ্বিকের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সাহিত্যও বিভিন্ন ভাবে ও বিচিত্র ধারায় রসান্বিত হইয়া উঠে। এইরূপ যুগোচিত রুচি ও অনুভূতির সার্থক অভিব্যক্তিতে নদীয়ার সাহিত্যিকগণ সাহিত্যের বিভিন্ন পর্য্যায়ে নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছেন। সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিব, নদীয়ার যুগপ্রবর্ত্তক মনীষী সাহিত্যিকগণের প্রতিভার আলোয় বাংলা সাহিত্যের ধারা বার বার গতানুগতিকতার মোহ কাটাইয়া নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া ধন্য হইয়াছে।

সাহিত্য যখনই পূর্ব্বাচরিত পথ ছাড়িয়া নূতন ভাবে,

নূতন ভঙ্গীতে, নূতন যুগের অভিনব আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে, সেইখানেই আমরা নদীয়ার সাহিত্য-মনীষাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

এই হিসাবে বাংলা সাহিত্যে নদীয়ার দাবী অগ্রগণ্য। সাহিত্যের আদিযুগে বৌদ্ধ গান ও দোহা ভাষার যে কতকগুলি পদাবলীর উল্লেখ করা হইয়া থাকে, সেগুলি সম্বন্ধে আজ বিশেষ কিছুই জানিবার উপায় নাই। এই সকল একান্ত দুরূহ ও অপ্রচলিত ভাষার পদ কয়টি ও বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা সম্বলিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কতকগুলি অমার্জিত ও দুর্বোধ্য পদাবলীর কথা ছাড়িয়া দিলে নদীয়ার কবি কৃত্তিবাসকেই বঙ্গসাহিত্যের আদি-কবি বলিতে হইবে। এতাবৎকাল পর্যন্ত যৎকিঞ্চিৎ পদাবলী কিছু কিছু রচিত হইয়া থাকিলেও বাংলা সাহিত্যের তখনও নীহারিকা অবস্থা।

চণ্ডীদাসের যে-সকল অনুপম পদাবলী আজ আমাদের কানের ভিতর দিয়া প্রাণ আকুল করিয়া তুলিতেছে, তাহাই বাহুল্য পণ্ডিতবর্গের মতে সে-গুলি অনেক পরবর্তীকালের রচনা এবং বৈষ্ণবিনী কবি বিদ্যাপতির সুললিত কণ্ঠ বাংলার আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইলেও তাহা বাংলার নিজস্ব নহে। এই হিসাবে বঙ্গভাষার আদি সাহিত্যিক বলিয়া নদীয়ার কবি কৃত্তিবাসের দাবীই যে সমধিক, সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই।

আনুমানিক ১৪৩২ খৃষ্টাব্দে শান্তিপুরের সন্নিকটস্থ ফুলিয়া গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে কবি কৃত্তিবাসের জন্ম হয়। কবির বড় আদরের গ্রামখানি ফুলিয়া কালচক্রে আজ জঙ্গলাকীর্ণ ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র এবং একটি দোলমঞ্চ ছাড়া কবির কোন নিদর্শনই সেখানে আজ পাওয়া যায় না। কিন্তু কাল হইল সেখানে একটি ক্ষুদ্র মর্মরস্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে ও শান্তিপুর সাহিত্য সম্মেলনীর উদ্যোগে প্রতি বৎসর তথায় মহাকবির জন্ম-তিথিতে উৎসব হইয়া থাকে। যাহা হউক, কবির স্বলিখিত আত্মবিবরণী-জ্ঞাপক একটি কবিতা আবিষ্কৃত হওয়ায় এই আদি-কবি সম্বন্ধে অনেক কথাই আজ জানিতে পারা যাইতেছে। সংস্কৃত শিক্ষাদি শেষ করিয়া বিদ্যা-নিষ্পৃহ কবি যে-দিন পক্ষ গৌড়াধিপতির রাজসভায় উপস্থিত হইয়া তুচ্ছ রাজদত্ত সম্মান অপেক্ষা আপনার কবিত্ব গৌরবে আপনাকে অধিক গৌরবান্বিত মনে করিয়া বলিয়াছিলেন—

"কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥"

সেই দিন বঙ্গভাষার এক স্মরণীয় শুভ দিন। গৌড়েশ্বরের উৎসাহে রামায়ণ রচনায় প্রেরণা লাভ করিয়া সেই দিন তিনি প্রকৃতপক্ষে বঙ্গসাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। মহাকবি বাল্মীকির অমর লেখনীপ্রসূত রামায়ণ মহাকাব্যের অন্তরে রসের যে অমৃত-উৎস লুক্কায়িত ছিল, নদীয়ার কবি কৃত্তিবাস অঞ্জলি পুরিয়া সেই রস বাংলার ঘরে ঘরে পরিবেশন করিয়া দিয়া বঙ্গসাহিত্যের শুভ উদ্বোধন করিলেন।

কৃত্তিবাসের পর কিছু কাল ধরিয়া মুসলমান রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় খান কয়েক রামায়ণ মহাভারতের খণ্ডানুবাদ ও চণ্ডী, শীতলা, মনসার বিবিধ ছড়া, পাঁচালী, ব্রতকথা রচনায় বাংলার সমগ্র কবিপ্রতিভা নিয়োজিত হইল। এই ভাবে অগ্রসর হইতে থাকিলে বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ এত অল্প সময়ের মধ্যে কখনই এমন উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু অকস্মাৎ দেবতার আশীর্বাদে বৈশাখ প্লাবনের মত নদীয়ার বৈষ্ণব সাধকগণের অপূর্ব প্রেমোন্মাদনার বিপুল প্রবাহ বঙ্গসাহিত্যের অনুর্বর ভূমিকে সরসপুষ্পে সুশোভিত করিয়া প্রবাহিত হইল। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে আবির্ভূত হইলেন। বর্ষার নব মেঘধারায় সঞ্জীবিত হইয়া শুষ্ক বনভূমি যেমন দেখিতে দেখিতে পত্রে-পুষ্পে শোভমান হইয়া উঠে, তেমনি মহাপ্রভুর প্রেমধারায় অভিষিক্ত হইয়া সমাজের বিভিন্ন স্তরের জবা হইতে অজস্র কবির উদ্ভব হইতে লাগিল। বৈষ্ণব যুগেই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও সাহিত্য বলিয়া গর্ব করিবার মত ইহার দৃঢ় ভিত্তির প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের অনেকেই তাঁহারই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অবজ্ঞাত মাতৃভাষায় তাঁহাদের ধর্মের মর্মকথা জন-সাধারণকে বুঝাইতে লাগিলেন। রাজসভার রাজানুগ্রহপুষ্ট সাহিত্য 'অমের চামে'র পুণ্য-পরশ লাভ করিয়া বাংলার ঘরে ঘরে বাঙ্গালীর মর্মকথা হইয়া দাঁড়াইল। এই সকল কবিবৃন্দের মধ্যে কেহ বা নদীয়াতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কেহ বা

নদীয়ায় আজীবন বসবাস করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, কেহ বা নদীয়াকে ভালবাসিয়া, নদীয়ার প্রেমে পাগল হইয়া, নদীয়া-বিনোদের গুণকারিনী গাহিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। বাংলার বৈষ্ণব কবি যেখানেই জন্ম গ্রহণ করুন না কেন, নবদ্বীপচন্দ্রের প্রেমধারায় অভিষিক্ত হইয়াই তাঁহাদের কবি-প্রতিভার উন্মেষ, নদীয়াকে ভালবাসিয়াই তাঁহারা কবি। এই হিসাবে সকল বৈষ্ণব কবির উপরেই যে নদীয়ার দাবী আছে, এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

নদীয়ার বিজয় বৈষ্ণব কবি বলিতে সর্ব্বপ্রথমেই বৃন্দাবনদাসের নাম মনে পড়ে। বৃন্দাবনদাস বৈষ্ণব পণ্ডিত-সমাজে ব্যাসাবতার বলিয়া সম্মানিত ও তাঁহার 'চৈতন্য ভাগবত' একখানি বিখ্যাত প্রামাণিক গ্রন্থরূপে বৈষ্ণবগণের নিকটে পরম সমাদৃত।

এতদ্ব্যতীত নবদ্বীপের জগদানন্দ, গোবিন্দ, মাধব ও বাসু ঘোষ, স্বরূপ দামোদর, কাঁচড়াপাড়ার সেন শিবানন্দ, কবি কর্ণপুর, কুলিয়া গ্রামের বংশীবদন প্রেমদাস প্রভৃতি বিখ্যাত পদকর্ত্তাগণের কথা আর বিশদ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

মহাপ্রভুর জনক মাধবাচার্য্য 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' নামে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের একখানি অতি প্রাচীন পদ্যানুবাদ প্রণয়ন করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের স্বনামধন্য কবি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও এই জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামের অধিবাসী। বহুবিধ উৎকৃষ্ট ও সুবিখ্যাত সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও ইনি 'অলদা গীতচিন্তামণি' নামে একখানি বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদ-সংগ্রহ প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং আজ পর্য্যন্ত যতগুলি প্রাচীন পদ-সংগ্রহের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে এই খানিই প্রাচীনতম।

এই ভাবে নদীয়ার প্রেমধর্ম্ম সাধনাই বহুকাল ধরিয়া বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধন করিয়াছে। তৎসহ সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া বহুতর মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ কাব্য, গীতিকাব্য প্রভৃতি রচিত হইয়া সাহিত্য যখন ক্রমশঃই বৈচিত্র্যহীন ও মৌলিকতাবর্জ্জিত হইয়া উঠিতেছিল, ঠিক এমনি সময়ে, অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে নদীয়ার রাজকবি ভারতচন্দ্রের অনুপম রসকাব্য 'অন্নদামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' প্রকাশিত হইল। অষ্টাদশ শতকে বাংলার জাতীয় জীবনে সর্ব্বদিকু দিয়াই বিপর্য্যয়। বাংলার ভাগ্য-গগন ক্রমশঃই তখন রাষ্ট্রবিপ্লবের ঘন-কৃষ্ণ মেঘজালে আবৃত হইয়া আসিতেছিল। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে বিজ্ঞ, বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব। কূটরাজ-নীতি চক্রান্তে ও প্রভাব প্রতিপত্তিতেও তৎকালিক দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে অগ্রণী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। উল্লিখিত দেশব্যাপী রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনা সত্ত্বেও এই মহা-মহিমান্বিত রাজচক্রবর্ত্তীর ছত্রছায়ার অন্তরাল হইতেই অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের অনুপম কণ্ঠ ধ্বনিত হইতে পারিয়াছিল। ইঁহাদের জন্মস্থান নদীয়ার না হইলেও নদীয়ায় আসিয়া ও নদীয়া রাজের কৃপারশ্মি লাভ করিয়া যে তাঁহাদের কাব্য-প্রতিভার অমল-কমল সহস্রদলে বিকশিত হইয়া উঠে, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই।

বিদ্যাসুন্দর এই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য এবং বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম রোমান্টিক কাব্য। ধর্ম্মগাথা বা দেবদ্বিজদের উপাখ্যানাশ্রিত সাহিত্যের মধ্য হইতে নরনারীর লৌকিক প্রণয়কাহিনীমূলক রোমান্সের প্রথম উদ্ভব তৎকালিক রসজ্ঞচিত্তে কতখানি চমক লাগাইয়া দিয়াছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। ভাব ও ভাষার পরি-পক্কতার, কিম্বা ছন্দ ও অলঙ্কারের পারিপাট্যের দিক্ বিচার করিলে ভারতচন্দ্রকে প্রাক্‌বৃটিশ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি না বলিয়া উপায় নাই। শুধু ছন্দোকারুকারের জ্ঞানে নহে, চরিত্র চিত্রাঙ্কনের তীক্ষ্ণ মনীষা ও অন্তর্দৃষ্টির প্রাখর্য্যে ভারতচন্দ্র একেবারেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বেই সাধক কবি রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানে হাত দিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা তাঁহার অপূর্ব্ব প্রসাদী পদাবলীই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। মাতৃভক্ত সাধক কবি শ্যামাসঙ্গীতের পূজায় আপনাকে কায়মনোবাক্যে উৎসর্গ করিয়া যে-ভাবে স্বতোৎ-সারিত মাতৃনাম-গানে আকাশ বাতাস পূর্ণ করিয়া তুলিয়া-ছিলেন, তাহারই অপূর্ব্ব ভাবমাধুরী পরবর্ত্তী কালের বহু ভক্ত কবি-হৃদয়ে অনুপ্রেরণা জাগাইয়া আসিয়াছে। কৃষ্ণনগর রাজ-বংশের নাম এই সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ স্বয়ং অনেকগুলি বিখ্যাত শ্যামাসঙ্গীতের পদ রচ-

করিয়াছিলেন। তৎপরে ঐ বংশে মহারাজ শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, নরচন্দ্র, নরেশচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই উৎকৃষ্ট মাতৃপদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ইহার কিছু পরে আর একজন সুবিখ্যাত বৈষ্ণব কবি নদীয়ায় আবির্ভূত হন। ইনি কৃষ্ণকমল গোস্বামী। কৃষ্ণকমল ১৮১০ খৃঃ নদীয়ার অন্তর্গত ভাজনঘাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার 'রাই উন্মাদিনী,' 'স্বপ্নবিলাস,' 'ধ্রুবচরিত্র' প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কবিত্বপূর্ণ করুণ-রসাত্মক বৈষ্ণব পালাকাব্য আছে। সঙ্গীত রচনাতেও ইঁহার প্রতিভা পূর্ব্বোক্ত যে কোন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবির সহিত তুলিত হইতে পারে বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

এইখানেই প্রাক্‌বৃটিশ যুগের প্রাচীন সাহিত্যের অবসান বলিতে হয়। তাহার পর বর্ত্তমান ইংরাজী যুগের প্রাক্কালে যে সকল মনীষী আপনার প্রতিভাবলে নূতন ভাবে, নূতন ধারায়, আমাদের নূতন অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বর্ত্তমান সাহিত্যের লালন-পালন করিয়াছিলেন, নদীয়ার কবি ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয় তাঁহাদের অগ্রণী।

গুপ্ত কবি ১৮১১ খৃঃ কাঁচড়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরাজী সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁহার সাহিত্যে কিছু না থাকিলেও ইঙ্গ-সভ্যতার রুচি ও রীতির ছাপ তাহাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। সংবাদপত্র পরিচালনায়, সাহিত্য সমালোচনায়, প্রাচীন সাহিত্য সংগ্রহে, নবীন সাহিত্যিকগণকে উৎসাহ প্রদানে ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয় প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ যুগীয় বঙ্গসাহিত্যের অগ্রদূতের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ১৮৩১ খৃঃ ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং এই 'সংবাদ প্রভাকর'ই বঙ্গসাহিত্যের নবযুগকে আবাহন করিয়া আনিবার নিমন্ত্রণ-পত্র।

গুপ্ত কবির উপযুক্ত কাব্যশিষ্য স্বনামধন্য দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ও নদীয়ার কবি। বাং ১২০৬ সালে কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী চৌবেড়ীয়া গ্রামে দীনবন্ধু মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। (চৌবেড়ীয়া তৎকালে নদীয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল)। গুপ্ত কবির বাস্তবপ্রিয়তা ও পরিহাসরসিকতা তাঁহার বালক ভক্ত দীনবন্ধুর কল্পনাকে হয় তো অনেকখানি পরিচালিত করিয়াছিল, তাই কবির অধিকাংশ রচনাই নির্ম্মল হাস্য-পরিহাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। যে চরিত্র চিত্রাঙ্কনে তিনি হাস্যরসের রঙে তুলিকা রাঙাইয়াছেন সেই চিত্রই তাঁহার অনুপম হইয়াছে। 'নীলদর্পণ' দীনবন্ধুর প্রথম নাটক, এবং এই নাটকখানি হইতেই তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। 'নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর' জনসাধারণের আকুল মর্ম্মবেদনা এই নীলদর্পণের ছত্রে ছত্রে যেন রক্ত হইয়া রহিয়াছে।

অতঃপর নদীয়ার সুবর্ণপুর গ্রাম নিবাসী যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশে যে-সকল দেশ-প্রেমিক আপনাপন দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে সর্ব্বস্ব ত্যাগের মহান্ ব্রত গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, যোগেন্দ্রনাথ তাঁহাদের সেই সকল বীরত্ব গৌরব-মণ্ডিত জীবনীকথা ও নানা জাতির মুক্তির ইতিহাস শুনাইয়া নিরীহ বঙ্গবাসীর হৃদয়ে নব আশার সঞ্চার করিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধে খৃষ্টীয় মিশনারী ও ইংরাজ রাজপুরুষগণ অমানুষিক যত্ন, অধ্যবসায় ও ভালবাসা সহকারে যে-সময়ে বাংলা গদ্যের সৃষ্টি ও লালনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, সেই সময়েও নদীয়ার বহু ইংরাজী-শিক্ষিত নবীন সাহিত্যিক এই মহৎ কার্য্যে তাঁহাদের সাহায্য করিয়াছেন। পাদ্রী উইলিয়াম কেরী প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের সাহায্যকারী হিসাবে নদীয়ার জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। চারি পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন ভাষায় লেখা কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরামী মহাভারত যে আজিও বাংলার ঘরে ঘরে পরম সমাদরে পঠিত হইতেছে, তাহা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের যুগোচিত সংস্কৃতির ফলেই সম্ভব হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এইবার কবি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নাম করিতে হয়। মদনমোহন ১৮১৪ খৃঃ নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিল্বগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। "সংস্কৃত ছন্দের অনুবাদে মূলের ছন্দোরক্ষা ও অনুপ্রাসাদি রক্ষায় অবিকৃত রাখিয়া তিনি যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। ভারতচন্দ্র ছাড়া কেহই এমন সুন্দর, সুমধুর ও অলঙ্কারবহুল ছন্দ রচনা করিতে পারেন নাই বলা যাইতে পারে।

মুন্সীরখালীর সাধক কবি হরিনাথ মজুমদার বা কাঙ্গাল হরিনাথ বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'বিজয়-বসন্ত' প্রণয়ন

করেন। ইহা ছাড়াও তাঁহাদের অপূর্ব্ব সাধনসঙ্গীতাবলীর কথা আশা করি কাহারও অজ্ঞাত নাই। নদীয়ার শ্যামাসঙ্গীত কবি দ্বিজেন্দ্রলালের নাম এতক্ষণ উল্লেখ করা হয় নাই। তাঁহার উদ্দীপনাময় স্বদেশী সঙ্গীতগুলি সমগ্র বাংলার বুকে দেশাত্মবোধের চিরজাগরূক অক্ষয় মন্ত্র। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা বিশ্লেষণ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। শুধু এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কবি ও নাট্যকার হিসাবে বঙ্গীয় শ্রেষ্ঠ কবিবৃন্দের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের আসন আজ সুনির্দ্দিষ্ট এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁহার হাসির গান ও রসরচনা আজিও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

এতদ্ব্যতীত প্রাচীন সাহিত্যিকগণের মধ্যে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ভারাচরণ সরকার, ধর্ম্মোদয় মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর কবিরত্ন, লোহারাম শিরোরত্ন, রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী প্রভৃতি নদীয়ার সুসন্তানগণের নাম উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম। পরবর্ত্তী কালের স্বনামধন্য সাহিত্যরথীবর্গ—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, উপন্যাসিক জলধর সেন, রহস্যলহরীর দীনেন্দ্রকুমার রায়, দার্শনিক পণ্ডিত সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখক ভগবানদ্দ রায়, গিরীন্দ্রশেখর বসু, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, কবি কঙ্কণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচি এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রভৃতি লেখকগণের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিবার কোনই আবশ্যক নাই। বর্ত্তমানকালের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক রাজশেখর বসু ওরফে 'পরশুরাম'ও নদীয়া জেলার লোক। এমন কি রবীন্দ্রনাথের উপরেও নদীয়ার দাবী নগণ্য নহে। কবিকে অন্তরঙ্গতার সঙ্কীর্ণ পটভূমিতে স্থাপন করিয়া দেখিতে গেলে, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমেই শিলাইদহের কবি বলিতে হয়। শিলাইদহের দিগন্তবিস্তৃত শ্যামল হরিৎক্ষেত্র, নির্জ্জননদীতীর, উন্মুক্ত আকাশ প্রান্তর, ছায়াঘন পল্লীকুঞ্জ ও অনাড়ম্বর সরল গ্রাম্য জীবনযাত্রা রবীন্দ্রনাথের বিমুগ্ধ কবিচিত্তে যে কি অপরিসীম সৌন্দর্য্য ও বিচিত্ররসব্যঞ্জনা জাগ্রত করিয়াছিল, তখনকার গল্পে কবিতায় ও চিঠিপত্রে আমরা তাহার খানিকটা আভাস পাই। এই সময়কার অধিকাংশ রচনাতেই প্রায় নদীয়ার এই শান্ত পল্লীজীবনের ও পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির ছায়া-রৌদ্রালোকিত শ্যামল আবেষ্টনীর অভিনব অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করিবার আবেগ পরিস্ফুট।

শিলাইদহেই কবির 'সাধনা'র সূচনা। দেশকে নূতন করিয়া ভাবাইয়া, মাতাইয়া, পাগল করিয়া দিবার প্রবলতর উৎসাহে এক যোগে সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম, দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্বদিকেই 'গদ্য-পদ্যের জুড়ি হাঁকাইয়া' কবি যে বিরাট অনায়াসসাধন করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। এমনিভাবে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া নদীয়ার আকাশ, বাতাস, পল্লীপ্রান্তর কবিচিত্তের খোরাক যোগাইয়াছে। গ্রাম্য-জীবনের বিচিত্র রসানুভূতি গানে গল্পে গাথায় অজস্রধারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

যাহা হউক, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত নদীয়ার যে-সকল লোকোত্তর—প্রতিভাপ্রদীপ্ত মনীষী সাহিত্যিকগণের আপ্রাণ সাধনায় বাংলা সাহিত্য আজ এতখানি পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাঁহাদের জনকয়েকের মাত্র নাম উল্লেখ করিবার চেষ্টা করিলাম। ইহা ছাড়াও আরও কত বিখ্যাত ও অখ্যাত সাহিত্যসেবী আপনাদের আন্তরিক সাধনায় বঙ্গবাণীকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। নদীয়াতেই প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি। বাংলা সাহিত্যের স্রোতোধারা যেখানেই মোড় ফিরিয়াছে, সেইখানেই আমরা নদীয়ার কোন সাহিত্যরথীকে দেখিয়াছি, এবং আশা করি এমনি করিয়া নদীয়া তাহার প্রদীপ্ত প্রতিভার মশাল ধরিয়া ভবিষ্যতের সাহিত্যকে নব নব অভিজ্ঞতার পথে পরিচালিত করিতে পারিবে।

# বিড়ম্বনা

—শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

সমস্তদিন ধরিয়া বৃষ্টি হইয়াছে, মাঝে মাঝে বাতাস আর অনবরত বৃষ্টি। কালো কালো মেঘে সূর্যকে ঢাকিয়া রাখিয়া অবিরত বিরামহীন বৃষ্টি ঝরিয়া পড়িয়াছে। চারিদিক্ অন্ধকার—ঠাণ্ডা আর স্যাঁতসেঁতে। রাস্তায় কাদা, এখানে ওখানে এত জল জমিয়াছে যে, রাস্তা চলা দুষ্কর।

সমস্তদিন বৃষ্টি হইবার পর, সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি সামান্য থামিয়াছে। আকাশে মেঘ নাই, এখন বেশ পরিষ্কার। চাঁদ উঠিয়াছে, জ্যোৎস্নার আলোয় সমস্ত অন্ধকার দূরে পালাইয়াছে। বৃষ্টি-ধৌত গাছপালাগুলির উপর জ্যোৎস্নার আলো ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। দোতলার একখানি ঘরের জানালার কাছে নিশীথ দাঁড়াইয়া। সমস্তদিন কোথাও বাহির হইবার উপায় ছিল না—তাই সন্ধ্যার সময় বন্ধুবান্ধবদের কাছে বেড়াইতে যাইবার জন্য নিশীথ সাজ-সজ্জা করিতেছে। বাড়ীটা নিস্তব্ধ, কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নাই। একটি চাকর আছে, বাহিরের কাজ-কর্ম সেই করিয়া থাকে—আর বিধবা পিসি ভিতরে কর্ত্রীত্ব করেন। লোকে বলে, নিশীথ ভাগ্যবান আছে। কোন ঝঞ্ঝাট নাই—না বউ না ছেলে। নিশীথের বাপ মা যখন মারা যান, তখন নিশীথ অত্যন্ত ছোট। বিধবা পিসি তখন হইতে সংসারের ভার মাথায় তুলিয়া লন।

ঘরের ভিতর প্রকাণ্ড আয়না, দামী টেবিল চেয়ার, ভাল ভাল ছবি। গৃহসজ্জা সবই মূল্যবান এবং সুরুচির পরিচায়ক। ইহা দেখিয়া মনে হয়, গৃহস্বামীর রুচি সুন্দর ও আর্থিক অবস্থা ভালই। সত্যই তাই। প্রসাধন শেষ হইলে, নিশীথ জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে ফুলের বাগান, বাগানে অজস্র ফুল ফুটিয়াছে। বাতাসে সুন্দর সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। নিশীথ জোরে নিশ্বাস টানিতে লাগিল। সমস্তদিন গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া মাথা তার হইয়া উঠিয়াছিল, এতক্ষণে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সমস্ত ক্লান্তি দূর হইয়া গেল।

নিশীথ বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। নিকটেই একটা পাখী ডাকিতেছে—বেশ সুন্দর লাগিতেছে। যে-দিক্ হইতে পাখীটার স্বর ভাসিয়া আসিতেছিল, সেই দিকে কান পাতিয়া নিশীথ বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

জ্যোৎস্নার আলো তাহার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। নিঃশব্দে দুই চোখ বুজিয়া পাখীর ডাক শুনিতে শুনিতে নিশীথ সুগন্ধ-ভরা বাতাস উপভোগ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে জানালা হইতে সরিয়া, সম্মুখে তাকাইতেই, তাহার মুখের ভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল। সম্মুখের দেওয়ালে তাহার মৃতা স্ত্রীর প্রকাণ্ড তৈলচিত্র। কিছুক্ষণ সেইটির দিকে তাকাইয়া নিশীথ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

রায়েদের বাড়ীর বৈঠকখানায় বন্ধুবান্ধবদের সমাগম হইয়াছে। কেহই বাদ নাই। তাসের চা দুই চলিতেছে।

ঘরে ঢুকিবার পূর্বে তাহার নাম কানে আসিতেই, নিশীথ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হরেন ভক্ত লোক। কথাটা সেই বলিতেছিল, "বুঝলে, এ-যুগে সীতা সাবিত্রীর অভাব নেই। তাঁদের পুণ্যের জোরেই আমরা টিঁকে রয়েছি, এ কথাটা ভুলো না। আজকালকার ছেলেরা এক ফুঁয়ে গিয়ে, রামায়ণ মহাভারত উড়িয়ে দেয়। সবই নাকি কল্পনা, কিছুই সত্যি নয় এই তারা বলে। শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। চোখের সামনে দেখ, এই নিশীথের বউ। তিনি স্বর্গে গিয়েছেন তাঁরই পুণ্যে আজ নিশীথের কোন অভাব নেই। বিয়ের আগের অবস্থাটা ভেবে দেখ। বিয়ের পর দু'মাস না যেতেই, কোথাকার দূর সম্পর্কের এক খুড়ো, তার সব বিষয়-সম্পত্তি টাকা-কড়ি ওকে দিয়ে গেল। কই বিয়ের আগে তিনি ছিলেন কোথা, তখন সে-বুদ্ধি তাঁর মাথায় ঢোকেনি। এ-সবই সতী স্ত্রীর পুণ্যে। কিন্তু যাহবা নিশীথ! দেখ বউ মরার পর আজ তিন বছর হয়ে গেছে, আর বিয়ের নামটী নেই। এই তো পুরুষ মানুষ। এই তো আদর্শ স্বামীর কর্তব্য, স্বামী এই রকমই হওয়া দরকার।"

বীরেন বলিল, "কিন্তু সকলেই যদি ঐ-পথ বেছে নেয়, তবে সংসার চলবে কি করে?"

হরেন বলিল, "সকলেই তা পারে না। আদর্শ স্ত্রী আদর্শ স্বামী যদি ঘরে ঘরে দেখা যেত, তবে সংসারের চেহারা বদলে যেত। তা নয় ওরা আমাদের দৃষ্টান্তস্থল আদর্শ-দম্পতি—"

নিশীথ যেমন আসিয়াছিল, ঠিক তেমনি চলিয়া গেল।

সরোজিনী যখন মারা যায়, নিশীথের কষ্ট হইয়াছিল বই কি। দু'এক মাস ভাল ভাবে রাত্রে ঘুমায় নাই—কতদিন খায় নাই। বন্ধুবান্ধবদের সহিত তেমন ভাল ভাবে মিশিত না। সমস্ত দিন একলা থাকিয়া, রাত্রে ছাদের উপর আসিয়া বসিত। স্ত্রীর প্রত্যেকটী জিনিষ শতবার দেখিয়াও যেন তৃপ্ত হইত না। রাত্রে সমস্ত গ্রাম যখন নিঃশব্দ—তখন ছাদে আসিয়া চুপ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিত—কোথায় সে চলিয়া গেল। কোন কোন দিন চেয়ারে বসিয়া থাকিতে থাকিতে ঘুমাইয়া পড়িত, ঘুম যখন ভাঙ্গিত তখন রাত শেষ হইয়া আসিয়াছে। কোনদিন নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে গৃহ যখন শব্দহীন, বেলা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে, সূর্য্যের আলো নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে, দূর হইতে ঘুঘু পাখীর উদাস ডাক ভাসিয়া আসিতেছে, সেই সময় সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে নামিতে, তাহার মনে হইত, হয় তো এখনই সরোজিনীর সহিত দেখা হইয়া যাইবে। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আশা লইয়া, অত্যন্ত নিঃশব্দে সে নীচে আসে। দালানে দাঁড়াইয়া ভাবে, এই বুঝি পাশের ঘর হইতে সরোজিনী বাহির হইয়া আসিবে, অথবা এই বুঝি খিড়কী দিয়া ভিজা-কাপড়ে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইবে। রোয়াকের উপর কলসীটী নামাইয়া, আস্তে আস্তে ভাঁড়ার-ঘরে চলিয়া যাইবে। হয় তো এখনই কোথাও তাহার শাড়ীর লাল পাড়ের কিয়দংশ দেখা যাইবে। সেই নিস্তব্ধ দালানে বহুক্ষণ নিশীথ দাঁড়াইয়া থাকিত।

প্রথম কিছুদিন স্ত্রীর শোকে সমস্ত ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন ছিল। কিছুই ভাল লাগিত না, কিছুই করিতে ইচ্ছা হইত না। ঘুরিয়া ফিরিয়া সরোজিনীর স্মৃতি সকল কাজের মাঝে ফুটিয়া উঠিত, তাহার সমস্ত চিন্তাকে বিভ্রান্ত করিয়া দিত। তার পর সেই তীব্র শোক কমিয়া, যেখানে দেখা গেল, সরোজিনীর স্মৃতি লইয়া সমস্ত মুহূর্ত্ত ডুবিয়া থাকা। রাত্রে যতক্ষণ ঘুম আসিত না, ততক্ষণ সরোজিনীকে ভাবিত। যেন সে আসিয়াছে, অথচ কাছে আসিতেছে না, হাসি মুখে ঘুরে দাঁড়াইয়া। কাছে ডাকিলে কেমন হাসিয়া সরিয়া দাঁড়ায়। এক সময় নিশীথ যেন ছুটিয়া যাইয়া তাহার দেহের উপর মুখ গুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিল। সরোজিনী আস্তে আস্তে তাহাকে ধরিয়া তুলিল।

নিশীথ বলিল, "বল তুমি যাবে না। তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না, বল যাবে না—"

সরোজিনী হাসিয়া কহিল, "যাব না, যাব না। হ'ল তো—"

সরোজিনীর স্মৃতি লইয়া এ যেন এক খেলা। তার পর এক সময় নিশীথ ঘুমাইয়া পড়িত। এখন আর সেই তীব্র বেদনা বোধ হয় না—বরং তাহাকে লইয়া নানা কল্পনা ভালই লাগে।

সকাল বেলা চা খাইতে খাইতে তাহার মনে হইত, সরোজিনী যেন তাহাকে চা দিতে আসিয়াছে। নিশীথ পাশে চাহিয়া বলিত, "বস।"

সত্যই পাশের চেয়ারটি ঝাড়িয়া দিয়া নিশীথ বলিত, "যা রে অত দূরে কেন? আর একটু সরে এস—আর একটু। আচ্ছা কাল কি হয়েছিল? রাত্রে একটা কথাও বললে না, কেন কি হয়েছিল?"

কিছুক্ষণ চা খাওয়ার পর হঠাৎ নিশীথ হাসিয়া বলিত, "যা রে চলে যাচ্ছ কেন? শোন শোন—ওগো শোন একটু—" এই বলিয়া কাহাকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইয়া বলিত, "এবার যাও দেখি। আমি ডাকলেই অমনি ছুট, কেন, আমায় ভাল লাগে না?"

ইহার পর আরও দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে, সরোজিনীর স্মৃতি বিন্দুমাত্র আর তাহার মনে নাই। তাহাকে লইয়া খেলার বিলাসিতা বা তাহার জন্য অবাক বেদনার বিন্দুমাত্র অনুভব হয় না। দূর অতীতে কেহ একজন ছিল বটে, কিন্তু যেন আর মনে পড়ে না। আলমারীর ভিতর সরোজিনীর ব্যবহৃত জামা-কাপড় ছিল, তাহা ক্রমশঃ কমিয়া

আসিতেছে। নানা কারণে অকারণে এটা ওটা চাকা হইয়াছে, কতকগুলি কিতাবী বা অন্য কেহ লইয়া গিয়াছে। একমাত্র দেওয়ালে বড় তৈলচিত্রখানি ঝুলিতেছে।

এক এক সময় ভাল লাগে না। বড়ই একা নিঃসঙ্গ মনে হয়। অনেক রাত্রে হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙিয়া যায়, বাহিরে আকাশ পরিষ্কার, উজ্জ্বল অজস্র নক্ষত্র আর একক চাঁদ কল্‌মল্‌ করিতে থাকে, জানালার ওপারে জোৎস্নার আলোয় বান ডাকে—দক্ষিণের মিঠা হাওয়া, ফুলের গন্ধ লইয়া ঝিরি ঝিরি বহিয়া যায়, তখন যেন মন কেমন হইয়া উঠে।

দু'টী কথা বলিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। এক-জনের হাতে হাত দিয়া, একজনের কাছে রহিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল প্রার্থনা করে।

কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলিবার উপায় নাই। সঙ্কোচ হয়, দুরন্ত লজ্জা আসিয়া সমস্ত পথ যেন রোধ করিয়া দাঁড়ায়।

অভিভাবক নাই—সুতরাং বিবাহের উদ্যোগ করিতে হইলে, সবই তাহাকে করিতে হইবে। কিন্তু তিন বৎসর পর, পুনরায় বিবাহের কথা তুলিতে তাহার বড়ই বাধ-বাধ লাগে। গ্রামশুদ্ধ লোক জানিয়া গিয়াছে, নিশীথ আর বিবাহ করিবে না। মেয়েরা যখন তখন স্বামীর সহিত ঝগড়া করিলেই বলে, "জানি, আমি মরে গেলে শান্তি পাও। আর একটা বিয়ে করতে ছুটবে। নিশাথবাবুর বন্ধু হয়েও, তাঁর একটু গুণ পেলে না।"

সে দিন সকাল বেলা হরেন আসিয়াছে।

হরেন বলিল, "কি দাদা মুখ শুকনো শুকনো যে?"

নিশীথ চেয়ারে ভাল হইয়া বসিয়া কহিল, "আর কেন বল। কে বা করে। রাত্রে যেমন জ্বর, তেমনি তেষ্টা। উঃ। বড় কষ্টেই কাল রাত গিয়েছে—"

হরেন কপালে হাত দিয়া কহিল, "বা এখন তো বেশ ঠাণ্ডা, জ্বর একেবারেই নেই। এক কাজ কর দিকি একটু কুইনাইন খেয়ে নাও।"

নিশীথ মুখ বিকৃতি করিয়া বলিল, "কি হবে কুইনিন খেয়ে, যা হয় হোক্ গে।"

হরেন নিজ হাতে এক গ্লাস জল, লইয়া কহিল, "না-না বড়ি একটা খাওয়া দরকার। তোমার কোন ভয় নেই। সতী স্ত্রীর পুণ্যে, সমস্ত বিপদ কেটে যাবে। তবুও একটা বড়ি খাওয়া দরকার। কই হাঁ কর দিকি, বাব্বা খেয়ে নাও।"

"কি বিপদ, না কুইনিন খাব না। বড় মাথা ধরে।" কিন্তু হরেন ছাড়িল না। অগত্যা নিশীথকে কুইনিন খাইতে হইল। মুখ বিকৃতি করিয়া কহিল, "আর ভাল লাগে না। কে বা দেখে, কে কি করে।" নিশাথ তাকাইয়া দেখিল, হরেনের চক্ষু অর্দ্ধ-নীমিলিত। স্পষ্ট করিয়া, ইচ্ছাটা প্রকাশ করিবে না কি?

একটু কাশিয়া নিশীথ কহিল, "বুঝলে হরেন, আর ভাল লাগে না, কে বা কি করে। অসুখে জলের গেলাসটা দেয়, এমন লোক নেই। মাথাটাই বা কে টিপে দেয়, ভাত জলই বা কে করে।"

হরেন নিস্তব্ধ। কথাটার অর্থ সে কি কিছু বুঝিতেছে না? একটু বলিলেই না হয়, দুই একবার অসম্মতি জানাইয়া বলিবে, "তা তোমরা যখন ধরেছ, তখন আর কি করি।" কিন্তু হরেন এ-বিষয়ের ধার ঘেঁসিয়াও গেল না।

হরেন বলিল, "কি আর করবে বল। সবই ভগবানের ইচ্ছা—নইলে অমন সতী লক্ষ্মী স্ত্রী অকালে স্বর্গে যান। কিন্তু নিশীথ এ-যুগে তুমি সত্যই আদর্শ পুরুষ। গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করেছ। তোমার বন্ধু বলে আমারও গর্ব্ব অনুভব করি।"

নিশীথ রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কেন?"

হরেন যেন আকাশ হইতে পড়িল, "কেন? তোমার আদর্শ চরিত্র—তোমার"—কথা শেষ না করিয়াই হরেন বাহির হইয়া গেল।

নিশীথ ভাবিতে লাগিল, অন্যত্র চলিয়া যাইয়া সেখানে বিবাহ সারিলে কেমন হয়? কিন্তু ফিরিয়া আসিতে হইবে তো। কিন্তু কেন? দেশ ছাড়িয়া কেনই বা সে যাইবে। কোন খারাপ কাজ তো করিতেছে না। লজ্জা—কিন্তু লজ্জাই বা কিসের? এ মিথ্যা লজ্জা লইয়া সমস্ত জীবন দুঃখ-ভারাক্রান্ত করিয়া কি ফল? লোকে কি বিবাহ করিতেছে না! স্ত্রীর মৃত্যুর চারি পাঁচ বৎসর পরও তো

অনেকে বিবাহ করিতেছে। লোকে কি ভাবিবে এ-কথা ভুল। লোকচক্ষুর নিকট আদর্শ স্বামী সাজিয়া থাকিলে, তাহার দুঃখ তো ঘুচিবে না। না বিবাহ সে করিবেই। লজ্জাই বা কি তাহার বা কিসের?

নিশীথ পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়া, আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুলগুলি ঠিক করিতে করিতে সিগারেট ধরাইল। আজ সকলের সম্মুখে বিবাহের কথা বলিবে। নিশীথ আর এক-বার আয়নায় নিজের চেহারা দেখিয়া, বাহির হইল। চাকরকে সম্মুখে দেখিয়া একটু ধমক দিয়া বলিল, "দিন দিন হচ্ছে কি? আজকাল কোন কাজেই যেন নজর নেই। সব পরিষ্কার চাই—বাগানটায় জঙ্গল সাফ্ করে ফেল্! এ-সব কে করবে? আমি না কি—অ্যাঁ—"

চাকর বহুদিনের। নিশীথের নিকট হইতে চড়া-গলার আদেশ কখনও শোনে নাই। সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

রাত্রের বৈঠকখানায় সকলে আসিয়া জমিয়াছে। নিশীথ ঢুকিতেই পঞ্চানন বলিল, "এই যে এস, তোমার কথাই হচ্ছিল।"

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া নিশীথ বলিল, "আমার কথা?"

"হাঁ তোমার কথাই। এই বিভূতি আবার বিয়ে করতে চায়, তাই বলেছিলাম, আবার ও-সব ঝঞ্ঝাট কেন? এই আমাদের নিশীথ রয়েছে তো।"

হরেন বলিল, "নিশীথের সঙ্গে তুলনা করো না।"

হরেনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া নিশীথ উত্তর দিল, "কেন বিয়ে করবে না? নিশ্চয়ই করবে।"

সকলে অবাক হইয়া গেল। পঞ্চানন বলিল, "বল কি? তুমি এ-কথা বলছ?"

"হাঁ, আমিই বলছি। বিয়ে কেন করবে না—সময় অসময়ে কে দেখা-শুনো করবে? তোমরা না পাড়ার লোক? অসুখ হ'লে জলের গেলাসটা কে দেবে? এ-ছাড়া সংসারী লোকের স্ত্রী ছাড়া চলে কি করে—বিভূতি আমি তোমায় অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

নরেশ রায় এতক্ষণ একমনে তামাক টানিতেছিল, বলিল, "বাবু খুব তামাসা করতে শিখেছ। কিন্তু সাতই ভাদ্দির যে কাছে এ'ল।"

নিশীথ যেন কিঞ্চিৎ অবাক্ হইয়া বলিল, "সাতই ভাদ্দির, কিসের সাতই ভাদ্দির?"

এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া নরেশ কহিল, "বা রে, তোমার এ'ল কি?" এতক্ষণে নিশীথের মনে হইল। সাতই শ্রাবণ, সরোজিনীর মৃত্যু-দিবস। এই দিনটীতে সে প্রতি বৎসর বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে, স্ত্রীর তৈল-চিত্র ভালভাবে সাজাইয়া সমস্ত দিন সরোজিনীর ধ্যানেই চিত্ত পূর্ণ রাখে। সেই সাতই শ্রাবণ আসিতে আর বিলম্ব নাই।

নিশীথ কোন কথা বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

সাতই শ্রাবণ আসিতে আর বিলম্ব নাই। মাত্র মাঝে একটি দিন। কিন্তু কিছুই জোগাড় হয় নাই। অন্যান্য বৎসর ঐ দিনটীর তিন চারি দিন পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, সাতই শ্রাবণ আসিতেছে।

সে-দিন সকালে উঠিয়াই নিশীথ ধরণী ঘোষালকে ডাকিয়া পাঠাইল। ঘোষালের সন্ধানে বহু পাত্র-পাত্রী আছে। নিশীথের পাত্রীরই প্রয়োজন। বাহিরের ঘরে ধরণী ঘোষাল আসিয়া দেখা দিল।

"ধরণী জিজ্ঞাসা করিল, আমায় আবার তোমার দরকারটা কি?"

নিশীথ হাসিতে চেয়ার দেখাইয়া বসিতে বলিল, "তোমার সন্ধানে ভাল মেয়ে আছে? মেয়ে বয়স্থা হলেই ভাল হয়। অতি সুন্দরী দরকার নেই—তবে কুশ্রী না হলেই হ'ল।"

"কিন্তু পাত্র কে?"

নিশীথ কি ভাবি ভাবিয়া বলিল, "আমার এক বন্ধু। কলকাতায় কাজ করে—বয়সও অল্প। মাইনে মন্দ পায় না—বহু জায়গায় মেয়ে দেখার পর, কোনটা তার পছন্দ হয় না। আমার ওপর এখন তার দিয়েছে। তা সন্ধানে আছে কি? বিয়ে এই মাসের মধ্যেই হওয়া চাই। টাকা পয়সার দাবী নেই।"

ধরণী ঘোষাল কথাটা চাপিয়া রাখিবার প্রয়োজন মনে করিল না। হরেন কথাটা শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিল না। হরেন নিশীথের সহিত দেখা করিতে আসিল।

নিশীথের ঘরে দুই জন অপরিচিত যুবক বসিয়া রহিয়াছে।

হরেন সোজাসুজি কহিল, "নিশীথ তুমি না কি বিয়ে করছ?" প্রশ্নটি করিয়া হরেন মুখখানি এমন করুণ করিয়া রহিল, দেখিলে মনে হয় এই মাত্র যেন তাহার মাতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে। চোখের দৃষ্টি ছলছল—কণ্ঠস্বরে শোকাচ্ছন্নতা।

নিশীথের কিছু বলিবার পূর্ব্বেই অপরিচিত যুবকদ্বয়ের মধ্যে এক জন বলিয়া উঠিল, "পাগল হয়েছেন। এ-সব কার কাছে শুনলেন? অর্ব্বাচীন পাষণ্ড সব।"

আর এক জন বলিল, "সে কোন্ পাষণ্ড। এতে ওঁকে যন্ত্রণাদায়ক অপমান করা হয়।"

হরেন যেন শক্তি ফিরিয়া পাইল, "তাই বলুন। আমি তো ভয়ে বাঁচি নে—"

নিশীথ নির্ব্বোধের মত চুপ করিয়া রহিল।

যুবকটি দাঁড়াইয়া বলিল, "তবে অনুগ্রহ করে যাবেন। আপনার আদর্শে, আপনার সাহায্যে আমাদের সেবাশ্রম গড়ে উঠবে। আপনার ত্যাগে, সংযমে, আমরা মানুষ হ'য়ে উঠব।" এই বলিয়া, ছোকরাটি এক কাণ্ড করিয়া বসিল। হঠাৎ নিশীথের দুই পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। নিশীথ ব্যস্ত হইয়া হাত ধরিবার পূর্ব্বেই প্রণাম করা শেষ হইয়া গিয়াছে।

ছেলেটি হাসিয়া কহিল, "এ আপনার অন্যায়, শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাতে দেবেন না। এ-কি কথা। আচ্ছা আসি।"

যুবক দুইটি চলিয়া যাইবামাত্র হরেন টেবিলের উপরে সজোরে ঘুষি মারিয়া কহিল, "নিশ্চয়ই তো। ওরা শ্রদ্ধা-ভক্তি কেন দেখাবে না। তুমি আদর্শ পুরুষ এই সংযমহীন দেশে। তোমার আদর্শ, তোমার ত্যাগ কম নয়। দেশ তোমার মুখের পানে চেয়ে রয়েছে, ছেলেরা তোমার দিকে চেয়ে আছে। তোমার সংযম, তোমার ত্যাগ, তোমার আদর্শ-চরিত্র সকলের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ।"

নিশীথ শুষ্কমুখে বসিয়া হরেনের কথা শুনিতে শুনিতে কেমন যেন হইয়া গেল।

পিসিমা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিশি লোকে কি বলেছে জানিস। ও-বেলা বামুনদিদি বললেন, নিশীথ না কি বিয়ে করবে। আমি শুনে হেসে বাঁচিনে। বললাম, 'হাঁ নিশি আবার বিয়ে করবে কখনও।' কিন্তু কার জন্যে মেয়ে দেখছিস?" নিশীথের এক খুড়তুতো ভাই ছিল নন্দ। কলিকাতায় কি যেন একটা চাকরী করে। এখনও বিবাহ করে নাই।

নিশীথ কহিল, "নন্দর জন্য। লোকে বলছে না কি, আমিই বিয়ে করব।"

পিসি বলিলেন, "তাই—আমি তো হেসে বাঁচিনে।"

পিসির কথা নিশীথের কেমন ভাল লাগিল না। নিজের ঘরে আসিয়া টেবিলের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া, নিশীথ চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ সরোজিনীর ছবিখানির দিকে চাহিয়া অলিয়া উঠিল। লাফ দিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া, সবলে চেয়ারে টানিয়া, অয়েলপেন্টিংখানি নামাইয়া ফেলিল। নামাইয়া একখানি কাপড়ে ঢাকিয়া একপাশে রাখিয়া দিল।

নিশীথ পুনরায় চেয়ারে আসিয়া বসিল। বিবাহ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সে বুঝিতে পারিতেছে, এ তাহার পক্ষে মস্ত দুর্ব্বলতা, এ তার মিথ্যা লজ্জা। তবুও এ দুর্ব্বলতা এ—মিথ্যা লজ্জা—মিথ্যা মোহকে ভাঙিয়া, তাহার সত্যরূপ লোকচক্ষুর নিকট তুলিয়া ধরিবার কোন শক্তিই সে পাইল না। তাহাকে ডুবিতে হইবে, অসহায় অবস্থায় মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও, যে ব্যক্তি ডুবিতে থাকে, ঠিক সেইরূপ ভাবেই তাহাকে ডুবিতে হইবে।

বিবাহের সময় আসন্ন। নন্দ ছুটি লইয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। যজ্ঞের মত সকল উদ্যোগ আয়োজন নিশীথকেই করিতে হইতেছে। কথা যখন দিয়াছে, এ-বিবাহ বন্ধ করা যায় না। নিশীথ নির্জ্জনে শুধু নিশ্বাস ফেলিল।

পিসিমা বলিলেন, "তোর মুখ শুকনো শুকনো কেন রে?"

নিশীথ কোন উত্তর দিল না।

আজ পনেরই শ্রাবণ। বিবাহ-বাড়ীতে নানা কাজের, নানা লোকের ভীড়। পাল্কী ঠিক করা, বরযাত্রীরা কে যাইবে—বাজী-বাজনা, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সবই তাহাকে করিতে হইতেছে। নন্দর দাদার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার সীমা নাই।

সন্ধ্যা হইতেই আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া গেল। বন্ধু-বান্ধবেরা গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছে। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনির মধ্যে সাজ-সজ্জা করিয়া নন্দ পাল্কীতে উঠিয়াছে। নিশীথ আসিয়া বলিল, "ভাই, শরীরটা বেশ ভাল ঠেকছে না। আমার যাওয়া সম্ভব নয়।"

"বল কি? তাও কি হয়, কিন্তু হঠাৎ অসুখ—মুশ্‌কিলে ফেললে হে"—মাথার চুলের ভিতর আঙুল চালাইতে চালাইতে, নিশীথ বলিল, "পেটে হঠাৎ বেদনা উঠেছে, টাকা কড়ি নাও, যা করবার সব করো। দেখো যেন কোন গোলমাল না হয়।" নিশীথ দ্রুত উপরে উঠিয়া যাইল। অগত্যা একটু ক্ষুণ্ণ মনে, সকলে যাত্রা করিল। বরের পাল্কী, বরযাত্রীদের গাড়ী ক্রমশঃ দৃষ্টি-পথের বাহিরে চলিয়া গেল। সেই দিকে চাহিয়া, নিশীথ জানালার গরাদে ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

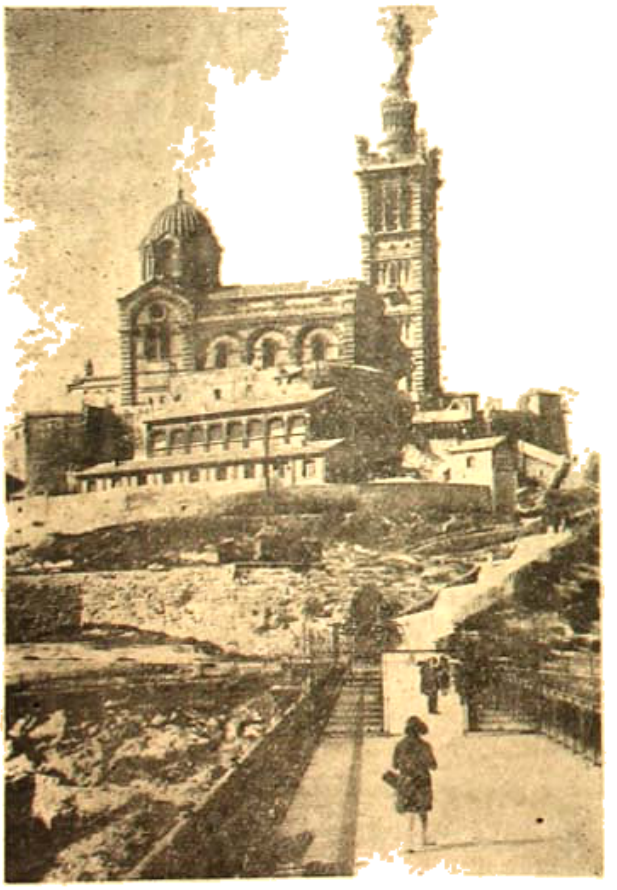

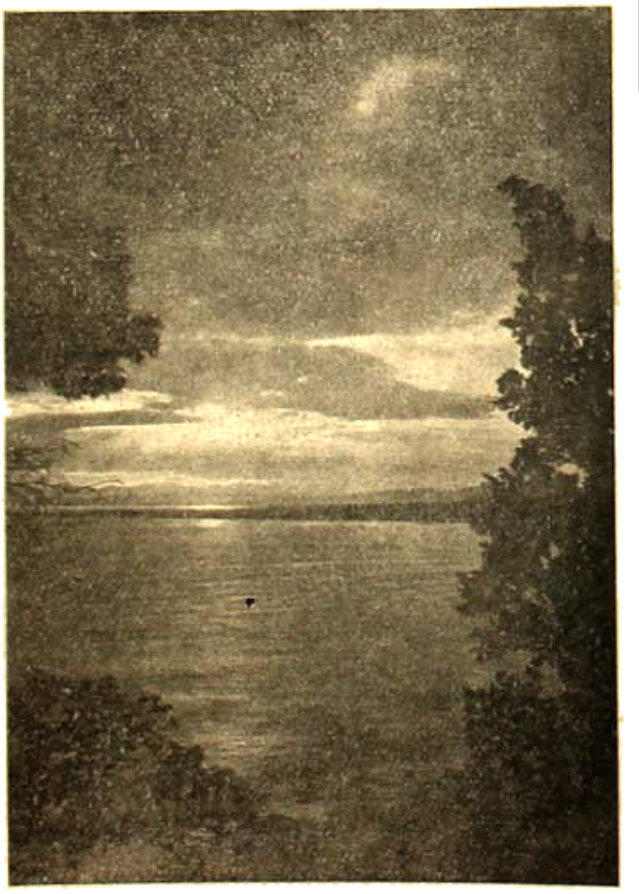

# দক্ষিণ ফ্রান্সে কয়েকদিন

—শ্রীচিন্তামণি কর

প্রাতরুত্থান কথাটা ইউরোপে এসে ভুললেও কাল রাত্রে কথাটা বার বার মনে করে শুতে হয়েছে। শীতের প্রভাত যেন উৎ পেতে বসে আছে, কেউ লেপের বাইরে এলেই তার চোখে মুখে, শরীরে ঠাণ্ডা ফুঁ দিয়ে অসাড় করে দেবে। সাতটায় এক প্রিয় বন্ধুকে বিদায় দিতে যেতে হবে—"গার্ দ্যু নর"-এতে। পাঁচ মাসের আলাপ, মনে হয় পাঁচ যুগের সংযোগ। বিদেশে কেউ মনের মানুষ হলে এমনি হয়ে থাকে। হঠাৎ প্রীতি এত গভীর হয়ে পড়ে যে, পুরানো না হলেও আলাপের প্রথম দিন এবং ঘটনা পর্যন্ত ভুলে যাই।

রাস্তায়, বাড়ির জানালার ওপর, নীচের আলসেয়, ছাদের কার্নিসে রাত্রের পড়া তুষারের সাদা স্তূপ হয়ে আছে। একটু কুয়াশাও ছিল, তবে লণ্ডনের মত তমাট কালো নয়। গত রাত্রের চাঁদের আলো সারা রাত জেগে পাণ্ডুর হয়ে পথের ওপর পড়ে যেন ঝিমোচ্ছে।

ষ্টেশনে পৌঁছাতে বন্ধু একগাল হেসে বললেন, "তবু ভাল যে এসেছ। এই শীতে সকালে সুখ-শয্যা ছেড়ে যে তুমি আসবে, তাহতেই পারি নি।"

ঠিক বিদায়ের আগে মামুলী কথাবার্তায় বর্ষণে বিচ্ছেদের ব্যথাকে চাকবার চেষ্টা চলছিল। কিন্তু অভিনয়কে বেশী দীর্ঘ করতে হল না। ট্রেন ছাড়ল বলে। বন্ধু সচাপ করমর্দন করে বল্লেন, "খবরদার কর চুম্বন করতে পারবে না। তোমার সঙ্গে আর হয় তো কোন দিন দেখা হবে না। কিন্তু যে ক'মাস আমরা পরস্পরের সাহচর্য্য পেয়েছি, তার আনন্দময় মুহূর্তগুলি স্মৃতির খাতায় জমা রইল, তাকে বাসী দিয়ে ভেজে-চুরে মুছে দিও না। আচ্ছা বিদায়।"

আজ আর ষ্টুডিওতে যাবার ইচ্ছে নেই। মন থেকে হঠাৎ সব চিন্তা যেন গুলিয়ে ছড়িয়ে গেছে। আজ আগ্রহ স্পৃহা কেবল আত্মিমানিক শব্দ মাত্র। দরজায় মৃদু করাঘাত হঠাৎ অবচেতন ভাবকে ভেঙ্গে দিল। নিতান্ত নিস্পৃহ ভাবে বল্লাম, "আঁত্রে" (প্রবেশ করুন)।

"কেমন আছেন," বলেই দেব মশাই ঢুকে পড়লেন। এত সকালে দেব আগমনে বুঝলাম সংবাদ আছে। বললেন, "মশায় দক্ষিণ ফ্রান্সে চলুন, ভূমধ্যসাগরের তীরে সোণালী রোদ আর মলয় বাতাস শরীরটাকে চাঙ্গা করে তুলবে।"

অতি উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু মালপত্রের খাতায় অঙ্কের পরিমাণে শাঁস ওদি ঝরে শীর্ণ হাড় কয়টী পেটে ধর্ষণট চালাবার ষড়্‌যন্ত্র শুরু করেছে। এ-অবস্থায় যাওয়া কি সমীচীন। কিন্তু দেবের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এবং ফরাসী রিভিয়েরার বহুশ্রুত সৌন্দর্য্য শেষ পর্য্যন্ত আমায় উদ্যোগী করে তুললে।

দেব মশাই ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিত। ফরাসী আল্‌প্‌স মারিতিম-এর প্রত্যেকটী বালুকণা ও প্রস্তরখণ্ড তাঁকে চেনে। পাহাড়ের অনেক স্থানই তাঁর সকণ্টক বুট ও হাতুড়ীর ঘায় আর্ত্তনাদ করেছে। তাদের বুকের ক্ষত আজও মিলায় নি। কিন্তু তারা এ-বার প্রতিশোধ নেবে। এরই পার থেকে দেব এক প্রিয়জনের বিদায়সম্ভাষণ করতে চলেছেন। ভাবলাম বন্ধু-বিদায়ের 'এপিডেমিক' শুরু হল না কি! আমাদের যাবার অবশ্য আর একটী বড় কারণ ছিল। একজন বাঙ্গালী ছাত্র হুরু রোগাক্রান্ত হয়ে কানের এক নার্সিং হোমে পড়ে আছে। তার মেরুদণ্ডে ক্ষয় রোগ বাসা বেঁধেছে। তার শেষ ইচ্ছা যদি তাকে দেশে পাঠান সম্ভব হয় তো তার ব্যবস্থা করা।

রাত সাড়ে আটটা হবে। ষ্টেশনে শীত করছিল। দু'টী কম্বল ও বালিশ ভাড়া নিয়ে আমরা তৃতীয় শ্রেণীর একটী কামরা দখল করে বসলাম। জানলার ধারে মুখোমুখী আসন দু'টীতে রিসার্ভড্ কার্ড ঝুলছিল। দেব বললেন, "দেখুন আবার কোন অকথ্য লোক হয় তো ঐ আসনের মালিক।"

একটু ঠাট্টা করে বললাম, "অত হতাশ হবেন না, আমি দিব্যচক্ষে দেখছি আপনার পাশের আসনে একটী অবিবাহযৌবনা এবং আমার পাশের আসনে একটী উদ্ভিন্ন-

যৌবনার শুভাগমন হবে।" রসিকতা দেখি সত্যে পরিণত হল। কাশতে কাশতে বছর ত্রিশের একটি ফরাসী মেয়ে বেঞ্চের পাশের আসনে এসে বসলেন। গাড়ী ছাড়বার কয়েক মুহূর্ত আগে একটি অল্পবয়স্কা মেয়ে ব্যস্তসমস্ত ভাবে, গাড়ীতে উঠে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে "আউফ ভিয়ার-জেয়েন" চীৎকারে বিদায়-সম্ভাষণ শুরু করে দিলে।

গাড়ী ছাড়তে তার গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে ফরাসী মহিলাটীর কাশির বেগও বেড়ে চল্ল। আধছায়া আলো হলেও বেশ দেখা যাচ্ছিল বিপরীত কোণে বেঞ্চের কুহুর-কুণ্ডলী হয়ে ছোঁয়াচ বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা। একবার বল্লেন, "টি. বি.-র রুগী নয় তো!" আর্য্যান মেয়েটী হঠাৎ উঠে নিজের কতকগুলি কাপড় ভাঁজ করে অতিশয় আদরে ও সন্তর্পণে ফরাসী মহিলাটীর মাথায় তলায় দিয়ে কি সব বকতে লাগল। ভাবলাম তারা বুঝি বন্ধু। কিন্তু পরে বোঝা গেল তারা কেউ কাউকে চেনে না, বা পরস্পরের ভাষাও বোঝে না। বেশ লাগল তার বিদেশী প্রীতিটুকু।

রেফ্রিজেটার কামরাটাকে বড় গরম করে তুলেছে। দেব এবং আমি বার্লিন ছ'টো ওদের দান করে জড়ো করা কম্বলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছি। আর্য্যান মেয়েটা রাক্ষস না কি! সমস্তক্ষণ খেয়েই চলেছে। কি খেয়াল হল আমাদের দিকে একটী লেবু ধরে বললে "নাও।" দেব সেটী ধন্যবাদ সহকারে প্রত্যাখ্যান করতে চাইলে, সে সেটী জোর করে আমাদের গছিয়ে খুব হেসে উঠল, যেন কি একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। ভোরের দিকে দেব মশায় তার সঙ্গে ভাঙ্গা আর্য্যানে বেশ আলাপ জমিয়ে তুললেন। আমাকে অবশ্য মাঝে মাঝে তর্জ্জমা করে দিচ্ছিলেন। মেয়েটী বিতাড়িত আর্য্যান ইহুদী, নাম সেসিলিয়া, বাড়ী ফিরেনায়। সে এবং তার ভাই হিট্লারের চরদের চোখে ধুলো দিয়ে অতি কষ্টে পালিয়ে এসেছে। ফরাসী মেয়েটীর সঙ্গে আলাপে জানা গেল সে নর্ত্তকী ও গায়িকা, কানের কোন উৎসব-মন্দিরের আহ্বানে চলেছে। তার কাশি বন্ধ হয়েছে দেখে একটু গানের ফরমাশ করা গেল। মার্সাইতে ফিরবার পথে দেখা করবার, বিশেষ অনুরোধ করে সেসিলিয়া নেমে গেল।

এতক্ষণ বাইরে লক্ষ্য করি নি। দক্ষিণ ফ্রান্সের মাটীতে আমরা এসে গেছি। লাল পাহাড়ের গায় ঘন সবুজ বনানীর ওপর সোণালী মিমোসা ফুলের ছোঁয়ায় মনে হচ্ছিল যেন মুক্ত-প্রাঙ্গনে কয়েকটী কার্পেট সাজান রয়েছে। যে দিকেই তাকাই অফুরন্ত ফুল-ফোটা চোখের চাহনীতে ইসারা করছে, "এস বসবে?" মাঝে মাঝে বেশ বিস্তৃত শ্বেত-শুভ্র চেরী ফুলের রাশি, জমা তুষারের একটী বড় বরফির মত দেখাচ্ছিল। ঈষদুষ্ণ বাতাস পারীর শীতে জমা হাড়গুলিকে একটু সজীব সচল করে তুললে। নানা রকমের প্রস্তরস্তূপের বিচিত্র লীলাভঙ্গ দেখে দেবকে দু-' একটা প্রশ্ন করতেই তিনি আমায় চমৎকার করে বলতে লাগলেন, পৃথিবী কেমন তার শরীরের এক স্থানে মেদ-চর্ব্বি-বহুল ভুল করে তোলে, আবার খেয়াল হলে সেখানেই মাংস সরিয়ে লোলচর্ম্ম হাড় বের করে, কখনও বা লাভা যখন করে রুক্ষ বেজাজে তুর দেখায়।

আমরা কান্-এ এসে গেছি। যার জন্য এতদূর আসা তিনি আমাদের দেখেই প্ল্যাটফরমে হাতনাড়া শুরু করে দিলেন। জিনিষপত্র ক্লোক-রুমে জমা রেখে কাকেতে সামান্য জলযোগ সেরেই আমরা তাড়াতাড়ি নার্সিং হোমে রওনা হ'লাম, কারণ শুনলাম কুহুর অবস্থা খারাপ। নার্সিং হোমের সাদা দেওয়াল, দরজা, পর্দ্দা সবই যেন হিরোগাস্ত যবনিকা। সব এত চুপচাপ যে সুস্থ মানুষকে কণকালের মধ্যে অসুস্থ করে তোলে। হোমের কর্ত্রীর সঙ্গে লিফ্‌টে চার তলায় উঠলে তিনি নীরবে কুহুর কামরাটী সঙ্কেতে দেখালেন। একটী লোহার খাটে কুহুর সমস্ত শরীর 'মমি'র মত প্লাসটার ও ব্যাণ্ডেজে বাঁধা। মুখটার একাংশ পক্ষাঘাতে বেঁকে গেছে, মাথার ব্যাণ্ডেজের সঙ্গে বাঁধা একটী প্রকাণ্ড ওজন খাটের পাশে ঝুলান। মনে হচ্ছিল বাস্তি-র কারা-নরকে নির্ম্মম সাজার দৃশ্য।

আমাদের দেখেই কুহু কেঁদে উঠল, "বাঁচাও ভাই, আমাকে বাঁচাও। তোমাদের কাছে আমার শেষ ভিক্ষে আমায় বাঁচাও। এখানকার নিস্তব্ধতা নিঃসঙ্গতা আমায় পাগল করে তুলেছে। দুরন্তসাগরের অবিরাম ফোঁসফোঁসানি শুনে আমার মনে হয় চার পাশে কারা যেন বুকফাটা নিঃশ্বাস ফেলে আমার শেষ নিঃশ্বাসের অপেক্ষা করছে। আমি এ সহ্য করতে পারি না, ভয় করছে। নিয়ে যাও আমায় ভাই এখান থেকে

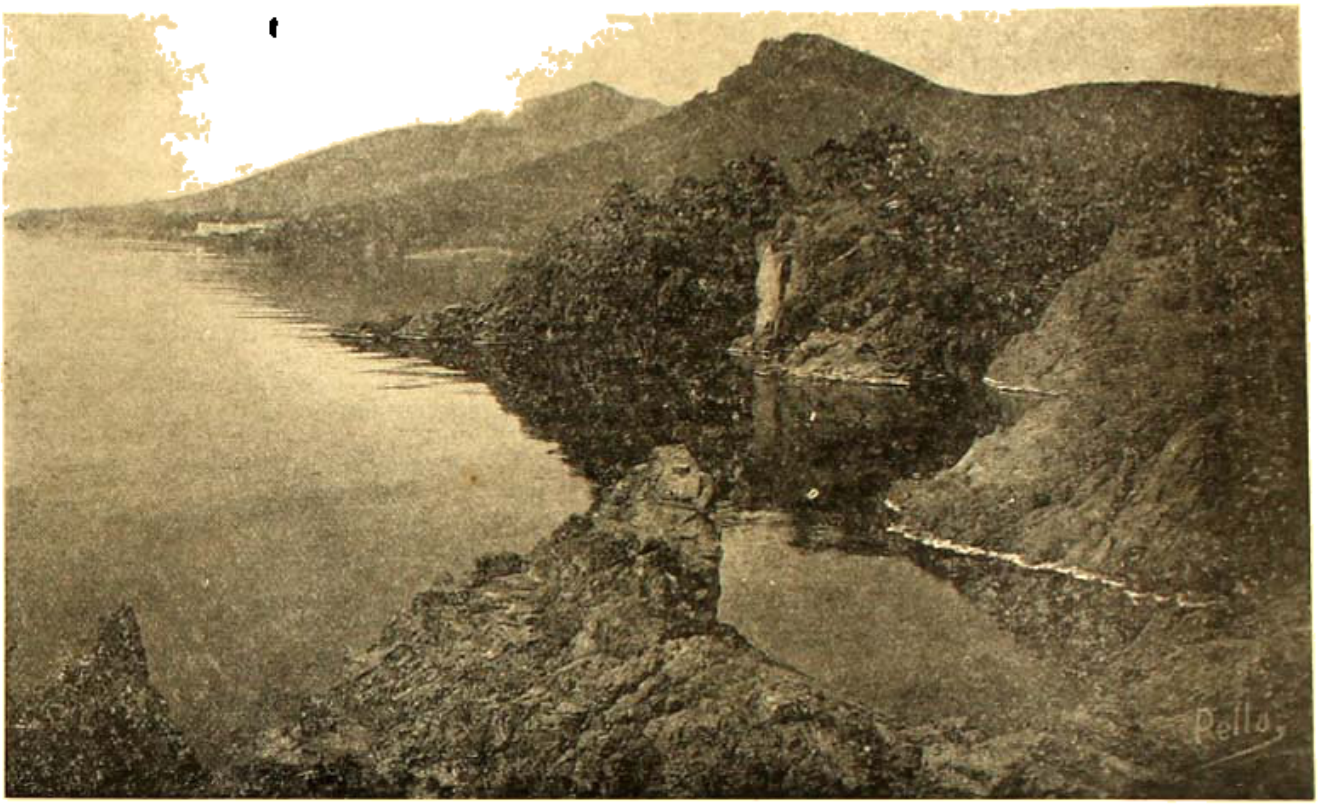


দুইখানাকের হ্রদে জিনগোলা

এলপ্ মারিতিম

সরিয়ে, আমি দেশের মাটীতে মরতে চাই। দেশে না হলেও, পারীতে অন্ততঃ তোমাদের সামনে মরব।" তার দু'চোখের ধারা আর বাঁধ মানছিল না। বাঁচবার জন্য মুমূর্ষুর কি আকাঙ্ক্ষা! এই কুতুই কয়েকমাস আগে বলেছিল, "অভাগা দেশে আর ফিরব না। যদি মরি তো' এই দেশেই মরব।" - হায়! বেচারী তখন কি জানত যে সত্যিই তার দেহ ফ্রান্সের মাটীকে শেষ আশ্রয় করবে। শেষ কুতুকে কতকগুলি অক্ষম প্রবোধ, প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেম, "আমরা কাল নিস্-এ যাচ্ছি, সেখানে আপনাকে অবিলম্বে দেশে পাঠানর ব্যবস্থা করে জানাব।"

নিস্-এ রাত্রে পৌঁছে পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ভীষণ খিদেও পেয়েছে। যেমন করে নিস্‌কে অভিনন্দন জানাব মনে মনে কবিত্ব করে রেখেছিলাম, তা কোথায় হারিয়ে গেল। বসন্তোৎসবের যাত্রীরা নিস্ ভরিয়ে ফেলেছে, কোথাও স্থান পাই না। অনেক ঘুরে শেষে দুই হোটেলে তিন জনের মাথা বাঁচোবার স্থান জুটল।

সকাল হয়েছে। এক টুকরো ঝরঝরে নীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাসের দু'একটী হিল্লোল, আর সোণালী রোদের একফালি জানলার পর্দার পাশ থেকে হাতছানি দিয়ে বল, "সুপ্রভাত।" রাস্তায় বেরিয়ে দেখি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নগরীটিতে আজ উৎসব-সজ্জার ধুম পড়ে গেছে। বড়, সোজা বুলভার্ডগুলিতে ব্যতিব্যস্ত যানবাহনের ভিড় নেই। যানবাহন, পথচারী সবই কোন শোভাযাত্রার শেষাংশটীর শেষ ফুলের মত সাথ বেঁধে ধীরে ধীরে চলেছে। বসন্ত-আবাহন উৎসবের সৌরচন্দ্রিকায় বর্ষিত কুসুমদল রাস্তার ঘাটে সর্ব্বত্র পড়েছিল। রাস্তার মাঝে মাঝে আলোর মালায় সাজান তোরণ। সেগুলিকে আলোক-উৎসবের রাত্রিতে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।

পরের দিন সকালে 'বাতাই দ্য ফ্লের' (পুষ্পরণ) উৎসব সুরু হল। প্রচুর ফুলে নানা ভাবে সাজান গাড়িগুলিতে সুন্দরী তরুণীরা, রাস্তার দু'পাশে ভিড় করা পুরুষদের, ফুলের তোড়ার ঘায় জর্জ্জরিত করে চলছিল, আর পুরুষরাও তাদের ফুলের ডালি তরুণীদের গায়ে উজাড় করে দিতে কসুর করছিল না।

আর একদিন বড় বড় মুখোস পরে সং-এর শোভাযাত্রা হল। ফ্রান্সে বহু প্রাচীন উৎসবগুলিও আজ সভ্যতার প্রগতি ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির চাপে কবে যায়নি। জাতটা যে খেয়ালী, কলারসিক তার প্রমাণ পাওয়া যায়—প্রাণচালা নাচে, গানে, হাসিতে, কথায়, বেশভূষায়। ভূমধ্যসাগরের বেলাভূমির প্রায় উপরেই উঁচু বাঁধান রাস্তাটী বড় চমৎকার। অনেকে বেলায় রৌদ্রস্নান করছে। আমরা টমাস্ কুকের অফিসে গিয়ে কুতুকে দেশে পাঠান সম্বন্ধে অনুসন্ধান নিয়ে শহরটার ধারে একটী পাহাড়ে উঠলাম। তাদের ঘরের মত বৃক্ষমান বাড়ীর ছাদগুলি রোদে ঝলমল করছিল। দূরে আলপস্‌এর তুষারাবৃত চূড়া দেখা গেল। নামবার সময় দেখলাম একটী ছেলে তার ছবি ঠিক করছিল, তার নিকটে ধীবর-পত্নী তার ছেলে এবং মেয়েটীকে আদর করছিল। বেশ লাগল এ দৃশ্যটী। তাদের অজ্ঞাতে একটী ছবি তুলে নেওয়া গেল।

পরদিন বিকেলে পারাবাহে মন্তেকার্লো শহরে গেলাম। শহরটীর যত প্রশংসাই থাক, ধনীর অর্থ-গরিমা উচ্ছৃঙ্খলের তুচ্ছ সমাবেশ ছাড়া আর কিছুই উল্লেখ করবার নেই। চমৎকার কেয়ারী-করা ফুলের বাগান, ফরাসিনীর চোখে সুর্মা, গালে, ঠোঁটে রঙ্ মাখিয়ে বেশী সুন্দরী হবার মত, কৃত্রিম শোভার কাষ্ঠ-হাসিতে মন তোলাতে পারে নি। শহরটীর আকর্ষণ সৌন্দর্য্যের নয়—জুয়ার আড্ডার।

দেব বন্ধু-বিদায় পর্ব্ব শেষ করে একটু মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। দক্ষিণ ফ্রান্সের সৌন্দর্য্য তাঁর বিচ্ছেদ-ব্যথাকে তোলাতে পারছে না দেখে ঠিক করলাম নিস্-এর কাছে বিদায় নেব।

আবার কান্-এ এসেছি। বসন্তকে নিয়ে এখানেও মাতামাতি পড়ে গেছে। মিমোসা সুন্দরীকে আজ অভিনন্দিত করা হবে। বাড়ীর প্রবেশ পথে, রাস্তার তোরণে রাশি রাশি মিমোসা পুষ্পস্তবক মৃদু বাতাসে দোল খাচ্ছে। একটী তরুণীকে মিমোসা ফুলের সাজে সাজিয়ে শোভাযাত্রা বেরবে। কুতুর ভাবনা-পীড়িত মনে আমরা কতুরাজকে পূজার অক্ষমতা জানিয়ে বললাম, "অরভোয়ার।"

আর দেরী নয়, সময় অতি অল্প। এর মধ্যে আমাদের একবার গ্রাস্-এর কাছে গাল্‌কোতার যেতে হবে। আমার ভেঙ্গলে থেকে মঁসিয় রোমঁ। রাল্‌। চিঠিতে যে-সকল শিল্পীর

ঠিকানা দিয়ে দেখা করতে বলেছিলেন, বালকোভার মাদাম ঔাঁদ্রে কার্পেলেস্ তাঁদের একজন। ইনি কিছুকাল ভারতে ছিলেন। বাস-এ করে দেব ও আমি হওনা হলাম।

পুষ্পিত বৃক্ষ-লতা গুল্মগুলি যেন চারিদিকের পর্ব্বত তরঙ্গের উপর ভাসমান শুক্তি, শঙ্খ, প্রবালের মেলা। মহাকবির বর্ণিত—

> পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ স্ফুরৎ-প্রবালোষ্ঠ-মনোহরাভ্যঃ।
> লতাবধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপুর্বিনম্রশাখাভুজবন্ধনানি।

এক বাস্তবে এমন করে মূর্ত্ত কোনদিন দেখি নি।

একটী স্থানে দেবের নির্দ্দেশানুসারে বাস থেকে নেমে দাঁড়ান গেল। একটু পরেই স্বামীসহ মাদাম কার্পেলেস হাজির হলেন। তাঁদের গাড়ীতে আর কয়েক কিলোমিটার যেতে হল। হ্যাঁ, কবি-শিল্পীর খেয়াল বটে! আলপস্ মারিতিমের পাওব-বর্জ্জিত বেওয়ারিশ জমির উপর তাঁদের নিরাভিমানী কুটীরটি। মাদামের স্বামী সুইডেন-বাসী এবং পণ্ডিত লোক। দু'জনে বই লেখেন, খেয়াল হলে মাদাম আঁকেন ছবি, তখন তাঁর স্বামীর কাজ সেটি কেমন হচ্ছে দেখা ও তারিফ করা।

চায়ের টেবিলে মাদাম বললেন, "কর তোমাদের 'লিবারেশনের' খবর কি?"

বললাম, "খবর মন্দ নয়। নব্য বঙ্গীয় শিল্পীকুল খেয়ার খেলায় এবং ভাবের গভীর উন্মাদনায় মেতে গেছেন। আপনাদের 'ইভনে'র অপরিচ্ছন্ন ফিটেফাটা তার উপর সোণায় কাটি ছুঁইয়ে কয়েকটি শিল্পীর মধ্যে যে-রসের সৃষ্টি করেছে তা প্রায় নেনিলিসের পাত্র ভরে দেবার মত। তবে আশা, এই নিয়েই শিল্পীরা চুপ করে বসে থাকবে না, তার প্রমাণও কিছু পাওয়া গেছে।"

অবনীন্দ্রনাথের দু'একটি শিল্পবিষয়ক বই মাদাম ফরাসীতে অনুবাদ করেছেন। বললাম, "অবনীন্দ্রনাথের বই পুরা-তাত্ত্বিককে আনন্দ দেবে, পুরাতনের পুনরাবৃত্তিতে শিল্পীদের সাহায্য করবে, কিন্তু ভবিষ্য শিল্পী, যারা নতুন কথায় শিল্পের নব ব্যাখ্যা করবে, তাদের তাঁর বই শিল্প-মন্দিরের একটি ধাপেও উঠিয়ে দিতে সক্ষম হবে না। তবে ইতিহাস হিসেবে এগুলিকে আমি অসম্মান করছি না।"

এবার ফিরতি পথে। মার্সাইতে নেমে নেনিলিসের খোঁজ পাওয়া গেল। তার ভাই ও মাঁসির পোলাক বলে আর একটি অষ্ট্রীয়ান ইহুদী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। মঃ পোলাক খানিক পিয়ানো বাজিয়ে আমাদের শোনালেন। তিনি ইউরোপের সেরা সঙ্গীতের দেশের লোক, তার পরিচয় প্রত্যেক সঙ্গীত সুর-তরঙ্গে ফুটে উঠেছিল। কিন্তু সুরের মূর্চ্ছনায় বিভাড়িতের বেদনাও ছিল প্রচুর। সন্ধ্যায় মার্সাই-এর বিখ্যাত গীর্জ্জা—নোতর্ দাম দ লা গার্দ্-এর উচ্চ অবস্থানটিতে সকলে মিলে বেড়ান গেল। আবার বিদায়।

সেই পুরাতন পারী। দু'দিনের জমা গায়ের উত্তাপ শীতের ফুৎকারে আবার নিতে গেল। নৈমিত্তিক কাজের ফাঁকে কাজের কোলে বসে কাফি ও সময়ের সদ্ব্যবহারে ক'দিনের ঘটনাগুলি অতীতে স্মৃতির অস্পষ্ট রেখায় মিলিয়ে গেল।

মাঝে সেনিলিয়ার দু'টী বান্ধবী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। অনেক কথার পর তারা বললে, "মাঁসির কয়, আপনার খেলা দেখাচ্ছেন কবে?" মানে? আমি ত হতবাক্! বললে, "কেন, আপনার ট্রাপিজের খেলা? আপনি ত সার্কাসের আর্টিষ্ট।" ওঃ এতক্ষণে বোঝা গেল, দেব মশাই-এর জাপানী আলাপের সেনিলিয়া টীকা করেছে চমৎকার। আমি কোন্ শ্রেণীর শিল্পী বলার পর, ট্রাপিজের খেলা না দেখতে পেয়ে তারা বড় মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

কাফেতে বসে আছি, গল্প জমেছে বেশ। ক্লান্ত অবসন্ন পা ফেলে শ্রথ শরীরে দেব প্রবেশ করলেন। তাঁর প্রথম কথা, "শুনেছেন কুতু মারা গেছে।" সব গোলমাল ঐ-কটী কথায় চুপ হয়ে গেল। দেব বল্লেন, "তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারী অন্যায় মশায় হিন্দুর ছেলেকে সেথে কবর দিলে।" বল্লাম, "মরার পর পোড়ানো আর কবরে কি এসে যায় মশাই।" আর কোন কথা হল না। কিন্তু আমার কাণে তখন প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল তার শেষ কথা কয়টি, "বাঁচাও ভাই আমাকে বাঁচাও, তোমাদের কাছে আমার শেষ ভিক্ষা···আমি দেশের মাটিতে মরতে চাই।"

কবরে শুয়ে সাগরের কৌসকোসানির ভীতি থেকে কুতু পরিত্রাণ পেয়েছে কি না কে জানে।

বিয়ের কনে

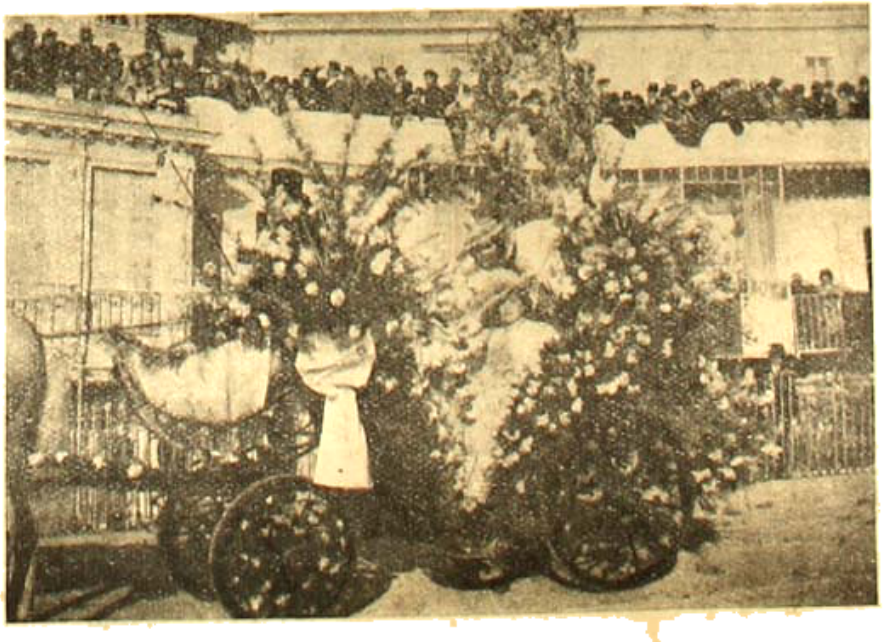

ফুলের উৎসব

# মধু-বসন্ত

—শ্রীমন্মথনাথ বিদ্যাভূষণ

১২

বিচারের আর একদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। হারাণ কলিকাতা আর ঘর করিতেছে। বিমলা ও গোপালের যাহাতে কোন কষ্ট না হয়, কমলা, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। শত্রুর হস্তে কন্যার আত্মসমর্পণ বিনোদিনীর বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। শেষে কন্যার সহিত কলহ করিয়া কয়েকদিন হইল ঠানদিদির গৃহে গিয়া অবস্থান করিতেছে। সেখানে আহারাদির বিশেষ সুবিধা না হইলেও গল্প-গুজবের এবং মোড়লবাড়ীর মাথাগুড়ানর ব্যবস্থার বিশেষ সুবিধা থাকায় মনমরা হইয়া একরকম করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যে-দিন বিনোদিনী কন্যাকে দেখিতে আসে, সে-দিন কন্যার কোনরূপ অভ্যর্থনা না দেখিয়া, গোপালের তাহার 'জ্যাঠামা'র নিকটে থাকা দেখিয়া হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া যাইত। কেবল স্নেহ করিয়া কথা কহিত আর আসিবার সময় দুরন্ত কলহ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিত, "আর তোর কাছে আসি তো আমার নাম নেই।"

কন্যা মাতার আগমন চাহিত না; কিন্তু মাতার যায় আসিব না বলিলেও মাতা না আসিয়া থাকিতে পারিত না। দু'কথা মাঝে মাঝে না শুনাইয়া দিলে তাহার ভাত হজম হইত না।

জামিনে পরাণকে খালাস করিবার যথেষ্ট চেষ্টা হারাণ করিয়াছিল। কিন্তু কলিকাতা তাহার পক্ষে বিদেশ, সেখানে অত টাকার জামিন হইবার মত লোক তাহার জানা ছিল না। ব্যবসার খাতিরে পূর্ব্বে যাহাদিগের সহিত তাহার জানা-শুনা ছিল, তাহাদিগের কেহ কেহ জামিন হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু কেহ হইল না। অগত্যা হারাণকে বিচারের দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইল। কিন্তু কি করিয়া ভ্রাতাকে উদ্ধার করিবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কলিকাতায় হাইকোর্টে মোকর্দ্দমা। বড় এটর্ণি এবং বড় ব্যারিষ্টারও সে নিযুক্ত করিয়াছে। দেখা যাউক ফল কি হয়। তাঁহারা তো তাহাকে যথেষ্ট ভরসা দিয়াছেন। কিন্তু তাহার জানা আছে ব্যারিষ্টার, উকিল জাতীয় লোকের ভরসার সহিত হার-জিতের কোন সম্পর্ক সাধারণতঃ থাকে না। যতক্ষণ না বিচার হইয়া ফল বাহির হয়, ততক্ষণ তাহার আর কি করিবার আছে তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না। তবে ব্যারিষ্টার মনোমোহনবাবু বড় ভদ্রলোক। তিনি বলিয়াছেন যে, একজন এমন সাক্ষী দরকার, যে অন্ততঃ বলিবে যে, বিশু জাল হাণ্ড-নোট দেখাইতেছে। কিন্তু সে-রকম লোক হারাণ কোথাও খুঁজিয়া পাইল না। ভগবানের উপর সকল নির্ভর করিয়া হারাণ নির্দ্দিষ্ট দিনের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

পরদিন বিচারের জন্য দুই পক্ষ আদালতে উপস্থিত। বিশু তাহার উকিলের সহিত পরামর্শ করিতেছে, হাসিতেছে ও মাঝে মাঝে মুখ গম্ভীর করিয়া কি বলিতেছে। কাঠ-গড়ায় পরাণকে যাইতে হয় নাই। পঞ্চাশ হাজার টাকা যে-ব্যক্তি ঋণ করে, সে তো সাধারণ অধমর্ণের মত নহে, সুতরাং তাহাকে একটু ভদ্র পরিচ্ছদে এবং ভদ্র আসনে স্থান দেওয়া হইয়াছে। হারাণ যে ব্যারিষ্টার মনোমোহন-বাবুকে নিযুক্ত করিয়াছিল তাঁহার সহিত পরাণের পরিচয় করাইয়া দিল। মনোমোহনবাবু পরাণের নিকট অনেক কথা জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জানিতে পারিলেন যে, দীনেশ বলিয়া একজন বৃদ্ধলোক জানে যে, কয়েক খানা কাগজে বিশু তাহাকে সহি করিতে বলে, পরাণও সহি করে। পরাণকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, অন্যে থিয়েটারে ভাল বসিবার স্থান অধিকার করিতে হইলে 'দরখাস্ত দিতে হয়।' তবে সেই দরখাস্তের সঙ্গে যদি এক টাকা ধারের স্বীকারোক্তির কোন সম্পর্ক থাকে, তাহা হইলে সে তাহার কিছুই জানে না। মনোমোহনবাবু বলিলেন, "দীনেশকে একবার পাওয়া যায় না, হারাণ বাবু?"

পরাণকে দীনেশের কথা জিজ্ঞাসা করায় পরাণ বলিল, সে বিশুর সঙ্গেই আসিত। তাহার অতিরিক্ত সে আর

কিছুই জানে না। সাক্ষী নাই অথচ মোকর্দ্দমা করিতে হইবে। মনোমোহনবাবু কেবল ভরসা করিলেন জেরার উপরে। বিত্তর পক্ষ প্রবল। তাহার হাণ্ডনোট আছে, পরাণের সহি আছে। সুতরাং তাহার জয় নিশ্চিতই।

অন্যান্য দুই একটি মোকর্দ্দমার পরই পরাণের হাণ্ড-নোটের মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল। মনোমোহনবাবু জেরা করিলেন, "পঞ্চাশ হাজার টাকা তো আর কেউ নগদ দিতে পারে না। আপনি চেক দিয়াছিলেন তো?"

বিত্ত ইহার সঠিক উত্তর দিতে পারিল না। চেকের কথা বলিলে তাহার নম্বর, যে ব্যাঙ্কের উপর চেক, সেই ব্যাঙ্কের নাম ইত্যাদিতে গোলমাল হইবে। যদি দশ টাকা নোটের কথা বলে তাহাও একটা বিরাট ব্যাপার হইবে। বিত্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর দিল যে, নগদ টাকা, অলঙ্কার ইত্যাদিতে একদিনে নয়, বহুদিনে সে পরাণকে যাহা দিয়াছে তাহার মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা। এবং সেই মর্ম্মে পাঁচ সাতখানি পরাণের দস্তখতযুক্ত হাণ্ডনোট বাহির করিয়া দিল।

উভয় পক্ষে নানাপ্রকার বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছে এমন সময়ে এক শীর্ণকায় দীর্ঘ ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। কাহারও বাধা না মানিয়া সে বিচারকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নমস্কার করিয়া বলিল,

"ধর্ম্মাবতার, এই পরাণ অতি ভাললোক। হাণ্ডনোটের কথা যে বিত্ত বলছে, সব মিথ্যে কথা। কতকগুলো সাদা কাগজে সই করিয়ে নিয়ে গিয়ে সেইগুলো হাণ্ডনোট করে বার করেছে। আজ দু'দিন হল বিত্ত আর তার এটর্ণি আমাকে বলছিল, 'তোকে হাজার দুই দেয়া যাবে এখন। তুই বলবি আমার সাম্নে পরাণ সই করেছিল, আর আমি নগদ টাকা এনে দিয়েছিলুম।' আমি না হয় পাঁচটা আসটা খাই। মদও যে খাইনে তা নয়। তাও পরের ঘাড় ভেঙে। এ-ক্ষেত্রে বিত্ত পরাণের যথাসর্ব্বস্ব খেয়েছে, আর আমিও যে তার কিছু ভাগ পাই নি তা নয়। তা'র সবই খেলুম, আমার তাকে জেলে পচাবে এ কেমন আমার ভাল লাগল না। তাই ধর্ম্মাবতারের কাছে ছুটে এলুম। এতটা সইবে কেন?"

বিচারালয়ে একটা হলস্থূল পড়িয়া গেল। আলকরা অপরাধে বিত্ত ও দীনেশ গ্রেপ্তার হইল। বেগতিক দেখিয়া এটর্ণি গা ঢাকা দিয়াছিল। সম্মানে পরাণ মহামান্য হাইকোর্টের বিচারে মুক্তি লাভ করিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা হারাণের পা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। ভাইকে বুকে তুলিয়া লইয়া হারাণ তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল এবং নিজেও কাঁদিতে লাগিল। বলিল, "পরাণ, বুঝেছিস তো ভাই, বিত্ত কেমন তোর আপনার জন। আর কখনও হঠাৎ কাউকে বিশ্বাস করিস নি ভাই।"

পরাণ কাঁদিয়া আকুল। কত কি বলিল, হারাণ তাহার একবর্ণও বুঝিল না। হারাণ বলিল, "ভাই, চল দেশে। চাষ আছে ভাবনা কি?" আদালতগৃহ চমকিত করিয়া যখন বিত্ত ও দীনেশের গ্রেপ্তার ও পরাণের মুক্তি হইল, তখন প্রায় দিন শেষ হইয়া আসিয়াছিল। সেই দিন বাসন্তী পূর্ণিমার চতুর্দ্দশী তিথি। কলিকাতা মহানগরীর স্থানে স্থানে 'বেড়া পোড়া'র বিশেষ আয়োজন হইতেছিল। হারাণের মনে তাহার গৃহের কথা জাগিয়া উঠিল। ছোট বউমা কাঁদিয়া কাঁদিয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। বড় বউ নিশ্চয়ই আকুল হইয়া ছটফট করিতেছে। গোপাল কি করিতেছে? হয় তো সে-দিন রন্ধন হয় নাই। গোপাল শুষ্কমুখে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দাওয়ার ছাঁচতলায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। বিনোদিনী তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। বিলম্ব না করিয়া হারাণ পরাণকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা উঠিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

১০

মণ্ডল-গৃহে আজ রন্ধন হয় নাই। কে রন্ধন করিবে? পেটের জ্বালার চেয়ে প্রাণের জ্বালা অধিক হইয়াছিল। অতি প্রত্যূষে যখন হারাণ গৃহত্যাগ করিয়া কলিকাতা অভি-মুখে যাত্রা করিল, তখন গৃহের প্রত্যেক প্রাণী জাগরিত হইয়া উঠিল। অনেক করিয়া আশ্বস্ত করিলেও হারাণ বড় বউ বা ছোট বউমাকে শান্ত করিতে পারিল না। লজ্জার আবরণ আজ টুটিয়া গিয়াছে। ক্রন্দনের স্বর হারাণের কর্ণে প্রবেশ করিল। আকুল হারাণ আরও আকুল হইয়া উঠিল। বড় বউ হারাণের হাতদুটি ধরিয়া কেবল কাঁদিতেই লাগিল।

চক্ষের জল আর বুঝি থাকে না। অতিকষ্টে হারাণ আত্ম-সম্বরণ করিয়া উহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। যতই সান্ত্বনা দেয়, ততই দুই বউ কাঁদিয়া আকুল হয়। সকলে কাঁদিতেছে দেখিয়া গোপালও কাঁদিতে লাগিল। কারণ কি তাহা বুঝিল না, তথাপি কাঁদিতে লাগিল। পরাণ উপায়ান্তর না দেখিয়া ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া দ্রুতগতিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল।

সেই যে তাহারা কাঁদিতে বসিয়াছিল, রাত্রি প্রহরাধিক হইল তথাপি তাহাদিগের ক্রন্দন থামিল না। কেমন মনটা করিয়া উঠিল, বিনোদিনী একবার মেয়ের কাছে আসিয়াছিল। প্রথমে চটিয়া উঠিয়াছিল; পরে কি জানি কি কারণে আর কিছু না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছিল। অনেক বেলা হইল, গোপাল ভাত পাইল না। অদৃষ্টের কশাঘাতে তাহার অনেকটা না খাইয়া থাকার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেল। কেহ তাহার খবরও রাখিল না। দিন কাটিয়া গেল। বাসন্তী শুক্লা-চতুর্দশী। আকাশে চাঁদ হাসিয়া দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া দিল। নিকটে দূরে দেবতার মন্দিরে, গৃহ-দেবতার মণ্ডপে, আরতিকের শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পর দিন দোল। আজ চাঁচর, 'নেড়া পোড়া' হইবে। সাধারণ স্থলে বৃহৎ এক 'নেড়া' কলার বাসনার বিচালিতে মনুষ্য আকার ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে। গলায় ফুলের মালা দুলিতেছে। আশে পাশে গ্রামের যত ছেলে সকলেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, চেঁচাইতেছে, কলহ করিতেছে এবং পরক্ষণেই মিটমাট করিতেছে। কেহ ঘণ্টা, কেহ শঙ্খ, কেহ কাঁসর বাজাইতেছে। দলে দলে লোক দূর হইতে আসিয়া জুটিতেছে। সমস্ত গ্রামময় একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই আনন্দে ছুটিয়াছে। কেবল নিরানন্দ মণ্ডল-গৃহে বিষাদের কাল ছায়া সে-গৃহ ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

সমস্ত দিন অনাহারে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর গোপাল বাল-সুলভ চপলতা বশতঃ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সকলেই আমোদ করিতেছে। গোপালেরও তাহাদিগের সহিত ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিবার ইচ্ছা হইলেও, তাহা তাহার অনশনক্লিষ্ট শরীরে সহিল না। সে এক জায়গায় বসিয়া পড়িল। চারিদিকে নানা দোকান বসিয়াছিল। তাহাতে খাবার প্রচুর পরিমাণে শোভা পাইতেছিল। দুই এক পয়সা সকলে কিনিতেছিল, খাইতেছিল, ছড়াইতেছিল। গোপাল সতৃষ্ণ নয়নে তাহা দেখিতেছিল।

যেখানে গোপাল বসিয়াছিল, তাহার পার্শ্বে একখানি দোকান ছিল। একটি ভদ্রলোক আসিয়া সেই দোকানে দাঁড়াইল। তাহার সহিত চারি পাঁচটি ছেলেও আসিয়াছিল। দোকানদারকে দেখাইয়া বলিল, "তোমার ভাল ভাল খাবার এই ছেলে কয়টিকে দুই আনা করিয়া প্রত্যেককে দাও।"

এই কথা বলিয়া ভদ্রলোকটি এ-দিক ও-দিক দেখিতে লাগিল। দোকানদার প্রফুল্ল মনে তাহার পুত্রের সহিত বালক গোপালের হাতেও এক ঠোঙ্গা খাবার দিল। গোপাল আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল। ছেলেরা খাবার পাইয়া মহোল্লাসে খাইতে আরম্ভ করিল। গোপাল খাইতেছে না দেখিয়া একটী বালক বলিল, "খাও না ভাই তুমি চেয়ে রয়েছ যে?"

হঠাৎ ভদ্রলোকটি ফিরিলে দোকানদার পয়সা চাহিল। ভদ্রলোকটী জিজ্ঞাসা করিল, "সব দু'আনা করে দিয়েছ ত?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

পাঁচ জনের হিসাব করিয়া দশ আনা পয়সা দোকানদারকে দিল। দোকানদার তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবু আর দু'আনা?"

"কেন পাঁচ জনের দশ আনাই তো দিয়েছি।"

"আজ্ঞে, ছ'জন যে। এটী কি আপনার ছেলে নয়?"

গোপাল তখনও খাবার হাতে করিয়া ধরিয়া আছে। দোকানদার গোপালকে বলিল, "পয়সা দাও।"

গোপাল কোন উত্তর দিল না। কি উত্তর দিবে তাহাও বুঝিল না। দোকানদার বলিল, "খাবার দাও। পয়সা না দাও, খাবার দাও।"

ভদ্রলোকটী এতক্ষণ গোপালকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। দোকানদার চাহিবামাত্র গোপাল খাবারের ঠোঙা তাহাকে দিতে গেল। ভদ্রলোকটী বাধা দিয়া বলিল, "না, না, বাবা, তুমিও খাবার খাও। আমিই পয়সা দিচ্ছি। আচ্ছা তোমাকে অত শুক্‌নো দেখছি কেন বাবা? তুমি কি আজ ভাত খাও নি?"

গোপাল কাঁদিয়া ফেলিল। ভদ্রলোকটী কোলে করিয়া

সান্ত্বনা দিয়া চোখ মুছাইয়া দিয়া আরো খাবার লইয়া গোপালকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইল। সুস্থ হইলে গোপালের মুখে হাসি দেখা দিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

"আমি তোমার জ্যাঠা-মশাই।"

"না, না! জ্যাঠা তো কলকাতায় গেছে।"

ভদ্রলোকটী আজও খবর লইয়া মণ্ডল-বাড়ীর সকল সমাচার অবগত হইল। বড়ই দুঃখিত হইল। সে জানিত না যে, যাহার সম্পত্তি ক্রয় করিয়া আজ দখল লইবার জন্য সেই গ্রামে আসিয়া তাহার আত্মীয়ের বাটীতে অবস্থান করিতেছে, গোপাল তাহারই পুত্র এবং বিধির বিড়ম্বনায় এবং স্বপনায়ে সেই ব্যক্তিই আজ রাজত্ববাসে। সে গোপালকে ছাড়িল না। কেমন যেন গোপালের উপর তাহার মমতা বসিয়া গিয়াছিল। যতক্ষণ না 'নেড়া পোড়া' শেষ হইল, ততক্ষণ তাহারা সেই খানে রহিল। গোপালও তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে লাগিল।

গোপালের কেমন ইচ্ছা হইল, নেড়ার একটু আগুন লইয়া অপরের মত ঘুরাইবে। অনেক বাখারি সেইখানে ছিল। অপরের মত সেও একটা লইয়া নেড়ার আগুনে জ্বালাইয়া লইল। মাকে ও 'জ্যাঠামা'কে দেখাইবে বলিয়া তাহা লইয়া গৃহাভিমুখে চলিল। নেড়া পোড়া শেষ হইয়াছিল। সকলেই বাড়ী যাইতে লাগিল। ভদ্রলোকটীও তাহার পুত্রদিগকে লইয়া তাহার আত্মীয়ের বাটীর দিকে যাইতে লাগিল। গোপালের বাড়ীর পথ দিয়া তাহাকেও যাইতে হইল। ইত্যবসরে তাহার আত্মীয় আসিয়া তাহার সহিত মিলিল। গল্প করিতে করিতে তাহারা গৃহাভিমুখে চলিল।

গোপাল তাহাদিগকে ছাড়িয়া দ্রুতগতি গৃহে ফিরিল। হাতে বাখারির আগুন তখন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। গোপাল গৃহের সদর দরজা পার হইতে না হইতে তাহার হাতের বাখারি এমন জ্বলিয়া উঠিল যে, তাহা সহ্য করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে হস্তস্থিত বাখারি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। ঘটনাক্রমে তাহাদিগের প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া যে-অংশ চিহ্নিত করিয়া বেড়া দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে আগুন লাগিয়া গেল। বেড়ায় বাঁশ বেশী। গত শীতকালের একটানা রৌদ্রে তাহা অতি শুষ্ক হইয়া থাকায় সামান্য অগ্নির স্পর্শেই তাহা জ্বলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বেড়ার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কে যেন সেই আগুন ছড়াইয়া দিল। গোপালের কিছু মাত্র ভয় হইল না। সে হাততালি দিয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। বড় বউ কমলা, ছোট বউ বিমলা ছুটিয়া আসিয়াছে—ভয়ে বিহ্বল হইয়া ভীতনেত্রে চতুর্দ্দিকে চাহিতেছে, চেঁচাইয়া লোক ডাকিতে চেষ্টা করিতেছে, চেঁচাইতে পারিতেছে না। বিভীষিকার ভীষণ চিহ্ন তাহাদিগের মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তখন যাহারা মণ্ডল-বাড়ীর সম্মুখ পথ দিয়া "নেড়া পোড়া" দেখিয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে ফিরিতেছিল, তাহারা মহা গোলমাল করিয়া মণ্ডল-বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। পাড়ার সকলেই প্রায় সমবেত হইয়াছিল। চারিদিকে একটা মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল—"আগুন, আগুন।"

ভয়ে আতঙ্কে বিনোদিনী কন্যার গৃহে আসিয়া মূর্চ্ছিতা প্রমাদ গণিল। কি ছিল, কি হইল! কি হইতেই বা চলিল। যে-মণ্ডল বাড়ীর আহারে ব্যবহারে অভাবের চিহ্ন মাত্র পাওয়া যাইত না, পরিপূর্ণতায় ঢল ঢল মূর্ত্তি সদাই বিরাজ করিত, সেখানে আজ অনশন, অভাবের মূর্ত্তি যেন সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে আসিয়াছে। থাকিবার দুইখানা ঘর ছিল। বুঝি বা বিধির দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া তাহাও শেষ হইয়া যায়! যাওয়া হউক, বা না হউক মাথা গুঁজিবার যে তিলমাত্র স্থানটুকু ছিল তাহাও বুঝি আর থাকে না! গাছতলায় বুঝি বা দাঁড়াইতে হয়। জামাই-এর জেল—কন্যা গাছতলায়, দৌহিত্র পথে পথে! বিনোদিনীর চক্ষে জল আসিল। অলক্ষ্যে বুঝি বা দুই এক ফোঁটা গড়াইয়া পড়িল!

যখন সকলে হায় হায় করিতে লাগিল, বুঝি বা ঘরের চাল ধরিয়া যায়, যখন চারি দিকে জল আনিবার জন্য কলসীদিগের হুড়োহুড়ি পড়িয়া গেল, তখন দুই ভাই হাসিতে হাসিতে গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। জনরোল দেখিয়া, আগুন দেখিয়া ত্বরিত প্রবেশ করিল। তখন জনমণ্ডলী একবার ব্যাত্যাহত স্ফীত ও তরঙ্গ-সঙ্কুল, উদ্বেল সাগরবক্ষের মত চীৎকারে স্ফীত হইয়া উঠিল। ঘড়া ঘড়া জল আনিয়া কেহ বা চালায় উঠিয়া জল ছড়াইতে লাগিল, কেহ বা প্রজ্বলিত বেড়ার জল ঢালিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

খারাপ কিছু মাত্র চকল না হইয়া, যাহারা প্রাঙ্গনের বেড়ায় জল চালিতে যাইতেছিল, তাহাদিগকে বারণ করিল।

পরাণ বলিল,—"যে-বেড়া আমাদের দু'ভাইকে মার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দূরে ফেলেছিল, সে-বেড়া পুড়ে যাক। দাদা, আমাকে ক্ষমা কর, দাদা আমাকে ক্ষমা কর। আমি আপনাকে ঠিক বুঝতে পারি নি, দাদা। একটা অজানা অচেনা বিদেশী লোক এসে আমাকে লোভ দেখিয়ে আমার ভাইয়ের বুক থেকে আমাকে টেনে বার ক'রে দিয়েছিল। আমার মত লোভ দেখে মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল। মনে করেছিলুম, সে বুঝি আমার আপনার! বিদেশীর কথায় আর ভুলব না, দাদা।"

সকলে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" হওয়ার ব্যবধান পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল। গোপাল আসিয়া জ্যাঠাবাবুর কোলে ঝাঁপাইয়া উঠিল। আজি হারাণের চক্ষে আর জল থামিল না। গণ্ড, বক্ষ, বদন সিক্ত করিয়া অভিমান, ক্ষয় ধোয়াইয়া দিল। যে-ক্ষত্রলোকটী গোপালের দুঃখে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কাঁদিয়াছিলেন, তিনি দুই ভাইকে দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না। কাছে আসিয়া বলিলেন, "ভাই তোমাদের যা কিছু আমি কিনে নিয়েছিলুম। আমি গোপালকে তা ফিরিয়ে দিলুম। সে আমাকে জ্যাঠা বলেছে!"

* * *

আবার কোমুদী হাসিল। ভাই ভাই আবার এক হইয়া ভগ্ন-সৌধ আবার সৌন্দর্যময় করিয়া তুলিল।

[ সমাপ্ত

---

# গ্রামের রূপ

—শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

রূপসী মোর নিজ গ্রাম ছিল—হইয়াছে রূপহীনা,
মরিয়া বাঁচার বেদনায় কাঁদে তাহার বুকের বীণা।

ধানের গরিমা সোনার হাসির ছড়াইত হাসি রাশি,
পুঁজি করা চাল গুঁজি গুঁজি করা—দেখিয়া হাসিত চাষী।

আজিও চাষার সেই মেহনত আছে সেই ক্ষেতিবাড়ী,
জানে না সে শুধু কোন্ পথে গেল ঘরের লক্ষ্মী ছাড়ি।

সমরে দু'জন অতিথ্ এলেও আজ কাঁপে তার হিয়া,
তণ্ডুলকণা নাই গৃহে তার তুষিবে কি ধন দিয়া?

দুধ মুড়ি ছিল ঘরে ভরপুর পাত্র ভরা ছিল গুড়,
তা দিয়ে তো আগে অতিথি সেবায় কাঁদিত না হৃদিপুর?

*

পরাণের দায়ে করিল সে সেনা বিকালো সেনার চুল,
আপন জমীনে চষিছে সে আজ এমনি বিধির ভুল।

গেঁয়ো জমিদার যমের মতই দীনের শৈক্ষ চুষি,
প্রজা রঞ্জন করিয়া চলেছে—দৈন্য দেখিয়া খুশী।

ওদের শিক্ষা প্রয়োজনহীন—অকাজের পাঠশালা,
ভাবে উদাসি "ওরা জ্ঞান পেলে বাড়িবে বাঁচার জ্বালা।

আলোকের কোন দরকার নাই রবে ওরা কোণ ঠাসা,
মলিন হইয়া আছে চিরদিন—আজও রহিবে চাষা।"

গ্রাম ছাড়ি যারা অন্নের লাগি দূরের শহর পানে,
স্বজন লইয়া বাঁধিয়াছে বাসা কি বাপা ওরা কি জানে?

শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞান-গরিমায় ওরা আজ আধুনিক,
গ্রাম জীবনেরে অবহেলা দিয়া তালাসে আসল দিক্।

স্বপন-মায়ায় আপন ভুলিয়া দিশাহারা হইয়াছে,
আলোর দিশারী কে দেবে ওদের জ্বালিয়া বুকের কাছে?

দেবে কে খুলিয়া অন্ধ নয়ন রুদ্ধ সে বাতায়ন,
নতুন করিয়া দেখাতে গ্রামের পুরাণো বৃন্দাবন।

পথের ধূলায় হারানো মাণিক কবে সে লইবে তুলে,
বলিবে—"রে ভাই কিষাণ আমরা তোমারে ছিলাম ভুলে।

ক্ষমিয়ো আমার শত অপরাধ অক্ষম ভাই মানি,
আজি চেতনায় নতুন আলোকে আমাদের জানাজানি।

ফিরিয়া এলাম তোমাদের বুকে মায়ের আঁধার ঘরে,
তোমাদের লাগি এনেছি যতটা পরাণের থরে থরে।"

*

আসিবে কি দিন সেই শুভদিন—গ্রামের দুঃখ যাবে,
জননীর রূপ হবে অপরূপ মৃত্যুমলিন ভাবে।

বেদনার মেঘ রবে না বক্ষে মলিন অন্ধকার,
খুশীর আলোয় ফুটিবে স্বরূপ অভাগী পল্লী-মার।

# উত্তর বঙ্গের কবি জীবন মৈত্রের পদ্মাপুরাণ

—শ্রীশম্ভুচন্দ্র চৌধুরী

উত্তর বঙ্গে এক সময় পট্টবস্ত্রের অত্যন্ত প্রসিদ্ধি ছিল। বগুড়া, মালদহ, রাজশাহী প্রভৃতি অঞ্চল রেশমের জন্য বিখ্যাত ছিল। [ হাণ্টারের ষ্ট্যাটিস্‌টিকাল আকাউণ্ট অব-বেঙ্গল গ্রন্থে ইহার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ] জীবনের গ্রন্থে পাই—

বোম্বাই দেশের পাট-পাছা আমার দেশের পাটার।
তবে অল্প কড়ি মূল্য হয় ত টুটা।
আমার দেশের বস্ত্র বিনা জল পাইলে নষ্ট।
এক বৎসরে আমার কাপড়ের প্রথা বাড়ি কষ্ট।
আমার দেশের উৎস লোকে হাত দিয়া পড়ে।
আমার দেশের বিনা প্রতি ঘরে ঘরে।

সে-সময়ে দিনমজুরের পারিশ্রমিক অতিশয় অল্প ছিল। অর্থের মূল্য তখন খুব বেশি ছিল। সামান্য কড়ি ও চাউলের বিনিময়েই সমস্ত দিনের জন্য মজুর জুটিত।

দিলাম দিলাম বলে কড়ি পাঁচ বুড়ি
সোণাক চাউল পাই দিনমনে ভরি।

"বেগার"মজুর সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। চাঁদ সদাগর বিদেশে বাণিজ্য করিতে যাইয়া মনসার প্রকোপে ধনসর্বস্ব হইয়া অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল। দৈবযোগে এক কুম্ভকারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে চাঁদ পাথের সংগ্রহ করিবার জন্য অর্থ বিনিময়ে কুম্ভকারের 'হাড়ি'র ভার বহিতে স্বীকৃত হইল। এখানেও দেখিতে পাওয়া যায় পারিশ্রমিক কত কম।

তুমার ঘেলে তুমি ভার দিতে পার।
চাল যেলে কড়ি পাইলে কাড় করিব তোর।
তাহাকে হয় গণ্ডা কড়ি কহিল চুকারী।
বাসনের ভার লহ অল্প ভারেখনি।

কোটিপতি চাঁদ সদাগরের অবস্থা বিপর্যয়ে এইরূপ দুর্গতিপ্রদর্শন অবলম্বন করিয়া জীবন মৈত্র তখনকার দেশের আর্থিক অবস্থার দুই চারিটি তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চাঁদ পথে কতকগুলি রাখালের সহিত একটি জলায় মাছ ধরিবার সময়ে কাদায় তাহার চক্ষু পীড়িত হইয়া পড়িল। তখন অন্যান্য রাখাল তাহার প্রতি ধরাপরবশ হইয়া বলিল, "আমরা বহুত ধরি ভাগ নাই পাছে" এবং তাহারা চাঁদকে মাছের পাহারায় নিযুক্ত করিল। তার পর মাছ ধরা হইয়া গেলে চাঁদ তাহার ভাগের মাছ বিক্রয় করিয়া কিরূপে অর্থ সংগ্রহ করিবে তাহার একটি নমুনা, জীবন সঙ্কলিত করিয়াছেন।

আনিয়া পলাই সাধু ঠাকে লয় মিন।
ভাজিতে ভাজিতে সাধু লয় রাত্রি দিন।
সাধু বোলে এহি মৎস্য বিকাই হয় বুড়ি।
চাউল হাড়ি তেল নব আর নব খড়ি।
পাঁচ গণ্ডা হাড়িক দিয়া বাজার ভাড়া।
ভাজিয়া চাকিয়া তবে কামির গেল বাসা মুড়া।
বাকি পাঁচ গণ্ডায় মৎস্য সাত বেচে বর্ষরিয়া ফেরে।
বাকি পাঁচ গণ্ডায় খাইব শুধা পান।
আনন্দে যাইব দেশে করিয়া পয়াণ।

লখিন্দরের বিবাহ উপলক্ষ্যে অনেক প্রকারের বাজনা বাজিয়াছিল, এই সমস্ত বাদ্যের একটি তালিকা কবি দিয়াছেন।

বাজিয়া মৃদঙ্গ বাজে খঞ্জুরী করতাল।
বোসারি মুহুরী বাজে ভেউর রসাল।
ডমরু ডমরু বাজে আর বাজে দোতারা।
ঝিং ঝিং ঝিং ঝিং বাজে ঘোসীয়া কেয়ারা।
ভাগড় ভাগড় ঢোল বাই বাজে ডিমিক খোল।
ভো ভো ভো সিঙ্গা বাজে চমক চমক চেল।
ঝুড়-মুড় ঝুড়-মুড় ঝুড়-মুড় ঝুড়-মুড় বাজে মুহুরী নাগরা।
ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ সানাকি বাজে ভেরট সঙ্গ।
ঝনক ঝনক ধ্বনী করে করতাল খঞ্জুরী।
ঝুক ঝ ঝ বাজে তুরী বাকবিনা মহরী।
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে অতি মনোহর।
বিবাহের সাজ সাজে বালা লখিন্দর।

চাঁদ যখন 'দক্ষিণ পাটনে' বাণিজ্য করিতে যাইবে স্থির করিল, তখন তাহার পত্নী সনেকা গর্ভবতী; চাঁদ কবে

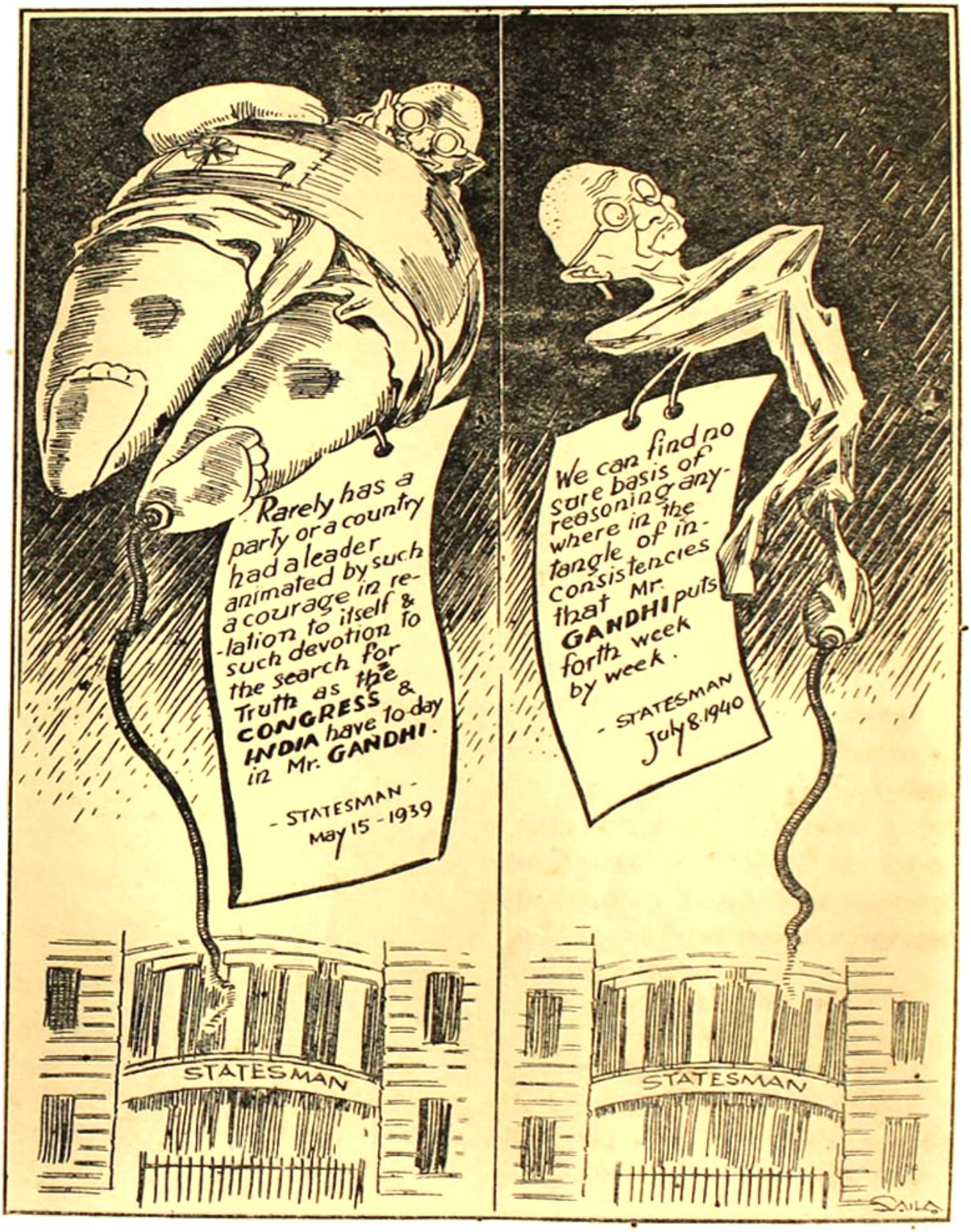
Rarely has a party or a country had a leader animated by such a courage in relation to itself & such devotion to the search for Truth as the CONGRESS & INDIA have to-day in Mr. GANDHI.
- STATESMAN - May 15 - 1939
We can find no sure basis of reasoning anywhere in the tangle of inconsistencies that Mr. GANDHI puts forth week by week.
- STATESMAN July 8 1940
STATESMAN
STATESMAN

বুদ্ধ-বিদারণ

কিরিবে ঠিক নাই, তাই পাছে কেহ সন্ধানী চাঁদের পত্নীকে কোনও প্রকার সন্দেহ করিয়া বসে, তাই চাঁদ 'সদাই ব্রাহ্মণ'কে ডাকিয়া একখানি 'সাক্ষিপত্র' লিখিয়া দিয়া গেল ; তৎকালীন সমাজের অবস্থা যে খুব উচ্চ ছিল না এই ব্যবস্থায় তাহার কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। সনেকা নিজেই স্বামীর নিকট এইরূপ স্বীকৃতিপত্র প্রার্থনা করিতেছে।

সোনা যোলে প্রাণনাথ করি নিবেদন।
এবার বৎসরের পথ বহিল সাতন।
একখানি জয়পত্র দেহত আপনে।
তোমার বিনাশ থাকুক মোর বিদ্যমানে।

চাঁদ সদাগরও একজন সাক্ষ্য রাখিয়া এইরূপ একখানি 'জয়পত্র' সম্পাদন করিয়া দিল।

চাঁদ বোলে বেকা ব্রাহ্মণ অশোচের।
সদাই পণ্ডিত ডাকি আন সত্বর।
ডাকমাত্রে পণ্ডিত আইল তৎক্ষণ।
প্রণাম করিয়া ঠিক্ করে নিবেদন।
চাঁদ বলে পুরোহিত বলি তোমায় ঠাঁই।
তোমার সাক্ষাত কিছু অশোচর নাই।
মম জায়া সনেকা আছে গর্ভবতী।
সাক্ষিপত্র লিখি দেহ সনেকার প্রতি।
জয়পত্র লিখে চাঁদ করিয়া কৌশল।
সনেকাকে বিনা পত্র সাক্ষির গোচর।

লখিন্দরের বিবাহ উৎসবে চারিদিক হইতে নারীকুল সমবেত হইয়াছে। তাহারা লখিন্দরের রূপ দেখিয়া নিজ নিজ পতির সহিত সেই রূপের তুলনা আরম্ভ করিয়া দিল। বর্ণনাটি এইস্থলে বেশ কৌতুককর হইয়াছে। গ্রাম্য রমণী-গণের সহজ সারল্য লক্ষ্য করিবার বিষয়।

দেখিয়া বালার রূপ বলে হায় রে হায়।
কেমনে গড়িল ইহার কোন্ বিধাতায়।
আমা সভার বাপ মায়ের চক্ষে নাহি ধরে।
কড়ি পায়ে বিকা দিল কালাকুড়ার ঘরে।
এক যুবতী বলে মুঞি বালার লাগি পাও।
চালা পুল বলিয়া খোপায় তুলি খেও।
আর যুবতী বলে মুঞি বালাক পাইনু হেন।
আর যুবতী বলে বালার চন্দ্র জলে জুখ
যেন মনে লয় যে তুলিয়া রাখি বুকে।
আর যুবতী বলে দিদি মোর কপাল পোড়া।
মুঞি যেন সুন্দরী নারী মোর ভাতার খোঁড়া।
লাথি মারে উঠে খোঁড়া নাহি মরে হাটে।
কাথো ত হাজন নহে কথায় পাদর কাটে।
আর যুবতী বলে দিদি খোঁড়া তোমার ভাল।
মোর ঘরত কাল যমী নহিল কৈল কাল।
আর যুবতী বোলে মোর উহনে মন ভাল।
আমার ঘরত যাতেদিনা ভাতার সহিল কৈল কাল।
একদিন শয়ন কৈলাম লাখিন্দার নিকটে।
বাঙ্গারের কাটা যেমন পটর পটর ফুটে।
আর যুবতী বোলে মোর ওহনে মন ভাল।
মোর ঘরত ঠেলা যমি সহিল কৈল কাল।

নারীর লক্ষণ সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন :—

যতেক পাওয়া মেলা যদি হয় উতল বাতি।
কুটিল মন দুটায় মন যায় আপন পতি।
সিন্দুর চুল কুলিয়ে বুল সকল কোনা মোছা।
ঘরে পতি দুটায় কুল পতর শাশুড়ি খাদা।

বেহুলার বিবাহের সময়ে তাহার আত্মীয়-স্বজনের মনে স্বভাবতই আশঙ্কা হইয়াছিল, বেহুলা স্বামীকে 'বশে' রাখিতে পারিবে কি না। পত্নী-সাহিত্যে স্বামীকে 'বশ' করা একটা অতি পরিচিত ঘটনা। এই সম্পর্কে নানা প্রকার তন্ত্র-মন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। জীবনের কাব্যে এইরূপ কতকগুলি 'বশীকরণ' ঔষধের ও বিধি-ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। যদিও এই বিংশ শতাব্দীতে যাহারা 'জুতা মোজা' পরিয়া "সোজা সোজা" হাঁটেন এবং 'বলেন বটে কথাবার্ত্তা অন্য দেশীর চালে' তাঁহারা এই সমস্ত ঔষধ দুর্ব্বিনীত স্বামীকে শায়েস্তা করিবার জন্য ব্যবহার করিবেন না জানি, তবু নিছক সেকালের তথ্য হিসাবেই এইরূপ মহামূল্যবান বশীকরণ ঔষধের উল্লেখ করিলাম :

যেনকা বোলেরে দিদি আর কথা জান।
ঔষধি যে আনে তাক চাক দিয়া আন।
উদ্ধরী ব্রাহ্মণী বোলে শুন প্রাণ সৈ।
বিল্লা ঔষধ আছে তোক তাহার কৈ।
দুধামুখি শুতা আর শুতার মোকাবে।
যার হৈত পাব আন কেহ নাহি জানে।
এক কড়ায় দুল আন পড়ে যেই আদি।
দেখিবা কেমন বশ হয় বালার আদি।
দুই আঙ্গুলা আন আর আগনতির পাত।
এক রত্তি গর্ভের দুধ আনি দেহ হাত।

দুইয়া বালার হাত দুঁখ কৈব পর।
বালাবোনী দুই জনে রবে এক ঘর।
বাপিকার যোবনে মৈতে আনবা সিন্দুর।
কানা বড়ি পাঁচ কড়া হাতা কর চুর।
কলা বাসে ভুক্ত দিয়া বাহিয়া দেব বেটী।
মুখ চাইয়া মা বলিবে চাঁদ সাধুর বেটী।

* * *

হাত বাড়া মুখ বাড়া সকল কৈলাম আমি।
আর যে ঘটল তাহা নিজ আন তুমি।
ডিঙ্গের চাঁদা ডিঙ্গের খোল চিত্র ডিঙ্গের পাত।
সেই চিত্রার তুলসীপত্র গোটা পাঁচ সাত।
চিত্রার মাসী কাঁচা পড়িল রাবিব আগালা।
শনি মঙ্গল বার তারা দুইতে তুলিল।
উল্টা পাল্টাতে তারা একত্র করিয়া।
এক মহীচ তের ধান তাহাতে বান্ধিয়া।
দিবসী হইয়া তুমি যাইবা আপনে।
সাবধান হইও ইহা কেহ নাহি জানে।
যদি পথ পুরুষ মানী আসিয়া হাথে ধরে।
কিছু না বলিবে বালা যেমনেতে সরে।

জীবনের কাব্যে পল্লীজীবনের এইরূপ নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আরও নানাপ্রকারের তথ্য এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত দেখা যাইবে। কিন্তু গ্রন্থখানি এইরূপ তথ্যসমাবেশে ঘটনাবহুল হওয়া সত্ত্বেও অনেক কাব্যরসের আকর হইয়াছে। কবি জীবন মৈত্র ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই সময় বাঙ্গালা কাব্যের গতি অতিশয় মন্থর হইয়া আসিতেছিল; বাঙ্গালী সমাজের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল; কয়েকজন কবিওয়ালা এবং ভারতচন্দ্র কোন প্রকারেই এই বাঙ্গালা কাব্যের নির্ব্বাপিতপ্রায় শিখাটি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন। কবি জীবন মৈত্রের কাব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের এই অন্ধকার যুগে রচিত হইয়াছিল। তখন দেশে কি রাষ্ট্রে, সমাজে, সাহিত্যে কোনও অনুকরণযোগ্য আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল না। জাতীয় জীবনের এই পটভূমিকায় বেছিলে দ্বিধাবিহীনচিত্তে এ-কথা স্বীকার করা যায় যে, জীবন মৈত্রের কাব্য কোন কোন স্থলে উৎকট আদিরসাশ্রিত হইলেও মূলতঃ অশ্লেষ কাব্যরস পরিবেশন করিয়াছে এবং এই-সময়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারাকে সজীব রাখিয়াছে। জীবনের কবিত্বশক্তিও একেবারে নিরক্ষরের ছিল না। তাঁহার কবিত্বের কিছু কিছু নিদর্শন এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। জীবনের কল্পনা ভাব-সমৃদ্ধ ছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ তাঁহার কাব্যমধ্যে রহিয়াছে। দুই একটি বিশেষ বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। "কামগঞ্জ" নামক নরবর্জ্জিত নগরীর প্রতিষ্ঠা জীবনের মূল্যবান কল্পনা-শক্তির পরিচায়ক। এই উপলক্ষ্যে আনুষঙ্গিক যে-সমস্ত বিষয়ের অবতারণা কবি করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার কল্পনার সমৃদ্ধিরই সূচনা করে। "ঊষা-অনিরুদ্ধে"র প্রেম ও তাহারই ভিত্তিমূলে কাব্যরচনায় জীবনের আখ্যায়িকা নির্ব্বাচনের সরলতার প্রমাণ মিলিয়াছে। এইরূপ একটি সুন্দর কল্পনার পরিসমাপ্তি যেরূপ কৌশলে কবি আঁকিয়াছেন, তাহা এই যুগে নিতান্তই বিরল। যে ঊষা একদিন 'গঙ্গাদেবী'কে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিল যে, অনিরুদ্ধসহ তাহাকে পুনরায় স্বর্গে আনিতে হইবে, সেই ঊষাকে যখন স্বর্গে আহ্বান করা হইল তখন সে কাতরস্বরে নিবেদন করিল "স্বর্গেত ছিলাম প্রভু স্বর্গ নাহি চাহি।" মর্ত্ত্যের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা পরিপূর্ণ জীবনের সহিত পরিচিত হওয়ায় এই মাটীর পৃথিবীর মোহ তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছে, তাহার নারী-হৃদয়ের মহিমাকে একটি নূতন সার্থকতার সন্ধান দিয়াছে, সে পৃথিবীর মায়ায় বাঁধা পড়িয়া গেল; মানব-জীবনের প্রতি এই যে শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ ইহা জীবনের কাব্যে কেমন করিয়া আসিল তাহাতে অনেকে বিস্মিত হইতে পারেন। অথচ 'বেহুলা'র এই যে আকৃতি ইহাতে দেবাশ্রিত আদিরসের কোন সংস্রব নাই। সমগ্র পরিকল্পনাটি নিছক কবিত্বের আশ্রয়ে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। আখ্যায়িকার এই সমগ্রতা ছাড়াও জীবনের গ্রন্থে বহুস্থলেই উচ্চ কবিত্বের নিদর্শন মিলিবে। "উষাহরণ" প্রসঙ্গে একটি এইরূপ কল্পনার মনোহারিত্বের উল্লেখ করা যায়। রাত্রিতে স্বপ্ন-যোগে বাণরাজকন্যা 'ঊষাবতী' মদনপুত্র "অনিরুদ্ধ" দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছে এবং ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে; প্রভাতে সেই সুদর্শন যুবকটির জন্য তাহার চিত্ত একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল, তাহার অদর্শনে "ঊষার প্রাণ" আর বাঁচে না, অথচ যুবকটির কোন পরিচয়ই তো তাহার জানা নাই। এই নিদারুণ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ঊষা তাহার সখী চিত্ররেখার

গোচরে আনিলে চিত্ররেখা উষার নিকট ত্রিভুবনের বীরগণের চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্য হইতে উষার প্রিয়কে নির্দ্দিষ্ট করিতে বলিল; এইরূপে উষা তাহার ভালবাসার পাত্রের পরিচয় আবিষ্কার করিল। কল্পনাটি আগাগোড়া কবিত্বরসে পরিপূর্ণ, অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্যের চিত্রাঙ্কণ হইতে জীবন ইঙ্গিত পাইয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার কৃতিত্ব কমে না। এই অংশের সামান্য একটি খণ্ড উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

চিত্ররেখা বোলে সখি কর অবধান।
ত্রিভুবন অগোচর নাহি বিদ্যমান।
যে মূর্ত্তি যথাত আছে কহে অগোচর।
পট লিখি তোমাক দেখাই সকল।
যথাত যে মূর্ত্তি আছে আমি লিখি পটে।
পশ্চিম করি দেহ দেহি মূর্ত্তি কটে।
এহি বলি দিয়া পট করিল নির্ম্মাণ।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে লিখিল স্থানে স্থান।
দেবতা সকল লেখে ঈশর আদি করি।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর লেখে বিদ্যা বিদ্যাধরী।
চিত্ররেখা বোলে সখি দেখ স্বর্গ পটে।
ইহার মধ্যে কোন্ মূর্ত্তি দেখিছিলে খাটে।
সুনিয়াত উসাবতী করিল তরাস।
না দেখিয়া অনিরুদ্ধ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
উসাবতী বোলে সখি বলি তোমার ঠাই।
তলাদিলাপে প্রাণনাথ ইহার মধ্যে নাই।
সুনিকাত চিত্ররেখা চিন্তিত অপার।
পাতালে ত চিত্ররেখা লিখিল আসার।

* * *

ঐরিসহ কামদেব লিখি একত্তর।
দেখিবার দিল পট উসার গোচর।
দেখিলেন অনিরুদ্ধ কৃষ্ণের সাক্ষাত।
প্রাণনাথ বলি উসা করে জোড় হাথ।
অনিরুদ্ধ দেখিকা হৈল আকুল।
ঘুমিত পরিল উসা আউলিয়া চুল।

জীবনমৈত্রের কবিত্বের অন্যান্য উদাহরণ :—

যখন শরত শোভা কিবা পুনিমার চাঁদ।
মুখক বলিতে যেন পাতিআছে ফাঁদ।
নয়ান খঞ্জন আখে অঞ্জন কর্জ্জল।
কপালার পোতে তারে ললাট চঞ্চল।
মুখ তোর মনোহর পুনিমার শশধর
ধরিবের বিম্ব জিনি বস্ত্র।
কেশরির মাজাখানি কুচিল জিনিয়া বাণী
দেখিয়া দেবতা লাগে ধন্দ।
কুঞ্জর জিনিয়া ঠাম হেন কামদেবুপাম
তন তোর বনাবের কোরে।
দারুণ মদনশর কহিলেক জর জর
মজি গেল বাণিয়ার ঘর।
দেখিতে সুন্দর আঁখি হেসব খঞ্জন পাখি
অঞ্জন জিনিয়া বিন্দু কল
মুটিল কুন্তল ভাল চামর জিনিয়া তার
ধনুযুগ জিনিয়া বুলাল।
অতি বিষ বাজাখানি কেশর জিনিয়া বাণী
ডালিম্ব জিনিয়া দুইস্তন।
গলে বাণিয়র হার লোভে বনো অনিবার
তোর জলে স্থির নহে মন।

*

বালার বচনে বলীর কম্পিত হৈল হিয়া।
চন্দ্র কম্পিত যেন রাহুক দেখিয়া।
হরিণি কম্পিত যেন সম্মুখে দেখে বাঘ।
মৃগি ব্যাকুল যেন সিংহ পাইলে লাগ।

আমি পতিব্রতা সতি সহজে জিয়াব পতি
বলনা ছাড়ুবে কদাচিত।
যেহিন আমার পতি তাথ নিল পদ্মাবতি
তুমি আমার স্বামীর বন্ধব।

ভয় পাইয়া সুন্দরি স্বামীক চাপি ধরে।
যে স্থানে ভয়ের কথা সেহ স্থান ধরে।
স্বামীক দেখিয়া বালি কান্দে অভিমানে।
খসিল স্বামির অঙ্গ সুন্দরি অন্তরি।
ঝুলাত বসিয়া কান্দে বালি চন্দ্রমুখি।
খসিল স্বামির অঙ্গ যথন খসিত।
খসিল নুপাল বাহু আজানু লম্বিত।
খসিল সুন্দর আঁখি জিতি শশধর।
খসিল নাসিকা চারু চিকুর চামর।
মস্তক খসিল বালার লোকবীর গোল।
কেশভার ঝুলিল চামর গঙ্গাজল।

নয়ান খসিল যেন খঞ্জনের জুড়ি।
জিজ্ঞা মোটা খদি পৈল কাহে কৈমে বলেতি॥
খসপতি রাজা বলে অতি মনোহর।
কনক খসিয়া পৈল মুকুতার উপর॥
অনহা বুক দেহি খসিয়া পড়ে।
একলা অদিয়াছে বালি দুয়ার উপরে॥

...

জীবনকৃষ্ণ মৈত্র "হেঁয়ালি"তে ছন্দ-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই যুগের কবিগণের নিকট হেঁয়ালির একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ভারতচন্দ্রের "অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ" ইত্যাদি ব্যর্থবোধক ভাষা আমাদের সুপরিচিত। জীবন মৈত্র রচিত এইরূপ ব্যর্থবোধক ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা সঙ্কলিত করিয়া দেওয়া গেল।

পদ্মা বোলে শুন বালি আমার উত্তর।
হেঁয়ালি বুঝিতে পার তবে জানি বর॥

রাম রক্ষা বোলে বালি বুঝ হিঁয়ালি।
পিছা মাত্র বাদি তার দিয়া ছন্দ কেলি॥
দুইটি অক্ষরে তার নাম লিখা যায়।
হিঁয়ালি প্রবন্ধে কবি জীবন মৈত্র কয়॥

বালি বোলে হারিতে আকাশে উদিত যে ভব
সে বামে পড়য় আমার গন্ধর্বদিক নগর।
অন্তিমেতে অনন্তার ভাবাবসে পাবে।
সে বামে পাইবে যার চন্দনা নগরে॥

শ্রীরামের অনুজ তাই তার হয় নামা।
সর্পাঘাতে মৃত্যু হৈল তুমি তার মামা॥

...

পর্বত পুড়িল যার বানর চন্দন।
জল বিনা জন্ম করে রবির নন্দন॥
চারি অক্ষরে আট বাম জীবন মৈত্র কয়।
মুক মুক পণ্ডিত বলয় পাঁচ হয়॥

## গ্রন্থের ভাষা :

জীবন মৈত্রের 'পদ্মাপুরাণে'র মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হইল। রচনাখানি বৃহৎ, সে তুলনায় পরিচয় নিতান্ত সাধারণ ভাবে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। মাসিক পত্রের প্রবন্ধে ইহাপেক্ষা পূর্ণতর পরিচয় দেওয়া যায় না। শুধু "বঙ্গশ্রীর" পাঠকবর্গের বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ অক্ষুণ্ণ থাকায় এতটা সম্ভব হইল। সেজন্য তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রন্থখানি সম্পাদনা করিবার ইচ্ছা আছে, সেই সময় আমার সমস্ত বক্তব্য বিশদ ভাবে বলিব। বর্তমানে 'পদ্মাপুরাণে'র ভাষার যৎসামান্য আলোচনা করিয়াই আমার এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

জীবন মৈত্র উত্তরবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার কাব্য উত্তরবঙ্গের তৎকালীন কথিত ভাষায় একটি রূপভেদের আধারের উপর এক প্রকার সাহিত্যিক ভাষায় রচিত হইয়াছিল। পরবর্তী লেখক সম্প্রদায়ের মুদ্রণহস্তাবলেপ সত্ত্বেও জীবন মৈত্রের এই গ্রন্থে উত্তর বঙ্গের, বিশেষতঃ রঙ্গপুর অঞ্চলের প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন ভাষার বহু বহু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে। উত্তর বঙ্গের উপভাষা সম্পর্কে কোনও অনুসন্ধানকার্যে এইরূপ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা এই জন্যই অত্যন্ত বেশী।

## ধ্বনিতত্ত্ব :

"অ্যা" ও "ই" স্বরধ্বনির প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করিতে পারা যায়; পশ্চিম বঙ্গের "এ" ধ্বনি অনেকস্থলেই এই গ্রন্থে "অ্যা" ধ্বনিরূপে পাওয়া যায়; এই অঞ্চলের ভাষায় "ও" ধ্বনির একটি বিশিষ্ট প্রয়োগ করা যায়। সাধারণতঃ বাঙ্গালায় যে-সমস্ত স্থলে "অ" ধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে তাহার কতকগুলি স্থলে এই অঞ্চলে "ও" ধ্বনি পাওয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্য এই অঞ্চলের আধুনিক উপভাষাতেও অক্ষুণ্ণ আছে। জীবনের গ্রন্থের ভাষায় "ড় এবং র"-য়ে অনেক স্থলেই কোনও প্রভেদ দেখা যায় না; প্রকৃত পক্ষে উত্তরবঙ্গের উপভাষার ইহা একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য; আবার "র" স্থলে "ল" এবং মূলতঃ যে শব্দে 'র' ধ্বনি বর্তমান ছিল সেই সমস্ত শব্দে "র" ধ্বনির বিলোপও জীবনের গ্রন্থে পাওয়া যায়। মহাপ্রাণ বর্ণের অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য্য "পদ্মাপুরাণে" একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। পশ্চিম বঙ্গের ভাষায় প্রায় ষোড়শ শতাব্দীতেই মহাপ্রাণ বর্ণের স্বল্পতা আরম্ভ হইয়া যায়। নাসিক্য-ধ্বনির অস্তিত্ব জীবনের "পদ্মাপুরাণে" রহিয়াছে। নানারূপ

স্বরধ্বনি-বিপর্যয় স্বরসঙ্গতি অভিশ্রুতি প্রভৃতি দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের স্বরধ্বনিগুলিকে অনেক প্রকার পরিবর্তনের অধীন করিয়াছে। জীবনের গ্রন্থে এই সমস্ত ধ্বনিবিপর্যয় লক্ষ্য করা যায় না; পরন্তু পূর্বোক্ত অঞ্চলের ভাষা হইতে 'অপিনিহিতি' বহু পূর্বেই বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু জীবনের গ্রন্থে অপিনিহিতি পূর্বোক্তমে তাহার কাজ করিয়া যাইতেছে। "ই" ও "এ" ধ্বনির স্থান বিনিময়, 'প' স্থানে "ও," "ম" স্থানে "ও" বা "ঙ"—এই গ্রন্থের ভাষার বিশেষত্ব। সাধারণতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গালা ভাষায় স্বরধ্বনি সন্ধির প্রভাবে অনেকটা সঙ্কুচিত আকার ধারণ করিয়াছে। উত্তর বঙ্গের উপভাষায় এইরূপ স্বরধ্বনির সন্ধি-সঙ্কোচন অনেকস্থলেই আজিও হয় নাই।

রূপতত্ত্ব :

শব্দের রূপতত্ত্ব (শব্দরূপ, ধাতুরূপ ইত্যাদি) বিষয়ে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য জীবনের কাব্যের ভাষায় রক্ষিত আছে। বিভিন্ন কারক বিভক্তির মোটামুটি তালিকা নীচে সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

কর্তা— -০, -এ, -য়;

কর্ম— -অক্, -ওক্;

করণ— -ত, -অত, -দি;

সম্প্রদান— -অক্, -ওক্;

অপাদান—হনে, -হইতে ইত্যাদি।

সম্বন্ধ— -অর, -এর, -র;

অধিকরণ— -অত, -পর, -তি, -এত, -ত;

উপরের প্রদর্শিত শব্দবিভক্তিগুলি একবচনের; দ্বিবচনের কোনও বিভক্তি নাই; দুই সংখ্যা বুঝাবার এইরূপ সংখ্যাবাচক শব্দ প্রভৃতি সহযোগে সাধারণতঃ দ্বিবচন নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বহুবচনেও তেমন কোনও বিভক্তির প্রয়োগ নাই। -গুলি, -রা প্রভৃতি দুই একটি বহুবচন বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ইহা ব্যতীত বহুবচন-বোধক শব্দ—সব, সভেরা, গণ, কুল, সমূহ, ব্রজ প্রভৃতি শব্দ অনুপদ বা অনুসর্গরূপে ব্যবহৃত হইয়া বহুবচনের অর্থ প্রকাশিত করিয়া থাকে। নির্দেশক হিসাবে "গোটা" "কোনা" "খানি" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এই শব্দগুলি প্রায়শঃ একবচন বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "এহি বট বৃক্ষ গোটা করহ দংশন," "এড়িল মুগল গোটা" ইত্যাদি "দুয় গোটা নাগ তুমি করহ ভক্ষন" ইত্যাদি বাক্যে "দুয় গোটা" -নিতে "একটি একটি করিয়া দুইটি" বুঝিতে হইবে।

"কোণা" শব্দটির প্রয়োগ এই অর্থে সঙ্কীর্ণ; "মানুষ কোনা", রংপুর অঞ্চলের ভাষায় অদ্যাপি এই "কোণা" শব্দের বহুল প্রচলন আছে। "খানি" শব্দটির প্রয়োগে প্রাচীনত্ব রক্ষিত আছে। বর্তমান সময়ে অপ্রাণিবাচক শব্দেই সাধারণতঃ "খানি"র প্রয়োগ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রাচীন কালে এইরূপ ছিল না; "খানি"র প্রয়োগ আরও ব্যাপক ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে "নাতিনী খানি" ইত্যাদির প্রয়োগ আছে। প্রাচীন আসামীতে "কন্যাখানি" ইত্যাদি পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসের রামায়ণেও দেখি "সীতাহিয়া আনে বৃত্ত অর্জুনের শরীরখানি" বর্তমান বাঙ্গালায় "কন্যাখানি" "নাতিনীখানি" বা "শরীরখানি" প্রচলিত নাই। জীবনের গ্রন্থে 'খানি'র প্রাচীন প্রয়োগ-রীতি অক্ষুণ্ণ আছে দেখিতে পাই। "বাসরেতে কান্দে কেনে পুত্রবধূখানি।" "বিভাতিতে পুত্রখানি"; "একখানি ভগ্নি ছয় ভাইয়ের দুলালী," "একখানি বোন তার নিবেদন করি"; "আমার কন্যাখানি, হউক তোমার সেবকিনী।" অপাদান অর্থ বুঝাইতে "হনে" শব্দটির প্রয়োগ এতই ব্যাপক যে, উহা প্রায় বিভক্তিতে পরিণত হইয়াছে। "আজি হনে মামী তুমি সম্পদে নৈরাস।" "পুরাণে প্রশংস কথা কর আমিহনে," "অবদান কর সৃষ্টি ছৈল জেহি হনে।" "কাল-মালর বাড়ী হনে" ইত্যাদি; দুই একটি জায়গায় ষষ্ঠীর একবচনে—'কে' বিভক্তি পাওয়া গিয়াছে, যেমন—"মিত্রকে কপট হবে মন"="মিত্রের মন কপট হইবে।" এই প্রসঙ্গে মৈথিলী ভাষার অনুরূপ রীতির স্মরণ করা যাইতে পারে। -কে -কো বিভক্তি দ্বিতীয়া ও চতুর্থীর বিভক্তি; সংস্কৃতের কর্ম ও সম্প্রদান প্রাকৃত ভাষায় আসিয়া একাকার হইয়া যায়; পুনরায় এই প্রাকৃতেই সম্প্রদান ও সম্বন্ধ একাকার হইয়া যায়। "আমাকে ভাল লাগে না"="আমার ভাল লাগে না," ইত্যাদি প্রয়োগ আজিও উত্তরবঙ্গে প্রচলিত আছে।

সংস্কৃতের সাদৃশ্যে সৃষ্ট কতকগুলি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ 'পদ্ম-পুরাণে' পাওয়া যায়, যথা:—"বৈতালী," "গ্রামনী," "প্রেয়কিনী," "বাণিয়ানী", "কুমিরিনী" ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে

একটি স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। "বেহুলা"কে প্রায় সর্বত্রই "বালী" (বেলনী) বলা হইয়াছে এবং লখিন্দরকে প্রায় সর্বত্রই "বালা" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

সর্বনাম, অব্যয় বা ক্রিয়াপদেও অনেক বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। উত্তম পুরুষের একবচনে বর্তমান কালে "ওঁ" বিভক্তি লক্ষ্য করিবার বিষয়। কতকগুলি নামধাতুর উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে যথা :—সমাধিয়া, আওাইব, সান্তাইল, শান্তায়, "কাছাইতে নাহি পারে ঔষধের গন্ধে" "দুখায়" ইত্যাদি।

শব্দকোষ :

জীবন কথ্যভাষায় কাব্য রচনা করিলেও তাঁহার সংস্কৃত-প্রিয়তার উদাহরণ কাব্যমধ্যে প্রচুর রহিয়াছে। কাব্যমধ্যে বহুস্থলেই তিনি যে সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন তাহার পরিচয় মিলিবে। বহু বহু প্রাদা শব্দে কাব্যখানি পূর্ণ হইলেও অবিকৃত খাঁটী সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগের প্রচুর লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে। "আয়ত্তী," "কৃপাণ্ড" "কন্দর্তিকা" "জম্পতি" "উৎপল" "উদীপক" "বশবর্তিনী" ইত্যাদি জীবনের সংস্কৃত-প্রিয়তার নিদর্শন। চতুর্দশ ধর্মের বর্ণনার একস্থলে জীবন লিখিয়াছেন :

যম ধর্ম মৃত্যু সাথে অনন্ত বৈষ্ণব।
কাল সর্বভূক্ত সাথে উচ্চৈঃস্বর রত।
যমা মালা নীল সাথে পরমেষ্টি আর।
কুকোদর চিত্র চিত্রগুপ্ত দুসময়।

তুলনীয়, যমতর্পণ :—

নমো যমায় ধর্মরাজায় মৃত্যুবৈবাসকায় চ।
ঔদুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় তে নমঃ॥

জীবনের গ্রন্থের ভাষায় প্রচুর সংখ্যায় ফারসী ও উত্তর বঙ্গের উপভাষার বৈশিষ্ট্য শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। অতি সাধারণ এলোমেলো ভাবে এইরূপ কতকগুলি শব্দচয়ন করিয়া দিয়া আমার প্রবন্ধ শেষ করি :

মাচ (লোহার বাসর ঘর) আবাগে (বাতীত) করুণা (বন্ধন) [ এই অর্থে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে "করুণা" শব্দের প্রয়োগ আছে। "ধরে করে রাধিকার নয়নের পানি, অধিক করুণা করে চন্দ্রাবলী রাণী।" ] গাবর (মাল্লা), জেয়রা (কুটুম), ওয়াল (চীৎকার), ছ্যাবর (অসতী) নাথান (মতন), আজনায় (বৈজয়ন্তপত্র), ফাখম (সম্মান), ডেকেত (কর্দমে), মদ্দি (অভিসম্পাত), অচর্থাৎ (অসম্ভব), ধাইত্রি (ধাই+ধাত্রী), আদা (অনেক), ভাও (রীতিনীতি), উজার (বহন করে), অনীত (অত্যন্ত সঙ্কীর্ণমনা), অনুবন্ধ (অবতারণা), থাকোর (অহঙ্কার), কৈতর (পারাবত), ব্যাগান (নিষ্কর), ঘাঁটা (পথ), হাকাবাকী (শীঘ্র), আবুড়্যা (আবর্জনা), গাটাগোটা গাটাগোটা (হৃষ্টপুষ্ট), আনাগড়ি ওনাগড়ি (এপাশ ওপাশ), বাহুড় (কেয়), ভুসমায় (ভাদিয়া ফেলে), ঘোমট (ঘোমটা), চটকে (চমকে), উহনে (উহা হইতে), মাথারি (ছাতা), সিগাফোঁড়া (সেলাই ফোঁড়াই), ডহর (খালখন্দ), পুরক্যা (মোরে), গুয়াতিয়া (গুপারীবিক্রয়কারী), আইর (এয়ো), খুবড়া (কন্যাপক্ষকে বেয় বিবাহের সময়ে উপহার), মঙ্গল (ছুরা), নিকটিয়া (শিটকাইয়া), পাড়ি (খাল), আসয়ার, পাটোয়ার, শীর, মীর, টুঁই (কুটীরের বরগা), পাইক, কৌজ, বাড়ি (কল পাকিবার ঠিক পূর্বাবস্থা) ইত্যাদি।

[ সমাপ্ত

---

## মহাভারত ও বেদ

...মহাভারত ও বেদাঙ্গে প্রবিষ্ট না হইতে পারিলে ঋষিদিগের ভাষা বুঝিতে পারা যায় না এবং ঋষিদিগের ভাষা বুঝিতে না পারিলে 'মহাভারতে'র অর্থ বুঝা সম্ভব হয় না এবং 'মহাভারত' না বুঝিতে পারিলে 'বেদ' বুঝা সম্ভব হয় না এবং মহাভারত ও বেদ যথাযথ ভাবে না বুঝিতে পারিলে দর্শন ও সাহিত্য ও চিকিৎসাশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, শিল্পের প্রভৃতি কিছুই বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না।.....

# জ্যোতিঃহারা

—শ্রীঅনুরূপা দেবী

## প্রথম অঙ্ক

### তৃতীয় দৃশ্য

[ যামিনীর বাড়ী—সুসঙ্গতার শয়ন-কক্ষ—খাট, টেবিল-হারমোনিয়াম, একটি আলমারি ইত্যাদি—বিছানায় সুসঙ্গতা শুইয়া বই পড়িতেছিল, চঞ্চলা আসিয়া দাঁড়াইল ]

চঞ্চলা। একটা গান গাও না, বউদি! বাজনা বাজিয়ে। আমার শুনতে বড্ড ভালো লাগে।

সুসঙ্গতা। এ বাড়ীতে গান গাইতে হলে বার, তিথি, নক্ষত্র সমস্ত লগ্ন মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে হয়, গানের কোষ্ঠী-বিচার করতে হয়, তা বুঝি তুমি জানো না?

চঞ্চলা। ও-মা, সে আবার কি গো! সে তো বিয়ের বেলাই লাগে।

সুসঙ্গতা। উঁ হুঁ, তোমাদের দেশে সকল-তাতেই লাগে।

চঞ্চলা। হেঁই বউদি! তোমার দুটী পায়ে পড় করি, বড্ড শুনতে মন যাচ্ছে, আমার মাথা খাবে, একটা গাও না ভাই!

সুসঙ্গতা। ( উঠিয়া ) বেশ গাইছি, দোষ-ঘাট হলে আমি কিন্তু জানি নে। ( অর্গান বাজাইয়া গান )—

"কেন যাওয়া কাঁকন বন কন কত ছল ভরে,
অমন, করে দিয়ে চল ঘরক কলসে জল ভরে;
মেঘ. ঘমুনা বেলায়,—আলসে বেলায়,
খেল খেলা—"

( সসম্ভ্রমে নন্দিনী প্রবেশ করিল )

নন্দিনী। বউদি, করছ কি? বাবা বাড়ী রয়েছেন, ও গান কেন ধরলে ভাই? ভাল দেখে একটা গাইলেই ত পারতে!

সুসঙ্গতা। (তীব্রকণ্ঠে) কেন? একি বন্ধ গান হোলো? কি দোষ-ঘাট হোলো এর শুনি? নিমুবাবুর টপ্পা?

নন্দিনী। দোষ অবশ্য কিছু নেই; কিন্তু তবু গুরুজনের সামনে গাইবার গানও তো কিছু কম লেখেন নি, রবিবাবু বা রজনী সেন! বাবা যা ভালবাসেন তাই একটা—

সুসঙ্গতা। দেখ, সকল তাতেই উপদেশ দিতে এসো না,—সহ্য হয় না! এই নাকে-কাণে খত দিচ্ছি, আর যদি কখন এ-বাড়ীতে গান গাই! ( উঠিয়া আসিয়া বিছানায় শুইল )।

নন্দিনী। বউদি, অনর্থক তুমি চটে ওঠো! বাবা বাড়ী রয়েছেন, তাই বলেছিলুম, আমরা তাঁর সামনে এ ধরণের গান ত গাই না।

সুসঙ্গতা। তোমার বাবা কখন না কখন বাড়ী থাকেন? চব্বিশ ঘণ্টাই তো বেরে মানুষের মতন বাড়ীর মধ্যে বসে আছেন, সে হিসাব রাখতে গেলে তো কল্পান্ত কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে।

নন্দিনী। ( সক্ষোভে ) কি কথার যে কি কথা আনো! আজই বাবা দুঃখ করছিলেন, উপাসনার সময় তুমি যাওয়া ছেড়ে দিয়েছ বলে।

সুসঙ্গতা। দোষো না তো কি? আমি কি ওঁর মতন বুড়ো হয়েছি, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে আমার যে, ওঁর সঙ্গে সমান তালে তাল দিয়ে দিয়ে সাধন-ভজন করতে যাবো? ওঁদের এখন পরকালের ভাবনা এসেছে, বস্ত পারেন ভাবুন। আমার ওপোর শুধুশুধু এ জুলুম চালানো কেন বল তো?

নন্দিনী। আমাকে তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, তোমায় শিক্ষাও সেই ভাবে হয়, এই তিনি চান। এটাকে তুমি জুলুম ভাবছো কেন বউদি? আমার চেয়েও যে তুমি বাবার বেশী আদরের।

সুসঙ্গতা। থাক নন্দিনী! শিক্ষার আর গুরুর তুমি করো না! তোমার বা তোমাদের মত শিক্ষা আমার সাত-জন্মেও হয়ে কাজ নেই। বাবার যেমন কাণ্ড! বিয়ে দেখে একেবারে জ্ঞানগম্যি হারিয়ে ফেললেন! যাও ভাই যাও,

আমি যা আছি, তাই থাকি, তুমি ভাল মেয়ে, আমার সঙ্গে মিশো না। যাও, যাও, আমার পিছনে লেগে না থেকে, আমায় একটু মুক্তি দাও ;—মোহাই তোমার……

[ যামিনী প্রবেশ করিল, চকিতা চলিয়া গেল ]

যামিনী। ( সহাস্যে ) কি রে নন্দি, তোদের কিসের গল্প হচ্ছে ? এ কি তুই কাঁদছিস্ ? কেন রে ? ( কাছে আসিয়া মাথায় হাত রাখিল ) কি হয়েছে ভাই ? সোনা-মণিটি ! কাঁদছো কেন ?

সুসঙ্গতা। লাগাও, লাগাও, সাতখানি করে বলে কেন,—বা, বা, বাঃ, এমন ভাই-সোহাগি বোন তো কখন সাতজন্মেও দেখি নি !

যামিনী। তুমি বুঝি ওর সঙ্গে কগড়া করেছ ?

সুসঙ্গতা। আমার আর তা ছাড়া কি করবার আছে ? তোমাদের সঙ্গে কগড়া করতেই তো এই এঁদো পাড়াড়ে এসে ঢুকেছি !

যামিনী। আচ্ছা, নন্দু এমন ভাল মেয়ে ? তার সঙ্গেও তোমার কি করে কগড়া হয় ?—আশ্চর্য্য !

সুসঙ্গতা। খুব সহজ কারণেই,—আমি ভীষণ মন্দ বলে।

নন্দিনী। ( চোখ মুছিয়া ) দাদা ! আমি কাঁদি নি তো। চোখে একটা কি পড়েছিল, তুমি কেন ভাই মিথ্যে মিথ্যে বৌদিকে দোষ দিচ্ছো ! আমি তোমার খাবার দিই গে, তুমি কাপড়চোপড় ছেড়ে খেতে এসো। ( প্রস্থান )

যামিনী। ( সনিশ্বাসে ) সুসঙ্গতা !

সুসঙ্গতা। কী হুকুম !

যামিনী। এ আবার কি ?

সুসঙ্গতা। হুকুমই তো কিছু করবে, তাই বাঁদীর মতই উত্তরটা দিয়ে রাখলুম। কাজটা এগিয়ে থাকলো। আমি তো তোমাদের বিনাপণে কেনা বাঁদীই।

যামিনী। থাক্, তা হলে হুকুমটা বাকিই থেকে যাক ! শুনে আর কাজ নেই। ( প্রস্থান )

সুসঙ্গতা। বাপ হয়ে এত বড় শত্রু। উঃ, কি বিয়েই আমায় দিয়েছেন ! 'ঘাড় পোড়ানো মাস জ্বালানো' যাকে বলে, এদের বাড়ী এসে আমার তাই হয়েছে ! এর ওপোর আবার পয়সার অভাব ! হাতখরচ করতে শ্বশুর মশাই সে দিন দয়া করে পাঁচটী টাকা পাঠিয়ে দিয়ে, বলে দিয়েছেন, 'মাস কাবারে তাঁকে হিসেব দিতে হবে !' শুনে হাসবো কি কাঁদবো, তাই ভেবে পাইনে ! আমিও তক্ষুনি সে-টাকা ওঁর মুখের ওপর ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছি, বলেছি, 'টাকা আমার বাবা আমায় দেন, আমার দরকার নেই !' আমি তো টাকা কক্ষনো দেখিনি, তাই এসেছেন আমায় টাকা দেখাতে !

যামিনী। ( প্রবেশ করিয়া ) সুসঙ্গতা ! শুনলুম না কি বাবার ফেরৎ টাকা তুমি তাঁকে ফেরৎ দিয়েছ ! এতে বাবা বড় দুঃখিত হয়েছেন, কেন দিলে ?

সুসঙ্গতা। কেন দিলুম ? তোমাদের 'হিসেবের কড়ি বাঘে খাবে না' বলে ! ভালই তো করেছি, বাজে খরচ বেঁচে গেছে ! তোমরা তো খরচ বাঁচাতে ভালই বাস।

যামিনী। আমরা গরীব, খরচ বাঁচাতে আমাদের চেষ্টা করতে হয় বই কি ! কিন্তু বাবা নিজে যেটা হাতে ক'রে তোমায় দিলেন, সেটা ফেরৎ দিলে তাঁকে অপমান করা হয় না কি ?

সুসঙ্গতা। যাদের মানের বালাই যত কম, অপমানের ভাবনা তাদেরই তত বেশী !

যামিনী। সুসঙ্গতা ! বাবার সম্বন্ধে তুমি ও-রকম মন্তব্যগুলো করো না, তিনি গরীব হলেও সম্মানে যে কোন ধনীর চেয়ে খাটো নন। তা ছাড়া, তিনি তোমার পিতৃতুল্য। আমাদের যা করো করো তাঁকে কোরো না।

সুসঙ্গতা। বেশ, তাঁকেও বলে দিও, আমায় যেন ঘাঁটান না। আমার ওপর ঢিল ছুঁড়লেই পাটকেলটী খেতে হবে।

( প্রস্থান )

যামিনী। ইনিই আমার সহধর্ম্মিণী !

## চতুর্থ দৃশ্য

[ মিঃ দত্তর শয়নকক্ষ, মিঃ দত্ত শয্যায় শায়িত, পার্শ্বে উপবিষ্টা অণিমা ! ]

মিঃ দত্ত। অণিমা কই প্রকাশ তো এলো না রে ?

অণিমা। অত কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত আছেন বোধ হয়, তাই দেরি হচ্ছে।

মিঃ দত্ত। যদি সে না আসে ?

অণিমা। ( শান্তকণ্ঠে ) তা'-না যদি আসেন, নাই বা এলেন।

মিঃ দত্ত। (অর্দ্ধোত্থিত হইয়া) বলিস্ কি অপি? তার উপর আমার যে দাবী আছে। নিশ্চয় আছে! তার উপর যদি না থাকে, এ বিশ্বে আর কার উপর আছে বল তো? তাকে আমার চাই! তাকে হারিয়ে আমি যে তাকে ভাল করেই চিনেছি।

অপিমা। বাবা, মিথ্যে কেন অত উত্তেজিত হচ্ছো! বরং আমি একটা কিছু পড়ে শোনাই, কি পড়বো বলো তো?

মিঃ দত্ত। নাঃ থাক্ গে,—সারা জীবন ধরে অনেক কিছুই পড়েছি,—অনেক পড়িয়েছি,—তা'তে করে কোন কিছুরই কি মীমাংসা হোলো? জীবনের জটিলতা বাড়লো বই আর কমলো কোথায়?

But unable though we must ever remain to give a complete account of the transformation of things, even in any of its minor parts,—নাঃ, নাঃ মন ভরে না,—ভাল লাগে না,—নাঃ ভাল লাগে না। It is beyond our reach! beyond our intelligence—অপি! বড় কষ্ট রে!

অপিমা। ওষুধ খাবার সময় হয়েছে, খাইয়ে দিই।

(অপিমা উঠিয়া ঔষধ-পত্র আনিতে গেল ও আনিয়া সেবন করাইল)

(ঘর দরজার বাহির হইতে) প্রকাশ বাবু আছা।

অপিমা। আসতে বলো।

(যামিনীর প্রবেশ)

যামিনী। (নমস্কারাদি করিয়া খাটের পাশে দাঁড়াইয়া) কেমন আছেন?

মিঃ দত্ত। Bad as bad...

যামিনী। গঙ্গার ধারের হাওয়ায় একটুখানি ঘুরে বোধ করছেন না?

মিঃ দত্ত। (ক্ষীণ হাসে) It is too late in the day, my boy! (কিছুক্ষণ পরে) তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা কইবার আছে প্রকাশ।

যামিনী। আজ্ঞা করুন।

(অপিমা ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল)।

মিঃ দত্ত। প্রকাশ, আমি যা ভুল করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত নেই! আমার প্রাপ্যধিকা করার সমস্ত জীবনটাই আমি নষ্ট করে দিয়েছি! আর তুমি? সন্দেহ হয়, সুখী হ'তে পেরেছ কি না! কারণ আমার মেয়েকে যে দেখেছে, সে কি আর—থাক্ এ সব কথা বলবার হয় তো, হয় তো আমার অধিকারও নেই আজ!

যামিনী। (চোখ জলিয়া উঠিল, ঘরের আলোর কোন মতে রোধপূর্ব্বক গাঢ় কণ্ঠে)—অতীতের আলোচনা নিরর্থক! তার আপনি অসুস্থ। (কণ্ঠ পরিষ্কৃত করিয়া) মিহির কবে নাগাৎ ফিরছে?

মিঃ দত্ত। আমার কাছে যে আজ এই আলোচনাই সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, প্রকাশ! কেমন করে তাকে বোঝাই? আমি নিজে যাই হই, ওর জীবনটাকে নিয়ে bargain করা আমার একেবারেই উচিত হয় নি। তার ফলে মেয়ে আমার এই যে চির-সন্ন্যাসিনী হয়ে রইলো, সে তো আমারই ভুলে। তাতে তো আর কোনই ভুল নেই! সে স্পষ্টই আমায় বলেছে, বিয়ে সে কোন দিনই করবে না। আজ মিহির দেশে নেই, জানিনে কবে এবং কি ভাবে সে ফিরবে! ওকে এতদিন কে দেখবে?

যামিনী। (স্বগতঃ) আজ সুদীর্ঘ চারটী বৎসর পরে দেখলুম, কি অনির্ব্বচনীয় পবিত্র রূপ! কি স্বর্গের জ্যোতি ওর চোখে মুখে! আর কোথায় আমার স্ত্রী সুসঙ্গতা।

মিঃ দত্ত। প্রকাশ! দেশ বিদেশে অনেক ঘুরেছি। অনেকের সঙ্গে মিশতে সুযোগ পেয়েছি, বহু পাত্র অযাচিত হয়ে ওকে বিয়ে করতে ছুটে এসেছে; কিন্তু ও কারু দিকে চেয়ে দেখে নি. প্রার্থিতজনকেও দ্বিধাহীন চিত্তে প্রত্যাখান করেছে। আমি—হ্যাঁ আমিও তার জন্যে তাকে অপরাধী করতে পারি নি। কেন পারি নি? কেন পারি নি জান? তোমার মুখ, তোমার ব্যবহার সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যে জেগে উঠেছে! অন্তর পুরুষ তারস্বরে বলেছে,—ওরে মূঢ়! তার কাছে এরা কি? প্রকাশ! প্রকাশ! আমি হাতের মাণিক অতল জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি! আমার সব চেয়ে প্রিয় যে, তারই সর্ব্বনাশ আমি,—আমি স্বেচ্ছায় করেছি, আমি স্বেচ্ছায় করেছি! উঃ কেন তুমি জোর করে তাকে আমার কবল থেকে কেড়ে নিলে না? কেন নিলে না? কেন নিলে না?

যামিনী। ( সান্ত্বনা-শীতল কণ্ঠে ) আপনি জ্ঞানী, বৃথা পরিতাপ করছেন কেন? নিয়তির লেখাকে কে অতিক্রম করতে পারে?

মিঃ দত্ত। ( শুষ্ক হাস্যে ) এ সান্ত্বনা আমার জন্যে নয় প্রকাশ! আমি তো কোন দিন ওদের অস্তিত্ব মানি নি! আজ একান্ত অসময়ে, অসহায় আমি কি অপরিজ্ঞাতের পাদমূলে আত্মসমর্পণ করবো? না, না, এ' আমার স্বেচ্ছাকৃত কার্যের প্রত্যক্ষ প্রতিফল! এ আমার পাপের দণ্ড! এ আমিই বইবো! আর বইবে, আমার রক্ত নিয়ে যার জন্ম; শত নিরপরাধ হলেও—তাকে, তাকে,—হাঁা, তাকেও এ দণ্ড বইতে—হবে, হবে। আগুন হাত দিয়েছি, হাত পুড়বে না?

যামিনী। ( স্বগত ) আহও সেই একনিষ্ঠ নাস্তিকতা! বলবার কথা তো কিছুই খুঁজে পাইনে!

মিঃ দত্ত। প্রকাশ! আমার মৃত্যুর পর, অণিকে তুমি একটু দেখো। আমার উইলে তোমার আর আমার ভাগ্নী ছামাই রমেনকে তার সম্পত্তির executor করেছি। মিহির না আসা পর্যন্ত তোমরা—উঃ বড় কষ্ট! অণিমা!

অণিমা। ( প্রবিষ্ট হইয়া ) প্রকাশ বাবু! বাবা এখন একটু বিশ্রাম করবেন।

যামিনী। ( উঠিয়া নমস্কারান্তে ) আমি ও-বেলা আবার আসবো'খন।

( প্রস্থান )

অণিমা। বাবা! বড্ড বেশী কথা বলেছ তুমি, ও-বেলা আর আমি ওঁকে আসতে দেব না কিন্তু। (গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। )

মিঃ দত্ত। Oh! my past! "Hide me from my deep emotion" না, না এই আমি চুপ করছি। কিন্তু অণু! মা! প্রকাশ একটী রত্ন! উঃ আমি কি করেছি বল্ তো? এমন কেউ কি কখনও করে? অণি!

অণিমা। কি বাবা!

মিঃ দত্ত। তুই পলাশীর যুদ্ধ পড়েছিস?

অণিমা। পড়েছি তো বাবা! কেন? পড়বো? তুমি শুনবে?

মিঃ দত্ত। নাঃ, ওর একটা লাইন মনে পড়ে গেল,—

"সূর্য তুমি মাটী কাটি লভি কোহিনূর,
অনা'সে রত্নে যায়, ঠেলিয়া ফেলিলে পায়,
বিনিময়ে অঙ্গে মাটী মাখিয়া প্রচুর।"

অণিমা। বাবা! আমি তা'হলে উঠে যাচ্ছি! তুমি স্থির হয়ে একটু ঘুমোও দেখি, ওরকম করলে যন্ত্রণা বাড়বে যে!

মিঃ দত্ত। আচ্ছা মা, আমি ঘুমোব। তুমি কিন্তু একটা পড়ে শোনাও তা হলে।

অণিমা। ( উঠিয়া ) কি পড়বো বল তো?

মিঃ দত্ত। তোমার যা খুসী, "O late, late so late! and dark the night and chill! Late, late so late—"

অণিমা। বাবা!

মিঃ দত্ত। নাঃ আর না, ( মৃদু কণ্ঠে ) Late, late, so late—so late so—so—so—o

পঞ্চম দৃশ্য

[ কলিকাতার একটী বাসা-বাটী, রমেন্দ্র, ভূষণ ও অন্যান্য নটীগণ ]

রমেন্দ্র। এরা কে? এ কাদের বাড়ী ভূষণ! কোন ভদ্রলোককে তো কোথাও দেখছি না? কই? গান কে গাইবে? তুমি যে বললে এমন বিখ্যাত গাইয়ের গান জীবনে কখনো শুনি নি! তা কই ওস্তাদ-টোস্তাদ কাউকে তো কোথাও দেখছি না।

ভূষণ! এই যে এখনি এলেন বলে—

[ দ্বার খুলিয়া রমনের প্রবেশ, পিছনে দু'জন লোক, একজন বাঁয়া-তবলা লইয়া বসিল, একজন হারমোনিয়ম লইল ]

রমন। নমস্কার, কুমার সাহেব! আপনি কৃপা করে এ দাসীর কুঁড়ে ঘরে পায়ের ধুলো দিয়ে কৃতার্থ করেছেন, এর জন্য আমি জন্মের মত আপনার চরণে কেনা হয়ে গেছি জানবেন।

রমেন্দ্র। ( বিজড়িত কণ্ঠে ) আমার ও-সব কথা—আ-আ-আপনি এ-রকম···

রঞ্জন। ( হাসিয়া ) লজ্জায় যে কবলা কাণ দু'টী রাঙা হয়ে এ রাঙিয়ে ফেললেন !

বরেন্দ্র। ( ভূষণকে মৃদুকণ্ঠে ) ওঁরা বুঝি গান করবেন ?

ভূষণ। হাঁা, ইনি।

বরেন্দ্র। ( সবিস্ময়ে ) ইনি ? স্ত্রীলোক ? গান গাইবেন ?

ভূষণ। কলকাতায় এ-সব চাল আছে।—গান না বিবি সাহেব ! একখানা ভাল দেখে গান শুনিয়ে দিন না, দয়া করে। আমরা অনেক দূর থেকে আপনার গানের খ্যাতি শুনে ছুটে এসেছি।

রঞ্জন। কি গাইবো ?

ভূষণ। যা আপনার অভিরুচি।

রঞ্জন। কই, উনি তো কিছু বলছেন না ?

বরেন্দ্র। ( কোন মতে ) গান—

রঞ্জন। "আচ্ছা গাই—"

গীত।

না, না গো না, আশা ছাড়িব না।
আশায় বেঁচে রব, ভুলিব না।
যদি জীবন যায়, সাথে সব আশায়
নিরাশায় কেবা ধরিবে না।

সঙ্গিগণ। encore, encore—

রঞ্জন। ( আবার গীত )

বরেন্দ্র। ভূষণ ! এ আমায় কোথায় আনলে ? এ কি ইন্দ্রালয় ? মানুষে এমন গান গাইতে পারে ? কি চমৎকার গলা !

ভূষণ। তা' চুপি চুপি আমায় বলা কেন ? যিনি গাইলেন, তাঁকেই বলো না।

বরেন্দ্র। আ-আপনার গান আমার খুব ভাল লেগেছে !

রঞ্জন। ( হাসিয়া করযোড়ে ) সে আমার সৌভাগ্য। আপনার মত রসজ্ঞ মরমী শ্রোতাকে যে একখানা গান শোনাতে পেরেছি, এই আমার পরম সৌভাগ্য !

বরেন্দ্র। না, না সে কি—

রঞ্জন। তা ছাড়া আর কি ? এ-দিন কি আমার ভাগ্যে আর কোন দিন হবে ?

ভূষণ। আলবৎ হবে ! কি বলেন কুমার সাহেব ?

বরেন্দ্র। ( সাগ্রহে ) নিশ্চয়, আপনি যে দিন বলবেন, আমি এসে শুনে যাব।

রঞ্জন। ( ভূষণের সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিয়া ) আপনি রোজ রোজ কেন কষ্ট করবেন, শুনেছি আপনার গঙ্গার উপরে রাজবাড়ীর মতন বাড়ী আছে, হুকুম করলে আমিই তো সেখানে ছুটে গিয়ে হাজির হ'তে পারি।

বরেন্দ্র। ( ভূষণান্তিকে ) ভূষণ ! সেটা কি—

ভূষণ। চুপ চুপ, এক্ষনি শুনতে পাবেন যে ! আপনি এখনও নেহাৎ পাড়াগেঁয়ে আছেন ! ( রঞ্জনকে ) কুমার সাহেব বলছেন, সে আর আমায় জিজ্ঞাসা করছেন কেন ? আমি যখন ওঁর ঘরে এসেছি, তখনই তো ওঁর পাল্টা যাবার অধিকারই হয়ে গেছে !

রঞ্জন। ( মুখ টিপিয়া হাসিয়া ) ওঃ তাই বলছিলেন বুঝি ! তা' বেশ তো, আমি কালই যাবো'খন।

বরেন্দ্র। আমি আর একটী গান শুনতে চাই।

রঞ্জন। দেখবেন, কাণে আঙুল দেবেন না যেন সেইটায়।

গীত

আমি কত না যতনে মালাটী গেঁথেছি, তায় আশাপথ চাহি।
তায় আলো স্বপনে, আদুর বয়ানে, চেয়ে চেয়ে দিন বহি।
হায় ! এ মালা পরাবো কায় ? বঁধুর ঘর অন্ধকারে গেল,
শুখায়ে শুকিল হায়।
( আমার সাধের মালাটী শুকায়ে গেল, মালাটী শুকায়ে গেল,
তায় লাগি পাশে এ মালা রহিল। সে তব বিহনে সুখ না পেল।
আমার, সাধ করে গাঁথা মালা শুকালো। শুকানো এ মালা পরাবো কা'রে ?
এ মালা আর পরাবো কা'রে ? দুখের তাপে মালা শুকালো।
ছেড়ে ছেড়ে প্রাণে সুখ না পেল।
প্রাণের মনের সুখ ফুরালো, তবু শুকালো,
সেই তাপে বুঝি মালা শুকালো, এ মালা আমি পরাবো কা'রে ?)
যার আশা করে গেঁথেছ মালা ( আমি ) তারই হয়েন রহিব।
( সেই নিধুর, নিপট, শঠ বিহনে, সেই সে কঠিন পাষাণ বিনে,
আর তো কা'রেও মন যাচে না, অন্যের পরাণ কা'রেও চাহে না,
সে না আসিলে কারে না দিব,
আমার মালা ধূলে যাক প্রাণ ছাড়িব, সে যদি না আসে (এই) প্রাণই দিব।
কি হবে একার বিফল জীবনে, সে যদি বিহনে প্রাণই দিব,
আমার, এই মালা কেন্ ছার প্রাণ ছাড়িব )
সে যদি না এলো তাহির পরাণ, ধরণীর অবসাদে।

বরেন্দ্র। অপূর্ব !

বন্ধুগণ। Excellent……

জনৈক। Encore

রঞ্জন। খুব বা হোক ঠাট্টাটা করে নিলেন।

বরেন্দ্র। কি বলেন ! আমি গ্রামোফোনেই যা শুনেছি, খালি গলায় এমন গান আর কখনও শুনি নি। আচ্ছা আজ যাই, আর এক দিন এসে আবার এই রকম কীর্ত্তন শুনবো।

রঞ্জন। ( অভিবাদনান্তে ) সে আপনার দয়া !

ভূষণ। কাল যে আপনাকেই যেতে হবে। কুমার বাহাদুর যে যাবার নিমন্ত্রণ করেছেন।

বরেন্দ্র। ওঃ হাঁা, হাঁা, ভুল হয়েছে ! যাবেন্।

রঞ্জন। এ আপনার বিশেষ দয়া ! [ ক্রমশঃ

# প্রাচীন বাঙ্‌লা কাব্যে বঙ্গশ্রী

—শ্রীস্বদেশরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

প্রাচীন বাঙ্‌লার কথা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি, সুফলা-সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গমাতার সেই চিরগৌরবময়ী মূর্ত্তিও আমরা মানসপটে হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছি। বিস্মৃতির ধবনিকা ঘুচাইয়া পুনরায় প্রাচীন বাঙ্‌লার রূপকে ধ্যানগোচর করিতে হইবে। নগ্ন বাঙ্‌লার ঐতিহিহ্বল, মৃত্যু-ম্লান ও হতশ্রী রূপ দেখিয়া আমরা প্রাচীন বাঙ্‌লার কল্পনা করিতে পারি না। প্রাচীন বাঙ্‌লা কাব্যগুলিতে সেই প্রাচীন বাঙ্‌লার অনুপম সৌন্দর্য্যময়ী রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন বাঙ্‌লা কাব্যগুলির প্রতি অক্ষরে অক্ষরে প্রাচীন বঙ্গশ্রীর চিত্র সুচিত্রিত। কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি হইতেই কাব্যের বিষয় করিত হয়, কেন না, কল্পনা বাস্তবকে অবলম্বন করিয়া স্ফূর্ত্তি পায়। কবিকঙ্কণ চণ্ডী অন্যূন সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বেকার রচনা। সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙ্‌লা কেমন ছিল, চণ্ডীকাব্য পাঠে আমরা তাহা জানিতে পারি।

আদর্শ গ্রামের ছবি অঙ্কনে আমরা কবির কল্পনাচাতুর্য্যের লক্ষণ দেখিতে পাই,

"দেখিতে সুধার সারি ইন্দ্রের আওসারি
সারি সারি বিদুর দহন
কনক কলস চূড়ে নেতের পতাকা উড়ে
পুরন্দরে শোভে সুদর্শন
কোন দিন অধিষ্ঠান কোন দিন করে কথা
কেহ পড়ে ভারত পুরাণ
সদা যেন হইতে আসে পদ্মা বিদ্যার আসন।"

এই প্রকার ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কায়স্থ, নবশাক ও ইতর জাতিগণের বসতি ও বেশবিন্যাস লইয়া গ্রামের পরিকল্পনা। প্রাচীন বাঙ্‌লার নগর ও গ্রাম যে সুবিন্যস্ত ছিল, একটি কথায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

"... যার যত জন বসে
একপাশে তার অধিষ্ঠান।"

প্রাচীন বাঙ্‌লার ধর্ম্ম, বলবীর্য্য, ধনদৌলত, বাণিজ্য-সম্পত্তি সবই ছিল।

"তুলিয়া আখড়া ঘর মল্লযুদ্ধ করে নর
মালসাট করী চাপ পাড়ি
লইয়া চালখাঁড়া কেহ ধরে তোলাপাড়া"

আবার ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসঙ্গে চণ্ডীকাব্যে অধিকতর লিখিতেছেন,—

"বৈসে ধনে মহাজন কুল সেবে অনুক্ষণ
কুদি-কর্ণ করে গো-হরণ।
কেহ কালাজ্বর লয় মুখে কেহ ধান্য বয়
কাণে ফিরে গাঁথে কোন জন
কেহ হয় কড়ি তোলা হীরা নীলা মতি পলা
নানা বেশ ভ্রমে স্থানে স্থানে।"

প্রাচীন বাঙ্‌লার এই ছবি যেন স্বর্গছবি। সর্ব্বত্রই উজ্জ্বলতা, শুচিতা, বীর্য্যবত্তা ও পৌরুষ; সর্ব্বত্রই সুপ্রতুল অবস্থা।

অধুনা বাঙ্‌লার শতকরা তিয়ানব্বই জন নিরক্ষর। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্‌লায় এই শ্রেণীর উৎকট নিরক্ষরতা ছিল না।

"প্রথম সবারে বন্দী দেবপড়া সবে আদি
সর্ব্বজন নমস্কার শোভা।"

প্রাচীন বাঙ্‌লা ছিল ভাস্বর, প্রদীপ্ত। প্রাচীন বাঙ্‌লায় বাঙালীর লজ্জা নিবারণ করিতে বিদেশীর দ্বারস্থ হইতে হইত না।

"শত শত একমাস শুভঘটে তন্তুবাস
তুলি বুনি কুল মেড়পড়া।"

বর্ত্তমান বাঙালীরা হতভাগ্য, সর্ব্বহারা। বীর্য্যবল, অর্থসম্পদ, ব্যবসাবাণিজ্য, সর্ব্বক্ষেত্রেই সে বিপর্য্যস্ত। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্‌লায় সুপ্রতিষ্ঠ বাঙালীর সবই ছিল। তখন জমিদার নগর-স্থাপনের জন্য প্রজাকে আহ্বান করিত। দেশে প্রচুর পরিমাণে স্বাচ্ছন্দ্য থাকিলে, তবে এই প্রকার প্রলোভন-মুক্ত করিয়া প্রজা বসাইতে পারা যায়। অর্থনৈতিক উন্নতি ও সৌকর্য্যবিধানই জাতীয় উন্নতির প্রাথমিক পরিচয়। সে পরিচয় প্রাচীন বাঙ্‌লায় সুপরিস্ফুট। কালকেতু ফুল্লরা-মণ্ডলকে বলিতেছে,

"আইস আমার পুত্র সম্ভাষ করিব মুঞি
কাণে দিব কনক কুণ্ডল।"

প্রসাদের মধ্যেও দেখিতেছি—"কেহ কলন্তর নয়।"

চণ্ডীকাব্যে যেখানে ইতর-ভাতিদের বর্ণনা আছে, সেখানেও দেখিতেছি, সকলেই বিত্তবান, সুখী পরিবার।

"বাছুরা দিবসে পুত্র জাল বুনে বৎসর ভরে
কৌতুকে করে লীলারঙ্গে।"

অন্যান্য শ্রেণীরও সকলেরই "লীলারঙ্গে" দিন যাইত। প্রাচীন বাঙলায় দরিদ্র যে ছিল না, তাহা সুনিশ্চিত। সকলে সুখে স্বচ্ছন্দে খাইতে পরিতে পারিত। হাটে বাজারে "খুলের পুটলি বান্ধে, সাজি ভরে ল'য়ে কান্ধে" ব্যবসায়ীর মালাকর ভাতিয়া বিচরণ করিত। ইহাতে বুঝা যায় দেশে আদৌ অসন্তোষ পরিলক্ষিত হইত না।

প্রাচীন বাঙলায় বাঙালী কেরাণীর জাতি ছিল না। প্রাচীন বাঙালী কিন্তু "সাত ডিঙা সাজাইয়া" সিন্ধুবক্ষ মন্থন করিয়া দিকে দিকে বাণিজ্য করিতে যাইত।

"সাতখান ডিঙা ভাসে জলের ভরে।
পোরে বান্ধা সাত ডিঙা লোহার শিকলে।"

আর এই সব ডিঙাগুলি যেমন তেমন নহে,

"... দীর্ঘে ডিঙা শত হয়
আড়ে প্রস্থে বিশেষি প্রমাণ
মকর আকার মাথা পক্ষবুলা ঐছে যাতা
দাণ্ডিকে করিলে চক্ষু দান।"

ধুল্লনার কথায় বুঝা যায় যে, এক একখানি ডিঙা কত বড়।

"যদি শত কারিয়র যদি এক বৎসর
তবে হয় ডিঙা একখান।"

প্রাচীন বাঙলার সাধারণ মানুষগুলি পর্যন্ত চরিত্রবান্ ও ধর্মপরায়ণ ছিল। অতি নিম্ন ব্যাধজাতি পর্যন্ত কিরূপ শুদ্ধ-চরিত্র ছিল, চণ্ডীকাব্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। দেবী যখন ব্যাধ কালকেতুর গৃহে অবস্থান করিতেছেন, তখন কালকেতু বলিতেছে,

"আমি অতি দুরাচারী, এই ঘরে ঐছে নারী
একেলা উচিত নহে স্থান
আজির আমের ফল ভেল বড় অমঙ্গল পাপ
পরের কামার ঘর আওরা ঘরে।"

"চরণে ধরিয়া মাগি রাখহো নিলয়।"

কালুর নিজের মুখেই পরিচয়,—

"আখেটি ঝিলিক দাড় চৌদিকে পসরা হাড়
এই মোর সদাই সমান।"

প্রাচীন বাঙলা ছিল পল্লীপ্রধান। পল্লীকে কেন্দ্র করিয়াই বাঙালীর জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। পল্লীমাত্রই শ্রীশালিনী, সৌষ্ঠবসম্পন্ন-বিভূষিতা ছিল। প্রতি গ্রামেই স্বচ্ছসলিলা দীঘি, সরোবর, অন্ততঃ বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী থাকিত। গৃহগুলি সবই সুবিন্যস্ত—পর্ণকুটীর হইলেও কারুকার্যে সুশোভিত ছিল। প্রতি পল্লীর অপরিহার্য অঙ্গ ছিল দেবমন্দির। পথঘাট সুপরিষ্কৃত ছিল। প্রতি গৃহস্থের বহির্বাটীতে চণ্ডীমণ্ডপ থাকিত। পুষ্পবাটিকাও বিদ্যমান থাকিত। দেবপূজা নিত্যকর্ম ছিল বলিয়া প্রত্যেককেই পুষ্পোদ্যান রচনা করিতে হইত। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বেও এই প্রকার বহু পল্লীর অস্তিত্ব ছিল। অদ্যাবধি খুলনা জিলার সুদূর দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ঐ-রূপ দুই একখানি গ্রামের অস্তিত্ব রহিয়াছে।

প্রাচীন বাঙলায় জীবনসংগ্রাম ছিল না। তাই তখনকার বাঙালীরা বেশীর ভাগ গ্রামবাসীই ছিল। ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ এবং বণিক ব্যবসায় ও শিল্পকার্যে রত থাকিতেন; কাহারও চিন্তা ছিল না অথচ কাজকর্ম ছিল। সব কাজ নিয়মের পূর্বাহ্ণেই শেষ হইত। বিলাসব্যসন ছিল না—কাজেই কৃত্রিম অভাবী ছিল না, সকলে স্বাবলম্বী, স্বধর্ম-সেবী, শিল্পী ও ব্যবসায়ী ছিল, ফলে অর্থনৈতিক অনটন ঘটে নাই। অপরাহ্ণে প্রৌঢ় ও বয়োবৃদ্ধগণ একত্র মিলিত হইয়া নানা সদালাপে কালাতিপাত করিতেন; এবং যুবক ও কিশোরেরা আখড়ায় লাঠি খেলা ও কুস্তি করিত। চৈতন্যমঙ্গল ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে বাঙালীর জীবনের প্রতিচ্ছবি সুপরিস্ফুট।

"প্রতিঘরে শোভে অতি বিচিত্র কপাট।
প্রতিঘরে নৃত্যগীত আর বেদ পাঠ।"

মুকুন্দরাম বাঙলার পল্লীগ্রাম, নবনদী, বন উপবন, পশু-পক্ষী, তরুলতা, আচার-ব্যবহার, এক কথায় বাঙালীর পল্লী-জীবন প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন। চণ্ডীকাব্য সর্বাংশে মনন করিয়া রচিত হইলেও সমসাময়িক বাঙলা ও বাঙালীর ছবি কবির নিজস্ব মৌলিক হই।

দেবতার বন্দনা না করিয়া কোনও শুভকার্য্য আরম্ভ করিতেন না। ধনবান লোক তখনকার দিনে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে দেবতার উদ্দেশে দেউল দিতেন। ভক্ত-সাধারণ দেবপূজাকল্পে ভূমি দান করিতেন। গ্রামের বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত লোক ধর্ম্মাধিকরণী হইতেন। ব্রাহ্মণসন্তানগণও চাষ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেন, এ-দৃষ্টান্ত এখনও বর্দ্ধমান জিলায় বিরল নহে। তাঁহারা কৃষাণ নিযুক্ত করিয়া কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। মোটা ভাত-কাপড়ের জন্য তাঁহাদের বিশেষ কষ্ট ছিল না। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিরচিত শিবায়ণ পাঠেও এই কথা জানিতে পারি।

সমসাময়িক দিনের বৈষয়িক পরিচয় প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন যে, উহীরের অত্যাচারে কৃষিপের সময়ে পনর কাঠায় বিঘা, তাহাও জমির এক কোণ হইতে অন্য কোণে দড়ি ধরিয়া মাপ হইতে লাগিল। অনাবাদী 'খিল' ভূমির উপর আবাদী হিসাবে কর ধার্য্য হইল। পোদ্দার টাকায় আড়াই আনা কম দিতে লাগিল। দিন প্রতি এক পয়সা হিসাবে সুদ লইতে আরম্ভ করিল। পাছে প্রজা এই শুল্ক করভার সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করে তাই "দুয়ার আঁটিয়া দেই খানা।" লোক ব্যাকুল হইয়া যথাসর্ব্বস্ব—টাকার দ্রব্য দশ আনায় বিক্রয় করিয়া—পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল।

সমসাময়িক দিনের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ কবিগণের উপযুক্ত মর্য্যাদা দান করিতে কখনও পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। কবিকঙ্কণের গুণ দেখিয়া রাজুকারায় ধন আঢ়া খাঁ দিয়াছিলেন। নব্য বাঙলায় এই দৃষ্টান্ত বিরল। তখনকার দিনে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। কবিকঙ্কণ নিজেই দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। সপত্নী-কলহ ভালরূপ চলিত। কবির জন্মভূমি সরকার সুলেমানাবাদ সেলিমাবাদ —বর্ত্তমান রায়না রায়নগর তৎকালে শাসন ও রাজস্বের কেন্দ্রস্থল ছিল। কবির সময়ের 'রসাপু' দামোদরের শাখা ছিল। ঐ শাখানদী বাহিয়া দামিন্যার বড় বড় জাহাজ আসিত। বর্ত্তমানে 'রসাপু' একটি খালে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

তখনকার দিনে বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে 'চণ্ডী'র গান হইত। গায়কগণ মঞ্জিরাসংযোগে গানের সঙ্গে নর্ত্তন করিতেন। ইহাই তখন কাব্য-প্রচারের মধ্য দিয়া লোক-শিক্ষার প্রধান উপায় ছিল।

কবিকঙ্কণে তখনকার দিনের বাঙালীর বিবাহোৎসবের নিখুঁত ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। বিবাহে কোন চুক্তি থাকিত না। বিবাহের পর কন্যার পিতা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া দানসামগ্রী দিতেন।

পার্ব্বত্য প্রদেশের কোচ পল্লীতে তখন ঘৃত দধি ভিক্ষার সামগ্রী ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতার আলোকে আলোকিত নগর-বাজারে অতিথি সকল গৃহে একমুষ্টি তণ্ডুল ভিক্ষা পায় না। ইহা বাঙলার অতীত ঐশ্বর্য্য ও আতিথেয়তা এবং বর্ত্তমান দারিদ্র্য ও নৈতিক অবনতির বিশিষ্ট প্রমাণ। অতিথির পূজা করিতে বাঙালী কোন দিন পশ্চাদ্‌পদ নহে। যাঁহার যাহা থাকিত ঘৃত দধি পর্য্যন্ত ভিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হইত না। অধুনা মূল্যের বিনিময়েও ঘৃত দধি দুষ্প্রাপ্য। কবিকঙ্কণের ব্যঞ্জনের তালিকা হইতে, তখনকার গৃহস্থ বাঙালীর খাদ্যসামগ্রীর বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। কালকেতুর মাসে মাসে বারাণসীতে সম্বল প্রেরণে মনে হয়, বাঙালী প্রথম হইতে গোটা সমাজকে ধর্ম্মের বন্ধনে বাঁধিয়াছিল। তাই শতধাছিন্ন সমাজ প্রাণহীন হয় নাই।

কালকেতুর লোকবর্ণনা চিত্তা করিবার বিষয়। বাঙলার কালকেতুর মত বীরের তখন অভাব ছিল না। চণ্ডীর সহিত পশুগণের কথোপকথন হইতে সেই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার বেশ আভাস পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়ের সৌর্য্য তখন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। কবি কালকেতুকে ক্ষেত্রী ও বাঘকে আদি ক্ষেত্রী বিশেষণ দিয়াছেন। অনুক-হস্তীর বিলাপ হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বড় বড় ভূস্বামীগণ সে-সময়ের শাসকসম্প্রদায়ের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল। ছলে বলে ও কৌশলে তাহাদের ধনসম্পত্তি হস্তগত করিতে ও তাহাদিগকে হীনবল করিয়া রাখিতে রাজপুরুষগণ সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতেন।

বাঙলার অতীতের দিকে অনুসন্ধান করিলে লোকশিক্ষার এখন কিরূপ অধঃপতন হইয়াছে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তখন পুরাণ, ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারত গান, যাত্রা ও কথকতা প্রভৃতির মধ্য দিয়া সমাজের সকল স্তরের ভিতর প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বাঙলায় এখন যাহাদিগকে "অনুন্নত জাতি" বলা হয়, তাহারা মুসলমান শাসনকালেও এখনকার মত নিরক্ষর ও অনুন্নত ছিল না। পুরাতন

সাহিত্য, ইতিহাস ও পুরাতন দলিলাদি হইতে ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

বৈশাখ মাস—বাঙালীর নববর্ষ। নিরামিষ ভোজনের বিধান সর্ব্বত্রই প্রতিপালিত হইত। কার্ত্তিক মাসেও লোক নিরামিষ ভোজন করিত। এক্ষণে এদেশে লোপ পাইয়াছে, কিন্তু উড়িষ্যায় লোক এখনও কার্ত্তিক মাসে নিরামিষ ভোজন, পয়ঃপ্রদান ও জগন্নাথ দর্শনের বিধান পালন করিয়া থাকে।

ফুল্লরার দুঃখকাহিনী আমাদের ভাবিবার বিষয়। কবি প্রায় চারি শতাব্দীর পূর্ব্বসময়ের বর্ণনা করিয়াছেন। এই চারি শতাব্দীর মধ্যে মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়, লয় এবং নূতন রাজশক্তির ভারতে আগমন ও রাজ্যবিস্তার ঘটিয়াছে। দেশের উপর দিয়া এত তুফান চলিয়া গিয়াছে, এত রাজনৈতিক অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, এত ভিন্ন ভিন্ন বৈদেশিক সভ্যতার সহিত অবিরাম সংঘর্ষ চলিয়াছে, কিন্তু অর্থ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হিসাবে দরিদ্রের অবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেই ছোট কাপড়, সেই তাল পাতার ছাউনি ঘর, সেই হাটে রৌদ্রে পদব্রজে, সেই শীতে অনাবৃত দেহ এবং বার মাস সেই অর্দ্ধ-দহন সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। বরং আধিব্যাধির ও মৃত্যুর মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়াছে, অভাব ও অনশনের মাত্রা বাড়িয়াছে ভিন্ন কমে নাই। ব্যাধজাতির নিষ্পাপ সরল শুভ্রমনে কোনরূপ পাপ চিন্তার উদয় হওয়া দূরে থাকুক, যাহাতে অপরে কিছু সন্দেহমাত্র না করিতে পারে সেই জন্য তাহারা উদ্বিগ্ন হইত। অসহায়া রমণীকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিবার পক্ষে তাহারা অত্যন্ত উপযুক্ত ও বিশ্বাসী পাত্র ছিল। কালকেতুও অভয়াকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইবার সময়ে ফুল্লরাকে সঙ্গে লইতে চাহে। ইহাই হিন্দুসমাজের চিরন্তন নীতি। হিংস্রস্বভাব ব্যাধের বংশে জাত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত কালকেতু এতাদৃশ চরিত্রবল হিন্দুধর্ম্মেই সম্ভব ও সম্ভবপর মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে কালকেতুর চরিত্রে কবিকঙ্কণ হিন্দু-সমাজের যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার উপর কুমারী মেয়োর তুল্য বৈদেশিক ভ্রমণকারী লেখকলেখিকার পক্ষে কালিমা লেপনের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। হিন্দু-সমাজের প্রকৃত পরিচয় বৈদেশিকের প্রতিষ্ঠিত অথবা বৈদেশিক ভাবাজ্ঞান নাগরিক ধাত্রী চিকিৎসালয়ের বিবরণ হইতে পাওয়া যায় না। হিন্দুসমাজকে পরীক্ষা করিতে হইলে, হিন্দুসমাজের প্রকৃত পরিচয় লইতে হইলে, অন্ততঃ বেশে একাকিনী হিন্দু পল্লীগ্রামে কালুর বাটীতে আজও বিংশ শতাব্দীতে যাইতে হইবে, যেখা যাইবে, সম্বলহীন, অনশনক্লিষ্ট, কৌপীনধারী কালু একাকিনী অসামান্যা রূপ-লাবণ্যশালিনী মণি-মাণিক্যখচিত বেশভূষা-বিভূষিতা যুবতী অবলাকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করে।

সমসাময়িক যুগে চৌহাড় ব্রাহ্মণের উত্তম ব্রাহ্মণগণ পুরোধা হইতেন না। অনসাধারণও তাঁহাদের স্পর্শ করিত না। প্রায় চারি শতাব্দী পূর্ব্বেও উচ্চবর্ণের লোকগণ "ছুঁই ছুঁই" করিয়া আপনাকে স্বরচিত প্রাচীরে বেষ্টিত করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিত ও বাহিরের বিরাট পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিত না।

কবিকঙ্কণের পুরীনির্ম্মাণের বর্ণনা হইতে তখনকার দিনের স্থপতিবিদ্যার সুন্দর আভাস পাওয়া যায়। তৎকালে মুসলমানগণ নগরের পশ্চিমধারে ও কায়স্থকুল নগরের দক্ষিণপ্রান্তে বসতি লইত। বাঙ্‌লার তন্তুবায়গণ বস্ত্রশিল্পের কিরূপ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল সেই প্রসঙ্গে দেখিতে পাই যে,—

"শত শত তন্তুবায় বৈসে তথা একঠায়
বুনী, বনী খুরি কুবি পড়া।"

বৈদ্যগণ কেহ বা চিকিৎসা ও গো-রক্ষণকার্য্যে রত হইত, কেহ বা ব্যবসায়ে মন দিত এবং—

"সাজন করিয়া নাও কেহ যায় বাণিজ্য
সিন্ধুর চন্দন কিনি আনে।"

প্রাচীন বাঙ্‌লায় এই বণিক্‌দল কোথায় গেল? কবিকঙ্কণের সময়ে বাঙ্‌লায় নাটকের অভিনয়ও চলিত। সেকালে প্রাচীন লোকেও এ দেশে শিশুদের সহিত পারাবত উড়াইত। ইহা আদৌ আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার নহে। এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের অভিজাতবংশীয়গণের কুকুট-যুদ্ধ দর্শনের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। বিধবা বুড়ী, জোঠী, মাসী, পাতুলানীর দুর্দ্দশা কবির সময়েও ছিল। হিন্দুসমাজের এই প্রকার অধঃপতন বহুদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

তখনকার বাঙালী গৃহস্থের ভোজ্যের আয়োজন বিশেষ চিন্তার বিষয়। তাহার শতাংশের একাংশও এখন বাঙালীর জোটে না এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর স্বাস্থ্য, বল ও বিক্রম অতীতের স্বপ্নস্বরূপ হইয়াছে।

বৈশাখ মাসে নৃপতিগণ পুরাণ শুনিতেন। বৈশাখ মাসে চন্দন দান করা পুণ্যজনক কার্য্য ছিল। চারি শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই এ দেশের সকলে বাণিজ্যে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। দেশের সাধুরা বিদেশের তট ঘর ছাড়িত না। বিদেশী বণিকও বড় একটা দেখা যাইত না। তবু যে চন্দনের অভাব হয় তাহা নহে, নীলা, শঙ্খ, চামর, লবঙ্গ প্রভৃতি নানা-বিধ জিনিষের অভাব ঘটিতে থাকে। কিন্তু দেশের নৃপতিরা তখন বিবিধপ্রকারে বণিক্‌গণের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেন। বণিক্‌গণও সমুদ্রে তরী ভাসাইয়া দিগ্‌ দিগন্ত হইতে ধনরাশি আহরণ করিয়া আনিয়া স্বদেশের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিত। —তাহাতে এত বড় জাতির অধঃপতন কি সহজে হইয়াছে।

প্রাচীন বাঙলায় সর্ব্বশ্রেণীর মানুষকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার রীতি ছিল। মস্তিষ্কজীবীও জ্ঞানের সাধনা করিতেন; শ্রমিকও বিদ্যালাভ করিতেন। তবে জ্ঞানলাভের পথ ও প্রণালীর বৈষম্য ছিল। প্রাচীন বাঙলায় গণশিক্ষা বিশেষ ভাবেই বর্ত্তমান ছিল। তখন দেশের প্রত্যেক মানুষটিকেই শিক্ষা দেওয়া হইত। সেই শিক্ষা ছিল প্রধানতঃ চরিত্রগত। তাহাতে মানুষ প্রকৃত মানুষ হইতে শিক্ষা করে, পবিত্র হইতে, সংযত হইতে, ত্যাগী হইতে, সত্যব্রতী হইতে অভ্যাস করে, তাহারই চেষ্টা করা হইত। তখন আক্ষরিক শিক্ষা ছিল না, তাই তখন বাঙলায় মনুষ্যত্ব ছিল। সমাজে নানা উৎসব প্রচলিত ছিল এবং সেই সকল উৎসব নানা প্রকার পৌরাণিক লোক-শিক্ষামূলক সুমহান্ ইতিবৃত্ত লইয়া উদ্ভূত হইত। এই সমুদয় উৎসবে যে যাত্রাগান ও কথকতা হইত, তাহাতে সাক্ষর নিরক্ষর নির্ব্বিশেষে আত্মত্যাগ, মহত্ত্ব, শৌর্য্য ও বহু প্রকারের পুণ্যকাহিনী শ্রবণ করিয়া সকলে সেই ভাবে প্রবুদ্ধ হইত।

শুধু ইহাই নহে—বৈরাগী নিত্য যে গান গাহিয়া বেড়ায়, যে সুরে ভিক্ষা চায়, এক একটি পার্ব্বণে ও মেলায় যে কীর্ত্তন, কথকতা, কবি, তর্জ্জা হয়, তাহাতে জনসাধারণ একটা উদার শিক্ষায় অভিষিক্ত হইত। প্রাচীন বাঙলা শিক্ষায় আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। বাঙলার গণ-শিক্ষার আহারে, বিহারে, কর্ম্মে, বিশ্রামে, উৎসবে ও দুর্দ্দিনে সত্যকে জপ করিবার পদ্ধতি ছিল। দিবসে বৈরাগী বাউল গান করিত—গৃহস্থের দুয়ারে, হাটে, বাজারে দোকানে কাহারী-প্রাঙ্গণে। এই গানের ভাবে ও সুরে জনসাধারণের হৃদয়হারা মন ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইত। প্রাচীন বাঙলার ইহা এক অভিনব শিক্ষা-প্রকরণ। প্রাচীন বাঙলার গণ-শিক্ষায় শুধু একটি মাত্র বিশিষ্ট পদ্ধতি ছিল না, তখন সমাজ এমন সুবিন্যস্ত ছিল যে, তাহাতে জ্ঞানলাভের লক্ষ দ্বার উন্মুক্ত ছিল। প্রাচীন বাঙলার আর একটি শিক্ষণীয় ব্যাপার ছিল—বার মাসে তের পার্ব্বণ। প্রত্যেক পূজাপার্ব্বণের পিছনে পুণ্য পৌরাণিক কাহিনী বিজড়িত, উহা সমাজের সহিত নিবিড়ভাবে বিমিশ্র থাকায় প্রত্যেক মানুষ উদ্বুদ্ধ হইত। এই পূজাপার্ব্বণের আর একটি বিশেষ শক্তিশালী প্রভাব ছিল যে, ইহা কোন শিল্পকলাকে আশ্রয় করিয়া অনুষ্ঠিত হইত। তাহাতে বহু ভাস্কর এবং শিল্পীরও অন্নসংস্থান হইত। ইহার পর বারোয়ারী সামাজিক আনন্দের ব্যাপক অনুষ্ঠানস্বরূপ ছিল। ইহাতে শিক্ষা ও আনন্দের একত্র সমাবেশ ছিল। ইহার কেন্দ্রস্থলেও —দেবতা। কাজেই শুচির ভাবও বর্ত্তমান ছিল, যেহেতু দেবতাকে পুরোভাগে রাখিয়া যে উৎসবের আয়োজন, তাহাও পুণ্যময়, তাহাও সংযত, সংহত ও পাবনী শক্তিযুক্ত। থিয়েটার বায়োস্কোপের মত তখনকার দিনে যাত্রাগান, কথকতা, কবি, পাঁচালী, তর্জ্জা প্রভৃতি চিত্তবিনোদনের অবলম্বন ছিল। ইহার আনন্দ শুধুই বাসন ছিল না, শিক্ষার সহিত আনন্দ মিশ্রিত ছিল। ধনী, নির্ধন, আপামর সাধারণ জন্মোৎসবে, উপনয়নে, বিবাহে, কোন কিছু শুভকর্ম্মে, পাড়ার সকলে মিলিয়া কিম্বা নিজেরাই পাঁচালীর আসর বসাইত। শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন এমনই ভাবে সুগঠিত হইয়াছিল। তখনকার সাহিত্যাচার্য্যগণও গণ-শিক্ষার এক সহায় ছিলেন। এমন ভাবপ্লুত কাব্য, নাটক, কাহিনী, গাথা, গীতি তাঁহারা রচনা করিতেন যে, তাঁহাদের মনীষা জনসমাজের অন্তঃস্থল আলোড়িত করিয়া মাতাইয়া তুলিত। এমন পল্লী নাই যে সেখানে মনসার ভাসান গীত হইত না। জগদ্বিখ্যাত কবির রচনা এই মনসা-মঙ্গল। বাঙলার প্রত্যেক গ্রামে ও পল্লীতে উহার প্রচলন ছিল। এখনকার কাব্যনাটক, লোক-শিক্ষা ও শিক্ষার সাহিত্য নহে।

তখন অস্পৃশ্যতা ছিল দৈহিক, বর্ত্তমানে কিন্তু মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীন বাঙলার উৎসবানন্দ-মুখরিত

বারোয়ারী-তলায় ডোম, চাঁড়াল হইতে ব্রাহ্মণ জমিদার পর্য্যন্ত এক ক্ষেত্রে, অবাধ সম্মিলনে উচ্ছ্বসিত পুণ্যকথায় শিক্ষালাভ করিত। দেব-মন্দির হইতে প্রমোদাগার, শ্রমিকের কর্ম্মমুখর কর্ম্মক্ষেত্র পর্য্যন্ত একটি বিস্তৃত স্বাভাবিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল। সমাজপতি যখন সন্ধ্যার অবসরে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া শাস্ত্রপাঠ ও নানা সৎ কথার আলোচনা করিতেন, তখন পল্লীর জনসাধারণ শ্রদ্ধায় তাহা উৎকর্ণ হইয়া শুনিত। প্রাচীন বাঙ্‌লার মেলাগুলি মায়ের মত জনসাধারণকে কোলে টানিয়া আনিত। পুণ্যশ্রবণ আনন্দের শুভ্রধারায় জাতি ও সমাজকে পরিপুষ্ট করিত। দশটা বিদ্যালয়ে দশ বছরে যাহা না হয়, এক একটি মেলায় তাহা অনায়াসে সফল হইত। এই প্রধান প্রধান বিষয় ভিন্ন নওলী, গোষ্ঠী-বৎসপ্রসার প্রভৃতির ভিতর কত যে শিক্ষণীয় ব্রতপূজার প্রচলন ছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই।

গ্রীক সেনাবাহিনীসহ আলেকজাণ্ডার বাঙ্‌লার সীমান্তে উপস্থিত হইলে, অজয়নদের পরপারে দুর্জ্জয় বাঙালী সৈনিকের বীর্য্যপ্লাবনে ভাসিয়া গেল। বাঙ্‌লার যাহারা শান্তির দিনে পরমস্বস্তিতে গার্হস্থ্যজীবন যাপন করিত, যাহারা শিল্পী, যাহারা শ্রমজীবী তাহারাই এই গ্রীক-বিজয়ী জাতি। তাহারা এই বাঙ্‌লার হাড়ি, ডোম, দুলে, বাগ্দী, কেওট, কৈবর্ত্ত, চাঁড়াল, চাষা, গোয়ালা, অতি সাধারণ জন-সমাজ। ইহারা পর্ব্বতটের দাওয়ায় বসিয়া "হরি বেলা গেল, সন্ধ্যে হলো" এই বৈরাগ্যব্যঞ্জক সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে, যখনই দেশ, সমাজ, স্বধর্ম্ম ও স্বজাতি রক্ষার আহ্বান পাইয়াছে, বজ্রের মত জ্বলিয়া বিঘ্নকে ভস্মীভূত করিতে ছুটিয়াছে, নীরবে বুকের রক্ত ঢালিয়াছে; উৎপাত শেষ করিয়া আবার প্রশান্ত ভাবে গৃহাভিমুখী হইয়া লাঙল ধরিয়াছে, তাঁত বুনিয়াছে, মাটি কাটিয়াছে, ক্ষুদ্র গৃহের মত পুত্রকন্যা পালনে মন দিয়াছে, পুনরায় বৈরাগ্যমূলক গানে সান্ধ্য আকাশকে পবিত্র করিয়া দিয়াছে। বক্ষ-রক্ত-করণ, মৃত্যু, অতি সহজ কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করিয়াছে। অন্ধ বিজয়গর্ব্ব তাহাদের চিত্তকে দর্পিত করে নাই। প্রাচীন বাঙ্‌লার ইতিহাসের কোনও পৃষ্ঠায় বিকৃত জীবের পরিচয় নাই। তখন স্বায়ত্তশাসন আশ্চর্য্যরকমে পরিণতি লাভ করিয়াছিল। এক একটি পল্লী এক একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যখণ্ডের মত ছিল। কোন পল্লীর শাসনে পালনে, শিক্ষায়, আচারে, অনুষ্ঠানে আর কাহারও অধিকার ছিল না। প্রতি গ্রামের পরিচালনা গ্রামের দশ জন মণ্ডলের দ্বারাই নির্ব্বাহ হইত। গ্রামের যখনই কোনও জাতীয় কর্ত্তব্য উপস্থিত হইত, তখন গ্রামের সকলেই মিলিত হইয়া পরস্পরের সাহচর্য্য ও শুভবুদ্ধির সাহায্যে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফেলিত। সেই সম্মেলন যদিও কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নেতৃস্বরূপে পরিচালনা করিতেন, তথাপি গ্রামা সকলেই অভিমত দিবার অধিকার পাইত। এমন গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসনপদ্ধতি জগতের অপর কোন জাতির মধ্যে বিকাশ লাভ করে নাই।

মুসলমান রাজত্বের অবসান কালে ও ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্ব ভাগে, বাঙালীর শ্রেষ্ঠবিশেষ ডাকাত হইয়াছিল। তাহারা পথিকের ধন প্রাণ হরণ করিত, গৃহস্থের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত, তাহারা সমাজের পক্ষে একটা বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা অধিকাংশই শ্রমিক শ্রেণীর। ক্ষেত্রবিশেষে অভিজাত-সম্প্রদায় ইহাদের নেতৃত্ব করিতেন। যে সকল লোক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ডাকাতিতে লিপ্ত রহিত, তাহারা তখনকার রাজকীয় সৈন্য-বিভাগে নিয়োজিত রহিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। কেহ বা ভূম্যধিকারীর বা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পাইক ও লাঠিয়ালগিরি করিয়া বৃত্তি পাইত। মোটের উপর শারীরিক বলচর্চ্চাই ইহাদের কার্য্য ছিল। সামাজিক রীতিতে শৌর্য্যবীর্য্যানুশীলনের সহস্রবিধ সুবিধা থাকায় ইহারা শক্তিমান্ হইত, সমাজে ইহাদের সুবিধা ও মর্য্যাদাজনক স্থান হইত। বিগত কালের রাষ্ট্রবিপ্লবে বাঙ্‌লার এইরূপ বহু ডাকাত জমিদার হিলেন। ইহাঁরা ডাকাত অথচ দস্যু নহেন—ইহাঁরা চাহিতেন বাঙ্‌লায় স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। ইহাঁরা মুসলমানকেও স্বীকার করিতে পারেন নাই, আবার নবাগত ইংরাজকেও বর্জ্জন করিতে সচেষ্ট ছিলেন। এই সম্প্রদায় ধনবৃদ্ধিকল্পে বিত্তবানদিগের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতেন। ইহাঁদের স্বরূপ প্রচ্ছন্ন ছিল; কেবল ইহাঁদের পোষ্যরা পাইক ও লাঠিয়ালরাই ডাকাত আখ্যা পাইয়াছিল। অভিজাত শ্রেণীর ডাকাত বলিয়া যাঁহারা পরিচিত ও তন্মধ্যে যাঁহারা স্বাধীনতাপন্থী ছিলেন, তাঁহারা স্বজাতি ও সমাজের উন্নতির দিকে

সঙ্গে রাখিয়া নূতন পুরাতন উভয় রাজশক্তির বিরোধিতা করিয়াছেন। ইহাঁরা রাজস্ব লুঠন করিয়াছেন, রাজভোগ কাড়িয়া খাইয়াছেন ও নিজের প্রাপ্য রাজস্ব বন্ধ করিয়া স্পষ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। ইংরাজের প্রথম আমলে "আনন্দমঠে" যে সন্ন্যাসীবিদ্রোহের উল্লেখ আছে, তাহাও ঐ ডাকাত এবং ডাকাতি।

বাঙলার কতকগুলি লোক বল-বিক্রমের চর্চ্চায় উদরান্নের সংস্থান করিত। ইহারা সৈনিকের বৃত্তি লইয়া পাইক, লাঠিয়াল, দারবান হইয়া নিরন্তর ঐ যুদ্ধ-বিগ্রহের কাজেই লিপ্ত থাকিত। অথচ এই বলিষ্ঠশ্রেণী রাষ্ট্রবিপর্য্যয়ে তাহাদের চিরন্তন প্রতিষ্ঠাভূমি হারাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক দিক্ দিয়া একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। পুরাতন রাজশক্তি শক্তিহীন হওয়ায় সেখানে ইহাদের কোন ঠাঁই হইল না, নূতন রাজতন্ত্র বিদ্রোহের আশঙ্কায় পরাজিত পক্ষের অকর্ম্মণ্যতার অজুহাত বলিয়া ইহাদের সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করিলেন না। জমিদার প্রভৃতির অধীনে যাহারা কর্ম্ম করিত, তাহারাও জমিদারের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে কর্ম্মহীন হইল। অতঃপর এই উপেক্ষিত শ্রমিক-গুলি জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহকল্পে বৃত্তি গ্রহণ করিল। ডাকাতি এবং যুদ্ধে বেশী প্রভেদ নাই। স্বাধীন দেশে যাহার নাম যুদ্ধ—পরাধীন দেশে তাহাই ডাকাতি। যদি বাঙলার যুদ্ধজীবী সম্প্রদায়কে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করা হইত, তুরানীদের হাতে যদি আত্মশাসনের ক্ষমতা থাকিত ও ঐ বীর্য্যশালী লোক-দিগকে বীরত্বব্যঞ্জক কার্য্যে নিয়োগ করিতেন, তবে ডাকাত বাঙালীর উদ্ভব হইত না। বাঙলার ডাকাতি নিছক চুরতি নয়, উহার পশ্চাতে বহু সেবাব্রত ও যথার্থ মনুষ্যধর্ম্মী খাঁটি মানুষের অন্তঃকরণ ছিল। এই সব ডাকাতির অর্থে অগণিত দুস্থ গৃহস্থ প্রতিপালিত হইত। প্রাচীন বাঙলার মানুষগুলি যেমন অধীনস্থজনের প্রতি মমতাময় ব্যবহার করিত, সমাজের সর্ব্ববিধ শ্রেণীর সহিতও তেমনই হৃদ্য-ভাবে আদানপ্রদান করিত।

সমবায়—স্বাধীন বাঙালীর জীবনে একান্ত স্বাভাবিক ও সহজ হইয়াছিল। প্রাচীন বাঙলার সমবায় দুইটি রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল—পারিবারিক ও সামাজিক। পারিবারিক সমবায় প্রত্যেক ব্যক্তিজীবনের সাধ্যায়ত্ত ছিল। সামাজিকভাবে যাহা কর্ত্তব্য তাহা তো ছিলই। বাঙলার যে ব্যক্তিগত সমবায় প্রথা ছিল, তাহার মধ্যে মানুষের ধর্ম্মপরায়ণতাই অনুসৃত হইত। তখন সমগ্র সমাজটি যেন একসূত্রে গ্রথিত ছিল। বাঙলার দিনমজুর বিত্তহীন, প্রতিষ্ঠাহীন, গৃহহীন ছিল না। তাহারা ধনীর ভূমি চাষ করিয়া, ধনীর সহিত আধা-আধিভাগে উৎপন্ন ফসলের ভাগ লইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত গৃহস্থের মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। বাঙলার কৃষাণ ইউরোপের শ্রমিকের মত ধনীর ক্রীতদাস ছিল না বা ছয়ছাড়া গৃহহীনও ছিল না। ইহা প্রাচীন বাঙলার সমবায়ের একটি শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ। প্রাচীন বাঙলার ধনীরা উৎসব আয়োজন করিয়া প্রত্যেককে তাঁহার অর্থের অংশীদার করিতেন; আর যাহার অর্থসঙ্গতি তেমন সচ্ছল নয়, সে শারীরিক শ্রম দিয়া, শ্রমোৎপন্ন ফসল দিয়া যথাসাধ্য সংযোগ-সূত্র রক্ষা করিয়া চলিত। ধনী যে-ক্ষেত্রে মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়া মিলনকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতেন, শ্রমিক তথায় গাছের একটা লাউ, একটা কুমড়া দিয়া তাহার প্রতিদান দিত। পরস্পরের স্নেহ ও শ্রদ্ধা থাকিলে একটা প্রণতি—একটা রাজ্যখণ্ড দানের অপেক্ষাও পরিষ্কৃত হয়, একটা আশীর্ব্বাদ-মণিমাণিক্য উপহারের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হয়। তাই বাঙালীর সমবায়ে কখনও অসঙ্গতি দোষ আসে নাই। ছোট বড়কে শ্রদ্ধা করিত, বড় ছোটকে স্নেহ করিত। এমনি ভাবে ছোট বড়'র মিশিয়া বাঙালীর জাতীয় জীবন—এক জীবন হইয়া উঠিয়া-ছিল। বাঙালী শাস্ত্রশাসিত জাতি। তাহার জাতীয় জীবন শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানের নির্দ্দেশে পরিচালিত ছিল। বাঙালী হিন্দুর শাস্ত্র একটা ব্যক্তিগত ও একটা সমষ্টিগত সাধনার নির্দ্দেশ দিয়াছে। ব্যক্তি-বাঙালীকে সমষ্টি-বাঙালীর সহিত এক সঙ্গে চলিতে হইত। তাই বাঙালীর জাতক্রিয়ার সহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—এমন কি শ্রাদ্ধক্রিয়ার পর্য্যন্ত সামাজিক সংযোগ রহিয়াছে। বাঙালীর শিশুসন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন কেবল পিতামাতারই আনন্দ হয় না, সমাজের আরও দশজনকে লইয়া সেই জন্মোৎসব নির্ব্বাহ হয়। বাঙলার সমাজ-অঙ্কে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে এই সমাজের সহিত সংযোগ রাখিতে বাধ্য। কোন বাঙালীর জীবনযাত্রা একাকী নির্ব্বাহ হইতে পারিত না, এমনই তখন বিধিবিধান ছিল।

আর এই মিলন কোন সম্প্রদায় বিশেষকে—কেবল উচ্চ-বর্ণকে অভিজাত গোষ্ঠী বা ব্যক্তিকে লইয়াই নহে, পরন্তু সমাজের যে যেখানে আছে সকলকে লইয়াই।

প্রত্যেক হিন্দু বাঙালীকে কতকগুলি নিত্য ও নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহা পরিহার করিয়া কোনও বাঙালীর সমাজ-জীবনে ঠাঁই নাই। প্রত্যেক হিন্দু বাঙালীকে জাতকর্ম হইতে শ্রাদ্ধক্রিয়া পর্যন্ত করিতে হইবে। ইহার ব্যত্যয় ঘটিতে পারিবে না, ধনবান্‌ও ইহা করিতে বাধ্য। নৃপতি বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করিবেন, কিন্তু যে নিয়ম তাহাকে বালির পিণ্ডও দিতে হইবে। এই ক্রিয়াকাণ্ডগুলি, ইহা ব্যক্তিগত খেয়ালে বা ইচ্ছায় হইবে না, কোন সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রথাতেও হইবে না, শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধিবিধানের উপর নির্ভর করিয়াই হইবে। আর ঐ-শাস্ত্রীয় বিধিবিধান প্রত্যেক অনুষ্ঠানের এমন নিখুঁত নির্দেশ করিয়াছেন, যাহাতে কাহাকেও বাদ দেওয়া চলে না। প্রত্যেক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ হইতে শিল্পী, বণিক, শ্রমজীবী সকলেরই সাহচর্য শ্রম ও সম্মিলন অপরিহার্যরূপে আবশ্যক। পূজা করিলে পূজক যেমন ভাবেই আত্মানুশীলন করুন, তাঁহাকে পূজার অঙ্গ স্বরূপে সমবায়মূলক কতকগুলি অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহা অপরিহার্য। যে কোনও পূজায় ব্রাহ্মণের আবশ্যক, মূর্তি গঠনের জন্য সূত্রধর ও কুম্ভকারের প্রয়োজন, পুষ্প ও সজ্জার জন্য মালাকারের প্রয়োজন, বাদ্যের জন্য বাদ্যকর আবশ্যক। এমনই বিবাহ, পূজা, জাতকর্ম বা শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বাঙালীর সমাজের উচ্চবর্ণ হইতে নিম্নবর্ণ পর্যন্ত সকলেরই ঠাঁই আছে। এমন সমবায়মূলক সমাজবিন্যাস-পদ্ধতি এই ধন-বিজ্ঞান-সৃষ্ট সমবায়ের অপেক্ষা সুন্দর নহে কি! প্রাচীন বাঙলার সমবায় প্রথায় বিয়োগ, প্রতিযোগিতার লেশ মাত্র নাই। বাঙালীর সমাজের নিম্নস্তর, কুলবর্ণ ও কুলকর্মকে অতিক্রম করিবার উপায় নাই। যিনি যাঁহার পূজা করেন, তিনি তাঁহার পুরুষানুক্রমিক পূজারী ও পুরোহিত; এমনই সূত্রধর, কর্মকার, কৌরকার, বাদ্যকার প্রভৃতিরও। ইহাতে সংযোগ ও সমবায় অব্যাহত থাকে, হৃদ্যতা ও মিলন ক্রমশঃ গাঢ় হয়।

এই জন্যই বাঙালী ঐশ্বর্যবানের সন্তান একজন বয়োবৃদ্ধ অন্ত্যজ শ্রমজীবীকেও শ্রদ্ধা করিত, আবার একজন নিরক্ষর শ্রমিকও সমাজের অভিজাতগণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিত। বিরুদ্ধাচরণ বা হিংসার লেশ মাত্র নাই। বর্ণাশ্রম ধর্মকে বাঙালীর সমবায় অপূর্ব নমনীয়তা-মধুরতায় লইয়া সমাজে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা এবং মৈত্রীভাব সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিল।

---

# করিনু কি ভুল

—শ্রীঅমিয়মোহন বসু

এ সারা জীবন শুধুই কি আমি করিনু ভুল!
বৃথাই কি আমি উদাসী হইয়া সাজি 'বাউল'!

দেব-পূজা সাঙ্গ করিনু সাঙ্গারে,
রেখেছি নিয়ত দক্ষিণ ধারে,
প্রতিমার কাছে হ'য়েছি আকুল,
চরণে দিয়েছি এনে কত ফুল!
করিনু ভুল?

দেখেছিনু ধরা শুধু দুখভরা,
অসতা প্রেম, কলুষিত ধরা,
সত্যের পথ বাধা-সঙ্কুল,
নির্জনতায় কাঁদি অতুল।
করিনু ভুল?

পূজাশেষে আমি উঠিনু যেমনি
অসীম আকাশে শুনিনু যে ধ্বনি—
"পূজা নহে সব, জীব-সেবা মূল,
মাটিরে দেবতা ক'রনা বাতুল,
করোনি ভুল।"

# কলমী-লতা

—শ্রীধরণী ভট্টাচার্য্য

কলমী শাকের ঘণ্ট লইয়া মনু ও পিণ্টুতে মারামারি বাধিয়া গেল।

ব্যাপারটা সামান্যই। ও পাড়ার সিধু বৈরাগী ঠাকুর-পাড়া হইতে ফিরিবার সময় সরমাকে কিছু চাল দিয়া গিয়াছিল। ঠাকুরপাড়ায় সে দিন কামাখ্যা ঠাকুরের বাড়ীতে বিশেষ কিসের যেন পূজা ছিল। সিধু কামাখ্যা ঠাকুরের স্ত্রী কেমঙ্করীর বিশেষ অনুগত,—কাইটা ফরমাসটা খাটিতেই আছে। পূজা শেষে কেমঙ্করী বলিলেন, "যাবার সময় কিছে থাল কটা নিয়ে যেও সিধু অবিশ্যি অবিশ্যি করে—"

সিধু বৈরাগী একসময় সরমাদেরই আশ্রিত ছিল। তখন অবশ্য সরমাদের অবস্থা এতটা খারাপ হইয়া পড়ে নাই। শ্বশুর মোটামুটি রকম যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, বুদ্ধিমতী হইতে পারিলে কোন কষ্টই হইত না। কিন্তু সরমার স্বামী অমল অতটা কষ্ট করিতে রাজি ছিলেন না। অল্প বয়সে মদ এবং আনুষঙ্গিক কয়েকটা নেশা আসিয়া জুটিল এবং একদিন যখন পাওনাদারগণের তাগাদায় অতিষ্ঠ হইয়া তিনি এই শান্তিহীন জীবন ও প্রাণহীন জগতের উপর অতিশয় বীতশ্রদ্ধ হইয়া, তাঁহার নশ্বর দেহ ও অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন,—তখন সরমা পুত্র দু'টির হাত ধরিয়া প্রতিবেশি-গণের দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিলেন, দু'টি উদরান্নের জন্য। গ্রামের কোন কোন সহৃদয় ব্যক্তি দয়া করিয়া মাঝে মাঝে চাঁদা তুলিয়া কিছু কিছু সাহায্য করিতেন, কিন্তু তাহাতে আর কতদিন চলে? তাই মাঝে মাঝে সরমাদের দুই বেলাই ভাত হইত, কোন কোন দিন বা এক বেলা, কিন্তু বেশীর ভাগ দিন একেবারেই না। সরমা এটা ওটা দিয়া বা কাহারও বাড়ী হইতে দু'টি ভাত চাহিয়া আনিয়া ছেলেদের খাওয়াইত।

ভাত যে দিন হইত না, মনু ও পিণ্টু হয় ত সকাল হইতে উঠিয়া ভাবিত, এইবার মা নিশ্চয় ভাত চড়াইবে, কিন্তু বেলা যখন ক্রমে বাড়িয়াই চলিত, মনু উসখুস্ করিতে করিতে বলিত, "বড্ড দেরী করে মা—মা-টা আজকাল বড় দুষ্টু হয়েছে—না রে পিণ্টু?"

পিণ্টুও বোধ হয় তাহাই মনে মনে ভাবিতেছে, মায়ের পানে চাহিয়া মুখখানা কাঁদোকাঁদো করে, ভাবটা যেন 'বড্ড খিদে পেয়েছে'।

মনু আশ্বাসের সুরে বলে, "আজকে ভাত হবে পিণ্টু তুই খাবি—আমি খাব—সেই বসি থালাটা করে—এই এতগুলো খাব আমি—আর তুই—?" বলিয়া ভাতের পরিমাণটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে পিণ্টুকে দেখায়। খাবার রকম দেখিয়া পিণ্টু বোকার মত হাসিয়া উঠে।

কিন্তু আশায় আশায় থাকিয়াও যখন ভাতের কোনরূপ চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন মনু মায়ের নির্লিপ্ততায় বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিত, "কত বেলা হোল, ভাত চড়াবে না মা?"

সরমা ছেলেকে নানা রকমে কথায় ভুলাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু মনু ভুলিবার ছেলে নয়। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আবার সেই কথাই আনিয়া ফেলিত। সরমা নিরুপায় হইয়া বুঝাইত, "লক্ষী বাবা আমার, আজকে ভাত রাঁধতে নেই কি না, আজকে আমার 'বোস্ত' আছে। এ বেলা মুড়ি খাও দু'জনাইয়ে, ও বেলা তখন সাহুদের বাড়ী নেমন্তন্ন খেও, বেশ?"

মনু সাহুদের বাড়ীর নিমন্ত্রণে কিছু মাত্র উৎসাহ দেখায় না। মায়ের কথায় তাহার ঠিক প্রত্যয় হয় না, মা অমন প্রায়ই বলিয়া থাকে। মনু ইনাইয়া বিনাইয়া সুর তোলে,—"না রাঁধতে নেই বই কি—রোজই তোমার 'বোস্ত' থাকে, আমি কিছু বুঝি না বুঝি, এঁ্যা…"

সরমা অতি কষ্টে ছেলেকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলে, "শোন্, খাবার গল্প বলি শোন্—রাণুর বিয়ে হবে—আমরা নেমন্তন্ন খেতে যাব, কত খাবার, সে কি শুধু ভাত? তখন দেখবি কত লুচি মণ্ডা, ছরে মরণার সন্দেশ, রসগোল্লা, কিছুতি মরণার ছানার জিলিপি…" বলিতে বলিতে সরমার নিজের জিভেই জল আসিয়া পড়ে।

গল্প শুনিতে শুনিতে মনু কোন্ এক সময় সরমার কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

আজ প্রায় তিন দিন তাহারা ভাতের মুখ দেখে নাই। সরমা এটা ওটা দিয়া কোন রকমে ছেলেদের ভুলাইয়া রাখিয়াছে।

সিধু বৈরাগী মাঝে মাঝে সরমাদের খোঁজ লইত। সরমার শুষ্ক মুখ দেখিয়া সিধু বুঝিতে পারে—চালের খুঁটে বাঁধা ছিঁড়ে চাল ক'টা তাই আর সে দিন ফিরাইয়া লইয়া গেল না, সরমাকে চাল ক'টা দিয়া গেল।

বাড়ীর পিছনেই একটা এঁদো পুকুর জঙ্গলে প্রায় ভরিয়া গিয়াছে। সাপের,—বিশেষ করিয়া রতন ঠাকুরের ভয়ে কেহ পুকুরটায় নামিতে সাহস করিত না। এক কালে পুকুরটা সরমাদেরই ছিল, দেনার দায়ে রতন ঠাকুর কিনিয়া লইয়াছেন। পুকুরে তিনি নূতন মাছ ছাড়িয়াছেন, ওটার দিকে তাঁর কড়া নজর ছিল।

তিন দিন পরে শুধু ভাত ক'টা কি করিয়া ছেলে দু'টোর মুখের সামনে ধরিয়া দেয়। সরমা চুপি চুপি পুকুরটায় নামিয়া কতকগুলো কলমী-শাক সংগ্রহ করিয়া আনিল। ভয়—পাছে রতন ঠাকুর দেখিতে পান।

রতন ঠাকুর দেখিলেন না—দেখিলেন তাঁহার গৃহিণী সৌদামিনী ঠাকুরাণী। গোল গোল চক্ষু দু'টি ঘুরাইয়া, হস্ত ও পদের অপূর্ব্ব ভঙ্গিসহকারে বলিয়া উঠিলেন, "ও মা, তাই ও বলি পুকুরের এত মাছ যায় কোথায়! ভালখাকির এমন দিনের বেলায় মাছ চুরি করে গা। বলি ও ভাল মানুষের মেয়ে—এটা কি তোমার বাবার কেলে পুকুর পেয়েছ যে—" তিনি আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন—সরমা সদ্য সংগৃহীত হাতের কলমী-শাকগুলোর প্রতি সৌদামিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিল, "মাছ নয় পিসিমা, এই দু'টো শাক তুলছিলাম মা…"

ঠাকুরাণী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "থামো বাছা, শাক দিয়ে আর মাছ ঢেকো না—ও মা ছি ছি ছিঃ কি ঘেন্নার কথা মা! যাদুনের ঘরের রাঁড়ী মাগী—" বলিতে বলিতে পাড়ার এই সুখবরটুকু পরিবেশন করিতেই বোধ হয়, তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলেন।

সরমা শাক কয়টি জলে সিদ্ধ করিয়া, সামান্য লবণ ছিটাইয়া সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যাবেলায় তাহাই দিয়া ছেলেদের ভাত বাড়িয়া দিল। কিন্তু গোলমাল বাধিল মনুকে লইয়া। পিন্টুর পাতে যে শাকের পরিমাণ বেশী হইয়াছে ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য মনু উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

সামান্য আতপ চাউলের বরের দুই ভাত, ছেলেদেরই কুলায় না, নিজের জন্য আবার কি রাখিবে—তাহার উপর দুজনে পুকুরের মধ্যে ইহাই লইয়া মারামারি বাধিয়া গেল। হাঁড়ির গায়ে এক মুঠা ভাত হয় ত লাগিয়া আছে, মনু কিছুতেই হাঁড়িতে তাহা রাখিতে দিবে না, সব তাহার পাতে ঢালিয়া দিতে হইবে। তাহাতেও নিরস্ত না হইয়া মনু দূরের পাত্রটা দেখাইয়া বলে, "উই অতগুলো শাক কেন রেখেছ তুমি, এঁ্যা—তুমি বুঝি খাবে?"

সরমা বলে, "না বাবা আমি খাব না তুমি খাও, খেতে পারলে আবার দেব।"

মনু ছাড়ে না, বলে, "আগে খাও তুমি।" বাধ্য হইয়া সরমাকে অবশিষ্ট শাকটুকু মনুর পাতে তুলিয়া দিতে হয়।

মনু আর খাইতে পারে না। পাতের ভাত লইয়া নাড়াচাড়া করে। পিন্টু শান্ত ছেলের মত খাইয়া উঠিয়া পড়িয়াছে।

সরমা বলে, "আর খাইয়ে দিই তোকে।" মনুর ভরসা হয় না বলে, "না তুমি নিজে খেয়ে ফেলবে, খাবে না বল এঁা?"

সরমা প্রতিশ্রুতি দিয়া মনুকে খাওয়াইতে বসে।

প্রদীপের আলোটা তেলের অভাবে ঝিমিত হইয়া আসে। সরমা ফুঁ দিয়া প্রদীপটা নিভাইয়া দেয়। মনু প্রতিবাদ করিয়া উঠে, "আলো নিভিয়ে দিলে কেন?" সরমা বলে, "তেল নেই বাবা, এ-কটা ভাত এমনিই খেয়ে নাও, লক্ষ্মী বাবা তো।"

মনুর পেট ভরিয়া গিয়াছে। সরমা মনুর অলক্ষ্যে অন্ধকারেই দু'এক গ্রাস ভাত নিজের মুখে তুলিয়া লয়। মনুর মনে হয় তো সন্দেহ জাগে, বলে, "আর খেতে পাচ্ছি না মা, আমার ভাত ক'টা ঢাকা দিয়ে রেখে দাও, পিন্টু যেন খেয়ে ফেলে না, আমি পরশু দিন খাব, শুনছ ও মা, মা কথা কইছো না যে।"

কথা কহিলে পাছে ধরা পড়িয়া যায়—এই ভয়ে সরমা তাড়াতাড়ি মুখের ভাতগুলা চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিয়া বলে, "আচ্ছা চল্ আঁচিয়ে দিই গে।"

ছেলেদের শোয়াইয়া, ঘুম পাড়াইয়া, চুপি চুপি ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া, সরমা অন্ধকারেই মনুর উচ্ছিষ্ট পাতের পোড়ায় বসিয়া পড়িয়া সে দিনের সংগৃহীত কলমী-শাক সযত্নে অবশিষ্ট ভাত কয়টি সহযোগে অবশিষ্ট ভাত কয়টি সহযোগে গিলিতে থাকে।

# হিন্দু সমাজের কয়েকটি দিক্

—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়

দীর্ঘকালব্যাপী ভারতবাসী জনসাধারণের নিরক্ষরতা, পুরোহিতগণের কূপমণ্ডূকতা এবং অধিকাংশ পণ্ডিতের শাস্ত্রবচন সমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার অক্ষমতা প্রযুক্ত প্রাচীন হিন্দু সমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে অনেকগুলি দোষ প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কীয় নিষেধ বোধ হয় ইহাদের অন্যতম।

সমুদ্রযাত্রা :

বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা যে দেশের ধন বৃদ্ধি করা যায়, অর্থোপার্জ্জনের পথে ইহাই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা, ইহা প্রাচীন হিন্দুগণ বিলক্ষণ জানিতেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন—

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং, ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ ॥

অর্থাৎ বাণিজ্যেই লক্ষ্মীদেবী বাস করেন, কৃষিকার্য্যে উহার অর্দ্ধেক, রাজসেবা অর্থাৎ চাকুরীতে কৃষিরও অর্দ্ধেক অর্থ লাভ হয়; ভিক্ষা দ্বারা কিছুই লাভ করা চলে না। বাঙ্গালী ব্যবসায়িগণ আজিও একঘরে হইবার আশঙ্কায় 'কালাপানি' পার হইতে সাহস পান না। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, বহু পূর্ব্বকালে তাঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষেরা এবং দক্ষিণ ভারতীয় বণিকগণ চীন, মিশর, বাবিলন, ফিনিশীয়া, গ্রীক, রোম ও জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন।

মহাবীর আলেকজাণ্ডার ৩২৬ খৃঃ পূর্ব্বে পাঞ্জাব প্রদেশ আক্রমণ করেন এবং পুরুরাজকে পরাস্ত করিয়া সমুদ্রপথে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সংকল্প করেন। এই সময়ে তাঁহার নৌসেনাপতি নিয়ার্কাসের আদেশে ভারতীয় নাবিকগণ দ্বারা বাহিত এবং ভারতীয় শিল্পীদ্বারা নির্ম্মিত বহুসংখ্যক অর্ণবপোত আট হাজার পদাতিক সৈন্য, কয়েক সহস্র অশ্বারোহী এবং বহুতর রসদাদি লইয়া পারস্যোপসাগরে গমন করিয়াছিল। ৩২৫ খৃঃ পূর্ব্বে বার্টিস প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর সভাপতি বিখ্যাত অগাথারকাইডিস ১৭৭ খৃঃ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, সে সময়ে সিন্ধুনদ ও পাটল হইতে বাণিজ্যপোত সকল ইউরোপে যাতায়াত করিত। পোর্ত্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিলে হিন্দু বণিকদিগের সহিত মিলিত হন এবং তাহাদের পথ অনুসরণ পূর্ব্বক ভারতের কালিকট বন্দরে প্রথম উপনীত হন।

ভারতীয় হিন্দু নাবিকগণ যে শুধু ইউরোপ ও আফ্রিকার উপকূলে বাণিজ্য করিতে যাইতেন, তাহা নহে; পূর্ব্ব ভারতে জাভা, বালী প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে তাঁহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যীশুখৃষ্টের জন্মের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি ভারতবাসী "শেনসি" অতিক্রম করতঃ পূর্ব্ব সীমান্তে একটি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই রাজ্যের নাম ছিল শিন (T'sin) অর্থাৎ চীন। ফিনিশীয় পরিব্রাজক মার্কো পোলো এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাপক লাকুপিরি প্রমাণ করিয়াছেন যে, ৬৮০ খৃঃ পূঃ কিয়াও-চাউ উপসাগরে ভারতীয় বণিকগণের একটি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ উপনিবেশের নাম ছিল "লংগ বা লংইয়ে।" আর উহার রাজধানী "শি-মিয়ো" বা "শিমো" নামক পল্লীতে অবস্থিত ছিল। ঐ বণিকদিগের মুদ্রাযন্ত্র দেখিয়া চীন-দেশের যুবরাজ আপন রাজ্যমধ্যে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। ৬৮০ খৃঃ পূঃ চীনের য়ু (Tu'u), সি (Tsi) এবং ইয়ে (Yueh) প্রদেশ পরস্পরের মধ্যে বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে চীনের ঐ-হিন্দু উপনিবেশিকগণ "লংগ" পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। জগতের মধ্যে বাঙ্গালী ও কোরিয়া-(বর্ত্তমান চুসেন)-বাসিগণ মস্তকে টুপি ব্যবহার করেন না। এইরূপ সাদৃশ্যের কোন ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য নাই কি? ঐ-দেশের স্ত্রী পুরুষের নাম ও কিংবদন্তী আলোচনা করা প্রয়োজন।

অতি প্রাচীন কালে একমাত্র ভারতবাসিগণই সূর্য্যের রশ্মি হইতে ধাতুকাচের সাহায্যে অগ্নি উৎপাদন

করিতে জানিতেন। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে এইরূপে অগ্নি উৎপাদনের প্রথা ভারতবাসীগণকর্তৃক চীনে প্রচলিত হইয়াছিল। কন্‌ফিউসিয়সের সময়েও চীনারা ইহার বিষয় অবগত ছিলেন না। "পংগ" দেশের সমুদ্র-বিহারী ভারতীয় বণিকগণ কর্তৃক যে ঐ যন্ত্র ও অগ্নি উৎপাদন প্রণালী চীনদেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহা "মৌ-লি" গ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে।

ফলতঃ চীনাগণ তখন হিন্দু ছিলেন ও অগ্নির উপাসনা করিতেন। মনুসংহিতায় চীনদিগকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। পরে যখন বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ চীন দেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার করেন, তখন তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। চীন সম্রাটের সহিত "হউয়ান-কিউ" অঞ্চলের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্ম আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ২০০ খৃঃ পূঃ অব্দে ব্রাহ্মণ নীতির অনুসারী হিন্দু-দিগের প্রভাব, চীনের উত্তর সীমানায় হিউংনাম জাতির মধ্যে বিস্তৃত হয়। এ-বিষয়ে অধিক কথা লেখা নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক পাঠক-পাঠিকারা এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে, বহু পূর্ব্বকালেও হিন্দুগণ সমুদ্র যাত্রা করিতেন এবং বিদেশেও হিন্দু উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এমনও শুনিতে পাওয়া যায় যে, এখনও অনেক গুজরাটী হিন্দু বণিক গুড় ও চিড়ার বস্তা সঙ্গে লইয়া জাহাজে চড়িয়া মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রে পর্য্যন্ত ব্যবসায় করিতে গিয়া থাকেন।

উত্তর কালে সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ কি? ঐতিহাসিকগণ এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিবেন। সাধারণ বুদ্ধিতে অনুমান হয় যে, এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার নানা স্থানে মুসলমান ধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিলে, আত্মরক্ষার্থ হিন্দুগণ ঐ প্রথা অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। পরের ছেলেকে বাঁচিয়া উঠিতে না দিলে, নিজের ছেলে-দেরই শাসন করিতে হয়। এই বাধা নিষেধের মূলে অবশ্যই কোন যুক্তি ছিল; নতুবা বিনা প্রয়োজনে কেবল মাত্র কয়েকজন পণ্ডিতের কথায় কি অর্থশালী বণিকসম্প্রদায় পূর্ব্ব-পুরুষদিগের রীতিনীতি ও অধিকার পরিত্যাগ করিতে রাজী হইত?

অল্পকাল পূর্ব্বেও দেখা গিয়াছে যে, অধিকাংশ বাঙ্গালী হিন্দু যুবক শিক্ষার্থে ইউরোপে গিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করিত এবং অনেকে মেম বিবাহ করিয়া দেশের বাড়িতেও বিধা করিত না। হিন্দুর আচার-ব্যবহার ও পোষাক-পরিচ্ছদ তাহাদের কাছে ঘৃণা বলিয়া বিবেচিত হইত। এই কারণে অনেক পিতামাতা পুত্রদিগকে শিক্ষার্থে বিলাতে পাঠাইতে সাহস পাইতেন না। কেহ কেহ আবার পুত্রের বিবাহ দিয়া তাহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইতেন, যাহাতে তাহার ধর্ম্ম নষ্ট না হইতে পারে। দুর্ব্বল হিন্দু সমাজের মধ্যে বৈদেশিক অনাচার ও ব্যভিচার যাহাতে বণিকগণ অথবা অন্য কোন হিন্দু দ্বারা আনীত না হইতে পারে, এই কারণেও পণ্ডিতেরা হয়তো সমুদ্র-যাত্রাকে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা দিয়া থাকিবেন। তবে সুখের বিষয় আজকাল হিন্দু যুবকদিগের মধ্যে জাতীয়তা-বোধ জাগরণের ফলে অনেকেই আর বিদেশ হইতে সাহেব হইয়া ফিরিতেছে না। সুতরাং তাহাদিগকে হিন্দু-সমাজ সাদরে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

## বিদেশ-ভ্রমণ

বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে যখন একমাত্র সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বিরাজ করিত, তখন ভারত স্বাধীন ও উন্নত ছিল। অতঃপর যখন আত্মধর্ম্মে যাগযজ্ঞের বাহুল্য ও পশুবলি প্রভৃতির প্রাবল্য ঘটে, তখন সমাজমধ্যে একটা বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। ইহারই ফলে তখন জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া আর্য্যধর্ম্মকে একরূপ গ্রাস করে। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম চীন জাপান প্রভৃতি দূরদেশে প্রচারিত হয়। খৃষ্টান পাদ্রীরা এখন যেরূপ নানা দেশে খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়ান, তখন বৌদ্ধ শ্রমণেরাও সেইরূপ এশিয়া ও ইউরোপের অনেক স্থানে বৌদ্ধ মত প্রচার করিতেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই স্থলপথে ভারতীয় মূল্যবান পণ্যদ্রব্য গ্রীস ও ইতালীর বাজারে বণিকগণ দ্বারা বিক্রীত হইত। সেখানকার পথে কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণ দিয়া ইউরোপের দিকে একটা বাণিজ্য-পথ ছিল। তাতার দস্যুদিগের অত্যাচারের ফলে ঐ-পথ পরিত্যক্ত হয়। তখন বেলুচিস্থান ও পারস্যের মধ্য দিয়া পণ্যসামগ্রী হুরমুজসাগরের তীরস্থিত টায়ার বন্দরে নীত হইতে থাকে, এবং তথা হইতে ঐগুলি সমুদ্রপথে রোমের বাজারে গিয়া উপনীত হয়। "আফগানিস্থান ও তুর্কীস্থানের মধ্য

দিয়া একটি বাণিজ্য-পথ খুব দূর চীনদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সব পথ দিয়া প্রাচীন হিন্দু সন্ন্যাসীরাও ইউরোপের নানা অংশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। কেহ কেহ এরূপ অনুমান করেন যে, তাঁহাদের কেহ কেহ সুদূর ইংলণ্ড পর্য্যন্ত গমন করিতেন। প্রাচীন বৃটেনে এক জাতীয় সন্ন্যাসী দেখা যাইত। অধিবাসিগণ তাঁহাদিগকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত। রাণী বোয়াডিসিয়া তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং রোমান শাসকদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া যুদ্ধে নিহত হন। কোন কোন ইংরাজ পণ্ডিতের মতে ঐ-সকল সন্ন্যাসী ভারতবাসী ছিলেন। তাঁহারা দাড়ি, গোঁফ ও চুল রক্ষা করিতেন এবং সাধারণ লোককে নানাবিধ ঔষধ প্রদান করিতেন। এখনও আমরা সাধারণ হিন্দু সন্ন্যাসীদিগকে এরূপ করিতে দেখিতে পাই। দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় জাতির বাস। কেহ কেহ এমনও বলিয়াছেন যে, দ্রাবিড়-জাতীয় হিন্দু সন্ন্যাসীরা বৃটেনে যাইতেন বলিয়া তাঁহারা সাধারণতঃ দ্রাবিড় বা 'ড্রুইড' নামে অভিহিত হইতেন। হিন্দুই হউন আর বৌদ্ধই হউন, ভারতবাসী সন্ন্যাসীরা যে বিদেশে নিজ নিজ ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া বেড়াইতেন ইহাতে সন্দেহ নাই। কালক্রমে খৃষ্ট ও মুসলমানধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিতে থাকায় হিন্দু সন্ন্যাসীরা আর বড় একটা বিদেশে যান নাই। সম্প্রতি ভারতীয় অনেকগুলি সন্ন্যাসী আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ধর্ম্মমত

সহসা কি বিশ্বাস করিতে পারা যায় যে, যে-কালে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ বর্ব্বরতার অন্ধকারময় গর্ভে নিমজ্জিত ছিল, সেই সময় হিন্দুদিগেরই পূর্ব্বপুরুষগণ ধর্ম্ম-জ্ঞান-বিজ্ঞানের উজ্জ্বল দীপশিখা হস্তে ধারণপূর্ব্বক সংসারকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন? বর্ত্তমান কালের অধঃপতিত এই ভারতেরই প্রাচীন নিভৃত তপোবন হইতে ওঙ্কারধ্বনি উত্থিত হইত; উদার-হৃদয় মুনি-ঋষিগণের সেই বেদধ্বনির দিব্য জ্যোতি জগৎকে উদ্ভাসিত করিত; ভারতের সেই সুপ্রাচীন ধ্বনি, সেই অমৃতময় বাণী—সেই মন্ত্রই—ভারতের গৌরবের বস্তু। ইহাকেই আশ্রয় করিয়া হিন্দু ধর্ম্ম ও সভ্যতা বহুবিধ বাধা অতিক্রম করতঃ ভারতে বিদ্যমান থাকিতে সমর্থ হইয়াছে।

"বৈদিক যুগে আর্য্যগণ নির্দ্দিষ্ট প্রথানুসারে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি দেবতার পূজা করিতেন। উত্তরকালে কিন্তু এই ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। আর্য্য-সমাজে বহুবিধ ধর্ম্মমত প্রচারিত হয়। জৈন, বৌদ্ধ, শাক্ত, শৈব, পাশুপত্য ও বৈষ্ণবগণ নিজ নিজ ধর্ম্মমত সাধারণের মধ্যে প্রচার ও অনুরূপ আচার ব্যবহারাদির অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু এই সকল মতেরই মূল লক্ষ্য ছিল—"আত্মার আত্ম-সম্মিলন"। সব মানুষের আকৃতি যেরূপ অবিকল একই প্রকারের হয় না, সেইরূপ সকলেরই প্রকৃতি, জ্ঞান, অধিকার কখনই একই প্রকারের হইতে পারে না। কেহ পণ্ডিত, কেহ বা মূর্খ, কেহ ধার্ম্মিক, ধর্ম্মপরায়ণ আবার কেহ বা নিষ্ঠুর প্রকৃতির হইয়া থাকে। একই শ্রেণীর সকল ছাত্রকে শিক্ষকগণ সমভাবে উপদেশ দান করিলেও, সকলে সমানরূপ শিক্ষালাভ করিতে পারে না, ইহা তো নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয়। সেই জন্য প্রাচীন ঋষিগণ অধিকারীভেদে ধর্ম্মাচরণের বিভিন্নরূপ পন্থা ও ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। শিশুকে কেহ উপনিষদের সুকঠিন তত্ত্ব শিক্ষা দিতে যাও হয়েন কি? ভূপৃষ্ঠে পতিত বৃষ্টির জলরাশি শত সহস্র নদী ও নালা দিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে ও বিভিন্ন মুখে ধাবিত হইলেও, সকল জলেরই উদ্দেশ্য যেরূপ সাগর-সঙ্গম, শাস্ত্রাদিতে বিভিন্ন প্রকারে ধর্ম্মাচরণের ব্যবস্থা থাকিলেও সকলেরই লক্ষ্য সেই আনন্দ-সাগর-সম্মিলন চিরানন্দ মহাসমুদ্রে অবগাহন। আপাতঃদৃষ্টিতে উহাদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য লক্ষিত হইলেও, মূলতঃ কোন প্রভেদ খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলতঃ বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধান করাই ভারতীয় ধর্ম্মসমূহের বৈশিষ্ট্য। সেই জন্য বিভিন্ন মতাবলম্বীরা অন্যের ধর্ম্মমত লইয়া মারামারি কাটাকাটি করেন নাই; অপর ধর্ম্মমতকে ভ্রান্তও বলেন নাই। তাঁহারা ভাল ভাবেই জানিতেন ও মানিতেন যে, সকল ধর্ম্মেরই উদ্দেশ্য এক—ভগবানকে লাভ করা। ভারতের বাহিরে যে-সকল ধর্ম্মমত উদ্ভূত হইয়াছিল, উহাদের অনুসরণকারিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্ম্মের কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়াই আপনাপন ধর্ম্মমত দেশ-বিদেশে প্রচার করা আবশ্যক মনে করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন যুগে যাগ-যজ্ঞাদির অত্যধিক আড়ম্বর ও নিরীহ পশুবলির প্রাচুর্য্য ঘটিলে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি ঘটে। এই ধর্ম্ম অশোকাদি সম্রাটদিগের সাহায্যে চীন, জাপান প্রভৃতি বিদেশেও প্রচারিত হয়। অধিকাংশ ভারতবাসীই উহা গ্রহণ করে। দীর্ঘকাল ধরিয়া উহা ভারতে বিরাজিত ছিল। কালক্রমে ভগবান বুদ্ধের সেই উদার বাণী—"অহিংসা পরমোধর্ম্ম"—আর ভারতবাসীদিগের হৃদয়ে স্থান পায় নাই। হিন্দুর তান্ত্রিকতার সংমিশ্রণে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। নিরাকার ব্রহ্মের স্থানে আকারোপাসনার প্রাদুর্ভাব হয়। তখন বৌদ্ধধর্ম্মে পৌত্তলিকতা দেখা দেয়। বুদ্ধদেবের নখ, চুল, দন্ত, বস্ত্র প্রভৃতি বৌদ্ধগণের প্রধান উপাস্য হইয়া উঠে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ধর্ম্মভাব ও চরিত্রের পবিত্রতা বিলুপ্ত হয়। কুমারী ভিক্ষুণীগণও বৌদ্ধ শ্রমণদিগেরই অনুরূপ হইয়া পড়েন। বর্ত্তমান সময়ে অশিক্ষিত সাধারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনাচারের ফলে মহাপ্রভুর উদার ধর্ম্ম যেরূপ অনেকটা কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে, একসময়ে বৌদ্ধধর্ম্মেরও ঠিক সেই অবস্থা ঘটে। আজকাল লোকে যেমন তান্ত্রিকদিগকে কদাচারী বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকে, সেই সময় লোকেরা বৌদ্ধগণকেও সেইরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে। ফলে পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম মাথা তুলে; বেদান্তের উন্নত ধর্ম্ম ভারতীয় বৌদ্ধগণকে হিন্দু করিয়া লয়। পরবর্ত্তী কালে কিন্তু পুনরায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার অনুকরণে তান্ত্রিকতা দেখা দেয়। অবশেষে সেই তান্ত্রিকতা উচ্ছৃঙ্খলতায় ও ব্যভিচারে পরিণত হয়। হিন্দুধর্ম্ম আপন স্বরূপ হারাইয়া ফেলে। এই সময়ে হিন্দুর রীতি-নীতি, চাল-চলন, সমাজ ও ধর্ম্ম—সকলই বিকৃত হইয়া পড়ে। মূর্ত্তিপূজার প্রাদুর্ভাব ঘটে; কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজাই হিন্দুর প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হয় এবং শাক্ত, শৈব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটে। এই সময়েই সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবল আকারে দেখা দেয়। ক্রমে ক্রমে বাহ্যিক আচার ও বাহ্যনিষ্ঠাই হিন্দুধর্ম্মের ব্যাপকত্ব এবং সার্ব্বজনীনত্বের স্থান অধিকার করিলে হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে অন্তঃসারশূন্য হইয়া উঠে।

হিন্দুগণ যখন এইরূপ বিচারবিহীন ও সাম্প্রদায়িক পূজাদি লইয়া আত্মকলহে ব্যাপৃত হন, সেই সময়ে—অর্থাৎ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে আরবগণ সিন্ধু প্রদেশ অধিকার করিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। পরে মুসলমানেরা ধীরে ধীরে ভারতের সিংহাসন অধিকার করিয়া লন এবং প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এ দেশে রাজ্য শাসন করেন। তাহার ফলে হিন্দু সমাজের বন্ধ জাঁটুনি অনেকটা শিথিল হইয়া পড়ে। বহু হিন্দু, বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর, অনেকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারতীয় মুসলমান সমাজের সৃষ্টি করে। আধুনিক কালে অনেক হিন্দু যেরূপ ইংরাজ শাসকদিগের সংসর্গে আসিয়া খৃষ্টান হইয়াছেন, কেহ বা নানাবিধ প্রলোভনে পড়িয়াও খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দেশীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়কে পুষ্ট করিতেছেন, পূর্ব্বকালেও অনুরূপ কারণে হয় তো কেহ কেহ মুসলমান হইয়া থাকিবেন। এতদ্ভিন্ন মুসলমান সমাজের সাম্যভাব ও স্বজাতি-প্রীতি এই কার্য্যে যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। শিক্ষা ও দীক্ষায় যথেষ্ট উন্নতি করিলেও আচারনিষ্ঠ গোঁড়া ব্রাহ্মণবর্গ নিম্ন শ্রেণীর হাড়ী, মুচি, ডোম প্রভৃতি বংশের কোন লোককে আপনাদের উচ্চ সমাজে স্থান দেন না, কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সেই লোকই উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যেও স্থান লাভ করিতে সমর্থ হন; বিবাহ দিতেও বাধা থাকে না। এক সমাজে অবাধ নির্য্যাতন, আর দেশের মধ্যেই অন্য সমাজে সাদর আপ্যায়ন, এরূপ প্রলোভন কতজন এড়াইতে পারে?

## হিন্দু সমাজে গ্রহণ

হিন্দু সমাজ চিরকাল বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় গোঁড়ামি প্রকাশ করে নাই। সর্পাদি পূজক দ্রাবিড়জাতি প্রথমে আর্য্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন না। অনেক ঐতিহাসিকের মতে তাহারা বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অগস্ত্য ঋষি সর্ব্বপ্রথমে বিন্ধ্যপর্ব্বত পার হইয়া দাক্ষিণাত্যে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং সেই সময় হইতে ধীরে ধীরে বৈদিক ধর্ম্ম দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বত্র বিস্তৃতি লাভ করে। বৈদিক কাল হইতে পৌরাণিক কাল পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে যবনাদি অনেক অন্যধর্ম্মী ব্যক্তি-সম্প্রদায় হিন্দু সমাজে গৃহীত হইয়াছিলেন। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

প্রাচীন গ্রীকগণ 'যবন' নামে পরিচিত হইতেন। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পূর্বেও বৈদেশিকগণ এ-দেশে আসিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের একান্ত অভাব। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদিগকে ভারত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। কিন্তু পাঞ্জাবের পূর্ব্বাঞ্চলে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের সন্নিকটে "বাক্ট্রিয়ানা" প্রদেশে তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। মৌর্য্যবংশের অবসানে শুঙ্গবংশের অভ্যুদয় হইলে তাঁহারা পূর্ব্বদিকে যমুনা নদীর তীর এবং দক্ষিণে কাথিয়াবাড় প্রদেশে (সুরাষ্ট্রে) গ্রীক আধিপত্য বিস্তার করেন। "মিলিন্দ পহ" বৌদ্ধদিগের একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ। উহাতে লিখিত আছে—"মিলিন্দ" যবন ছিলেন, নাগসেন কর্ত্তৃক তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। পশ্চিম ভারতের গিরি-গুহার মধ্যস্থ শিলালিপিসমূহে যবনগণের বিবিধ দানের পরিচয় পাওয়া যায়। পুণার সন্নিকটস্থ জুন্নার, নাসিক ও কার্লির গিরি-গুহার মধ্যস্থ অনেক স্তম্ভ যবন রাজাদিগের দান বলিয়া খোদিত আছে।* সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অনেক যবন (গ্রীক) বৌদ্ধ ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন এবং অনেকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। যবন শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলে চক্ষে হিন্দু চন্দ্র বলিয়া মনে হইত না কি? গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত বেসনগরে একখানি স্তম্ভ-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ লিপিতে গরুড়-ধ্বজের বিষয় উল্লিখিত আছে। দেবাদিদেব বাসুদেবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য "দিয়ার পুত্র হেলিওডোরো ঐ গরুড়-ধ্বজ নির্ম্মাণ করেন। রাজা আন্টালিকিডা (এণ্টিয়ালকিডাস্) রাজা ভাগভদ্রকে ঐ গরুড়-ধ্বজ উপহার দেন।" স্তম্ভে এইরূপ লেখা আছে। হেলিওডোরো গ্রীকদূত ছিলেন। দিয়া বা ডিওও গ্রীক ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত লিপিতে যবনরাজ "ভাগবত" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। গ্রীক হইয়াও যিনি গরুড়-ধ্বজ নির্ম্মাণ করিতে পারেন এবং "ভাগবত" উপাধি ধারণ করেন, তিনি যে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক বিশিষ্ট বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই, এইরূপ অনুমান কি অসঙ্গত?

গ্রীক বা যবনগণের ন্যায় শকগণও ভারতে আসিয়া আপনাদের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলেন। এই শকজাতি এক সময়ে পাঞ্জাব ও আফ্‌গানিস্থানের পূর্ব্বাংশে আধিপত্য স্থাপন করেন। শকদিগের অধিনায়কত্বে তাঁহাদিগের অধিকৃত দূরবর্ত্তী প্রদেশসমূহে যাঁহারা শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিতেন, তাঁহাদিগের উপাধি ছিল "ক্ষত্রপ" বা "সাত্রাপ" (satrap)। এই সকল সাত্রাপ শীঘ্রই স্বাধীন হইয়া উঠেন। ইহাঁদের অনেকেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তক্ষশিলার "কুসুলস"-বংশীয় ক্ষত্রপ লিয়াক বুদ্ধদেবের সমাধির উপরে এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে এরূপ করিতেন কি? শকবংশীয় ক্ষত্রপদিগের আর দুইটি সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পরিপোষক ছিলেন। ক্ষত্রপ "ঔষবদত্ত" ব্রাহ্মণ ও দেবতার নামে ষোল খানি গ্রাম উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত সোমনাথ পত্তনে প্রভাসতীর্থে আট জন ব্রাহ্মণের বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি প্রতি বৎসর লক্ষ ব্রাহ্মণকে চর্ব্বা-চোষ্য-লেহ্য-পেয় প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন করাইতেন। যিনি নিজে অহিন্দু, তিনি এরূপ কার্য্য কখনও করেন কি? বহুত্বের খাতিরে এতদূর হয় না। শকবংশীয় ক্ষত্রবর্ম্মনও হিন্দু হইয়াছিলেন।

শকদিগের সমসময়ে "আভীর" নামে আর এক বৈদেশিক জাতি ভারতে প্রবেশ করে ও নানা স্থান লুণ্ঠন করিয়া শেষে ভারতেই বসবাস আরম্ভ করিয়া দেয়। বিষ্ণুপুরাণে ও মহাভারতের মুষলপর্ব্বে আভীরদিগকে দস্যু ও ম্লেচ্ছ বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের দেহান্তে অর্জ্জুন যখন যাদবদিগের সুন্দরী রমণীগণকে লইয়া দ্বারকা হইতে পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া মথুরায় প্রস্থান করিতেছিলেন, তখন আভীরগণ আক্রমণ করিয়া অর্থাদি সহ যাদব রমণীদিগকে হরণ করিয়াছিল।*

পরে ইঁহারাই ভারতে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন।

* "বেসুকাণ্ডারায় দিয়স্যস নাম যবনস্য দানং"—এই স্তম্ভ।

"যবনস্য চংদালস্য দেয় ধন পরিযাদ।" —জুন্নার; অর্থাৎ যবন চণ্ড এই যাগ নির্ম্মাণ করিয়াছেন—জুন্নার। ইত্যাদি।

* "হতে যদি গাণ্ডীব ধনুঃ পরাসন। প্রীতমনে লইয়া পার্থ ধনুর্দ্ধর যবন। কৃষ্ণের রমণীগণে দেখিবারে পায়। যেন কালে দৈত্যদল আইল ধোয়ায়। কৃষ্ণের রমণীগণে হরিল এখন। একত্র হইয়া যুক্তি করে সর্ব্বজন। গ্রীগণ লইয়া গেল অজ্ঞান যবনে। দৈত্যগণ অর্জ্জুনেরে পরাজিয়া রণে। —কাশীরামী মহাভারত (দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত), মুষলপর্ব্ব, ১০৮০ পৃঃ।

বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা "আহীর" (গোপ) বলিয়া কথিত হন, প্রাচীন কালে তাঁহারাই আভীর নামে অভিহিত হইতেন। ইহাই প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত। ইঁহারা সমগ্র ভারতেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। ইঁহাদের অনেকেই গো-ব্যবসায়ী হওয়ায় গোয়ালা বলিয়া পরিচিত। আজিও আমরা অনেক আহীরকে বড় বড় মেষপাল লইয়া নানা স্থানে যাতায়াত ও "যাযান" করিতে দেখিতে পাই। ভারতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষেরা মধ্য এশিয়ার প্রান্তরে গো, মেষ ও মহিষাদির বৃহৎ বৃহৎ দল লইয়া যাযাবর জীবন যাপন করিত না তো? পূর্ব্বপুরুষদিগের বৃত্তি মানুষ সহজে পরিত্যাগ করিতে চাহে না। মহাভারতের পাঠক মাত্রেই জানেন যে, মৎস্যদেশের অধিপতি বিরাট-রাজের অসংখ্য গো-ধন ছিল। মহারাজা নিজেও গোপালন করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যে গোষ্ঠে ধেনু চরাইতে যাইতেন, হিন্দু বালকমাত্রই সকলেই এ-কথা অবগত আছেন। সকল আহীরই যে গোপাবৃত্তি-দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত তাহা নহে; কেন না ঋগ্বেদ অঞ্চলে আহীর সোণার (আভীর স্বর্ণকার) আহীর সূতার (আভীর সূত্রধর বা ছুতার) প্রভৃতি এখনও দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন ঋগ্বেদে, রাজপুতানায় এবং গুজরাটে আভীর ব্রাহ্মণের অস্তিত্বেরও না কি প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে "আহীরাণী" নামে একটা ভাষা প্রচলিত আছে, মহারাষ্ট্র ভাষা হইতে উহা অনেকটা স্বতন্ত্র।

বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বস্থলী থানার এলাকায় জামালপুর নামক একটি গ্রাম রহিয়াছে। এখানে প্রতি পূর্ণিমা তিথিতে "ধর্ম্মরাজের" পূজা উপলক্ষে নানা স্থান হইতে লোক আসিয়া থাকে। বৈশাখী পূর্ণিমায় লোকের বিশেষ ভিড় হয়। ঘানতী ছাগল ও ভেড়া বহু সংখ্যায় শিবের সম্মুখে বলি হইয়া থাকে। অনেক মুসলমানও এই মেলায় যায়। স্থানীয় আহীরদের কেহ কেহ শূকর পর্য্যন্ত বলি দিতে দ্বিধা করে না। অন্যে একবার শূকর বলি লইয়া স্থানীয় মুসলমানদিগের সহিত ইহাদের বাধা হয়। এ-অঞ্চলে একমাত্র ঘাড়ীরাই শূকর পোষে ও উহার মাংস খায়। উহারা অবশ্য হিন্দু। পূর্ব্বোক্ত আহীরগণের পূর্ব্বপুরুষেরা হয় প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, পরে অন্যান্য অনেকের সেখাদেখি ক্রমশঃ হিন্দু আচারব্যবহার গ্রহণপূর্ব্বক হিন্দু সমাজের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তবে পূর্ব্বকালের বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ ধর্ম্ম-সংস্কার সহজে ছাড়াও শক্ত। অনেক গারো খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও না কি পিতৃপুরুষের আচরিত ভূত-প্রেতাদির পূজা ত্যাগ করিতে পারে নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও তিব্বতীগণ ডাগরলি পরিষার করিয়াছিল কি? যাহারা এখন হিন্দু দেবদেবীর পূজা করে ও এই সব পূজা উপলক্ষে ব্রাহ্মণাদিগকে দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা প্রভৃতি যোগাইয়া থাকে এবং যাহারা আজিও শিবের গাজন করে, সেই সব আহীরকে কেহ অহিন্দু বলিতে পারেন কি?

শক, আভীর প্রভৃতির পর কুষনরাজগণ আর্য্যাবর্ত্তে আধিপত্য বিস্তার করে। এই বংশের প্রথম রাজা "কাডফিসেস্" শৈব ছিলেন। ইহার পর ক্রমে কণিষ্ক, হুবিষ্ক এবং বাসুদেব সিংহাসন লাভ করেন। কণিষ্কের মুদ্রায় বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দৃষ্ট হয়। আবার কাহারও কাহারও মুদ্রায় বুদ্ধদেব বা শিবের মূর্ত্তি দেখা যায়। কাহারও কাহারও মুদ্রায় কার্ত্তিকের প্রতিমূর্ত্তি পর্য্যন্ত অঙ্কিত রহিয়াছে। এই সকল রাজারা তুর্কীর পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, আর আকৃতিতে ইঁহারা মঙ্গোলীয়দের অনুরূপ ছিলেন। মুদ্রাদির প্রমাণ হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এই সকল বৈদেশিক রাজন্যবর্গ যে হিন্দু দেবদেবীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতেন ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে কি? শক, আভীর প্রভৃতির ন্যায় কুষনগণও হিন্দু সমাজে গৃহীত হইয়াছিলেন, এ-কথা কে অস্বীকার করিবে?

দাক্ষিণাত্যের কঙ্কণ প্রদেশের কতকগুলি বেণীর মুসলমান প্রজা এক সময়ে ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর নিকটে আবেদন করে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হিন্দু ছিলেন। তবে কোনও কারণে তাঁহারা মুসলমান হইয়া যান। কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদের অনেক বংশধর উদ্ভিন্ন হিন্দু পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্ম পুনর্গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক; মহারাজা যেন উপযুক্ত অনুমতি প্রদান করেন। মহারাজ শিবাজী তদীয় গুরুদেব রামদাস স্বামীর আদেশ লইয়া ঐ-সকল প্রজাকে হিন্দু হইবার অনুমতি দান করেন। প্রজাগণ শুদ্ধ হইয়া হিন্দু-সমাজে মিশিয়া যায়। ইহা অবশ্য নূতন শুদ্ধি-সংস্কার

নহে, বৈদিক কাল হইতে পৌরাণিক যুগ পর্য্যন্ত যে যবনাদি অনেক বিদেশী ব্যক্তি হিন্দু সমাজে গৃহীত হইয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলেন যে, বাঙ্গালীরা মিশ্রজাতি। ইহাদের অনেকের দেহে দাক্ষিণাত্য-বাসী কৃষ্ণকায় দ্রাবিড় জাতি, আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী শ্বেতকায় আর্য্যজাতি এবং তিব্বতবাসী পীতকায় মঙ্গোল জাতির রক্ত মিশ্রিতাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাচীন ভারতের যে-সকল আদিম অধিবাসী কোল, ভিল, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্যজাতি আর্য্যদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণ হিন্দু সমাজের চতুর্থ বর্ণ অর্থাৎ শূদ্র। ইহারা অবশ্য আর্য্যচিহ্ন উপবীত ধারণের অধিকার পায় নাই। প্রাচীন আর্য্যগণের আচার-ব্যবহারের সহিত সমসাময়িক বঙ্গবাসীদিগের আচারানুষ্ঠানের মিল ছিল না। সেই জন্য একমাত্র তীর্থভ্রমণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে আর্য্যগণ বঙ্গদেশে পদার্পণ করিতেন না, করিলে ধর্ম্ম নষ্ট হইত। অথচ বাঙ্গালীর অনেকেই আপনাদিগকে বিশিষ্ট হিন্দু বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। প্রথম যৌবনে সকলেরই হজমশক্তি প্রবল থাকে, বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে উহা ধীরে ধীরে কমিয়া যায়, এই মাত্র তফাৎ। সনাতন হিন্দু সমাজেরও এই দশা ঘটিয়াছে।

হিন্দু সমাজের প্রাচীন রীতিনীতি আলোচনা করিতে হইলে ভারতের পুরাতন ইতিহাসের সমক্ষে আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্য দেশ-সকলের ন্যায় পুরাকালের ইতিহাস ধারাবাহিক ভাবে লিখিত হয় নাই। তবে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থ ও অন্যান্য পুস্তক হইতে আমরা প্রাচীন হিন্দু সমাজের রীতিনীতির হিসাব অনেকটা পাইতে পারি। শাস্ত্রজ্ঞ তীক্ষ্ণধী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকগণ এই কার্য্যে হাত না দিলে, কে আর ইহা সুসম্পন্ন করিতে পারিবে? শাস্ত্রগ্রন্থ ভিন্ন বৈদেশিক ভ্রমণকারী ও পণ্ডিতগণের লিখিত ইতিবৃত্ত সকলও এ-সম্বন্ধে আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। বিদেশী পণ্ডিতদিগের মধ্যে গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস্, চীন দেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়ান এবং হুয়েন-সাং, ইৎ-সিং প্রধান। ইহাঁদের লেখার বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

### বর ও কন্যাপণ

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু সমাজের মধ্যে বর ও কন্যাপণ, বিধবার পতান্তর গ্রহণ, অসবর্ণ বিবাহ, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও শুদ্ধি প্রধানরূপে সংস্কারকদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছে। কন্যার আজীবন ভরণ-পোষণ ও রক্ষার ভার হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্য পিতামাতার পক্ষে সালঙ্কারা কন্যাকে উপযুক্ত জামাতার হস্তে সমর্পণের ব্যবস্থা হইয়াছে। কন্যার রূপ, গুণ, বংশ ও শিক্ষার ত্রুটির ক্ষতিপূরণের জন্য পিতামাতাকে কিছু অর্থদণ্ড দিতে হয়। নতুবা কন্যার উপযুক্ত পাত্র মিলে না। ইহা হইতেই বরপণের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। তবে এই দণ্ড অভিভাবকের পক্ষে অসাধ্য না হইলেই ভাল। অত্যধিক বরপণ যোগাইতে না পারায় ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি অনেক উচ্চবর্ণের মধ্যে কন্যাদিগকে দীর্ঘকাল ধরিয়া কুমারী থাকিতে হইতেছে। আবার পল্লীঅঞ্চলে নিরক্ষর গোপ, নমশূদ্র, মরা, ধোপা, কলু প্রভৃতি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে কন্যাপণ সংগ্রহ করিতে না পারায়, অনেক পুরুষকে প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত অবিবাহিত অবস্থায় কাটাইতে হয়। বলা বাহুল্য, বিবাহের অল্প কয়েক বৎসর পরেই অনেকে ইহসংসার হইতে চিরবিদায় লইয়া থাকে। এই সব কারণে হিন্দু সমাজের মধ্যে বিধবার সংখ্যা বেশী হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে পরোক্ষে ব্যভিচারের বৃদ্ধি হইতেছে।

### বিধবার পতান্তর গ্রহণ

এই দোষ নিবারণের জন্য কেহ কেহ বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী। আজ কাল রাজনৈতিক কারণের দিক্ দিয়া অর্থাৎ সংখ্যা-পরিষ্ঠতার আশায় অনেকে এই প্রথার প্রচলনের পক্ষপাতী হইয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে দুই একটি বিধবার বিবাহ দেখা গিয়াছে, উচ্চবর্ণের মধ্যে ইহা এখনও পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত হয় নাই বলিলেই চলে। ফলতঃ যে পণপ্রথার জন্য হিন্দু সমাজে বিধবার সংখ্যা অধিক হইতেছে, সেই অর্থগৃধ্নুতার বিরুদ্ধে দেশে পুরুষের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। একদিন সকলকেই যে পিতামাতা হইতে হইবে এ-কথা স্মরণ করা ভাল।

### বিভিন্ন প্রদেশে সবর্ণ বিবাহ

রেল ও ষ্টীমারের কল্যাণে অনেক হিন্দুকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য দেশ ও বিদেশে গমন ও তথায় দীর্ঘকাল ধরিয়া বসবাস

করিতে হইতেছে। অনেক বাঙ্গালী পরিবারকে ব্রহ্মদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বাই ও বিহারাদি প্রদেশে পুরুষানুক্রমে বসবাস করিতে হইতেছে। এই সকল ব্যক্তিকে পুত্র ও কন্যার বিবাহ উপলক্ষে সুদূর বাঙ্গালাদেশে আসিতে হয়। অথচ ঐ-সকল প্রদেশেই সবর্ণের মধ্যে বর-কন্যা সহজেই মিলিতে পারে। আর এরূপ মিলনের ফলে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপিত হইতে পারে, জাতিরও শক্তি বৃদ্ধি পায়। পাঞ্জাবীর শক্তি ও বাঙ্গালীর বুদ্ধির মিলন কি বাঞ্ছনীয় হওয়া সম্ভব? ব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণের, কায়স্থের সঙ্গে কায়স্থের বিবাহ অশাস্ত্রীয়ও নহে। তবে আহার-বিহারাদি বিষয়ে প্রথম প্রথম কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইতেও পারে।

## অসবর্ণ বিবাহ

এক শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে কন্যা-সংখ্যার অল্পতা, কিন্তু অপর শ্রেণীর মধ্যে উহাদের আধিক্য দেখা যায়। সিন্ধু প্রদেশে হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক কম বলিয়া অনেকে বাঙ্গালা দেশ হইতে অর্থ দিয়া বিধবা বা বারবনিতা ক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গরজ বড় বালাই। হিন্দু সমাজ আপত্তি করিলেও ধীরে ধীরে এইরূপ বিবাহ প্রচলিত হইয়া পড়িতে বাধ্য। বাঙ্গালী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ অসবর্ণ বিবাহ যথেষ্ট প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু উহাতেও সাধারণ হিন্দু সমাজ ধ্বংস হয় নাই। সুতরাং আবশ্যক স্থলে অসবর্ণ বিবাহ স্বীকার করাই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত। আভীরেরা যাদব রমণীদিগকে বিবাহ করিয়া যে হিন্দু হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইংরাজের আইনে এইরূপ বিবাহ সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই নহে, পরন্তু প্রাচীন হিন্দু সমাজেও এইরূপ প্রথার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। মনুসংহিতাতেও অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের উল্লেখ রহিয়াছে। মিশ্রশ্রেণীর কতিপয় অনেক বর্ষের মধ্যেও এইরূপ বিবাহ প্রচলিত হইলে সমাজের হিতসাধনই হইতে পারে, নতুবা অনেক বর্ষের লোপ অল্পকালসাপেক্ষ। অনেক পল্লী-গ্রাম হইতে ধোপা, নাপিত ও কলু বংশ যে বিলুপ্ত হইতেছে, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকেন। সমাজ-পতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের এদিকে ঊষার দৃষ্টি প্রদর্শন করা একান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ হিন্দু সমাজ আজিও তাঁহাদেরই অনুগমন করিয়া চলিতেছে এ-কথা তাঁহারা যেন না ভুলেন। এ-দায়িত্ব তাঁহাদেরই বেশী।

## মন্দির-প্রবেশ

ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার, ব্যক্তিস্বাধীনতা, জ্ঞান-বৃদ্ধি ও পাশ্চাত্য রীতিনীতির আবহাওয়ার ফলে পেশোয়ার হইতে সদিয়া এবং শ্রীনগর হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত, অর্থাৎ সমগ্র হিন্দুস্থানে একটা 'জাগরণে'র সাড়া পড়িয়াছে। বর্ণাচরণ সম্বন্ধে হিন্দু সমাজ অতি প্রাচীনকাল হইতেই যুক্তিবাদী। কেহ কাহারও মত বিনা বিচারে নির্বিবাদে গ্রহণ করার পক্ষপাতী নহে। এই জন্যই অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্ট দ্বৈতবাদের উৎপত্তি। শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য ও শৈব সম্প্রদায়ের এই হেতুই আবির্ভাব ঘটে। এই যাচাই-প্রবৃত্তির ফলেই বাঙ্গালী বৈষ্ণবদিগের মধ্যে আধুনিক বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে।

বাঙ্গালা দেশের মন্দির-প্রাঙ্গণে সকল বর্ণের হিন্দুর প্রবেশাধিকার রহিয়াছে, যদিও বিগ্রহের নিকটে সকলে যাইতে পায় না। দক্ষিণ ভারতে ইহা পূর্ব্বে একরূপ অসম্ভবই ছিল। সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন ও সত্যাগ্রহের ফলে এই দুঃসাধ্য কার্য্যও ধীরে ধীরে সম্পাদিত হইতেছে।

## সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব

বাঙ্গালার অনেক অঞ্চলে কলিকাতার দেখাদেখি বারোয়ারী সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব, সরস্বতী প্রভৃতি পূজার প্রচলন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কালে আচণ্ডালের মধ্যে এইরূপ বারোয়ারী পূজা হয় তো প্রবর্ত্তিত হইয়া পড়িবে। যাহা দশ পনর বৎসর পূর্ব্বে স্বপ্নেরও অতীত ছিল, আজ তাহা সম্ভব হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পরে যে ইহাই দেশীয় প্রথা হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

## অস্পৃশ্যতা

"বাঙ্গালা দেশে আচার আছে, কিন্তু বিচার নাই" এইরূপ একটা অপবাদ অবাঙ্গালীরা আমাদিগের বিরুদ্ধে দিয়া থাকেন। দক্ষিণ ভারতের আচার আবার আমাদের অপেক্ষাও যুক্তি-বিরুদ্ধ। ধাঙ্গড়, মুচি, ডোম ও মেথরদিগকে আমরা চতুর্ব্বর্ণের মধ্যেই স্বীকার করিয়া থাকি, কিন্তু মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর ও মহীশূরাদি অঞ্চলে উহাদিগকে পঞ্চম বলিয়া ধরা হয়।

ঐ-সব দেশে উহারা এত ঘৃণ্য যে, উহাদিগের ছায়া মাড়াইলেও ব্রাহ্মণগণ অপবিত্র হইয়া যান। শহরের সরু রাস্তা-ঘাট দিয়া চলিবার সময় উহারা হস্তস্থিত ঘণ্টাধ্বনি করে এবং ঐ সঙ্গে 'পঞ্চম, পঞ্চম' উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণপূর্বক বিপ্রগণকে দূর হইতে সাবধান করিয়া দেয়, যেন তাঁহারা অশুচি হইয়া না পড়েন। ব্রাহ্মণেরা যেখানে বাজার করেন, সেখানে তাহাদের গমনাগমন নিষিদ্ধ। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বাঙ্গালীদের শিরা ও ধমনীতে দ্রাবিড় রক্ত মিশ্রিত রহিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালায় কুত্রাপি হিন্দু সমাজে এরূপ কঠোর বিধান দেখা যায় না কেন? আর্যাবর্ত বা মধ্যভারতেও এরূপ নিয়ম নাই। যে-রাজপথ দিয়া নিষিদ্ধ-মাংসভোজী অহিন্দুগণ অনায়াসে গমনাগমন করিতে সমর্থ, সেই রাস্তা দিয়া হিন্দু পঞ্চমগণের যাতায়াত কি কারণে নিষিদ্ধ হইতে পারে, তাহা বুঝা শক্ত। শুনিলে অবাক্ হইতে হয় যে, ঐ-অঞ্চলে কোন একটি বৃহৎ পুষ্করিণীতে কোনও পঞ্চম অবগাহন করিলে উহা না কি অপবিত্র হইয়া পড়ে। ইহার জন্য আদালতে নালিশ হইলে পঞ্চমের শাস্তি হইয়া থাকে। যাহারা হিন্দু-সমাজে এতদূর ঘৃণ্য বলিয়া গণ্য, তাহারা যে কি কারণে আজিও মুসলমান বা খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করে নাই, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না।

শিমলা সহরের পূর্বপ্রান্তে ধক পর্যন্ত বিস্তমান। উহার শিখরদেশে রামসীতার একটি মন্দির রহিয়াছে। ঐ শৈলের পূর্বাংশে সান্‌জুলী নামক পল্লী অবস্থিত। উহা সেমীর কোটি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। কর্মোপলক্ষে আমাকে কিছুকাল ঐ পল্লীতে বসবাস করিতে হয়। ভারত সরকারের অধিকাংশ মাদ্রাজী কর্মচারী ঐ পল্লীতে বাসা করিয়া থাকেন। বাসা ভাড়ার সুবিধা ও স্ত্রীলোকদিগের স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের পক্ষে সুবিধার জন্য অনেক বাঙ্গালী এবং তদুপরি পানীয় জল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মাদ্রাজী ব্রাহ্মণগণ ঐ অঞ্চলে থাকা পছন্দ করেন। বলা বাহুল্য কলিকাতার ন্যায় শিমলা ও সান্‌জুলীতেও পথের ধারে জলের কল রহিয়াছে। দূরবর্তী একটা পাহাড়ের ঝরণাকে নল দ্বারা শহরে আনা হয়। সকল জাতিই গৃহকার্যের জন্য ঐ জল ব্যবহার করে, কিন্তু মাদ্রাজীরা উহা স্পর্শও করে না। আমরা দেখিয়া অবাক্ হইতাম যে, দুঃসহ শীতের মধ্যেও মাদ্রাজী ব্রাহ্মণকন্যাগণ নিকটস্থ কল পরিত্যাগ করিয়া বহু দূরবর্তী ঝরণা হইতে রন্ধন ও পানের জন্য জল বহন করিতেন, আমাদের ন্যায় ভৃত্য বা ভারীর জল স্পর্শও করিতেন না। ঝরণারই জল নলযোগে আনীত হইলেও কেন যে উহা অপবিত্র হইয়া থাকে, তাহার কারণ কেহ অনুসন্ধান করিতেন না; পুরুষেরাও উহার অযৌক্তিকতা স্বীকার করিতে নারাজ ছিলেন। বরং আমাদিগকেই তাঁহারা অনেকটা গৃষ্টান বলিয়া নিন্দা করিতেন; যদিও তাঁহারা জানিতেন যে আমরাও ব্রাহ্মণ।

এই অযৌক্তিক শুচিজ্ঞান সমগ্র ভারতেই হিন্দু সমাজে ন্যূনাধিক পরিমাণে দেখা যায়। চতুর্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণই প্রধান। তাঁহারাই শাস্ত্রচর্চা করিতেন এবং প্রাচীন আচার-ব্যবহার পালন করার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। গৃষ্টান এবং মুসলমানদিগের সংস্রবে যখন বহু হিন্দু স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া কালাপাহাড় হইয়া পড়ে, তখন ব্রাহ্মণগণ ভয় তো বাধ্য হইয়া ঐরূপ আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টিত হন। যে-সকল বর্ণের আচার-ব্যবহার অনেকটা ভিন্ন প্রকারের দেখিতেন, তাহাদিগের সংস্পর্শ তাঁহারা পরিত্যাগ করিতেন এবং তজ্জন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ স্বীকার করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। সুবর্ণ-বণিক, স্বর্ণকার, সূত্রধর প্রভৃতি অনেক উন্নত সম্প্রদায়ের জল যে নিষিদ্ধ হইয়াছিল, ইহা ভিন্ন আর তাহার কি কারণ থাকিতে পারে? পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আজকাল এই সকল দোষ অনেক পরিমাণে লুপ্ত হইতেছে। চণ্ডালাদি অনেক জাতি পূর্বে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিলেও, পূর্বপুরুষ-দিগের আচার-ব্যবহার সম্যক্ পরিত্যাগ না করায়, উচ্চবর্ণের মধ্যে উহারা স্থান লাভ করিতে পারে নাই। বর্তমান কালে চাঁড়াল ও গাঁড়াল প্রভৃতি জাতির জল অচল হওয়ার পক্ষে কি যুক্তি থাকিতে পারে? নাপিত ও পুরোহিত পর্যন্ত ইহাদের পৃথক্ দেখা যায়। অনেকে দুঃখ করিয়া থাকে যে, তাহারা হিন্দু থাকায় ধোপা ও নাপিত তাহাদের কাজ করে না, কিন্তু তাহাদেরই কোন কোন জাতি-বন্ধু গৃষ্টান বা মুসলমান হওয়ায় গ্রাম্য নাপিতেরা উহাদের ক্ষৌরকার্য করিতে আপত্তি করে না। হিন্দু সমাজের সংহতি রক্ষার জন্য আবশ্যক সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সম্প্রদায় এ-দিকে দৃষ্টি দিলে ভাল হয়। নতুবা কালে তাঁহাদের প্রভাব বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইবার বিলক্ষণ আশঙ্কা রহিয়াছে।

এই অস্পৃশ্যতা হইতে—অযৌক্তিক শুচিবাই হইতে, ভারতীয় মুসলমান, খৃষ্টান ও হিন্দু অধিবাসীদিগের মধ্যে একটা অহেতুক মনোমালিন্যের আবির্ভাব হইয়াছে। বাঙ্গলাদেশে ইহা আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া থাকি। মুসলমানদিগকে অভিযোগ করিতে শুনিয়াছি যে, হিন্দুরা তাহাদিগকে কুকুর বিড়াল অপেক্ষাও ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। রান্নাঘরে ও ঠাকুরের মন্দিরে বিড়াল গেলে কোন দোষ হয় না, কিন্তু কোন মুসলমান মজুর বৈঠকখানা ঘরের চালের নীচে আসিলে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের হুঁকার জল বহুদূর হইতেই অপবিত্র হইয়া যায়। অথচ মুসলমান বা খৃষ্টানের সোডা বা লিমনেডের জল আজকাল অধিকাংশ হিন্দুই অম্লানবদনে পান করিয়া থাকে। মুসলমানের পাঁউরুটী এবং সাহেবী বিস্কুট খাদ্য শুদ্ধ, কিন্তু তাহাদের প্রস্তুত রুটি ও লুচি অস্পৃশ্য। মুসলমানের প্রস্তুত গুড় ও সিদ্ধ চাউলের ব্যবহার বাঙ্গালার ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে দোষের নহে, খেজুর রসও অস্পৃশ্য নয়, কিন্তু নদী হইতে আনীত জলই অপেয় বলিয়া গণ্য। বাস্তবিকই আমাদের মধ্যে আজকাল বিচার অপেক্ষা প্রাচীন আচারেরই প্রাধান্য লক্ষিত হইয়া থাকে। তবে বর্ত্তমানে মুগ কলেজ, রেল ষ্টীমার প্রভৃতির কল্যাণে এই ছোঁয়াচে রোগ—শুচিবাই অনেকটা কমিয়া আসিতেছে। রেল ও ষ্টীমার-ষ্টেশনে এখন অনেক হিন্দু স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত চায়ের পেয়ালা লইবার সময় জাতি বিচার করিতেছেন না। কলিকাতা শহরে বিবাহোৎসবের সময় জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে পংক্তি-ভোজন করিতেছে। আজ যাহা কলিকাতা ও অন্যান্য শহরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কাল যে তাহা সমগ্র বাঙ্গালায় বিস্তারলাভ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যাহা গোপনে অনুষ্ঠিত হইতেছে, উহাকে প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিলে দোষ কি? বরং উহাই বোধ করি সুসঙ্গত।

## হিন্দু-মুসলমান বিরোধ

বর্ত্তমান সময়ে রাজনৈতিক কারণে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা তীব্র বিদ্বেষ দেখা দিয়াছে। উভয় দলেরই অদূরদর্শী ধর্ম্মান্ধতা এই বিবাদে ইন্ধন যোগাইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দিল্লী নগরীতে একদল মুসলমানের সভায় প্রকাশ্যে স্থির হয় যে, দশ বৎসরের মধ্যে অস্পৃশ্য হিন্দুদিগকে মুসলমান করিবার জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। তাহার ফলে সাত কোটি অস্পৃশ্য-হিন্দু মুসলমান হইয়া ভারতে মুসলমানের সংখ্যা চৌদ্দ কোটীতে উন্নীত করিবে। তখন ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহাদের কথা শুনিতে বাধ্য হইবেন। কতকগুলি অদূরদর্শী ব্যক্তির এই প্রকার উক্তির বিষময় ফল শীঘ্রই ফলিতে আরম্ভ করে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অনেক হিন্দুকে অর্থ অত্যাচারের আশঙ্কায় দেশ ছাড়িয়া লাহোরে আশ্রয় লইতে হয়। শুনা যায়, দাক্ষিণাত্যের অশিক্ষিত মোপ্লাগণ বলপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর অনেক হিন্দুকে মুসলমান করিয়া ফেলে। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের অনেক নিরপরাধিনী হিন্দুবিধবা ধর্ষিতা হয়। ব্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ এইরূপে ধর্ষিতা রমণীদিগকে হিন্দু সমাজে স্থান দিবে না, এই জ্ঞানই দুর্ব্বৃত্তদিগকে এই অন্যায় কার্য্যে উৎসাহিত করে। কুম্ভীয়ার মেলা দেখিয়া ফিরিবার সময় খেয়া নদীর অপর পারে কয়েকজন মুসলমান গুণ্ডা গুটিকতক হিন্দু রমণীকে আক্রমণ করে। সুখের বিষয় জনৈক মুসলমান বিপন্না হিন্দু স্ত্রীলোকদিগকে আশ্রয় দান করিয়া সে যাত্রা রক্ষা করেন। পল্লীবাসী অশিক্ষিত মুসলমান সমাজের মধ্যেও যে, বলপূর্ব্বক মুসলমান করা অধর্ম্মকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়, উহা তাহারই প্রমাণ। বলা বাহুল্য স্ত্রীলোকের উপরে অত্যাচার সকল সমাজেই নিন্দার্হ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই জঘন্য কার্য্য বাঙ্গালাদেশে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্রকৃত শিক্ষার অভাবে সাধারণ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে উদার ধর্ম্মজ্ঞানের একান্ত অভাব ঘটিয়াছে। ইহারই ফলে ধর্ম্মান্ধতার সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দুদিগের পূজাপার্ব্বণে ও বিবাহাদি উৎসবের সময় বাদ্যধ্বনির ব্যবস্থা আছে। মহরমের সময় মুসলমানগণও বাদ্য করিয়া থাকেন। বাল্যকালে বাদ্যধ্বনি লইয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখি নাই। কিন্তু এক্ষণে ইহা সর্ব্বত্রই দেখা গিয়াছে। কানপুরে হিন্দু বিবাহের বাজনা লইয়া কতকগুলি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিবাদ হয়। হোলীর দিনের রং-বাজী বাধে, উহাতে না কি ৪২ জন লোক নিহত হয় এবং বহুসংখ্যক ব্যক্তি আহত হইয়া হাসপাতালে প্রেরিত হয়। হোলীর সময় মহরম উপলক্ষে বারাণসী শহরেও ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। কোন দলেই অবশ্য

নরহত্যার ব্যবস্থা নাই। পরমত-সহিষ্ণুতা ও উদারতা ধর্মবিশ্বাসের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কোরাণ ও উপনিষদাদি হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। উহার ফলে উভয় সম্প্রদায়ই পরস্পরকে ভালরূপে জানিতে পারিবে ও বিদ্বেষভাব দূরীভূত হইবে।

## শুদ্ধি আন্দোলন

বাঙ্গালাদেশে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ ও পাঞ্জাবের দয়ানন্দ সরস্বতী আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। অনেক হিন্দু ঐ দুই সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ দুই সম্প্রদায়কে পরিপুষ্ট করে। ইঁহাদের অনুকরণে হিন্দুদের মধ্যেও শুদ্ধি আন্দোলন দেখা দেয়। গায়ে, খাদিয়া প্রভৃতি অসভ্য জাতিকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। ভারতীয় কোন কোন মুসলমান হিন্দু সমাজে পুনঃ-প্রবেশ করে। ইহার ফলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোকের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে। ইহারই ফলে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিহত হন। কিন্তু এই শুদ্ধি কার্য যে রাজনৈতিক কারণে উদ্ভূত হয় নাই, ইহা শিবাজীর উদাহরণ দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতে পারে। খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্মের ন্যায় হিন্দু ধর্মেরও প্রচার কোন ক্রমেই দুষণীয় হইতে পারে না। যে ধর্ম যাহার ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারা উচিত। ফলতঃ চীন ও জাপানে ধর্মান্তর লইয়া যেরূপ কোন মনোমালিন্য ঘটে না, ভারতেও কবে সেই ভাব দেখা দিবে, একমাত্র ভগবানই জানেন।

## সমাজ-সংস্কার

এ-জগতে কোন জিনিষই চিরস্থির নহে। বর্তমান হিন্দু সমাজও এই সনাতন নিয়মের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না। সংস্কার অবশ্যম্ভাবী। হিন্দু শাস্ত্রকারগণও দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে সংস্কারকার্যের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। তবে কে এই গুরুত্ব কার্য সিদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবেন? পুরাতন দেবমন্দিরের সংস্কার সাধন করিবার সময় যথেষ্ট সাবধানতার প্রয়োজন, নতুবা বিগ্রহের অন্তর্ধানি অবশ্যম্ভাবী। অতি প্রাচীন জরাজীর্ণ হিন্দু সমাজের সংস্কারের সময়েও সেইরূপ সাবধানতা আবশ্যক। যিনি আপনাকে হিন্দু বলিতে গর্ব অনুভব করেন, যিনি হিন্দুর পূজা-পার্বণাদির প্রতি শ্রদ্ধাবান্, যিনি হিন্দু সমাজের প্রাচীন রীতিনীতি সশ্রদ্ধভাবে সম্যক্ আলোচনা ও পালন করিয়া থাকেন, যিনি নিজের শাস্ত্রের আলোচনা ও মর্ম সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ, যিনি বেদ ও পুরাণাদির সাহায্যে বৈদিক যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত সনাতন হিন্দু সমাজের রীতিনীতি ও ক্রমপরিবর্তন উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই বিচক্ষণ, বহুদর্শী ও দরদী পণ্ডিত ব্যক্তিই এই কার্যের পক্ষে উপযুক্ত। হিন্দু সমাজ তাঁহারই ব্যবস্থাসমূহ শিরোধার্য করিয়া লইবে। নিজ মাতৃস্কন্ধের মারাত্মক দুই ক্ষতের চিকিৎসার ন্যায় তাঁহাকে অতি সাবধানে অস্ত্র ধারণ করিতে হইবে। তিনি অধুনা অনাবশ্যক ও ক্ষতিকর প্রথাসমূহের ধীরে ধীরে লোপের বিধান দিবেন। আর উহাদের অপকারিতার বিষয় হিন্দু সাধারণের মধ্যে ক্রমাগত আলোচনা করিবেন। পূজা-পার্বণে, তীর্থ-ক্ষেত্রে, মেলায় এবং সভাসমিতিতে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই সকল বিষয়ের যুক্তিপূর্ণ বিচার আবশ্যক। হিন্দুগণ চিরকালই যুক্তির পক্ষপাতী। শাস্ত্রেও আছে "যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্মহানি প্রজায়তে।" দেশকে পূর্বে প্রস্তুত না করিয়া সাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনরূপ সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।*

* লেখকের সহিত আমাদের অনেক বিষয়েই মতসাম্য নাই, ইহা "বঙ্গশ্রী"র সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টিবহির্ভূত থাকিবে না। তথাপি ইংরাজী শিক্ষিত সমাজের একাংশের মত হিসাবে ইহা আমরা প্রকাশ করিতেছি। লেখকের যুক্তির ধারার কোথায় ত্রুটি, তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে হইলে এ মাসের "বঙ্গশ্রী"তে সম্পাদকীয় স্তম্ভে এবং বিগত কয়েক বৎসরে প্রকাশিত "ভারতের বর্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়" শীর্ষক "ধর্ম সম্বন্ধে ভারতীয় মনোভাবের কথা" শীর্ষক সন্দর্ভে এ সকল বিষয়ে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা সম্বন্ধে পাঠ করা প্রয়োজন।—ঃ সঃ।

## দলাদলির ইতিহাস

...দলাদলি যে একমাত্র অধুনা ভারতবর্ষেই বিদ্যমান আছে, তাহা নহে। জগতের প্রত্যেক দেশের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা কার্য-কারণের সংযুক্তি অনুসারে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, জগতের ইতিহাসে এমন একদিন ছিল, যখন সমগ্র মনুষ্য-সমাজের পরস্পরের মধ্যে দলাদলি একরূপ ছিল না বলিলেও চলিতে পারে, কিন্তু অন্ততঃ পক্ষে গত তিন হাজার বৎসর হইতে জগতের প্রত্যেক দেশেই দলাদলি তীব্রভাবে চলিয়া আসিতেছে এবং প্রত্যেক দেশের ঐক্যবন্ধনও বস্তুতঃ পক্ষে বিলুপ্ত হইয়াছে।

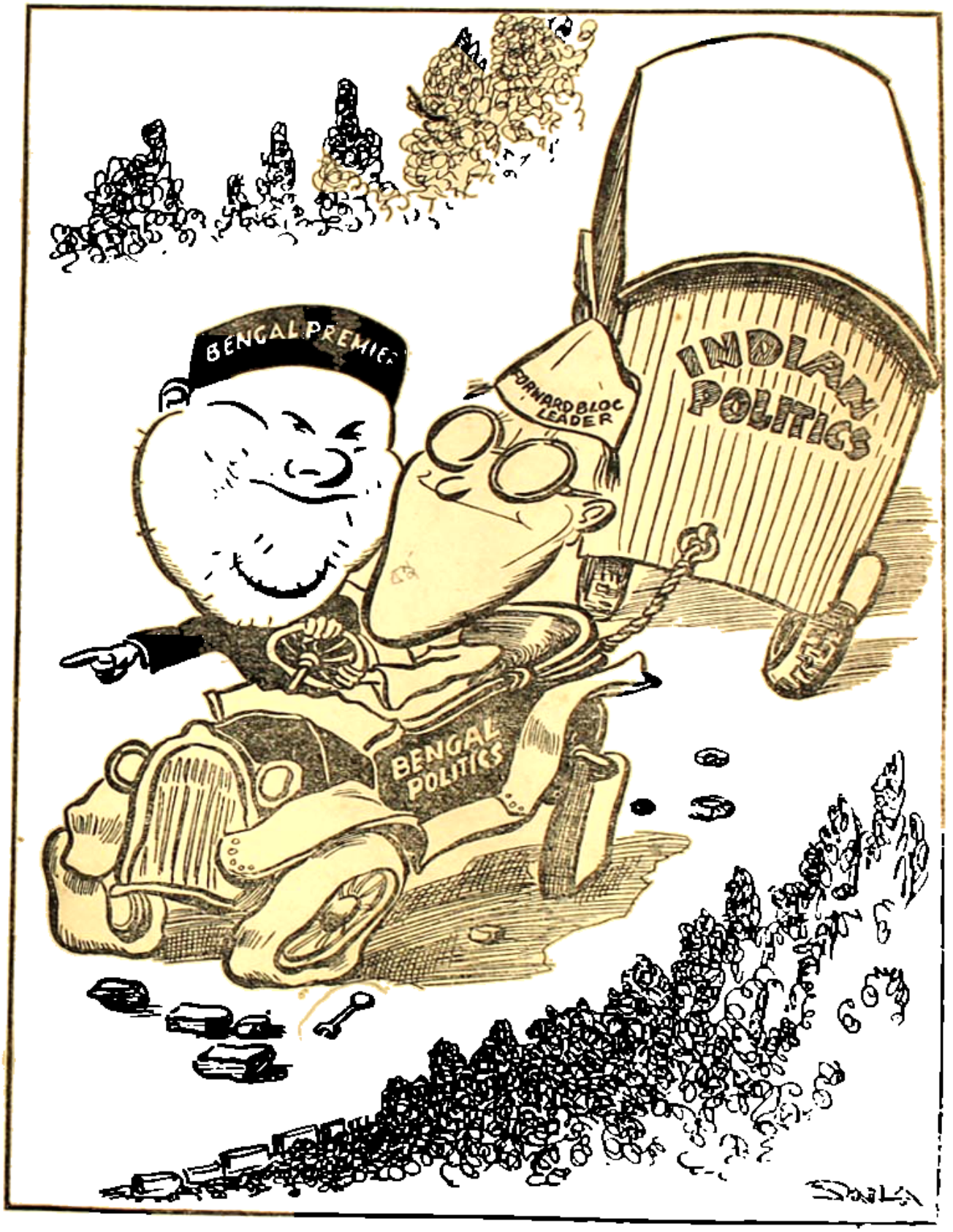


মিতালি

[ লবেল চাড়ির অনুসরণে

# লজ্জাহীনা

—শ্রীকান্তনী মুখোপাধ্যায়

প্রৌঢ় বয়সের পুত্র টুনুন।

একমাত্র কন্যা সীতা তাহাকে খুঁটিয়া মানুষ করিতেছে জননীর স্বাস্থ্য দুর্বল বলিয়া। সীতাই যেন টুনুনের মা। সকাল হইতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হইতে রাত্রি সীতা ভাইটিকে কোলে, পিঠে, বগলে রাখিয়া অতন্দ্র প্রহরীর মত জাগিয়া আছে। তাহার স্কুল কামাই হয়, উপায় নাই। তাহার খেলার সাথীরা ডাকিয়া ফিরিয়া যায়, সীতা টুনুনকে লইয়া বিব্রত থাকে। আশুতোষ ধার্মিক পিতা গৌরীশঙ্কর মাঝে মাঝে চাহিয়া দেখেন দশম-বর্ষীয়া বালিকার মধ্যে জগৎ-জননীর মূর্তি; বিশ্ব-পালয়িত্রী যেন সীতার মধ্যে আবির্ভূতা।

টুনুনের আবদারের শেষ নাই। অধ্যাপক পিতার শ্মশ্রু-সঙ্কুল গম্ভীর মুখ দেখিলেই সে কাঁদিয়া উঠে, মাতৃহীনা মাতা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাই যত কিছু অভাব-অভিযোগ তাহার দিদির উপর। দুই বৎসরের শিশুকে লইয়া দশ বৎসরের সীতা মাঝে মাঝে হাঁপাইয়া উঠে; কখনো বা মনে হয়, টুনুন না থাকিলে সে বাঁচিয়া যাইত। তৎক্ষণাৎ টুনুনের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া সীতা মনে মনে বলে, ষাট্! টুনুনকে দুধ খাওয়াইয়া, কাজল পরাইয়া, মুখ খানি আঁচল দিয়া মুছিয়া সীতা তাহাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হয়। সুশ্রী ছেলেটিকে দেখিয়া যে কেহ কোলে লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া দেয়, বলে, সুন্দর ছেলে। সীতা আনন্দে হাসিতে থাকে। কেহ বা বলে, ছেলেটা কি দেমাকে, ভারী কত, বেশ মোটাসোটা ছেলে। সীতা তৎক্ষণাৎ তাহার কোল হইতে টুনুনকে ছিনাইয়া লইয়া বলে, যাও আমার ছেলে দাও। ভারী লাগে তো কোলে নিতে এয়েছিলে কেন মরতে। তার পর টুনুনের মাথায় মুখ দিতে দিতে সে বলে, মা ষষ্ঠী রক্ষা করো—ষাট্ ষাট্ ষাট্।

এই টুনুন, আর এই সীতা। মা'র সহিত তাহাদের বিশেষ কোন যোগ নাই। কন্যা মাতার জন্য থি'র ব্যবস্থা আছে। পিতার সহিত তাহাদের যোগও বৎসামান্য। অধ্যাপক মহাশয় সকাল সন্ধ্যা পাঠগৃহে পুস্তকপরিবেষ্টিত থাকেন। মধ্যে একবার অধ্যাপনা করিবার জন্য কলেজে যান। রাত্রিতে কন্যা স্ত্রীর একবার তত্ত্বাবধান করিয়া যখন সীতা ও টুনুনকে দেখিতে আসেন, তখন সীতা আপনি খাইয়াছে এবং টুনুনকে খাওয়াইয়া বুকের কাছে লইয়া ঘুমাইয়া গিয়াছে। একবার স্নেহ দৃষ্টি বুলাইয়া তিনি কন্যার অকাল-মাতৃত্ব নিরীক্ষণ করেন, তার পর ধীরে ধীরে শয়ন করেন। রাত্রে কোন কোন দিন টুনুন কাঁদিয়া উঠিলে সীতা বাবাকে জাগায় না, নিজেই টুনুনকে শান্ত করে। বাহিরের বারান্দায়—আর চাঁদ আর—দূরের সুরে গাহিয়া অধ্যাপক মহাশয় জাগিয়া দেখেন শুভ্র নৈশপ্রকৃতির বুকে মাতৃত্বের কোমল জাগরণ! বুকের গভীর নিঃশ্বাস চাপিয়া তিনি পাশ ফিরিয়া শয়ন করেন।

সীতার জন্য তাঁহার দুঃখ সীমাতীত, কিন্তু উপায় কি! ঐ টুনুনকে কে মানুষ করিবে? দশ বৎসরের সীতা সঙ্গীহীনা, একাকিনী। তাহার খেলাঘর ভাঙিয়া গিয়াছে। পুতুলগুলি সবই টুনুনের হাতে বিপর্যস্ত, জামাকাপড় পর্য্যন্ত টুনুনের দৌরাত্ম্যে ধূলিস্নান। অথচ টুনুন আসিবার পূর্ব্বে ঐ সীতাই ছিল তাঁহার একমাত্র নয়নানন্দময়ী আদরিণী কন্যা। ঐ সীতাই কতবার বলিয়াছে, বাবা, আমার যদি একটি ভাই থাকতো! কিন্তু ভাই আসিয়া তাহার সব সৌভাগ্য যেন কাড়িয়া লইল। হাঁ, সীতাকে তো তিনি আর তেমন করে দিতে পারিবেন না, ঐ টুনুন আসিয়া ভাগ বসাইয়াছে। এমন কি, ভাল করিয়া শিক্ষা দান করিয়া কন্যাকে যে ভাল বরের যোগ্যা করিয়া তুলিবেন, তাহারও পথ বন্ধ করিয়াছে ঐ টুনুনই। অধ্যাপক মহাশয় ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখেন, "নারী-জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত মাতৃত্ব" সম্বন্ধে একটা ভাল প্রবন্ধ লিখিবেন। উপাদান তাঁহার করেই জমা হইতেছে।

ত্রয়োদশী সীতার কোলে পঞ্চমবর্ষীয় টুনুন। টুনুনের দৌরাত্ম্য দিনে দিনে বাড়িয়া চলিয়াছে, আর কিশোরী

সীতার মনে জাগিতেছে, কোন দুরাগত কামনার সঙ্কেত, না-শোনা বাঁশীর রেশ। অধ্যাপক মহাশয় আজিও তাঁহার প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। সীতার দিকে মন দিবার তাঁহার সময়াভাব, টুকুন সীতার আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। পত্নীর কথা প্রভাত এবং রাত্রি ছাড়া তাঁহার স্মরণ হয় না। সংসার চলিতেছে আপনার আবর্ত্তে। অকস্মাৎ একদিন সীতা আসিয়া বলিল, বাবা টুকুনের হাতে খড়ি দিতে হবে। পাঁচ বছরে পড়ল যে।

বাবা চাহিয়া দেখিলেন, দিদির আঁচল ধরিয়া পঞ্চমবর্ষীয় টুকুন আবদার জুড়িয়াছে—খড়ি নেবো……।

দর্শন-চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটিয়া গেল। সীতা কিশোরী হইয়া উঠিয়াছে। অথচ লেখাপড়া প্রায় কিছুই শিখে নাই। উহাকে পাত্রস্থা করিবেন কিরূপে! কিন্তু সে-চিন্তা তাঁহার মনে রাখিবার অবসর সীতা দিল না। টুকুনের বিদ্যারম্ভের দিন স্থির করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ পঞ্জিকা লইয়া আসিল। অধ্যাপক মহাশয় দিন স্থির করিয়া তখনকার মত কন্যাকে বিদায় করিলেন, কিন্তু চিন্তাটা কাঁটার মত তাঁহার মনে বিঁধিয়া রহিল, টুকুন সীতার সব সৌভাগ্য অপহরণ করিয়াছে। সীতা কিন্তু তাহার জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নয়, হয় তো এখনো সে উপলব্ধিই করিতে পারে নাই, টুকুনকে মানুষ করিতে গিয়া সে নিজেকে কত দিক্ দিয়া রিক্ত করিয়াছে। তবুও টুকুন ছেলে, আর সীতা মেয়ে। বাঙলা দেশের সনাতনী মন অধ্যাপকের মধ্যে সাড়া দিয়া উঠিল, টুকুনের সহিত সীতার তুলনা হয় না। সীতার বিদ্যাশিক্ষা হয় নাই, কিন্তু টুকুনের বিদ্যালাভ হওয়া চাই-ই। এতবড় অধ্যাপকের পুত্রকে তাহার পিতার সম্মান রাখিতেই হইবে। তাহাকে মূর্খ করিয়া রাখা চলে না।

অধ্যাপক বিদ্যারম্ভের আয়োজন করিলেন ভাল ভাবেই। সীতার আনন্দই ইহাতে সর্ব্বাধিক। সে কি ভাবে টুকুনকে সাজাইবে, কোথায় বসাইবে, কেমন করিয়া টুকুন তাহার রাঙারাঙা কচি হাতে খড়ি দিয়া অ-আ ক-খ লিখিবে, সীতা শুধু তাহাই ভাবিয়া সারা হইয়া উঠিল। প্রতিবেশীরা বলিতে লাগিল, নিজে সীতা লেখাপড়া শিখতে পায় নি, তাই ভাই-এর জন্য কেঁদে সারা। ভাই তোর নিশ্চয় লেখা-পড়া শিখবে সীতা, তুই কিছু ভাবিস না। টুকুন নিশ্চয় লেখাপড়া শিখিবে, সীতারও ইহা জানা আছে। বাবার মত পণ্ডিত হইবে টুকুন।

বিদ্যারম্ভ উৎসব শেষ হইয়া গেল। রাত্রে কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তাঁহারা বাহিরের ঘরে বসিয়া অধ্যাপকের সহিত আলাপ করিতেছেন। সীতার বিবাহ দিতে হইবে, অথচ লেখাপড়া তাহাকে কিছুই শেখান হইল না। বন্ধুরা বলিতেছেন, নিতান্ত কচি মেয়ে, এখনো শিখবার যথেষ্ট সময় আছে, দিন্ না স্কুলে ভর্ত্তি করে। কিন্তু অধ্যাপক জানেন, তাহা হইলে টুকুন কাঁদিয়া তাঁহাকে গৃহছাড়া করিবে। দিদির অস্বাভাবিক আদরে টুকুনটা বড়ই বেয়াড়া হইয়া উঠিয়াছে। ঐ যে, ঐ তো সে কাঁদিতেছে; সীতা কোথায় গেল! সীতা ও-বাড়া হইতে ছুটিয়া আসিল। আজ উৎসবের দিনে সে একবার কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য গিয়াছিল বন্ধু রাণীকে ডাকিয়া আনিতে। টুকুন ইতিমধ্যেই বিশ চড় মারিয়া, জল ঘাঁটিয়া, কাদা মাখিয়া একাকার করিয়াছে। সীতা আসিয়া তাহাকে সামলাইতে পারে না।

অত আদর দিস নে সীতা, শেষটায় কেউ-ই ওকে সামলাতে পারবে না, বলিয়া অধ্যাপক মহাশয় সীতাকে সাবধান করিলেন। সীতারও বড়ই বিরক্তি বোধ হইতেছে। রাণীর সহিত দু'একটি কথা, কৈশোর জীবনের কথা, বয়ঃসন্ধির আবেগময়ী উচ্ছ্বাস, কত-কিছুর জন্যই সে রাণীকে আজ ডাকিয়া আনিল, কিন্তু টুকুন যেন আজ বেশী বাড়াবাড়ি করিতেছে। রাগিয়া সীতা তাহাকে ধমক দিল। রাণী বলিল, আঃ মর, ছেলেকে যত আদর করা হচ্ছে, তত ওরা কান্না বাড়ছে। টুকুন আরো জোরে কাঁদিয়া উঠিল। সীতার কি যে হইল, দিল টুকুনের গালে এক চড় বসাইয়া।

টুকুন চিলের মত চেঁচাইয়া উঠিল। সব যেন তাহার আটকাইয়া যাইবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই টুকুন দিদির কোলে ঘুমাইয়া পড়িল। তখনো টুকুন ফুলিতেছে।

সকালে টুকুনকে কোলে লইতে গিয়াই সীতার বুক ছাঁৎ করিয়া উঠিল। টুকুনের গা এত গরম! কাল সীতা তাহাকে মারিয়াছে, তাহারই জন্য কি টুকুনের জ্বর হইয়াছে! সীতা বাবাকে ডাকিয়া আনিল। অধ্যাপক বলিলেন, ও

কিছু না, কাল একটু অনিয়ম হয়েছে, জল খেঁটেছে, তাই বোধ হয় সর্দ্দি লেগেছে। কিন্তু সীতা কাঁদিয়া অস্থির করিয়া তুলিল, ডাক্তার ডাকো বাবা! অধ্যাপক কন্যার অধীরতায় তাহার মাতৃমূর্ত্তিরই বিকাশ দেখিলেন, ডাক্তার ডাকিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না।

তৃতীয় দিনে টুনুনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল এবং ডাক্তার আসিয়া যাহা ব্যবস্থা দিলেন তাহা দেখিয়া অধ্যাপক বুঝিলেন, সীতার কথা শুনিলেই ভাল হইত। ডাক্তার ডাকিতে দেরী হইয়া গিয়াছে।

পঞ্চম দিনে পঞ্চমবর্ষীয় টুনুন চলিয়া গেল এক অজানা দেশে। জন্মা মাতা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, ঝি-চাকর সব চোখের জলের বন্যা বহাইয়া দিল, নির্লিপ্ত অধ্যাপকের পর্য্যন্ত চোখ দুটি শুষ্ক রহিল না, কিন্তু সীতা নিশ্চল,—মৃত টুনুনের মাথা কোলে লইয়া সীতা নির্ব্বিকার বসিয়া রহিল। পাড়ার একটি সৎসাহসী যুবক সীতার কোল হইতে টুনুনের দেহ লইয়া সৎকার করিয়া আসিল, সীতা তথাপি বসিয়া রহিল। শেষে অধ্যাপক স্বয়ং আসিয়া বলিলেন, সীতা, ওঠ্ মা অমন করে বসে থাকলে টুনুন তো ফিরবে না।

অকস্মাৎ সীতা গগনভেদী চীৎকার করিয়া উঠিল, আর কখ্খনো মারবো না তোকে ভাই রে টুনুন, ফিরে আয়।—

বিষাদের বাষ্পে পাড়াটা যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। সীতা টুনুনকে লইয়া যে-খাটখানায় শুইত, তাহাতেই আজিও শুইয়া রহিল। ক্রন্দনের আবেগে দেহ তাহার দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী অধ্যাপক মহাশয় নীরবে বসিয়া ভাবিতেছেন, সীতাকেই এবার তিনি মানুষ করিয়া তুলিবেন। কালই তাহার জন্য একজন মাষ্টার রাখিতে হইবে। পড়াশুনার মধ্যে সে হয় তো টুনুনের শোকটা কিছু ভুলিতে পারিবে।

সহসা সীতা উঠিয়া বলিল, বাবা, জানো, তোমার ছেলেকে আমি মেরে ফেলেছি বাবা।

অধ্যাপক শিহরিয়া উঠিলেন, সে কি কথা মা!

হাঁ বাবা, রাণীর বিয়ে হবে, তার গয়না গুনবার জন্যে আমি টুনুনকে মেরেছিলাম; খুব জোরে মেরেছিলাম বাবা, এত জোরে আর কখ্খনো তাকে মারি নি।

অধ্যাপক বিষাদের স্বরে বলিলেন, তাতে কি টুনুন মরে যা, ও আমাদের ভাগ্যে মরেছে, কাঁদিস নে।

সীতা পুনরায় শুইয়া পড়িল। কয়েক মিনিট পরে উঠিয়া বলিল, বাবা আমার ফাঁসি হওয়া উচিত।

—ছিঃ মা, ও-কথা ভাবতে নেই। তুই টুনুনকে এত বড় করেছিলি, তুই কি তাকে মারতে পারিস্। আমার অদৃষ্টে ছেলে নেই—না থাক্, তুই বেঁচে থাক্, তোকেই আমি আমার সব বিলিয়ে দান করে যাবো!

পর দিনই সীতার মাষ্টার বহাল হইয়া গেল। সকাল-সন্ধ্যা দুইবার সীতাকে পড়িতে বসিতে হয়। বর্ষার আকাশে মেঘ ঘনাইয়া আসে,—জার্টবুকের ব্যাঙের পাতা উল্টাইয়া সীতা বলিয়া উঠে, বড্ড ঠাণ্ডা বাতাস, টুনুনের যদি অসুখ করে! মাষ্টার তাহার ভ্রম সংশোধন করিতে গিয়া দেখেন, সীতা নিজেই ভুল বুঝিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছে। বৃষ্টির ছাঁট আসিতেছে জানালার পথে—সীতা চেঁচাইয়া উঠে, এই ঝি, টুনুনটা কোথায় গেল!

সীতা জানালা বন্ধ করিতে উঠিয়া কাঁদিয়া জানাইয়া দেয়। তথাপি পড়িতে হয়। ক্ষণে ক্ষণে সীতার অমনোযোগ, আর মাষ্টার মহাশয়ের ধমক কোনটাই কমিতেছে না। শেষে একদিন মাষ্টার মহাশয় অধ্যাপকের নিকট গিয়া সব কথা নিবেদন করিলেন।

আহারের সময় অধ্যাপক কন্যাকে কহিলেন, তুই পড়াশুনায় কিছু মনোযোগ দিস নে সীতা, কাদলে কি টুনুন ফিরে আসবে! আমার নাম তোকেই রাখতে হবে, বুঝেছিস্?

সীতা নীরবে বাবাকে হাত ধুইবার জল ঢালিয়া দিল। আরো মাসখানেক পরে অধ্যাপক কন্যার পাঠে অমনোযোগের পুনরভিযোগ শুনিয়া মৃদু তিরস্কারের সহিত বলিলেন, ও-রকম করলে চলবে না সীতা, পড়াশুনা কর।

সীতা মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া রহিল, তার পর ধীরে ধীরে বলিল, লেখাপড়া আমার হবে না বাবা, তার চেয়ে বিয়ে দিয়ে দাও, ঘর-সংসার করি।

চতুর্দ্দশী কন্যার কথায় চিরগম্ভীর অধ্যাপক বিস্ময়াহত হইয়া উঠিলেন। আধুনিক যুগের আশ্চর্য্য প্রগতিবাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও, বর্ত্তমান কালের নারীদের সম্বন্ধে তিনি অনেক কথাই শুনিয়াছেন। তাঁহার কন্যা, মাত্র চৌদ্দ বৎসর যাহার বয়স, সে বিবাহ করিতে চায়, এবং সেই ইচ্ছা পিতাকে জানাইতেও লজ্জা বোধ করে না।

অধ্যাপক নীরবে ফিরে শয়ন করিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন। মানব-জীবনের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকায় অধ্যাপক বুঝিতে পারিলেন না যে, দশ বৎসর বয়সে যাহার মাতৃত্বের জাগরণ হইয়াছে, চতুর্দশ বৎসরে সে বিকশিত হইতে চায়। সীতা লজ্জিতা না হইলেও, সীতার কথায় তিনিই লজ্জিত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু পড়াশুনা যখন তাহার হইবে না, আর বিবাহ যখন সে নিজেই করিতে চায়, তখন আপত্তি করিবার কি-ইবা কারণ থাকিতে পারে। বরং একটি ভাল ছেলে দেখিয়া ঘরে আনিলে অধ্যাপকের কাজের কতকটা লাঘব হইবে।

দুই তিন মাসের মধ্যে তিনি সীতার বিবাহ দিলেন, তাঁহারই একটী প্রতিভাবান্ সচ্চরিত্র ছাত্রের সঙ্গে। জামাতা ঘরেই রহিলেন।

অধ্যাপক যেন নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছেন। সীতার খবর তিনি কোন দিনই লইতেন না, আজও লইবার অবকাশ পান না। বরং সীতাই এখন তাঁহার খবর বেশী করিয়া লইতেছে। কন্যা পত্নীকে দুইবেলা দেখিয়া আসা ছাড়া অধ্যাপকের সহিত সংসারের আর কোন সম্বন্ধই নাই। বেশ আছেন তিনি। ভুলিয়া গিয়াছেন যে, তিনি এখনো গার্হস্থ্যাশ্রমে বাস করিতেছেন।

সহসা এক সন্ধ্যায় ঝি আসিয়া জানাইল, সীতা আসন্ন-প্রসবা। জামাইবাবু নার্স আনিতে গিয়াছেন, কিন্তু সীতা বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছে। বিস্মিত অধ্যাপক পক্ষকাল পূর্বের কথা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। সেই দীর্ঘা বিধবা সীতা, তাহার খোকা হইবে! স্তম্ভিত উঠিয়া তিনি ভিতরে আসিলেন। নার্স আসিয়াছে। অসহ্য যন্ত্রণার ভিতর দিয়া সীতার প্রসবকার্য্য শেষ হইল, কিন্তু সীতা বোধ হয় আর কথা বলিবে না।

শব্দহীন রাত্রির কোলে দাঁড়াইয়া অধ্যাপক দেখিতে লাগিলেন, মনের সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া সীতা যেন চোখ খুলিল, বলিল, "কি হয়েছে, মেয়ে?"

—না, ছেলে—হাসিমুখে নার্স তাহাকে জানাইল।

সীতা ডাকিল—বাবা! অধ্যাপক কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি তোমার ছেলেকে মেরে ফেলেছিলাম বাবা, আমার ছেলেকে তোমায় দিলুম, ওকে তোমার সব দিতে দিও।

বেদনার তমাট অন্ধত্ব মধ্যে অধ্যাপক অনুভব করিলেন, নির্লজ্জা সীতা কেন চাহিয়াছিল ঘর-সংসার করিতে।

---

# পল্লীর ব্যথা

—শ্রীনকুলেশ্বর পাল

কল্পনারি স্বপ্নে বোনা এই কি সাধের পল্লীরাণী,
শ্যামলতারি ছায়ায় ঘেরা ধরার বুকে স্বর্গখানি।
কোথে যেথায় পাতায় পাতায় খেলতো উষার কনক হাসি,
রাখাল যেথা মধুর সুরে বাজিয়ে বেতো গোঠের বাঁশী।
পাখীর ললিত মধুর বোলে চলতো যেথায় সুরের খেলা,
পল্লী-মায়ের আঁচল ঘিরে ব'সতো নিতুই রংয়ের মেলা।
কাজলা দীঘির অথই জলে ফোটে না আর কমল রাশি,
পল্লী-বালা 'জলুক এসে', হাসে না আর মধুর হাসি।
গোলা-ভরা নাই যে সে-ধান গোয়াল-ভরা দুধেল গাই,
সোণার পল্লী শ্মশান হ'ল দুঃখ রাখার নাই যে ঠাঁই।
পল্লীর ঘাটে পল্লীর মাঠে পল্লীর বুকে মানুষ নাই,
কার অভিশাপে এমন হইল পল্লীর দশা ভাবি যে তাই।
আশা-মন্দিরে জ্বলে না প্রদীপ সন্ধ্যা আরতি বাজে না আর,
পল্লীর ব্যথা কেহ বোঝেনা রে, সন্তান নাই পল্লী-মার!

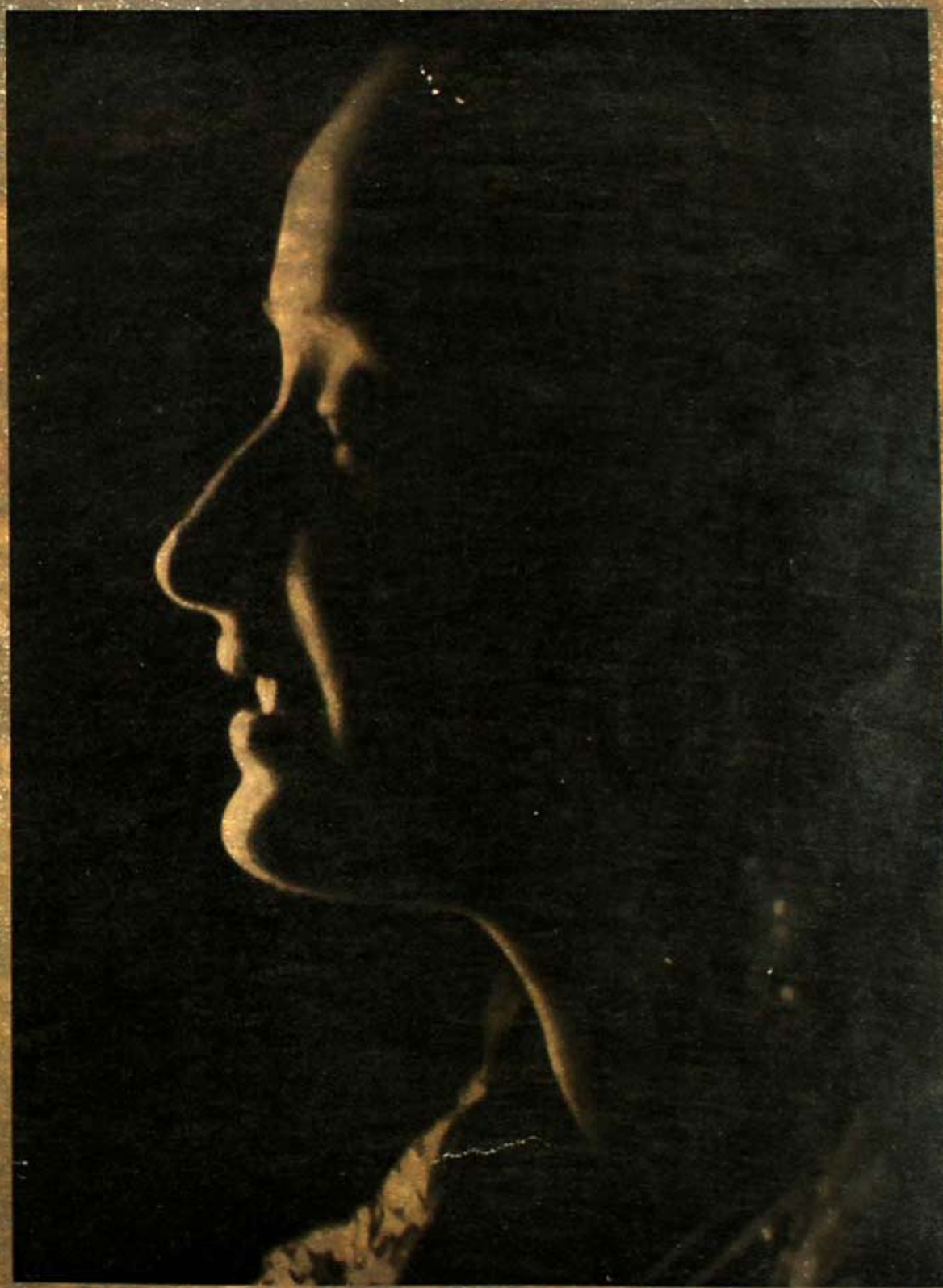

কৈশোর [ শ্রীপরিমল গোস্বামী

—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ

## দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপ

ইউরোপীয় সভ্যতা বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে তাহা নাই বলিলেই চলে। ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি, এবং নৃতত্ত্ববিদ্গণও এ বিষয়ে একমত যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা ইউরোপীয় সাধারণ ব্যবস্থা হইতে পৃথক্।

এই দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপকে প্রচলিত ভাষায় বল্‌কান্ অঞ্চল বলিয়া পরিচিত করা হইয়া থাকে। রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া, আলবানিয়া, গ্রীস ও বুল্‌গেরিয়া রাষ্ট্রগুলিই বল্‌কান্ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এবং, রাশিয়া, পোলাণ্ড, অষ্ট্রীয়া, ইতালী ও তুরস্ক রাষ্ট্রগুলি এই বল্‌কান্ অঞ্চলের চারি পাশে অবস্থিত। প্রাচ্য, মাঝার, তুরস্ক হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপের জাতিসমূহের সংমিশ্রণের ফলেই বর্ত্তমান বল্‌কান্ জনপদগুলী গড়িয়া উঠিয়াছে।

এইরূপ বিচিত্র পরিবেশ এবং বিচিত্র জনতার সমাবেশ, বল্‌কান্ অঞ্চলের রাষ্ট্রনৈতিক আকাশে সর্ব্বদাই একটা অপ্রসন্ন দুর্য্যোগের আবহাওয়া সঞ্চারিত করিয়া রাখিয়াছে। তদুপরি, জনসংখ্যা এবং অর্থনৈতিক কারণও এই অঞ্চলকে যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের কূটনৈতিক ক্রীড়া-ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ নদী দানিয়ুব, বল্‌কান্ অঞ্চলকে সুদূর পলিমাটির উপহারে সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বল্‌কানের বৃহৎ জনসংখ্যা যে কোনও সৈন্য-সংগ্রহকারীর লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম।

এই সকল কারণেই প্রাচীনকাল হইতে রোমক, তুর্কী, জার্মান ও রাশিয়ান রাষ্ট্রনায়কগণ এই জনবহুল, সুজলা, সুফলা ভূভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব বিস্তারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

ইতিহাসের ঘটনা আপনার পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকে। সেই জন্যই দেখিতেছি, বর্ত্তমান ইউরোপীয় পরিস্থিতিতে বল্‌কান্ অঞ্চলের সমস্যা ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে।

বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের পূর্ব্বে এই অঞ্চলের কোনও স্থানে স্বরাজ প্রচলিত ছিল না। কিন্তু অষ্ট্রিয়ান, রুশ এবং তুর্কী সাম্রাজ্যের পরাধীনতার ফলে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে রাষ্ট্রিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শেষ অবধি এই অঞ্চলের জনৈক অধিবাসীর নিক্ষিপ্ত গুলীর আঘাতে একটি বিশিষ্ট রাষ্ট্রনেতার প্রাণবিয়োগ হয় এবং সেই হইতেই বিগত ইউরোপীয় মহাসমরে ধ্বংসানল প্রজ্বলিত হইয়া পড়ে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স, বৃটেন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জয়লাভের পর, বিশেষজ্ঞের অভিপ্রায়ানুসারে তৎ তৎ দেশীয় ব্যবস্থানুযায়ী—অর্থাৎ পশ্চিম-ইউরোপীয় গণতন্ত্রের আদর্শে বল্‌কান্ রাষ্ট্রসমূহেরও শাসনব্যবস্থার পত্তন করা হইল। ভাষা ও জাতির বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যদিও এই নূতন ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়, তথাপি স্বীকৃত হইয়াছে যে, এই নূতন ব্যবস্থা-পত্তন পুরাপুরি আদর্শানুযায়ী হয় নাই। তদুপরি, পশ্চিম ইউরোপের গণতন্ত্র যে অর্থনৈতিক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, বল্‌কান্ রাষ্ট্রগুলির তদনুরূপ আর্থিক সুদৃঢ় ভিত্তি ছিল না। ইহা ছাড়া, যে পরিমাণ শিক্ষা ও শাসন-ব্যাপারে অভিজ্ঞতা রাষ্ট্রপরিচালকদের থাকা আবশ্যক, বল্‌কান্ রাষ্ট্রসমূহের কুত্রাপি সেই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা জন-সাধারণের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল না।

এতদ্ভিন্ন, পশ্চিম ইউরোপের আদর্শে সীমান্তরক্ষা ও আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় রাখিবার নিমিত্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রেই ব্যয়-বহুল সেনাবাহিনী গঠিত হয়।

এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, যে, ব্যয়-বহুল শাসন-ব্যবস্থা

নিরঙ্কুশ রাখিতে হইলে, দেশের আর্থিক সম্পদ্ বাড়ান দরকার। কিন্তু বল্‌কান্ অঞ্চলের প্রধান আয় হইয়া থাকে কৃষি-সম্পদের রপ্তানীর বিনিময়ে। রুমানিয়ায় অবশ্য পেট্রোলের খনি রহিয়াছে, যাহার বার্ষিক উৎপাদন-পরিমাণ ( ৪ কোটী ৭০ লক্ষ ব্যারেল ) সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের বার্ষিক উৎপাদন-পরিমাণ ( ২ কোটী ৬৫ লক্ষ ব্যারেল ) অপেক্ষা অনেক বেশী। এক রুমানিয়া ব্যতীত সমগ্র বল্‌কান অঞ্চল মূলতঃ চাষী-দেশ নামে অভিহিত হইতে পারে।

সমাজ-বিজ্ঞানের গোড়াকার কথাই এই যে, চাষীরা চিরকালই আত্মসচেতন এবং আপন প্রাধান্য ও নিজস্ব ক্ষুদ্র গণ্ডীতেই বিরাজ করিবার অভিলাষী। রাশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, রাশিয়ার জোৎদার এবং সাধারণ চাষীদিগকে সোভিয়েটের অন্তর্ভুক্ত করিবার তালে বিপ্লবী শাসকনেতারা কিরূপ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের বিগত সাতশো বছরের ইতিহাসেও আমরা দেখি যে, রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি চাষীরা চিরকাল উদাসীন রহিয়াছে। "এক রাজা যাবে পুনঃ অন্য রাজা হবে, ভারতের সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।" এ কথার যাথার্থ্য কেবল মাত্র ভারতীয় চাষীরাই অনুভব করে নাই, সর্বদেশের চাষীরাই অনুভব করিয়াছে। দেশে যে কেহই রাজা হউক, যেরূপ শাসন-ব্যবস্থাই প্রচলিত হউক, জমির নিরাপত্তা বজায় রহিলেই হইল, চাষীর তাহাতে কিছু যায় আসে না।

ফলে, বল্‌কান্ অঞ্চলের প্রত্যেক দেশেই, সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রভুত্ব করিতে লাগিল। কিন্তু ব্যয়-বহুল শাসন-ব্যবস্থা চালাইতে হইলে অতিরিক্ত শোষণ-ব্যবস্থাও চালান চাই; বল্‌কান্ রাষ্ট্রে শাসক ও শাসিতে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া আসিল। দেশে শাসনের মূলে থাকে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। বল্‌কান্ দেশে তাহা নাই; ধনী দরিদ্রের বালাই নাই। আছে চারি শ্রেণীর লোক—চাষী, জোৎদার, মোড়ল, পাদ্রী-পুরোহিত এবং সামরিক-শাসক সম্প্রদায়। অর্থের সামর্থ্য নাই কাহারও; সুতরাং শাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে চরিত্রহীনতা এবং স্বার্থপরতার বিস্তার ঘটিতে লাগিল। এই মানসিক বিকারের সুযোগ লইয়া জার্মান ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনায়ক ও বণিক্-সম্প্রদায় বল্‌কান্ দেশের রাষ্ট্র-নায়কদের মধ্যে টাকা ছড়াইতে লাগিলেন। যাহারা এই টাকা পাইতে লাগিল, তাহারা স্ব স্ব দেশের উন্নতির জন্য তাহা ব্যয় করিল না, স্বীয় বিলাসের পিছনেই তাহা ব্যয় করিতে লাগিল। এবং যে বিদেশী রাষ্ট্র হইতে যখন বেশী টাকা পাওয়া যাইতে লাগিল, তাহারা সেই দিকেই ঝুঁকিতে লাগিল।

সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, বল্‌কান্ রাষ্ট্র-সমূহের পররাষ্ট্রনীতির কোনও স্থিরতা বা আদর্শ নাই। কখনও বৃটিশ, কখনও বা জার্মান—বল্‌কান্ রাষ্ট্রনায়করা নিজেদের প্রয়োজন মত ( দেশের প্রয়োজন মত নয় ) উহাদের তাঁবেদারী করিয়াছে। কিন্তু এক বিষয়ে বল্‌কান্ অঞ্চলের শাসিত ও শাসক উভয় দলই আশ্চর্য রকমে একমত: সোভিয়েট রাশিয়াকে উভয় দলই শত্রু জ্ঞান করিয়া থাকে। বল্‌কানে বিত্তহীন চাষী নাই; ফসল কাটিবার জন্য অষ্ট্রিয়া ও ইতালী হইতে মজুর আমদানী করিতে হয়, এতই শস্য-শালিনী এই বল্‌কান্ দেশগুলি।

ফাশিস্ত, নাৎসী ও সাম্রাজ্যবাদী-গণতন্ত্রী রাষ্ট্রনায়করা বল্‌কান্ অঞ্চলকে স্বীয় প্রভুত্বের ও প্রভাবের আওতায় আনিবার উদ্দেশ্যে আপনাপন রাষ্ট্রের ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিয়া ঐ অঞ্চলে প্রচারকার্য চালাইয়া আসিয়াছে।

বর্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে ফ্রান্সের পতনের পর, সংবাদ আসিয়াছে, রুমানিয়ায় ফাশিস্ত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। রুমানিয়ার রাজা ক্যারল একদা বৃটিশ কূটনীতির পরোক্ষ বিক্রমের ফলে সিংহাসন লাভে বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন। বর্তমানে, ফ্রান্সের পতনের পর, নিষ্কণ্টকে তিনি রাজ্যময় নাৎসী-অনুরাগের পরিচায়ক শাসন-ব্যবস্থা প্রচলন করিতে উৎসাহী হইয়াছেন। একমাত্র গ্রীস ও তুরস্ক ছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে বৃটিশ প্রভুত্ব আর প্রত্যক্ষ রহিল না। এবং অদূর ভবিষ্যতে যে বল্‌কান্ রাষ্ট্রসমূহের রূপান্তর ঘটিবে, সে সম্বন্ধেও প্রায় নিশ্চিত হওয়া যায়।

কিন্তু তাহাতেই কি আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিবে? বল্‌কানের আকাশে বাতাসটা আপাততঃ যদিও উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতেই প্রবল হইয়া বহিতেছে, তথাপি পূর্বোত্তর কোণের মেঘটার কথাও বিস্মৃত হইলে চলিবে না। কৃষ্ণ-সাগরের পার ঘেঁষিয়া সোভিয়েটের আকাশে মেঘ জমা

হইয়া আছে। রুমানিয়ার বেলারাবিয়া প্রদেশের উপর বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। আপাততঃ খুবই সম্ভব জার্মানী বল্‌কানের অনেকটা অংশই সোভিয়েট রাশিয়াকে ছাড়িয়া দিবে।* ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের গণতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব বল্‌কান্ হইতে উচ্ছেদ হইয়া গেলেও যে আকাশ স্বচ্ছ হইয়া আসিবে, এমন মনে করা অসঙ্গতই হইবে। নাৎসীবাদ ও কম্যুনিজম্ পরস্পর-বিরোধী। দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে,—এশিয়ার সিংহদ্বারে,—একের প্রভুত্ব নিঃশেষ করিতেই হইবে, নতুবা অপরের একচ্ছত্রত্ব বজায় থাকে না।

সুতরাং 'আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ঝড় উঠিবে'। সেই ঝড়ের ঝাপট যে কেবলমাত্র বল্‌কান্, ভূমধ্যসাগর ও এশিয়া মাইনরের উপরেই পরস্পর-বিরোধী মেঘের ধ্বংসেই সমাপ্ত হইবে, তাহা মনে করিবারও কারণ নাই। আপাততঃ ঝড়ের দেবতা অতলান্তিকের অভিমুখে ধাবমান বলিয়া যে চকিতেই গতি ফিরাইবেন না, তাহা শপথ করিয়া কে বলিতে পারে? পশ্চিম এশিয়ার মরুভূমির বালুরাশি উড়াইয়া দিয়া আরব-সমুদ্রের কূল ঘেঁষিয়া যে ওঁহার ছায়া পূর্ব্বাভিমুখী হইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

### দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্কট

ভারতবর্ষের তুলনায় দক্ষিণ আমেরিকার আয়তন চারিগুণেরও অধিক, একমাত্র ব্রাজিল দেশটাই ভারতবর্ষের অপেক্ষা বৃহত্তর, কিন্তু সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকার লোকসংখ্যা ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার এক-চতুর্থ ভাগেরও কম। আট কোটী অধিবাসীর মধ্যে মোটামুটি এক কোটী লোক আদিম অধিবাসী, বাকী সকলে আসিয়াছে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ইউরোপ হইতে। প্রধানতঃ স্পেনীয়, রোমক ও পর্ত্তুগীস ঔপনিবেশকরাই এদেশে আসিয়া বিগত তিন চারিশত বৎসর ধরিয়া ভেড়াডাঙা বাঁধিয়া ঘর-বাড়ী, সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠন করিয়া রহিয়াছে।

স্পেন সাম্রাজ্যের পতনের পর স্পেনীয় উপনিবেশগুলি দক্ষিণ আমেরিকায় স্বরাজ পাইয়াছিল। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে এই সমুদয় রাষ্ট্র গঠিত ও পরিচালিত হয়। প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ এই দেশগুলি ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করিয়া থাকে।

দক্ষিণ ব্রাজিল ও লাপ্লাতার উপত্যকায় বহুসংখ্যক ইতালীয় ও জার্মান ঔপনিবেশিক বসতি করিয়াছে।

সম্প্রতি ইউরোপের যুদ্ধের ফলে দক্ষিণ আমেরিকার স্বাতন্ত্র্য বিপন্ন হইবার কারণ দেখা দিয়াছে।

মনে রাখিতে হইবে, ইউরোপের যে সব দেশ হইতে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া যে-সকল ভাগ্যান্বেষী দক্ষিণ আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, তাহারা এবং সেই সকল দেশ, যথা—স্পেন, ইতালী ও জার্মানী—বর্ত্তমানে ফাশিস্ত-নাৎসী রাজনীতির নির্দ্দেশানুসারে পরিচালিত হইয়া থাকে। ফাশিস্তরা ইউরোপের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়া রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কায়েমী হইয়া বসিয়াই বিশেষভ্ব স্ব স্ব জাতির ঔপনিবেশিকদের প্রতি মনোনিবেশ করিল। ফলে কূট-নীতি, রাষ্ট্রনীতি এবং বাণিজ্য-নীতির সাহায্যে দক্ষিণ আমেরিকায় ফাশিজম্ প্রচারিত হইতে লাগিল।

আমেরিকা ভূখণ্ডে যুক্তরাষ্ট্র আপনাকে অভিভাবক বলিয়া জ্ঞান করে এবং তদনুযায়ী কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে। এই কর্ম্মপন্থার ফলেই মনরো-নীতি প্রবর্ত্তিত হয়। মনরো-নীতির অন্যতম অনুজ্ঞা এই যে, দক্ষিণ আমেরিকার কোন রাষ্ট্রই ইউরোপের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হইতে পারিবে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে দক্ষিণ আমেরিকায় ফাশিজম্ বিশেষ করিয়া প্রচার লাভ করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করিয়া, ভেনিজুয়েলা, ব্রাজিল, বোলিভিয়া, পারাগুয়া, উরুগুয়া এবং আর্জ্জেন্টিনায় ফাসিজম্ দৃঢ় শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ইতালী ও জার্মানীর সহিত এই সব রাষ্ট্রগুলির প্রত্যক্ষ বাণিজ্যসূত্র এবং বিমান-যোগ স্থাপিত হইয়াছে। এই বাণিজ্যসূত্র এবং বিমান-পথে যতটা বাণিজ্য-দ্রব্য চলাচল করে, তদপেক্ষা বেশী পরিমাণ চলাচল করে ফাশিজমের প্রচারকার্য্য। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল যাহা, তাহা সংবাদ-পত্রের পাঠকগণ ইতিমধ্যেই জ্ঞাত হইয়াছেন: ব্রাজিলে সরকারী ভাবে কম্যুনিষ্টদের দমন করা হইয়াছে; ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচুর পরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছে।

* এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পরে সোভিয়েট রুমানিয়ার নিকট হইতে বেসারাবিয়া ও উত্তর বুকোভিনা দাবী করে। রুমানিয়া এই দাবী মানিয়া লইয়াছে। গত ৩রা জুলাই তারিখে এই অঞ্চলের অধিকার মানিয়া সম্পূর্ণ করিয়াছে। জার্মানী ও ইতালী কোনরূপ বাধা দেয় নাই।—ঃ সঃ।

কয়েক মাস আগে যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় দক্ষিণ আমেরিকা সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যবহুল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা পাঠে জানা যায় যে, দক্ষিণ আমেরিকার প্রত্যেকটী রাষ্ট্রেই সৈন্য বিভাগের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তার বা সামরিক উপদেষ্টার পদে হয় ইতালীয় নয় জার্ম্মান, নয়তো কোন জাপানী লোক রহিয়াছে; এবং এই সকল গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারীরা যে প্রকাশ্যভাবেই ফ্যাসিজমের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহাও বহুজন-বিদিত।

এখন আমাদের জানিতে হইবে, দক্ষিণ আমেরিকার প্রতি ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রবিদ্‌দের এত সরস নজর কেন। কারণটা খানিকটা জানা যাউক: ব্রাজিলে কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে চিনি, তামাক, তুলা এবং উৎপন্ন ও খনিজ দ্রব্যের মধ্যে রবার, কফি (সমগ্র পৃথিবীর শতকরা আশী ভাগ কফি এই ব্রাজিল হইতেই রপ্তানী হয়) এবং কোকো, হীরা, সোনা এবং অন্যান্য ধাতুদ্রব্য পাওয়া যায়। কলম্বিয়া রাষ্ট্রে নাতিশীতোষ্ণ লোভনীয় জলবায়ুতে চাউল, চিনি, গম, আলু, কোকো, কফি, কলা, সোনা এবং চামড়ার রপ্তানী ব্যবসায় কলাও ভাবে চলে। আর্জেন্টিনা হইতেই পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মাংস রপ্তানী হইয়া থাকে. পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ পরিমাণ গম একমাত্র আর্জেন্টিনাতেই উৎপাদিত হয়। স্থানাভাবের জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের বিবরণ লিখিলাম না। কিন্তু উপরোক্ত বিবরণ হইতেই ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্র-সমূহের সহিত ব্যবহারের কারণ উপলব্ধি করা যাইবে।

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক এই পটভূমিকায় পূর্ব্বোভাগে ইউরোপীয় রাষ্ট্র-বিপ্লবের ঢেউ আসিয়া দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্র-উপকূল এবং দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীদের মনে আঘাত করিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রবলতম প্রচেষ্টা করিয়াও এই রাষ্ট্রগুলিকে ইউরোপীয় রাজনীতির আওতা হইতে সরাইয়া রাখিতে পারিবে কি না কে জানে।

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর উপকূলে গায়েনা বলিয়া একটি দেশ আছে। বৃটিশ, ফরাসী ও ওলন্দাজ সরকার ইহার এক একটা অংশের মালিক। ওলন্দাজ ও ফরাসী গবর্ণমেণ্টের পতনের পর রাষ্ট্রিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। মনরো-নীতি অনুসারে এই সব দেশের স্বাতন্ত্র্য ও নিরাপত্তা বজায় রাখায় দায়িত্বের অংশীদার যুক্তরাষ্ট্রও বটে। কিন্তু ওলন্দাজ ও ফরাসী গায়েনাতে যদি অতঃপর নাৎসী কর্ত্তৃপক্ষ জার্ম্মানীর তাঁবেদার গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে উদ্যোগী হয় এবং ব্রাজিল ও অন্যান্য ফ্যাসিজমের অনুরাগী দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিকে হাত করিয়া লয়—অন্ততঃ একটা তাবী দলকে যদি সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশে সংঘবদ্ধ করিয়া লয়, তবে কি পরিস্থিতিটা আরও ঘোরালো হইয়া আসিবে না? ইউরোপীয় যুদ্ধের একটা হেস্তনেস্ত করিতে পারিলেই যে অতঃপর দক্ষিণ আমেরিকার দিকে নাৎসী-ফাসিস্ত সম্মিলিত 'পঞ্চম বাহিনী' অভিযান করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগের বাহিরে একটা দক্ষিণ আমেরিকার 'সম্মিলিত রাষ্ট্রগুলী' গঠন করিবার কথা শোনা যাইতেছে। বাক্য ব্রহ্ম; সুতরাং এখন যাহাকে কেবল মাত্র বাক্য বলিয়াই প্রতীত হইতেছে, তাহা যে কালে বা অকালে কার্য্যে রূপান্তর লাভ করিবার প্রয়াসী হইবে না, তাহা জোর করিয়া কে বলিতে পারে?

বিগত তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যাহারা দেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, পরবর্ত্তী তিন শত বৎসরের সঞ্চিত অন্যায় সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ফল ভোগ করিবার জন্য তাহাদিগেরই ডাক পড়িয়াছে। যত দিনে ইউরোপের জীবনযাত্রা বিষয়ক অনুসৃত পন্থায় আমূল পরিবর্ত্তন না হইবে, ততদিন কি ইউরোপ, কি সমগ্র পৃথিবী, কাহারও মুক্তি নাই।

## ফ্রান্সের পতনের পর

ফ্রান্সের পতনের পর অস্বীকার করা চলে না যে, গ্রেট বৃটেনের অবস্থা শঙ্কাজনক হইয়াছে। ইউরোপীয় সংবাদ পাঠ করিয়া এই রূপ মনে হয় যে, জার্ম্মানী এবার তাহার সমুদয় শক্তি দিয়া বৃটেনকে কাবু করিবার চেষ্টা করিবে। সোজাসুজি আক্রমণ হইতে পারে, হয়তো বা এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বেই তাহা আরম্ভ হইতে পারে, হয়তো প্রত্যক্ষ আক্রমণ না-ও হইতে পারে। হয়তো 'ব্লকেড' বা অবরোধের প্রক্রিয়ায় জার্ম্মানী এবার গ্রেট বৃটেনকে কাবেল করিবার প্রয়াস পাইবে।

যদি অবরোধ নীতিই প্রকৃত বলিয়া জার্ম্মানী বোধ করে,

তবে কি কি উপায় সে অবলম্বন করিতে পারে, তাহা দেখা যাউক্ :

আমরা জানি যে গ্রেট্ বৃটেন হইতে তাহার প্রাচ্য দেশ-সমূহে যাওয়ার রাস্তা ইংলণ্ড-জিব্রাল্টার-মাল্টা-সৈয়দ-বন্দর-আলেক্জান্দ্রিয়া ও এডেনের পথে। অর্থাৎ ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের পথে। এইটি ছাড়া আরও একটি পথ আছে, তাহা হইতেছে সমগ্র আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া অতলান্তিক-ভারতমহাসমুদ্রের পথে; অনেকটা ঘুরিয়া অনেক সময় ও অর্থব্যয় করিয়া এই শেষোক্ত পথে জাহাজ চলিয়া থাকে। ইতালী যুদ্ধে যোগদানের পরেই ভূমধ্যসাগরের পথ বৃটিশ জাহাজদের পক্ষে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কি ভূমধ্যসাগর, কি আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপের পথ, দুইটিই পর্তুগালের উপকূলের সন্নিকট দিয়া গিয়াছে। সুতরাং পর্তুগালের প্রতি বৃটিশ ও জার্মানী-ইতালীর সমানই প্রখর দৃষ্টি ও কর্মৎপরতা শুরু হইয়াছে। পর্তুগালকে যে পক্ষ হাত করিতে পারিবে, যুদ্ধে যে সেই পক্ষ অনেকটা জয়ের পথে আগাইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আগেই বলিয়াছি, ভূমধ্যসাগরের পথ বন্ধ করিয়া দেওয়ার পর, বৃটিশ নৌ-বাণিজ্য-কর্তৃপক্ষ উত্তমাশা অন্তরীপের পথে নিজের প্রাচ্যদেশগামী জাহাজগুলিকে চালনার নির্দেশ দিয়াছেন। এই পথটা পর্তুগালের উপকূলের সন্নিকটে পড়ে, তাহাও পূর্বে বলিয়াছি। এই পথের নিরাপত্তা রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। মানচিত্র দেখিলে বুঝা যাইবে যে, এক জিব্রাল্টার ভিন্ন এমন কোনও স্থান আফ্রিকার পশ্চিম-উত্তর অঞ্চলে নাই, যেখানে সামরিক ঘাঁটি পাতিয়া বৃটিশ কর্তৃপক্ষ জাহাজ চলাচলের পথ নির্বিঘ্ন করিতে পারেন।

কিন্তু ফ্রান্সের পতনের পর, ইতালীর যুদ্ধে যোগদান করিবার ফলে, এবং স্পেনীয় গবর্ণমেণ্টের ফ্যাশিস্তবাদের অনুরাগী ও ইতালীর কর্তৃপক্ষের তাঁবেদার হওয়ার দরুণ জিব্রাল্টার এখন আর পূর্বের মত নিরাপদ নহে। জিব্রাল্টারের নিরাপত্তা তাহা হইলেই রক্ষিত হয় যদি পর্তুগাল সরকার গ্রেট্ বৃটেনের সত্যকার বন্ধু হয়। জার্মানীও যে এই তথ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন, তাহা আড়াই বৎসর আগেকার একটি নাৎসী সামরিক বক্তৃতা হইতে জানা যায়।

"Gibraltar cannot be held without Portugal....The harbours of Malta and Gibraltar are too narrow to be quite satisfactory. But the situation would be entirely changed if England had an air base on the southern coast of Portugal at her disposal." অর্থাৎ পর্তুগালের সাহায্য ব্যতিরেকে জিব্রাল্টার হাতে রাখা যায় না.....মাল্টা ও জিব্রাল্টারের বন্দরগুলি খুব ছোট ও অসন্তোষজনক। কিন্তু যদি পর্তুগালের দক্ষিণ উপকূলে বিমান বন্দরের অস্তানা ইংলণ্ড করিয়া লইতে পারে, তবে পরিস্থিতিটা পুরাপুরি পরিবর্তিত হইয়া যাইবে।

বৃটিশ রাষ্ট্র-কর্তৃপক্ষ নিজেদের বাণিজ্য-পথের নিরাপত্তার সম্পর্কে পর্তুগালের গুরুত্ব বিশেষ ভাবেই পরিজ্ঞাত আছেন। পর্তুগালের সঙ্গে গ্রেট্ বৃটেনের বহু শতাব্দীব্যাপী বন্ধুত্বও অনেকটা যে সেই কারণেই তাহা অস্বীকার করিবার নহে। সম্প্রতি পর্তুগালের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অষ্টম শতবার্ষিকী উৎসবে বৃটিশ সম্রাটের কনিষ্ঠ সহোদর ডিউক অব্ কেণ্ট স্বয়ং সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপে যোগদান করিয়াছিলেন; এবং বিগত দুই বৎসর কাল মধ্যে একাধিকবার পর্তুগাল ও বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ ও সামরিক মিশন পরস্পরের মধ্যে শুভেচ্ছা ও সংবাদ বিনিময় করিয়াছেন।

কিন্তু পর্তুগালের এই বৃটিশ-প্রীতির অবলোপ সাধন করা বর্তমান নাৎসী-ফ্যাশিস্তবাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। স্পেনের ঘরোয়া যুদ্ধের পর জেনারাল ফ্রাঙ্কোর জয়লাভে বর্তমানে পর্তুগালের রাষ্ট্রনিরাপত্তা বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। স্পেন ও পর্তুগালের সীমান্ত-রেখা এমন কিছু দুর্লঙ্ঘ্য নয়। তদুপরি সীমান্তের শত্রুদিগকে ঠেকাইতে পারে এমন যুদ্ধসজ্জা বা সেনাবাহিনীও পর্তুগালের নাই; তাহার মোট সৈন্যসংখ্যার পরিমাণ হইতেছে আশী হাজারের মত। অপর পক্ষে স্পেনের সৈন্যসংখ্যা হইতেছে আড়াই লক্ষেরও বেশী। সমস্যাটা আরও জটিল হইয়াছে, পর্তুগালের নিজ বাসিন্দাদের মধ্যে একটা মোটা অংশ পর্তুগালকে স্পেনের সঙ্গে যুক্ত করিয়া প্যান্-ইবেরীয় (Pan-Iberian) যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে অভিলাষী। (স্পেন ও পর্তুগালকে ভৌগোলিকরা ইবেরীয় উপদ্বীপ বলিয়া বর্ণনা করেন।) জার্মানরা এই ইবেরীয় আন্দোলনকে সফল করিতে চায়। তাহা হইলে পর্তুগাল হইতে বৃটিশ-প্রীতির উচ্ছেদ সম্ভবপর। এতৎসম্পর্কে নাৎসীদের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। পূর্বোল্লিখিত বক্তৃতায়

অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলে এতৎসম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিবে :

"It seems that Germany's best chance for a counter-stroke against England lies in support of the Pan-Iberian movement and in seeking the friendship of such groups as are dreaming of an opening up of the colonies and a restoration of the old political and economic importance of the Iberian peninsula. In short, those who in the pursuit of these aims, are bound to come up against Portugal's vassal-like position towards England." অর্থাৎ : "এইরূপ প্রতীত হইতেছে যে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত করিতে হইলে, যাহারা প্যান্-ইবেরীয় আন্দোলন করিতেছে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে, এবং যে সব দল প্রাচীন উপনিবেশগুলি ফিরিয়া পাইবার জন্য বা ইবেরীয় উপদ্বীপের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত আগ্রহশীল তাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে হইবে। সোজা কথায় বলিতে গেলে, তাহাদিগকেই হাত করিতে হইবে, যাহারা উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনোদ্দেশ্যে পর্তুগালকে ইংলণ্ডের তাঁবেদারীর বিরুদ্ধে খাড়া করাইতে চায়।"

পর্তুগালের স্বাধীনতা এবং তথাকার বর্তমান রাষ্ট্রিক নীতি বজায় রাখিতে হইলে স্পেনকে শান্ত রাখা প্রয়োজনীয়। স্পেনে বর্তমান বৃটিশ রাজদূত হইতেছেন বিখ্যাত কূটনীতিক স্যর্ সামুয়েল হোর্। ইঁহার তথা সমগ্র বৃটিশ মন্ত্রিসভার অন্যান্য প্রয়াস আপাততঃ স্পেনকে শান্ত রাখিবার জন্যই নিয়োজিত হইবে। সেইরূপ লক্ষণই দেখা যাইতেছে।

দ্রুত ঘটনা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আধুনিক ইউরোপীয় রাজনীতি এবং সামরিক প্রয়াস অগ্রসর হইতেছে। এতকাল ধরিয়া ইউরোপীয় আর্থিক ও রাষ্ট্রব্যবস্থা যে ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা ইউরোপীয় জনসাধারণকে নিরাপদ রাখিতে পারে নাই। ইউরোপ এখন একটা প্রকাণ্ড বিপ্লবের মুখে। পর্তুগালকে কেন্দ্র করিয়া হয়তো একটা প্রবল বিস্ফোরণ হইতে পারে। রাজনীতিকরা যদি পর্তুগালকে রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে ইউরোপও অনেকটা রক্ষা পাইয়া যাইতে পারে।'

## খাক্সার আন্দোলন

ভারতবর্ষে বহুতর রাজনৈতিক দল বর্তমান রহিয়াছে। সম্প্রতি আর একটি দলের উদ্ভব এবং প্রসার ঘটিয়াছে। এই দলের নাম 'খাক্সার' দল, লাহোরে ইহার কেন্দ্র এবং আল্লামা ইনায়েতউল্লা খান্ মাশরিকি নামক জনৈক ইউরোপ-প্রত্যাগত মুস্লীম্ ব্যক্তি এই দলের নেতা। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ইহার পার্থক্য এই যে, এই দলের সদস্যরা মুস্লীম্ সমাজের সামাজিক উন্নতি-কল্পে একটি সামরিক-প্রায় দল। সামরিক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ইহারা পথে ঘাটে কুচ-কাওয়াজ করিয়া বেড়ায় এবং ইজিপ্টের ফয়সল রোগাইবার মতো একটি বৃহৎ "বেল্চা" রাইফেলের মতো করিয়া পৃষ্ঠদেশে বহন করিয়া থাকে।

এই খাক্সার আন্দোলন মুখ্যতঃ মুস্লীম্ সামাজিক আন্দোলন বলিয়া বিঘোষিত হইলেও, মুস্লীম্ লীগের সহিত ইহার কোনও যোগাযোগ নাই, এবং মুস্লীম্ লীগের অন্যতম নেতা ও পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যর্ সিকন্দর হায়াৎ খান্ এই খাক্সার আন্দোলনকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং সরকারী সামরিক পুলিশ ও সৈন্য দলের সাহায্যে গুলি চালাইয়া খাক্সারদের পাঞ্জাব হইতে বিতাড়িত করিবার প্রবল প্রয়াস করিয়াছেন। সম্প্রতি শোনা যাইতেছে, বাংলাদেশের মন্ত্রিমণ্ডলীর কেহ কেহ না কি খাক্সারদিগের অনুরাগী হইয়াছেন, এবং খাক্সাররা হাওড়া ও অন্যত্র শাখা খুলিয়াছে।

স্যর্ সিকন্দর এবং কলিকাতার 'ষ্টেট্স্ম্যান' পত্রিকা খাক্সারদিগকে নাৎসী-চর বা 'পঞ্চম বাহিনী' নামে অভিহিত করিয়াছেন। বঙ্গীয় খাক্সার বাহিনীর নেতা তাহার প্রতিবাদও করিয়াছেন।

ইহাও সংবাদপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে আল্লামা ইনায়েত্উল্লা জার্মানীতে গিয়াছিলেন এবং তথায় হের্ হিট্লারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

খাক্সার আন্দোলন মুখ্যতঃ মুস্লীম্ সামাজিক আন্দোলনের পথে অগ্রসর হইলেও সম্প্রতি ইহার সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার জন্য আলোচনা চলিয়াছে। খাক্সারদের মূলনীতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, সমগ্র পৃথিবীর উপর আধিপত্য করিবার আগ্রহ ইহাদের আছে ("The aim of the Khaksar soldier is to establish sovereignty over the

whole world and to secure social and political supremacy"), এবং এতদুদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত চাঁদা ও পৃষ্ঠপোষক সংগ্রহের নির্দেশও রহিয়াছে। যাহারা চাঁদা দিবে অথচ প্রত্যক্ষ আন্দোলনে যোগ দিবে না তাহাদিগকে 'মুহাদিন্' নামে অভিহিত করা হইবে।

নাৎসী দলের গঠন ও পরিচালনের ধারা করিয়া ইতিমধ্যেই খাকসার আন্দোলনের সঙ্গে তাহার সঙ্গতি অনেকেই নির্দেশ করিয়াছেন। যাহারা খাকসারদের মতে দেশদ্রোহী, তাহাদের নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখা হইতেছে, সুযোগ হইলে এবং সামর্থ্য হাতে আসিলে তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে বলিয়া খাকসার-অনুজ্ঞা প্রচার করা হইয়াছে।

মোট কথা, বর্তমানের দুর্যোগময় কালে, দেশময় একটা শক্তিশালী সামরিক দলের অভ্যুদয় এবং ব্যাপ্তি বিশেষ উদ্বেগজনক। ইংরেজদের সম্পর্কে ইহাদের বিরূপ মনোভাব আরও শঙ্কার কারণ ঘটাইয়াছে ("The Englishman is in most matters dishonest")।

শোনা যাইতেছে, কোনও অমুসলীম্ বাঙ্গালী নেতা এই খাকসার আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন। মোট কথা, খাকসার আন্দোলন যদি প্রধানতঃ মুসলীম্ সামাজিক আন্দোলনই হইত, তাহা হইলে কোনও আপত্তির কারণ ছিল না। কিন্তু দেখা যাইতেছে, খাকসার আন্দোলন একটি উগ্র রাজনৈতিক মতবাদসম্পন্ন সামরিক আন্দোলন এবং মুসলীম্ সমাজ-সংস্কারেরও অতীত আরও উদ্দেশ্য খাকসারদের আছে। দুর্যোগের কাল বলিয়া, এবং নাৎসী-আন্দোলনের পরিপূরক আন্দোলন বলিয়া প্রকান্তরে ইহাকে অভিহিত করিবার ফলে গণতন্ত্রে বিশ্বাস-পরায়ণ ব্যক্তিদের বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিয়াছে।

---

# ধুস্তুর

—শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী

ধুতুরা যে তুমি নহ মধুকর
　　অমরাবতীর নহ গো তুমি,
রাধিকা গাঁথে নি মালো তোমায়
　　নন্দন-বনে পাও নি তুমি।

কোমল পেলব নহে তব কায়া
　　অলি নাহি গায় তোমারে ঘেরি
তোমার দুয়ারে বাঁধনি ক' বাসা
　　বিলাস-বাসনে তোমা না হেরি।

বায় ত তোমায় লাগে না ক' ভাল
　　ফাল্গুনের দিনে মলয় বায়
বায় ত চাহে না পাখীর কূজন
　　কুঞ্জবনের শীতল ছায়।

বাসন্তীর চেয়ে রুদ্র বিধাতে
　　বায় ত তোমার অধিক রুচি
চন্দন চেয়ে ভস্মের মাঝে
　　বায় ত দেহার অধিক শুচি।

হলাহল তুমি লইয়াছ বুকে
　　মৃত্যুকে তব শঙ্কা নাই
রুদ্রের সাথে সখা তোমার
　　শ্মশান-ভূমিতে নিবেছ ঠাঁই।

কুসুমের মাঝে তুমি যে তাপস
　　ত্যাগের গরিমা অঙ্গে অলে,
তাই ত তোমার আসন পেতেছ
　　সর্বত্যাগীর চরণতলে।

---

# রাগ

—শ্রীপ্রভাত দেব সরকার

রাগটা না কি চণ্ডাল! দপ্ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে, আবার খপ্ করিয়া নিবিয়াও যায়। বোধ করি, নিবিয়া যাইবার গুণ আছে বলিয়াই সংসারে উহার স্থান বড় হইয়া আছে।···

আমরা সংসারী মানুষ—সঙ্গ-সুখ লাভে আমাদের যত-খানি আগ্রহ আছে, ঠিক ততখানি আগ্রহ আছে ওটার বিচ্ছেদ করিতে। তবে বিচ্ছেদের আগ্রহ থাকে অল্পক্ষণ, এই যা।

কলিকাতায় আসিয়া যে বাড়ীটা ভাড়া করিয়াছিলাম, তাহাকে একটি বিশিষ্ট বাড়ী আখ্যা না দিয়া বাড়ী-ওয়ালার প্রকাণ্ড অট্টালিকার পিছনের অংশ মাত্র বলিলে ঠিক বলা হইবে। প্রথম প্রথম বেশ কাটিয়াছিল বলিতে হইবে—কোনরূপ উচ্চ-বাচ্য শুনিতে পাই নাই। কিন্তু যখনই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম (অর্থাৎ উভয় গৃহস্থিত গৃহলক্ষ্মীদের মধ্যে খাদ্য-দ্রব্য এবং 'মনের কথার' আদান প্রদান চলিতে লাগিল), তখনই মন-কষাকষির মৃদু গুঞ্জন কানে আসিয়া পৌঁছিল। যত দিন যায়, রেশটা তত বিকট হইতে থাকে। অবশেষে কান ঝালা-পালা হইল।···

বাবা বুড়া মানুষ। চিরকাল মফঃস্বলে নির্ব্বিবাদ জীবন কাটাইয়া আসিয়াছেন—অনেক সহ্য করিয়া তিনি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। আশু বাড়ী-বদলের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। আমি কিন্তু তত খেয়াল করিলাম না। সত্য কথা বলতে কি, দূর হইতে অপরের মন-কষাকষির মৃদু গুঞ্জনটা আমার ভালই লাগে। আর রোষ আমারই বা একার কি? সকলেরই ঐ দশা। কোন বাড়ীতে একটু চেঁচামেচি হইলে আর রক্ষা নাই—যত রাজ্যের লোক সকৌতুকে ভিড় করিয়া জমা হয়। মজা এই যে, নিজ-গৃহ-বিবাদ মিটাইবার অপেক্ষা পরগৃহ-বিবাদ মিটাইবার দক্ষতাই আমাদের বেশী—তৎপরও আমরা খুব। আর এমনি আশ্চর্য্য, সেখানে গিয়া বেশ বড় বড়, ভাল ভাল, যুক্তি-পূর্ণ উপদেশেরও অভাব আমাদের কোন দিন হয় না। বাঁশ-বনে ডোম কিন্তু চিরদিনই কানা থাকে।

সে-দিন বাহির হইতেছি, বাবা ছুটিয়া আসিলেন। কহিলেন, আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দিবিনে টুনে?

বুঝিতে না পারিয়া কহিলাম, তার মানে? আপনার কি কোন অসুবিধে হচ্ছে?

চোখ কপালে তুলিয়া বাবা কহিলেন, অসুবিধে! নয় তো কি? গীতা খুলে যখনই বসি, অমনি আরম্ভ হয় ওবাড়ীর চেঁচামেচি—আমার সব গুলিয়ে যায়। রোজ-রোজ কি আর ভাল লাগে?

বলিয়া রোষ-কষায়িত কটাক্ষে একবার ওবাড়ীর দিকে চাহিলেন।

বাবার ইঙ্গিত বুঝিলাম। মুখে কহিলাম, আর দু'এক-দিন সবুর করুন, এই হ'ল বলে'।

মনে মনে কিন্তু ভারী অসন্তুষ্ট হইলাম। কি আর এমন হয়? একটুখানি ঝগড়া! ইহাতেই একেবারে এত অসহ্য! সংসারী মানুষ, একথা ভুললে চলিবে কেন?

দৃষ্টি ফিরাইয়া বাবা কহিলেন, যা হয় একটা কর বাপু—আর ভাল লাগে না!

মনে মনে হাসিয়া বিদায় লইলাম।···

অফিস হইতে হাঁটিয়া ফিরিতেছি। সন্ধ্যাটা মন্দ লাগিতেছে না। বড় রাস্তা ফেলিয়া একটা মাঝারি গোছের রাস্তায় ঢুকিলাম। আশেপাশের বাড়িগুলির মিট্-মিটে আলোকমালা যেন আপনাপন ভাষায় কিসের ইঙ্গিত করিতে চায়।

দু'চারখানি বাড়ি ডাইনে ও বাঁয়ে ফেলিয়া যেই পথটা ছোট করিয়া লইবার জন্য 'বাই-লেনে' পা দিয়াছি, অমনি জোরে চেঁচামেচির শব্দ কানে আসিয়া পৌঁছিল। সহসা পদদ্বয়ের গতি লঘু হইয়া আসিল। স্বভাব-দোষ! কি হইল, না হইল জানিতে মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৎপরতায় যাহা জানিলাম, তাহা অল্পই—কিন্তু মন ভারি খুশী হইয়া উঠিল।

২

মাস ছয়েক কাটিয়া গেছে। ইতিমধ্যে বাবার তাড়ায় বার-তিনেক বাড়ী-বদল করিয়াছি। অজুহাত ঐ একই। আশ্চর্য্য এই যে, বাবাকে যখনই জিজ্ঞাসা করি—বাবা, আমাদের বাড়ীতে ও বস্তুটী কি একেবারেই নেই,—বাবা তৎক্ষণাৎ বলেন, না, একেবারেই না।

উপস্থিত যে বাড়ীতে আছি, সেটীর অবস্থাওয়া একটু ভাল। আজ প্রায় মাসাবধি কোনরূপ চেঁচামেচি শুনিতে পাই নাই। বাবাও বেশ প্রসন্ন আছেন। আমার কিন্তু একেবারেই ভাল লাগিতেছে না।···

সেদিন বাড়ী ফিরিতে একটু রাত হইয়া গেল। বাড়ী ঢুকিয়াই কেমন যেন অমঙ্গলের আভাষ পাইলাম। দেখি, বাবার মুখটী অস্বাভাবিক রকম শুক্‌নো। তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া কোন উত্তরই পাইলাম না। ব্যাপার কি জানিতে রান্নাঘরে স্ত্রীর নিকট ছুটিলাম।

তিনি অভিনিবেশ সহকারে রাঁধিয়া চলিয়াছেন—খন্তির শব্দটা যেন অন্য দিন অপেক্ষা একটু জোরে জোরে হইতেছে। অমঙ্গলের আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবার কি হয়েছে?

বধূঠাকুরাণী আমার দিকে না চাহিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন: জানি না। তাঁকে জিগ্যেস্ করোগে। আর কাল থেকে একটা রাঁধুনী রাখবার ব্যবস্থা কোরো!

ঘমিয়া গেলাম। শেষে কি না আমার বাড়ীতে! অনুনয়ের স্বরে কহিলাম, লক্ষ্মীটি একটু খুলে বল না।

লক্ষ্মীর রাগ পড়িল, কহিলেন, বাবা আমাকে আজ বা-নয়-তাই বলেছেন—হারামজাদী, বাঁদী,...বলিয়া চোখে আঁচল চাপা দিয়া কোঁপাইতে লাগিলেন।

কহিলাম, বাবা তো তেমন লোকই নন।

বধূ ঝপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন: নয় তো নয়! আমিই বজ্জাত, পাজী!···মিথ্যে বলচি গুরুজনের নামে—যাও···

এই সারিয়াছে, কোথাকার জল কোথায় আসিয়া পড়িল! উহাকে আর না খোঁচাইয়া কাপড় ছাড়িতে গেলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে তিনি খাবার জন্য তাড়া দিয়ে গেলেন। বাবাকেও ডাকিয়া লইতে বলিলেন। কিন্তু সমস্ত ঘর-দোর তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বাবাকে পাইলাম না। বেওয়ালপাত্র হইতে বাবার কোটটীও অন্তর্হিত হইয়াছে। রাগে স্ত্রীকে দুইটা কড়া কথা বলিয়া ফেলিলাম।

দালানে খাইতে বসিয়াছি। দেখি, বাবা খাবারের ঠোঙা হাতে করিয়া উপরে উঠিতেছেন। কহিলাম, আপনি বুড়ো মানুষ নিজে কষ্ট করে' না গিয়ে হরিয়াকে পাঠালে পারতেন।

আমার কথায় কাণ না দিয়া বাবা সোজা রান্নাঘরের দিকে চলিলেন। দালান হইতে শুনিতে পাইলাম, বাবা বলিতেছেন, কই গো বউমা ধর না, এটা। বুড়ো ছেলে না হয় অন্যায়ই করে' ফেলেছে, তা বলে' কি মায়েরও রাগ করে' থাকতে হবে!

বধূ কি বলিলেন, শুনিতে পাইলাম না।

একটু পরেই দেখি, বধূ এক হাতে খাবারের ঠোঙা আর এক হাতে আসন লইয়া আয়গা করিতে ব্যস্ত। ব্যাপারটা বুঝিলাম।

বাবা আসিয়া ভালছেলের মত খাইতে বসিলেন। বধূ বীজন করিতে লাগিলেন। বাবা কহিলেন, বউমা, তুমিই বা আর দেরী কর কেন? তোমারও ভাতটা এখানেই বেড়ে নিয়ে এস—এক সঙ্গে খাওয়া যাক্।

অবাক হইয়া গেলাম। বাবা বলেন কি!

বউ যত বলে, না, বাবা তত বলেন, হাঁ। শেষ পর্য্যন্ত বাবারই জিত হইল। এক সঙ্গে খাওয়া আরম্ভ হইয়া গেল। বাবা আজ ছেলে-মানুষের মত অনেক কথাই বলিতেছেন,—সীতার সে গাম্ভীর্য্য তাঁহার নাই।

চুপিসাড়ে খাইয়া উঠিয়া আসিলাম।

* * *

আজ ভোর হইতে পাশের বাড়ীর শাশুড়ী-বউ-এ রন্ধনি আরম্ভ হইয়াছে। আমার ভারি মুখরোচক লাগিতেছে। ওবাড়ীর বধূটীকে বুদ্ধিমতী বলিতে হইবে, মাঝে মাঝে দু'একটী নৈর্ব্যক্তিক মন্তব্য করিয়া কলহটাকে এমনি ঘোরাল করিয়া তুলিতেছে যে, দেখিতে দেখিতে আশে-পাশে সব বাড়ীগুলির দরজা জানালা সকৌতুকে ফাঁক হইয়া গেল। নির্ব্বোধ শাশুড়ীটী কেবল চীৎকার করিয়া সকলের সহানুভূতি হারাইতেছে।

ছুটিয়া বাবার অবস্থা দেখিতে আসিলাম। দেখি,

বাবা ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া আছেন, আর বউ কলিকায় একটি জলন্ত অঙ্গার তুলিয়া আশ-পাশের অঙ্গারের সহিত তাহার মিলন করাইয়া দিতে ঘন ঘন ফুঁ দিতেছে।

বাবা কহিলেন, দেখ বৌমা, কাল তোমায় যা বলেছিলুম, আজও মনে ক'রে রেখেছো না কি?

বউ লজ্জিত কণ্ঠে কহিল, না, না আপনার কথায়···

বাবা কহিলেন, ঐ দেখ না পাশের বাড়ীতে কি রকমটা আরম্ভ হয়েচে—আমারই মত আর কি!

বউ কহিল, অমন দুই-ই সংসারে বাস করতে গেলে।

বাবার মুখ চক্-চক্ করিয়া উঠিল। লুকাইয়া দেখিয়া সরিয়া আসিলাম।

যাইতে যাইতে শুনিতে পাইলাম, বাবা বলিতেছেন: দেখ বৌমা, রাগটা আর কিছু না—ওটা কি জান, অভিমান। অভিমানটা যখন বেশী হয় তখনই রাগটা নানা রকম অসংলগ্ন কথা নিয়ে প্রকাশ পায়। সংসারে বাস করতে গেলে ওটারও দরকার আছে, কি বল? নইলে সব একঘেয়ে হয়ে পড়ে।

স্ত্রী বোধ হয় নিঃশব্দে হাসিলেন।

---

# ভ্রাতৃ স্মৃতি

—শ্রীকালিদাস রায়

বয়স বারো কি তেরো মিশনারি বিদ্যালয়ে পড়ি
প্রত্যহ প্রভাতে যাই ঔষধের শিশি হাতে করি,
দাতব্য চিকিৎসালয়ে। চিররুগ্ন ভাইটির তরে
ওষুধ আনিতে হয়, প্রতিদিন, সারাটি বছরে
রোগ তার ছাড়ে না ক'। বেঞ্চি 'পরে বসে থাকি তাই
যত রোগিবন্ধু সনে ঔষধের ক্লান্ত প্রতীক্ষায়।
রুগ্ন ভাইটির কথা দূর পানে চেয়ে চেয়ে ভাবি,
ইস্কুলের ছেলে বলি সব আগে পাইবার দাবি;
এখানে নাহি ও' কিছু। তাই প'ড়ে রোগের শয্যায়,
সমস্ত প্রভাত যদি ব্যর্থ হয় দাওয়াই-খানায়
সারাহ্ন উৎকণ্ঠা ভরে দুয়ারের পানে শুধু চাই,
কখন পড়িবে ডাক, ঘড়িপানে এ দিকে তাকাই
ইস্কুলের বেলা হয়, আধক্রোশ যেতে হবে হেঁটে
তার পর স্নান সারি তাড়াতাড়ি দিয়ে কিছু পেটে
ইস্কুলে ছুটিতে হবে। একটি ক্রোশেরও বেশী পথ
নিশ্চয় চলিয়া গেছে এতক্ষণ হেমন্ত শরৎ।
পড়াও হয়নি তৈরী। সারারাত করেছে চীৎকার
বমন ওষুধ পেলে সুস্থ হবে ভাইটি আমার,
তারও দেরি হয়ে যায়। রৌদ্র বাড়ে, বেড়ে যায় বেলা
রোগের জীবন নিয়ে এরা সব ক'রে যায় খেলা
নিষ্ঠুর হৃদয়হীন। জাগিয়াছি রাত্রি দ্বিপ্রহর,
ক্লান্ত তনু, ভিন্ন চিত্ত সেথা বসি অবশ্যি কাতর
প্রতীক্ষা কণ্টকাসনে। রেঁধে বেড়ে রোগীর শিয়রে
জননী বসিয়া আছে, কখন ফিরিয়া যাব ঘরে
পথপানে চেয়ে আছে। রৌদ্র বাড়ে বেড়ে যায় বেলা
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ভরি, ভেঙ্গে যায় বারেন্দার মেলা
প্রতীক্ষা বেদনা বক্ষে ভগবানে স্মরি বারে বারে
'কি পাপে বালক পাপী ভগবান্ দুঃখ দেয় তারে।'
কৈশোর প্রভাতগুলি কেটে গেল দাওয়াই খানায়
হায় লাগি এই ভাবে। সেই ভাই আজিকে কোথায়?

# সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ছোট গল্প

[ ১২৯৮ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩০৬ বঙ্গাব্দ ]

—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীর চরিত্র সমালোচনা করিতে গিয়া সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৯৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের "সাহিত্যে" লিখিয়াছেন :—

"উপন্যাসের উদ্দেশ্য সাধারণতঃ দুই প্রকার :

প্রথম। স্বাভাবিক কল্পনার প্রাচুর্য্যে বিশ্লেষণ সৌন্দর্য্যে হৃদয়ের অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত ভাবগুলিকে বিশিষ্টরূপে করিয়া ফুটাইয়া তোলা : দক্ষিণের মেঘের মত হৃদয়ে গোধূলির ম্লান ছায়া-মণ্ডিত একটি অস্পষ্ট ছবি আঁকিয়া দেওয়া ও ধীরে ধীরে তুলিকার মৃদু স্পর্শে ও সজ্জায় আয়তনে তাহাকে বিকাশিত করিয়া হৃদয়কে মাতাইয়া তোলা। নিকট হইতে কেবল বিক্ষিপ্ত বর্ণের সমাবেশ ; দূর হইতে একটি সুন্দর ছবি। এইরূপ উপন্যাস ভাব-প্রধান। শেল মেশে ও কতকটা কপালী মেশে এই উপন্যাসের প্রাধান্য।

দ্বিতীয়। প্রকৃত জীবনের রহস্যময় চির পরিবর্ত্তনশীল ঘটনাসূত্রের সন্নিবেশ। মনুষ্য চরিত্রের ক্রম বিকাশ, মনুষ্যত্বের বাহ্যান্তরীণ সংঘর্ষ, আশার ছলনা, নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকার, বাসনার অতৃপ্তি, সুখের বিদ্যুৎ-লহরী, দুঃখের দুর্ভেদ্য যাতনা, প্রেমের লীলা, সমাজের আবর্ত্ত, হৃদয়ের আবর্ত্ত, জীবন-সংগ্রাম, এক কথায় জীবনের পঙ্কে অভিনয় দেখানোই এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য। জীবনের মহাপথে এই উপন্যাস পথ প্রদর্শক ; ইহার ধর্ম সত্যের ন্যায় সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল। ইংলণ্ড দেশে এই উপন্যাসের প্রাধান্য।"

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভবানীপুর সাহিত্য সম্মেলনে সৌরো-হিত্য কালে ছোট গল্পের উদ্দেশ্য কি বুঝাইতে গিয়া ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "মানুষ বিরহ-কাতর হইয়া প্রিয় জনের নিকট পত্রে নিজের মনের গোপন ব্যথা জানায়, ছোট-গল্পের জন্ম সেখানে। প্রণয়-পত্র হইতে ছোট-গল্পের উদ্ভব। হৃদয়ের প্রেমের সমস্তটুকু সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যক্ত করিবার উপায় ছোট-গল্প। ইহা সমস্ত জীবনের কথা নহে।" সুতরাং শেষোক্ত লেখকের মতে ছোট-গল্প প্রেমমূলক লিপি ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

উল্লিখিত উপন্যাস ও ছোট-গল্পের উদ্দেশ্য আলোচনা করিতে গিয়া বুঝা যায় উপন্যাস ও ছোট-গল্প উভয়ই ভাব-প্রবণ সাহিত্য। কিন্তু আলোচ্য লেখক সুরেশচন্দ্র সমাজ-পতি সাহিত্যের উদ্দেশ্য বুঝাইবার কালে বলিয়াছেন "যাহা কিছু সত্য ও সুন্দর.....।" অতএব ভাবপ্রবণতা-মূলক রচনা ভিন্নও ছোট-গল্প হইতে পারে। ছোট-গল্পের কাঠামো বজায় রাখিয়া সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা ছোট-গল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতির "বড় কে" ছোট-গল্পটি শেষোক্ত আদর্শের ছোট-গল্প। উহা ১২৯৮ বঙ্গাব্দের "সাহিত্যে"র দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া ইহার স্বতন্ত্র রূপ দিয়া বাংলা দেশে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ভাষা-জননীকে মনের মত বিদেশী অলঙ্কারে বিভূষিত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি উক্ত মহা প্রতিভা-দ্বয়ের মিলনক্ষেত্রস্বরূপ। বঙ্গীয় গদ্য সাহিত্যের তিনি সুনিপুণ সমালোচক ছিলেন ; তাই তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতর যাহা পাওয়া যায় তুলাদণ্ডে তুলিত। "যাহা কিছু সত্য ও সুন্দর"! সেজন্য তাঁহার ছোট-গল্পে সেই ভাবে আদর্শ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাঁহার ভাষার রূপ ঈশ্বর-বঙ্কিম আদর্শের।

যদিও লেখক সেই সুদূর কালের হিতোপদেশাত্মক নীতির উল্লেখ এই "বড় কে" ছোট-গল্পে করিয়াছেন, তথাপি ইহাকে নীতিশিক্ষামূলক হিতোপদেশজাতীয় গল্প বলা যাইবে কি না সংশয় হইতেছে।

যে ক্ষত্রিয় যুবক যমুনাতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে বিজয়ী বাবরের জিঘাংসা মনে পোষণ করিতেছিল, সেই রাজপুত বীরের হৃদয়ই পরিশেষে কৃতজ্ঞতার অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল। তখন আর সেই বীরজনয়ের মনে বাবরের প্রতি প্রতি-হিংসানল থাকিল না।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এই ছোট-গল্পটি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন। দেশ-মাতৃকার অর্চ্চনা করা রাজস্থানের একটা অচ্ছেদ্য ইতিহাস। এই ছোট-গল্প লেখকের মনেও বোধ হয় সেই স্বদেশ-প্রেমের উদ্বুদ্ধ

জাগিত, তাই তিনি তাহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া ছোট-গল্পাকারে সেই আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়াছেন।

সে যাহা হউক, একটি রাজপুত যুবক বাবরের দিগ্বিজয়ে হিংসাপরায়ণ হইয়া গুপ্ত অস্ত্র সহ দিল্লীর সর্বত্র এই উদ্দেশ্যে ঘুরিয়া বেড়াইত যে, সুযোগ পাইলেই সে বাবরকে হত্যা করিবে। এদিকে বাবর পানিপথের যুদ্ধ জয় করিয়া চাঙ্গেজীয় মেদিনী রায়, সিবারের রাণা সঙ্গ প্রভৃতিকে পরাজয় করিয়া ছদ্ম-বেশে সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়া স্বচক্ষে দেখিত প্রজাদের দুঃখদুর্দশার অন্ত হয় কি না।

এই সময়ে দিল্লী শহরে এক প্রকাণ্ড হস্তী ছুটিয়া অগণিত লোকের প্রাণ বধ করিতেছিল। বাবর তাহা দেখিতে পাইয়া নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া এক মরণোন্মুখ শিশুর প্রাণ রক্ষা করিল। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া বাবরের বধাভিলাষী সেই যুবক বাবরের প্রতি ধারণা পরিবর্তিত করিল। শেষে সেই যুবক স্বয়ং বাবরের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা জ্ঞাপন করিল। বাবর সেই অবধি সেই রাজপুত যুবককেই নিজের দেহরক্ষী নিযুক্ত করিল।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যার "সাহিত্য" মাসিক পত্রিকায় "সহযোগি সাহিত্য" প্রবন্ধে ছোট-গল্প সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"আমাদের দেশে এখন যত্রতত্র-যকে তসাল ছোট-গল্প শুনিতে পাই। সে আশার কথা সম্বন্ধ নাই। কিন্তু আমরা যখন দেখি, আমাদের যে ছোট-গল্প সর্বদা দেখিতে পাই, তাহার প্রধান দোষ অতিবিস্তৃতি। যাহাতে কেবলই দেখা, তখন বড় আশঙ্কা হয়। সাগর বলিলে সমস্ত সমুদ্র দেখিতে পাই, তাহাতে নীল জলের শোভা হয়, তাহার উপর রবিকরে ইন্দ্রধনু ফুটিয়াছে। বড় মধুর দেখায় কিন্তু তাহাও সদা সর্বদায় ভাল লাগে। আবার সাদরের পক্ষে যাহা শোভন, সোপানে তাহা বড় বিসদৃশ দেখায়। সব জিনিসেরই একটা মানান আছে।"

ইহা হইতে ধারণা করা অসঙ্গত হইবে না সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কেনপুচ্ছের মতন অযথা কৃত্রিম বস্তুর দ্বারা সাধারণতঃ ভাব-গম্ভীর রচনাকে আয়তনে বাড়াইতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ছোট-গল্পেও তিনি অবান্তর কতকগুলি বকিয়া উহাকে বড় করিতে ইচ্ছা করেন নাই এবং ইহাই ছোট গল্পের ন্যায্য ধর্ম।

আলোচিত "বড় কে" ছোট-গল্পও সেই ধরণের। নেহাৎ সে কথাটি না বলিলে ইহা ছোট-গল্প হইত না, সুরেশ-চন্দ্র সমাজপতি তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে ঘটনাসংস্থান, চরিত্রাঙ্কন প্রভৃতি যেন বড়ই সংক্ষিপ্ত ও নীতিপূর্ণ, তাই ইহাকে নীতিগল্প বলিতে ইচ্ছা হয়।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতির "দুইটি বৌদ্ধ গল্প : ১। শোক-বিজয় ২। লালসা ও সংযম" এই শ্রেণীর ছোট গল্প। তিনি এই দুইটির ঘটনা-সংস্থান বিষয় "পালি জাতক" হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

"শোক বিজয়" গল্পটি একটি রূপকের গল্প। "লালসা ও সংযম" গল্পটি বারবিলাসিনী মধুরাবাসিনী বাসবদত্তার গল্প। পূর্বে বলা হইয়াছে 'সুরেশচন্দ্র সমাজপতির "শোকবিজয়" এবং "লালসা ও সংযম" "বড় কে" গল্পের সমশ্রেণীর।' তবে শেষোক্ত গল্পটির সহিত পূর্বোক্ত গল্প দুইটির পার্থক্য এই যে, পূর্বোক্ত গল্প দুইটি জাতকের গল্পের ভাবাবলম্বনে লিখিত।

বৌদ্ধজাতক গল্প হিতোপদেশ জাতীয় গল্প না হইলেও নীতি কথার ন্যায়। উহার উদ্দেশ্য ধর্মনীতি-পূর্ণ উপদেশ প্রদান করা। সে কারণ "বড় কে" গল্পটি, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, ইহাদের সহিত এক ধর্মাবলম্বী গল্প হইতে পারে না।

যাহাকে ছোট-গল্প বলা হইতেছে, জাতকের গল্প সে জাতীয় গল্প নহে, যদিও ছোট-গল্পের সমস্ত বিধি নিয়ম উহাতে রক্ষিত হইয়া থাকে। চরিত্রাঙ্কন ছোট-গল্পের একটি প্রধান বস্তু, রূপকথা জাতীয় ছোট গল্পে এমন অদ্ভুত চরিত্রাঙ্কনের পটুতা দেখা যায় যে তাহাতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি লক্ষিত হয় না; তাহা হইলেও রূপকথাকে ছোট-গল্প বলা যায় না, একমুখিতা ছোট গল্পের মেরুদণ্ড; উক্ত জাতক-পুরাণের গল্পে একমুখিতা যথেষ্ট বর্তমান, তাহা হইলেও এই জাতীয় ছোট গল্পগুলিকে ছোট-গল্প আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে না। এবং এই জন্যই সুরেশচন্দ্র সমাজপতির "বড় কে" গল্পটিকে খাঁটি ছোট গল্প বলিতে ইচ্ছা হয় না। বৌদ্ধ গল্প দুইটিকেও নহে। এই স্থলে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখিত একটি উক্তি পাঠক-পাঠিকার কৌতূহলের জন্য উল্লেখ করা হইতেছে।

"—এই ছোট-গল্পের রূপায় ক্রমে চলিত কথা ও-সাহিত্যে স্থান পাইতে লাগিল। বস বার ছন্দের গাম্ভীর্য হইতে ছোট-গল্প অর্ধ কলম ব্যাপী হইয়া উঠিল। কিন্তু বড় হইয়াও ছোট-গল্প পূর্ববৎ সংক্ষিপ্ত ও

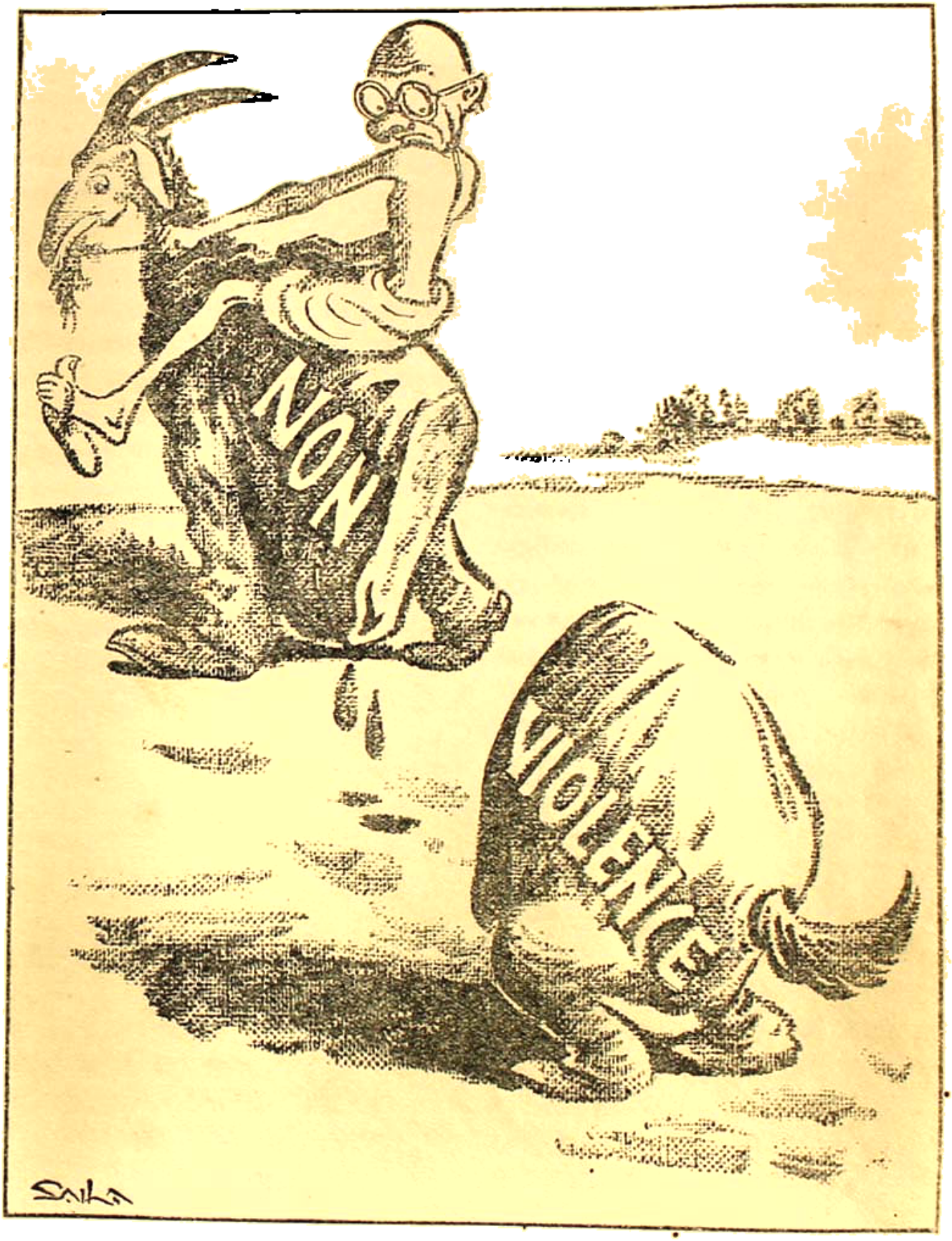


দ্বিধা !

আর প্রকাশ ব্যাপারে দলে হইল। আসলে কোনও পরিবর্তন হইল না। এই ছোট-গল্পে ঘটনা-প্রাচুর্য বা বহু-সৃষ্ট ঘটনা-প্রণালী লোকে সহ্য করিত না। লঘু ঘণ্টের মত এই বাহুল্য-বর্জিত গল্প একেবারে মর্মস্থলে পৌঁছিত, পথে থামিয়া ঘুরিয়া যাইত না। তাহার পথ সরল। এইরূপ গল্প যে অনেক লেখক লিখিয়াছেন এবং এই সকল গল্পে যে কোনও প্রকার নৈতিকতা রক্ষিত না তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ইহাতে সর্বপ্রধান লক্ষ্য রাখিবার বিষয় ইহার মৌলিকতা। ক্রমে ছোট গল্পে ঘটনা সমাবেশ হইতে চরিত্রচিত্রণ আরম্ভ হইল। দুই চার ছত্রে সমাজের এক এক কালের বিস্তৃত চিত্র প্রদত্ত হইত, কিন্তু গল্পে একটি মাত্র কথা থাকিত না।"

—বঙ্গীয় সাহিত্য : সাহিত্য, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ

১২৯৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় "সাহিত্যে" সুরেশচন্দ্র সমাজপতির বর্তমান যুগের ছোট গল্পে প্রথম হাত দেওয়া দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া অনুমিত হয়। প্রতিভা সর্বত্রই বিজয়ী। পাশ্চাত্য জগতের অমর কবি মিল্টন অমিত্রাক্ষর ছন্দের ইংরাজী ভাষায় একরূপ প্রবর্তক, কিন্তু প্রবর্তক হইলেও তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ অমিত্রাক্ষর ছন্দের রচয়িতা। অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙ্গলা ভাষায় সৃষ্টি করিলেন এবং তিনিই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান লেখক। "Paradise Lost" ও "মেঘনাদবধ" তাহার সাক্ষ্য চিরকাল দিবে। "বড় কে", "শোক বিজয়" ও "লালসা ও সংযম" যিনি লিখিয়াছেন তিনিই আবার "প্রভা" লিখিলেন। এমন নিখুঁৎ প্রেমের ছবি তাঁহারই কলমে আসিবে ইহাই আশ্চর্যের কথা।

"প্রভা" পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে লিখিত হইয়াছিল, তখন ছোট-গল্প সবে মাত্র মায়ের কোলে ছেলে-খেলা করিতেছিল, তখনই উহা যেন পরিপূর্ণ যৌবনের, পড়িলে মনে হয় এই মাসেরই কোনও এক সম্মানিত মাসিক পত্রিকায় পরিপক্ক শিল্পীর লেখা প্রকাশিত হইয়াছে।

"প্রভা"র আরও গৌরব এই যে, উহা কালজয়ী, এ-কালের রচনাকেও পরাভূত করিয়াছে কিন্তু উহাতে একালের বৈশিষ্ট্য নাই। সেই রঙ্গাগুণ একালের অসংযমকে স্পর্শ করিতে দেয় নাই। শুচিতা ও পবিত্রতা উহাতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। আজ দীর্ঘ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীবর্ষ পরে ছোট-গল্প কতই না উন্নত হইয়াছে এবং ইহা বাংলা সাহিত্য ছাইয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বর্তমান যুগের ছোট-গল্প যেন সংযমহীন। প্রেম বলিতে ইহা যেন পাগল। হয় ইহা কোন সিনেমার চলচ্চিত্রের সবাক্ লাজহীন উষার প্রেমিক-যুগলের স্বচ্ছ দিবালোকের উলঙ্গ প্রেমের মূর্তি কল্পনা করিবে, না হয় ইহাতে বালিগঞ্জ লেকে গিয়া বাসন্তী সায়াহ্নের জন-কোলাহলের মধ্যে যুবক-যুবতীর "ওয়াটার পোলো" খেলিবার দৃশ্য চিত্রিত করিবে অথবা ইহা যেন "হলিউডে"র ছবি অঙ্কিত করিবে। কিন্তু "প্রভা"র প্রেমের কথা থাকিলেও এরূপ নয় প্রেম নহে। এই বিষয়ে সেই পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগেকার ছোট-গল্প বিশেষ সতর্ক এবং উচ্চতর আদর্শে লিখিত।

"প্রভা" প্রেমমূলক ছোট-গল্প। প্রেমের জন্য ইহার জন্ম, প্রেমের জন্য ইহার মৃত্যু। লেখকের বাসনা যেন দীপ্ত হইয়া এই রচনাটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফুটিয়া উঠিতেছে।

পূর্বে বলা হইয়াছে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির লেখার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্ততা। কোনও বিষয় তিনি ফেনানো ভালবাসেন না। সেইরূপ তাঁহার প্রেম নিবেদনেও বাজে কথা নাই। কোনও রূপ ভূমিকা বা গৌরচন্দ্রিকা না করিয়া নিছক কাজের কথাটি তিনি বলিয়া ফেলেন। সে জন্য তাঁহার যেন বিলম্ব সহে না এবং সে বলাটা অতি সহজ ও সরল ভাষায়। সাবলীলতাই সুরেশচন্দ্রের ভাষার প্রধান গুণ। এমন চাতুরি তাহাতে নাই যে ছোট-গল্পের ছোট প্রণয় অথবা সংক্ষিপ্ত ভালবাসা পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ঙ্গম করিতে কষ্ট হয়।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ছোট-গল্পের নায়ক নায়িকার নাম নির্বাচনেও যেন তাঁহার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। নায়িকার নাম—প্রভা, নায়কের নাম—হেম। এই দুইটি চরিত্রের সহজ ও সরল প্রেমলীলাই এই ছোট-গল্পটির ঘটনা।

সুরেশচন্দ্র লিখিয়াছেন :

"হেম ছোটবেলা হইতেই দুষ্ট প্রকৃতির ছিল। কাহারও কথা শুনিত না। যেখায় খেলিত, যেখায় বেড়াইত, যেখায় অত্যাচার করিত সকলকে জ্বালাইত। সুতরাং কে তাহাকে এত পাগলামি সহিতে পারে! সকলেই তাহার প্রতি মুখ করিত। কিন্তু হেমের একটি দুর্বলতা ছেলেবেলা হইতেই ছিল পাশের বাড়ীর ছোট মেয়ে প্রভাকে দেখিলে, প্রভার কথা শুনিলে, প্রভা কাছে আসিলে সে যেন সব ভুলিয়া যাইত। হেম অনেক অকার্য করিয়াছে এমন সময় প্রভার সাড়া যদি সে পাইত তবে সে তাহা হইতে বিরত হইত। হেমের মা হেমের প্রতি সন্তুষ্ট না থাকিলেও এই জিনিসটি লক্ষ্য করিতেন। মা যে কাজটি করিতে নিষেধ করিতেন হেম

তাহা করিত, কিন্তু প্রভা যাহা করিতে যাহা করিত হেম তাহা করিত না। হেমের যাহা ঘরের ভাত যায়, প্রভাকে তাহা উপর পাঁচ হয়।

হেমের বয়স ষোল হইয়াছে। সে এখন নভেল পড়িতে পারে। ভালবাসাকে সে এখন ভালবাসিতে শিখিয়াছে। সে এখন একটু একটু ভালবাসিতে চাহিতেছে, পাত্রী নির্বাচন করিতে হয় নাই। প্রভাকে এখন তাহার ভাল লাগে। হেম মনে জানিত কেহই তাহাকে দেখিতে পারে না কিন্তু প্রভা তাহার সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করে। তাহার জন্য প্রভা প্রাণে প্রাণে কষ্ট পায়। তাহার দুঃখে সে দুঃখী। তাহার সুখে সে সুখী।"

এক বৃষ্টির দিনের কলে কেতার ছবিখানি সুরেশচন্দ্র এমন মধুরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন যে, পাঠক-পাঠিকা উহা পড়িয়াই হেমের প্রভার উপরে স্বতঃপ্রবৃত্ত ভালোবাসার সাড়া পায়, কিন্তু মা বড় কি প্রভা বড়, এই বিতর্ক পাঠক-পাঠিকা সমাধান করিতে পারে না। ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে, হেমের প্রভার প্রতি ভালোবাসা তখনও অনাবিল ছিল। তাহার মন যেন লৌহের মত চুম্বক পানে চালিত হইত।

যে মায়ের আবেশে হেমকে বাদলের মল দিয়া পড়া বৃষ্টির জলে ভেজা হইতে বিরত করিতে পারে নাই, তাহা প্রভার করুণ আঁখির গদগদ ভাষায় বিরত করিল। হেমের গায়ের বৃষ্টির জল প্রভা নিজের আঁচল দিয়া মুছাইয়া দিল। ইহাতে সুরেশচন্দ্র হেমকে দিয়া মায়ের অপমান করান নাই এবং গুরুজনের অবমাননা প্রদর্শন করাইবার পাত্র তিনি নহেন। তিনি এখানে কিশোরী প্রভা ও কিশোর হেমের বাল্য-প্রেমের অঙ্কুত খেলা দেখাইয়াছেন।

তার পর আর একটি দৃশ্য, হেমের অসুস্থাবস্থায় প্রভার ব্যাকুলতা। হেম জ্বরের বিকারে প্রলাপ বকিত। সে প্রলাপ "প্রভা প্রভা!" প্রভা কিন্তু অহোরাত্র হেমের শয্যা-পার্শ্বে থাকিয়া ভগবানের নিকট তাহার জীবন ভিক্ষা করিত। হেম বাঁচিয়া উঠিল। কিন্তু যখন সে মায়ের মুখে শুনিল যে সে রোগের বিকারাবস্থায় প্রভার নাম করিয়াছে তখন হেমের লজ্জার সীমানা থাকিল না।

সুরেশচন্দ্রের কৃতিত্ব এখানে। তারপর প্রভার সুখের দিন ঘনাইয়া আসিল। সে বড় হইল। তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইল, কিন্তু হেমের সঙ্গে নহে, কারণ তাহারা গরীব।

যেখানে এত ভালবাসা সেখানে যদি মিলন না হয় তবে দুইটি প্রাণ রিক্ত থাকিয়া যায়। অধিকন্তু হেমকে দিয়া সুরেশচন্দ্র প্রভাকে সেই বিবাহের পূর্বক্ষণে হেমের সাক্ষা দেওয়াইয়াছেন, তাই সুরেশচন্দ্র প্রভার ভাগ্যবিধাতা। এরূপ দুর্দমনীয় হৃদয়, যাহা আবাল্য দুর্দমনীয়তার খাদ্য পাইয়া আসিয়াছে, তাহা প্রভা অন্যের জন্য উন্মুখ রাখিতে পারে না। তাহা হইলে সে যে হিন্দুয়ানার অনুসারে অসতী হইবে। তাহা সুরেশচন্দ্র সহ্য করিতে পারিবেন না। তাই তিনি প্রভাকে বধ করিয়া শান্তি পাইলেন। হেম তখন ছিল পাপের বংশনের প্রায়শ্চিত্ত করিতে মধুপুরে। সে সংবাদ পাইয়া আসিয়া আর সামাজিক পরের বউকে—প্রভাকে দেখিল না। সুরেশচন্দ্র হেমের জন্য করুণতার প্রস্রবণ ছুটাইয়া রাখিলেন। ইহাই ছোট-গল্পের মেরুদণ্ড।

"যাও প্রভা, আমার আশা মিটিল। জীবনের পরপারে তুমি আগে গিয়াছ। বর্তমান এখনই অতীতে মিশিবে, তখন এই জীবনপথ ধরিয়া যাইবে। এখানে ঘুমাইয়া সেখানে মিলা যাবি। তারপর আর কখনও কি তোমায় হারাইব!"

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এখানে নিতান্ত হিন্দু। হিন্দু-শাস্ত্রের জন্মান্তর, পরলোক, প্রাক্তন সমস্ত দার্শনিক তথ্য, এখানে টানিয়া আনিয়াছেন। তিনি মনে প্রাণে তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "মানুষ মরিলে কি হয়, মানুষ কোথা হইতে আসে, মানুষ কোথায় যায়, এই পরিবর্তমান জগতে কিসের বলে চীর কি জন্য প্রাপ্ত হয়"; ইহার উত্তর সুরেশ-চন্দ্র সমাজপতি দিয়াছেন।

প্রভা হেমকে ভাল বাসিয়াছিল এবং মনে প্রাণে নিজেকে তাহাকে সঁপিয়াছিল, কিন্তু দুর্দৈব দারিদ্র্য, সমাজ, তাই তাহাদের মিলন হইল না। রিক্ত প্রাণে সমাজ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া বিধাতার কৃপায় প্রভা অবিশ্বাসিনী হইল না, অচিরে দেহ ছাড়িয়া গেল। হেম তাই তাহার প্রভাকে হারাইয়া বিশ্বাস করিয়া ফেলিল প্রভার মৃত্যু সফল, জীবনও সফল ছিল এবং সফলতা লাভ করিবে সে, যখন সে নিজে মরিবে। হেম মরিয়া প্রভাকে পুনরায় নিজের করিবে।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতির "প্রাইভেট টিউটর" ছোট-গল্পটি এই ১২৯১ বঙ্গাব্দেরই জ্যৈষ্ঠ মাসে "সাহিত্য" পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। "প্রভা" প্রকাশিত হইয়াছিল "প্রাইভেট টিউটরে"র এক মাস পরে কিন্তু ভুলবশতঃ "প্রভা"কে "প্রাই-ভেট টিউটরে"র পূর্বে সমালোচনা করা হইয়াছে, অবশ্য ইহাতে আলোচনার সুবিধাই বরং হইয়াছে। কারণ এই প্রবন্ধের সময়ের সীমার মধ্যে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির যতগুলি

ছোট-গল্প পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে "প্রাইভেট টিউটর" গল্পটি বিশেষ আদর্শ-স্থানীয়। ইহার পরবর্তী ছোট-গল্প "কমলা"ও বিশেষ আকর্ষক। এই দুইটি ছোট-গল্পদ্বারাই সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যাইবে এবং তাঁহার ভাব, ভাষা, কল্পনা, মনস্তত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্যিকত্ব, প্রেমের অনুভূতি, বিচার-শক্তি, সামাজিকত্ব, হিন্দুর সংস্কারে আস্থাবানতা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান জন্মিবে।

"প্রাইভেট টিউটর"কে আলোচনা করিবার পূর্বে সর্ব্ব-প্রথমে ইহার রচনা-প্রণালী সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলা আবশ্যক। ছোট-গল্পের সৃষ্টির কাল লইতে এযাবৎ যে কাঠামোর ছোট-গল্প পাওয়া গিয়াছে ইহা সেরূপ নহে। ইহা পত্রাকারে রচিত। একে অন্যের নিকট পত্র দিতেছে, সেই পত্রসমূহের ভিতর দিয়া একটি ছোট-গল্প রচিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ঊনবিংশতি শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত এমন কি আধুনিক কালেও অর্থাৎ খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর পঞ্চত্রিংশ ছত্রিশ সাল পর্য্যন্তও এরূপ ধরণের গল্প কদাচিৎ দেখা গিয়াছে। এই পত্রাকারের ছোট-গল্পের চরিত্রগুলির পরিচয় পাঠক-পাঠিকাকে দেওয়া যাইতেছে :

পুরুষ :—

১। বিজয়—সরলার প্রাইভেট টিউটর।
২। মন্মথ—বিজয়ের ছোট ভগিনীপতি।
৩। ভুবন—সুমতির স্বামী, সরলার ভগিনীপতি।
৪। জমীদার—সরলার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

স্ত্রী :

১। সরলা—স্বর্গীয় মেজো, জমীদারের কনিষ্ঠা ভগিনী।
২। সুমতি—সরলার জ্যেষ্ঠা ভগিনী।
৩। গৃহিণী—বিজয়ের কনিষ্ঠা ভগিনী, মন্মথের স্ত্রী।

উল্লিখিত পাত্র-পাত্রী লইয়া "প্রাইভেট টিউটর" রচিত। ইহাতে :

১। বিজয়ের প্রথম পত্র—মন্মথর নিকট লিখিত।
২। সরলার প্রথম পত্র—সুমতির নিকট লিখিত।
৩। সুমতির প্রথম পত্র—সরলার নিকট লিখিত।
৪। মন্মথ বাবুর পত্র—বিজয়ের নিকট লিখিত।
৫। সরলার দ্বিতীয় পত্র—সুমতির নিকট লিখিত।
৬। ভুবন বাবুর পত্র—সরলার নিকট লিখিত।
৭। বিজয়ের দ্বিতীয় পত্র—মন্মথর নিকট লিখিত।
৮। মন্মথ বাবুর দ্বিতীয় পত্র—বিজয়ের নিকট লিখিত।
৯। বিজয়ের তৃতীয় পত্র—মন্মথর নিকট লিখিত।
১০। সরলার তৃতীয় পত্র—সুমতির নিকট লিখিত।
১১। মন্মথ বাবুর তৃতীয় পত্র—বিজয়ের নিকট লিখিত।
১২। বিজয়ের চতুর্থ পত্র—মন্মথর নিকট লিখিত।
১৩। সরলার চতুর্থ পত্র—সুমতির নিকট লিখিত।
১৪। বিজয়ের শেষ পত্র—মন্মথর নিকট লিখিত।

মোট চৌদ্দখানি পত্র লিখিত আছে। ইহা ভিন্ন আর এক খানি পত্রের ভিতর পত্র, তাহা :

জমীদার রায়ের পত্র—বিজয়ের নিকট লিখিত।

ইহা হইতে আলোচনার সুবিধার জন্য পৃথক পৃথক নামে আবার কতখানি পত্র তাহার শ্রেণী বিভাগ করা যাইতেছে :

১। বিজয়—পাঁচখানি পত্র।
২। মন্মথ—তিনখানি পত্র।
৩। ভুবন—একখানি পত্র।
৪। জমীদার রায়—একখানি পত্র।
৫। সুমতি—একখানি পত্র।

মোট পনরখানি পত্রে এই "প্রাইভেট টিউটর" ছোট-গল্পটি লিখিত। এই এতগুলি পত্রের ভিতর দিয়া নানা চরিত্র নানা ভাবে উক্তি করিলেও এই ছোট-গল্পের শাখান্তরে অবিচ্ছিন্ন একমুখিতা ইহাতে সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষা আছে।

যদিও ইহাতে একটি সুন্দর প্রণয়ের ছবি সুদক্ষ তুলিতে অঙ্কিত আছে, তথাপি ইহা লেখকের গভীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের আধার। কিরূপে বেকার যুবক বিজয় প্রাসাচ্ছাদনের জন্য একটি পড়ানো যোগাড় করিয়া ছাত্রী সরলার প্রতি ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হইয়াছিল ইহা তাহারই নিদর্শন।

বিজয়ের মনোবৃত্তি কিরূপ তিল তিল করিয়া সরলার মনোবৃত্তিকে গ্রাস করিয়াছিল এবং সরলার মনও কিরূপ ধীরে ধীরে বিজয়ের মনে অঙ্কিত হইয়াছিল এই বিশ্লেষণ লইয়াই যেন লেখক "প্রাইভেট টিউটর" লিখিয়াছেন।

বিজয় সরলাকে পড়াইত, যেমন আধুনিক সৃষ্টি-সম্পন্ন বড় লোকের বাড়ীতে "মাষ্টার" মেয়ে পড়ায়। বিজয়ের সহিত সরলার বিবাহ হওয়া যখন অসম্ভব, কারণ দারিদ্র্যই প্রতিবন্ধক, তখন লেখক সরলাকে বিজয়ের পানে চুম্বকের আকর্ষণে ফেলেন নাই বরং তিনি শেষ রক্ষা করিলেন এই সুরাহা করিয়া যে, বিজয়ের শরণে বর হইল। তাহার বাস

টাকা মাহিনার চাকরিস্থলে চোখের বাহির করা দেড় শত টাকা মাহিনার চাকরি নাগপুরে কমলালেবুর দেশে সংগৃহীত হইল। আরও বিজয়ের দারিদ্র্যের সহায়তা করিল জগদীশ্বরের চারিশত টাকার মোটের পাখের।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি দারিদ্র্যের ছবি তুলিতে কিরূপ নিপুণ-হস্ত তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশে দ্রষ্টব্য :

"হে প্রেম! তোমায় আর নিন্দা করিব না। তুমি আমায়, এই হীন দরিদ্র মোক্তারী প্র্যাক্টিস্ টিউটরের ঘাড় হইতে নামিয়া যাও, আমি বাঁচি। কে বলে প্রেম কাণা পাগলামি, কে বলে প্রেমের কবিতা, কাণ্ড সব ছাই! এত দিনে বুঝিলাম, আর শিখাইবার দরকার নাই। হে প্রেম! তুমি ছদিন আগে যোর সাথের সাথী হও, আমার ঘাড়। তুমি সকাম নিষ্কাম অকাম সহেতুক অহেতুক যা-ই হও না কেন আমায় অব্যাহতি দাও। তুমি আমায় পাকড়াও করিলে কেন; বারটি টাকা মাহিনা পাই চারিটি টাকা মেসে গচ্চা দিয়া আটটি টাকায় কথঞ্চিৎ কলিকাতার বাসার খরচের পূর্ণ করি, আর হাঁড়ির মতো থাকি, আমার উপর তোমার এ কারিগুরী কেন! সাধের উপর বজ্রাঘাত কেন? প্রেম! তুমি অন্ধ কে বলে! তাহা হইলে দেখিয়া শুনিয়া আমার মত এমন দুর্বল বিদ্যায় ভর্ত্তি লইলে কিরূপে! আমি কি পারিব! আমার কি সহিবে! তবে কেবল করিয়া প্রেমের পাগল হই বল: আমার পক্ষে লম্বা লম্বা চুল রাখা অসম্ভব, ছেলে তোমাইব কেমন করিয়া! রাস্তার ধুলায় ও ঘিয়ে প্রেমিকের কুন্তল জাল ছুটিয়ে সন্ন্যাসীর জটা হইয়া যাইবে। তোমায় দেখা যায় যে চোখে সিঁদা চোখের জল ঢাকিয়া রাখিব। আমার হাঁড়ির সহিত মাথার কবিত্ব উর্বরতা করিতে হয়। তবে কবিতা লিখিতে বল ত পারি।

দারিদ্র্য এত দুঃখের! দারিদ্র্য মানুষকে কাড়িয়া লইয়া যায়! আগে ভাই আমার সন্তোষ ছিল, কিন্তু এখন আমি ঘোর অসন্তুষ্ট। কি করিলে পরম হয় বলিতে পার? হায়! আমার মরণের জন্য এ পাপ দারিদ্র্য কোথা হইতে আসিল! এক প্যাক খামের কাগজ কিনিবার সঙ্গতি নাই যে তাহাতে চিঠি লিখিয়া মনের জ্বালা জুড়াই। এই যাই হক কাগজ গুলিতে কি প্রণয়িনীকে চিঠি লেখা যায়!"

গরীবকে বড় চোখে দেখাইতে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যেমন কৌশলী কারিকর এরূপ কমই দেখা যায়। সাংসারিক অভাব ও দৈন্যের নিষ্পেষণে মানুষ কিরূপে আত্মমর্যাদা নষ্ট করিতে বাধ্য হয়, "দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী" কত বড় সত্য কথা, তিনি নিজের জীবনে বোধ হয় তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাই তাঁহার কলমে বিজয়কে পাওয়া যায়। গরীব হইয়াও বিজয়ের ভালবাসা কোমল মনোবৃত্তি থাকিতে পারে, তাহার প্রাণে সাংসারিক ধন-দৌলত উপভোগের লিপ্সা জাগরিত হওয়া স্বাভাবিক। সে কল্পনায় সরলার ছবি চোখের জলের ভিতর দিয়া সাধনা করিতে পারে, তাই সে পত্রে মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের পর্ব্বতস্থিত নদীর গতির সহিত তাহার প্রেমের তুলনা করিয়াছে অথবা রবীন্দ্রনাথের কাঁদ পাতার কথা বলিয়াছে। সুরেশচন্দ্রকে কিশোরের কিশোরীর প্রতি প্রেমে বড়ই আস্থাবান দেখা যায়। "প্রভা"য় তিনি যেমন তাহা সুচারুরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন, এখানেও ঠিক তাহাই আঁকিয়াছেন। কিন্তু তিনি নীরস ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন বিবাহিত যুবক ভুবনচন্দ্রকে, যে খ্যাকারের নভেল লইয়া সর্ব্বদাই ব্যস্ত ও যেন কোন নাটকের বয়স্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

"তোমার ভবিষ্যপতি যে রসিক, তাকে আর চিঠি লেখাবো কি। প্রথমটা যেন এমন লোকের হাতেও পড়েছিলাম··· ।"

কিন্তু সেই সুমতির আবার স্বামীর প্রতি উক্তি যে অতি সুদৃঢ়ই—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাহা দেখাইয়াছেন।

সুরেশচন্দ্র নবীন ও প্রাচীন সাহিত্যে যে সুপণ্ডিত ও সূক্ষ্ম সমালোচক ছিলেন তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তিনি শুধু সাহিত্যের সমালোচনা করিতেন না, তিনি দেশের নৈতিক সামাজিক পারিপার্শ্বিক আদব-কায়দারও তীব্র সমালোচনা করিয়া দেশকে সংযত রাখিতেন।

পূর্ব্বোদ্ধৃত দুইটি অংশে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কবি হওয়ার লাঞ্ছনারূপের বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন এবং মনে হয় তিনি এই বাক্যবাণ কাহাকেও কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন।

"এই যে কাগজে সদ্য দুগ্ধপোষ্য শিশু থেকে গলিতকেশ বৃদ্ধ পর্যন্ত নানাবিধ কবির যথেষ্ট প্রেমের খোরাক পড়া যায়, সে সব কবিতা সে সব সেন্টিমেন্টাল লিখিয়ে জগতে ছড়িয়ে যাচ্ছে কি?"

তাঁহার সময়ে মেসে যে সমস্ত সভা-সমিতিতে সাহিত্য, দর্শন, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হইত, তাহার হুবহু ছবি তিনি এই "প্রাইভেট টিউটরে" দিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এত বিস্তৃত বিষয় সন্নিবিষ্ট করিতে গিয়া তিনি এই ছোট-গল্পটিকে ছোট-গল্পের মর্য্যাদাহীন করেন নাই।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতির "কমলা" ১৩০৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের "সাহিত্যে" প্রকাশিত হয়। ইহা "প্রাইভেট টিউ-

টারের" ন্যায় পত্রাকারে ছোট-গল্প। ইহার নায়ক প্রমথ নামে একটি উচ্ছৃঙ্খল যুবক, নায়িকা কমলা নাম্নী একটি ধনী বিধবা যুবতী। "প্রাইভেট টিউটরে" তিনি দুইটি অবিবাহিত যুবক যুবতীর প্রেমোন্মুখ হৃদয়ের উন্মেষ দেখাইয়াছেন; কিন্তু পাপের স্পর্শ দেন নাই। এই প্রেমই সাধনায় স্বর্গীয় হইতে পারে। ইহাতে ভুলত্ব নাই। কিন্তু "কমলা"র সেই প্রেম বিকৃত। প্রেম প্রেতমূর্ত্তি ধারণ করিলে কিরূপ নারকীয় হইতে পারে, তাহাই এখানে দেখাইবার তাঁহার বাসনা। এখানে প্রেমের স্থূলতা-ক্রমেই ডুবিবার দৃশ্য।

"কমলা"-ও "প্রাইভেট টিউটর"-এর মত প্রেমের বাহনে গভীর মনস্তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছে। প্রমথর প্রেম মোহ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সে চায় নিতান্ত সঙ্গ। এই কামজ মোহে আচ্ছন্ন হইয়া মানুষ কিরূপ পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হয়! তখন তাহার ধ্যান-ধারণা সমস্ত লোপ পায়, ভাল-মন্দ বিচার করিবার তাহার শক্তি থাকে না, সে দর্পে রজ্জু ভ্রম করে এবং উপদেশ তাহার নিকট ক্রোধের কারণ হয়। কিন্তু মানুষের যখন সেই মোহ কাটিয়া যায়, তখন তাহার তীব্র অনুতাপ আসে। সে সেই অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া ছারখার হইয়া যায়। সুরেশচন্দ্র সেই অনুতাপের দৃশ্য দেখাইবার জন্য এই ছোট-গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। সুখের ভাগ হইতে দুঃখের ভাগই তিনি দেখাইতে যেন অধিক আনন্দিত। ইহা সংসারের দৈনন্দিন ঘটনা।

"প্রাইভেট টিউটর"-এর ন্যায় "কমলা" গল্পাংশে কিছুই নহে, কিন্তু সেই স্বল্প গল্প-ভাগটি লেখক পত্রাকারে কেমন ধাপে ধাপে তুলিয়াছেন ও নামাইয়াছেন। ইহাই দেখিতে সমালোচকের তীব্র আনন্দ।

১। বিজয়ের পত্র—প্রমথর নিকট লিখিত।
২। প্রমথর পত্র—বিজয়ের নিকট লিখিত।
৩। প্রমথর পত্র—কমলের নিকট লিখিত।
৪। কমলের পত্র—প্রমথর নিকট লিখিত।
৫। প্রমথর পত্র—কমলের নিকট লিখিত।
৬। বিজয়ের পত্র—প্রমথর নিকট লিখিত।
৭। প্রমথর পত্র—বিজয়ের নিকট লিখিত।
৮। কমলের পত্র—প্রমথর নিকট লিখিত (বিজয়ের পত্রের কিয়দংশ)।
৯। প্রমথর পত্র—কমলের নিকট লিখিত।
১০। বিজয়ের টেলিগ্রাম—প্রমথর নিকট।
১১। প্রমথর পত্র—কমলের নিকট লিখিত।
১২। প্রমথর পত্র—কমলের নিকট লিখিত।
১৩। বিজয়ের পত্র—প্রমথর নিকট লিখিত।
১৪। প্রমথর পত্র—বিজয়ের নিকট লিখিত।
১৫। প্রমথর পত্র—বিজয়ের নিকট লিখিত।
১৬। বিজয়ের পত্র—প্রমথর নিকট লিখিত।
১৭। প্রমথর পত্র—বিজয়ের নিকট লিখিত।
১৮। প্রমথর পত্র—বিজয়ের নিকট লিখিত।
১৯। কমলের পত্র—প্রমথর নিকট লিখিত।
২০। প্রমথর পত্র—কমলের নিকট লিখিত।
২১। বিজয়ের পত্র—প্রমথর নিকট লিখিত।
২২। প্রমথর পত্র—বিজয়ের নিকট লিখিত।
২৩। কমলের পত্র—প্রমথর নিকট লিখিত।
২৪। প্রমথর পত্র—কমলের নিকট লিখিত।
২৫। কমলের পত্র—প্রমথর নিকট লিখিত।

সর্ব্বশুদ্ধ এই পঁচিশখানি পত্রে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি "কমলা" ছোট-গল্পটি লিখিয়াছেন। নানা ব্যক্তির নানা পত্রের ভিতর দিয়া এই ছোট-গল্পটি লিখিত হইলেও ইহা কোনও দিক দিয়া ছোট-গল্পের বিধি-নিয়ম লঙ্ঘন করে নাই। সেই একমুখী গতি, প্রমথর কমলার প্রতি ভালবাসা বর্ণিত হইয়াছে।

উচ্ছৃঙ্খল যুবক প্রমথ বাড়ী-ঘর আত্মীয়-স্বজন বিষয়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া কমলা নাম্নী একটি যুবতী বিধবার প্রেমে পড়িয়াছিল। বিজয় প্রমথকে এইরূপ গর্হিত, অসামাজিক ও কুলাপমানকারক কমলার প্রেমে পড়িতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিল, উচ্ছৃঙ্খল যুবক তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। কমলা প্রথমতঃ এই প্রেমে লোক দেখান "না না" করিয়াছিল, কিন্তু শেষে সে স্বীকৃতা হইল। প্রমথ কমলাকে গান্ধর্ব্ব-বিবাহ করিল, কিন্তু এইরূপ প্রেমের যে পরিণাম অবশ্যম্ভাবী, তাহাই হইল। ক্রমে কমলা প্রমথর অপছন্দ হইল, শেষে সে আত্মহত্যা করিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির রচনার সাবলীল গতি, সংক্ষিপ্ততা, সংযম অনন্যসাধারণ, তাই এই ছোট গল্পটিকে তিনি সরল ও সংক্ষিপ্তভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি ইহাতে যে গভীর মনস্তত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পড়িবামাত্র পাঠক-পাঠিকার মনে আঘাত করে।

"কমলা" খানিও ছোট-গল্প, কিন্তু লেখক ইহাতে বহু দার্শনিক সার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"এই পৃথিবীতে যাহার সঙ্গে নাই তাহার মত দুর্ভাগা কে? সঙ্গে মানুষের প্রয়োজন বর্ষা। মানুষ উপকৃতি সঙ্গে করিতে পারে, বিপদটা মানুষকে সে অবশ্য দিবেন।"

তিনি প্রমথকে এরূপ অসংযমী উচ্ছৃঙ্খল সৃষ্টি করিয়াছেন এই জন্যই যে, মানুষ যেন প্রমথর মত ছার পিছিত-পিণ্ডের লোভে আত্মধর্মে বিসর্জন না দেয়। তিনি বিজয়কে দিয়া কহাইয়েছেন, "তুমিও ফিরিতে পার, কিন্তু তখন তুমি অনুশোচনার বশ হইবে।"

সত্যই প্রমথর তাহা হইয়াছিল, কিন্তু সে ফেরা সুলতান মাহমুদের ফেরদৌসীকে "শাহ নামা" রচনার পারিশ্রমিক দানের মত। সে বড় দেরীতে। প্রমথর তখন বয়স গিয়াছে, ঐশ্বর্য্য গিয়াছে, দুর্নাম রটিয়াছে।

এই ছোট-গল্পের ভিতর সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে অনর পারস্য কবি ওমর খৈয়ামের দর্শনের অবতারণা করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। "সাকী আর সুরা," "Eat drink and be merry," "এ জীবন নিশার স্বপন।" পলকে যখন জীবনের সমাধি হইতে পারে, তখন অশান্তির ছায়াকে কায়া ধরিয়া মানুষ কষ্ট পায়। ধূলা-খেলা দু'দিন বই তো নয়। আনন্দ লাভ কর। কিন্তু এ আনন্দের মূলে যে সেই সচ্চিদানন্দ বিরাজিত তাহা দেখাইবার জন্যই সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এই মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। সাকী ও সুরার উদ্দেশ্য কবির সেই পরম আনন্দময়ের পাদপদ্ম লাভ, ঐহিক, দৈহিক ছার সুখের জন্য নহে।

"ভাল করে এ সব ভাবিয়া না ঠিক করিয়াছি। অতএব এ বিষয়ে তোমার পরামর্শ বৃথা। সে পক্ষে যোগেন বাবু দক্ষ নয়; যতক্ষণ মাথায় থাকে, আমি তাহা চাই তাহাকে মাথায় আসিতে দেয় না। শুধু কমলা ও যোগেন। শুধু কমলা ও গঙ্গা। শুধু কমলা ও সৌরভ! শুধু কমলা ও সুখ। শুধু কমলা। কমলা। কমলা!"

বাস্তবিক মনের এরূপ বিকৃতাবস্থা আসে। ইহা মনোবিজ্ঞানের কথা। মানুষ অন্যায় করিতে করিতে যখন কোন কূল-কিনারা দেখে না, তখন আর তাহার সংজ্ঞা থাকে না। সে তখন ভাবে "সমুদ্রে শয়ন যদি শিশিরে কি ভয়," কিন্তু লেখকের এখানে চরম উদ্দেশ্য সেই রত্নাকরকে বাল্মীকি সাজানো। তাই তিনি বলিয়াছেন:

"জগতে পাপি বড় দুর্লভ, কিন্তু বড়,চড়া রকমে এ অভিজ্ঞতা কিনিতে হইয়াছে। যারপর অশান্তি, অতৃপ্ত অতৃপ্তি ঘোর তাল। কিন্তু এই অন্ধ অবসাদ আর সহ্য হয় না। আমি এখন মরীচের দুর্লভতার হাত, জীবন যায় হাত, অন্ধ পথিকের মত চলিয়াছি, কিন্তু কেন কোথায় কে জানে।"

একজন বড় সাহিত্যিক বলিয়াছেন।

"লেকসপিয়রের লেডি ম্যাকবেথের ঘুমিয়া ঘোর অভিনয় করা যায়।"

সুরেশচন্দ্র এখানে তাই বলিতেছেন:

"হায় এই সেই জীবন! তখন কেন এ জীবনের মায়া কাটাইতে পারি নাই? এখন মনে হইতেছে মরণ সুন্দর।"

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি "প্রাইভেট টিউটরে" বলিয়াছেন:

"মরণ রে! তুঁহু মম শ্যাম সমান।"

বস্তুতঃ জীবনে যখন অন্যায়ের অনুশোচনার বোঝা মানুষকে ঘন আটকাইয়া মারিতে আসে, তখন এ জীবনের পরে কি আছে দেখিতে মানুষের বড় সাধ হয়। এই সেই কল্পনতা, যাহা ছোট-গল্পের অন্তর্ভূত অঙ্গ।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ছোট-গল্পের আলোচনার শেষ সময় আসিয়াছে, কারণ এই প্রবন্ধে ছোট-গল্প আলোচনার সময়ের গণ্ডী ১৩০৬ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা বিকাশের মধ্যাহ্ন-সূর্য্য তখনও সাহিত্যাকাশে উদিত হয় নাই, তখন কেবল প্রাতঃ।

১৩০৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির "তীর্থের পথে" "সাহিত্যে" প্রকাশিত হয়। লেখক ক্রমেই যেন গুটাইয়া কম জায়গায় অনেক ব্যাপারের সংস্থান করিতে পারিতেছেন। তাই ইহা ছোট একটি ছোট-গল্প, মাত্র কয়েক পৃষ্ঠায় একটি বাঙ্গালী ঘরের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা গৃহ-চিত্র।

সুরেশচন্দ্রের কোনও গল্পটি অন্য কোনও গল্পের মত নহে। প্রতিটিই বিভিন্ন রকমের এবং স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য লইয়া লেখা। লেখক দেখাইতে চাহিয়াছেন, ছোট-গল্প প্রেমমূলক হইতেছে বটে, কিন্তু সেই প্রেম বিভিন্ন আধারে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বিকাশিত।

যে সৈনিক যুদ্ধে প্রাণ দিতে গিয়াছে, তাহাকেও ভালবাসিতে দেখা যায়। পশু—যাহার গলদেশ যূপমূলে এখনই বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে—সেও মোহময়।

"তীর্থের পথে"-লেখক এই মোহ উৎপাদন করিয়াছেন। মহামায়া ও যোগমায়া জ্যাঠতুতো ও খুড়তুতো বোন। মহামায়া সুখে স্বামীসোহাগিনী। যোগমায়া বিবাহের পরে বিধবা হইয়া হতভাগিনী। ইহা একরূপ ভগবানের ব্যবস্থা

ছিল। হিন্দুসমাজ এই দুইটি যুবতীর জন্য যথাবিহিত বন্দোবস্ত করিয়াছে। একের ভাগ্যে দাম্পত্য ব্রত, অন্যের ভাগ্যে ব্রহ্মচর্য্য, কিন্তু ভগবানের বিধান যাহা হউক, সমাজের বিধান না মানিয়াই এখানে গোলমাল।

যোগমায়া তাহার লোভী যৌবনকে তুষ্ট রাখিতে পারিত না। প্রেমের একরূপে রাধিকা, অন্যরূপে ব্যাপিকা; যোগমায়া তাই অনাঘ্রাতিনী হইয়া রামদয়ালের স্পর্শে উন্মাদিনী হইল। রামদয়ালও আর যেন শ্বশুর-বাড়ীর শ্যালিকার লোভ ত্যাগ করিতে পারিল না। মহামায়ার অবস্থা অনুমেয়।

এক রাত্রিতে মহামায়া অসুস্থ পিতার শয্যাপার্শ্বে রাত্রি জাগরণ করিবার কালে স্বামী রামদয়াল ও বোন যোগমায়াকে গভীর রাত্রিতে এক কক্ষে আড়ি পাতিয়া নিজ চোখে ভাল করিয়া দেখিয়া স্বামীর বিরুদ্ধে একটি অভ্রান্ত ধারণা লইয়া মনকে বিপদের জন্য বাঁধিল।

ঘটনা-স্রোত পরে যাহা হয়, তাহাই হইল। স্বামী শ্যালিকার প্রেমে আসক্ত হইয়া ধর্ম্মপত্নীকে বিদায় দিল। তারপর প্রায় বার বৎসর চলিয়া গেল।

মহামায়া তীর্থের পথে যাত্রা করিয়া পথে এক চটিতে কলেরায় আক্রান্ত হইল। ঐ চটিতে আরও একটি যাত্রী একই রোগে পড়িল। শেষে দেখা গেল সেই যাত্রীটি অন্য কেহ নহে রামদয়াল; সঙ্গে যোগমায়া। যোগমায়া সহযাত্রিনীকে মহামায়া বলিয়া চিনিতে পারিয়া রামদয়ালের শয্যাপার্শ্বে মহামায়ার শয্যা আনিয়া উভয়ের মিলন করিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অনন্ত পথের যাত্রী হইল। পড়িয়া রহিল পাগলিনী বেশে যোগমায়া।

সুরেশচন্দ্র গল্পাংশ যাহাই করুন না কেন, যে প্রেমে বাসবদত্তা, প্রভা, সরলা, কমলার সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই প্রেমে মহামায়ারও সৃষ্টি হইল। যে ভালবাসায় উপগুপ্ত, মেঘ, মন্মথ, প্রমথর আবির্ভাব, সেই প্রেমে রামদয়ালেরও আবির্ভাব! সমস্তই এক প্রেম বা ভালবাসায় উৎপন্ন। তবে রূপভেদ। এক জল যেমন পাত্রভেদে রূপান্তর দেখায়।

সুরেশচন্দ্রের কি পরিণতি দেখাইবার অভিলাষ তাহা সহজেই অনুমেয় হইবে যদি তাঁহাকে ধরা যায় যে, তিনি নিতান্ত বাঙ্গালী, হিন্দু, এদেশের স্বধর্ম্মের খাঁটি মানুষ ছিলেন। তাঁহার রচনায় তাই বৈরাচারিতার অভাব। তাঁহার দর্শন গভীর ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র। তাঁহার মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ইউরোপীয় ধারার নহে। রাগ হইলে বাঙ্গালী বড় জোর ভাত না খাইয়া থাকে বা নিজের মাথার চুল ছেঁড়ে বা কপাল কুটিয়া নিজের কপাল ফোলায়, কিন্তু যাহার উপর তাহার ক্রোধ হয় তাহাকে রিভলবার দিয়া খুন করে না বা নিজের বুকে গুলী ছোড়ে না। সেইরূপ তিনিও ক্রুদ্ধ হন।

বাঙ্গালী মহিলার প্রেমের আদর্শ নিজে সহিয়া :

"বড় আশায় করিয়া বড় আশায় বুক বাঁধিয়াছিলাম, মরিবার আগে তাঁহার পদধূলি লইয়া মরিব। তাঁর পদধূলি দাও, মরিবার আগে দাও দিদি! আমি সুখে মরিব…"

পরকে সুখী করিয়া বিবেকীদের মত উঁচু পাহাড় হইতে নীচে উপত্যকায় বা সাগরে ঝাঁপাইয়া স্বামীকে জব্দ করে না বা তাহাকে জেলে দেয় না।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাই তাঁহার ছোট-গল্পগুলিতে এ দেশের ছবি ফুটাইয়াছেন, এ দেশেরই কাঠামোতে।

---

## অনুকরণ করিবে কাহাকে ?

…সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন অন্য কোন জাতির সাহায্যে অতিক্রমের আয়ত্ত ও ব্যবহারের ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থাৎ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আনয়ন করে না, তাহা কখনই আকাঙ্ক্ষণীয় হইতে পারে না। বর্ত্তমান ইউরোপীয় জাতিগুলি ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাহাদের সকলেরই প্রায় রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আছে, কিন্তু কাহারও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নাই। তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা যে কোন জাতির আকাঙ্ক্ষণীয় নহে, তাহা চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।…

# বিজয়ী

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

তুমি শবরী

সবে রুক্মিণীরা স্নান করিয়া আসিয়াছেন, সুদেষ্ণা বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল, দেখিয়া বলিল, "কখন গেছলে মা? আমায় বলে গেলে না যে?"

"তোর গা ধোয়া হয়ে গেছল তখন।"

"তবু তোমার সঙ্গে যেয়ে আসতাম, তাতে স্বার্থপর হচ্ছ তুমি—চল না আবার যাই।"

"দিব্যি চুল বাঁধা রয়েছে—আজ থাক, কাল যাস।

"চুল খুলতে কতক্ষণ—এখুনি খুলছি—আমার অত বাবুগিরি নেই।"

রুক্মিণী গামছা নিংড়াইতে নিংড়াইতে বলিলেন, "দূর ছাই, এটার সঙ্গে কে পারবে? মা গেলেন কোথা?"

কৈকেয়ীও গামছা হাতে ঘর হইতে বাহির হইলেন; রুক্মিণী বলিলেন, "এই দেখ না মা, অবেলায় ওর নাইবার সখ চাপলো।"

কৈকেয়ী বলিলেন, "এখন নাইবি কি? অসুখ করবে যে?"

"কবে আবার আমার অসুখ করে? যে গরম পড়েছে আজ না নাইলে থাকতে পারা যায়?"

"খুব যায়—চুল খুলিস নে, অবেলায় নাইতে হবে না।"

বাধা পাইয়া নিমেষে সুদেষ্ণার মুখ ভার হইয়া উঠিল, খোঁপা হইতে হাত নামিয়া পড়িল এবং কৈকেয়ীর দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল।

একটু হাসিয়া রুক্মিণী চলিয়া গেলেন। কৈকেয়ী সুদেষ্ণাকে ধরিয়া নিজের দিকে ফিরাইতে চাহিলেন, অমনি তাঁহার হাত ছাড়াইয়া সে আরও তফাতে গিয়া দাঁড়াইল।

আনন্দ বেড়াইতে যাইতেছিল, এই দিকে চাহিয়া ব্যাপারটা দেখিল। হাসিয়া বলিল "দিদি, তুমিইতো আদর দিয়ে দিয়ে নষ্ট করেছ তোমার পুণ্যটিকে, এখন কেমন মজা।"

সুদেষ্ণার জল-ভরা চোখ দুটির তীব্র বক্র কটাক্ষ চকিতে আনন্দের দিকে নিক্ষিপ্ত হইল।

আনন্দ আবার হাসিয়া নামিয়া গেল। কৈকেয়ী মানিনীর খোঁপার গহনাগুলি খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "দিন দিন বড় হচ্ছিস, আর ছেলেমানুষী বাড়ছে—নে, ধর এগুলো।"

সুদেষ্ণা তেমনি নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কৈকেয়ী সেগুলি জানালার উপর রাখিয়া দিলেন। সুদেষ্ণার চুল খুলিয়া দিয়া নিজের দিকে তাহাকে ফিরাইয়া তাহার চোখ দুটি মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন, "আচ্ছা যখন তখন চোখে জল আনিস কেমন করে লক্ষ্মণ? ওতেই তো তুই জিতে যাস্—বিয়ের আগে সেই বন্ধীতলায় দেখলাম কি লক্ষ্মী মেয়েটি! এত যে গুণ তা কি জানতাম?"

সুদেষ্ণার মুখে হাসি দেখা গেল, কৈকেয়ীর দিকে চোখ তুলিয়া একটু গম্ভীর একটু প্রফুল্ল ভাবে ভ্রু দুটি টান টান করিয়া বলিল, "জানলে কি করতে? আনতে না বুঝি?"

"না, না এনে কি উপায় ছিল? মনের ভেতর ঢুকে গিয়েছিলি তাই।"

একটু দূরে বারান্দার কোণে সাদা পাথরের তুলসী-বেদী-তলে জানকী বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছে, গাঁথা শেষ হইলেই মন্দিরে যাইবে—রুক্মিণী প্রদীপ সাজাইতেছেন। সুদেষ্ণাকে লইয়া কৈকেয়ী নামিয়া গেলে জানকী বলিল, "ছেলেমানুষীই করুক—আর যা-ই করুক—বৌমা মার মতনই শক্ত মেয়ে।"

রুক্মিণী বলিলেন, "না ভাই, কি বল তুমি—ওর মনটা ফুলের মত নরম।"

"ঐ নরম মন পাথরের মতন শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এখুনিই দেখ না এক কোঁটা মেয়ে মাকে নিজের ইচ্ছের চালাচ্ছে।"

স্নিগ্ধ আনন্দের হাসি রুক্মিণীর মুখে ফুটিয়া উঠিল, "তাই বল—আমি মার কোন সাধ মেটাতে পারিনি, ও করুক।"

একটু অপ্রসন্ন ভাবে জানকী বলিল, "নিজেকে অত খেলো মনে কোরো না তুমি, ঐ তোমার দোষ।"

সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিতেছে। স্নান সারিয়া আসিয়া কৈকেয়ী নিজের পূজার ঘরে ঢুকিলেন। সুদেষ্ণা দুয়ারে দাঁড়াইয়া মাথা মুছিতে লাগিল, বলিল, "ছোড়দটা ডুব দিয়েছি দিদিমা, দিদি কিছু বলে নি।"

"বেশ করেছ—লক্ষ্মী বউ তুমি। তুমি মা'র কি রকমটা হয়েছ জান? ঠিক লক্ষ্মণ ভাইটিই, শ্রীরাম তো লক্ষ্মণ ভিন্ন জানতেন না।"

সুদেষ্ণা বলিল, "লক্ষ্মণও তেমনি।"

"না তফাৎ আছে। শ্রীরাম লক্ষ্মণকে বলেছিলেন, 'ভ্রাতৃবলাধিক্য চাত্রং বলং' লক্ষ্মণ জবাব দিলেন, 'বাহুবলাধিক্য নাত্রং বলং'।"

জানকীর আবৃত্তির সুর যেমন তেজস্বী, তেমনই মধুর—সংস্কৃত বা হিন্দী কথা তাহার কণ্ঠে অপূর্ব ঝঙ্কার দিয়া উঠে। সুদেষ্ণা আরো কাছে সরিয়া আসিল। কৃত্তিনী মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "কি সুন্দর!"

জানকী বলিল, "শ্রীরাম সংসারী হয়েও সন্ন্যাসী, পার্থিব সংসারের বিষয় কিছুই জানেন না। রাজপুত্র হয়েও রাজনীতি শিখতে গেলেন রাবণের কাছে, আর লক্ষ্মণ সন্ন্যাসী হয়েও সংসারী। সবই জানেন। সেই জন্য সীতার গহনা রাম চিনতে পারেন নি—লক্ষ্মণ দেখা মাত্র চিনলেন। শ্রীরাম জানেন ভাই-ই সব। লক্ষ্মণ ভাবেন—বাহুবল ভিন্ন কিছুই কিছু না। যখন শ্রীরাম বলেন, 'চক্রং দীপায়িত নাত্রং দীপং', তখন লক্ষ্মণ জবাব দেন, 'চক্ষু দীপায়িত নাত্রং দীপং'। চন্দ্র শ্রেষ্ঠ দীপ বটে, কিন্তু চক্ষু না থাকলে দেখবেন কি করে? এমনি করে তিনি দাদাকে ঘিরে রেখেছিলেন। সংসার-বোধহীন শ্রীরামের লক্ষ্মণই ছিলেন একমাত্র সম্বল। তাই সীতার বনবাস ও অন্তর্ধান তিনি সয়েছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ-বর্জন সইতে পারলেন না। মা তোমায় যে চোখে দেখে সে তুমি বেশ জান, কিন্তু তুমি সে রকম পারবে কি?"

সুদেষ্ণা ধীরে ধীরে বলিল, "আমি বৌদিকে সব চেয়ে ভালবাসি।"

জানকী জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম? এই এপুনি যেমনটি দেখালে?"

লজ্জা পাইয়া সুদেষ্ণা একটু হাসিল।

কৃত্তিনী বলিলেন, "আরতি দেখতে যাই চল।"

জানকী বলিল, "তুমি? সময় হবে? দাদাকে আঁচলে বেঁধে নাও তবে।"

কৃত্তিনী বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার শুধু ঠাট্টা—চল যাই, ক'দিন যাইনি।"

"তুমি যাও, আমি যাব একটু পরে। লক্ষ্মীর জন্যে মালা দুটো করে নিই আগে—নারায়ণকে মালা দিলে লক্ষ্মী রাগ করবেন না? তাঁর জন্যে কিছু না নিয়ে মন্দিরে ঢুকবো কি করে?"

"তবে হাতে হাতে গেঁথে নিই"—কৃত্তিনী ফুলের ঝালা গাঁথিতে বসিলেন—সুদেষ্ণাও বসিয়া পড়িল, "বাঃ! গরুড় বুঝি বাঁকি? আমি গরুড়ের মালা গেঁথে নিচ্ছি।"

জানকী মৃদু মৃদু গাহিতে লাগিল:

"ভজ সীতারাম, ভজ সীতারাম, ভজ সীতারাম
যে যুগ যন।"

"দেখ বৌদি, এক এক সময় আমার সব ছেড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়।"

"তুমি তো পালিয়েই আছ ভাই।"

"না—রামকে জানো, খুড়ই ভালো, আমায় খুড়ই মন্দ—ভালবেসে ডাক, সাড়া দেবে না—অহঙ্কার—দর্প! গ্রাহ্যই নেই—শত্রুভাবে চাও, তক্ষুনি পাবে। শবরীর দশা দেখ, যুগ যুগ ধরেই আছে, রাবণকে দেখ—চাইলে আর পেলে! জগতের নীতিটা হচ্ছে কি জান, শঠে শাঠ্যং,—যেমন দুর্জ্জন তেমনি ব্যবহার চাই। ও কাকুতি মিনতি কিছু না।"

বলিতে বলিতে জানকীর চোখ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—একটা উগ্র কঠোর ভাব ফুটিয়া উঠিল তাহার চোখে মুখে সর্ব্বাঙ্গে। রুক্ষ চুলে বৈদিক বস্ত্রে ক্রতভঙ্গীতে গাঢ় কৃষ্ণচক্ষের তীব্র চাহনীতে শান্ত জানকী যেন নিমেষে রুদ্রা এক যোগিনীতে পরিণত হইয়া গেল।

বাড়ীর চারিদিকে উপরে নীচে সিঁড়িতে বারান্দায় ঘরে সর্ব্বত্রই আলোকময়। এই দিকটা শুধু বাদ—এদিক্ জানকীর মহল, বিদ্যুতের আলোর আদর নাই। কেবল তুলসী-তলায় মাটীর দীপ বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ম্লান জ্যোতি ছড়াইতেছে। সেই অনুজ্জ্বল আলোকে জানকীর

জ্যোতির্ময় কৃষ্ণ চেহারা দেখিয়া সুরেকা আড়ষ্ট হইয়া চাহিয়া রহিল।

অন্ধকার আকাশে সপ্ত তারা অস্তমিত হইয়াছে। ধূপদানী হইতে ধূপের ধূম উঠিতে উঠিতে দক্ষিণা বাতাসে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। নির্জ্জন তরল ছায়ালোকতলে জানকী অপলক চক্ষে প্রদীপ-শিখার দিকে চাহিয়া আছে।

শঙ্কিত মৃদুকণ্ঠে ধীরে ধীরে রুক্মিণী বলিলেন, "তুমি যে কি আজও চিনতে পারলাম না।"

ধীরে ধীরে জানকী নিঃশ্বাস ফেলিল। দেখিতে দেখিতে তাহার রুষ্টভাব মিলাইয়া গিয়া স্বাভাবিক শান্ত গম্ভীর শ্রী দেখা দিল। একটু স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া মৃদু মধুর স্বরে উত্তর দিল, "আমি রামের দাসী।"

### ষষ্ঠীতলায়

জৈষ্ঠ্য মাসে ষষ্ঠী পূজা। বছরের প্রতি পূজাতেই কৈকেয়ী সুরেকাকে লইয়া পূজা দিতে যান। যে যায় না পারেন পূজা পাঠাইয়া দেন।

পূজার আগের দিন শুইতে যাইবার সময় কৈকেয়ী বলিলেন, "বৌমা, কাল তোমায় ষষ্টীতলা যেতে হবে।"

বৌমা নীরবে আদেশ মানিয়া নিজের ঘরের দিকে গেলেন।

সকাল বেলা সন্ধ্যা-জপ সারিয়া কৈকেয়ী আসনেই বসিয়া আছেন—স্নান সারিয়া রুক্মিণী দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কৈকেয়ী চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "এত ভোরেই তৈরি হয়েছ? ভালই—কাল তিনটের ষষ্ঠী লেগেছে আজ তিনটে অবধি আছে তুমি পীপুলীর পুজো সেরে এসো, দেরী হলে ভক্ত ভিড় হয় ওখানে।"

"লক্ষ্মণ যেতে চাইছে।"

"না, তুমি যাকে পাবে তারই সঙ্গে গল্প করতে বসবে লক্ষ্মণের আর সেটা দিখে কাজ নেই। তা তুমি যাচ্ছ এমন ভিখিরী সেজে কেন? কাপড়-চোপড় নেই না কি?"

রুক্মিণী কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "আর কি পরবো, সেবালয়ে যাচ্ছি।"

"পট্টবস্ত্রটা সেবালয়ের জন্যেই তৈরি হয়েছে; যাও কাপড় ছেড়ে এসো।"

একটু পরেই একখানা মযূরকণ্ঠী রং [illegible]সের সাড়ী পরিয়া গলায় একটা মোটা চেন-হার ঝুলাইয়া রুক্মিণী আবার আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মনে মনে বিশ্বাস ছিল এবার শাশুড়ী সুখী হইবেন। কিন্তু ভ্রূকুটী করিয়া কৈকেয়ী বলিলেন, "জরি-পেড়ে গয়না একটা পরলে না কেন?"

বিব্রতভাবে রুক্মিণী বলিলেন, "গয়না খস্ খস্ করে কেবলি মাথা থেকে পড়ে পড়ে যায়।"

"ব্যবহার না করলে খস খস করবে বই কি, শত জন্মে মাথে হাত দেবে না! যাক গে শোন বৌমা। যোগো এখানে যা বলতে চেয়েছি। লক্ষ্মণের সতের বছর বয়েস এখনো ছেলে পিলে কিছু হলো না। বাইরে লোকে কানা কানি করে সবই তো কানে আসে—বলে 'ও না কি বন্ধ্যা! এবার চৌধুরীদের সম্পত্তি লুটবে কোথাকার কোন পুষ্যিপুত্তুর।' কি ভাবনা যে আমার হয়েছে কি বলবো, সাত পুরুষ থেকে এ বংশে একটি করে ছেলে চলে আসছে এবার কি তাও লোপ পাবে? বাবার বংশে পোষ্য-পুত্র, এ কথা মনে হলেও আমার অন্তর জেগে যায়। সে আমি হতেও দেব না, সইতেও পারবো না। আমি ষষ্ঠীর কাছে সব সময় চাইছি কিন্তু মা শুনছেন না।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কৈকেয়ী বলিলেন, "বংশধর আমার চাই-ই। তাই তোমায় বলছি যা তোমার ইচ্ছে হয় তাই মানৎ করে মার কাছে বর চেয়ে নিয়ো মা লক্ষ্মণের কোলে সুসন্তান দিন।"

রুক্মিণী চুপ করিয়া রহিলেন। কৈকেয়ী বলিলেন, "আমার—আমার মনে হয়, মা তোমার কথা রাখবেন, তাই তোমায় পাঠাচ্ছি।"

ইতিপূর্ব্বে কৈকেয়ীর মুখে এরকম কথার আভাসও শোনা যায় নাই, আজ হঠাৎ কেন মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়া ফেলিলেন?

রুক্মিণী কোন দিনই শাশুড়ীর কথায় প্রতিবাদ করেন না আজও এই গুরুতর আদেশ পাইয়াও কিছুই বলিলেন না, চিন্তাবিপন্ন-মুখে কৈকেয়ীর পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইয়া যাত্রা করিলেন। সুখদা সঙ্গে গেল।

আটটা বাজিবার আগেই রুক্মিণী ষষ্ঠীতলায় পৌঁছিলেন। বনানীর নীরব গম্ভীর শান্ত শ্রী এক মুহূর্ত্তে তাঁহার মনের

ভার হাল্কা করিয়া দিল। ষষ্ঠীতলায় এই তাঁহার প্রথম আসা।

ষষ্ঠীতলায় কৈবর্তেরা একখানা টিনের চাল দেওয়া বড় ঘর তুলিয়া দিয়াছেন বৃষ্টির সময় পূজার্থীদের আশ্রয়ের জন্য। পূজার জিনিষপত্র রাখিবার জন্য ঘরের দেওয়ালে সারি সারি দেওয়াল-আলমারী। ঘরের চারিদিকেই দরজা।

গরুর গাড়ীতে পূজার জিনিষ ও লোকজন আগেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে, পুরোহিতও আসিয়াছেন। রুক্মিণী পূজার সাজ করিয়া দিলেন, পূজা আরম্ভ হইল।

রুক্মিণী ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিছুক্ষণ দেখিলেন। জঙ্গল খুব বড়, ভিতরে দাঁড়াইলে মনে হয় বুঝি জঙ্গলের শেষ নাই, আঁকা-বাঁকা বীথি-পথে চলিতে চলিতে নদী দেখা দিল, নির্জ্জন নদী-তীর, নির্জ্জন স্থান, রুক্মিণী একটা গাছতলায় বসিয়া পড়িলেন।

তখনো পল্লীর মেয়েরা কেহই আসে নাই। তত সকালে কেহ আসেও না। গাছপালার ফাঁক দিয়া পূজা-বেদী দেখা যায়। সুখদা সেখানে আছে, অন্যান্য ঝিয়েরাও আছে। ধূপের ধোঁয়ায় সমস্ত বনতল ভরিয়া উঠিল, পুরোহিতের গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ শব্দও শোনা যায়। নদীর ধার দিয়া একটা শিয়াল ছুটিয়া পলাইল, কি বিদ্যুৎ-গতি! যায় আর মুখ ফিরাইয়া রুক্মিণীকে দেখে। এদিক ওদিক চাহিয়া রুক্মিণী দেখেন একটা গাছতলায় চারি পাঁচটি শাবক লইয়া একটা ছাগী চরিতেছে। খুব সম্ভব একটা ছানা শিয়ালটার লক্ষ্য ছিল।

বৈশাখের নির্দ্দেষ ঘননীল আকাশ, পাখা মেলিয়া অলস-গতি চিল উড়িতেছে। বাহির হইতে যে রকম নিবিড় বন দেখায়, ভিতরে তেমন নয়। বড় বড় গাছ কত রকম বনলতা নীল, লাল, হলদে ফুল লইয়া সেই গাছে পাকে পাকে জড়াইয়া আছে। গাছের মাথায় মাথায় উজ্জ্বল রোদ-ছড়ানো ডালপালা ও ঘন সবুজ পাতায় জাল বেশ করিয়া রোদ মাটী ছুঁইতে পায় না। গাছ খুব কাছাকাছি নয়, কিন্তু ডালপালা পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া সমস্ত বন জুড়িয়া অপূর্ব্ব সবুজ চাঁদোয়া তৈয়ারী করিয়াছে। নীচের পথে লতার ফুল ঝরিয়া পড়িয়া আছে, একটা মিষ্ট ও অত্যন্ত মৃদু সুগন্ধে চারিদিক ভরা, কত জানা অজানা ফুলের গাছ, কত রকম বিচিত্র রঙ, বিচিত্র সুগন্ধ। পায়ে চলা পথ নাই। দূর্ব্বা ঘাসের উপর শুধু গরু ও বাঁকা পদরেখা, সেদিকে চিহ্ন রাখিয়া নদীর ধার অবধি গিয়াছে। ভোর বেলা পাখীরা নীড় ছাড়িয়া গিয়াছে, আবার কত রকম পাখী ছোট বড় হলদে মেটে খুসর রংয়ের নীড়ে ঘাসের মধ্যে আবার অন্বেষণে রত। গাছের ফল পাকিয়া পড়িয়া যায়, ষষ্ঠীতলার পশু-পক্ষীরই তাহার অধিকার।

রুক্মিণী অনেক দেশ বেড়াইয়াছেন, কিন্তু এমন একটা শান্তিস্নেহা ছায়াময় স্থান কোথাও দেখেন নাই। কি অপূর্ব্ব আনন্দ-রসে তাঁহার মন ভরিয়া উঠিল, একটা বিচিত্র অনুভূতি যা জীবনে হয় নাই।

জঙ্গলের মধ্য দিয়া একটা বনবিড়াল ছুটিতে ছুটিতে দাঁড়াইল, সজাগ ও সচকিত হইয়া রুক্মিণী চাহিয়া রহিলেন। এই বনবিড়াল, কলিকাতার চিড়িয়াখানায় দেখিয়াছেন, নিস্তেজ নিরুৎসাহ বন্দী। বনের দুলাল নিজের রাজ্য বনে নিজের রূপে দেখা দিল! কি সতেজ গর্ব্বিত ভঙ্গী, পুষ্ট দৃঢ় কঠিন, কটাশে চোখে হিংস্রকিত চাহনী, মানুষের উপর অনন্ত ঘৃণা, ঘৃণা মেশানো ভয়। আকারেও খুব বড়—অনায়াসে একটা ছাগল ধরিয়া লইয়া যাইতে পারে।

মিনিট দুয়েক সটান দাঁড়াইয়া থাকিয়া বনবিড়াল চলিয়া গেল। রুক্মিণীর মন তখন এক মায়ারাজ্যে উধাও হইয়া গিয়াছে। মানুষ যুক্তি জানিত বহু যুগ আগে প্রকৃতির দান। সেই আদিম চিরন্তনী প্রকৃতি মায়ের সন্তান মানুষ আজ সব ভুলিয়াছে, নিজেকেও ভুলিয়াছে, প্রকৃতির কোল ছাড়িয়া সৌধ গড়িতে মন দিয়াছে, পাঁচতলা ছয়তলা আরও কঠিন আরও দৃঢ় আরও দুর্গম দুর্গ গড়িয়া তাহারই ভিতর বন্দী থাকিয়া পরম আনন্দে ভাবে খুব সুখে আছি, মাকড়সার মত নিজের জালে নিজেই আটকা পড়িয়া! লিফ্‌টে চড়িয়া ওঠানামা করে, নিজের মনে সুখের মাত্রা বাড়ে! শতপাক বাঁধন আরও আঁটিয়া বসে, আরও আত্মপ্রসাদ বাড়ে, হায় পৃথিবী-মায়ের অবোধ অজ্ঞান সন্তান! শুধু কৃত্রিম বাস, বেশ, বিলাস, কৃত্রিম জীবন-পথে কৃত্রিম জীবন-যাত্রা—এই কি উন্নতি, এই কি জীবনের সফলতা?

নদীর ওপারে বাগ্দী ও ভেলেদের বৌ-মেয়েরা ঘাটে জল

করিতে আসিয়া এপারে বহুতলার জঙ্গলের ফাঁকে গাছতলায় রুক্মিণীকে দেখিতে পাইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে গেল। বৈশাখের ক্ষীণকায়া নদী, তবু প্রখর স্রোত হিমালয় হইতে বহিয়া আসিয়াছে, চলিয়াছে সাগর উদ্দেশে। এপারে দাঁড়াইয়া ওপারের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা চলে।

এপারে নদী কিনারের পথ দিয়া নন্দী বোষ্টমী খিড়কি বাহির হইয়াছে, রুক্মিণীকে দেখিয়া সানন্দে জঙ্গলে ঢুকিল এবং সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মা যে? পুজো দিতে এসেছ?"

রুক্মিণীর চিন্তা-সূত্র ভাঙিয়া গেল। নন্দীর দিকে চোখ তুলিয়া চাহিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না। নন্দী রুক্মিণীরই আশ্রিতা, বরাবর সাহায্য পায়। ভাবিল, মা বুঝি অভিমান করিয়াছেন—সুতরাং আর বিরক্ত না করিয়া চলিয়া গেল।

রুক্মিণী সজাগ হইয়া একবার পূজার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, অমনি মনে পড়িল, কিসের জন্য আসিয়াছেন কিসের জন্য বৈকেয়ী তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন এখানে।

আনন্দের একটি ছেলে, বংশধর চাই-ই চাই।

যদি না হয় কি ক্ষতি?

ঐ যে বাগদী পাড়া, জেলে পাড়া, কি ছোট ছোট জীর্ণ ঘর, কত দুঃখ কষ্ট অভাব—উহাদের কি মানুষের মত করিয়া তোলা যায় না, অন্ন বস্ত্র গৃহ ও শিক্ষা দিয়া? উহাদের কি কোন দাবী নাই অর্থশালীদের কাছে?

আনন্দের ছেলে—অনাগত সেই শিশুর জন্য সকলের মন উদ্‌গ্রীব! সমস্ত স্নেহ-মমতা সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে সে আসুক, সবই তাহার, তাহারই সেবায় লাগিয়া সমস্ত ধনসম্পদ্ সার্থক হোক এই তো কামনা? হায় রে, মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই।

যদি না হয়? মনে একটু কষ্ট হইবে বটে—তা হোক না, আনন্দ তাঁর কোল জুড়িয়া আছে, বধূ সুখেচ্ছা মেয়ের স্থান পূরণ করিয়াছেন আর কি চাই? ভবিষ্যতে তারা সমস্ত সম্পদ দিয়া দুর্ভাগা দরিদ্র দেশের সেবা করুক, তার চেয়ে অর্থের সার্থকতা আর কি আছে?

তখন মনে পড়িল বৈকেয়ীর কথা, রুক্মিণী বড় বিব্রত হইলেন, মার যে বড় সাধ! বড় আশা করে বলে দিয়েছেন! কি করি আমি? কেমন করে তাঁর কথা ঠেলবো? কি বলেই বা চাইবো?

রুক্মিণীর চোখে মুখে বিপন্ন ব্যাকুল ভাব ফুটিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময়ে সুখদা একটু দূর হইতে ডাকিল, "বৌদি এসো না?"

রুক্মিণী উঠিয়া আসিলেন, পূজা শেষ হইয়াছে, পুরোহিত একটি তামার পাত্রে প্রসাদী নির্মাল্য রুক্মিণীকে দিয়া বলিলেন, "কবচে করে বৌমার গলায় পরিয়ে দেবেন মা!"

রুক্মিণী অভিভূত ও বিভ্রান্ত ভাবে পাত্রটি লইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; একটু আগে মনের যে ব্যাকুলতা ভুলিয়া গেছেন, কিন্তু মন উদ্বেগে ভরা, সেইখানে স্থির হইয়া নীরবে কিছুক্ষণ চলিতে চলিতে নিজের অজ্ঞাতে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে সমস্ত উদ্বেগ ব্যাকুল বিপন্নতা মিলাইয়া গেল এবং মনের বিধা দ্বন্দ্ব ও ভয় ঘুচিয়া এক অজ্ঞাত অপরূপ তৃপ্তির নির্মল আনন্দে মন ভরিয়া উঠিল। তখন গলায় আঁচল জড়াইয়া রুক্মিণী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিলেন, কামনাহীন অকপট প্রণাম। মনে আর কোন কামনা বাসনার ছায়া নাই।

সে দিন সারা দিন ধরিয়াই পূজা, পুরোহিতকে থাকিতে হইবে। তাঁহার প্রাপ্য তাঁহার ঘরে পাঠাইয়া দিবার পরে জিনিস-পত্র শুদ্ধ গরুর গাড়ী ছাড়িয়া গেল। রুক্মিণী সুখদাকে লইয়া ফিরিলেন।

সুখদা বলিল, "এই দিক্‌কার পথ দিয়ে গেলে বৌমার ভায়ের বাড়ী।"

"তাই না কি? তবে এই পথেই যাই চল।"

সুখদা দ্বিধার সঙ্গে বলিল, "মা যদি রাগ করেন?"

অসংশয় বিশ্বাসে রুক্মিণী বলিলেন, "কিছু বলবেন না, এ পরের বাড়ী নয়।"

পথটা কিছু সরু এবং অনেক ঘুরিয়া তবে শ্রীনগরের দিকে গিয়াছে। মিনিট কয়েক পরেই গাড়ী থামিল বিনোদের বাড়ীর দুয়ারে। বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া রুক্মিণী ডাকিলেন, "করুণা!"

ঘরের বাহির হইয়া করুণার মুখে কথা সরিল না।

সস্নেহে রুক্মিণী বলিলেন, "তোমায় দেখতে এসেছি।"

কাছে আসিয়া করুণা প্রণাম করিল। তাহার কাঁধে

হাত রাখিয়া রুক্মিণী বলিলেন, "মায়ের পুজো দিতে এসেছিলাম।"

করুণা ক্ষীণ সুরে বলিল, "আপনার শাশুড়ী লক্ষ্মণকে নিয়ে পুজো দিতে আসেন বরাবর, কিন্তু এক দিনও এখানে থাকেন নি।" করুণা একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলিল।

"আমার শরীরটা ভাল না, আমাদের পাড়ার সবাই যাবেন, তাঁরাই আমার পুজো নিয়ে যাবেন। আসুন ঘরে বসবেন। আপনি আসবেন, স্বপ্নেও ভাবিনি।"

"তুমিও তো আর এক দিন খেলে না মা, আমি পথ চেয়ে থাকি। সব বারই খালি গাড়ী ফিরে যায়, কেন যাও না মা?"

সমস্ত ক্রিয়া-কর্মেই করুণা ও বিনোদের জন্ত গাড়ী পাঠান হয়, প্রতি বারই গাড়ী ফেরৎ যায়। শেষে দুই পক্ষেই ব্যাপারটা সহিয়া গিয়াছে।

করুণা বিব্রত হইয়া মুখ নীচু করিল, কিন্তু রুক্মিণীর জিজ্ঞাসার উত্তরে কথাটা ঘুরাইয়া বলিতেও ইচ্ছা হইল না, চোখ নীচু করিয়াই বলিল, "উনি তেমন পছন্দ করেন না।"

রুক্মিণী হাসিয়া বলিলেন, "বুঝেছি কিন্তু খেতে কিছু দোষ নেই মা, বিনোদ কই, আমি তাকে বলে যেতাম, কি দুষ্টু ছেলে যে।"

"ছেলে পড়াতে গেছেন।"

"তবে এখন আসি, অনেকক্ষণ এসেছি।"

করুণা তাড়াতাড়ি রুক্মিণীকে পান আনিয়া দিল।

রুক্মিণী বলিলেন, "তোমার শরীর বড্ড খারাপ হয়ে গেছে; যা দেখেছিলাম অর্দ্ধেকও নেই।"

"খোকা হবার পর থেকেই অসুখ চলছে।"

"খোকা? কই?" এদিক ওদিক চাহিয়া রুক্মিণী দেখিলেন একটি শিশু ঘরের ভিতর হইতে আসিবে বলিয়া চৌকাঠের সঙ্গে মুখ বাধাইয়াছে কিন্তু পার হইতে পারিতেছে না। "সুখী আন, ওকে আন।"

সুখদার কাছ হইতে ছেলেটিকে লইয়া রুক্মিণী বলিলেন, "কি সুন্দর ছেলে—চাঁদের টুক্‌রো!" বার বার তাহাকে আদর করিয়া চুমা খাইয়া বলিলেন, "মাণিক সোনা লক্ষ্মী ছেলে।"

লক্ষ্মী ছেলে তৎক্ষণে রুক্মিণীর চেন-হার লইয়া মুখে পুরিবার চেষ্টায় আছে।

সুখদা বলিল, "আহা এমনি একটি ছেলে আমাদের বৌমার হ'তো, ঘর কি সুখই হ'তো না বৌদি?"

করুণা বলিল, "লক্ষ্মণের বহিনী সবারই দু'তিনটি ক'রে ছেলে মেয়ে হয়েছে। আমাদের না-ষষ্ঠীর দয়ায় অনেকের অনেক বয়সেও ছেলে হয়। আহা! আপনার কাপড়ে একরাশ ধুলো লেগে গেল, দিন ওকে নামিয়ে।"

সুখদা বলিল, "চল বৌদি, যেখানে দাঁড়াও কথা আর ফুরোয় না তোমার, যা কি বলবে বল তো?"

"চল যাই, একে আমার কোল থেকে নামাতে ইচ্ছে হচ্ছে না, এমনি হঠাৎ এসেছি এখন সোনার হাতে দিই কি?" বলিয়া চেন-হারটা খুলিয়া শিশুর গলায় পরাইয়া দিলেন, বলিলেন, "এইটে জেখে ওর বালা-হার করে দিও।"

করুণা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না-না, ও কি, আপনার হার ফিরিয়ে নিন, এমনি আশীর্ব্বাদ করুন, ওদিনের কিছু দরকার নেই।" বলিতে বলিতে খুলিয়া দিবার জন্ত হারটা সে ধরিল।

রুক্মিণী করুণার হাত চাপিয়া ধরিয়া বাধা দিলেন, "কেন ফিরিয়ে দিচ্ছ? তুমি যে আমার মেয়ে, আমি তোমার মা।"

রুক্মিণীর বাষ্পিত সুর ও ম্লান মুখ দেখিয়া করুণা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শিশুকে চুম্বন করিয়া করুণার কোলে দিয়া তাহার গায় মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া রুক্মিণী বিদায় হইলেন।

পথে আসিয়া সুখদা বলিল, "বৌদির মত কাও! বুড়ি ওরির হারটা।"

"চুপ কর্ চুপ কর, সাগর-ছেঁচা মাণিকের কাছে সোণার দাম?"

[ ক্রমশঃ

# পৌরাণিক ভূতত্ত্ব

—শ্রীরমেন্দ্রনাথ সেন শর্ম্মা।

বর্ত্তমানে প্রাচীন ভূগোল বিষয়ে আলোচনা না থাকায় সাধারণের নিকট উহা অজ্ঞাত বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের এরূপ দুই একটি অপ্রাসঙ্গিক সমালোচনা কোন কোন মাসিক পত্রিকায় দেখা যায়। কিছু দিন পূর্ব্বে একখানা 'নারায়ণ' পত্রিকায় এরূপ একটি প্রবন্ধ দেখিয়া আমার বিশেষ কৌতূহল জন্মিয়াছিল। তাহাতে দেখিয়াছিলাম যে, একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি আর্য্যগণের পৃথিবীবিষয়ক জ্ঞানকে ভারতখণ্ডেই সীমাবদ্ধ করিয়া লিখায়, উক্ত প্রবন্ধলেখক তাহার প্রতিবাদ করত সমগ্র এশিয়া দেশে আর্য্যগণের গতিবিধি ছিল এরূপ প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

আমি বাদ-প্রতিবাদ কিছু না করিয়া শুধু সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রাচীন ভূগোলের বিজ্ঞান-সঙ্গত ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পৃথিবীর বর্ত্তমান নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত, বৃক্ষ-লতা ও লোকবাসবিষয়ক তথ্যগুলি বর্ত্তমান-বিজ্ঞান-সঙ্গত করিয়া প্রাচীন নাম, বর্ত্তমান নাম ও বিস্তৃত বিবরণ সহ লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

সমস্ত প্রমাণই বিষ্ণুপুরাণ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। বিষ্ণুপুরাণে সকল বিষয় সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণ হইতে বিষয়ের অবতারণা করিয়া বিস্তৃত বিবরণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

বহু পরিশ্রমে বিষয়গুলির সরল ও সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইহাদ্বারা জনসাধারণের কথঞ্চিৎ উপকার হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। চন্দ্র, সূর্য্য, ধ্রুব, ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহলোক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোক এবং পৃথিবীর উৎপত্তি, গতি ও প্রলয় বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পৃথক পুস্তকে (প্রাকৃত ভূতত্ত্বে) করিবার আশা রহিল।

আমরা প্রত্যেকেই মনে করি 'আমি খুব বুদ্ধিমান্।' আমরা যাহা বুঝিয়াছি তদতিরিক্ত যদি কিছু থাকে, তাহা আমরা বুঝিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা যাহা জানি তাহাই সত্য, অন্য কোন মত আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। কিন্তু বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ ভাবিয়া দেখিবেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যেও অনেক মতভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে। বাংলা ১৩৩৩ সনের 'দৈনিক আনন্দবাজার' পত্রিকার মফঃস্বল সংখ্যার ১৩ই মাঘ মঙ্গলবার তারিখে একটি অভিমত প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার আংশিক বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"পৃথিবীর আকার লইয়া পণ্ডিতদের গবেষণা"—"কমলা লেবুর মত না পিরামিডের মত।"

"আমাদের রথের আকৃতিটি কিরূপ? জানি, একদলে সকলে মিলিয়া তৃতীয় মানের ছাত্রেরা ভূগোলের সূত্র আওড়াইতে আরম্ভ করিবে 'কমলালেবুর মত উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা।' এই আমাদের অপূর্ব্ব রথ। এই আমাদের মাতা বসুমতীর আকৃতি। ছেলেদের ভূগোলে যাহাকে কমলালেবুর মত বলা হইয়াছে বড়দের ভূগোল-বিজ্ঞানে তাহার নাম এলিপসয়েড্ (Ellipsoid)."

"তৃতীয় মান পর্য্যন্ত যে হতভাগা পৌঁছাইতে পারে নাই, সে যদি বলিয়া বসে পৃথিবীটা চ্যাপ্টা তাহা হইলে তৃতীয় মানের ছেলের দল যে কিরূপ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু না সেই বেচারীরা, না তাদের শিক্ষকেরা, না বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা, কেহই কিন্তু লেবুটির আকৃতি প্রত্যক্ষ করেন নাই। কতকগুলি গণিতের হিসাবের উপর সেই ধারণার ভিত্তি। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস কি তীব্র!"

"কিন্তু হায়! জগতের কোন জিনিষই সম্পূর্ণ নহে। আমাদের এই কমলালেবুটি সম্পর্কেও বহু সংশয়-সন্দেহ আছে। পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণায় একদল আধুনিক বৈজ্ঞানিক একটা প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছেন। এইখানে তাহারই কথা বলিতেছি। মতটা কি? তাহাদের মত এই যে, পৃথিবীটা দেখিতে কমলালেবুর মত নহে, বরং একটা পিরামিডের মত।"

এক্ষণে প্রশ্ন এই জিজ্ঞাসিত হইতে পারে যে, যদি পিরামিডের মতই হইয়া থাকে, তবে অন্যান্য গ্রহগুলি পিরামিডের মত নহে কেন? তাহাদের উপরও তো একই নিয়ম কাজ করিতেছিল; সত্য, কিন্তু তাহারা যে পিরামিডাকৃতি নহে, তাহাও কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন না। বৃহস্পতি, শনি ও ইউরেনস্ সম্ভবতঃ এখনও অর্দ্ধতরল অবস্থায় রহিয়াছে। এখনও তাহাদের উপরের কঠিন আবরণ গড়িয়া উঠে নাই। শুক্রগ্রহ মেঘের আবরণে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। তাহার চেহারা যে কি প্রকার দেখিবার উপায় নাই। বুধের গায়ে এমন কোন দাগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যাহাতে তাহার উন্নত ও অবনত অংশগুলিকে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। একমাত্র আবাবের প্রতিবাসী মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর তুলনা করা চলিতে পারে। পণ্ডিতগণ মঙ্গলগ্রহের উপরিভাগের একটা মোটামুটি মানচিত্র খাড়া করিয়াছেন। এই মানচিত্রে একটা মজার ব্যাপার এই চোখে পড়ে যে, পণ্ডিতগণ যে অংশকে মহাদেশ বলেন, তাহা পৃথিবীর মহাদেশের মতই একটি মেরুর দিকে প্রসারিত হইয়াছে। মঙ্গল গ্রহের এই অংশ যদি সত্যই মহাদেশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ গতি-বিজ্ঞানের একই নীতি মঙ্গলগ্রহকেও চারিক্ষেত্র-বিশিষ্ট পিরামিড্ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে।"

উল্লিখিত পিরামিডাকৃতি পৃথিবীর সহিত পৌরাণিক ত্রিকোণ পৃথিবীর কতকটা সাদৃশ্য থাকিলেও বর্ত্তমান মতের সহিত বিরুদ্ধতা আছে। বেদব্যাসের মতগুলির সর্ব্বত্রই সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু বর্ত্তমান মতের সকল বিষয়েই অসামঞ্জস্য দেখা যায়।

দৈনিক 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় ১৩৪২ সনের ২৬শে ফাল্গুন মঙ্গলবার তারিখের "বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পৃথিবীর প্রথম রূপ"-শীর্ষক প্রবন্ধে পৃথিবীর বয়স লইয়া যে অসমঞ্জস আলোচনা হইয়াছিল, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

"এইবার সংক্ষেপে বসুন্ধরার বয়সের হিসাব লইতে পারি। পণ্ডিতগণ যে দিক হইতে পৃথিবীর বয়সের হিসাব করিয়াছেন তাহার ছাটি তিন এখানে উল্লেখ করিব। (১) উত্তাপ, (২) ভূগঠন, (৩) সমুদ্রে লবণের পরিমাণ।"

"পৃথিবীর উপরিভাগ আগেকার চেয়ে অনেক শীতল হইয়াছে। পৃথিবী যখন প্রথম গড়িতে আরম্ভ করিল তখন তাহার উত্তাপ ২০,০০০ ডিগ্রি ছিল ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং বর্ত্তমানের উত্তাপ বাদ দিলে আমরা বুঝিতে পারি আগের চেয়ে উত্তাপ কত কমিয়াছে। এখন যদি আমরা বাৎসরিক কত উত্তাপ খুঁজে মিলাইয়া যায়—বাহির করিতে পারি, তবে বয়সের হিসাব পাওয়া যাইতে পারে। অধ্যাপক জে. ডি. এডারেট হিসাব করিয়াছেন যে, পৃথিবী হইতে প্রতি বৎসর যে উত্তাপ পলাইয়া যায়, তাহা দ্বারা পৃথিবীর উপরে যদি এক ইঞ্চি পুরু বরফ স্তর থাকিত তাহা গলান যাইত। এই দিক হইতে হিসাব করিয়া লর্ড কেলভিন স্থির করেন যে, পৃথিবীর বয়স ২ কোটি হইতে ৪ কোটির মধ্যে, তবে ২ কোটি হইবার সম্ভাবনাই অধিক।"

"ভূগঠন হইতেও পৃথিবীর বয়স নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে; বৃষ্টি ও অন্যান্য কারণে ভূস্তরের ক্ষয় হয়, এই তলানি অন্যত্র জমা হইতে থাকে। এইরূপ ৫০ মাইল পুরু 'সেডিমেন্টারি পাহাড়' তৈরী হইয়াছে। পণ্ডিতেরা বলেন যে, একশত বৎসরে এক ফুট স্তর তৈরী হয়। এই হিসাবে ৫০ মাইল পুরু স্তর তৈরী হইতে লাগিয়াছে দুই কোটী বাইট লক্ষ বৎসর। কিন্তু এই গণনারও বহু গোলমাল আছে। এক ফুট ১০০ শত বৎসর, এই নিয়ম সব সময় খাটে না। কতক স্তর আবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

"সমুদ্রের লবণের পরিমাণ হইতে পৃথিবীর বয়স অনুমান আর একটি পদ্ধতি। সমুদ্র যখন প্রথম তৈরী হয় তখন তাহার জল ডিষ্টিল্ড্ ওয়াটারের মতন অর্থাৎ বিশুদ্ধ ছিল। লবণাংশ আসিয়াছে ভূস্তর হইতে। সমুদ্রে যে লবণ রহিয়াছে তাহার পরিমাণ ধরা হইয়াছে ১৪,০০০ মিলিয়ান টন। এখন যদি বাহির করা যায় যে, বার্ষিক সমুদ্রে কত লবণ পড়ে তাহা হইলে বয়স নির্দ্ধারিত হইতে পারে। বৎসরে সমুদ্রে নদী হইতে ১৬০ মিলিয়ান টন লবণ পতিত হয়। অধ্যাপক জলি এরূপ একটি হিসাব তৈরী করিয়াছেন। সেই হিসাবে পৃথিবীর বয়স দাঁড়াইবে ৯ কোটি বৎসর।"

এই সকল আনুমানিক সিদ্ধান্তদ্বারা সঠিক বর্ষ নিরূপণ চলে না। ইহার ভিতর ভুলভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। গতিবিধিদ্বারা পৃথিবীর সঠিক বয়স নিরূপণ করা যায়। তাই বেদব্যাস-সঙ্কলিত পৃথিবী, সূর্য্য ও ধ্রুবের গতিবিধিদ্বারা নিরূপিত

"কালনিরূপণ" করিলাম। ইহার বিস্তৃত বিবরণ "প্রাকৃত-ভূতত্ত্বে" সন্নিবেশিত হইল।

## ভূমিকা

বর্ত্তমানে কতক লোকের ধারণা এই যে, অতিপূর্ব্বকালে আর্য্যগণের পৃথিবী বিষয়ে কোন জ্ঞান ছিল না। তাঁহারা বর্ত্তমান ভারতবর্ষকেই পৃথিবী বলিতেন এবং তদনুসারে কেহ কেহ ত্রিকোণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। পৃথিবী সম্বন্ধে আর্য্য ভূগোলবেত্তৃগণ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, বাস্তব পৃথিবী বর্ত্তমান আবিষ্কৃত পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড়। বর্ত্তমান আবিষ্কৃত পৃথিবীর দক্ষিণে অনেক অনাবিষ্কৃত স্থান আছে। যদি উত্তর ও দক্ষিণমেরু সম্যক্ আবিষ্কৃত হয়, তবে সে সকল স্থানের সন্ধান পাওয়া যাইবে। সে যাহা হউক, পূর্ব্বকালের পুরাণসংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক অধ্যায়ে যাহা আছে, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

বিষ্ণুপুরাণে পরাশর মৈত্রেয়কে বলিয়াছেন :—

জম্বুপ্লক্ষাহ্বয়ো দ্বীপঃ শাল্মলিশ্চাপরো দ্বিজ।
কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ ॥
এতে দ্বীপাঃ সমুদ্রেণ সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ।
লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলৈঃ সমম্ ॥
জম্বুদ্বীপঃ সমস্তানামেতেষাং মধ্য সংস্থিতঃ।
তত্রাপি মেরুর্মৈত্রেয় মধ্যে কনকপর্ব্বতঃ ॥

( বিষ্ণুপুরাণ ২য় অং ২য় অঃ ৫—৭ শ্লোক )

অর্থাৎ, হে দ্বিজ! জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর এই সপ্তদ্বীপ যথাক্রমে লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও জল এই সপ্ত সমুদ্রদ্বারা সর্ব্বত্র সমভাবে পরিবেষ্টিত। হে মৈত্রেয়! জম্বুদ্বীপ সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিত। তাহার মধ্যস্থলে সুবর্ণ পর্ব্বত মেরু অবস্থিত।

ভূপদ্মস্য শৈলেশঃ কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ ॥

( বিষ্ণুপুঃ ২য় অং ২য় অঃ ৯ শ্লোক )

অর্থাৎ, এই পর্ব্বতরাজ ( সুমেরু ) পৃথিবী পদ্মের কর্ণিকা অর্থাৎ বীজকোষ স্বরূপ।

ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীকে পদ্মের সহিত তুলনা করিয়া তাহার মধ্যস্থলে বীজকোষ স্বরূপ সুবর্ণ-পর্ব্বতকে ( মেরু-পর্ব্বতকে ) নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে আমরা পূর্ব্ব-গোলার্দ্ধ ও পশ্চিম-গোলার্দ্ধ হিসাবে পৃথিবীকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া ভূগোলে ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। কিন্তু পুরাণে বিষুবরেখায় পৃথিবীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া উত্তর-গোলার্দ্ধ ও দক্ষিণ-গোলার্দ্ধ হিসাবে ভাগ করা হইয়াছে, এবং ইহার উত্তর-গোলার্দ্ধের মধ্যস্থলে সুবর্ণ-পর্ব্বত ( মেরু-পর্ব্বত ) সংস্থিত। এই সুবর্ণ-পর্ব্বতের মধ্যস্থলে গিরিশিখরে ব্রহ্মপুরী নামে একটি স্থান আছে। এই ব্রহ্মপুরীতে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পারে না।

যথা :—

অমেরোর্মধ্যশৃঙ্গেষু চোপরি ব্রহ্মণঃ সভাম্।
যে যে বসন্তিরাদর্ত্তঃ প্রযান্তি ব্রহ্মণঃ সভাম্।
তে তে বিমুক্তসন্তাপা ন্যস্তশস্ত্রা মুদান্বিতাঃ বৈ। ১৮

( বিষ্ণু পুঃ ২য় অং ৮ম অঃ ১৮ শ্লোক )

অর্থাৎ, সূর্য্য অমরগিরির ( সুমেরুর ) উপরিভাগে ব্রহ্মসভা ব্যতীত সর্ব্বত্রই আলোকময় করেন। সূর্য্যের যে-সকল কিরণ ব্রহ্মসভায় যায় তাহারা তাহার প্রভায় নিরস্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত ( reflected ) হয়।

উত্তর-মেরুতে সুবর্ণ-পর্ব্বতের শিখরে যে ব্রহ্মপুরী আছে, তাহা সকলের উপরে ও মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই সুবর্ণ-পর্ব্বতের ( মেরু-পর্ব্বতের ) চারিদিকে কতকগুলি কেশর-পর্ব্বত আছে। সেই কেশর-পর্ব্বতের এক একটি উপত্যকায় এক এক সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। ঐ সকল উপত্যকায় কোথাও বিষ্ণুপুরী, কোথাও লক্ষ্মীপুরী, কোথাও যমপুরী, কোথাও বরুণপুরী, কোথাও চন্দ্রপুরী, কোথাও সূর্য্যপুরী, কোথাও বা ইন্দ্রপুরী অবস্থিত।

ব্রহ্মপুরীর পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রপুরী, দক্ষিণদিকে যমপুরী, পশ্চিমদিকে বরুণপুরী ও উত্তরদিকে চন্দ্রপুরী অবস্থিত। এই সকল স্থান অতীব মনোরম বলিয়া খ্যাত। ইহা সুবর্ণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এদেশে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস কাল রাত্রি থাকায় মনুষ্যগণের এক বৎসরে দেবগণের এক দিন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে পরাশর বলিয়াছেন :—

মেরোশ্চতুর্দ্দিশং যে তু প্রোক্তাঃ কেশরপর্ব্বতাঃ।
শীতান্তাতা মুনে তেষামন্তরে হি মনোরমাঃ ॥৩৩
শৈলা নানাদ্রুমোপেতাঃ সিদ্ধচারণসেবিতাঃ।
সুরম্যাণি তথা তত্র কাননান্যপি চ ॥৩৪

লক্ষ্মীবিষ্ণ্বগ্নিসূর্য্যাদিদেবানাং মুনিসত্তম।
তানাহতনবর্ষাণি ভূতানি বসতিস্তয়োঃ ॥৭৬
গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রক্ষাংসি তথা দৈতেয়দানবাঃ।
ক্রীড়ন্তি সততং যত্র পৌরুষীং তনুমাশ্রিতাঃ ॥৭৭
তৌম্যা হ্যেতে স্মৃতাঃ স্বর্গা নরকাস্তে ন সংশয়ঃ ॥৭৮
( বিষ্ণু ২য় অং ২য় অং ৬৬—৭৮ শ্লোক )

অর্থাৎ, মেরুর চতুর্দ্দিকে শীতান্ত প্রভৃতি যে সকল কেশর-পর্ব্বতের কথা বলিলাম, তাহাদের মধ্যে অনেক মনোরম কন্দর আছে। সিদ্ধ, দেব ও গন্ধর্বগণ তথায় বাস করেন। সেই সকল কন্দরে সুরম্য কানন ও পুর আছে। হে মুনি-সত্তম! সেই সকল স্থানে লক্ষ্মী, বিষ্ণু, অগ্নি ও সূর্য্যাদি দেবগণের শ্রেষ্ঠ কিন্নরসেবিত আয়তন-বর্ষ সকল রহিয়াছে। গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ, দৈতেয় ও দানবসমূহ সেই সকল রমণীয় শৈলকন্দরে দিবানিশি ক্রীড়া করিতেছেন। এই সকল রমণীয় স্থান ভৌম অর্থাৎ ভূবর্গ এবং ধার্ম্মিকের আলয় বলিয়া কথিত হয়।

ইহার চতুর্দ্দিক বরফে আচ্ছাদিত। এই দেশের নাম ইলাবৃত বর্ষ। বর্ত্তমানে সাইবিরিয়া ও গ্রীণল্যাণ্ড প্রভৃতিও এই দেশের অন্তর্গত।

এই ইলাবৃতবর্ষের পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ব নামে একটি দেশ আছে। উহাকে বর্ত্তমানে কামস্কাটকা, পূর্ব্ব-সাইবিরিয়া ও আলস্কা বলে। দক্ষিণে সমুদ্রতীরে হিমালয়ের দক্ষিণে ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষ বর্ত্তমান ভারতবর্ষ হইতে অনেক বড়। অর্থাৎ, পশ্চিমে পারস্য উপসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বদিকে শ্যামরাজ্যের পূর্ব্বাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই ভারত-বর্ষের পশ্চিম অংশে অর্থাৎ পারস্যদেশে যবনগণ পূর্ব্বদিকে শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে কিরাতগণ এবং মধ্যস্থলে অর্থাৎ বর্ত্তমান ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ বাস করেন। যথা,

পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাস্তু ভাগশঃ।
( বিষ্ণুঃ ২য় অং ৩য় অং ৮ শ্লোক )

এই ভারতবর্ষের উত্তরে কিম্পুরুষবর্ষ ও তদুত্তরে হরিবর্ষ নামে দুইটি দেশ আছে। বর্ত্তমানে কিম্পুরুষবর্ষকে তিব্বত ও চীন দেশ এবং হরিবর্ষকে মঙ্গোলিয়া ও মধ্য-এশিয়া বলে।

ইলাবৃতবর্ষের পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ বর্ত্তমানে ইউরোপ, আফ্রিকা, তুরস্ক ও আরব নামে খ্যাত।

পৃথিবী-পদ্মের মধ্যস্থলে জম্বুদ্বীপ, তাহার মধ্যস্থলে সুমেরু-পর্ব্বত। এই সুমেরুপর্ব্বতকে মধ্য করিয়া চতুর্দ্দিকে বর্ষ সকল রহিয়াছে। সুতরাং ইলাবৃতবর্ষের পূর্ব্বদিকে কামস্কাটকা, দক্ষিণে ভারতবর্ষ, পশ্চিমে ইউরোপ ও উত্তরে আমেরিকা অবস্থিত।

ইলাবৃতবর্ষের উত্তরে রম্যকবর্ষ। এই রম্যকবর্ষ বর্ত্তমানে কেনেডা নামে প্রসিদ্ধ। ইহার উত্তরে হিরণ্ময়-বর্ষ। বর্ত্তমানে তাহা ইউনাইটেড্ ষ্টেট বলিয়া কথিত হয়। ইহার উত্তরে উত্তর-কুরুবর্ষ। বর্ত্তমানে উহাকে দক্ষিণ আমেরিকা বলে।

শূন্যে পৃথিবীর অবস্থান হেতু ঊর্দ্ধ বলিয়া কোন দিক থাকিতে পারে না। সুতরাং ধ্রুবনক্ষত্রকে স্থির নক্ষত্র ও ঊর্দ্ধ দিক্ ধরিয়া সুমেরুপর্ব্বতকে পৃথিবীর ঊর্দ্ধ দিক নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপে ইলাবৃতবর্ষ সকল বর্ষের ঊর্দ্ধে ও মধ্যস্থলে অবস্থিত। (১) ভদ্রাশ্ববর্ষ (২) ভারতবর্ষ (৩) কিম্পুরুষবর্ষ (৪) হরিবর্ষ (৫) কেতুমালবর্ষ (৬) রম্যকবর্ষ (৭) হিরণ্ময়বর্ষ (৮) উত্তরকুরুবর্ষ, এই আটটি বর্ষ ইলাবৃত বর্ষের নিম্নে ও চতুর্দ্দিকে অবস্থিত।

এই নয়টি দেশ-সমন্বিত জম্বুদ্বীপ সকল দ্বীপের ঊর্দ্ধ দিকে অবস্থিত। জম্বুদ্বীপ আবার ইহার দ্বিগুণ-পরিমিত লবণ-সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত।

ইহার অধোদেশে অর্থাৎ বর্ত্তমান দক্ষিণ-মেরুতে আর একটি দেশ আছে। তাহার নাম অতলনামা পাতাল। সেখানকার ভূমি শুক্লবর্ণা। সেখানে দিবাকররশ্মি কেবল প্রভা বিস্তার করে, উত্তাপ বিস্তার করে না এবং চন্দ্রের রশ্মি কেবল আলোকের কারণ হয়, শীতের কারণ হয় না।

# একটী দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ

—গী ভ মোপাসাঁ

লড়াই থেমে গিয়েছে। ফ্রান্স এখন জার্মানীর অধিকারে। বিজয়ী প্রতিপক্ষের হাঁটুর নীচে পরাজিত কুস্তি-গীর যেমন ক'রে হাঁসফাঁস করে, দেশও তেমনি হাঁপাচ্ছে।

দুর্ভিক্ষ ও নিরাশার অসহনীয়তা কেটে গিয়েছে। প্যারী থেকে প্রথম ট্রেন নতুন সীমান্তের উদ্দেশ্যে ছাড়ছিল একে একে। গ্রাম ও গ্রাম্য জেলাগুলির মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে ট্রেনগুলি চলে যায়। যাত্রীরা দল জানালা থেকে মুখ বের ক'রে বৃষ্টিত শূন্য মাঠ আর বিধ্বস্ত নিষ্প্রাণ গ্রামগুলি দেখছে। প্রুশীয় সৈন্যদল, এই সমস্ত ধ্বস্ত গৃহের পিতলের গোঁজগুলির সামনে ঘোড়ার পিঠে ব'সে কিম্বা চুল্লীর সামনে দাঁড়িয়ে পাইপে তামাক খাচ্ছে। কোনও ক্রমে বাড়ীগুলি এখনও দাঁড়িয়ে আছে। শত্রু-সৈন্যের কেউ কাজ ক'রছে কিম্বা কথা বলছে, যেন তারা সেই পরিবারেরই একজন হবে। বিজিত শহরের মধ্যে দিয়ে গেলে সকলের চোখে পড়বে—শহরের মধ্যে সৈন্যবাহিনী বুচকাওয়াজ করছে। ঘোড়ার গাড়ীর চাকার আওয়াজ সত্ত্বেও, তাদের দলপতির আদেশের কর্কশ স্বর কানে বাজ্‌ছে।

মঃ দ্যুবোয়া—অবরোধের সময় বয়সের পারীতে ন্যাশনাল্ গার্ড দলের সৈন্য ছিলেন। এখন তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে দেখবার জন্যে চলেছেন। লড়াইয়ের আগে বুদ্ধি ক'রে তিনি তাদের সুইট্‌জারল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এই ধনী, শান্তি-প্রিয় ব্যবসায়ীর বিশেষত্ব—তাঁর বিরাট উদর দুর্ভিক্ষ বা কষ্টের ভয়ে একটুও টুটে নি। এই ভয়ঙ্কর কাল তিনি কাটিয়েছেন দুঃখার্ত সহিষ্ণুতা এবং মানুষের নৃশংসতার বিরুদ্ধে তীব্র নালিশ জানিয়ে। এত দিন পরে যুদ্ধের শেষে সীমান্তে চ'লেছেন, তাই প্রুশীয়ানদের তিনি প্রথম দেখতে পেলেন; যদিও তিনি যুদ্ধের সময় দুর্গের ধারে তাঁর কর্ত্তব্য করতেন এবং শীতের রাত্রে সাহসের সঙ্গে দুর্গে পাহারা দিতেন, কিন্তু শত্রু-সৈন্যদের সেখানে দেখেন নি।

যে সব শত্রু-শোণিত সপন্ন লোক সমগ্র ফরাসী দেশে—তাদের নিজের দেশের মত আজ দাঁড়িয়ে আছে, তাদের দিকে তিনি যুগপৎ ভয় ও ক্রোধভরে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। যে স্বেচ্ছাধীনতা ও আত্ম রক্ষার অনুভূতি আমাদের কোন দিন ছেড়ে যায় না, তা থাকা সত্ত্বেও তিনি মনে প্রাণে অনুভব করলেন—এক নির্ব্বীর্য দেশভক্তির প্রবাহ। একই কামরায়, দুজন ইংরাজ দেশ-ভ্রমণকারী যাচ্ছিলেন, তাঁরা মৃদু কৌতূহলবশে চারিদিক্ দেখতে দেখতে চলেছিলেন। তাঁরাও শক্তিশালী ছিলেন এবং তাঁদের ভাষায় অবিরাম বকে যাচ্ছিলেন। এক এক বার তাঁদের গাইড বই দেখছিলেন এবং জায়গার নামগুলি খুব জোরে জোরে পড়ছিলেন।

হঠাৎ একটা ছোট ষ্টেশনে গাড়ী থামলো এবং রেল-গাড়ীর ফুট-বোর্ডে তরোয়ালের ঝনৎকার তুলে, এক লাফে গাড়ীতে একজন প্রুশীয়ান অফিসার উঠলেন। বেশ লম্বা চেহারা, গায়ের পোষাক চেপে বসেছে আর তাঁর মুখের হাব-ভাব দেখতেও খুব কর্কশ ব'লে মনে হয়। তাঁর লাল চুলে যেন আগুন লেগেছে এবং তাঁর লম্বা গোঁফ আর দাড়ির রঙ্ কিছু কম লাল বলেও মুখের দুপাশে যেন আটকানো, দেখে মনে হয় বুঝি কেটে দু ভাগ করা হ'য়েছে।

নব-জাগ্রত কৌতূহলের বশে ইংরাজরা তাঁর পানে তৎক্ষণাৎ চাইতে থাকেন। কিন্তু মঃ দ্যুবোয়া খবরের কাগজ পড়ছেন—এই ভাব দেখান। এক কোণে জড়সড় হ'য়ে তিনি বসে থাকেন, পাহারাওয়ালাকে দেখলে চোরে যেমন করে থাকে।

আবার গাড়ী ছাড়ে। ইংরাজেরা কথাবার্ত্তা শুরু করেন এবং যুদ্ধের যথাযথ স্থানগুলি হাত দিয়ে পরস্পরকে দেখাতে থাকেন। খুব নিকটবর্ত্তী একটী গ্রাম দেখাতে যেন তাঁদের একজন হাত বাড়িয়েছেন, এমন সময় হঠাৎ সেই প্রুশীয়ান অফিসার তাঁর পা দুটি সামনে বাড়িয়ে পিছনে হেলান্ দিয়ে ফরাসী ভাষায় বললেন, "ওই গ্রামে আমরা ডজন খানেক ফরাসীকে সে দিন হত্যা করেছি, আর বন্দী করেছি—এক শ' জনেরও বেশী।"

খুব আগ্রহান্বিত হ'য়ে ইংরাজেরা তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করলেন, "ওঃ! ওই গ্রামের নামটী?"

প্রুশীয়ান উত্তর দিলেন "কারলস্‌রুর্গ।" তারপর বললেন, "এই ফরাসী গার্ডগুলোর কান পাকড়ে ধরে এনেছি।" এবং মঃ দ্যুবোয়ার দিকে চাইলেন, অপমান করার ছলে গোঁফের তাঁকে একটু হেসেও দিলেন।

ট্রেণ চলতে থাকলো, বিজয়ী সেনাদলের অধিকারভুক্ত ছোট ছোট গ্রাম পার হ'য়ে জার্মান সৈন্যদের রাস্তার ধারে, মাঠের পাশে, দরজার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাকতে কিম্বা কাজের মধ্যে কথা ব'লতে দেখা গেল সর্ব্বত্র। আফ্রিকার পঙ্গপালের মত তারা সমগ্র ফরাসী দেশ ছেয়ে ফেলেছে।

হাত নেড়ে অফিসার বললেন, "আমার হুকুম যদি চলতো তা হ'লে আমি পারী অধিকার ক'রে সব পুড়িয়ে দিতাম, সকলকেই হত্যা করাতাম। ইউরোপে ফ্রান্সের চিহ্ন মাত্র রাখতাম না।"

ভদ্রতার জন্যেই ইংরাজেরা সরল ভাবে উত্তর দিলেন, "ওঃ! বেশ!"

তিনি বলে চ'ললেন, "বিশ বছরের মধ্যে সমগ্র ইউরোপ, আমাদের হয়ে যাবে। কারণ সকলের চাইতে প্রুশিয়া শক্তিশালী।"

ইংরাজেরা বিরক্ত হ'য়ে এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। তাঁদের মুখ প্রশান্ত, দেখে মনে হয় লম্বা গোঁফের পিছনে মুখ যেন মোমে তৈয়ারী। প্রুশীয়ান অফিসার হাসতে লাগলেন। তারপর পিছনে হেলান দিয়ে ঠাট্টা করতে থাকলেন। ফ্রান্সের পতনকে উপেক্ষ ক'রে ঠাট্টা করলেন; বিজিত শত্রুর অপমান করলেন; সদ্য-বিজিত অষ্ট্রিয়াকে লক্ষ্য ক'রে উপহাস করলেন, বিভিন্ন বিভাগের তীক্ষ্ণ অথচ নিষ্ফল আত্মরক্ষার প্রয়াসকে অবজ্ঞা করে ঠাট্টা করলেন। 'গার্দ মোবিল' এবং অকর্ম্মণ্য গোলান্দাজ-বাহিনীও বাদ গেল না। তিনি বললেন যে, বিসমার্ক না কি অধিকৃত কামানের লোহা দিয়ে একটি নগর তৈয়ার করার পরিকল্পনা করেছেন। তারপর হঠাৎ মঃ দ্যুবোয়ার উরুতে সজোরে বুট দিয়ে আঘাত করলেন, মঁসিয় মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তাঁর চুলের গোড়া পর্য্যন্ত ক্রোধে লাল হ'য়ে গেল।

ইংরাজেরা গভীর ঔদাসীন্যের ভাব দেখালেন, তাঁরা যেন পৃথিবীর গোলমাল থেকে বহু দূরে তাদের নিজের দ্বীপে বন্দী হ'য়ে আছেন, এমনি ভাব দেখালেন।

অফিসার তাঁর তামাক খাবার পাইপটা বের করে, এক দৃষ্টে ফরাসী ভদ্রলোকের পানে চেয়ে ব'ললেন, "এই, তামাক আছে তোমার কাছে? তামাক?"

মঃ দ্যুবোয়া উত্তর দিলেন, "না, মঁসিয়।"

জার্মান অফিসার বললেন, "পরে গাড়ী থামলে আমার জন্যে কিছু তামাক গিয়ে কিনে আনবে।" বলেই নতুন ক'রে হাসতে শুরু করলেন। আবার বললেন, "আমি তোমাকে কিছু পানীয়ের খরচ দেব।"

বাঁশী বাজিয়ে ট্রেণের গতি মন্থরীভূত হ'ল। তাঁরা যে রেল-ষ্টেশনে পৌঁছালেন, এখানে ট্রেণ বরাবর থামে, যদিও ষ্টেশনটী পুড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছে।

জার্মান অফিসার গাড়ীর দরজা খুলে মঃ দ্যুবোয়ার হাত ধ'রে বললেন, "যাও, যাও, যা বললাম করো। চট্‌পট্-চট্‌পট্!"

ষ্টেশন এক প্রুশীয়ান বাহিনীর অধিকারে ছিল। কাঠের মার্কীর পিছন থেকে আর সব সৈন্য দেখছিল। আবার চ'লবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে ইঞ্জিন বাষ্প উদ্গার করছে। মঃ দ্যুবোয়া তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফর্ম্মে লাফিয়ে পড়লেন এবং ষ্টেশন-মাষ্টার তাঁকে সতর্ক ক'রে দিলেও, নিকটস্থ কামরায় সবেগে ঢুকে পড়লেন।

* * *

তিনি একা! তাঁর ওভারকোট টেনে খুলে ফেললেন, কত দ্রুতবেগে তাঁর হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয় এবং নিঃশ্বাস নিতে তিনি হাঁফিয়ে উঠেন! তাঁর কপালের ঘর্ম্মবিন্দু তিনি হাত দিয়ে মুছে ফেললেন।

আর একটা ষ্টেশনে গাড়ী এসে থামে। হঠাৎ অফিসার তাঁর কামরার দরজার দেখা দিলেন এবং লাফিয়ে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ঠিক তাঁর পিছনে পিছনে সেই দুই ইংরাজ ভদ্রলোকও এসে পড়লেন, কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে। ফরাসীর সামনে এসে জার্মানটি বসলেন এবং তেমনি হাসতে হাসতেই বললেন, "যা বললাম, তা তুমি করতে চাও না?"

মঁসিয় দ্যুবোয়া বললেন তার উত্তরে, "না মঁসিয়।"

তখনি ট্রেণ ষ্টেশন থেকে ছেড়ে দিল। অফিসার বললেন, "তোমার গোঁফ কেটে আমার পাইপ ভরতি করবো।"—বলেই তিনি ফরাসী ভদ্রলোকের মুখের কাছে হাত নিয়ে এলেন।

উদাস ভাবে ইংরাজদ্বয় একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। ততক্ষণ আর্শান অফিসার তাঁর কোট খুলে ফেলেছেন এবং টানতে আরম্ভ করেছেন। মঃ ছ্যাবোয়া হাতের উল্টা আঘাতে অফিসারের হাত ছিটকে ফেলে দিয়ে তাঁর কলার চেপে ধরলেন এবং তাঁর আসনেই তাঁকে ফেলে দিলেন। তারপর ক্রোধে জ্ঞানহারা হ'য়ে—তাঁর কপালের শিরাগুলি ফুলে উঠেছে এবং চোখে তাঁর আগুন জ্বলছে,—তিনি একহাতে অফিসারকে নীচে ধরে মুষ্টিবদ্ধ অন্য হাত দিয়ে ভীষণভাবে তাঁর মুখে মুষ্টাঘাত ক'রে যেতে লাগলেন। প্রুশীয়ান অফিসার জোর করেন, তাঁর তরোয়াল বের ক'রতে চেষ্টা করেন, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও প্রতিদ্বন্দ্বীর কবলেই চিৎ হয়ে পড়ে থাকেন। মঃ ছ্যাবোয়া তাঁর বিশাল মুঁড়ির চাপে তাঁকে চেপে ধরে রাখেন এবং নিঃশ্বাসও না নিয়ে ঘুঁষি মেরে চলেন, কোন কিছু না দেখে। আর্শানের মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে যায়, তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসে, গলার কম্পনের সঙ্গে তাঁর ভাঙ্গা দাঁতগুলি মুখ থেকে সবেগে বাইরে ফেলে দেন। আর এই উত্তেজিত মানুষ—যে তাঁকে প্রায় হত্যা করছে, তার কবল থেকে বাঁচতে বৃথাই চেষ্টা করেন।

ইংরাজেরা উঠে দাঁড়ান এবং ভাল করে দেখবার জন্য আরও কাছে আসেন। আনন্দ ও কৌতূহলে পূর্ণ হ'য়ে দু'জনেই তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকেন,—যেন কে জিতবে, কে হারবে, তা নিয়ে তাঁরা বাজী ধ'রতে যাচ্ছেন।

উগ্র উত্তেজনায় ক্লান্ত হয়ে মঃ ছ্যাবোয়া হঠাৎ উঠে বিনা বাক্যব্যয়ে আপন জায়গায় গিয়ে ব'সে পড়েন। প্রুশীয়ান তাঁকে আক্রমণ করেন না, কারণ এই পাশব আক্রমণ তাঁকে খুব কাবু করেছে, এবং অফিসারের ভয়ও হ'য়েছে। অনেকক্ষণ পরে আবার বিনা বাধায় নিঃশ্বাস নিতে পারার পর, তিনি বলিলেন, "পিস্তল নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমাকে সন্তুষ্ট না করতে পারলে, তোমাকে আমি খুন করবো।"

মঃ ছ্যাবোয়া বললেন, "যা তোমার খুসী, আমি খুবই প্রস্তুত।"

আর্শান বললেন, "এই হচ্ছে ষ্ট্রাসবুর্গ শহর। আমার সহকারী হওয়ার জন্যে আমি দুজন অফিসারকে আনছি। ট্রেন ছাড়তে দেরী হবে, সুতরাং সময়েরও অভাব নাই।"

মঃ ছ্যাবোয়া এঞ্জিনের মতই ফোঁস ফোঁস করছিলেন। ইংরাজদ্বয় বললেন: "আপনারা আমার সহকারী হবেন কি?"

তাঁরা দুজনেই একসঙ্গে উত্তর দিলেন: "ওঃ। নিশ্চয়ই হবো!"

ট্রেণ থামলো।

এক মিনিটের মধ্যে প্রুশীয়ান দুজন সঙ্গীকে ডেকে নিয়ে আসেন, তাদের হাতে পিস্তল। তাঁরা দুর্গ-প্রাকারের দিকে এগিয়ে যান।

ইংরাজ ভদ্রলোক দুটী অনবরত তাঁদের ঘড়ির দিকে লক্ষ্য রাখেন, কম্পিত পদে তাঁরা খুব দ্রুত ব্যবস্থা করতে থাকেন, পাছে ট্রেণ ধরতে তাদের দেরী হয়, এই ভেবে তাঁরা অস্থির হয়ে উঠেন।

মঃ ছ্যাবোয়া জীবনে কখনও পিস্তল ছোড়েন নি। তাঁরা তাঁকে শত্রুর কাছ থেকে বিশ পা দূরে দাঁড় করিয়ে দেন।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়: "আপনি কি প্রস্তুত?"

"হ্যাঁ, মঁসিয়!" বলে উত্তর দেওয়ার সময় তিনি দেখতে পান যে, একজন ইংরাজ রোদ্দুর থেকে মাথা বাঁচাতে তাঁর ছাতা খুলে মাথার উপর ধরলেন।

একজন কে আদেশ দেয়: "ফায়ার!"

মঃ ছ্যাবোয়া পাগলের মত এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকেন, সেখেন না কি করছেন, কা'কে মারছেন। আর তার সম্মুখে প্রুশীয়ান অফিসারকে টল্‌টলায়মান হ'তে দেখে বিস্মিত হন। হাত দুটী তুলে একটু পরেই মুখ থুবড়ে অফিসার মাটীতে প'ড়ে যান।

ছ্যাবোয়া প্রুশীয়ান অফিসারকে হত্যা করেছেন।

একজন ইংরাজ মনের আবেগে "উঃ!" বলে চীৎকার ক'রে উঠেন। তারপর কৌতূহল নিবারিত হওয়ার জন্যে আনন্দের অধীরতায়, কাঁপতে থাকেন। অন্যজন তখনও ঘড়ি দেখতে থাকেন এবং তাঁকে ধ'রে ষ্টেশনের অভিমুখে সবেগে ধাবিত হন। তাঁর স্বদেশী সঙ্গী তাঁদের তিনজনার পদশব্দ শুনতে শুনতে চলেন। দুপাশে দুজনে মঁসিয়র হাত ধ'রে ছুটতে থাকেন: "এক! দুই! এক! দুই!"

তাঁরা তিন জনে পাশাপাশি ষ্টেশনের অভিমুখে দ্রুতবেগে অগ্রসর হন, তাঁদের তখন 'কমিক' খবরের কাগজের কিম্ভূত-কিমাকার ছবির মত দেখায়।

গাড়ী প্রায় ছাড়ে আর কি! এমন সময় তাঁরা লাফিয়ে তাঁদের কামরায় ঢুকে পড়েন। তারপর ইংরাজদ্বয় তাঁদের ভ্রমণের টুপী খুলে, মাথার উপর তিন পাক ক'রে ঘুরিয়ে চীৎকার করে উঠে: "হিপ্! হিপ্! হিপ্! হুরে!"

গম্ভীর ভাবে তাঁরা একে একে তাঁদের ডান হাতখানি মঁসিয় ছ্যাবোয়ার দিকে বাড়িয়ে দেন এবং তারপর আপন আপন বসবার জায়গায় গিয়ে বসে পড়েন।

[ অনুবাদ—শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

# সংবাদ ও মন্তব্য

## মিঃ গান্ধী, ভারতীয় কংগ্রেস এবং মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ

কিছুদিন আগে মিঃ গান্ধী 'হরিজন' পত্রিকায় (৬ই জুলাই তারিখের সংখ্যায়) লিখিয়াছেন—"মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ কংগ্রেসের উপর নির্ভর করিতেছে।"

মিঃ গান্ধীর এই কথা সত্য, অত্যন্ত 'নির্ভয়'ভাবে সত্য, কেন না আমাদের মতে মিঃ গান্ধীই তাঁহার আত্মাভিমান, অজ্ঞতা, ছল-সর্বস্বতা এবং অসারতা ও অসত্যতার ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যজাতির এই ভবিষ্যৎ আশার পথে অটল অনড় প্রাচীর রূপে বিরাজ করিতেছেন। মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ কি জন্য ভারতীয় কংগ্রেসের উপর নির্ভর করিতেছে, মিঃ গান্ধী তাহা নিজে বুঝেন নাই, স্বকীয় অনুগত ভক্তবৃন্দকে বুঝাইতে পারেন নাই, ভারত তথা ব্রিটিশ সরকারকেও বুঝাইতে পারেন নাই। না পারিয়া নিজের অসামর্থ্য সম্বন্ধে লজ্জিত হইয়া তিনি 'বানপ্রস্থ' অবলম্বন করিতে পারিলেন না, স্বীয় আত্মাভিমানের ধ্বজার চারিপার্শ্বে ঘুরিয়া ফিরিয়া মত প্রকাশ করিলেন, "আমি ব্যাসদেবের ন্যায় অরণ্যে রোদন করিতেছি" (১৭ই জুলাই তারিখের হরিজন)। ব্যাসদেব কি কথা বলিয়াছিলেন, কি তাহার অর্থ, সে বাদানুবাদ করিবার এখানে প্রয়োজন নাই। তবে একটি কথা বলিবার প্রয়োজন যে, ব্যাসদেব বলিয়াছেন ধর্ম ব্যতীত অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হইবে না। সুতরাং ধর্মটা কি তাহা জানিবার প্রয়োজন। গান্ধীজী কুত্রাপি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই যে, 'ধর্ম'টা কি। অথচ তিনি ব্যাসদেবের সমকক্ষ নিজেকে ভাবিয়া লইলেন!

কি নিমিত্ত মিঃ রাজাগোপালাচারি এবং বল্লভভাই পটেলের ন্যায় তাঁহার স্তাবকবৃন্দ শেষ পর্যন্ত তাঁহার নেতৃত্ব পরিহার করিতে বাধ্য হইলেন, তাহা কি তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন? ইহা কি তাঁহাদের অসামর্থ্য, না তাঁহার? মিঃ আণের জিজ্ঞাসাকে তিনি প্রশংসাবাক্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন—মিঃ আণে বলিয়াছেন, "যাহা ব্যাসদেব পারেন নাই, তাহা আপনি পারিবেন কিরূপে?" তিনি অমনই নিজেকে ব্যাসদেবের সমকক্ষ করিয়া 'হরিজন'এ মিঃ আণের বাক্যানুবাদে স্বকীয় প্রশংসাপত্র ঘোষণা করিলেন! ব্যাসদেব কি পারেন নাই এবং কি পারিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে সামান্যমাত্র জ্ঞানও যদি মিঃ গান্ধী লাভ করিতে পারিতেন, তবে টলষ্টয়ের পেটেন্ট 'অহিংসা' লইয়া তিনি ভারতের সর্বনাশ সাধন করিতেন না। গীতায় তাহা মিঃ গান্ধী একখানি লিখিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি। কিন্তু যিনি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ভারতীয় সংস্কৃতির রচয়িতা, সেই ব্যাসদেবের একটি মাত্র নির্দেশও যদি মিঃ গান্ধীর পূর্ণরূপে জানা থাকিত, তাহা হইলে ভারতের সংস্কৃতির মূল কি, তাহা বুঝিয়া তিনি তদনুযায়ী কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন—দক্ষিণ-আফ্রিকার উপকূল হইতে জাহাজী অহিংসা আমদানী না করিয়া, এই ভারতের 'মৃত্তিকা'তে কি ভাবে অহিংসাবীজ উপ্ত হইয়াছিল এবং কি ভাবে আজিও তাহা কলে ফুলে শতো বিকাশলাভ করিতে পারে, তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য সচেষ্ট হইতেন। ভারতের এই 'মৃত্তিকা'র কি গুণ এবং কি ইহার বৈশিষ্ট্য, তাহার আলোচনা আমাদের সম্পাদকীয় সম্বন্ধে একাধিক বার করা হইয়াছে এবং বার বার আমরা যুক্তিসহ দেখাইয়াছি যে, যতদিন পর্যন্ত একটিমাত্র ব্যক্তিরও নিরন্ন থাকিবার কারণ বর্তমান থাকিবে, ততদিন হিংসা-দ্বেষের অঙ্কুরও থাকিয়া যাইবে।

ইহা মিঃ গান্ধী বুঝেন নাই, বুঝিবার চেষ্টা পর্যন্তও করেন নাই, তাই আমরা তাঁহাকে আত্মাভিমানী, অজ্ঞ, ছল-সর্বস্ব, শঠ, অসার এবং অসৎ আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছি, করিতেছি এবং যতদিন তিনি নিজের প্রকৃত সংশোধন না করিবেন, ততদিন তাহা করিব।

মিঃ গান্ধী অসৎ না হইলে তিনি ভারতের রাজ-প্রতিনিধিকে বুঝাইতে পারিতেন যে, কেবল আত্ম-সমর্পণ দ্বারাই নহে, পরন্তু যাহা "হিট্‌লারবাদ" বলিয়া কথিত হইতেছে, তাহার মূলে যে অর্থনৈতিক বঞ্চনা বর্তমান, ভারতীয় কৃষি-বিজ্ঞানের সহায়তায় ভারতের জমী হইতে তাহা মিটাইতে পারা যাইবে।

মিঃ গান্ধী অসার না হইলে এই প্রসঙ্গে আমরা এখানে

যে-সকল যুক্তি তাঁহাকে, সরকারকে এবং দেশের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ করিয়া উত্থাপন করিয়াছি, তাহা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত এবং তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেন, অন্ততঃ বুঝিবার চেষ্টা করিতেন।

মিঃ গান্ধী শঠ না হইলে কেবল আত্ম-সমর্পণের ভূমিকা অভিনয় করিলে যে কোনক্রমেই হিটলারবাদের অশুভ মুখা নির্বাসিত হইতে পারে না, ইহা ভাবিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করিতেন না।

মিঃ গান্ধী বলসর্বস্ব না হইলে আজি পর্যন্ত এই মনে ভাবিয়া তিনি সান্ত্বনা-লাভের চেষ্টা পাইতেন না যে, রাজাগোপালাচারি এবং প্যটেল পুনরায় তাঁহার কুক্ষিগত হইবে। ইহা তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, ইঁহারা দেশের প্রকৃত কল্যাণ অপেক্ষা গান্ধীবাদের আবরণে দল বাঁধিতেই অধিকতর প্রয়াসী এবং যে মুহূর্তে বুঝিবেন যে, তাঁহাদের সে দল আজ মিঃ গান্ধী বাতীতও হয়তো বজায় থাকিতে পারে, সেই মুহূর্তে মিঃ গান্ধীকেও বিদায় দিবেন।

মিঃ গান্ধী আত্মাভিমানী এবং অন্ধ না হইলে বুঝিতেন যে, মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ কোন স্বপ্ন-সৌধের উপর গঠিত হইতে পারে না—তাহার ভিত্তি কেবল অহিংসার বেদীতেও রচিত হইতে পারে না—তাহার জন্য চাই আর্থিক ঐশ্বর্য, খাদ্যের প্রাচুর্য এবং মানসিক সন্তুষ্টি।

এই তিনটি কি করিয়া প্রত্যেকটি জীবের জন্য বাঞ্ছিত হইতে পারে, এই ভারতে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজিও কিয়ৎপরিমাণে বর্তমান ভারতীয় কবির রচনায় তাহা লিপিবদ্ধ আছে। এই জন্যই আমরা মনে করি, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ভারতের উপর নির্ভর করে। কিন্তু ভারতের বর্তমান অবস্থা কংগ্রেসের উপর নির্ভর করিতেছে, সুতরাং পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ভারতীয় কংগ্রেসের উপরই নির্ভর করিতেছে।

মিঃ গান্ধী যাহা না বুঝিয়া বলিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। আমাদের বক্তব্য তিনি বুঝিলে ভারত সরকারও তাঁহার বক্তব্য বুঝিবেন। সে চেষ্টা কি তিনি করিবেন?

## বাঙ্গালার লাট এবং বেকার বাঙ্গালী

সম্প্রতি ঢাকায় ( ৩রা জুলাই ) মাননীয় বাঙ্গালার লাট বাহাদুর এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, বেকার হইলেই যে, সৈনিকের কর্তব্য করিতে পারিবে, তাহা মনে করিবার কারণ নাই, বুদ্ধিমান্ হইলেই যে সে ঐ কর্তব্য করিতে পারিবে, তাহাও মনে করিবার কারণ নাই……

আমরাও তাহাই বিবেচনা করি। উপরন্তু যাহা বিবেচনা করি, এই সম্পর্কে তাহার উল্লেখ করিতেছি সৈনিকের কর্তব্য দেশ-রক্ষা। দেশের অধিবাসীদের লইয়াই দেশ। যদি দেশের অধিকাংশ অধিবাসী হয় বেকার, না হয় কর্মনিযুক্ত হইয়াও ক্রমশঃই অধিকতর দুঃখ-দুর্দশার ক্লিষ্ট হইতেছে বলিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেশ-রক্ষার কার্য সৈনিক দ্বারাই সম্পূর্ণ হইতে পারে কি না, তাহা ভাবিবার বিষয়। সৈনিক যাহা করিতে পারে, তাহা হইতেছে নিজের প্রাণদান করিয়া অপরের প্রাণরক্ষার চেষ্টা। কিন্তু যাহাদের প্রাণ-রক্ষার চেষ্টা করা হইবে, তাহারা যদি প্রাণধারণের আনন্দই না উপভোগ করিতে পারিল, তবে সৈনিকের কর্তব্যের সম্পূর্ণ মার্থকতা কোথায়, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। বাঙ্গালী বেকার যদি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ-বিসর্জনের অধিকারী না হয়, তাহা হইলেও যবে বলিয়া তাহাদের শুকাইয়া মরিতে দিতে, কিংবা কোন কোন সময়ে আত্মহত্যা করিতে বাধা দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায় কিরূপে—বাঙ্গালার মাননীয় লাট সে-বিষয়ে ভাবিয়া দেখিবেন কি?

## বন্যা-সমস্যা

উড়িষ্যার প্রতি বৎসরের ন্যায় আবার বন্যার তীব্র প্রকোপ দেখা দিয়াছে। বালেশ্বর অঞ্চল হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সেখানকার বন্যার অবস্থা এমনই ভীষণ যে, লোকজন ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া গাছের ডালে উঠিয়া জীবন বাঁচাইতে বাধ্য হইতেছে।

এই সমস্যার প্রতীকার কি? আমরা অনেকবার দেখাইয়াছি যে, সরকার হইতে যে ভাবে ইহা প্রতীকারের চেষ্টা এ যাবৎ করা হইয়াছে, তাহা বিন্দুমাত্র কার্যকরী হয় নাই। একদিন বাঁধ বাঁধিয়া ইহার প্রতীকারের চেষ্টা করা হইয়াছিল, ফলে নদীর স্রোত অন্যদিকে প্রবলতর হইয়া তথায় ভীষণ বন্যার সৃষ্টি করিয়াছে, স্থানে স্থানে নির্মিত বাঁধ ভাঙ্গিয়াই নদীস্রোত প্রবলের অপ্রতিরোধ্যতা প্রমাণ করিয়াছে। সুতরাং বাঁধই যে বন্যার হেতু, তাহাও আবার নূতন করিয়া কমিটি বসাইয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই কমিটি ও

আড়ি

তাহার রিপোর্ট পুনরায় বন্যার কলে যখন ভাসিয়া গিয়াছে, তখন আবার কমিটি বসান হইতেছে। ইতিমধ্যে জন-সাধারণের অবস্থার কৃচ্ছ্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা বারংবার বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি যে, বর্তমান বিজ্ঞান যে-পন্থায় সকল সমস্যার প্রতীকার-প্রয়াসী হইতেছে, তাহা ভ্রান্ত। বিজ্ঞানের বর্তমান আদর্শ হইতেছে একদেশদর্শী, সমগ্রভাবে ব্যাপক করিয়া কোন সমস্যার আলোচনায় ইহার অসামর্থ্য একাধিকবার প্রমাণিত হইয়াছে। হইতে বাধ্য। বিজ্ঞানের আদর্শ হইবে—কোন্ নিয়মে বিশ্ববিধানের কার্য্য সমাধা হইতেছে, তাহারই আবিষ্কার। চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, ইহা আবিষ্কার করিতে হইলে প্রাণ-শক্তির উদ্ভব কি করিয়া হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বর্তমান বিজ্ঞান তাহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ফলতঃ তাহার সকল আবিষ্কারই প্রাণঘাতী হইয়া উঠিয়াছে।

সংপ্রতি পত্রিকায় প্রকাশ, বাঙ্গালার সরকার একটি বন্যা-কমিটি গঠন করিয়াছেন। ইহার পুরোভাগে আছেন মিঃ এস. সি. মজুমদার—বাঙ্গালার পূর্ত্ত-বিভাগের চীফ ইঞ্জিনীয়ার। তিনি এবং তাঁহার সহকর্মীরা এ যাবৎ অনেক প্রক্রিয়াতেই বন্যা-নিরোধের চেষ্টা করিয়াছেন—কৃতকার্য্য তাহা ফলবতী হয় নাই। হইবেও না। কেন না, নদীর স্বাভাবিক গতি-স্রোতের নিয়ম নিরূপণ না করিতে পারিলে বন্যা-নিরোধ সম্ভব হইবে না। বর্তমান বিজ্ঞান তাহা পারে নাই। মিঃ মজুমদারের পূর্ব্ব-প্রকাশিত রচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, নদীর স্বাভাবিক গতি-স্রোতে বর্তমান বিজ্ঞানের কার্য্যের ফলে যে-সকল প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আটচু রাখিয়াই তিনি এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে চাহেন। আমাদের মতে, এই চেষ্টা হাস্যকর। নদীর স্বাভাবিক গতি-স্রোত রোধ করিলে, তাহা কেবল যে, বন্যা সৃষ্টি করে তাহাই নহে, ইহার পরম প্রয়োজন যে জন্য, মনুষ্যজাতির রক্ষা, তাহা ব্যাহত হয়। কৃষির যে স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি, তাহা একমাত্র ভূমিনিহিত রস, তেজ ও বায়ুর বিশেষ একটি অনুপাতের উপর নির্ভর করিতেছে। যদি নদী-স্রোত ভূনিম্নস্থ বালুকাস্তর পর্য্যন্ত অব্যাহত না থাকে, তবে ঐ অনুপাত অক্ষত থাকিতে পারে না। সাধারণ বিবেচনা-জ্ঞান হইতেই প্রমাণিত হইবে যে, নদী-স্রোতের পথে সেতু ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাধা উপস্থিত করিলে নদীর গতি রুদ্ধ করিয়া নদী-স্রোতকে সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত প্রবাহমান থাকিতে দেয় না। সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞানের সকল আবিষ্কারই শেষ পর্য্যন্ত মনুষ্যপ্রাণ-রক্ষার বাধা-সৃষ্টিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। মিঃ মজুমদারকে আমরা এই সহজ, সরল, স্বাভাবিক সত্যটি অনুধাবন করিয়া বন্যা-কমিটীর কার্য্যে অগ্রসর হইতে অনুরোধ জ্ঞাপন করি।

### যক্ষ্মা-সমস্যা

মাননীয় বড়লাটের পত্নী ভারতে যক্ষ্মা-রোগের অধিকতর বিস্তারের পথ-রোধ করিতে সচেষ্ট হইয়া ভারতবাসীর ধন্য-বাদার্হ হইয়াছেন। সংপ্রতি ( এই জুলাই ) দিল্লী হইতে তিনি একটি ব্রডকাষ্ট বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন : এই ব্যাধি গোপন করিবার চেষ্টা ভারতে সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। তিনি ইহা পরিহার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

তাঁহার এই অনুরোধ সুনিশ্চিত-প্রসূত, ইহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বর্তমান ভারতের জনসাধারণকে জীবন-যাপন করিতে হয়, তাহাতে দারিদ্র্য যাহার আর সকল ব্যাধিই প্রায় গোপন থাকিতে বাধ্য। এই দারিদ্র্য তাহারা গোপন করে না, করিতে পারে না বলিয়া। এই ব্যাধির প্রতীকার হইলেই যে অন্য সকল ব্যাধির প্রতীকার স্বতঃই সূচিত হইবে ইহা আমরা নিশ্চিত জানি। যক্ষ্মার হেতু কি, কেন ইহার বিস্তার হয়, এই সমস্ত যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, বর্তমান জীবনযাত্রার অস্বাভাবিকতা ইহার মূলে এবং এই অস্বাভাবিকতা বর্তমান সভ্যতার সৃষ্টি। ফলতঃ দেখা যায়, ভারতের শ্রমিক-দিগের যাহারা ফ্যাক্টরিতে কাজ করে এবং মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত-গণের মধ্যে এই ব্যাধির প্রকোপ যেরূপ অধিক, কৃষকগণের মধ্যে আজিও তাহার সেইরূপ আধিক্য নাই। ৩৫ কোটি ভারতীয়ের মধ্যে ত্রিশ কোটি জনসাধারণের জীবনযাত্রা অদ্যাবধি যক্ষ্মার অভিযান হইতে কথঞ্চিৎ দূরে রহিয়াছে—কিন্তু এই ত্রিশ কোটি জনসাধারণকে যে-অন্নহীনতা গ্রাস করিতে চলিয়াছে, তাহার পথ রুদ্ধ করিতে না পারিলে, তাহাদিগের জীবন-নাশের জন্য বোধ করি আর যক্ষ্মার প্রয়োজন হইবে না। মাননীয় বড়লাট-পত্নীর নিকট আমাদের অনুরোধ পৌঁছায় না, যদি পৌঁছায়, তবে আমরা তাঁহাকে ভারতবাসী জন-সাধারণের এই দারিদ্র্য-সমস্যার প্রতীকার-ব্যবস্থার প্রতি তাঁহার জননী-সুলভ দৃষ্টি যাচ্ঞা করিতেছি। এই ব্যবস্থা কি এবং কেন এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে ইংলণ্ডের তথা সমগ্র পৃথিবীর অন্নাভাব ঘুচিতে পারে, তাহার আলোচনা ইতিপূর্ব্বে আমরা করিয়াছি।

### রবীন্দ্রনাথের দুঃখ

সংপ্রতি রবীন্দ্রনাথ দুঃখ প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, ইতিপূর্ব্বে তাঁহার একটি রচনার মধ্যে সুভাষচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া ব্যঙ্গ করা হইয়াছে বলিয়া যে মনে করা হইতেছে, তাহা ভ্রান্ত—কথার মারপ্যাঁচ সৃষ্টি করিয়া তিনি জীবনে ব্যক্তিগত ভাবে কাহাকেও আক্রমণ করেন নাই।

ইহা সত্য কি না, সে আলোচনা করিবার বর্তমানে প্রয়োজন নাই। বর্তমান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে কেবল একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আজীবন তাঁহার রচনার তিনি যে-অর্থ বুঝিয়াছেন, অধিকাংশ দেশবাসী যে তাহার বিপরীত অর্থ করিয়াছে এবং বারে বারে তাঁহাকে তাহার প্রতিবাদ করিতে হইয়াছে, ইহা কি তিনি অস্বীকার করিবেন? কেবল "শত্রুপক্ষ" নহে, তাঁহার "মিত্রপক্ষ"-এর বিরুদ্ধেও তাঁহাকে এই অভিযোগ অনেকবার করিতে হইয়াছে। ইহাও তাঁহার সম্ভবতঃ অবিদিত নাই যে, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহার যে কবিতা পাঠ্য বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে, অনেক পেশাদার 'নোট'-রচয়িতাই তাহার বিভূতিমাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাহিত্য-রচনার যদি কোন সার্থকতা থাকে, তবে আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহা দুর্ব্বোধকে সুবোধ্য করা; যাহা সাধারণের নিকট রহস্যময়, তাহার রহস্য তাহাদের নিকট প্রকাশ করিবার মধ্যেই সাহিত্যের মর্য্যাদা, সাহিত্যের সার্থকতা। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিণাম যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, সাধারণের নিকট যাহা ইতিপূর্ব্বে রহস্যময় ছিল, তাহাই অধিকতর রহস্যময় (প্রথম চৌধুরী মহাশয়ের কথায় বলিতে ইচ্ছা হয়, ঐ পদের সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা উভয় অর্থেই) হইয়া উঠিয়াছে। সুভাষচন্দ্রকে বাদ না করিয়া তিনি যে-বাণী প্রদান করিলেন, দেশবাসী বুঝিল সুভাষচন্দ্রকে তিনি তাহাতে বাদ করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্রকে বাদ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি যাহা লিখিলেন, তাহাতে দেশবাসী হয়ত বুঝিবে তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বাদ করিয়াছেন। এমন রহস্য কি করিয়া সম্ভব হয়, তাহা তিনি ভাবিয়া দেখিবেন। আমরা এ বিষয়ে যাহা ভাবিবার, তাহা ভাবিয়াছি এবং সে সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। আমাদের মতে, রবীন্দ্র-সাহিত্য যে সাহিত্যানামের কলঙ্ক-স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার একটি কারণ—যে-স্বাভাবিক প্রতিভা লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে অস্বাভাবিক করিয়া তুলিবার সাধনাই তিনি আজীবন করিয়াছেন এবং তাঁহার কথার অনুকরণ করিয়াই বলি—উহাতে সরু ও মোটা দুইটি তার জড়াইয়া বীণায় যে সুর তিনি তুলিতে চাহিয়াছেন, সে সুর তিনি তুলিতে পারেন নাই। দেশবাসী এবং পৃথিবীবাসীর যে অংশ এ জন্য তাঁহাকে ধন্য-ধন্য করিয়াছেন, তাহাদের বর্ব্বরতা তাঁহাকে বিমুগ্ধ করিয়াছে এবং হাত-তালির মধ্যে তিনি নিজের কলঙ্কিত স্বকীয় প্রতিভার শেষ পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি "অচলায়তন" ভাঙিবার চেষ্টায় অচলতর আয়তনের সৃষ্টি করিয়াছেন, কেন না অচলায়তন ভাঙিবার বেলায় তিনি লক্ষ্য করেন নাই যে, উহার ভিত্তি সনাতন বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত—সে বেদী বিশ্ব-বিধাতার সৃষ্টি। যাঁহারা অচলায়তন গড়িয়াছিলেন, তাঁহারা বিশ্ব-বিধাতার সৃষ্টির সূত্র আবিষ্কার করিয়া ঐ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ইহার পরে কালক্রমে সেই সূত্র দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এবং নির্ব্বিচারে শাস্ত্রব্যাখ্যাকারীরা সেই সূত্রকে নিজেদের স্বার্থসূত্রে রূপান্তরিত করিয়া অচলায়তনের যাহা গৌরব, তাহাকে অগৌরব করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কৃত অগৌরব অচলায়তনের গৌরবকে মিথ্যা করিতে পারে নাই, পারিবে না। ইহা তিনিও জানেন, না হইলে "অপোরনের বাণী" তাঁহাকে মুগ্ধ করিত না। এই মোহই তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। তিনি দুঃখ-সুখের সহস্র ধারার মধ্যে উহাকে চাহিয়াছেন। সুন্দর ভুবনে তিনি কেবল বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন। কিন্তু এই বাঁচিবার জন্য যাহার সমধিক প্রয়োজন, সেই দুঃখে উদ্বেগহীনতা এবং সুখে বিগতস্পৃহ হইবার আদর্শ তাঁহার নাগালের বাহিরে থাকিয়া গিয়াছে। তাই সুন্দর ভুবনের সত্য এবং কল্যাণ যেখানে, তাহাকে তিনি সহস্ররূপে অন্তরালে রাখিয়া জীবনাতিপাত করিয়াছেন।

ইহা দার্শনিক সত্য।

এই দার্শনিক সত্যের পটভূমিকায় তাঁহার রচনার বিচার করিলে অধিকাংশই তাহার অসত্যে বিলীন হইয়া যায়। সেই অসত্য তাঁহাকে বারংবার দেশবাসীর জাগ্রত চিত্তের আঘাতরূপে পীড়িত করিয়াছে। আজ যাহা সুভাষচন্দ্রের অনুদ্ধিষ্ট বাদ সুভাষ চন্দ্রকে বাদ করিয়াছে, গত কল্য তাহাই 'ঘরে বাইরে'তে 'সীতা'র অনুদ্ধিষ্ট বাদ হিন্দুমাত্রকেই বাদ করিয়াছিল।

সেদিন তিনি স্বকীয় প্রতিভার দম্ভে ইহা গ্রাহ্য করেন নাই, তখনও তিনি যৌবন মদমত্ত, আর আজ?

আমরা তাঁহাকে অসম্মান করিতে চাহি না, কেবল সসম্মান অনুরোধ জ্ঞাপন করিতে চাহি যে, আজ বোধ হয় সে সময় আসিয়াছে, যেদিন তিনি জীবনের বিগত দিবসের দিকে চাহিয়া সত্যই বলিতে পারেন:

"আমি কেবলি স্বপন করিনু বপন বাতাসে।"

এই স্বীকার তাঁহাকে দেশের নিকট মহৎ স্মৃতির অধিকারী করিবে। সেই সাহসের উত্তরাধিকার লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—আজ কি তাহা অবশিষ্ট আছে?

পার্থ-সারথি

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

UNIVERSI

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

# বঙ্গশ্রী

ভাদ্র—১৩৪৭

৮ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—২য় সংখ্যা

সম্পাদকীয়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

## "মৃত্যু" ও "মরণ" কি একার্থক ?

গত ১৩৪৭ সালের বৈশাখ মাসের 'বঙ্গশ্রী'তে "মোক্ষ-যোগ-বিচার" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়াছিলাম :—

"হেমচন্দ্রের অভিধানানুসারে 'মোক্ষ' শব্দের অর্থ 'মৃত্যু'। 'মোক্ষর্মৃত্যুঃ ইতি হেমচন্দ্রঃ'। পাঠকগণ হয়ত মনে করিবেন যে, হেমচন্দ্র যখন 'মোক্ষ'-শব্দের অর্থে 'মৃত্যু' লিখিয়াছেন, তখন যে-কোন মরণের নামই 'মোক্ষ' এবং দেহত্যাগ না ঘটিলে মোক্ষলাভ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সংস্কৃত ভাষায় "মৃত্যু" ও "মরণ" একার্থক নহে। 'মৃ' ধাতুর উত্তর 'অনট্' প্রত্যয়ের যোগে 'মরণ' শব্দটী নিষ্পন্ন হয়, আর 'মৃত্যু'-শব্দটী সংঘটিত হইয়া থাকে 'মৃ' ধাতুর উত্তর 'তুন্' প্রত্যয়ের যোগে। একই ধাতুর উত্তর প্রত্যয়ের বিভিন্নতা-বশতঃ অর্থের অনেকখানি বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে।……অল্পকথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, জীবন-বিধান তন্ত্রের ( physiological functions-এর ) অবসানের নাম 'মরণ', আর উপভোগ-পরায়ণ প্রবৃত্তির অথবা বহির্মুখীনতার অবসানের নাম 'মৃত্যু'। দুই-এতেই অবসান আছে বটে, কিন্তু একটীতে জীবনের অবসান, আর একটীতে বি-কর্ম্ম ও কু-কর্ম্ম-পরায়ণতার অবসান।"……ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া "মৃত্যু" ও "মরণ" শব্দে আমরা 'বঙ্গশ্রী'র উপরোক্ত সংখ্যায় আরও অনেক কথা লিখিয়াছিলাম। পাঠকগণকে তাহা মনযোগসহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

গত ২রা শ্রাবণের 'অবতারে' আমাদিগের উপরোক্ত কথাগুলির একটী 'প্রতিবাদ' বাহির হইয়াছে। ঐ প্রতিবাদের লেখক শ্রীযুক্ত উমাপদ মুখোপাধ্যায় বি-এ, কাব্যতীর্থ। 'বি-এ, কাব্যতীর্থ' মহাশয় তাঁহার প্রতিবাদে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়াছেন :—

১। বিগত ১৩।৩।৪৭ তারিখের 'অবতার' মারফৎ অবগত হইলাম যে, শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্যের মতে 'মৃত্যু' ও 'মরণ' একার্থবাচক নহে।

২। তিনি বলেন, 'মরণ' শব্দে দেহের ধ্বংস এবং 'মৃত্যু' শব্দে বাসনার নিবৃত্তি বুঝায়; সুতরাং কোন ব্যক্তি ইহলীলা সম্বরণ করিলে বলিতে হইবে যে, ঐ ব্যক্তির "মরণ" হইয়াছে, অন্যথা ব্যুৎপত্তিগত ভুল হইবে। এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আধুনিক পণ্ডিতগণ বিদিত না থাকায় এই ভুল তাঁহারা ক্রমাগতই করিতেছেন।

৩। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপযুক্ত সমাধান কেবল বেদাঙ্গ-মূলক। যে বেদাঙ্গ তাঁহার লক্ষীভূত বিষয় সে স্থানে হয়ত ঐ কথার অর্থ ঠিক হইতে পারে, কিন্তু নিম্নলিখিত শাস্ত্র-বচনগুলিতে যে 'মৃত্যু' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যা ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিরূপ করিবেন তাহা আপনার প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক মারফৎ জানাইবেন কি ?

(ক) "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ"
—গীতা ২।২৭।

(খ) "য ইমং পশ্যতি লোকমবিকারং বিদুঃ স্তটিঃ।
কালেন তস্য মৃত্যুঃ স্যাদ্ভাবাভাবচেতসঃ।
—গরুড় ২৩ অধ্যায়ে অকালমৃত্যুপ্রশমনতন্ত্রে।

(গ) "পঞ্চাশৎপঞ্চাড়িত বর্ষে মনুষ্যাণাং প্রমাপ্যতে"
(পঞ্চাশৎপঞ্চাড়িতঃ বর্ষে মনুষ্যাণাং মৃত্যুঃ প্রমাপ্যতে।)
—মার্কণ্ডেয়পুরাণে অনন্ত উপাখ্যানে অষ্টাশীতি লক্ষণং।

(ঘ) "যাং প্রাপ্য চৈব দুষ্টাত্মা মৃত্যুং যাতি সুনিশ্চিতম্"
—পদ্মে ভূমিখণ্ডে ব্রহ্মনারদোপাখ্যানে পাপ-পুণ্যনিরূপণে
১১ অধ্যায়ে।

(ঙ) "জন্মা বালো জরার্ত্তস্তুর্ম্রিয়তেঽবিবিধাতুরঃ"
—ইতি অমরকোষে ব্রহ্মবর্গে।

৪। উদ্ধৃত শাস্ত্র-বচনসমূহ হইতে দেখা যায়, 'মৃত্যু' শব্দের যদি ভবলীলা সংবরণ বা মরণ ব্যাখ্যা না করা যায় তবে উহাদের অর্থসঙ্গতি হয় না।

৫। এখন জিজ্ঞাস্য, ব্যাসদেব-প্রমুখ শাস্ত্রকারগণও কি "মৃত্যু" ও "মরণ" শব্দ দুয়ের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জানিতেন না? অথবা ঐ সব আর্ষ-প্রয়োগ বলিবেন? কিন্তু আর্ষ-প্রয়োগ এরূপ ব্যাপক নহে।

এই প্রতিবাদের উপরোক্ত পাঁচটী অংশ প্রায়শঃ কিরূপ বুদ্ধিহীনতা ও অজ্ঞতা-প্রকাশক তাহা দেখান আমাদিগের এই প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য। আজকালকার মানুষ বস্তুতপক্ষে মূর্খ হইয়াও যে কিরূপ পাণ্ডিত্যাভিমান পোষণ করিয়া থাকেন এবং পণ্ডিত বলিয়া বিকাইয়া থাকেন তাহা আমাদিগের এই প্রবন্ধ অনুধাবন করিতে পারিলে বুঝা যাইবে। গীতা, গরুড়-পুরাণ, মার্কণ্ডেয়-পুরাণ, পদ্ম-পুরাণ ও অমরকোষ হইতে যে পাঁচটি বচন প্রতিবাদ-কর্ত্তা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার অর্থসঙ্গতি কিরূপে হইতে পারে কেবলমাত্র তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াই যদি তিনি নিবৃত্ত হইতেন তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা সদ্ভাবাপন্ন ব্যক্তি মনে করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিতে পারিতাম। কিন্তু প্রতিবাদের শেষাংশে যে হুল-ফোটান হইয়াছে তাহা যদি অথবা অথবা অন্যায় বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রতিবাদ-কর্ত্তা আকাট-মূর্খ হইয়াও পাণ্ডিত্যাভিমানী এবং তদনুসারে সমাজের উপকারার্থে বেত্রাঘাত ও কাণমলা পাইবার উপযুক্ত।

প্রতিবাদ-কর্ত্তা মনে করেন যে, "মৃত্যু" ও "মরণ" যদি একার্থক না হয় তাহা হইলে তাঁহার উদ্ধৃত পাঁচটী শাস্ত্রবচনের অর্থ-সঙ্গতি হয় না।

আমরা সর্ব্বপ্রথমে দেখাইব যে "মৃত্যু" ও "মরণ" একার্থক বলিয়া ধরিয়া লইলে প্রতিবাদ-কর্ত্তার উদ্ধৃত পাঁচটী শাস্ত্র-বচনের কোনটীরই অর্থসঙ্গতি হয় না। এবং ঐ সঙ্গে আরও দেখাইব যে "মৃত্যু" শব্দের ব্যাকরণসঙ্গত যে অর্থ হয় বলিয়া আমরা ব্যাখ্যা করিয়াছি, একমাত্র সেই অর্থ গ্রহণ করিলেই প্রতিবাদকর্ত্তার উদ্ধৃত পাঁচটী শাস্ত্রবচনের প্রত্যেকটীর কার্য্য-কারণ-সঙ্গত অর্থ হইয়া থাকে।

প্রথমে 'গীতা' হইতে উদ্ধৃত "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ"—এই বচনটী ধরা যাউক।

প্রতিবাদকর্ত্তা এই বচনের কোন অনুবাদ উদ্ধৃত করেন নাই। কাজেই আমাদিগকে ধরিয়া লইতে হইবে যে চলতি অর্থকেই তিনি ঐ বচনের প্রকৃত অর্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ঐ বচনের চলতি অর্থ—"যে হেতু, জাতের মরণ নিশ্চিত এবং মৃতেরও জন্ম নিশ্চিত হইয়া থাকে।"

এক্ষণে দেখা যাউক জাত-মাত্রেরই মরণ এবং মৃত-মাত্রেরই জন্ম নিশ্চিত হইয়া থাকে কি না। যদি দেখা যায় যে জাত-মাত্রেরই মরণ এবং মৃত-মাত্রেরই জন্ম অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইলে চলতি অর্থ যে সাধারণ বুদ্ধি (common sense)-সঙ্গত তদ্বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না।

জাত-মাত্রেরই মরণ অবশ্যম্ভাবী কি না তদ্বিষয়ে নির্ণয় করিতে হইলে 'জাত'-শব্দের কি অর্থ তাহা জানিয়া লইতে হইবে। যে কোন অভিধান খুলিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, সংস্কৃত ভাষা অনুসারে যে কোন ব্যক্ত পদার্থকেই "জাত"

বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। কাজেই জাত-মাত্রেরই মরণ অবশ্যম্ভাবী কি না তদ্বিষয়ে নির্ণয় করিতে হইলে যে-কোন ব্যক্ত পদার্থেরই মৃত্যু হয় কি না তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করিতে হইবে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ইহারা প্রত্যেকেই ব্যক্ত অথবা "জাত"; চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ ও উপগ্রহ এবং তারকাসমূহও ব্যক্ত অথবা জাত; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, এবং গন্ধ প্রভৃতিও ব্যক্ত অথবা জাত; অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে ইহাদের কখনও মরণ হয় না। ইহা ছাড়া ব্যাস-প্রণীত পুরাণ অনুসন্ধান করিলেও একাধিক অমরের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

কাজেই 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ' এই বচনের অর্থ যদি 'জাতমাত্রেরই মরণ সুনিশ্চিত' বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে বলা হয় যে ব্যাসদেব প্রতিবাদ-কর্ত্তার মত মূর্খ-জনোচিত অসত্য কথা তাঁহার গীতায় লিখিয়া গিয়াছেন।

তাহার পর, "ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ"—এই বচনের অর্থ "মৃত-মাত্রেরই জন্ম সুনিশ্চিত" হইতে পারে কি না তাহার নির্ণয় করিতে হইলে বস্তুতঃ মৃত-মাত্রই জন্ম গ্রহণ করে কি না তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

ব্যাসদেব গীতার যে অধ্যায়ে "ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" এবংবিধ বচন লিখিয়াছেন সেই অধ্যায়েরই একপঞ্চাশৎ শ্লোকে লিখিয়াছেন—

"কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥"

চলতি তথাকথিত পণ্ডিতগণই উহার অর্থ করিয়া থাকেন "যেহেতু, (সমত্ব-) বুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ কর্ম্মজ ফল ত্যাগ করিয়া জন্ম-বন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত (হইয়া) অনাময় (মোক্ষ)-পদ প্রাপ্ত হন।"

চতুর্থ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে লিখিয়াছেন—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥"

ইহার চলতি অর্থ—

"হে অর্জ্জুন, যিনি আমার এইরূপ দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় জন্ম প্রাপ্ত হন না, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হন।"

অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে লিখিয়াছেন—

"মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥"

এই শ্লোকের চলতি অর্থ—

"পরমা সংসিদ্ধি প্রাপ্ত মহাত্মাগণ আমাকে পাইয়া পুনরায় দুঃখের আলয়স্বরূপ ও অনিত্য জন্ম প্রাপ্ত হন না।"

উপরোক্ত শ্লোক তিনটীর চলতি অর্থ হইতে বুঝিতে হয় যে ব্যাসদেবের মতে এমন মানুষও হইতে পারেন যাঁহারা মরণের পর জন্মগ্রহণ করেন না।

কাজেই, "ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" এই বচনের অর্থ যদি "মৃত-মাত্রেরই জন্ম সুনিশ্চিত" বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে প্রকারান্তরে বলা হয় যে ব্যাসদেব একই গ্রন্থে পরস্পর-বিরোধী (self-contradictory) কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই এবং তাঁহার মস্তিষ্কে কিছু গণ্ডগোল ছিল।

ব্যাসদেবকে যাঁহারা প্রকারান্তরে মিথ্যাবাদী ও মস্তিষ্কের গণ্ডগোলযুক্ত প্রতিপন্ন করিয়া সংস্কৃতজ্ঞ-পাণ্ডিত্যের অভিমান পোষণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না তাঁহারা তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্যের বালাই লইয়া যেই যেই করিয়া নাচিতে থাকুন এবং সমাজ তাহা সহ্য করিলেও, আমরা উহা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি। আমাদিগের গভর্ণমেণ্টের সংস্কৃত-শিক্ষাবিভাগে কতকগুলি চরিত্রহীন, গতমূর্খ, গুণ্ডার আড্ডা হইয়াছে। তাই কতকগুলি গতমূর্খ গুণ্ডাও মহামহোপাধ্যায়, তর্কতীর্থ, সাঙ্খ্যতীর্থ ও কাব্যতীর্থ প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হইতে পারিতেছে।

মোটের উপর ব্যাসদেবের উপর শ্রদ্ধা পোষণ করিলে "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ"—এই বচনের অভিপ্রায় যে, "যে হেতু, জাতের মরণ নিশ্চিত এবং মৃতের জন্মও নিশ্চিত"—এতাদৃশ হইতে পারে না তাহা সাধারণ বুদ্ধি (common sense) দ্বারাও বুঝা যাইবে। যাহা সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা বুঝা যায়, তাহা যখন একটী 'বি-এ, কাব্য-তীর্থ' বুঝিতে পারেন না, তখন বুঝিতে হইবে যে, এই উপাধি দুইটী একটী অপাত্রে ন্যস্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশের শিক্ষা-বিভাগে যদি এখনও মানুষ থাকে, তাহা হইলে ঐ উপাধি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপাধি দুইটী অনতিবিলম্বে কাড়িয়া লওয়া উচিত।

শাস্ত্রজ্ঞ হইলে বুঝা যাইবে যে, 'জন্ম' ও 'মরণ' বলিতে সাধারণ ভাবে যাহা বুঝা যায় তাহার কোন মুখ্য-কথা

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে মুখ্যতঃ থাকিতে পারে না। কারণ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অপর নাম "সাংখ্য-যোগাধ্যায়।" "সাংখ্য" ও 'সাংখ্য-যোগ' বলিতে কি বুঝায় তাহা ধারণা ( conceive ) করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে 'বিশেষের' "দুঃখাত্মক বৈশিষ্ট্যই" "সাংখ্যে"র "সাংখ্যত্ব।" 'বিশেষের দুঃখাত্মক বৈশিষ্ট্য' কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে হইলে কণাদ-সূত্র ও গৌতম-সূত্রের সহিত পরিচয়ের প্রয়োজন এবং তাহা বিশদভাবে বুঝাইতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হইবে। উহা এই প্রবন্ধে সন্নিবেশযোগ্য নহে।

জীবের দুঃখ কেন উপস্থিত হয় এবং উহা কি করিয়া দূর করা যাইতে পারে এতদ্বিষয়ক কথা ছাড়া জন্ম ও মরণ-বিষয়ক কোন কথা সৌষ্ঠবভাবে 'সাংখ্যযোগে' স্থান পাইলেও পাইতে পারে বটে কিন্তু মুখ্যভাবে ঐ সমস্ত কথা সাংখ্য-যোগে স্থান পাইয়াছে দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, লেখক আমাদিগের প্রতিবাদকর্ত্তার মত শাস্ত্র-জ্ঞান-হীন। একমাত্র সাংখ্যের সাংখ্যত্ব কাহাকে বলে তাহা ধারণা করিতে পারিলেই, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের চলতি ব্যাখ্যা যে ব্যাসদেবের ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক তাহা বুঝা যাইবে। চলতি ব্যাখ্যানুসারে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে সমস্ত কথা পাওয়া যায়, তাহাতে জীবের দুঃখের কারণ ও দুঃখ দূর করিবার কোন পন্থাই নির্দ্দিষ্ট হওয়া যায় না। অথচ ব্যাসদেবের ভাষায় প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, জীবের সাধারণ দুঃখের সমস্ত কারণ ও উহা মোটামুটী ভাবে দূর করিবার সমস্ত পন্থা ঐ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সমাজ আজ বুঝুক আর না-ই বুঝুক—আজ-কালকার তথাকথিত সংস্কৃতজ্ঞগণ যে ঋষিপ্রণীত সংস্কৃত ভাষা বুঝিতে পারেন না এবং ইঁহাদিগের এই অজ্ঞতার জন্য যে মানব-সমাজের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে তাহা ধ্রুব সত্য। অদূরভবিষ্যতে অনেকের কাছেই এ সত্য প্রতিভাত হইবে।

ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষা যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে,

"আত্মা বি জ্ঞো মৃত্যু র্ঞি জন্ম মৃতস্য চ"—

এই বচনের অর্থ—

"প্রবণ-শক্তির বিকাশ আরম্ভ হইলে অহং-বোধের উন্মেষ আরম্ভ হয় এবং তখনই ব্যক্তির সূচনা হয় এবং ব্যক্তির সূচনা হইতেই ব্যক্তি-মূলক আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয়। সমস্ত আকাঙ্ক্ষার মূলে যে প্রবণ-শক্তির বিকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে উপভোগ-পরায়ণতা ও বহির্মুখীনতার হাত হইতে এড়ান সম্ভব হয়। আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধক কর্ম্মের আশ্রয় লইলে অন্তর্মুখীন মানুষেরও নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হইয়া থাকে।"

স্ফোট-প্রকরণের সাহায্যে "জাত", "ধ্রুব", "মৃত্যু", "জন্ম" ও "মৃত" এই পাঁচটী পদের অর্থ ধারণা করিতে পারিলে এবং নিরুক্তের সাহায্যে 'হি' ও 'চ' এই দুইটী নিপাতের সাঙ্কেতিক অর্থ কি তাহা বুঝিতে পারিলে এবং বেদাঙ্গান্তর্গত ব্যাকরণের সাহায্যে বিভক্তি ও লিঙ্গের অর্থ ধারণা করিতে পারিলে আমাদিগের উপরোক্ত অর্থ যে সম্পূর্ণ সঠিক তাহা বুঝা যাইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, স্ফোট-প্রকরণ অথবা নিরুক্ত-কথিত নিপাতের অর্থ, অথবা বিভক্তি ও লিঙ্গের অর্থ ইহার কোনটিই আজকালকার তথাকথিত কোন পণ্ডিতের জানা নাই। ইঁহারা কাল্পনিক একটা লৌকিক ভাষাকে সংস্কৃত ভাষা বলিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং ঐ ভাষায় লিখিয়া ও কথা কহিয়া নিজদিগকে সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এত বড় প্রতারণার ফলে ইঁহাদিগের প্রায় প্রত্যেকেই হয় নির্ব্বংশ, না হয় অর্থ-সম্পদ্-হীন, না হয় স্বাস্থ্যহীন, না হয় শান্তিহীন হইয়া প্রতিনিয়ত জর্জ্জরিত হইতেছেন। অথচ ইঁহাদিগের চৈতন্য নাই। ইঁহাদিগের মধ্যে যদি কেহ প্রকৃত ব্রাহ্মণসন্তান থাকেন, তাহা হইলে তিনি জানিয়া রাখুন যে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা একমাত্র প্রকৃত ব্রাহ্মণের ভাষা। ঐ ভাষা যথাযথভাবে জানিতে পারিলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হওয়া যায় এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণের কখনও কোনরূপ রোগ, অথবা শোক, অথবা কোনরূপ দুঃখের উদ্ভব হইতে পারে না। যাঁহারা রোগ অথবা শোক অথবা কোনরূপ দুঃখে বিন্দুমাত্র জর্জ্জরিত, তাঁহারা কখনও প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহেন। ( যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ অথবা পণ্ডিত না হইয়াও ব্রাহ্মণ্যের অথবা পাণ্ডিত্যের অভিনয় করেন, অথবা অভিমান পোষণ করেন ), তাঁহারা চতুর্ব্বর্ণের অস্পৃশ্য ও শূদ্রাধম। ইঁহারা সমাজের প্রত্যেকের পদাঘাতের যোগ্য।

উপরোক্ত কথাগুলি আমাদের নিজস্ব নহে। উহার প্রত্যেক কথাটী ঋষি-প্রণীত সংহিতা হইতে গৃহীত।

প্রয়োজন হইলে আমরা উহার পরোক্ষ ছত্র প্রমাণিত করিব।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আজ বিপদে পড়িয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিতেছেন। বুঝে 'ভগবান' 'ভগবান' করিলে ভগবানকে প্রকৃতভাবে স্মরণ করা হয় না। ভগবানকে প্রকৃতভাবে স্মরণ করিতে হইলে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পাপের শাস্তি, পুণ্যের পুরস্কার-বিধান অপরিহার্য্য। পাপের শাস্তি দিতে হইলে শাস্ত্রিত্যাভিমানী এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর শাস্তি পাইবার উপযোগী তাহা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিবেন কি? সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করিতে হইলে একদিকে যেরূপ প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার পুনরাবিষ্কার করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে, অন্য দিকে আবার আজকাল স্কুলে, কলেজে এবং টোলে সংস্কৃত ভাষার নামে যে লৌকিক ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করিতে হইবে। এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত লৌকিক ভাষায় যাহাতে কোন গ্রন্থ লিখিত না হয় এবং ঐ ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থ ও গ্রন্থকার যাহাতে সমাদৃত না হয় তাহার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। ভারতীয় সমাজ পাপ-পুণ্যের উপরোক্ত গোড়ার কথা অবহেলা করিয়াছে বলিয়াই সোণার ভারত আজ তাহার ভারত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। ভারতীয় সমাজ পাপপুণ্যের যে কথা অবহেলা করিয়া আসিতেছে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টও তাহারই প্রশ্রয় দিতেছেন। আমরা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে এখনও সতর্কতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

ইহার পর আমরা গরুড়-পুরাণের উদ্ধৃত বচনের আলোচনা করিব। প্রতিবাদ-কর্ত্তা উহা নিম্নলিখিত ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"য ইদং পঠতি নিত্যং ত্রিকালং নিয়তঃ শুচিঃ।
নাকালে তস্য মৃত্যুঃ স্যান্নরস্যাচ্যুতচেতসঃ।"

প্রতিবাদ-কর্ত্তার যদি বুদ্ধি-জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে তিনি ঐ শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের সহযোগে বুঝিতে পারিতেন যে, ঐ পাঠ নিতান্ত ভ্রম-পরিপূর্ণ। ইহা ছাড়া তাঁহার যদি "মৃত্যু", "অষ্টক" ও "স্তোত্র" এই তিনটি পদের অর্থ সম্বন্ধে কোন প্রকৃত ধারণা থাকিত, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, যখন মৃত্যুষ্টক-স্তোত্র সম্বন্ধে কোন নির্দ্দেশ দেওয়া হয়, তখন কুত্রাপি ধাতুর পরস্মৈপদ ব্যবহৃত হইতে পারে না এবং প্রকৃত সংস্কৃতজ্ঞগণ তাহা করেন না। প্রকৃত সংস্কৃত ভাষানুসারে ঐ শ্লোকটীর পাঠ হইবে :—

"ইদং যঃ পঠতে নিত্যং ত্রিকালং নিয়তঃ শুচিঃ।
নাকালে তস্য মৃত্যুঃ স্যান্নরস্যাচ্যুতচেতসঃ।"

গরুড়-পুরাণের যে-সমস্ত সংস্করণ ( edition ) আছে, তাহার একাধিক সংস্করণে উপরোক্ত পাঠ দেখা যাইবে।

এ শ্লোকটীর চল্‌তি অর্থ :—

যিনি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় নিয়তচিত্তে এই স্তব পাঠ করেন, সেই অচ্যুতার্পিতচিত্ত ব্যক্তির অকাল-মৃত্যু হয় না।

উপরোক্ত অর্থে ব্যাকরণ-গত কত ভুল যে বিদ্যমান আছে তাহার আলোচনা বিশদভাবে করিতে বসিলে প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে এবং উহা সাধারণের বোধগম্য হইবে না। ইহারই জন্য আমরা ব্যাকরণের আলোচনা হইতে বিরত থাকিয়া এ অর্থ যথার্থ কি না তাহার বিচারের জন্য কেবলমাত্র সাধারণ বুদ্ধির (common sense-এর ) সহায়তা লইব।

চল্‌তি অর্থ হইতে বুঝিতে হয় যে, যিনি প্রতিদিন ত্রি-সন্ধ্যায় নিয়তচিত্তে এই স্তব পাঠ করেন তিনিই অচ্যুতার্পিত-চিত্ত হইয়া থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, যদি কোন একটী স্তব কোন নির্দ্দিষ্ট ভাবে পাঠ করিলেই অকাল-মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হইত তাহা হইলে শ্রুতি ও বেদাভ্যাসের কি প্রয়োজন? ব্যাসদেবের যদি ইহাই মতবাদ হয় তাহা হইলে তিনি আবার বেদ রচনা করিলেন কেন? বাস্তবিকপক্ষে কোন স্তব ত্রি-সন্ধ্যায় পাঠ করিয়া কেহ কখনও অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন বলিয়া শুনা গিয়াছে কি?

উপরোক্ত চল্‌তি অর্থকে মূল শ্লোকের প্রকৃত অর্থ বলিয়া ধরিয়া লইলে উহার প্রণেতা ব্যাসদেবকে হয় একজন অদূর-দর্শী গোঁড়া মানুষ নতুবা একজন স্বার্থপরায়ণ মানুষ বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়।

মোটকথা, মূল শ্লোকের চল্‌তি অর্থ যে আদৌ ঠিক নহে তাহা উপরোক্ত ভাবে সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিলেও বুঝা যাইবে।

পুরাণান্তর্গত কোন শ্লোকের বাংলা ভাষায় অর্থ করা বড়ই দুরূহ। প্রত্যেক পুরাণের আরিতে 'নারায়ণং নমস্কৃত্য' ইত্যাদি যে শ্লোক বিদ্যমান আছে তাহা যথাযথ ভাবে স্কোট-প্রকরণের সহায়তায় বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক পুরাণের প্রত্যেক শ্লোকের অর্থ ত্রিবিধ ভাব হইতে গ্রহণ করিতে হয়। একটী—শব্দের নিগমানুযায়ী ভাব; একটী—নিঘণ্টানুযায়ী ভাব এবং অপরটী—লৌকিক ভাব। কাহার নাম নিগমানুযায়ী ভাব, কাহার নাম নিঘণ্টানুযায়ী ভাব এবং কাহার নাম লৌকিক ভাব তাহা বুঝিতে হইলে 'পুরাণ' কাহাকে বলে এবং 'বেদে'র সহিত 'পুরাণে'র সম্বন্ধ কি তাহা প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে।

মানুষের যত রকম অবস্থা হয় সেই সমস্ত রকম অবস্থার প্রত্যেকটীর বৈশিষ্ট্য কিরূপ, প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের কারণ কি কি, প্রত্যেক অবস্থার মধ্যে যে সমস্ত অপায় ও উপায় নিহিত থাকে সেই সমস্ত অপায় অপসারিত করা যায় কি করিয়া এবং উপায় উদ্ভূত করা যায় কি করিয়া তাহা দেখান পুরাণের প্রধান উদ্দেশ্য। সংক্ষেপতঃ বলিতে হইলে বলিতে হয় যে সকল অবস্থাতেই মানুষ যাহাতে তাহার অবনতির অথবা অপায়ের কারণ দূরীকৃত করিয়া উন্নতির অথবা উপায়ের দিকে অগ্রসর হইতে পারে তাহার পন্থা দেখান পুরাণের উদ্দেশ্য। মানুষের যত রকম অবস্থা হয় তাহা অষ্টাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহারই জন্য পুরাণ অষ্টাদশ বিভাগে বিভক্ত এবং অষ্টাদশ মহাপুরাণের উদ্ভব। জীবের যত রকম অবস্থা হয় সেই সমস্ত রকম অবস্থার প্রত্যেকটীর বৈশিষ্ট্য কিরূপ ও প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের কারণ কি কি তাহা জানিতে হইলে জীবের অবস্থার উদ্ভব হয় কেন ও কিরূপে, জীবের উদ্ভব হয় কেন ও কিরূপে, জীবের অবস্থার সমতা কোথায় তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়। জীবের অবস্থার উদ্ভব হয় কেন ও কিরূপে, জীবের উদ্ভব হয় কেন ও কিরূপে, জীবের অবস্থার সমতা কোথায় তাহা যাহাতে বুঝিতে পারা যায় এবং প্রত্যক্ষ করা যায় প্রত্যক্ষ পন্থা দেখান বেদের প্রধান উদ্দেশ্য।

মানুষ তাহার স্বকীয় অবস্থা সম্বন্ধে একটা মোটামুটী ধারণা যত সহজে করিতে পারে তাহার অবস্থার বৈশিষ্ট্য অথবা বৈশিষ্ট্যের কারণ সম্বন্ধে কোন একটা ধারণা তত সহজে করিতে পারে না। আবার, মানুষ তাহার অবস্থার বৈশিষ্ট্য অথবা বৈশিষ্ট্যের কারণ সম্বন্ধে যত সহজে ধারণা করিতে পারে, তত সহজে মানুষ তাহার অবস্থার উৎপত্তি হয় কেন এবং তাহার নিজের উৎপত্তি হয় কেন তাহা ধারণা করিতে পারে না।

অন্যদিকে, মানুষ যদি তাহার অবস্থা সম্বন্ধে নিখুঁৎ ভাবে ধারণা করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার অবস্থার বৈশিষ্ট্য এবং বৈশিষ্ট্যের কারণ সম্বন্ধে ধারণা করা অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য হয়। অবস্থার বৈশিষ্ট্য এবং বৈশিষ্ট্যের কারণ সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিলে, মানুষের অবস্থার উৎপত্তি হয় কেন এবং মানুষের উৎপত্তি হয় কেন, তৎসম্বন্ধে ধারণা করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়া থাকে।

উপরোক্ত কথাগুলি তলাইয়া বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বেদের বক্তব্য ধারণা করিতে হইলে পুরাণের বক্তব্য ধারণা করিতে হয়। অন্যদিকে, পুরাণের বক্তব্য ধারণা করিতে না পারিলে বেদের বক্তব্য ধারণা করা সম্ভব হয় না। বেদের বক্তব্য পূর্ণ করিবার সহায়তা যাহার দ্বারা হইয়া থাকে তাহার নাম 'পুরাণ'। ইহারই জন্য পুরাণসমূহ 'পুরাণ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে 'বেদ' ও 'পুরাণ' সম্বন্ধে আমরা উপরে যে সমস্ত কথা বলিলাম তাহা অতীব আংশিক। এতদ্বিষয়ীয় সমস্ত কথা সম্পূর্ণ ভাবে বলা বাংলা প্রভৃতি কোন লৌকিক ভাষার সম্ভবযোগ্য কি না তদ্বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ আছে। অন্ততপক্ষে, আমরা সক্ষম নহি তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে।

মানুষ তাহার স্বকীয় অবস্থা সম্বন্ধে নিখুঁৎ ভাবে ধারণা করিবার প্রয়াসী হইলে দেখিতে পাইবে যে আপাতদৃষ্টিতে তাহার অবস্থা যাহা বলিয়া মনে হয়, ঐ অবস্থার বৈশিষ্ট্য কি কি এবং ঐ বৈশিষ্ট্যসমূহের কারণ কি কি তাহার অনুসন্ধান-প্রয়াসী হইলে, প্রথম ধারণা সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্তিত হইয়া যায়। ইহা ছাড়া আরও দেখিতে পাইবে যে, আপাত-দৃষ্টিতে তাহার অবস্থা যাহা বলিয়া মনে হয় তাহা বর্ণনা করার ভাষা যত সহজ, অবস্থার বৈশিষ্ট্য কি কি তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা তত সহজ নহে এবং অবস্থার বৈশিষ্ট্যের কারণ কি কি তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা আরও দুরূহ। কোন বস্তুর

কোন অবস্থার বৈশিষ্ট্য কি কি এবং ঐ বৈশিষ্ট্যের কারণ কি কি তাহা না বুঝিয়া মানুষ আপাতদৃষ্টিতে কোন বস্তুর অবস্থা যাহা বলিয়া মনে করে তাহা তাহার লৌকিক ভাব এবং তাহা স্বতঃই যে ভাষায় বর্ণনা করে—তাহার নাম লৌকিক ভাষা। উহা বুঝিবার নাম ভাষার লৌকিকার্থ গ্রহণ করা।

কোন বস্তুর কোন অবস্থার বৈশিষ্ট্যের কারণ কি কি তাহা না বুঝিয়া কেবলমাত্র ঐ অবস্থার বৈশিষ্ট্য কি কি তাহা বুঝিয়া লইয়া যখন বস্তুর ঐ অবস্থার ও তাহার বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করা হয় তখন ভাষার নৈঘণ্টুক অবস্থায় উপনীত হইতে হয়। ভাষার এই অবস্থায় বক্তব্য বুঝিবার নাম নিঘণ্টু-অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করা।

কোন বস্তুর কোন অবস্থার বৈশিষ্ট্য কি কি ও তাহার কারণ কি কি তাহা সম্যক্‌ভাবে বুঝিয়া যখন বস্তুর ঐ অবস্থার, তাহার বৈশিষ্ট্যের এবং ঐ ঐ বৈশিষ্ট্যের কারণসমূহ বিস্তৃত ও সম্যক্‌ভাবে বর্ণনা করা হয় তখন ভাষার নৈগম অবস্থায় উপনীত হইতে হয়। ভাষার এই অবস্থার বক্তব্য বুঝিবার নাম নিগমানুযায়ী অর্থগ্রহণ করা।

ইহা ছাড়া ভাষার আর একটী অবস্থা আছে, তাহার নাম "মন্ত্রাবস্থা"। মন্ত্রাবস্থা আবার চারি বিভাগে বিভক্ত, যথা :—(১) বীজ, (২) বীজমন্ত্র, (৩) মন্ত্র, এবং (৪) মালা।

জগতে যত কিছু ভাষা আছে তন্মধ্যে একমাত্র সংস্কৃত ভাষাতে বস্তুর সর্ব্ববিধ অবস্থা অথবা ভাব সম্যক্ প্রকারে বর্ণনা করা সম্ভব হয়। আর কোন ভাষায় উহা সম্ভব নহে। পাশ্চাত্ত্য Philologist অর্থাৎ তথাকথিত ভাষাবিদ্‌গণ ভাষার উপরোক্ত তথ্যসমূহ পরিজ্ঞাত নহেন। তাঁহাদিগের উহা পরিজ্ঞাত হইবার বালাই নাই, কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে অবস্থায় উপনীত হইলে বস্তুর ও তাহার কারণসমূহ বর্ণনা করিবার ভাষা যেরূপ প্রয়ত্ন-সাধ্য হইয়া থাকে—আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সেই অবস্থায় উপনীত হইতে পারে নাই। পাশ্চাত্ত্য তথাকথিত ভাষাবিদ্‌গণ ভাষার উপরোক্ত চারিটী অবস্থা (অর্থাৎ লৌকিক, নৈঘণ্টুক, নৈগম ও মন্ত্রাবস্থা) সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত থাকুন আর না-ই থাকুন, ঐ চারিটী অবস্থা যে আছে তাহা সকলের পক্ষে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব না হইলেও সাধনা-নিরত হইলে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় এবং কাযেই, উহা অস্বীকার করা যায় না।

ভাষার এই চারিটী অবস্থা বিচার করিয়া সংস্কৃত ভাষা প্রণীত হইয়াছে বলিয়াই সংস্কৃত ভাষাতে বস্তুর সর্ব্ববিধ অবস্থা সম্যক্ ভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হয়।

হিব্রু ভাষা ( অবশ্য প্রাচীন হিব্রু ভাষা, আধুনিক নহে ) ভাষার তিনটী অবস্থা (অর্থাৎ লৌকিক, নৈঘণ্টুক ও নৈগমাবস্থা ) বিচার করিয়া প্রণীত হইয়াছে। বস্তুর যে অবস্থা বর্ণনা করিবার জন্য ভাষার মন্ত্রাবস্থার সহায়তা লইতে হয় হিব্রু ভাষায় বস্তুর সেই অবস্থা বর্ণনা করা সম্ভব নহে।

আরবী ভাষা ( অবশ্য প্রাচীন আরবী ভাষা, আধুনিক নহে) ভাষার দুইটী অবস্থা (অর্থাৎ লৌকিক ও নৈঘণ্টুকাবস্থা) বিচার করিয়া প্রণীত হইয়াছে।

সংস্কৃত, হিব্রু ও আরবী ছাড়া আর যতকিছু ভাষা জগতে বিদ্যমান আছে তাহার কোনটীর সহায়তায় বস্তুর লৌকিক অবস্থা ছাড়া আর কোন অবস্থা সম্যক্ ও নিখুঁৎ ভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নহে।

বস্তুর অথবা ভাষার নৈঘণ্টুক, নৈগম ও মন্ত্রাবস্থা যে কি তাহা সাধারণ পাঠকের পক্ষে বুঝিয়া উঠা বড়ই দুরূহ। স্কোট-প্রকরণে সিদ্ধ হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে না পারিলে উহা অন্য কোন উপায়ে বুঝা সম্ভব কি না তদ্বিষয়ে আমাদিগের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। যাস্কদেব নিরুক্তের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রারম্ভেই উহা বুঝাইয়াছেন। স্কোট-প্রকরণের সহায়তায় উহা বুঝিবার জন্য প্রযত্নশীল হইলে দেখা যাইবে যে, যাস্কদেবের কথাগুলি বড়ই সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ। অথচ দুর্গাচার্য্য প্রভৃতি যে কোন ভাষ্যকার ও টীকাকার ঐ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, কাহারও লেখায় যাস্কদেবের বক্তব্য সম্যক্ ও নিখুঁৎভাবে পরিস্ফুট হয় নাই।

মহাপুরাণ সমষ্টিতে প্রত্যেক বস্তুর সাধারণতঃ ত্রিবিধ অবস্থা ( অর্থাৎ লৌকিক, নৈঘণ্টুক ও নৈগম অবস্থার ) বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রত্যেক বস্তুর মন্ত্রাবস্থার বর্ণনা রহিয়াছে বেদে। কাযেই কোন মহাপুরাণ সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে হইলে উহার প্রত্যেক শ্লোকটী ত্রিবিধভাবে ( অর্থাৎ লৌকিকানুযায়ী, নিঘণ্টু-অনুযায়ী এবং নিগমানুযায়ী ) বুঝিয়া লইয়া, বেদে যে বস্তুর মন্ত্রাবস্থার বর্ণনা রহিয়াছে তাহার সহিত মিলাইতে হয়। এইরূপভাবে সমগ্র অষ্টাদশ মহাপুরাণ

না বুঝা হইলে কোন মহাপুরাণই সম্যক্‌ভাবে বুঝা হয় না—ইহা ঋষিদিগের নির্দ্দেশ। "নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং" ইত্যাদি শ্লোকটী সম্যক্ ভাবে বুঝিতে পারিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

আমরা আগেই বলিয়া রাখি উপরোক্ত ভাবে মহাপুরাণের অধ্যয়ন আমাদিগের কিছু অগ্রসর হইয়াছে বটে কিন্তু এখনও সমাপ্তি হয় নাই। আমরা এতাবৎ কাল যাহা লিখিয়াছি তাহা লক্ষ্য করিলে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে আমাদিগের লেখার বেদাঙ্গ, দর্শন, মীমাংসা, সংহিতা ও তন্ত্রের মূল কারিকা ও সূত্র লইয়া কথা থাকে বটে কিন্তু এতাবৎ আমরা বেদের কোন মূল মন্ত্রের অথবা পুরাণের কোন মূল শ্লোকের অর্থ সম্বন্ধে কোন কথা লিখি নাই। উহা একমাত্র প্রকৃত ব্রাহ্মণের পক্ষেই সম্ভব। যে ব্রাহ্মণ বেদ ও পুরাণের মূল কথার ব্যাখ্যা করিবার অধিকারী সেই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য এই পাপময় লেখকের আয়ত্ত বটে কিন্তু এখনও সে এই ব্রাহ্মণ্য অর্জ্জন করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান জীবনে তাহার পক্ষে উহা সম্ভব হইবে কি না তাহাও বলা যায় না। প্রকৃত ব্রাহ্মণের কখনও অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব আসিতে পারে না। কিন্তু এই হতভাগ্যের আন্নাধিক পরিমাণে সমস্তই বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ কখনও নিরীহ অর্দ্ধাশনীর অর্দ্ধাশন ও অনশনীর অনশন দূরীভূত না করিয়া আহার গ্রহণ করেন না। কিন্তু পশুপ্রধান প্রকৃতি-সম্পন্ন এই হতভাগ্যের জঠর-জ্বালা এতই তীব্র যে চারিদিকে অনশন ও অর্দ্ধাশনের এত হাহাকার শুনিয়াও ইহাকে বধিরের মত কাহারও দিকে না তাকাইয়া নিজের জঠর-জ্বালার নিবৃত্তির জন্য বিব্রত হইতে হয়। জীবনকে ধিক্কার দিয়া লাভ নাই। যিনি যে অবস্থায় থাকেন তাঁহাকে সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিবার জন্য প্রযত্নশীল হইতে হইবে।

মূল কথা, আমরা বেদের মূলমন্ত্র ও মহাপুরাণের মূল শ্লোকের ব্যাখ্যা করিবার অধিকারী এখনও হই নাই। কাযেই শাস্ত্রানুসারে আমাদিগকে উহা হইতে বিরত থাকিতে হয়। কিন্তু তথাপি আমরা তাহা পারিব না। অন্তর্নিহিত যে অব্যক্ত শক্তি মূলকে বাধ্য করিয়া থাকেন, যিনি এই দুর্ব্বহকে লেখক করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার প্রয়োজনার্থ আজ প্রয়োজন সাধন করিবার উদ্দেশ্যে আমাদিগকে মহাপুরাণের মূল শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। আমরা ঐ অব্যক্ত-শক্তিকে যথাসাধ্য অন্তরের স্মৃতিপথে জাগ্রত রাখিয়া উহাতে প্রবৃত্ত হইব। প্রচলিত ব্যাখ্যা যে ভ্রমাত্মক তাহা যত দৃঢ়তার সহিত আমরা বলিতে সক্ষম—আমাদিগের ব্যাখ্যা যে বিশ্বাসযোগ্য তাহা তত দৃঢ়তার সহিত আমরা বলিতে সক্ষম নহি। পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ আমাদিগের কোন কথার প্রতি অবিচারিত শ্রদ্ধা পোষণ করেন তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে আমাদিগের পুরাণ ব্যাখ্যা বিষয়ে উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করি।

পুরাণের কোন শ্লোক সম্যক্‌ভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইলে ত্রিবিধ ভাব (অর্থাৎ লৌকিক, বৈষ্ণটুক ও নৈগম ভাব) বুঝিয়া লইয়া নৈগম ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। উহা কোন লৌকিক ভাষার সাহায্যে করা সম্ভব নহে। এবং উহা আজকালকার পাঠকগণের পক্ষে উপলব্ধি করাও সাধারণতঃ সাধ্যায়ত্ত নহে। আমরা কেবলমাত্র মর্ম্ম-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইব।

গরুড়-পুরাণের "বৈদং যঃ পঠতে ভক্ত্যা" প্রভৃতি যে শ্লোক প্রতিবাদকর্ত্তা উদ্ধৃত করিয়াছেন—লৌকিকভাবে তাহার মর্ম্মার্থ :—

'মৃত্যু' ও তাহার 'অষ্টকের' মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য যে ক্রম প্রদর্শিত হইল, ঐ ক্রম—যাহার শক্তির (অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সংযমের) সহায়তায়, এবং অবয়বের যে প্রকরণে সত্ত্ব হইতে রজ ও রজ হইতে তম ও তম হইতে সত্ত্বের উদ্ভব হয় সেই প্রকরণের, ও যে প্রকরণে প্রতিষেধাত্মক বাহুপ্রবাহ হইতে অহংকৃতির উদ্ভব হয় সেই প্রকরণের, এবং যে প্রকরণে তামসিক ভাব প্রতিরুদ্ধ হয় সেই প্রকরণের আশ্রয়ে উপলব্ধিযোগ্য হয়, তিনি গুণবিমুক্ততা সাধন করিতে পারেন এবং গুণবিমুক্তাবিকরণেও তাঁহার বহির্ম্মুখীতার অবসান সম্ভবযোগ্য হয়।

গরুড়-পুরাণের এই অধ্যায়ে একটী অবস্থাবিশেষে কি করিয়া মোক্ষলাভ করিতে হয় অথবা ঐ অবস্থায় অপায় হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় তাহার একটী প্রকরণ দেখান হইয়াছে। চলতি ভাষায় আজকাল যাহাকে 'যোগ' বলিয়া মনে করা হয় ঐ প্রকরণটী সেই হিসাবে যৌগিক। উহা সাধারণের বোধ্য নহে। কাযেই আমরা উহার বিশদ ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াসী হইব না।

আজকালকার পণ্ডিতগণকে মনে রাখিতে হইবে যে, পুরাণ ও বেদের অর্থ বুঝিতে হইলে সংস্কৃত ভাষার যে শ্রেণীর জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা তাঁহাদিগের আদৌ নাই।

ইঁহারা সর্ব্বনাম শব্দগুলিকে ( যথা 'ইদং যঃ পঠতে তস্যা' প্রভৃতি শ্লোকের "ইদং", "যঃ" প্রভৃতি শব্দগুলিকে ) সাধারণতঃ যে অর্থে গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা লৌকিক ভাবের ব্যাখ্যায় মোটামুটিভাবে প্রযোজ্য হইলেও হইতে পারে বটে কিন্তু নিগম-ব্যাখ্যায় আদৌ প্রযোজ্য নহে। নিগম-ব্যাখ্যায় সর্ব্বনাম শব্দগুলি কিরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে তাহা বাক্যপদীয়ের ব্রহ্ম-সমুদ্দেশের তৃতীয় শ্লোকটী যথাযথ-ভাবে বুঝিতে পারিলে কতকটা ধারণা করা যাইবে। নিম্নে ঐ শ্লোকটী উদ্ধৃত হইল—

"বস্তুপলক্ষণং যত্র সর্ব্বনাম প্রযুজ্যতে
তত্রাবিভূতাতত্ত্বে লোকবৎ ভেদকর্ষনে বিবক্ষিতঃ।"

পদের 'ভেদত্ব' যে কি, তাহা স্ফোট-প্রকরণে সিদ্ধ হইলে নিজে বুঝা যায় এবং যাঁহারা উহার জন্য যথাযথ পন্থায় প্রযত্নশীল তাঁহাদিগের বুঝিবার কতকটা সহায়তাও করা যায়, কিন্তু যাঁহারা ঐ রাস্তার পথিক নহেন তাঁহাদিগকে কোনক্রমেই বুঝান সম্ভব নহে।

সেইরূপ আবার "পঠতে", "ভক্ষ্যা", "ত্রিকালং", "নিয়তং" "ওঃ", "অকালে", "অচ্যুত-চেতসঃ", এই শব্দগুলিকে সাধারণতঃ তথাকথিত পণ্ডিতগণ যে যে অর্থে গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা লৌকিকভাবের ভাষায় মোটামুটিভাবে কথঞ্চিৎ প্রযোজ্য হইলেও নিগম ভাবের ভাষায় আদৌ প্রযোজ্য নহে। নিগম ভাবের ভাষায় ঐ পদগুলির অর্থ যথাযথ গ্রহণ করিতে হইলে প্রথমতঃ স্ফোটের সাহায্যে পদ-প্রকৃতির অর্থ স্থির করিতে হয়, তাহার পর আবার বিভক্তি ও প্রত্যয়-ঘটিত অর্থ-বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিতে হয়।

আজকালকার পণ্ডিতগণ পদ-প্রকৃতির অর্থ সাধারণতঃ ধাতু-পাঠের অথবা অভিধানের সাহায্যে স্থির করিয়া থাকেন। প্রকৃত সংস্কৃত ভাষায় প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে ধাতু-পাঠের অথবা অভিধানের সাহায্যে পদ-প্রকৃতির যে অর্থ নিরূপিত হয় তাহা লৌকিকভাবের ভাষায় কতকটা প্রযোজ্য হইলেও নিগম ভাবের ভাষায় আদৌ প্রযুজ্য নহে। নিগম ভাবের ভাষায় যে সমস্ত পদ-প্রকৃতি ব্যবহৃত হয় তাহার অর্থ স্থির করিবার একমাত্র উপায় স্ফোট-প্রকরণ। তাহা জানা ত দূরের কথা, বিভক্তি ও প্রত্যয়-যোগে পদ-প্রকৃতির অর্থ-বৈশিষ্ট্যের নিয়ম যে কি, তাহা পর্য্যন্ত আজকালকার তথাকথিত পণ্ডিতগণ সম্যক্ ও নির্ভুলভাবে বিদিত নহেন। উহা সম্যক্ ভাবে জানিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা অষ্টাধ্যায়ী সূত্র-পাঠের সূত্রে ও সূত্র-শৃঙ্খলায় প্রবিষ্ট হওয়া। দুর্ভাগ্যক্রমে অষ্টাধ্যায়ী সূত্র-পাঠের সূত্র ও সূত্র-শৃঙ্খলার পঠন ও পাঠন একরূপ সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা পাণিনি পড়েন বলিয়া মনে করেন তাঁহারা প্রায়শঃ অষ্টাধ্যায়ী-সূত্রপাঠের সূত্র ও সূত্র-শৃঙ্খলা পড়েন না। তাঁহারা পড়েন সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর অথবা অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠের সূত্রের একটা বৃত্তি ও তাহার সংস্কারগত একটা অর্থ। ঐ সংস্কারগত অর্থের সহিত মূল সূত্রের অর্থের যে কত পার্থক্য তাহা বুঝিতে পারিলে আমাদিগের কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে।

"ন"-পদের অর্থ আজকালকার তথাকথিত পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ "না" বলিয়া গ্রহণ করেন। লৌকিকভাবের ভাষায় এই অর্থ কতকপরিমাণে প্রযোজ্য হইলেও হইতে পারে বটে কিন্তু নিগম ভাবের ভাষায় "ন"-পদের অর্থ "না" বলিয়া গ্রহণ করিলে বাক্যের অভিপ্রায় আদৌ বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না। নিগম ভাবের ভাষায় যখন "ন"-পদ ব্যবহৃত হয় তখন মনে রাখিতে হইবে যে "ন"-পদটী একটী উপমার্থক নিপাত। নিগমভাবের ভাষায় এ বাক্যে "ন" ব্যবহৃত হয় তাহার অর্থ বুঝিতে হইলে নিপাতের উদ্দেশ্য কি, উপমার্থক নিপাত কাহাকে বলে, এবং "ন"-পদের অর্থ কি তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে।

নিপাতের উদ্দেশ্য কি, ও উপমার্থক নিপাত কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে হইলে 'উচ্চাবচেষু অর্থেষু নি-পতন্তি অপি উপমার্থে অপি কর্ম্মোপসংগ্রহার্থে অপি পদপূরণাঃ"—নিরুক্তের এই বাক্যের অর্থ বুঝিবার প্রয়োজন হয়।

"ন"-পদের অর্থ কি তাহা বুঝিতে হইলে 'ন'-ইতি—প্রতিষেধবাচীনো ভাষায়াং উভয়ং অন্বয়ার্হম্" এই বাক্যের অভিপ্রায় ধারণা করিতে হয়।

নিরুক্তের উপরোক্ত দুইটী বাক্যই স্ফোট-প্রকরণ ব্যতীত বুঝিবার উপায় নাই। কাজেই আজকালকার পণ্ডিতগণের পক্ষে উহা বুঝা সম্ভবযোগ্য নহে। "প্রতিষেধ" কাহাকে

বলে তাহা বিশেষ সাধনা ব্যতীত কাহারও পক্ষে উপলব্ধি করা সাধ্যায়ত্ত নহে।

নিগূঢ়ভাবের ভাষায় লেখা পুরাণ আজকালকার পণ্ডিতগণের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা কেন সাধ্যায়ত্ত নহে তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা উপরোক্ত কথাগুলি লিখিলাম। এই পণ্ডিতগণ কোন পুরাণ যথার্থ অর্থে বুঝিতে পারেন না বলিয়াই প্রচলিত ব্যাখ্যায় আমরা পুরাণে এত উপকথার (fiction-এর) সংবাদ শুনিতে পাই। এই তথাকথিত পণ্ডিতগণকে মনে রাখিতে হইবে যে ঋষি-প্রণীত গ্রন্থে উপকথা স্থান পাইয়াছে ইহা বলিলে প্রকারান্তরে ঋষির সত্যদর্শিতার উপর দোষারোপ করা হয় এবং তাহাতে মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। এই পাপের জন্যই আজকালকার পণ্ডিতগণকে হয় নির্বংশ নতুবা শ্রীহীন হইয়া জীবন যাপন করিতে হয়। এই তথাকথিত পণ্ডিতগণকে জানিতে হইবে যে, তাঁহারা যখন প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা জানেন না তখন তাহা স্বীকার করিলে এবং তদনুসারে চলিলে তাঁহাদের কোন পাপ হইতে পারে না কিন্তু তাহা না জানিয়া জানিবার ভাণ করিলে অথবা অভিমান পোষণ করিলে, প্রাকৃতিক কঠোর শাস্তি অবশ্যম্ভাবী।

একণে আমরা মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকের মর্মার্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ঐ শ্লোকের একটী মাত্র চরণ প্রতিবাদ-কর্ত্তা উদ্ধৃত করিয়াছেন। সম্পূর্ণ শ্লোকটী এই—

"করালৈঃ বিকটৈঃ কৃষ্ণৈঃ পুরুষৈঃ উদ্যতায়ুধৈঃ।
পাষাণৈঃ তাড়িতঃ স্বপ্নে সদ্যো মৃত্যুং নরো ব্রজেৎ॥"

উপরোক্ত শ্লোকের প্রচলিত অর্থ :—

"স্বপ্নে অতীব ভীষণ ও বিকট প্রকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ পুরুষগণ আয়ুধ উদ্যত করিয়া পাষাণের আঘাত করিলে সদ্য মরণ হইয়া থাকে।"

স্বপ্নে অতীব ভীষণ কিছু ঘটিলে জীবের মরণ কি করিয়া ঘটিতে পারে তাহার যুক্তি অথবা বিজ্ঞান প্রদর্শন করিতে পারিলে প্রচলিত অর্থ যে সঙ্গত তাহা স্বীকার করিবার কারণ উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহা যদি না পারা যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, হয় পুরাণ-প্রণেতা ঋষি অলৌকিক কথা বলিয়াছেন, নতুবা তথাকথিত পণ্ডিতগণ উহা বুঝিতে পারেন নাই।

'স্বপ্ন' কাহাকে বলে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে বোঝা যাইবে যে, স্বপ্ন-কালে মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে বটে কিন্তু কোন স্বপ্ন কখনও মৃত্যুর কারণ হইতে পারে না; পরন্তু অবস্থাবিশেষে স্বপ্ন আরোগ্যের কারণ হইতে পারে। কাজেই বলিতে হইবে যে, হয় পুরাণ-প্রণেতা ঋষি অলৌকিক ও অবৈজ্ঞানিক কথা বলিয়াছেন, নতুবা তথাকথিত পণ্ডিতগণ ঋষির বক্তব্য বুঝিতে পারেন নাই। সত্য-দর্শী কোন ঋষির লেখনী হইতে যে কখনও কোন অলৌকিক অথবা অ-বৈজ্ঞানিক কথা নিঃসৃত হইতে পারে না তাহা একাধিক রকমে প্রমাণিত হইতে পারে। সুতরাং তথাকথিত পণ্ডিতগণ যে পুরাণ-প্রণেতা ঋষির কথা বুঝিতে পারেন না তাহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

নিগূঢ় ভাবের ভাষা বুঝিবার প্রণালী অনুসারে উপরোক্ত শ্লোকের মর্মার্থ :—

"রক্ত-মাংসের প্রয়োচনা-জাত কর্ম্মে লিপ্ত হইয়াও যদি কোন মানুষ—মূল প্রকৃতি তেজোবহুল হইয়া কি করিয়া রসের সৃষ্টি করে, চর্ম্ম-প্রকৃতি হইতে কি করিয়া বুদ্ধির সৃষ্টি হয়, ঈশ্বরভাবাপন্ন প্রকৃতি হইতে কি করিয়া রাজসিকতার বীজ উৎপন্ন হয়, অকৃৎ-পুরুষের বিকশিত রূপ হইতে কি করিয়া রাজসিকতার বিকাশ হয়, জীবের 'আত্ম' হইতে তাহার বিভিন্ন বিকাশ কিরূপে উদ্ভব হয়, অকৃৎ পুরুষগত রাজসিকতা কি করিয়া সংহত করিতে হয়—এবম্বিধ তথ্যগুলি জানিবার জন্য ব্যগ্র হয় তাহা হইলে সে তাহার মূল সত্তা সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হইতে পারে এবং তখন তাহার বহির্মুখীনতার অবসান হইবার কারণ উপস্থিত হয়।"

পদ্ম-পুরাণ হইতে প্রতিবাদ-কর্ত্তা যে শ্লোকের চরণটী উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার সম্পূর্ণরূপ এই :—

"অক্ষিস্পন্দনবেগঃ পুংসামাশ্রিত্য পার্শ্বকম্পিবেঃ।
তং প্রাপ্য ভৈরবং ক্ষুত্বা মৃত্যুং যাতি ন সংশয়ঃ॥"

প্রতিবাদ কর্ত্তা লিখিয়াছেন যে এই শ্লোকটি পদ্ম-পুরাণের ভূমি-খণ্ডের সপ্তদশ-অধ্যায়ে আছে। আমরা উহা সপ্তদশ অধ্যায়ে পাই নাই, পরন্তু পঞ্চদশ অধ্যায়ে উহা আমরা পাইয়াছি।

উহার চলতি অর্থ যে কি তাহা আমরা সঠিক জানি না। কেহ কেহ বলেন যে উহার অর্থ—

"পাপযুক্ত অস্থি, চর্মনখপরিপূর্ণ স্থান আশ্রয় করিয়া অতি গুপ্তভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"

আমাদিগের মতে চলতি ব্যাকরণের সাহায্যে এই শ্লোকের কোন অর্থই নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

নিগূঢ় ভাবের ভাষা বুঝিবার প্রণালী অনুসারে এই শ্লোকের মর্মার্থ—

অস্থি চর্ম ও নখের সহায়তায় অক্ষর-পুরুষের দ্বারা পূর্ণ ভাবে পাপ-প্রকৃতিতে বিন্যস্ত হইয়াও যদি অহঙ্কারের পরিণতি বুঝিতে পারা যায় এবং আত্মা (অর্থাৎ ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞানের বীজ) কি করিয়া ঘুষিত হয় তাহা উপলব্ধি করিবার প্রণালী জানা যায় তাহা হইলে সংসার কার্যের নিয়মবশতঃ স্বতঃই বহির্মুখীনতার অবসান হইবে।

পদ্মপুরাণের ভূমি-খণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায়টী ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে মৃত্যু ও মরণের মধ্যে যে কি পার্থক্য এবং উহারা যে একার্থক নহে, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

অমরকোষের যে শ্লোকের যে চরণটি প্রতিবাদ-কর্তা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার পূর্ণ রূপ—

"তাৎ পক্ততা কালধর্মো দিষ্টান্তঃ প্রলয়ো হয়ঃ।
অন্তো নাশো মৃত্যুরুষো মরণং নিধনোঽস্ত্রিয়াম্॥

এই শ্লোকের প্রচলিত অর্থ—

"মরণের নাম—পক্ততা, কালধর্ম, দিষ্টান্ত, প্রলয়, অত্যয়, অন্ত, নাশ, মৃত্যু, মরণ, নিধন।"

অমর-কোষের উপরোক্ত শ্লোকের প্রচলিত অর্থ যে-রূপ ভাবে করা হয় তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে উপরোক্ত শ্লোক হইতে এই অর্থে উপনীত হইতে হইলে শ্লোকান্তর্গত 'ঋষোর্মৃত্যুঃ' এই দুইটি পদের "ঋষোঃ"-পদের এবং 'নিধনোঽস্ত্রিয়াং' এর "অস্ত্রিয়াং" পদের অর্থ বাদ দেওয়া হয়। 'ঋষোঃ' পদটী ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত এবং 'অস্ত্রিয়াং' সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত। শ্লোকান্তর্গত কোন পদকে বাদ দিয়া শ্লোকের যে অর্থে উপনীত হওয়া যায়, সেই অর্থ যে কখনও সঠিক হইতে পারে না তাহা গোঁড়ামীর আশ্রয় না লইলে স্বীকার করিতেই হইবে।

তাহার পর আবার শ্লোকের বাক্যবিভাগ কি করিয়া করিতে হয় তাহা 'শিক্ষার' সাহায্যে যথাযথ ভাবে অবগত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে উদ্ধৃত শ্লোকে (১) তাৎ পক্ততা কালধর্মঃ, (২) (অস্ত্রিয়াং) অদিষ্টান্তঃ প্রলয়ঃ অত্যয়ঃ, (৩) অন্তঃ নাশঃ, (৪) ঋষোঃ মৃত্যুঃ, (৫) মরণং নিধনঃ—এই পাঁচটী বাক্য আছে। এবং ঐ পাঁচটি বাক্যের অর্থ লইয়া শ্লোকের সম্পূর্ণার্থ। এতদনুসারে ঐ শ্লোকটির নিম্নলিখিত অর্থ হইবে:

কালের ধর্ম হইতেছে "পক্ততা"। মানুষ যদি তাহার প্রত্যেক কার্যে শুধুকেই একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় বলিয়া মনে করে অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ পরাহত হয় তাহা হইলে স্বভাবের প্রয়োচনায় দিগ্ভ্রান্ত হইয়া (অর্থাৎ বিমূঢ় হইয়া) 'প্রলয়' শক্তিযুক্ত 'অত্যয়' সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নষ্ট হইয়া যায়। অন্তরিকে যদি সে কেন নষ্ট হইতেছে তাহা চিন্তা করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে তাহার স্বভাবজাত মোহের প্রতি প্রতি-দ্বেষের উপস্থিত হয়। কেন নষ্ট হইতেছে এই চিন্তা এবং মোহের প্রতি প্রতিদ্বেষের ফলে তাহার 'মৃত্যু' অথবা বহির্মুখীনতার অবসান ঘটে। মানুষের ভাবকর্ম সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইবার নাম তাহার "মৃত্যু।"

এই শ্লোকটীর উপরোক্ত অর্থ যে সঠিক তাহা শিক্ষা, নিরুক্ত ও ব্যাকরণের সাহায্যে অতি সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে। অনেকখানি লিখিতে হইবে বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধে উহা হইতে বিরত থাকিলাম। প্রয়োজন হইলে আমরা আমাদিগের কথাগুলি বুঝাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি।

ক্বৎ, তদ্ধিত প্রত্যয়ের জ্ঞান থাকিলে অনায়াসেই দেখা যাইবে যে কাল-ধর্ম মরণের কারণ হইতে পারে বটে কিন্তু কাল-ধর্ম ও মরণ কখনও একার্থক নহে। সেইরূপ দিষ্টান্ত মরণের একটি গৌণ কারণ হইতে পারে বটে, কিন্তু দিষ্টান্ত ও মরণ কখনও একার্থক হইতে পারে না। মানুষ সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে অত্যন্ত অজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই অবাধে লিখিয়া যাইতেছে যে মরণের নাম কাল-ধর্ম, দিষ্টান্ত, প্রলয়, অত্যয় অন্ত, নাশ ও মৃত্যু; এবং ঐ লেখা পাঠকগণ হজম করিতেছেন এবং উহা স্কুলের ও টোলের পাঠ্য হইতেছে। অমরকোষের বিভিন্ন বর্গের অর্থ কি তাহাই মানুষ বুঝিতে পারে না, অথচ মনে করে যে অমর-কোষ তাহাদের পরিজ্ঞাত। প্রকৃতপক্ষে অমর-কোষের একটি শ্লোকেরও প্রচলিত অর্থ ঠিক নহে। অমর-কোষের অর্থ ঠিক থাকিলে সংস্কৃত ভাষা নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবম্বিধ কথা আমরা বলিতে পারিতাম না।

"মৃত্যু" ও 'মরণ' একার্থক কি না এবং এই প্রতিবাদ-কর্তার শ্রেণীর মানুষ কোপমনা ও বেত-পাইবার উপযুক্ত কি না তাহা এক্ষণে পাঠকগণ বিচার করুন।

## 'বঙ্গশ্রী'র উদ্দেশ্য কি ?

কতিপয় শুভার্থী আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, আমরা ব্রিটিশবিরোধী এবং জার্মানীর প্রতি পক্ষপাতমূলক মনোভাব-বিশিষ্ট, আমাদের সম্বন্ধে কেহ কেহ এইরূপ ধারণা পোষণ করেন এবং যুদ্ধ সম্বন্ধে আমরা যে-সকল রচনা প্রকাশ করিয়াছি উহাই তাঁহাদের সেই ধারণার মূল। আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আমাদের সম্বন্ধে এইরূপ ধারণার উৎস কোথায়, তাহা আমরা নিশ্চিত করিয়া জানি না, কিন্তু সন্দেহ করিবার আমাদিগের কারণ রহিয়াছে যে, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত প্রতিষ্ঠাপন্ন যে-সকল দৈনিক পত্রিকার মতবাদের আমরা সমালোচনা করিয়া থাকি এবং তাহাদের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া থাকি, তাহারই একখানির অঙ্গুলী আমাদের সম্বন্ধে এই ধারণা প্রচারের পশ্চাতে বিদ্যমান। সত্যতামূলক সমালোচনা সম্বন্ধে ধৈর্য্য প্রদর্শন বিষয়ে যে-পত্রিকা একদা আদর্শস্থানীয় ছিল, বর্ত্তমানে সেই পত্রিকার এইরূপ অবস্থায় আমাদের মাত্র অনুকম্পার উদ্রেক হইতেছে। এই পত্রিকার সম্পাদকগণ যুক্তিসঙ্গতভাবে আমাদের যুক্তি খণ্ডন করিবেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। যাহাই হউক, যে-ভাবধারা-প্রণোদিত হইয়া আমাদের লেখনী পরিচালিত হইতেছে, তাহা সুস্পষ্টভাবে পাঠক সাধারণের নিকট ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছি।

যাঁহারা আমাদিগকে ব্রিটিশ-বিরোধী বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন, তাঁহাদিগের জ্ঞাতব্য এই যে, আমাদের পত্রিকার পশ্চাতে একাধিক শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়ীর অর্থানুকূল্য বিদ্যমান এবং আমাদিগের রচনাসমূহের মূল ভাবসমূহ যাঁহার লেখনীনিঃসৃত, তাঁহার সঞ্চিত অর্থাদির সমগ্রাংশ প্রধানতঃ কতিপয় ব্রিটিশ শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়ী, তথা ব্রিটিশ উচ্চপদাধিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং মহাজনের অনুগ্রহে লব্ধ এবং অদ্যাবধি তিনি শিল্প-বাণিজ্যের দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বলাই বাহুল্য যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের ইঙ্গিত মাত্রেও কোন বিচক্ষণ শিল্প কিংবা বাণিজ্য-ব্যবসায়ী বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারেন না, কেন না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাঙ্ক এবং কাগেন্সি তথা টাঁকশালের কার্য্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে—যাহার ফলে বর্ত্তমান শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়িগণের সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া পড়িবার নিশ্চিত সম্ভাবনা। এক কথায়, যাঁহারা আমাদিগকে ব্রিটিশ-বিরোধী কিংবা জার্মানগণের প্রতি অনুকূল মনোভাব-বিশিষ্ট বলিয়া সন্দেহ করেন, তাঁহারা আমাদিগের মতবাদ বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছেন।

যাঁহারা এই পত্রিকার প্রবর্ত্তক তাঁহারা স্বকীয় শিল্প এবং বাণিজ্যের সমৃদ্ধি প্রত্যাশা করেন এবং আমাদের শিল্প এবং বাণিজ্যের সর্ব্বাধিক স্থায়ী নিশ্চিত সমৃদ্ধির সহায়ক ভাবধারা এবং সংগঠন ইচ্ছা করেন। "আমাদের শিল্প এবং বাণিজ্য" বলিতে আমরা ভারতের, তথা ইংলণ্ডের শিল্প ও বাণিজ্য উভয়ই বুঝাইতে চাই। শিল্প এবং বাণিজ্যের সমৃদ্ধি সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে ভাবধারা প্রচলিত তাহাতে মনে করা হয় যে, যদি কোনরূপ কাঁচামাল এবং প্রয়োজনীয় পণ্য সর্ব্বনিম্ন মূল্যে ক্রয় করিয়া সর্ব্বাধিক মূল্যে উহার বিক্রয় ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে লাভ সুনিশ্চিত এবং তাহা হইলেই সমৃদ্ধিশালী শিল্প এবং বাণিজ্য-ব্যবসায়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। আমাদের মতবাদ স্বতন্ত্র। আমাদিগের মতে, যতই সন্তানী এবং অবহিত হওয়া যাউক না কেন, সকলের পক্ষে সর্ব্বনিম্ন মূল্যে ক্রয় এবং সর্ব্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয় কখনও সম্ভব হইতে পারে না। সর্ব্বনিম্ন মূল্যে যিনি দ্রব্য ক্রয় করিতেছেন, তখন যিনি বিক্রেতা তাঁহাকে যে সর্ব্বনিম্ন মূল্যেই পণ্য বিক্রয় করিতে হইতেছে, ইহা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ কেহ যখন সর্ব্বনিম্ন মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিয়া লাভ করেন, তখন অপর জনের পক্ষে সর্ব্বাধিক মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় সম্ভব হয় না এবং তাঁহাকে পড়তি মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়, সুতরাং ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে হয়।

এক কথায়, বর্ত্তমান শিল্প-বাণিজ্য যেরূপে পরিচালিত, তথা যে মুদ্রামান-ব্যবস্থার উপর বর্ত্তমান শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত, আমরা তাহার সহিত একমত নহি এবং এতদ্বিষয়ে আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন বিদ্যমান বলিয়া আমরা মনে করি।

আমাদিগের মতে, প্রত্যেকটি শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়ীর লাভ যাহাতে সুনিশ্চিত হয়, এরূপ ব্যবস্থা হইলে প্রত্যেক দেশের শিল্প এবং বাণিজ্য সমৃদ্ধ হইতে পারে এবং যদি দ্রব্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি বন্ধ করা যায় এবং শিল্প-বাণিজ্য-

ব্যবসায়িগণের দীও মারিবার ইচ্ছা নিবৃত্ত করা যায়, তথা প্রত্যেকটি ক্রেতার যাহাতে ক্রয়-সামর্থ্য রক্ষিত হয় এবং বিনষ্ট না হয়, তাহা হইলেই অনুরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হইতে পারে। কোন দেশের অধিকসংখ্যক অধিবাসীর প্রাসাচ্ছাদন-বাবদ অতিরিক্ত ব্যয়ের পক্ষে অর্থের সঙ্কুলান না থাকিলে সেই দেশের শিল্প এবং বাণিজ্য কখনও সুশৃঙ্খলায় চালিত হইতে পারে না। আমরা মনে করি, কোন দেশের অধিক-সংখ্যক অধিবাসীর বাৎসরিক আয়-সাচ্ছল্য সুনিশ্চিত করিবার উপযোগী সংগঠন যদি ব্যবস্থিত করা যায়, তবে দেশবাসীর মনোভাব এমন ভাবে পরিবর্তিত হইতে বাধ্য, যাহাতে শিল্প এবং বাণিজ্য-ব্যবসায়ীদিগের দীও মারিবার স্পৃহা স্বতঃই নিবারিত হইবে এবং ফলতঃ দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধির অবসান ঘটিবে।

শিল্প ও বাণিজ্যের সমৃদ্ধি বিষয়ে আমাদিগের মতবাদ সংক্ষেপ করিয়া বলিতে হইলে এই দাঁড়াইবে যে, আমাদের মতে প্রত্যেক দেশের বাণিজ্য এবং সমৃদ্ধি ঐ দেশের অধিকাংশ দেশবাসীর অবস্থার সচ্ছলতার সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে সংশ্লিষ্ট, অর্থাৎ আমরা মনে করি যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ অধিবাসীর বাৎসরিক আয় সুনিশ্চিত করিয়া তাহাদের অবস্থার সচ্ছলতা সাধন করিতে না পারিলে আমাদের, অর্থাৎ শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়ীদিগের স্থায়ী সচ্ছলতার বিষয় চিন্তা করাও নিরর্থক।

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই পত্রিকার প্রবর্ত্তকদিগের মনে এই চিন্তার সূচনা হয় এবং তাঁহারা প্রত্যেক দেশের জন-সাধারণের মধ্যে বর্ত্তমানে যে অনাহার এবং বেকার-সমস্যার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, তদ্বিষয়ক চিন্তায় বহু সময়ক্ষেপ করিতে বাধ্য হন। সেই চিন্তার ফলে তাঁহারা মনে-প্রাণে বুঝিতে পারেন যে, সমগ্র মনুষ্যজাতির কল্যাণ এবং স্বার্থ পরস্পর এরূপ ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট এবং নির্ভরশীল যে, সকল দেশের, তথা সমগ্র মনুষ্যজাতির অবস্থার কিয়ৎ-পরিমাণ সচ্ছলতা সংঘটিত না হইলে বিচ্ছিন্ন ভাবে কোন একটি মাত্র দেশ সম্পূর্ণ ভাবে সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। সুতরাং স্বতঃ-উৎসারিত ভাবেই তাঁহারা সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রত্যেকের আর্থিক সচ্ছলতা, শারীরিক সুস্থতা এবং মানসিক সমৃদ্ধি কিরূপ সংগঠনের সাহায্যে সুনিশ্চিত ভাবে ব্যবস্থিত হইতে পারে, তাহার সন্ধান-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হন। মনের এই উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহারা ইউরোপে রেনেসাঁস-যুগের পরবর্ত্তী কালের ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, রুশিয়া ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশের অর্থনীতিবিদ্, জীব-বিজ্ঞানবিদ্, পদার্থবিদ্, রসায়নবিদ্, দার্শনিক, রাষ্ট্রনীতিবিদ্, ভাষাবিজ্ঞানবিদ্, শরীরবিধানবিজ্ঞান বিদ্, শরীরগঠনবিজ্ঞানবিদ্ প্রভৃতি সকলের চিন্তাধারার পরিচয় লাভার্থ সচেষ্ট হন। আমাদের পত্রিকায় এযাবৎ তাঁহাদের রচিত যে-সকল সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, ঐ সকল বিষয়ের বক্তব্য তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল অর্থনীতিবিদ্ প্রভৃতি কাহারও নিকট তাঁহারা সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রত্যেকটি ব্যক্তির আর্থিক সচ্ছলতা, শারীরিক সুস্থতা এবং মানসিক সমৃদ্ধি নিশ্চিতরূপে ব্যবস্থিত করিবার সহায়ক সংগঠনের সন্ধান যখন লাভ করিতে পারিলেন না; এমন কি যখন দেখিলেন যে, এই সকল গ্রন্থ-কারের প্রত্যেকটি গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে—কোন একটি ব্যক্তির অবস্থা সুনিশ্চিত স্থায়ী এবং পূর্ণরূপে সমৃদ্ধ করিতে হইলেও যে সমগ্র মনুষ্যজাতির সমৃদ্ধির বিষয়ে চিন্তা না করিয়া উপায় নাই—এমন ভাবের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই, তখন তাঁহারা ইঁহাদের সম্বন্ধে যে-প্রত্যাশা পোষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে নিরতিশয় নৈরাশ্য বোধ করেন। ইঁহাদিগের প্রায় প্রত্যেকেই একটি নির্দ্দিষ্ট জাতি (nation), কিংবা একটি নির্দ্দিষ্ট দেশ (country) কি করিয়া সমৃদ্ধি-লাভ করিতে পারে, কেবল তাহার চিন্তা করিয়া গিয়াছেন, এবং মাত্র কতিপয় অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহাদের সংগঠন-বিষয়ক কার্য্যনির্দ্দেশ দান করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের অনুমান যে প্রকৃতির কার্য্যক্রমের সহিত সামঞ্জস্য-বিশিষ্ট, ইহাতে নিঃসন্দিগ্ধ হইবার পক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই; অনেকে আবার এমন উল্লেখ পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছেন যে, মনুষ্যজাতির প্রত্যেকের সচ্ছলতা কখনও সাধিত হইতে পারে না।

ফলে এই পত্রিকার প্রবর্ত্তকদিগের মনে নিরতিশয় বেদনার সঞ্চার হয় এবং এই সময়ে অকস্মাৎ, সম্ভবতঃ ঈশ্বরানুগ্রহে, ভারতীয় বাক্তিগণের ন্যায়সূত্র এবং বৈশেষিকের কতিপয় সূত্র দৈবীপ্রেরণার ন্যায় ক্রমাবয়বে উদ্ভাসিত হয়। কি ভাবে ইহা ঘটে, তাহা তাঁহাদের স্মরণে নাই, কিন্তু ফলতঃ তাঁহারা অনুধাবন করেন যে, ভারতীয় ঋষিগণের রচিত বলিয়া

পরিচিত গ্রন্থসমূহের পরস্পর-সংবদ্ধ এবং সমবেতভাবে অর্থ-দ্যোতক ; এবং ইহাদের মধ্যেই তাঁহারা যে চিন্তায় উৎসাহিত বোধ করিতেছিলেন এবং বর্তমান পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিকে যে-সকল সমস্যা বিশিষ্ট-ভিন্ন করিতেছে, তাহাদের প্রত্যেকটির সমাধান সুস্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। 'ভারতীয় ঋষিগণের রচিত গ্রন্থসমূহ পরস্পর-সংবদ্ধ এবং সমগ্র ভাবে অর্থ-দ্যোতক' আমাদিগের এই কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, মীমাংসা, দর্শন, তন্ত্র এবং সংহিতাসমূহের মূলগ্রন্থের উপজীব্য বিষয় একটিমাত্র—শারীরিক এবং আধিদৈবিক সকলপ্রকার দুঃখ-দুর্দশা হইতে মনুষ্যের নিষ্কৃতিলাভের পন্থা। এতগুলি গ্রন্থে যে একটি মাত্র বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে, তাহা ইহার প্রত্যেকটি গ্রন্থ যথাযথভাবে পাঠ এবং উপলব্ধি-পূর্বক অধ্যয়ন করিতে না পারিলে সম্যক্ প্রকারে বুঝা যাইবে না। ভারতীয় ঋষিগণের রচিত গ্রন্থসমূহের অর্থোদ্ধারের প্রচলিত পন্থা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং স্বকীয় দেহমধ্যে বিভিন্ন সংস্কৃত বর্ণের এবং তাহাদের বিভিন্ন মিশ্রণোদ্ভূত অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিলে যে তাহা বুঝিতে পারা যায় না, ইহাও এই পত্রিকার প্রবর্তকগণ বুঝিতে পারেন।

বর্তমান পণ্ডিতগণ এবং প্রাচীন ভাষ্যকারগণ কর্তৃক যে এইসকল গ্রন্থ অলীক কাহিনী, অস্বাভাবিক মতবাদ এবং ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা-বাক্যপূর্ণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়, তাহার মূলে তাঁহাদের এই সকল গ্রন্থের অর্থ বুঝিবার অজ্ঞতা বিদ্যমান। অতঃপর এই পত্রিকার প্রবর্তকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে যে, বাইবেল এবং কোরাণের উপজীব্য বিষয়ও উহাই, অর্থাৎ পৃথিবীর জাতিসমূহের প্রত্যেকের ভিত্তিমূল-বিশিষ্টকারী সমস্যাসমূহের সমাধান। বাইবেল ও কোরাণের মূল গ্রন্থ যে-ভাষায় লিখিত, অনুবাদকগণের তৎসম্বন্ধীয় অজ্ঞতা বশতঃ উহারাও ভ্রান্ত অনুবাদের মধ্যস্থতায় প্রচলিত হইতেছে।

এই বিস্তৃত কাহিনী সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, বর্তমান মনুষ্যজাতির সমগ্র অধিবাসীসংখ্যা যদি দশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তথাপি মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকটি অধিবাসীর আর্থিক সচ্ছলতা, শারীরিক সুস্থতা এবং মানসিক সন্তুষ্টি-বিধায়ক সংগঠন-বিষয়ক—বর্তমান গ্রন্থকারগণের আর কেহ তাহা আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া দৃষ্ট হয় না,—এই হিসাবে আমাদিগের নিজস্ব কতিপয় মতবাদ বর্তমান। এই পত্রিকার সূচনাবধি আমরা যে-সকল আলোচনা করিয়া আসিতেছি, তৎসমুদায় যাঁহারা মনোযোগসহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট নিশ্চয়ই প্রতিভাত হইয়া থাকিবে যে, এতৎপর্যায়ের কতিপয় মতবাদের আমরা অধিকারী।

এই পত্রিকা-প্রবর্তকগণ যখন এতৎপর্যায়ের মতবাদের অধিকারী হন, তখন তৎসমূহ কি ভাবে কার্যে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে, ইহাই তাঁহাদের চিন্তার বিষয় হয় এবং ক্রমশঃ তাঁহাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, প্রথমতঃ ইংলণ্ড ও ভারতের জনসাধারণের আন্তরিক যোগসূত্রে এবং অতঃপর মনুষ্য-জাতির পরস্পর ঐক্য দ্বারা বর্তমানের বিধ্বংসী সমস্যাসমূহের সমাধানপূর্বক সমগ্র মনুষ্য-জাতির প্রত্যেকের আর্থিক সচ্ছলতা, শারীরিক সুস্থতা এবং মানসিক সন্তুষ্টি বিহিত করা যায়। আমরা এই বিশ্বাসের উত্তরাধিকারী। আমাদিগের রচনাসমূহ যথার্থ ভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, আমরা আদ্যন্ত এই বিশ্বাস প্রচার করিয়া আসিতেছি।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, আমাদের মত এই যে, পৃথিবীর কুত্রাপি জন-সাধারণের অবস্থার কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন না করিয়া মনুষ্যজাতির সমস্যাসমূহের সমাধানের প্রথম সোপান হইতেছে ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের পরস্পর আন্তরিক যোগসূত্র। প্রথমেই ভারতবাসী জন-সাধারণের সহিত, জার্মানীর, তথা ইতালীর, তথা রুষিয়ার, তথা আমেরিকার, তথা জাপানের, তথা তুরস্কপ্রভৃতির জন-সাধারণের কোনরূপ যোগসূত্রস্থাপনের মতবাদ আমরা পোষণ করি না, এবং সূচনায় কেবল ইংলণ্ডের জন-সাধারণের সহিত সমপ্রাণতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি, কেন না, আমাদিগের নিজস্ব সমস্যাসমূহের সমাধান পক্ষে পৃথিবীর অপর সকল জাতির সমস্যাসমূহের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, ইহা আমরা চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি এবং পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া কেবল ব্রিটিশ-জাতিই সমগ্র পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধসূত্র স্থাপনা করিয়াছে। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতন হয়, তবে পৃথিবীর বর্তমান বিপুল অধিকার, সম্পদ অনাহার, বেকার, অন্যান্য

এবং মানসিক অশান্তি বশতঃ সমগ্র জগদ্বাসীকে আগামী কিয়ৎকাল ধরিয়া অভূতপূর্ব্ব প্রকারের বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিপতিত হইতে হইবে।

আমাদিগের রচনাসমূহ যথাযথ ভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, আমরা সর্ব্বদা অন্তরের সহিত এই মতবাদই প্রচার করিয়া আসিয়াছি। ব্রিটেন কিম্বা জাতি হিসাবে ব্রিটিশদিগের বিরুদ্ধে আমরা কোন প্রকার মনোভাব পোষণ করি, এইরূপ ধারণাকে আমরা নির্ব্বুদ্ধিতা-প্রসূত বলিয়া মনে করিতে বাধ্য।

একাধিক ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতা, তথা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কার্য্যকলাপের, তথা ব্রিটিশ এবং ভারতীয় সরকারের কার্য্যনীতির আমরা তীব্র সমালোচনা করিয়া আসিতেছি, ইহা সত্য। আমাদের এইরূপ করিবার কি উদ্দেশ্য, তাহা বলিবার প্রয়োজন।

আমাদিগের সমস্যাসমূহের সমাধানার্থে ইংলণ্ড এবং ভারতীয় জন-সাধারণের পরস্পর আন্তরিক যোগসূত্রের অত্যধিক প্রয়োজন, ইহা বুঝিয়া আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে অবহিত হইয়া দেখিলাম, তথায় ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা চলিতেছে। ইংলণ্ড এবং ভারতের পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহের কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াই আমরা অচিরাৎ উপলব্ধি করিলাম যে, বস্তুতঃ ইংলণ্ড এবং ভারতের জন-সাধারণের মধ্যে পরস্পর কোন দ্বন্দ্ব-কলহ নাই, উহার সমগ্রাংশই ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতা এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কার্য্যকলাপ কেন্দ্র করিয়া সৃষ্ট। এই বিষয়ে আমাদিগের চিন্তা অত্যল্প সংক্ষেপ করিয়া বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে, আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তদনুযায়ী ২০২ কোটি ব্যক্তি, অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর মনুষ্যসংখ্যা, মাত্র ৩০ লক্ষ সংখ্যক ব্যক্তিবৃন্দের দোষে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দ্দশায় দিন যাপন করিতেছে। অধিকাংশ ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতা এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দের একাধিক গুণ বিদ্যমান, ইহাও আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল বটে, কিন্তু তাঁহাদের সকলে যে-স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত যোগ্যতা এবং চরিত্রবল অর্জ্জন না করিয়াই যে তাঁহারা ঐ স্থান অধিকার করিয়াছেন, ইহাও আমাদের দৃষ্টি-বহির্ভূত থাকিল না। কোন দেশের নেতৃত্ব কিম্বা তাহার রাষ্ট্র-চালনার নিমিত্ত যে গুণরাশি এবং চরিত্রবল সর্ব্বাধিক আবশ্যক, তাহা অর্জ্জন করা দূরে থাক, ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতা এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দের অধিকাংশের মধ্যেই তাহার বিপরীত সমাবেশ দেখা যায়। আমাদের মত এই যে, ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ যেমন ব্রিটিশ নামের অযোগ্য, ভারতীয় নেতৃবৃন্দও সেইরূপ ভারতীয় অভিহিত হইবার অযোগ্য। "ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতা" আখ্যায় আমরা তাঁহাদিগকে বুঝিতেছি, যাঁহারা গ্রেটবৃটেন, তথা তাহার উপনিবেশ এবং বৈদেশিক ব্রিটিশ-রক্ষণাধীন অঞ্চলসমূহে ব্রিটিশ সরকারের শাসন নীতি প্রবর্ত্তনের জন্য মূলতঃ দায়ী। "ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতা"র এই তালিকার মধ্যে শাসনকার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, শিল্প-বাণিজ্য ব্যবসায়ীদিগকে অন্তর্ভুক্ত করি না, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ তথা ব্রিটিশ রাজ-নৈতিক দলসমূহের কর্ণধারগণ এবং কতিপয় ব্রিটিশ সাংবাদিক, ব্রিটিশ অধ্যাপক, ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক এবং ব্রিটিশ ধর্ম্মযাজককে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতার এই তালিকাভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি, কেন না ব্রিটিশ সরকারের শাসন-নীতি রচনায় তাঁহাদের অনেকখানি ক্ষমতা বর্ত্তমান, ইহাই আমরা দেখিতে পাই। আমাদের মত হইতেছে, এই সকল ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতা তথা ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে তাঁহাদের দোষসমূহ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তাহার সংশোধন সাধন ব্যতীত বর্ত্তমানের এই সর্ব্বনাশা সমস্যাসমূহের সমাধানের আর কোন পন্থা নাই। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রেরণাতেই আমরা ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতা, তথা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কার্য্যকলাপের সমালোচনা করিয়া থাকি। প্রথম হইতে এই পর্য্যন্ত আমরা যাহা লিখিয়া আসিয়াছি, তাহা বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, আমাদের বক্তব্যসমূহ সম্পূর্ণ সত্য। আমাদের রচনাসমূহ অনুধাবন করিলে ইহাও বুঝা যাইবে যে, সূচনায় আমাদের সমালোচনা তীব্রতাহীন এবং পরিমার্জ্জিত ছিল, কিন্তু যথাযোগ্য দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে অসমর্থ হইতেছে দেখিয়া আমাদিগকে ক্রমশঃ উহা তীব্র হইতে তীব্রতর করিতে হইয়াছে।

আমাদের মতে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণজনক স্থায়িত্বের নিমিত্ত এবং সমগ্র মনুষ্যজাতির হিতার্থে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতা, তথা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহের প্রদর্শন প্রয়োজন। পরিবারের যিনি কর্ত্তা, তাঁহার কোন দোষ বর্ত্তমান

না থাকিলে, সেই পরিবারের কোন প্রকার কষ্ট পাইতে হয় না, ইহা জন-সাধারণের বুঝিবার প্রয়োজন। যদি তর্ক উত্থাপিত হয় যে, কর্ত্তার যতই না কেন যোগ্যতা থাকুক, পরিবারের অপর সকল ব্যক্তির কুকার্য্যের ফলেই ঐ পরিবারকে কষ্ট পাইতে হইতেছে, তবে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, কর্ত্তারই কর্ত্তব্য হইতেছে তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিবৃন্দকে এরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং তাঁহাদিগকে এরূপ ভাবে পরিচালিত করা যে, পরিবারস্থ প্রত্যেকটি ব্যক্তি সকল প্রকার কুকার্য্য হইতে বিরত থাকিতে পারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা হইতে অন্ততঃ এক বিষয়ে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া উচিত যে, ইহার কার্য্য-পরিচালনার ভার যাঁহারা প্রধানতঃ দায়ী, তাঁহাদের নিশ্চয়ই কোন গুরুতর ত্রুটি বিদ্যমান, সুতরাং এই সকল রাষ্ট্রনেতার ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে অবহিত করিবার জন্য যাঁহারা ব্যাপৃত, তাঁহাদের কার্য্যে কোন বাধা প্রদান অনুচিত।

জন-সাধারণের কোন সমস্যার সমাধান সরকার ব্যতীত অন্য কোন সংগঠনের দ্বারাই সম্ভব বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের মতে, ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণের যদি শাসন-নীতি-রচনায় কোন ত্রুটিই না ঘটিত, তবে ভারতে কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইত না এবং সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে অসাধু বিবেচনা করিয়া উহাদের উচ্ছেদ সাধন করা হইত। ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণের এই ভ্রান্ত অবস্থায়, ভারতের জাতীয় মহাসভা, অর্থাৎ কংগ্রেসের প্রয়োজন রহিয়াছে, কিন্তু ইহার একমাত্র কর্ত্তব্য হওয়া উচিত, ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণের ভ্রান্তিসমূহ সুযুক্তি সহকারে দেখাইয়া দেওয়া এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ যাহাতে তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন করেন, তদনুরূপ পন্থানুসরণ। আমাদের মতে, ভারতের কংগ্রেস কর্ত্তৃক কখনও ভারতের শাসনভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীবৃন্দের কার্য্যে বাধা উপস্থিত করা উচিত নহে, কেন না, এই ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীবৃন্দ তাঁহাদের কার্য্যকলাপের নিমিত্ত দায়ী নহেন, ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ প্রবর্ত্তিত শাসন-নীতির দ্বারাই তাঁহারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকেন। সমগ্র মনুষ্য-জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয় এই ভারপ্রাপ্ত ব্রিটিশ রাজকর্ম্মচারীদিগের কার্য্যে বাধা-সৃষ্টিকে আমরা পাপ বলিয়া মনে করি। তাঁহার অপেক্ষা ব্রিটিশ জাতির শত্রু আর কেহ নাই, এমন কি সেই কাইজার দ্বিতীয় উইলহেল্ম্ পর্য্যন্ত তাঁহার স্মৃতিগ্রন্থে (Memoirs)। স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, মনুষ্য-মস্তিষ্কে যেরূপ চিন্তা স্থান পাইতে পারে, তন্মধ্যে ব্রিটিশ জাতির সংগঠন এবং শাসনপদ্ধতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে বাণিজ্য লইয়া ঈর্ষা-দ্বেষ, সমাজের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহ যে মূলতঃ আর্থিক অভাব বশতঃ এবং তাহার একমাত্র কারণ যে ভ্রান্ত বিজ্ঞান এবং শিক্ষা-নীতি ইহাই আমাদের অভিমত। মনুষ্যজাতির বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিতে হইলে প্রথমতঃ এমন ব্যবস্থা প্রয়োজন যদ্দ্বারা মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকটি অধিবাসী তাহার জীবনযাপন পক্ষে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য উপার্জ্জনে সমর্থ হইতে পারে। বর্ত্তমান বিজ্ঞান এবং শিক্ষানীতির ভ্রান্তি কোথায় এবং প্রকৃত বিজ্ঞান ও প্রকৃত শিক্ষানীতি কি, জন সাধারণ তাহার সন্ধান লাভ না করিলে ঐ ব্যবস্থা সম্ভব নহে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের এবং শিক্ষানীতির ভ্রান্তি কোথায় এবং তাহা কি ভাবে সংশোধন করিতে হইবে, জন-সাধারণের পক্ষে এই জ্ঞান প্রয়োজন, ইহা যেমন সত্য, তেমনই জন-সাধারণকে যতদিন প্রচুর স্বাস্থ্যপ্রদ আহার্য্যের অভাবে ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পাইতে হইবে, সুতরাং তাহাদের মস্তিষ্ক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকিবে, ততদিন যে জনসাধারণের সকলের পক্ষে এই জ্ঞানলাভ সম্ভব হইবে না, ইহাও সত্য। সুতরাং এমন কতিপয় ব্যক্তির অবশ্য প্রয়োজন, যাঁহাদিগকে অনাহারের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে না। কিন্তু তাঁহাদিগকে সকল বিলাস-বাসনা পরিহার করিতে হইবে এবং উপরিলিখিত বক্তব্য অনুযায়ী গবেষণায় ব্যাপৃত থাকিয়া যাহাতে মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি বেতনভোগী চাকুরীর সহায়তা না লইয়া তাহাদের আর্থিক অভাব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, এমন ব্যবস্থার সংগঠনে ব্রতী হইতে হইবে। অনাহার এবং বেকার-সমস্যার সমাধান হইলে, অতঃপর সমাজে সু-শিক্ষা প্রচলনের ব্যবস্থা অনুসরণ করিতে হইবে। যখন অধিকাংশ, অর্থাৎ শতকরা প্রায় পঁচানব্বই জন ব্যক্তি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট পাইতেছে, তখন জন-সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার কিংবা শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে কোন আলোচনা উত্থাপন পর্য্যন্ত নিরর্থক।

মনুষ্যজাতির বর্ত্তমান বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় এই একটি মাত্র বলিয়া আমাদের বিশ্বাস এবং অচিরাৎ যদি কোন প্রকৃত বুদ্ধিশালী এবং ক্ষমতাবান্ ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়া এতদনুযায়ী কার্য্যপন্থা অবলম্বন না করেন, তবে লিখিত ইতিহাস-কালের মধ্যে যেরূপ বিশৃঙ্খলা কোনদিন দেখা যায় নাই, সমগ্র জগৎ তন্মধ্যে নিপতিত হইবে।

কেবল ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের সহযোগিতার দ্বারাই আর কিছুতেই নহে, এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইতে পারে, ইহাই আমাদিগের অভিমত। আমাদের এই মতের কারণ এই যে, আমাদের গবেষণানুযায়ী, এতৎকল্পে জমীর সর্ব্বনিম্ন স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির সংরক্ষণের অপরিহার্য্য-রূপে সংযোজন এবং সর্ব্বনিম্ন স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বলিতে যাহা বুঝিতে হইবে, বর্ত্তমান বিজ্ঞান এবং সভ্যতার কার্য্যকলাপ বশতঃ পৃথিবীর প্রত্যেক অঞ্চলের জমী তদপেক্ষা অনেক কম শক্তিশালী হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষ সূর্য্য এবং চন্দ্রের অবস্থানে তাহার ঘূরত্ব এবং ভৌগিক কারণে এমন একটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, মাত্র সাত বৎসর কালের মধ্যে ভারতের জমীর সর্ব্বনিম্ন স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির পুনরুদ্ধার সম্ভব, আমরা এই মত পোষণ করি। সমগ্র মনুষ্যজাতি বর্ত্তমানে আধার্য্য ও কাঁচামালের যে ঘাটতি ভোগ করিতেছে, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে পূরণ করিবার নিমিত্ত যাহা প্রয়োজন, তাহা ভারতের জমী হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে। ভারতে যাহা কেবল সাত বৎসর কালের মধ্যে সম্ভব, পৃথিবীর অপর কোন দেশে তাহা সত্তর বৎসর অপেক্ষা অনধিক কালে সম্ভব নহে। ভারতীয় ঋষিগণ তাঁহাদের মূল গ্রন্থে যেরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ব্রিটিশগণ যদি সেই পন্থা শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী কার্য্যে অগ্রসর হন, তবেই ভারতের জমীর এই স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির উপরি-লিখিত প্রকার পুনরুদ্ধার সম্ভব; কেন না, ভারতের শাসন-কার্য্যের দায়িত্ব তাঁহাদেরই উপর প্রকৃত প্রস্তাবে ন্যস্ত রহিয়াছে। এই জন্যই আমাদের বক্তব্য যে, কেবল ভারত এবং ইংলণ্ডের সহযোগিতাই মনুষ্যজাতিকে তাহার বর্ত্তমান দুঃখদুর্দ্দশা হইতে বাঁচাইতে পারে।

এই সহযোগিতা যদি স্থাপিত না হয়, তবে অনিবার্য্য বিপর্য্যয়ের নিমিত্ত পৃথিবীবাসীকে প্রস্তুত হইতে হইবে। অর্থাৎ আমাদের বক্তব্য হইতেছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব কেবল ভারতবাসী এবং ব্রিটনদিগের জন্যই নহে, পরন্তু সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রত্যেকের জন্যই আবশ্যক।

তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিপন্ন হইলে, কিংবা আমাদের নৃপতি ও সম্রাটকে তদ্বিষয়ে উল্লেখ করিতে দেখিলে আমরা কষ্ট বোধ করি। আমাদের এই কষ্টবোধ বস্তুতঃ কিরূপ সুতীব্র, ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত সন্দর্ভ হইতে তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

স্বদেশবাসী জন-সাধারণের সমস্যার সমাধান উদ্দেশ্যে জার্ম্মানী এবং ইটালীর নির্দ্দোষ কর্ণধারসদৃশ ব্যক্তিবৃন্দকে যখন সমরদিগ্দু বলিয়া দেখা যাইতেছে, তখন এইরূপ আক্রমণেচ্ছুদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা ব্যতীত ইংলণ্ডের কোন গত্যন্তর নাই, ইহা আমরা স্বীকার করি। ইংলণ্ডকে এই যুদ্ধ হইতে কাপুরুষের ন্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইবার অনুরোধ করা আমাদের পক্ষে নির্ব্বুদ্ধিতা, কিন্তু আমাদের রচনাসমূহ মনো-যোগসহকারে পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, কুত্রাপি আমরা সেইরূপ নির্দ্দেশ দান করি নাই। আমরা নির্দ্দেশ দান করিয়াছি যে, জার্ম্মানগণ যুদ্ধের যে পদ্ধতি প্রদর্শন করিতেছে, ইংলণ্ড তাহা পরিহার করিয়া যুদ্ধ-ঘোষণা করুন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধে শেষতঃ জয়ী হইবার পক্ষে ইংলণ্ড যে অসাধারণ এবং অদ্ভূতপূর্ব্ব পন্থার অধিকারী, তাহাই প্রদর্শন করুন। যাঁহারা জার্ম্মানগণের অনুসৃত যুদ্ধ-পরিচালনার পক্ষপাতী এবং ইংলণ্ডকে তাহাই অবলম্বন করিতে বলিতেছেন, আমরা তাঁহা-দিগকে নির্ব্বোধ অভিহিত করি। আমাদের পাঠ-প্রণালী অনুসারে, ভারতীয় ঋষিগণ তাঁহাদের রচনায় কোন সাম্রাজ্যকে তাহার সর্ব্ববিধ বিপৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার পন্থার নির্দ্দেশ দান করিয়া গিয়াছেন; আমাদের বড়লাট বাহাদুর এবং তাঁহার মধ্যস্থতায় ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ও ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা যাহাতে ঐ নির্দ্দেশ কি, তাহা জানিতে উদ্গ্রীব হন, আমাদের ইহাই কাম্য। আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, কোন সরকারের বিরুদ্ধে কোন জন-সাধারণের কোন প্রকার বিদ্বেষ উদ্রেক করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে এবং জন-সাধারণের সমস্যাসমূহের সমাধানকল্পে সরকার ব্যতীত আমরা অপর কোন প্রকার প্রতিষ্ঠানে আস্থাবান্ নহি। যদি আমাদের

কার্যে কোন প্রাদেশিক সরকার বাধা দান করেন, তবে আমাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে, কিন্তু আমরা মনে করি, এই ভাবে আমাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করা যে-কাহারও পক্ষে পাপ। কুইনিন্ তিক্ত হইলেও কয়েক প্রকার জ্বর হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার পক্ষে ইহাই সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ।

ভগবান্ আমাদিগের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায় হউন।*

## পঞ্চবিধ স্বাধীনতা : "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রিকার সাংবাদিক জ্ঞান এবং রাষ্ট্রনীতি জ্ঞানের নমুনা

"ষ্টেট্‌স্‌ম্যান"-নামীয় কলিকাতা হইতে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রের গত ১৩ই জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত "পঞ্চবিধ স্বাধীনতা ( Five Freedoms )" শীর্ষক সম্পাদকীয় সন্দর্ভ সম্মুখে রাখিয়া আমরা বর্তমান সন্দর্ভ রচনায় অগ্রসর হইতেছি।

পাঠকবর্গ বিদিত আছেন যে, কিয়ৎকাল পূর্বে মার্কিন যুক্তরাজ্যের সভাপতি রুজভেল্ট পৃথিবীর শান্তি-বিধানার্থ মূলভিত্তি হিসাবে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করেন, (১) বোমার ভয় হইতে মুক্তি, (২) জ্ঞানবিষয়ক এবং বার্তাবিষয়ক স্বাধীনতা, (৩) ধর্মবিষয়ক স্বাধীনতা, (৪) মনোভাব প্রকাশের স্বাধীনতা এবং (৫) অভাব হইতে মুক্তি।

এই পাঁচটি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রিকার "পঞ্চবিধ স্বাধীনতা ( Five Freedoms )" শীর্ষক সন্দর্ভ রচিত। সম্পাদক দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই পাঁচটি বিষয় একদলপ্রধান রাষ্ট্র ( totalitarian State ) অপেক্ষা গণতন্ত্রে ( democratic State ) অধিকতর রূপে কার্যে রূপান্তরিত হইতে পারে। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন, "এই পঞ্চবিধ স্বাধীনতা জগতে বিরাজমান থাকিলে, অত্যন্ত সুখের বিষয় হইবে। মনুষ্য-জীবন আজিও যে-স্তরে উঠিতে পারে নাই, সেই স্তরে পৌঁছাইবে, ইত্যাদি (It would be a much happier world in which these five freedoms existed. Human life would be on a level that it has never touched···&c)." আমাদের এই সন্দর্ভ পাঠ করিবার পূর্বে যাঁহাদের পক্ষে সম্ভব তাঁহারা যেন 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকার "পঞ্চবিধ স্বাধীনতা ( Five Freedoms )" শীর্ষক সন্দর্ভটি অতিশয় মনোযোগসহকারে পাঠ করেন।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, তথা "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রিকার যে-সম্পাদক এই "পঞ্চবিধ স্বাধীনতা ( Five Freedoms )" শীর্ষক সন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা "জ্ঞানবিষয়ক এবং বার্তাবিষয়ক স্বাধীনতা", "ধর্মবিষয়ক স্বাধীনতা," "মনোভাব-প্রকাশবিষয়ক স্বাধীনতা" ইত্যাদি উক্তির দ্বারা কি বুঝেন, তাহা আমরা সম্যক্ অনুধাবন করিতে পারিলাম না; কিন্তু আমরা জানি যে, "জ্ঞান," "বার্তা," "ধর্ম" এবং "মনোভাব-প্রকাশ" ইত্যাদি পদের আভিধানিক শব্দ-বিজ্ঞান অনুসারে ধাতুগত এক একটি নির্দিষ্ট অর্থ বিদ্যমান, এবং যেমন "কৃষ্ণ সূর্য", "রক্ত চন্দ্র," "চতুষ্কোণ বৃত্ত" পদ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইতে পারে না, তেমনই "জ্ঞানবিষয়ক এবং বার্তাবিষয়ক স্বাধীনতা," "ধর্মবিষয়ক স্বাধীনতা", "মনোভাব প্রকাশ বিষয়ক স্বাধীনতা" ইত্যাদি পদও সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইতে পারে না। "জ্ঞান", "বার্তা", "ধর্ম" এবং "মনোভাব-প্রকাশ" ইত্যাদি পদের ধাতুগত অর্থ যথাযথরূপে উপলব্ধি করিয়া আয়ত্ত করিতে পারিলে অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে, কোন সমাজ যদি "জ্ঞানবিষয়ক স্বাধীনতা," অথবা "বার্তাবিষয়ক স্বাধীনতা", অথবা "ধর্মবিষয়ক স্বাধীনতা," অথবা "মনোভাব প্রকাশ বিষয়ক স্বাধীনতা"র জন্য চেষ্টিত হয়, তবে সে-সমাজ মনুষ্যের বাস-পক্ষে নিকৃষ্টতম হইয়া পড়িতে বাধ্য।

এমন কি "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রিকার সম্পাদক এই সকল বিষয়ে, অর্থাৎ জ্ঞান এবং বার্তা, ধর্ম এবং মনোভাব-প্রকাশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহা হইতেও প্রমাণিত হইবে যে, যে সমাজে জ্ঞান এবং বার্তা, ধর্ম এবং মনোভাব-

* "দি ইষ্টার্ণ বসুশ্রী"র ১৩৪৯ সনের শ্রাবণ অধিবেশের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

প্রকাশের স্বাধীনতা বিদ্যমান, তাহা মনুষ্য-বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িতে বাধ্য।

সম্পাদক বলিতেছেন, "ইহাতে জন-সাধারণ ক্রুদ্ধ হইলে ক্রুদ্ধভাবের বক্তৃতার সাহায্যে ক্রোধের উপশম বোধ করিতে পারে, তাহাদের পূজা-পদ্ধতির জন্য নিগ্রহ ভোগ করিতে হয় না এবং সামান্য মাত্র নিষেধ স্বীকার করিয়া লইলেই তাহারা যেরূপ ভাবে চিন্তা করে, সেইরূপ ভাবের কথা বলিতে পারে এবং রচনা প্রকাশ করিতে পারে ( In these men can find the relief of angry speech when they are angry, they are not persecuted for their methods of worship, they can say and write what they think, with small limitations )" সম্পাদক এই "সামান্য মাত্র নিষেধ স্বীকার (with small limitations)" বলিতে কি বুঝিতেছেন, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আমরা "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" যেরূপ বলিতেছেন, তদনুযায়ী সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জ্ঞান এবং বার্ত্তা, ধর্ম্ম এবং মনোভাব-প্রকাশ বিষয়ে সামান্য মাত্র নিষেধ বিদ্যমান রহিয়াছে, এইরূপ ধরিয়া লইতেছি। অতঃপর উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাউক, এই কলিকাতা সহরে সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভাবে ঐ ত্রিবিধ স্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং জন-সাধারণ ক্রুদ্ধ হইলে তাহাদিগের ক্রুদ্ধ মনোভাব-প্রকাশক বক্তৃতা দান করিয়া তাহার উপশম করিবার অনুমতি লাভ করিয়াছে, তাহাদিগের পূজা-পদ্ধতির নিমিত্ত কোন নিগ্রহ ভোগ করিতে হইতেছে না এবং যেরূপ খুসী চিন্তা করিয়া তাহারা কথা বলিতে এবং রচনা প্রকাশ করিতে পাইতেছে। এই কলিকাতা সহরের দুইজন অধিবাসী আছেন, একজনের নাম আর্থার মুর এবং অপর জনের নাম মিঃ ওয়ার্ডসোয়ার্থ এবং তাঁহারা উভয়েই "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগ-সংশ্লিষ্ট। তাঁহাদিগকে আমরা সদাশয় প্রকৃতির ব্যক্তি বলিয়াই জানি, ইংলণ্ড হইতে বার্ত্তাবিদ্যায় কিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহারা এদেশে আসিয়াছেন। কিন্তু ধরা যাউক, এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাহাদের মিঃ আর্থার মুর যে অতিশয় স্ফীত-মস্তিষ্ক এবং সঙ্কীর্ণ-দৃষ্টি, তথা মিঃ ওয়ার্ডসোয়ার্থ যে একটি 'আকাট-মূর্খ' অথচ নিজের বিদ্যাবত্তা বিষয়ে অত্যন্ত 'হাম-বড়া' এইরূপ ধারণা বর্ত্তমান। এই সকল ব্যক্তির মিঃ আর্থার মুর এবং মিঃ ওয়ার্ডসোয়ার্থ সম্বন্ধে মনোভাব ভাল নহে, উপরন্তু তাঁহারা ভ্রান্ত-সংবাদবশতঃ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান"-এর এই দুইজন সম্পাদক কলিকাতার ব্রিটিশ এবং ভারতীয় উভয় সমাজের বহু অনিষ্ট সাধন করিতেছেন এবং এই ভ্রান্ত সংবাদের জন্য তাঁহারা উভয়ের ( মিঃ আর্থার মুর এবং ওয়ার্ডসোয়ার্থের ) বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্থির করিলেন যে, উহাদিগকে কলিকাতা হইতে পদাঘাতে বহিষ্কৃত করিতে হইবে। মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইলে, তাঁহারা একটি দল গঠনের উদ্দেশ্য-সাধনার্থ জনসভা আহ্বান করিয়া তাহাতে ক্রুদ্ধ বক্তৃতা দান করিলেন এবং মিঃ ওয়ার্ডসোয়ার্থ এবং মিঃ আর্থার মুরকে "বোকা" "আকাট-মূর্খ," "গর্দ্দভ" ইত্যাদি, আখ্যায় অভিহিত করিয়া তাঁহাদিগকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য তাঁহাদিগের আবাসবাটীর সম্মুখে উপনীত হইয়া উহার জানালা লক্ষ্য করিয়া ইষ্টক নিক্ষেপ করিতে থাকিলেন।

মিঃ আর্থার মুর এবং মিঃ ওয়ার্ডসোয়ার্থ, উভয়েই ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন না, কেন না, তাঁহারা জ্ঞান-বিষয়ক ও বার্ত্তা-বিষয়ক, তথা মনোভাব-প্রকাশ-বিষয়ক স্বাধীনতার পক্ষপাতী। আমরা কেবল "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রিকার সম্পাদক বর্গকে জিজ্ঞাসা করিব যে, উপরে তথাকথিত জ্ঞান-বিষয়ক ও বার্ত্তা-বিষয়ক এবং মনোভাব-প্রকাশ বিষয়ক স্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত হইলে কি অবস্থা দাঁড়াইতে পারে, তাহার উদাহরণ স্বরূপ যে-চিত্রের অবতারণা করা হইল, তাহা সত্যই সংঘটিত হইলে তাঁহাদের কেমন বোধ হইবে? ইহা কি মনুষ্য-বাসের অযোগ্যতার দৃষ্ট নহে?

অতঃপর আর একটি দৃষ্টান্ত ধরা যাউক, সমাজে ধর্ম্ম-বিষয়ক স্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত হইলে, তাহার চিত্র কিরূপ দাঁড়াইতে পারে। "ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে"র সম্পাদকবর্গের মতে পূজা-পদ্ধতির নিমিত্ত জন-সাধারণকে নিগৃহীত করা চলিবে না, ইহা মনে রাখিতে হইবে। অতঃপর কল্পনা করুন যে, কলিকাতায় এমন একটি সম্প্রদায় বিদ্যমান, যাহাদের পূজা-পদ্ধতিতে মনুষ্য-রক্তের প্রয়োজন এবং তাহারা বিবেচনা করিল যে, এতদুদ্দেশ্যে "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান"-এর দুই একটি সম্পাদকের রক্ত হইলে মন্দ হয় না, সুতরাং তাহারা ঐ কার্য্যে অগ্রসর হইল। "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রিকার সম্পাদকবর্গ ইহার প্রতিবাদ করিতে

পারেন না, কেন না, তাঁহাদের মতে জন-সাধারণকে তাহাদের পূজা-পদ্ধতির জন্য নিগৃহীত করা চলিতে পারে না। কিন্তু এই চিত্র যদি বাস্তব ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা কেমন বোধ করিবেন, ইহা তাঁহারা কল্পনা করিবেন কি?

"ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে এই শ্রেণীর নির্ব্বোধ লেখকের স্থান হয়, ইহা বাস্তবিক পক্ষে অনুকম্পার বিষয়। পুণ্যস্মৃতি ডক ডেভিড ইস্কুলের উদ্যোগ-সংকুল পবিত্র প্রতিষ্ঠান কি আজ কতিপয় অসার এবং নির্ব্বোধ ব্যক্তির লীলাস্থলে পরিণত হইয়াছে!

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ওষ্ঠ হইতে এইরূপ চিন্তাধারা নিঃসৃত হইতে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই নাই, কেন না, অনেক দিক্ হইতে সামর্থ্য-সম্পন্ন হইলেও, যে-জাতির তিনি মুখপাত্র, তাহা শৈশব অতিক্রম করিতে পারে নাই। আমাদের মতে, মিস্ত্রী এবং যন্ত্র-শিল্পী (engineer) জাতি হিসাবে, এমন কি কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প-ব্যাপারে পর্য্যন্ত আমেরিকা চেষ্টা করিলে উচ্চ পর্য্যায়ে উপনীত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বুদ্ধিবৃত্তির আদর্শ সাধন তদ্দ্বারা কখনও সম্ভব নহে। সূর্য্য এবং চন্দ্রের সহিত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সম্পর্ক বর্ণনা করিতে পারিয়াছে, এরূপ অভ্রান্ত জ্যোতিষমূলক কৃষিজাত সম্পূর্ণ এবং নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে আমাদের এই উক্তির যাথার্থ্য সহজে উপলব্ধিযোগ্য হইবে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং বহুকোণ, উভয়েই এই জ্যোতিষমূলক কৃষিজা আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের কোন ভ্রান্তিহীন অনুবাদ নাই, সুতরাং সাধারণ পাঠক উহা বিশুদ্ধ অর্থে পাঠ করিতে পারেন না, কেন না, শব্দ-স্ফোট পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে উহা যথার্থ অর্থে পাঠ করা যায় না। এই জ্যোতিষমূলক কৃষিজা প্রকৃত অর্থে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মহাদেশসমূহের মধ্যে আমেরিকা প্রতি বাদশ সহস্র বৎসর কালের প্রত্যেক পর্ব্বে তিন সহস্র বৎসর কাল ধরিয়া জল-স্থলে নিমজ্জিত থাকে, সুতরাং প্রকৃত বুদ্ধি-বৃত্তির আদর্শ-সাধন কল্পে যে-অভিজ্ঞতা লাভ অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়, তাহা আমেরিকার অধিবাসী কর্ত্তৃক অর্জ্জিত হইতে পারে না।

"জ্ঞান," "বার্ত্তা" "ধর্ম্ম," এবং "মনোভাব-প্রকাশ" ইত্যাদি পদের ধাতুগত অর্থ ভাষানিহিত শব্দ-বিজ্ঞান অনুযায়ী সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়া আয়ত্ত করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যেরূপ অন্ধকারে কোন যোগফল, কোন বিয়োগফল, কোন গুণফল, কিংবা কোন ভাগফলের যাথার্থ্য একটি মাত্র, সেইরূপই যথার্থ জ্ঞান, যথার্থ বার্ত্তা, যথার্থ ধর্ম্ম এবং যথার্থ মনোভাব-প্রকাশের সামর্থ্য অর্জ্জন এবং তাহার শিক্ষা প্রণালী শেষ পর্য্যন্ত মাত্র একটি হইতে বাধ্য এবং উহাদের কোন একটি বিষয়ে, কোন প্রকার স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকিতে পারে না। এইরূপ কোন স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকিলে সমাজে ত্রুটিবিচ্যুতি এবং বিশৃঙ্খলা নিশ্চয়ই বিরাজ করিবে। বর্ত্তমান সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি বিজ্ঞতার অভিনয়কারী মূর্খ বলিয়াই, এই সমাজে জ্ঞান-বিষয়ক স্বাধীনতা, বার্ত্তাবিষয়ক, ধর্ম্মবিষয়ক এবং মনোভাব-প্রকাশ-বিষয়ক স্বাধীনতার কথা উত্থাপিত হইয়াছে।

আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটি কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা প্রমাণ করিতে আমরা সমর্থ, কিন্তু ইহাতে সন্দর্ভ দীর্ঘ হইয়া যাইবে এবং উহার মধ্যে এমন অনেক কথা আসিয়া পড়িবে, যাহা সাধারণ পাঠকের সুবোধ্য হইতে পারে না। সুতরাং সেই আলোচনায় বিরত থাকিতে হইল। আমরা যাহা বলিতেছি, তাহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোন পাঠকের সন্দেহ থাকিলে তিনি পূর্ব্বাহ্নে জানাইয়া আমাদিগের নিকট আসিলে আমরা তাঁহার সন্দেহ নিরসন করিতে সানন্দে প্রস্তুত আছি।

"ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রিকার সম্পাদক অভাব-মুক্তি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "অভাব হইতে নিষ্কৃতির সুনিশ্চিত পন্থা কুত্রাপি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই (freedom from wants has nowhere been assured.)" এবং আর্থিক অভাব হইতে নিষ্কৃতির সাধন-চেষ্টায় অগ্রসর হইতে হইলে "কি ভাবে তাহা আরম্ভ হইবে (where is the beginning to be made)" তাহা তাঁহার জানা নাই, ইহা জানাইয়াছেন। আশ্চর্য্য এই যে, তথাপি তিনি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নির্দ্দেশ সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা প্রচার করিয়াছেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, যতদিন পর্য্যন্ত সম্পাদক নিজে না অবগত হইবেন কি করিয়া আর্থিক অভাব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়, ততদিন পর্য্যন্ত আর্থিক অভাব হইতে নিষ্কৃতি লাভ সম্ভব কি না, তাহাও তিনি জানিতে পারেন না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং

এই বিষয়ক কোন নির্দেশ সম্বন্ধে তাঁহাকে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতে দেখিলে স্বভাবতঃই তাঁহা হৃদয়ের বিষয় হইয়া উঠে, কেন না, ঐ নির্দেশ অনুযায়ী কার্য্য করিতে গেলে হয় তো বাস্তব ক্ষেত্রে উহা প্রয়োগের অযোগ্য বলিয়া দেখা যাইতে পারে।

কোন বহুল-প্রচারিত সংবাদপত্রের যে সম্পাদকবর্গ তাঁহাদের রচনাকে এই প্রকার অসামঞ্জস্য হইতে মুক্ত করিতে পারেন না, তাঁহাদের দ্বারা কার্য্য-পরিচালনা বস্তুতঃ হাস্যকর।

যে-সম্পাদক লিখিবার দুঃসাহস দেখান যে, "আর্থিক অভাব হইতে মুক্তি সুনিশ্চিত ভাবে কুত্রাপি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই (freedom from wants has nowhere been assured)," তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহার জ্ঞানের পরিধি কতখানি এবং জগতের কয়টি মনস্বীর চিন্তাধারার পরিচয় তিনি লাভ করিয়াছেন। কেন না, "আর্থিক অভাব হইতে মুক্তি সুনিশ্চিত ভাবে কুত্রাপি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই," ইহা বলিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে হইলে সমগ্র প্রকৃত সত্য-সন্ধ বাক্তির, তথা সমগ্র চিন্তারাশি এবং সমগ্র সত্যের সহিত পরিচয়লাভ নিশ্চিত ভাবে আবশ্যক। এই ক্ষীণ-মস্তিষ্ক সম্পাদকবর্গ যে প্রায়শঃ কিছুই জানেন না এবং তাঁহাদের পাঠের পরিধিও যে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, ইহা আমরা জানি। কেন না, আমরা সংস্কৃতে রচিত এক ডজনেরও অধিক প্রাচীন গ্রন্থের সহিত পরিচিত, যাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে, কি ভাবে এরূপ সমাজ সংগঠন করিতে হইবে যে, উহার লোক-সংখ্যা যত অধিকই হউক না কেন, প্রত্যেকটি ব্যক্তি জীবনধারণার্থ সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য অর্জ্জন করিতে পারে, এবং কেবল আর্থিক অভাব হইতে নহে, শারীরিক অস্বাস্থ্য, মানসিক অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যুর কবল হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিতে পারে।

গীতায় "নাভাবো বিদ্যতে সতঃ," এই বাক্যের যাহা মর্ম্ম—জমী এবং জীবের উৎপাদনসামর্থ্য সৃষ্টি এবং রক্ষা কি করিয়া হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে কোন প্রকার অভাব বিদ্যমান থাকিতে পারে না—ইহা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া আত্মস্থ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঐ একটি মাত্র বাক্যে প্রত্যেকটি ব্যক্তি এবং প্রতিটি জাতি কি করিয়া অভাব হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, তাহার নীতিসমূহ নিহিত রহিয়াছে। আমাদের পত্রিকার সূচনাবধি আমরা এই আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তির কবল হইতে নিষ্কৃতি-লাভের পন্থার আলোচনা করিয়া আসিতেছি। যে ব্যক্তি আমাদের রচনা-সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়াছেন, তিনি যে—আমরা যদি বলি, প্রত্যেক সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি কি ভাবে আর্থিক অভাব হইতে মুক্তি লাভ করিবে, তদনুযায়ী সংগঠনের উপায় বিদ্যমান,—তাহা সমর্থন করিবেন, ইহা জোর করিয়াই বলিতে পারি।

জমীর সর্ব্বনিম্ন স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি কি, তাহা বুঝিয়া প্রত্যেক দেশের স্বাভাবিক নদীস্রোতের প্রতিবন্ধক-সমূহ দূর করিয়া যদি ঐ দেশের জমীর সর্ব্বনিম্ন স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির পুনরুদ্ধার করা যায়, তবে আর্থিক অভাব হইতে কষ্টভোগ অতীতের ইতিহাস হইয়া পড়িবে। তদুপরি জনসাধারণকে যদি এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায়, যাহাতে তাহারা রিপুদমন করিতে পারে, তবে অস্বাস্থ্য এবং অশান্তি হইতে কষ্টভোগেরও অবসান ঘটিবে। স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি এবং রিপুদমনসহায়ক শিক্ষার এই দুই কার্য্যসূত্র যে, আর্থিক দুর্দ্দশা, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তির সমস্যার সমাধানে সমর্থ, তাহা অনায়াসেই প্রমাণিত হইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত কতিপয় সংখ্যায় আমরা ইহা প্রমাণ করিয়াছি এবং প্রয়োজন হইলে ইহা পুনর্ব্বার করিব।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে কি প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি প্রবিষ্ট হইতে যাধা, বর্ত্তমানে তাহার আলোচনা করিবার আমাদের ইচ্ছা নাই। আমাদের মত এই যে, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগণিত তারকা যাহা করিতে পারে না, একমাত্র সূর্য্য তাহা করিতে পারে, তেমনই উপযুক্ত নৃপতি কিংবা উপযুক্ত ডিক্টেটর একজন যাহা করিতে পারেন, তাহা জনসাধারণের বহুসংখ্যক অযোগ্য প্রতিনিধির দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। বর্ত্তমান একদলপ্রধান রাষ্ট্রসমূহের কোন একজন ডিক্টেটরকেই অবশ্য আমরা উপযুক্ত পরিমাণে যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি না। প্রত্যেক কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন জাতি যে বর্ত্তমানে গণতন্ত্র দাবী করিতেছে, তাহার কারণ উপযুক্ত ডিক্টেটর হইতে হইলে যে-পরিমাণ যোগ্যতার প্রয়োজন, তাহার সম্পূর্ণ অভাব ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় অগত্যা রাষ্ট্রশাসন-কার্য্য এক গণতান্ত্রিক

শাসনপদ্ধতি ব্যতীত আর কোন পদ্ধতিতে সম্ভব নহে। কিন্তু ইহা দৃষ্টিবহির্ভূত থাকিলে চলিবে না যে, গণতন্ত্র জটিল গ্রন্থিসমূহ সৃষ্টি করিতে বাধ্য।

বর্তমানে "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" যেরূপ সম্পাদকবর্গকর্তৃক চালিত হইতেছে, তদপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তিবৃন্দ উহার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করুন, ইহাই আমাদের কামনা।*

## মিঃ বাটলার এবং ফ্রান্সে হিটলারের কৃষি-প্রতিষ্ঠা

ইংলণ্ডের সহকারী-পররাষ্ট্রসচিব মিঃ বাটলার কিছুদিন পূর্বে রেডিয়ো-মারফৎ ঘোষণা করেন যে, হিটলার ফরাসী জনসাধারণের কার্য-নিয়োগার্থ ফ্রান্সের সর্বত্র কৃষি-প্রবর্তন করিতেছেন এবং তাঁহাদের শিল্প-সংগঠনের উচ্ছেদ সাধনে অগ্রসর হইয়াছেন। নিঃসন্দেহে হিটলার-তন্ত্রে জনসাধারণের জীবন কিরূপ দুর্বিষহ হইয়া উঠিবে, ইহাই প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্য লইয়া মিঃ বাটলার এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের আশঙ্কা হয় যে, এই শ্রেণীর ঘোষণার ফল বিপরীত হইবে এবং ইহাতে হিটলার-তন্ত্রের প্রতি অনেকে পক্ষপাতী হইয়া উঠিবে। ইহার কারণ এই যে, কৃষি এবং শিল্প-তন্ত্রের তুলনামূলক কোন বিচারে অগ্রসর হইলে দেখা যায় বর্তমান ব্যবস্থায় শিল্প-তন্ত্র অপেক্ষা কৃষির অধিক পক্ষপাতী হইবার হেতু বিদ্যমান এবং বর্তমানে জগতের প্রত্যেক সভ্য দেশ ও জাতি কৃষি-অপেক্ষা শিল্প-তন্ত্রের অধিক পক্ষপাতী হইয়াছে বলিয়াই প্রধানতঃ তাহাদিগকে নিম্নলিখিত আর্থিক দুর্দশাসমূহ হইতে কষ্ট পাইতে হইতেছে, যথা (১) বাজে এবং কাঁচামালের ঘাটতি, (২) অনাহার, (৩) বেকার অবস্থা ইত্যাদি। শিল্প তন্ত্র অপেক্ষা কৃষি কেন অধিকতর বাঞ্ছনীয়, তাহার সন্ধানলাভ করিতে বিশেষ বেগ পাইতেও হইবে না।

যিনি যথাযথভাবে ধারণা করিতে পারিবেন, তাঁহার বুঝিতে কষ্ট হইবে না যে, কৃষি-ব্যতীত কোন ক্ষেত্রেই শিল্প চলিতে পারে না। কেননা, শিল্পের পক্ষে কাঁচামাল অপরিহার্য এবং কৃষি (শব্দ-কোটানুযায়ী ইহার অর্থ, মৃত্তিকালাভ দ্রব্যের কার্য) ব্যতীত কোন কাঁচামাল মিলিতে পারেনা। কেবল ইহাই (অর্থাৎ কৃষি ব্যতীত কোন শিল্প চলিতে পারে না, এই সত্য) নহে, উপরন্তু ইহাও সত্য যে, শিল্পসমূহের জন্য যে সংগঠন, তাহাতে কর্মনিয়োগের সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং কখনও কখনও উহা অস্বাস্থ্যকর। অন্যদিকে কৃষি-ব্যবস্থা যদি সমাক্ প্রকারের হয়, তবে তাহাতে প্রত্যেক জাতির এবং প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাস্থ্যকর ভাবে কর্মনিয়োগের সম্ভাবনা। কিন্তু তাহা হইলেও, শিল্পেরও প্রয়োজনীয়তা আছে এবং কোন জাতিরই মাত্র কৃষি লইয়া পড়িয়া থাকা অনুচিত। প্রত্যেক জাতিরই কৃষি এবং শিল্প, উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, কেন না, যেমন কৃষি ব্যতীত কোন প্রকার শিল্পই চলিতে পারে না, তেমনই শিল্প (শব্দকোষ অনুযায়ী ইহার অর্থ, কাঁচামালকে ব্যবহার্য দ্রব্যে পরিবর্তন) ব্যতীত জীবন-যাপন সুচারুরূপে নির্বাহিত হইতে পারে না। পাঠকদিগকে অবহিত হইতে বলি যে, আমাদিগের মতে শিল্প-তন্ত্রের ত্রুটি নিম্নলিখিত বিবিধ, যথা :—

(১) শিল্প-তন্ত্র কর্তৃক কর্মনিয়োগ-সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ;

(২) তাহাও (অর্থাৎ শিল্পতন্ত্র কর্তৃক কর্মনিয়োগ) আবার কখনও কখনও অস্বাস্থ্যকর।

হাতে-কলমে শিল্প-ক্ষেত্রে যাঁহাদের সামান্য মাত্রও জ্ঞান-লাভ হইয়াছে, শিল্প-তন্ত্রে যে কর্মনিয়োগ-সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, ইহা তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। ইহা (অর্থাৎ হাতে-কলমে শিল্পক্ষেত্রে সামান্য মাত্র জ্ঞান) হইতে বুঝা যায় যে, ব্যক্তিগত ভাবে স্বাভাবিক দ্রব্যের যাহা মোট পরিমাণ দাঁড়ায়, একটি জাতির সেই সচরাচর ব্যবহার্য দ্রব্যের অধিক শিল্প-দ্রব্য উৎপন্ন করা অনুচিত। জীবন-যাত্রার মান-বৃদ্ধির নামে যদি কোন ব্যক্তি কিংবা জাতির ব্যবহার্য দ্রব্যের অনুপাত বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হয়, তবে তাহার ফলে জাতির শারীরিক এবং নৈতিক উভয় উৎকর্ষেরই

* "যদি ষ্টেট্‌স্‌ম্যান বঙ্গশ্রী'র হস্তে মুদ্রাই সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সম্পর্ক হইতে।

অনিষ্ট সাধিত হয়। চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ অথবা উৎপাদন অধিক হইলে শিল্প-সমূহ অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে নষ্ট হইতে থাকে এবং তাহার ফলে শিল্প-সমূহের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়িতে থাকে।

এই সকল সত্য মনে রাখিয়া সমগ্র মনুষ্য-জগৎকে একটি পরিবার মনে করিয়া লইলে দেখা যাইবে যে, সমগ্র পরিবারের সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় যাবতীয় শিল্প-দ্রব্য সমগ্র পূর্ণবয়স্ক পুরুষ অধিবাসী-সংখ্যার শতকরা মাত্র দশ জনের দ্বারাই উৎপন্ন হইতে পারে—অবশ্য যদি যন্ত্র-চালিত শিল্পের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করা যায় এবং কেবল কুটীর-শিল্প অবলম্বিত হয়। যন্ত্র-চালিত শিল্প-ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে সমগ্র পূর্ণবয়স্ক পুরুষ অধিবাসী সংখ্যার শতকরা দুই জনের অধিক কর্মনিযুক্ত থাকিতে পারে না। শিল্প-তন্ত্রের মধ্যস্থতায় এই সংখ্যা অপেক্ষা অধিকতর কর্মনিয়োগের চেষ্টা করিলে, তাহাতে অতিরিক্ত শিল্প-দ্রব্য উৎপন্ন হইতে থাকা, অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ দেশ এবং জাতির প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইয়া পড়ে। ইহার ফলে বিদেশের বাজার সন্ধানের প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হয়, তাহাতে ( অর্থাৎ বিদেশে বাজার প্রতিষ্ঠার এই চেষ্টায় ) প্রতিযোগিতা, কলহ এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত হইয়া থাকে, সুতরাং শেষতঃ শিল্প-সংগঠনের ভিত্তি পর্যন্ত বিধ্বস্ত হয়। বর্তমান শিল্প-জগৎ এইরূপ অবস্থায় আসিয়াই উপনীত হইয়াছে।

শিল্প-তন্ত্রের অধীন কর্মনিয়োগ যে সময়ে সময়ে অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে, তাহা কল-কারখানায় যাহারা কার্য করে, তাহাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা হইতেই প্রমাণিত হইবে। কৃষিজীবী এবং কুটীর-শিল্পজীবীদিগের তুলনায় কল-কারখানায় যাহাদিগকে কার্য করিতে হয়, তাহাদিগকে যে অধিকতর অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে দিন যাপন করিতে হয়, ইহা বর্তমান চিকিৎসকগণ পর্যন্ত স্বীকার করিয়া থাকেন।

কুটীরশিল্পের সংগঠনে যে কর্মনিয়োগক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, তাহা অস্বাস্থ্যকর নহে এবং সেই জন্যই আমরা বলিতেছি যে, শিল্প-তন্ত্রে যে কর্মনিয়োগক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, তাহা সর্বদা অস্বাস্থ্যকর নহে, পরন্তু সময়ে সময়ে অস্বাস্থ্যকর। যন্ত্র-চালিত শিল্পের মধ্যস্থতায় অবিমিশ্র এবং নিছক যে শিল্প-তন্ত্র, তাহাতে কোন জাতির কর্মনিয়োগের সম্ভাবনা নাই; অন্তপক্ষে কৃষি এবং কুটীর-শিল্প এই উভয় উদ্দেশ্যই সাধন করিতে পারে, ইহা যদি সুস্পষ্ট হয় তবে যুক্তি-সঙ্গত ভাবে সিদ্ধান্ত করা চলে যে, যন্ত্র-চালিত শিল্পের বিস্তার অপেক্ষা কৃষির উন্নয়ন বাঞ্ছনীয়। এবং সেই জন্য কোন সরকার যদি বহুল ভাবে কৃষির বিস্তার এবং উন্নয়নে ব্যাপৃত হয়, তবে তাহাকে যুক্তিযুক্ত ভাবে নিন্দনীয় বলা চলে না।

এই জন্যই আমরা বলিয়াছি যে, হিটলার ফ্রান্সে সমগ্র ভাবে কৃষিকার্য প্রবর্তন করিতেছেন, এইরূপ ঘোষণা করিয়া মিঃ বাটলার যদি হিটলারের কার্যকে জন-সাধারণের সুপাই করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে চাহেন, তবে তাহাতে ইচ্ছানুযায়ী ফল লাভ হইবে না, উপরন্তু ইহাতে কাহারও কাহারও মনে বিপরীত চিন্তার উদয় হইবে। মিঃ বাটলারকে আমরা বিবেচনা করিতে বলি যে, এই শ্রেণীর প্রচার কার্য কৃতঘ্ন হিটলারের পঞ্চম-বাহিনীর কার্যোদ্ধেশ্য বিফল না করিয়া, তাহার সহায়ক হইবে কি না।

মিঃ বাটলার দূরদর্শী রাষ্ট্রনেতা হইলে, হিটলার-কর্তৃক কৃষিকার্যের উন্নয়ন বাঞ্ছনীয় করিবার চেষ্টার ত্রুটি সন্ধান না করিয়া তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দের নিকট তিনি সমুত্থাপিত করিতেন যে, কৃষির এই বিস্তার এবং উন্নয়ন-প্রচেষ্টার প্রবর্তনা করিলে হিটলার-কর্তৃক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সম্ভাবনাই সমধিক, কেন না, কৃষিকার্যের উন্নয়ন কোথায় এবং কি ভাবে সম্যক্ প্রকারে সাধিত হইতে পারে, তাহা হিটলারের অপরিজ্ঞাত। প্রকৃত কৃষিবিজ্ঞানের অভ্রান্ত সন্ধান পাওয়া গেলে দেখা যাইবে যে, জমীর স্বাভাবিক উর্বরাশক্তি কৃষির বিস্তার পক্ষে অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয় এবং যে দেশে চলাচলকল্পে রেলপথ এবং মোটর-পথের বিস্তৃত ব্যবস্থা বিদ্যমান, সে-দেশে কখনও উহা রক্ষিত হইতে পারে না। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, একাধারে বর্তমান বিজ্ঞানের সুখ-সুবিধা এবং কৃষির সমৃদ্ধি উপভোগ করা যায় না এবং যতদিন ফ্রান্সে রেলপথ এবং মোটরপথের বিস্তৃত ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে, ততদিন তথায় কৃষিকার্য হইতে প্রাপ্য সম্পূর্ণ সুফল লাভের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

আমরা ইতিপূর্ব্বে "বঙ্গশ্রী"র একাধিক সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি, কোথায় কি ভাবে কৃষিকার্য্যের সমাক্ উন্নয়ন সুসাধ্য। এক্ষণে তাহার পুনরাবৃত্তি করিব না।

উপসংহারে আমরা বলিতে চাই যে, আমাদের অধিকাংশ রাষ্ট্রনেতাই তাঁহাদের অদূরদর্শী মন্তব্য এবং কার্য্যকলাপ দ্বারা সাম্রাজ্যের চিত্ত অপেক্ষা অধিক অর্হিত সাধন করিয়া থাকেন এবং মিঃ বাটলার তাঁহাদেরই একজন।

ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর রাষ্ট্রনেতাগণ অধিকতর সতর্কতা—বিশেষতঃ এই সঙ্কটকালে—অবলম্বন করিবেন, আমরা এই কামনা করি।*

## কোন জাতি কিংবা দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের ইহাই কি পন্থা ?

কিছুদিন পূর্ব্বে পুনায় অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির এক সভায় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ পুনরায় তাঁহাদের দাবী উত্থাপিত করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে গৃহীত প্রস্তাবের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাঁহাদের এতদ্বিষয়ক ধারণার মোটামুটি একটি আভাস পাওয়া যাইবে :

"ভারত, তথা ব্রিটেনকে যে-সকল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, গ্রেটবৃটেন কর্ত্তৃক ভারতের স্বাধীনতার স্বীকৃতির মধ্যেই যে তাহার সমাধান, ওয়ার্কিং কমিটী এ-বিষয়ে অধিকতর নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছেন ; সুতরাং তাঁহাদের মত এই যে, এইরূপ একটি সুস্পষ্ট ঘোষণা অনতিবিলম্বে হওয়া প্রয়োজন এবং তাহা কার্য্যে রূপান্তরিত করিবার জন্য অচিরাৎ কেন্দ্রে অস্থায়ী ভাবে একটি জাতীয় সরকার গঠনের প্রয়োজন। উহা অস্থায়ী ব্যবস্থা হইলেও এমন হইবে যে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি-মণ্ডলের বিশ্বাসভাজন হইবে এবং প্রদেশ-সমূহের সকল দায়িত্বশীল সরকারের সহযোগিতালাভে সমর্থ হইবে (The Working Committee are more than ever convinced that the acknowledgment by Great Britain of complete independence of India is the only solution of the problems facing both India and Britain and are, therefore, of opinion that such an unequivocal declaration should be immediately made and that as an immediate step in giving effect to it a provisional National Government should be constituted at the Centre, which, though formed as a transitory measure, should be such as to command the confidence of all the elected elements in the Central Legislature, and secure the closest co-operation of the responsible Governments in the Provinces.)"

দিল্লী অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের উপরি-উদ্ধৃতাংশ মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মতে, গ্রেটবৃটেন কর্ত্তৃক ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার "স্বীকৃতি (acknowledgment)" এবং তৎসহ কেন্দ্রে একটি "অস্থায়ী জাতীয় সরকার (provisional National Government)" গঠিত হইলেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবে।

আমরা বুঝিতে পারি না কি করিয়া গ্রেটবৃটেন, বস্তুতঃ ভারত স্বাধীন না হইলেও, স্বীকার করিতে পারে যে, ভারত স্বাধীন। আমাদের মতে, ভারতের যে-অবস্থা তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন আখ্যা দান করিতে পারে, বাস্তব ক্ষেত্রে সে তাহার অধিকারী না হইলে 'ভারত পূর্ণ ভাবে স্বাধীন,' ইহা সম্পূর্ণ অলীক উক্তি। যদি তর্ক উত্থাপিত হয় যে, সঙ্গে সঙ্গে অস্থায়ী জাতীয় সরকার (provisional National Government) গঠিত হইলে, উহাই তাহার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের প্রথম সোপান স্বরূপ হইবে, তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, এইরূপ কোন অস্থায়ী জাতীয় সরকার (provisional National Government) গঠন দ্বারা যদি কোন প্রকার স্বাধীনতা সাধিত হইতে পারে, তবে তাহা ইউরোপীয় কিংবা মার্কিন সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা,—উহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে।

* দি টাইম্‌স বঙ্গশ্রী'র এ-সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মূল ইংরাজী সংস্করণ হইতে।

যে-দেশ কিংবা জাতি প্রকৃত স্বাধীনতার প্রার্থী, তাহার আদর্শ ইউরোপীয় কিংবা মার্কিন সংস্করণের স্বাধীনতা হইতে পারে না। আমাদের মতে, যতদিন পর্যন্ত ইউরোপ কিংবা আমেরিকা তাহাদের স্বাধীনতার বর্তমান আদর্শের উচ্ছেদ সাধন না করিবে, ততদিন তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন হইতে পারিবে না। কোন দেশ কিংবা জাতিকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন হইতে হইলে নিম্নলিখিত পঞ্চবিধ মুক্তি :—(১) আর্থিক অভাব হইতে মুক্তি ; (২) শারীরিক অস্বাস্থ্য হইতে মুক্তি ; (৩) অশান্তি হইতে মুক্তি ; (৪) অকালবার্দ্ধক্য হইতে মুক্তি, এবং (৫) অকালমৃত্যু হইতে মুক্তি—সেই দেশ কিংবা জাতির প্রত্যেকটি অধিবাসীর, অন্ততঃ অধিকাংশের, আয়ত্ত হইবার প্রয়োজন। যে দেশ কিংবা জাতির অধিকাংশ ব্যক্তিই আর্থিক দুর্দশা, অস্বাস্থ্য, অশান্তি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যু ভোগ করিতেছে বলিয়া দেখা যাইতেছে, তাহার সেই স্বাধীনতা অর্থহীন। ইউরোপ এবং আমেরিকার প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাদের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের শতকরা আশীজন ব্যক্তিই হয় আর্থিক দুর্দশা, নয় অস্বাস্থ্য, নয় অশান্তি, নয় অকালবার্দ্ধক্য, নয় অকালমৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। সামান্য কাণ্ডজ্ঞান হইতেই নিঃসন্দিগ্ধ রূপে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইউরোপীয় কিংবা মার্কিন আদর্শের স্বাধীনতার লিপ্সা সম্পূর্ণ অর্থহীন।

ইউরোপীয় এবং মার্কিন আদর্শের বর্তমান স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য্য যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাদের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে একদল গুণ্ডা প্রকৃতির ব্যক্তি—যাহাদের না আছে প্রকৃত শিক্ষা ( ইহার ধাতুমূলক অর্থে ) না আছে প্রকৃত চরিত্রবল ( ইহার ধাতুমূলক অর্থে ), কিংবা যাহাদের জন-সাধারণের দুঃখ দুর্দশা এবং দারিদ্র্য বলিতে প্রকৃত সমপ্রাণতা পর্য্যন্ত নাই—তাহারাই "ডাণ্ডাল্ ফোর্তা-নিজ্‌ম্", "ক্যাপিট্যালিজ্‌ম্", "বলশেভিজ্‌ম্," "কম্যুনিজ্‌ম্," "পার্লামেণ্টেরিয়ানিজ্‌ম্," কিংবা "ডিমোক্রেসী" ইত্যাদির বিভিন্ন দল গঁড়িয়া বসিয়া আছেন! এই গুণ্ডাগণ আমেরিকা ও ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহের প্রত্যেকটির শাসন-যন্ত্র অধিকার-পূর্বক শাসন-কার্য্যে কতিপয় নিরুপায় ব্যক্তিবৃন্দকে নিযুক্ত করিয়া দরিদ্র এবং নিরীহ জন-সাধারণের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের দুঃখ-দুর্দশায় ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া তাহাদিগের দ্বারা দেশপ্রেম এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে বলপূর্বক যাহা খুশী তাহাই করাইয়া লইতেছে। জার্মাণী, ইটালী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হলাণ্ড, ডেনমার্ক, ইংলণ্ড এবং রুশিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ঘটিতেছে, তাহা অনুভব করিবার জন্য ভগবদ্দত্ত যাহার আছে, তাঁহার সহিত আমাদের মত-পার্থক্য হইবে না।

আমাদের কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দও উপরিলিখিত প্রকার স্বাধীনতা বাঞ্ছা করেন। অর্থাৎ তাঁহারাও ( এই সকল নেতৃবৃন্দ ) ইউরোপ এবং আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহে যেরূপ দেখা যাইতেছে, সেইরূপ ভাবে দল বাঁধিয়া জাতীয়তার নামে ভারতের পবিত্র শাসন-যন্ত্র অধিকার করিতে চাহেন এবং জন-সাধারণের দুঃখ-দুর্দশায় বিন্দু মাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলপূর্বক তাহাদিগের দ্বারা যাহা খুশী তাহাই করাইয়া লইতে চাহেন। মিঃ গান্ধী, জহরলাল, পটেল, রাজাগোপালাচারিয়ার, সুভাষচন্দ্র এবং তাঁহাদের অনুচরবৃন্দ প্রভৃতি কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের চাল-চলন এবং কার্য্যকলাপ যথার্থ ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহারা ইউরোপ এবং আমেরিকার গুণ্ডাদিগের অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে। সাময়িক অভিধানের অনুযায়ী তত্রত্য জন-সাধারণকে অপরিসীম দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত করিতে ইউরোপ এবং আমেরিকার গুণ্ডাগণ যেরূপ বিবেকদংশন বোধ করেন না, তেমনই ভারতের এই গুণ্ডাগণও "আইন অমান্য" এবং "অহিংস অসহযোগ"-এর আবরণে ভারতবাসী জন-সাধারণকে অশেষ দুঃখের ভাগী করিয়াছেন। তাঁহাদের ইউরোপ এবং আমেরিকাবাসী ইষ্টদেবতাদের ন্যায়, ভারতের গুণ্ডাগণও প্রকৃত শিক্ষা, চরিত্রবল এবং হৃদয় হীন। তাঁহারা যদি এইরূপ, ( অর্থাৎ শিক্ষা, চরিত্রবল এবং হৃদয় হীন ) না হইতেন, তবে একটি মাত্র ব্যক্তিকেও কোনরূপ দুঃখ-দুর্দশার ভাগী না করিয়া কিরূপে ভারত এবং ভারতবাসীর পক্ষে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জ্জন করা যায়, তাহা নিশ্চয়ই জানিতে পারিতেন। তাঁহারা যদি মনে করেন, ইহা কার্য্যতঃ অসম্ভব, তবে জিজ্ঞাসু ছাত্র হিসাবে তাঁহারা আমাদের নিকট আসিতে পারেন—কি ভাবে একটি মাত্র ব্যক্তিকেও দুঃখভাগী না করিয়া কেবল ভারত এবং ভারতবাসীর নহে, সমগ্র মনুষ্য-জাতির প্রত্যেকের

প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইতে পারে, তাহা আমরা তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিব। প্রকৃতির সকল প্রকার বিকৃতিরই একটি সীমা আছে, এই নেতৃবৃন্দের ইহা অবশ্য-জ্ঞাতব্য। ইউরোপ এবং আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে গিয়া রাষ্ট্রে এবং মনুষ্য-সমাজে বহু বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদের বিচারের দিন আজ সমাগত। এই জন্যই বর্ত্তমান যুদ্ধের সংঘটন। এই যুদ্ধ কোন একটি জাতিরই সম্পূর্ণ উদ্ভোতাদুরূপ নহে, পাপাসক্ত জগতের শাস্তির নিমিত্ত ইহা প্রকৃতির বিচার-প্রকাশক মাত্র। ইউরোপ কিংবা আমেরিকার একটি মাত্র জাতও এই বিচার হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমানের জাতিসমূহের প্রবৃত্তি নিঃশেষে অবসানার্থই ইহার সূত্রপাত। আমাদের এই বাক্যের সম্বন্ধে যাঁহার সন্দেহ থাকিবে, তিনি আর মাত্র পঞ্চবর্ষ বৎসর অপেক্ষা করিলে বুঝিবেন, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা যথার্থ কি না।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আমার অভিহিত ভারতীয় জাতি-গণকে আমরা কার্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বলি, নতুবা সর্ব্বনিয়ন্তার হস্তে তাঁহাদের সমুচিত শাস্তি-লাভার্থ তাঁহাদিগকে প্রস্তুত হইতে বলি। কংগ্রেসের নির্দ্দোষ কর্ম্মীবৃন্দের মধ্যে যাঁহাদের স্বদেশবাসীর দুঃখে বিন্দুমাত্র সমব্যথিতা বর্ত্তমান, তাঁহাদিগকে আমরা এই জাতিপ্রকৃতির নেতৃবৃন্দের কবল হইতে অনতিবিলম্বে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া নিজেদের মধ্য হইতে যথোপযুক্ত নেতৃবৃন্দ নির্ব্বাচন করিতে পরামর্শ দান করিতেছি।

তাঁহারা যদি প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকেন, তবে বর্ত্তমানে উহার প্রকৃষ্ট সময়। কেবল ভারত-বাসী জন-সাধারণ কর্ত্তৃকই উহা বর্ত্তমানে অর্জ্জিত হইতে পারে এবং তাহাদের নিকট হইতেই জগদ্বাসীকে উহা গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকৃত স্বাধীনতার প্রার্থী হইলে তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ, উহা কি করিয়া অর্জ্জন করিতে হইবে তাহা শিক্ষা করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদের ইউরোপ ভূখণ্ডের ভ্রাতৃবৃন্দকে এই পদ্ধতির মূলকথা অবিলম্বে শেষ করিয়া এবং তাহাতে জয়ী হইয়া কি করিয়া ইউরোপের জন-সাধারণের প্রত্যেকের পক্ষে সেই জয় ফলপ্রসূ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে শিক্ষা দান করিতে হইবে। এতদুদ্দেশে তাঁহাদিগকে এমন প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিতে হইবে, যাহাতে ইউরোপের সমর-রত ভ্রাতৃবৃন্দের উত্তেজিত শ্রবণে তাহার রব পৌঁছায় এবং তাঁহারা প্রত্যেকে তাঁহাদের স্বকীয় ক্যাপ্টেন ও জেনারেলের নিকট আবেদন উপস্থিত করিতে প্রেরণা বোধ করেন যে, তাঁহাদের স্ব স্ব জাতি ও দেশের প্রত্যেকটি ব্যক্তি যে অনাহার ও বেকার সমস্যার দ্বারা পীড়িত হইতেছেন, ঐ দুই সমস্যার সমাধান কি করিয়া এই যুদ্ধ দ্বারা সমাধান সম্ভব, তাহা তাঁহারা প্রদর্শন করুন।

ভারতবাসী প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে উন্মুখ হইয়া থাকিলে, বর্ত্তমানেই তাহার প্রকৃষ্ট সময়, ইহা আমরা আবার বলিতেছি, কেন না এমন কি ইংলণ্ডের তথাকথিত স্বাধীনতাও অল্প বিপন্ন। কূটনৈতিক যুক্তিতর্ক কিংবা অস্ত্র-সম্ভার বৃদ্ধি, কিংবা অসহযোগ, কিংবা কোনপ্রকার সন্ত্রাসমূলক কার্য্য, কিংবা আইন অমান্য—ইহার কোন একটির সহায়তাতেই ভারতবাসী প্রকৃত স্বাধীনতা আয়ত্ত করিতে পারিবে না। ভারতবাসিগণের প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের একটি মাত্র পন্থা হইতেছে—বর্ত্তমানে প্রত্যেকটি জাতি যে কাঁচামাল ও আহার্য্যের ঘাটতি হেতু ভীষণ কষ্ট পাইতেছে তাহা পূরণ করিয়া জগদ্বাসীর তথা নিজেদের মঙ্গল-সাধন। মূলতঃ এই স্বাস্থ্যপ্রদ আহার্য্য এবং কাঁচামালের ঘাটতিই পৃথিবীর সকল বিশিষ্ট জাতিকে বর্ত্তমানে যুদ্ধ এবং মনুষ্যহত্যায় লিপ্ত করিয়াছে। কেবলমাত্র ভারতবাসী-কর্ত্তৃক পৃথিবীব্যাপী এই স্বাস্থ্যপ্রদ আহার্য্য ও কাঁচামালের ঘাটতি সাত বৎসর কালের মধ্যে পূরণ সম্ভব, অপর কোন জাতি কর্ত্তৃক সমস্ত বৎসরের অনধিক কালের মধ্যে উহা সাধিত হওয়া সম্ভব নহে। ভারতবাসী জনসাধারণ ইংলণ্ডের প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জ্জনে ও রক্ষায় সহায়ক হইলে ভারতের স্বাধীনতা স্বতঃই অর্জ্জিত হইবে। এবং মিলিত ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড কর্ত্তৃক তখন সমগ্র মনুষ্য-জাতির স্বয়ং-রাজ্যের আধিপত্য-লাভ দুঃসাধ্য হইবে না। হিটলার কিংবা মুসোলিনী, যিনিই হউন, ইহাতে বাধা দিতে পারিবেন না এবং ইহাতে বাধা প্রদান করিতে আসিলে স্বকীয় জনসাধারণের হস্তেই তাঁহাদিগকে নিগৃহীত হইতে হইবে।

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী কিংবা ইংলণ্ডের আর কোন ক্ষমতা-প্রাপ্ত প্রতিনিধি ঘোষণা করুন যে, হিটলার যে স্বাধী

করিতেছেন, তিনি বিজয়ী, তাহা তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত, কিন্তু সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে চাহিলে কি ভাবে তিনি তাঁহার প্রজাবৃন্দের দুই বেলা পেট পুরিয়া আহারের ব্যবস্থা করিবেন, তাহার কার্য্যকরী পরিকল্পনা তাঁহাকে দাখিল করিতে হইবে। হিটলার যে কার্য্য-পরিকল্পনা উপস্থিত করিবেন, তাহা পরীক্ষার্থ একটি নিরপেক্ষ কমিটি নিয়োগ করিতে হইবে। হিটলার এই পরিকল্পনা উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে কিংবা প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করিলে পৃথিবীবাসী, তথা হিটলারের স্বদেশবাসীরাও দেখিবেন যে, হিটলার যে রক্তপাত-পরিকল্পনায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার পরিসমাপ্তি কোথায় এবং তখন সুনিশ্চিত ভাবে প্রকৃতিসঙ্গত মনোবৈজ্ঞানিক বিধানই জার্ম্মাণ জাতির এই দুরাভিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। জার্ম্মান জাতির বৈজ্ঞানিক প্রগতিসমূহের যিনি সংবাদ রাখেন, তিনি—একমাত্র স্বাস্থ্যপ্রদ আহার্য্য এবং কাঁচামাল উৎপাদন বিষয় ব্যতীত জার্ম্মানগণ বিজ্ঞানের আর সকল বিভাগেই যে উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, আমরা ইহা বলিলে, নিশ্চয়ই তাহার সমর্থন করিবেন। সুতরাং হিটলার যে তাঁহার অধীন জাতিসমূহের প্রত্যেকটি ব্যক্তি কি করিয়া পেট পুরিয়া দুইবেলা খাইতে পাইবে, তাহার পরিকল্পনা দাখিল করিতে পারিবেন না, ইহা সুনিশ্চিত, কেন না জার্ম্মানীর বিজ্ঞানে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না। হিটলার এই পরিকল্পনা উপস্থিত করিতে পারেন না, ইহার প্রমাণ পাওয়া গেলেই সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রমাণ হইবে যে, তিনি কোন জাতির কর্ণধারও হইতে পারেন না, কেন না কি করিয়া প্রজাবৃন্দের প্রত্যেকে তাঁহাদের জীবনধারণ পক্ষে প্রয়োজনীয় সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ দ্রব্য অর্জ্জন করিতে পারিবে, তাহার নির্দ্দেশ দান জাতির কর্ণধারের অবশ্য-পালনীয় কার্য্য।

হিটলার ব্যর্থ হইলে, ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণকে এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। ব্রিটিশ বিজ্ঞানেও উহার সন্ধান মিলিবে না, সুতরাং ব্রিটিশজাতিও যে ইহা পারিবেন না, তাহা আমরা জানি। কিন্তু তাঁহারা যদি কতিপয় ভারতবাসীর সাধারণ-প্রজ্ঞের মতি স্বীকার করেন, তবে তাঁহারা জগদ্বাসী তথা জার্ম্মানীর অধিবাসীদের সমক্ষে প্রমাণিত করিতে পারিবেন যে, লোকসংখ্যা যত অধিকই হউক না কেন, মনুষ্যজাতির প্রত্যেকে কি করিয়া জীবন-ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ দ্রব্য অর্জ্জন করিতে পারে, একমাত্র তাঁহারাই ইহা পরিজ্ঞাত। জার্ম্মানীর, তথা পৃথিবীর সকল জাতির নিকট তাঁহারা প্রমাণ করিতে পারিবেন যে, ব্রিটিশগণ কেবল ঐ কার্য্যের উপযোগী পরিকল্পনা যে জ্ঞাত আছেন, তাহা নহে, ঐ পরিকল্পনা বস্তুতঃ কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হইলে যে সংস্থানের অতি অল্প প্রয়োজন, তাঁহারা তাহারও অধিকারী—অপর কোন জাতিরই সেই সংস্থান নাই। এইরূপে প্রমাণ হয় যে, কেবল ইংলণ্ড এবং ভারতের মিলিত সহযোগ দ্বারা সমগ্র মনুষ্যজাতির ক্ষুধা-রাজ্যের আধিপত্য লাভ হইতে পারে, কিন্তু এই মিলনের উদ্ভেদ সাধিত হইলে মনুষ্যজাতির সকলেরই সর্ব্বনাশ আসন্ন।

আমরা ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণকে এখনও সুবিবেচক হইবার জন্য অনুরোধ করি এবং যত দূর দৃঢ়তার সহিত সম্ভব ভারতের এই রাজনৈতিক শুভাগমকে সমুচিত শান্তি-প্রদানে অবহিত হইতে বলি।*

## উৎকৃষ্ট সমাজ এবং রাষ্ট্রের আদর্শ

অনেকেই প্রায়শঃ "উৎকৃষ্ট সমাজ" এবং "উৎকৃষ্ট রাষ্ট্র" বিষয়ে উল্লেখ করেন দেখা যায়, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, কি হইলে যে সমাজ কিংবা রাষ্ট্রকে উৎকৃষ্ট বলা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ক ধারণা ইঁহাদের প্রায় কাহারও নাই। সমাজ কিংবা রাষ্ট্রকে উৎকৃষ্ট হইতে হইলে তাহা কি ভাবের হইবে, ইহা নিরূপণার্থ আমরা ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, রুশিয়া, ইতালী, জাপান এবং আমেরিকার সমাজ-বিজ্ঞান এবং রাষ্ট্র-বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা-স্তূপ তন্ন তন্ন রূপে সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু এই সকল দেশের সমাজ-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানক্ষেত্রে খ্যাতনামা মনস্বিগণের গ্রন্থ হইতেও আমরা বিন্দুমাত্র পরিতৃপ্তি পাই নাই।

* পি টাইম্‌স্ বম্বাই'র ৯ই আগষ্ট সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী হইতে।

এই সকল মনস্বীর চিন্তাধারা অনুধাবন কালে আমাদের প্রায়শঃই মনে হইয়াছে—কি নির্ব্বুদ্ধিতার মধ্যেই আমাদিগকে জীবন অতিবাহিত করিতে হইতেছে। অনেক সময় এমন মনে হইয়াছে যে, আমরা অত্যন্ত বিশৃংখলাময় নির্ব্বুদ্ধিতার রাজ্যে বাস না করিলে যাঁহারা "মনস্বী" বলিয়া বর্ত্তমানে যশোলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা করিতে পারিতেন না। ইঁহারা বস্তুতঃ অনেক সময়েই হাস্যকর আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অবস্থা এইরূপ না হইলে, বর্ত্তমান জগতে এত তীব্র ও বিচিত্র দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রাদুর্ভাব ঘটিত না।

আমাদের এই কটূক্তি আমাদিগের অনেক বন্ধুর বিরক্তি উৎপাদন করিবে বলিয়া আমরা জানি, কিন্তু আমরা যে চিন্তাক্ষেত্রে দাসত্বজীবী হইয়া পড়িয়াছি, এতৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সচেতন করিবার উদ্দেশ্যেই আমরা এই কটূক্তাঘাতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। আমাদিগকে এবং আমাদের বন্ধুবৃন্দকে আমরা চিন্তাক্ষেত্রে দাসত্বজীবী বলিয়া আখ্যাত করিতেছি, কেন না তাঁহাদের বৈদেশিক গুরুগণের নিকট হইতে তাঁহারা যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছেন এবং যাহা তাঁহাদের হৃদয়ে একাধিপত্য করিতেছে, কি করিয়া ঐ সকল ধারণা যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহা তাঁহারা জানেন না। ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, রুশিয়া, ইতালী, জাপান, আমেরিকা ইত্যাদির তথাকথিত সমাজবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানমূলক ধারণা ও মতবাদ কি ভাবে যথাযথ রূপে বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহা তাঁহাদের জানা থাকিলে অচিরাৎ বুঝিতে পারিতেন যে, ঐ সকল দেশের তথাকথিত মনস্বিগণের নিকট হইতে উৎকৃষ্ট সমাজ এবং রাষ্ট্রের অতি অল্প প্রয়োজনীয় উপাদান কি, তাহার সন্ধান-প্রণালীর কিছুই শিক্ষণীয় নাই। কেবল ভারতীয়দিগের রচনা হইতেই উৎকৃষ্ট সমাজ এবং রাষ্ট্রের কি আদর্শ হইবে, তাহা সংগৃহীত হইতে পারে। অর্থাৎ যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় (ইংরাজী-ভাষাপন্ন নহেন কিংবা অন্ধ গোঁড়া নহেন), উৎকৃষ্ট সমাজ এবং উৎকৃষ্ট রাষ্ট্রের কি আদর্শ হইবে, তাহা কেবল তাঁহারই শিক্ষণীয় এবং কেবল তিনিই ইহার বিষয়ে পৃথিবীর অপরাপর জাতিকে শিক্ষা দিতে পারেন। আমাদিগের ইংরাজীভাষাপন্নতা এবং নির্ব্বুদ্ধিতামূলক অন্ধ গোঁড়ামী বশতঃ আমরা আমাদিগকে সকল ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে দাসত্বজীবীতে পরিণত করিয়াছি, এবং আমরা উপরের মতবাদ শোষণ করিয়া বলিয়া জগতের অপরাপর সকলেরই আমাদিগকে উপহাস করিবার সকল প্রকার অধিকার বর্ত্তমান; কিন্তু তথাপি আমরা বলিতেছি যে, সে দিন আগতপ্রায় যে দিন ভারতমাতা—আমাদের সকল চিন্তার উপাদানের যিনি উৎসস্বরূপা—তাঁহার পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিবেন এবং সমগ্র জগদ্বাসীকে তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে কি রূপে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইবে, তাহার পন্থা প্রদর্শন করিবেন।

আমাদের আরাধ্যা জননীর স্বরূপ যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারেন, এমন একটি ব্যক্তিও আমাদের দৃষ্টিতে নাই, ইহা বলিতে হইতেছে, কিন্তু তথাপি আমরা বিবেচনা করি যে, অনতিবিলম্বে যাদুদণ্ডের স্পর্শে যে লীলা আরম্ভ হইবে, সেই লীলা জননী ব্যতীত আর কে দেখাইতে পারেন? পৃথিবীবাসী তখন চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিবে ভারতবর্ষ আবার প্রকৃত ভারত-সন্তানে ছাইয়া গিয়াছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে যে অরাজকতার সৃষ্টি হইবে, তাহার বিষয় ভাবিতেও আশঙ্কা হয় এবং মন চাহে অন্ততঃ সেই সময়ের জন্যও অদৃশ্য হইয়া যাই। ইহা কাপুরুষতা, তাহা জানি, কিন্তু এমন কাহাকেও তো দেখিতে পাই না, যিনি অনুমান পর্য্যন্ত করিতেছেন, পৃথিবী যে দিকে দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে, কি ভীষণ অরাজকতা তাহার পরিণাম। এমন একটি মাত্র ব্যক্তিও দৃষ্টিতে পড়িতেছে না, যিনি এই আসন্ন অরাজকতার অভিযান রোধ করিতে উন্মুখ হইয়াছেন। আরও অনেকের মুখেই অরাজকতার কথা শুনা যাইতেছে স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উহা কেবল তাঁহাদের ওষ্ঠনিঃসৃত, কেবল ওষ্ঠ সাহায্যেই উহা উচ্চারিত, তাঁহাদের অন্তর হইতে সে-কথার উদয় নহে। তাঁহারা যাহা বলিতেছেন, তাহা তাঁহাদের অন্তরোত্থিত হইলে তাঁহারা অন্ততঃ অংশতঃও অনুমান করিতে পারিতেন যে, আমাদের পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, ভাতা, ভগ্নী, কন্যা, সকলে কি মারাত্মক অবস্থার মধ্যে নিপতিত হইতে চলিয়াছেন, এবং তাহা হইতে অব্যাহতি-লাভার্থ নিজেদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তাঁহারা বিসর্জ্জন দিতে চাহিতেন—কিন্তু কই, এমন কোন একটি আশ্রয়ও তো দেখিতে পাইতেছি না, যেখানে আশ্রয় নিবেদন করিয়া ফল লাভ করি। সুতরাং জননীর অঞ্চলের এক প্রান্ত হইতে ক্রন্দন ব্যতীত আর উপায়

না দেখিয়া তাঁহারই নিকট নিরন্তর প্রার্থনা করিতেছি, "মা গো, তুমি তোমার সোনার কাঠির স্পর্শে তোমার অযোগ্য সন্তানদের চৈতন্য জাগ্রত কর।"

কেবল ভারতীয়দিগের রচনাবলী হইতেই উৎকৃষ্ট সমাজ এবং উৎকৃষ্ট রাষ্ট্রের আদর্শের সন্ধান পাওয়া যাইবে, আমাদের এই বক্তব্যের অর্থ ইহা নহে যে, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, মধুসূদন, রজনীকান্ত, শরৎচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ, ভারতের এই আধুনিক লেখকগণের রচনায় তাহার সন্ধান মিলিবে। এই সকল আধুনিক লেখকের রচনায় নানাদিক্ হইতে প্রশংসনীয় অনেক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু উৎকৃষ্ট রাষ্ট্র এবং উৎকৃষ্ট সমাজ-ব্যবস্থার ত্রুটিহীন আদর্শের সন্ধান তাঁহারা কেহ দিয়া গিয়াছেন বলিয়া দৃষ্টিতে পড়ে না, ইহাও সুনিশ্চিত। এই লেখকদিগের প্রত্যেকেই যে ভারতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারতীয় চিন্তা-ধারার অবিমিশ্রতা তাঁহারা কেহ রক্ষা করিতে পারেন নাই, কেন না বৈদেশিকদের সহিত সংসর্গে এবং তথাকথিত বৈদেশিক শিক্ষা সদাচার যে অনিবার্য্য প্রভাব আনয়ন করে, সেই মিশ্রণ হইতে তাঁহারা কেহই নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। মধ্য-যুগের যাঁহারা সংস্কৃত-নবীশ, শঙ্করাচার্য্য, কুমারিল ভট্ট, ভাস্করাচার্য্য, নাগেশ ভট্ট, মেধাতিথি, রঘুনন্দন ভট্ট এবং রঘুনন্দন প্রভৃতি, তাঁহাদের রচনা হইতেও উৎকৃষ্ট সমাজ এবং উৎকৃষ্ট রাষ্ট্রের আদর্শের সন্ধান মিলিবে না, কেন না গোঁড়ামীর জন্য তাঁহাদের বুদ্ধি-বিকৃতি ঘটে এবং সহজবুদ্ধি, তথা কার্য্যে প্রয়োগযোগ্য ইঙ্গিত পর্য্যন্ত প্রায়শঃ তাঁহাদের রচনায় পাওয়া যায় না।

উৎকৃষ্ট সমাজ এবং উৎকৃষ্ট রাষ্ট্রের আদর্শের সন্ধান পাওয়া যাইবে কেবল ব্যাসদেব, জৈমিনী, কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম এবং কণাদ প্রভৃতি ভারতীয় ঋষির সুপ্রাচীন রচনায়; কিন্তু ইহাদিগের পাঠ এবং ব্যাখ্যা বুঝিবার সামর্থ্যের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। অনেক নির্ব্বোধ গবেষক কি ভাবে ইঁহাদের রচনা-নিহিত চিন্তা ও তাহার শৃঙ্খলা যথাযথ-ভাবে অনুসরণ করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া এই সকল বিভিন্ন রচনার কাল নির্দ্ধারণ করিতে চাহিয়াছেন এবং প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, খৃষ্ট জন্মাইবার পূর্ব্বে এক হাজার বৎসর কালের মধ্যে ভারতীয় ঋষিগণের জন্ম। এই সকল গবেষক মূর্খ এবং দাম্ভিক। তাঁহাদের রচনা হইতেই অনায়াসে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, ভারতীয় ঋষিগণের লেখনী-নিঃসৃত যে-সকল রচনা, তাহাদের প্রত্যেকটি খৃষ্ট জন্মাইবার, এমন কি আটত্রিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল। সংক্ষেপতঃ বলা যাইতে পারে যে, ভারতীয় ঋষিগণ মনুষ্য-সমাজে যে-সভ্যতা এবং বিজ্ঞান প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান জগতের বিন্দুমাত্র ধারণা পর্য্যন্ত নাই। ভারতীয় ঋষিগণ কেবল ব্রাহ্মণদিগের জন্য, কিংবা ভারতীয়দিগের জন্যই চিন্তা করিয়াছিলেন, ইহা মনে করাও অর্থহীন। যথাযথভাবে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ধারণা লাভ করিয়া তাঁহাদের বক্তব্য উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহারা সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির নিমিত্ত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। যে-বিজ্ঞান এবং সভ্যতা মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেককে দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে মুক্তি দান করিতে পারে, তাহা গঠন করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের প্রত্যেকে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা বিবেচনা করেন যে, ভারতীয় ঋষিগণের পরস্পর মত-সার্থক্য বর্ত্তমান। আমরা ইঁহাদিগকে সম্পূর্ণ নির্ব্বোধ বলিয়া মনে করি। ভারতীয় ঋষিগণের চিন্তা এবং চিন্তার ধারাতে তাঁহারা যথাযথভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই বলিয়াই এই সকল ব্যক্তি এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন। অঙ্কশাস্ত্রের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের সঠিক উত্তর যেমন একটি ব্যতীত অন্য কোন প্রকার হইতে পারে না, তেমনই বিভিন্ন সত্য-দ্রষ্টার নির্দ্দেশ কখনও বিভিন্ন হইতে পারে না। নিম্নে আমরা উৎকৃষ্ট সমাজ এবং রাষ্ট্রগঠনের অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদান কি হইবে, তাহার যে-পরিকল্পনা উপস্থিত করিতেছি, তাহা ভারতীয় ঋষিগণের ভাবধারা অবলম্বনে রচিত।

উৎকৃষ্ট সমাজ কিংবা উৎকৃষ্ট রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সংগঠনের পক্ষে অপরিহার্য্য উপাদান কি হইবে, তাহার সন্ধান করিতে হইলে প্রথমতঃ জানিতে হইবে মনুষ্যজাতিকে যে-সকল দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা প্রধানতঃ কয় শ্রেণীর। উৎকৃষ্ট সমাজ এবং উৎকৃষ্ট রাষ্ট্রের আদর্শ হইবে যাহাতে মনুষ্য সকল প্রকার দুর্দ্দশা হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারে, এমন অবস্থার সৃষ্টি। মনুষ্যজাতির এই সকল দুঃখের প্রধান শ্রেণী-

কয় প্রকার, তাহা জানিতে হইলে সন্ধান করিবার প্রয়োজন, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব কোন্ কোন্ উপাদান লইয়া গঠিত। তৎসম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমানে না করিয়া আমরা সহজ করিয়া বলিতে পারি যে, মনুষ্যজাতিকে যে-সকল দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়, তাহা নিম্নলিখিত পাঁচ ভাগে প্রধানতঃ বিভাজ্য :—

(১) আর্থিক প্রয়োজন, যথা স্বাস্থ্যপ্রদ আহার্য্য, বস্ত্র, আসবাব পত্র, বাস-গৃহ ইত্যাদির অভাবজনিত দুঃখ ;

(২) প্রকৃত শারীরিক সুস্থতার অভাবজনিত দুঃখ ;

(৩) মনের শান্তি অথবা সন্তুষ্টির অভাবজনিত দুঃখ ;

(৪) অকালমৃত্যুজনিত দুঃখ ;

(৫) অপরিণত-বয়স্কদিগের অকালমৃত্যুজনিত দুঃখ।

সুতরাং সমাজকে উৎকৃষ্ট সংগঠন দান করিতে হইলে, তাহাকে এমন রূপ দান করিতে হইবে, যাহাতে তদন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির—অন্ততঃ অধিকাংশ অধিবাসীর—এই পাঁচ প্রকার দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ সুনিশ্চিত হইতে পারে। বর্ত্তমান জগতের চিন্তার প্রকার হইতেছে যে, উপরিলিখিত ভাবে কোন সমাজ সংগঠন হইতে পারে না, এবং কোন না কোন শ্রেণীর কোন না কোন প্রকার দুঃখ নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। বস্তুতঃও বর্ত্তমান পৃথিবীর প্রত্যেক সমাজে, জনসাধারণের অধিকাংশ, শতকরা প্রায় নব্বই জন, এই পাঁচ শ্রেণীর দুঃখের প্রত্যেকটির অধীন হইয়া পড়িয়াছে এবং অবশিষ্ট শতকরা দশ জন হয় একটি, নয় দুইটি, নয় তিনটী, নয় এমন কি চারিটির পর্য্যন্ত অধীন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া দেখা যাইতেছে।

ভারতীয় ঋষিগণ তাঁহাদের রচনায় স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন যে, জমীর সর্ব্বনিম্ন উর্ব্বরাশক্তি রক্ষা করিতে পারিলে কৃষকদিগের প্রত্যেকের পক্ষে কৃষিকার্য্য স্বাধীনভাবে লাভজনক হইতে পারে। জমীর সর্ব্বনিম্ন উর্ব্বরাশক্তি অব্যাহত থাকিলে প্রত্যেকটি কৃষক বৎসরের পাঁচ মাস কাল মাত্র পরিশ্রম করিয়া তাহার জীবিকা উপার্জ্জনে সমর্থ হইতে পারে। বৎসরের পাঁচ মাস কাল মাত্র পরিশ্রম করিয়া কৃষকেরা যাহাতে নিজেদের জীবিকা অর্জ্জনে সমর্থ হয়, যদি তদনুরূপ ব্যবস্থা করা হয়, তবে তাহাদিগকে অবশিষ্টকাল ছুটিরশিরে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। কৃষকদিগকে তাহাদের অবসর-কালে কুটিরশিল্পে কার্য্য-নিয়োগ-ব্যবস্থা সম্ভব হইলে, যে দ্রব্য উৎপন্ন হইবে, তাহার সহিত যন্ত্রচালিত শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্য প্রতিযোগিতা করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারে না। অর্থাৎ জমীর সর্ব্বনিম্ন স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির পুনরুদ্ধার সাধিত করিয়া তাহা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, সমগ্র জন-সংখ্যার শতকরা নব্বই জনের কর্ম্মনিয়োগ সম্ভব হইবে এবং তাহারা কোন বেতনভোগী চাকুরীর আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া কেবল কৃষি এবং কুটিরশিল্পের সাহায্যেই স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সমগ্র দ্রব্য অর্জ্জন করিতে পারিবে। তাহারা, অর্থাৎ সমগ্র জন-সংখ্যার শত করা নব্বই জন, এই রূপে সকল প্রকার আর্থিক দুর্দ্দশা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে।

আর্থিক দুর্দ্দশাসমূহের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলে, শারীরিক অস্বাস্থ্যের সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য হইবে। যাঁহারা শারীরিক অসুস্থতার মোটামুটি কারণ কি, তাহা পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন—কেন এইরূপ হয়। ভারতীয় ঋষিগণ কর্ত্তৃক অতিশয় সুযুক্তি সহকারে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রধানতঃ শারীরিক অস্বাস্থ্যের কারণ দ্বিবিধ :—

(১) অস্বাস্থ্যজনক এবং বদ্ধ আবহাওয়া ;

(২) ইন্দ্রিয় সংযমের অভাব বশতঃ দৈনন্দিন জীবনে অনুচিত চাল-চলন।

তাঁহারা ইহাও দেখাইয়াছেন যে, আবহাওয়া সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর এবং যথার্থ প্রাণপদ করিতে পারিলে, শারীরিক অস্বাস্থ্যের শতকরা নব্বইটি কারণ অপসৃত হইয়া যাইবে।

অতঃপর জন-সাধারণকে রিপু-দমনের শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে পারিলে, শারীরিক অস্বাস্থ্যের অবশিষ্ট শতকরা দশটি কারণও তিরোহিত হইয়া যাইবে। ভারতীয় ঋষিগণ ইহাও প্রমাণিত করিয়াছেন যে, প্রকৃতির রহস্য হইতেছে এই যে, জমীর সর্ব্বনিম্ন স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির পুনরুদ্ধারের জন্য প্রণালীবদ্ধ চেষ্টা আরম্ভ হইলে, উহার দ্বারা অল্পই আব-হাওয়ার অস্বাস্থ্যকরতা এবং বদ্ধতার অবসান ঘটিবে।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহা সংক্ষেপে বলিতে গেলে দেখিব যে, জমীর স্বাভাবিক সর্ব্বনিম্ন উর্ব্বরাশক্তির

উদ্ধার এবং তাহা রক্ষিত হইলে, তথা রিপু-দমনের শিক্ষা প্রবর্তিত হইলে, সমাজের সমগ্র জন-সংখ্যার শতকরা নব্বই জনের আর্থিক দুর্দশা এবং শারীরিক অসুস্থতাজনিত সকল প্রকার দুঃখ বিদূরিত হইতে পারে। সমাজ হইতে আর্থিক দুর্দশা এবং অন্যান্যজনিত দুঃখ-দুর্দশার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলে, মানসিক অশান্তি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যুজনিত অপর তিন প্রকার দুঃখও দূরীভূত হইবে। অর্থাৎ দাঁড়াইতেছে এই যে, লোক-সংখ্যা যত অধিকই হউক না কেন, যদি জমীর সর্ব্বনিম্ন স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির পুনরুদ্ধার করা যায় এবং তৎসঙ্গে যদি এমন শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করা যায়, যাহা রিপু-দমনে সাহায্য করে, তবে যে-কোন সমাজের শতকরা নিরানব্বই জন লোক সকল শ্রেণীর দুঃখ-দুর্দশা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে।

কোন সমাজের লোক-সংখ্যার শতকরা নব্বই জনের সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দশা হইতে নিষ্কৃতিলাভের পন্থা সুনিশ্চিত হইয়া গেলে, অবশিষ্ট দশ জনের পক্ষেও তাহা অনায়াসেই ব্যবস্থিত হইতে পারে। জন-সংখ্যার এই শতকরা দশ জনকে নিম্নলিখিত ভাবে সহজেই কর্ম্মনিযুক্ত করা যাইতে পারে :—

(১) জমীর সর্ব্বনিম্ন স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির পুনরুদ্ধার এবং তাহার রক্ষণপ্রণালীর অনুসন্ধান। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ক্রমাগত পরিবর্ত্তন হেতু ক্রমাগত গবেষণার প্রয়োজন।

(২) জন সাধারণ যাহাতে রিপু-দমনের শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারে, তদনুরূপ শিক্ষাপদ্ধতির অনুসন্ধান। মনুষ্য-বুদ্ধি এবং মনুষ্য-স্বভাবের ক্রমাগত পরিবর্ত্তন বশতঃ ক্রমাগত অনুসন্ধান প্রয়োজন।

(৩) এই দুই পদ্ধতিকে কার্য্যে প্রয়োগ।

(৪) জন-সাধারণকে এই দুই প্রণালীতে শিক্ষা দান।

(৫) কৃষিজাত এবং শিল্পজাত দ্রব্যসমূহের সমতা-মূলক বিতরণ-ব্যবস্থা।

(৬) সমাজের আইন এবং শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ঐ সকল বিভিন্ন শ্রেণীর দ্বারিত্ব যথাযথভাবে পালিত হইতেছে কি না তাহার পর্য্যবেক্ষণ।

উৎকৃষ্ট সমাজ এবং উৎকৃষ্ট রাষ্ট্রের বর্ত্তমান আদর্শ তাহা হইলে নিম্নলিখিত দুই প্রকার ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিতেছে :—

(১) পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের জমীর স্বাভাবিক সর্ব্বনিম্ন উর্ব্বরাশক্তির পুনরুদ্ধার, রক্ষা এবং বৃদ্ধি যে-ব্যবস্থায় সম্ভব, তাহার প্রবর্ত্তন।

(২) প্রত্যেক সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যে-শিক্ষাপদ্ধতিতে প্রত্যেকটি রিপু-দমনে সমর্থ হইবে, সেই শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন।

আমাদের দ্বারা সমাজের এবং রাষ্ট্রের কোন প্রকার হিত সাধিত হউক, ইহাই আমাদের কামা।*

* 'দি টাইম্‌স্ বঙ্গশ্রী'র ১০ই আগষ্ট তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সম্পাদকীয় হইতে।

---

## বর্ত্তমান অবস্থার মূল

...প্রত্যেক মানুষ কতকগুলি ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার সমষ্টি, অথচ দুইটি মানুষ সর্ব্বতোভাবে সমান নহে এবং প্রত্যেক মানুষের কতকগুলি অসামর্থ্য থাকে। যে-জ্ঞান ও কার্য্যশক্তি অর্জ্জন করিতে পারিলে মানুষ তাহার অন্তিত্ব অটুট রাখিতে পারে, সেই জ্ঞান ও কার্য্যশক্তির নাম মানুষের সামর্থ্য। যে জ্ঞান ও কার্য্যশক্তির অভাবে মানুষ অসুস্থতার এবং অশান্তির আঘাত-প্রাপ্ত হয় এবং তিল তিল করিয়া মৃত্যুমুখে অগ্রসর হয়, তাহা প্রচলিত ভাষায় জ্ঞান ও কার্য্যশক্তি বলিয়া অভিহিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে কুজ্ঞান ও কুকার্য্যশক্তি। ঐ কুজ্ঞান ও কুকার্য্যশক্তির নাম মানুষের অসামর্থ্য।

মানুষের সামর্থ্যের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাইবে, মানুষের দুরবস্থার পরিমাণ তত কমিয়া যাইবে এবং মানুষের অসামর্থ্যের পরিমাণ যত বাড়িয়া যাইবে, তত্তই তাহার দুরবস্থার পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য। কাজেই মানুষের অবস্থা প্রকৃত পক্ষে কি হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহার আলোচনা করিতে হইলে, দেশের অসামর্থ্যের অর্থাৎ কুজ্ঞানের এবং কুকার্য্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে অথবা কমিয়া যাইতেছে, তাহার বিচার করা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমানে সাধারণের বিদ্যা যে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্রমিক উন্নতি সাধিত হইতেছে। অথচ একটু চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে দেখিলে দেখা যাইবে যে, সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোকের মধ্যে অসুস্থতাগ্রস্ত ও বেকার লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে।...

# মানুষের মন

—শ্রীসুকৃতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আত্মীয়-স্বজন, ঘর-দোর সব ঘুচে যায়,—হিমাদ্রির বয়স তখন এগার। করুণাময়ী পরের বাড়ী রান্না-বান্না ক'রে ছেলেকে মানুষ করেন। আশা ছিল, তাঁর এ দুঃখের একদিন শেষ হবে। আকাশের মেঘ তো আর চিরকাল থাকে না! কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে, জীবনের সে প্রভাত বেলা তার জীবনে আর এল না। অকস্মাৎ কাশীর অনাথাশ্রমে তিনি মারা যান। রোগ এমন কিছু কঠিন হয় নি, কিন্তু তবু তিনি তা থেকে রেহাই পান নি।

এর-ওর কাছে খেয়ে, এর-তার পুরাণ জামা কাপড় প'রে, এক-এক মাসীমা-পিসীমা ব'লে হিমাদ্রি মানুষ হ'ল। লেখা-পড়া শেখা তার বেশী হ'ল না আর্থিক অসঙ্গতির জন্য। অত্যন্ত লাজুক ছেলে সে। সহজে ওকে দেখে কেউ আঁচ করতে পারে না, ওর পড়া-শুনো কতদূর! মা মারা যাবার পর এখানে ওখানে নোঙর ছেঁড়া নৌকোর মত টাল খেয়ে খেয়ে অবশেষে সে কলকাতায় এসে দাঁড়াল। পরের ছেলেদের সঙ্গে হেসে খেলে, মানুষের সেবা ক'রে, হুকুম খেটে, অবসর সময়ে সাহিত্যচর্চা ক'রে, ছেলে পড়িয়ে পরের আশ্রয়ে দিনগুলো এগুতে লাগল।

একটা 'কিছু' হব, এ আশা মন থেকে একদিন অজ্ঞাতে কখন যে মুছে গেল ও নিজেই জানল না। পরের অনুগ্রহে, পরের দাক্ষিণ্যে অচেনা সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবার কঠিন পরীক্ষা চলল।

হিমাদ্রির বয়স কুড়ির ও-দিকে নয়। অত্যন্ত গোপনে ক'জন কুমারী মেয়েকে ঘর দেখে তা জানা যায় নি। তার দিকে করুণ কটাক্ষে চাইবারও কোন মেয়ে নেই এও ভাল ক'রেই সে জানে। কেন না সে শুধু হিমাদ্রি। অত্যন্ত ছোট্ট পরিচয়। পরের ছেলে পড়িয়ে, পরের অনুগ্রহ কুড়িয়ে সে জীবন ধারণ করে। পরের পিছনে পিছনে একটা চাকরির জন্য ছোটে। না আছে তার ঘর-বাড়ী, না আছে তার ধন-দৌলত। পথিকে পথেতে সম্বন্ধটা খুব স্পষ্ট। সে একজন পথিক মাত্র। এই শহরের অনেক বাড়ীতে তার যাতায়াত আছে। মেয়ে দেখলেই সে চোখ নামিয়ে নেয়। মেয়েরা অনেকেই একটা চাপা পরিহাস করে, "লজ্জায় যেন মেজে পড়বেন না।" বস্তুতঃ এটা ওর আত্মাভিমান ছাড়া আর কিছুই নয়।

সম্প্রতি হিমাদ্রি নানা কারণে এই কাছে-পিঠেই এক-খানা ছোট্ট টিলে-কোঠা ভাড়া ক'রে উঠে গেছে। বাড়ী-খানা কোন একজন মাড়োয়ারীর বাড়ী। তিনি থাকেন না। বাড়ীটি নানা জাতীয় ভাড়াটেতে ভরাট। জাতীয় 'এক্স-জিবিশন' বললেও ভুল হয় না। চারতলা বাড়ী। তিনতলায় থাকে একঘর ভাটিয়া পরিবার। দোতলাটাতে জনকয়েক বাঙালী। নীচের তলাতে এক দিকে একটি ডাক্তার দোকান, তার পাশের ঘরখানিতে থাকে একঘর বিলাসপুরী। আর ও-দিকের কোণের বড় ঘরখানির ভাড়া একটু বেশী ব'লে এতদিন খালি ছিল। দেখা গেল, কাল সে ঘরখানি একঘর বাঙালী পরিবার এসে দখল করলেন। চারতলার পাশাপাশি দু'খানি টিনের ঘরের একখানিতে থাকে লখিয়ার মা—বাসন-কোসন মাজে, অপরখানিতে থাকে হিমাদ্রি।

দিনকয়েক যেতে না যেতেই একটা চাপা খবর পাওয়া গেল, নীচের নবাগত ভাড়াটের মেয়েটির অসুখ না কি সারবার নয়। কেউ বলেন, ম্যালেরিয়া—কেউ বলেন, নিউ-মোনিয়া। দোতলা থেকে সুরেনবাবু বলেন, "জান তো ভাই, ও বস্তা। ছোঁয়াছুঁয়ি যেন কেউ কর না। খবরদার।" অতএব নীচে আনা-গোনা সবাই বন্ধ ক'রে দিলে।

বউটির আবার কিটের ব্যামো।

স্বামী চলে গেছে অফিসে, ছেলেরা গেছে ইস্কুলে। বউটি রান্না করতে করতেই উনুনের ধারে গা এলিয়ে শুয়ে পড়ল। মেয়েটার হাজার ডাকেও কোন সাড়া নেই।

হিমাদ্রি পড়িয়ে ফিরছিল, সিঁড়িতে পা দিতেই কানে এল মেয়েটার গলার আওয়াজ। হিমাদ্রি দ্রুতপায়ে দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে লক্ষ্য ক'রে জিজ্ঞেস করল, "আপনার মার কি হয়েছে? উনুনের ধারে শুয়ে যে, গন্‌গন্ করছে আঁচ—"

মেয়েটি যেন খেই পেল। বললে, "এক বাড়ী লোক গিজ্‌গিজ্‌ করছে, কত ডাকছি কেউ কাণেই শোনে না। মায়ের পিত্তের অসুখ আছে, একটু দয়া ক'রে দেখুন না!"

হিমাদ্রি বুড়ির ঠোঙাটা তাড়াতাড়ি একপাশে নামিয়ে রেখে নিঃসঙ্কোচে উনুনের পাশ থেকে তুলে এনে চোখে মুখে জল দিয়ে, পাখা ক'রে তাকে সোজা ক'রে তুলল। জ্ঞান হ'তেই একহাত ঘোমটা টেনে বউটি মুখ ঢেকে বললেন। উনুনের উপর দুধের কড়াটা পুড়ছিল, হিমাদ্রি সেটাকে নামিয়ে রাখতেই বউটি বলে উঠল, "ছোঁবেন না, ছোঁবেন না।"

"দুধটা পুড়ে যাচ্ছিল যে···"

ব'লেই সে অপরাধীর মত বেরিয়ে গেল। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে শুনতে পেল, মহামায়া বলছে. "কি-না কি জাত, তার ঠিক নেই। হাঁড়ি-কুঁড়ি সব একাকার ক'রে গেল। না চেনা না শোনা, একেবারে ঘরের ভিতর এসে হাজির। ওমা, কেন গো? কলকাতায় শহর বলে কি জ্ঞান-গম্যি থাকতেও নেই? আসুক সে!"

হিমাদ্রি মনে মনে হেসে উঠল। ঘরে এসে সে ভাবলে, মানুষে আর পশুতে দৈহিক আকার ছাড়া আর কোন প্রভেদ নেই।

হিমাদ্রির জীবনে এ-ঘটনা আজ নতুন ক'রে নয়। কাজেই এ তার বিশেষ হৃদয়কে আঘাত করতে পেল না। ঘরের জিনিষ-পত্তর তার এতই বেশী যে, হঠাৎ ঘরে ঢুকলে মনে হয়, যেন বেড়াতে এসে বৃষ্টি-বাদলা দেখে পথিকটি আটকে পড়েছে। একটি টিনের তোরঙ্গ, একখানা মাদুর, একখানা মোটা বই, তাতেই ওর বাল্মিকির কাজ চ'লে যায়। তবু, তার উপর তার দৃষ্টি নেই। ঘরটি পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। কাছাকাছি যেন একটা হোটেলে খায়। সারা দুপুর কাটে কাগজে কলমে। কোন দিন লেখে কবিতা, কোন দিন গল্প, কিন্তু ছাপাবার জন্য নয়। নিজের দুঃখ নিজের ক'রেই এঁকে রাখে একান্ত নিজের কাছে। বন্ধু-বান্ধবেরা খুঁজতে এলেই শুনত, তার আজ অনেক কাজ আছে। অন্ততঃ আজকের দিনটি। এমনি রোজ তার কাজ থাকে, অথচ তার কাজ যে কী তা জানা যায় না।

"তোর আবার কাজ কিসের, বাধা! না মাগ, না ছেলে। সারা পৃথিবী ঘুরলে তো কাউকেই পাওয়া যাবে না, যে না কি তোর আপনার কেউ।"

"আছে ভাই, একটু আছে।"

কিন্তু কাজ যে কী, তা, সবাই জানে। একটি বেলা সে ছেলে পড়ায়। বাকি দিনটে কাটে তার পরের দুদুর থেকে। বিয়ে, উপনয়ন, মেয়ে দেখা, শ্রাদ্ধ, অসুখে-বিসুখে তদ্বির করা, ডাক্তারের বাড়ী থেকে ওষুধ এনে দেওয়া—কোন দিকেই তার ত্রুটি নেই। বাধিত যখন নেয়—ফাঁকী দিতে পারে না। অথচ, বাধিত ভগবান তাকে নিজের ক'রে কিছুই যেন নি। তাতে ওর দুঃখ নেই মোটেই।

অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চলেছে হয় তো, পথে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা।

"কোথায় চললি রে, হিমাদ্রি?"

"ডাক্তার বাবুর কাছে। আর বলিস কেন, মাসীমার পেটে ব্যথা উঠেছে—তার উপর অজয়াটার একশ' জ্বর।"

বন্ধুরা জানে, এ-উদ্বেগ প্রকাশ করা ন্যায়সঙ্গত নয়। অজয়ার সঙ্গে সম্পর্ক তাদের চেয়ে তার একতিলও বেশী নয়। জনৈক বন্ধুর বোন, এই তো?

কেউ কেউ ঠাট্টা ক'রে বলে, "যার বিয়ে তার খোঁজ নেই পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই। মা বোনের অসুখ—সে লাট সাহেব তো বেশ আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। তোর এমন কী মাথা-ব্যথা পড়েছে যে যেতেই হবে? রেখে দে ও-সব কর্ণালিটি। যতই কর ভাই, মন কারু পাবে না। After all we are just Indians. একবার বলেছিলি না একটা চাকরির জন্য ওর বাবাকে? কি-রকম পাশ কাটিয়েছিল। বন্ধু তুই-ই একা নোস আমরাও। চল, চল।"

সত্যিই যে তারা ওর কেউ নয়, এ-কথা যখনই ওকে কেউ মনে করিয়ে দেয় তখন পা দুটো আর চলতে চায় না। ঘিন্ ঘিন্ করে। বন্ধুরা অট্টহাসি তুলে চ'লে গেলে, হিমাদ্রি ডাক্তারের বাড়ী-মুখো যেতে যেতে ভাবল, সত্যিই চাকরি একটা তারা ক'রে দিতে পারলেও দেয় নি। বলেছিল শুধু, "নিজের ছেলেপুলে নিয়েই ব্যস্ত। Sorry my boy."

বেলা সাড়ে পাঁচটা। ঘরের কপাটে শিকল দিয়ে হিমাদ্রি নীচে নেমে গেল।

নীচেকার কোণের সেই ঘর থেকে বেঁটে ভদ্রলোকটি হাঁকলেন, "ওহে ছোকরা, শোন তো।"

হিমাদ্রি থমকে দাঁড়াল।

"তোমার নাম কি হে?" কণ্ঠস্বরে ভদ্রতার লেশমাত্র নেই।

"হিমাদ্রি।"

"তা জানতে চাই নি। জানতে চাইছি, তোমার পদবী কি? কী জাত, বামুন না কায়েত—তুমি যে ঘট ক'রে ভদ্রলোকের ঘরে ঢুকে—"

হিমাদ্রি তাচ্ছিল্যভরে বেরিয়ে গেল। গলির মোড়ে আসতেই অশোকের বাবার সঙ্গে দেখা।

"কাকাবাবু এ-দিকে যে বড়?"

"তোমার কাছেই আসছি বাবা। নির্মলার তো বিয়ের দিন ঠিক ক'রে ফেলেছি। তোমাকে এ-কদিন একটু—হ্যাঁ, মানে, দেখা শোনা, পরিবেশন, অভ্যর্থনা—অশোকটা কোন কাজের নয়। বুঝেছ না? তোমার এখন কোন কাজ নেই তো? চল না একটু আমার সঙ্গে, বাজারটা ক'রে ফেলি।"

"চলুন।"

কিছুদূর এগুতেই দেখা ভুবনবাবুর সঙ্গে।

"আরে, ওহে, তোমার বাসার ঠিকানা যে কি ক'রে বার করেছি তা আমিই জানি। তোমাকে যে আমার একটা কাজ করতে হবে বাবা।"

"বলুন।"

"ছেলেটার পরীক্ষা সুরু হ'য়েছে, মাষ্টারটার আবার সময় বুঝে করল অসুখ। তোমার মাসীমা বললেন যে, হিমাদ্রিকে বল, একবেলা এসে সে কদিন পড়িয়ে যাবে। যাবে—"

"অত ক'রে বলতে হবে না। যাব মেসোমশাই। ঠিক যাব।"

তার পর সে ফর্দখানা পড়তে পড়তে বাজার-মুখো অগ্রসর হ'ল। পিছনে চললেন ভুবনেশ্বর।

বাড়ী যখন ফিরল রাত তখন দশটা। ঘরে এসেই শোনে ভাটিয়াদের বউটি ঘরময় চীৎকার করছে। লখিয়ার মাকে জিজ্ঞেস ক'রে জানল, বউটি আজ হঠাৎ কলতলায় পড়ে গিয়ে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছে। রান্নাবান্না কিছু হয় নি। একা মানুষ; স্বামী তার বারোটার কম কোন দিন ফেরে না। লখিয়ার মাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে, "কিশোরীবাবুর বউকে জিজ্ঞেস কর তো ওঁর স্বামীকে কি খবর দিতে হবে?"

"দিতে পারলেই তো ভাল হয় খোকা বাবু। পোয়াতী মানুষ! কোমরে বড্ড লেগেছে। আমাকে বললে, তা আমি কি ক'রে যাই বলুন তো? তোতলায় ঐ বাবুদের কত বললাম, কেউ কাণে তুললে না। ঠিকানা জিজ্ঞেস করব?"

"কর।"

লখিয়ার মা বউটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, বউটি আড়-চোখে তার পানে চেয়ে একটু ঘোমটা টেনে দিয়িতে বললে, "উনি কি চিনতে পারবেন? রামকিষণ শুক্লার গদী, দশ নম্বর কটন্ ষ্ট্রীট্।"

"কিসের দোকান জিজ্ঞেস কর তো লখিয়ার মা।"

বউটি সলজ্জকণ্ঠে, আস্তে আস্তে জবাব দিল, "বেনারসী কাপড়ের দোকান। কাশ্মীরী শাল, পালিচা এই সব।"

"ও, আচ্ছা।" জামাটা পুনরায় গলায় নামিয়ে হিমাদ্রি নীচে নেবে গেল।

ঘণ্টা খানেকের ভিতরেই সে ফিরে এল। আগে আগে এল কিশোরীবাবু। বরফের বন্দোবস্ত ক'রেই তারা এসেছিল। একটু যাতনা কমলে হিমাদ্রি হাসিমুখে বললে, "দরকার মনে করলে ডাকবেন কিশোরীবাবু। কোন লজ্জা করবেন না।"

কিশোরী বাবু বললেন, "নিশ্চয়ই। ধন্যবাদ বাবুসাব।"

বউটি অবাক হয়ে তার পানে চাইল। দেখতে কালো শীর্ণ ছেলেটি। চালে চলনে কোথাও আভিজাত্যের চিহ্ন নেই। অথচ, পরের জন্য তার কি অপরিসীম উৎকণ্ঠা! কি নির্মল অন্তরটি।

মাদুরটি বিছিয়ে সে শুল। কিন্তু ঘুম তার এল না। বইয়ের তাঁক থেকে একখানা ছবি বার ক'রে চাঁদের অস্পষ্ট আলোর সামনে একবার তুলে, আবার তখুনি রেখে দিয়ে পাশ ফিরল।.....

তার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবেরা কেউ তার এখানে আনা-গোনা করে না। কেন না তারা জানত, তাদের বসতে দেবার মত জায়গা তার নেই। কিন্তু আজ তারা পথ ভুলে এল তার বহুজন্মের এ-উপেক্ষিত দরিদ্র আশ্রয়ে? সিঁড়িতে কারা যেন তার নাম শুধোচ্ছে।

কুঁকে দেখে কেউ নয়, শৈলেন আর তার দিদি শান্তা। শান্তা বয়সে বড়, অতএব হেঁট হ'য়ে তার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, "কেমন আছেন, শান্তাদি ?"

"কেমন দেখছ বল, তুমি।"

হিমাদ্রি হেসে বলল, "বাইরে থেকে তো মনে হচ্ছে মন্দ নয়।"

"পথুনের নজর তাগাড়েই পড়ে। বাইরেটাই দেখলে! ভেতরটার অবস্থা যে কি,তা যদি জানতে, আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে, হিমাদ্রি। দোষ দেব কি, হাজার হ'লেও পুরুষ মানুষ তো !"

শান্তা ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

হিমাদ্রি আর হেসে বললে, "বুঝলাম। তার পর, কি মনে ক'রে দু' ভাইবোনে ? হঠাৎ পথ ভুলে আজ এ গরীব ভাইটির এখানে ?"

"এক রকম ভাই-ই। যে বাড়ীতে তুমি থাক, মানুষে কি ছাই আসতে পারে ?"

"আমি যে মানুষ নই তখনই বুঝেছি যখনই পদার্পণ করেছেন। গোয়ালে গরুই আসে, মানুষ থাকে না।"

শান্তা খোঁচা খেয়ে বললেন, "তুমি মনে করেছ বুঝি, সখ ক'রে বেড়াতে এসেছি, তা নয়। দরকারে পড়েই এসেছি।"

"দরকার ? কি, শুনি ?" হিমাদ্রি বিস্ময়ে চাইল।

"এখন কিছু নয়"—ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, "এসেছিলাম এ-দিকে একজনের বাড়ীতে। রাস্তায় সুন্দর ইলিশ মাছ বিক্রি হ'চ্ছে। তাই ভাবলাম, তোমার কাছ থেকে আনা-পাঁচেক পয়সা নিয়ে শৈলকে দিয়ে কিনে নিয়ে যাই। তোমার পয়সাটা পরে পাঠিয়ে দেব'খন।"

"মা-ই বা দিলেন।" হাসতে হাসতে একটি আধুলি সাড়ম্বরে খুঁজে বার ক'রে দিতেই শান্তা আঁচলে বেঁধে ফেলল। অচল কি সচল, দেখবারও দরকার মনে করল না।

বলল, "দু' চার দিন পরে পাবে ভাই। আর তো সংসারের কি রকম টানাটানি। কোথায় বেরুবে যে, কর্ণা জামা—কর্ণা কাপড়, ব্যাপার কি ?" বইখানা ছুঁড়িয়ে নিল।

"এমনি! কেন পড়তে নেই ?" কোঁচা কুঁচুতে কুঁচুতে হিমাদ্রি জবাব দিল।

শান্তা হঠাৎ কি একটা বস্তু আবিষ্কার ক'রে বলে উঠল, "না, তা বলি নি। কিন্তু ছবিখানা কার ? আমাদের নির্ম্মলার, না ?" তাঁর চোখে মুখে একটা বিস্ময়ের ভাব।

হিমাদ্রির মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। মুখ নামিয়েই বলল, "আপনি চিনলেন কি ক'রে ?"

"চিনি বৈ কি। বইলে, অমনি বলছি কি ? এক আধ-দিন নয়, দশ-দশটি বছর পাশাপাশি হাটখোলাতে ছিলাম। ওকে তো হ'তে দেখেছি। সেই মেয়ের আবার বিয়েরও সাত দেখলাম। কিন্তু তোমার কাছে তার ফটো এল কি ক'রে ? আবার নীচেই এ কি সব লেখা ? এই তো নির্ম্মলার নাম। হ্যাঁ, হিমাদ্রি ?" শান্তার চোখে-মুখে একটা বিদ্বেষের ভাব। কেলাসীর ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, "এতদূর যখন গড়িয়েছে তখন আর বে' দেওয়া কেন বাবা। পাত্র তো হাতেই ছিল, ছিঃ!"

একটা কিছু সদুপদেশ দেবার অছিলা শান্তা খুঁজতে বসল। শৈলেন বলল, "কলসীর জল ঘাটতে পড়লে গড়ায় অনেক দূর। কাজ কি দিদি তোমার এ-সব কথায় ?"

"ভুল বুঝিস নে, শৈলেন। আমি জানতুম না। হঠাৎ নির্ম্মলা দেবি এই কাণ্ড ক'রে বসেছে। আমি কি আমার ওজন জানি নে ? বামন হ'য়ে আকাশের চাঁদে হাত দিতে যাব ! পথের ভিখিরি আমি ! আমার কোন মেয়ে ভালবেসে, এই কঠিন দুঃখ গলায় পরতে পারে, এ-কথা আপনারা ভাবতে পারেন শান্তাদি ?"

পড়ন্ত বেলার অত্যন্ত করুণ শোনালে তার কথাগুলি। হিমাদ্রি তাদের পিছু পিছু নেমে গেল। কারু মুখে কোন কথা নেই।

আজ নির্ম্মলার বিয়ে।

সারা সন্ধ্যা পরিবেশন ক'রে খাইয়ে-দাইয়ে সে যখন হাত ধুয়ে দাঁড়াল, বিয়ে-বাড়ীর কোলাহল প্রায় থেমে গেছে। বাসর-ঘরে বর-বধূকে নিয়ে প্রবল হাস্যোল্লাস চলছে। হিমাদ্রি খেল কি খেল না, কেউ একবার খোঁজও নিলে না। কি জানি কেন ওর মনে হঠাৎ খেয়াল হ'ল, নির্ম্মলার বধূ-বেশটি একবার চুপি চুপি দেখে আসি। যদি কেউ কিছু মনে করে ? বাড়ীর পিছন দিকে একটা পথ ছিল, পাঁচিল

ডিঙিয়ে সেই পথে ঘরের কোণটাতে এসে দাঁড়ালে। তার ছায়াটা কে যেন দেখে ফেলেছিল।

"কে—কে ওখানে দাঁড়িয়ে এত রাত্তিরে?" চারিদিক্ থেকে সবাই এসে তাকে ঘিরে ধরল। সে পালাবার পথ পেল না। দু'একটি অল্প বয়সের বউ ছিল। তারা বললে, "অ-মরণ! নির্ম্মলার ভাইয়ের আগে পড়াত না? শেষে চোর হোলো? ডাক জ্যাঠাইমাইকে।"

মেয়েদের চেঁচামেচি শুনে মৃগেনবাবু বেরিয়ে এলেন, "শালাকো মার ডালো। পুলিশ বোলাও"—কাছে এসেই একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। অনুতপ্ত-কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "এমন অসময়ে এখানে কেন, বাবা?"

হিমাদ্রি পাংশু কণ্ঠে জবাব দিল, "এমনি।"

বাসর-ঘর থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এসে গ্রীবা-ভঙ্গিমা ক'রে বললে, "এমনি! এমনি যদি তো এখানে কেন? ভাগ্যিস ছায়াটা বেণুর নজরে পড়েছিল তাই তো? একঘর সোমত্ত মেয়ে, এক গা গয়না, লোকটা কে জ্যাঠাইমাই?"

বেণু হেসে উঠে বলল, "তা-ও তুমি জান না ছোট মাসী? 'হিউ অফ বাগদাদে'র গল্প পড় নি? এ সেই! কাণা গরুর ভিন্ন গোয়াল না হ'লে এ-দিকে আসে।"

অপরাধীর মত হিমাদ্রি বলল, "থামবেন না, বলে যান। আপনাদের ভিতরে যে এত কালও আছে, তা জানতুম না। মেয়েরা বিয়ে হ'লে যে এমন প্রবল হ'য়ে ওঠে, আজ তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি নিরুপমা। তাই আজ দিব্যি অচেনার ভাণ ক'রে গেলে। কিন্তু ভুলে যেও না, একদিন আমার কাছে কিছুদিন পড়েছিলে। বেশী দিনের কথা নয়। এখানে যখন থাকতে।"

নিরুপমা বেঁকে দাঁড়াল। যেন তার আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে। যাবার আগে তাই শুনিয়ে শুনিয়ে বলে গেল, "তারি আমার মাষ্টার রে! যিনি মাইনেই তো পড়াতেন। তা আবার অত কেন?"

মৃগেন্দ্র সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "এখানে কি জন্যে এসেছিলে বল তো? কিন্তু—"

অপরাধীর মত হিমাদ্রি জবাব দিল, "বড্ড গরম হচ্ছিল, ভাবলাম একটু ছাদে গিয়ে বসব। সিঁড়ির কাছে মেয়েরা ভিড় ক'রে ছিলেন তাই।"

"খাওয়া হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"ছাদে যাবে তো যাও।"

"না থাক।" বলে, সে পা টেনে টেনে পথ চলতে লাগল। যেতে যেতে সে অনেক কথা ভাবলে। ভাবলে, আজকের এই নিরুপমার সঙ্গে সে-দিনের নিরুপমার কোন মিল নেই। সেদিন সে ছিল শুধু জ্যাঠার সংসারে প্রতিপালিতা নিরুপমা, আর আজ সে সন্তানের জননী। একদিন যে মেয়ে তাকে কথায় কথায় বলত লাজুক, না এলে কৈফিয়ৎ চেয়ে অস্থির ক'রে তুলত, এটা-ওটা বায়না ক'রে তাকে অস্থির করত, আর আজ সে-ই তাকে চোর ব'লে পাঁচ-জনের সামনে অপমান করল। হিমাদ্রি বুঝলে, এ নিরুপমার আর কিছু নয়—জেলাদী। নির্ম্মলাকে টপকে ঘুমাগী জীবনে সে যে তার হৃদয়কে ছুঁয়ে যেতে পারে নি, এ তারই প্রতিক্ষিপ্ত প্রতিশোধ। এ আর কিছু নয়। হায় রে নারী। কে জানে, তোমাতে অমৃত-গরল দুই-ই থাকে।

সেদিনটাতে নেহাৎ অজ্ঞাতসারে নির্ম্মলার নামটা তার মুখে মুখে ফিরত। বন্ধুরা শুনে খোঁচা দিতে ছাড়ত না, বলত, "অন্ন বিদ্যা ভয়ঙ্করী! অল্প জলের মাছ ফর ফর করে। নতুন যারা মেয়েদের ছাপা মাড়াতে পায়, তারে, না জানি কি হ'লায় রে! পঞ্চমুখে তখন কবিতা লেখে। ও হচ্ছে এক রকমের সার্কাসের সং।" তার প্রতি যে কারও এতটুকু শ্রদ্ধা নেই, এই কথাটাই হিমাদ্রির মনে বার বার আনাগোনা করতে লাগল।

নির্ম্মলাদের বাড়ী আর গেল না।

হিমাদ্রি বিকেলে বেরুবে বলে নামছে, দেখে সিঁড়ির কাছে নীচের সেই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

"তোমাকেই খুঁজছিলাম হে ছোকরা।"

"আমাকে?" হিমাদ্রির চোখে-মুখে অবিশ্বাসের ভাব। ভদ্রলোক রুক্ষস্বরে বললেন, "কি মনে হয়? সে-দিন তুমি যে আমার ঘরে ঢুকেছিলে, আমার ঘড়িটে কি করলে?"

হিমাদ্রি বিরক্তস্বরে বলল, "তার আমি কি জানি?"

"জানি নে বললে শুনছে কে?"

ঘোড়সওয়ারের বিপদ

হিমাদ্রি থতমত খেয়ে গেল। বলে কি?

দোতলা থেকে কৈলাসবাবু বলে উঠল,"ধরুন স্যার, ধরুন। আমাদেরও 'ডাউট' হয়। বেকার ছেলে, দেখছেন না জামা-কাপড়, চোখ-মুখের ছিরি।"

সুরেনবাবু বেরিয়ে এসে বলল, "আমিও বলব বলব ভাবছিলাম। একলা বাচ্চা বউ নিয়ে থাকি। আর ঐ ছোট্ট মেয়েটা। সারাদিন আফিসে থাকি, আপনাদের উপর ভরসা ক'রেই তো? ওমা, মেয়েটা ছাদে উঠল, তাকে কোলে পিঠে করবে। জিজ্ঞেস করবে, 'তোমার নাম কি?' রোজ রোজ লজেন্‌চুস্ এনে দেবে, বল তো খেলনা। কেন, কিসের জন্য? তোমার তো বাপু কেউ মাথার দিব্যি দেয় নি। সেদিন হঠাৎ এসে আমার পরিবারকে রাঙেল্‌টা বলে কি? বলে, 'বৌদি, যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি, আমি চাল এনে দিচ্ছি আপনার হাঁড়িতে যদি দু'টি ফুটিয়ে দেন। হোটেলে খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া প'ড়ে গেছে,'—শুনুন আবদার একবার! ওঃ, যেন আমার বাপের কুলের গুরুঠাকুর উনি। সেই থেকে আর মেয়েটাকে তো ছাদে উঠতে দিই নে। কি জানি, কোনদিন হয় তো গলা থেকে হারছড়া ছিনিয়ে নিয়ে পালাবে। সব ঐ, বুঝেছেন কৈলাসবাবু, বাড়ীয়ালা ব্যাটার দোষ। চাল নেই চুলো নেই। না আগ, না পেছে, একটা ছেঁড়া মাদুর আর একপাটা বই, ও-সব নিয়ে পালাতে কতক্ষণ?"

হিমাদ্রি সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনলে! শেষে যাবার সময় বলল,"সত্যিই আমি চোর, আমি অভদ্র, অন্ততঃ আমার বেশ-পোষাক তাই বলে। আমি যদি জানতুম আপনার স্ত্রী তার জন্য অসন্তুষ্ট হবেন, কখনও তাঁকে বিব্রত করতুম না। আমার নিজের ভাই পো, ভাই কি নেই ব'লেই আপনার মিনুকে অত ভালবাসি। কি ক'রে জানব যে, তার জন্য আপনারা আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন। চিরকালটা পরকে নিয়ে আমার কাটল। কাজেই পর কাউকে এখন ভাবতে পারি নে। বেশ, আমি গেলেই যদি আপনাদের ভাল হয় তাই যাব সুরেনদা। আমার জীবনে এর বেশী যে পাবনা তা আমি জানি।" বলতে বলতে সে উপরে উঠে গেল।

তার পরদিন ভোর না হোতেই মৃগেন্দ্র তার খোঁজে এলেন।

কৈলাসবাবু প্রশ্ন করলেন, "উপরের সেই ছোকরাটিকে খুঁজছেন তো? কোথায় গেছে তা তো জানি নে। কাল রাত্তিরে তাড়া খেয়ে পালিয়েছে। আপনিও তার কাছে কিছু পেতেন বুঝি?"

উপর থেকে কিশোরীবাবু জবাব দিলেন, "কে বললে তাড়া খেয়েছে? আমার পরিবারের কাছে দিয়ে গেছে। আপনি যাবেন কি-না তাই সব্বাইকে কেবল জানতেই দেখেন। চাকরির নাম ক'রে খেলে বেড়ান তো ভূরি। আপনার বুদ্ধি এর চেয়ে আর কত ভাল হবে—"

কৈলাসবাবু চোখ-মুখ রাঙিয়ে কি একটা কঠিন প্রত্যুত্তর করতে যাচ্ছিলেন। কিশোরীবাবু তীব্রকণ্ঠে জবাব দিলেন, "ও-সব চোখ রাঙানি আমাকে দেখিও না বাবু। আমি তো সে চেহারার মত ভাল মানুষ নই। একটি বুঁকিতে ঠাণ্ডা ক'রে দেব। কাউকে খাতির জানির করব না।" বলেই কিশোরীবাবু যেন লাফাবার জন্য পা বাড়ালেন। কৈলাসের ঘরের দরজা সপাং ক'রে বন্ধ হ'য়ে গেল দেখে সুরেন্দ্র হো হো ক'রে হেসে উঠল।

"কাওয়ার্ড-কাওয়ার্ড। লোকটা একটা পকেটমার, জানেন কিশোরীবাবু। ছোঁড়াটা বেহাৎ ভাল মানুষ ছিল। ঐ ব্যাটাই শিখনে লেগে"—পরে মৃগেন্দ্রকে লক্ষ্য ক'রে, "সে উঠে গেছে মশাই।"

যাকে লক্ষ্য ক'রে বলা সেই মৃগেন্দ্র চলতে চলতে বললেন, "উঠে গেছে তা তো বুঝলাম। কিন্তু কোথায় যে গেছে, তা তো আর বলে যায় নি। এমন একটা বিশ্বাসী লোকও পাচ্ছি নে ছাই, যে তার সঙ্গে ভাইঝিটাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাই। পাঁচদিনের কড়ারে এনে আজ পনের দিন হ'য়ে গেল। পরের বৌ হাজার হ'লেও তো!"

# ঘূর্ণির মৃৎশিল্প

—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়

নদীয়া জেলার প্রধান শহর কৃষ্ণনগর মাটির পুতুলের জন্য দেশদেশান্তরে খ্যাত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা কৃষ্ণনগরে প্রস্তুত হয় না। ঘূর্ণি নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লী উহার আদি জন্মস্থান। এখনও এই স্থানেই প্রধানতঃ নানাবিধ মৃৎ-পুতুলি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিরূপে এই শিল্পের উৎপত্তি ঘটে, তাহা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে।

হাঁড়ি-কুঁড়ি প্রস্তুত করাই সাধারণ কুম্ভকারদিগের প্রধান উপজীবিকা। ঘূর্ণির পালেদের পেশা উহাই ছিল। কেহ কেহ এই সঙ্গে পাতকুয়ার জন্য পাট গড়িত। সুতরাং হাঁড়ি-কুঁড়ি ও পাট গড়াই ছিল ঘূর্ণির মৃৎশিল্পের প্রথম অবস্থা।

দ্বিতীয় অবস্থায় আমরা তাহাদিগকে সময়ে সময়ে হিন্দুদের দেবীর মূর্ত্তি গঠন করিতে দেখি। রাজা সুরথ না কি সর্ব্ব-প্রথমে বাসন্তী পূজা প্রবর্ত্তন করেন। রাবণ বধের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্রকে অকালে বোধন করিয়া আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা করিতে হয়। সেই হইতে শারদীয়া পূজা হইয়া আসিতেছে। আট শত বৎসর পূর্ব্বে মহীশূর সরকার একখানি প্রস্তরখণ্ড পান—উহাতে মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তি খোদিত ছিল। ঐ প্রস্তর-খানি এক্ষণে কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। অন্ততঃ আট শত বৎসর পূর্ব্বে যে দুর্গাপূজা হইত, ইহা তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রাজা হন। (১) দরিদ্র গৃহস্থদিগের সুবিধার জন্য ইনি সভক্সাধ্য জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন করেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে নবদ্বীপে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্রোক্ত দেব-দেবীর সাকারমূর্ত্তিসমূহের পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়া যান। সুতরাং প্রায় সাড়ে চার শত বৎসর ধরিয়া নবদ্বীপ অঞ্চলে দক্ষিণাকালী মূর্ত্তি গঠিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় হইতে ধরিলেও কৃষ্ণনগর ও ঘূর্ণির কুম্ভকারেরা যে দীর্ঘ দুইশত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া ছোটবড় নানাপ্রকার প্রতিমা গড়িয়া আসিতেছে, ইহাতে কোন সন্দেহই নাই।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মনস্তুষ্টি সাধন ও তাঁহার নিকট হইতে সম্মান এবং পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে গৃহস্থেরা আপনাপন দুর্গাদি প্রতিমা রাজবাটীতে লইয়া যাইতেন এবং এখনও যান। উৎকৃষ্টরূপে গঠিত ও সজ্জিত প্রতিমার কারিকরদিগকে গুণানুসারে পুরস্কার দানের ব্যবস্থা আজিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পুরুষানুক্রমে বিবিধ প্রকার প্রতিমা নির্ম্মাণে অভ্যস্ত হওয়ায় এখানকার পালেরা মৃৎশিল্পে বিশেষ পটুতা অর্জ্জন করে। এই জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাজা-মহারাজা পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগর ও ঘূর্ণি হইতে ভাল ভাল কারিকর লইয়া গিয়া দুর্গা, কালী প্রভৃতি প্রতিমা গঠন করাইতেছেন।

এক্ষণে কি কারণে এবং প্রধানতঃ কোন্ কোন্ কারিকর-দ্বারা ঘূর্ণির জগদ্বিখ্যাত মৃৎশিল্প ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার ইতিবৃত্ত অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক।

ঘূর্ণির মৃৎশিল্পের তৃতীয় স্তরে (age) রহ প্রকার খেলানে পুতুল বা সং প্রস্তুতের কাল। ৺রঘুনাথ পাল (১০৭ বৎসর, ১০ মাস, ১০ দিন) ৺রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য (৯৭ বৎসর) প্রভৃতি দীর্ঘজীবী বৃদ্ধগণের নিকট গল্প শুনিতাম যে, ঘূর্ণির কালাচাঁদ পাল সর্ব্বপ্রথমে আনন্দমেলে গ্রামে গিয়া ভূত প্রেত ও সং গঠন করেন। ঐ গ্রামটা না কি হাবড়া অঞ্চলে অবস্থিত। ঐ গ্রামে যে মেলা বসিত, উহাতে মানুষের আকৃতি-বিশিষ্ট পৌরাণিক সং দেখান হইত। প্রথম প্রথম খড় ও মাটির সাহায্যে কালাচাঁদ রাম রাবণ প্রভৃতির যে সব প্রমাণ সং গড়িতেন, সেগুলার হাত পা নড়ান যাইত না। সেইজন্য কালাচাঁদ ঐ গ্রামেরই চণ্ডী মিস্ত্রী নামক একজন ভাল ছুতারের সাহায্যে কাঠ দ্বারা কাঠাম গড়িয়া লইতেন। পরে উহাদের উপরে জাকড়ার সাহায্যে কাথা পরাইয়া সং গঠন করিতেন। দড়ির সাহায্যে ঐগুলার হাত পা ইচ্ছানুরূপে নড়ান চলিত। মেলার কতকটা স্থান বয়না দ্বারা উত্তমরূপে ঘিরিয়া উহার মধ্যে ওস্তাদ কালাচাঁদ পাল অশিষ্য অবস্থান করিতেন এবং ঢোল ও সানাইয়ের বাদ্যের সঙ্গে তালে তালে সংগুলার হাত পা ও মুখ নড়াইয়া যুদ্ধাদির অভিনয় দেখাইতেন। তাঁহার জনৈক শিষ্য ছিলেন আনন্দমোহন পাল।

কালাচাঁদ পাল মহাশয় যে, শুধু ভাল ভাল সং গড়িতে পারিতেন, তাহা নহে। বিবাহোপলক্ষে একবার তিনি মহা-

---

(১) কৃষ্ণনগরের রাজাদিগের বংশাবলী প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হয়। উহা "কিতীশ বংশাবলী চরিতং" নামে খ্যাত। উহাতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাল পর্য্যন্ত সংক্ষেপে লেখা আছে। জনৈক জার্ম্মান-পণ্ডিত উহা অনুবাদ করেন। যথা :—"A chronicle of the family by Rajah Krishna Chandra, Navadwipa, Bangal, Edited and translated by W. Pertsch, Berlin, 1852." স্বর্গীয় ৺কার্ত্তিকচন্দ্র রায় মহাশয় উহা অবলম্বনে বাংলাভাষায় "কিতীশ বংশাবলী" রচনা করেন।...লেখক।

রাজা শিরীশচন্দ্রের একটা প্রমাণ মূর্ত্তি এরূপ নিখুঁত ভাবে গড়েন যে, তাঁহার অনেক প্রজা উহাকে প্রকৃত মহারাজা ভ্রমে প্রণাম করিয়াছিল। ইঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া উত্তরকালে রঘুনাথাদি অনেকে মূর্ত্তি গঠন শিক্ষা করিয়া যশস্বী হন। প্রায় ১৪০ বৎসর পূর্ব্বে কালাচাঁদ পাল মহাশয় ঘূর্ণিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশে লোপ পাইয়াছে।

জলপথ বা খড়্গনদীপথে সে কালে বড় বড় নৌকা ঘূর্ণির ঘাট দিয়া যাতায়াত করিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পণ্য-বাহী বড় বড় নৌকাও সময়ে সময়ে চলাচল না করিত এমন নহে। মহৎপুর ও অন্যান্য স্থানের নীলকুঠীর সাহেবদিগের কলিকাতায় যাতায়াতের ইহাই ছিল একমাত্র পথ, কারণ তখন এতদঞ্চলে রেলপথ ছিল না। ঘূর্ণিতে একটা কুণ্ডঘাট ছিল। ঐস্থানে বহুসংখ্যক নৌকাকে অপেক্ষা করিতে হইত। বৈদ্যনাথ পালের কনিষ্ঠপুত্র চণ্ডীচরণ একবার খেয়ালবশে কয়েকটী ফকীর, পুরাণী ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী প্রস্তুত করিয়া ঘাটে লইয়া যান। কোম্পানির জনৈক সাহেব ঐগুলিকে দুই টাকা হিসাবে কিনিয়া লন। আশাতীত মূল্য লাভ করায় তিনি অধিক পরিমাণে সাহেবদের পছন্দসই বাবুর্চ্চি, খানসামা প্রভৃতি পুতুল নির্ম্মাণে মনোযোগ দেন। বর্ত্তমান মৃৎশিল্পের ইহাই প্রথম সূত্র। তাঁহার দেখাদেখি রামলাল পাল, শ্রীরাম পাল প্রভৃতি অনেকেই ঐরূপ পুতুল গড়িতে আরম্ভ করেন। ইহাই মৃৎশিল্পের চতুর্থ স্তর বুঝিতে হইবে।

বিখ্যাত মৃৎশিল্পী রঘুনাথ পাল মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, একবার কৃষ্ণনগরের জনৈক জমাদারের পেন্সন লইয়া বিলাতে যাইবার পূর্ব্বে শ্রীরাম পাল মহাশয়কে কয়েকটা এক ফুট উচ্চ উচ্চ খানসামা, বাবুর্চি, চাপরাসী, কেরাণী ও মোকারের মূর্ত্তি গঠন করিবার বরাত দেন। প্রচলিত প্রথানুসারে বাঁশের গায়ে কোটোঘাটি ধরাইয়া ঐগুলি প্রস্তুত করা হয়। জমাদার সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী ঐ সব পুতুল দেখিয়া বিশেষ প্রীত হন। তাঁহার দেখাদেখি পুলিস ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবরাও ইচ্ছানুরূপ অর্ডার দেন। এই সকল সাহেব-দিগের নিকট হইতে অত্যধিক অর্থ পাইবার আশায় অন্যান্য পালেরাও পৈতৃক ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া খানসামাদি গঠনে ব্যাপৃত হন। ইহাকেই আমরা ঘূর্ণির মৃৎশিল্পের পঞ্চম অবস্থা বলিতে পারি।

একবার স্থানীয় ডাক-বাংলায় একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারী আসিয়া কয়েকদিন বাস করেন। তিনি শ্রীরাম পাল মহাশয়কে কয়েকটা পুতুলের বরাত দেন। পরদিন চণ্ডীচরণ পাল ডাক-বাংলায় গিয়া সাহেবকে অনুরোধ করিয়া কয়েকটা পুতুলের বরাত পান। প্রতিভাশালী প্রতিদ্বন্দ্বী চণ্ডীচরণ বুদ্ধি খাটাইয়া বাঁশের গোঁজের পরিবর্ত্তে আবশ্যকমত ছোট ছোট লোহার শিক দিয়া নয় দশ ইঞ্চি আন্দাজ উচ্চ পুতুল প্রস্তুত করেন এবং ঐগুলিকে 'পোয়ানে' পোড়াইয়া লন। পরে রং করিয়া সাহেবটির নিকটে নির্দ্দিষ্ট দিনে লইয়া যান। শ্রীরাম পালও সেই সময়ে সাহেবের নিকটে উপস্থিত ছিলেন। চণ্ডীচরণ উভয়ের পুতুলকে জলে ডুবাইবার জন্য সাহেবকে অনুরোধ করেন। শ্রীরাম পাল অবশ্য তাঁহার কাঁচা মাটির পুতুলকে জলে ডুবাইতে রাজী হন নাই, কিন্তু চণ্ডীচরণ নিজের পুতুলগুলিকে একটা টবের জলে ডুবাইয়া দেখান যে এগুলি কিরূপ শক্ত ও স্থায়ী। এইরূপে সে যাত্রা চণ্ডীচরণই জিতিয়া যান। সেই হইতে লোহার শিক দেওয়া পোড়ান' পুতুল নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীরাম পালের প্রাতুষ্পুত্র রাখালদাস পাল মহাশয়ের ব্যবসায়-বুদ্ধি সমধিক তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি ছোট ছোট খড়ের চালা-ঘর প্রস্তুত করাইয়া উহাদের মধ্যে উপযুক্তরূপ পুতুল রাখিয়া হিন্দুসমাজের বিবাহাদি বিবিধ প্রকারের সামাজিক চিত্র প্রদর্শন করিতেন এবং ঐগুলিকে রঙ্গ-কাছারী, নীলকুঠী প্রভৃতিতে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া আসিতেন। এইরূপেই ঘূর্ণির পালেদের নাম বাহির হয়। দেশ-বিদেশের শিল্প-প্রদর্শনীতে সময়ে সময়ে এইসব পুতুল প্রেরিত হইত। ইহাই প্রকৃতপক্ষে মৃৎশিল্পের ষষ্ঠ স্তর।

দেশবিদেশের শিল্প-প্রদর্শনীতে প্রেরিত হওয়ায় এই নূতন শিল্পের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্য এবং ফ্রান্সাদি বিদেশের প্রদর্শনীর জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ঘূর্ণিতে নানাবিধ পুতুলের বরাত দিতেন। কোন কোন শিল্পী বাঙ্গালী হিন্দু-সম্প্রদায়ের বিবাহাদি সামাজিক রীতি-নীতি উপযুক্ত পুতুলের সাহায্যে প্রদর্শন করিতেন। বলা বাহুল্য এগুলি ইংরাজ ফরাসী প্রভৃতি বিদেশীয় দর্শকদিগের পক্ষে বিশেষ কৌতূহলজনক ও প্রীতিপদ হইত। মেলার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কারিকরদিগকে যে সকল সার্টিফিকেট ও মেডেল পারিতোষিক দিতেন, নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মারফৎ ঐগুলা পালেদের মধ্যে প্রদান করা হইত। ঐগুলি এখনও পালেদের ঘরে সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

উদাহরণ স্বরূপে হাইডপার্কের (লণ্ডন) ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ও পারী সহরের ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। পরবর্ত্তীকালে কোন কোন কারিকর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মেলবোর্ণ (অষ্ট্রেলিয়া, ১৮৮০খৃঃ), বোষ্টন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১৮৮৩খৃঃ) প্রভৃতির মেলাতেও নানাবিধ পুতুল পাঠাইয়া মেডেল ও সার্টিফিকেট লাভ করেন। ফলতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঘূর্ণির যে সকল কারিকরের চেষ্টায় মাটির পুতুলের নাম বাহির হয়, তাহাদের মধ্যে রামলাল পাল, শ্রীরাম পাল, রাখালদাস পাল ও রঘুনাথ পাল মহাশয়দিগের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।

রামলালের পুত্র শ্রীযুক্ত বঙ্কেশ্বর পাল মহাশয়ের বয়স এক্ষণে ৭৮ বৎসর। পিতৃব্য বিখ্যাত শিল্পী রঘুনাথ পালের নিকট

ইনি শিক্ষালাভ করেন। সর্ব্বপ্রকার মৃৎশিল্পে ইনি তখন অদ্বিতীয়। ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যয়াধিক্যে ইনি একবার বাংলার সকল রকম মাছের এক এক জোড়া প্রস্তুত করেন। পাঠাইবার পূর্ব্বে ইনি কয়েকটা পুঁটিমাছকে বার্ণিশ শুকাইবার জন্য রৌদ্রে রাখিয়া অন্যত্র যান। একটা চিল প্রকৃতমৎস্যভ্রমে একটি পুঁটিমাছের উপরে ছোঁ মারিয়া নিকটস্থ চণ্ডীমণ্ডপের মটকার উপরে বসিয়া খাইবার চেষ্টা করে। উহা যে মাছ নহে, মৃত্তিকা মাত্র, তাহা বুঝিতে পারিয়া অন্যত্র উড়িয়া যায়। বকেশ্বর পালের শিল্প-কুশলতার ইহা একটি সামান্য উদাহরণ মাত্র।

মৃৎ-শিল্পের সপ্তম বা শেষস্তরে মানুষের অবিকল মূর্ত্তি গঠনের যুগ। কালাচাঁদ পালে ইহার আরম্ভ এবং রঘুনাথ পালে ইহার চরমোন্নতি ঘটে। ৺রঘুনাথ পাল মহাশয় পিতৃব্য প্রতিভাশালী চণ্ডীচরণের নিকটে শিল্প সাধনা করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি স্বভাবের অনুকরণ করিতে ভালবাসিতেন; অনেক সময় গোরাল ঘরে বসিয়া গাভীর মূর্ত্তি-গঠন অভ্যাস করিতেন। ভিক্ষুককে পয়সা দিয়া কাছে বসাইয়া রাখিতেন এবং ঘরে বসিয়া বসিয়া তাহার মূর্ত্তি গড়িতেন। ইহার ফলে তাঁহার নির্ম্মিত পুতুলগুলি নিখুঁত হইত। কলিকাতাস্থিত গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলের জন্য অল্প বেতনে একজন দেশীয় মডেলার রাখা স্থিরীকৃত হইলে রঘুনাথকেই নিযুক্ত করা হয়। স্কুলের তদানীন্তন অধ্যক্ষ লক সাহেব (Mr. Lock) তাঁহাকে মডেলিং সম্বন্ধে অনেক তথ্য শিক্ষা দেন।

ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে কলিকাতায় একটা প্রদর্শনী খোলা হয় (১৮৮২-৮৩ খৃঃ)। উহার জন্য গবর্ণমেণ্ট গারো, নাগা, আন্দামানী প্রভৃতি বহু জাতীয় লোককে কলিকাতায় আনয়ন করেন। ৺রঘুনাথ বাঁশ খড় ও মৃত্তিকার সাহায্যে উহাদের প্রমাণ অবিকল মূর্ত্তি গড়িয়া দেন। ঐ মূর্ত্তিগুলি মেলায় প্রদর্শিত হয়। একজন ইতালীয় কারিকর না কি প্ল্যাষ্টারের সাহায্যে ঐগুলি ছাঁচ লন ও প্ল্যাষ্টারের দ্বারা মূর্ত্তি ঢালাই করিয়া দেন। ঐ ঢালাই মূর্ত্তিগুলি লণ্ডনে প্রেরিত হয়, আর মৃত্তিকা নির্ম্মিত আদি মূর্ত্তিগুলিকে কলিকাতা যাদুঘরে (museum) রক্ষা করা হয়। ঐগুলি অবশ্য অদ্যাপি যাদুঘরে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নাগা, গারো প্রভৃতি নানা জাতীয় লোকের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে করিতে ৺রঘুনাথ মানুষের প্রতিমূর্ত্তি গঠনে এরূপ সিদ্ধ হইয়া উঠেন যে, প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরাদি অনেক রাজা মহারাজা তাঁহার দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে মৃন্ময় মূর্ত্তি গড়াইয়া লইয়া ইতালীতে পাঠান। সেখানে তদ্দৃষ্টে মার্ব্বেল মূর্ত্তি প্রস্তুত হইলে নিজ নিজ গৃহে আনিয়া স্থাপন করেন। ফলতঃ তাঁহার হস্তে মৃৎ-শিল্পের চরমোন্নতি ঘটে।

পূর্ব্বের মত সাহেবেরা এখন আর ঘুর্ণির মাটির পুতুল ক্রয় করেন না। সুতরাং দরিদ্র ভারতবাসীদের জন্য অতি সস্তা পুতুল প্রস্তুত করা আবশ্যক বোধ হয়। এই কারণেই সস্তা ছেঁচো "ওজনে-পুতুলের" উৎপত্তি ঘটে। প্রথমে ভাল ভাল কারিকরের হস্তে নির্ম্মিত পুতুল হইতে মৃত্তিকা বা প্ল্যাষ্টারের সাহায্যে খণ্ড খণ্ড ছাঁচ লওয়া হয়, পরে ঐ গুলির সাহায্যে মৃত্তিকাদ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক পুতুল বাহির করা চলে। এই কাজে অনেক অনাথা স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা নিযুক্ত করায় নাম ছেঁচো সস্তা পড়ে। অবশ্য কারিকরদ্বারা ঐ গুলিকে সংশোধিত করিয়া লওয়া হয়।

শতবর্ষ পূর্ব্বেও ঘুর্ণিতে একপ্রকার ছেঁচো পুতুলের প্রচলন ছিল। বলা বাহুল্য, সেগুলি এখনকার মত সুন্দর হইত না। পালেদের অনেক বালক-বালিকা এবং বিধবা স্ত্রীলোক আজিও ঐরূপ পুতুল গড়িয়া স্থানীয় চড়ক ও রথ-প্রভৃতির মেলায় বিক্রয় করিয়া থাকে। ৮০।৯০ বৎসর পূর্ব্বে ঘুর্ণির কুণ্ডঘাটে—দিনাজপুর অঞ্চল হইতে "পুরবী চাউল" বোঝাই যে সকল নৌকা আসিত, উহাদের মাঝি-মাল্লারা চাউলের পরিবর্ত্তে খাঁপা ছেঁচো পুতুল লইত। যে পুতুলটার খোলের মধ্যে যত চাউল ধরিত উহাই ছিল তাহার বিনিময়-মূল্য। বলা বাহুল্য, অধিক চাউল পাইবার আশায় পালেরা তখন খুবই খাঁপা পুতুল প্রস্তুত করিত। রঘুনাথ বাল্যকালে এরূপ পুতুল অনেক বেচিতেন বলিয়া গল্প করিয়াছিলেন। খড়ে নদীতে এখন আর বারমাস নৌকা চলে না। তদ্ভিন্ন এ অঞ্চলে একাধিক রেলপথ নির্ম্মিত হওয়ায় নৌকাযোগে চাউল যাতায়াত কমে না। সুতরাং চাউলের পরিবর্ত্তে ছেঁচো পুতুল বিক্রীত হইতে দেখা যায় না।

পূর্ব্বকালে মাটির পুতুলকে পাট ও সনের ছেঁসো, বাজে তুলা, কাগজের টুকরা ও কাঠের গুঁড়া দ্বারা প্যাক করা হইত। কিন্তু রেলওয়ে কুলিদের অত্যাচারে অনেক পুতুল চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে বিচালী খড়দ্বারা নিরাপদে দূর দূরান্তরে পুতুল পাঠাইবার উপায় উদ্ভাবন করেন। ষ্টুটিং কাগজ আবিষ্কারের মত এ ঘটনাটাও অবশ্য আকস্মিক ঘটনা ছিল। মেদিনীপুরের এক প্রদর্শনীর জন্য পুতুল প্যাক করিবার সময় প্যাটার্দির অভাব ঘটায় ইনি উপস্থিত-বুদ্ধিবলে গরুর জন্য কাটা বিচালী খড়দ্বারা বাকী পুতুলগুলাকে প্যাক্ করিয়া পাঠান। আশ্চর্য্যের বিষয় ঐ বাক্সের পুতুলগুলা অক্ষতভাবে পৌঁছে, যদিও অন্যান্য বাক্সের অনেক পুতুল চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। ইহার পর ইনি বিচালী খড় ব্যবহার করিতেছেন—বিলাত পর্য্যন্ত পুতুল অক্ষতাবস্থায় পৌঁছিতেছে। ইহার দেখাদেখি সকলেই এখন বিচালী-খড় কাজে লাগাইতেছেন। প্যাকিং বাক্সের পরিবর্ত্তে বাঁশের ঝুড়ি, চুপড়ি ও ডোলের ব্যবহার ইঁহারই কৃতিত্ব। মৃৎশিল্পের বিস্তার-পক্ষে এই সকল ব্যবস্থার আবশ্যকতা আদৌ উপেক্ষণীয় নহে।

# এলোমেলো

—শ্রীসুধাংশু মুখোপাধ্যায়

বাড়ীটা বেশ জমকালো। বাইরের চেয়ে ভিতরের চাকচিক্য আরও বেশী। চাকচিক্য বলতে দেওয়ালের রঙের বৈচিত্র্য বা আসবাবপত্র, ছবি ইত্যাদির চাকচিক্য বোঝাচ্ছে না এখানে। সেগুলো তো আছেই এবং এত অধিক পরিমাণে আছে যে, তাদের আকৃতি, প্রকৃতি বা অবস্থান সম্বন্ধে বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। নিষ্প্রয়োজন এই জন্য যে, একটা বড় বাড়ীতে কি পরিমাণ আসবাবপত্র থাকা উচিত, সে সম্বন্ধে বাইরে থেকে দেখেই লোকে একটা ধারণা ক'রে নিতে পারে। যদি বলা যায়, বাড়ীটা প্রাসাদতুল্য, তার ড্রয়িং-রুমে ঢুকলেই সোফা, কৌচ ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যাবে, একটা দামী কুলকাটা সিল্কের টেবিলক্লথ দিয়ে মোড়া পাথরের টেবিলের উপর দুটো সুদৃশ্য চীনামাটির কুলদানীতে চমৎকার দুটো ফুলের তোড়া, পরলোকগত গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনীর দুটো বড় অয়েলপেন্টিং, লাইব্রেরী-ঘরে গোটাকয়েক বড় বড় বুকশেল্ফে দেশী বিলাতী নানারকম বই এবং সাময়িক পত্র, ইত্যাদি—এবং এই ক'রে প্রত্যেক ঘরের এক একটা বিশদ্ বর্ণনা করা যায়, তা হ'লে লেখবার আর পড়বার, দুটোরই ধৈর্য্য থাকা চাই খুব বেশী।

কিন্তু আসলেই গলদ রয়ে গেছে। গলদ এই, বাড়ীটা বড় এবং জমকালো বলেই সে তার একটা বিশেষ রূপ থাকবে অথবা আসবাবপত্র জমকালো হবে, বেশ একটা রাজপ্রাসাদের মত সাজানো হবে, তা নয়। অথচ বাড়ীটা বড়, আর যা জমকালো বা বৈচিত্র্যপূর্ণ, তা হ'ল তার অধিবাসীরা। আসবাবপত্র নয়, সোফা কৌচও নয়, যা দেওয়ালের রঙের বৈচিত্র্যও নয়।

তবু বাড়ীটার একটা রূপ আছে। তার ইটের উপর চুণবালির অস্তিত্ব হয় তো বহু পূর্ব্বকালে ছিল, কিন্তু এখন দেখলে সেটা অনুমান করা দুঃসাধ্য। বাড়ীটার বৃহৎ আয়তন ছাড়া বাহ্যিক সৌষ্ঠব কিছুই নেই। বহুদিনের সংস্কার অভাবে সেটা যেমন শ্রীহীন, তেমনই জীর্ণ আর পুরাতন।

কিন্তু বাইরের সৌন্দর্য্যই সব নয়। বাইরের চোখ-ঝলসানো রূপ বা সৌন্দর্য্য মানুষের মনে সাময়িক উত্তেজনা এনে দিতে পারে, উন্মাদনার সৃষ্টি করতে পারে, বিমুগ্ধও করতে পারে হয় তো; কিন্তু অন্তরের সৌন্দর্য্য যে চিরকাল মনকে বিভ্রান্ত ক'রে তোলে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

এই বিপুলায়তন বাড়ীটার অন্তরের সৌন্দর্য্য হ'ল তার অধিবাসীরা বা অধিবাসীরা। এঁদের নিয়েই আখ্যায়িকা।

বাড়ীর সব চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ থেকে আরম্ভ করলে প্রথমেই পরিচয় দিতে হয় বিধবা পিসীমার। পিসীমার পিতৃদত্ত নাম একটা আছে অবশ্য, কি তাতে কোন প্রয়োজন নেই। যেহেতু পিসীমা বললে যত সহজে চিনতে পারা যাবে, নাম বললে তত সহজে পারা যাবে না। সুতরাং পিসীমা ব'লে পরিচয় দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। অল্প বয়সে বিবাহ হয়েছিল তাঁর এবং সেই বয়সেই বিধবা হ'য়ে পিতৃগৃহে কায়েমী ভাবে বসবাস করছেন। এখন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ বছর। এই পঁয়ত্রিশ বছর আগের এ-বাড়ীর ইতিহাসে যা পাওয়া যায়, সেটা শুনতে বেশ ভাল লাগে। তখন এ বাড়ীর কর্ত্তা হরিনারায়ণ চাটুয্যের প্রবল প্রতাপ। অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি কোন কিছুরই অভাব ছিল না। তার পরের সত্তর পঁচাত্তর বছরে কি করে সে প্রতিপত্তি গেল, বাড়ীটার চুণবালি খসে পড়ল, এবং বর্ত্তমান গৃহস্বামীরা সাধারণ লোকের মত দুঃখ-দুর্দ্দশা সহ্য করতে শিখলেন, সে সব প্রকাণ্ড কাহিনী। সে কাহিনী হয় তো চিত্তাকর্ষক হ'তে পারে, কিন্তু তার কোন প্রয়োজন নেই। জগতে একটা ভাঙ্গাগড়া চলেছেই বরাবর। সেই ভাঙ্গাগড়ার মাঝেই উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ, এই সব পর পর হ'য়ে চলেছে। এই ভাঙ্গাগড়ার মাঝে কত সাম্রাজ্য, কত বিরাট কীর্ত্তি চলে যাচ্ছে, কত নূতন রাজা, নূতন ঐশ্বর্য্য, নূতন ইতিহাসের পত্তন হচ্ছে। সুতরাং এই পঁচাত্তর বছরে হরিনারায়ণের পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারীদের এই বাড়ীটার যে চুণবালি খসে ইট বার হতে পারে, এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে!

কিন্তু এ সব অবান্তর কথা।

পিসীমা হ'লেন সেই আমলের। পিতৃগৃহের ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে খুব ভাল ক'রেই পরিচয় ছিল তাঁর। ঐশ্বর্য্য জীবনে ভোগ করতে না পারলেও, চোখে দেখেছেন তিনি। ভোগ করতে পারেন নি এই জন্য যে, জীবন যখন তাঁর আরম্ভ হ'ল, তখন চোখ মেলে দেখতে পেলেন যে, তাঁর জীবনটা সকল ঐশ্বর্য্যের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। সারা জীবনের এই ব্যর্থতা, কঠোরতা, পঙ্গুতা এই সবে মিলে তাঁকে কঠিন রুক্ষ প্রকৃতির ক'রে তুলেছে।

তার পরেই পরিচয় দিতে হয় পিসীমার ভ্রাতুষ্পুত্রদের। প্রথমে যিনি জ্যেষ্ঠ তাঁকে নিয়েই আরম্ভ করা যাক। এঁর নাম মণিমোহন, বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ, পেশা চাকুরী, চাকুরীটা উল্লেখযোগ্য নয় মোটেই,—সামান্য। মণিমোহন একান্ত নির্ব্বিরোধী লোক, কারো সাতেও থাকেন না, পাঁচেও থাকেন না। সংসারের কোনদিকেই দৃষ্টি নেই তাঁর। চাকুরী ক'রে যে সামান্য অবসরটুকু পান, সেটুকু একটা খবরের কাগজ বা যে কোন একটা বই, তা সে ধর্ম্মপুস্তকই হোক বা অন্য কিছু হোক না কেন—পড়েই কাটিয়ে দেন। সংসারের অভাব-অভিযোগ, সুখ-অসুখ এ সবের বাইরে তিনি। একান্ত যদি কেউ জোর ক'রে স্মরণ করিয়ে দেয়, তা হলে সাময়িক ভাবে সেটুকু স্মরণে রাখেন এই পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয়ের নাম রামমোহন, পেশা খুব বাহারী। সুতরাং এর পেশাটাও অনুল্লেখ্য। রামমোহনের প্রকৃতিটা কিন্তু বড় ভাই মণিমোহনের সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থাৎ রামমোহন সংসার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। কোথাও কোন দিক্ দিয়ে এতটুকু ত্রুটী দেখলেই তার মেজাজ যায় খারাপ হ'য়ে। অবশ্য মিতব্যয়ী হওয়া খুবই ভাল, আর সেজন্য তাকে দোষ দেওয়া যাচ্ছে না। তবু সময়ে অসময়ে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে সে এমন গোলমালের সৃষ্টি করে, যেটা শান্ত, নির্ব্বিরোধী মণিমোহনকে পর্য্যন্ত বিচলিত ক'রে তোলে। তার স্বভাবের এই একটা দিকই যা খারাপ, আর সব ভাল। অন্ততঃ বাইরে থেকে দেখে তাই মনে হয়, মনের মধ্যে তার কি আছে কে জানে।

ক্রমিক সংখ্যা হিসাবে দ্বিতীয়ের পর তৃতীয়ের পরিচয়। ইনি হরিমোহন, কলিকাতায় থেকে চাকুরী করেন। অতএব সংসারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শুধু শনি-রবিবারে। সপ্তাহের বাকী কটা দিন অন্ন-সংস্থানের জন্য অফিসে কলমপেষায় ব্যস্ত থাকেন এবং দুটীর দিন পাড়ার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা, গল্প করা, আর তাস খেলায় কেটে যায়। সুতরাং এঁর প্রকৃতি স্ফুরণের সুযোগ খুব কমই পায় বলেই জানা হচ্ছে, তবে বাইরে থেকে দেখায় ভালই।

তার পর চতুর্থ অর্থাৎ ছোট, নাম ব্রজমোহন, পেশা কিছুই নয়। পেশা বলতে জীবিকার্জ্জন যদি বোঝায় তবে কিছুই নয়, আর পেশা বলতে যদি অন্য কিছু বোঝায়, তবে তার পেশা অনেক রকম। চাকুরী করা সম্বন্ধে তার নিজস্ব একটা মত আছে এবং সেই মতের পরিপোষকতার জন্যই চাকুরী সে আজ পর্য্যন্ত করে নাই বা ভবিষ্যতে করবার বিশেষ ভরসাও নাই। ব্রজমোহন হ'ল সেই প্রকৃতির লোক, যারা স্বাধীন মতবাদকে জীবনে শ্রেষ্ঠস্থান দেয়, পরাধীন হ'য়ে অন্নসংস্থানের জন্য চাকুরী করা, এ তার পোষায়ও না, মানায়ও না। এ-ছাড়া তার পেশা রয়, যেমন পাড়ায় তাদের আড্ডা বা গ্রামের নাট্য-সমিতির প্রধান উদ্যোক্তারূপে অথবা লোকের আপদে বিপদে সে সর্ব্বত্রই আছে। বাড়ীতে তার দেখা পাওয়া যায় শুধু দুবেলা দুটী খাওয়ার সময়ে। বাকী সময়টা সে যে কোথায় থাকে, কি করে, কেউ জানে না। তবে বাড়ীতে যে সময়টুকু সে থাকে, সে সময়ে সবাই বেশ সন্ত্রস্ত হয়েই থাকে। কোন কাজেই তার খুঁত থাকবে না, এই সে চায় এবং সেই কাজে একটু উনিশ-বিশ হ'লেই তার কর্কশ প্রকৃতিটা ধরা পড়ে। এই বড় একান্নবর্ত্তী পরিবারটাতে তার মত অক্ষয় আজও হ'য়ে গেছে শুধু বড় ভাই মণিমোহনের সরল প্রকৃতির জন্য। মণিমোহনের ছোট ভাইদের পরে আবাল্য স্নেহই আজও তাকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। না হ'লে, তার মত ছন্ন-ছাড়া জীবনের লোক কবে কোন অজানা পথ ধ'রে চ'লে যেত। অন্য ভাইয়েরা অবশ্য এটা পছন্দ করে না মোটেই; তবু সে জানে যত দিন বড়দা আছেন, তত দিন সে কাউকে গ্রাহ্য করে না।

মুস্কিল হয়েছে বেচারী ছোটবৌ-এর। তার স্বামীর অকর্ম্মণ্যতার জন্য বড় তিন যা'দের কাছে প্রায় প্রতিনিয়তই নানা অনুযোগ এবং আনুষঙ্গিক বচন-পরিপাটী তাকে শুনতে

হয়। এবং এত অধিক পরিমাণে শুনতে হয় তাকে যে, সেগুলো শুনে সহ্য করা প্রায় অনেক সময়েই তার হ'য়ে ওঠে না। প্রতিবাদ করতে হয় তাকে এবং প্রতিবাদের ফলে বাধে বিরোধ, আর বিরোধের ফলে জমে ওঠে অশান্তি। তার উপর পতিদেবতার ক্রোধ, সে ক্রোধের বিরাম নেই,—কারণে, অকারণে অতি তুচ্ছ ব্যাপারে সে ক্রোধের স্ফুলিঙ্গের বিকাশ হয়।

অথচ যে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার রূপলতার বালা আর কৈশোর কেটেছে, তাতে এ-রকম জীবনের সন্ধান সে কোন দিনই পায় নাই। সে-জীবনে স্বপ্ন আর কল্পনায় ওরা ভবিষ্যতের একখানি সুন্দর রঙীন ছবিই দেখা যেত। তার পিতৃগৃহের অবস্থা ভালই ছিল এবং বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কুমারী-জীবনের দিনগুলোর স্মৃতি অত্যন্ত মধুর। পিতার স্বচ্ছল অবস্থা সত্ত্বেও, কি করে সে ব্রজমোহনের মত পরোপকারী যুবকের হাতে পড়ল, সে কথা এখানে অবান্তর। হয় তো ব্রজমোহনের অক্ষমতা আছে, কিন্তু বংশগৌরবের জন্যই অথবা বিধিলিপির জন্য, যে জন্যই হোক রূপলতার বিবাহ হ'য়েছিল ব্রজমোহনের সঙ্গে।

কিন্তু এ পরের কথা—

বাকী পরিচয় বড়, মেজ আর সেজ তিন বৌয়ের। কলহ-বিবাদ প্রায় প্রত্যেক সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। কলহ-বিবাদ বাদ দিলে এরা ভালই। অবশ্য এ-কথা বলা হচ্ছে না যে, এরা কলহপরায়ণা। তবে সেটা প্রায়ই কাণে শুনতে হয়, সেটা চাপা দিয়ে লাভ নেই ব'লেই বলা।

এর পরের পরিচয় তিন বৌয়ের ছেলে-মেয়েদের। রূপলতা অর্থাৎ ছোট-বৌ নির্ব্বাট মানুষ। কিন্তু ছেলে-মেয়েদের সংখ্যার হিসাব দিতে গেলে খাতা পেন্সিল নিয়ে হিসাব করতে হয়, সে রীতিমত পাটীগণিতের ব্যাপার। কাযেই সে চেষ্টা ক'রে লাভ নেই।

এইবার কাহিনীর আরম্ভ। বাড়ীটা যে জমকালো তার পরিচয় পাওয়া গেল।

তখন সন্ধ্যা হ'য়েছে।

পিসীমা হাতে মালা জপছেন এবং মাঝে মাঝে কীর্ত্তনীয়া প্রসারিত করে বধূদের কাছের ক্রটী-বিচ্যুতি ধরছেন। মালা জপা শেষ হ'লে তিনি গল্প শোনাবেন, এই আশায় গুটি পাঁচ ছয় নাতি-নাতনী তাঁকে ঘিরে বসে আছে, এক সময়ে মালা রেখে গল্প শুনাতে আরম্ভ করেন তিনি—

তার পর জানিস অমু, তোর বাবা তখন তোর মতন ছোট, এই তুমি যেমন এখন ছোট না, সেই রকম তোমার বাবা ছিলেন—

বাবা না কি আমার মত ছোট ছিল? দোৎ—

ছিল রে ছিল, তখন এক দিন তার কি অসুখ, সাগ্গে না আর কিছুতেই, এ দিকে ডাক্তারের পয়সা চাই তো, পথ্য কেনবার জন্য পয়সাও চাই। অথচ হাতে একটী পয়সা নেই। কি করি···

ঠাকুরের চরণেতা খাইয়ে দিলে না কেন বাবাকে?

তাও খাইয়ে দিয়েছিলাম বই কি। কিন্তু পয়সাও তো চাই, ও মেজবৌমা, মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল যাহা তোমার, তুলে নিয়ে যাও।

আচ্ছা ঠাকুমা, বাবার মাইনে থেকে পয়সা নিলে না কেন?

পাগল, বাবা যে তখন তোর মত ছোট বললাম না, মাইনে পাবে কোথা থেকে? ওই যে ঘোষেদের খিড়কীর বড় নারকেল বাগানটা আছে না, ওটা ছিল আমাদের।

আমাদের? তবে মটু যে বলে ওদের বাগান?

এখন ওদেরই, আগে ছিল তোমাদের। বিষ্টুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, গাছে যা নারকেল আছে তার দাম কত হবে? সে বললে, পঞ্চাশ টাকা হ'তে পারে। আমি বললাম, না, দেড়শ' টাকা হবে, দেড়শ টাকা আমার চাই। সঙ্গে সঙ্গে কথাটী না ক'য়ে সে দেড়শ টাকা নগদ গুণে দিয়ে, নারকেল পাড়বার বন্দোবস্ত করতে গেল।

সেজ-বৌ খিল্ খিল্ করে হেসে মেজ-বৌয়ের গায়ে ঢলে পড়ল।

শুনছিস দিদি, বুড়ীর রঙ্গ দেখে বাঁচি না আর, পঞ্চাশ টাকার নারকেল কথাটী না ক'য়ে সে দেড়শ টাকায় নিয়ে গেল।

পিসীমা কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণতা আর রুক্ষতা দুটোই মিশিয়ে বললেন, তার সঙ্গে বেলায় তোদের অত হাসি কিসের লা? লজ্জা সরম আর কিছু নেই তোদের—

একটি সাবালক নাতি অর্থাৎ মণিমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র এক কোণে মাদুর বিছিয়ে পড়ছিল, সে ঠিক পড়ছিল বললে ভুল বলা হয়। খাতা আর পেন্সিল নিয়ে সরল কিছু একটা অঙ্কনের চেষ্টা করছিল। আর যখনই নিকটে কারও পায়ের শব্দ পাচ্ছিল, তখনই একখানা বই টেনে নিয়ে গুণ গুণ করে পড়ছিল, তিনি হঠাৎ টিপ্পনি কাটলেন, হাঁ, ঠাকুরমা, পঞ্চাশ টাকার নারকেল ষেড়শ টাকায় কিনে নিয়ে গেল,—নারকেলগুলো কিসের তৈরী ছিল?

নারকেল আবার কিসের তৈরী হয়?

তিন গুণ দাম দিয়ে নিয়ে গেল যখন, তখন রূপে বা ঐ রকম কিছু দিয়ে মোড়া ছিল নিশ্চয়ই?

আমার সঙ্গে মস্করা, পাজী। আসুক তোর বাবা। বুড়ো বয়সে মার খাইয়ে তবে ছাড়ব!

বাবা কিন্তু এলেন না। যিনি এলেন, তিনি ছোট কর্ত্তা, ব্রজমোহন। এসেই সপ্তমে সুর ধরলেন, এ সব কি অন্যায় বল দেখি, পিসীমা! কখন যদি কোন জিনিষ দরকারের সময় পাওয়া যাবে! কোথায় গেল এরা সব?

এরা বলতে অবশ্য একজনকেই বোঝায়, সম্ভ্রমে বহু-বচন। এরা অর্থাৎ ছোট-বৌ তখন রান্না-ঘরে কোন কিছু কাযে ব্যস্ত ছিল। সাড়া পেতেই শশব্যস্তে হাত ধুয়ে প্রায় এক রকম ছুটতে ছুটতেই এসে হাজির।

এই যে, রান্নাঘর ছাড়া আর দুনিয়াতে যাগো নেই তোমাদের? কেবল রান্না আর খাওয়া, হাতের বোতাম দুটো গেল কোথায় আমার?

তোমার হাতের বোতাম আমি জানব কি করে, বা রে!

শুনলে, পিসীমা?

পিসীমা কঙ্কার তুললেন, তাইত বাছা, ওরকম বগড়াটে স্বভাবও তোমার ভাল নয়।

বোতাম খুঁজে বার কর, কোথায় আছে। চিরুণীটাই বা গেল কোথায়, তাও আলাতনেই পড়া গেছে।

একটী ছোট ভ্রাতুষ্পুত্র নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে সানুনাসিক সুরে বললে, চিরুণী দাদা নিয়েছিল। দাদা, অর্থাৎ সেই চিত্রাঙ্কণে ব্যাপৃত ছেলেটী সগর্জ্জনে বললে, আমি নিয়েছিলাম, তুই দেখেছিস? এমন চড় মারব—

ছোট ছেলেটী তার পূর্ব্বেই অন্তর্দ্ধান করেছে।

নাওনি যদি, তবে গেল কোথায়? তার হাত পা হল নাকি?

আমি জানি না, কুমীকে জিজ্ঞাসা কর।

কুমী তনেই প্রতিবাদ করলে, আমি কি জানি? আমি নিয়েছি না কি? মনুকে জিজ্ঞাসা কর।

ইহাই দৈনন্দিন জীবন। এই ভাবেই চলেছে দিনের পর দিন।

এই হয়। যেখানেই অভাব, সেইখানেই অশান্তি, এ আর নূতন কি!

তবু তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে সময়ে অসময়ে কি অশান্তির সৃষ্টি! সংসারে পোষ্য অনেকগুলি, অথচ আহার্য্যের সংস্থান অল্প। আর এই ভাবেই ওদের কেটে গেল পর পর দু পুরুষ।

ছোট-বৌ রূপলতা যে তার বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে নি, একথাটা তার প্রতি অঙ্গভঙ্গির মধ্যে এমনভাবে সুপরিস্ফুট হয়ে আছে যে, যে-কেউ একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে। এ বলা হচ্ছে না যে, সে তার পিতৃগৃহের ঐশ্বর্য্যের কথা স্মরণ করে কখন চোখের জল ফেলেছে, অথবা বর্ত্তমান অসঙ্গতির মধ্যে বাস করে কোনদিন কোন অভিযোগ জানিয়েছে। যদি তাও সে করত, তা'হলে তা'র পক্ষে সেটা অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক হ'ত ব'লে মনে হয় না।

বড় তিন যা'দের চেয়ে রূপলতা সুন্দরী। তার গায়ের রঙটা গেরস্থ ঘরে থাকে বলে চলনসই তার অনেক উপরে। তাছাড়া তার মুখের গড়নটী এমন নিখুঁত আর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যে, দেখলে মানুষের মনকে আকৃষ্ট তো করেই তার উপর একটা উন্মাদনাও যে এনে দেয় না তাদের মনে, একথাও জোর করে বলা যায় না। তার যৌবন-চলচল যোড়শী তনুলতা, তার মাদকতা মাখানো সুশ্রী ছোট মুখখানার অভ্যন্তরে যে কামনাতরঙ্গ, পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-ভরা মনটী সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় রয়েছে, সেটার তো মৃত্যু ঘটতে দিতে পারে না সে।

কিন্তু মনের কামনা থাকলেই যে সেটা পূর্ণ হবে, এও তো হয় না। মনটা বেঁচেই থাকে, কামনার অপমৃত্যু ঘটে।

বছর চারেক আগের কুমারী রূপলতা কি কল্পনাও ক'রেছিল যে, পাঁচটী নগ্ন, কুরূপ, নোংরা সন্তানের জননী তার কালো আর কুৎসিত-দর্শন বপুখানি নিয়ে বড় যা বলবে, ছোট-বৌ, ছেলে মেয়েগুলোকে দেখ্ তো একবার, আমি পুকুর ঘাট থেকে আসছি।

কিংবা মেজ যা মিশিতরা দাঁতে ঠাট্টার হাসি মাখিয়ে তাকে শোনাবে, আ, মরি, রূপসীর ভাবন দেখে আর বাঁচিনে। আমরা কিন্তু বাপু অত ঢং জানতাম না, ছেলেটাকে দেখেই একটু উপকার কর, বেঁধে মল যে। —ব'লে একটা কদাকার উলঙ্গ শিশুকে গুম ক'রে তার কাছে বসিয়ে দিয়ে চলে যাবে!

ছোট-বৌয়ের যে একটা রূপ আছে, তাদের তিন জনের কারুরই নেই, এ-সম্বন্ধে তারা খুবই সচেতন। অন্ত মেয়ে হ'লে কি করত বলা যায় না, কিন্তু রূপলতা সংঘর্ষ আর কলহ ছুটোকেই প্রাণপণে এড়িয়ে চলে বলেই তার তরফ থেকে প্রতিবাদ শোনা যায় খুব কম।

তথাপি কলহের সূত্রপাত হয় এবং পরিণতি হয় বেশ জোরালো হয়েই।

মেজ-বৌ হয় ত কথায় কথায় বলে, মরণ আর কি,—সাধ আর ঘুরোয় না। খোঁপায় আবার কি নতুন ঢং দেখেছিস্ মেজদি?

বড়-বৌ কাছেই ছিল এবং কোন কারণে হয় তো সেদিন ছোট-বৌয়ের উপর তিনি প্রসন্ন—বলেন, তোর কি লা। তোর তো কালপেঁচার মত রূপের জৌলুষ, তা ব'লে ছোট-বৌকে যখন তখন খোঁটা দিস্ কেন?

ব্যস, এই সূত্রপাত। এরই জের চলে সারাদিন, সারারাত, তার পরের দিন, তারও পরের—

মেজ আর মেজ-বৌয়ে ভারী ভাব। মেজ-বৌ মেজ বৌয়ের কথা কেড়ে নিয়ে হাত-পা নেড়ে, চীৎকার করে অনর্থ বাধায়,—আমরা না হয় কালপেঁচা, তুমি কি পেত্নী! রূপটা একবার আয়নায় দেখ না নিজের। থাকে নিয়ে বিরোধ, সেই রূপলতা কিন্তু নির্ব্বিকার-চিত্তে চুল বেঁধে যায়, আলতা পরে, মুখখানা আয়নাতে বার বার দেখে দু হাত দিয়ে সামনের চুলগুলো কুলিয়ে নেয়, তারপর পিতলের ঘড়াটা নিয়ে বেরিয়ে যায় পুকুর-ঘাটে; এ সব দৈনন্দিন ব্যাপার, এতে সে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। এ সব নিয়ে মাথা ঘামানো চলে না। বড় যা মেজ যা কি বলছে, এ শোনবার কোন আবশ্যকতা নেই, গা ধুয়ে, ভিজে পাতলা কাপড়ের উপর বেশ করে গামছাটা জড়িয়ে, বাঁকালে ঘড়াটা বসিয়ে যখন সে বাড়ীতে ফেরে, তখনও চলেছে মহামারী ব্যাপার।

বড়-বৌয়ের কর্কশ স্বর তখন উচ্চস্বরে উঠে বাড়ীর বাইরেও বেশ শোনা যাচ্ছিল,—ও ভারী তো রোজগার, তার আবার অত বেমাক কিসের! আবার ছেলেকে তুই খাওয়াচ্ছিস্? তোর হাত জন্মের পুণ্যি যে বাড়ীতে ঠাঁই দিয়েছি তোকে। আমিই তো এনেছি, বলুক না লোকে—

থাম্ না বাপু তোরা। তোদের জ্বালায় বাড়ীতে কাকচিল বসতে পায় না। ছেলে-মেয়ের মা হয়েও ছেলেমানুষী ঝগড়াটে স্বভাব ভাল না তোদের। ছি, ছি, জন্তুর স্বরের বৌকি ব'লে পরিচয় দেবার কিছু বাকী রইল না। আর—পিসিমা ক্ষীণ দৃষ্টি কার দিকে রেখে এতগুলি কথা বলে গেলেন, বোঝা গেল না।

—কেন, ছোট-বৌ তুই-ই বল না, বলে ছোট-বৌয়ের দিকে চাইতেই দেখা গেল, সে তখন বড়-বৌয়ের কোলের মেয়েটাকে নিয়ে ভারী বিব্রত হ'য়ে পড়েছে। হতভাগা মেয়েটার যেমন কদাকার রূপ তেমন বদমাইস,—একেবারে শয়তান।

তার মার যেমন ঝগড়াটে স্বভাব, একবার আরম্ভ করলে আর থামতে চায় না, মেয়েটাও তেমনি একবার কাঁদতে আরম্ভ করলে থামায় কার সাধ্য। ছোট-বৌ যথাসাধ্য চেষ্টা করেও যখন তার কান্না থামাতে পারে না, তখন নিতান্ত অসহিষ্ণু হ'য়েই তার গালে সশব্দে এমন একটা চড় বসিয়ে দিলে যে, তার দৃশ্য তার মা দেখতে পেলে তো বটেই, উপরন্তু চড়ের শব্দটাও শুনতে পেলে এবং তার ফল হ'ল এই যে, কলহের গতিটা একমুহূর্ত্তে মেজ বৌয়ের উপর থেকে চলে এল ছোট-বৌয়ের উপর।

—আমার মেয়ের অত খোঁয়ার কিসের লা! তোর চক্ষের বিষ হয়েছে ওরা, না? আমারই খাবে, আর আমারই ছেলে মেয়ের খোঁয়ার করবে, পোড়ারমুখী, নিজের কোলে দেবতা এখনও কিছু দিলেন না কি না, তাই যাহাদের ওপর এত আক্রোশ, ফের যদি আমার মেয়ের গায়ে হাত তুলবি তো আমার দিব্যি রইল। অত তেজ কিসের—

মেজ-বৌ সুযোগ পে'য়ে টিপ্‌পনী কাটলে, কেন ছোট বৌ তো তোমার ভারী আপনার। তবে গাল—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বড় বৌ বললে, বেশ করব গাল দেব। তুর আমার বরদী রে—

এই সময়ে যিনি বাড়ীতে প্রবেশ করলেন, তিনি বড়কর্ত্তা মণিমোহন। মেজ, সেজ আর ছোট-বৌ একগলা ঘোমটা টেনে প্রস্থান করলেন এবং বড়-বৌ সালঙ্কারে ক্ষণপূর্ব্বকার ঘটনাবলী শোনাতে বসলেন। অবশেষে মন্তব্য করলেন, ওদের পাপ আর ঘরে পুষে রাখা কি চলে! দূর ক'রে দাও, যে যার নিজের পথ দেখুক।

ইতিমধ্যে মেজকর্ত্তা কখন এসে ঘরে ঢুকেছেন এবং সহধর্ম্মিণীর কাছে সব কথা বেশ তুলিয়ে শুনেছেন। এখন বড়-বৌয়ের এই অনুযোগ শুনে সবেগে ঘর থেকে বার হ'য়ে সরবে বললেন, কি সব ছোটলোকদের মত দিনরাত আরম্ভ করেছ বাড়ীতে! মানসম্ভ্রম আর রাখলে না তোমরা, ওরকম ইতরের মত চীৎকার চলবে না বাড়ীতে।

বড়-বৌ ঈষৎ ঘোমটার আড়াল থেকে বললেন, মানসম্ভ্রম রাখতে হয়, যে যার নিজের পথ দেখ।

রামমোহন উত্তপ্ত হ'য়েই ছিল, এ কথায় আরও উত্তপ্ত হয়ে বললে, বেশ, তাই হবে। সেই ভাল, তোমাদের মনোগত ইচ্ছা যখন আলাদা বন্দোবস্ত করা, তখন সেই ব্যবস্থাই হোক। দাদাকে বলে রাখছি, কালই সব ব্যবস্থা কর, হরিকে ডেকে আন—

দাদা তখন নিরিবিলিতে ঘরে কাপড়-জামা ছাড়ছে।

শুনছ, বড়দা, আমি কালই পৃথক্ বন্দোবস্ত করতে চাই—

বড়দা শুধু হেসে বললেন, পাগল!

তোমার ও হাসি আর মিষ্টি কথা রাখ। হরিমোহনকে আসতে বল, কালকেই সব পাকাপাকি হ'য়ে যাক।

তাহ'লে ব্রজ কোথায় যাবে?

যেখায় খুশী তার। তার আবার যাবার যায়গার অভাব! থিয়েটার ক্লাব আছে, তাসের আড্ডা আছে, পয়সা রোজগার তো করতে হয় না। তা ছাড়া তার শ্বশুরবাড়ী আছে। কে কোথায় যাবে, তা নিয়ে এ অশান্তি ভোগ কেন! এক-আধদিন হয়, সহ্য করা যায়, এ যে রোজকার ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেছে। বড়-বৌ ঠাকরুণের চোখরাঙানি আর পাড়া মাথায় ক'রে গালাগাল—

বড়-বৌ গর্জ্জিয়া উঠলেন, কি, গালাগাল দিয়েছি আমি! আরও তো পাঁচ জন রয়েছে, বলুক না। মেজ-বৌ—

আচ্ছা, আচ্ছা, মেজ-বৌ গাল দিয়েছে তোমায়, তুমি দাও নি। বেশ তো কাউকেই গাল দিতে হবে না, আমি ব্যবস্থা করছি—

মেজ বৌ ওদিকে ফিস ফিস ক'রে কি বললে, বোঝা গেল না।

মণিমোহন বললেন, যা, যা, খেটেখুটে এসেছিস, ঘরে গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করগে যা। ওরা ঝগড়া করতেই আছে, ঝগড়া করেই যাবে। তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই কেন!

ও সব বাজে কথা শুনতে চাই না আমি—আরও কি বলতে বলতে সে ঘরে গেল।

মাসকয়েক পরে এই কয়কালো বাড়ীটার ইতিহাসে অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে দেখা গেল। দেখা গেল স্বতন্ত্র যায়গায় রান্নাঘরে রান্না হচ্ছে। উঠানে অবশ্য বাঁশের বেড়া দিয়ে সীমা নির্দ্দেশ করা নেই বটে, তবে এরা যে পৃথক্ হয়েছে, এ বোঝা গেল। বোঝা গেল বাড়ীটার অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাব দেখে।

কিসের একটা ছুটীর দিন সেটা। সেজ-বৌয়ের অংশটায় দেখা গেল তালা বন্ধ। সপুত্রকন্যা তারা বায়স্কোপ দেখতে গেছে।

মেজ-বৌয়ের অংশটা নিস্তব্ধ—তারা অভ্যন্তরেই আছে অবশ্য।

পিসীমা বড়-বৌয়ের ছেলেমেয়েদের প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের কাহিনী শোনাবার জন্য আজও বেঁচে আছেন এবং শোনাচ্ছিলেনও তাই,—

তারপর, জান দিনু, এই বাড়ীতে চাকর চাকরাণী ছিল পঁচিশ জন।

তারা কোথায় গেল, ঠাকুমা?

তারা। তারা সব শনির দৃষ্টি লেগে চলে গেল।

কাহিনী বেড়েই চলল।

ব্রজমোহনের গলা শোনা গেল, এখানে আর নয়। এ বাড়ীর নিঃশ্বাসে বিষ লেগে আছে, জান ছোট-বৌ। চাকরী, চাকরীর ভাবনা কি। ও একটা খুঁজলেই জুটে যাবে। আমরা চলে যাই চল।

কোথায়?

আগে তো বাড়ী ছেড়ে বার হই, তার পরে দেখা যাবে।

ব্রজমোহন আর যেন আগেকার মানুষ নেই, আজকাল সে বেশ হিসাব করে কথা বলে, বড়রা তাকে পৃথক্ করে দিয়েছে, এ আঘাতটা সে যেন ভুলতে পারে না।

বড়-বৌকে একদিন রূপসজ্জা বললে, আমরা কাল চলে যাব, দিদি।

কোথায় রে?

তা তো জানি না দিদি, এ রকম বাড়ীতে বসে থাকলেও তো কেউ খেতে দেবে না।

তা চলে গিয়েই বা কি খাবি? না বাপু, আমি ভাল বুঝছি না, তোর বট্‌ঠাকুরকে বলি।

বলেই বা করবে কি দিদি! বট্‌ঠাকুর আর কত করবেন।

না, না, ওসব ছেলেমানুষী, আমার ভয় করে বাপু। তার চেয়ে তোরা বাপু থাক এখানে, আমার ছেলেমেয়েদের যখন জুটছে দুবেলা দুমুঠো, তখন তোদেরও দু'জনের জুটবে। তারপর ঠাকুরপোর চাকরী-বাকরী হলে—শুনছ, ওগো।

শেষ পর্য্যন্ত শুনলে সবাই, কিন্তু কিছুই হল না। ব্রজমোহন একদিন ছোট বৌকে নিয়ে চলে গেল।

মণিমোহন শুধু বড় বৌকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রজ গেল কোথায়? শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়ে উঠবে বোধ হয়?

বড়-বৌ ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, আমি জানব কেমন করে। যার যেথায় খুশী, সেখানে গেছে।

মণিমোহন শুধু বললেন, তাই তো, বলে খবরের কাগজটা আবার চোখের সামনে মেলে ধরলেন।

পিসীমা অবশ্য অনেক চোখের জল ফেলেছেন, মুখের কথাও খরচ করছেন অনেক! মাঝে মাঝে শোক যখন উথলে ওঠে, বলেন, আমি আর কদিন বাঁচব, এতকাল কেটে গেল আর বরবার শেষ কটা দিনের জন্যে সব ছন্নছাড়া হয়ে গেলি।

প্রয়োজন নাই বলেই এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দেয় না।

ব্রজমোহন বা ছোট-বৌ চলে যাওয়াতে যে বাড়ীটার কোন পরিবর্ত্তন ঘটেছে অথবা এর জন্য কারো কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়েছে, এমন কোন চিহ্নই দেখা যায় না।

রামমোহন যথারীতি স্কুলে পড়িয়ে অবসর সময়টুকু গৃহকোণে কাটিয়ে দেয়।

হরিমোহন চিরন্তনী প্রথায় সমস্ত সপ্তাহ ধরে অফিসে কলম পেষে এবং ছুটির দিনে বন্ধু-বান্ধবদের দল ভারী করে অথবা সস্ত্রীক সিনেমা দেখে।

মণিমোহন চিত্তাভাবশে অবসর বিনোদন করে কাগজ পাঠ করে এবং তিনবার ডাকলে একবার সাড়া দেয়।

বড়-বৌয়ের সেই কালো মেয়েটা কাকীমার কথা ভেবে কাঁদে এবং যেও আর সেজ বৌয়ের ছেলেমেয়েগুলোও খোঁজে সেই একজনকে। তারা যখন কাঁদে তখন সকলের মনে পড়ে ছোট বৌয়ের কথা, পোড়ারমুখী ছেলেমেয়েগুলোকে এমন বশ করে রেখেছিল যে, আজও ভুলতে পারলে না।

---

## প্রকৃত বিদ্যা

...গত তিন শত বৎসর হইতে জগতের অন্যান্য দেশে পুনরায় প্রচুর পরিমাণে মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপন্ন করিবার আয়োজনের সাড়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু যে বিদ্যা থাকিলে স্বাস্থ্যকর বস্তু অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা সম্ভব হয়, সেই বিদ্যা অদ্যাবধি জগতের কোন দেশ লাভ করিতে পারে নাই। ঐ বিদ্যা একদিন একমাত্র ভারতবর্ষেই বিদ্যমান ছিল এবং ভারতবাসিগণ উহা সারা জগৎকে বিতরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অবনতির ফলে এক্ষণে তাঁহারা পর্য্যন্ত উহা বিস্মৃত হইয়াছেন এবং আধুনিক জগতে বিদ্যা ও শিল্পের নামে যাহা যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি মানুষের উপকার সাধন করা ত' দূরের কথা, বস্তুতঃ পক্ষে তাহাদের অপকারই সাধন করিতেছে।...

# খেতুরীর মহোৎসব ও বৈষ্ণব লীলাধর্ম্মের প্রচার

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ

বৈষ্ণব ধর্ম্ম সাধনার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, খেতুরীর মহোৎসবের ন্যায় বিরাট ঘটনা তৎপূর্ব্বে বা তৎপরবর্ত্তী কালে কখনও সংঘটিত হয় নাই। বৈষ্ণব সাধনার ইতিহাসে খেতুরীর মহোৎসব অসাধারণ ও চির-স্মরণীয়। কিন্তু, খেতুরীর মহোৎসব বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর, বৈষ্ণব লীলাধর্ম্মের প্রচার বিষয়ে কতখানি ফলপ্রসূ হইয়াছে, অথবা কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, দুঃখের বিষয়, সে সম্বন্ধে আমরা খুব কমই সংবাদ রাখি। বৈষ্ণব সাহিত্য বা বৈষ্ণব সাধনার সহিত সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতে হইলে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ খেতুরীর মহোৎসবের স্বরূপ ও তাৎপর্য্যের আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক।

খেতুরীর মহোৎসব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে যে মহাপুরুষের অসাধারণ প্রচেষ্টায় ও অধিনেতৃত্বে এই মহা-সম্মেলন সুসম্পন্ন হইয়াছিল, তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে যে তিন জন মহাজন বাংলাদেশে বৈষ্ণবতত্ত্বের প্রচার করেন, তাঁহাদের অন্যতম নরোত্তম ঠাকুর খেতুরীর মহোৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা ও অধিনেতা ছিলেন।

বর্ত্তমান রাজসাহী শহরের প্রায় ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গড়ের হাট পরগণায় খেতুরী গ্রাম অবস্থিত। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এই খেতুরী একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী নগরী ছিল। সেই সময়েই খেতুরীর রাজ-পরিবারে নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন। নরোত্তমের পিতার নাম কৃষ্ণানন্দ দত্ত এবং মাতার নাম নারায়ণী দেবী। নরোত্তমের জন্মতারিখ নির্দ্দিষ্ট নাই; তবে যে-সময় তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময়ে চৈতন্যদেব জীবিত ছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই নরোত্তম সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। এই জন্য তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া যৌবনকালেই বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে তিনি লোকনাথ গোস্বামীর আশ্রয় লাভ করেন। লোকনাথ গোস্বামী নরোত্তমের অসাধারণ গুরু-ভক্তি ও নিষ্ঠা-নিষ্ঠা দর্শন করিয়া তাঁহাকে দীক্ষা দান করেন। নরোত্তম বৃন্দাবনে জীব গোস্বামীর নিকট গোস্বামী গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করেন এবং অপূর্ব্ব প্রতিভা-শক্তির বলে অত্যল্পকাল মধ্যেই আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। জীব গোস্বামী তাঁহাকে উপযুক্ত দেখিয়া এই সময়েই "ঠাকুর মহাশয়" উপাধিতে ভূষিত করেন। বৃন্দাবনে নরোত্তম দুই জন ক্ষমতাশালী সঙ্গী লাভ করেন—ইঁহারা সুপ্রসিদ্ধ শ্যামানন্দ ও শ্রীনিবাস।

বহুদিন পরে নরোত্তম ঠাকুর জন্মভূমি খেতুরীতে আগমন করেন। তিনি আর গার্হস্থ্য-জীবন গ্রহণ করিলেন না, হরি-সংকীর্ত্তনের দল বাঁধিয়া নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিতে লাগিলেন। খুব সম্ভব, এই সময়ে নরোত্তম ঠাকুর নূতন সুরে ভক্তি-উদ্দীপক নূতন নূতন কীর্ত্তন গান প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বোধ হয়, খেতুরীতে "গরাণহাটী" কীর্ত্তন সুরের সৃষ্টি হইয়াছে—নরোত্তম ঠাকুরই এই কীর্ত্তন রীতির স্রষ্টা ও প্রবর্ত্তক। গড়ের হাট পরগণায় উৎপত্তি বলিয়া কীর্ত্তনের এই নূতন সুরের নাম "গরাণহাটী" হইয়াছে।

নিজ জন্মস্থান খেতুরীতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের বিগ্রহ স্থাপন উদ্দেশ্যে নরোত্তম ঠাকুর খেতুরীতে এক বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। এই মহোৎসব উপলক্ষে খেতুরীতে ছয়টি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়, যথা—শ্রীগৌরাঙ্গ, বল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, শ্রীরাধারমণ ও রাধাকান্ত। এই উৎসবে বৃন্দাবন ও পুরী হইতে বহু বৈষ্ণব মহাজন, পদকর্ত্তা ও কীর্ত্তনীয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। 'প্রেমবিলাসে' উল্লিখিত আছে যে, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রূপনারায়ণ, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এমন কি, নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবী দেবী, শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্যামানন্দ, বৃন্দাবন দাস, রঘুনন্দন ঠাকুর, পরমেশ্বরী দাস প্রভৃতি মহাজন ব্যক্তিগণও এখানে উপস্থিত ছিলেন। এই উৎসবের সর্ব্বা-পেক্ষা স্মরণীয় বিষয় এই যে, শতবর্ষবয়স্কা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী

স্বয়ং তাঁহার স্বামীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দেখিবার জন্য খেতুরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। খেতুরী উৎসবের পূর্ণ বৃত্তান্ত নরহরি চক্রবর্ত্তীর 'নরোত্তম বিলাস' ও 'ভক্তি রত্নাকর', নিত্যানন্দের 'প্রেমবিলাস' প্রভৃতি পুস্তকে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে। খেতুরীর মহোৎসব ঠিক কোন্ সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। খুব সম্ভব, ইহা ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে অথবা সপ্তদশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

এখন কথা হইতেছে, এত বড় মহাসম্মেলনে চৈতন্য প্রভুর বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করাই কি শুধু এই মহোৎসবের উদ্দেশ্য ছিল? বৈষ্ণব ধর্ম্ম সংরক্ষণ করে এবং ইহার বহুল প্রচার উদ্দেশ্যে কোন্ নীতি অনুসৃত হইবে, নূতন কি ভাবধারা সংযুক্ত করা হইবে প্রভৃতি বিষয়েও একটা স্থির সিদ্ধান্ত বোধ হয় এই মহাসম্মেলনে গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই মহা-সম্মেলনে বৃন্দাবন, পুরী, নবদ্বীপ প্রভৃতি বৈষ্ণব-কেন্দ্র হইতে প্রধান প্রধান পরিচালক এবং সমগ্র দেশ হইতে বহু বৈষ্ণব ভক্ত উপস্থিত ছিলেন; সুতরাং এই অনুষ্ঠান বৈষ্ণব প্রতি-নিধি-মূলক ছিল। কাজেই, এখানে কোনও স্থির সিদ্ধান্ত ও কর্ম্মনীতি গ্রাহ্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক। খুব সম্ভব, নিম্ন-লিখিত প্রধান বিষয়গুলি এখানে আলোচিত হইয়াছিল এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীতও হইয়াছিল:

(১) কীর্ত্তন গাহিবার পূর্ব্বে "গৌরচন্দ্রিকা" গাহিবার রীতির প্রবর্ত্তন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই কীর্ত্তনের অধিদেবতা। সুতরাং কীর্ত্তনে তাঁহার গুণ মাহাত্ম্য গাহিবার প্রারম্ভেই গৌরচন্দ্রকে প্রণাম করা বিধেয়। খেতুরীর মহোৎসবেই সম্ভবতঃ নরোত্তম ঠাকুর কর্ত্তৃক এই গৌরচন্দ্রিকা গাহিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। খেতুরীর মহোৎসবে আমরা পাই, নরোত্তম দাস গৌরচন্দ্রের রাধাভাব পরিকল্পনা করিয়া পদ রচনা করিতেছেন। অন্য দিন রাত্র শেষের একটি গৌর রূপের পদ গাহিয়া গৌরচন্দ্রিকা করিতেছেন।

(২) মনোহরশাহী কীর্ত্তনের প্রচার। মহোৎসবের কিছু কাল পূর্ব্ব হইতেই খেতুরীতে নরোত্তম কর্ত্তৃক মনোহরশাহী কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইলেও, বাহিরে বেশী প্রচারিত হইতে পারে নাই। খেতুরীর মহোৎসবে সমগ্র দেশের বৈষ্ণবদের সম্মুখে নরোত্তম কর্ত্তৃক যখন এই কীর্ত্তন-রীতি ব্যবহৃত হইল, খুব সম্ভব তখন হইতেই ইহা সারা বৈষ্ণব জগতে প্রচারিত হইয়াছিল।

উত্তর বঙ্গের বৈষ্ণবগণের অধিকাংশই নরোত্তম সম্প্রদায়-ভুক্ত। নরোত্তম ঠাকুর প্রচারিত বৈষ্ণব লীলাধর্ম্মের রসস্রোতে সারা উত্তর বঙ্গ যে সেই সময়ে ভাসিয়া গিয়াছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এখনও সেই বৈষ্ণব সাধনার জীবন্ত ধারা উত্তর বঙ্গের পল্লীগুলিতে সংরক্ষিত হইতেছে। সারা বৈশাখ মাস এতদঞ্চলের হিন্দু বৈষ্ণবগণ সন্ধ্যা বেলা কীর্ত্তন গাহিয়া থাকে। চৈত্র-সংক্রান্তির দিন হইতে নগরসংকীর্ত্তন আরম্ভ হয় এবং বৈশাখ-সংক্রান্তির দিন ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রতি সন্ধ্যায় কীর্ত্তন-দল খোল, করতালি, শঙ্খ, শিঙ্গা বাজাইতে বাজাইতে সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া গ্রামের নির্দ্দিষ্ট "হরি-মণ্ডপে" উপস্থিত হয়। এই সময়ে প্রত্যহ সন্ধ্যায় হরিলুঠ দিবার বিধি রহিয়াছে। বৈশাখ-সংক্রান্তির দিন সারা দিন হরি-মণ্ডপে মহোৎসব হইয়া থাকে। এতদঞ্চলে যে-সব কীর্ত্তন গান গীত হয়, তাহার অধিকাংশই নরোত্তম ঠাকুরের রচিত গান এবং সুরপ্রণালীও মনোহরশাহী। পল্লী-অঞ্চলে মনোহরশাহী রীতির সুদক্ষ কীর্ত্তন-গায়ক এখনও দুই এক জন মিলিবে। তাহা ছাড়া, উত্তর বঙ্গের বহু পল্লীতে বৈশাখ মাসে "অষ্টপ্রহর" কীর্ত্তনেরও প্রচলন আছে। উত্তর বঙ্গের বৈষ্ণব-প্রধান পল্লী গুলিতে অনেকের গৃহেই 'গোপাল-সেবা' রহিয়াছে। রাজসাহী জেলার 'কৃষ্ণপুর', 'চক শ্রীকৃষ্ণ,' 'রাধানগর,' 'গোপালপুর,' 'গোবিন্দপুর' প্রভৃতি গ্রামের নাম হইতে বুঝা যায় যে, এগুলি বৈষ্ণব প্রভাবান্বিত। রাজসাহী জেলার 'খেতুরী' ও 'মান্দা' মেলার নাম সমগ্র বঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ। খেতুরীর "প্রেমতলী" নামক স্থানে এবং মান্দার "দখিনা" নামক স্থানে মেলার সময় বিরাট বৈষ্ণব সমাবেশ হইয়া থাকে। এগুলিতে সেই সময়ে মনোহরশাহী কীর্ত্তন দিবানিশি গীত হইয়া থাকে এবং এগুলি প্রত্যক্ষ দেখিলে বুঝা যায়, এখনও এই সব অঞ্চলে বৈষ্ণব প্রভাব কতখানি আছে। মোট কথা, বৈষ্ণব ধর্ম্ম সাধনার ইতিহাসে রাজসাহীর একটি বিশিষ্ট গৌরবময় স্থান রহিয়াছে। *

* এই প্রবন্ধ রচনায় লেখক অধ্যাপক রায় যতীন্দ্রনাথ মিত্র এম. এ. মহাশয়ের নিকট যথেষ্ট ঋণী।

# কৃষি ও কুটীর-শিল্প

—শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়

কৃষি কখনই কোন লোককে বৎসরের সকল সময় কর্মনিযুক্ত রাখিতে পারে না। কোন দেশেই চাষীকে বৎসরের সকল সময় মাঠে চাষের কাজে নিযুক্ত থাকিতে হয় না। বৎসরের একটা নির্দিষ্ট কালে পরিশ্রম করিলেই ফসল উৎপাদনের কার্য্য শেষ হয়। এই নির্দিষ্টকালের পরিমাণ হিসাব করিলে দেখা যায় বৎসরে গড়ে পাঁচ ছয় মাস এইরূপ দাঁড়ায়। অবশিষ্ট কাল বিশেষ করিয়া সারা শীতের সময়টা—কোনরূপ উল্লেখযোগ্য চাষের কাজ না থাকায় চাষীদের বৃথা আলস্যে অতিবাহিত হইয়া থাকে। জাতীয় জীবনের ইহা একটা মস্ত ক্ষতি। এই যে দীর্ঘ অবসর চাষীদের কোন কাজের অভাবে বৃথা অতিবাহিত হয়, ইহার সদ্ব্যবহার হইলে শুধু যে তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয় তাহা নহে, পরন্তু জাতীয় সম্পদও বৃদ্ধি হয়। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে ভাবিয়া দেখা, কি উপায়ে তাহাদের এই দীর্ঘ অবসরকাল কোন অর্থকরী কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চাষীরা তাহাদের অবসর সময় কিরূপ কার্য্যে অতিবাহিত করে সর্ব্বাগ্রে তাহার আলোচনা করিয়া দেখা যাক। প্রত্যেক দেশেই জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য পল্লীর অধিবাসীদের কৃষি ছাড়া আরও একটি অবলম্বন অপরিহার্য্য।

ইংলণ্ডের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সেখানে বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁত ও টাকু, হাতুড়ী ও নেঁহা, কোদাই করিবার ছুরি ও আঙ্গুলের অগ্রভাগ রক্ষিত করিবার চর্ম্ম পল্লীর অধিবাসীদের জীবিকার অবলম্বন-স্বরূপ ছিল। চাষের কাজের ফাঁকে ফাঁকে বস্ত্রবয়ন ও নানা রকম হাতের কাজে বহু নর-নারী প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিত।

জাপানী কৃষকদের আর্থিক স্বাচ্ছল্যের কথা কাহারও অবিদিত নাই। জাপানের কৃষির অবস্থাটা অনেকটা আমাদের দেশেরই অনুরূপ। তথায় চাষের জমির আয়তন আমাদের দেশেরই মত ছোট এবং তাহাতে কৃষ্ণাৎপাদন করিয়া কোন চাষী-গৃহস্থেরই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং কৃষিকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা জীবিকা-অর্জ্জনের আর একটি পন্থা খুঁজিয়া লয়। জাপান দ্বীপময় দেশ বলিয়া অবসর সময়ে তথাকার চাষীরা সমুদ্রে মাছ ধরিয়া সেই মাছ বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা পাইয়া থাকে। ইহা ছাড়া জাপানী গবর্ণমেণ্ট এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন থাকায় তাহাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে জাপানের কুটীর-শিল্পে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

ফ্রান্সের পল্লী অঞ্চলে প্রায় সর্ব্বত্রই কুটীর-শিল্প কৃষির পরিপূরক হইয়া আছে। অর্থাৎ যে সময় ক্ষেতে কোনরূপ কাজ না থাকে, তখন চাষীরা নানা রকম হাতের কাজে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। সামাজিক যে-কোন ব্যাপারে ফরাসী দেশের পল্লী-অধিবাসীদের মনোভাব অত্যন্ত সংরক্ষণশীল হওয়ায় তথাকার অতীতের কুটীর-শিল্পগুলি এখনও কল-কারখানার মুখে বিনাশপ্রাপ্ত হইতে পারে নাই। ঐ দেশের পল্লী-অঞ্চলের মেয়েরা দিব্য কিতা বুনিয়া এবং সুন্দর সুন্দর সেলাই-এর কাজে যথেষ্ট রোজগার করে। এই সমস্ত হাতের কাজে তাহাদের বাহাদুরিও যথেষ্ট প্রকাশ পায় এবং অনেকক্ষেত্রে ঐগুলি এত মনোরম ও টেঁকসই হইয়া থাকে যে, কলে প্রস্তুত ঐ জিনিষ উহার পাশে দাঁড়াইতেই পারে না।

রাশিয়ায় চাষীরা চাষের কাজের ফাঁকে ফাঁকে নদীতে মাছ ধরিয়া, তাঁতে কাপড় বুনিয়া এবং বহু প্রকারের হাতের কাজে অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। তাঁত-শিল্প রুশ দেশে যতখানি প্রসার লাভ করিয়াছিল ইউরোপের অন্য কোথাও সেরূপ হয় নাই। সোভিয়েট কর্ত্তৃক যে সময় রাশিয়ার কল-কারখানার কাজ সব বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, কোটি কোটি তাঁতে সে সময় সে দেশে পরিধেয় বস্ত্র জোগাইয়াছিল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার সমবায় সমিতিগুলি মোট ২,৪০,০০,০০০ গজ হাতে বোনা কাপড় প্রস্তুত করে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭,০০,০০,০০০ গজে দাঁড়ায়।

ইহা ছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিলে পল্লী-অঞ্চলে কৃষির পরিপূরক বহু কুটীর-শিল্পের নিদর্শন চোখে

পড়ে। কোথাও পাহাড়ের গায়ে ইতস্ততঃ ছড়ান কুটীর-গুলিতে তাঁতের ঠকাঠক শব্দ, কোথাও টুপী তৈয়ারীর জন্য ব্যবহৃত খড় পাকানোর সময় সমবেত কৃষকদের আনন্দ-মুখর কলরব ছাড়, কোথাও বিস্তীর্ণ অরণ্য অঞ্চলের উপত্যকা প্রদেশে ছোট ছোট হাতের কাজে রত সুন্দরী কৃষক তরুণীদের লঘু হাসির শব্দ কর্ণগোচর হইবেই। লোরেন, বেলজিয়াম, ইতালী ও অষ্ট্রিয়ায় প্রচুর ফিতা হাতে তৈয়ারী হইয়া থাকে। চেকোশ্লোভাকিয়ার পল্লী-বাসীরা এক খণ্ড কাঠ ও কয়েক টুকরা তার লইয়া যেরূপ ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সহিত ইঁদুর-ধরা কল তৈয়ারী করে তাহা দেখিলে সত্যই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহা ছাড়া আরও বহু প্রকারের হাতের কাজে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের পল্লী-অঞ্চলের অধিবাসীদের অবসর সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে। কৃষিকেই তাহারা জীবিকার একমাত্র অবলম্বন মনে করে না, সেজন্য তাহাদের আর্থিক অবস্থা আমাদের দেশের কৃষকদের তুলনায় স্বচ্ছল। ঐ-সকল দেশে কুটীর-শিল্পের এই রকম প্রচলন দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়, যন্ত্র-শিল্প বহুল বিস্তৃতি-লাভ করিলেও তাহার নব-অধিকৃত স্থানের ফাঁকে ফাঁকে কুটীর-শিল্পের সংযোগ কখনই অসম্ভব হইবে না। অর্থাৎ যন্ত্র-শিল্পের অনুপূরক হইয়া কুটীর-শিল্প চিরদিনই আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে সক্ষম হইবে। যন্ত্র-শিল্পের স্থান শহরে, আর কুটীর-শিল্প পল্লীর কৃষক অধিবাসীদের অবসর সময়ে জীবিকা-অর্জ্জনের সহায়ক হইয়া থাকে।

ইউরোপ ও আমেরিকার শিল্প-প্রধান দেশগুলিতেও বড় বড় কল-কারখানার পাশাপাশি কুটীর-শিল্প যে-ভাবে দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিলে সত্যই চমৎকৃত হইতে হয়। রাশিয়ার বহু বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানা থাকা সত্ত্বেও তথাকার তাঁত-শিল্পের অপূর্ব্ব সাফল্যের বিষয় পূর্ব্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে। জাপানে ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি যে ভাবে বিশ্বের বাজারের জন্য মাল উৎপন্ন করে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। জার্ম্মানীর মত শিল্প-প্রধান দেশে আজিও জাহাজ তৈয়ারীর জন্য ব্যবহৃত বড় বড় পেরেকগুলি হাতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। বেলজিয়মে অনেক কাপড় এখনও হাতে বোনা হয়। জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গারী প্রভৃতি দেশেও উৎপন্ন বস্ত্রের একটা মোটা অংশ হাতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বেলজিয়ম, সুইটসারল্যাণ্ড, ইতালী, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের কৃষকেরা কৃষিকার্য্যের ফাঁকে ফাঁকে টুপি তৈয়ারীর জন্য খড় পাকাইয়া বেশ দু' পয়সা রোজগার করিয়া থাকে। ফ্রান্সের লিয়ঁ অঞ্চলের রেশম বয়ন-শিল্প ও সাঁৎ-এতিয়েন অঞ্চলের সিল্ক ফিতা বয়ন-শিল্প কুটীর-শিল্পের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। লিয়ঁ অঞ্চলে সিল্ক বয়ন-শিল্পে কমবেশী ৬০,০০০ তাঁতী নিযুক্ত আছে, তাহাদের মধ্যে প্রায় ৫৫,০০০ জন ঐ অঞ্চলের পল্লীগুলিরই অধিবাসী। তারার অঞ্চল মসলিন ও ঝাঁজু অঞ্চল কার্পাস বয়ন-শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। লোরে ও তাহার সংলগ্ন প্রায় ২০০ খানি গ্রামে তাঁত-শিল্প বহু নর-নারীর জীবিকার অবলম্বন-স্বরূপ হইয়া আছে। সূচী-শিল্পে ও জরীর কাজে কাঁব্রে অঞ্চলের তরুণীরা প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। নান্তের প্রদেশে প্রচুর গেঞ্জী, মোজা প্রভৃতি হাতে তৈয়ারী হয়। গ্রেনোবল-এর অন্তর্বর্ত্তী অঞ্চলে দস্তানা তৈয়ারীর কাজে ২০,০০০ নর নারী অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। প্যারী শহরে যে সকল বাদ্য-যন্ত্রাদি বিক্রয় হয়, লোরেনের অন্তর্গত মীরকোর্ট নামক স্থানে তাহা প্রস্তুত হয়। ফরাসী জুতা প্রদেশে ঠিক সুইস ঘড়ির অনুরূপ ঘড়ি হাতে তৈয়ারী হয়।

ইতালীতেও পল্লীবাসীরা কাঠের চামচ, ছাতা, ছুরী প্রভৃতি নির্ম্মাণ এবং ঝোড়া, চাঁচ, মাদুর প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে।

উপরে কয়েকটি শিল্প-প্রধান দেশের কুটীর শিল্পের অবস্থা বর্ণনা করা হইল। ঐ সকল দেশের চাষীরা মাঠে যখন কাজ না থাকে, উক্ত কুটীর-শিল্পগুলির সাহায্যে অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া সারা বৎসর অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ পায়। কিন্তু আমাদের দেশে বর্ত্তমান অবস্থায় পল্লী অঞ্চলে কুটীর-শিল্পের যে দুর্দ্দশা তাহাতে কৃষকদের একমাত্র ভরসা চাষ। এবং কৃষি ছাড়া অন্য কোন বৃত্তিতে চালিত হইবার সম্ভাবনা না থাকায় চাষের কাজ যখন না থাকে, তখন তাহা-দের সময় একরূপ বসিয়া বসিয়াই কাটিয়া যায়। এ দেশের কৃষকদের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার ইহাই যে অন্যতম কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। কৃষির পরিপূরক হিসাবে চাই তাহাদের একটি বৃত্তি, যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অবসরকালে তাহারা দু' পয়সা রোজগার করিয়া আর্থিক অবস্থার সচ্ছলতা

আনিতে পারে। কৃষির নানাবিধ উন্নতি-প্রচেষ্টার সহিত এ বিষয়েও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

একটী কৃষক পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই যাহাতে বৎসরের সকল সময় কর্মনিযুক্ত থাকিয়া অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পল্লী অঞ্চলে কুটীর-শিল্পগুলি পুনরুজ্জীবিত করিয়া এই ব্যবস্থা সম্ভব। সুতাকাটা, তাঁত বোনা, নানা রকমের খেলনা তৈরী, মাদুর বোনা, দড়ি, চাঁচ, ঝোড়া প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া এ দেশের পল্লীবাসীরা ও ফ্রান্স ও ইতালীর পল্লী অধিবাসীদের মত প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে। ভারতের পল্লী-অঞ্চলের অবস্থা বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্যর আলফ্রেড চ্যাটারটন (Sir Alfred Chatterton) নামে এক জন বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন যে, এ দেশে কুটীর-শিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল এবং আশাপ্রদ। এ উক্তি যথার্থই সত্য। একটু ভাবিয়া দেখিলেই ইহার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। প্রতি বৎসর এ দেশে যত খেলনা বিক্রী হয়, তাহার অধিকাংশই জার্ম্মানী, ইতালী ও জাপান হইতে আমদানী হইয়া থাকে। এই খেলনা বাবদই প্রতি বৎসর কত অর্থ বিদেশে রপ্তানী হইতেছে! ইহা ছাড়া কাচের পুতুল, কাচের চুড়ি, চুলের ফিতা, জুতার ফিতা, ঘড়ির কাঁচ প্রভৃতি আমদানী হয় বিদেশ হইতে এবং সুদূর পল্লী-অঞ্চলের মেলাগুলিতে বিক্রীত হইয়া বহু অর্থ এ দেশের পল্লী হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। পল্লীর যে অর্থ এইরূপে বাহিরে চলিয়া যাইতেছে, তাহা পল্লীতে সীমাবদ্ধ রাখিতে পারিলে পল্লীবাসীদের অর্থ সঙ্কটের কথঞ্চিৎ উপশম সম্ভব হয় না কি?

এক জন বিদেশী অর্থতত্ত্ববিদের ভাষায় তাই বলিতে ইচ্ছা হয়—The market for the products of small industries is still there and we appear resigned to its being supplied by foreigners. এই ইচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দায়ী আমরাই নই কি? পল্লী-অঞ্চলে নানাবিধ কুটীর-শিল্পের প্রচলনের দ্বারা পল্লীর অর্থ-নৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধান করিবার দায়িত্ব তো আমাদের নিজেদেরই।

অন্য দেশের গভর্ণমেণ্টসমূহ পল্লীর কুটীর-শিল্পগুলির উন্নতি প্রচেষ্টায় যতখানি মনোযোগী আমাদের দেশের গভর্ণমেণ্ট তাহার একাংশ মনোযোগী হইলেই পল্লীর মৃত-প্রায় কুটীর-শিল্পগুলি পুনরুজ্জীবিত হইয়া বহু নরনারীর জীবিকার উপায়স্বরূপ হইতে পারে। দেশের গভর্ণমেণ্ট সরকারী ব্যয়ে পল্লী-অঞ্চলে বহু শিল্প-শিক্ষালয় স্থাপিত করিয়া বালকদিগকে শিল্প-শিক্ষালাভের সুযোগ দিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া মধ্যে মধ্যে প্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করিয়া পল্লীবাসীদের শিল্প-শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহও দিয়া থাকেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতেও বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। অষ্ট্রিয়া দেশের কিছু কাল পূর্ব্বের অবস্থা হইতে জানা যায় যে তথায় মোট ১৬৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিল্প-শিক্ষা দেওয়া হইত এবং শতকরা চল্লিশটি বিদ্যালয়ে কুটীর-শিল্পে শিক্ষা লাভ শিক্ষকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল। ইংলণ্ডেও বৃত্তি শিক্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বাধ্যতামূলক এবং ঐরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। কুটীর-শিল্পের উন্নতিকল্পে জাপানী গভর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টা অন্য সকল গভর্ণমেণ্টকেই ছাড়াইয়া গিয়াছে। রাশিয়ার অবস্থাও অনেকটা জাপানেরই মত। চীনের মত দেশেও কুটীর-শিল্পের প্রসারকল্পে চেষ্টা চলিয়াছে বহু দিন হইতে। ভারতবর্ষে কি কুটীর-শিল্পের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হইবে না? যদি হয়, কত দিনে? এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, কৃষি ও কুটীর-শিল্প পরস্পর পরিপূরক, কৃষির উন্নতি সাধন করিতে হইলে কুটীর-শিল্পের পুনরুজ্জীবন অপরিহার্য্য।

# মীমাংসা

মিঃ গান্ধী 'হরিজন' পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, 'অহিংসা'র পরীক্ষা শেষ হয়।

# জয়ী

—শ্রীউৎপলাসনা দেবী

বাড়ীটি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বাড়ীতে আগত-প্রায় উৎসবের আয়োজন চলিতেছে। বাড়ীতে রঙ্ করান, বিজলী-বাতি নানারকম ভাবে সাজান এবং ছাদে প্যারাপ বাঁধার ব্যবস্থা হইতেছে।

গৃহকর্ত্তা শশাঙ্কভূষণ রায় বাহিরের বারান্দায় বসিয়া চারি দিকের কাজ-কর্ম্মের তদারক করিতে করিতে নাপিত দ্বারা ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করাইতেছিলেন।

এমন সময় একটি মোটর গাড়ী আসিয়া বাড়ীর গেটের কাছে দাঁড়াইল এবং ত্বরিৎ পদে হর্ষোৎফুল্ল মুখে দুইটি যুবক-যুবতী নামিয়া পড়িল।

তাহাদের দিকে চাহিয়া শশাঙ্কবাবু বলিলেন, "কি, সব কেনা হ'য়ে গেল প্রশান্ত?"

প্রশান্ত হাসিয়া রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "না, এখনও অনেক বাকি। জুয়েলারের দোকানে আপনাকে নিয়ে যাব বলে এলাম।"

"আমার তো বাবা এ-দিকে যে কাজ জমে আছে সেই-গুলোই কি ক'রে এ দু'দিনে মিটিয়ে উঠবো, তা ভেবে আমি কূল-কিনারা পাচ্ছি নে, আবার গহনার দোকানে আমায় কেন? ও তো মানসী গেলেই হবে।"

মানসী আবদারের সুরে বলিল, "না বাবা, তোমায় যেতেই হবে; নইলে ওরা সব আমাদের ঠকিয়ে দেবে।"

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, "কিন্তু তোমরা দু'জনে যে রকম ঘোরাঘুরি লাগিয়েছ, বিয়ের আগে একটা অসুখ বাধিয়ে ফেলবে দেখছি। আজ অনেক বেলা হ'য়ে গেছে, আর এ-বেলা বেরিও না।"

প্রশান্ত বলিল, "তা এ-দিকে যে আর সময় নেই, মাত্র দুটি দিন বাকে—"

শশাঙ্কবাবু প্রশান্তের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "তা হোক বাপু! এর মধ্যে যা কেনা হয় তা'তেই চলবে, বিয়ের পরেই বরং কিনে দিও। এখন তোমাদের বিয়েটা ভালয় ভালয় দিয়ে উঠতে পারি তবেই হয়। তোমরা ঘরে গিয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে বস গে। ও-বেলা তিনটে নাগাদ আমায় বেরিও, আমিও সঙ্গে যাব'খন। প্রশান্ত, তুমি এ-বেলা আর বাড়ী যেও না, এখানেই খাবে। যাও এখন দু'জনে ঘরে গিয়ে গল্প কর গে। আমি এই খবরের কাগজটার চোখ বুলিয়ে নিই। এই কাজ-কর্ম্মের গোলমালে কাগজ-গুলো ভাল ক'রে ক'দিন পড়াই হয় না।"

মানসী ও প্রশান্ত ঘরে গিয়া বসিল।

প্রশান্ত বলিল, "মণি, তোমার গহনা কেনা হলে আমি নিশ্চিন্ত হতাম।"

"তুমি কেবল গহনা গহনা করছ, আমি ভাবছি কিন্তু কবে যে—" বলিয়া এক ঝলক বিদ্যুতের মত হাসিয়া দুটি হাত দিয়া নিজের মুখখানি ঢাকিল।

প্রশান্ত অন্তরে একটা সুখ-কল্পনার ঢেউ তুলিয়া মানসীর হাত দুটি ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "থামলে কেন? বল! বল!"

মানসী সলাজ হাস্যে বলিল, "যাও, আমি জানি না।"

"আমি কিন্তু জানি। বলবো? বলছিলে, কবে যে এই দুটো দিন পার হবে, কবে যে সেই মধুর দিনটি আসবে মিলন-রজনীর উৎসবের বাঁশীটি বাজিয়ে!"

বাহিরে পর্দ্দার আড়ালে কি বিন্দু তরলিত কণ্ঠে ডাকিল, "দিদিমণি গো, শীগ্‌গির এসো! বাবু যেন কেমন করছে।"

বিবর্ণ মুখে মানসী, "অ্যাঁ! কি বলছ!" বলিতে বলিতে বাহিরে আসিল। প্রশান্তও তাহার সঙ্গে বাহিরে আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কোথায়?"

বিন্দু বলিল, "বাবু তাঁর পড়ার ঘরে কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ কি রকম শব্দ ক'রে ভিরমী গেল গো। শীগ্‌গির আপুনি এস!"

প্রশান্ত ও মণি দু'জনে ছুটিয়া শশাঙ্কবাবুর কাছে গিয়া দেখিল, তিনি ইজি-চেয়ারে শুইয়া আছেন, তাঁর চোখ-মুখ সব নীল হইয়া গিয়াছে, তিনি হাঁপাইতেছেন। তাঁর বুকের উপর দৈনিক সংবাদপত্রখানি পড়িয়া আছে।

মানসী ছুটিয়া গিয়া শশাঙ্কবাবুর গলা জড়াইয়া আর্ত্তস্বরে ডাকিল, "বাবা! অমন করছ কেন?"

প্রশান্ত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা জল আনিয়া শশাঙ্কবাবুর চোখে মুখে দিতে মনে হইল তিনি বেশ একটু সুস্থ বোধ করিতেছেন।

প্রশান্ত মণিকে বলিল, "তুমি এইখানে বসো, আমি ডাক্তারকে ফোন করি।"

কিছুক্ষণ বাদে ডাক্তার আসিলেন।

ডাক্তার শশাঙ্কবাবুকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "না, ভয়ের কিছু নেই। তবে বড় নার্ভাস হ'য়ে পড়েছেন। মিঃ রায় কি মনে কোন জোর আঘাত পেয়েছেন?"

"কই, আমি তো কিছু জানি না", বলিয়া প্রশান্ত জিজ্ঞাসু নেত্রে মণির দিকে চাহিল।

মণি বলিল, "বাবার মনে কোন আঘাত লাগতে পারে এমন কারণ তো কিছু নেই, তবে কিছুদিন ধরে তিনি বড়ই পরিশ্রম করছিলেন, সে জন্য সময়মত নাওয়া খাওয়া সব দিন ঠিকমত হচ্ছিল না।"

সেখানে বিন্দু দাঁড়াইয়া ছিল। সে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "তা বাপু, মনে আঘাত নেই বললে কি করে, এই যে, একমাত্র সন্তান দু'দিন পরে শ্বশুর-বাড়ী যাবে তাঁকে ছেড়ে, এ কি কম আঘাতের কথা!"

ডাক্তার বলিলেন, "তাই হবে বোধ হয়। একটা মানসিক উত্তেজনার এটা হয়েছে। এখন অন্ততঃপক্ষে পনের দিন বিশ্রামের প্রয়োজন।"

প্রশান্ত বলিল, "পনের দিন কেন, যত দিন মিঃ রায়ের পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে না আসে, ততদিন বাড়ীতে কোন গোলমাল হ'তে দেওয়া হবে না।" মণিও এ-কথায় সম্পূর্ণ মত দিল।

ডাক্তার বলিলেন, "না, না, এমন কিছু নয়। অত ভয় আপনারা পাবেন না। তবে কিছু দিন এখন মিঃ রায়কে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিন।"

ইহার দিন দুই পরে। শশাঙ্কবাবু বিছানায় শুইয়াছিলেন, মণি তাঁহাকে একখানি বই পড়িয়া শুনাইতেছিল, এমন সময় প্রশান্ত ঘরের দরজার পর্দাটি সরাইয়া আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

মণি বইখানি রাখিয়া বলিল, "এস।"

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, "কে রে, মণি?"

প্রশান্ত বলিল, "আমি প্রশান্ত! আপনি আজ কেমন আছেন?"

"ভাল আছি!" বলিয়া বৃদ্ধ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। প্রশান্ত মানসীকে মৃদুস্বরে বলিল, "আমার ছোটবেলার সেই বিশিষ্ট বন্ধুটি আসছে মানসী! যার কথা তোমায় অনেকবার বলেছি তোমার স্মরণ থাকতে পারে। সে শুধু বন্ধুই ছিল না আমার, সে আমার"—বলিতে বলিতে তার গলার স্বর যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল, "সে আমার ভাইয়ের মতনই ছিল। তার অন্তরের পরিচয় যে কেউ পাবে, সে-ই মুগ্ধ না হ'য়ে থাকতে পারবে না। তাকে রিসিভ করতে আমি আউট্রাম ঘাটে যাচ্ছি। আমি যদি বিকেলে না আসতে পারি তো আমাদের বাড়ী যেও।" বলিয়া প্রশান্ত চলিয়া গেল।

বর্ম্মার জাহাজ 'থাওেলা' আউট্রাম ঘাটে আসিয়া লাগিল।

প্রশান্ত জেটির উপর দাঁড়াইয়া একটি পরিচিত মুখ খুঁজিতে লাগিল।

খদ্দর-পরা সৌম্যকান্তি, বলিষ্ঠ, সুপুরুষ একটি যুবক প্রশান্তের কাঁধে হাত দিয়া বলিল, "হ্যালো প্রশান্ত!"

প্রশান্ত আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। চোখ-মুখ উজ্জ্বল করিয়া বলিল, "তোকেই তো এতক্ষণ খুঁজছিলাম রে!"

"আমাকে! কি ক'রে জানলি যে আমি আজ আসবো।"

"গত তিরিশে তারিখ অর্থাৎ ততদিন কাগজে দেখলাম তোমাদের ক'জনকেই তো মুক্তি দিয়েছে! তা আজ যখন মেল জাহাজ আসার দিন তখন আজ আসবে নিশ্চয়ই। তা তোমার সঙ্গে কর্ত্তারা একেবারে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন তো? না আমার দু'দিন পরে তাঁরা তোমাকে সাদরে আহ্বান করবেন?"

"তা কি জানি! কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম।"

"রাজার অতিথি হ'য়ে থেকে তোমার শরীরটা কিন্তু বেশ হ'য়েছে। বর্ম্মার জল হাওয়া ভাল বোধ হয়, কি বল?"

"হ্যাঁ তাঁরা আমার যে রকম যত্ন করতেন এক মুহূর্ত্ত চোখের আড়াল করতেন না। সবাই বড্ড ভালবাসতেন আমাকে। শুধু খাওয়া বলা চলে। তোফা শ্বশুর-বাড়ী।"

"তা বেশ! তবে তোমার শ্বশুরের ছেলেরা তোমাকে আর স্মরণ না করলেই বাঁচি। তাঁদের প্রেমটা তোমার প্রতি একটু কমুক।"

কুলির মাথায় ছোট্ট একটি বিছানা ও সুটকেশ দিয়া দুই বন্ধু গল্প করিতে করিতে গাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। একটি ঘরের মোটর দেখাইয়া প্রশান্ত বলিল, "ওঠ, সুপ্রকাশ।"

সুপ্রকাশ গাড়ীতে উঠিয়া প্রশান্তকে অজস্র প্রশ্ন করিতে করিতে চলিল।

"হ্যাঁ রে, এটা কিসের আফিস রে?"

"এটা বেঙ্গল কাউন্সিলের বাড়ী।"

"তাই না কি! কবে হলো? হ্যাঁ রে, ইডেন গার্ডেনে বসে সেই রকম ব্যাণ্ড শুনিস?"

"নাঃ, ব্যাণ্ড আর এখন বাজে না। এখন তো কলকাতা কর্পোরেশন বাঙালীদের হাতে।"

"ওকি রে, প্রত্যেক বাড়ীর ছাদেই যে তারের মেলা, ওই বুঝি বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কার রেডিও'র এরিয়্যাল?"

প্রশান্ত ব্যথিত হৃদয়ে করুণ এবং সহানুভূতিপূর্ণ নেত্রে সুপ্রকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "হ্যাঁ!"

সুপ্রকাশ একটা আক্ষেপের সুরে বলিল, "আমি একেবারেই যুগ থেকে এসেছি রে। জগতের কত পরিবর্ত্তনই না হয়েছে, দেখছি।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুপ্রকাশ বলিল, "দেখ প্রশান্ত। আমার আজ মনে হচ্ছে যে আমার জীবনটারও দাম আছে। আমিও পারি আমার এই জীবনপথের মোড় ফেরাতে, তার গতির ধারা উল্টে দিতে। আবার আমার আজ মনে হচ্ছে, পৃথিবীর সকল আনন্দ আমি পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করবো। সব চাই।"

"কি, বৌমা বাচ্চাও আবার চাই না কি?"

"না রে, আর ও সব নয়। এখন রীতিমত মায়ের স্নেহ, স্ত্রীর পবিত্র প্রেম, সন্তানের সাহচর্য্য। স্নেহ প্রেম ভালবাসা যেমন লুটতে চাই, তেমনি বিলোতে চাই।"

সুপ্রকাশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "হ্যাঁ রে প্রশান্ত, তুই বিয়ে করেছিস্?"

"বিয়ে, তা করি নি বটে, তবে প্রায় হয়েই আছে।"

"কি রকম? প্রায় আবার বিয়ে কি ধরে হয়? এ কি আ—না সে তো স্বতন্ত্র কথা, তোর আবার কি?"

"আজকের তারিখে আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, তা যে ভদ্রলোকের মেয়ে, তাঁর পরশু হঠাৎ খুব অসুখ করে, সেজন্য কিছু দিনের জন্য বিয়ে স্থগিত রইল। তবে আমরা দু'জনে পরিণয়ে আবদ্ধ না হ'লেও প্রণয়ে আবদ্ধ। তাঁর প্রেমে আমার অন্তর ভরে আছে।"

"আর তাঁর?"

"তাঁরও অন্তর নিশ্চয়ই আমার প্রেমে ভরে আছে।"

"তুমি সৌভাগ্যবান!"

২

গাড়ী আসিয়া প্রশান্তদের বাড়ীর গেটের মধ্যে প্রবেশ করিতে শাঁখ বাজিয়া উঠিল।

গেটের দু'পাশে মঙ্গলঘট বসান।

পিসীমা গাড়ীর দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সুপ্রকাশ গাড়ী হইতে নামিয়া পিসীমাকে প্রণাম করিল।

পিসীমা তাঁর 'সুপান্তু'কে সস্নেহে কোলের কাছে টানিয়া নিলেন।

সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিল, "পিসীমা, এই সব কি? যেন আমি যুদ্ধে জয়লাভ করে এলাম। শাঁখ বাজছে, মঙ্গলঘট বসেছে।"

"বাবা! আমরা তোমাকে যে আবার ফিরে পাব তার কোন আশা আমাদের ছিল না। ভগবানের কৃপায় যে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছ, এ কেবল তোমার স্বর্গগত মা ও বাবার পুণ্যের জোরে। তা আমরা একটু মঙ্গল-সূচক আনন্দ করব না?"

প্রশান্ত পিসীমার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "চল চল এখন ঘরে চল।"

সারা দুপুর দুই বন্ধু অনর্গল গল্প করিয়া কাটাইল। তিনটা বাজিতেই প্রশান্ত উঠিয়া পড়িল।

সুপ্রকাশ লক্ষ্য করিল প্রশান্ত আর যেন মন দিয়া গল্প করিতে পারিতেছে না। সে অকারণে এ-দিক্ ও-দিক্ করিতেছে।

সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিল, "কি রে প্রশান্ত! অত ছট্-ফট্ করছিস কেন?"

প্রশান্ত হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "তা কিছু নয়, তবে ভিনটে তো বাজলো, সেই ভদ্রলোক কেমন আছেন আজ, ভাল করে খোঁজ করা হয় নি।"

সুপ্রকাশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "ও মাই গড্! তাই বলো। তা নিশ্চয়ই যাবে বই কি। একশো বার যাবে। যাও যাও, আর দেরী করো না।"

প্রশান্ত একটু সলজ্জভাবে বলিল, "এই হচ্ছে কি না, আমার ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে মণির আলাপ করিয়ে দি। তা তুমি চা-টা খাও, আমি আসছি তাকে নিয়ে।"

প্রশান্ত চলিয়া গেল। সুপ্রকাশ পিসীমার হাতে তৈয়ারী নানা রকম খাবার খাইয়া তাঁহার সঙ্গে তার বন্দী-জীবনের দৈনন্দিন গল্প করিল। তার পর পিসীমা তাঁর কাজে চলিয়া গেলেন। সে গাড়ী-বারান্দার ছাদে আসিয়া একটা ইজি চেয়ারে বসিল।

সূর্য্যাস্ত সবে মাত্র হইয়াছে। পশ্চিমাকাশ তখন নব বধূর নবরাগের মত রঞ্জিত। সেই দিকে চাহিয়া সুপ্রকাশের মনে বহু দিনের একটি ছবি ভাসিয়া উঠিল। হাঁ! এমনি গোধূলি সাঁঝে, এই রকমই রাঙা মেঘের রঙের লাল বেনারসী পরা একটি বালিকার ছোট্ট মুখ। অনেক দিনের অনেক কথা, এক সঙ্গে সব যেন মুক্তি করিয়া ভাসিয়া উঠিল তাহার মানসপটে।

পরে আবার ধীরে ধীরে ভাসিল মনে, সেই ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটির রোগাক্রান্ত পাণ্ডুমূর্ত্তি! এই ম্লানমুখী সন্ধ্যার মতনই ক্লান্ত মলিন। একে একে সব যেন ওই আকাশের গায়ে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

খুট খুট জুতোর আওয়াজে সুপ্রকাশ সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া চাহিয়া দেখিল, একটি তরুণী!

সুপ্রকাশ চমকাইয়া উঠিল। এ কি! ওই যে, দিগন্তের অন্তরেখার সাথে যে মুখখানি এখনও ফুটিয়া রহিয়াছে এ যে তাহারি অনুরূপ। তেমনি অথচ সম্পূর্ণ অচেনা!

তরুণী হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিয়া তাহাকে বলিল, "আপনিই বোধ হয় সুপ্রকাশবাবু?"

সুপ্রকাশ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া আগন্তুককে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ! আসুন। পরে একটি চেয়ার দেখাইয়া বলিল, বসুন, প্রশান্ত আসে নি?"

তরুণীটি চেয়ারে বসিয়া বলিল, "প্রশান্তবাবুর সঙ্গে আমার তো দেখা হয় নি। তিনি তা'হলে বাড়ী নেই?"

"সে তো বোধ হয় আপনাদের বাড়ীতেই গেল। আপনিই তো—"

তরুণী সলাজে বলিল, "আপনার অনুমান সত্য।"

ইতিমধ্যে পিসীমা আসিলেন।

পিসীমা মানসীর পিতার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, "কি কপালের ইচ্ছে বল দেখি? আজ কোথায় দু'টিতে মিলবে, তা নয় কোথা দিয়ে কি হলো। তা তোমার বাবা আজ বেশ সহজে চলা-ফেরা করছেন তো, শরীরের গ্লানি আর নেই তো?"

মানসী বলিল, "না, বাবার শরীর এখন সম্পূর্ণই সুস্থ আছে। কোন প্রকার গ্লানি নেই, আজ তো অফিসেও গিয়েছিলেন। সে-দিন হঠাৎ কি রকম শক্ লেগেছিল কোন কারণে বোধ হয়, তাই ও-রকমটা হলো।"

পিসীমা বলিলেন, সে তো আর আশ্চর্য্য নয়। তুমি তাঁর মা-হারা একমাত্র সন্তান। তা যাই হোক, এখন তোমাদের দু'হাত এক হয়ে গেলেই বাঁচি। আহা প্রশান্তের আমার আজ দু'দিন ধরে মুখখানি শুকিয়ে আছে। কত মেয়েই তো আমার প্রশান্তকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, তা প্রশান্ত আমার মানসী বলতে অজ্ঞান। কি জাদুটাই মা ও তোমায় বাসে, তা আর কি বলব।"

"কাকে ভালবাসি, পিসীমা? কার কথা বলছ?" বলিতে বলিতে প্রশান্ত তাহাদের সম্মুখে আসিল। মানসী লজ্জায় রাঙিয়া উঠিল।

"এই যে, মণি এসেছ, আমি তোমাদের বাড়ী গিয়েছিলুম, শুনলাম তুমি অনেকক্ষণ বেরিয়েছ।"

"এই একটু মার্কেটে গিয়েছিলুম, আমার তখনি মনে হয়েছিল, তুমি বোধ হয় আমাদের বাড়ী যাবে।"

তার পর সকলে মিলিয়া গল্প করিতে লাগিল।

মানসী বলিল, "সুপ্রকাশ বাবু, আপনি এক দিন আমাদের বাড়ী চলুন। আপনার সঙ্গে আমার বাবার আলাপ করিয়ে দেবো।"

প্রশান্ত মৃদু হাসিয়া বলিল, "ও যে এখন কাকে-খাওয়া ফল মণি, ওরাই এখন এই দেশের রাষ্ট্রনীতির অনধিকারচর্চ্চা-

রোগের ছুঁইত হওয়া, সংক্রামক ব্যাধি। সেজন্য যে-কোন রাজভক্ত ব্যক্তি ওদের মনের মতন ভয় করেন।"

মানসী চুপ করিয়া রহিল।

প্রশান্ত বলিল, "চল সুপ্রকাশ, এক দিন ডায়মণ্ড-হারবারে গিয়ে পিক্‌নিক্ ক'রে আসি। কি বল মণি?"

সুপ্রকাশ বলিল, "তবে আমি কবে বাড়ী যাব?"

"বাড়ী যেও এখন, দু'দিন থাক না এখানে। তা যেখানেই যাও না কেন, আমাদের বিয়ের অন্ততঃ দু'দিন আগেও আসা চাই।"

সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিল, "সে তো নিশ্চয়ই, আঃ, কত দিন যে বিয়ের নেমন্তন্ন খাই নি রে! একেবারে মনুষ্য-সমাজের বাইরে ছিলাম সব ভুলে।"

৩

ডায়মণ্ডহারবারে নদীর ধারে পিক্‌নিক্ করা হইল। খাওয়ার পর শিশীরা বলিলেন, "তোমরা বাপু তিন জনে বেড়াও, আমি বুড়ো মানুষ একটু শোবার জোগাড় দেখি।"

মণি ও প্রশান্ত খানিকটা দূরে একটা বড় গাছের তলায় বসিল।

সুপ্রকাশ তাহাদের কাছ হইতে হাত পঞ্চাশ দূরে একটি গাছের মোটা শিকড়ের উপর গিয়া বসিল।

অদূরে দুটি তরুণ তরুণী হাসিতেছে, অনর্গল গল্প করিতেছে, নানা রকম কৌতুক করিতেছে, সে দূরে বসিয়া তাহা দেখিয়া মনে বেশ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে মানসী বলিল, "সুপ্রকাশ বাবু, আমাদের অত্যন্ত অন্যায় হয়ে গেছে, আমরা গল্প করতে করতে এত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম যে, এখানে একলা আপনি বসে আছেন তা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম।"

সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিল, "এইখানে বসে আমি আপনাদের দু'জনার আনন্দের ভাগ পাচ্ছিলাম।"

মানসী জিজ্ঞাসা করিল, "কালই আপনি বাড়ী যাবেন?"

"হাঁ কালই যাব।"

"কে কে সেখানে আছেন?"

সুপ্রকাশ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া অন্য দিকে চাহিয়া বলিল, "এখন পরিচয় দেবার মতন কেউ নেই।"

"আপনি বিয়ে করেছেন?"

"বিয়ে? হাঁ করেছি বই কি!"

প্রশান্ত অবাক্ হইয়া বলিল, "তুই আবার কবে বিয়ে করলি?"

সুপ্রকাশ হাসিতে লাগিল।

মানসী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বাড়ী কোথায়?"

"আমাদের বাড়ী বীরনগর।"

"বীরনগর? নদীয়া জেলায়?"

"হাঁ।"

"ও মা, সেখানে তো আমাদেরও বাড়ী।"

"আপনাদের বাড়ী? তাই না কি। আপনার বাবার নাম?"

"শ্রীশশাঙ্কভূষণ রায়?"

"কি বললেন? শশাঙ্কভূষণ রায়? বাবু কিরীটেশ্বর রায় মহাশয়ের ছেলে!"

"হাঁ, কিরীটেশ্বর বাবু আমার ঠাকুরদাদা ছিলেন।" সুপ্রকাশের সমস্ত মুখ যেন নীল হইয়া গেল। সে বিবর্ণ মুখে বলিল, "আমি তো জানতাম শশাঙ্কবাবুর একটি মাত্র সন্তান, সেটি মেয়ে, নাম মানসী!"

মানসী সলাজে বলিল, "আপনি তো সব ঠিকই জানেন দেখছি। আমি বাবার একটি মাত্র সন্তান।"

৪

পর দিনই সুপ্রকাশ তাহার দেশে চলিয়া গেল। সুপ্রকাশ ইহার পর যতক্ষণ প্রশান্তর কাছে ছিল সে খুবই কম কথা বলিয়াছিল প্রশান্তর সঙ্গে। সুপ্রকাশের হঠাৎ পরিবর্তন হওয়ায় প্রশান্ত বিস্মিত হইল, কিন্তু সুপ্রকাশকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পায় নাই।

শশাঙ্ক বাবু ক্রমশঃ বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক সদাপ্রফুল্ল ভাবটা আর ফিরিল না। তাঁহাকে দেখিলে এখন মনে হয় তাঁহার অন্তরে কোথায় একটা শঙ্কা ও অশান্তি লুকান আছে। তবে তিনি মানসীর বিবাহের জোগাড় করিতে লাগিলেন এবং বিবাহের আর একটা দিনও স্থির করিলেন।

পরদিন বিবাহ। আজ গাত্রহরিদ্রা। বাড়ীতে কয়েক-জন বন্ধু ও বন্ধুর মা ছাড়া আর কেহ আসে নাই।

তবে ঝি-চাকর অন্যান্য লোকজনের বেশ ভিড়। বাহিরে সানাই বাজিতেছে। বরের বাড়ী হইতে বস্ত্র ও অধিবাসের তত্ত্ব লইয়া ঝিয়ের দল উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। চোড়া শাঁখ বাজিয়া উঠিল।

এমন সময় মানসী পিতার উগ্র কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহার কাছে দ্রুতপদে উৎকণ্ঠিত হইয়া যাইতে যাইতে আর একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া দরজার কাছে পর্দার আড়ালে দাঁড়াইল।

"বলুন আপনি হিন্দু কি না, আপনি বৈদিক ধর্ম মানেন কি না? আর তাই যদি মানেন তো এতবড় গর্হিত কাজ করার দুঃসাহস কেন হলো, বলুন?"

"তোমার কাছে আমি এই কৈফিয়ৎ দেব কেন?"

"আপনাকে বাধ্য হবেন আমার এই সব কথার উত্তর দিতে।"

"তুমি কি করবে, মামলা?"

"আমি কি করবো! ন্যায়তঃ, ধর্মতঃ, আইনতঃ সকল দিক্ দিয়ে যখন আমার স্ত্রীকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য, আমি নিশ্চয়ই তার সকল রকম চেষ্টা করবো।"

"তোমার স্ত্রী! হা, হঁ, হা, স্ত্রী! কবে কোথায় একটা সাত আট বছরের মেয়ের সঙ্গে কুমারাবস্থায় বিয়ের অর্দ্ধেক অনুষ্ঠান মাত্র করেছিলে, তাকে কি বিয়ে বলে? সে তো একটা অভিনয়, একটা খেলা শুধু হয়েছিল। সেই শিশুটিকে স্ত্রী বলার কোন অধিকার তোমার নেই।"

"আপনি হিন্দুদের বাল্যবিবাহে তবে মানছেন না, কিন্তু আজকের বিয়ে তো আবার বেশ হিন্দুমতেই আরম্ভ করেছেন দেখছি। কিন্তু থাক আপনার ধর্ম। আমি যে অধিকারের দাবী নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি, তা স্বীকার করবেন কি না বলুন? নইলে আমিও সহজে ছাড়বো না, জানবেন।"

"বাপু হে আর গোলমাল করো না, অতীতের সামান্য কথা ভুলে যাও। তুমি যদি বিয়ে হ'তে না-ও যাও, তা হ'লে তুমি যাকে স্ত্রী বলে দাবী করছ, সে কিন্তু তোমায় স্বামী বলে কখনও গ্রহণ করবে না। কাজেই তুমি বল, কি হ'লে চলে যাবে, আমি চেক্ লিখে দিচ্ছি।"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে অপর কণ্ঠ গর্জ্জিয়া উঠিল, "কি?"

"মা-গো মা, মণি!"

মণি দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার পিতা পুনরায় সেইদিনকার মত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন।

মণি রোষকষায়িত লোচনে আগন্তুকের দিকে চাহিয়া বলিল, "সুপ্রকাশ বাবু! আপনি এখনই এই বাড়ী হ'তে বেরিয়ে যান।" তাহার কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া সুপ্রকাশ তাড়াতাড়ি কুঁজা হইতে জল লইয়া শশাঙ্কবাবুর মুখে-চোখে দিয়া একটা পাখা দিয়া বাতাস করিতে করিতে মণিকে বলিল, "ডাক্তারকে খবর দাও।"

মণি সুপ্রকাশের হাত হইতে পাখাখানি কাড়িয়া লইল। সুপ্রকাশ তখন শশাঙ্কবাবুর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিল, "ভয়ের কারণ নেই, ভাল আছেন।" একটু থামিয়া বলিল, "আচ্ছা আমি এখন চললাম", বলিয়া সে নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

মণি প্রশান্তকে খবর দিল। প্রশান্ত আসিল। রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে।

শশাঙ্ক বাবু বিছানায় শুইয়া আছেন।

তাঁহার এক পাশে প্রশান্ত, অন্য পাশে মণি বসিয়া আছে। রোগীর চক্ষে নিদ্রা নাই। রোগীকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা দু'জনে করিতেছে।

শশাঙ্ক ডাকিলেন, "প্রশান্ত!"

"এই যে, আমি।"

"উঃ বড় অশান্তি, মণি!"

"কি, বাবা, তোমার কি অশান্তি আমায় বলো না। বেশ তো তুমি মেয়েছিলে বাবা! কোথা হ'তে যে সুপ্রকাশ বাবু এলেন, এসে যত কাণ্ড বাধালেন।"

প্রশান্ত অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সুপ্রকাশ এসেছিল? কার কাছে? কখন?"

মণি বলিল, "তিনিই তো বাবার আজকের অসুখের কারণ। কি নিয়ে যে তিনি বাবার সঙ্গে গোলমাল করছিলেন তা আমি মোটে বুঝতে পারলাম না।"

শশাঙ্কবাবু আবার ডাকিলেন, "প্রশান্ত! কটা বাজলো?"

প্রশান্ত বলিল, "আড়াইটে।"

"আড়াইটে?"

"হাঁ।"

"মণি!"

"কি বাবা।"

"কাল ২৬শে নয় রে?"

"হ্যাঁ!"

"হুঁ! আচ্ছা কাল যদি তোদের বিয়ে না হয়, তোদের মনে খুব কষ্ট হবে, নয় রে?"

"না বাবা, বিয়ে কাল বন্ধ করো। তুমি পড়ে যুইলে বিছানায়।"

"প্রশান্ত।"

"বলুন।"

"তোমার কি অভিমত?"

"আপনার যা মত আমারও তাই!"

"নাঃ, শুভ কাজ হয়েই যাক। আমি যদি এই রকম বিছানায় পড়ে থাকি, তা হলে তো হবে না। না, না, কালই বিয়ে দেবো। তার পর যা হয় হবে এখন।"

"তোমার তো বাবা বেশ শরীর সেরেছিল, শুধু কোথা হ'তে যে-সুপ্রকাশ বাবু এসে তোমার শরীর খারাপ করে দিলেন।"

"ওঃ, আবার সুপ্রকাশ! কি গ্রহ দেখ! নাঃ আমায় শান্তিতে থাকতে দিলে না। মণি! প্রশান্ত!"

"কি বাবা।"

"কি বলুন।"

"তোমাদের আজ আমি একটা গল্প বলতে চাই। শুনবার জন্যে তৈরী হও। তার পর তোমরা বিচার ক'রে যা ভাল বুঝবে তাই ক'রো। আমি আর তোমাদের মধ্যে থাকবো না।"

"না বললেন আপনার গল্প! এখন আপনার শরীর খারাপ, বেশী কথা না বলাই ভাল; দেরে উঠুন তার পর বলবেন।"

"না, না, তোমাদের শুনতেই হবে গল্প। বলাই ভাল। যদি আমি না পাই বলবার সুযোগ। যে রকম আমার ও-পার হ'তে ডাক আসছে। শোন।"

প্রশান্ত ও মণির মন মুহূর্তে একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। দু'জনে দু'জনার দিকে চাহিয়া রহিল কিছু ক্ষণ।

শশাঙ্কবাবু বলিতে লাগিলেন: "এক গ্রামে এক ভদ্রলোক থাকতেন। তাঁর একটি মাত্র ছেলে। ছেলে পুলিসে কাজ করে, কলকাতায় থাকে। ছেলের স্ত্রী ছোট একটি মেয়ে রেখে মারা যায়। মেয়েটি দেশে তার দাদুর কাছে থাকতো। দাদু খুব তেজস্বী একরোখা ও জেদী লোক ছিলেন। তিনি তাঁর ছেলের কাছ থেকে এক পয়সা নিতেন না, ছেলেকে এক পয়সা ওজনের গ্রাহ্যও ক'রতেন না। ছেলে তখনকার নব্যযুগের আলোকপ্রাপ্ত ছিলেন। এজন্য তাঁর বাবার শঙ্কা জাগে, কি জানি ছেলে কখন কি করে বসে। হ্যাঁ তিনি ছিলেন গোঁড়া হিন্দু।

"সেই ভদ্রলোক তাঁর নাতনীর বিয়ের সব ঠিক ক'রে ছেলেকে মেয়ের বিয়ের দু'দিন আগে খবর দেন। ছেলের অবশ্য মেয়ের বিয়ের সংবাদ শুনে মনটা প্রসন্ন হ'লো না, কারণ তার মেয়েটির বয়স তখন মাত্র সাত বছর। কিন্তু কি করবেন? বাবার সঙ্গে তো ঝগড়া করা চলে না। তিনি বিয়ের আগের দিন বিকেলে পৌঁছুলেন। খুবই ঘুমধাম হ'লো। মহা সমারোহ ব্যাপার। বর এলো। ছেলেটি অর্থাৎ পাত্রটির বয়স বছর ষোল হবে, রাঙা টুকটুকে ছেলেটি। শোনা গেল যে, ম্যাট্রিকে সে সেবার সর্বপ্রথম হ'য়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। কলকাতায় থেকে আই-এ পড়ে। কাজেই বিয়ের সময় আর সেই মেয়েটির বাবার মন তত ভারাক্রান্ত হইল না। চারি দিকে উৎসবের আনন্দ। কন্যা-সম্প্রদান হচ্ছে, এমন সময় মেয়েটি হঠাৎ খুব কয়েকবার বমি করলে। তার পর কাঁপতে কাঁপতে এল তার জ্বর। সম্প্রদানের কাজ সম্পূর্ণ না হ'তেই মেয়েটিকে সে-স্থান হতে তুলে আনা হ'লো। সেই জ্বর হয়ে দাঁড়াল টাইফয়েড্। একেবারে ঘমে মানুষে টানাটানি ক'রে যদি বা তাকে বাঁচান গেল, কিন্তু তার স্মৃতিশক্তি হলো বিলুপ্ত। মেয়েটিকে নিয়ে বেড়াতে যেতে হ'লো পাহাড়ে পাহাড়ে। এই রকম পাঁচ বছর। কুশণ্ডিকা হ'লো না, মেয়েও শ্বশুর-বাড়ী গেল না। যে ছেলেটির সঙ্গে তার বিয়ে হ'য়েছিল সে ছেলেটির এক মামা ছাড়া আর কেউ ছিল না। মেয়েটির ঠাকুরদাদা নাতনীর বিয়ের এক বছর বাদে মারা গেলেন। যে ছেলেটির সঙ্গে তার এই অর্দ্ধেক বিয়ে হয়েছিল, সে তো পর দিনেই চলে যায়, তার পর এই বিপদে তার আর কোন সংবাদ রাখা হ'লো না। যখন এই মেয়েটির বাবা মুঙ্গেরী পাহাড়ে মেয়েকে নিয়ে বাস করছিলেন, বিয়ের বছর পাঁচেক বাদে, তখন তিনি এক দিন খবরের কাগজে দেখলেন

যে, সেই ছেলেটিকে সন্দেহবাদী সন্দেহে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অন্তরীণ ক'রে রাখা হবে বর্ষায়।"

মানসী আর্তকণ্ঠে বলিল, "বাবা কি বলছ?"

"হাঁ মানসী।"

মানসী দু' হাত দিয়া তাহার মুখ চাকিয়া বলিল, "আর ব'লো না বাবা।"

প্রশান্ত যখন পাঁচোরি করিতে করিতে নিজের মাথার চুলগুলি হাত দিয়া মাঝে মাঝে টানিতেছিল। চোখ-মুখ তাহার লাল হইয়া উঠিল।

শশাঙ্কবাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "আরও আছে।"

"আর শুনতে চাই নে বাবা! তুমি—তুমি কেন তা হ'লে—"

"হাঁ, আমি সেই কথাই আজ বলবো তোমাদের। ভেবেছিলাম তোমাদের বিয়ের পরেই বলবো, তা সে আর হ'লো না। বোধ হয় ভগবানের ইচ্ছা তোমাদের জানা।"

"আর ব'লো না বাবা।"

"না মা, এটুকু শুনতেই হবে। প্রশান্তের বাবা সব খবর জানতেন; তবু তিনি আমার কাছে তোমার চেয়ে গিয়েছেন। তিনি ও আমি এক মতের এবং অভিন্ন আত্মা ছিলাম। তিনিই অনুরোধ ক'রে গিয়েছেন যে, এই কথা যেন তোমাদের বিয়ের পর জানাই। মনে ক'রো না প্রশান্ত, তোমাদের ঠকাবার ইচ্ছা আমার ছিল। আমি বড় বড় পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁরা সকলেই বলেছেন এই বিয়ে সিদ্ধ হয় নি। কাজেই এই মেয়ে তো কুমারীর মত। আমি হিন্দু, তবে আমি কুসংস্কারগ্রস্ত ভীত হিন্দু নই। আমি হিন্দুধর্মের উদারতা খুঁজে বার করেছি। ওই আলমারিটা খোল, দেখ ওতে স্মৃতিশাস্ত্রের কত বই আছে। আমি আজ ক বছর ধ'রে এই সব অনবরত পড়েছি। এই সব আলোচনা পণ্ডিতদের সঙ্গে অনেক ক'রে দেখেছি, পুনরায় বিয়েতে কিছুমাত্র শাস্ত্রলঙ্ঘন হয় না। বিয়ের আবার যখন মেয়েটির জ্ঞানশক্তি ফিরে এলো, তখন কিন্তু তার বিয়ের কথা একেবারেই মনে পড়ল না। কাজেই আমি আর এ-বিয়ে মানি নে।—আমায় একটু জল দে, মা।"

পিতার মুখে জল দিয়া মণি বলিল, "তবে বাবা, যখন তোমার মতে আমাদের বিয়ে অধর্ম নয়, পাপ নয়, তখন কেন অত ভয় পাচ্ছ, মনে কষ্ট ক'রছো?"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে শশাঙ্কবাবু বলিলেন, "হাঁ মা, পণ্ডিতদের মতে পাপ নয়, অশাস্ত্রীয়ও নয়, তবু, মা সে-দিন খবরের কাগজে সুপ্রকাশের মুক্তির খবরটা সহ্য ক'রতে পারলাম না। এই আজকের মত একটা গোলমাল করবে, এই ভয়টা তখনই আমার খুব হ'য়েছিল, তাই ভাবছি, যা হোক ক'রে তাড়াতাড়ি বিয়েটা হলেই বাঁচি। প্রশান্ত কোথায়? প্রশান্ত! প্রশান্ত, আমি যে কাজটা করছি সেটা কি তোমার অবৈধ ব'লে মনে হচ্ছে?"

প্রশান্ত চুপ করিয়া রহিল।

"প্রশান্ত তুমি আমার এই আলমারিটা খোল। সব পড়ো। যদি তাতেও তোমার মনে সন্দেহ থাকে তো, যাও সেই সব পণ্ডিতদের কাছে। কিন্তু দ্বিধা করো না, তুমি।"

বাহিরে ভোর হইয়া আসিতেছে। দুমিষ্ট পাখীর কাকলী প্রভাতের আগমনবার্তা মধুরকণ্ঠে জানাইতে লাগিল।

প্রশান্ত বাহিরের বারান্দায় আসিয়া পূর্বাকাশের দিকে চাহিল। এই যে অমানিশা বিলুপ্ত করিয়া যে সোণার আলো আসিতেছে, যে সূর্য তাহার উদ্দীপ্ত দীপশিখা লইয়া এখনি উঠিবে, সে কি আর তাহার এই জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে! তাহার কি আজ জীবনপ্রভাত হইল? না তাহার জীবনের আলো তমসার আঁধারের সহিত চির-বিলুপ্ত হইল!

বাহিরে বিন্দু কি ডাকিল, "দিদিমণি, এস গো, ধর্মিমঙ্গল হবে।"

মানসী প্রশান্তর দিকে চাহিল।

আজ এই প্রভাতে প্রশান্তর মুখে যে ছবি মণি দেখিল, সে ছবি আর কাহারও মুখে সে কখনও দেখে নাই। এই ছবি কাতরতার না উদারতার, ক্রোধের কি করুণার, শান্তির কি প্রলয়ের, সে কিছুই বুঝিতে পারিল না।

সে একপা দুইপা করিয়া প্রশান্তের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রশান্তের সে অনুমতি চাহে।

বিন্দু আবার ডাকিল, "দিদিমণি এস গো! কাক পক্ষী ডেকে গেল।"

বাহিরে শাঁখ বাজিয়া উঠিল।

মানসী মৃদুস্বরে ডাকিল, "প্রশান্ত।"

প্রশান্ত মানসীর দিকে চাহিল।

"তুমি বাবার গল্প সব বুঝেছ তো?"

প্রশান্ত শুধু একটু হাসিল।

"তবে আজ আমাদের বিয়ে তো ঠিকই?"

প্রশান্ত আবার দিগন্তের দিকে এক বার চাহিল। তার পর মণির দিকে চাহিয়া বলিল, "বন্ধ করো মণি।"

মণি প্রশান্তের দিকে বিবর্ণমুখে চাহিয়া বলিল, "তবে?"

"বন্ধ থাক, আমি চললাম।"

মণি প্রশান্তের দুই হাত ধরিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, "শোন শোন! তুমি আমার গুরু! তুমিই আমায় বুঝিয়েছ, বিবাহ মনের মিলন। ভালবাসার পূর্ণতাই হ'লো বিবাহের অনুষ্ঠান। বাইরের অনুষ্ঠান শুধু সমাজের চোখের জন্য। আইনতঃ শাস্ত্রীয় ব্যাপার সব তো—" মণি আর বলিতে পারিল না, ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

"ছি, কেঁদ না মণি! তুমি জান সুপ্রকাশ আমার কত খানি? আমার ধর্ম্ম কোথায়, তাও তুমি জান। ভালবাসলে অনেক সময় পাপ নাও হ'তে পারে, তবে অন্যের ভিনিষ প্রতারণা ক'রে নিলে পাপ হয়। আমিও হিন্দু, সম্প্রদান সম্পূর্ণ না হলেও, কিছু যখন হয়েছিল, তখন তার ভিনিষ আমি অপহরণ ক'রবো না। আমি সুপ্রকাশের কাছে চললাম।"

মানসীর দু'টি চক্ষু প্রখর অগ্নিসং ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "তুমি ভাবছ কি? আমি একটা মাটির চেলা, না এক চেলা কাদা? যেমন খুসী তেমনি করে আমাকে নাড়া চাড়া করবে? যাও, যাও!" বলিয়া মানসী দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

বিবাহ-বাড়ীতে সানাই বাজিতে গিয়া থামিয়া গেল। যে যেখানে ছিল সে সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। কলকণ্ঠপূর্ণ বিবাহ-বাড়ী নিস্তব্ধ! পুরনারীরা ফিস্ ফিস্ করিয়া দু'একটি কথা বলিতেছে। মানসী তাহার ঘরে সেই যে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে, আর সে বাহিরে আসে নাই। বাড়ী যেন হতশ্রী।

এমন সময় পিসীমা আসিলেন। তিনি প্রথমে শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে দু'একটি কথা বলিয়া মানসীর ঘরের কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিলেন, "মা মণি! একটু দরজাটা খোল।" মণি দরজা খুলিলে, তিনি মণির মুখখানি চকিতে এক বার দেখিয়া একখানি খামে আঁটা চিঠি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "তোমার চিঠি মা! তবে কাল পড়ো আজ নয়। যে চিঠি দিয়েছে, সে বিশেষ ক'রে অনুরোধ করেছে মা কাল পড়তে।"

তার পর তিনি বাহিরে আসিয়া বাড়ীর সরকারকে বলিলেন, "বাবা শশাঙ্কবাবুর যখন এত অসুখ তখন তো বিয়ে কিছুতেই হ'তে পারে না। আজ বিয়ে বন্ধ করো। টেলিফোনে নিমন্ত্রণ সব বন্ধ করে দাও।"

তার পর বাড়ীর অন্যান্য ব্যবস্থা করিয়া, মানসী ও শশাঙ্কবাবুকে কিছু খাওয়াইয়া তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন।

পর দিন ভোর না হইতেই মণির বড়ই প্রলোভন হইতে লাগিল চিঠিখানি খুলিবার জন্য। কিন্তু তবু সে ধীরে সুস্থে দুপুর বেলা চিঠিখানি খুলিল।

অপরিচিত হাতের লেখা।

"মানসী, প্রিয়তমা! এখন আমার অধিকার আছে তাই তোমায় এই সম্বোধন করছি। আমি আমার অন্তরের পবিত্র ভালবাসা ও নিষ্পাপ স্নেহ দিয়া এই কথাগুলির অক্ষর গড়ান। তোমার ইচ্ছা হয় প'ড়ো এই চিঠি, না হয় প'ড়ো না, ছিঁড়ে ফেলো।

"ভেবেছিলাম কিছুই কাহাকেও ব'লবো না। কাহাকেও না জানাব নালিশ, না জানাব অভিযোগ, আর না জানাব আমার এই অতি লঘু পবিত্র, স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা! কিন্তু কিছুই আমার সংযত হ'লো না। তবু শোন একটা গল্প! যার প্রতি অক্ষর আগুনের মত সত্য।

"তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়, প্রায় পনের বৎসর পূর্ব্বে। তুমি তখন সাত বৎসরের, আমি পনের বৎসরের। সম্প্রদান প্রায় শেষ হয়, তবে কুশণ্ডিকা হয় না। আমি তবু ব'লবো, তুমি আমার স্ত্রী—আমি তোমার স্বামী! তোমার জ্বরানক অসুখ ক'রলো, বিয়ের রাত হ'তে। আমি তখন বালক মাত্র। তবু সেই শুভদৃষ্টি সময়ের তোমার কচি প্রস্ফুটিত গোলাপের মত মুখখানি আমার অন্তরে সোনার জলে আঁকা রইল। তোমার রোগশয্যার ধারে আমায় যেতে দিত না এবং আমি লজ্জায় লোকের সম্মুখে তোমার কাছে যেতাম না। আমি লুকিয়ে, রাত্রি জেগে জানালার ফাঁক দিয়ে তোমায় দেখতাম

"তোমার রোগের যাতনা দেখে আমার দুই চক্ষু দিয়ে অনবরত জল ঝরতো। তার পর তোমরা গেলে পাহাড়ে। আমি রইলুম কলকাতায়। তার কয়েক বছর বাদে একটা বোমার মামলায় সন্দেহে ধরলো পুলিশে আমাকে। তাহাতে উঠে বিদায়-বেলায় বাঁশীর করুণ সুরের সঙ্গে ভেসে উঠেছিল তোমার দুইখানি মুখ, একখানি সেই শুভ-দৃষ্টির, অপরখানি রোগশয্যার।

"তার পর দশ বৎসর! এই দশ বৎসরে তুমিই ছিলে আমার কবিতা, তুমিই ছিলে আমার স্বপ্ন। মনে মনে কত কবিতা আমি তোমার নামে রচনা করেছি। যখন আমি মুক্তি পেলাম, তখন আমার মুক্তির আনন্দ ছিলে একমাত্র তুমি। তুমি আমার কল্পনা-সুন্দরী, তুমি আমার মানসী প্রিয়া। ফিরিবার সারা পথ তোমায় নিয়ে আমি কত স্বপনই না দেখেছি! এই গত দশ বৎসর তোমাদের আর কোন খবরই পাই নি। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত আমি বাধা পাই সে-দিন শিকুনিকে। তার পর ঘূর্ণী হাওয়ার মত, আমি এই ক'টা দিন কাটিয়েছি। আমার অপরাধ ক্ষমা ক'রো। আমি রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ, দেবতা নই। তা-ই আমি সে-দিন পাতালের মত গিয়েছিলাম তোমায় কেড়ে আনবার ভরে তোমার বাবার কাছে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝেছি আমার ভুল, বুঝেছি আমার ভাগ্য! তা-ই আজ সে-দিনকার সুপ্রকাশ নই, এখন আমি পিসীমার সুশান্ত হয়েছি।

"তোমাদের আশীর্ব্বাদ করছি তোমরা সুখী হও দু'জনে। আমি একটা ঘূর্ণী হাওয়ার মত এসেছিলাম, এই অশান্ত কড়টার কথা তোমরা ভুলে যেও। সব কথা না জানিয়ে থাকতে না পারায় জানালাম। কিন্তু যখন তুমি আমার এই চিঠি পাবে, তখন আমি থাকবো অনেক দূরে। তোমাদের শান্তির নীড়ে আমি এই ধূমকেতুর মত আবির্ভাব হওয়ায়, তোমাদের চেয়ে বেশী কষ্ট পাচ্ছি আমি। সেজন্য আমি যেমন দুঃখিত, তেমনি লজ্জিত। তোমরা সব ভুলে যেও।

ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন। ইতি—

পরম স্নেহাশীর্ব্বাদক সুপ্রকাশ।"

মানসীর দুই চক্ষু কাপ্‌সা হইয়া আসিল। সে নিষ্পন্দ-প্রায় দেহে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কতক্ষণ কাটিয়া গেল সে বুঝিতেও পারিল না। হঠাৎ প্রশান্ত ঝড়ের বেগে ঘরে আসায় সে সচেতন হইয়া উঠিল।

প্রশান্ত রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মণি, সুপ্রকাশ তোমায় কোন চিঠি দিয়েছে? কই দেখি।"

চিঠিখানি পড়িয়া প্রশান্ত বলিল, "সে আমাকেও একখানা চিঠি দিয়েছে, এই রকম ধরণের। সে বোম্বে গেছে কাল। চল তৈরী হয়ে নাও।" হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, "সময় আর বেশী নেই।"

মণি তার মড়ার মত ফ্যাকাশে মুখে, অসহায় দৃষ্টিতে প্রশান্তর দিকে চাহিল। সে দৃষ্টি যেন বিকল বিহ্বল!

প্রশান্ত মৃদু অথচ গম্ভীর স্বরে বলিল, "তোমায় বোম্বে যেতে হবে। তৈরী হয়ে নাও, আমি যাই কাকাবাবুকেও তৈরী হ'তে বলি গে।"

মানসী করুণ সুরে বলিল, "আবার আমায় কেন?"

প্রশান্ত দৃঢ়স্বরে বলিল, "তোমার যাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। যেতে তোমায় হবেই।" এই কথাগুলি প্রশান্ত আবেশের সুরে বলিল।

শশাঙ্কবাবুর সকল আপত্তি প্রশান্ত ঝড়ের মুখে তৃণের মত উড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে ও মানসীকে লইয়া বোম্বে রওনা হইয়া যথা সময়ে সেখানে পৌঁছিল। পথের তিন দিনে এই তিনজন পথযাত্রীর নিতান্ত দু' একটি সাধারণ কথা ছাড়া আর কোন কথাই হইল না।

বোম্বে আসিয়া অনেক খুঁজিয়া সুপ্রকাশের হোটেল বাহির করিল।

সুপ্রকাশ তাহাদের দেখিয়া অবাক্!

"এ কি কাণ্ড! তোমরা এখানে?"

প্রশান্ত গাড়ী হইতে জিনিষপত্রগুলি নামাইয়া রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে হাসিয়া বলিল, "তুমি আসতে পার, আর আমরা বুঝি পারি নে? এখন শীগগির আমাদের খাওয়ার জোগাড় করো। হাঁ, আর খান দুই ঘরের আগে ব্যবস্থা কর।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমার দ্বারে আমরা আজ অতিথি!"

সুপ্রকাশ অবাক্।

"আঃ দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চল ভিতরে চল।"

দিন দুই পরে। সুমুদ্রের ধারে বন্দরে। অদূরে ইংলণ্ড-গামী জাহাজ দাঁড়াইয়া আছে। যাত্রীরা সব প্রিয়জনের নিকট হইতে বিদায় লইতেছে।

বন্দরে প্রশান্ত, সুপ্রকাশ, মানসী ও শশাঙ্কবাবু দাঁড়াইয়া।

সুপ্রকাশ ছলছল্ নেত্রে প্রশান্তকে জড়াইয়া বলিল, "প্রশান্ত, কেন তুমি যাচ্ছ? আমি তোমায় কিছুতেই যেতে দেবো না।"

প্রশান্ত হাসিয়া বলিল, "বা রে! আমি বিলেত যাব! কত দিনের আশা আজ আমার সফল হ'তে চললো। এত দূরে এসে কি ছাড়তে পারি? দেখবে কি রকম সাহেব হ'য়ে আসি।"

সুপ্রকাশ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "প্রশান্ত, তোমার মনের এই সঙ্কল্প যদি গত কালও আমি জানতে পারতাম তা হ'লে আমি তোমায় ঠিক আটকাতে পারতাম। এখন আমার অত্যন্ত দুঃখ হচ্ছে, কেন আমার মুক্তি হ'লো? আমার সেই বন্দী-জীবনই বেশ আনন্দের, বেশ সুখের ছিল। মুক্তির আনন্দ আমার এমন দুঃস্বপ্নের মত হবে, জীবনে এমন দুর্ঘটনা আনবে, আমি যে তা কখনও ভাবতেই পারি নি। কিন্তু যাই হ'ক, তুমি জান মণি তোমায় কত ভালবাসে? যার জন্য তুমি এত ত্যাগ ক'রে যাচ্ছ, তা একেবারেই অসম্ভব।"

"অসম্ভব কেন? মণি! তুমিই সে দিন আমায় বলেছিলে, আমি তোমার গুরু। তা হ'লে তোমার গুরুর আদেশ, তার আশীর্ব্বাদ, পরে স্নেহাশীর্ব্বাদ তুমি তোমার স্বামীর সহধর্ম্মিণী হও। ভগবান তোমাদের মঙ্গল-করবেন। কিন্তু ভয় নেই সুপ্রান্ত, তোমার অসীম ভালবাসা ওকে দু'দিনে বেঁধে ফেলবে। আচ্ছা গুডবাই। চললাম।"

মানসী কিছুই বলিল না, শুধু নিঃশব্দে সে প্রশান্তকে প্রণাম করিল।

যাত্রী উঠা শেষ হইয়া গেল। যাত্রীরা জাহাজের ডেকে দাঁড়াইয়া রুমাল উড়াইতেছে। প্রশান্তও রুমাল উড়াইতে লাগিল।

বন্দরে জেটির উপরের মানুষেরাও রুমাল উড়াইতে লাগিল। শুধু এই তিনটি প্রাণী নিস্পন্দপ্রায় দেহে, অপলক নেত্রে সেই জাহাজের দিকে তাকাইয়া রহিল।

তাহাদের সেই স্তব্ধ দেহে কাহারও হাত নড়িল না, পা নড়িল না, মুখে কোন বাক্য সরিল না, চক্ষুর পাতাও পড়িল না। পাথরে গোরা প্রাণহীন মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া তাহারা দাঁড়াইয়া রহিল।

---

## দ্বন্দ্বের কারণ

...মানুষ ইচ্ছামতোই ধর্ম্মগ্রহণ করুক, আর আক্রিকা অথবা আমেরিকাই জন্মগ্রহণ করুক, মানুষ মুসলমানই হউক আর খৃষ্টানই হউক, আর হিন্দুই হউক, মানুষ যে মানুষ, মানুষের শারীরবিধানের কর্ম্ম এবং তাহার শরীরের গঠন যে, সমস্ত মানুষের মধ্যে মূলতঃ এক, ইহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে হইলে যে বিদ্যা ও শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা বিদ্যমান থাকিলে মানুষের আর্থিক অভাব অভাবরূপে ভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারিত না এবং মানুষের মধ্যে অমিলন এরূপভাবে পরিলক্ষিত হইত না। হিন্দুই হউক, আর মুসলমানই হউক, আর খৃষ্টানই হউক, ইংরাজই হউক, আর তুর্কীই হউক, আর আফগানীই হউক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও মলমূত্র ত্যাগের প্রবৃত্তি : আহার, নিদ্রা, শিক্ষা, কর্ম্মপ্রচেষ্টা এবং বিশ্রামের বাসনা বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্দ্ধক্য যে সকল মানুষেরই আছে, তাহা বস্তুতঃভাবে লক্ষ্য করিলে ধর্ম্ম ও জাতি লইয়া মানুষের মধ্যে এত বিদ্বেষের চিহ্ন হইতে পারে কি?...

---

# বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্মস্থান

—শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

যে পল্লীর কথা বলিতেছি, তাহার দিকে শিক্ষিত ও জনসাধারণের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। বাংলার অসংখ্য পল্লীর ন্যায়, এই মধ্যদ্রুমদ্বীপ বা মামগাছী গ্রামটী, বর্ত্তমানে একরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অতীতে, এই গ্রামটী এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাহা বিগত কালের ইতিহাসই নির্দ্দেশ করিতেছে। ব্যাসাবতার আদি মহাকবি শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ( শ্রীচৈতন্য-ভাগবত প্রণেতা ) এই মধ্যদ্রুমদ্বীপ বা মামগাছী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শৈশবকাল ও যৌবনের কিছু অংশ এই স্থানেই অতিবাহিত হয়। বর্দ্ধমান জিলাটী যেমন বিখ্যাত পাঁচালী-প্রণেতা রামেশ্বর, গৌড়লীলা পদ-রচয়িতা নরহরি, বিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্র, কবিকঙ্কণ, কবিবর গোবিন্দদাস, কমলাকান্ত, বিখ্যাত সাধক মরহুম সাহেব প্রভৃতি মহাপুরুষগণের আবির্ভাবে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া রহিয়াছে, তেমনি বর্দ্ধমান জিলার এই ক্ষুদ্র গ্রামটী একমাত্র মহাকবি বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয়ের জন্মভূমি বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট পরম তীর্থক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। পূর্ব্বস্থলী থানার অন্তর্গত, ভাগীরথীর তীরে, এই মামগাছী বা মধ্যদ্রুমদ্বীপ আজিও ধ্বংসময় অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই গ্রামের পূর্ব্বে নবদ্বীপ শহর ও ইহার চতুষ্পার্শ্বে পারুলিয়া, পূর্ব্বস্থলী, সুলাট, জামগড়, মাতাপুর বা মাধাতাপুর, তাতশালা প্রভৃতি গ্রাম। ঐতিহাসিক ঘটনার দিক্ হইতে, এই গ্রামগুলি নানা কারণে প্রসিদ্ধ। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ভাগীরথী বক্ষে নৌবাণিজ্যের সময়, এই সব গ্রামগুলি বহুবার লুণ্ঠিত ও ভস্মসাৎ হইয়াছিল। মহারাষ্ট্র পুরাণে তাহার বিবরণ উল্লেখ আছে, যথা :—

তবে কেল্লা গ্রাম লুটি দিল পোড়াইয়া।
সে সব গ্রামের নাম শুন মন দিয়া।
ভাটেছালা পোড়ায় আর মেজাপুর চাঁদড়া।
কুড়মন পলাসী আর বেঁচি বেড়্যা।
সমুদ্রগড় মালঞ্চ আর নবীয়া।
মাতাপুর, ফুলটপুর খইল পোড়ন দিয়া।
পোটপাড়া, চাঁদপাড়া আর আগদীয়া।
রাতারাতি লুটিল দিল পোড়াইয়া।

[মহারাষ্ট্র পুরাণ—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ]

উপরোক্ত ভাটছালা ( তাতশালা ), সমুদ্রগড় ( সমুদ্রগড় ), আগদীয়া (অগ্রদ্বীপ), মাতাপুর (মাধাতাপুর), জামগড়, সকল গ্রামই মামগাছী গ্রামের সংলগ্ন।

ভাটছালা বা তাতশালা গ্রাম প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা মতিলাল মহাশয়ের জন্মভূমি। এই মধ্যদ্রুম দ্বীপ বা মামগাছী গ্রামে বর্ত্তমানে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ভিটার উপর গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ও তথায় তাঁহার নিত্যবিগ্রহ, গৌর নিতানন্দ পূজা হইয়া থাকে। ইতিহাসের কথা এই যে, শ্রীবাসের গৃহিণী মালিনী দেবীর মামগাছী গ্রামে শিত্রালয় ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের প্রিয় ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীনারায়ণী দেবীর মামগাছী গ্রামে বিবাহ হয়, এই নারায়ণী দেবীর গর্ভে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পিতৃ-কুলের বিশেষ পরিচয় জানা যায় না, তাঁহার পিতার নামও অজ্ঞাত। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না—তাঁহার স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি শেষ বয়সে দেমুড় গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার চারি শিষ্যের মধ্যে শ্রীরামহরি নামক একটি কায়স্থকে, তাঁহার বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া যান। উক্ত রামহরি ঠাকুরের বংশধরগণ, তথায় দেমুড়-পাঠবাড়ীতে থাকিয়া, ঠাকুরের সেবা-কার্য্য করিতেছেন।

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত' রচনা করেন। এই গ্রন্থটী সমগ্র বৈষ্ণবগণের নিকট পূজিত ও বঙ্গীয় সাহিত্যের সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ হিসাবে ইহার যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে। এই লেখকের পূর্ব্বে শ্রীলোচন দাস ঠাকুর, 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' নামে, গৌরাঙ্গ-লীলাখেলা বর্ণনা করিয়া

গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পূর্ব্বে গুণরাজ খাঁ, অথবা মালাধর বসু, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক একখানি হৃদ্যোপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। মহাকবি ব্যাস যেমন ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়া বেদব্যাস রূপে পূজিত হইতেছেন, তেমনি বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যলীলা' নামক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া, চৈতন্যলীলার ব্যাস বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন।

বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর নন্দন
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা যেমন
চৈতন্য-লীলায় ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
( শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত )

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে, শ্রীচৈতন্যলীলা তিনভাগে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম ভাগ বিদ্যাবিলাস-প্রধান—'আদি-খণ্ড,' দ্বিতীয় ভাগ কীর্ত্তন-প্রকাশ-প্রধান—'মধ্য খণ্ড,' তৃতীয় ভাগ সন্ন্যাসীরূপে শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচলে নাম-প্রচার-প্রধান 'অন্ত্য খণ্ড'। এই চৈতন্য-ভাগবতের আদি নাম ছিল, 'চৈতন্য-মঙ্গল'। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পূর্ব্বে, শ্রীনরহরি ঠাকুরের শিষ্য শ্রীলোচন দাস ঠাকুর, 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' নামে একটী পাঁচালী গ্রন্থ রচনা করেন। পরে, উভয় গ্রন্থের পার্থক্য জানাইবার জন্য, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, তাঁহার পুস্তকের নাম শ্রীচৈতন্য ভাগবত দেন। কথিত আছে, নারায়ণী দেবীর ইচ্ছা অনুসারে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, তাঁহার গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করেন ও নাম রাখেন শ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

মদ্রুমদ্বীপ বা বর্ত্তমান মামগাছী গ্রামের বৈশিষ্ট্য ও তাহার মূল্য বুঝাইতে হইলে নবদ্বীপ সম্বন্ধে দুইটী আভাস দিতে হয়; কারণ এই মদ্রুম দ্বীপ বা মামগাছীর নবদ্বীপের সহিত ঘনিষ্ঠরূপ যোগাযোগ রহিয়াছে। ভাগীরথীর পূর্ব্ব উপকূলে, বর্ত্তমান নবদ্বীপ নগর। বহু পূর্ব্বে তথায় সেন-রাজবংশের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমানে সেই স্থানগুলি, নবদ্বীপ নামে খ্যাত না হইয়া, অন্য নামে পরিচিত হইতেছে। জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ, শ্রীবাসের অঙ্গন, অদ্বৈতের ভবন, মুরারীগুপ্তের স্থান প্রভৃতি, অধুনা মায়াপুর নামে খ্যাত।

গঙ্গার পরিবর্ত্তনে মহাপ্রভুর প্রকটকালে নবদ্বীপ নগরের অধিকাংশই জলমগ্ন হইয়াছিল, সুতরাং সেই সময়কার অধিবাসিগণের অনেকেই উঠিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। গৌরাঙ্গদেবের প্রকটকালীন ফুলিয়া গ্রাম বা পাহাড়পুরই অধুনা নবদ্বীপ শহর। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে, নবদ্বীপ নগর, ফুলিয়াদহ বা ফুলিয়াবীদহের চড়ায় অবস্থিত ছিল। আবার সপ্তদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপ নগর, বর্ত্তমান নিদয়া গ্রাম, শঙ্করপুর, রুদ্রপাড়া প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়। তৎপূর্ব্বে ষোড়শ শতাব্দীতে, মহাপ্রভুর সমকালীন নবদ্বীপ নগর, মায়াপুর, বল্লালদীঘি, মাধবপুকুর, শ্রীনাথপুর প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত ছিল। বর্ত্তমান রামচন্দ্রপুর, শ্রীনাথপুর, কাঁকড়ের ঘাট, শ্রীরামপুর, বাবলাড়ি প্রভৃতি স্থানগুলি গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। উহার কিয়ৎ অংশ কোলদ্বীপ ও মদ্রুম দ্বীপের অন্তর্গত ছিল। গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে, বিদ্যানগর, মামগাছী, ভারপড়, কোলদা প্রভৃতি স্থান, নবদ্বীপের শহরতলীরূপে অবস্থিত ছিল।

'ভক্তিরত্নাকরে' এই মদ্রুমদ্বীপ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করা গেল :

—অথবা শ্রীনবদ্বীপে—নবদ্বীপ নাম।
পৃথক পৃথক কিন্তু, হয় এক গ্রাম।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলির আছেকথা।
বহিল সে নামের যাত্রার কোন মতে।
কৈছে কলি যুগ কৈলে নামের বাহার।
তথাপি সে সব নাম অন্যথা হয়।
ক্রমে ক্রমে নাম কৈছে পৃথক হৈয়াছে।
যথাইল গ্রামে কৃষ্ণ লীলাপুরুষোত্তমে।
কথো কাল পরে, কথো গ্রাম লুপ্ত হৈল।
কথো গ্রামে নাম লোকে অন্য ধারা কৈল।
কৈছে নবদ্বীপে অন্তর্ভূতি হৈল গ্রাম।
প্রভু-ভক্ত লীলা যতে ব্যক্ত হইল নাম।
কথো অন্য ব্যক্ত কথো লুপ্ত সেই মতে।
কিন্তু নবদ্বীপ নাম জানাই জগতে।
'দ্বীপ' নাম প্রথমে, সকল দ্বন্দ্বে কয়।
গঙ্গা পূর্ব্ব পশ্চিম হৈয়াছে দ্বীপ নয়।
পুনঃ অন্তর্দ্বীপ, ঈ সীমন্ত দ্বীপ হয়।
গোদ্রুমদ্বীপ, ঈ মধ্য দ্বীপ চতুষ্টয়।
কোল দ্বীপ, মধ্য তহ্, জহ্নুর আরে।
ঋতু দ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার।
এই নবদ্বীপে নবদ্বীপাখ্যা প্রথায়।
প্রভু প্রিয় শিব-পঞ্চাদি গোতে গায়।
[ ভক্তি-রত্নাকর ১২শ তরঙ্গ ]

যাহা হউক, প্রকৃত নবদ্বীপ কোন্‌টি তাহা ঐতিহাসিক ও গবেষকগণই নির্দ্দেশ করিতে পারেন। সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি মতে, গঙ্গার লীলা-বিচার দ্বারা মনে হয়, বর্ত্তমান নবদ্বীপ শহর, সেই শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ নহে। এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ এই প্রবন্ধের বিষয় নহে। এই মামগাছী, বা মদ্রুমদ্বীপ নবদ্বীপেরই অন্তর্গত, এবং এই স্থানে মহাকবি বৃন্দাবন দাস ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ও শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; বর্ত্তমানে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত, জঙ্গলাকীর্ণ ও মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে। একটি প্রাচীন পল্লীর কীর্ত্তিময় কথা ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্য এই, যাঁহারা বৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, তাঁহারা যেন তাঁহার জন্মভূমির প্রতি বর্ত্তমানে দৃষ্টি রাখেন।

# বিজয়ী

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

## উল্টা পথে

লেখাপড়া শেষ করিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

কৈকেয়ী প্রশ্ন করিলেন, "সে এখন কি করবি? বাপের পথ ধরবি, না সব দেখবি শুনবি?"

আনন্দ জবাব দিল, "খুটোর একটাও না।"

"তা আমি জানি, আমায় তোরা ছুটি দিবিনে, তবে আমি সব লক্ষণের নামে লেখা পড়া করে দিই, তোদের বাপ ব্যাটার চেয়ে ও চালাতে পারবে ভাল।"

"সর্ব্বনাশ! এতই কাজের লোক ধরে উঠেছে তোমার পুত্রী?"

"হয়েছেই তো! ওকে আমি অনেক কথা জিজ্ঞেস করি অনেক সময়। হেসে বটে খেয়ালে, আধ-পাগলার মত, কাজের কথা হলে জবাব দেয় যেন পণ্ডিত! বললে বিশ্বাস করবিনে, ওর কথামত কাজ করে আমি ঠকিনে।"

"ভরেই" হোক, ভক্তিতেই হোক, আমি কিন্তু স্বীকার করবো না তা,—যাক্‌গে তুমি লেখা পড়া করে রাখ,—যা যাও, দিয়ো, আগে আমার কিছু কথা আছে সেইটে শুনে তার পরে। কখন তোমায় পাব?"

"সন্ধ্যের পর।"

ঠিক সময়ে আনন্দ বেড়াইয়া আসিয়া কৈকেয়ীর কাছে আসিল। সুমেরুর ঘরে ঢুকিয়াই ঠোঁট উল্টাইয়া আবার ফিরিয়া গেল। কৈকেয়ী একটু হাসিয়া বলিলেন, "চাস করে চলে গেল বৌমণি? এ সময়টা ও আমার কাছে থাকে।"

"থাকগে থাক, তুমি শোনো, বাবার বইগুলো পড়েছ তো? সেই গুলো হচ্ছে আমার আদর্শ, আমি কাজ করে দেখাব। লেখা পড়া দরকার তাই শিখলাম—আইন আমা চাই, আইন পড়লাম শুধু আমার কাজের সুবিধার জন্যে। আমার সমস্ত প্ল্যান তৈরি আছে—শুধু তোমার অনুমতি, আর সাহায্য চাই।"

কৈকেয়ী হাসিয়া বলিলেন "ভূমিকা শুনে মনে হচ্ছে একটা ভীষণ ব্যাপার, কি প্ল্যান তোর?"

"আমি দেশের উন্নতি করবো, অর্থাৎ আমাদের দেশের গরীব চাষীদের; তারাই আমাদের দেশ। আমি সভা সমিতি করবো না, লেকচার দিয়ে বেড়াবো না, তাদের সঙ্গে থেকে শুধু দেখাবো আর বোঝাবো কিসে তারা উন্নত হবে। ব্যাপারটা শুনতে সোজা, কিন্তু কঠিন। তবে যতই কঠিন হোক আমি করবোই।"

"কি রকম করে করবি?"

"ম্যালেরিয়া নষ্ট করে, অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষ না হয়, তার ব্যবস্থা করে, পাট বোনা বন্ধ করে, লেখা পড়া শিখিয়ে।"

"কি যে বলিস, দুর্ভিক্ষ বন্ধ করবে মানুষে?"

"হাঁ। দুর্ভিক্ষ মানে, শস্য না জন্মানো—এই তো? ধর উপর্য্যুপরি দু' তিন বছর অজন্মা হলো, তখন অন্ন-কষ্ট হয় দারুণ। কিন্তু পর পর যদি দু' তিন বছরের মোগা শস্য জমা করা থাকে তবে দুর্ভিক্ষ হবে কেন? প্রকৃতির একটা নিয়ম আছে, দু' বছর অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি হলে তৃতীয় বছরে খুব সুফসলী হয়। আমরা কষ্ট পাই নিজেদের দোষে—ভবিষ্যৎ দেখিনে বলে। আমি গ্রামে গ্রামে গোলা তৈরী করবো, সকলেই এক বছরের খোরাকী শস্য রেখে বাকী সব সেই গোলায় জমা দেবে, এক বছর অপেক্ষা করে, সেই শস্য বিক্রী করা হবে, কিন্তু টাকা কেরৎ পাবে না, সেই টাকা থাকবে বিপদের সম্বল—যখন দুর্ভিক্ষ হবে তখন যা দরকার সাহায্য পাবে।"

"কেউ কি রাজী হবে?"

"রাজী হবে, রাজী করাব কাজ রেখিয়ে। আমি ট্র্যাকটার দিয়ে জমি চাষ করাবো। এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্টে আমার দু' জন বন্ধু কাজ করে, তারা সে কাজ ছেড়ে দিয়ে আসবে। আরো চার পাঁচ জন পাশ করে বেরিয়েছে তারাও আসবে, সে আমি ঠিক করেছি। মনে করো না

দিদি, তোমার আনন্দ কলকাতা হাডিঞ্জ হোষ্টেলে থেকে শুধু কলেজে পড়েছে, আর থিয়েটার সিনেমা দেখেছে। আমি যতটা সময় পড়েছি, তার চেয়ে বেশী সময় এই সব ভেবেছি, এই সব করেছি।"

কৈকেয়ী চুপ করিয়া রহিলেন। আনন্দ বলিল, "আমাদের সমস্ত চাষী প্রজার দায়িত্ব ষোল আনাই আমার নিতে হবে। এক বছরের দায়িত্ব, এক বছরের সমস্ত দায়িত্ব তাদের যদি আমি স্বীকার করে নেই বা দিয়ে নেই তবে তারা আমার কথা শুনবে। সেইটে আমি করবো, এক বছরের জন্যে সমস্ত চাষী-জমি আমার, ইচ্ছে মত আমি কাজ করাব। সেই কাজের ফল দেখে পরের বছর আপনিই তারা আমার পথে আসবে।"

কৈকেয়ী কিছুই বলিলেন না। আনন্দ বলিয়া চলিল, "তার পরে নিজেদের সীমানার মধ্যে কাজ শেষ হলে এবং ফসলটা যখন ফলতে আরম্ভ করবে, তখন আমাদের কাঁথি-ক্ষেত্রের প্রসার হতে থাকবে, এখান থেকে আরও উত্তরে কত অনাবাদী হাজার হাজার মাঠ জঙ্গল পড়ে আছে, পূর্ব্ববঙ্গের চাষীরা এসে চাষ আবাদ করে ধনী হয়ে উঠছে নাম মাত্র খাজনা দিয়ে। আমরা রয়েছি পূর্ব্ব উত্তরের ঠিক মাঝখানে বরং উত্তরের দিকেই। আর আমি যা করতে চাইছি এই দেশেই সেটা সম্ভব। এখানে তো বছর বছর পূর্ব্ববঙ্গের মত বন্যা হয় না!"

আবার কৈকেয়ী বলিলেন, "এত সব ভেবেছিস, তোর বাবাকে বল।"

"তোমাকে আগে, তুমি রাজী হলে তবে তো? বাবা খুব খুশী হবেন আমি জানি।"

"তোর সব ঠিক করাই হয়েছে দেখছি, মন্ত্র একটা দল গড়েছিস বল?"

আনন্দ হাসিয়া বলিল, "মন্দ না—অনেকেই জুটতে চাইছে, আমাদের বেড্ মাষ্টার হচ্ছেন লীডার।"

"তা বেশ, এখন আমায় কি করতে হবে তাই বল।"

"তোমায়? তুমি অনুমতি দেবে, আর দেবে টাকা।"

"কত টাকা?"

"সেটা কাল তোমায় বলবো। বাদা সাহেবকে বলে দিয়েছেন কত ঘর চাষী-প্রজা আমাদের আছে কোন্ কোন্ মহালে, আর চাষের জমির পরিমাণ কত—সেই সম্বন্ধে একটা লিষ্ট মায়ের আমার দেবে, তখন বলতে পারবো।"

"আমি ভাবছি তোদের নিয়ে এবার মহালগুলোতে যাব, তোরা দেখে শুনে চিনবি, আর তুই এই সব ভাবছিস?"

"ও একই কথা, চিনতেই তো চাইছি দিদি। আমরা আমাদের নিজের ঘর চিনিনে বলেই তো এই দশা। মিস্তিরিরা কলকাতায় মস্ত বাড়ী করেছে। তুমিও করতে চেয়েছ—সত্তর হাজার টাকার এষ্টিমেট, সেটা তুমি কয়োনা আর। সেই টাকাটা আমার জন্যে রাখ।"

"বলিস কি? কলকাতায় একরত্তি সাতেক কাঠের বাড়ী, সেইটায় ওঠবার জন্যেই কলকাতা যাইনে, এখন তোরা আজকালকার মানুষ কলকাতা থাকবি, বাড়ী না করলে হয়?"

"কলকাতায় আমি থাকতে চাইনে, সেটা আমার মতে কাজের জায়গা—বসে বসে আরাম করবার নয়। মাসে হয়তো দশবার কলকাতা যেতে হতে পারে—সে আমি হোটেলে উঠে কাটাতে পারি—কিন্তু অত টাকা দিয়ে বাড়ী করবার তো কিছু দরকার নেই। তাছাড়া আমরা টাকার মালিক, আমাদেরই তো উচিত দেশের কাজ করা—দেশের কথা ভাবা। বিলাসিতা, আরাম, সেই কি মানুষের কাজ, না সেই টাকার সদ্ব্যবহার?"

বলিতে বলিতে আনন্দ বালিশ ছাড়িয়া সোজা হইয়া বসিল; বলিল, "আলসে হয়ে বিলাসিতা নিয়ে থাকবার সময় বাঙলা দেশের আর আছে কি দিদি? যদি কিছু কর্ত্তব্য থাকে, সে আমাদেরই—যাদের টাকা আছে। আমরা পথ দেখাবো, কাজ করবো, তবে না লোকে বুঝবে? কিন্তু দুর্ভাগা দেশের ধনীরা করেন কি? শুধু বিলাসিতার সখ মেটাতে হাজার হাজার টাকা জলের মত উড়িয়ে দিচ্ছেন, প্রজারা না খেয়ে মরছে। আমরা প্রজাদের বাঁচাব নিজেদের স্বার্থের জন্যেই—ওরা মানেই তো আমরা, ওরা না বাঁচলে কি আমরা বাঁচব? রঙীন কানুনের মত, খেলনা বেলুনের মত এক নিমিষেই শেষ হয়ে যাব, যাচ্ছিও। তাই যাতে ওরা বাঁচে, মানুষের মত হয়ে ওঠে আমি সেই চেষ্টা করবো। এখন আমার সহায় ভগবান আর তুমি।"

কৈকেয়ীর ভ্রূকুঞ্চিত মুখে চিন্তার ভাব। আনন্দ বলিল, "কি ভাবছো দিদি?"

"ভাবছি, মনটি পেয়েছিস তো ঠিক মায়ের।"

"মা'র? তোমার নয় কেন? কে আমার মাথায় এ সব ঢোকালে? তুমি তো অন্য জমিদারদের মতন নও, তুমি গ্রামে গ্রামে টিউবওয়েল বসাচ্ছ, পুকুর কাটাচ্ছ, ভিস্-পেনসারী দিয়েছ, স্কুল করেছ, আজকাল এ রকম করে কেউ? মিত্তিররা কি করছেন জানো? কলকাতায় বাড়ী সারা হলেই সব শুদ্ধ সেখানে গিয়ে থাকবেন। একটা এরোপ্লেন কেনবার মন হয়েছে, দেশ বিদেশ বেড়াবেন। আর তুমি নিয়ম করেছ বছরে দু' এক মাস কলকাতা থাকবে।'

"তা কলকাতা ছাড়লে কি চলে? মধ্যে মধ্যে একটু ঘুরে ফিরে বেড়ানো, পাঁচ রকম জিনিষ দেখা চাই, মনের পক্ষেও, স্বাস্থ্যের পক্ষেও, দরকার।"

"তবে ঐটেই ঠিক থাক, নতুন বাড়ী আর করোনা। আমিই কি চিরকাল পাড়াগাঁয়ে কাটাবো? বছরে কত বার কলকাতা যেতে হবে তার ঠিক নেই, যে বাড়ী আছে তেমন খারাপ নয়, ঐ বেশ। টাকাটা তুমি আমায় দেবে বলে? তুমি প্রজার উন্নতি চাও, আমিও তাই চাই—কাজটা যদি ঠিক করে উঠতে পারি তবে বুঝবো সব সার্থক হলো।"

"তা টাকা নিস যা দরকার, তোরই তো সব। বুদ্ধি করেছিস ভাল। গাঁয়ে ঘুরবি, থাকবি কোথা?"

"থাকবার ভাবনা কি? যেখানে যাব তাদের মধ্যেই থাকবো, তারাই জায়গা দেবে।"

"তা কেন? কাছারী বাড়ী বলে কাজ হয় না? হেড্ কোয়ার্টার করলি কাছারী বাড়ী—চার দিক ঘুরে কাজ করলি।"

"না, চেয়ার পেতে বসে কাজ হয় না, বাহাদুরি হয়। কিছু ভাবনা নেই দিদি, তোমার আনন্দ হারিয়ে যাবে না। তুমিও মধ্যে মধ্যে গিয়ে দেখে এসো কত দূর কি করি। উৎসাহ দিয়ো, ভুল হলে শুধরে দিয়ো—যা করি তোমার নাম নিয়েই করবো যে।"

অবাক্ হইয়া কৈকেয়ী চাহিয়া রহিলেন, সরল বালকের মত প্রফুল্ল মুখ, উৎসাহ-উজ্জ্বল চোখ, এখনো যাহাকে কোলের ছেলে বলিয়া ভুল হয়—সে এত কথা ভাবিয়াছে, এত চিন্তা-শক্তি আছে তার! বাপ-ঠাকুর্দা যার চির দিন বই লইয়া ঘরের কোণে কাটাইল, (একজন পড়িয়া, আর জন লিখিয়া!) তাদেরই সন্তান নিজের শক্তির জোরে কার্য-ক্ষেত্র বাছিতে চায়! সে কার্য-ক্ষেত্র তার নিজেরই সৃষ্টি!

প্রতাপ চৌধুরীর সঙ্গে আনন্দের কিছুই মেলে না, এ বংশে তেমন আর হইবে না, তেমন দুর্দ্ধর্ষ তেজস্বী সিংহ—অজ্ঞাতে কৈকেয়ীর একটা নিঃশ্বাস পড়িল। রাজসিক প্রতাপ চৌধুরীর বংশ হইয়া উঠিল ঘোর সাত্ত্বিক—কোন দিন বা ইহারা হরিশ্চন্দ্র রাজার মত সর্ব্বস্ব দান করিয়া ভিখারী হইয়া বসে।

তবু কৈকেয়ীর মনে একদিক দিয়া হর্ষের আভা ফুটিয়াছে। যেমন জোর দিয়া ব্যাকুলভাবে প্রাণ ঢালিয়া আনন্দ কথাগুলি বলিয়াছে, প্রত্যেকটা কথা কৈকেয়ীর মনে লাগিয়াছে। কেশব বলিলে হয় তো তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। আনন্দের কথা আলাদা। নিরুপায় দুঃখী চাষাদের কষ্ট যদি কেহ ঘুচাইতে চায়, কে তাহাতে বাধা দিবে?

"তা আমি যে লক্ষ্মণকে নিয়ে, তোকে নিয়ে বেরুতে চাইছি—তার কি হবে?"

"তোমার পুসীকে নিয়ে? উনি কি মিত্তির দাদামশায়ের মতন রাইডিং-সুট পরে মহাল দেখতে বেরুবেন না কি? তা হলে দর্জ্জিকে বলে দিতে হয়! কোন ঘোড়াটা?"

কৈকেয়ী হাসিয়া বলিল, "ও যদি তেমন পোষাক পরে—যা মানাবে! তোদের চেয়ে হাজার গুণে ভাল। তুই তো চাষা হতে চললি, ওকে কিন্তু আমি চাষা হতে দেবো না। ওর হাতে সব থাকবে তুই শুধু চেয়ে নিবি।"

"তা থাক, আমি দরকার মতন পেলেই খুসী। উনি জন্ম জন্ম রাণী থাকুন, নিত্যি নতুন শাড়ী আসুক, দু' বেলা গহনার অর্ডার যাক, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু লোহার সিন্দুক বোঝাই হয়ে গেছে, রাখবো কোথা সেই সমস্যা। তা সিন্দুকটা খালি করে আমায় দিয়ে দাও, আবার নতুন হোক। আমিও 'জয় রাণীর জয়' বলে বেরুই।"

"দা-দা, ওর গয়নার দিকে তুই নজর দিস নে। তোর মা কিছু পরলে না—সব রইল চিরকাল তোলা। লক্ষ্মণ বাড়ীর ছিরি ফিরিয়েছে। ঘরের বউ থাকবে লক্ষ্মীর মতন সেজে, তবে না লক্ষ্মী খুশী থাকেন।"

"ঠিক্ ঠিক্, লক্ষ্মী খুশী থাকাই আমার এখন দরকার। তা তুমি যত ইচ্ছে পরাও না? এক এক বার বাড়ীর ভেতর আসি—এক একবার এক এক রকম সাজ, দেখে চম্‌কে উঠি, চিনতে পারিনে, মনে হয়, সেকেলে বড় বড় মহারাণীরা বুঝি পালা করে বেড়াতে আসছেন।"

"তুই যা খুশী ভাব, ও আরও পরবে! তা তোরা বেরোবি কবে?"

"পরশু বেরোবো ভেবেছি।"

"ফিরবি কবে?"

"তার কিছু ঠিক নেই—মাসে দু' তিনবারও আসতে পারি—আবার ছ' মাস না-ও আসতে পারি। কাজের ওপর নির্ভর করছে কি না? তুমি যেন পথ চেয়ে থেকো না, চিঠি না পেলে ভেব না।"

"বাড়ীর কাউকে নিবিনে সঙ্গে?"

"না, আমরা একটা বড় রকম দল জুটেছি আর কাউকে চাই নে। যাদের কাছে যাব, যাদের ক্ষেতে খাটবো তারাই হবে সঙ্গী। এক বিঘে জমিতে ছ'টা ফসল হবার কথা কখনো তা হয়? ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে সয়ে যাচ্ছি, এবার যখন দেখবে পুরো ফসল উঠলো, তখন আমি-ই হব বড় ভাগের।"

"তাই বলে যেখানে সেখানে খেয়ে বেড়াস নে যেন?"

"না—সেটা আমিও পছন্দ করিনে। কেউ কেউ ভাবে এক সঙ্গে এক পাতে খেলে বুঝি বন্ধুত্ব হয়—এক প্রাণ হয়। তা নয়, খাওয়া ব্যাপারটা যার যার রুচি অনুযায়ী। ওটাকে মিলিয়ে মিশিয়ে খিচুড়ী পাকালে খুব বেশী সুবিধে হয় না। বরং অনেক গোলমাল বাধে—"

"বলিস কিরে? এই অস্পৃশ্যতা-নিবারণের যুগে তোর মতন 'আপ-টু-ডেট' ছেলের মুখে এমন কথা?"

আনন্দ হাসিয়া বলিল, "সবাই একমত হবে এমন কি কথা আছে? আমি যেমন বুঝি তেমনই করবো। তুমি আমায় মানুষ করেছ—তোমার মনের ভাব যদি আমার মধ্যে এসে থাকে, সেটা কি খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার? ওসব বাজে কথা নিয়ে আমি ভাবিনে, যার তার ঘরে ঢুকে একসঙ্গে খেলে তারাও স্বর্গ পাবে না আমিও না। বরং যার যা কাজ, সে তাই করুক—ভাল ভাবে করুক। অস্পৃশ্য যারা নিজের পায় দাঁড়াক, বেঁচে উঠুক, শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে মানুষ হোক, তখন উঁচু জাতরা আপনিই শ্রদ্ধা করবে মানবে, ভালবাসবে। টানা-হেঁচড়া করে জোর করে কখনও কোন কাজ হয় না—যদি আপনা থেকে না হয়।"

"তা সত্যি। তুই বেশ তো লেক্‌চার দিতে শিখেছিস, সভা ডেকে তোর কথা বল না শুনিয়ে, সবাই শুনুক।"

"এখন না। এক বছর পরে সভা করবো, হিসাব দেবো সবাইকে যা যা করেছি। কাজের ফল চোখের ওপর মেলিয়ে দিলে যতটা বিশ্বাস হয়, দু'বেলা লেক্‌চার দিলেও তা হয় না। উল্টে লোকে বিরক্ত হয়ে যায়। লেক্‌চার তো যথেষ্ট হচ্ছে বাঙলায়—কাজ হচ্ছে কই? তাই আমি আর ওপথে যাচ্ছিনে।"

"তা বেশ। তুই যা ভাল বুঝিস কর। আর কিছু না হোক তোর বাপের মতন যে কুণো হতে চাসনি সেই আমার ভাগ্যি—বাইরের আলো দেখা তো তোদের কুষ্ঠীতে নেই।"

"বাবা যদি না লিখতেন আমি এ বুদ্ধি কোথা থেকে পেতাম?"

"বুদ্ধি যার যার আপনার আপনি মাথায় জোটে, কাউকে শেখাতে হয় না।"

"তা হোক মুখে যা-ই বল, মনে মনে বাবাকে তুমি আমার চেয়ে বেশী ভালবাস, বাবা যদি এই কাজ করতে চাইতেন তুমি দিতে না। আমি বললাম অমনি রাজী হয়ে গেলে; নিজের ছেলে তো নয়, গলে ভিক্ষুক রোগে পুড়ুক বা খুন হয়ে যাক গে।"

বৈকেরী হাসিয়া বলিলেন, "বুঝেছিস ভাল।"

"ঠিক বুঝেছি। ওঃ আমার কি ভয়ই না ছিল তুমি শুনে কি বলবে—আমার কি আনন্দ হচ্ছে জান? মনে হচ্ছে অর্দ্ধেক কাজ এগিয়েছে। এখন আমি নির্ভাবনা, নিশ্চিন্ত। এবার একটু চা আনতে বল।"

"খাচ্ছিস চাষা হতে, বাবুয়ানা করবি না কি?"

"নিশ্চয় চা সঙ্গে থাকবে আমার। বাতাহারী জমি হতে কাজ করবো একথা কে বললে তোমায়? নিজেকেও

দেখবো, অন্যকেও দেখাবো, আনন্দের সঙ্গে কাজ করবো—দায়ে পড়ে নয়। আনন্দ যার দিলে থাকবে অবসাদ—বিরক্তি। আমরা চা খাব, গান গাইবো, গল্প করবো, আবার হেসে খেলে ঘুরে ঘুরে কাজ করবো। জীবনে দুই-ই চাই—একটা বাদ দিয়ে অন্যটা হয় না। উৎকট বা কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন বেশী দিন টেঁকে না। যা স্বাভাবিক, যা মাঝামাঝি তাই টিঁকে থাকে।"

"বাক, আমার ভয় হয়েছিল—কি জানি, না-খেয়েদেয়ে বুঝি নেংটি পরেই মাঠে মাঠে ঘুরবি।"

"তাহলে কি বাড়ী ঢুকতে দেবে?"

"আমি হয়ত দেবো, কিন্তু লক্ষ্মণ দেবে না।"

"তবে যাওয়া ভাল, অতঃপর সাবধান হয়েই চলবো। যেহেতু হাত পাততে হবে তো ওঁরই কাছে।"

কৈকেয়ী বিন্দুকে ডাকিয়া চা আনিতে বলিলেন। আনন্দ বলিল, "কিছু ভয় নেই, কিছু ভয় নেই। আপাততঃ কিছু জামা কাপড় বিছানা ঠিক করে দিয়ো, বড় 'সুটকেস'টা আর চায়ের সেট্, তারপর যেমন বুঝবো তেমনি ব্যবস্থা করে নেওয়া যাবে।"

### কল্পনা নহে কাজ

আনন্দের দল-গঠন হইল, কাজ-পদ্ধতি ঠিক হইল। যতই সাবধান হোক না খবর ছড়াইতে দেরি হয় না। নগর হইতে কতকগুলি বেকার যুবক আসিয়া জুটিল। আনন্দের লোকের দরকার, বিনা বাক্যে তাহাদের দলভুক্ত করিল তারপর সমস্ত রওনা হইয়া গেল।

হয় তো বাহির হইতে কেহ আসিয়া এই কাজটা করিতে চাহিলে চাষাদের কাছে আমলই পাইত না। কিন্তু আনন্দ তাহাদেরই জমিদার এবং অন্ন-বস্ত্রের সমস্ত দায়িত্ব লইয়া, এক হিসাবে উচিত দামে, জমি কিনিয়া লইতেছে এক বছরের জন্য। অতঃপর তাহের খান-কলাইতে পোকা লাগিবে না, বাবুরা না কি কি সব শিখিয়া আসিয়াছে কল কারখানা দিয়া জমি চাষ করিবে—ঘোল আনা ফসল তুলিবার জন্য, ইহাতে তাহাদের মেহনত বাঁচিয়া যাইবে এবং সেই সময়টা তাহারা লেখা-পড়া শিখিবে, বাবুদের কাছে গল্প শুনিবে দেশ-বিদেশের। বিলাত দেশের চাষীরা তাহাদেরই মত জমির কাজ করে, আবার পঁয়ত্রিশের কাগজ পড়ে। আহা, বাবুর যেমন রূপ তেমনি গুণ, তেমন মিষ্টি স্বভাব! এক বুড়ী একটা শসা দিয়াছে, অমনি বাবু কি না সেটা পকেটে ফেলিল। চাষারা বিদ্রোহ করিল না, বিরক্ত হইল না, সাদরে আনন্দকে গ্রহণ করিল।

তখন দলটা ভাগে ভাগে ভাগ হইল, এক দল যায় ট্র্যাক্টার লইয়া জমি চাষের দিকে, এক দল ঘরে ঘরে চাষাদের বুঝায়, এক দল ঔষধ-পথ্য দেয়, চিকিৎসা করে, আর এক দল যায় সতেজ সুপুষ্ট ফসল উৎপাদনের দিকে।

আনন্দকে প্রায়ই শ্রীনগর আসিতে হয়। একবার সে কালেক্টার ও এস্. পি.র সঙ্গে দেখা করিয়া নিজের সংকল্পের কথা বুঝাইয়া বলিল। তাঁহারা প্রশ্ন করিলেন, "ব্যাপারটা প্রজা-বিদ্রোহ নয় তো?"

আনন্দ হাসিয়া বলিল, "ডিটেকটিভ লাগিয়ে দিন না? তা হলেই জানতে পারবেন। লোকে খেতে পাচ্ছে না বিদ্রোহ করবে কিসের জোরে? অকারণ বিদ্রোহই বা করবে কেন?"

"তা বটে, কিন্তু গ্রাজুয়েট হয়ে কি আপনি শেষে এই কাজ ঠিক করলেন? য়ুরোপ বেড়াতে গেলেন না কেন?"

"বৈরাৎ আমি জমিদার; সুযোগটা আমার আছে, ছাড়বো কেন? য়ুরোপ বেড়ানোর চেয়ে আপাততঃ পল্লীতে ঘোরাই আমার দরকার।"

"আপনি যা করতে চাচ্ছেন, বিলেতটা ঘুরে এলে বিষয়টা আরো ভাল জানতেন।"

"তা জানতাম, কিন্তু যে টাকাটা আমার খরচ হতো সেটা দিয়ে অনেক কাজ আমি করতে পারি।'

"অলরাইট, ঈশ্বর আপনার বাসনা পূর্ণ করুন।"

তবু পুলিস কিছু দিন আনন্দের দলের উপর নজর রাখিল। পুলিসের সঙ্গেও আনন্দের সদ্ভাব, উজ্জ্বল প্রফুল্ল চেহারা, রসপ্রিয় কথার ধরণ, অকপট আলাপ, অযথা বক্তৃতা দেয় না, সভা ডাকিয়া জোরালো ভাষায় জাতিকে জাগাইতে চেষ্টা করে না, নিতান্ত সাদাসিধা পাড়াগাঁয়ের লোকের মত কখনো গাছতলায় কখনো মাঠে, কখনও ঘরে থাকে। পুলিস কি করিবে? তদন্ত করিতে আসিয়া অনেক সময় তরুণ দারোগারা আনন্দের দলে ভিড়িয়া যায়। তাহাদের সকলেরই তো পাড়াগাঁয়ে বাড়ী আছে, কারো ভাল অবস্থা,

কেহ বা গরীব চাষার ছেলে। ধীরে ধীরে তাহাদের মাথায়ও আনন্দের খেয়াল চোকে।

আনন্দ হাসিয়া বলে—"আমরা নিরস্ত্র, হাল লাঙল সম্বল, যুদ্ধ করতে চান যদি, অন্ততঃ কিছু হাতিয়ার যেবেন।"

"দেখে শুনে চাকরী ছেড়ে আপনার দলে ঢুকতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

"অমন কাজটি করবেন না, টাকা চাই, খালি হাতে কোন কাজ হয় না। বরং সাহায্য যা যেবেন আদর করে নেবো, কিন্তু আমাদের দলে ঢুকতে এলে দলই ভেঙ্গে যাবে।"

"আপনার দল মানে, এই রকম দল আমাদের নিজের দেশে করতে চাই।"

"তার জন্যে চাকরী ছাড়বেন কেন? একটা বাঁধা আয় সোজা কথা? আপনার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেক মূর্খ কি বেকার নিশ্চয়ই আছে, তাদের লাগিয়ে দিন, আপনি নজর রাখুন। ট্রাক্‌টারের দরকার কি? কৃষি-বিজ্ঞান, উন্নত ধরণের চাষ আবাদ চাই, সে হাল লাঙলে বেশ চলতে পারে। হাজার হাজার বিঘের পক্ষে ট্রাকটার দরকার হয়, দু' দশ বিঘের জন্যে নয়, সে হয় মশা মারতে কামান দাগা। আমার সখ ছিল কিন্‌লাম, তা-ও বড় কিনিনি, মাঝারি ছুটো কিনেছি। এর পর উত্তরের অনাবাদী মাঠ চাষ করবো।"

"তা হলে তখন আমরাও ট্রাক্টার হয়ে ঐ দিকে যাব আপনার কাজ দেখতে।"

কৈকেয়ী লিখিয়া পাঠাইলেন, "প্রভা ক্ষেপিয়ে খাজনা বন্ধ করাচ্ছিস নে ত?"

আনন্দ জবাব দিল, "নিশ্চিন্ত থাক—পুলীর দুধের বরাদ্দ বাড়াও—খাজনা বেশী রকম আদায়ের চেষ্টায়ই আছি। তোমার পুলী আরও কম্‌কম্ করে যাতে বেড়াতে পারে, সে ইচ্ছে আমার তোমার চেয়ে কম নয় জেনো।"

সুদেষ্ণা চিঠি পড়িয়া সে বেলাটা কৈকেয়ীর কাছে ঘেঁসিল না, কৈকেয়ী আনন্দকে তেমন ভাবে শাসন করেন না এই তার রাগ।

## সর্ব্বেশ্বরী

সুখদার ছেলে ডাক্তারি পাশ করিয়া আসিয়া কৈকেয়ীর এক মহালে ডাক্তার হইয়া গেল। সুখদারা স্বামী স্ত্রী চৌধুরী-বাড়ীতেই থাকে, এবার ছেলেটি মা-বাপকে নিজের কাছে লইয়া যাইতে চাহিল।

সুখদা দারুণ বিপদে পড়িল। এই সুখ ও ভোগবিলাস ছাড়িয়া কোন্ বিশ্রী পাড়াগাঁয়ে গিয়া থাকিবে? এখানে মাসে মাসে থিয়েটার হয়, সে থিয়েটার—সে যে কলিকাতার থিয়েটার দেখিয়াছে তার চেয়ে—খারাপ তো নয়ই, বরং ভালই। তাহা ছাড়া যাত্রা-কীর্ত্তন আরো কত কি যারো মাসই লাগিয়া আছে! সবাই থাকিবে, বিন্দু, পদী, নীচের কিওলো পর্য্যন্ত—আর সে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াও সব ফেলিয়া যাইবে?

ধরিল সে সুদেষ্ণাকে, "বৌ মণি, তুমি মাকে বল, বল যে আমার ছেলেকে যেন বলে দেয় আমাকে ছাড়লে তাঁর কষ্ট হবে; তা হলে আর আমায় নিতে চাইবে না।"

সুদেষ্ণা অবাক্ হইয়া বলিল, "সে কি, তোমার ছেলে নিতে চাইছে, তুমি যাবে না, এ যে অন্যায় কথা।"

"না না, এই রাজপুরী ছেড়ে আমি সে মেটে ঘরে গিয়ে থাকতে পারবো না, সর্দ্দি হয়ে মারা যাব।"

"কি যে বল, আমার বাপের বাড়ী তো মেটে ঘর, সবাই সর্দ্দি হয়ে মারা যাচ্ছে না কি? এক ছেলে—তোমার মায়া নেই? সেই তো তোমার রাজপুরী, এটা তো পরের।"

"এই আমার আপনার, তুমি মাকে বল।"

"তুমিই বল না কেন?"

"আমি বললে শুনবে না, আর কেউ বললেই শুনবে না, তুমি বললে শুনবে।"

"এমন অন্যায় কথা না শোনাই ভাল। তা বেশ আমি বলছি, দিদি রাজী হবেন না দেখো।"

"হবে হবে—তুমি ভাল করে বল, বল যে সুখীর শরীর ভাল নেই, সেই পাড়াগাঁয়ে গেলেই বামো হয়ে পড়বে।"

সুদেষ্ণা একটু ভ্রুকুটী করিয়া বলিল, "মিথ্যে কথা আমি বলতে পারবো না। তুমি তো বেশ ভালই আছ, যদি নেহাৎ না যেতে চাও কেউ তো জোর করে ধরে নিয়ে যাবে না? তার জন্যে মিথ্যে কথা কেন?"

সুখদা অবাক্ হইয়া গেল, সেদিনকার একরত্তি বৌ-ছুঁড়ি আজ্ঞা পক্ক হইয়া উঠিয়াছে তো? কেমন কথা শিখিয়াছে! থাকে তো গান-বাজনা খেলা-ধূলা লইয়া। নাঃ, এর চেয়ে

তানকী দিদিকে বলিলে এক কথায় হইত ; তা সে আবার সংসারের কথা কাণে করে না। বৌদিকে বলিলেও হইত—নাঃ, তার কথা যা শোনেনই না। কাল বুঝিয়া সুধেষ্ণাকে ধরিতে আসিল, ফল হইল উল্টা !

সুধেষ্ণা গিয়া কৈকেয়ীকে বলিল, সুখদা আড়ালে দাঁড়াইল। সুধেষ্ণাই দাঁড়াইতে বলিল। কিন্তু কৈকেয়ী এক কথায় জবাব দিলেন, "না—ছেলে যখন নিয়ে যেতে চেয়েছে সাবে।"

চোখ মুছিতে মুছিতে সুখদা সামনে আসিল ; সুধেষ্ণা হাসিয়া বলিল, "পাড়াগাঁয়ে যেতে সুখী দিদির ভয় হচ্ছে।"

"তাই না কি ? আচ্ছা সহরে হয়েছিস তো ? কোপায় আমোদ আহ্লাদ করে যাবি—ছেলে মানুষ হয়েছে, বিয়ে পা দে, ঘর সংসার করগে। ছেলে শুনলে বলবে কি ? এ বাড়ী তো রইলোই যখন ইচ্ছা বেড়িয়ে যাস।"

সেই দিনই কৈকেয়ী সুখদার যাত্রার যোগাড় করিয়া দিলেন। সুখদা অগত্যা কুন্দমনে স্বামীর সঙ্গে চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে বাধিল এক কাণ্ড। বাসুদেবপুর প্রগনটা বেশ সমৃদ্ধিশালী এবং স্বাস্থ্যকর। সেখানকার নায়েবটি কিছু ধূর্ত। ছল-চুতাচুরি করিয়া মধ্যে মধ্যে দু'চার বার ধরাও পড়িয়াছে, পুরানো লোক বলিয়া দেবনাথ বহাল রাখিয়াছেন এবং মহাল-টার উপর নজর রাখেন।

নায়েব সমস্ত প্রজাদের কাছ হইতে অবস্থা বিশেষে দুই আনা হইতে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা হিসাবে আবার করিয়াছে, আনন্দের নূতন কর্ম-পদ্ধতির জন্য। আনন্দের নাম ও কাজের কথা শুনিয়া প্রজারা নিরাপত্তিতে যে যা পারে টাকা দিয়াছে। সব শুদ্ধ হাজার পাঁচেক টাকা উঠিয়াছে—দেড় হাজার টাকা সদরে পাঠাইয়া নায়েব লিখিয়াছে, "প্রজাদের সাগ্রহ দান তাহাদের মালিকের জন্য।"

দেবনাথ সেটা আনন্দের নামে রাখিয়া একটু সন্ধান লইলেন, জানা গেল বাকী পড়ে তিন হাজার নায়েবের হস্তগত।

কৈকেয়ী বলিলেন, "প্রজায় ছ'মাস বাসুদেবপুর থাক, নইলে মহালটা ঠিক হবে না।"

ও দিকে প্রজারা নায়েবের কীর্তি টের পাইয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, একদিন সার সার করিয়া কাছারী বাড়ীতে যাওয়া করিয়াছিল—নায়েব পলাইয়া বাঁচিয়াছে এবং খুব সাবধানে আছে। সে রিপোর্টও নায়েবের কাছ হইতেই আসিল কিন্তু অন্যরূপে।

কৈকেয়ী বলিলেন, "চল যেতে হবে।"

বর্ষায় নদীতে জোয়ার আসিয়াছে, কৈকেয়ী নৌকায় যাইবেন। সেই দিন আনন্দ আসিল।

কৈকেয়ী বলিলেন, "তুই আমাদের সঙ্গে—না বাড়ীতে থাকবি ক'দিন ?"

"না, আজই যাব—এসেছি গোটা কয়েক তাঁবু নিতে।"

কৈকেয়ী কেশবকে বলিলেন, "দিন রাত ঘরে বসে থাকিস, চল না একটু বেড়িয়ে আসবি।"

কেশব রাজী হইলেন না, কৈকেয়ীর ইচ্ছা ছিল, ছেলে-বৌ দু'জনকে লইয়া যান—কেশব গেলেন না বলিয়া কল্পিতও যাওয়া হইল না।

জলে বজরা ভাসিল। সুধেষ্ণার আনন্দের সীমা নাই। মধ্যে মধ্যে কলিকাতা যায়। একবার একটা নিমন্ত্রণে নারায়ণ-গঞ্জে গিয়াছিল—সবই কৈকেয়ীর সঙ্গে। কৈকেয়ী ছাড়া সে কোথাও যাইতে চায় না।

নৌকায় নদীপথে নিতান্ত অরসিকেরও কাব্যের ছোঁয়াচ লাগে, সুধেষ্ণা তো ছেলেমানুষ ! পাখী যেন মুক্ত আকাশে উড়িতে পাইয়াছে। বর্ষাবারিস্ফীতা কলস্রোতা রঙ্গময়ী নদীটির মতই সে উচ্ছল জীবনরসে পূর্ণ।

জানালায় বসিয়া সুধেষ্ণা তীরের ছবি দেখিতেছে। সতেজ ঘনপল্লব তরুশ্রেণী—গাছে গাছে নানা রঙের ছোট বড় পাখী, দুপুরের শুদ্ধ বিজনতা ভাঙিয়া তাহাদের কূজন-কাকলীতে তীরভূমি মুখর।

"দিদি, পাখীগুলো ঠিক বন্দীশালার মতন, এরা বুঝি পোষ মানে না ?"

"মানবে না কেন ? এরা কথা কইতে পারে না, তাই লোকে পোষে না।"

গৃহ-স্বজনরা জল নিতে আসিয়াছে। তন্ত্র-পল্লী খুব বিরল—বৈরাগী কৈবর্ত জেলে বাগ্দীই বেশী। সুধেষ্ণা বলিল, "ওরা কি কর্ম্মা, দুপুর বেলাই জল নিতে এসেছে ! আমার একটি ছোট্ট কলসী ছিল, বৌদির সঙ্গে জল আন্‌তাম ; এখন লীলা সেটা নিয়েছে !"

গ্রাম ছাড়াইয়া দুই ধারে শস্তের ক্ষেত, সযত্নে মেঠো রাস্তা।

সুলেখা বলিল, "এই মাঠে সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে আমি আসব।"

কৈকেয়ী বলিলেন, "বাসুদেবপুর নিয়ে গিয়ে তোকে ছেড়ে দেবো—মনের সাধে বেড়াস।"

"আমি একা কি বেড়াব না কি?"

"আনন্দকে সঙ্গে দেব।"

সুলেখা কৈকেয়ীর কোলের কাছে উপুড় হইয়া শুইল—"না, সে হবে না—তোমায় যেতে হবে, নইলে আমি কোথাও যাব না।"

"বাবি—বাবি! অমন সঙ্গীটি পেলে আর কিছু চাইবি নে।"

"ইস্", আরো কাছে সরিয়া আসিয়া আবদার-ভরা সুরে সুলেখা বলিল, "আমার দিদিমণিকে ছেড়ে আমি এক-পা কোথাও যাব না।"

কৈকেয়ী তাহার কপালের উপর হইতে চুলগুলি সরাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "আর জড়ানলে, শত পাকে তো বেঁধেছিস, তবু কি সাধ মেটে না?"

আজকাল কৈকেয়ীর অটল গাম্ভীর্য্য মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া যায় এইরূপে। সুলেখা যেন কঠোর শৈলগাত্রে গিরি-ঝরণা।

একটু পরে কৈকেয়ী বলিলেন, "আচ্ছা কে তোকে সব চেয়ে ভালবাসে বল দেখি।"

"তুমি দাদা বৌদি বাবা মা পিসীমা।"

"আর কে?"

"বিন্দু-দি, সুখী পিসি সবাই তো। দেখ দিদি, সুখী-পিসি বড্ড কেমনধারা কাঁদকাঁদ হয়ে গেল—যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে, বলে সেখানে "ইলেক্‌ট্রি" নেই—অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পড়েই মরবো" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

"ও তারি আত্মসুখী। হাঁা, আর কে ভালবাসে বলদিনে?"

"বললাম যে।"

"আনন্দের কথা কই বলিস্ নি।"

সুলেখা এক গোছা চুল কৈকেয়ীর হাতে জড়াইতে ও খুলিতে লাগিল। কথা বলিল না।

"বল না, সে তোকে ভালবাসে না বুঝি?"

সুলেখা বলিয়া ফেলিল, "হাই বাসে।"

"সে কি রে? আমি জানি সে তোকে খুব ভাল বাসে।"

সুলেখা ভ্রূকুটী করিল, "তুমি বলবে বৈ কি, তোমার নিজের নাতিটি কি না?"

"পুর নেমকহারাম, তুই আসবার পর সে আমায় আছে না কি? আমি দেখি তুই তার সঙ্গে মোটেই ভাল ব্যবহার করিসনে, সেই দুঃখেই তো চাষা হয়ে গেল—"

"আমার দোষ? রাত-দিন ঠাট্টা! রাত-দিন ঠাট্টা। আমি বুঝি মানুষ নই, আমায় বলে কলকাতা গিয়ে কিছুদিন থাক, — আপটুডেট ফ্যাশানটা শেখ—কলেজের মেয়েরা কেমন ফিন্‌ফিনে শাড়ী—একগাছা করে চুড়ি,সরু হার পরে—উঁচু হিলের জুতো পায়ে পুট্ পুট্ করে চলে—তেমনটি শিখে এস।"

"ও, ওর কথা ধরিস নি। ও মনে মনে অপছন্দ করে মুখে সেইটের সুখ্যাতি করে—ওর ঐ স্বভাব চিরদিন। কোন মেয়ে তোর কাছে লাগে না রে, ছ' বছরে তুই যে লেখাপড়া শিখেছিস, কুড়ি বছরে কেউ পারবে না। তুই রাগ করিস নি।"

নিজের সুখ্যাতি শুনিয়া সুলেখার চোখে-মুখে খুসীর ভাব দেখা দিল।

কৈকেয়ী তাহার পিঠের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, "আমি তোকে সবচেয়ে ভালবাসি বলি, কিন্তু আমি যদি তোকে সব চেয়ে কষ্ট দি?"

অবিশ্বাসের সুরে সুলেখা বলিল, "কষ্ট দেবে তুমি আমাকে? কি রকম করে?"

কৈকেয়ী মৃদু স্বরে বলিলেন, "আনন্দকে যদি আবার বিয়ে দিই?"

"যাও না—তাতে আমার কষ্ট কি?"

"কেন রে? তোদের ভাব ভঙ্গী আমি তো কিছু বুঝতে পারিনে, মায়া পড়েনি কি তোদের মধ্যে? এ সময়ে লোকে চোখের আড়াল করতে পারে না—তোদের যেন সতীন সম্বন্ধ! নাটক নভেলও পড়িস তো? কি লেখে তাতে?"

"আমার মাথা লেখে" বলিয়া সুলেখা নিশ্চিন্ত ভাবে কৈকেয়ীর পাশের বালিশে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিল।

কৈকেয়ীর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে বলিলেন, "ছেলেমানুষী করিসনে। আমার কথা শোন, একথা কাউকে

বলতে পারিনে তোকে ছাড়া। তোর ছেলে যদি না হয় বাবার বংশ থাকবে না। ভিন্ন-গোত্রে ভিন্ন বংশের পোষ্য-পুত্তুর নিলে বংশের কাজ হয় না, ও শুধু মনকে চোখ ঠারা। আমি যে সে আমই, জাম যে সে জাম। ছুটোর জোড়া লাগে না কখনো। তোমার ছেলে না হলে কেশবকে দিয়ে দিতাম, আমার ছেলে না হলে তোর দাদা শ্বশুরকে দিয়ে দিতাম—বাবার বংশ আমি সাধ্যমত রক্ষা করবো কথা দিয়েছি তাঁকে।"

সুদেষ্ণা চোখ খুলিয়া চাহিল, অকপট বিশ্বাস ভরা চোখ দুটি কৈকেয়ীর দিকে ফিরাইয়া বলিল, "এই কথা? তা তুমি যাও না বিয়ে, কে বারণ করছে।"

"তুই দুঃখ করবিনে? রাগ করবিনে?"

"কেন?"

"সতীন সইতে পারবি?"

"তুমি কি তাকে আমার চেয়ে ভালবাসবে বেশী? তা যদি বাসো তবে সইবো না।"

"আমি? আমার কথা কাউকে বলবার নয়। লোকে ভাবে আমি পাষাণ। আমার মন কেউ জানে না। তুই আমার সব। সবই তোর, চিরদিন সর্ব্বেসর্ব্বা থাকবি, তোর অমতে কেউ একটা কাণাকড়ি পাবে না, সে ব্যবস্থা করবো সবার আগে। ভগবান না করুন, মনে হলেও আমার দম বন্ধ হয়ে আসে—যদি আনন্দের বিয়েই দিতে হয় সুন্দরী না, বংশ ভাল আর গরীব—শুধু ছেলের জন্যে। ছেলে আমার দরকার। তার মা থাকবে পাঁচ জনের মতন—তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ থাকবে না।"

সুদেষ্ণা কৌতূহলী হইয়া বলিল, "সে কি দিদি, সে ছাড়বে কেন? সে-ও তো এই বাড়ীর বৌ হবে।"

"শুধু ছেলের জন্যে, তা ছাড়া কোন দাবী থাকবে না তার—সে লেখাপড়া করে রেজেষ্ট্রী করে নেবো। আনন্দেরও কোন অধিকার থাকবে না কিছুতে, তুই একা মালিক হয়ে থাকবি।"

বলিতে বলিতে একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া কৈকেয়ী চুপ করিলেন, তাঁহার চোখের পাতা নামিয়া আসিল—সমস্ত মুখে একটা ঘোর দুঃখের ছায়া পড়িল।

সুদেষ্ণা চাহিয়া দেখিল, তাঁহার হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিল, "তুমি অত ভাবছো কেন? যাও না বিয়ে। তোমার বাবার বংশ, সে কি আমারও নয়? তোমার যা ইচ্ছে কর, আমার কোন আপত্তি নেই।"

কৈকেয়ী চোখ খুলিয়া অপলক সুদেষ্ণার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "সে আমি জানি—তোকে আমি চিনিনে?"

সুদেষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "তা বিয়েটা দিচ্ছ কবে? এবার বাড়ী ফিরেই না কি? একটা কলেজের মেয়ে আনো না—সব মিটুক।"

"ক্ষেপেছিস? আজই কি? তার পঁচিশ বৎসর অবধি দেখবো তারপর যা হয় হবে। একথা আর কাউকে বলতে পারিনে তোকে ছাড়া। তাই বললাম।"

"বাবাঃ! আচ্ছা মানুষ তুমি। দশ বছর পর কি হবে না হবে তাই নিয়ে আজই ভাবতে বসে গেছ? একেই বলে ভবিষ্যৎদর্শী! নাও হয়েছে, শোন একটা গান শোন, ভাটিয়ালী গান"—বলিতে বলিতে সুদেষ্ণার মুখে এবার সহজ প্রসন্ন হাসি ফুটিল। সে গান ধরিল:

"কোন দেশেতে বাড়ী তোমার, কোন দেশেতে যাও।"

কৈকেয়ী সুদেষ্ণাকে কোলে টানিয়া লইলেন—নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, "নারায়ণ রক্ষা করুন আমায়—তোর মনে কষ্ট দেবো এমন দিন যেন আমার না আসে।"

এক রকম মানুষ আছে—কঠিন তাহাদের আদর্শ—কৈকেয়ী সেই। নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ, সাধ, আশা-ভরসা সব বিসর্জ্জন দিয়া আদর্শ রক্ষা করা চাই, মানুষের কোন মূল্য নাই—মূল্য আদর্শের। অন্যেরা যিনি নিজের সতীন আনিতে পারেন—তিনি অন্যের পারিবেন না কেন? যাহারা এই রকম পরিবারে প্রবেশ করে তাহারাও এই ধরণেই গড়িয়া ওঠে। সত্যই তো, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মহারাণীরা একাধিক সতীন সহ্য করেন কি করিয়া? সে রাত্রে বার বার সুদেষ্ণার ঘুম ভাঙিয়া একটা কথাই শুধু মনে উঠিতে লাগিল, আনন্দের আবার বিয়ে। আনন্দ ভাল নয়—তাকে ভালবাসে না, তবে তার বিয়ের কথায় মনে এমন অস্বাচ্ছন্দ্য আসে কেন? যতই সুদেষ্ণা ভাবিতে যায় সতীনওয়ালী রাণীদের কথা, ততই মনের অশান্তি বাড়ে। শেষে মনে পড়িল সে তো আজ নয়, আট দশ বছর পরে। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। [ ক্রমশঃ

# ডাক-টিকিট

—শ্রীসুবিমলনারায়ণ সাহা

আজকাল গ্রামের চাষা বা নিরক্ষর লোকেরাও ডাক-টিকিট চেনে ও জানে, কিন্তু এমন দিনও ছিল যে পৃথিবীর লোক এটা ধারণাতে আনতে পারে নি সামান্য এক টুকরা ছাপান কাগজ সমস্ত পৃথিবী চালাতে পারে! এর অর্থ এই যে, ডাক-টিকিটের সাহায্য ব্যতীত বিশ্বচরাচরে সংবাদ আদান-প্রদান হয় না এবং তা না হলে পৃথিবীর কাজ-কর্ম চলতে পারে না। এখনও কিন্তু অনেকেই হয় তো এর প্রাচীন ইতিহাস জানে না।

১৫৩৩ সালে প্যারিসে ম সিলায়ে (M. de. Villayer) নামে একজন ছিলেন যাঁর মাথায় সর্বপ্রথম এই সম্বন্ধে এক ফন্দি আসে। তিনি খান আষ্টেক কতগুলি কথা তৈরী করে তাতে একটা বিশেষ চিহ্ন দিয়েছিলেন, এবং সেইগুলিই হল ওঁর পত্রে ব্যবহার করা যায়। এটা অবশ্য তিনি রাজার হুকুম নিয়েই করেছিলেন। চিঠি পত্র এই খামগুলি ডাক-বাক্সে ফেলা হ'ত। কতকগুলি লোক নিযুক্ত ছিল তারা এ গুলি বাক্স থেকে নিয়ে বিলিই লোকের কাছে পৌঁছে দিত এবং খামখানা ফেরৎ দিয়ে আনত পুনরায় ব্যবহারের জন্য। এই হল প্রথম টিকিট প্রচলনের ব্যবস্থা। খামগুলি কতকটা আমাদের বর্তমান এক আনার খামের মত ছিল। এটা কিন্তু সাধারণের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হল না। তারপর আমরা দেখতে পাই সুইডেনের লেফটেন্যান্ট ট্রেকেনবার্গ নামে জনৈক ভদ্রলোক মনস্থ করলেন যে, খামগুলির উপর টিকিট-মাইর একটা কিছু এঁটে দিলে মন্দ হয় না। এটা হল ১৮১০ সালের কথা। অবশ্য তাঁর মতলব তখন গ্রাহ্য করা হয় নি। কিন্তুক্রমে পরে এক ব্যক্তি (১৮৩০-৩১) একটা সিলারের উপরীত হয়েছিলেন, তাঁকে বোলাণ্ড হিল নামে একব্যক্তি ১৮৩০ সালে কার্যে পরিণত করেছিলেন। ১৮৩৯ সালে নিউ সাউথ ওয়েলস-এ স্থানীয় চিঠি-পত্র ব্যবহারের জন্য এক প্রকার কাগজ ছাপা হয়েছিল, যেগুলো ১ শিলিং ৩ পেন্স ওজন করে বিক্রয় হত। গ্রেট ব্রিটেনে ১৮৩০ সালে যে দুই খানা প্রথম নূতন ডাকটিকিট বের করা হয়েছিল সে গুলো এই রকম :—(১) উইলিয়াম মাসগ্রেভ-এ অঙ্কিত একখানা সাধারণ টিকিট-মূল্য খানের কলার ; (২) বর্তমানে চলিত টিকিটের মত এক টুকরা কাগজ, তার মধ্যে একটী ভায়োলের সামনে রাণীর মাথার ছবি ছিল। মাসগ্রেভ-এ অঙ্কিত কলার এবং ঐ অঙ্কিত খামের পেন্স ও দুই পেন্সের টিকিটগুলি ১৮৩০ সালের ৬ই মে তারিখে প্রথম প্রচলিত হয়। অবশ্য কতকগুলি ১লা মে তারিখে বিক্রয় হয়েছিল, কিন্তু সরকার যাহাদের সেগুলি ৬ই তারিখের পূর্বে ব্যবহার করতে দেন নাই। বোলাণ্ড হিল ১৭ই মে তারিখে এই মন্তব্য করলেন যে, খামের কলার লোকে চায় না। কাজেই যেগুলি ছাপা হয়েছিল সেগুলি নষ্ট করে তার বদলে রাণীর মাথার ছবি টিকিট বেশী করে ছাপা হল এবং ১৮৪০ সাল হতে রীতিমত ভাবে তার ব্যবহার আরম্ভ হল। এর থেকে আমরা দেখতে পাই গ্রেট ব্রিটেন-ই ডাক-টিকিট প্রচলনে সর্বপ্রথম। পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা বহুদিন পর থেকে টিকিট প্রচলনের ব্যবস্থা করে।

হেন্রি ই. উইণ্ডস নামে এক জন ইংরাজ আমেরিকাতে ছিল সেন্টস একখানা টিকিট সর্বপ্রথম প্রচলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেটা হয় ১৮৪৪ সালে। জেনিভা, ব্রাজিল, এই সব দেখে ১৮৪০ সালে প্রথম টিকিট প্রচলন আরম্ভ করে দেয়। ব্রাজিলের প্রথম টিকিটখানা "Bull's eye" নামে খ্যাত, কেন না সেটার আকৃতি ছিল কতকটা ডিম্বাকৃতি। আমেরিকার কয়েকজন পোষ্টমাষ্টার ১৮৪৫ সালে খানকয়েক টিকিট বের করেছিলেন। আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট ১৮৪৭ সালে হ'তে ভাল ভাবে ডাক-টিকিট প্রচলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। "কয়েক বছরের পোষ্টমাষ্টারের প্রচলিত টিকিট অবশ্য খুবই ভাল হয়েছিল। যেমন :—আলেক্জান্দ্রিয়া, আনাপোলিস, বাল্টিমোর, বোস্টন, লকপোর্ট, মিসৌরী, নিউ হ্যাভেন, সেণ্ট লুই প্রভৃতি স্থানে।

এরপর ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির চোখে পড়ল এই ডাক-টিকিটের উপায়। এই কাজে সর্বপ্রথম স্থান মরিশাস্কে দেওয়া হতে পারে। সেখানে যে সবের টিকিট বের হয় সেটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার বলা যায়। একটা হোটেলে একটা তামার সাইনবোর্ড ছিল। একজন ঘড়ি-প্রস্তুতকারক সেটা একটুকরা নিয়ে তার উল্টো পিঠে একখানা টিকিটের নক্সা সুন্দর ভাবে এনগ্রেভ করেছিল। এক পেনী মূল্যের টিকিট কয়লানেদুর মত লাল ছিল এবং দুই পেন্সের টিকিট ছিল নীল রঙের। সেটার বাম ধারে লেখা ছিল "পোষ্ট অফিস" এবং টিকিটের গায়ে হাত লেখা ছিল। ছবি ছিল রাণীর। দুঃখের বিষয় বর্তমানে উহার মাত্র ৩০ খানা নমুনা পৃথিবীতে পাওয়া যায়।

আমেরিকার যুক্তরাজ্য সর্বপ্রথম ১৮৫১ সালের ১লা জুলাই তারিখে টিকিট বিক্রয়ার্থ ছাপান। ৫ সেণ্টের টিকিটে প্রেসিডেণ্ট জ্যাকসন-এর ছবি এবং ১০ সেণ্টের টিকিটে ওয়াশিংটন-এর ছবি ছিল। ১৮৬৮ সালে বার্মুডার পোষ্টমাষ্টার আমেরিকার পোষ্টমাষ্টারদের অনুকরণ করে টিকিট প্রচলন করেছিলেন। তারপর পরবর্তী দুই চার বৎসরের মধ্যে অন্যান্য দেশে টিকিট প্রচলিত হয়। ক্রমান্বয়ে নাম দেওয়া গেল : মরোক্কো, লুক্সেমবুর্গ, গ্রীস (১৮৬১), অষ্ট্রিয়া, ব্রিটিশ গায়েনা, হনোলুলু, নিউ সাউথ ওয়েলস, প্রাসিয়া, স্পেন, সুইটজারল্যাণ্ড, ভেক্টোরিয়া (১৮৫০) ইত্যাদি।

পোনা যায় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম সেও পাওয়ার আমলে ডাক সংবাদাদের ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই সময় একজন লোক ছিল যাদের

অল্প কিছু দিলেই তারা যথাস্থানে তাকে পৌঁছে দিত। আগে এর সময়ে তাকে আনাগোনা করবার জন্য পেয়াদা, ঘোড়ার তাকের ব্যবস্থা করেছিলেন। লণ্ডন-এর ব্রিটিশ মিউজিয়ম-এর ক্যাটালোগ-এ আমরা দেখতে পাই যে সিন্ধুপ্রদেশে ১৮৫২ সালের ১লা জুলাই তারিখে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে ডাকটিকিটের প্রচলন হয়। স্যর আর্থার ক্রোয়ে (সিন্ধু প্রদেশের তখনকার কমিশনার) দ্বারা প্রথম ইহা প্রচলিত হয়। প্রথম প্রচলিত টিকিটখানার মূল্য ছিল মাত্র দুই পয়সা। ১৮৪০ সালের এপ্রিল মাস হইতে মহারাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্তি সহ দুই পয়সা হইতে চারি আনা মূল্যের টিকিট প্রচলন করেছিলেন। এগুলি হ'ল কোম্পানীর অধীনে। কিন্তু রাজার অধীনে টিকিট সর্বপ্রথম চলে ১৮৮০ সালের ১ই মে হতে। ইহাই ডাকটিকিট সম্বন্ধে প্রচলিত প্রাচীন ইতিহাস।

অনেকেই আছেন যাঁরা ডাকটিকিট সংগ্রহ করেন। অবশ্য আমাদের দেশে ইহাদের সংখ্যা খুব কম। লণ্ডন প্রভৃতি শহরে ইহার প্রচলন খুব বেশী। বিজ্ঞানিকের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এটা বেশ মজাদার, কেন না ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং আরও অন্যান্য নানা দিক শিক্ষা করা যায় এই টিকিট সংগ্রহের ভিতর দিয়ে। প্রথম একখানা টিকিট পেলেই সংগ্রাহকের মনে হবে সেই টিকিটখানা কোন দেশের, কোন সালের ছাপান, তখনকার রাজা বা প্রেসিডেন্ট কে, অঙ্ক কোন ছবি থাকলে সেটা দিয়ার তাৎপর্য কি, দেশের ভাষা কি, সেখানকার প্রচলিত মুদ্রা কি—ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রশ্নের উত্তর সেই টিকিটখানার পাওয়া যাবে। তা হলেই দেখা যাচ্ছে, বেশ কিছু শিক্ষালাভ হ'ল সেই সামান্য টিকিটখানা থেকে। এইভাবে অনেক কিছু শেখা যায়। অনেক সময় সেই দেশের রাজা বা প্রেসিডেন্টের ছবি বা দেশের প্রসিদ্ধ জিনিষগুলি ছাপা থাকে। সেগুলিকে ভালভাবে করবার এটা একটা ভাল পন্থা। যেমন জাপানের টিকিটে ফুজিয়ামা; ভারতবর্ষের টিকিটে তাজমহল, পারদোচা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল; আমেরিকার লেডেন্স স্ট্যাচু, স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি; অষ্ট্রেলিয়ার কিঙ্গারু বা বুনো ইত্যাদি নানান রকম প্রসিদ্ধ জিনিষের ছবি নানান দেশের টিকিটে থাকে। অনেক সময় আবার সেই দেশের জীব-জন্তুর ছবি থাকে। সেগুলি থেকে সে দেশের জীব-জন্তুদের নাম জানা যায়। যেমন :—মালয়ের টিকিটে বাঘের ছবি, অষ্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারুর ছবি, ইংলণ্ডের সিংহের ছবি। যদি কেউ কেবলমাত্র পাখীর ছবি দিয়ে টিকিটের আলবাম তৈরি করতে পারেন তাহলে তাঁর সংগ্রহ সার্থক হবে। অবশ্য সেটা কষ্টকর ও ব্যয়সাপেক্ষ। এর থেকেও নানান দেশের প্রসিদ্ধ পাখীগুলির নাম জানা যায় যেমন :—আবিসিনিয়ার—উটপাখী, জাপানের—'রয়াগটেল,' অষ্ট্রেলিয়ার—কোকাবুরা, দামো বাড়গালা, ইমল, Lyre-bird, সোমালিল্যাণ্ডের—কোয়েটরাল, বর্ণিওনিয়ার—'ওরাংহার্ড', সাইবেরিয়ার—বর্ণবিল, কার্পাসিয়া—ইবল, নিউজিলাণ্ডের—কিউইয়া পাখী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জাপান যুদ্ধের পর যে করেছিল একখানা টিকিট যাতে ছিল একটা যুদ্ধরত যুদ্ধের পাখা। এর থেকে বোঝা যায় যে ঐ জাতি শান্তির চিহ্নস্বরূপ জাপান যে করেছিল। কলম্বাসের নাম স্মরণার্থে U. S. A. একটা টিকিট বের করেছিল যাতে কলম্বাসের ছবি ছিল ও লেখা ছিল "Landing of Columbus।" টমাস এডিসন-কে সম্মান দেখাবার জন্য আমেরিকা বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ছবি দিয়ে একখানি টিকিট বের করেছিল। এইপ্রকার যে ইতিহাস আমরা টিকিট থেকে জানতে পাই। কাজেই আমরা দেখতে পাই যে, টিকিট সংগ্রহ হ'তে আমরা কেবলমাত্র ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক বিষয়ই শিক্ষালাভ করি, তা নয়, অন্যান্য অনেক কিছুও আমরা শিখতে পারি।

টিকিট যেমন বিজ্ঞানিকের সহায়তা করে তেমনই আবার ইহার মত কাজ করে। একজন টিকিট সংগ্রহ করে ফেলে তার সৌভাগ্য-সৌহিত্যের হচ্ছেও তা থেকে বহু অর্থ লাভ করতে পারে। কাজেই আপনাদের মধ্যে কেউ যদি বাবামহাশয়ের পুরাণ বস্তা খুঁজতে খুঁজতে বাসী টিকিট পেয়ে ফেলেন তবেই রাতারাতি বড়লোক! এটা অবশ্য ভাগ্য। যে কোনও টিকিটেরই অবশ্য দাম পাওয়া যায় না। টিকিটের বিশিষ্টতা, ছাপাবার কম সংখ্যা, ইত্যাদি হিসাবে তার দাম নির্দ্ধারিত হয়। একখানা মরিশাসের টিকিট-এর দাম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনাদের কারও থাকলে সযত্নে রেখে দেবেন, কেন না পরে আরও বেশী দাম হবে। টিকিট-খানা এই রকম :—মাঝে রাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি, উপরে Postage লেখা, তলায় One Penny এবং দুধারেতে 'Post Office লেখা আছে। এটার দাম বোধ হয় কিছু তার হাজার পাউণ্ড হ'তে পারে। বৎসর চার পূর্বে লণ্ডন শহরের জনৈক ভদ্রলোক ব্রিটিশ গায়েনার একটি টিকিট ৭০০ পাউণ্ড দিয়ে কিনেছিলেন। আপনারা কেউ কিনতে ইচ্ছুক হ'লে ৯,০০০ হাজার পাউণ্ড বা ১,৩৫,০০০ টাকা নিয়ে তাকে বলবে হবে তিনি সেটা বিক্রয় করতে পারেন।

অনেকেই বোধ হয় জানেন বম্বা-দিল্লী শহরের সাম্রাজ্য উদ্বোধন-উৎসবের সময় একসেট লঘাকৃতি টিকিট বের হয়েছিল। একসেটের দাম এখন প্রায় ২০ টাকা, কমপক্ষে হলেও পঞ্চাশ ১০০ টাকা হবে বলে আশা করা যায়। মহামতি পঞ্চম জর্জের রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে সমগ্র ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে ৫০০ খানা টিকিট বের হয়েছিল। ১৯০০ সালে সেই সেটের মোট দাম ছিল ৪ পাউণ্ড দশ শিলিং। কিন্তু তার বর্তমান দাম হচ্ছে প্রায় ১০ পাউণ্ড। হয়তো আর দশ বৎসর পর ৩০।৪০ পাউণ্ড দাম হ'তেও পারে। এটা যে ইন্সিওরেন্সের মত কাজ করে সেটা প্রত্যক্ষ দেখা যায় কিলিপ লা মেসিউর, ডি'ভেরারি'র মৃত্যুর পর। এর নাম বোধ হয় টিকিট জগতের সকলেই জানেন। ১৯১৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর ফরাসী গভর্নমেণ্ট তাঁর টিকিট-সংগ্রহ দখল করেন এবং সেগুলি ১৯২২ সাল হতে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত নিলামে বিক্রয় করতে থাকেন। ৩৯ দিনে ১৪ বারে সেগুলি

[ ভাদ্র—১৩৪৯

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

[ পঞ্চম বর্ষ

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

[ ভাদ্র—১৩৪৯

বিক্রয় হলে বিক্রয়লব্ধ অর্থের সংখ্যা হয়েছিল কত জানেন? ৪,০২,১১৪ পাউণ্ড বা ৩০,১১,৪৭০ টাকা। যদি তাঁর কোনও ওয়ারীশ থাকত তাহলে তারা অন্তত লাখখানেক হতো তাতে কোনই সন্দেহ নাই। তাঁর সংগ্রহে এক দুআপ্য এবং দামী টিকিট ছিল। সেগুলির বাম এবং কত দামে বিক্রয় হয়েছিল তারা নিম্নে দেওয়া হল: ব্রিটিশ গায়েনার ১৮৫৬ সালের ১ সেন্টের ১০,১১১ টাকায়, মরিশাসের ১৮৫৭ সালের ২ সেলের ও ১ পেনীর টিকিট যথাক্রমে ৭৪, ৭০ টাকায় ও ৩১,৩১০ টাকায়, মোল বাহামের এর ১৮৫৯ সালের ৪ সেন্টের—৩৯,৪৭৫ টাকায়, লকপোর্টের ১৮৫৩ সালের ৫ সেন্টের টিকিট—২৮,১২৫ টাকায়। এইরূপ আরও অনেক টিকিট ছিল। সম্প্রতি হেয় হিটনার-এর পলাশৎ জন্মদিন উপলক্ষে কয়েকখানা টিকিট বের হয়েছে। তার সংখ্যা খুব বেশী নয়। এখন সংগ্রহ করে রাখলে হয় ত' পরে দাম বেশী হবার আশা করা যায়। সেদের যুদ্ধ-কুশল সময় জেনারেল ফ্রাঙ্কো প্রায় ৫০ খানা টিকিট বের করেছিলেন।

আঁর এডওয়ার্ড-এর রাজত্বকাল খুব বেশী নয় এবং তাঁর সময় খুব বেশী টিকিটও ছাপা হয় নাই। কাজেই সেগুলি দামী হবার আশা আছে। কানাডা টিকিট-সংগ্রাহকদের এবার হরার এপ্রিলফুল করেছে। মন্ট্রিল পোষ্টঅফিস হ'তে ১০ সেন্টের অন্ত কয়েকখানা টিকিট পয়লা এপ্রিল তারিখে বের হয়েছিল। সেগুলি বিক্রয় হ'বার পর অন্য লোক চাইলে তাদের বলা হয়েছিল পরদিন পাওয়া যাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে টিকিট আর পাওয়া যায় নাই বা যাবেও না। ভবিষ্যতে যে এগুলির দাম বাড়বে তা এখনই বুঝা যাচ্ছে কেন না এখনই তাদের প্রত্যেকখানার দাম প্রায় দুই টাকা করে হয়েছে। সম্প্রতি ভারতবর্ষে ষষ্ঠ জর্জ-এর ছবি দিয়ে কয়েকখানা টিকিট বেরিয়েছে। সেগুলি দেখতে বেশ ভালই। তাতে ডাক টিকা, ডাক রানার, ডাকবাহী উট; ডাকবাহী নৌকা, ট্রেন ও টিমার, ইত্যাদি ছবি আছে। পঞ্চম জর্জের রজত-জয়ন্তীর সময়ও অনেক খানা ভাল টিকিট বেরিয়েছিল। ১৯১৭ সালে ইটালি রোম ও টিউনিস বিমান ডাকের ব্যবস্থা হোবার পর একখানা বিমান-ডাকের টিকিট বের করেছিল। আজকাল অষ্ট্রিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, জার্মানি, আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, রুমানিয়া ইত্যাদি বহু দেশে এরোপ্লেনের ছবি দিয়ে এয়ার মেল-এ টিকিট বের হয়েছে। যে সমস্ত টিকিট খামের বা পোষ্ট কার্ডের উপর বাস্তবিকই বিমান ডাকে পাঠাবার জন্য ব্যবহৃত হয় সেগুলির মূল্যই বেশী হয় কেন না সেগুলিতে ঐতিহাসিক বিমানে ভ্রমণের বৃত্তান্ত সংক্রান্ত থাকে, যেমন:—হকার-এর এপ্রিল মাসের ১৯১৩ সালের ভ্রমণ, ভ্যান ডে. আলবক-এর জুন মাসের ১৯১৯ সালের ভ্রমণ, ব্রাজুইস বা সিনেসের ১৯১৭ সালের ভ্রমণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পুরাকালের সংগ্রহের মধ্যে মৃত ই. কে. ট্যাপলিং-এর বিস্তৃত সংগ্রহ যাহাতে অন্যান্যগুলি প্রায়ই সমস্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে। ট্যাপলিং-এর সংগ্রহ ব্রিটিশ মিউজিয়মে দেওয়া হয়েছে। তাঁর সংগ্রহে ১৮৯০ পর্যন্ত সম্পূর্ণ আছে। স্মারটের লাইব্রেরী-তে নিম্নলিখিত দুআপ্য টিকিটগুলি আছে। এগুলি বিশেষ যত্নে রক্ষিত রাখা হয়। রৌদ্র এবং বৃষ্টি থেকে এইগুলি রক্ষা করার জন্য বিশেষ কাঁচের আলমারিতে ঐগুলি রাখা হয়েছে। হাওয়াই দ্বীপের-এর সম্পূর্ণ সেট্ [১২ খানা]; ১৮৫১ সালের ১৮৫৮ সালের সোনালী রঙের ব্রিটিশ গায়েনার ৪ সেন্টের একখানা, ৪ সেন্টের গাঢ় নীল রঙের একখানা; মরিশাসের ১৮৫৭ সালের একখানা অব্যবহৃত ১২ পেন্সের কালো রঙ-এর একখানা; উত্তমাশা অন্তরীপের ১ এবং দুই পেন্সের; সিংহলের সোনালী ৪ পেন্সের, ভারতবর্ষের ৪ আনা মাপের [ উল্টো করে ছাপান ]; পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার ৪ পেন্সের [ ঘোড়ার ছবি উল্টো করে ছাপান ]; আমেরিকার অলবানি-তে পোষ্ট-মাষ্টারের ছাপান একখানা টিকিট; সেন্ট লুইসের, ইত্যাদি নানান প্রকারের যে টিকিট স্মারটের লাইব্রেরীতে আছে সে গুলি অনেক দুআপ্য। ফিলাডেলফি শহরের মিঃ বি. কে. ফিলার ১৮২৪ সাল পর্যন্ত আমেরিকার সমস্ত টিকিট সংগ্রহ করে মিট ইয়র্ক-এর নাথান পার্টরাইজকে দিয়েছেন। তিনি একজন আমেরিকান। ডাবলিনের বিজ্ঞান মিউজিয়ম-এ, মাকেষ্টারের হাইলাট ইনষ্টিটুট-এ, সিডনীর মিচেল লাইব্রেরীতে কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, ইত্যাদি বহু স্থানে অনেক দুআপ্য এবং সুদৃশ্য টিকিট সংগ্রহ করা আছে।

স্বর্গীয় রাজা পঞ্চম জর্জ Royal Philatelic Society of London এর সভাপতি এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি যখন রাজত্বের কাজ শিক্ষানবীশ সেই সময় তিনি টিকিট সংগ্রহ করতেন। ব্রিটিশ উপনিবেশ সমূহের প্রায় সমস্তই টিকিট সংগ্রহ করেছিলেন এমন কি মরিশাসের ৪ খানা পোষ্ট অফিস ষ্টাম্প ও একখানা ১ পেন্সের (ব্যবহৃত) আর খানা ২ পেন্সের (অব্যবহৃত), ব্রিটিশ গায়েনার ১৮৫০ সালের ২ সেন্টের এবং ১৮৫৩ সালের ১ সেন্টের টিকিট ব্যতীত সমস্তই তাঁর সংগ্রহে ছিল। তাঁর কাছে কতগুলি টিকিট ছিল সেগুলি ভুল করে ছাপা হয়ে ছিল বলে ব্যবহার করাই হয় নি, যেমন "2d Tyrian Plum King Ed" ইত্যাদি। সম্রাট পঞ্চম জর্জ সম্বন্ধে একদিন রাজ্যের কোনও কাজ না করে তাঁর আলবাম-এর কাজ করেছেন।

আজকাল মিট ইয়র্কের আর্থার মিট-এর সংগ্রহই সব থেকে বেশী দামী। তিনি বিখ্যাত 'কেরাবী রেজ' হ'তে বহু ভাল টিকিট কিনেছেন। তাঁর মিকট এমন কতকগুলি টিকিট আছে সেগুলি পৃথিবীতে কেবল মাত্র এক খানা করেই আছে, তাদের মধ্যে ব্রিটিশ গায়েনার এক সেন্টের, মোসকিটোর এবং লকপোর্টের পোষ্টমাষ্টারের টিকিট এবং মরিশাসের অব্যবহৃত দুইখানা টিকিট উল্লেখযোগ্য। তিনি এক পেনী ও দুই পেন্স মূল্য একখানা খাম এর জন্য ৮৬,০০০ টাকা দিয়েছিলেন। সম্প্রতি ব্রাজিল কয়েকখানা এয়ার মেলের টিকিট বের করেছে, যাতে নানান প্রকারের এরোপ্লেনের ছবি দিয়েছে। তাতে তারা তাদের বিমান বহরের কতকটা পরিচয় দিতে চায়। এইরূপ ধরণের এয়ার মেলের টিকিট এ পর্যন্ত কোনও দেশ বের করে নাই। লণ্ডনের খ্যাত "International Stamp Bourse"এ সম্প্রতি বোম্বাই এর ই. এস. দুপার নামক জনৈক লোক প্রায় এককোটী ভারত বর্ষীয় টিকিট বিক্রয় করেছেন। এর আগে এত টিকিট কেউ বিক্রয় করতে পারেন নাই। ইহা ১৯১৭ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই Bourse-এ যোগাযোগ ব্যতীত কেহ ক্রয় করিতে পারে না। যে এক কোটী টিকিট মোকাবেলায় দুপার-এর নিকট হতে কিনেছে, তার প্রায় অর্দ্ধেক সংগ্রাহকরা এর আগেই কিনে নিয়েছে। এখানে ব্রিটিশ গায়েনার একখানা টিকিট ৬০০ পাউণ্ড বা ৯,০০০ টাকায় বিক্রী হয়েছে। গত বৎসর একজন সিংহলী লোক লণ্ডনের টিকিট বিক্রয়ে প্রায় ৬০,০০০ টাকা পয়দা করেছিলেন। তিনি এখন পৃথিবীর মধ্যে সিংহলের টিকিট সংগ্রহে সর্বপ্রথম।

# জ্যোতিঃহারা

শ্রীঅনুরূপা দেবী

## প্রথম অঙ্ক

### ৬ষ্ঠ দৃশ্য

[যামিনীর অফিস ঘর, যামিনী ও রমেন্দ্র।]

রমেন্দ্র। মিহির তো নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলো, এদিকে আমরা তো মহা বিপদে পড়েছি ভাই, কি করে যে ওকে ঠাণ্ডা করি, দু জনে যেন ভেবেই পাচ্ছিনে!

যামিনী। আঘাতটা বড্ডই গুরুতর হয়েছে কি না। সময় লাগবে।

রমেন্দ্র। কোন একটা অবলম্বন তো ওকে দিয়ে গেলেন না, দিলেন শুধু লাখ দুয়েক টাকা! নিজেও ত এই শেষ পর্য্যন্ত পুরো নাস্তিক থেকেই চলে গেলেন, বেখলে ত শ্রাদ্ধ-শান্তি বা কোন রকম ধার্ম্মিক অনুষ্ঠান করতে নিষেধ করে গেলেন। ওর জীবনটাকে এমন কঠিন্ করে যাবার জন্যে আমার মামাশ্বশুরই এক মাত্র দায়ী।

যামিনী। যাক্ মৃতের বিরুদ্ধে আমাদের সমালোচনা করার অধিকার নেই। তাঁদের আত্মা স্বর্গীয় বলে প্রতিপন্ন করে থাকি। তোমরা এসে পড়েছ, এখন ক্রমশঃ একটু শান্ত হতে পার্ব্বেন।

রমেন্দ্র। তুমি আর তোমার স্ত্রী যতো যত্নে যেও ভাই। আজ মিসেস রায় গেলেন, তাই দেখেই আমি একটু বেরিয়ে পড়লাম। আচ্ছা এখন আমি তা হলে উঠি।

(প্রস্থান)

যামিনী। মিসেস রায়! উঃ কি যাতনাদায়ক করেই পাঠিয়েছি! ওরা পাঠাতে বলে, ও যেতে চায় না, কি যে মুস্কিল হয়েছে আমার।

(ইন্দ্রনাথ, অমলা ও জ্যোৎস্নার প্রবেশ)

যামিনী। (উঠিয়া সসম্ভ্রমে) আসুন, আসুন কাকাবাবু! এই যে দিদি এসেছেন। বসুন এই খানে (সকলকে চেয়ার দেখাইয়া দিয়া নমস্কার করিয়া জ্যোৎস্নার দিকে চাহিল)।

অমলা। (প্রতিনমস্কারান্তে আসন গ্রহণান্তর) চিন্তে পারছো না প্রকাশ! ও আমার ছোট বোন জ্যোৎস্না। জ্যোতি, প্রকাশদা'কে প্রণাম করলি নে'?

(জ্যোৎস্না লজ্জানম্র নেত্রে কোনমতে নত দেহে পায়ের কাছে প্রণাম করিয়াই দিদির পিছনে মুখ ফিরাইয়া আড়ষ্টা হইয়া রহিল)

যামিনী। (সহাস্যে) সেই ছোট্ট জ্যোৎস্না এত বড় হয়েছে! এ বারে কোন্ ইয়ার হলো?

(জ্যোৎস্না কথা কহিল না দেখিয়া অমলা তাহাকে ঠেলিয়া দিল, তারপর নিজেই তাহার হইয়া বলিল)

অমলা। এই বারে থার্ড ইয়ার হয়ে গালো। হলে কি হবে, এমন লাজুক আর মুখচোরা হচ্ছে দিনকের দিন, সাতটা চড় মারলেও মুখে একটা রা' বার হবে না।

(সুলক্ষণার প্রবেশ)

এসো ভাই! কোথাও বেরিয়েছিলে বুঝি?

সুলক্ষণা। (চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া) বলেন কেন! ওই ওঁর জন্যে! কদিন ধরে অতিষ্ঠ করে তুলে, ঠেলেঠুলে, পাঠিয়ে দিলেন। তা আমি কি সেখানে টেঁকতে পারি! বাব্বাঃ! লোকও হ'তে দেখেছি ঢের ঢের লোকের, কিন্তু নিজেকে অত আর কেউ তা ব'লে 'সো' করে না। বসেছেন তো এক ইঞ্চি চেয়ারে,—উদাসিনী রাজকন্যার মতন উর্দ্ধ চোখে চেয়ে, রুক্ষ চুলের গোছা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে,—পাশে বসে এক সুন্দরী দাসী, রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছেন, থেকে, থেকে। মুখে কারুরই কোন কথাটী নেই। খানিকক্ষণ বসে থেকেই আমার ত মাথা ধরে গেল। সেখান থেকে পালিয়ে আসতে যেন পথ খুঁজে পাইনে।

অমলা। কা'র কথা বলছো বউ? মিস গুপ্তা কি?

সুলক্ষণা। তাছাড়া আবার কে অত চং জানে? আর্ট গ্যালারীতে 'বিষাদিনী' নাম দিয়ে ছবি তুলিয়ে রাখবার মতন 'পোজটা হয়েছিল বটে, তা' দুর্ভাগা' লোকেরাই কপালক্রমে অমন মৃতটা দেখতে পেলে না! (স্বামীর প্রতি বক্র কটাক্ষপাত করিল।)

যামিনী। কাকা বাবু এসেছেন, দেখতে পাওনি বোধ হয় ?

সুলক্ষণা। পাবো না কেন ? কাণা তো আর হই নি। এসেছেন, বেশ করেছেন, কি হয়েছে তায় ?

ইন্দ্রনাথ। ভাল আছেন বৌমা ? নলিনী কোথায় ?

সুলক্ষণা। জানি নে তো, কোথায় আছে ওদিকে। ওটী কে ? জ্যোৎস্না না ? ভাল কথা, একটা গান গাও না ভাই ? ওখানে গিয়ে মাথাটা ধরে গ্যাছে, গান শুনলে যদি একটু ছাড়ে। গাও, গাও, বাজনা তো ওই সামনে রয়েইছে। না ও নেরি করো না সত্যি, গাও। জ্যোৎস্না ( দিদির পিঠে মুখ লুকাইয়া মৃদু কণ্ঠে ) গান আমি ভাল পারি নে।

সুলক্ষণা। আহা আমি যেন আর তোমার গান কখন শুনি নি। তা' ছাড়া' আমার পিস্‌শাশুড়ীর তো তোমার গানের কথা বলতে গিয়ে মুখে নাল ঝরে ! ( যামিনীকে লক্ষ্য করিয়া ) ইনিও তো এক সময়ে তোমার বউ ছিলেন, না ? ভাল। ভাল। আর কতগুলি আছে এ রকম শুনি !

যামিনী। (অপ্রতিভভাবে ইন্দ্রনাথকে) আপনাদের সভার অধিবেশনটা কবে হচ্ছে ?

ইন্দ্র। সেই কথাই তো বলতে এসেছি। এক মাসের মধ্যেই একটা দিন স্থির করতে হবে। এবার একটু ভাল করে ওটা করাতে চাই। মেয়েদের ইস্কুলটি আর তো চলে না। মিস দত্তকে ধরে যদি কিছু করাতে পারা যায়, তাই ভাবছি,—মেয়েদের একদিন এখানে পাঠাবো কি ? তুমি কি বল ?

যামিনী। তা' পাঠান না। রমেনের স্ত্রীও সেদিন বলছিল, মিস দত্তর অঙ্গে একটা কোন অবলম্বন না দিতে পারলে, তাঁকে শান্ত করা যাচ্ছে না। ভাল রকম করে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করার সাধ তাঁর অনেক দিন ধরেই আছে।

সুলক্ষণা। কই গান গাইলে না ? ওমা, ও কি ! ছেলে-মানুষ অমন একগুঁয়ে কেন ?

অমলা। গাও না জ্যোতি ! যা পার একটা গাও !

( জ্যোৎস্না সলজ্জভাবে হার্মোনিয়মের কাছে গেল ও আরম্ভ করিল )।

সুলক্ষণা। দেখো ভাই ! একটা বিকট গম্ভীর ধাঁচের ব্রহ্ম-সঙ্গীত যেন গাইতে বসে যেও না। রক্ষা কোরো।

অমলা। বউ আমাদের পরনের সাড়ীটী থেকে শ্রবণের সঙ্গীতটীতে শুদ্ধ খাঁটী লঘুত্বের পক্ষপাতী। কোথাও কোন গাম্ভীর্য্যের বালাই সইতে পারেন না !

সুলক্ষণা। না ভাই ! যা পারিনে,তা' পারিনে। (জ্যোৎস্নাকে) তুমি একটি নরম সরম দেখে গান গাও, ও সব বড় বড় ভাবে আমার বুকে যেন জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দেয়। পাপী মানুষ হাঁফিয়ে উঠি।

জ্যোৎস্না—

গীত

চিত্ত চঞ্চল রে, কে জানে, কেন, কেন কে জানে।
কেন কাঁদে প্রাণ, কে জানে কেন, কি জানে ?
সুলক্ষণা বোধ হয় গান ভাল লাগে কই :
নয়ন সজল কেন অকারণে—
কেহই যে করে খাঁটি খুঁজে পাই নে'।

সুলক্ষণা। মাগো ! গাইলেই যদি, তবে অমন কাঁদুনে গান গাওয়া কেন বল তো ? তোমাদের এদেশটাই দেখছি বাপু যেন কান্না ভরা প্যান্‌পেনে, প্যান্‌সে ! কলকাতার মেয়েরা কিন্তু রবিবাবুর ভাল ভাল গান গায় ; আজ আমার কপালে কান্না শোনারই পালা ছিল। আচ্ছা আমি এখন তা' হলে ভেতরে যাচ্ছি, মাথাটা বড্ড ধরে আছে, একটু শুয়ে পড়িগে'।

( প্রস্থান )

যামিনী ( অপ্রতিভভাবে ) কাকাবাবু একটু চা' খেয়ে যাবেন, আমি পিসিমাকে বলে আসি, একটু বসুন ( উঠিয়া দাঁড়াইল )।

ইন্দ্র। না, না, থাক, থাক,—তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আর একদিন তখন হবে, আজ আর নয় ; আজ আমরাও উঠি। এস অমলা ! জ্যোৎস্না ! চল আজ বাড়ী ফেরা যাক্। উপাসনার সময়ও হয়ে এলো।

( সকলের প্রস্থান )

যামিনী। ইচ্ছে করে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাই—

( প্রস্থান )

## দ্বিতীয় অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

( গঙ্গাতীরে সুসজ্জিত বাগান-বাড়ীর বারান্দা। বরেন্দ্র ও ভূষণ )

ভূষণ। বাপের কেনা বাগান-বাড়ী আছে, থাক্ না, আছে বলেই যে এইখেনেই এসে পেকড় গাড়তে হবে, তার কোন মানে হয় না! কলকাতার পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীর ভাড়াটেকে ছুটিশ দেওয়া হয়েছে, বাড়ী খালি হলেই সেখানে গিয়ে ইস্তাশন বিছিয়ে দেবো, এই দেখুন তো! রঙ্গনকে এখানে হপ্তায় হপ্তায় আনতে এক মাসেই হাজার টাকা পড়ে গেল, তা'ছাড়া তার মোটর খরচা, তার বক্শিষ সে সবও আলাদা আছে। তাতেও তো প্রায় দু'এক শো লাগছে।

বরেন্দ্র। সবই তো বুঝতে পারছি ভূষণ! কিন্তু এখানে থাকার আর বোধ করি হলো না। মাষ্টার মশাই বড্ডই রেগে গ্যাছেন। কাল রাত্রে অনেক কথাই বললেন, তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। বাস্তবিক ভাল আমায় তিনি খুবই বাসেন। আজীবন যত্ন যা' পেয়েছি তা' তাঁরই কাছে। তাই মনে হয়, তাঁর মনে এতটা কষ্ট দেওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত হচ্ছে না।

ভূষণ। ( মুখ ভার করিয়া ) তা তো বটেই! ভাল যা বেসেছেন তা' তিনিই! আমরা গরীব, আমরা মুখ্যু, আমরা তো আর ভালবাসতে জানি নি,—কখনও আপনাকে ভালও বাসি নি। আপনার সুখের জন্যে প্রাণ উজ্জুগ্যও করতে যেন পারি নে'। তা বেশ! তাই করুন গে', যান ওঁনারই ন্যাজ ধরে, ঘরের ছেলেটি ঘরেই ফিরে যান। পোষা মেনি-বেড়ালটী হয়ে ওঁনার পাছে পাছে ঘুরে বেড়ান গিয়ে। আমাদেরই বা ওদ্দর লোকের ছেলের অন্নে হস্তারক হ'বার দরকারটা কি? চাকরীটা ওনার বজায়ই থাক। মিথ্যে শাপ মন্যি কুড়ুতে চাই নি।

বরেন্দ্র। দেখ ভূষণ! তা' বড় মিথ্যে তুমি বলনি, না? চাকরীর খাতিরেই বোধ করি এতটা কাতর হয়েছেন না? আমার জন্যে নয়, না? তাই হবে, না? ঠিক বলেছ, আমি ওঁর হাত-ছাড়া হলে দুটী পো করে টাকা মাস মাস গুনবে কে? তাই না?—থাক তা'হলে ও মায়া টায়া ও সব কিছুই নয়, না? তা ওঁকে কি বলবো বলতো? সোজা জবাবই কি দিয়ে দোব? কিন্তু—

ভূষণ। হাঁ।—হ্যাঁ, তা'ছাড়া আবার কি? কবে দুটো 'সি, এ, টি, ক্যাট্' আর 'বি, এ, টি, ব্যাট্' শিখিয়ে কি কাঁচা মাথাটা কিনে নিয়েছে না কি? এই এমনি করে মুখের সামনে মুখ তুলে, তুড়ি মেরে বলে যেবেন, 'তোম্কো আউর হাম নেহি মাংতা হ্যায়।' বলবেন, মানুষ হয়ে জন্মেছি, কুকুর বেড়াল ভেড়া হয়ে জন্মাইনি। পাখী নই যে আপনার গাঁড়ে বসিয়ে ছোলা খাওয়াবেন,—আর 'হয়ে তেই হয়ে যায়, পড়ো বাবা আত্মারাম' বলে বুলি পড়াবেন। ভগবান মানুষকে যে সকল জীবের বাড়া করে তৈরি করেছেন, নিজের ইচ্ছে সুখে চলবার জন্যে। অন্যের কাছে তা'ও আবার না বাপ ভাই, না জ্ঞাতি কুটুম্ব, নিছক পয়ের কাছে, টিকি বাঁধা রাখবার জন্যে নয়। বুঝলেন, স্বাধীন হয়েছেন, স্বাধীনতা রক্ষা করুন, নৈলে যদি 'যে তিমিরে সে তিমিরেই' থাকবেন, তবে আর কোট অব ওয়ার্ডের হাত ছাড়িয়ে হলো কি?

বরেন্দ্র। তা সত্যি! আচ্ছা তাই আমি বলবো; নাঃ কিসের এত খাতির? আপনার জন কেউই না, রক্তের টান নেই, কিছুই না, ও শুধু টাকার টান, না? কি বল ভূষণ?'

ভূষণ। আমি তো সেই কথাই বলছি, নিছক টাকার টান, সেই যে কথায় বলে না, যে,

"মাছ মরেছে বেড়াল কাঁদে শাস্ত করলে যকে,
"বেংয়ের শোকে সাঁতার পানি হেরি সাপের চোখে।"
এও তাই!

বরেন্দ্র। আচ্ছা তাহলে বেশ করে গুকথা শুনিয়ে দিয়ে—

( গার্জেন টিউটরের প্রবেশ )

মাষ্টার। তাহলে আমরা আজ রাত্তিরে চাকা মেলেই রওনা হই না কেন? কি বল বরেন? আর দেরী করে কি হবে?

বরেন্দ্র। তা' দেখুন, তা' তা' আ-আমার তো আ-আজকে যাওয়া কোন মতেই হ'তে পারে না, আ-আমি মনে করছি, দু'এক হপ্তা পরেই যাবো।

মাষ্টার। তা' হয় না বরেন! বাড়ীতে আমার ছোট ছেলেটার অসুখ দেখে এসেছি। শুধু তুমি এক হপ্তা বলে এসে

আড়াই হপ্তা করলে দেখে আমি ছুটে এসেছি, না হলে সে-ছেলে কেলে কেউ বাড়ীর বার হয় না।

কৃষ্ণা। বেশ তো, আপনি তা হলে আজই ফিরে যান্ না, ওঁনার তো আর ছেলের অসুখ নয়, উনি দুদিন পরেই যাবেন।

মাষ্টার। (সরোষে) তুমি চুপ করে থাক, তোমায় কেউ মধ্যস্থতা করতে ডাকে নি। শোন বরেন্দ্র! এদের হাতে তোমায় ছেড়ে যেতে, সত্যি কথা বলতে কি, আমার ভরসাই হয় না। তুমি চলো, হ্যাঁ আজই চলো।

বরেন্দ্র। আজ? আজ হয় না।

কৃষ্ণা। উনি আর নাবালক নেই, এদের হাতে না থাকলেও এদের হাতেও থাকবার দিন আর ওঁনার নেই। এই সত্যি কথাটুকু আপনার শুনতে আপত্তি থাকলেও আমি বলতে বাধ্য! আপনার মাইনেটী যে উনি চিরকাল ধরেই গুণে যাবেন, এ আশা যদি করে থাকেন, নেহাৎ ভুল করেছেন।

মাষ্টার। বরেন্দ্র! তুমি কি এসব কথা একে বলতে বলেছ?

বরেন্দ্র। (ইতস্ততঃ করিয়া) ঠিক তা' নয়। তবে—

মাষ্টার। (হাত তুলিয়া) থাক্ আর বলতে হবে না। অনেক কষ্টে মানুষ করে, এমন করে তোমায় অধঃপাতের পথে ছেড়ে যেতে প্রাণ আমার হাহাকার করে কাঁদছে,—কিন্তু উপায় আমি কিছুই দেখছি নে'! দেখছি এরই মধ্যে ও পথের অনেকখানিই তুমি এগিয়ে গ্যাছ। থাক্ ভগবান তোমায় এদের হাত থেকে পরিত্রাণ করুন। আমি আজ থেকে তোমার চাকুরী ছেড়ে দিলুম। আশীর্ব্বাদ করি শীঘ্রই যেন তোমার সুমতি হয়। নিজের ভুল বুঝে যেন এই অবুঝদের হাত থেকে তুমি আত্মরক্ষা করতে পারো। আমি চললুম!

(প্রস্থান)

বরেন্দ্র। (ব্যস্তভাবে) না, না, যাবেন না, শুনে যান—

কৃষ্ণা। (ব্যস্তভাবে হাত ধরিয়া) আহা, যাচ্ছেন না, কেন মিথ্যে ব্যস্ত হচ্ছেন? যদি সত্যিই যায়, মস্ত একটা আপদ যাবে, ঐ দুটোশো টাকায় আর পঞ্চাশটি দিলে রজনী-দিদিকে আরও একটী দিন করে নিয়ে আসা চলবে।

বরেন্দ্র। (বলিতে উদ্যত হইয়া) তা বটে! তবে কি না—বাঃ! কি চমৎকার চেহারা! কি অপরূপ রূপ! কৃষ্ণা, দেখ দেখ! (পার্শ্বের বারান্দার দিকে চাহিয়া রহিল। ঐ বারান্দাটী মিঃ বসুর বাড়ীর, উহাতে রেলিংয়ে ভর দিয়া অন্যমনা হইয়া অনিমা দাঁড়াইয়া আছে। তার চুল খোলা, বেশ-ভূষা পারিপাট্যহীন, মুখ বিষণ্ণ। ক্ষণকাল ঐরূপ থাকিয়া সে পাশের দরজার মধ্য দিয়া চলিয়া গেল)।

বরেন্দ্র। কৃষ্ণা! এ কে' ভাই? এমন কখনও দেখিনি! না, এখানে আসা আমার সার্থক হলো!

কৃষ্ণা। ওর পরিচয় আমি জানি, একটা বিলেত-ফেরতা জজের মেয়ে, আপনাদেরই জাত, বি-এ না এম্-এ পাশ করে বিদুষীধাড়ী হয়ে বসে আছে, বিয়ে-টিয়ে জোটে নি। চাকরী-বাকরী ক'রে খাবে বোধ হয়। কোলকেতায় ওরকম অনেক আছে।

বরেন্দ্র। কৃষ্ণা! মাষ্টার মশাই আমায় বিয়ে করতে বলছিলেন, আমার তখন ভাল লাগে নি, কিন্তু আর আমার অমত নেই। আমি বিয়ে কর্ব্বো। ওই কুমারী নাইটিঙ্গেল বা বিদুষী গার্গী যাই বল, ওই ওকেই আমি চাই। আমি চাই-ই। মাষ্টার মশাই! মাষ্টার মশাই! ডাকো তাঁকে।

কৃষ্ণা। (বিরক্তভাবে) কেন, ঘটকালী কি আর আমরাই করতে জানি নে' না কি? তা ছাড়া উনি সেকেলে ভদ্রের লোক, সেই গরুর-গাড়ীর যুগের মানুষ, ঐ ধেড়ে বিদ্বী মেয়ে মর্দ্দা কি উনি আপনার বউ হওয়া মত কর্ব্বেন? উল্টে বরং ভাংচী দিয়ে—

বরেন্দ্র। তা হলে থাক্। কিন্তু কৃষ্ণা! ঐ বিদুষবরণীকে যদি না পাই তবে গলায় কলসী বেঁধে এই হুগলী নদীর জলে ডুবে মরবো, এ তুমি জেনে রেখো!

কৃষ্ণা। কিসের দুঃখে! বলে "বেঁচে থাকুক চুড়াবাঁশি, কত শত মিলবে দাসী।" বিয়েই যদি করতে চান, তাহলে আপনার কনের না কি অভাব হবে? হুকুম করুন না, ক' গণ্ডা চান?

বরেন্দ্র। না, না, কৃষ্ণা! ওই ওঁকে ছাড়া আমি আর কাকে-কেই চাই নে। বল ভাই! আশা দাও, যদি আমার সত্যিকার বন্ধু হও, তবে প্রাণপণে চেষ্টা করো। ওঃ আমার প্রাণটা কে যেন পাগল করে দিয়ে গেল!

ভূষণ। তবু কি, হবে যাবে, পাবেন, পাবেন। আপনিই ত সে দিন বলছিলেন না, "None but the brave deserve the fair" মনে বল করুন। 'কুছ পৈরোয়'—জগতে এমন কি কাজ আছে যা ভূষণচন্দ্র পারে না?

বরেন্দ্র। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বারান্দার দিকে চাহিল) ভূষণ! তুমি আমায় বাঁচালে। চল, একটু বেড়িয়ে আসি গে'। (উভয়ের প্রস্থান)

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ মিঃ বসুর বাড়ীর একটী কক্ষ, অণিমার বসার ঘর।

একটী রাইটিং-টেবিল, দুখানা চেয়ার দু-এক আলমারি বই, দু'একখানি ফটো বাঁধানো, এক পাশে একখানা সোফায় অণিমা শুইয়া আছে।

মৃণালিনী প্রবেশ করিল। ]

মৃণা। আচ্ছা অণি! এমন করে শরীরটাকে মাটী করলেই কি তাঁকে ফিরিয়ে পাবি? এত জ্ঞানবুদ্ধি তোর, এর বেলা এমন ছেলেমানুষী করছিস কেন? নে' উঠে বস্, আয় চুলটা বেঁধে দিই। আজ হয় ত যামিনী বাবু আর ইন্দ্রবাবুর মেয়েরাও আসতে পারেন, সেই হিতসাধিনী সভার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কইতে।

অণিমা। (চোক মুছিতে মুছিতে) আমার আর কিছুই ভাল লাগে না। দাদাও যদি একটীবার আসতো!

মৃণা। তা' মিহির দা'কে একবার আসতে লেখই না কেন, কোন একটা ছুটিতে।

অণিমা। সে আসবে না। বাবার অত অসুখ শুনেই এলো না। উল্টে লিখলে, "তুই রয়েছিস, আমি গিয়ে আর বেশী কি করতে পার্ব্বো? যা' করতে এসেছি সেটা শেষ করে যাই।" না, তাকে আসতে বলার দরকার নেই, আমায় সব সইবে। (চোক মুছিয়া উঠিয়া বসিল) নে' কি করবি কর।

মৃণা। (পিছনে দাঁড়াইয়া চুল বাঁধিতে বাঁধিতে) ওঁরা যা' বলেছেন সে মন্দ না। ইস্কুলটা উঠে যাচ্ছে, আর না তোতে আমাতে দিনকতক দেখি শুনি। পরেরও উপকার হবে, নিজেদেরও সময় কেটে যাবে। তোর তো এখানে একটা মেয়েস্কুল করবার খুবই ইচ্ছা ছিল, তা' সেটা আছে ওইটেই ভাল করে তুলে তো খুব ভালই হবে। সংসার করা, আর নতুন করা দুইই সমান।

অণিমা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে) কি জানি, মনে হয় আর বোধ হয় আমার এজন্মে কোন কিছুই ভাল লাগবে না। বাবা আমার সমস্ত পৃথিবী শূন্য করে দিয়ে গেছেন।

(নীরবে ক্রন্দন)

মৃণা। (সান্ত্বনার সহিত) চুপ কর ভাই, চুপ কর। মা বাপ আর কার চিরদিনই বেঁচে থাকেন, অণি। তোর তো তবু এতদিন ছিলেন, আর আমার কথা মনে করে দেখ দেখি, তোর চাইতে কত কম বয়সে ওসব পাঠ চুকে গেছে! (মনে মনে) মুখে যাই বলি, মন আমার সবই জানে! তোমার বাবা যে তোমার বুক অনেক আগেই ছেঁচে-চুষে রেখে দিয়েছিলেন। না' হলে আজ তোমার প্রাণ এমন করে শ্মশান করে দিয়ে যেতেন না। (প্রকাশ্যে) দেখ ভাই! ধৈর্য্য ধরা ছাড়া আর তো কোন উপায় নেই, মনকে জোর করে শক্ত করে নে'। সংসারে কত দুঃখ কত অভাব, তাদের দিকে চেয়ে দেখ নিজের দুঃখ অনেকখানি ভুলে যাবি।

অণি। (চোক মুছিয়া) সত্যি মিলি। সে কথা ঠিক! আমার চাইতে জগতে আরও কত বেশী দুঃখী আছে। আমি স্বার্থপর, তাই নিজেকে নিয়েই অস্থির হচ্ছি। মনে করি আমার মত দুঃখী নেই। মা নেই, তাই ঘুরে, একমাত্র বাপকে নিয়ে সব কষ্ট ভুলেছিলুম, তাও তাঁকে রাখতে পারলুম না, হারিয়ে ফেলুম। (চোখ মুছিল)।

মৃণা। ঐ শোন ভাই, ওঁরা সব বোধ হয় আসছেন. তুই যা' ভাই, চট করে শাড়ীটা একটু বদলে মুখটা ধুয়ে আয়গে' যা, আমি ওঁদের বসাচ্ছি।

অণিমা। থাক না ভাই! ইচ্ছে করছে না।

মৃণা। (হাত ধরিয়া) না, না, যা। ওঠ ভাই! কথা শোন।

(অণিমা উঠিয়া চলিয়া গেল। অন্য দরজা দিয়া 'বয়' আসিয়া জানাইল 'মাইজী লোক আয়া',—অনুমতি লইয়া প্রবেশ করিল অমলা ও জ্যোৎস্না)।

মৃণা। (অগ্রসর হইয়া) আসুন ভাই, আসুন! কি আনন্দ যে হলো বলতে পারি না। এস ভাই, তোমায় আর

আপনি বলছি নে', আমার চাইতে বয়সে ঢের ছোট। ( অমলাকে নমস্কার করিল ও জ্যোৎস্নার হাত ধরিল। )

অমলা। সব ভাল তো? মিদ্ বস্থ কই? তাঁর শরীর ভাল আছে? একটু সঙ্গে হ'তে পেরেছেন? সেদিন বড্ডই কাতর দেখে গেছলেম, বাবার সঙ্গে এসে। বাবা সেদিন থেকে ঈশ্বরের নিকট ওঁর মনের শান্তি প্রার্থনা এটী বেলাই করে থাকেন।

মৃণা। তিনি সেই রকমই স্নেহময় বটেন! একটী বার দেখেছি, এত ভাল লেগেছে। যামিনী বাবু ওঁকে কাকাবাবু বলেন, শুনলুম; না? তা' আমরাও এখন থেকে তাই বলবো।

অমলা। বেশতো, তাই বলবেন। আমরাও আপনাদের মতন দুটী রূপগুণবতী বোন পেয়ে ধন্য হয়ে যাবো। [ সকলে সোফায় বসিল। পরক্ষণেই 'বয়' আসিয়া দ্বারের নিকট হইতে কিছু বলিতে উদ্যত হইল, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই অন্য দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া প্রবেশ করিল অণিমা—এবং যামিনীর আসার কথা 'বয়' জানাইয়া দিল। ]

মৃণা। ( উঠিয়া ) আসুন যামিনী বাবু!

যামিনী। ( প্রবেশ করিয়া সকলকেই নমস্কার করিল, অণিমাকে অপেক্ষাকৃত সহজ অবস্থায় দেখিয়া তার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল ) ভাল আছেন?

অণিমা। ( প্রতিনমস্কারান্তে ) ভালই আছি। আপনি? ( অমলার প্রতি ) আপনারা দয়া করে এসেছেন, আমি যেতে পারিনি, তবু যে মনে করে এতটা কষ্ট স্বীকার করেছেন, এতে কত যে আনন্দ হলো বলতে পারিনে'। ( প্রণাম করিয়া সামনের একটী চেয়ারে বসিতে যাইতেছিল, অমলা হাত ধরিয়া নিজের পাশে বসাইল )।

অমলা। এই যে ভাই! এইখানে বসুন। দেখ, প্রকাশ। আমরা চারটী বোনে পাশাপাশি বসেছি, কেমন মানাচ্ছে বল দেখি?

যামিনী। ( হাসিয়া ) আর ভাইটীই বুঝি বয়কটেড্ হয়েছেন?

অমলা। সে কি কথা ভাই! ভাইটী তো তারার মালার উপরে চন্দ্রজ্যোতির মতন একলাই উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন! ভাল কথা, তোমার বয়টি কোথায় ভাই? তাকে যে আজ বড় দেখছি নে'? ( মৃণালিনীকে )।

মৃণা। মক্কেলের ধান্দায় আছেন আর কি! বরং ইষ্ট-দেবতাকে চটাতে পারেন, তবু ওদের অনুষ্ঠানে তো বিন্দুমাত্র ত্রুটী ঘটাতে পারেন না।

অমলা। তা ভাই ওরাই যে ওঁদের কর্ম্মজীবনের প্রত্যক্ষ দেবতা, চটালেই বা চলবে কেন? আচ্ছা প্রকাশ! তুমি তা'হলে আমাদের সভা অধিবেশনের একটা দিনটিন স্থির করে ফেল না ভাই!

যামিনী। ( অণিমার প্রতি ) সেই কথাই তো বলতে এসেছি। কাকাবাবু আমায় বলতে বলেছিলেন, এবারকার সভায় আপনাকেই সভানেত্রী হ'তে হবে। আপনি যতই আপত্তি করুন, কিছুই শোনা হবে না; তাঁর এই অনুরোধ এবং আদেশ।

অমলা ও মৃণাল ( একসঙ্গে )। বেশ বলেছেন, আমরাও তাতে খুব খুসী হবো।

অণিমা। ( ভীত ভাবে ) সর্ব্বনাশ! না, না ওসব আমি পেরে উঠবো না। তাঁকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে বলবেন, তাঁর এ আদেশের আমি নিতান্ত অযোগ্যা। কোন যোগ্যতর ব্যক্তিকে যেন আমার পরিবর্ত্তে তাঁরা সভাপতি বা সভানেত্রী নির্ব্বাচন করে নেন।

অমলা। কেন বৃথা আপত্তি করছেন, আমরা ওসব কথা কানেও তুলবো না।

( বয়জা খুশিয়া সুসজ্জিতা প্রবেশ করিল, তার পরণে একখানি খুব জমকালো সাড়ী, পায়ে হিল-ওয়ালা খুব দামী জুতা, হাতে কারুকার্য্য করা হাতপাখা, মুখে পেণ্ট করা। )

সুধা। বাঃ! বাঃ! চাঁদের হাট বসে গ্যাছে যে। তাই না বলি, যে, অফিস থেকে এসে হন্তদন্ত হয়ে কোথায় না জানি, কি মহাকার্য্যেই বা ছুটলেন। ওঃ এইজন্যে তোরা গেল, এই জন্যেই এত তাড়া! তা' আমায় জানিয়ে এলেই হতো, তা'হলে আর এর মধ্যে এসে পড়ে তোমাদের আলোচনার ব্যাঘাত করতুম না। তা' আমায় দেখে সবাই একেবারে চুপচাপ হয়ে গেলেন যে? আমি না হয় চলেই যাচ্ছি ( গমনোদ্যত )।

মৃণা। (উঠিয়া আসিয়া) সে কি ভাই! আপনি আসায় আমরা সকলেই কত যে খুসী হয়েছি, আপনার দেখে চুপচাপই

না হবো কিসের জন্যে? আপনাকে তো আমরা সর্ব্বদাই আমাদের মধ্যে চাইছি, আপনি-ই বলেন, সময় পান না।

সুলক্ষণা। (আসিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল ও হাতপাখার হাওয়া খাইতে লাগিল) তা' ভাই! কিছু অন্যায় কথা বলাও হয়নি ত! উনি তো আপনাদের ঘোর কামড়ে পড়েই আছেন, আবার আমি শুদ্ধু তাই করলে; আমার সংসারটী চলে কি করে বলুন তো? আমরা তো ভাই, আপনাদের মতন বড়লোক নই। বয়, খানসামা, দরওয়ান, আয়া এ সব তো কিছুই আমাদের ভাই, নেই। যা' করবো, যা' না করবো সবই তো নিজে নিজে। মেয়েটা আছে, তারও কজাটটী বড় কম নয়, কাজেই সময় আমার কোথায়?

মৃণা। তা' সত্যি!

যামিনী। (স্বগতঃ) সত্যি যা' তা' আর না বলাই ভাল! সংসার দেখেন পিসিমা, আর মেয়ে—সে কোন গতিকে বেঁচে থেকে স্বাভাবিক ক্রমে বড় হচ্ছে!

সুলক্ষণা (জ্যোৎস্নার প্রতি)। এই যে তুমিও এসেছ! তা' ভালই হয়েছে, একটা গান শুনিয়ে দাও দেখি।

জ্যোৎস্না (মৃদুস্বরে) আজ আমায় মাপ করবেন, আজ আমি পারবো না।

সুলক্ষণা। কেন গো! আজ আবার তোমার কি হলো? ভাল গলা হলে ওরকম হয়েই থাকে; ও আমি অনেক মেয়েই দেখেছি, রীতিমত খোসামোদটী না করিয়ে নিয়ে, কক্ষণ গায় না।

অমলা। না ভাই, ওর সে রকম ভাল গলাও না, আর সে রকম স্বভাবও নয়। বড্ড সর্দ্দি হয়েছে, তাই পারবে না। অন্য দিন তখন শুনো।

সুলক্ষণা। না ভাই! গাইতে হয় ত, আজই হোক। অন্য-দিন যদি আমায় শুনতে ভাল না-ই লাগে। শুনো সুন্দরী! একটু গা' তোল না। গাও গাও, ক্ল্যাপ্ পাবে,—প্যালা পাবে, এক্‌কোর দেওয়া যাবে, কিছু ত্রুটী রাখব না। নাও মান ছেড়ে উঠে পড়। (সকলেরই অন্যমনস্ক ভাব, যামিনী সোফায় অধোমুখ। জ্যোৎস্নার কাঁদো কাঁদো মুখে দিদির মুখ চাওয়া, অমলার বিরক্ত ইঙ্গিত ও জ্যোৎস্নার শুধু গলায় মৃদু কণ্ঠে গান)—

গান

যে সুর বাজে তোমার একতারাতে, সে সুর বাজাও চিত্তবীণায়।
সে প্রেম প্রাণে উঠুক জেগে, যে প্রেম তোমায় দিক মাতায়।
দাঁড়াও তুমি হে অপরূপ, আমার মাঝে আড়াল করে,
আমার জ্ঞানের মলিনতা, পাক দেখে পদ্মটুক ভরে,
জীবন আমার পূর্ণ করো, তোমার প্রেমানন্দের বিমল ধারায়।
—প্রেমানন্দের বিমল ধারায়,—

অমিয়া। (স্বগতঃ) 'প্রেমানন্দের বিমল ধারায়'—হায়, আমার প্রাণে প্রেমও নেই, আনন্দও নেই,—তাই বোধকরি প্রাণের মধ্যে দিনরাত এই প্রচণ্ড হাহাকার! বাবা! বাবা! যদি মনে করতে পারতাম, তুমি ভগবানের বক্ষে লীন হয়েছ, হয় ত শান্তি পেতাম! সর্ব্বদা হয় ত এমন করে বুক ফাটিয়ে মনে হতো না, তোমায় হারিয়েছি, চির-ভবিষ্যতের মতই এ হারানো!

মৃণা। কি মিষ্টি গলাটি! বোনটি আমাদের সত্যই যেন নবীন-সরস একটি টুক্‌রো চাঁদের জ্যোৎস্না! যেমন শান্ত, তেমনই মধুকণ্ঠী! তা' হবে না, আমার দিদিরই তো ছোট বোন।

সুলক্ষণা। আচ্ছা জ্যোছনা! তোমায় সেদিন বলি নি, ওই কটকটে ব্রহ্মসঙ্গীতগুলো আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি নে! তোমার ভাই, ইচ্ছে করে আমায় অপমান করা।

অমলা। অমন কথা বলো না বউ! ছিঃ! এ'কি এমন কটকটে গান? নানক কবীরের নয়, অথবা দ্বিজেন্দ্র-সত্যেন্দ্রের উচ্চাঙ্গের ব্রহ্মসঙ্গীত নয়। তা' হলে স্পষ্ট করে বলেই হতো, যে তুমি ভগবানের নামগন্ধমাত্র শুনতে চাও না!

সুলক্ষণা। আপনি থামুন, মিসেস কর। বোনের ঘরে আর ওকালতি করতে হবে না—

অমলা। তোমায় কতবার বলেছি বউ! আমায় পরের মতন 'মিসেস কর' না বলে দিদি বলবে, তোমার মনে থাকে না কেন?

সুলক্ষণা। মনে থাকবে না কেন? ইচ্ছে করেই বলি নে'। দিদির কি আমার আকাল পড়েছে না কি, যে পাতানো সম্পর্কে দিদি বলতে হবে? ওরকম গায়ে পড়ে সম্পর্ক পাতিয়ে আপন করা আমি দু'টি চক্ষে দেখতে পারি নে'। বলি, তা'তেই কি আর পর আপন হয়?

( যামিনীর চোখ রোদ্রপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, মৃণালিনীও তদ্রূপ ভাবে দৃষ্টিবিনিময় করিল, জ্যোৎস্না ঈষৎ বাঁকিয়া মেজে যামিনীর দিকে অপাঙ্গে চাহিল। শুধু অমলাই মৃদু হাসিল। )

অমলা। বিধি বলতে ইচ্ছা না হয়, না-ই বললে। প্রকারান্তের বিধি হিসাবে না হয় ঠাকুরঝিই বলো ; তা' বলে আমার চিরদিনের স্নেহের ভাইটীর বউএর মুখ থেকে পরের মতন 'ডিসেণ্ট কর' আমি সইতে পারি নে', পিঠে চাবুক পড়ে ওতে।

সুনন্দতা। রক্ষা করুন! সুখের মধ্যে ওই একটি সুখই আমার আছে বাকি! ছোট ননদ থাকলেও বড় ননদটী নেই। ওইটি হলেই সুখের চার পো আমার পূর্ণ হতো! আচ্ছা, আমি তা' হলে এখন চল্লুম। ( সহসোত্থিতা হইয়া ফিরিয়া ) ভাল কথা, শুনছো? জামাই বাবুর টেলিগ্রাম এসেছে, মোটর কেনা হয়ে গেছে, টাকা পাঠাতে হবে। আমি মনে করছি, টাকাটা নিজেই নিয়ে যাবো, একেবারে মোটরে চড়ে ফিরবো। এস দেখি একবার বাড়ীতে, এখানের আড্ডা তো অনেকক্ষণ দেওয়া হলো। সংসারের একটু আধটু খবর রাখা না রাখলেও তো আর চলে না। ওঠো, ওঠো—

যামিনী। ( সচেষ্ট ধৈর্য্যের সহিত ) তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।

সুনন্দতা। তোমায় না নিয়ে নড়ব তা' তুমি মনেও করো না। আজ রাত্রেই আমায় যেতে হবে। কি গাড়ি কেনা হলো, সে দেখবার জন্যে আমার বলে, প্রাণ ছটফট করছে। বলেছিলুম 'উইলসী-নাইট', না হয় 'অবর্ণ', তা' সে সব না কি বড্ড দাম, সে চড়া আর এ কপালের কর্ম্ম নয়। কি ছাই পাশ হলো, চক্ষে না হয় দেখেই আসি। ওঠো না বাবু! আজ্ঞা দেওয়া তো কাণও চলতে পারবে, এক বেলায় একটু কম হ'লে তো আর মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

যামিনী। ( মাথে ঠোঁট চাপিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া অতিথির নমস্কার ও অমলার পদধূলি লইয়া নীরবে বাহির হইয়া গেল)।

সুনন্দতা। ( অমলাকে ) কি নিয়ে আমি ঘর করছি, নিজের চোখেই একটু দেখুন! টাকা যদি খসাতে হলো, মনে করেন, কি সর্ব্বনাশই বা হয়ে গেল! কত যে মাথা-মুড় খুঁড়ে, কত যে, না খেয়ে না দেয়ে, তবে এই সাড়ে তিনটী হাজার টাকা আমায় করেছি! ওঁর পি-আর-এস-এর টাকা কিছুতে কি বার করতে চায়? বলে সময় অসময় আছে, মেয়ে হয়েছে তার লেখাপড়া, তার বিয়ে! মেয়েকে যেন পৌরীদানই করবেন! আসল কথা হাড়-কেপ্পণ, একেবারে একটুখানিও দরদ নেই! ( প্রস্থান )

মৃণালিনী। আহা বেচারা যামিনীবাবু!

অমিয়া। ( স্বগতঃ ) এ কি দেখলুম! ওঁর কপালে এই হয়েছে! নাঃ আমার দুঃখ অনেক কম!

জ্যোৎস্না। ( স্বগতঃ ) কি আশ্চর্য্য স্বভাব ওঁর! দেবতাকেও দৈত্য বানাতে এক কৌটাও দ্বিধা করেন না!

অমলা। ( স্বগতঃ ) ওর এ অবস্থার জন্যে আমিও খানিকটা দায়ী। তার উপর কোঠামশাই তাড়াতাড়ি করে রুজই অবিমৃষ্যকারিতার কাজ করে গেছেন! ( প্রকাশ্যে ) আজ এখন উঠুন ভাই! সময় পেলেই আবার আসবো'খন।

অমিয়া ও মৃণালিনী। আপনাকে পেলে, আমরা যে কত আনন্দ পাবো, বোধ করি সে কথা মুখে বলার কোন দরকার হবে না!

(অমিয়া ও মৃণালিনী অমলাকে প্রণাম করিল, অমলা তাদের চিবুক হইতে চুম্বন করিল ও জ্যোৎস্না তিনজনেরই পদধূলি লইয়া চুম্বন লাভ করিল, অমলা জ্যোৎস্নার প্রস্থান )।

মৃণা। আয় ভাই! সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, একটু বারান্দায় গিয়ে বসি গে, সারাক্ষণই ঘরে থাকা ঠিক নয়।

অমিয়া। চল। ( উভয়ের প্রস্থান )

ক্রমশঃ

# সিপাহী-যুদ্ধের নূতন কথা

—শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

সিপাহীযুদ্ধ-কালে উভয় পক্ষেরই নৃশংসতা ও বর্ব্বরতার বহু দৃষ্টান্ত ডাঃ সূর্য্যকুমারের দৈনন্দিন লিপি হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের বিশেষ সাবধানতা সত্ত্বেও তাহা রোধ করিতে পারা যায় নাই—রোধ করা অবস্থা-চক্রে বোধ হয় সম্ভবপরও হয় নাই। লর্ড ক্যানিং মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে একখানি পত্রে ( ২৪ শে সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ ) লিখেন :

> "One of the greatest difficulties which lie ahead—and Lord Canning grieves to say so to Your Majesty—will be the violent rancour of a very *large portion* of the English community against every native Indian of every class. There is a rabid and indiscriminate vindictiveness abroad....."

আত্মীয় বা বন্ধুর কোথাও কোথাও নির্ম্মমভাবে নিধনে ঘোর প্রতিহিংসা-লিপ্সাই উহার মূল বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্ম-প্রবণ জাতি একদিকে ধর্ম্মহানির ভয়ে—অন্যের সত্তা কারণ না থাকিলেও—দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য, অন্যদিকে তাহাদিগের কৃত-কর্ম্মের জন্য অন্য পক্ষের ভীষণ জিঘাংসাপরায়ণতা। একদিকে অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিকট উন্মত্ততা, অন্যদিকে শিক্ষা ও সভ্যতাভিমানী সম্প্রদায়ের অন্ধ প্রতিহিংসা-লিপ্সা, পাত্রাপাত্রের বিচার পর্য্যন্ত না করিয়া। শান্তি প্রতিষ্ঠায় লর্ড ক্যানিং-এর গবর্ণমেণ্টের ইহাতে যে কি বাধা-বিপত্তি ঘটিয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়—তিনি মহারাণীর সমীপে সেই নিবেদনই করেন।

জনসাধারণের মধ্যে অনেকানেক দেশীয় ভূস্বামী, জমিদার ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিবর্গ খুনিবারণের বিপুল চেষ্টা কি আন্তরিকভাবে করেন তাহারও ভূয়োভূয়ঃ দৃষ্টান্ত ডাঃ সর্ব্বাধিকারীর দৈনন্দিন লিপি হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাঁদের এবং অন্যান্য অসংখ্য দেশীয়ের কোম্পানীবৎসলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লর্ড ক্যানিং পূর্ব্বোল্লিখিত পত্রের একাংশে লিপিবদ্ধ করেন :

> "Innumerable instances of kindness and generosity of both Hindus and Mohammedans have come upon record during these troubles."

দেশীয় জনসাধারণের এই অযাচিত বদান্যতা, বিশ্বস্ততা এবং নিঃস্বার্থপরতার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তসত্ত্বেও এক জাতীয় ইয়োরোপীয়—ঐতিহাসিক নামের কলঙ্ক হইলেও—ঐতিহাসিক সাহিত্য ভারতীয়ের নামে দুরপনেয় কালিমা লেপনে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। প্রত্যক্ষদর্শী সূর্য্যকুমারের দিনলিপি পাঠে জানা যাইবে, ধন ও জন-বলে বলীয়ানের অনেকে হো বটেই, দীনের দীনও আত্মজীবন ঘোর সঙ্কটাপন্ন করিয়া কত শত বিপন্নকে রক্ষা করিতে অকুতোভয়ে অগ্রসর হইয়াছে। ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের সভ্যতা, ভারতের কৃষ্টিই যে তাহাকে তাহা করাইয়াছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিলে ইহার সত্যতা অনুভূত হইবে।

মিরাট যখন বাই খাই করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তখন মিরাটের কমিশনারের আবাসগৃহ প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া সিপাহীরা বাটীর যাহা কিছু পাইল লুণ্ঠন করিল। কমিশনর সস্ত্রীক তখন অন্য কয়েকজন ইয়োরোপীয় মহিলাকে লইয়া বাটীর ছাদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বস্ত কয়েকজন দেশীয় অনুচর তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিল। তাহারা দেখিল, সে বিপদে কাহারও পরিত্রাণ নাই। তাহাতে তাহারা ভীত হইল না। বিপন্নের পরিত্রাণচেষ্টায় কর্ত্তব্য-বুদ্ধি হারাইল না। সপরিবার কমিশনর সাহেবকে হত্যা করিতে যখন সিপাহীরা তাঁহাদিগকে খাঁতি-পাতি করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, বিশ্বস্ত ভৃত্যদের মধ্যে একজন ( মালী ), নাম সোলাপ সিং, সিপাহীদের কার্য্যে বারম্বারই উৎসাহ ও সহানুভূতি দেখাইয়া তাহাদিগকে বলিল, 'ভাই সব এখানে বৃথা পরিশ্রম করিতেছ, সাহেব দলবলসহ বহুক্ষণ পূর্ব্বেই পলাইয়াছে, তবে ধন-সম্পত্তি লইয়া

পলাইতে পারে নাই। যুদ্ধে ওই যে ওদাম দেখিতেছ তল্লাস করিলে ওইখানে সে সব পাইবে। পাইলে মেহেরবানী করিয়া আমার কথা মনে রাখিও। কেবল ধন-সম্পত্তি নহে ওদামে খড়ের গাদার নিচেও বহু সাদা আদমীও লুকাইয়া আছে।'

"মালীর কথা শুনিয়া সিপাহীরা উল্লাসভরে ওদামের দিকে ছুটিয়া গেল। মুহূর্তমাত্র সময় ক্ষেপ না করিয়া গোলাপ সিং এদিকে ছাদে মই লাগাইয়া প্রভু, প্রভু-পত্নী ও অন্যান্য আশ্রিতাদের স্থানত্যাগ করিবার সুযোগ করিয়া দিল। সকলে নামিয়া আসিলে নিকটস্থ এক উদ্যান-বাটিকায় যাইয়া তাহারা লুকাইয়া রহিল। এ সকল ঘটে রাত্রি কালে। রাত্রি প্রভাত হইলে মিরাটের সমর-শিক্ষাগারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সকলে নিরাপদ হয়।"

মিরাটের আর একটি ঘটনা উদ্ধৃত হইতেছে :

"তৃতীয় ক্যাভালরী দলের কাপ্তেন ক্রেগী যুদ্ধক্ষেত্রে যখন নিযুক্ত সেই সময়ে সিপাহীদের একদল তাঁহার বাটীতে হানা দেয়—বাসগৃহ জ্বালাইয়া মিসেস্ ক্রেগীকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। ক্রেগীর বিশ্বস্ত অনুচরেরা প্রভুপত্নীর প্রাণরক্ষাকল্পে নিজ নিজ প্রাণ উপেক্ষা করিতে তিল মাত্র দ্বিধা বোধ করে নাই। সৌভাগ্যক্রমে ক্রেগীর চারিজন সশস্ত্র অশ্বারোহী সেই সময়ে ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়। সকলের সমবেত চেষ্টায় মিসেস্ ক্রেগী প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া যান।"

অশিক্ষিতের এই মহানুভবতা, 'সবার উপর মানুষ'—অন্তর্নিহিত এই গভীর জ্ঞান ভারতের বৈশিষ্ট্য। ডাক্তার সুধাকুমার বলিতেছেন : "অসন্তোষ-জনিত সিপাহী-উত্থানে ভারতবাসীর প্রতি কাহারও কাহারও মনে মনে বিরূপ সন্দেহ সিপাহীর নৃশংসতা হইতে নিষ্পীড়িতকে রক্ষা করিতে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে, অনুকূলকে আহার্য দিতে তাহারাও পশ্চাৎপদ হয় নাই।"

ডাঃ সর্বাধিকারী মিরাটের ঘটনা উল্লেখকালে জানাইয়াছেন : "দুইজন সিপাহী দুইটী ইংরাজ-মহিলা ও তাঁহাদের সন্তানগণকে সৈনিক নিবাসে পৌঁছাইয়া দিয়া তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করে।

"সিপাহীদের খড়্গে প্রভু ও প্রভু-পত্নীর দেহ বিখণ্ডিত। রক্তপিপাসুর দল তখন শিশু-রক্তপানে ধাবিত। বিশ্বস্ত দাসী কি করিবে? তাহার হাতে যে পরাণ প্রভু ও প্রভু-পত্নী তাঁহাদের সন্তান দুইটীকে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছেন! 'দানবেরা ওই বুঝি আসিল—কি করি ভগবান, ভগবান্, দুগ্ধপোষ্য শিশুদের রক্ষা কর।' প্রভুভক্তির পুরস্কার দানে ভগবানের আসন বুঝি টলিল। চমকিতা হইয়া দাসী চাহিয়া দেখে তাহার সম্মুখে এক অপরিচিত ব্যক্তি, স্কন্ধে তাহার বস্ত্রের নাতিবৃহৎ একটী পুঁটলী। বেশ করিয়া সে তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিল—এ যে সাহেবেরই রক্ষক। তাহাকে আহ্বান করিয়া সকাতরে দাসী বলিল, 'দেরক রাখো, সাহেবের বাচ্চা-কাচ্চা বাঁচাও।' অপর ব্যক্তি বলিল, 'আলবাৎ, জান্ যায় সো ভি পরোয়া নেহি।' দুইজনে পরামর্শ করিয়া পুঁটলীর মধ্যে শিশুদিগকে লইয়া বিপদ্-সঙ্কুল স্থান পরিত্যাগ করিল।"

এই জাতির, এই দেশের অগণিত যুবা, কিশোর কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে নরহত্যার আপনাদিগকে লিপ্ত করে। ইহার কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া ডাঃ সুধাকুমার তাহার ফল তাঁহার দিনলিপিতে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সারাংশ 'সিপাহী-যুদ্ধের নূতন কথা'র যথাস্থানে প্রকাশিত হইয়াছে। সে-সকল কথা ছাপার হরফে প্রকাশিত করিবার কল্পনাও তিনি কখনও করেন নাই। পক্ষপাতদুষ্ট এই সকল বর্ণনার মূলে কল্পনা-প্রসূত এবং পক্ষপাতদুষ্ট তথাকথিত ঐতিহাসিকের ইতিহাস (?) অপেক্ষা কত অধিক তাহা না বলিলেও চলে। অবশ্য কে (Kaye) মার্টিন (Martin) 'ইণ্ডিয়ান্ এম্পায়ার'-এর গ্রন্থকার, 'ইণ্ডিয়ান্ মিউটিনি'র গ্রন্থকার এবং সিপাহীযুদ্ধ বিষয়ের অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থ ও পত্রিকায় এইভাবের ঘটনার উল্লেখ স্থানে স্থানে আছে; কিন্তু নিরপেক্ষতার মাপকাঠিতে সুধাকুমার যে সকলকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন তাহা যিনি সুধাকুমারের রোজনামচা পড়িবার সুযোগ পাইয়াছেন তিনিই বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এই সূত্রে ডাঃ সুধাকুমার-বর্ণিত একটী প্রাসঙ্গিক ঘটনার উল্লেখ এখানে অবশ্যকর্তব্য। যুদ্ধের কারণে সামরিক আইনের প্রচলন তখন সর্বত্র বলবৎ। ইহার প্রয়োজনীয়তা ছিল খুবই যে তাহা বলাই বাহুল্য। এই আইন বলবৎ কালে দোষীর সঙ্গে ভুল-ভ্রান্তি বশতঃ বা কর্তব্যসাধনের মনোভাব

কেন্তু কোনও কোনও নির্দোষীরও কঠিন শাস্তি পাওয়া বা মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত হওয়া বিচিত্র নহে। লর্ড ক্যানিং ও তাঁহার বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য পরামর্শদাতাদের এ ব্যাপার যাহাতে না ঘটে তাহার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিলেও এরূপ ঘটনা যে অনেক ঘটে তাহা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। সুধাকুমার তাঁহার ডায়েরীর এক-স্থলে লিখিয়াছেন, "বুকে বুকে লটকান সারি সারি বেশুমার মৃতদেহের মধ্যে কত যথার্থ নির্দোষীও যে অবশ্যম্ভাবীরূপে বলির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহার নির্দেশ কে করিবে!" ইহা বলিবার তাঁহার যথেষ্ট কারণ ছিল। তাঁহার বর্ণিত একটী ঘটনার উল্লেখ করিলে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। সুধাকুমার লিখিতেছেন :

"লক্ষ্ণৌ উদ্ধারকল্পে গাজীপুর হইতে প্রেরিত সৈন্যবাহিনীর 'ব্রেভড্ সার্জন রূপে আমাকেও যাইতে হয়। সেই সৈন্য-বাহিনী লক্ষ্ণৌ-এ যখন কুইকাওয়াজে নিযুক্ত সেই সময়ে দুই শতের অধিক এক দল অসামরিক দেশীয় শোভাযাত্রা করিয়া তাহার অন্তিমুখে দিয়া যাইবার কালে বিদ্রোহী বলিয়া ধৃত হয় এবং তাহাদের প্রত্যেকে 'কোর্টমার্শাল'-এর বিচারে প্রাণদণ্ডের দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এই ভীষণ সংবাদ আমার কর্ণগোচর হইবামাত্র স্বাধীনভাবে আমি অনুসন্ধানে লিপ্ত হই এবং তাহার ফলে নিঃসন্দেহভাবে জানিতে পারি, উহারা বিদ্রোহী নহে, নিরীহ ব্যক্তি—বর লইয়া আনন্দ সহকারে সমারোহের সহিত শোভাযাত্রা করিয়া যাইতেছিল। তাহাদের নির্ভরযোগ্য কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে বিদ্রোহী বলিয়া স্থির করে। আমি তৎক্ষণাৎ ইহা উচ্চতম সামরিক কর্ম-চারীর কাছে নিবেদন করি এবং তাঁহাকে আরও জানাই, ইহারা যে নিরীহ বরযাত্রী এই এই লক্ষণ মিলাইয়া দেখিলে তিনি স্বয়ংই তাহা বুঝিতে পারিবেন। আমার কথায় তাঁহার বিশ্বাস যথেষ্টই ছিল, এ প্রমাণ পূর্বে আমি অনেকবার পাইয়াছি। এবার কিন্তু আমার কথায় কোনও সুফল হইল না। তাহাতে আমি তাঁহাকে বলি, আমার কর্তব্য আমি করিয়াছি, আপনার কর্তব্য আপনি করুন। এই বলিয়া আমি তাঁহার কাছে তখন বিদায় লই। যে কারণেই হউক গুপ্তভাবে আমার কথার সত্যাসত্য নির্ণয়ার্থে তিনি স্বয়ং নিযুক্ত হন এবং আমার সকল কথাই যে ঠিক জানিতে পারেন। অনুসন্ধান শেষ করিয়া তিনি সত্বরই আমার কাছে আমার কোয়ার্টারে আসেন। তখন গভীর রাত্রি। রাত্রি প্রভাতে বিদ্রোহী বলিয়া ধৃতদের প্রাণবধও হইবে। জেনারল গম্ভীর-ভাবে আমাকে বলেন, 'ডাঃ সুধাকুমার, আপনি আমাদিগকে মহাপাপ কার্যে লিপ্ত হইতে বিরত করিলেন, আপনার কথাই ঠিক, উহারা নির্দোষী।' আমার কাছে আসিয়া আমার করদ্বয় ধরিয়া বলিলেন, 'Do you pray, can you pray, have you any objection to pray with me?' আমরা উভয়ে নতজানু হইয়া প্রার্থনা করি। সেই গভীর রজনীতে মনুষ্য-বাসহীন প্রান্তরের সেনানিবাসে তাঁহার সেই অকপট প্রাণস্পর্শী প্রার্থনার অনুরূপ কোনও খৃষ্টীয় মন্দিরে পূর্বে আমি কখনও শুনি নাই।"

বলা বাহুল্য ধৃত ও দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত ব্যক্তিরা সকলেই সসম্মানে মুক্তি পায়। তাহা হইলেও নিরীহ ব্যক্তিগণ অনেকে যে সে সময়ে নিস্তার পায় নাই তাহা সুধাকুমার-প্রদত্ত অন্যান্য ঘটনার বিবৃতি হইতে প্রমাণিত হয়। অন্য পরে কা কথা, স্বয়ং সুধাকুমার গাজীপুর বাহিনীর লক্ষ্ণৌ-অভিযান সম্পর্কে যে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়েন, তাহা তাঁহার ডায়েরীতে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে :

"লক্ষ্ণৌ অভিমুখে যাত্রাকালে রেজিমেন্ট-সংক্রান্ত রসদ বিভাগ সুকৌশলে সিপাহীদিগের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। সারা দিনের পরিশ্রমে গোরারা যারপরনাই ক্লান্ত হইয়া পড়ায় তাহাদের ক্লান্তি দূর-করণার্থ তাহাদিগকে অল্পমাত্রায় মদ্য পান করিতে দিবার হুকুম উপরিওয়ালা করেন। হুকুম ত' হইল, কিন্তু মদ্য কোথায়? লুণ্ঠন কালে সিপাহীরা শেষ বোতলটী পর্য্যন্ত ছাড়িয়া যায় নাই, লুটিয়া লইয়া গিয়াছে। রসদ বিভাগ মদ্যশূন্য হইলেও 'মেডিকাল ষ্টোর্সে ( Medical Stores )' কয়েক বোতল মদ্য ছিল। মেডিকাল ষ্টোর্স হইতে তাহা বিতরণের হুকুম হয়। এই ষ্টোর্সের ভার আমার উপর। এড্‌জুটাণ্ট জেনারল্ আমার নিকট মদ্য প্রার্থনা করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'আপনার অনুরোধ পালন করিতে আমি পারিতেছি না, সে জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। কিন্তু কি করিব, সেনাপতি হ্যাভ্‌লকের লিখিত আদেশ ব্যতীত এক ফোঁটা মদও দিতে পারি না।' তিনি বলিলেন 'এ আদেশ জেনারেলেরই।' তথাপি আমি তাঁহাকে বাধিত করিতে

পারিলাম না, স্পষ্ট বলিয়া দিলাম 'মৌখিক আদেশ চলিবে না। লিখিত আদেশ চাই।' মন্ত্র-বলে আমার অস্বীকৃতির অজুহাতে আমার নামে উপরিওয়ালার নিকটে অভিযোগ উপস্থিত হয়। ফলে কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন না করার অভিযোগে আমার কোর্ট মার্শালের বিচারাধীন হইবার ব্যবস্থা হয়। বিচারের দিনে দেখি কেনয়ন হাডসন্ স্বয়ং কোর্টের সভাপতি। আমার বিপক্ষে অভিযোগ প্রমাণিত হইয়া যায়। সভাপতি তখন জলদগম্ভীর স্বরে বলেন, 'আসামীর কিছু বলিবার আছে?' আমিও স্থির বলি, 'আমি নির্দোষ।' ইহা বলা হইলে সভাপতি আমার দিকে চাহিয়া বলেন, 'এ অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড; তুমি যে নির্দোষ তাহার কোনও প্রমাণ দিতে পার?' আমি বলিলাম, 'নিশ্চয়ই পারি।' এই বলিয়া সভাপতির কাছে যাইয়া আমার বুক-পকেট্ হইতে পকেট্-বুক বাহির করিয়া তাহার স্থান-বিশেষ তাঁহাকে দেখাই। সে স্থানে তাহার স্বহস্তে লেখা রহিয়াছে 'লিখিত আদেশ ব্যতীত ষ্টোর্স হইতে কোনও দ্রব্য কাহাকেও সরবরাহ করা যেন না হয়, এমন কি আমাকেও নহে।' নিজ স্বাক্ষরিত আদেশ-বাণী পাঠ করিয়া সভাপতির মুখ লাল হইয়া উঠে। লিখিতাংশ তিনি অন্যান্য বিচারকদিগকে দেখান। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বিচার-কক্ষের হওয়া বদলাইয়া যায়। সকলে একবাক্যে আমাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করেন। শুধু নির্দোষ নহে আমার কর্তব্য-পরায়ণতার জন্য আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপিত হয়।"

সূর্যকুমার সম্বন্ধে এই ঘটনা হইতে কোর্ট-মার্শালের বিভীষিকা প্রতীয়মান হইবে। অবশ্যই বহু লোকের ভাগ্যে সূর্যকুমারের ন্যায় নিষ্কৃতিলাভ ঘটে নাই, সূর্যকুমার তাহার যথেষ্ট আভাস দিয়াছেন। লর্ড ক্যানিং-এর গভর্ণমেণ্টের সাবধানতা অনেককেই রক্ষা করিতে পারে নাই।

অনেক নির্দোষী ব্যক্তির কোর্ট-মার্শালে শাস্তি-প্রাপ্ত হওয়ার সুযোগ কোম্পানীর বিরুদ্ধ-বাদীরা লইতে ছাড়ে নাই, জনসাধারণের মন ভাঙ্গাইয়া দিবার নানা চেষ্টা তাহারা করিয়াছে। তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়াছে কোম্পানী-পক্ষীয় অনেকানেক অতি-কর্তব্য-পরায়ণ, সহজ-জ্ঞান-হীন, ক্রোধান্ধ কর্মচারী। 'সঙ্গ দোষে প্রাণ নষ্ট' হয় নিশ্চয়ই। কিন্তু সঙ্গ না করিয়াও এ সময়ে প্রাণ উজাড় হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নহে—কোনও কোনও কর্মচারী সম্বন্ধে 'অতি'-আখ্যার প্রয়োগ হওয়ায়। সাধারণের মনে ইহাতে অসন্তোষের বহ্নি বাড়িয়া যাওয়া খুবই স্বাভাবিক, লর্ড ক্যানিং এ কথা একাধিক বার মহারাণীকে জানান:

> "Not one man in ten seems to think that the hanging and shooting of forty or fifty thousand mutineers besides other rebels can be otherwise than practicable and right…"

এ অভিমত লর্ড ক্যানিং জানান সিপাহী-যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কয়েক মাসের মধ্যে। বুকে বুকে লম্বমান মুক্তবেহ—ইহার দৃষ্ট সূর্যকুমার যাহা দেখাইয়াছেন তাহা হইতে ফাঁসী ও তোপের মুখে উড়িয়া যাওয়ার সংখ্যা আরও কত হইয়াছিল নির্দেশ করা সহজ নহে। তবে ইহার মধ্যে নির্দোষীর সংখ্যাও অল্প ছিল না সে সম্বন্ধে সূর্যকুমার দৃঢ় মত।

স্বদেশীয়, স্বধর্মীয়, পরিচিত, অপরিচিত, আত্মীয়, অনাত্মীয়, পদস্থ বা সাধারণ ব্যক্তির এই নির্মম অবস্থা প্রাপ্তি-সত্ত্বেও একমনের কোম্পানীপক্ষীয়ের বিপরে, সহায়হীনতার সহানুভূতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত সূর্যকুমারের ডায়েরী হইতে ইহার পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। আরও কয়েকটী উদ্ধৃত করার প্রয়োজনীয়তা আছে:

"সম্রাট্-মহিষী তিয়তমহল তাঁহার মহলে প্রায় অর্দ্ধশত নরনারীকে লুকাইয়া রাখিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা করেন।"

"৫৮ নং পদাতিক দলের একজন অফিসার নিজ মুখে বলেন, 'দিল্লী হইতে আমাদের পলাইবার সুযোগ করিয়া দেয় সিপাহীদেরই মধ্যে কেহ কেহ। বহুক্ষণ পদব্রজে যাইয়া একটী ভগ্নগৃহে আমরা আশ্রয় পাইলাম। স্থানীয় কয়েকজন ব্রাহ্মণ তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাদের পল্লীতে বহুসহকারে আমাদের লইয়া যান। পর্য্যাপ্ত চাপাটি ও দুধ দিয়া আমাদের আহারাদি করান। পরে তাঁহাদের সাহায্যে আমরা যমুনা পার হই। পথে কয়েকজন গুজর কর্তৃক আমরা আক্রান্ত হইলে সেখানকার কয়েকজন ব্রাহ্মণ তাহাদের হস্ত হইতে আমাদের পরিত্রাণ করে এবং ডিহা নামক একটি নিকটবর্তী পল্লীতে লইয়া গিয়া আহার্য্যাদি দিয়া শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দেন। ইহার পরে একজন সন্ন্যাসীও আমাদের প্রতি যথেষ্ট

সহানুভূতি প্রকাশ করে। তাঁহার সাহায্যে মিরাটে আমাদের শোচনীয় অবস্থার কথা মিরাটের কর্তৃপক্ষীয়কে জানাই। মিরাট পৌঁছাইতে আমাদের আট দিন লাগে। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরের অধিবাসীরা আমাদের সাহায্য না করিলে পথে আমাদের মৃত্যু হইত'।"

"৭৪নং সৈনিকদলের ডাঃ বাটসনকে পলায়নের সুবিধা করিয়া দিতে একজন সাধুপন্থী তাহাকে সন্ন্যাসী সাজাইয়া দেয়।"

"ঘোরতর আহত এবং উপর্যুপরি কয়দিন অনাহারী গ্রান্ট্, নামক একজন ইংরাজকে নারীবেশে সজ্জিত করিয়া ডুলি চড়াইয়া তাহার ধিবমহগার নিরাপদ স্থানে লইয়া যায়।"

"কানপুরের দ্বিতীয় অশ্বারোহী দলের সুবেদার বৃদ্ধ ভবানী সিং, সিপাহীগণ কোম্পানীর বিরুদ্ধতা না করে সে চেষ্টা করায় স্বদলের একজন সৈনিক কর্তৃক ভীষণ ভাবে আহত হয়। তথাপি কোম্পানীর মঙ্গল চেষ্টায় তাহার বিরতি থাকে না। কানপুর অবরোধের প্রথমাবস্থায় গোলার আঘাতে ভবানী সিং নিহত হয়। তখনও তাহার অধীনস্থ শতাধিক সিপাহী ও কয়েকজন বেসীর অধিবাসী অবরুদ্ধ কোম্পানীর সৈন্যের সঙ্গে সিপাহীর বিরুদ্ধে একযোগে যুদ্ধ করে। খাদ্য ও পানীয়ের অভাব ঘটিলে কোম্পানী তাহাদিগকে স্বদেশে প্রেরণ করে। তাহারা নিতান্ত অনিচ্ছায় কোম্পানীর সঙ্গ ত্যাগ করে।"

"গুলির আঘাতে ডাঃ উড্ (৩৫নং সৈনিকদলের চিকিৎসক) অন্যান্য ইয়োরোপীয় নরনারী সহ পলায়ন কালে পথে তাহাদের ভীষণ ক্লেশ ও দুর্দশা এবং তাহা দেখিয়া বিভিন্ন গ্রামের গ্রামবাসীদের, রাজপুত নারীর, এমন কি মজুরদেরও তাহাদের প্রতি ঐকান্তিক সহানুভূতি-প্রদর্শন, আশ্রয় দান ও সেবাশুশ্রূষা-করণ সিপাহী-যুদ্ধের অপরূপ চিত্র।"

"অনেক-জননী নিহত, অসহায় তাঁহাদের শিশু-সন্তানের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে এক হিন্দু দাসী। কানপুরের অবরুদ্ধ ইয়োরোপীয়গণ আত্মসমর্পণ করিলে আত্মসমর্পণের সর্তমত যখন তাহারা গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া কানপুর ত্যাগের জন্য নৌকারোহণে উদ্যত অকস্মাৎ সর্ত ভঙ্গ করিয়া তাহাদের উপর চারিদিক হইতে গুলি বর্ষণ হইতে থাকে। আক্রান্তিতের মধ্যে দাসী সহ শিশুটিও ছিল। দাসীকে বুকের মধ্যে লুকাইয়া দাসী দৌড়াইতে আরম্ভ করে। সিপাহীরা তাহাকে ধরিয়া ফেলে এবং তরবারী দেখাইয়া শিশুকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে আজ্ঞা দেয়। দাসী দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'আমি বাঁচিয়া থাকিতে তাহা হইবে না। তোমাদের তরবারি আছে, আমার ভগবান আছে। তাঁহার কাছে আমি অবিশ্বাসিনী হইতে পারিব না।' দুর্বৃত্তের দল তাহাতে রুষ্ট হইয়া তরবারির মুখে বিদ্ধিয়া তাহাকে হত্যা করে। হত তাহাকে হইতে হইবে জানিয়াও কর্তব্যপরায়ণা নারী কর্তব্যপথ হইতে বিচলিতা হয় নাই।"

এলোমেলো ভাবে কয়টি ঘটনার কথা মাত্র উদ্ধৃত হইল। এ প্রকারের অসংখ্য ঘটনার কথায় সূর্য্যকুমারের ডায়েরী পরিপূর্ণ। উদ্ধৃত কয়টি ঘটনা হইতেই সিপাহী-যুদ্ধ-কালে ভারতীয় জনসাধারণের (ঘোর প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও) প্রকৃত মনোভাব প্রতীয়মান হইবে। বালকের পক্ষেও যাহা সহজে বোধগম্য 'সাভস্ ঐতিহাসিকে'র হৃদয় তাহা স্পর্শ করে না—তাহারা যে জাগিয়া ঘুমায়, গভীর উদ্দেশ্য লইয়া। সূর্য্যকুমারের এই ডায়েরীর কথা যখন তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ জানিতে পারেন, সিপাহী-যুদ্ধের এই স্বরূপ চিত্র পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য তাঁহারা তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তাহা তিনি না করায় 'সিপাহী যুদ্ধে'র গ্রন্থকার যোগেন্দ্র বাবু তাঁহার শরণাপন্ন হন, তাঁহার গ্রন্থের জন্য মালমশলা লইতে। সূর্য্যকুমার সানন্দে তাহা তাঁহাকে দেন, তবে যোগেন্দ্র বাবুকে প্রতিশ্রুতি দিতে হয় তিনি সূর্য্যকুমারের নামগানও তাঁহার গ্রন্থে করিবেন না। এ প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে যোগেন্দ্র বাবু পালন করিয়া গিয়াছেন। 'সাভস্ ঐতিহাসিক'দের সন্দেহ নিরাকরণার্থ প্রত্যক্ষদর্শী সূর্য্যকুমারের সিপাহী-যুদ্ধের অভিজ্ঞতার বিবরণ তাঁহার স্বনামে প্রকাশিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উদ্ধৃতাংশ অনুকূল হওয়াতেই 'সিপাহী-যুদ্ধের নূতন কথা'র অবতারণা।

বলা বাহুল্য ইহার অধিকাংশ কথা পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। সুধাকুমার যাহা লিপিবদ্ধ করেন, লর্ড ক্যানিং-এর পত্রাদি ও ডেস্‌প্যাচে বর্ণিত বিবরণ তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করে, পাঠক-পাঠিকা তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সাতাইশ বছরের অপ্রকৃত ঘটনার সমাবেশে সৃষ্ট 'ইতিহাস'-এর মূল্য কতটুকু সুধাকুমারের ডায়েরী পাঠে তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না। দুঃখের বিষয় আর্থার ক্রিস্টোফার বেন্‌সন ও ভাইকাউন্ট এশারের সম্পাদনায় তাঁহাদের গ্রন্থে এই অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে যে :

"Summary vengeance was inflicted on the sepoy rebels which gave rise to some criticism of our troops for inhumanity ; but Lord Canning, the Governor-General, was no less severely blamed for his clemency ; and the general verdict was in favour of the measures adopted by the military and civilian officers whose zeal and capacity suppressed the Mutiny."

ভারতীয়ের বিশ্বস্ততা, সাম্রাজ্যদানে ভারতীয়ের আন্তরিকতা, নিজ নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া বিপন্নকে তুচ্ছ জ্ঞান করা সব ভাসিয়া গেল। চীন দেশে প্রেরিত ব্রিটিশ সৈন্য অর্ধ পথ হইতে ভারতে আনিয়া কেনা, কেপ্‌ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ৪০,০০০ হাজার সৈন্যবাহিনী সরাসরি ইংলণ্ড হইতে ভারতে আনা বৃথা হইত, যদি অধিকাংশ ভারতীয়ের বিশ্বস্ততা ঘোর পরীক্ষার মধ্যেও অটুট না থাকিত। সুধাকুমার বারবার ইহা বলিয়াছেন। তিনি আরও প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, মিলিটারি ও সিভিলিয়নের 'জিল্‌' (zeal) এবং 'কেপাসিটির' (capacity) বাড়াবাড়ি যদি না হইত সিপাহী-যুদ্ধ কোরকেই বিনষ্ট হইত—ভারতীয় বন্ধু-বর্গের সাহায্যে এবং লর্ড ক্যানিং-এর 'ক্লেমেন্সির'(clemency) ফলে। অতো 'জিল্‌' ও 'কেপাসিটির' ধাপ্পটেও বন্ধু বিগড়ায় নাই বলিয়াই সাত সমুদ্র তের নদীর পার হইতে সৈন্য আমদানি করার সময় পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কৃতজ্ঞতা তো দূরের কথা, এ সকল কথার উল্লেখ মাত্র 'নামজাদা' অনেক 'ইতিহাসে' নাই। এ সম্বন্ধে লর্ড ক্যানিং মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে একখানি পত্রে লিখেন :

"But the cry ( of vengeance ) is raised loudest by those who have been sitting quietly in their homes from the beginning and have suffered little…"

লর্ড ক্যানিং-এর আর একখানি পত্রপাঠে জানা যায় 'জিল্‌' ও 'কেপাসিটি'র সমর্থন বা লর্ড ক্যানিং-এর 'ক্লেমেন্সি'র অভিযোগে কর্ণপাত মহারাণী করেন নাই। পত্রাংশ এইরূপ :

"However certain Lord Canning might have been as to the sentiments with which Your Majesty would view the spirit of bitter and unreasoning vengeance against Your Majesty's Indian subjects with which too many minds are imbued in England as well as in this country, it has been an indescribable pleasure to him to read what Your Majesty has condescended to write to him upon this painful topic. Your Majesty's gracious kindness in the reference made by Your Majesty to what is said by the newspapers is also deeply felt by Lord Canning. He can truly and conscientiously assure Your Majesty of indifference to all such attacks—an indifference so complete indeed as to surprise himself."

লর্ড ক্যানিং-এর মনে এই অনুযোগের ভাব না জন্মাইলে সিপাহী-যুদ্ধের পরিণতি হয় তো অন্যরূপ হইত। সুধাকুমার জানাইয়াছেন : "লর্ড ক্যানিং-এর অকৃত্রিম আন্তরিকতার ওপরে শত অসুবিধা, শত অপমানের মধ্যে ভারতীয়ের সঙ্গে বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটে নাই। সভ্যতার শিখরে একদা উপবিষ্ট ভারত 'কিল খাইয়া কিল চুরি' করিয়াছিল।"

যুদ্ধাবসানে শান্তি পুনঃস্থাপিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মহারাণীর ঘোষণা ( Proclamation ) ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়। তাহাতে আশার বাণী অনেক থাকে। সেই সূত্রে মহারাণী লর্ড ক্যানিংকে লিখেন :

"It is a source of great satisfaction and pride to her to feel herself in direct communication with 'that enormous Empire which is so bright a jewel of her Crown and which

she would wish to see happy, contented and peaceful."

সিপাহী যুদ্ধ-কালে কোম্পানীর মারফৎ রাজ্যপরিচালনার নানা অসুবিধা অনুভূত হয় তাঁহারও। 'জিল্' ও 'কেপা-সিটি'র মাত্রার ন্যূনতাই তাঁহার কাম্য হয়। সেই কারণে সরাসরি (direct) তাহা পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে পারিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা থাকে না। তিনি এ কথাও বুঝিতে পারেন, সিপাহী-যুদ্ধ হেতু তাঁহার নীতি অন্যায্য কঠোরতর না হওয়াতে এবং তাহা করিতে তাঁহার স্বদেশবাসী বন্ধুরা বার বার অনুরুদ্ধ হইলেও তিনি তাহাতে কর্ণপাত না করায় তাঁহারা সকলেই তাঁহার প্রতি বীতরাগ—জাতিকে এত বড় বিপদের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াও লর্ড ক্যানিংকে যোগ্যভাবে সমাদর করিতে তাঁহারা অনিচ্ছুক। তাই তিনি স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া তৎকালীন মন্ত্রী লর্ড পাল্মার্স্টনকে লিখেন :

"The Queen thinks that the time is come when the bestowal of some honour or reward on Lord Canning ought no longer to be delayed, If any man deserved an acknowledgment of his services at the hands of the Crown, it is surely he....."

লর্ড ক্যানিংএর নীতি 'পাঁচ ভূতের' মনোমত না হইলেও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার যে সম্পূর্ণ মনোমত হইয়াছিল, এই পত্রে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। "সঙ্কট কালে বহু হিন্দু মুসলমানের কোম্পানীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সঙ্কট হইতে উদ্ধারের বিধিমত চেষ্টা করা তিনি প্রত্যক্ষ করেন—তাঁহার নীতি অবলম্বিত নীতি হইতে পৃথক হইতে পারে কি?" সুধাকুমার তাঁহার ডায়েরীর শেষ ভাগে অভিমত করিয়াছেন। চোখে দেখা এবং কাণে শোনার প্রভেদ আছেই। ইহার উপর 'শোনা কথা' বিকৃত করিয়া বলা—আর যাহাই হউক, ইতিহাস নহে।

"সিপাহী-যুদ্ধের নূতন কথা"র অবশিষ্ট যাহা রহিল, পরবর্ত্তী প্রবন্ধে তাহা সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা রহিল।

---

# ত্রিশঙ্কু

—শ্রীহরিপদ ঠাকুর

বন্ধুনারি যে'টা করিয়াছি সে ত'—
ফিরান হ'য়েছে দায়,
আপনার ভুলে আপনি প'ড়েছি
কণ্টক বেড়ি পায়।

আফিসে মাসের তারারে মাত্র
কুড়িটী টাকা ত পাই,
জনক-জননী ঘরের গৃহিণী
খুদি তাতে কেহ নাই।

জননী চাহেন রাখিতে আমারে
স্নেহের আঁচলে ঢাকি,
গৃহিণী চাহেন গহনা দি' আর
মুখমুখি হয়ে থাকি।

মনিবে টানেন আফিসে বসিয়া
জনক-জননী ঘরে—
নিশীথে প্রেয়সী ভুলায়ে বন্ধন
মানে থাকে পাশ ফিরে।

জননী বলেন, পুত্র আমার
অন্যের কেহ নয়,
গৃহিণী বলেন, সোয়ামী আমার
কারে করি আমি ভয়।

অফিসার বলে চাকর আমার
আমারি অন্নবাস,
আমার স্বত্ব নাহি থাকে যদি
গোলামে কে বারমাস!

সকলেই বলে এ দিকে তাকাও
চোখে কি দৃষ্টি নাই,
কোন্ দিকে চাই এ পোড়া নয়নে
এ যে বড় জ্বালা ভাই।

সবারি স্বত্বে আমি সম্পদ্
সবে করে টানাটানি,
এ'র— কোনটার মাঝে আমি ত্রিশঙ্কু—
রব শুধু মনে গণি॥

---

# আগুন-খাকীর মাঠ

—শ্রীধরণী ভট্টাচার্য্য

কে যে কবে ইহার নামকরণ করিয়াছিল জানি না, তবে ছোটবেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি আগুন-খাকীর মাঠ। যে-ই রাখিয়া থাকুক, নামটার সঙ্গে ইহার সামঞ্জস্যের অভাব হয় নাই। সারা মাঠখানা যেন আগুনে পুড়িয়া খাক হইয়া গিয়াছে। বৈশাখ মাসের দারুণ রৌদ্রে এই মাঠ পার হইতে গিয়া পুড়িয়া ঝলসাইয়া যাইতে হয়।

বড় রাস্তাটা বরাবর গ্রামের শেষ সীমানায় আসিয়া মাঠের কাছে নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া আগুন-খাকীর বুকের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জানা না থাকিলে ইহার যে-কোন একটা ধরিয়া আগাইয়া গেলে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার ঠিক সেই যায়গায় ফিরিয়া আসিতে হইবে। পৃথিবীটা যে গোলাকার তাহা এই মাঠের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এখানে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেও কাহারও সাড়া মিলিবে না। যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু ধূ ধূ করিতেছে মাঠ আর মাঠ। মাঝে মাঝে কোথাও দু'একটা বাবলা গাছ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাতাসের সঙ্গে মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া এ উহাকে যেন ইসারায় ডাকিয়া লইতেছে। ইহা ছাড়া কোথাও সবুজের রেখামাত্র চোখে পড়ে না। অতি দূরে দিক্‌চক্রবালে বনানীর অস্পষ্ট ছায়াটুকু শুধু একটা কাল প্রলেপের মত দেখা যায়। চির-শ্যামলা বঙ্গভূমির বুকের উপরে আগুন-খাকীর মাঠখানা যেন উদ্ধত স্বেচ্ছাচারের মত হাত পা ছড়াইয়া পড়িয়া আছে।

সূচি-পাড়ার ভিতর দিয়া যে রাস্তাটা বরাবর দক্ষিণে আসিয়া মাঠের বুকে নামিয়া গিয়াছে, শহরে বা কাছারীতে যাইতে হইলে এইটাই তাহার একমাত্র রাস্তা। সারাদিন লোকে এই আগুন-খাকীর রাস্তা ধরিয়াই যাতায়াত করে। সন্ধ্যার পর ডাকাতের ভয়ে এ রাস্তায় বড় একটা কেউ হাঁটে না। দরকার বেশী পড়িলে পাশের গ্রাম ঘুরিয়া সোনা-মুখীর বালুচর দিয়া যাইতে হয়। কত অজ্ঞাত পথিকই যে এই আগুন-খাকীর বুকের উপর দস্যুর হাতে প্রাণ হারাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। গ্রামের কেহ শহরে বা কাছারীতে গেলে বেলা থাকিতে থাকিতে আগুন-খাকীর মাঠ পার হইয়া আসে।

সে-দিনের কথা। সুরেন গোমস্তা আসিতেছিল কুসুম-পুর হইতে খাজানা আদায় করিয়া। ভয়ের কারণ ছিল, সঙ্গে কাঁচা টাকা রহিয়াছে। সুটু মল্লিকের বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় হিসাব করিয়া দেখিল, যে-সময় আছে তাহাতে আগুন-খাকীর মাঠ পার হইয়া যাইতে পারিবে। চলিতে চলিতে পথে দুই একজনের সহিত কথা কহিতে কহিতে দেরী হইয়া গেল। সেদিকে সুরেনের খেয়াল ছিল না। আগুন-খাকীর মাঝামাঝি আসিয়া সন্ধ্যা হইয়া গেল। তখন আর ফিরিলেও যা আগাইলেও তাই। সুরেন কম্পিত বুকে আগাইয়া চলিল। তাড়াতাড়ি চলিয়াছে সুরেন, আর একটু যাইতে পারিলেই ঘরে মুচির খোঁয়াড় দেখিতে পাইবে। আর ভয় কি! দূর হইতেই সুরেন হাঁকিতে হাঁকিতে চলিল, "হরে বাড়ী আছিস না কি রে—হরে। আরে কে যায় ও, প্রিয়নাথ নাকি!" কোথায় বা হরে আর কোথায় বা প্রিয়নাথ! যে যাইতেছিল সে হঠাৎ চট্ করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া পিছন হইতে একগাছি সরু দড়ির ফাঁস বাহির করিয়া সুরেনের মাথা লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া দিয়াই একটা টান দিল। সুরেন আগে হইতেই আতঙ্কে অর্দ্ধমৃত হইয়াছিল, "বাবা রে" বলিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই আর একটা টানে ফাঁস টা তাহার গলায় আঁটিয়া বসিয়া গেল। আততায়ী ততক্ষণে সুরেনকে ফেলিয়া ফাঁসটা আরও একটু টানিয়া দিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে টাকাকড়ি সমস্ত বাহির করিয়া লইয়া আততায়ী সুরেনের গলা হইতে ফাঁসটা খুলিয়া লইতেই এক ঝলক রক্তের সঙ্গে দেহটা একটু নড়িয়া উঠিয়াই নিস্পন্দ হইয়া গেল।

করিম মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করিয়া উঠে। কেন, বিশের অভাব এখন তাহাদের? বাপ-বেটার দুইটা মরদে খাটিয়া যাহা উপার্জ্জন করে, বাপের এই পৈশাচিক উপায়ে উপার্জ্জিত অর্থ হইতে কম হইলেও ইহাতেই তাহাদের সুখে কষ্টে

সংসার চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু আফরকে বুঝাইয়াও সে এ-পথ ছাড়াইতে পারে নাই।

করিম তো কতদিন বলিয়াছে—"সারাডা জীবনডোরই তো উওই করলে, অখুন তো আর ভাত-কাপড়ের দুস্‌চু নেই—অখুন ও পথডা তুমি ছাড়ান দেও বাপজান।"

আফর পুত্রের সদুপদেশে খাপ্পা হইয়া বলে—"আরে থো' বেটা সুমুন্দির-পো।—কড়ড়্ কড়ড়্ করিস সে, ছেরডা কাল উওই করে কেটিয়ে আলাম, সুমুন্দির বাই আমার সবরং শেখাইচে"—বলিয়া কড়ড়্ কড়ড়্ করিয়া হুঁকাটা টানিতে থাকে।

রাবেজান বিবি গোপনালে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া স্বামী-পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া ব্যাপারটা বুঝিবার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া রাবেজান বলে—"আইজ আবার যাবা নাকি?"

আফর মুখখানা বিকৃত করিয়া খেঁকাইয়া উঠে—"জানে না যেন, ন্যাকা মাগী"—বলিয়া বাতা হইতে ফাঁসগাছা পাড়িয়া হাতে ঝুলাইয়া বাহির হইয়া পড়ে।

ঘরের সামনের জমিটুকুতে সেদিন লাঙ্গল দিতে দিতে আফর করিমের দিকে চাহিয়া বলিল, "ছেলে দুটোরে এবার বেচে ফ্যালাব—একেবারে বুড়ো হয়ে গিয়েছেন, বোঝাল মুটে টানতেই পারেন না, শহরের তোঁরা মোড়ল তো কিনবে বলেলো,—একবার ওবসর করে শহরে যা কানে?"

করিম বুড়ো আঙুলের ডগায় কপালের ঘামটা মুছিয়া ফেলিয়া, ফেলের ন্যাজটা মোচড়াইয়া দিয়া জিহ্বা ও তালুর সংযোগে, 'টক্' করিয়া একটা শব্দ করিয়া বলিল—"এবার ছ্যানব্বোর দিন যখুন শহরে গিয়েলাম, তখুন তো অনেক করে বলে কয়ে ঐ দেড় কুড়িতেই তো আজিও করেলাম,—তা তুমিই তো বললে..."

বাধা দিয়া আফর বলিল, "তেখুনকার কথা ছাড়ান দে, ট্যাহা-পয়সার বেজায় টানাটুনি পড়েছেন অখুন, তা কালই তুই একবার যা, মোড়লের পো যদিন ঐ দেড়-কুড়িতেই আজি হয় তবে ফেলে দুটো অখুন বেচেই ফ্যালাই, কি কস? যাবি কাল? সাঁঝে থাকতি থাকতি ফিরে আসিস্ কেনে?"

করিম ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে কালই শহরে যাইয়া ফেলে দুইটার বন্দোবস্ত করিয়া আসিবে। শহর সেখান হইতে মাইল-আটেকের পথ হইবে। সেখানে ভোঁরা মোড়লের গুড়ের কারবার, তিন খানা গাড়ী বোঝাই হইয়া গ্রাম হইতে গুড় লইয়া দিন রাত শহরে যাতায়াত করিতেছে। আফরের বলদ দুটো কিনিবার প্রস্তাব সে ই প্রথম করে। চার কুড়ি টাকায় বলদ কিনিয়া দেড় কুড়ি টাকায় বেচিয়া ফেলিতে আফরের তখন মন লয় নাই। আজ কয়েক মাস হইতে অর্থের টানাটানি, তাহার উপর বলদ দুটাও যেন কেমন অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। লাঙ্গল টানিবার শক্তি না থাকিলেও ফেলে দুটাকে দিয়া গাড়ী টানান চলিতে পারে।

সত্যই টানাটানি পড়িয়াছে আফরের। শিকার তাহার একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তবুও নিত্যকার অভ্যাস মত আফর ফাঁসগাছা হাতে লইয়া আগুন-খাকীর মাঠে বাবলা গাছটার নীচে ঘাপটী মারিয়া বসিয়া থাকে।

মোড়লের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া করিমের হঠাৎ বাপজানের কথা মনে পড়িয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আফর তাহাকে ফিরিতে বলিয়াছিল, এ দিকে রাত্রি হইয়া গেল। বাপজান এখনও তাহাকে ছেলেমানুষ ভাবিয়াছে না কি! অন্ধকারে এইটুকু রাস্তাই যদি না সে যাইয়া দিতে পারে, তবে আর তাহাকে চাষ করিয়া খাইতে হইবে না। করিম নিজের সম্বন্ধে বাপজানের অজ্ঞতার পরিচয়ে মনে মনে অনুকম্পার হাসি হাসিল।

আপন মনে চলিতে চলিতে করিম ভুলিয়া গিয়াছে কাছেই বাপজান তাহার কোথায় না কোথায়ও ওঁত পাতিয়া আছে। করিম ভাবিতেছে মোড়ল দেড়কুড়িতেই রাজি হইয়াছে। কালই শহরে যাইয়া বলদ দুটা সে বেচিয়া আসিবে। আপাততঃ টানাটানিটা তো কিছুটা মিটিবে।

সহসা ধড়ির শব্দ একটা ফাঁদ করিমের মাথার উপর গলিয়া আসে। হাত দিয়া ধরিবার পূর্ব্বেই আফরের একটা টানে ফাঁসগাছি গলায় আর একটু চাপিয়া বসিল। করিম বুঝিতে পারিয়া প্রাণপণ শক্তিতে গোঙাইয়া গোঙাইয়া বলিতে চেষ্টা করিল, "বাপজান আমি যে,...ও... ও...অপ্ ..." করিমের কথা আর শেষ হইতে পাইল না, আর একটা

টানে ফাঁসটাকে আরও একটু আঁটিয়া দিয়া, করিমকে মাটীতে ফেলিয়া বিকট অট্টহাসি হাসিয়া আক্কর বলিল, "ঠেলায় পড়লি অমুন দশাই বাধা বলেন।"

কিন্তু আতিপাতি করিয়া করিমের সমস্ত দেহ অনুসন্ধান করিয়াও যখন একটি আধলাও আক্কর বাহির করিতে পারিল না তখন করিমের মৃতদেহটা "ধুর শালা" বলিয়া পায়ের একটা ঠেলা দিয়া সরাইয়া দিয়া ফাঁসগাছা হাতে করিয়া চলিয়া গেল।

দাওয়ার উপর উঠিতেই রাবেজান ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—"আলে গো, করিম তো অখুনও আলো না।"

অন্যমনস্ক ভাবে আক্কর দড়িগাছা বাতার উপরে গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল, "কেনে সিয়োলো কোতানে?" চিন্তিত মুখে রাবেজান বলিল, "সেই কোন য্যান বেলায় শহরে সিয়োলো।"

রাবেজানকে আর কিছু বলিতে হইল না, আক্করের এক সঙ্গে সমস্ত কথা মনে পড়িয়া গেল। চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, "বলিস্ কি," বলিয়া দাওয়ার উপর হইতে কুপীটা তুলিয়া লইয়াই "ওরে রাবেজান সর্ব্বোনাশ হইছে রে," বলিয়াই এক লাফে দাওয়া হইতে নামিয়া পড়িয়া আগুন-খাকীর মাঠের দিকে ছুটিতে লাগিল। পিছনে পিছনে রাবেজান কিছু দূর ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কনে যাওলো অমুন করা।,"—ততক্ষণে আক্কর মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়িয়া অদৃশ্য হইয়াছে।

বাতাসে কুপীটা বুঝি নিবিয়া যায়। কাপড়ের ভিতর আড়াল করিয়া বাতাস হইতে কুপীটাকে কোন রকমে বাঁচাইয়া আগুন-খাকীর বুকের উপর দিয়া ছুটিয়া চলে আক্কর। নির্দ্দিষ্ট জায়গায় আসিয়া আতিপাতি করিয়া খুঁজিয়া ও করিমের মৃত-দেহটা সেখানে দেখিতে পাইল না। আশার একটুখানি আলো আক্করের মনের মধ্যে চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিল। হয়তো করিম এখনও বাঁচিয়া আছে!

হঠাৎ ওধারের বাবলা গাছটার নীচে মনে হইল যেন দুইটা শেয়ালে কি একটা লইয়া টানাটানি করিতেছে। আক্কর ছুটিয়া যাইতেই শেয়াল দুইটা খ্যাক খ্যাক করিয়া ছুটিয়া পলাইল। ব্যাকুল আগ্রহে আক্কর করিমের মৃতদেহের মুখের উপর কুপীটা তুলিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, "করিম রে!"

একটা ঝাপটা বাতাসে কুপীটা নিবিয়া গেল। আগুন-খাকীর মাঠখানা যেন আক্করকে ভেংচাইয়া উঠিল, "রে···এ···এ···এ!"

---

## প্রকৃত মানুষ

...বর্ত্তমান সময়ে যখন প্রত্যেক দেশে, সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোকের মধ্যে অসন্তোষগ্রস্ত ও বেকার লোকের সংখ্যার প্রাচুর্য্য এত বেশী এবং ক্রমশঃই তাহা আরও বাড়িয়া যাইতেছে, তখন নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে, এখন আর প্রকৃত ঋষি, প্রকৃত ব্রাহ্মণ, প্রকৃত ক্ষত্রিয়, প্রকৃত বৈশ্য অথবা প্রকৃত অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ-সমস্যার নাই এবং প্রকৃত জ্ঞান ও বিজ্ঞান জগৎ হইতে লোপ পাইয়াছে। বস্তুতঃ এখন কাহারও অনাবৃষ্টি বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে, তাহা তাঁহার পক্ষে অপমানকর বিবেচিত হয় এবং যাঁহারা নিজেদিগকে ঋষি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বলিয়া প্রচারিত করেন, তাঁহাদিগকে ঐ ঐ নামের অভিধেয় বলা যাইতে পারে। অভিধা হইলেও তাহা যথার্থ সত্য। যে দেশে অগণিত অনাবৃষ্টি প্রত্যেকে অত্যধিক অন্নাভাবে ক্লিষ্ট, যেখানে যুবকগুলি জীবিকার্জ্জন-ক্ষেত্রের সন্ধান পায় না, অথবা কর্ম্মের পরিশ্রম করিয়াও সুখে, শান্তিতে দিনাতিপাত করিতে পায় না, প্রত্যেক লোক অসন্তুষ্ট, অসুখী এবং অকালমৃত্যুর কবলে পতিত হয়, সেই দেশে যদি কোন মানুষ নিজেকে বুদ্ধিমান্, পণ্ডিত অথবা কার্য্যকুশল বলিয়া মনে করেন অথবা প্রচার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কি বুদ্ধিমত্তার, পাণ্ডিত্যের অথবা কার্য্যকুশলতার অভিনয়কারী ভণ্ড বলা যায় না?

আমরা যারা বুদ্ধিহীন অকুণ্ঠচিত্তে বলিতে হয় যে, এখন আর আমাদের প্রকৃত বুদ্ধিমান্, প্রকৃত পণ্ডিত অথবা প্রকৃত কার্য্যকুশল লোক আছেন, তাহা মনে করিবার কারণ নাই।...

# পাবনা-পরিচিতি

—শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার

রাজা দেবীদাস

বর্ত্তমান পাবনা জেলা সেন-রাজগণের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাবনা জেলার রাধানগর থানার অধীন মাধাইনগরে যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, রাজা লক্ষ্মণ সেন জনৈক ব্রাহ্মণকে মাধাই নগর, চড়িয়া, তাড়াশ প্রভৃতি অঞ্চলে ব্রহ্মত্র ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই জেলায় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের সামাজিক ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলেও জানিতে পারা যায় যে, ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তৎকালে বঙ্গের প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট্ বল্লাল সেন প্রবর্ত্তিত কৌলীন্য-মর্য্যাদা অবহেলা ও উপেক্ষা করিয়া স্বীয় স্বাধীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সমাজশক্তির উপর রাজশক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে দেন নাই।

বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাসে আলোচনা করিলে জানা যায়, ভীম ওঝা সম্রাট্ বল্লাল সেনের পুরোহিত ছিলেন। গৌড়নগরের নিকট কালিয়া গ্রামে তাঁহার বসতি ছিল। তাই তাঁহার বংশধরগণ আপনাদের "কালিয়া বংশ" বলিয়া পরিচয় দেন। বল্লালের সংস্রব ত্যাগ করিয়া তিনি পাবনা জেলায় ছাতক গ্রামে বসতি করিয়াছিলেন। তিনি যখন পূর্ব্ববঙ্গে বাড়ী করিয়াছিলেন, তখন পূর্ব্বাঞ্চে আর কোন শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন না। এজন্য তাঁহাদিগের বাঙ্গাল ওঝা নামে পরিচিত হইতেন। তাঁহার পৌত্র অনন্ত রায় বাঙ্গাল ওঝা, রাজা লক্ষ্মণ সেনের গুরু ছিলেন। তিনি সিন্দুরী ও শাখিনী (দুইটি পরগণাই পাবনা জেলার অন্তর্গত) এই দুইটি পরগণা নিষ্কররূপে গুরুদক্ষিণা পাইয়া বহুসংখ্যক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এই স্থানে স্থাপনা করিয়াছিলেন।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করিয়া বাবর দিল্লীতে মোগল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেও, ১৫৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশ পাঠান সুলতান বা সর্দারগণের করতলগত ছিল। কখন সুরবংশীয়, কখন কররাণী বংশীয় পাঠানগণ কেহ গৌড়ে, কেহ রাজমহলে, কেহ তাণ্ডায় রাজধানী সংস্থাপন করিয়া স্বাধীনভাবে বঙ্গদেশ শাসন করিতেন। রাজ্যমধ্যে হিন্দু মুসলমান সামন্ত নরপতিগণ প্রকৃত প্রস্তাবে দেশ-শাসন কার্য্য পরিচালন করিতেন—পাঠান সুলতানগণ কেবল মাত্র রাজস্ব পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। এই সমস্ত সামন্ত নরপতিগণ পরে 'বারভূঞা' বা ভৌমিকী শাসন-প্রথা প্রবর্ত্তন করেন।

নবাবগণ হিন্দু জমিদারগণকে বিচ্যুত করিয়া পাঠান সর্দারগণকে জমিদারী দিতে পারিতেন, কিন্তু বাঙ্গলাদেশ নদী, হ্রদ, বিল ও জঙ্গল দ্বারা পূর্ণ ছিল। অল্পসংখ্যক পাঠান সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়িলে হিন্দুগণকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল। অধিকসংখ্যক পাঠান সৈন্য প্রেরণ করিলেও তাহার ব্যয় বহনেই আদায়ী কর নিঃশেষিত হইয়া যাইত, নবাব সরকারে মালগুজারী দিতে পারিত না। বাকীর জন্য পীড়াপীড়ি করিলে বিদ্রোহী হইত। শুধু তাই নয়, বাঙ্গলা দেশের জলবায়ুকে দিল্লী ও রাজধানীস্থিত কর্ম্মচারীগণ বড় ভয় করিতেন—লোকে ঊর্দ্দু কি হিন্দি বুঝিত না, কাজেই রাজকর্ম্মচারীদিগকে শাস্তি দিবার জন্য অনেক সময়ে বাঙ্গলায় প্রেরণ করা হইত।

১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে শের শাহের পুত্রগণকে বিতাড়িত করিয়া বিহারের শাসনকর্ত্তা কররাণী বংশের সুলেমান কররাণী বাঙ্গলার সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি গৌড় হইতে রাজমহলের নিকট তাণ্ডা নগরে বাঙ্গলার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

এই সময়ে পাবনার পূর্ব্বাঞ্চলে "কালিয়া" বংশের ভূঞা রাজা দেবীদাসের অভ্যুদয় হয়। তিনি সুলেমান কররাণীকে কর দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন। বাঙ্গলার তাঁহার রাজধানী ছাতক আক্রমণ করিবার জন্য একদল সৈন্য সেনাপতি উমরের অধীনে প্রেরণ করেন। উমরের সৈন্যগণ আকড়ার উত্তরে বিস্তৃত মাঠে ছাউনি ফেলে—সেই হইতে ঐ মাঠকে লোকে 'ঘোড়াবাধার' মাঠ নামে অভিহিত করিয়া থাকে। রাজা দেবীদাস মন্ত্রীদের সঙ্গে নানা যুক্তি-পরামর্শের পর নবাব-সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র কার্ত্তিক রায় সেনাপতি হইয়া নবাব-সৈন্যের সম্মুখীন

হইলেন। দেবীদাসের বহু নৌ-সৈন্য ও তৎকালীন যুদ্ধোপযোগী নৌ-বহর ছিল। রাজা দেবীদাসের নৌ-বহরের কেন্দ্রস্থল এখনও পাবনার "সাঁথিয়া-বেড়ী" রাস্তার পূর্ব্বে "গাজ-ভাঙা" বিলের মধ্যের টিলার চিহ্নরূপে বর্ত্তমান আছে। উক্ত টিলা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী 'গড়পার' হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, উহা এক কালে একটি নৌ-কেন্দ্র ছিল।

রাজা দেবীদাস তাঁহার কোশা ছোট নৌকা ও জমিদারী সৈন্য লইয়া তিন দিন তিন রাত্রি অবিশ্রান্ত যুদ্ধ পরিচালনা করিলেন। তিন দিন পরে নবাবের সৈন্য অতি কষ্টে জয়লাভ করিল। কার্ত্তিক রায় বীরের মত যুদ্ধ করিতে করিতে রণক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করিলেন। যুদ্ধের পর নবাব-সৈন্য রাজকোষ, মণিরত্ন সব লুণ্ঠন করিতে লাগিল। রাজপরিবারের মেয়েরা দেখিলেন যে, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করার চেয়ে বিষপানে জীবন বিসর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ। তাঁহারা সকলে অনশন ব্রত করিয়া জীবন শেষ করিলেন

রাজপুত্রদের মধ্যে ঠাকুর কেশবনাথ রায় ও ঠাকুর কালীনাথ রায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্তান পাবনা জেলার আমিনপুরের মিত্রা ও ঢাকা জেলার এলাচিপুরের মিত্রা।

কিন্তু রাজার আর তিনটি পুত্রকে পাওয়া গেল না। রাজার প্রভুভক্ত নাপিত 'ভোলা' তাহার নিজ তিনটি পুত্রকে রাজার পুত্রের পরিচয় দিয়া নবাব-সৈন্যাধ্যক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিল। প্রভুভক্ত নাপিতের কৃপায় রাজপুত্র—ঠাকুর কালিদাস, ঠাকুর চণ্ডীদাস ও ঠাকুর নরোত্তম দাস—রক্ষা পাইলেন। তাই এখনও এই বংশধরগণ নাপিতের সম্মান রক্ষার জন্য নিজেদের 'নাপ্‌তে কালাই' বংশ বলিয়া পরিচয় দেন।

বর্ত্তমান সময়ে পাবনা জেলার বাগ, কাশীনাথপুর, কেতুপাড়া, শঙ্করপাশার রায়গণ পূর্ব্বোক্ত ঠাকুর কালিদাসের সন্তান, কাবারিখোলার মল্লিক, ভারেঙ্গার চৌধুরী, হাটুরিয়ার রায়গণ চণ্ডীদাসের সন্তান, এবং সাঁড়াসিয়া, বেলতৈল, ব্রাহ্মণগ্রাম, সাকরা, বাগমারা ও এলাসিনের রায়গণ নরোত্তমের বংশধর বলিয়া খ্যাত।

ছাতক এক্ষণে একপ্রকার জনশূন্য জঙ্গলাকীর্ণ পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। ছাতক গ্রাম সংলগ্ন বরাটও একটী প্রাচীন গ্রাম। ছাতক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষের বহু লাখেরাজ নিষ্কর ভূমি প্রদানে নবাব এখানে স্থায়ীভাবে তাহাদের প্রতিষ্ঠিত করেন। বর্ত্তমানেও ছাতক বরাট প্রভৃতি স্থানে বহু সাহা আদি হিন্দু বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারা বোধ হয় তৎকালীন ব্যবসায়ীদের বংশধর।

পাবনা জেলার কালিয়া বংশের বহু বংশধর আছেন বিধায় তাহার বংশতালিকা প্রদত্ত হইল।

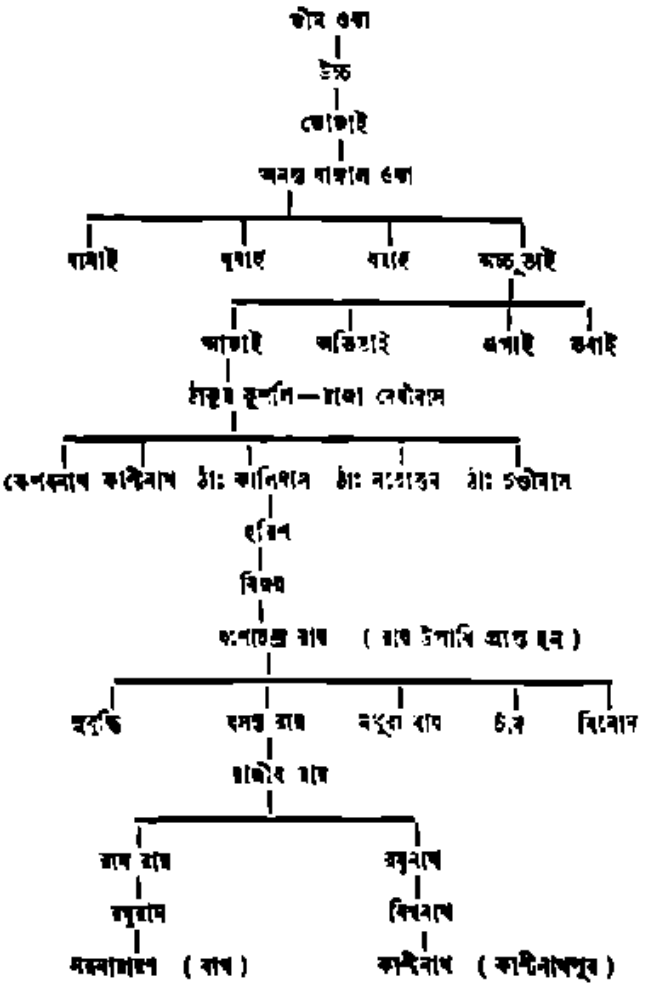


## বেণীরায়

বেণীরায় রাজা দেবীদাসের সমসাময়িক। গৌড় বাদশাহ দাউদের সময়ে বরেন্দ্র-ভূমিতে তাঁহার প্রবল প্রতাপ ছিল। কুলশাস্ত্রে লিখিত আছে :

"পরাশরের পরাবর, কহিতের বেণী,
ভাতকের বসন্তরায়, পুজনীয় জানী।"

বেণীরায় একজন কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাড়াশ থানার অধীন কহিত নামক স্থানে চলন বিলের মধ্যে তাঁহার

নিবাস ছিল। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন—তাই লোকে তাঁহাকে 'পণ্ডিত ডাকাইত' বলিত। বেণীরায়ের পন্থা পাঠান সেনাপতিগণ কর্তৃক অনুসৃত হইলে, তিনি ধর্মান্তর গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু সংসারত্যাগী হইয়া নানা জাতীয় হিন্দু চেলা বা শিষ্য সংগ্রহ করিয়া একদল ডাকাইত বা সৈন্য প্রস্তুত করেন। চলন বিলের মধ্যে কহিত নামক স্থানে এক কালী-মূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া তথায় লোকদের ধরিয়া আনিয়া তিনি বলি দিতেন। তাঁহার বাসস্থানকে লোকে এখনও 'পণ্ডিত ডাকাইতের ভিটা' বলে।

বেণীরায় সাঁতোর সান্যালদিগের কুটুম্ব ছিলেন। তজ্জন্য সাঁতোরের সান্যাল ও কায়স্থগণ তাঁহার দলে যোগ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যুগলকিশোর সান্যাল ও কায়স্থ চণ্ডীপ্রসাদ রায় সর্ব্ব-প্রধান। বেণীরায়ের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রধান চেলা যুগলকিশোর সান্যাল সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। তাঁহার সন্তানেরাই বগুড়া জেলার শেরপুরের সান্যাল নামে অদ্যাপি জমিদারী ভোগ করিতেছেন। বেণীরায়-প্রতিষ্ঠিত কালী-মূর্ত্তিও শেরপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে তাহা শেরপুরের বড় ভূমিকম্পে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বেণীরায়ের দ্বিতীয় শিষ্য চণ্ডীপ্রসাদ রায়ও জমিদারী পাইয়া পাবনা জেলার অন্তর্গত পোতাজিয়া গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানেরাই পোতাজিয়ার রায়। যুগলকিশোর ও চণ্ডীপ্রসাদকে পাঠানেরা 'কাল ভোগলা' ও 'কাল চণ্ডীয়া' বলিত। আর যে সকল ব্রাহ্মণ বেণীরায়ের দলে ছিলেন, তাঁহারা এবং তৎসংশ্লিষ্ট কুলীনেরা 'বেণী পঠিয় কুলীন' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্তানেরা এখনও 'বেণী-পঠিয় কুলীন' নামেই পরিচিত।

বেণীরায়ের ডাকাইতি নিবারণ মানসিংহের এতদঞ্চলে আগমনের অন্যতম কারণ। মানসিংহ মাতৃহা কাবুলীকে দমন করিবার জন্য পদ্মার উত্তর তীরে বর্ত্তমান ছাতনি গ্রামে যে শিবির বা ছাউনি সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কালে ছাউনি স্থলে 'ছাতনি' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার নিকটবর্ত্তী বুয়াপাড়া, মনোহরপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও মানসিংহের আগমন ও তৎপ্রতিষ্ঠিত কালী-বাড়ীর জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়।

মানসিংহ যখন পদ্মার দক্ষিণ পারে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তাঁহার ভ্রাতা ঠাকুর ভানুসিংহ সদ্ভাবে, বিনা যুদ্ধে ও বিনা রক্তপাতে বেণীরায়কে জমিদারী এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কালী-দেবীর সেবার দিতে স্বীকার করিলে রাজা মানসিংহের দ্বারা সম্রাটের সনন্দ আনাইয়া দিলেন। বেণীরায় তদবধি শান্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন। বেণীরায়ের অনুরোধে ভানুসিংহ যুগলকিশোর সান্যালকে এবং চণ্ডীপ্রসাদ রায়কেও জমিদারী দিয়াছিলেন। আর চণ্ডীপ্রসাদ রায়কে নবাব দরবার পেশ্‌কার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

তৎকালে নবগ্রাম সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। তথায় ভানুসিংহ কিয়ৎকাল স্থায়ী হইয়াছিলেন। অদ্যাবধি নবগ্রামে ভানুসিংহ-খনিত দীর্ঘিকা চলিত ভাষায় 'ভানসিংহের দীঘি' নামে পরিচিত হইতেছে। তৎকালে নির্ম্মিত ভানসিংহের রাস্তা বা ভানসিংহের জাঙ্গাল এখনও বর্ত্তমান আছে।

## রাণী সর্ব্বাণী

১৭০৪ খৃষ্টাব্দের পর হইতে যখন আলিম ওস্‌মানের সহিত কলহ করিয়া মুরশিদ্ কুলী খাঁ ঢাকা হইতে মুরশিদাবাদে বঙ্গের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন, তখন পাবনা জেলার পশ্চিমোত্তরস্থ ভূভাগ সাঁতৈল রাজগণের এবং ইহার দক্ষিণাংশ ভূষণার জমিদার সীতারাম রায়ের জমিদারী ভুক্ত ছিল। তখন সাঁতৈলরাজ রামকৃষ্ণ সান্যাল ও তাঁহার অভাবে রাণী সর্ব্বাণী পাবনা জেলার মালিক ছিলেন।

পাবনা জেলার গোহাইলবাড়ী, সালিখা, শুনাইগাছা, সাহোরা, ডেমরা ও হিমাইতপুর প্রভৃতি গ্রামের অনেক ব্রাহ্মণদিগের গৃহে অদ্যাপি রাণী সর্ব্বাণীর প্রদত্ত দস্তখতি ও সিলমোহরযুক্ত ব্রহ্মত্র দানপত্র দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

তৎকালে পাবনার পূর্ব্বে গোপাহি গ্রাম ও পশ্চিমে পাকসি প্রভৃতি গ্রাম রাজা সীতারাম রায়ের জমিদারী-ভুক্ত ছিল। প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে রাজা সীতারাম প্রদত্ত ব্রহ্মত্র ও দেবোত্তরের সনন্দ উক্ত গ্রামের ব্রাহ্মণদিগের গৃহে এখনও বর্ত্তমান আছে।

রাজসাহী, বগুড়া ও পাবনাদি জেলা লইয়া সাঁতৈল রাজ্য গঠিত ছিল। পাবনার হরিপুর হইতে ৫।৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রাজসাহী জেলার মধ্যে সাঁতোল অবস্থিত।

রাজা রামকৃষ্ণ ডেমরার রায় বংশের সর্ব্বাণী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন এবং দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়া সর্ব্বাণী দেবীকে বর্ত্তমান রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। সাঁতোরের

রাণী সর্ব্বাণী একবিংশ বয়সে নিঃসন্তান বিধবা হইয়া ৬৭ বৎসর সাঁতোর রাজ্য অসাধারণ যোগ্যতাসহ পালন করিয়াছিলেন। তিনি অষ্টাশীতি বর্ষ বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি বাঙ্গলা লেখাপড়া উত্তমরূপে জানিতেন। তিনি শেষে কিছু ফারসীও শিখিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত শ্লোক অনেক মুখস্থ করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন, সকল বিষয়ে নিজে তদন্ত করিতেন। রাণী সর্ব্বাণী বৈষয়িক বিকাশের নিয়ম করিয়াছিলেন। ইহাতে আমলাদের অনুচিত আয় হইত না সত্য, কিন্তু শেষে তাহাদের কোন বিবাদও হইত না।

সাঁতোল বা সাঁতোর রাজ্য সামান্য ছিল না। Grant's Analysis of Finances of Bengal পাঠে জানা যায়, তখন তাতুরিয়া ও তদন্তর্গত ২,৪১,৩৯৭৲ টাকা বার্ষিক রাজস্বের ১৩ পরগণায় সাঁতোল-রাজ রাজা রামকৃষ্ণের জমিদারী ছিল। কেহ কেহ বলেন, "নাটোরের রঘুনন্দনের অব্যবহিত পূর্ব্বে সাঁতোল জমিদারীর ৩০ পরগণার ৪,০১,৯২১৲ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত ছিল এবং তাহা তাতুরিয়া জমিদারী নামেই সুপরিচিত ছিল।"

সাঁতোল রাজবংশ বিদ্যোৎসাহিতা ও পুণ্যকীর্ত্তির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। নবদ্বীপের ন্যায় তাঁহাদের রাজধানীও সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মণ্ডলীতে পরিপূর্ণ থাকিত। সুপণ্ডিত জয়দেব, তর্কবিশারদ রামকৃষ্ণ, দিগ্বা সিংহ, অনন্ত রায়, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ সাঁতোলের রাজসভার অলঙ্কার ছিলেন। পাবনা জেলার সাঁতোরা, সালিখা, সমাজ, সিদ্ধি-নগর, দহ (চাটমহর), গাড়াবহ প্রভৃতি পল্লীসমূহের বহু বিজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতবর্গ উক্ত রাজসরকার হইতে প্রতিপালিত হইতেন। সাঁতোল রাজ্যের চিহ্ন এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু পাবনা জেলার উপরোক্ত গ্রামসমূহে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের গৃহে গৃহে সযত্নে রক্ষিত সাঁতৈলরাজ-প্রদত্ত ভূমিদান পত্র এবং দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতির প্রাচীন সনন্দ দৃষ্টে এখনও তাহাদের বহু সুকীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। সাঁতৈল রাজবংশের সর্ব্বশেষ ভূম্যধিকারিণী রাণী সর্ব্বাণী প্রদত্ত অনেক লাখেরাজ ব্রহ্মত্রাদির প্রাচীন দলিল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ডেমরার রায়-বংশে তাঁহার জন্ম হয়, উক্ত রায় বংশীয়েরাও তাঁহার প্রদত্ত অনেক ভূসম্পত্তি এখনও ভোগ করিতেছেন। পাবনা ও বগুড়া জেলার মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত ভবানীপুর নামক পীঠস্থানেরও তাঁহার সময়ে বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়।

সালিখা-নিবাসী পণ্ডিত গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎকৃত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :

ইত্যেব সময়ে রাজা মহান্ বভূবেহ হরাৎ।
রাজ্ঞঃ স্বস্য সর্ব্বাণী রাজ্ঞ্যেবেতি সাহসাৎ। ৫৮
* * * *
অদ্যাপি বর্ত্ততে কিঞ্চিৎ সাম্রোলস্য নিদর্শনম্।
দুর্ব্বিদগ্ধমুখাদ্বৃদ্ধিঃ শ্রুতা যাদৃচ্ছয়া ময়া। ৬৯
সাম্রাজ্ঞী সোঽরাসাস ভবানীপুর পত্তনম্।
অদ্যাপি বুধ্যতে লোকৈঃ সর্ব্বাণী কৃত নগরম্। ৭০

"নবদ্বীপ", তৃতীয়খণ্ড, গৌড়পর্ব্ব ২১৮,১৯ পৃষ্ঠা

---

## কুটীর-শিল্প ও যন্ত্র-শিল্প

...কুটীর-শিল্পের প্রসার লাভ করিতে হইলে একদিকে যাহাতে প্রস্তুতীকরণ ব্যয়ের জন্য পাঁচ মাস মাত্র পরিশ্রম করিয়া প্রচুর পরিমাণে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে এবং অন্যদিকে যাহাতে যন্ত্র-শিল্পের পরিবর্ত্তন বর্জ্জিত হয়, তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। এই অবস্থার দিকেই ভারতীয় অধিবাসীর মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। বেদ, সাহিত্য এবং অধিকাংশ শিল্প-গ্রন্থে ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। যন্ত্র-শিল্প আধুনিক আবিষ্কার হইলেও বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের ধারণা। ইহাও সত্য নহে। শব্দ-কোষ-পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, 'যন্ত্র' এই শব্দটির অর্থই কি করিয়া মানুষ সহায়তায় যন্ত্রের পরিচালন ও নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহার সূত্র ও সঙ্কেত নিহিত রহিয়াছে।...

# অদৃষ্টের পরিহাস

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুস্তফী

মনোরমা ভাবিয়া ভাবিয়া আর পারে না। সারাদিন সারারাত্রি এমন করিয়া ভাবিতে ভাবিতে সত্যই কি সে একদা পাগল হইয়া যাইবে? এক একবার সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না, সে সত্যই পাগল হইয়াছে কি না। এইরূপ উদ্ভট চিন্তা করিয়া সে প্রথমে রীতিমত ভয় পাইয়া যায়, কিন্তু যখন প্রমাণ পায় সে সত্যকারের পাগল হয় নাই তখন সে আপন মনে থাকিয়া থাকিয়া হাসিয়া মরে। সেই ভোর হইতে উঠিয়া পর্যন্ত তাহার চিন্তার আর বিরাম নাই। এই অচল-প্রায় সংসারের দুর্জ্জয় রথচক্র ঘুরাইবার চিন্তায় তাহার সারাটি দিন কাটিয়া যায়।

আজ কয়দিন যাবৎ ছোট খোকাটির অসুখ। চারি মাসের শিশু, বেদনা প্রকাশের ভাষা একমাত্র কান্নাই তাহার সম্বল। কোথায় ব্যথা তাহা সঠিক করিয়া নির্দ্দেশ করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। ডাক্তার আশ্বাস দিয়াছে সত্য; কিন্তু সে আশ্বাসের মূল্য মনোরমা জানে। রাত্রে তাহার ঘুম নাই। গভীর রাত্রে কে যেন তাহাকে নাড়া দিয়া তুলিয়া দেয়। সে-ও ক্রমাগত চিন্তা করিয়া যায়। সেই স্বপ্নের মত শিশুকাল, অনাথ অবস্থায় মামার সংসারে মানুষ হওয়া···মামীমার অতিরিক্ত স্নেহ-ভালবাসা···তাঁহার বিরাট সংসারের কর্ত্রীভার গ্রহণ, তাঁহার অগণিত সন্তান পালনের দায়িত্ব। শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার ঘুম আর আসে না, অসংখ্য হারাণ স্মৃতি কোন্ সোনার কাঠির স্পর্শে যেন সজাগ হইয়া ওঠে। মনে পড়ে ফাল্গুনের এক শুভ লগ্নে বাসরঘরের সুখশয্যায় বাসন্তী প্রেম, স্বামীর নিবিড় সোহাগ, বিকশিত যৌবনের এক অপূর্ব্ব আস্বাদন। ইহা স্বপ্নের চেয়ে সত্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এ সুখস্মৃতি চিরস্থায়ী হয় না। অচিরেই দুর্দ্দিন তাহার রুক্ষপক্ষে দিগন্ত ছাইয়া দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়ায়। তাহার বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া বেচারা মনোরমা শিহরিয়া ওঠে, হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে থাকে। সতীশ স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেয়, মনো, পাগলের মত তুমি এ কি করছ? চাকরী কি মানুষের চিরকাল থাকে? একটা চাকরী গেছে, আর একটা হতে কত দেরী?

আপাততঃ মনে হয় তো বুঝিল, সান্ত্বনা প্রবোধও মানিল, কিন্তু সতীশ ব্যাপারটি যত সহজ ভাবিয়াছিল, আসলে তাহা তত সহজে মিটিল না। আফিসে আফিসে ঘুরিয়া দরখাস্ত পেশ করিয়া করিয়া তাহার চাকুরী আর জুটিল না। একটি জীবনবীমার আফিসে একবার মাত্র ডাক পড়িয়াছিল। নবগঠিত কোম্পানী, পাঁচ শ' টাকা জমা চাহিয়া বসিল। মনো তাহার যাহা কিছু সম্বল ছিল সব বিক্রয় করিয়া সতীশকে পাঁচ শ' টাকা দিল। সতীশ চাকুরী পাইল। দুই দিন দশটায় খাইয়া পাঁচটায় ফিরিল, দুই দিন সুখের সূর্য্য উঠিল। কিন্তু এই সুখের উপর একদিন যবনিকা পড়িল অকস্মাৎ, যেমন অকস্মাৎ তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। লাভের মধ্যে তাহার টাকাগুলি নষ্ট হইল, স্ত্রীকে নিরাভরণ হইতে হইল। সতীশ পুনরায় মনোরমাকে সান্ত্বনা দিল,—আঃ, অত অভিভূত হলে কি সংসার চলে? দুঃখে কি অমন মুষড়ে পড়তে আছে?

পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সতীশ কাহিল হইয়া পড়িল। শরীরের উপর এই অত্যাচার সহ্য হইল না। শরীর তাহার ভাঙ্গিয়া পড়িল, অকালে বার্দ্ধক্য আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। তাহাদের জীবনের উপর দিয়া বিরাট পরিবর্ত্তনের ঝড় বহিয়া গেল। সব কিছুই পরিবর্ত্তিত হইল সত্য, কিন্তু একটি ঘটনা মনোরমার জীবনে অপরিবর্ত্তিত রহিয়া গেল। এই দুঃখ দৈন্যের মাঝে এই চরম দুর্দ্দিনেও স্বর্গের দেবদূত প্রতি বৎসর তাহার জীবন আলোকিত করিতে আসিতে ভুলিল না। মনোরমা ভুলিয়াও কোনদিন তাহাদের অভ্যর্থনা করে নাই, তথাপি তাহারা অনাহূত অতিথির প্রায় হাসিমুখে তাহার নিকট আসিয়া উদয় হইতে লাগিল। এই অনাহারক্লিষ্ট সংসারে অতিথি-বাহুল্য দেখিয়া মনোরমা কাঁদিয়া ফেলিল, ঠাকুর তোমার এ কি পরিহাস? সোনার বাছাদের শুকিয়ে মারবার জন্যে কেন এ আবাগীর কোলে ওদের দিয়েছ? আমি চাই না, আমি চাই না, আমি চাই না।

মানুষ যাহা চায় তাহা পায় না, আর যাহা পায় তাহা চায় না। অঘটনঘটনপটু লীলাময় বিধাতাপুরুষের এ বোধ হয়

এক নিষ্ঠুর বিদ্রূপ! সাত বৎসরের বিবাহিত জীবনে সে ছয়বার ভগবানের অভিসম্পাত সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছে। কিন্তু এই খোকাটি তাহাকে রীতিমত কষ্ট দিয়াছিল। তাহাকে মেডিক্যাল্ কলেজে গিয়া সাতদিন থাকিতে হইয়াছিল। কেন জানে না সে সকলের চেয়ে ইহাকেই বেশী ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। দুঃখের দ্বারা যাহাকে পাওয়া যায় তাহার প্রতি স্নেহের টান না কি অত বেশী প্রবল হয়।

আজ কয়দিন হইল তাহার এই ছোট খোকারই অসুখ। সামান্য সর্দ্দি ও কাশি হইয়া রোগের সূত্রপাত। আজ নিকটস্থ কর্পোরেশনের ডিস্পেন্সারীতে তাহাকে দেখাইতে লইয়া গিয়াছিল। ওষুধ আনিয়াছে, ওষুধ খাওয়াইয়াছেও। কিন্তু রোগ তাহার কমে নাই। রাত্রি যত গভীর হইতে লাগিল রোগের প্রকোপও যেন তত বাড়িতে লাগিল। সতীশ বাড়ী নাই। সে সচরাচর এত সকালে বাড়ী ফেরে না। মনোরমা আজ নূতন রোগ দেখিল না, কিন্তু এমন সৃষ্টিছাড়া রোগ সে কখনও দেখে নাই। কে জানে কেন যেন তাহার গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। একটানা কাশিতে কাশিতে খোকার চক্ষু যেন ঠিক্‌রাইয়া পড়িবার উপক্রম হইল। ও-বেলার পান্তা ভাত ছিল। ছেলেগুলি তাহা খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আর ভাত নাই। সতীশ এবং তাহার ভাগ্যে আজ ভাত জুটে কি না সন্দেহ। আলোয় তেল নাই; কিন্তু রাস্তার গ্যাসের একফালি আলো ঘরে পড়িয়াছিল। তাহাতেই কোন প্রকারে কাজ চলিতে লাগিল। খোকাকে সেই আলোয় শোয়াইয়া সে তাহার শিয়রে বসিয়া রহিল। ডাক্তার বলিয়াছে, মিছরির জল ও ডাবের জল খাওয়াইতে। ডাব কিনিবার সঙ্গতি তাহার নাই। আধসেরের মিছরি ঘরে আনিয়াছিল বড় খোকাটি। আধসের জলে তাহা ফুটাইয়া রাখিয়াছে। মুদীর অনেক ধার জমিয়াছে, সে তাগাদা করে, আর ধার দিতে চায় না। বড় খোকাটিও চাহিতে যাইতে রাজী হয় না। আজ আনিয়াছে নিতান্ত ভায়ের অসুখ বলিয়াই।

সতীশ সেই ভোরে স্নান করিয়া বাহির হইয়াছে। মনোরমা বলিল, খালি মুখে বাড়ীর বার হতে নেই। একটু মিছরি মুখে দিয়ে যাও।

সতীশ বলিল, ওই তো ব্যাঙের পুঁজি! তা আমিই বা কি নেব আর খোকাই বা কি খাবে? থাক, আমি দোকান থেকে কিছু কিনে খাব।

মনোরমা প্রশ্ন করিল, কিন্তু পয়সা দেবে কে?

সতীশ এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না। আর তাহার বলিবারই বা কি আছে? সে হাত পাতিয়া দাঁড়াইল, বলিল, দাও।

মনোরমা তাহার হাতে একটুকরা মিছরি দিল। মিছরি-টুকু গলায় ফেলিয়া সতীশ ঢক্ ঢক্ করিয়া এক গ্লাস জল খাইয়া পথের মাঝে বাহির হইয়া পড়িল প্রতিদিনকার ন্যায় চাকুরীর অন্বেষণে। দিনের দীর্ঘ চাকা ঘুরিয়া গেল। সতীশ ফিরিল না। অন্যদিন সে মধ্যাহ্নে একবার আসিয়া যাহা-হোউক দুটি নাকে-মুখে গুঁজিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে।

পাশের জমীদার-বাড়ীর ঘড়িতে সুর করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া গেল। তখনও সতীশের কোন চিহ্ন নাই। মনোরমার নারী-হৃদয় অযথা বিপদ গণিয়া মরিতে লাগিল। খোকনের কাশি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। মনোরমা একবার তাহার শিয়রে বসিতে লাগিল, একবার দ্বারপ্রান্তে গিয়া দূর পথের পানে চাহিয়া রহিল নিরিড় প্রতীক্ষায়। প্রতি পথিকের প্রতি পদক্ষেপটি তাহার সুকুমার হৃদয়ে কত আশা আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া হতাশায় বিলীন হইতে লাগিল। তাহার মাথা টন্ টন্ করিতে লাগিল। প্রসবের পর তাহার শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কলেজে যে-কয়দিন ছিল সে কয়দিন ঘড়ি-ধরিয়া খাওয়া-দাওয়া হইয়াছিল। দুইবছর পর কলেজে গিয়া সে কমলা-লেবুর মুখ দেখিল, দুই বছর পর সে দিনে একসের করিয়া দুধ খাইতে লাগিল, দুই বছর পর সে মাখন দিয়া পাঁউরুটি মুখে তুলিল। সুখের এই পীঠস্থান হইতে সে বাড়ী ফিরিতে চাহে নাই; কিন্তু কলেজের কর্তৃপক্ষ তাহাকে সাত দিনের বেশী স্থান দিল না। অগত্যা উপবাসবহুল নিরানন্দ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সে তাহার সন্তানদের শিশুমুখ দেখিয়া শান্তি পাইতে চেষ্টা করিল। তাহার বুভুক্ষিত মাতৃহৃদয় শান্তি পাইল বটে; কিন্তু সংসারের গুরু দায়িত্ব তাহার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। দুর্ভিক্ষপ্রস্ত সেই পাঁচটি সন্তানের রাত্রি-দিন হাহাকার—স্বামীর ব্যর্থ চাকুরীর অন্বেষণ···নানা দেবদেবীকে মানৎ করিয়া লোভ দেখানোর দুরন্ত প্রচেষ্টা···কাক-কোকিল ডাকিবার পূর্ব্বে ক্ষুধার্ত্ত শিশুদের খাইবার জন্য বিশ্রী আর্ত্তনাদ। নিজের শরীরের পানে চাহিবার তাহার মুহূর্ত্তসৎ ঘটিল না। আপন সন্তানের মুখে

যে আহার দিতে পারে না, সে কেমন করিয়া নিজে আহার করিবে? দুদিন যে বাপের বাড়ী যাইবে তাহারও সুযোগ নাই। তাসাগুণে সে কুসও নিষ্ফল করিয়া বসিয়াছে। দুঃখ যখন আসে তখন সে একা আসে না, তখন এমনি করিয়া সাঙ্গপাঙ্গ নিয়া চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়াই আসে।

সময়ের কাঁটা ধীরে ধীরে ঘুরিয়া চলিতে লাগিল। তাহাকে রোধ করিবার শক্তি মানুষের নাই। পাশের বিক্রমপুরের জমিদারবাড়ীতে ঘড়িটায় সুর করিয়া বারটা বাজিয়া গেল। সতীশ তখনও আসিল না। পৃথিবীর সমস্ত ক্লান্তি যেন আজ মনোরমাকে পাইয়া বসিয়াছে। পেটের মধ্যে তাহার যেন দাবানল জ্বলিয়া যাইতেছে। বসিবার তাহার এতটুকু শক্তি নাই। খোকন অঝিরাম কাঁদিয়া চলিয়াছে, শত চেষ্টাসত্ত্বেও সে তাহার নিমীলিত-প্রায় চক্ষু উন্মীলিত করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। তাহার দেহ যেন ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া মাটির সহিত মিশিয়া যাইতেছিল।

মনোরমা কতক্ষণ যে এমনি অর্দ্ধনিদ্রিত অর্দ্ধজাগরিত অবস্থায় কর্ণশিখর বিগলিত-প্রসারিত ক্রন্দনধ্বনি শুনিতেছিল তাহা তাহার স্মরণ নাই। বাহিরে অকস্মাৎ সতীশের কণ্ঠস্বরে তাহার নিদ্রা টুটিয়া গেল, সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সতীশ বলিল, ওঃ কি কুম্ভকর্ণের ঘুম না জানি!

মনোরমার দুর্ব্বল হৃদয় তখনও ভীষণ স্পন্দিত হইতেছিল। কোন কথা বলিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না। সতীশ ধপ্ করিয়া বেতের উপর বসিয়া পড়িয়া তাহার শত-তালিযুক্ত বহুবর্ণবিশিষ্ট জুতা দুটি খুলিতে লাগিল। খোকা সহসা বিকট শব্দে কাঁদিয়া উঠিল। সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, খোকন কেমন আছে মনো?

মনো বলিল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। একবার একজন ডাক্তার আনলে হত। সতীশ একটি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিল। মনোরমা তাহার অর্থ বোঝে। যেখানে ক্ষুধিত মানুষের মুখে অন্নাভাবের দরুণ একমুষ্টি ভাত জোটে না, সেখানে ডাক্তার দেখান, বিলাসিতা বই আর কিছু নয়।

নিঃসম্বল সতীশ এটুকু বোঝে। কিন্তু তাহার অবস্থা চিরটাকালই এমন ছিল না। তাহার বাপ ছিলেন আর বাপের ছিল মোটা পেন্‌শন ও অর্থ ব্যয় করিবার দুর্নিবার দুষ্প্রবৃত্তি। তিনি নিজের পায়ে ভর করিয়া নিজে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং তাহাকেই পৌরুষ বলিয়া গণ্য করিতেন। আপন সন্তানের সেই পৌরুষের পরীক্ষা না লইয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বাক্স কাড়িয়া খুব জোর শ্রাদ্ধের খরচটা পাওয়া গেল। সতীশের নিকট এ পরীক্ষা চরম হইল। সে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অতীতের সেই হাস্যোজ্জ্বল সুখ স্বপ্নের স্মৃতি-ভারে তাহার বক্ষ দলিয়া পিষিয়া এক গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বাহির হইল। আজ সে ডাক্তার ডাকিবে কি দিয়া? সারাদিন কোন্ এক আখের কলের কারখানায় খাটিয়া ছয় আনা পয়সা পাইয়াছে। ছয় আনা পয়সায় আর ডাক্তার ডাকা যায় না। খোকা পুনরায় সেইরূপ বিকট শব্দে কাঁদিয়া উঠিল। মনোরমা ভীতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি একবার একটা ডাক্তার ডাক।

নিরুপায় হইয়া সতীশ ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল আর মনোরমা তাহার শিশু-সন্তানের শিয়রে বসিয়া অঝোরঝরনে রোদন করিতে লাগিল। আজ তাহার অবুঝ মাতৃহৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, অভাব অনটনের তীব্র বেদনা আজ তাহাকে সচেতন করিতে পারিল না। খোকা কাঁদিতে কাঁদিতে পুনরায় চোখ-মুখ কপালে তুলিয়া ফেলিল। মনোরমা তাহার দুর্ব্বল বাহুলতা দিয়া তাহাকে পরম যত্নে বেষ্টন করিয়া করুণ কণ্ঠে অনুরোধ করিয়া উঠিল, ওগো, তুমি মানুষ না কি? খোকার কষ্ট আর যে আমি দেখতে পারছি না।

সতীশ অসহায়ের ন্যায় ক্যালফ্যাল করিয়া মোহ্যমানা পত্নীর পানে চাহিয়া রহিল। মনোরমাকে এমনি আলুথালু মূর্ত্তিতে কখনও সে দেখে নাই। দুঃখ-দৈন্যের সর্ব্বপ্রকার গভীর আঘাতকে সে তাহার হাস্যসুন্দর মুখের সহায়তায় অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে। মনোরমা বহু কষ্ট করিয়াও খোকার কান্না থামাইতে না পারিয়া কহিল, ওগো লক্ষীটি তুমি অমনি করে দাঁড়িয়ে থেক না। যে-কোন একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস। তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার এই হাতের নোয়া আছে।

সেই নোয়া—এতদিন মনোরমার কাছে যাহা দুর্লভ বলিয়া পরিগণিত হইত। তাহার সবকিছু সম্বল বিসর্জ্জন

দিয়া কেবল এই সোনা দিয়া বাঁধান লোহার তাবিজটি সে পরম যত্নে এতাবৎকাল রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। বিপত্নীক শ্বশুর বিবাহের দিন তাহাকে নিজ হাতে ইহা পরাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, মা, জীবনে এ জিনিষটি তুমি কাছছাড়া কোরো না। আমরা বংশানুক্রমে এই সোনা ব্যবহার করে আসছি।

আজ অভাবের শেষপ্রান্তে দাঁড়াইয়া মনোরমার দৃষ্টি পরিত্রাণের জন্য ঐ বহু কষ্টে রক্ষিত সোনাটির উপর নিবদ্ধ হইল। সতীশ ডাক্তারের উদ্দেশ্যে ছুটিয়া পথের মাঝে বাহির হইয়া পড়িল। আর মনোরমা পড়িয়া পড়িয়া সদ্য দেবতার চরণে মাথা কুটিতে লাগিল। রোগের এমন তীব্র প্রকোপ সে আগে কখনও দেখে নাই। মাত্র পাঁচ দিনের রোগে খোকা তাহার হাড়পাঁজর হইয়া গিয়াছে। তাহার পানে চাহিলে যেন ভয় করে। যাহা খাওয়াইতেছে তাহাই তৎক্ষণাৎ তুলিয়া ফেলিতেছে। বিছানার জলও পেটে সহিতেছে না। সতীশ চলিয়া গেলে মনোরমার সারা গা যেন ছমছম্ করিতে লাগিল। তাহার যেন বোধ হইল কে বাহিরে পদশব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মানুষের স্পষ্ট পদধ্বনি। ভাবিল হয়তো স্বামী ডাক্তার আনিয়া ফিরিয়াছে। মাথার ঘোমটা টানিয়া বসিল; কিন্তু কেহ আসিল না। তাহার গায়ের রোমকূপগুলি খাড়া হইয়া উঠিল। সে প্রাণপণে বড়খোকাকে ডাকিতে লাগিল, রতন, ও রতন, ওঠ তো বাবা।

রতন সবে সাত বছরের বালক। সে কেবল পাশ ফিরিয়া শুইল। মনোরমা ভাবিতে লাগিল সতীশকে পাঠাইয়া দিয়া সে ভাল কাজ করে নাই। খোকার কাশি আপাততঃ বন্ধ হইয়াছে। তাহাকে সে শয্যার উপর শোয়াইয়া দিয়াছে। কাশি বন্ধ হইয়াছে—কিন্তু তাহার নিশ্বাস লইতে কেমন যেন কষ্ট হইতেছে। একটা দমকা বাতাসে সহসা সামনের বন্ধ জানালাটি খুলিয়া গেল। বাহিরে জ্যোৎস্নার ফুটফুটে আলোয় চিকণ নিম গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি হইয়াছে, শুভ্র মেঘপুঞ্জ আকাশের কোল দিয়া হুস্ হুস্ করিয়া উত্তরের দিকে ভাসিয়া চলিয়াছে। গাছের পাতাগুলি মাঝে মাঝে ইতস্ততঃ হেলিতেছে। সপ্তর্ষি-মণ্ডল আকাশের পশ্চিম প্রান্তে হেলিয়া পড়িয়াছে—ধ্রুবতারাটি যেন সেই দূরান্তর হইতে তাহাদের পানে অপলক চাহিয়া রহিয়াছে। বহু দিন পর মনোরমা আজ আকাশ দেখিল। খোকা তখনও অঝোরে ধুঁকিতেছে। মনোরমার ভয় ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। খোকা একবার চমকাইয়া উঠিল। মনোরমা পাশ ফিরিয়া দ্বারের পানে চাহিয়া দেখিল কে যেন অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় একটি শাদা ছাতা কাঁধে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার চক্ষে যেন বিশ্বের আকুতি পুঞ্জীকৃত হইয়া রহিয়াছে। ভয়ে ও বিস্ময়ে মনোরমার সারা গা কাঁপিয়া উঠিল। সে ডাকিল, রতন, ওরে রতন।

ডাকিল সত্য; কিন্তু তাহার কণ্ঠ হইতে কোন শব্দ নিঃসৃত হইল না। সে দ্রুত চক্ষু বুজিয়া ফেলিল।

ঘণ্টা খানেক পরে সতীশ এক হোমিয়োপ্যাথ ডাক্তার লইয়া বাড়ী ফিরিল। কিন্তু তখন সব ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। বাহির হইতেই তমিল মনোরমা শিরস্ত মথিত করিয়া তাহার সুকুমার মাতৃহৃদয়ের বহ্নিশিখাটী নিঙড়াইয়া নিঙড়াইয়া আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে। সেই সকরুণ আর্ত্তনাদ নিঃশব্দ রাত্রির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া নিশীথ বায়ুস্তরে দূর হইতে দূরান্তরে লীন হইতে লাগিল। ডাক্তার সবে নূতন পাশ করিয়া ডিসপেন্সারী খুলিয়াছেন। ব্যবসার প্রবৃত্তির স্পর্শে তাহার হৃদয় এখনও পাষাণে পরিণত হয় নাই। সুতরাং সতীশের হাত হইতে চামড়ার ব্যাগটি লইয়া বলিল, আর আমার যাবার কোন প্রয়োজন নেই। সব ফুরিয়ে গেছে।

সতীশ তখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই, সে চীৎকার করিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবে কি না। কেবল দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার কুঞ্চিতপ্রায় গণ্ড বহিয়া ধীরে ধীরে ঝরিয়া পড়িল। মন্থর পদক্ষেপে সে দ্বারপ্রান্তে আসিয়া প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনোরমা তখনও আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া চীৎকার করিতেছে, খোকন রে! তুই কোথায় গেলি রে! তোকে খেতে দিতে পারলুম না রে। তুই না খেয়ে গলি রে।

পাঁচটি সুপ্ত সন্তান জাগিয়া উঠিল। তাহারা রোরুদ্যমানা মাতার পানে নির্ব্বাক্ হইয়া ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। রাত্রি ক্রমে ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল—দু একটা বাদুড় আকাশের কোল দিয়া ডানার শব্দ করিতে করিতে উড়িয়া গেল। নিম গাছের একটি শাখার একটি ক্ষুদ্র সযত্নকৃত নীড় হইতে একটি কাক ডানা ঝটাপট করিতে করিতে কা-কা রব করিতে লাগিল। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত

শুভ্র ছায়াপথের মাঝে অসংখ্য নক্ষত্র চিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। মনোরমা একটানা সুরে কাঁদিতে লাগিল। কান্নার তাহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই।

একটি মৃতবৎসা বিড়ালী কাছের ডাইবিনের ধারে মর্ম্মস্পর্শী সুরে কাঁদিয়া মরিতেছিল। অন্য দিন হইলে সতীশ হয়তো তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া আসিত; কিন্তু আজ আর তাহার হাত পা উঠিল না। সে উদাস দৃষ্টিতে তাহার অনাহারক্লিষ্ট সন্তানদের পানে, শীর্ণ মৃত শিশুর পানে চাহিয়া রহিল। বেচারা সহস্র জন্মের পাপের শাস্তি-স্বরূপ এমন মাতা পিতা লাভ করিয়াছিল। উপযুক্ত সময়ে ডাক্তার ডাকিলে হয় তো সে বাঁচিত—হয় তো কেন, নিশ্চয়ই সে বাঁচিত। ঔষধ ও পথ্য পাইলে কখনও অমন জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িত না। সে বাঁচিত—সে বড় হইত। এমন করিয়া কখনই অকালে মৃত্যু বরণ করিত না। অভাবের তীব্র তাড়না আজ তাহাকে দগ্ধ করিয়া মারিতে লাগিল। সে পিতা হইয়াছে, কিন্তু সন্তান লালন করিবার, তাহাকে পেট পুরিয়া খাইতে দিবার শক্তি বা সামর্থ্য তাহার নাই। নিজের অনুপযুক্ততা বিবেচনা করিয়া সতীশ আজ না কাঁদিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিল না। মনোরমাও কাঁদিতে লাগিল—দুঃখের যাহাদের মুখে দুবেলা, দুমুঠা অন্ন দিতে পারে না বলিয়া। এই দুঃখ-দৈন্য-জর্জ্জরিত অভাব-অনটনের সংসারে সে তুলিয়াও কখন সন্তান কামনা করিয়া বসে নাই। সে বারবার সেই অদৃশ্য বিধাতাপুরুষের নিকট বৃথা কৈফিয়ৎ চাহিয়াছে, ঠাকুর তুমি এ অভাগীর সঙ্গে এ কি দারুণ পরিহাস করছো প্রভু?

দেবতা অলক্ষ্যে কেবল হাসিতে লাগিলেন।

পাশের বিক্রমপুরের জমিদার-বাড়ীর ঘড়িতে আবার সুর করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল। তখনও তেতলার ঘরে নীল আলো জ্বলিতেছিল, তখনও একটি মানুষ দুগ্ধফেননিভ শুভ্র শয্যায় শুইয়া হৃদয় মথিত করিয়া করিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে এ-পাশ ও-পাশ করিতেছিল। অনেক দিন হইতেই তাহার রোগ হইয়াছে, রাত্রে ঘুম নাই। এমনি করিয়া সারারাত্রি প্রায় বিছানার উপর ছটফট করিয়া মরে। কখনও বা ঘরময় পায়চারি করে, কখনও বা জানালার গরাদে ধরিয়া অসংখ্য নক্ষত্র-খচিত ঘন নীল আকাশের পানে অপলক চাহিয়া থাকে, কখনও বা ছাদে গিয়া আঁচল বিছাইয়া মেঝের উপরেই শুইয়া পড়ে, কখনও বা নিজের অদৃষ্টের জীবনের পানে চাহিয়া নিঃশব্দে রোদন করিয়া মরে। তাহার বিবাহিত জীবনের আটটি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহাদের কোন সন্তান হইল না। বিক্রমপুরের জমিদারদের একটিমাত্র পুত্রের একটিমাত্র বধূ। পুত্র পাইবার ব্যাকুল চেষ্টায় তাহার ত্রুটি হয় নাই। নানা দেবতার নিকট মানৎ করিয়াছে, ধর্ণা দিয়াছে, নানা মাদুলি পরিয়া গলা এবং হাত বোঝাই করিয়া ফেলিয়াছে, নানারূপ শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিয়াছে তথাপি কোন ফল দর্শায় নাই। তাহার দুর্জ্জয় বন্ধ্যাত্ব কেহই ঘুচাইতে পারে নাই। শিশু লালন-পালন করিবার জন্য নানা সামগ্রী সে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার আশায় সে কান পাতিয়া নিবিড় প্রতীক্ষায় দিন কাটাইয়াছে, কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় নাই। সারারাত্রি ব্যর্থতার নিবিড় বেদনায় অতৃপ্ত মাতৃহৃদয়ের দুঃসহ যাতনায় ক্ষুধিত বাহু দুটি তাহাকে স্নিগ্ধ স্নেহধারায় সিঞ্চন করিয়া বেষ্টন করিবার বাসনায় শুষ্ক গৃহকোণে কাঁদিয়া মরিয়াছে। নিষ্ফল জীবনের কথা বিবেচনা করিয়া প্রাচুর্য্য-ভরা শূন্য সংসারের পানে চাহিয়া তাহার চক্ষু জ্বালা করিয়া উঠিয়াছে।

সে রাত্রিও সে কাঁদিতে লাগিল, বিগলিত ধারে তাহার নিটোল গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। অসহ্য বোধ হইল ত্রিশটি বসন্তের এমনি নিরর্থক যাওয়া আসা। ধীরে ধীরে সে বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িল, ধীরে ধীরে—চাহিয়া দেখিল দেওয়ালে টাঙ্গানো অগণিত শিশু ও মাতৃমূর্ত্তি, শিশু কৃষ্ণকর্ত্তৃক শ্রীযশোদার মধুর স্তন্যপান। দেখিয়া দেখিয়া অশ্রুধারায় চক্ষু তাহার ঝাপ্‌সা হইয়া গেল। নিঃশব্দ পদক্ষেপে সে বাতায়ন-পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। কালি চাঁদ আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে হেলিয়া পড়িয়াছে, তাহার পদতলে একটি নিঃসঙ্গ তারা টিপ্ টিপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। একবার সে মুখ ফিরাইয়া ঘরের মধ্যে চাহিল। শিশু আসিবে এই আশায় সে কত দিন ধরিয়া কত সামগ্রী কিনিয়া রাখিয়াছে, পাছে তাহার এতটুকু অযত্ন হয় তাহার জন্য সে সর্ব্বদা সচকিত। বিছানার এক ধারে তাহার স্বামী তখনও নীরবে ঘুমাইতেছে। অকস্মাৎ বধূটির অবশ দেহ জানালার কোলে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল, জমিদার-বধূ ভিখারিণীর ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া রাত্রির নিঃস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া মরিতে লাগিল, ভগবান্ আর কত দিন তুমি এমনি করে আমার কোল শূন্য করে রাখবে নিষ্ঠুর?

নিকটেই মনোরমার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া উঠিল, ঠাকুর,—আমি ছেলে চাই না, ছেলে চাই না। কে জানে, মানুষের বধির ঠাকুর অলক্ষ্যে থাকিয়া সামান্য হাসিল কি না।

UNIVERSITY

# হিমালয়ের পশ্চিমে

—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত

পূজার ছুটিও এল, বসে বসে ভাবছি-কি করা যায়, অর্থাৎ কোথায় যাওয়া যায়। সঙ্গীর অভাব; সঙ্গী পেলে কোন একটা দিকে বেরিয়ে পড়তাম। আমার সঙ্গীরাও আবার পালুডি যাওয়াই ঠিক ক'রে বসে আছেন। তাঁদের সৌন্দর্য্য-বোধ আছে, কিন্তু অজানার প্রতি আকর্ষণ নেই। অন্ততঃ পয়সার প্রতি আকর্ষণ তাঁদের বোধ হয় একটু অতিরিক্ত, তাই তাঁদের একটা দূরত্বভীতি আছে। আমার কিন্তু একই জায়গায় বার বার যেতে ইচ্ছে করে না। প্রাণ চায় বেরিয়ে পড়তে, নব নব দেশে, নব নব রূপের সন্ধানে। তাই বসে বসে ভাবছিলাম, কোথায় সঙ্গী পাই। এমন সময় নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে সুদূর হৈমবতীর দেশের শেষ-প্রান্ত থেকে বন্ধুবরের চিঠি পেলাম, "এ-বার পূজায় কি ক'রবে? যদি কোথাও যাও তো চল এক সঙ্গে যাওয়া যাক!" বহুদিন এই বন্ধুর কোন খবর পাই নি। সে যে কোথায় আছে তাও ঠিক জানতাম না। আজ হঠাৎ এ-সময়ে তাঁর এই চিঠি আমাকে অত্যন্ত বিচলিত করল। এই অদ্ভুত যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে আমি সুদূরের এক আহ্বান শুনতে পেলাম, যে আহ্বানে সাড়া না দিয়ে থাকা অসম্ভব। তখনই লাফিয়ে উঠে তাঁর চিঠির উত্তর দিলাম। চিঠিতে চিঠিতে ঠিক হল, দু'জনে মিলে এবার অজন্তা, ইলোরা, বম্বে, পুণা, ঐ দিকটা ঘুরে আসব; এবং সেই অনুযায়ী সব গুছিয়ে নিয়ে ২৮শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যের সময় কলকাতায় এসে পৌঁছলাম।

কিন্তু তার পরদিন সকালে যখন বন্ধুবরের সঙ্গে দেখা হল, তিনি তখন সব প্রোগ্রাম উল্টে বসে আছেন। বললেন, "অজন্তা-টজন্তা এবার থাক, চল কাশ্মীর বেড়িয়ে আসি।" কাশ্মীর! দশদিনের ছুটীতে কাশ্মীর! বন্ধুবর অঙ্ক কষে হিসেব ক'রে দেখিয়ে দিলেন, সেটা কিছুই অসম্ভব নয়। (কিন্তু সেই হিসেবের মধ্যে যে একটা মস্ত ভুল ছিল সেটা জানতে পারলাম তখন যখন আর সংশোধনের কোন উপায় নেই।) আমি বললাম, "কিন্তু কাশ্মীরে যে ভয়ানক শীত। শীতের কাপড় চোপড় ত কিছুই সঙ্গে নেই।" বন্ধুবর বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন যে, তিনি পূজোর সময় একাধিক বার দার্জিলিং গিয়েছেন। ৪,০০০ ফুট উঁচুতে অক্টোবর মাসে আবার শীত! ও-সব 'বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখান' তাঁর কাছে চলবে না। বন্ধুবরের এত বড় অভিজ্ঞতার নজিরেও ঠিক আশ্বস্ত হ'তে পারলাম না; কারণ আমার যতদূর জানা ছিল শ্রীনগরের মত শীত ভারতবর্ষের খুব কম জায়গায়ই আছে। কিন্তু বন্ধুবর কোন বাধা মানতে রাজি নন। তাঁর সমস্ত প্রাণ তখন ছুটেছে কাশ্মীরের দিকে, অগত্যা শীতবস্ত্র যতদূর সম্ভব যোগাড় করে তৈরী হয়ে নিতে হল। বন্ধু সংগ্রহ করলেন দু'খানা লেপ। আমি নিলাম দু'টা কম্বল; চব্বিশ ঘণ্টার নোটীসে একটা ক'রে গরম সুট তৈরী করিয়ে নিলাম। এ ছাড়া সঙ্গে রইল, আলোয়ান, গরম মোজা, গরম গেঞ্জী। এই নিয়ে ৩০শে সেপ্টেম্বর পাঞ্জাব-মেলে রওনা হওয়া গেল।

ট্রেন ছাড়ল সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়। কিন্তু তার অনেক আগে থেকে এসে বিছানা পেতে দুই বেঞ্চি দু'জনে দখল ক'রে বসে ছিলাম। তার পর অবশ্য গাড়ীতে অনেক লোক উঠল, কিন্তু আমাদের শুয়ে যাওয়ার পক্ষে কোন বাধা হয় নি। অনেক দূরের পাড়ি; ট্রেনেই দু'দিন দু'রাত্রি কাটবে। সুতরাং গাড়ীতে যথেষ্ট জায়গা পাওয়া মস্ত লাভ। খাওয়ার অবশ্য কোন ভাবনাই নেই। রেস্তোরাঁকার সঙ্গে চলেছে। যদিও আমাদের ইন্টার ক্লাসের টিকিট, কিন্তু হুকুম পেলে তারা খুসী হয়ে গাড়ীতে খাবার দিয়ে যায়।

বর্দ্ধমান ষ্টেশনে 'কারি রাইস' খেয়ে শুয়ে পড়লাম। সকালে যখন ঘুম ভাঙল, ট্রেন তখন মোগলসরাই ষ্টেশনের কাছাকাছি।

২

দু'রাত্রি ও একদিন অনবরত চলে ২রা অক্টোবর তারিখে সকাল সাতটার সময় ট্রেন এসে থামল লাহোর ষ্টেশনে। পাঞ্জাব মেলের দৌড় এই পর্য্যন্ত, কিন্তু আমাদের যেতে হবে

আরও অনেক দূর। তাই এখানে গাড়ী বদল করে রুটিয়ার মেলে চাপলাম। গাড়ী ছাড়ল আটটার সময়। লাহোর শহর ছাড়িয়ে বাইরে এসে দেখি, দু'দিকে আর্য্যাবর্ত্তের সেই বিস্তীর্ণ সমতল মাঠ, সেই আখের ক্ষেত, জোয়ারের ক্ষেত, সেই বাবলা গাছ, খোলার বস্তি, সেই ধুলো—যা কাল সমস্ত দিন ধরে ট্রেন থেকে দেখেছি। তবে একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই, যত পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, প্রকৃতির চেহারা ততই শ্রীহীন রুক্ষ উগ্রভাব ধারণ ক'রছে। দু'দিন ট্রেনে স্নান করতে না পেয়ে অনবরত ধুলো আর কয়লার ধোঁয়া খেয়ে আমাদের চেহারার ক্রমে যেমন পরিবর্ত্তন হচ্ছিল অনেকটা সেই রকম। একই আর্য্যাবর্ত্তের সমতল ভূমি হলে কি হয়, বাংলা দেশের প্রকৃতির সে কমনীয়তা, সে সজল-স্নিগ্ধতা এখানে মিলবে না।

ট্রেন যখন খেরিয়াল বলে একটা ছোট্ট ষ্টেশন পার হ'য়ে গেল, বেলা তখন প্রায় বারটা। এখান থেকে প্রকৃতির চেহারা হঠাৎ একেবারে বদলে গেল। সে সমতল মাঠ অদৃশ্য হয়েছে। এখন দু'দিকে খালি পাহাড়, ছোট বড় নানা আকারের, নানা ভঙ্গির। কিন্তু এ-সমস্ত পাহাড়ের বিশেষত্ব হচ্ছে প্রায় সবটাই মাটির। কিন্তু কি রুক্ষ উগ্রভাব। ছায়াহীন, তরু-গুল্মহীন ধূলিময় বন্ধুর সেই পার্ব্বত্য প্রদেশের দুপুরের প্রচণ্ড সূর্য্যালোকে সে এক অদ্ভুত রুদ্রমূর্ত্তি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কখনও যাই নি। কিন্তু প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তন দেখেই বুঝলাম সীমান্ত প্রদেশের সীমানার ভেতর এসে পড়েছি। এই বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্যে দিয়ে ট্রেন এঁকে বেঁকে আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠতে লাগল। রাওয়ালপিণ্ডি এসে যখন নামলাম বেলা তখন প্রায় সাড়ে তিনটে।

এখান থেকে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর পর্য্যন্ত ১৯৬ মাইল আমাদের যেতে হবে মোটরে। আমরা একেবারে শ্রীনগরের 'রিটার্ণ' টিকিট করেছিলাম। নেমেই রেল-কোম্পানীর মোটরের খোঁজ ক'রলাম। বন্ধুবর কলকাতায় বসে যা হিসেব করেছিলেন তাতে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে মোটর ছাড়বে সাড়ে তিনটেয়,—রাত এগারটা কি বারটা তখন হয় শ্রীনগর পৌঁছে যাব, এই কথা। কিন্তু শুনলাম তার পরদিন সকালের আগে কোন মোটরই ছাড়বে না, এবং যেহেতু আমাদের ইণ্টার ক্লাসের টিকিট আমাদের যেতে হবে বাসে; শ্রীনগর পৌঁছতে লাগে দু'দিন। টাঙ্গাতে গেলে অবশ্য একদিনে যাওয়া যায়; কিন্তু টাঙ্গা হচ্ছে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্যে। তখনই বুঝলাম একেবারে শ্রীনগর পর্য্যন্ত টিকিট ক'রে ভুল ক'রেছি। রাওয়ালপিণ্ডি পর্য্যন্ত টিকিট করলে এখান থেকে প্রাইভেট কোম্পানীর টাঙ্গাতে যাওয়া যেত; তাতে যে পয়সার দিক্ দিয়েও সস্তা হ'ত সেটা জানলাম পরে।

কিন্তু এখন কি করা যায়। দশদিন ছুটীর আট দিনই ত দেখছি কাটে যাতায়াতে, ফেরারও আর পথ নেই। আর এক কথা—বাসে গেলে পথের দৃশ্য কি ঠিক মত দেখা যাবে? কাশ্মীর দেখার চেয়েও রাওয়ালপিণ্ডি থেকে শ্রীনগর পর্য্যন্ত ২০০ মাইল হিমালয়ের বুকের উপর দিয়ে মোটরে যাওয়ার আনন্দই আমাকে অন্ততঃ ভেতরে ভেতরে বেশী আকৃষ্ট ক'রছিল। সুতরাং সব দিক ভেবে আমরা প্রত্যেকে পাঁচ টাকা ক'রে অতিরিক্ত দিয়ে টাঙ্গাতে দু'টো সিট্ 'রিজার্ভ' করলাম। কুলীর মাথায় জিনিষপত্র চাপিয়ে ষ্টেশনের নিকটেই পাঞ্জাব হোটেল নামে একটা হোটেলে এসে উঠলাম।

হোটেলটা বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়। কিন্তু আবার কোথায় যাব! এখানেই কোন রকমে রাতটা কাটান যাক। দু'জনার উপযুক্ত একটা ঘরের ভাড়া এক রাত্রির জন্য দু' টাকা। একজনার উপযুক্ত ছোট ঘর এক টাকা; খাই-খরচ আলাদা। আমরা একটা ছোট ঘরই ঠিক করলাম। তাতে শুধু আর একটা খাটিয়া আনিয়ে নিলাম। তার জন্যে চার আনা পয়সা বেশী দিতে হ'ল।

ধুলো আর কয়লার ধোঁয়া খেতে খেতে দু'দিন, দু'রাত ট্রেনে এসেছি, জলের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। ভেতর যায় শুকিয়ে চুরমুরে হয়ে গেছে। সব চেয়ে প্রয়োজন তখন স্নানের। কলতলায় বসে অনেকক্ষণ ধরে বেশ আয়াসে স্নান করা গেল। তার পর চা রুটী-টোষ্ট ডিম প্রভৃতি খেয়ে যখন উঠলাম তখন মনে হ'ল সব গ্লানি কেটে গেছে, শরীর সম্পূর্ণ ভাজা বোধ ক'রলাম। তখনও যথেষ্ট আলো; রাওয়ালপিণ্ডি কলকাতা থেকে ১,০৪৫ মাইল পশ্চিমে, সুতরাং সূর্য্যাস্ত হয় অনেক পরে। আমরা একটা টাঙ্গা ভাড়া করে শহর দেখতে বের হলাম। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বাস

শ্রীনগরের পথে : কোহালায় ঝেলাম নদী, দূরে নদীর উপর পুল দেখা যাচ্ছে, এই পুল পার হয়ে কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করতে হয়

শ্রীনগরের পথে : খাদের ভিতর দিয়ে ঝেলাম নদী গর্জন করে বয়ে যাচ্ছে

শ্রীনগর

শ্রীনগর

কাশ্মীরের নিতান্ত আধুনিক শহর, চওড়া চওড়া পিচ-ঢালা রাস্তা, দু'দিকে লাখান গোছান সুন্দর সুন্দর বাড়ী! সিনেমা-হাউস, রাস্তায় বিস্তর সাহেব-মেম, আর শহরের পিছনে দূরে হিমালয়ের বিরাট কাল গম্ভীর মূর্তি। ঐ পাহাড় বেয়ে ক'রে কাল আমরা যাব, ভাবতেই মন নেচে উঠল।

প্রায় ঘণ্টা খানেক ঘুরে সন্ধ্যেবেলা আমরা গেলাম এখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীর আড্ডা কালীবাড়ী বেড়াতে। দেখলাম সেখানে বারোয়ারী দুর্গাপূজা হচ্ছে। ষ্টেজ্ খাটান হয়েছে, রাত্রে "মেবার পতন" অভিনয় হবে। একজন কর্ম্মী আমাদের অনুরোধ করলেন রাত্রে থেকে অভিনয় দেখে যেতে, কিন্তু অভিনয় দেখার আগ্রহের চেয়ে রাত্রে ঘুমের প্রয়োজনীয়তা তখন আমাদের অনেক বেশী, সুতরাং সে অনুরোধ রক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। হোটেলে ফিরে এলাম।

কলকাতা থেকে ১,৩৫০ মাইল দূরে ব'সে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে চিঠি লেখার মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতির আনন্দ আছে। সঙ্গে অনেক খাম, পোষ্টকার্ড ছিল। চিঠি লেখা, ডায়রী লেখা ইত্যাদি কাজ সেরে খাবার অর্ডার দেওয়া গেল। হোটেলটী বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়, সে কথা আগেই বলেছি। দেখা গেল রান্নাও বিশেষ উচ্চাঙ্গের নয়, তবে চলনসই। সুবিধে এই যে, সবরকম খাবার এরা তৈরী রাখে, নিজের রুচি অনুযায়ী যার যা খুশী অর্ডার দিতে পারে। খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে তাড়াতাড়ি শোয়া গেল, আবার ভোরে উঠতে হবে। অক্টোবর মাস সবে আরম্ভ, কিন্তু রাত্রে কি শীত! দুপুরে আবার খুবই গরম। কিন্তু সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করে, রাত্রে লেপ না হ'লে চলে না। আলো নিবিয়ে, দু'জনে পাশাপাশি খাটিয়ার লেপের তলে শুয়ে গল্প করতে লাগলাম। ঘুম আসতে খুব বেশী দেরী হ'ল না।

৩

সকালে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে মোটর ছাড়তে আটটা বাজিয়ে দিল। মোটরে আমরা দু'জন যাব আর একজন যাত্রী ছিলেন, গুজরাটী ভদ্রলোক, নাম সুরেন্দ্র মারচেণ্ট, থাকেন শ্রীনগরে। 'অল্-ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোসিয়েশন'-এর কাশ্মীর শাখার সম্পাদক। অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন উপলক্ষে দিল্লী গিয়েছিলেন—এখন শ্রীনগর ফিরে যাচ্ছেন। উচ্চান্তঃকরণের অমায়িক ভদ্রলোক। তাঁর সৌজন্য আমাদের বিশেষ কাজে লেগে গেল। মোটর কোম্পানীর ম্যানেজার বলেছিল টাক্সি সূর্য্যাস্তের মধ্যে শ্রীনগর পৌঁছে দেবে। মারচেণ্ট বললেন, "তা অসম্ভব। ওরা ও-রকম বলে থাকে। পৌঁছতে রাত হবে।" তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "শ্রীনগরে গিয়ে রাত্রে কোথায় ওঠা যায়?"

"আপনারা কি আর কখনও শ্রীনগর যান নি?"

"না, এই প্রথম যাচ্ছি।"

"তা হ'লে ত আপনাদের বড় অসুবিধা হবে। পৌঁছতে রাত দাড়ে-আটটা ন'টা হতে পারে। আপনারা এক কাজ করুন; আমাদের ওখানে চলুন, রাতটা সেখানে কাটিয়ে সকালে একটা হাউস-বোট ঠিক ক'রে নেবেন।"

"যদি অন্য কোন উপায় থাকে তা হলে আপনাদের আর কষ্ট দিতে চাই না।"

"কষ্ট কিছুই নয়। আমাদের অতিথিশালা আছে। সেখানে অনায়াসেই রাতটা কাটাতে পারবেন।"

দেখলাম এ-সুযোগ ছাড়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না; সুতরাং ধন্যবাদ দিয়ে আমরা তাঁর প্রস্তাবে রাজি হ'লাম।

শহর ছাড়িয়ে আমাদের মোটর ছুটল সামনের ঐ বিরাট কাল পর্ব্বত-প্রাচীর অভিমুখে। মোটর যতই অগ্রসর হ'তে লাগল, মন ততই এক অপূর্ব্ব পুলকে পূর্ণ হ'য়ে উঠতে লাগল। কাশ্মীর ভ্রমণের আনন্দ যথার্থ আরম্ভ হ'ল এখান থেকে। বার মাইলের পর থেকে দু'দিকে পাহাড় আরম্ভ হ'ল। সতের মাইলে 'সতরমাইল' বলে একটা জায়গা, এইখানে আমাদের মোটর দাঁড় করিয়ে আমাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে আট আনা ক'রে টোল আদায় করা হ'ল। পথে এ-রকম টোল আমাদের আরও দু'জায়গায় দিতে হয়েছিল। মারচেণ্টের কাছে শুনলাম আমরা যদি প্রাইভেট কোম্পানীর মোটরে আসতাম তা হ'লে এ টোল না কি আমাদের দিতে হ'ত না, মোটর কোম্পানীই দিত। এটা হ'ল 'রেইল-কাম রোড' টিকিট কেনার শাস্তি।

সতরমাইলে কিছু ফলা কেনা গেল। বড় বড় সুপক ফলা, দেখতেও যেমন খেতেও তেমনি, অতি উপাদেয়।

মারচেন্ট বললেন, "বেশি খাবেন না। আঁকা বাঁকা পথে মোটর চলবে, মাথা ঘুরবে। পেট ভর্তি থাকলে বমি হবার সম্ভাবনা।"

সত্তরমাইলের পর থেকে আমাদের মোটর আস্তে আস্তে উপরে উঠতে লাগল। তেইশ মাইলের পর থেকে দ্রুত উপরের দিকে উঠতে লাগলাম। আমরা এখন উপুক্ত সমতল প্রদেশ ছাড়িয়ে পার্বত্য রাজ্যের একেবারে ভেতরে প্রবেশ ক'রেছি। চারি দিকে বিরাট বিরাট পাহাড়ের শ্রেণী, গম্ভীর ভাবের চেহারা। এই সব পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে বেঁকে আমাদের মোটর দ্রুত উপরের দিকে উঠতে লাগল। আরও কিছু দূর অগ্রসর হয়ে বহুদূরবিস্তৃত এক নিবিড় পাইন-বনের ভিতর দিয়ে আমাদের মোটর চলল। আমরা এখন যথেষ্ট উপরে উঠে এসেছি, বাতাসে হিম-শীতল স্পর্শ অনুভব করতে লাগলাম। গায়ে যথেষ্ট গরম জামা-কাপড় ছিল, তাই শীত বিশেষ বোধ ক'রলাম না।

সাঁইত্রিশ মাইলে 'পানি বাড' বলে একটা জায়গা, ৬,০০০ ফুট উঁচু। এখান থেকে দু' মাইল দূরে নারি পর্যন্ত একটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে। নারি ঠিক শ্রীনগর যাওয়ার পথে না হ'লেও সব মোটরই যাতায়াতে একবার নারি যায়, যাত্রী নামাতে ওঠাতে। ৬,৫০০ ফিট উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে পাইন বনের ভিতর নারি সহর। এখান থেকে একজন নূতন যাত্রী আমাদের মোটরে উঠলেন—পাঞ্জাবী ভদ্রলোক, শুনলাম তিনি পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের পশু চিকিৎসা বিভাগের একজন রিসার্চ ওয়ার্কার,—কাজ উপলক্ষে শ্রীনগর যাচ্ছেন।

বেয়াল্লিশ মাইলে চিকাগলি ব'লে একটা জায়গা, ৬,৫০০ ফুট উঁচুতে। শ্রীনগর যাবার পথে এইটেই সব চেয়ে উঁচু স্থান। এখান থেকে আমাদের মোটর নীচে নামতে আরম্ভ করল। ৬৬ মাইলে কোহালা বলে একটা জায়গা, ১,৯০০ ফুট উঁচু, এই পথের সব চেয়ে নীচু জায়গা। চিকাগলি থেকে কোহালা চব্বিশ মাইল, এই চব্বিশ মাইলে আমরা নেমে এলাম ৪,৬০০ ফুট। পথে এক জায়গায় পাঞ্জাব প্রদেশের সীমানা ছাড়িয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ ক'রলাম। পথের পাশে এক সাইন-বোর্ডে এ সীমানাস্থান চিহ্নিত করা রয়েছে দেখলাম।

এ অঞ্চলের পাহাড় পর্বত আদৌই জঙ্গলাবৃত নয়। মাঝে মাঝে এক আধটা পাইন গাছ বা ফার গাছের বন বাদে প্রায় সব পাহাড়ই ধূম্র নয়। এই সমস্ত পাহাড়ের গা চ'ষে পাহাড়ীরা শস্য উৎপাদন করে। দূর থেকে এই সমস্ত শস্যক্ষেত্র বড় সুন্দর দেখায়। মনে হয়, যেন পাহাড়ের গায়ে থাপে থাপে নানা রঙের সিঁড়ি উঠে গেছে। মাঝে মাঝে ক্ষেতের পাশে পাহাড়ীদের মাটির সমতল ছাদওয়ালা ছোট ছোট বাড়ী। কোহালার পথে দূরে দেখা গেল অনেক নীচে এক খালের ভেতর দিয়ে সরু ফেনায় নদী ব'য়ে চলেছে।

কোহালা থেকে তিন মাইল এ-দিকে এক জায়গায় আমাদের মোটর দাঁড় করাল। পাশেই দু'টী দোকান—একটী মুসলমানের, অন্যটী শিখের। সেখানে চাপাটি, মাংস প্রভৃতি বিক্রয় হয়। বেলা বোধ হয় তখন সাড়ে বারটা, সূর্য্যের তেজ খুবই প্রখর। তবুও ব্রহ্মপুত্রদেবের তেজও তখন কম প্রখর নয়, দেখলাম আমাদের সহযাত্রী সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটী শিখের দোকানে খেতে বসে গেছেন। যা রে! আমরাই বা ছাড়ি কেন! দোকানটী মোটেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়; উনুনের ধোঁয়ায় সমস্ত দোকান-ঘর কালীবর্ণ, দোকানীর পোষাকও তথৈবচ। এক কালে পোষাকের রঙ্ যে সাদা ছিল তা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু সে সব দিকে লক্ষ্য করবার মত অবস্থা তখন আমাদের নয়! খাদ্যদ্রব্যের সুগন্ধ তখন নাকের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ ক'রে প্রাণ আকুল ক'রে তুলেছে। আমরা প্রত্যেকে একটী ক'রে চাপাটি ও দু'টী ক'রে ডিমের অমলেট অর্ডার দিলাম। লাগল প্রত্যেকের দু' আনা ক'রে পয়সা। কিন্তু সেই দুর্জ্জয় ক্ষিদের মুখে সেই গরম গরম চাপাটি, অমলেট কি উপাদেয়ই যে লাগল কেমন ক'রে বলি। খাওয়া শেষ ক'রে পাশের একটী ঝরণা থেকে ঠাণ্ডা মিষ্টি জল খেয়ে যখন একটী চুরুট ধরালাম, একটা মহা তৃপ্তি বোধ হ'ল। সামনেই একটা খালের ভেতর দিয়ে বেলাম নদী গর্জ্জন ক'রে বয়ে যাচ্ছে। সে দিকে তাকিয়ে ভাবলাম আজ নবমী। বাংলা দেশের লোক হ'য়ে আজ এই নবমী পুজোর দিনে কোন্ সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এক গভীর পার্ব্বত্য রাজ্যে এক দোকানে বসে চাপাটি অমলেট খাচ্ছি। ভাবতে কেমন মনে হল।

হিমালয়ের পথে : শিমলের পাহাড়ে নিবিড় পাইন-জঙ্গলে ছাওয়া

হিমালয়ের পথে

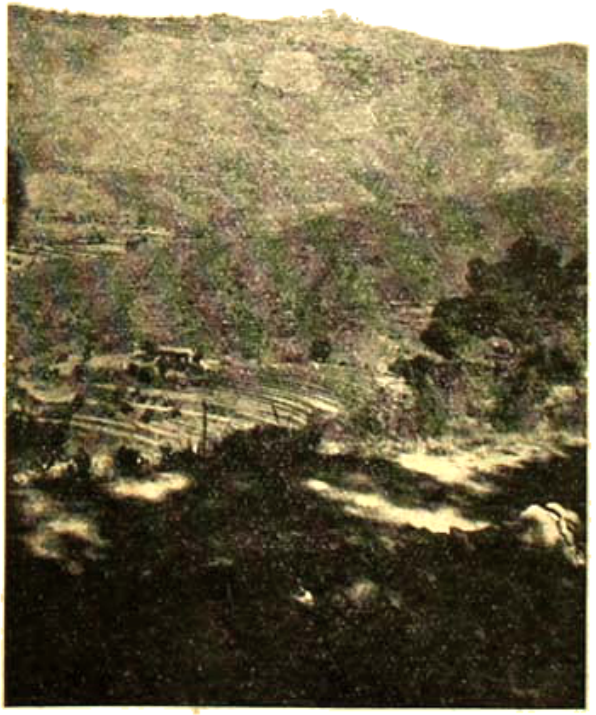

হিমালয়ের পথে

হিমালয়ের পথে

কোহালায় আবার আমাদের কাছ থেকে টোল আদায় করা হল, এবার মাথা পিছু সাত আনা করে। কোহালায় ঝেলামের উপর পুল আছে। এই পুলের উপর দিয়ে ঝেলাম নদী পার হয়ে আমরা কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করলাম। এইখান থেকে ১৬২ মাইলে বড়ামুলা পর্যন্ত,—অর্থাৎ ৯৬ মাইল পথ আমাদের যেতে হল ঝেলাম নদীর পাড় দিয়ে দিয়ে। এই ৯৬ মাইল দীর্ঘ পথের দৃশ্যও মোটের উপর একই রকম, দু'দিকে বিরাট পর্ব্বতের প্রাচীর। মাঝখান দিয়ে ঝেলাম নদী বয়ে যাচ্ছে। এরই এক দিকের পাহাড়ের গা বেয়ে আমাদের মোটর চলেছে; আমাদের এক দিকে খাড়া পাহাড়, আর এক দিকে গভীর খাদ; এই খাদের ভিতর বহু নিম্নে দেখা যায়, ঝেলাম নদী সরোষে ভীম বেগে গর্জ্জন করে চলেছে। সে গতিরও আর বিরাম নেই, সে রোষেরও আর শান্তি নেই। যখনই কোন কারণে একটু মোটর থামে, শুনতে পাই গভীর নির্জ্জনতার মাঝখানে ঝেলামের অবিশ্রান্ত গর্জ্জন। সে গর্জ্জনের একটানা সুরের ভেতর পাওয়া যায় এক অজানা রহস্যের আভাস।

নিরানব্বই মাইলে ডোমেল: এখানে আবার টোল এবং এবারে জন প্রতি ২।০ আনা করে। শুধু টোল নয়। এখানে আমাদের নাম-ধাম, কাশ্মীর যাওয়ার উদ্দেশ্য সব লিখে নেওয়া হল, এবং এইখানে আমাদের প্রত্যেককে লিখে দিতে হল যে, আমাদের সঙ্গে কাস্টম্‌স ডিউটি দেবার মত কোন জিনিস নেই। মনে হল এই ভাবে কাস্টম্ বিভাগের কর্ম্মচারীরা নিজেদের কাজ সংক্ষেপ করেছেন।

টোল আমাদের দুই বন্ধুকে দিতে হল সাড়ে চার টাকা, কিন্তু খুচরো টাকা সঙ্গে না থাকাতে আমরা ড্রাইভারের হাতে পাঁচ টাকার একখানা নোট দিলাম,—ভাঙিয়ে বাকি আট আনা পয়সা আমাদের ফেরৎ দেবে। সে নোটখানি রেখে দিল এবং নিজের পকেট থেকে আপাততঃ ৪৷০ টাকা দিয়ে দিল। কিন্তু সে আট আনা পয়সা পরে আর তার কাছ থেকে আদায় করতে পারি নি। আমাদের সহযাত্রী মারচেন্ট ও সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি দুজনেই বলেছিলেন, "কাশ্মীর ঠগ জুয়াচোরের দেশ; প্রতি পদে সাবধান হয়ে চলবেন।" তাঁদের কথার সত্যতার প্রথম পরিচয় এই পেলাম।

ডোমেল থেকে মোটর ছাড়তে যাচ্ছি, এমন সময় একজন সেপাই এসে আমাদের ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করে পাশের থানাতে নিয়ে গেল। কি ব্যাপার! শুনলাম সে কাশ্মীর আদালতের সমন অমান্য করে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, তাই তাকে ধরেছে। তারপর উপায়? আমাদের মুখ তো শুকিয়ে গেল। মারচেন্ট সাহেব সঙ্গে না থাকলে অনেক দুঃখ আমাদের কপালে ছিল। তিনি গিয়ে অনেক করে ড্রাইভারকে ছাড়িয়ে আনলেন।

ডোমেল থেকে মোটর ছাড়তে তিনটে বেজে গেল। অনেক দেরী হয়ে গেছে,—শ্রীনগর পৌঁছতে অনেক রাত হবে। ড্রাইভার বেগে মোটর ছাড়ল। পাহাড়ের গা বেয়ে সাপের মত বাঁকা বাঁকা সরু পথে ঘণ্টায় প্রায় ৪০ মাইল বেগে আমাদের মোটর ছুটে চলেছে। বাঁ পাশে গভীর খাদ। বন্ধুরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। কোন রকমে মোটর যদি স্লিপ করে পাশের খাদে পড়ে, আমাদের আর চিহ্নটী পাওয়া যাবে না। ভয় হবারই কথা। লজ্জার মাথা খেয়ে বন্ধুরা শেষ পর্য্যন্ত বলে ফেললেন, "একটু আস্তে চালাও।" কে কার কথা শোনে? ড্রাইভার পাঞ্জাবী ভাষায় শুধু মরিব দিল, (মারচেন্ট সেটা ইংরেজীতে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন)—"আপনার তো জীবন বীমা করা আছে, তবে আর ভয় কি!" এর উপর আর কথা চলে না, চুপ করে থেকে মনে মনে দুর্গা নাম জপ করা ছাড়া আর উপায় কি?

বেলা পড়ে আসছে। ঝেলামের জলে ম্লান ছায়া নেমেছে। শুধু পাহাড়ের মাথায় রোদ।

মারচেন্ট বলেছিলেন,—বাঁকা বাঁকা পথে মোটরে করে পাহাড়ের উপর দিয়ে যাবার সময় ঘুরবে, বমি হবারও সম্ভাবনা। আমাদের অবশ্য তা কিছুই হয় নি। তবে এরকম বন্ধুর পথে একটানা ২০০ মাইল মোটরে যাওয়া অনেকের পক্ষেই কষ্টকর হতে পারে। সে ক্ষেত্রে উচিত, যদি সময় হাতে থাকে, পথে দু'এক রাত বিশ্রাম করে যাওয়া। তার বেশ সুবিধেও আছে। পথে অনেক জায়গায়ই বেশ ভালো ডাকবাংলো আছে। সেখানে খাবার দাবার সবই পাওয়া যায়। উড়ি নামক একস্থানে এইরকম একটী ডাকবাংলোয় নেমে আমরা বেলা ৪টার সময় চা খেয়ে নিলাম,—চা'এর সঙ্গে ছিল ওমলেট রুটী-টোষ্ট। খাবার জন প্রতি দশ আনা।

১৬২ মাইলে বড়ামুলা শহর। এইখান থেকে কাশ্মীর উপত্যকা আরম্ভ। বড়ামুলায় যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বড়ামুলা বেশ বড় শহর বলেই মনে হল। শহর ছাড়িয়ে জ্যোৎস্নালোকে দেখলাম বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে দিয়ে আমাদের মোটর চলছে। আর বিশেষ কিছু বোঝা গেল না। শরীরও তখন নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বাহির দেখার উৎসাহ অনেক কমেছে।

শ্রীনগর পৌঁছলাম রাত সাড়ে আটটায়। রাজ্যের মত স্পিনারস্ এসোসিয়েশন (Spinners' Association)এর অতিথি হওয়া গেল। তাঁরা সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। গান্ধীজির শিষ্য—বাড়ীতে আসবাব-পত্রের বালাই নেই,—দোতালা বাড়ীর নীচের তালার একটা ঘর পরিষ্কার করে সেখানে আমাদের জন্যে দুটী খাটিয়া বিছিয়ে দেওয়া হল; তার উপর আমরা বিছানা পেতে ফেললাম। এইবার খাবার পালা। বন্ধুবর বললেন,—তাঁর কিছু প্রয়োজন নেই, শুধু এক পেয়ালা দুধ হলেই চলবে। কিন্তু আমার তাতে চলবে না, দুধের আমি ভক্ত নই, তা ছাড়া খিদেও বেশ পেয়েছে। মারফেট বললেন, "বাঙ্গালীদের মাছের ঝোল ভাত খুব প্রিয় আমরা জানি, এবং কাশ্মীরেও তা যথেষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু এখন তা জোগাড় করা তো সম্ভব নয়।" আমি ভদ্রতা করে বললাম, "কোন প্রয়োজন নেই, আপনারা যা খান তাই আমি খাব।" হায়! তখন কি জানি তারা কি খায়। পরিচয় পেলাম অন্ন পরেই,—এনে দিল চাপাটি তিন প্রকারের শবজি ও একটা বাটিতে সাদা সাদা কি যেন। জিজ্ঞেস করে জানলাম, 'ঘি,' মুখে দিয়ে আমি বিপন্ন গণলাম। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালী এক সৃষ্টি ছাড়া জীব বিশেষ। এ খাদ্য, এ রান্না আর যে-ই পারুক, বাঙ্গালীর পক্ষে গলাধঃকরণ করা অসম্ভব। বন্ধুবরের দূর দৃষ্টির কথা ভেবে মনে মনে প্রশংসা না করে পারলাম না। খাওয়াও গেল চুলায় এখন ভদ্রতা রক্ষা হয় কি করে। যাঁরা সযত্নে পাশে বসে খাওয়াচ্ছেন তাঁদের কাছে কি কৈফিয়ৎ দি! অগত্যা আমাকে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে হল; দু'শ মাইল একটানা মোটরে এসে মাথা ঘুরছে, খাবার ইচ্ছা একেবারেই নেই, ইত্যাদি। তাছাড়া উপায় কি? সত্যের ভয়ডঙ্কা বাজিয়ে এ ক্ষেত্রে যদি বলা যায়,—আপনাদের এ খাদ্য খাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, তা হলে—না, না, এখানে মিথ্যা বলাটাই ধর্ম, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। [ ক্রমশঃ

---

# পল্লীমাতা

—শ্রীগোপেশ্বর সাহা

গ্রাম-জননীর কোলের ছেলে আমরা যে ভাই গ্রামের লোক,
গাঁয়ের বুকেই থাকতে চাহি গাঁয়ের পরেই মোদের ঝোঁক।
মুক্ত আকাশ মুক্ত বাতাস মুক্ত আলোর বর্ণা-ধারে
নিত্য মোরা নাইয়ে উঠি আসতে যেতে শতেক বারে।
বিল-বাঁওরে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী নাচেন দিবস-রাতে
পল্লবনে পল্লাশয়া চরণ ফেলেন পদ্ম-পাতে।
গ্রাম ওটিনী ঢেউ খেলে যায় বাঁকে বাঁকে কোণটি ঘেঁসে,
পাল তুলে যায় বোঝাই তরী কোন্ অজানার যায় যে শেষে!
উদাস হয়েই চেয়ে দেখি, চেয়ে দেখে গ্রামের বঁধু,
জলের ঘাটে কাঁকন বাজে চরণে মল করায় মধু।

মুক্ত মাঠে মুক্ত ঘাটে মুক্ত বাটে সবার সাথ,
এক সাথেতে মিশতে পারি ধরতে পারি সবার হাত।
আজো ইহার শ্যামল বুকে শ্যামল কানাই বাজিয়ে বেণু,
উড়িয়ে চলে সন্ধ্যা সকাল গোধূর ধূলির ধূসর রেণু।
আজো দেখায় মা অশোধা প্রাণ গলান' প্রীতির সাথে
চন্দ্র-পুলি ক্ষীরের নাড়ু গড়ায় সুখে আপন হাতে।
এই সে গ্রামের ধূলিকণায় গোলক ব্রজ রয় যে মিশে,
এই সে গ্রামের নদীর জলে গঙ্গাধারা হারায় দিশে।
এই যে মোদের তীর্থ রে ভাই সাত পুরুষের পুণ্য ধাম,
প্রণাম জানাই মায়ের পায়ে ভক্তিতে গাই মায়ের নাম।

# অনির্বাণ

—শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চী

'সাত ভাই চম্পা জাগো রে
কেন ডাকে পাখী ডাকো রে।'

সাত ভাই না হ'লেও তিন ভাই বটে। বোন একটি—নাম জয়ন্তী। তিন ভাইয়ের নাম—পার্থসারথি, সাত্যকি আর দেবকুমার। এরা ব্রাহ্মণ—মুখোপাধ্যায়। কলকাতায় যে হঠাৎ এরা আসবে, এমন কোন সম্ভাবনা ছিল না। বাড়ী পাড়াগাঁয়ে। বাপ-মা কেউই নেই। সম্পত্তির মধ্যে জমি-জমা, গাঁয়ের পাকা বাড়ী, আম-কাঁঠালের বাগান, দু'একটি পুকুর—এই। এ সব দেখা-শোনা করে একজন প্রবীণ লোক, নাম তা'র মধু। সে এদের দেশের বাড়ীতেই থাকে। জয়ন্তীর বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে। এদের মা'র মৃত্যু আগেই হ'য়েছিল। জয়ন্তীর বিয়ে দিয়েই তা'দের বাবা মারা যান। বাবা মারা গেলেও সংসারে অর্থকষ্ট হয় নি। নগদ টাকাকড়ি ছিল, তা ছাড়া সম্পত্তির আয়ও ছিল—তা'তেই বেশ চলত। অবস্থা এক কথায় ভালই বলতে হ'বে।

পার্থসারথি, সাত্যকি আর দেবকুমার—তিন ভাই-ই এখনো ছাত্র। বহরমপুর কলেজে তা'রা পড়ে। মাঝে মাঝে ছুটি-ছাটায় বাড়ী আসে। বাড়ীতে এমন কেউই নেই যে, তা'রা বাড়ী এলে তা'দের যত্ন করে। একা মধু সব দিক্ সামলাতে পারে না। যোগাড়-যন্ত্র সে ক'রে দেয় বটে, কিন্তু যত্ন যা'কে বলে, সেটা শুধু মেয়েদের সেবাতেই পাওয়া যায়, সেটা মাতৃহীন তা'রা কোথায় পাবে? তিন ভাই বাড়ী এসে হৈ হৈ আরম্ভ ক'রে দেয়। একটা কথা বলা হয় নি—তিন ভাইই পিঠোপিঠি, বয়সের তফাৎ খুব বেশী নেই। বড় পার্থসারথি, দোহারা চেহারা, রঙ্ ময়লা, চোখ দু'টি টানা-টানা, বড়-বড়। বড় ব'লেই হোক, আর যার জন্যই হোক, একটু দায়িত্ববোধ যেন তার বেশী। বয়স পঁচিশ। মেজ সাত্যকি প্রায়ই ম্যালেরিয়ায় ভোগে, রঙ্ ফর্সা, বয়স তেইশ। চোখমুখ তিন ভাইয়েরই প্রায় এক রকম। অসুখে ভুগে ভুগে তার মেজাজটা একটু খিটখিটে। ছোট দেবকুমার, দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ গঠন, বয়স একুশ, তার বড়দাদার মত রঙ ময়লা নয়, কবিতা লেখা, ছবি আঁকা প্রভৃতি সুকুমার কারু-শিল্পের প্রতি তার অনুরাগ; একটু অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয়, সাহসী। ভাইদের মধ্যে দু'জন, পার্থসারথি আর সাত্যকি বি. এ. আর দেবকুমার আই. এ. পড়ে। জয়ন্তী দেবকুমারের চেয়ে বছর দেড়েকের ছোট। জয়ন্তীর স্বামীর নাম দিগিন্দ্র; তাঁকে দেখলে মনে হয়, তাঁর বয়স বেশী হ'য়েছে। কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছর বয়স খুব বেশী আর কি! দিগিন্দ্র গ্রামেই থাকেন। গ্রামেরই একটি ইস্কুলে দিগিন্দ্র পড়ান। জয়ন্তী দেখতে সুশ্রী। বাড়ী পাড়াগাঁয়ে হ'লেও লেখাপড়া বাংলা-ইংরেজী সে তার বাবার কাছে শিখেছে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে তারই উপরে তার বাবার স্নেহ যেন একটু বেশী ছিল ব'লে মনে হয়। পার্থসারথি বেরীতে পড়াশুনা আরম্ভ করেছিল ব'লে ইস্কুল-কলেজের পড়াশুনা-পরীক্ষা প্রভৃতি দিতে দিতে তার বয়স একটু বেশীই হ'য়ে পড়েছে।

পুজোর ছুটিতে বাড়ী এসে সাত্যকি পড়লো জ্বরে। সে জ্বর ক্রমশঃ বেড়ে চলল। বাড়ী এসেই তারা শ্বশুরবাড়ী থেকে জয়ন্তীকে আনিয়েছে। সে অনেক চেষ্টা ক'রে শেষটায় দেশের চিকিৎসাপদ্ধতির উপর বিরক্ত হ'য়ে বলল, "দাদা, মেজদা'কে নিয়ে কলকাতায় চলো।" তারই নির্দেশ মত সবাই কলকাতায় এসে উঠেছে। প্রথম এক আত্মীয়ের বাড়ীতে এসে উঠে তারা দু' একদিনের মধ্যে ভবানীপুর অঞ্চলে একটা চমৎকার বাসা দেখে নিয়েছে। রোগীর থাকবার উপযুক্ত বাসা। তিন চারখানা ঘর, এক ফালি ছোট উঠান। সামনের এক টুকরো জমিতে কয়েকটি ফুল-গাছ। স্নানের জায়গায় সুন্দর ব্যবস্থা। জয়ন্তী বাসা দেখে খুব খুশী। সে বলল, "দাদা, হয় তো এ বাসায় মেজদা সেরে উঠবে।"

জয়ন্তীর কথাই সত্য হ'ল। চিকিৎসার ব্যবস্থায় আর স্থানপরিবর্তনের গুণে সাত্যকি ক্রমশঃ সুস্থ হ'য়ে উঠতে লাগল। সেদিন সন্ধ্যায় দোতলার সামনের ছোট বারান্দায় চায়ের ভাইবোনের চা-পান এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তা

ছিল। পার্থসারথি চা খেতে খেতে বলল, "জয়ন্তী, তুই না এলে সাত্যকিকে নিয়ে মহাবিপদে পড়তে হ'ত।" পার্থসারথির কথার উত্তর না দিয়ে জয়ন্তী তার মেজদাদার মাথায় হাত বুলোতে লাগল। সাত্যকি তার রোগপাণ্ডুর মুখখানি জয়ন্তীর কোলের উপর নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় রেখে চোখ দু'টি বুজে জয়ন্তীর নিঃসঙ্গ সেবা গ্রহণ করছিল। জয়ন্তীও ঈষৎ নত হ'য়ে তার মেজদা'র মাথার বড় বড় চুলগুলির মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে। একটি ভারি সুন্দর আরাম, এবং যেন তারই সেবায় সাত্যকি সেরে উঠেছে এই রকম একটি সার্থকতার ভাব তার মুখে। পার্থসারথি আবার বলল, "তোকে নিয়ে আসাই মুস্‌কিল, বিয়ে হ'য়ে গেলে মেয়েরা একেবারে পর হ'য়ে যায়, বাপের বাড়ী ব'লে কিছু যে একটা আছে এ কথা মেয়ের শ্বশুরবাড়ীর লোকদের বোঝানো কঠিন। কত হাঙ্গামার পর তোকে নিয়ে আসা হল বল দেখি।"

দেবকুমার চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, "হাঙ্গামাই বটে! পাঞ্জির ঠেলায় অন্ধকার। বাপ রে বাপ, তুমি আর কি ভালো বড়দা', আমাকেই তো নিয়ে আসতে হ'য়েছে, ঠেলাটা আমিই বুঝেছি।"

জয়ন্তী মৃদু মৃদু হাসছিল। একটু হেসে বলল, "এমনি সর্ব্বত্রই। ওরই মধ্যে বুঝে সুঝে চলতে হবে, পাঞ্জি মানতে হবে প্রয়োজন হ'লে।"

দেবকুমার বিরক্ত হ'য়ে বলল, "তুই যেমন চলিস, তা হ'লেই হ'ল, কিন্তু দরকারের সময় এমন বিরক্তি আসে যে, কি আর ব'লব! মনে কর, তুই না এলে এ দিকে অচল, অথচ সেই সময়ে যদি কারণে অকারণে আসতে দেরী হয়, তা হ'লে কি মুস্‌কিল হয় বল দেখি!"

"জানি ছোটদা', তোমরা যেমন দরকারটা বোঝো, তারাও তেমনি বোঝে, তা'দের বুদ্ধির মধ্যে একটু বেশী মাত্রায় পাঞ্জি ঘোরাফেরা করে, তোমাদের তা' করে না, এই যা তফাৎ। দেরী হয়, হাঙ্গামা হয় ব'লে কোনো উপায় নেই। মানুষের জগৎটাই অমনি বেয়াড়া রকম।"

সাত্যকি ক্ষীণ স্বরে একটু প্রতিবাদ জানিয়ে, বলল', "কি বক্ বক্ করছ তখন থেকে? আমার তো ও সব কিছুই ভালো লাগে না। রাত্রে আমাকে কি খেতে দেবে? ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে দেবকুমার?"

"হাঁ, যাই এবার, সন্ধ্যের পর আবার তিনি বেরিয়ে যান।" এই ব'লে দেবকুমার পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে আর তালতলা জোড়া প'রে ডাক্তারের উদ্দেশ্যে বা'র হ'ল।

•

পার্থসারথি মুখ গম্ভীর ক'রে বলল, "কেমন বুঝছ সাত্যকি? পুজোর ছুটি তো প্রায় শেষ হ'ল। তোমাকে নিয়ে তেজে টেজে যেতে হবে না তো? ডাক্তার এলে কথাটা ভালো ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখতে হবে। আমার হ'য়েছে নানা ভাবনা। ধরো যদি তেজেই যেতে হয়, তা'হলে দেবকুমারের আর পড়ার ক্ষতি না ক'রে ওকে বহরমপুর পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল। তা'হলে তুমি, জয়ন্তী, আর আমি—আমরা এই তিনজন ধরা যাক মেয়ে কেটে দেওঘর কিংবা মধুপুর পর্য্যন্ত যেতে পারি, সঙ্গে চাকর-বাকর নিতে হ'বে, আরও নানা হাঙ্গামা আছে। তারপর, জয়ন্তীর শ্বশুরবাড়ী থেকে লোক এসে ওকে নিয়ে যেতেই বা কতক্ষণ? এই সব নানা ভাবনা আমার।"

জয়ন্তী বলল, "আচ্ছা, ধরো যদি নিয়েই যায়," এই ব'লে জয়ন্তী কি একটা ভেবে নিল, তারপর বলল, "না, তা হবে না। মেজদা' সম্পূর্ণ সুস্থ না হ'লে আমি যা'ব না!"

পার্থসারথি তা'র দিকে খানিকক্ষণ বিহ্বলের মত তাকিয়ে রইল, তারপর বলল যেন আপন মনেই, "ও যাবি নে, আচ্ছা দেখা যাক, কি কতদূর হয়!"

সাত্যকি ধীরে ধীরে তা'র রোগজীর্ণ দেহটিকে নিয়ে উঠে বসল, এবং বারান্দার রেলিংএর উপরে মাথাটা রেখে বলল, "তোমাদের অত ভাবতে হবে না, বোধ হয় আমি এখানেই সেরে উঠব।" তারপর জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে সে বলল, "তুই তো যাবি নে; সে আমার পক্ষে অনেকখানি। সত্যি দেখ, অসুখবিসুখ যে কি ভয়ানক, তাই ভাবি। কত দিকে কত ক্ষতি—মনটা যেন একটা ছোট ছেলের মত হ'য়ে যায়।"

"হাঁ, বুঝি খুবই, তোমাকে একটা বালিশ এনে দেব? রেলিং দিয়ে বাইরের মাঠ আর রাস্তা দেখবে।"

"আচ্ছা, নিয়ে আয়, তোর তো আবার অনেক হাঙ্গামা আছে!"

পার্থসারথি বল্‌ল, "আচ্ছা, তাই যাও। আমাকে আবার একটু বেরুতে হ'বে।" এই ব'লে পার্থসারথি বারান্দা থেকে চ'লে গেল।

জয়ন্তী বলল, "আচ্ছা মেজদা, ইজি-চেয়ারটাই নিয়ে আসি। আর আমি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসি তোমার কাছে, কেমন? তোমার জন্যে একটু দুধ নিয়ে আসব, না, এক পেয়ালা কোকো তৈরী ক'রে দেব?"

সাত্যকি শুধু বল্‌ল, "কোকোই করে' দে!"

২

"যে দিন মনে ছিল আশা"

জয়ন্তী বারান্দাতে ইজি-চেয়ারে সাত্যকিকে শুইয়ে নিজে একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে তা'র পাশেই এসে বসল। বল্‌ল, "চা তো তুমি খাও নি! তোমাকে এক কাপ কোকোই ক'রে দি ষ্টোভ্ জেলে।"

"তাই দাও।"

"বি" ব'লে জয়ন্তী সামনের ঘরে ষ্টোভ্ জ্বালতে গেল। সাত্যকি ইজি চেয়ারে শুয়ে সামনে চেয়ে রইল। মাঠের উপরে অন্ধকার, সম্মুখেই পথ, দু' ধারে গাছপালার মধ্য থেকে গ্যাসপোষ্টগুলো মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। পূজো শেষ হ'য়ে গিয়েছে; অল্প অল্প ঠাণ্ডা। শিশিরে ঘোঁয়াতে গ্যাসের আলোয় সামনের মাঠটি সাত্যকির বড় অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। জয়ন্তী কোকো নিয়ে এসে সাত্যকিকে দিয়ে বলল 'খাও!'

কোকো খেতে খেতে সাত্যকি বলল, "জয়ন্তী, তোর ছোট বেলার কথা মনে পড়ে?"

জয়ন্তী তা'র সুন্দর মাথাটি একটু কাৎ ক'রে বলল, "হ্যাঁ পড়ে।"

"আমার তো কোনো জ্ঞানই ছিল না, অসুখের সময়ে তোকে খুব খাটতে হয়েছে, নয় রে?"—সাত্যকি জিজ্ঞাসা করল।

"আমি না খাটলে কে আর খাটবে বলো—যা আছে আমাদের?"—এই খানটিতে জয়ন্তীর গলার স্বর একটু ধ'রে এল।

"আচ্ছা, শ্বশুরবাড়ীতে তুই কেমন আছিস?"

"খুব ভাল!"

"না, বল না, সেখানে শান্তিতে—এই ধর, এখানে যেমন স্বাধীনভাবে মনের আনন্দে মাথার কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পাস, সেখানে তেমন পারিস?"

"সেটা অবশ্য সম্ভব নয়। তবে মোটামুটি ভালই আছি।"

"আচ্ছা কোথায় তোর ভাল লাগে, এখানে না সেখানে?" কোকোর কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সেটা নীচে নামিয়ে রেখে সাত্যকি জিজ্ঞাসা করল।

"যদি বলি সেখানে?"

"তা'হলে ত খুবই ভাল হয়। তা' হলে বুঝব, তুই খুব ভাল আছিস!"

"সত্যি কথা বল্‌ব? কোনোখানেই ভালো লাগে না আমার, কেবল মনে হয় ঘুরে ঘুরে বেড়াই এখান থেকে সেখানে।"

"যেমন ঘুরে ঘুরে বেড়াতে এ-পাড়া থেকে সে-পাড়া ছোট বয়সে! কোথায় কা'র অসুখ করেছে, তা'র জন্যে চিন্তে, তাকে খাবার দিয়ে আসা, মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া—এ অভ্যেসটা তোমার ছোট থেকেই—মনে পড়ে?"

"হ্যাঁ পড়ে!"

"এখন তোকে আমরা ঘরে বন্দী করেছি, এ ঘরে আর সে-ঘরে। একবার এ ঘরে আসবি, আবার সে-ঘরে যাবি, কেমন? সেখানে কারও অসুখ-বিসুখ করে না রে? তা' হলে বুঝতাম, আমার লক্ষ্মী বোনটির মর্যাদা তা'রা বুঝত!"

"কই না তো, অসুখ-বিসুখ কার নেই। মাঝে মাঝে হয় ম্যালেরিয়া—ম্যালেরিয়ার সময় কেটে গেলে, আর অসুখ-বিসুখ হয় না।"

"ও তা বটে, একবার যদি বেশীরকম অসুখ কারো হয়, তখন সব বুঝবেন জয়ন্তীকে। যেমন আমার হ'য়েছে, অবশ্য এরকম যেন আর কারও না হয়—তা'ও বলি।"

"যা—ও, তুমি আমাকে বড্ড বাড়িয়ে দিচ্ছ। আমি এবার যাই, তুমি একটা কিছু পড়ো, সেই 'বন্ধনা'র বই, না 'মুনু'র বই পড়বে?"

"'মুনু'র বইখানা দিয়ে যা—'যোগাযোগ' তো! আঃ, আমার বড় সুন্দর লাগে সেই বই।"

"যাই", ব'লে জয়ন্তী পাশের একটা ঘরে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

৩

দেবকুমার স্কুলবাগান রোড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ল্যান্সডাউন রোডে এসে উঠল, কাছেই ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারী। গাড়ী-ঘোড়া, ট্যাক্সি, মোটর, বাস, রিক্সা,—ছুর্জেয় যান-চক্রের যুদ্ধ ব্যূহ ক'রে ডিস্‌পেন্সারীতে এসে দেবকুমার বসল। সমস্ত ছুটিটা তা'র রোগীর সেবা করতেই কেটে গেল। ভাইদের মধ্যে যে ছোট হয়, তারই উপর যত কাজের ফরমাস। সে ভেবেছিল, ছুটিতে আধুনিক বিদেশী কবিদের কবিতা অনুবাদ করবে, পড়াশুনা করবে, ছবি আঁকবে, কিন্তু সে সব কিছুই তা'র হ'ল না। মনের এক কোণে এইরকম একটি ক্ষোভ, আবার অন্য দিকে সান্ত্বনা যে সেরে উঠেছে, এ যাত্রা সে যে খুব বেঁচে গেছে—এ ভাবনাও তা'র আছে। এইরকম বিধা দ্বন্দ্ব নিয়ে,—দা ও বয়সের ছেলেদের থাকা স্বাভাবিক—দেবকুমার ডাক্তারখানার চেয়ারে এসে বসল। খানিক পরেই নিজেই মোটর চালিয়ে ডাক্তারবাবু এসে উপস্থিত। গলদের স্যুট, ইন্‌জেকশন করার সরঞ্জাম,—একেবারে কড়কড়ে তকতকে সদর ডাক্তার।

"এই যে এত সকালে? রোগীর খবর কি?"

"ভালই, তবে কেমন জানি মন-মরা ভাব। ওটা বাঘে কি ক'রে?"

"ক্রমশঃ বাঘে—অত ব্যস্ত হ'লে চলে কি? একটা ক্রনিক রোগ—সারতে দেরীও হয়!"

"চেঞ্জের কথা বাবা জিগ্যেস করছিলেন।"

"চেঞ্জ? কলকাতাতেই তো চেঞ্জ হ'ল। আবার চেঞ্জে গিয়ে কি হ'বে?"

"তা হ'লে ওঁকে কি বলব?"

"বলবেন, পরে দেখা যাবে ভেবে-চিন্তে।"

"আপনাকে তো যেতে হ'বে এখন?"

"তা হবে বই কি। ইন্‌জেকশন এখনও বাকী। যেতে হ'বে। আজ আরও তাড়া। দুই এক দিন পরে যাব। এ কথাও বলবেন।"

"আচ্ছা"—বলে দেবকুমার বিদায় হ'ল।

৪

পার্থসারথি বাড়ী থেকে বেরিয়েই দেখে রাস্তার মোড়ে ভীষণ ভিড়। হৈ-হৈ, মার-মার, কাট-কাট অবস্থা। একটা লোক উর্দ্ধশ্বাসে কাছা-কোঁচা খোলা অবস্থাতে দৌড়চ্ছে। পিছনে অগণ্য বেকার দর্শকের দল। তারা 'চোর চোর' ব'লে লোকটির পিছু পিছু ছুটছে। পার্থসারথি লোকটির এইরকম অসহায় অবস্থা দেখে ভাবল, তাই তো ওর চেহারা দেখে তো চোর বলে মনে হয় না! ফুটপাথের উপর প'ড়ে র'য়েছে একটা ছাতা, আর একটা ভালি দেওয়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ। একটু এগিয়ে গিয়েই পার্থসারথি প্রাণপণে দৌড়ে লোকটির পিছু নিল। সে তখন ব্যাকুল হ'য়ে এ-গলি থেকে ও-গলি করছে। এক হাতে সে কাছা সামলায় তো কোঁচা যায় খুলে, আবার কোঁচা সামলায় ত কাছা যায় খুলে—এমনি অবস্থা।

যা'রা পিছু নিয়েছে, তারা খানিকক্ষণ দৌড়ে দৌড়ে ক্লান্ত হ'য়ে ঘাম মুছতে মুছতে বলল, "ও চোর নয়, আসল চোর কোথায় এতক্ষণ পগার পার!" এই ব'লে তারা তো যায় চলে। পার্থসারথি কিন্তু ব্যাগ ও ছাতাটি নিতে ভোলে নি। একটা জনবিরল গলির মোড়ে সে লোকটির প্রায় কাছাকাছি এসে চেঁচিয়ে ডাকল, "ও জামাইবাবু, শুনছেন, আরে মশাই এদিকে আসুন, ও জামাই বাবু!"

জামাইবাবু এইরকম বার কয়েক স্নিগ্ধ কণ্ঠের ডাক শুনতে পেয়ে তাকিয়ে দেখেন তাঁরই শ্যালক পার্থসারথি।

"আরে কি সর্ব্বনাশ ভাই, আজ শ্রীঘরে গিয়েছিলাম আর একটু হ'লে। কোন্ ব্যাটা চুরি করেছে, আর উনোর পিণ্ডী বুধোর ঘাড়ে। ভালো দিন দেখে বেরিয়েছি, তা সত্ত্বেও এমন বিপদ"—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে "হরি হে, তুমিই সত্য"—বলে তিনি পার্থসারথিকে জড়িয়ে ধ'রে অত্যন্ত বিহ্বল হ'য়ে পড়লেন।

"আরে, ব্যস্ত হ'বেন না, করেন কি, করেন কি"—বলে পার্থসারথি বলল, "এই দেখুন আপনার সেই ব্যাগ, আর এই ছাতা। আসুন আমার সঙ্গে—ওরকম হয় কলকাতা শহরে।" —বলে পার্থসারথি তো বিহ্বল জামাইবাবু গিরিন্দ্রনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে এ-গলি সে-গলি ক'রে বাড়ী এসে হাজির।

ঠিক সেই সময়ে দেবকুমারও বাড়ী ঢুকছে।

"আরে গিরিনবাবু যে, এমন অসময়ে।"

"হরি হে, তুমিই সত্য।" বলে গিরিন্দ্রনারায়ণ বাইরের ঘরের চৌকীর উপর নিতান্ত অসহায়ের মত বসে পড়লেন।

৩

"এই যাহ আপে কয় আর"

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর। ইজি-চেয়ারে সাত্যকি শায়িত। দেবকুমার একখানি টুলের চেয়ারে ব'সে তা'র মাথার বড় বড় চুলগুলির মধ্যে আঙুল পুরে দিয়ে চুলগুলোকে মুঠো মুঠো ক'রে ধ'রে টেনে টেনে দিচ্ছিল। সাত্যকি চেঁচিয়ে উঠে বলল; "একটু আস্তে দেবকুমার, একটু আস্তে!"

"কষ্ট হচ্ছে? আচ্ছা আস্তেই দিচ্ছি। ডাক্তার বাবু তো বলেন, চেঞ্জ এখন নয়, পরে ভেবে-চিন্তে দেখবেন!'

"ও!"

"এদিকে দিগিন্দ্র ও এসে হাজির! জয়ন্তীকে নিয়ে যা'বে না কি?" সাত্যকি ম্লান হেসে বলল, "যায় যাক! বাধা দিও না। আমি তো এখন সেরে উঠেছি।"

"যদি তোমার চেঞ্জ দরকার হয়, তখন সঙ্গে কে যা'বে?"

এমন সময়ে বিশ্রাম করবার জন্যে পার্থসারথি ঘরে এল। ঘরে এসে আর একটা ইজি-চেয়ারের ডাঁজ খুলতে খুলতে সে বলল, "দু পহরে বেশ একটু ঘুম পাও, বিশেষ ক'রে আহারাদির পর। ওদিকে ওরা দু'জনে কথাবার্ত্তা কইছে!"

ইজি-চেয়ার থেকে মাথা তুলে সাত্যকি বলল, "কে কে?"

সারথি বলল, "দিগিন আর জয়ন্তী।"

দেবকুমার বলল, "যাক বাঁচা গেল। কথা না কইলেই ঘুম্‌কিল। তবে চ'লে যদি যায়, তাহ'লে ছোটবার উপায় কি হ'বে?"

"উপায় ভগবান্। তুমি বোধ হয় চেঞ্জের কথা ভাবছ?"—সারথি বলল। এমন সময় বাড়ীর দরজার কাছে মোটরের হর্ণ শুনতে পাওয়া গেল। সত্য বলল, "ঐ বোধ হয় ডাক্তার। লক্ষণ, যা' দরজা খুলে দিয়ে আয়।"

কক্ষান্তর থেকে ভৃত্য লক্ষণের সকরুণ 'যাই' কণ্ঠস্বর শোনা গেল। খানিক পরেই সদর ডাক্তার ঘরে এলেন।

পার্থসারথি ইজি-চেয়ার ছেড়ে উঠে বলল, "এই যে ডাক্তার বাবু, আসুন, আসুন!"

•

একখানি চৌকীতে দিগিন্দ্র অর্দ্ধ-শয়ান। কখনও বা আবিষ্ট অবস্থায় চোখ-দু'টি অর্দ্ধ-মুদ্রিত হচ্ছে, কখনো বা খুলছে। বোধ হয়, সকালে রাস্তায় যা ঘটেছে, তা'রই ক্লান্তিতে তাঁকে অত্যন্ত অসহায় ব'লে মনে হচ্ছে। জয়ন্তী চৌকী থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে টেম্পারেচার লেখা খাতাখানি উলটে যাচ্ছে। মৃদু নিম্ন স্বরে সে প'ড়ে ব'লে যাচ্ছে; "১৫।১০।৩৮ হ'ল ম্যাক্সিমাম্ ১০০ ডিগ্রী, ১৬।১০।৩৮ হ'ল ঐ, ১৭।১০।৩৮ হ'ল ৯৯·৪ ডিগ্রী, ১৮।১০।৩৮ হ'ল একোরে ৯৮·৪ ডিগ্রী, এমনই ক্রমশঃ কমছে, কি জানি হঠাৎ যদি আবার বেড়ে যায়, তাহলে—(দিগিন্দ্রের দিকে ফিরে) আপনার জন্যে এক গ্লাস জল আর নেবু, কেমন? আচ্ছা, এনে দিচ্ছি। আর কিছু চাই?"

গম্ভীর কণ্ঠে দিগিন্দ্র বললেন, "না!"

টেবিলের উপর খাতাখানি এবং অন্যান্য সরঞ্জাম গোছাতে গোছাতে জয়ন্তী বলল, "বাড়ীতে উপস্থিত সব কেমন—পিসিমা, রবীন্দ্র, ফণীন্দ্র?"

দিগিন্দ্র দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চৌকীতে উঠে ব'সে বালিশ একটা বুকে টেনে নিয়ে বললেন—"রাস্তায় আসতে আসতে আজ কি বিপদ! ভেবেছ বোধ হয়?"

জয়ন্তী বলল, "হাঁ!"

"বাড়ীতে সব ভালই। তবে, তুমি এসেছ এখানে আজ—" দিগিন্দ্রের মুখ থেকে এ কথা বেরুতে না বেরুতেই ভৃত্য লক্ষণ ঘরে এল। এসে সে বলল, "দিদিমণি, ডাক্তার-বাবু এসেছেন। আপনাকে ডেকে আনতে বললেন, ছোট-দাদা বাবু।" ব'লে সে চলে গেল। দিগিন্দ্র ব্যস্ত হয়ে বললেন, "তা হলে, আমিও যাই তোমার সঙ্গে, কি বল?"

ব্যস্ত ভাবে টেম্পারেচার-খাতা নিয়ে চলতে চলতে জয়ন্তী বলল, "আসুন!"

•

বারান্দায় পার্থসারথি, সাত্যকি, দেবকুমার, ডাক্তারবাবু, জয়ন্তী এবং দিগিন্দ্র। দ্বিপ্রহর বৈকালের দিকে চলেছে।

ডাক্তারবাবুর দিকে ফিরে জয়ন্তী বলল, "আপনি এমন অসময়ে?"

ডাক্তার বললেন, "অসম্ভব কাজের ভিড়, সময় পাচ্ছি সে সব জায়গায় যেতে—তাই!"

জয়ন্তী বলল, "তা' এসেছেন এসেছেন, বেশ করেছেন, এখন বলুন তো দেখি, চেঞ্জ দরকার হ'বে, না হ'বে না—সেই অনুসারে আমাদের সব ব্যবস্থা।"

দিগিন্দ্র অন্তরীর দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। অন্তরী যে তাঁর সামনে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা কইছে, এতেই তাঁর বিস্ময়। তাঁদের বাড়ীতে এ ব্যাপারটা একেবারে নতুন এবং অসম্ভব।

ডাক্তার সবিস্ময়ে বললেন, "চেঞ্জ? না, এখন দরকার নেই। তবে, ঠিক বলতে পারছি না কখন কি হয়। দেখা যাক তো—"

সারথি বলল, "একটু কথা আছে। দেখুন তা হ'লে একটা ওলট-পালট হ'য়ে যাবে। দেবকুমারকে তা হ'লে দেশে পাঠিয়ে দিতে হয়। যদি সাত্যকিকে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে করেন, তা হ'লে আর বাসা রেখেই বা কি ফল?"

ডাক্তার বললেন, "সম্পূর্ণ সুস্থ তো বলা যায় না। বলেছি তো কখন কি হয়, দেখতে হ'বে। অর্থাৎ আরও মাসখানেক দেখুন আপনারা।"

দেবকুমার একটু বিরক্তির সুরেই বলল, "সেই কথা বলুন, তা হ'লে আমি আজই রওনা দি। আমার এখানে একটুও ভাল লাগছে না।"

ডাক্তার নিঃশব্দে তাঁর কাজ শেষ ক'রে অন্তরীর কাছ থেকে টেম্পারেচারের খাতাখানা নিয়ে পাতা উল্টাতে উল্টাতে বললেন, "যা দেখা যাচ্ছে, তা'তে ভালই মনে হয়। একটা ওষুধ দেবার ব্যবস্থা করতে হ'বে, আর ডায়েট সম্বন্ধে যা বলেছি তাই, আর শুধু উপস্থিত দু' একদিন বন্ধ থাক। দেখাই যাক না কেন, কি রকমটা দাঁড়ায়!"

নতমস্তকে ধীর ভাবে দিগিন্দ্র বললেন, "তা হ'লে ভালোই মনে হচ্ছে, কি বলেন? সবই এই অসুখ এবং অসুখ সারানর ব্যবস্থা নিয়ে, আর অসুখ যখন ভালোর দিকেই যাচ্ছে, তাই আমার কিছু বলার ছিল, আপনারা সবাই আছেন, বলব কি?"

ডাক্তার বললেন, "বলুন, বলুন!"

মাথা চুলকোতে চুলকোতে দিগিন্দ্র বললেন, "সাত্যকি যখন ক্রমশঃ সেরেই উঠছে, তখন (অন্তরীর দিকে নির্দেশ ক'রে) এঁর আর এখানে থাকার প্রয়োজন তো দেখছি নে।"

ডাক্তার অল্প হেসে বললেন, "অ' বটে, তবে এ আপনাদের ফ্যামিলি ম্যাটার্স, (পারিবারিক ব্যাপার) এ আপনারা রিটুয়িন ইওরসেল্‌ভ্‌স (নিজেদের মধ্যে) ঠিক ক'রে নেবেন। আসি তবে, নমস্কার—" ব'লে ডাক্তার বিদায় নিলেন।

দেবকুমার বিচলিত ভাবে বলল, "তা হ'লে আমি যাচ্ছি বড়দা', অন্তরীও যদি—"

সাত্যকি বিষণ্ণ ভাবে বলল, "তোমরা সবাই যাও; আমার সঙ্গে একটা ঠাকুর আর ঐ লক্ষ্মণ থাকবে।" বিষণ্ণ-ভাবে সেখানে রাস্তায় টপ দি অ্যাণ্ড বাই ওয়ান-লেখা আইস ক্রীম-এর সাইকেল যাচ্ছে, সেই দিকে সে তাকিয়ে রইল।

একটা চড়াই পাখী খড়কুটো মুখে ক'রে 'রাণীগঞ্জ টাইলে'-ছাওয়া বারান্দায় উড়ে এসে বসল, তার পর, লোহার শিকের উপর দিয়ে সে এখানে ওখানে ছুটোছুটি করতে লাগল।

খানিকটা নিস্তব্ধতা। তার পর পার্থসারথি বলল, "তাই তো চিন্তার বিষয়। (দিগিন্দ্রের দিকে ফিরে) এতই যদি হ'ল, আরও একটা মাস অপেক্ষা করুন দিগিনবাবু, কি বলেন?"

দিগিন্দ্র বললেন, "দেখুন, যা ভালো হয়।"

অন্তরী মাথার ওণ্ঠন একটু টেনে দিয়ে বলল, "আমি এখন যাব না।"

রাস্তায় ফেরীওয়ালাদের উচ্চ চীৎকার। কলের বায়ু ঝর শব্দ। দিগিন্দ্র উঠে গেলেন। সাত্যকি নিমীলিত নেত্রে ব'সে রইল। পার্থসারথি ও দেবকুমার দিগিন্দ্রের পিছু পিছু চ'লে গেল।

৪

"ওরে মিথ্যে গরবী,
তুই কি শাসন-শৃঙ্খল জানিস আজও?"

কিছুদিন পরে। গ্রামে দেবকুমার চ'লে এসেছে একা। যে ক'দিন ছুটির বাকী আছে, সে ক'দিন সে পড়াশুনা প্রভৃতি করতে চায়। আসবার সময় পার্থসারথি কতকটা দায়িত্বপূর্ণ অভিভাবকতার দেবকুমারের দিকে চেয়ে বলল, "তা হ'লে তুই যাবি—হ্যাঁ, তোকে তো যেতেই হ'বে। আর সাত্যকি যখন সেরেই উঠছে, তখন তোর আর থাকার দরকার নেই।"

দেবকুমার বলল, "হ্যাঁ, আমি চ'লেই যাই। চিঠিপত্র দিও। মেওদা সেরেই উঠবে মনে হয়।"

সাতাকি ম্লান-হাসে বলল, "হ্যাঁ, আমি সেরেই উঠব। তুমি যাও, নিজের পড়াশুনা কর গে।"

…তার পর দেবকুমার বাড়ী চ'লে এসেছে। বাড়ীতে একটি পুরনো চাকর। নাম তার পূর্ব্বেই বলা হয়েছে—মধু। মধু দেবকুমারকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে দেখে বিস্মিত হ'ল। একসময়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "দেবকুমার, তুমি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে। সাতাকি ভাল আছে তো?"

"হ্যাঁ, ভাল আছে। আর ভয়ের কারণ নেই দেখে ফিরে এলাম।"

কোন একটা কাজ করতে করতে মধু বলল, "তবু ভাল, আমি তো তোমাকে পথে একলা আসতে দেখে কেবলই ভাবছি, কি জানি কি হ'ল বুঝি!"

"না, চিন্তার কারণ কিছু নেই। সেরে উঠছে বেশরা'।"

"তুমি কি এখন এখানে থাকবে? তা যদি থাক, তা হ'লে তোমার তো সব যোগাড় চাই। ষ্টোভ্ এনেছ? তুমি তো আমার হাতে খাবে না দাদা!"

"যা হয় কর, আমি আজ আর রাঁধতে পারছি নে।"

মাথা চুলকোতে চুলকোতে মধুর প্রস্থান। যা হয় একটা কি যে সে করবে, তাই বোধ হয় ভাবতে গেল।

•

কলকাতা—দিগিন্দ্র আর জয়ন্তী।

দিগিন্দ্র ক্যাম্বিসের ব্যাগ গোছাতে গোছাতে বললেন, "তুমি যে আজকাল সবার সামনেই কথা কও, এটা জানা ছিল না।"

জয়ন্তী একটু অধীরভাবে বলল, "জানা না থাকাই ভাল। এখন আপনার আসার কি দরকার ছিল? আপনি জানেন আমি এখানে বেড়াতে আসি নি। কি অবস্থায় এসেছি যে, তা' আপনারা সবাই জানেন। শুধু শুধু এসে সবার সামনে কি কাণ্ডটা করলেন বলুন তো? আমি এখন যাব না—বেলা সম্পূর্ণ সুস্থ হ'লে যাব। এতে আপনাদের যা ভাল হয়, করুন।"—ব'লে সে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

দিগিন্দ্র ব্যাগ গোছান শেষ ক'রে বললে, "তা হ'লে তুমি থাক। একেবারে এঁকে সুস্থ করে যেও। নিজেই যেও—আমি আর নিতে আসব না।"

জয়ন্তী বলল, "ভাল লাগছে না আমার। আমাকে এতটা কষ্ট দেবার আপনার কোনই প্রয়োজন ছিল না।"

দিগিন্দ্র বললেন, "না, তা ঠিক। প্রয়োজন ছিল না। এমনিই এসেছিলাম—(মাথা চুলকোতে চুলকোতে) দেখেও গেলাম কেমন আছ। আর, সবার সামনে তোমাকে নিয়ে যাবার কথাটা বোধ হয় বলা ঠিক হয় নি। আচ্ছা থাক তবে, আমি আসি।"

জয়ন্তী নিঃশব্দে নত হ'য়ে দিগিন্দ্রের পায়ের ধুলো নিল। ক্যাম্বিসের ব্যাগ আর ছাতা নিয়ে দিগিন্দ্র চ'লে গেলেন। যাবার সময়ে পার্থসারথির সঙ্গে দেখা হ'ল না। সাতাকি ইজি-চেয়ারে শুয়ে বোধ হয় 'যোগাযোগ' পড়ছিল।

•

ঘন বনের মধ্য দিয়ে একা একা দেবকুমার চলেছে অন্যমনস্কভাবে। সে ভাবছে মনে মনে, "ছুটিও শেষ হ'য়ে এল। বেশ লাগছে কিন্তু একা একা। মধুদা' একটা খরগোস মেরে নিয়ে এল কাল। লাল টক্‌টকে মাংস!" একটা সেঁয়াকুল গাছের উপর ঝুঁকে প'ড়ে কাল কাল সুন্দর ফলগুলোর দিকে চেয়ে, "ছিঁড়ে নেব না কি কতকগুলো? আচ্ছা, এগুলো প্রায় আঙুরের মত,—সেই আঙুর। খাই গোটাকতক—" কয়েকটা নিয়ে মুখে ফেলে দিয়ে, "খরগোসের মাংস কি আর এমন খেতে ভাল? মধুদা' আজ হরিণও মেরে নিয়ে আসবে বলেছে।" একটা ক্যাঁচকেঁচে পাখী তার পিছনে পিছনে আরও কয়েকটা, তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।…"কি সুন্দর লাগে আমার! একটা কবিতা লিখব আমি,—তা'তে থাকবে এই বনের গন্ধ, এই পাখীর স্বর আর পাতার ঝর-ঝর ঝর-ঝর শব্দ। এটা না কি যন্ত্রযুগ!" আরও গোটাকতক সেঁয়াকুল মুখে পুরে,—"কাব্যের আবার যুগ কি? এই দেখলাম বন, অনুভব করলাম এর ঘন ছায়া, যতটা পারলাম আমার সেই আনন্দ আরও দশজনকে দেবার চেষ্টা করলাম। যন্ত্রযুগের কবিতা শুনলে আমার হাসি পায়—কেবল শ্রেণী-বিভাগ, পোষ্টাফিসে চিঠি ভাগ করার মত, ইনি হ'লেন এই যুগের কবি, ইনি এই যুগের,—কপালে এক একটা কেবল এঁটে—তারি বিশ্রী!"…আর একটু এগিয়ে গিয়ে, যেখানটিতে খানিকটা জলা, চারিপাশে নিবিড় বন, কোন পথ নেই, সেইখানে গিয়ে চারিদিকে তাকাতে

তাকাতে, "এ আবার এলাম কোথায় ছাই! বেশ থাক, এ-সব ঝামেলার খুব চেনা, সঙ্গে বন্দুকটাও আনি নি!" তালের উপর একটা প্রকাণ্ড রাজপাখী তার উজ্জ্বল দু'টি চোখ আর তীক্ষ্ণ ঠোঁট বের ক'রে ব'সে আছে। সেই দিকে তাকিয়ে, "ও বাবা, রাজপাখী যে, থাক ও ব'সে, আমি আরও এগিয়ে যাই—" বলে বাঁশ-বনের ঘন অন্ধকারের মধ্যে পাতার খস-খস মড়-মড় শব্দের মধ্য দিয়ে দেবকুমার অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

•

কলকাতা। জয়ন্তী, পার্থসারথি আর সাত্যকি। ব্যস্তভাবে ডাক্তার এলেন। পার্থসারথির দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "আবার ডেকেছেন কেন?"

পার্থসারথি বলল, "এই যে আসুন। দেখুন তো খাতা-খানা। কাল থেকে টেম্পারেচার আবার রাইজ করছে, কি যে হ'বে কিছুই ঠিক পাচ্ছি নে!"

ডাক্তার চিন্তিতমুখে খাতা দেখতে দেখতে বললেন, "বড় মুশকিল! আমিও আগেই বলেছিলাম, ঠিক বলা যায় না কিছুই, শরীর দুর্বল, রক্তহীন থাকলে নানা রোগের উঁকি-ঝুঁকি! অনুমান, এটা সর্দ্দিজ্বরের ব্যাপার—দেখুন, দু'এক দিন। তাতে যদি না কমে, তা হ'লে ব্লেড পাঠাতেই হবে।"

পার্থসারথি নতমুখে চুপ ক'রে ব'সে রইল।

জয়ন্তী চিন্তিতমুখে বলল, "ভাবিয়ে তুললেন যে!"

ডাক্তার বললেন, "ভাবনার কথাই তো! অসুখ কি না। একটু নড়াচড়া, একটু অনিয়ম,—অমনি আবার অসুখ! খুব সাবধান, খুব সাবধান! পথ্য, চলাফেরা সব খুব নিয়ম মত হওয়া দরকার।"

জয়ন্তী বলল, "নিয়মের ত্রুটি তো নেই। কোন্ ফাঁকে যে কি হয়, কিছুই বোঝা যায় না।"

•

ডাক্তার চ'লে গেলে জয়ন্তী সারথির দিকে চেয়ে বলল, "তুমি বেশী ভেব না বাবা, আমার মন বলছে ভেঙ্গে গেলে সারবে।"

পার্থসারথি বলল, "বেশী ভাবব না বলা। ভাবনার কথাই যে, এ-সময়ে আবার দেবকুমার গেল চ'লে! সে থাকলেও অনেকখানি ভরসা ছিল।"

সাত্যকি মৃদু-নিম্নস্বরে বলল, "তোমাদের ভাবনা আমাদেরও ভাবাচ্ছে। অসুখ তাতে কমবে কি? সুখ তো পেলামই না। আজ কি খাব বল ত জয়ন্তী।"

জয়ন্তী চেয়ারে ব'সে দুলতে দুলতে বলল, "কি খাবে? ঝোল একটু মাছের! মাগুর মাছ অবিশ্যি। আর কি? সাগু? (সাত্যকির মুখভাব লক্ষ্য ক'রে) না না, সাগু না, রুটি খাবে কেমন?"

"আচ্ছা।"

পার্থসারথি বলল, "আমাকেও রুটিই দাও। ডাক্তারেরা যে কি ছাই, বুঝি নে! অসুখ তো মাস ছাড়িয়ে গেল, আবার চেঞ্জ বলে। বাড়ীতে তা হ'লে মধুকে জানিয়ে চিঠি দি—কিছু টাকা পাঠিয়ে দিক। দেবকুমার কি আসবে?"

জয়ন্তী বলল, "তাই কর। ছোটদাকেও আসতে লেখ। মধুও যেন চ'লে আসে। না হ'লে চেঞ্জের ব্যবস্থা একা তোমার দ্বারা হবে না। মধুর মত একজন লোক থাকা দরকার।"

সাত্যকি তেমনি নিম্নস্বরেই বলল, "তা হ'লে চেঞ্জ যেন ডাকছে আমাকে। চল ঘুরে আসি। সর্দ্দিই হয়েছে আমার, বুঝলে! বেশী ভেব না। কোথায় রইল পড়া-শুনা আর কোথায় কি? হৈ-হৈ ক'রে ফের এ-দেশ, সে-দেশ।"

[ ক্রমশঃ

## তুরস্কের সমস্যা

—শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ

ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশকে কেন্দ্র করিয়াই অতঃপর যুদ্ধ-দেবতা আপনাকে প্রকাশ করিবেন, এ আশঙ্কা এখন আর কল্পনা মাত্র নহে। গত এক মাসের ঘটনা-পরম্পরার দ্রুত বিন্যাসের ফলেই এমন আশঙ্কা একেবারে আসন্ন হইয়া আসিয়াছে।

ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশের সন্নিকটে যে কয়টি শক্তিশালী রাষ্ট্র রহিয়াছে, তন্মধ্যে তুরস্ক, মিশর এবং রুমানিয়া সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বাকী কয়টি রাষ্ট্র তুলনায় ইহাদের পশ্চাতে অবস্থিতি করে।

আমরা সকলেই জানি যে, বল্‌কান্ অঞ্চলের স্বর্ণপ্রসূ শস্যশালিনী জমীর দিকে এবং রুমানিয়ার তেলের খনির দিকে জার্মানী, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের লোলুপ দৃষ্টি রহিয়াছে। এবং উপরোক্ত কারণে বল্‌কান্ অঞ্চলে শক্তিশালী সাম্রাজ্য-বাদী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত বিশেষ উৎকট হইয়াই আসিয়াছে। অকস্মাৎ রাশিয়া কর্তৃক বেসারাবিয়া ও উত্তর বুকোভিনা অধিকার এবং অস্ট্রিয়াকে বুলগেরিয়া কর্তৃক ডোব্রুজা ও হাঙ্গারী কর্তৃক পশ্চিম ট্রান্‌সিল্‌ভানিয়া দাবী, রুমানিয়াকে জার্মানীর দিকে ঠেলিতে বাধ্য করিয়াছে। নাৎসী অনুরাগের নিদর্শন স্বরূপ সে ইতিমধ্যেই রুমানিয়া হইতে বৃটিশ স্বার্থের নিশ্চিহ্নতা সাধন করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। রুমানিয়ায় যে পেট্রল উৎপন্ন হয়, সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের উৎপন্ন পেট্রলের তুলনায় তাহা প্রায় দ্বিগুণ; এবং এই তৈলখনিগুলিতে নিয়োজিত মূলধন আসিয়াছে অধি-কাংশই বৃটিশ বণিকদের পকেট হইতে। রুমানিয়ায় প্রবর্তিত নূতন আইনের ফলে বৃটিশ ধনিকদের স্বার্থ রুমানিয়া হইতে বিলুপ্ত হইতে বাধ্য। সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, বল্‌কান্ অঞ্চলে ক্রমবর্দ্ধমান রুশ-প্রভাবকে প্রতিহত করিতে এবং বল্‌কান্ অঞ্চল হইতে বৃটিশ প্রভাবকে বিলুপ্ত করিতে নাৎসী জার্মান কর্তৃপক্ষ বিশেষ উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন।

এই তো গেলো রুমানিয়ার অবস্থা।

তুরস্কের সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে, যুদ্ধ-ঘটিকার কেন্দ্র তুরস্ককেই স্থির করিয়া অতঃপর নির্দ্ধারিত হইবে বলিয়া অনুমান হয়। পারিপার্শ্বিক ঘটনা-সংস্থিতি তাহারই নির্দ্দেশ করিতেছে। সমগ্র এশিয়ার মধ্যে তুরস্কই সর্ব্ব প্রথম এবং একমাত্র দেশ যেখানে জাতীয় রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া ইয়োরোপীয় আদর্শকে সমাজে, রাষ্ট্র-জীবনে ও ব্যক্তিবিশেষের জীবনে প্রবর্তিত করা হইয়াছে। খালেদ এদিব্ একজন খ্যাতনাম্নী তুর্কী লেখিকা। তিনি লিখিতেছেন: "১৮২৬, ১৮৩৯ ও ১৯০৮ খৃষ্টাব্দগুলি তুর্কী ইতিহাসে বিশিষ্ট। একমাত্র আবদুল হামিদের রাজ্যকাল (১৮৭৬—১৯০৮) ব্যতিরেকে, বিগত এক শতাব্দীর ইতিহাস তুরস্কের দিক হইতে ইয়োরোপীয় আদর্শ গ্রহণেরই ইতিহাস।" এবং এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তুরস্ক নিকটবর্ত্তী ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে সৌহার্দ্য রক্ষা করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছে। তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী রফিক্ সারাম বর্ত্তমান বৎসরের ১৮ই জানুয়ারী তুর্কী পার্লামেন্টে যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলেই এতৎসম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হইয়া আসিবে। তিনি বলেন: "Our regime is based on constitutional principles. We respect the liberties of all. A system which aims to rule without control is an easy one, but such a system is not acceptable to us. The safest way, in our opinion, is the one which leads to a responsible democratic regime." [অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিক মূলভিত্তির উপরই

আমাদের রাষ্ট্রের বনিয়াদ। আমরা প্রত্যেকেই স্বাধীনতার প্রত্যাশী। অন্তর্বিরোধী শাসন-ব্যবস্থা সহজ, কিন্তু তাহা আমাদের পক্ষে প্রহণীয় নহে। ...আমাদের বিবেচনায় তাহাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ পন্থা যাহা স্বাধিকমূলক গণতন্ত্রের অভিমুখী।] পুনশ্চ এই মূলসূত্র অবলম্বন করিয়াই বলা হইয়াছে: "Alliances with the Balkan nations for both economic and defensive purposes are important for Turkish security." [অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও দেশরক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে তুরস্ক ও বল্‌কান্ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক নিরাপত্তা রক্ষার্থে চুক্তিবদ্ধ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।]

ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রাশিয়া ও জার্মানীই নব্য-তুরস্কের প্রতি প্রথমে বন্ধুভাবাপন্ন হইয়াছিল।

তুরস্কের রপ্তানী ও আমদানী-বাণিজ্যের শতকরা পঞ্চাশ ভাগই হইতেছে জার্মানীর সঙ্গে। ব্রিটেন প্রথমতঃ নব্য-তুরস্ককে যথোচিত মর্যাদা দেয় নাই; কিন্তু পরে সে সুযোগ গুরু উসুল দিয়াছে। বিগত দুই বৎসরের মধ্যে দেশরক্ষা, রেলপথ-নির্মাণ প্রভৃতি ব্যাপারে এবং বাণিজ্য-বিস্তারে যে বিরাট ধনভাণ্ডার নিয়োজিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে কি পরিমাণ অংশ বৃটেন হইতে আসিয়াছে, তাহার হিসাব পাওয়া গেলে তাহার বিপুলত্ব সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হইত। সম্প্রতি একটা সংবাদ আসিয়াছে যে, বসরা হইতে বার্লা পর্যন্ত একটি সুদীর্ঘ রেলপথ বৃটেনের অর্থানুকূল্যে নির্মিত হইয়াছে।

দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপে রাশিয়া ও জার্মানীর নীরব প্রতিযোগিতা চলিয়াছে সার্বভৌমত্ব লইয়া। জার্মানীর পক্ষে খাদ্যভাণ্ডার চাই; রাশিয়ার দিক্ হইতে জার্মানীর ক্ষমতা-বৃদ্ধি লোভনীয় নহে। রাশিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ড দখল করিয়া বল্‌টিক্ সাগরে প্রভুত্ব স্থাপন করিবার উপক্রম করিতেই জার্মানী নরোয়ে ও ডেন্‌মার্ক অধিকার করিয়া বল্‌টিক্‌কে অকেজো করিয়া দিল। রাশিয়ার সমুদ্র-পথ চাই। হয়তো একদিন পারস্য উপসাগরে রাশিয়ার প্রধান নৌবহর ও বন্দর গঠিত হইবে। অন্ততঃ বর্তমানে বল্‌কানে জার্মান বিস্তৃতি বন্ধ করিয়া পশ্চিম এশিয়ার রাজ্যগুলিতে নিজের মর্যাদা স্থাপন করা দরকার। সেই উদ্দেশ্যে তুরস্কের সঙ্গে রাশিয়া মিতালী পাতাইতে চায়।

সুয়েজ খালের খবরদারীর কাজে সহায়তার জন্য মিশরকে বৃটেন যে-কোনো উপায়েই হোক, হাতে রাখিতে চায়।

ঘোটের উপর, নিকট-প্রাচ্যে, অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশে, বৃটেন নিরপেক্ষ ধার্মিক দর্শক মাত্রই নহে। তাহার বিরাট সাম্রাজ্যের বৃহত্তম রাজপথটা এই ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশ দিয়াই গিয়াছে। এইজন্য বল্‌কানে, তুরস্কে ও মিশরে তাহার ইচ্ছং ও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত থাকা চাই।

রুমানিয়ার নিকট হইতে পূর্ব-অধিকৃত প্রদেশ কাড়িয়া লইয়া এবং বুলগেরিয়াকে পরোক্ষ উসকানি দিয়া রাশিয়া বল্‌কান অঞ্চলে জার্মানীর প্রভুত্ব ও প্রভাবকে কোণঠাসা করিয়া দিয়াছে। সম্প্রতি বাজেয়াপ্ত করিয়া ও আটক করিয়া রুমানিয়া বৃটেনের প্রস্তাবকে অস্বীকার করিয়াছে। বৃটেন, জার্মানী ও রাশিয়া পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় নিজেকে তুরস্কের শ্রেষ্ঠ বন্ধু বলিয়া পরিপোষিত করিতে চাহিতেছে।

অপর দেশ ও অপর জাতির প্রতি, বিশেষ করিয়া যখন সেই দেশ বা জাতি তেমন প্রবল নহে, একাধিক শক্তিশালী রাষ্ট্রের একই সময়ে বহুত্ব প্রমাণের প্রতিযোগিতা সেই অপর পক্ষে মারাত্মক হইতে বাধ্য। তুরস্ক যে অধিক দিন ইয়োরোপীয় যুদ্ধ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে, তাহা মনে হয় না। জটিল কূটনীতির অপ্রকাশিত গতিবিধি না জানা থাকায়, সঠিক করিয়া বলা অসম্ভব তুরস্ক কোন্ পক্ষ লইয়া যুদ্ধে নামিবে। তবে, ব্যাপার-গতিক যতটা সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় বৃটেনের বিপক্ষে নামা তাহার সত্ত্ব ও স্বার্থ উভয়েরই বিরোধী। রাশিয়ার অভিপ্রায় সঠিক হয়তো বুঝা যাইতেছে না বলিয়াই জার্মানী ও ইতালীর বিরুদ্ধে তুরস্ক অন্যাবধি যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিতেছে না। ওদিকে, রাশিয়া বল্‌কান্ ও নিকট-প্রাচ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা কায়েমী রাখিতে চায়, অথচ অপর কোন পক্ষকে বল্‌কানে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে দিতে চাহে না।

নানারূপ প্রবাহ আসিয়া ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশকে ঘোলাটে করিয়াছে। দুই সহস্র বৎসর আগে একদা এইখানে ইয়োরোপীয় কৃষি ও সভ্যতার জন্ম লাভ হইয়াছিল; হয়তো সেই স্থানটিতেই তাহার অবসান ঘটিবে।

মহাচীন ও রাশিয়া

মহাচীন যে গত আট বৎসর ধরিয়া জাপানের বিরুদ্ধে লড়িতেছে, তাহার কারণ, তাহাকে এই কার্যে পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য করিতেছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া এবং গ্রেট বিটেন। মহাচীনকে গাঁটের পয়সা খরচ করিয়াই যে দীর্ঘ কাল ধরিয়া সাহায্য করা, ইহার মূলে কি নিষ্কাম মানব-প্রেমই মাত্র, না অন্য কিছু, স্বভাবতঃই এই প্রশ্নটী মনে জাগা স্বাভাবিক।

বাঁচিয়া থাকিবার স্পৃহা এবং প্রভুত্ব-স্পৃহা, মানুষের এই আদিম দুই প্রবৃত্তি বিগত তিন শতাব্দীর ইয়োরোপীয় কূট-নীতির কুৎসিত প্রয়োগে মানব-সভ্যতাকে ধ্বংসাভিমুখে লইয়া চলিয়াছে।

মহাচীনে, বাহিরের রাষ্ট্রগুলির দরদও মানুষের উপরিলিখিত আদিম প্রবৃত্তি দুইটিকে ভিত্তি করিয়া প্রকটিত হইয়াছে।

রাশিয়া, বৃটেন বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কেহই জাপানের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিকে সুনজরে তো দেখেই না, পরন্তু এই ক্রমবর্দ্ধন তাহাদের নিরাপত্তার পক্ষে বিঘ্নসঙ্কুল মনে করে।

রাশিয়া পশ্চিম দিকে জার্ম্মানীর সঙ্গে সন্ধি করিয়া আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার পরিপূর্ণ ভাবে নজর দিতে সুযোগ পাইয়াছে; জাপানের সঙ্গেও একটা সন্ধি করিতে পারিলে তাহার সেই পথ সহজ হইয়া আসে। অথচ জাপানের ক্ষমতাবৃদ্ধি তাহার পক্ষে আশঙ্কার কারণ।

মহাচীনে এক বৃটেনেরই প্রায় দুইশত কোটী ডলার বিভিন্ন ব্যবসায়ে মূলধন হিসাবে খাটিতেছে। দক্ষিণ চীনের উলফ্রাম ( বা টাংষ্টেন্ অক্সাইড্—যাহা যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্রাদিতে অপরিহার্য্য ) পৃথিবীর সমগ্র উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ অধিকার করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। 'বক্সার' যুদ্ধের পর হইতে পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জ চীনে বাণিজ্যিক সুবিধার সুযোগে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগাইয়াছিল। জাপানের অভ্যুদয়কে তাহারা নানা কারণেই বরদাস্ত করিতে পারে নাই। চীন সরকারও এই সব পাশ্চাত্য শক্তির পৃষ্ঠপোষকতার উপর ভরসা করিয়া জাপানের বিরুদ্ধে লড়িতে নামিয়াছিল। চীনের পূর্ব্ব উপকূলের প্রায় প্রত্যেকটি অঞ্চল জাপানীদের দ্বারা অধিকৃত হওয়ার ফলে বৃটেনকে ইউন্নান-বর্ম্মা রোড্ তৈয়ারী করিতে হয়। দুর্গম অরণ্য ও পর্ব্বতের উপর দিয়া প্রায় তিন হাজার মাইল দীর্ঘ রাজপথ ( যাহা পরে রেলপথ বসাইবার উপযোগী হইতে পারে ) প্রস্তুত করিতে বৃটেনেরও কম ব্যয় হয় নাই, যদিও চীন সরকারও তাহার ব্যয় আংশিক ভাবে বহন করিয়াছে। এই পথ দিয়া চীনে যে পরিমাণ মোটর ট্রাক্ ও অস্ত্র-শস্ত্রাদি প্রেরিত হইয়াছে তাহার মোট পরিমাণ প্রকাশিত হয় নাই। তবে, ব্রহ্মদেশের শুল্ক বিভাগ এই পথে আমদানী রপ্তানীর উপর শুল্কই পাইয়াছেন গড়পড়তা প্রত্যহ প্রায় এক লক্ষ টাকা। ফরাসী-অধিকৃত ইন্দোচীন হইতে কোয়াংসি, বর্ম্মা-ইউন্নান ও চুংকিং হইতে বহির্মঙ্গোলিয়ার অভ্যন্তর দিয়া রাশিয়া, এই তিনটি পথ দিয়াই চীনে বৈদেশিক শক্তিসমূহ অস্ত্রশস্ত্র ও সাহায্য প্রেরণ করিত। কোয়াংসি জাপ-অধিকারে গিয়াছে। ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে টোকিয়োতে জাপ-পররাষ্ট্র-সচিব আরিতা ও বৃটিশ রাজদূত ক্রেগি মহাশয়ের যে আলাপ আলোচনা হয়, তাহাতেই বর্ম্মা-ইউন্নান পথ বন্ধ করিয়া দিবার প্রস্তাব ছিল। ইউরোপে জার্ম্মানীর সঙ্গে লড়িতে লড়িতে সুদূর প্রাচ্যে মানব-প্রেম বিলাইয়া রাখা বিঘ্ন-সঙ্কুল বটে! চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র এই ক্রেগি আরিতা আলোচনার সংবাদ রাখিত। চীনারা সেই জন্য ২,৫০০ মাইল দীর্ঘ মরুভূমির পথে বিশ সহস্র উষ্ট্রের সাহায্যে রাশিয়া হইতে অস্ত্র আমদানী করিবার ব্যবস্থা করিল। এবং নতুন পাল্টা বাণিজ্যচুক্তির দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে ক্রেগি-আরিতা চুক্তি সফল করিতে দিল না। বর্ত্তমানে বৃটেন আপাততঃ তিন মাসের জন্য বর্ম্মা-ইউন্নান পথ বন্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ তিন মাস পরেও তাহা খুলিবে না। ইউরোপীয় যুদ্ধ-পরিস্থিতি বৃটেনকে বিশ্ব-প্রেম-প্রবৃত্তিকে সাময়িক ভাবে সংযত করিতে বাধ্য করিয়াছে। সাফাই স্বরূপ, বৃটিশ রাজনৈতিকরা বলিতেছেন, বর্ষার সময় বর্ম্মা-ইউন্নান রোডে মাল চলাচল বন্ধই থাকে, সুতরাং প্রস্তাবিত চুক্তি বিশেষ ফলপ্রসূ হইবে না। সম্ভবতঃ জাপানীরা সেই সংবাদ রাখে না। নতুবা এই বর্ষার সময়ই সেই অকেজো পথটাকে বন্ধ রাখিবার জন্য জিদ্ করিবে কেন?

জনৈক আমেরিকান পণ্ডিত বলেন যে, ১৯৩৯ সালের জুলাই মাস হইতেই পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জ চীনকে অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে প্রেরণ-জাপন শতকরা ৬০ ভাগ কমাইয়া দিয়াছে ( যা নিজেদের ঘর সামলাইবার তাগিদে কমাইতে বাধ্য হইয়াছে )।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অতঃপর চীন আর পাশ্চাত্য শক্তির প্রত্যক্ষ সাহায্য পাইবে না। বাকী থাকে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে চীনকে প্রত্যক্ষ কোন সাহায্য করা কোন কালেই বিশেষরূপ প্রশস্ত ছিল না, কেবল মাত্র কূটনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের দ্বারা সে জাপানকে কোণঠাসা রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে।

বাকী থাকে এক রাশিয়া। পাশ্চাত্য সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, জাপানের বিরুদ্ধে লড়িতে হইলে, চিয়াং কাই-শেক ও কুয়োমিনটাং গবর্ণমেণ্ট অধিকতর ভাবেই কম্যুনিষ্ট-ঘেঁষা হইতে বাধ্য। ইয়েনান্ প্রবেশ রাশিয়া-সীমান্তে অবস্থিত; এখানকার কম্যুনিষ্ট-ভাষাপন্ন সামরিক নেতা মাও টুসে-টুঙ্ ( Mao tse-tung ) মহাশয় চীন, মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার অগণিত সাম্যবাদীর নেতা। চিয়াং কাই-শেক বাধ্য হইয়াই ইঁহার ও ইঁহাদের সাহায্য লাভ করিতেছেন।

চীনে আপন প্রভাব ও সম্পত্তির যাহাতে লোপ-সাধন না হয়, এই উদ্দেশ্যে বৃটিশ মালিকেরা যে-কোন প্রকারেই হউক জাপানের সঙ্গে আপোষ কামনা করেন। হংকং-এর জনৈক বৃটিশ রাষ্ট্রিক নেতা স্পষ্টই বলিয়াছেন: "America's uncompromising attitude is throwing Japan in the arms of Stalin. British interests are at stake. America must either act out here, or hush up and let us reach our own agreement with Tokyo." [ আমেরিকার বেয়াড়া মনোবৃত্তিই জাপানকে ষ্টালিনের বাহু-বন্ধনে ঠেলিয়া দিতেছে। বৃটিশের সর্বনাশ এখন বিপদাসন্ন। আমেরিকা হয় এখানে তার কার্যক্রম বন্ধ রাখিবে অথবা চুপ করিয়া থাকিবে; এবং আমাদিগকে জাপানের সহিত নিষ্পত্তি করিয়া লইবার সুযোগ দিবে ]।

চীনে যদি জাপান নিষ্কণ্টক লাভ করে, তবে প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্র প্রবল এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইবে। সেই জন্যই জাপ-বৃটিশ চুক্তি সে পছন্দ করে না। ইতিমধ্যেই জাপানে পেট্রল রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া যুক্তরাষ্ট্র এক পাল্টা চাল চালিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনে হয়, জাপানকে বিশেষ কাবু করিতে যুক্তরাষ্ট্র একেলা পারিবে না।

সুতরাং বাকী থাকে সেই এক রাশিয়া, যাহার নিকট হইতে জাপান কোন রকম প্রতিবন্ধকতা আশঙ্কা করিতে পারে। রাশিয়ার সঙ্গেও যদি জাপান এক অনাক্রমণাত্মক চুক্তি করিতে পারে, তবে এশিয়ায়—অন্ততঃ পূর্ব এশিয়ায় তাহার প্রভাব সার্বভৌমত্বের আকার ধারণ করিবে। জাপ-রুশ মৈত্রীমূলক চুক্তি কি অসম্ভব?

জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর জাপানের সঙ্গে অনুরূপ চুক্তি আর এক্ষণে অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কথা উঠিতে পারে যে, চীনের কম্যুনিষ্ট দলের বিশ্বাস হারাইবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ষ্টালিন এরূপ চুক্তি করিবেন কি না!

এ-কথা জানা দরকার যে, স্পেন-মেক্সিকো-ইংলণ্ড-ফ্রান্স-মহাচীন প্রভৃতি দেশগুলির শক্তিশালী কম্যুনিষ্টরা ষ্টালিনের কর্তৃত্ব সর্বতোভাবে স্বীকার করে না এবং রাশিয়াও যতটা না করিলে নয় তৎপেক্ষা অধিক পরিমাণ সাহায্য এই সব দেশে করে নাই এবং করিবেও না। তাহার সব চেয়ে বেশী দরকার এখন নিজের ঘর সামলাইবার অথবা সীমান্ত সুরক্ষিত করিবার।

আমাদের বিশ্বাস এবং আন্তর্জাতিক অনেকেরই বিশ্বাস যে, জাপ-রাশিয়া অনাক্রমণাত্মক একটি কার্যকরী চুক্তি অনতিবিলম্বেই সম্পাদিত হইবে। এবং এই চুক্তি যে, মার্কসীয় দর্শন ও কার্যপন্থার বিরোধী নহে, তাহার যুক্তি দিতেছি:

আমরা সকলেই জানি যে, রাশিয়ায় বোলশেভিক্ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পরেই ইংলণ্ড, আমেরিকা এমন কি জাপান অবধি সৈন্য প্রেরণ করিয়া বোলশেভিক্-বাদকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। মার্কস্, এঙ্গেলস্ ও লেনিন বিশ্বাস করিতেন এবং সমাজতন্ত্রী সাম্যবাদীরা এখনও বিশ্বাস করে যে, সাম্রাজ্যবাদী ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি সাম্যবাদের কিন্তিরূপ রাশিয়াকে ধ্বংস করিবার অছিলা খুঁজিতেছে। রাশিয়াকে 'জাতে তুলিতে' কোন

যাইই ইচ্ছুক ছিল না; আজ যে স্যর স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌কে বৃটেন রাজদূত করিয়া রাশিয়ায় পাঠাইয়াছে তাহাও রাশিয়াকে গদ্‌গদ্‌-চিত্ত করিতে পারে নাই; এই সে-দিনও মিউনিক্ চুক্তি এবং পোলাণ্ড সংক্রান্ত ব্যাপারে রাশিয়াকে তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মলোটভ্ মহাশয় প্রায়শঃই সে কথার পুনরুক্তি করিয়াছেন। পরস্পর মাথা খাওয়া-খাওয়ি করিলেও যে সব শেয়ালই এক ডাক দিবে, রাশিয়া সে-কথা জানে। এই জন্য রাশিয়ার বর্তমান কর্তৃপক্ষ 'ক্যাপিটালিজম্' সম্পর্কে প্রায় অচিবাই-এস্ত মানুষের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে।

কম্যুনিষ্ট মতবাদ চায় যে, পরস্পর মারামারি করিয়া সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি দুর্বল হইয়া পড়িলে তত্রত্য দেশে অন্তর্বিপ্লব ঘটিবে। [ এচ. জি. ওয়েল্‌স্ মহাশয়ও তাঁহার *World Order* নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন: The eager and adventurous unemployed young are indeed the shock-troops in the destruction of the old social order everywhere. They find guidance in some confident party or some inspired champion, who organises them for revolutionary or counter-revolutionary ends. ·····The essence is the combination of energy, frustration and discontent. ]

বর্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধ রাশিয়াকে সেই সুযোগ দিয়াছে। এই যুদ্ধ যাহাতে দীর্ঘস্থায়ী হইয়া যুদ্ধরত দেশসমূহে সাধারণের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ায় রাশিয়া তাহাই চায়। জার্মানীকে সে সুযোগ দিয়াছে বৃটেনের সঙ্গে লড়িতে, জাপানকেও সে বড় হইতে দিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইতে চায়।

দ্বিতীয়তঃ, কম্যুনিষ্টরা মনে করে, সাম্রাজ্যবাদী যা অরী—যে-কোন নামই হোক না কেন, বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির মূল মর্মন এক। এবং প্রত্যক্ষ সক্রিয়তাপন্ন ও সাময়িক নিষ্ক্রিয়তাপন্ন বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মধ্যে যে সামান্য প্রভেদ পাওয়া যায়, তাহাকেই কাজে লাগাইয়া যুদ্ধকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিস্তৃত করিয়া দেওয়া উচিত। ১৯০৯ সালের মার্চ মাসে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় ষ্টালিন বলিয়াছিলেন: "The Second Imperialist War may lead to the victory of the revolution in one or several countries." [ অর্থাৎ, দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে হয় তো বিপ্লব একাধিক দেশে সফল হইবে। ] এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়াও রাশিয়া জাপানের সঙ্গে সাময়িক বন্ধুত্ব করিতে পারে।

জাপ-রুশ চুক্তির সম্ভাবনা তাহা হইলে একেবারে আকাশ-কুসুম নয়! এই চুক্তি সম্ভাবিত হইলে, প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জাপান রাশিয়াকে পশ্চিম চীন, পূর্ব তুর্কীস্তান, তিব্বত, আফগানিস্তান, পারস্য, এমন কি ভারতবর্ষেও প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারে। অপর দিকে, জাপান চীনে প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠা করিয়া ইন্দোচীন, জাভা, অষ্ট্রেলিয়া এমন কি ব্রহ্মদেশ ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ অবধি 'বান্‌জাই' 'বান্‌জাই' রবে ধাবমান হইতে পারে; এবং যে দিকেই যাক, বৃটেন অথবা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘর্ষ তাহার তখন অনিবার্য হইয়া আসিবে।

ষ্টালিন এবং কোমিন্টার্নের কম্যুনিষ্টরা প্রচণ্ড বাস্তববাদী; মানব-প্রেম ইত্যাদি তাঁহারা দিবার পক্ষপাতী নয়। সে-কথা তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন। চীন উপলক্ষে হয় তো তাহা আর একবার প্রমাণিত হইবে।

---

## ভারতের পতনের কারণ

···লোকহিতৈষণা, শিল্প-বিজ্ঞান প্রভৃতি ও তাহার অন্যান্য প্রকৃতির সন্ধান পাওয়া যাইবে। একমাত্র ভারতীয় ঋষির বেদাদি গ্রন্থে, ব্রাহ্মণে এবং তন্ত্র-টোন্ত্রেতে। ঐ সমস্ত গ্রন্থ লিখিত রহিয়াছে প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন আরবী এবং প্রাচীন হিব্রু ভাষায়। বহু সহস্র বৎসর হইতে মানুষ ঐ তিনটি ভাষা ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়া বহু দিন হইতে কেহ ঐ বেদাদি গ্রন্থ, ব্রাহ্মণ এবং তন্ত্র-টোন্ত্রেতে যথাযথভাবে বুঝিতে পারে না এবং তাহার ফলে প্রকৃত লোকহিতৈষণা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ব্যবস্থা মানুষ বিস্মৃত হয় এবং মানুষের জীবন যাপন করা প্রধানতঃ অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

কতদিন হইতে ভারতবাসীর পতন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিনসাধ্য। তবে কিছু পর আট হাজার বৎসর ধরিয়া যে ভারতবাসী ক্রমশঃ পতিত হইয়াছে, তাহা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে। এই আট হাজার বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে যে-সমস্ত গ্রন্থ ঋষিপ্রণীত গ্রন্থের অনুবাদ অথবা তাহা বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, তাহার কোন খানিতেই ঋষিপ্রণীত কোন মূল গ্রন্থের লহিত যথার্থ সাদৃশ্য নাই।...

---

# মোটর-দুর্ঘটনা

শ্রীহেমাঙ্গিনী ঘোষ

১

কিতীশ চেঁচিয়ে বলে ওঠে, "বলি ব্যাপার কি? বেলা যে আটটা বাজে, একটু চা-টা মেবে না না কি? যত সব কুঁড়ের—"

তার কথা শেষ না হ'তে এক হাতে এক বাটী গরম চা, আর হাতে ছোট ডিসে একটু হালুয়া নিয়ে অমলা ঘরে ঢোকে। কোন কথা না ব'লে চায়ের বাটী ও হালুয়া স্বামীর সামনে ধ'রে দিয়ে, যেমন নীরবে এসেছিল, তেমনি ভাবে পাশের ঘরে চলে যায়।

বেশাথোর মানুষের নেশার জিনিসটী সময় মত না পেলে যেমনতরো বিগড়ে যায়, তখন ভাল কথাতেও রাগ ধরে। কিতীশ লোকটা খুব রাগী নয়, তবে অভাব অনটনে পড়ে তার স্বভাব কিছু রুক্ষ হয়েছে; তার উপর শীতের দিনে সকাল থেকে বেচারী একটু চায়ের প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছে, এ অবস্থায় একটু চা না পেলে রাগ হয় বই কি!

বা চোক গরম চায়ে দু'চার চুমুক দিতেই তার উগ্র মেজাজ কোমল এবং তীব্র স্বর মৃদু হয়ে আসে। জানলা দিয়ে তার চোখে পড়ে, কলতলায় এক ডাঁই এঁটো বাসন নিয়ে অমলা মাজতে বসেছে; চার বছরের ছেলে নেপু, এক পাশে বসে বাটিতে ক'রে মুড়ি খাচ্ছে আর ছড়াচ্ছে। দেখতে দেখতে আপনা থেকে তার চোখে জল এসে পড়ে।

•

কিতীশ সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে; কিন্তু তার বাবার অর্থ ছিল না। তবুও নিজে নানা রকম কষ্টের মধ্যে থেকেও একমাত্র ছেলেটাকে শিক্ষা দিতে কার্পণ্য করেন নি। কিন্তু কিতীশের অদৃষ্ট মন্দ, তাই তার আই-এস্‌-সি পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে তার বাবা ইহলোকের দেনা-পাওনা চুকিয়ে পর-লোকে যাত্রা করেন। ছেলের শিক্ষার ভাবনা, সংসারের চিন্তা কোন কিছুই তাঁকে আটকে রাখতে পারে নি। তাঁর মৃত্যুর অল্প দিন পরে, তাঁর স্ত্রীও তাঁর অনুগমন করেন। বাবার স্নেহের দুলাল, মায়ের অন্ধের নড়ি, সংসারানভিজ্ঞ হতভাগা যুবক, যুগপৎ পিতৃ-মাতৃহীন হ'য়ে, চার দিক্ আঁধার দেখে। তার আপনার জন বলতে জগতে কেউ আর রইল না।

তবে তার বাবা এখান থেকে যাবার আগে একটা কাজ ক'রে যান। সে যখন ম্যাট্রিক পাশ করে, এক গরীব গৃহস্থের সুন্দরী মেয়ে দেখে ভদ্রলোক মুগ্ধ হন, এবং এক পয়সা পণ না নিয়ে তাকে পুত্রবধূ ক'রে ঘরে আনেন। অমলা গরীবের মেয়ে হ'লেও একেবারে মূর্খ ছিল না। তার স্বভাবটীও ছিল সুন্দর। স্বামীর ঘরে এসেই সে সব অবস্থা বুঝে নেয়। তার শাশুড়ীও মনের মত বৌ পেয়ে, তার হাতে সংসার তুলে দিয়ে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। বাবা মায়ের মৃত্যুতে কিতীশ যখন অথই জলে প'ড়ে হাবু-ডুবু খাচ্ছে, কোন দিকেই কূল দেখতে পায় না, তখন অমলা স্বামীর হাত ধ'রে কূলের দিক্ দেখিয়ে দেয়। তারই যুক্তি নিয়ে কিতীশ, তার বাবার অফিসের বড় সাহেবকে কেঁদে-কেটে ধরে। সাহেব ছিলেন দয়ালু। কাজের লোক, আর তিনি কিতীশের বাবাকে ভালও বাসতেন, তাই এক কথায় কিতীশের চাকরী হ'য়ে যায়। তার বাবার কাজটাই সে পায়। তখন আর সংসারের ভাবনা থাকে না। কিতীশ লেখা-পড়া শিখলেও, সংসারের জ্ঞান তার কোন দিনই ছিল না। মাসকাবারে বেতনটী পেলেই, টাকা কয়টী অমলার হাতে এনে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়। ওর বাবা বেঁচে থাকতেই একটী ছেলে হয় তার। নীপেশের বয়স এখন চার বছর। সংসারটী চলে যাচ্ছিল বেশ। হঠাৎ কিতীশের ভাগ্য-দেবতা মুখ ফিরিয়ে নেন। ইউরোপে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। কিতীশদের অফিসটা উঠে যায়। বড় সাহেব, ছোট সাহেব স্বজাতি-প্রেরণায়, অফিস তুলে দিয়ে স্বদেশে যাত্রা করেন। আজ তিন মাস কিতীশ বেকার।

জানলা দিয়ে অমলাকে বাসন মাজতে দেখে, কিতীশের চোখে জল আসে। সে গুম্ হ'য়ে বসে থাকে। খানিক বাদে অমলা ঘরে এলে কিতীশ বলে, "অমল! আজ কি আসে নি?"

গণৎকার

অমলা মুখ নীচু ক'রে, ছোট্ট একটা "না" ব'লে চলে যায়। কিতীশ ব'সে ব'সে কেবল ভাবে।

অনেকক্ষণ বাদে নেপু এসে বলে, "বাবা! বাইরে যাবে না? মা ভাত খেতে ডাকছে যে!"

কিতীশ নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "তুমি খেয়েছ নেপু?"

"হুঁ-উ,—কখন খেয় বাবা! মা আজ মাছ রাঁধে নি। কিছু না, খালি ডাল রেঁধেছে। ডাল ভাল না। তুমি বাবা মাছ এনো, আমি এই দু'টীখানি ভাত খেয়েছি। ও-বেলা তোমার সঙ্গে মাছ দিয়ে বেশী ক'রে ভাত খাব।"

কিতীশ নীরবে কলতলা থেকে মেঝে আসে। দালানে ঠাঁই করা ছিল, আসনে বসতে অমলা এক হাতে জলের গ্লাস, অন্য হাতে ভাতের থালা নিয়ে স্বামীর কাছে ধ'রে দেয়। থালায় অতি সামান্য। থালার এক পাশে একটু কি তরকারি, একখানা বেগুন ভাজা, আর একটা বাটীতে ডাল। থালা খানা নামিয়ে দিয়েই অমলা চলে যায়। স্বামীকে এই রকম প্রায়-শুধু ভাত, হাতে ক'রে দিতে তার বুক যেন ফেটে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায়ই সে ভেবে পায় নি। কিতীশ-বিহ্বলের মত কিছুক্ষণ তার চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে থাকে।

নেপু ডাকে, "বাবা! ভাত খাচ্ছ না যে? ঐ দেখ, তোমাকেও শুধু ডাল দিয়েছে। বাবা! এ-বেলা ডাল খাও। ও-বেলা কালী দিদি এলে ঠিক মাছ আনতে বলব। হ্যাঁ বাবা! কালী দিদি আসে না কেন?"

শিশুর অন্তরের সরল কথায় আবার কিতীশের চোখে জল আসে। কিতীশ বুঝতে পারে তাদের সংসারে কিছু একটা পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সেটা যে কোথায় হঠাৎ ধারণায় আসে না। অমলাকে কলতলায় বাসন মাজতে দেখে অবধি তার কেমন গোলমাল ঠেকে। কোন রকমে খাওয়া শেষ ক'রে, বাইরের ঘরটায় এসে বসে। অন্য মনে কি ভেবে হঠাৎ ডাকে, "কি, তামাক দিয়ে যাও।"

খানিক বাদে, একটা ডিবের খোলে দু'টী পান, আর কল্কের ফুঁ দিতে দিতে অমলা আসে, হুঁকোর মাথায় কল্কে বসিয়ে হুঁকোটা স্বামীর হাতে দিয়ে পান রেখে সে চলে যায়। কিতীশ বিড়ি সিগারেট খায় না। ওর বাবার নিষেধ ছিল। একটু একটু হুঁকোয় তামাক খায়, তাও দু' বেলা খাওয়ার পরে দু'টী বার মাত্র।

অমলা চলে যায় দেখে, হঠাৎ কিতীশ তার হাত ধ'রে বলে, "যেও না অমল! কথা আছে।"

অমলা দাঁড়িয়ে বলে, "বল, শুনছি।"

কিতীশ বলে, "এর মানে কি?"

"কিসের মানে?"

"তুমি তখন এঁটো বাসন মাজছিলে, এখন তামাক সেজে আনলে!"

অমলা ধীরে ধীরে বলে, "কালও তো আমি তামাক দিয়েছি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মনে থাকে না, কালও তুমি তামাক দিয়েছিলে, কেন তাই জানতে চাইছি।"

"এর আর জানা-জানি কি? ঝি নেই, কাজেই আমি না করলে কে ক'রবে?"

কিতীশ কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনি তার মনে হয়, তাই তো, আজ তিন মাসের ভিতর একটা পয়সাও তো সে অমলাকে দিতে পারে নি, অমলা কি ক'রে সংসার চালাচ্ছে? কই! এত দিন তো তার নিজের কোন কিছুর ত্রুটি হয় নি! সবই যথানিয়মে চলেছে। কি ক'রে চলছে? অমলা কি ক'রে চালাচ্ছে! ভাবতে ভাবতে তার চোখ দু'টো জ্বালা করে। চোখের কোণ দু'টো সজল হ'য়ে আসে।

২

অন্যমনস্কভাবে কিতীশ হ্যারিসন্ রোড দিয়ে যাচ্ছে, রাস্তায় তখন ট্রাম বাসের অসম্ভব ভীড়। চলা-পথেও লোক-জনের বিরাম নেই। ফুটপাথের কিনারা ঘ'ষে সে যাচ্ছে, হঠাৎ চার দিক্ থেকে "সামাল সামাল" "গেল গেল" একটা গোলমাল ওঠে। ব্যাপারটা ভাল রকম বুঝতে না বুঝতে, কিতীশ ফুটপাথের উপরে পড়ে যায়। তার মনে হয়, প্রকাণ্ড একটা পাহাড়ের মত ভারী জিনিস, তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। দিনের সমস্ত আলো তার চোখে নিভে আসে। একটা অস্পষ্ট অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে সে জ্ঞান হারায়।

যখন কিতীশের জ্ঞান হ'ল, সে ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইলে। সে কোথায় ছিল কোথায় এসেছে, কিছু

তার মনে পড়ে না। সব যেন কেমন ঝাপ্‌সা আপ্‌সা মত মনে হয়। কিন্তু এখানে তো সে কখনো আসে নি। এ-ঘর তার চোখে একেবারে নতুন। খাটের ওপর দিব্যি ধব্‌ধবে নরম বিছানায় সে শুয়ে আছে। মাথার ওপরে বিজলী পাখা চলছে। সময়টা রাত্রি। নীল পরদার ঘেরা ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলছে। মূল্যবান সোফা, চেয়ার, ছবি, গ্লাস-কেসে ঘরখানি সুন্দর ও সুরুচিভাবে সজ্জিত—এ কোথায় এসেছে সে?

কিতীশকে উৎসুকভাবে চার দিকে চাইতে দেখে মাথার কাছ থেকে মৃদু-কোমল কণ্ঠে কে বলে, "কিছু বলবেন কি?"

কিতীশ ক্ষীণকণ্ঠে বলে, "আমি কোথায়?"

"আপনি ভাল জায়গাতেই আছেন। কিন্তু এখন বেশী কথা বলবেন না, ডাক্তার বারণ করেছেন।"

"ডাক্তার বারণ করেছে? কেন? আমার কি হয়েছে?"

"এখন কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।"

কিতীশ কিছু বুঝতে পারে না, কিন্তু বক্তার কণ্ঠস্বর তার কাণে অমৃত ছড়িয়ে দিয়ে তাকে স্থির শান্ত করে। সে ব্যাকুলভাবে বলে, "একটী—একটী মাত্র কথা, তুমি কে?"

মধুর স্বরে মাথার দিক্ থেকে উত্তর আসে, "আমি শীলা!"

শীলা! শীলা! নিশীথে ঘুমের বীণাধ্বনির মত কিতীশের কাণে ঐ দু'টী শব্দের রেশ যেন অনুক্ষণ জেগে থাকে। সে কাউকে দেখতে পায় না, কিছু জানতেও পারে না। মনের ভিতর সবই কেমন গোলমাল ঠেকে। একটা নিঃশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুতে গিয়ে মাথায় বেদনা অনুভব করে। বিস্মিত কিতীশ, মাথায় হাত দিয়ে বুঝতে পারে, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তাকে মাথায় হাত দিতে দেখে, একখানি কোমল হাত, ব্যস্তভাবে তার হাতখানি ধ'রে ফেলে বলে, "করেন কি? মাথায় হাত দেবেন না।"

"মাথায় ব্যথা কেন?" কিতীশ বলে।

"প'ড়ে গিয়ে মাথায় চোট লেগেছে।"

প'ড়ে গিয়ে? হবেও বা। কিতীশ ভাববার চেষ্টা করে। দুর্বল মন, বেশীক্ষণ ভাবতে পারে না। ক্লান্ত চোখ দু'টী বুঁজে আসে।

৩

বেশ একটা সুনিদ্রার পরে কিতীশ জেগে ওঠে। মাথাটা আগের চেয়ে পরিষ্কার ঠেকে। ধীরে ধীরে স্বপ্নের মত মনের ভেতর জেগে ওঠে হ্যারিসন্ রোডের ফুটপাথ দিয়ে যাওয়ার সময় কি যেন একটা প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দেয়, এইটুকু তার মনে পড়ে। তার পর সবই যেন কেমন অস্পষ্ট ভাসা-ভাসা। সে ঘুমিয়ে পড়ে, কতক্ষণ পরে জেগে উঠে দেখে, এক নতুন রাজ্যে এসে পড়েছে। স্বয়ং-পরীরা ঘুমন্ত উড়িয়ে এনে কি তাকে এই স্বপ্নের রাজ্যে ফেলেছে? এমন ঘরে তো কখনো থাকে নি সে! এমন মূল্যবান্ আসবাবপত্রও ব্যবহার করতে পায় নি কখনো! তার কেমন চমক লাগে। আর সব চেয়ে তার মনে জাগে, "শীলা" নামটী।

আজ ঘুম ভেঙে বিছানার ওপর উঠে বসতেই তার চোখে পড়ে—অপরূপ সুন্দরী তরুণীমূর্ত্তি। সে অবাক্ হ'য়ে তরুণীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। চোখের পলক আর পড়ে না। এমন ভাবে অপরিচিতা তরুণীর মুখের দিকে চেয়ে থাকা ওর মত যুবকের পক্ষে যে কতটা অভদ্রতা, সে-কথা ভুলে যায়। তার বিহ্বলতায়, তরুণী মৃদু হেসে বলে, "আমার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছেন?"

"দেখছি তোমাকে, কে তুমি?"

দুষ্টুমির হাসি হেসে তরুণী বলে, "আমি শীলা—"

কিতীশ পাংশুমুখে বলে, "মাফ্ করবেন আমায়! আপনাকে আমি ঠিক চিনতে পারি নি। মাথার ভেতর কেমন গোলমাল ঠেকে। আমার যেন মনে হয়, অনেকক্ষণ আমি ঘুমিয়েছি, আর সেই ঘুমের ঘোরে এক জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তিকে অনুক্ষণ স্বপ্নে দেখেছি, হঠাৎ ঘুম ভেঙে সামনে আপনাকে দেখে—"

"সেই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সশরীরে আপনাকে দেখা দিয়েছেন, এই তো বলবেন?"

চাপা হাসিতে শীলার সুন্দর মুখখানি রঙীন হয়ে ওঠে। মুগ্ধ কিতীশ, অপলক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, চোখ আর ফেরাতে পারে না।

সাধেবী-পোষাক পরা একটী সুন্দর যুবক ঘরের মধ্যে এসে, কিতীশকে ব'সে থাকতে দেখে, হাসতে হাসতে বলে,

"অল্‌রাইট, এই যে উঠে বসেছেন, মাথার ব্যথাটা কেমন? একটু আছে? ওর জন্যে কোন চিন্তা নেই, জ্বর হয় নি তো? দেখি পাল্‌সটা?' ক্ষিতীশের ডান হাতখানি ধ'রে কিছুক্ষণ রাখে আবার বলে, "অল্‌রাইট—পথ্য কি দেওয়া হচ্ছে?"

শীলা বলে, "বেদানার রস আর হরলিক্‌স্—"

"উত্তম। আজ দুধ দিতে পারেন। আর প্রত্যেকবার দুধের সঙ্গে কুড়ি ফোঁটা ক'রে ভাইনাম্ গ্যালিসাই মেবেন। আর কোন ভয় নেই। দু' একদিন বাদেই ভাত খেতে পারবেন।"

একটী প্রৌঢ় ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত হ'য়ে বলেন, "আজ কেমন দেখছ সতীশ? উঃ! কি ভয়ই পেয়েছিলাম! ভগবান্ বড় রক্ষে করেছেন। ড্রাইভার ছিল না, শীলা বলে, 'বাবা! আমি তো মোটর চালাতে পারি, মাসীমার অসুখ, চল না চট ক'রে রেখে আসি।' আমার কেমন খেয়াল হ'ল, ওর কথায় সায় দিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। অদৃষ্টে নিগ্রহ ভোগ আছে কি না! তবু ভগবান রক্ষে করেছেন, নরহত্যার পাপ থেকে মুক্তি দিয়েছেন আমায়। উঃ সে-দিনের কথা মনে হ'লে এখনো যেন আমি পাগল হয়ে যাই। এ-দিকে ট্রাম, ও-দিকে বাস, পাশ দিয়ে মানুষের ভীড় চলেছে। তার মাঝখান দিয়ে মোটর চালান কি সোজা কথা? বিশেষ ঐ একরত্তি মেয়ের? তবু চার দিকের সেই ভীষণ ভীড়ের মধ্যেও ও ব্রেক ক'ষে এনেছে, তবি মধ্যে কেমন ক'রে একটু ধাক্কা লেগে ভদ্র-লোকের ছেলে ফুটপাথের ওপর প'ড়ে যায়। সে এক ভীষণ দৃশ্য! মাথা কেটে রক্তের ধারা গড়াচ্ছে, একেবারে অসাড়, মরার মত। আমি তো একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছি। শীলা নিজের কাপড় দিয়ে ওর মাথা চেপে ধরেছে। ভাগ্যে সতীশ তুমি সে সময়, যেন ভগবান-প্রেরিত হয়েই, সেখানে উপস্থিত হয়েছিলে। সেখানে তখন অনেক লোক জড় হ'য়ে কেবল ভীড়ই জমাচ্ছিল, তুমি দু'হাতে লোক ঠেলে কোলে ক'রে ওকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে এলে। আর সেই থেকে কি অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রেই না ওকে বাঁচিয়ে তুলেছ? তোমার জন্যেই মৃত্যুমুখ থেকে ওকে ফেরাতে পেরেছি। নইলে—নইলে আজ আমি লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারতুম না।"

তাঁর কথায় বাধা দিয়ে সতীশ বলে, "না-না কাকাবাবু! অমন কথা বলবেন না। আমি কি-ই বা করেছি? ডাক্তার হিসাবে যতটুকু করা দরকার, তাই করেছি মাত্র। সে তো আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু আমার একার চেষ্টায় কিছু হয় নি। সেবা-শুশ্রূষায় যিনি মুমূর্ষুর জীবন দান করেছেন, তাঁকেই ধন্যবাদ দিন। ওঁর অমন ঐকান্তিক প্রাণঢালা শুশ্রূষা না পেলে, আমার সাধ্য ছিল না ওকে বাঁচাতে—"

সতীশ প্রশংসমান দৃষ্টিতে শীলার মুখের দিকে চায়, শীলা সলজ্জ হেসে মুখ নীচু করে।

৪

একমাস পরের কথা। ক্ষিতীশ এখন বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠেছে। সে-দিনকার কথাবার্ত্তায় সে বুঝতে পারে, এঁদেরই মোটর-দুর্ঘটনায় আহত হ'য়ে সে এঁদের আশ্রয় লাভ করে। আর এঁদেরই আপ্রাণ চেষ্টা-যত্ন, সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসায় তার জীবন রক্ষা হয়। সেই থেকে এখানে সে পরম সুখে আছে। সারদাবাবুকে সে পিতার মত সম্মান করে। তাঁর স্ত্রীকে 'মা' ব'লে ডাকে; তিনিও ছেলের মত স্নেহ করেন ওকে। ডাক্তার সতীশকে সে ভায়ের মত—বন্ধুর মত ভালবাসে। সতীশও ওকে খুব ভালবাসে। কেবল শীলাকে যে সে কি চোখে দেখে, তা সে নিজেই বুঝে উঠতে পারে না। শীলা যতক্ষণ কাছে থাকে, সে কেবলি তার দিকে চেয়ে থাকে, তার সঙ্গে কথা বলতে গেলেই ওর কেমন কথা বেধে যায়, আর সব কিছুই যেন কেমন গোলমাল হ'য়ে যায়। ওর ভাব দেখে শীলা মুখ টিপে হাসে, বলে, "কি ক্ষিতীশবাবু, কোন কথা আছে কি?"

মাথায় আঘাত পেয়ে ক্ষিতীশের পূর্ব্বস্মৃতি লোপ পেয়েছে, নিজের নামটা মনে আছে, কিন্তু সে কে? কোথায় বাড়ী? আপনার জন কেউ আছে কি না? কিছুই মনে নেই তার।

সতীশ পিতৃ-মাতৃহীন দরিদ্র সন্তান। সারদাবাবুই তাকে খরচ দিয়ে বিলেত পাঠান। সে বিলেত থেকে ডাক্তারী পাশ করে এসেছে। এখানে এসেই সে সরকারী চাকরী পায়। এবং হোটেলে রুম ভাড়া নিয়ে আছে। আজও বিয়ে করে নি। সারদাবাবু ওকে খুবই ভালবাসেন, তাঁকে পেলেই সে এঁদের বাড়ী আসে। শীলার সঙ্গে ওর বিয়ের

শুনব শোনা যায়, ওদের দু'জনেরও সেটা জানতে বাকি নেই, আর তাতে ওদের অমত আছে বলেও মনে হয় না। কিতীশের সম্বন্ধে সতীশ বলেছে, সময়ে ওর স্মৃতিশক্তি ফিরতে পারে, কিন্তু সে কবে বা কতদিন পরে, সেটা বলা যায় না।

শীলার কথায় কিতীশ চমকে ওঠে। অস্পষ্ট ভাষায় কি যে বলে, ভাল বোঝা যায় না। "হাঁ-না, আপনাকে আমি এই বলছিলেম যে,—" এই পর্যন্ত বলেই ওর কথা হারিয়ে যায়, আর কিছুই বলতে পারে না সে। কুণ্ঠিত দৃষ্টি মেলে শীলার দিকে চেয়ে থাকে।

কিতীশ যে বড় ঘরের ছেলে, তার আকার-প্রকার, কথা-বার্ত্তায় সারদাবাবু বুঝতে পারেন; কিন্তু তার সম্পূর্ণ পরিচয় না জানতে পেরে, তাঁর মনে স্বস্তি থাকে না। তিনি অনেক রকম চেষ্টা ক'রেও তার পরিচয় জানতে পারেন না। এই ভাবে দিন যায়।

কিতীশ ভাল ক'রেই সেরে উঠেছে, তার চেহারারও পরিবর্ত্তন হয়েছে। স্বভাবতঃই সে প্রিয়দর্শন ছিল, অভাব-অনটনের ভিতর থেকে তার শরীর শীর্ণ ও মলিন হয়ে পড়ে। এখন যত্ন-আদর ও আরামের মধ্যে থেকে তার স্বভাব-সুন্দর আকৃতিতে একটা সুষ্ঠু ও সুকুমারভাব দেখা যায়। আগেকার সেই কিতীশ আর এখনকার এই কিতীশে অনেক প্রভেদ হয়েছে। আগের কেউ দেখলে, সহসা বোধ হয় চিনতে পারবে না। তার কথা-বার্ত্তায়, সারদাবাবুর তাকে শিক্ষিত ব'লেই মনে হয়।

একদিন সারদাবাবু কিতীশকে বলেন, "কিতীশ! আমাদের অফিসে একটা কাজ খালি আছে। বেতন যদিও সামান্য, মাত্র ত্রিশ টাকা, কিন্তু ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে, ক'রবে তুমি? আমার মনে হয়, চুপচাপ বসে না থেকে একটা কিছু করা মন্দ নয়। ওটা সব দিক্ দিয়েই ভাল। স্বাস্থ্যের পক্ষেও বটে, আর মনের দিক্ দিয়েও বটে, মন ওতে শান্ত থাকে।"

কিতীশ আগ্রহভরে বলে, "আজ্ঞে, এ তো খুব ভাল কথা। আমি ঐ-কাজ করব। আপনার দয়া কখন ভুলব না—"

তার কথায় বাধা দিয়ে সারদাবাবু বলেন, "সে কি বাবা! অমন কথা ব'ল না। যতদিন তুমি আমার বাড়ীতে এসেছ, নিজের ছেলের মতই তোমাকে মনে করি। আমার তো ছেলে নেই? তুমিই আমার ছেলে!"

কিতীশের চোখের কোণ সজল হ'য়ে আসে। স্বভাবতঃ সে বড় ভাবপ্রবণ, অল্পেতেই তার চোখে জল আসে। সারদাবাবুর স্নেহপূর্ণ কথায়, তার দু'টী চোখে জল ভরে ওঠে। হেঁট হয়ে ওঁর দু'পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় নেয়।

৫

দু' তিন বছর কেটে গেছে। কিতীশ এখন ম্যাক্-কারলন এণ্ড কোম্পানীর বড়বাবু। খোদকর্ত্তা ম্যাকফারলন সাহেবের পরে সারদাবাবু অফিসের বড়বাবু ছিলেন—তিনি অবসর নিয়েছেন। তাঁর জায়গায় কিতীশ এখন বড়বাবু। কিতীশ বিদ্বান, বুদ্ধিমান কাজের লোক। অল্প দিনের ভিতরেই তার দ্বারা অফিসের উন্নতি হয়েছে। বিশেষ সে সারদাবাবুর অনুগত এবং পরম স্নেহভাজন, কাজেই, পদোন্নতির সঙ্গে কিতীশের বেতনও বৃদ্ধি হয়েছে। সুখ এবং সম্পদের ভিতর থেকেও কিতীশ পূর্ণভাবে সুখী হ'তে পারে নি। সময় সময় তার মনের মধ্যে একটা অজানা অশান্তি জেগে উঠত। এই অকারণ-বিষণ্ণতা কোন রকমে ছাড়াতে না পেরে মাঝে মাঝে তার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়ে পড়ত।

কিতীশ এখন শীলার সঙ্গে যদিও কথা বলে, তবু এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যেও তার মনের সঙ্কোচ দূর হয় নি, মন খুলে শীলার সঙ্গে সে মিশতে পারে নি। শীলাকে দেখলেই সে কেমন যেন হ'য়ে যায়। চোখ-মুখ লাল ক'রে—কোন রকমে নিজের বক্তব্যটা ব'লেই আর সেখানে দাঁড়ায় না। তার ভাব দেখে শীলা মনে মনে হাসে।

এতদিনের ভিতরেও, কিতীশের পরিচয় না জেনে সারদা-বাবু মনে কেমন অস্বস্তি বোধ করেন। অনেক ভেবে সতীশের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কয়েকখানা খবরের কাগজে নিম্নরূপ বিজ্ঞাপন দেন:

"কিতীশচন্দ্র নামে একটী ভদ্রসন্তান আমার আশ্রয়ে আছে। মোটর-দুর্ঘটনার মস্তকে আঘাত পেয়ে তার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে; তার আত্মীয়-স্বজন যে কেউ থাকেন, নিম্ন ঠিকানায় আমার বাড়ীতে এসে তার সঙ্গে দেখা করে।"

পর পর কয়েক সপ্তাহ এই বিজ্ঞাপন বের হয়, তবু কারও খোঁজ পাওয়া যায় না। সারদাবাবু এইবারে তার পরিচয় সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েন।

একদিন সকালবেলা সারদাবাবু নীচের বসবার ঘরে ব'সে, খবরের কাগজ দেখছিলেন, এমন সময়, মলিন প্যাণ্ট ও জামা গায়ে একটী বছর সাতেকের সুশ্রী ছেলে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। ছেলেটী রোগা, তার মুখখানি বড় করুণ! দেখলে মায়া হয়। সারদাবাবু তাকে কাছে ডাকেন। কুণ্ঠিতভাবে সে কাছে এসে দাঁড়ায়। তার মুখের দিকে চেয়ে সারদাবাবু বলেন, "কে তুমি খোকা? কি চাও এখানে?"

ছেলেটি হকচকিয়ে গিয়ে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে। একটা নীচজাতীয় লোক বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল; সে সামনে এসে সারদাবাবুকে নমস্কার করে। তিনি তাকে বলেন, "কে বাপু তুমি?"

সে লোকটা আবার একটা নমস্কার ক'রে বলে, "এজ্ঞে আমি সনাতন। এই ছেলেডার মা বড় ভাল মানুষের মেয়ে। তেনার মত নষ্মি মেয়ে খুব কম দেখা যায়। এই খোকার বাবা আজ ক'বছর হয়—নিউদ্দেশ হয়ে গেলেন। সেই থেকে ওনাদের বড্ড কষ্ট যাচ্ছেন। যে বাড়ীটের ওঁরা ছেলেন, ভাড়া দিতি পারেন নি ব'লে তেড়িয়ে দিয়েছে। বুড়ো কত্তা মোরে বড্ড ভালবাসতেন। তিনি ছেলেন মোর পুরণো মুনিব। ওনার বাড়ী কাজ-কম্ম ক'রে থাকে-থাকেই আমি মানুষ। আমি মা ঠাকুরোণেরে মোর কুড়ের আনিচি। কষ্টে-ছেষ্টে এক রকম দিন যাচ্ছিল,—কিন্তু মা আজ চার পাঁচ মাস রোগে পড়েছেন, এক কেঁটা অষুদও মার পেটে পড়েন নি—ছেলেডার কষ্টের একশেষ। তাই বাবু, আপনার কাছে—" এই পর্য্যন্ত ব'লে সনাতন হাত দু'টী যোড় করে।

সারদাবাবু একজন চাকরকে দিয়ে ক্ষিতীশকে ডেকে পাঠান। ছেলেটী আস্তে আস্তে সনাতনকে বলে, "সনা দা! আমার বাবার কথা বললে না তো?"

"হাঁ, তোর বাবা কি অ্যাদ্দিন আছে দাদা? থাকলি তো এইখেনেই দেখা হতো সে আজ দু'তিন বছরের কথা—"

এই সময় ক্ষিতীশ বাড়ীর ভেতর থেকে এসে সারদা-বাবুকে বলে, "আমায় ডাকছেন?"

"হাঁ, ক্ষিতীশ! এই ছেলেটীর মায়ের অসুখ কিছু ভিক্ষা চাইতে এসেছে। পাঁচটা টাকা এঁকে দিয়ে দাও।"

ক্ষিতীশ ছেলেটীর সামনে এসে, ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখে, হঠাৎ তার কি যেন মনে হয়। সে বার বার তার মুখের দিকে চায়, তার পর ছুটে এসে ছেলেটীকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধ'রে বলে, "নেপু" এবং সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে সে মাটিতে প'ড়ে যায়।

যখন ক্ষিতীশের জ্ঞান হ'ল, দেখে, শীলার কোলে ওর মাথা রয়েছে, মাথায় বরফ দিয়ে, শীলা আস্তে আস্তে হাত-পাখায় হাওয়া করছে। সারদাবাবু কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। সতীশ পাশে একটা চেয়ারে ব'সে আছে, তার হাতে একটা শিশি, বোধ হয় স্মেলিং সল্ট। ক্ষিতীশ চোখ চাইতে সতীশ হাসি মুখে বলে, "কেমন আছেন ক্ষিতীশ বাবু?"

সে কথার জবাব না দিয়ে ক্ষিতীশ ব্যাকুল ভাবে বলে, "নেপু!—আমার নেপু!"

নেপু এক পাশে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, সারদাবাবু সস্নেহে বালককে কোলের মধ্যে নিয়ে বলেন, "এই যে তোমার নেপু—ক্ষিতীশ! চিনতে পার একে?"

"হাঁ, আমার ছেলে! ছেড়ে দিন আমায়—আমি অমলার কাছে যাই—আমার অমলা! কত কষ্টে—ওঃ! আজ কত দিন!" ক্ষিতীশ আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

শীলা ও সতীশের শুশ্রূষায় যখন তার জ্ঞান ফিরে এল, সারদা বাবু স্নেহস্বরে তার হাত ধরে বলেন, "কোথায় যাবে বাবা? তুমি যে আমার ছেলে, আমি সনাতনের কাছে সব জেনে তাঁকে আনতে সতীশকে পাঠিয়েছি, তিনি পীড়িতা, তাঁকে আমার কাছে এনে চিকিৎসা করাব। আর তোমার কোনই ভাবনা নেই ক্ষিতীশ।"

ক্ষিতীশ কেমন হতভম্ব হয়ে পড়ে। কি যে হয়েছে, হঠাৎ যেন মাথায় আসে না তার। মনে হ'ল, অনেক দিনের একটা কাল পরদা ধীরে ধীরে যেন তার চোখের উপর থেকে স'রে যাচ্ছে।

শীলার মা এক বাটী গরম দুধ এনে ক্ষিতীশের মুখের কাছে ধরেন। স্নেহভরা কণ্ঠে ডাকেন, "বাবা ক্ষিতীশ! দুধটুকু খাও বাবা! বড় দুর্বল হয়ে পড়েছ তুমি!"

কিতীশ বিহ্বলভাবে ওর মুখের দিকে তাকায়। এ কোন্ স্বপ্নরাজ্যে এসে পড়েছে সে? এত স্নেহ, এমন আন্তরিকতা! এমন সহানুভূতি হতভাগা কিতীশের জন্য কোথায় লুকিয়ে ছিল!

শীলার কোলে তখনও কিতীশের মাথা রয়েছে।

শীলা ওর মুখের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে ডাকে, "কিতীশ দা! এখন একটু ভাল মনে হয় কি?"

বিহ্বলতার ভারে অতর্কিতে হাত ঠেকলে, মানুষ যেমন চমকে ওঠে, শীলার ডাক শুনে কিতীশ তেমনি ভাবে চমকে উঠে বসে, শীলার দু'খানি হাত নিজের হাতে নিয়ে কম্পিত স্বরে বলে, "শীলা! দেবী, স্নেহময়ী ভগিনী! মূর্খ আমি, অন্ধ আমি তাই তোমায় চিনতে পারি নি এত দিন, তোমার অমর্যাদা করেছি আমার মনে কর দিদি!"

কিতীশের স্বর ভারী হয়ে আসে—চোখের কোণ দুটো সজল হয়ে ওঠে। শীলারও চোখে জল আসে। সে কিতীশের পায়ের ধুলো নিয়ে গাঢ় স্বরে বলে, "দাদা! আমার কাছে তোমার কোন সঙ্কোচের কারণ নেই তো? আমি যে তোমার ছোট বোন!"

কিছুক্ষণ দু'জনেই নীরব। কেউ কোন কথা বলে না। হঠাৎ মোটরের হর্ণ শুনে শীলা ছোট মেয়েটীর মত কলকণ্ঠে হেসে ওঠে। "ঐ-যে বৌদি এসেছেন—চল দাদা, দু'জনে বৌদিকে নামিয়ে আনি। ওঁর যে অসুখ, নিজে তো নামতে পারবেন না—"

কিতীশের হাত ধ'রে শীলা মোটরের দিকে ছুটে যায়। সতীশ হাসতে হাসতে গাড়ী থেকে নেমে বলে, "কারো ধ'রতে হবে না শীলা! বৌদির অসুখটা শরীরে নয়—মনে। আমার মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্রে অর্দ্ধেক অসুখ ভাল হয়ে গেছে। যেটুকু আছে, সুসময়ে এখুনি ভাল হয়ে যাবে।" কিতীশ মোটরের সামনে এসে দাঁড়ায়। অমলা কম্পিত-চরণে মাটীতে পা দিতে, শীলা তাকে বুকের ভিতরে জড়িয়ে ধরে।

---

# পল্লীকাব্য

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

শিমুলতলার পাশ দিয়ে গেছে এঁকে বেঁকে মেঠো পথ
পথের দু'ধারে আপ্‌শেওড়ার বন।
দীঘির কোলেতে ভাঙা মন্দির, তার পাশে ভাঙা রথ,
পালপার্ব্বণ-চিহ্ন নাহিক উদাসী পল্লীজন।

সন্ধ্যা সকালে বনফুলের গন্ধ পবনে বয়,
এ দিকে ও দিকে কূজন-মুখর পাখী।
দীঘির সম্মুখে পাতার কুটীর শূন্যহৃদয়ে রয়,
ঘরের লক্ষ্মী নিয়েছে বিদায় অশ্রু-কমল রাখি'।

সেই কুটীরের দাওয়ায় বসিয়া 'রতন' বাজাতো বাঁশী,
বিরহের সুর গুমরি' উঠিত দুখে।
তারি কাছে ঘুমায়ে পড়িত স্নেহের কন্যা 'হাসি'—
মায়ের বিহনে বিশ্বের মায়া দিত হোলো তার বুকে।

সারাটী দিবস পিতায় লাগিয়া ব্যাকুল রহিত মেয়ে,
পাড়ায় থাকিত পাড়াপড়শীর ঘরে।
কর্ম্মক্লান্ত দিবসের শেষে ধীরে ধীরে পথ বেয়ে
'রতন' ফিরিত জীবননদীর ভরাবালুকা চরে।

আধ আধ স্বরে কহিত কন্যা—'যাও কেন ফেলে মোরে,
দুষ্টু নাহিক তোমারি মতন কেহ—'
ছল-ছল চোখে শুনাতো 'রতন'—'কেমনে বুঝাব তোরে,
মাগোবিনি, তোর মায়ার মধুর আমারি শূন্য গেহ।'

এমনি করিয়া চলে যায় দিন বিহগশ্রেণীর মত,
বেদনায় কেঁদে কত না রাত্রি আসে,
কত না আবেগে আহত পরাণ কেহ নাহি অবগত,
সংসার-পথ রিক্ত রাহীর অশ্রু-সলিলে ভাসে।

পাড়াপড়শীরা কহিল—'রতন! আবার বিবাহ করে'
নূতন করিয়া সংসার গড়ে তোলো।'
উদাসী 'রতন' শুনালো সবারে—'আলো ও কেন গো মোরে—'
তবুও সবাই কহিল তাহারে—'অতীতের কথা ভোলো।'

চলার পথের ফুরালো যাহার, মিছে তার পথ চলা
সকরুণ সুর সজল বাতাসে থাকে।
বলিবার যাহা ছিল মন-মাঝে, হ'ল না'ক আর বলা,
সমাহিত ক'রে রেখে দিল তার দুখের স্বপনটাকে।

বহুদিন পরে থেমে গেল বাঁশী কৃষাণ-কুটীর দ্বারে
বসিল ফণি 'রতনে'র মেয়েপরি,
জীবনের দীপ নিয়ে এ'ল তার 'হাসি'র কোলের কাছে,
'হাসি'র বলিতে রহিল না কেহ—ডুবিল আশার তরী।

রাতের আকাশে ছেয়ে গেল তার মনের অন্ধকার,
ভোরের বেলায় বিকিয়ে উঠিল ধরা।
পাড়ার মেয়েরা কত না বুঝায়, বুঝিতে চাহে না আর,
ধূলায় লুটিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া রহে সে মূর্চ্ছা ভরা।

নদীর জলেতে ভাসাতে চলেছে 'রতনে'র দেহ সবে,
পিছু পিছু ছোটে নয় বছরের মেয়ে।
করুণ বিলাপ উঠিল তাহার কেমনে একাকী র'বে।
মেসে যায় মেহ,—অভাগিনী থাকে তার পানে শুধু চেয়ে।

পুতুল খেলায় দিনগুলি তার শোকের সাগরে ডোবে,
উল্কা উলসি' মিশায় আঁধার কোলে।
জোনাকী-বধূরা কুটীরের পানে চেয়ে থাকে বিকোচে,
বেদুইন ছায়ে মানুষের মত রাতের ছায়াটী দোলে।

করুণায় ঢাকা প্রতিবেশীদের স্নেহের পরশ লভি'
প্রাণের তরণী বয়ে যায় কোনমতে।
বিজন বেলায় জীবন-কুটীরে বসে বসে দেখে ছবি,
শশিকলা সম অভাগিনী 'হাসি' বর্দ্ধিত হোলো পথে।

এয়োতীরা এসে পাতিল একদা মঙ্গল-ঘট তার,
সানায়ের সাথে ঢোল বাজে ঘনে ঘনে।
আত্মীয় সব পাড়াপড়শীরা যেতে দিল সংসার,
শ্বশুরবাড়ীতে চলে গেল 'হাসি' নীরবে স্বামীর সনে।

কে জানে তখন পল্লীবালার কেটে যাবে দুর্দ্দিন,
ঘটিবে সুখের রজনীর পথ মাঝে!
কে জানে তখন মিলনের ঘট পড়ে র'বে উদাসীন
শত অবহেলা পাবে অভাগিনী আপনজনের কাছে?

নারীর মানা যদি নাহি পারে রাখিতে একটুখানি,
বিবাহ করিতে কেন হোলো এত সাধ?
দ্বিতীয়-পক্ষ—ছেলে আছে দুটী—কিশোরী বধূরে আনি'
এত যা কিসের শুরু গঞ্জনা দেয় স্বামী দিন রাত!

সকাল বেলায় চলে যায় মাঠে হুকো লাঙল নিয়া,
কুড়োলের আছে কিসের বুদ্ধি খুব।
চাষীদের সাথে গোলমাল করে মাঠেতে প্রথম গিয়া
সকলের কাছে মেরে মার খেয়ে একেবারে থাকে চুপ্।

ঘরে ফিরে এলে ছোট ছেলে দুটী করে নানা অভিযোগ,
পেট ভরে না কি পায়না তাহারা খেতে!
এ কি মিছে কথা! এ কি লাঞ্ছনা! প্রতিদিন দুর্ভোগ!
শোনে নাক স্বামী দুখিনীর কথা ভালো করে কান পেতে।

"সতু লোকে নয়ে, আবাগীর বেটি! নাহি কি মরণ তোর?
ভাইনির মত ছেলেদের খাবি শেষে!"
চরণ ধরিয়া স্বামীরে বুঝায়—'কোন দোষ নাহি মোর',
স্বামী রেগে বলে—'এবার তোমারে পাঠাব বাপের দেশে।'

"তাই কর তুমি,—ওগো তাই কর—মিটিছে সকল সাধ
প্রহার করিছ বিনা দোষে মোরে তুমি।
ভালোবাসা তব পাই নাই কভু—দিলে মিছে অপবাদ,
আসুক শমন, তাহারি চরণে হাসিয়া পড়িব ঘুমি'।"

সে দিন নেমেছে শ্রাবণের ধারা ধানের ক্ষেতের পরে,
মাঠে মাঠে চলে রোপণের উৎসব।
'কুড়োলে'র মন ভীতি-বিহ্বল, ফিরে যায় কুঁড়ে ঘরে,
ডেঙুল-তলায় কাছে গিয়ে শুনে ছেলেদের কলরব।

'হাসি' ঘরে নাহি শুনিয়া সহসা ম্লান হোলো তার মুখ,
কড় বাদলের পথ দিয়া ছুটে যায়।
গাঁয়ের লোকেরা জানে না কিছুই, দুরু দুরু কাঁদে বুক,
শুধায় ডাকারে, সে বলে —'জানি না'—বহিছে উতলা বায়।

কিছু দিন পরে পথ হেঁটে হেঁটে 'হাসি' এ'ল বাবাদাতে,
জলদে ভরা বাপের বাস্ত-ভিটে।
মোড়ল-পত্নী কহিল-'কুড়োল এ'ল নাক তোর সাথে?'
সে শুধু কহিল—'বিশ্বের মাঝে বাপের বাস্ত মিঠে।'

## গৃহনীড়

—শ্রীরেখা দেবী

যে গৃহ কোন দিন কোন নারীর কল্যাণময় হস্তস্পর্শে ধন্য হয় নি, তার সে দুর্ভাগ্যের কথা, সেই বঞ্চিত হওয়ার ইতিহাস, তার আশেপাশে এবং প্রতিটী ধূলিকণার পর্যন্ত এমন স্পষ্ট হয়ে ফুটে থাকে যে, সে-গৃহের চারিদিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করলেই তা বোঝা যায়। গৃহস্বামী যদি অত্যন্ত ধনশালীও হন, তবু তিনি বহুমূল্য দ্রব্যাদি দিয়ে ঘর সাজিয়ে এবং সে সবের তদারক করতে একদল বেতনগ্রাহী ভৃত্য রেখেও সেই লক্ষ্মীহীন গৃহের শ্রীহীনতা ঢেকে রাখতে সমর্থ হবেন না। আসবাবপত্র গৃহকে সজ্জিতই করতে পারে, কিন্তু সঞ্জীবিত করবার ক্ষমতা তাদের নেই। পূজার আগে প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করার মতই গৃহেরও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হয়—তবেই তা হয় যথার্থ বাসের উপযুক্ত। যেখানে বিরাজ করে শান্তি ও আনন্দ, যার স্নেহময় সুশীতল ছায়ায় মানুষ তার শ্রান্ত দেহ মন নিয়ে এসে পেতে পারে বিশ্রাম ও সেবা, সে-ই হচ্ছে "গৃহ", তাতেই থাকে স্বর্গের সুষমা ও শ্রী—আর একমাত্র নারীর স্পর্শ-ই আনতে পারে গৃহে সেই শ্রী ও শৃঙ্খলা, যা তাকে সঞ্জীবিত করে তোলে।

সবাই জানে নারী মাত্রেই বস্ত্র ও অলঙ্কারের পক্ষপাতী—এর আকাঙ্ক্ষা না কি তার কোন দিনও মেটে না! কিন্তু এ ছাড়াও যে আর একটি কামনা নারীর মনের আসন জুড়ে বসে থাকে, তার খবর খুব কম লোকেই রাখেন। সত্য বটে যে, সুন্দর শাড়ী বা গহনা দেখলে মেয়েদের তা পাবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু আর একটি জিনিষ তারা এর চেয়েও বেশী চায়—সে হচ্ছে এই গৃহ! আমার মনে হয় নীড়-রচনার ইচ্ছাই নারীর মনের আর সব আশা-আকাঙ্ক্ষার চেয়ে প্রবল। স্বীকার করি যে, মেয়েরা শাড়ী-গহনা ভালবাসেন, কিন্তু তার চেয়েও যে গৃহ-রচনা করতে তাঁরা ভালবাসেন আরও বেশী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই, আর তার দৃষ্টান্তও আমরা দেখতে পাই অনেক জায়গাতেই। যথা, যে ভাগ্যহীনা নারী নিষ্ঠুর নিয়তির চক্রান্তে "সর্ব্বহারা," যে মানব-জীবনের সব কিছু আলো, আনন্দ থেকে বঞ্চিত, গভীর দুঃখে তার মন নারী-সুলভ অনেক কিছু আশা, আকাঙ্ক্ষার প্রতিই বিমুখ হয়ে ওঠে, বস্ত্রালঙ্কারে আর তার কোন লোভ, কোন প্রয়োজনই থাকে না—কারণ যার জন্য নারীর সৌন্দর্য্য, প্রসাধন, যার জন্য সে এতদিন বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা নিজকে সজ্জিত করেছে, সেই স্বামী হারাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে সবের সাধও তার জন্মের মত ফুরিয়ে গেছে; এমন একটী নারী যখন আর একটি সুসজ্জিতা সালঙ্করা নারীকে দেখে, তখন তার মনে কোন কথাই উদয় হয় না; কারণ সে সবের প্রতি তার তখন আর কোন আসক্তিই নাই—একবার "আমি ঐ সব পরতে পাব না" ভেবে তার দুঃখ হবে না—বা অন্য নারীটীর প্রতি কোন হিংসা বা দ্বেষ তার মনে জাগবে না। বরং উল্টে সে ভগবানকে জানাবে তার মত দুর্ভাগা যেন সে মেয়েটীর না হয়; চিরকাল যেন তার এমনি সিন্দুর-আলতায় রাণীর মত বেশে সজ্জিত হবার অধিকার থাকে। আশীর্ব্বাদ করে বলবে, "সুখী হও, চির-আয়ুষ্মতী হও"—সেই স্বামীহারা, গৃহহারা, দুঃখিনী যখন দেখে অপরের সংসার, সজ্জিত গৃহ, তখন তার মনে কোন হিংসা বা কুটিলতা জাগে না বটে, তবে হয় তো বা তার নিজেরই অজ্ঞাতে পড়ে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস। সে-ও যে নারী—সে ও যে একদিন এমনি করেই নিজের হাতে আর একটী সংসারকে গড়ে তুলেছিল, তার গৃহকে এমনি ভাবেই সাজিয়ে তুলেছিল! আর একজনের গৃহের পৃক্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও

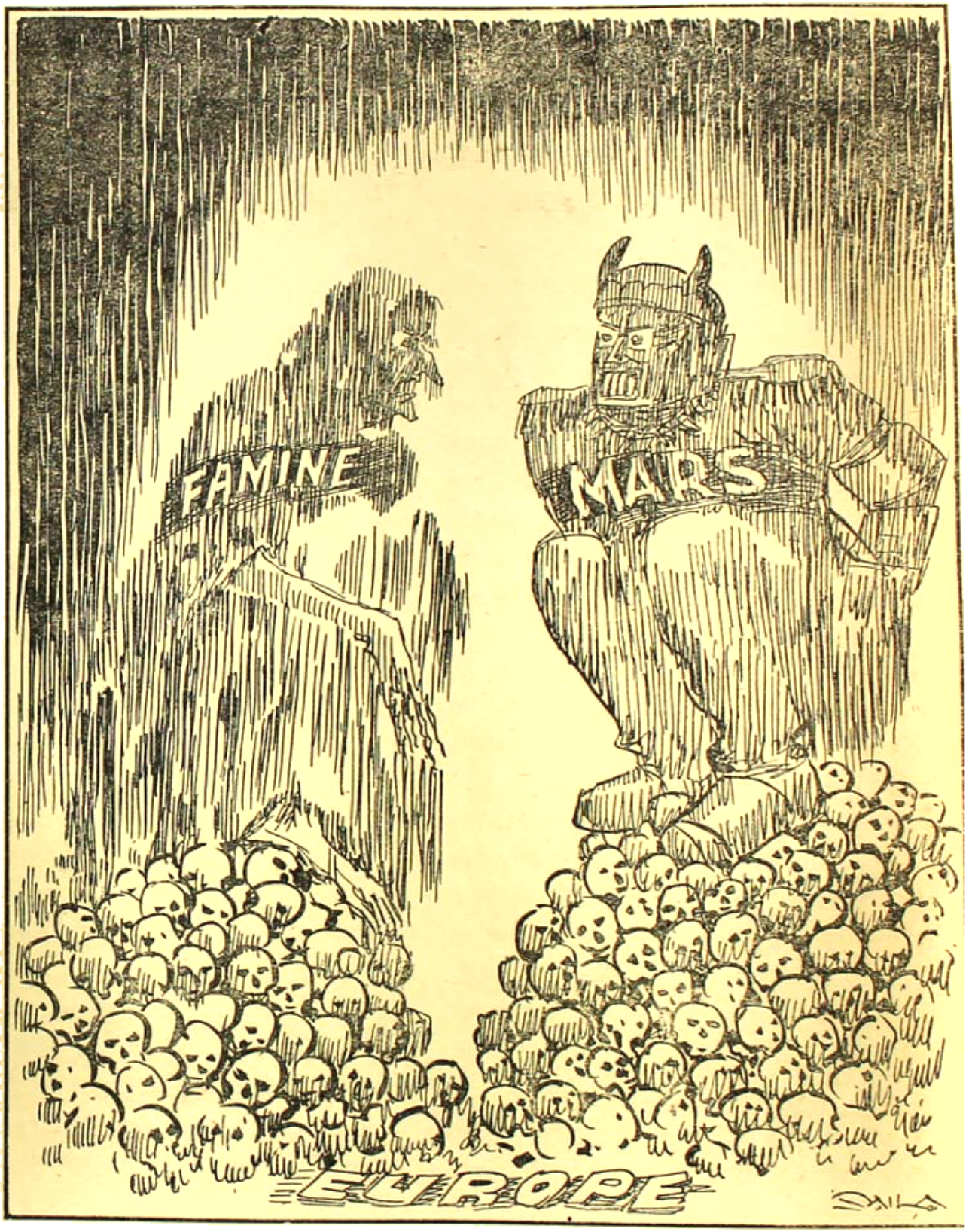


ইউরোপের অভ্যন্তরে

তার মনে এনে দেয় এমনি আর একটী গৃহের ছবি! তার সহ ভালবাসার, সহ যত্নের, বহু স্মৃতি-বিজড়িত সেই গৃহ—যার প্রতিটী দ্রব্য সে নিজের হাতে যথাস্থানে সাজিয়ে রেখেছিল, যে গৃহের জন্য একদিন সহস্রবার অনেক কিছুই নিজের হাতে তৈরী করেছিল। তার যে ছোট "নীড়"খানি সর্ব্বনাশা ঝড়ের আঘাতে ভেঙ্গে পড়েছে তার কথা মনে পড়ে বুকের ভেতর হাহাকার করে ওঠে! এ তার হিংসা নয়; তার যা নেই অন্যের তা আছে দেখে পীড়া বোধ হওয়াও নয়, এ কেবল তার চির-আকাঙ্ক্ষিত, অতি প্রিয়, হারিয়ে-যাওয়া বস্তুর স্মৃতির দংশন-জ্বালা। এই যে হারানো দিনের কথা মনে পড়া, এই থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়, কি নারীর অধিক প্রিয়। অন্যের বস্ত্রালঙ্কার নয়, তার গৃহের দৃশ্যই সমর্থ হয়েছে এই ভোগ-বিলাস-আসক্তি-বর্জ্জিত নারীকে বিচলিত করতে; অমনি আরও শত সহস্র নিদর্শন পাওয়া যায়, যা থেকে বোঝা যায় গৃহ নারীর কত প্রিয়। এই প্রিয় বস্তুকে তারা যে সুন্দর করে তুলতেই চায়, সে কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য। মানুষ মাত্রেই সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী—যা কিছু সুন্দর তাই সে পেতে চায় এবং নিজের যা কিছু আছে তাকেও সুন্দর করে তুলতে চায়; তেমনি মেয়েরাও শাড়ী গহনা পরে কেবল নিজেরা সেজেই ক্ষান্ত হন না, সঙ্গে সঙ্গে যে গৃহে বাস করেন, তাকেও সুসজ্জিত এবং সুন্দর করে তুলতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু খুঁকে দেখলে এ ছাড়া আরও একটী কারণ চোখে পড়ে, যে জন্য আমরা ঘর-বাড়ী সুন্দর ও সুসজ্জিত করে রাখার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখি, সেটী হচ্ছে লোকের সমালোচনা—(প্রশংসা পাবার ইচ্ছাটাও অবশ্য তার মধ্যে একটু আধটু থাকে)। বাইরের লোকে ঘরের সাজ-সজ্জা থেকেই গৃহস্বামীর রুচি, আর্থিক অবস্থা ও পদমর্য্যাদার ওজন করে থাকেন বলে এবং বাড়ীর গৃহিণীর এ বিদ্যায় দখল কতখানি ও তিনি সুগৃহিণী কি না সেও কতকটা আন্দাজ করে নিতে পারা যায় বলে, এ-দিকটাতে চোখ রাখা বিশেষ দরকার। হাতের লেখা দেখে মানুষের চরিত্র বোঝা যায় এ কথা অনেকেই জানেন; সেই হাতের লেখার মতই গৃহের শৃঙ্খলা ও সজ্জাতেও প্রকাশ পায় গৃহিণীর আসল রূপ। তাই সকলেরই উচিত, এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা—যেন প্রশংসা কেনবার উগ্রলোভে অন্ধ হয়ে বেমানান জিনিষ দিয়ে ঘর বোঝাই করে রুচির বিকারের পরিচয় না দিয়ে বসেন।

অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে, সুন্দর করে ঘর সাজাতে গেলেই অনেক বহুমূল্য আসবাব-পত্রের দরকার। তাই যাঁদের হয় তো অর্থের অভাব নেই, তাঁরা এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে রাশি রাশি জিনিষ কিনে ঘর বোঝাই করেই মনে করেন বুঝি ঘর সাজানো হল। আর যাঁদের সে উপায় নেই, তাঁরা মনে করেন দামী জিনিষ কেনবারই যখন উপায় নেই তখন আর ঘর সাজানো হবে কি দিয়ে? এই ভেবে দুঃখিত মনে, হাল ছেড়ে দিয়ে বসেন। কিন্তু এতে দুঃখ করবার কিছুই নেই; গৃহকে সুচারুরূপে সজ্জিত করতে হলে দরকার একটী জিনিষের—গৃহসজ্জা-চারুকলার জ্ঞান—একে অর্থের বিনিময়ে কেনা যায় না। এ থাকে আমাদের ভিতরে ঘুমিয়ে, কেবল তাকে জাগিয়ে তুলতে পারলেই আমরা এই পরীক্ষায় বিনা অর্থেও উত্তীর্ণ হতে পারব, দামী আসবাব-পত্রের অভাব আর বোধ করতে হবে না এবং কি ধনী কি দরিদ্র সকলেই ইচ্ছা করলে তাদের গৃহসজ্জায় সুরুচির পরিচয় দিয়ে সুনিপুণা ও সুগৃহিণী বলে খ্যাতি লাভ করতে পারবেন।

কত অল্প জিনিষ দিয়ে যে কত সুন্দর করে ঘর সাজানো সম্ভব হতে পারে, সে শিক্ষা যেমন করে আমরা জাপানী মেয়েদের কাছ থেকে পেতে পারি এমন আর কোথাও পাব না। জাপানে যে কোন গৃহস্থের বাড়ীতে গেলেই আগে চোখে পড়বে তাদের ঘরের সুন্দর অথচ আড়ম্বরহীন গৃহসজ্জা—যা থেকে পাওয়া যায় জাপানী গৃহিণীদের সুরুচির পরিচয়। আমাদের মত এঁরাও ঘরের প্রতিটী জিনিষ নিজের হাতে মনের মত করে সাজিয়ে রাখেন। এঁদের ঘরে জিনিষপত্র থাকে খুবই কম এবং যা থাকে তা-ও মূল্যবান্ কিছুই নয়, কিন্তু তবুও যে লোকে সে সব ঘরের সজ্জা দেখে মুগ্ধ হয়, তার কারণ এঁদের প্রত্যেকেরই ভিতর আছে গৃহসজ্জার চারুকলার জ্ঞান, যার সাহায্যে সামান্য ও স্বল্পমূল্যের আসবাব-পত্রের দ্বারাই তাঁরা অমন সুচারুরূপে তাঁদের গৃহসজ্জা সম্পন্ন করতে সমর্থ হন।

বাজারের কেনা জিনিষের চেয়ে নিজের হাতের তৈরী জিনিষ যে অনেক ভালো ও সুন্দর একথা আমাদের সকলেরই জানা আছে, তবু কেন যে ঘর

করে বাইরে থেকে ঘর সাজাবার জিনিষ কিনতে না পারলে দুঃখিত হব, এর কোন কারণই আমার চোখে পড়ে না। আমাদের ঘরে সাধারণতঃ যে সব জিনিষ থাকে, তার অধিকাংশই যখন নিজেরা তৈরী করতে পারি, তখন এ নিয়ে ভাবনার কিছু থাকতেই পারে না। দেয়ালে টাঙ্গানো ছবি থেকে শুরু করে মেঝের পাতা কার্পেটটী পর্য্যন্ত আপনারা ইচ্ছা করলে সবই নিজেরা তৈরী করতে পারেন এবং অনেকে হয় তো তা করছেন। যাঁরা এসব নিজেরা তৈরী করেছেন, তাঁরা জানেন, এতে কত আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়া যায়, তাঁদের আর এ বিষয়ে নতুন করে কিছু বলবার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু যাঁরা এখনও তা করেন নি, কিন্তু ভবিষ্যতে করবার যাঁদের ইচ্ছা আছে তাঁদের সাহায্যার্থেই আমি ঐ রকম দু'একটি জিনিষের প্রস্তুত-প্রণালী নিয়ে আলোচনা করব, যাতে তাঁরা এই থেকে সেগুলি প্রস্তুত করবার কিছু সাহায্য ও উৎসাহ পান।

নিজের হাতের তৈরী জিনিষ দিয়ে ঘর সাজাতে আমাদের সকলেরই ইচ্ছা করে, কিন্তু অনেক জিনিষ প্রস্তুত করবার সহজ উপায় জানা থাকে না বলে সে ইচ্ছা দমন করতে বাধ্য হতে হয়। যেমন ছবি। ছবি-আঁকা সকলেরই কিছু আসে না; আপনাদের মধ্যে হয় তো দু'একজন একটু আঁকতে পারেন, যাঁরা ছবি আঁকতে পারেন তাঁদের অবশ্য খুবই সুবিধা—সুন্দর সুন্দর নানা রকম ছবি এঁকে ঘরে টাঙ্গাতে পারেন—কিন্তু তাই বলে যাঁরা আঁকতে পারেন না, তাঁদের যে এ-আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই। আঁকতে না পারলেও সেলাই যখন অল্প-বিস্তর সকলেরই জানা আছে, তখন ঐ দিয়েই ছবি তৈরী করা যেতে পারে। 'কার্পেটে'র ছবি হয় তো অনেকেই করেছেন এবং নিজের ছোট ছোট বোন বা মেয়েদের হয় তো শিখিয়েছেনও, কাজেই এ নিয়ে আলোচনাটা একেবারেই ফলপ্রসূ হবার কথা নয়। কিন্তু আমি যে ছবির কথা বলছি সেটি কার্পেটের ছবি নয়—সাধারণ সেন কাপড়ের ওপর তিন-চার রকম 'ষ্টিচ' বা সেলাই দিয়ে এটি প্রস্তুত করতে হয়। পশু পক্ষী-মানুষ প্রভৃতির মুখ ইত্যাদি সব কিছু এভাবে কাপড়ের ওপর আঁকা ছবির মতই সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা যায়। একেবারে প্রথমেই খুব শক্ত ছবি না করে সহজ একটা কিছু করে "হাত পাকিয়ে" নিয়ে তার পর বড় কাজে হাত দিলেই ভাল হয়।

আপনাদের সুবিধার জন্য এখানে একটি ছবির দেওয়া গেল। একটী পুষ্পপাত্রে সাজানো আছে এক গোছা ফুল, সেগুলি আবার নানা রঙের! ঠিক মত করতে পারলে সেলাইয়ে এই ছবিটী খুব সুন্দর হবে। করবারও বিশেষ কোন হাঙ্গামা নেই, সারা ছবিটীতে আছে কেবল তিন রকম সেলাই —buttonhole stitch বা বোতাম-ঘর সেলাই, chain stitch, চেন-সেলাই ও stem stitch বা ফুল-পাতার ডালের জন্যে যে রকম সরু সেলাই হয় সেই রকম সেলাই। এই দিয়েই সারা ছবিটী তৈরী হবে। কোথায় কোন্ সেলাই হবে তা ছবিটীর বাঁ দিকের অংশটায় কিছু কিছু আঁকা রইল, দেখলেই বুঝতে পারা যাবে। তা ছাড়াও আমি আলাদা করে বলে দেব কোথায় কোন রঙ্ দিয়ে কি সেলাই হবে—তা হলে আর করবার সময় একটুও অসুবিধা হবে না।

## সেলাইয়ের ছবি

উপকরণ :—এক টুকরো ফিকে হলদে চৌকা 'লিনেন' কাপড় ও লাল, সবুজ, ফিকে সবুজ, কারোলেট, ফিকে নীল ব্রাউন বা খয়ের রঙের ও কমলা লেবু, কালো, এবং সাদা রঙের ডি. এম. সি. বা কোন ভালো রেশম। প্যাটার্ণ হিসাবে এই ছবিটীই ব্যবহৃত হবে বলে আর সে নিয়ে ভাবনার দরকার নাই। কেবল প্যাটার্ণটী যখন কাপড়ের উপর আঁকা হবে তখন মোটাটী ডবল লাইন দিয়ে আঁকতে হবে (যেখানে চওড়া কালো রেখা দেওয়া হয়েছে ছবিতে, সেইখানে ততখানি চওড়া ডবল লাইন হবে) অবশ্য ছোট ফুল ও সরু ডালগুলি ছাড়া।

প্রণালী :—প্রথমে প্যাটার্ণ আঁকা হবার পর ডিজাইনটির আশপাশের ডাঁর ডবল লাইনের ভিতর ছোট ছোট 'রাণ' দিয়ে ভরিয়ে নেতে হবে, কেবল এক লাইন রাণ করলেই যথেষ্ট হবে। তার পর যে বড় বড় ফুলের পাপড়িগুলি ডবল লাইন দিয়ে আঁকা হয়েছে এবং ছবিতে যেগুলি মোটা করে কালো রঙ্ দিয়ে আঁকা আছে, সেই সব বড় বড় ফুল এবং পাতাগুলি ছোট ছোট রাণগুলি ঢেকে দিয়ে অল্পটাই চওড়া করে 'বোতাম-ঘর' সেলাই দিয়ে করে যেতে হবে (১ নম্বর পাতায় এর নমুনা আঁকা দেখতে পাবেন)। পাতা ও ফুলগুলির

ভিতরের যে সরু সরু শিরাগুলি আঁকা আছে, সেগুলি 'ফ্রেঞ্চ ষ্টিচ্' বা 'ডালে'র সেলাই দিয়ে করলে ভালো হয়; তবে ইচ্ছা করলে ছোট ছোট করে 'রাণ' বা ষ্টিচ্ করেও দিতে পারেন। সরু সরু ফুল ও পাতার ডালগুলি ফ্রেঞ্চ্ ষ্টিচ্ বা 'ডালে'র সেলাই (২নং) ও ফুলদানীটার দুই পাশ ফ্রেঞ্চ ষ্টিচ্ দিয়ে হবে (৩নং)। তার গায়ে যে দুটী মোটা মোটা ছোরা কাটা আছে সেইটী বোতাম-ঘর ও তার বাকের দাঁত-দাঁতগুলি ফ্রেঞ্চ্ ষ্টিচ্ দিয়ে করবেন। পাত্রটীর তলাটীও হবে বোতাম ঘর সেলাইয়ে।

কোথায় কি রঙ্ দিতে হবে তা' ছবিতেই লেখা আছে অনুসরণ করতে কষ্ট হবার কথা নয়, কিন্তু তবুও আর একবার ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া যাক: বড় গোলাপ ফুলটী লাল রঙের, তার ডান পাশের সরু সরু পাতাগুলি ফিকে সবুজ ও তার ডাল খয়েরী, বড় পাতা দু'টী গাঢ় সবুজ, তার পরের স-পাপড়ী ফুলটী ফিকে নীল, তার পাশের ছোট গোল গোল ফুলগুলি সাদা, বড় ফুলটী আবার লাল এবং কোণে তারার মত চারটি ফুল সাদা দিয়ে হবে।

গোলাপটীর বাঁ দিকের (১নং) পাতা সবুজ, পরের ফুলটী ফিকে নীল, ছোট ফুলগুলি সাদা এবং তার পাশেরটী লাল, মাঝখানের বড় ফুলটী ভায়োলেট রঙের এবং তার নীচের দিকের চারিটী বড় পাতা সবুজ রঙ্ দিয়ে সেলাই হবে।

মাঝের ভায়োলেট ফুলটী এবং তার বাঁ পাশের লাল ফুলটীর মাঝখানের ছুটী-ছুটী এবং দুইটী গোল লাইন কমলা রঙের রেশম দিয়ে সেলাই করতে হবে। পুষ্পপাত্রটী হবে খয়েরি রঙের, তার পাশের মোটা মোটা তোড়াগুলী কমলা রঙের ও তাদের ভিতরের কাজগুলি হবে কালো রঙের।

সেলাই হয়ে যাবার পর যে কাপড়টির উপর সেলাই করা হয়েছে সেটী উল্টে ফেলে উল্টো দিক্ থেকে খুব গরম 'ইস্ত্রি' দিয়ে সেলাইগুলি ভালো করে বসিয়ে ও কাপড়টীর চারধারের সব ভাঁজ ভালো করে ভেঙে নেওয়া দরকার, না হলে বাঁধাবার পর চার পাশে বিশ্রী ভাঁজের দাগ চোখে পড়ে ছবিটীর সব সৌন্দর্য্য নষ্ট করে দেবে। পরে সাধারণ ছবির মত কাঁচ এবং ফ্রেম দিয়ে বাঁধিয়ে আনলেই আপনার

সেলাইয়ের ছবি।

দেওয়ালে টাঙাবার একখানি সুন্দর ছবি তৈরী করা শেষ হবে।

## কি রান্না হবে ?

বাড়ীর গৃহিণীদের প্রতিদিন যে অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, দুই বেলার "একম্-পক্ষ" হচ্ছে তার মধ্যে প্রধান—বছরের ৩৬৫ দিনের দু' বেলায় ৭৩০টী খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত

কথা বড় সহজ ব্যাপার নয়। এবেলা যা রান্না হয়েছে ওবেলা তার থেকে ভিন্ন রকম হওয়া চাই, কাল যা-যা খেয়েছিল আজ আর সে সব চলবে না। প্রতিদিন নতুন করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা রকমের রান্নার ব্যবস্থা এদের করতে হয় তাই এই চির-পুরাতন রান্নার কথা গৃহিণীদের কাছে কখনো পুরাণো হয় না। কারণ এর ভিতর দিয়ে নতুন নতুন রান্নার কথা জানা যায় বলে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করবার পক্ষে এই পাক-প্রণালীর আলোচনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তার উপর কেউ যদি "বাড়তি-রান্না"টা কি ভাবে আর একবেলা "নতুন" করে চালানো যেতে পারে তা বলে দেবার ব্যবস্থা করেন তাহলে তো আর কথাই নেই। আমাদের গৃহিণীদের এ বিষয়ে অর্থাৎ 'কি রান্না হবে' সে বিষয়ে ঋতুর পরিবর্তন ও তদনুযায়ী শাক-সবজী ও ফল-মূলের আবির্ভাব অনেকটা সাহায্য করে—তাই আমাদের দেশে ঋতু অনুযায়ী রান্না করার প্রথার এত চলন।

বর্ষার ভিজে হাওয়া মানুষের শরীর মন যখন করে তোলে স্যাঁতসেতে তখন তাকে জাগিয়ে তুলতে, সেই 'জিজে' ভাব কাটিয়ে উঠতে ঘরে ঘরে 'খিচুড়ি' রান্নার ধুম পড়ে যায়। গরম গরম 'খিচুড়ি' ও ভাজা বর্ষাকালে যেমন মুখরোচক হয় এমন আর কোন সময় হয় না। এ সময় ক্ষুধা না থাকলেও 'খিচুড়ি'র সুগন্ধ নাকে এসে প্রবেশ করলেই আপনি ক্ষুধার উদ্রেক হতে শুরু করে। শীতকালে কপি, কড়াইশুটি,—গ্রীষ্মকালে কাঁচা পাকা আম ইত্যাদি অনেক জিনিষই আমাদের বাড়ীর লোকের ক্ষুধার ও রান্না-ঘরে গৃহিণীদের রান্নার সাহায্য করে থাকে। ঠিক বর্ষার পরই এই সময়টা, ওরই মধ্যে একটু কষ্ট করতে হয়; কারণ এ সময়ে সাধারণতঃ ক্ষুধার উদ্রেক হয় কিন্তু কম—তার উপর জিনিষ-পত্রও তেমন কিছু নতুন ওঠে না, যা দিয়ে রান্না করলে লোভ দেখিয়েও খানিকটা খাওয়ানো যাবে। ছেলে-মেয়েদেরও তেমন খাবার ইচ্ছা থাকে না বলে ভাল রান্না হলেও তখন অনেক জিনিষ বাদ তো বেশী হয়।

এখন ঐ যে বাড়তি মাছ, মাংস ঐগুলি দিয়ে যদি এমন কিছু একটা নতুন এবং মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত করা যায় যা দেখলেই খেতে ইচ্ছা হবে, তবেই বাড়ীর লোকদের পরিপাটী-রূপে খাওয়ানোর এবং বাড়তি রান্নার সমস্যা দুইই হবে। আমি এখানে বাড়তি রান্না মাংসের থেকে তৈরী একটি রান্নার প্রণালী দিলাম। তৈরী হবার পর যখন সেগুলি গরম গরম ছেলে, মেয়ে ও গৃহস্বামীর পাতে পড়বে তখন শত অনুরোধ-উপরোধেও যা হতো না তাই হবে, অর্থাৎ পাতে এগুলি বেশীক্ষণ পড়ে থাকতে দেখা যাবে না—বিশ্বাস না হয় আন্ত কতক গরম গরম পাতে দিয়েই দেখুন না কি হয়।

### মাংসের ভাজা পুলি

উপকরণ: রান্না মাংসের টুকরাগুলি, কিছু কাঁচা আলু, ২টী পেঁয়াজ, ২টী ডিম, অল্প নুণ, গোলমরিচ ও ঘি।

প্রণালী: প্রথমে আলুগুলি ভালো করে ধুয়ে তারপর সিদ্ধ করতে চাপান এবং পেঁয়াজ ছাড়িয়ে সেই পাত্রেই ফেলে দিন, আলুগুলি খোসাশুদ্ধই সিদ্ধ হবে। তারপর সিদ্ধ হয়ে গেলে নাবিয়ে নিয়ে জল ঝরিয়ে আলুর খোসাগুলি ছাড়িয়ে ফেলুন এবং সেগুলি পেঁয়াজের সঙ্গে খুব ভালো মিহি করে পিষে রেখে রাখুন। তাতে নুণ ও গোলমরিচ ইচ্ছা হলে মিশিয়ে নিতে পারেন, না হলে পরেও দেওয়া চলতে পারে। ডিম দু'টী ভেঙ্গে একটু পাত্রে ঢেলে বেশ করে 'ফেটিয়ে' রাখুন এবং তারপর রান্না মাংসের টুকরোগুলি বেশ করে একখানা ছুরির সাহায্যে খুড়ে ফেলুন (যেমন করে 'কাটলেট' ভাজবার সময় মাংস খুড়ে নেওয়া হয় ঠিক তেমনি করে)। মাংস 'খোড়া' হবার পর, যে আলু ও পেঁয়াজ রেখেছেন তার সঙ্গে মিশিয়ে ভালো করে আর একবার মেখে নিন, যাতে মাংসের টুকরো আলুর সঙ্গে বেশ মিশে যায়। এইবার তার থেকে ইচ্ছামত গোল গোল বা 'পুলি'র মত করে যতগুলি ইচ্ছা 'পুলি' গড়ে ফেলুন। সব গড়া হয়ে যাবার পর একটি একটি করে ঐ যে দু'টী ডিম ভেঙ্গে ফেটিয়ে রেখেছেন তাতে চুবিয়ে নিয়ে ঘিয়ে ভেজে তুলুন—বেশ লাল হলে তবে ঘি থেকে তুলবেন।

আজকাল বড় বড় পটল খুবই সস্তায় পাওয়া যায়—'পুলি'র মত করে বাড়তি মাংস খুড়ে নিয়ে বড় বড় পটলের মুখ কেটে তার কিতরটী 'কুরে' ফেলে ঐ মাংস পটলের ভিতর 'পুর' করে দিয়ে তার উপর 'বেসন' মাখিয়ে 'পটলি' ভাজলেও খেতে খুবই সুস্বাদু হয় এবং বাড়তি মাংস বেশ কাজে লাগানো হয়। 'পটলি' আপনারা সবাই তৈরী করেন, কিন্তু তার "পুরের" জন্য ব্যবহার করেন বিশেষ করে তারই

অল্প তৈরী করা টাটকা মাছ বা মাংসের 'পুর'! তা না করে বাসী বাড়তি মাংসও এই পুর হিসাবে ব্যবহার করা চলে।

## প্রয়োজনীয় কথা

অনেক সময় অনেক ভালো ভালো কাপড়, জামা, একবার মাত্র পরবার পরই এমন ভাবে নষ্ট হয়ে যায় যে, আর সেগুলি পরে কোথাও বাইরে যাবার উপায় থাকে না, হয় তো তাতে অসাবধানতাবশতঃ শরবৎ, চা, কিম্বা অন্য কিছু পড়ে গিয়ে এমন বিশ্রী ভাবে দাগ ধরে যায় যে কিছুতেই আর পরে সে দাগ তোলা যায় না; ফলে অতি প্রিয় শাড়ী বা জামাটিকে অত্যন্ত দুঃখিত মনে ঘরে পরে পরে নষ্ট করে ফেলা ছাড়া আর কোন উপায়ই খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই সব দাগ কিসে এবং কি দিয়ে তুললে একেবারে সম্পূর্ণ ভাবে উঠে যায় তা জানা থাকলে অনেকগুলি ভাল কাপড়কে বারাবার দুঃখ থেকে বাঁচাতে পারেন। তা ছাড়া এই দাগ লাগিয়ে কাপড় নষ্ট করতে যে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কি রকম ওস্তাদ সে কথা আর আপনাদের নতুন করে বলবার দরকার হবে না। আমি এখানে একটী তালিকা প্রস্তুত করে দিলাম, কিসে কোন জিনিসের দাগ তোলা যায়। সঙ্গে রাখলে তালিকাটি ভবিষ্যতে অনেক উপকারে লাগবে।

ফলের রসের দাগ:—কাপড়ে ফলের রসটী পড়া মাত্রই জিজে থাকতে থাকতে যদি তার উপরে খানিকটা ফুটন্ত জল পাত্রটি উঁচুতে ধরে ঢেলে দেন যাতে জলের তোড়েই দাগটিকে তুলে ফেলতে সাহায্য করে, তাহলে আর তাতে একটুও দাগ দেখা যাবে না। আর দাগটী যদি শুকনো হয় তবে কাপড়ের সেই স্থানটী গ্লিসারিন দিয়ে খানিকক্ষণ ভিজিয়ে রেখে তার পর ধুলেও অনেকটা ফল পাওয়া যায়।

চা'এর দাগ:—একটুকরো কাপড় 'গ্লিসারিনে' ভিজিয়ে সেটি এই দাগের উপর ঘসতে থাকুন, কিছু পরে ধুয়ে ফেলুন। সুতির কাপড় হলে এতেই দাগ উঠে যাবে, না হলে দাগটী লেবুর (পাতি) রসে ভিজিয়ে রৌদ্রে রেখে দিন এবং শুকিয়ে গেলেই আবার লেবুর রস দিয়ে ভিজিয়ে দিন, কয়েকবার ওরকম করার পর ধুয়ে ফেলুন। গরম দুধও চায়ের দাগ তুলতে সাহায্য করে।

লিমনেডের দাগ:—জিজে থাকতে থাকতে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ফেলবেন। দুই তিন বার ভাল করে ধুলেই আর দাগ থাকবে না।

মাখনের বা ঘিয়ের দাগ:—তুলোয় করে খানিকটা 'বেঞ্জিন' নিয়ে দাগটীর ওপর ঘসে দিন এবং শুকিয়ে গেলে সেই স্থানে এক টুকরা 'ব্লটিং' রেখে তার উপর গরম ইস্ত্রি চালিয়ে দিলেই দাগ উঠে যাবে।

কোকো বা চকোলেটের দাগ:—যেখানে এই দু'টীর একটীও পড়বে সেই জায়গাটী প্রথমে ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে তার পর ফুটন্ত জলে ধুয়ে ফেলুন, যত শীঘ্র ধোবেন ততই ভালো, দাগটী পুরনো হলে তোলা শক্ত হয়।

পিচের দাগ:—রাস্তায় চলতে বা কোন রকমে কাপড়ে পিচ লেগে গেলে, আগে কাপড় থেকে পিচগুলি ছাড়িয়ে ফেলে তার পর সেখানটায় একটু মাখন লাগিয়ে ঘসে দিন—দাগ উঠে গেলে মাখনের তেল-তেলা দাগ তুলতে সেখানে একটু পেট্রল একটুকরো কাপড় ভিজিয়ে ঘসে নিন, তাহলেই মাখনের দাগও উঠে যাবে—কিন্তু একটী কোন খোলা বাতির সামনে কখনও যেন করবেন না। পেট্রল খোলা বাতির কাছে রাখা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

---

## স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি

...যারা জমির মানুষের পরিবর্তন অনতিবিলম্বে সাধন করিতে হইবে, ভারতবর্ষের জমী যাহাতে অচিরে স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি পুনরায় লাভ করে, প্রথমতঃ তাহার আয়োজন করিতে হইবে। তাহার পর ক্রমে ক্রমে যাহাতে ভারতবর্ষের প্রকৃত কৃষি-বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান প্রভৃতির অবনতি পুনরায় বৈজ্ঞানিকভাবে আয়ত্তাধীন করা আরম্ভ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের জমীর উর্ব্বরাশক্তির ইতিহাসের কথা বলিতে গেলে যত শীঘ্র সাধ্য লাভ করা সম্ভব, অন্য দেশের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে, কারণ পরীক্ষা করিলে জানা যাইবে যে, এখনও এখানকার জমীতে যে স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি আছে, তাহা অন্য কোন দেশের জমীতে নাই এবং এখানে অনায়াস-সুবিধাযোগ্য জমীর পরিমাণ যত অধিক, তাহা অন্যত্র আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হইবে না। একমাত্র ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ ও অষ্ট্রেলিয়া ব্যতীত অন্যত্রের সর্ব্বত্রই অল্প পরিমাণে খাদ্যশস্যের অভাব আরম্ভ হইয়াছে। অনেক শত বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষের জমীর যে স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি ছিল, তাহা ফিরাইয়া আনিতে পারিলে, সারা জগতে যে খাদ্যশস্যের অভাব ঘটিয়াছে, তাহার পূরণ একমাত্র ভারতবর্ষের দ্বারাই সংসাধিত হইতে পারে।

ভারতবর্ষের জমী যাহাতে অচিরে তাহার প্রাচীন স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি ফিরিয়া পায়, তাহা করিতে হইলে ইংরাজদিগকে এবং ভারতবাসীদিগকে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে হইবে এবং রাষ্ট্রের পরিচালনা যাহাতে লোকহিতকর রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।...

---

# ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস

—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

৩

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় সাহিত্য আশ্রয় করিয়া জাতীয়তা প্রচারে ব্রতী হন, জাতীয় রঙ্গমঞ্চও তেমনি সাধারণ লোকের মধ্যে এই ভাব প্রচারে বিশেষ সহায়তা করে। সাময়িক হইলেও বাঙ্গালার রঙ্গালয় বরাবরই জাতীয়তার বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে। দীনবন্ধুর কথা তো পূর্ব্ব অধ্যায়েই বলিয়াছি। গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যলীলা, সিরাজদ্দৌলা, মিরকাসিম ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি নাটকও এক সময়ে জাতীয় ভাব ও জাতীয় ধর্ম্মপ্রচারে প্রচুর লোক-শিক্ষার কার্য্য করিয়াছে। আর আজ এই জাতীয়তার অনুদয় কালেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ, হরলাল ও শিশিরকুমার জাতীয়তামূলক নাটকাদির সহায়তায় যথেষ্ট লোক-শিক্ষার উপাদান যোগাইয়াছেন। যে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের সময়ে জাতীয় মহাবিদ্যালয়রূপে পরিণত হইয়াছিল, এই যুগেই তাহার সূচনা।

যে বৎসরে 'হিন্দুমেলা'র শুভ উদ্বোধন, সে বৎসরই কয়েকমাস পরে গিরিশচন্দ্র বাগবাজার পল্লী-অঞ্চলে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় করিয়া উহার সমগ্র অধিবাসীকে মুগ্ধ করেন। ইহার ২।৩ বৎসর মধ্যেই গিরিশ সম্প্রদায় "ন্যাসনাল থিয়েটার" নাম পরিগ্রহ করে (১৮৭১)। থিয়েটারের 'ন্যাসনাল' নামটীও 'ন্যাসনাল নবকুমারের'ই দেওয়া নাম। ইতিপূর্ব্বে তিনি 'ন্যাসনাল পেপার' প্রচলন করেন এবং দেশীয় অনুষ্ঠানাদিকে 'ন্যাসনাল' নামে অভিহিত করিতে ভালবাসিতেন। তাই লোকে তাঁহার 'ন্যাসনাল নবগোপাল' আখ্যা দিয়াছিলেন। হিন্দুমেলার অনুষ্ঠাতাও ইনিই ছিলেন।

জাতীয় নাট্যশালা ক্রমে 'পাব্‌লিক' হইয়া সাধারণের নিকটে পয়সা লইয়া থিয়েটার দেখাইতে ব্যবস্থা করে; এবং 'নীলদর্পণ' নাটকেই ইহার আরম্ভ। তবে নীলকর অত্যাচার তখন প্রায় স্থানেই প্রশমিত হইয়াছে, তাই অভিনয়ের জন্য হইলেও জাতীয়তা হিসাবে এতদিন পরে কলিকাতায় অভিনীত এই নাটকের আর তেমন আদর হয় নাই। অবশ্য সেই আদর দেখা গিয়াছিল দাদশ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা নগরীতে। কিন্তু পরবর্ত্তী অনেক নাটকাদিতে বিলক্ষণ জাতীয়তার বীজ উপ্ত হইত। তখন সহরে 'স্বদেশ-হিতৈষিতা,' 'স্বাধীনতা' প্রভৃতি কথার বেশ আলোচনা হইত। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত সঙ্গীত'* তখন বঙ্গনির্ঘোষ স্বরে নিনাদিত হইত। অধিকাংশ ছাত্র, শিক্ষক ও যুবকের মুখেই প্রতিধ্বনিত হইয়া বাহির হইত :—

"বাজ রে শিঙ্গা, বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই মানব মায়ের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

"আছয়ে হিমাদ্রি পাষাণ, তুষারী
তাহার, হিমাদ্রি অঙ্গ কর কি,
চীন, তাতারেশ, অনন্ত আসার,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রবল,
বাদল করিতে করে বেরজান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।
শিরেতে কোটি মানবের বাস,
এ ভারতভূমি বলের আশ,
হরষে পড়িয়া পৃথ্বীতল ধীরা।
আর্য্যাবর্ত্তবাসী পুরুষ যারারা
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা?
হেন কর শুধু হইয়া পাষাণ—
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা।"

সদ্য-প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাসনাল থিয়েটার'ও জাতীয়তা প্রচারের বিশেষ সহায়ক অস্ত্র হইয়া উঠিল। এ সময়ে অমৃতবাজার পত্রিকার সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় 'ভারতমাতা' নামে একখণ্ড নাটিকাকার রচনা করেন এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী ন্যাসনাল থিয়েটারে উহা অভিনীত হয়। 'ভারতমাতা' সম্বন্ধে অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন—

"এই সময়ে সহরে আর একটা বিষয়ের অল্পে অল্পে আদর হচ্ছিল, সেটা স্বদেশ-হিতৈষিতা, স্বাধীনতা ইত্যাদি। ন্যাসনাল নবগোপালের হিন্দুমেলা টেলা উপলক্ষে নবগোপাল মনোমোহন বসুর বক্তৃতাদিতে ঐ সকল কথার আলোচনা হ'ত, তখন হেম বাবুর ভারত-সঙ্গীত নূতন হয়েছে, তখন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সব ভারত সন্তান' গানটি নূতন রচিত হয়েছে। এই সময়ে আমরা ন্যাসনাল থিয়েটারে 'ভারতমাতা' বলে একটা ছোট-খাট দৃশ্য দিলাম। এই 'ভারতমাতা'র অভিনয় বড়ই শুভক্ষণে আরম্ভ হয়েছিল।

* ১৮৭০।৭১ খৃষ্টাব্দে এডুকেশন গেজেটে 'ভারত সঙ্গীত' প্রকাশিত হয়।

সাধারণে বিষয়টী বড় appreciate করলে। ভারতমাতার ক'খানা প্রচলিত গান ছিল, সে গুলার আদর এমন বেড়ে গেল যে, শেষে আমাদের যেদিন ভারতমাতার অভিনয় না হ'ত, সে দিন দর্শকের তুষ্টির জন্য প্লাকার্ডের পরিশেষে ভারত-সঙ্গীত বলে বিজ্ঞাপন দিতে হ'ত। মহেন্দ্রবাবু ভারতমাতা সাজতেন। এমন সুন্দর অভিনয় ক'রেছিলেন যে, আমরা তাঁকে 'মা' ব'লে ডাকতেম।"

পাঠকের অবগতির জন্য ভারতমাতার সমগ্র কাব্যটির বিবরণ এখানে উদ্ধৃত হইল—

ভারতমাতা বাম করে বাম গণ্ড স্থাপন করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার মূর্ত্তি গম্ভীর, মুখশ্রী অপূর্ব্ব সুন্দর কিন্তু মলিন। কেশ রুক্ষ ও আলুলায়িত, পরিধানে একখানি মলিন ও জীর্ণ-বস্ত্র। হস্তে দুইগাছি লৌহবলয়, যেন চিন্তাসাগরে নিমগ্ন। নিকটে কয়েকটী সন্তান নিদ্রা যাইতেছে, মুখ শুষ্ক। শরীর চর্ম্মাবশিষ্ট ও পরিধানে জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র।

"সন্তান কটী নিকটে ঘুমায়,
বিছানা বিহনে পড়িয়া ধূলায়,
অস্থি-চর্ম্ম-সার দেখায়ি যেন,
তেজহীন শুষ্ক বিবর্ণ বদন,
পরিধানে বস্ত্র মলিন ফাটা,
জানায় যে কাহে নাহিক কেহ।"

এমন সময়ে হঠাৎ রক্তালোকে গৃহ আলোকিত হইল। ভারতলক্ষ্মী আবির্ভূতা হইয়া ভারতমাতার মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ভারতমাতার দৃক্‌পাত নাই, লক্ষ্মী একটী গান করিলেন—

"মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি
হেরি নিশা-দিশি ঝরে নেত্রবারি
যে বদন হাসি বরষিত শশি
আজি তা কেমনে এমন নেহারি
দুখ-পারাবারে নিরখি তোমারে
হৃদয়ে ধৈরজ ধরিতে না পারি।"

গান শুনিয়া ভারতমাতা লক্ষ্মীর দিকে চক্ষু ফিরাইলেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি শূন্য ও পলকহীন। যেন জ্ঞান নাই। লক্ষ্মী আর একটী গান গাহিলেন—

"ভারতি, তোমার সন্তানগণ
ঘুমায়ে রয়েছে সবে হয়ে হতজ্ঞান
জ্ঞানহীনতায়, আর নিশা শেষ
দুর্দ্দশা দেখিয়া বিদরে প্রাণ"

"তোমার এই দশা আর দেখতে পারি না। আজ এইস্থান পরিত্যাগ করে দুস্তর সাগরের অপর পারে চলে যাচ্ছি।"

ভারতমাতা আবার চাহিলেন। কিন্তু এবারেও যেন তিনি সংজ্ঞাহীনা। লক্ষ্মী তখন অন্তর্ধান করিলেন, আর অমনি আলোক নিভিয়া গেল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই ভারতমাতা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। মনে হইল যেন তাহার সর্ব্বস্বই চোরে অপহরণ করিয়াছে। তিনি সন্তানগণকে জাগাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কেহই উঠিল না—উঠিলেও আবার ঘুমাইয়া পড়িল। ভারতমাতা কাঁদিলেন—

"হায়, লক্ষ্মী অন্তর্হিত হয়েছে, তিনি এখন মহারাণীর মূর্ত্তিতেই সাগরপারে বিরাজ কচ্ছেন তাঁরই আশ্রয় প্রার্থনা করা যাক্।" সকলে 'মহারাণীর জয়' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। এমন সময়ে কিন্তু বিধি বাম হইল—

"যেমনকালে যেতকান্তি একজন
কোপে জর্জ্জর আরক বদন
কিম্বাহী বলিয়া ভৎর্সিয়া গর্জ্জিয়া
পদাঘাত করে নিদ্রিত অন্তরে
সন্তানগণের গায়।
যেমিয়া দুঃখিনী ভারতমাতা ভূমি
কাঁদি বলে, বিধি কোথা আছ তুমি
হারিলেন লক্ষ্মী আমায় যে কালে
কেন না গেলেন তুমিয়া পাতালে?
কোথায় হরিশ কোথায় গিরিশ
কোথা মেলি গেলি হায়?"

ভারতমাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "ঈশ্বর তুমি কোথায়? হতবিধে! তোমার মনে কি এই ছিল? উঃ বাবা। তোরাই কি আমার তারা রে? আমার সেই একদিন আর এই একদিন! কোথায় হরিশ, কোথায় গিরিশ। কোথায় রামমোহন, কোথায় রামগোপাল!"

এই স্থানটী বড় মর্ম্মস্পর্শী হইত।

শেষভাগে "একতা" আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন—

"ভ্রাতৃগণ, অনৈক্য, আত্মাভিমান ও স্বজাতি-হিংসাই তোমাদের সর্ব্বনাশের মূল। যতদিন তোমাদের অন্তর হ'তে এ সব ভাব দূরীভূত না হবে, ততদিন তোমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। এখন সকলে আমায় আশ্রয় গ্রহণ কর ও কায়মনোবাক্যে জননীর দুঃখনাশ-ব্রতে ব্রতী হও,—

"কেন ভয় ভীরু কর সাহস আশ্রয়
'একোধর্ম্ম জয়ো হয়'
ছিন্ন-ভিন্ন হীনবল,
ঐক্যেতে পাইবে বল,
বাদের দূর উচ্চল করিতে
কি ভয়?"*

এই 'ভারতমাতা' অভিনয় দেখিতে সময় সময় প্রায় ১৫ শত লোকও উপস্থিত হইত। আর অভিনয়ের পরেও প্রায় পোনর মিনিট পর্য্যন্ত শ্রোতৃবৃন্দ নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিত। ১৮৭৪ সালে নৈহাটীতে যে হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে ন্যাশনাল থিয়েটার কর্ত্তৃক "ভারতমাতা" অভিনীত হয়।

* কবিতাটী তখনকার বাঙ্গালা অমৃত বাজার হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি।

রঙ্গভূমিতে জাতীয় ভাব প্রচারের এই প্রথম আরম্ভ এবং পরে বিভিন্ন নাটকে এই ভাবটী নানা প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে।

এই 'ভারতমাতা'র উপরে ঠাকুর বাড়ীর যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কেবল গান কয়খানিই যে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত তাহা নয়; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরু-বিক্রম,' সত্যেন্দ্রনাথের "মিলে সব ভারত-সন্তান একতান," এবং দ্বিতীয় হিন্দু মেলা উপলক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ জাতীয় কবিতা সবই যেন 'ভারতমাতা'র এক সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। নাটকখানিতে কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার রচয়িতা বলিয়া প্রকাশ আছে। কিন্তু অমৃতলাল প্রভৃতি অনেকেই বলিয়াছেন যে, উহাতে শিশিরকুমার ঘোষ (অমৃতবাজার-সম্পাদক), অমৃতলাল বসু, দেবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেরই ভাব সন্নিবিষ্ট আছে। কিন্তু বর্তমান লেখকের ধারণা যে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের জাতীয় কবিতাই* উহার জননী।

'ভারত মাতা'র পরে ক্লাসনাল থিয়েটারে জাতীয়তা-মূলক একাধিক নাটকের অভিনয় হয়। তন্মধ্যে ১৮৭৪ সালের জ্যোতিরিন্দ্র নাথের 'পুরু-বিক্রম' ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বঙ্গের সুখাবসান,' ১৮৭৫ সালের 'সরৎ সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকে (উক্ত নাটকই উপেন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক রচিত) এবং অমৃতলাল বসু মহাশয়ের 'হীরকচূর্ণ নাটক'ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'পুরু-বিক্রম' নাটকে গ্রীক সম্রাট সেকেন্দার সাহের বিরুদ্ধে ভারতগৌরব পুরু কিরূপ বিক্রমশীলতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা বেশ অঙ্কিত আছে। এখানেও 'মিলে সব ভারত সন্তান' গানটী উদ্ধৃত হইয়াছে। গত বারে আমরা গানটীর কতক পরিচয় দিয়াছি। নিম্নলিখিত কলি কয়টীও উহার অংশ। অভিনয়ে গভীর ভাবের সঞ্চার হইত :—

গাও ভারতের জয়—
জগতজয়ী সাধ্বী সতী ভারত ললনা
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
গার্গী, মৈত্রী, সীতা, দময়ন্তী পতিব্রতা
অরুন্ধতী ভারত-ললনা।
ধোর ভারতের জয় ইত্যাদি.
বর্ণিত, গৌতম, ঋষি আদিবিদ
বিরচিত্র যুক্ত অপাদান।
বাল্মিকী, বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস,
কবিকুল ভারত-ভূষণ।
ধোর ভারতের জয় ইত্যাদি।
বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী,
অধীনতা আমিল রহনী
দুরন্তর সে ত্রিদিব বাসিরা কি ভবে ছিল,
দেখা দিবে বীর বিক্রমে:
ধোর ভারতের জয় ইত্যাদি,
ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীমার্জুন নহিল কি ভারত,
পৃথ্বীরাজ আদি বীরগণ?
ভারতের ছিল সেতু যবনের ধূমকেতু
আর্যবন্ধু দুষ্টের যবন।
ধোর ভারতের জয় ইত্যাদি।
কেন তবে ভীরু কর সাহস আশ্রয়,
ভারতবর্ষ তোমার।
ছিন-ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে ও পাইবে বল
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?
ধোর ভারতের জয় ইত্যাদি।

যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পুরুরাজ ভারতীয় সৈন্যগণকে যখন সৈন্যগণের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত উৎসাহ-বাণীতে উত্তেজিত করিতেছিলেন :

"ওঠ! জাগ! বীরগণ! দুর্বাস্ত যবনগণ,
পুনঃ যেন করেছে আক্রমণ।
হও সবে একপ্রাণ, বাহুবলে কর ত্রাণ,
অস্ত্রবলে কর নিধন।
বিলম্ব না সহে আর, উলঙ্গিয়ে তরবার
ধরণীস্থ যবন সব চল সবে রণে।
বিজয় নিশান যেন উড়িছে গগনে।
যবনের রক্তে ধরা হোক্ প্লাবমান
যবনের রক্তে নদী হোক্ বহমান
যবন-শোণিত-বৃষ্টি করুক বিধান।
ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোক্ ফলবান।
এত স্পর্দ্ধা যবনের, স্বাধীনতা ভারতের
অনায়াসে করিবে হরণ?
আর্য কি করেছে মনে, সমস্ত ভারত-ভূমে
পুরুষ নাহিক একজন?
'বীর-যোনি এই ভূমি, সত বীরের জননী,'
মা জননে একথা তারা অযোগ্য সকল।
যার শিরা সঞ্চালিত নেযুক শিরায়।
অরির-বিক্রমে আজ কাঁপুক মেদিনী
অরিরের অসি হোক অলন্ত অশনি
ভীরু লোক ফেলে যাক তুমি সেই ধ্বনি
পিতৃপিতামহ সবে, ছাড়ি দুঃখময় ভবে
বিরাজেন যেথা যাঁরা পুরু বিক্রমায়।
ভয়েরে দেহ পাতি, দেখ যেন অপঘাতি
না হয় মরণ, থাকে অক্ষয় জীবন।
আকাশ-উচ্চায় ওরে, মরণে যে ভয় করে,
ধিক সেই কাপুরুষে, শত ধিক তারে।
পড়ুক সে চিরকাল দাসত্ব-শৃঙ্খলে,

* পত আষাঢ়ের 'বঙ্গশ্রী'তে ৩৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

* শেষোক্ত চরণটি 'ভারত-মাতা'তেও আছে। নিশ্চয়ই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই গানটী হইতে উহার উদ্ভব।

স্বাধীনতা বিনিময়ে, কি হবে সে প্রাণ লয়ে
যে ঘরে এমন প্রাণ কিছু নাহি তার।
যাক যাক প্রাণ যাক, স্বাধীনতা বেঁচে থাক
বেঁচে থাক চিরকাল দেশের গৌরব।
কিসের বাহিক আর, খোল সবে তরবার
ঐ শোন ঐ শোন রণের দামামা।
এইবার বীরগণ, কর সবে মৃত্যু পণ
মরণ পরম মিত্র মরণ-বিহনে,
মরণ-বিহনে কিবা মরণ শরম,
পরাণ পরণ কিবা জিনে সাধ্য।

জ্যোতিরিন্দ্র নাথের* 'সরোজিনী' নাটকেও জন্মভূমির জন্য আত্মবলিদান হেতু বীরাঙ্গনাগণ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশকালে গাহিতেছিলেন—

"জ্বল্ জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা
দেখরে যবন তাকাতে তোরা
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে
সাক্ষী রহিলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল তুষিতে হবে।"

'সরোজিনী' নাটকে নায়ক বিজয়সিংহ ( অমৃত বসু মহাশয় সাজিতেন ) বলিতেছে—

"যখন মাতৃভূমি আমাদিগকে ডাকা ক'রতে বলছেন তখন তাই যথেষ্ট, আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত ক'রবার প্রয়োজন নাই। মাতৃভূমির ডাকাই আমাদের একমাত্র বৈধবাণী। দেবতারা আমাদের একমাত্র হর্ত্তা কর্ত্তা সত্য, কিন্তু মহারাজ, কীর্ত্তিলাভ আমাদের নিজের চেষ্টার উপরেই নির্ভর করে। অতএব অদৃষ্টের প্রতি দৃক্‌পাত না ক'রে পৌরুষ আমাদিগকে যেখানে যেতে বলছে—চলুন আমরা সেইখানেই যাই।"

এই সরোজিনী নাটকের অভিনয়ে কিরূপ উত্তেজনার উদ্রেক হইত এ বিষয়ে স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয়ের কাছে অনেক কথা শুনিয়াছি। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সর্ব্বপ্রথমা ও সর্ব্ব-প্রধানা অভিনেত্রী শ্রীযুক্তা বিনোদিনীর নিকটেও সবই শুনিয়াছি। তাঁহার লিখিত স্মৃতি-কথা হইতে তদানীন্তন অবস্থা উদ্ধৃত করিলাম :—

"সরোজিনী নাটকখানির অভিনয় তারি জমত। অভিনয় করতে করতে আমরা একেবারে আত্মহারা হয়ে যেতাম। শুধু আমরা নয়, যাঁরা দেখতেন সেই দর্শকবৃন্দও আত্মহারা হয়ে যেতেন। এক দিনকার ঘটনা উল্লেখ করলেই কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি সরোজিনী সাজতাম। সরোজিনীকে বলি দেবার জন্যে যূপকাষ্ঠের কাছে আনা হ'ল। রাজমহিষীর সমস্ত অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা ক'রে রাজা স্বদেশের কল্যাণ-কামনায় কন্যার বলিদানের আদেশ দিয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রোদন করছেন, উত্তেজিত রণবীর সিংহ শীঘ্র কাজ শেষ করবার জন্য তাগিদ দিচ্ছেন, কপট ব্রাহ্মণ বেশধারী চৈত্যবাচার্য্য তরবারি হস্তে সরোজিনীকে বেদীতে কাটতে এসেছে, এমন সময় বিজয়সিংহ বেদীতে ছুটে এসে বললেন, সব মিথ্যে সব মিথ্যে, চৈত্যবাচার্য্য ব্রাহ্মণ নয়, মুসলমান, সে মুসলমানের চর—অমনই সমস্ত দর্শক একেবারে ক্ষেপে উঠে মার মার কাট কাট করে যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন! জন দুই দর্শক এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁরা আর নিজেকে সাম্‌লাতে পারলেন না, ছুট-লাইট ডিঙিয়ে 'মার মার' করতে করতে একেবারে ষ্টেজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে তারা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তখনই ড্রপ ফেলে দেওয়া হ'ল; তাদের ষ্টেজের উপর থেকে তুলে ভেতরে নিয়ে সকলে শুশ্রূষা করতে লেগে গেল! তাঁরা যখন প্রকৃতিস্থ হলেন তখন আবার অভিনয় আরম্ভ হ'ল।"

বিনোদিনী "জ্বল্ জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" দৃশ্যটীরও যথার্থ পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলেন, "সরোজিনী নাটকের এই দৃশ্যটী মানুষকে যেন উন্মাদ ক'রে দিত। ধূ ধূ ক'রে চিতা জ্বলছে, দু'তিন হাত উঁচুতেও আগুনের শিখা লক্ লক্ ক'রে জ্বলে উঠত। তখন বিদ্যুতের আলো ছিল না, ষ্টেজের উপর ৪।৫ ফুট লম্বা টীন পেতে তার উপর সরু সরু কাট জ্বেলে দেওয়া হ'ত। লাল রঙের সাড়ী পরে কেউ বা ফুলের গয়নায় সেজে কেউ বা ফুলের মালা হাতে নিয়ে এক এক দল রাজপুত-রমণী 'জ্বল জ্বল চিতা' গাইতে গাইতে প্রদক্ষিণ করত, আর ঝুপ ঝুপ ক'রে সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ত। সঙ্গে পিচকারী ক'রে সেই আগুনের মধ্যে কেরোসিন ছড়িয়ে দেওয়া হত, আর আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠত, কারু চুল পুড়ে যেত, কারু বা কাপড় ধ'রে উঠত কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। তারা ঘুরে ঘুরে এসে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ত—সেই দৃশ্যে যে কি রকমের একটা উত্তেজনা হ'ত, তা লিখে ঠিক বুঝাতে পারছি না।"

উপেন্দ্রনাথ দাস ঐ ন্যাশনাল থিয়েটারের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার শরৎ-সরোজিনী ও সুরেন্দ্র-বিনোদিনী উভয় নাটকেই তিনি দর্শকবৃন্দকে নানারূপ জাতীয়তামূলক উক্তিতে উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। কোন কোন স্থানে ফৌজ উইলিয়মের প্রতিও কটাক্ষ ছিল। আবার উভয় নাটকেই জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটদের অত্যাচার কাহিনী বিবৃত হইয়াছিল। এই সমস্ত নাটক ও অভিনয় তদানীন্তন ছোট লাট স্যার রিচার্ড টেম্পলের আদৌ পছন্দ ছিল না। একবার বেলভিডিয়ার

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকাবলী সম্বন্ধে সুসাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, মহোদয়ের নিকট আমি বিশেষ ঋণী। ইনি 'বেঙ্গলী' প্রভৃতি অনেকগুলি ইংরাজী সংবাদপত্রের সুযোগ্য লেখক।

প্রাসাদে সাহিত্যিকগণ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে হেয়ার স্কুলের শিক্ষক হরলালবাবু "বঙ্গের সুখাবসান" নাটক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ছোটলাট বাহাদুর হরলালবাবুকে ঐ নাটকে স্বাধীনতা প্রকাশ করায় বেশ উপহাস করিয়াছিলেন।*

জাতীয়তামূলক নাটকের জন্য ইতিপূর্ব্বেই গভর্ণমেণ্ট ন্যাসনাল থিয়েটারের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। অল্প অল্প অজুহাতে একেবারে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনই পাশ হইয়া যায়। অর্থাৎ অশ্লীল, মানহানিকর অথবা রাজদ্রোহকর কোন বিষয় থাকিলে গভর্ণমেণ্ট সে নাটকের অভিনয় বন্ধ করিতে পারেন। এ-সময়ে ১৮৭৬, জানুয়ারী, প্রিন্স এডওয়ার্ডের কলিকাতা আগমন উপলক্ষে জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী হইতে মহিলারা যে-ভাবে রাজকুমারের অভ্যর্থনা করেন, তাহাতে এই থিয়েটার তাহাকে ক্ষেপ করিয়া 'পঞ্চরানন্দ' ও 'হনুমান চরিত্র' প্রভৃতি প্রহসনের অভিনয় করেন। আর সুরেন্দ্রবিনোদিনী নাটকের কোন কোন স্থানের জন্য, বিশেষতঃ মাজিষ্ট্রেট মাকফেরিষ্কির অনাবশ্যক ব্যবহার প্রদর্শনের জন্য উপেন্দ্রবাবু ও অমৃতলাল বসু মহাশয়ের জেল হয়। যেদিন উহার হাইকোর্টের বিচারে মুক্ত হন, সেই দিনই কাউন্সিলে অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ বিল উপস্থাপিত হয়।

থিয়েটারের এই সমস্ত বিষয়ে সাধারণের মধ্যে বিষম আন্দোলনের সঞ্চার হয় এবং থিয়েটারের শক্তি এই ভাবে খর্ব্ব হওয়ায় জন-সাধারণ বিশেষরূপে উত্তেজিত হন। রঙ্গমঞ্চঘটিত বিবরণাদিও জন-শক্তিবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ।

শিক্ষিত মহলে আর একটি বিষয়ে বড় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ইহারও উৎপত্তি সাদা-কালোর ভেদবুদ্ধিতে। "ইলবার্ট বিল আন্দোলনে" তখন উহা বিশেষভাবে সাধারণের মধ্যে ব্যাপক আবেগ সঞ্চার করে।

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত মহাশয় একই বৎসরে বিলাত হইতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ হইয়া বিভিন্ন স্থানে আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। সামান্য সামান্য বিষয়ে ত্রুটি হওয়ায় সুরেন্দ্রবাবুর চাকুরী যায়। এক সময়ে সুরেন্দ্রবাবু ঘোষতর সাহেব ছিলেন, এমন কি এজলাসে বাঙ্গলায় সওয়াল জবাব পর্য্যন্ত হইতে দেন নাই, কিন্তু তাঁহার পদচ্যুতিতে দেশীয়গণ সাদা-কালোর পার্থক্যবশতঃ চাকুরীটি গিয়াছে উপলব্ধি করিয়া বড়ই ব্যথিত হন ও জাতীয় অপমানে বিশেষভাবে উত্তেজিত হন।

সুরেন্দ্রনাথও বসিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। অল্পান্ত সাধনায় দু'এক বৎসরের মধ্যেই তিনি জনশক্তি উদ্বোধিত করিয়া ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন (Indian Association) গঠন করেন ১৮৭৬।২৬শে জুলাই তারিখে। ইতিপূর্ব্বে স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ও 'ন্যাসনাল লীগ' নামে একটি জাতীয় সমিতি গঠন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে বেশ কাজ কাজ হইত। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান লীগ থাকিতে অন্য একটী সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপত্তি করেন। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ও একটী বঙ্গীয় সমিতি গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। যাহা হউক সুরেন্দ্রনাথ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গঠনেই কৃতকার্য্য হন। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু এ-বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন এবং তিনিই প্রথম সম্পাদক পদে বৃত হন ও সাহিত্যরথী স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার সরকার মহাশয় আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী হন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ হয়:

(1) Creation of a strong body of public opinion in the country.

(2) Unification of Indian races and peoples upon the basis of common political interests and aspirations.

(3) The promotion of friendly feeling between Hindus and Mohammedans.

(4) Inclusion of the masses in the great public movements of the day.

যাহা হউক এ সময়ের আর একটি ঘটনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অভিনয় আইন পাশ হইবার পরেই লর্ড লীটন ভার্ণাকুলার প্রেস আক্ট (Vernacular Press Act) নামে একটি আইন করিয়া বাঙ্গলা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন। অমৃতবাজার কাগজ তখন বাঙ্গলায় প্রকাশিত হইতেছিল, অতঃপর রাতারাতি ইংরাজী হইয়া গেল। এই আইনে দেশবাসী আপনাদিগকে আরও অপমানিত মনে করিল। ইতঃপূর্ব্বে অস্ত্র আইন 'Arms Act' পাশ করিয়া ভারতবাসীগণকে নিরস্ত্র করিয়াও লর্ড লীটন যথেষ্ট কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়াছিলেন, ভারতীয়গণকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে ইনিই সুপারিশ করিয়াছিলেন কিন্তু ভারতসচিব তাহা অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু অতঃপর ১৮৮০ সালে ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্ট পরিবর্ত্তিত হইল। গ্লাডষ্টোনের হাতে আবার ক্ষমতা আসিল এবং তাঁহারই উদারতায় অতঃপরে লর্ড লীটনের স্থানে ভারতে একজন সহৃদয় গভর্ণর জেনারেল আসিলেন। ইনিই ভারতবন্ধু লর্ড রিপন। তাঁহার ভারত-হিতৈষণা সর্ব্বজন-বিদিত। কিন্তু অস্ত্র আইন রহিত করিতে না পারিলেও তিনি অন্যায়মূলক 'মুদ্রাযন্ত্র আইন' (Press Act) রহিত করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতা-

* রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত।

ভাজন হন। বেন্টিঙ্ক ও ক্যানিং-এর ন্যায়, কৃতজ্ঞ-হৃদয় ভারত চিরকাল রিপনেরও গুণগান করিতে বিরত হইবে না। লর্ড রিপন যে কেবল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনঃ প্রদান করিলেন তাহা নয়। তিনিই প্রথমে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত সাদা কালোর পার্থক্য যে ভারতবাসীর প্রাণে গুরুতর বেদনা দিতেছে, তাহা উপলব্ধি করিয়া তিনি প্রথমে ইলবার্ট বিলের যৌক্তিকতা সমর্থন করেন। উপরোক্ত প্রত্যেকটী বিষয়ে এবং উহাদিগের আনুষঙ্গিক ব্যাপারে জনশক্তি বড় প্রবল হইয়া উঠে। বস্তুতঃ ভারতবাসীর হৃদয়স্থিত প্রধূমিত অন্তর্শক্তি ১৮৮২-১৮৮৩-তে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই সংহতি শক্তিই কংগ্রেসের উদ্যোগ পর্ব্ব।

ইলবার্ট বিল আন্দোলন আরম্ভ হয় ১৮৮২ সালের প্রারম্ভে। এই বৎসরেই Criminal Procedure Code-এর (ফৌজদারী কার্য্যবিধির) সংস্কার আরম্ভ হয়। এই সময় বেহারীলাল গুপ্ত মহাশয় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন বাঁকুড়া জিলার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটরা জষ্টিস অব্ দি পিস্ (জে. পি) হইতেন, কিন্তু মফঃস্বলের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটরা Justice of the Peace হইতে পারিতেন না। অথচ উভয়েই সিভিলিয়ান; ফলে এই হইল যে, কলিকাতায় বিহারীলাল গুপ্ত শ্বেতাঙ্গদিগের (European British Subjects) অপরাধের বিচার করিতে পারিতেন আর মফঃস্বল বলিয়া উক্ত শ্বেতাঙ্গ আসামীর উপরে রমেশ দত্ত মহাশয়ের কোন হাত ছিল না। অথচ তাঁহার অধীনস্থ শ্বেতাঙ্গ জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের সেই বিচারের অধিকার ছিল। রমেশচন্দ্র বেহারীলালের দৃষ্টি এই বৈষম্যের প্রতি আকর্ষিত করিলে, মিঃ গুপ্ত ছোটলাট বাহাদুর স্যার এসলি ইডেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দেন। স্যার এসলির নির্দ্দেশানুসারে মিঃ গুপ্ত একটী মন্তব্য লিখিয়া পাঠান এবং স্যার এসলি বড়লাট সাহেবের কাছে তাহা পাঠাইয়া উহা সমর্থনে মতামত প্রকাশ করেন। ইহাই পাঠ করিয়া ১৮৮২, ২০শে মার্চ্চ বড়লাট লর্ড রিপন ব্যবস্থা-সচিব (Law Member) স্যার কোর্টনে ইলবার্টকে দিয়া একটি বিল (আইনের খসড়া) প্রস্তুত করেন। এই বিলই 'ইল্‌বার্ট বিল' নামে খ্যাত। এই বিলের খসড়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ৩০শে জানুয়ারী প্রস্তুত হয়।

এই বিলটি উপলক্ষে সমগ্র শ্বেতাঙ্গ সমাজে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। নেটিভের হাতে তাহাদের বিচার! তাহাদের অসহ্য হইল। তাহারা চাঁদা তুলিয়া আন্দোলন চালাইতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন এবং এই আন্দোলনে ইউরোপিয়ান, ইউ-রেসিয়ান, আর্ম্মেনিয়ান ও ইহুদি প্রভৃতি সকলে বদ্ধপরিকর হইলেন। তাহাদের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া অচিরে একটী ডিফেন্স এসোসিয়েশন্ (Defence Association) গঠিত হইল।

৯ই ফেব্রুয়ারী (১৮৮৩) এই বিল ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইলে উহা বাহিরে আলোচনার জন্য সময় দেওয়া হয়। চতুর্দ্দিকে সভা হইতে আরম্ভ হয়, শ্বেতাঙ্গগণ এ-সম্বন্ধে লিখিতে, বলিতে ও বুঝাইতে লাগিলেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এই বিলের প্রতিবাদকারিগণ টাউন হলে একটি বিরাট সভা করেন। ঐ সভায় জে. জে. কেস্‌টইক্, মিঃ জি, এইচ. এ. ব্রানসন ও এ. বি. মিলার প্রভৃতি ক্ষুদ্রচিত্ত এংলো-ইণ্ডিয়ান দলপতিগণ দেশীয়দিগের সম্বন্ধে যে সাম্প্রদায়িক বিষ উদ্গীরণ করেন, তাহাতে সমগ্র ভারতে ভয়ানক আগুণ জ্বলিয়া উঠে। সে সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা তখনকার ভয়ানক দৃশ্য কখনও ভুলিতে পারেন নাই। কেবল দেশীয়গণের বিরুদ্ধে নয়, লর্ড রিপনও এই সময় নেতৃবৃন্দের নানারূপ বিদ্রূপ ও নিন্দার পাত্র হইয়া উঠিলেন। আর ইংলিশম্যান ও হরকরা প্রভৃতি কাগজ সে সাম্প্রদায়িক অনলে ইন্ধন প্রদান করিতে লাগিল।

এই সভায় কটূক্তি ও বিদ্রূপবাণীতে ব্রানসনই সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করে এবং এরূপ জঘন্য নিন্দার এমনি খ্যাতিলাভ করিল যে, বিলের বিরুদ্ধে তাহার প্রতিবাদ Bransonism এ পরিণত হয়। এই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র একজন দেশীয় খ্রীষ্টান (নায়ক) ও এক জেলেনীর কাহিনী অতি অপূর্ব্ব ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা সেই চিত্রটীর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ইংলিশম্যান সংবাদ পত্র জলধর ডিপুটীর সহিত জেলেনির মধ্যে যে সম্পর্কের তত্ত্ব খুঁজিয়া পাইয়াছেন আর ডিক্‌সন নামধারী একজন দেশীয় জেলে খ্রীষ্টানকে যে কিরূপ European প্রজা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র সেই রসিকতার সহিত সে চিত্রটী অঙ্কিত করিয়াছেন।

যাহা হউক, অনেকগুলি প্রস্তাব টাউনহলের উক্ত সভায় পাশ করা হয়। প্রথমটীতে বলা হয় যে, এই বিলটী অনাবশ্যক, "unnecessary, uncalled for and founded on no experience" আর, "Whilst forfeiting a much valued and prized and time-honoured privilege of European British subjects it confers no benefit upon natives, whilst imperilling the liberties of European British subjects it in no way affords any additional protection to natives; it will deter the investment of British capital in the country by giving rise to a feeling of insecurity as to liberties and safety of European British subjects employed in the mofussil and also of their wives and daughters and it has

already stirred on both sides a feeling of race antagonism and jealousy such as never has been aroused since the Mutiny of 1857."

এই প্রস্তাবটী উত্থাপিত করেন মিঃ কে., কে. কেলস্টন্‌ক্; সমর্থন করেন মিঃ কে. এইচ. এ ব্রানসন এবং অনুমোদন করেন মিঃ ডব্লিউ. ব্লিক।

আর্য্যনিবাস ও আংলো-ইণ্ডিয়ানগণের প্রতিবাদ ও 'নেটিভের' প্রতি বিদ্রোপাত্মক এবং ইংলিসম্যান প্রভৃতি কাগজের ঐ প্রতিবাদের সমর্থনে অবিরত মুখর হইয়া উঠে। এই সময়ে এই আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া অনেক কবিতা ও ছড়া রচিত হয়। কবিবর হেমচন্দ্র লিখিলেন—

"কেন রাজা হেন আজ, ডাকিল ইংলিসম্যান
ডাক ছাড়ে ব্রানসন, কেমনে বিচার
নেটিবের কাছে খাড়া, বেটার- বেটার"
বেটার—যে অপমান, হইবার নিবারণ,
নেটিবে পারে সাধন, আবাদের ধারণা?
বিচারে ' বেটা প্রায়, কখনো তা হবে না।"

বেতাঙ্গ ব্যারিষ্টারগণের অন্যতম স্বপ্রসিদ্ধ বাগ্মী লালমোহন ঘোষ মহাশয় চাকার নর্থ-ব্রুক হলে এমন প্রাণস্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা দেন যে, সমগ্র বাঙ্গালা ব্রানসন প্রকৃতির প্রতি অন্তর বিদ্বেষে পূর্ণ করিতে লাগিল। হাইকোর্টের উকিলগণও সভা করিয়া ব্রানসন প্রভৃতিকে কাজ দেওয়া বন্ধ করিল। দেশীয় আটর্ণিরাও এক সভা করিয়া উকিলগণের প্রস্তাব অনুমোদন করেন, আর ব্রানসনকে কোনও মোকদ্দমায় নিযুক্ত করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ফলে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ব্রানসন হাইকোর্টে briefless ব্যারিষ্টারক্রপে পরিণত হন। ব্রানসন এই কটু ক্তির নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনাও করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশীয়গণ উহা মঞ্জুর করেন নাই। কারণ ব্রানসন নিজের মত যে প্রত্যক্ষক তাহা ঘুণাক্ষরেও স্বীকার করেন নাই। ব্রানসনের অবনীভাজন অবস্থা "সোমপ্রকাশে" (১৮৮০, ৭ই মে) বিবৃত আছে।

"কেবল সোমপ্রকাশের নয়, ভারতীয় সংবাদপত্রের পাঠকবর্গকে আর পরিচয় করিয়া দিতে হইবে না যে, এই ব্রানসন সাহেবটী কে? ইনি ভারত অকাল বিদ্বেষপূর্ণ, ইলবার্ট-বিলের চূড়ান্ত বিরোধী, ইনিই অত্যাচারক সমর্থন করিয়া ইলবার্টবিলী ইংরাজদিগের উকিল হইয়াছিলেন, সেই অপরাধে ইনিই সুপ্রীমকোর্টের অবমাননা করিয়া হা অন্ন হা অন্ন করিতে করিতে জাহাজে চড়িয়া বসু বসু করিয়া আসিতে আসিতে আজ বাবুর পায়ে চলিয়া যাইতেছেন।

"আহা! ব্রানসন সাহেবের শেষ দশাটা ভাবিলে প্রাণের ভিতর কাঁদিয়া উঠে। এতকাল হাইকোর্টে থাকিয়া যিনি তর্কবিদ্যায় অসামান্য পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন—তাঁর অন্তিমদশায় এই ঘটিল। অর্থ যাঁহাকে অহরহ আহ্বান করিত, রাশি রাশি মোকর্দ্দমা নিবার জন্য লোক যাঁহার কত আরাধনা করিত, সেই ব্রানসন অবশেষে আর একটীও মোকর্দ্দমা পাইলেন না; গলদশ্রুলোচনে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তবু তাঁহার অদৃষ্টচক্র আর ঘুরিয়া আসিল না। সুতরাং দিনপাতের আর উপায় কি? কাজেই তিনি বিলাত যাত্রা করিলেন।" [ সোমপ্রকাশ, ২৪শে বৈশাখ ১২৯০ ]

ভারতীয়গণের সংবর্ত্তিদলে ব্রানসনের এই দশা হইল বটে, কিন্তু বেতাঙ্গগণের আন্দোলন থামিল না। Sir Rivers Thompson ( পরবর্ত্তী লেফটেনাণ্ট ) লিখিলেন—

If it be the opinion of the Government of India that this is a case of temporary excitement which will soon die out, I am sure they are mistaken; for I feel, in the whole of my experience in India, this is unmistakably the strongest and most united.

বস্তুতঃ বেতাঙ্গগণ লর্ড রিপণের উপর বলপ্রয়োগ করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। ১৮৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে গবর্ণমেণ্ট হাউসের সিংহদ্বারে লর্ড রিপণের সহিত একদল লোক অপমানসূচক ব্যবহার করিয়াছিল। মিঃ বাকলাণ্ড বলেন—

A conspiracy had been formed by a number of men in Calcutta who had bound themselves in the event of Government adhering to their projected legislation to overpower the sentries at Government House, put the Viceroy on board a steamer at Chandpalghat and send him to England via Cape Comorin. The existence of the conspiracy was known to the Lieutenant Governor and the responsible officers who subsequently gave the information.

ইলবার্ট বিলের ফলাফল সম্বন্ধে আগামীবারে আলোচনা করিব। কিন্তু বাঙ্গালী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে যে খুব সক্ষম এই ব্যাপারে তাহা নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। বাঙ্গালী কিছুদিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিল—

"অসম্ভবম্—
দম্ভ ফোটে তবু বল বল নিবার বারতা—"

আর আজ বঙ্গভঙ্গের বহুপূর্ব্বেই বাঙ্গালী প্রমাণ করিল—

"অবলা কেন বা এত বল?"

---

* Our poets shall sing of his infamy until his name shall become a bye word and a hissing reproach to after-ages and to generation yet unborn.

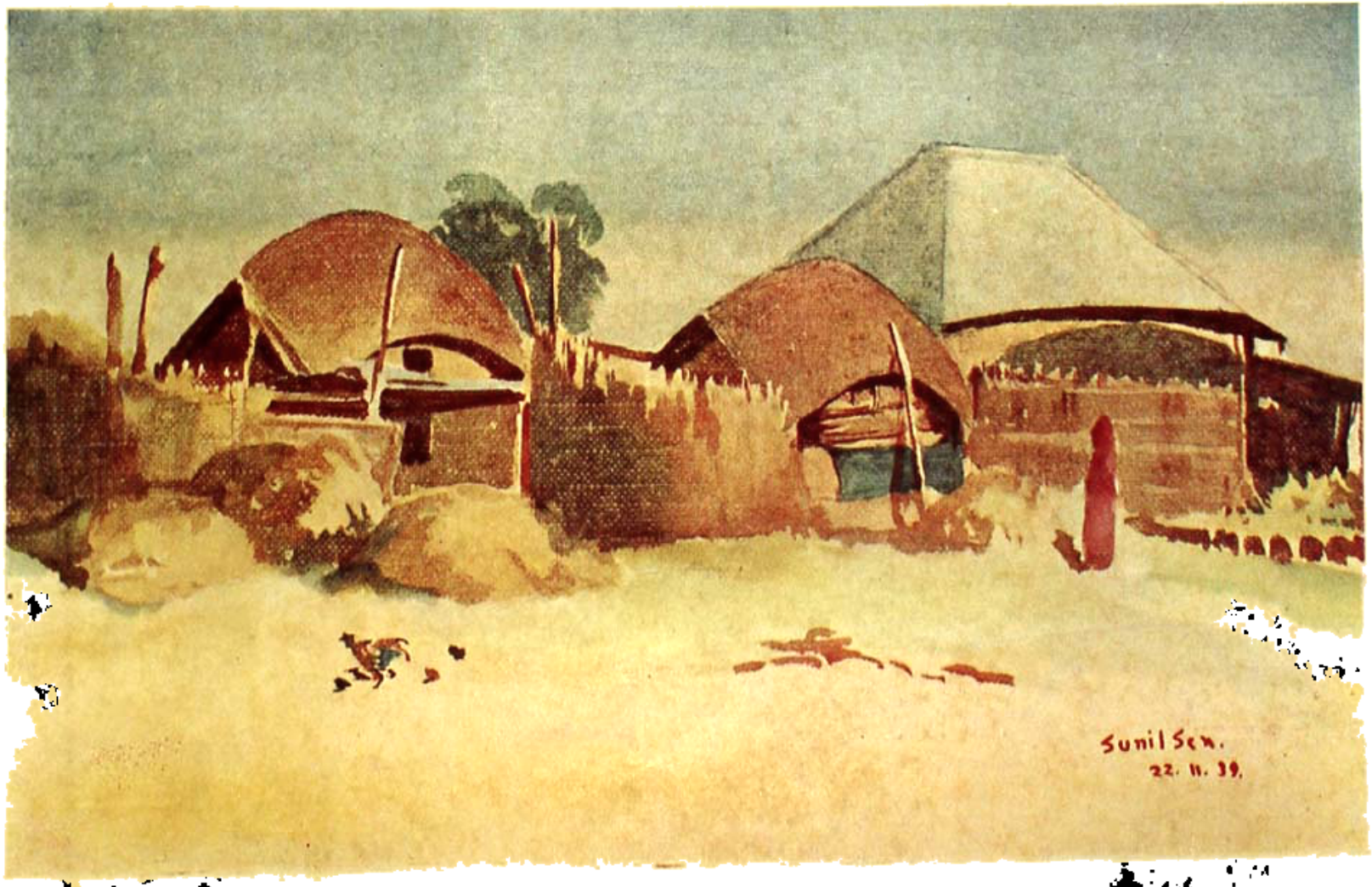


খামার-বাড়ী। শ্রীসুনীল সেন

"তুষ্টিস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

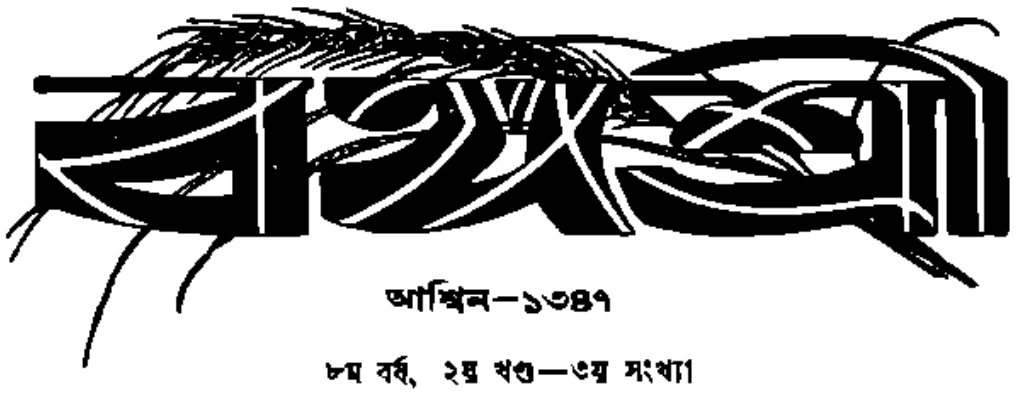

আশ্বিন—১৩৪৭

৮ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—৩য় সংখ্যা

**সম্পাদকীয়**

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

# বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা ও আধুনিক বিজ্ঞানের অসাফল্য (৪)

## কোন্ বিজ্ঞানে জাতীয় জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধান সর্ব্বতোভাবে সম্ভবযোগ্য ?

কোন্ বিজ্ঞানে জাতীয় জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধান সর্ব্বতোভাবে সম্ভবযোগ্য তাহা নির্ণয় করিতে হইলে জাতীয় জীবনের সমস্যা-সমূহের শ্রেণীবিভাগ কিরূপ তাহা আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে জানিয়া লইতে হইবে। পাঠকগণকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জাতীয় জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলি কয় শ্রেণীর ; তৎপ্রসঙ্গে আমাদের গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় দেখাইয়াছি যে, জাতীয় জীবনের—শুধু জাতীয় জীবনের কেন, প্রত্যেক ব্যক্তিগত মনুষ্য জীবনের—সমস্যা প্রধানতঃ পাঁচ-শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—

(১) অর্থ-গত সমস্যা ( অর্থাৎ খাওয়া-পরা, টাকা-কড়ির সমস্যা )
(২) স্বাস্থ্য-গত সমস্যা ( অর্থাৎ অসুখ-বিসুখের সমস্যা )
(৩) মন-গত সমস্যা ( অর্থাৎ অশান্তি ও অসন্তুষ্টির সমস্যা )
(৪) যৌবন-গত সমস্যা ( অর্থাৎ অকাল-বার্দ্ধক্যের সমস্যা )
(৫) মরণ-গত সমস্যা ( অর্থাৎ অকাল-মরণের অথবা পিতা থাকিতে সন্তানের, জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠের মরণজনিত সমস্যা )।

এই প্রসঙ্গে আরও দেখান হইয়াছে যে, উপরোক্ত পাঁচ-শ্রেণীর সমস্যার যুগপৎ সমাধান করিতে না পারিলে কোন মানুষের অথবা কোন জাতির দুঃখ সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত করা সম্ভব-যোগ্য নহে। এই পাঁচশ্রেণীর সমস্যার কোন এক-শ্রেণীর, অথবা কোন দুইশ্রেণীর, অথবা কোন তিনশ্রেণীর, অথবা কোন চারিশ্রেণীর সমস্যার সমাধান করিলেও—যতক্ষণ পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর সমস্যার সমাধান না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জাতীয় জীবনের সমস্যাসমূহের সর্ব্বতোভাবের সমাধান করা হইল না ইহা বুঝিতে হইবে।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় যে এতাদৃশভাবে কোন জাতীয় জীবনের সমস্যাসমূহের সমাধান করা সম্ভব-যোগ্য নহে তাহাও আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যাগুলিতে দেখাইয়াছি।

এক্ষণে প্রশ্ন—যদি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় কোন জাতীয় জীবনের সমস্যাসমূহের সর্ব্বতোভাবে সমাধান করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কোন্ বিজ্ঞানের সহায়তায় উহা হইতে পারে ? কোন্ বিজ্ঞানের সহায়তায় উহা হইতে পারে তদ্বিষয়ক সিদ্ধান্তে সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা উপনীত হইতে হইলে, বাস্তবক্ষেত্রে মানুষ কি কি অবস্থায় দুঃখে জর্জ্জরিত হইতে বাধ্য হয় অথবা দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহার একটা ধারণা করিয়া লইতে হইবে।

সর্ব্বপ্রথমে অর্থ-গত সুখ-দুঃখের কথা ধরা যাউক।

কোন এক জাতির লোকসংখ্যা সর্বসমেত একশত ইহা কল্পনা করা যাউক। এই একশত মানুষের মধ্যে দশজন ধনবান্, এই দশজন যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই ক্রয় করিতে পারে। আর বাকী নব্বই জন সর্বদাই অর্থাভাবের জন্য চিন্তাক্লিষ্ট। এই বাকী নব্বই জন পূজনীয় জরা-গ্রস্ত পিতা-মাতা ও জ্যেষ্ঠের ভরণপোষণ নিবৃত্ত করিতে অথবা আদরের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও কনিষ্ঠের স্নেহের দাবী পূরণ করিতে অসমর্থ। এই অবস্থা দেখা গেলে ঐ জাতির অর্থ-গত সমস্যা যে সমাধান করা সম্ভব-যোগ্য হয় নাই তাহা নিশ্চয়ই বলিতে হইবে। কোন জাতির সর্বসমেত লোক-সংখ্যা যত, তাহার প্রত্যেক মানুষটী ঐ জাতির এক একটী অংশ। **যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক মানুষটীর সমস্যাসমূহের পূরণ করা সম্ভব না হয়, এমন কি একজন সচ্চরিত্র মানুষেরও যদি কোন একটী সমস্যায় বিক্ষুব্ধ হইতে হয়, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে, ঐ জাতির সমস্যা-সমূহের সমাধান আংশিকভাবে মাত্র সম্পন্ন হইয়াছে, সর্বতোভাবে উহা হয় নাই।** ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, সকলেরই সর্ববিধ দুঃখ দূর হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র জাতির মধ্যে যদি একজন সচ্চরিত্র মানুষেরও কোনরূপ দুঃখ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে ঐ জাতির অপরাপর অনেকেরই ঐ একজনের দুঃখের কথা শুনিয়া, ক্ষণিকের জন্য হইলেও, কথঞ্চিৎ পরিমাণে অশান্তি অথবা দুঃখভোগ করিতে হয়। ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, মানুষ সাধারণতঃ এতাদৃশ মনোবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে যে, সে কেবলমাত্র নিজের দুঃখ দূর করিতে পারিলেই সম্যক্‌ভাবে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-কুটুম্ব—ইহাদিগের প্রত্যেকের যাবতীয় দুঃখ যতদিন পর্য্যন্ত বিদূরিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত একটা অতৃপ্তি, একটা হা-হুতাশ প্রায় সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। কোন কোন সমাজে অথবা পরিবারে এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম কখন কখন দেখা যায় বটে, কিন্তু উহা প্রায়শঃ কুশিক্ষা ও পশু-প্রবৃত্তির ফল। যাঁহারা ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-কুটুম্বদিগের দুঃখে প্রকৃতভাবে দুঃখানুভব করেন না এবং এই দুঃখ দূর করিবার প্রয়াসী হন না, তাঁহারা যৌবনের উদ্দামতায় অথবা উত্তেজনায় মোহমুগ্ধ হইয়া একরূপ হৈচৈ করিয়া দিনাতিপাত করিতে সক্ষম হন বটে, কিন্তু প্রৌঢ়াবস্থায় যখন যৌবনের মোহ আপনা হইতেই কাটিয়া যায়, তখন অনুতাপানলে বিদগ্ধ হইতে বাধ্য হন। শুধু যে আত্মীয়-কুটুম্বাদির দুঃখ দূর হইলেই সর্বতোভাবে শান্তি পাওয়া যায় তাহা নহে, প্রতিবেশী, স্ব-গ্রামবাসী, স্ব-জিলাবাসী, স্ব-প্রদেশবাসী, স্ব-দেশবাসী—সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রত্যেকের দুঃখ দূর হওয়া দরকার, নতুবা কোন একজন মানুষ কেবলমাত্র নিজের ধনবত্তার দ্বারা সর্বতোভাবে শান্তি লাভ করিতে পারে না। যাহার দুঃখ থাকিবে, সে-ই হয় ভিক্ষার জন্য করুণ কাহিনী বিবৃত করিয়া বক্ষস্থল ছিন্ন করিবে ও প্রাণকে উন্মাদ করিয়া চিত্ত-বিক্ষেপ উপস্থিত করিবে, নতুবা কোন প্রবঞ্চনা অথবা চুরি অথবা ডাকাতি করিতে বাধ্য হইয়া সমাজের অপরাপরের অশান্তি উৎপাদন করিবে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, কোন জাতিকে সর্বতোভাবে সমস্যামুক্ত করিতে হইলে মনুষ্যজাতির প্রত্যেকে যাহাতে সমস্যামুক্ত হয়, তাহার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

তাহার পর আবার দেখুন, আমি ধনবান্—আমার যথেষ্ট টাকা আছে। যাহা ইচ্ছা তাহাই কিনিবার সামর্থ্য আমার আছে বটে, কিন্তু কোন্ সময়ে, কোন্ স্থানে, কোন্ পরিশ্রমে কি কি বস্তু কত পরিমাণে কি ভাবে খাইলে, কোন্ কোন্ বসন কি ভাবে পরিধান করিলে, কোন্ কোন্ শয্যা কি ভাবে ব্যবহার করিলে, কোন্ কোন্ বাসন-কোসন কি ভাবে নাড়া-চাড়া করিলে, কোন্ শ্রেণীর গৃহে কি ভাবে আশ্রয় লইলে, কোন্ শ্রেণীর স্থানে কি রকমে চলা-ফেরা করিলে, কোন্ মানুষের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলে, কোন্ আনন্দ কিরূপ উপভোগ করিলে, আমার শরীর ও ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন অসুস্থ হইতে পারে অথবা সুস্থ থাকিতে পারে, তাহা আমার জানা নাই। উহা আমার জানা নাই বলিয়া আমার যথেষ্ট টাকা থাকা সত্ত্বেও আমার যাহা যে ভাবে যে পরিমাণে খাওয়া উচিত নহে, তাহা আমি নিজে খাইয়া থাকি এবং পোষ্যবর্গকে খাওয়াইয়া থাকি, যে বসন যে ভাবে আমার পরিধান করা উচিত নহে তাহা আমি পরিধান করিয়া থাকি এবং পোষ্যবর্গকে পরিধান করাইয়া থাকি। যে শয্যা যে ভাবে

ব্যবহার করা উচিত নহে, সেই ভাবে আমি উহা ব্যবহার করিয়া থাকি এবং পোষ্যবর্গকে ব্যবহার করাইয়া থাকি, যে বাসন-কোসন যে ভাবে নাড়া-চাড়া করা উচিত নহে, সেই বাসন-কোসন সেই ভাবে নাড়া-চাড়া করিয়া থাকি এবং পোষ্যবর্গের তাদৃশ নাড়া-চাড়া করিবার কার্য্য অনুমোদন করিয়া থাকি, যে শ্রেণীর গৃহে যে ভাবে বাস করা উচিত নহে সেই শ্রেণীর গৃহে সেই ভাবে বাস করিয়া থাকি এবং পোষ্যবর্গকে বাস করাইয়া থাকি; যে শ্রেণীর যানে যে রকম ভাবে চলাফেরা করা উচিত নহে সেই শ্রেণীর যানে সেই ভাবে চলাফেরা করিয়া থাকি এবং পোষ্যবর্গকে করাইয়া থাকি, যে মানুষের সহিত যেরূপ ব্যবহার করা উচিত নহে সেই মানুষের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি এবং পোষ্যবর্গের সেইরূপ ব্যবহার অনুমোদন করিয়া থাকি। যে আনন্দ যেরূপ ভাবে উপভোগ করা উচিত নহে সেই আনন্দ সেইরূপ ভাবে উপভোগ করিয়া থাকি ও পোষ্যবর্গের উপভোগ অনুমোদন করিয়া থাকি। এতাদৃশ অকর্ত্তব্য কার্য্যের ফলে সময় সময় আমার স্বাস্থ্য ও মন যে অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং প্রায়শঃ আমি অতৃপ্তি অনুভব করিয়া নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা বিষয়ক পরিকল্পনায় ব্যস্ত হই এবং যথেষ্ট টাকা থাকা সত্ত্বেও যথার্থ আকাঙ্ক্ষাসমূহের তৃপ্তির জন্য যে টাকার আবশ্যক তাহার অভাব অনুভব করিয়া থাকি, ইহা বলাই বাহুল্য। কাযেই দেখা যাইতেছে যে, প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের ব্যবস্থা থাকিলেই যে অর্থগত সমস্যার সমাধান হইয়া থাকে তাহা নহে। অর্থগত সমস্যার সর্ব্বতোভাবে সমাধান করিতে হইলে এক দিকে যেরূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্রয়োপযোগী প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন, সেইরূপ আবার দ্রব্য-জ্ঞান এবং ব্যবহার-জ্ঞান লাভ করিবার উপযোগী শিক্ষা থাকিবারও প্রয়োজন হইয়া থাকে।

আবার দেখুন, সমাজের প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার উপযোগী প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের ব্যবস্থা আছে। দ্রব্য-জ্ঞান এবং ব্যবহার-জ্ঞান লাভ করিবার উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় দ্রব্য অর্থাৎ খাদ্যবস্তু ও পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি যাহা জীবনধারণ করিবার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা অজন্মা-বশতঃ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। এতাদৃশ অবস্থায় অর্থ ও শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মানুষকে দুর্ভিক্ষ ও নানা অভাবের সম্মুখীন হইতে হয় এবং নানা রকম দুঃখে হাবুডুবু খাইতে হয়। কাযেই বলিতে হইবে যে, শুধু অর্থোপার্জ্জনের ব্যবস্থা এবং দ্রব্য-জ্ঞান ও ব্যবহার-জ্ঞান থাকিলেই যে সমাজের অর্থগত সমস্যা সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত হয় তাহা নহে; অর্থগত সমস্যা সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত করিতে হইলে যাহা খাইয়া ও যাহা পরিধান করিয়া মানুষ সুস্থ ভাবে জীবন ধারণ করিতে পারে, তাহা যাহাতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

ইহার পর আবার দেখুন, সমাজের প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার মত প্রচুর অর্থ আছে। দ্রব্য-জ্ঞান এবং ব্যবহার-জ্ঞান লাভ করিবার উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে, যাহা খাইয়া ও যাহা পরিধান করিয়া মানুষ সুস্থ ভাবে জীবন-ধারণ করিতে পারে, তাহা যাহাতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তাহার ব্যবস্থাও আছে কিন্তু দেশের মধ্যে জল ও হাওয়া এমন অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে যে, যাহা খাইয়া অথবা যাহা পরিধান করিয়া মানুষ তাহার স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে পারে তাহা উৎপাদন করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এবং দেশে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা মাটী, জল ও হাওয়ার বিকৃতির জন্য অল্পাধিক পরিমাণে অস্বাস্থ্যপ্রদ হইয়া পড়িয়াছে। এতদবস্থায় প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের ব্যবস্থা, যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা, আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য-প্রদ আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য উৎপাদনের অক্ষমতা-নিবন্ধন মানুষকে বাধ্য হইয়া দুঃখভোগ করিতে হয়। কাযেই বলিতে হয় যে, মানুষের অর্থগত সমস্যা সর্ব্বতোভাবে সমাধান করিতে হইলে একদিকে যেরূপ সমাজের প্রত্যেকে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে, যাহাতে দ্রব্য-জ্ঞান ও ব্যবহার-জ্ঞান লাভ করিতে পারে, এবং দেশে যাহাতে আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়, সেইরূপ আবার দেশের মাটী, জল ও হাওয়া যাহাতে স্বাস্থ্য-প্রদ আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য উৎপাদনে অপটু না হয়, তাহার ব্যবস্থাও করিতে হয়।

ইহার পর আবার চিন্তা করুন—কোন জাতি, তাহার দেশের প্রত্যেকের যাহাতে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন হয়, প্রত্যেকে

যাহাতে দ্রব্য-জ্ঞান ও দ্রব্যের ব্যবহার-জ্ঞান লাভ করিতে পারে, আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য যাহাতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, দেশের মাটী, জল ও হাওয়া যাহাতে ভাল থাকে এবং উৎপন্ন আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য যাহাতে স্বাস্থ্য-প্রদ হয় তাহার সমস্ত ব্যবস্থাই করিতে পারিয়াছে, কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের জন্য যে যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে অধিকাংশকেই চাকুরী করিতে হয় এবং সর্ব্বদাই নিজ নিজ বিবেককে বিসর্জ্জন দিয়া উপরিওয়ালার মন যোগাইতে হয়। অধিকন্তু যেরূপ ভাবের চাকুরী করিতে হয় তাহাতে স্বাস্থ্য সম্যক্ ভাবে বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এতদবস্থায় উপরোক্ত নানাবিধ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, চাকুরীতে বিবেককে বিসর্জ্জন দিয়া অথবা কোঁতা করিয়া উপরিওয়ালার মন যোগাইতে হয় ও সময় সময় তিরস্কার খাইতে হয় বলিয়া, এবং চাকুরীর ছুটী-নিবন্ধন স্বাধীন থাকে না বলিয়া মানুষ দুঃখে জর্জ্জরিত হইতে বাধ্য হয়। কাজেই বলিতে হইবে যে, মানুষের অর্থগত সমস্যা সর্ব্বতোভাবে সমাধান করিতে হইলে—একদিকে যেরূপ সমাজের প্রত্যেকে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে, যাহাতে দ্রব্য-জ্ঞান ও দ্রব্যের ব্যবহার-জ্ঞান লাভ করিতে পারে, দেশে যাহাতে আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, দেশের মাটী, জল ও হাওয়া যাহাতে ভাল থাকে এবং উৎপন্ন আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য যাহাতে স্বাস্থ্য-প্রদ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়—সেইরূপ আবার অর্থোপার্জ্জনের পন্থাগুলি ( অর্থাৎ vocations for earning livelihood) যাহাতে অস্বাস্থ্য-প্রদ না হয় এবং অর্থোপার্জ্জনের জন্য যাহাতে চাকুরী অবলম্বন করিতে না হয় তাহার ব্যবস্থাও করিতে হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন—চাকুরী ছাড়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য আর কি কি পন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে?

চাকুরী ছাড়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য আর কি কি পন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, চাকুরী ছাড়া অর্থোপার্জ্জনের আর যে যে পন্থা আছে তাহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—( ১ ) কৃষি, ( ২ ) শিল্প, ( ৩ ) বাণিজ্য। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে ওকালতী, ডাক্তারী, দালালী, সাংবাদিকতা, অধ্যাপকতা, গুরুগিরি, পুরোহিতী প্রভৃতি অর্থোপার্জ্জনের যে সমস্ত ব্যবসায় সমাজে প্রচলিত আছে, তাহার প্রত্যেকটী উপরোক্ত তিন শ্রেণীর ব্যবসায়ের [ অর্থাৎ ( ১ ) কৃষি, ( ২ ) শিল্প, ( ৩ ) বাণিজ্য, ও ( ৪ ) চাকুরীর অন্তর্গত।

ইহার পর আবার চিন্তা করুন, কোন জাতি তাহার দেশের প্রত্যেকের যাহাতে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন হয়, অর্থোপার্জ্জনের ব্যবসায়গুলি যাহাতে অস্বাস্থ্য-প্রদ না হয়, চাকুরী অবলম্বন না করিয়া যাহাতে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে পারা যায়, প্রত্যেকে যাহাতে দ্রব্য-জ্ঞান ও দ্রব্যের ব্যবহার-জ্ঞান লাভ করিতে পারে, আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য যাহাতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, দেশের মাটী, জল ও হাওয়া যাহাতে ভাল থাকে এবং উৎপন্ন আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য যাহাতে স্বাস্থ্য-প্রদ হয়, তাহার সমস্ত ব্যবস্থাই করিতে পারিয়াছে, কিন্তু কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের পরিচালনার জন্য যে যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে কোন কোন সময়ে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে লাভ হইয়া থাকে, আবার কোন কোন সময়ে লোকসান হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া ক্রেতাগণকেও সময় সময় দ্রব্যের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির জন্য অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এতদবস্থায় উপরোক্ত নানাবিধ ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যখন মানুষ কৃষি অথবা শিল্প অথবা বাণিজ্যে লোকসান গ্রস্ত হয় অথবা অত্যধিক মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে বাধ্য হয়—তখন সে দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। কাজেই বলিতে হইবে যে, মানুষের অর্থগত সমস্যা সর্ব্বতোভাবে সমাধান করিতে হইলে এক দিকে যেরূপ উপরোক্ত নানাবিধ ব্যবস্থার, প্রয়োজন সেইরূপ আবার দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের আশ্রয় যাহারা লইবে, তাহারা যাহাতে কোন বৎসর কোন প্রকারে লোকসানগ্রস্ত না হয়, এবং ক্রেতাগণকে যাহাতে অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে না হয়, তাহার ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে।

ইহার পর আবার চিন্তা করুন—কোন জাতি তাহার দেশের প্রত্যেকের যাহাতে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন হয়, অর্থোপার্জ্জনের ব্যবসায়গুলি যাহাতে অস্বাস্থ্য-প্রদ না হয়, চাকুরী অবলম্বন না করিয়া যাহাতে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে পারা যায়, দ্রব্যমূল্য যাহাতে অত্যধিক হ্রাস ও

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে যাহাতে কোন ক্রমে তাহারও লোকসানগ্রস্ত না হইতে হয়, প্রত্যেকে যাহাতে দ্রব্য-জ্ঞান ও দ্রব্যের ব্যবহার-জ্ঞান লাভ করিতে পারে, আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্য যাহাতে দেশের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, দেশের মাটী, জল ও হাওয়া যাহাতে ভাল থাকে এবং উৎপন্ন আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি যাহাতে কোন ক্রমে অস্বাস্থ্যপ্রদ না হয়, তাহার সমস্ত ব্যবস্থাই করিতে পারিয়াছে, কিন্তু কতকগুলি মানুষ কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে অল্প সময়ের মধ্যে অত্যধিক লাভবান্ হইবার জন্য সুরা, নারীর রূপ প্রভৃতি যে-সমস্ত দ্রব্য মোহগ্রস্ত মানুষের আপাততৃপ্তিকর অল্প পরিমাণে অস্বাস্থ্যপ্রদ ও সমাজের বিলাসিতা ও বিশৃঙ্খলার বৃদ্ধিকর, সেই সমস্ত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ও নানা রকমের জুয়া খেলা আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা দেখিলে দেখা যাইবে যে, অর্থ-গত-সমস্যা দূর করিবার জন্য যত কিছু ব্যবস্থা করা যাউক না কেন, তাহা যতই সুষ্ঠু হউক না কেন, যদি সুরা ও নারীর রূপ প্রভৃতি যে-সমস্ত দ্রব্য মোহগ্রস্ত মানুষের আপাততৃপ্তিকর অথচ পরিণামে অস্বাস্থ্যপ্রদ ও সমাজের বিলাসিতা ও বিশৃঙ্খলাবৃদ্ধিকর সেই সমস্ত দ্রব্যের অবাধ ক্রয়-বিক্রয় এবং জুয়াখেলা প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে কতকগুলি মানুষ কোন ক্রমেই নানাবিধ দুঃখের হাত এড়াইতে পারে না। কাজেই বলিতে হইবে যে, অর্থগত সমস্যা সর্ব্বতোভাবে সমাধান করিতে হইলে এক দিকে যেরূপ উপরোক্ত নানাবিধ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে, সেইরূপ আবার সুরা ও নারীর রূপ প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্যের অবাধ ক্রয়-বিক্রয় ও কোন রকমের জুয়া-খেলা যাহাতে সমাজ মধ্যে সংঘটিত না হয়, তাহার ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে।

ইহার পর আবার চিন্তা করুন, কোন জাতি তাহার দেশের প্রত্যেকের যাহাতে জীবিকা-নির্ব্বাহের উপযোগী প্রচুর অর্থোপার্জ্জন হয়, অর্থোপার্জ্জনের ব্যবসায়গুলি যাহাতে কোন ক্রমে অস্বাস্থ্য-প্রদ না হয়, চাকুরী অবলম্বন না করিয়া যাহাতে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে পারা যায়, দ্রব্য-মূল্য যাহাতে অত্যধিক হ্রাস ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে যাহাতে কোনক্রমে কাহারও লোকসানগ্রস্ত না হইতে হয়, সুরা ও নারীর রূপ প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ও কোন রকমের জুয়া-খেলা যাহাতে অবাধে সংঘটিত না হয়, প্রত্যেকে যাহাতে দ্রব্য-জ্ঞান ও দ্রব্যের ব্যবহার-জ্ঞান লাভ করিতে পারে, আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্য যাহাতে দেশের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, দেশের মাটী, জল ও হাওয়া যাহাতে কোন ক্রমে বিকৃত না হয় এবং উৎপন্ন আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি যাহাতে কোন ক্রমে অস্বাস্থ্যপ্রদ না হয়, এবিষয় সমস্ত ব্যবস্থাই করিতে পারিয়াছে, অথচ কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও চাকুরী-ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে যে, কেহ কেহ খাঁটিভাবে দিবা রাত্রি শারীরিক অথবা মানসিক পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতে পারেন, অপর কেহ কেহ কোনরূপ পরিশ্রম না করিয়াও তাহার অনেক বেশী উপার্জ্জন করিতে পারেন। এতদবস্থায় যাঁহারা খাঁটিভাবে দিবা-রাত্রি শারীরিক অথবা মানসিক পরিশ্রম করিয়াও অপর পক্ষের তুলনায় কম উপার্জ্জন করিতে বাধ্য হন, তাঁহাদিগের পক্ষে অসন্তুষ্ট হোন করা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। যাহারা খাঁটিভাবে শারীরিক অথবা মানসিক পরিশ্রম না করিয়া প্রচুর উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন, তাঁহাদিগের পক্ষেও অর্থোপার্জ্জনের গুরুত্ব এবং অর্থের গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। ফলে তাঁহারাও অমিতব্যয়ী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়েন। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, অর্থগত সমস্যার সর্ব্বতোভাবে সমাধান করিতে হইলে সমাজ মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাগুলির যেরূপ প্রয়োজন, সেইরূপ আবার কেহ যাহাতে খাঁটি ভাবে শারীরিক অথবা মানসিক পরিশ্রম না করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারে, এবং খাঁটি পরিশ্রমের পরিমাণের সহিত তুলনা করিয়া যাহাতে পারিশ্রমিকের পরিমাণ স্থির করা হয় তাহার ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে।

ইহার পর আবার চিন্তা করুন, কোন জাতি তাহার দেশের প্রত্যেকের যাহাতে জীবিকা-নির্ব্বাহের উপযোগী প্রচুর অর্থোপার্জ্জন হয়, অর্থোপার্জ্জনের ব্যবসায়গুলি যাহাতে কোন ক্রমে অস্বাস্থ্য-প্রদ না হয়, চাকুরী অবলম্বন না করিয়া যাহাতে অধিকাংশ মানুষ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে, দ্রব্য-মূল্য যাহাতে অত্যধিক হ্রাস ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে যাহাতে কোনক্রমে কাহারও লোকসান-গ্রস্ত না হইতে হয়, সুরা ও নারীর রূপ প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ও কোন রকমের জুয়া-খেলা যাহাতে অবাধে সংঘটিত না হয়, খাঁটিভাবে

শারীরিক অথবা মানসিক পরিশ্রম না করিয়া কেহ যাহাতে অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারে, খাঁটি পরিশ্রমের পরিমাণের সহিত তুলনা করিয়া যাহাতে পারিশ্রমিকের পরিমাণ স্থির করা হয়, প্রত্যেকে যাহাতে দ্রব্যের জ্ঞান ও দ্রব্যের ব্যবহার-জ্ঞান লাভ করিতে পারে, আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্য যাহাতে দেশের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, দেশের মাটী, জল ও হাওয়া যাহাতে কোনক্রমে বিকৃত না হয় এবং উৎপন্ন আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি যাহাতে কোনক্রমে অস্বাস্থ্যপ্রদ না হয় এবিষয় সমস্ত ব্যবস্থাই করিতে পারিয়াছে, অথচ স্ত্রী ও পুরুষের ভিতর দায়িত্ব-বিভাগ না থাকায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই উপার্জ্জনের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এবং সংসার সংরক্ষণের দায়িত্ব বেতনভোগী পরিচারক ও পরিচারিকাগণের হস্তে ন্যস্ত হয়। ইহা বলাই বাহুল্য যে, সংসার সংরক্ষণে এমন বহুবিধ কার্য্য আছে যাহা কখনও, এমন কি দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন পরিচারক অথবা পরিচারিকাগণের দ্বারা পর্য্যন্ত, সম্পাদন করা সম্ভব নহে। এই শ্রেণীর কার্য্যের জন্য প্রয়োজন সুনিষ্ঠ আন্তরিকতা অথবা সম-প্রাপ্ততা, অথবা অকৃত্রিম মাতৃত্ব, অথবা অকৃত্রিম স্নিগ্ধত্ব, অথবা অকৃত্রিম দুহিতৃত্ব, অথবা অকৃত্রিম সহধর্ম্মিণীত্ব। উহা কখনও বেতন-ভোগী পরিচারক অথবা পরিচারিকাগণের নিকট পাওয়া যায় না এবং পাওয়ার আশা করা পর্য্যন্ত সঙ্গত নহে। এতৎ স্থলে উপার্জ্জনের পরিশ্রম নির্ব্বাহ করিয়া বিশ্রামের জন্য ঘরে ফিরিলে খুঁটিনাটি অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ফলে আর্থিক-সমস্যা দূর করিবার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থার বিদ্যমানতা সত্ত্বেও স্ত্রী-পুরুষের ভিতর দায়িত্ব বিভাগ না থাকায় মানুষকে নানারকম দুঃখে জর্জ্জরিত হইতে হয়। কাজেই বলিতে হইবে যে, কোন জাতির আর্থিক-সমস্যা সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে হইলে একদিকে যেরূপ পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাগুলি প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে, সেইরূপ আবার স্ত্রী ও পুরুষের ভিতর দায়িত্ব-বিভাগের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। স্ত্রী ও পুরুষের কর্ম্মশক্তির মধ্যে প্রকৃতিগত তফাৎ কি কি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, পুরুষগণ যেরূপ স্বভাবতঃ উপার্জ্জনের কার্য্যে নৈপুণ্য লাভ করিতে পারেন, সংরক্ষণ ও শান্তিদানের কার্য্যে তাদৃশ নৈপুণ্য লাভ করিতে পারেন না। অন্যপক্ষে স্ত্রীগণ যেরূপ স্বভাবতঃই সংরক্ষণ ও শান্তিদানের কার্য্যে নৈপুণ্য লাভ করিতে পারেন, উপার্জ্জনের কার্য্যে তাদৃশ নৈপুণ্য লাভ করিতে পারেন না। ইহারই জন্য অর্থগত সমস্যার সমাধান সর্ব্বতোভাবে করিতে হইলে সমাজের পুরুষগণ যাহাতে উপার্জ্জন-কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং স্ত্রীগণ যাহাতে ঐ দায়িত্ব গ্রহণ না করেন, এবং স্ত্রীগণ যাহাতে সংরক্ষণ ও শান্তি-দান-কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও পুরুষগণ যাহাতে ঐ দায়িত্ব গ্রহণ না করেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

ইহার পর আবার চিন্তা করুন—কোন জাতি তাহার দেশে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ব্যবস্থাই প্রবর্ত্তিত করিয়াছে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে দায়িত্ব বিভাগের ব্যবস্থাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু যাহাদিগের পরিচালনায় ঐ ব্যবস্থাগুলি কার্য্য-প্রসূ হইবে, সেই রাজকর্ম্মচারিগণ চরিত্রবান, নির্লোভ, সংযতেন্দ্রিয় ও সত্যবাদী কি না তাহা কঠোর ভাবে পরীক্ষা না করিয়াই তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। ফলে কতকগুলি পাস-করা উপাধিধারী তথাকথিত বিদ্বান রাজ-কর্ম্মের দায়িত্বভার পায়। এবং তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঐ ব্যবস্থাগুলি যথাযথভাবে সংরক্ষিত হইতেছে কি না তাহার দিকে আদৌ লক্ষ্য না করিয়া—কখনও বা অর্থ বা উত্তেজনা গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের অথবা অশান্তি উৎপাদন করে, কখনও বা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া স্বার্থ পক্ষের পীড়ন ও অন্যায়-পক্ষের অন্যায়ে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকে এবং মিথ্যা রিপোর্টের নৈপুণ্য দেখাইয়া সমাজের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করে। এতদবস্থায় অর্থগত সমস্যা সমাধানের নানাবিধ ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মানুষ নানারকমে বিধ্বস্ত হইতে বাধ্য হয়। কাজেই বলিতে হইবে যে, অর্থগত সমস্যার সমাধান সর্ব্বতোভাবে করিতে হইলে একদিকে যেরূপ পূর্ব্ব-কথিত সমস্ত ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতে হইবে, সেইরূপ আবার রাজকর্ম্মচারীনিয়োগকালে নিয়োগ-প্রার্থিগণ কার্য্যতঃ চরিত্রবান, নির্লোভ, সংযতেন্দ্রিয় ও সত্যবাদী কি না তাহা যাহাতে কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হয় এবং এই পরীক্ষায় যাঁহারা সম্পূর্ণ সন্তোষজনকভাবে উত্তীর্ণ না হইতে পারেন, তাঁহারা যাহাতে কোনক্রমে কোন রাজ-কর্ম্মের দায়িত্ব লাভ করিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

ইহার পর আবার চিন্তা করুন—কোন জাতি তাহার দেশে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ব্যবস্থাই প্রবর্ত্তিত করিয়াছে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে দায়িত্ব বিভাগের ব্যবস্থা ও রাজকর্ম্মে নিয়োগকালে নিয়োগ-প্রার্থীগণ কার্য্যতঃ চরিত্রবান্, নির্লোভ, সংযতেন্দ্রিয় ও সত্যবাদী কি না তাহা কঠোরভাবে পরীক্ষা করিয়া রাজকর্ম্মচারীনিয়োগের ব্যবস্থাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু রাজকর্ম্মচারীগণ যাহাতে তাঁহাদিগের নির্লোভপরায়ণতা, সংযতেন্দ্রিয়তা, সত্যবাদিতা ও চরিত্রবত্তা স্ব স্ব কার্য্য-কালের চিরদিন বজায় রাখিতে বাধ্য হন তাহার কোন ব্যবস্থাই প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এতদবস্থায় রাজকর্ম্মচারীগণের পাতিত্য প্রায়ই সম্ভব-যোগ্য হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে সমাজ-মধ্যে মানুষের দুঃখ ভোগ করিবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। কাজেই বলিতে হইবে যে, কোন জাতির অর্থগত সমস্যার সর্ব্বতোভাবে সমাধান করিতে হইলে একদিকে যেরূপ পূর্ব্ব-কথিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিতে হইবে, সেইরূপ আবার রাজকর্ম্মচারীগণের নির্লোভপরায়ণতা, সংযতেন্দ্রিয়তা, সত্যবাদিতা ও চরিত্রবত্তা বিষয়ে কোনরূপ পাতিত্য যাহাতে না ঘটিতে পারে এবং কোনরূপ পাতিত্য ঘটিলে রাজকর্ম্মচারীগণ যাহাতে তৎক্ষণাৎ রাজকর্ম্ম হইতে অপসারিত হন, তাহার ব্যবস্থাও প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে।

ইহার পর আবার চিন্তা করুন—কোন জাতি তাহার দেশে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ব্যবস্থাই প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। ইহা ছাড়া স্ত্রী ও পুরুষগণের মধ্যে দায়িত্ব যাহাতে বিভক্ত হয়, রাজ-কার্য্যে নিয়োগকালে নিয়োগ-প্রার্থীগণ কার্য্যতঃ চরিত্রবান্, নির্লোভ, সংযতেন্দ্রিয় ও সত্যবাদী কি না, তাহা যাহাতে কঠোর ভাবে পরীক্ষা করা হয়, রাজকর্ম্মচারীগণের নির্লোভপরায়ণতা, সংযতেন্দ্রিয়তা, সত্যবাদিতা ও চরিত্রবত্তা বিষয়ে কোনরূপ পাতিত্য যাহাতে না ঘটিতে পারে, রাজকর্ম্মচারীগণের কোনরূপ পাতিত্য ঘটিলে তাঁহারা যাহাতে তৎক্ষণাৎ রাজকর্ম্ম হইতে অপসারিত হন এবম্বিধ সমস্ত ব্যবস্থাই সংঘটিত হইয়াছে, কিন্তু যাহারা এই সমস্ত ব্যবস্থা উপেক্ষা করিবে অথবা তাহার কোনটার বিরোধিতা করিবে, তাহাদিগের বিচার ও দণ্ডের কোনরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, নানারকম ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ঐটুকু ত্রুটী থাকিলেই সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইবার আশঙ্কা থাকিয়া যায়। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, অপরাধীগণের শুধু বিচার ও দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেই চলে না, বিচার যাহাতে অনায়াসলভ্য ও অল্প ব্যয়সাপেক্ষ হয় তাহার ব্যবস্থা করিবারও প্রয়োজন হয়। কারণ বিচার অনায়াসলভ্য ও অল্পব্যয়সাপেক্ষ না হইলে দরিদ্রগণের পক্ষে বিচারপ্রার্থী হওয়া ও বিচার লাভ করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

উপরে যে সমস্ত দৃষ্টান্ত দেখান হইল, তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয় যে, কোন জাতির অর্থগত-সমস্যার সর্ব্বতোভাবে সমাধান করিতে হইলে যে-সমস্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহার মূলে নিম্নলিখিত সূত্রগুলি লক্ষ্য করা একান্ত প্রয়োজনীয়:—

(১) দেশের প্রত্যেকের যাহাতে জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী প্রচুর অর্থোপার্জ্জন ব্যবস্থা হয়।

(২) অর্থোপার্জ্জনের কোন পন্থা যাহাতে কোনক্রমে অন্যায়-প্রশ্রয় না হয়।

(৩) চাকুরী অবলম্বন না করিয়া যাহাতে অধিকাংশ মানুষ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে।

(৪) দ্রব্য-মূল্য যাহাতে অত্যধিক হ্রাস ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়।

(৫) কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে যাহাতে কোনক্রমে কাহারও লোকসানগ্রস্ত না হইতে হয়।

(৬) সুরা ও নারীর রূপ প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় এবং কোন রকমের জুয়া যাহাতে সমাজমধ্যে অবাধে সাধিত না হয়।

(৭) যাহাতে সমাজের কাহারও কোন অনিষ্ট না হইতে পারে খাঁটিভাবে এমন কোন শারীরিক অথবা মানসিক পরিশ্রম না করিয়া কেহ যাহাতে অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারে।

(৮) খাঁটি পরিশ্রমের পরিমাণের সহিত তুলনা করিয়া যাহাতে পারিশ্রমিকের পরিমাণ স্থির করা হয়।

(৯) প্রত্যেকে যাহাতে দ্রব্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও দ্রব্যের ব্যবহার-জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

(১০) আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্য যাহাতে দেশের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

(১১) দেশের মাটী, জল ও হাওয়া যাহাতে কোনক্রমে বিকৃত না হয়।

(১২) উৎপন্ন আহার্য ও ব্যবহার্য দ্রব্যগুলি যাহাতে কোনক্রমে অস্বাস্থ্যকর না হয়।

(১৩) স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যাহাতে সংসার পরিচালনার দায়িত্ব বিভক্ত হয়।

(১৪) রাজকর্মচারী-নিয়োগকালে নিয়োগ-প্রার্থীগণ কার্যতঃ চরিত্রবান্, নির্লোভ, সংযতেন্দ্রিয় ও সত্যবাদী কি না, তাহা যাহাতে কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হয়। ঐ পরীক্ষায় যাহারা সম্পূর্ণ সন্তোষজনকভাবে উত্তীর্ণ না হইতে পারেন, তাঁহারা যাহাতে কোনক্রমে কোন রাজকার্যের দায়িত্বলাভ করিতে না পারেন।

(১৫) রাজকর্মচারীগণের নির্লোভপরায়ণতা, সংযতেন্দ্রিয়তা, সত্যবাদিতা ও চরিত্রবত্তা বিষয়ে কোনরূপ পাতিত্য যাহাতে না ঘটিতে পারে।

(১৬) রাজকর্মচারীগণের কোনরূপ পাতিত্য ঘটিলে তাঁহারা যাহাতে তৎক্ষণাৎ রাজকার্য হইতে অপসারিত হন।

(১৭) সমাজের অর্থগত সমস্যার সর্বতোভাবে সমাধান-কল্পে যে সমস্ত নিয়ম প্রবর্তিত থাকে, যাঁহারা সেই সমস্ত নিয়ম পালনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন অথবা উহার কোনটীর বিরুদ্ধাচরণ করিবেন, তাঁহাদিগের যাহাতে বিচার হয় ও দণ্ড দেওয়া হয়।

(১৮) বিচার-কার্য যাহাতে অনায়াসসাধ্য ও অল্প-ব্যয়-সাপেক্ষ হয়।

উপরোক্ত সূত্রগুলি আমূলভাবে চিন্তা করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহার কোনটি বাদ দিয়া অথবা উহার কোনটীর বিরুদ্ধ ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়া কোন সমগ্র জাতির অর্থগত সমস্যা সর্বতোভাবে সমাধান করা সম্ভবযোগ্য নহে। অধুনা সারা জগতের ঘরে ঘরে অর্থগত সমস্যা যে ক্রমেই জটিল হইতে জটিলতর হইয়া পড়িতেছে, তাহার একমাত্র কারণ উপরোক্ত সূত্রগুলির বিরুদ্ধ ব্যবস্থার প্রচলন। জগতের কোন দেশে এখন আর দেশের প্রত্যেকে যাহাতে জীবিকানির্বাহোপযোগী প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা নাই। কোন দেশে দারাদেশের প্রত্যেক মানুষটীর জন্য ভাবেন অথবা ভাবিবার প্রবৃত্তি পোষণ করেন, এমন একটী মানুষ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সাধারণ শ্রমজীবী অথবা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মানুষ কেবল মাত্র নিজের অথবা নিজের পরিবারের ভাবনা লইয়াই ব্যাকুল। কোন আত্মীয়, কুটুম্ব অথবা বন্ধুর পরিবারের ভবিষ্যৎ কি হইবে তাহার ভাবনা অকৃত্রিম রূপে ভাবেন, এমন একটী মানুষ পর্যন্ত বিরল হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা দেশের নেতা তাঁহারা সর্ব-সাধারণের ভাবনা লইয়া অস্থির আছেন বলিয়া অভিনয় করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের কার্য বিশ্লেষণ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহারা নিজেদের পরিবারের জন্য পর্যন্ত বুদ্ধিমানের মত কোন ভাবনা পোষণ করেন না। তাঁহাদিগের যত কিছু ভাবনা তাহা নিজ নিজ নেতৃত্বের জন্য। নিজ নিজ বল কি করিয়া অক্ষুণ্ণ থাকিবে তাহার চেষ্টাতেই তাঁহারা সর্বদা বিব্রত থাকেন। প্রত্যেক দেশের তথাকথিত রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ( political leaders ) বাস্তবিক পক্ষে জনসাধারণকে ত' প্রতারিত করেনই, এমন কি নিজদিগকে পর্যন্ত প্রতারিত করিয়া থাকেন।

যাঁহাদিগের উপর দেশের রাজ-কার্যের দায়িত্ব-ভার অর্পিত হইয়া থাকে, তাঁহাদিগকে দেশের প্রত্যেকের ভাবনা কথঞ্চিৎ-পরিমাণে ভাবিতে বাধ্য হইতে হয় বটে, কিন্তু প্রত্যেক দেশের রাজ-কার্যের ভার-প্রাপ্ত রাজ-পুরুষদিগের কার্যকলাপ বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ইহাঁদিগের কোন কার্যেই আপামর জন-সাধারণের কোন হিত সাধিত হইতে পারে না এবং হয় না। ইহাঁদিগের যে আইনটীতে মধ্যবিত্তের অথবা ধনবানের কোন উপকার সাধিত হয়, সেই আইনটীতে গরীবের বহুই অপকার সাধিত হইয়া থাকে। আবার যে আইনটীতে গরীবের উপকার হয়, সেই আইনটীতে মধ্যবিত্তের ও ধনবানের সর্বনাশ সাধিত হইয়া থাকে। দেশের প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের স্বার্থ যথাযথ ভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কি করিয়া আইন প্রণয়ন করিতে হয় তাহা যে বর্তমান রাজ-পুরুষদিগের কেহ জানেন তাহার কোন সাক্ষ্য কোন দেশে পাওয়া যায় না। অথচ যিনি একবার কোন দেশের আইন-সচিবের (Law member-এর) পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন, তিনি যে কত বড় নবাব, তাহার ওজন তিনি নিজেই করিতে পারেন না। বর্তমান

কালের এই আইন-সচিবগণ ধর্ম-শাস্ত্রানুসারে সমাজের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় পাপী। যাঁহারা পাপ-পুণ্যে বিশ্বাস করেন না তাঁহাদিগকে আমরা প্রত্যেক দেশের আইন-সচিবগণের ভবিষ্যৎ বিশ্লেষণ করিতে অনুরোধ করি। এই বিশ্লেষণ-পটুতা লাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, এই আইন-সচিবগণ স্বকীয় পাপ কার্যের ফলে হয় নিজেরা, নতুবা তাঁহাদিগের সন্তান-সন্ততিগণ, অর্থকৃচ্ছ্রতা নতুবা অন্যান্য নতুবা ঘোর অশান্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। যিনি যে কার্যের উপযুক্ত নহেন, তাঁহার সেই কার্য-ভার গ্রহণ করা কখনও সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ রাজ-কার্য সম্বন্ধে এই নিয়ম কখনও অবহেলা করা পরামর্শ-সিদ্ধ নহে।

দেশের অথবা সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রত্যেকের ভাবনা যথাযথ ভাবে ভাবিবার মানুষ যত দিন পর্যন্ত মনুষ্য-সমাজে না দেখা যায়, ততদিন পর্যন্ত মানুষকে দুঃর্ভোগ ভুগিতেই হইবে। যাঁহারা মনে করেন যে হিটলার, মুসোলিনী, ষ্ট্যালিন, লেনিন্, মার্কস্ প্রভৃতি মানুষ সমগ্র মনুষ্য-সমাজের জন্য অথবা অন্ততঃ তাঁহাদিগের নিজেদের দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য ভাবিয়া থাকেন অথবা ভাবিয়াছেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞানুসারে ইঁহারা প্রত্যেকেই অল্পাধিক পরিমাণে অতি-পাতকী ও মহাপাতকী। ইঁহাদিগের দ্বারা কোন দেশের কোন মানুষের যথার্থ হিত সাধিত হইতে পারে না। খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখিলে আপাতদৃষ্টিতে ইঁহারা কাহারও কাহারও উপকার করিতেছেন বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু আমূল বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ইঁহারা কাহারও যথার্থ-পক্ষে কোন উপকার সাধন করিতে পারিতেছেন না।

অর্থগত-সমস্যার সর্বাঙ্গীন সমাধান সাধন করিতে হইলে "অর্থোপার্জনের কোন পন্থা যাহাতে কোনক্রমে অন্যান্যগ্রস্ত না হয়" তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। অথচ আজকাল সারা জগতে এই সম্বন্ধে যাহা চলিতেছে তাহা ঐ নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। স্কুল, কলেজ, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার, আফিস, বিচারালয়, শিল্পাগার, বাণিজ্যাগার প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার যত কিছু প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার প্রত্যেকটীর দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, হয় এক ঘরে অনেকগুলি মানুষকে ভর্তি করিয়া রাখিয়া নতুবা কতকগুলি অন্যান্যগ্রস্ত দ্রব্য ও কার্য রক্ষা করিয়া মানুষের অন্যান্য সৃষ্টি করা হইতেছে।

অর্থগত সমস্যার সর্বাঙ্গীন সমাধান করিবার তৃতীয় সূত্র—"চাকুরী অবলম্বন না করিয়া যাহাতে অধিকাংশ মানুষ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা অর্থোপার্জন করিতে পারে তদনুরূপ ব্যবস্থা করা।" অথচ কার্যক্ষেত্রে চলিতেছে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যেরূপভাবে চাকুরী, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সংগঠন সাধিত হইয়াছে, তাহাতে মানুষ চাকুরীর দিকে আকৃষ্ট না হইয়া এখন আর কোন স্বাধীন বৃত্তির দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে না। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, সারা জগতের প্রত্যেক দেশেই চাকুরী-কামীর সংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে।

অর্থগত সমস্যার সর্বাঙ্গীন সমাধান করিবার চতুর্থ সূত্র—"দ্রব্যমূল্য যাহাতে অত্যধিক হ্রাস ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হয় তদনুরূপ ব্যবস্থা করা"। বর্তমান যুদ্ধ-কালে সকল দেশের রাজ-পুরুষদিগের মধ্যে এতাদৃশ একটা প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়াছে বটে, কিন্তু কি করিয়া যে ব্যবসায়ী ও ক্রেতাগণকে কোনরূপে বিব্রত না করিয়া ইহা করিতে হয়, তাহা কোন দেশের রাজ-পুরুষদিগের যে জানা আছে তাহার কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। ইঁহারা স্ব স্ব ক্ষমতাবলে আইনের দ্বারা জোর করিয়া দ্রব্য-মূল্যের অত্যধিক হ্রাস ও বৃদ্ধি থামাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সুফল অপেক্ষা কুফল অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে দেখা যাইতেছে। এবং অনেক স্থলে ইঁহারা মোটেই কৃতকার্য হইতেছেন না।

অর্থগত সমস্যার সর্বাঙ্গীন সমাধান করিবার পঞ্চম সূত্র—"কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে যাহাতে কোনক্রমে কাহারও লোকসানগ্রস্ত না হইতে হয় তদনুরূপ ব্যবস্থা করা"। মানব-জাতির ইতিহাস যুক্তি-যুক্ত ভাবে অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, সারা জগতের প্রত্যেক দেশে এমন একটী সময় ছিল, যখন কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে কাহারও লোকসান-গ্রস্ত হইতে হইত না। তাহার প্রমাণ বংশানুক্রমে কৃষকের কৃষি-সম্পাদন, শিল্পীর শিল্প-সম্পাদন ও বণিকের বাণিজ্য-সম্পাদন। উহার কোনটী যদি কাহারও পক্ষে কোনরূপ লোকসানজনক হইত, তাহা হইলে কৃষকের সন্তান স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কৃষিকার্যে, শিল্পীর সন্তান স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শিল্পের কার্যে, এবং বণিকের

সন্তান স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বাণিজ্যের কার্য্যে বংশানুক্রমে প্রবৃত্ত হইত না। আজকাল আর তাহা হইতে পারিতেছে না। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, আজকাল কোন দেশেই প্রায়শঃ কোন মানুষ আজীবন কোন কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে লাভবান্ হইতে পারিতেছেন না এবং ইহার ফলে প্রায় প্রত্যেক দেশে প্রায় প্রত্যেক কৃষক, শিল্পী ও বণিকের সন্তান নিজ নিজ পিতৃব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া হয় অন্য কোন ব্যবসায় নতুবা কোন চাকুরী অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছে। যাহারা কৃষি অথবা শিল্প অথবা বাণিজ্যের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া সংশ্লিষ্ট অথবা যাহারা কোন কারবারের বাৎসরিক হিসাব (অর্থাৎ Annual Balance Sheet, Profit and Loss Account এবং Revenue Account) পড়িয়া ঐ কারবারের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কোন কোন বীমার কারবার এবং কয়েকটি রাসায়নিক ও বিদ্যুৎ সংবন্ধীয় শিল্পে এই নিয়মের ব্যতিচার দেখা যাইবে। কিন্তু ঐ কারবার গুলি এত আধুনিক যে, উহাদের ফলাফল বিচার করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।

অর্থগত সমস্যার সর্ব্বাঙ্গীন সমাধান করিবার ষষ্ঠ সূত্র—"সুরা ও নারীর রূপ প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় এবং কোন রকমের জুয়া যাহাতে সমাজমধ্যে অবাধে সাধিত না হয় তদনুরূপ ব্যবস্থা করা।" এই সূত্র যে বর্ত্তমান জগতের প্রত্যেক দেশে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হইতেছে এবং তাহার ফলে যে নানারকমের কুফল উৎপন্ন হইতেছে, তাহা যে কোন দেশের তথাকথিত বুদ্ধিমানগণের ও সুরাক্ষীগণের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে।

"কোন্ বিজ্ঞানে জাতীয় জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধান সর্ব্বতোভাবে সম্ভবযোগ্য", তাহার আসল কথায় আমরা এখনও উপনীত হই নাই। এতাবৎ মানুষের বর্ত্তমান অবস্থা কোথায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে এবং কোন্ উপায়ে তাহার উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে, তাহা সাধারণ বুদ্ধির সহায়তায় যতখানি বুঝিতে পারা যায়, তাহার কথাই আমরা আলোচনা করিয়াছি। আসল বিজ্ঞানের কথায় উপনীত হইতে অনেক বিলম্ব আছে। আর এক কথা লিখিলেও আমাদিগের এই প্রবন্ধের বক্তব্য সম্পূর্ণ হইবে না। পাঠকগণের ধৈর্য্য-চ্যুতি হইতে পারে এই আশঙ্কায় এই সংখ্যায় এই খানেই আমাদিগের লেখনী স্থগিত হইবে।

## যুদ্ধ এবং তাহার ভবিষ্যৎ

বর্ত্তমান যুদ্ধের দ্বারা সমগ্র মনুষ্য-সমাজ, তথা ভারতবর্ষের অবস্থায় কিরূপ বিপর্য্যয় ঘটিবার আশঙ্কা, এবং তাহার কুফল হইতে রক্ষালাভার্থ ভারতবাসিগণের কর্ত্তব্য কি, তাহার সন্ধান বর্ত্তমান সন্দর্ভের উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান যুদ্ধের দ্বারা সমগ্র মনুষ্য-সমাজ, তথা ভারতবর্ষের অবস্থায় কিরূপ বিপর্য্যয় ঘটিবার আশঙ্কা, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমতঃ স্থির করিতে হইবে, যুদ্ধে কোন্ পক্ষের জয়ী হইবার সম্ভাবনা। ইহা স্থির করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, কেন না বর্ত্তমান ব্রিটিশ এবং জার্ম্মান, এই উভয় জাতির রাষ্ট্রীয় মতবাদের মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য বিদ্যমান এবং যে-পক্ষ জয়ী হইবেন, অবিলম্বে পৃথিবীর পুনঃ সংগঠনকল্পে তাঁহারা নিজস্ব পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিবেন। কেবল ইহা স্থির করিলেই চলিবে না, উপরন্তু, মনুষ্যজাতির, তথা ভারতবাসীর বর্ত্তমান অবস্থাও সম্যক্‌রূপে নিরূপণ করিয়া লইতে হইবে।

কোন্ পক্ষের যুদ্ধে জয়ী হইবার সম্ভাবনা, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা এক প্রকার অসম্ভব, অন্ততঃ দুঃসাধ্য। আমাদের মতে, ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনেতাগণ বর্ত্তমানে যে-প্রকার চাল-চলন প্রদর্শন করিতেছেন, তদপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধি-বিচক্ষণতা আয়ত্ত করিতে পারিলে এই যুদ্ধে ইংলণ্ড নিশ্চিত জয়ী হইতে পারিতেন। মনুষ্যজাতির দুর্ভাগ্য তাহার সূত্রপাতেই নিবারণ কিংবা অবসান করিতে হইলে যে-জ্ঞানের প্রয়োজন, ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণের তাহা থাকিলে যুদ্ধ সংঘটিত হইতে পারিত না, সুতরাং যুদ্ধে জয়লাভের প্রশ্নও উত্থাপিত হইত না। ইংলণ্ড এবং তাহার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইলে যে পরিমাণ পশুশক্তি এবং সাহসের

প্রয়োজন, ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণকর্তৃক তাঁহাদের কর্তব্য যথা-যথভাবে পালিত হইলে, তাহা পৃথিবীর কোন জাতি কর্তৃক সংগৃহীত হইতে পারিত না।

সমগ্র মনুষ্যজাতির যুদ্ধোৎসা-বৃত্তির নিবারণ কিংবা উচ্ছেদ সাধনার্থ যাহা প্রয়োজন, একমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যদ্বারাই তাহা রক্ষিত হইতে পারে, কেন না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্পদ্ অফুরন্ত। আমাদের সেই বিশ্বাস হইতেই আমরা এই কথা বলিতেছি, ইহার পশ্চাতে ব্রিটিশ জাতির স্বপক্ষে কোন প্রচার-কার্য্য চালাইবার মনোভাব বিদ্যমান নাই।

যুদ্ধের শেষ ফল যাহাই হউক্ না কেন, ইংলণ্ডের জন-সাধারণ যে অভূতপূর্ব্ব ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য এবং নিয়মানুগত্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে এবং এই সদ্গুণসমূহের প্রাপ্য কোন পুরস্কার থাকিলে, পরাজয়ের গ্লানি স্বীকার করিবার দুর্ভাগ্য ব্রিটিশ জাতির কখনও হইবে না। অতএব, ব্রিটিশ জাতি শেষতঃ বিজিত হইলে, নিশ্চয় বলিতে হইবে যে, তাহার সম্পূর্ণ দায় ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতা এবং বুদ্ধিজীবিগণের যুদ্ধ-পরিচালনা। প্রকৃত বুদ্ধি-মত্তার নিমিত্ত যাহা অপরিহার্য্য রূপে আবশ্যক, তদপেক্ষা অলসতা, বিবেকহীনতা, চরিত্রহীনতা, ইন্দ্রিয়পরবশতা এবং বিলাস-চরিতার্থতা প্রভৃতির যে রাষ্ট্রনীতি অধিকতর সহায়ক হইয়াছে, ব্রিটেনের জনসাধারণ যে তাহা সহ্য করিয়াছেন, ইহাই পরিতাপের বিষয়। অতীত বিষয়ে অনুশোচনা করিয়া লাভ নাই, কিন্তু প্রত্যেক ব্রিটনের লক্ষ্যীভূত হওয়া উচিত যে, যদি তাঁহারা পুনর্ব্বার সুযোগ-লাভের উপযুক্ত সৌভাগ্যশালী হন, তবে তাঁহাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্র-নৈতিক বিচার সংস্কার অত্যাবশ্যক। নিরীহ ইংরাজ জনসাধারণের রক্ষার্থ আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, কিন্তু কিছুকাল হইতে ইংরাজের রাষ্ট্রনীতি যেরূপ পাপের প্রশ্রয় দান করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বনিয়ন্তার ন্যায়-বিচারে ইহা (অর্থাৎ ইংরাজের রাষ্ট্রনীতি) তাহার প্রাপ্য দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবে কি না, সে বিষয়ে বিবেচনা করিতে গেলেও আমাদের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। ইংলণ্ডের রাষ্ট্র-নেতাগণ তাঁহাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে অবহিত হউন, ইহাই আমাদের অভিপ্রায়—মিঃ চার্চ্চিল এবং তাঁহার অনুবর্ত্তিগণেরই তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের যে-কাহারও অপেক্ষা এতদ্বিষয়ে দায়িত্ব অধিকতর। অতীতে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনৈতিক চাল-চলনে এবং যুদ্ধ-পরিচালনায় বুদ্ধিবৃত্তির এবং সদ্বুদ্ধতার যে-প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইত, মিঃ চার্চ্চিল এবং তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের চাল-চলনে তাহার সম্পূর্ণ অভাব লক্ষ্য করিয়াই আমরা মিঃ চার্চ্চিলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করিতেছি। জার্মাণ-গণের পাশবিক সমর-চালনার রীতি অনুকরণ না করিয়াও বুদ্ধি-প্রধান যুদ্ধ-পরিচালনার দ্বারাই ব্রিটিশগণের জয় এখনও পর্য্যন্ত সুনিশ্চিত করা যায়, আমরা এই মত এখনও পোষণ করি। যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থায় কি ভাবে বুদ্ধি-প্রধান যুদ্ধ পরিচালনা করিতে হইবে, মিঃ চার্চ্চিল এবং তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ যদি তাহা না বুঝিয়া উঠিতে পারেন, উহা কি ভাবে করিতে হইবে, তাহা আমরা প্রদর্শন করিতে পারি —এ বিষয়ে আমরা তাঁহাকে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছি।

যুদ্ধের পরিণাম যেরূপ উপরিলিখিত অনুযায়ী পরিতাপ-জনক হইবার সম্ভাবনা, তেমনই মনুষ্যজাতির অবস্থাও ইহার ফলে এতদপেক্ষা অনধিক পরিতাপজনক হইবার সম্ভাবনা নাই।

কোন দেশ কিংবা জাতির অবস্থার প্রকৃত পরিমাপ করিতে হইলে, যে-সকল বিচ্ছিন্ন উপাদান সমবেতভাবে কল-প্রসূ হইতেছে, তাহাদিগের শ্রেণীবিভাগ কি প্রকারে করিতে হইবে, তাহা জানিতে হয়। সূক্ষ্ম বিচারে না যাইয়াও অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্যের অবস্থার নিরূপণের প্রধান দুইটি উপাদান হইল আর্থিক সচ্ছলতা এবং স্বাস্থ্য (শারীরিক এবং মানসিক)। কোন ব্যক্তি নিজেকে যত সামান্যই বিবেচনা করুন না কেন, কিংবা সামান্য বলিয়া নিজেকে জাহির করুন না কেন, জীবন যাপনের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যলাভের পক্ষে যথোপযুক্ত সচ্ছলতা তাঁহার না থাকিলে কিংবা জীবন উপভোগ, তথা মানসিক শান্তি ও সদ্বুদ্ধি-রক্ষার উপযোগী স্বাস্থ্য বজায় না থাকিলে তিনি যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত তাহা বলিতেই হইবে। ব্যক্তির পক্ষে যেমন ইহা সত্য, সমাজ কিংবা জাতির পক্ষেও তেমনই ইহা সত্য। কোন জাতি নিজদিগকে যতই না কেন বলশালী বিবেচনা করুক, কিংবা বলশালী বলিয়া ঘোষণা করুক, তদন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ ব্যক্তিকে যদি অর্থের এবং স্বাস্থ্যের অভাব

যোগ করিতে হয়, তবে ঐ জাতিকে দুর্দশাগ্রস্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। জাতির অবস্থা পরিমাপের এই সূত্র স্মরণে রাখিয়া এতদ্‌সাহায্যে বিভিন্ন জাতির অবস্থা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ভূমণ্ডলের প্রত্যেক জাতিই বর্ত্তমানে অন্ন-বিস্তর দুর্দশাগ্রস্ত রহিয়াছে এবং সকল জাতির এইরূপ দুর্দশার মধ্যে কেবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই তাহাদের অবস্থার পরস্পর সমতা রক্ষার প্রধানতঃ সহায়তা করিয়া আসিতেছে।

সুতরাং অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ভূমণ্ডলের প্রত্যেক জাতির অবস্থাতেই অন্ন-বিস্তর বিশৃংখলা সৃষ্ট হইবে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বিশৃংখলার প্রকৃতি কি রূপ হইবে, তাহার বিচার করিতে হইলে অনেক বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা না করাই সমীচীন, কেন না তাহাতে আতঙ্কের কারণ ঘটিতে পারে।

সংক্ষেপতঃ বলা যায় যে, বর্ত্তমানে পৃথিবীর সকল ব্যক্তি যে-উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহার সকল ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু বিপর্য্যয়ের সূত্রপাত হইবেই। আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধসূত্রে এবং চলাচলের ব্যবস্থায় বাধা ঘটিলে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ে নিশ্চিত বাধা উপস্থিত হইবে। আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ে বাধা উপস্থিত হইলে প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও বাধা উপস্থিত হইবে। বর্ত্তমান ব্যবসায়-পদ্ধতিই ইহার হেতু। প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-ব্যবস্থা কোন না কোন প্রকারে অধুনা আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ের সহিত জড়িত। এইরূপে আন্তর্জ্জাতিক এবং আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে যখন বাধা উপস্থিত হইবে, তখন প্রত্যেক দেশেরই শিল্প যখন বাজারের উপর এমন ভাবে নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, তখন তাহাতেও বাধা উপস্থিত হইবে। ব্যবসায় এবং শিল্পে বাধা উপস্থিত হইলে চাকুরী-ব্যবস্থাও অটুট থাকিতে পারে না। সুতরাং তাহাতেও বাধা উপস্থিত হইবে। এই সময়ে একমাত্র কৃষিকার্য্যের উপজীবিকাই দেশকে সচল রাখিতে পারিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্ব হইতেই সে ক্ষেত্রেও এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, কোন দেশের কৃষিকার্য্যই আর কৃষকের পক্ষে বর্ত্তমানে লাভজনক নহে। সুতরাং আমাদের পরবর্ত্তী আলোচ্য হইতেছে, এই বাধা অনিবার্য্য হইলে কি ভাবে জীবিকানির্ব্বাহ সম্ভব হইবে।

এই বাধার প্রকৃতি যাহাই হউক্ এবং তাহার প্রসার যত বিস্তৃতই হউক্ না কেন, সকল সময়েই—শ্রমজীবী কিংবা কৃষিজীবী উভয় শ্রেণীর মধ্যেই যাঁহারা প্রকৃত কর্ম্মী, তাঁহারা যদি সৎপথে থাকিয়া কর্ম্মরত থাকিতে পারেন, তবে তাঁহারা কখনও জীবিকার্জ্জনে ব্যর্থ হইতে পারেন না—ইহাই প্রকৃতির চিরন্তন বিধান। সৎ পথে থাকিয়া কার্য্য বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহা যিনি বুঝিতে সক্ষম, তাঁহার চক্ষে প্রকৃতির এই বিধানও অগোচর থাকিতে পারে না। প্রকৃতির কার্য্য-ক্রমের পারিপাটিক শৃঙ্খলা এবং বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন ব্যক্তিগত সামর্থ্যে জীবদেহের কার্য্যক্রম যিনি উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তিনি প্রকৃতির এই বিধানের মূলীভূত কারণ সমূহও নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

অতঃপর আমাদের আলোচ্য, যে-কোন অবস্থাতে জীবিকা-অর্জ্জনের সদুপায় বলিতে কি বুঝা যায়।

যে-কোন অবস্থাতে জীবিকার্জ্জনের সদুপায়সমূহ কি, তাহা বুঝিতে হইলে স্রষ্টা মনুষ্যজাতিকে যে মূলগত প্রণালী-অনুযায়ী সৃষ্টি করিয়াছেন, তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। এতদ্বিষয়ে প্রবিষ্ট হইবার চেষ্টা করিলে বুঝা যাইবে যে, মনুষ্যজাতির প্রত্যেকটি ব্যক্তি তাহার স্বকীয় অঙ্গ, কার্য্যনির্ব্বাহার্থ পাঁচটি প্রত্যঙ্গ (বাক্, পদ, পাণি, পায়ু, উপস্থ), পাঁচটি ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য ( দর্শন, শ্রবণ, গন্ধ-গ্রহণ, আস্বাদন এবং স্পর্শ) এবং বুদ্ধিবৃত্তি নামে কার্য্যকারণের যোগ-স্থাপন-সামর্থ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে। সকল ব্যক্তিই এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে, ইহা সত্য বটে, কিন্তু সকল ব্যক্তি তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়-সামর্থ্যের সমান যোগ্যতা লইয়া জন্ম-গ্রহণ করে না। এই সত্য যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, পার্থক্য ও বৈচিত্র্য বশতঃ সমগ্র মনুষ্যজাতি মূলতঃ দুই অংশে বিভক্ত। এক শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দের বুদ্ধিসাধ্য কার্য্য অপেক্ষা শারীরিক পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্যপক্ষে যোগ্যতা অধিক এবং অপর শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দের শারীরিক পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্য অপেক্ষা বুদ্ধিসাধ্য কার্য্যের যোগ্যতা অধিক।

মনুষ্যজাতির এই প্রকৃতিগত শ্রেণীবিভাগ যথাযথ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিলে, মনুষ্য-সমাজের সকল বিপর্য্যয়ের অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের জীবিকার্জ্জন পক্ষে সদুপায় কি, তাহা বুঝা অধিকতর অনায়াসসাধ্য হইবে।

উপরে মনুষ্যজাতির যে প্রকৃতিগত শ্রেণীবিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা যথাযথ ভাবে পর্য্যবেক্ষিত হইলে দেখা যাইবে যে, যাঁহাদের শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্যের প্রকৃতিগত যোগ্যতা অধিক, তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে পারিলে, তাঁহারা সকল শ্রেণীর শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি এবং চাকুরী-সংশ্লিষ্ট বিবিধ প্রকার কার্য্যের শারীরিক শ্রমসাধ্য অংশ স্বভাবতঃই অতি সুচারু ভাবে নিষ্পন্ন করিতে পারেন। এবং বুদ্ধিসাধ্য কার্য্যের পক্ষে যাঁহাদের প্রকৃতিগত যোগ্যতা অধিক, তাঁহারা যদি স্বকীয় স্বার্থের বলে শ্রমজীবিগণের স্বার্থের অনুকূলে শিক্ষালাভে ব্রতী হন, তাহা হইলে বাণিজ্য, শিল্প, কৃষিকার্য্য এবং চাকুরী-সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ বিজ্ঞান স্বভাবতঃই আয়ত্ত করিতে পারেন। অর্থাৎ, যদি বুদ্ধিজীবিগণ তাঁহাদের প্রকৃতিগত শক্তি-সামর্থ্যের যথোপযুক্ত নৈপুণ্য লাভ করিতে, এবং বিন্দুমাত্র স্বার্থপর না হইয়া শ্রমজীবিগণের স্বার্থ ও কল্যাণকল্পে কার্য্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তবে মনুষ্যজাতির শ্রমজীবী এবং বুদ্ধিজীবী কর্ম্মীদের আন্তরিক সহযোগিতা এবং সমবেত কার্য্য-প্রচেষ্টার ফলে মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকে সকল প্রকার বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও স্বকীয় জীবিকার্জ্জনে সমর্থ হইতে পারেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে, বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলকে বুদ্ধিসাধ্য কার্য্যের প্রকৃতিগত যোগ্যতা-সম্পন্ন বলা চলে না এবং তাঁহারা যথার্থ প্রণালীতে স্বকীয় সামর্থ্যের নৈপুণ্য বৃদ্ধিও যেরূপ করেন নাই, তেমনই কেবল শ্রমজীবিগণের স্বার্থ এবং কল্যাণের অনুকূলে তাঁহা-দিগকে কার্য্যে ব্রতী হইতেও দেখা যায় না।

প্রত্যেক দেশের বর্ত্তমান আইন-কানুন যথার্থ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, অধুনাতন মনুষ্য-সমাজের তথাকথিত বুদ্ধিজীবিগণ শ্রমজীবিগণের স্বার্থের অনিষ্ট সাধন করিয়া স্বকীয় স্বার্থ-সাধনেই অধিক মাত্রায় ব্যস্ত। ইহাকে জঘন্য পাপাচরণ বলিতে হয় এবং এই জন্য তাঁহারা কঠোরতম শাস্তির যোগ্য। ইহারই নিমিত্ত, অর্থাৎ এই পাপাশয়দিগের শাস্তি নিমিত্তই পৃথিবীতে বর্ত্তমান বিপর্য্যয়ের সূত্রপাত হইয়াছে। এই বিপর্য্যয়-আনয়নকারী শক্তিসমূহ সূচনায় অত্যন্ত অত্যাচারী এবং অপ্রিয় বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির কার্য্যক্রমের প্রতি অবহিত হইলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমানের তথাকথিত বুদ্ধিজীবিগণ সম্প্রদায় হিসাবে পাপাশয় হইয়া পড়িয়াছেন, এবং তাঁহাদের চালচলনেরই ইহা অতি অবশ্যম্ভাবী ফল। সমাজকে রক্ষা পাইতে হইলে, তথাকথিত এই বুদ্ধিজীবিগণকে নিজেদের চরিত্র সংশোধনে ব্রতী হইতে হইবে। প্রত্যেক দেশের এই সকল সম্প্রদায় বাধ্য হইবার পূর্ব্বে সেই কার্য্যে অবহিত হউন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।*

## রাষ্ট্রীয় ভারত

কংগ্রেসের দাবী, বড়লাটের বিবৃতি এবং মিঃ আমেরি-প্রদত্ত তাহার ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া আমরা এই সন্দর্ভ রচনা করিতেছি। রাজনীতির নামে আমাদের দেশে সর্ব্বতোভাবে কি নির্ব্বুদ্ধিতা চলিতেছে, তাহা প্রদর্শন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কংগ্রেস যে দাবী সমুত্থাপিত করিয়াছে, তাহার পশ্চাতে যে ভারতের প্রকৃত কল্যাণসাধনের ইচ্ছা বর্ত্তমান, ইহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। ভারত এবং ইংলণ্ড, উভয়েরই প্রকৃত কল্যাণ-সাধন ব্যতীত বড়লাট বাহাদুরের যে আর কোন অভিপ্রায় বিদ্যমান, এমন সন্দেহ করিবারও কোন কারণ নাই। কিন্তু তথাপি আমরা না জিজ্ঞাসা করিয়া পারিতেছি না যে, "কোন দেশ কিংবা কোন জাতির ইহাই কি প্রকৃত কল্যাণসাধন-পন্থা?"

আমরা প্রথমতঃ কংগ্রেসের পক্ষ আলোচনা করিব এবং অতঃপর বড়লাট ও ভারত-সচিবের বিবৃতি ও ব্যাখ্যার আলোচনা করিব।

কংগ্রেসের উত্থাপিত দাবী তাঁহাদের গৃহীত প্রস্তাবের নিম্নোদ্ধৃতাংশে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া আমাদের পাঠকবর্গ বিদিত আছেন:—

"ভারত, তথা বৃটেনকে, যে-সকল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, গ্রেট বৃটেন কর্ত্তৃক ভারতের স্বাধীনতার স্বীকৃতির মধ্যেই যে তাহার সমাধান, ওয়ার্কিং কমিটি এ বিষয়ে অধিকতর নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের মত এই

* "দি টাইম্‌স্ লিটারারী সাপ্লিমেণ্ট"র ২৭শে আগষ্টের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

যে, এইরূপ কোন সুস্পষ্ট ঘোষণা অনতিবিলম্বে করা উচিত এবং তাহা কার্য্যতঃ রূপান্তরিত করিবার জন্য অচিরাৎ কেন্দ্রে অস্থায়ী ভাবের জাতীয় একটি সরকার (provisional National Government) গঠনের প্রয়োজন। অস্থায়ী ভাবে গঠিত হইলেও উহা এমন হওয়া প্রয়োজন যে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সকল প্রতিনিধির বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে এবং প্রদেশসমূহের সকল দায়িত্বসম্পন্ন সরকারের সহযোগিতা লাভ করিতে পারে।"

মোটামুটি কংগ্রেসের দাবী প্রধানতঃ নিম্নলিখিত দুই প্রকার, যথা :—

(১) ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃতি-বিষয়ক গ্রেট বৃটেনের সুস্পষ্ট ঘোষণা।

(২) ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাকে কার্য্যতঃ রূপদানের নিমিত্ত অনতিবিলম্বে কেন্দ্রে এমন একটি অস্থায়ী ভাবের জাতীয় সরকার (provisional National Government) সংগঠন, যাহা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সকল নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে এবং প্রদেশসমূহের সকল দায়িত্বসম্পন্ন সরকারের সহযোগিতা লাভ করিতে পারে।

কংগ্রেসের উত্থাপিত দাবী উপরে উদ্ধৃত হইল। বড়লাট বাহাদুর যাহা দান করিতে চাহেন, নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইতেছে :—

(১) "গত অক্টোবর মাসে মহামান্য সম্রাটের সরকার (His Majesty's Government) ভারতে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ প্রতিষ্ঠাই যে তাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাহা পুনর্ব্বার স্পষ্টরূপে ঘোষণা করিয়াছেন..." "ব্রিটিশ কমনওয়েল্থ অব নেশন্সের অন্তর্গতভাবে নূতন শাসন-বিধান গঠনের উপায় বিষয়ে অনুরোধ উপস্থিত করা হইয়াছে যে, যখন সময় হইবে, তখন এইরূপ শাসন-বিধান গঠনের প্রাথমিক দায়িত্ব ভারতবাসীদিগেরই এবং সমাজ, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রীয় সংগঠনে জীবন-যাপন প্রণালীর বিষয়ে ভারতীয়গণ যে ধারণা পোষণ করেন, তাহা হইতেই তাহার উদ্ভব হওয়া উচিত। মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের সরকার এই ইচ্ছার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন এবং ভারতের সহিত গ্রেট ব্রিটেনের সুদীর্ঘ সম্পর্ক হেতু তাহার যে-সকল দায়িত্ব পালনীয় হইয়া পড়িয়াছে এবং যে-দায়িত্ব হইতে মহামান্য সম্রাটের সরকার মুক্ত হইতে পারেন না, সেই সকল দায়িত্ব যথোপযুক্তরূপ পালন করিয়া কার্য্যতঃ সেই সহানুভূতিকে তাঁহারা রূপ দান করিতে চাহেন—( with regard to the machinery for building within the British Commonwealth of Nations a new constitutional scheme when the time comes, there has been a strong insistence that the framing of that scheme should be primarily the responsibility of Indians themselves and should originate from Indian conceptions of the social, economic and political structure of Indian life. His Majesty's Government are in sympathy with that desire, and wish to see it given the fullest practical expression, subject to the due fulfilment of the obligations which Great Britain's long connexion with India has imposed upon her and for which His Majesty's Government cannot divest themselves of responsibility )"

(২) বড়লাটের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় সর্ব্বশ্রেণী হইতে নির্ব্বাচিত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কতিপয় ভারতীয়কে যোগদানার্থ নিমন্ত্রণ করিবার অধিকার মহামান্য সম্রাটের সরকার বড়লাটকে দান করিয়াছেন।

(৩) যুদ্ধ-বিষয়ক একটি পরামর্শ-সভা ( War Advisory Council ) গঠনের অধিকারও বড়লাট বাহাদুরকে মহামান্য সম্রাটের সরকার দান করিয়াছেন। এই সভা সমগ্র ভারতের জাতীয় জীবনে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, তথা ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিগণ লইয়া গঠিত হইবে এবং একটি নির্দ্দিষ্ট কাল অন্তর অন্তর ইহার অধিবেশন হইবে।

এই সকল প্রতিশ্রুতির প্রকৃতি পরিবর্তনার্থ এবং ইহা-দিগকে বিশেষ অর্থদ্যোতক করিবার নিমিত্ত বড়লাট বাহাদুরকে যে-সকল কথা ব্যবহার করিতে হইয়াছে, কংগ্রেসের উত্থাপিত দাবীতে তাহার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত নাই—ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, লর্ড লিনলিথগো-এর প্রতিশ্রুতি অপেক্ষা কংগ্রেসের দাবী অধিক স্পষ্ট। অন্যান্তরে, স্পষ্ট-বাদিত্ব সাধারণ ভাবে ব্রিটিশ জাতির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বলিয়া যদি স্বীকার করা হয়, তবে ভারতীয় কংগ্রেসের পুরোভাগস্থ ব্যক্তিবৃন্দকে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতা অপেক্ষা অধিকতর ব্রিটিশোচিত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণের অধঃপতন কিরূপ চূড়ান্ত হইয়াছে এবং স্পষ্টবাদিতারূপ তাঁহাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যও যে তাঁহারা কি পরিমাণ হারাইয়া ফেলিয়াছেন, এতদ্দ্বারা তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইতেছে। ইহা সত্যই পরিতাপের বিষয়।

উপরে কংগ্রেসের দাবী এবং বড়লাটের যে-প্রতিশ্রুতি উল্লিখিত হইল, তাহা হইতে নিম্নলিখিত তুলনামূলক পর্য্যা-লোচনা অনায়াসেই করা যাইতে পারে :—

(১) ভারতের নিমিত্ত পূর্ণ স্বাধীনতার সুস্পষ্ট ঘোষণার দাবী কংগ্রেস উত্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু বড়লাট বাহাদুর ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস এবং পূর্ণ-স্বাধীনতা একই বলিয়া যে তর্ক উঠিয়াছে, তাহার উত্তরে আমাদের জিজ্ঞাস্য, "এতদবস্থায় বড়লাট বাহাদুর পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দান কেন করিবেন না?" ইহা বলিলেও আমরা এমন কথা বলিতে চাহি না যে, বর্ত্তমান ভারতের নেতৃবৃন্দের যে অবস্থা, তাহাতে ভারত—পূর্ণ স্বাধীনতাই হউক, অথবা ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসই হউক—কোনটির যোগ্য, কিন্তু ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস ও পূর্ণ স্বাধীনতা বস্তুতঃ একই বলিয়া যে ধোঁকাবাজীর সৃষ্টি করা হইতেছে, আমরা তাহার বিরোধী।

(২) নূতন শাসন-বিধান গঠনের উপায় সম্পর্কে কংগ্রেস বাধাহীন কার্য্যাধিকার দাবী করিতেছেন, কিন্তু বড়লাট বাহাদুরের প্রতিশ্রুতিতে কতিপয় বাধার উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৩) ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতা অচিরাৎ কার্য্যকরী করিবার পন্থা হিসাবে কংগ্রেস দাবী করিতেছে—কেবল ভারতবাসিগণের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে এমনভাবে একটি জাতীয় সরকার গঠন, কিন্তু বড়লাট বাহাদুর কেবল সকীয় বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে, যুদ্ধ-বিষয়ক এমন একটি পরামর্শ-সভা এবং বড়লাটের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিস্তারের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন।

উপরি-উদ্ধৃত কয়েকটি বিষয় হইতে অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কংগ্রেসের দাবী এবং বড় লাটের প্রতিশ্রুতির মধ্যে পার্থক্য প্রকৃত প্রস্তাবে অত্যধিক।

কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের নিকট আমাদের প্রথম জিজ্ঞাস্য হইতেছে—ব্রিটিশ সরকারের বিবেচনায় যে-সকল দাবী পূরণ তাঁহারা করিতে পারিবেন না, ইহা যখন সুস্পষ্ট, তখন তাঁহাদের এমন দাবী উত্থাপন করা কেন? ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণের আসনে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ প্রতিষ্ঠিত থাকিলে এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের অবস্থায় অধিষ্ঠিত হইলে, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ কি এই-সকল দাবী পূরণ করিতেন? নিজেরা যাহা করিতে না পারা যায়, অন্যের নিকট তাহা করিবার দাবী উপস্থিত করা কেন? ইহার এক মাত্র অর্থ অনর্থক দ্বন্দ্ব-কলহের উদ্ভব। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের অতি-অবশ্য জ্ঞাতব্য এই যে, প্রকৃত উদ্দেশ্যমূলের কোন একটি মাত্রেরও স্থায়ী লাভ পক্ষে কোনপ্রকার দ্বন্দ্ব-কলহ কাহাকেও সহায়তা করে না—ইহা সকল দর্শনের সেরা দর্শন। দ্বন্দ্ব-কলহের দ্বারা অবাস্তব উদ্দেশ্যসমূহের পূরণ কোন কোন সময়ে হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাও স্থায়ী হয় না, অস্থায়ী হইয়া থাকে। স্বকীয় জীবনে যে-সকল অভিজ্ঞতা সঞ্চিত আছে, তৎসমূহ সংস্কার-বিজ্ঞির হইয়া বিশ্লেষণ করিতে পারিলে যে-কেহ উপরি-লিখিত সকল দর্শনের সেরা এই দর্শনের সত্যতার সমর্থন করিবেন। যাঁহারা যুদ্ধের পক্ষপাতী, তাঁহারা বিভিন্ন মতবাদ অনুযায়ী কার্য্য করেন, ইহা দেখা যায় বটে, কিন্তু অতীতে মনুষ্য-জগতে যে-সকল যুদ্ধ সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের ফল বিচার করিলেই প্রমাণ হইবে যে, তাঁহারা ভ্রান্ত। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যদি প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় জন,

তাঁহাদিগকে এই সত্য অনুধাবন করা অগ্রসর হইতে হইবে, নচেৎ তাঁহাদের উচ্চাশাকে দুরাকাঙ্ক্ষা বলিয়া দেখিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হইবে। বৃটিশ-সরকারের সহিত দ্বন্দ্ব-কলহ না ঘটাইয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যপূরণের আর কোন উপায় নাই বলিয়া তাঁহারা মনে করিতে পারেন এবং তাঁহারা এইরূপই মনে করেন, ইহা অতিশয় স্পষ্ট; কিন্তু আমরা বলিতেছি যে, কেবল ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ নহে, পরন্তু, সমগ্র মনুষ্যজগতের—এমন কি সশস্ত্র বিপক্ষতার বিরুদ্ধেও—এবং সকল জাতির সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাহারও কোন স্বার্থে কোন বিঘ্ন উৎপাদন না করিয়া কিংবা কিছুমাত্র কলহের সৃষ্টি না করিয়াই সমগ্র মনুষ্যসমাজের উপর ভারতের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার উপায় বর্ত্তমান। কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দ সে উপায়ের সন্ধান লাভ যদি না করিয়া থাকেন, তাঁহারা অবসর গ্রহণ করুন এবং আমাদিগকে তাঁহাদের স্থানে অধিষ্ঠিত হইতে দিন—তাহা হইলে সমগ্র জগতের সমক্ষে আমরা এখানে যাহা বলিতেছি, তাহার সত্যতা সপ্রমাণ করিব। মিঃ গান্ধী হয় তো বলিবেন যে, তাঁহার 'অহিংসা' এই উপায়ের পথিপ্রদর্শক হইবে, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত সন্দর্ভসমূহে আমরা দেখাইয়াছি যে, তাঁহার আপাতমস্তক নির্ব্বুদ্ধিতায় পরিপূর্ণ এবং যে-কথা তিনি বলেন, তাহার অর্থ নিজেই তিনি ধারণা করিতে পারেন না।

কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যদি অনুমান করেন যে, ব্রিটিশ সরকারের বিপক্ষতা করিয়াও তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করিবার যোগ্যতার সম্পূর্ণ অধিকারী, তবে জার্ম্মান এবং ইতালীয়দিগের ন্যায় সশস্ত্র সম্মুখ-যুদ্ধে অবতীর্ণ না হইয়া তাঁহারা দাবী উত্থাপনে নিজেদের কণ্ঠস্বরের প্রাবল্য প্রদর্শন করিতেছেন কেন? প্রস্তাবের মধ্যে কথার কসরৎ এবং বারপ্যাচ দেখাইয়া তাহার উপর নির্ভর করা কি পাশ্চাত্য পদ্ধতির ধোঁকাবাজী ও ধাপ্পাবাজীর অনুকরণ নহে এবং ইহা কি সম্পূর্ণ নিরর্থক নহে?

কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের নিকট আমাদের পরবর্ত্তী জিজ্ঞাস্য হইতেছে—ব্রিটিশ সরকার কর্ত্তৃক যদি তাঁহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাদত্ত হয়, তথাপি কি তাঁহারা বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণে [ অর্থাৎ (ক) বেতনভোগী নফরশিরির দাসত্ব ব্যতিরেকে ভারতবাসী প্রত্যেকটি ব্যক্তির জীবন-যাপন পক্ষে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিশ্চিত সংস্থান, (খ) ভারতবাসী প্রত্যেকটি ব্যক্তির শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক সন্তুষ্টি রক্ষার নিশ্চিত ব্যবস্থা] সমর্থ হইবেন? তাঁহারা যদি ইহার উত্তরে বলেন, "হ্যাঁ, পারিব," তবে আমাদিগকে সহজ-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ইংরাজীতে যেরূপ বলা হয়, সেইরূপ বলিতে হইবে, "দেবদূতেরা যে-অঞ্চলে যাইতে ভয় পায় নির্ব্বোধেরা সেই পথে যাইতে ব্যস্ত (Fools rush in where angels fear to tread.)" ভারতবাসী প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্য উপরি-নির্দ্দিষ্ট ভাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে যাহা প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকিলে, তাঁহারা নিমেষে বুঝিতে পারিবেন যে, ব্রিটিশ-জাতিকে কোনরূপে ক্ষুব্ধ করিলে বর্ত্তমান অবস্থায় ঐ উদ্দেশ্যসিদ্ধি অসম্ভব। ভারতবাসী প্রত্যেকটি ব্যক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ করিতে হইলে, যাহা প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান নিশ্চয়যোগ্যরূপে নির্ব্বোধোচিত বলিয়াই আমাদের নেতৃবৃন্দ বর্ত্তমান দুঃসময়েও পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলিয়া থাকেন। গত ১৮ই আগষ্টের সংখ্যা "হরিজন"-এ মিঃ গান্ধী যে সংগঠনমূলক কার্য্যপন্থার বিষয় দেশবাসীর সমক্ষে উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপেই সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে যে, ভারতবাসী প্রত্যেকটি ব্যক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্যসিদ্ধিকল্পে যাহা প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই সকল অবিবেচক এবং অর্ব্বাচীন নেতারা তাঁহাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সচেতন হউন, ইহাই আমাদের কাম্য।

কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের নিকট আমাদের তৃতীয় জিজ্ঞাস্য হইতেছে—অস্থায়ীভাবের এই জাতীয় সরকার (National Government) বিষয়ে তাঁহাদের দাবী পূরণ করা হইলে, তাঁহারা কি মিত্রপক্ষের জয় বিষয়ে তাঁহাদিগকে নিশ্চয়তা দান করিতে পারেন? তদুত্তরে যদি তাঁহারা পুনর্ব্বার "হ্যাঁ" বলেন, তবে আমরা পুনরায় তাঁহাদিগকে সেই ইংরাজী প্রবাদ শুনাইব, "দেবদূতেরা যে-অঞ্চলে যাইতে ভয় পায়, নির্ব্বোধেরা সেই পথে যাইবার জন্য ব্যস্ত।" জার্ম্মান জাতির বিরুদ্ধে জয়ী হইতে হইলে যে অত্যাশ্চর্য্য কৌশলের অধিকারী হইবার প্রয়োজন, তাহা যদি তাঁহারা পরিজ্ঞাতই থাকেন, তবে এতদিন তাঁহারা নিজেরা নীরব রহিয়াছেন

কেন, তৎসাহায্যে তাঁহারা যে-ব্রিটিশজাতিকে "শয়তান" আখ্যায় আখ্যাত করিতেছেন, এতাবৎ তাঁহাদিগের উচ্ছেদ-সাধন করেন নাই কেন ?

কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের কার্যাকলাপে এতগুলি অসঙ্গতি প্রদর্শন করা আমরা কর্তব্য বিবেচনা করিয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের বড়লাট লর্ড লিনলিথগাউ-এর কার্যকলাপ উহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহে, ইহাও আমাদের বলিতে হইতেছে। এই সকল ভারতীয় নেতাকে অধিকতর শাসনতন্ত্রগত অধিকার দানের কি সার্থকতা থাকিতে পারে, তাহা বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। এই সকল ভারতীয় নেতা যদি বিপরীত চেষ্টা করেন এবং বিপক্ষতাও করিতে থাকেন, তথাপি যুদ্ধ-চালনার উপযোগী দ্রব্যসম্ভার এবং লোকসংখ্যা ভারত হইতে সংগ্রহ করিবার পক্ষে ব্রিটিশ সরকারের কোন বেগ পাইতে হইবে না। সুতরাং বলিতে হইবে যে, শাসনতন্ত্রগত অধিকতর অধিকার দান করিয়া যুদ্ধ-চালনার পক্ষে নূতনতর কোন সুবিধালাভও যেরূপ হইবে না, তেমনই তাঁহাদিগকে এই শাসনতন্ত্রগত অধিকতর অধিকার দান না করিলে ব্রিটিশ জাতির কোন অসুবিধাও নাই। যদি কেহ তর্ক উত্থাপন করিয়া বলেন যে, ভারতবাসীর সন্তুষ্টি বিধান করিতে পারিলে যথেষ্ট সুবিধা রহিয়াছে এবং তদুদ্দেশ্যেই 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস'-এর প্রস্তাব, তবে আমরা বলিব যে, এতগুলি বৎসর ধরিয়া রাজ-প্রতিনিধির আসনে বসিয়া থাকিলেও বর্তমান বড়লাট বাহাদুর ভারতের অবস্থা প্রকৃত পক্ষে কি, তাহা যথার্থ ভাবে অনুধাবন করিতে পারেন নাই।

ভারতের প্রকৃত অবস্থা মনোযোগ সহকারে বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যাইবে যে, ভারতীয় জন-সাধারণের শতকরা পঁচানব্বই জনের উপর ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কোন একজনেরই প্রকৃত প্রাধান্য নাই, ভারতের সমগ্র অধিবাসীর শতকরা এই পঁচানব্বই জনের যে-দুর্দশা ভোগ করিতে হয়, এই নেতৃবৃন্দের শতকরা নিরানব্বই জনই তদ্বিষয়ে অজ্ঞ এবং জন-সাধারণের দুঃখে তাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি পর্যন্ত নাই। এই সকল স্বার্থপর নেতার কার্যকলাপ ও চালচলন বিষয়ে জন-সাধারণ আবার তাঁহাদের পক্ষ হইতে হয় সম্পূর্ণ অজ্ঞ, নয় উদাসীন। এই নেতৃবৃন্দের অধর্মাচরণ এবং ইংরাজীয়ানা-বিশিষ্ট চাল-চলনের নিমিত্ত জন-সাধারণের অধিকাংশই প্রায়শঃ তাঁহাদিগকে ঘৃণা করে। জন-সাধারণ যদি এই সকল নেতার কার্যে উদাসীন না হইত, তাহা হইলে ভারতে "ভেদনীতি" কখনও সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিত না এবং কোন সাম্প্রদায়িক বিবাদ কিংবা প্রদেশে প্রদেশে অমিলন দেখা যাইত না। নেতারা যখন পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করিতেছেন, তখন জন-সাধারণের সহিত কোন একজন নেতারও যেরূপ আন্তরিক যোগসূত্র থাকিলে, ব্রিটিশ সরকার পূর্ণ স্বাধীনতা দানে বিলম্বসাধনে সমর্থ হইতেন না—ইহা সাধারণ বিবেচনার দ্বারাই বুঝা যাইতে পারে। এই সকল নেতার অধিকাংশকেই "ঘো-আঁশলা" বলিতে হয়, কেন না তাঁহারা ভারতে জন্মগ্রহণ করিলেও ইউরোপীয় ধারায় চিন্তা করিয়া থাকেন এবং অনুরূপ ভাবে চলাফেরা করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানে এবং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় তাঁহাদিগের মস্তিষ্কশক্তি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের চিন্তার ধারা যন্ত্রচালিতবৎ হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্যই এই সকল নেতা তাঁহাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি বুঝিতে পারেন না, কিংবা জন-সাধারণের নিকট আন্তরিক শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারেন না। কাউন্সিল এবং এসেম্বলীতে তাঁহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হইতে সময়ে সময়ে বিপরীত অনুমান করিবার কারণ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার মূলে যে-কারণ রহিয়াছে, তাহা যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা অভ্রান্ত ভাবে সত্য।

গত পঞ্চাশ বৎসর কাল ধরিয়া ভারতবাসী জন-সাধারণ অনশনে এবং অর্ধাশনের মধ্যে, তথা অস্বাস্থ্য এবং অশান্তির মধ্যে, মহাদুঃখে জীবন অতিবাহিত করিয়া আসিতেছে। বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অবস্থা ক্রমশঃ নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর হইয়াই চলিয়াছে। সূচনায় ব্রিটিশ শাসনের প্রতি তাহাদের আস্থা ছিল এবং ব্রিটিশ শাসকবৃন্দের নিকট হইতে তাহারা দুঃখ-দুর্দশার উপশম প্রত্যাশা করিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের সে-আশা পূর্ণ হয় নাই, সুতরাং বর্তমানে যাহা কিছু ব্রিটিশ-বিরোধী, তাহারই তাহারা সমর্থন আরম্ভ করিয়াছে। এই সকল ভারতীয় নেতার উদ্দেশ্যে তাহারা কোন অনুরাগ কিংবা শ্রদ্ধা পোষণ করে বলিয়া তাহারা ইঁহাদিগকে ভোট দান করে

না, এই সকল নেতা ব্রিটিশ-বিরোধী ভাব করেন বলিয়াই, তাহারা নির্ব্বিচারে ইঁহাদিগকে ভোট দান করে। ভারতের অবশ্য ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ প্রকৃত প্রস্তাবে যদি উপলব্ধি করিতে পারিতেন এবং জন-সাধারণকে বিবিধ দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতি-দানের যথাযথ পন্থা অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে নিমেষের মধ্যে তাঁহারা দেখিতে পাইতেন যে, এই সকল ব্রিটিশ-বিরোধী নেতারা ভোটাধিক্য-লাভে অসমর্থ হইয়াছেন, এবং ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ নিজেরাই ভারতীয় জন-সাধারণের নিকট হইতে শ্রেষ্ঠ প্রশংসার অধিকারী হইয়াছেন। এবং এইরূপে ভারতের সৃষ্টি বিধান করিয়া আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে প্রমাণ করিতে পারিতেন যে, একমাত্র ব্রিটিশ জাতি বিজিত জাতির উপর শাসন-কর্তৃত্ব লাভের উপযুক্ত, অপর কোন জাতির সে যোগ্যতা নাই। ইহা না করিয়া তাঁহারা যদি ভারত-শাসনের দায়িত্ব যোগ্যতাহীন এবং নির্ভর ভারতীয় নেতাদের হস্তে ন্যস্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বিশ্বাসকে অসম্ভব করিয়া তুলিবার সাহায্য করিবেন, কেন না এই সকল "দো-আঁশলা"র শাসনে জন-সাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা অধিকতররূপে বৃদ্ধি পাইবে। এবং ইহার ফলে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ যে, কোন একটি জাতির শাসন-কর্তৃত্ব লাভের যোগ্যতার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, তাহাই প্রমাণ হইবে।

মিঃ আমেরী কর্তৃকও সকল কিছুই ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কেন যে ভারতকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিতে পারেন না, তাহা তিনি ব্যাখ্যা করেন নাই। অতি-বিলম্ব হইবার পূর্ব্বে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ তাঁহাদের স্বকীয় স্বভাব সংশোধন করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ভারতীয় ঋষিগণ তাঁহাদের রচনায় ভারতবাসি-গণের, তথা সমগ্র মনুষ্যজাতির বিবিধ দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতিলাভের প্রকৃত পন্থা কি, তাহা বিস্তৃত ভাবে এবং যুক্তিযুক্তরূপে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারা দেখাইয়া গিয়াছেন যে, উপরে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্ব্যতীত এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির আর কোন পন্থা নাই এবং ইহাই একমাত্র পন্থা। এমন একদিন ছিল, যে-দিন অধিকাংশ ভারতীয় বুদ্ধিজীবিগণ ভারতীয় ঋষি নির্দ্দিষ্ট উপরিলিখিত পন্থা পরিজ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমানে উহা বিস্মৃতিগর্ভে নিমজ্জিত রহিয়াছে।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ-সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত ব্যক্তি উহা কি জানিতে জিজ্ঞাসু হইলে আমরা সানন্দে ঐ উপায় বর্ণনা করিব। *

## মিঃ গান্ধীর সংগঠন-মূলক কার্য্য-সূচী

মিঃ গান্ধী লিখিত "সংগঠনমূলক কার্য্য-সূচীর মর্ম্ম (Implications of Constructive Programme)" শীর্ষক একটি সন্দর্ভ সংপ্রতি 'হরিজন' পত্রিকার একটি সংখ্যায় (১৮ই আগষ্ট তারিখের) প্রকাশিত হইয়াছে। এই সন্দর্ভে যে কেবল বিচক্ষণতার অভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই নহে, ইহাতে নির্ব্বুদ্ধিতাও দৃষ্ট হইবে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া মিঃ গান্ধীর এই সন্দর্ভে যে-সকল ভ্রান্তি বিদ্যমান, সাধারণের সমক্ষে তাহার উদ্ঘাটন আমরা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। মিঃ গান্ধীর যদি "অন্তরাত্মা (inner soul)"র সহিত সাধারণ পরিচয় ঘটিয়া থাকে, কিংবা অন্ততঃ তাঁহার যদি আত্ম-বিশ্লেষণের অভ্যাস থাকে, তবে প্রত্যাশা করিবার আমাদের সর্ব্বপ্রকার যুক্তি বিদ্যমান যে, আমরা যাহা বলিব তাহাতে তিনি অপমান বোধ করিবেন না কিংবা বিন্দুমাত্রও বর্ম্মাহত হইবেন না। বরং আমরা আশা করি যে, ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতে পারেন, তাঁহার এইরূপ শুভার্থী আছে জানিয়া আমাদের উদ্দেশে তিনি কৃতজ্ঞতা বোধ করিবেন এবং অবতিবিলম্বে সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করিবেন যে, তিনি এতদিন তাঁহার অনুবর্ত্তিগণকে ভ্রান্ত নির্দ্দেশ দান করিয়া আসিয়াছেন।

মিঃ গান্ধীর এই সন্দর্ভের আরম্ভ নিম্নলিখিতরূপ :—

"জনৈক পত্রলেখক লিখিতেছেন :

"সংগঠনমূলক কার্য্যসূচীর উপর জোর দিয়া জন-সাধারণের মধ্যে আপনি কোন্ কোন্ গুণের বিকাশ দেখিতে চাহেন? সংগঠনমূলক কার্য্যে ব্রতী ব্যক্তির কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে তাহার কোন্ কোন্ গুণ থাকা আবশ্যক?'

"সংগঠনমূলক কার্য্যসূচী বৃহৎ বিষয় এবং একাধিক কার্য্য ইহার অন্তর্ভুক্ত; (১) হিন্দু-মুসলমান অথবা সাম্প্রদায়িক

* যদি উহাদি 'রঙ্গশ্রী'র রংপে আগষ্টের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইত।

ঐক্য, (২) অস্পৃশ্যতা নিবারণ, (৩) নারীজাতির বন্ধন, (৪) খাদি, (৫) অপরাপর গ্রামশিল্প, (৬) পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা, (৭) অভিনব অথবা ভিত্তিগঠনকারী (basic) শিক্ষা, (৮) পূর্ণ বয়স্কের শিক্ষা, (৯) নারী-প্রগতি, (১০) স্বাস্থ্য, নীতি এবং শরীর চর্চা শিক্ষা, (১১) রাষ্ট্রভাষার উন্নতি, (১২) মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ চর্চা, (১৩) অর্থনৈতিক সাম্য সাধনের কার্য্য। প্রয়োজন হইলে তালিকায় এতদতিরিক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, কিন্তু এই তালিকা এমন ব্যাপক যে, এই তালিকায় বহির্ভূত বিষয় বলিয়া যাহা মনে হইতেছে, তাহাও ইহার অন্তর্গত বলিয়া প্রমাণিত হইবে—আমি এইরূপ মনে করি।

"পাঠকের দৃষ্টিতে পড়িবে যে, এই সকল বিষয়ের অভাবই আমাদের পরাধীনতার মূলে।···

"...কিন্তু ভিত্তিস্বরূপ যদি অর্থনৈতিক সাম্য সুপ্রতিষ্ঠিত না করা হয়, তবে এই কার্য্যসূচীর সমগ্রাংশই বালুকার উপর প্রাসাদ-নির্ম্মাণ তুল্য হইবে। সকলেই যে ঐহিক আকাঙ্ক্ষার দ্রব্যসমূহের সমান ভাগের অধিকারী হইবেন, অর্থনৈতিক সাম্যের এমন অর্থধান সম্ভবীন হইবে না। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিরই বাসোপযোগী আবাসগৃহ, যথেষ্ট এবং যথোচিত খাদ্য, পরিধেয়ের পক্ষে যথেষ্ট খাদি বস্ত্রের সংস্থান থাকিবে, এই কথা হইতে তাহা বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমানে এই ক্ষেত্রে যে ভয়াবহ অসাম্য বিরাজ করিতেছে, তাহা অবিমিশ্র অহিংস উপায়ে বিদূরিত হইবে, এই কথা হইতে তাহাও বুঝিতে হইবে।"

আমাদের মতে যে-কার্য্য-সূচী কেবল মাত্র ভারতের স্বাধীনতা (ঐ পদের প্রকৃত অর্থে) অর্জ্জন এবং রক্ষা নহে, পরন্তু সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতির স্বাধীনতার নিশ্চিত সহায়ক হইতে পারে, মিঃ গান্ধীর কার্য্য-সূচীর ত্রুটি কোথায় তাহা প্রদর্শনার্থ, পাঠকবৃন্দের সমক্ষে সেই কার্য্যসূচী উপস্থাপিত করা বিধেয় মনে করিতেছি। ইহাতে, উভয়ের তুলনা করিয়া পাঠক-বৃন্দের পক্ষে মিঃ গান্ধীর কার্য্য-সূচীর ত্রুটি কোথায়, তাহা বুঝা সহজসাধ্য হইবে।

যে কার্য্য-সূচী ভারত, তথা পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জ্জন এবং রক্ষার পক্ষে সুনিশ্চিত সহায়ক হইতে পারে, মূলতঃ তাহাকে দুই ধারায় বিভাগ করা যাইতে পারে, যথা :—

[ ক ] ভারতের অধিকাংশ অধিবাসী যে-সংগঠনের সাহায্যে কোন প্রকার বেতনভোগী চাকুরীর সহায়তা ব্যতিরেকে সুস্থ জীবন-যাপন পক্ষে আর্থিক ভাবে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য উপার্জ্জন করিতে পারিবে, তাহার ব্যবস্থা।

[ খ ] ভারতবাসী প্রত্যেকটি ব্যক্তি যে-শিক্ষাপদ্ধতির সাহায্যে সকল প্রকার রিপু দমন করিতে পারিবে এবং যাহাতে, ভারতের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় পৃথিবীর অপরাপর দেশের অধিবাসীকে ঐ শিক্ষা (অর্থাৎ কি করিয়া রিপু দমন করিতে হইবে) তথা বেতনভোগী চাকুরী অর্থাৎ নফরগিরি ব্যতিরেকেই কি করিয়া সুস্থ জীবন-যাপন পক্ষে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, তাহার শিক্ষা দান করিতে পারিবে, সেই ব্যবস্থা।

ভারতের অধিকাংশ ব্যক্তির যাহাতে সুস্থ জীবন-যাপন পক্ষে তাহাদের ন্যূনতম আর্থিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য উপার্জ্জন করিতে নফরগিরির আশ্রয় গ্রহণ না করিতে হয়, অনতি-বিলম্বে এমন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে প্রধানতঃ নিম্নোক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন, যথা :—

(১) দেশের নদীসমূহের এবং অন্যান্য স্রোতস্বিনীর সকল বাধা অপসৃত করিয়া তথায় স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির পুনরুদ্ধার এবং তথাকথিত যে-সকল বৈজ্ঞানিক সংগঠন দেশের জলহাওয়াকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে, তাহাদিগের উচ্ছেদ সাধন-পূর্ব্বক ঐ স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির সর্ব্ববিধ উৎকর্ষ সাধন।

(২) বর্ত্তমানে যাঁহারা যন্ত্র-চালিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অধিকারী, তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া সকল যন্ত্র-চালিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উচ্ছেদ সাধন-পূর্ব্বক আহার্য্য এবং পরিধেয়ের ব্যবস্থায় শুধু কৃষকগণকে তাহাদের অবসরের কয়েক মাস কুটির-শিল্পের কার্য্যে নিয়োগ সাধন।

(৩) যতদিন পর্য্যন্ত না জমীর সর্ব্বনিম্ন স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তির পুনরুদ্ধার হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত সকল খাজনা ও কর প্রদান হইতে কৃষক শ্রেণীকে নিষ্কৃতিদান এবং কেবল কাগজের নোট প্রচলন করিয়া রাষ্ট্রের ব্যয়-পরিচালন ব্যবস্থা।

(৪) যে-দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে-পরিমাণ শ্রমিক-সংখ্যার প্রয়োজন, তাহার সমগ্রাংশ এবং শ্রমিক-শিল্পীদের বেতনের হারের অনুপাতে সেই দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ।

(৫) সমগ্র দেশে দুই বৎসর কালের মধ্যে যে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন হইবে, তাহার সমগ্রাংশের তুল্য মূল্যের মধ্যে ধাতু-মুদ্রা এবং কাগজের নোট প্রচলনের সমগ্র পরিমাণ আবদ্ধ রাখা।

(৬) স্থল এবং বায়ুপথে সকল যন্ত্রযান চলাচলের উচ্ছেদ সাধন এবং তৎপরিবর্ত্তে জলপথে যন্ত্রযানে চলাচলের ব্যবস্থা।

(৭) চলাচল নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সমগ্র শ্রমিক-সংখ্যার পারিশ্রমিকের মূল্যের অনুপাতে চলাচল-ব্যবস্থার মূল্যের হার নির্দ্ধারণ।

(৮) সরকারী এবং বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্ম্মচারী-বৃন্দের পরিবারের স্বচ্ছন্দ প্রতিপালনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের সমগ্রাংশের মূল্যের অনুপাতে তাঁহাদের বেতনের হার নির্দ্ধারণ।

(৯) সরকারী এবং বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্ম্মচারী হইবার নিমিত্ত ব্যক্তিবিশেষের যেরূপ চরিত্র ও সততার অধিকারী হইতে হইবে, তাহার পরীক্ষার ব্যবস্থা।

(১০) সকল প্রকার উত্তেজনা এবং বিপুবমনে সম্পূর্ণ সমর্থ হইয়াছেন কি না কিংবা সকল অবস্থায় সত্যবাদিতা রক্ষা করিতে পারেন কি না, তাহার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতে পারিলে প্রার্থী যত গুণসম্পন্নই হউন না কেন, সরকারী এবং বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানসমূহে কোন প্রকার চাকুরী পাইবেন না, এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন।

(১১) চরাচরে, এবং জীবদেহে কোন্ প্রকৃতিগত শৃঙ্খলায় তেজ, রস, এবং বায়ু কার্য্যকরী হইতেছে, তথা অনুভবশক্তি এবং জমীর উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধির প্রকৃতিগত পন্থা কি, তদ্বিষয়ক গবেষণার ব্যবস্থা।

(১২) একাদশ প্রকার যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই প্রকৃতিগত শৃঙ্খলা এবং প্রকৃতিগত পন্থার জ্ঞান যাঁহার না থাকিবে এবং নিজের অতীত কার্য্যের দ্বারা যে-ব্যক্তি তাঁহার পরিবার প্রতিপালনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কৃষকগণকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে অর্থসাহায্যে প্রবৃত্ত না করিতে পারিবেন, তিনি যাহাতে সরকারী এবং বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানসমূহের উপরিতন কর্ম্মচারীর পদলাভে সমর্থ না হন,—অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন।

(১৩) সরকারী উপরিতন কর্ম্মচারীর কোন পদই বেতন-ভোগী হইবে না, সকল পদই অবৈতনিক হইবে, অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন।

(১৪) শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের নিমিত্ত বিনামূল্যে মৌখিক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং তাঁহারা যাহাতে কৃষি ও শিল্প-কার্য্যের পদ্ধতিমূলক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তথা উত্তেজনা এবং বিপুবমনে অভ্যস্ত হন,—অনুরূপ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন।

(১৫) চলাচল ব্যবস্থার নিমিত্ত যন্ত্রযান-নির্ম্মাণ শিল্প সংরক্ষণ এবং সরকার হইতে তাহার পরিচালনার ব্যবস্থা।

(১৬) চলাচলের নিমিত্ত যন্ত্রযান নির্ম্মাণের এবং পরি-চালনার সকল প্রকার বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের উচ্ছেদ।

(১৭) বাণিজ্য, ব্যবসায়, বীমা এবং ব্যাঙ্কিং পরিচালনার সকল প্রকার বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের উচ্ছেদ এবং বর্ত্তমানে ঐ সকলের যাঁহারা অধিকারী, তাঁহাদিগকে যথোপযুক্তরূপ ক্ষতিপূরণ দিয়া সরকার হইতে উহাদের পরিচালনার ব্যবস্থা।

(১৮) বাণিজ্য, ব্যবসায়, বীমা, ব্যাঙ্কিং, যন্ত্রচালিত চলাচল-ব্যবস্থা এবং জমিদারী প্রভৃতিতে যে-সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত যথাযথ রূপ ও অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা।

(১৯) যাঁহারা জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তির পুনরুদ্ধার, রক্ষা এবং বৃদ্ধির পন্থাসমূহ—তথা শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে যে শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইবে, তাহার পদ্ধতি—পরিজ্ঞাত হইবেন, কেবল তাঁহাদিগকেই বে-সরকারী ভাবে জমিদারী চালাইবার অনুমতি দান।

(২০) যাঁহারা জীবিকার্জ্জন-কল্পে প্রত্যক্ষ কিংবা অপ্রত্যক্ষ ভাবে কোনরূপ সমাজ-সেবা, তথা ধর্ম্মানুষ্ঠানের কার্য্যকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকে গুরুতর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা।

ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীকে বেতনভোগী নফরগিরির সহায়তা ব্যতিরেকে সুষ্ঠু ভাবে জীবনযাপন পক্ষে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম দ্রব্যসমূহ উপার্জ্জন করিতে হইলে যে-সকল সংগঠন আবশ্যক, তদ্ব্যতীত অপরাপর ব্যবস্থারও প্রয়োজন, ইহা অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে, কিন্তু তাহা বিস্তৃত আলোচনাসাপেক্ষ। সুতরাং বর্ত্তমানে আমরা সে আলোচনা হইতে নিবৃত্ত থাকিব। ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, চরম উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইবে।

ইহা অতি অবশ্য লক্ষ্যণীয় যে, সমগ্র মনুষ্যজাতির পক্ষে অনুরূপ স্বাধীনতা ব্যবস্থিত না হইলে বিচ্ছিন্ন ভাবে কোন একটিমাত্র জাতির পক্ষে আর্থিক অভাব অথবা স্বাস্থ্য-রক্ষার অনুকূল অবস্থার অভাব হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের ব্যবস্থা সাধিত হইতে পারে না। কেন না যে জাতিকে এই সকল দুর্দশা ভোগ করিতে হইবে, লুণ্ঠন করিয়া হউক কিংবা প্রতারণা করিয়া হউক, তাহাদের নিজেদের জীবিকা অর্জ্জনে বাধা হইতে হইবে। এই কারণ বশতঃই ভারতকে, তাহার অধিবাসী সমূহের প্রত্যেকের সুস্থ জীবন-যাপন পক্ষে সর্ব্ব-নিম্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করিতে হইলে সমগ্র মনুষ্যজাতির হইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। ভারতের ভৌগোলিক এবং জ্যোতিষিক অবস্থান বিবেচনা করিলে এবং ভারতের বুদ্ধিজীবী সন্তান সন্ততিরা যদি নিজেদের বর্ত্তমান নির্ব্বুদ্ধিতা পরিহারে প্রস্তুত হন, তবে ভারতের পক্ষে ঐ কার্য্য সাধনে মোটেই বেগ পাইতে হইবে না। আর কোন পক্ষ ইহা সাধন না করিতে পারিলে, যদি মিঃ গান্ধী এবং লর্ড লিনলিথগাউ-এর ন্যায় কাহাকেও আমাদের অনুবর্ত্তী হিসাবে আমরা লাভ করি, তবে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দান করিতেছি—আমরাই উহা সাধন করিব। সমগ্র মনুষ্যজাতিকে বর্ত্তমান দুর্দশা হইতে মুক্তিদান করিতে পারে একমাত্র ভারত, সমগ্র পৃথিবীবাসীর পক্ষে ইহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে এবং ভারতের হিন্দু নেতাগণের তথা ব্রিটিশ রাজনৈতিকগণের ভ্রান্ত এবং পাশবিক আচরণ বশতঃই সমগ্র মনুষ্যজাতিকে বর্ত্তমানের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে জীবন যাপন করিতে হইতেছে, ইহাও তাঁহাদের বুঝিবার সময় হইয়াছে। নিজেদের এই পাপাচরণের জন্য এই দুই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদিগকেই সুকঠিন শাস্তির জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

মিঃ গান্ধী-প্রস্তাবিত কার্য্যসূচীর মধ্যে যে-সকল ভুল-ভ্রান্তি বর্ত্তমান, অতঃপর আমরা তাহার আলোচনা করিতেছি। দেশের প্রত্যেকের সুস্থ জীবনযাপনার্থ ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত না হইলে এবং কি করিয়া উত্তেজনা এবং রিপুদমন করিতে হইবে তাহার শিক্ষা উহারা লাভ না করিলে আন্তরিক ভাবের হিন্দু-মুসলমান অথবা সাম্প্রদায়িক ঐক্যসাধন অসম্ভব। আমরা কেন এই কথা বলিতেছি, তাহা, যাঁহাদের মনুষ্যোচিত মস্তিষ্ক-সামর্থ্য বর্ত্তমান, তাঁহারা যদি লক্ষ্য করিয়া দেখেন কেন দ্বন্দ্ব-কলহের উদ্ভব হয়, তবে তাঁহাদের পক্ষে বুঝা দুঃসাধ্য হইবে না। আর্থিক অভাব, তথা উত্তেজনা এবং রিপুপরবশতা মূলে না থাকিলে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব-কলহের উদ্ভব হইতে পারে না—ইহা অত্যন্ত সাধারণ ধর্ম্মবোধ ও জ্ঞান। কিন্তু তাহাতে ঐ উদ্ভব বিদ্যমান। তথাকথিত "সভ্যতা" ইত্যাদি প্রবর্ত্তিত বর্ত্তমান কালের যে-সকল কারখানা বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া চলিয়া যাইতেছে, তথায় কেবল প্রধানতঃ রিপুর উত্তেজনামূলক শিক্ষাই দান করা হইয়া থাকে। অর্থনীতি-ক্ষেত্রে জীবন-যাত্রার মান-বৃদ্ধির চীৎকার দ্বারা ক্রমাগত অভাব বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। এমতাবস্থায় আমূল পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়া সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন নির্ব্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছু কি না, তাহা আমরা আমাদের পাঠকবৃন্দকে অনুধাবন করিয়া দেখিতে বলি।

যখন সর্ব্বত্র অস্পৃশ্যতাকে ধর্ম্মানুষ্ঠানমূলক বলিয়া বিবেচনা করিবার ন্যায় লোক বর্ত্তমান, সেই অবস্থায় অস্পৃশ্যতা নিবারণের প্রসঙ্গ উত্থাপনে দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টি হইতে বাধ্য। সুতরাং একই নিঃশ্বাসে ঐক্যসাধন ও অস্পৃশ্যতা নিবারণের প্রসঙ্গ উত্থাপন নিরর্থক। উপরন্তু, চরাচরস্থ এবং জীবদেহস্থ তেজ, রস, ও বায়ুর কার্য্যকলাপের প্রকৃতিগত বিধানের সহিত জন-সাধারণের যখন পরিচয় হইবে, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, মনুষ্য-মস্তিষ্ক-সাধ্যের কোন কোন অবস্থায় আংশিকভাবে অস্পৃশ্যতা পালন মনুষ্যজাতিরই কল্যাণসাধন করে প্রয়োজন। সুতরাং বিশ্ব-পৃথিবীর মূল কারণ কার্য্যতঃ উপলব্ধি না করিয়া কিংবা তাহা হইতে কোন্ কোন্ কারণে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা অনুধাবন না করিয়া কত কাল হইতে প্রাগৈতিহাসিক যে-সকল বাধা-নিষেধ প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, তাহা নিবারণের প্রসঙ্গ উত্থাপন সম্পূর্ণ এবং অবিমিশ্র ধান্ধিকতা।

সমগ্র ভাবে মাদক দ্রব্য বর্জ্জনের প্রসঙ্গ উত্থাপন, অপর একটি নির্ব্বোধোচিত ব্যাপার। বুদ্ধি এবং শরীর-বৃদ্ধির প্রকৃতিগত বিধান যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের পক্ষে কখনও কখনও মাদক গ্রহণের প্রয়োজন, কিন্তু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের পক্ষে ইহা অত্যন্ত অনিষ্ট-সাধক। উপরন্তু দেশের সর্ব্বত্রই যখন মাদক গ্রহণের অনুকূল মতাবলম্বী লোক বর্ত্তমান, তখন যে শিক্ষা-ব্যবস্থায় মাদকগ্রহণ প্রবৃত্তি সংযত হইতে পারে, তাহার ভিত্তি স্থাপিত না করিয়া একই নিঃশ্বাসে ঐক্যসাধন ও মাদক দ্রব্য বর্জ্জনের প্রসঙ্গ উত্থাপন অতিশয় অযৌক্তিক।

সমগ্র ভাবে স্ত্রী প্রবর্ত্তনের প্রসঙ্গ উত্থাপন মনুষ্যদেহের আজ্ঞাধীন সম্পর্কিত কারণসমূহের নীতিবিষয়ক জ্ঞানের অভাবের পরিচায়ক। যাহা ব্যয় না করিলে নহে, কোন বিষয়ে তদপেক্ষা অধিক ব্যয়ের জন্য দরিদ্র সাধারণকে প্রণোদিত করা বিলাসের প্রশ্রয় দান এবং ইহা কোনও ক্ষিপ্ত ব্যক্তি সমর্থন করিবেন না। স্ত্রীকে যদি কুটীর-শিল্পের প্রতীক স্বরূপ ধরা হয়, তথাপি মনে রাখা উচিত যে, বর্ত্তমান ব্যবস্থায় কুটীর-শিল্পের প্রসার সাধন অসাধ্য, কেন না জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি না পাইলে এবং অতএব জমীতে বৎসরের পাঁচমাস মাত্র পরিশ্রম করিয়া কৃষকগণ সমৎসরের খাদ্য সংস্থান না করিতে পারিলে, তথা অবসর-কালে কুটীর-

শিল্পে কৃষকদিগের এমন ভাবের নিয়োগ সাধন যদি সম্ভব না হয়, যাহাতে এই শিল্পকার্য্য-প্রসূত আয়ের উপর তাহাদের প্রত্যাশা না রাখিতে হয় তবে যন্ত্র-শিল্পের প্রতিযোগিতায় কুটীরশিল্প কখনও টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। মিঃ গান্ধীর পর্য্যায়ের অনভিজ্ঞ একটি ব্যারিষ্টারের পক্ষে এই সকল বিষয় অনুসরণ অত্যন্ত দুরূহ, এই ভয় আমাদের অবশ্য আছে। আমাদের কেবল এই অনুরোধ যে, বর্ণপরিচয়ে প্রবিষ্ট না হইয়া বাক্যের মর্ম্মানুধাবনের চেষ্টায় তিনি অধিকতর অগ্রসর না হইলেই ভাল।

জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির যথেষ্টভাবে বৃদ্ধিসাধন করিয়া বৎসরের পাঁচমাস কাল মাত্র জমীতে খাটিয়া কৃষকগণের সম্বাৎসরিক খাদ্য-সংস্থান যাহাতে সম্ভাবিত হয়, তাহা না করিতে পারিলে অপরাপর কুটীরশিল্পের উৎকর্ষ সাধনও অসাধ্য ব্যাপার।

স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা কি, তাহা না জানিয়া পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার প্রসঙ্গ উত্থাপন নিরর্থক। প্রকৃত স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে চরাচরস্থ জলাশয়ের উপরিভাগে, স্থলে এবং জীবদেহে সতত সঞ্চরমান তেজ, রস ও বায়ুর কার্য্য-কলাপের প্রকৃতিগত বিধানের জ্ঞানের অত্যাবশ্যক। পৃথিবী-ব্যাপী আধুনিক পণ্ডিতসমূহের অবস্থা হইতে এবং মনুষ্যবাসপক্ষে তাহারা যেরূপ অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইতেই বর্ত্তমান স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান যে যথোপযুক্ত নহে, তাহা স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইবে। তাহাই যদি না হইত, তবে পল্লীবাসীদিগের ক্রমাগত স্বাস্থ্য-পরিবর্ত্তনের বিষয় চিন্তা করিতে হইত না।

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, তৎসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র না পরিজ্ঞাত হইয়া শিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন প্রহসন মাত্র। মিঃ গান্ধীর রচনা এবং বক্তৃতার কুত্রাপি আমরা এখন কোন উল্লেখ দেখি নাই, যাহাতে এই বিষয়ে তাঁহার সামান্য জ্ঞান আছে বলিয়া কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারেন। উপরন্তু, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর ব্যক্তিবৃন্দ কর্ত্তৃক কোন প্রকৃত শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসৃত হইতে পারে না। জন-সাধারণের ক্ষুধা-তৃষ্ণার ব্যবস্থা সাধন না করিয়া আমূল কোন প্রকার শিক্ষার প্রসঙ্গ উত্থাপন নিরর্থক, আমরা এই কথা বলিলে পাঠকবৃন্দ আমাদের সহিত একমত হইবেন, ইহা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি।

নারীপ্রগতির প্রসঙ্গ উত্থাপন অপর একটি অর্থহীন বিষয়। পুরুষজাতি যথোপযুক্ত না হইতে পারিলে, যাঁহারা পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী, তাঁহাদের উন্নতি কখনও বিহিত হইতে পারে না, ইহা বলা কি অন্যায় হইবে? পুরুষগণ যদি ক্রমশঃ নিকৃষ্ট চরিত্রের হইয়া পড়েন, তবে অর্দ্ধাঙ্গিনীদিগকেও কি তাহা সংক্রামিত করিবে না? যদি সুস্থ জীবন-যাপনের উপযোগী ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য উপার্জ্জনের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা কিরূপে বিহিত হইবে, দেশের পুরুষদিগকে তাহা প্রদর্শিত না হয়, তবে নারীজাতির উন্নতি কি করিয়া সম্ভব হইবে?

প্রকৃত স্বাস্থ্যনীতি এবং স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে যথার্থ ভাবের স্বাস্থ্যনীতি এবং স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের শিক্ষাদান অসম্ভব। আমরা এই সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি, অধুনা তাহার আর পুনরাবৃত্তি করিব না।

রাষ্ট্রভাষা প্রচারের প্রসঙ্গ হইতে প্রমাণিত হয় যে, মনুষ্যের ভাষানিহিত প্রকৃত বিজ্ঞান সম্বন্ধে মিঃ গান্ধীর কোন ধারণাই নাই। এই বিষয়ক প্রকৃত বিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, সকল ভাষা বুঝিবার উপযোগী একটি সর্ব্বাশ্রয়ী পদ্ধতি বর্ত্তমান বটে, কিন্তু কোন বিশেষ ভাষা কখনও সর্ব্বাশ্রয়ী হইতে পারে না। রাষ্ট্রভাষা অথবা সর্ব্বাশ্রয়ী কোন ভাষা তৈয়ারীর চেষ্টা কেবলমাত্র জন কয়েকের মধ্যে ধারণা আদান-প্রদানের যোগ্য, একটি গোপনীয় পদ্ধতির ভাষা-সৃষ্টিতে পর্য্যবসিত হইতে বাধ্য—কিন্তু অধিকাংশের শ্রবণ হইতে সে-ধারণা চিরকাল সুগোপন থাকিতেও বাধ্য। ইহা নিকৃষ্ট প্রকারের অসাধুতা এবং সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

কাহারও মাতৃভাষা সম্বন্ধে অনুরাগ-চর্চ্চার প্রসঙ্গ উত্থাপন অর্থহীন, কেন না অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষেই ইহা স্বাভাবিক। ভারতে যে কতিপয় 'দো-আঁশলা' শ্রেণীর ব্যক্তি সৃষ্ট হয়, তাঁহাদের আচরণ অবশ্য স্বতন্ত্র। তাঁহাদের অধিকাংশই মিঃ গান্ধীর নেতৃত্বাধীন অথবা কাহারও নেতৃত্বাধীন নহেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন আশাপোষণ নিরর্থক, কেন না বস্তুতঃ তাঁহারা মনুষ্যদেহে পশু মাত্র। তদুপরি ইহাকে কোন সর্ব্বব্যাপক কার্য্যসূচীর বিষয়ীভূত করিবারও তেমন কোন প্রয়োজন নাই, কেন না মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তির ইহা বিলাস মাত্র।

অর্থনৈতিক সমতা কি করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহার কোন নির্দ্দেশ দান না করিয়া ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপনের দ্বারা কি কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে? ইহা আমার অপর একটি প্রহসন।

জন-সাধারণ তাঁহাদের এই নেতাটির স্বরূপ দর্শন করিতে অবহিত হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।*

---

* 'দি ইউরেলি ফরেষ্টার' ১৯৩৯ আষাঢ়ের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

## আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে সংঘর্ষ কি অনিবার্য্য ?

—শ্রীনির্ম্মলকুমার ঘোষ

গত সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম যে, রাশিয়া দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধকে পৃথিবীর সমুদয় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া পরিশেষে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এক সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের ব্যবস্থা-পত্তনের জন্য অভিলাষী ; এবং সেই ব্যবস্থা-পত্তনকে ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে আপাততঃ সে অন্যতম সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া লড়াইবার জন্য অন্যতম জঙ্গী রাষ্ট্র জার্ম্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ-চুক্তি যেরূপ সহজেই করিয়াছে, জাপানের সঙ্গেও অনুরূপ একটি চুক্তি করিতে পারে। এবং জাপ-সোভিয়েট চুক্তির ফলে চীন হইতে বৃটেনের অর্থনৈতিক স্বার্থ ও মর্য্যাদা লোপ পাইতে বাধ্য। সাম্প্রতিক আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি যাঁহারা লক্ষ্য করিতেছেন, তাঁহারা আর এখন জাপ-সোভিয়েট চুক্তিকে অসম্ভব বলিয়া মনে করেন না।

কিন্তু শুধু বৃটেনকে পরোক্ষে ধ্বংস করিবার জন্যই যে রাশিয়া এইরূপে জার্ম্মানী ও জাপানকে সাহায্য করিতেছে তাহা নহে। বৃটিশ-জার্ম্মান যুদ্ধে, অনেকে সন্দেহ করিয়াছিল, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনকে সহায়তা করিবে এবং ফলে ইয়োরোপীয় যুদ্ধ আমেরিকা অবধি বিস্তৃত হইবে। যদিও কানাডার সহিত একটি যুক্ত-রক্ষামূলক সামরিক ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি অবলম্বন করিয়াছে, এবং এচ. জি. ওয়েল্‌স্-প্রমুখ অনেক আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভদ্রলোকেরা ইংরেজী ভাষা-ভাষীদের একটি অখণ্ড যুক্তরাষ্ট্রিক ব্যবস্থা অ-সৌখে পত্তন করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না, তথাপি দেখা যাইতেছে যে, যুক্তরাষ্ট্র আপাততঃ যুদ্ধে যোগদানের প্রশ্নটাকে এড়াইয়াই যাইতে চায়—আত্মরক্ষা এবং যাহাতে পশ্চিম গোলার্দ্ধে যুদ্ধ বিস্তৃত না হয় তদ্বিষয়েই সে মনোনিবেশ করিয়াছে।

সুতরাং মহাসমরকে পৃথিবীব্যাপী করিয়া তুলিতে হইলে প্রশান্ত মহাসাগরের শান্তিকেও বিনষ্ট করা দরকার। এবং এই ব্যাপারটা সম্ভবপর হয় যদি জাপানকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়ানো যায়।

জাপানে ও যুক্তরাষ্ট্রে সংঘর্ষ কি সত্যই অনিবার্য্য ?

সংঘর্ষ এই জন্যই অনিবার্য্য, যে হেতু চীনে, ইন্দোচীনে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের প্রায় পাঁচ হাজার দ্বীপে যুক্তরাষ্ট্রের অপরিমিত অর্থ, বাণিজ্য ও অন্যান্য ব্যাপারে নিয়োজিত রহিয়াছে। যদি জাপান পূর্ব্ব-এশিয়ায় প্রাধান্য লাভ করে, তবে ঐ অঞ্চল হইতে অদূর-ভবিষ্যতে অন্যান্য ইয়োরোপীয় জাতির ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রকেও সরিয়া পড়িতে হইবে। শুধু সরিয়া পড়িলেই যদি সমস্যা মিটিয়া যাইত, তবে কথা ছিল না ; কিন্তু অতিরিক্ত ক্ষমতা ও সম্পত্তি হাতে পাইলে জাপান যে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রশান্ত মহাসাগরের সীমানার পারে কোণঠাসা করিয়া রাখিবে না, এবং দক্ষিণ আমেরিকা ও পূর্ব্বগোলার্দ্ধের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যের পথ বন্ধ করিয়া তাহাকে ভাতে মারিবার চেষ্টা করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে ? অন্ততঃ যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামরিক মুরুব্বরেরা সেইরূপ আশঙ্কাই করেন।

অবশ্য চেষ্টা চলিতেছে, যাহাতে জাপানের সঙ্গে একটা রফা করিয়া পূর্ব্ব গোলার্দ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ইজ্জৎ ও ঐশ্বর্য্য বজায় রাখা যায়। হয় তো সাময়িক ভাবে রফা হইয়া যাইতেও পারে, কিন্তু সে রফা চিরস্থায়ী হইতে পারিবে না। কেন হইবে না সে সম্বন্ধে যাহা মনে হয় তাহা লিখিতেছি :

প্রশান্ত মহাসাগরের আশে পাশে যুক্তরাষ্ট্রের বণিকদের অন্যূন পঁচাত্তর কোটি ডলার ব্যবসায়ে নিয়োজিত রহিয়াছে। ১৯৩৮ সালে এক সুদূর প্রাচ্য অঞ্চলেই তাহার রপ্তানী-

বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল অন্যূন আট কোটি ডলার। জাপানের সার্ব্বভৌমত্ব সুদূর প্রাচ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে এত বড় বাণিজ্যটা ধ্বংস হইতে বিলম্ব হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করিতে পারিলে পোর্ট্স্মাউথকে যেরূপ দ্বিধাবিভক্ত করা হইয়াছিল, রাশিয়া ও জাপান মহাচীনকেও সেইরূপ ভাগ করিয়া লইতে পারে। ফলে দক্ষিণ ও উত্তর চীনের অপর্য্যাপ্ত খনিজ সম্পদ্ এবং পূর্ব্বচীনের শস্য ও ফসলাদি জাপানের অধিকারে আসিবে; এবং এই অপরিমিত সম্পত্তি আহরণ করিয়া জাপানের সমর-লালসা পৃথিবীতে জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে একচ্ছত্র করিবার অভিযানে নিয়োজিত হইবে।

যুক্তরাষ্ট্র এই বিপদ সম্পর্কে অন্ধ নয়; জাপানকে প্রতিহত করিবার আয়োজন ইতিমধ্যেই সে শুরু করিয়া দিয়াছে।

আমাদের জানা দরকার যে, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে বিরাট প্রশান্ত মহাসাগর অবস্থিত। চীনের উপকূল হইতে আমেরিকার উপকূলের নিকটতম দূরত্ব সাত হাজার মাইল, এবং এই বিপুল সমুদ্রের উপর অন্যূন পাঁচ হাজার দ্বীপ রহিয়াছে। এই দ্বীপগুলির অধিকাংশই মনুষ্যস্পর্শ-বিরহিত; এতাবৎ উহাদের উপর কাহারও বিশেষ নজর ছিল না। কিন্তু ইদানিং এই সকল দ্বীপে অনেকগুলিই সামরিক কর্তৃপক্ষের অধীন করিয়া হয় জাপান নয় যুক্তরাষ্ট্র সুদৃঢ় নৌ ও বিমান-ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিতেছে। এই ব্যয়ের পরিমাণ যে কিরূপ তাহার উদাহরণ দিতেছি:

জাপান ও আমেরিকার মধ্যস্থলে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত; ইহা যুক্তরাষ্ট্রের অধীন এবং প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে প্রধানতম নৌ-বন্দর। বলা বাহুল্য, যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরস্থ বিরাট নৌ-ও বিমান-ঘাঁটির আজ্ঞাবহ ইহাই। এই হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের প্রায় ১,৩০০ নাইল পশ্চিমোত্তরে মিডওয়ে দ্বীপ, এবং ২,০১৫ মাইল পশ্চিমে গুয়েম্ দ্বীপ। এই দ্বীপ দুইটিকে সুরক্ষিত করিবার জন্য অন্যূন সাড়ে পঞ্চান্ন লক্ষ ডলার ব্যয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ পার্ল বন্দরকে সুদৃঢ় করিবার জন্য ৭০ কোটি ডলার বরাদ্দ হইতেছে। প্রশান্ত ও অতলান্তিক মহাসাগরে পৃথক্ পৃথক্ দুইটি নৌ-বহর গঠন করিবার নিমিত্ত গত এপ্রিল মাসের পর প্রায় ৯১ কোটি ডলার মঞ্জুর করা হইয়াছে!

জাপানও চুপ করিয়া বসিয়া নাই। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে তাহার অধীনে প্রায় দেড় হাজার ছোট-বড় দ্বীপ রহিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশেও তাহার সাইপান প্রভৃতি বহুতর শক্তিশালী ঘাঁটি রহিয়াছে।

উভয় পক্ষের এই যে বিপুল অর্থব্যয় তাহা কি কেবলমাত্র খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্যই অপব্যয়?

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অর্থ ও ক্ষমতাকে আয়ত্ত করিয়া পাশ্চাত্ত্য ধনীরা, তথা জনগণ, চরিত্রহীন এক বিকৃত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন ও বর্দ্ধন করিয়া আসিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া জাপানও অনুরূপ করিতেছে। ফলে এই বিকৃতি বর্ত্তমানে মানব-সভ্যতার এক চরম সঙ্কটের আকার ধারণ করিয়াছে।

মার্কস্ ও লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণী—দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাসমর—সম্ভাবিত হইয়াছে। যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে, ইয়োরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া ও আমেরিকা; এবং ভূমধ্য-সাগর ও অতলান্তিক হইতে শুরু করিয়া প্রশান্ত মহাসাগর অবধি এক বিরাট সমরানল প্রজ্বলিত হইতে চলিয়াছে। চরিত্রহীন অদূরদর্শী এবং আত্মসর্ব্বস্ব বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাদের সাধ্য নাই এই মহাসমরকে প্রতিনিবৃত্ত করে। বর্ত্তমান মানবসভ্যতা, পঞ্চাশ সহস্র বৎসরের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা, মানুষের সমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

## শ্যামদেশে জাপানী আধিপত্য

ব্রহ্মদেশের পূর্ব্ব সীমান্ত-রেখা তিনটি দেশকে স্পর্শ করিয়াছে:—(১) শ্যাম, (২) ইন্দো-চীন, (৩) চীন। যদি আপ-রূপ অনাক্রমণাত্মক চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ ব্রহ্মসীমান্তের চীনদেশ (ইউন্নান প্রদেশ) জাপানীদের অধীন হইবে। ইন্দো-চীন ফরাসীর অধিকারে; বর্ত্তমানে এই দেশটি অধিকারে আনিবার জন্য জাপানীরা সামরিক ও কূটনীতিক অভিযান চালাইয়াছে। অগ্রসরের খুব বড় কোনও কারণ এযাবৎ দেখিতেছি না। বাকী থাকে শ্যাম দেশ। সংবাদপত্রে প্রকাশ: তথায় নৌ-ঘাঁটি ও বিমান-ঘাঁটি নির্ম্মাণ এবং শ্যামের সামরিক বিভাগে মাতব্বরী করিবার জন্য জাপান চেষ্টা করিতেছে।

শ্যামদেশের উপর জাপানীদের লোভটা অনেক দিন হইতেই বেশ প্রখরভাবে দেখা গিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পর হইতেই জাপানীরা উৎকোচ কূটনীতির সাহায্যে শ্যামদেশীয় একাধিক মাতব্বর ব্যক্তিকে হাত করিবার কিকিরে ছিল। রাজা প্রজাধিপকের সিংহাসনচ্যুতির মূল কারণ,—অনেকের বিশ্বাস,—বৃটিশ ও জাপানীদের পরোক্ষ কূটনীতিক সংঘর্ষের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে।

সিঙ্গাপুরে বৃটিশ বন্দর সুদৃঢ় করিবার সঙ্গে সঙ্গেই জাপানীরা উহাকে অকেজো করিয়া দিবার চেষ্টায় ছিল। ব্রহ্মদেশের দক্ষিণতম প্রান্তের দক্ষিণে শ্যামদেশ সরু হইয়া একটি যোজকের আকার প্রাপ্ত হইয়াছে; এক দিকে বঙ্গোপসাগর, অন্য দিকে শ্যামসাগর। মধ্যস্থ যোজক কোনও কোনও স্থলে এক শত মাইলেরও কম প্রশস্ত। পানামা বা সুয়েজের মত একটা খাল কাটিতে পারিলে অনেক কম খরচায় কম সময়ে বৃটিশ জাতির সম্পদের ভাণ্ডার ভারতবর্ষে হাজির দিবার পথটা সুগম হইয়া আসে, এবং সিঙ্গাপুরের পথটা প্রায় অকেজো হইয়া যায়। জাপানীরা একদা সেই উদ্দেশ্য সাধনে উঠিয়া পড়িয়া লাগে। পাল্টা বৃটিশ কূটনীতিক চালে জাপানীদের প্রয়াস সফল হয় নাই। বর্তমান সময়ে বৃটিশ জাতির বিপত্তির সুযোগে জাপানীরা আবার অপর কতকগুলি চেষ্টা চালাইতেছে। এবার যদি তাহাদের চেষ্টা সফল হয়।

এবার যদি শ্যামে জাপানীদের ক্রিয়া-কলাপ সফল হয়, তবে ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের নিরাপত্তা প্রভূত পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা।

শ্যাম ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে অন্ততঃ চারিটি পথ ধরিয়া উভয় দেশের মধ্যে স্মরণাতীত কাল হইতে লোকজনের যাতায়াত চলিয়া আসিয়াছে। এই চারিটি রাজপথ ধরিয়াই হয় তো একদা ভারতীয় হিন্দু সভ্যতা শ্যাম, ইন্দো-চীন হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে পৌঁছিয়াছিল। তারপর ভারতীয় কৃষ্টির ভাণ্ডার হইতে অঞ্জলি ভরিয়া দান করিবার লোকেরও অভাব হইল, যাযাবর পথিকরাও আর মধুলোভী ভৃঙ্গের মত সন্ধানতৎপর রহিল না।

কিন্তু সেই পথগুলি মুছিয়া যায় নাই। মৌলমেন হইতে, ট্যাভয় হইতে, মার্গুই হইতে একাধিক পার্বত্যপথ ধরিয়া অদ্যাবধি স্থানীয় অধিবাসীরা দেশ হইতে দেশান্তরে যাইয়া থাকে। দুঃসাহসী ব্রাহ্মণাধ্যাপকের আকর্ষণ করিবার জন্য খাপরসঙ্কুল অস্পষ্টপ্রায় নির্জন পথরেখা এখনও চূড়ান্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ বনস্থলীর অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষ এবং জাপানী রাষ্ট্রনেতারা এই পথগুলির সন্ধান জানে। এই পথগুলির আশে পাশে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ নিবিড় বনস্পতির আড়ালে লুকাইয়া আছে, অদ্যাবধি তাহার অধিকাংশেই মনুষ্য-পদচিহ্ন পড়ে নাই। শুধু আকাশে উঁকিতে অনুমান করা গিয়াছে, অপরিমিত প্রাকৃতিক সম্পদ্ যুগ যুগ ধরিয়া সেখানে সঞ্চিত রহিয়াছে।

পৃথিবীর অন্তরাত্মের এই সম্পদ্ লইয়াই বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক ঈর্ষা ও বৈরিতা।

সুতরাং, জাপানীরা যদি শ্যামদেশে কূটনীতিক জয় লাভ করিতে পারে, তবে তাহার অনতিকালের মধ্যেই শ্যামব্রহ্ম-সীমান্ত সচকিত হইয়া উঠিবে। হয় তো, যেখানে কোনও দিন মানুষের পদচিহ্ন পড়ে নাই, সেখানে অপর্যাপ্ত মানুষের রক্তপাতে মানুষের প্রথম-পদপাত-উৎসব সাধিত হইবে।

## পীতাতঙ্ক

জাপানের সাম্রাজ্য-বিস্তারের লালসা নানারূপ অবস্থা-বৈগুণ্যের ফলে এতকাল সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। বর্তমান ইয়োরোপীয় যুদ্ধে তাহার সুবিধার ও সুযোগের পথ খুলিয়া গিয়াছে।

জাপানের বিগত তিন শতাব্দীর ইতিহাস ইয়োরোপীয় জাতিসমূহ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি ঈর্ষার ইতিহাস। ইয়োরোপের বাহিরে জাপানই একমাত্র দেশ যেখানে ইয়োরোপীয় বণিকৃতা জামাই-আদর পায় নাই। সদা সতর্ক থাকিয়া জাপানী রাষ্ট্রশক্তি ইয়োরোপীয়দের পরিহার করিয়াছে; কিন্তু পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের এবং পাশ্চাত্য বিকৃত সভ্যতার মূলনীতিগুলি সে সযত্নে অনুধাবন ও অনুশীলন করিয়াছে। ফলে, দীর্ঘ শতাব্দীগুলি পার হইয়া আজ সে পাশ্চাত্য সভ্যতার সমকক্ষ সভ্যতা গঠন করিতে পারিয়াছে।

বলা বাহুল্য, জাপানী রাষ্ট্রনীতি পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতিরই পীত সংস্করণ মাত্র।

সাম্রাজ্য বিস্তারের কল্পনা জাপানী রাষ্ট্রনায়কেরা বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ১৯০৫ সালের যুদ্ধে তাৎকালীন অন্যতম শক্তিশালী রাশিয়াকে পরাজিত করিয়া জাপান নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে প্রত্যয়ী হয়। তারপর শুরু হইল তাহার দিগ্বিজয়। কোরিয়া অধিকার করিয়া ঠিক পাশ্চাত্য আদর্শে সেখানে সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ পোক্ত করা হইল। ১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়া দখল করা হইল। মাঞ্চুরিয়া দখলের চারি বৎসর পূর্বে তাৎকালীন প্রধান মন্ত্রী বারন তানাকা ১৯২৭ সালের ২৫শে জুলাই তারিখে জাপ-সম্রাটের সমীপে এক স্মারক-লিপি পেশ করেন। "চায়না স্পিক্‌স্" নামক গ্রন্থের লেখক চিট্ সেঙ্ জাপানী প্রধান মন্ত্রী-মহাশয়ের স্মারক-লিপি উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী মহাশয় জানাইয়াছিলেন :

"In a certain sense Manchuria and Mongolia are key-positions, by holding which we can seize the wealth of the whole of China. After this, we shall subjugate India, the South Seas, Asia Minor and Central Asia, and finally Europe."

[ অর্থাৎ, "একদিক দিয়া দেখিলে ইহাই মনে হইবে যে, মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়া গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। ইহা দখল করিতে পারিলে আমরা সমগ্র চীনের ঐশ্বর্য হাত করিতে পারিব। তারপর আমরা ভারতবর্ষ, দক্ষিণ মহাসাগর ( অষ্ট্রেলিয়া ? ), এশিয়া মাইনর, মধ্য এশিয়া এবং সর্বশেষে ইয়োরোপকে অধীন করিব।" ]

বলা প্রয়োজনীয় যে, যে-ব্যক্তি এই কথা লিখিয়াছিল সে বদ্ধ-পাগল নহে। 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্' পত্রিকার অন্যতম লেখক হ্যানেট অ্যাবেণ্ড্ চীন সম্পর্কে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি লিখিয়াছেন :

"Japan's intentions are plain. She aims to rule not only China, but all Asia, with the great arsenal of China's natural resources at her disposal··· ···Japan will be ready to try the economic conquest of the world."

[ অর্থাৎ, "জাপানের উদ্দেশ্য সরল। সে কেবল চীনের উপর প্রভুত্ব করিতেই অভিলাষী নয়, পরন্তু সমগ্র এশিয়াই তাহার লক্ষ্য। চীনের অপরিমিত ধনভাণ্ডার তাহার হাতে আসিলে জাপান সমগ্র পৃথিবীতে অর্থনৈতিক দিগ্বিজয়ের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবে।" ]

ইংলণ্ডেও চীন ও জাপান সম্পর্কে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যে সব বই প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতেও ( যেমন, *Japan at the Crossroads* ) উপরোক্ত সমস্যার সম্ভাবনা স্বীকৃত হইয়াছে।

ইয়োরোপের সঙ্কটসময়ের সুযোগে জাপানের কল্পনা সফল হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। কূটনীতিক ক্রিয়াকলাপের ফলে চীন হইতে বৃটিশ প্রভুত্ব উচ্ছেদ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

দীর্ঘ এক শতাব্দীকাল ধরিয়া চীনকে বিদেশী শক্তিপুঞ্জ শোষণ করিয়া আসিতেছে। কোনও একক শক্তি সেখানে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া উপনিবেশ পত্তন করিতে পারে নাই। বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্রের পারস্পরিক প্রহরার জন্যই এই ব্যাপারটা ( balance of power ) সম্ভবপর হইয়াছে। ইহার ফলে, চীনের খানিকটা সুবিধাও যে না হইয়াছে, তাহা নহে ; অর্থনৈতিক অধীনতা স্বীকার করিলেও—নামে মাত্র হইলেও—একটা রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা তাহার ছিল। ফ্রান্সের পতন এবং বৃটিশের বহিষ্করণের ফলে জাপান এবার চীনে সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগ পাইল। রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত করিতে পারিলে সে হাতে স্বর্গ পাইবে।

## দক্ষিণ-আমেরিকায় যুদ্ধ-বিস্তৃতি সম্ভব কি না ?

ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বর্তমান ইয়োরোপীয় মহাসমরে প্রত্যক্ষ ভাবে যোগ না দিলেও, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনের দিকেই ঝুঁকিয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই জার্মানীর বর্তমান নায়কদের মনঃপূত নহে। তাঁহারা এবং ইতালীয়ান ফাশিস্তরা ইহার পাল্টা কিছু চাল যে দিবে না তাহা বলা যায় না।

প্যারিস শহরের পতনের দিন-কয়েক আগে এখানকার সুপ্রসিদ্ধ "ল্য ফিগারো" পত্রিকায় জর্জ হুআমেল্-নামক জনৈক ভদ্রলোক একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি, জার্মানীর দক্ষিণ-আমেরিকা অভিযানের একটি কল্পিত কাহিনী। খৃষ্টীয় শতাব্দীর বর্তমান দশকের কোনো

একটি তারিখে কতিপয় রণতরীর মারফৎ অকস্মাৎ বৃহৎ একটি জার্মান সেনাবাহিনী ব্রাজিলের রাজধানী রিও-দে-জানেইরো শহরে হানা দেয়।* কাহিনীটা কাল্পনিক হইলেও অবিশ্বাস্য নহে। ভূমধ্যসাগরে ইতালীয়ানরা যদি সুয়েজ ও জিব্রল্টারের ঘুম ঘুচিয়া দিতে পারে, তবে হুআয়েল্ দাহেলের কল্পনা হয় তো বাস্তব হইয়াও উঠিতে পারে।

কেন পারে, বলিতেছি।

দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা ও সামরিক ব্যবস্থার উল্লেখ করিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হইয়া আসিবে।

ব্রাজিলে কিছুদিন আগে কম্যুনিষ্ট ঠেকানো হইয়াছিল। ওখানকার রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ভার্গাস মহাশয় প্রকাশ্যেই ফাসিস্ত মতাবলম্বী। লোকসংখ্যার মধ্যে দেড় কোটি লোক ইতালীয় (মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৫ ভাগ)। এতদ্ভিন্ন চার লাখ জার্মান এবং পাঁচ লাখ জাপানীও আছে। আর্জেন্টিনা গণতন্ত্রে শতকরা ৫৫ জন ইতালীয়ান। উরুগুয়ের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৩০ জন ইতালীয়। পেরুতে পঞ্চাশ হাজার অধিবাসী জাপানী। তা ছাড়া প্যারাগুয়ে, বোলিভিয়া, চীলি এবং পেরুতে সামরিক উপদেষ্টাদের পদে বহু জার্মানী, বহু ইতালী, বহু জাপানের ভক্তী মতাবলম্বী ব্যক্তিরা রহিয়াছে।

সুতরাং, বলা যাইতে পারে, ক্ষেত্র প্রস্তুত।

দক্ষিণ-আমেরিকা প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। ফল ও শস্যাদি রপ্তানীর দ্বারা এতদ্দেশীয়দের জীবিকানির্ব্বাহ হয়। পূর্ব্বেকার এক সংখ্যায় তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

যুদ্ধের ফলে রপ্তানী বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং স্থানীয় অসন্তোষ বাড়িতেছে। যুক্তরাষ্ট্র-কর্তৃপক্ষ সেই অসন্তোষ প্রশমনার্থে অপরিমিত অর্থব্যয় করিয়া দক্ষিণ আমেরিকার রপ্তানী-পণ্য ক্রয় করিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে এক পরিকল্পনা করিয়াছে। কিন্তু তাহাও যে কতদূর সফল হইবে বলা যায় না; কেন না যুক্তরাষ্ট্রের ও ফল ফসল ইত্যাদিই অন্যতম রপ্তানী-পণ্য।

মানুষের আহার্য্য-সংস্থানের সমস্যাই বড় সমস্যা। সেই সমস্যারই সুযোগ লইয়া অন্তর্বিপ্লব যারে যারে পৃথিবীতে দেখা দিয়াছে।

---

* "In the early days of April, 1940···at the beginning of the sub-equatorial autumn, a very mild season for North Europeans, a fleet composed of 10 dreadnoughts, 20 cruisers and 50 destroyers preceding 50 transport ships, a fleet coming from all points of the compass and assembled as if by a miracle on the empty Atlantic, suddenly appears before the Bay of Rio-de-Janeiro. Prominent persons—fifth columnists who had settled in the Brazilian capital months or years before,—inform the Government that the Germans demand the freedom of the Bay, the right to land an expeditionary force, control of the railway roads and mails, and immediate surrender of all of Brazil, south of parallel 15°, about 1,675,000 sq. miles, and where the main deposits of minerals are."—*Current History*, July, 1940).

---

## খাদ্যতত্ত্ব

...গত পঞ্চাশ বৎসর হইতে বিভিন্ন দেশের বাৎসরিক কৃষি-বিবরণী ও খাদ্য-বিবরণী প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। তাহা পর্য্যালোচনা করিলে, জগতের প্রত্যেক দেশে প্রতি বিঘা জমীর উৎপাদিকা-শক্তি যে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই ক্রমশঃ অর্দ্ধেক পরিমাণ হইয়াছে এবং মানুষের অকাল-মৃত্যু প্রায় সকল দেশে বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান জগতে কিঞ্চিদধিক দুই শত দুই কোটি লোক আছে। কার্য্যকরভাবে উপযোগী খাদ্য সকলের রক্ষিত হইলে, মানুষের অন্ততঃ-পক্ষে প্রতিদিন অন্ততঃ এক পাউণ্ড চাউল অথবা সমজাত দ্রব্য খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতে হয়। বর্ত্তমান বিজ্ঞানে "খাদ্যতত্ত্ব" সম্বন্ধে ভাবে কেহ আলোচনা করেন নাই। কাযেই, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের চেষ্টার দ্বারা মানুষের যে প্রতিদিন এক পাউণ্ড চাউল অথবা সমজাত দ্রব্য একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা যা দেখা ও যা বুঝা সম্ভব হইতে পারে। সারা জগতের সমস্ত লোকের দ্বারা বৎসরের প্রয়োজনীয় খাদ্যের জন্য অন্ততঃ-পক্ষে ৩০ কোটি টন ধান এবং চাউলের প্রয়োজন হয়। তাহার মধ্যে বর্ত্তমানে উৎপন্ন হয় মাত্র ২০১ কোটি টন। প্রতি বৎসর মানুষের নাগাল পায় কোটি টন ধান ও চাউলের অভাব পড়িতেছে এবং প্রত্যেক মানুষ অপ্রত্যক্ষ ভাবে অর্দ্ধাহারী থাকিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও জগতের এই অবস্থা ছিল না। এই অবস্থার জন্যই জগতের সর্ব্বত্র হাহাকার আরম্ভ হইয়াছে। মানুষের বুদ্ধি কি দিবিব, বর্ত্তমান "বৈজ্ঞানিক" তাহা না জানায়, মানুষের বুদ্ধি ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে এবং তাহারই জন্য জগতের হাহাকারের কারণ নির্ণীত হইতেছে না...

---

# সমাজ ও সাহিত্য

—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেনগুপ্ত

অদ্য আমি আপনাদের সম্মুখে সমাজের সহিত সাহিত্যের সম্পর্ক, সাহিত্যের আদর্শ, বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি ও গতি এবং বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত বর্তমান বাঙ্গালী সমাজের সম্পর্ক-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি।* সাহিত্য লইয়া যাঁহারা নাড়াচাড়া করেন, আমি তাঁহাদিগকে এই কয় শ্রেণীতে ভাগ করিতে চাহি: (১) সাহিত্য-স্রষ্টা, (২) সাহিত্যসেবী, (৩) সাহিত্য-রসিক, (৪) সাহিত্য-ব্যবসায়ী, (৫) 'এমেচার' বা সৌখিন সাহিত্যিক এবং (৬) পাঠক। প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে, আমি একজন সাধারণ পাঠক মাত্র; বড় জোর মাঝে মাঝে 'এমেচার' সাহিত্যিকের কার্যে 'প্র্যাক্টিস' করিয়া থাকি। কিন্তু "ছোট বড় মাঝারি" সকল সাহিত্যিক, এবং এমন কি 'মনাই-সমালোচক'ও যখন সাহিত্যের ব্যবসায়ে আমিরি করেন, তখন আমি একটু 'বাহাদুরদারী' করিলে ক্ষতি কি?—বিশেষতঃ এই ব্যক্তি-স্বাধীনতার যুগে?

সমাজের সহিত সাহিত্যের সম্পর্ক আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই এই দুইটি কথার সুস্পষ্ট অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ইংরাজি শিক্ষিত-সম্প্রদায় "সোসাইটি" এবং "লিটারেচার" এই দুই কথার প্রতিশব্দরূপে 'সমাজ' ও 'সাহিত্য' এই দুইটি কথার ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রথমে society এবং literature এই দুইটি কথার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। Society—fellowship, companionship; a number of persons associated for a common interest; a community or partnership, the civilised body of mankind. Literature—The science of letters or what is written; the whole body of literary compositions in any language or on a given subject; all literary productions except those relating to positive science and art usually confined, however, to 'belles lettres' (belles lettres=polite or elegant literature, including poetry, fiction, criticism, æsthetics etc.)[১] Society-র সংজ্ঞা এইরূপ দেওয়া যাইতে পারে: "An aggregate of men living together, united by common interests and relationships may be termed a society. A human society is distinguished from the types of social life exhibited by a lower order of beings, *e.g.*, bees, wasps, ants, in that there is in the minds of the members of human society a common consciousness or mental interests and aims." Literature-এর এইরূপ definition দেওয়া হইয়াছে: "Literature consists of all the books where moral truth and human passions are touched with a certain largeness, sanity and attraction of form."[২]

এখন সমাজ ও সাহিত্য শব্দদ্বয়ের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। সংস্কৃতে সমাজ = সম্-অজ্ (গমন করা) + ঘঞ্—এক সঙ্গে গমন; মানবসমূহ, সভা; সমূহ; গণ। সাহিত্য = সহিত + ষ্ণ্য (ভাবে); সম্ (সম্যক্) যে হিত সে সহিত, তদ্ভাবের ষ্ণ্য; সম্যক্ হিত করে যে; সঙ্গ, সংসর্গ, একক্রিয়াদ্বিত্ব। সুতরাং society এবং সমাজ দুইটাই একার্থবোধক শব্দ। কিন্তু literature ও সাহিত্য অনেকটা একার্থবোধক, সম্পূর্ণ একার্থবোধক নয়।

অতএব ইংরাজি ও সংস্কৃত দুই ভাষার সমাজ ও society শব্দের অর্থ মিলাইয়া আমরা বুঝি যে, যখন কোন মানব-সম্প্রদায় (সমূহ বা গণ) কোনও সাধারণ ঐক্য-সম্পন্ন আদর্শ বা স্বার্থদ্বারা মিলিত হয়, এবং তাহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য, আচার-ব্যবহারের মধ্যে মোটামুটি একটা সচেতন সমতা লক্ষিত হয়, তখন উক্ত মানবসমূহ বা সম্প্রদায়কে

* ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখে প্রবন্ধ ছোপা পর্যন্তই যাই] ফুলের 'এক্সটেনসন লেকচার'।

১। Chambers

২। J. Morley, quoted in Webster's Dictionary.

সমাজ বলে। সুতরাং সমাজ কথাটা বিশ্লেষণ করিলে তাহার মধ্য হইতে আমরা এই অর্থগুলি পাই :

(১) কতক সংখ্যক মানব, একটা দল বা সম্প্রদায় ;

(২) আদর্শ ও স্বার্থের সমতা বা ঐক্য ;

(৩) উক্ত সমতা বা ঐক্য সম্বন্ধে চেতনা ( বা consciousness )।

যেহেতু সমাজ একটা সংঘ বা সম্প্রদায়, সেই হেতুই উক্ত তিনটি অর্থের যে-কোনটি সমাজের মধ্যে দুর্বল লক্ষিত হইবে, সেই সমাজ সেই পরিমাণে দুর্বল হইয়া পড়িবে,—সেই "সংঘের" "সংহতি" সেই পরিমাণে কমিয়া যাইবে। দুই একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সমাজ—একই অর্থের আদর্শে ইচ্ছাপূর্বক ঐক্যবদ্ধ হইয়া ইহাদের এক একটি সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের যে কোন একটি সমাজের আদর্শ হইতে যে-মানব যে-পরিমাণে বিচ্যুত হইবে, সে সেই পরিমাণে সেই সমাজের গণ্ডী হইতে দূরে চলিয়া যাইবে। অবশ্য এই গণ্ডীর পরিমাণ সব সমাজে সমান নয়, কম বেশী আছে। কিন্তু আদর্শ বা উদ্দেশ্যের ঐক্য প্রতি সমাজেই অবশ্য থাকিবে, সুতরাং গণ্ডীও থাকিতেই হইবে। আবার সমাজের গণ্ডী অতি ছোটও হইতে পারে—যেমন "অমেচার ডায়মণ্ড জুবিলি লাইব্রেরী ও ক্লাব।" এই সমাজের আদর্শের সমতা আছে, যথা ফটলা, তরলা, স্ত্রীর ক্রীড়া ও ধূম্র পান, এবং বন্ধনও আছে, যথা মাসিক একটি করিয়া রৌপ্য মুদ্রা। আপনারা সকলেই জানেন, উক্ত আদর্শগুলির যে কোনটি ক্ষুণ্ণ করিলে উক্ত 'সোসাইটি'র আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়, এবং মুদ্রাটির অভাবে ঐক্যবন্ধনই ছিন্ন হইয়া যায়।

সমাজ-বিজ্ঞানের গোড়ার কথাটি স্মরণ করিলে সমাজের উদ্দেশ্য ও অর্থ আরও স্পষ্ট হইবে। মানুষ যখন পশুর মতই বনে বাস করিত, তখনও তাহারা সাধারণ বিপদ ( common danger ) উপস্থিত হইলে সংঘবদ্ধ হইত, কিন্তু সেটা instinct বা সহজাত সংস্কার দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া ; যেমন এখনও পশু পক্ষী ইত্যাদি ইতর প্রাণীরা হইয়া থাকে। কিন্তু পরে যখন একতাবদ্ধ হইবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাহাদের বোধ ( consciousness ) জন্মিল, তখনই সমাজ-বন্ধনের সৃষ্টি হইল। এবং এই সমাজ-গঠনই মনুষ্যের সভ্যতা-সৌধের প্রথম ভিত্তিস্থাপন।

এখন literature ও সাহিত্য শব্দদ্বয়ের অর্থ বোঝা যাক। এই দুই শব্দের অর্থে কিছু পার্থক্য আছে। Literature শব্দটি letters ( বা বর্ণমালা ) শব্দ হইতে আসিয়াছে। Literature =science of letters, or what is written, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইংরাজি literature-শব্দ মতে ভাষা লিখিত হইবার পূর্ব্বে literature-এর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। এই অর্থে হোমারের ইলিয়ড এবং অডিসিয়াস্ literature নয়, কেননা তখন লিখিত ভাষার সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু "সাহিত্য"-শব্দের অর্থ—সম্যক্ হিত করে যে। সভ্যতার ইতিহাস বলে যে, প্রথমে সমাজ এবং অনেক পরে লিখিত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল ; কিন্তু কথা দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিবার কৌশল সমাজ-গঠনের পূর্ব্ববর্ত্তী। যখন মানুষ সমাজ-বদ্ধ হইয়া বাস করিতে শিখিল, তখন বাক্যদ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। তখন কোন না কোন আদর্শ সমাজের অধিকাংশ মানুষদ্বারা গৃহীত হইয়াছে, তখন মানুষ নিজের এবং পরের জন্য চিন্তা করিতে শিখিয়াছে, এবং সেই চিন্তা ভাষা দ্বারা অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে শিখিয়াছে। উক্ত গৃহীত আদর্শ সমাজের হিতের জন্য ; এই নিখিল সমাজের চিন্তাশীল লোক সকল, সমাজের জ্ঞানী লোক সকল, তাঁহাদের স্ব স্ব চিন্তা প্রণালীবদ্ধ সুশৃঙ্খল ভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাই হইল সাহিত্য। সম্+হিত=সহিত। তদুত্তরে ষ্ণ্য=সম্যক্ হিত করে যে। এই জন্যই বেদ আমাদের প্রাচীনতম প্রকৃষ্টতম সাহিত্য। কেন না বেদ যে জ্ঞানের কথা প্রকাশ করে, উহাই আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। তখনকার মানবগণ তাঁহাদের হিত বা সুখের আদর্শ স্থির করিলেন, "ভূমৈব সুখম্ ; নাল্পে সুখমস্তি" , এবং বৈদিক ঋষি স্বয়ং ভূমার আস্বাদ পাইয়া নিখিল বিশ্বের মানবগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।" ইহা সাহিত্য, ইহা আমাদের সম্যক্ হিত করে।

অতএব, যে আদর্শ বা আদর্শসমূহ সম্মুখে রাখিয়া কতকগুলি মানব একটি সমাজবদ্ধ বা সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া বাস করে, সাহিত্য সেই আদর্শেরই প্রকাশ। ইহাই হইতেছে সমাজের সহিত সাহিত্যের সম্পর্ক। অর্থাৎ, সাহিত্য

সমাজ-বৃক্ষেরই একটি সুন্দর প্রস্ফুটিত পুষ্প। যে সমাজে সাহিত্য নাই, সে সমাজ অপরিণত, সে সমাজকে আমরা সভ্য সমাজ বলি না। কোল, ভীল, সাঁওতাল, নাগা, কুকীর সাহিত্য নাই, কেন না তাহারা সভ্যতার অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত। সাহিত্যই সমাজের প্রকৃত মাপকাঠি, কেন না সাহিত্যের ভিতর দিয়াই সমাজের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। কোন সমাজের অবস্থা কোন্ যুগে কিরূপ ছিল, তাহা বিচার করিতে আমাদের সেই যুগের সাহিত্য ঘাঁটিতে হইবে। সাহিত্যই সমাজকে বাঁচাইয়া রাখে, সমাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে।

কিন্তু সমাজের সহিত সাহিত্যের সম্পর্ক ঐ একই প্রকার নহে; সাহিত্য সমাজের শুধু অনুগামীই নহে, অগ্রগামীও বটে। সমাজের সহিত সাহিত্যের 'ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া', action and reaction সম্পর্ক। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাহি। সাহিত্য সমাজের আদর্শ প্রকাশ করে। এই হিসাবে সাহিত্য সমাজের অনুগামী। প্রকৃত এবং প্রতিভাশালী সাহিত্যিকের রচনায় সমাজের আদর্শ প্রকাশিত হয়। সাহিত্যিক সমাজের আদর্শের এবং অবস্থার মূর্ত প্রকাশ। যে ভাবনিচয় সমাজের শত শত চিন্তাশীল লোকের মনে বিচ্ছুরিত ভাবে ভাসিয়া বেড়ায়—প্রতিভাবান্ সাহিত্যিকের রচনায় সেই ভাবগুলি মূর্তি-পরিগ্রহ করে। সেই তরল, চঞ্চল, স্বচ্ছ ভাবগুলি জমাট বাঁধিলে বুদ্ধিযুক্ত সাধারণ মানব-মনের পক্ষে সেইগুলি ধারণা করা সহজ ও সম্ভব হয়। এই জন্য এমার্সনের ভাষায় এইরূপ প্রতিভাবান্ সাহিত্যিকদিগকে বলিতে পারি—representative men, কেন না এইরূপ সাহিত্যিকগণ সমাজের চিন্তাধারাকে নিজেদের চিন্তাধারা দ্বারা represent করেন। কিন্তু তাঁহাদের রচিত সাহিত্যের কার্য্য এখানেই শেষ হইল না। এক দিকে যেমন তাঁহারা পুরাতন আদর্শ প্রকাশ করিবেন, তেমনি আবার তাঁহাদের সাহিত্যে নূতন আদর্শও স্থাপিত করিবেন। এক দিকে যেমন শত শত সহস্র সহস্র লোক তাঁহাদের রচনায় তাহাদেরই চকল অপরিণত ভাবগুলিকে সুসংবদ্ধ ও পরিণত দেখিয়া আনন্দে অধীর হইবে, তেমনি আবার সমাজের শত শত সহস্র সহস্র লোক নূতন নূতন চিন্তার বিষয় পাইবে, তাহাদের বুদ্ধি ও চিন্তাকে নূতন নূতন খাদে প্রবাহিত করিতে পারিবে।

যদৃচ্ছাক্রমে দুই চারিটি উদাহরণ দেওয়া যাক্। যেমন, বাল্মীকির রামায়ণ এবং ব্যাসদেবের মহাভারত শুধু যে সেই সেই যুগের প্রধান প্রধান ঘটনা ও সামাজিক বা নৈতিক অবস্থাই প্রকাশ করিয়াছে, তাহা নহে, অতি উন্নত আদর্শেরও সৃষ্টি করিয়াছে—যে আদর্শ সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ অবিকৃত থাকিয়া কোটি কোটি নরনারীকে সৎপথ দেখাইতেছে;—যে আদর্শ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও যেমন সমাজের শিরোধার্য্য ছিল, এখনও তেমনি আছে। আবার, প্লেটোর রিপাব্লিক, রুসো'র সোস্যাল কণ্ট্রাক্ট ও এমিল এবং কার্ল-মার্ক্সের Das Capital, প্লেটোর সময়ে সমাজ ও রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় যে ভাবগুলি সূক্ষ্ম ও অপরিণত আকারে লোকের মনের মধ্যে ছিল, প্লেটো তাহাদের যে শুধু আকার দিয়াছেন তাহা নয়, নূতন আদর্শেরও সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং প্রাচীন গ্রীস ও রোমে বহুদিন পর্য্যন্ত এই আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। সেইরূপ রুসো তাঁহার সময়ে ইউরোপের representative man; যে বিপুল অসন্তোষ এবং পরিবর্তনেচ্ছা ফ্রান্সের জনসাধারণের মনে ধূমায়িত হইতেছিল রুসো তাহার মূর্ত বহ্নিশিখাস্বরূপ। রুসোর Le Contract Social-কে নেপোলিয়ান ফরাসীবিপ্লবের Gospel বলিয়াছেন। রুসো Emile-এ শিক্ষা সম্বন্ধে যে বিপ্লবের সূচনা ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছিলেন, শিক্ষাব্যবসায়িগণ জানেন যে Pestalozzi, Froebel, Montessori এবং Heleen, Parkhurt সেই আদর্শেরই অনুগামী মাত্র। পদদলিত, অত্যাচারক্লিষ্ট নরনারীর representative man কার্ল মার্ক্স্ রাষ্ট্রের যে নূতন আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ফল বর্ত্তমান রাশিয়া; এবং সেই ফল সেই দেশেই শেষ হইবে কি না, তাহা জগতের মনীষীদিগের চিন্তার বিষয় হইয়াছে।

এই হেতু যখনই সমাজের যে কোনও অঙ্গের—রাষ্ট্রেরই হউক অথবা ধর্ম্মেরই হউক—কোন পরিবর্ত্তন, সংস্কার, বিপ্লব বা উন্নতি সংঘটিত হইয়াছে, তখনই আমরা প্রতিভাবান্ সাহিত্যিকের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। যে যুগে আর্য্য সভ্যতা আর্য্যাবর্ত্ত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাপথ, ও তথা হইতে লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল—পৃথিবীর আদি কবি বাল্মীকি সেই যুগের সাহিত্যিক। সেইরূপ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মহানায়ক শ্রীকৃষ্ণ যে যুগে অধর্ম্মের বিনাশ করিয়া ধর্ম-

ECONOMIC INEQUALITY
1925 1927
1926 1928
1929
1930
1931
1932/933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
CONGRESS

নিদ্রাভঙ্গ (?)

সংস্থাপন করিয়াছিলেন, ঋষি বেদব্যাস সেই যুগের ; এবং ট্রয়ের ধ্বংসের উপর গ্রীক সভ্যতার ভিত্তি যে যুগে স্থাপিত হইয়াছিল, হোমার সেই যুগের সাহিত্যিক। গ্রীক ট্র্যাজেডির জন্মদাতা Aeschylus শুধু যে সাহিত্যিক ছিলেন তাহা নহে, তিনি ম্যারাথনের যুদ্ধে পারসিকদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, এবং আহত হইয়াছিলেন। ম্যাসিডোনিয়ার বীর সেকেন্দর দার্শনিকপ্রবর Aristotle-এর শিষ্য ছিলেন। এবং তিনি যখন দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন, তখন অন্ততঃ ছয়জন সাহিত্যিক তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। যে যুগে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ও হিন্দু পৌরাণিক ধর্মের সূচনা, সেই যুগেই কালিদাস, ভবভূতি ইত্যাদি কবিদিগের কাব্য-ঝঙ্কারে উজ্জয়িনী মুখরিত হইয়াছিল। এইরূপে দেখিতে পাই, ইংলণ্ডে যে এলিজাবেথের যুগে স্প্যানিশ আর্মাডা ধ্বংস হইয়াছিল, ভারতে সাম্রাজ্যস্থাপনকারী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পত্তন হইয়াছিল, মার্টিন লুথার কর্তৃক সংস্কৃত ধর্ম খৃষ্টান সমাজে গুরুতর বিপ্লব ঘটাইয়াছিল, এবং যে যুগের বর্ণনা করিতে গিয়া ঐতিহাসিক গ্রীন ইংলণ্ড সম্বন্ধে লিখিয়াছেন : "a noble and puissant nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invincible locks—as an eagle mewing her mighty youth and kindling her undazzled eyes at the full midday beam"—Edward Spenser, William Shakespeare এবং Francis Bacon সেই যুগেরই সাহিত্যিক। রাণী এলিজাবেথের সুদীর্ঘ রাজত্বকাল অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু সাহিত্যে সেই যুগ আমরা এখনও প্রত্যক্ষ করিতেছি। এইরূপ জন্সটেয়ার ও ভিক্টর হিউগো ফরাসীদেশে, গোটে ও শিলার জার্মানীতে, পুশ্কিন ও টলষ্টয় রাশিয়ার এক একটি যুগের প্রতীক ও অগ্রদূত।

সমাজের সহিত সাহিত্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে এ পর্যন্ত আমি যাহা বলিলাম তাহাতে আমি এই কথা কয়েকটি পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে—

(ক) সমাজ ও সাহিত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত,—সমাজ যাহার বহিরাবরণ, সাহিত্য তাহারই অন্তর-স্বরূপ।

(খ) সমাজ ও সাহিত্য উভয়েরই আদর্শ আছে, এবং এই আদর্শ এক ও অভিন্ন।

(গ) প্রকৃত ও প্রতিভাবান্ সাহিত্যিকদিগের সাহিত্য শুধু সমাজের ছবিই দেখিবে না, তাঁহারা নূতন আদর্শের সৃষ্টিও করিবেন ; কিন্তু যাহাই করুন, সমাজের সমাক্ হিত করা চাই, নতুবা সাহিত্য সৃষ্টি হইবে না। কেন না সমাজের সহিত সাহিত্যের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্ক বলিয়া সমাজের উপর সাহিত্যের যে প্রতিক্রিয়া হইবে, তাহা সামান্য ও উপেক্ষণীয় নয়।

কিন্তু সাহিত্য যে সমাজের হিত করিবে, সেই হিত কিসে হয়? সাহিত্যের আদর্শ কি? সমাজের আদর্শ কি? মনুষ্যসমাজ আবহমান কাল হইতে কি চায়? কি খোঁজে? সুখ? আনন্দ?—যুগে যুগে জিজ্ঞাসু মানব এই কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যুক্তীকরণ বা অপনয়ন প্রথা (Process of Elimination) দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও অল্পকালস্থায়ী সুখ বা আনন্দ বর্জন করিয়া করিয়া দেখিয়াছে যে, প্রকৃত ও একমাত্র স্থায়ী সুখ বা আনন্দের বস্তু সত্য (Truth)। মানুষ যুগে যুগে, দেশে দেশে, চিরকাল সত্যকেই খুঁজিয়া আসিতেছে। যে যেমন সেই সত্যবস্তুকে লাভ করিয়াছে, যতখানি তাহার নিকটবর্তী হইয়াছে সে সেই পরিমাণে আনন্দের অধিকারী হইয়াছে। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির আনন্দ অতি অল্পকাল স্থায়ী,—আবার সেই আনন্দের পরেই অবসাদ, সুতরাং সে আনন্দ আদর্শ হইতে পারে না। যে আনন্দ যে পরিমাণে সেই সত্য বস্তুর আভাস দিতে পারে, সেই আনন্দই সেই পরিমাণে প্রার্থনীয়। যাঁহারাই যখন-ই সত্যের সন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই তখন-ই এই কথা-ই প্রচার করিয়াছেন। এই সত্যই সমাজের আদর্শ, সুতরাং এই সত্যই সাহিত্যেরও আদর্শ।

এই আদর্শ অনুসারে সাহিত্যের Scope (লক্ষ্য, উদ্দেশ্য) এবং Jurisdiction (এলাকা) সুপ্রসারী এবং বৃহৎ হইয়া পড়ে—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্য, কথা-সাহিত্য, নীতি, ধর্মশাস্ত্র, কিছু বাদ পড়ে না। কিন্তু সমগ্রভাবে 'সাহিত্য' আলোচনা করিবার শক্তি আমার নাই। সুতরাং আমি সাহিত্যের একটা অংশ—অবশ্য প্রধান অংশ—কাব্য, সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য শব্দের দ্বিতীয় অর্থ "কাব্য" কাব্য কি? "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং।" রসপূর্ণ বাক্যের নাম

কাব্য। রস কি? "কাব্যপাঠের সাহচর্য সহৃদয় জনগণের চিত্তচমৎকার আস্বাদন, অর্থাৎ সহৃদয় জনগণের চিত্তে রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব, বিভাবাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আনন্দজনক হইলে তাহাকে 'রস' বলে; রস নয় প্রকার, যথা—শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত। "কাব্য" দুই প্রকার, গদ্য ও পদ্য। ছন্দোবদ্ধ বাক্যকে কবিতা বা পদ্য বলে। রঘুবংশ, মেঘনাদ-বধ, সন্ধ্যাসঙ্গীত, বানদী প্রভৃতি পদ্যকাব্য। কাদম্বরী, কপালকুণ্ডলা, উদ্ভ্রান্ত প্রেম, নৌকাডুবি ও গল্পগুচ্ছ গদ্যকাব্য। ইংরাজী সাহিত্যে literature-শব্দ এখন প্রায় এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়—যথা, poetry, fiction, criticism, aesthetics প্রভৃতি। নাটক বা দৃশ্য-কাব্য রচনায় গদ্য বা পদ্য বা উভয় প্রকার রচনারীতিই ব্যবহৃত হইতে পারে।

সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে যাহাকে রস বলে, ইংরাজী ভাষায় তাহার প্রতিশব্দ বা অনুরূপ শব্দ, emotion, feeling, passion. মানুষের চিত্ত এই emotion দ্বারা পূর্ণ। সুতরাং কাব্যের কাজ এই emotion জাগ্রত করা। "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং।" Matthew Arnold বলেন, "Poetry is at bottom a criticism of life"—পদ্য মূলতঃ জীবনের সমালোচনা বা সম্যক্ আলোচনা। জীবনের সম্যক্ আলোচনা অর্থ, জীবনকে সমগ্র বা পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার আলোচনা—জীবনের সমস্ত দিক্ বা aspect লইয়া আলোচনা। Matthew Arnold-এর 'poetry'-কে হ্রস্ব মাত্র না বলিয়া 'কাব্য' এই অর্থে গ্রহণ করিলেই সঙ্গত হইবে। জন মর্লি প্রবন্ধ সংজ্ঞা হইতে literature-এর অর্থ আর একটু স্পষ্ট হয়। যে সকল গ্রন্থ উদারতা ও সংযমের সহিত মনোজ্ঞ ভাষায় moral truth প্রকাশ করে এবং human passion জাগ্রত করে, সেই সকল গ্রন্থকে "literature" এই আখ্যা দেওয়া যায়। যে সকল গ্রন্থ এই সকল গুণসমন্বিত, সেগুলি সমাজের হিতও করে বটে। সাহিত্যের আদর্শের কথায় বলিয়াছি, সত্যই সমাজের তথা সাহিত্যের আদর্শ। কিন্তু "সত্য" কি? "সত্য বস্তু" কি? সত্য এক ও অদ্বিতীয়, চিরন্তন ও সার্বজনীন। এক, অদ্বিতীয়, চিরন্তন ও সার্বজনীন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক পরমেশ্বর বা পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। এই কথাই মহাপুরুষেরা বলিয়া থাকেন। সত্য ব্রহ্মেরই একটা গুণ বা বিভূতি। তিনি সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত। তিনি সত্য, শিব ও সুন্দর। তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দ। চলতি কথায় আমরা যাহাকে 'ধর্ম' বলি ইহাই তাহার লক্ষ্য। সুতরাং ধর্মের ও সাহিত্যের লক্ষ্য বা আদর্শের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখি না। অতএব ধর্মের সহিতও সাহিত্যের অতি নিকট সম্পর্ক। যাহাকে আপনারা morality বা সুনীতি বলেন, তাহা এই সত্যেরই একটা offshoot, শাখা মাত্র। Ethics এই morality-রই law বা শাস্ত্র। সুতরাং morality বা Ethics-এর সহিতও সাহিত্যের সম্পর্ক অতি নিকট।

এ পর্যন্ত যাহা আলোচনা করিলাম, তাহা হইতে সাহিত্যের (এ স্থলে কাব্যের) একটা standard বা মাপ-কাঠি তৈরী করা বোধ হয় কঠিন হইবে না। আদর্শ কাব্যের এই সকল গুণ থাকিবে:—

(১) কাব্য সত্যকে প্রকাশ করিবে, কাব্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে; কেবল সত্যই সমাজ ও সাহিত্যের চরম আদর্শ ও লক্ষ্য।

(২) যেহেতু এই সত্যের সহিত ধর্মের ও সুনীতির অতি নিকট সম্বন্ধ, সেই হেতু কাব্য ধর্ম ও সুনীতিই প্রকাশ ও প্রচার করিবে।

(৩) যেহেতু কাব্য রসাত্মক বাক্য, সেই হেতু কাব্য মানুষের মধ্যে রস, feeling, passion বা emotion জাগ্রত করিবে।

(৪) কাব্য মানুষের অন্তঃকরণ বা মন বা চিত্তের উপর ক্রিয়া করিবে বলিয়া কাব্যকে ঘরণী হইতে হইবে—কাব্যের মধ্যে মানুষ তাহার আপনার অন্তঃকরণের ছায়া দেখিতে পাইবে। আপন আদর্শেরও সন্ধান পাইবে।

(৫) Passion বা emotion উদ্রিক্ত করিতে হইবে বলিয়া, রস সৃষ্টি করিতে হইবে বলিয়া, কাব্য এমন ভাষায় রচিত হইবে, যাহা সহজেই মানুষের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারে।

(৬) কাব্য মানুষকে আনন্দ বিতরণ করিবে, কাব্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করিবে; কেন না কাব্য যে সত্যকে প্রকাশ করিবে, যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই সত্য যাঁহার বিকাশ, সেই সত্যের যিনি আধার, তিনি অনন্ত আনন্দময়, তিনি অনন্ত সৌন্দর্যময়।

উক্ত গুণগুলি আদর্শ কাব্যের গুণ, এ কথা গোড়াতেই বলিয়া রাখিলাম; সুতরাং এই কষ্টিপাথরে যাচাই করিলে অনেক কাব্যই হয় ত প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইবে না। কিন্তু যে কাব্য এই আদর্শের যত নিকটবর্তী হইবে, সেই কাব্য তত উৎকৃষ্ট। পৃথিবীর মহাকবিগণের, অথবা শ্রেষ্ঠ কবিগণের কাব্য আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদের সকলেরই কাব্যে এই আদর্শই প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহাদের কাহারো কাব্যে হয় ত কোন গুণের অধিক বা অল্প স্ফুরণ হইয়াছে, কিন্তু উপরি-উক্ত আদর্শ হইতে কেহই বিচ্যুত হন নাই। কালিদাস মূলতঃ সৌন্দর্যের উপাসক; তাঁহার কাব্যে শকুন্তলার পূর্বীভূত দুঃখ ও যক্ষের ব্যাকুল বিরহ যতই ওতপ্রোত হইয়া উঠুক, সকল ছাড়াইয়া তাঁহার অনুকরণীয় সুমধুর ভাষা ও অতুলনীয় সৌন্দর্য-সৃষ্টিই আমাদের স্মরণ হয়। কিন্তু Shakespeare নিপুণ anatomist-এর মত মানুষের অন্তঃকরণের সকল aspect বা দিক্ যেমন কাটিয়া কাটিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন, তেমন পৃথিবীর আর কোন কবি পারিয়াছেন কি না, আমি জানি না। অথচ এই দুই মহাকবিই সাহিত্যের মূল আদর্শ বজায় রাখিয়াছেন—সত্য প্রচার ও সত্য প্রতিষ্ঠা। কালিদাসের কথা না-ই বা ধরিলাম, কেন না দেব-দেবী লইয়াই তাঁহার প্রধানতঃ কারবার। ধর্ম ত হিন্দুর দৈনন্দিন "কটিনের" অন্তর্গত; কিন্তু মানুষের মনের বিবিধ অবস্থা লইয়া যিনি খেলা করিয়াছেন মনের "ডিসেকশান"-কারী সেই Shakespeareও কোথাও ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয়—এই মূল নীতিকে লঙ্ঘন করেন নাই। Macbeth বা Merchant of Venice, King Lear বা Hamlet, বহু নাটকে তিনি বহুরূপে পাপের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও পাপ পুণ্য হইতে অধিকতর উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত হয় নাই—সর্বত্রই পাপের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করা হইয়াছে। "Sin is represented as an ulcer at the heart of life, poisoning its very source, and bringing with it a train of miseries. • • • He shows us the worst and yet he makes us feel that human society with all its imperfections, rests on the basis of a moral order."—Henry S. Pancoast, "An Introduction to English Literature".

কাব্যের উক্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কাব্য সম্বন্ধে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে কয়েকটি নূতন মতবাদের আমদানী হইয়াছে, তাহাদের আলোচনা করা যাক। সেগুলি এই—(এইখানে সাহিত্যের সংকীর্ণ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে—সাহিত্য, কাব্য, কবিতা, কথাসাহিত্য ইত্যাদি।)

(১) সাহিত্যের কার্য গুরুমহাশয়-গিরি নয়,—সাহিত্য লোকশিক্ষার জন্য সৃষ্ট হয় নাই—সাহিত্য নিছক আনন্দদান করিবে।

(২) সাহিত্য মনুষ্যজীবনের নিখুঁত ছবি—সাহিত্য প্রকৃতিকেই অনুসরণ করিবে, সুতরাং সাহিত্যের সহিত ধর্ম, morality বা Ethics-এর কোন সম্পর্ক নাই।

(৩) "Art for Art's sake"—সাহিত্য সৃষ্টির কোন উদ্দেশ্য নাই, মানুষ শুধু যথাযথ আঁকিয়া যাইবে, উদ্দেশ্যের কোন ধার ধারিবে না।

সমাজের সহিত সাহিত্যের সম্পর্ক, সমাজ ও সাহিত্যের আদর্শ, কাব্যের গুণ, ইত্যাদি সম্বন্ধে এ পর্যন্ত আমি যে মত প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিলাম, সেই আদর্শ স্থির রাখিয়া সংক্ষেপে এইগুলির উত্তর দিতেছি।

(১) সমাজের সহিত সাহিত্যের যখন action and reaction-এর (ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার) সম্পর্ক, তখন সাহিত্যিক ইচ্ছা করুন আর না-ই করুন, তাঁহার লেখা সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিবেই। যে সাহিত্য শিক্ষা দিবে না, সে সাহিত্যের কুশিক্ষা দিবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। সাহিত্য আনন্দ দিবে নিশ্চয়ই; কিন্তু সেই আনন্দের প্রকার ভেদ আছে; স্থায়ী ও পূর্ণ আনন্দ মানুষের লক্ষ্য, অস্থায়ী অপূর্ণ আনন্দ, যাহা ক্ষণিকের জন্য একটা 'ইমোশান' জাগাইয়া পরক্ষণেই অবসাদ আনিয়া দেয়, সেই আনন্দ মানুষের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়-বৃত্তির পরিচালনা দ্বারা মানুষ সেই চরম ও পরম আনন্দ পাইতে পারে না, সংযম-দ্বারাই পাইতে পারে—এই সত্য পৃথিবীর সকল দেশের, সকল কালের, সকল মহাজনই প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এটা চিরপুরাতন কথা বলিয়াই পচিয়া যায় নাই। কেন না, সত্য অক্ষয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

(২) মনুষ্যজীবনের নিখুঁত ছবি সাহিত্যের আদর্শ হইতে পারে না। প্রকৃতিতে যাহা ঘটে তাহাই মানুষের

আদর্শ নয়, কারণ মানুষ প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াই মনুষ্যত্ব লাভ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। মানুষ যখন দাবানল দেখিয়া ভয়ে অস্থির হইত এবং পলাইতে না পারিয়া পুড়িয়া মরিত, তখন পশু হইতে উন্নত ছিল না। কিন্তু যখন অগ্নিকে আপনার আয়ত্তে আনিয়া তাহা দ্বারা নিজ কার্য্য সাধন করিতে লাগিল, তখনই মানুষ সভ্যতার প্রথম সোপানে পদার্পণ করিল। তার পর ক্রমে ক্রমে মানুষ স্থলে, জলে, পবনে, গগনে, নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করিল, এবং প্রকৃতির শক্তিসমূহকে করায়ত্ত করিতে লাগিল, তাই মানুষ এত সভ্য। আমাদের আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ, সকল বিষয়েই আট-পৌরে ও পোষাকী, দুইটা দিক্ আছে। আমরা ঘরে ও বাহিরে, মনে ও মুখে, দুই প্রকার ব্যবহার করিতে বাধ্য। কেন না, আমরা সমাজবদ্ধ জীব—পরের মুখ চাহিয়া আমাদের সকল ব্যবহারই সংযত করিতে হয়। তা ছাড়া মানুষ যাহা সমাজের দশ জনের সম্মুখে বাহির করিবে, তাহা তাহাদের গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই, নতুবা তাহা প্রকাশযোগ্য নয়। মানুষ যাহা নিয়তই করে, নিয়তই দেখে ও নিয়তই শোনে, সাহিত্যে শুধু তাহাই পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে না, তাহার চেয়ে উচ্চ-স্তরের একটা কিছু চায়, একটা আদর্শ চায়। শুধু স্বভাবকে অনুসরণ করিলে পৃথিবীর সকল নাটকই মাঠে মারা যাইত। নাটকের নায়ক-নায়িকা যখন নির্জ্জন পাতাকুঞ্জে মিথিলেরে দুটা মনের কথা বলেন, তখন তাহা শুনিয়া সম্মুখে উপবিষ্ট পাঁচ হাজার শ্রোতার "হৈমোশান" উথলিয়া উঠে কিরূপে? নাটক শুধুই স্বাভাবিক হইলে হ্যামলেট যে কথা মনে মনে ভাবিয়া-ছিলেন, তাহা ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙ্গালী ১৫০ বৎসর যাবৎ কোটেশনরূপে ব্যবহার করিতেছেন কিরূপে?* স্বভাবের অনুসরণই যদি সাহিত্যের আদর্শ হইবে, তাহা হইলে কি মোহিনীকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে গোবিন্দলাল "পাপে ছেড়ে তোমায় রাখায় রেখেছিলাম; রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, রাজার অধিক সম্পদ, অকলঙ্ক চরিত্র, অন্যান্য ধর্ম্ম, সব তোমার জন্য ছেড়েছিলাম" বলিয়া 'থিয়েটারী' করে? না, মডার্ণ রাম মডার্ণ সীতাকে—"সী—তা, সী—তা" বলিয়া হাকামী করে? বাস্তবিক, মনুষ্যজীবন যেমন আধা-স্বাভাবিক ও-অস্বাভাবিক, সাহিত্যও তেমনি স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতার সংমিশ্রণে গঠিত হইবে।

তারপর, ধর্ম্ম ও নরালিটির সহিত সাহিত্যের সম্পর্কের কথা। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে সত্যানুসন্ধান ও সত্য প্রতিষ্ঠা সমাজের ও সাহিত্যের লক্ষ্য, তাহাই ধর্ম্মেরও লক্ষ্য, অথবা এক কথায় তাহাই 'ধর্ম্ম'। এবং morality বা সুনীতি সেই ধর্ম্ম বা সত্যের একটা অঙ্গ ছিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ধর্ম্ম এবং morality বা সুনীতিকে বাদ দিলে সাহিত্য আর সাহিত্য থাকিতে পারে না,—সাহিত্যের সমাক্ হিত করিবার ক্ষমতা লোপ পায়। বাস্তবিক, পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকই সুনীতির উপর তাঁহাদের সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যে ইংরাজি সাহিত্যের আওতায় আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই ইংরাজী সাহিত্যের মূল কথাও তাহাই। রুসটেয়ার বলেন—"No nation has treated in poetry moral ideas with more enegy and depth than the English nation." Matthew Arnold বলেন—"A poetry of revolt against moral ideas is a poetry of revolt against life. A poetry of indifference towards moral ideas is a poetry of indifference towards life." সেক্‌স্‌পীয়রের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মিলটনের Paradise Lost ও প্রতিদত বাইবেলের টীকা। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকেও প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক কবি বলা যাইতে পারে। শেলী, কীট্‌স্, ব্রাউনিং-দম্পতি এবং টেনিসন্ তাঁহাদের কাব্য সুনীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বায়রণ সম্বন্ধে আপত্তি হইতে পারে, কিন্তু বায়রণের কাব্য হইতে দুর্নীতিমূলক অংশগুলি বাদ দিলেও তিনি বড় কবি। অর্থাৎ বায়রণ তাঁহার দুর্নীতি সত্ত্বেও বড়, দুর্নীতির জন্য বড় নন,* যেমন মাইকেল মধুসূদন দত্ত মদ্যপ হইয়াও মেঘনাদ-বধ কাব্য লিখিয়াছিলেন,—মেঘনাদ-বধ কাব্য তাঁহার মদ্য-পানের ফল নয়।

(৩) "Art for Art's sake"—এই মতবাদটীও কম হাস্যকর নয়। শুনিয়াছি, এই মতবাদটী যিনি প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই ভিক্টর হিউগোও পরে এই মত সমর্থন

* "To be or not to be, that is the question." ইত্যাদি।

* "The books are great not because of their moral deficiencies, but in spite of them"—Prof. C. T. Winchester.

করিতেন না, বরং প্রতিবাদ করিতেন। বাস্তবিক, দুনিয়াতে বিনা প্রয়োজনে একটা গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ে না, কিন্তু সাহিত্য,—সমাজের সম্যক্ হিত করাই যাহার কার্য্য, তাহাই শুধু বিনা প্রয়োজনে, বিনা উদ্দেশ্যে, দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞানশূন্য হইয়া "নিরুদ্দেশ যাত্রার" মত অকূল সমুদ্রে তরণী ভাসাইবে, ইহার চেয়ে হাস্যকর মত আর কি হইতে পারে? Pleasure বা Emotion জাগ্রত করা ইত্যাদি যদি সাহিত্যের উদ্দেশ্য হয়, তবে "Art for Art's sake" হইল কি করিয়া? যাহা খুশী তাহাই লিখিয়া যদি সাহিত্য বলিয়া চালান যায় তবে সেটা সাহিত্য হইবে না, হইবে, যাহা-ইচ্ছা-তাই, অর্থাৎ চলতি কথায়—"যাচ্ছেতাই।"

এ পর্য্যন্ত আমি যাহা আলোচনা করিলাম, তাহা প্রায় সমস্তই ইউরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধে, এবং সাধারণ ভাবে সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে। তাহার কারণ এই যে, যদিও বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতরূপ ভূমি হইতে রস গ্রহণ করিয়াছে, তথাপি, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষ ভাবে ইউরোপীয় আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে। অর্থাৎ বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের heredity সংস্কৃত, কিন্তু environment ইউরোপীয় সাহিত্য। আজ কালকার উদীয়মান, উদিত এবং অস্তমিত সাহিত্যিকগণ সাহিত্যের কথা বলিতে হইলেই বিশ্ব-সাহিত্যিকদিগের দোহাই যেন বলিয়া আমিও তাঁহাদেরই কয়েক জনের নাম করিয়াছি। বলা বাহুল্য, এই সকল তরুণ সাহিত্যিকদিগের 'বিশ্ব' অর্থ ইউরোপ। যেমন পূর্ব্বে ভারতবর্ষের একটা প্রদেশের রাজাও সদাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইতেন।

আমি যে কাব্যের কষ্টিপাথর স্থির করিয়াছি, তাহাতে কষিয়া দেখিলে প্রাচীন বাঙ্গালী সাহিত্যও খুব উৎরাইবে না। চণ্ডীদাস হইতে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত সাহিত্যিকগণ সকলেই খাঁটি বাঙ্গালী, তাঁহাদের কাব্যে বাঙ্গালার মর্ম্ম-কথাই ধ্বনিত হইতেছে। বাঙ্গালীর সমাজ, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, বাঙ্গালীর আচার, বাঙ্গালীর বিচার, এমন কি বাঙ্গালীর "পিঠে খাওয়া" পর্য্যন্তও বাঙ্গালা কাব্যে বাদ পড়ে নাই। সুতরাং ইঁহারা representative men; ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার জন্য ভারতচন্দ্র দায়ী নহেন, তখনকার বাঙ্গালী সমাজ, তথা নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাই দায়ী। কিন্তু ভারতচন্দ্রের সম্বন্ধেও আমি বলিতে ইচ্ছা করি যে, ভারতচন্দ্র তাঁহার অশ্লীলতার জন্যই বড় নহেন, অশ্লীলতা সত্ত্বেও বড়।

তারপর নব সভ্যতার ভগীরথ রাজা রামমোহন রায় আসিয়া "ভাষণী নদী" প্রবাহিত করিলেন। তিনি বর্ত্তমান সভ্যতার "পাইয়োনীয়ার" হইতে পারেন, কিন্তু বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। সাহিত্যের দশ দিক্ তাঁহার মঙ্গলশঙ্খের আহ্বান-ধ্বনিতে মুখরিত হইয়াছিল। তিনি ইংরাজী সাহিত্য রসিক, কিন্তু বাংলারই representative man—তাঁহার সাহিত্যে বাংলারই মর্ম্মকথা ধ্বনিত হইতেছে। বঙ্কিম-সাহিত্যও দোষ শূন্য নয়, কেন না কোন সাহিত্যই নির্দ্দোষ হইতে পারে না; তিনি যে উপন্যাসের আমদানী করিয়াছেন, তাহার আদর্শ বিলাতি; কিন্তু তবুও এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যে তিনি নূতন আদর্শেরও সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সেই আদর্শ কখনও আদর্শের আসন হইতে বিচ্যুত হইতে পারে না।

কিন্তু বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য কোন্ পথে যাইতেছে? কোন্ আদর্শের অনুসরণ করিতেছে?

ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায়, অতি-আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যিকগণ কেবলমাত্র দুইটি রসের চর্চ্চা করিতেছেন,—শৃঙ্গার রস ও বীভৎস রস। প্রথমটি তাঁহাদের ইচ্ছাকৃত, কিন্তু দ্বিতীয়টি তাঁহাদের অনিচ্ছাকৃত এবং তাঁহাদের মূল লক্ষ্য একটি,—মনুষ্য-জীবনের নিখুঁত ছবি আঁকা। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের লিখিবার ক্ষমতার অভাব নাই, দরদ (sympathy)-রও সম্ভবতঃ অভাব নাই। কিন্তু সমগ্র ভাবে মনুষ্য-জীবন আঁকিবার ক্ষমতা, দক্ষতা বা ইচ্ছা না থাকায়, তাঁহাদের চিত্রে শুধু মনুষ্য-জীবনের একটা দিক্‌টাই প্রতিফলিত হয়। শুধু তরল কথা-সাহিত্য ছাড়া তাঁহারা সাহিত্যের আর কোন বিভাগে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ইউরোপে বর্ত্তমান যুগে যে বস্তুতান্ত্রিক (realistic) কথা সাহিত্য চলিতেছে, আমাদের দেশের কথা-সাহিত্যিকগণ শুধু তাহারই অন্ধ অনুকরণ করিতেছেন। কেন না, ইউরোপীয় সমাজের বিবিধ বৈচিত্র্য আমাদের সমাজে নাই, এবং স্ত্রীপুরুষের যে অবাধ যৌন-সম্মিলন আমাদের তরুণ

কথা-সাহিত্যিকগণ তাহাদের একমাত্র বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা আমাদের সমাজে এখনও অতিশয় নিন্দনীয় বলিয়াই বিবেচিত হয়। আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে কুমারীর প্রেম ছিল—যাহাকে বলে পূর্ব্বরাগ। বিবাহেই এই পূর্ব্বরাগের পরিসমাপ্তি হইত। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম আমদানী করিলেন বিধবার প্রেম। সেটা প্রেমের একটা বৈচিত্র্য বটে। কিন্তু এই বিধবার প্রেমের পরিণাম যে কি, তাহা তিনি দেখাইতে কসুর করেন নাই। একজন বিষ খাইয়া, আর একজন বিষ খাইয়া। কিন্তু আজকালকার কথা-সাহিত্যে যেরূপ বারবনিতার প্রেম ও সধবার প্রেমের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেটা আমাদের দেশের পক্ষে অভিনব ও ধারণাতীত। ইউরোপে আজকাল Sex-Psychology এবং Criminologyর খুব জোর রাজত্ব চলিতেছে। স্কান্দিনাভি নরওয়ের নাট্যসাহিত্যিক Ibsen এবং রাশিয়ার কথাসাহিত্যিক Dostoevsky সাহিত্যে যথাক্রমে এই Sex-Psychology ও Criminology আমদানীর প্রধান পুরোহিত। ইউরোপে সাহিত্য মহারথীর অভাব নাই। কিন্তু সেই সকল চিন্তাশীল, পণ্ডিত, মনস্তত্ত্ববিদ্ ও সমাজ-সমালোচকদিগের অনুকরণ করিতে না পারিয়া এই সকল বাঙ্গালী আধুনিক কথাসাহিত্যিকগণ কেন Sex-Psychologist ও Criminologistদের চর্ব্বিতচর্ব্বণ গলাধঃকরণ করিয়া নির্জ্জীব ত্যাগ করিতেছেন, কেন ভাবের মন্দাকিনী প্রবাহিত করিতে না পারিয়া ইউরোপীয় ড্রেণের পঙ্কিল দূষিত জল প্রবাহিত করিতেছেন, তাহা বোঝা কঠিন নয়। Anatole France-এর কলাকৌশল (Art), Romain Rolland-র বিবিধ-বিষয়িণী প্রতিভা, Bernard Shaw-র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গযুক্ত সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ, John Galsworthyর নাট্যপ্রতিভা এবং অন্তর্দৃষ্টি এবং Leo Tolstoy-এর সাহিত্যে মহাপ্রাণতার অনুকরণ করিতে না পারিয়া, যে প্রবৃত্তির জন্য মানুষ এখনও পশুত্বের পর্য্যায় হইতে উচ্চে উঠিতে পারে নাই, এবং যে প্রবৃত্তিকে দমন করিবার চেষ্টায় সাধু কঠোর সংযম অভ্যাস করিতে চেষ্টা করেন—এই ঘডার্গ অর্ব্বাচীন কথা-সাহিত্যিকগণ সেই প্রবৃত্তির খোরাক জোগাইতেই প্রবৃত্ত আছেন। কুক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্র যে বিধবার প্রেমের আমদানী করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে যৌগিদির প্রেমে প্রমোশান দিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানেই তিনি ক্ষান্ত না থাকিয়া "ঘরের বৌ"-কে "বাহির" করিয়াছেন এবং সন্দীপ ও বিমলার যে 'refined' প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, কোন ক্রমেই তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া আমরা সাধারণ পাঠকবর্গ চক্ষে সরিষার ফুল দেখি। কিন্তু তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণকারী শরৎচন্দ্র সার্থকনামা বটে! তিনি নিশীথ রাত্রির সাহিত্যিক, তাই তাঁহার শুকসারা বিদ্যা আরও উপরে উঠিয়াছে। তিনি আর সধবার সন্ধই না থাকিয়া বাইজি ও বি'র চিত্র আঁকিয়া হাত পাকাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা যাহা আছে, তাহা reflected প্রতিভা। কিন্তু তাঁহার শিষ্য, অনুশিষ্য ও প্রশিষ্য এবং অতিবৃদ্ধ-প্রশিষ্যরা কোথায় গিয়া থামিবেন?

এখন আপনাদিগকে এই কথাটাই জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এই তথাকথিত সাহিত্যের 'সাহিত্য' এই অতি উচ্চ নাম পাইবার কি গুণ আছে? এই সাহিত্য সমাজের হিত করে না, সুতরাং ইহা অসত্য। এই সাহিত্যের সহিত ধর্ম্ম ও সুনীতির কোন সম্পর্ক নাই, ইহা শুধু একটি মাত্র রস প্রকাশ করে, এবং সে রসও বহু দূর হইতে আমদানী করা ও বিকৃত (fermented)—সুতরাং রস নহে, বি-রস (বদ); এই সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালী সমাজের অন্তরের যোগ নাই, ইহা representative নয়, ইহার ভাষাও প্রায়শঃ কৃত্রিম এবং অনেক স্থলে নীরস, এবং এই সাহিত্য সমাজকে যে আনন্দ দান করিতে চেষ্টা করে, পৃথিবীর সকল মনীষীই সেই আনন্দকে নিকৃষ্ট আনন্দ বলিয়া উচ্চতর আনন্দের জন্য ব্যাকুল হন।

এখন আমার জিজ্ঞাস্য, অতি-আধুনিক বাঙ্গালা কথা-সাহিত্যের স্থান কোথায়?

## আনন্দময়ীর আগমনে

—শ্রীরেখা দেবী

পূজা আগতপ্রায়, আর দু'দিন বাদেই আমরা শুনতে পাবো পুজো-বাড়ীর সানাইয়ের মধুর 'আগমনী' সুর—দেখবো পুজোর দালানে আনন্দময়ীর প্রতিমা—ঘরে ঘরে জাগবে সাড়া, পড়ে যাবে উৎসবের আয়োজনের ধুম! কি ধনী, কি দরিদ্র, সবাই যে যার ক্ষমতার অনুযায়ী আয়োজন করবে, মায়ের আগমনে আনন্দ প্রকাশ করবে। যাদের ক্ষমতা আছে তারা মাকে আনবে নিজের ঘরে—তাঁর রাতুল চরণে পূজার অর্ঘ্য উৎসর্গ করে আনন্দ ও তৃপ্তি পাবে। তাই বলে যে দরিদ্র সন্তানরা তা করতে পারবে না, তারা যে মাকে দেখতে পাবে না, বা তাঁর চরণে অর্ঘ্য দিতে পারবে না, তা নয়। মা যে জগতের মা, তাঁর কাছে তাঁর সকল সন্তানই সমান। তাই যে তাঁকে ঘরে আনতে পারবে না, সে যাবে যেখানে তাঁর আনন্দময়ী প্রতিমা বিরাজ করছে সেই পূজার অঙ্গনে, দেবে অর্ঘ্য, আর পাবে মায়ের দর্শন ও প্রসাদ। তার পর সে মায়ের চরণে প্রণাম জানিয়ে প্রাণভরা আনন্দ ও হাসি নিয়ে ফিরবে নিজের কুটীরে—যেখানে তার সাধ্যমত উৎসবের আয়োজন করা আছে। পূজার কটা দিন সে তার দুঃখ, দারিদ্র্য সব ভুলে যাবে; ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, আত্মীয় পরিজন সবাই মিলে একটা দিন তারা আনন্দে কাটাবে।

আমাদের দেশে পূজার কটা দিন যে আনন্দ-উৎসব চলে তাকে আমাদের সারা বছরের সম্বল বললেও ভুল হয় না, সমস্ত বছর লোকে কেবল দু'টী অন্নের সংস্থানের জন্যই প্রাণপণে চেষ্টা করে কাটায়, আর কিছু করবার তাদের সময়ও নেই, উপায়ও নেই—কাজেই অন্য কোন পূজা-পার্ব্বণেই আর এমন করে সবাই আনন্দ-উৎসবে যোগদান করতে পারে না, কেবল পারেন যাঁদের উপর মা লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি আছে তাঁরা, কিন্তু তাঁদের সংখ্যাও অল্প। সারা দেশ এমন করে জাগে, হাসে, আনন্দ করে কেবল বছরে তিনটী দিন—সে হচ্ছে এই পূজোর সময়। এখন প্রতিগৃহেই এক আয়োজনের চেষ্টা চলেছে, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মনে একই কথা, একই আশা জাগছে—তারা পাবে "নতুন জিনিষ", যার জন্য তাদের কচি মনগুলি সারা বছর উৎসুক ভাবে অপেক্ষা করে। এই বিশেষ দিনগুলির জন্য তারা জমিয়ে রাখে অনেক আব্দার ও অনেক বায়না।

সামনে পূজা—এখন সবাই ভাবছে, পূজার কাপড়-জামা কেনবার কথা, বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা অধীরভাবে অপেক্ষা করছে—কবে তাদের পূজোর জামা-কাপড় বাড়ীতে আসবে তারই আশায়। তাদের মায়েরা ও বোনেরা মনে মনে ভাবছেন, এবার পূজোর কাপড়খানা কি পাড়ের হবে এবং জামাটাই বা কি প্যাটার্ণে তৈরী হবে। গৃহস্বামী কাগজ কলম নিয়ে হিসেব করছেন সবার ফরমাস মত জিনিষ কিনতে কত খরচ বাড়বে! অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ঘরে 'সেকরা'দেরও ডাক পড়েছে, গহনার বায়না দিতে—এখন থেকে না দিলে ঠিক দিনে ঘরে উঠবে কেন? আর কটা দিনই বা বাকি? মোট কথা এখন অন্তঃপুরে যে হাওয়া বইছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কথা বলতে গেলে করতে হবে কাপড়, জামা, ও গহনা নিয়ে আলোচনা। আবার শুধু তাই নয়, এগুলি নিয়ে যা কিছু বলা হবে তাতে থাকা চাই 'নতুনত্ব'—না হলে অন্তঃপুরের দরবারে তার প্রবেশাধিকার স্থান হবে না—'পুরণো' কথা শুনে নষ্ট করবার মত সময় এখন

একেবারেই নেই। সবাই ভাবছেন নতুন জিনিষ তৈরী করাবার কথা—এখন যদি এমন কিছু বলা যায়, যা "নতুন জিনিষ" তৈরী করাবার কাজে সাহায্য করবে, বা শোনবার পরই 'সেকরা' বা দর্জিকে ডাকিয়ে পাঠানো যায় অথবা নিজেরা সেলাইয়ের কল ও কাঁচি নিয়ে বসে পড়া যায়, তাহলে বরং সে কথা ৫'মিনিট ধৈর্য্য ধরে পড়া বা শোনা যায়। কাজেই আমার পক্ষে এখন যে কাজটী করা উচিত, সেটী আমি বেশ বুঝতে পারছি। এখন আমার উচিত নতুন 'ডিজাইন' বা 'প্যাটার্ণ' দেওয়া। এটী যে উৎসবের পূর্ব্বে মেয়েদের কি ভীষণ রকম দরকার পড়ে, তা যাঁরা ভুক্তভোগী সেই অন্তঃপুরিকারাই জানেন, আর সৌভাগ্যবশতঃ ( কিম্বা "দুর্ভাগ্যবশতঃ" –ঠিক বলতে পারলাম না কোনটা ) আমিও মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলেই নিজেকে দিয়ে একথা খুব ভাল ভাবেই উপলব্ধি করতে পারছি। এবং সেইজন্যই এবার আর অন্য কোন কথা নিয়ে আলোচনা না করে সেটী আপনাদের এখন সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন সেই "নতুন ডিজাইন" বা প্যাটার্ণ নিয়েই কিছু বলবো, যাতে এর ভিতর দিয়ে আপনাদের কিছু সাহায্য করতে পারি। আমি জানি যে আমার কি উদ্দেশ্যে আজ অন্তঃপুরে আগমন তা জানতে পেরেই আপনারা একটু কৌতূহলী হয়ে উঠবেন—মনটা ব্যস্ত হয়ে উঠবে শীঘ্রই আমার বক্তব্যটা শুনে নিয়ে নতুন প্যাটার্ণটী শিখে নেবার জন্য—এবং তা হবারই কথা। 'নতুন রকম শাড়ী", "নতুন প্যাটার্ণের জামা", কিম্বা "নতুন ধরণের গহনা",—এ কথাগুলি মেয়ে মাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করবে, কারণ এগুলি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু। তাছাড়া এগুলি নতুন রকম করে তৈরী করিয়ে পরে সুরুচির পরিচয় দিতে ও আত্মীয়-স্বজন ও বান্ধবী-মহলে নাম কিনতে সকল মেয়েরই মনে মনে ইচ্ছা থাকে। তার উপর যখন এমনি পূজা-পার্ব্বণ বা নব-বৎসরে নতুন জিনিষ তৈরী করাবার সুযোগ পাওয়া যায় মাত্র বছরে একদিন, তখন কি আর সে সময় কারুর পাঁচ বছর আগেকার পুরণো প্যাটার্ণে জামা করাতে কখনও ইচ্ছা যায়? কখনই নয়। এবং সেইজন্যই এই সব উৎসবের সময় মেয়েদের অনেক কষ্টে যোগাড় করতে হয় নতুন ডিজাইন, কিন্তু অনেককে আবার এই প্যাটার্ণ-সমস্যা নিয়ে অত্যন্ত বেশী রকম মাথা ঘামাতে হয়, কিছুতেই আর তাঁরা ঠিক করতে পারেন না কি ভাবে নতুন জামাটী তৈরী করাবেন—এঁদের যদি সে সময় একটু সেই বিষয়ে সাহায্য করা যায়, তবে তাঁদের পূজার আনন্দে যোগদান করাটা অনেক সহজ ও শীঘ্র হয়ে উঠবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

ভগবানের কৃপায় যাদের অর্থের অভাব নেই, পোষাক-পরিচ্ছদ নিয়ে তাঁদের বেশী ভাবতে হয় না, কারণ দাম যতই পড়ুক তাঁরা তাই দিয়েই নিজেদের মনের মত জিনিষটী কিনতে বা তৈরী করাতে সমর্থ হন। তাই তাদের কোন সাহায্যের দরকারও বড় একটা হয় না—কিন্তু এমন সৌভাগ্যবতীর সংখ্যা আমাদের দেশে কম। যাদের সুলভ মূল্যের জিনিষ কিনে, অল্প-খরচে পূজার বাজার সারতে হয় এমন মেয়ের সংখ্যাই বেশী, আর পোষাকের সমস্যাও ভাবিতে গেলে এঁদেরই বেশী, কারণ অল্প দামে মনের মত জিনিষ পাওয়া কঠিন, অথচ একটা ধরা-বাঁধা অঙ্কের ভিতর তাঁদের ছেলে-মেয়ে ও নিজেদের জিনিষ কিনতে হবে; এমনিভাবে যাদের অর্থের দিকে দৃষ্টি রেখে এসব জামা-কাপড় কিনতে হবে, আমার কথা তাঁদেরই নিয়ে।

আমার মনে হয় যে, এভাবে যাঁদের চলতে হয় তাঁরা যদি একদিনেই সব কিছু না কিনে, কিছুদিন আগে থেকেই নিজের এবং অন্যদের জিনিষ-পত্র আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে কিনে রাখেন তাহলে অনেক দিক থেকে সুবিধে হয়। প্রথমতঃ, অনেকগুলো টাকা একসঙ্গে খরচ হয় না—তাছাড়া, সময় থাকতে কিনলে জামা, ফ্রক, পাঞ্জাবি, ইত্যাদি নিজেরাই সব ঘরে তৈরী করেও ফেলতে পারেন। আর শেষ মুহূর্ত্তে কিনলে নিজেরা করবার সময় হয় না বলে আবার হয় তো খরচ করে দর্জ্জিকে দিয়েই করাতে হয়—কিন্তু নিজের হাতে করলে জিনিষগুলি ভালো ও অনেক বেশী মনোমত হবে, তাই সেই চেষ্টা সকলেরই করা উচিত।

ছোটদের জামা-কাপড় নিয়ে বেশী ভাবতে হয় না, তারা নতুন কাপড় পেলেই খুশী, প্যাটার্ণ নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। কিন্তু যত মুস্কিল বাধে নিজেদের জামা তৈরীর সময়—কিছুতেই একটা ভালো প্যাটার্ণ আর মনে আসে না, আর না হয় তো যে প্যাটার্ণটা মনে হয় সেটা আবার যে কাপড়টা কেনা হয়েছে তাতে তৈরী হবে না। কাজেই নাচার হয়ে শেষে একটা সেই "মান্ধাতার-আমলের" বহুবার-পরা

প্যাটার্ণেই একটা ধা'তা করে নিয়ে পরতে হয়। তাতে করে নতুন জিনিষ পরার আনন্দ তো উবে যায়ই, উপরন্তু সর্ব্বদাই মনটা খুঁৎ খুঁৎ করে—আর পাঁচ জনের গায়ে নতুন ধরণের জামা দেখে নিজের উপর কেবলই রাগ হতে থাকে, তেমনি একটা কিছু না করতে পারার দরুণ। অবশ্য এটাও ঠিক যে নতুন প্যাটার্ণ মাথা থেকে বের করে তৈরী করা বড় সহজ নয়—কিন্তু তাই বলে কেবল শুনেও তৈরী করা যায় না; কেউ হয় তো একটা সহজ ও সুন্দর প্যাটার্ণ বলে দিলে—তখন আবার একটু খট্‌কা লাগে এই ভেবে যে "তৈরী হলে জামাটী কেমন দেখাবে—শুনতে তো ভালই লাগছে কিন্তু দেখতেও কি তেমনি হবে?" এমনি নাড়ে, পাঁচ জনে আবার সেটাও করা হয় না, পাছে কাপড়টা কেটে ফেলে নষ্ট করা হয় এই ভেবে—এবং সেইজন্যই আমি যে প্যাটার্ণটী বলে দিচ্ছি তার একখানা ছবিও সঙ্গে সঙ্গে এঁকে দিলাম, যাতে সেটী অনুসরণ করবার এবং হয়ে গেলে সেটী কেমন দেখতে হবে তা বোঝবার সুবিধে হয়।

### জামার প্যাটার্ণ

এই প্যাটার্ণে জামা তৈরী করতে গেলে লাগবে একগজ গাঢ় রঙের সিল্ক বা সাটীন, আধগজ হাল্কা রঙের ঐ কাপড়—এবং ঐ দুটী রঙের সঙ্গে সঙ্গে মেলানো কিছু হাল্কা ও গাঢ় রঙের ভালো রেশম—কয়েকটী সেফ্‌টি-প্রেস বা টেপা বোতাম।

জামার প্যাটার্ণ

জামাটী অবশ্য যে যার পছন্দ মত রঙ্‌-সমন্বয়ে করতে পারেন—কিন্তু আমার মনে হয় একটা বিষয় লক্ষ্য রাখলে এটী দেখতে আরও ভালো হবে। সেটী হচ্ছে—জামাটী যে রঙের হবে সেই রঙেরই কিছু হাল্কা দেখে আধগজ কাপড় কিনবেন এর কাফ ও কলারের জন্য। দুটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন রঙ্‌ না দিয়ে এই একই কিন্তু গাঢ় ও হাল্কা রঙের সমন্বয়ে কোন কিছু তৈরী করতে পারলে তা দেখতে ভারী সুন্দর হয় এবং এতে আপনার সুরুচিরও পরিচয় দেওয়া হয়—তার পর যদি ঠিক ঐ হাল্কা এবং গাঢ় রঙের সঙ্গে মিলিয়ে বেশম কিনে জামাটীর হাতে গলায় কাজ করতে পারেন তা হলে চমৎকার দেখতে হবে।

প্রথমে ছোট হাতের এবং ছোট 'ভি' গলার নিজের গায়ের মাপের একটী জামা ঐ গাঢ় রঙের কাপড়টী থেকে তৈরী করুন—এর গলাটা আপনাদের অন্যান্য জামার গলার

চেয়ে বেশ খানিকটা উঁচু বা ছোট করে কাটতে হবে, অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছোট তো হওয়া চাই-ই। জামাটী সেলাই করে রেখে তার পর কাফ ও কলারের জন্য যে অপেক্ষাকৃত হাল্কা রঙের কাপড় এনেছেন তাতে ঐ জামার গলার ও হাতের মাপে কফ ও কলার পেন্সিল দিয়ে আগে এঁকে নিন—কিন্তু কাটবেন না—কেটে নেবার আগেই তাতে কাজ করা শেষ করতে হবে—কারণ কাটবার পর ছোট ছোট টুকরোর উপর কাজ করা বড় অসুবিধা-জনক হয়ে পড়বে। যাই হোক এবার ঐ আঁকা কাফ ও কলারের উপর কাজ করবার উদ্যোগ করতে হবে—প্রথমে ছবিতে যেমন আছে তেমনি চ'টী মাছ কলারের সামনের দু'ধারে এঁকে নিন—তার পর মাছটীর গায়ের বাইরের রেখাগুলি 'outline' ২-'বী' রেশম গাঢ় রঙ থেকে বেছে নিয়ে stem stitch বা ডালের সরু সেলাই যেমন করে করা হয় তেমনি ভাবে করে ফুটিয়ে তুলুন। হয়ে গেলে হাল্কা রঙের রেশম একটী নিয়ে মাছের আঁশ-গুলি বোতাম-ঘর সেলাই দিয়ে প্রত্যেকটী আলাদা আলাদা করে ভরিয়ে যান—মাছের চোখটী কেবল হবে টুক্‌টুকে লাল রেশমের একটী "ফ্রেঞ্চ-নট"। তার পর বাইরের জলের রেখাগুলি ( মাছের গায়ের কাছে যে সরু সরু আঁকা বাঁকা লাইনগুলি আছে )—সেগুলি হয় ঐ দুই রঙের রেশম মিলিয়ে 'ষ্টেম-ষ্টিচ্' দিয়ে ফুটিয়ে দিন, আর না হয় তো ফিকে নীল জলের রঙের রেশম দিয়েও করে দিতে পারেন—তা হলেই এমব্রয়ডারি শেষ হল। এইবার এই কাজ ও কলার, পেন্সিলের যে দাগ দিয়ে রেখেছেন সেই দাগের চেয়ে দিকি ইঞ্চি বড় করে কেটে নিন ও মুড়ি মুড়ে যথারীতি সেগুলি জামার হাতে, গলায় বসাবার জন্য প্রস্তুত হন—কলারের যে দিকটা গলায় বসাতে হবে সে দিকটায় আর কিছু করতে হবে না—কিন্তু যে ধারটা বাইরের দিকে থাকবে তার মুড়ি মোড়া যেন খুব সরু হয় আর সেদিকের সেলাইও হবে ছোট ছোট। এমনি করে কাফ ও কলার কেটে নিয়ে সেলাই করে, জামায় বসাবেন। না হলে ধারের সেলাই দেওয়া শক্ত হবে।

এখন ধারের সেলাই কি ভাবে করতে হবে তাই বলি :—কাফ ও কলারের বাইরের ধারটায় ছবিতে যেমন একটী করে ছোট ছোট 'ক্রস' আঁকা আছে তাই করতে হবে; ক্রস-ষ্টিচ্ আপনারা সকলেই জানেন—তেমনি করে একসার ক্রস-ষ্টিচ্ গাঢ় রঙের রেশম দিয়ে করে দিন। এর জন্য ২।৩ 'বী'র বেশী রেশম ছুঁচে দেবার দরকার নেই। ৩'বী' নিলেই ঠিক হবে। এইবার এই কাজ-করা কাফ ও কলার আপনার জামার হাতে ও গলায় সেলাই করে বসিয়ে দিন, তা হলেই ঐ ছবির অনুরূপ একটী জামা তৈরী হবে—কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে, জামার গলাটা ছোট করা হয়েছে বলে বোতামের ঘরটা সাড়ীর পাড়ের উপর দিয়ে চোখে পড়ছে এবং সেটাকেও একটু কাজ করে সুন্দর করে তোলা হয়েছে। ওখানে কাজ না দিলে প্লেন চওড়া পটীর নীচে সেফটী-প্রেসগুলো আঁটা থাকলে মনে হতো জামাটা অসম্পূর্ণ আছে—তাই এই ব্যবস্থা। বোতামের ঘরের কাছের পটীগুলো বেশ চওড়া করে দিয়ে তলায় টেপা বোতামগুলি লাগিয়ে দিয়ে উপর দিকে একটী ফিকে ও একটী গাঢ় রঙের বড় বড় 'ক্রস' সেলাই করে সেটী উপর থেকে নীচ পর্য্যন্ত ভরিয়ে দিন। তার পর আধ ইঞ্চি তফাতে পটীর দু' পাশে ছোট ছোট বকন বা ষ্টেম-ষ্টিচ দিয়ে দুটী দাগ দিয়ে দিলেই ছবির প্যাটার্ণটী অবিকল নকল করা হবে, এবং পূজার দিনে পরবার জন্য তৈরী হবে ঐ রকম সুন্দর একটী জামা—পেয়ে মনটা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে।

## পূজার নূতন খাবার

ছেলে-মেয়েরা পূজোর সময় কাপড়ের প্যাটার্ণ নিয়ে মাথা ঘামায় না বটে, তবে আর একটী বিষয়ের উপর তাদের সতর্ক দৃষ্টি থাকে। সেটী হচ্ছে পূজোর দিনের খাবার—মায়েরা নিজেদের জামা-কাপড়ের চেয়েও এই কথা আরও বেশী করে ভাবেন। ভাবেন—উৎসবের দিনে নতুন রকম খাবার করা চাই। না হলে যে "খুদে দস্যু"র দলটী এখন শান্ত ভাবে নতুন কাপড়-জামা ও খেলনা নিয়ে ভুলে আছে, তাদের আক্রমণে মায়েদের অত্যন্ত বিব্রত হয়ে উঠতে হবে। তাই আর কিছু ভাববার বা করবার অনেক আগে থেকেই তাঁদের 'পূজার খাদ্য-তালিকা' প্রস্তুত করে রাখতে হয়। "নতুন রকম খাবার চাই"—এই হচ্ছে ছোটদের ফরমাস, যা মায়েদের শুনতেই হয়। কিন্তু কেবল 'নতুন রকম' কিছু হলেই চলবে না তার উপর সেটী হওয়া চাই এমন 'মুখরোচক' যে সেটী খেলেই যেন ছোট ছোট জিভ্‌গুলি সরস হয়ে ওঠে। এই ফরমাস মত কিছু তৈরী করা বড় সহজ ব্যাপার নয়—ছোটদের উপযুক্ত কিছু করা বড়দের জন্য করার চেয়ে অনেক

শক্ত। আমার মনে হয় "কেক" ও "চকোলেট" এই কথা দুটী শুনেই ছোটদের মনে লোভের উদ্রেক হয়। বিলিতী নাম শুনে ভড়কাবেন না, রসগোল্লা যেমন সাহেবরা কম পছন্দ করেন না। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, ঐ দ্রব্য দুটী পাতে পড়লে ছেলে-মেয়েরা খুবই আনন্দিত হবে—তাই আজ আমি ঐ দুটী জিনিষের সাধ্যেটে মায়েদের পূজার খাদ্য-তালিকা প্রস্তুতে সাহায্য করবো ঠিক করেছি। আজ আমি ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য যে দুটী জিনিষ তৈরী করবার কথা বলবো, মায়েরা সেগুলি পূজোর দিনে নির্ভাবনায় তাদের জন্য তৈরী করতে পারবেন—খাবার সময় ছোট ছোট কৌতূহলী মুখগুলিতে যে হাসি ফুটবে তাই দেখেই আপনারা বুঝতে পারবেন জিনিষগুলি তাদের মনের মত হয়েছে কি না।

জ্যাম-কেক

উপকরণ :—মাখন দেড় ছটাক, মিহি চিনি আধ পোয়া, ময়দা আড়াই ছটাক, ডিম তিনটি, চা-চামচের এক চামচ বেকিং পাউডার।

কেকের ভিতরের 'পুর' হিসাবে দেবার জন্য লাগবে বড় চামচের দুই চামচ জ্যাম, এক ছটাক মাখন ও এক থেকে দেড় ছটাক আইসিং-এর চিনি (icing sugar—মার্কেটের যে কোন বড় দোকান থেকে কিনতে পারবেন), আর কেকটীর উপরের 'চিনির লর' বা আইসিং-এর জন্য লাগবে আধ সের আইসিং শুগার।

তিনটী ডিমের সাদা অংশ, আধখানা পাতি লেবু এবং কিছু পেস্তা, বাদাম ও কিস্‌মিস্—এগুলি দিয়ে কেকের উপর ফুল তৈরী করে দিতে বা তার ধারে ধারে এক লাইন সাজিয়ে দিতে পারেন, যাতে দেখতে সুন্দর হয়।

প্রণালী :—প্রথমে কেকের জন্য যে দেড় ছটাক মাখন ও আধ সের চিনি আনা হয়েছে, সে দু'টীকে একটি পাত্রে ঢেলে চামচে করে কেটিয়ে কেটিয়ে একেবারে চিনি ও মাখন মোলায়েম করে মিশিয়ে ফেলুন, যাতে চিনির দানা একেবারে না থাকে। আর একটী পাত্রে ডিম তিনটীও ভাল করে কেটিয়ে নিন, তার পর সেটাও প্রথম পাত্রে ঢেলে ফেলে আবার কেটাতে শুরু করুন। কিছুক্ষণ এই ভাবে মেশাতে মেশাতে যখন দেখবেন মাখন, চিনি ও ডিম, এ-তিনটীই একেবারে এক হয়ে মিশে গিয়ে একটী মোলায়েম ঘন পদার্থে পরিণত হয়েছে, তখন সেটী একধারে সরিয়ে রাখুন। তার পর ময়দাটা একটী পাতলা কাপড়ে করে ছেঁকে নিন, তার সঙ্গে সব শেষে বেকিং পাউডারটাও ছেঁকে নেবেন—মিশে আস্তে আস্তে ঐ ময়দা যে ডিম-চিনি-মাখনের মিশ্রণটী করে রেখেছেন তাতে ঢেলে নেড়ে নেড়ে বেশ করে মিশিয়ে দিন, সর্ব্বশেষে দিন বেকিং পাউডার—এইবার যে পাত্রে কেকটী বেক করা হবে সেটীর ভিতর একটু ঘি বা মাখন মাখিয়ে দিন এবং ব্রাউন কাগজ খানিকটা কেটে নিয়ে সেই পাত্রের মাপে মাপের মত করে পরিয়ে দিন, যেন পাত্রটীর সবটাই এই কাগজ দিয়ে ঢাকা থাকে—কেকের মিশ্রণটী যেন কোন দিক দিয়ে পাত্রটীর গায়ে না লাগতে পারে। এইবার ঐ কাগজের খাপের ভিতর আস্তে আস্তে যে মিশ্রণটী তৈরী করে রেখেছেন সেটী ঢেলে দিয়ে কেকটী 'বেক' করতে বসিয়ে দিন। মাঝারি আঁচে পঁয়তাল্লিশ মিনিট বেক করুন, দরকার বোধে আর দু'এক মিনিট বেশীও করতে পারেন। তার পর যখন ওপরটী লালচে হয়ে যাবে এবং বুঝতে পারবেন যে, ভিতরটীও বেশ ফেঁপেছে তখন সেটীকে বার করে নিয়ে ঠাণ্ডা হতে দেবেন। যতক্ষণ কেকটী ঠাণ্ডা হতে লাগবে, ততক্ষণে তার ভিতরের 'পুর' ঠিক করে ফেলুন। পুরের জন্য যে মাখন ও চিনি রেখেছেন—সেই চিনিটা ভাল করে চালুনী দিয়ে ছেঁকে নিয়ে মাখনের সঙ্গে কেটিয়ে মোলায়েম করে মিশিয়ে ফেলুন, তার পর বড় টেবিল-চামচের দু' চামচ জ্যাম তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আর একটি কাঁটা বা চামচ দিয়ে ভাল করে নেড়ে দিন, এই হল কেকের ভিতরের 'পুর' বা filling। এইবার দেখুন যদি কেকটী একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে একখানা খুব ধারালো ছুরির সাহায্যে সেটাকে সাবধানে দু'ভাগ করে কেটে ফেলুন। ওপরের অর্দ্ধেকটি সরিয়ে রেখে, নীচের অর্দ্ধেকের উপর এইবার যে 'পুর' তৈরী করে রেখেছেন সেটী বেশ পুরু করে মাখিয়ে দিন, দিয়ে আস্তে আস্তে উপরের অর্দ্ধেকটা আবার তার ওপর বসিয়ে দিন, তা হলেই আপনার জ্যাম-কেক তৈরী প্রায় শেষ হল, কিন্তু এটীকে আবার আর একটু দেখতে সুন্দর করা চাই, তা হলে জিনিষটী আরও লোভনীয় হবে।

এখন এই কেকের উপরে আইসিং বা চিনির 'লর' প্রস্তুত করতে হবে, এর জন্য যে আধ সের আইসিং চিনি আনা আছে সেটিকে চালনী দিয়ে ছেঁকে একটী পাত্রে ঢালুন, তার

পর তিনটী ডিম ভেঙে তার দাগা অংশটি নিয়ে আলাদা করে কেটিয়ে কেটিয়ে ফেনা করে ফাঁপা করে তুলুন, তার পর সেটী ঐ চিনিতে মিশ্রিত করে তার মাঝখানে ঢেলে দিন ও তাতে কয়েক ফোঁটা পাতি লেবুর রস দিন—এটী ঠিক যেন লুচির ময়দায় 'ময়ান' দেওয়ার মত করে করতে হবে। তার পর সেটী বেশ করে মিশিয়ে নিয়ে মিনিট কয়েক নাড়াচাড়া করে যখন দেখবেন গুলের ক্ষীরের মত বেশ ঘন ঘন হয়েছে তখন সেটী চামচে করে তুলে তুলে কেকের উপর ঢেলে দিয়ে তার ওপর ও চার পাশ বেশ করে এইটী দিয়ে ঢেকে দিন, কেকটী দেখতে হবে যেন ছোট একটী বরফের পাহাড়। এর ওপর বাদাম, পেস্তা ও কিস্‌মিসের সাহায্যে ফুল তৈরী করে দিলে বা সেগুলি এর ওপর ছড়িয়ে দিলেও দেখতে এবং খেতে দু-ই ভালো হবে। চিনিটা নরম থাকতে থাকতে এগুলি দেওয়া চাই, তা হলে সেটী ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি তাতে আটকে যাবে।

এইবার আমি-কেক তৈরী করা সম্পূর্ণ হল। কিন্তু আর একটী জিনিষ এখনও বাকি আছে—সেটী হচ্ছে 'চকোলেট বিস্কুট' তৈরী করা। প্রথমেই আমরা ঠিক করেছি দু'টী জিনিষের সাহায্যে এবার ছোটদের মনো-রঞ্জন করা হবে। তার মধ্যে একটী তৈরী করা শেখানো হল, আর একটী এখনও বাকি—এইবার সেটির কথা বলব।

## চকোলেট বিস্কুট

উপকরণ: ডিম দু'টী, তিন ছটাক মিহি চিনি, এক পোয়া 'মেরী' বিস্কুট (যা বাজারে খোলা বিক্রি হয়), এক পোয়া মাখন, মেড় ছটাক ভালো 'কোকো'।

প্রণালী: বিস্কুটগুলিকে আগে বেশ ছোট ছোট টুকরো করে ভেঙে নিয়ে এক জায়গায় জড়ো করে রাখুন, কিন্তু দেখবেন যেন সেগুলি একেবারে গুঁড়ো না হয়ে যায়। এই বার ডিম দুটীকে ভেঙে একটী পাত্রে ঢেলে ফেটিয়ে নিন। একটু পরে তাতে চিনিটা দিয়ে আবার মেশান, চিনির প্রতিটী দানা পর্য্যন্ত গলে মিশে যাওয়া চাই। যখন দেখবেন আর চিনি একেবারেই কচকচ করছে না, তখন তাতে 'কোকো' ঢেলে দিন—দিয়ে আবার মেশাতে থাকুন। এই মেশানোটীই হচ্ছে চকোলেট বিস্কুটের আসল কাজ, তাই সেটি যাতে খুব ভালো ভাবে হয় সে-দিকে বিশেষ ভাবে নজর রাখবেন। যাই হোক কোকোটী ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে সেটী সরিয়ে রেখে আর একটী পাত্রে 'চিমে আঁচে' মাখনটা গলিয়ে নিন এবং খুব গরম থাকতে থাকতেই যে পাত্রে ডিম-চিনি-কোকো মেশানো আছে তাতে ঢেলে দিন, এবং বিস্কুটের টুকরোগুলিও এবার তাতে দিয়ে দিন। তার পর কিছুক্ষণ ধরে নেড়ে নেড়ে সব জিনিষগুলি ভালো করে মিশিয়ে দিয়ে এইবার এটীকে জমাতে বসান। এর আগে কোকোর জন্য যেমন করেছেন ঠিক তেমনি করেই একটী পাত্রে অল্প একটু ঘি বা মাখন মাখিয়ে দিয়ে পরিষ্কার ব্রাউন কাগজ লম্বা করে কেটে তার চারিধার সেই কাগজ দিয়ে ঢেকে দিন, তা হলেই পাত্রটীর ভিতর একটী গোল বা চৌকো কাগজের ঠোঙা বসানো আছে বলে মনে হবে; সেই কাগজের ঠোঙার ভিতর এইবার সাবধানে যে 'মিশ্রণ'টী তৈরী করে রেখেছেন সেটীকে ঢেলে দিন। একখানা ছুরি বা বড় চামচের সাহায্যে চেপে চেপে সমান করে দিন যাতে বিস্কুটের টুকরোগুলি উঁচু নীচু হয়ে না থাকে। তার পর এটীকে আর নাড়া চাড়া না করে যে-দিন তৈরী করবেন তার পরের দিন পর্য্যন্ত রেখে দিতে হবে—তবে এটী জমবে। আরও ভালো শক্ত হয়ে এটী জমবে, যদি অপেক্ষাকৃত একটী বড় পাত্রে ঐ পাত্রটী বসিয়ে তার চারি দিকে বরফের টুকরো দিয়ে রাখতে পারেন। বরফগুলি গলে গেলেই আবার নতুন করে দিয়ে দিয়ে এটিকে যদি ঠাণ্ডা রাখা যায় তা হলে পরের দিন সুন্দর ও শক্ত হয়ে বসে যাবে, তখন ছুরি দিয়ে বরফির মত করে কেটে নিলেই এর থেকে অনায়াসে অনেকগুলি সুন্দর চকোলেট বিস্কুট পাওয়া যাবে।

ছেলে-মেয়েদের লোভ দেখিয়ে অনেক কাজ করাতে হয়, বা তাদের শান্ত রাখতে হয়। পুজো-বাড়ীতে মায়েদের ব্যস্ত না করে যদি তারা 'লক্ষ্মী' ছেলে বা মেয়ে হয়ে থাকে তা হলে তাদের পুরস্কার-স্বরূপ বিতরণ করবেন এই চকোলেট বিস্কুট। পুরস্কারটা আগের দিন থেকেই ঘোষণা করে রাখবেন, তা হলে কাজের দিনে আর ছেলে-মেয়েদের আব্দার বা দুষ্টুমির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতে হবে না। আপনারা নিশ্চিন্ত মনে কাজ ও আনন্দ করতে পারবেন, কারণ এমন লোভনীয় পুরস্কার পাবার লোভে যে ছেলে-মেয়েরা সবাই 'পাল্লা' দিয়ে 'লক্ষ্মী' হতে সুরু করবে, সে-কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। আর তাদের দুষ্টুমির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে আপনারা যে-সময়টা তাদের 'কোলাতে' কাটাতেন, সেই সময়টা নিশ্চিন্তে যা ইচ্ছে তাই করে কাটাতে পারবেন, আর সেই ছুটিটুকুর জন্য আপনাদের মনে যে আনন্দের সঞ্চার হবে সেইটুকুই হবে 'লেখিকা'র পুরস্কার।

# অনির্বাণ

—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

৫

"এবার তবে বলাই ক'রে কেন গো মেরে চাকি'
অতি নিবিড় ঘন তিমির তলে!"

দেবকুমার গ্রামেই আছে। বনে-বনে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, মাঝে মাঝে এক আধটুকু পড়ে। সে-দিন সকালের ডাকে তার নামে এল এক চিঠি। পার্থসারথি লিখেছে—'দেবকুমার, তুমি পত্রপাঠ মধুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী বন্ধ ক'রে কলকাতায় চ'লে আসবে। এখানে সাত্যকি এখনো সেরে ওঠে নি। তাকে সম্ভবতঃ চেঞ্জে যেতে হবে। তুমি আর দেরী ক'রো না। মধুকে টাকার কথা বলবে। টাকা একেবারেই নেই, অথচ চেঞ্জে যাব কি নিয়ে? সব কথা মধুকে বুঝিয়ে ব'লে টাকার ব্যবস্থা করবে। আমার ভাবনার আর অন্ত নেই—অথচ সাত্যকি সেরে না উঠলে মনেও শান্তি নেই। ইতি, পার্থসারথি।'

দেবকুমার ও চিঠি পড়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। কি যে সে করবে প্রথমটায় ভেবে পেল না কিছু। তার পর মধুকে সে ডাকতে গেল। মধু তখন গেছে শ্যামার-বাড়ীতে কাজ করতে। দেবকুমার অনেক পথ ঘুরে আমবাগানের পাশ দিয়ে ঘাটে এসে পড়ল। মধুকে দেখা গেল। সে বিচুলি-গুলো আঁটি আঁটি ক'রে তার উপর সাজাচ্ছে। দূর থেকে দেবকুমার ডাকল, "মধু দা' এ-দিকে এস একবার। দাদার চিঠি এসেছে, জরুরী চিঠি।"

মধু দা' দূর থেকে চেঁচিয়ে বলল, "যা-ই।"

এমন সময় একজন লোক মাঠের আলপথ বেয়ে অনেক দূর থেকে আসছে যেন দেখা গেল। এক হাতে এক লাঠি আর এক হাতে গামছায় বাঁধা এক পুঁটুলি। মাঠে আর লোক-জন নেই। অনেক দূরে বিলের ধারে ধারে নানা-ধরণের বকের মেলা। বর্ষার বানের জল সরে সরে যাচ্ছে। জলা মাঠের ওপরে বকগুলো তাদের সরু সরু কাঠির মত পা নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লম্বা ঘাড় বাঁকা ক'রে পুঁটি, চুনো প্রভৃতি মাছ ধ'রে ধ'রে খাচ্ছে। শরৎ-শেষের আকাশ—রৌদ্রোজ্জ্বল, গাঢ় নীল; অনেক দূরে এক ঝাঁক বক উড়ে চলেছে, তা'রা এত দূরে উঠেছে যে, তাদের একগাছি ছোট মালার মত দেখাচ্ছে।

মধু কিছু কিছু লেখাপড়া জানে, দেবকুমার তাকে পার্থ-সারথির চিঠিখানি দেখাল। মধু চিঠিখানি পড়ে ফেলে বলল, "দেখ ত কি মুস্কিল! টাকার কথা লিখেছে, টাকা এখন হঠাৎ কোথায় পাই? তাছাড়া আমার এখন দেশ ছেড়ে গেলেই বা কি ক'রে চলে?"

দেবকুমার বলল, "যা ভাল বোঝো কর। মেজ দা' কি সেরে উঠবে? যেতে যখন লিখেছে আমাদের, তখন চল, যাওয়া যাক। টাকা তুমি একটু চেষ্টা করলেই পেতে পার মধু দা। তোমার কাছে না থাকলেও তুমি যোগাড় করতে পার, পার না কি?"

মধু বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে বলল, "হাঁ তা পারি। তবে এখন ফসলের সময়, এখানেই বা কে দেখে শোনে? আর গেলেই বা কি ক'রে চলবে? সব দেখছি ভাল-গোল পাকিয়ে উঠল।"

এমন সময় সেই গামছায় পুঁটুলি-হাতে লোকটি ধীরে ধীরে তাদের কাছাকাছি এ'ল। মধু তার দিকে ফিরে বলল, "কি গো কত্তা, কদ্দূর যাবা? আসছ কোথা থেকে?"

লোকটি মধু'র দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার আপাদ-মস্তক লক্ষ্য ক'রে বলল, "যাব নিশ্চিন্দিপুর ভাই, আসছি কিনগা থেকে।"

মধু একটু বিস্মিত হ'ল। নিশ্চিন্দিপুর যারা যায়, তারা ট্রেনে যায়। লোকটি এ-ভাবে হেঁটে যায় কেন? তাই সে জিজ্ঞাসা করল, "তা পায়ে হেঁটে যে? নিশ্চিন্দিপুর কি এখানে? তোমার ত যেতে রাত হবে।"

"হাঁ, তা ত হবেই। রাত হলেই বা করছি কি? দুপুরটা কোথাও থাকবার জায়গা পেলে বাঁচা যেত। এখানে কি সে ব্যবস্থা হ'তে পারে?"

দেবকুমার বলল, "হাঁা হবে, তুমি আমাদের বাড়ীতে এস।"

লোকটি যেন বেঁচে গেল, এই রকম একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে মধু আর দেবকুমারের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল।

বাড়ী এসে দেবকুমার তার নিজের ঘরে চলে গেল। মধু কুয়া থেকে জল তুলে আগন্তুকের হাত-পা ধোয়ার ব্যবস্থা করতে লাগল। হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে লোকটি দাওয়ায় বসল চুপ ক'রে। মধু তামাক সাজতে সাজতে বলল, "তামাক ইচ্ছে করবে কত্তা?"

"হাঁা, তা খাও।"

"নিশ্চিন্দিপুর কি নিবাস?"

"আজ্ঞে হাঁা।"

"কি জাত তোমরা?"

"আজ্ঞে কৈবর্ত্ত!"

"ও!" ব'লে মধু তাকে হুঁকো না দিয়ে শুধু সাজা কল্‌কেটা দিল। লোকটি পরম আরামে চৌকীতে ব'সে তামাক খেতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে তারই ফিরিয়ে দেওয়া কল্‌কেটা নিয়ে হুঁকোর মাথার উপর গুঁজে মধু পরম নিশ্চিন্ত ভাবে ভুরুক্-ভুরুক্ ক'রে তামাক খায় আর মাঝে মাঝে এক আধটা কথা জিজ্ঞাসা করে, "কি করা হয় কত্তা তোমার?"

"আজ্ঞে চাষ-বাস করি।"

"ও"—ব'লে মধু আবার তামাক খেতে থাকে। আবার কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করে, "ভিন্ গাঁয়ে গিয়েছিলে কেন?"

"একটা নেমন্তন্ন ছিল বিয়ের, সেটা সেরে এলাম।"

"ও"—ব'লে মধু আবার অন্যমনস্ক হ'য়ে তামাক টানতে থাকে। এমনি ভাবে কথায় কথায় অনেকক্ষণ গেল। তার পরে মধু রান্না চাপিয়ে দিল। দেবকুমার তার হাতে খায়। বিশেষ ইচ্ছা যে-দিন তার হয়, সে-দিন সে হোঁচ মারে। মধু রান্না করতে লাগল, আর সেই লোকটি আস্তে আস্তে মধুকে সাহায্য করতে লাগল। সে কাঠ এনে দেয়, কখনো বা তরকারি কুটে দেয়। তার চটপটে ভাব দেখে মধু তার উপর ভারি খুশী। কথায় কথায় সে জানতে পারল লোকটি বড় দুঃখী। সংসারে তার কেউ নেই। মধুর ইচ্ছা হ'ল, লোকটিকে সে তার কাজকর্ম দেখিয়ে তার উপর ভার দিয়ে দেবকুমারকে নিয়ে চ'লে যায়। তার পরে সে ভাবল, অতটা বিশ্বাস একজন সম্পূর্ণ নতুন লোককে করা চলে না। তবে তার উপর ভার দেবে এই নিয়ে সে দেবকুমারের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল। শেষটায় ঠিক হ'ল, নতুন লোকটিকে নিয়ে আর টাকাকড়ি নিয়ে দেবকুমারই যাবে। মধুর আর বাড়ী ছেড়ে যাওয়া চলে না। সেই ব্যবস্থাই ঠিক রইল।

লোকটির নাম বঙ্কু। খাওয়া-দাওয়ার পর বঙ্কু মধুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগল। এক দিনেই সে হ'য়ে উঠল কত আপনার যেন। পুকুর, জমি, ঘর-দোর—সবই সে ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতে লাগল। মধু তার উপর ভারি খুশী।

তার পরের দিন দেবকুমারের যাওয়ার কথা। দেবকুমার মধুকে জিজ্ঞাসা করল, "মধু দা টাকা-কড়ির ব্যবস্থা করেছ?"

"হাঁা হয়েছে, কিছু কিছু পেয়েছি।"

"যা পেয়েছ দাও, বেশী দেরী করলে চলবে না।"

"আচ্ছা, তা হ'লে আজই যাওয়ার ব্যবস্থা করা যাক।"

"বেশ কর।"—ব'লে দেবকুমার কোথায় স'রে পড়ল। মনে মনে খানিকটা ঘুরে স্নান ক'রে খেয়ে-দেয়ে বিকেলের দিকের ট্রেনে সে যাবে। সঙ্গে যাবে বঙ্কু। দেবকুমারের একেবারে খেয়ালই নেই সে-দিকে। নতুন লোকটি কেমন, হঠাৎ তাকে নিয়ে অনেক দূর দেশে যাওয়া—বিশ্বাসী কি না, এ সব ভাবনা তার একেবারেই নেই।

৬

"দিন যায় ও গো দিন যায়
দিবসটি যায় অস্তে,
সাহি হেরি বাট, ঘুম ওরে মাঠ
ঘুমের ঘোমটা-ঘুমিয়া!"

গিরিন্দ্রনারায়ণের বাড়ী। একেবারে মাঠের মধ্যে। মাটির বাড়ী। তাকে মাটকোঠা বলে, খানিকটা দেয়াল গেঁথে তার উপরে তালকাঠের কড়ি ফেলে ফেলে মাটির ছাদ, পাশেই সিঁড়ি। ওপরে উঠে যাওয়া যায়। খড়ের চাল। এই রকম খানকয় ঘর; গিরিন্দ্রের বাপ-মা কেউই নেই, দু'টি ভাই, এক দূর-সম্পর্কীয়া পিসীমা। সকালবেলার রোদ্দুর; বাড়ীর উঠানে কয়েকটি গোলা।

সম্বৎসরের খোরাক তাতে থাকে। আর, দিগিন্দ্র কাছাকাছি এক গ্রামের উচ্চ ইংরাজী ইস্কুলের শিক্ষক। ছেলেদের পড়িয়ে কোন রকমে দিগিন্দ্রের দিন চলে।

দিগিন্দ্র ভাবছিলেন, সংসার অচল। জয়ন্তী এল না। কবে আসবে তারও কিছু ঠিক নেই। পিসীমার দ্বারা সব কাজ সম্ভব নয়। চেঁচিয়ে তিনি ডাকলেন, "পিসীমা রান্না হ'ল? আমার ইস্কুলের বেলা হ'ল যে! ও-দুটোই বা গেল কোথায়?"

পিসীমা রান্না-ঘরের মধ্য থেকে ক্ষীণস্বরে উত্তর দিলেন, "কি জানি বাপু। কোথায় গেল ওরা! রান্নারও আর বেশী দেরী নেই।"

"তাই ত পিসীমা, কি যে করা যায়, সব দিকেই গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে। চিঠিও নেই, পত্রও নেই, কি যে হ'ল তাদের, কে জানে?" এই ব'লে দিগিন্দ্র স্নান করতে গেলেন। অনেকখানি পথ হেঁটে তাঁকে ইস্কুল যেতে হবে।

এমন সময় গ্রামের পিওন একখানি চিঠি দিয়ে গেল। দিগিন্দ্রের ভাই রবীন্দ্র চিঠিখানি নিয়ে তাদের মাষ্টার হাতে দিল। চিঠিখানি খামে। লিখছে জয়ন্তী—সংক্ষিপ্ত চিঠি। চিঠির মর্ম্ম এই :—

"মেজ মা'র অসুখ একেবারেই কমে নি। ডাক্তারের নির্দ্দেশমত চেঞ্জে যাওয়াই ঠিক হ'ল। আমরা দেওঘর চললাম আজ। আপনি পারেন ত আসবেন। কত দিনে যে অসুখ সারবে, তার কিছু ঠিক নেই। আমাকে থাকতে হবেই, নৈলে কে দেখবে? বাড়ীতে অসুবিধে হবে—তা ব'লে কি করি? আপনি দয়া ক'রে আসবেন। এসে যেমন যা ভাল ব্যবস্থা হয় করবেন। জয়ন্তী।"

দিগিন্দ্র চিঠি প'ড়ে স্তম্ভিতের মত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তার পরে পিসীমাকে সমস্ত ব্যাপারটা বলতেই তিনি তেলেবেগুনে জ্ব'লে উঠলেন। বললেন, "তাই ব'লে রোগ যদি না সারে, তা হ'লে তিনি কি বাপের বাড়ীতেই থাকবেন? এ আবার কোন্ দেশী কথা? তুমি যাও বাপু, তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে এস গে। আমি আর পারি নে—দু' বেলা সমানে হাঁড়ি ঠেলে ঠেলে আমার হাড়মাস কালি হ'য়ে গেল। তুমি আজই ইস্কুলে ছুটি নাও গে, তার পর তাকে নিয়ে এসো গে।"

দিগিন্দ্র নিরুত্তরে খেয়ে নিয়ে ইস্কুল চ'লে গেলেন। ভাইরাও নির্ব্বাক্ হ'য়ে সঙ্গে সঙ্গে গেল।

•

ইস্কুলে পড়াতে দিগিন্দ্রের ভাল লাগল না। সাত্যকির অসুখ যেন সব দিক দিয়ে একটা বিশৃঙ্খলা এনে দিয়েছে। তাদের নিজেদের বাড়ীতেও তাদেরই ভবিষ্যৎ জীবন যেন কি রকম হ'য়ে গেল। পড়াশুনা বন্ধ। যে অসুখে ভুগছে তার ত বটেই, অসুখে যারা ভুগছে না, তাদেরও। আর তাঁর বাড়ীতে ত কথাই নেই। নিরালা মাঠের জীবন তাঁর। অনেকখানি পথ হেঁটে যেতে হয় ইস্কুল। কত রোদ্দুর, কত বর্ষা, কত শীত, কত হাড়ভাঙা খাটুনি। মাঝখানে জয়ন্তীর আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তেমনি বিচিত্র। জয়ন্তীর বাবা ধনী ছিলেন না। হিসাবী মানুষ, মেয়ের বিয়ের জন্যে খরচ ক'রেছিলেন বেশ কিছু। জয়ন্তী সুন্দর মেয়ে, সব দিক্ দিয়েই ভাল। কাজেই দিগিন্দ্র তাঁর অনবসর ইস্কুল মাষ্টারী, টিউশানী প্রভৃতি নিয়ে জয়ন্তীকে ভালই রেখেছিলেন। শেষে এমন হ'য়ে ছিল যে, জয়ন্তীকে এক মুহূর্ত্ত চোখের আড়ালে রেখে দিগিন্দ্রের শান্তি ছিল না। তাদের মাঠের বাড়ীতে জয়ন্তীর প্রথম প্রথম বেশ লেগেছিল। তার পর, দুই একবার দীর্ঘ একটানা ম্যালেরিয়ায় ভুগে অস্থি-চর্ম্মসার হ'য়ে জয়ন্তীর এসেছিল বিরক্তি আর ক্লান্তি। বিয়ের কিছু দিন পরেই জয়ন্তীর বাবা মারা গেলেন। মা ত আগেই মারা গিয়েছিলেন। কাজেই পিতৃশোক আর ম্যালেরিয়ায় জয়ন্তীর মনের রঙ্ গেল ঘুরে যুছে। এর ওপর দিগিন্দ্রের অতি সতর্কতা, সোজা কথায় ভীরুতা, তার একেবারেই ভাল লাগত না। চুপ ক'রে থাকত সে, কি করবে? এরই মধ্যে সাত্যকির হ'ল অসুখ—তার পরের ঘটনা চলেছে। জয়ন্তীর এই ভাল না লাগার কারণ দিগিন্দ্র অনুমান করতে পারতেন না। ঠিক সে জয়ন্তী আর নেই—এইটেই তাঁর বারে বারে পড়াতে পড়াতে মনে হচ্ছিল। বিশেষ ক'রে কলকাতার বাসায় জয়ন্তীকে তিনি এত উদাসীন দেখেছেন যে, এমনটা কি ক'রে হ'ল ভাবতেই তাঁর বিস্ময় লাগে। ভাইদের সঙ্গে জয়ন্তীর

সম্বন্ধ কি, তাদের শৈশব, কৈশোর, পিতামাতার স্নেহ, সেই ভাইদেরই একটির অসুখ, এত চিন্তা দিগিন্দ্র করেন নি, বা তা তাঁর করবার বৈধ্য ছিল না। তাঁর সেই কাঠের বাড়ী, সেখানে তাঁর জয়ন্তী—এই ছিল তাঁর চিন্তার কেন্দ্র। সেখানে সাত্যকি অতি সামান্য।

এই সব সাত-পাঁচ ভেবে দিগিন্দ্র ছুটির দরখাস্ত করলেন আর দরখাস্ত মঞ্জুর হ'লে তিনি তার পর দিনই দেওঘর রওনা হলেন। রবীন্দ্র, ফণীন্দ্র আর পিসীমার ওপর সংসারের ভার রইল।

৭

"পারবি না কি যোগ দিতে সেই রণে রে।
ব'লে যাবার, ভেসে যাবার ভাটুয়ারই আনমনে রে!"

আসানসোল ছাড়িয়ে এসে সাত্যকির মনে আনন্দ আর ধরে না। মাটি ক্রমশঃ লাল হচ্ছে আর কাঁকরে বোঝাই—দূরে দূরে মেঘের মত পাহাড়ের রেখা। সাত্যকি তার রোগজীর্ণ দু'টি চোখ চলমান ট্রেনের জানালার বাইরে রেখে কলকাতার ধোঁয়া আর ধুলো ভুলে বাইরের দৃশ্য যেন মনের মধ্যে গেঁথে নিতে লাগল। ইণ্টার ক্লাস। জয়ন্তী বেশী ভিড় নেই দেখে তার ক্লিষ্টমান মুখ আর ক্লান্ত দেহ নিয়ে একটা গদির উপর শুয়ে পড়েছে। পার্থসারথি আর দেবকুমার কি একটা বিষয় নিয়ে ঘোর তর্ক বাধিয়ে তুলেছে। বিষয়টা বোধ হয় বর্তমান জীবন আর পল্লী। তর্ক খুব জমে উঠেছে। বহু অন্য কামরায় আছে। এ কামরায় ভিড় একেবারে নেই বললেই হয়। একটি ভদ্রলোক এক দিকে সুজনির চাদর বিছিয়ে তাঁর ছোট স্যুটকেশটির উপরে কি একখানা কেতাব মন দিয়েছেন। আর এক দিকে কয়েকজন ভদ্র হিন্দুস্থানী তাঁদের দেশী ভাষায় গল্প-গুজব করছেন।

কেতাব থেকে চোখ তুলে ভদ্রলোকটি দেবকুমার আর পার্থসারথির দিকে চাইলেন। সৌম্য সুন্দর আকৃতি। সুজনির চাদরের এক পাশে গায়ের জামা খুলে তিনি রেখে দিয়েছেন। স্যুটকেশটির এক পাশে একটি ছোট টুকরীতে নানা রকম ফলমূল। পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে তা'র থেকে এক এক মুঠো নিয়ে চিবোচ্ছেন। গায়ে গেঞ্জি, বেশভূষা মোটেই অসাধারণ নয়। চুল ছোট ছোট ক'রে ছাঁটা—চোখে চশমা। বয়স অনুমান পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ—যদি যৌবন যা'কে বলা চলে। একটু হেসে পার্থসারথির দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "আপনারা কতদূর?"

প্রসন্ন হাসি কথা বলায়, কথা বলতে বাধ্য করে। সারথি তর্ক থামিয়ে বলল, "আপাততঃ জসিডি অবধি—তার পর দেওঘর।"

"বেশ বেশ, আমিও সেইখানেই যাচ্ছি।" এই ব'লে তিনি দু'টি বেদানা নিয়ে সারথি আর দেবকুমারকে দিলেন। তা'রা হাঁ কি না কিছুই বলতে পারলে না, শুধু নিঃশব্দে বেদানা দু'টি নেওয়া ছাড়া তা'দের আর কোন উপায় ছিল না। সুন্দর আকৃতির এমনই নিঃশব্দ ক্রিয়া। তার পর তিনি আবার ব'লে চললেন, "আমি সেইখানেই থাকি। অর্থাৎ দেওঘরেই। আপনারা কোথায় থাকবেন? অনেক টাউন সেখানে—কোনটাতে? বাসা-টাসা ঠিক করেছেন?"

অত্যন্ত ম্লানভাবে সারথি উত্তর দিল, "না, একেবারেই না। আমরা সোজা বেরিয়ে পড়েছি—দুর্গানাম ক'রে। শুনেছি আশ্রম মেলে—পাণ্ডাদের কৃপায়, তার পর সেখানে উঠে বাসা ঠিক ক'রে নেব, এই ইচ্ছে।"

"বেশ, বেশ—বাসা আমি ঠিক ক'রে দেব। অনেক টাউনে আমার অনেক বাড়ী—একা মানুষ, আমার অত বাড়ীর প্রয়োজন নেই, তা'রই যে কোন একটাতে এসে আপনারা উঠতে পারেন।"

দেবকুমার একরকম চেঁচিয়েই ডাকলে, "বেজবা, কি দেখছ জানালা দিয়ে, কয়লার গুঁড়ো পড়বে চোখে। মুখ ভেতরে রাখো, আর শোন, ইনি—এই ভদ্রলোকটি—একখানি বাড়ী আমাদের থাকবার জন্য দেবেন ব'লেছেন।"

জয়ন্তীর ঘুম ভেঙে গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। মুখ তার অত্যন্ত ম্লান। একেবারে উঠে বসতেই সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে চোখোচোখি। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দেবকুমারকে দেখেই জিজ্ঞাসা করল, "কে বাড়ী দেবেন?"

দেবকুমার একটু হেসে বলল, "এই যে ইনি।"

জয়ন্তী তাঁকে একটি ছোট নমস্কার ক'রে বাইরের চলমান ছায়ালোকের দিকে তাকিয়ে রইল। ভদ্রলোকটির প্রসন্ন মুখ প্রসন্নতর হ'ল। তিনি হেসেই বললেন, "আপনারা খান বেদানা!"

দেবকুমার বলল, "মেজদাকে দি—ওর অসুখ। ওরই জন্যে আমরা দেওঘর চলেছি।"

সাত্যকি মৃদু-কণ্ঠে বললে, "নমস্কার আপনাকে। বাড়ী-সমস্যা আমাদের ছিলই। সেটা ট্রেনেই মিটল। যিনু, বেদানা খাওয়া যাক, গলাটা কেমন যেন শুকিয়ে উঠেছে।"

বেদানা নিয়ে সাত্যকি কেটে কেটে খেতে লাগল। তার পর পরস্পরের বিস্তৃত পরিচয় হ'ল। ভদ্রলোকটির নাম, সুবোধ চক্রবর্তী। অনেক ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁদের। ধনী। সাত্যকির অসুখের কথা, তিন ভাই আর এক বোনের কথা—এমনি অনেক আলাপ হ'ল।

মধ্যে সুবোধ জয়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কিছু খাবেন না?"

জয়ন্তী সংক্ষেপে "না" বলে চুপ ক'রে রইল। সুবোধের বই বন্ধ হ'ল। বাকি পথটা শুধু নানা গল্পে হাসিতে কাটল। তাঁর কথায়-বার্তায় সারথিরা জানল যে, বাড়ীটা তাঁর বেশ ভাল। দারোয়া নদীর কাছাকাছি। সামনে ফুলের বাগান, ইউকালিপ্‌টাস গাছ। আর আছে শান্ত নির্জনতা।

সকলে বেশ প্রফুল্ল মনে গল্প করতে করতে চলতে লাগল। ···তার পর জসিডি,···তার পর দেওঘর।

৮

"যৌবনের সেই রূপ-কথা
চমকিয়া মরি শুধু—"

দেওঘরের বাড়ী বাস্তবিকই বেশ সুন্দর। সাত্যকির এক দিনেই অরুচি কেটে গেছে। সে গোলাপের কেয়ারীতে, ঘু-ঘু শুষ্ক রুক্ষ মাঠে, ধূসর 'ডিগ্‌রিয়া' পাহাড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে, ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দিচ্ছে। এখানে ওখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে খিধে পায় খুব। তার পর ঠাকুরের রান্না, প্রায় অখাদ্যও তা'দের কাছে সুখাদ্য হ'য়ে ওঠে। জয়ন্তী বলল, "বেশ লাগছে দেওঘর!" "বেশ, বেশ"—সাত্যকি বলে, "আমি শীগ্‌গির সেরে উঠব দেখো।"

•

ট্রেনে ছোট একটি সুটকেশ হাতে বিশিষ্টনারায়ণ অত্যন্ত অন্যমনস্ক হ'য়ে ব'সে আছেন। থার্ড ক্লাস গাড়ীতে অসম্ভব ভিড়। বস্তায়, বাক্সে, পুঁটুলিতে আর ময়লা চাদর গায়ে দেওয়া হিন্দুস্থানীদের বিড়ির ধোঁয়ায়, উচ্ছিষ্ট শালপাতায় কেউ যে সেখানে স্থির হ'য়ে ব'সে থাকতে পারে, তা' ভাবাই যায় না। তা'র মধ্যে বিশিষ্টনারায়ণ যেন বিভ্রান্ত হ'য়ে কি করবেন ঠিক করতে না পেরে চুপ ক'রে ব'সে আছেন।

•

সুবোধ গাড়ী নিয়ে এসেছেন। চার ভাই বোনে চলল বেড়াতে 'ত্রিকূট' পাহাড়! সুবোধ নিজেই ড্রাইভার। নিঃসাড় গাড়ী বিচিত্র চলচ্ছায়ার মধ্য দিয়ে দ্রুত চলেছে। সুবোধের পাশে সাত্যকি। পিছনের সীটে মাঝখানে জয়ন্তী, দু'পাশে দেবকুমার আর পার্থসারথি। কেমন যেন সঙ্কুচিত ভাব জয়ন্তীর। সুবোধের এত অনুগ্রহ সে যেন সহ্য করতে পারছে না। একটি মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে জয়ন্তী বলল: "অনেক আরাম, অনেক স্বাচ্ছন্দ্য!" সারথি বলল, "তা তো বটেই। যোগ্যতা আছে যা'র, সে আরাম তো করবেই!" সুবোধ বললেন, "শুনতে পাচ্ছি কিন্তু!"

সাত্যকি মৃদু-হাস্যে বলল, "কি বীভৎস দারিদ্র্য এখানে সুবোধ দা'! যেন হাঁফ লাগে" জয়ন্তী সাত্যকির দিকে চেয়ে বলল, "যে-দিকে চাই, সে-দিকেই দেখি ভিক্ষুক—অগণতি! অসংখ্য! দেওঘর যেন ধনী বাঙালীর জন্যেই। হ্যাঁ দারিদ্র্য আছে বটে বাংলাতে—এত উগ্র নয়! তোমার ভাল লাগছে নেজ দা'?"

"বেশ ভাল লাগছে রে!" সাত্যকি এর বেশী কিছু বলল না।

সুবোধ ধীরে ধীরে ব'লে চললেন, "ভাল লাগারই কথা। ভিক্ষুকের নগ্নতা এখানে বেশী—মন্দিরের ত্রিকূটাতে খুবই। সব তীর্থস্থানেই এই রকম। কালীঘাটেও সেই এক কথা। ও-কথা এত বেশী ভাবলে চলবে কি ক'রে? খাটতে হবে সবাইকেই। মনকে রাখতে হ'বে প্রসন্ন, ধীর। তা হ'লে আরও বেশী ভাল লাগবে।"

জয়ন্তী কথাগুলি খুব মন দিয়ে শুনল। শুধু সে জিজ্ঞাসা করল, "আর কত দূর আছে ত্রিকূট?"

সুবোধ তা'র দিকে চেয়ে বললেন, "আর বেশী দূর নয়, এই যে," ব'লেই দেখালেন, "দেখতে পাচ্ছেন?"

জয়ন্তী বলল, "হ্যাঁ, পেয়েছি দেখতে।"

•

জসিডি থেকে দেওঘর আসা মোটেই কষ্টকর নয়। সেইখান থেকেই দু'জন পাণ্ডা দিগিন্দ্রের পিছু নিল। দেওঘরের ট্রেনে উঠে একটা থার্ড ক্লাস কামরাতে দিগিন্দ্র তাঁর বিষণ্ণ, ক্লান্ত, ধূলি-মলিন দেহটাকে কোন রকমে একটা খালি বেঞ্চিতে ফেলে ঘুমোবার চেষ্টা করছেন; এমন সময় দু'জন গোঁফ-দাড়ি-কামানো, চাদর পৈতাধারী পাণ্ডা তাঁর কামরাতে ঢুকে একজন তাঁর পায়ের কাছে, আর একজন তাঁর মাথার কাছে এসে বসল। তারা নির্ব্বাক্, যে ক্লান্ত দেহটি বেঞ্চিতে, তার ক্লান্তির পরিমাণ, তার আশ্রয়হীনতা, তার করুণ, অসহায় ভাব—তারা জসিডি প্ল্যাটফার্ম থেকেই লক্ষ্য ক'রে ক'রে একেবারে এসে দেহটিকে অধিকার ক'রে বসল।

পাশ ফিরতে গিয়ে দিগিন্দ্র মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাই আপনাদের?'

পাণ্ডারা বেশ বাংলা জানে। একজন তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল: "আপনার বাড়ী কাটোয়ার কাছাকাছি।"

"কি ক'রে জানলেন?" ঔৎসুক্যে দিগিন্দ্র বললেন।

"আমরা বুঝতে পারি।"

"ও" মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে দিগিন্দ্র আবার পাশ ফিরে শুলেন।

"দেওঘরে কি আপনার বাসা আছে?"

"আজ্ঞে না।"

"তা হ'লে কোথায় থাকা হ'বে?"

"একটা বাসার খোঁজে বেরিয়েছি, যদি পাই, সেখানেই উঠব। আপনারা যোগ্য পাণ্ডা! যদি না পাই, তা হ'লে আপনাদের শরণাপন্ন হব।"

"কোথায় সে বাসা?"

"তা জানি নে।"

"তা হ'লে তো আপনার খুবই মুস্কিল। আসুন আমাদের ওখানে। দোতলা বাড়ী—আপনার কোন অসুবিধে হবে না। ঠাকুরদর্শন করিয়ে দেব। সামান্য কিছু দেবেন এখন। তার পর, নাম বললে আপনাদের সে বাসা খুঁজে দেব।" অগত্যা দিগিন্দ্র তাতেই রাজি হ'লেন। অন্ধকার গলির মধ্যে একটা ভাঙা দোতলা বাড়ীতে দিগিন্দ্র আশ্রয় পেলেন।

•

ত্রিকূট পাহাড়ের নীচে একটা বড় শাল গাছের কাছাকাছি একটা সতরঞ্চি বিছিয়ে পাঁচ জনে ব'সে। জয়ন্তী, সুবোধ, সাতাকি, সারথি আর দেবকুমার। গাড়িটা একটু দূরে। পাহাড়ে সাতাকিকে নিয়ে এঁরা ওঠেন নি। বেলা দুপুর। অগ্রহায়ণের রোদ নিতান্ত কম নয়। নীচে ব'সে সব গল্প-গুজব হচ্ছে।

উঁচু-নীচু মাঠ দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। ঘুরে ঘুরে শাল-বনের রেখা; এক-একটি ছোট ছোট নদী তাঁর জলরেখাহীন বালুরাশি নিয়ে প'ড়ে আছে। তাদের বিসর্পিত দেহ উঁচু-নীচু মাঠের মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। মাঝে মাঝে ধূম্রকার রাস্তা দিয়ে ধূলোর ঝড় বইয়ে দিয়ে এক-আধখানা মোটর ছুটে চলেছে। দূর বনের ফাঁকে ফাঁকে এক আধজন কৃষকায় সাঁওতালকে দেখতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া আর কোথাও কোন প্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। একটা ধূ ধূ শুষ্ক রুক্ষতা। জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করল, "পাহাড়ের ওপরে কি কোন মন্দির-টন্দির আছে—কোন সাধু-সন্ন্যাসী কোন গুহায়?"

সুবোধ: "আছেন বলে শুনেছি, তবে সেখানে সাতাকিকে নিয়ে যাওয়া যায় না। ওঠা-নামা কষ্টকর।"

"এই বেশ আছি সুবোধ দা', পাহাড়ে ওঠা আমার কাজ নয়।"

দেবকুমার: "তোমরা ব'স, আমি ঘুরে আসি খানিকটা।"

সারথি: "আমিই বা বসে থাকি কেন? চল আমিও যাই।"

সুবোধ এদের উৎসাহ থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আরে বসুন না, যাবেন কোথায় এখন? গল্প-টল্প হ'ক।"—এই ব'লে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাদের দেশ কোথায়?" সারথি উত্তর দিল, "মুর্শিদাবাদ, ভয়ানক ম্যালেরিয়া সেখানে; বাড়ী-ঘর সবই সেখানে। আমরা তো পড়াশুনা ক'রে থাকি বহরমপুর কলেজে। এই সাতাকির জন্যেই সব ছেড়েছুড়ে ঘুরে বেড়ান। প্রথম ম্যালেরিয়া ব'লেই সারাল, তার পর কলকাতায় একে নিয়ে আসা। সেখানে

ভাল হ'ল না বেখে এসেছি এখানে—তার পর, আপনার সঙ্গে দেখা। দেখা না হ'লে কি অসুবিধেই হ'ত! পাওনাদের পাল্লায় প'ড়ে কি যে হ'ত তা' ভাবাই যায় না।"

"বেশ, বহরমপুরে আপনারা তিন জনেই পড়েন? কি পড়েন? আর্টস্ কোর্স না সায়েন্স?"

"আর্টসই পড়ি তিন ভাই-এ। সাহিত্যই ভালবাসি তিনজনে। দেবকুমার তো কবিতা-টবিতা লিখে থাকে, ছবিও আঁকে।"

"তাই না কি?" দেবকুমারের দিকে সপ্রশংসদৃষ্টিতে তাকিয়ে সুবোধ বললেন, "সাধু! সাধু! কবিত্বং চ সুদুর্লভম্—সংস্কৃতে এ কথাটি আছে। কবিতা চর্চ্চা আর পড়া-শুনো এক সঙ্গে হয় তো? কোন অসুবিধা হয় না?"

দেবকুমার মৃদু হেসে বলল, "মোটেই না। বরং ভালই লাগে। কলেজের পড়া-শুনো করতে করতেই তো অনেকে কবিখ্যাতি পান। কলেজের পড়াশুনো সাঙ্গ হ'লেই ত টিউশানীর পালা। চোখে ধাঁ-ধাঁ লেগে যায়। যতদিন পড়তে পাই, ততদিন লিখতেও পাওয়া যায়। তার পর তো দেখি, কাজও মেলে না, টিউশানী ক'রে ক'রে দিন চালানো।"

সুবোধ: "খুব সত্যি কথা বলেছেন; অল্পসমস্যাই সকীন বাংলা দেশে। শুধু বাংলা দেশে কেন, সর্ব্বত্র।"

একটু ম্লান হেসে তিনি ব'লে চললেন, "আমিও এককালে কবিতা-টবিতা লিখতাম। ঘোর আর কি! মনের একটি বিশেষ অবস্থাকে মধুর ভাষায় প্রকাশ করা। এ করেছি কতবার, কত নির্জ্জন মুহূর্ত্তে। প্রকাশ করবার মোহ ছিল না ব'লেই রক্ষা। তার পর একসময়ে দেখলাম, যে-জগতে আমরা বাস করি, তা'তে অত মধুর ভাষার প্রয়োজন নেই। হয় তো মানুষের নির্জ্জন মুহূর্ত্তে তা'র প্রয়োজন আছে, ভাবনা-বিলাসী মানুষের। কিন্তু আমি তা'র প্রয়োজন বুঝলাম না। আর যে-দিন থেকে বুঝলাম এর প্রয়োজন নেই, সেইদিন থেকে মতামত গেল বদলে। কার্জের মানুষ হবার দুরাশা সাধনা করলাম, কতকটা সার্থকতাও এল।"—এই ব'লে তিনি একটু থামলেন।

অন্তরী এতক্ষণ কথা-বার্ত্তা শুনছিল। একটি মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আপনি কি একাই থাকেন? আপনার আর কে কে আছেন?"

একটু হেসে অন্তরীর দিকে তাকিয়ে সুবোধ বলে চললেন, "উত্তর দিই আপনার কথার। তার পর তো কাজের মানুষ হ'লাম। একেবারে কথাটা বললে যা বোঝায়, তাই। ব্যবসা আরম্ভ করলাম, কত ব্যবসাই না করেছি। ভুঁইফোঁড় থেকে আরম্ভ ক'রে কত কিছু আমাদের আয়ত্তে আছে, সব। নানা দিক্ দিয়ে নানা রকম করতে করতে তবে উন্নতি হ'ল। গাড়ী হ'ল, বাড়ী অবশ্য আগেই ছিল। এখনো এই নিয়ে আছি। মাঝে মাঝে চমক লাগে। এতটা practical হ'য়েছি। মাঝে মাঝে আমার বিদ্বৎপ্রায় ভাবপ্রিয়া ভাবী-খানি দিয়ে ডাকেন। একটু উন্মনা হ'য়ে পড়ি। কিন্তু উপায় নেই, যা ধরেছি তা ছাড়া যায় না। এইবার (অন্তরীর দিকে তাকিয়ে) আপনার কথার উত্তর দি'। কেউ নেই আমার, বাবা কিছু টাকা রেখে গিয়েছেন, সেইটিকে বই না ক'রে বাড়িয়েছি ব্যবসায়ে। আত্মীয়-স্বজন আছেন, তাঁরা অভাবে প'ড়ে হুড়-মুড় ক'রে আসেন আমার ওপরে। উপায় নেই, সাহায্য করতেই হয়। তাঁদের অভাব মিটলে তাঁরা চলে যান। আবার আসেন, আবার তাঁদের অভাব মেটাই। এমনি চলেছে বৈচিত্র্যহীন জীবন আমার। এই তো। মোটামুটি একাই থাকি। মাঝে মাঝে পড়াশুনো করি। বেশীর ভাগ speculation ব্যবসা—মোটা টাকা লাভ পাই। সময় পাই ঢের—অনেক দূর দেশ বেড়িয়ে আসি। বেশ ভালোই লাগে।"

অন্তরী মুখ নীচু ক'রে সব শুনছিল। পাশ থেকে একটা ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে মাটির ওপর রেখাপাত ক'রতে ক'রতে বলল, "শুনলাম, ইংরেজী খুব ভাল জানি নে। যে ব্যবসার নাম ক'রলেন, ওটি কি বস্তু? কি ক'রে হতে লাভ হয়? আমার বাবাও কিছু টাকা রেখে গেছেন। দাদারা আপনার মত কোন ব্যবসা-টেবসা করলে কি হয়? পড়াশুনো ক'রে তো টিউশানী সেব পর্য্যন্ত। না হয় তো, খুব বড় পণ্ডিত হওয়া যায়। তা'তে লাভ কি? পাণ্ডিত্য তো খেতে দেবে না, পাণ্ডিত্যের দাম কে দেয়?"

সুবোধ বললেন, "খুব সত্যি কথা। বর্ত্তমান সমস্যা খুবই জানি। আর এক সময় এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।" এই বলে তিনি অন্তরীর সুন্দর সীঁথির প্রান্তে সিন্দুর-রেখা লক্ষ্য ক'রে কৌতূহলীতে বললেন, "আপনার বিয়ের আগেই কি আপনার বাবা মারা গেছেন?"

কথাটির উত্তর দিল সাত্যকি। সে বলল, "না, জয়ন্তীর বিয়ে দিয়ে তিনি মারা গেছেন।"

"কোথায় বিয়ে হ'য়েছে জানতে পারি কি? অপরাধ নেবেন না যেন, আপনাদের সঙ্গে এত পরিচিত হ'য়ে গেলাম যে, নিজেকে আপনাদের আত্মীয় ব'লে মনে হচ্ছে।"

সাত্যকি বলল, "না, তাতে আর কি? মুর্শিদাবাদেই বিয়ে হ'য়েছে। আমার ভগ্নীপতি একজন পণ্ডিত মানুষ, সংস্কৃতজ্ঞ।"

প্রসন্নহাস্যে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত ক'রে সকলের দিকে চেয়ে সুবোধ বললেন, "বেশ, বেশ, কিন্তু বেলা হ'ল অনেক। কথা-বার্ত্তা হ'ল, আলাপ-পরিচয়। অবশ্য ট্রেনে খানিকটা আলাপ হ'য়েছিল, কিন্তু সে সামান্যই। এখন গাড়ীর মধ্যে আছে খাবার। কিছু সদ্ব্যবহার করা যাক্, তার পর কাছাকাছি এক গুহায় থাকেন এক সন্ন্যাসী, দেখা ক'রে যেতে হবে।"

জয়ন্তী বলল, "আমি কিছু খাব না। আপনারা খান। একটু জল খাব মাত্র।"

মন্দিরের কাছাকাছি একটা সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে পাণ্ডাদের এক মোতালা বাড়ীর উপরকার একটি ঘরে দিগিন্দ্রনারায়ণ এসে উঠেছেন। তিনি যে-দিন এসেছেন, সেই রাত্রের কথা। এসেই তিনি এঁদের নাম করেছেন। পাণ্ডাঠাকুর সমস্ত দিন খুঁজে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত কোন হদিস পান নি। দিগিন্দ্রনারায়ণ ব'সে ব'সে জয়ন্তীর কথা ভাবছিলেন। জয়ন্তী চিঠিতে ঠিকানা পর্য্যন্ত দেয় নি। কেমন যেন একটু অবহেলার ভাব। গরীব তিনি বটেন, কিন্তু জয়ন্তী এমন কি তাঁকে অবহেলাই করে? হয় তো দিগিন্দ্র ভাবলেন, জয়ন্তীর পক্ষে ঠিকানা দেওয়া সম্ভব হয় নি, তাড়াতাড়িতে হয় তো তারা এসেছে, হয় তো আগে থেকে বাড়ী ঠিক ক'রে আসে নি। এই রকম অনেক 'হয় তো' নিয়ে দিগিন্দ্র ব'সে ব'সে ভাবছিলেন। এমন সময় পাণ্ডার আবির্ভাব। এসে সে বলল, "কোন খোঁজই পেলাম না। অনেক খুঁজেছি। তবে ব্যস্ত হবেন না। খোঁজ আমি ক'রে দেবই। তবে একটু দেরী হবে।"

দিগিন্দ্র বললেন, "তাই তো, দেরী হ'লে তো খুবই মুস্কিলের কথা! সাধারণতঃ ভদ্র বাঙালীরা এসে কোন্ পাড়ায় বাসা করেন?"

"তার কিছু কি ঠিক আছে? যখন যেখানে সুবিধা হয়, তখন সেখানে থাকে। অত ব্যস্ত হ'লে চলবে কি ক'রে? খুঁজে আমি দেবই বলেছি যখন, তখন নিশ্চয়ই দেব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।" এই ব'লে পাণ্ডা গেল চলে।

দিগিন্দ্র আবার ব'সে ব'সে ভাবনার অকূলপাথারে ভাসতে লাগলেন। ঘরটিতে না আছে আলো, না বাতাস; বেশীক্ষণ ব'সে না থেকে নিজেকেই খুঁজে দেখতে হবে। এই ভেবে দিগিন্দ্র জামা-চাদর নিয়ে সুটকেশটি খুলে মনিব্যাগটি বার ক'রে পকেটে ফেলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর একটি ছোট সুটকেশ—সেটিকে চাদর প্রভৃতির মধ্যে পুঁটলির মত ক'রেই তিনি বেঁধেছেন। চাদর বিছিয়ে সুটকেশটি মাথায় দিয়ে ঘুমোবেন—এই রকম অভিপ্রায়। বেশী কিছু সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসেন নি তিনি।

রাস্তায় বেরিয়ে তিনি দেখেন, অনেক গলি—গলির পর গলি। সদর রাস্তার সন্ধান নেই। মন্দিরের পূজার অনেক সরঞ্জামের খুঁটিনাটির দোকান গলির দু'পাশে। এ-গলি সে-গলি ক'রতে ক'রতে দিগিন্দ্র বাজারের রাস্তায় এসে পড়লেন। সন্ধ্যার আলো দু'দিকের দোকানগুলিতে জ্বলে উঠেছে। ধূনোর গন্ধে, ধূপে মন্দিরের আরতির কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে দেবতরের সন্ধ্যার আকাশ মুখর। মাঝে মাঝে দু'একখানা ঘোড়ার গাড়ী, ক্বচিৎ কখনও বা এক-আধখানি মোটর চলেছে সবেগে। দিগিন্দ্র বিহ্বলের মত বাজারের রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। দু'-একজন অনুসন্ধিৎসু পাণ্ডা তাঁর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে গেল। দিগিন্দ্র আবার কোন্ দিকে যাবেন, কাকে পার্থসারথির কথা জিজ্ঞাসা ক'রবেন, তার কিছুই ঠিক পেলেন না। খানিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে একটু এগিয়ে গেলেন,—সেখানে একটা সাইকেল মেরামতির দোকান। সে-দিকে চেয়ে দেখলেন, দোকানদার বাঙালী। তাকে সে কথা জিজ্ঞাসা ক'রবেন কি না ভাবছেন—এমন সময় অনেক ধূলো উড়িয়ে জোরে হর্ণ বাজিয়ে একখানা সুন্দর বড় মোটর তাঁ'রই সম্মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। সচকিতে তিনি সে-দিকে চেয়ে দেখলেন—দেখলেন সাত্যকি

আর অহল্যাকে। আর কাউকে দেখতে পেলেন না। মোটর খুব জোরে বেরিয়ে গেল। পিছনকার ৩'টি লাল আলোয় তিনি স্পষ্ট দেখলেন মোটরের নম্বর। সেটা তিনি বুদ্ধি ক'রে সাইকেলের দোকান থেকে এক টুক্‌রো কাগজে লিখে নিলেন।

আজ রাত্রেই তিনি ঐ মোটর এবং বাড়ী খুঁজে বা'র ক'রবেন। সাইকেলের দোকানেই তিনি বসলেন। তা'দের জিজ্ঞাসা করতেই তা'রা বলল, "ও তো সুবোধ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী।"

"বাড়ীটা কোন জায়গায় বলতে পারেন?"

"বাড়ী তো দারোগার ধারে একখানা আছে। তা' ছাড়া তাঁ'র আরও অনেক বাড়ী—সহরময়।"

"সাধারণতঃ তিনি কোন্ বাড়ীতে থাকেন?"

"তা'র কিছু ঠিক নেই।"

"বাড়ী কি তিনি ভাড়া দেন?"

"দেন বৈ কি!"—এত প্রশ্ন শুনে সাইকেলের দোকানের ভদ্রলোক একটু বোধ হয় বিরক্ত হ'লেন। "কি দরকার আপনার?"

তখন বাধ্য হ'য়ে দিগিন্দ্র সব খুলে বলতেই তিনি বললেন, "হয়েছে, তাঁরই বাড়ীতে বোধ হয় তাঁরাই উঠেছেন। দারোগা নদীর ধারে সে বাড়ী। আপনি যান, একেবারে সোজা রাস্তা।"

দিগিন্দ্র আর কালবিলম্ব না ক'রে তখনি সোজা রাস্তায় দারোগার দিকে অগ্রসর হ'লেন। ট্রেনে আসবার সময় একটি নদীর ব্রিজ তাঁ'র মনে পড়ল। সেইটিই বোধ হয় দারোগার।

[ ক্রমশঃ

---

# স্বপ্নের রূপ

—শ্রীনকুলেশ্বর পাল

স্বপ্নের রূপে স্বরগের শোভা
স্বপ্নের রূপে জগত আলো;
হয় ঋতু সেথা উপহার ডালি
উজলি ধরার সকল কালো।
গ্রীষ্মে সেথায় আম্র-কাননে
মধুপেরা মধু কেমন লোটে;
বর্ষায় ক্ষীরধারা বহি বুকে
ফুল্ ফুল্ বেগে তটিনী ছোটে।
শরতের চাঁদ নামে সে ধরায়
নীপতরুমূল হিয়ায় দোলে;
অঘ্রাণে পূজা অর্ঘ্য সাজায়ে
ধানের বোঝা মাথায় তোলে।
শীতের কুহেলী মাখিয়া অঙ্গে
রৌদ্র-পিয়াসী পউষ প্রাতে;
বোলচম্পা ফুলে ফুলে খেলে
অধির প্রজাপতির সাথে।
কিংশুক-লাল রক্ত লালিমা
ছড়ায়ে গোধূলি গগন গায়ে;
ফাগুয়ার রঙ্গে সব লালে লাল
স্বপন-শ্যামল চিকণ কায়ে।
চাঁদের কিরণে অধির ধারায়
পাপিয়ার গানে ঢালিয়া মধু;
নব-বসন্তে আগমনী গায়
শ্যামলিমা বুকে স্বপন-বধূ।

---

কথাটির উত্তর দিল সাত্যকি। সে বলল, "না, জয়ন্তীর বিয়ে দিয়ে তিনি মারা গেছেন।"

"কোথায় বিয়ে হ'য়েছে জানতে পারি কি? অপরাধ নেবেন না যেন, আপনাদের সঙ্গে এত পরিচিত হ'য়ে গেলাম যে, নিজেকে আপনাদের আত্মীয় ব'লে মনে হচ্ছে।"

সাত্যকি বলল, "না, তাতে আর কি? মুর্শিদাবাদেই বিয়ে হ'য়েছে। আমার ভগ্নীপতি একজন পণ্ডিত মানুষ, সংস্কৃতজ্ঞ।"

প্রসন্নহাস্যে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত ক'রে সকলের দিকে চেয়ে সুবোধ বললেন, "বেশ, বেশ; কিন্তু বেলা হ'ল অনেক। কথা-বার্তা হ'ল, আলাপ-পরিচয়। অবশ্য ট্রেনে খানিকটা আলাপ হ'য়েছিল, কিন্তু সে সামান্যই। এখন গাড়ীর মধ্যে আছে খাবার। কিছু সদ্ব্যবহার করা যাক্, তার পর কাছাকাছি এক গুহায় থাকেন এক সন্ন্যাসী, দেখা ক'রে যেতে হবে।"

জয়ন্তী বলল, "আমি কিছু খাব না। আপনারা খান। একটু জল খাব মাত্র।"

•

মন্দিরের কাছাকাছি একটা সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে পাণ্ডাদের এক দোতালা বাড়ীর উপরকার একটি ঘরে দিগিন্দ্রনারায়ণ এসে উঠেছেন। তিনি যে-দিন এসেছেন, সেই রাত্রের কথা। এসেই তিনি এঁদের নাম করেছেন। পাণ্ডাঠাকুর সমস্ত দিন খুঁজে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত কোন হদিস পান নি। দিগিন্দ্রনারায়ণ ব'সে ব'সে জয়ন্তীর কথা ভাবছিলেন। জয়ন্তী চিঠিতে ঠিকানা পর্য্যন্ত দেয় নি। কেমন যেন একটু অবহেলার ভাব। গরীব তিনি বটেন, কিন্তু জয়ন্তী এখন কি তাঁকে অবহেলাই করে? হয় তো দিগিন্দ্র ভাবলেন, জয়ন্তীর পক্ষে ঠিকানা দেওয়া সম্ভব হয় নি, তাড়াতাড়িতে হয় তো তারা এসেছে, হয় তো আগে থেকে বাড়ী ঠিক ক'রে আসে নি। এই রকম অনেক 'হয় তো' নিয়ে দিগিন্দ্র ব'সে ব'সে ভাবছিলেন। এমন সময় পাণ্ডার আবির্ভাব। এসে সে বলল, "কোন খোঁজই পেলাম না। অনেক খুঁজেছি। তবে ব্যস্ত হবেন না। খোঁজ আমি করে দেবই। তবে একটু দেরী হবে।"

দিগিন্দ্র বললেন, "তাই তো, দেরী হ'লে তো খুবই মুস্কিলের কথা! সাধারণতঃ ভদ্র বাঙালীরা এসে কোন্ পাড়ায় বাসা করেন?"

"তার কিন্তু কি ঠিক আছে? যখন যেখানে সুবিধা হয়, তখন সেখানে থাকে। অত ব্যস্ত হ'লে চলবে কি ক'রে? খুঁজে আমি দেবই বলেছি যখন, তখন নিশ্চয়ই দেব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন!" এই ব'লে পাণ্ডা গেল চলে।

দিগিন্দ্র আবার ব'সে ব'সে ভাবনার অকূলপাথারে তলাতে লাগলেন। ঘরটিতে না আছে আলো, না বাতাস; বেশীক্ষণ ব'সে না থেকে নিজেকেই খুঁজে দেখতে হবে। এই ভেবে দিগিন্দ্র জামা-চাদর নিয়ে সুটকেশটি খুলে মনিব্যাগটি বার ক'রে পকেটে ফেলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর একটি ছোট সুটকেশ—সেটিকে চাদর প্রভৃতির মধ্যে পুঁটলির মত ক'রেই তিনি বেঁধেছেন। চাদর বিছিয়ে সুটকেশটি মাথায় দিয়ে ঘুমোবেন—এই রকম অভিপ্রায়। বেশী কিছু সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসেন নি তিনি।

রাস্তায় বেরিয়ে তিনি দেখেন, অনেক গলি—গলির পর গলি। সদর রাস্তার সন্ধান নেই। মন্দিরের পূজার অনেক সরঞ্জামের খুঁটিনাটির দোকান গলির দু'পাশে। এ-গলি সে-গলি ক'রতে ক'রতে দিগিন্দ্র বাজারের রাস্তায় এসে পড়লেন। সন্ধ্যার আলো দু'দিকের দোকানগুলিতে জ্বলে উঠেছে। ধূপের গন্ধে, দূরে মন্দিরের আরতির কাঁসর-ঘন্টার শব্দে দেবত্বরের সন্ধ্যার আকাশ মুখর। মাঝে মাঝে দু'একখানা ঘোড়ার গাড়ী, ক্বচিৎ কখনও বা এক-আধখানি মোটর চলেছে সবেগে। দিগিন্দ্র বিহ্বলের মত বাজারের রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। দু'-একজন অনুসন্ধিৎসু পাণ্ডা তাঁর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে গেল। দিগিন্দ্র আবার কোন্ দিকে যাবেন, কাকে পার্থসারথির কথা জিজ্ঞাসা ক'রবেন, তার কিছুই ঠিক পেলেন না। খানিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে একটু এগিয়ে গেলেন,—সেখানে একটা সাইকেল মেরামতির দোকান। সে-দিকে চেয়ে দেখলেন, দোকানদার বাঙালী। তাকে সে কথা জিজ্ঞাসা ক'রবেন কি না ভাবছেন —এমন সময় অনেক ধূলো উড়িয়ে জোরে হর্ণ বাজিয়ে একখানা সুন্দর বড় মোটর তাঁরই সম্মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। সচকিতে তিনি সে-দিকে চেয়ে দেখলেন—দেখলেন সাত্যকি

আর অরন্তীকে। আর কাউকে দেখতে পেলেন না। মোটর খুব জোরে বেরিয়ে গেল। পিছনকার ৩'টি লাল আলোয় তিনি স্পষ্ট দেখলেন মোটরের নম্বর। সেটা তিনি বুদ্ধি ক'রে সাইকেলের দোকান থেকে এক টুক্‌রো কাগজে লিখে নিলেন।

আজ রাত্রেই তিনি ঐ মোটর এবং বাড়ী খুঁজে বা'র ক'রবেন। সাইকেলের দোকানেই তিনি বললেন। তা'দের জিজ্ঞাসা করতেই তা'রা বলল, "ও তো সুবোধ চক্রবর্ত্তীর গাড়ী।"

"বাড়ীটা কোন জায়গায় বলতে পারেন?"

"বাড়ী তো দারোগার ধারে একখানা আছে। তা' ছাড়া তাঁ'র আরও অনেক বাড়ী—সহরময়।"

"সাধারণতঃ তিনি কোন্ বাড়ীতে থাকেন?"

"তা'র কিছু ঠিক নেই।"

"বাড়ী কি তিনি ভাড়া দেন?"

"দেন বৈ কি!"—এত প্রশ্ন শুনে সাইকেলের দোকানের ভদ্রলোক একটু বোধ হয় বিরক্ত হ'লেন। "কি দরকার আপনার?"

তখন বাধ্য হ'য়ে দিগিন্দ্র সব খুলে বলতেই তিনি বললেন, "হয়েছে, তাঁরই বাড়ীতে বোধ হয় তাঁরাই উঠেছেন। দারোগা নদীর ধারে সে বাড়ী। আপনি যান, একেবারে সোজা রাস্তা।"

দিগিন্দ্র আর কালবিলম্ব না ক'রে তখনি সোজা রাস্তায় দারোগার দিকে অগ্রসর হ'লেন। ট্রেনে আসবার সময় একটি নদীর ব্রিজ তাঁ'র মনে পড়ল। সেইটিই বোধ হয় দারোগার।

[ ক্রমশঃ

---

# স্বপ্নের রূপ

—শ্রীনকুলেশ্বর পাল

স্বপ্নের রূপে স্বরগের শোভা
　　স্বপ্নের রূপে জগত আলো;
হয় ঋতু যেন উপহার ডালি
　　উজলি ধরার সকল কালো।
গ্রীষ্মে সেথায় আম্র-কাননে
　　মধুপেরা মধু কেমন লোটে;
বর্ষায় ক্ষীরধারা বহি বুকে
　　কুলু কুলু বেগে তটিনী ছোটে।
শরতের চাঁদ নামে সে ধরায়
　　নীপতরুফুল হিয়ায় দোলে;
অঘ্রাণে পূজা অর্ঘ্য সাজায়ে
　　ধানের বোঝা মাথায় তোলে।
শীতের কুহেলী মাখিয়া অঙ্গে
　　রৌদ্র-পিয়াসী পউষ প্রাতে;
দোলনচম্পা দুলে দুলে খেলে
　　অম্বির প্রজাপতির সাথে।
কিংশুক-লাল রক্ত লালিমা
　　ছড়ায়ে গোধূলি গগন গায়ে;
ফাগুয়ার রঙে সব লালে লাল
　　স্বপন-শ্যামল চিকণ কায়ে।
চাঁদের কিরণে অধির ধারায়
　　পাপিয়ার গানে ঢালিয়া মধু;
নব-বসন্তে আগমনী গায়
　　শ্যামলিমা বুকে স্বপন-বধূ।

---

# হিমালয়ের পশ্চিমে

—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত

৪

সকালে ঘুম ভাঙতে নূতন দেশের আলো প্রথম চোখে পড়ল। কাঁচের জানালার ভিতর দিয়ে দেখলাম—আকাশে অল্প অল্প মেঘ। মনে একটু ভয় হল, আবার বৃষ্টি হবে না তো। দেখলাম, জানালা খোলা যায় না—কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া।

ওরই ভিতর কোন রকমে মুখ-হাত ধোয়া শেষ করে আমরা তৈরী হ'য়ে নিলাম। একটা হাউস-বোট ঠিক করতে হবে। কোথাও স্থিতি হ'তে না পারলে মন স্থির হচ্ছে না। আমরা যাঁদের অতিথি, তাঁরা ছাড়লেন না,—অন্ততঃ এক কাপ করে চা খেয়ে নিতে হল। তারপর বেরিয়ে ওঁদেরই একজন কর্মীর সাহায্যে দু'জনার উপযুক্ত একখানা হাউস-বোট ঠিক করা গেল,—দৈনিক ভাড়ে চার টাকা ভাড়ায়। অর্থাৎ জন প্রতি ২ টাকা।০ আনা। তারই ভিতর খাওয়া, ইলেকট্রিক খরচ, দেখার খরচ সব। শুনলাম মরশুম নয় বলেই এত সস্তা, মরশুমের সময়ে এই বোটেরই ভাড়া হ'ত না কি দৈনিক প্রায় পনের টাকা। কাশ্মীরের আসল মরশুম হচ্ছে জুন, জুলাই ও আগষ্ট মাস।

আমাদের হাউস-বোটটীতে ছোট একটী বৈঠকখানা, একটী খাবার ঘর, একটী জিনিষ-পত্র রাখার ঘর, একটী দু'জনার উপযুক্ত শোবার ঘর ও তার দু'পাশে দুটী বাথরুম। আগা-গোড়া ইংরাজি ফ্যাশানে কার্পেট, কাউচ, সোফা, পরদা প্রভৃতি দিয়ে রুচিসঙ্গত ভাবে সাজান। পাশ থেকে তার এনে ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বোটের সঙ্গে আর একটী নৌকা বাঁধা, তাতে বোটের মাঝি সপরিবারে বাস করে। তারাই রান্না-বান্না করে খাওয়ায়।

জিনিষপত্র এনে সব গুছিয়ে নিয়ে, চা খেয়ে আত্মীয়-স্বজনের কাছে দু' একখানা চিঠি লিখতে লিখতে বেলা ১১টা, ১১॥ টা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি স্নান খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে একখানা 'শিকারা' ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লাম ডাল লেক্, শালামার বাগ দেখতে।

হাউস-বোটের মত শিকারা হচ্ছে শ্রীনগরের আর একটী বিশেষত্ব—এক একটা সরু লম্বা নৌকা, মাঝখানে চারদিকে চারটে খুঁটি দিয়ে উপরে কাপড়-ঢেকা চাঁদোয়া টাঙান; তার নীচে পুরু গদি পাতা, তার উপরে মোটা মোটা তাকিয়া, সেইখানে বসতে হয়। মাঝিরা দাঁড় টানে সব পেছনে বসে, সম্মুখের দৃষ্টি অপ্রতিহত। এ নৌকা চলেও যেমন জোরে, চড়েও তেমনি আরাম। বাইরে কাশ্মীরের যে এত নাম, সে যে শুধু কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য তা নয়, তার মূলে বোধ হয় অনেকখানি রয়েছে কাশ্মীরের, বিশেষভাবে শ্রীনগরের, আবহাওয়ার নূতনত্ব, হাউস-বোটের জীবন ও শিকারা-ভ্রমণের নূতনত্ব ও আরাম।

ছোট ছোট খালের ভিতর দিয়ে আমাদের নৌকা চলল। দু' পারে অসংখ্য ছোট বড় নৌকা বাঁধা। নৌকার কাশ্মীরের মেয়েরা নানা কাজে ব্যস্ত। কী কুৎসিত তাদের পোষাক, আর কি নোংরার মধ্যে থাকে তারা! কিন্তু কী অপূর্ব্ব তাদের রূপ,—যেন আস্তাকুঁড়ে সব গোলাপ ফুল ফুটে আছে।

ক্রমে শহর ছাড়িয়ে জলাভূমির ভিতর ও জলাভূমি ছাড়িয়ে প্রকৃত ডাল হ্রদে এসে পড়লাম। সমগ্র হ্রদের পরিপূর্ণ রূপ হঠাৎ চোখের সামনে মেলে উঠায় চোখ জুড়িয়ে গেল। তিন দিকে বিরাট পাহাড় দিয়ে ঘেরা বিশাল গোলাকার হ্রদ, পরিষ্কার টলটলে জল, স্থির নিথর। মুগ্ধ চোখে চারিদিকে তাকিয়ে মনে হল,—কাশ্মীর আসা সার্থক হল।

আমরা সোজা হ্রদ পাড়ি দিয়ে ওপারে গিয়ে নামলাম। নেমে আমাদের আধ মাইলের উপর হাঁটতে হল—শালামার বাগ যেতে। শালামারবাগ সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের তৈরী বিরাট এক ফুলের বাগান, পাহাড়ের পাদদেশে। সেখান থেকে যখন ফিরলাম তখন বেলা খুব বেশী নেই; আকাশের অবস্থাও ভয়াবহ, পাহাড়ের মাথায় বিরাট কাল মেঘ জমেছে, প্রকৃতির একটা থমথমে ভাব। আমরা যতদূর সম্ভব শিকারা

ডাল হ্রদের একটি দৃশ্য



ডাল হ্রদের আর একটি দৃশ্য



কাশ্মীর-কন্যা



কাশ্মীরী বধূ



ডাল হ্রদের একটি দৃশ্য



ঝেলাম নদীর উপর মহারাজার প্রাসাদ

অভিমুখে চললাম। ইচ্ছা, ফেরার পথে নিশাদবাগটাও দেখে যাব। কিন্তু ভগবানের তা ইচ্ছা নয়। পার ছেড়ে আমাদের শিকারা বেশ খানিকটা দূর অগ্রসর হয়েছে এমন সময় শোঁ শোঁ শব্দে ঝড় ছুটে এল। মাঝিরা প্রাণপণ চেষ্টায়ও নৌকা ঠিক রাখতে পারল না,—হু হু করে আমাদের নৌকা ঠেলে নিয়ে ফেলল—কাছেই কাঠ-বোঝাই একটা প্রকাণ্ড নৌকা বাঁধা ছিল তার উপর। আমরা সকলে মিলে সেই নৌকাটাকে চেপে ধরলাম,—বেঁচে গেলাম। পরক্ষণেই একটা প্রবল ঝাপটায় আমাদের শিকারার চাঁদোয়া উড়িয়ে নিয়ে গেল। এ ঝাপটা যদি দু'মিনিট আগে লাগত তবে চাঁদোয়া উড়িয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিকারা নিঃসন্দেহে উল্টে যেত,—গায়ের গরম পোষাক জুতো মোজা সমেত আমরাও জলের ভেতর ইটের মত তলিয়ে যেতাম। বাঙালীর ছেলের সমাধি হত কাশ্মীরের হ্রদের জলে। সেখানকার প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ভিতর অনন্তকাল মিশিয়ে থাকতাম। আমাদের বেঁচে থাকার আনন্দ, ভ্রমণের স্ফূর্তি নিয়ে হ্রদের জলে পদ্মফুল ফুটত।

বড় বেশী কবিত্ব হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের তখনকার যা অবস্থা তা নিয়ে কোন মতেই কবিত্ব করা চলে না। গরম জামা-কাপড় সত্ত্বেও ঝড়ের বাতাসে এমনিই আমাদের কাঁপিয়ে তুলছিল। তার উপর এল বৃষ্টি। ওঃ, সে কি শোচনীয় অবস্থা! হাতে মুখে এক এক ফোঁটা বৃষ্টির জল পড়ছে—যেন ছুঁচের মত বিঁধছে। সঙ্গে ছাতা-টাতা কিছুই নেই। কে জানত অক্টোবর মাসে কাশ্মীর গিয়ে বৃষ্টি ভোগ করতে হবে। তা হলে তো ছাতা বর্ষাতি সবই সঙ্গে আনা যেত। শিকারার গদির নীচে ছিল একটা বড় শতরঞ্চি,—তাই টেনে বের করে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে দু'জনে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রইলাম। তাতেই কি নিস্তার আছে! পাশ দিয়ে তলায় জল ঢুকছে। বরফের মত ঠাণ্ডা জল। উপায় নেই। সেই ভাবে নিথর হয়ে পড়ে রইলাম। একটু নড়া চড়া করতে গেলে হাড় মজ্জা শুদ্ধ কাঁপিয়ে তোলে।

বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বেগ কমে গেল। তার প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে বৃষ্টি একটু ধরতে মাঝিরা নৌকা ছাড়ল। কিন্তু আমাদের মুখ বের করবার উপায় নেই। সেই ভাবে পড়ে রইলাম। যখন মুখ বের করলাম, তখন রীতিমত অন্ধকার হয়েছে, চারিদিকে শহরের বিজলী আলো, মেঘ কেটে আকাশে তারা ফুটেছে।

রাত সাড়ে আটটার সময় আমাদের বোটে এসে পৌঁছলাম। বোটের মাঝি সিদ্দিকা, তাড়াতাড়ি ছুটো বেতের চুবড়ি করে দু' চুবড়ি আগুন নিয়ে এল। কোন রকমে ভিজে জামা-কাপড় বদলে বিছানায় দেহের তলায় নিয়ে সেই আগুনের চুবড়ি কোলের ভিতর নিয়ে বসলাম। তারপর এল গরম গরম চা। ও সে আরাম বর্ণনাতীত।

৫

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেখলাম বাইরে কম্ কম্ বৃষ্টি হচ্ছে। এ কি সর্ব্বনাশ! মন দশ হাত মাটির নীচে বসে গেল। তবু মনকে প্রবোধ দিলাম যে এ-বৃষ্টি এখনই থেমে যাবে। উঠে মুখ-হাত ধুলাম। চা-টা খেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু বৃষ্টি থামবার কোন লক্ষণ নেই। বরং আরও অন্ধকার করে বৃষ্টি যেন আরও ঘনিয়ে নামছে। এ যে বাঙলা দেশের পচা বৃষ্টি! এ বৃষ্টিতে নিজের বাড়ী বসে ছুটীর দিনে কবিত্ব করতে বেশ লাগে। কিন্তু আমরা এসেছি অনেক দূর থেকে, অনেক কষ্ট স্বীকার করে মাত্র চার দিনের জন্য কাশ্মীরে; যা কিছু দেখবার আছে চটপট দেখে নিতে হবে। কিন্তু সব যে মাটি হল! এ কি ঘোর অবিচার! এ কখনও সম্ভব হতে পারে না। বৃষ্টি থামবেই;—প্রবল আশায় বুক বেঁধে বসলাম। বৃষ্টিরও আর বিরাম নেই, আমাদের আশারও আর শেষ নেই। এক এক বার বৃষ্টি ধরে আসে, পরক্ষণে অন্ধকার করে দ্বিগুণ বেগে বৃষ্টি নামে। সিদ্দিকা বলল, এখানে বৃষ্টি হচ্ছে আজ এই প্রায় তিন চার মাস পরে। হায় হায়! এত দিন বৃষ্টিটা তোলা ছিল শুধু কি আমাদেরই জন্যে? সকাল পেরিয়ে দুপুর হল, দুপুর গিয়ে সন্ধ্যে রাত হল,—বাইরে বৃষ্টির বিরাম নেই; আর বোটের ভেতর সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করে আমরা দুটী প্রাণী মুখোমুখি বসে। চারদিনের এক দিন তো গেল, দেখা যাক কাল কি হয়।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে দেখলাম বৃষ্টি তেমনি চলেছে। তখন আমরা সম্পূর্ণ হাল ছেড়ে দিয়েছি। অদৃষ্টের এই নিষ্ঠুর পরিহাসকে বরণ করে নিয়ে কি করে সময় মত ছুটী

থাকতে দেখে কেরা যায় সেই চিন্তা আরম্ভ করেছি। হঠাৎ বেলা এগারটা আন্দাজ বৃষ্টি থেমে গেল। আমরা লাফিয়ে উঠলাম। আকাশে তখনও যথেষ্ট মেঘ, আবার বৃষ্টি নামা কিছু আশ্চর্য্য নয়। আমরা ঠিক করলাম এই ফাঁকে অন্ততঃ শ্রীনগর শহরটা দেখে নেওয়া যাক্। খাওয়া-দাওয়া পরে হবে। একখানা শিকারা ভাড়া করে চটপট বেরিয়ে পড়লাম।

শ্রীনগর যত শহর, চওড়ায় বিশেষ বড় নয়,—সরু লম্বা শহর—ঝেলামের দুই পার দিয়ে সমভাবে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নদীর উপর পর পর সাতটী পুল শহরের দুই অংশকে সংযুক্ত করেছে। এই জন্যে এর আর এক নাম 'city of seven bridges'। অধিকাংশ পুলই কাঠের, শহরের বাড়ীগুলিরও অধিকাংশই কাঠের। ঝেলামের দু' দিক দিয়ে অনেক ছোট ছোট খাল বেরিয়ে শহরের মধ্যে দিয়ে এঁকে-বেঁকে বয়ে চলে গেছে। শহরে রাস্তা-ঘাটের অভাব নেই; কিন্তু এই ঝেলাম নদী ও এই সব ছোট ছোট খালই হচ্ছে এখানকার প্রধান পথ, ও শিকারাই এখানকার প্রধান যান। এই জন্যে শ্রীনগরকে বলে, এশিয়ার ভেনিস। শহর অত্যন্ত নোংরা, অনেক স্থানে নাকে কাপড় না দিয়ে যাওয়া যায় না। তথাপি এর একটা বিশেষ রূপ আছে। শিকারা করে যেতে যেতে, শহরের সেই রূপটাই বিশেষ ভাবে চোখে পড়ল। নদীর দুই পারে বাঁধা অসংখ্য ছোট-বড় নৌকা ও দুই তীরে সারি-বাঁধা নূতন ধরণের দোতালা তেতালা কাঠের বাড়ী। শহরের ঠিক পেছনে সুউচ্চ শঙ্করাচার্য্য পাহাড় এঁকে একটা বৈশিষ্ট্য দান করেছে। দূরে দূরে দেখা যায় চারিদিক ঘিরে আছে হিমালয়ের তুষার-ধবল গিরিশৃঙ্গ। তার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড শ্রীনগর সম্বন্ধে এক স্থানে বলেছেন, 'In spite of its dirt and squalor, it is unique in Asia,' অর্থাৎ আবর্জ্জনা ও দারিদ্র্যের মাঝেও সমগ্র এশিয়ার মধ্যে শ্রীনগরের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। কোন উচ্চ স্থানে উঠে যদি শহরটিকে সমগ্র ভাবে দেখা যায় তবে এ উক্তির সত্যতা সহজেই উপলব্ধি হবে।

৬

হাউস-বোটে ফিরতে আমাদের প্রায় দু'ঘণ্টা লেগে গেল। মেঘ টুটে তখন রোদের হাসি ফুটে উঠেছে, ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশ দেখা দিয়েছে। আমরা তাড়াতাড়ি স্নান-আহার সেরে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম নিসাদবাগের উদ্দেশ্যে—এবার টাঙ্গায় করে। শহর ছাড়িয়ে 'হরিসিঙ্ হুলতার' দিয়ে বড় দ্রুত গতিতে আমাদের টাঙ্গা চলল। অতি মনোরম ঝকঝকে পরিষ্কার চওড়া রাস্তা ডাল হ্রদের পার দিয়ে গোল হয়ে ঘুরে গেছে। এক দিকে বিরাট পর্ব্বতমালা, আর এক দিকে হ্রদের বিশাল শান্ত স্নিগ্ধ মূর্ত্তি। পথে পড়ল পাহাড়ের পাদদেশে মহারাজের নবনির্ম্মিত প্রাসাদ। আকাশে তখন মেঘ ও রোদের লুকোচুরি খেলা চলেছে। আমরা তন্ময় হয়ে হ্রদের বিশাল শান্ত শোভা ও পাহাড়ের গায়ে বিচিত্র রঙ্গের খেলা দেখতে দেখতে অগ্রসর হতে লাগলাম। শ্রীনগর থেকে নিসাদবাগ নয় মাইল। এই নয় মাইল পথ কি করে দেখতে দেখতে পার হয়ে এলাম যেন টেরই পেলাম না। হঠাৎ দেখি নিসাদবাগের গেটের সামনে আমাদের টাঙ্গা এসে দাঁড়িয়েছে।

শালামারবাগের মত নিসাদবাগও একটী ফুলের বাগান, একই সময়ে তৈরী। শালামারবাগ তৈরী করিয়েছিলেন সম্রাট্ জাহাঙ্গীর, আর নিসাদবাগের পরিকল্পনা না কি তাঁর প্রধান মন্ত্রী আসফ খাঁর। বাগানও এর আগে কত দেখেছি। ফুলের বাগান যে বিশেষ একটা দেখবার জিনিস, বা তার ভেতর সত্যিকারের কোন 'আর্ট' থাকতে পারে, এ ধারণা আমার কোন দিনই ছিল না। ফুল অবশ্য চিরকালই মানুষের আদরের সামগ্রী, আর সেই ফুল যেখানে এক সঙ্গে অনেক ফুটে থাকে, তার একটা শোভা আলাদা। আর তারই সঙ্গে বাগানে আছে একটা গোছ-গাছ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাব। কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায় সাধারণ উদ্যানে সব শোভাকে ছাড়িয়ে প্রকট হয়ে ওঠে একটা কৃত্রিমতার ভাব, যা দস্তুরমত চোখকে পীড়া দেয়। সব সহ্য করা যায়, কিন্তু কৃত্রিমতা সহ্য করা শক্ত। তাই কাশ্মীরে গিয়ে বন্ধুবর যখন বাগান দেখার প্রস্তাব করলেন, তখন সে প্রস্তাবে সানন্দে সায় দিতে পারি নি। এত পয়সা খরচ করে এত কষ্ট সহ্য করে মাত্র চার দিনের জন্য কাশ্মীরে এসে দেখব কি না বাগান, একথা ভাবতেই আমার মন বিমুখ হল। যাই হোক শেষ পর্য্যন্ত রফা হল,—এখানে বাগানও অনেক আছে তার মধ্যে যে ফুটো সবচেয়ে নাম করা,—অর্থাৎ

ডাল হ্রদের একটি দৃশ্য

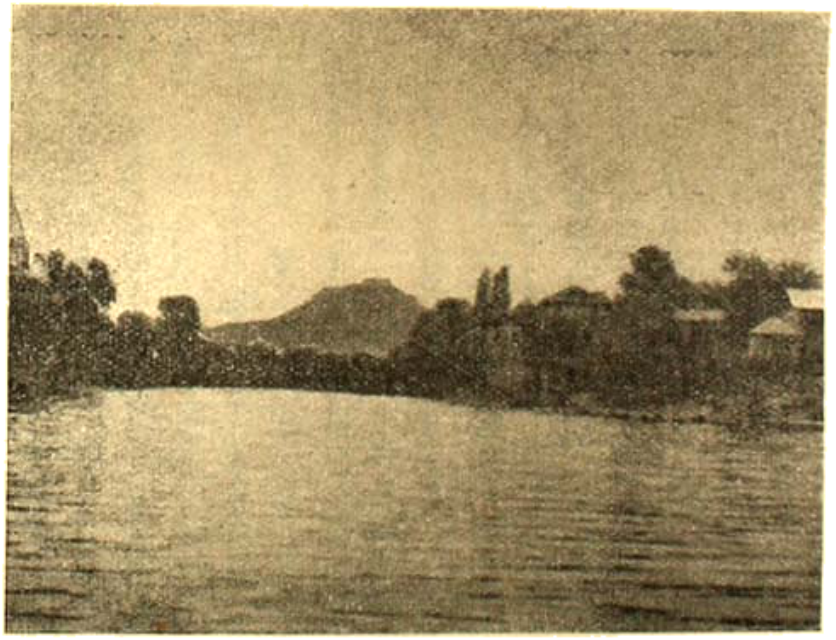

শ্রীনগরে খেলাম নদী  ফুল পত্র(৪৫৫) পাতা

ডাল হ্রদের একটি দৃশ্য

শালামারবাগ ও নিশাদবাগ, শুধু সেই দুটো দেখব। তাই সে দিন দেখেছিলাম শালামারবাগ, আর আজ এলাম নিশাদবাগ দেখতে। সে দিন শালামারবাগ দেখেই মনে হয়েছিল, না দেখলে ঠকতাম, আজ নিশাদবাগ দেখে সে ধারণা আমার দৃঢ় হল। বাগান যে কী হতে পারে এবং তার মধ্যে যে কি রকম ঐশ্বর্য্যের আট থাকা সম্ভব, এর আগে তা ছিল সম্পূর্ণরূপে আমার ধারণার অতীত এবং আমার বিশ্বাস এ ধরণের বাগান না দেখলে সাধারণ লোকের পক্ষে সে ধারণা করা খুবই শক্ত। শালামারবাগ ও নিশাদবাগ একই ধরণের, একই প্রকারের পরিকল্পনা, মনে হয় যেন একই ছাঁচে ঢালা। তবে শালামারবাগে যা দেখেছিলাম ছোট আকারে, নিশাদবাগে তাই দেখলাম আরও বিরাট ভাবে। এ বাগান দুটীর কোনটাই সমতল ক্ষেত্রের উপর নয়,—পর পর বিভিন্ন স্তরে সাজান। সম্মুখে ডাল হ্রদের শান্ত স্নিগ্ধ রূপ আর পশ্চাতে বিরাট পাহাড়ের কালো গম্ভীর মূর্ত্তি,—মাঝখানে বাগান, স্তরে স্তরে, ধাপে ধাপে উঠে ঘুরে পাহাড়ের কোলে গিয়ে মিশেছে। বাগানের মধ্যে চারি দিকে ছড়ান বড় বড় চেনার বৃক্ষ, তাদের বিরাট পত্রবহুল দেহসৌষ্ঠবে চারি দিকে একটা শান্ত শোভা বিস্তার করেছে,—আর সেই সব চেনার বৃক্ষের তল ছেয়ে স্তরে স্তরে অসংখ্য ফুল,—হরেক রকমের ফুল, কত বিভিন্ন রঙের, বিভিন্ন রূপের। এক সঙ্গে এত ফুল—এ কি ছাই কখন' কল্পনা করতে পেরেছিলাম! কবি বলেছেন, 'Ten thousand saw I at a glance!' আমি বলতে পারি—ten million saw I at a glance! তখন পাহাড়ের মাথায় স্তরে স্তরে যেন এবে সমস্ত বাগান খানার উপর একটা ম্লান ছায়া বিস্তার করেছে। বাতাস সম্পূর্ণ স্থির, ফুলগুলির মধ্যে কোন প্রকার চাঞ্চল্যের লক্ষণ নেই; বিষাদমাখা মুখে সব বীর স্থির ভাবে রয়েছে। এত-বড় বিরাট ফুলের মেলা—কিন্তু এদের হাসিমুখ দেখতে পেলাম না বলে মনে ক্ষোভ রয়ে গেল। সেখানা দিনে দেখতে হয় অরুণোদয়ের ঠিক পরে, কিম্বা ফুলের যখন ফুটে উঠে উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে। ভাবলাম—আহা, এখন যদি একবার রোদ ফুটত, সে আলোর স্পর্শে এক সঙ্গে এতগুলি ফুল খিল্‌খিল করে হেসে উঠত। সে হাসির জ্যোতি কল্পনাতেই আমার চোখকে যেন ধাঁধিয়ে দিল। যা পেলাম না, কল্পনায় তা পূরণ করে নেবার চেষ্টা করলাম।

নিশাদবাগ থেকে যখন আমাদের টাঙ্গা ছাড়ল, তখন সন্ধ্যা হতে বড় দেরী নেই।　　[ ক্রমশঃ

---

# সূর্য্য ও নদী

—শ্রীরামদুলাল চৌধুরী

স্রোতস্বিনী কহে রাগি' কর্কশ আবার,
"কেন সূর্য্যদেব তুমি জ্বালাও আমায়!
আমি মোর সৌন্দর্য্যে থাকি গো মগন,
পর দ্রব্যে কভু মোর নাহি আকিঞ্চন;
তৃষ্ণার্থে সকলের লাগি মুই কাজে!
তব কৃত অপরাধ তোমার কি সাজে?"

সূর্য্যদেব কহে, "নদী! ক্রোধে কি বা ফল;
আমি তব জল তুলি আনিয়া অনল,
বারি বরিষণ হয় আমার কৃপায়,
আমার প্রসাদে তা'রা তবে জল পায়।

"আর এক কথা বলি, শুন ও গো প্রিয়া!
যে স্থানে যাও তুমি সেই স্থান দিয়া;
শুচি কত প্রাণী পায় তব উপকার।
তা হ'তে অনেক বড় তুলনা আমার।
প্রলয়ের মূর্ত্তি ধরি, দিগ্বিদিক নাশো গো যখন;
আমি তখন তব জল করিয়ে শোষণ,
তরাই ধরার ভার,
বল নদী কি দোষ আমার?"

# পল্‌সনের কাহিনী

—হাসে জেটারষ্ট্রম

"পল্‌সন কি অদ্ভুত ভাবে হাঁটে", আমার স্ত্রী বললেন, "তুমি কি লক্ষ্য ক'রেছ ?"

আমি লক্ষ্য করেছিলাম ; শুধু তাই নয়, আমি ভাল ভাবেই পর্যবেক্ষণ করেছিলাম। এ যেন বেশ অসাধারণ একটা কিছু, যার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে আমরা পারি না। আপনি যদি ট্রামে একটি ঠোঁট-কাটা কিংবা ট্যারা-চোখ লোকের সামনে বসেন, আপনার চোখ সেদিকে আকৃষ্ট হয় ! পল্‌সনের ব্যাপারও তেমনি ; ওর একটি মাত্র পায়ে—শুধু বাঁ পায়েই—দোষ ছিল. তার পা ছিল অন্যান্য দশ জনের মতই স্বাভাবিক। যখন সে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে থাকে তখন কিছুই চোখে পড়ে না—কিন্তু যখন হাঁটে তখন একটা পা এগিয়ে দেয়—পা'টা এরকম ভাবে বেঁকে যায় যে, দেখলে মনে হয় ও বুঝি পড়ে যাবে, কিন্তু ও পড়ে না। ও তখনই ওর সমস্ত দেহটা সোজা করে দাঁড়ায়।

"ও কি ওর পা সারানোর জন্য কিছু করে নি ?" আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন। তিনি চান যে সবাই নিখুঁৎ পূর্ণাঙ্গ হোক।

"আমি তো এ বিষয়ে ওকে কখনও জিজ্ঞাসা করি নি [redacted] বলুন ও পল্‌সন কে ? সে আমারই যুবক ভৃত্য—নানা উপায়ে আমাদের সেবা করে। ও আমাদের সংবাদ আনা-প্রনা করে, বাজার করে এবং অবাঞ্ছিত আগন্তুকদের হাত থেকে আমাদের বাঁচায়। সুন্দর আমোদপ্রিয় যুবক—ওকে যে হঠাৎ কোথায় পেয়েছিলাম তা আমার মনে নেই—তবে ওকে আমরা সবাই বিশ্বাস করি। কিন্তু কি অদ্ভুত ভাবে ও হাঁটে।

একদিন আমি ওকে বললাম : "পল্‌সন, তোমার পা'টার জন্য একটা কিছু করা দরকার। একজন বিশেষজ্ঞের মত নাও—হয় তো ব্যাপারটা বিশেষ কঠিন নয়, হয় তো সহজেই সেরে যাবে।"

মৃদু হেসে পল্‌সন জবাব দিলে : "আমি এই পা নিয়ে অনেক ডাক্তারের কাছে অনেক হাসপাতালে গেছি। তারা কিছুই করতে পারে নি। ছোট বেলায় আমি ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম, তার ফলেই পা'টার এই অবস্থা হয়েছে। আমার পা সম্বন্ধে ডাক্তারদের খুব উৎসাহ কিন্তু তারা পা'টা ঠিকমত লাগিয়ে দিতে পারে না। যাক, এখন আর চেষ্টা করে লাভ নেই—কথাবার্ত্তা সব পাকা হয়ে গেছে, আমি আমার টাকাও পেয়েছি।"

"কি ? কিসের কথাবার্ত্তা পাকা হয়ে গেছে ?"

"আমি অর্থোপিডিক্ ইন্‌স্টিটিউটের ( Othopaedic Institute ) অধ্যাপক এডের কাছে আমার পা খানা বিক্রী করেছি। আর শুধু পা-ই নয়—সমস্ত কিছু—আমার সমস্ত কঙ্কালটা ! এর জন্য আমি পাঁচশ ক্রাউন্ পেয়েছি। অবশ্য আমি না মরে যাওয়া পর্য্যন্ত তিনি এ কঙ্কালটি নেবেন না। এই ব্যাপার নিয়ে এত বেশী হৈ চৈ হয়েছে যে আমি বিরক্ত হয়ে গেছি। ইচ্ছা হয় এখনই এই অবস্থায় আমার কঙ্কালটা অধ্যাপককে দিয়ে দিই !"

"তুমি অধ্যাপক এডের সঙ্গে কি করে এই ব্যবস্থা করলে ?"

"তিনি আমার চিকিৎসা করছিলেন। তারপর কিছুদিন চিকিৎসা করে অন্যান্য ডাক্তারের মত তিনিও বললেন : 'এ পা ভাল করা যাবে না। কিন্তু দেখ পল্‌সন, আমি ইন্‌স্টিটিউটের জন্য তোমার পা কিনে নেব। ব্যাপারটা খুব রহস্যজনক, কাজেই তোমার পা না পেলে বিজ্ঞানের পক্ষে মহা ক্ষতির কারণ হবে। তুমি কি তিনশ' ক্রাউন নেবে ?' 'পা যদি বিক্রী করি তবে নগদ বিক্রী করব' আমি তাঁকে বললাম। 'নিজে হলেই এ রকম ব্যাপার শীঘ্র পাকা হয়ে যায়। আমি এ বিষয়ে একটু ভেবে দেখতে চাই।' কাজেই বাড়ীতে বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে একবার কথা বলে দেখলাম। তিনি বেশ পাকা কার্য্যকরী বুদ্ধি রাখেন। তিনি বললেন যে চেষ্টা করলে হয় তো আমি বেশীও পেতে পারি। আর ঠিক বেশীই পেলাম। অধ্যাপক এইচ পাঁচশ ক্রাউন দিতে স্বীকৃত হলেন। কাগজে কলমে লিখে আমরা কথা পাকা করে ফেললাম।"

"অদ্ভুত ব্যাপার তো! এমন কথা তো কোন দিন শুনি নি!"

"ওঃ, আমি ছাড়া আরও অনেকে তাদের কপাল বিক্রী করে। আপনি কি ফ্রেন্‌হুসেট্‌কে চেনেন, স্যর?"

"না, আমি চিনি না।"

"ওর মাথাটা—ওপরদিকে নয়, পাশে দিন দিন বড় হয়ে যাচ্ছিল। আমার বাবা ওকে চেনেন—ওর মাথা বড় হতে শুরু করবার আগে, ও আর আমার বাবা একই কাজ করতেন—ও মাঝে মাঝেই আমাদের বাড়ীতে গল্প করতে আসে। একদিন সন্ধ্যায় ও আমাদের বললে যে সে তার কপাল এক হাজার ক্রাউনে বিক্রী করেছে। বোধ হয় ডাক্তাররা মনে ক'রেছিলেন যে ওর মাথাটাও বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য খুব দরকারী। ও যখন চ'লে গেল আমার বুড়ো বাবা তো প্রায় পাগল হয়ে আমাকে অভিশাপ দিতে লাগলেন যে, আমি নিজের বোকামীর জন্যই মাত্র পাঁচশ পেয়েছি। তাঁর ধারণা যে, ফ্রেন্‌হুসেটের মাথা এবং আমার পা'র একই দাম হওয়া উচিত। আর তাঁর ধারণা তো ঠিকই!

"তারপর মনে করলাম যে, একখানা মোটর বাইক্ কিনব। আমার পরিচিত এক ছোকরার মোটর বাইকে চ'ড়ে আমার ইচ্ছা হ'ল যে, ওরই মত একখানা বাইক্ কিনি। আমার কিছু জমানো টাকা ছিল, কিন্তু আরও শ'খানেকের দরকার। বাবাকে আমার অসুবিধার কথা বললাম। তিনি বললেন, 'তুমি চেষ্টা ক'রে অধ্যাপকের কাছ থেকে ধার নাও না কেন? লোকটি তো বেশ ভাল!'

"যাক, অধ্যাপকের কাছে গেলাম—আমার কথা শুনে তিনি তো রেগেই খুন। তিনি চীৎকার ক'রে উঠলেন: 'ভেবেছ কি? মোটর সাইকে চড়বে? এর চেয়ে কি আর ভয়ের কিছু আছে। একটা দুর্ঘটনা ঘটিবে আমার পা'টা নষ্ট করবে—মানে, এই তোমার পা'টা নষ্ট করবে—আর আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলবে না। তোমাকে খুব সাবধানে থাকতে হ'বে—কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটালে চলবে না। মনে রেখ যে, তুমি যেমনটি আছ ঠিক তেমনটির জন্য আমি পাঁচশ' ক্রাউন্ দিয়েছি।'

"তাঁর কথা মেনে নিলাম—তিনি তো ঠিকই বলেছেন। মোটর বাইক্ কিনব না, এই কড়ারে দু'শ ক্রাউন ধার নিলাম। আরও প্রতিশ্রুতি দিলাম যে, কোন দিন যদি মোটর খুব সস্তাও হয়, তবু মোটর কিন্‌ব না!

"যাক, তারপর আর কোন গণ্ডগোল হ'ল না। সব কিছুই আগের মত চলল—অবশেষে লিসার সঙ্গে আমার বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হ'ল। লিসা চমৎকার সুন্দরী মেয়ে—ও আমার পায়ের ব্যাপার নিয়ে মাথাই ঘামাল না। কি ক'রে আমার বাঁ পা'টা এমন হ'য়েছিল, তা' ওকে একদিন বললাম—ওই পর্যন্তই! যখন একজন আর একজনকে ভালবাসে, সে তো আর পা' দেখে ভালবাসে না।

"লিসার একটি ভাই আছে—সে কোন একটি অফিসে কাজ করে। একদিন কথায় কথায় সে বলতে শুরু করলে যে, অবসর সময়ে যখন সে অফিসে যায় না, তখন সে চমৎকার চমৎকার কাজ ক'রে অর্থ উপার্জ্জন করে।

"আমার নিজেকে একটু যেন ছোট ব'লে মনে হ'ল এবং কোন রকমে আমি ওদের বোঝানোর চেষ্টা করলুম যে, বাইরের কাজ আমিও একটু আধটু করতে জানি—ফলে অধ্যাপকঘটিত সমস্ত গল্প—কপালের কথা, সাতশ ক্রাউনের কথা সব বেরিয়ে পড়ল। আমি লিসাকে অভিভূত করার উদ্দেশ্যে একটু বেশ ফেনিয়ে গল্পটা ব'লেছিলাম কিন্তু অভিভূত তো করতে পারলামই না—উল্টো ফল ফলল। ও একেবারে পাগল হ'য়ে গেল—আমাকে হুকুম করল যে, অধ্যাপকের সঙ্গে সমস্ত চুক্তি ভাঙতে হ'বে। তার সঙ্গে যে লোকটির বিয়ে ঠিক হ'য়েছে যখন সে তাকে বিয়ে করবে তার দেহ মন সব কিছুই হ'বে তার নিজের। অন্য কারও সঙ্গে—এমন কি পৃথিবীর সব চেয়ে বড় অধ্যাপকের সঙ্গেও—সে তাকে ভাগ ক'রে নিতে রাজী নয়। তার স্বামীর সঙ্গে বিজ্ঞানের কি সম্বন্ধ? সে অধ্যাপক এচের কাছে যেতে চায়। ব্যাপার এখন এমনই দাঁড়িয়েছে। আমি এতদিন পর্য্যন্ত তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছি কিন্তু আর বেশী দিন পারব না। তার মত মেয়ের মাথায় যা' একবার ঢোকে তা' লেগেই থাকে..."

দু'বছর চ'লে গেল। পল্‌সন আমাদের ছেড়ে চ'লে গিয়েছিল। কোথায় কোন হোটেলে সে একটা চাকরী পেয়েছিল। তারপর আর একদিন আমাদের দেখা হ'ল কারণ পৃথিবীটা ছোট আর রাস্তাঘাট গুলোও বড় সঙ্কীর্ণ। একদিন সন্ধ্যায় আমি একটা থিয়েটারে গিয়েছিলাম—বিরামের সময় একটা কাফেতে ঢুকে' পড়লাম। সেখানে পল্‌সনের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। পল্‌সন আমাকে সোডাওয়াটার এনে দিল—ও সেই কাফের পরিবেশক।

"পল্‌সন, তুমি এখানে?" আমি বললাম, "কি আশ্চর্য্যের ব্যাপার!"

"হাঁ, স্যার, দেখলাম বেস্তোরাঁর কাজে বেশ দু'পয়সা আয় হয়!"

সে একজন খরিদ্দারের অর্ডার নিয়ে মুহূর্ত্তের জন্য চ'লে গেল—আমি দেখলাম যে ওর হাঁটবার সে পুরাণ ধরণ আর নেই। ওর বাঁ পায়ের সেই অদ্ভুত গতি আর নেই। ওর পা'টা এখন খুব স্বাভাবিক হ'য়েছে। ও বেশ অন্য দশজনের মত তাড়াতাড়ি হাঁটতে শিখেছে।

কয়েক মিনিট পরে সে ফিরে এল। পরবর্ত্তী অঙ্কের ঘণ্টা প'ড়ে গেল, কিন্তু পল্‌সনের কাহিনী আমার কাছে নাটকের চেয়ে বেশী চমকপ্রদ ব'লে মনে হওয়ায় আমি কাফেতেই ব'সে গেলাম। সেইখানে আমি পল্‌সনের কঙ্কাল হওয়ার পরবর্ত্তী গল্পটুকু শুনলাম।

"যে হোটেলে আমি কাজ করছিলাম সেখানে একজন বিদেশী পর্য্যটক ছিলেন। আমি যখন খাবার ঘরে কাজ করতাম, তিনি তখন সব সময় আমায় লক্ষ্য করতেন। একদিন তিনি আমার কাছে এসে আমার সঙ্গে কথা বলবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমরা দু'জন তাঁর ঘরে গেলাম। তিনি আমায় একটা সিগারেট দিয়ে ইংরাজীতে আমায় বললেন,—( আমি আজকাল একটু ইংরাজী বুঝি ) :

"'তোমার পা'টা সম্বন্ধে তুমি কি কোন ব্যবস্থা ক'রেছ?'

"'এ পা সারান অসম্ভব', আমি তাঁকে বললাম। আর নিজের মনে মনে বললাম যে আপনি যদি আমার পা কেনার কথা ভেবে থাকেন তবে বড় দেরী হয়ে গেছে! একটা কঙ্কাল তো আর দুজনের কাছে বিক্রী করা যায় না। এমন কি ব্যক্তিগত ব্যাপারেও আমি যে খুব সাধু লোক তা' সবাই জানে।

"যাক্, তারপর তিনি তাঁর পরিচয় দিলেন—তিনি একজন মার্কিন ডাক্তার—অষ্টিওপ্যাথ ( osteopath ) না কি যেন বলে। তিনি টাকা-পয়সা কিছু না নিয়েই আমার পা' সারাবার ভার নিতে চাইলেন। আমি ভাবলাম যে আমার যখন কোন ক্ষতি নেই তখন তিনি না হয় পা'টা নিয়ে কিছুদিন হৈ চৈ করলেনই!

"হাঁ চিকিৎসা করলেন বটে। মালিশ ও নয়—আমার পা'টাই যেন ছিঁড়ে যেত। অনেক সময় আমাদের দুজনে প্রায় হাতাহাতি হ'ত। কিন্তু আমি কষ্ট স্বীকার ক'রে চিকিৎসা করালাম। আমার মনে হ'তে লাগল যে আমি দিনদিন ভাল হ'য়ে উঠছি আর সত্যি সত্যি আমি ভাল হ'চ্ছিলাম। এক বছরের টানা-হেঁচড়ার ফলে আমার বাঁ পা'টা এমন হ'ল যে তার পায়ের সঙ্গে আর তার কোন প্রভেদ রইল না। আমি আবার ভাল ভাবে হাঁটতে শুরু করলাম।

"কাজেই আমার সাধ্যানুসারে আমি তাঁকে কিছু দর্শনী দিতে চাইলাম কিন্তু তিনি টাকা-পয়সা কিছুই নিলেন না। তিনি আমার প্রতিশ্রুতি নিলেন যে আমি যেন গিয়ে অধ্যাপক এঙ্কে আমার পা' দেখিয়ে আসি। তারপর আমি যখন হোটেলের কাজ ছেড়ে বাড়ী চ'লে এলাম, তখন অধ্যাপক এঙ্কে আমার পা' দেখালাম।"

"অধ্যাপক কি বললেন? তিনি নিশ্চয়ই খুব খুশী হ'য়েছেন?

"না তাঁকে দেখে তো তা' মনে হ'ল না। তিনি বরং আরও রেগে গেলেন—মোটর বাইক্ কিনতে চাইবার সময়ও তাঁর এমন রাগ দেখি নি'। তিনি বললেন যে আমি শঠ এবং প্রবঞ্চক। তিনি যে-পা কিনেছিলেন, সে-পা' আর ছিল না—কাজেই আমার মত নরাধম জোচ্চোর আর কে? কাজেই তিনি আমায় তাড়িয়ে দিলেন—আমার পিছনে আমাদের চুক্তিপত্রও দিলেন ফেলে।"

ব্যাপারটার এমন আনন্দদায়ক পরিসমাপ্তি হওয়ায় আমি পল্‌সনকে অভিনন্দন জানিয়ে বললাম: "আমার মনে হয় লিসা নিশ্চয়ই খুব আনন্দিত হয়েছিল?"

"লিসা? ওঃ, সে ব্যাপার বহুদিন শেষ হ'য়ে গেছে। সে যখন আমাকে দিয়ে অধ্যাপকের চুক্তিপত্র ভাঙতে পারলে না, তখনই আমায় ত্যাগ করলে। এখন আর একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ঠিক হ'য়েছে—মেয়েটি এত চমৎকার আর বুদ্ধিমতী! তাকে যদি কখনও আমি বিষণ্ণ মনে দেখি তখনই আমি আমার কঙ্কাল-বিক্রীর কাহিনী বলি—প্রথম থেকে শেষ অবধি,—আর ও হাসতে হাসতে শেষ পর্য্যন্ত কেঁদেই ফেলে। সে বলে যে জীবনে সে আর এমন মজার গল্প শোনে নি'। ও আমার গল্পের একটি কথাও সত্যি ব'লে বিশ্বাস করে না। মেয়েরা অদ্ভুত জীব। অন্য মেয়েটিও বা এ গল্পটিকে কেন নেহাৎ আষাঢ়ে গল্প ব'লে মনে করলে না?"*

অনুবাদক—শ্রীগোপাল ভৌমিক

* Hasse Zetterstrom-এর সুইডিশ গল্প থেকে।

# পারীর অপেরা ও ফরাসী শিল্পী

—শ্রীচিন্তামণি কর

রাত আটটা হবে। অপেরার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, বন্ধু জেলিনিস্কির অপেক্ষায়। বন্ধু জাতে পোল, গান-বাজনার বড় ভক্ত। আজ অপেরায় গোটের ফাউষ্ট অভিনয় দেখতে সে আমায় নিমন্ত্রণ করেছে।

পাঁচটী ছোট বড় রাজপথের সংযোগস্থলে অপেরার বিরাট ধূসর সৌধ, অসংখ্য যানবাহন, পথচারীর চলমান স্রোতাবর্ত্তের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সে-যুগের সেরা স্থপতি গারনিয়ে, তখনকার শ্রেষ্ঠ ভাস্কর, চিত্রকরের সহযোগিতায় এই সঙ্গীতাভিনয়ের মনোজ্ঞ মন্দিরটীর রূপ দিয়েছিলেন। এই অপেরা-ভবনই পারীর বিখ্যাত সঙ্গীত-শিক্ষা পরিষদের আসন। সৌধটীর নীচের তলায় বহির্গাত্রে সজ্জিত সঙ্গীত, যন্ত্র-সঙ্গীত, নৃত্য ও গীতিনাট্যের চারিটী প্রস্তরে গঠিত অপূর্ব্ব রূপক মূর্ত্তি সে-যুগের কয়েকজন বিখ্যাত ভাস্করের জীবনকে অমর করে রেখেছে। উপরের তলায় অলিন্দের উন্মুক্ত গোলাকৃতি বেষ্টনীগুলির মাঝে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতনায়ক নট ও নাট্যকারদের আবক্ষ মূর্ত্তিগুলি যেন দামনের জন-সমুদ্রকে আহ্বান করে বলছে, "ওগো তোমাদের কর্ম্মক্লান্ত দেহটাকে একটু বিশ্রাম দাও। এস ভিতরে এস, তোমাদের জন্য সুখাসন পেতে রেখেছি। তোমাদের কাণে সঙ্গীতের অমৃতধারা বর্ষণ করে কর্ম্মজীবনের রুঢ় বাস্তবতাকে দূরে সরিয়ে দেব। বাস্তব-জগতের নির্ম্মম, মধুর জীবন-কাহিনীকে নৃত্য-গীতাভিনয়ের বিচিত্র ছন্দ ভঙ্গিমায় উপভোগ্য করে তুলব।"

"কি হে কতক্ষণ"—বলে জেলিনিস্কি অপেরার প্রবেশ-পথের পাথরে-বাঁধান সিঁড়ি থেকে ডাক দিলেন।

ভিতরে বিচিত্র আকৃতির আলোকাধারের সজ্জা ফেল করে অভিনয়-কক্ষের সোণালী কারুকার্য্যের ঈষৎ উষ্ণতাগাত্রে আলো বিচ্ছুরিত হ'য়ে, বারুকদলের উজ্জ্বল-মসৃণ বস্ত্রের গায়ে, আসন, মঞ্চ ও বৃত্তি-বেষ্টিত বিশিষ্ট মঞ্চে অর্থ-পরিধির কর্ণ-হস্তাভরণের মণি-মাণিক্যের উপর পড়ে এক স্বপ্নময় আবহাওয়ার সৃষ্টি করছিল। ক্ষণপরেই বেটোফেন্, ভাগনার, মোজার্ট-এর রচিত সুর-তরঙ্গের উচ্ছ্বাস অন্তরকে পূর্ণ করে দিল। অভিনয়-মঞ্চের সামনে ভারী রঙীন চিত্রিত পর্দ্দাটী উন্মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে ফাউষ্টের জীবনে বীতস্পৃহার গান বিরাট গম্ভীরকণ্ঠে ধ্বনিত হল। আলো-ছায়ার অপরূপ সমাবেশ-কৌশল কাহিনীর রূপকে বেশ প্রীতিপ্রদ ও স্পষ্ট করে তুলল। ফাউষ্ট বিষপানের জন্য পাত্রে ওষ্ঠস্পর্শ করবামাত্র বিকট কর্কশ শব্দের হঠাৎ অসতারণায় দর্শকদল চমকে উঠল। এ কি! অভিনয়-মঞ্চের এক কোণ থেকে সর্ব্বশরীর কাপড়ে ঢাকা বিবর্ণ নীল বিকট-দর্শন এক প্রেতকায় মূর্ত্তি আবির্ভূত হল। বুঝলাম এ মেফিষ্টফেলিস্। তার পর পটভূমির পর্দ্দায়, আলোর খেলায় পরিবর্ত্তিত প্রকৃতির ধীরে ধীরে বিকশিত ও মিলিয়ে-যাওয়া রূপ, মার্গারিটার প্রেম, শেষ বিচারের দিনে নরকের ভয়াবহ দৃশ্য এবং অর্কেষ্ট্রার বিচিত্র সুরবিন্যাস আমাদের এক কল্পনাতীত আবহাওয়ার মধ্যে নিয়ে গেল। এর পর একটী 'বালে' নৃত্যাভিনয় হল। ফরাসী 'বালে' নৃত্য পৃথিবীখ্যাত। অদ্ভুত অভিনয়! মুখে বাণী নেই, সুর নেই, কেবল মাত্র অঙ্গের বিচিত্রবিন্যাস ও নৃত্য একটী নাটিকার রূপ দিলে। "একটী কিশোরী স্বপ্নে টাঙ্গান এক সু-পুরুষ রাজপুত্রের আলেখ্যের সঙ্গে নিজের মধুর সম্পর্কের কল্পনায় বিভোরা। সে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল, যে এতদিন জেগের বেষ্টনীতে নীরব আলেখ্যমাত্র হয়ে ছিল, সে জীবন্ত বাস্তবরূপ নিয়ে তার সামনে প্রেম নিবেদন করল। তার পর তাদের মিলন উৎসবে আর কত প্রাচীন প্রেমিক দম্পতীরা এসে তাদের শুভ ইচ্ছা জানিয়ে গেল। ভোরের আবছা আলোয় জেগে সে রাজপুত্রকে পাশে না দেখতে পেয়ে চমকে উঠল। অন্তর্হিত রাজপুত্রের সন্ধানে তার কি অপূর্ব্ব আকুলতা ফুটিয়ে তুলল তার নৃত্য-ভঙ্গিমায়। ছবির দিকে তাকিয়ে সে দেখতে পেল আগের মত অর্থহীন দৃষ্টিতে রাজপুত্র তার দিকে চেয়ে আছে। স্বপ্নে-পাওয়া মিলনের বিচ্ছেদ-বেদনায় সে উন্মত্ত হয়ে বার বার প্রশ্ন করতে লাগল, তুমি কি চিরকাল

শুধু পটে লেখা ছবি মাত্র থাকবে? তুমি আসবে বলে কত দিন থেকে আমার ছবির দ্বার খুলে রেখেছি। স্বপ্নে এসে মাঝে মাঝে পরশের বাথাটুকু দিয়ে চলে গেছ। কবে তোমায় চিরন্তন করে পাব?"

সৌন্দর্য্যের এমন একটী আধারকে দেখবার সৌভাগ্য ঘটাবার জন্য জেলিনিস্কিকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। জেলিনিস্কি আমায় অপেরা অভিনয় দেখিয়ে যে আনন্দ দিয়েছে তা জীবনে ভুলব না, কিন্তু তার নিজের জীবন-নাট্যের পরিণতি আমায় চিরব্যথিত করে রেখেছে।

জার্ম্মানীর পোল্যাণ্ড অভিযানের চারদিন আগে সে দেশের জন্য সংগ্রামে যোগ দিতে চলে গেল। চলন্ত ট্রেণের জানলায় যতক্ষণ তার ঝুঁকে-পড়া শরীরটা দেখা গেল তার স্ত্রী নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। আশ্চর্য্য! এক ফোঁটা চোখের জলকেও তিনি ফেলতে দিলেন না, পাছে স্বামীর কর্ত্তব্য-কঠোর মন, মমতায় ব্যথিত হয়। কয়েক দিন পরে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, শ্বেতাবগুণ্ঠিনী মানোন্ জেলিনিস্কি অস্ফুট ভাবে শুধু বললেন, "হি ইজ্ ডেড্, হি ইজ্ ডেড্! (সে মারা গেছে, সে মারা গেছে)।" তিনি পারী ছেড়ে চলে যাবার দিন সকালে আমরা আর্ক অফ ট্রিয়ম্ফ্-এর তলায় অজ্ঞাত সৈনিকদের কবরে ফুল দিয়ে দেশমাতৃকার সম্মান রক্ষার্থে নিহত বন্ধুর উদ্দেশে শ্রদ্ধাতর্পণ দেবার সময় ভাবছিলাম, অপেরার কল্পনাময় অভিনয়ে ও বন্ধুর বাস্তব-জীবনের রঙ্গমঞ্চে নিত্য অভিনয়ে, কোন্‌টার বেশী ফাঁকি।

এসব দার্শনিক তত্ত্ব ছেড়ে এখন অপেরা দেখা রাতের কথা বলে শেষ করি। রাত্রে ঘুম আসছিল না। নর্ত্তক, নর্ত্তকী, নট, নটী আর বাদ্যকরদের চিন্তা মনে ভিড় করে মস্তিষ্ককে ক্লান্ত করে তুলছিল। চাই না তাদের কথা ভাবতে। মনশ্চক্ষু থেকে তাদের ছবি মুছে দিতে চাইলে তারা যেন আরও বেশী হট্টগোল করে আক্রমণ করতে থাকে। জেগে বাস্তবে যে অভিনয় দেখেছি তারই ক্রমানুবর্ত্তী দৃশ্য দেখতে লাগলাম স্বপ্নে, তবে ফাউষ্ট বা 'বালে' নৃত্যের অভিনয় নয়, বিষয় ও অভিনয় ভঙ্গিমা বিস্তর ও আরও বাস্তব।

পাশ্চাত্যে সন্ধ্যার অন্ধকারকে মদীধূম্রাক্ত করে একটী ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত হাতের বৈদ্যুতিকা একটী সরু গলিপথের কোণের খানিকটা স্থান ঘোলাটে আলোয় ভরিয়ে রেখেছে। তারী কাল পোষাকের আবরণে কিম্ভূতকিমাকার প্রেতমূর্ত্তির মত দু' একজন লোক বহুকালের জীর্ণ ওভারকোটের ছিদ্রগুলি হাতে চেপে আঁধারে লুপ্ত এক দরজার ফাঁক থেকে বেরিয়ে অপর দরজায় বা গলির বাঁকে মিলিয়ে যাচ্ছিল। একটী জানলার জেব্রা কপাটের ফাঁক থেকে আলোর ফালি ও হট্টগোল, হাসির উচ্ছ্বাস বাড়ীতে একটু বড় রকমের "রাঁদেভু" (আড্ডা)র আভাস দিচ্ছিল। কি কৌতূহলে জানি না বাড়ীটাতে ঢুকে পড়লাম। একটি নাতিপ্রশস্ত হলে কয়েকটী প্রৌঢ় চাষী-মজুর ও তাদের স্ত্রী-পুত্রেরা মোটা পাত্রে মদ খাচ্ছিল। এক পাশে একটী ছেলে কাঠের বাঁশীতে, গাল দুটো যতদূর সম্ভব ফুলিয়ে, কর্কশ সুরের অবতারণায় মোহিত হয়ে, নিজেকে নিজে তারিফ করে মাথা দোলাচ্ছে। কয়েকটী মহিলা প্রৌঢ়ত্বের গল্পরস এক মনে শুনছিল। "কানা-তোবড়ান টুপির ফাঁক থেকে একজন চাষী আড়চোখে আমায় দেখে বললে, "কি হে ছোকরা! হাঁ করে কি দেখছ? বলে যাও একপাত্র সুধারস নিয়ে। আমরা দুনুই বা গরীব, গেলাই বা রাজার খাজনার দর বিকিয়ে, আনন্দকে তো আর বিসর্জ্জন দিতে পারি না! গরীব হলেও আমাদের মধ্যে কেবল চাষী-মজুরই নেই, এর মধ্যে খুঁজে পাবে শিল্পী, কবি, গায়ক। দেখ না সব শিল্পী চায় রাজার প্রাসাদ পেতে, আঁকে তাদের তাঁবেদারী ছবি। কিন্তু ঐ কোণে বসে যে তিনজনকে দেখছ ওরা ছবি তৈরীতে রাজার কারিগরদের চেয়ে কম ওস্তাদ নয়। তবে ওরা আমাদের বড় ভালবাসে। রাজার কৃপাকে উপেক্ষা করে ওরা আমাদের জীবনক্ষেত্রকে ওদের "আতলিয়ে (কর্ম্মশালা)" করেছে।" জিজ্ঞাসা করলাম ওরা কে? সে অবাক হয়ে বলল, "সে কি হে। হুঁ। ব্রাক্-ম্যাতিস্‌কে তুমি চেন না।"

মনে পড়ল হুঁ। ম্যাতিসের আঁকা চাষী পরিবারের ছবিগুলি। সঙ্গে সঙ্গে দেখি যেন সুভ্রা মিউজিয়মে হুঁ। ম্যাতিসের আঁকা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। শিল্পীর জীবদ্দশায় কেউ সমাদর করে নি বলে, বোধ হল ছবির মূর্ত্তিগুলি বিদ্রূপভরা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। হঠাৎ দেখি আবার সেই গলিটী, যেখানে বড় রাজপথে এসে মিশেছে, সেইখানে দাঁড়িয়ে আছি। রাস্তায় বিরাট শোভাযাত্রার ভাবে কতকগুলি লোক চলছিল। ঠিক তাদের মাঝে বেশ

জমকালো পোষাক পরে, হীরে মণি-মাণিক্যের আভা ছড়িয়ে একজন ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল। বগলে পাকান কাগজ, হাতে রঙ্, তুলির আধার ও কারুকার্য্যের সরঞ্জাম ইত্যাদি নিয়ে একদল লোক তাকে ঘিরে চলছিল। অশ্বারূঢ় লোকটী যখন যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল, সে যেন কৃতার্থ মনে করছিল। সকলেই তার সঙ্গে একটু কথা বলে যেন ধন্য হতে চায়। পাশে যে পূর্ব্বে দেখা চাষী-মজুরগুলি কখন এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্য করি নি। একজন ঐ দলটীর দিকে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি ফেলে বললে, "বৃথা যন্ত্র! লক্ষ্মীটা রাজার দেওয়া চাকরীর শিল্পীদের সভাপতির খেতাব পেয়ে মনে করছে নিজেও যেন আর এক চতুর্দ্দশ লুই। আর দেখ না ঐ চাটুকার পটুয়ার দলটী। সভাপতির পদলেহনে যেন ওদের জন্ম সার্থক মনে করছে।" আর একজন বলল, "আমরা কি ঘুসেই জন্মেছি, শিল্পী যে স্বাধীনভাবে রূপ রচনা করবে তারও উপায় নেই, সেখানেও মানতে হবে রাজার খেয়াল।" দু'টী ভাতারা বললেন, "এরা শিল্পী-জীবনকে কলঙ্কিত করেছে, এর জন্য ভবিষ্যতের শিল্পীকুল এদের কোন দিন ক্ষমা করবে না।" কি খেয়াল হল জানি না, দলটীর পিছনে আমিও সঙ্গ নিলাম। চলতে চলতে একস্থানে ভিড় দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম। দণ্ডায়মান দর্শকদের ঘন বেষ্টনীকে অতিক্রম করে দেখবার চেষ্টার সহজেই যেন দয়া হয়ে গেলাম। আমার মাথাটী অগণিত মস্তকের চেয়ে উঁচু হওয়ায় দেখতে পেলাম বারোয়ারী থিয়েটার হচ্ছে। অভিনয় হচ্ছিল ধর্ম্ম-পুরাণ কাহিনী নিয়ে। বাঃ! দৃশ্যপটগুলির রঙ্ তো বেশ! কিন্তু চিত্রিত নিসর্গ দৃশ্য ও যবনিকার আকৃতি বেশী বড় ও স্পষ্ট হওয়ায় নট-নটীদের বড় ও আশানুরূপ স্পষ্ট দেখাচ্ছিল না। আমার পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গেই অভিনয় শেষ হয়ে গেল। একজন যবনিকার বাইরে এসে বললেন, "এ দৃশ্যপট-গুলি ও নাটক আমার রচনা। ইতালির রাফাএলের রচনা দেখে আমি উৎসাহিত হয়ে এই অভিনয়ের সৃষ্টি করেছি। এতে হয় তো অনেক ত্রুটী থেকে গেছে, কিন্তু আশা করি আপনাদের কিছু আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছি।" দর্শকদল-গুলির পাকে পড়ে কিছুক্ষণ নানা সমালোচনা শুনলাম। বহুলোক বলছিল, "শিল্পী পুর্ত্তা জীবনের বেশী সময়টা ইতালিতে কাটিয়েছেন বলেই রাজার খেয়াল তামিলের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়ে, কিন্তু নিজের কথা নতুন দৃশ্যপটে, নতুন রঙে বোঝাতে পেরেছেন।" বুঝলাম উপসংহারের বক্তা শিল্পী পুর্ত্তা।

আমার চলার বিরাম নেই। জনসঙ্ঘ, অট্টালিকা সব ক্রমে পিছনে মিলিয়ে গিয়ে, সামনে নীল আকাশ, তারল বনানী, প্রান্তর সব এগিয়ে আসছিল। একটী বাগানের এক পাশে এক যুবক-শিল্পীকে একমনে দেখে নিঃশব্দে তার পিছনে গিয়ে ছবি দেখতে লাগলাম। তার আঁকা ছবির মধ্য হতে বাঁশীর মিঠে তান, ফুলবনের ফুলের গন্ধের সঙ্গে ভেসে এল। গ্রাম্য তরুণীরা সরল হাসি হেসে তরুণদের হাতে হাত শৃঙ্খলিত করে বৃত্তাকারে নাচতে লাগল। ছবি ছেড়ে শিল্পীর দিকে চেয়ে দেখি কেউ নেই। এইমাত্র দেখেছিলাম তাকে ছবি আঁকতে, এই মুহূর্ত্তেই সে গেল কোথায়। তার তুলিটি কেবল মাটিতে পড়ে আছে দেখা গেল। সামনে চাইতেই ছবির তরুণ-তরুণীর দলটি এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলে, "কি খুঁজছ?" বললাম, "এইমাত্র এখানে একজন শিল্পীকে আঁকতে দেখেছিলাম, সে গেল কোথায়?" তারা হেসে বলে, "ওঃ শিল্পী তাকেও খুঁজছ? সে তো পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে।" শুনে বড় দুঃখিত হ'লাম। তরুণ-তরুণীরা আমার মনের ভাব বুঝে বললে, "দুঃখ ক'র না, যদিও সে মাত্র সাঁইত্রিশ বৎসর মর্ত্ত্যে থেকেছে, দান কিছু সে অপূর্ব রেখে যায় নি। তার যাওয়াকে অকাল বলে যারা ক্ষুব্ধ হবে, আমরা নেচে গেয়ে তাদের দুঃখ ভুলিয়ে দেব।" তার পর আমায় ঘিরে তারা নাচ আর গান আরম্ভ করে দিলে।

শহরে ফিরে দেখি, এইটুকু সময়ে ঘোর পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। লোকগুলি অত্যন্ত মন্থর হয়ে গেছে এবং প্রকাশ্য-ভাবে লাম্পট্য দেখিয়ে গর্ব্ব প্রকাশ করছে। একটী প্রাসাদের অলিন্দে কয়েকটী ভূকাবক্ষোত্তেজক নগ্ননারীর ছবি ঝুলছিল। সেগুলির দিকে চোখ পড়তেই কে একজন আমার হাতে টান দিয়ে বলল, "এ দিকে এস, তোমায় ভাল ছবি দেখাব। ঐ ছবিগুলি রঙে ও অঙ্কন-নৈপুণ্যে ভাল হলে কি হয়, যেমন হয়েছে লম্পট রাজা পঞ্চদশ লুই তেমনি আঁকে তার শিল্পী বুলে।" লোকটীর সঙ্গে একটী বাড়ীতে গিয়ে দেখি, গৃহস্থের জীবন-চিত্রের কয়েকটী সাধারণ ঘটনাকে রূপ দিয়ে শিল্পী এক নতুন রসের সৃষ্টি করেছেন। লোকটি বলল, "এর

রচয়িতাকে বোধ হয় ভেব না। ইনি শাবেঁা, সাধারণ ঘটনাবলীকে রঙে রসে উপভোগ্য করে তুলতে ইনি ফরাসী শিল্পীদের মধ্যে অদ্বিতীয়।" কয়েকজন ভাচ্ শিল্পী ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছিলেন।

ছবি দেখে একটী বড় বুলভার দিয়ে চলছি, এমন সময় মলা, ছেঁড়া, হীন পোষাকপরা রুক্ষ চেহারার অসংখ্য লোক লাঠির ডগায় কাস্তে, ছুরি ও নানা রকমের অস্ত্রফলক বেঁধে, বিকট চীৎকার ও হল্লা করতে করতে এগিয়ে আসতে লাগল। রাস্তাটিকে অতিক্রম করে একদিকে পালাতে গিয়ে, সামনে একটী বিরাট কাঠের ফ্রেমে ঝুলান, প্রকাণ্ড ধারাল ভারী অস্ত্রফলকের ছৌলুসে চোখ ঝলসে গেল। কয়েকটী লোক, রাজদর্শন একজনকে ফ্রেমের মাঝে বেঁধে সজোরে অস্ত্র-ফলকটি ফেলে দিলে। তার মুণ্ডুটী ছিটকে পড়ল। মুণ্ডু ও কাটা গলা থেকে বেগে নির্গত রক্তস্রোতে লুটোপুটী খেয়ে, রক্তমাখা হাত উপরে তুলে কয়েকজন চেঁচিয়ে উঠল,"ভিভ্ লা রেভলুসিঁ।" সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে শবের রক্ত-মাখান একফালি কাপড়ের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল, তাদের সমবেত চীৎকার শব্দনাথকেও অতিক্রম করে গেল। ভিড় ঠেলে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় এসে দেখি, একটী উঁচু মঞ্চের উপর একটি লোক চীৎকার করে বলছে, "গ্রীক এবং রোমানদের মত বীর চাই, আমরা চাই সাধারণতন্ত্র।" তার সামনে গ্রীক, রোমানদের কাহিনী-বিষয়ক কয়েকটি ছবি ঝুলছিল। তারপর বিক্ষুব্ধ জনতার মাঝে, অশ্বের ঝনঝনানি, ঘোড়ার ক্ষুর, মানুষের মৃত্যু করুণ চীৎকারে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম। যখন জ্ঞান হল, দেখি দিকে দিকে বিজয়োৎসবের ঘুম পড়ে গেছে। একজনকে প্রশ্ন করলাম, "এ কার বিজয়োৎসব?" সে অবাক্ হয়ে বলে, "জান না? সম্রাট নাপলেঁর। ঐ যে বিজয়ী সৈন্যদলের পুরোভাগে সাদা ঘোড়ায় তিনি আসছেন, নতজানু হয়ে সম্মান দেখাও।"

যে লোকটি একটু আগে ছবি দেখিয়ে চীৎকার করছিল সে দেখি একটী অট্টালিকার বিরাট বাতায়নপ্রান্তে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে, "নাপলেঁ দীর্ঘজীবী হও।" লোকটি কে জানবার প্রবল ইচ্ছায় বাড়ীটিতে ঢুকে পড়লাম। একটী প্রশস্ত ঘরে অনিন্দ্যসুন্দরী, বিধুমুখী মাদাম রেকামিয়ে-এর একখানি প্রতিকৃতির সামনে তাঁর কয়েকজন ভক্ত সেই জানালায় দেখা লোকটির করমর্দন করে বলছিল, "দাভি, তুমি এ যুগের সেরা শিল্পী। তোমার দানের সামনে শুধু আমরা নই, ভবিষ্যতের শিল্পীরাও, প্রণতি জানাবে।"

তারপর কেমন করে যে কেন নদীর ধারে এসে পড়লাম তা স্বপ্নই বলতে পারে। কয়েকজন লোক নদীতে ভাসমান একটি শবদেহ তুলে নিয়ে এল। মৃতের কয়েকজন বন্ধু শবদেহটি ফুলের স্তবকে আবৃত করে বললে, "বন্ধু জাঁগ্র, তুমি সম্রাট নাপলেঁর সভা-শিল্পীর সম্মান পেয়েও সন্তুষ্ট হতে পারলে না। তোমার শিক্ষাগুরু দাভির ক্লাসিক শিল্পধারা তোমাকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি, কারণ তুমি যুদ্ধ-বিগ্রহের বাঁক থেকে বাস্তব জীবনের প্রতিফলন দিয়েছ। তোমার রোমান্টিসিজম্ ছেড়ে ক্লাসিসিজম-এর ব্যর্থ প্রচেষ্টাকে তরুণ শিল্পী-সম্প্রদায় বাঙ্গ করেছে বলে তুমি কেন এভাবে আত্মহত্যা করলে বন্ধু!"

তাদের ঐ শোকসভায় আমার থাকাটা অশোভন দেখাচ্ছিল, তাই সরে এলাম।

এবার বাস্তব দৃশ্য ছেড়ে দেখি লুভ্র্-এর রোমান্টিক ও রিয়েলিষ্ট গ্যালারীর মধ্যে চলে গেছি। জাঁগ্র্-এর আঁকা জলকলসধৃতা নিষ্পাপ নগ্না লা হুয়ুস্ ও মানবিনীর লাবণ্যময়ী মূর্তির প্রতি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছি। পাশে মেদিকোর অঙ্কিত বিশাল তরঙ্গে ভাসমান মেদুসা ভেলার নিমজ্জিত জাহাজের মৃত ও মৃতপ্রায় আরোহীদের বিবর্ণ পাণ্ডুর দেহ আবছায়া আলোয় ভয়াবহ দেখাচ্ছিল। ভলাক্রোয়ার আঁকা দিয়োর হত্যাকাণ্ড ছবিটিতে আহতের গোঙানী, রক্তস্রোত, অশ্বের ক্রেষাঘাতে বিক্ষুব্ধচিত্ত হয়ে আবার গ্যালারীর বাইরে চলে গেলাম। সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে সেন নদীর ধার দিয়ে চলতে, শাখা দিয়ে জল ছুঁতে বাগ্র গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট দৃশ্যমান সেতু যেন কোরোর একখানি নিসর্গচিত্রের মত দেখাচ্ছিল। দারুণ ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত হয়ে একটী রেস্তোরাঁতে গিয়ে পরিবেশিকাকে খাবার দিতে অনুরোধ করলাম। পরিবেশিকার সচকিত চীৎকারে চমকে দেখি তার হাত থেকে একটী সদ্য-কাটা মানুষের কান মাটীতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, আর সে একটী চিঠি হাতে থর্ থর্ কাঁপছে। চিঠির লেখাটী রক্তাক্ষরে আমার সামনে জ্বলতে লাগল। "শেরি, তোমায় আমি অন্য কিছু দিতে পারি না বলে তুমি

আমার কান চেয়েছিলে। তাই ক্রিষ্টমাসের উপহার-স্বরূপ, তোমার প্রার্থিত আমার একটী কান পাঠালাম। আশা করি, আমার এ দীন উপহার তোমায় খুশী করবে। ইতি – ভ্যানগঘ।" পরিবেশিকা আর্ত্তস্বরে বললে, "কি ভয়ানক লোক সে! রহস্যকে এমন সত্যভাবে নিলে! আর নিজের কান নিজে কাটলে! উঃ! শিল্পী জাতটাই অদ্ভুত!" কানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ভ্যানগঘের সে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হল, চোখে পড়ল গুলিবিদ্ধ শিল্পীর দেহ ঘাসের উপর পড়ে, শেষ একবার হাত পা ছুড়ে নিস্পন্দ হয়ে গেল।

ঘুম এবার পাতলা হয়ে এসেছে। আধোজাগ্রত অবস্থায় এক রোলসরয়ের মাঝে স্বপ্ন আমায় পৌঁছে দিল। শিল্পী মানে, পিসারো, রোনোয়া এবং আরও অনেকে সেজানের শিল্প-শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে তাঁকে অভিনন্দন দিতে এই ভোজের আয়োজন করেছেন, শুনলাম। সেজান পৌঁছানর পর মানে তাঁকে অভিনন্দিত করে বক্তৃতা করলেন। সাশ্রু নেত্রে মাথা নত করে সেজান শুনে গেলেন। মানের কথা শেষ হবামাত্র সেজান উঠে বললেন, "মানে, তুমিও আমায় বিদ্রূপ করে সকলের কাছে হাস্যাস্পদ করলে!" তার পর সবেগে সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে অনেকে হতবাক্ হয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে গেলেন। কিন্তু কেউ তাঁকে বোঝাতে পারলেন না যে তাঁর যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে অকৃত্রিম ভাবে এই প্রশংসাপত্র পাঠ করা হয়েছে। মুক্ত মানে শুধু বললেন, "এত বড় শিল্পীকে কেউ আদর দিলে না, বুঝলে না, তাঁর এ ব্রণ স্বাভাবিক যে তাঁকে প্রশংসা করা বিদ্রূপেরই নামান্তর। এ ব্রণের পিছনে তাঁর সারা জীবন-লব্ধ যে পুঞ্জীভূত অবহেলা, অপমান, অপমানের বোঝা আছে, তাকে এক মুহূর্ত্তের দু'টী মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে দিতে যাওয়াই আমাদের ভুল।"

হাল্কা ঠাণ্ডা বাতাসের এক হিল্লোল এসে আমার গায়ে যেন শত ছুরিকাঘাত করল। ঘুম ভেঙ্গে গেল। হোটেল-কর্ত্রী স্বয়ং এসে আমার ঘরের জানালা খুলে পর্দ্দা সরিয়ে দিচ্ছিলেন। আমায় জাগ্রত দেখে বললেন, "বড়ই অনেক ধাক্কা দিয়ে তোমার সাড়া না পেয়ে ঢুকেছি, এর জন্য মাপ চাচ্ছি। কিন্তু তুমি কি অসুস্থ? বলটা যাবে, আজ ষ্টুডিয়োতে যাবে না?" বললাম, "সুপ্রভাত মাদাম, আমি সুস্থই আছি কেবল কাল রাতে আমার মস্তিষ্কে কিছু গোলযোগ ঘটেছিল।"

---

# কৃতঘ্নতা

—শ্রীকালীকিঙ্কর সেন গুপ্ত

দূরবীক্ষণ গঠিল যে জন, অন্বের পর পারে
খগোল পরিধি পার ক'রে দিল মানবের দু-নয়ন
তাহার ঋণের কৃতজ্ঞতায় বন্দী করিয়া তারে
কারাগারে দিল, ব্যর্থ করিল যৌবন দেহ মন।

অণুবীক্ষণে প্রেক্ষা যাহার সূক্ষ্মতমের প্রতি
তৃতীয় নয়ন মিলিল মানবে, মানবের অবিচারে
গৃহ-পরিজন ছাড়ি সেই জন লভিল কি পরিণতি!
অগৌরবের মৃত্যু ডুবিল ক্ষিতি মৃত্তিকা তারে।

মানবের লাগি যে মহা মানব তপস্যা করিল জয়
সেই মানবের কৃতঘ্নতায় তা'রি দুর্গতি হয়।

---

## মরুভূমির শহর টিউনিস্ ও প্রাচীন কার্থেজ*

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

টুনিসিয়া আফ্রিকায় ফরাসী সাম্রাজ্যের একটী প্রদেশ। এর একদিকে বিস্তৃত সাহারা মরুভূমি, অপর দিকে সমুদ্র। ইউরোপের এত কাছে এ দেশ এবং ইউরোপের এত প্রভাব এর ওপরে পড়েছে যে, একে ইউরোপের উপকণ্ঠ বলা যায়।

সিসিলি দ্বীপের রাজধানী ট্রাপানি থেকে ষ্টীমারে রাত্রারাতি টুনিসিয়ার রাজধানীতে পৌঁছানো যায়। এখানে এত ইতালীয় বাসিন্দা আছে যে সারা লিবিয়া দেশে অত নেই।

টুনিসিয়া বহুকাল আগে ছিল সাহারা মরুর বুকে স্বর্গভূমিস্বরূপ মরুদ্যান—এখন এখানে এমন অনেক পণ্য উৎপন্ন হয়, যা ফ্রান্স ও ইতালির উৎপন্ন পণ্যের সঙ্গে পাল্লা দেয়—বিশেষ করে মদ ও তৈল।

এগারো বছর পরে আমি টুনিসিয়াতে ফিরলাম।

প্রাচ্য দেশের জীবনযাত্রার মধ্যে একেবারে যেন রাত্রারাতি ডুবে গেলাম। অথচ নাম যাই হোক, টিউনিস প্রায় ইউরোপীয় শহর।

সে সময়ে ইতালীর সঙ্গে আবিসিনিয়ার যুদ্ধ চলছে। অ্যাভিনিউ জুল্ ফেরি ও অ্যাভিনিউ কার্থেজের সংযোগস্থলে প্রকাণ্ড টাইমস্ স্কোয়ারে আবিসিনিয়ার বড় ম্যাপ টাঙানো হয়েছে, ছোট ছোট পতাকা ম্যাপের ওপর পুঁতে আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ইতালীয় সৈন্যের অগ্রগতি বোঝানো হচ্ছে প্রতিদিন।

এখানেও জুয়াখেলার জন্যে কাসিনো আছে, রাস্তায় মোটর-গাড়ীর ভিড়, বড় বড় রেস্তোরাঁয় খাবার সময়ে অর্কেস্ট্রা বাজে। প্যারিসের অনুকরণে বড় বড় অ্যাভিনিউ তৈরী করা হয়েছে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কার্থেজ বর্ত্তমান টিউনিস্ নগরীর উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি ধ্বংসস্তূপে পরিপূর্ণ প্রান্তর—শহর থেকে কার্থেজ দেখতে যাবার জন্যে বৈদ্যুতিক রেলগাড়ীর ব্যবস্থা আছে, সুতরাং টিউনিস্ একেবারে আধুনিক শহর।

শহরের এ অঞ্চল ত্যাগ করে আমি বার্ব্বার, বেদুইন ও আরবীদের জগতে প্রবেশ করতে চাইলাম।

বড় রাস্তা দিয়ে কিছুদূর গিয়ে পোর্ত্ত দ ফ্রান্স'এর অদূরে দেশী লোকের আবাসস্থান। এখানে রাস্তার ধারের টেবিলে কফি পানরত লালফেজ্ পরা খরিদ্দারের ভিড়। নিকটেই একটি ক্ষুদ্র পার্ক, পার্কের চারিধারে পুরানো যুগের লাল ও সবুজ ইট-এর স্তম্ভ ও খিলান এখনও দাঁড়িয়ে আছে—সেকালে এইটিই ছিল ক্রীতদাস বিক্রয়ের বাজার।

বার্ব্বার জলদস্যুদের প্রধান ব্যবসায় ছিল, ভূমধ্যসাগরের জাহাজ লুঠ করে ক্রীতদাস সংগ্রহ করা এবং টিউনিসের বাজারে চড়াদামে বিক্রয় করা। মার্কিন যুক্তরাজ্য সর্ব্বপ্রথম বার্ব্বার জলদস্যুদের অত্যাচার নিবারণ করতে যথেষ্ট সাহায্য করে এবং আংশিকভাবে কৃতকার্য্যও হয়েছিল।

এই শহরের উপকণ্ঠে মার্কিণ কবি জন হাওয়ার্ড পেইনের সমাধি একটি দ্রষ্টব্য স্থান। কবি এখানে কিছুদিন বাস করেছিলেন, এখানেই শেষে দেহত্যাগ করেন। কোন্ এমন স্কুলের ছেলে আছে, যে কবির বিখ্যাত সঙ্গীত "Home, Sweet Home" কবিতা হিসাবে পাঠ্যপুস্তকে পড়ে নি?

কিন্তু কবির শবদেহ এখানে নেই। স্বদেশস্থ কবির দেহ ১৮৮০ সালের ৫ই জানুয়ারী তারিখে এখান থেকে ওয়াশিংটন শহরে নীত হয় এবং ঐ সালের ৯ই জুন সেখানে জাঁকজমকের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হয়।

কফির দোকানের সামনে সেকালে বার্ব্বার নর্ত্তকীরা কফিপানরত বেদুইন ও আরবদের মনোরঞ্জন করতো,

* সেনার্ড উইলিয়ামসের বর্ণনা হইতে।

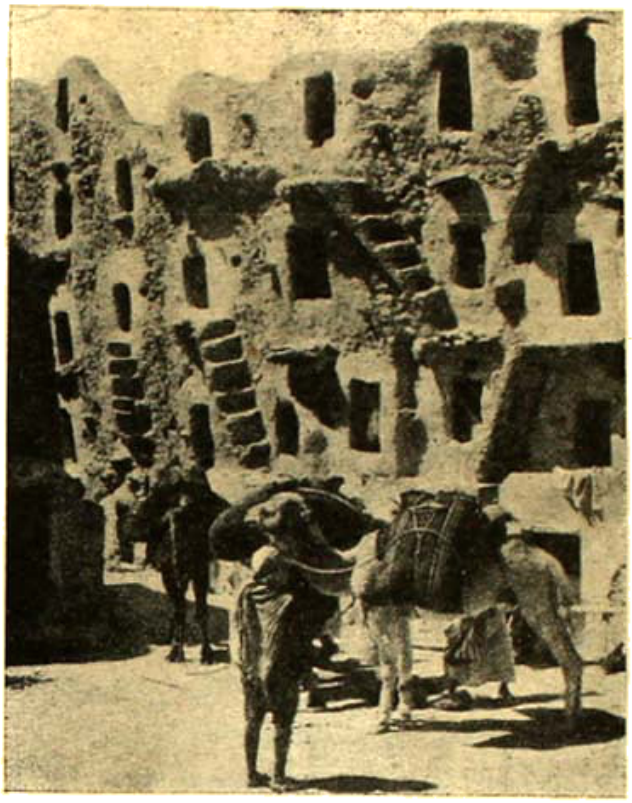

কড়িবরগাহীন বহু-তল মাটীর বাড়ী

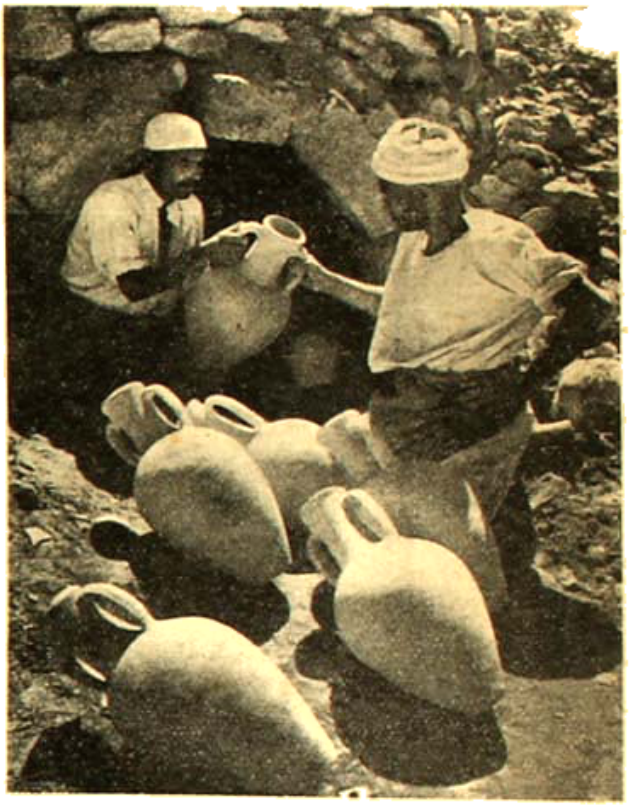

লোম থেকে মাটীর পাত্র তৈরী করা হচ্ছে

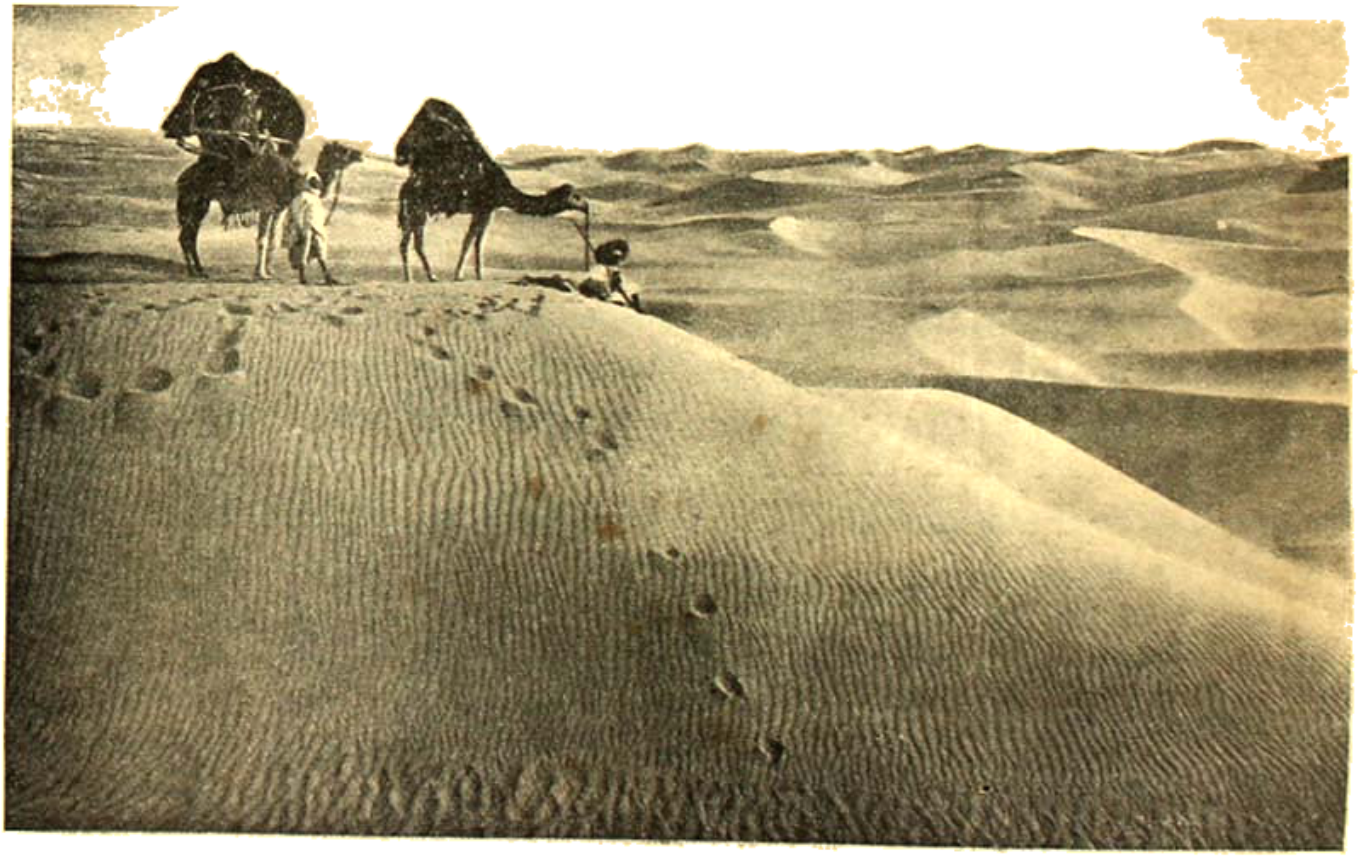

টাইগ্রিসের পশ্চিম তীরাঞ্চলের দৃশ্য

আজকাল রেডিওর লাউড্‌স্পীকারের কণ্ঠনিঃসৃত কর্কশ খাতব সঙ্গীত ও বাদ্য সেই কাজ করে। জায়গাটার নাম গ্রাস্ বাচ্ স্ট্রইকা—রাস্তা দিয়ে ট্রাম গাড়ী যাচ্ছে, কমলা-লেবুর ফিরিওয়ালারা চীৎকার করে লেবু ফিরি করছে। আমাদের পেছনে বড় বড় সাদা ভোমওয়ালা বাড়ী, ঘর, মসজিদ।

প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের মিলন এখানে বড় স্পষ্ট।

নিকটেই বার্ডো মিউজিয়ম, এক সময়ে টিউনিসের শাসক হামিদ বে'র হারেম ছিল বাড়ীটা। এখানে একসময় সুন্দরী অন্তঃপুরিকাগণ সোনার খাঁচায় পোষাপাখীর মত আবদ্ধ থাকতেন, আজকাল বিভিন্ন দেশের টুরিষ্টরা সেই স্থানে পিউনিক, রোমান ও আরবীয় শিল্পদ্রব্য দেখে বেড়াচ্ছে।

প্রাচীন কালের এই শিল্পসম্ভার এখানে এত বেশী পরিমাণে ও এত বিচিত্র শ্রেণীর আছে যে, প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতকে বিস্মিত হতে হবে সে সব দেখে। এগুলি সবই টিউনিসের শাসকগণের দ্বারা সংগৃহীত এবং সব সময়ে সদুপায়ে সংগৃহীত নয়, তা বলাই বাহুল্য।

হামিদ বে এবং তাঁর পূর্বপুরুষেরা বহু জায়গা থেকে লুণ্ঠনচ্ছলে করে এই ঐশ্বর্যসম্ভার এনে নিজেদের প্রাসাদ ও হারেম সজ্জিত করেছিলেন। টিউনিসিয়া ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অধীনে আসবার সঙ্গে সঙ্গে শাসকবংশের প্রভাব অনেকখানি কমে গিয়েছে এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যসমেত প্রাসাদটী মিউজিয়মে পরিণত করা হয়েছে।

মিউজিয়মের বহিঃপ্রাঙ্গণেও অনেক ভগ্নস্তম্ভ ও মূর্তির হাত, পা ইত্যাদি জড় করা আছে। কিন্তু উত্তর আফ্রিকার মধ্যে রোমান মন্দির, প্রাসাদ ও চত্বরের ধ্বংসস্তূপ সকলের চেয়ে বেশী দেখা যাবে ডুগা ও থুগা বলে প্রাচীন রোমান উপনিবেশে।

ডুগাতে অনেক ধনবান ব্যক্তি রোমান সম্রাট্ আলেক-জাণ্ডার সেভারাসের সময় একটী মার্বেল পাথরের সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী পুরা-তত্ত্ববিদ্‌গণ এই মন্দিরের মধ্যভাগ মাটীর ভেতর থেকে খুঁড়ে দিনের আলোয় বার করেছেন। থুগাতেও এ-রকম কয়েকটী প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ আছে। প্রধানতঃ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে মন্দিরগুলি নির্মিত হয়।

মার্বেল ও ব্রোঞ্জের তৈরী অনেক রোমান দেব-দেবীর মূর্তি টিউনিসিয়ার নানা স্থানে দেখতে পাওয়া যায়।

ত্রিশ বছর পূর্বে একজন ডুবুরি মাল্‌দিয়ার নিকটবর্তী সমুদ্রে প্রবাল সংগ্রহের জন্য ডুব দিয়েছিল। অল্পক্ষণ পরেই সে জলের ওপরে ভেসে উঠলো সমুদ্রের তলা থেকে, ভয়ে তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে। জলের গভীর তলদেশের অন্ধকারে সে এক ভীষণ-দর্শন মূর্তি দেখতে পেয়ে ভয়ে উঠে এসেছে! তার সঙ্গীরা তার মুখে এ-বৃত্তান্ত শুনে কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে সেখানে ডুব দিলে। জলের তলায় তারা যা দেখলে তাতে তারা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল, নানা রকমের মূর্তি ও শিল্পদ্রব্য একত্রাকারে প্রবালের বনে জড় হয়ে আছে। পরে জানা যায়, রোমান সেনাপতি সল্লা এথেন্স্ নগরী লুঠ করে রোম নগরীতে যখন যাত্রা করেন, তখন মাল্‌দিয়ার নিকটবর্তী সমুদ্রে তাঁর জাহাজডুবি হয়ে সব শিল্পদ্রব্য জলের তলায় সমাধিপ্রাপ্ত হয়, ডুবুরিদের দৃষ্ট এই জিনিসগুলি আসলে প্রাচীন-যুগের রোম সেনাপতি দ্বারা লুণ্ঠিত সেই শিল্প-দ্রব্যসম্ভার।

বার্ডো মিউজিয়মে একটী ব্রোঞ্জ মূর্তি আছে, এটী প্রসিদ্ধ গ্রীক্ ভাস্কর প্রাক্সিটেলিস নির্মিত এরোস্ বা কন্দর্পদেবের মূর্তির নকল। প্রেম যে অন্ধ, তা বোঝাবার জন্য বোধ হয় প্রাক্সিটেলিস এই মূর্তির চক্ষু দুটীকে অঙ্কিতাবস্থায় রেখেছিলেন। আসল মূর্তিটীর বর্ণনা দিয়েছেন গ্রীক্ ঐতিহাসিক ক্যালিষ্ট্রেটাস, কিন্তু এই মূর্তিটী বহুদিন পূর্বে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বার্ডো মিউজিয়মের যে বিরাট হলঘরে সল্লার লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি জলতলে নিমজ্জিত হবার কুড়ি শতাব্দী পরে আবার দিনের আলো দেখছে, তারই একটী উচ্চস্থানে মার্বেল বেদীর ওপর এই প্রসিদ্ধ ও অমূল্য ভাস্কর্যটী স্থাপিত আছে।

বার্ডো মিউজিয়মের আরব শিল্পদ্রব্য প্রধানতঃ চিত্রবিচিত্র টালি, চামড়ার কাজ, প্লাষ্টারের খোদাই কাজ ও তামাদ্বাসের তৈজসপত্র। কিন্তু আরবদের শিল্পকে ভাল করে দেখতে হলে, মিউজিয়ম না দেখে বাইরের উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে মরুভূমির প্রান্তবর্তী পাহাড়ের ওপরকার গাছতলায় এসে দূরবর্তী শ্বেতবর্ণ টিউনিস্ শহরের দিকে চেয়ে বসে থাকতে হয়।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কার্থেজ টিউনিস্ শহর থেকে বেশী দূরে নয়। টিউনিস থেকে মোটর গাড়ীতে বা ইলেক্‌ট্রিক ট্রেণে কার্থেজ যাওয়া যায়।

ভিদো, হানিবল ও হামিলকারের নাম আগেই মনে আসে। এই সম্পর্কে লাটিন কবি ভার্জিলের নাম ও ফরাসী ঔপন্যাসিক ফ্লবেয়ারের নামও উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত দু'জন তাঁদের অমর লেখনীর সাহায্যে কার্থেজকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে গেছেন।

লেখকেরা এই ভাবেই দেশকে, স্থানকে বাঁচিয়ে রাখেন বটে!

কার্থেজ, অতীত যুগের গৌরবময়ী নগরীর শীর্ণ প্রেতাত্মা শক্তিমান লেখকের এ ঋণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে—যেখানে এখন কার্থেজের ইলেক্‌ট্রিক ট্রেণের ষ্টেশন, তার কাছে ডেজি ও জিরেনিয়ম ফুলের ক্ষেতের মধ্যে 'সালাম্‌বো'র অমর স্রষ্টার স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত।

তাঁর 'মাদাম বোভারি'র চেয়েও 'সালাম্‌বো' এ-দেশে বেশী পরিচিত।

আমি ১৯২৩ সালে যখন প্রথম কার্থেজ দেখতে এসেছিলাম, তখন এ-কথা আমার মনে না এসে পারে নি যে, ফ্লবেয়ার কার্থেজকে যে মহিমা দান করে গিয়েছেন তাঁর লেখনীর সাহায্যে, তা এখন কেউ দেখতে পাবে না। তা স্বপ্নলব্ধ সত্যদৃষ্টি।

ফ্লবেয়ারের কাজ তখন আরও কত কঠিন ছিল, কারণ তখন তিনি 'সালাম্‌বো' রচনা করেন, তখন পিয়ের ও লেপরের কার্থেজ নগরীর খননকার্য্য আরম্ভ হয় নি।

এখন মনে হয়, ফ্লবেয়ার লিখে ভালই করেছেন, অতীতের কুয়াশার মধ্য দিয়ে কার্থেজ যেখানেই ভাল।

বর্ত্তমানে কার্থেজ কতকগুলি মাটির ঘর আর খড়ের চালের সমষ্টি মাত্র। যেখানে এক সময় কার্থেজের দুর্গ, ধনীদের প্রাসাদ, মন্দির, সভাগৃহ ইত্যাদি ছিল, এখন সেখানে অতি দরিদ্র আরবীয় পল্লীবাসীদের তরিতরকারীর ক্ষেত ও কুটীরশ্রেণী বিদ্যমান। অথচ এক সময়ে সাত লক্ষ নাগরিকের বাসস্থান ছিল এই মরুময় প্রান্তর।

কার্থেজের বাস্তবেরটা অবশ্য ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি মাত্র, কিন্তু সেই নামে এখনও একটি ক্ষুদ্র গ্রাম কার্থেজের অদূরে অবস্থিত আছে।

ইলেক্‌ট্রিক ট্রেণের কণ্ডাক্টর কার্থেজের পথে যেতে যেতে যখন 'সালাম্‌বোতে নেমে যাও' বলে চীৎকার করে ওঠে, তখন এই ঐন্দ্রজালিক নাম শুনে হঠাৎ চমকে উঠতে হয়।

একটীমাত্র পুরানো শিল্পদ্রব্য এখনও কার্থেজের নাম এবং ফ্লবেয়ারের উপন্যাসের নায়িকার ছবি মনে এনে দেয়। পিউনিক যুগের একটী প্রস্তরের শবাধারের ওপর এক তরুণী উপাসিকার মূর্ত্তি খোদিত আছে। মূর্ত্তিটীর হাতে একটী ঘুঘু, লাবণ্যময়ী তনু সারা দেহে, কার্থেজের শ্মশানের মধ্যে এই সুন্দরী নারীমূর্ত্তিটী ভ্রমণকারীদের দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে আকৃষ্ট করে।

প্রাচীন দিনের প্রতিহিংসাপরায়ণ যোদ্ধার দল ভাল করেই তাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিল। কার্থেজের একখানাও পাথর তারা মাটীর ওপর দাঁড় করিয়ে রাখে নি। কিন্তু পাহাড়ের পাশের সমাধিগর্ভে লুকোনো এই তরুণী উপাসিকার মূর্ত্তিটী তাদের চোখ এড়িয়েছিল বলেই আমরা আজ পিউনিক শিল্পীদের রুচি ও শিল্প-প্রতিভার প্রতি সুবিচার করতে বাধ্য হই।

কার্থেজের প্রাচীন বন্দর বহুকাল পূর্ব্বে সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। পুনরায় আবার তা টিউনিসের ক্ষুদ্র উপসাগরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।

কার্থেজের চক্রাকৃতি পাথরের গ্যালারির উপর একটী সাদা ক্রুশ পোতা দেখে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলাম। কার্থেজ কোন কালেই খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে নি, তবে তার ধ্বংসস্তূপে ক্রুশচিহ্ন কিসের?

পরে জেনেছিলাম এইখানে কয়েকজন প্রথম যুগের খৃষ্টান প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল তাদের ধর্ম্মের জন্যে—এখন থেকে প্রায় বারশ' বছর আগে। কার্ডিন্যাল লাভাশোর সেই পবিত্র স্থানে ক্রুশটী স্থাপন করেছেন।

'কার্থেজকে নিশ্চয়ই ধ্বংস করতে হবে' এটা ছিল কথার কথা মাত্র। সিপিও কার্থেজকে আংশিক ভাবে ধ্বংস করেছিলেন বটে—কিন্তু সম্রাট অগষ্টাস ও সিজার এত ভুলবুদ্ধি ছিলেন না। এই দুই উদারহৃদয় শাসক কার্থেজ নগরীকে ভাল করে গড়ে তোলেন।

সম্রাট হাড্রিয়ান নগরীর জল-কষ্ট নিবারণ করবার জন্যে বিখ্যাত পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ করেন, হাড্রিয়ানের এই

পয়ঃপ্রণালীর ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমানে টিটনিসিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ও সুদৃশ্য প্রাচীনকালীন কীর্ত্তি।

রোমান পয়ঃপ্রণালী তখনকার কালে যেমন উঁচু স্তম্ভের ওপর খিলান করে তৈরী করা হোত—এটিও সে ভাবে তৈরী করা হয়েছে। মাইলের পর মাইল ধরে শস্যক্ষেত্র ও পশু-চারণ ভূমির ওপর দিয়ে এই সু-উচ্চ পয়ঃপ্রণালী জাওয়ান পর্ব্বতে চলে গিয়েছে। এই পর্ব্বত পূর্ব্বে যেমন কার্থেজকে জল সরবরাহ করতো, বর্ত্তমানে টিটনিসকেও তেমনি জল সরবরাহ করে।

কার্থেজের এই বিখ্যাত পয়ঃপ্রণালীর পথে কাইরওয়ান মসজিদ। সন্ধ্যার নিস্তব্ধ শান্তির মধ্যে এই বিশাল মসজিদ আমাদের মনে অভূতপূর্ব্ব ভাব এনে দিল।

এটী আরবীয়দের পাড়া।

পথে গরীব আরবীয়েরা এসে হাত পেতে দাঁড়ায়—মিঞার, একটা সিগারেট হবে? কাইরওয়ান মসজিদ এবং দক্ষিণ ওয়েলিসের মধ্যে বিস্তৃত সমতলভূমি। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট এই মরুভূমিকে উর্ব্বরা করেছেন বলে গর্ব্ব করতে পারেন। আজকাল এখানে বড় বড় জলপাই বাগান—সারবন্দী জল-পাই গাছ, আশি ফুট অন্তর অন্তর পোঁতা, প্রচুর জলপাই ফলে। প্রাচীন যুগে যেমন, এখনও তেমনি, জলপাইয়ের তেলের এ-দেশে খুব আদর। প্রাচীন রোমান পালোয়ানেরা জলপাইয়ের তেলে শরীর মর্দ্দন করত, রোমান সুন্দরীরা মাথায় ও গায়ে জলপাইয়ের তেল মাখতেন—জলপাইয়ের তেল প্রদীপে পোড়ানো হত। এখনও হয়। আমার সাংবাদিক বন্ধু গাউক্রেজো তাঁর গৃহে আমায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এক সময়ে তাঁর বাড়ীটা তুর্কী সানাগার ছিল। ঢুকবার ডেউড়িতে আমি একটা সেকেলে ব্রোঞ্জের প্রদীপ দেখেছিলাম, তাতে জলপাইয়ের তেল পোড়ানো হত।

আমার বন্ধু সামান্য দামে জনৈক কেরিওয়ালার কাছে একটী খরিদ করেন। তাঁর গৃহ আরজিস্ ওয়েলিসের প্রান্ত-ভাগে—শহর থেকে অনেক দূরে, সেখানে গ্যাস বা বিদ্যুতের সরবরাহ নেই, সুতরাং বন্ধুটী এই প্রদীপে প্রাচীন কালের মত জলপাই তেল পুরে জ্বালিয়ে থাকেন। মিউজিয়মে রক্ষিত মাটীর প্রদীপ দেখা যায়, বহু পুরানো আমলের প্রদীপ—সবগুলিতে জলপাইয়ের তেল ব্যবহৃত হত বলে তাদের গঠন থেকে অনুমিত হয়।

টিটনিস শহর থেকে কিছু দূরে সাউসি নামে আর একটা ছোট শহর আছে। এখানে অনেক প্রাচীন রোমান কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। এখানকার বালির মধ্যে একটী ক্ষুদ্র রত্ন পাওয়া যায়—তার গায়ে 'ইনিড্' রচনারত অবস্থায় ভার্জ্জিলের মূর্ত্তি খোদিত। এই ক্ষুদ্র মণিটী বার্ডো মিউ-জিয়মে সযত্নে রক্ষিত আছে।

বেদুইন আরবীর মেয়েরা অত্যন্ত লাজুক। ক্যামেরার তেপায়া খাটিয়ে কালো বনাতের তলায় মুখ ঢেকেছি কি অমনি তারা ঘরের মাটীর দেওয়ালের আড়ালে লুকিয়ে গিয়েছে। যখন বাধ্য হয়ে ভগ্নমনে ক্যামেরা তুলে চলে যাচ্ছি, হয়তো তখন পেছন ফিরে চেয়ে দেখি, বেদুইন তরুণীরা আড়াল থেকে বার হয়ে মুখে কাপড় দিয়ে হাসছে, আমাদের দুর্দ্দশা দেখে।

একদিন সম্মুখের মরুভূমির মধ্যে বেড়াতে গেলাম।

মরুভূমির মধ্যে দিয়ে আঁকা বাঁকা মাটমাটা পাহাড় অভিমুখে চলেছি। আকাশ থেকে কোন বৈমানিক মাটমাটা পাহাড় ও তার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি দেখে ভাবতে পারে, তারা চাঁদের দেশে এসে পড়েছে; জমি সেখানে এমন অসমতল ও অসংখ্য গর্ত্তে ভরা, জমির মুখে যেন বসন্তের দাগ হয়েছে। কিন্তু কাছে গেলে বোঝা যাবে, গর্ত্তগুলি আসলে মানুষের বাসস্থান।

মাটমাটা পাহাড়ের গায়ে এবং চারিপাশে লোকে প্রাচীন-যুগের গুহাবাসী মানবের মত মাটীতে চতুষ্কোণ গর্ত্ত কেটে তার মধ্যে পুরুষানুক্রমে বাস করছে। এদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজারের কম নয়।

এদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে অত্যন্ত কড়া পর্দ্দা, বাইরের লোক অনেক সময়ে গুহাবাসীদের দেশে বেড়াতে গিয়ে অপমানিত হয়ে এসেছে, কারণ তখনকার পুরুষেরা পছন্দ করে না যে, তাদের স্ত্রীলোকদের কেউ দেখে।

আরবীয়েরা যখন এ-দেশ আক্রমণ করেছিল বহুক শ' বছর পূর্ব্বে, তখন বার্ব্বার অধিবাসীরা তাদের স্ত্রী-পুত্র, ধনরত্ন নিয়ে মাটীর মধ্যে গর্ত্ত কেটে আশ্রয় নেয়। বার্ব্বারি অঞ্চলে প্রাচীন কাল থেকে এ-রকম প্রথা প্রচলিত আছে।

বহু শতাব্দী হল আরবদের ভয় কেটে গিয়েছে, কিন্তু বার্ব্বার যোদ্ধাদের বংশধরেরা এখনও গুহার মধ্যে বাস করছে। এখন তাদের শত্রু আরবীয়েরা নয়, আফ্রিকার প্রখর রৌদ্র

এবং বন্যা-মাছি। আমি এই সমস্ত গুহায় প্রবেশের সুযোগ লাভ করেছিলাম, তা থেকে জানি, মাঝে মাঝেও এই গুহা-গুলির ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা। সারাদিন এরা মাটমাটা পাহাড়ের পাশে ক্ষেতখামারে কাজ করে, প্রধানতঃ কৃষিকার্যই এদের উপজীবিকা।

আলিবাবার গল্পে বর্ণিত তেলের জালার মত বড় বড় ঘড়ে বুহুনি জালায় এদের শস্য রক্ষিত থাকে। গৃহপালিত ভেড় ও ছাগলের জন্যে মাটির মধ্যে খোঁয়াড় আছে—ছাগলের দুধ থেকে পনির ও ঘই তৈরী করে, মাংস খায়।

মেয়েরা ছোট ছোট মেটে উনুনে রান্না করে। অনেক-সময় গুহার উঠানটা খোলা জায়গায়, উঠানের মাথার ওপর আকাশ দেখা যায়, সেইখানেই উনুন বসানো। এ-দেশে বৃষ্টি এত কম যে, এ রকম ব্যবস্থায় কোনো অসুবিধাই হয় না।

আর একধরণের বাড়ী আছে তা মাটমাটার গুহা-বাসের ঠিক উল্টো, অর্থাৎ সেখানেও গুহা আছে বটে কিন্তু সে গুহা মাটির ভেতরে নয়, একটার পর একটা হিসাবে থাকে থাকে সজ্জিত। অর্থাৎ মাটির পাঁচতলা ছ'তলা বাড়ী।

মরুভূমির উপদ্রব থেকে ধনপ্রাণ বাঁচানোর জন্যে এরা এই রকম বাড়ীতে প্রাচীনকালে বাস করতো—এখন ফরাসী গবর্ণমেণ্টের শাসনে দস্যুভয় পূর্বাপেক্ষা অনেক কম, তবুও লোকে আজও তালার ওপর তালা তুলে জানালাবিহীন গুহাকৃতি মাটির ঘরে বাস করে। এদের ঘরে কড়ি-বরগা নেই, শুধুই কাদা দিয়ে গাঁথা আগা-গোড়া। মরুভূমির দেশে কাঠ অতি দুর্লভ ও দুর্মূল্য। এ-ধরণের বাড়ীকে এ-অঞ্চলে "ঘোরকা" বলে। তবে আজকাল লোহা ও সিমেণ্ট আমদানি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংক্রিটের "ঘোরকা"ও তৈরী হচ্ছে।

সাহারা মরুভূমির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আজকাল এরোপ্লেন ও মোটরগাড়ী যাতায়াত করে। মরু-প্রান্তের মধ্যে পূর্বে যেমন কূপ থাকতো, আজকাল সেখানে পেট্রোল ট্যাঙ্ক স্থাপিত।

একটী ক্ষুদ্র মরু-পল্লীর নাম জেরবা। অধিবাসীদের দেখে মনে হয়, এরাই টেনিসন বর্ণিত lotos-eaters এর দল। তবে এরা জীবনটাকে আরম্ভ করে অন্য ভাবে। দলে দলে বিদেশে যায় অর্থ উপার্জনের চেষ্টায়, যাদের প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হন, তারা কিছুকাল পরে ফিরে এসে ছোট সাদা-ডোমওয়ালা বাড়ী তৈরী করে, বাড়ীর সামনে একটা বা দুটো উট বেঁধে রাখে ( উট বাঁধা গৃহ-সজ্জার সামিল, এতে সচ্ছলতা প্রমাণিত হয় ), তার পর বাকি জীবনটুকু খেজুর ও ডুমুর গাছের ছায়ায় নিশ্চেষ্ট আলস্যে কাটিয়ে দেয়।

জেরবা গ্রামের কাছে তিন শ' বছর ধরে নরমুণ্ডের হাড়ের একটী স্তূপ অবস্থিত ছিল, এর আকার অনেকটা পিরামিডের মত ছিল বলে শুনেছি। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে আরব ও স্পেনীয়দের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। তখন ড্রাগুট নামধারী জনৈক বার্বারি সর্দার জেরবা দুর্গ দখল করে যোদ্ধাদের মেরে ফেলে এবং তাদের মুণ্ডে এই পিরামিডটী তৈরী করে।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট প্রায় এক শ' বছর আগে এটী ভেঙে ফেলে মুণ্ডগুলিকে খ্রীষ্টীয় ধর্মানুযায়ী সমাহিত করেন।

---

## প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান

...প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা বিকৃত হওয়ার ফলে বহুদিন হইতে ঋষি-প্রণীত গ্রন্থ অর্থাভাবে-ভাবশূন্য অযোগ্য অর্থে প্রচারিত হইতেছে। তাই, এখন আর ঐ সমস্ত গ্রন্থ হইতে 'ব্রহ্ম', "ঈশ্বর" প্রভৃতি শব্দের বাস্তবিক পক্ষে কি বুঝায়, কি কি উপায়ে তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ করা যায়, বাস্তবজীবনে তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিবার প্রয়োজনীয়তা কি, ইত্যাদি তত্ত্ব জানা যায় না। পরন্তু "ব্রহ্ম", "ঈশ্বর" প্রভৃতির কথা এখন কেবল কথার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঋষি-প্রণীত গ্রন্থ বিকৃত অর্থে প্রচারিত হইতেছে বলিয়া, কি কল্পিত সাধারণ সৃষ্টি হয়, পরমাণু হইতে অণুর উদ্ভব কি উপায়ে হইয়া থাকে, অণুগুলি বিশ্লিষ্ট না হইয়া কি উপায়ে পরস্পর সম্বন্ধ-বিশিষ্ট থাকে, ইত্যাদি তত্ত্ব এখন আর ঐ সমস্ত গ্রন্থে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এমন কি উহাদিগকে "চাষার গান", "অসভ্যের অসভ্যতার আদিম সৃষ্টি", "গৌরাণিক গল্প", "বিদ্যাবুদ্ধির ভাণ্ডার", "পাইকারী" এবম্বিধ আখ্যায় আখ্যাত করা হইতেছে।

কি উপায়ে পরমাণু হইতে অণুর উদ্ভব হয়, পরমাণু হইতে অণুর উদ্ভব হইবার পদ্ধতি কি, কেন পরমাণু এবং অণুসমূহ বিশ্লিষ্ট না হইয়া কি উপায়ে একত্র সম্মিলিত থাকে এবং জীবের চলাফেরা প্রভৃতি জীবন রক্ষা করিবার সহায় সাধন করে, এবম্বিধ তত্ত্ব বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণার বস্তু। কিন্তু এই তত্ত্বসমূহ বর্তমান প্রাচ্যের বিজ্ঞানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।...

# মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনে প্রধান কয়েকটি ঘটনা

—শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়

বাংলার শেষ স্বাধীন নৃপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে কেন্দ্র করিয়া যে কয়খানি গ্রন্থ এ পর্যন্ত রচিত হইয়াছে, তাহার প্রধান অংশ কল্পনায় অনুরঞ্জিত। অদ্যাবধি সঠিক ইতিহাস ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে আলোচিত ও প্রচারিত না হওয়ায় প্রতাপ-জীবনের কতিপয় প্রধান ঘটনা সম্পর্কে সাধারণের ভ্রান্ত ধারণা অধিকমাত্রায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে। যে বীর-কেশরীর শৌর্যমণ্ডিত পুণ্যগাথা বাংলার প্রতিটি ধূলিকণার সহিত নিবিড়তম ভাবে বিজড়িত, সংশ্লিষ্ট, যাঁহার কীর্তিগরিমায় বাংলা আজ গরবিণী, যাঁহার বীর্য-মহিমায় বাংলা আজ মহিমময়ী, সেই বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্যের উজ্জ্বলতম জীবনেতিহাস আজ পর্যন্ত কোন বঙ্গবাসী লেখক সঠিকভাবে গ্রথিত করিবার জন্য সচেষ্ট হন নাই। বাংলার গৌরব মহারাজ প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে আজও সকলে শোচনীয় ভাবে উদাসীন। এ উদাসীনতা প্রত্যেকটি বাঙ্গালীর পক্ষে গুরুপদের কলঙ্কের বিষয় সন্দেহ নাই। যাহা হউক, প্রতাপ-জীবনের যে কয়টি প্রধান ঘটনা সম্পর্কে সমগ্র দেশের ভ্রান্ত ধারণা আজিও বদ্ধমূল রহিয়াছে, তাহা নিরসন-মানসে বক্ষ্যমান প্রবন্ধে তাঁহার সংক্ষিপ্ত অথচ সঠিক ঐতিহ্য পরিবেশন করিলাম।

বংশকথা ; যশোহরের উৎপত্তি ;
মহারাজ প্রতাপাদিত্য

কোটরাজ সর্বাণী বিরাট গুহের দ্বাদশ পুরুষ অধস্তন শ্রেষ্ঠ কায়স্থ কুলীন রামচন্দ্র গুহ যশোর রাজবংশের আদি এবং মূলী। রামচন্দ্র গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের রাজত্বকালে করিদপুর জেলার চন্দনা গ্রাম হইতে উঠিয়া প্রথমে বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ, পরে সপ্তগ্রামের পাটমহলে আসিয়া বাস করেন এবং নবাব সরকারে কানুনগো পদে নিয়োজিত হন। ঐ সময় তিনি "নিয়োগী" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র গুহের তিন পুত্র—ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ। ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে ভবানন্দের শ্রীহরি এবং ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে গুণানন্দের জানকীবল্লভ নামে পুত্র জন্মে। ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সুলেমান কররাণী গৌড়ের মসনদে উপবিষ্ট হইলে ভবানন্দ-প্রমুখ ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভবানন্দ কিছুদিন পরে গৌড়েশ্বরের "মজুমদার" ও "মজুমদার" উপাধি প্রাপ্ত হন। সুলেমান কররাণীর বায়জিদ ও দায়ুদ নামক পুত্রদ্বয়ের সহিত শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রগাঢ় প্রণয় ছিল। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে দায়ুদ নবাব হইয়া শ্রীহরিকে "রাজা বিক্রমাদিত্য" এবং জানকীবল্লভকে "রাজা বসন্ত রায়" উপাধি সহ নাম প্রদান করিলে পূর্বপ্রতিশ্রুতি মত বিক্রমাদিত্যকে সর্বপ্রধান সচিব এবং বসন্ত রায়কে রাজস্ব বিভাগের প্রধান সচিব পদে নিযুক্ত করেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিশ্ববিশ্রুত বঙ্গবীর মহারাজা প্রতাপাদিত্য ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাংলার শেষ পাঠান নবাব দায়ুদ মোগল সংঘর্ষের সঙ্কট-ময় মুহূর্তে রাজা বিক্রমাদিত্য ও রাজা বসন্তরায়কে তাঁহার যাবতীয় বিত্তসম্পদ্ এবং দক্ষিণ বঙ্গের সুন্দরবন-সংলগ্ন "চাঁদ খাঁ চকের" সনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা ভ্রাতৃদ্বয় দায়ুদের শেষ সনির্বন্ধ অনুরোধ কোন মতে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া ধনসম্ভার ও সনন্দসহ চাঁদ খাঁর জাগীরে আসিয়া বন-জঙ্গল কাটাইয়া যশোর নগরের পত্তন করেন। পরে প্রতাপাদিত্যের সময়ে মহাপীঠ মাতা যশোরেশ্বরী দেবী আবির্ভূতা হইলে উক্ত দেবীর নামানুসারে যশোর নগর ক্রম-বর্দ্ধিতায়তনে বিশাল যশোর রাজ্যে পরিণত হয়। যশোর রাজ্য এত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল যে, তাহা অতিক্রম করিতে মাসাধিককাল ব্যয়িত হইত। বর্তমান প্রেসিডেন্সী বিভাগ তদানীন্তন যশোর রাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উড়িষ্যা, হিজলী জয় করার পর সমগ্র উড়িষ্যা এবং পরে বিষ্ণুপুর আরাকান্ প্রভৃতি প্রতাপের পদানত হয়। সমগ্র যশোর রাজ্যের রাজধানী ছিল ধুমঘাট। উহা অধুনাতন খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত ভামনগর

থানার এলেকায় অবস্থিত। এখন যে স্থানে যশোরেশ্বরী দেবী-পীঠ তাহাকে যশোরেশ্বরীপুর, বা সংক্ষেপতঃ যশোর বা ঈশ্বরীপুর বলিয়া থাকে। উহা রাজধানী ধুমঘাটেরই একাংশ ছিল—যেমন কলিকাতার ভিতর কালীঘাট।

অনেকেরই ধারণা আছে যে, প্রতাপাদিত্যের "যশোর" যশোহর জেলায়; কিন্তু আদৌ তাহা নহে। প্রতাপের "যশোর" যশোহর নহে।

অনেকে আরও জানেন যে, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে যশোর রাজ্যের এবং তাঁহার রাজধানী ধুমঘাটের অভ্যুদয়; কিন্তু তাহাও সত্য নয়। "ভবিষ্যপুরাণে" এই সম্বন্ধে পাইতেছি—

'অশোর দেশ বিষয়ে বসুনন্দা প্রদক্ষিণে।
ধুমঘট পত্তনে চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।'

এতদ্ব্যতীত "তন্ত্রচূড়ামণি" শাস্ত্রে আরও পাওয়া যাইতেছে যে,—

"যশোরে পাশিনামক দেবতা যশোরেশ্বরী।
চতুষ্ক ভৈরবস্তত্র বর নিদ্ধিদাতৃ নাং।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যশোরের এবং রাজধানী ধুমঘাটের অস্তিত্ব যুগযুগ হইতে রহিয়াছে। মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাহা সৃষ্টি করেন নাই, পুনঃপ্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন মাত্র।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সময়ে রাজা বিক্রমাদিত্য ও রাজা বসন্ত রায়ের আমলের প্রাচীন যশোর নগর যে স্থানে ছিল, তাহার উত্তরাংশের নাম কালক্রমে বসন্ত রায়ের নামানুযায়ী বসন্তপুর হয়। যে স্থানে দুর্গ ও মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাকে এখন গড়মুকুন্দপুর বা শুধু মুকুন্দপুর বলে।

প্রতাপের রাজত্ব খ্রীষ্টীয় ১৫৮৩ হইতে আরম্ভ। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (১৫০৮ শকাব্দ, ২১শে বৈশাখী-পূর্ণিমা) তাঁহার প্রথম রাজ্যাভিষেক হয়। ঐ একই বৎসরে মহাপীঠ-দেবী যশোরেশ্বরী আবিষ্কৃতা হন এবং তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহ ও কুমার উদয়াদিত্যের জন্ম হয়। উক্ত দিবস আজিও যশোর রাজবংশীয়দের নিকট প্রতিপালিত হইতেছে। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রতাপের দ্বিতীয় অভিষেক, স্বাধীনতা ঘোষণা ও বিরাট বজ্রতক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা ঘোষণার পর স্বীয় নামে মুদ্রা (coin) প্রচলন করিয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রা ছিল ত্রিকোণাকার। মুদ্রার সম্মুখ ভাগে সংস্কৃত ভাষায় লেখা ছিল—"শ্রীশ্রীকালী প্রসাদেন তবতি শ্রীমন্মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায়স্য", এবং পশ্চাদ্ভাগে ফারসী ভাষায় ছিল—"বজৎ দিকা বহিমো জরবে বাদাহ্ মহারাজা প্রতাপাদিত্য অর্দাল।" সে মুদ্রা আমার মাতৃষসুপতি, আমার জ্যেষ্ঠতাত এবং আমার আপনবংশীয় নিকট জ্ঞাতি সম্পর্কীয় পিতামহ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। আমার উক্ত জ্যেষ্ঠতাতের স্বলিখিত নোট-বইয়ে প্রতাপাদিত্য-প্রসঙ্গে তাহাই পাইয়াছি। তাহা ছাড়া উক্ত জ্ঞাতি সম্পর্কীয় পিতামহ স্বর্গীয় রাজা নগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় তাঁহার স্বলিখিত "প্রতাপাদিত্য" নামক ইংরাজী গ্রন্থের এক স্থানে উহার উল্লেখ করিয়াছেন।*

অধিকন্তু আমি তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছিও। তাঁহাদের এই প্রত্যক্ষ দেখা প্রামাণ্য কথা ও লেখাকে তৃতীয় কোন ব্যক্তির কথা বা লেখা কথার মত কিছুতেই উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত প্রতাপাদিত্য রাজকীয় পত্রাদিতে ব্যবহারের জন্য ডিম্বাকার মৃন্ময় মুদ্রার (termcotta) প্রচার করেন। তাহার এক পৃষ্ঠে লেখা ছিল—"সং ১৩ মাঘ দিনে ৩ শুভম্ভ প্রতাপাদিত্য"। এই মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে এবং বঙ্গীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে তাহা রক্ষিত হইতেছে।

## চ্যাণ্ডিকান্

কেন্সুইট্ পাদরিগণ মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে "The last king of Sagar Island" বা "চ্যাণ্ডিকানাধিপতি" বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। অনেকে এই কথায় বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন এবং পড়িয়াছেনও। হুগলী নদীর পূর্ব্বাংশে অর্থাৎ যশোর রাজ্যের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশের নামই চ্যাণ্ডিকান (Chandican)। চাঁদখান্ অথবা চান্দখান শব্দের অপভ্রংশ হইতেই চ্যাণ্ডিকান্ শব্দের উৎপত্তি, এবং তাহাই ব্যবহৃত হইয়া এ তর্কের জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে।

* "Pratapaditya gradually became the undisputed Monarch of Bengal and declared himself independent of Delhi. He struck coins in his own name, some of the coins were seen by the author in his early age."

সাগর দ্বীপ, ধূমঘাট সকল কিছুই চাতিকানের এবং সমগ্র চাতিকান্ যশোর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।*

### সুবেদার আজিম খাঁর সহিত সংঘর্ষ

রাজ্য গঠন সম্পর্কিত কার্য্যে মহাসচিব শঙ্কর চক্রবর্ত্তী বর্দ্ধমান ও রাজমহল প্রভৃতি অঞ্চলে মহারাজ প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। তখন আজিম খাঁ বাংলার সুবেদার এবং শের আফগান ( নূরজাহানের পূর্ব্ব স্বামী ) তদধীনে বর্দ্ধমানের জায়গীরদার। শঙ্কর রাজনৈতিক ষড়্‌যন্ত্রের অভিযোগে শের আফগান কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দী হইলে প্রতাপাদিত্য কৌশলে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া আনেন। ফলে, অধুনাতন বসিরহাটের সন্নিকট যমুনা-ইছামতীর উত্তর তীরে ( অধুনা সংগ্রামপুর নামে অভিহিত) শের আফগানের সহিত প্রতাপের এক সংঘর্ষ হয়। শের আফগান পরাকৃত হইয়া পলায়ন করেন এবং সুবেদার আজিম খাঁর শরণ লন।†

আজিম খাঁ প্রথমে সেনাপতি শেখ ইব্রাহিমকে পাঠান।‡ তিনিও মাতলার যুদ্ধে পরাজিত হইলে বাধ্য হইয়া আজিম খাঁকে অভিযান করিতে হইয়াছিল।§

প্রাচীন ঘটককারিকায়ও পাইতেছি—

> শ্রেষরায়ণে সেনানী আজিমখান সংজ্ঞকঃ।
> প্রতাপাদিত্য ভূপালো যবনারি র্দর্পহৃৎ।
> আজিমাগমনং শ্রুত্বা শ্রুত্বাপি স কৃপান্বয়ঃ।
> ওষধাৎ সিংহনাদেন খগেন্দ্রঃ পন্নগৈরিব।
> সর্ব্বসৈন্যে সমাযুর্যৌ আজিমো হি বিতো যথা।

চাঁচড়া রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ ভবেশ্বর রায় এই যুদ্ধে তাঁহাকে গুপ্ত সন্ধানাদি দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করেন। শেষে উভয়-পক্ষে সন্ধি সংস্থাপিত হয়। উক্ত ভবেশ্বর রায়ের সহোদর ভ্রাতা রত্নেশ্বর রায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অন্যতম শরীর-রক্ষী ছিলেন।

### শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব বিগ্রহ ও উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ

খ্রীষ্টীয় ১৫৯১ অব্দে বাংলা ও বিহারের সামন্তরাজগণের সহায়তায় মানসিংহ বিদ্রোহী পাঠান দমনার্থে উড়িষ্যায় যান। ঐ সময়ে প্রতাপও তাঁহাকে সাহায্য করেন ( ১৫৯২ )। মোগল পক্ষের জয়লাভ ঘটে। প্রতাপ উৎকলে পুরীধামে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য পরাক্রমশালী হিন্দু রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া পিতৃদেব শ্রীশ্রীমন্মহারাজ বসন্ত রায়ের অভীপ্সিত সুবিখ্যাত শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব ও শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী ( রাধিকা ) বিগ্রহ এবং উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ লইয়া আসেন ( ১৫৯৩ অব্দের প্রথম ভাগ )। মহারাজ বসন্ত রায় কর্ত্তৃক রাজধানী ধূমঘাটের তিন মাইল উত্তরে যমুনা-ইছামতীর পশ্চিম তীরে এক স্থানের নাম "গোপালপুর" রাখিয়া এক মনোজ্ঞ মন্দির তথায় নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক উক্ত বিগ্রহদ্বয় এবং কপোতাক্ষী নদীতীরে এক স্থানের "বেদকাশী" নাম-করণ করিয়া উক্ত শিবলিঙ্গ সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।*

উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গের কোন অস্তিত্ব বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু বেদকাশীর বিপুল ধ্বংসাবশেষ বিস্ময়কর ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একখানি গোলাকার প্রস্তর-ফলকে একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। তাহাতে উৎকীর্ণ আছে—

> "বিশ্বেশে বিশ্বকর্ম্মা সৎ পঞ্চবক্ত্রানি প্রতিষ্ঠিতম্।
> উৎকলেশ্বরসংজ্ঞঞ্চ শিবলিঙ্গমনুত্তমম্
> প্রতাপাদিত্য ভূপেনানীতমুৎকলদেশতঃ
> অত্র বসন্তরায়েন স্থাপিতং বেদিতঞ্চ তৎ।"

---

* মনোনিবেশ সহকারে Pierre Du Jarric's "Histoire des Indes Orientales"; Beveridge's History; ১৯২০ সালের Calcutta Review-তে প্রকাশিত P. Leo Faulkner's "Where Pratapaditya Reigned" নামক প্রবন্ধ এবং স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মিত্রের History of Jessore-Khulna, p. II, আলোচনা করিলে এই সম্পর্কিত সকল তর্কের মীমাংসা হইবে।

†স্বর্গীয় সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'মহারাজ প্রতাপাদিত্য' এবং সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোহর খুলনার ইতিহাস', ২য় খণ্ড।

‡ Proceedings of the Asiatic Society of Bengal ( 1868 )-তে পাওয়া যায়—"The first general sent was Abram Khan whose army was nearly annihilated near the fort Mutlar ( Mutlah, now Port Canning )"

§ মহীয় স্বর্গীয় কোষ্টভাতের সহস্তলিখিত নোট বইয়ের প্রতাপাদিত্য-প্রসঙ্গ; সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'মহারাজ প্রতাপাদিত্য' এবং সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস', ২য় খণ্ড

* Ancient Monuments of Bengal এ আছে—"It is one of the four temples * * for the idol Govinda Dev. The idol * * was brought by him (Pratapaditya) from Puri."

গোপালপুরের উক্ত গোবিন্দ-মন্দির বিরাট ধ্বংসক্ষেত্রের মধ্যে অদ্ভুত অবস্থায় দাঁড়াইয়া আজিও ভারতীয় ভাস্কর্য্যের এবং কারু-শিল্পের উজ্জ্বলতম গরিমা প্রচার করিতেছে। শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব জীউ ও শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী দেবী বিগ্রহ বর্ত্তমানে যশোর রাজবংশীয়দের নিকট রক্ষিত ও নিত্য পূজিত হইতেছেন। প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোলোৎসব ক্রিয়া সমারোহে সম্পাদিত হইয়া থাকে।*

## শ্রীশ্রীমন্মহারাজ বসন্ত রায়

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে ভ্রাতৃবর মহারাজ বসন্ত রায়ই ছিলেন সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি। কিন্তু প্রতাপ পিতৃব্যের প্রতি বিবিধ পারিপার্শ্বিক ও সংসারিক কারণে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। পরম স্নেহশীল মহাপ্রাণ পিতৃব্যের অন্তর তিনি কোন দিন বুঝিয়া দেখিবার সুযোগ পান নাই। উজ্জ্বল রাজচরিত্রের এত বড় মারাত্মক ভ্রম অন্যত্র পরিলক্ষিত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। এই ভ্রমই শেষে বীভৎস আকার ধারণ করিয়া এক দারুণ বিষময় ফল প্রসব করিয়াছিল।

প্রতাপের যশোর রাজ্যের আপন দশ আনা অংশের চকশ্রী নামক একটি স্থানে পিতৃব্যের আপন ছয় আনা অংশের মধ্যে পড়িয়াছিল। কিন্তু চকশ্রীর উপর মহারাজ বসন্ত রায়ের প্রকৃত পক্ষে কোনও হাত ছিল না। কারণ, জ্যেষ্ঠ মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাহা তাঁহার (মহারাজ বসন্ত রায়ের) শ্বশুরকে যৌতুক দিয়াছিলেন। চকশ্রীর গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি-হেতু দুর্গ নির্ম্মাণাভিপ্রায়ে প্রতাপ অন্য স্থানের বিনিময়ে তাহা পিতৃব্যের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভাল্লকবর্গের অসম্মতি-হেতু তাহা প্রদান করিবার কোনরূপ পন্থা না পাইয়া অনন্যোপায় হইয়া প্রতাপের নিকট মহারাজ বসন্ত রায় নিজ অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন, এবং পরিবর্ত্তে স্বীয় অংশের অন্য স্থান অর্পণ করিতে সানন্দে ও সাগ্রহে স্বীকৃত হন। কিন্তু প্রতাপ প্রকৃত বিষয় অবগত না পারায়, তাঁহার (প্রতাপের) পূর্ব্বলক্ষিত অসন্তুষ্টি ও পরবর্ত্তী কারণ-সঞ্জাত সন্দেহ ও বিদ্বেষ ভাব ক্রমশঃ প্রতিহিংসায় পরিণত হইয়া উঠে। পিতৃব্যের তখন রায়গড়ে (কলিকাতার দক্ষিণে বর্ত্তমান সরশুনা গ্রামের উত্তরাংশে) অবস্থান করিতেছিলেন। অতঃপর একদা পিতৃব্যের মৃগান্ত পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে প্রতাপাদিত্য নিমন্ত্রিত হন। পিতৃব্যের ষড়যন্ত্র থাকিতে পারে অনুমান করিয়া প্রতাপ সসৈন্য হইয়া রায়গড়ে গমন করেন। তথায় তিনি পিতৃব্যের সহিত সাক্ষাৎকার মানসে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ-কালে কূটচক্রী গুহ এবং জ্ঞাতিশত্রু গোবিন্দ রায় (মহারাজ বসন্ত রায়ের তৃতীয় পুত্র) তাঁহাকে আক্রমণ করেন। ফলে গোবিন্দ প্রতাপের হস্তে নিহত হন। ঠিক তৎকালেই মহারাজ বসন্ত রায় শ্রাদ্ধ-কার্য্যের জন্য অনুচরকে গঙ্গাজল (গঙ্গোদক) আনিতে আদেশ দিয়াছিলেন। পিতৃব্যের আদেশ কর্ণগোচর হইলে প্রতাপ উত্তেজনার অধিকতর ভুল বুঝিয়া বসেন। অনুচরও প্রভুর আদেশের অর্থ (পুরীর বীভৎস পরিস্থিতির মধ্যে) সম্যক্ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার (মহারাজ বসন্ত রায়ের) "গঙ্গাজল" নামক প্রসিদ্ধ তরবারি আনয়ন করিয়া বসে। পিতৃব্যের সমীপবর্ত্তী হইবার প্রাক্কালে প্রতাপ অনুচরের হস্তে অস্ত্র দর্শন করিয়া ক্রোধে দিক্‌বিদিক্ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্য হইয়া মুহূর্ত্তে নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, আজীবন ধর্ম্ম ও স্নেহপরায়ণ পিতৃব্যদেবকে হত্যা করেন (১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই চৈত্র, শুক্লা-ত্রয়োদশী)। এই শোকবিষম আজিও যশোররাজবংশীয়দের নিকট নিয়মিতভাবে উদ্‌যাপিত হইয়া আসিতেছে।

## বাংলার সর্ব্বপ্রথম গীর্জ্জা—যশোর-ধুমঘাট

হুগলী অবস্থান কালে জেসুইট্ পাদরী ফ্রান্সিস্কো ফার্ণাণ্ডেজ্ (Francisco Fernandez), মেল্‌কিওর দা ফন্‌সেকা (Melchior da Fonseca) ও ডোমিংগো দে সুজা (Domingo de Souza) মহারাজ প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ধুমঘাটে আগমন করেন। ঐ বৎসরেই মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা ধুমঘাটে একটি গীর্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। ফাদার ফন্‌সেকা লিখিয়া গিয়াছেন,—"...বঙ্গদেশে জেসুইটদিগের

* "Once a year, at the time of Dol festival in February it (Idol Govinda Dev) is taken to village Nurnagar, which contains the residence of some descendants of Pratapaditya, (the Hindu Hero of the Sundarbans) who hold a high position among the Bhugaja Kayasthas of Bengal"—Bengal Gazetteer, Khulna, 1910

সর্ব্বপ্রথম গীর্জ্জা যশোর-ধুমঘাটে প্রস্তুত হয় এবং তাহাকে যীশুর গীর্জ্জা নাম দেওয়া হয়।...আমরা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নিকট যেরূপ আতিথেয়তা, সহানুভূতি ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তেমন আর কোথাও পাই নাই।..."*

## জামাতা রাজা রামচন্দ্র এবং বিন্দুমতী

চন্দ্রদ্বীপের কিশোর রাজা রামচন্দ্রের [ বারভুঞার অন্যতম রাজা, কন্দর্পনারায়ণ ( বসু ) রায়ের পুত্র ] সহিত মহারাজ প্রতাপাদিত্য আপন কনিষ্ঠা কন্যা বিন্দুমতীর ( পূর্ব্ব-নাম বিমলা ; মহারাজ বসন্ত রায়ের এক মহিষীর নামও বিমলা ছিল, সেই কারণে শেষে প্রতাপ-নন্দিনীর নাম বিমলার স্থলে বিন্দুমতী হয় ) বিবাহ দেন (১৬০০)। বিবাহ-দিবসে নবরত্নখচিতকে যৌতুকস্বরূপ প্রদান কালে প্রতাপাদিত্য জামাতার সম্মুখে মোগল-অধীনতার নিদর্শন তারকাঙ্ক-অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত রাজছত্রের সমর্থন করিয়া ঘৃণাপূর্ণ ঘৃণায় ও ক্রোধে নানা কটূক্তি করেন এবং তৎক্ষণাৎ মোগলানুগত্যের হীন নিদর্শনকে ধূলিতলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দেন। কিন্তু রামচন্দ্র মাতৃ-আজ্ঞা পালন-হেতু শ্বশুরের পরবর্ত্তী আজ্ঞা পালনের অক্ষমতা জ্ঞাপন করায় মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে একদা বিন্দুমতী প্রতাপাদিত্য-কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী মাধবপাশার নিকটবর্ত্তী সারদী নামক স্থানের নদীর ঘাটে "মহলগিরি" তরণীতে ( ইহা মযূরপঙ্খী বজরা অপেক্ষা বৃহৎ এবং সুন্দর এবং ইহাতে রাণী বা রাজবংশীয়া বিশিষ্টা মহিলারা আরোহণ করিতেন ) অপেক্ষা করিতে থাকেন। বাকলার রাজবধূঠাকুরাণী দর্শনের নিমিত্ত তদঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ কাতারে কাতারে তথায় সমবেত হয়। তখন এবংবিধ জনতা হইয়াছিল যে, রীতিমত ঘাট-বাজার বসিয়া গিয়াছিল। সেই হইতে সেই স্থানের নাম হয় "বৌ-ঠাকুরাণীর ঘাট"। এই বৌঠাকুরাণীর ঘাট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কাহিনী সত্য নহে।†

রামচন্দ্র সংবাদ পাইয়া সে সময় বিন্দুমতীকে লইয়া যাইবার কোন ব্যবস্থা না করায় রাজমাতা ( রামচন্দ্রের মাতা ) স্বয়ং আসিয়া বধূরাণীকে মহাসমারোহে লইয়া গিয়াছিলেন ( ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ )।*

কয়েকদিন পরে রামচন্দ্রও পত্নীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।†

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জামাতৃ-পরিত্যাগ সম্পর্কে যে অপর একটি সরস গল্প প্রচলিত আছে, তাহারও কোন ভিত্তি নাই। তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

## কার্ভালহো হত্যা

পর্ত্তুগীজ সর্দ্দার ডোমিংগস্ কার্ভালহো ( Domingos Carvalho ) শ্রীপুরের ( ঢাকা ) রাজা কেদার রায় ( বারভুঞার অন্যতম ) কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া কেদার রায়ের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া হুগলীতে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় যশোরাধিপ প্রতাপাদিত্যের নিকট হইতে তিনি এক আহ্বান পান। প্রতাপের আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তিনি অবিলম্বে ধূমঘাট যাত্রা করেন। পূর্ব্বে সন্দ্বীপে কার্ভালহোর আধিপত্যকালে যশোরের বণিক্‌সম্প্রদায়ের কয়েকখানি বাণিজ্যপোত লুণ্ঠিত হইয়াছিল। সে কারণে কার্ভালহোর উপর বণিক্-সমাজের বিশেষ আক্রোশ ছিল। তাহার উপর কার্ভালহোর এই ধূমঘাট গমনে উপযুক্ত সুযোগ মিলিয়া যায়। প্রতিশোধ-বাসনায় তাহারা পথিমধ্যে

---

* Peirre Du Jarric's "Histoire des Indes Orientales"

† Beveridge সাহেব তাঁহার History of Bakharganj-এ লিখিয়াছেন—"Afterwards Pratapaditya relented and sent his daughter to Ramchandra ; and the place where she landed, near Madhabpasha, is still called Badhumata Hat or the Bride's Market, as a market was established there in her honour"

* স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস', ২য় খণ্ড, ১০৫ পৃষ্ঠায় আছে—"ঝাড়াপাড়া কারিকা ( আশুতোষবংশ ) পূর্ব্ববঙ্গীয় প্রাচীনিক ও অতি পুরাতন কারিকা। এই কারিকা হইতে দেখিতে পাইতেছি—প্রতাপের এক কন্যার সহিত বাকলার অধিপতি রাজা রামচন্দ্রের বিবাহ হয়। সে কন্যার নাম বিন্দুমতী। * * তিনি রামচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়াছিলেন, এ উক্তি মিথ্যা।"

† যোগিনীকুমার রায় চৌধুরীর 'বাকলা'।

কার্ভালহোকে আক্রমণ এবং নিহত করে। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নিকট এই নিদারুণ দুঃসংবাদ পৌঁছিলে, তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হইয়া বিশেষ অনুসন্ধানদ্বারা প্রকৃত হত্যাকারীগণকে বাহির করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য কার্ভালহোকে হত্যা করেন নাই। কার্ভালহোর হত্যা-ব্যাপারে জেসুইট্ পাদরিরা এবং স্বয়ং বেভারিজ্ সাহেব মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে জড়িত করিয়া তাঁহার চরিত্রের উপর এক কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; তাহা সর্ব্বাংশে মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে।*

## বাইশ ওমরাহের পতন ও মানসিংহের সহিত যুদ্ধ

সপ্তদশ শতকের প্রথমে বাংলা দেশে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের মত প্রকৃত গৌরবশালী ও পরাক্রমশালী স্বাধীন নরপতি কেহই ছিলেন না। বাংলার সুবেদার ইস্‌লাম খাঁর শাসনকালে (১৬০৮ হইতে) আব্দুল লতীফ নামক একব্যক্তি বঙ্গে আগমন করেন। তাঁহারই বিখ্যাত ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে উহা স্পষ্টতঃ জানিতে পারা যায়, দিকে-দিকে যখন প্রতাপের এমন শৌর্য্য-বীর্য্য ও যশঃখ্যাতি পরিব্যাপ্ত, তখন তাহার প্রতিপক্ষ হইল গৃহশত্রু রাঘবরায় রায় (ইনি মহারাজ বসন্ত রায়ের নবম পুত্র এবং কচু রায় নামে খ্যাত) এবং বাসুদেব রায়ের (মহারাজ বসন্ত রায়ের ভ্রাতা) জামাতা রূপরাম বসু। মহারাজ বসন্ত রায়ের হত্যার পর তাঁহারা হিজলীপতি ঈশাখাঁর (বাইশ ভূঞার অন্যতম) নিকট আশ্রয় লন। পরিশেষে প্রতাপ কর্ত্তৃক ঈশা খাঁ পরাজিত ও নিহত এবং হিজলি (উড়িষ্যা) প্রতাপের করায়ত্ত হইলে উভয়েই আগরা গমন করেন।†

আকবর তাঁহাদের নিকট সাদরে প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতা ও মোগলের বিরুদ্ধতার কাহিনী অবগত হইয়া অবিলম্বে বাইশ ওমরাহের অধীনে বিরাট সৈন্যশক্তি প্রেরণ করেন। প্রতাপের বিখ্যাত ঐরোণ যুদ্ধ দুর্গের নিকট লক্ষরনগরে (বর্ত্তমানে হাসনাবাদ বলিয়া কথিত) কয়েকদিন ভীষণ যুদ্ধের পর মোগলেরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয় এবং বাইশ ওমরাহ নিহত হন।‡

আকবর এবম্বিধ মানিকর অবমাননার প্রতিশোধ বাসনায় পুনরায় ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে মানসিংহকে বিপুল বাহিনী সহযোগে যশোর অভিযানে পাঠান। পথে বর্ত্তমান কৃষ্ণনগর রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের সহিত যোগ দেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক বহু গোপন রাজনৈতিক ও সামরিক সংবাদ অবগত করাইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ভবানন্দ মজুমদারের পূর্ব্বনাম দুর্গাদাস সমাদ্দার। তিনি বাল্যকালে ধূমঘাটে আসেন এবং রাজান্তঃপুরে দেব-সেবার পুষ্প-চয়ন কার্য্যে ব্রতী হন।‡

---

* ডক্টর যদুনাথ সরকারের লেখার একাংশ উদ্ধৃত করিয়া লেখাইতেছি—"In the history of Du Jarric written on the outlines of the Jesuit Missionaries, it has been described that the Raja of Chandican (Jessore) assassinated through treachery, the Ferringhee (Portuguese) naval Commander Domingos Carvalho; Mr. Beveridge in his book "Bakherganj" says, that this man was King Pratapaditya. But Page 168-B of the manuscript of Baharistan-i-Ghaibi clearly proves that the imputation is false.....There is a Persian manuscript in London, a second copy of which is not to be found in the whole world. It bears the title Baharistan i-Ghaibi. ...I have secured a rotograph of the book page after page."

† আমার স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠতাতের হস্তলিখিত প্রাচীন নোট বইয়ের প্রতাপপ্রসঙ্গে পাইতেছি—"They (Raghaba and Rup Basu) fled to Hijli where they lived for about two years under the care of Isha Khan. The latter was killed in a battle with Pratapaditya in 1596 when they fled to Agra." [ স্বর্গীয় সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'মহারাজ প্রতাপাদিত্য' ও সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

‡ Ancient Monuments of Bengal-এ আছে—".....Raja Pratapaditya of Jessore having declared himself independent of the authorities of the Empire of Delhi, the Emperor Jahangir (?) successively sent twenty-two Omraos with large armies to subdue him, but Pratapaditya defeated them all in battle." এই সম্পর্কে 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্' ও 'ঘটক কারিকা'ও দ্রষ্টব্য।

‡ স্বর্গীয় সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'মহারাজ প্রতাপাদিত্য' ও সতীশ বাবুর 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস', ২য় খণ্ড)। পুনশ্চ—"For a time Pratapaditya defied the great Akbar, and the conquest of his kingdom was ultimately effected by Raja Mansing, chiefly

ক্রমে তিনি রাজপরিবারের প্রিয়পাত্র হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ মহারাণী শংকুমারী (দ্বিতীয়া মহিষীর নাম মহারাণী বিদ্যাধরী) তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সেই সময়ে মহারাণীর নিকট হইতে তিনি পুরস্কার স্বরূপ দেবনগর ও হুবলী নামক দুইখানি গ্রাম (ফুয়নগর হইতে কয়েক মাইল দূরে) বৃত্তি লাভ করেন। বংশানুক্রমে বহুদিন পর্য্যন্ত উহা ভোগ করিয়াছিলেন। উক্ত বৃত্তি "রাণীয়ান্ বৃত্তি" বলিয়া আজিও সর্ব্বত্র কথিত ও সরকারী কাগজ-পত্রে লিখিত হইতেছে।*

মানসিংহ যে পথ দিয়া যশোরে আসিয়াছিলেন, আজও তাহাকে "বাদশাহী সড়ক" বলে।†

সে চিহ্ন বহু বহু স্থানে আজও বিদ্যমান। মুকুন্দপুর দুর্গের (প্রাচীন যশোর দুর্গের) সন্নিকটে তিন দিন উভয় পক্ষের জীবণতম সংগ্রাম হয় (১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে)। প্রতাপের বীরত্বে মানসিংহ বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। অবশেষে অবস্থা বুঝিয়া প্রতাপ সন্ধি করেন।‡

উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইলে মানসিংহ রাজা কেদার রায়কে দমন করিবার নিমিত্ত শ্রীপুর (ঢাকা) অভিযান করেন।

## দুই-একত্র মহাপীঠ-মাতা যশোরেশ্বরী দেবী

রাজা কেদার রায় পরাজিত হইলে মানসিংহ কেদার রায়ের কুলদেবতা "শীলাদেবী" (অষ্টভুজা দুর্গা-প্রতিমা—ক্ষুদ্রমূর্ত্তি) অম্বরপুর রাজ্যের রাজধানী অম্বরনগরে লইয়া গিয়াছিলেন। মানসিংহের যশোরেশ্বরী লইয়া যাইবার কাহিনী বিন্দুমাত্র সত্য নহে।•

ভারতের একান্ন মহাপীঠের দুই-একত্র মহাপীঠ-দেবী, মহারাজ প্রতাপের উপাস্য-দেবতা যশোরেশ্বরী কালিকা মূর্ত্তি এবং অম্বরে মানসিংহের প্রতিষ্ঠিতা দেবী অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী দুর্গামূর্ত্তি। অম্বরপুর অঞ্চলে সে দেবী-মূর্ত্তি সন্নাদেবী বা সীলা-দেবী নামে অভিহিতা ও পরিচিতা। যশোরেশ্বরী পুরে যে দেবীপ্রতিমা আজিও নিত্য পূজিতা হইতেছেন, তিনি প্রামাণিক এবং প্রাচীনতম দুই-একত্র মহাপীঠ মূর্ত্তি যশোরেশ্বরী দেবী।

## প্রতাপাদিত্যের পরিণাম

বাংলার সুবেদার ইস্‌লাম খাঁর সময় (১৬০৮ হইতে—তখন জাহাঙ্গীর 'দিল্লীর বাদশাহ') মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পতন হয়। ভাটির জমিদারদিগের দমনে মহারাজ প্রতাপাদিত্য সুবেদারকে সময়মত সাহায্য না করায় সুবেদার ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সেনাপতি ইনায়েৎ খাঁ (খিয়াস্ খাঁ) ও মির্জ্জা নথনকে যশোর-বিজয়ে পাঠান। তাঁহারা প্রতাপের শালখা দুর্গে (যমুনা-ইছামতীর সঙ্গমে) মুসলমান ঈশ্বরাদিত্য কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইলেও তাঁহাদের জয়লাভ ঘটে। তখন মোগল সেনানীদ্বয় অগ্রসর হইয়া বঙ্গীয় সেনাসহ মৌতলা

through the treachery of Bhabananda Mazumdar, who had been in the service of Pratapaditya, as a pet Brahmin boy."—Dr. Jogendra Nath Vidyabhusan's "Hindu Castes and Sects."

• স্বর্গত যশোর রাজবংশীয় রাজা নগেন্দ্রনাথ রায় তদীয় ইংরাজী "প্রতাপাদিত্য" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"Bhowananda Mazumdar gained the sobriquet of 'Raneeyan' from the Ranee of Jessore, known as Raneeyan Brittee. The property was enjoyed for a long time by the Rajas of Krishnanagar from Bhowananda downwards." স্বর্গত সতীশচন্দ্র রায়ের "বঙ্গীয়-সমাজ" গ্রন্থ, ১৫১ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য।

† Hunter's Statistical Accounts, Vol. XI, p. 143

‡ "বঙ্গেশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্য" নামক হস্তলিখিত গ্রন্থ—(যশোর রাজবংশের); রামরাম বসুর "প্রতাপাদিত্য চরিত্র", ১ম সংস্করণ; "যশোহর-খুলনার ইতিহাস", ২য় খণ্ড।

• অম্বরে সন্নাদেবীর (শীলাদেবীর) পুরোহিত-গোষ্ঠীর (ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যকে মানসিংহ পূজার্থে অম্বরে লইয়া যান; ইঁহারা তদ্দেশীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বংশপরম্পরায় তথায় বাস ও আজও পুরোহিতের কার্য্য করিতেছেন) অম্বরপুরী ভাষায় লিখিত প্রামাণিক বংশেতিহাসের একস্থলে আছে—"...পাছে উঠিনে কেদার কায়স্থ কো রাজ ছো। সো রাজা বাটৈ ছো। সো উঁকে সিলামাতা হী। সো মাতাকা প্রতাপ সে উনে কোই কী জোৎ তো নহী।... অর মাতা নেঁ লে আয়া।....." তদ্ব্যতীত অম্বরপুরাজ-স্কুলের হেড্‌মাষ্টার রামনাথ বাবুই তাঁহার "ইতিহাস-রাজস্থান" নামক হিন্দী গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন—".....প্রতাপাদিত্য কো জীতকর্ রাজা কেদার কে রাজা চড়াই কী। বহ জাতিকা কায়স্থ থা। ঔর সন্নামাতা নামী দেবী কা উসকে ইষ্ট থা; .....মানসিংহ জীনে প্রসন্ন হো কর্ কেদার কে বাদসাহ কা পাদসেবী বনা কর্ উস্‌কা রাজা পীছা দে দিয়া, ঔর্ সন্নাদেবী কে আদেশ লে আয়ে।....."

দুর্গের নিকটবর্ত্তী কুশ্‌লী রণক্ষেত্রে যোরতর যুদ্ধ করেন। ভাগ্যক্রমে প্রতাপের পরাজয় সংঘটিত হয়। সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে ইনায়েৎ খাঁ নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া প্রতাপকে ঢাকার সুবেদার-সকাশে গমন করিবার পরামর্শ দেন। সকল বুঝিয়া বাধ্য হইয়া প্রতাপ উদয়াদিত্যের উপর রাজ্যের ভার দিয়া ইনায়েৎ-সমভিব্যাহারে ঢাকায় গমন করেন। ইসলাম খাঁ সন্ধির প্রস্তাব প্রবণের ছলে প্রতাপকে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক বন্দী করিয়াছিলেন। স্যর যদুনাথ সরকার লণ্ডন হইতে "বাহারিস্তান্-ই-ঘাইবী" নামক পারসিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির সমগ্র অংশের ফোটোগ্রাফ্ আনিয়া তাহার অনুবাদ করাইয়া গত ১৩২৭ সালের কার্ত্তিকের "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত "বাহারিস্তানের" ৫৭ ক পৃষ্ঠায় লিখিত বিষয়ের কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ এইরূপ—"এখন বিয়াস (ইনায়েৎ) খাঁর কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। যশোর হইতে রওনা হইয়া এবং পথবিভাগগুলি দ্রুত অতিক্রম করিয়া অতি অল্প সময়ে তিনি জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকায়) পৌঁছিয়া নিজে ইসলাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং রাজা প্রতাপাদিত্যকে পদচুম্বন করাইলেন। ইসলাম খাঁ প্রতাপাদিত্যকে পৃথলের আজ্ঞা দিয়া যশোর দেশের নেতৃত্ব ইনায়েৎ খাঁর হস্তে অর্পণ করিলেন।....." তাহার কিছুদিন পরে বন্দী প্রতাপ আগরায় প্রেরিত হন। পথিমধ্যে বারাণসী ধামে তাঁহার ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয়।*

অবশেষে যুবরাজ উদয়াদিত্য প্রথমে কুশ্‌লী রণক্ষেত্রে বিজ্জী নথনের সহিত যুদ্ধে এবং পরে মহারাণী পরৎকুমারী ও মহারাণী বিদ্যাধরী প্রমুখ রাজান্তঃপুরচারিণিবৃন্দ যমুনা-গর্ভে (যে স্থানকে এখনও "পরৎখানার দহ" বলে) আত্মাহুতি প্রদান করিয়া যশোরের শেষ সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। বাঙালীর শেষ গৌরব-সূর্য্য সেই হইতে অস্তমিত, বাংলার রাজলক্ষ্মী সেই হইতে যমুনা-গর্ভে নিমজ্জিতা।

* 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্'; রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্যের চরিত্র'; 'ইতিহাস-রাজস্থান', J. H. Rainey's Proceedings of the Asiatic Society; Westland's 'Report of Jessore' দ্রষ্টব্য।

---

# ভাব-তৃষা

—শ্রীমোহিনী চৌধুরী

কবিতা, তোমার বিলাসিতা-প্রেমে তৃপ্তি পাই নি আমি,
মনের পরশমণিমঞ্জুষা সকলের চেয়ে দামী।
ছদ্ম-আঁচল ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে রেখো না তারে,
সোনার খাঁচায় বন্দী করো না জীবনের বলাকারে।
স্বপনের মেঘ ভেসে চলে যায় অলস ঘুমের স্রোতে,
হাসি-অশ্রুর আলো আর ছায়া ফুটে তারি বুক হ'তে।
রামধনু রঙে আঁকনা আঁকে প্রিয় কল্পনা যত,
আশা-ঊর্ম্মির মঞ্জীর বাজে হিয়াতলে অবিরত।
কত ফুল ফোটে মনের লতায়, সুরু হয় কত খেলা,
ধ্যানের প্রতিমা প্রাণের দেউলে পূজা করি সারা বেলা।
অরূপের পায়ে ভালবাসা মম অঞ্জলি ভরে আনি,
দৃষ্টি-প্রদীপে এখনো দেখিনি গোপন স্বরূপখানি।
ওগো বিচিত্রা, হারালে নিজেরে আবরণে আভরণে,
অপরিচিতার অভিসার শুধু অপরূপ প্রসাধনে।
বক্ষার জাগে কণ্ঠে তোমার দেয়ালী গানের সুরে,
মর্ম্মের বাণী নীরবে দাঁড়ায় নিরালায় হেসে ঘুরে।
ব্যাকুল আবেগ দেখে নি এখনো বাধা জানাবার ভাষা,
আকাশ-কপোতী খুঁজে পায় নি কো বালুচরে ভালবাসা।
স্বচ্ছপরতে ফোটে নি এখনো ভাবের আলোক ছবি,
মায়া-মহুয়ার মাতাল হয়েছে স্বপ্নবিলাসী কবি।
আমি তো চাই নি মদির আবেশ, রূপের রূপালী রেণু,
দেহের অতীত তোমারেই আমি চিরদিন চেয়েছিনু।
তোমার আত্মা আত্মীয়রূপে এলো না আমার কাছে,
চির-তৃষাতুর অন্তরে তাই কাঁটা হয়ে বেঁধে আছে।
তোমারে চিনি না, চিনেছি তোমার বুকের বকুলমালা,
পেয়েছি তোমার তনুর সুরভি অগুরুগন্ধ চালা।
উদাসী করেছে তোমার ইসারা উতলা মাধবী রাতে,
পরিচয় আজো হয় নি মানসী তোমার মনের সাথে।
সহজ আবেগে মোর কাছে তুমি আজো তো দিলে না ধরা,
বসন্তে তাই সাজে নি আমার তাপসী বসুন্ধরা।
বাস্তবিকার অনুরাগে জাগে ভীরু বাসনার নদী,
স্বরূপ তোমার দেখাও, কবিতা, মোরে ভালবাসো যদি।

# চিরন্তনী

—শ্রীঅমূল্য গুপ্ত

চিত্রার হাত টন্ টন্ করিতেছে। স্বামীর ছেঁড়া ধোপা সবে সে রিপু করিয়াছে। এখনও বাকী পুত্রের প্যাণ্ট। হাত আর চলে না, প্রতিদিন সেলাই করিতে হয়। হাতের ব্যথা কমিতেছে না। কিন্তু উপায় কি? ওদিকে ছোট ছেলেটা কাঁদিতেছে। কি যে হইয়াছে, কত বড় শত্রুতা করিতে পেটে আসিয়াছিল চিত্রার! দিন রাত খালি কান্না আর কান্না। ছেলেটারই বা দোষ কি? বেচারী জন্মাইবার পর হইতেই কত রকম অসুখে ভুগিতেছে, চিত্রা তার নাম জানে না। এই বয়সে হাজার রকম ওষুধ খাইয়াছে—কবিরাজি, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি) আরও কত কি, জল পড়া ঝাড়-ফুঁ,—সব বৃথা।

রিপু করিতে করিতে দু'তিন বার চিত্রাকে উঠিতে হইয়াছে। ছেলেটাও যেন কি! মাকে চক্ষুর আড়াল করিতে চায় না। সিমেণ্ট ফাটা রোয়াকে ছেড়া কাঁথায় শোয়াইয়া দিল চিত্রা, হাত পা নাড়িয়া মায়ের সেলাই দেখিতেছে। মাঝে মাঝে মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে তার কান্নায়। কাঁদুক, কত কাঁদিতে পারে, চিত্রা আজ আর কিছুতেই তাহাকে ধরিবে না। সে রিপু করিতে লাগিল। সেলায়ের ফোঁড়ে প্যাণ্টের কাপড় ছিঁড়িতে লাগিল। অবাক বেদনায় তার মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। কোন্ জায়গাই বা সে রিপু করিবে? কিন্তু রিপু তাহাকে করিতে হইবে। জুতু আসিয়া কি পরিবে? বড় বড় ফোঁড় দিতে লাগিল, সময় নাই। স্কুলের ছুটী হইবার সময় হইয়াছে। পতীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে চিত্রার।

কি কল্পনাই সে করিয়াছিল! বিবাহিত জীবন তার সুখে কাটিবে। ছোট একটি নীড় বাঁধিবে স্বামী আর সে। ছেলেমেয়ের কথা যে ভাবে নাই, তা নয়। ভাবিতে তার শরীর রোমাঞ্চিত হইত।

ছোট সংসার সে পাইয়াছিল। স্বামী কুমুদের কেহ ছিল না। মামার বাড়ী থাকিয়া সে মানুষ, বিবাহের পর স্ত্রীকে লইয়া এখানে ঘর-সংসার পাতিয়াছিল। সে আজ দশ বছর। বিবাহের একটা বছর বেশ আরামে কাটিয়াছিল। মাসের শেষে ত্রিশ টাকা চিত্রার হাতে দিয়া কুমুদ বলিত, "একটু মানিয়ে চল, পরলার আগে আর একটি পাইও পাবে না।"

ত্রিশ টাকার মজুরকে ধার দিবে কে? মাথা খুঁড়িয়া রক্তপাত করিলেও মিলিবে না।

চিত্রা তবুও ছিল সুখী। দু'জন মানুষ, ভাবনা কি?

ত্রিশ টাকার মধ্যে সে সংসার চালাইত। লক্ষ্মীর হাঁড়িতে রোজ একটি করিয়া পয়সা রাখিত।

কুমুদ হাসিয়া বলিত, "পয়সা জমাচ্ছ কার জন্য? না আছে একটা ছেলে পুলে।"

চিত্রা উত্তর দিত, "দেখো, অনেক কাজ হবে এতে, ধর—"

হাত পথে চিত্রা থামিয়া যাইত। এ কি সে বলিতে যাইতেছে?

কুমুদ কথার সারমর্ম বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছিল, "ভয় নেই, আমার অসুখ-বিসুখ হবে না।"

কুমুদ স্ত্রীর কষ্ট দেখিয়া কি রাখিতে বলিয়াছিল। অথচ তিনটি টাকা ধার করিতে চিত্রা নারাজ। আর নিজে, স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে আরাম পাইত।

স্বামীর কথায় প্রতিবাদ করিয়াছিল, "আমি কি পাটের রাণী সাজতে এসেছি? আমার বাপু তা চলবে না।"

কুমুদ সে দিন অফিস ফেরত আনিয়াছিল একটি ক্রীম। মাসের পয়লা তারিখ, ভাবনা কি? অন্ততঃ একদিনের জন্য সে বড়লোক।

চিত্রার গর্ব্ব হইয়াছিল স্বামীর উপহারে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে মনে পড়িল তাহারা ক্রীম ব্যবহার করিবার উপযুক্ত নয়। স্বামীর হাতে ফেরৎ দিয়া বলিয়াছিল, "দোকানে ফিরিয়ে দিও। কেন বাজে পয়সা খরচ কর বলত? এই দশ আনাতে পাঁচ দিনের বাজার হত।"

আমতা আমতা করিয়া কুমুদ উত্তর দিয়াছিল, "তা হক। আমার কি সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই?"

"থাকাটাই সম্ভব, কিন্তু আমাদের তা বিচার করলে চলবে কেন? তুমি লেখাপড়া শিখে এত অসুর কেন বল তো?"

কুমুদ বাধাজড়িত কণ্ঠে বলিয়াছিল, "বেশ দাও, এখুনি ফেরত দিয়ে আসি।"

"অমনি রাগ হ'ল। আচ্ছা এবার থাক, কিন্তু ভবিষ্যতে আর এনো না।"

অপব্যয়ের পরিণতি কি জানিত সে। পিতা তার ছিলেন অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের। অজস্র ব্যয় করিতেন, সাধ্যাতিরিক্ত। এক পয়সা রাখা তো দূরের কথা, রাখিয়া গিয়াছিলেন অসুরক্ত দেনা—যার কি দুর্গতি হইয়াছিল, যেদিন পিতা মারা গেলেন। সে কথা ভাবিতে চিত্রার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইত। সৎকার করিবার খরচ পর্যন্ত অন্যের কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিতে হইয়াছিল। দেনার দায়ে চিত্রার দাদা আত্মহত্যা করিয়াছিল দিনকয়েক পরে।

কি অদৃষ্টের পরিহাস! কোন দিন কেহ কল্পনা করে নাই, তাহাদের সংসারের অমন পরিণতি হইবে।

তাই সে শিখিয়াছিল সংসারকে সচল রাখিতে কি কষ্ট। বিশেষতঃ তাহাদের মত অবস্থায়। কুমুদকে সে কিছুতেই শিখাইতে পারে নাই। ফলে সংসারের বোঝা দিন দিন ভারী হইতে লাগিল। পূর্বে তাহারা ছিল দুজন। এখন আরও চারজন বাড়িয়াছে। আর পূর্বের সেই ত্রিশ টাকা।

ছোট ছেলের সূতিকা-গৃহে চিত্রা অসুখে পড়িয়াছিল, বাঁচিবার কোন আশাই ছিল না। কুমুদ দেনা করিয়াছিল তার চিকিৎসার। চিত্রা মরিল না। হয় তো দেনা না করিলেও সে বাঁচিত। দরিদ্রের সংখ্যা লোপ পাইতে পারে না। পথ্য যেদিন করিয়াছিল, কি আনন্দ চিত্রার! স্বামী আছে, কোল-জোড়া দুটী পুত্র আছে, কার মরিতে ইচ্ছা করে? কিন্তু এ বাঁচার দাম কি? অসুখ শুধু তাহার হয় নাই, সে করিয়াছে সংসারকে ব্যাধিগ্রস্ত।

স্বামীকে দুশ্চিন্তায় ফেলিয়াছিল। দিন দিন সে জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। অফিসের দেনা এখনও মিটাইয়া দিতে পারে নাই। মাসে মাসে দশ টাকা কাটিয়া লইত। কুড়ি টাকায় সংসার চালাইতে চিত্রা হিম্-সিম খাইত।

সংসার অচল থাকে না। দুরবস্থার বৈষম্যে মানুষের পরিবর্তন হয়। চিত্রারও মনে বৈরাগ্য দেখা দিয়াছিল। তাহা সংসারকে জোড়া লাগাইতে আগ্রহ নাই। সে সময় মরিলে বাঁচিত।

দিন দিন অনটন বাড়িতেছে। ছোট ছেলেটী বড় রুগ্ন। অসুখ তাহার কমে না। তার ওষুধ আছে, পথ্য আছে। মাসের শেষে কুমুদ যাহা আনিত তাহা নিঃশেষিত হইত পনের দিনে। বাকি পনের দিন কি অষ্টপ্রহর টানাটানি। সমস্ত বোঝা চাপিত চিত্রার ঘাড়ে, কুমুদ নির্লিপ্ত। আটটায় নাকে মুখে গুঁজিয়া অফিস যায়, সন্ধ্যা সাতটায় পরিশ্রান্ত দেহে বাড়ী ফেরে। বাড়ীর পোকা-মাকড়টী পর্যন্ত থাকে সন্ত্রস্ত। স্বামীকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চিত্রার সাহস হয় না।

আয় পূর্বের ত্রিশ, ইদানীং খরচ আরও বাড়িয়াছে। জুলু বড় হইয়াছে। বোকা মুখ করিয়া রাখা যায় না। স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছে। মাহিনা দিতে কি কষ্ট চিত্রাই জানে। পুত্রের পড়াশুনা লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া-ঝাটি মাঝে মাঝে হয়। মুখ বুজিয়া সে সহ্য করে। সহ্য করে জুলুর আশায়। জুলু একদিন মানুষ হইবে। তাহাদের সুখে রাখিতে পারিবে। ছোট একটী সংসারে জুলুকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। বিবেক চিত্রাকে বাধা দিল। তাহাদের জীবন তো কাটিল, কি ভাবে তাহারাই জানে। সে আর একটী জীবন নষ্ট হইতে দিতে পারে না। পুত্রের সহিত ঝগড়া করিতে হয় করিবে, তবুও সে অটল থাকিবে। কিছুতেই সে আর একটী ভুল করিতে পারিবে না।

চিত্রার চিন্তায় বাধা দিল জুলু, 'মা দরজা খোল।' দরজার হুড়কা খুলিতে জুলু হুড় মুড় করিয়া ভিতরে ঢুকিয়াই বলিল, "মা চটপট খেতে দাও। ফু গার্ডেন যাব। কত কি জন্তু জানোয়ার আছে। সে দিন নন্তু গিয়েছিল, ওরা তো বড় লোক, ভিখিরীকে একটাও পয়সা দেয় না, বলে তারা না কি চোর। সত্যি মা?—ও কী বসে পড়লে যে, খেতে দেবে না?"

"দাঁড়া দিচ্ছি, ঘোড়ার লাগাম দিয়ে এসেছে যেন, কি পরে যাবি? সে দিকে ছেলের যদি হুঁস্ থাকত! আজ বাড়ী আসুক।" বলিয়া চিত্রা সেলাইয়ে মন দিল।

'আজ বাড়ী আসুক' বলিতে কাহাকে বোঝায় জুলু জানিত। বাড়ী আসায় কি ফল পাইত, তাহা জুলু ভুলিতে

পারে না। পিতার কথায় জুলু রীতিমত রাগিয়া উঠিল। পিতাকে সে ভয় করে বাঘের চেয়ে বেশী।

দারিদ্র্যের প্রতিশোধ কুমুদ ছেলের উপর লইত, জানোয়ারের মত শাসন করিত সামান্য কারণে। যে দিন চিত্রা প্রতিবাদ করিত, জুলুর সে দিন আর রক্ষা থাকিত না, কালসিটে দাগে তার শরীর ভর্তি হইত।

মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, "বেশ বলে দিও। জানি মার খাওয়াতে তোমার ভাল লাগে।" অভিমানে জুলুর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল—"এক দিন নিজের পিঠে পড়লে বুঝতে।"

চিত্রাও অনেকবার ভাবিয়াছে। হয়ত কুমুদ এক দিন তাহাকেও—যা পরিবর্তন হইয়াছে, তার পক্ষে এটা বিচিত্র নয়।

পুত্রের হাতে মুড়ির বাটী দিয়া বলিল, "হ্যাঁরে জুলু, আমিও কি মন্দ?"

অভিমান তখনও যায় নাই, জুলু বলিল, "নিজে না মারলে বুঝি মারা হয় না! সে দিন তো বাবাকে বলে দিয়ে কি মার খাওয়ালে, এখনি বুঝি ভুলে গেলে?"

কথায় চিত্রার চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। পুত্রও এই বয়সে মাকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে। কত বড় ভুল, কি করিয়া চিত্রা ছেলেকে বুঝাইবে? একবার সে ভাবিল বলে: ওরে আমরা যে গরীব, তুই যা ভাবিস তা আমরা নই। বলিতে পারিল না, বুকের মধ্যে অসহ্য জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল।

মায়ের ব্যথা জুলু হয়ত বুঝিতে পারে, কিন্তু তার সময় নাই, মায়ের মনাই কি তার জন্য দাঁড়াইবে? সকলেই হয় তো আসিয়াছে, বাকী শুধু সে, তাড়াতাড়ি মাকে বলিল, "যা তুমি ভাল, বাবা ছাই।'

ছেলের এই লুকোচুরি, চিত্রার মন আরও ভাঙিয়া পড়িল। এই সামান্য ব্যাপারে কেন সে বিচলিত হয়? তাড়াতাড়ি সেলাই করিতে মন দিল।

"যা প্যাণ্ট খাও।"

"দাঁড়া দিচ্ছি, আর একটু বাকী আছে, তুই ততক্ষণে হাত মুখ ধুয়ে আয়।"

"বা! নতুন প্যাণ্ট বাজার থেকে আনাতে বলেছিলে যে? এই তুমি আমায় ভালবাস? আমি চাইনে ছেঁড়া প্যাণ্ট পরতে।" বলিয়াই জুলু মায়ের হাত হইতে কাড়িয়া নিল প্যাণ্টটা। রাগে সে উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

"বড় বাড় বেড়েছে," বলিয়া চিত্রা জুলুর গালে জোরে একটা চড় বসাইয়া দিল। কি জানি কেন, জুলু পড়িয়া গেল ইট-বার-করা দেওয়ালে। ফিন্‌কি দিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল জুলুর কপাল কাটিয়া। চিত্রা তাড়াতাড়ি মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিল। রক্ত কিছুতেই থামে না। লজ্জায় ভয়ে চিত্রা কাঁপিতে লাগিল। এ কি করিল সে! মুহূর্তের রাগে সে অমন জোরে কেন চড় দিল? জুলুর দোষ কি? জন্মাইবার পর হইতে সে কি অবহেলায় না মানুষ হইয়াছে! সংসারের অনটন এই বয়সে অনেক সে বুঝিয়াছিল। কোন দিন মুখ ফুটিয়া কোন জিনিষের আবদার করে নাই। কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রমের মূল্য কি?

জুলুকে সে বিছানায় শোয়াইয়া দিল। সে মায়ের মুখের দিকে নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিল, না বলিল একটী কথা। খানিক পরে পাশ ফিরিয়া শুইল। ঘরের আলো আলাইতে ভুলিয়া গেল চিত্রা। আলোতে সে কি করিয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিবে? মাকে কি জুলু ক্ষমা করিতে পারিবে? সন্ধ্যায় সে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, জুলু, ব্যথা কি বড্ড বেশী লাগছে? কপালে হাত বুলিয়ে দেব?

দরজায় কড়া ঘন ঘন নড়িতে লাগিল। কড়ার মৃদু শব্দ চিত্রার কাণে যায় না। কড়াটা আলগা হওয়ায় শব্দ হয় না। বাহির হইতে কুমুদ কিম্বা হেলে ডাকিত। কিন্তু আজ কুমুদের এ ব্যতিক্রম কেন? কুমুদ চীৎকার করিয়া ডাকিল, "চিত্রা, চিত্রা।" চিত্রা দরজা খুলিয়া সঙ্কুচিত ভাবে ভিতরে চলিয়া গেল। অন্যদিন সে কপাট নিজের হাতে বন্ধ করিত, অন্ততঃ নিজের হাতে হুড়কা টানাটানি করিয়া দেখিত দরজা বন্ধ ঠিক মত হইয়াছে কি না। আজ সে স্বামীর কাছ হইতে পলাইতে ব্যস্ত।

কি অদৃষ্টে আছে?

"বাড়ী এত অন্ধকার কেন?" কর্কশ কণ্ঠে কুমুদ কহিল, চিত্রার মনেও একথা জাগিয়াছিল। তাড়াতাড়ি সে লণ্ঠন জ্বালাইল।

কুমুদ ঘরে ঢুকিয়াই পুত্রের ব্যাণ্ডেজ বাঁধার কারণ জিজ্ঞাসা করিল, "জুলুটার কি হ'ল ?"

পিতার গলার স্বরে সে এপাশে ফিরিয়া শুইয়াছিল, আজ সে পিতাকে নিজের দেখাইবে মা তাকে মারিয়াছে। পিতার কর্কশ স্বরে কাঁপিয়া উঠিল। কি জানি আছে মায়ের কপালে ? চিত্রার মুখ ভয়ে বিবর্ণ। ঘনঘাসিত স্বরে বলিল, "আমি মেরেছি তাকে—"

মাকে থামাইয়া প্রতিবাদ করিল জুলু. "না বাবা, খেলতে গিয়ে লেগেছে। তুমি মারবে কি না তাই মা নিজের ঘাড়ে দোষ নিচ্ছে।"

মা ও ছেলে দৃষ্টি বিনিময় করিল।

পৃথিবীতে এটা নূতন নয়। কিন্তু এটা এত স্বাভাবিক যে কাহারও হয় তো নজরে পড়ে না। বর্তমানে ধারা পাল্টাইল। মা ও ছেলের মুহূর্তের চাতুরীর সার্থকতা কুমুদের অন্তরে আঘাত করিল। সেও অনুকরণ করিল, "ও তাই না কি ? বেশী তো লাগেনি, কালই সেরে যাবে।"

চিত্রা ভাবে, পৃথিবীই শুধু বিচিত্র নয়, বিচিত্র মানুষগুলি। চিত্রা স্বামীকে কি যেন বলিতে চেষ্টা করে।

কুমুদ থামাইয়া বলে, "কি দরকার ; আমি জানি কি ব্যথা তুমি সইছ। কি আর করবে, আমরা সংসারের খেলার সামগ্রী।"

স্ত্রীর মনের খেদ করিয়া যায়। স্বাভাবিকতার রূপ ফিরিয়া আসে, কিন্তু কুমুদ লজ্জায় মুখ তুলিতে পারে না। জুলুর দৃষ্টি তাকে আরও লজ্জাতুর করিল। সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

জুলুর বয়স কী। সবে সে নয় বছরে পড়িয়াছে। পিতাকে সে চিনিয়াছে : দয়া নাই, মায়া নাই—আস্ত একটি বিবেকহীন মানুষ। সে কি চিরদিন এমন ছিল ? তার মধ্যেও অনেক গুণ ছিল—যা চিত্রা জানে। কিন্তু আজ এ পরিবর্তনের মূলে কি ? কিন্তু জুলু কি তাহা বুঝিবে ? যদি সে বুঝিত, তাহা হইলে সে কি এই লুকোচুরির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত ?

এই তো বয়স ! মাকে বয়স পিতার হাত হইতে বাঁচাইবার কি চেষ্টা !

কুমুদের বলিতে ইচ্ছা করে, জুলু, তুই যা ভাবিস আমি তা নই। আমিও একদিন তোকে আদর করেছি, ভালবাসি এখনও। পারিল না কুমুদ নিজের দৈন্য উদ্ঘাটিত করিতে।

ঘরের গুমোট ভাব অপসারিত হয় ছোট ছেলেটার কান্নায়। চিত্রা তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলে লইল।

কুমুদ বলে, "আমার কাছে দাও, বাইরের হাওয়ায় ঘুরিয়ে আনি—যা গরম।"

"না থাক। তুমি বিশ্রাম কর। কি রে খোকা, তুই এত দুষ্টু কেন ?"—বলে চিত্রা। মাতৃত্বের হাসি চিত্রার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

বলিতে কুমুদ ভুলিয়া গিয়াছিল, দশ টাকা ওভার-টাইম পাইয়াছে। অনেকবার ওভার-টাইম খাটিয়াছে, এক পয়সাও পায় নাই। পাইবার আশাও করে নাই। সাহেবের কি মরজী, এবার কড়া গণ্ডা পর্যন্ত মিটাইয়া দিয়াছে।

চিত্রা উত্তর দিল, "কাল জুলুর একটা প্যাণ্ট এনো।"

জুলু প্রতিবাদ করে, "না বাবা আমার তো একটা প্যাণ্ট আছে, মা'র যে মোটেই কাপড় নেই।"

তারপর স্বামী-স্ত্রীতে আলোচনায় বসে। কি না হইলে নয় ? পুঁজি মোটে দশ টাকা। কর্দ যা হইল তাতে পঁচিশ টাকায় হয় কি না সন্দেহ। কাঁট-ছাঁট অনেক করিল, মনঃপূত হয় না। এটা না হইলে নয়, ওটা তো কিনিতেই হইবে। তাহাতে দাঁড়ায় পনের টাকার ধাক্কা। টাকা দশটা যেন তাহাদের বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে।

চিত্রাই মীমাংসা করিল, "এ মাসে কিছুই হবে না, তুমি অফিসের ঋণের টাকা দশটা পাওনা আছে, তাই দিয়ে দিও।"

"সেই ভাল।" বুক ঠেলিয়া কুমুদের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

# যশোহর-পরিচিতি

—শ্রীসুশীলকুমার বসু

## ইংরেজ আমলে যশোহর

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাঙ্গলার দেওয়ানী-লাভের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। দেওয়ানের কর্ত্তব্য ছিল রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানী মামলার বিচার করা; দেশের শান্তি বা শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করা তাঁহার কর্ত্তব্যের অন্তর্গত ছিল না। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ছিল নবাবের উপর এবং এজন্য বাঙ্গলার নবাব একজন নায়েব নাজিম নিযুক্ত করিলেন। রাজস্ব আদায়ের ভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপর ন্যস্ত হওয়াতে নবাবী আমলের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ ফৌজদারেরা কোম্পানীর আমলে পুলিসের বড় কর্ত্তার মাত্র রূপান্তরিত হইলেন। ফৌজদারের অধীনস্থ এলেকা কয়েকটি থানায় বিভক্ত হইত এবং প্রতি থানায় ফৌজদারের অধীন একজন করিয়া থানাদার থাকিত। তৎকালীন যশোহর এলেকায় (বর্ত্তমান কালের যশোহর, খুলনা ও ফরিদপুরের অধিকাংশ তৎকালীন যশোহর এলেকার অন্তর্ভুক্ত ছিল) চারিটি থানা ছিল—ভূষণা, মীর্জ্জানগর, বরদপুর (কেশবপুরের নিকটে) ও নওয়াবাদ (বর্ত্তমান খুলনার অপর পারে)। প্রত্যেক থানার অধীনে বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি চৌকী থাকিত। চৌকীর কর্ম্মচারীদিগকে 'গোয়েন্দা' (সংবাদ-সংগ্রাহক) বলা হইত। গোয়েন্দাগণ কোনও নির্দ্দিষ্ট মাহিনা পাইত না,—সুতরাং অধিকাংশস্থলে গোয়েন্দাগণ নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া ও তাহার নিকট হইতে অর্থ আদায় করিয়া নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিত। এতদপেক্ষা পুলিস ব্যবস্থা যখন অনেক উন্নততর হইয়াছে তখনই সমগ্র যশোহর এলেকার পুলিসের ব্যয় ছিল ৮০০৲ হইতে ৮৫০৲। ইহা হইতেই বুঝা যায় দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা তখন কিরূপ ছিল।

কিন্তু, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার যে নামমাত্র ব্যবস্থা ছিল, তাহাও কার্য্যকরী হইত না। দেওয়ানী লাভ করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথমেই দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করে নাই, রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত মুন্সের রেজা খাঁকে বঙ্গের নায়েব নাজিম নিযুক্ত করে। মুহম্মদ রেজা খাঁ অতীব নিষ্ঠুরতার সহিত নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার 'দেওয়ানী' লুণ্ঠনের নামান্তর হইয়া দাঁড়াইল। রেজা খাঁ যে লুণ্ঠনবৃত্তি রাজস্ব-বিভাগের উপরের স্তরে প্রচলিত করেন, সে বৃত্তি শীঘ্রই নিম্নতম স্তর পর্য্যন্তও বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং তথা হইতে সমাজের সর্ব্বস্তরেই ব্যাপ্ত হইল। দুষ্ট ও হিংস্র প্রকৃতির লোকেরা দুর্ব্বলের উপর পীড়ন ও জঘন্য নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া নিজেদের অর্থলালসা তৃপ্ত করিতে লাগিল। এইরূপে দেশের সর্ব্বত্র ভীষণ অরাজকতা দেখা দিল, কুত্রাপি ধন-প্রাণ আর নিরাপদ রহিল না। রেজা খাঁ বা কোম্পানী এ দিকে দৃষ্টিপাত করাই প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই, কারণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ছিল নবাবের উপর। নবাবের দায়িত্ব ছিল বটে, কিন্তু নবাবের কোনও ক্ষমতা ছিল না বা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ক্ষমতা বা অর্থাদিও নবাবকে প্রদান করা হয় নাই। সুতরাং, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার যে অত্যন্ত অপর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল, তাহাও অকার্য্যকর রহিয়া গেল। অনেকস্থলে ফৌজদার নিজেই প্রজাপীড়ন করিয়া নিজ অর্থাগমের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিতেন ও তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা দুর্ব্বৃত্ত দস্যুদিগের সহিত মিলিত হইয়া প্রকাশ্যে দস্যুতা করিতেও পশ্চাদ্‌পদ হইত না। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে টিলম্যান হেকেল প্রথম জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া মুড়লীতে (বর্ত্তমান যশোর নগর হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত) আসিবার পরও এক এক দলে ৫০ জনের অধিক দস্যুকে স্বচ্ছন্দে ও প্রকাশ্যে বিচরণ ও দস্যুতা করিতে দেখা গিয়াছে। অরাজকতার এরূপ অভিজ্ঞতা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গে আর কখনও হইয়াছিল কি না সন্দেহ।

স্বাভাবিক অরাজকতাকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১১৭৬ সাল, খৃঃ ১৭৬৯) শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল। অনাহারে ও চর্ম্মিক-জাত নানারূপ পীড়াতে বঙ্গের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ

লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কিন্তু কোম্পানীর রাজস্ব পূর্ব্বাপেক্ষা কঠোরতার সহিত আদায় হইতে লাগিল। 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, দুর্ভিক্ষের প্রকৃত ভয়াবহতার তুলনায় তাহা বোধ করি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। নদীমাতৃক দেশ বলিয়া অবশ্য যশোহরের অন্নাভাব বা ক্রাণহানি পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় অতিরিক্ত না হইলেও লোকের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল,—ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পূর্ব্বে যেখানে টাকায় ১১০ সের ধান বিক্রীত হইত, মন্বন্তরের সময় ধানের মূল্য সেখানে হইয়াছিল টাকায় মাত্র ১০ সের।

দুর্ভিক্ষ ও অরাজকতার জন্য ভারত শাসনের উপর কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি পতিত হয়। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস গবর্ণর হইয়াই দেওয়ানী-অফিস মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন ও স্থানে স্থানে রাজস্ব আদায়ের জন্য রেভেন্যু কালেক্টর বা সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন। যশোহরেও এই সময় রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত একজন কালেক্টর প্রেরিত হন। নূতন প্রথা কার্য্যকর করিতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল তাহা অধিক বিবেচিত হওয়ায়, নূতন ব্যবস্থা রহিত করা হয়। যশোহরেও এই প্রথানুযায়ী প্রায় দুই বৎসর কাল চলিবার পর, কালেক্টরের পদ তুলিয়া দেওয়ায়, পূর্ব্বের অরাজকতা দেখা দিল;—ধনবান ও দুর্ব্বৃত্ত-কর্ত্তৃক দুর্ব্বল ও দরিদ্রের নূতন অপ্রতিহত ভাবে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ হইতে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মিঃ টিলম্যান হেষ্টেলের যশোহরের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে আগমন পর্য্যন্ত যশোহরে পূর্ণ অরাজকতা বিরাজমান ছিল।

আধুনিক যশোহর নগরীর দক্ষিণ-পূর্ব্বে ও সন্নিকটে কাঁচকরার নিকট মুড়লীতে মুসলমান আমল হইতেই একটি শাসন-কেন্দ্র ছিল। বর্ত্তমান যশোহর, ফরিদপুর ও খুলনার অধিকাংশকে এলেকা লইয়া ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মুড়লীতে একটি আদালত খোলা হয় এবং মিঃ রিচার্ড জোন্সকে সহকারীরূপে লইয়া মিঃ টিলম্যান হেষ্টেল যশোহর এলেকার জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে মুড়লীতে আগমন করেন। মিঃ হেষ্টেল সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন; এবং অরাজকতার স্থলে নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভবিষ্যতে কোম্পানীর যে মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছিল তাহার গৌরব অনেকখানি মিঃ হেষ্টেলের ব্যক্তিগত ভাবে প্রাপ্য।

নূতন ব্যবস্থানুযায়ী ফৌজদার ও থানাদারের কার্য্যের ভার পড়িল ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর; এতদ্ব্যতীত জজ হিসাবে দেওয়ানী মামলা বিচারের ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। ফৌজদার ও থানাদারেরা ফৌজদারী মামলার বিচার করিতে পারিতেন না, ফৌজদারী মামলার বিচার করিতেন 'দারোগা'। ফৌজদারী মামলা বিচার করিবার নিমিত্ত মুড়লীতে ও ফুলপায় দুইজন 'দারোগা' ছিলেন। সুতরাং মিঃ হেষ্টেলকে পুলিসের বড়কর্ত্তা হিসাবে ফৌজদারী মামলা বিচার করিবার নিমিত্ত আসামীকে দারোগার নিকট প্রেরণ করিতে হইত।

হেষ্টেল আসিয়াই অরাজকতা দূরীকরণার্থ পুলিস বিভাগ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। থানাদারের পদ তুলিয়া দিয়া প্রত্যেক থানায় একজন করিয়া 'পীয়দার' বা প্রধান পুলিস নিযুক্ত করা হয়। এখন হইতে 'পীয়দারের' কার্য্য হইল দস্যু গ্রেফ্‌তার করা ও বিচারার্থ দস্যুকে মুড়লীতে চালান দেওয়া। থানাদারের অধীন স্থানীয় বরকন্দাজ রাখার ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া এবং চৌকী হইতে গোয়েন্দা তুলিয়া দিয়া বাহির হইতে সিপাহী আমদানী করা হইল। ইহার ফলে একদিকে যেমন দুর্ব্বৃত্তেরা স্থানীয় বরকন্দাজদের সহায়তায় দস্যুতা করিবার সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইল, অপরদিকে তেমনি গোয়েন্দা-পদের পরিবর্ত্তে সিপাহী আমদানী করায় তৎকালীন পুলিস-ব্যবস্থা অতীব প্রয়োজনীয় সামরিক প্রকৃতি ধারণ করে। নূতন ব্যবস্থানুযায়ী মুড়লীতে ৫০ জন, ফুলপা ও শ্রীনগরে ৩০ জন করিয়া এবং হরমপুরে ৪ জন সিপাহী রাখা হইল। নড়াগাতে কোনও সিপাহী রাখা হইল না; খুলনার নিমকচৌকীর লোক দ্বারাই সিপাহীর কার্য্য চালাইয়া লওয়া হইত। নূতন ব্যবস্থায় পুলিসের ব্যয় মাসিক আটশত টাকা হইতে সাড়ে আটশত টাকা পড়িতে লাগিল। বণিক কোম্পানীর সরকারের অর্থকরী হিসাবী-বুদ্ধির নিকট এই ব্যয় অত্যধিক ও অপব্যয় বলিয়া মনে হওয়াতে পর বৎসরই, অর্থাৎ ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কেবল মাত্র মুড়লী ভিন্ন অপর সকল স্থানের পুলিস ব্যবস্থা উঠাইয়া দিয়া পুলিসের কাজ জমিদারদের উপর অর্পণ করা হইল। জমিদারদের উপর ইস্তাহার জারী করা হইল যে, জমিদারগণ

দেখিবেন যেন তাঁহাদের জমিদারিতে যে, কোনও চুরি, ডাকাতি বা খুন না হয়। স্ব স্ব এলেকার জমিদারদের ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দ্দেশমত থানা বসাইতে হইবে, থানাতে নিজ ব্যয়ে পুলিস নিয়োগ করিতে হইবে এবং এই সকল পুলিসের অকর্ম্মণ্যতার জন্য জমিদারকেই দায়ী হইতে হইবে। চুরি-ডাকাতির জন্য প্রজার ক্ষতি-পূরণ জমিদারকেই করিতে হইবে এবং উপরি উক্ত অপরাধগুলি বা শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যাঘাতজনক কোনও কার্য্য জমিদারের জ্ঞাতসারে বা অবহেলার জন্য অনুষ্ঠিত হইলে জমিদারকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। জমিদারেরা অবশ্য ইস্তাহারের কঠোর বিধানে ভীত হইয়া এটি স্থলে ১৩টি থানা বসাইলেন এবং স্ব-এলেকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে চেষ্টাও করিলেন, কিন্তু তাহাতে অরাজকতা বিশেষ কিছু কমিল না। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসন-সংস্কার পর্য্যন্ত এ ব্যবস্থা চলিল বটে, কিন্তু ইস্তাহারের কঠিন বিধান জমিদারদের উপর কোনও দিন প্রয়োগ করা হয় নাই।

হেস্টেলের পুলিস-ব্যবস্থা কোম্পানী উল্টাইয়া দিয়া তৎস্থলে জমিদারদের উপর পুলিসের কার্য্য করিবার ভার অর্পণ করিলেন। এই ব্যবস্থা দ্বারা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল ও প্রায়ই শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। কাগজ-পত্র হইতে দেখা যায় যে এ সময় দেশে বিরাট দস্যুবাহিনী প্রকাশ্যে দস্যুতা করিয়া বেড়াইত। সাধারণ প্রজার তো কথাই নাই, এমন কি কোম্পানীর রাজস্বও সময় সময় দস্যুদল কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইত। প্রয়োজন বোধ করিলে দস্যুদল কোম্পানীর কারাগার হইতে বন্দী মুক্ত করিয়া লইতে বা কোম্পানীর সিপাহীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেও পশ্চাদ্‌পদ হইত না। ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার দারোগার উপর ন্যস্ত হওয়ায়, ধৃত আসামীদের বিচার কোথাও কোথাও প্রহসনে পর্য্যবসিত হইত, কোথাও কোথাও বা শাস্তির কঠোরতার সহিত অপরাধের মাত্রার গভীর অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইত। কখনও ঘোর অপরাধীকে সামান্য কয়েক ঘা বেত্রাঘাত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত, কখন বা সামান্য অপরাধের জন্য হস্ত-পদাদি ছেদন করিয়া অপরাধীর অঙ্গহানি ঘটান হইত। বলা বাহুল্য, যেখানে বিচারের ব্যবস্থা এরূপভাবে ব্যক্তিগত খেয়ালখুশীর উপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ফৌজদারী-আদালত শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সহায়ক না হইয়া, অরাজকতা দমন না করিয়া, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রতিকূলতা করিয়া অরাজকতা বিস্তারের সহায়ক হইয়া থাকে। হেস্টেল ম্যাজিষ্ট্রেট-পদে নিযুক্ত হইয়াই ফৌজদারী মামলায় বিচারে এরূপ অব্যবস্থার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকেন; ফলে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কর্ত্তৃপক্ষ ম্যাজিষ্ট্রেটকে সামান্য সামান্য অপরাধ যেমন 'মাদ্র-ঘর', ছিঁচকে চুরি প্রভৃতির বিচারের ভার প্রদান করেন। অনধিক চারিদিবস জেল ও অনধিক ১৫টি বেত্রাঘাত দিবার ক্ষমতা ম্যাজিষ্ট্রেটকে দেওয়া হইল। গুরুতর অপরাধের বিচারকর্ত্তা দারোগাই রহিলেন। দারোগার বিচার-ব্যবস্থার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এখানে শুধু এইটুকু যোগ করা প্রয়োজন যে, সময় সময় অপরাধীদিগকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কারাগারে নিক্ষেপ করা হইত। দারোগার শাস্তি-ব্যবস্থা চতুর্ব্বিধ ছিল—মৃত্যু, কারাবাস, বেত্রাঘাত ও অঙ্গহানি। অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য যাহাদিগকে কারাবাস দেওয়া হইত, কখনও কখনও তাহারা ক্ষতি-পূরণ করিয়া বা ভবিষ্যৎ শান্তিরক্ষা-কল্পে উপযুক্ত জামিন দিয়া মুক্তি লাভ করিত। এই শ্রেণীর কারাবাসীদের অধিকাংশের জন্যই অবশ্য এ সুযোগ বা সুবিধা ঘটিত না। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে যখন কারাগারের ভার কোম্পানীর গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন, তখন যশোহরের তিন শত কয়েদীর মধ্যে একশত আট জন এরূপ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অবরুদ্ধ ছিল।

দেওয়ানী-মামলা বিচারের ভার অবশ্য জজ হিসাবে হেস্টেলের উপরই ন্যস্ত ছিল; কিন্তু একক হেস্টেলের পক্ষে সমগ্র জিলার (১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে যশোহর একটি পৃথক্ জিলারূপে সৃষ্ট হয়; ইহাই বঙ্গের প্রথম জিলা) দেওয়ানী মামলাসমূহের বিচার করা অসাধ্য হওয়ায়, হেস্টেলকে প্রায়ই স্থানীয় জমিদারদের উপর বিচারের ভার অর্পণ করিতে হইত। সুতরাং যেখানে জমিদার-প্রজায় কলহ বা একপক্ষ জমিদার-অনুগৃহীত পাত্র হইত সেখানে কোনরূপ বিচারই হইত না। দেওয়ানী মামলার বিচারের সুব্যবস্থার নিমিত্ত কয়েকজন 'আমীন' নিয়োগের তিনি প্রস্তাব করেন। কিন্তু যে বণিক্‌কুল প্রজার ধন-প্রাণ রক্ষার দায়কে অসহায় বলিয়া মনে করিয়া-

ছিল, তাহারা অধিক বস্ত্র লইয়া প্রজার প্রজার বিরোধের মীমাংসা ব্যয়-বাহুল্য বলিয়া মনে করিবে ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি! হেষ্টেলের প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

হেষ্টেল যশোহরের অরাজকতা দূরীকরণে যে-সকল প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা কোম্পানীর বণিকবৃত্তি-সূচক মনোভাবের জন্যই সুফল প্রসব করিতে পারে নাই। হেষ্টেলকে শুধু যে দস্যু-তস্কর দমনে চেষ্টা করিতে হইয়াছিল তাহা নহে, প্রজার ধন-প্রাণ রক্ষার্থে তাঁহাকে কোম্পানীর তৃতীয় রিপুর সহিতও লড়িতে হইয়াছিল। তৎকালীন অবস্থা ও হেষ্টেলের পত্র বিশ্লেষণ করিলে হেষ্টেলের কার্য্যকালের এই অধ্যায়টি যেমন চিত্তাকর্ষক, ভারতবর্ষের নিয়মতান্ত্রিক শাসন-যন্ত্র গঠনের ইতিহাসের পক্ষে তেমনই প্রয়োজনীয় অধ্যায়।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় কোম্পানী শুধু মাত্র শাসকই ছিল না, পরন্তু বড় ব্যবসায়ীও ছিল। ভারতবর্ষের অধিবাসীর লোভ তখনও কোম্পানীর ব্যবসায়ের লাভকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের শাসনযন্ত্র পরিচালনাকে তখন কোম্পানী ব্যবসায়ের সহায়ক হিসাবেই মনে করিতেন। হেষ্টেলের শান্তি-শৃঙ্খলা প্রচেষ্টা যে বারবার কোম্পানীর বণিক-মনোবৃত্তির দ্বারা প্রতিহত হইয়াছে তাহারও কারণ ইহাই—আইনতঃ কোম্পানী শাসক হইলেও মুখ্যতঃ ও বস্তুতঃ কোম্পানী তখনও বণিকবৃত্তি পরিত্যাগ করে নাই। অন্যান্য স্থানের ন্যায় যশোহরেও কোম্পানীর নানাবিধ ব্যবসায় ছিল—তন্মধ্যে কাপড় ও লবণের ব্যবসাই প্রধান। সুন্দরবনাঞ্চলে রায়মঙ্গলে তখন লবণ উৎপন্ন হইত, কিন্তু সেখানে কোনও বসতি না থাকায় কারখানায় কার্য্য করিবার জন্য বাহির হইতে লোক আমদানী করিতে হইত। রায়মঙ্গল জীতিসঙ্কুল স্থান বলিয়া সেখানে লোক আমদানী করা অতি কষ্টকর ছিল। সাধারণতঃ দাদন দিয়া লোক সংগ্রহ করা হইত, কিন্তু অনেক সময় দাদন দ্বারা কাজ হইত না—হয় দাদন লইয়াও কেহ কেহ যাইতে চাহিত না, নয় লোকে দাদন লইতেই চাহিত না। যখন লোক সংগ্রহ করা দুষ্কর হইত, তখন কোম্পানীর কর্মচারীরা ভয় দেখাইয়া বা জোর পূর্ব্বক সিপাহীর সাহায্যে লোক সংগ্রহ করিত। লোক সংগ্রহের নিমিত্ত ও ব্যবসায় সম্পর্কিত অন্যান্য কার্য্যের জন্য খুলনায় সদর-অফিস বা নিমক-চৌকী ছিল। প্রধানতঃ প্রয়োজনীয় লোক সংগ্রহের নিমিত্ত নিমক-চৌকীতে মানেজারের অধীন দুইজন দারোগা ও বহুসংখ্যক সিপাহী ছিল। হেষ্টেল আসিবার পূর্ব্বে যখন অরাজকতাই ছিল দেশের স্বাভাবিক অবস্থা, তখন নিমক-চৌকীর সিপাহী ও অন্যান্য লোকজনের অত্যাচারে ও উৎপীড়নের কোন প্রতিকারই হইত না। কিন্তু হেষ্টেল জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিবার পর নিমক-চৌকীর লোকজনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁহার গোচরে আসিতে লাগিল। হেষ্টেল অত্যাচারিত প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া নিমক-চৌকীর লোক জনের বিরুদ্ধে অবিরত অভিযোগ করিতেন; সময় সময় মানেজারের সহিত তাঁহার ঘটাঘটিও বাধিত। কোম্পানীর ব্যবসায়ের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোম্পানীর ভৃত্য হইয়াও হেষ্টেলের প্রজার পক্ষাবলম্বন কম সাহসের পরিচায়ক নয়। হেষ্টেলের প্রজার পক্ষাবলম্বন কোম্পানীর স্বার্থের বিরোধী হওয়ায় খুব বেশী ফল প্রসব করিত না। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া হেষ্টেল নিজেই নিমক-মহলের ভার গ্রহণ করিতে চাহিলেন। নিমক-চৌকীর মানেজারের সহিত হেষ্টেলের ক্রমাগতই বিরোধ উপস্থিত হইতেছিল দেখিয়া কোম্পানী হেষ্টেলের প্রস্তাবে রাজী হয় ও তদনীন্তন মানেজারকে বাখরগঞ্জে প্রেরণ করে। হেষ্টেল ভার গ্রহণ করিয়াই প্রচার করিয়া দিলেন যে, কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাদন লইতে বাধ্য করা হইবে না, বা জোর করিয়া কোনও প্রকারে লবণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত রায়মঙ্গলে প্রেরণ করা হইবে না। এতৎসহ আরও ঘোষণা করা হইল যে, প্রজারা স্বেচ্ছায় লবণ-কারখানার কাজ করিতে না চাহিলে লবণের কারবার তুলিয়া দেওয়া হইবে।

তৎকালীন যশোহর কোম্পানীর বস্ত্র-ব্যবসায়ের কেন্দ্র ছিল। জোলাদের নিকট দাদন দিয়া বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া চালান দেওয়া হইত। কোম্পানীর লোকেরা কতকগুলি জোলাকে চিহ্নিত করিয়া রাখিত—স্বেচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক তাহাদের কোম্পানীর কারখানের মত বস্ত্র বয়ন করিতে হইত। এই সকল জোলা কোন অবস্থাতেই অন্যলোকের নিকট বস্ত্র বিক্রয় করিতে বা নিজেদের ইচ্ছামত বস্ত্র বয়ন করিতে পারিত না। এমন কি ইহাদের উপর সরাসরি

ভাবে কোনও আইনও কার্য্যতঃ প্রযুক্ত হইতে পারিত না। কোম্পানীর চিহ্নিত কোলাদের ধন-প্রাণ সম্পূর্ণ ভাবে কোম্পানীর লোকজনের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিত। কোলাদের উপর কোম্পানীর লোকের অত্যাচার হেস্টেলের গোচরে আসিত—হেস্টেল যথাসাধ্য এই সকল অত্যাচারের প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিতেন এবং তজ্জন্য বস্ত্র-ব্যবসায়ের কেন্দ্রের কর্ম্মচারীদের সহিত বিরোধও তাঁহার লাগিয়া ছিল। কোম্পানীর লোকের কোলাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে হেস্টেল উচ্চতন কর্ম্মচারীর সহিত কোলাদের পক্ষ লইয়া বহু লেখালেখি করিতেন। কিন্তু, লবণের ব্যবসায় অপেক্ষা বস্ত্রব্যবসায় অধিকতর লাভজনক বলিয়া হেস্টেলের প্রতিবাদ বা লেখালেখির কোনও প্রত্যক্ষ ফল হয় নাই। যে সকল কারণে কোম্পানী পরে ভারতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, উহার মধ্যে যে জজ হেস্টেলের প্রজার পক্ষ লইয়া অন্যায় অত্যাচার ও প্রতিবাদের পরোক্ষ ফল রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বল্প আট বৎসরকাল যশোহরের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে ঘোর অরাজকতার মধ্যে হেস্টেল যেরূপ নির্ভীকতা ও সহিষ্ণুতার সহিত প্রজাদের পক্ষ হইয়া লড়িয়াছিলেন তাহাতে তিনি প্রজাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হেস্টেল যশোহরের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। হেস্টেল যশোহর হইতে বদলী হইলে রোক সাহেব যশোহরের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট হন। হেস্টেল যশোহরের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিবার সময়ই তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে সুন্দরবন পত্তন আরম্ভ করেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত দক্ষিণ বঙ্গে মগ ও ফিরিঙ্গিরা যে অত্যাচার উৎপীড়ন ও লুণ্ঠন চালাইয়াছিল তাহা মগ ও ফিরিঙ্গি নাম দুইটিকে দক্ষিণ বঙ্গে বিভীষিকাময় করিয়া তুলিয়াছিল। সুন্দরবনাঞ্চলের দ্বীপগুলির তো কথাই নাই, নদীপথে একশত মাইল পর্য্যন্ত দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মগ-ফিরিঙ্গিরা অত্যাচার চালাইত। মগ-ফিরিঙ্গিরা লুণ্ঠন ও গৃহদাহ তো করিতই, এমন কি বহু নর-নারী পর্য্যন্ত দাস হিসাবে লইয়া যাইত। যে গ্রামে মগ ও ফিরিঙ্গিরা প্রবেশ করিত সে গ্রামের পুরুষ কেহ কেহ পলায়ন করিয়া বাঁচিতে পারিলেও, যে কোন বয়সের স্ত্রীলোক হোক না কেন তাহার মুক্তি ছিল না। নিজেদের প্রয়োজনানুযায়ী ধৃত বন্দীদের রাখিয়া, অবশিষ্ট বন্দীদের বিক্রয় করিয়া ফেলিত। নদী-তীরবর্ত্তী বহু পুরাতন যে সকল গ্রাম দেখা যায়, সেখানকার অধিবাসীদের বসতির পরিকল্পনা দেখিলে মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার বঙ্গে কিরূপ বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। নদীর ঠিক তীরেই এই সকল অত্যাচারীদের প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত বঙ্গের শক্তিশালী উপজাতিদের বসবাস—তৎকালীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা নদী হইতে দূরে গ্রামের দূরে অপর প্রান্তে বসতি স্থাপন করিতেন। মগ-ফিরিঙ্গির অত্যাচারে বঙ্গের কত পল্লী যে শ্মশানে পরিণত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এককালে সুন্দরবনাঞ্চল ও ঝঞ্চোপসাগরের দ্বীপগুলি জনাকীর্ণ ছিল বলিয়া কাহারও কাহারও বিশ্বাস। কিন্তু কোম্পানী যখন দেওয়ানী লাভ করেন তখন সেগুলি জনশূন্য শ্বাপদপূর্ণ জঙ্গল মাত্র। খৃষ্টান ধর্ম্ম-যাজক মানরিক ফিরিঙ্গিদের পক্ষ হইতে আরাকান-রাজের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহাতেই উল্লেখ রহিয়াছে যে, এমনও বৎসর গিয়াছে যে সে বৎসর ফিরিঙ্গিরা বঙ্গ হইতে এগার হাজার পরিবারকে ধৃত করিয়া আরাকানে বসতি করাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঐ বৎসর দাস হিসাবে বহু বাঙ্গালী যে বিক্রীত হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মানরিকের বিবরণীতে অন্যত্র প্রকাশ, যে পাঁচ বৎসর কাল মানরিক আরাকানে ছিলেন তন্মধ্যে মগ-ফিরিঙ্গিরা ১৮,০০০ বঙ্গবাসীকে শুধু মাত্র চিট্টাগং ও ও অন্যান্য দুই স্থানেই ধৃত করিয়া আনয়ন করিয়াছিল। চট্টগ্রাম হইতে হুগলী পর্য্যন্ত কোনও স্থানই মগ-ফিরিঙ্গির লুণ্ঠনাভিযান হইতে মুক্ত ছিল না। বঙ্গের শাসন-কর্ত্তা শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম বিজয় কালে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মগ-ফিরিঙ্গিদের সাময়িক ভাবে দমন করেন। এখনও কোন দুর্দ্দমনীয় লোককে দমন করাকে বঙ্গ-ভাষায় 'শায়েস্তা করা' বলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মগ-ফিরিঙ্গির অত্যাচার কতকটা হ্রাস পাইল বটে কিন্তু, সুন্দরবনাঞ্চল দস্যু-তস্করাদির দুর্গ-সদৃশ হইয়া রহিল। এই সকল দস্যু-তস্কর কোম্পানীর শাসনকালে জোর করিয়া কোন বঙ্গবাসীকে ধৃত করিয়া দাসে পরিণত করিয়া বিক্রয় করিত

না বটে, কিন্তু মগ-ফিরিঙ্গির ভয়েই নদীপথে নদী-তীরবর্তী গ্রামসমূহে দস্যুতা, লুণ্ঠন, অগ্নিদাহ প্রভৃতি করিয়া বেড়াইত। হেস্টেল সাহেব দেখিলেন দুর্ধিগম্য বিস্তৃত সুন্দর বনাঞ্চলে দস্যুদমনে অভিযান প্রেরণ করিয়া সাময়িক ভাবে কোনও সুবিধা হইলেও দক্ষিণ বঙ্গের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা স্থায়ী ভাবে তদ্দ্বারা হইবে না। দস্যুদমনকল্পে হেস্টেল সুন্দরবনের পতিত জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি আবাদ করিয়া দীর্ঘ মেয়াদী করেণীদের উপনিবেশ স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন। তৎকালীন গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস হেস্টেলের প্রস্তাব অনুমোদন করিলে হেস্টেল কার্য্যে অগ্রসর হন। বালেশ্বর ও কালিন্দী নদীর মধ্যবর্ত্তী সুন্দরবন ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে নিজ তত্ত্বাবধানে জরিপ ও জমাবন্দী করেন ও ১৪৪টি তালুকের প্রতিষ্ঠা করেন। নূতন তালুকসমূহের শাসন ও কর সংগ্রহের নিমিত্ত তিনটি কেন্দ্র—পশ্চিমে হেস্টেলগঞ্জ, মধ্যভাগে চাঁদখালি ও পূর্ব্ব সীমায় কচুয়া—প্রতিষ্ঠিত হয়। সুন্দরবনাঞ্চল যে আজকাল বঙ্গীয় সরকারের একটি আয়ের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত তাহার মূলে রহিয়াছে হেস্টেলের এই প্রচেষ্টা। সুন্দরবনাঞ্চলে যেমন আবাদ প্রসারিত হইতে লাগিল, তেমনি বঙ্গে দস্যুদিগের উপদ্রব ও অত্যাচার হ্রাস পাইতে লাগিল।

হেস্টেলের পর রোক বশোহরের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট হন সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রোক হেস্টেলের সহকারীরূপেই প্রথম বশোহরে আগমন করেন। গবর্ণমেণ্টের সর্ব্ব বিভাগে সংস্কার করতঃ দেশের অরাজকতা দূরীকরণে রোক হেস্টেলের দক্ষিণহস্তরূপে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। সুতরাং জিলার ভার প্রাপ্ত হইয়া রোক হেস্টেলের নীতিই অনুসরণ করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে দেশ শাসনের সর্ব্ব বিভাগ সংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমান রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু, কর্ণওয়ালিসের সংস্কারের মূলে রহিয়াছে হেস্টেলের সংস্কার প্রচেষ্টা ও প্রজার হিত-সাধন-সঙ্কল্প। কর্ণওয়ালিসের শাসন-সংস্কার যখন বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন রোক বশোহরের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে অধিষ্ঠিত।

ইতিপূর্ব্বে ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর আমল হইতেই দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার সর্ব্বোচ্চ বিচারালয় হিসাবে কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত এই হিসাবে দুইটি প্রধান বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু, জিলায় দেওয়ানী মামলার বিচার করিতেন জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট ও ফৌজদারী মামলার বিচার করিতেন দারোগারা। এরূপ বিচার-ব্যবস্থা, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কতদূর সহায়ক হইয়াছিল সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কর্ণওয়ালিসের আমলে যে সকল শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তন্মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলার পক্ষে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'দারোগা' পদের অবলোপ। পূর্ব্বের ন্যায় জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট সামান্য ফৌজদারী মামলাসমূহের বিচার করিতে থাকেন; গুরুতর অপরাধের বিচার হইত সদর আদালতের অধীনস্থ প্রাদেশিক আদালতে। মোট চারিটি প্রাদেশিক আদালত গঠিত হয় এবং তৎকালীন সমগ্র বঙ্গদেশকে চারিটি এলেকায় বিভক্ত করিয়া প্রাদেশিক আদালতের অধীন করা হয়। প্রত্যেক প্রাদেশিক আদালতে চারিজন বৃটিশ জজ, আইনজ্ঞ হিন্দু ও মুসলমান কর্ম্মচারীর সহায়তায় নিজ নিজ এলেকায় ঘুরিয়া গুরুতর অপরাধের বিচার করিয়া বেড়াইতেন। জিলার পুলিস বিভাগ জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীন রহিল। দেওয়ানী মামলার বিচার অবশ্য জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটই করিতেন। হেস্টেলের সময় সময়াভাব বশতঃ জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটকে দেওয়ানী মামলা বিচারের ভার জমিদারের উপর অর্পণ করিতে হইত; কিন্তু এক্ষণে সে প্রথা রহিত হইয়া গেল; জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীন আমীন, সালিশ ও মুনসেফগণ জিলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেওয়ানী মামলার বিচার করিতে লাগিলেন।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও কর্ণওয়ালিস-শাসন-সংস্কারের সহিত আর একটি সংস্কারের উল্লেখ করা উচিত। হেস্টেলের পূর্ব্বে রাজস্ব বিভাগের আফিস ছিল কলিকাতায় (কোম্পানী যখন দেওয়ানী গ্রহণ করেন তখন অবশ্য এই আফিস ছিল মুর্শিদাবাদে; পরে হেষ্টিংস-এর আমলে এই আফিস কলিকাতায় উঠাইয়া আনা হয়)। কিন্তু, তৎকালে যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা থাকায় কলিকাতায় রাজস্ব বিভাগ থাকাতে মফঃস্বলে রাজস্ব সম্পর্কিত কার্য্য-পরিচালনায় বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিত। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম বশোহর জিলা গঠিত হয় এবং ঐ বৎসরই হেস্টেলের পরামর্শ ক্রমে এবং হেস্টেল ঐ বিভাগের ভার লওয়ার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেতন দাবী না করিতে স্বীকৃত হওয়ায় বশোহরে ঐ জিলার জন্য কালেক্টরেট বা রাজস্ব বিভাগ খোলা হয়; এবং হেস্টেলই প্রথম কালেক্টরের কার্য্যের ভার গ্রহণ করায় জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর পদ একসঙ্গে চলিতে থাকে। জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর পদে একই ব্যক্তি নিযুক্ত হওয়ার প্রথা ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু ঐ বৎসরই জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট পদ হইতে কালেক্টরের পদ স্বতন্ত্র করা হয়।

বিশ্রাম [ শ্রীঅজয় সেন

# বিজয়ী

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

## কৈকেয়ী চৌধুরাণী

অনেক রাত্রে বাসুদেবপুরের ঘাটে বজরা ভিড়িল। কৈকেয়ী ঘুমন্ত সুদেষ্ণাকে ঠেলিয়া বলিলেন, "ওঠ দিদি ওঠ—"

সুদেষ্ণা জাগিল না।

কৈকেয়ী আনন্দকে বলিলেন, "আমি এগিয়ে যাই, তুই ওকে নিয়ে আয়।"

কৈকেয়ী নামিয়া গেলেন। আনন্দ অনেক ডাকাডাকি করিল, টানাটানি করিল—কিছুতেই সুদেষ্ণার ঘুম ভাঙ্গিল না। চাঁদের আলো তাহার মুখে, মাথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শিথিল খোঁপা হইতে একটা ফুল খুলিয়া বালিশে পড়িয়া আছে। সেটি তুলিয়া সুদেষ্ণার চুলে বিঁধিয়া দিতে দিতে আনন্দ হাসিয়া বলিল, "হাজার টাকা দামের খোঁপা।"

আরও কয়েকবার ডাকাডাকি করিয়া শেষে বিরক্ত হইয়া আনন্দ বলিল, "এত ঘুম মানুষের!" তারপর কুঁজা হইতে একটু জল লইয়া সুদেষ্ণার দুই চোখে ছিটিয়া দিল। নদীর ঘুম ভাঙাইবার অব্যর্থ ঔষধ। নিমেষে আশ্চর্য্য ফল ফলিল, সচকিতে জাগিয়া উঠিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে সুদেষ্ণা বলিল, "কোর হয়ে গেছে?"

"হাঁ গো কুম্ভকর্ণা দেবী, এখন ওঠ শীগগির—"

"কেন? দিদি ডাকছেন?" সুদেষ্ণা বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। অমনি চোখ পড়িল খোলা জানালা দিয়া নদীর উপর—তখন হাসিয়া বলিল, "আমরা যে বাসুদেবপুর যাচ্ছি—"

"বুঝতে পেরেছ? চল, নামতে হবে।"

"দিদি, দিদি কই?"

"তিনি আগেই গেছেন।"

"আমায় ফেলে?"

"তুমি উঠলে না, কতক্ষণ থাকবেন? চল যাই।"

"তোমার সঙ্গে?"

"বিশ্বাস হচ্ছে না? ঠিক পৌঁছে দেব এস।" আনন্দ তাহাকে লইয়া ঘাটে নামিল। নদীর অস্ফুট কলধ্বনি পিছনে ফেলিয়া তাহারা চলিল, সামনে কাছারী-বাড়ী, তিনদিক্-ঘেরা বাগানের মধ্যে একতলা জ্যোৎস্না-ধোয়া বাড়ীটি।

সেই কাছারী-বাড়ীর একটা ঘরে দেবনাথ বসিয়া। বাসুদেবপুরের জন-প্রাণী জানে না যে, কৈকেয়ী আসিয়াছেন, এমন কি নায়েবও না। সে লোকের ঘরে ঘরেই লুকাইয়া থাকে। হয় তো বা টাকাগুলির কোন একটা ভাল সদ্গতির বিষয় স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করিতে করিতে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অকস্মাৎ মধ্যরাত্রে ম্যানেজারের তলব পাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কাছারী-বাড়ী আসিয়া হাজির হইল।

দেবনাথ কখনও চীৎকার বা গর্জ্জন করেন না। অত্যন্ত শান্ত-সুদৃঢ় স্বরে বলিলেন, "জেলে যেতে চাও?"

এমন সময় কৈকেয়ী দেখা দিলেন। সেই শুভ্র কঠিন পাথরের মূর্ত্তি দেখিয়া নায়েব একেবারে নির্ব্বাক আড়ষ্ট হইয়া গেল।

দেবনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কৈকেয়ী বলিলেন, "টাকা দিয়ে এস।"

কলের পুতুলের মত বোধ হয় নিজেরই অজ্ঞাতসারে নায়েব পা বাড়াইল।

"সঙ্গে লোক যাবে।"

নায়েব দাঁড়াইল।

কৈকেয়ীর আদেশের বিরুদ্ধে কিছু বলা উচিত বা ভাবা উচিত, সে-সব বিষয়ে নায়েব একেবারেই অন্ধ হইয়া গিয়াছে। অস্বীকার করিবে, নিজের পক্ষে একটা কথাও বলিবে, এমন কথা বা চিন্তা তাহার মনেও উঠিল না।

চারিজন বরকন্দাজ নায়েবের সঙ্গে গেল। একখণ্ড নূতন কাপড়ে বাঁধা একটা পুঁটুলি আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল।

দেবনাথ পুঁটুলিটা খুলিয়া ফেলিলেন। খুচরা পয়সা, সিকি, দুয়ানী, টাকা, মোট সাড়ে তিন হাজার টাকা গণিয়া লইলেন। যেমন চাহা পাঠাইয়াছে তেমনি রহিয়াছে। খুচরাগুলিও নোট বা টাকা করিয়া রাখে নাই।

সেগুলি সোণা হইলে পকেট হইতে বাকী দেড় হাজার টাকার নোট বাহির করিয়া সবশুদ্ধ একত্র বাঁধিয়া রাখিয়া দিলেন। কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন একে সদরে পাঠিয়ে দিই?"

কৈকেয়ী বলিলেন, "না; যাও কৃপতি বাড়ী যাও, সকাল-বেলা এস।"

নায়েব চলিয়া গেল। এবার আর সঙ্গে কেহ গেল না।

তার পরে সেই রাত্রে কাছারী হইতে অনেক বার অনেক লোক নানা জায়গায় যাতায়াত করিল। জানালায় বসিয়া দেখিয়া দেখিয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া সুদেষ্ণা ঘুমাইয়া পড়িল—কৈকেয়ীর দেখা আর পাইল না।

সকালবেলা। কাছারী প্রাঙ্গণে সতরঞ্চ বিছানো। প্রজারা জুটিয়াছে, বারান্দার একদিকে দেবনাথ ও কাছারীর কর্মচারীরা, তাঁহার পিছনে নায়েব দাঁড়াইয়া, অপর দিকে কৈকেয়ীর চেয়ার খালি রহিয়াছে। দেবনাথ নায়েবের হিসাব-নিকাশের কথা জানিয়া লইতেছেন।

এমন সময় কৈকেয়ী ভিতরের দিক্ হইতে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রজারা উঠিয়া দাঁড়াইল, কেহ ভূমিষ্ঠ প্রণাম, কেহ নমস্কার, কেহ বা হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

টেবিলের উপর পুঁটলিটা রহিয়াছে—দেবনাথ খুলিয়া নোটগুলি টেবিলের উপর ঢালিয়া ফেলিলেন। কৈকেয়ী বলিলেন, "তোমাদের সব টাকাই আছে, এবার মনে দুঃখ রেখ না।"

প্রধান প্রজারা বলিল, "না মা, আমাদের মালিক পেলেই আমরা খুশী।"

কৈকেয়ী বলিলেন, "তোমাদের মালিকের ইচ্ছা, এই টাকা তোমাদেরই কোন কাজে খরচ করা হয়। তার এখন টাকার তেমন কোন দরকার নেই।"

"সে কি মা, তিনি আমাদের দাদাবাবু, তাঁকে আমরা মালিক বলি নে, মালিক তুমি—তুমি যা করবে তাই হবে।"

"আচ্ছা তোমাদের কি এমন কোন দরকার নেই, যাতে এই টাকাটা দিয়ে কাজ হয়?"

"তা কেন মা, আমরা দাদাবাবুকে দিয়েছি ওটা, তিনি পেলেন না বলেই আমাদের রাগ—"

"তোমাদের কি দরকার, সেটা তোমাদের দাদাবাবুই ভাল বলতে পারবে—তাকে ডাকাচ্ছি—"

আনন্দ আসিল। রান্নাঘর হইতে নামিয়া উঠানে প্রজাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তার পরে কৈকেয়ীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "এদের অন্য কিছুর দরকার এখন নেই, শুধু মেয়েদের পড়বার একটা পাঠশালা চাই।"

কৈকেয়ী বলিলেন, "বেশ কে তার নেবে?"

আনন্দ মুখ ফিরাইয়া জনকয়েককে ইঙ্গিত করিল, চার-পাঁচজন যুবক সামনে আসিয়া মাথা নোয়াইয়া বলিল, "আমরা নিতে পারি।"

"আচ্ছা, টাকা নতুন নায়েবের কাছে জমা থাকবে, নিয়ে খরচ কর, একটা হিসাব রেখ। তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে কে বেশী লেখাপড়া শিখেছ?"

একজন প্রৌঢ় প্রজা একটি যুবককে দেখাইয়া বলিল, "এই, বি. এ. ফেল করেছে।"

"ফেল করেছে? আর পড়ে না?"

"না চাকরী করবে বলছে।"

"এগিয়ে এস, নাম কি তোমার?"

"ধর্ম্মদাস মণ্ডল।"

"তুমিই বাসুদেবপুরের নায়েব হও, সদরের নায়েব দু' এক দিনের মধ্যে আসবে, তোমায় কাজ শেখাতে, নামের মর্য্যাদা রেখ।"

ধর্ম্মদাস দূর হইতে কৈকেয়ীকে প্রণাম করিয়া সরিয়া গেল।

কৈকেয়ী ফিরিয়া ডাকিলেন, "কৃপতি।"

কৃপতি একটু আগাইয়া আসিল।

"এই তিনবার! তোমায় জেলে দেওয়া আমার উচিত ছিল, শুধু তোমার ছেলে-পিলের মুখ চেয়ে সেটা করলাম না। সদর নায়েবের কাছে হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে আমার এলাকা ছেড়ে চলে যাবে, তার পর যদি তোমায় দেখি, তখন দেখ। যাও এখন বাড়ী যাও, সবার সামনে থেকে চলে যাও।"

বারান্দা হইতে নামিয়া উঠানের এক পাশ দিয়া কৃপতি ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সকলে চাহিয়া দেখিল।

"এই তোমাদের দাদাবাবু, তোমাদেরই হয়ে গেছে, যা কিছু সুখ-দুঃখের কথা, মনের কথা সব খুলে বল ওকে।"

দুই হাত যোড় করিয়া কপাল ঠেকাইয়া কৈকেয়ী প্রস্থান করিলেন। হঠাৎ যেন বারান্দাটা খালি হইয়া গেল।

## নিরুপায়ের সঙ্গী

ভিতরে পা দিবামাত্র সুদেষ্ণা বলিয়া উঠিল, "ভাগ্যিস ঘরবার? ভাগ্যিস? খুব মেয়ে বটে! আমি যে একটা বাদী পড়ে আছি, তা মনেও নেই? মানুষ বলে মনে হয় না? নতুন জায়গায় এসে আমায় ফেলে মজা করে বেড়াচ্ছে! কাল রাত্তির থেকে আর দেখাই নেই—"

"বাপরে, কি দজ্জাল ননদ! এখুনি খাম, অত রণরঙ্গিণী হয়ে উঠেছিস কেন? বাড়ী ছেড়ে কোথাও তো যাই নি, আনন্দকে ডেকে পাঠাস নি কেন? তা হলে একা থাকতে হত না।"

"যাও যাও, আবার দেও আমায় দেখলে, দেখ তখন। যাও, এখন বাইতে যাও, আজ কে রেঁধেছে জান?"

"জানি, বামনী।"

"ইস্—আমি।"

"তাই এমন রাঙা মুখ? আগুন-তাতে বসে আগুন বেজায় হয়েছে।"

সুদেষ্ণা হাসিয়া বলিল, "যাও ঢেরি কর না, আমায় বেড়াতে নিয়ে যাবে কখন? দুপুরবেলা?"

"দিনের বেলা বেরতে পারছি নে, লোকে ভিড় করে দেখতে আসবে, ছেঁকে ধরবে, এমনটি তো দেখে নি কেউ, তারবে স্বর্গ থেকে অপ্সরা নামল বুঝি।"

"যাও যাও, কখন নিয়ে যাবে তবে?"

"সন্ধ্যার পর—জোছনা রাত আছে, বেড়িয়ে আরাম পাব। তা তুই এমন আটপৌরে হয়ে রয়েছিস কেন? ভাল শাড়ী পর, দুপুরবেলা পাড়ার মেয়েরা আসতে পারে।"

"তোমার তো এবেলারটা ওবেলা আটপৌরে হয়ে যায়, কত আর বদলাব? আবার বিদ্যুদি বললে, পরবার একটা বাক্সও এনেছ না কি? সে কিন্তু আমি পরবো না।"

"না পরলে কি হয়? মেয়েরা ভাববে, একটা বৌ তাকে কিছু দেয় নি।"

"তা বলে আমি সত্ত দেজে বসে থাকতে পারব না। গায়ে যা রয়েছে তাই ঢের বেশী, এর ওপর আরও?"—বলিয়া আঁচল উড়াইয়া চলিল। একবার মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিয়া বলিয়া গেল, "ঠিক আধ ঘণ্টা সময় দিলাম, আমার রান্না যেন জুড়িয়ে যায় না।"

অনেক কাজকর্মের ও গোলমালের মধ্য দিয়া কৈকেয়ীর দিন কাটিয়া গেল। এ-দিকে সুদেষ্ণা বেড়াইতে যাইবার আশায় আছে। কৈকেয়ীর সন্ধ্যাহ্নিক সারা হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে পাশের ঘর হইতে আসিয়া দাঁড়াইল। মনের সাধে সাজ-সজ্জা করিয়াছে, কৈকেয়ীকে খুশী করিবার পন্থা সে ভাল করিয়াই জানে। খোঁপা ঘিরিয়া তাহার সাদা ও হলদে ফুলের মোটা মালা, গলায় লাল ফুলের মালা, কানে, বাহুতে ও হাতে গোলাপী ও হলদে ফুলের গহনা। চিকণ রূপালী পেড়ে ঘন সবুজ রঙের শাড়ী, কপালে ছোট্ট সিঁদুরের টিপ। কৈকেয়ী হাসিয়া বলিলেন, "সাওতালনী এ বেশসজ্জা কার জন্যে?"

"তোমার জন্যে।"

"আমার যে একটু কাজ আছে, গ্রামের ক'জন মেয়ে আসবে, তারা কি বলবে?"

"তাই বলে আমি যাব না?"

"নিশ্চয় যাবি। আনন্দ, লক্ষ্মণকে একটু বেড়িয়ে আনতে পারবি?"

অন্যদিকের ঘরে আনন্দ ছিল, সেখান হইতে জবাব দিল, "বলা যায় না, বড় কঠিন কাজ।"

"রঙ রাখ, ওকে নিয়ে বেড়িয়ে আয়, বেশী দূর যাস নে, ওর-টর না পায় দেখিস।"

আনন্দ দরজায় দাঁড়াইয়া বলিল, "আসতে আজ্ঞা হয়।"

কৈকেয়ী বলিলেন, "যা।"

সুদেষ্ণা কিছু অগ্রসর মুখে ঘর হইতে বাহির হইল। কাছারীর পাশ দিয়া যে সোজা রাস্তা গিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া দুই জনে চলিল, খানিকটা চলিবার পরেই লোকালয় হইল বিরল এবং মাঠ-জঙ্গল দেখা দিল। চতুর্দশীর উজ্জ্বল জ্যোৎস্না, স্নিগ্ধ-বাতাসে গাছপালা দুলিতেছে, দুই তিনটা শিয়াল এদিক্ ওদিক্ ছুটিয়া গেল।

সুরেফা বলিল, "এদিকে বাড়ী ঘর কই ?"

"বাসুদেবপুর প্রায় শেষ, এ দিকে আর লোকজন নেই।"

"ও সব কি ? শেয়াল না ? ছুটোছুটি করছে কেন ?"

"সে কথা তো আমায় বলে নি ওরা।"

"শেয়াল ভারি পাজি, চল ফিরি।"

"এখনি ? আর একটু বেড়াই এস, ফিরবার পথে সুন্দর পুকুর আছে একটা সেইখানে বসি গে চল।"

দুইজনে ফিরিল। খানিক দূর আসিবার পর, দূর হইতে কান্নারী-বাড়ীর আলো দেখা গেল। পথ হইতে ডান দিকে কয়েক পা গিয়া একটা বড় পুকুর। বাঁধান ঘাট, নির্জ্জন, স্থির নির্ম্মল জলে চাঁদের আলো পড়িয়াছে। অপর পাড়ে এক বৃহৎ বাঁশঝাড় কৃষ্ণবর্ণ গম্ভীর রূপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আনন্দ বলিল, "বস এই চাতালে।"

"বসব ? যদি একা আসেন যে।"

"তাঁর কাছে এখন অনেক লোক রয়েছে" বলিয়া আনন্দ হাসিল।

"বস বস, আমার কাছে বসলে তোমার মানহানি হবে না।"

বসিতে গিয়া সুরেফা চট্ করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল, "আমি বলেছি মানহানি হয় ?"

"তবে বলতে চাইছ না কেন ? যদিও তোমার সঙ্গে আসতে আমার লজ্জা হয়, তবে রাতে আর কে দেখতে আসছে।"

"কি ? লজ্জা হয় ?" ভ্রুকুটী করিয়া সুরেফা আর একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

"নাঃ, তুমি কেবলি উল্টো বুঝবে, চেয়ে দেখ না কেন ? তোমার সঙ্গে মানায় আমায় ? লোকে দেখলে ভাববে, রাণীর সঙ্গে খানসামাটা।"

এবার সুরেফা বসিয়া বলিল, "তোমায় তো কেউ চেনে না। তাহলেই হলো ?"

বলিতে বলিতে বাঁশঝাড়ের মধ্যে গম্ভীর শব্দে পেঁচা ডাকিয়া উঠিল। ভয় পাইয়া সুরেফা আনন্দের কাছে সরিয়া আসিল। রাত্রিবেলা এমন নির্জ্জন পল্লীতে সে আর কখনও আসে নাই। পেঁচার ডাক ঘরে বসিয়া এরকম শোনায়, কিন্তু মুক্ত প্রান্তরে হঠাৎ শুনিলে আর একরকম শোনা যায়। অদ্ভুত গম্ভীর রব।

আনন্দ বাঁ হাতে সুরেফাকে বেড়িয়া ধরিয়া বলিল, "এত ভয় ? বীরত্বটা বুঝি ঘরের ভেতর।"

সুরেফা সগর্ব্বে মুখ উঁচু করিয়া বলিল, "কে বললে ভয় পেয়েছি ?"

কিন্তু সরিয়া গেল না। ভয় পাইয়াছে সেটা আনন্দকে বুঝিতে দিবার ইচ্ছা ছিল না, অতর্কিতে সরিয়া কাছে বসিয়াছে।

গাছে গাছে পাখীরা একসঙ্গে প্রহর ঘোষণা করিয়া উঠিয়া আবার নিস্তব্ধ হইয়া গেল। এবং অকস্মাৎ পুকুরের তিন দিক্ হইতে যেন দলে দলে শিয়াল প্রাণপণে তীক্ষ্ণ চীৎকার করিয়া উঠিল, কোথা হইতে হঠাৎ বাহির হইয়াছে প্রহর ঘোষণা করিতে, দলে দলে দাঁড়াইয়া কর্ত্তব্য পালন করিতেছে ! স্পষ্ট দেখা গেল, বার কয়েক ডাকিয়া আবার তাহারা আগের মত লুকাইয়া পড়িল।

এবার সুরেফা চমকিয়া উঠিয়া আনন্দের বাঁ হাত জড়াইয়া ধরিয়া আরো ঘেঁসিয়া বসিয়াছে। জ্যোৎস্নালোকে সুরেফার মুখের দিকে চাহিয়া আনন্দের বড় মায়া হইল, কেমন ভীরু পাখীটির মত আত্মসমর্পণ করিয়া আশ্বাস খুঁজিতেছে, অথচ অন্য সময়ে প্রবল প্রতাপে সকলকে সে অস্থির রাখে। আনন্দ কি ভালবাসে না সুরেফাকে ? এমন সুন্দরী, এমন সুশিক্ষিতা, এমন সুগায়িকা, এমন সুসজ্জিতা স্ত্রী পাইলে কে না ধন্য হয় ? কিন্তু ইহাদের কথা আলাদা। নিতান্ত শিশু বয়সে বিবাহ হইয়াছে ছেলেখেলার মত, দুই জনে সমবয়সীর মত ঝগড়া, বিবাদ করিতে করিতে বাড়িয়া উঠিয়াছে; এখন একে অন্যকে পরাস্ত করিয়া নিজের অধিকার স্থাপন করিতে চায়, সে হিসাবে সুরেফাই হইয়াছে জয়ী। দুই জনে যেন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, আধপ্রহর একে অন্যের ওপর উদ্যত হইয়াই থাকে, মিত্র ও চৌধুরীদের সিংহ ও শিকারীর মত। মধুর নবীন প্রেম ইহাদের অন্তরে কোন্ নিভৃত প্রদেশে লুকাইয়াছে যে, খুঁজিলেও সন্ধান মেলা দুষ্কর। তবে বোধ হয় বেশী সুরেফার, অসহিষ্ণু স্বভাব, খেয়ালী মন, অভিমানী প্রকৃতি। আনন্দের ছল-পরিহাসে নিমেষে জ্বলিয়া ওঠে, আনন্দ ভাল কথা বলিলেও তার মনে হয় বুঝি ঠাট্টা করিতেছে।

তাই এ-হেন গর্ব্বিতা স্বাধীন-স্বভাবা স্ত্রীটি যখন আপনা হইতেই ধরা দিয়া ফেলিল, শিয়ালের ভয়ে, যদিও প্রেমের

প্রেরণায় নহে, তবুও বলিষ্ঠ পক্ষ-পুটে সাগ্রহে তাহাকে ঢাকিতে কার না ইচ্ছা হয় ?

এক হাতে সুদেষ্ণাকে ঘিরিয়া ধরিয়া, অন্য হাতে সুদেষ্ণার হাত ধরিয়া, আনন্দ হাসিয়া বলিল, "এত ভয় কেন ? ওদের কাজ শেষ করে পাঠিয়ে দেছে। ভগবানের ঘড়ি ওরা, ঠিক সময় রাখে, চিরদিন—চিরকাল।"

কালো আকাশের তারার মত উজ্জ্বল চোখ দুটি আনন্দের দিকে তুলিয়া সুদেষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "ভুল হয় না কোন দিন ?"

"না, শীতে, গ্রীষ্মে, ঝড়ে, বৃষ্টিতে কখনো ওরা কর্ত্তব্য ভোলে না। সমস্ত পশু-পক্ষীর সময়ের জ্ঞান একেবারে বাঁধা, শুধু মানুষ ছাড়া। যারা জ্ঞানের বড়াই করে, যারা ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—সেই মানুষ, ঘটা করে সময়ের নাম দিয়েছে, ছড়া বাঁধে, উপদেশ দেয়, সময়ের মূল্য বোঝায়! কিন্তু কাজের বেলা কি পশু-পক্ষীর সঙ্গে পারে ? মানুষ ছাড়া, জগতের সমস্ত ছোট-বড় প্রাণী, সেকেণ্ড-মিনিট-ঘণ্টা হিসেবে প্রকৃতির দাস, সময়ের নাম রেখেছে অক্ষুণ্ণ।"

সুদেষ্ণা চুপ করিয়া শুনিল, মনে মনে আনন্দের কথাগুলি মিলাইয়া দেখিল। ঠিক কথাই তো, পাখীরা ঠিক সময়ে জাগিয়া ওঠে, ডাকে, নীড় ছাড়িয়া বাহির হয়, আবার নীড়ে ফেরে, প্রহরে প্রহরে ঘোষণা করে—সব নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা। রাত্রে কি কোন মানুষ ঠিক ঠিক সময়ে আপনা হইতে জাগিয়া উঠিতে পারে ? অথচ নির্ব্বোধ ইতর প্রাণী গভীর রাত্রেও দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রহরে নিজের কাজ করিয়া চলিতেছে, সে কাজ শুভ-মুখর বিশাল বিশ্ব জানুক বা না জানুক।

চাঁদ উঠিল মাথার উপরে, রাত্রি বাড়িয়া চলিয়াছে। পল্লীর ঘরে ঘরে আলোক নিভিতে শুরু করিল, শুধু কাছারী-বাড়ীর আলোটা উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছে।

আনন্দ বলিল, "কটা এসেন্সের শিশি আজ খালি করেছ ?"

সুদেষ্ণা বলিল, "কেন ?"

"এত সুগন্ধি তোমার সর্ব্বাঙ্গে ? কালই বোধ হয় দোকানে লোক ছুটবে! তা বাসুদেবপুরে আবার দামী জিনিস পাওয়া যায় না, সেই হচ্ছে মুস্কিল।"

সুদেষ্ণা হাসিয়া বলিল, "তোমার একটুও বুদ্ধি নেই, সব ফুলের গন্ধ।"

"ওঃ তা বটে, তা বটে, চার রকম ফুলের গন্ধ এক সঙ্গে মিশে এসেন্স হয়ে উঠেছে!"

পথ হইতে বিন্দুর গলা শোনা গেল, "দাদাবাবু, ও দাদাবাবু।"

দুই জনে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিন্দু কাছে আসিয়া বলিল, "তোমরা এই খানে ? আমি পথ থেকে দেখতে পেয়েছি, চিনতে পারি নি বলে ডাকলাম।"

আনন্দ বলিল, "আমাদের খুঁজতে এসেছ ?"

"না, কোথা তোমরা—কোথা খুঁজবো ? ছোট বউয়ের বাড়ী ঐ যে, পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি, দেখি না কারা বসে—তাই ডাকলাম। শশীও এসেছে, তা পায়ে কাঁটা ফুটে ঐ যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হ্যাগা বৌদি, কর পাও নি তো ? যে জোয়ালো মানুষের কাছে রয়েছ! দিদিমা যে বিশ্বাস করে দাদাবাবুর সঙ্গে তোমায় ছেড়ে দিয়েছে, সেই আশ্চর্য্য।" বলিয়া বিন্দু হাসিতে লাগিল।

আনন্দ সুদেষ্ণার হাত ধরিয়া বলিল, "আগে যাচ্ছ কেন ? ঐ বাঁশঝাড়টার কাছ দিয়েই যেতে হবে, তারপর তোমায় দিদির কাছে পৌঁছে দিতে পারলে আমি এখন বাঁচি।"

## কেশব ও রুক্মিণী

( উদ্যোগ-পর্ব্ব )

বাড়ী ফিরিয়া কৈকেয়ী দেখেন কেশব জ্বরে অজ্ঞান। বলিলেন, "হঠাৎ এত জ্বর কেন হল?"

রুক্মিণী বলিলেন, "মাস খানেক ধরে কেবলি রাত জেগে লেখেন, বারণ করলে শোনেন না।"

"বুঝেছি ঐ লেখা-পড়াতেই ও মাটী হয়ে গেল, আবার একটা বই আরম্ভ করেছে বুঝি ?"

"এবার আবার কবিতা লিখছেন।"

"আরও ভাল! কাব্য-রোগ ধরেছে ? এত জ্বর, আমায় খবর দাও নি কেন ?"

"আমি দিতে চেয়েছিলাম, বারণ করলেন, বললেন, 'মা তো আসছেনই, শুধু কেন তাঁকে ব্যস্ত করা'।"

প্রায় মাসখানেক ভুগিয়া কেশব বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেন, ডাক্তারেরা উপদেশ দিলেন, হাওয়া বদল করিতে।

কেশব সে কথায় কোন কাণ দিলেন না। কৈকেয়ী বলিলেন, "কেশব শরীরটা খেলা-কেলার জিনিস নয়, জোরজার করলে তুই ভাল করবি নে; দিন-রাত ঘরের কোণে থাকলে কি শরীর থাকে? ডাক্তারেরা বলছে অত করে, বেড়িয়ে আর না কিছু দিন।"

কেশব হাসিয়া বলিলেন, "সামনে পুজো, পুজোর আগে কি বাড়ী ছেড়ে যেতে আছে মা?"

"তা হলে পুজোর পর যাবি?"

"তুমি যাবে?"

"আমি কি যখন-তখন বাড়ী ছেড়ে বেরতে পারি? নানা গোলমাল লেগেই আছে, তোরা তো কিছু দেখবি নে, কেলেছিস সব আমার ঘাড়ে, তোদের জন্যেই তো আমি বাঁধা। তুই আর যৌনা যা—"

"তা দেখা যাবে পুজোর পর।"

রুক্মিণী এক সময় বলিলেন, "কেন তুমি বাইরে যেতে চাও না, কি শরীর কি হল বুঝতে পার না?"

"কিছু না, বাড়ী ছেড়ে আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না।"

"মা যা বলেন, ঠিক কাবিা-রোগে ধরেছে এবার।"

"সত্যি রুক্মিণী, এই ঘরটা ছেড়ে যেতে না হলে তোমাদের সব কথাই আমি শুনতাম।"

"তোমার এই টেবিল ও চেয়ারটা তো? সঙ্গে নিলেই হল।"

"না, বাইরে দেখেছি মনটা এমন ঠিক থাকে না।"

কেশবের অনিচ্ছা দেখিয়া রুক্মিণী আর কিছু বলিলেন না।

কিন্তু মাস খানেক পরেই কেশব আবার ঘরে পড়িলেন। সমস্ত আশ্বিন মাসটা বিছানাতেই কাটিল।

ডাক্তারেরা এবার রীতিমত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন, অগত্যা কেশব রাজী হইলেন, যাত্রা তিথি—শুক্লা প্রতিপদ, স্থান—ঘাটশীলা।

যাত্রার আগের দিন কোজাগরী পূর্ণিমা। রুক্মিণীর উপরে পূজার ভার। সুদেষ্ণাও তাঁহার সঙ্গে উপবাস করিয়াছে এবং বৈকাল না হইতেই আল্পনা দিতে বসিল।

সকাল বেলা আনন্দ আসিয়াছে, বলিল, "দিদি, বাবার সঙ্গে কে কে যাচ্ছে?"

কৈকেয়ী বলিলেন, "বাঙ্গালী যাবে, আর যাকে যাকে দরকার বৌমাকে বলেছি নিতে।"

"আমিও যাব।"

"তুই যাবি তোর কাজ ফেলে?"

"কাজ তো রইলই, বাবার সঙ্গে বেড়িয়ে আসি।"

মনের কথা প্রকাশ করা আনন্দের স্বভাব নয়। কৈকেয়ী একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা বেশ," মনে মনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

"যাকে দেখছ তো? ওরেই আধখানা হয়ে গেছে—তুমি সবাইকে আঁচল চাপা দিয়ে দিয়ে এমনি করে ফেলেছ যে বাড়ীর বাইরে এক পা যেতে কারও সাহস নেই।"

"তা আমার সঙ্গে ছাড়া ওরা কখনও বাইরে যায় নি, তয় একটু হবে বই কি—আমি বিশু আর শশীকে যেতে বলেছি।"

বিশু ঘরেই বিছানা ঝাড়িতেছিল। সে বলিল, "আমাদের নেবে না মা, বললে, 'তোরা গেলে মার কষ্ট হবে'; নেত্য আর চন্দ্রকে নিলে, সরকার মশাই কাল সকালে ওদের বদলী দু'জন এনে দেবে।"

নিত্য, চন্দ্র নীচের বিভাগের মধ্যে দুইজন। বাঙ্গালী কেশবের অনুচর। আনন্দেরও একটি নিজস্ব অনুচর আছে, নাম জীবন। আনন্দ তাহাকে নিজের দলে ভর্তি করিয়াছে এবং কাজের ভার মাথায় চাপাইয়া দিয়া সকলের রাখিয়া আসিয়াছে।

ঘর হইতে বাহির হইয়া আনন্দ চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল, সুদেষ্ণার আল্পনা দেওয়া প্রায় শেষ। প্রত্যেক ঘরের সামনে এবং সিঁড়ির মাথায় আল্পনা দেওয়া, আল্পনাও অভিনব! দুইদিকে দুইটি ধানের শীষ, তার পরে আর দুইটি শঙ্খ, মাঝখানে একজোড়া করিয়া চরণ-চিহ্ন। সিঁড়ির মাথার চিহ্নগুলি যেন নীচ হইতে উঠিয়া আসিয়া দাঁড়াবো—ঠিক সেইভাবে আঁকা। ঘরের সামনের পরিষ্কার গৃহ প্রবেশোদ্যত ভঙ্গীতে।

আনন্দ বলিল, "দিদি, ব্যাপারটা কি? মা লক্ষ্মী একা-চুকছেন তো দেখি সব ঘরেই, বেরুচ্ছেন না তো? বেরুবার মত

পায়ের ছাপ দেখছি যে যে? না বেরলে সব ঘরে ঢুকছেন কি করে? এ কি আল্‌পনা, না হেঁয়ালী?"

সুদেষ্ণা তখন কেশবের ঘরের সামনে আল্‌পনা দিতেছে, কথাটা শুনিতে পাইয়াই মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া বলিল, "কি বুদ্ধি! মা লক্ষ্মীকে না কি ঘর থেকে বেরতে দেয় কেউ?"

আনন্দ হাসিয়া উঠিল, "বা! বা! কি ভক্তি! ভক্তির চোটে মাকে একেবারে বেঁধে ফেলার ব্যবস্থা! আহা, এমন পূর্ণিমার রাত, আর মা কি-না ঘরের ভেতর বন্দিনী! মেয়েটি বড়ই লক্ষ্মী কি-না তাই সব অত্যাচার সয়ে যান। যদি বুদ্ধি থাকত একটুও, তা হলে আর এ ফাঁদে পা দিতেন না, তা যতই না কেন শ্রীপাদপদ্ম আঁকা হোক—কি নারিকেল-চিপিটকের আয়োজন হোক।"

পিছন হইতে কৈকেয়ী ঠেলা দিয়া আনন্দকে সরাইয়া দিলেন, "ওর সঙ্গে লাগতে এলি কেন? সারাদিন উপোস করেছে, দু'ঘণ্টা ধরে আল্‌পনা দিচ্ছে, এর পর পুজোর কাজ আছে, তোর মতন তো ও নিষ্কর্মা নয়।"

ততক্ষণ সুদেষ্ণা কেশবের পড়িবার ঘরের দরজায় আল্‌পনা দিতে বসিয়াছে। জানালার কাছে চেয়ারে শুইয়া কেশব একটা বই পড়িতেছেন, রুক্মিণী স্নান করিয়া একটু ব্যস্ত হইয়াই ঘরে ঢুকিলেন, কেশবকে ঔষধ দিয়া পূজার দিকে যাইবেন। ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, না দেরী হয় নাই।

কেশব বলিলেন, "আজ কোজাগরী, রাত্রি জাগতে হয়, আমার লেখা তো বন্ধ করেছই, যদি পড়তেও না দাও তবে আমি কিছুতেই রাত জাগব না।"

রুক্মিণী হাসিয়া বলিলেন, "অসুখ শরীরে রাত জাগবে কে বললে?"

"বরাবর জেগেছি আজ কেন জাগব না?"

"না, তোমাকে জাগতে হবে না।"

"তা হলে তোমার মতলব কি? আমায় ঘরে ফেলে রেখে 'অক্ষক্রীড়ায়' বসে যাবে?"

"অক্ষক্রীড়া মেয়েদের খেলা নয়, পুরুষের। কিন্তু কোন দিন তুমি খেলেছ কি? লিখেই তো রাত জেগেছ, না? আমরা বরাবর দশ-পঁচিশ খেলি, এবারও তাই খেলব।"

"তা হলে আমি ছাদে গিয়ে বসে থাকব, হিম লাগাব।"

"পূর্ণিমার জোছনায় সারারাত থাকলে 'চন্দ্রাহত' হয় জান?"

"সেও ভাল—তবু আমি একা বিছানায় থাকতে পারব না।"

রুক্মিণী ইসারা করিয়া সুদেষ্ণাকে দেখাইলেন, সুদেষ্ণার মন আল্‌পনার দিকে, অন্য দিকে খেয়াল নাই। কেশব উঠিয়া বসিয়া দেখিলেন, বলিলেন, "ওটা কি হচ্ছে ছোট-মা?"

"আল্‌পনা দিচ্ছি বাবা, মা লক্ষ্মীর পদ-চিহ্ন।"

"সর্ব্বনাশ, সরস্বতীর মন্দিরে লক্ষ্মীর প্রবেশ? দু'জনে ঝগড়া বাধাবি না কি? মহা মুস্‌কিলে ফেললি যে?"

"কিন্তু মুস্‌কিল না বাবা, কে বলে ওঁরা ঝগড়া করেন? মানুষ নিজের স্বভাব নিয়ে দেব-চরিত্র আঁকে। কেউ ঝগড়া করতে দেখেছে?"

"নিশ্চয় কেউ না কেউ দেখে থাকবে—নইলে লেখে কেন? মা যদি ঘরে ঢুকেই আমার খাতা-পত্র ঝেঁটিয়ে সাফ করেন, তবে ঠেকাবে কে?"

সুদেষ্ণা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, "বাবা তোমার কিছু ভয় নেই, মা আরও আশীর্ব্বাদ করবেন, যাতে বেশী লিখতে পার। দেখ নি যে কত লোক গরীব, খেতে পায় না, সেই লিখতে আরম্ভ করেছে—ভাগ্যি ফিরে গেল। 'লেখা-পড়া করে যেই, গাড়ী-ঘোড়া চড়ে সেই।' সরস্বতী দয়া করলে লক্ষ্মীও দয়া করেন" বলিয়া পিটুলি গোলার পাত্র লইয়া প্রস্থান করিল।

কেশব বলিলেন, "বেটি কথা কয় পণ্ডিতের মত।"

রুক্মিণী হাসিয়া বলিলেন, "বরং বল যে মার মত কথায় সুর ধরেছ, ঠিক যেন মা।"

"তা হলে কি ঠিক করলে তুমি? আমি একা ঘরে ঘুমোব আর তুমি রাত জাগবে?"

"তোমার হল কি? নাও ওষুধটা খেয়ে ফেল, আমি যাই। রাত তোর হয়ে যাবে কাজকর্ম মিটতে—কিছু গোছ-গাছ করি নি যাবার, বাকী রাতটুকু সেইগুলো করব, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক।"

পথের দিশা

পর দিন সকাল হইতেই কেশবের যাত্রার আয়োজন শুরু হইল। কেশব বরাবর অনাড়ম্বরপ্রিয়, শান্তিপ্রয়াসী। কিন্তু কৈকেয়ী সে-ভাবে যাইতে দিবেন কেন?

সুদেষ্ণা মলিন মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সুখদা খবর পাইয়া রুক্মিণীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিল, উপরে উঠিতেই সুদেষ্ণার সঙ্গে দেখা, কি একটা জিজ্ঞাসা করিল সে, কিন্তু সুদেষ্ণা কোন জবাব দিল না।

এক সময়ে রুক্মিণী তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "অমন মুখ করে রয়েছিস কেন?"

"আমি তোমায় কত কষ্ট দিয়েছি মা, তুমি কখনও রাগ কর নি—"

"কি কষ্ট দিয়েছিস?"

"কি না দিয়েছি? কথা শুনি নি, রাত্তিরে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, তুমি ডেকে ডেকে হয়রাণ হও তবু উঠি নে—"

বিন্দু কাপড় গুছাইয়া বাক্সে ভরিতে ভরিতে জবাব দিল, "তা বললে কি হবে, যে তোমার ঘুম, কাণের কাছে ঢাক পেটালে ভাঙে না! তিরিশ দিন বিদিয়া তোমায় আগে খেতে বলে, তিরিশ দিনই তুমি না খেয়ে শোবে! টেনে তুলে বসালেন তো মুখ গোঁজ করে রইলে, তুমি খাও না বলে মাও খায় না, বলে ও না খেয়ে রইল—আমি কি করে খাই।"

সুদেষ্ণা বিন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া নিজের স্বভাব বর্ণন শুনিল, তার পরে রুক্মিণীকে বলিল, "তবু তুমি বলছ কষ্ট দিইনি?"

"কষ্ট কি মা? একটি মেয়ের সাধ ছিল আমার, তোকে দিয়ে ভগবান তা মেটালেন, তুই যে কষ্ট দিস সেও ভাগ্যি।" বলিয়া তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করিলেন।

"যা, ওঁকে ওষুধ দিয়ে আয়, অমন মন-মরা হয়ে থাকিস নে, তোর ও-মুখ দেখায় না।"

কত কাজ—কত ব্যস্ততা, তবু রুক্মিণী সুদেষ্ণার চুল বাঁধিতে বসিলেন, জানালা দিয়া দেখিয়া লইয়া আনন্দ বলিল, "মা ঘরে একবার এস দেখি, ও-সব বাজে কাজ রাখ।"

অমনি সুদেষ্ণা রুক্মিণীর হাত চাপিয়া ধরিল, "না তুমি কিছুতে উঠতে পাবে না, আমার চুল বাঁধা বাজে কাজ। উনি ডাকছেন সেইটে বড় খাটি! মাকে তো নিয়েই চললেন, একটু আমার কাছে থাকবে তাও সয় না?"

সন্ধ্যার পরে কেশবের ঘরে কিছু ভিড়, ডাক্তারেরা, দেবনাথ, কৈকেয়ী আছেন। সুদেষ্ণা ঘরের এ-দিক্ ও-দিক্ কিছুক্ষণ ঘুরিল, শেষে কৈকেয়ীর ঘরে গিয়া বসিল।

আর একদিক দিয়া আনন্দ ঢুকিল সেই ঘরে, ঘরে কেহ নাই ভাবিয়া ফিরিতে গিয়া হঠাৎ চোখ পড়িল কোণের দিকের একটা জানালায় বসিয়া সুদেষ্ণা কি সেলাই করিতেছে। মুখের একটা পাশ দেখা যায়, আঁচলটা মাটিতে লুটানো। ডানদিকের লাল রেশমী ব্লাউজের অংশটা এবং রুক্মিণীর হাতে বাঁধা প্রকাণ্ড সুন্দর খোঁপাটা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

আনন্দ আর একটু কাছে সরিয়া আসিল। তখন সুদেষ্ণা মুখ তুলিয়া চাহিল, কোন যুদ্ধের ভাবের লক্ষণ নাই, বড় বিষণ্ণ মুখ।

নিমেষে আনন্দের মুখে কৌতুক-রেখা ফুটিল, বলিল, "এ কি? মলিন মুখ, ছলছল চোখ কেন? আমার বিরহে?"

"কিসের বিরহ?"

"আমি চলে যা'চ্ছি যে।"

"তাতে আমার কি?"

"ওঃ অভিমান, অভিমান। এতক্ষণ আসি নি রাগ হয়েছে, তা তুমি অত মন খারাপ কর না—আমি ছ'তিন দিন পরে পরে চিঠি দেব।"

"আমি চাই নে তোমার চিঠি।"

"আমি দেবই।"

"আমি পড়বই না, খুলবও না।"

"তবু দেব।"

"ঠিকানা কেটে ফেরৎ পাঠাব।"

"তবু লিখব।"

নিরুত্তরে সুদেষ্ণা চোখ ফিরাইয়া লইয়া সেলাইয়ে মন দিল।

"কি সেলাই হচ্ছে দর্জি-মশায়?"

"বাবার কম্ফর্টার বোতাম।"

"আমার এই জামাটার বোতাম ছিঁড়ে গেছে, খুলে দি, সেলাই করে দাও।"

"আমার বরে গেছে—"

"উঃ কি নিষ্ঠুর। আজ আমি চলে যাচ্ছি কত দূরে—কত দিনের জন্যে, তা বলে একটু মায়াও নেই, পাষাণী! সাক্ষাৎ পাষাণী, শিলারূপিণী!"

সুদেষ্ণার আজ বিবাদে মন নাই। চুপ করিয়া সে বোতাম সেলাই করিতে লাগিল।

আনন্দ আর একটু কাছে আসিয়া বলিল, "আমার সময় নেই, কতকগুলো কাজ আছে চললাম, রাত্রে সোবা-পড়া হবে তখন—"

"রাত্রে আমি এই ঘরে শোব।"

"এই ঘরে? কেন? কি আমার অপরাধ?"

"আমার ইচ্ছে।"

এমন সময় বারান্দায় রুক্মিণীর গলা শোনা গেল—আনন্দ তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল।

রুক্মিণী বাহির হইতেই ডাকিলেন, "লক্ষ্মণ, উনি ডাকছেন।"

কেশব শুইয়া আছেন, কৈকেয়ী কাছে বসিয়া, আর কেহ নাই। সুদেষ্ণা কাছে আসিল, "কি বাবা?"

"এখানে আয়।"

সুদেষ্ণা কেশবের কোলের কাছে ঘেঁসিয়া বসিল। শিশু বয়স হইতে সকলের কোলে কোলে সে বাড়িয়া উঠিয়াছে, আদুরে মেয়ের মত। কেহ তাহাকে বসু বলিয়া ডাকে না—সে নিজেও না।

কেশব তাহার পিঠে শীর্ণ হাতটি রাখিয়া শ্রান্তভাবে বলিলেন, "একটা গান শোনাবি?"

"শোনাব, কোন্‌টা গাইব বল।"

"সেই, যে একদিন গেয়েছিলে—আমার মনে নেই, আলোটা নিবিয়ে দাও আগে।"

আলো নিভাইয়া দিয়া সুদেষ্ণা ফিরিয়া আসিয়া বসিল। অন্ধকার ঘরে তাহার গানের সুর উঠিল ধীরে ধীরে—

"আমারে এই আঁধারে এমন করে ডাকায় কে গো?
আমি বুঝতে নারি, বলতে নারি, চিনতে নারি কিছুই যে গো
হায় গো আমি চিনতে নারি
কিছুই যে গো!"

কেশবের কপালে হাত রাখিয়া কৈকেয়ী বালিশে ভর দিয়া বসিয়া আছেন, নিঃশব্দে রুক্মিণী আসিয়া পাশের জানালায় বসিলেন। বাহিরের আলোর রেখাগুলি জানালার ফাঁকে ফাঁকে ঘরে ঢুকিয়া মেঝেতে যেন আলপনা আঁকিয়াছে, ঘরের বাতাস ধূপ-সুরভি। টিক্ টিক্ শব্দে ঘড়িটা শুধু জানাইতেছে,—সময় অবিরাম বহিয়া চলিয়াছে।

কেশব এক হাতে কপাল টিপিয়া ধরিয়া আছেন, অপর হাত মায়ের কোলে। কেশবের সবল উন্নত দেহ রোগে শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, নিতান্ত নির্ভরশীল শিশুর মত মায়ের কাছে শুইয়া রহিয়াছেন।

ঘরময় গানের সুর তরঙ্গে তরঙ্গে ঝঙ্কার তুলিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে—

"মনে হয় চিরসাথী
একলা আলোতে বসি, ঘুমিয়ে রাতি,
নতুন করে দেখা যে গো!
আমারে এই আঁধারে—"

যেন কোন ক্লান্ত পথহারা অন্ধকারে হতাশভাবে দিশা খুঁজিয়া ফিরিতেছে, আশ্বাস ভরসা চাহিয়া ব্যাকুল প্রার্থনা করিতেছে। সেই অদৃশ্য অসহায়ের উন্মনা আকুল মিনতির বিশ্রান্ত করুণ রাগিণীতে ঘর ভরিয়া গেল, সমস্ত কক্ষের বায়ু যেন এক অপরূপ আবেগভরে থম্ থম্ করিতেছে। ধীরে ধীরে কেশবের হাতখানি কৈকেয়ীর কোল হইতে বিছানায় লুটাইয়া পড়িল। কেশব একেবারে নিশ্চল ও নিস্পন্দ—যেন গভীর ঘুমে মগ্ন।

[ ক্রমশঃ

# প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে শিল্প-প্রসঙ্গ

—শ্রীস্বদেশরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

বাঙ্গালা দেশ চিরদিনই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা। অল্পচিন্তায় বাঙ্গালীকে পৃথিবীর অপরাপর জাতির মত যাযাবর-বৃত্তি গ্রহণ করিতে হয় নাই। তাহারা গৃহে শান্ত শীতল ছায়ায় বসিয়া নানাবিধ শিল্পবিদ্যার অনুশীলন করিয়া জাতীয় সংস্কৃতিকে পরিবর্দ্ধনশীল করিয়া তুলিয়াছিল। তাই বাঙ্গালীর প্রাচীন শিল্পসম্পদ বিশ্বের বিস্ময়-স্থল। তথাপি বিশ্বের কয়টি জাতি আজ বাঙ্গালার শিল্পসম্পদের সেই বিচিত্র কাহিনী অবগত আছে? তাহার একমাত্র কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন: "বাঙ্গালার ইতিহাস রচিত হয় নাই। যাহা হইয়াছে তাহা বাঙ্গালীর কলঙ্কের ও দাসত্বের কথা—নিছক উপকথা।" সত্যই বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের ইতিবৃত্ত মহাকালের ন্যায় মহাকালরূপিনী বর্ত্তমানের পদতলে মূর্চ্ছিত রহিয়াছে।

প্রাচীন বাঙ্গালার শিল্পসম্পদ প্রসঙ্গে প্রাচীন লোকদের মুখে আমরা নিত্য কত কথাই না শুনিয়া থাকি, কিন্তু কোন দিন অনুসন্ধান করি নাই, করিবার প্রবৃত্তি ও ধৈর্য্য আমাদের নাই। কালপ্রবাহে আমরা স্রোতের তৃণের মত ভাসিয়া চলিয়াছি। প্রাচীন বাঙ্গালার শিল্পীগণ, কি নগরপত্তন, কি সেতুবন্ধন, কি জাহাজ-গঠন, সর্ব্ববিষয়ে সুনিপুণ ছিল। বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্যগুলিই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও গৃহাদি নির্ম্মাণ-শিল্পের কলা-কৌশল দেখিতে পাই। কালকেতু ঘোর অরণ্য কাটিয়া নগর পত্তন করিবার জন্য বিশ্বকর্ম্মার শরণাপন্ন হইয়াছেন।

ভগবতী বিশ্বকর্ম্মাকে আদর্শ নগর-পত্তনপ্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

"মোর ভক্ত বিপাই করহ অন্বেষণ।
মহাবীরের ঘোড়া পুরী করহ নির্ম্মাণ।"

অতঃপর নির্ম্মাণ-কার্য্য যথারীতি আরম্ভ হইয়া গেল।

"আশাস তুলিল এক ক্রোশ পরিমাণ।"
... ... ...
"বিশ্বকর্ম্মা নিরমিয়া দিলেন কোদাল।
আড় দিকে দশ গণ্ডা প্রমাণ বিশাল।"

এই বার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর গঠন প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন,—

"এমন প্রাচীর দিল হৈল চারিপাট।
বাইটি পাথরে তার দিল বন্দবাট।
তালতরু-সম উচ্চ কলিল প্রাচীর।
পাথরের ঘাওয়া দিল হনুমান বীর।"

গৃহসজ্জা প্রসঙ্গে দেখিতেছি,—

"খড়্গালা রচিয়া অধি আরোপিলা কাঠ।
চারি হালা খড় দিয়াই হয় চারি পাট।
পুরীর ভিতর ভক্ত চারি চতুঃশালা।
মাঝে আটচালা পিড়া বান্ধে দিয়া শিলা।"

অন্তঃপুর ও অভ্রাসনবাটীর গঠন-নৈপুণ্য বিষয়ে কবি-কঙ্কণ প্রাচীন বাঙ্গালার শিল্প-জ্ঞানের চরম পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন—

"অন্তঃপুরে সরোবর করিল নির্ম্মাণ।
পাষাণে বান্ধিল তার বাট চারি খান।
উত্তরে খিড়কি দিংহদ্বার পূর্ব্বভাগে।
পাষাণে রচিত পাকশালা চারিভাগে।
সাতার কক্ষে দিয়াই বরাইল সুতা।
ইন্দ্রনীল পাষাণে রচিত হৈল পোতা।
সপ্তম বয়সে ছোলে চণ্ডীর খেউল।
পাষাণে লিখে দিয়াই হয়ে অনুকূল।
নানারত্ন দিয়ে তথি রচিল পিড়িকা।...

উপরি উক্ত বর্ণনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, কালকেতু যে-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা মহাবীরের ঘোগ্য পুরীই বটে। এক ক্রোশ পরিমাণ তাহার আওয়াস। তাল গাছের মত উঁচু প্রাচীর তাহার চারি পাশে বেষ্টিত। বাইটি পাথর দ্বারা তাহা সুগঠিত। খড় দিয়া সে ঘর ছাওয়া হইয়াছিল। পুরীর ভিতর চতুঃশালা বর্ত্তমান। মধ্যস্থানে আটচালা। অন্তঃপুরে দীঘিও খনিত হইয়াছিল। দীঘির ঘাট পাষাণে বাঁধান। উত্তরে খিড়কীর সিংহদ্বার ও পূর্ব্বদিকে পাষাণ নির্ম্মিত পাকশালা। সাতার বস্ত্রের ঘর। ইন্দ্রনীল পাষাণ দ্বারা তাহার ভিত্তি সুদৃঢ় করা হইয়াছিল। সাত মহলায়

চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। তাহাতে বিভিন্ন রকমের চিত্রের প্রতিলিপি খোদিত করা হয়। লঙ্কাপুরীর সৌধমালার সহিত উপমিত হইলেও এইপ্রকার গঠন-নৈপুণ্যে বাঙ্গালার নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পূর্ণরূপেই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

কালকেতু কর্তৃক গুজরাট নগর পত্তনকালেও শিল্পিগণের এই প্রকার শিল্পজ্ঞানের পরিচয় পাইতেছি। অবশ্য গুজরিন দেখিয়া নগরের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। কবি বলিতেছেন,—

"সুবর্ণ কার্ত্তিকমাস ঈষৎ তেজল আকাশ।"

অতঃপর দেখিতেছি,—

"শিল্পগুরু একচিত  পাষাণে ঘটিল ভিত
থিরি সথ ঘটিল বিলয়।
চারি ডৌহী চতুঃশালা  মাঝে পিঁড়ি কাঁচ ঢালা
পাষাণে ঘটিল নাচঘাট।
নির্ম্মাণ করয়ে রথি  রূপে জিনি ধারাধরী
পাষাণে পুরট কপাট।
আগুয়াসের পূর্ব্বদিগে  বিচিত্র কদলী বৈসে
সারি সারি বিদ্রুম খেটল।
বিল্ব বীরা নীলা খণ্ডী  খচিতে বিদ্রুম পিণ্ডি
অবল বিজলী সমতুল।
সাগরাসে দুর্গা মেলা  তার কাছে নাটশালা
সিংহদ্বার পূর্ব্বে ঝলমল।
বিচিত্র উদ্যান ভাগে  কলটুঙ্গি তার আগে
প্রতি বাড়ী ফুলের সকল।
নগর চত্বর মাঝে  শিবের মন্দির সাজে
অনাবরণ ভাতশালা।
বাপাড়ে জলের তরে  পাষাণ মন্দির করে
প্রবাসী জনের তৃষি মেলা।
পশ্চিম দিকেতে সেহ  তুলিল অমল গৃহ
ঘাটাল বসুমিত্র নাম ঘোষে।
সুবর্ণা কোমল শালা  তুলিল ভক্তশালা
যিনি চাখে ঘাতী তথি বান্ধে।
কাষ্ঠ আসে তার বোঝা  সুবর্ণার পোড়ায় পাঁজা
তাহে ইট করয়ে নির্ম্মাণ।
দিয়া হীরা নীল খণ্ড  নির্ম্মাইল দোলপিণ্ড
কনক কামল সরিধানে।"

প্রাচীন বাঙ্গালার এই শিল্প-নৈপুণ্য মনোরম স্থাপন বিন্যাসের একত্র সুন্দর সমাবেশ দেখিলে আধুনিক কালে স্থাপত্য-শিল্পের যে চরম উৎকর্ষসাধন হইয়াছে এই কথা মন হইতে বিদূরিত হইয়া যায়। শুধু শিল্পজ্ঞানের বিষয় বলিয়াই নহে, বাসভূমির পরিকল্পনার পূর্ব্বেই প্রাচীন বাঙ্গালীরা "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্" এই তিনটি প্রসঙ্গ ভাবিয়া দেখিতেন। সত্য অর্থাৎ স্থায়িত্ব, শিবম্ অর্থাৎ জনসমাজের কল্যাণকামী, দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, সুন্দরম্ অর্থাৎ সুশোভন।

প্রাচীন বাঙ্গালার "প্লান" সম্বন্ধে গুজরাট নগরীর বর্ণনাকালে কবিকঙ্কণ বলিতেছেন,—

"পাথরের ঝড়  পাথরের গড়
বসুধা পুরট পোতা।
মধ্যে মধ্যে মণি  যেন দিনমণি
চারিদিকে করে আভা।"

উজানী নগরের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ অনুরূপ কথাই বলিতেছেন,—

"উজানীর কথা  গড় খাদি ভিতা
চৌদিকে বেটড় বাঁশ।
রাজার সাবন্ত  বাহি পায় অন্ত
যদি ভ্রমে চারি মাস।
ভিতে বান্ধে গাঢ়  পাথরের গড়
কাঙ্কর পুরট পোতা।
পাথরে খিচনী  যেন দিনমণি
চারিদিকে ক'রে শোভা।"

অতঃপর কবিকঙ্কণ আর একটি অভিনব শিল্পের কথা বলিতেছেন—শিল্পের নির্ম্মাণ-সপাণী।

"গড়ে কারিগর  সুবর্ণ-শিল্পর
দেখিবারে মনোহর।
মুক্ত সারি সারি  অতি মনোহারী
গড়ে চতুঃশালা ঘর।
খালি হরতাল  আটটে কাজল
চারিভিতে স্বর্ণ চাড়।
সুবর্ণ ঘর  দেখিতে সুন্দর
পাখী বসিবার দাঁড়।
তাতে স্বর্ণ খারি  অতি পরিপাটী
সোণার পড়িল থাল।
হীরকের বাটি  হীরা দিয়া সেটি
চৌদিকে সোণার জাল।

ধূর্ত্ত কলস দেখিতে রূপস
বিচিত্র পটাকা ছিড়ে।
কর্ণে কণাট অতি বড় আঁট
বিচিত্র করিয়া পড়ে।"

ধুল্লনার ঋতু-গৃহে পদীকাদানের নিমিত্ত, কবিকঙ্কণ ঋতু-গৃহের গঠন-প্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন। ঋতু-গৃহ-গঠনের জন্য সওদাগর প্রতি নগরে কারিগর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কেহই সাহস করিয়া অগ্রসর হয় না। সাধু তখন নগরে নগরে ঘোষণা করিলেন যে, যে কারিগর ঋতুগৃহ নির্ম্মাণে সমর্থ হইবে সে শত পল সোনা পুরস্কার পাইবে।

যথাসময়ে দুইজন কারিগর আসিয়া ঋতুগৃহের গঠনকার্য্য আরম্ভ করিল। কবিকঙ্কণে দেখিতে পাই,—

"ভাক দিয়া আনে যত নগরের বড়ি।
সাহানাই কন্দে দিলাই টাঙ্গাইল দড়ি।
সাত হাত খাদ খোড়ে দেখিতে সুন্দর।
চৌরে বেওয়াল দিল অতি মনোহর।
চৌরের আড়া, চৌরের পাড়ী চৌরের কপাট।
চৌরে সাঁড়ক দিল চৌরের ঘনকাট।
চৌরের ভাটনি দিল চৌরের রাজনি।
ষোল পাট দিয়া কৈল চৌরের ছাটনি।
চৌদ্দ নির্ম্মাইল ঘর দিবার।
ফেলা দুই কারিগর রাজার গোচর।"

অতঃপর কবিকঙ্কণ নৌকাগঠনের প্রণালী বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহল গমনে ডিঙ্গার প্রয়োজন। ধুল্লনা শ্রীমন্তকে ডিঙ্গাগঠন প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

"যদি পত কারিগর পড়ে এক কলস
তবে হয় ডিঙ্গা একখান।
করিতে ডিঙ্গার সাজ কেবল ঘরের কাজ।"

সমুদ্রে ডিঙ্গার গতিবিধিসম্পর্কে দেখিতেছি,—

"আ ডিঙ্গি নির্ম্মিল আগে প্রাণীড়ঙ্গিল
তবু যায় পড়েক যোজন।
কি করে ঠেকে গিয়া পড়ে ডুবে লয় ডিঙ্গা
সেই যায় সঙ্কটীজন।
সাগরে যাইবে যারা সে পথে না জীয়ে তারা
পরাণ সঙ্কট লোকা যায়।"

যথাসময়ে কোটাল ঘোষণা করিয়া দিল যে, সপ্তডিঙ্গা নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইবে, তাঁহাকে শত পল স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হইবে। বিশ্বকর্ম্মার পুত্র বাঙ্কবর্ম্মা নৌকাগঠনার্থ সাধুর নিকট উপনীত হইলেন।

অতঃপর ডিঙ্গাগঠন প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ বলিতেছেন,—

"দেব কারু বিশ্বকর্ম্মা তার পুত্র বাঙ্কবর্ম্মা
শিরে ধরি চণ্ডিকার পায়।
এ চারি প্রহর রাতি আসিয়া কুতের ঘাতি
সাত ডিঙ্গা করয়ে নির্ম্মাণ।
হনুমান মহাবীর নখে করে দুই চির
কাঠালে পিয়াল পাল তাল।
গাছারী জমান তরু নখে বিদারিল গরু
বাঙ্কবর্ম্মা গড়য়ে পয়াল।
শীলে শানাইয়া বাসি পাটী চাহে রাশি রাশি
নানাফুলে বিচিত্র কলস।
পিতাপুত্র যোড়ে আঁট পয়ালে গাঁথিল পাটী
ঘড় ডিঙ্গা দেখিতে রূপস।
প্রথমে করিল লঙ্ক দীর্ঘে ডিঙ্গা শতগজ
আড়ে ঘড়ে বিংশতি প্রমাণ।
মকর আকার মাথা গজমুকুতার দাঁতা
মাণিকে করিল চক্ষুদান।
ঘড়ে ডিঙ্গা মধুকর রাজধানে দুই ঘর
পাশে গুয়া বসিতে কাণ্ডার।
দুলারি বসিতে পাইল উপরে বালুয় কাঠ
শিরে ঘড়ে মাণিক আড়ার।
ঘড়ে ডিঙ্গা সিংহমুখী নাম যার ভগবতী
আর ডিঙ্গা নামে লক্ষ্মী।
অপরূপ রূপ সীমা ঘড়ে ডিঙ্গা চণ্ডীমা
গড়িল সকল মহাকায়।
ঘড়ে ডিঙ্গা সর্ব্বমঙ্গা হীরামুখী চন্দ্রকলা
আর ডিঙ্গা নামে নাটশালা।
চারিয়া কাঠাল পাল ঘড়ে ঘত কেরোয়াল
ডিঙ্গা গিয়ে করিল যুকুলা।"

প্রাচীন বাঙ্গালার শিল্পীর শিল্প-সম্পদ আত্মপ্রকাশ করিবার পর তাহাকে ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শুভদিনের জন্য অপেক্ষা করা হইত। এ সম্পর্কেও তাহার অন্যথা হয় নাই। কবিকঙ্কণ বলিতেছেন—

"শুভযোগ মুখশিরা যোগমূলে দেব হীরা
আসা ঘড় রবি শনিবার।
বণিক ধনপতি সিংহ বাণিজ্যে করণ ইচ্ছি
ইহা বিনে যাত্রা নাহি আর।"

কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য "শিবায়ণ" কাব্যে লাঙ্গলাদি চাষের সজ্জা নির্ম্মাণ প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

"ঈশ্বরীর ইচ্ছায় কিশাই পায় পড়ে।
লাঙ্গল জুয়ালি মই সব দিল গড়ে॥
পাল পাতি শূল ভাঙ্গি সজ্জা কর বসি।
জোয়ালি কোয়ালি ভাল দা উখুর পাখী॥
ফুলে করে শূলে ধরে তৌলিল তখন।
ঠিক সাড়া হৈল খাড়া রূপ দশ মণ॥
পাঁচ বোপে পাণী কড়ি আনী বোপে দাম।
দু বোপের দু জুয়ালি অর্দ্ধেকে জোয়াল॥
দশ বোপের দা অষ্ট বোপের উখুর।
দুই দশ বোপে দেখ করিয়া একুর॥
বন্ধ করি বান্ধয়ালে জাঁয়া দিল জোয়া।
পাবকে ফেলিতে প্রেত চিতায়ার ধারা॥
দশ হাতে সাঁড়াসিতে শূল নিল ধরে।
ধীরু পাতু ঘনে ঘুড়া আড়ম্বর করে॥
ভীষণ ভৈরব জাঁতা জাঁতে হাতে পায়।
যে ভাঙ্গা আড়া তাকে হাঁকে উচ্চরায়॥
ঘড়ঘড়ে ঘুর করে বিলেক বিস্তর।
কোস কোস করে জাঁতা ফুকরে আগুন॥
অন্তে পুড়ি ভস্ম করে যেবাই উপর।
উদর পর্ব্বতে কেন শোভে দিবাকর॥
দশনে অধর চাপি চপ্ চপ্ পিটে।
ঘন্ ঘন্ ঘামানল দশদিক ছুটে॥
বড়ঙ্গ ভুলে পাড়ে যেন ঘুমঘোরে।
ঘর ঘর দেহ ঘেরে পড়ে কাল ঘাম॥
কর্ম্ম করি কামিলা করিল যাই যাই।
সারা দিন পিটে শূল দাগ বসে নাই॥"

কোন ক্রমেই শূল ভাঙ্গিতে চাহে না। অতঃপর রসায়ন-বিদ্যাপ্রভাবে শূল দ্রব করাইয়া ব্যবহার-উপযোগী করিয়া লইতে হইল। সমসাময়িক যুগে রসায়ন-বিদ্যার প্রচলন কিরূপ উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল পাঠকগণ তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন।

চাষের সজ্জা প্রস্তুতকরণ প্রসঙ্গে কবি রামেশ্বর শূল গলাইবার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

"বৈকর্ত্তী কিশারি বিষ্ণু হল কৈল ধূল।
যেকালে দ্রবে তবে দ্রব হয় শূল॥"

অতঃপর কারিগর,—

"জোলুবে বেজ্‌না ঘুড়ি ফুকে রাখে আগ।
ঈষ ধরে পাণী ফেরে পরাইল ফাল॥
বাট দিয়া জোয়ালে জোয়ালি দিয়া দলি।
পুরস্কার পেয়ে চলে লয়ে পরধূলি॥"

অযোধ্যা নগরের গঠন-শিল্পসম্পর্কে কবি রঘুনন্দন 'রামরসায়ন' কাব্যে লিখিতেছেন,—

"যাজন যোজন যৈছে প্রয়াগ তাহারে।
অতি অনোহর চির যোজন বিস্তার॥
দৃঢ়তর দুর্গ দেখি দুরীহ দুরন্ত।
সাগর গভীর গড় খাত নাহি অন্ত॥
অতি উচ্চ পুরট পাচীর ভালে ভাল।
চতুর্দ্দিগে চতুর্ব্বারে কপাট বিশাল॥"

... ...

"লক্ষ লক্ষ হর্ম্ম্য ঘর যমযুগ দুয়ার
উজালা গোশালা সে কত॥
অপূর্ব্ব সভার স্থান নানা মণি নিরমাণ
ঝাটিকের গুম্ভ সারি সারি।
মধ্যে রাজ সিংহাসন ঝলমল রবিগণ
কিবা শোভা করিতে না পারি॥
সরোবর স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব উদ্যান বনে
তার মধ্যে বিচিত্র প্রাসাদ।
কিবা হেটকের চয় দেবগণ কত রয়
দেখি মনে হয় সেই প্রসাদ॥
কিবা সে বিচিত্র বাড়ি পুরট পাচীর বেড়ি
পক্ষীপক্ষী লঙ্ঘিতে না পারে।
দুই ধার দুই দিগেতে মণির কপাট তাতে
তারে দ্বারী দুরন্ত দীকারে॥"

রাজধানী নির্ম্মাণ ও তাহার শোভা সম্পর্কে একমাত্র রাজাকে ধন্যবাদ দেওয়া কখনও চলিতে পারে না। রাজা তো শুধু মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করিতে পারেন। যদি দেশের মধ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কারিগরের সন্ধান না মিলে তাহা হইলে রাজা অর্থ দিয়া কোন উদ্দেশ্য সাধন করিবেন? কারিগর ও শিল্পীর দক্ষতাই একমাত্র রাজধানী প্রভৃতির গঠন-কার্য্যে ধন্যবাদ পাইবার উপযুক্ত পাত্র। এই কারণে স্থাপত্য-শিল্পের দিক্ দিয়া শাজাহান অপেক্ষাও তাজমহলের শিল্পী বিশ্বের হৃদয়ে আবহমানকাল অমর হইয়া রহিবেন। অযোধ্যাপুরীর বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি রঘুনন্দন তাঁহার 'শ্রীরামরসায়ন' কাব্যে উপরি-উক্ত যে "প্লান" অঙ্কিত করিয়া জনসাধারণের চক্ষুর

সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা একমাত্র বাঙ্গালী কবি ও শিল্পীরই যোগ্যতার চরম পরাকাষ্ঠা। মহানগরীর উপযুক্ত প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের এই প্রকার মনোরম সন্নিবেশ বিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল মধ্যাহ্নেও সসঙ্কোচে দৃষ্টি-পথে পতিত হয় না। তাজমহলের শিল্পীর মত যোগ্য শিল্পী কি বর্ত্তমান বিজ্ঞান-জগতে আবির্ভাব হইয়াছে? আমাদের পক্ষে সত্য সত্যই ইহা কি অথৈই প্রাপ্তার বিষয় নহে?

কবি রঘুনন্দন বর্ণিত 'শ্রীরামরসায়ন' কাব্যে কিষ্কিন্ধা-পুরীর নির্ম্মাণকুশলতা প্রসঙ্গেও শিল্পীগণের অসাধারণ কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

"কিবা সে কিষ্কিন্ধাপুরী অতিশয় মনোহারী
পর্ব্বতের গুহার ভিতর।
বিশ্বকর্ম্মা বিরচন অতিশয় সুঠাম
আকাশ বিস্তৃত অট্টালিকা।
মণিময় পুরদ্বার স্বর্ণের কপাট তার
রাজপথ অতি সুশোভন।
কল যেন ইন্দ্রধনু বেন হয় পর্ব্বতের
কত জাতি কে করে গণন।
বিদ্যা রত্ন বিরচিত হাট-সভা সুশোভিত
অতি রমনীয় রাজধানী।
স্থানে স্থানে উপবন কুসুম মল্লিকাসন
কত সরোবর পরিপাটী।
দিব্য ঘাট দিব্য হাট দিব্য ঘর ক্ষুদ্র ঘাট
কে শোভা কি করিব বর্ণন।"

উদ্ধৃত অংশ হইতে দেখা যাইতেছে, যে, পর্ব্বতের গুহামধ্যে কিষ্কিন্ধানগরীর নির্ম্মাণকুশলতা সম্ভব হইয়াছিল। রাজপথের দুই পার্শ্বে বৃক্ষমালার অবস্থিতি বর্ত্তমান যুগের "পার্ক" বা "অ্যাভেনিউ"র মত শোভা পাইত।

সুগ্রীব রাজার মন্দির-ভবনের শিল্পপরিকল্পনাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কবি লিখিয়াছেন,

"কিবা সে রম্য ভবন বিশ্বকর্ম্মা বিরচন
স্ফটিক পাষাণে সুঘটিত।
স্বর্ণ বিমোহন অতি মধ্যে বিরাজ যিনি
জন্ম মরে নর জন্ম চিত্ত।
চারি দিকে পুষ্পবাটী দেখি অতি পরিপাটী
নানা মণি খচিত প্রাঙ্গণ।
নীল মণিময় স্তম্ভ শত শত অবিলম্ব
নানা মণি খচিত সোপান।
স্বর্ণ-কাঁপা কলসন নানা বর্ণ সুশোভন
উপরেতে বিরাজে সুবর্ণ।
অন্য রাজ সিংহাসন মণিমুক্তা সুশোভন
বিচিত্র আসন তদুপর।"

অতঃপর স্বর্ণলঙ্কাপুরীর গঠন-নৈপুণ্য সমসাময়িক যুগের সর্ব্ববিধ শিল্পকেন্দ্রকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে,—

"সভাযীপ সিন্ধুনীরে ত্রিকূট সুন্দর ধরে
তিন শৃঙ্গ সোভা করে তার।
তার মধ্য সুশোপরি রহিয়াছে লঙ্কাপুরী
দীর্ঘ যার শতেক যোজন।
ত্রিংশৎ যোজন যার রহিয়াছে সুবিস্তার
যার তুলা না হয় বর্ণন।
বাহিরে পরিখা অতি বিস্তীর্ণ সুগভীরবতী
অগাধ রয়েছে তার জল।
তাহাদের পরিষ্কার অতি উচ্চ সুবিস্তার
লৌহের প্রাচীর চারিধারে।
চারিদিকে চারিদ্বার লৌহের কপাট তার
রক্ষক আছয়ে তার দ্বারে দ্বারে।
সেই চারি দ্বার আগে পরিখা উপরি ভাগে
চারি সাঁকো অতি মনোহর।
নানা অস্ত্র তারে আছে শত্রুলোক গেলে কাছে
তারা ভুবে জলের ভিতর।
লৌহের প্রাচীর পরে গিরি আর কথোদূরে
শিলার প্রাচীর সুবিস্তীর্ণ।
তেমই পিতল কাঁসা তার রৌপ্য স্বর্ণ বাসা
পঞ্চ রঙ্গে পাঁচ বর্ণ ভিত্তি।
সাত খণ্ড এই মতে রাক্ষস বিবাস তাতে
গৃহ সব স্বর্ণ নির্ম্মিত।
স্থানে স্থানে সরোবর উপবন মনোহর
নানা মণি খচিত পঙ্কজ।
তারে রাজপথ চারি ক্ষুদ্র পথ সারি সারি
কত চতুরাস্তা কত স্থানে।
কত স্থানে মহাবট ক্ষুদ্র মাঝে রথ
অল্প গৃহ না যায় গণনে।
অন্য রাক্ষসের বাটী কি করিব পরিপাটী
ইন্দ্রপুরে যে করে বিহার।
যে পুরীর দক্ষিণেতে বহু গিরি পরভাগে
সুবেল তাহাতে শোভে তায়।"

লঙ্কাপুরীর এই অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ-কুশলতা ও পারিপাট্য-প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিও দৃষ্টিগোচর হয়। শত্রুদের বিনাশের জন্য বিবিধ মারণ-যন্ত্রও তৎকালে স্থাপিত হইয়াছিল—

"সাজা যন্ত্র তাহে আছে শত্রু লোক দেখে কাছে
তারা ডুবে জলের ভিতর।"

অন্যত্র রাবণের বাটী প্রসঙ্গে কবি লিখিতেছেন,—

"অগাধ গভীর জল বিকসিত শতদল
বিলাস করিয়া চারিধারে।
অতি উচ্চ হেমময় প্রাচীর চৌদিকে রয়
পক্ষী যারে লঙ্ঘিতে না পারে।
নীলমণি কৃত দ্বারে প্রবাল কবাট তারে
শোভা যেন বিচিত্র কোরক।"

রাবণের পুষ্পকবিমানের প্রসঙ্গে দেখিতে পাই,—

"কিন্তু সেই বিমান অত্যন্ত চমৎকার।
হয় কোশ দীর্ঘে কোশমূলে বিস্তার।
স্বর্ণ বিরচিত মণিগণ বিরচিত।
নাহি হয় অতি উচ্চ নহে অতি নীচ।
সর্ব্ব ঋতু সুখময় ইচ্ছা অনুসারে।
যত লোকে ইচ্ছা করে পারে বসিবারে।"

এ ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে রাবণের পুষ্পকবিমান এমন অপূর্ব্ব ধাতুসমূহের একত্র সমাবেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল, যাহাতে নাতিশীতোষ্ণতার অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছিল। প্রাচীন যুগের শিল্পীর বৈজ্ঞানিক দক্ষতার পরিচয় এই সূত্রে পাওয়া যায় না কি?

এই পুষ্পকবিমানে আরোহণ করিয়া পবননন্দন রাবণের অন্তঃপুরের শোভা ও গঠন-কুশলতা নিরীক্ষণ করিয়া চমকিত হইয়াছিলেন। তৎপ্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন,—

"চৌদিকে প্রাচীর তার স্বর্ণ-বিরচিত।
অতিশয় উচ্চ যত মণিতে জড়িত।
হীরার কবাট তায় যাহাতে শোভয়।
মণির কিঙ্করে যত দিয়া সারাধয়।
যত স্থানে আছে কত পক্ষ উপবন।"

হয়া সবতনে কারুর গঠন
যেন শিল্পী সুচতুর।
স্বর্ণ জড়িত অতি উচ্চ ভিত
রচিত রত্নময়।

স্ফটিক ভিতর স্ফটিক পাথর
পাতিয়াছে সুচিকণ।
শুভ্র পাটি পাতি অতি মনোহারী
সোপান সুখকর।
কিবা শোভাময় উপরি বিতান
হয়ে আলা ঘর ঘর।
পালঙ্ক সুন্দর তাহার উপর
তুলী অতি সুকোমল।"

অলকাপুরীর গঠনকলা-প্রসঙ্গে কবি রঘুনন্দন বলিতেছেন,—

"কিবা মণি সুবর্ণে রচিত সে নগর।
বিশ্বকর্ম্ম বিনির্ম্মিত পরম সুন্দর।"

অতঃপর সাগর বন্ধন কালে প্রাচীনযুগের "ইঞ্জিনীয়ারিং" বিদ্যার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। নানাবিধ সুদৃঢ় বৃক্ষ, বিভিন্ন শিলা, প্রস্তরখণ্ড দ্বারাই সেতু বিনির্ম্মিত হয়,—

"তবে সেই বানরীয় বানর নিকর।
আনিতে লাগিল বৃক্ষ শিলা খণ্ডবর।
কেহ আনে শাল কেহ অর্জ্জুন তমাল।
কেহ ঘট সপ্ত কেহ সুউচ্চ রসাল।
জম্বীর অশ্বত্থ চম্পু কেতক চম্পক।
গুবাক নারিকেল আম্রাতক।
অশোক কিংশুক শমী শিরীষ মন্দার।
বহুল বাকুলী বেত্র আদি কত আর।
কেহ আনে নানাবিধ শিলা মনোরম।
নীল সিত রক্ত পীত বিচিত্র বরণ।
সেই সেতু করি যত দেবের বিস্ময়।
বান্ধিতে লাগিলা সবে সাগর মাঝায়।
দেখিলাম বড়ই আশ্চর্য্য তারে এক।
ভাসিয়ে জলেতে শিলা গিরি পাষাণক।
এমন পাষাণ গিরি কুত্রাপি না হয়।
সকলের বা হয় ইহা সমুদয়ে নয়।"

স্থাপত্যশিল্পীগণ কিন্তু নলের শিল্প-চাতুর্য্যেরই প্রশংসা করিবেন। আমরা দেখিতেছি সেতু নির্ম্মাণ করিতে মাত্র মাসাধিককাল ব্যয়িত হইয়াছিল, কি সুন্দর দক্ষতা ও প্রাণ-পরিকল্পনা।

"সেই সেতু একমাসে সম্পূর্ণ হইয়া।
লঙ্ঘা হৈল বন্ধিলেন কূলেতে যাইয়া।

পুনরায় রাবণের পুরীর শিল্পচাতুর্য্য-বর্ণনা প্রসঙ্গে বিভীষণ রামকে লঙ্কাপুরীর যাবতীয় "ভৌগোলিক অবস্থান বলিয়া দিতেছেন।

"দেখ দেখ বায়ুবেগে ধায় ধাওয়া চারিভিতে
অনন্ত প্রভার যার বাতি।
হারদের পরিখায় অতি উচ্চ দুর্গিকায়
লৌহের প্রাচীর চারিভিত।
চারিদিকে চারিদ্বার লৌহের কপাট তার
দেখ চায় যায় আগে পরিখা উপরি ভাগে
চারি সাঁকো অতি মনোহর।
ইথে দিয়া যত আসে শত্রু লোক পেলে ত্রাসে
ডুবে তারা জলের ভিতর।
লৌহের প্রাচীর পরে দেখ আর কথোদূরে
শিলার প্রাচীর পূর্ণগাঢ়।"

কবি রঘুনন্দন 'শ্রীরামরসায়ন' কাব্যে মায়া সীতার মস্তক-ছেদন পরিচ্ছেদে প্রাচীন যুগের ভাস্কর্য্য-শিল্পের চরম চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে যেমন মহাপুরুষগণের অবিকল প্রতিমূর্ত্তি গঠন করা হয়, তৎকালেও শিল্পীগণের এই প্রকার শিল্প-দক্ষতার অসামান্য পরিচয় পাওয়া যাইত,—

"কিবা চমৎকার সেই রাক্ষস নির্ম্মিতি।
যাহে নাহি হয় সীতা নহে ছল অতি।
সেই বর্ণ সেই কেশ সেইত বয়স।
সেই নাসা সেই ভুরু সেইত নয়ন।
সেই বাহু সেই কর সেই বক্ষঃস্থল।
সেই উরু সেই জানু সেই পদতল।
সেই দৃষ্টি সেই ধৈর্য্য সেই নিষ্ঠভাব।
সেই মনিনা বুদ্ধা সেই হাবভাব।"

বর্ত্তমান যুগে ছবির পশ্চাৎ কথা বলান হইয়া থাকে, তৎকালেও প্রতিমূর্ত্তির মধ্য দিয়া কথা বলান হইত, উপরি-উক্ত পংক্তিদ্বয় হইতে ইহার আভাস পাওয়া যায়।

বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রকে দেশে ফিরিবার জন্য পুষ্পকবিমান আনিয়া দিলেন। অধুনা সকলেই ব্যোমযানের নির্ম্মাণ-কুশলতা ও আভ্যন্তরীণ কলকব্জা ও অবস্থান বিষয়ে অল্প-বিস্তর অবগত আছেন। প্রাচীন ভারতের পুষ্পকযানের অবস্থান বিষয়ে রঘুনন্দনে জানিতে পারি,—

"কিবা সে পুষ্পকযান বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ
ত্রিভুবন মধ্যে অনুপাম।
দৈর্ঘ্যে যার ক্রোশ ছয় বিস্তারেতে ক্রোশত্রয়
বিমানবিদ্যার ভাণ্ডার।
নিজ ইচ্ছা অনুসারে অল্প বাড়িতে পারে
হইতেও পারে ক্ষুদ্র দেহ।
যেখানেতে ইচ্ছা করে সেখানে যাইতে পারে
নানারূপ হয়ে পারে যেই।
আকাশ উপরি যায় মন হেন বেগে ধায়
হয়ে যাহাতেতে যাবে মন।
অতি উচ্চ নাহি হয় অত্যন্ত শীতল নয়
সর্ব্বকাল অতি সুখোদয়।
আরো তাহে মনোহর অতি দিব্য সভাঘর
বিশ্রামের স্থান সুশোভন।
জিহ্বের নিকেতন মণিকৃত উপবন
সুশোভিত অনেক প্রাঙ্গণ।
কিবা তার সুগঠন স্বর্ণ মণি বিরচন
তেজ করে সূর্য্যের সমান।
তাহে শোভে সুশোভন শত শত নিকেতন
স্বর্ণমণি রচত বিমান।
মধ্যে এক গৃহ তার শোভা কি মহিমা তার
ইন্দ্রপুরে কারে বিভায়।
স্ফটিক প্রবাল মতি হীরা ইন্দ্রনীল অতি
মাণিক্যরচিত অঙ্গ তার।
মধ্যে মণিময় স্থল নানা মণি ঝলমল
উপরিতে চন্দ্রাতপ সাজে।
তার মধ্যে দিব্যতুলী বালিশ দিয়াছে ভালী
মৃদুতায় জানয় বিরাজে।
স্বর্ণ-ঝাপা শোভে তায় চামর উড়ায়ে যায়
বাজায়ে কিঙ্কিণী ঘণ্টাগণ!"

উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে এই পঙ্‌ক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

"নিজ ইচ্ছা অনুসারে অল্প বাড়িতে পারে
হইতেও পারে ক্ষুদ্র দেহ।

আধুনিক যুগের বিশ্ববিখ্যাত ব্যোমযানগুলিও এইরূপ যখন তখন নিজের আকার পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। অপরাপর বর্ণনাহতে প্রাচীন ভারতের পুষ্পকযান আধুনিক যুগের ব্যোমযান অপেক্ষা নিকৃষ্ট তো নহেই, অধিকন্তু সম-সাময়িক শিল্পীগণের অবশ্য শ্লাঘা করিবার উপযুক্ত।

অযোধ্যাপুরীর নব নির্ম্মাণ পরিকল্পনায় কবি রঘুনন্দনে দেখিতে পাই,—

তার চারি পাশে পরকাশে স্ফটিক প্রাচীর।
যাহা লঙ্ঘিবারে নাহি পারে আপনি মদীর।

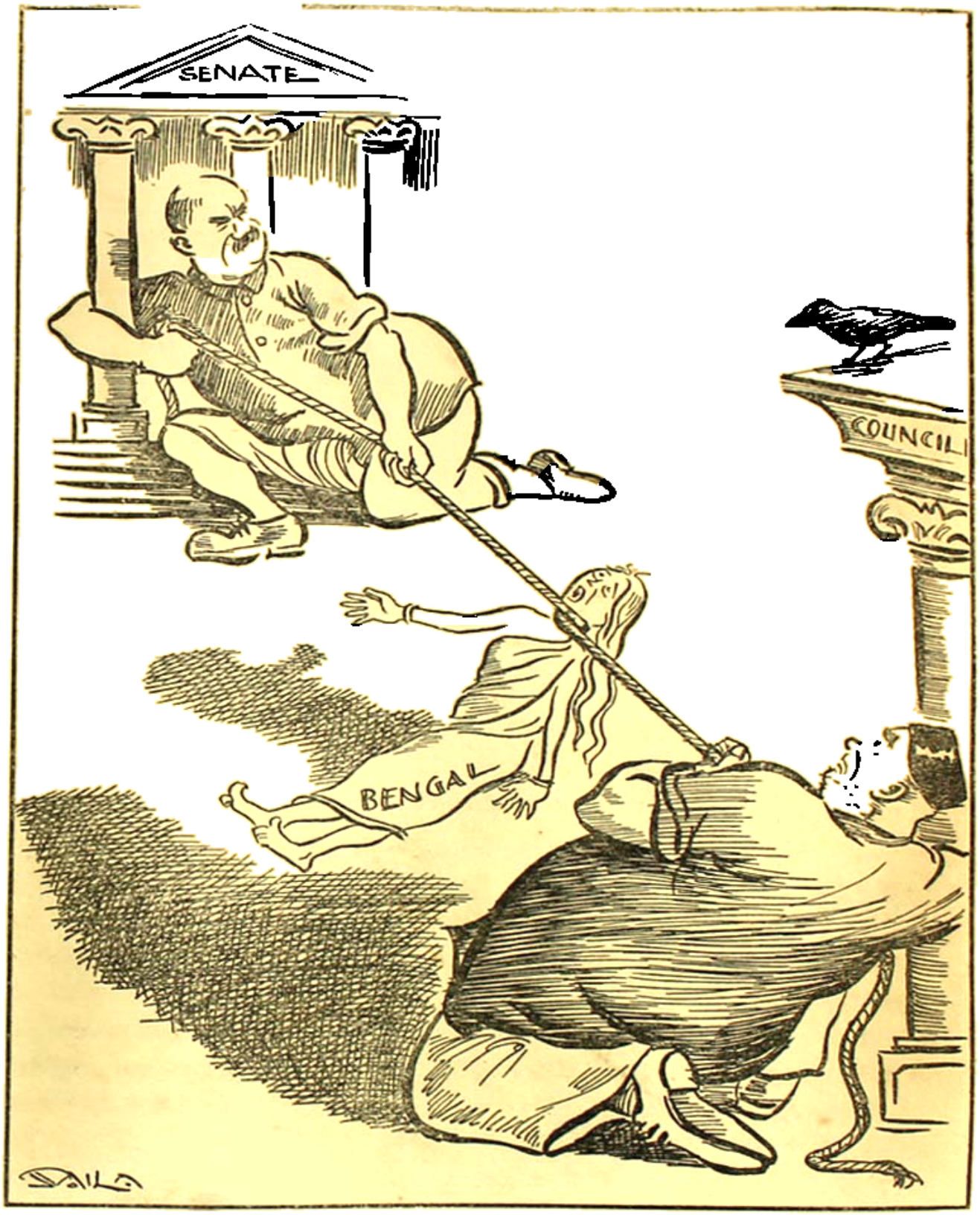


সমানে সমানে

তার পথ নয় অনন্তর সুন্দর চিকণ।
যায়, করি ভর নীলাম্বর কয়ারে পাতন।
মধ্যে মধ্যে তার রক্ত আঃ ধবল পাষাণ।
দিয়া সাজায়ন্তে সাহি ভাহে যার উপমান।
আল- বাল চয় স্বর্ণময় পরম শোভন।
দিয়া, নানামণি স্বর্ণখনি কয়ারে সাজন।
তাহে মনোহর সংযোগ আছে অপর্যিত।
নানা মণিচয় বহু হয় যাহাদের ভিত।
চার দিগে চার ঘাট পরিষ্কার ঘুটিতল।
সেই নানাবর্ণ, শিলাবর্ণ- পটে সুশোভন।
যায় চারিপাশে পরকাশে অপূর্ব্ব অঙ্গন।
মধ্যে থানি থানি নানামণি কয়ারে শোভন।
তার স্ফটিকিতে চারিভিতে পিত্তলসুশোভন।
নীল মণিগণ চিকণ পরম চিকণ।
তাহে সারি সারি গুপ্ত চারি দিগে পরিষর।
যেন নিলাকৃত ঐরাবত চলে আকার।
চারি খান ভিত কিবা সিত- পাষাণ-বিরচিত।
তাহে নব চিত্র নানাচিত্র মণি বিরচিত।
তাতে ধারগণ সুঘটন প্রবালগঠিত।
নানা মণিযুত স্বর্ণকৃত কবাট শোভিত।"

চাঁদ সদাগরের পুরাণ ডিঙা সংস্কার ও নূতন ডিঙা গঠন-কালে কবি বংশীদাস 'পদ্মাপুরাণ'কাব্যে প্রাচীন বাঙ্গালার শিল্পীদের অসামান্য নিপুণতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন। চাঁদ সদাগর সূত্রধরকে আদেশ দিতেছেন,—

"মন-পবন যদি পাও তবে সে গড়াও নাও
আর কাঠের বাধ নাহি মোর।"

সূত্রধরের নাম গিরিবর। সে মন-পবন কাঠের সন্ধানে সারা অরণ্য ঘুরিতেছে। কোথাও মনপবন বৃক্ষ পাওয়া গেল না। অতঃপর নর্ম্মদা তীরে বৃক্ষ মিলিল—

"আসী তালবৃক্ষ সম দীর্ঘ তরুবর।
যার ফোল পদ্ম ঝুড়ি আড়ে পরিসর।"

কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও গিরিবর গাছ কাটিতে পারিল না। সেই বৃক্ষের সাপ ও বাঘ তাড়াইবার পর গিরিবর গাছ কাটিতে লাগিল।

"কাটিতে লাগিল গাছ দর সূত্রধরে।
আধা তাল বৃক্ষতল উচ মহাবীর।
রাত্রি দিবা কাটি গাছে ঘুমির উপর।
নানাবিধ মহোৎসব করি কুতূহলে।
বৃক্ষ মোটা নাবাইল নর্ম্মদার জলে।
রাজা প্রসাদ পাইয়া গিরিবর চলে ধাইয়া
চিরিবারে সে গাছ সত্বর।
বৃক্ষ মোটা তুলিলেক আড়ায় উপর।
রাত্রিকালে নিশাভাগে সবে মিলি কাছে লাগে
চিরি গাছ কৈল খান খান।
কাঠ চিরি কৈল সারা ছুতারে টানিল ধারা
জানাইল চান্দের গোচর।
নায় করি শুভক্ষণ ডিঙা করয় গঠন
এখনে লিখব কেন কয়।
গোপাল নামে গিরিবর জল দেখিতে সত্বর
গেল, কালিদহ কত পানি।"

অতঃপর দ্বিজ বংশীদাস কালীদহের জলের পরিমাণ প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

"জল দেখিবারে নৌকা মাপে ছয় দিয়া।
তিনুলালি তৈ নয়ে উত্তম ছই নয়।
গিরিবর বসিলেক তাহার উপর।
দেখিয়া আসিল পানি বড় ডুবোয়াল।
চারিপাশে তার জল যথা তের তাল।
জল দেখি গিরিবর হরষিত হৈল।
চান্দের গোচর কৈল তার সবে দিয়া।"

এই প্রসঙ্গে দৈবজ্ঞকর্ত্তৃক ডিঙা নির্ম্মাণির লগ্ন-গণনাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দৈবজ্ঞ কিন্তু চাঁদকে অশুভ দিন বলিয়া দিল,—

"দশমী মঙ্গলবারে রাহুদিনি তোর।
সে কালে ডিঙার হয় করিতে উজোর।
পদ্মার কলতে চাঁদের ডুবিবাণ হৈল।
তিথি বদ্ধা দিনে ডিঙা আরম্ভ করিল।"

এইবার চাঁদ সদাগরের ডিঙার কথা বলি,—

"সোনার ঝুলুই লৈয়া আগেতে কাটিল গিয়া
বাড়া বিন্দে আপনার হাতে।
দীর্ঘে হাজার গজ দুআ ধরি কৈল সাজ
মধ্যে দিল তের তাল উচে।
মন-পবন কাঠে সন্ধি করি নাগায় পুটে
লোহার পেরাল দিল তারে।
দুয়ে সে গড়িল তলা বাইরে বাইলে হাড়ুকালা
লোপাপানি ছুইতে না পারে।
তলা গড়ি কৈল সারা লাগাইল আঠাগুঁড়া
পিঠ পাত লাগায় ঘাঁস দিয়া।
বাঘা কাঠ দিল হাতে সোণা রূপায় হালে পাত
লাগাইল সন্ধি সন্ধি চাইয়া।

মধ্যে করি রাজাসন চেরা আট বিলক্ষণ
ঘনহ পড়িল সারি সারি।
বালুর কাটি দিল বাড়ি পাতরাল জোখা বাড়ী
চাড়া পরব মধ্যে করি।
ধাপা চিত্রে ছত্র ঘর সারি সারি চামর
বেত ঝুলানি মালা ছন্দে।
ডিঙ্গার দিবেক ঝাঁপি সোণা রূপার ঘুঙ্গুরি
কপালে বিরাজ করে চান্দে।"

চাঁদের বাণিজ্য-যাত্রার উদ্যোগ প্রসঙ্গে কবি ডিঙ্গার শ্রেণী বিভাগ ও নাম করণের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—

"ডিঙ্গা বানাইয়া চলে রাজা চন্দ্রধর।
কৌতুকে ডিঙ্গার নাম থুইল বহুতর।
মাটি ভরি ডঙ্গা কৈল সকল মুসার।
হাট বাট বসাইল চৌখণ্ডি বাজার।
আধা নাঙ্গে পঞ্চম করিল নির্ম্মাণ।
সিঙ্গলিক পুজিবার চণ্ডিকার স্থান।
পুরুষী নির্ম্মাইল হাতে স্নানের পঞ্চপিড়ি।
বারবাস বাইবারে মিষ্ট চলা ভরি।
নানুক কেওড়া সিন্দাড়া লাগাইল জলে।
নবমল্লিকা চাঁপাইল কোহিড় কাননে।
আর লেখে নানে লাগায় বিবিধ উদ্যান।
চই মরিচ লাগাইল আর হিঙ্গা পান।
আদা হরিদ্রা লাগায় উদ্যান বারোমাসি।
ওল আলু লাগাইল আর যে উচ্ছি।
আম্র কাঁঠাল লাগায় আর আতিকেল।
কদলা বদরি লাগায় বাড়িঘরি কেল।
লেখু জামির কত হয় লেখা জোখা নাই।
নানাজন্তে পুষ্প লাগাইল ঠাঁকি ঠাঁকি।
তুলসী লাগাইল বেদী করিয়া নির্ম্মাণ।
যার জল পরশিলে নিচা পঞ্চ স্নানে।
চান্দ বলে শুন ভাই গোবিন্দ ভাণ্ডারী।
ছৌদ্দ লক্ষ টাকা সে মৌকায় তুলা করি।"

তখনকার যুগের ছৌদ্দ লক্ষ টাকা, কম কথা নহে। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্যদেশে এই প্রকার সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠান সমন্বিত অর্ণবযান নির্ম্মিত হইতেছে সত্য, কিন্তু ভারত যে দিন গৌরবময় যুগে অধিষ্ঠিত ছিল, সেই দিন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কোন অন্ধকার গহ্বরে লুক্কায়িত ছিল?

"প্রথমে চলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
যাহাতে বান্ধিছে সাধু শিঙ্গলিক ঘর।
দ্বিতীয়ে চলিল ডিঙ্গা নাম শঙ্খচুর।
দুই পাশ ভাঙ্গি নেয় সমুদ্রের দূর।
তৃতীয়ে চলিল ডিঙ্গা নামে রত্নপাতা।
চতুর্থে চলিল ডিঙ্গা নামে খরশান।
পঞ্চমে চলিল ডিঙ্গা নামে যে দুর্গার।
ষষ্ঠেতে চলিল ডিঙ্গা আগল পাগল।
সপ্তমে চলিল ডিঙ্গা নামে চৌদুটুলি।
অষ্টমে চলিল ডিঙ্গা নামে লক্ষ্মীপাশা।
নবমে চলিল ডিঙ্গা নামে উদয়তারা।
দশমে চলিল ডিঙ্গা বাণিজ্যে বেহুলা।
উনু ছৈয়া বাড় বায় ষোলদ ঘাটুয়া।
চলন পাট ডিঙ্গা চলিল একসনে।
সমুদ্রের দুই পাড় ভাঙ্গে যায় দেখে।
বামনে চলিল ডিঙ্গা নাম কালনদেবি।
লাফাইল পর্ব্বত হেন যার পেট বেধি।
ব্রহ্মদণ্ডে চলে ডিঙ্গা নামে ধলশঙ্খ।
চতুর্দ্দণ্ডে চলে ডিঙ্গা নামে নাগর কেশা।

চাঁদ সদাগরের পুত্র লক্ষ্মীন্দরের লোহার বাসর ঘর নির্ম্মাণ কালে কবি বংশীদাস "কেসাই কামারে"র শিল্প-চাতুর্য্যের অসাধারণত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

"পাম ফুল লৈয়া আগে পরম আনন্দ লাগে
লোহার বাসর গড়িবার।
পঞ্চাশ জোকান পাতি লোহা ভাঙ্গি দিবারাতি
পাট খড়ি কয়িল জোগার।
সন করি দীর্ঘ পাশ ছিটা গড়ি কৈল রাশে
চারি ঘুরা গড়িল লোহার।
খাণ্ডা গড়ি চারি কোণে দৃঢ়া জোখি সবানে
নির্ম্মাইল চৌচালার বান্ধে।
পাটে পাটে সন্ধি করি খিল হাবে সারি সারি
বেড় গড়ি তুলিল সানন্দে।
ভাগে ভাগে চয়ি হাল সবানে গড়িল ভাল
লাগাইল ঘুইয়া আনি কাছি।
সাবলে লাগয়ে জোড়া গড়িয়া তুলিল চূড়া
ফাইল পঞ্চকলসী।
পূর্ব্বে করি দুয়ার কপাট গড়িল তার
দুয়ুল গড়িল অনায়িতে।
কড়ায়ে বুড়িয়া লোহা তদুপরি চুণ-ধোয়া
ফুলজ গড়িল চারিভিতে।
লোহকাটা সারি সারি উপরে লাগায় তারি
চৌদিকে ফুয়ের বার ছিদ্র।
মণি-মুকুতার দাম লাগাইল অনুপাম
সোনারূপা লাগা ছিদ্র করি।
ভিতরে গড়িল তাঃ পঞ্চ প্রদীপের ঘর
চঞ্চল সোনার সারি সারি।"

শেষ পর্য্যন্ত কেসাই কামার চাঁদসদাগরকে প্রতারণা করিল—

"ঈশানে কোনেতে ছিদ্র করিল লাগুন।
সেই ও ছিদ্রের সঙ্গে তা ঢাকে গোপনে।"

# অভিমান

—শ্রীশোভনা ভট্টাচার্য্য

লাঙ্গডাউন রোডের উপরেই পল্লবের সুন্দর দালান বাড়ীটি। সামনের ছোট্ট বাগানটুকুর ভিতরে পল্লব সেদিন নিজের হাতে কয়েকটা ফুলগাছ বসাইয়াছিল। রজনীগন্ধার মদির সৌরভে জ্যোৎস্না-রাতের আকাশ-বাতাস মাতাল হইয়া উঠিয়াছে।

গির্জ্জার ঘড়িতে চং চং করিয়া দ্বিতীয় প্রহর ঘোষণা করিল। তখনও ওধারের অশোক গাছটার নীচে পল্লব ও লীলা বসিয়া রহিয়াছে। বিবাহের পর শুক্লা দ্বাদশীর শুভ্র জ্যোৎস্নালোকের স্বপ্নময় রাত্রিতে নবদম্পতি তাহাদের ভবিষ্য-জীবনের স্বপ্নময় কল্পনাকে বাস্তবের তুলিতে ফুটাইয়া তুলিতেছিল। লীলাকে পাইয়া পল্লব সুখী, যৌবনের স্বপ্ন-কামনা তাহার সফল হইয়াছে। সুন্দর নীল রঙের শাড়ীখানায় লীলাকে কি চমৎকার মানাইয়াছে। সুন্দর যাহা কিছু এই পৃথিবীতে, তাহার সবটুকুই বুঝি লীলাকে আসিয়া আশ্রয় করিয়াছে। উহাকে ছুঁইতে ইচ্ছা করে না পল্লবের, মনে হয় প্রস্ফুটিত গোলাপের মতই উহাকে স্পর্শ করিলেই বুঝি ঝরিয়া যাইবে।

লীলার কথা যেন আর ফুরাইতে চায় না। উচ্ছ্বসিত হাসি ও কৌতুকে উত্তাল হইয়া উঠিতে চায়। হাসির মাঝে হঠাৎ লীলা একসময় পল্লবের একখানি হাত লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিয়া উঠিল, "হাঁ গো, বল না গো। সত্যিই কি তুমি আমায় পেয়ে সুখী হয়েছ? আমায় পেয়ে তুমি সুখী হয়েছ—বারবার আমার এই কথাটা শুনতে ভারী ইচ্ছে করে।"

পল্লব লীলাকে একেবারে বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিল, "হাঁ গো হাঁ, তোমায় আমি খুব ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি—কেমন হল তো?"

সহসা পল্লব যেন কেমন হইয়া পড়ে। প্রণয়িনীর দৃষ্টির সম্মুখ হইতে সব কিছু তাহার লুপ্ত হইয়া যায়। উদ্দাম আবেগে লীলাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠে, "সত্যিই তুমি আমার জীবনে যে পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছ—যে অকূলের পরশে তুমি আমার বুক ভরে দিয়েছ, আমি তার উপযুক্ত নই লীলা! তোমায় এমন করে কাছে পেয়েও সব সময় আমার মনে হয় যেন তোমায় সম্পূর্ণ করে পেলাম না আমি, মনে হয় কখন বুঝি তোমায় হারিয়ে ফেলি।"

লীলা হাত দিয়া পল্লবের মুখটা নিজের দিকে ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "তুমি মাঝে মাঝে বড় সিরিয়স্ হয়ে ওঠ! যাও, তা হলে তোমার সঙ্গে কথাই বলব না আমি।" কৃত্রিম অভিমানে লীলা মুখখানি ফিরাইয়া লইল।

পল্লব হাসিয়া বলিল, "কি, রাগ হল বুঝি? আচ্ছা আর কখনও বলব না, হল তো?"

আবার লীলার কলগুঞ্জনে জ্যোৎস্না-রাতের স্তব্ধ প্রকৃতি মুখরিত হইয়া উঠিল। কি একটা কথায় কথায় লীলা প্রশ্ন করিয়া বসিল, "আচ্ছা আমি মরে গেলেও কি তুমি আমায় ঠিক এমনি করেই ভালবাসবে?"

পল্লব হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "এই তো নয়, তুমিও আবার সিরিয়স্ হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছ। এবার কিন্তু তা হলে আমার পালা? থাক গে, ওসব কথায় কাজ নেই, অনেক রাত হয়েছে, চল শুই গে।"

• •

বৈঠকখানার আসর গুলজার হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাণ্ড টেবিলের চারি পাশে নিখিল, প্রতুল, অনন্ত ও সুরেশ কি একটা বিষয় লইয়া তুমুল তর্ক চালাইয়াছে। সকলেই উপস্থিত, কেবল পল্লব আসিলেই হয়।

বিরক্ত হইয়া প্রতুল বলিয়া উঠিল, "পল্লবকে নিয়ে আর পারা গেল না, আটটা বাজে এখনও দেখা নেই।"

নিখিল হাতের গ্লাসটা আগাইয়া দিয়া বলিল, "বিয়ে করে পল্লবটা যে এমন স্ত্রৈণ হয়ে পড়বে, এ আমরা কখনো কল্পনাও করতে পারতাম না।"

গ্লাসের পর গ্লাস ঘুরিতে লাগিল। নিখিল টেবিলের উপর পা দুইটা তুলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম—"

ইতিমধ্যে পল্লব ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "মাপ কর ভাই, আমাকে আর ডেক না, আমি একদম এসব ছেড়ে দিয়েছি।"

গান থামাইয়া নিখিল চীৎকার করিয়া উঠিল, "থ্যাঙ্কস্, কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, তুমি একজন মেয়ে মানুষের খপ্পরে—মানে প্রেমে পড়ে, আমাদের কি একেবারে ডিচ্ছোল' মানে, ত্যাজ্যপুত্তুর করলে ধাবা!"

অসহিষ্ণুকণ্ঠে পল্লব বলিয়া উঠিল, "তোমরা এখন কেউই প্রকৃতিস্থ নও। তোমাদের সঙ্গে মিথ্যে কথা কয়ে সময় নষ্ট করতে চাই না, আচ্ছা, আসি তা হলে।"

* *

"এখন কেমন লাগছে লীলা?"

"উঃ বড় যন্ত্রণা মাথায়!"

"দেখি, মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দি, একটু অডিকলোন লাগিয়ে দেব?"

"না। তুমি বস আমার পাশে, কোথাও যেও না, এস আরও কাছে এস।"

পল্লব ধীরে ধীরে লীলার মাথাটা কোলের উপর তুলিয়া লইল। আজ তের দিন লীলার অসুখ, টাইফয়েডে দাঁড়াইয়াছে। পল্লব সমস্ত কাজ-কর্ম্ম ফেলিয়া একাদিক্রমে তের দিন, তের রাত অবিশ্রান্তভাবে লীলার সেবা করিয়া চলিয়াছে। মুখে এতটুকু ক্লান্তির চিহ্নও নাই। মাঝে মাঝে ব্যগ্রভাবে লীলার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ডাকে, "লীলা, লীলা কথা কও লীলা! তুমি এমন ভাবে পড়ে থাকলে আমি যে নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না, লীলা।" পল্লবের চোখে মুখে আশঙ্কার কালো ছায়া।

আজ কয়দিন হইতে লীলার অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছে। পল্লবের ব্যাকুল আহ্বানের কোন প্রত্যুত্তরই দেয় না সে। সকাল বেলায় ডাক্তার ভদ্র আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "অবস্থা খুব খারাপ, সাবধানে রাখবেন।"

পল্লব উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে, "না, না, না, তোমায় মরতে আমি দেব না লীলা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক দিয়ে তোমার চিকিৎসা করাব, লীলা—লীলা।"

লীলার চেতনাহীন দেহ কোন প্রত্যুত্তরই দেয় না সে ডাকের।

পরদিন ডাক্তার ভদ্র লীলাকে দেখিতে আসিলেন। পরীক্ষা করিতে বড় দেরী করেন ডাক্তার ভদ্র। পল্লব ডাক্তারের মুখের পানে চাহিয়া ভাবে। তাঁহার একটা কথার উপর যেন পল্লবের সমস্ত জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে।

পরীক্ষাশেষে ডাক্তার ভদ্র স্মিতহাস্যে বলিলেন "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ মিঃ রায়!—অবস্থা আশাপ্রদ।" পল্লব টলিয়া পড়িয়া যাইতেছিল।

লীলা ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। পল্লবের মুখে আবার হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু লীলা কেন পল্লবের সঙ্গে কথা কয় না। ও কি এখনও এত দুর্ব্বল! পল্লব ডাকে, "লীলা! বড় দুর্ব্বল লাগছে নয়? কথা বলতে কষ্ট হয়?"

লীলা ভাব-লেশহীন দৃষ্টিতে পল্লবের মুখের পানে চাহিয়া থাকে। পল্লব সে-দৃষ্টি সহ্য করিতে পারে না।

সে-দিন ডাক্তার ভদ্র আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিলেন লীলাকে। যাইবার পূর্ব্বে পল্লবকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া অনেকখানি ভূমিকার পর বলিলেন, "দেখুন মিঃ রায়, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমার মনে হয়, ইয়ে, মিসেস্ রায় বোধ হয় বাক্‌শক্তি হারিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণশক্তিও তাঁর লোপ পেয়েছে। তবে আবার হয় তো ফিরে পেতেও পারেন।"

বজ্রাহতের মত পল্লব দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "উঃ, ডাক্তার, ডাক্তার! তোমার কাছে কি বিষও ছিল না। লীলাকে তুমি আমার এমনি করে বাঁচিয়ে তুললে! লীলা। লীলা!"

ঝড়ের মত পল্লব ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এ আঘাত পল্লব সামলাইয়া উঠিতে পারিল না। স্ত্রী তাঁর বাঁচিয়া থাকিয়াও নাই! তার ডাকে লীলা আর সাড়া দেয় না। লীলার কলকণ্ঠ ও উচ্ছ্বসিত হাসি পল্লব আর শুনিতে পাইবে না। লীলা কিন্নরীকণ্ঠে অপূর্ব্ব সঙ্গীতে আর তাহাকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিবে না। আর সে তাহার ডাকের সাড়া দিবে না।

পল্লব আবার মদ ধরিয়াছে। চেতনাকে সে লুপ্ত করিয়া দিতে চায়।

লীলা পায়ে পায়ে আগাইয়া আসে। মুকবেদনায় অশ্রু দু'টি গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়ে। লীলা বোঝে, স্বামী তাহার দিন দিন কোন পথে অগ্রসর হইতেছে। সিভারটা পাকিয়া উঠিয়াছে পল্লবের। তা উঠুক, মদ সে ছাড়িতে পারে না। উঃ সমস্ত শরীরে কি অসহ্য জ্বালা!

মিনতিভরা চোখে লীলা পল্লবের পানে চায়।

পল্লব উন্মাদের হাসি হাসিয়া বলে, "কি বলছ তুমি লীলা। তুমি তো আমার লীলা নও! যদি তাই হও, তবে কই, তোমার সে মধুর কণ্ঠস্বর কই! কই তুমি তো আমায় ডাকে সাড়া দাও না? কেন দাও না, লীলা! লীলা!" উন্মাদের মত পল্লব দুই হাতে লীলাকে জড়াইয়া ধরে।...

আজ কয়দিন হইতে পল্লবের ভয়ানক জ্বর। মাঝে মাঝে প্রলাপ বকিতেছে। সমস্ত সিভারটা তাহার পচিয়া গিয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছেন, "আর বাঁচান অসম্ভব।"

পল্লবের দিদি আসিয়াছেন পল্লবের সেবার জন্তে। কিন্তু লীলা তাঁহাকে কিছু করিতে দেয় না। পুঞ্জীভূত বেদনার গ্লানি লইয়া মূক-বধির নারীটি বসিয়া থাকে তাহার স্বামীর শিয়রে। স্বামীর কুশল সে লইতে পারে না, কাহাকেও জানাইতে পারে না তাহার ব্যথা, কণ্ঠে তার ভাষা নাই।

রাত তখন দুইটা বাজে। নিথর নিস্পন্দ ভাবে পল্লবের শিয়রে বসিয়া লীলা, ও ধারে উদ্বিগ্ন মুখে দিদি বসিয়া। সামনে চেয়ারে ডাক্তার ভদ্র বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। আজিকার রাত্রিই বোধ হয় পল্লবের শেষ রাত্রি!

ভোরের দিকে হঠাৎ পল্লব যেন কেমন করিয়া উঠিল। ডাক্তার আবার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টা চলিল, পল্লবের নাড়ী পাওয়া গেল না। ডাক্তার ভদ্র বিষাদমিশ্রিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "সব শেষ।"

লীলা এখনও কিছু জানে না। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া শুধু ডাক্তারের মুখের পানে চাহিয়া থাকে। হঠাৎ দিদির আর্তস্বরে চমক ভাঙ্গিয়া যায়, এতক্ষণে বোধ হয় লীলা সব বুঝিতে পারে।

সহসা লীলা দাঁড়াইয়া উঠিয়া দুই একবার গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওগো, তুমি অভিমান করে চলে গেলে, আমি কথা কই নি বলে তুমি অভিমান করেছ! এই তো আমি আবার কথা কয়েছি—তুমি ফিরে এস"—বলিতে বলিতে লীলা পল্লবের নিস্পন্দ দেহের উপরে লুটাইয়া পড়িল।

লীলার কণ্ঠে আজ ভাষা ফিরিয়াছে। কিন্তু যাহার জন্তে ফুটিয়াছে এ ভাষা, সে এখন বহু দূরে। লীলার কণ্ঠ তো অত দূরে পৌঁছিবে না।

পশ্চিম দিগন্তে তখন শুক্লা দ্বাদশীর একফালি চাঁদ ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছিল।

---

## প্রকৃত ও বিকৃত বিজ্ঞান

...একমাত্র ভারতবর্ষেই প্রচুর স্বাভাবিক উর্বরাশক্তিযুক্ত জমী, লোকহিতকর কৃষি-বিজ্ঞান, লাভবান্ কৃষি-সম্বন্ধীয় ব্যবসা, লোকহিতকর শিল্প-বিজ্ঞান, লাভবান্ শিল্প-সম্বন্ধীয় ব্যবসা, লোকহিতকর বাণিজ্য-বিজ্ঞান, লাভবান্ বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় ব্যবসা, লোকহিতকর শিক্ষা-বিজ্ঞান ও তাহার ব্যবসা, লোকহিতকর রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও তাহার ব্যবসা বিদ্যমান ছিল এবং তাহা ভারতবর্ষ ব্যতীত জগতের আর কোন দেশে লিখিত ইতিহাসকালের মধ্যে ছিল বা এখন এখনও নাই। জগতের অন্য কোন দেশে যে বর্তমানে উর্বরাশক্তিসম্পন্ন জমী, লোকহিতকর কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষি-সম্বন্ধীয় যথাযথ ব্যবসা বিদ্যমান নাই, তাহা ঐ সকল দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা এবং রাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। কোন দিনই যে তাহা ছিল না, তাহাও ঐসকল দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ ও অবস্থা চিন্তা করিলে পরিস্ফুট হয়।

অনেকে মনে করেন যে, গ্রীকগণ প্রাচীন কালে বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানে খুব উন্নত ছিলেন। একথা যাহারা যে ভিত্তিহীন, তাহা গ্রীক গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ পড়িলে বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাদের সমগ্র গ্রন্থরাশি হইতে কোন সুচিন্তিত কৃষি-বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান, বাণিজ্য-বিজ্ঞান, শিক্ষা-বিজ্ঞান এবং রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। গ্রীকগণের যদি খুব উন্নত কৃষি-বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান প্রভৃতি অথবা তৎসম্বন্ধীয় ব্যবসা প্রভৃতি থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারাও অন্য দেশের মুখাপেক্ষী না হইয়া ভারতবাসীর মত চিরদিন নিজ দেশে বসবাস করিয়া জীবনযাপন করিতে পারিতেন, ইহা সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে।...

---

# বিজ্ঞান জগৎ

## শক্তির নূতন উৎস

—শ্রীনীলরতন কর

স্টীম্ ইঞ্জিন, অয়েল ইঞ্জিন, টারবাইন্ ও ডায়নামো-যন্ত্রের আবিষ্কার করলা, তেল ও জলপ্রবাহের শক্তিকে কাজে লাগাবার সন্ধান দিয়েছে। সম্প্রতি পরমাণুর ( atom ) আভ্যন্তরীণ শক্তি পাবার এক নূতন কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে; তার ফলে ভবিষ্যতের বাস্তব জগতে অদ্ভুত পরিবর্তন সংঘটনের সম্ভাবনা দেখা যায়।

শতাধিক বৎসর পূর্বে জন্ ডলটন্ বলেছিলেন, অক্সিজেন্, গন্ধক, পারদ, স্বর্ণ প্রভৃতি মৌলিকের (element) রাসায়নিক গুণাবলী স্বতন্ত্র এবং তাদের পরমাণবিক গুরুত্ব (atomic weight) বিভিন্ন। বর্তমানের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, একই রাসায়নিক-গুণসম্পন্ন মৌলিকের পরমাণু-সমূহের গুরুত্বে পার্থক্য থাকতে পারে। কোনও মৌলিকের পরমাণুসমূহ রাসায়নিক গুণে এক হয়েও যদি পরমাণবিক গুরুত্বে পৃথক্ হয়, তাদের আইসোটোপ্ (Isotopes) বলে।

একটা কথা আজকাল সুপরিচিত; অ্যাটম্ বা পরমাণু বস্তুর চরম কণিকা নয়। সর্ববিধ মৌলিকের পরমাণু বাবচ্ছেদ ক'রে চারি প্রকার কণিকা পাওয়া যায়—ইলেক্ট্রন, পজিট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন। ইলেক্ট্রন ঋণবিদ্যুৎযুক্ত, ( negatively charged ) পজিট্রন্ ও প্রোটন ধনবিদ্যুৎযুক্ত ( positively charged ) এবং নিউট্রন বিদ্যুৎ-বর্জিত। প্রোটন ও নিউট্রনের গুরুত্ব সমান; ইলেক্ট্রন ও পজিট্রনের গুরুত্ব সমান; কিন্তু প্রোটন ও নিউট্রনের গুরুত্বের তুলনায় ইলেক্ট্রন ও পজিট্রনের গুরুত্ব নগণ্য। পদার্থবিদ্গণের বিশ্বাস, একটি প্রোটনের সহিত একটি ইলেক্ট্রন ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হলে একটি নিউট্রন-কণিকা পাওয়া যায় এবং একটি নিউট্রনের সহিত একটি পজিট্রন যুক্ত হলে একটি প্রোটন-কণিকা গঠিত হয়—যদিও এর কোনও প্রামাণিক সাক্ষ্য পাওয়া যায় নি। প্রত্যেক পরমাণুর বহিরংশ ইলেক্ট্রনের দ্বারা এবং তার অভ্যন্তর-ভাগ প্রোটনের দ্বারা নির্মিত। আভ্যন্তরীণ অংশটীর নাম কেন্দ্রক (nucleus)। কেন্দ্রকের চারিদিকে ইলেক্ট্রনগুলি সূর্য্য-প্রদক্ষিণশীল গ্রহের মতো ঘুরে বেড়ায়। কেন্দ্রকস্থিত প্রোটনের ধন-বিদ্যুৎ তাকে প্রদক্ষিণ-কারী ইলেক্ট্রনের ঋণ-বিদ্যুৎ দ্বারা তৃপ্ত থাকায় সাধারণ পরমাণুর বাহিরে কোনও বৈদ্যুতিক আসক্তি থাকে না। কোন কোন পরমাণুর কেন্দ্রক প্রোটন ও নিউট্রন-কণিকার সমবায়ে রচিত। পরমাণু-কেন্দ্রকের চারিদিকে প্রদক্ষিণকারী ইলেক্ট্রনের সংখ্যার উপর মৌলিকের রাসায়নিক বিশেষত্ব এবং কেন্দ্রকস্থিত প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার উপর তার পরমাণবিক গুরুত্ব নির্ভর করে। কোনও পরমাণুর কেন্দ্রে যদি অতিরিক্ত নিউট্রন-কণিকা সন্নিবিষ্ট হয়, তবে পরমাণুর রাসায়নিক গুণ বজায় থেকেও তার পরমাণবিক গুরুত্ব বদলায়; মৌলিকের বিভিন্ন আইসোটোপের অস্তিত্বের পশ্চাতে এই কারণ বিদ্যমান। আজকাল কৃত্রিম উপায়ে নিউট্রন-কণিকা বর্ষণ ক'রে নূতন আইসোটোপ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন্ আর্. ডুনিঙ্ ইউরেনিয়ম্-মৌলিকের একটি আইসোটোপ পৃথক্ করেছেন, তার পরমাণবিক গুরুত্ব ২৩৫; সে জন্য এর নাম দেওয়া

হয়েছে 'ইউ-২৩৫'। সাধারণ ইউরেনিয়ম মৌলিকের পরমাণবিক গুরুত্ব ২৩৮; একে পৃথিবীর নানা স্থানে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়। সাধারণ ইউরেনিয়মের মধ্যে যেটুকু 'ইউ-২৩৫' মিশ্রিত থাকে, তাকে বিশ্লেষণ করার প্রণালী বর্ত্তমানে খুব জটিল; কিন্তু ভবিষ্যতে যদি তা সহজসাধ্য হয়, তবে শক্তির ব্যবহারিক উৎস হিসাবে ইউ-২৩৫ কাজে লাগবে।

৫০,০০,০০০ গ্যালন কয়লা, অথবা ৩০,০০,০০০ গ্যালন গ্যাসোলিন যে শক্তি যোগায় ইউ-২৩৫-এর এক পাউণ্ড সেই পরিমাণ শক্তি দিতে পারে। মাত্র পাঁচ সের পাউণ্ড ইউ-২৩৫ পেলে তার শক্তি-সাহায্যে 'কুইন মেরী'র মত বড় জাহাজ আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র পাড়ি দিতে পারবে, সাবমেরিন্ বিনা তেলে পৃথিবীর সব কয়টী মহাসমুদ্র ঘুরে বেড়াবে। কয়লা হতে তাপ পাবার জন্য তাতে প্রথমে আগুন জ্বালাতে হয়; তার পর নিয়মিত পরিমাণে অক্সিজেন সরবরাহ করতে পারলে তা আপনি জ্বলতে থাকে। ইউ-২৩৫ হতে শক্তি পাবার জন্য প্রয়োজন শুধু ঠাণ্ডা জল। তাকে ঠাণ্ডা জলে ডোবালেই জল গরম হয়ে বাষ্প হয়ে যায়। বাষ্পীয় শক্তি-সাহায্যে টারবাইন চালিয়ে জাহাজ ও কল-কারখানা চলতে পারে। কাজের প্রয়োজন শেষ হলে ইউ-২৩৫-কে জল থেকে তুলে রাখা যায়; ঠাণ্ডা জল না পেলে তার শক্তি খরচ হয় না।

ইউরেনিয়ম-আইসোটোপ্ শক্তির উৎস হিসাবে কাজে লাগতে পারে এ কথা তত্ত্বমূলক দিক্ থেকে প্রথম অনুমান করেন, অধ্যাপক নীলস্ বর্। ১৯৩৯-এর জানুয়ারী মাসে তাঁর নিকট সংবাদ আসে যে, জার্মান পদার্থবিদ্ অটো হান্ (Otto Hahn) এবং অধ্যাপক লিজে মেইট্নের (Lise Meitner) ইউরেনিয়মের উপর নিউট্রন বর্ষণ করায় তার পরমাণু ভেঙে সামান্য পরিমাণে বেরিয়ম্ তৈরী হয়েছে ও ২০,০০,০০,০০০ ইলেক্ট্রন-ভোল্ট শক্তি পাওয়া গিয়েছে। (এক ইলেক্ট্রন-ভোল্ট শক্তি=১·৬×১০$^{-১২}$ আর্গ বা ১·২×১০$^{-১৯}$ ফুট পাউণ্ড।)

অধ্যাপক বর্ ও ডক্টর হুইলার্ হিসাব ক'রে দেখান যে, ইউরেনিয়মের মধ্যে ইউ-২৩৫-এর অবস্থিতি হেতু এই শক্তি পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এর কারণ প্রদর্শন করতে গিয়ে তাঁরা বলেন, যে-সকল পরমাণুর গুরুত্ব বিজোড় সংখ্যা, তারা জোড়-সংখ্যক গুরুত্ব-বিশিষ্ট পরমাণু অপেক্ষা অধিক স্থায়ী। ইউ-২৩৫-এর কেন্দ্রকে একটি নিউট্রন সন্নিবিষ্ট হলে তার পরমাণবিক গুরুত্ব হয় ২৩৬; ২৩৬ জোড় সংখ্যা, এ জন্য এই পরমাণু সহজে ভঙ্গুর। কিন্তু ইউরেনিয়ম্-২৩৮-এর কেন্দ্রকে নিউট্রন-কণিকা ঢুকলে তার পরমাণুর গুরুত্ব হয় ২৩৯; এটি ইউ-২৩৬-এর মতো স্বতঃভঙ্গুর নয়।

জার্ম্মানিতে পরীক্ষিত ঘটনাটি—কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, জন্স্ হপ্কিন্স্ ইনষ্টিটিউট, ওয়াশিংটনের কার্নেগী ইনষ্টিটিউট এবং অন্যান্য বীক্ষণাগারে পরীক্ষা ক'রে পদার্থবিদ্গণ স্থির-নিশ্চয় হয়েছেন যে, ইউ-২৩৫-এর উপর নিউট্রন বর্ষণে তার পরমাণুর অভ্যন্তর হতে শক্তি নিঃসৃত হয়।

বায়ুমণ্ডলে স্বভাবতঃ অল্প পরিমাণে রেডিয়ম্ ছড়িয়ে আছে। তার আঘাতে বায়ু থেকে নিউট্রন মুক্ত হচ্ছে, তা' ছাড়া সর্ব্বব্যাপী কস্মিক-রশ্মি মহাকাশ হতে পৃথিবীতে ভেঙ্গ বর্ষণ ক'রে বায়ুর পরমাণু হতে নিউট্রন মুক্ত করছে। জলের আয়তনের দুই-তৃতীয়াংশ হল প্রোটন; বায়ু হতে উদ্মুক্ত বেগবান নিউট্রনকণা তাতে লেগে মন্দগতি হয়। জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা ইউ-২৩৫-এর সঙ্গে মন্দগামী নিউট্রন-কণিকার সম্মিলন-ফলে তার পরমাণু ভেঙে যায় ও প্রচুর পরিমাণে শক্তি নির্গত হতে থাকে। সেই শক্তিতে গরম হয়ে জল বাষ্পীভূত হয়। সমস্ত জল বাষ্পে পরিণত হলে তার মধ্যে গমনশীল নিউট্রন-কণিকার বেগ কমে না; কাজেই তখন নিউট্রন-কণিকা ইউরেনিয়ম পরমাণু না ভেঙে বেরিয়ে যায়। আবার ঠাণ্ডা জল পেলে ইউ-২৩৫ হতে শক্তির স্ফুরণ হয়। জল যত ঠাণ্ডা হয় এই প্রক্রিয়া তত তাড়াতাড়ি চলে। ইউ-২৩৫-এর উপর ঠাণ্ডা জলের প্রবাহ যত দ্রুত হবে জল ততই গরম হয়ে উঠবে, কারণ এ ব্যাপারে মন্দগামী নিউট্রনগুলিই বেশী দক্ষ।

## দিগন্তের অন্তরালের ঘটনা দর্শন

পৃথিবী বর্ত্তুলাকার, এজন্য ভূমির কোন স্থান হতে আমাদের পৃথিবী দেখার সহজদৃষ্টি দিগন্তের চক্রবেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভূমি হতে উচ্চ স্থানে আরোহণ করলে দিগন্তের পরিধি বৃদ্ধি পায়। শত ফুট উচ্চতায় দিগন্তের ব্যাসার্দ্ধ ১২·২ মাইল, পনেরো শত ফুট উচ্চতায় দিগন্তের ব্যাসার্দ্ধ

৪৭২ মাইল। উচ্চ স্থান হতে অধিক দূরের স্থান দেখা যায় ব'লে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ফ্রান্সে উচ্চ স্তূপ হতে নিশানা-সাহায্যে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। পাঁচ হতে দশ মাইল দূরে দূরে উচ্চস্তূপ নির্মাণ করা হয়েছিল; স্তূপের উপর থেকে দুইটি দণ্ডের বিভিন্ন প্রকার সজ্জার ইঙ্গিতে বাক্য রচনা করা হত; নিশানার ইঙ্গিত এক স্তূপ হতে অপর স্তূপশিখরে দেখতে পাওয়ার জন্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নেওয়া হত। এই উপায়ে প্রেরিত প্রথম সংবাদ—ফরাসী সৈন্য কর্তৃক অষ্ট্রীয়া বিজয়ের বার্তা—১৭৯৪ অব্দের ১৫ই আগষ্ট পাঠানো হয়। ১৮৪৫ অব্দে রাশিয়া, সুইডেন্, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে এই বার্তাযন্ত্রের (semaphore system) চলন হয়। এজন্য অর্থব্যয় হয়েছিল প্রচুর। বহু সহস্র মাইল জুড়ে' হাজার হাজার বার্তাস্তূপ নির্মাণ করা হয়। বার্তাযন্ত্রের কাজ ইয়োরোপে যখন পূর্ণোদ্যমে চলছে তখন এল তারযুক্ত টেলিগ্রাফ। তারপর তারযুক্ত টেলিফোন মানুষের গলার স্বরকে দূরদেশে পৌঁছে দিলে। ইতিমধ্যে সেকেলে বার্তাযন্ত্র অকেজো হয়ে উঠে গেল। আজকাল বেতার যন্ত্রের প্রচলন হয়েছে। প্রেরক-যন্ত্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গ আকারে শক্তি প্রেরণ করে, গ্রাহক-যন্ত্র শত শত মাইল দূর হতে তার আঘাতে সাড়া দেয়। প্রেরক-যন্ত্রে যে শব্দ করা হয়, তার বৈচিত্র্য-অনুযায়ী প্রেরিত বিদ্যুৎ-তরঙ্গের আকার বদলায়। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ দৃশ্য আলোক-রশ্মির মতো সরল রেখায় চলে। পৃথিবীর অন্তরীক্ষে ষাট মাইল উর্দ্ধে কেনেলি-হিভিসাইড স্তর ( Kennely-Heaviside layer ) নামে এক বিদ্যুৎযুক্ত বায়ুস্তর আছে সেই স্তরে গিয়ে ধাক্কা লেগে কোন কোন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ দর্পণে লাগা আলোকের মতো প্রতিফলিত হয়। এজন্য পৃথিবীপৃষ্ঠের বক্রতা সত্ত্বেও বেতার-তরঙ্গকে দিগন্ত অতিক্রম ক'রে দূর-দেশে পাঠানো সম্ভব হয়েছে। সাধারণ বেতার বার্তা প্রেরণের তরঙ্গগুলি আকারে বড়—তার কম্পাঙ্ক (frequency) সাড়ে পাঁচ লক্ষ হতে ষোল লক্ষের মধ্যে। কিন্তু টেলিভিজনের প্রেরক-যন্ত্র হতে যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাঠানো হয় তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অনেক কম অর্থাৎ তার কম্পাঙ্ক অনেক বেশী—সেকেণ্ডে প্রায় চার কোটী। এত ক্ষুদ্র তরঙ্গ কেনেলি-হিভিসাইড স্তরে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে না, পৃথিবী ছেড়ে সোজা বেরিয়ে যায়। কাজেই টেলিভিজনের দৃষ্টির সীমানা দিগন্তরেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ। টেলিভিজনের চলচ্চিত্র প্রেরক-যন্ত্র হতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যদি ভূমি অপেক্ষা উচ্চস্থান হতে পাঠানো হয় তবে তার পৃথিবী-পরিভ্রমণের সীমানা ভূমির নিকট হতে দেখা দিগন্তরেখার চেয়ে বেশীদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হবে। এই উপায় অবলম্বন করলে সূর্য্য অস্ত যাবার পরেও আমরা টেলিভিজন সাহায্যে সূর্য্যকে দেখতে পাব। অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্থাপিত বার্তাযন্ত্রের মতো যদি পনেরো হতে ত্রিশ মাইল ব্যবধানে বহুসংখ্যক টেলিভিজন প্রেরক-যন্ত্র স্থাপিত হয় এবং মধ্যেকার যন্ত্রগুলি টেলিভিজনের চিত্র পুনঃ-প্রেরণের রিলে-ষ্টেশন হিসাবে কাজ করে, তবে দিগন্ত অতিক্রম করে বহু দূরদেশে টেলিভিজনের চিত্র পাঠানো যাবে। গত মার্চ্চ মাসে নিউ ইয়র্ক হতে ১৪২ মাইল দূরে শেনেক্‌টাডিতে এই পন্থায় টেলিভিজনে চলচ্চিত্র দেখানো হয়েছে। দর্শকগণ নিউ ইয়র্ক থেকে পাঠানো সুর ও রূপ যুগপৎ প্রত্যক্ষ ক'রে বিস্মিত হন।

## আল্‌ট্রাভায়লেট্-রশ্মি-প্রতিফলক রঙ্

যে রঙ্ দেওয়ালে সাধারণতঃ যে সকল রঙ্ লাগানো হয় তাদের আল্‌ট্রাভায়লেট্-রশ্মি-প্রতিফলক ক্ষমতা সামান্য। সাধারণ রঙ্ আল্‌ট্রাভায়লেট্ রশ্মির শতকরা নব্বইভাগ শোষণ করে নিয়ে মাত্র দশভাগ প্রতিফলিত করে। সিন্‌সিনেটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বীক্ষণাগারে গবেষণা ক'রে ডি. এফ্. উইল্‌কক্ এক প্রকার সাদা রঙ্ আবিষ্কার করেছেন, তার আল্‌ট্রাভায়লেট্ রশ্মি প্রতিফলন-ক্ষমতা সাধারণ রঙের সাতগুণের অধিক। রোগীদের গৃহপ্রাচীরে প্রলেপ দেওয়ার পক্ষে এই রঙ্ কাজে লাগবে।

## ক্যান্‌সার রোগ চিকিৎসার অভিনব ব্যবস্থা

"জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক এক্স্-রে কর্পোরেশন" ক্লিভ্‌ল্যাণ্ডের সেণ্ট্ জন্স হাসপাতালে ক্যান্‌সার রোগের চিকিৎসার জন্য একটি দশলক্ষ ভোল্ট এক্স্-রে যন্ত্র স্থাপন করেছেন। ৮৪০ পাউণ্ড রেডিয়ম্ থাকলে যতটা চিকিৎসা কার্য্য করা সম্ভব হত এই যন্ত্র হতে নিঃসৃত তেজ সেই উদ্দেশ্য সমাধা করবে। এই পরিমাণ রেডিয়মের মূল্য প্রায় ৬৭ কোটি টাকা। এই যন্ত্রটিকে রক্ষা করার জন্য আবটন সীসা ব্যবহার করা হয়েছে; সমেতে যন্ত্রটির ওজন চার হাজার

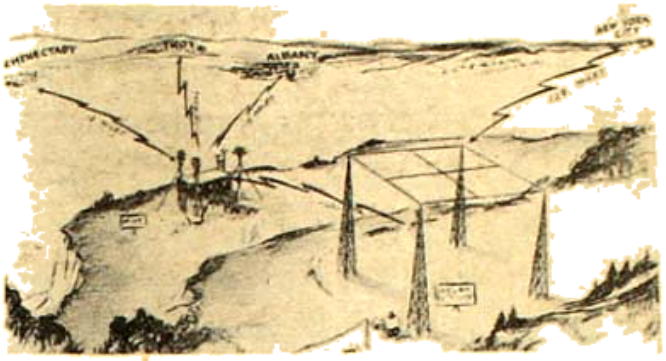

টেলিভিজনের রিলে-ষ্টেশনসমূহের শুরু : নিউ ইয়র্ক, অলবানি, বুফ ও শেষেরটাটি পর্য্যন্ত কি ভাবে বেতার-তরঙ্গ প্রেরিত হয়ের চিত্রে তা প্রদর্শন করা হয়েছে

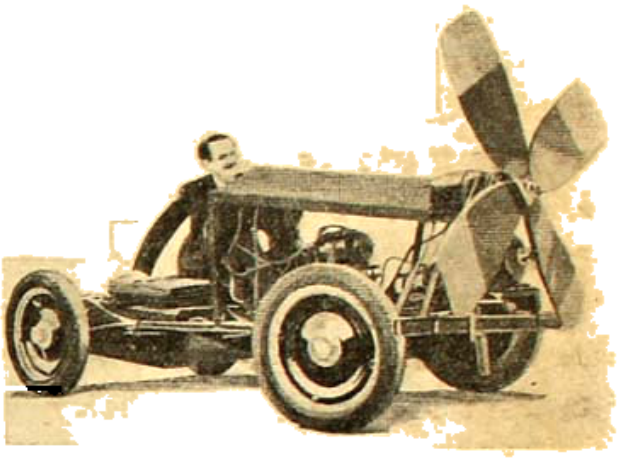

হাওয়া-কলসংযুক্ত বৈদ্যুতিক মোটর-গাড়ী

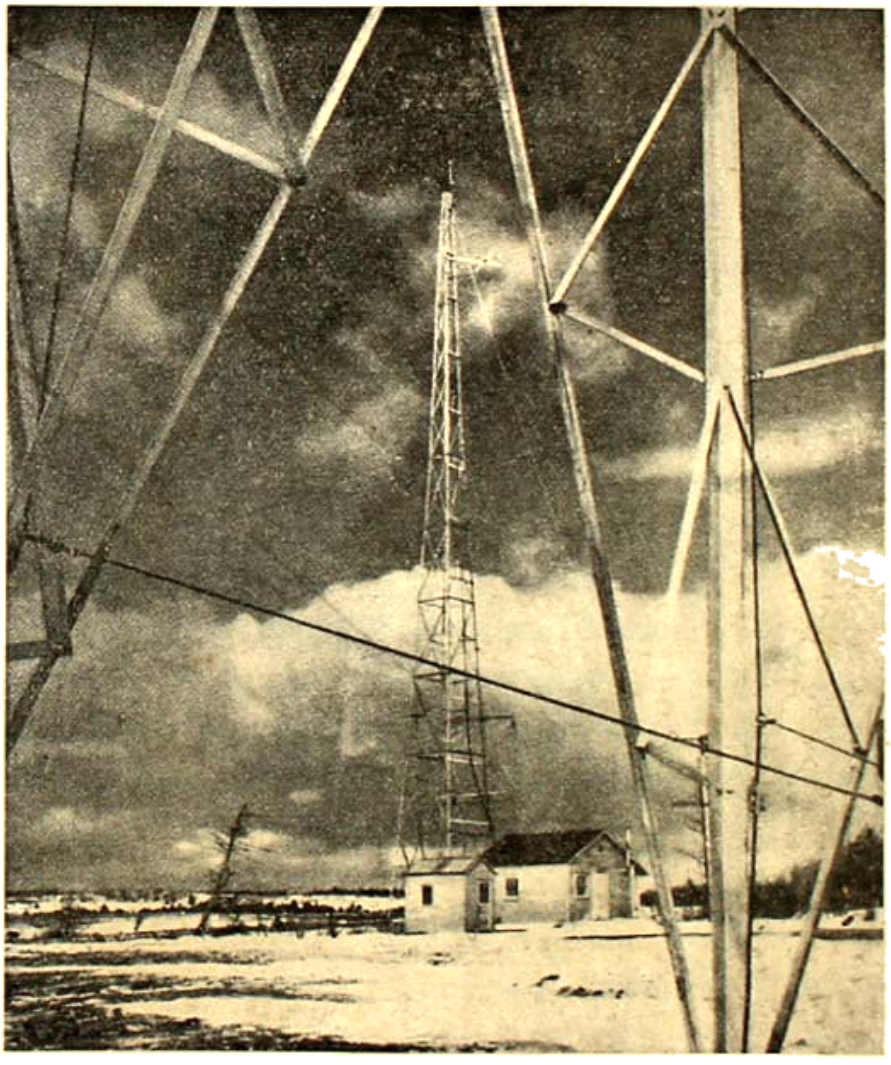

টেলিভিজনের ভবিষ্যৎ প্রেরণের শুরু : সম্মুখস্থ একটি শুরুর মধ্য হতে দূরবর্ত্তী রিলে-ষ্টেশন দেখা যাচ্ছে

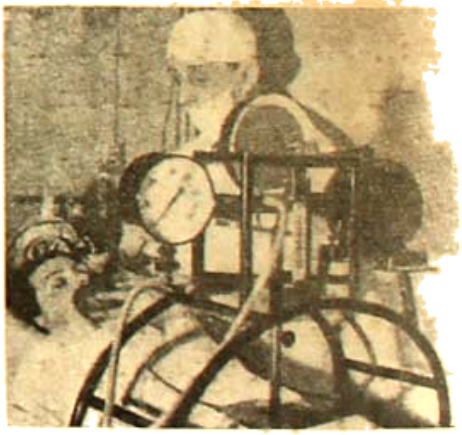

নূতন ধরণের কৌণ-দূরবীক্ষণ

পাউণ্ড। যন্ত্রটির উচ্চ বৈদ্যুতিক চাপ অবধারক পাত্রের ব্যাস চার ফুট এবং তার উচ্চতা সাত ফুট।

## নূতন ধরণের লৌহ-ফুস্‌ফুস্

জেনিভার ডক্টর রেমণ্ড একটি নূতন ধরণের লৌহ-ফুস্‌ফুস উদ্ভাবন করেছেন। পূর্ব্বেকার ব্যবহৃত লৌহ-ফুস্‌ফুস অপেক্ষা এই নূতন যন্ত্রটি হালকা ও দামে সস্তা। বৈদ্যুতিক মোটর সাহায্যে ফুস্‌ফুসটি চালনা করা হয় এবং হৃদ্‌যন্ত্রের চলাচল সিসিগ্রে লেখা হয়ে যায়। যন্ত্রটি শায়িত রোগীর পাকস্থলীকে ঊর্দ্ধাধঃভাবে সঞ্চালিত করে।

## বৈদ্যুতিক গাড়ীতে হাওয়া-কল

বারোটি ষ্টোরেজ-ব্যাটারী-সংলগ্ন বৈদ্যুতিক মোটর সাহায্যে এই গাড়ীটি চলে। গাড়ী চলার সময় ব্যাটারী হতে বিদ্যুৎ ব্যয়িত হয় কিন্তু সামনের হাওয়া-কল বায়ুপ্রবাহে ঘূর্ণায়মান হয়ে বিদ্যুৎ-জনক ডায়নামো সাহায্যে ব্যাটারীতে বিদ্যুৎ সঞ্চার করে। গাড়ীটির উদ্ভাবন-কর্ত্তার হিসাব অনুসারে, এই গাড়ী চালাতে মাইলপ্রতি এক পয়সার কম খরচ পড়বে।

## ভবিষ্যতের খাদ্য

শতবর্ষ পরে পৃথিবীতে মানুষের খাদ্য কিরূপ আকার গ্রহণ করবে সে প্রসঙ্গে লর্ড বার্কেনহেড অনেক জল্পনা-কল্পনা করেছিলেন। তিনি বলেছেন—তখন আর কাউকে বিদেশ হতে খাদ্য আমদানী করতে হবে না, চাষ আবাদের হাঙ্গামা থাকবে না, থাকবে শুধু কৃত্রিম খাদ্যের কারখানা। এই কারখানাগুলি সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকবে আর খাদ্যবিশারদ বোর্ড জনগণের শরীরে কখন কি বস্তুর অভাব হচ্ছে তা নিরূপণ করে খাদ্য-ফরমুলার পরিবর্ত্তন করবেন। লোকের বাড়ীতে কোন রান্নাঘর থাকবে না, কারখানান্বিত বিরাট চুল্লী, প্রকাণ্ড কটাহ, বোলার, ক্রাশার, ফিল্টার প্রেস্ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে জাতির খাদ্য তৈরী হয়ে শিশি ও বোতলে ভর্ত্তি হবে। কে কি খাবে তা নিয়ে চিন্তার প্রয়োজন হবে না, সে ভার খাদ্য-বিশারদগণের উপর ন্যস্ত থাকবে; প্রতি সোমবার প্রত্যেকের বাড়ী ডাকযোগে সপ্তাহের খাদ্যের ট্যাবলেট পৌঁছে যাবে। অথবা হয় তো এক রকম তরল খাদ্য তৈরী হয়ে শহরের কলের জলের মত বাড়ীতে বাড়ীতে নলযোগে খাবার পাম্প করে দেওয়া হবে। ইম্পিরিয়াল্ কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজের চেয়ারম্যান লর্ড মাথ্‌গোম্যান বলছেন, আমরা না কি সেই পথেই দ্রুত অগ্রসর হচ্ছি। রাসায়নিক সংশ্লেষিত খাদ্য বর্ত্তমানের স্বাভাবিক খাদ্যের স্থান অধিকার করবে। যন্ত্রতন্ত্রের দ্রুত উন্নতি এবং শক্তির প্রচুর শক্তি পাওয়ার ফলে মানুষকে আর দিবারাত্র পরিশ্রম করিতে হবে না। দৈনিক এক ঘণ্টা চাকা ঘোরান, বোতাম টেপা, হাতল টানা প্রভৃতি কাজ তার জীবিকা-অর্জ্জনের পক্ষে যথেষ্ট, দিনের শেষে একটা পিল খেলেই উদরপূর্ত্তি। কিছুদিন আগে হাইডেলবার্গের অধ্যাপক কাল্‌পার শ্মিট তুলার বীজ হতে একপ্রকার অতি পুষ্টিকর খাদ্য তৈরী করেছেন বলে প্রচার করেন। সেই খাদ্যের দুইটি ট্যাবলেট তিনদিনের খাবারের অভাব পূরণ করে। একটি ট্যাবলেটের মধ্যে আধপোয়া মাংস, দুইটি কমলা লেবু এবং একটি ডিমের পুডিং-এর সমতুল্য পুষ্টিকারিতা বর্ত্তমান। অধ্যাপক শ্মিট বলেন এই খাদ্য সেনাবাহিনী, বিমান চালক, এবং মেরু, মরু ও পর্ব্বত-অভিযানকারীদের পক্ষে খুব সুবিধাজনক হবে। সংবাদপত্রে প্রকাশ, হলাণ্ড আক্রমণকারী জার্মান প্যারাশুটিষ্টদের নিকট এইরূপ খাদ্য-ট্যাবলেট ছিল।

অনুমান করা যায় ভবিষ্যতের ট্যাবলেট-পুষ্ট মস্তিষ্কের মানুষ রাগদ্বেষ ও ভাবাবেগ বর্জ্জিত হবে এবং আইনষ্টাইনের থিওরী অপেক্ষা 'সুপার রিলেটিভিটি' শাস্ত্রে এবং 'হাইপার কিউবিষ্ট' আর্টে মনোনিবেশ করবে।

## স্বাস্থ্যের জন্য তৃণ ব্যবস্থা

বাবিলনের রাজা নেবুকাদ্‌নেজার, শরীর দুর্ব্বল হলে ঘাস খেয়েছিলেন। তৃণভোজী হলেও তিনি খুব পরাক্রমশালী ছিলেন। সিরিয়া বিজয়, জেরুজালেমের ধ্বংসসাধন এবং এশিয়া হতে মিশরীয়দের বিতাড়ন তাঁর ঐতিহাসিক কীর্ত্তি।

চার বৎসর বহু পরীক্ষার পর বৈজ্ঞানিকগণ জানতে পেরেছেন, যে ঘাসে ভিটামিন 'ডি'-ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার ভিটামিনের প্রাচুর্য্য আছে; শুক্‌নো ফল ও শব্‌জির তুলনায় ঘাসে ৮০০ গুণ অধিক ভিটামিন বিদ্যমান। পরিমাণ হিসাবে তৃণে ভিটামিন 'এ' গাজরের ২০ গুণ, ভিটামিন 'বি', সমুদ্র শফরীর নয়গুণ, ভিটামিন 'বি-২' লেটুসের বারোগুণ, ভিটামিন 'সি' টমেটো ও টক লেবুর চৌদ্দ

ওল। যে সকল বৈজ্ঞানিক এই নিয়ে পরীক্ষা করেছেন তাঁরা নিজে খাদ্যের সঙ্গে ঘাস খেয়ে দেখেছেন—তাঁদের স্বাস্থ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে এবং শীতকালে সর্দ্দি হয় নি।

ইতিমধ্যে কানাডা ও ইউনাইটেড ষ্টেটস্-এ খাদ্যোপযোগী ঘাসের গুঁড়ো তৈরীর চারটী কারখানা স্থাপিত হয়েছে। সেখানে প্রস্তুত একসের তৃণ-চূর্ণের মূল্য প্রায় ছয় আনা। গত এপ্রিল মাসে সিনসিনেটিতে আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটীর এক অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে তৃণের পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং আমেরিকাবাসীদের প্রত্যেককে তৃণ খাওয়ানোর জন্য প্রচার-কার্য্য চালাতে বলা হয়।

## নীরোগ গোধূম

কাঙ্গী নামক বীজাণু গোধূমের শত্রু। কানাডার ডোমিনিয়ন্ রাস্ট রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে তিন জন বৈজ্ঞানিক শস্যধ্বংসী বীজাণুর আক্রমণ-প্রতিরোধকারী ছয় জাতীয় নূতন ধরণের গোধূম চাষে সমর্থ হয়েছেন। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে এই গোধূম বিশপ্রকার উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ করতে পারে।

## নররক্ত সুস্বাদু নহে

নরখাদকদের কথা স্বতন্ত্র। জনৈক কীটতত্ত্ববিদ্, শোণিতপানে স্ফীতোদর মশকের রক্ত নিয়ে রাসায়নিক পরীক্ষা করে বলেছেন, নররক্তের প্রতি মশক-সমাজের বিশেষ লোভ নেই; গোজাতীয় প্রাণীর রক্ত তাদের অধিকতর প্রিয়। তাঁর মন্তব্যানুসারে মশকদের নিকট মুরগীর রক্ত সবচেয়ে নিকৃষ্ট, মানুষের রক্ত তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ সরস, কুকুরের রক্ত চলনসই; গো-অশ্বাদির রক্ত উৎকৃষ্ট এবং শূকররক্ত না কি সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয়।

## কুকুরের মন

সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে মানুষের চক্ষুর বোধই সবচেয়ে স্পষ্ট। কিন্তু কুকুরের চক্ষু অপেক্ষা ঘ্রাণের বোধ প্রবল। সুশিক্ষিত কুকুর মানুষের গায়ের গন্ধ অনুসরণ ক'রে অনেক স্থানে গোয়েন্দার কাজ করে একথা সকলেই জানেন। তার ঘ্রাণ-বোধের সূক্ষ্মতা কতখানি, সম্প্রতি তার পরিমাপ করা হয়েছে। চার পাঁচটি গন্ধদ্রব্য একত্র মিশ্রিত থাকলে তার মধ্য হতে কুকুর তার পরিচিত গন্ধের অস্তিত্ব বুঝতে পারে। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, দুইশতভাগ জলে এক-ভাগ নাইট্রোবেঞ্জিন, দশলক্ষভাগ জলে একভাগ লাক্টিক্ অ্যাসিড, কাপ্রিলিক্ অ্যাসিড্ অথবা ফর্মিক অ্যাসিড্, চল্লিশলক্ষভাগ জলে একভাগ আয়োডোফর্ম, কোটীভাগ জলে একভাগ সালফিউরিক্ অ্যাসিড্ থাকলে শিক্ষিত কুকুর কেবল ঘ্রাণের সাহায্যে তা বলে দিতে পারে। শোনা যায় কোন কোন মানুষ চায়ে চিনি আছে কি না, অথবা ঝোলে লবণ আছে কি না, কেবল শুঁকে বলে দিতে পারে। কোনও পুলিসের এলসাট নামে এক গোয়েন্দা-কুকুরকে নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে, সে দশহাজার ভাগ জলে একভাগ লবণ অথবা একভাগ হুইনীনের অস্তিত্ব কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয় সাহায্যে বুঝতে পারে।

কুকুরের গন্ধনির্ব্বাচন-ক্ষমতা জানবার জন্য নিম্নোক্ত পরীক্ষাটী করা হয়:

ছয়জন ব্যক্তি একত্রে ছয়টি পাথর হাতে নিয়ে বিশ-ত্রিশ হাত দূরে ছুঁড়ে দেয়; তাদের মধ্যে যে কোনও এক ব্যক্তির হাত শুঁকে তার হস্ত-নিক্ষিপ্ত পাথর কুকুরটি আনতে সমর্থ হয়; এই পরীক্ষায় একবারও সে ভুল করেনি।

কুকুরের সুর-বোধ সম্বন্ধেও নানাবিধ পরীক্ষা করা হয়েছে। একটি শিক্ষিত কুকুরকে খাবার দেওয়ার সময় পিয়ানোতে কোনও নির্দ্দিষ্ট সুর বাজানো হয় এবং অপর একটি নির্দ্দিষ্ট সুর বাজিয়ে তাকে খাওয়া হতে বিরত হওয়ার জন্য বাধা দেওয়া হয়। কয়েকদিন এরূপ করার পর দেখা গেল খাওয়া সম্বন্ধের সুর বাজিয়ে তার মুখের কাছে মাংসের টুকরা ধরলে সে খায় না; কিন্তু ভোজনত্যাগের সুর আরম্ভ করলেই তৎক্ষণাৎ খেতে আরম্ভ করে। সাধারণ মানুষ আট দশ হাত দূর হতে যে শব্দ শুনতে পায় না, কুকুর পঞ্চাশ হাত দূর হতে তা শুনতে পায়। বাটটি বিভিন্ন রকম শব্দ যুগপৎ বিভিন্ন দিক্ হ'তে উৎপন্ন ক'রে তার মধ্যে কোনও একটি বিশেষ সুর কোন্ দিক হতে আসছে জিজ্ঞাসা করলে শিক্ষিত কুকুর তা বলে দিতে পারে। মানুষকে অনুরূপ পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে, ষোলটির অধিকসংখ্যক বিভিন্ন শব্দ হলে মানুষ তার মধ্যে কোনও শব্দের দিক্ নির্ণয় করতে পারে না।

সার জন লাবক্ (Sir John Lubbock) তাঁর কুকুরের আকার-বোধ সম্বন্ধে এই বিবৃতি দিয়েছেন : কয়েকটি কার্ডে 'খাবার,' 'হাড়,' 'জল,' 'চা,' ইত্যাদি লিখে তাকে হুকুম-অনুযায়ী একটি বিশেষ কার্ড আনতে শিক্ষিত করা হয়। বাইশ দিন এই ভাবে শিক্ষা দেওয়ার পর সে খাবার দরকার বলেই কার্ডগুলির মধ্য হতে 'খাবার' লেখা কার্ডখানি এনে উপস্থিত করত। কেবল একবার সে ভুল করে 'food' লেখা কার্ডের পরিবর্তে 'door' লেখা কার্ড এনেছিল। এ থেকে মনে হয় অক্ষরগুলির প্রতিই কুকুরটির লক্ষ্য ছিল।

## ভূগোল পাঠে ভুল

যাঁরা ইয়োরোপ পরিভ্রমণ করে ফিরেছেন, তাঁরা জানেন প্রাগ্, ভিয়েনা, রোম, মিউনিক্, বেলগ্রেড্, এথেন্স্ প্রভৃতি বললে সেই সকল স্থানের অধিবাসীরা অনেকে বিস্ময় বোধ করেন। কারণ সেই স্থানগুলির প্রকৃত উচ্চারণ যথাক্রমে প্রাহা ( Praha ), ভিন্ ( Wien ), রোমা ( Roma ), ম্যুন্শেন্ (Muenchen), বেওগ্রাদ্ (Beograd), আথেনাই ( Athenai ) ইত্যাদি। ক্যালিফোর্নিয়ার মিল্স্ কলেজের অধ্যাপক জন হার্ডি মুর্কে বলেছেন, বর্তমান যুগে ইয়োরোপের ভৌগোলিক স্থানের নামকে এইরূপ বিকৃতভাবে উচ্চারণ করার পক্ষে কোনও যুক্তি পাওয়া যায় না। তাঁর মতে ছয়বছর সন্তান বৈদেশিক নামের প্রকৃত উচ্চারণ শিক্ষা করা উচিত।

বর্তমানের যুদ্ধ শেষ হলে ইয়োরোপের জন্য নূতন মানচিত্র তৈরী করতে হবে ; সে সময় যাতে এই ভুলের আর পুনরাবৃত্তি না হয় সে বিষয়ে তিনি আমেরিকাবাসীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

## প্রাচীন পারসীক ভাষা সম্পর্কে নূতন তথ্য

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যতত্ত্ব-বিভাগের বিবরণীতে প্রকাশ, পারস্যদেশে কোন রাজকীয় সমাধিমন্দিরের নিকট প্রোথিত এক প্রাচীর-গাত্রে একখানি খোদিত প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে ; তার মধ্যে পহলবী বা মধ্য-পারসীক ভাষায় এবং গ্রীক ভাষায় একই বিবরণী লিখিত আছে। রসেটা প্রস্তরে যেমন গ্রীক ও মিশরীয় ভাষায় এক প্রকার বিবৃতি লিপিবদ্ধ থাকায় মিশরীয় ভাষা জানার সুবিধা হয়েছিল, এই প্রস্তরটি সেইরূপ পহলবী ভাষা জানার সাহায্য করবে।

'জর্ণাল অব সেমিটিক্ ল্যাঙ্গোয়েজ এণ্ড লিটারেচারে' ডক্টর্ মার্টিন স্প্রেংলিং সেই খোদিত প্রস্তরে পারসীক ভাষায় লিখিত অংশটির অনুবাদ প্রকাশিত করেছেন। তা থেকে জানা যায়, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে প্রাচীন জরথুষ্ট্রীয় ধর্মে বাইবেল ও কোরাণের সদৃশ কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ ছিল না।

---

## জগাখিচুড়ী

...কোন্ উপায়ে বর্তমান জগৎকে তাহার জগাখিচুড়ী ও পণ্ডাশ্রম অবস্থা হইতে রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, বর্তমান জগৎ কেন এই জগাখিচুড়ীর অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বর্তমান জগৎ কেন এই জগাখিচুড়ীর অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইলে, জগতের কোন্ অবস্থাকে জগাখিচুড়ীর অবস্থা বলা যায়, আর কি হইলে তাহার শান্তি ও শৃঙ্খলার অবস্থায় উন্নত হয়, সর্বাগ্রে তাহার আলোচনা করিতে হইবে।

কি হইলে জগৎ জগাখিচুড়ীর অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, আর কখন উহা শান্তি ও শৃঙ্খলায় বিরাজিত রহিয়াছে বলিয়া স্থির করিতে হয়, তাহার সম্যক্ আলোচনা অতীব বিস্তৃত একটি দর্শন-বিষয়ক।

সংক্ষেপতঃ উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে বলিতে হয় যে, প্রত্যেক মানুষ যাহাতঃ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি লইয়া গঠিত এবং প্রত্যেকের ইন্দ্রিয়গুলি কার্যসমূহ অথবা অর্থের প্রাচুর্যের জন্য, প্রত্যেকের মন শান্তি ও সুখের জন্য এবং প্রত্যেকের বুদ্ধি জগতে কেন কি হইতেছে তাহা বুঝিবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকে।

যখন জগতে মানুষের কার্যসমূহ প্রাচুর্য, মনের শান্তি ও সুখ এবং জগতে কেন কি হইতেছে, তাহা বুঝিবার মত বিদ্যা ও শিক্ষার উৎকর্ষ বিদ্যমান থাকে, তখন উহা শান্তি ও শৃঙ্খলায় বিরাজিত রহিয়াছে, ইহা বুঝিতে হয়। আর তদ্বিপরীত অবস্থার নাম জগাখিচুড়ীর অবস্থা।

মানুষের সাধারণ (common) কার্যসমূহ কি কি, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, মানুষের যত কিছু সাধারণ কার্যসমূহ আছে, তন্মধ্যে আর্থিক প্রাচুর্য, খাদ্যসম্ভার, যৌন যৌবন ও নীরোগ দর্শনাগ্রে উল্লেখযোগ্য...

---

# জ্যোতিঃহারা

—শ্রীঅনুরূপা দেবী

## দ্বিতীয় অঙ্ক

### তৃতীয় দৃশ্য

[ 'হিতসাধিনী' সভার অধিবেশন হইতেছে। স্থান—বালিকা-বিদ্যালয়েরই গৃহ, সময়—অপরাহ্ণ, উদ্যোগ যথাসাধ্য করা হইয়াছে, অর্থাৎ লাল সালুর উপর সাদা অক্ষরে 'স্বাগত' লেখা হইয়াছে, কাগজের মালা ঝোলান হইয়াছে, ফোটনের পাতা দিয়া সামনের দু'টি থামে একটু বাহার করা হইয়াছে। তাহির পাতা করাসের উপর কতকগুলি ছেলেমেয়ে, মহিলা ও ভদ্রলোক বসিয়াছেন, মধ্যে একটি ছোট টেবিলের উপর একটি ফুলদানীতে ফুল, একখানি বাঁধান খাতা, কয়েক শিট কাগজ, দোয়াতদান, ব্লটিংপ্যাড এবং তার সামনের আসনে অমিয়া বসিয়া আছে, গলায় তার ফুলের মালা। টেবিলের একধারে ইন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া—ইতিপূর্ব্বে সভার কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিতেছিলেন। এক্ষণে পড়া শেষ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এইখান হইতে শোনা গেল। ]

ইন্দ্রনাথ। সাক্ষাৎ বাণীরূপিনী আমাদের আজিকার সভা-নেত্রী মহোদয়া যে-সব কথাগুলি বলিলেন, আমি সর্ব্বান্তঃকরণেই তার সঙ্গে আমার ঐকমত্য পোষণ করছি, বাস্তবিক আমাদের আর নিরপেক্ষ হ'য়ে প্রতীক্ষা করবার অবসর নেই, আমাদের শিয়রে শমন বসলেই হয়! লক্ষ লক্ষ লোক এক ম্যালেরিয়ার হাতেই অকালে জীবন বিসর্জ্জন দিচ্ছে, তা ভিন্ন টাইফয়েড, কলেরা, কালাজ্বর, বসন্ত এ-সকলই প্রচুরতররূপে বিদ্যমান। আমাদের ঘরে ঘরে অজ্ঞতার অন্ধকার পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। এ-দেশের কোটী কোটী নরনারীর মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা অঙ্গুলীর পর্ব্বে গণনা করা চলে, এ কথা সকলেই জানেন। আমাদের এখন নারী-পুরুষনির্ব্বিশেষে একচিত্ত হ'য়ে এই সকল অন্তরে বাহিরে রোগ-বিমুক্তির একান্ত প্রচেষ্টা করা দরকার হয়ে পড়েছে। এর জন্য যার যতটুকু সাধ্য তিনি তাই করুন। যদিও 'হিতসাধিনী' তার নামের যোগ্য কাজ এ-পর্য্যন্ত কিছুই করতে পারে নি, কিন্তু এবার আমাদের আশা হচ্ছে, আমরা যে আমাদের মধ্যে আমাদের পরম স্নেহের ও একান্ত প্রদ্ধার পাত্র-পাত্রী কয়েকটিকে লাভ করেছি, ওঁদের তরুণ ও কঠিন চিত্তের উৎসাহে ও আয়োজনে এইবার এই হিতসাধিনী তার পূর্ব্ব-প্রদত্ত নামের গৌরব রক্ষা করতে সমর্থ হবে।

( নেপথ্যে ) "এখানে মেয়েলোকের বক্তিমে হচ্ছে শুনে আমাদের কুমার সাহেব শুনতে এয়েছেন, তা' এতে পথ আটকানো হচ্ছে কি জন্য শুনি? এটা কি গুপ্ত-চক্র না কি যে, বাইরের লোককে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না?"

[ সকলে সচকিত হইল; ইন্দ্রবাবু বক্তৃতা বন্ধ করিলেন। যামিনী উঠিয়া গেল। কথা কহিতেছিল ফুলণ, আবার তার গলা শোনা গেল। ]

ফুলণ। এ কি রকম সভা মশাই! সভা করবেন, যার খুশী সে দেখতে যাবে। ভদ্দর মহিলা যিনি সভায় দাঁড়িয়ে বক্তিমে দিচ্ছেন, তাঁর আবার অত লোক-বিচার কিসের? যে রাজের সামনে বক্তিমে করতে পারে, তাদের সামনেও তার না পারবার কোনই সঙ্গত কারণ নেই। যান যান, পথ ছিন আমরা যাই, থিয়েটার, বায়োস্কোপ, সার্কেস সব দেখা হয়েছে, এইটে এখনও দেখা হয় নি, দেখতে চাই।

( নেপথ্যে যামিনী ) দেখুন, ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে যাঁরা সম্মান রেখে কথা কইতে শেখেন নি, তাঁরা তাঁদের মধ্যে বসবার যোগ্য নন। মাপ করবেন, আমাদের এ-সভা মাত্র পরিচিত জনেরই মধ্যের, এর মেম্বরদের নিয়ে অধিবেশন, সাধারণ জন-সভা নয়। নমস্কার!...দরওয়ান, দোর বন্ধ রাখবে। ( ভিতরে ফিরিয়া আসিল। )

( নেপথ্যে ফুলণ ) বেশ! আমরাও এক্ষণই পুলিস-থানায় গিয়ে খবর দিয়ে আসছি; এখানে বিপ্লবীদের চক্রান্ত সভা হচ্ছে, খোঁজ করলেই রিভলবার বের হয়ে পড়বে। চলি তা হ'লে।

ইন্দ্রনাথ ও অপর একটি প্রবীণ সভ্য। তা হ'লে না হয় মেয়েরা একটু ভেতরে যান, ওরা একবার আসতে চায় আসুক, কি জানি, যা' দিন-কাল পড়েছে।

( মেয়েরা যামিনীর দিকে চাহিয়া ছিল, যামিনী গম্ভীর দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল "না", তারপর ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিল। )

যামিনী। কাকাবাবু! সভার কাজ তো একরকম শেষই হয়ে গেছে। বাকিটুকুও হয়ে যাক ( অণিমার প্রতি ) কার্য্য-বিবরণীটা অনুগ্রহ ক'রে দেখুন তো।

অণিমা। ( উঠিয়া ) বিদ্যালয়ের ছাত্রী বৃদ্ধি এবং পুষ্করিণী-সংস্কারের টাকা সংগ্রহের জন্য সমবেত সভ্যবর্গের চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা। প্রস্তাবক, শ্রীযুক্ত সেক্রেটারী মহাশয়।

ইন্দ্রনাথ। যাক মা, আমার যা' বলবার ছিল, বলাই হয়েছে। এইটুকু শেষ কথা যে, এখন আমার এই জরাজীর্ণ পলিত মস্তক থেকে যে-ভার আজ আমার পুত্রপ্রতিম স্নেহাস্পদ শ্রীমান যামিনীপ্রকাশ তাঁর সুযোগ্য ও সবল হস্তে গ্রহণ করলেন, এ'তে আমরা ভবিষ্যতের সম্বন্ধে প্রচুরতর আশা নিয়েই যথাশক্তি উক্ত দুইটি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হ'তে পারবো।

রমেন্দ্র। ( উঠিয়া ) আমি আপনাদের এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণরূপেই সমর্থন করি।

অণিমা। ছাত্রীগণের দ্বারা সঙ্গীত।

[ কয়েকটী কিশোরী অগ্রসর হইয়া আসিয়া গাহিল, তার মধ্যে জ্যোৎস্নাও ছিল ; সে বাজাইতে লাগিল, গান গাহিল কি না বলা যায় না। ]

গীত

ঐযে ধীরে,—
গত গৌরব আসিবে ফিরে।
মোরা আজ সাথী, ভবিষ্য ভগিনী, গৃহিণী, জননী,
হবো লক্ষ্মীরূপিণী, জ্ঞানে ধনী,—
নির্মলা শীতলা জাহ্নবী বারি,
গৌরব-আসন ঊর্দ্ধিবে অচিরে।

[ গানশেষে যবনিকা পতন। ]

## চতুর্থ দৃশ্য

( যামিনীর বাটী, সুলক্ষণার কক্ষ )

[ এক পাশে একটা আলমারি, অন্যদিকে আল্‌নায় শাড়ী, ব্লাউস কতকগুলি ঝোলানো আছে, একটা ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া সুলক্ষণা প্রসাধন করিতেছিল ; যামিনীর পিসীমা প্রবেশ করিলেন। ]

সৌদামিনী। হ্যাঁ বউমা! এ কি রকম কাণ্ড মা! মেয়ের একটা অসুখ, 'মা মা' করে যাছা আজ ক'দিন ধরে যেন ডগ্‌মা পিটতে লেগেছে, বাপের বাড়ী গেলে, চারদিন সেখানে কাটিয়ে এলেই আবার কি না সেজেগুজে যাবার ধুম! একবার মেয়েটাকে দেখতে পর্য্যন্ত গেলে না মা! মেয়েকে আমি যে আর রাখতে পারছি নে।

সুলক্ষণা। ( মাথার সেমিজ আঁটিতে আঁটিতে ) তা' আমি আর কি করব? মেয়ে কি শুধু আমার একলারই? আপনাদেরই তো ও বেশী ভালবাসে, রাখুন না আপনারাই। আমার আজ একবার এখনই বেরুতে হবে, না গেলেই নয়।

সৌদামিনী। তা' যাবে যেও যাছা, জোগা মেয়ে অত-ক'রে ডাকছে একবারটী তাকে দেখাটা দিয়ে যাও।

সুলক্ষণা। দেখুন, কেবলই কেন ওই এক কথাই বলছেন? আমি এখন যাব না। গেলেই তো ছাড়তে চাইবে না, কাঁদতে থাকবে, কোলে উঠতে চাইবে। দেখছেন তো, শাড়ীখানার কি রকম সূক্ষ্ম কাজ! একটা জায়গা টেনে গেলেই জন্মের শোধ হয়ে গেল। বাবা এখানা বোম্বাই থেকে কিনিয়ে আনিয়েছিলেন, দুশো টাকা প্রায় দাম।

সৌদামিনী। ( নিঃশ্বাস ফেলিয়া ) তবে আর কি ক'রে মেয়ে কোলে করবে মা! দুশো টাকার শাড়ী তো আর নষ্ট করতে পার না। থাক, কিন্তু আকাশ যে মেঘে ভরে উঠছে, এমন সময় বাড়ীর বার না হলেই ভাল হতো। যাক যা ভাল বোঝ তাই কর মা, দিব্যে রুকে মরি, কথা তো শুনবে না, বলেই বা লাভ কি!

( প্রস্থান )

সুলক্ষণা। আপদের আর শান্তি নেই! বাড়ীর কর্ত্তাটি তবু এখনও বাড়ী ফেরেন নি, সেখান থেকে আর একটাট উপদেশের অনুবৃত্তি এখনও বাকিপাওনা আছে। তার আগেই বেরিয়ে পড়তে পারলে বেঁচে যাই। ( দ্রুত হস্তে মুখে পাউডার পাফ্‌ বুলাইয়া দিল এবং হাতব্যাগটা বুলাইয়া যেমন বাহির হইতে যাইবে, যামিনী দিয়া প্রবেশ করিল যামিনী, অফিসেরই পোষাকে )

যামিনী। এ কি! আমার কোথাও বেরুচ্ছ না কি? মেয়েটার জ্বর, ক'দিন ক্রমাগতই তোমায় খুঁজেছে, এই মাত্র আমায় দেখেই বললে, 'আমার মা'কে ডেকে দাও'। যাও না একটিবার ওর কাছে, আজ আর নাই বা বেড়াতে গেলে।

সুদক্ষতা। ( বিরক্তির সহিত ) বুঝেছি! এ'টি তোমার মিটমিটে ডান পিসীমায়েরই শয়তানী! মেয়ে আগলে থাকতে পারছেন না, সেই কথাটি স্পষ্ট ক'রে বললেই তো হয়! তা' না মেয়ে ডাকছে। ছেলেমানুষ যা বলে তাই না কি আবার শুনতে হবে? ওতে আস্কারা দিয়ে কচি ছেলের মাথা চিবিয়ে খাওয়া হয় না? পরকালটি ওর ঝরঝরে না ক'রে তো আর উনি ছাড়বেন না! না, আমি এখন দেরি করতে পারব না। আমার সেই খুড়তুতো বোন দীপা এসেছে নৈহাটীতে, তাদের আমার বাড়ী। আমায় অনেক ক'রে নেমন্তন্ন করেছে, আমায় আজকে যেতেই হবে।

যামিনী। ভয়ানক মেঘ করেছে, যদি ঝড় ওঠে! গঙ্গা এ-সময় পার হওয়া উচিত?

সুদক্ষতা। ( সবিদ্রূপে হাসিয়া ) আর কোন ছুতো নেই? সোজা বাংলায় বললেই হ'ত যে, তোমার মেয়ের রোগের সেবা তুমিই কর গে যাও, আমরা কেউ পারব না। দেখ, আমিও সোজা কথায় বলে দিচ্ছি, মেয়ে আমার একার নয়, বাপের মেয়ে তারাই দেখুক, কাল যা' হয় করা যাবে, আজ আর আমি মেয়ে নিয়ে বসছি নে। ( গমনোদ্যত হইয়া ফিরিল ) ভাল কথা, একটা সুখবর আছে, বাবা আমায় তাঁর উইলে পঁচিশ হাজার টাকা আর কলকাতায় একখানা বাড়ী দিচ্ছেন যে! দুর্দশার হাত থেকে এইবার একটু বাঁচব। চললুম, ( কাছে আসিয়া ) রাগ হ'ল? অমন একটা সুসংবাদ দিলুম, একটা ধন্যবাদও দিলে না? যা' তোমার চিরজন্মের রোগারে কখনও হয় তো হবে না। ( কাঁধে হাত রাখিয়া গলাটা জড়াইয়া ধরিল )

যামিনী। ( নির্লিপ্ত ভাবে ) কি আর বলব? বলবার মত ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি নে! আধুনিকতার বিষ যে মানুষকে কি রকম আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে, তুমিই তার এক জলন্ত দৃষ্টান্ত! টাকার নেশা তোমার নারীত্ব মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়ে দিয়েছে।

সুদক্ষতা। কি মুশ্‌কিল! 'যার জন্যে পালাও তুমি, সেই দেবী যোগাচ্ছা আমি,' আমার তাই হ'ল যে। আচ্ছা, আচ্ছা, কৌমুদী মশাই! একটু থামুন, রাত্রে ফিরে এসে সব নিরিবিলিতে শোনা-টোনা যাবে। ( প্রস্থান )

যামিনী। 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী'। কি পাপে? হে ভগবান! কি পাপে আমার এই লোহার শেকল গলায় পরালে? না:, অপিমা চের সুখী। আমার মত যেন অতি বড় শত্রুরও না হয়। গরীব হ'য়ে বিলাসী ধনীর কন্যা বিয়ে করা আর ফাঁসীকাঠে গলা দেওয়া সমান। ( সৌদামিনীর ব্যস্তভাবে প্রবেশ )

সৌদামিনী। প্রকাশ! হাঁা রে, বউমাকে যেতে দিলি? এ-দিকে যে তুমুল হ'য়ে ঝড় উঠল রে? শুনছি না কি নৈহাটী গেল? এই ঝড়ে গঙ্গা পেরবে। ওমা, আমার কি হবে মা! ( মেঘ গর্জ্জন ও বিদ্যুদ্বিকাশ )

যামিনী। তাই তো পিসীমা! কি করি বল তো? গাড়ী তো নিয়ে গেছে, আমি না হয় একবার পারঘাটায় ছুটে যাই, যদি না বেরিয়ে থাকে, যদি ফেরাতে পারি।

( গমনোদ্যত হইল )

সৌদামিনী। ও রে, ঐ যে চড় বড় ক'রে বৃষ্টি নামল। হেঁটে এই দুর্য্যোগে কোথা যাবি? দাঁড়া একটা গাড়ী ভাড়া ক'রে আনাই। না হয় ছাতা নে, ছাতা নে, অমনি যাস নি বাবা। ও রে কেষ্ট কেষ্ট! ( যামিনী ততক্ষণে বাহির হইয়া গিয়াছে ) ও মা, আমার কি হবে মা, কি বউ ঘরে এনেছিল গো! একটা কিছু না ঘটিয়ে আর সহজে ছাড়বে না! ইন্দ্রদাদার মেয়ে লোহাগুকে বউ করবারই আমার বরাবরের সাধ ছিল, যাকে হ'তে ঐ রকম মেয়ের সঙ্গে কথা হ'য়ে কি যে এক কাণ্ড ঘটে গেল। ওরাও কি জেনে জানি না হঠাৎ বিয়ে দিতে অমত করলে। বললে মেয়ে এখন ছোট। যাক, যা হবার তা'তো হ'লই, এখন ছেলে আমার বউ নিয়ে ফিরলে যে আমি বাঁচি। কি করি? কি করি? হে ভগবান! ( প্রস্থান )

## তৃতীয় অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

[ মিঃ দত্ত'র বারান্দার একটু দূরেই বন্ধেন্দ্রের বারান্দার অংশ, নীচে গঙ্গা দেখা যাইতেছে, তীরে একখানা নৌকা

কাৎ করা, তারই পাশে এক জটাজুটওয়ালা নাগা সন্ন্যাসী ধুনীর আগুনে গাঁজা সাজিতেছিল। আকাশে মেঘ ডাকিতেছে, ঝড়ের শব্দ হইতেছে, বরেন্দ্রের বারান্দায় একটি লোক একটি মোড়ায় বসিয়া গলা ছাড়িয়া আপনমনে গান গাহিতেছিল। ]

গীত

কত ওঁহার জটাজুট ঐ ঘড়িয়ে ঘোঁছে আকাশে,
অগ্নিবাণের লীলায় মতন তড়িল্লতা বিকাশে।
স্তব্ধবায়ু পবন আজি মূর্চ্ছাহতে বিস্ময়ে,
পুষ্পবনে পূজায় জনি শুক হ'ল কার ভয়ে,
মেঘডম্বরু তালে তালে হরষ কাঁপে তারায়ে।
মূর্ত্তিটীর নেত্রানলে দগ্ধ হ'ল মদন তো।
মূর্ত্তি কোথায় কাঁদছে প্রতি, বিলাপ বিল কলস্ত।
অটবীরা উর্দ্ধমুখে চেয়ে আছে, পাখীরা খুঁজছে বাসা গাছে গাছে,
নদীর বুকের খেয়ার পরে যাত্রী ঘরে হতাশে।

অণিমা। ( বারান্দায় দাঁড়াইয়া গান শুনিল ) কি মিষ্টি গলা! ও-বাড়ীটায় প্রায় বৎসর খানেক থেকে কারা এসেছে, কে জানে! মাঝে মাঝে গান শুনতে পাই। ইনিই গান বোধ হয়। উঃ কি মেঘই করেছে! রুদ্রের জটাজুটের মতই রুদ্ররূপ প্রকটিত ক'রে হৃদয়ে কম্পন আনছে! ঐ যে একখানা নৌকাই তো দেখছি ওপারের দিকে চলেছে। আরোহীরা দুঃসাহসী বটে! এমন আসন্ন-সঙ্কটের মধ্য দিয়ে কেউ এত বড় নদী পাড়ি দেয়, উঃ দেখতে দেখতে কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরেই ঝড় উঠল! নৌকাখানা টলমল টলমল করছে। কি জানি কি হবে? আচ্ছা সংসার-সমুদ্রে আমাদের জীবন-তরীই বা ওর চেয়ে কতটুকু নিরাপদ? অনুকূল বাতাসবেগে যেন ইচ্ছাসুখে ভেসে যায়, আবার হঠাৎ কখন ঝড় উঠে তাকে ডুবিয়ে দেবে, তারও তো কোনই স্থিরতা নেই। নাঃ, জীবনটা ক্রমেই যেন ভার হয়ে উঠছে! কিছুই আর ভাল লাগে না। আমার বান্‌চাল হওয়া এই আশা ভরী যে কত দিনেই—কি ভয়ানক জোরে বৃষ্টি এল! আচ্ছা সেই সন্ন্যাসীটি বসে বসে ভিজছেন বুঝি? ওকে না হয় ডাকি। আহা গরীব নিরাশ্রয়! সন্ন্যাসীঠাকুর! সন্ন্যাসী-ঠাকুর!

সন্ন্যাসী। মায়ী?

অণিমা। জলে ভিজছেন কেন? আমার বাড়ীতে আসুন। দাঁড়ান আমি যাচ্ছি।

[ কড় কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া কোথায় একটা বজ্রপাত হইল। চারিদিক একবার বজ্রালোকে আলোকিত হইয়াই আবার অন্ধকার হইয়া গেল। ইহার মধ্যে দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, নীচের একটা দালানে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী তার আর্দ্র জটাজাল মেলিয়া দিয়া জল ঝাড়িতেছিল, অণিমা প্রবেশ করিল, তাহার পিছনে একটা চাকর একটা লণ্ঠন রাখিয়া গেল। ]

অণিমা। গঙ্গা! সন্ন্যাসীঠাকুর আজ রাত্রে এখানেই খাবেন, তার ব্যবস্থা করে দিও, ঠাকুর! বৃষ্টিতে ভিজছিলেন কেন? বাড়ীর মধ্যে চলে এলেই তো হ'ত। দেখুন তো কি রকম ভিজে গেছেন; আহা আপনাদের তো বড্ড কষ্ট!

সন্ন্যাসী। ( স্মিত হাসিয়া ) কষ্ট তো কিছুই হোয় না মায়ী! স্বপন ঝড় উঠে, জল আসে, ঝড় লাগে, ধূলা হয়, আঁখ মুদিয়ে কিষেণজীর রূপ ধেয়ান করি, দুখ্ আর দুখ্‌ই দিতে পারে না। সোব ভালা হোয়ে যায়। সে কি রূপ, আহা সে কি রূপ! ( সুরে ) "বনিহারী যাই তুহারি হে অপরূপ!"

অণিমা। ( সবিস্ময়ে সন্ন্যাসীকে দেখিতে দেখিতে স্বগতঃ ) এই মূর্খ অশিক্ষিত সামান্য লোকটার মুখে কি আনন্দের জ্যোতিঃ! আত্মনিবেদনের কি প্রশান্ত শান্তি! কোন্ মহা তপঃ-প্রভাবে এ এই আত্মানন্দলাভে সমর্থ হয়েছে? ( প্রকাশ্যে ) আচ্ছা সন্ন্যাসীঠাকুর! সত্যি কি তোমার কিষণজী তোমার সব কষ্ট সহ্য করতে ভরসা দেন? সত্যি কি তিনি আছেন?

সন্ন্যাসী। ( জটা বাঁধিতে বাঁধিতে ) আছেন বই কি মায়ী, আছেন বই কি। তিনি যদি নেই, তবে কে এই ঝোড়ের মধ্যে হামায় ডাকিয়ে নিলে? তুই সন্ন্যাইকে কি এমোন করিয়ে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া আনিস্ সন্ধ্যা মায়ী? তার বাঁশীর সুর তোর কাণের মধ্যে ঢুকলো বোলে সেই না তুই হামায় আনিয়ে নিলি রে রাধারাণী। এ তার বাদুযন্তর রে।

অণিমা। ( চমকিয়া স্বগতঃ ) কার সে বাঁশীর তান? না, মিথ্যা ভ্রম! অলীক কল্পনা, কোথায় কোন্ অদৃষ্টলোকের অচেনা বংশীধারী আমার প্রাণের তারে তার সুরের রেশ কোন

কল্পনাই আনে নি। এ যাদুমন্ত্রই যদি হয়, তবে ঐ ঘটনা সংঘটন-কারিণী অঘটনঘটন-পটীয়সী প্রকৃতিদেবীর সে যাদুমন্ত্র, যে কখনও কল্যাণী, কখনও রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধারণ করতে সমর্থ! বাঁশী যদি বেজেই থাকে, তবে সে ঐ অম্বরেরই বাঁশী। তা ছাড়া কোথায় আবার কোন্ দ্বিতীয় বংশীধারী।

সন্ন্যাসী। ( নীরবে চাহিয়া দেখিয়া হাসিল ) বাচ্চা! এখনও তাকে চিনিস নি, কিন্তু আমি এই খোলিয়ে দিচ্ছি, একদিন তুই তার এই রোকম মূর্ত্তি তোর বুকের ভিতরে আঁকা দেখতে পাইবি। তুই সাক্ষাৎ রাধিকাজী আছিস, আমি তোকে চিনিয়েছি। ( ঝুলির মধ্য হইতে একখানি ছোট পট বাহির করিয়া দেখিতে দেখিতে ) নে' মায়ী! ওর ঐ রাঙ্গা পায়ের উপর আপনাকে লুটিয়ে দে; ধন্য হ'য়ে যা! ধন্য হ'য়ে যা! মায়ি! ধন্য ধন্য জীবন তুহারি! এই নে' মায়ী!

গীত

( চিমটা বাজাইয়া )

ভজন করো মন তাকো,
দিবা রাত, নাম তাকো।
তপন চন্দ্রমা তারাজাতি, দিবা রাতি নাম পাতি,
সকল পাপন জর যাতি,
কিস্কো ধরম নাকো।

অণিমা। ( ঈষৎ সরিয়া গিয়া ) না ঠাকুর, তোমার দেবতা তুমিই রাখ, আমার ওতে দরকার নেই, আমি দেবতা মানি নে।

সন্ন্যাসী। ( হাসিয়া ) কচ্ছু দোষ্ নেহি বচ্চা! যে রাম সেহি রহিম, যে তোর ব্রহ্মা সেহি হামারা কিষেনজী। কবীরজী বলেছেন ( সুরে ) তুঁহি ব্রহ্মা, তুঁহি বিষ্ণু, তুঁহি শেষ, তুঁহি অশেষ।

অণিমা। আমি ঈশ্বর মানি নে, ভগবান আছেন বলেই আমার বিশ্বাস নেই।

সন্ন্যাসী। ( বিস্ময়াহত ভাবে চাহিয়া রহিল, তার দৃষ্টি কঠিন হইয়া আসিল, ছবিখানি তুলিতে ফেলিয়া সে উঠিল এবং কোন কথা না বলিয়াই দৃঢ় পদক্ষেপে চলিয়া গেল। )

দূর হইতে তার গাওয়া মীরাবাইএর ভজন গানের একটুখানি ভাসিয়া আসিল—

"মেরা জনম মরণ কে সাথী, তাহুসে নহি বিসরিয়ো, দিন্ রাতি।"

অণিমা। কত সুখী, আমার চেয়ে ওই কপর্দকশূন্যা ভিখিরীও কত সুখী। কেন আমি অমনই সরল বিশ্বাসী হ'য়ে গড়ে উঠতে পাই নি? কেন আমায় কেউ তা' ছোটবেলা থেকে শেখায় নি। এই বিশ্বাসের জ্যোতিঃ হারিয়েই আমার জীবন এমন জ্যোতিঃহারা হ'য়ে গেছে! কেন, কেন আমি সবাই যা' পায়, তাও পেলুম না।

( দ্রুতপদে কৃপালিনীর প্রবেশ )

কৃপালিনী। অণি! অণি! কি সর্ব্বনেশে খবর পেলুম! যামিনীবাবু না কি নৌকাডুবিতে মারা গেছেন। এ'কি হ'ল ভাই!

অণিমা। ( সহসা আত্মবিস্মৃত ভাবে আর্ত্তস্বরে ) সত্যি কি তুমি নেই? আমায় এত ক'রেও তোমার সাথ মেটে নি? বাকীটুকুও কেড়ে নিলে? ( বসিয়া পড়িল )

রমেন্দ্র। ( নেপথ্যে ) মিলি! ও ভুল খবর। যামিনীর কিছু হয় নি। নৌকাডুবী হয়েছে তার স্ত্রীর। ( প্রবেশ করিল ) অণিমা এখানে অমন ক'রে ব'সে কেন? ওঃ, ওই খবরটা বুঝি এখানেও এরই মধ্যে পৌঁছে গেছে? যা' হ'ক ভগবানের দয়ায় সে নিরাপদ আছে, কিন্তু কি ভয়ানক বিপদই তার ঘটল! বেচারী এই প্রচণ্ড দুর্যোগ মাথায় ক'রে ছুটে বেরিয়েছে; এখন এই খবর পাওয়া গেল। আমি যাই দেখি তার কোন সাহায্য করতে পারি কি না। ( প্রস্থান )

কৃপালিনী। চল্ ওপারে যাই, বৃষ্টিটা ধরলে একবার যামিনীবাবুর বাড়ী যেতে হবে। ( স্বগতঃ ) তোমার মনের কথাটা এবার ভাল ক'রেই জানা গেল! উনি না কি আবার ঈশ্বর মানেন না। ( উভয়ের প্রস্থান )

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ রমেন্দ্রের বৈঠকখানায় বন্ধুর দল রমনকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল। রমন একটী গান গাহিতেছিল। )

গীত

ভুলে যদি যাবে, ভুল করে তবে কেন এত ভালবাসিলে?
যদি হায় হবে খনক-ইন্দু, কেন সুখে ভেসে হাসিলে?
প্রভাতের আলো জ্যোৎস্নার লেখা, সে হাসির মাঝে ছিল না কি দেখা,
স্বর্গের সুধা মর্ত্ত্যে বসে, কেন সাথে লয়ে আসিলে?

ভূষণ। আর তোমার ঐ গান-কানের কর্ম নয় বাবাজি! ভাল ক'রে বাঁধন কষণ দিতে না পারলে শিকার এবার তোমার হাত ছাড়াবে, তা তোমায় এই বলে দিচ্ছি, বুঝে-সুঝে সাবধান হও। সঙ্কটত্রাণের কোন রকম উপায়-টুপায় জানা থাকে তো তাই কর।

রঞ্জন। কেন গো! তোমাদের বাবু ক্ষেপ্ নিয়ে বৈরাগী হচ্ছে না কি?

ভূষণ। সে হ'লেও তো এর চাইতে ভাল ছিল। বাবু এই পাশের বাড়ীর এক ধেড়ে-থুবড়ো পাশকরা রূপসী বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছেন। রূপসী ঠাকরুণ যদিও রাজী নন, কিন্তু তিনি যে-রকম উঠে-পড়ে লেগে আছেন, একটা হেস্তনেস্ত না করে আর ছাড়ার লক্ষণই নেই।

রঞ্জন। তা' বেশ তো, করুন না।

ভূষণ। আহা কি কথাই বল্লে! শুনে তো অঙ্গ আমার জল হ'য়ে গেল! বেশ তো! তা' বেশটা কার পক্ষে—তোমার না আমার?

রঞ্জন। (হাসিয়া) তোমারও না, আমারও না, ওঁনার নিজের।

ভূষণ। তা'তে তোমার আমার পেট ভরবে না তো! সেটার জন্যে কি ব্যবস্থাটা করেছ শুনি?

রঞ্জন। "জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনিই", তোমাদের বাবুই কি আর আমার খাইয়ে-পরিয়ে এত বড়টা করলেন না কি? তা' তার জন্যে ওঁনার সখ হয়েছে, উনি বিয়ে করবেন নাই বা কেন? তোমার আমার পুষবেন বলে কি আর সংসার-ধর্ম্মে মন দেবেন না?

বিনু। শোন তোরা শোন! নিজেদের স্বার্থই শুধু দেখতে শিখেছিস, কি রকম দিলদরিয়া উদার মন দেখ তো! হ্যাঁ, এমন না হ'লে দেবেমানুষ!

কল্পনা। আহা কি দয়াময়ী গো! 'মাছ মরেছে বেড়াল কাঁদে'; ওঁর মুখে আবার বড় বড় বিবেকের বুলি! বলে, (সুরে) 'কত কত হাড়ে দুব্বো গজালে, কত সংসার রসাতলে দিলে।'

ভূষণ। উনি দয়াময়ী হবেন না কেন? 'এক রাজা যাবে অন্য রাজা হবে, বাংলার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে'। মরতে মরব আবার শাশানাই!

রঞ্জন। দূর দূর গানটাও শেষ করতে দিলে না! বে-রসিকের দল সব!

গীত

আমার চিতে যার আগুনে, অন্তরে-প্রোত জাগে বহ্নিরেখা,
মুখে হাসি এবে বক্ষ-বেদন, কিবা দুখস্রোতে ভাসিলে?

(বরেন্দ্রের প্রবেশ ও রঞ্জনের দিকে চাহিয়াই গম্ভীর মুখে থমকিয়া দাঁড়ান)

রঞ্জন। (উঠিয়া) বন্দেগী হুজুরদাবের!

বরেন্দ্র। ভাল আছ?

রঞ্জন। যেমন দেখেছেন। অনেকক্ষণ এসেছি, আমার দোষ নেই, আপনিই দেরী করলেন। আজ আর বসতে পারব না, এখনই কিন্তু বিদায় দিতে হচ্ছে।

বরেন্দ্র। (সাগ্রহে) তা হ'লে বিনু, করুণা, তোমরা কেউ সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে এস। মোটরে গেলেই তো হয়? নৌকার চেয়ে দোলা মোটরে যাওয়াই তো ভাল। করুণা! আমার গাড়ীটা ক'রে তুমিই ওকে পৌঁছে দিয়ে এস গে।

রঞ্জন। (হাসিয়া নমস্কার করিল, স্বগতঃ) হবু কনের চোখ বাঁচাবার জন্যে আমায় আজ পর্দ্দানশীন্‌রূপে বিদায় দেবার ব্যবস্থা হ'ল! আহা বেচারা! নতুন প্রেমের নেশা এমনই বটে! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা আসি।

(রঞ্জন ও তৎপশ্চাৎ করুণা প্রভৃতি সকলের প্রস্থান)

বরেন্দ্র। ভূষণ! আর না, আর না, এ-সব হীন আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা বন্ধ কর ভাই! তোমার পায়ে পড়ি, আর এসব করো না, আমি স্বপ্ন দেখেছি, অত্যন্ত দুঃস্বপ্ন! সে-স্বপ্ন আমার ভেঙ্গে যাবে, সে-স্বপ্ন আমার ভেঙ্গে গেলে আমি বাঁচব না।

ভূষণ। (বিরক্তি-কঠিন কণ্ঠে) এ কি! দেখতে দেখতে একেবারে যে বুদ্ধদেব হ'য়ে উঠলেন! তাও বলি, এতটা বাড়াবাড়ি যাতে সইবে তো? বলে, 'অতি বাড়া ভাল না, ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে।'

বরেন্দ্র। ভূষণ! তুমি বুঝতে পারছ না, অনেক কষ্টে, অনেক দিনের অনেক চেষ্টা-যত্নে বিস্তর টাকা খরচ ক'রে এত-দিনে যেন একটা পথ পেয়েছি, এ-সময় এ-সব খবর যদি ঘুণাক্ষরেও তার কানে উঠে,—ওঃ আমি ভাবতেও পারি নে!

ভূষণ। (সবিদ্রূপ রুষ্টকণ্ঠে) আপনি তোর কৌপীন নিয়ে সন্ন্যাসী হন গে।

বরেন্দ্র। (ভাবোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) হ্যাঁ, তাই হব, যদি তাকে না পাই, যদি তাকে না পাই এ-ব্যর্থজীবন আমি

রাখব না, ভূষণ! আমি যেকি নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলুম, ভগবান আমার খাঁটি সোনা মিলিয়ে দিয়েছেন। এখন তা শাঁক করা না করা আমার বরাত। আমি তাকে কাছে থেকে দেখেছি, কথা কয়েছি, আমার জন্ম সার্থক হয়েছে।

ভূষণ। সত্যি কেমন ক'রে বাগালেন? আমি তো জানতুম, ওসব পাশকরা মেয়ে মেমেদের মতন নিজের বর নিজেই খুঁজে বেড়ায়, এই যেমন 'কানমাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ'। তা' যাই হ'ক ঘটকালিটায় কিন্তু আমায় ফাঁকি দিলে চলবে না।

বরেন্দ্র। (ঘর্মাক্তকলেবরে) না না, ফাঁকি আমি কাউকে দেব না, কাউকে না। সে-দিন যদি আমার আসে, রঘু-রাজার মতন দানে নিঃস্ব হব। দাতাকর্ণের মতন অঙ্গচ্ছেদ ক'রে দান করব। কিন্তু কে জানে, সে-দিন কি আমার আসবে? (সহসা উত্তেজিতভাবে) ভূষণ! ওই হতভাগা যামিনী উকিলটাকে সরাতে পার? কোথাকার একটা পেটি উকিল, ও ব্যাটা কিসের সুবাদে ওঁকে দিন-রাত্তির আগলে বেড়ায়? যা ক'রে হ'ক, ওকে সরাও, ওকে সরাও—

ভূষণ। (স্থিরচক্ষে চাহিয়া) যা ক'রে হ'ক সরাব তো? পাব কত?

বরেন্দ্র। দশহাজার টাকা। যেমন ক'রে পার। ও-ই আমার জীবন অতিষ্ঠ করে দিচ্ছে, ওকে ওঁর কাছ ছাড়া করাই চাই-ই চাই।

ভূষণ। তা বলি, আলাপ-মিলাপটা হল কেমন ক'রে? সেই যে বলেছিলেন, এখানের কালেক্টর সাহেবের মেম ওর বন্ধু, তার কাছ থেকেই আলাপ করে নেব, তাই করলেন না কি?

বরেন্দ্র। (সানন্দে) আমি কোর্ট অব ওয়ার্ডে ছিলুম তো সাহেবদের ধাত-ঘোত বুঝি কিছু কিছু। সোজা গিয়ে বললুম, এখানে ভাল মেয়ে-স্কুল নেই, আমার বাবার ধরম-পুরে যে জমীওলা বাড়ীটা আছে, স্কুল করার জন্যে আমি ওটা দান করতে চাই, আর দশ-হাজার টাকা। তারি খুশী, তক্ষণি মেমকে ডেকে আলাপ করিয়ে দিলে, মেমও অমনি সঙ্গে ক'রে দস্তখাড়ী হাজির! ভালই হচ্ছিল সব, শেষে সেই যামিনীটাকে না ডেকে আর গতি হ'ল না। যা হ'ক, পথ পেয়েছি, এখন নিজেই দেখা-শোনা যাওয়া-আসা চলতে পারবে। তবে যামিনী দু'ব্যাটা পাহারাওলা চাজির থাকে বটে, তবু একদিন কি আর আসবে না?

ভূষণ। 'সবুরে মেওয়া ফলে,' এ তো কথাই আছে। মেওয়ার গাছ তো খুঁজে পেয়েছেন, এখন দখল করতে যেটুকু দেরি। দেখুন না, সব ঠিক হ'য়ে যাচ্ছে।

বরেন্দ্র। তাই বল, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। যা দেখলুম ভূষণ! এমন কখন কল্পনাও করতে পারি নি! যেমন রূপ, তেমনি শিক্ষা, আবার তেমনি গাম্ভীর্য্য, কথা কইতে গিয়ে যেন বেসুর বনে যাই!

ভূষণ। ভাল, ভাল! বউ এসে আপনার মাষ্টারমশাই-এর খালি জায়গাটি যখন ভরবে'খন, আমাদের অন্ন বোধ করি এবার উঠল? মানে মানে পথ দেখাই এখন ভাল, নইলে কোন দিন না কোন দিন বলে দেবেন (হাত দিয়া দেখাইয়া) 'গেট আউট'।

বরেন্দ্র। না না, ভূষণ। (হাত ধরিয়া) রাগ ক'র না, তুমি আমার ভাইএর মতন। কিন্তু ওঁর সামনে, উনি যখন তোমার বউদি হবেন, ওসব ভাল্গারিটী যেন ক'রে বলো না। উনি প্রকৃতি-বিশুদ্ধা একটী নারীরত্ন! আঃ মুখখানি যেন একটী অনাঘ্রাত টাটকা গোলাপের মতন। স্কুলটির সাহায্য হবে শুনে আনন্দে যেন উচ্ছল হ'য়ে উঠলেন; সে কি রকম কোমল চাউনি। আবার কাল যেতে পাব, কথা কইতে পাব, কথা শুনতে পাব, ভূষণ। ভূষণ! এ স্বপ্ন না সত্যি। [ স্বপ্নাবিষ্টের মত বলিতে বলিতে চলিয়া গেল ]

ভূষণ। (সেই দিকে চাহিয়া) তোমার দফা শেষ। ভ্যাম্-পায়ারে যেমন ক'রে রক্ত শুষে নেয়, আমরাও তোমার তাই করছিলুম, কোথা থেকে আবার এক তাজা রক্ত-খেকো বাঘিনী বিদেশী মেয়ের মূর্ত্তি ধরে আমাদের রক্ত খেতে এসে পৌঁছলো? বরেন্দ্রকেষ্ট! তোমার বরাত জোর আছে, নইলে রতন খাসী সেও তোমার উপরে রেখে পোকাটির মতন সরে গেল। আচ্ছা ওর ভাবখানা কি? ভালবাসা-টাসা হ'য়ে গিছল না কি? মুখখানা দেখে তাই যেন মনে হচ্ছিল। নাঃ, মেয়েমানুষের চরিত্তির দেবতারাও বোঝে না, তা সত্যি। নইলে এমন ফাঁদে ফেললুম, তা কি না ফাঁদ নিজেই শিকার ছেড়ে দিয়ে সরে গেল। পোড়া বরাত। পোড়া বরাত এই ভূষণ পাকড়াশীর। যে বরাতে 'শিলা জলে ভেসে যায়, বানরে সঙ্গীত গায়,' তাই হয়েছে। এরা দেখছি জীবনটাকে অস্তিষ্ঠ ক'রে দিলে।

(যবনিকার অন্তরালে প্রস্থান)

[ ক্রমশঃ

# ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস

—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

৪

গত তিন সংখ্যায় মদ্‌লিখিত কংগ্রেসের ইতিহাস পাঠ করিয়া অনেকে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেও দুই একজন সহৃদয় বন্ধু জিজ্ঞাসু হইয়াছেন যে, কংগ্রেসের ইতিহাসে সাহিত্যের বিস্তৃত ইতিহাসের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্ন খুবই সমীচীন এবং ঐ সকল বন্ধু যে মনোযোগ সহকারে প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া সমালোচনা করিয়া আমাকে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন ইহাতে আমি তাঁহাদের নিকট খুবই কৃতজ্ঞ।

কংগ্রেসের ইতিহাস লিখিতে বিভিন্ন দিক্ হইতে বাঙ্গালীর অবদান উল্লেখ না করিলে সেই ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে। কারণ এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে "What Bengal thinks today, India thinks tomorrow", আর বঙ্গবাসীই যে সর্ব্বাগ্রে প্রথম হইতে স্বাবলম্বন ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আর লর্ড লিটন ও লর্ড রিপনের সময় আত্মপ্রতিষ্ঠার উপাদানও জুটিয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্য যদি জমি উর্ব্বর করিয়া না রাখিত তবে জনশক্তি এত প্রবল হইত না, আবার জনশক্তি প্রবল না হইলে কংগ্রেস ক্রমে জনকয়েক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত বাৎসরাত্মিক মিলন সভা হইতে অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে এত বড় বিরাট জনসঙ্ঘে পরিণত হইতে পারিত না। সুতরাং জনশক্তির উদ্ভব, বৃদ্ধি ও প্রাবল্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে পূর্ব্ববর্ত্তী যাবতীয় ঘটনাবলী উল্লেখ না করিলে কংগ্রেসের ইতিহাস একেবারে অসম্পূর্ণ থাকিবে। সুতরাং অনিবার্য্য কারণে ঐ সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িতেছে আর জাতীয় সাহিত্যেই সেই সমস্ত কাহিনী সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইয়াছে। এজন্যই ১৮৮৫ ডিসেম্বরের পূর্ব্বের জাতীয় সাহিত্যের অবস্থা ও যাবতীয় আবশ্যকীয় ঘটনাই আমি উল্লেখ করিয়াছি।

গত মাসে আমরা ইলবার্ট বিল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কেন সহসা এরূপ তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইল? "নেটিভে"র উদ্যমে কেন এত বিভীষিকার হইল? ইডেন, রিপন ও ইলবার্ট তো রত্নের আশায়ই সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন, তবে কেন হলাহল উত্থিত হইল, কেন তাঁহারা শেষে ভীত হইয়া পড়িলেন? অনেকেই জানেন যে লর্ড রীপন এই সময়ে স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে স্যার রিচার্ড গার্থের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী ভাবে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং মিঃ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ষ্টাণ্ডিং কৌন্সিলি (Standing Counsel) নিযুক্ত করিয়া উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে শ্বেতকায় বারিষ্টারগণ বড়ই অসন্তুষ্ট হন।*

বস্তুতঃ ইউরোপীয়গণ মনে করিতেন যে, "ভারতবর্ষ আমাদের বিজিত দেশ, আমরা তরবারির সহায়তায় ইহা অর্জ্জন করিয়াছি, তরবারির সহায়তায়ই ইহা রক্ষা করিব। এদেশবাসীর ভারতবর্ষে অধিকার কি? ইহারা তো দাস বই কিছুই নয়?" এই সংস্কার হইতেই যত অনর্থ উৎপাদিত হইল। ইহার পরও বহুদিন অতীত হইয়াছে, কিন্তু এখনও ইংরাজগণ এই বিশ্বাস অপসারণ করিবার মত উদারতা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হন নাই। যতদিন এই ভেদবুদ্ধি থাকিবে, ততদিন আর সেই অনর্থের শেষ নাই। ইলবার্ট বিলের সময় ছোট লাট স্যার রিভরস্ টমসন, মিঃ আষ্টিন্ ষ্টিকেন প্রভৃতি সিভিলিয়ানও এই সাদা-কালোর পার্থক্য বিদূরিত করিতে অগ্রসর না হইয়া বরং ইহার বিরোধীই হইয়াছিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শ্বেতকায় এসিয়াবাসীও, এমন কি আর্ম্মেনিয়ান ইহুদী পর্য্যন্ত, ইলবার্ট বিলের ঘোরতর বিরোধী হইয়াছিলেন। সাদা কালোর

*সুপ্রসিদ্ধ জন ব্রাইট এই অসদ্ভাবের কারণানুসন্ধান করিয়া বলিয়াছেন—

"These two appointments and the suspicion that more may follow, have disturbed the minds of the members of the Calcutta Bar, and built up all this jealousy"—Speech at Wills' Rooms on Aug. 1, 1883.

পার্থক্য উঠাইবার উদ্দেশ্য * গৃহীত হইল। প্রসিদ্ধ বাগ্মী লালমোহন ঘোষ ব্যতীত। সেদিনই কেবল ব্রাডলের প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়ান নাই, ইংলণ্ডে গিয়াও নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়া তিনি ইংরাজগণকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্রাইট, ব্রাডলা প্রভৃতি উদারনীতিক ইংলণ্ডবাসীগণ এদেশীয় ইংরাজগণকে বিশেষ সতর্ক করিয়া ভারতবাসীর সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন করিতে উপদেশ দেন। ব্রাডলার পার্লামেণ্টের বক্তৃতায় এই ভাবটি স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। তিনি এই সময়ে ১৮৮৩, ৩১ ডিসেম্বরে ভারতবাসীগণকে সমানাধিকার প্রদানের পক্ষপাতী হইয়া পার্লামেণ্টে বলেন—

"I am of opinion that we have obtained our authority in India in a great part by means, of which we ought to be heartily ashamed. And I think if we continue to govern India, there is the weightiest duty upon every Englishman and English woman to take care that the despotic authority of England should be used, as much as it can be, to redeem our past and to make our Indian fellow citizens desirous of being governed by us (hear, hear). Conservative speakers seem to hold a different view. They hold the view that was put forward by Lord Ellenborough in the House of Lords many years ago. He said that "*Our very existence depended upon the exclusion of the native from the military and political power. We have won the empire by the sword and we preserve it by the same means.*" [*Shame*]. I say that is a shameful doctrine (hear, hear). I say that is a doctrine which no Englishman, to whatever party he may belong, ought to propound." †

Corn Law-এর বিনাশকর্ত্তা বৃদ্ধ জন ব্রাইটও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্যে স্বাভাবিক উদারতা দেখান :

"But I should say that one thing is perfectly certain that India was not committed to our control to be held as a field for English ambition and English greed. Our fathers may have erred—in my opinion, they did greatly err—but their children will make some compensation to the countless millions now subject to their rule by a policy of generosity and justice—a policy, which in my opinion, India and the world have a right to expect and to demand from a Christian people, as we profess to be." ‡

"ইংরাজগণের দুরাকাঙ্ক্ষা ও অর্থলিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্যই ভারতবর্ষের শাসনভার আমাদের হস্তে ন্যস্ত হয় নাই।..."

ব্রাডলা একজন উদারনৈতিক ভারত-হিতৈষী পার্লামেণ্টের সভ্য ছিলেন। তিনি যত প্রকাশ করেন যে, যদি কুচরিত্র ইউরোপবাসী শ্বেতাঙ্গগণ ভারতীয়গণকে আপনার করিয়া লইতে না পারেন, তবে তাহারা যেন সেই দেশে যায় না। ইলবার্ট বিল সম্বন্ধে তাঁহার মতও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

I hold here a Government report—not a report of a party character but a report made under the authority of Governments both Conservative and Liberal, and I find that since railways have commenced mean whites or European vagrants have begun to spread over the country and are increasing in numbers so that efforts have been made to grapple with this evil. This report has not been made for the Ilbert Bill, for it was printed nine years before the Ilbert Bill was proposed. The gaols and workhouses have found in them too many of these European vagrants. But none of these have been subject to Criminal Law, because there was no European Judge and in order to get them tried, you had to send them to Madras, Calcutta or Bombay. Often you could not transport the witnesses so far; therefore, there was a failure and miscarriage of justice. The Ilbert Bill is to remedy this, to give the same jurisdiction outside the presidency cities as exists inside..... ...Now Mr. Justice Stephen claims that the

* The object of removing the race-disability imposed upon native Magistrates and Judges by chapter 33 of the Code of Criminal Procedure.

† Vide 'Hindu Patriot', January 9, 1884.

‡ Presidential Speech at Wills' Rooms on August 1, 1883, in support of Ilbert Bill.

Ilbert Bill ought not to be accepted because it is the privilege of the European not to be tried by a Hindoo. I deny that privilege. If an Englishman puts himself in contact with the Hindoo knowingly beforehand, he is bound to submit himself to the law and he has no right to privilege which prevent his crime from punishment. (cheers.)

The people who has no sympathy with the natives amongst whom they go, should not go there (hear, hear). They should not go amongst them if they intend to regard them as an alien race. And if they go, they have no right to ask us to protect them with the sword, because they do not choose to be sympathetic with the natives to whom it is their profit to go.

কিন্তু ইংলণ্ডে লালমোহন, ব্রাইট, ব্রাডলু, ব্রাইস্ প্রভৃতি মহানুভবগণের চেষ্টা সত্ত্বেও, ভারতে জনশক্তি প্রবল হইয়া উঠিলেও, ফলতঃ সবই ব্যর্থ হইল। ১৮৮৪ সালের ৪ঠা ও ৭ই জানুয়ারীতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাদানুবাদ হয় এবং পরে ২৮শে জানুয়ারী ১৮৮৪ সালের তিন আইন ( Act III of 1884 ) বিধিবদ্ধ হইয়া স্থিরীকৃত হয় :

( ১ ) ইউরোপীয় এবং ভারতীয় জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সেসনের জজদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে না, তাঁহারা 'জষ্টিস অব দি পিস্ (J. P.)' বলিয়া অভিহিত হইবেন।

( ২ ) কিন্তু ইউরোপীয় প্রজা (European British subject) যে কোন অভিযোগে ইচ্ছা করিলেই বিচারে জুরীর সহায়তা পাইবেন। সেই সব জুরীর অধিক সংখ্যকই তাঁহাদের সমশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি হইবেন।

ইহাতে ফলে কোন লাভই হইল না। একদিকে ইউরোপীয় প্রজাগণের সুবিধা পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিল। ভারতীয় প্রজাগণের জুরীর সুবিধা রহিল না। আর ইংরাজের পক্ষে অন্যরূপ দাঁড়াইল। একদিকে জিলার ইউরোপীয় জুরীগণ নির্দ্দোষী বলিলে প্রায়ই আসামীর মুক্তিলাভ হইত। অনেক সময়ে মফঃস্বলে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক জুরী পাওয়া যাইত না। ফলে অন্য জিলা অথবা কলিকাতায় বিচার হইত, তাহাতে বিচার-প্রার্থীর অযথা খরচ ও অসুবিধায় একশেষ হইত এবং সাক্ষী প্রভৃতি যথা সময়ে উপস্থিত করিতে না পারায় অপরাধীর অব্যাহতিলাভ প্রায়ই হইত। অতএব ইলবার্ট বিলের পরিণাম ভারতবাসীর পক্ষে মোটেই হিতজনক হইল না। এবং লর্ড রিপনকে বাধ্য হইয়া এই কয়টী বিষয়ের জন্য ব্যাপারটী Select Committee-তে দিতে হইয়াছিল। তবে দণ্ডপ্রদান সম্বন্ধে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের একটু ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। কার্য্যবিধির ৩৩৬ ধারানুসারে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্বেতাঙ্গ অপরাধীর তিন মাস বা ১,০০০৲ টাকার স্থলে ৬ মাস শাস্তি অথবা ২,০০০৲ টাকা জরিমানা পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন। ইহা কিছুই নয়, কারণ দেশীয় জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে বিচারই প্রায় হইত না; কারণ যে সমস্ত স্থানে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের ভার এদেশবাসীর নিকট অর্পিত থাকিত সেখানে শ্বেতাঙ্গ আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটও দেওয়া হইত। আর ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটও এই সব হাঙ্গামার ভয়ে সাধারণতঃ অধীনস্থ শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ান আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসেই এরূপ মোকদ্দমা প্রেরণ করিতেন। কারণ শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেটগণের ক্ষমতা পূর্ব্ববৎই রহিল। ফলে যেখানকার জল সেখানেই রহিল। নীল-কর ও চা-করগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল।

কবিবর হেমচন্দ্র ইলবার্ট বিলের পরিণাম দেখিয়া 'অদৃষ্টের সাধন' নামে কবিতায় প্রাণের ঝাল মিটাইলেন—

শিখিবে ভারত—শিখিবে এ কথা
চিরদিন তরে না হবে অন্যথা—
একদিকে কোটী প্রাণী কাতরতা
শ্বেতাঙ্গ ক'জন বিপক্ষ তায়!
অমূক ক'জনে চাপে বলিল
রায় একদিনি রায়মণ্ডল
অমনি তাদের অমিত বল।
শেষ যে এখন ভারত সন্তান
শ্বেতাঙ্গ নিকটে কুকুর সমান
সবল ভারত জাতি কুলাঙ্গার—
রাজভক্তি গান সদা বিকল।
যে অস্ত্র সাধনে সুপটু উহারা
সেই বীরাস্ত্র—একতার ধারা
সে সাহস-উদ্যম—সে উৎসাহ-পারা
হৃদয়কন্দরে গাঁথিয়া রাখো—
তবে অন্যথা হৈও কভু আর—
করিতে এরূপ ঘৃণাতি উহার—

সকল ঘরি হাত আপনার—
বন্ধুরা যা আমরা তাহাই থাকো।*

হেমচন্দ্র লর্ড রিপনকেও রেহাই দেন নাই। তাঁহার সম্বন্ধেও উল্লেখ করিয়া নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করিয়াছেন—

"ওহে যে রিপন ভারতের লাট
আর নাহি করো এ ভারত মাট
বিষম কল—বিষ বিকট
বন্ধুত্ব-ছলে সহিত খেলা।
অতি চাতুরী—ঘোর কুকথায়
সে জাতিও যবে আনায় সেলায়
ভুলে থাকবে—আশা না ফুরায়
সে নিরাশাঘাত সেবব না খেলা।
সুধাকলে তুমি দিলে গরলে
সন্ধিতি করিলে মহ বিফলে
বাড়ালে হাতের পঞ্চগুণ বল
"পুটাঞ্জিলা মাটি" মোদেতে কথা।"

কিন্তু ভারতবাসীর প্রতি তিনি বস্তুতঃই সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে, রিপনের ঐ ব্যাপারে বিশেষ দোষ ছিল না, তিনি মোটামোর পড়িয়াই এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থা ছিল "Between Scilla and Charybdis". লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর Sir Rivers Thompson-প্রভৃতি সকলেই তাঁহার বিপক্ষে ছিলেন। তাঁহার অবস্থা সম্বন্ধে সমসাময়িক সংবাদপত্র-সম্পাদকের মতের সহিত আমাদের খুব মিল হয়।† উক্ত সাংবাদিক মন্তব্য করিয়াছেন—

A few days before the commencement of the past year, had been announced the concordat with the European and Anglo-Indian Defence Association upon the ill-fated Ilbert Bill. Throughout the prolonged and bitter controversy caused by this unfortunate measure, the native community had given Lord Ripon a loyal, warm and enthusiastic support. Nevertheless their hopes received a rude shock, when the late Viceroy set his heart upon domestic reform; little did he think of the difficulties which beset his path. Surrounded by a Bureaucracy tenacious of their own powers and by a European community jealous of their own privileges, Lord Ripon found himself placed in an extremely difficult and delicate position, and some of his whole schemes for the advancement of the country were shipwrecked between them. "The peace with dishonour"—as our lamented predecessor, The Hon'ble Kristo Das Pal in the agony of his distress characterised the arrangement in the Defence Association—had grievously disappointed our countrymen. The task of reform in India is difficult in any case, but it becomes hopeless when it is imposed by obstructions prepared for at the very Council table of the Government House.

লালমোহনও Kensington Town Hall-এ এই সম্বন্ধে বলেন*

"Well, gentlemen, I must confess that for a time it seemed as if the feelings of loyalty to the throne, and of grateful admiration for the Viceroy, were about to give way to resentment and sullen discontent; it seemed as if my countrymen were about to lose all faith in the sincerity of English statesmen, or at any rate, in their capacity and power to do justice to us when the Anglo-Indian community were interested in the perpetuation of injustice and oppression. But, gentlemen, when we had time for reflection and after the outburst of disappointment, better counsels prevailed. We recognised the earnestness with which Lord Ripon had laboured for the good of the people. We recognised the difficulties which the Viceroy had had to encounter. We felt that a Viceroy, however good and conscientious he might be—and none could be better or

* অন্যত্র লালমোহনও এ বিষয়ে বিলাতের সভায় স্পষ্টই বুঝাইয়াছিলেন—

"Well, gentlemen, it comes to this, that while a native of India may be sentenced to capital punishment without the intervention of a jury, the same Magistrate may not of himself impose a shilling fine on a drunken Englishman who may claim to be tried by a jury, no matter how trivial the offence may be with which he is charged—with being drunk or disorderly in the streets".

† Hindu Patriot Jan. 5, 1885.

* Lecture on Friday, 4th April, 1884.

more conscientious than Lord Ripon—we felt that such a Viceroy, unless he also happened to be gifted with more than ordinary strength of mind, would perhaps be powerless to do much good to us, if he is to be thwarted at every step and opposed, openly and in secret, by the whole pack of permanent officials in India. I might go further, that it is hardly much use for you to send out a good man to India like Lord Ripon if he is to have as his immediate subordinates men like the Lieutenant Governor of Bengal—men who are constantly insulting the Indian people by openly professing their contempt for Indian national sentiment and popular feeling.

( Cries of 'shame' & hissing )

ইলবার্ট বিলের পরিণাম এইরূপ হইল বটে, উহার উদ্দেশ্য পণ্ড হইল সত্য, কিন্তু বাঙ্গালী একটা মহৎ শিক্ষা লাভ করিল। ইংরাজ তাহাকে সঙ্ঘবদ্ধতার পরিণাম শিখাইল—বাঙ্গালী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ইংরাজকেও ভয় করিল।*

বস্তুতঃ দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথের মোকর্দ্দমা ও নির্য্যাতনে বাঙ্গালী উপরোক্ত শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের সদ্ব্যবহার করিল। তবে পার্থক্য এই—শ্বেতাঙ্গগণ যেমন বাঙ্গালীর প্রতি অসৌজন্য-সূচক উক্তি প্রয়োগ করিয়া ক্ষুদ্রতার পরিচয় দিয়াছিল, বাঙ্গালী কখনও তাহা করে নাই। আর এই আন্দোলন কেবল বঙ্গভূমেই নিবদ্ধ রহিল না। বোম্বাই, মাদ্রাজ, অযোধ্যা, পাঞ্জাব প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জন-সাধারণ বাঙ্গালীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া উহা শক্তিশালী করিয়া তোলে।† এইখানে উহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত প্রদান করিতেছি।

কলিকাতার বড়বাজারের একটী মোকর্দ্দমায় হাই-কোর্টের বিচারপতি নরীস সাহেব গৃহস্বামীর বাটীর শালগ্রাম-শিলাটীর প্রাচীনত্ব বা নবীনত্ব প্রমাণের জন্য উহা আদালতে আনিতে আদেশ দেন এবং ইহাতে দেশবাসী ভারতীয় হিন্দুর মন ব্যথিত হয়।

এই ঘটনাটী সর্ব্বপ্রথমে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পিতা ভুবনমোহন দাস মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত Brahmo Public Opinion কাগজে প্রকাশ করিয়া আদালতের এইরূপ আপত্তিজনক আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার সম্পাদিত বেঙ্গলী সংবাদপত্রে তীব্রতার সুর আরও একটু উপরে উঠাইয়া জষ্টিস নরীসের আচরণের ঘোর প্রতিবাদ করেন। উক্ত মন্তব্যে জজ বাহাদুরকে জেফ্রিস ও ক্রপসের সহিত তুলনা করা হয়। তখন ইলবার্টের তুমুল আন্দোলনে বঙ্গদেশ একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রকম্পিত। ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে সদ্ভাবের হ্রাস পাইয়াছে, পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে। জষ্টিস নরীসও রাজনৈতিক আন্দোলনকারী সুরেন্দ্রনাথের ভাষা নীরবে সহ্য করিলেন না। অবিলম্বে সুরেন্দ্রনাথকে আদালত অবমাননার অপরাধে full bench-এ সোপর্দ্দ করা হইল এবং বিচারে দুইমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। ঐ সময়ে চীফ জষ্টিস ছিলেন স্যর রিচার্ড গার্থ। মিঃ রমেশচন্দ্র মিত্রও ( পরে স্যর রমেশ ) পাঁচজনের একজন ছিলেন কিন্তু তিনি ভিন্ন মত পোষণ করিয়া বলেন যে, এক্ষেত্রে Taylor case-এ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রধান বিচারপতি স্যর বার্ণেস পিকক্ কেবল ভয়প্রদর্শন করিয়াছিলেন; এ ক্ষেত্রেও জেল খাটা দেওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তাই নাই। কিন্তু সকলে ছিলেন একদিকে আর তিনি একদিকে। অতএব অধিকাংশের মতানুসারে জেলের আদেশই বহাল রহিল।

যেদিন সুরেন্দ্রবাবুর জেলের হুকুম হয় ( ৪ই মে, ১৮৮৩ ), ছাত্রগণ একটি বিরাট শোকযাত্রা করিয়া হাইকোর্টে প্রবেশ করে। ঢাকার বিখ্যাত ব্যায়াম-বীর ( পরে ত্রিবিদী স্কুলের

---

* They faithfully reproduced the example set by the European community when the editor of the 'Bengalee' Newspaper was committed by the Full Bench of the High Court to the Presidency Jail on a charge of contempt of Court ( Jan. 7, 1884. 'Hindu Patriot' ).

† ( Vide Editor's remarks, Hindu Patriot 7. 1. 1884. )

Our enemies were but too ready to taunt us with the remark that the hardy races of Upper India had no sympathy for the weak Bengalee but the demonstrative action in the North Western Provinces, the Punjab, Oudh, Bombay and Madras showed beyond the shadow of a doubt that there is a common feeling among all classes of the native population throughout the country.

শিক্ষক ) ৺পরেশনাথ ঘোষ মহাশয় তখন কলিকাতায়। তিনিও শোভাযাত্রার সঙ্গে ছিলেন এবং হাই কোর্টের প্রধান ফটকের কাছে সর্ব্বাগ্রে আসিয়া হাই কোর্টের দরজা বন্ধ হইবার পূর্ব্বে দ্বাররক্ষকদিগকে—যেন সাহায্য করিবার অভিপ্রায়েই—উহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দরজা ধরিয়া রাখেন। সাহেবগণ বুঝিল যে ছাত্রগণ পরেশনাথকে ঠেলিয়া ভিতরে যাইতে পারিবে না, তাই কেহ আপত্তি করিল না; কিন্তু তাহারা অবিলম্বে দেখিয়া স্তম্ভিত হইল যে তাঁহার পশ্চাতের মধ্যে স্থান দিয়া ছাত্রগণ অনায়াসে দলে দলে হাইকোর্টের প্রাঙ্গনে ও এজলাসে প্রবেশ করিতে লাগিল।

স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ( পরে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর আশুতোষ ) সেই ছাত্রদলের দলপতি ছিলেন; স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জনও ( দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ) সেই দলভুক্ত ছিলেন। স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের একটী স্যালকও তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া জানালা ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং উক্ত আট দিনের জেলে সুরেন্দ্রবাবুর সহযাত্রী হন। সুরেন্দ্রনাথের মুক্তির পরেও ( ৪ঠা জুলাই, ১৮৮০ ), সভা, শোভাযাত্রা ও অভিনন্দনের কলকোলাহলে দেশের চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল।

সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসে দেশের মধ্যে সংগ্রামের শক্তি আরও বাড়িয়া পড়ে। দেশবাসীর সঙ্ঘশক্তির অঙ্কুরোদ্গম হইল। বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্রের বাণী সার্থক করিবার পথে অগ্রসর হইল—

"অবলা কেন মা এত বল?"

অতঃপর ইলবার্ট বিল আন্দোলনের কয়েক মাস মধ্যেই, ১৮৮৪ সালের শেষ দিকে, লর্ড রিপন পদত্যাগ করিলেন। আবার বাঙ্গালায়—কেবল বাঙ্গালায় নহে, সমগ্র ভারতের—সঙ্ঘবদ্ধতার সুরে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত হইল। প্রথমেই তিনি কি কাজে যেন বাম্বাইয়ে গিয়াছিলেন, ফিরিবার পথে সিয়ালদহ হইতে গভর্ণমেণ্ট হাউস পর্য্যন্ত কলিকাতায় যে শোভাযাত্রা হইল তাহা অবর্ণনীয়, অপূর্ব্ব, অভাবনীয়। যে আবেগ, যে শ্রদ্ধা, যে কৃতজ্ঞতা লইয়া বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহার দর্শনেচ্ছু হইয়া রাস্তায়, ময়দানে, জানালার পার্শ্বে জনতার সৃষ্টি করিয়াছিল পূর্ব্বে তাহা কেহ কখনও দেখে নাই। অতঃপর আবার কলিকাতা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রদেশে প্রদেশে জিলায় জিলায় ভারতের লোক তাঁহাকে যেরূপ আকুল প্রাণে বিদায় দিয়াছিল তাহাও কল্পনার অতীত। সমগ্র ভারত এক সুরে বলিয়া উঠিল, আর আবালবৃদ্ধ ভয়-ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসু হইল—একি সত্য না স্বপ্ন! ( If it is real, what does it mean ! )

ইলবার্ট বিল আন্দোলন ও সুরেন্দ্রনাথের নির্য্যাতন ব্যতিরেকে আর একটি বিষয়েও বাঙ্গালী হৃদয় উত্তাক্ত ও ব্যথিত হইয়াছিল। যদিও সেই আন্দোলনের মর্ম্ম শিক্ষিত ব্যক্তি মহলেই ( intelligentia-তেই ) নিবদ্ধ ছিল, তথাপি গভর্ণমেণ্টের অসমান ব্যবহারে সকলের হৃদয়ই তিক্ততায় ভরিয়া গিয়াছিল। এই আন্দোলনটি সিভিল সার্ভিস সংক্রান্ত ব্যাপারে উত্থিত হইয়াছিল।

লর্ড মেকলে এদেশবাসীদিগকে রাজকার্য্যে তুল্যাধিকার দেওয়ার জন্যই ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে, লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে, ১৮৩৩ সালে যে চার্টার পুনঃপ্রবর্ত্তিত হয়, তাহার একটি ধারায় ( Sec. 87 of the Charter Act of 1833 ) তাহা লিপিবদ্ধ আছে :—

"No native of the said territories nor any natural-born subject of His Majesty resident therein shall, by reason only of his religion, place of birth, descent, or colour be disabled from holding any place, office or employment under the Company."

অতঃপরে মহারাণীর ঘোষণাপত্রেও ( Queen Victoria's Proclamation of 1858 ) এই কথা প্রতিধ্বনিত হইয়াছে :—

"And it is our further will that, so far as may be, our subjects, of whatever race or creed, be freely and impartially admitted to office in our service—the duties of which they may be qualified by their education, ability and integrity duly to discharge".

এই দুইটী প্রতিজ্ঞাপত্রের বলেই, এই দেশের লোক যাহাতে ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের ন্যায় পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া ঐ সার্ভিসে যোগ দিতে পারে, তজ্জন্য ভারতবাসীগণকে উক্ত পরীক্ষা প্রদানের অধিকার দেওয়া হয়। এই নিয়মের ফলেই স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া

বোম্বাই প্রদেশে মাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র এবং বিহারীলালও সিভিলিয়ান পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন। কিন্তু লর্ড লিটন এত বড় ধাষ্টিপূর্ণ কার্য্যে নেটিভের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিয়া শঙ্কিত হন ও এই দেশবাসীর সেই অধিকার লোপের জন্য সুপারিশ করিয়া ডেস্‌পাচ পাঠান। ভারত-সচিব লর্ড ক্রানব্রুক (Cranbrook) কিন্তু তাহা অনুমোদন করিলেন না।

কিন্তু অন্যভাবে লর্ড লিটনের উদ্দেশ্য সাধিত হইল।

অতঃপরে উক্ত পরীক্ষার ২২ বৎসরের স্থলে ১৯ বৎসরের বেশী বয়স্ক পরীক্ষার্থীর অধিকার বিলোপ করা হয়। আর লর্ড লিটন আনন্দের সহিত প্রকাশ করেন যে এই বয়স কমাইয়া দেওয়ায় ভারতবাসী আর বড় কেহ পরীক্ষায় পাশ হইতে পারিবে না। ফলে ভারতবাসীর নিকটে সিভিল সার্ভিসের দ্বার একরকম রুদ্ধই রহিল। বস্তুতঃ ১৯ বৎসরে পরীক্ষা দিতে হইলে বৎসর তিনেক পূর্ব্বে পরীক্ষার্থীকে ইংলণ্ডে যাইতে হইত। এত অল্প বয়সে মা বাবা প্রায়ই ছেলেকে ছাড়িয়া দিতেন না। আর ইংরাজীতেও তাহাদের জ্ঞান ইংরাজ ছাত্রদের মত হইত না। আর এ পর্য্যন্ত কোন ছাত্রই ১৯। বৎসরের পূর্ব্বে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন নাই।

এই বৈষম্যের জন্য এই দেশে ও ইংলণ্ডে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং লালমোহন সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই আন্দোলনের মূলে ছিলেন। লর্ড রিপন এই বৈষম্য উঠাইবার জন্য, ইংলণ্ড ও ভারতে যাহাতে উক্ত পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয় এবং সংস্কৃত* ও আরবী ভাষার যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় নম্বর বেশী থাকে তজ্জন্য ২৩।৩।৮৩ ও ১৮৮৩ সালের ১৭ এপ্রিল তারিখে দুইটি despatch লিখিয়া পাঠান। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কারণ তিনি এবং ইলবার্ট সাহেব ছিলেন বয়স-বৃদ্ধি অর্থাৎ ২২ বৎসরের পক্ষে, আর কাউন্সিলের অন্যান্য সভ্য ছিলেন এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে; বিশেষতঃ ভারত-সচিব লর্ড কিম্বার্লে তাঁহাকে (লর্ড রিপনকে) কোন রূপেই সমর্থন করেন নাই। তবে এই উপলক্ষেও জনশক্তি অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়।

ইলবার্ট বিল আন্দোলন, সুরেন্দ্রনাথের নির্য্যাতন, লর্ড রিপনের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি এবং সিভিল সার্ভিস আন্দোলন প্রভৃতি ব্যাপারে যে জনশক্তি এত বৃদ্ধি পাইল এবং যে জনশক্তির প্রাবল্যে কংগ্রেস প্রথম হইতেই শক্তিশালী সঙ্ঘে পরিণত হইবার মত অনুষ্ঠানে গড়িয়া উঠিতেছিল, সেই শক্তির উদ্ভব কোথায়? কেবল কবিতা, প্রবন্ধ, নাটকেই কি ইহার উৎপত্তি? বাঙ্গালী তো বহুকাল পূর্ব্বেই বিবশে মগ্ন হইয়াছিল—

কত কাল পরে বল ভারত রে!
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে।
অদৃষ্টবায়ে ডুবিয়ে ডুবিয়ে
ও কি শেষ নিবেশ ডুবাইল রে।
নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে,
পর-দাসখতে সমুদয় বিকে;
পর হাতে দিতে ধনরত্ন তুলে,
বহু লৌহ-নিগড়িত হয় বুকে।
পরদীপালোকে নয়নে বঞ্চনে,
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।*

এই ভাবের গান শুনিয়া বাঙ্গালী তো তিমিরেই আচ্ছন্ন হইতেছিল। কিন্তু এই তিমির হইতে আলোকরশ্মি দেখাইয়া কে বাঙ্গালার শক্তি গড়িল? কে বাঙ্গালীকে আপনার বাণী বলিয়া উৎসাহিত করিল? কাহার মন্ত্রশক্তিবলে বাঙ্গালার আপামর সাধারণ ক্রমে এত শক্তিমান হইয়া উঠিল? পূর্ব্বাপর আনুপূর্ব্বিক অবস্থা অনুধাবন করিলে বলিতে হইবে যে, **এই শক্তিগঠনের কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্রেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।** বঙ্কিমই প্রথমে বাঙ্গালীকে মাতৃমূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। বঙ্কিমই প্রথমে দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া শুনাইয়াছিলেন—

"এস ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার-কালস্রোতে ঝাঁপ দিই! এস আমরা যাবৎকোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, দশকোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্র মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে উহারা পথ দেখাইবে—চল চল অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মথিত, বাস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ

* সুরেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাষায় অনেক নম্বর পাইয়াছিলেন, কিন্তু তৎপরেই উক্ত বিষয়ে ৫০০ নম্বরের স্থলে ৩০০ নির্দ্দিষ্ট হয়। অপর পক্ষে, লাটিন ও গ্রীকে বেশী নম্বর নির্দ্দিষ্ট হয়।

* স্বকবি গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়-রচিত বিবাহমূলক অপেক্ষা সঙ্গীত ১২৮৩ সালে 'আর্য্যদর্শন' কাগজে প্রথম প্রকাশিত হয়।

করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় ক'রে আনি। হয় কে? না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?"

বঙ্কিম সকলকে ডাকিলেন, কাল-সমুদ্রে সুবর্ণময়ী বঙ্গ-প্রতিমা দেখাইলেন, ছয়কোটি সন্তান লইয়া ত্রিশকোটি করজোড়ে মায়ের পাদপদ্ম পূজা করিতে চাহিলেন, কিন্তু আমরা তো সে মূর্ত্তি দেখিলাম না, সে মূর্ত্তি দেখিতে চাহিলাম না—সে পাদপদ্ম পূজা করিতেও আগ্রহ হইল না। তাই বঙ্কিম কাঁদিতে কাঁদিতে লিখিলেন,—

"আমি একা রোদন করিতেছি। কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা"—('বঙ্গদর্শন' তৃতীয় খণ্ড—"আমার দুর্গোৎসব" ২২১ কার্ত্তিক, ১৮৭৯-নভেম্বর)।

বঙ্কিম কিন্তু মাকে ভুলিলেন না, আবার মাতৃমূর্ত্তি দেখাইতে অগ্রসর হইলেন, উপন্যাসের সহায়তায় মন ভুলাইলেন। এবারেও তিনি সেই মাতৃমূর্ত্তি দেখাইলেন, তবে **কাল-সমুদ্রতীরে নয়, সমুদ্রাভ্যন্তরে।** আর ভারতের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া সমগ্র দেশবাসীকে উন্মাদিত করিয়া উদাত্ত সুরে গাহিলেন—

"বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং
মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটিকণ্ঠ-কল-কল-নিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃত-খরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীম্
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।"

এইস্থানে "বন্দেমাতরম্"-এর সময়কার ইংরাজ শাসনের একটু অবস্থা জানা আবশ্যক। ১৮৭৬ হইতে ৮০ পর্য্যন্ত লর্ড লিটন ভারতবর্ষের গবর্ণর ছিলেন এবং ডিসরেলির প্রকৃত শিষ্যরূপে ভারতবর্ষে রুদ্রনীতি প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতবাসীকে উত্যক্ত ও পীড়িত করিতেছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আহত হয় বাঙ্গালী; এবং বাঙ্গালারই রুদ্রনীতির পরিণাম—জনশক্তিরজাগরণ—হয় খুব বেশী। ডিসরেলি ও সেলিসবারী, এলেনবরা ও লিটন সেই রক্ষণশীলদলেরই ছিলেন অগ্রণী, আর এই দল ভারত-বাসীকে দাস এবং ভারতবর্ষকে বিজিত দেশ ভিন্ন আর কিছু মনে করিতে পারিতেন না। এই নীতির প্রত্যুত্তরেই বঙ্কিম-লেখনী প্রসব করিল আমাদের অমূল্য সম্পদ্ 'আনন্দ মঠ'* আর এই অমর গান "বন্দেমাতরম্"। এ গান শুনিয়া অনেকে প্রথমে উপহাস করিয়াছিল কিন্তু মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিম জানিতেন, —এবং জানিতেন বলিয়াই প্রকাশ করিতেন যে—"একদিন এই গানে ভারতের আকাশ বাতাস বিকম্পিত হবে। আর মাটিগুলো ধ'তে আরম্ভ ক'রে গাছের পাতা পর্য্যন্ত কাঁপতে থাকবে।"

এই মাতৃমূর্ত্তি নূতন নহে। বঙ্কিম "আমার দুর্গোৎসবে" বাঙ্গালীকে আর একবার এই মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন, আজ আবার গদগদ কণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে দেখাইলেন যে, অন্ধকার-সমাচ্ছন্না কালিমাময়ী হৃত-সর্ব্বস্বা নষ্টিকা মা আবার হইবেন "দশভুজ দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরেন্দ্র-কেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত, দিগ্‌ভুজা নানাপ্রহরণ-প্রহারিণী শত্রুবিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী

* আনন্দমঠ মুদ্রিত হয় ১৮৮২, ডিসেম্বর, আর বঙ্গদর্শনে বাহির হয় ১২৮৭ সালের চৈত্র হইতে ১২৮৯ বৈশাখ পর্য্যন্ত, (১৮৮১ মার্চ্চ হইতে ১৮৮২ এপ্রেলের মে পর্য্যন্ত)।

ত্যাগরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।"

কিন্তু কি রূপে মায়ের মূর্ত্তি দেশবাসী সকলে দেখিতে পাইবে? বঙ্কিম তাহাও বলিয়া দিলেন—

"যখে মায়ের সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেইদিন উনি প্রসন্ন হইবেন।"

কি লইয়া মাকে মা বলিয়া ডাকিবে? বঙ্কিম বলিলেন, ভক্তি লইয়া। অতি প্রথমেই সেই ভক্তির চিত্র বঙ্কিম অঙ্কিত করিলেন—

"অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেক জাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোক প্রবেশের পথ-মাত্র শূন্য; এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ, পবনে তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে ঘনান্ধকার। মধ্যাহ্নেও আলোক অস্ফুট, ভয়ানক। তাহার ভিতরে কখন মনুষ্য যায় না। পাতার অনন্ত মর্ম্মর এবং বহু পশু-পক্ষীর রব ভিন্ন অন্য শব্দ তাহার ভিতর শুনা যায় না।

"এক এই বিস্তৃত অতি-নিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য। তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার; কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়।

"পশুপক্ষী একেবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়—শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধতার অনুভব করা যাইতে পারে না।

"সেই অন্তর্ভূত অরণ্যমধ্যে, সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধতা মধ্যে শব্দ হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

"শব্দ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল; তখন কে বলিবে যে, এ অরণ্যমধ্যে মনুষ্য শব্দ শুনা গিয়াছিল? কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া মনুষ্য-কণ্ঠ ধ্বনিত হইল।

"'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?'

"এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকার-সমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল—'তোমার পণ কি?'

"প্রত্যুত্তরে বলিল, 'পণ আমার জীবন সর্ব্বস্ব।'

"প্রতিশব্দ হইল, 'জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।'

"'আর কি আছে? আর কি দিব?'

"তখন উত্তর হইল, 'ভক্তি'।"

ঘটিচ পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে "জীবন-সর্ব্বস্ব" কথা ছিল, কিন্তু ১৮৮২ সালে প্রথম সংস্করণে "ভক্তি" কথা বাহির হয়। অতএব বঙ্কিম বুঝাইতে চাহেন "বলেশকে সমস্ত ভক্তি দিয়া ভালবাসিবে এবং সেইজন্য অধর্ম্ম, আলস্য ও ইন্দ্রিয় ত্যাগ করিবে, আপনা ভুলিবে, ভ্রাতৃবৎসল হইবে, পরের মঙ্গল সাধিবে।"

অতঃপরে আমাদের কার্য্য-পদ্ধতিও বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক করিয়া দিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে লর্ড লিটনের মুদ্রাযন্ত্র আইন ও ইলবার্ট বিলের নীতির প্রতিষেধক রূপে যে রাজনৈতিক আন্দোলন সমুত্থিত হইয়াছিল এবং সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ বাগ্মিগণ যে ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া রাজনীতি বা পলিটিক্স্ প্রচার করিতেছিলেন—বঙ্কিম 'কমলাকান্তের পত্রে' পলিটিকস্ প্রবন্ধে উহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "না, এতে হবে না, 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'। নিজের পায়ের উপরে নিজে নির্ভর কর।" তাই বঙ্কিম লিখিতেছেন—

"আমাদের ইচ্ছা পলিটিক্স—হপ্তায় হপ্তায় রোজ রোজ পলিটিক্স।.....কিন্তু তাই পলিটিক্সওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তোমাদিগের হিতবাক্য বলিতেছি, পিতামহার শ্বশুরবাড়ী আছে তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স নাই। "জয় রাধে কৃষ্ণ। ভিক্ষা দাও গো"; ইহাই আমাদের পলিটিক্স। তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।

"এইরূপ ভাবিতেছিলাম, ইত্যবসরে দেখিলাম শিব্ কলুর পৌত্র দশম বর্ষীয় বালক এক কাঁসী ভাত আনিয়া উঠানে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। দূর হইতে একটী শ্বেতকায়

কুকুর তাহা দেখিল। দেখিয়া একবার দাঁড়াইয়া চাহিয়া কুরমনে ফিরিয়া নিজের কাজে লাগিল। অমনি যখন অন্নরাশি কাংস্য-পাত্রে কুকুরদাসবর বিরাজ করিতেছে—কুকুরের পেটটা দেখিলাম নিতান্ত পড়িয়া আছে। কুকুর চাহিয়া চাহিয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, একবার আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া, হাই তুলিল। তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে এক এক পদ অগ্রসর হইল, এক এক বার কলুর পুত্রের অসংপরিপুষ্টিত বদন প্রতি আড় নয়নে কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয়। অকস্মাৎ অহিফেন-প্রসাদে দিব্য চক্ষু লাভ করিলাম;—দেখিলাম, এই ত পলিটিক্স, এই কুকুর পলিটিক্যান! তখন মনোনিবেশপূর্ব্বক দেখিতে লাগিলাম যে কুকুর পাকা পলিটীক্যাল চাল চালিতে আরম্ভ করিল। কুকুর দেখিল, কলু-পুত্র কিছু বলে না, বড় সরলের বালক, কুকুর কাছে গিয়া থাবা পাতিয়া বসিল। ধীরে ধীরে লাঙ্গুল নাড়ে, আর কলুর পোঁয়ে মুখপানে চাহিয়া হা-হা করিয়া হাঁপায়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, পাংশু পেট, কাতর দৃষ্টি এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস দেখিয়া কলু-পুত্রের দয়া হইল, তাহার পলিটিক্যাল এজিটেশন সফল হইল, কলু-পুত্র একখানা মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া লইয়া কুকুরের দিকে ফেলিয়া দিল। কুকুর আগ্রহ-সহকারে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, তাহা চর্ব্বণ লেহন, গেলন এবং হজম-করণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে তাহার চক্ষু দুঁইয়া আসিল।

"যখন সেই মৎস্য-কণ্টক সম্বন্ধে এই সুমহৎ কার্য্য উত্তম-রূপে সমাপন হইল তখন সেই সুচতুর পলিটিক্সনের মনে হইল যে, আর একখানা কাঁটা পাইলে ভাল হয়। এইরূপ ভাবিয়া পলিটিক্স আবার বালকের মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেখিল, বালক আপন মনে গুড় ভেঁতুল মাখিয়া ঘোর রবে ভোজন করিতেছে—কুকুর পানে আর চাহে না। তখন কুকুর একটী bold move অবলম্বন করিল—জাত পলিটিক্স, না হবে কেন? সেই রাজনীতিবিদ্ সাহসে ভর করিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া বসিলেন। একবার হাই তুলিলেন। তাহাতেও কলুর ছেলে চাহিয়া দেখিল না। অতঃপর কুকুর মৃদু মৃদু শব্দ করিতে লাগিলেন। বোধ হয় বলিতেছেন, 'হে রাজাধিরাজ কলুপুত্র! কাঙ্গালের পেট ভরে নাই।' তখন কলুর ছেলে তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। আর মাছ নাই, এক মুষ্টি ভাত কুকুরকে ফেলিয়া দিল। আর কুকুরও সুখে অন্নমুষ্টি ভোজন করিতে লাগিল।...এমন সময়ে কলুগৃহিণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ছেলের কাছে একটা কুকুর ম্যাক্ ম্যাক্ করিয়া ভাত খাইতেছে—দেখিয়া কলুপত্নী রোষ-কষায়িত লোচনে এক ইষ্টকখণ্ড লইয়া কুকুরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত হইয়া, লাঙ্গুল সংগ্রহ পূর্ব্বক বহুবিধ রাগরাগিণী আলাপচারী করিতে করিতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।"*

বঙ্কিমচন্দ্র পলিটিক্যাল এজিটেশনের ও ভিক্ষাবৃত্তি বা মডারেট পলিটিক্সের পূর্ব্বোক্ত ছবিটী দিয়া বলেন,—

"এ দিকে এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া জোর করিয়া জাবনা খাইয়া গেল, বৎসরান্তের তরেও একপদ সরিল না। কলু পত্নীর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইল; অবশেষে তিনি রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন আর বৃষ অবকাশমতে নাধা নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে তুলিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।"

বঙ্কিম এই কুকুরজাতীয় পলিটিক্স পরিহার করিয়া বৃষ জাতীয় পলিটিক্স গ্রহণ করিতেই নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

## আত্মনির্ভরতা ও সাহসই বঙ্কিমের রাজনীতি।

অতএব বঙ্কিম প্রথমেই দেশবাসিগণকে আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দিলেন এবং মায়ের বন্ধন মোচন করিতে মায়ের সকল সন্তানগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে বলেন—

সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকলনিনাদ করালে
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে।

বঙ্কিম কিন্তু ইংরাজের অধীনে থাকিয়াই সকলকে বহি-র্ভাবে সুশিক্ষিত হইয়া আবার জ্ঞানবান্ গুণবান্ আর বলবান্ হইতে বলিতেছেন—কেন না, "ইংরাজ-রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে, নিষ্কণ্টকে ধর্ম্মাচরণ করিবে।"†

'ভারত-কলঙ্ক' প্রবন্ধেও বঙ্কিম লিখিয়াছেন:—"ইংরাজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরাজ আমাদিগকে অনেক নূতন কথা শিখাইতেছে।.....সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরাজের

* "আমাদের পলিটিক্স" বঙ্গদর্শন, ১২৮০ ফাল্গুন।

† অনুশীলন।

চিত্ত তাহার হইতে লাভ করিতেছি তাহার মধ্যে দুইটী আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতি প্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাদের বলে তাহা হিন্দু জানিত না।*

বঙ্কিম আমাদিগকে জ্ঞান লাভ হওয়া পর্য্যন্ত ইংরাজের অধীন হইয়া থাকিতে উপদেশ দিতেছেন বটে, কিন্তু তিনি দেশবাসীকে ইংরাজের পদ লেহন করিয়া থাকিতেও বলেন নাই; তাই "দেবী চৌধুরাণী"র প্রকাশের (১৮৮২-৮৩ এপ্রিল) লেফটেনাণ্ট ব্রানাল কর্ত্তৃক অকারণে অপমানিত হইয়া আবার পালটিয়া সাহেবকে মুষ্টাঘাতে মুর্চ্ছিকা দিয়াছিলেন, আবার পাদরী হেষ্টী হিন্দুধর্ম্মের অপমান করিলে তাঁহাকেও বঙ্কিম স্বয়ং লেখনী ধারণ করিয়া সমুচিত উত্তর দিতে সঙ্কুচিত হন নাই (১৮৮২-৮৩)।। আর বঙ্কিম সেই শিক্ষা 'আনন্দ-মঠে'র শান্তিকে দিয়া কর্ণেল টমাসকেও দিয়াছিলেন।

দেখিতে দেখিতে আমরা ১৮৮৪ সালে আসিয়া পড়িলাম। আর এক বৎসর মাত্র কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের বাকী। ঘটনাস্রোতে এই বৎসরটী বড়ই স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। যেমন ভাবে ও কার্য্যে জনশক্তি প্রকৃত পথগামী হইল, তেমন দেশের সিদ্ধান্তও প্রায় দ্বিধীকৃত হইল। এই বৎসরে যেমন ইলবার্ট বিলের সিদ্ধান্ত ও লর্ড রিপনের পদত্যাগে রাজনীতি-ক্ষেত্র বড়ই উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, ধর্ম্ম-জগতেও এক বিষম আন্দোলন সমুত্থিত হইল। এই আন্দোলনের মূলে একদিকে যেমন ছিলেন রামকৃষ্ণ দেব ও তাঁহার পুত্রবৎসল শিষ্য গিরিশ ঘোষ, অন্য দিকে আবার ছিলেন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। দিগন্তবিকাশী সোসাইটীর প্রভাবও বড় ন্যূন ছিল না। আর বঙ্কিমচন্দ্রের এদিকেরও অবদান বড় সামান্য ছিল না। প্রবন্ধটী একটু দীর্ঘ হইলেও গোড়ার কথাগুলি এবারেই শেষ করিয়া ফেলিব।

রাজনীতিক্ষেত্রে দেশ তখন যেমন অত্যন্ত অবনমিত হইয়াছিল, ধর্ম্ম-জগতেও সেইরূপ বিপ্লব দেখা দিয়াছিল। তখন Young Bengal-এর বড়ই প্রভাব, কিন্তু তাহারা বিদ্বান ও সমাজে মান্য-গণ্য হইলেও অনেকেই জড়বাদী ছিলেন। কেহ কেহ ক্রিশ্চিয়ান হইয়াছিলেন, কাহারও বা ব্রাহ্মধর্ম্মে বড় আকর্ষণ ছিল। ইহারা সকলেই ছিলেন হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী। এদিকে হিন্দু-সমাজ মধ্যেও নানারূপ মতভেদ,—শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, হিন্দু শাস্ত্রক কদাচারী; বৈষ্ণবসমাজও আবার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। ফলে দেশীয় যুবকমণ্ডলী অধিকাংশই তখন ধর্ম্মচ্যুত ও জাতীয়তা-ভ্রষ্ট হইতেছিল। এই দুর্দ্দিনে বঙ্কিমের হইতে পরমহংস রামকৃষ্ণদেব সকলের জন্য ব্যবস্থা করিয়া এক সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম প্রচার করেন—"যত মত তত পথ"। আবার পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি এই সময়ে যেমন একদিকে হিন্দু-ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, ভারতীয় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রও সেইরূপ অনুশীলন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া জনমণ্ডলীকে দেহ, মন, বুদ্ধি ও জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে বদ্ধপরিকর হইতে শিক্ষা দিয়া গুরুর আসন অধিকার করিয়াছিলেন। ঠিক এই সময়েই (১২৯১, শ্রাবণ) নাট্যকার গিরিশচন্দ্র 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয়ে বাঙ্গালায় এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ধর্ম্মের বন্যা বহাইয়া এক নূতন ভাবের বন্যা উত্থিত করেন।

'চৈতন্যলীলা'র প্রভাব সম্বন্ধে সমসাময়িক দেশীয় সংবাদ-পত্রের ভাষায়ও বলিতেছি:

The extraordinary success of চৈতন্যলীলা must have been largely due to the fact of its being the first of the passion-plays of the modern stage of Bengal and as such, to have appealed forcibly to the religious instincts of an arduously religious people and to have captivated the imagination and innate good feelings of a sceptical audience whom a revolutionary system of education had strongly and not unnaturally worked upon.....*Babu Girish Chandra Ghose has deserved well of his co-religionists and his countrymen by his endeavours to improve the moral tone of our age, to popularise the Hindu religion and to develop the slender literary and dramatic resources of the country.* Our stage, as all right-minded men must concede, is after all beginning to be what it ought to be—namely, a power for good in the country and its influence must have already been felt and strongly to have succeeded in evoking hostile criticism in quarters.

Hindu Patriot, Dec. 14, 1885.

* বঙ্গদর্শন ১২৭৯, বৈশাখ।

। আজীর উপরে বঙ্কিমের এতদূর অবদানের ইতিহাস বৎসরীয় বঙ্কিম-জীবনীতে (শ্রাবণ) পাঠক বিস্তৃতভাবে পাইবেন।

in which the religion of the Hindu is expected to find its least favour.

কর্ণেল অলকট্ও চৈতন্যলীলার অভিনয় দেখিয়া ইহার বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া যত প্রলাপ করেন—

"As for 'Chaitanya-Lila' I unhesitatingly affirm that *it is impossible* for any one but a "civilized" peg-drinking Babu like the one misbehaving himself on the front bench of the orchestra, to *witness the play without a rush of spiritual feeling and religious fervour.*" *

এই ভাবে বাঙ্গালায় যখন বিপ্লবের ধারা চতুর্দ্দিক হইতে প্রবাহিত, থিওজফিক্যাল্ সোসাইটী (Theosophical Society) তখন বিশেষ ভাবে ভারতের উপকার সাধন করে। Colonel Olcott ও মাডাম ব্লাভাট্স্কি তখন ভারতে †—তাঁহারা স্থানে স্থানে হিন্দুর নিকট এই বাণী প্রচার করিলেন, "A Hindu had no reason to be ashamed of his own past and to rush for wisdom and inspiration from the material West—" "জড়বাদী পাশ্চাত্য হইতে ধার করিবার আবশ্যক কি? হিন্দুর অতীত কি বিশাল ও প্রভাবশালী!"

হিন্দুর জাগরণের দিনে এই বাণী জাতীয়তার দিক্ হইতে অমৃতের কার্য্য করিল। হিন্দু আপন স্বত্ব বুঝিল, ধর্ম্ম বুঝিল, জাতীয়তা বুঝিল। হিন্দু পাশ্চাত্য-মোহ অপসারিত করিবার পথ খুঁজিয়া পাইল। এবং এই বিষয়ে সেই থিওজফিক্যাল সোসাইটীর নিকটে ভারত বিশেষভাবে ঋণী।

থিওজফিক্যাল সোসাইটীর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভ্রাতৃভাব ও সমভাবপরায়ণতা বৃদ্ধি (universal brotherhood and equality), এবং ইহার প্রসারকল্পে প্রতি বৎসর সভ্যগণের এক একটী সম্মিলন (conference) হইত। এই সম্মিলন প্রথমে বোম্বাইতে হইত এবং পরে মাদ্রাজে হয়। কর্ণেল অলকট এক সম্মিলনে বলিয়াছিলেন, "This will be the nucleus of the future parliament of India"—"ভবিষ্য জাতি-সম্মিলনের ইহাই উৎস হইয়া দাঁড়াইবে।" ফলেও তাহাই হইল। স্বর্গীয় জানকীনাথ ঘোষাল (স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা ও স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী), নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় প্রভৃতি এই সব সম্মিলনে যাইতেন। মিঃ হিউমও একজন গোঁড়া থিওজফিষ্ট ছিলেন এবং এই সব সম্মিলনে যোগদান করিতেন। হিউম, নরেন্দ্রনাথ, জানকীনাথ এবং জন কয়েক থিওজফিষ্টই প্রথম কংগ্রেস সম্মিলনের অনুষ্ঠাতা ছিলেন। ক্রমে ধর্ম্মের আন্দোলনের স্থান রাজনৈতিক আন্দোলন অধিকার করিল। এতদ্ব্যতীত ১৮৮৪ সালে লর্ড রিপনকে বিদায় অভিনন্দন দেওয়ার জন্য বোম্বাই নগরীতে যে সমগ্র ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মিলনের সুযোগ হয়, তাহাতেও এইরূপ একটি সম্মিলনের আবশ্যকতা অনেকেই অনুভব করেন। এই সমস্ত সম্মিলনী হইতে ভাবধারা পাইয়াই ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত হইয়াছে।

তবে হিউম সাহেব প্রথমে একটী সামাজিক সম্মিলন গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কেন তাহা হয় নাই ক্রমে বলিতেছি।

কংগ্রেসের ইতিহাসের একটী পুরাতন কথাও আছে। সাত আট বৎসর পূর্ব্বে লর্ড লিটনের দিল্লী দরবারের সময় (১৮৭৭) পুণায় সার্ব্বজনীন সভার প্রতিষ্ঠাতা গণেশ বস্ত যোশী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সাংবাদিকগণ* প্রতি বৎসর দেশের দুঃখ-কষ্ট জানাইবার জন্য একটী সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে যোশী পর বৎসর কলিকাতায়ও আসিয়াছিলেন। কিন্তু উহা বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তবে যোশী তাঁহার সঙ্কল্প বিস্মৃত হন নাই।

যাহা হউক ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকেই জানকী ঘোষাল মহাশয় এবং দেওয়ান রঘুনাথ রাও (অন্যতম থিওজফিষ্ট) ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকটে এইরূপ রাজনৈতিক সম্মিলনের আবশ্যকতা বুঝাইয়া চিঠি-পত্রাদি লিখিতে লাগিলেন। লিটনের দমন-নীতি ইলবার্ট বিল আন্দোলন, রিপনের প্রতি আমলাতন্ত্রের বিরোধিতা, সুরেন্দ্রনাথের নির্য্যাতন প্রভৃতিতে তাঁহাদের মন তখন খুবই তিক্ত, তাঁহারা উপরোক্ত প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করিলেন। পুণার সার্ব্বজনীন সভা এই কাজের ভার গ্রহণ করিল।

* Sd. H. S. Olcott 17th Oct. 1885 and published in Reis & Rayat.

† পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা ভারতভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

* সাংবাদিকগণ লর্ড লিটনকে একটী অভিনন্দন পত্রও দিয়াছিলেন। সেই পত্র পাঠ করেন সুরেন্দ্রনাথ। তিনি তখন 'হিন্দু পেট্রিয়টের' প্রতিনিধিরূপে দিল্লীতে গিয়াছিলেন।

মাদ্রাজের একটী বৈঠকে কার্য্য সম্পাদনের জন্য আটজন সভ্য লইয়া অতঃপর একটী কমিটি গঠিত হয় ১৮৮৫ মার্চ্চ মাসে এবং তাহাতে নরেন্দ্র নাথ, জানকীনাথ, দেওয়ান রঘুনাথ রাও, মিঃ এস্. সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রভৃতি সভ্য নির্ব্বাচিত হন। বোম্বাই হইতেও কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গ প্রভৃতি প্রতিনিধি ছিলেন।

মিঃ হিউম যে বিগতশতাব্দীর সোসাইটীর একজন প্রধান সভ্য ছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইনি সিভিল সার্ভিসের কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ভারতের হিতৈষণায় আত্ম-নিয়োগ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। ইতিপূর্ব্বে তিনি Bombay Presidency Association প্রতিষ্ঠা করেন এবং কলিকাতা ও বোম্বাই হইতে এদেশ সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত টেলিগ্রাম বিলাতে পৌঁছাইয়া ভারতের প্রকৃত অবস্থা যেন গোপনে না রাখা হয়, তজ্জন্য বোম্বাইতে একটী টেলিগ্রাফ ইউ-নিয়ন স্থাপিত করেন। মাদ্রাজে উক্ত প্রতিনিধি-সভার বৈঠকের অল্প পরেই তিনি মাদ্রাজে উপস্থিত হইয়া সেই সভায় যোগদান করিয়া ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যগঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এইরূপ সম্মিলনের কল্পনা তিনি পূর্ব্ব হইতেই করিতেছিলেন, এবং যোগদানে করিবার পর হইতেই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, অজস্র অর্থব্যয় করিয়া, চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া যে সম্মিলন গঠন করেন, আজ তাহাই ভারতের একমাত্র শক্তিশালী সর্ব্বদল প্রতিনিধি সম্মিলন। মিঃ হিউমের প্রস্তাবেই কনফারেন্স নামের পরিবর্ত্তে এই অনুষ্ঠানকে জাতীয় কংগ্রেস (National Congress) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই নামকরণ বোম্বাই নগরীতে প্রথম অধিবেশনের পূর্ব্বেই করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ জানকী নাথ ও গণেশ জোশী, নরেন্দ্রনাথ ও হিউমের অধ্যবসায় ও আন্তরিক পরিশ্রম ব্যতীত এই সম্মিলনী এত সহজে গঠিত হইতে পারিত কি না সন্দেহ; তবে এ-কথাও ঠিক যে, ব্যক্তি বিশেষকে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বা জনক বলিলে কথাটী ঠিক হইবে না—কারণ জাতীয় কংগ্রেস তখনকার কালের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, ব্যক্তি বিশেষ কার্য্যে সহায়তা করিয়া-ছিল এইমাত্র বলা যাইতে পারে।

এ-সময়ে ভারতবর্ষে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টও বিরোধী হইলেন না। কারণ উপর্য্যুপরি দুই তিন শাসনকর্ত্তার সময়ে জনশক্তি যেরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহাতে গভর্ণমেণ্ট প্রকৃতই শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। ডিসরেলির মন্ত্রিত্বকালে লর্ড লিটনের কূটনীতিতে ভারত খুবই উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল আর সদাশয় রিপনের শাসনকালে সেই উষ্ণতা আরও শতগুণে বৃদ্ধি পাইল; কারণ শ্বেতাঙ্গগণ মিলিয়া তাহাতে কি ইংলণ্ডে তাঁহার সমস্ত উদ্যোগই ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন।—তাহাতে ভারতবাসীর নিকটে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিলেন বটে—

"রিপনের গুণের কথা
রইল গাঁথা
জনের মনে ঘরে ঘরে বাজারে"

কিন্তু শ্বেতাঙ্গগণের ব্যবহারে দেশবাসী এত ত্যক্ত ও উৎপীড়িত হইয়া উঠিল যে, শঙ্কিত-হৃদয় লর্ড ডফরিণ ইচ্ছা করিয়াই মিঃ হিউমকে রাজনৈতিক সম্মিলনের গঠনকার্য্যে উৎসাহিত করেন। লর্ড ডফরিণ বোধ হয় মনে করেন, ইঁহারা দুই একটী মন্তব্য করিয়া কেবল "বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের পলিটি-কাল এডিটেসন" করিবে বই তো নয়, কিন্তু মনের কথা বাহির হইয়া যাওয়ায় ভূমধ্যস্থ আগ্নেয়গিরির উদ্ভব হইবার কারণ হইবে না বরং নিঃসারিত হইলে ক্ষতি সব ঠাণ্ডা থাকিবে। তাই তিনি মিঃ হিউমকে সামাজিক সম্মিলন না করিয়া রাজনৈতিক সম্মিলন করিতেই উদ্বুদ্ধ করেন, উদ্দেশ্য যেন কংগ্রেস ইংরাজ শাসনের safety valve রূপে কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। রাজনৈতিক সম্মিলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইংলণ্ডবাসীর মনেও যেন সন্দেহ না হয়, তজ্জন্য হিউম সাহেব বিলাতে গিয়াও কর্ত্তৃপক্ষকে বুঝাইয়া দিয়া আসেন।

সমগ্র ভারতই তখন ব্রিটিশতন্ত্রের কূটনীতিতে ব্যথিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বাঙ্গালাতেই সেই তীব্রতা সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বরে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে একটী জাতীয় সম্মিলনী আহূত হয় এবং তাহা যেন শীঘ্রই ভারতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়, এই ভাবে সুরেন্দ্রনাথ জলদ ভাষায় তথায় বুঝাইয়া দেন। ১৮৮৪ সালে বাঙ্গালায় আর কোন অনুষ্ঠান হয় না, কিন্তু ১৮৮৫ সালে বড়দিনের ছুটী উপলক্ষে কলিকাতায় আবার সেইরূপ একটী অনুষ্ঠান হয়।

---

* পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিউম সাহেব প্রথমে একটী সামাজিক সম্মিলন গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারই পরামর্শানুসারেই তাহা হয় নাই।

কলিকাতার কনফারেন্সে দারভাঙ্গার মহারাজা, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, হেনরী কটন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন এবং কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা (British Indian Association) ইহার সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল।*

লর্ড লিটন ও রিপনের শাসনকালীন ব্যাপারাদি—অস্ত্র আইন, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা, ফৌজদারী বিচারে শাসন ও বিচার-বিভাগের সংশ্রবহীনতা প্রভৃতি বিষয় এবং ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায় এই সব সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, বোম্বাইতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন সময়ে আবার কলিকাতায়ও একটী অনুরূপ অনুষ্ঠান হয়। প্রথমেই ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের এই বিভাস সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ হইতে পারে। সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতাই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র হওয়া উচিত, এই মত পোষণ করিতেন, তাই তিনি জমিদারবর্গের সহযোগিতায় উক্ত কনফারেন্সের আয়োজন করেন। অন্যান্য সকলে এ-মত পোষণ করিতেন না। কিন্তু ইহাই মতদ্বৈধের একমাত্র কারণ নয়।

হিউম সাহেব এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটু শঙ্কিত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ জেলের আসামী, সিভিল সার্ভিস হইতে স্থানান্তরিত, ম্যাট্‌সিনির শিষ্য। বিশেষতঃ তাঁহার বক্তৃতাগুলি প্রায়ই গরম-গরম হইত। ছাত্রগণের তাঁহার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি যখন ছাত্রগণের সভায় বলিতেন, "who of you will be Mazzini and Garibaldi?" ছাত্রগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিত, "we, we," কাজেই ছাত্র ও যুবকদলের অবিসম্বাদী নেতা উগ্রপন্থী (extremist) সুরেন্দ্রনাথকে সকলেই একটু ভয়ের চক্ষে দেখিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কংগ্রেসের অনুষ্ঠাতাগণ প্রায়ই ছিলেন থিওসফিষ্ট। থিওসফিষ্টগণকে গভর্ণমেণ্ট একটু সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, কেন না তখন রুষিয়ার আক্রমণের ভীতি ছিল, আর ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কি ছিলেন রুষিয়ার অধিবাসিনী। হিউম সাহেব সুরেন্দ্রনাথকে প্রথমে গ্রহণ করিয়া আরও গভর্ণমেণ্টের সন্দেহের মাত্রা বাড়াইবার ইচ্ছা পোষণ করেন নাই।

তবে প্রথম কংগ্রেসের সূত্রপাতেই হিউম সাহেব জমিদার বলিয়া কোন সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট না হইয়া ভালই করিয়াছিলেন।

এই ভাবেই ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বরে বোম্বাই নগরীতে প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, আর ইহার প্রথম সভাপতি-পদে বৃত হন বাঙ্গালারই একজন বিশিষ্ট জননায়ক।

হেনরী কটন (পরে স্যার হেনরী) যে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন "Bengal has captured the imagination of the whole of India from Assam to Khyber Pass", কংগ্রেস সংগঠনে সেই সত্য প্রমাণিত হইল। এই সম্বন্ধে পরবর্ত্তী সংখ্যায় আমরা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব।

---

* A Conference of delegates from different parts of the country and representing different political associations was held at the British Indian Association Rooms on Friday, the 25th instant and the two following days. The conference was convened at the instance of the British Indian Association, the Indian Union and the Indian Association. Delegates from Pabna, Faridpore, Burdwan, Jessore, Kanaipore, Baidyabati, Kati, Katada, Krishnagore and the North-western Provinces, the Orissa People's Association and the Barle Association also sent their representatives. The chair on the first day was taken by Babu Durga Charan Law C. I. E. and the conference was attended by H. H. the Maharaja of Darbhanga, the Hon'ble Rai Saheb Viswanath Narain Mullick, Raja Purna Chandra Singh Bahadoor, the Hon'ble Peary Mohan Mukerjee, Mr. H. J. S. Cotton, Babu Jogendra Chandra Ghosa, Babu Mohesh Chandra Choudhury, Dr. Gurudas Banerjee and Babu Surendra Nath Banerjee, among others. The reconstitution of the Legislative Councils and the Arms Act question were discussed on the first day; the question of retrenchment of expenditure, the Civil Service question and Lord Kimberley's reply were discussed upon on the second day; and the subjects of third day's discussion were the separation of Judicial from the Executive authority in the administration of criminal justice in the mofussil and the reconstitution of the Police. Mr. Cotton took part in the proceedings of the conference and assured the delegates that many of his countrymen in England sympathised with the natives of this country and their desire for more enlarged representation in the Legislative Assemblies of the Empire, but counselled moderation.

—Hindu Patriot, Dec. 28, 1885: Page 606.

চিকিৎসা-সঙ্কট

## বিচিত্র এশিয়া : চীনের প্রাচীর ও হ্রদ

—শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তী

এশিয়ার রহস্যের সীমা নাই। বিরাট একটি মহাদেশ, কত নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, প্রান্তর-মরুভূমি ইত্যাদি ইহাকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে। কত জাতি, কত মানুষের বাস; বর্তমানে তাহাদের ভাষা, ধর্ম, সভ্যতা কত রকমের তাহার ঠিকানা নাই। কি ভূগোল, কি ইতিহাস সকল দিক দিয়াই এশিয়ার বৈচিত্র্য অতুলনীয়। এই অদ্ভুত মহাদেশটির একটি অতি প্রাচীন রাস্তা ও রহস্যময় একটি হ্রদের কথা আজ বলিতেছি।

আজকাল আমরা সর্বত্র সিল্ক দেখিতে পাই, আমাদের বাড়ী-ঘরেও সিল্কের সাড়ী জামা প্রভৃতির প্রচলন আছে। কিন্তু এই জিনিষটি প্রথম কোথায় উৎপন্ন হইল, সে সম্বন্ধে আমাদের অনেকেই হয় তো কিছু জানেন না। সিল্ক প্রথম উৎপন্ন হয় চীনে এবং তথা হইতে ইহা এশিয়া ও ইউরোপের নানা স্থানে চালান যাইত। চীন হইতে যে-রাস্তা দিয়া সিল্ক এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে চালান যাইত, সেই রাস্তাটির কথাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

বিশেষ কথা এই—যে-সময়ের কথা বলিতেছি তখন এক রোম ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য দেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন; তাহাদের কাছে সভ্যতার আলোক তখনও পৌঁছায় নাই। সে সময়ে রোমের সভ্যতা যদিও নানা ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল তথাপি রোমবাসী পৃথিবীর পরিচয় বড় একটা রাখিত না; ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় চীন সম্বন্ধে তাহাদের অজ্ঞতা হইতে। যীশুখৃষ্টের জন্মের শতাধিক বৎসর আগেও রোমে সিল্কের প্রচলন বেশ ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রোমবাসী চীনের নাম পর্যন্তও জানিত না। তাহাদের ধারণা ছিল, সুদূর পূর্বের কোন অজ্ঞাত দেশ হইতে সিল্ক আসে। এদিকে চীনের ব্যবসায়িগণও সম্ভবতঃ জানিত না, কোন্ কোন্ দেশে তাহাদের সিল্ক সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইতেছে। উটের পিঠে চাপাইয়া তাহারা দেশ-দেশান্তরে সিল্ক পাঠাইত, হাজার হাজার মাইল ব্যাপী দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই ভাবেই এক দেশের সহিত আর এক দেশের ব্যবসা চলিত। অথচ এক দেশের লোক আর এক দেশের নাম পর্যন্তও জানিত না। রোমের অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছে চীনের সিল্কের যে বিশেষ আদর ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, চীনের সিল্কের ব্যবসা দুই হাজার বৎসরেরও আগে হইতে প্রচলিত ছিল। ভূমধ্য-সাগরের তীরবর্তী দেশসমূহে চীন হইতে সিল্ক আসিত। কেবল তাহাই নহে, পারস্যের প্রাচীন ইতিহাসেও চৈনিক সিল্কের উল্লেখ দেখা যায়। কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী অনেক জায়গায় প্রাচীন নিদর্শনের সহিত সিল্ক পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষেও যে এই সিল্ক আসিত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণও রহিয়াছে। একথা ভাবিলে খুবই আশ্চর্য হইতে হয় যে, অতি প্রাচীন যুগে একমাত্র সিল্কই প্রশান্ত-মহাসাগরের সহিত ভূমধ্য-সাগরের একটি গভীর যোগ স্থাপন করিয়াছিল।

চীনের প্রাচীরের কথা আমরা সকলেই জানি; খৃষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীরটির নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়; প্রাচীরটি কবে শেষ হইয়াছিল তাহা আমরা জানি না। অনুমান খৃষ্ট-পূর্ব ১৩৮ সনে এই প্রাচীরকে খানিকটা বাড়ান হয়। ইহার একটি উদ্দেশ্য ছিল উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমের 'অসভ্য' জাতির আক্রমণ হইতে চীনকে রক্ষা করা, আর একটি উদ্দেশ্য ছিল সিল্ক-ব্যবসায়ের রাস্তাটি সংরক্ষণ করা।

উটের পিঠে চড়িয়া অগণিত চৈনিক ব্যবসায়িগণ তাহাদের পণ্য লইয়া এই রাস্তা ধরিয়া চলিত; তাহাদের

কল-কোলাহলে রাস্তাটি দিন-রাত মুখরিত থাকিত। ইহার ইতিহাস কি বিচিত্র! চৈনিক ব্যবসায়িগণ আগাগোড়া রাস্তাটি অতিক্রম করিত না, খানিক দূরে আসিয়া তাহারা অন্যদেশীয় ব্যবসায়ীর হাতে নিজেদের পণ্যের বোঝা অর্পণ করিত। ইহারাই সমগ্র এশিয়া—সমরখন্দ, পারস্য, সিরিয়ান মরুভূমি, আলেপ্পো, ডামাস্কাস্, প্যালেস্টাইন ইত্যাদির ভিতর দিয়া নানা স্থানে চীনের সিল্ক বিক্রয় করিয়া ফিরিত। এই রাস্তাটি সাংহাই হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; ইহার দৈর্ঘ্য ছিল ৯,০০০ মাইল। ইস্তাম্বুল হইতে কতকগুলি রাস্তা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চলিয়া গিয়াছিল। পৃথিবীতে এত বড় ও এত প্রাচীন রাস্তা আর নাই।

যাত্রীদের অসুবিধা দূর করিবার জন্য এই বিরাট রাস্তাটির ধারে ধারে অসংখ্য সরাইখানা গড়িয়া উঠিয়াছিল, মাঝে মাঝে দুর্গ ও সামরিক ঘাঁটি ছিল। ব্যবসায়িগণ যাহাতে নিরাপদে চলিতে পারে সে জন্য পুলিসের বন্দোবস্তও ভাল রকম ছিল। সকল সীমান্তেই দ্বিভাষিক পাওয়া যাইত; কেন না এই দীর্ঘ রাস্তা বহু দেশের ভিতর দিয়া গিয়াছিল এবং প্রত্যেকটি দেশের ভাষা স্বতন্ত্র হওয়ার ফলে দ্বিভাষিক ছাড়া এক দেশের লোক আর এক দেশের লোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে পারিত না। টাংওয়াং ও লোপ-নর হ্রদের মধ্যবর্ত্তী মরুভূমিতে উটের পিঠে চাপাইয়া জল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা ছিল।

এই রাস্তার পরিচয় বহুদিন পর্য্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। মার্কো পোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে ইহার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। তবে ইহার সহিত আমাদের সম্পূর্ণ পরিচয় করাইয়া দেন বিখ্যাত অভিযানকারী সোয়েন হেডিন।

যে-রহস্যময় হ্রদটির কথা আমরা প্রথমে বলিয়াছি, তাহার রহস্যও উদ্ঘাটন করিয়াছেন এই সোয়েন হেডিন। হ্রদটির নাম ইনি দিয়াছেন 'ভ্রাম্যমাণ হ্রদ'। লোপ মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত লোপ-নর হ্রদ—যাহার ধার দিয়া দুই হাজার বৎসর আগে উক্ত রাস্তাটি বিস্তৃত ছিল তাহাই হইতেছে 'ভ্রাম্যমাণ হ্রদ'। হ্রদ কি করিয়া ভ্রাম্যমাণ হইতে পারে তাহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না, কিন্তু ব্যাপারটি সত্যই বিশ্বাসযোগ্য।

চীনাদের মানচিত্রে দেখা যায়, এই হ্রদটির পূর্ব্ব দিক্ দিয়া তারিম নদী প্রবাহিত, বাম দিক্ হইতে খাইদু-গোল নামে একটি উপনদী আসিয়া ইহাতে মিশিয়াছে, তাহার পরে তারিম আসিয়া পড়িয়াছে লোপ-নরে। এই হ্রদটি ১৮৭৬ সনে জনৈক রুশ কর্ণেল কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। তিনি বলেন, চীনাদের মানচিত্রে এই হ্রদকে যতটা দক্ষিণে আছে দেখা যায়, ইহা তাহার অপেক্ষাও দক্ষিণে অবস্থিত; এবং তারিম সোজা পূর্ব্বে না যাইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও পরে দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়াছে। তাঁহার এই আবিষ্কার ইউরোপে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

১৯০০ সনে সোয়েন হেডিন আবিষ্কার করিলেন, লোপ মরুভূমির উত্তর প্রান্তে কুরুক-দরিয়া বা কুম-দরিয়া নামে একটি নদীর যে শুষ্ক খাল আছে, সেই খাল দিয়া অতি প্রাচীন কালে তারিম তাহার উপনদী সহ প্রবাহিত ছিল। তাহার পরে তিনি এই মরুভূমির উপরে লু-লা শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। এই শহরের মাটি-চাপা-পড়া বাড়ী হইতে তিনি বহু পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করিয়াছিলেন।

১৯০১ সনে সোয়েন হেডিন নানা রকম পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলেন, কারাকোশান নামে আর যে একটি হ্রদ আছে, তাহা শীঘ্রই শুকাইয়া যাইবে এবং প্রাচীন কালে চীনা মানচিত্রে যেখানে লোপ-নর হ্রদের অবস্থান দেখাইয়াছিল, ঠিক সেইখানেই আবার একটি জলাশয় গড়িয়া উঠিবে। এই ধারণা তাঁহার বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, তারিম নদী ঘুরিয়া আবার কুরুক-দরিয়া দিয়াই প্রবাহিত হইবে। কতকগুলি নৈসর্গিক কারণে নদীটি ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত একবার উত্তরের ও আর একবার দক্ষিণের পথ দিয়া চলে। হ্রদ ও নদীর স্থান-পরিবর্ত্তনের সময় পনের শত বৎসর। সোয়েন হেডিন ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন, খুব শীঘ্রই এমন একটি পরিবর্ত্তন ঘটিবে, এবং তাঁহার ফলে লোপ-নর ও কুরুক-দরিয়া জলে ভরিয়া উঠিবে। তাঁহার ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হইয়াছে; ১৯২১ সনে কুরুক-দরিয়া স্রোতস্বিনী নদীতে পরিণত হইয়াছে!

পনের শত বৎসর আগে কুরুক-দরিয়া লোপ-নর হ্রদ হইতে উঠিয়া তারিমের সহিত মিলিত হইয়াছিল, তখন ইহারই ধারে লু-লা শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার পরে হঠাৎ কুরুক-দরিয়া শুকাইয়া গেল, লোপ-নরের জল দক্ষিণে আসিয়া কারাকোশানে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে নদীটির ওই

ধারে মরুভূমি জাগিয়া উঠিল, এবং শু-লা অন্তর্ধান হইল। আবার কিন্তু নদীটির দুই তীরে গাছপালা দেখা দিয়াছে, পশু-পক্ষীর ভিড় জমিয়াছে। হয় তো আবার-কোন শহর শু-লার ধ্বংসবিশেষের উপর গড়িয়া উঠিবে। কিন্তু তাহার আয়ু হইবে মাত্র পনের শত বৎসর। লোপ-নর আবার শুকাইয়া যাইবে, তাহার ফল আসিয়া আবার উপস্থিত হইবে কারাকোরাম হ্রদে। আবার বিরাট মরুভূমির মাঝে নানা রকম রহস্যময় শব্দ শুনা যাইবে—মার্কো পোলো যে সকল শব্দ ভূতপ্রেতের কণ্ঠস্বর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এমন 'ত্রাসাযাপ হ্রদ' আর কোথাও নাই।

## বিশ্ব-পরিচয় ঃ আলোকবর্ষ

বিরাট বিশ্বের সম্পূর্ণ পরিচয় বর্ত্তমানে আমরা আজও লাভ করিতে পারি নাই, কিন্তু যতটুকু করিয়াছি তাহাতে আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই। মাঝে মাঝে আমাদের মন এই পৃথিবী ছাড়িয়া অনন্ত বিশ্বের মাঝে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে চায়, কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত নক্ষত্র বা ঘূর্ণ্যমান নীহারিকাপুঞ্জের দুর্জ্ঞেয় রহস্য আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে থাকে। পৃথিবীতে এমন লোক খুব কমই আছে, যাহে আকাশের দিকে চাহিয়া যাহার মনে কোন প্রশ্ন জাগে না। কোটি কোটি নক্ষত্র-মণ্ডিত ছায়াপথ-সুশোভিত আকাশের দিকে চাহিলে প্রথম প্রশ্নই আমাদের মনে জাগে—আমাদের পৃথিবী হইতে এই সকল নক্ষত্রের দূরত্ব কত? বর্ত্তমান বিজ্ঞান ইহার যে-উত্তর দিয়াছে, এখানে সে আলোচনার চুম্বক দিতেছি—পরে কাজে লাগিবে।

নক্ষত্রের দূরত্ব সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে আমাদের একটি মাপকাঠির দরকার। ধরা যাউক একখানি এক্সপ্রেস ট্রেন ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে ছুটিতেছে; দিন-রাতের মধ্যে একবারও না থামিলে ইহা ১৩ দিনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে পারিবে। ১৩ দিনে ট্রেনখানি মোট ২৫,০০০ মাইল যাইবে। ট্রেনখানি যদি পৃথিবীকে এই রকম সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া আরও খানিকটা অগ্রসর হয় তাহা হইলে উহা মোট ১,৮৬,০০০ মাইল অতিক্রম করিবে। ১,৮৬,০০০ মাইল যাইতে উহার তিন মাসেরও অধিক সময় লাগিবে। আলোকরশ্মি কিন্তু এক সেকেণ্ডে এই দূরত্ব পার হইতে পারে।

১,৮৬,০০০ মাইলকে বর্ত্তমান বিজ্ঞান এক আলোক-সেকেণ্ড বলিতেছে। নক্ষত্রের দূরত্ব মাপিতে হইলে ইহাই আমাদের এক মাত্র মাপ-কাঠি। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব এক আলোক-সেকেণ্ডের কিছু বেশী। আবার পৃথিবী হইতে চন্দ্রের যে দূরত্ব, পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব তাহার অপেক্ষা চারিশত গুণ। সূর্য্য হইতে আলোক-রশ্মির পৃথিবীতে পৌঁছিতে প্রায় আট মিনিট সময় লাগে। ইহা হইতে আলোক-মিনিট কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

পৃথিবী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দূরে যে গ্রহ তাহার নাম প্লুটো, ইহার দূরত্ব সাড়ে পাঁচ আলোক-ঘণ্টা। এইবার আমরা আমাদের সৌরজগৎ ছাড়িয়া অনন্ত আকাশের দিকে একবার চাহিতে পারি।

খালি চোখে ধ্রুবক নামক স্থির নক্ষত্রকে সুস্পষ্ট দেখা যায়, এই নক্ষত্র পৃথিবীর অত্যন্ত নিকটে। কিন্তু এই নক্ষত্রে যাইতে আলোকের নয় বৎসর লাগে। আলোক-রশ্মির গতি ও বেতারগতি তরঙ্গের এক। বেতারে ধ্রুবকে কোন খবর পাঠাইলে উহা নয় বৎসর পরে তথায় পৌঁছিবে। গত বৎসর ওরা সেপ্টেম্বর তারিখে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী বেতার-যোগে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন; এই যুদ্ধের খবর ১৯৪৮ সনের ওরা সেপ্টেম্বরের আগে ধ্রুবকে পৌঁছিবে না।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, মাঝে মাঝে কতকগুলি নক্ষত্রমণ্ডলী রচিত হইয়াছে। আকৃতি দেখিয়া নক্ষত্রমণ্ডলী-গুলিকে চিনিতে দেরী হয় না। উদাহরণ স্বরূপ সপ্তর্ষি-মণ্ডলের নাম করা যাইতে পারে। সপ্তর্ষি-মণ্ডলের প্রধান নক্ষত্রের পৃথিবী হইতে দূরত্ব ৮০ আলোক-বর্ষ। আর একটি নক্ষত্র-মণ্ডলী বৃশ্চিক, ইহার উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হইতে আমাদের কাছে আলো আসিতে ৩৩০ বৎসর লাগে। পৃথিবী হইতে কালপুরুষ নামক নক্ষত্রমণ্ডলীর দূরত্ব ৫০০ হইতে ৬০০ আলোক-বর্ষ।

ছায়াপথ আমরা সকলেই দেখিতে পাই; এই ছায়াপথে যে কত কোটি কোটি নক্ষত্র আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ছায়াপথের উপরে আমাদের সূর্য্যকে বসাইলে তাহাকে অতি ক্ষুদ্র একটি বিন্দুর মত মনে হইবে। পৃথিবী হইতে ছায়া-পথের কোন কোন নক্ষত্রের দূরত্ব ২,০০০ আলোক-বর্ষ। ছায়াপথ কত বড় তাহা জানিবার জন্য আমাদের অসীম আগ্রহ হয়। জ্যোতির্ব্বিদেরা বলেন যে, ছায়াপথের প্রস্থ প্রায় ১,০০,০০০ আলোক-বর্ষ।

অগণিত নক্ষত্র দেখিয়া মনে হয়, অনন্ত বিশ্বের বোধ হয় সর্ব্বত্রই নক্ষত্র, কোথাও এতটুকু ফাঁকা নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিশ্ব এত বিরাট ও অসীম যে, কোটি কোটি নক্ষত্র সত্ত্বেও ইহা প্রায় শূন্যই রহিয়াছে। মনে করা যাউক উত্তর-মেরু ও দক্ষিণ-মেরু হইতে একই সময়ে দুইখানি নৌকা লক্ষ্যহীন পথে যাত্রা করিয়াছে; পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করিলে ইহাদের অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের একখানির সহিত আর একখানির ধাক্কা লাগিবার সম্ভাবনা আদৌ নাই বলিলেও চলে; এই বিরাট বিশ্বে দুইটি নক্ষত্রের মধ্যেও সংঘর্ষ হইবার সম্ভাবনা সেইরূপ। তার পর নক্ষত্রগুলি যে কি ভয়ঙ্কর বেগে ঘুরিতেছে তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। ছায়াপথের পরেও আরো কোটি কোটি নক্ষত্র রহিয়াছে, যাহাদের সম্বন্ধে আমরা এখনও বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই। যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা ক্রমশঃ বলিবার ইচ্ছা রহিল।

## জীবনী : কবি সীতারাম দাস

আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবির পরিচয় তাঁহাদের রচিত বই হইতে জানা যায়। প্রায়ই শুনা যায়, তাঁহারা দেবদেবীর কৃপায় কাব্য রচনা করিয়াছেন। মহাকবি কালিদাসের কথা আমরা জানি, কি ভাবে স্বয়ং সরস্বতী তাঁহাকে দর্শন দেন এবং কি ভাবে বাগ্‌দেবীর কৃপায় তিনি তাঁহার অমর কাব্যগুলি রচনা করেন। বাংলা দেশে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সীতারাম দাস নামে এক কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি কেমন করিয়া দেবতার কৃপায় ধর্ম্মমঙ্গল রচনায় প্রবৃত্ত হন তাহাই বলিতেছি। বাংলা সাহিত্যে ধর্ম্মমঙ্গলের বিশেষ একটি স্থান আছে; বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইতে হইলে এ বইখানিকে বাদ দেওয়া যায় না। কবি সীতারাম দাস ধর্ম্মমঙ্গলের প্রথমেই নিজের পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিতেছি সবই তাঁহার রচনা হইতে সংগৃহীত।

সীতারাম দাসের অবস্থান কালে বাংলা দেশে মোগলের উপদ্রব সুরু হইয়াছিল। মোগলের উপদ্রব সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে। কাহারও বাড়ীঘর নিরাপদ নহে, সীতারামের বাড়ীঘরও লুঠেরা লোড়াইয়া দিয়াছে। নূতন করিয়া বাড়ী নির্ম্মাণের প্রয়োজন; কবির গুরু তাঁহাকে কামকুড়ির বন হইতে কাঠ আনিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। সকাল বেলা, কমলার মাঠে সবে মাত্র সূর্য্য উঠিতেছে; কবি দামিন্যার ঘাটে তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুইয়া বনের দিকে রওনা হইলেন।

বেলা প্রায় দুই দণ্ডের সময় সীতারাম বনে পৌঁছিলেন। কবির তামাকের পিপাসা উপস্থিত, তিনি খানিকটা অগ্রসর হইয়া এক চৌকীতে তামাক খাইতে বসিয়াছেন, এমন সময় একজন লোক ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে যাইতে নিষেধ করিল, কেন না যাহারা সে পথে যাইতেছে তাহাদের সকলকে না কি লস্করেরা গ্রেপ্তার করিতেছে। কবির খুব ভয় হইল, এ দিকে অন্য পথও তিনি জানেন না, অগত্যা সাহসে ভর করিয়া তিনি একটি বনে প্রবেশ করিলেন। রাস্তামেটের নিকটে এক ইরাকী ঘোড়া দেখিয়া তিনি একটি পুকুরের ধার দিয়া পলায়ন করিলেন। বনের মধ্যে হরিণ-হরিণী নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে, বাতাসে কুরচিফুল ঝরিয়া পড়িতেছে, কোথাও কৃষ্ণসার মৃগ-মৃগী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কোথাও ঘন বন গাঢ় ছায়া রচনা করিয়াছে, কোথাও বা বনের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যের আলো দেখা যাইতেছে!

হঠাৎ ঘোড়ার ক্ষুরের মত মেঘের ডাক শুনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ঝড় উঠিল, আকাশ মেঘে ঢাকিয়া গেল। কবি পথ হারাইয়া অস্থির ভাবে ঘুরিতে লাগিলেন এবং ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে এক সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কবির মন আনন্দে ভরিয়া গেল, তিনি সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, কবি কোথায় যাইবেন। কবি বলিলেন, তিনি কাঠ আনিবার জন্য শেওড়াবুনি যাইতেছেন। হোগপুকুরের পথ জানিতে চাহিলে সন্ন্যাসী কবিকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন; দুই জনে কথা বলিতে বলিতে যাইবেন সন্ন্যাসী এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

কিছু দূর যাইয়া কবি সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোথায় যাইবেন। সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, তিনি বিষ্ণুপুর যাইবেন। কবির সঙ্গে তাঁহার না কি প্রয়োজন আছে তাই তিনি সুখসাগর দিয়া ঘুরিয়া কবিকে খুঁজিয়া আসিয়াছেন। একথা শুনিয়া কবির খুব ভয় হইল। তাঁহার সঙ্গে সন্ন্যাসীর আবার প্রয়োজন কি! তিনি সভয়ে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা

করিলেন, সন্ন্যাসীর কি প্রয়োজন। সন্ন্যাসী স্বয়ং ধর্ম; কবির নিকট সেই পরিচয় দিয়া তিনি কবিকে 'ধর্মমঙ্গল' রচনা করিতে আদেশ দিলেন।

কবি মূর্খ, সুতরাং কি করিয়া তিনি ধর্মমঙ্গল রচনা করিবেন জিজ্ঞাসা করায় সন্ন্যাসী কবিকে বিশেষ ভরসা দিলেন এবং আশীর্বাদ-স্বরূপ কুরচি ফুল কবির হাতে দিলেন। সন্ন্যাসী যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছেন এমন সময় কবির পরকালের ভয় হইল; সন্ন্যাসী তাঁহাকে অভয় দিলেন, মৃত্যুর পরে তিনি ধর্মের পদ লাভ করিবেন।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন, তখন দুর্যোগ কাটিয়া গিয়াছে। কবি বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন, বাড়ী পৌঁছিতে তাঁহার সন্ধ্যা হইল। মা ভাত বাড়িয়া দিয়াছেন, কিন্তু খাওয়া শেষ না হইতেই তাঁহার কম্প দিয়া জ্বর আসিল। কবি তাড়াতাড়ি উঠিয়া গায়ে কাপড় দিলেন।

সে রাত্রে চতুর্ভুজরূপে উঠিয়া কবি স্বপ্ন দেখিলেন পদ্মলক্ষ্মীদেবী তাঁহার শিয়রে বসিয়া তাঁহাকে ধর্মের গান রচনা করিতে বলিতেছেন; কি ভাবে লিখিতে হইবে সে কথাও দেবী বলিয়া দিলেন। কবি তাড়াতাড়ি উঠিয়া গান রচনা করিতে বসিলেন। শরীর মন দুই-ই অসুস্থ, কাজেই বেশী-ক্ষণ লেখা হইল না। ইহার পরে কবি মহা বিপদে পড়িলেন, একদিকে দেবতার আদেশ, আর এক দিকে তাঁহার মন খুব চঞ্চল। ঘরে থাকা তাঁহার আর চলিল না, বাউল বৈষ্ণবের মত তিনি এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ঈশান গ্রামে নারায়ণ পণ্ডিত কবিকে বিশেষ যত্ন করিয়া নিজের ঘরে রাখিলেন। ধর্মঠাকুর নারায়ণ পণ্ডিতকে স্বপ্নে কবির কথা জানাইলেন এবং আদেশ দিলেন তিনিও যেন কবিকে ধর্মমঙ্গলের গান রচনায় সহায়তা করেন। নারায়ণ পণ্ডিতের সহায়তায় ধর্মঠাকুরের মন্দিরে বসিয়া সীতারাম দাস ধর্মমঙ্গলের প্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলেন।

## সভ্যতার কাহিনী

পৃথিবীর বয়স তিনশো কোটি বৎসর। বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ ইহাই নির্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা স্বীকার করেন, এমন অনেক নক্ষত্র আছে যাহাদের বয়স পৃথিবীর অপেক্ষা হাজার হাজার গুণ বেশী। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে পৃথিবীতে প্রাণের সাড়া জাগিয়াছে মাত্র একশো কোটি বৎসর হইল, ইহার আগে কোন জীব বা উদ্ভিদ্ দেখা দেয় নাই।

পৃথিবীতে প্রথম কি ভাবে প্রাণীর সৃষ্টি হইল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যে সকল অবস্থার ফলে প্রথম প্রাণী জন্মলাভ করিল তাহা যেমন জটিল তেমন সূক্ষ্ম। পৃথিবীর তাপ তখন যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা কয়েক ডিগ্রী কম বা বেশী হইলে কিংবা আলো ও জলের পরিমাণের তারতম্য ঘটিলে প্রথম প্রাণীটি কখনই বাঁচিতে পারিত না। জীব বা উদ্ভিদ্-জগতের মূলে প্রধান যে উপাদানটি রহিয়াছে ইহাদের মতে তাহা হইতেছে কার্বন বা অঙ্গার; এই পদার্থটি না থাকিলে কোন গাছপালা দেখা দিত না, বা আমরাও পৃথিবীতে আসিতাম না। এই বিরাট বিশ্বের অন্য কোথাও প্রাণী আছে কি না তাহা আমরা জানি না। প্রাণী বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার জীবন-ধারণ নির্ভর করে আমাদের জীবন-ধারণের অনুরূপ অবস্থার উপর।

হাজার হাজার বৎসর আগে প্রথম প্রাণী দেখা দিয়াছিল ঈষৎ উত্তপ্ত সমুদ্রের ধারে ধারে। তাহার পর হইতে কত রকমের জীব-জন্তু পশু-পক্ষী আমাদের পৃথিবীতে আসিয়াছে ও লুপ্ত হইয়াছে তাহার হিসাব কেহই দিতে পারে না। এখানে সেখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, নানা জীবজন্তুর ভিতর দিয়া একটি অভিব্যক্তির ধারা চলিয়া আসিয়াছে। এই অভিব্যক্তির ধারার মাঝে, কেমন করিয়া জানি না, আমরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

পৃথিবীতে মানুষ দেখা দিয়াছে মাত্র পঞ্চাশ হাজার বৎসর হইল। পৃথিবীর প্রথম মানুষ যে কত অসহায় ছিল তাহা না বলিলেও চলে। আহার্য উৎপন্ন করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না, হাতের কাছে যাহা পাওয়া যাইত, তাহাই খাইয়া কোনমতে তাহাকে জীবন-ধারণ করিতে হইত; কখনও অনাহারে, কখনও বা অত্যধিক আহারে তাহার মৃত্যু হইত।

আধুনিক মতে, মাত্র দশ হাজার হইতে বিশ হাজার বৎসর হইল মানুষ চাষ করিতেছে ও নিজের আহার্য উৎপন্ন করিতেছে এবং আবিসিনিয়ার পাহাড়-পর্বতে মানুষের প্রথম কৃষিকার্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। কৃষিকার্যের সঙ্গে সঙ্গেই সভ্যতার বিকাশ শুরু হয় কিন্তু প্রথম সভ্যতা দেখা দেয় মিশরে, তাহার পরে মেসোপটেমিয়াতে; ক্রমশঃ নানা দেশে সভ্যতা গড়িয়া উঠিতে থাকে। ইহা সত্য কি না সে বিচার করিবার পূর্বে বর্তমানে যাহা স্বীকৃত মত, তাহা জানিবার প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যেই "সভ্যতার কাহিনী"র অবতারণা।

কৃষিকার্য শিখিবার আগে মানুষ যাযাবর জীবন যাপন করিত; কৃষিকার্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা একত্র বাস করিতে থাকে এবং তাহাদের সংখ্যাও বাড়িতে থাকে। খৃষ্ট-পূর্ব

দশ হাজার হইতে পাঁচ হাজার বৎসরের মধ্যে মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে। স্বীকৃত হইতেছে যে, মানব-সভ্যতার বয়স অনুমান বার হাজার বৎসর। পৃথিবীর মানুষের প্রথম আবির্ভাবের সময় হইতে বিচার করিলে এই বার হাজার বৎসর এমন কিছুই নহে, অথচ ইহার ভিতরেও তাহার কতই না ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া হতাশ হইবার কিছু নাই। কেন না তাহার সামনে এখনও বিরাট অনাগত কাল রহিয়াছে, ইচ্ছা করিলে নূতন করিয়া অনেক কাজ সে এখনও করিতে পারিবে।

এই বিষয়ে পরবর্তী আলোচনার জন্য ইহা সূচনা মাত্র।

---

# জন্মাষ্টমী

—শ্রীশিবপদ চট্টোপাধ্যায়

আধিকার প্রমত্ত কংসরাজ
রাজ্যে হানে বাজ,
দেবতারে বান্ধিল কারায়,
সুকীর্তি নাশায়।
অনলের নিষ্প্রভে প্রভঞ্জন-আকুল শর্ব্বরী তলে,
কংসনিসূদন কৃষ্ণ ভারত বালার্ক জন্মিল যে ছলে।
কারাগারে সে একেলা মুক্তির স্বপন বুনিছে আগল,
বসুদেব কৃষ্ণের জনক হইল বিহ্বল,…উতল,…উতল!
অন্ধকার, অন্ধকারবিময় যমুনা, কড় বহে যায়,
উন্মাদ সে প্রলয়-নিশীথে বিশ্বদীপ বক্ষে তায়,
কোথা পথ? কোথা স্বাধীনতা! শিশু যদি নাহি বাঁচে আজ,
দেবতার দেশ সৃষ্টি, কৃষ্টির গরিমা, ডুবে যাবে অন্ধকার মাঝে।
চির-অন্ধকার হতে আলো আসে,
সে আলোক প্রদীপ আড়াতে,
মানুষের দেহঘটে অজানা দেবতা
বেঁধেছে তাহার তরী, আজ রাতে…
ঐ হের ভবিষ্য অঙ্গনে, কদম্বের বনে
বাজে বাঁশী মনভাঙানিয়া,
চকিতা চঞ্চলা আর উদাসিনী,
গোপী ছুটে, সুখভাগানিয়া।
ঐ হের কাজলী তাহার, রাখে পায়ে
শৌর্য্যে ভরা কার্ম্মুক বিপুল,
নীল আঁখি ধীরে কর তুলি, করে আশীর্ব্বাদ,
নাহি তার ভুল,…নাহি কোন ভুল।
ভারতের কলকোলাহল, কুরুক্ষেত্র,
সে মহাসমর দাবানলে,
মোহাবিষ্ট অর্জ্জুনের শঙ্কিত হৃদয়ে,
বিশ্বরূপ প্রকাশিয়া ছলে
তারহেরে অজ্ঞানের আঁধি হতে
কে করিল মুক্ত নিরন্তর?
কৃষ্ণ জ্ঞান-কল্প, (জীবন তিমির)
আর রাধা প্রেম ছল্ ছল্।
বসন্তের লীলাচঞ্চলতা নাহি আজ রাতে
ঝড়, ঝড়, যমুনার হিল্লোলিত তুফানের সাথে,
হায় কি গো, পাবে শিশু কূল!…আঁধার এপারে,
ওপারে দুর্ভেদ্য অন্ধকার, বসুদেব ধীরে চলে রাতে…
প্রলয়ের ক্রন্দন এ নয়, নহে হতাশার আর্ত্তিস্বর,
অট্টহাসি-প্রলয়-প্রতীক
ভবিষ্যের কী বিরাট লাগি! ত্রিভুবন কাঁপে থর থর।
মূর্খ কংস ভবে অজ্ঞানেতে
কৃষ্ণ ধ্বংসে পাবে পরিত্রাণ,
বিধাতা হাসেন অন্তরালে,
বাঁচে শিশু, ভূ-ভারত মান।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, দেবতা নিশ্চয়
কে পারে তাহারে নাশিতে?
এপারে, ওপারে ঝড় যমুনার
বক্ষে লয়ে দেবশিশু,
চলে বসুদেব, কাঁপিতে কাঁপিতে।
বক্ষে তাঁর আশার প্রদীপ
এ-ঘোর তিমির রাতি হবে অবসান,
জন্মের বন্ধন সাথে মুক্তির এ অপূর্ব্ব স্বপন,
ভবিষ্য কাহিনীলোকে লভিল যে স্থান।
মৃত্যুরে করিতে বাদ
অবতার নামে ধরাধামে,
অষ্টমী তিথির রাত্রি
বসুন্ধরা জাগে কৃষ্ণ-নামে।

---

# প্যালারামের টোট্‌কা

—শ্রীবীরাচার্য্য

রবিবার কিম্বা অন্য কি একটা ছুটির দিন হইবে। দ্বিপ্রাহরিক গুরুভোজনের পর খবরের কাগজ খানা হাতে লইয়া একটু দিবানিদ্রার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় ঘরে প্যালারাম আসিয়া হাজির। প্যালারামকে বহুদিন দেখি নাই; জানিতাম বিনা হুজুগে সে থাকিতে পারে না। সম্ভবতঃ পৃথিবীর কোথাও কোন একটা আধিদৈবিক দুর্ঘটনার প্রতিকার কল্পে 'কাণ্ড' সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্যালারাম ইস্কুলকে গোলামখানা বোধে পড়াশুনায় ইতি করিয়া সেই যে ডুব মারিয়াছিল, তারপর বহুদিন আর তাহাকে দেখি নাই। যখন দেখিলাম তখন সে রীতিমত নেতা বনিয়া গিয়াছে অর্থাৎ গায়ে বেশ চর্ব্বির সঞ্চার হইয়াছে, মাথায় টাক পড়িয়া আসিতেছে, কথা উপদেশ-বহুল এবং সঙ্গে গোটাকতক চেলাচামুণ্ডারও অভাব নাই। মোটের উপর বেশভূষায়, কথাবার্ত্তায় বা আচার-ব্যবহারে পুরাপুরি নেতা বলিতে যাহা বুঝি তাহাই হইয়া পড়িয়াছে সে।

প্যালারাম সেবার লবণ আইন অমান্য করিতে শিষ্যবর্গ-সমেত এখানে আসিয়া হাজির হইল। লবণ তো সাধারণতঃ সমুদ্রের ধারেই প্রস্তুত হয় জানিতাম। প্যালারামকে বলিতেই সে হাসিয়া উত্তর করিল, "দাদা, লবণটা তো আসলে কিছুই নয়, আইনভঙ্গটাই আসল, তা সে পুকুরেই হোক আর নদীতেই হোক।" হইবেও বা, লবণ চিরকাল কিনিয়াই খাইয়াছি, আইনের খবর এত জানিব কিরূপে? সমুদ্রোপকূলের গ্রামগুলায় যে সময় মহামারী কাণ্ড চলিতেছে, প্যালারাম তখন উগ্র বক্তৃতা ছড়াইয়া শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় নদীর জল ঘোলা করা আরম্ভ করিয়াছে। পরে শুনিলাম উহাদের হৈ-চৈ এ অতিষ্ঠ হইয়া থানা পুলিস হইতে না কি জানাইয়া দেওয়া হয় যে, জনসাধারণের স্নানপানের জল এই ভাবে নষ্ট করিতে থাকিলে তাহাদের পৃষ্ঠদেশ তৈল-পক্ক বংশযষ্টিদ্বারা তাড়িত হইবার গুরুতর সম্ভাবনা আছে। প্যালারাম বুদ্ধিমান্। অনতিবিলম্বেই স্বীয় পৃষ্ঠদেশ স্থানান্তরে প্রেরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে তাহার দেরী হয় নাই। প্যালারামকে তাহার পর হইতে আর বহুদিন দেখি নাই।

অকস্মাৎ আজ তাহার উপস্থিতিতে মনে মনে শঙ্কিত হইলাম। ভূমিকা না করিয়াই সে করিল, "তোমার সঙ্গে গোটাকতক দারী দরকারী কথা আছে, দাদা। এক গ্লাস জল দাও তো খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে ধীরে সুস্থে আলোচনা করা যাক।"

আমার সঙ্গে আবার প্যালারামের কি দরকারী কথা থাকিতে পারে? আমার চাকরী ছাড়ার হুজুগ লইয়া আসিল না কি!

জলপান শেষ করিয়া সে একখানি জাপানী-বস্ত্রের রুমালে মুখটা বেশ করিয়া মুছিয়া লইল, তার পর অত্যন্ত বিজ্ঞের মত প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা দাদা, তুমি ত কেমিষ্ট্রিতে এম. এ., না?"

"হাঁ, কেন বল দেখি?" প্যালারামের আলোচনাটা কোন্ মুখে ঘুরিবে বুঝিতে না পারিয়া ক্রমশঃই যেন শঙ্কিত হইতেছি।

"তুমি দ্রব্যগুণ বিশ্বাস কর তো?"

"তা' করি বৈ কি। দ্রব্য থাকলেই তার একটা গুণ তো থাকবেই। এর জন্যে আর কেমিষ্ট্রি পড়তে হবে কেন?"

"তা' বলছি নে। মানে, অ্যাট্রাকশন ও রিপালশন বলে এক জাতীয় গুণ তো দেখা যায় কোন কোন জিনিষের মধ্যে। অর্থাৎ বাংলায় যাকে আকর্ষণ-বিকর্ষণ বলে আর কি।"

কথাটা বাংলায় না বলিলেও হয় তো বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু প্যালারাম নেতা বনিয়া গিয়াছে কি না, তাই সব কথাই এখন তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বলা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, কারণ, শুনিয়াছি নিজেকে ছাড়া আর সকলকেই অজ্ঞ মনে করা না কি নেতাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

মনে মনে হাসিয়া উত্তর করিলাম, "সে তো বটেই ভাই। যেমন ধর না, নেতাদের নামের প্রতি অ্যাট্রাকশন, কাজের প্রতি রিপালশন, সাধারণের কাজে কাজের প্রতি অ্যাট্রাকশন,

দায়িত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার আটোকেশন, পালন করার—"

"আঃ ও সব কথা হচ্ছে না। এমন কতকগুলো জিনিষ আছে তো, যাদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের শক্তি দেখা যায়—"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এই স্বাভাবিক শক্তিটাকে যে দেশের কাজে লাগাতে পারে, সেই তো সত্যিকারের নেতা! যেমন ধর না, কোন একটা কাজে ভলেন্টিয়ারের দল তৈরী করতে হলে কি হাঙ্গামাই পোহাতে হয়, অথচ সুভাষবাবুর আপোষ-বিরোধী সভার কাজ এত বাধা সত্ত্বেও কত সহজে হয়ে গেল। এই তো হ'চ্ছে নেতার বুদ্ধির বাহাদুরী। প্রথমে দু' একটা দল লেডি-ভলেন্টিয়ার তৈরী করে দাও, তার পর দেখবে হু হু করে পুরুষ-ভলেন্টিয়ারের দল অম্নিই কেমন অর্গ্যানাইজড্ হয়ে যাচ্ছে। বলা নেই, কহা নেই, ডাকা-হাঙ্গামা নেই, অটোমেটিক্যালি বিরাট বাহিনী তৈরী হয়ে যাবে। যুদ্ধের সেনা-সংগ্রহে এই কথাটা যে এখনো কাজে লাগাচ্ছে না কেন তাই ভাবি। আমাদের ক্যাশনাল মিলিশিয়া তৈরী করবার সময় নেতারা নিশ্চয়ই এ বিষয়ে অবহিত হবেন, কি বল প্যালারাম?"

দেখিলাম প্যালারাম চটিয়াছে। রুক্ষভাবে কহিল, "নাঃ, এ রকম কথায় কথায় ঠাট্টা-তামাসা কর, তা হলে আমি এখন উঠি। ভাবলাম, একটা দরকারী আলোচনা করব—তা দেখছি আর হ'ল না।"

"আরে হবে না কেন? বস বস। ব্যাপারটা কি আগে খুলেই বল, তারপর আমার বিদ্যাবুদ্ধিতে যা' কুলোয় আলোচনা করা যাবে'খন।"

প্যালারাম ঠাণ্ডা হইয়া কহিল, "মানে, এই হিন্দু-মুসলমানের মিলন সমস্যাটার কথা বলছি। ভারতবর্ষে এর চেয়ে বড় সমস্যা তো আর নেই। এটার কোন সমাধান না হলে স্বাধীনতাই বল আর যা-ই বল, সবই হ'ল গিয়ে অম্নে ঘি ঢালা।"

"উঁহু, অম্নে ঘি ঢালা কথাটা ঠিক হ'ল না প্যালারাম, বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতি বলতে পার।"

"আচ্ছা, না হয় তাই হল। কিন্তু এমন কেন হয় বলতে পার? চিন্তা করেছ কখনও এ বিষয়ে?"

"সময় পাইনি ভাই। নিজের ঝঞ্ঝাটেই বাঁচিনে, তাছাড়া ওসব ভাববার ভার তো আমাদের উপর নেই।"

প্যালারাম বাধা দিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "তোমরাই তো ভাববে, তোমাদেরই তো ভাবিত্ব। তোমরা হ'লে গিয়ে সাহেবটি, তোমরা ছাড়া আর কারো কি এর সমাধান করবার ক্ষমতা আছে?"

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সাহেবের সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ প্যালারাম! হিন্দু আর মুসলমান কি অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন যে, এক বোতলে পুরে একটা ইলেকট্রিক স্পার্ক ঝাড়লেই সমস্ত জল হয়ে যাবে?"

"—ঠিক ধরেছ দাদা। এমনি করেই বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে মিলনের পথ আবিষ্কার করতে হবে ভেতর থেকে। এত কাল ধরে বাইরের দিক থেকে যতবার মেলাবার চেষ্টা হয়েছে ততবারই সবাই ব্যর্থ হয়েছেন, কারণ রোগের গোড়া না মেরে বাইরের দিক থেকে যতই ঝোড়া-তালি দাও, কোন কাজই হবে না তাতে। উল্টে ভিতরে ভিতরে রোগ আরো বাড়তে থাকবে। আমি একেবারে মানুষের মনের ভিতর থেকে এই জাতিগত বিরোধের মূল কারণটা উচ্ছেদ করবার কল্পী বার করেছি।"

"বল কি প্যালারাম, কোন মন্তর-তন্তর না কি?"

"উঁহু, একেবারে বৈজ্ঞানিক রিসার্চ, ড্রব্যগুণের ব্যাপার আর কি। দেখ, ভারতবর্ষে হিন্দু আর মুসলমান বলে দুটো জাত পাশাপাশি বাস করছে একই দেশে, একই ভাবে। অথচ এত বুঝানো বা বক্তৃতা সত্ত্বেও একজন আর একজনকে দেখলেই মনে একটা বৈরীভাব জেগে ওঠে কি না?"

কথাটা যদিও আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি না, তথাপি তর্কের খাতিরে স্বীকার করিয়া কহিলাম, "আচ্ছা, না হয় তাই হ'ল, তা'তে কি?"

"তাই বলছি। এই স্বাভাবিক বৈরীভাব বা বিপাকপ্রণ কেন হয়? অহি-নকুল কিংবা বাঘ-আর-গরু এদের স্বাভাবিক বৈরীভাব কি কিছুতেই যায়?"

"যায় বই কি প্যালারাম। সুদীর্ঘ স্বার্থের পাল্লায় পড়ে বাঘ আর গরুতে একঘাটে জল খাওয়ার কথা শোন নি কখনও? বিশ্বাস না হয় কর্পোরেশন ষ্ট্রীটের মস্ত বড় পাল বাড়ীটার ভিতরে গিয়ে একদিন দেখে এস—বাঘে গরুতে

কেমন সুন্দর এক ভাবনার মুখ দিয়ে খাবার চেষ্টা। কিসের ধারে জান ত? কাউন্সিল হাউসেও—"

প্যালারাম চটিয়া কহিল, "ওসব হেঁয়ালী ছেড়ে দাও, এর কারণ আছে। আসল কথা জীবজগতের মধ্যে এই যে বৈরীভাব, এ সবই হচ্ছে ম্যাগনেটিজমের ব্যাপার। প্রত্যেক জীবেরই একটা নিজস্ব ম্যাগনেটিজম আছে কি না, আর সমজাতীয় ম্যাগনেটিজম একসঙ্গে হলেই যে রিপেল অর্থাৎ বিকর্ষণ করবে সে তো জানোই।"

ম্যাগনেটিজম জানিলেও এতটা জানিতাম না। মুগ্ধ হইয়া প্যালারামের বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা শুনিতেছি।

পরমোৎসাহে প্যালারাম কহিতে লাগিল, "গবেষণা করে পেয়েছি যে, ভারতের হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের শরীরেই একজাতীয় ম্যাগনেটিজম বিদ্যমান। যদি কোন বৃহত্তর ম্যাগনেটের দ্বারা তাড়িত করে কিম্বা কোন দ্রব্যগুণে কোন একটা জাতির ম্যাগনেটিজম উল্টে দেওয়া যায় তবে দেখবে প্রাণে প্রাণে কেমন মিল হয়ে যায় এই দুই জাতির।"

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আচ্ছা, প্যালারাম, পুলিসের বেটনটা একবার পরীক্ষা করে দেখ তো। ওতে বোধ হয় খুব চোরালো রকমের কোন একটা ম্যাগনেটিজম আছে।"

প্যালারাম বোকা নহে। একটু হাসিয়া বলিল, "ঠাট্টা ক'রো না দাদা, ভেবে দেখ দেখি সত্যি সত্যি বৈজ্ঞানিক ভাবে এ' সম্ভব কি না? আমি ত রিসার্চ ক'রে এই ম্যাগনেটিজম পাল্টে দেবার একটা পৃথক্ উপায় বে'র করেছি। পরীক্ষা করে দেখ কি আশ্চর্য্য ফল হয় এর।"

প্যালারাম পকেট হইতে একটা ছোট্ট মোড়ক বাহির করিল, একখানা পুরাতন 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পত্রিকার কাগজ দিয়া মোড়কটি জড়ান।

মোড়কটি খুলিতেই তাহার ভিতর হইতে কতকগুলি কালো কালো বড়ি বাহির হইল। প্যালারাম কহিল, "এই যে বড়িগুলো দেখছ দাদা, এ' একেবারে ম্যাগনেটিক মাইন বললেই হয়।"

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিসের তৈরী এগুলো প্যালারাম?"

"ওঃ, সে অনেক রকম জিনিষ। রিসার্চ করে পাওয়া গেল, বহু বৎসর আগে পলাশীর যুদ্ধের আমলে মিরজাফর আর জগৎ শেঠ উমিচাঁদে যে পাক্কা হয় তাতেই জানা যায়, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কোর্স টা তখন কত বেশী ছিল। হলওয়েল মনুমেন্টের মধ্যে সেই আমলের ম্যাগনেটিক কোর্স অনেকখানি রয়ে গিয়েছে দেখলাম। ওরি সামান্য একটু টুকরো নিয়ে তুর্কিস্থানের আসল আঙ্গুরের রস আর খাঁটি বাংলার দেশী গব্যিকা ঘি মিশিয়ে বেটে এই বড়িগুলো তৈরী হয়েছে। সকাল সন্ধ্যে দুটো করে বড়ি ছাগলের দুধ দিয়ে বেটে খেয়ে নিলে দেখবে, দু'দিনে মনের ভাব পাল্টে গিয়েছে। আপন-পর বলে আর কেউ নেই, সব 'ভাই বেরাদার' আর কি। তা'ছাড়া হলওয়েল মনুমেন্টের টুকরার প্রতি কণায় ওই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পাক্কের স্মৃতি প্রতি নেতার প্রাণে মিলনের একটা দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলবে। ভাবছি 'কোয়ালিশনী ম্যাগনেটিক মাইন' বলে এর পেটেন্ট নেব, কি বল দাদা?"

প্যালারামের কথা শুনিয়া আমি তো অবাক্। সন্দিগ্ধের মত কহিলাম, "তা ত হ'ল, কিন্তু দু' একটা কেসে পরীক্ষা করে দেখলে হ'ত না আগে, প্যালারাম?"

প্যালারাম ও হাসিয়াই অস্থির। কহিল, "কি যে বল দাদা? সে কি আর বাকী আছে। গত কর্পোরেশন ইলেকশনের আগে হিন্দু মহাসভার কর্ত্তাদের আর ফরোয়ার্ড ব্লকের সুভাষ বাবুকে কয়েক ডোজ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। মহাসভার শ্যামাপ্রসাদ খেলেন না বিশ্বাস করে, খেলেন গিয়ে বি-সি. চাটুজ্জে মশাই আর ফলটা কি রকম হাতে হাতে ফলেছে তা তো দেখতেই পেলে। সুভাষ বাবু তো এত খুসী হয়েছেন যে, মহাজাতি-সদনের মধ্যে খানিকটে জায়গায় এর কারখানাই করে দেবেন বলেছেন।"

ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেই জন্যেই কি হলওয়েল মনুমেন্ট ভাঙ্গার প্রস্তাব?"

প্যালারাম চোখ টিপিয়া চুপি চুপি বলিল, "ঠিক ধরেছ দাদা, ব'ল না যেন কাউকে। ম্যাগ্নেটাইজিং ফেলে বড়ি তৈরী হবে কি না তাইতে হলওয়েল থামের সমস্ত পাথরটাই চাই। এটা হচ্ছে খুব গোপন কথা, কেউ জানে না। খবরদার, কাউকে যেন বল না কিন্তু। আমরা এখন হলওয়েল মনুমেন্টে জোর সত্যাগ্রহ চালাব কি না।"

অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। অবাক্ হইয়া ভাবিতেছি, সত্যই তো প্যালারাম আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটাইয়াছে। বটুকার অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ভাবিতে ভাবিতে সর্ব্ব শরীরে কেমন যেন শিহরণ আসিল। অজ্ঞাতে চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত হইয়া পড়িল আর অন্তর্দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ ভারতের সমস্ত চিত্রটা যেন চোখের উপর ফুটিয়া উঠিল।

ভারতে আর যেন দ্বেষ-হিংসা মারামারি খুনোখুনি নাই। পাকিস্থান নাই, হিন্দুস্থান নাই, আত্মপর ভেদজ্ঞান নাই, আমি নাই তুমি নাই, সব একাকার। সমস্ত ভারত জুড়িয়া শুধু একটা বিরাট জলসা বসিয়াছে। আনন্দের স্রোত বহিতেছে। সাবরকর ও জেরাল্ড সাহেব আনন্দে কোলাকুলি করিয়া নাচিতেছেন। গান্ধীজী ও সুভাষ বসু সঙ্গত করিতেছেন। গান্ধীজীর মুখে হরিজনের বাণী আর সুভাষ বসুর কাঁধে কয়োয়ার্ড ব্লকী ঢোল। হক সাহেব আর শ্যামাপ্রসাদ ডুয়েটে গান ধরিয়াছেন, "মেরেছ কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না" ; আর দূরে আমেরী সাহেব আমিয়ের মত বসিয়া বাহবা দিতেছেন আর মাঝে মাঝে ডোমিনিয়ান ষ্ট্যাটাস লেখা একটা খোলের ভিতর হইতে মুঠা মুঠা প্রতিশ্রুতির পয়সা দিতেছেন। আসর বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ দেখি, গান্ধীজীর ছাগলটা পিছনে আমার চুল ধরিয়া টানিতেছে।

চমকাইয়া চাহিয়া দেখি গৃহিণী মাথায় হাত দিয়া ডাকিতেছেন, "ওঠো, বেলা গেল যে। অবেলায় এত নাক ডাকিয়ে ঘুম—"

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দেখি বটিকার মোড়ক সমেত প্যালারাম কখন চলিয়া গিয়াছে।

---

## সংবাদ ও মন্তব্য

### মিঃ হকের বিলম্বে নিদ্রাভঙ্গ

বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মিঃ আবুল কাসেম ফজলল হক্ কিছুদিন আগে বোম্বাই গিয়াছিলেন। সেখানে তখন দ্বাপঞ্চাল প্ল্যানিং কমিটির অধিবেশন হইতেছিল। অধিবেশনের একটি বৈঠকে মিঃ হক্ উপস্থিত ছিলেন। কমিটির চেয়ারম্যান, মিঃ গুহরলাল নেহেরু তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলে তাহার উত্তরে মিঃ হক্ বক্তৃতায় বলিয়া আসিয়াছেন : যে-জাতীয় সমস্যার সমাধানার্থ জাতীয় কমিটি চেষ্টা করিতেছেন, তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা হইতেছে, দেশের লোকদের ব্যক্তিগত দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতীকার-চেষ্টা (human approach)। তিনি দেশের যেখানে গিয়াছেন, সর্ব্বত্র চাষীদের মর্ম্মান্তিক দারিদ্র্য তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে, কেন না, তাহাদের চাষকার্য্য ক্রমশঃ লোকসানজনক হইয়া পড়িতেছে…।

হক্ সাহেব ধরিয়াছেন ঠিক্, একটু বিলম্বে এই যা। তাহাতেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এতদিন পরে দেশের চাষীদের দুঃখ-দুর্দ্দশা যখন তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্টই করিয়াছে এবং যখন তিনি নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহার প্রতীকার হইতেছে দেশের লোকদের ব্যক্তিগত দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতীকার, তখন কি উপায়ে ইহা করিতে হইবে, তাহা না বলিলে "দুষ্ট লোকে"র সন্দেহ হইবে—ইহা তাঁহার জানা নাই। সমস্যার 'হদিস' যখন তাঁহার মিলিয়াছে, তখন তাহার সমাধান-পন্থাও মিলিতে বিলম্ব হওয়ার কথা নহে। ইহা ঠিকই যে, তাঁহার কথা হইতেই প্রমাণ হইতেছে, এতদিন ধরিয়া দেশের কৃষিকার্য্যকে কৃষকের পক্ষে লাভজনক করিবার জন্য সরকার হইতে যে চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাতে অন্ধে ঘি ঢালা হইয়াছে মাত্র। যখন এ-কথা তিনি স্বীকার করিতে সাহসী হইয়াছেন, তখন আমরা আশা করিতেছি, অবশিষ্টাংশ, যে, বিলাতী পন্থায় এ-দেশের চাষের কাজ চলিবে না, ইহাও তিনি স্বীকার করিবেন। অতঃপর তিনি "বসুশ্রী"র পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিতে পারেন, গত পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া আমরা এই বিষয়ে কি লিখিয়া আসিয়াছি।

### কংগ্রেসের জুয়াচুরি

মিঃ জহরলাল নেহেরু মিঃ কজলল হককে অভ্যর্থনা করিতে উঠিয়া কমিটির এই বৈঠকে যাহা বলেন, তাহার সার কথা হইতেছে : জাতীয় কমিটিকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতের চল্লিশ কোটি অধিবাসীর অর্থনৈতিক দুঃখ দূরীকরণই তাঁহাদের লক্ষ্য। তাঁহার বিশ্বাস এই যে, ভারতের সমস্যার সমাধানের সহিত পৃথিবীর সমস্যার সমাধান ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু কমিটির সে সাধ্য নাই, অতএব……

অতএব ভারতের সমস্যার সমাধানকল্পে কমিটি যাহা করিতেছেন, তাহা যে পণ্ডশ্রম হইবে, ইহা বলিতে মিঃ নেহেরু পারেন নাই। পারিলে ভাল হইত। না পারিয়া মিঃ নেহেরু বলিয়াছেন যে, ভারতকেই সমগ্রভাবে দেখিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। তাই বা তাঁহারা করিতে পারিয়াছেন কই? সমস্যা তো ত্রিশ কোটি কৃষকের। মিঃ হক্ বলিতেছেন, দেশের সর্ব্বত্র তিনি দেখিয়াছেন, কৃষকের অবস্থা ক্রমশঃ নিকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে। মিঃ নেহেরু সম্ভবতঃ বলিবেন, স্বাধীনতা পাইলেই মুহূর্ত্তে ইন্দ্রজালের সাহায্যে তাহাদের অবস্থা ভাল হইয়া যাইবে। মিঃ নেহেরুর মনে আছে কি না জানি না, বর্ত্তমান প্রাদেশিক এসেম্বলিসমূহের নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস হইতে যে ইস্তাহারের ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহাতে উল্লেখ ছিল যে, "যে-কার্য্যপদ্ধতিতে কৃষক সমস্যার সমাধান সম্ভব হইতে পারে, ঐ কার্য্য-পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে ইহার পর নির্দ্ধারিত হইবে।" অতঃপর কংগ্রেস নয়টি প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি ঐ কার্য্য-পদ্ধতির কোন নির্দ্ধারণ আমরা দেখি নাই, বরং যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে প্রমাণ পাইয়াছি যে, কংগ্রেসে একটি মাত্র ব্যক্তি নাই যিনি দেশবাসীর সমস্যার কথা আদৌ ভাবিয়াছেন। কেবল মুখে বলিলেই হয় না যে, চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর দুঃখ দূর করিতে হইবে! কংগ্রেসের এই ব্যবহারকে কি জুয়াচুরী বলিতে হইবে না?

### শ্যামাপ্রসাদবাবুর মরা-কান্না

এ দেশের ভাগ্যে মহামারী, বন্যা ইত্যাদি প্রায় যখন নিয়মিত হইয়া আসিতেছিল এবং দেশবাসী বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, "ইহা নিয়তি," তখন হইতে আবার এক নূতন উৎপাতের সৃষ্টি হইয়াছে—যেমন প্রাদেশিক আইন-সভায় আনীত বিল ইত্যাদি। এগুলিও বর্ত্তমানে প্রায় মহামারী ও বন্যার সমকক্ষ মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইতে চলিয়াছে। সংপ্রতি বাংলা দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের জন্য একটি আইন হক্ সাহেবের দল আনয়ন করিয়াছেন—তাহার জন্য দেশবাসীর সুবিধা কি অসুবিধা হইবে, সে আলোচনা করা দূরে থাকুক, ধারণা করিবার শক্তি কিংবা সামর্থ্যও,—বলাই বাহুল্য, দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের, কাহারও নাই। কিন্তু দলের পাণ্ডারা ভয় পাইতেছেন, ইহাতে তাঁহাদের কাহারও কাহারও দল-প্রাধান্য নষ্ট হইবে।

সুতরাং ইহার বিরুদ্ধে 'এজিটেশন' শুরু হইয়াছে। এবং সে এজিটেশন আরম্ভ করিয়াছেন অবশ্য ভট্টর মিঃ শ্যামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে ( ২৪শে আগষ্ট ) কলিকাতায় এক সভায় তিনি ইহার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া জানাইয়াছেন যে, রাজনীতি লইয়া তাঁহাদের মধ্যে দলাদলি থাকিলেও শিক্ষা সম্বন্ধে কোন দলাদলি নাই। সুতরাং শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে—হক্ সরকার আনীত এই বিলের বিপক্ষতা করিতে তিনি দেশের সকল অধিবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন —"তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ( for the sake of very existence)।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর হইতে এযাবৎ দেশবাসীর অস্তিত্ব-রক্ষার কোন সুবিধা যদি হইয়া থাকিত, তবে ভট্টর মুখোপাধ্যায় ইহা বলিলেও বলিতে পারিতেন। কিন্তু আমরা শ্যামাপ্রসাদবাবুকে বুকে হাত দিয়া ভাবিয়া দেখিতে বলি যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরূপ ভাবে শিক্ষা দান করা হয়, তাহাতে অস্তিত্ব-রক্ষার সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধা অধিক কি না? তাঁহাকে বেশী দূর যাইতে হইবে না, তিনি আজ হক্ সাহেবের যে কোয়ালিশনী দলকে দেশের পরম শত্রু মনে করিতেছেন—তাঁহাদের অধিকাংশই কি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রাপ্ত নহেন? দলাদলি মিটাইয়া তিনি যে-শিক্ষানীতিকে বাঁচাইবার জন্য দেশবাসীকে অনুরোধ করিতেছেন—সেই শিক্ষার মধ্যেই কি দলাদলির বীজ অঙ্কুরিত নাই? এ কথা আমরা কি বিবেচনায় বলিতেছি, তাহা বুঝিবার সামর্থ্য ও শক্তি তাঁহার নাই। কিন্তু আত্ম-বিশ্লেষণ

করিয়া তিনি দেখিতে পাইবেন—তাঁহার নিজেরই মনে কত দল কত-রূপে প্রাচীর তুলিয়া বসিয়া আছে। লজ্জা করে না তাঁহার যে, হিন্দুসভার দলাদলিকে দেশের বুকে ঘুমাইত করিয়া একদিকে দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন, আবার অন্যদিকে দলাদলি মিটাইবার জন্য তিনি দেশবাসীকে ডাকিতেছেন!

হক্ সাহেবের দলের আনীত বিলে তাঁহাকে কোথায় আঘাত করিয়াছে, তাহা আমরাও যেমন জানি, তেমনই দেশবাসীও জানে। আমরা হক্ সাহেবের বিলের সম্পূর্ণ সমর্থন করিব না, কিন্তু তবু মনের ভাব হিসাবে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মৌরসীপাট্টা একবার হাত বদলাইলে দেশবাসীর সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে এমন মনে করিতেও পারি না। শ্যামাপ্রসাদ বাবুর কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইতে পারে। কাওজ্ঞান থাকিলে অবশ্য সে অসুবিধার হাত হইতে তিনি আজিও বাঁচিতে পারেন। নিজে তাহার উপায় না বুঝিতে পারিলে, আমরা তাঁহাকে সে উপায় বাৎলাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি।

## "বিপজ্জনক" মিঃ শরৎ সি. বসু

বাঙ্গালা দেশের হিন্দু-নেতা কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্ব পরিধারণের অন্যতম দাওয়া মিঃ শরৎ সি. বসু ঐ একই জন-সভাতে জোর গলায় বলিয়াছেন—যাহারা বলে দেশের সাধারণ লোক বর্ত্তমানে বিপজ্জনক ভাবে প্রভাবিত হইয়াছে, তাহাদিগকে আমি বলিতেছি, আমি চাই এই বিপজ্জনক ভাব, বিপ্লবী মনোবৃত্তি, জাতির স্বাধীনতা। দেশের ছেলেরা বিপজ্জনক ভাবে চিন্তা করুক্, বিপজ্জনক স্বপ্ন দেখুক, বিপজ্জনক কার্য্য করুক্…।

বসু বসুকে আমরা ভাবিয়া দেখিতে বলি—অবশ্য বলিলেও তিনি বুঝিবেন কি?—এই কথার তাৎপর্য্য কি। বিপজ্জনক কার্য্য অর্থে চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, নারীহরণ, দাঙ্গা ইত্যাদি যদি দেশের ছেলে-মেয়েরা করিয়া বেড়ায়, তাহার জন্য খুশী হইবার খুব বিশেষ কিছু আছে বলিয়া কি সত্যই তিনি মনে করেন না কি। না, ভাবিতেছেন বিপজ্জনক ভাবে কেবল সেই কার্য্য যাহা তাঁহার দল দ্বারা অনুমোদিত হইবে। যেমন, হলওয়েল গুপ্ত অপসরণ ইত্যাদি। "বিপজ্জনক চিন্তা, স্বপ্ন দেখা এবং কার্য্য (dangerously think, dream and act)" কথাগুলি ভয়াবহ; জানি না ইহার আর কোন স্বতন্ত্র অর্থ হইতে পারে কি না। কিন্তু আমাদের ভারতীয় চিত্তের পক্ষে "danger (বিপদ)" কথাটির সহিত উপরে যে-সব বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আর যে কয়টি বিষয় জড়িত, যেমন ৪০০ ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক্তি, পেট্রোলে ভরা ট্যাঙ্ক ইত্যাদি, সমস্তই শঙ্কাদায়ক হইয়া উঠে। বিলাতে গিয়া বন্দুকিটারি পড়িয়া আসিবার সৌভাগ্য যখন লাভ করি নাই, তখন "dangerously (বিপজ্জনক ভাবে)" কথাটি সহসা হৃৎপোল্লার মত বুকিয়া লইতে আমাদের বাধিতেছে। হায় রে দেশ এবং হায় রে দেশের নেতা!

## মিঃ অ্যামেরীর "মিথ্যা উক্তি"

বর্ত্তমান ভারত-সচিব মিঃ অ্যামেরীর যে-বক্তৃতা (১০ই আগষ্ট পার্লামেণ্টে প্রদত্ত) ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ করিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র বাক্য স্মরণযোগ্য হিসাবে এখানে উদ্ধার করিতেছি:—'ভারতের এমন কোন্ অধিবাসী আছেন এবং এমন কোন্ সম্প্রদায়ই বা আছেন, যিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় তাঁহার স্বদেশবাসীর সম্বন্ধে গর্ব্ববোধ করেন না?'

কথাটি ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। ভারতে ধরা যাউক প্রায় ৩৫ কোটি লোক, তন্মধ্যে প্রায় ত্রিশ কোটিই হইতেছে চাষী—এই সর্ব্ববৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বলিতে কেহ গর্ব্ববোধ করে কি না, তাহা জানিবার জন্য সেন্সাস লইবার প্রয়োজন নাই। অবশিষ্ট অধিবাসীদের যাঁহারা শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ইত্যাদি, তাঁহাদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ বলিতে গর্ব্ব-বোধ করিবার ব্যক্তি পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। মোটা-মুটি ভাবে, শতকরা ৫ জন শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যেই বা শতকরা কয়জন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গৌরবান্বিত? রবীন্দ্র-ভক্তেরা বলিবেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষে লজ্জার বিষয়। হইতে পারে কিংবা না-ও হইতে পারে, বাস্তবতঃ দেখা যাইতেছে, মিঃ অ্যামেরী ভারত-সচিব হইয়াও ভারতবাসী সম্বন্ধে যে-জ্ঞান পোষণ করিতেছেন, তাহা নিতান্তই অবাস্তব। রবীন্দ্রনাথের অবশ্য বহুদিন হইতেই আশা ছিল, দেশের দিকে দিকে তাঁহার নাম প্রচারিত হউক্ এবং সম্ভবতঃ "এই সব ক্ষুদ্র নাম মুক মুখে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে ভাষ" বলিয়া তিনি যে-কবিতা একদা রচনা করিয়াছিলেন, সেই কবিতার মূলে এই বাসনাই ছিল। ঘটনাচক্রে "ছিন্ন যাহা পলাতক বালকের" "বাঁশী"র কবল হইতে তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন না—সুতরাং অ্যামেরী সাহেবের কথা মিথ্যায় পর্য্যবসিত হইল।

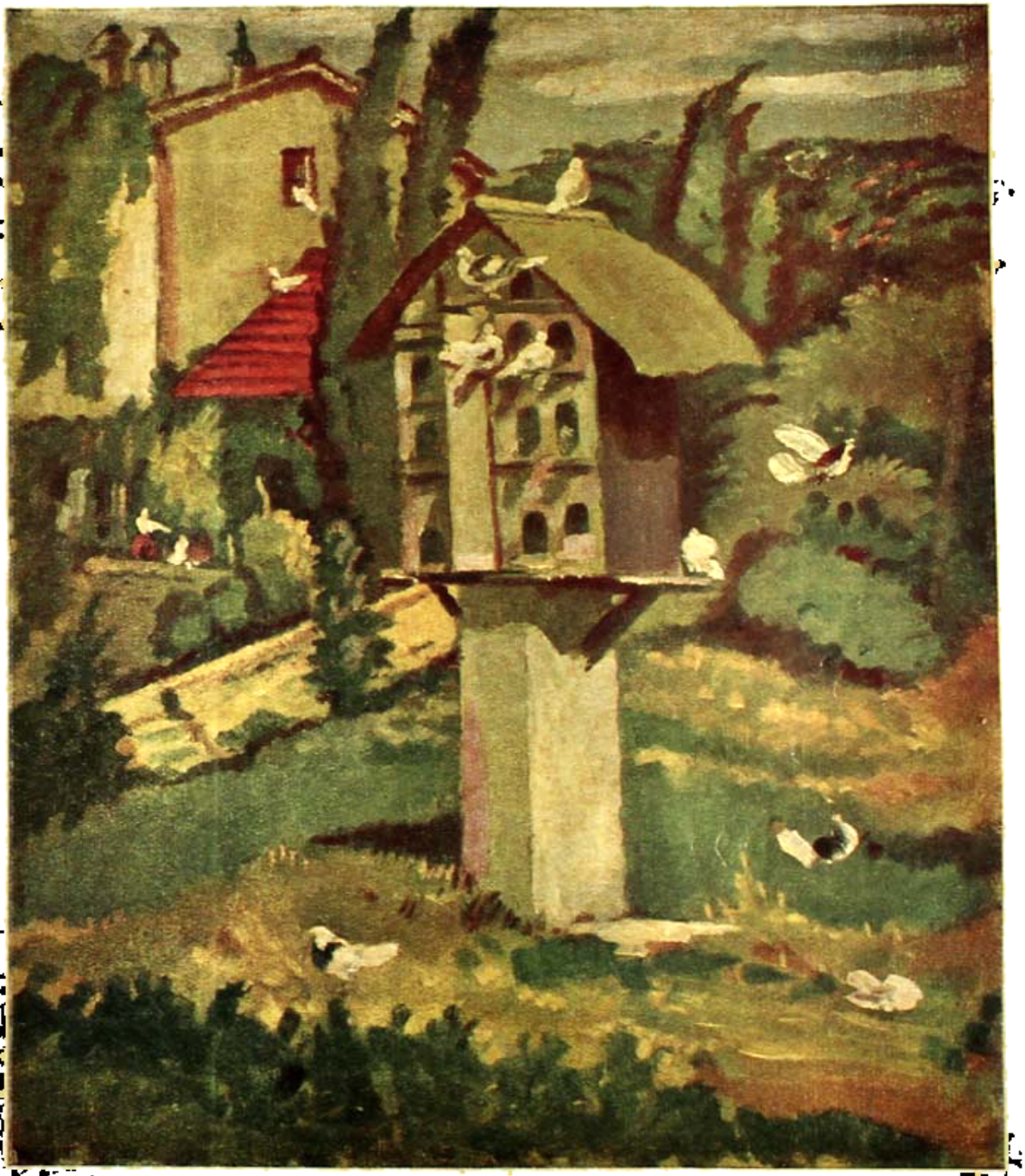

পারাবতাগার [ শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

দশভুজা

[ ১৮২৪সনে প্রকাশিত "গৌরীবিলাস" পুস্তকে মুদ্রিত লাইন এনগ্রেভিং হইতে ]

"ওঁ ত্বমীস্তং ধান্যরূপাসি প্রাণেনা প্রাণদায়িনী"

# নবশক্তি

কার্ত্তিক—১৩৪৭
৮ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা

## সম্পাদকীয়

— শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

যে অনন্ত কথা তুমি আমার মধ্যে রক্ষা করিয়াছ এবং প্রতিনিয়ত জাগ্রত করিয়া তুলিতেছ, যে ভাষায় সেই অনন্ত কথা আমার ঐ ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের প্রাণে জাগিয়া উঠিতে পারে, সেইরূপ ভাষা আজ আমার প্রাণে জাগ্রত কর মা। আমার মধ্যে যত কিছু দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তি এবং রাগ ও দ্বেষের প্রমত্ততা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আজ দূরীভূত হউক। তুমি যে আমাদের সর্ব্বসাধারণের মাতা এবং তোমার সৃষ্ট প্রত্যেক মানুষটী যে এক মাতার সন্তান, সেই ভাবে আমি যেন প্রবুদ্ধ হই এবং ঐ ভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া যেন আমি রাগ, দ্বেষ, হিংসা, অভিমানের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া সকলকেই প্রকৃত ভ্রাতা ও ভগ্নীর মত প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গন করিতে পারি।

আমার এই আকাঙ্ক্ষারূপী রাজসিকতার মধ্যে যেন তোমার ঐ সাত্বিকতা অটুট ভাবে মিলিত থাকে।

# বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা ও আধুনিক বিজ্ঞানের অসাফল্য (৫)

## কোন্ বিজ্ঞানে জাতীয় জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধান সর্ব্বতোভাবে সম্ভববোগ্য ?

অর্থগত সমস্যার সর্ব্বাঙ্গীন সমাধান করিবার সপ্তম সূত্র—"যাহাতে সমাজের কাহারও কোন অনিষ্ট না হইতে পারে ঘটিভাবে এমন কোন শারীরিক অথবা মানসিক পরিশ্রম না করিয়া কেহ যাহাতে অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা করা।" এই সূত্রের উদ্দেশ্য দুইটী, যথা : (১) যাহারা প্রাপ্তবয়স্ক তাঁহাদিগের প্রত্যেকে যাহাতে সমাজের কোন না কোন হিতার্থে কোন না কোন পরিশ্রম করিতে বাধ্য হন এবং তাঁহাদিগের কেহই যাহাতে আলস্যে অথবা ছলনায় অথবা আমোদ-প্রমোদে দিনাতিপাত করিতে না পারেন, এবং (২) কেহ যাহাতে সমাজের কাহারও কোনরূপ অনিষ্টজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন, তাহার ব্যবস্থা করা। বর্ত্তমান জগতে এই সূত্রের ব্যতিচার প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সংঘটিত হইতেছে। আজকালকার জমীদারগণ, ধনী ব্যবসায়িগণ, উচ্চপদাধিষ্ঠিত রাজকর্ম্মচারিগণ, আইন ব্যবসায়িগণ, বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ ঐ ব্যতিচারের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দৃষ্টান্ত। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় যে ইঁহারা ইঁহাদিগের স্ব স্ব পরিশ্রমের দ্বারা সমাজের কোন না কোন হিত সাধন করিতেছেন, কিন্তু তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ইঁহাদিগের কার্য্যে সমাজের হিত অপেক্ষা অহিতই অধিক পরিমাণে সাধিত হইতেছে। কৃষক ও গভর্ণমেণ্টের মাঝখানে সমাজে কতকগুলি জমিদার রাখিবার কি প্রয়োজন আছে, তদ্বিষয়ে অনেকের মনে আজকাল একটা প্রশ্ন উদিত হইয়াছে এবং জগতের অনেক গভর্ণমেণ্ট জমিদারি-ব্যবস্থা বাতিল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে আজকাল জমিদারেরা প্রজার কোনই উপকার করেন না, পরন্তু বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্রে, আষাঢ়ের বর্ষণে প্রকৃত সন্ন্যাসীর মত কঠোর পরিশ্রম করিয়া কৃষকগণ নানাবিধ যাহা উৎপাদন করে, জমিদারগণ তাহাতে ভাগ বসাইয়া থাকেন। এমনিতে তো কৃষকের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ যেরূপ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে তাহাতে উহার সম্পূর্ণাংশ পাইলেও তাহার বাৎসরিক আহার সম্পূর্ণ ভাবে নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব হয় না। তাহার পর আবার জমিদারের ভাগ বসাইবার ফলে কৃষক আরও অনাহার ও অর্দ্ধাহারক্লিষ্ট হইতে বাধ্য হইতেছে। কাজেই এখন জমিদারগণ যে কৃষকগণের অপকারই করিতেছেন এবং জমিদার শ্রেণীর থাকা অপেক্ষা কৃষকগণের পক্ষে না থাকাই ভাল তাহা অস্বীকার করা যায় না। অথচ সমগ্র মানব-সমাজের প্রাচীন ইতিহাস শৃঙ্খলিতভাবে আবিষ্কার করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, এমন একদিন ছিল যখন এই জমিদার শ্রেণীই জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি কিরূপে বৃদ্ধি পাইতে পারে, কোন্ জমিতে কোন্ শ্রেণীর শস্য কোন্ ঋতুতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধরণের ও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে এবংবিধ তথ্য আবিষ্কার করিয়া এবং উহা কৃষকগণকে শিখাইয়া তাহাদিগের কৃষি-কার্য্যের যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। জমিদারগণের কার্য্যাবলীর ফলে কৃষকগণ স্ব স্ব জমি হইতে তাঁহাদিগের স্ব স্ব পরিবারের প্রয়োজনের চাহিদা শস্য উৎপাদন করিতে পারিত এবং সানন্দে জমিদারগণকে উৎপন্ন শস্যের অংশ প্রদান করিত। এখন আর জমিদারগণ যখন কৃষকগণের ঐ শ্রেণীর সহায়তা করেন না এবং জমির উৎপাদিকাশক্তি যখন হু হু করিয়া কমিয়া যাইতেছে, তথাপি তাঁহারা যখন কৃষকগণের উপার্জ্জনের অংশ গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, তখন তাঁহারা যে সমাজের উপকার অপেক্ষা বেশীর ভাগ অপকার করিতেছেন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

জমিদারগণ যেরূপ সমাজের অধিকাংশের অপকার করিতেছেন সেইরূপ ধনী ব্যবসায়িগণও যথেষ্ট অপকার

করিতেছেন। কৃষক ও শিল্পী প্রভৃতি শ্রমজীবিগণ যে সমাজের শতকরা নব্বইজন ইহা বলাই বাহুল্য। যাহাতে শ্রমজীবিগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভবান্ হয় তাহা না করা অথবা তাহাতে পরোক্ষভাবে বাধা দেওয়া যে সমাজের অধিকাংশের অনিষ্টসাধন করা—ইহাও মানুষ মানিয়া লইতে বাধ্য। আধুনিক ব্যবসায়িগণ বিলাসের দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিয়া শ্রমজীবিগণকে বিলাসী করিয়া তুলিতেছেন, এবং অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিয়া উহাদিগের অন্নবস্ত্রের ইক্ষন যোগাইতেছেন। সর্ব্বোপরি, ক্রয়-বিক্রয় কি করিয়া করিতে হয় তাহা শ্রমজীবিগণকে শিখাইবার সহজ পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিলে শ্রমজীবিগণই ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারিত এবং ক্রয়-বিক্রয়ের লাভ সম্পূর্ণাংশে শ্রমজীবিগণ উপভোগ করিতে পারিত এবং উহার যে অংশ অধুনা ব্যবসায়িগণকে দিয়া শ্রমজীবিগণকে লোকসানগ্রস্ত হইতে হইতেছে সেই অংশ ব্যবসায়িগণকে দিতে হইত না। মানবসমাজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ইতিহাস নির্ভুলভাবে জানিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঋগ্বেদ-যুগে ব্যবসায়িগণের প্রধান কার্য্য ছিল শ্রমজীবিগণকে শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ শিক্ষা মৌখিকভাবে প্রদান করা এবং যাহাতে কোন লেখাপড়ার ফাঁকির মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া অনায়াসে শিল্প ও বাণিজ্য অতি অল্প খরচে সমাজের মধ্যে চলিতে পারে এবং শ্রমজীবিগণ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে লাভবান হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থার ফলে শ্রমজীবিগণ যথেষ্ট লাভবান হইত এবং স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ব্যবসায়িগণকে তাহাদিগের সংসার নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ প্রদান করিত। ইহার ফলে শ্রমজীবী শ্রেণী ও ব্যবসায়ী শ্রেণী এই উভয়েই সুখে ও স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিত। কাযেই দেখা যাইতেছে যে, মানবসমাজের প্রাচীনকালে ব্যবসায়িগণের প্রধান কর্ত্তব্যভার ছিল তিনটী, যথা :—(১) শ্রমজীবিগণকে মৌখিকভাবে শিল্প ও বাণিজ্য শেখান, (২) শিল্প ও বাণিজ্যের সহজ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা, এবং (৩) শ্রমজীবিগণের অন্যায়, অসচ্চরিত্র ও বিলাসিতা যাহাতে আসিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা। এক কথায়, শ্রমজীবিগণ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে লাভবান হয় এবং যাহাতে তাহারা কখনও লোকসানগ্রস্ত না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা ছিল ব্যবসায়িগণের দায়িত্ব। আর এক্ষণে? শ্রমজীবিগণ যাহাতে কিছুর মধ্যে গভীরভাবে প্রবিষ্ট না হইতে পারে, যাহাতে তাহারা বিলাসী ও অসচ্চরিত্র হয়, ব্যবসায়ের ব্যবস্থা যাহাতে জটিল হয়, শ্রমজীবিগণকে ফাঁকি দিয়া শোষণ করা যাহাতে সহজসাধ্য হয় ইহাই হইতেছে আধুনিক ব্যবসায়িগণের মুখ্য লক্ষ্য।

আধুনিক উচ্চপদাধিষ্ঠিত রাজকর্ম্মচারিগণও যে সমাজের হিত অপেক্ষা অহিতই যথেষ্ট পরিমাণে সাধন করিতেছেন, তাহাও একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। জমিদার ও ব্যবসায়ীশ্রেণী যাহাতে কর্ত্তব্যপরায়ণ হন এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর প্রতি কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করেন, তদুপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলে একদিকে যেরূপ জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রেণী চরিত্রবান্ হইতে পারেন, সেইরূপ আবার শ্রমজীবিগণও চরিত্রবান্ হইতে পারেন। তখন একমাত্র জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর দ্বারাই সর্ব্ববিধ রাজকার্য্যের পনের আনা সুচারুভাবে নির্ব্বাহ করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে। ফলে প্রজার উপর কোন করভার না চাপাইয়া অথবা নামমাত্র করভার চাপাইয়া রাজকার্য্য চলিতে পারে। প্রজাশ্রেণীর যদি অর্থাভাব না থাকে এবং তাহারা যদি অসচ্চরিত্র ও কুশিক্ষা প্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে অশান্তির সম্ভাবনা পনের আনা কমিয়া যায়। এবং তখন প্রজার মধ্যে শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশের, অথবা বিচার বিভাগের, অথবা মিলিটারী বিভাগের প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে না। জমিদারশ্রেণী শিক্ষিত, চরিত্রবান্ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইলে উহাদিগের দ্বারাই গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায়ের কার্য্য চলিতে পারে এবং তখন গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব-বিভাগেরও কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। কাজেই দেখা যাইতেছে যে জমিদার শ্রেণী ও ব্যবসায়ী শ্রেণী যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারেন এবং হইতে বাধ্য হন একমাত্র তদুপযোগী সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগ, বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ ও মিলিটারী বিভাগ বন্ধ করিয়া দেওয়া সম্ভবযোগ্য হয় এবং প্রজার করভার বার আনা পরিমাণেই কমাইয়া দেওয়া চলিতে পারে।

মানব-সমাজের প্রাচীন কালে ঋষিযুগে রাজকার্য্যের কি ব্যবস্থা ছিল তাহা অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে উপরোক্ত ব্যবস্থা তখন প্রবর্ত্তিত ছিল এবং তাহাতে প্রজাগণ সুখের

হাত হইতে এড়াইয়া সর্ব্বদাই রাজার অনুরক্ত থাকিত। এক্ষণে উহা যখন হইতেছে না এবং প্রজাগণকে সর্ব্বদা বিপুল করভারে নিষ্পীড়িত হইতে হইতেছে, তখন উচ্চপদাধিষ্ঠিত রাজকর্ম্মচারিগণ যে সমাজের উপকার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে অপকারই করিতেছেন তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ উচ্চপদাধিষ্ঠিত রাজকর্ম্মচারিগণই রাজকার্য্যের সুব্যবস্থা প্রচলনের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী। উপরোক্ত প্রয়োজনীয়তা ও নিষ্প্রয়োজনীয়তার এবং করভারের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যাইবে যে, একমাত্র পুলিশবিভাগ ছাড়া গভর্ণমেণ্টের অন্য সমস্ত বিভাগে জনসাধারণের অপকারই অধিকাংশ পরিমাণে সাধিত হইতেছে। অনেক দেশের গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান বিচার বিভাগের অস্তিত্বের জন্য গৌরব করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, একে তো বিচার বিভাগ এত ব্যয়বহুল যে, উহার দরুণ জনসাধারণকে বিচার পাইতে হইলে প্রায়শঃ অধিকতর দরিদ্র হইয়া পড়িতে হয়, তাহার পর আবার বিচারকগণ প্রায়শঃ এত ভ্রমপ্রমাদ পরিপূর্ণ এবং বিচারপদ্ধতি সাক্ষীগ্রহণের নিয়মের জন্য এত কলঙ্কিত যে, বিচার-প্রার্থিগণকে বাধ্য হইয়া মিথ্যা সাক্ষীর আবিষ্কার করিতে হয় এবং চরিত্রহীন হইয়া পড়িতে হয়। এক কথায় গভর্ণমেণ্টের বিচারবিভাগ দরিদ্র জনসাধারণকে অধিকতর দরিদ্র ও চরিত্রহীন এবং মিথ্যাশ্রয়ী করিয়া তুলিতেছেন।

আইন ব্যবসায়িগণ ও বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ সমাজের অনিষ্টজনক কার্য্য করিতেছেন কি না তাহার বিচার করিতে বসিলে হতাশ হইতে হইবে।

যাহাতে বিচারকার্য্য জটিলতাহীন, অল্প সময় সাপেক্ষ, অল্প খরচ সাপেক্ষ ও সত্যানুগ হয়, যাহাতে অপরাধীর দণ্ড হয় ও সমাজ হইতে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, কলহ ও মারামারির প্রবৃত্তি কমিয়া যায়, তাহার সহায়তা করাই যে আইন ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এতদ্বিষয়ে কেহ যুক্তিসঙ্গত ভাবে অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আইন ব্যবসায়িগণ কার্য্যতঃ কি করিতেছেন, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত দায়িত্বগুলি নির্ব্বাহ করা তো দূরের কথা, ইঁহাদিগের প্রায় প্রত্যেকের কার্য্যেই উল্টা উৎপত্তি হইতেছে। ইঁহারাই প্রায়শঃ বিচারকার্য্যকে জটিলতাময় করিয়া তোলেন, ইঁহাদিগের কার্য্যফলে মোকদ্দমার শুনানীর কার্য্যে তারিখের পর তারিখ লাগিয়া থাকে এবং বিচারপ্রার্থিগণ প্রায়শঃ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকেন। মোকদ্দমার বিষয় যথাযথভাবে বুঝিতে হইলে যে ধৈর্য্য ও বুদ্ধি-শক্তির প্রয়োজন তাহার অভাব হেতু ইঁহারা প্রায়শঃ বিচারপ্রার্থিগণের কলহের বিষয়ে যথাযথভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারেন না। তাহার ফলে স্ব স্ব মক্কেলানুযায়ী আইনের কোন না কোন একটী ধারার উপনীত হইবার জন্য সাক্ষ্য সংগ্রহে উদ্যোগী হন্ এবং বিচারপ্রার্থী সম্প্রদায় ও সাক্ষী সম্প্রদায় এই উদ্দেশ্যেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মিথ্যার সহায়তা লইতে প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের পাপ অতীব ভীষণ এবং তাহার ফলে আইন-ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সর্ব্বনিয়ন্তার নিয়মানুসারে কঠোর শাস্তিও পাইয়া থাকেন। ইঁহাদিগের কার্য্যের ফলে সমাজমধ্যে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, কলহ ও মারামারির প্রবৃত্তি কমিয়া যাওয়া তো দূরের কথা উহা যে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা সমাজের অবস্থা একটু তলাইয়া লক্ষ্য করিলেই উপলব্ধি করা যাইবে। ইঁহারা ভগবানের নিয়মে যে কঠোর শাস্তি পাইয়া থাকেন তাহা ইঁহাদিগের অবস্থা লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকেন বটে কিন্তু প্রায়শঃ শারীরিক অস্বাস্থ্য ও মানসিক অশান্তিতে জর্জ্জরিত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের পুত্র-কন্যাগণ প্রায়শঃ কলুষিত চরিত্র-যুক্ত, অমিতব্যয়ী এবং অস্বাস্থ্যের আধার হইয়া পিতা-মাতার মানসিক অশান্তি ও অর্থাভাবের কারণ হইয়া থাকেন। ইঁহাদিগের ঐশ্বর্য্যও প্রায়শঃ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অনেকেই হয় নানারকম লোকসানে, নতুবা প্রতারণায়, নতুবা ব্যাধির চিকিৎসায়, নতুবা ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধনে নিজ নিজ জীবদ্দশাতেই নিঃস্ব হইয়া থাকেন। যাঁহারা জীবদ্দশাতে কোনক্রমে স্ব স্ব ঐশ্বর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদিগের ঐশ্বর্য্য প্রায়ই দেখা যাইবে উত্তরাধিকারিগণের হাতে দুই-তিন পুরুষের মধ্যে অপব্যয়ে নষ্ট হইয়া যায়। মানুষ মোহবশতঃ অন্ধ হইয়া পাপের পরিণাম বুঝিতে পারে না। কিন্তু মোহমুক্ত হইয়া লক্ষ্য করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, পাপের শাস্তি ও

পুণ্যের পুরস্কার দুনিয়ায় যথাযথভাবে সর্ব্বদাই চলিয়া আসিতেছে।

আধুনিক আইন ব্যবসায়িগণের অধিকাংশই যেরূপ সমাজের অনিষ্টজনক কার্য্য করিতেছেন, আধুনিক শিক্ষা-বিভাগের অধ্যাপকগণও সেইরূপ সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। কি হইলে সমাজ হইতে সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে বিতাড়িত হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, সমাজকে সর্ব্বতোভাবে দুঃখ-মুক্ত করিতে হইলে, শ্রমজীবিগণের ঐকান্তিক কায়িক শ্রম এবং বুদ্ধিজীবিগণের ঐকান্তিক মানসিক শ্রম মিলিতভাবে একান্ত প্রয়োজনীয়। এই দুই শ্রেণীর মানুষের মিলিত শ্রম কার্য্যকর করিতে হইলে বুদ্ধিজীবী মানুষের সন্তানগণ যাহাতে বিলাস-বাসনা, আলস্য, পরশ্রীকাতরতা ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা সংযত করিয়া সত্যাশ্রয়ী হইয়া নিঃস্বার্থভাবে শ্রমজীবিগণের হিতার্থে জীবনযাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হয় তদুপযোগী শিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। কিন্তু আধুনিক অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগকে যে শিক্ষা দিতেছেন তাহাতে উহার ঠিক বিপরীত ফলোদয় হইতেছে। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ছাত্রগণকে আধুনিককালে যে-শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে বিলাসবাসনা, আলস্য, পরশ্রীকাতরতা, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা, মিথ্যাবাদিতা, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরায়ণতা বৃদ্ধি পাওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। কার্য্যতঃও দেখা যাইবে যে, অশিক্ষিত শ্রমজীবিগণের মধ্যে বিলাসিতা, আলস্য, পরশ্রীকাতরতা, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা, মিথ্যাবাদিতা, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরায়ণতা সম্বন্ধে যতটুকু সংযততা দেখা যায়, শিক্ষিতগণের মধ্যে তাহা প্রায়শঃ বিরল। পরন্তু অনেক গুণ অধিক। শ্রমজীবিগণের প্রতি যাহাতে অনুকম্পার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায় তাহার শিক্ষা পাওয়া তো দূরের কথা, শিক্ষিতগণ প্রায়শঃ শ্রমজীবিগণকে "ছোটলোক" বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। অশিক্ষিত মধ্যবিত্তগণের মধ্যে শ্রমজীবিগণের প্রতি যে অনুকম্পার প্রবৃত্তি প্রায়শঃ দেখা যায়, শিক্ষিতগণের মধ্যে সেই অনুকম্পার প্রবৃত্তি এক-চতুর্থাংশ পরিমাণেও দেখা যায় না, এমন কি অধ্যাপকগণ নিজেরা পর্য্যন্ত উপরোক্ত ত্রুটিসমূহ হইতে মুক্ত নহেন। ইঁহারা প্রায়শঃ বাহ্যিক, মিথ্যাবাদী, কপট, বৃথা বিদ্যাভিমানী, গতানুগতিক ও কলুষিত চরিত্রের হইয়া থাকেন। অধ্যাপক শ্রেণীর মধ্যে যিনি যত উচ্চপদাধিষ্ঠিত তিনি তত অধিক পরিমাণে উপরোক্ত দোষসমূহের দুষ্টতায় দূষিত হইয়া পড়েন। ইঁহারা বাস্তবিকপক্ষে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট সাধন করিতেছেন, কারণ যে দুষ্টতার জন্য আধুনিক সমাজ এতাদৃশভাবে নানাবিধ দুঃখে জর্জ্জরিত হইতেছে, সেই দুষ্টতার বীজ ইঁহাদিগেরই ক্রটীর জন্য সমাজের ভবিষ্যৎ আশার স্থল যুবকবৃন্দের মধ্যে রোপিত হইতেছে।

আইন ব্যবসায়িগণ যেরূপ সর্ব্ববিষয়ের সর্ব্বব্যাপী বিষয়ের ফলে স্ব স্ব পাপের জন্য কঠোর শাস্তি পাইতেছেন, সেইরূপ এই অধ্যাপক শ্রেণীও সর্ব্বনিয়ন্তার সর্ব্বব্যাপী নিয়মের ফলে স্ব স্ব পাপের কঠোর শাস্তি প্রতিনিয়ত ভোগ করিতে বাধ্য হইতেছেন। অভাব, ক্লেশ, অশান্তি, অতৃপ্তি, নিজদিগের ও পুত্রকন্যাগণের অশ্রদ্ধা, ইঁহাদিগকে সর্ব্বদা জর্জ্জরিত করিতেছে। বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় যে, ইঁহারা প্রায়শঃ অমায়িক, ক্ষিতক্রোধ এবং শান্ত আছেন কিন্তু ইঁহাদিগের অন্তরের ভিতর প্রবিষ্ট হইবার সক্ষমতা লাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ইঁহারা প্রায়শঃ সর্পের মত ক্রূরতা ও ভীষণ স্বভাবের এক একটি অবতার। বাহিরে যিনি যত অধিক অমায়িকতা ও সংযততার অভিনয় করিয়া থাকেন, ভিতরে তিনি তত অধিক পরিমাণে ক্রূর ও অসংযত।

অবশ্য একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, উপরোক্ত ত্রুটীর জন্য কোন মানুষ ব্যক্তিগতভাবে যত দায়ী, তদপেক্ষা বেশী দায়ী গভর্ণমেণ্টের আইন ও নিয়ম ( Acts and Rules )।

শুধু যে আজকালকার জমীদার শ্রেণী, ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণী, উচ্চ পদাধিষ্ঠিত রাজকর্ম্মচারী শ্রেণী, আইন ব্যবসায়ী শ্রেণী, এবং অধ্যাপক শ্রেণী তাঁহাদিগের স্ব স্ব কার্য্যের দ্বারা সমাজের যথেষ্ট অপকার সাধন করিতেছেন তাহা নহে, আজ-কালকার রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, সামাজিক নেতৃবর্গ, ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, তথাকথিত গৃহত্যাগী পরিত্যাগী সন্ন্যাসিবর্গ, কবিকুল, সাহিত্যিকবর্গ এবং সাংবাদিকগণও মানবসমাজের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার এক একটী প্রকাণ্ড কারণ। ইঁহাদিগের কার্য্যাবলী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে ইঁহারা প্রায়শঃ এক একটী গতানুগতিক এবং কল্পনাতীত তত্ত্ব অথচ ইঁহারা সাধিব

থাকেন এবং জনসাধারণও ভাবিয়া থাকে যে ইঁহারা লোক হিতার্থে স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

ইহার পর আবার, জমীদার শ্রেণীর সন্তানগণ, ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণীর সন্তানগণ, উচ্চ পদাধিষ্ঠিত রাজকর্ম্মচারী শ্রেণীর সন্তানগণ, ধনী আইন ব্যবসায়ী শ্রেণীর সন্তানগণ এবং অধ্যাপক শ্রেণীর সন্তানগণ প্রায়শঃ বিলাসের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া অলস জীবন যাপন করেন ও স্ব স্ব পিতার ঐশ্বর্য্যে গর্ব্বান্বিত হইয়া সমাজের অধিকাংশ কু-দৃষ্টান্তের ও কু-কার্য্যের আবিষ্কর্ত্তা হইয়া থাকেন। এই ধনিগণের পুত্রগণ প্রায়শঃ পুরুষ-শ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খলতার আদর্শ এবং উঁহাদের কন্যাগণ প্রায়শঃ যাহা হইয়া পড়িয়াছেন তাহা লিখিতেও লজ্জা হয়। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগুন আর নাই বুঝুন, একথা ধ্রুব সত্য যে এইশ্রেণীর ধনীর কন্যাগণের বিষ-বিষময়রূপে ব্যভিচারের ফলে মানবসমাজে প্রকৃত বুদ্ধিমান মানুষের জন্ম হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

মোটের উপর যাহাতে সমাজের কাহারও কোন অনিষ্ট না হইতে পারে, খাঁটিভাবে এমন কোন শারীরিক অথবা মানসিক পরিশ্রম না করিয়া কেহ যাহাতে অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারে তদনুরূপ ব্যবস্থা যে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজে প্রচলিত নাই এবং তাহার ফলে ধনিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে সর্ব্বতোভাবে উৎসন্ন প্রাপ্তে হইয়াছে তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে।

অর্থগত সমস্যার সর্ব্বাঙ্গীন সমাধান করিবার অষ্টম সূত্র—"খাঁটি পরিশ্রমের পরিমাণের সহিত তুলনা করিয়া যাহাতে পারিশ্রমিকের পরিমাণ স্থির করা হয় তদনুরূপ ব্যবস্থা।" অথচ কার্য্যক্ষেত্রে ইহার যথেষ্ট অন্যথা আচরিত হইতেছে। কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গুরু মহাশয়কে যে বেতন দেওয়া হয়, তাহার অনেক বেশী বেতন দেওয়া হয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে, আবার কোন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে যে বেতন দেওয়া হয়, তাহার অনেক গুণ বেশী বেতন দেওয়া হয় কলেজের বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপকগণকে। ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে উপরোক্ত তিন শ্রেণীর শিক্ষকের মধ্যে যাঁহারা সুকুমারমতি বালকগণকে শিক্ষা দিয়া ভবিষ্যৎ শিক্ষার বনিয়াদ প্রস্তুত করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের পরিশ্রমের পরিমাণ ও গুরুত্ব অপর দুই শ্রেণীর শিক্ষকের পরিশ্রমের তুলনায় কোন অংশে কম নহে। এক-জন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটকে যে বেতন দেওয়া হয় তদপেক্ষা পুলিসের একজন সব-ইন্‌স্পেক্টরের বেতন অনেক কম। ইহারই বা যে কি কারণ তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে জনসাধারণের মধ্যে শান্তিরক্ষার কার্য্যে পুলিস সব-ইন্‌স্পেক্টরগণকে যে পরিমাণ পরিশ্রম করিতে হয় এবং তাঁহাদিগের কার্য্যে যে পরিমাণ বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন, তাহা কোন ক্রমেই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটগণের বুদ্ধিমত্তার তুলনায় কম নহে। আজকাল ব্রিটিশ রাজত্বে যে অসন্তুষ্টির বহ্নি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার কারণ সন্ধান করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কতকগুলি অনুপযুক্ত দাম্ভিক লোক প্রকৃত বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা লাভ না করিয়া কেবলমাত্র মুখস্থ বিদ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটা পাশ করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে পারিতেছে বলিয়াই ঐরূপ ঘটিতেছে। অথচ এই লোকগুলিকে সম্মানযোগ্য পদে অধিষ্ঠিত করিয়া এবং যোগ্যতার অধিক বেতন দিয়া ইঁহাদিগের অযথা দাম্ভিকতার ইন্ধন যোগান হইয়া থাকে এবং পরোক্ষভাবে ইহাদিগের ও সমাজের সর্ব্বনাশ করা হইয়া থাকে। যে মানুষগুলি নিরন্তর কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া এবং ঐ কার্য্যের অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটের বলে সরাসরি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে পারিয়াছেন এবং ক্রমে ক্রমে ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে পর্য্যন্ত উন্নীত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে তাঁহাদিগের শত করা ৮০ জন কার্য্যকারণ-সঙ্গতির সাধারণ জ্ঞান বিবর্জ্জিত এবং এক একটী গর্দ্দভের প্রতিমূর্ত্তি। আইন প্রণয়ন, বিচার ও শাসন বিভাগের মানুষগুলি যদি স্ব স্ব কার্য্যের উপযুক্ত হন তাহা হইলে কোন গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টির বহ্নি প্রজ্বলিত হইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে সর্ব্বত্রই গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রজার অসন্তুষ্টি অত্যন্ত বাড়িয়া চলিতেছে তখন আইন-প্রণয়ন, বিচার ও শাসন বিভাগের কর্ম্মচারিগণ যে প্রকৃত উপযুক্ততা লাভ ও পরিশ্রম না করিয়াও মোটা মোটা বেতন পাইতেছেন তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

অর্থগত সমস্যা সমাধান করিবার নবম সূত্র—"প্রত্যেকে যাহাতে দ্রব্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও দ্রব্যের ব্যবহার-জ্ঞান লাভ

করিতে পারে তদনুরূপ ব্যবস্থা"। দ্রব্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞান বলিতে বুঝায় কোন্ দ্রব্যে কতখানি রস ও কতখানি স্নেহ থাকে এবং কোন্ দ্রব্য মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার সমতা সাধন করিতে কতখানি সমর্থ তৎসম্বন্ধীয় উপলব্ধি। দ্রব্যের ব্যবহার-জ্ঞান বলিতে বুঝায়—দ্রব্যের সেই রকমের ব্যবহার, যে রকমের ব্যবহারে দ্রব্যের স্বাভাবিক গুণগুলি কোনরূপে নষ্ট না হইয়া সর্ব্বতোভাবে পরিরক্ষিত হয়। "দ্রব্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞান" ও "দ্রব্যের ব্যবহার-জ্ঞান" কাহাকে বলে তাহা যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তথাকথিত পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন—যথেষ্ট পরিমাণে তথাকথিত উন্নতি লাভ করিয়াছে বটে কিন্তু প্রাচীনকালে "দ্রব্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞান" ও দ্রব্যের "ব্যবহার-জ্ঞান" সম্বন্ধীয় যে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রচলিত ছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে।

অর্থগত সমস্যা সমাধান করিবার দশম সূত্র—"আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্য যাহাতে দেশের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় তদনুরূপ ব্যবস্থা করা।" অথচ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে প্রত্যেক দেশেই নানাবিধ অস্বাস্থ্যকর ও বিলাসিতার দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে বটে কিন্তু যাহা যাহা খাইলে ও ব্যবহার করিলে মানুষের স্বাস্থ্য উন্নতি-লাভ করিতে পারে তাহার উৎপত্তি প্রত্যেক দেশেই মোট লোক-সংখ্যার তুলনায় ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে।

অর্থগত সমস্যা সর্ব্বাঙ্গীনভাবে সমাধান করিবার একাদশ-সূত্র—"দেশের মাটী, জল ও হাওয়া যাহাতে কোনরূপে বিকৃত না হয়—তদনুরূপ ব্যবস্থা করা।" অথচ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে প্রত্যেক দেশের মাটী, জল ও হাওয়া ক্রমেই অধিকতর বিকৃতি লাভ করিতেছে।

অর্থ-গত সমস্যা সর্ব্বাঙ্গীনভাবে সমাধান করিবার দ্বাদশ সূত্র—"উৎপন্ন আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি যাহাতে কোনরূপে অস্বাস্থ্যপ্রদ না হয় তদনুরূপ ব্যবস্থা করা।" অথচ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে আজকাল অনেক রকমের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু যে কোন দেশে যাহা কিছু আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয় তাহার প্রত্যেকটী অল্পাধিক পরিমাণে অস্বাস্থ্যপ্রদ। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে মনুষ্যজাতির ইতিহাসে এমন একটী কাল ছিল, যখন প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য সর্ব্বতোভাবে স্বাস্থ্যপ্রদ ছিল।

অর্থগত সমস্যা সর্ব্বাঙ্গীনভাবে সমাধান করিবার ত্রয়োদশ সূত্র—"স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যাহাতে সংসার পরিচালনার দায়িত্ব বিভক্ত হয় তদনুরূপ ব্যবস্থা করা।" এই নিয়ম যে আজকাল সর্ব্বতোভাবে অবহেলিত হইয়া আসিতেছে ইহা বলাই বাহুল্য।

অর্থগত সমস্যা সর্ব্বাঙ্গীনভাবে সমাধান করিতে হইলে রাজকর্ম্মচারিগণের চরিত্র, নির্লোভতা, সংযতেন্দ্রিয়তা ও সত্যবাদিতা সম্বন্ধে যে সমস্ত সতর্কতা একান্ত প্রয়োজনীয় তাহাও বর্ত্তমান কালে অল্পাধিক পরিমাণে সর্ব্বত্রই অবহেলিত হইয়া থাকে।

এক কথায়, অর্থগত সমস্যা সর্ব্বতোভাবে সমাধান করিতে হইলে কি কি প্রয়োজনীয় এবং প্রত্যেক সমাজে কি কি চলিতেছে তাহা লক্ষ্য করিলে বলিতে হয় যে এতদবস্থায় অর্থগত সমস্যা না থাকাই আশ্চর্য্যজনক। প্রত্যেক দেশের মানুষ যে আর্থিক সমস্যার ক্রমেই অধিক হইতে অধিকতর-ভাবে জর্জ্জরিত হইতেছে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই।

এক্ষণে আমরা স্বাস্থ্যগত সুখ-দুঃখের কথা আলোচনা করিব।

কোন্ বিজ্ঞানের সহায়তায় অর্থ-গত সমস্যার সমাধান হইতে পারে তাহা আবিষ্কার করিতে হইলে যেরূপ, বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষ কি কি অবস্থায় অর্থ-গত দুঃখে জর্জ্জরিত হইতে বাধ্য হয় অথবা অর্থ-গত দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে তাহার একটা ধারণা করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ কোন্ বিজ্ঞানে স্বাস্থ্য-গত সমস্যার সমাধান হইতে পারে তাহা আবিষ্কার করিতে হইলে বাস্তবক্ষেত্রে মানুষ কি কি অবস্থায় স্বাস্থ্য-গত দুঃখে জর্জ্জরিত হইতে বাধ্য হয় অথবা স্বাস্থ্য-গত দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে তাহার একটা ধারণা করিয়া লইতে হইবে।

পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা ঐ ধারণার উদ্যোগী হইবার ইচ্ছুক হইয়াছেন তাঁহারা কল্পনা করুন যে একজন মানুষ স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে হইলে অথবা তার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে হইলে যাহা যাহা প্রয়োজনীয় তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞানই

আহরণ করিয়াছে কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে হইলে যে যে বস্তুর প্রয়োজন তাহা ক্রয় করিবার সামর্থ্যহীন। এতদবস্থায় ঐ মানুষটী যে, প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবে অস্বাস্থ্যমূলক যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হইবে ইহা বলাই বাহুল্য। কাজেই বলিতে হইবে যে, স্বাস্থ্য-গত সমস্যা সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন অর্থ-গত সমস্যার সমাধান। অর্থ-গত সমস্যার সমাধান না করিয়া স্বাস্থ্য-গত সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হইয়া গভর্ণমেণ্ট, কর্পোরেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ও অংশীদারী জন-সাধারণের প্রদত্ত টাকা খরচ করা অধিবাহিত ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় ও সুখের ক্রোড়ে লালিত পালিত ডক্টর কুমুদশঙ্কর রায় শ্রেণীর ডাক্তারের পক্ষে শোভনীয় হইলেও হইতে পারে বটে কিন্তু কোন দূরদর্শী বুদ্ধিমান্ মানুষের পক্ষে শোভনীয় হইতে পারে না।

তাহার পর আবার কল্পনা করুন, একজন মানুষ যথেষ্ট ধনের অধিকারী এবং যে কোন কারণেই হউক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তিনি সর্ব্ব-প্রথমে একজন অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার ডাকিয়াছেন। ঐ অ্যালোপ্যাথটীর কোট, প্যাণ্টালুন, চশমা, বুকনি, চক্‌চকে জুতা, ষ্টেথেস্‌কোপ, থার্ম্মোমিটার, রক্ত পরীক্ষার যন্ত্র, মূত্র পরীক্ষার যন্ত্র, থুথু পরীক্ষার যন্ত্র, ঘাম পরীক্ষার যন্ত্র, মল পরীক্ষার যন্ত্র, রক্তের চাপ পরীক্ষার যন্ত্র, কর্ণ পরীক্ষার যন্ত্র, নাক পরীক্ষার যন্ত্র, চক্ষু পরীক্ষার যন্ত্র, হস্ত পরীক্ষার যন্ত্র, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম. ডি., বিলাতের এম. আর. সি. পি. প্রভৃতি উপাধি, জগতে যত কিছু ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার কর্দ্দ, কোথায় কাহার কোন্ চিকিৎসায় কি ফল হইয়াছে তাহার সূচী, বড় বড় অ্যানাটমী, ফিজিওলজী, প্যাথোলজী প্রভৃতি ডাক্তারীর সমস্ত অলঙ্কারই আছে। নাই কেবল রোগীর বাসস্থান, বয়স্কাল, বাৎসরিক কাল, ঋতুকাল, মাস-কাল, দিবস-কাল, আচারবৃত্তি, মনোবৃত্তি এবং শরীরের অবস্থা প্রভেদে শরীর গঠন, ও শরীর বিধানে অহরহ যে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার ও নির্ণয় করিবার জ্ঞান। আর নাই শরীর গঠন ও শরীর বিধানের কোন্ বিকৃতিতে কোন্ কোন্ ঔষধের কোন্ কোন্ মাত্রায় মিশ্রণ প্রয়োগ করিতে হয় তাহার জ্ঞান। আর নাই ঔষধগুলি কোন্ বিধানে পাক করিলে উহাদের স্বাভাবিক গুণগুলি রক্ষিত হইতে পারে ও রোগীর শরীরের স্বাভাবিকতা ফিরাইয়া পাওয়া যাইতে পারে তাহার জ্ঞান। এতদবস্থায় ঐ এম. ডি. ও এম. আর. সি. পি.-টী. যে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িতে বাধ্য হইবেন এবং তাঁহার তপশ্চর্য্যায় রোগীটী যেরূপ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন, সেইরূপ আবার যমালয়ে সাক্ষাৎ করিতে পারেন ইহা বলাই বাহুল্য।

অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের স্থানে যদি কোন আয়ুর্বেদিক কবিরাজ অথবা কোন হোমিওপ্যাথ অথবা কোন হকিমকে ডাকা হয় তাহা হইলেও যে একই প্রকার ফলোদয় হইবে তাহা বোধ হয় পাঠকগণকে বলিয়া দিতে হইবে না। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে, সর্ব্বতোভাবে স্বাস্থ্যগত সমস্যার সমাধান করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে যেরূপ অর্থগত সমস্যার সমাধান করিতে হইবে সেইরূপ আবার শরীর-বিধান ( Physiology ) ও শরীর গঠন ( Anatomy ) সম্বন্ধীয় সম্যক্ জ্ঞান, ঔষধের প্রয়োগ সম্বন্ধীয় সম্যক্ জ্ঞান ও ঔষধপাক সম্বন্ধীয় সম্যক্ জ্ঞান নির্ভুল ভাবে অর্জ্জন করিতে হইবে।

ইহার পর আবার কল্পনা করুন—সমাজের অর্থসমস্যা সর্ব্বতোভাবে সমাধান করা হইয়াছে, সম্পূর্ণ শরীর বিধান-বিজ্ঞান, সম্পূর্ণ শরীর গঠন-বিজ্ঞান, সম্পূর্ণ ঔষধ প্রয়োগ-বিজ্ঞান ও সম্পূর্ণ ঔষধ-পাক বিজ্ঞান নির্ভুলভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার ফলে মানুষ যখন ব্যাধিগ্রস্ত হয় তখন তাহার আরোগ্য সাধন করা সম্ভবযোগ্য হইয়াছে। কিন্তু দেশের মাটী, জল ও হাওয়াতে রোগের কীটাণু রহিয়া গিয়াছে এবং রোগের ঐ কীটাণুসমূহ মানুষকে সর্ব্বদাই নানাবিধ ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে। এতদবস্থায় মানুষ যে একবার আরোগ্য লাভ করিতে পারিলেও পুনরায় ব্যাধিগ্রস্ত হইবে এবং ব্যাধিযন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইবে ইহা বলাই বাহুল্য। কাজেই বলিতে হইবে যে, মানুষের স্বাস্থ্যগত সমস্যা সর্ব্বতোভাবে সমাধান করিতে হইলে—

প্রথমতঃ, অর্থগত সমস্যার সর্ব্বাঙ্গীন সমাধান;

দ্বিতীয়তঃ, সম্পূর্ণ শরীর বিধান বিজ্ঞানের, সম্পূর্ণ শরীর গঠন বিজ্ঞানের, সম্পূর্ণ ঔষধ-প্রয়োগ বিজ্ঞানের, সম্পূর্ণ ঔষধ-পাক বিজ্ঞানের নির্ভুল আবিষ্কার এবং

তৃতীয়তঃ, দেশের মাটি, জল ও হাওয়াতে যাহাতে কোন ক্রমে রোগের বীজাণু প্রকটতালাভ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা—একান্ত প্রয়োজনীয়।

অথচ বর্ত্তমান জগতে কার্য্যক্ষেত্রে বস্তুতঃ কি হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, অর্থগত সমস্যার সর্ব্বাঙ্গীন সমাধান ত' দূরের কথা, প্রত্যেক দেশের প্রায় প্রত্যেক ঘরে ঘরে আর্থিক অভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। শরীর-বিধান, শরীর-গঠন, ঔষধ-প্রয়োগ, ঔষধপাক প্রভৃতি বিষয়ক বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবের অধিকার ও দূরের কথা তাহার চেষ্টা পর্য্যন্ত হইতেছে না। পরন্তু ঐ ঐ বিষয়ের বৈজ্ঞানিকগণ ঐ সমস্ত বিষয়ের উৎকর্ষ সাধন করিবার যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে সম্পূর্ণতা ও নির্ভুলতা লাভ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সমস্ত বিজ্ঞানের নির্ভুলতা ও সম্পূর্ণতা লাভ করিবার একমাত্র উপায় বহির্ম্মুখীনতা (অর্থাৎ যন্ত্রের ব্যবহার) পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্ম্মুখী ও অন্তর্দৃষ্টিযুক্ত হওয়া। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ অন্তর্ম্মুখী অন্তর্দৃষ্টিযুক্ত হওয়া ত দূরের কথা অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ ও রেডিও প্রভৃতির সহায়তায় কার্য্যোদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এই উপায়ে মানুষের শরীরের মধ্যে কি কি আছে এবং তাহার কোন্‌ট কোন্ অবস্থায় কি কি কার্য্য করিতেছে তাহা সম্পূর্ণ ও সঠিক ভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া অসম্ভব।

বাষ্পীয় যন্ত্র ও যানসমূহের অবাধ ব্যবহারে হাওয়া প্রতি-নিয়ত বিষময় বাষ্পে পরিপূর্ণ হইতেছে। তাঁড়িত ও বৈদ্যুতিক শক্তির অবাধ উদ্ভবনে হাওয়ার স্বাভাবিকতা নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং উহা বিকৃতি লাভ করিতেছে। বেতারের অবাধ চাল-চলনে যে গুণগুলির জন্য হাওয়া জীবের স্বাস্থ্যবান্ সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের সহায়ক হয় সেই গুণগুলি অপহৃত হইয়া পড়িতেছে। নদ-নদীসমূহের স্রোতগুলি বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় উহারা জমীর সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত গভীরতা রক্ষা করিতে পারিতেছে না। তাহার ফলে একদিকে নদীর জল কলুষিত হইয়া পড়িতেছে এবং বিষাক্ত কচুরীপানা প্রভৃতির উৎপত্তি হইতেছে; অন্যদিকে নদীর জল সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত গভীর থাকিলে জমীর গর্ভে সর্ব্বত্রই একটী লুক্কায়িত জলস্রোত (undercurrent) বহিতে থাকে এবং উহা মাটির বাষ্পকে বিশুদ্ধ করিয়া দিতে পারে। কিন্তু এক্ষণে নদীসমূহ অগভীর হইয়া যাওয়ায় ঐ জমীগর্ভস্থিত লুক্কায়িত জলস্রোত প্রবাহিত হইতে পারিতেছে না এবং তাহার ফলে সর্ব্বত্রই মাটী বিষাক্ত বাষ্পময় হইয়া পড়িতেছে। ইহার পর আবার আধুনিক বিজ্ঞানের বর্জ্জনোচিত পয়ঃপ্রণালীর (sewerage এর) ফলে সহরের মাটীর গর্ভে সর্ব্বদাই বিষাক্ত বিষ্ঠা লক্ষিত পাকিয়া মাটীকে অধিকতর বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে।

উপরোক্ত অবস্থাগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে যুক্তি-জ্ঞান-যুক্ত মানুষ বলিতে বাধ্য হইবেন যে, ডক্টর সাহা প্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণের প্রভুত্ব যতদিন পর্য্যন্ত বজায় থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত দেশে অস্বাস্থ্য না থাকাই আশ্চর্য্যজনক। ইহাদিগের হাসপাতাল ও ঔষধ বিতরণ প্রভৃতি লোকহিতকর কার্য্য "গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিবার" অনুরূপ।

ইহার পর আমরা মন-গত সমস্যা (অর্থাৎ অশান্তি ও অসন্তুষ্টির সমস্যা) সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

অর্থাভাবের অথবা স্বাস্থ্যাভাবের জ্বালা বিদ্যমান থাকিলে কাহারও পক্ষে মানসিক শান্তি লাভ করা যে কোনক্রমে সম্ভবযোগ্য নহে, ইহা বলাই বাহুল্য। কাজেই বলিতে হইবে যে মন-গত সমস্যার সমাধান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে অর্থ-গত সমস্যা ও স্বাস্থ্য-গত সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। কিন্তু এরূপ মনে করিলে চলিবে না যে অর্থগত সমস্যা ও স্বাস্থ্যগত সমস্যার সমাধান হইলেই মন-গত সমস্যার সমাধান আপনা-আপনি হইয়া যাইবে।

লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে রাজার ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যান্বিত পরম স্বাস্থ্যবান্ মানুষও নানারূপ অশান্তিতে দগ্ধ হইয়া থাকেন। অর্থের প্রাচুর্য্য ও স্বাস্থ্য থাকিলেই যদি অশান্তি ও অসন্তুষ্টির জ্বালা নিবারিত হইতে পারিত, তাহা হইলে স্বাস্থ্যবান ও ঐশ্বর্য্যশালী রাজা অথবা সম্রাটগণকে কখনও মানসিক অশান্তি ভোগ করিতে হইত না।

এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁহারা মনে করেন যে, "ভোগে" অর্থাৎ পান-ভোজন ও আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির আনন্দ উপভোগেই শান্তি পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর উপায়ে ক্ষণিকের জন্য শান্তি পাইলেও, পরক্ষণেই যে অসুস্থতা নিবন্ধন অশান্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইতে হয় এবং এতাদৃশ শান্তি যে কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। কাজেই বলিতে হয় যে, যেরূপ অর্থ ও স্বাস্থ্য থাকিলেই মানসিক অশান্তি ও অসন্তুষ্টি দূর করা যায় না,

সেইরূপ ভোগে অর্থাৎ পান-ভোজন ও আমোদ প্রভৃতির আনন্দ উপভোগেও চিরস্থায়ী শান্তি পাওয়া যায় না।

কেহ কেহ মনে করেন যে, সংসারাশ্রমে থাকিয়াও ত্যাগ অথবা প্রবৃত্তির "নিবৃত্তি" অথবা সংযম অভ্যাস করিতে পারিলেই শান্তি পাওয়া যায়। পূর্ণ মাত্রায় ত্যাগ অথবা প্রবৃত্তির "নিবৃত্তি" অথবা সংযম অভ্যাস করিতে পারিলে যে চিরস্থায়ী শান্তি পাওয়া যায় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই বটে কিন্তু যাঁহারা উহা অভ্যাস করিতে উপযোগী হইয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, আজকালকার মানুষ সাধারণতঃ যে জ্ঞান লইয়া জীবন যাপন করে তাহাতে উহা যৎকিঞ্চিৎ মাত্রায় অভ্যাস করা সম্ভব হয় বটে কিন্তু পূর্ণ মাত্রায় উহা অভ্যাস করা কখনও সম্ভব হয় না। কাজেই বলিতে হয় যে, শান্তি পাওয়ার জন্য যে ত্যাগ-মার্গ অথবা নিবৃত্তি মার্গ অথবা সংযম-মার্গের কথা কওয়া হয় তাহা কথার কথা মাত্র।

কেহ কেহ মনে করেন যে সংসারাশ্রমে থাকিয়া সন্ধ্যা, পূজা, জপ, হোম এবং উপাসনায় সময় কাটাইতে পারিলেই শান্তিতে জীবন কাটান হয়। এই ধারণাও ভ্রান্তিযুক্ত। যাঁহারা এই রাস্তার পথিক হইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছেন যে কেবলমাত্র সন্ধ্যা, পূজা, জপ, হোম এবং উপাসনার মন্ত্র পাঠ করিলেই মনের শান্তি ও সন্তুষ্টি পূর্ণমাত্রায় লাভ করা সম্ভব হয় না। যাঁহাদিগের মন যথাযথ ভাবে প্রস্তুত হয় নাই তাঁহারা সন্ধ্যাদিতে প্রবৃত্ত হইলেও উহার কোনটী যথাযথ ভাবে নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। একদিকে মন্ত্র উচ্চারিত হইতে থাকে, অন্যদিকে অতর্কিতভাবে মন কখনও বা ঝগড়া-কাঁটির, কখনও বা রাগ-দ্বেষের কখনও বা অহঙ্কার-তৃপ্তির চিন্তায় ব্যাপৃত হয় এবং অল্পক্ষণের ভিতর ক্লান্তি আনিয়া দেয়। কাজেই সন্ধ্যা, পূজা, জপ, হোম ও উপাসনায় যে শান্তি পাওয়া যায় বলিয়া বলা হইয়া থাকে, উহাও একটী কথার কথা মাত্র।

কেহ কেহ মনে করেন যে, শাস্ত্রাধ্যয়ন অথবা সদ্গ্রন্থ পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেই শান্তি পাওয়া যায়। শাস্ত্রাধ্যয়ন অথবা সদ্গ্রন্থ পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলে যে সাময়িক শান্তি লাভ করা সম্ভব হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাতে কখনও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি লাভ করা সম্ভবপরপর হয় না। অধিকন্তু যাঁহারা মনকে প্রস্তুত করিতে না পারিয়াছেন তাঁহাদিগের পক্ষে কখনও যথাযথ ভাবে শাস্ত্রাধ্যয়ন করা সম্ভব হয় না। যাঁহারা শাস্ত্রাধ্যয়নে উদ্যোগী হইবার জন্য সচেষ্ট, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, মন প্রস্তুত না হইলে অধ্যয়নের বিষয় হইতে কত দূরে সে অতর্কিত ভাবে কখন যে চলিয়া যায় তাহার নাগাল পাওয়া যায় না।

কেহ কেহ মনে করেন যে, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া তথাকথিত সন্ন্যাস অবলম্বনে তথাকথিত যোগ-তপস্যায় সময় কাটাইতে পারিলেই পূর্ণমাত্রায় শান্তি পাওয়া সম্ভব হয়। এই ধারণাও ভ্রম-প্রমাদ-যুক্ত। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, মন প্রস্তুত করিতে না পারিলে গৃহস্থাশ্রম-পরিত্যাগী তথাকথিত সন্ন্যাসীরও ইন্দ্রিয়ের দাবী-দাওয়া সমান ভাবেই থাকিয়া যায়। 'মন' কাহাকে বলে এবং 'মন' কি করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় তদ্বিষয়ক তথ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রথমতঃ পিতার পিতৃত্ব, মাতার মাতৃত্ব, ভ্রাতার ভ্রাতৃত্ব, ভগ্নীর ভগ্নীত্ব, সহধর্ম্মিণীর সহধর্ম্মিণীত্ব, পুত্রের পুত্রত্ব, দুহিতার দুহিতৃত্ব, পুত্রবধূর পুত্রবধূত্ব, জামাতার জামাতৃত্ব এবং দ্বিতীয়তঃ সমগ্র ধার্ম্মিক মানব-সমাজের বন্ধুত্ব লাভ করিবার সৌভাগ্যে ভাগ্যবান্ না হইতে পারিলে কখনও মনকে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত করা সম্ভবযোগ্য হয় না। এই তথ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, গৃহস্থাশ্রম-পরিত্যাগী চিরকুমার সন্ন্যাসীর জীবন এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে তাহার মন সর্ব্বদাই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অসম্পূর্ণ মন যে কখনও সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত-যোগ্য নহে, ইহা বলাই বাহুল্য।

উপরোক্তভাবে ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, মনগত সমস্যা অর্থাৎ মানসিক অশান্তি ও অসন্তুষ্টি দূর করিবার জন্য প্রচলিত ধারণানুসারে যে যে পন্থা বিদ্যমান আছে তাহার প্রত্যেকটী অল্পাধিক পরিমাণে অসার অর্থাৎ ঐ সকল উপায়ের দ্বারা কখন কখন শান্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব হয় এবং কখন কখন হয় না। তাহা হইলেই বলিতে হইবে যে, উহার কোনটীর দ্বারা সর্ব্বতোভাবে শান্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব হয় না।

এক্ষণে প্রশ্ন—কোন্ উপায়ের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে শান্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব হইতে পারে?

আগেই দেখান হইয়াছে যে, মনকে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত করিতে না পারিলে কোন পন্থাতেই সর্ব্বতোভাবে শান্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব হয় না। ইহার দ্বারা বুঝিতে হয় যে, মনকে প্রস্তুত করিতে পারিলে সকল পন্থাতেই এবং সর্ব্বাবস্থাতেই শান্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। কাযেই প্রশ্ন করিতে হইবে মনকে প্রস্তুত করিতে পারা যায় কোন্ পন্থায়। বলা বাহুল্য যে, মনটী যে কি বস্তু তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে মনকে প্রস্তুত করা কখনও সম্ভব হয় না। সুতরাং ধরিয়া লইতে হইবে যে, সর্ব্বতোভাবে শান্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করিতে হইলে মনটী যে কি বস্তু তাহা সর্ব্বাগ্রে উপলব্ধি করিতে হইবে। মনটী যে কি বস্তু তাহা উপলব্ধি করা শিক্ষা ও সাধনা-সাপেক্ষ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, মন গত সমস্যা সর্ব্বতোভাবে সমাধান করিবার উপায় তিনটী, যথা :—

(১) অর্থ-গত সমস্যার সমাধান।

(২) স্বাস্থ্যগত সমস্যার সমাধান এবং—

(৩) যে শিক্ষা ও সাধনায় মনটী যে কি বস্তু তাহা উপলব্ধি করা যায় সেই শিক্ষা ও সাধনার আশ্রয় লওয়া।

কোন্ শিক্ষা ও সাধনায় মনটী যে কি বস্তু তাহা উপলব্ধি করা যাইতে পারে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে ইংরাজী, জার্ম্মান, ফ্রেঞ্চ, ল্যাটীন, গ্রীক, ও আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মনতত্ত্ব বিষয়ক যে যে গ্রন্থ বিদ্যমান আছে—তাহার কোন গ্রন্থের কোন লেখায় ঐ শিক্ষা ও সাধনার কোন তথ্য লিপিবদ্ধ হয় নাই। যে শিক্ষা ও সাধনায় মনটী যে কি বস্তু তাহা উপলব্ধি করা যাইতে পারে সেই শিক্ষা ও সাধনায় অভ্যস্ত হইতে পারিলে প্রতিভাত হইবে যে, ইংরাজী, জার্ম্মান্, ফ্রেঞ্চ, ল্যাটীন, গ্রীক ও আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মনতত্ত্ব বিষয়ক যে যে গ্রন্থ বিদ্যমান আছে উহার প্রায় প্রত্যেকখানি অল্পাধিক পরিমাণে গ্রন্থকারের আত্ম-প্রতারণা, কপটতা ও গণ্ড-মূর্খতার পরিচায়ক। আমাদিগের উপরোক্ত কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, বর্ত্তমান মানব-সমাজ একটী প্রকাণ্ড গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে জীবন যাপন করিতেছে এবং বর্ত্তমান মানবসমাজে যাঁহারা দার্শনিক বলিয়া বিকাইতেছেন তাঁহাদিগের বিদ্যা যাহাতে প্রসার লাভ না করে, অপরিণত বুদ্ধির যুবকগণ যাহাতে ঐ বিদ্যা লাভ করিবার প্রয়াসী না হয়, কোন বিদ্যালয়ে যাহাতে আধুনিক দার্শনিকগণের দার্শনিক বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া না হয়, তাহা সমাজের প্রত্যেক মঙ্গল-কামীর সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

যে শিক্ষা ও সাধনায় মনটী যে কি বস্তু তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া ও উপলব্ধি করা সম্ভবযোগ্য হয় তাহার সম্যক্ সন্ধান রহিয়াছে, ভারতীয় ঋষি-প্রণীত ন্যায়বিদ্যার অর্থাৎ সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনে এবং ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদে। এই কথায় কেহ যেন বুঝিয়া লন না যে, ঐ সাতখানি গ্রন্থের যে কোন একখানি, অথবা দুইখানি, অথবা তিনখানি, অথবা চারখানি, অথবা পাঁচখানি, অথবা ছয়খানি গ্রন্থের সহিত পরিচিত হইতে পারিলেই মন যে কি বস্তু তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া ও উপলব্ধি করা সম্ভবযোগ্য হইবে। মন যে কি বস্তু তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া উপলব্ধিযোগ্য করিতে হইলে উপরোক্ত সাতখানি গ্রন্থের প্রত্যেকখানির সহিত যথাযথ অর্থে ও সম্যক্ ভাবে পরিচিত হইতে হইবে এবং তদুপদিষ্ট অভ্যাসে অভ্যস্ত হইতে হইবে। যাঁহাদিগের এতাদৃশ ধৈর্য্য ও সামর্থ্য নাই তাঁহাদিগকে যাঁহারা ঐ সাতখানি গ্রন্থের সহিত পরিচিত এবং তদুপদিষ্ট অভ্যাসে অভ্যস্ত তাঁহাদিগের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

ঋষি প্রণীত ন্যায়বিদ্যা ও শ্রুতি ছাড়া প্রাচীন আরবী ও হিব্রুভাষায় লিখিত কোন কোন গ্রন্থে মনতত্ত্ব বিষয়ক সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া অনুমান করিবার কারণ আছে। প্রাচীন আরবী ও প্রাচীন হিব্রুভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থের সহিত আমরা সম্যক্‌ভাবে পরিচিত নহি। আমাদিগের বিশ্বাস এই দুই ভাষায় লিখিত বহু গ্রন্থ এখনও লুপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

মানুষের প্রায় প্রত্যেক বাক্যে (যথা "আমার মন বড় চঞ্চল হইয়াছে," "ইহা আমার মনে হয় না", "তুমি কি মনে কর") 'মন' সম্বন্ধে কোন না কোন কথা বলা হইয়া থাকে। কাযেই 'মন' যে একটি মানুষের অবয়বের মধ্যের কোন না কোন কিছু, তাহা নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অথচ মানুষ 'মন' যে কি বস্তু তাহা জানে না এবং উপলব্ধি

করিতে পারে না। ইহা মানুষের অত্যন্ত অসামর্থ্যের পরিচায়ক।

মন যে কি বস্তু তাহা এক কথায় নির্ভুলভাবে বলিতে হইলে যে ভাষার ব্যবহার করিতে হইবে সেই ভাষার সহিত আধুনিক মানবসমাজ পরিচিত নহে। ইংরাজী, বাংলা প্রভৃতি লৌকিক ভাষায় উহা বলা সম্ভব নহে।

মোটামুটিভাবে বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে, "যে কর্ম্মের দ্বারা মানুষ সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে সেই সমস্ত কর্ম্ম মানুষ তাহার যে বৃত্তিদ্বারা অনুভব করে সেই বৃত্তির নাম মানুষের 'মন,' আর, "যে যে কর্ম্মের দ্বারা মানুষ সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া সেই সেই কর্ম্ম কেন সংঘটিত হয় এবং সেই সেই কর্ম্মের গাণিতিক নিয়ম কি কি তাহা মানুষ তাহার যে বৃত্তির দ্বারা অনুভব করে সেই বৃত্তির নাম মানুষের বুদ্ধি।" 'মন' ও 'বুদ্ধি'র উপরোক্ত সংজ্ঞা আমরা একণে কয়েকটি উদাহরণের দ্বারা পাঠকবর্গকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

ধরুন, আমি একজনের সহিত প্রেমের সম্বন্ধে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়াছি। তখন ঐ মানুষটী আমার চোখে কি কি রূপে প্রতিভাত হয় তাহা আংশিকভাবেই হউক অথবা পূর্ণভাবেই হউক বর্ণনা করা মনের কার্য্য। কেন ঐ ঐ রূপে প্রতিভাত হইতেছে অথবা উহার গাণিতিক নিয়ম কি কি তাহা নির্ণয় করা বুদ্ধির কার্য্য। আবার, যখন আমি একটি মানুষের সহিত প্রেমের সম্বন্ধে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়াছি তখন আমার শরীর-গঠন ও শরীর-বিধানে কি কি অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া এবং ঐ অবস্থা আংশিক হউক অথবা পূর্ণভাবেই হউক বর্ণনা করা মনের কার্য্য। আমার শরীর বিধানে ও শরীর গঠনে কেন ঐ ঐ অবস্থা প্রতিভাত হইতেছে অথবা উহার গাণিতিক নিয়ম কি কি তাহা নির্ণয় করা বুদ্ধির কার্য্য। তাহার পর আবার, যখন আমি একটি মানুষের সহিত প্রেমের সম্বন্ধে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়াছি তখন আমার নাসিকার মধ্যে বায়ু কি কি বিশেষ ভাব লইয়া প্রবিষ্ট হইতেছে এবং আবার নির্গত হইতেছে তাহা স্থির করা এবং উহার বর্ণনা করা মনের কার্য্য। বায়ুর ঐ ঐ বিশেষ ভাব কেন উদ্ভূত হইতেছে এবং উহার গাণিতিক নিয়ম কি তাহা নির্ণয় করা বুদ্ধির কার্য্য। মোটের উপর বুঝিয়া রাখিতে হইবে মানুষের "মন" ও "বুদ্ধি" অত্যন্ত ব্যাপক। উহা যেমন, যাহা লইয়া সর্ব্বদা মানুষ চলা-ফেরা করে তাহার প্রত্যেকটীর মধ্যে নিহিত থাকে সেইরূপ আবার উহা বিশ্ব-দুনিয়ার সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। "মন" ও "বুদ্ধি" কি বস্তু তাহা বুঝিবার ও উপলব্ধি করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে ঋষি-প্রণীত "সম্বন্ধ-দর্শন" সর্ব্বাগ্রে অধ্যয়ন করিতে হয়। মন ও বুদ্ধি নিজের অবয়বের মধ্যে উপলব্ধি করিতে না পারিলে কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানে নির্ভুলভাবে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভব হয় না। ঋষি-প্রণীত "সম্বন্ধ-দর্শন" অধ্যয়ন করিয়া সাংখ্যদর্শন অধ্যয়ন করিতে পারিলেই "মন" ও "বুদ্ধি" যে কি বস্তু তাহা অনুমান করা যায় কিন্তু তখনও তাহা প্রত্যক্ষ হয় না অর্থাৎ মন ও বুদ্ধিকে উপলব্ধি করা যায় না। এই মাত্র বুঝা যায় যে, মন ও বুদ্ধি এই দুইটী পদার্থ মানুষের দুইটী বৃত্তি মাত্র। এই দুইটী বৃত্তির মূলে যেমন মানুষের অবয়ব বিদ্যমান আছে, সেইরূপ আবার বিশ্ব-দুনিয়া ব্যাপী বায়ু, অগ্নি ও বহ্নির পঞ্চবিধ কর্ম্ম ও রাসায়নিক সংমিশ্রণও বিদ্যমান আছে।

মন ও বুদ্ধি প্রত্যক্ষ করিতে হইলে অর্থাৎ নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে পাতঞ্জলসূত্রের আশ্রয় লইয়া তদুক্ত কার্য্য সমূহে প্রবত্নশীল হইতে হয়। পাতঞ্জল সূত্রোক্ত সাধনায় প্রবত্নশীল হইলে দেখা যাইবে যে ঐ সমস্ত সাধনার সহায়তায় মন ও বুদ্ধিকে নিজের মধ্যে কথঞ্চিৎ পরিমাণে উপলব্ধি করা যায় বটে, কিন্তু সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা যায় না। পাতঞ্জল সূত্রের সাধক হইলে আরও দেখা যাইবে যে, বিশ্ব-দুনিয়াব্যাপী যে বায়ু, অগ্নি ও বহ্নি বিদ্যমান আছে তাহাদিগের পঞ্চবিধ কর্ম্ম ও রাসায়নিক সংমিশ্রণের গাণিতিক নিয়ম উপলব্ধি করিতে না পারিলে মন ও বুদ্ধিকে সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করা যায় না। বিশ্ব-দুনিয়াব্যাপী যে বায়ু, অগ্নি ও বহ্নি বিদ্যমান আছে তাহাদিগের পঞ্চবিধ কর্ম্ম ও রাসায়নিক সংমিশ্রণের গাণিতিক নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে কণাদ-সূত্রে অর্থাৎ বৈশেষিক দর্শনে। কণাদ-সূত্র অধ্যয়ন করিলে বিশ্ব-দুনিয়াব্যাপী বায়ু, অগ্নি ও বহ্নির পঞ্চবিধ কর্ম্ম ও রাসায়নিক সংমিশ্রণের গাণিতিক নিয়ম পরিজ্ঞাত হওয়া যায় বটে কিন্তু ঋক্, সাম ও যজু এই তিনটী বেদের অভ্যাস সমূহে অভ্যস্ত না হইতে পারিলে উহা ( অর্থাৎ বায়ু, অগ্নি ও বহ্নির পঞ্চবিধ কর্ম্ম ও রাসায়নিক সংমিশ্রণ ) প্রত্যক্ষ করা যায় না অর্থাৎ উপলব্ধিযোগ্য হয় না। উহা প্রত্যক্ষ

করিবার সর্ব্বশেষ পন্থা ঋক্, সাম ও যজু এই তিনটী বেদের অভ্যাসসমূহে অভ্যস্ত হওয়া। ঋক্, সাম ও যজু এই তিনটী বেদের অভ্যাসসমূহে অভ্যস্ত হওয়া অতীব দুরূহ। ঐ অভ্যাসসমূহে অভ্যস্ত হইতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে শব্দের সহিত আকাশ, বায়ু, অপ্ ও বহ্নির কি সম্বন্ধ তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হয় ও উপলব্ধি করিতে হয়। শব্দের সহিত আকাশ, বায়ু, অপ্ ও বহ্নির কি সম্বন্ধ তাহা পরিজ্ঞাত হইবার ও উপলব্ধি করিবার নাম শব্দব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করা। উহা (অর্থাৎ শব্দ-ব্রহ্ম) প্রত্যক্ষ করার একমাত্র উপায় ঋষি-প্রণীত তন্ত্রোক্ত পূজা, জপ ও হোমে অভ্যস্ত হওয়া। শব্দের সহিত আকাশ, বায়ু, অপ্ ও বহ্নির কি সম্বন্ধ তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে অর্থাৎ শব্দ-ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে বেদে প্রবেশযোগ্য হইতে পারা যায়। যিনি শব্দ-ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিতে পারেন তাঁহার নাম "ব্রাহ্মণ"। ইহাইই জন্য বলা হয় যে, ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেহ বেদের অধিকারী নহে। বেদে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক বেদের প্রত্যেক অধ্যায় প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর মন্ত্রে বিভক্ত। একশ্রেণীর মন্ত্রে কতকগুলি অব্যক্ত (unmanifested, যাহা হইতে ব্যক্তি অথবা manifestation সংঘটিত হইতেছে) প্রাকৃতিক সত্তার (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী প্রাকৃতিক কর্ম্ম ও রাসায়নিক সংমিশ্রণের) বর্ণনা করা হইয়াছে এবং আর এক শ্রেণীর মন্ত্রে ঐ অব্যক্ত প্রাকৃতিক সত্তাগুলি (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী প্রাকৃতিক কর্ম্ম ও রাসায়নিক সংমিশ্রণের গাণিতিক নিয়মগুলি) কি করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। শব্দ-ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়া বেদে প্রবিষ্ট হইতে পারিলেও বেদার্থ গ্রহণে ও বেদের অভ্যাস-পদ্ধতিতে ভ্রম হইতে পারে। বেদার্থ গ্রহণে যাহাতে ভুল না হয় তাহার জন্য কণাদ-সূত্র ও গৌতম-সূত্র এবং বেদের অভ্যাস-পদ্ধতিতে যাহাতে ভ্রম না হয় তাহার জন্য দুইটী মীমাংসা রচিত হইয়াছে।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, "মন" ও "বুদ্ধি" এই দুইটী পদার্থকে সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে সর্ব্ব-প্রথমে কপিল-সূত্র, তাহার পর পাতঞ্জল-সূত্র অধ্যয়ন করিতে হয়। তাহার পর তন্ত্রোক্ত পূজা, জপ ও হোমে অভ্যস্ত হইয়া শব্দ-ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিতে হয়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে কণাদ-সূত্র, গৌতম-সূত্র, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা অধ্যয়ন করিতে হয়। সর্ব্বশেষে ত্রয়ীর (অর্থাৎ ঋক্, সাম ও যজু এই তিনটী বেদের) অধ্যয়ন ও অভ্যাস করিতে হয়।

সুতরাং উপরোক্ত শিক্ষা ও সাধনাকেই মন-গত সমস্যা সর্ব্বতোভাবে সমাধান করিবার একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে।

অনেকে ঐ শিক্ষা ও সাধনাকে একটা কাল্পনিক আধ্যাত্মিক সাধনা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যে শিক্ষা ও সাধনায় মন ও বুদ্ধি এই দুইটী পদার্থকে সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় সেই শিক্ষা ও সাধনাকে আত্মাধি-করণের শিক্ষা ও সাধনা এবং এই অর্থে আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সাধনা বলিতে হয় বটে, কিন্তু উহা কখনও কাল্পনিক নহে। কেহ কেহ যে আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে বাস্তব মনে না করিয়া কাল্পনিক মনে করিয়া থাকেন তাহার কারণ, ইঁহারা "আত্মা" শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তাহা যথাযথ সম্যক্‌ভাবে ধারণা করিতে পারেন না। গৌতম-সূত্রের "ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ-জ্ঞানানি আত্মনো লিঙ্গং" এই সূত্রটী যথাযথ-ভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যাহা জীবের ইচ্ছা-দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ, এবং জ্ঞানের বীজ, তাহার নাম উহার "আত্মা"। কাজেই "আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সাধনা" বলিতে বুঝিতে হয় যে, জীবের ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞানের উৎপত্তি হয় কেন এবং কিরূপে তৎসম্বন্ধীয় শিক্ষা লাভ করা এবং সাধনায় অভ্যস্ত হওয়া। "আত্মার" উপরোক্ত সংজ্ঞাটী যথাযথভাবে ধারণা করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রকৃত জীব-বিজ্ঞানকেই সংস্কৃত ভাষায় আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান বলা হইয়া থাকে। সমন্বয়-দর্শন, কপিলসূত্র, পাতঞ্জল-সূত্র, তন্ত্র, কণাদ-সূত্র, গৌতম-সূত্র, দুইটী মীমাংসা ও তিনটী বেদ যথাযথ ভাবে অধ্যয়ন ও অভ্যাস করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে উহাতে আপামর সমস্ত জীব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান আধুনিক বৈজ্ঞানিকের কল্পনাতীত ভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বর্ত্তমান কালে এই জীব-বিজ্ঞান লুক্কায়িত রহিয়াছে বলিয়াই আজ-কালকার মানুষে জীব-সম্বন্ধীয় কোন তথ্য যথাযথ ভাবে জানিতে পারিতেছে না এবং নানা রকম দুঃখে ও পশুভাবে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই বিজ্ঞান জানিতে পারিলে দেখা যাইবে যে পাশ্চাত্য বায়োলজি (Biology) জীব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটী

প্রহসন ( farce ) মাত্র। ঋষি-প্রণীত আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানকে যে কারণিক বলিয়া মনে করা হয় তাহার কারণ এখন আর কেহ ভারতীয় ঋষির ভাষা সম্যক্ ভাবে বুঝিতে পারেন না এবং তাহার ফলে ঋষি-প্রণীত কোন গ্রন্থই কাহারও পক্ষে সম্যক্ ভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না। মানুষের অর্থগত ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা কোন্ অবস্থায় কিরূপ ভাবে সমাধান করিতে হইবে তাহার মূল সূত্রও ঋষি-প্রণীত এই আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানেই নিহিত আছে।

ইহার পর আমরা যৌবন-গত ও মরণগত সমস্যার আলোচনা করিব।

একমাত্র আধ্যাত্মিক-বিজ্ঞানের সহায়তাতেই যে জাতীয় জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধান সর্ব্বতোভাবে সম্ভব-যোগ্য, তাহা প্রসঙ্গতঃ বলা হইল বটে কিন্তু ঐ সম্বন্ধে এখনও অনেক কথা বলিবার বাকী আছে।

[ ক্রমশঃ

## বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতীয় জাতীয় মহাসভার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ

কোন নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় কোন ব্যষ্টি কিংবা সমষ্টির কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইলে যে-উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত ঐ ব্যষ্টি কিংবা সমষ্টি কার্য্য করিতেছেন এবং যে-জন্য তাহার অস্তিত্ব, তদ্বিষয়ে সতত সজাগ থাকিবার নিতান্ত প্রয়োজন। ইহা অতি সহজবোধ্য। কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত কার্য্য করা হইতেছে এবং কি নিমিত্ত অস্তিত্ব, তৎসম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট না রাখিলে, বিভিন্ন কার্য্যাবলী উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল না-ও হইতে পারে এবং ফলে সময়ের অপব্যবহার ঘটিতে পারে। এই সত্য অনুযায়ী, কংগ্রেসের চরম উদ্দেশ্য কি, তাহা সতত মনে রাখা প্রয়োজন।

পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন, ভারতীয় জাতীয় মহাসভার চরম উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, আমরা সকলেই ইহা জানি।

সুতরাং প্রথমেই প্রশ্ন উঠিতেছে যে, "বর্ত্তমানে যেরূপ ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়া ভারতীয় জাতীয় মহাসভা যে-ভাবে অগ্রসর হইতেছে, তদ্দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইতে পারে কি না?"

এই প্রশ্নের উত্তর দান করিতে হইলে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অবস্থায় বর্ত্তমানে কোন্ কোন্ ঘটনা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহা মনে রাখিতে হইবে। নিম্নলিখিত রূপে এই সকল ঘটনা উল্লিখিত হইতে পারে :—

(১) কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দান-বিষয়ক সুস্পষ্ট ঘোষণা দাবী করা হইতেছে, কিন্তু ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ কেবল ডোমিনিয়ম ষ্টেটাস দানে স্বীকৃত হইয়াছেন।

(২) শাসনতন্ত্র-সম্বন্ধীয় নূতন ব্যবস্থা প্রণয়নে কংগ্রেস অ-বাধ অধিকার দাবী করিয়াছেন, কিন্তু ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের আনীত প্রস্তাবে কতিপয় বাধার উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৩) ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতা যাহাতে অনতিবিলম্বে কার্য্যকরী হইতে পারে, তাহার সূচনা হিসাবে কংগ্রেস কেবল ভারতবাসিগণের বিশ্বাস উৎপাদনে সমর্থ একটি "অস্থায়ী জাতীয় সরকার (provisional National Government)" দাবী করিতেছেন, কিন্তু ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ প্রধানতঃ বড়লাটের বিশ্বাস উৎপাদনে সমর্থ "বড়লাটের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির একটি বিস্তৃত সংস্করণ", তথা একটি "যুদ্ধবিষয়ক পরামর্শ-দান সভা" প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন।

(৪) তাঁহাদের দাবী সম্পূর্ণভাবে মানিয়া না লইলে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কিংবা প্রাদেশিক সরকার পরিচালনায় কোন প্রকার অংশগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, কিন্তু মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, এবং লিবারেল ( liberal ) দল মোটামুটিভাবে বর্ত্তমান সরকার পরিচালনায় এক প্রকার সহযোগিতা করিতে স্বীকার পাইয়াছেন।

উল্লিখিত ঘটনাবলী দেখিয়াও, কংগ্রেস বর্ত্তমান সরকারের সহিত অসহযোগিতার নীতি অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া যদি স্থাণুর ন্যায় বসিয়া থাকে, তবে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পথে কি

ভাবে বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হওয়া সম্ভব তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। অবশ্য পূর্ণ স্বাধীনতা যদি সহসা গণবিপ্লব অবলম্বন করিয়া আসিয়া কংগ্রেসের মহামতি নেতৃবৃন্দের পাদদেশ স্বেচ্ছায় চুম্বনাঙ্কিত করে, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা।

হের হিটলারের ভয়ে ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের নিকট নতজানু হইতে বাধ্য হইবেন এবং তাঁহারা যাহা চাহিবেন তাহাই দান করিবেন, এমন কথা ভাবা হইয়া থাকিলে, উহা মেসার্স গান্ধী-পটেল কোম্পানীর কল্পনাশক্তির উপযুক্তই হইয়াছে, কিন্তু আমরা এমন কথা ভাবিবার যুক্তি খুঁজিয়া পাই না।

জার্মানগণের ব্রিটিশদিগকে পরাজিত করিবার সকল সম্ভাবনা বর্তমান এবং জার্মান জাতি আসিয়াই ভারতকে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ভাবে স্বাধীনতা হাতে তুলিয়া দিবে, সুতরাং কংগ্রেসের কিছুই করিবার প্রয়োজন নাই, এমন কথা ভাবা হইয়া থাকিলে, মেসার্স গান্ধী-জওহরলাল-কোম্পানীর রাষ্ট্রনীতিবেত্তৃত্বেরই তাহা উপযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু বর্তমান সরকারের মূলোচ্ছেদ হইলে, তাহার ফলে অনতি-বিলম্বে অরাজকতা ব্যতীত আর কিছু ঘটিতে পারে বলিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি না।

যুদ্ধের বর্তমান অবস্থা বিচার করিবার উপযোগী অন্তর্দৃষ্টি যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসেই স্বীকার করিবেন যে, ব্রিটিশদিগের ন্যায় যাঁহারা সকল প্রকার দুর্বিপাকের সম্মুখীন হইতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন, এইরূপ কোন জাতিকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করা আপাতভাবে যত সহজ মনে হইতে পারে, বস্তুতঃ তত সহজ নহে। তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়া লওয়াও যায় যে, ব্রিটিশ জাতি জার্মানগণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইবেন এবং জার্মানগণ ভারত সরকারের অধিকারী হইবেন, তথাপি হিটলার যে ভারত সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ভারতীয় নেতৃবৃন্দের হস্তে আরোপ করিবেন, এমন প্রত্যাশা পোষণ করিবার আমরা কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। উপরন্তু শাসন-পরিচালনায় হের হিটলার যে নীতি অনুযায়ী চলেন, তাহা যথার্থভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ভারত-শাসনের কর্তৃত্ব তিনি সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়া চলিবেন এবং অনাহার ও বেকার-সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে ব্রিটিশজাতির শাসন অপেক্ষা তাঁহার শাসনের ফল কোন প্রকারে উৎকৃষ্টতর হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহা না হইলে বিগত যে ছয় বৎসর কাল ধরিয়া জার্মানীতে তাঁহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে হের হিটলার জার্মান জাতির অনাহার ও বেকার-সমস্যার সমাধানের কোন সুব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া দেখা যাইত। কিন্তু যথার্থ অনুসন্ধিৎসু হইলে দেখা যাইবে যে, এই ক্ষেত্রে হিটলার বস্তুতঃ কিছুই করেন নাই, মাত্র কতিপয় ধনীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। হের হিটলারের শৈশব দরিদ্রদিগের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে সুতরাং তাহাদের সহিত তাঁহার সমপ্রাণতা বিদ্যমান থাকিলেও থাকিতে পারে। এ-বিষয়ে তাঁহার ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের সহিত কোন সাদৃশ্য নাই। ইঁহারা সকলেই ধনীর সন্তান। কিন্তু তাই বলিয়া এমন মনে করা চলে না যে, দরিদ্রদিগকে তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা হইতে নিষ্কৃতি দান করিতে হইলে যে-যোগ্যতার অধিকারী হইতে হইবে, হিটলার তাহার অধিকারী।

এইভাবে চিন্তা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, কংগ্রেস যদি নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকে তবে ভারতের হইয়া কোন প্রকার স্বাধীনতালাভে কংগ্রেস সমর্থ হইবে না।

বর্তমানে যে-সকল সরকার কার্যকরী রহিয়াছে, তাহাদের সহিত সম্পূর্ণ অসহযোগিতা করিয়াও কংগ্রেস তাহার কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধি করিতে পারে না। কেন না, কংগ্রেস অ-সহযোগ করিলে, মুসলীম লীগ, হিন্দু মহাসভা এবং লিবারেল দল সরকার অধিকার করিতে পারেন। ইহার ফলে, কংগ্রেস যদি স্বাধীনতা-লাভে ইচ্ছুক হইয়া স্বতন্ত্র কোন উপায় অবলম্বনের বিষয় চিন্তা করেন, তবে দেশের মধ্যে মারাত্মক অনৈক্যের সৃষ্টি হইবে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা অথবা লিবারেল দল দেশের অনাহার ও বেকার সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন, এমন ভরসা থাকিলে, বর্তমান কংগ্রেস যদি বিনষ্টও হইয়া যাইত, তাহা হইলেও জন-সাধারণের কিছু যাইত আসিত না। কিন্তু মূলে যে-মনোভাব বশতঃ মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, লিবারেল দলের প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির আরম্ভ, তাহা যথার্থ ভাবে অনুধাবন করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, এই সকল প্রতিষ্ঠান কখনও দেশের জন-সাধারণের বেকার এবং অনাহার সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন এমন প্রত্যাশা

করা যায় না। এই সকল প্রতিষ্ঠানের যাহারা অন্তর্ভুক্ত, তাঁহাদিগকে যে-সমস্যা যারা প্রপীড়িত হইতে হইতেছে, বড় জোর তাহার সমাধানের ইহারা চেষ্টা করিতে পারেন, মাত্র ইহাই আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা সফলকাম হইতে পারিবেন না। কেন না, দেশের সমগ্র অধিবাসী-সংখ্যার যাহারা অধিকাংশ অর্থাৎ শতকরা প্রায় নব্বই জন, সেই শ্রমজীবী জন-সাধারণের অনাহার ও বেকার সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান না হইলে, আর কোন সম্প্রদায়ের কোন সমস্যারই সম্পূর্ণ সমাধান সম্ভব হইবে না। সুতরাং মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা এবং লিবারেল দল, সকলেরই ত্রুটি থাকিলেও, কংগ্রেসের কু-নেতৃত্বের সংশোধনকল্পে মুসলিম লীগের সার্থকতা বিদ্যমান। কিন্তু অপর দুইটি প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের যদি দেশের জন-সাধারণ বলিতে বিন্দুমাত্রও সমপ্রাণতা থাকে, তবে যত শীঘ্র সম্ভব তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের মূলোচ্ছেদ তাঁহাদের করা উচিত। নচেৎ দেশের পক্ষে অনিষ্ট-সাধক অনৈক্য সৃষ্টি না করিয়া তাঁহাদিগকে শান্তিদান যেদিন সম্ভব হইবে, সেদিন দেশের কার্যে তাঁহারা নির্বুদ্ধিতামূলক কৃতঘ্নতার সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া গুরু দণ্ড লাভ করিবেন। ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই ধনিসন্তান, সুতরাং দরিদ্র জন-সাধারণকে কি পরিমাণ দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করিতে হইতেছে তাহা তাঁহারা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা যদি নিজদিগকে সম্পূর্ণরূপে সংশোধন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প না হন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের স্বদেশের কিংবা এই দেশের জন-সাধারণের অনাহার এবং বেকার সমস্যার যথাযথভাবে সমাধান করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি না। একে তো তাঁহারা দরিদ্রদিগের দুঃখ-কষ্টের পরিমাণ উপলব্ধি করিতে পারেন না, তদুপরি কুজ্ঞান এবং কুসংগঠনপদ্ধতির মোহে তাঁহারা এমন ভাবেই আবদ্ধ যে, যে-বিজ্ঞান এবং সংগঠন-পদ্ধতি নিশ্চিত প্রত্যেক শ্রেণীর দুঃখ-দুর্দশা দূর করিতে সমর্থ, তাঁহাদের মস্তিষ্ক তাহার ধারণা পর্যন্ত করিতে পারে না।

সুতরাং দাঁড়াইতেছে যে, কেবল ভারতীয় জাতীয় মহাসভাই একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান—দেশের জনসাধারণকে তাহাদের সকল জরুরী সমস্যার সমাধানার্থে যাহার অপেক্ষা রাখিতে পারে। কিন্তু বর্তমানে কংগ্রেস যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহার ত্রুটী অসংখ্য। বিশেষতঃ তাহার নেতৃবৃন্দই এই সকল ত্রুটির মূল। কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃবৃন্দের প্রথম এবং সর্বপ্রধান ত্রুটি হইতেছে, তাঁহাদের স্বকীয় কোন মৌলিক চিন্তাধারা নাই এবং কোনরূপ ফলাফল বিশ্লেষণ না করিয়া তাঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য পদ্ধতির কার্য-কলাপ অনুসরণ করিয়া থাকেন। কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃবৃন্দ যদি বস্তুতঃই দেশবাসী দরিদ্র জন-সাধারণের হিতসাধক কোন কার্যসাধনে উদ্‌গ্রীব থাকেন, তাহা হইলে প্রথমতঃ, ব্রিটিশ কূটনীতির এই ছলনাহীন এবং সত্যাসত্যবোধশূন্য কার্য-পদ্ধতির অনুকরণ-স্পৃহা তাঁহাদিগকে পরিহার করিতে হইবে এবং ঘটনা ও কার্যের পারম্পর্যমূলক বিচারে কি কারণে কি ঘটিতেছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ অবহিত হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের কু-কার্য হেতু তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিবার, তথা তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করিবার মনোভাব সম্পূর্ণ দমন করিয়া ঐ বিরুদ্ধ ভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, কোন প্রকার দ্বন্দ্ব-কলহের মনোভাব দ্বারা যে, কোন কল্যাণকার্য সাধিত হইতে পারে না, এবং ফলে বিরুদ্ধ পক্ষের বাধাপ্রদান-সত্ত্বেও কি করিয়া দ্বন্দ্ব-কলহ না করিয়াও কোন্ উপায়ে কার্য পরিচালনা করিতে হইবে, কংগ্রেসের প্রত্যেক নেতাকে তাহা শিক্ষা করিতে হইবে—ইহাই তাঁহাদের প্রত্যেক চিন্তা ও কার্যের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত।

কংগ্রেসের নেতৃত্বে ত্রুটি থাকিলেও লক্ষ্যের বিষয় এই যে, দেশের দরিদ্রদিগের দুঃখে সহানুভূতি পোষণ করেন এমন লোকের সংখ্যা—তাঁহারা পশ্চাতে বিরাজ করিলেও—এই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানের সদস্যদিগের মধ্যেই অধিক। সত্য অস্বীকার না করিলে দেখা যাইবে যে, কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানে দেশবাসী দরিদ্রদিগের দুঃখে প্রকৃত সহানুভূতি-সম্পন্ন যে-সংখ্যক সদস্য বর্তমান, অপর তিনটি প্রতিষ্ঠানে, অর্থাৎ মুসলিম লীগে, হিন্দু মহাসভায় এবং লিবারেল দলে, তাহার শতকরা একাংশও নাই। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যদি মনে-প্রাণে বুঝিয়া লইতে পারেন যে, কল্যাণ-কার্যে দ্বন্দ্ব-কলহের মনোভাব কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারে না, তবে সরকারের সহিত অসহযোগিতার মনোভাব বর্জন

করিয়া অনতিবিলম্বে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ, তথা বড়লাট-বাহাদুরের প্রস্তাবিত তাঁহার কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় এবং যুদ্ধ-বিষয়ক পরামর্শ-সভায় যোগদান করিতে স্বীকৃত হওয়া উচিত। রাষ্ট্রনৈতিক দিক্ হইতে কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী সোষাবহ, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কংগ্রেস ঐ দাবী পরিহার না করিয়াও ঘোষণা করিতে পারেন যে, বন্ধ-কল্পের মনোভাব পোষণ করিতে তাঁহারা ঘৃণা বোধ করেন, সুতরাং বড়লাট বাহাদুরের প্রস্তাবকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার কার্য্যে তাঁহারা সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত। এই ভাবে, ব্যবস্থাপক-সভায় পুনঃ-প্রবেশ এবং যুদ্ধ-বিষয়ক পরামর্শ সভা, তথা বড়লাট বাহাদুরের বিস্তৃততর কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় প্রবেশ করাই কংগ্রেসের কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা হইলেও তথায় তাঁহাদিগের কোন দায়িত্বমূলক পদগ্রহণ করা সাধারণতঃ উচিত হইবে না; ঐ সকল পদে যাহাতে মুসলমান এবং তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের ব্যক্তিবৃন্দ অধিষ্ঠিত হইতে পারেন, এতদ্বিষয়ে কংগ্রেসের সকল প্রকার সাহায্য করা উচিত। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সাধারণতঃ যাহাতে কোন দায়িত্বমূলক পদ গ্রহণ না করেন, কংগ্রেস-কর্ত্তৃক কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে এই নির্দ্দেশমূলক বিধি জারী হওয়া উচিত। কিন্তু মুসলমান ও তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের সদস্যবৃন্দ যদি সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে কোন দায়িত্ব-সম্পন্ন কার্য্যভার তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে বলেন, তবে তাহা গ্রহণে তাঁহাদের ইতস্ততঃ করা উচিত নহে। কংগ্রেস এই নীতি অবলম্বন করিলে, অনতিবিলম্বে কংগ্রেস সমগ্রভাবে ঐক্যবদ্ধ ভারতবাসীর মুখপাত্রে পরিণত হইবে এবং যে-দেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে পরাধীন, তাহার সর্ব্ববিধ সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত যে-যোগ্যতা অত্যাবশ্যক তাহার অধিকারী হইবে।

প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের এবং বড়লাট বাহাদুরের নিকট কংগ্রেসের সদস্যবৃন্দের প্রধানতঃ দাবী উপস্থিত করিতে হইবে,—যে-সংগঠনমূলক কার্য্যসূচীর দ্বারা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং এদেশের প্রত্যেকটি ব্যক্তি সুস্থ জীবন যাপন পক্ষে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম দ্রব্যসমূহ সুনিশ্চিতভাবে লাভ করিতে পারে, তাহার নির্দ্দেশ তাঁহারা দান করুন। দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেসকে—প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ এবং বড়লাট বাহাদুর যে-সকল প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন, কোনপ্রকার তিক্ততা সৃষ্টি না করিয়া বিচার-বিবেচনা ও যুক্তিতর্কের সাহায্যে তৎসমূহের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অসঙ্গতিসমূহ প্রদর্শন করিতে পারিবে, তথা জন-সাধারণকে বর্ত্তমান বিজ্ঞান এবং সভ্যতার নির্ব্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ করিতে পারিবে—প্রত্যেক প্রদেশে এইরূপ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে কংগ্রেসী সদস্যবৃন্দ এই কার্য্যক্রম অনুসরণে সক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারিলে, তাহাতে যদি আর কিছু না হয়, অন্ততঃ নিম্নলিখিত চারিটি ফল লাভ ঘটিবে :—

(১) ভারতের বুদ্ধিজীবিগণকে যে ব্রিটিশ বিজ্ঞান এবং সভ্যতা ক্রীতদাস মাত্রে পরিণত করিয়া দেশের বুদ্ধিমূলক জড় সিদ্ধ করিয়াছে, তাহা সমূলে উৎপাটিত হইবে।

(২) ভারতের এই বুদ্ধিজীবিগণ যে-মোহপাশে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিবেন এবং কংগ্রেসের উদ্দেশ্য-সিদ্ধিকল্পে অধিকতর ভাবে সুসঙ্ঘবদ্ধ এবং ঐক্যবদ্ধ হইবেন।

(৩) জনসাধারণ যুক্তিসঙ্গত ভাবে এবং বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হইয়া যে-দাবী উপস্থিত করিতেছেন, তাহা যথাযথ ভাবে পূরণ করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন শাসকবৃন্দের সন্ধানলাভ যে ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের মধ্যে করিতে পারিতেছেন না —সমগ্র জগৎ ইহার পরিচয় পাইবে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের যে আর ভারত-শাসনের যোগ্যতা নাই, ইহাতে তাহা প্রমাণিত হইবে এবং তন্নিমিত্ত তাঁহারা নৈতিক ভাবে বিপন্ন বোধ করিবেন কিন্তু ভারতীয়দিগের নৈতিক উৎকর্ষ সংসাধিত হইবে।

(৪) ব্রিটিশ বিজ্ঞান এবং সভ্যতার সম্পূর্ণ নিষ্ফলতা এইরূপে যথাযথভাবে যখন উদ্ঘাটিত হইবে, তখন ভারতবাসীর মস্তিষ্ক এই অপদার্থ বিজ্ঞান এবং সভ্যতার আর অনুকরণ করিতে চাহিবে না, সুতরাং নূতন পন্থার বিষয় চিন্তা করিবার কারণ উপস্থিত হইবে। অর্থাৎ ভারতীয় ঋষিগণের চিন্তাধারার

উত্তরাধিকারী মস্তিষ্কসংস্থাপন্ন ভারতীয়গণ স্বাধীনভাবে চিন্তার প্রেরণা লাভ করিবেন এবং এই মস্তিষ্ক-সামর্থ্যের ফলশ্রুতি কি, অচিরাৎ তাহা পৃথিবী-বাসীর সম্মুখে দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবে।

কংগ্রেসের সদস্যবৃন্দকে "যুদ্ধ-বিষয়ক পরামর্শ সভা"র মহামান্য প্রধান সেনাপতি এবং মহারাজ-বড়লাট বাহাদুরের নিকট প্রথমতঃ দাবী উপস্থিত করিতে হইবে যে, তাঁহারা দেশরক্ষার এইরূপ পরিকল্পনার নির্দ্দেশ দান করুন—যাহাতে মনুষ্যপ্রাণ-মাত্র সংহার না করিয়া এবং দেশবাসীর সম্পত্তির কোন ক্ষতি না করিয়া, ভারতবাসিগণ ভারত, তথা সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের, রক্ষা সাধন করিতে পারে। প্রধান সেনাপতি এবং বড়লাট বাহাদুর এইরূপ কোন পরিকল্পনা উপস্থিত করিতে না পারিলে, —প্রধান সেনাপতি এবং বড়লাট বাহাদুর ভারতীয় জাতীয় মহা-সভার নির্দ্দেশে কার্য্য করিবেন, অকপটে যদি এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, তবে কংগ্রেসের সদস্যবৃন্দই যে উহা করিতে পারিবেন, কংগ্রেসের সদস্যবৃন্দকে অবশ্য তাঁহাদের মতীথ্যগণকে তদ্বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেসের সদস্যবৃন্দকে হের হিটলারের নিকট জানিতে চাহিতে হইবে যে, ভারতবাসিগণ ব্রিটিশ শাসনের বিনিময়ে জার্ম্মানদিগের শাসন মানিয়া লইতে রাজী থাকিলে, ভারত এবং জার্ম্মানীর প্রত্যেকটি অধিবাসী সুস্থভাবে জীবনযাপনপক্ষে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম দ্রব্য সুনিশ্চিতরূপে যাহাতে অর্জ্জন করিতে পারিবে, তদুপযোগী সংগঠনমূলক কি কার্য্যপদ্ধতি তিনি ভারতে প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন।

প্রস্তাবিত যুদ্ধবিষয়ক পরামর্শ-সভায় কংগ্রেসী সদস্যবৃন্দ এই কার্য্যক্রম অনুসরণে দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারিলে, আর কিছু না হউক, অন্ততঃ নিম্নলিখিত ফললাভ ঘটিবে :

(১) ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ যদিপি সগর্ব্বে ঘোষণা করিতেছেন যে, ভারত-রক্ষায় একমাত্র তাঁহারাই সমর্থ, তথাপি অগণিত মনুষ্যপ্রাণ হত্যা এবং দেশবাসীর সম্পত্তির অনিষ্ট সাধন না করিয়া তাঁহারা যে ভারত-রক্ষায় সমর্থ নহেন, সমগ্র ভারতের অধিবাসী ইহার পরিচয় পাইবে এবং তাহা উপলব্ধি করিবে। ভারত-শাসনে স্বকীয় যোগ্যতার দাবী প্রমাণে ইহাই যে ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের প্রধান দাবী, তাহা অবশ্য স্মরণে রাখিতে হইবে।

(২) পৃথিবীবাসী পরিচয় পাইবে যে, মুষ্টিমেয় কোন সঙ্ঘের একটিমাত্র মনুষ্যপ্রাণ সংহার না করিয়া এবং দেশবাসীর সম্পত্তির বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন না করিয়া দেশরক্ষার যে পন্থা, একমাত্র ভারতবর্ষই তাহার অধিকারী।

(৩) কংগ্রেস সদস্যবৃন্দ এই উপায়ে যখন জার্ম্মানীর অধিবাসীবৃন্দের নিকট নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রমাণ উপস্থিত করিবেন যে, সমগ্র জগতের আধিপত্য লাভ করিলেও কি করিয়া জার্ম্মানীর অধিকাংশ অধিবাসী তাহাদের অর্দ্ধাশন এবং বেকার-সমস্যার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে, হের হিটলারের তদুপযোগী কোন পরিকল্পনা নাই, তখন জার্ম্মানীর জন-সাধারণের দৃঢ়চিত্ততা (morale) নিরতিশয় হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে এবং হের হিটলারের নেতৃত্বের প্রকৃত কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে তাহাদের বিশ্বাসের শৈথিল্য উৎপাদনের কার্য্য অনেকাংশে অগ্রসর হইবে। রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-সমূহের পরস্পর যুদ্ধ এবং নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি-শাসিত রাষ্ট্র-সমূহের পরস্পর যুদ্ধের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা বুঝিবার যাঁহাদের সামর্থ্য হইয়াছে, তাঁহারা বুঝিবেন এতদ্দ্বারা কি ফলোদয় হইবে।

মেসার্স গান্ধী-পটেল এণ্ড কোম্পানী দয়া করিয়া তাঁহা-দের দ্বান্দ্বিকতা পরিহারপূর্ব্বক দেখিবার চেষ্টা পাইবেন কি যে, ভারতের আকাশ চারিদিক্ হইতে কিরূপ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে? সর্ব্বনিয়ন্তা এখনও তাঁহাদের চৈতন্যোদয়ের সহায়তা করুন।*

* "দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী"র ৭ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

## কাহারা অধিকতর সাম্প্রদায়িক মনোভাব-বিশিষ্ট—হিন্দু, না মুসলমান ?

বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মিঃ হক্ কিছুদিন হইল মিঃ গান্ধীকে একটি খোলা-চিঠি লিখিয়াছিলেন। কংগ্রেস-প্রাধান্য কালে হিন্দুরা যখন মন্ত্রিত্বে আসীন ছিলেন, তখন তাঁহারা কিরূপ সাম্প্রদায়িক মনোভাব-বিশিষ্ট আচরণ করেন, এই চিঠি লিখিবার স্পষ্টতঃ উদ্দেশ্য তাহাই প্রমাণ করা। মিঃ গান্ধী মিঃ হকের পত্রের উত্তরে মিঃ হক আনীত অভিযোগ খণ্ডনে প্রয়াসী হইয়াছেন। মিঃ গান্ধী নিরপেক্ষ মনোভাব প্রদর্শনের জন্য সচেষ্ট হইলেও, উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ভারতে সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রসারের মূলে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানগণের দায়িত্ব অধিকতর, প্রকারান্তরে এই অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। এই জন্যই আমরা এই প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছি : ভারতে সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রসারের মূলে কাহার দায়িত্ব অধিকতর —হিন্দুর, না মুসলমানের ?

মুসলমানগণ অপেক্ষা উচ্চবর্ণের হিন্দুগণেরই যে ইহার দায় অধিকতর, ইহাই আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত। প্রায় এক সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুদের মধ্যে যে ভাবের আচরণ চলিয়া আসিতেছে, তৎসমূহ সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করিলে, আমাদের অভিমত যে যথার্থ, তাহা সহজেই প্রমাণিত হইবে।

তথাকথিত হিন্দুধর্ম্মে রন্ধনশালায় এবং বাসগৃহে বিড়াল কিংবা ছাগলেরও প্রবেশে আপত্তি নাই। এই তথাকথিত ধর্ম্মানুযায়ী বিড়াল কিংবা ছাগল গৃহে প্রবেশ করিলে হিন্দু-দিগের সে গৃহ পবিত্র করিয়া লইবার প্রয়োজন হয় না কিংবা রন্ধনের বাসন-পত্র ধৌত করিবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু কোন মুসলমান হিন্দুর রন্ধনশালায় কিংবা বাসগৃহে প্রবেশ করিলে, তথাকথিত হিন্দুকে অবিলম্বে—হয় রন্ধনের বাসন-পত্র দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে, নতুবা উহাদিগকে প্রক্ষালিত করিতে হইবে এবং বাসগৃহকেও পুনঃ পবিত্র করিয়া লইতে হইবে। মুসলমানগণের প্রতি তথাকথিত হিন্দুগণ এই ভাবের আচরণ বহুদিন যাবৎ করিয়া আসিতে-ছেন, কিন্তু মুসলমানগণ তাঁহাদের রন্ধনশালায় কিংবা বাসগৃহে হিন্দুরা প্রবেশ করিলে কখনও আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। ইহার অর্থ দাঁড়াইতেছে, গত সহস্র বৎসর ধরিয়া এই তথাকথিত হিন্দুগণ মুসলমানগণের প্রতি, বিড়াল কিংবা ছাগলের উদ্দেশ্যে যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, তদপেক্ষা নিকৃষ্ট আচরণ করিয়া আসিয়াছেন, অথচ মুসলমানগণ হিন্দুদের উদ্দেশ্যে তদ্রূপ উদ্দেশ্যে যেরূপ আচরণ কর্ত্তব্য, তাহাই করিয়া আসিয়াছেন।

মুসলমান কোন ঘরে প্রবেশ মাত্র করিলে তথাকথিত গোঁড়া হিন্দুগণের ঐ ঘরে পানাহার নিষেধ, কিন্তু কোন ঘরে একাধিক হিন্দু থাকিলেও মুসলমানদিগের ঐ ঘরে বসিয়া পানাহার বাধে না।

যত সম্ভ্রান্তই হউন না কেন, কোন মুসলমান কোন তথাকথিত গোঁড়া হিন্দুর সহিত সাক্ষাতে আসিলে উপরে ছাদ আছে এরূপ কোন স্থানে তাঁহাকে বসিতে দেওয়া হইত না, তাঁহাকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করিতে হইত। উপবেশনার্থ তাঁহাকে কোন মূল্যবান আসবাব দেওয়া হইত না, চট কিংবা পিঁড়ি ইত্যাদি সামান্য আসনেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। অন্য পক্ষে, যত নীচ এবং অশিক্ষিতই হউন না কেন, কোন গোঁড়া-হিন্দু মুসলমানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাঁহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘরে বসাইয়া অভ্যর্থনা করা হইত এবং ঐ মুসলমানের বাড়ীতে উপবেশনের জন্য আসনের মধ্যে যেটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সেইটি তাঁহাকে বসিতে দেওয়া হইত।

পানের জন্য জলদান-কালে কোন গোঁড়া হিন্দু-বিধবার যদি কোন মুসলমানের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াইবার সম্ভাবনা ঘটিত, তাঁহার পানের জল অশুদ্ধ হইয়া যাইবে এই বিশ্বাসে তিনি মুসলমানকে অবিলম্বে পথ ছাড়িবার জন্য বলিতেন। মুসলমানও তাঁহার আদেশপালনে বিলম্ব করিতেন না। কিন্তু হিন্দুদিগের অপেক্ষা নিজেদের প্রাধান্য প্রদর্শন করে, এরূপ কোন আচরণ কোন মুসলমান বিধবা কোন দিন করেন নাই।

উপরে যে-শ্রেণীর ঘটনাসমূহ উল্লিখিত হইল, তদ্দ্বারা যে-কেহ নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারিবেন যে, এমন এক সময় হিন্দু

সমাজের ছিল এবং সে সময় বহু দূর অতীত নহে, যে-সময়ে সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দুগণ মুসলমানগণের সহিত দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারে পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রদর্শন করিতেন। সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানগণ কিন্তু এই সমস্ত নীচ ব্যবহারই সহ্য করিতেন এবং হিন্দুদিগের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন দূরে থাকুক, যথাসম্ভব সম্ভ্রম আচরণ করিতেন।

বহুদূর অতীতের হিন্দুগণই কেবল এই ভাবে আচরণ করেন নাই, এমন কি সে দিন পর্য্যন্ত হিন্দুদের আচরণ এই প্রকার কলঙ্কযুক্ত ছিল বলিয়া দেখা যাইবে না। এমন কি, ১৫শ বৎসর পূর্ব্বেও গ্রামের মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা যখন মুষ্টিমেয় ছিল, তখন তাহাদের হিন্দু সতীর্থগণের নিকট হইতে তাহারা কিরূপ ব্যবহার লাভ করিত—তাহা যাঁহাদের মনে পড়িবে তাঁহারা যুক্তিসঙ্গত ভাবে লজ্জাবোধ না করিয়া পারিবেন না।

এমন কি, চাকুরীর ক্ষেত্রেও হিন্দুদের যখন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, মুসলমানদের সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ ন্যায়-সঙ্গত এবং সুবিচারমূলক ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া দাবী করিতে পারেন না। সত্যের প্রতি অবহিত হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, চাকুরী দান কালে স্বজাতি হিন্দুকে নিযুক্ত করিবার লোভ সম্বরণ করিয়া প্রার্থীর যোগ্যতামাত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিবার ন্যায় হিন্দু কদাচিৎ মিলিয়াছে।

অতঃপর প্রশ্ন দাঁড়ায়: হিন্দু দেশবাসিগণ তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়ভুক্ত, এই হিসাবে যে-মুসলমানগণ তাঁহাদিগকে একদা শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহারা আজ আর তাঁহাদের প্রতি সে-শ্রদ্ধা পোষণ করিতেছেন না কেন? উপরন্তু তাঁহাদের অতীত আচরণ হইতে প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন যে, হিন্দুগণ তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত নির্ম্মম ব্যবহার করিয়াছেন এবং পাকিস্তান পরিকল্পনার সাহায্যে হিন্দুদিগের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ দাবী করিতেছেন কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দান করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমতঃ যে-অবস্থায় মুসলমানদের প্রতি কদাচরণ সত্ত্বেও হিন্দুগণ তাঁহাদের নিকট হইতে সম্ভ্রম ব্যবহার লাভ করিতেন, সেই অবস্থা-সম্বন্ধীয় সন্ধান লাভ করিতে হইবে।

মুসলমানগণের নিকট হইতে হিন্দুগণ যে-অবস্থায় সম্ভ্রম ব্যবহার লাভ করিতে পারিতেন, সেই অবস্থার সন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ভারতে আজ যাঁহারা হিন্দু বলিয়া আখ্যাত হন, তাঁহারা ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের নেতৃত্বাধীন এবং এই ব্রাহ্মণগণ ভারতীয় ঋষিদিগের সন্তান বলিয়া বিদিত। আমাদিগকে আরও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, মনুষ্যজাতির ইতিহাসে ক্রমান্বয়ে ধর্ম্মমতের চারি প্রকার অভ্যুদয় দেখা গিয়াছে, যথা—(১) বৌদ্ধ যুগ, (২) খ্রীষ্টান যুগ, (৩ মুসলমান যুগ, এবং (৪) বস্তুতঃ সকল ধর্ম্মমতবিজ্ঞির এই বর্ত্তমান যুগ। এই চারি যুগের প্রত্যেকটিই হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক ঘটনাবহুল; সুতরাং বৌদ্ধ ধর্ম্মের উদ্ভবের পরবর্ত্তী কালে যে এমন কোন-কিছুরই সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না, যাহাতে আমরা বুঝিতে পারি মুসলমানগণ কি জন্য হিন্দুদের প্রতি সম্ভ্রম ছিলেন, তাহা সুনিশ্চিত। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উদ্ভবের পূর্ব্ববর্ত্তী কালেই যে সন্ধান করিতে হইবে, তাহাও নিশ্চিত ভাবে বলা যাইতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই কালের ইতিহাস বিস্মৃতিগর্ভে নিমজ্জিত। আমরা কেবল বর্ত্তমান বৌদ্ধ মতের উদ্ভবের বহু পূর্ব্বে রচিত ভারতীয় ঋষিগণের স্তূপীকৃত সাহিত্য পাইতেছি। সুতরাং আমাদিগের উদ্দেশ্যের সন্ধানলাভার্থ, অর্থাৎ কি কারণ বশতঃ মুসলমানগণের প্রতি নির্ম্মম আচরণ সত্ত্বেও হিন্দুগণ তাঁহাদের সম্ভ্রম ব্যবহার পাইতেন, তাহার সন্ধানলাভার্থ, আমাদিগের এই সকল ভারতীয় ঋষিগণ-রচিত সাহিত্যের মূল গ্রন্থের বক্তব্যে প্রবিষ্ট হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

ঐ সকল গ্রন্থে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে উহা হইতে কিরূপ সন্ধান লাভ করা যায়, আমরা অতঃপর তাহাই দেখিব।

প্রথমতঃ, আমরা বর্ত্তমান কাল হইতে প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এমন একটি কালের সুস্পষ্ট পরিচয় লাভ করি, যখন হিন্দু পণ্ডিতগণের কাহারও লিখিত কোন টীকা-ভাষ্যের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, কেবল ভারতীয় ঋষিগণের রচিত মূল গ্রন্থেরই সন্ধান পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় ঋষিগণের রচিত সাহিত্যের মূল গ্রন্থের কোন একখানিতে ধর্ম্ম হিসাবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান অথবা মুসলমান নামের উল্লেখ দেখা যায় না। এই সকল সাহিত্যে কেবল "মানবধর্ম্ম" নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

তৃতীয়তঃ, দেখা যায়, ভারতীয় ঋষিগণের সমগ্র সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকটি অধিবাসীর সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দশা হইতে নিষ্কৃতির পন্থানির্দ্দেশ এবং ঋষিদিগের এই সাহিত্যসমূহ সমগ্র ভাবে অখণ্ডোত্তক এবং বিচ্ছিন্ন ভাবে ইহাদের প্রত্যেকটি গ্রন্থ সেই সমগ্র সাহিত্যের এক একটি অংশ মাত্র।

বিশেষতঃ লক্ষ্যের বিষয় এই যে, ভারতীয় ঋষিগণের রচিত এই মূল গ্রন্থসমূহের উদ্দেশ্য কেবল হিন্দু, অথবা ভারতীয়, অথবা ব্রাহ্মণগণকেই কিম্বা কেবল পুণ্যবানকে তাঁহাদের দুঃখ হইতে নিষ্কৃতিদান নহে; ইহাদের লক্ষ্য, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রত্যেককে সর্ব্ব-প্রকার দুঃখ-দুর্দশা হইতে মুক্তিসন্ধান নির্দ্দেশ-দান। এমন কি পাপাশয়গণও কি প্রকারে সকল প্রকার, অর্থাৎ আর্থিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, ভারতীয় ঋষিগণ তাহার কার্য্য-প্রয়োগযোগ্য নির্দ্দেশ দান করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে যদি কাহারও কোনরূপ সন্দেহ থাকে, তিনি আমাদের নিকট আসিলে ঋষিগণের বক্তব্য আমরা তাঁহাকে ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি যে, তাঁহাদের ঐ নির্দ্দেশসমূহ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে প্রয়োগযোগ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে—রাষ্ট্রকে সংস্কার করিয়া যিনি তাহার সকল বিষয় যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবেন—নির্দ্দিষ্ট অর্থের অন্ততঃ সেইরূপ এক জন প্রকৃত ব্রাহ্মণ সম্ভব না হইলে ঐ সকল পন্থা যথার্থ ভাবে কার্য্যতঃ প্রযুক্ত হইতে পারে না। ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ভারতীয় ঋষিগণের নির্দ্দেশানুসারে কেবল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হইলেই এবং টীকি-নামাবলী পরিধান করিলেই কোন ব্যক্তি প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য হইতে পারেন না, ইহার জন্য বাহ্য হইতে ও রস-বিষয়ক উপলব্ধিমূলক জ্ঞান এবং তদনুযায়ী দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অত্যাবশ্যক।

চতুর্থতঃ, দেখা যায় যে, গত ২,০০০ বৎসরের মধ্যে যে-সকল ভারতীয় পণ্ডিত বিভিন্ন টীকা-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অর্থ ভারতীয় ঋষিগণের রচিত মূল গ্রন্থসমূহের অর্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

পঞ্চমতঃ, দেখা যায় যে, ভারতীয় ঋষিগণের নির্দ্দেশানুসারে মনুষ্যজাতির প্রত্যেকটি অধিবাসীকে সকল প্রকার দুঃখ হইতে মুক্তিদানার্থ কোন প্রকার চেষ্টা করিতে হইলে মনুষ্য-প্রকৃতি কি করিয়া বিশ্লেষণ করিতে হইবে, তাহার জ্ঞান, তথা মনুষ্য-প্রকৃতির বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব এবং বিকাশ কি ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে তাহার জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

ষষ্ঠতঃ, দেখা যায় যে, ভারতীয় ঋষিগণের নির্দ্দেশানুসারে, কোন সমাজকে সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দশা হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে তাহার সংগঠন মনুষ্য-প্রকৃতি-অনুগ হওয়া প্রয়োজন, কোন ক্রমে ব্যতিক্রম হইলে চলিবে না।

সপ্তমতঃ, দেখা যায় যে, ভারতীয় ঋষিগণের নির্দ্দেশানুসারে মনুষ্য-জাতির প্রত্যেক সমাজে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর কর্ম্মী বিদ্যমান। একশ্রেণী বুদ্ধিজীবী, অপর শ্রেণী শ্রমজীবী। অর্থাৎ মূলতঃ মনুষ্য স্বভাবতঃ বুদ্ধিজীবী কর্ম্মী কিংবা স্বভাবতঃ শ্রমজীবী কর্ম্মী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু বুদ্ধিজীবী কর্ম্মী হইবার সম্ভাবনা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে কিংবা শ্রমজীবী কর্ম্মী হইবার সম্ভাবনা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, জন্মকাল হইতে সাত দিনের মধ্যে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার নির্দ্দিষ্ট পন্থা বিদ্যমান। সমাজকে প্রকৃতভাবে সংগঠিত করিতে হইলে যাহারা বুদ্ধিজীবী কর্ম্মী হইবার সম্ভাবনা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের যাহাতে বুদ্ধি-সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়, অনুরূপ শিক্ষা এবং দীক্ষা আবশ্যক এবং যাহারা শ্রমজীবী কর্ম্মী হইবার সম্ভাবনা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা যাহাতে দৈহিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করিতে পারে, তদনুরূপ শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন। যাহারা বুদ্ধিজীবী কর্ম্মী হইবার সম্ভাবনা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে দৈহিক সামর্থ্য বৃদ্ধির শিক্ষা দান করিলে এবং অন্য পক্ষে যাহারা শ্রমজীবী কর্ম্মী হইবার সম্ভাবনা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে বুদ্ধি-সামর্থ্য বৃদ্ধির শিক্ষা দান করিলে সমাজে বিশৃঙ্খল অবস্থা অবশ্যম্ভাবী।

অষ্টমতঃ, দেখা যায় যে, ভারতীয় ঋষিগণের নির্দ্দেশানুসারে জীবিকার্জ্জনের সদুপায় মাত্র তিন প্রকার, যথা, (১) কৃষি, (২) শিল্প, এবং (৩) বাণিজ্য। তাঁহারা দাসত্ব এবং নফরবৃত্তির নিন্দা করিয়াছেন এবং কোন সমাজের সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দশা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে হইলে, প্রথমতঃ সেই সমাজে যাহাতে স্ব স্ব ভাবে লাভজনক কৃষি, লাভজনক শিল্প এবং লাভজনক বাণিজ্য পরিচালনার একং

ব্যবস্থা হয় যে, কৌটিকক্ষেত্রে এবং তদ্ভিন্ন সহযোগের ক্ষেত্রে কোন দিন কোন প্রকারে লোকসান না ঘটে, মূলতঃ সেই সমাজের মধ্যে তদনুসারে সংগঠন আবশ্যক,—তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

নবমতঃ, আমরা দেখি যে, ভারতীয় ঋষিগণের নির্দ্দেশানুসারে কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের দৈহিক শ্রমসাধ্য কার্য্য শ্রমজীবী কর্ম্মীগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইবে বটে, কিন্তু বুদ্ধিজীবী কর্ম্মীগণকে,—উপরিলিখিত তিন প্রকার জীবিকার্জ্জনের সহযোগ যাহাতে শ্রমজীবিগণের সহজসাধ্য এবং সুশৃঙ্খল হয়, তদ্বিষয়ে সাহায্য করিতে হইবে এবং বুদ্ধিজীবিগণের উহা কোন প্রকার অর্থসঞ্চয়ের মনোভাব হইতে করিলে চলিবে না। ভারতীয় ঋষিগণের মতামত অনুসারে, শ্রমজীবিগণের পক্ষে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য যাহাতে এরূপ পরিমাণে সহজ ও সুশৃঙ্খল হয় যে, উহা হইতে তাহারা যথোপযুক্ত লাভ করিতে পারে এবং বুদ্ধিজীবি কর্ম্মীগণের কর্ম্ম-রক্ষণার্থে এবং তাঁহাদের সংসার-নির্ব্বাহার্থে তাহারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবেই বৃত্তি দান করে—তদ্ভিন্ন বুদ্ধিজীবী কর্ম্মীগণকে সুকঠিন পরিশ্রম করিতে হইবে। অর্থাৎ, কোন সমাজের অধিবাসীদের প্রত্যেককে সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতি দান করিবার বাসনা থাকিলে কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের লাভ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা শ্রমজীবিগণেরই প্রাপ্য হইবে এবং রাষ্ট্র হইতে এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, বুদ্ধিজীবিগণ কোন প্রকার অর্থসঞ্চয়ের আশা পোষণ না করিয়া কেবল শ্রমজীবিগণের জন্যই কার্য্যনিযুক্ত থাকিতে পারেন।

উপরিলিখিত ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য ভারতীয় ঋষিগণ কি নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন, তাহা বিস্তৃত আলোচনা-সাপেক্ষ। এই সন্দর্ভে সে-আলোচনা করা সম্ভব নহে।

অতঃপর আমরা দেখি, ভারতীয় ঋষিগণ তাঁহাদের শাস্ত্রিতা সুযুক্তিসহকারে বুদ্ধিজীবী কর্ম্মীদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত রাখিবার পরামর্শ দান করিয়াছেন; যথা: প্রথম শ্রেণী মনুষ্য-প্রকৃতির উদ্ভব এবং বিকাশের আদ্যন্ত কার্য্যতঃ উপলব্ধিপূর্ব্বক ঐ প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মনুষ্য-জীবনযাত্রার সর্ব্ববিষয়ক বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবেন; দ্বিতীয় শ্রেণী শ্রমজীবিগণকে শিক্ষা-দীক্ষা দান করিবেন এবং তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মনির্ব্বাহে সহায়তা করিবেন; এবং অপর এক শ্রেণী সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন সমাজের প্রত্যেকে প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিগণের নির্দ্দেশানুসারে কার্য্যনিযুক্ত আছেন কি না এবং যাঁহারা তাহা না করিবেন, তাঁহাদিগকে দণ্ডিত করিবেন। সাধারণতঃ, যে-সকল ব্যক্তি শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিকভাবে অসুস্থতা ভোগ করিত, তাহাদিগকে নীরোগ করিবার দায়িত্ব এই তৃতীয় শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিগণের কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিত। যখন এই অসুস্থতার প্রকার অসাধারণ হইত, কেবল তখনই প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিগণের সাহায্য প্রার্থনা করা হইত।

একাদশতঃ, আমরা দেখি, মনুষ্য-প্রকৃতির উদ্ভব এবং বিকাশ সম্পূর্ণতঃ উপলব্ধি করিবার জন্য ক্রমান্বয়ে চারি প্রকার সাধনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ক্রমান্বয়ে এই যে চারি প্রকার সাধনা, তাহার প্রথমটি "মোক্ষ" অথবা "তত্ত্ব-সাধনা" বলিয়া অভিহিত ছিল; দ্বিতীয়টি "কৃষ্ণ", "বিষ্ণু" অথবা "ঈশ্বর-সাধনা"; তৃতীয়টি "শিব" অথবা "বুদ্ধি-সাধনা"; এবং চতুর্থটি "ব্রহ্ম-সাধনা"। ভাষাভিত্তিক শব্দবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর গঠিত প্রাচীন আরবী ভাষানুসারে "মুসলিম" ও "মোক্ষ" একার্থক, "ইসলাম" ও "ঈশ্বর" একার্থক, "আল্লা" ও "শিব" একার্থক এবং "হিন্দু" ও "ব্রহ্ম" একার্থক। ভারতীয় ঋষিগণের রচিত মূল গ্রন্থের বক্তব্য প্রবিষ্ট হইয়া অতঃপর যদি ভারতীয় ঋষিগণের কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত মনুষ্য-জাতির ইতিহাস কার্য্য-কারণসঙ্গত ভাবে সংযুক্ত করিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে ইহা বুঝা যাইবে যে, এমন একদিন ছিল, যে-দিন সমগ্র মনুষ্যজাতি আর্থিক, সামাজিক, ধর্ম্মানুষ্ঠানমূলক এবং আধ্যাত্মিক সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিল ইহা বুঝা যাইবে। বাণিজ্য এবং ব্যবসায়ের লিখিত ইতিহাস যদি কেহ বিবেকানুমোদিত ভাবে পাঠ করিয়া থাকেন, তবে তিনি তাহা হইতে অতি সহজেই প্রমাণ লাভ করিবেন যে, সমগ্র মনুষ্যসমাজের অবস্থা একদিন অনুরূপ ছিল। আধুনিক নৃতাত্ত্বিকগণ যাহাই বলুন না কেন, সাধারণ বিচার-বুদ্ধি দ্বারাই বুঝা যাইতে পারে যে, যতদিন হইতে বিশ্বজগতে সূর্য্য এবং চন্দ্র বিরাজমান, ততদিন সকল প্রকার জীবদেহও বিরাজমান থাকিতে বাধ্য এবং সূর্য্য-চন্দ্র নাই, অথচ পৃথিবী বিদ্যমান, এমন অবস্থার কথা কেহ জ্ঞাত নহেন। সুতরাং নিরপেক্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে যে, যতদিন

পৃথিবী বিরাজ করিতেছে, ততদিন মনুষ্য এবং অমনুষ্যের ভেদেরও অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। এবং কোন দেশ যদি সর্ব্বদিক্ দিয়া সম্পূর্ণ না থাকে এবং ঐ দেশে যদি অনেকখানি পরিমাণে শৃঙ্খলা না থাকে, তবে ঐ দেশের অধিবাসিগণ স্বদেশের মধ্যে কখনও নিবদ্ধ থাকিতে পারে না। এই সত্য স্মরণে জাগরূক রাখিয়া যদি লক্ষ্য করা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে পৃথিবীর কোন দেশের অধিবাসীকে অপর দেশের অধিবাসীর সহিত বাণিজ্য এবং ব্যবসায়-সম্পর্কের মুখাপেক্ষা করিতে হয় নাই, তবে ইহা হইতেই প্রত্যেক যুক্তি-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া উচিত যে, সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ স্ব-সম্পূর্ণ ছিল এবং দেশে স্বল্পে পরিমাণে শান্তিও বিদ্যমান ছিল।

ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে এমন এক সময় ছিল, যখন সমগ্র মনুষ্যজাতি সম্পূর্ণ রূপে সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দ্দশামুক্ত ছিল এবং ক্রমশঃ ইহা সপ্তম শতাব্দীর অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয়। ভারতীয় ঋষিগণের শাস্ত্র সম্যকরূপে অনুধাবন করিলে যে-কেহ নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারেন যে, মনুষ্যজাতির এই সুখের অবস্থা আমাদেরই ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এবং সূচিত হয়। ভারতীয় ঋষিগণ মূলতঃ নিম্নলিখিত সূত্রের উপর তাঁহাদের কালে সমাজ গঠন করেন। মনুষ্যসমাজের কর্ম্মীগণকে দুই শ্রেণীতে, যথা—বুদ্ধিজীবী এবং শ্রমজীবীতে—বিভক্ত করিয়া বুদ্ধিজীবিগণ নিজেরা যাহাতে কোনরূপ লাভের আশা না রাখিয়া সম্পূর্ণরূপে শ্রমজীবিগণের কল্যাণকল্পে জীবন নিয়োজিত করিতে পারেন, তাঁহারাই এই ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন।

ইহারই ফলে 'হিন্দু'দিগের প্রতি—প্রাচীন আরবী ভাষায় 'হিন্দু' পদটি যাহারা বুদ্ধিসাধনায় সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর হইতেন, তাঁহাদেরই প্রতি প্রযুক্ত হইত—শ্রমজীবিগণের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার ভাব জাগরিত হয়। এবং ইহার ফলে সমগ্র মনুষ্য-জাতির সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকল্পে প্রয়োজনীয় সর্ব্ববিধ বিজ্ঞান এবং সংগঠনের পুষ্টি সংসাধিত হয়। কালক্রমে যখন সংগঠনসমূহ পূর্ণতালাভ করে এবং শ্রমজীবী সম্প্রদায় সম্পূর্ণ ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও কার্য্যক্ষম হয়, তখন বুদ্ধি-জীবিগণের সহায়তা ব্যতিরেকেই তাহারা স্বকীয় কার্য্যসাধনে সমর্থ হয় বটে, কিন্তু বুদ্ধিজীবিগণই তাহাদিগকে কার্য্যক্ষম করিয়া তুলেন বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি উহারা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিয়াই চলিতে থাকে। ইহার ফলে বুদ্ধিজীবিগণ অলস হইয়া পড়েন এবং ক্রমশঃ যে-বিজ্ঞানে ত্রুটিহীন সংগঠনের মূলনীতিসমূহ নিহিত রহিয়াছে, তাহা বিস্মৃত হন। শেষ পর্য্যন্ত, ভারতীয় ঋষিগণ যে ভাষায় তাঁহাদের ঐ বিজ্ঞান লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহারা বিস্মৃত হন।

কিন্তু তথাপি বুদ্ধিজীবীদিগকে অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই, কেন না পৃথিবীর সর্ব্বত্র তখনও স্বাস্থ্যপ্রদ কৃষি, স্বাস্থ্য-প্রদ শিল্প এবং স্বাস্থ্যপ্রদ বাণিজ্য প্রচলিত ছিল এবং শ্রমজীবি-গণের পক্ষে এমন উপার্জ্জন সম্ভব ছিল, যাহাতে সেই উপার্জ্জনের একাংশ তাহারা বুদ্ধিজীবিগণের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবশতঃই তাঁহাদের সংসার-নির্ব্বাহার্থ দান করিতে পারিত।

কিন্তু যেদিন হইতে কৃত্রিমভাবে দ্রব্যের উৎপাদনে অত্যন্ত হ্রাস ঘটিতে থাকে এবং শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা প্রত্যেক দেশে বিষমসঙ্কুল হইয়া পড়ে, সুতরাং বুদ্ধিজীবিগণের অলস জীবনযাত্রাকল্পে শ্রমজীবিগণের পক্ষে স্বেচ্ছামূলক দান কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে, সেইদিন হইতেই সঙ্কটের সূচনা। সেইদিন হইতে ভারতীয় ঋষিগণের সংগঠনের সূত্রসমূহ, প্রকৃত বিজ্ঞান তথা প্রকৃত ভাষা বিস্মৃত হইয়াও বুদ্ধিজীবিগণ কেবল ভারতীয় ঋষিগণের বংশধর হইবার অধিকারেই শ্রমজীবী সাধারণের নিকট হইতে সশ্রদ্ধ বৃত্তি দাবী করিতে থাকেন। শ্রমজীবী-শ্রেণীর কেহ কেহ এই প্রকার দানে অসমর্থ হয় বলিয়া, তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ভারতীয় ঋষিদের অযোগ্য বংশধরেরা—তদানীন্তন তথাকথিত বুদ্ধিজীবিগণ—ঐ শ্রমজীবীদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘোষণা করেন। ভারতীয় ঋষিগণের মূল শাস্ত্রের মধ্যে সম্যক্ অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ভারতীয় ঋষিগণ শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের কাহাকেও কোন অবস্থায় অস্পৃশ্য ঘোষণা করিবার অধিকার সমাজের কাহাকেও দান করেন নাই। ইহা তো তাঁহারা করেনই নাই, উপরন্তু ভারতীয় ঋষির নির্দ্দেশানুসারে দেখা যায়, বুদ্ধিজীবী যখন সর্ব্বতোভাবে বুদ্ধিবিকাশে অসমর্থ হইয়াও বুদ্ধিজীবী হইবার গর্ব্ব পোষণ করেন, তখন তাঁহাকেই অস্পৃশ্য হইতে হয়।

ভারতীয় ঋষিগণের সন্তান-নামের অযোগ্য ব্যক্তিবৃন্দের এই সকল নির্ব্বুদ্ধিতা এবং দাম্ভিকতাবশতঃই, একদিন যে

মানব-সমাজ 'মানবধর্ম্মে'র পতাকাতলে একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল, তাহা কালক্রমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এই সকল নির্ব্বোধ ব্যক্তিই হিন্দু পণ্ডিত আখ্যা ধারণ করেন। তাঁহারা অযোগ্য না হইলে, ভারতীয় ঋষিগণের যে 'মানবধর্ম্ম' একদা সমগ্র মানব-সমাজকে সম্পূর্ণ সার্ব্বজনীন সূত্রে গ্রথিত করিয়াছিল, তাহার কার্য্যকারিতার অভাব সংসাধিত হইত না এবং পরবর্ত্তীকালে পৃথিবীতে ক্রমান্বয়ে এতগুলি মতবাদ প্রচারিত হইয়া পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করিয়া সমগ্র মনুষ্য-সমাজের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ উপস্থিত করিত না। ভারতীয় ঋষিগণের প্রকৃত বিজ্ঞানের পটভূমিকা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করিতে না পারিলে, এই সকল হিন্দু পণ্ডিত কি পরিমাণ শয়তান এবং কাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা সুকঠিন।

যাহা হউক, এই ভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইল—শতাব্দীচ্ছিন্ন হইয়াও এবং সর্ব্বনাশকর অবস্থার মধ্যে পতিত হইলেও, এই সকল "হিন্দু-পণ্ডিতে"র পাপাচরণ হইতে মনুষ্যজগৎ স্বকীয় রক্ষার আর কোন পন্থা খুঁজিয়া পায় নাই। অবশেষে প্রকৃতির সর্ব্বাশ্রয়ী বিধানানুযায়ী শাক্যসিংহ, যীশুখৃষ্ট এবং নবী মহম্মদ, এই তিন জন মহাপুরুষ ক্রমান্বয়ে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে আবির্ভূত হইয়া মনুষ্যজাতিকে দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতিদানকল্পে তাঁহাদের বাণী প্রচার করেন। আধুনিক ইতিহাস-রচয়িতারা যাহাই বলুন না কেন, ঘটনাবলী হইতেই প্রমাণ পাওয়া যাইবে যে, সমসাময়িক-কালীন ভারতের শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যেও ভারতীয় ঋষিগণের সন্তানদিগের প্রতি এমন শ্রদ্ধা বিদ্যমান ছিল যে, শাক্যসিংহ কিংবা যীশুখৃষ্ট, কেহই তাহাদিগকে উল্লেখযোগ্য ভাবে তাঁহাদের অনুসরণে প্রণোদিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু নবী মহম্মদ, তাঁহার ধর্ম্মমতের জনপ্রিয়তাবশতঃ এই কার্য্যসাধন করেন—তজ্জন্যই, যদিও নবী মহম্মদের এই ধর্ম্মমত ভারতীয় শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের কিয়দংশ গ্রহণ করেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা গোঁড়া হিন্দুদিগের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনের মূলস্তম্ভ মানিয়া চলিতে থাকেন। অধুনা যে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে হিন্দুদিগের উদ্দেশ্যে আর সেই শ্রদ্ধা দেখা যায় না, তাহার মূলে পরবর্ত্তী কালের ধর্ম্মমূলক এবং রাজনৈতিক প্রচার বিদ্যমান।

তথাকথিত এই হিন্দুগণ ভারতীয় ঋষিগণের শাস্ত্রের পুনরনুশীলনসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া কি করিয়া মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি সকল অবস্থাতে সর্ব্বপ্রকার দুর্দ্দশা হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, পৃথিবী-সমক্ষে যদি ইহা প্রদর্শন করেন, তবে নিমিষের মধ্যে এই সকল ভূগর্ভ রাজনৈতিক প্রচার-কার্য্য নিষ্ফল হইয়া যাইবে—আমরা এই অভিমত পোষণ করি। অন্নসমস্যা মনুষ্যজাতির সকল সমস্যার মধ্যে কঠিনতম সমস্যা এবং বর্ত্তমানে এমন একটা সময় আসিয়াছে যে, সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার শতকরা ৯৯ জনই অন্নসমস্যায় কষ্ট পাইতেছে। মনুষ্য-জাতির প্রত্যেকের অন্নসমস্যার সমাধান-পন্থা বিষয়ে কেহ যদি চিন্তা করিতে চাহেন, এবং তজ্জন্য সকল সাহিত্য সন্ধান করেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, কোন দেশের কোন সাহিত্য উল্লিখিত পন্থার কোন সার্থক নির্দ্দেশ দানে সমর্থ হয় নাই—কেবল ভারতীয় ঋষিগণই উহাতে সমর্থ হইয়াছেন। সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য এই যে, কিয়ৎকাল ধরিয়া কিয়ৎসংখ্যক ব্যক্তিকে স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া রাখা যাইতে পারে, কিন্তু সকলকে চিরকালের জন্য ভুলাইয়া রাখা চলে না। আমাদের এই উক্তির উদ্দেশ্য হইতেছে, মুসলমান জন-সাধারণ তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্তোকবাক্য শ্রবণে কিয়ৎপরিমাণে ভুলিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু হিন্দুগণ যদি বর্ত্তমান বিজ্ঞান এবং সভ্যতা সম্বন্ধে যত পরিহার করে, তাহা হইলে জন-সাধারণের অন্ন-সমস্যার সমাধান পন্থা যত স্পষ্টরূপে অবগত হইতে পারিবেন, তাঁহারা (অর্থাৎ মুসলমান নেতৃবৃন্দ), তাহা অবগত হইতে পারিবেন না।

মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দ যে কৈফিয়তই দান করুন না কেন, হিন্দুগণই যে ভারতে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের অস্তিত্বের জন্য মুসলমানদিগের অপেক্ষা অধিক দায়ী, আমাদের এই সিদ্ধান্ত যথাযথ কি না অতঃপর আমরা পাঠকবৃন্দকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলি।

ভারতীয় ঋষিগণ, মনুষ্যজাতির প্রত্যেককে কি উপায়ে সর্ব্ববিধ দুঃখমুক্ত করিতে হইবে, তাহার যে নির্দ্দেশ দান করিয়া গিয়াছেন, আমরা মিঃ গান্ধীকে তাহা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। ইহা পরিজ্ঞাত হইতে

পারিলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, রাষ্ট্র-জগতের আধুনিক যে চিন্তা 'ফ্যাসিজম্' আখ্যাত হইয়া পৃথিবীকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা তথাকথিত গণতন্ত্রের নিষ্ফলতার পরিণাম। শাসনের প্রকৃত পন্থা সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা যদি ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণকে অবগত করানো যায়, তবে তাঁহারা উহা অবলম্বন করিবেন এবং বর্তমান পৃথিবীর দুঃখ-দুর্দশার পরিসমাপ্তি ঘটিবে, এমন আশা করা যাইতে পারে। মিঃ গান্ধীর বিরুদ্ধে আমরা যাহাই বলি না কেন, ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের মত পরিবর্তনে সমর্থ কোন ব্যক্তি যদি বর্তমানে ভারতবর্ষে থাকেন তবে সে-ব্যক্তি মিঃ গান্ধী—ইহা আমরা স্বীকার করি।

মিঃ গান্ধী কি তাঁহার ধার্মিকত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া নিজেকে প্রকৃত "মহাত্মা"য় রূপান্তরিত করিবার সুযোগ গ্রহণ করিবেন না?*

## ভারতীয় জাতীয় মহাসভার কার্য্যক্রম নির্দ্দেশ

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বিগত বোম্বাই অধিবেশনে মিঃ গান্ধী যে বক্তৃতা দান করিয়াছেন, তাহাতে ভবিষ্যতে তিনি কি করিবেন ইহা তাঁহার জানা নাই, এইরূপ স্বীকার করিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে, তিনি অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা যদি তাঁহার মনের কথা হয়, তবে তাঁহার এই স্পষ্টোক্তির জন্য দেশবাসীর তিনি প্রশংসার্হ। আমাদের মতে, কোন বিষয় না জানিতে পারা অপরাধ নহে, কিন্তু কেহ যদি বস্তুতঃ কোন বিষয় না জানিয়া উহা জানিবার ভাণ করেন, তাহা অপরাধ। মিঃ গান্ধী যে বলিয়াছেন, ভবিষ্যতে তিনি কি করিবেন তাহা তিনি জানেন না—এই বিবৃতি তাঁহার মনের কথা কি না, তাহাতে আমাদের বিশেষ সন্দেহ বর্তমান। জন-সাধারণকে দুঃখ-দুর্দশা হইতে মুক্তি দান করিতে হইলে কোন্ লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া চলা উচিত, মিঃ গান্ধীর সেই সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা নাই, ইহা আমরা জানি। নচেৎ 'হরিজন'-এ প্রকাশিত তাঁহার সংগঠন-প্রস্তাবের মূলক কার্য্যসূচী সম্বন্ধে তিনি লজ্জা বোধ করিতেন।

দেশবাসী মিঃ গান্ধীর সম্বন্ধে যাহাই ধারণা করুন না কেন, আমাদের মতে, তিনি রাষ্ট্রনীতিবিদ্ হইবার ভাণ করিলেও তাঁহার কার্য্যাবলীর দ্বারাই তিনি স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন যে, তিনি তাহা নহেন। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হইবার ভাণ করিলেও স্বকীয় কার্য্যাবলীর দ্বারাই মিঃ গান্ধী প্রমাণ করিয়াছেন যে, তিনি ধর্মপ্রাণও নহেন। মিঃ গান্ধীর কার্য্যাবলী হইতে আরও প্রমাণ হয় যে, "অহিংসা" এবং "সত্যাগ্রহ" প্রচার করিলেও তিনি অহিংসও (অবশ্য অহিংস হওয়া যদি সম্ভব হয়) নহেন, সত্যাশ্রয়ীও নহেন। সর্বাপেক্ষা অনুকম্পার বিষয় হইতেছে, তিনি দেশপ্রেমিক পর্য্যন্ত নহেন।

দেশবাসী প্রশ্ন করিতে পারেন যে, মিঃ গান্ধী যদি রাষ্ট্রনীতিবিদ্, ধর্মপ্রাণ, অহিংস, বা দেশ-প্রেমিক—ইহার একটিও নহেন, তবে তিনি কি। ইহাতে আমাদের বক্তব্য যে, তিনি আধুনিক যুগের ব্যারিষ্টার মাত্র। ইহার অর্থ এই যে, স্বকীয় বক্তব্যের কোন অর্থ না বুঝিলেও তিনি বাগ্‌বিস্তারে দিবারক্ষ।

উপরে বোম্বাই-এ তাঁহার যে-বক্তৃতার উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে মিঃ গান্ধী তথাকথিত কবি রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ রহস্য-সৃজনের প্রয়াসী হইয়াছেন। মিঃ গান্ধী, তথা দেশবাসীকে আমরা এই শ্রেণীর প্রবঞ্চনা বিষয়ে সংহিত হইতে বলি।

মিঃ গান্ধী এবং দেশবাসী জনসাধারণকে সতর্ক করিবার নিমিত্তই আমরা মিঃ গান্ধীর সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলিয়াছি। বর্তমান অবস্থায় ভারতের নেতৃত্বের কোন প্রকার যোগ্যতা মিঃ গান্ধীর নাই, মিঃ গান্ধীর কার্য্যকলাপে ইহা প্রমাণিত হইলেও মিঃ গান্ধী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যক্তিও যে বর্তমানে নাই, ইহাও আমরা স্বীকার করিতেছি। সুতরাং মিঃ গান্ধীর নেতৃত্ব যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, তজ্জন্য দেশবাসী প্রত্যেকের যথাসাধ্য করা অবশ্যকর্তব্য।

* "দি টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া"র ১৩ই-সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী হইতে।

মিঃ গান্ধীর পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য এই যে, ভারতের ন্যায় বিস্তৃত দেশের নেতার যোগ্য হইতে হইলে একটি পরিবারের কর্ত্তা হইতে হইলেও নিজেকে নিজের সদ্‌গুণ অপেক্ষা ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে অধিকতর সজাগ থাকিতে হয় এবং যিনি তাঁহাকে তাঁহার ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখাইয়া দেন, তাঁহাকে প্রকৃত বন্ধু বলিয়া তাঁহার মানিয়া লওয়া উচিত।

তাঁহার সম্বন্ধে আমরা উপরে যে-সকল অপ্রিয় উক্তি করিয়াছি, মিঃ গান্ধীকে তাঁহার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে সজাগ হইতে সাহায্য করাই তাহার উদ্দেশ্য। দেশের একনিষ্ঠ নেতার যোগ্যতালাভে তাঁহার ইচ্ছা থাকিলে এবং ঐ নেতৃত্ব সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে সত্য চিন্তা, সত্য ভাষণ, এবং তাঁহারা সত্য কথা বলিতে প্রস্তুত তাঁহাদিগকে মানিয়া চলা —এই সমস্তই তাঁহার অবশ্যকর্ত্তব্য। মিঃ গান্ধী যে-কথা বলেন, সে-সব যদি তাঁহার মনের কথা হয়, তবে আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটি উক্তির প্রতি তাঁহার অবহিত হওয়া উচিত বলিয়াই আমরা মনে করি; উহার কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে উদাসীন থাকা কিংবা কর্ণপাত না করা তাঁহার উচিত হইবে না।

ভারতীয় জন-সাধারণের দুঃখ দুর্দশা হইতে প্রকৃত মুক্তি মিঃ গান্ধীর লক্ষ্য হইলে তাঁহাকে একে একে নিম্নলিখিত সমস্যাসমূহের সমাধানে চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ, দেশের প্রত্যেকটি অধিবাসী যাহাতে তাহার সকল দুঃখ-দুর্দশার কারণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ক আর্থিক সমস্যার সমাধান।

দ্বিতীয়তঃ, দেশের প্রত্যেকটি অধিবাসী যাহাতে তাহার সকল প্রকার অস্বাস্থ্যের কারণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ক স্বাস্থ্য-সমস্যার সমাধান।

তৃতীয়তঃ, দেশের প্রত্যেকটি অধিবাসী যাহাতে তাহার সকল প্রকার অশান্তির কারণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ক সকল মানসিক সমস্যার সমাধান।

এমন কথা বলা হইতেছে না যে, মিঃ গান্ধী ইন্দ্রজালের দ্বারা এমন কিছু করুন, যদ্দ্বারা দেশের প্রত্যেকটি অধিবাসী তাহার আর্থিক সমস্যা, স্বাস্থ্য-সমস্যা এবং মানসিক সমস্যা হইতে অকস্মাৎ অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। আমাদের বক্তব্য হইতেছে: রাষ্ট্রে এবং রাষ্ট্রের সাহায্যে মিঃ গান্ধী এমন বিধি-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করুন, দেশের কেহ যাহাতে সরকারের প্রবর্ত্তিত এবং সমর্থিত নিকৃষ্ট আইন-কানুনের জন্যই আর্থিক দুর্দশা, অস্বাস্থ্য এবং অশান্তি হইতে মুক্তিলাভ অসম্ভব—এই অভিযোগ আনয়ন না করিতে পারেন। দেশের বর্ত্তমান আইন-কানুনে প্রত্যেকটি অধিবাসীর পক্ষে আর্থিক দুর্দশা, অস্বাস্থ্য এবং অশান্তি হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি এবং ভবিষ্যতেও প্রমাণ করিতে পারিব। বস্তুতঃ এদেশে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ যে নিকৃষ্ট আইন-কানুনের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা আর্থিক দুর্দশা, অস্বাস্থ্য এবং অশান্তির সৃষ্টিকর। যদি মিঃ গান্ধী প্রকৃতভাবে দেশপ্রেমিক হন এবং যদি তাঁহার দেশের জন-সাধারণের, তথা সমগ্র মনুষ্যজাতির জন্য বাস্তব কিছু করার আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তবে শাসনকার্য্যের যাবিষ্ক কাহাদের উপর অর্পিত রহিয়াছে, সে-বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া দেশের শাসননীতি এবং আইন-কানুনের সম্পূর্ণ সংশোধনের জন্য চেষ্টিত হওয়া তাঁহার পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য। দেশের যিনি প্রকৃত রাজারে নেতা হইবেন, তাঁহার নিকট দেশবাসী জন-সাধারণের একমাত্র প্রার্থনার বস্তু ইহাই বলিয়া তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে এবং কেহ যে তাঁহার ব্যক্তিগত পাপ কিংবা পুণ্যকার্য্যের ফল ভোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন না, ইহাও তাঁহাদিগের অতি অবশ্য উপলব্ধি করিতে হইবে।

অবশ্য লক্ষ্যণীয় বিষয় হইতেছে: উপরিলিখিত তিনটি সমস্যার সমাধান-পক্ষে প্রথম কার্য্য আর্থিক সমস্যার সমাধান। এই সমস্যার সমাধানে ইচ্ছুক হইলে মিঃ গান্ধীকে সেপ্রসঙ্গে নিম্নলিখিত আইন-কানুন প্রবর্ত্তিত করিবার লক্ষ্য লইয়া কার্য্য করিতে হইবে:—

(১) জীবনযাপন পক্ষে সর্ব্বনিম্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য অর্জ্জনের স্বাধীন এবং যথোপযুক্ত উপায় দেশের প্রত্যেকের যাহাতে আয়ত্ত হয়।

(২) জীবিকার্জ্জনের কোন পন্থা যাহাতে কোন প্রকারে অস্বাস্থ্যজনক না হয়।

(৩) জীবিকার্জ্জনার্থ যাহাতে কাহাকেও বেতনভোগী চাকুরীর আশ্রয় অবলম্বনে বাধ্য হইতে না হয়।

(৪) সকল প্রকার দ্রব্যের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি যেন অতিরিক্ত অধিক না হইতে পারে।

(৫) কোন প্রকার শিল্প-বাণিজ্যে যাহাতে কোন লোকসান না ঘটে।

(৬) কোন নীতিবিগর্হিত এবং অস্বাস্থ্যজনক শিল্প-বাণিজ্য যাহাতে প্রচলিত না থাকে।

(৭) দেশের কোন একজন অধিবাসীর পক্ষেও যাহাতে কুফলপ্রসূ হইতে পারে, এরূপ কোন উপায় অবলম্বন করিয়া যাহাতে কাহারও পক্ষে ধনীবিকার্জ্জন সম্ভব না হয়।

(৮) স্বাস্থ্যগত এবং বুদ্ধিগত যোগ্যতা এবং কার্য্যের সুনির্দ্দিষ্ট পরিমাণের ভিত্তিতে যাহাতে লাভ এবং পারিশ্রমিকের হার স্থিরীকৃত হয়।

(৯) কোন বিশেষ দ্রব্য ব্যবহার মনুষ্যের পক্ষে উপকারী কিংবা অপকারী হইতে পারে, এবং কি ভাবে কোন্ দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার সন্ধানলাভ নিমিত্ত যাহাতে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি দেশজাত প্রত্যেকটি দ্রব্যের প্রয়োগনৈপুণ্য উপাদানের জ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

(১০) দেশে জনসাধারণের সুস্থ জীবন-যাপন পক্ষে অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যের উৎপাদন যাহাতে দেশবাসী প্রত্যেকের পক্ষে সুপ্রচুর হয়।

(১১) দেশের জল, স্থল এবং অন্তরীক্ষ যাহাতে কোন প্রকারে কলুষিত না হইতে পারে।

(১২) ভূমিজাত দ্রব্যসমূহ যাহাতে কোনপ্রকারে অস্বাস্থ্যপ্রদ না হইতে পারে।

(১৩) নারী ও পুরুষের সাহিত্য-বর্টনে যাহাতে সুনির্দ্দিষ্ট সীমা রক্ষিত হয়।

(১৪) সরকারী কার্য্যে প্রার্থী নিযুক্তকালীন যাহাতে তাঁহারা কার্য্যতঃ ক্রোধ, উত্তেজনা, লোভ এবং কাম সংযম করিতে পারেন কি না এবং তাঁহারা সত্যাশ্রয়ী কি না, তাহার কঠোর পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। অন্যান্য গুণ আছে মনে করা হইলেও এই-প্রকার পরীক্ষায় যাঁহারা অকৃতকার্য্য হইবেন, তাঁহারা কিছুতেই কর্ম্মনিয়োগ লাভ করিবেন না, যাহাতে এরূপ কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়।

(১৫) সরকারী কার্য্যনিযুক্ত কোন ব্যক্তি যাহাতে কোনপ্রকারে এইসকল গুণ হইতে বিচ্যুত না হইতে পারেন।

(১৬) সরকারী কার্য্যনিযুক্ত কোন ব্যক্তি যদি কোনপ্রকারে এই সকল গুণের কোন একটি হইতে বিচ্যুত হন, তাহা হইলে অচিরাৎ তিনি যাহাতে বরখাস্ত হন, তাহার ব্যবস্থা।

(১৭) জন-সাধারণের পরস্পরের মধ্যে ফৌজদারী কিংবা দেওয়ানী কোনপ্রকার মতানৈক্য উপস্থিত হইলে, তদ্বিষয়ে সুবিচারলাভার্থে জনসাধারণকে যাহাতে জটিল অবস্থার মধ্যে নিপতিত হইতে না হয় কিংবা যাহাতে তজ্জন্য তাহাদের কোনপ্রকার ব্যয় না করিতে হয়।

আধিক সমস্যাসমূহের সমাধান নিমিত্ত এই সকল আইন-কানুন কেন অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় এবং কি করিয়া ইহা ব্যবস্থিত করিতে হইবে, তাহা বিশদ আলোচনার বিষয়। বর্ত্তমান সম্বর্ত্তে তাহা আলোচনা না করিয়া ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে, তাহা করা হইবে। স্বকীয় নেতৃত্ব সাফল্যমণ্ডিত করিতে চাঁহিলে সরকারের সহিত দ্বন্দ্ব-কলহের মনোভাব পরিহার করিয়া এই সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে মিঃ গান্ধীকে কার্য্যনিযুক্ত হইতে হইবে। আমরা বারংবার এই কথা বলিতেছি।

---

শ্রি ঐকুলি বম্বাই'র ২১শে সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় একশ্রেণির মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

## ভ্রম-সংশোধন

গত আশ্বিন সংখ্যার সম্পাদকীয় সন্দর্ভ "মিঃ গান্ধীর সংগঠনমূলক কার্য্য-সূচী"র ২৯৫ পৃষ্ঠার, দক্ষিণ স্তম্ভের পঞ্চম প্যারাগ্রাফ নিম্নলিখিত ভাবে পড়িতে হইবে।—

(২) বর্ত্তমানে আহার্য্য এবং পরিধেয় বস্ত্র উৎপাদনকারী যে সকল যন্ত্রচালিত শিল্প বিদ্যমান, তৎসমূহের উচ্ছেদসাধনপূর্ব্বক এই শ্রেণীর যন্ত্রচালিত-শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান অধিকারীদিগকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া, কৃষকগণকে তাহাদের অবসরের কয়েক মাস কুটির-শিল্পের কার্য্যে নিয়োগ-ব্যবস্থা।

# বৃহত্তর ও দক্ষিণ ভারতে মূর্তিপূজা

—শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতি যত সহজে উত্তর ভারতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, দক্ষিণ ভারতে উহার প্রচার তত সহজে হয় নাই। আর্যদের দ্বারা পরাভূত ও বিতাড়িত দ্রবিড় ও অন্যান্য জাতিসকল দক্ষিণ ভারতেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তবে মৌর্য-বংশ গুপ্ত-বংশ প্রভৃতির রাজত্ব-কালে হিন্দুদিগের ধর্ম ও কৃষ্টি দক্ষিণ ভারত ও বৃহত্তর ভারতে ক্রমশঃই প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইয়াছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে এক সহস্র ব্রাহ্মণ চু-নানে গমন করিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। কাম্বোজ (Cambodia) তখন চু-নান প্রদেশেরই অন্তর্গত ছিল। ৩৪০ খৃষ্টাব্দে চু-নানের রাজা ফান্-চান্ নিজ আত্মীয় চু-উকে ভারতবর্ষে রাজদূত রূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এ সকলই ইতিহাসের কথা। সুতরাং অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এই সময় হইতে বৃহত্তর ভারতের সহিত ভারতের মাত্র বাণিজ্য-সম্পর্কই স্থাপিত হয় নাই, ভাবের আদান-প্রদানও হইয়াছিল। কাম্বোজ, শ্যাম-রাজ্য, সুমাত্রা, যবদ্বীপ (Java), বলিদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে হিন্দুধর্ম যে বহু প্রাচীন কাল হইতেই দৃঢ়রূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, ঐ সকল স্থানের মন্দির ও মূর্তি সকল হইতে তাহা অতি সহজেই প্রমাণিত হয়।*

বৃহত্তর ভারতের বিভিন্ন মন্দির যে বিভিন্ন কালে নির্মিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন উহাদের অঙ্গে পরিস্ফুট। সূর্যের উপাসনা বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে প্রচলিত ছিল; বৃহত্তর ভারতের মন্দির-গাত্রেও তাহার প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। সূর্যাকৃতি-চক্র-সমন্বিত চূড়াবিশিষ্ট মন্দির-গুলিই ঐ সময়ের বা উহার অব্যবহিত পরবর্তী যুগে নির্মিত। পরবর্তী যুগে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধ মঠের আদর্শে নির্মিত মন্দিরগুলি হয় সাত, আট অথবা নয়তলা-বিশিষ্ট এবং পাগোডাকৃতি। মন্দিরের বহির্গাত্রে সিংহাদি পশু, হংস ও গরুড়-মূর্তি এবং বিগ্রহের রক্ষকরূপী রাক্ষস-মূর্তি সকল বিদ্যমান। প্রবেশ-দ্বারে—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—গণেশের মূর্তি। সিংহদ্বার ও মন্দির-কেন্দ্রের মধ্যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। সেখানে চারি-ধারে বহু ছোট ছোট মন্দির ও তন্মধ্যে দেব-দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। গর্ভমন্দির উচ্চস্থানে নির্মিত ও উক্ত বেদীর নাম 'মেরু'। মন্দিরের সর্বপ্রধান দেবতা এই 'মেরু'তেই প্রতিষ্ঠিত।

উত্তর ভারতের মূর্তির সহিত বৃহত্তর ভারতের দেব-দেবীর মূর্তির যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। ব্যাঙ্ককের জাতীয় যাদুঘরে (National Museums) রামচন্দ্র, বিষ্ণু ও অন্যান্য বহু হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি আছে। তন্মধ্যে অনেকগুলি পিত্তল-নির্মিত। গণেশের একটি মূর্তি বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিবার মত। নরমুণ্ডকে আসন করিয়া গণেশের মূর্তি তদুপরি উপবিষ্ট। কর্ণে কুণ্ডলের পরিবর্তে দুইটি নরমুণ্ড দুলিতেছে। মস্তকোপরি নরমুণ্ড। বলিদ্বীপে যে-সকল শিব-মূর্তি দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে অনেকের একাধিক মুখ। পঞ্চমুখ শিবের মুখগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে আবার ক্রমান্বয়ে ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। কাম্বোজেও এই অবস্থা। তবে বৃহত্তর ভারতে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত শিব-মূর্তি। বলিদ্বীপ, যবদ্বীপ (ও তদন্তর্গত বাটাভিয়ার মিউজিয়ম), কাম্বোজ—সর্বস্থানেই বিভিন্ন আকৃতির ও গঠনের শিব-মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন স্থানে শিব-মূর্তির সহিত নর-কঙ্কালও রক্ষিত আছে। বৃহত্তর ভারতের প্রায় প্রত্যেক দেব-দেবীর মূর্তিতেই রুদ্র ভাব বিরাজমান। শিবের সৌম্যভাব, অথবা দুর্গার প্রসন্ন, প্রশান্ত মুখাবয়ব একেবারেই বিরল। দুর্গা-মূর্তি কালীর ন্যায় করাল বদনা, লোলরসনা। দুর্গা-মূর্তিকে ভীমা ভয়ঙ্করা রূপে অঙ্কিত করার দুইটি কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে প্রকৃতির রুদ্রলীলা বিশেষরূপে প্রকট। সমুদ্র-পরিবেষ্টিত, ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির উৎপাতে উহাদের ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসিগণের নিকট প্রকৃতির রুদ্ররূপ যে বিশেষ একটি মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া

* মূর্তিপূজাকে কেন্দ্র করিয়া ভারতীয় সভ্যতার একাংশের প্রসারের ইতিহাস সাম্প্রতিক গবেষণায় অনুদ্ঘাটিত হইয়াছে; এই সম্পর্কের প্রথম দিকে, তাহার আভাস মাত্র দান করিয়া, দক্ষিণ-ভারতে দুর্গাপূজার যে-রূপ সংস্করণ কিছু কাল পূর্বেও প্রচলিত ছিল, তাহার সামান্য পরিচয় উপস্থিত করা হইয়াছে। এই সম্পর্কের ঐতিহাসিক মর্যাদার প্রতি আস্থা না করিয়া পাঠক ইহার মধ্যে চিত্তার খাদ্য পাইবেন এইরূপ আশা করি।

প্রতিভাত হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। এবং দেব-দেবীর মূর্ত্তি গঠনের সময় প্রতিকৃতির উপর সেই রুদ্র ভাবের আরোপ একেবারে অসম্ভব নাও হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুধর্ম্মের প্রবেশলাভের পূর্ব্বে ঐ সকল স্থানে যে সকল আদিম দেবদেবীর মূর্ত্তি ছিল, তাহা অবশ্যই ভয়ঙ্কর ও অপ্রিয়দর্শন। কিন্তু কালক্রমে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি ঐ সকল স্থান অধিকার করিলেও আদিম দেবদেবীর ছাপ কিয়ৎ পরিমাণে উহাদের মধ্যে থাকিয়া যাওয়া আদৌ অস্বাভাবিক নয়। মন্দিরগাত্রের রাক্ষস-মূর্ত্তিগুলিরও এই-ভাবেই উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

শিব-মূর্ত্তি অত্যধিক পরিমাণে পরিদৃষ্ট হইলেও লিঙ্গ-মূর্ত্তি একেবারেই বিরল। ইহার কারণস্বরূপ সহজেই বলিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, বামাচারী শৈব সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই তৎকালীন হিন্দুধর্ম্ম বৃহত্তর ভারতে প্রসার লাভ করিয়াছিল। এবং পরবর্ত্তী যুগে বামাচারীরা স্বীয় অভ্যুত্থানের পরেও ঐ সকল স্থানে আপনাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার মূর্ত্তিও বৃহত্তর ভারতে দেখা যায় না।

বৃহত্তর ভারতের উপাসনা-পদ্ধতিও উত্তর ভারতের প্রণালী হইতে বিভিন্ন। দর্শনার্থীর কোলাহল একেবারেই নাই। সমবেত জনতা নীরবে প্রার্থনা করে। পুরোহিত আপন মনে একাগ্রচিত্তে আরাধনা করেন। পূজায় মধ্যে মুদ্রার প্রাধান্য যথেষ্ট। সুতরাং পুরোহিতের বৈশিষ্ট্য তাঁহার দক্ষিণেতর বাহু। বাম হস্তের অঙ্গুলির নখরগুলি সুবৃহৎ। পূজার সময় পুরোহিত গর্ভমন্দিরে মন্ত্রাদি পাঠ করেন, বাহিরে প্রাঙ্গণে আরাধিত দেবতার নয়ন-সম্মুখে উচ্চ বেদীর উপর নৈবেদ্যাদি সুসজ্জিত থাকে। ফলমূলাদিপূর্ণ নৈবেদ্যের পার্শ্বে, উপাস্ত দেবতার দৃষ্টিপথে, পুষ্পমালোয় সৌরভে পরিপূর্ণ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বর্ণ-বিদ্বেষহীন শুচিমনা দর্শক যখন গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সুমধুর বাদ্যধ্বনি ও পুরোহিতের উদাত্ত স্বরে মন্ত্রপাঠ শুনিতে শুনিতে এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশে তন্ময় হইয়া যায়, তখন সেই শান্তিপূর্ণ মন্দিরাভ্যন্তরে স্বর্গের সুষমা ও মাধুর্য্য আপনি আসিয়া তাহার নিকট স্বেচ্ছায় ধরা দেয়। পূজাবসানে উত্তর ভারতের প্রথার ন্যায় পুরোহিত প্রসাদসকল সযত্নে স্বীয় পরিবারের জন্য রক্ষা করিয়া উপস্থিত পূজার্থী ও ভক্তগণকে তাহিকা প্রদানে ব্যস্ত করেন না। উপস্থিত দর্শক-বৃন্দের মধ্যে প্রসাদ বিতারিত হয়। এমন কি দুই তিন দিন ধরিয়া এই বিতরণ চলিতে থাকে।

বৃহত্তর ভারতের দুর্গামূর্ত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের দুর্গামূর্ত্তির পরিকল্পনা আরও অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর। দক্ষিণ ভারতীয়দিগের মতে অব্যক্ত, অজ্ঞেয় দেবাদিদেব সর্ব্বশক্তিমান ও নিরাকার; সেই সর্ব্বশক্তিমানকে সাকাররূপে উপাসনা করার জন্য যে-আকৃতি দেওয়া হয়, সেই বাঙ্ময়োগোচর দর্শন ও স্পর্শেন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্ত্তিই লিঙ্গ। এই লিঙ্গ-মূর্ত্তিকেই দেখিতে অথবা স্পর্শ করিতে পারা যায়। এই লিঙ্গমূর্ত্তি প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের সম্মিলনে গঠিত। এই পুরুষই ঈশ্বর—অপর নাম শিব। এবং এই শক্তিই প্রকৃতি। এই শক্তির আর এক নাম পার্ব্বতী বা দুর্গা। পার্ব্বতী ঈশ্বরপত্নী, তবে সপত্নী-বিহীনা নন। ঈশ্বরের দুই স্ত্রী —গঙ্গা এবং পার্ব্বতী। গঙ্গার আবার সাত সখী। যদিও এই পার্ব্বতী এবং দুর্গা একই, তবুও উভয়ের আকৃতি-প্রকৃতি ও কার্য্যে অনেক প্রভেদ আছে।

দক্ষিণ ভারতে যে দুর্গা-মূর্ত্তির পূজা করা হয়, উহা উত্তর ভারতের মূর্ত্তি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমাদের দেশে দশভুজা দক্ষিণপদ সিংহের উপর এবং বামপদ মহিষাসুরের উপর বিন্যস্ত থাকেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের দুর্গামূর্ত্তি দাঁড়াইয়া থাকেন অসুরের উপর, এবং সেই অসুরের নাম সিংহমুখাসুর। নাম হইতে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে, দুর্গার সহিত যুদ্ধে নিরত উক্ত অসুরের মুখ সিংহমুখা-কৃতি। পশুরাজের মতই তাহার বিক্রম। কারণ দুর্গা যতবার তাহাকে বধ করিতেছিলেন, ততবারই তাহার দেহ হইতে একটি নূতন অসুরের উদ্ভব হইতেছিল। আমাদের পৌরাণিক কাহিনীর সহিত এই উপাখ্যানের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের এই দুর্গা দশভুজা নন,—তাঁহার বাহুর সংখ্যা মাত্র ছয়টি। ছয়বাহুর মধ্যে একটিতে আবার অস্ত্রাদি কিছুই নাই, অপর পাঁচটিতে যথাক্রমে চক্র, তরবারি, ত্রিশূল, ছাগ ও নরকপাল। দুর্গার কপালে পবিত্র ভস্মদ্বারা অঙ্কিত অর্দ্ধচন্দ্র। মস্তক, বাহু ও সমুদয় দেহে বিবিধ অলঙ্কারের বিশেষ প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। দুর্গার মস্তকের চারিদিকে এক তীব্র জ্যোতি—অগ্নির মতই উহা উজ্জ্বল।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের দুর্গার এই মস্তক। দেহ ও অন্যান্য অঙ্গ রমণীর ন্যায় হইলেও মস্তকটি নারীর নয়—দুর্গার মেষমস্তক।

দুর্গার এই মেষমস্তকের কারণ সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত আছে; কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য উহা সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল:

উত্তর ভারতের পৌরাণিক উপাখ্যানে মহামায়া বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তামিল ও মালয়ালমভাষীদিগের নিকট উহা সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। আমরা মহামায়া বলিতে বুঝি দুর্গা; কিন্তু উহাদের উপাখ্যান-অনুযায়ী মহামায়া এক অতি সুন্দরী, সুগঠিতদেহা, কামাতুরা রমণী। প্রিয়দর্শন মুনি রম্ভপ্লকে দেখিয়া তাঁহার অন্তরে সম্ভোগ-বাসনা জাগরিত হয়। নানা ছলনায় তিনি ধ্যানমগ্ন রম্ভপ্লের তপস্যা ভঙ্গ করেন। রম্ভপ্লও মহামায়ার রূপে মোহিত হন। মহামায়া নানা ভাবে রম্ভপ্লকে আকৃষ্ট করেন। দানবী বলিয়া মহামায়া স্বেচ্ছামত রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া যে কোন পশু অথবা প্রাণীর আকৃতি ধারণ করিতে পারিতেন। তপস্যাবলে মুনি রম্ভপ্লও কামরূপ ছিলেন। অবশেষে নেষরূপ পরিগ্রহ করিয়া উভয়ে মিলিত হন এবং এই মিলনের ফলে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করে তাহার দেহ নানা-বয়বের ন্যায় হইলেও মস্তকটি মেষের অনুরূপ থাকিয়া যায়। এই নবজাতা কন্যাই দুর্গা। উত্তর ভারতের নানা প্রাচীন উপাখ্যানে দেবদেবী সম্বন্ধে এরূপ কাহিনীর অস্তিত্ব একেবারে বিরল নয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উত্তর ভারত ব্যতীত অন্যান্য স্থানের দুর্গা মূর্ত্তিতে রহিয়াছে একটা কড়তার। এতদ্ব্যতীত, উত্তর ভারতের দুর্গার কাছে ধন, যশ, বিদ্যা ইত্যাদি দান করা, এবং সন্তানকামের আশায় প্রত্যেকে ঐ সকলই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের দুর্গা শক্তি, বাগ্বিভূতি, ও ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রদান করেন বলিয়াই সাধারণতঃ কল্পিত হইয়া থাকেন। উচ্চ-দেব-বংশ-প্রসূতা কোন দেবীর পক্ষে এবম্বিধ বিদ্যাদান গৌরবের হানিকর। বিশেষতঃ, তিনি রজোগুণ সম্পন্না—রণ-রঙ্গিণী মূর্ত্তিতে দুর্দ্ধর্ষ অসুরের সহিত যুদ্ধে নিরতা। সুতরাং তাঁহার মধ্যে ক্ষত্রিয় অর্থাৎ দেবত্ব ও দানবত্ব উভয়েরই সংমিশ্রণ আছে, প্রধানতঃ ইহাই দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহার জন্ম-কাহিনী এইভাবে প্রচলিত, বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে।

দুর্গার আরও অনেক নাম ঐ দেশে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটির নাম প্রদত্ত হইল: নীলী (মেঘের বর্ণ নীল বলিয়া), অজমুখী (মেষমস্তকের নিমিত্ত, এস্থলে অজ অর্থে মেষই গ্রহণ করিতে হইবে), সৌরী (সৌর্য্য ও শক্তির জন্য), শূলী (শূল অর্থাৎ ত্রিশূল ধারণ হেতু) ভগবতী, সুন্দরী ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দুর্গার আর এক নাম পার্ব্বতী। ঈশ্বরের প্রথমা স্ত্রী গঙ্গা, এবং পার্ব্বতী তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী। ঈশ্বরের পত্নীরূপে তাঁহাকে বর্ণনা করা হইলেও প্রকৃত পক্ষে নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রা, অক্ষতা, চিরকুমারী রূপেই তিনি কল্পিত হইয়া থাকেন। সুন্দরী রমণীর ন্যায় তাঁহার দেহের গঠন। পার্ব্বতীর যে যে রূপের বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে কালিদাসকে মনে পড়িয়া যায়:

> তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
> মধ্যে ক্ষামা চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
> শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
> যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।

তবে তিনি শ্যামা নন, তাঁহার রূপের জ্যোতি ও দীপ্তিতে কোটী সহস্র সূর্য্যও নিষ্প্রভ ও মলিন হইয়া যায়—এখানই তাঁহার রূপের প্রাখর্য্য। কিন্তু পার্ব্বতীর এতাদৃশ রূপ এবং আকৃতি হইলেও তিনি কামরূপা, যে কোন মুহূর্ত্তে ইচ্ছামত তিনি যে-কোন রূপ পরিগ্রহ করিতে পারেন।

দক্ষিণ ভারতের এই পার্ব্বতী তথাকার দুর্গা-মূর্ত্তির মত ষড়ভুজা নন—তিনি চতুর্ভুজা। ঊর্দ্ধবর্তী দুই বাহুর একটিতে একটি সূত্রাকৃতি ফুলমূর্ত্তি, এবং অপরটিতে পাশ ধারণ করিয়া আছেন। অপর দুইবাহু নিম্নবর্তী এবং শূন্য—অস্ত্রাদি কিছুই নাই। একটি বড় পদ্মকে আসন করিয়া তদুপরি দাঁড়াইয়া আছেন। মাথায় উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় মুকুট। বক্ষ, বাহু ও সারা অঙ্গ বিবিধ মণিমুক্তা ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত।

ঈশ্বরের ঔরসজাত পার্ব্বতীর সন্তানসংখ্যা সাতটি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, শুভ্রদন্তা, বিবাহন, তত্ত্বেশ্বর এবং বিঘ্নেশ্বর।

ঈশ্বর ও পার্ব্বতীর সম্মানার্থে এক বার্ষিক উৎসব হয়, সেই উৎসবের নাম তিরুকল্যাণ। এই উৎসবে ঈশ্বর এবং পার্ব্বতী

স্বামী-স্ত্রী রূপে কল্পিত হন, এবং ইঁহাকে তাঁহাদের বিবাহের বার্ষিক উৎসব বলা চলে। সাধারণতঃ এই উৎসব নয় অথবা দশদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঈশ্বর, পার্ব্বতী, বিঘ্নেশ্বর, ষড়ানন ও ভৃঙ্গীশ্বরকে শোভাযাত্রা সহকারে বাহির করা হয়। প্রথম তিন দিন চাঁদোয়ার দ্বারা আচ্ছাদিত পালকি চড়াইয়া তাঁহাদের নগর পরিভ্রমণ করান হয়। চতুর্থ দিন যে-আসনে বসিয়া তাঁহারা বাহির হন তাহাকে বলে পীঠ বা পীঠাসন। পঞ্চমদিনে বৃষপৃষ্ঠে তাঁহারা নগর প্রদক্ষিণ করেন। এই দিন জনতা ও দর্শনার্থীর সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। কারণ, সাধারণের বিশ্বাস এই দিন পূজা করিলে অতীত দিনে অজ্ঞাত কার্য্যের ফলে অর্জ্জিত পাপ সকল খণ্ডন হয়। সুতরাং পঞ্চম দিবসে দলে দলে লোকেরা পূজা করিতে আসে। ষষ্ঠদিনে হস্তী, সপ্তম দিনে সিংহ এবং অষ্টম দিনে কৈলাস পর্ব্বতারোহণে তাঁহাদিগকে বাহির করা হয়। শেষোক্ত দিনে তাঁহাদের সিংহাসনগুলিকে নানাভাবে সজ্জিত করিয়া দেখিতে পাহাড়ের মত করা হয়। এই দিনে দর্শনাকাঙ্ক্ষী ও পূজার্থীর সংখ্যা অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পায়। কারণ এই দিনে পার্ব্বতীকে পূজা করিলে সহজেই এক বিশেষ পুণ্য লাভ করা যায়। দক্ষিণ ভারতীয়দিগের দৃঢ় বিশ্বাস, এই দিনের পূজার ফলস্বরূপ মৃত্যুর পর তাহাদিগের অক্ষয় স্বর্গলাভ অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য অষ্টম দিনে অলিন্দাভ্যন্তর, প্রাঙ্গণ, পথ ইত্যাদি সমস্ত স্থানই বিশাল জনসমাগমে কোলাহলমুখরিত হইয়া উঠে। নবম দিবসে বাহির হয় পাঁচখানি রথ। দক্ষিণ ভারতের এই সকল রথ দেখিতে অনেকটা উত্তর ভারতের রথের মত হইলেও উভয়ের আকারে অনেক প্রভেদ আছে। বিশেষতঃ, যে-দুইখানি রথে ঈশ্বর ও পার্ব্বতীকে বসান হয় সেই দুইটি অতি বৃহৎ। এই সকল রথে শুধু দেবতার মূর্ত্তি এবং পূজারীই থাকেন না, রথের মধ্যস্থলে এক বিরাট অংশে দেবদাসীরাও নৃত্য করিতে থাকে। এই সকল বিশাল রথ পাঁচ শত, সাত শত, এমন কি হাজার লোক দ্বারাও বাহিত হয়।

দশম দিবসে পূজা সমাপ্তির পর ঈশ্বর ও পার্ব্বতীকে মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে স্থাপন করা হয়। সম্মুখের ও চারিপার্শ্বের উন্মুক্ত স্থানে অস্থায়ী আবরণের ব্যবস্থা করা হয়। এই দিনে স্থানটি প্রকৃতই দর্শনীয় হইয়া উঠে। পূজারীরা দলে দলে পুষ্প, মালা, পত্র এবং নারিকেল ইত্যাদি ফল লইয়া আসে। দেবমূর্ত্তির পার্শ্বে সেগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়। পূজারিগণ সুস্বরে মন্ত্রপাঠ করিতে থাকেন। এক ধারে অগ্নিক্রীড়া চলিতে থাকে। বড় বড় জলন্ত মশাল লইয়া অনেকে নানারূপ বিস্ময়কর ও কৌতূহলোদ্দীপক ক্রীড়া দেখায়। কেহ প্রজ্বলিত অগ্নিমুণ্ড উদ্গলনে অতিক্রম করিয়া যায়, কেহ বা বংশ-নির্ম্মিত কয়েকটি গোলাকার চক্র রচনা করিয়া তাহাতে বস্ত্রাদি জড়াইয়া অগ্নি-সংযোগ করে, এবং কয়েক হস্ত ব্যবধানে স্থাপন করিয়া চক্রের মধ্য দিয়া দৌড়াইয়া এধার ওধার যাতায়াত করে। দেব মূর্ত্তির ঠিক সম্মুখে সঙ্গীতালাপ চলে। বাদ্যাদি সংযোগে গায়কেরা গান গায়। কিন্তু এই সকল উৎসবে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে দেবদাসী। উত্তর ভারতে এই প্রথা আর নাই, বর্ত্তমানে দক্ষিণ ভারতেও বহুস্থানে আর দেবদাসী দেখা যায় না। তবে প্রবন্ধে যে সময়ের কথা বলা হইতেছে সেই সময়ে, অর্থাৎ একশত বৎসর পূর্ব্বে, দক্ষিণ ভারতে দেবদাসীর বিশেষ প্রচলন ছিল। উৎসবাদিতে দেবদাসীর নৃত্য একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। ঈশ্বর ও পার্ব্বতীর মূর্ত্তির সম্মুখে দেবদাসীগণের এই নৃত্য দেখিবার বিষয়। অঙ্গুলি-সঞ্চালনে বিবিধ মুদ্রা রচনা করিয়া ও বিবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে তাহারা নৃত্য করে। কোন কোন দেবতার সম্মুখে নৃত্যকালে লাস্যভাব পরিলক্ষিত হইলেও সাধারণতঃ দেবদেবীর নৃত্যসকল লাস্যভাববর্জ্জিত। তাহাদের পরিধেয়ও উল্লেখযোগ্য বলিয়াই বোধ হয়। কোঁচ দেওয়া ঘাঘরার মত পরিচ্ছদে তাহাদিগের কোমর হইতে পায়ের পর্য্যন্ত আবৃত থাকে। এই বসন কখন কখন বিবিধ এবং বিচিত্র বর্ণের হয়। পোষাকগুলি দেখিতে অনেকটা নেপালী বা বর্ম্মী মেয়েদের নিত্যদিনের পরিচ্ছদের অনুরূপ। দেবদাসীদের উপরার্দ্ধ অনাবৃত, কাহারও বা বক্ষবন্ধ একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা কাঁচুলির ধরণে বাঁধা। বলিদ্বীপের নারীদের মধ্যেও দেহের উপরাংশের বস্ত্রহীনতা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

এইভাবে উৎসব-মুখরিত উপাসনার মধ্য দিয়া দশম দিবসে ঈশ্বর ও পার্ব্বতীর বিবাহ-বার্ষিকী সমাধা হয়।

উত্তর ভারতের দেব-দেবীর সহিত দক্ষিণ ভারতের দেব-দেবীর সাদৃশ্য ও পার্থক্য দেখাইবার জন্য দক্ষিণ ভারতের প্রধান দেবতাদিগের একটি বংশাবলী প্রদত্ত হইল :

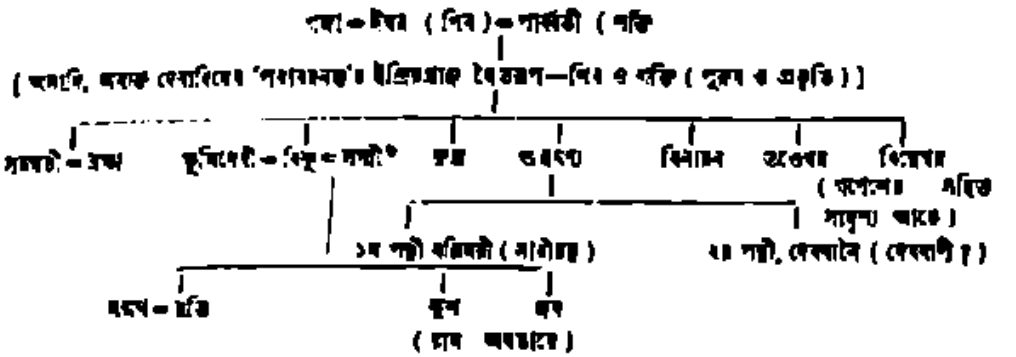


লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম দুঃখহরী। দুর্গাপূজার অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি, লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁহার চির-বিরোধ।

---

## দুর্গাপ্রতিমা

... দুর্গাপ্রতিমার গঠনচিত্র সর্বসাধারণে প্রচলিত। ইহা ও তাঁহার তিনটি অবস্থার প্রতিকৃতি। মূল দেবীমূর্তি ত্রিগুণপ্রকৃতির প্রতীক। তাঁহার দশটি হাত, পাঁচটি ত্রিনয়নবিশিষ্ট মাথা ও পরিধানে দশটি বিভাগ। দক্ষিণভাগস্থ সরস্বতীমূর্তি প্রকৃত জ্ঞানের প্রতিকৃতি। লক্ষ্মীমূর্তি প্রকৃত ঐশ্বর্যের প্রতিকৃতি। কার্তিকেয়মূর্তি সর্ববিধ সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতিকৃতি। গণেশমূর্তি সর্ববিধ আবিলতা-প্রসূতির প্রতিকৃতি। অসুরমূর্তি আসুরিকতার প্রতিকৃতি। সিংহমূর্তি মূল-প্রকৃতির কার্য-শক্তির প্রতিকৃতি।

যে অস্ত্রের দ্বারা 'মা' অসুরকে প্রহারকল্পে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, সেই অস্ত্রের নাম চক্রধার। সেই অস্ত্র দক্ষিণহাতের উর্ধ্ব হইতে সম্মুখ বাহুতে বর্তিত হয়।

আসুরিকতা অথবা ইচ্ছাবিকৃতি ও অসদ্বৃত্তির চরিতার্থতা নিরোধিত করিবার প্রকৃষ্ট উপায় কি তাহার নির্দেশ ইহা হইতে পাওয়া যায়। দক্ষিণহাতের উর্ধ্ব হইতে সম্মুখ বাহু দিয়া দক্ষিণ ভাগের প্রতিকৃতি আর তীক্ষ্ণাগ্র তীব্র তেজের প্রতিকৃতি। যাঁহারা আত্ম-তত্ত্বের সাধনার অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, নিজের সমগ্রভাব সম্বন্ধে জ্ঞানে অনুভবে করা অত্যন্ত প্রয়োজন, মানবিক মন ব্যবহারের সহিত ঐ এক করে প্রকৃত হইয়া নিজের পথে অগ্রসর হইতে পারিলেও শরীরের দক্ষিণভাগের সহিত বামভাগের যে কি সম্বন্ধ, তাহা উপলব্ধি করা এবং শরীরমধ্যস্থ পাঁচটি বায়ুর কার্য প্রত্যক্ষ করা সহজসাধ্য হয় না। তখনও কামাদির তীব্রতা প্রায় সমানভাবেই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু, আমাদের কবির এমনই আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি যে, যেকোন দুর্বলতম অবস্থায় কল্পিতে শিখা জ্বলিলেই নিজের দক্ষিণভাগের মূর্তিগুলা স্পষ্ট হইয়া যায় ও তাহা হইতে নিজ নিজ কল্পিত রস নির্গত হইতে থাকে। তখনকার অভিজ্ঞতায়, হৃদয়ভাব এবং শরীরভাবের পরস্পরের সাযোগ প্রত্যক্ষীভূত হইয়া পাঁচটি বায়ুর প্রত্যেকটির সমতা সাধিত হয় ও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধি হওয়া সম্বন্ধে উহা সহজ হইয়া পড়ে। এইরূপে নিজের দক্ষিণভাগের অবস্থার সহায়তায় আত্মিকতা বর্ধিত হয়।

দুর্গা-প্রতিমা সম্বন্ধে আমরা যাহা মুখাতঃ ব্যক্ত করিলাম, তাহা হয়ত অনেকের চক্ষে রূপক-ব্যাখ্যা বলিয়া প্রতীত হইবে। কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে উহা কোন রূপক-ব্যাখ্যা নহে। সমস্ত কোটি পরিভাষার হইতে পারিলে ব্রহ্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অনন্তদেব, দুর্গা, শিব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, কার্তিকেয়, গণেশ, অসুর, সিংহ এবং ছাগ প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা বিশ্লেষণে বুঝিতে পারা যায়। তখন দেখা যাইবে যে, আমরা যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণভাবে উপরোক্ত শব্দগুলির অর্থের সহিত সমঞ্জসীভূত...

---

# চিত্রগুপ্তের এড্‌ভেঞ্চার

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

এক দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীমান্ চিত্রগুপ্ত নয়ন-মনের দারে বসিয়া স্নায়িলাভের তাল দিয়া হস্ত-মার্জনা করিতেছিল। এমন সময়ে পিতামহ ব্রহ্মা হাসিয়া বলিলেন,—বৎস চিত্রগুপ্ত, তোমাকে একবার ইন্দ্রলোকে যাইতে হইতেছে।

এই অতর্কিত সংবাদে চিন্তিত হইয়া চিত্রগুপ্ত শুধাইল—পিতামহ, হঠাৎ এরূপ আদেশের কারণ কি? পিতামহ বলিলেন, তবে শোন। অনেক দিন হইল ইন্দ্রলোক হইতে যে সব রিপোর্ট আসিতেছে, তাহাতে দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিয়াছে। সকল দেবতারা বলিতেছে—পিতামহ বৃদ্ধ মানুষ, তাহার নিশ্চয় ভুল হইয়াছে। আর তাড়াতাড়িতে এত বড় বিশ্ব-সৃষ্টির সময়ে যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি ঘটিয়াছে, তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে!

চিত্রগুপ্ত শুধাইল—ভুলটা কি?

পিতামহ বলিলেন—তাহারা বলিতেছে ইন্দ্রজাতি সৃষ্টি করিবার সময়ে আমি না কি তাহাদের মাথার খুলির মধ্যে মস্তিষ্ক অর্থাৎ বুদ্ধি ভরিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছি। এত দিন ঘটনাটা জানা ছিল, সম্প্রতি ইন্দ্রলোক হইতে যে সব খবর আসিতেছে তাহাতেই এই তথ্যটা ধরা পড়িয়াছে।

চিত্রগুপ্ত বলিল—সে কি পিতামহ, মস্তিষ্ক ছাড়া কি মানুষ হয়?

ব্রহ্মা বলিলেন—হয় কি না হয়, অনুসন্ধান করিবার জন্যই তোমাকে একবার তথা করিয়া ইন্দ্রলোকের রাজধানীতে যাইতে হইবে। মনে রাখিও, তোমার রিপোর্টের উপরেই ইন্দ্রজাতির অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। সত্যই যদি উহাদের মাথার মধ্যে বুদ্ধি দিতে ভুল হইয়া গিয়া থাকে—তবে আস্তিটাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। ইতিমধ্যে দেবতারা এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য যে 'এন্‌কোয়ারি কমিটী' বসাইয়াছে, তাহার কাজ বন্ধ থাকিবে।

দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া চিত্রগুপ্ত ইন্দ্রলোকে যাইতে প্রস্তুত হইল; ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি ফিরিয়া আসিলে তোমার যাহিনার বিষয় একবার বিবেচনা করিব।

২

চিত্রগুপ্ত ইন্দ্রজাতির দেশে ইন্দ্রলোকের রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

একদিন সে দেখিতে পাইল সুদীর্ঘ এক জন-প্রবাহ রাজ-পথ ধরিয়া চলিয়াছে; তাহাদের হাতে লাল রঙের পতাকা, পতাকায় নানারূপ বাণী লিখিত; মুখে মুখে মুহুর্মুহু 'বিপ্লবিলাব ঈশ্বরাবাদ' ধ্বনি। এই শোভাযাত্রার সম্মুখভাগে

...সে কি পিতামহ! মস্তিষ্ক ছাড়া কি মানুষ হয়...

যাহারা চলিয়াছে তাহাদের অতি হীন বেশ, কিন্তু যতই পিছনে যাওয়া যায় লোকের বেশ-ভূষা মূল্যবান, সবশেষে যাহারা আসে তাহারা মোটরে ও অশ্বযানে চলিয়াছে। চিত্রগুপ্ত এ হেন দৃশ্য কখনও দেখে নাই; কাজেই বুঝিতে পারিল না এ জাতীয় শোভাযাত্রার উদ্দেশ্য কি? তবে এটুকু বুঝিল, কিছু অগ্রসর না হইলে জন-প্রবাহ এরূপ বিশৃঙ্খলভাবে ধারণ

করে না! ব্যাপার কি জানিবার জন্য সে পাতাকাঠালী এক ব্যক্তিকে শুধাইল, মশাই এ শোভাযাত্রা কিসের জন্য? সে লোকটা বিস্মিত হইয়া বলিল, আপনি নিশ্চয় রঙ্গজাতির লোক নন, নতুবা এ প্রশ্ন আপনার মনে উঠিত না। তারপর কণ্ঠস্বর নীচু করিয়া বলিল, এ জাতীয় প্রশ্ন করা মহা অপরাধ। বিদেহ জন্য এ শোভাযাত্রা আমি জানি না। তবে ইহাতে যোগ না দিলে অপরাধ আরও গুরুতর, তাই আসিয়াছি। আপনি পিছনে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

...মাথা থাকিলেই মস্তিষ্ক থাকে না, দিব্যদৃষ্টি লাভ করিলে আপনি দেখিতে পাইবেন এরা সবাই কবন্ধ...

চিত্রগুপ্ত পিছনের এক ব্যক্তিকে এই প্রশ্ন করিল। সে বলিল, এ প্রশ্ন কখনও আমার মনে জাগে নাই, জন্ম হইতেই এই জাতীয় শোভাযাত্রা দেখিতেছি। আপনি পিছনে জিজ্ঞাসা করুন।

চিত্রগুপ্ত ক্রমে পিছনে আসিতে লাগিল, কিন্তু কেহই বলিতে পারিল না এই শোভাযাত্রার অর্থ কি। অবশেষে সে সবচেয়ে পিছনের মোটরচড়ে এক নধরকান্তি পুরুষকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিল। সেই ব্যক্তি বলিল, দেখুন, আমি বুঝিতেছি আপনি নিশ্চয় রঙ্গজাতির লোক নন, কারণ তাহাদের মনে কখনও এ প্রশ্ন জাগে নাই। আপনাকে এই অঙ্গীকারে বলিতেছি যে, আপনি ইহা অপরকে বলিবেন না। আমার এক প্রবল শত্রুর একটি লোহার কারখানা আছে, প্রতিযোগিতায় আমার কারখানা কিছুতেই তাহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতেছে না, এমন চলিলে শীঘ্রই আমার সর্বনাশ হইবে। তাই আমি দেশের লোককে ক্ষেপাইয়া দিয়াছি; সে লোকটা যে দেশের শত্রু ইহা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছি; তার কারখানার মজুরেরা ধর্মঘট করিয়াছে—এখন আমরা সকলে মিলিয়া চলিয়াছি সেই কারখানা ধ্বংস করিতে।

চিত্রগুপ্ত বলিল, লোকে কি প্রশ্ন করিল না? জানিতে চাহিল না কি করিয়া লোকটা দেশের অনিষ্ট করিতেছে?

নেতা বলিল, আগে ওরকম বিরক্তিকর প্রশ্ন করিত, কিন্তু যেদিন হইতে তারা আমার হেপাজতে তাদের মস্তিষ্ক 'safe deposit' রাখিয়াছে, তারপর হইতে প্রশ্ন করিবার মত বুদ্ধি আর তাহাদের নাই।

বিস্মিত চিত্রগুপ্ত বলিল, সে কি? সকলেরই তো মাথা দেখিতেছি।

নেতা বলিল, মাথা থাকিলেই মস্তিষ্ক থাকে না। দিব্যদৃষ্টি লাভ করিলে আপনিও দেখিবেন এরা সবাই কবন্ধ।

চিত্রগুপ্ত বলিল, ভাল! কিন্তু ওই 'মিলমিলাব্ কৈজাবাদ' ধ্বনির অর্থ কি?

নেতা বলিল, সিংহ যে গর্জন করে তাহার অর্থ কি? শুনুন তবে বলি, এ রঙ্গদেশ, এখানে অর্থ বলিতে ধাতু-মুদ্রা বুঝায়। অন্য কোন জাতীয় অর্থ এদেশে আশা করিবেন না। 'মিল্‌মিলাব্ কৈজাবাদ' ধ্বনিতে অর্থ নাই, কেবল শব্দ আছে—আর নিরর্থক শব্দে রঙ্গজাতি যেমন অনুপ্রাণিত হয় এমন আর কিছুতেই নয়।

এই ব্যাপার দেখিয়া চিত্রগুপ্তের মানসাকাশে ক্রমে ক্রমে চৈতন্যের ধূমকেতু উদিত হইতে লাগিল।

৩

রঙ্গদেশের রাজধানীর প্রান্তে এক হ্রদ আছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় চিত্রগুপ্ত সেখানে যাইত; দিনের অভিজ্ঞতা পরিপাক করিবার জন্যও বটে, আবার সারাদিনের ঘটনার রিপোর্ট লিখিবার জন্যও বটে।

একদিন সে দেখিতে পাইল অদূরে একটি গাছতলার গাছের তলায় একখানা বেঞ্চিতে একটি তরুণী ও একটি যুবক উপবিষ্ট। তরুণীটি অতিশয় সুন্দরী।

চিত্রগুপ্তের চোখ ঊর্বশী-মেনকা-প্রুফ, অর্থাৎ যাকে তাকে চোখে ধরে না। কিন্তু এ নারী যে-সে নয়; এমন কি তাহার স্বর্গীয় চিত্তও চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই পুরুষটির প্রতি সে ঈর্ষা অনুভব করিল। দৈব-শক্তির বলে সে শুনিতে পাইল মেয়েটি যুবককে বলিতেছে, যতদিন না এই হ্রদের জল সমুদ্রের মত লবণাক্ত হয় ততদিন আমি তোমাকে ভালবাসিব। ইহা শুনিয়া চিত্রগুপ্ত বুঝিল, যুবকটির ভাগ্য ঈর্ষ্যা করিবার মত বটে।

পরদিন আবার সে রিপোর্ট লিখিবার জন্য এবং সেই তরুণীকে দেখিবার জন্য হ্রদের ধারে গেল। সে দেখিতে পাইল সেই তরুণীটি সেই স্থানে বসিয়া আছে, কিন্তু এ কি! তার পাশে যে যুবকটি সে তো আগের দিনের ব্যক্তি নয়! আরও সে শুনিতে পাইল, মেয়েটি সেই পূর্ব দিনের মত অঙ্গীকার করিতেছে, হ্রদের জল লবণাক্ত না হওয়া পর্যন্ত সে তাহাকে ভালবাসিবে।

ইহার পর প্রতিদিন সেই মেয়েটিকে সে লক্ষ্য করিয়াছে, প্রতিদিন তাহার পাশে নূতন এক যুবক, কিন্তু প্রতিদিন সেই পুরাতন প্রতিজ্ঞা।

অবশেষে সে বুঝিল রক্ষদেশের আধুনিকার বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত, এবং সে বিবাহের স্থায়িত্ব একটি দিন মাত্র। সে ভাবিল, স্বর্গে গিয়া এই 'দিনান্ত' বিবাহ সম্বন্ধে গোটা-দুই বক্তৃতা করিবে।

কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায় হ্রদের ধারে গিয়া আর সে তরুণীটিকে দেখিতে পাইল না। তার বদলে দেখিল, তরুণীর সঙ্গী যুবকদল হ্রদের ধারে বসিয়া হায় হায় করিতেছে, আর মাঝে মাঝে হ্রদের জল এক অঞ্জলি তুলিয়া মুখে দিয়া উচ্চ স্বরে কাঁদিয়া উঠিতেছে। জল মুখে দিয়া কাঁদিবার কি কারণ ঘটিতে পারে বুঝিতে না পারিয়া সেও এক অঞ্জলি জল তুলিয়া মুখে দিল, দেখিল, হ্রদের জল সমুদ্রের মত লবণাক্ত। তরুণীর প্রতিজ্ঞার কথা মনে হইল! কিন্তু হ্রদের জল লবণাক্ত হইল কি করিয়া?

সে পাশের একটি যুবককে ইহার রহস্যটা কি জিজ্ঞাসা করিল। যুবকটি বলিল, আর বলেন কেন? মেয়েটি, পাছে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, সেই ভয়ে রাতারাতি সাতাশ হাজার মণ লবণ আনিয়া হ্রদের জল লবণাক্ত করিয়া দিয়াছে। রক্ষ-জাতির আধুনিকারা পতি-পরিবর্তন করে কিন্তু মতি-পরিবর্তন করে না; অপমান করে কিন্তু অঙ্গীকার দান করিলে তাহা যথাসাধ্য রক্ষা করে।

...হায় হায় করিতেছে আর মাঝে মাঝে হ্রদের জল এক অঞ্জলি তুলিয়া মুখে দিয়া উচ্চ স্বরে কাঁদিয়া উঠিতেছে...

চিত্রগুপ্ত বলিল, তবে তো আপনাদের বড় দুঃখ দেখিতেছি?

যুবকটি বলিল, দারুণ দুঃখের মধ্যেও সান্ত্বনা লাভ করা রক্ষজাতির অভ্যাস। আমরা হতভাগ্য এই কয়জন মিলিয়া এই হ্রদটি ইজারা লইয়াছি; এখন জল শুকাইয়া লবণ করিতে পারিলে দু'পয়সা ঘরে আসিবে; দ্বিতীয় বারে বেচিতে পারিব, রাজধানীতে এক ছটাক লবণও নাই।

কিন্তু মেয়েটি গেল কোথায়?

যুবক বলিল, ওই লবণের পাইকারী ব্যবসায়ীর কাছে গিয়াছে।

সেখানেই কি বরাবর থাকিবে ?

যুবকটি বলিল, কেমন করিয়া বলিব ? ইহার পরে চিনি আছে, গুড় আছে, দুধের কলের কত রকম স্বাদ পরিবর্তন হইবে, দেখিতে পাইবেন।

চিত্রগুপ্ত শুধাইল, এমন রূপময়ী নারী হাতছাড়া হওয়াতে দুঃখ হইতেছে না ?

যুবক বলিল, রূপ ভাল, কিন্তু রূপা আরও ভাল, ইহাকেই বলে, "ইকনমিক ইণ্টারপ্রেটেশন অব্ লাভ।"

চিত্রগুপ্ত সেইদিন হইতে দুধে যাওয়া ছাড়িয়া দিল।

৪

রঙ্গদেশের সাহিত্যের খ্যাতি স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল ; চিত্রগুপ্ত শুনিয়াছিল এমন উচ্চদরের সাহিত্য না কি কোনও দেশে কখনও সৃষ্ট হয় নাই ; সাহিত্য উচ্চদরের হইলে সাহিত্যিকরাও অবশ্য উচ্চদরের হইবেন, চিত্রগুপ্তের ইচ্ছা হইল একবার তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে। স্বর্গে সে অবশ্য ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতিকে দেখিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা তো প্রাচীন কবি ; আধুনিক কবিগণকে দেখিয়া সে জন্ম সার্থক করিবে।

রাজধানীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সঙ্ঘের নাম 'সোমরস'। চিত্রগুপ্ত ত্বরে, সঙ্কোচে, শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে একদিন 'সোমরসে' গিয়া পৌঁছিল। সে আশা করিয়াছিল, রঙ্গজাতির সাহিত্যিকদের আলাপ-আলোচনা শুনিয়া জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া স্বর্গে ফিরিবে।

সে 'সোমরসে'র কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, একখানি টেবিলের চারিপাশে কয়েকজন সাহিত্যিক তাস খেলিতে বসিয়াছে, আর কয়েকজন ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেই খেলা দেখিতেছে। খেলিতে খেলিতে পরস্পরের প্রতি যে-সব বাক্য তাহারা প্রয়োগ করিতেছে, তাহা শুনিয়া চিত্রগুপ্তের কেমন যেন লাগিল,—ইহা কি ব্যাস-বাল্মীকির সগোত্রদের উচিত ভাষা !

আর একখানা টেবিল ঘিরিয়া একদল সাহিত্যিক ও সাহিত্যিকা গল্পগুজব করিতেছে। চিত্রগুপ্তের একটা বিষয় বড় রহস্যজনক বলিয়া মনে হইল—ইহারা সকলেই রঙ্গজাতির লোক, কিন্তু নামগুলা এমন বিদেশী কেন ? কাহারও নাম বার্ণার্ড শ', কাহারো নাম ওয়েল্স, কাহারও প্রুস্ত, কাহারো নাম এলিয়ট, কেহ স্পেণ্ডার, কেহ হুইটম্যান, কেহ বা ভার্জিনিয়া উল্ফ্ ! ব্যাপার কি ?

কোন এক মাসিকপত্রে ইঁহাদের একজনের একখানা বইয়ের নিন্দা করা হইয়াছে, সেই বিষয়ে আলোচনা চলিতেছিল।

প্রুস্ত বলিল, শালা লেখককে দেখে নেব ; লিখব এমন এক প্রবন্ধ।

…স্পেণ্ডার বলিল—ও-সব কিছু হবে না, চল ওর বাপের নামে কেচ্ছা লেখা যাক…

এলিয়ট বলিল, লিখে কি হবে ? বেটার স্ত্রীকে বের করে নিয়ে সরে পড়ো।

বার্ণার্ড্ শ' বলিল, তা হ'লে লোকটা বেঁচে যাবে। তার চেয়ে ও যখন গলি দিয়ে বের হয় ওর মাথায় মারো একখানা খান-ইট ছুঁড়ে।

স্পেণ্ডার বলিল, ওসব কিছু হবে না। চল ওর বাপের নামে কেচ্ছা লেখা যাক্।

ইহা শুনিয়া সকলে সমস্বরে 'হিপ হিপ, হুর্রে' করিয়া উঠিল !

আর একখানি টেবিলের পাশে কয়েকজন সাহিত্যিক বসিয়া নীরবে বোতল হইতে কি যেন ঢালিয়া ঢালিয়া পান করিতেছে। গন্ধটা যেন পরিচিত! ইন্দ্রের নৈশ দরবারে অনুরূপ গন্ধ অনেকবার সে ঘ্রাণ হইতে পাইয়াছে। ইহাদের কথা বলিবার পর্য্যন্ত অবকাশ ছিল না।

সে ফিরিয়া তাস-খেলোয়াড়দের কাছে গেল; তাহারা তখন তাস ছাড়িয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিয়াছে—ব্যাপার কি? অনেক অনুধাবন করিয়া বুঝিল, কারণ একজন রমণী। কে সেই রমণী? একটু সন্ধান করিতেই দেখিতে পাইল, একান্তে এক সুন্দরী তরুণী উপবিষ্টা; যমের দাবের বহু-বল্লভা সেই নারী!

ক্রমে ক্রমে সকলে সেখানে আসিয়া জড়ো হইল—তখন মারামারি গালাগালি এমন উচ্চগ্রামে উঠিল যে একটা কুরুক্ষেত্রের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। কেবল সেই যাহারা সন্দেহজনক পানীয় পান করিতেছিল তাহারা আসিল না, তখন তাহারা সমভূমি হইয়া শান্তিত।

চিত্রগুপ্ত ছুটিয়া গৃহত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। ট্রামের পয়সার জন্য পকেটে হাত দিয়া দেখিল পকেট শূন্য, কোটের পকেট শূন্য, পার্টের পকেট শূন্য, ফতুয়ার পকেট শূন্য। 'সোমরসে' আসিবার সময়ে পকেটে টাকা-পয়সা ছিল। বুঝিল সাহিত্যিকদেরই এই কাজ। ধন্য তাহাদের শিক্ষা! এক-সঙ্গে পর-পর তিন জামার তিন গুণ্ডে ছয় পকেট কাটা সামান্য প্রতিভার লক্ষণ নয়!

কিন্তু কি দেখিতে গিয়া কি দৃশ্য সে দেখিল! ইহারা সাহিত্যিক! ব্যাস-বাল্মীকির সগোত্র! কুৎসা, পরনিন্দা, অহমিকা, অশ্লীলতা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা, নারীহরণ, হত্যা, মদ প্রভৃতি লইয়া যাহারা মত্ত তাহারা মানুষকে কি নূতন কথা, কোন্ সান্ত্বনার কথা শুনাইবে? পাঠক ইহাদের বই পড়ে কেন? তাহারাও কি এই সব কথা শুনিতে চায়? চিত্রগুপ্তের মাথা ঘুরিতে লাগিল।

৫

চিত্রগুপ্ত থিয়েটার দেখিবার জন্য টিকিট করিয়াছে, কিন্তু পথ ভুলিয়া থিয়েটারে ঢুকিতে রঙ্গদেশের আইন-পরিষদে গিয়া প্রবেশ করিল। সে দেখিল বিরাট প্রাসাদ, ইহা রঙ্গদেশের যোগ্য থিয়েটার বটে। সুসজ্জিত আসনের একটাতে সে বসিল। দেখিল, রঙ্গমঞ্চে কাতারে কাতারে অভিনেতারা বসিয়া আছে; সাজ-সজ্জা দেখিয়া বুঝিল ইহারা সব কুরুপাণ্ডব। ওই যে বিরাটকায় পুরুষ, উনি নিশ্চয় ভীম, আর ওই যে চাপকান-সমন্বিত পুরুষ উনি নিশ্চয় দুর্য্যোধন। মাঝখানে ঘাড়ে-গর্দ্দানে যে লোকটা বসিয়া সে নিশ্চয় ধৃতরাষ্ট্র। ওই যে একদিকে অতি কীপকায়া দ্রৌপদীকেও দেখা যাইতেছে। সে পরম আগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এমন সময়ে দুর্য্যোধন উঠিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—ভাই সব, আজ এই সভায় স্থির করিতে হইবে সূর্য্য পশ্চিমে ওঠে, না পূব দিকে?

...পাণ্ডবের চোখকে কৌরবগণ বিশ্বাস করে না, কারণ তাহাদের চোখ মোহগ্রস্ত...

পাণ্ডবের দল ধিক্কার দিয়া উঠিল!

চিত্রগুপ্ত ভাবিল, এসব কথা তো মহাভারতে নাই। ভীম গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, প্রধান মন্ত্রী মহাশয়, আমি সহস্রবার সূর্য্যকে পূবে উঠিতে দেখিয়াছি। দুর্য্যোধন বলিলেন, আপনি দেখিলে কি হইবে? পাণ্ডবের চোখকে কৌরবগণ বিশ্বাস করে না, কারণ তাহাদের চোখ মোহগ্রস্ত।

পাণ্ডবের দল হইতে বিরূপাক্ষ বলিয়া উঠিল, আর কৌরবের চোখ অন্ধ; ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ—অন্ধের পুত্র অন্ধ।

দুর্য্যোধন বলিলেন, সভাপতি মহাশয়! বাপ তুলিয়া কথা বলা কি বে-আইনি নয়?

সভাপতি উত্তর দিবার আগেই বিরুপাক্ষ বলিল—বাপ যদি বে-আইনি না হয় তবে তার উল্লেখ বে-আইনি হইবে কেন?

পাণ্ডবের দল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; একজন বলিল—শুনুন, শুনুন।

কৌরবের দল বলিল, ধিক্ ধিক্!

সভাপতি রায় দিলেন, বাপ বে-আইনি নয়; তাহার উল্লেখ বে-আইনি।

তখন দুর্য্যোধন বলিলেন, ভাই সব, বর্ত্তমান যুগে চোখের উপরে বিশ্বাস নাই। আমরা ভোট দিয়া স্থির করিব সূর্য্য কোন্ দিকে ওঠে। আপনারা কি দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, ডাল-ভাতের জন্য কৌরবের দিকে ভোট দিবেন না? সূর্য্যের উদয় স্থির করিবার কি অধিকার পাণ্ডবদের আছে? উহারা সংখ্যায় কম; এ রাজ্য আমাদেরই; উহারা পুনরায় বনে যাক।

...তখন সভাগৃহের চারিদিক হইতে বিড়াল, কুকুর, গর্দ্দভ, বৃষভ, ছাগল, ভেড়া, মুরগি নানা জাতীয় সব পশু ডাকিয়া উঠিল।

সভাপতি বলিলেন, এ বিষয়ে তর্ক বৃথা! আপনারা ভোট দিবার জন্য প্রস্তুত হোন।

ইহা শুনিয়া ভীম বলিয়া উঠিলেন, ভ্রাতৃগণ—তোমরা যদি পাণ্ডবের দিকে হও, যদি আত্মসম্মান থাকে, যদি সত্য বলিবার সাহস থাকে, যদি স্বচক্ষে কখনও সূর্য্যোদয় দেখিয়া থাক—তবে এস আমার সঙ্গে সভা ত্যাগ করিয়া বাহিরে এস।

ইহা শুনিয়া ভীমকে অনুসরণ করিয়া পাণ্ডবদলের অনেকে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু কৌরবের দল ছাড়িবার পাত্র নয়। তাহারা হাত তুলিয়া স্থির করিল পশ্চিমে সূর্য্যোদয়ের পক্ষে ১৯৭ জন; আর পূর্ব্বে সূর্য্যোদয়ের পক্ষে মাত্র ২৭ জন!

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, আজ হইতে বঙ্গদেশে পশ্চিমে সূর্য্যোদয় হইবে; ইহার বিপরীত কথা কেহ বলিলে—বঙ্গদেশের আইন অনুসারে সে দণ্ডনীয় হইবে। সভা ভঙ্গ হইল।

চিত্রগুপ্ত বাহির হইয়া আসিতে আসিতে ভাবিতে লাগিল—তাহার পাঁচ সিকা পয়সা সার্থক হইয়াছে, এমন সুন্দর অভিনয় দেখিবার আশা সে করে নাই।

৬

চিত্রগুপ্ত ট্রামে ফিরিতেছে, এমন সময়ে দেখিল এক ছোকরা হাঁকিতেছে, নিয়ে নিন বাবু, চার চার পয়সা, নূতন আইন—"গীতার হস্তান্তরবাদ," নিয়ে নিন্।

গীতার হস্তান্তরবাদ! চিত্রগুপ্ত গীতার জন্মান্তর-বাদ সম্বন্ধে কিছু জানে! ব্যাপার কি দেখিবার জন্য চার

...আজ হইতে বঙ্গদেশে পশ্চিমে সূর্য্য উঠিবে...

পয়সা দিয়া একখানা বই কিনিয়া ফেলিল। বই পড়িয়া দেখিল—ব্যাপার আর কিছু নয়, মহাজনকে কি ভাবে ফাঁকি দেওয়া যায়, নিজের সম্পত্তি কি ভাবে আইনসঙ্গত উপায়ে বেনামী করা যায়, সেই সম্বন্ধে উদার সব আইন ইহাতে বিধিবদ্ধ। বঙ্গজাতি অত্যন্ত গীতাপরায়ণ, সেই জন্য গীতা হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া বুঝানো হইয়াছে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের গূঢ় মর্ম্ম কর্ম্ম-যোগ, জ্ঞান-যোগ নয়—ফল-যোগ; ফলীরা স্বভাবতই নিষ্কাম, অর্থাৎ ফল ভোগ করিবার ইচ্ছা

তাহাদের থাকে না; কিন্তু অসুস্থ মহাজনরা প্রায়ই নিষ্কাম হয় না—টাকা ফিরিয়া পাইবার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করে। এক্ষণে তাহাদের নিষ্কাম কর্ম্ম শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে; মহাজনরা যাহাতে ঋণবদ্ধ সম্পত্তি ধরিতে না পারে, উহাদের সম্পত্তি কি ভাবে আইন বাঁচাইয়া হস্তান্তর করিতে হয়, তাহার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে— সংক্ষেপে ইহারই নাম "গীতার হস্তান্তরবাদ।"

চিত্রগুপ্ত ভাবিল, দেবতারা মিছা অপবাদ দেন যে ব্রহ্মা রঙ্গজাতির মাথার মধ্যে মস্তিষ্ক ভরিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন! ইহা যদি মস্তিষ্কের পরিচয় না হয় তবে আর কিসে মস্তিষ্কের পরিচয় পাওয়া যাইবে?

সে পার্শ্ববর্ত্তী আরোহীকে বলিল, মশায়, এই যে আইন, ইহা কি ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে?

সে লোকটা হাঁ করিয়া থাকিল, শুধাইল, 'ন্যায়' কাহাকে বলিতেছেন? ব্রহ্মদেশে ও কথা কখনও কেহ শোনে নাই!

চিত্রগুপ্ত অবাক্! সে বলিল, সে কি মশায়, এ আইন তো ধর্ম্মসঙ্গত নয়।

—ধর্ম্ম? লোকটা আরও বেশী অবাক্ হইল! এমন সময়ে ট্রামের কণ্ডাক্টার আসিয়া তাহাকে বলিল, ট্রাম কোম্পানীর নিয়ম যে, ট্রামে কেহ অশ্লীল কথা বলিতে পারিবে না। আপনি হয় চুপ করুন, নয় নামিয়া যান।

ট্রামের সকল যাত্রী সমস্বরে বলিয়া উঠিল, কথা ঠিক! ওরকম অশ্লীল কথা আমরা শুনিতে পারি না। কণ্ডাক্টার তাহাকে নামাইয়া দিল।

কয়েকজন লোক তাহার সঙ্গে নামিয়া পড়িল; এবং 'ন্যায়', 'ধর্ম্ম' প্রভৃতি ভদ্রসমাজে অনুচ্চার্য্য অশ্লীল কথা বলিবার জন্য তাহাকে মারিতে গেল! চিত্রগুপ্ত প্রাণভয়ে ছুটিতে লাগিল। পথের সব লোক তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল, কেহ বলিল, শালা জার্ম্মানীর গুপ্তচর; কেহ বলিল, শত্রুপক্ষ বাহিনীর লোক; কেহ বলিল, শালা গান্ধীর চর, ব্রহ্মদেশকে আর কিছুতেই জব্দ করিতে না পারিয়া এখন ব্রহ্মজাতির নীতিজ্ঞান নষ্ট করিতে আসিয়াছে।

প্রাণভয়ে ভীত চিত্রগুপ্ত জনতাকে বহুদূরে ছাড়াইয়া চলিয়া গেল এবং সম্মুখে দেখিল এক বৃহৎ বাড়ী; আত্মগোপন করিবার অভিপ্রায়ে সে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

চিত্রগুপ্ত ভাবিয়াছিল, এখানেও আশ্রয় পাইবে না, কিন্তু এই বাড়ীটার বাসিন্দাদের ব্যবহারে সে অবাক্ হইয়া গেল। তাহারা চিত্রগুপ্তকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইল, আশ্রয় দিল, আহার্য্য দিল, অভয় দিল; তাহাদের সৌজন্যে সে মুগ্ধ হইয়া গেল।

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, এমন ছুটিয়া এখানে প্রবেশ করিলেন কেন?

চিত্রগুপ্ত সারাদিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া বলিল, ধর্ম্ম, ন্যায়, সত্য প্রভৃতি কথা উচ্চারণ করাতেই আমার এ দুর্দ্দশা। আপনারা কি ওসব কথা শোনেন নাই?

তাহারা একবাক্যে বলিল, তাহাদের দুর্দ্দশার মূলে ওই সব কথা। তাহারা ন্যায়, ধর্ম্ম প্রভৃতি কথা বলিত বলিয়াই এখানে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

চিত্রগুপ্ত শুধাইল, এ বাড়ীটা কি?

তাহারা বলিল, ইহা পাগলা গারদ এবং আমরা পাগল!

চিত্রগুপ্ত বলিল, সে কি! এই ব্রহ্মদেশে আপনাদেরই তো কেবল প্রকৃতিস্থ বলিয়া মনে হইতেছে।

তাহারা বলিল, সে কথা ঠিক, কিন্তু আমরা সংখ্যায় কম। তবে শুনুন, পৃথিবীতে পাগল দুই জাতীয়—বদ্ধ পাগল ও মুক্ত পাগল। বদ্ধ পাগলের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। মুক্ত পাগল অসংখ্য। বদ্ধ পাগলেরা গারদে থাকে, মুক্ত পাগলেরা সংসারে ঘুরিয়া বেড়ায়।

চিত্রগুপ্ত শুধাইল, আপনারা কতদিন এখানে থাকিবেন?

তাহারা বলিল, যতদিন না মুক্ত পাগলের দলে যোগ দিই অর্থাৎ ধর্ম্ম, ন্যায়, সত্য প্রভৃতি শব্দ কখনও যে শুনি নাই, ও সব পদার্থ যে ব্রহ্মদেশে নাই এ কথা যতদিন না স্বীকার করি।

চিত্রগুপ্ত বলিল, মহাশয়, যতদিন আমি ব্রহ্মদেশে থাকিব, আপনাদের আশ্রয়ে থাকিব; ব্রহ্মদেশে যদি ভদ্রলোকের স্থান থাকে তবে তাহা এই পাগলা গারদ।

•

চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মদেশের পাগলা গারদে বসিয়া ব্রহ্মার কাছে নিবেদন করিবার জন্য রিপোর্ট লিখিল। সে লিখিল,

ব্রহ্মদেশে ভ্রমণ করিলাম। পিতামহ ব্রহ্মা যে ইহাদের মাথার খুলির মধ্যে বুদ্ধি দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন তাহা মনে হয় না, কারণ কোন কোন বিষয়ে ইহারা অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়া থাকে, যাহা স্বর্গের অনুকরণযোগ্য। তবে ব্রহ্মদেশ ভাল কি মন্দ, এক কথায় বলা সম্ভব নয়। বরঞ্চ বলিতে গেলে বলিতে হয়, ইহা ভালও নয়, মন্দও নয়, ইহা অপূর্ব্ব—অর্থাৎ ব্রহ্মদেশের কবির ভাষায়—

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।"

এই দেশের সৃষ্টি ব্রহ্মার অসাধারণ কাক-কৌশলের পরিচয়। এ দেশ নষ্ট হইয়া গেলে বিশ্ব হইতে একটা অদ্ভুত জিনিষ নষ্ট হইবে, কাজেই ইহাকে সর্ব্বতোভাবে বাঁচাইয়া রাখা আবশ্যক।

পুনশ্চ

এ দেশে যাহাতে তরুণ দেবতারা না আসিতে পারেন সে দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন; আসিলে তাঁহারা ফিরিতে চাহিবেন না, আমি বৃদ্ধ, এক এক বার আমারই ফিরিতে অনিচ্ছা হইতেছিল; মায়াকর্ষণের শক্তি এ দেশে অবাহনীয় ভাবে প্রবল। ইতি—

---

# বোধন হতেছে বিসর্জ্জনের ঘাটে

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আগমনী সুর ভেদে ওঠে কেন নিখিলের পারাবারে?
পূজা নয় এ যে—বিশ্বের বন্দনা!
দিনের খেয়ায় শোভিতেছে উষা নীল আকাশের পারে,
নিঃস্ব হৃদয়ে জেগেছে বিড়ম্বনা।
শারদ প্রভাতে বনীর কেউলে বোধনের ঘট পাতা,
প্রতিমার বুকে দুলিছে রত্নহার;
সিংহ-দুয়ারে ভিখারিণী বেশে অভাগিনী দেশমাতা
ছিন্নকন্থা পরিধানে রহে তার।
বর্ষে বর্ষে চলে যায় কত এমি শারদ উষা,
মনের দুয়ারে বিভীষিকা জেগে রয়।
দেশ-জননীর গিয়াছে হারায়ে জীবনের মধুরিমা,
দীর্ঘ-নিশাস পায়ে-চলা পথে বয়।

জনতা-জটিল হিংসা-কুটিল নটী নগরীর বুকে
ব্যর্থ পূজার শারদীয় উৎসব।
কৃত্রিম হাসি চপলতা-ভরা নারী-পুরুষের মুখে,
পূজা-অঙ্গনে কুৎসিত কলরব।
রূপ-যৌবন-বিজ্ঞাপনের নানাবিধ সজ্জায়
আসে তরীরা অবগুণ্ঠন খুলি'।
তাদের উরজ-পুষ্পের পানে তরুণ নয়ন চায়,
প্রতিমার পূজা সকলে গিয়াছে ভুলি'।
মানব-মনের অধোগতি আজ দুর্গতি আনে দেশে,
দেবালয়ে এ কি পাপের অন্তরতা!
পরশ-পীড়ন-ব্যগ্র তরুণী তরুণের কোল ঘেঁসে
ভিড়ের ভিতরে কহিছে চটুল কথা।

আজিকার পূজা-মণ্ডপতলে রূপায়িত ব্যভিচার,
ভক্তি-বিহীন পূজারী মন্ত্র কহে।
এ পূজা হেরিয়া অন্তরে তব জাগে না কি ধিক্কার?
দেবী-বোধনের তরুণ মন্ত্র নহে!

আমি যে শুনেছি পূজার মন্ত্র এমি শারদ প্রাতে
রাঘব কণ্ঠে ধ্বনিত সিন্ধুকূলে।
মন্ত্রে অরূপ মূর্ত্ত হয়েছে অষ্টসিদ্ধি সাথে,
সে পূজা ভারত আজিকে গিয়াছে ভুলে।
আজিকার পূজা ভোগ-বিলাসের কামনায় কীটে ভরা,
দুখিনী মায়ের হাহাকারে বুক ফাটে;
অভাগা জীবের রক্ত-রুধিরে বিষাদে উঠেছে ধরা,
বোধন হতেছে বিসর্জ্জনের ঘাটে।
জননীর হাতে ভিক্ষার ঝুলি—ঘৃণায় ফিরায়ে মুখ
বাণী ভিড়িছে মিথ্যা-পূজার মোহে।
আলোর খেলনা বিহনে মায়ের আশাহত ভাঙা বুক,
চোখে আসে জল পার্ব্বণ-সমারোহে।

বন্ধু তোমার যদি থাকে প্রাণ, অভাগা মায়ের আনি'
বসাও প্রতিমা যেথায় শোভিছে আজ।
মায়ের পূজায় শক্তি লভিবে শোনগো আমার বাণী
ভেঙে দাও ভাই পূজার খেমটা নাচ।

---

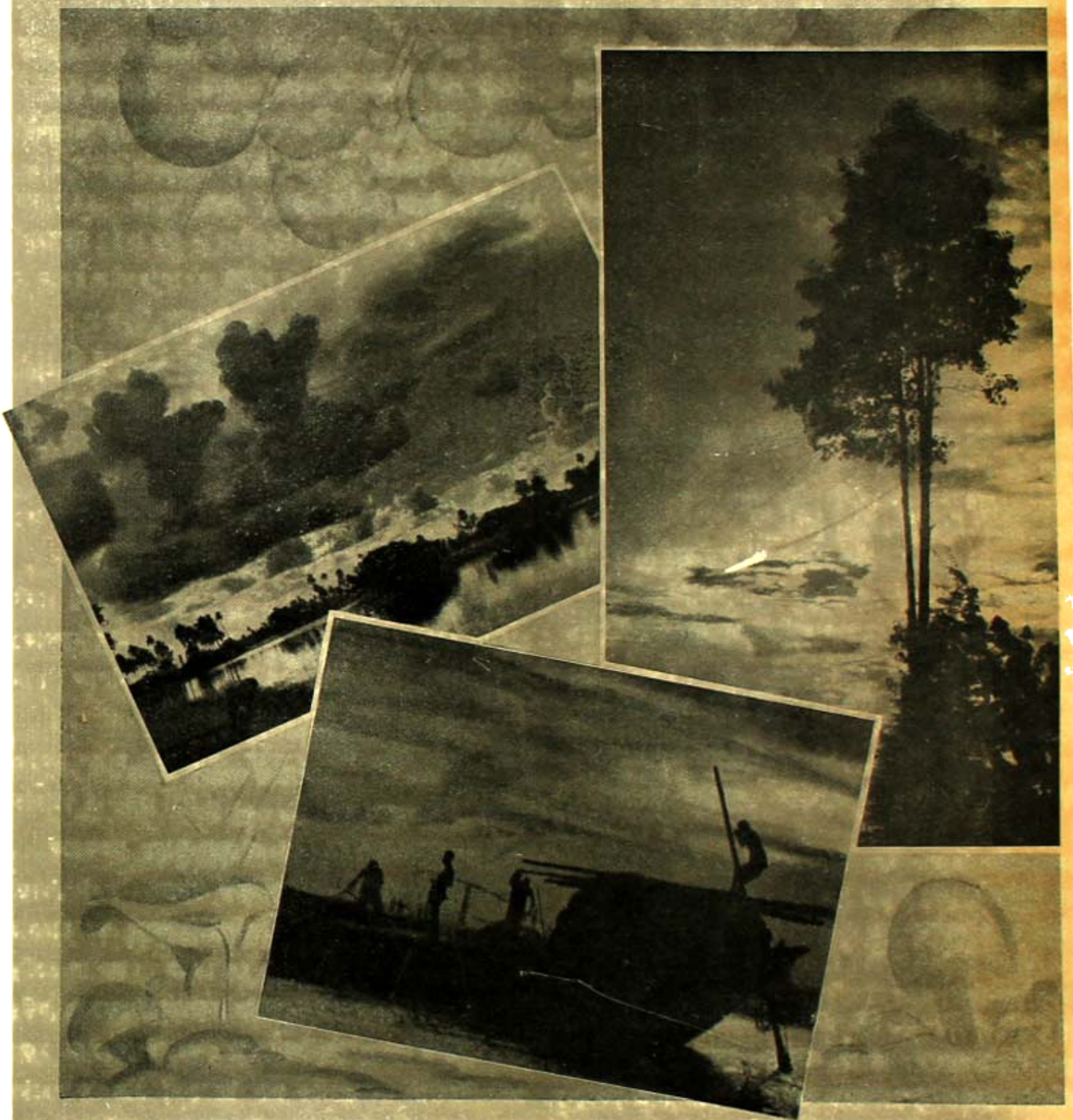

ঋতুচক্রঃ বর্ষা। শ্রীপরিমল গোস্বামী

# এলোরা গিরিমন্দির

—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

এলোরা আসিবার পথটি বড়ই সুন্দর লাগিয়াছিল। দুই দিকে সমুন্নত সুষমা। আর গিরিবননদী-বেষ্টিত এই সুরম্য প্রদেশে আসিয়া মন আনন্দে অভিভূত হইয়াছিল। ধীরে ধীরে গাড়ীখানি উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল। রাস্তাটি ক্রমোচ্চ হইয়া আসিয়া একেবারে এলোরা গিরিমন্দিরের পদপ্রান্তে পৌঁছিয়াছিল। দৌলতাবাদ দুর্গের ধ্বংস-চিহ্ন দেখিয়া মনের মধ্যে একটা বিষাদের করুণ রাগিণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল, তাই গাড়ী হইতে নামিয়া কৈলাস মন্দিরের সম্মুখে দূর্ব্বাদল-সমাচ্ছন্ন ভূখণ্ডে বসিয়া চারিদিক্ দেখিতেছিলাম। পশ্চাতে যে পাহাড়ের গা কাটিয়া এই গিরিমন্দির খোদিত হইয়াছে তাহারই একটি শৃঙ্গ দাঁড়াইয়া আছে। সেই শৃঙ্গেরই একদিকে নিজামের অতিথি-গৃহ বা গেষ্ট হাউস; নিজামের অতিথিরূপে যাঁহারা এলোরা দেখিতে আসেন তাঁহারা ঐ পাহাড়ের উপরকার গেষ্ট-হাউস-এ অবস্থান করেন। তাঁহাদের দেখা-শুনা এবং আহারাদি সম্পর্কেও নিজাম-সরকার সর্ব্ববিধ ব্যয় বহন করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষের এই গিরিমন্দিরগুলি প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যের অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। গুহা, মন্দির, চৈত্য, শ্রীমূর্ত্তি ইত্যাদি এক সময়ে যে সকল শিল্পী পাহাড়ের গা খুদিয়া তৈয়ারী করিয়াছিল, আজ তাহাদের কথা আমরা কয়জনে স্মরণ করিয়া থাকি? কয়জনে তাঁহাদের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে যত্নবান্ হইয়া থাকি? পশ্চিম ভারতের নানা স্থানে বহু গুহা মন্দির আছে। সে গুলি বিশেষজ্ঞের ভাষায় "early architectural remains of India." অনেকে মনে করেন যে, ভারতের নানাস্থানে যে সমুদয় গিরিমন্দির আছে তাহার সবগুলি আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। যতগুলি আবিষ্কার হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা নয়শত হইতে এক হাজার হইবে। তাহাদের মধ্যে অজন্তা, ইলুরা, কার্লি, কানহেরি, জুনার, নাসিক, বাগ, মালওয়া, ঔরঙ্গাবাদ, বাদামী প্রভৃতি প্রধান। এই গুহাগুলির কতকগুলিতে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য এবং জৈন প্রভাব আজিও সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

এলোরার গিরিমন্দির ঔরঙ্গাবাদ হইতে প্রায় চৌদ্দ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। গিরিমন্দিরগুলি উত্তর ও দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে প্রায় ১½ মাইল হইবে। বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্ত্তিপূর্ণ এই গুহা-গৃহগুলি অতুলনীয় শোভা ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ।

আমরা যখন এলোরার গিরিপাদমূলে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, অমনি কয়েকজন স্থানীয় লোক আমাদের গুহা-মন্দিরগুলি দেখাইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাদিগকে 'গাইড' বলা ঠিক্ হয় না, কেন না ইহাদের এই গুহা-গৃহগুলি সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানা নাই। সব গুহাগুলিকেই ইহারা কোন না কোন হিন্দু দেবতার নামের সহিত পরিচিত করিয়া থাকে।

এলোরার বিখ্যাত গিরিমন্দিরটির নাম কৈলাস। এলোরায় এই কৈলাসের কত ছবি দেখিয়াছি, কত জনের কৈলাস সম্বন্ধে লেখা পড়িয়াছি; সেই সব চিত্র ও লেখা পড়িয়া যেরূপ কল্পনা করিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া মনে হইল, আমার সেই কল্পনা বাস্তবের তুলনায় একান্ত নগণ্য।

প্রথমে গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতেই চোখে পড়ে বিরাট দুইটি ধ্বজস্তম্ভ, কেহ কেহ বলেন প্রদীপাধার বা lamp-post। কৈলাস দেখিতে আসিলেই এই দুইটি ধ্বজস্তম্ভ পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। মধ্য দিয়া বিস্তৃত পথ আর দুই দিকে কারুকার্য্য-খোদিত ত্রিতল, ও ত্রিতল গিরিমন্দির। শেষ প্রান্ত—পর্ব্বতের প্রাচীর গাত্র। আমরা প্রথমে ইহা যে প্রদীপ-স্তম্ভ তাহা বুঝিতে পারি নাই। যেমন উচ্চ, তেমনি উহার গায়ে বিবিধ মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে।

কৈলাসের ধ্বজদালানের মধ্যে প্রথম প্রবেশ করিলাম। দুই দিকে স্তম্ভের সারি আর বিবিধ শ্রীমূর্ত্তি—সেকালের ভক্ত নৃপতি ও সাধকমণ্ডলীর ভক্তি-নিবেদন এই সমুদয় দেব-দেবীর মূর্ত্তির মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এলোরা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন রাষ্ট্রকূট বংশীয় নৃপতি প্রথম কৃষ্ণরাজা। ইঁহার সময়ে রাষ্ট্রকূট নৃপতিদের প্রভাব দক্ষিণ ভারতে বিশেষভাবে

প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলেন: "The reign of Krishna I is memorable for the execution of the most marvellous architectural freak in India, the Kailasa monolithic temple at Elura (Ellora), now in the Nizam's dominions (N. Lat. 20°21', E. Long. 75°10') which is by far the most extensive and sumptuous of the rock-cut shrines—অর্থাৎ প্রথম কৃষ্ণরাজার রাজত্বকাল বিশেষ রূপে স্মরণীয় এলোরা মন্দির-নির্মাণের জন্য। ভারতবর্ষের কোথাও এমন কারুকার্য-খচিত স্থাপত্যের বিচিত্র নিদর্শন প্রস্তর-নির্মিত মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে উহা নিজাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত উত্তর ২০°২১' অক্ষ এবং ৭৫°১০' দ্রাঘিমায় অবস্থিত।" এলোরা নামে পরিচিত এ স্থান পূর্ব্বে ইলুরা, এলোপুরা ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। ডক্টর বার্জেস্ এবং মিঃ ফার্গুসন্ ভারতের গিরিমন্দির-সম্পর্কিত গ্রন্থে (Cave Temples of India) এলোরা সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

আমরা যে কৈলাস মন্দিরের কথা বলিতেছি তাহা পর্ব্বত-গাত্র খুদিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে। এ জন্য যে কিরূপ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, কত শেলে পাহাড়ের গা খুঁড়িতে হইয়াছে তাহা এখনও বেশ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এই মন্দিরটি বিতল। মন্দিরের নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভক্ত অংশে নানা দেব-দেবীর মূর্ত্তি। কোথাও পার্ব্বতী নটরাজ হইয়া মহাদেবের পদতলে বসিয়া আছেন, কোথাও বিঘ্নবিনাশন গণপতি, কোথাও সূর্য্য, বিষ্ণু, পদ্ম হস্তে দণ্ডায়মান। কোথাও শিব ও পার্ব্বতী পুত্র-পরিজনবেষ্টিত—প্রহরী নন্দী সহ। মহিষাসুরমর্দ্দিনী মহিষের স্কন্ধদেশে পদ ন্যস্ত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি অপূর্ব্ব শিল্প-মাধুর্য্য প্রকাশ করিতেছে।

অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির প্রসঙ্গে একটি কথা বলিতেছি। বাঙ্গালা দেশেও বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক কর্ত্তৃক একটি অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ মূর্ত্তিটি বিক্রমপুরের পুরাপাড়া গ্রাম হইতে আবিষ্কার করা হইয়া ছিল, উহা এক্ষণে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।* বাঙ্গালা দেশে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির সন্ধান যেমন মিলে না, এ অঞ্চলে কিন্তু তাহা নহে। এদিকে প্রায় সর্ব্বত্রই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আমি দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের বহুস্থানে অর্দ্ধনারীশ্বর ও নটরাজ শিবের মূর্ত্তি দেখিয়াছি। এলোরার গুহার ছাদের উপর যেমন চিত্রিত নটরাজ বা নটেশের মূর্ত্তি দেখিয়াছি, তেমনি প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তিও দেখিয়াছি, কাজেই এক সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই যে শৈব প্রভাব বিদ্যমান ছিল, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইয়া থাকে।

এই স্থানের অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিটিও বিভুজ। এক হস্তে ত্রিশূল, অপর হস্তে দর্পণ। শিবের অর্দ্ধাংশে ত্রিশূল, পার্ব্বতীর অর্দ্ধভাগের হস্তে দর্পণ। উমামহেশ্বর, চতুর্ভুজা কালী বা ভবানী এখানে শোভা পাইতেছেন। ভবানীর এক হস্তে ত্রিশূল, এক হস্তে তরবারি, এক হস্তে খর্পর, অপর হস্তে নৃমুণ্ড, একটি কুকুর সেই নৃমুণ্ড লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে।

কৈলাসের প্রধান মন্দিরটি হস্তী-পৃষ্ঠের উপর সংরক্ষিত। হস্তীর পর হস্তী, তার পর হস্তী সার বাঁধিয়া স্তম্ভগুলি ধারণ করিয়া আছে। এই হস্তীগুলি আকারে যেমন বৃহৎ, গঠন-নৈপুণ্যেও তেমনি সুন্দর। কোথাও সামান্য মাত্র ত্রুটীও পরিলক্ষিত হয় না।

কৈলাস বা শৈবমন্দিরের সম্মুখে বিরাটাকার দুইজন প্রহরী বা দ্বারপাল দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তি দুইটি পাথর কাটিয়া এমন আশ্চর্য্য ভাবে শিল্পীরা গড়িয়া তুলিয়াছে যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় এবং কত বড় বিরাট কল্পনা বুকে করিয়া তাহারা এইরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহাই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়।

এইখানেই দেখিতে পাইলাম শিবের ভৈরব মূর্ত্তি। এই ভৈরব মূর্ত্তি দেখিলে মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। কি ভীষণ এই মূর্ত্তি। বিরাট দেহ, গলে মুণ্ডমালা জানু পর্য্যন্ত বিলম্বিত। একটি গোক্ষুর সর্প কণ্ঠে প্রলম্বিত। এই সাপটি ফণা ধরিয়া আছে, আর ভৈরব-রূপী মহাদেব মুখব্যাদান করিয়া আছেন। মুখের ভিতর দেখা যাইতেছে তাঁহার দীর্ঘ দন্তগুলি। ত্রিশূল দ্বারা একটি অসুরের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়াছেন। আর একদিকে অপর একটি দানবকে নিহত করিয়াছেন। অপর একটি হস্ত দ্বারা ডমরু বাজাইতেছেন। মনে হইতেছে যেন দানবরক্ত পানে তাঁহার দারুণ তৃষা নিবারিত হওয়ায় আনন্দে

* বৎসম্পাদিত "বিক্রমপুরের ইতিহাস", প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ। ২১১—২১৪ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে।

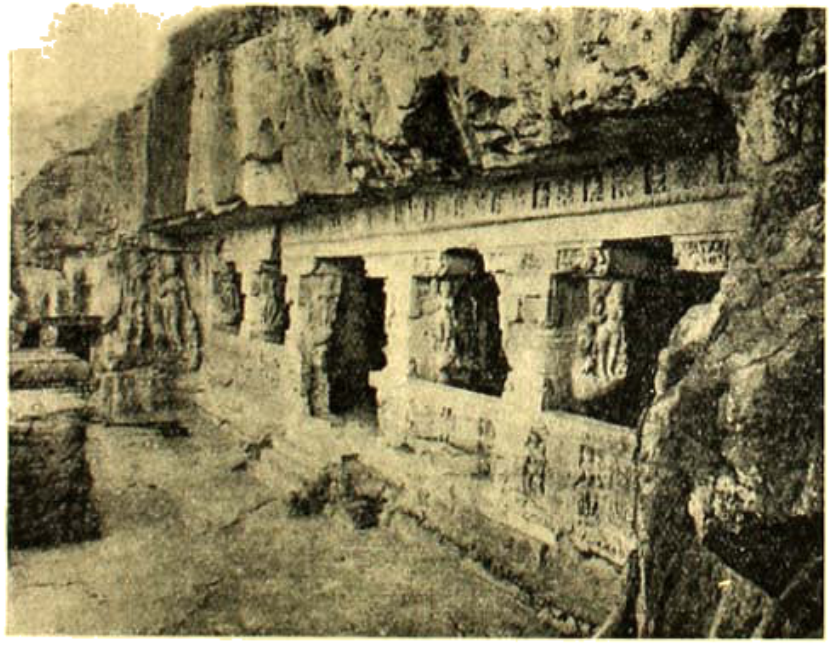

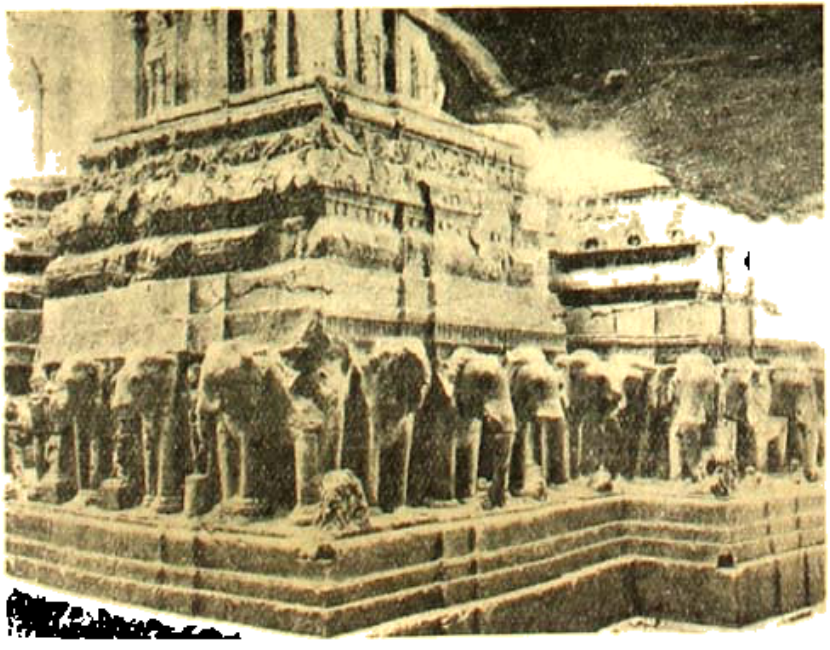

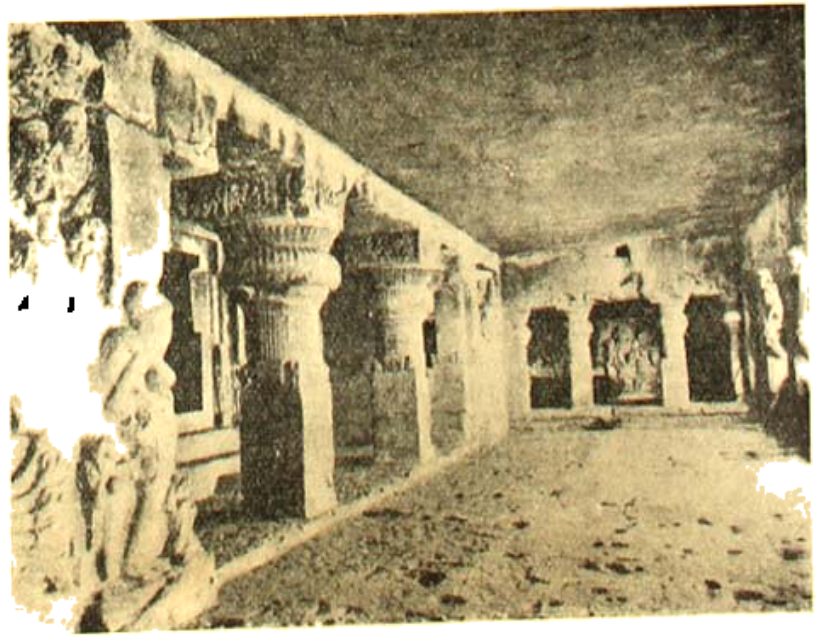

ডিমি ডিমি রবে ডমরু বাজাইতেছেন। এই ভীষণ ভৈরব মূর্ত্তির পার্শ্বেই চামুণ্ডা মূর্ত্তি। কঙ্কালসার এই ভীষণা মূর্ত্তিও শোণিতলোলুপা। এক হস্তে তীক্ষ্ণ, বক্র ছুরিকা, অপর হস্তে খর্পর। ভৈরবের ন্যায় শোণিত পানে বিভোরা এই ভীষণা মূর্ত্তি এক বীভৎস রসের উদ্রেক করে। তার পরে একটি উচ্চাসনে দেবী পার্ব্বতীর মূর্ত্তি। পার্ব্বতীর পাদমূলে রক্তাসুরের মূর্ত্তি। রক্তাসুরের জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, মুখে ও চোখে মৃত্যু-বিভীষিকা প্রকটিত। এই বিকৃতাকার মূর্ত্তিগুলি যেমনই ভীতি-উৎপাদক। অসুর-দলনী মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তিও এখানে কয়েকটি রহিয়াছে।

কৈলাসমন্দিরের দ্বিতীয় স্তরে দেখিলাম শিবের তাণ্ডব-নৃত্য। শিবের এই তাণ্ডব-নৃত্য পরম রমণীয়। মহেশ্বর নাচিতেছেন, শিবের সেই প্রলয়-নৃত্যে সৃষ্টি-স্থিতি ও বিলয় ঘটিতেছে। নৃত্যশীল নটরাজ শিবের মুখভঙ্গীতে সৃষ্টির আনন্দ, স্থিতির প্রফুল্লতা এবং মৃত্যু বা প্রলয়ের বিভীষিকা বিকশিত। আমি অপলকে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া এই মূর্ত্তিটি দেখিলাম। দেখিতে দেখিতে মনে পড়িল, শিবের সেই অপূর্ব্ব ধ্যানমূর্ত্তি। সৃষ্টি-স্থিতি ও সংহারকারী, জটাজুটধারী, বিশ্বাশক্তিসম্পন্ন গিরিশ, শান্তিময় শিব তোমাকে নমস্কার। তুমিই অষ্টমূর্ত্তি দ্বারা চরাচর সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত। তুমি, হে নৃত্যশীল মহাদেব, "উৎপাদকঃ স্থাপকশ্চ নাশকশ্চাপি বিশ্বকৃৎ।" তুমিই উৎপাদক, স্থাপক এবং নাশক।

অপলকে মূর্ত্তির পর মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে চলিলাম। হেমন্তের স্বর্ণাভ রৌদ্রকিরণ মূর্ত্তিগুলির গায়ে পড়িয়া আলো ও ছায়ার বিচিত্র রূপ-মাধুরী ছড়াইয়া দিয়াছিল। দেখিতে-ছিলাম, শিল্পী কোথাও শিব ও পার্ব্বতীর পাশা বা চৌকা খেলার দৃশ্যটি খোদিত করিয়াছেন, কোথাও গণেশ ও নন্দী, কোথাও শিব-পার্ব্বতীর পরিণয়। নামে পার্ব্বতী লজ্জাবতী বধূ-বধূটিরই মত নতনেত্রে দণ্ডায়মানা। ব্রহ্মা পৌরোহিত্য করিতেছেন। উপরে নীল আকাশে শূন্যপথে এই পবিত্র মিলনদৃশ্য দেখিবার জন্য দেবদেবীরা সমবেত হইয়াছেন। পৃথিবীর সমুদয় জীবজন্তু এই পবিত্র মিলনদৃশ্য দেখিতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে 'কুমার সম্ভবে'র সেই সুন্দর পার্ব্বতী-পরিণয়ের কালিদাসের অপূর্ব্ব বর্ণনা মনে পড়িল। আবার একস্থানে দেখিলাম শিব-ভক্ত মার্কণ্ডেয়কে দেবাদিদেব মহাদেব যমের হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছেন। মহাদেবের হস্তে ত্রিশূল, মুখে মৃদু হাসি।

আমাদের বোম্বাইয়ে পরিচিত একটি গুজরাটি পুরুষ ও মহিলার সহিত এইখানে দেখা হইল। তাঁহারা বৌদ্ধ গুহা-মন্দিরগুলি দেখিয়া এদিকে দেখিতে আসিয়াছেন। আর আমরা প্রথমেই 'কৈলাসে' প্রবেশ করিয়াছিলাম। মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিতেছিলাম তারুচন্দ্রের "কৈলাস বর্ণনা"র কবিতার কয়েকটী পংক্তি। কবি এই এলোরার কৈলাস কোন কালে দেখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তবে তাঁহার বর্ণনায় কৈলাস ভূধরের সহিত এই কৈলাসও যেন মিলিয়া যায়।

"কৈলাস ভূধর, অতি মনোহর,
কোটি শশী পরকাশ।
পঞ্চবর্ণ ঝিয়র, রত্ন বিভাধর,
অপ্সরগণের বাস।

চৌদিকে ভ্রময়ে, সুধার সাগর,
কল্পতরু সারি সারি।
মণি বেদী পরে, চিন্তামণি ঘরে
বসি গৌরী ত্রিপুরারী।
শিব শক্তি খেলা, নানা রসে খেলা,
বিলসয়ে বিলসয়।
হিয়ায় যে সব, সে সব কি কব',
বিধি বিষ্ণু অগোচর।
নন্দী দ্বারপাল, ভৈরব বেতাল,
কার্ত্তিকেয় সেনাপতি।
ভূত প্রেত যক্ষ, ব্রহ্ম দৈত্য রক্ষ,
গণিতে কার শকতি।"

কবির এই বর্ণনার সহিত এখানকার বিভিন্ন মূর্ত্তির অস্তিত্ব চক্ষে পড়ে। এমন মূর্ত্তি নাই যাহা কৈলাসগিরিতে না আছে। গুজরাটি মহিলাটি শিব ও পার্ব্বতীর বিবাহ-দৃশ্যটি দেখিয়া বলিলেন, এ কোন্ মূর্ত্তি? আমি তাঁহাকে শিব-পার্ব্বতীর পরিণয়ের পৌরাণিক কাহিনীটি বুঝাইয়া দিলাম। তিনি অত্যন্ত কৌতূহলভরে আখ্যানটি শুনিলেন। এইবার গুজরাটি বন্ধুরা আমাদের বন্ধু হইলেন। দ্রাবিড়ী বন্ধু সুব্বারিডু আমাদের সহিত থাকিয়া এই দুই দিনের মধ্যেই দু'

একটি বাঙ্গলা শব্দ শিখিয়াছিল, সে বলিল, "বড় ভালো, বড়ো হুমটকার। বহুৎ আচ্ছা।"

আমরা আবার দেখিতে দেখিতে চলিলাম। শ্রী বা লক্ষ্মী-মূর্ত্তি প্রথমেই দৃষ্টিপথে পড়িল। চারিদিক হইতে চারিটি হস্তী শুণ্ডদ্বারা তাঁহার শিরে জলধারা বর্ষণ করিতেছে। দুই জন পুরুষ অনুচরও কলসী করিয়া জল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের হস্তে শঙ্খ, চক্র ও পদ্ম দেখা যাইতেছে। লক্ষ্মীর হস্তে পদ্ম ও সীতাফল। দক্ষিণ দিকে দেখিলাম বিষ্ণুমূর্ত্তি। বিষ্ণুমূর্ত্তির এক হস্তে পদ্ম, অপর হস্তে ত্রিশূল। বিষ্ণুর হস্তে ত্রিশূল একটু নূতন ধরণের বলিতে হইবে। বিষ্ণুর দক্ষিণে গরুড় বসিয়া আছে। এখানে ক্রমে একটির পর একটি করিয়া বিষ্ণুর দশাবতার মূর্ত্তিও দেখিলাম।

এই দিকের মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া আমরা দক্ষিণ পার্শ্বের শ্রেণীবদ্ধ গিরিমন্দিরসমূহ দেখিয়াছিলাম। এ পাশের প্রায় মন্দিরগুলিই দ্বিতল। কোনটি ত্রিতল। মনে হইল যেন এগুলির কাজ শেষ হইতে পারে নাই। বন্ধুর প্রস্তর অমসৃণ এবং একতল, দ্বিতল ও ত্রিতলের মেঝ এমন উঁচু নীচু যে একটু অসতর্ক ভাবে চলাফেরা করিলেই হুঁচোট খাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। কোথাও সিড়ি সব তৈরী হইতে পারে নাই। কাজেই এই মন্দিরগুলি দেখিবার সময় বিশেষ সতর্কতার সহিত উঠানামা করা কর্ত্তব্য।

আবার আমরা সব মূর্ত্তিগুলি দেখিতে দেখিতে চলিলাম। এত মূর্ত্তি, এত কারুকার্য্য, এত বৈচিত্র্যপূর্ণ শিল্প সৃষ্টি এই-খানে রহিয়াছে যে, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা বড় সহজ নহে। ডক্টর জেমস্ বার্জেসের মতে ভারতবর্ষের গিরিমন্দিরগুলির মধ্যে এলোরার কৈলাস মন্দির অতুলনীয়। এলোরাতে যদি অন্য কোনও গিরিমন্দির না থাকিয়া একমাত্র বিশ্বকর্ম্মা, কৈলাস, ভিন তাল, হুমার লেনা ( গুহা ) এবং ইন্দ্র সভা থাকিত, তাহা হইলেই ইহাদের দেখিয়া পথিকের দীর্ঘ পথ-ক্লেশ নিবারিত হইত। আর কৈলাস—সে ত এখানকার মুকুটমণি। পথিকেরা এখানকার সবগুলি গুহামন্দির দেখিবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়েন বলিয়া কৈলাস মন্দিরের প্রতি তেমন ভাবে মন দিতে পারেন না। এত মূর্ত্তি, এত কারু-নৈপুণ্য, এত আখ্যান, এত প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য্য এখানকার পাষাণের গায়ে শিল্পীরা খোদিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, সে দেখা শুধু চোখ বুলাইয়া দেখা চলে না।

মনে হইতেছিল এই সব দেব-দেবীর মূর্ত্তি, এই সব নর-নারীর মূর্ত্তি, এই সব জীবজন্তু না জানি বিশ্ববিধাতার কোন্ অভিশাপে মৌন পাষাণের রূপে রূপান্তরিত হইয়াছে!

তাই—

"...দিবা রাত্রি অহরহ
লক্ষ কোটি পরাণীর মিলন, কলহ,
আনন্দ বিষাদ-ক্ষুব্ধ ক্রন্দন, গর্জ্জন,
অযুত পাষাণ পরাণি অনুক্ষণ···।"

এইখানে ইহাদের বুকের কাছে ধ্বনিত হইয়া উঠে। একদিন যদি দেবতার স্পর্শে এই সব পাষাণমূর্ত্তি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতে পারিত, তাহা হইলে কি এই নির্ব্বাণ গিরিমন্দির এমনি শুষ্ক এমনি মৌন থাকিতে পারিত? শিবের তাণ্ডবনৃত্যে রণরঙ্গিনী ভৈরবীর রণ, অসুরের তীব্র রণ-আস্ফালনে, হিংস্র জন্তুর গভীর ভৈরব গর্জ্জনে চারি দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত। কিন্তু আজি এই পাষাণ-রূপ শুধু মনে করাইয়া দেয় আমাদের মত কৌতূহলী দর্শকদের কাছে সেই সব শিল্পীদের কথা, যাহারা দিনের পর দিন তাহাদের মানসী এই সব প্রতিমা পাথরের গায়ে কুঁদিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে।

কৈলাস গিরিমন্দিরটি শিবের নামে উৎসর্গীকৃত। তাহা হইলেও এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং পৌরাণিক সমুদয় দেব-দেবীর মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। সেই সব মূর্ত্তির প্রকৃত সংখ্যা অল্প সময়ের মধ্যে নির্ণয় করা সুকঠিন। দক্ষিণ দিকের দীর্ঘ দরদালানটি বেশ দীর্ঘ। এই কৈলাস মন্দিরের বিষ্ণুর দশ অবতার মূর্ত্তি শেষ নারায়ণ, ত্রিমুখ ব্রহ্মা প্রভৃতির মূর্ত্তি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে।

পশ্চিম ভারতের অধিবাসীরা শিবকে সাধারণতঃ কাল-ভৈরব বলিয়া থাকেন। কালভৈরব মূর্ত্তি চতুর্ভুজ হইয়া থাকে। এই চতুর্ভুজ কালভৈরব শিবের কাছেই ক্ষুদ্রকায়া পার্ব্বতীর মূর্ত্তি বিরাজিতা। তারপর লক্ষ্য করিলে দেবাদিদেব মহাদেবের বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাই। যথা—

(১) শিব বা কপাল ভৈরব, (২) শিব—নবযোগিনী ভৈরব, (৩) শিব—সিদ্ধযোগিনী ভৈরব, (৪) শিব—বটুক

চিত্র ১৪৯ : ধ্যানী বুদ্ধ—অমিতাভ (১৪৮ নং)



চিত্র ১৪৮ : ধ্যানী বুদ্ধ—অমিতাভ



চিত্র ১৪৭ : বজ্রাসনে বুদ্ধমূর্তি



চিত্র ১৪৬ : বজ্রাসনে বুদ্ধমূর্তি

ভৈরব, (৫) শিব—ভূপাল ভৈরব, (৬) শিব—ভৈরব, (৭) শিব—মহাদেব, (৮) সদাশিব, (৯) শিব—বীরভদ্র, (১০) শিব-পার্ব্বতী—পরিণয়। এইরূপ ভাবে শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেব-দেবীর মূর্ত্তিসমূহ কৈলাস মন্দিরে সুশোভিত থাকিয়া হিন্দুর দেবদেবীগণের অপূর্ব্ব লীলামাধুর্য্য সকলকে বুঝাইয়া দিতেছে।

এতদ্ব্যতীত গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতীর মূর্ত্তিও এখানে দেখিতে পাইলাম। কৈলাস গিরিমন্দিরের উত্তর দিকে কয়েকটি ছোট ছোট গুহা-মন্দির আছে। তাহার একটির মধ্যে ত্রিমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। এলিফেণ্টা গিরিগুহায় যে ত্রিমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, ইহা তাহারই অনুরূপ। এখানকার আরও কয়েকটি মন্দিরে 'ত্রিমূর্ত্তি' খোদিত আছে। একটি মন্দিরের ছাদেও ত্রিমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। এখনও তাহার অস্পষ্ট চিহ্ন-মাত্র রহিয়াছে।

এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি, তাহা এই যে, আমরা, অনেকেই পৌরাণিক দেবদেবীর ইতিহাসের সহিত পরিচিত নহি। তাহার ফলে এখানকার খোদিত দেব-দেবীর পরিচয় ভাল করিয়া জানিতে পারি না বলিয়া রসবোধ করিতে পারি না। অতএব আমার অনুরোধ গুহা-মন্দিরগুলি দেখিতে আসিলে বৌদ্ধজাতক, দেবদেবীর পরিচয়, ইত্যাদি যেমন জানা আবশ্যক, তেমনি পুরাণ সম্বন্ধে মোটামুটি জানিয়া আসিলে মূর্ত্তি-পরিচয়ে আনন্দ পাইবেন। আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্য এই যে, হিন্দুর এমন সুন্দর পুরাণ কেহ ভাল করিয়া পড়েন না।

ইলোরার গিরি-মন্দিরের রামেশ্বরও একটি শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় স্থান। এই দরদালানটী দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ২৫১×৬৯ ফিট। উচ্চতায় ১৫½ ফিট। এখানেও বিবিধ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণের সমুদয় বৃত্তান্ত এখানকার প্রস্তর-গাত্রে খোদিত রহিয়াছে। এখানেও শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের বিভিন্ন অবতারের মূর্ত্তি রহিয়াছে। শিবের নীলকণ্ঠ মূর্ত্তি, মৃত্যুপরাজয় মূর্ত্তি এখানকার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। শ্রীরাম-চন্দ্রের জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা অতি সুন্দর ভাবে খোদিত থাকায় শুধু মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া গেলেই রামায়ণখানি পড়া হইয়া যায়।

যে গুহামন্দিরটি 'ধুমার লেনা' নামে পরিচিত তাহাকে সাধারণতঃ 'সীতা নাহনি' বলে। এইখানকার দরদালানটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ১৪৮×১৪৯ ফিট। উচ্চতায় ১৭ ফিট ৮ ইঞ্চি। উত্তর ও দক্ষিণে প্রায় ২৪০ ফিট দীর্ঘ পর্ব্বতগাত্র খোদিত করিয়া এই বৃহৎ গুহামন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই গুহামন্দিরের প্রবেশ-পথে দেখিতে পাই দুইটি বৃহদা-কারের সিংহের থাবার নীচে হস্তী—অর্থাৎ গজ-সিংহ মূর্ত্তি। এই গজসিংহ মূর্ত্তি সোপানের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে।

সম্মুখভাগে রাবণ কৈলাস পর্ব্বত ধারণ করিয়াছেন। পূর্ব্বদিকে পার্ব্বতীর পরিণয়-দৃশ্য। এইখানেই মহাযোগী শিব শতদলোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এখানেও পার্ব্বতী ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তি। ছোট কৈলাস গিরিমন্দিরটি নিজাম সরকার মাটি খুঁড়িয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে উদ্ধার করিয়াছেন। এখানকার মূর্ত্তিগুলিও শৈব মূর্ত্তি। একটি প্রাচীন লিপি হইতে জানা যায় যে, ১১৬৯ শকে বা ১২৪৭ খৃষ্টাব্দে এই গুহার কোন কোন অংশ খোদিত হইয়াছিল।

ইলোরার গুহা মন্দিরের কৈলাস, রামেশ্বর, সীতানাহনি প্রভৃতি দেখিলে আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। কত দিনে কত জন শিল্পী অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহা আজ আমাদের কল্পনারও অতীত। কৈলাসে আসিলে শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও গরুড়ের বিভিন্ন রূপ, লিঙ্গমূর্ত্তি, সপ্তমাতৃকা মূর্ত্তি দেখিলে চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। সপ্তমাতৃকার কোলে শিশু শোভা পাইতেছে। হিন্দুর এই মাতৃকামূর্ত্তির কি কোন তুলনা হয়? তাহাদের সেই শোভা ও সৌন্দর্য্য কালবশে অনেকখানি বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল—এখন অনেকটা সংস্কৃত হইয়াছে।

আমরা কৈলাস মন্দির দেখিয়া চলিলাম জৈন গিরিমন্দির দেখিতে। কৈলাস মন্দির হইতেছে ইলোরার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম মন্দির। কৈলাস মন্দিরের প্রবেশ-পথ দিয়া বাহিরে আসিলাম। সেখান হইতে দক্ষিণদিকে চলিলাম। পথটি আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। পশ্চাতে পাহাড়ের সারি চলিয়াছে। দূরে একটি সরোবরের জলে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছিল। একদিকে শুভ্রচূড় একটি সুন্দর মন্দিরের শোভা দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এই মন্দিরের কথা পরে বলিব।

জৈন মন্দিরের নাম ইন্দ্রসভা। ইন্দ্রসভা দ্বিতল দুইটি গুহামন্দির ও একটি ক্ষুদ্র গুহামন্দির লইয়া গঠিত। উহার

আশে-পাশেও একটি চৈত্য ও গুহামন্দির আছে। এই গুহা-মন্দিরে পার্শ্বনাথ রহিয়াছেন। দিগম্বর মূর্ত্তি। একটি নাগী-মূর্ত্তি, তাহার মাথায় একটি সপ্তফণা। তিনি একটি ছত্র পার্শ্বনাথের মস্তকোপরি ধারণ করিয়া আছেন। গোমত, মহাবীর, এবং জৈন শাস্ত্রে লিখিত অনেক দেব ও দেবীর মূর্ত্তি এখানে দেখিতে পাইলাম। ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর মূর্ত্তির তুলনা মেলে না। ইন্দ্রসভায় ইন্দ্র মূর্ত্তি দেখিলাম—ঐরাবৎ-বাহন ইন্দ্রের সেই প্রশান্ত-গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিলাম,—শ্রেণীবদ্ধ ভাবে নানা কারুকার্য্যশোভিত নানা মূর্ত্তি। সেই গুহামন্দিরে ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর মূর্ত্তির দুইদিকে বিরাজিত থাকিয়া বিবিধ মূর্ত্তি এই গুহামন্দিরটিকে অপূর্ব্ব শোভাসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে। গুহার ছাদে চিত্রলেখার বর্ণ-সুষমা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। কোথাও চিত্র সুপরিস্ফুট, কোথাও সুপরিস্ফুট নহে। কোথাও অপ্সরাগণের মূর্ত্তি, কোথাও শতদল, কোথাও হরিণ, কোথাও হস্তী, কোথাও ময়ূর, কোথাও ইন্দ্র, গোমত ও পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি—কোনও রঙের সুবর্ণাভা আজিও চক্ষু ঝলসিত করিয়া দেয়। ইন্দ্র বারান্দার বামদিকে আর ইন্দ্রাণী বারান্দার দক্ষিণদিকের শেষপ্রান্তে বিরাজিতা। দেখিতে দেখিতে মনে হয়:

"দেখে দেখে আঁখি না ফিরে,
তোমায় ছাড়ি আমি যাই সে কোন্ মন্দিরে।"

এই জৈন গিরিগুহার কয়েকটি খোদিত লিপি আছে। কোনটি স্পষ্ট, কোনটি অস্পষ্ট। কোনটি পড়া যায়, কোনটি পড়া যায় না। ঐ খোদিত লিপির বেশীর ভাগই কেনারি অক্ষরে খোদিত। উহা হইতে জানা যায়, সম্ভবতঃ এই গিরিমন্দিরটি ৮০০ শত খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

আমরা বিতলে উঠিয়া মেজের উপরে উপবেশন করিলাম। সম্মুখে দেখিতে পাইলাম—দিগন্ত-বিস্তৃত শ্যামল প্রান্তর—কোন্ যুগ বিস্মৃতে কোন্ গিরির সানুদেশে যাইয়া আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছে। চারিদিক বেড়িয়া স্তব্ধ বিজনতা—শুধু নির্ঝর জলধারার শান্তমধুর জলরব শুনিতেছিলাম। গাছের ডালে বন্য টিয়াপাখীর সে কি উল্লাস, আর বাতাস যে কোন্ সুদূর হইতে বহিয়া আসিতেছিল, সারা দেহ শীতল করিয়া দিতেছিল। এখানে বসিয়া মনে হইতেছিল, আর কেন? এখানেই থাকিয়া যাই না কেন? একদিন যেখানে ভক্ত উপাসকগণের ভক্তিমন্ত্র দেবতার উদ্দেশে ধ্বনিত হইয়া উঠিত, আজ সেখানে কেহ নাই! কালের এ কি পরিহাস! এখানকার ছাদের চিত্র সম্বন্ধে ডক্টর বার্জেস্ বলেন, "The roof has been painted in large concentric circles, and on the wall Mahavira is sculptured between fifty and sixty times, Parsvanatha perhaps nine or ten times, and over the heads of the Jinas the space has also been painted with more Jinas and their worshippers."

এখানকার একটি গুহার নাম জগন্নাথ সভা। এই জগন্নাথ গিরিমন্দিরটি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লোকচক্ষুর অগোচরে ছিল। মন্দিরটির উদ্ধারের পর উহার মধ্য হইতে বাহির হইল তক্ষণ-শিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন কয়েকটি ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ মূর্ত্তি।

ইন্দ্রসভার সম্মুখস্থ বারান্দায় জৈন ষোড়শ তীর্থঙ্কর শান্তি-নাথের দুইটি বৃহদাকারের মূর্ত্তি রহিয়াছে। উহার একটি মূর্ত্তির নীচে খোদিত লিপি আছে। ঐ লিপি নবম ও দশম শতাব্দীর হইবে। তাহা এই:

শ্রীসোহিল ব্রহ্মচারিণ শান্তি ভট্টারক প্রতিমিয়াম।

শান্তি ভট্টারকের এই মূর্ত্তি সোহিল ব্রহ্মচারী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী অর্থে দিগম্বর (naked Jains) সম্প্রদায়ের পণ্ডিত বুঝাইতেছে। আর একটি গুহামন্দিরের একটি দিগম্বর মূর্ত্তির পদতলে লিখিত আছে:—

শ্রীনাগবর্ম্মাকৃত প্রতিমা।

এই মূর্ত্তিটি শ্রীনাগবর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

এই গিরির শিখরপ্রান্তে একটি বিরাট পার্শ্বনাথ মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটি উচ্চে প্রায় ১৬ ফিট। এক জানু হইতে আর জানু পর্য্যন্ত বিস্তার ৯ ফিট। এই মূর্ত্তির দক্ষিণে উপাসকমণ্ডলী। সেই উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে শিব ও পার্ব্বতীকে পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহাসনোপরি যে খোদিত লিপি আছে তাহা হইতে জানা যায়, এই মূর্ত্তিটী ১২৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

জৈন মন্দিরের পথটির কতকাংশ ভাল ছিল না। আমরা জৈন গিরিমন্দিরগুলি দেখিয়া বৌদ্ধ মন্দিরের দিকে চলিলাম। সুন্দর লাল রঙের পথটি পাহাড়ের গা কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। রামধনুর মত বাঁকিয়া চলিয়াছে, তাহারই বাঁ দিকে

গায়ে গায়ে বৌদ্ধ গুহামন্দির। প্রথম গুহাটির বা ১নং গুহার নাম ধের বাদা—'ধের' অর্থে বৌদ্ধ শ্রমণদের বুঝাইয়া থাকে। এই ধের বাদা নাম এখন ধেবাবাদা শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। অনেকের মতে বৌদ্ধ-প্রাধান্য এখান হইতে বিলুপ্ত হইলে পর এই স্থানে ধেবাবাদা নামক নীচবংশীয় আদিম অধিবাসীরা আসিয়া বাস করার ফলে ইহার নাম হইয়াছিল ধেবাবাদা। [···Bauddha converts were made from Dhedas and other partially aboriginal low-caste tribes—the name of Dhedavada may have been quite applicable to the Bauddha series of caves from the first. ]

বৌদ্ধ গুহামন্দিরের ১নং গুহাটি তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। ২নং বৌদ্ধ গিরিমন্দিরটি বেশ বড় এবং রমণীয়। বোধ হয় এই চৈত্যগৃহটিতে সেকালের শ্রমণেরা ধ্যান ও অধ্যয়ন করিতেন। বারান্দা, অলিন্দ, স্তম্ভ, গন্ধর্ব, দ্বারপাল প্রভৃতির মূর্তিগুলি সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। পাশের ঘরদালান প্রভৃতি স্থাপত্য কৌশলের পরিচায়ক। এই মন্দিরের এক একটি দ্বারপালের উচ্চতা ১০ ফিট ও ১৪ ফিটের কম নহে। ইহাদের পোষাক সাধা-সিধা রকমের। এ মন্দিরের মধ্যে একটি বৃহদাকারের ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব যে সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন তাহা সিংহের দ্বারা ধৃত। উহার দুইদিকে গন্ধর্ব মূর্তি। এখানকার প্রবেশদ্বারের খিলানটি অর্দ্ধবৃত্তাকারে গঠিত। ভিতরে একটি দাগোবা আছে। এই মন্দিরটি কতকাল পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন—সম্ভবতঃ তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ শতাব্দীতে ইহার কতক কতক অংশ গঠিত হইয়াছিল; এবং বাকী কতক কতক অংশ অনেকটা পরবর্তী সময়ের—ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর—হইতে পারে।

৩নং মন্দিরে একটী ছোট বিহার ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার আকার ৪৬′ × ৪৬′ এইরূপ। উচ্চতাও ১১ ফিটের অধিক হইবে না। এখনও দুইটি ক্ষুদ্রাকৃতি মূর্তি আছে—একটী বুদ্ধ এবং অপরটী কোন ভক্ত উপাসকের।

ইহার পরে যে চার পাঁচটি গুহামন্দির রহিয়াছে, তাহার কোন কোনটির অবস্থা তেমন সন্তোষজনক নহে। বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, অবলোকিতেশ্বর বা পদ্মপাণির মূর্তিও কোন কোনটিতে আছে। ব্রাহ্মণ্য মূর্তিও দুই একটি দেখা যায়। ৫নং গুহামন্দির, যাহা সাধারণের নিকট মহারাদা (Mahar-wada) নামে পরিচিত, বেশ বড় রকমের গুহা। উহার দৈর্ঘ্য ১১৭ ফিট এবং প্রস্থ ৪৪½ ফিট। দুই দিকের বারান্দা প্রভৃতি ধরিলে আরও অনেক বড় বলিতে হয়। এই ভাবে ৩নং, ৭নং, ৮নং, ৯নং গুহামন্দিরগুলি দেখিয়া আমরা ১০নং গিরিমন্দিরে আসিলাম। এখানকার গিরিমন্দিরগুলির মধ্যে ইহাই একমাত্র চৈত্য মন্দির বা 'the cathedral temple of the Bauddha caves'. বিশেষজ্ঞগণের মতে ইহা কারুকার্য্য প্রভৃতিতে কার্লির বিখ্যাত গিরিমন্দিরের সহিত তুলনীয় না হইলেও এখানকার শিল্পনৈপুণ্য, বিস্তৃত মুক্ত প্রাঙ্গণ, চতুর্দ্দিকের বারান্দা, স্তম্ভশিরের গাত্রাঙ্কিত কারু-নৈপুণ্য—সেকালের শিল্পীদের অপূর্ব শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দিতেছে। এই চৈত্য মন্দিরের দাগোবাটি আকারেও বেশ বড়। সাতাশ ফিট খাড়াই এবং সাড়ে পনর ফিট বেড় হইবে। খিলানের পরে খিলান অতি সুন্দর দেখায়। দুই পার্শ্বে কারুকার্য্য খচিত স্তম্ভের সারি চলিয়াছে। শেষ প্রান্তে উচ্চ বেদীর উপরে বুদ্ধদেব বসিয়া আছেন। তাঁহার মাথার উপরে অর্দ্ধবৃত্তাকারে গন্ধর্ব, কিন্নর ও অপ্সরাগণের মূর্তি। দুই পার্শ্বে দুইজন অনুচর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই চৈত্য-মন্দিরে প্রবেশ করিলে কার্লি মন্দিরের চৈত্যটির কথা মনে পড়ে। ইহার দুই পার্শ্বে স্তম্ভের উপর দিক্ দিয়া বিস্তৃত খিলানের নিম্নাংশে বৌদ্ধজাতকের ও পুরাণের নানা আখ্যান খোদিত রহিয়াছে। দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া প্রত্যেকটি মূর্তি সূক্ষ্মভাবে পর্যাবেক্ষণ না করিলে সুস্পষ্টভাবে সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় না। আমাদের পক্ষে সেইরূপ সুযোগ পাওয়াও আর সম্ভবপর নয়।

স্থানীয় লোকেরা ইহার নাম দিয়াছে "সুতারের কোপড়া" "বিশ্বকর্মা"। স্থানীয় সূত্রধরেরা এই মন্দিরের অধিষ্ঠিত বুদ্ধদেবকে বিশ্বকর্মা নামে অভিহিত করিয়া থাকে—এবং বৎসরে একদিন আসিয়া পূজা ইত্যাদি করে। এই চৈত্য-মন্দিরটিই বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং আমরা অনেকটা সময় এখানকার চারিদিকটা পর্যাবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছিলাম।

ব্রাহ্মণ্য, জৈন এবং বৌদ্ধ গিরিমন্দির দেখিয়া ফিরিবার পথে অহল্যাবাঈয়ের মন্দিরটি দেখিয়া আসিলাম। এই

মন্দিরটিই আসিবার সময় সূর্য্যকিরণে দীপ্তিমান্ দেখিতে পাইয়াছিলাম। এই মন্দিরটি ভক্তিমতী অহল্যাবাঈ-এর কীর্ত্তি বুকে লইয়া আজিও বাঁচিয়া আছে। অনেকখানি ভূখণ্ডের উপর অতি সুন্দরভাবে মন্দিরটি নির্ম্মিত। নানা কারুকার্য্যও একান্ত প্রশংসনীয়। মন্দিরটি রক্তপ্রস্তরে নির্ম্মিত। এই মন্দিরের ভিতরে বেদীর উপরে গর্ভ গৃহমধ্যে শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ ও গঙ্গাদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিতা। সম্মুখে পাঁচটি বৃহৎ দীপাধারে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে। এই মন্দিরে প্রণামী দিতে হয়, তবে যাত্রীর ইচ্ছানুরূপ। গাইড সেবাইতটিকে আমাদের বেশ ভালই লাগিল। সে কহিল,—এ মন্দিরের কোন আয় নাই, তবে ভারতীর কিংবা রাণীরও নাই। যাত্রীগণের প্রণামীও ইচ্ছানুরূপ দান হইতেই বায় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। আমরা মন্দিরে বেশীক্ষণ ছিলাম না। আবার ফিরিয়া চলিলাম ঔরঙ্গাবাদের দিকে।

অস্তরবির রক্তিমাভা দূর পাহাড়ের গায়ে প্রতিফলিত হইতেছিল। যাত্রিগণ দলে দলে গাড়ী ও বাস বোঝাই করিয়া আবার যে যাহার যাত্রাপথে ফিরিয়া চলিলেন। আমরাও চলিলাম। এই গিরিমন্দিরগুলি একজন রাজার সময়েই নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা নহে—এলোরার কৈলাসও আস্তে আস্তে যুগের পর যুগে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কত নৃপতি যে ইহার জন্য অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, তাহা ও সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এখানকার বৌদ্ধ-গুহা-মন্দিরগুলিই সর্ব্বপ্রথমে নির্ম্মিত হইয়াছিল; তাহার পর কৈলাস ও ইন্দ্রসভা বা জৈনমন্দিরগুলি—এইরূপই পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।

রাষ্ট্রকূটবংশীয় নৃপতিরা প্রায় দুই শতাব্দীকাল দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করেন। রাষ্ট্রকূট নৃপতি প্রথম কৃষ্ণরাজা এলোরায় গিরিমন্দির নির্ম্মাণ করেন। তবে রাজা কৃষ্ণের সময়েই সমুদয় গিরিমন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছিল কি না তাহা বলা যায় না। বিশেষজ্ঞেরা বলেন—"These temples are cut out of the rock, there are no other temples like there in the world." একথার মধ্যে এতটুকুও অত্যুক্তি নাই।

আমরা এলোরা ছাড়িয়া চলিলাম। প্রিয়জনকে ছাড়িয়া প্রবাসে যাইতে মানুষের প্রাণে যেমন বেদনা অনুভূত হয়, তেমনি বেদনা অনুভব করিতেছিলাম। গাড়ী ঔরাঙ্গাবাদের দিকে ছুটিয়া চলিল, পশ্চাতে দেখিতে পাইলাম—এলোরার পাহাড় ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইতেছে। পথের একটা বাঁক ফিরিতেই তাহাকে আর দেখা গেল না।

---

## দুর্গা ও দুর্গাপূজা

...সম্ব-কোট ও পদ্ম-কোটের বিধানানুসারে দুর্গা এই পদটীর অর্থ গ্রহণ করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, "দুর্গা" বলিতে বুঝায় সেই তেজোময় প্রাকৃতিক কর্ম্ম-শক্তি, যদ্দ্বারা মনসার মনঃপ্রবণশক্তি ও চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির সৃষ্টি ও স্থিতি সাধিত হয়। এতদনুসারে দুর্গা-পূজা বলিতে বুঝায়—যে তেজোময় প্রাকৃতিক কর্ম্মশক্তির দ্বারা মনসার মনঃপ্রবণশক্তি এবং চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির সৃষ্টি ও স্থিতি সাধিত হইয়া থাকে সেই তেজোময় প্রাকৃতিক কর্ম্মশক্তিকে প্রসন্ন করা। দুর্গানামে যথাযথভাবে জপ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহার দ্বারা ঐ তেজোময় প্রাকৃতিক কর্ম্মশক্তিকে প্রসন্ন করা সম্ভব হয়। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, চক্ষুগোলকদ্বয় এবং ললাটফলকের মধ্যে একটী গিরিপৃষ্ঠাকারসদৃশ তেজোময় সত্তা বিদ্যমান আছে, যাহা হইতে উপরোক্ত তেজোময় প্রাকৃতিক কর্ম্মশক্তির উদ্ভব হইতেছে এবং মনসার মনঃপ্রবণশক্তির উদ্ভব হইতেছে এবং মনসার মনঃপ্রবণশক্তি ও চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির সৃষ্টি ও স্থিতি সাধিত হইতেছে। এই গিরিপৃষ্ঠাকারসদৃশ তেজোময় সত্তাকে সংস্কৃত ভাষায় "হিমালয়" বলা হইয়া থাকে। "হিমালয়" পদটীর অর্থ গ্রহণ করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, উহার অর্থ মস্তিষ্কতোরণস্থিত গিরিপৃষ্ঠাকারসদৃশ তেজোময় সত্তাকেই বুঝিতে হয়। ইহার জন্য পুরাণে হিমালয়কে দুর্গার জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

---

# অনির্বাণ

—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

১

"দেখ না আমার পরম গুরু নাই—
সে ঘুম-ঘুমাতে ছুটায় ঢুকুল, তা'র তাড়াহুড়া নাই।"

সুবোধকে এরা ছাড়ল না সে-রাত্রে। সবাই বলল, "আপনি থাকুন এখানে।" সুবোধ হেসে বললেন, "তা কি হয়? আমার কালই সকালে কলকাতা যেতে হ'বে। সেখান থেকে পরশুদিন যাব। ফিরি কবে ঠিক নেই।"

জয়ন্তী লোকটির আপাদমস্তক একবার সন্ত্রমের দৃষ্টিতে দেখল। হাঁ, কৃতী মানুষ এঁকেই বলতে হয়। কৃতজ্ঞতাও তার মনে যথেষ্ট। সাতাকি এখানে এসে অনেক ভাল আছে। সুখ তার প্রচুর। এইরকম ভাবে থাকতে পারলে খুব অল্পদিনেই সে সেরে যাবে। তখনকার অবস্থাটা জয়ন্তী মুহূর্তের মধ্যে কল্পনা ক'রে নিল। তাকে আবার সেই মাঠের বাড়ীতে ফিরে যেতে হ'বে। তা হোক, মেজ দা সেরে উঠে আবার পড়াশুনা করছে, সকলে ভাল আছে—এই ভেবেই তার আনন্দ। সুবোধের দিকে তাকিয়ে সে স্মিত হেসে বলল, "থাকুন আজ রাতটা এখানে। কাল সকালে কলকাতা না-ই গেলেন।"

সুবোধের যে সময়টুকু লাগল এ কথায়, তারই মধ্যে জয়ন্তী একটা ভেবে নিয়ে তাঁকে সে রাতে সেখানে থাকতে অনুরোধ করেছে। সুবোধ কথা বলতে বলতে একবার জয়ন্তীর দিকে চেয়েছিলেন। কি একটা তিনি ভাবলেন জয়ন্তীকে দেখে, তার পরেই জয়ন্তীর এই অনুরোধে সুবোধ একটু সচকিত হ'য়েই বললেন, (হঠাৎ যে জয়ন্তী তাঁকে এই অনুরোধ ক'রে বসবে, এ-আশা সুবোধ করতে পারেন নি) "তা তো হয় না, অনেক কাজ আমার। জানেন তো ব্যবসায়ী মানুষ। আজ এখানে, কাল সেখানে। তবে আপনি যখন বলছেন, তখন না হয় একটা দিন দেরীই হ'বে। তাই রইলাম, আজ রাতে এখানে।"

তার পরে একটা সাড়া প'ড়ে গেল বাড়ীতে। ঠাকুর একেবারেই রাঁধতে জানে না। জয়ন্তী বলল, "তুমি আজ রান্না করবে না। আমিই রাঁধব।" এই বলে জয়ন্তী নিজেই রাঁধতে গেল। বন্ধু তাকে সাহায্য করতে লাগল।

২

দিগিন্দ্র সোজা হন্ হন্ ক'রে দেওঘরের অর্দ্ধালোকিত রাস্তা দিয়ে দারোগার দিকে এগিয়ে চলেছেন। সুবোধের নাম করতেই পথের লোক তাঁকে বাড়ীর সন্ধান ব'লে দিয়েছে। দিগিন্দ্র সেটা মনে রেখে এগিয়ে চলেছেন। এমন সময়ে কতকগুলো আমগাছের সারি-দেওয়া ডানদিকের একটা পথ যেখানে এসে সেই সোজা পথে মিশেছে, সেইখানে এক ভদ্রলোক সোজা তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বললেন, "আরে দিগিন্দ্র যে! তুমি এখানে হঠাৎ, কি ব্যাপার?"

দিগিন্দ্র তার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন, কিন্তু কিছুতেই তাকে চিনতে পারলেন না। শেষটায় বললেন, "কই, আমি তো চিনতে পারছি নে!"

বিস্মিত হ'য়ে ভদ্রলোক বললেন, "তা চিনবে কি ক'রে? অনেক দিনের ছাড়াছাড়ি কি না—তুমি তো ঠিক তেমনটিই আছ দেখছি। আমার নাম অতীন।"

দিগিন্দ্রের ছিল একটা অমানুষিক ব্যস্ততা। তাড়াতাড়ির মুখে বহুদিনের অদেখা বন্ধুর নাম শুনে তিনি যে কি করবেন ঠিক করতে পারলেন না। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। বহুদিনের অদেখা বন্ধু অতীন্দ্র, আজ হঠাৎ তাকে দেওঘরে দেখে দিগিন্দ্র যে কি জন্য অত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছিলেন, তা বলতে পারলেন না। অতীন্দ্র কিছু না ব'লে তাঁর হাত ধ'রে বললেন, "এস, একযুগ পরে তোমার সঙ্গে দেখা। শীগ্‌গির তোমাকে ছাড়ছি নে। তার পর এখানে এসে উঠেছ কোথায়?"

"পাণ্ডাদের বাড়ী।"

"না, না, সে কি হয়? আমার এখানে এস। যে ক'দিন এখানে থাকবে, আমার বাসায় থাকবে।" ব'লে দিগিন্দ্রকে এক রকম জোর ক'রে টানতে টানতে তিনি নিয়ে চললেন তাঁর বাসার দিকে।

পথে যেতে যেতে দিগিন্দ্র বলল, "দেখ অতীন, আমার কথা তো তোমাকে সব বলা হয় নি। আমার ভারী মুশ্‌কিল যে।"

"কেন, কেন, কি ব্যাপার? আচ্ছা, সে-সব পরে হ'বে। আগে তো এস তুমি আমার বাসায়। সেখানে কেউ থাকে না। আমি একা, এক ঠাকুর আর এক চাকর। আর, কি রকম বাগান করেছি, দেখবে এস।"

"তা তো হ'ল ভাই অতীন—আজ কিন্তু আমি আসি। আমার যে বড় দরকার ভাই অতীন—আমি যাচ্ছিলাম এক বাসা খুঁজতে, সেখানে আমার গিন্নী আর শালারা আছে।"

"বল কি? তাই না কি? সে-কথা আগে বলতে পার নি? এই যে আমার বাসা। আরে এই গোবিন্দ! ঠাকুর! কেউ নেই দেখছি যে, সব গেল কোথায়?" ব'লে অতীন নিজেই বাগানের গেট খুলে ভেতরে ঢুকলেন। "এস ভেতরে", ব'লে দিগিন্দ্রকে একরকম জোর ক'রেই বাড়ীতে আনলেন।

"আজকে এখানে খাবো ভাই। কাল যেও তোমার সেই বাসায়, আমিই না হয় পৌঁছে দেব!" ব'লে অতীন্দ্র সেই রাত্রেই হেমন্তের শিশির-সিক্ত বিবিধ ফুলগাছের খবর নেন আর কি।

"ভাই, ও-সব পরে হ'বে। একটু বসি তোমার এখানে।" ব'লে দিগিন্দ্র বারান্দার পাতা চেয়ারে ব'সলেন।

"তার পর, কি করছ আজকাল এখানে?"

"বলি"—ব'লে অতীন্দ্র বাড়ীর মধ্যে চ'লে গেলেন।

•

কাজ-কর্ম বেশীর ভাগ ঠাকুর আর চাকর করে। কলকাতার বাসাতেও সেই ব্যবস্থা ছিল। লক্ষ্মণ ছিল সেখানে, দেওঘর আসার আগে তাকে বিদায় ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। বন্ধু এসে প'ড়েছিল, তাকে দেখে জয়ন্তী বলল, "আর লক্ষ্মণকে রেখে কি হ'বে?" সবাই বলল, "ঠিক বটে, লক্ষ্মণকে বিদেয় করো।" তার পর লক্ষ্মণ চ'লে গেল। বন্ধু বলল, "আমিই সব করব। ইস্তক রান্না থেকে সব কাজ আমি জানি।" তার পর, বন্ধুই এল দেওঘরে। বন্ধু জোগাড় ক'রে দিত, আর ঠাকুর রান্না করত।

আজ জয়ন্তী নিজেই রান্নার ভার নিয়েছে। একরকম ক'রে সব শেষ ক'রে সে খাবার ঠাঁই ক'রে বন্ধুকে বলল, "এঁদের ডেকে নিয়ে এস।"

জয়ন্তী পরিবেশন করবে। অনেকদিন রাঁধে নি সে। রাঁধতে রাঁধতে তার অনেক দিনের কথা মনে প'ড়ল। বাবা তাকে রাঁধতে দিতেন না, মা ছিলেন না সংসারে। সারথি বলত, "তোর বিয়ে হ'বে না। তুই রাঁধতে জানিস না।"

কি জানি কেন, জয়ন্তী নিজে থেকেই চেষ্টা ক'রে রান্না শিখেছিল। তার পর শ্বশুরবাড়ীতে এসে জয়ন্তী পিসশাশুড়ীর কাছে বকুনি খেত। ক্রমশঃ অবশ্য তার রান্না শেখা হ'য়েছিল। সেই সব কথা তা'র মনে পড়তে লাগল। খুব ভোরে উঠে উনুনে কয়লা দিয়ে চা-দুধ প্রভৃতির সরঞ্জাম শেষ ক'রে দিগিন্দ্রের ইস্কুলের ভাত রাঁধা। তার পর আবার রাত্রে। সংসারের নানা ঝক্কি। সেই সব কথা আজ অনেক দিন পরে রাঁধতে ব'সে জয়ন্তীর মনে পড়তে লাগল।

"তোমাদের আর কিছু চাই?" জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করল। এক হাতে তার পরিবেশনের থালা। লণ্ঠনের মৃদু আলো হেমন্তের রাতে তার মুখে এসে পড়েছে। ও-দিকে নিঃশব্দে চারজন খেয়ে চ'লেছেন। "তোমাকে আর চারটি ভাত আর ঝোল দেব মেজ বা?"

"না, আমাকে আর দিতে হ'বে না। সুবোধবাবুকে শুধোও, উনি যদি কিছু নেন!"

"না, না, আমার কিছু দরকার নেই। খাই টেবিলে, এ রকম ভাবে খেতে ব'সে অনেকদিন আগেকার পুরণো কথা মনে পড়ছে। আর রান্নাও চমৎকার আপনার।"

দেবকুমার বলল, "হাই! জয়ন্তী আবার রাঁধতে জানে না কি! ও কবে শিখল? আর একটু ঝোল দাও তো ভাই! বেশ চমৎকার হ'য়েছে।"

জয়ন্তী একটু হেসে ঝোল আনতে গেল।

•

বাড়ীর ভিতর থেকে অতীন্দ্র বেরিয়ে এলেন, তাঁর সঙ্গে একটি কিশোরী মেয়ে। অন্ধকারে মুখ ভালো দেখা গেল না।

অতীন্দ্র বললেন, "কেউ নেই ভাই বাড়ীতে। শুধু এ আছে, এর নাম মহালয়া। আমার ভাগ্নী, তুমি আমাদের জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এস তো মা।"

মহালয়া খাবার আনতে গেল।

বাগানে অজস্র ফুলগাছ। ফুলগুলির একটা মিশ্র গন্ধ আসছে। হেনার গন্ধ কিন্তু সবচেয়ে উগ্র। মিশ্র গন্ধের মধ্যে তাকে সহজেই চেনা যায়।

বাড়ীটার পিছনে ধূ-ধূ মাঠ। খানিকটা উঁচু জায়গায় বাড়ী। দেওঘরের যা নিয়ম, খানিকটা উঁচু, খানিকটা নীচু—রাস্তাগুলোর চালু ভাব দেখলে যা সহজেই বোঝা যায়। অনেক দূরে দূরে পাহাড়ের ধূসর অস্পষ্ট রেখা। বাড়ীটার ঠিক নীচ দিয়েই বিখ্যাত আধা-নদী আধা-নর্দ্দমা 'ধনুজোড়' প্রবাহিত। কাঁকরের চিবি এখানে ওখানে। রাত্রি ক্রমশঃ বেশী হচ্ছে। বারান্দায় চেয়ারে ব'সে দিগিন্দ্র তাঁর অপরিসীম ক্লান্তি নিয়ে। আর, অতীন্দ্র ব'সে আছেন তাঁর দেওঘর আসার ইতিবৃত্ত।

"জানো দিগিন, মানুষকে যে কত হাঙ্গামা পোয়াতে হয়, তার আর শেষ নেই। কত কাণ্ড করেছি, কত দেশ যে ঘুরেছি, তার আর শেষ নেই। তার পরে এইখানে এসে বেঁধেছি বাসা। আমার আবার কেউ নেই জানো তো? তা তুমিই বা জানবে কি ক'রে?" এই ব'লে তিনি যেন হঠাৎ সচকিত হ'য়েই বললেন, "তাই তো হে, তুমি আবার ক্লান্ত হ'য়েছ; একটু বিশ্রাম করো, কেমন? মহালয়া, ও মহালয়া, তোর খাবার হ'ল?"

ভেতর থেকে মহালয়ার গলার ক্ষীণ স্বর এলো, "যা-ই!"

খানিক পরে মহালয়া দু'খানি থালায় কিছু লুচি আর তরকারি, আর এক হাতে একটা আলো নিয়ে বাইরে এল। বলল, "তোমরা খাও, আমি চা ক'রে নিয়ে আসি।"

···বেমন্তের ঈষৎ শীতের আমেজ। দিগিন্দ্র থালায় হাত দিয়েই গরম লুচি আর তরকারী দেখে ব'লে উঠলেন, "এ তো অনেক করেছ দেখছি। এত কতবার দরকার কি ছিল? খাই তবে," ব'লে দিগিন্দ্র খেতে লাগলেন। খেতে খেতে গল্প চলতে লাগল দুই বন্ধুতে।

"বেশ সুন্দর বাড়ী করেছ অতীন, এখন এখানে কি করা হয়?"

"Practically কিছুই না।"

"বলো কি হে? আমরা তো মাষ্টারী ক'রে, এ-ক'রে তা-ক'রে কূল পাই নে। তুমি 'কিছুই না' ব'লে দিব্যি বাড়ী বানাও কি ক'রে?"

"আছে, আছে,—অনেক কিছু করি, তা আর না-ই শুনলে!"

"কি করো শুনিই না!"

"না, তা আর বলব না। খেয়ে নাও তুমি, তার পর এক সময়ে বলা যাবে।"

"আচ্ছা," ব'লে দিগিন্দ্র খেতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে মহালয়া চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বাইরে এল। সে-গুলো এঁদের সামনে রেখে সে দ্রুতপদে চ'লে গেল।

সে চ'লে গেলে দিগিন বললেন, "বেশ মেয়েটি!"

একটি সংক্ষিপ্ত "হুঁ" ব'লে অতীন বললেন, "ও আর আমি! আর কেউ নেই এখানে। ওরও কেউ নেই, আমারও না!"

৪

সে রাত্রে খেতে ব'সে অন্তীর মনে হ'ল সে বড় একা। লণ্ঠনের স্বল্প আলোয় ভাতের থালার সম্মুখে সে চুপ ক'রে অনেকক্ষণ ব'সে রইল। কই, এ-রকম ভাব তো তার আগে মনে আসে নি। যে-সব কথা সেওঘর এসে তার মনেই পড়ে নি, সেই সব কথা তার মনে পড়তে লাগল। দিগিন্দ্রকে সে চিঠি লিখেছে—কত সংক্ষিপ্ত চিঠি; কেন, আরও একটু বেশী লিখলে কি ক্ষতি হ'ত? আজ তার মনে পড়তে লাগল, তার সম্বন্ধে দিগিন্দ্রের অধীর ব্যাকুলতা! আধ খাওয়া ক'রে সে উঠে পড়ল। ইঁদারার ধারে জ্যোৎস্না-লোকিত নির্জ্জন রাতে আঁচাতে আঁচাতে তার মনে হ'ল, দিগিন্দ্রকে কেন সে আপনি বলে! কোথায় যেন এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সে নিজেই গড়েছে। দিগিন্দ্র সহস্র চেষ্টাতেও তার কাছেই আসতে পারে নি। আর আর শীতের হাওয়া—অনেক দূরে পশ্চিমাদের কুটীর থেকে হিন্দী গানের সুর ভেসে আসছে। সুবোধ আর এরা তিন ভাই দু'টি ঘরে শুয়ে হয় তো ঘুমিয়েই গেছে। বন্ধু খেতে বসেছে, আর জগতী সেই ধূ-ধূ মাঠ, জ্যোৎস্না-প্লাবন আর হিন্দী গানের সুরের মধ্যে অকস্মাৎ জেগে উঠল। সাত্যকি তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ছিল এতদিন। সাত্যকির অসুখের জন্য আজ আর চিন্তা নেই। আর কয়েক মাস; তার পরেই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যা'বে। তার পরেই তাকে আবার ফিরে যেতে হবে সেই পল্লী-প্রান্তরের মাটির ঘরগুলির মধ্যে।

তখন দিগিন্দ্রকে সে 'তুমি' বলবে, 'আপনি' বলা ছেড়ে দেবে। 'আপনি' কত দূর দূর, আর 'তুমি' কত কাছের, কত প্রিয়। জয়ন্তী এই রকম ভাবতে ভাবতে বন্ধুর কাছে এসে বললে, "তোমার খাওয়া হল বন্ধু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এই তো শেষ হয়ে গেছে। এইবার এঁটো বাসন-কোসনগুলো মেজে ঘর-দোর ছাপ্ ক'রে শুতে যাব।"

"বেশ, তা হ'লে আমি চললাম। দাদাবাবুদের বিছানা সব ঠিক ক'রে দিয়েছ? সুবোধবাবু আর মেজদার বিছানা এক ঘরে আর বড়দা ছোটদার বিছানা এক ঘরে—যা যা বলেছি, সব ঠিক সেই রকম করেছ তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ দিদিমণি, সব ঠিক ক'রে দিয়েছি।"

"আচ্ছা"—বলে জয়ন্তী তার নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

•

সাত্যকির সত্য রোগমুক্ত দেহ; তার ঘুম আসতে মোটেই দেরী হ'ল না। সুবোধের আর কিছুতেই ঘুম আসে না। তাঁর এমনি অভ্যাস; অনেকক্ষণ ধরে রাত্রে পড়া-শুনো ক'রে বেশী রাত্রে তাঁর ঘুমোন অভ্যাস। এ বাড়ীতে বই-টই নেই। অগত্যা বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। রাত প্রায় দু'টোর সময় সুবোধ একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে বসলেন। কিছুক্ষণ পরেই দেখেন, পাশের ঘর থেকে একখানি চেয়ার টানতে টানতে দেবকুমার বাইরে এসে উপস্থিত।

"এই যে, ভালোই হ'ল। আমি ভাবছিলাম, আমার মত ইন্‌সমনিয়াগ্রস্ত আর কেউ নেই এখানে। তুমি এসে পড়েছ, ভালোই হ'ল। এস, গল্প করা যাক।"

"আরে সুবোধবাবু যে বাইরে! Beyond my dreams! বেশ ভালো বরেছে, গল্প করা ছাড়া আর উপায় কি?"

এই বলে দু'জনে ধু-ধু মাঠের দিকে মুখ ক'রে গল্প ক'রতে ব'সলেন।

•

অতীন মহালয়াকে আবার ডেকে বললেন, "মহালয়া ইনি তোমারও মামা। এঁকে প্রণাম কর।" মহালয়া দিগিন্দ্রের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

"বেশ মেয়ে, চমৎকার মেয়ে!" বলে দিগিন্দ্র তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

অতীন মহালয়াকে বললেন, "ইনি আজ রাতে এখানে থাকবেন। এঁর বিছানা-টিছানা ভালো করে দাও। আর রাত্রে কি রান্না হবে মা?"

"যা আছে, তাই হবে", বলে দ্রুতপদে মহালয়া বাড়ীর ভিতরে চলে গেল।

খেতে ব'সে দিগিন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "মেয়ের বিয়ের বয়স তো হয়েছে, বিয়ে তো দিতে হবে।"

"তা তো হবেই। বিশেষ ব'লে তাই রক্ষে। দেশে-ঘরে হ'লে এতদিন অনেক কথা শুনতে হ'ত। শুধু চেষ্টা ক'রতে হ'বে! ভালই হ'ল তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে, তুমিও একটু দেখ না। কোন পাত্র-টাত্র যদি পাও।"

দিগিন্দ্র বললেন, "গরীবের ঘরে কি মেয়ের বিয়ে দেবে? তা হ'লে পাত্র হয় তো জুটতে পারে।"

অতীন বললেন, "দেখ, চেষ্টা করো, তুমি কি এখন এখানে কিছুদিন থাকবে? তা যদি থাকো, তা হ'লে চেষ্টা করো। দেখা তো হবেই তোমার সঙ্গে, কি বলো? মাঝে মাঝে পাত্রের কথা মনে করিয়ে দেব।"

১০

"তুমি মোর জীবনের আধিব বিভূ"

পরের দিন সকাল। সকালের চা ইত্যাদির পর সুবোধের চলে যাওয়ার সময় হ'ল। সুবোধ সকলকে বললেন, "আসুন, খানিকটা বেড়াতে বেড়াতে যাই। গাড়ী পরে নিয়ে গেলেই হবে।" সকলে রাজি হ'লেন। দারোয়ার রাস্তা ধরে সবাই হাঁটতে হাঁটতে চলতে লাগলেন। সাত্যকি অল্প কয়েকদিনেই বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। সে সবার সঙ্গে হেঁটে বেড়াতেও পারে দেখা গেল।

একটা মোড় ঘুরে রেলের লাইন পার হয়ে রাস্তা গেছে দক্ষিণ দিকে—রোহিণীর দিকে। দু'পাশে বড় বড় গাছের ঘন ছায়া। মাঝখানে লাল সুরকির রাস্তা। বাড়ী-গুলির একটার পর একটার মধ্যে ব্যবধান অনেক। মাঝে মাঝে বাঁধানো ইঁদারার পাশে জল তোলার কপিকলের দীর্ঘ বংশদণ্ড উঁচু হয়ে আছে। এই বাড়ীগুলির একটিতে সুবোধ

বামনের দেশ

থাকেন। সেটিও তাঁর নিজের। দু'পাশে যতদূর দেখা যায়, দেওঘরের অসমতল মাঠ তরঙ্গায়িত। অনেক দূরে এক আধখানা বাড়ী দেখা যায়। দিগন্তে ঘন নীল পাহাড় আর বনের রেখা। শীতের দিনের সকালের হাওয়ায় সকলে মিলে গল্প করতে করতে চললেন।

বাঁকরের পথ; জয়ন্তী খালি পায়েই চলেছে। তার চমৎকার লাগছে আজকের এই সকাল। সে বলল, "আর কতদূর গেলে আপনার বাড়ী?" সুবোধ বললেন, "বেশী দূর নয়, এই কাছেই। আপনার কেমন লাগছে, বলুন।" সংক্ষেপে জয়ন্তী বলল, "বেশ ভালো।"

সাত্যকি পিছিয়ে পড়েছিল, সে তার পায়ের সামনের কাঁকরগুলোতে ঠোকর দিয়ে বলল, "বেশ হয়েছে, শরীর আমার দু'দিনেই যেমন বুঝছি, তাতে মাসখানেকের মধ্যেই একেবারে সুস্থ হ'য়ে যাব, এই রকম মনে হচ্ছে।"

সুবোধ, দেবকুমার আর পাথ একটু এগিয়ে গেলেন। সাত্যকি আর জয়ন্তী পাশাপাশি চলতে লাগল।

জয়ন্তী তার কপালে একটি আঙুল বুলিয়ে এলোমেলো উড়ন্ত চুলগুলিকে কানের দু'পাশে গুছিয়ে রেখে ব'লল, "হাঁ, একমাসই থাকতে হবে। তার বেশী পরের বাড়ীতে আর চলে না। বোধ হয়, এক মাসেই তুমি একেবারে সেরে যাবে। কি বল মেজদা?"

"তাই তো বলি রে। এই রকম যদি বেড়াতে পাই দু' বেলা, সন্ধ্যার সকালে—আর ঠাকুরের হাতের রান্না চলে, খুব সাবা-সিধে খাওয়া—তা হ'লে বেশ সেরে যাব—এ বিশ্বাস আছে মনে।"

জয়ন্তী একটু মৃদু আপত্তি জানিয়ে বলল, "না, এবার থেকে আমি নিজেই রাঁধব, ঠাকুরটা কিছু জানে না। তুমি আপত্তি করবে না তো মেজ দা।"

"রাঁধতে পারিস যদি, তা হ'লে আর আপত্তি কেন ক'রব?" সাত্যকি সস্নেহে তার ছোট বোনের মুখের দিকে তাকাল। সাত্যকি বড় মৃদুভাষী, সেটা মনে পড়ল জয়ন্তীর। তাই সে বলল, "তুমি তো মুখ ফুটে কিছু বলবে না কোন দিন। রান্না খারাপ হ'লেও বলবে, ভালো হ'য়েছে, ভালো হ'লেও বলবে ভালো। এই তো তোমার স্বভাব। সে জন্যে ঠাকুর রাঁধছে তো রাঁধছেই, আমি একটা আর ভাবি নে। কাল সুবোধবাবুকে খেতে ব'লে নিজে রাঁধতে বড় ভালো লাগল। অনেক দিনের কথা সব মনে পড়তে লাগল।" এই খানটিতে সে তার বড় বড় চোখের পল্লব ঈষৎ স্তিমিত ক'রে যেন আপন মনেই থেমে গেল।

"কি কথা মনে পড়তে লাগল তোর?" সাত্যকি মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করল।

"এই ধরো শ্বশুর-বাড়ীর কথা, রোজই তো রাঁধতে হ'ত কি না! আর, আজ এটা নেই, কাল সেটা নেই, অমনি নানানরকম অভাব—এই সব কথা ভাবছিলাম।"

ক্রমশঃ আর আর রোদ উঠতে লাগল। শীতের অস্পষ্ট কুয়াসা আর রোদ! সাত্যকি কপালে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে চাদরটা ভালো ক'রে গায়ে দিতে দিতে বলল, "তা তো হ'বারই কথা। অনেক দিন এসেছ তুমি, দিগিন্দ্রকে চিঠি-পত্র দিচ্ছ তো? আমাদেরও উচিত এক-আধখানা চিঠি দেওয়া।"

জয়ন্তী কিছুই বলল না। যেন কতকটা অন্যমনস্কভাবে পথ চলতে লাগল।

অনেক দূর থেকে সুবোধ চেঁচিয়ে বললেন, "এই যে, আপনারা এত পেছিয়ে প'ড়েছেন কি ক'রে?"

"যাই," ব'লে জয়ন্তী আর সাত্যকি দ্রুত পা চালিয়ে দিল।

•

সুবোধের প্রকাণ্ড বাড়ী। সামনেটা নানা রকম ফুল গাছে ভর্ত্তি। বেলী ফুলই বেশী। টগর, গন্ধরাজ আর বেল ফুলই বেশী—আর অসংখ্য গোলাপ ফুটে রয়েছে বাগান আলো ক'রে। সুবোধ এঁদের বাড়ীতে সসম্মানে নিয়ে এলেন। একজন হিন্দুস্থানী মালী ইঁদারা থেকে জল তুলে বড় বড় টিনে ভর্ত্তি করছিল। সে ছুটে এসে গেট খুলে দিল। গন্ধরাজের ছায়া-বহুল ফুলের দিকে চেয়ে জয়ন্তী সুবোধ বাবুকে উদ্দেশ করে সবিস্ময়ে বললে, "এটিও আপনার বাড়ী?"

সুবোধ স্মিত মুখে বললেন, "হ্যাঁ, এটিও আমার।"

চারজনে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে এসে, কেউ বা একটা আরাম-কেদারা, কেউ বা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। জয়ন্তী ঘুরে ঘুরে এ-ঘর সে-ঘর দেখে বেড়াতে লাগল। বইতে, ছবিতে, দামী আসবাবপত্রে

ঘরগুলো যেন ঝলমল করছে। সে মনে মনে ভাবল, একা মানুষ, এত সব নিয়ে কি হ'বে? এ যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তা'র কেবলি মনে হ'তে লাগল, বৌ ছেলেপিলে থাকলে বেশ হ'ত।

ও-দিকে সুবোধ সাত্যকির দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, "এ-বেলাটা এ বাড়ীতে কাটিয়ে যান, কেমন? আমি ভাবছি বিকেলের দিকে রওনা দেব।"

সাত্যকি বলল, "না, তা হয় না। আপনাকে আবার এখানে এসে ব্যস্ত করা!" পার্থসারথি, দেবকুমারও সেই কথা বলল। তারা বলল, "আপনাকে তো আজই বিকেলে ফ'লে যেতে হ'বে, মাঝখান থেকে আমাদের জন্য মিছামিছি সময় নষ্ট।" মাঝী ইজি চেয়ারের পাশে টিপয়ের উপর কতকগুলো গোলাপ রেখে গিয়েছিল। সেগুলির মধ্য থেকে একটি রক্তগোলাপ তুলে নিয়ে সুবোধ একটু হেসে বললেন, "তা হ'লে বসুন খানিকটা, একটু পরেই না হয় যা'বেন।"

"আমরা তো ব'সেই আছি—আচ্ছা সুবোধবাবু, আমাদের আসার আগে এই দেওঘরে আপনি একরকম একা একাই কাটাতেন বোধ হয়!" দেবকুমার ঈষৎ চকিত হ'য়ে বলল।

হাতের গোলাপটির পাপড়িগুলোর উপরে হাত বুলোতে বুলোতে সুবোধ বললেন, "হ্যাঁ, অনেকটা একা একাই বটে। কোথায় কা'র সঙ্গে মিশবো? বই কিনেছি এবং এখনো কিনি, সেগুলো, তার পর আমার গাড়ী, শালবীথিকার প্রচ্ছন্ন পথ, উঁচু-নীচু মাঠ, অপোবন-ত্রিকূট আর জ্যোৎস্নার উদাস, মহুয়ার গন্ধে অলস নীল রাত আর রৌদ্রময়ী রাত্রির মত নির্জ্জন, মধ্যাহ্ন—এরাই আমার সঙ্গী।" ব'লে সুবোধ মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

তিনজনেই সপ্রশংস দৃষ্টিতে সুবোধের উদাস মুখের দিকে চেয়ে রইল। দেবকুমারের মনে হ'ল, লোকটা শিল্পী না হ'য়ে যায় না। পার্থসারথি ভাবল, এমন গম্ভীর অথচ সর্ব্বকর্ম্মক্ষম লোক বিরল। সাত্যকির মনে হ'ল, যেন কতকগুলো দেবদারু গাছের, ঘন-পল্লবের মধ্য দিয়ে খুব জোরে একটা দক্ষিণা হাওয়া ব'য়ে গেল। কথায়-বার্ত্তায়, আচারে-ব্যবহারে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে যেন একটা সুস্থতার হিল্লোল ব'য়ে যাচ্ছে।

দেবকুমার একটু হেসে বলল, "বেশ ভাল কথা। তার পর কি করেন?"

"তার পর বাকি সময়টা পড়তেই হয়, লেখা আর পড়া, ব্যবসাতেও তাই। লোকজন আসেন, তাঁদের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা তো আছেই। তা ছাড়া দরকার একটা সজাগ মনের। বাণিজ্য-জগতের খবর রাখতে হয়। নানা সূত্র থেকে নানা সংবাদ। এই; তার পর গাড়ীর সঙ্গে কাটে অনেকক্ষণ। যখন কাজ নেই, গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। সোজা ত্রিকূটের কাছাকাছি, না হয় আরও ঘুরে বেরিয়ে যাই। গেরুয়া মাটির উপরে যখন সন্ধ্যা ঘনায়, তখন বেশ লাগে। সব চেয়ে ভালো লাগে, এখানকার বর্ষা। এই তো শীত পড়েছে, ক্রমশঃ সব শুকিয়ে আসবে। এর পর দেখবেন, কোথাও সবুজের লেশমাত্র নেই। তার পর বৈত্রব বৈশাখ—পাথরে, রোদে, শুকনো লাল মাটিতে সে এক প্রকাণ্ড ব্যাপার হ'বে। সে সময়টা এখানে থাকি না, বর্ষা পড়লে আবার আসি। তখন সব সবুজ—ডমালে, পলাশে, মহুয়ায়, ঘনশ্যাম দূর্ব্বায় এই গিরিমাটির দেশকে অনেকটা বাঙলা দেশের সোদরা বলতে ইচ্ছে করে। যমুনাজোড়কে চেনা যায় হ'য়ে ওঠে। এই সব নিয়ে থাকি তখন। তখন খুব কাজ প'ড়ে যায়।"

পার্থসারথি বলল, "আচ্ছা, ব্যবসা করেন তো নানান্ রকম। ঠকেন নি কোনোটাতে, লোকসান হয় নি কোনটাতে? যখন যেটা পান, তখন সেটা করেন, না কি?"

"লোকসান তো হয়ই। মার খেতেই হয়। তা ব'লে উপায় কি? ধ'রে থাকতেই হয়, আর নানা fluctuating ব্যাপার ব্যবসা-জগতের; ও নিয়ে খাটতে হয় খুব। যখন যেটা পাই, তখন সেটা করি নে। একটা system তো আছে—সেই ভাবে চলতে হয়।"

সাত্যকি বুঝল, ইনি ব্যবসা সম্বন্ধে বেশী কিছু বলতে চান না। তখন সে ব্যাপারটিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, "গাড়ী নিয়ে কতদূর গেছেন? অনেক দূরপথ, নিবিড় বন, অরণ্যানী যা'কে বলে, তার মধ্যে গেছেন কি? কোনো দিন হয় তো বাঘের সামনে প'ড়ে গেলেন। এমন হয়েছে কি কখনও?"

সুবোধ একটু মৃদু হেসে বললেন, "না, বাঘের সামনে পড়ি নি কোনো দিন। তবে বাঘ হেঁটে গেছে, তার পায়ের

চিহ্ন দেখেছি ধূলোর উপর। গয়া জেলার বনের মধ্য দিয়ে গেছি, গাড়ী নিয়ে—অবশ্য একা নয়, সঙ্গে অনেকেই ছিল, বন্দুক-টন্দুক নিয়ে যেতে হয় সে-সব জায়গায়। শোনা যায়, চলন্ত গাড়ী থামিয়ে ডাকাতরা আক্রমণ করে। সে বড় ভয়ানক জায়গা। সেছি সেখানে, তবে বিপদে পড়ি নি।"

সাত্যকি হেসে বলল, "আপনার কাছে থাকলে যেন শরীর আপনা থেকেই সুস্থ হ'য়ে যায়।"

সুবোধ বললেন, "তাই না কি? এমন তো কখনও শুনি নি।" তার পর আর একটু হেসে বললেন, "বেশ ভালো, এই নিন ফুল।"—ব'লে সাত্যকির হাতে একটি গোলাপ দিলেন।

সাত্যকি গোলাপটি নিয়ে দেখতে দেখতে বলল, "এত বড় গোলাপ আমাদের ওখানে হয় না।"

দেবকুমার একটু হাসলে। বললে, "আপনি লেখেন না কেন? লিখতে ইচ্ছে করে না আপনার?"

"ঐ দেরেছেন! লেখাটেখা আসে না আমার। বলেছি তো একদিন,ছেলেবেলায় ও-অভ্যেস ছিল। যে জগতে আমরা বাস করি, তা'র ভাষাটা আলাদা। সেজন্যে কষ্ট ক'রে আর একটা ভাষার জগৎ গড়ি নি। আনন্দ পাই, পড়ে আনন্দ পাই। আপনি লিখুন, আমি পড়ব আপনার লেখা।"

"আমার কথা ছেড়ে দিন। কি কি বই পড়েন—কোন্ বই আপনাকে আনন্দ দেয়?"—দেবকুমার আবার একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল।

…সুবোধের সঙ্গে পরিচয় এদের খুব ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠতে লাগল। তিনজনেই তাই প্রশ্নের পর প্রশ্নে সুবোধকে যেন একটু বিচলিত ক'রেই তুলল।

দেবকুমারের কথায় সুবোধ একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। খানিক পরে তিনি চাকরকে ডেকে একটু চা করতে ব'লে দিলেন। তার পর বাইরের দিকে চেয়েই বললেন, "কি বই ভালো লাগে? সব সময়ে কি বই পড়ি? তা যদি বলেন, তা হ'লে রবীন্দ্র-সাহিত্যই পড়ি বেশীর ভাগ সময়। অসামান্য কবি!" ব'লে সুবোধ আবার অন্যমনস্কের মত বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন।

•

জয়ন্তী সব ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। প্রত্যেক ঘর সুনিপুণ ভাবে সাজানো। বইএর আলমারিগুলোর দিকে চেয়ে জয়ন্তীর চোখ জুড়িয়ে গেল। কত বই, ঘরখানির যে-দিকে সে চায়, দেখে শুধু বই, সুশৃঙ্খল সুন্দরভাবে সাজানো। বড় বড় ছবি দেওয়ালে, বিদেশের সব সুন্দর সুন্দর দৃশ্য—একখানা ছবি,সে বুঝতে পারলে, নেপোলিয়নের ছবি ব'লে—"অষ্টারলিৎসের যুদ্ধসমাপ্তি"—এটুকু ছবির নীচে লেখা আছে দেখা গেল। বিস্ময়ে দুই চোখ বিস্ফারিত ক'রে সে সেই বিশ্ববিজয়ী বীরের গৌরবময় রণজয়ের ছবি দেখতে লাগল। ছবির পটভূমিতে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, কামানের ধূম কি না বোঝা যায় না—সৈন্যরা যেন অগণিত পিঁপড়ের সারির মত দিক্ থেকে দিগন্তে প্রসারিত। কামানের ছবি, আর ছবির সম্মুখদিকে ভগ্নপদ, ছিন্নহস্ত সব মৃত সৈনিক—কামানের উপর তাদের দেহগুলি, আর হঠাৎ যে-মূর্ত্তিটির দিকে চোখ পড়ে, সেটি নেপোলিয়নের—ঘোড়ার পিঠে একটা দৃপ্ত-ভঙ্গিমার আঁকা—মাথায় একটা প্রকাণ্ড শিরস্ত্রাণ; দেখলেই মনে হয় আজকের যুদ্ধে তাঁর জয়লাভ হ'য়েছে। কি একটা আকর্ষণী-শক্তি ছিল ছবিটার, অথবা সমস্ত ঘরগুলির নির্জ্জনতায়, জয়ন্তী অনেকক্ষণই সেই ছবিটা থেকে চোখ ফেরাতে পারল না। ছবিটা থেকে চোখ তুলে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে কখন সে হঠাৎ মোটা কালো একটা পর্দা টেনে সুবোধের পড়বার ঘরে এসে পড়েছে! সেটা অপেক্ষাকৃত ছোট, প্রকাণ্ড একটা টেবিল, অসংখ্য মোটা মোটা বই এদিকে ওদিকে ছড়ানো। যেন মনে হয়, এখনি কে পড়াশুনা করতে করতে বই ফেলে চ'লে গেছে। জয়ন্তী যতটা পারলো, বইগুলিকে গুছিয়ে রাখলো ধূলো ঝেড়ে। কেমন একটা মমতা হ'তে লাগল তা'র—সুবোধের এই একক জীবনের উপর। মানুষ কেন একা থাকে—ভাবতে লাগল জয়ন্তী। কেন সে মিলে মিশে পাঁচজনকে নিয়ে তাদের একজন হয় না! হঠাৎ সে একটু গম্ভীর হ'য়ে গেল—হয় তো সে ভাবল, সবারই মন সমান নয়—হয়ত অনেকে একাই থাকতে চায়। হয় তো অনেকে চায় না। তবু বারে বারে তার মনে হ'তে লাগল, সুবোধ কেন একা থাকে?

পড়বার ঘর থেকে বেরিয়ে সমস্ত বাড়ীটা তন্ন তন্ন ক'রে সে দেখে বেড়াতে লাগল। রান্নাঘরে এসে দেখে, চাকর

প্রকাণ্ড একটা হৌত জ্বালবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। হৌতের যন্ত্র-সরঞ্জাম ভালো ক'রে গরম হ'তে না হ'তেই সে পাম্প করতে আরম্ভ করেছে। ফলে অনেকটা তেল উঠে ঘাই-দাউ ক'রে আগুন ধ'রে গেছে। জয়ন্তী তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বলল, "এই করো কি? আগেই কেন পাম্প করতে গেলে? যাও তুমি—আমি চা করছি, তুমি আমাকে সব গোছাড় ক'রে যাও।"

চাকর তো ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বলল, "যাই দিদিমণি!" ব'লে সে দৌড়ে চ'লে গেল। জয়ন্তী হৌতটাকে নিবিয়ে দিয়ে আবার খানিক পরে জ্বালো ক'রে জ্বালল। তার পর চাকর সব আনতে লাগল ভাঁড়ার থেকে। জয়ন্তী চা আর কিছু খাবার তৈরী ক'রে প্লেটে বসিয়ে, চায়ের সরঞ্জাম ট্রেতে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে চাকরের হাতে বাইরে পাঠিয়ে দিল। তার পর সে বাগানের ফুলের কেয়ারীর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আর একটু পরেই রোদ বেশ ভালো ভাবে গাছগুলির মাথায়-মাথায় রাস্তায় বাড়ীতে ছড়িয়ে প'ড়বে। বাগানের ফুলগাছগুলি কোনো কোনোটা ঝোপের মত হ'য়ে আছে—জয়ন্তী সেগুলোর পাশ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমে বাগানের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

•

রাত্রে দিগিন্দ্রের বেশ ভালো ঘুম হ'ল। মহালয়া মেয়েটির চারিদিকে বেশ তীক্ষ্ণ-সজাগ দৃষ্টি। বাড়ীতে চাকর-বাকর কেউ নেই—মহালয়া নিজেই সব কাজ-কর্ম করে। একটি ছোট সুন্দর ঘরে মহালয়া দিগিন্দ্রের জন্য বিছানা পেতে, খাবার জল ঢাকা দিয়ে রেখে গিয়েছিল।

সকালে উঠে দিগিন্দ্র মুখ-হাত না ধুয়ে অতীন্দ্রকে বললেন, "তা হলে চলা যাক, ভাই অতীন, তুমি আমার সঙ্গে আসবে?"

"তা ভাই, তুমি এসো! আমার কয়েকটা কাজ বাকী আছে। সেরে আবার বেরতে হ'বে। বাড়ী তো তোমার চেনা রইল, যে-কোনদিন সন্ধ্যার দিকে আসতে পারো!" —অতীন বললেন।

"আচ্ছা", ব'লে দিগিন্দ্র চ'লতে লাগলেন। মনটা তাঁর জয়ন্তীর উপর ঈষৎ বিরক্ত হ'য়েই আছে। সাত্যকির অসুখের পর থেকে হয়রাণির আর অন্ত নেই। আজ এখানে, কাল সেখানে, এখন সাত্যকি সেরে গেলে বাঁচা যায়। এই রকম ভাবতে ভাবতে দিগিন্দ্র চ'লতে লাগলেন।

সুবোধের বাড়ী চিনতে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। বাড়ীর সম্মুখে যেতেই দিগিন্দ্র দেখেন, একটী বাঙালী চাকর দালান ঝাঁট দিচ্ছে। তাকে দেখে দিগিন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে এটা কি সুবোধবাবুর বাড়ী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এইটেই সুবোধবাবুর বাড়ী, কি চাই আপনার?"

"আচ্ছা, তুমি ব'লতে পার কি, এখানে নতুন কেউ এসেছেন কি না?"

বহু কতকটা ভয়ে ভয়ে গেটের কাছাকাছি এসে গেট না খুলেই বলল, "কাদের কথা আপনি বলছেন?"

দিগিন্দ্র বললেন, "পার্থসারথি ব'লে কেউ এখানে এসেছে কি? ব'লতে পার?"

বহু বড়দাদাবাবুর নাম জানত। সে বলল, "হ্যাঁ, এই বাড়ীই বটে। আপনি কোথা হ'তে আসছেন?"

কি আর বলেন, দিগিন্দ্র বললেন, "আমি তা'দের আত্মীয় হই। তুমি গেটটা খোল বাপু।"

বহু একগাল হেসে বলল, "ও আচ্ছা, আসুন, আসুন, বসুন, এঁরা তো সব সকালে বেড়াতে বেরিয়েছেন। আপনি বসুন, সব এলেন ব'লে। দেরী নেই।"

দিগিন্দ্র ভিতরে এসে বললেন, "এঁরা কারা?"

বহু এক নিঃশ্বাসে বলল, "এই ধরুন, দিদিমণি, সুবোধবাবু, আর দাদাবাবুরা।"

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দিগিন্দ্র বললেন, "সুবোধবাবু কি এখানেই থাকেন?"

"আজ্ঞে না, তেনার পরকাণ্ড বাড়ী-গাড়ী সব র'য়েছেন। এখানে তিনি কেন থাকবেন?" ব'লে বহু দিগিন্দ্রের জন্যে একখানি চেয়ার বার ক'রে দিল। বলল, "বসুন বাবু, এঁরা সব এলেন বলে।"

ব'লে, সে তার নিজের কাজে চলে গেল। দিগিন্দ্র র‍্যাপারটা বেশ ক'রে গায়ে জড়িয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। তাঁর কেবলই মনে হ'তে লাগল, নিশ্চয়ই সাত্যকি সেরে উঠেছে। তা নইলে সে বেড়াতেই বা যাবে কেন? চাকরটিকে ডেকে সে কথা জিজ্ঞাসা ক'রবেন ভাবলেন। কিন্তু কার্যতঃ তা আর হ'ল না। সম্মুখেই দেখেন, সাত্যকি, সারথি আর দেবকুমার, আর পিছনে জয়ন্তী; নিজেরাই গেট খুলে বাড়ীতে ঢুকছে। দিগিন্দ্র একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, যেন তাদের দেখতে পান নি এই ভাবে, মাথা নীচু ক'রে ব'সে রইলেন। শুধু "আরে" বলে একটা শব্দ, তার পর প্রশ্নবাণ বর্ষিত হ'তে লাগল। জয়ন্তী সেই ফাঁকে একপাশ দিয়ে ভিতরে অন্তর্হিত হ'ল।

[ ক্রমশঃ

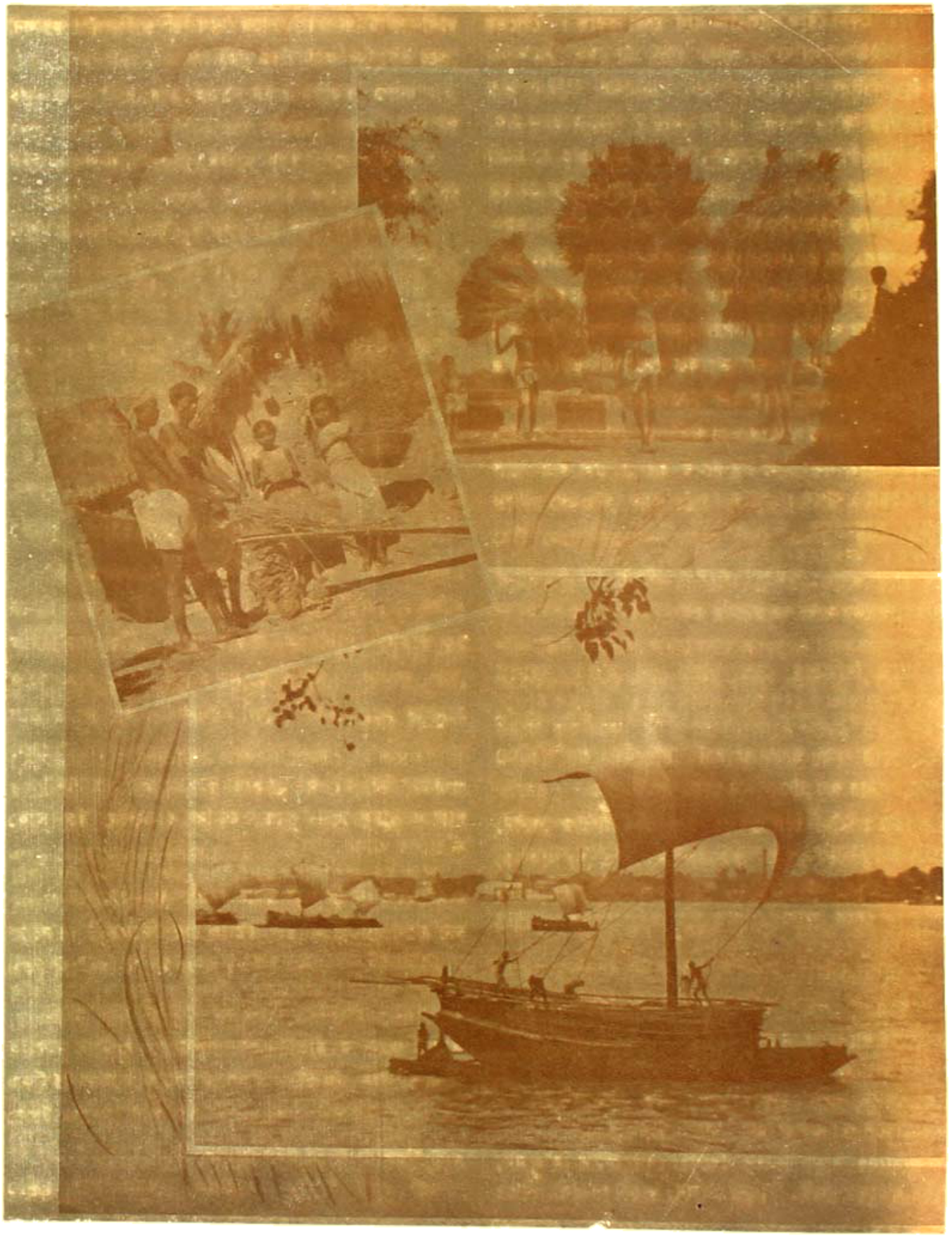

ঋতুচক্র : হেমন্ত

# ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও বাঙ্‌লা সাহিত্য

—শ্রীমনোমোহন ঘোষ

লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌-এর (১৭৮৮-১৭৯৩) প্রবর্তিত শাসন-সংস্কারের ফলে মাসিক একশত টাকার উর্দ্ধ বেতনের সমস্তকারী কর্ম্মে কেবল বিলাতী সাহেবদের নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু যে দেশীয় লোকদের প্রতি অবিশ্বাসবশতঃ এই রীতি প্রচলিত হয়, সে দেশের ভাষা না জানার ফলে সাহেবগণ সেই দেশীয় লোকদের উপর নির্ভর করিয়াই কাজ চালাইতেছিলেন। ইহাতে কর্ণওয়ালিস্‌-কৃত শাসনসংস্কারের উদ্দেশ্য বিফল হইতেছিল। এইরূপ অবস্থা, বিচক্ষণ লর্ড ওয়েলেস্‌লীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে, তিনি উহার সংশোধনের কথা চিন্তা করিলেন। দুই উপায়ে উহার প্রতিবিধান হইতে পারিত: (১) ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগকে দেশীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন করা, (২) দেশে ব্যাপকভাবে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করা। কিন্তু শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিলে এক ঘোরতর বিপদের সম্ভাবনা ছিল, কারণ য়ুরোপে তখন ফরাসী বিপ্লবের যুগ—ইংরেজ চিন্তাবীর ও লেখকগণের অধিকাংশই তখন বিপ্লবের মহিমায় মুগ্ধ ও বিপ্লবের যশোগানে প্রবৃত্ত। এইরূপ অবস্থায় এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইলে ইংরেজী সাহিত্যের ভিতর দিয়া লোকের মনে বিপ্লবী চিন্তাধারা জাগিতে ও প্রবল হইতে পারে এই আশঙ্কায় লর্ড ওয়েলেস্‌লী প্রথমোক্ত উপায়ই অবলম্বন করিলেন। কোম্পানীর অবতন (junior) কর্ম্মচারীগণকে দেশীয় ভাষা শিখাইবার ব্যবস্থা হইল। এদেশে কর্ম্মপ্রার্থী নবাগত ইংরেজ যুবকগণকে স্ব স্ব পদমর্য্যাদা ও দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য ওয়েলেস্‌লী যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করিলেন, তাহাতে অন্যান্য দেশীয় ভাষার সঙ্গে বাঙ্‌লা ভাষার শিক্ষা-দানেরও ব্যবস্থা হইল। য়ুরোপীয় সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাবী সিবিলিয়ানদিগকে এদেশের প্রচলিত ভাষাসমূহ শিখাইবারও বন্দোবস্ত হইল। কলেজের নিয়মানুসারে ইংরেজ ছাত্রগণকে দেশীয় ভাষায় স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করিতে ও তৎসম্পর্কিত আলোচনায় দেশীয় ভাষা ব্যবহার করিতে হইত। কাজেই দেখা যায় যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্‌লা ভাষা শিক্ষাদানের আদর্শ বিশেষ খাটো ছিল না।

উল্লিখিত আদর্শে শিক্ষাদান-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া উইলিয়ম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) দেখিলেন যে, বাঙ্‌লা ভাষায় উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের—বিশেষ ভাবে গদ্যগ্রন্থের—একান্ত অভাব। তাই তিনি এ বিষয়ে মনোযোগ দান করিলেন এবং পনের বছরের (১৮০১-১৮১৫) মধ্যে তাঁহার এবং তাঁহার আটজন সহকর্ম্মীর (রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতির) প্রচেষ্টায় চৌদ্দখানি গদ্যপুস্তক প্রকাশিত হইল। এই পুস্তক-নিচয়ের মধ্যে দুইখানি কেরীর রচিত, অবশিষ্ট বারোখানি তাঁহার সহকর্ম্মীদের। এই চৌদ্দখানি পুস্তকেই প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্‌লা গদ্যকে সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত করিবার প্রথম চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গদ্য-রচনার আদর্শ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকারবর্গের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। খুব সম্ভব এই কারণেই তাঁহারা বাঙ্‌লা গদ্যের রীতিপারিপাট্য লইয়া পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-কার্য্য (experiment) চালাইয়াছিলেন। এই পরীক্ষা-কার্য্যের ফলবত্তা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে হইলে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন।

কেরীর রচনা সর্ব্বপ্রথমেই আলোচ্য। 'কথোপকথন' নামে যে গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন বা সঙ্কলন করেন (১৮০১), তাহা তৎকালীন কথ্যভাষার একখানি অনতিবিস্তৃত দর্পণস্বরূপ। এদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে বা শাসনকার্য্যে সফলতা লাভ করিতে হইলে যে, কথ্যভাষা প্রয়োজন তাহা কেরী খুব ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন; তাই বাঙ্‌লাদেশের প্রধান প্রধান শ্রেণীর লোকদের কথাবার্ত্তার প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হইয়াছিল। তাঁহার উল্লিখিত গ্রন্থ এই অনুসন্ধিৎসারই ফল। ইহাতে যে-সকল কথাবার্ত্তার বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সে সকলকে নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীতে

আশা করা যায় :—(১) গ্রাম্য মধ্যবিত্ত লোকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা, (২) জাহাজ, জমি, চাষ বাস, ক্ষেত-খামার ও খাজনাপত্রের কথা, (৩) খাতক ও মহাজনের কথা, (৪) বিভিন্ন শ্রেণীর মেয়েদের বিশ্রম্ভালাপ, (৫) নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের বাজারে যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরার কথা, (৬) মুটে-মজুর, ফেরে-ফিরিঙ্গী আদির কথা।

এই নানা শ্রেণীর লোকের মুখে আরোপিত বিষয়ের কথাবার্ত্তার যে সরলতা, শব্দ-সম্পৎ ও প্রকাশ-বৈচিত্র্য লক্ষ্য-গোচর হয় তাহা সত্যই বিস্ময়জনক। প্রত্যেকটি কথাবার্ত্তা পাঠকের মনশ্চক্ষে তৎকালীন সামাজিক জীবনের অংশ-বিশেষকে বেশ জীবন্তবৎ প্রতিভাত করিয়া তোলে। এই গ্রন্থ পাঠে আর একটি কথা পাঠকের মনে হয় যে, তৎকালীন ভদ্র ও শিক্ষিত বাঙালী সমাজ যে ভাষায় কথা বলিতেন তাহা বেশ সুন্দর ও স্বাভাবিক গড়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই জন ভদ্র-লোকের কথাবার্ত্তার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে :—

"তাঁহার আত্মপুত্রেরা কেমন আছেন।" (?)

"তাঁহারা আমার আপনার লোক; তাঁহাদের সহিত আর কথা? তাঁহাদের প্রতিপালিকার লোক আমার দেশে নাই। এখানে কোম্পানীর কার্য্য পাইয়া যাহা বানাচা হইয়াছে; তাঁহাদের সমান ধনীলোক আমার দেশে চাকরী করিয়া হইতে পারে নাই। কেবল ধনীও নয়; বিদ্যাও অনেক করিয়াছে; আমি যাহাকে কতকগুলা লাকো টাকার জমিদারি করিয়াছি।"

"সমস্তই আমার বর্ণীভূত: দেখ দিকি তাঁহারা কি ছিলেন, এখন বা কি হইয়াছেন। এ আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছে।" (১)

এই রচনার সাহিত্যিক পারিপাট্য নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর হইলেও, ইহার মধ্যে যে প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণ বর্ত্তমান তাহা মৃত্যুঞ্জয়াদির রচনায় অনেক স্থলে দুর্লভ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কেরী যে সেরোক্ত ব্যক্তিদের গ্রন্থ ফোর্ট উইলিয়মের পুষ্ঠ-পোষকতায় প্রকাশিত করাইয়াছিলেন তাহার কারণ কি? খুব সম্ভব, বহু বিচিত্র রীতির নিদর্শনে সমৃদ্ধ ইংরেজী সাহিত্যের সহিত পরিচয় বশতঃই কেরী সহকর্ম্মীদের দ্বারা নানা রীতির গ্রন্থ প্রণয়নে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, যেন এই দিক্ দিয়া বঙ্গ-সাহিত্য সমৃদ্ধ হইতে পারে। যদি এই অনুমান সত্য হয় তবে তাঁহার দূরদর্শিতার প্রশংসা করিতে হইবে। কিন্তু নানা রীতিতে রচনায় উৎসাহ দান করিলেও কেরী স্বয়ং সহজ এবং প্রাঞ্জল রচনা-রীতিরই বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮১২ অব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'ইতিহাস-মালা' নামক পুস্তকেও এই রীতি অনুসৃত হইয়াছে। নামে 'ইতিহাস' শব্দ থাকিলেও ইহাতে ঐতিহাসিক কাহিনী খুব সামান্যই আছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উপকথা, সাহিত্য, পুরাণ-কাহিনী ও ইতিহাসাদি হইতে আহৃত বেড়শটি গল্পের সমবায়ে এই গ্রন্থ রচিত। যেমন, হিতোপদেশ এবং পঞ্চতন্ত্রের গল্পের সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল-বর্ণিত লহনা-খুল্লনার উপাখ্যান, আকবর বাদশাহের কাহিনী-আদি ইহাতে আছে। এই গল্পগুলির অধিকাংশই বেশ কৌতূকোৎপাদক ও শিক্ষাপ্রদ এবং ইহাদের স্থানে স্থানে বেশ হাস্যরসের অবতারণা আছে।

কেরীর উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয় মৌলিক রচনা না হইলেও উহাদের যে কোন সাহিত্যিক মূল্য নাই তাহা নহে। বাঙলা গদ্যের অন্তর্নিহিত বিচিত্র প্রতিভঙ্গীর বিকাশের সম্ভাবনা কেরীর দুইখানি পুস্তকেই সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ পাইয়াছিল। এই হিসাবে তাঁহার গ্রন্থ যে বহুল পরিমাণে তদীয় সহকর্ম্মীদের রচনানিচয়ের আদর্শ হইয়াছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কেরী কর্ত্তৃক বাঙলা সাহিত্যের উপকারের কথা স্মরণ করিয়া কোন কোন লেখক কৃতজ্ঞতার আতিশয্য বশতঃ তাঁহাকে বাঙালা গদ্যের নির্ম্মাতা বা 'জনক' এই আখ্যা দান করিয়াছেন; কিন্তু এই আখ্যাদান বিশেষ অজ্ঞতা-প্রসূত ও নিতান্ত ভ্রমোৎপাদক। কারণ কেরীর আগেও বাঙলা গদ্য—এমন কি সুন্দর প্রাঞ্জল গদ্য—বর্ত্তমান ছিল। তাহার বহু প্রমাণের মধ্যে কেরীর সঙ্কলিত 'কথোপকথন'-নামক গ্রন্থ অন্যতম। কেরীর প্রধান কৃতিত্ব গদ্যকে সুপ্রচলিত বা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা। গল্প, উপাখ্যান, ইতিহাসাদি পদ্যে রচিত না হইয়া গদ্যেও যে বেশ হৃদয়গ্রাহীভাবে রচিত হইতে পারে, তাহার প্রথম উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দেখাইলেন উইলিয়ম কেরী। এই হিসাবে তাঁহাকে বাঙালা ভাষার সাহিত্যিক গদ্যের আদি প্রবর্ত্তক বলাই উচিত হইবে। রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি সহকর্ম্মীদের দ্বারা কেরী যে বিবিধ গদ্য-পুস্তক রচনা করাইয়াছিলেন, তাহাও এই প্রবর্ত্তনাকার্য্যের অন্তর্গত।

কেরীর পরেই উল্লেখযোগ্য বাঙলা গদ্যলেখক ছিলেন রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩)। ইঁহার এইরূপ গৌরবের

(১) ইাড়ি মধ্যের উদ্ধৃত অংশের সমুদয় বিদ্যাসাগর প্রবন্ধ-লেখক প্রবন্ধ।

কারণ এই যে, ইনি কেরী সাহেবের বাঙ্‌লা-শিক্ষক ছিলেন এবং সাহেবের নির্দ্দেশক্রমে সর্ব্বপ্রথমে স্বীয় মাতৃভাষায় একখানি মৌলিক গদ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের নাম 'রাজা প্রতাপাদিত্যের চরিত্র'। ইহা ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং রামরাম বসুকে ইহার জন্য কলেজ হইতে ৩০০৲ পুরস্কার দেওয়া হয়। 'প্রতাপাদিত্যের চরিত্র' কেবল আধুনিক কালের প্রথম মৌলিক বাঙ্‌লা গদ্য-গ্রন্থ নহে, উহা বাঙ্‌লার প্রথম ইতিহাস-গ্রন্থও বটে। এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে গল্প-গল্পের অবতারণা থাকিলেও যোগ্য সমালোচকের দৃষ্টিতে ইহা ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। প্রায় এক-শত বৎসর আগে রামরাম বসু প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আধুনিক গবেষকগণ তদপেক্ষা নূতন কথা খুব অল্পই বলিতে পারিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্‌লায় 'চৈতন্য-ভাগবত,' ও 'চৈতন্য-চরিতামৃত'-আদি ঐতিহাসিক রচনা আছে বটে, কিন্তু পদ্যে লিখিত এই সকল ধর্ম্মমূলক গ্রন্থকে 'ইতিহাস' না বলিয়া সংস্কৃত 'পুরাণে'র শ্রেণীতে গণ্য করাই অধিকতর সঙ্গত। সত্য বটে, এ সকল গ্রন্থে যথার্থ ইতিহাসের বহু উপাদান আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাদিগকে ইতিহাস-গ্রন্থের শ্রেণীতে ফেলা যায় না। বাঙ্‌লা গদ্যে আধুনিক প্রণালীতে ইতিহাস-রচনার চেষ্টা রামরাম বসুই সর্ব্বপ্রথমে করিয়াছেন। মাঝে মাঝে বেশ চিত্তাকর্ষক কাহিনী ও বর্ণনা যোগ করিয়া ধারাবাহিকভাবে তিনি প্রতাপাদিত্যের জীবন-বৃত্তান্ত রচনা করিয়াছেন। প্রথম পথিকৃৎ (pioneer) হইয়াও ইতিহাসকে জীবন্ত করিয়া তুলিবার যে ক্ষমতা তিনি দেখাইয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য।

কেবল ইতিহাস হিসাবে নহে, বাঙ্‌লা সাহিত্যিক গদ্যের নিদর্শন রূপেও 'প্রতাপাদিত্যের চরিত্র' নিতান্ত মূল্যহীন নহে। ইহার বাক্য-বিন্যাস-রীতি স্থানে স্থানে সরল ও সহজবোধ্য; বর্ণনাসকল বেশ স্বভাবানুগত এবং চিত্তাকর্ষক। কিন্তু এই সকল সত্ত্বেও গ্রন্থখানি আধুনিক সমালোচকগণের নিকট সমাদর লাভ করে নাই। তাহার কারণ, এই গ্রন্থে (ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আনুকূল্যে প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থের মত) বিরামচিহ্ন অপ্রচুর। দাঁড়ি ছাড়া কোন চিহ্ন ইহাতে ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু এই দিক্ দিয়া পুস্তকের ত্রুটি গ্রহণ করা অন্যায়। কারণ যথোপযুক্ত বিরামচিহ্নের প্রয়োগ কদাপি রচনারীতির অঙ্গ নহে। 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্রে'র ভাষাকে বিকট করিয়া তুলিয়াছে উহার স্থানে স্থানে সংস্কৃত শব্দের অপব্যবহার এবং পদবিন্যাসের (syntax-এর) ক্লিষ্টতা। রাম বসুর সংস্কৃত জ্ঞানের এবং সাহিত্যিক শিক্ষার (training-এর) অভাব এজন্য দায়ী। কতিপয় স্থানে আরবী ফারসীর অজস্র ব্যবহারেও রাম বসুর রচনা অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু এদিক্ দিয়া তাঁহার যে ত্রুটি আবিষ্কার করা হয় তাহা সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। কারণ, যুদ্ধ, রাজ্যশাসন, বাদশাহী চরিত্রাদি বর্ণনে তিনি যে আরবী-ফারসী কথা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা না করিলে মুসলমান অধিকারের সময় বর্ণনা-প্রসঙ্গে রচনার স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হইত। তাহা সত্ত্বেও রাম বসু যে স্থানে স্থানে আরবী-ফারসী শব্দের মাত্রাধিক্য ঘটাইয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই ত্রুটির জন্য দায়ী তাঁহার যথার্থ সাহিত্যিকসুলভ শিল্পবোধের অভাব; তৎকালীন কথাবার্ত্তার মধ্যে প্রচুর আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহারের যে হেওয়াজ ছিল তাহা তিনি লেখার বেলায় এড়াইতে পারেন নাই। এই সকল ত্রুটি উপেক্ষা করিলে 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র রচনাকে তেমন নিকৃষ্ট বলা যায় না। রাম বসুর সম্মুখে যে, বাঙ্‌লা গদ্যের কোন অনুসরণযোগ্য আদর্শ ছিল না, এ কথা চিন্তা করিলেও এ গ্রন্থকে কিয়ৎপরিমাণে প্রশংসা দান করিতে হয়। নিম্নে 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভাষার একটি ক্ষুদ্র নমুনা দেওয়া হইল:

"রামচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের জামাতা; তাহার অধিকারের উপর চড়াই না করিয়া কোন কৌশলে বেশ কথন করে, তাহা করিল। একটা প্রকরণ বিস্তার দিয়া তাহাকে আনাইল ঘুষঘাট নিজ পুরীর মধ্যে; তাহাতে থাকিলেন থাকিল। তাবিল এখন কার্য্য ভাল থাকিলেন, আবশ্যক হইলে ইহাকে সংহার করণের ঘাটক হবে না। আর আর কোথা জল প্রভৃতি সকলকেই বিপাত করিয়া তাহার অধিকার আপন লোক দিয়া শাসন করিলেন।" (১)

১৮০২ অব্দে 'লিপিমালা' নামে রাম বসুর আর একখানি গদ্যপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তক চিঠির আকারে লিখিত কতিপয় প্রবন্ধের সমষ্টি। ইহাদের কয়েকটি বিষয়-কর্ম্ম ও পাইক্কা ব্যাপার সম্পর্কিত, আর কয়েকটিতে ধর্ম্ম, দর্শন, ইতিহাস এবং পুরাণ-কাহিনী সম্পর্কিত নিতান্ত অগভীর (shallow) আলোচনা আছে। 'লিপিমালা'র ভাষা

(১) বিরাম-চিহ্ন প্রবন্ধলেখক-প্রদত্ত।

'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' অপেক্ষা সংস্কৃতঘেঁষা এবং ইহার রচনা-রীতি স্থানে স্থানে বেশ সরল। নিম্নে ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :

"অব বিবরণক জিবব। তোমার ও অকলের অবে যথাশীঘ্র আলাসুব যে অতি চমৎকৃত হইলাম তাহা লেখনকার সেধাদি এখন পূর্ণবত হয় না ; তোমার বড় একটা মনোযোগ সে বিষয় প্রতি নাই, এ বড়ই বিরক্ত কথা ; আমি বুঝি তুমি তাহাতে জ্ঞাত নহ, অতএব সে বিষয়ে লেখিতেছি মনোযোগ করিবা।" (১)

রামরাম বসু অপেক্ষা প্রাঞ্জলতর গদ্য লিখিয়াছিলেন গোলোকনাথ শর্মা। তাঁহার কৃত সংস্কৃত 'হিতোপদেশ' নামক গল্প-পুস্তকের অনুবাদ ১৮০১ অব্দে প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদ যথাসম্ভব মূলের অনুগত এবং মোটামুটিভাবে সরল ; তবে ইহার স্থানে স্থানে পদবিন্যাস-রীতির কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু গোলোকনাথ সংস্কৃতের পণ্ডিত হইলেও এই অনুবাদ-গ্রন্থে তাঁহার ভাষায় পাণ্ডিত্যাড়ম্বর বা দুরূহত্ব নাই। কেরীর 'ইতিহাস মালা'র মত এ পুস্তকেও গ্রন্থকার বিনা আয়াসে এক সরল গদ্যরীতি অনুসরণ করিয়াছেন।

ডক্টর গিলক্রাইষ্ট সম্পাদিত 'ওরিয়েণ্টাল ফ্যাবুলিষ্ট' নামক গ্রন্থের অন্তর্গত ঈশপাদির গল্পের বাঙলা অনুবাদটি এ যুগের গদ্যের অন্যতম নিদর্শন। এই অনুবাদের প্রণেতা কোর্ট উইলিয়মের শিক্ষক তারিণীচরণ মিত্র ফারসী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। এই অনুবাদ (১৮০১) এগার বৎসর পরে প্রকাশিত কেরীর 'ইতিহাস মালা'র (১৮১২) সহিত তুলনীয়। তারিণীচরণ স্থানে স্থানে ইংরেজী বা ফারসী বাক্যরীতি অনুসরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সর্বত্র রচনাকে সহজ করিবার প্রয়াস থাকায় এই অনুবাদের রচনাভঙ্গী খুব নিন্দনীয় হয় নাই। চণ্ডীচরণ মুন্সীর "তোতা ইতিহাস" এবং রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের "কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র" একই বৎসরে প্রকাশিত হয় (১৮০৫)। এই দুইখানি গ্রন্থে যে ভাষা ও রচনা-রীতি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা পরস্পর-বিরুদ্ধ স্বভাবের। "তোতা ইতিহাস" ফারসী "তুতি নামা"র(২) অনুবাদ। এই অনুবাদের ভাষা গল্প-পুস্তকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহার গোড়ার দিকে কিঞ্চিৎ ফারসী শব্দের বাহুল্য থাকিলেও গোলোকনাথের হিতোপদেশ বা তারিণীচরণের 'ঈশপের গল্প'র অনুবাদ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে এবং স্থানবিশেষ পুস্তকদ্বয় হইতে সুখপাঠ্য।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র' ইতিহাস হিসাবে অকিঞ্চিৎকর। ইহার বেশীর ভাগই গান, গল্প ও কল্পিত ঘটনার পূর্ণ। কোন সমসাময়িক লোকের মতে গ্রন্থকার ইংরেজগণের প্রশংসালাভের অভিপ্রায়ে তাঁহাদের প্রশংসার পূর্ণ এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক দিক্ দিয়া নিকৃষ্ট হইলেও, 'কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র' গদ্য-রচনার নিদর্শন হিসাবে মন্দ নহে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য প্রকাশিত গ্রন্থমালার রচয়িতাগণের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নামের স্থানই সর্বাপেক্ষা বেশী। কারণ তিনি চারিখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, অপর সকলের প্রত্যেকে দুইখানি বা একখানি মাত্র। কিন্তু কেবল রচনার সংখ্যাধিক্য নহে, রীতি-বৈচিত্র্যের জন্যও মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা প্রণিধানযোগ্য। ১৮০১ অব্দে কোর্ট উইলিয়মের শিক্ষকতায় প্রবেশ করিয়াই তিনি 'বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা' নামক সংস্কৃত উপাখ্যানগ্রন্থকে বাঙলা গদ্যে অনুবাদ করিয়া 'বত্রিশ-সিংহাসন' নাম দিয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের ভাষা বিশেষভাবে সংস্কৃত-ঘেঁষা হইলেও সর্বত্র দুর্বোধ্য নহে ; তবে ইহার স্থানে স্থানে বাঙলা গদ্যের স্বাভাবিক বাক্যবিন্যাস (syntax) ও শব্দপ্রয়োগরীতি লঙ্ঘিত হইয়াছে, কিন্তু এই সকল ত্রুটিসত্ত্বেও মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা নিতান্ত অপাঠ্য নহে। ১৮০৮ অব্দে মৃত্যুঞ্জয়ের দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহা সংস্কৃত হিতোপদেশের এক অভিনব বঙ্গানুবাদ। এই অনুবাদের ভাষা প্রায় 'বত্রিশ-সিংহাসনে'র ভাষারই অনুরূপ এবং বিশেষ ভাবে সংস্কৃতঘেঁষা। গোলোকনাথ শর্মা-কৃত হিতোপদেশের যে অনুবাদ ১৮০১ অব্দে প্রকাশিত, হইয়াছিল মৃত্যুঞ্জয়ের অনুবাদের ভাষা তদপেক্ষা বেশী সংস্কৃত-প্রভাবযুক্ত এবং দুরূহ। ইহা সত্ত্বেও পুস্তকখানি যে কেন প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কারণ ঠিক বোঝা যায় না। মৃত্যুঞ্জয় রচিত 'রাজাবলি' ইতিহাস-গ্রন্থও ১৮০৮ অব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল সম্ভবতঃ 'রাজাবলী' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ।

(১) সর্বত্রই ইংরি অক্ষরের উচ্চারণের সমুদয় বিষয়-চিহ্ন প্রবন্ধকার-প্রদত্ত।

(২) ফারসী 'তুতিনামা'র উপাখ্যানভাগ 'শুকসপ্ততি'-নামক সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে পৃথীত।

কিন্তু এই গ্রন্থে ইতিহাসের মর্য্যাদা বিশেষ রক্ষিত হয় নাই। ইতিহাস, জনশ্রুতি ও কল্পনা মিশাইয়া মৃত্যুঞ্জয় এই গ্রন্থে এক অপূর্ব্ব খিচুড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন।

যদি এই 'রাজাবলি' অনুবাদাত্মক রচনা না হয়, তবে ইহাই মৃত্যুঞ্জয়ের প্রথম মৌলিক রচনা। কিন্তু মৌলিক রচনা হইলেও এই গ্রন্থ মৃত্যুঞ্জয় কোন নূতনতর শৈলীতে লেখেন নাই। তাঁহার অনুবাদ-গ্রন্থদ্বয় হইতে এই পুস্তকের ভাষা ভিন্ন প্রকারের নহে। কেবল, যে যে স্থানে তিনি বাদশাহ, নবাব, সুবেদার ও লড়াই আদির বর্ণনা করিয়াছেন, সে সে স্থানে সুবিধামত ফারসী আরবী শব্দ প্রবেশ করাইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। খুব সম্ভব রাম বসুর দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে তাঁহার উপর কার্য্যকরী হইয়াছিল। কিন্তু রাম বসুর ভাষার অনুকরণ করিলেও, প্রতাপাদিত্যের চরিতাখ্যায়কের মত তাঁহার ঐতিহাসিক চৈতন্য ( historical sense) ছিল না। এই হেতু ইতিহাস-হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি' নিকৃষ্ট রচনা।

'বেদান্ত চন্দ্রিকা' মৃত্যুঞ্জয়ের দ্বিতীয় মৌলিক রচনা। কিন্তু ইহা ফোর্ট উইলিয়মের জন্য রচিত নহে। রাজা রামমোহন রায়ের 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' প্রকাশিত হওয়ার পরে ( ১৮১৫ ) হিন্দু-সমাজে মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে এক প্রবল আন্দোলন সৃষ্ট হইয়াছিল। তাহারই প্রতিবাদ-স্বরূপ 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' প্রকাশিত হয় ( ১৮১৭ )। নামদৃষ্টে বিভ্রান্ত হইয়া কেহ কেহ ইহাকে বেদান্ত শাস্ত্রের গ্রন্থ মনে করিলেও উহা বস্তুতঃ ধর্ম্ম-আলোচনার পুস্তক নহে। ইহাতে আছে কেবল মূর্ত্তি-পূজার সপক্ষে কতিপয় লৌকিক তর্কযুক্তি এবং রামমোহন রায়ের প্রতি বাঙ্গ-বিদ্রূপ এবং কটূক্তি। বিতণ্ডামূলক এই গ্রন্থের ভাষা বড়ই কটমট। এই পুস্তকের আরম্ভ নিম্নলিখিতরূপ :

"ওঁনমোবৈ শ্রীগণেশায় নমোনমঃ। বাসুদেবায় কৌণ্ডেয় শিবোবাসপরায়ণায়। ইত্যাদি শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত বলাতিরিক্ত ওঁতৎসদ্ব্রহ্মনিষ্ঠাবিশিষ্টের বক্তব্যোপযুক্তি ওঁতৎসদ্ব্রহ্মনিষ্ঠ লিখি তাৎপর্য্যক বাক্যপ্রবন্ধ করণার্থে ইহা লেখা যাইতেছে এমত কেহ মনে করিও না। যে হেতুক খিস্টানানুযায়ি খিস্টানের সে কথা নহেই তবে যে এ গ্রন্থ রচিত হইতেছে বিস্তর ব্রাহ্মণিষ্ঠক অবিদ্যাত খিস্টানের হাতপি ব ব জাতি কুল ও আচারবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের কাল কর্ত্তে ও বক্তব্য কথন হইতে পারে না এ নিমিত্তই তথাপি এতদ্দেশে বোদ্ধাপাত্রের অপ্রাচুর্য্য প্রযুক্ত 'অনন্তরি কুমুদ ভাস্কর ধূর্জ্জটেরা হি বাদ্যেৎস্তাবাং' এবং শাস্ত্রার্থস্থায় বক্তব্যের বচনে পরমার্থ প্রতিপাদক বেদোক্তশাস্ত্রে অনাস্থা না হয় কেবল এই তাৎপর্য্যতে বেদোক্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে।" (১)

সংস্কৃতের সহিত যাহার কোন পরিচয় নাই, এইরূপ ভাষার মর্ম্মগ্রহণ করা তাহার পক্ষে মোটেই অনায়াসসাধ্য নহে। অতএব বাঙলা গ্রন্থ হিসাবে ইহার গুণাগুণ বিবেচনা করা একান্ত নিষ্প্রয়োজন। যেই রামমোহন রায়ের গ্রন্থের প্রতিবাদে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছিল, সেই রামমোহনের রচনা ইহা অপেক্ষা বহুগুণে সুখবোধ্য ও প্রাঞ্জল। নিম্নে 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র প্রত্যুত্তররূপে লিখিত রামমোহনের 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' গ্রন্থের আরম্ভস্থল উদ্ধৃত হইল :

"ভট্টাচার্য্য আপন গ্রন্থের প্রথমপত্রে লেখেন যে এ গ্রন্থ কোন ব্যক্তির কাল্পনিক বাক্যের খণ্ডনের জন্যে লেখা যাইতেছে এমত কেহ যেন মনে না করেন, কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্রে লোকের অনাস্থা না হয় কেবল এই নিমিত্তে বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে লেখা গেল, এবং ভট্টাচার্য্য ঐ গ্রন্থের সমাপ্তিতে আরো কিছু বেদান্ত চন্দ্রিকা লিখিয়াছেন। ইহাতে এই মত্ত আমরা বুঝিলাম যে যে ব্যক্তি বেদান্তশাস্ত্রের মত পূর্ণ হইতে না জানেন এবং ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যে বিশ্বাস রাখেন তিনি বেদান্তের মত জানিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন তখন সুতরাং দেখিবেন যে বেদান্ত চন্দ্রিকার প্রথম শ্লোকে কলিকালীয় ব্রাহ্মণ ব্রহ্মজ্ঞানির উপহাসের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়া দেব এবং—"

গ্রন্থখানির ভাষা কটমট হওয়ায় এবং ইহাতে রামমোহনের আশঙ্কিত প্রতারণার অভিসন্ধি থাকায় মৃত্যুঞ্জয় লজ্জাবশতঃ উহাতে নিজ নাম প্রকাশ করেন নাই। মৃত্যুঞ্জয় যে বেদান্ত-চন্দ্রিকার লেখক হিসাবে ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করেন নাই তাহার অন্য কারণ উক্ত পুস্তকের সমাপ্তিতে উৎকৃত লৌকিক ভাষা বা বাঙলা ভাষার নিন্দা। তিনি লিখিতেছেন :

"যেমনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না যেমন জগন্নাথক্ষেত্রী নারীশ্রীর জগন্নাথযোদ্ধা হৃদয়ুর পুরুষেরা দিবসী আসন্ন বালের লক্ষণে পরাঙ্মুখ হন তেমনি সাধভাষা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষায় তত্ত্বার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা বন্য উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণ মাত্রেতেই পরাঙ্মুখ হন।"

যিনি সুদীর্ঘকাল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মাসিক বেতন লইয়া 'নয়া লৌকিক ভাষা'র সেবা করিয়াছিলেন এবং ঐ

(১) টীকার-চিহ্ন প্রবন্ধলেখক-প্রদত্ত।

ভাষায় তৎপূর্ব্বে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার পক্ষে প্রকারান্তরে সেই ভাষার নিন্দা করা শোভন হইবে না মনে করিয়াই মৃত্যুঞ্জয় বেদান্তচন্দ্রিকায় নিজ নাম মুদ্রিত করেন নাই এরূপ অনুমান হয় তো অসঙ্গত হইবে না।

'প্রবোধ চন্দ্রিকা' মৃত্যুঞ্জয়ের সর্ব্বশেষে প্রকাশিত (১৮৩৩) গ্রন্থ-গ্রন্থ। খুব সম্ভব ইহা ১৮১৬-১৮১৮ অব্দের মধ্যে সমাপ্ত হইয়াছিল। ইহা তাঁহার সর্ব্ববাদিসম্মত মৌলিক গ্রন্থ। ইহাতে সংস্কৃত অলঙ্কার, নীতিশাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাসাদি হইতে বহু উপদেশ ও উপাখ্যান সঙ্কলিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে মৌলিক কাহিনীও বর্ত্তমান। বাঙ্‌লা ভাষার রীতি বৈচিত্র্য প্রদর্শনের জন্য মৃত্যুঞ্জয় এই পুস্তকে গুরুগম্ভীর সংস্কৃত-শব্দবহুল দীর্ঘসমাস-গ্রথিত বাক্য হইতে 'চলিত' শব্দময় নিতান্ত লঘু ভাষা পর্য্যন্ত সকলই ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে নানা-প্রকার রসের অবতারণার প্রয়াসও আছে। কিন্তু বিষয়-বৈচিত্র্য এবং রীতি-বৈচিত্র্য এই উভয় 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র বিশেষত্ব হইলেও, মৃত্যুঞ্জয়ের অনুবাদ-গ্রন্থগুলির হইতে ইহা যে খুব বেশী সুখপাঠ্য তাহা নহে। অধিকাংশ স্থলেই সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যের স্বাভাবিক গতি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র স্থানে স্থানে যে তৎকালীন 'চলিত' ভাষার ব্যবহার আছে, তাহা মূলতঃ কেরী-সঙ্কলিত 'কথোপ-কথনে'র ভাষার প্রভাবেই ঘটিয়াছে মনে করিতে পারা যায়। এই সকল দিক্ দিয়া দেখিলে মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার গুরুত্ব অনেকাংশে কমিয়া যায় এবং তাঁহাকে যে বাঙ্‌লা গদ্যের আদি প্রবর্ত্তকের সম্মান দেওয়ার চেষ্টা আজকাল হইতেছে তাহা নিতান্ত সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার অন্যতম লেখক হরপ্রসাদ রায়। ইহার 'পুরুষ পরীক্ষা' ১৮১৫ অব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক মৈথিল কবি বিদ্যাপতি-রচিত সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। ইহার ভাষা কোন কোন অংশে মৃত্যুঞ্জয়-রচিত 'বত্রিশ সিংহাসন' বা 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র সহিত তুলনীয়। কিন্তু ইহাতে অন্বিতান্বয় সংস্কৃত গদ্যের প্রভাব বর্ত্তমান থাকিলেও উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ের মত ইহার ভাষা তত অস্বাভাবিক বা পাণ্ডিত্য-প্রপীড়িত নহে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত গ্রন্থসমূহ গদ্য রচনার প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে নিতান্ত অপকৃষ্ট না হইলেও, আধুনিক গদ্য রচনার লোকপ্রিয়ত্ব সম্পাদন বিষয়ে তাহাদের কৃতিত্ব যে বেশী তাহা মনে হয় না। ইহার দুইটি কারণ আন্দাজ করা যাইতে পারে :—(১) গ্রন্থসমূহের আলোচিত বিষয়ের জন্য সাধারণের আগ্রহাভাব, (২) গ্রন্থ-সমূহের দুর্ম্মূল্যতা। এই গ্রন্থনিচয় যে সাধারণ পাঠকদের মনকে তেমন করিয়া আকর্ষণ করিতে পারে নাই, তাহার কারণ উহাদের বিষয়-বস্তুর মধ্যে অভিনব এবং চিত্তাকর্ষক কিছু ছিল না। যে বিষয়বস্তুর আকর্ষণ নাই বা অল্প আকর্ষণ আছে, তাহা লইয়া রচিত পুস্তকও নব-প্রবর্ত্তিত গদ্য-রচনার জন্য সাধারণের কৌতূহল এবং আকর্ষণের বস্তু হইতে পারিত; কিন্তু কলেজ প্রকাশিত পুস্তকসমূহের এরূপ উচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইত যে, সাধারণে তাহা ক্রয় করিবার কথা ভাবিতে পারিত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধ চন্দ্রিকার' প্রতি-খণ্ডের ৮৲ মূল্যের উল্লেখ করা যায়। এই দুর্ম্মূল্যতার ফলেও পুস্তকসকলের প্রচার নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল।

উল্লিখিত দুই কারণে ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালা বাঙ্‌লা গদ্য-সাহিত্যকে আশানুরূপ গতিবেগ দান করিতে পারে নাই। এই গতিবেগ আসিল রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) হইতে। কেবল গতিবেগ দান করা নয়, বাঙ্‌লা গদ্যকে তাহার নিজস্ব রূপটি দান করিলেন তিনি। তাঁহার রচিত 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' ১৮১৫ অব্দে মুদ্রিত ও বিনামূল্যে বিতরিত হইল। বাঙ্‌লা দেশের শিক্ষিত সমাজে এক অপূর্ব্ব চাঞ্চল্য দেখা গেল। সহজ ও প্রাঞ্জল গদ্যে রচিত তাঁহার একেশ্বরবাদ স্থাপক গ্রন্থদ্বয় বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইল না; তাহার ফলে একদল হইয়া উঠিলেন তাঁহার বিরুদ্ধবাদী এবং আর একদল—গোড়ার স্বল্পসংখ্যক—হইলেন তাঁহার অনুরাগী। এই দুই দলের সংঘর্ষের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ বাঙ্‌লার নবীন মন বিকাশপ্রাপ্ত হইল। বাঙ্‌লার গদ্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস এই মনোবিকাশের সঙ্গেই জড়িত।

# ঋণ

—শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

যাদের প্রচুর অবসর আছে সঙ্গতি আছে অর্থে ও সম্পদে
দুর্ভাবনায় নাহি কাটে যা'র দিন,
মহাড়ম্বরে আসীন যাহারা তথাকথিতের সমাজে উচ্চ পদে
নাহি মানে যা'রা পৃথিবীর কোন ঋণ,
অনাড়ম্বর জীবনে আমার দিনে ও রাত্রে ঈর্ষা জাগায়ে যা'রা
পরমানন্দে প্রেমের কবিতা লেখে
নাহি জানে তা'রা আমার মনের শঙ্কিতগতি ক্ষীণ ছন্দের ধারা
চঞ্চল স্রোতে কেন যায় এঁকে বেঁকে।

হিমাচল হ'তে কন্যাকুমারী অবাধ ভ্রমণে সার্থকপ্রাণ যা'রা—
অবারিত গতি আকাশে মাটিতে জলে,
তারা কি দেখেছে কাব্য আমার দিনে দিনে কেন রচিছে
স্বপ্নকারা ?
জীবন-স্বপ্নে বাঁধি ক্রূর শৃঙ্খলে।
হে জীবপালিনী পৃথিবী তোমার বুঝিতে পারি না
জীবপালনের রীতি
খুঁজিতেছি শুধু প্রাকৃতিক পরিচয়,
লৌহ-রেলিঙে বেষ্টিত ধনী-নাগরিকদের বিলাসোদ্যানে নিতি
হেরি প্রাণহীনা কুসুমের অভিনয়।

সহস্র সিন্ধুতীর হ'তে শুধু পুণীর সিন্ধু দেখিনি স্বর্গদ্বারে
দেশভ্রমণের জুটে নাই ট্রেণভাড়া,
বিপুল ক্ষুধিত জনতার ঢেউ সাগর-স্বপ্ন ভাঙিয়াছে বারে বারে
কল কোলাহলে কল্লোল দেয় সাড়া।
গগনচুম্বী অট্টালিকার পরপার হ'তে পূর্ব্বাচলের রবি
প্রত্যূষে কভু দেয় নি আমারে দেখা—
ভাড়াটে বাড়ীর আঁধার কক্ষে মনে মনে শুধু এঁকেছি
ভোরের ছবি
বাজনের ডাকে জাগিয়া উঠেছি একা।

প্রাত্যহিকের একটানা পথে কেরাণী-জীবন ঘটকায় সম
স্নেহ-প্রতিহীন কাঁটায় কাঁটায় চলে
বিশ্বকবির শা-জাহান তবু রচিয়াছে বুকে তাজের স্বপ্ন মম
অশ্রুর মত কালের কপোল তলে।

অদেখা সাগর অদেখা শৈল দূর দূরান্তে অদেখা ভূস্বর্গভূমি
অদেখা মরুর মরীচিকা ডাকে মোরে,
প্রবল-বীর্যের অদেখা প্রেয়সী ভ্রাক্তললাট স্বপনেতে যায় চুমি'
শিহরিয়া উঠি কল্পিত আঘাতে ঘোরে।

যাদের জীবন অপরিতৃপ্ত সন্তান খ্যাতি পদবীর বিদ্বেষণে
ক্যামেরায় যারা বিতরিছে বাঁকা হাসি,
বুকের নক্ত বাণী দেয় যারা তোষামোদ-প্রিয় সম্পাদকের কানে
বাজারে আত্মপ্রসাদের ঢাক্কা কাঁসি।
হায় রে জীবন বুঝেও বোঝে না মহান্তা তাঁরা দুর্গতদের দেশে
সাধারণ হ'তে উর্দ্ধে তাঁদের স্থান!
মার খেয়ে খেয়ে আধমরা যারা পথে পথে ঘোরে জীর্ণ
মলিন বেশে
তা'রা ত শেখে নি মনীষা রাখিতে মান।

সেই সাধারণ জনতার বুকে অতি সাধারণ এ কবি-
জীবনে মোর
জাগিতে পারে নি ; জাগে নি মহান্ ভাষা :
শত বিদ্রোহে কাব্যে আমার শতদীনতার সন্দেহ জাগে ঘোর
জন্মিতে চাহে অদৃষ্ট কোন্ ভাষা ?
জীবজগতের ইতিহাস যেন দূর হ'তে মোর কথা কয়
কানে কানে
প্রতিযোগিতার অতীত জীবন কথা,
যে জীবন আজও অদেখা অরূপ চেতনাদীপ্ত জাগিবারে
চায় প্রাণে
তারি লাগি মোর জাগে নিতি আকুলতা।

সুখে থাক্ যার অবসর আছে সঙ্গতি আছে অর্থে ও সম্পদে
দুর্ভাবনায় নাহি কাটে যার দিন
অতি সাধারণ জীবনে আমার অবহেলি' শত বন্ধন পদে পদে
শুধিতেই হ'বে পৃথিবীর মহা ঋণ।

# শুল্ক-শাকের ন-পড়ি

—শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

[ পটভূমিকা ]

সম্পাদকীয় বৈঠক থেকে ঘোষণা করেছেন, লেখা চাই। আমার লেখ-মালার যে কার' দরকার হয়, এটা আমার ঠিক জানা ছিল না কিন্তু। এঁদের দরবারে ফুলের সাজি সাজাবার জন্যে যে আমার মত মাইনার ডাক পড়ল, এ একটা ভাববার কথা। থাকি খালের ও-পারে, বাপার বিলের ধারে। নোনা-জলের হাওয়া, জলা-জমির শুল-শাক আর কাল-কাসুন্দের ফুল, কলের-ভোঁ, আর নালা-ভরতি ধান-পচান জলের সুবাস—এদের মধ্যে আমার বাস। বাড়ীর সামনে দিয়ে, রাত একটার পর পর্যান্ত উদগ্র ঘর্ঘর ঘোর চক্রের নিঃস্বন—লরী আর বাসের—আর মাথার ওপর দিয়ে উড়ো-জাহাজ ভেসে যায়, পরম বিস্ময়ে চরম অবস্থার রস জাগায়।···এইত হাল···এই jolly egalitarianism-এর দিনে আমার ডাক পড়ল কেন? ম্যাগনোলিয়া নেই, ভিগনোলিয়া নেই, রোডোডেন্ড্রনও নেই—কি দিয়ে সাজাব সাজি! ডস্টয়েভ্স্কি ( Dostoieffsky )-র মত subconscious-কে conscious করে দেখাতে পারব না, যে, neo-psychologist বাবুদের অবচেতনার ইঙ্গিত দিয়ে আসর জমাব। অস্কার ওয়াইল্ড্ ( Oscar Wilde ) কিম্বা রবি ঠাকুরের মত সোনার-পাত মোড়া ভাষারত্ন-কাটা ভাষা নেই, যে, প্রেমের মিহি সুতোর সঙ্গে পাত, শিব, অদ্বৈতের বিদ্রুনি গেঁথে দেব। আমার কাছে আছে দুঃখের ছেঁড়া-কাঁথার সেলাই করার জন্যে দুঁচে-পরানো পিঁঠ বেওয়া সুতোর ভাষা। ফোঁড় তুলি ফোঁড় তুলি; যাকে বিধি সেলাইয়ে তালি দিতে, সে ছেড়া কাঁথাও বলে, 'আর কেন,—আমিও বলি, 'বুড়ো বয়সে আমারও বুড়ো আঙুলে বেঁধে, তাইত আর কেন?' আজকালকার Go-as-you-please camaraderie of the sexes-এর কথা বলার বয়সও আমার নেই। তবে, কি লিখি!

•

চিন্তার বিচ্ছিন্ন ধারার মধ্যে সব তাল পাকিয়ে গেল। কবের আগুনও নিভে এল—সঙ্গে সঙ্গে ডাক এল, "দাদু—ও দাদু।"

—বাহির মহে যায়—চলে এস যদু আমার।
আর যত বাহিরার
চাহিবার অন্তরার—

ইন্দু ওপরে ওঠবার সিঁড়ি দিয়ে ডাকতে ডাকতে এল, "দাদু! অন্ধকারে যে? আ রে—"

"—জ্যোতির্ময়ো তমসো গময়ঃ আ-লো-ক দ্-ই-তে অ-ন্-ধ-কা-রে ল-ই-য়া যা-ও·· হে-মিথ্যা স্বরূপ—"

"আরে অন্ধকারে বসে আছ কেন?—"

এত আলো দেখে ভয় হচ্ছে ভাই, তাই অন্ধকারে মুখ লুকোতে চাই। দু'শ বছর ধরে অত আলোয় চোখ জলসে গেছে ভাই, এখন কিছুদিন পেচক-বৃত্তি করলেই ভাল হয়।

"আলো জ্বাল, কিছু যে দেখতে পাইনে।

"মন দিয়ে দেখ।"

"চোখ দিয়েই মানুষ দেখে···আরে!"

"Eureka! Eureka!···I have found out··· চোখ দিয়ে না মন দিয়ে? বন্ধু তোমায় ভালবাসি কি দিয়ে?"

"আরে তোমার হল কি?"

"দেশলাই আছে পকেটে? বলি আগুন নিয়ে ঘর কর, না তোমারও সব নিভে গেছে?"

দেশলাই জ্বলল।

"ব্যাপারটা কি?"

"কাগজের জন্য গল্প লিখছি। কল্পে সাজা আছে, ধরাও ত ভাই।"

"দেশলাই ত তোমার সামনে—অন্ধকারে বসে ছিলে কেন?"

"তোমার দাদির হুকুম নেই ভাই—দু'পয়সার আশী কাঠী বলে সস্তর কাঠী দিয়েছে—রাত্রে হারিকেন যতক্ষণ জ্বালান' থাকবে, তাতেই টিকে ধরাতে হবে—অন্যথা কল্পেই পাবে না।"

ইতিমধ্যে কল্কে ধরান হয়ে গেল। ভাগ্য বললেন, "কি গল্প লিখছ শুনি।"

গল্প ত' এখনও লিখি নি, ওটা পটভূমিকা।

"গল্পের আবার পটভূমিকা আছে নাকি?"

আছে না—অস্থায়ী আছে, অন্তরা আছে, আভোগ আছে, সঞ্চারীও আছে—

"কি রকম।"

গল্প শুনলেই বুঝবি। এখন শোন্। এক ছিল সাহিত্যিক,—

"এ আবার গল্প না কি?"

আঃ এসে গেছে, এসে গেছে, এসে গেছে, ছেপ্ এসে গেছে। এক ছিল সাহিত্যিক। সে অনেক দিনের কথা, গল্পটা সে সাহিত্যিক নিজে আমার কাছে বলেছিল, ঠিক বলে যাব। দেখ না একেবারে নিছক তারই গল্প। হুঁহু বলে যাব।

"গল্পের নাম কি?"

দাঁড়াও, আগে সাহিত্যিকের নাম ঠিক করি, না: আগেই, শোন্ না হয় অনুমান কর।

"অনুমান! নাম আবার অনুমান করব কি?"

আঃ তুই বড় বকাস্ ভাই, শোন।

'বহিরাত্মকথা গত্যা অন্তরাত্মনোঽনুমীয়তে গতিঃ, অন্তরাত্মকথা গত্যা বহিরাত্মনোঽনুমীয়তে গতিঃ'

"না, তোমার গল্প যা হবে, তা বুঝতেই পারছি, উপনিষদ আওড়াচ্ছ কেন?"

এখন যে 'উপ-ন'ই ফুল চলেছে তাই শোন্, বাইরে না ভেতরে, চোখ না মন।

"এখন গল্পটা কি শুনি?"

•

[ অস্থায়ী ]

এক ছিল সাহিত্যিক—গল্পটা একেবারে নিছক তারি··· তারি গল্প···অন্য কার নয়। নাম? নাম প্রদ্যোৎ; সে অনেক দিনের কথা—তার সঙ্গে ছেলে বেলায় পড়তাম বেথার স্কুলে। তখন থেকেই সে কবিতা লিখত, গল্প লিখত। সে কিন্তু বি-এ পাশ করে আইন পড়তে গেল, আর আমার ত' জান? আমার আর হল না, ডুব মেরে অগাধ জলের সুখের মত কেবল বুড়বুড়ী কাটছি। যখন উকিল হয়ে বেরুল তখন দিব্যি চেহারা—খুব লম্বা না হলেও বেশ ফরসা, সিথীয়ের সিথার মত সরু সরু আঙুল, কোঁকড়ান ও ঢেউ-খেলান চুল, দাঁতগুলো মুক্তার মত দামান, ঠোঁট ছুটো যেন পদ্ম। দিব্যি দানানসই সুপুরুষ বলা যেতে পারে, তবে তাতে কবির চেহারা খুব নেই, কেন না আকাশ-মার্গী চোখও নয়, সাপের মত 'ম্যাগনেটিক'ও নয়। সমস্ত কল্পনা-জল্পনার মধ্যেও তার দৃষ্টি ছিল পাটোয়ারীর। মাঝে মাঝে কিন্তু মনে হত, যেন একেবারেই সেন্টিমেন্টাল্।

ছেলে বেলা থেকেই সে আমাকে বড় ভালবাসত, আমিও তার লেখার খুব সুখ্যাতি করতাম। এমন এক এক সময় মনে হত' যে, নব যুবতীরা যেমন সৌন্দর্য্য দেখিয়ে আঁচল ভরে রূপের প্রশংসা নিয়ে তৃপ্তি পায়, সে তার লেখা নিয়ে তেমনি আমায় শুনিয়ে তৃপ্তি পেত। পাছে বাধা পায়, কড়া কথা কখন তাকে শুনাই নি, পাছে তার দুঃখ হয়। এক দিন তাকে বললাম, 'প্রদ্যোৎ। দেখ তোর লেখার ভেতর কেবল বড় ঘরের রঙিন কথা, কোথাও একটু দুঃখের ছায়া নেই, তা ছাড়া সবটাই যেন কেমন একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে। দেখ, দুঃখটা এ সংসারে একটা মস্ত জিনিষ, নিজে সত্যি দুঃখ না পেলে, সত্যি দুঃখ-বোধ না জাগলে, শুধু নিছক কল্পনায় যেন মানুষের অন্তরের ভিতরে ছোঁয়াচ ধরাতে পারে না। জোমাপ্ জিনিষটা খুব মিষ্টি বটে; কিন্তু, কি রকম জানিস্।—নোংরা মিষ্টি।'

সে বললে, 'কি রকম!'

এই যেমন ধর্, আরেবা বলছে 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!' এক দিকে এক জন বিরাট পাঠান অন্য দিকে বিশাল রাজপুত, যে বলছে সে হ'ল মুসলমান বাদশার মেয়ে; এ অবস্থায় থিয়েটারের সেকেলে যাত্রা হতে পারে, জাঁকাটে clique এর দল তাতে হাততালির চটচটা ধ্বনিতে প্রেক্ষাগার মুখরিত করতে পারে—তাতে প্রমাণ হয় জাতির ইতরানুভূতি। সাহিত্য-অনুভূতি হয় না। নায়িকার পাবলিসিটী (publicity) হয়; তাতে oriental-এর চরিত্র হয় না, Ivanhoeর আহুদীর মেয়েও semitic—সেও অমন কথা বলতে পারে না, ওটা স্কটল্যাণ্ডের মেয়ের ছবি, আর সাহিত্যে পাল্লা দেবার জন্যে বৈহাতীন ব্রাহ্মণের ভিয়েনের রস

করা। যত দিন তুই চোখ আর মন দু'টো দিয়ে সত্যি নিজের ভেতর 'সার্চ-লাইট্' না ফেলতে পারবি তত দিনই কল্পনায় ওই রিয়েলেটাই মিষ্টি লাগবে, কিন্তু নোংরা মিষ্টি। It smells filthy; অভিজ্ঞতা চাই, আত্ম-অনুসন্ধানী মন চাই, সহানুভূতি চাই, আন্তরিকতা চাই, তা না হলে সাহিত্য হয় না। ইংরিজীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়াটাই বড় কথা নয়। মনুষ্যত্বটা শুধু ইংরেজেরই একচেটে নয়। বাঙালীর কি ভাগ্যি বলে কোন জিনিষ নেই? তার নিজস্ব বলে কি কিছুই নেই? সে কি সেই গোড়া থেকে আজ পর্য্যন্ত পশ্চিমের দিকে মুখি-হাঁটাই দেখবে?

প্রদ্যোৎ চুপ করে শুনলে। কোন কথা বললে না, মনে হল, বড় আঘাত লাগল তার। তবু আমি বলে যেতে লাগলাম,—'দেখ তোর ভাষা এত মিষ্টি করবার চেষ্টা, এত ছন্দ তাল ধ্বনির খেলা তুই খেলতে চাস, যে, তাতে আসল কথা চাপাই পড়ে। অস্কার ওয়াইল্ড্‌কে অনুকরণ করে, ও রাজার মেয়ের ভাষা ঘরে এনে বাঙালীর কিছু সুবিধা হয় নি, হবেও না।'

দেখলাম প্রদ্যোৎ চটে গেল, একটু চিন্তিতও যেন হ'ল।

বললাম, 'যদি কখন জীবনে তোর এমন অবস্থা হয় যে, দুঃখের পদ্মনীতে পাঁজরা ছিঁড়ে ঘুরলে খাবে—সে দিন তোর সাহিত্য হয় ত সার্থক হতে পারে। না হলে চলল, এক পয়সা প্যাকেট—তৌলপুরা খয়ের—ক্রীম-মাখা খয়ের-খাঁ সাহিত্য। খেলে পেট-কাঁপা সারে ত' মাথা-ঘোরাও সারে।'

•

[ অন্তরা ]

ইন্দু বলে উঠল, "দাদু এ কি তোমার গল্প হচ্ছে না কি?"

না, এই হ'ল গল্পের অন্তরা—এইবার অন্তরা। শোন্ ওই যে বলেছি না, বাইরের গতি অন্তরের চাবি দিয়ে নির্দ্দেশ হয়, আর অন্তরের গতি বাইরে দিয়ে নির্দ্দেশ হয়—চোখ দিয়েও, মন দিয়েও।

ইন্দু বলে উঠল, "এতে গল্পের রস কিছুই নেই, ও তোমার discourse হচ্ছে—তাও অতি খেলো রকমের, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কেবল কাল আর তেতো কথা বলছ।"

আরে ভাই শোনই আগে—জানিস তেতো is a great appetizer—আগে শোন, তার পর করিস তোর সমালোচনা—ভাল আলোয় দেখলে। বলছি আগে অন্তরা গাইতে দে। তালে ভুল হয় তখন ধরিস।

"গাও শুনি। তালের কথা কি বলছ, সুরটাই লোকের ভাল লাগবে না—তাল ত' পরে।"

—চার-পাঁচ বছর তার পর আর আমার প্রদ্যোতের সঙ্গে দেখা হয় নি। পেটের দায়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের ফ্যাসাদে—ও সাহিত্যিক মহলের সঙ্গে দেখাও হ'ত না, আর কোন খবর রাখিও নি। প্রদ্যোৎও আর আমার কোন খবর নেয় নি।

"এই বুঝি তোমার গল্প—শেষ হয়ে গেল তো?"

—আরে দূর্—শোন না, হঠাৎ প্রদ্যোতের একখানা চিঠি পেলাম। চিঠিখানা রেজারিং, আমি তখন মাত্র কয়েকদিন হল, উড়িষ্যার জঙ্গল থেকে এসেছি, বামণী, কাটজুড়ি নদীর ধারের গো-সাপের চামড়া নিয়ে গুদামে বসে মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করছি। চিঠিখানা পড়লাম, প্রদ্যোৎ এলাহাবাদের একটা হাসপাতালে পড়ে, দু'দিন পরে তাকে সেখান থেকে চলে যেতে হবে, দেখবার কেউ নেই, হাতে একটা পয়সা নেই, পেন্‌সিলে চিঠি লেখা—তার সেই সাহিত্যিক ইনোন-বিনোন ভাষা, অত্যন্ত কাতর প্রার্থনা—লেখাও অবশ্য—তার গল্প লেখার চেয়ে খারাপ, তবে দুঃখটার ভাষা সত্যি বলেই মনে হ'ল। চাই দু'হাজার টাকা। ভাবলাম, প্রদ্যোতের অবস্থা কখন ত' খারাপ ছিল না। তার বাড়ী-ঘর আছে, হঠাৎ এমন অবস্থায় পড়ল। তবে দু'হাজার টাকা—তাই ত'।

প্রদ্যোতের ওপর আমার কেমন একটা মায়া ছিল। ভাবলাম, গো-সাপের চামড়া বেচে লাখে লাখে টাকা পেয়েছি, দু'হাজার টাকা তখন আমার আছে অতি সামান্য, আজই ত' চল্লিশ হাজার টাকার ড্রাফ্‌ট এসেছে, বাকি বন্ধু-লোক চেয়েছে বিপদের সময়। একবার ভাবলাম নিজে যাই, আবার এ-দিকে ব্যবসার ক্ষতি হয়। দু'হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলাম, এখানকার এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে টাকা দিয়ে, সেখানকার ব্যাঙ্কে টেলিগ্রাম করে বলে দিলাম যে, হাসপাতালে প্রদ্যোৎ রায় indoor patient আছে, তাকে এই টাকা যেন কাল সকালেই দেওয়া হয়। প্রদ্যোৎকেও টেলিগ্রাম করে দিলাম। টাকার রসিদ এল, কিন্তু প্রদ্যোতের আর কোন খবরও নেই, নিশানাও নেই।

থাক গে। ভাবলাম, বেঁচে থাকলে দেখা অবিশ্যি হবেই একদিন, তখন দেখা যাবে কি ব্যাপার। সংসারে খেলার মুখও পালটে গেল, আমারও বয়াত ফাটল। চামড়ার কারবার গেল, শেষার মার্কেটে সব বয়াতটা মাড়োয়ারীতে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিলে। দেনার দায়ে একেবারে দেশ ছেড়ে পালাতে হ'ল।

ইন্দু বিরক্ত হয়ে বললে, "থাক দাদু তোমার গল্প। এ না খবরের কাগজের realism, না radioর news relay—motion নেই, passion নেই, দু'টো ভালবাসার মিষ্টি কথা নেই, নাঃ এটা গল্পই নয়। Speedই নেই, চোখের ওপর কোন মানুষটাই ফুটছে না।"

থমকে গেলাম।

তাই না কি! আরে এ ত সবে অন্তরার এক কলি—দাঁড়া সব পাবি, সব পাবি। মুঠো-মুঠো ভালবাসা ছড়িয়ে দেব, একেবারে রামধনুকের রঙে রঙিন দেখ না—সব জিনিষই শ্রোতব্য পঠিতব্য, নিদিধ্যাসিতব্য: ধর্ম্মস্য তত্ত্ব গুহায় মধ্যেই নিহিত, ও সাহিত্যের প্রেমতত্ত্বও অমনি গুহায় নিহিত। বাধা দিস নে শোন, আর একটা কথে ধরা দিকিন্ ভাই।

"আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, এ শ্রোতব্য মোটেই নয়, তোমার কথে গেলে উত্তরসাধক হ'য়ে কিছু হবে না, বুঝতেই পাচ্ছি। গল্প তুমি লিখতেই জান না। কথে দিচ্ছি অবিশ্যি। যেমন তোমার অন্তরা, তেমনি তোমার অন্তরা, তার চেয়ে ভাষাক খাও, আমি উঠি।"

চটে' উঠিস কেন রে ভাই?

"উঠব না? এলাম দুটো ভাল কথা, হলের কথা শুনব বলে—দু'টো নাটকীয় কথা হবে, তা না, 'গল্প লিখছি শোন'। এতদিনে বুঝলাম মাথাটা তোমার খারাপ হয়ে গেছে, নিশ্চয়? নইলে গল্প লিখতে যাও তুমি?"

আবার ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি নামল। গুম হয়ে বসে তামাকই টানতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম, তবে কি সত্যিই আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেল? হবেও বা। বললাম, তা হলে কি বলিস, এ গল্প চলবে না?

"তুমি বুঝতে পারছ না দাদু, এতে কি আছে? গল্প কি রকম হবে জান, highest imagination, rocket-এর মত উঠবে, emotion-এর আগুনে ছড়িয়ে পড়বে, মানুষের বুকের ভিতরের অন্ধকার আলো করে দেবে। গল্প হ'ল তাই। এত ধারজা গোবজা দিয়ে ভরিয়ে গজর গজর করলে কেই বা শুনবে? লোকের পড়বার সময় চাই ত? তোমার মত কচ্ছপে হুঁ পেড়ে পেড়ে তামাক খাবার সময় কোথায় লোকের? We want speed—speed—speed, গতি, গতি, dynamic; static-এর যুগ চলে গেছে।"

তা ঠিক বলেছিস যোগাসনের তেউড় আর চেহারের ঝাঁশ, ও'য়েনরির ছোবড়া, কলোর তামাকের পিচ—চটকে মিলাতে পারলেই, আর তার সঙ্গে একটু নাটক আর একটু ফ্রয়েডের erotic theory—তাহলেই গল্প আলু-কাবলীর মত ভাল লাগবে। তা জানি—কিন্তু সে ত' আমি পারব না ভাই।

হুঁকোটা তার হাতে দিয়ে বললাম, ও! তাহলে আভোগ আর লকোটী গাইব না, এ ত গল্পই হবে না বলছিস যখন—

"গাও, আমার মত ধৈর্য্যশীল শ্রোতা আর পাবে কি না সন্দেহ। তবে সত্যি কথা বলি, আমার এ ভাল লাগছে না; দাদু, তুমি বুঝতে পারছ না, এতে speed নেই।"

খুব বুঝছি ভাই, বলতে যখন শুরু করেছি শুনব শোন, দেখ এতে কিন্তু হাজার ভোলটেজের একটা ডাইনামো বসান আছে। পাবে, কিন্তু এর পর মাথাটা যেন ঝিম্ ঝিম্ না ক'রে ওঠে। তখন দোষ দিয়োনি কিন্তু, হুঁ!

•

[ আভোগ ]

তার পর, আমিও দেশ ছেড়ে একেবারে বছর কতকের মত উধাও, দেশের কারও সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, বিদেশে এক রকম যা হয় করে বেড়াম, কিন্তু সফল হল, এলাম দেশে ফিরে। অন্ত দেশ অন্ত ভাষা—অন্ত রীতিনীতি আচার-ব্যবহার বরাবর ভাল লাগে না, এলাম ফিরে। এসে দেখলাম, দেশটার চেহারাই বদলে গেছে। মানুষগুলোর সে জড়তা নেই, বেশ চনমনে ভাব। আমার কিন্তু আবার অভাবের তাড়না, থাক্ সে কথা।

সেও এমনি শ্রাবণ মাস, টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, বেলা তখন ন'টা, বাড়ি সেন্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে, ফুট-পাথ থেকে নেমে ওধিকে যাব, এমন সময় একখানা মোটর

পিছনের দিকে এসে পাক করে উঠল ; আর একটু হলেই চাপা পড়তাম। রাস্তার জল-কাদায় কাপড়-জামা মাথা পর্য্যন্ত চন্দনসিক্ত হ'য়ে গেল। গাড়ীর ড্রাইভার, 'এ সাহোরা আঁখ নেহি হ্যায়,' ইত্যাদি মরাজী ভাষায় আমাকে অভিনন্দিত করলেন। গেল মরজ বিগড়ে। গাড়ীটা মোড়ে পাহারাওয়ালা সাহেবের হাত তোলার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল, হাতে আমার ছিল একখানা কাগজে-মোড়া ছবি, সেখানা মাটিতে ফেলে রেখে, ড্রাইভারের গালে এক চড়। হৈ হৈ ব্যাপারে রাস্তার লোক জড়ো হয়ে গেল। ড্রাইভার গাড়ী থেকে বেরিয়ে তাড়া করায় সঙ্গে সঙ্গে পড়ল তার বুকে দাঁড়িয়ে লাথি। গাড়ীর মধ্যে যিনি ছিলেন, তিনি আধপোড়া সিগারেট টানতে টানতে siesta নিচ্ছিলেন, চমক ভেঙে এলেন বেরিয়ে, দেখলাম প্রদ্যোৎ।

'আরে তুই প্রদ্যোৎ!'

"হাঁ, মাপ কর, ভাই মাপ কর, ও ঠিক বুঝতে পারে নি।"

ড্রাইভার মাটিতে পড়ে কর্দ্দমাক্ত হয়ে পুনশ্চ উঠে যে নব অভিযানের পর্ব্ব শুরু করতে চাচ্ছিল সেটা থেমে গেল।

'বুঝতে পার নি মানে,? আমি তোর চেনা বলে না, বড়-মানুষী দেখাচ্ছিস। অন্য কেউ হলে তাকে—'

"যাক্, যাক্, I'm so sorry, তুই কিছু মনে করিস নি। কোথায় যাচ্ছিস? আমার গাড়ীতে আয়। এতদিন কোথায় ছিলি?"···

'না, এখন আমার কাজ আছে।'

আমার ঠিকানা বললাম। প্রদ্যোৎ চলে গেল। একবার পিছন ফিরে দেখলাম। কর্ম্ম, না অদৃষ্টের পরিহাস! গাড়ীখানা মিলিয়ে গেল, পোড়া পেট্রলের গন্ধের বদলে ছড়িয়ে গেল নাগকেশরের গন্ধ। পথে একজন বললে, দেখলেন মশায়। আপনি শক্ত লোক, তাই। কোন উত্তর না দিয়ে আমি ছবি নিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

ইন্দু দেখলাম খানিকটা স্থির হয়ে ভাবছে। ঠোঁট দু'টো শক্ত করে চেপে রেখেছে।

কি রে? মোটর আসতেই speed এল না কি?

"তারপর, আমি ভাবছিলাম—তোমার সেই প্রদ্যোতের গালে একটা ঠাস্ করে চড় দিলে না কেন? Nonsense।

siesta, গাড়ী চড়ে siesta করছিলেন, একেবারে ওইখানেই সারেস্তা করে দিতে পারলে না?"

বাপ রে, বড়লোকের গালে চড় মারতে পারি? আমি গরীব লোক।

তার পর বাড়ীতে ফিরে সাবান দিয়ে জামা-কাপড় কাচলাম, বড়লোকের ছিটান চন্দন কি গরীবের কাপড় থেকে সহজে যায় রে ভাই! বিকেল বেলা সেই গাড়ী আমার বাড়ীর দরজায় এসে হাজির। খাকি গলির ভেতর, দরজায় ত' আর গাড়ী আসে না, দরজায় গোড়ায় সেই ড্রাইভার-মহোদয় এসে ডাকছেন।

"রে সাব গাড়ী লেকে হ্যায়। আপ কো সে যানে কো।"

'আমার ও আজকে যাবার ফুরসৎ নেই, আজ পারব না, অন্য দিন চেষ্টা করে দেখব।'

ফুরসৎ খুবই ছিল, কেবল দ্বিতীয় বস্ত্র বা আওরাখা না থাকার বাধ্য হয়ে বলতে হল, যেতে পারব না ; তার ওপর বাড়ীতে ছিল অসুখ, মনটাও ছিল না ভাল। তবু ভাবলাম, এখন বড়লোক হয়েছে, টাকাটা যদি ফিরিয়ে দেয় এতদিন পরে।

চার পাঁচদিন পরে প্রদ্যোৎ নিজে এসে আমাকে নিয়ে গেল তার বাড়ী। প্রকাণ্ড বাড়ী, পড়িয়াঘাটা রোডের ওপর। চারিদিকে পাঁচিল-ঘেরা বাগান। বোতলায় প্রকাণ্ড হল, চমৎকার সাজান, তার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে। তাকিয়ে দেখলাম, প্রদ্যোতের সে চেহারা আর নেই, বেশ একটু ভুঁড়ি হয়েছে, চিবুকের তলায় ডবল খুঁতি দেখেছে, চোখের কোলে থলি বেশ ভারি হয়েছে, সে প্রদ্যোত আর নেই। সাধারণ টাকা-ওয়ালা মানুষের চেহারা, বরং কিছু কর্কশ ভাব মুখে ফুটে উঠেছে। ছেলেবেলার সেই পাটোয়ারী চোখ এখন যেন পুরো বেলেতি চাউনিতে এসে দাঁড়িয়েছে। বেশ, যৌবনে মানুষের একটা চেহারা থাকে, সে সময় তার ভেতরের যে মানুষ, তার ছাপ মুখে ফোটে না, কেন না দেহ তখন বড় সজাগ। কিন্তু যেই সেই গণ্ডীটা পার হয়ে বয়স একটু চলে, অমনি ভেতরের মানুষের ছাপ ফিকে ফিকে ফুটে ওঠে। প্রদ্যোতেরও ঠিক তাই হয়েছে।

প্রদ্যোতের স্ত্রীর নাম জাতারাণী। নাম শুনে ত' চমকে গেলাম, তখন আর কিছু বললাম না। স্ত্রীর চোখগুলো খুব

আলোক-ভিক্ষা

বড় বড়, রক্ত অবিশ্যি করসাই বলতে হবে। নাকটী মাট-মাট। সাজ-পারিপাটা খুব। সিগারেট খান। বেশ সুর করে কথা বলতে পারেন। কথার ভঙ্গীতে "ইল-ক্লাঁদো-টেগোরো-গল্পী" বেশ চেট খেলিয়ে যায়। চার-নামী সম্প্রদায়ের যে কালচার, তা তার চলার তালে তালে পায়ের ধাপে ধাপে ফুটে উঠছে।

ডিনারে বসতে হ'ল, অত্যন্ত খাতিরে।

"তুই যে খাচ্ছিস নি?"

'আমার আজ ক' দিন খুব অসুখ, শরীর বড় খারাপ।'

কেন যে খাব না, বা খেতে পারব না তার আসল কারণ ত' মুখ খুলে বলা যায় না। বলতেও পারলাম না তাকে—যাক্, ডিনারের পর জাভারাণী একখানি জাফরাণী রঙের সাড়ী পরে নাগকেশর ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে এসে বললেন:

"Do you want any tea?"

"No, thanks dear—"

"Coffee? Cocktails? Then—"

"It would be too early dear."

"It's never too early for a cocktail!"

জাভারাণী জিত করলেন, উর্দী-পরা 'বয়' এসে ককটেল দিয়ে গেল।

আমি একটু ইতস্তত: করে বললাম, 'I'm afraid, Princess Java, আমি ত' এ-সব খাই না—'

জাভারাণী যেন আকাশ থেকে পড়লেন। রূপালী ঘুঙুরের মত হেসে, চোখ বিস্ফারিত করে বললেন, "It is very sweet, আপনি cocktail খান না, strange! It's a nice drink, মনটা বেশ রঙিন্ এবং তাজা হয়ে ওঠে। বিশেষত: বাদলার দিনে। It's a salt to the finer emotions."

"মাপ করবেন, আমি ঠিক ·"

"আচ্ছা, তা'হলে কফি পাঠিয়ে দিই। বয় কফি সার্ভ্ করতে। আচ্ছা আমি তাহলে বিদায় নিই; আমি পুতুর কাছে আপনার কথা অনেকবার শুনেছি, এতকাল পরে দুই বন্ধুর দেখা হল। অবিশ্যি, I won't create any intrusion, Enjoy yourselves thoroughly. Cheerio, Putoo, cheerio! Au revoir."

শেষ কথাটী বলে যে হাতের ভঙ্গী করলেন, তাতে মনে হ'ল, নাচও শিখেছেন, অবিমিশ্র প্রাচ্যের নৃত্য-শালের পাঠশালায়। সে মুদ্রা 'অভিনয়-দর্পণে' পাওয়া যায়। ব্যাপার দেখে আমি ত' একেবারে সাত হাত মাটীর তলায় নেমে গেলাম। কৌতূহল প্রথম থেকে অতি ব্যগ্র ভাবেই জেগেছিল আমার। তথাপি সেটা চেপে রেখে, আমি বললাম, 'তাহ'লে আমি আজ আসি ভাই।'

প্রজ্ঞোৎ দুঃখিত হল। বললে, "সে কি? After so many years দেখা হ'ল, শোন, অনেক কথা আছে—"

মনটা, বাড়ীর জন্যে, সত্যিই ভাল ছিল না—বললাম: 'আজকে যাই ভাই, অন্য দিন আসব।'

প্রজ্ঞোৎ চেয়ার থেকে উঠে আমার হাত দুটো ধরে বললে: "বোস্ না ভাই, তুই কি আমার ওপর রাগ করিছিস?"

'না-না, রাগ করব কেন?'

প্রজ্ঞোৎ আমার ঘণ্টা টিপ্‌লে। বয় এল:

"Two more cocktails···"

'আবার কি হবে? আবার খাবি?···'

প্রজ্ঞোৎ গুম্ খেয়ে বললে: "I must pay the price of the gold gathered. চটে ককটেল বানিয়ে আমি খাই, না হলে খাওতে পারিনে, অনেক টাকা হয়েছে কি না—তাই তার দাম দিতে হবে না, হা-হা-হা-হা, টাকার দাম দিতে হবে না!···"

বয় এল—দুটো cocktail-goblet করে নিয়ে এসে ধরলে, প্রজ্ঞোৎ পর-পর নিঃশ্বাস না ফেলে দুটো পাত্রই নিঃশেষ করলে।

"Now শোন্, আজ এখন আমার কথা না শুনে তোর যাওয়া হবে না, কিছুতেই হবে না—ছাড়ব না তোকে।"

দেখলাম মাতকতা বেশ ভরপুর—বলবার জন্যে সে যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। কি করি, বললাম: 'তোর ব্যাপারটা কি বল দিকিন্, অমন করছিস কেন?'

তার পর প্রজ্ঞোৎ তার জীবনের কাহিনী বলতে আরম্ভ করলে। আমি তার ভাবভঙ্গী দেখে একটু বিরক্ত হলাম প্রথমে, কিন্তু তার আগ্রহ, বলবার আগ্রহ ও ভঙ্গী দেখে বুঝলাম যে, বহু দিনের সঞ্চিত রুদ্ধ অগ্নি ও ধূম নির্গত হচ্ছে। সে যখন তার কাহিনী বলতে আরম্ভ করলে, তখন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল যেন আরব্য-উপন্যাসের সেই ছবি। সেই রুদ্ধ জালার মুখ খুলে দিতেই—ধূম আর অগ্নির

মধ্যে যেমন দৈত্যের বিকট কঙ্কাল খাড়া হয়ে উঠেছিল—আকাশ পর্য্যন্ত সে ধূম-কালি-কুলে ঘরটা যেন ধোঁয়ার ভরে গেল। আর তার মধ্যে থেকে-থেকে নীল অগ্নির শিখার ভিতর প্রদ্যোৎ, দীর্ঘ অস্থিচর্ম্মসার, তাপে জর্জ্জরিত। আগুনের মধ্যে তার চামড়া পেশী পুড়ে ধোঁয়ার কালিতে পরিণত হচ্ছে—শুধু কোটরগত চক্ষু তারকার মত জ্বলছে, নীল আগুনের শিখা চোখকে স্পর্শ করে সে আরও আগুনের মত জ্বলে উঠে তার কঙ্কালকে দীপ্তিমান করে তুলছে। একখানা যেন এক্স-রে ফোটোগ্রাফ! মেদ-অস্থির ভিতর থেকে শুধু হাড়-গুলো নড়ানড়ি করছে।

এই পর্য্যন্ত শুনেই ইন্দু বলে উঠল: "ব্যাপার কি দাদু? ভার পর, তার পর?…"

প্রিয়বর যে! একটা ঝড়েতে চম্‌কে উঠে দম ফেল কেন? বস, বস, বসে খাও, রকম আছে, আর একটা কল্পে ধরাও ভাই, এইবার আভোগের বাট শেষ হল, এইবার সঞ্চারী শুরু হবে।

"রাত যে দুপুর হয়ে গেল, তা যাক, বল—কিন্তু—"

কিন্তু আবার কি?

"কিন্তু একে কেউ গল্প বলবে বলে মনে হচ্ছে না, এ একটা রকম বটে। তোমার অবিশ্যি অস্থায়ী থেকে আভোগ পর্য্যন্ত ভোগ আসছে মনে হচ্ছে। কিন্তু তুমি যে মুঠো মুঠো ভালবাসা ছড়াবে বলছিলে, এতে ত' তার নামগন্ধ নেই, ভালবাসাহীন গল্প।"

হেত্বাভাস…পর্ব্বতো বহ্নিমান্…বহ্নি, বহিরাক্সনাহনুমীয়তে—ন্যায়শাস্ত্রে একেই বলেছে অনুমান, এটি অপদার্থ নয়, তোমার অলঙ্কারে এই হল ব্যঞ্জনা—বিলাতি suggestion গো, মুখ ফোটে ফোটে ফোটে না—গল্পে না কি তারি দাম বেশী।

"দেখ, তোমার এই বাজে ফোড়নে রসভঙ্গ হয়ে যায়। তুমি এটা বুঝতে পার না, দাদু!"

তাই, এ তোমাদের পাঁচ-ফোড়নের রান্না নয় ভাই—বাবার জলার ধারে বসে, এ আমার শুদ্ধ-শাকের ন-পড়ি। বাবা-কলির চচ্চড়ি আমার কাছে পাবে না।

"আরে, এত বাজে কথা না বলে গল্পটা বলতে ত' পারতে—এ যে দানা বাঁধছে না—রসভঙ্গ হলে ব্যভিচারী দোষ হয়, অলঙ্কার-শাস্ত্র ত' মানতে হবে, এটা ত' মান?"

না, তোমার রাজাদের আনন্দ-রসের অলঙ্কার-শাস্ত্র আমি মানিনে—তুমি ত' জান যে, যে-পথ দিয়ে চলার পায়ের তলায় রাস্তা জেগে আছে, সে-পথ দিয়ে আমি কখন চলি নি, আষাঢ়ার জল খাই, কাঁটা পথে চলি—সেয়াকুল কাঁটা আমার সর্ব্বাঙ্গে ফুটে আছে যে। আর ব্যভিচারী কথা যদি বললেই ভাই, তা হলে—সঞ্চারী ত' ব্যভিচারের মধ্যেই পড়ে—

ব্যভিচারি ভাবের বিতর্ক থাকি নয়।
ইহা দিলে সঞ্চারীর সর্ব্ব অঙ্গ হয়।

"গল্পটা জমবার মত যেই হল, অমনি তোমার বিতর্ক এল, না, দেখ এ গল্প কেউ পড়বে না, দেখে নিয়ো আমার কথা: যাক্ এখন গল্পটা শেষ কর শুনি…"

•

প্রদ্যোৎ বললে, "তোর টাকাই হল আমার কাল, তুই যদি সে সময়ে আমার টাকা না দিতিস, তা হলে আজ আর আমার এ হাল হত না। আজ নিজের চাকার ঘূর্ণীতে পড়ে আমিই ঘুরপাক খাচ্ছি, এর আর ছাড়ান-ছোড়ন নেই। কেবল টাকা, টাকা, টাকা—"

'বেশ ত' টাকা হয়েছে ভালই হয়েছে…'

"না, না, ভাল হয় নি, হয় নি, হয় নি…"

'তোর নেশা হয়েছে, ঘুমুগে যা, আমারও রাত হয়েছে, আর এক দিন…'

উত্তেজিত হয়ে প্রদ্যোৎ বললে, "খবরদার, আমার কথা না শুনে যদি যাস্ তবে তোকে খুন করে ফেলব…"

ভাবলাম, বাড়ীতে অসুখ, আর এ দিকে ত' ভারী গোল-মেলে মাতালের হাতে পড়লাম, আলাতন! উঠতে যেতেই জামাটা টেনে ধরে বললে, একটা আধা, পেল তার পয়মাল্—শেষ হল।

'বেশ বল্—তোর কি বলবার আছে।'

"মনে আছে তুই আমার লেখা সম্বন্ধে বলেছিলি এতে কিছু নেই, দুঃখের কথা নেই, আমি যে genius নই, অত্যন্ত mediocre, আমার রাগ হয়েছিল তখন। ভাবলাম, আচ্ছা, দুঃখকে একবার দেখেই নেব, দেখি না! কি করে যে অভিজ্ঞতা হয়। হঠাৎ আমার বাবা মারা গেল, হাতে পেলাম নগদ ত্রিশ হাজার টাকা আর বাড়ী। একলা মানুষ, আর কেউ ত' নেই। প্রথম ভাবলাম বিয়ে করি। হাইকোর্টে enrolled

হয়েছিলাম, যেতাম না,গলির ভেতরের বাড়ী দুই ত' যেখেছিল, বাড়ী বেচে দিলাম, পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে। টাকা ব্যাঙ্কে রেখে advice দিয়ে দেশ বেড়াতে বেরুলাম। সঙ্গে শুধু পুরোন চাকর সেই গোবর্দ্ধন। Poor fellow! সে মারা গেছে। পশ্চিমে অনেক জায়গায় বেড়ালাম। পেশা হ'ল, বেড়ান, গল্প-লেখা, আর কবিতা লেখা। তার সঙ্গে যে দু'একটা অকৃত-অন্ধ পাপ ছিল না, তা নয়। যাক্ গে, হ্যাঁ: এই, এই, এই, আরম্ভ হল—"

'কি আরম্ভ হল?'—থতমত খেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

প্রদ্যোত দু'হাত দিয়ে নিজের বুকটা চেপে ধরলে: "উঃ। উঃ"

'কি হল, ব্যথা ধরল!'

"না, কিছু হয় নি। Boy! one more cocktail!"

'আবার? আর খাস নি রে—'

বয় নিয়ে এল, এক চুমুকে পান করলে!

"Yes! hero! here!"

আবার বুকটা চেপে ধরলে।

"শোন্ আমি তখন এলাহাবাদে—

"সেখান থেকে জব্বলপুরে মার্ব্বেল-রক্-পাহাড় আর নর্ম্মদার জল-প্রপাত দেখতে গিয়েছিলাম। ছিলাম ডাক বাংলায়। শীতের দিন—সকালে গিয়েছি, সবে কুয়াশা কেটে রোদের আলো পড়ছে সেই প্রপাতের জলধারার ওপর—ধোঁয়ার মত হয়ে জলকণা ওপরে উঠছে ছিটকে, তার ওপর রোদের আলো পড়ে ক্ষণে ক্ষণে রামধনুর রঙ এঁকে দিচ্ছে। দেখি বাঁ দিকে পাহাড়ের কাছে বসে একটী মেয়ে ছবি আঁকছে একলা—কৌতূহল হল, এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, জল-রঙে সেই প্রপাতের ধারা আঁকছে। কথায় কথায় আলাপ হয়ে গেল। পাতলা ছিপ্‌ছিপে লম্বাটে ধরণ, হাড়ে-মাসে জড়ান, কোমর থেকে নীচের দিক অপেক্ষাকৃত লম্বা, চোখগুলো খুব টানা টানা ও বড়—বেশ বড়—চোখের ভেলোগুলো গ্রেটা গার্ব্বোর চোখের চেয়ে লম্বা লম্বা—যেন কাজল-কাল ঢেউ খেলে যায়। যুবখানায় এমন চোখ থাকতেও খানিকটা যেন বালকের ভাব, খানিকটা যেন ছলনা-মাখা যুবতী। সেই দিন থেকে মনে কেমন এক নিত্য দেখার আগ্রহ উঠ্‌ল। সে থাকত শহরে তার এক আত্মীয়ের বাড়ী, সেখানে যেতে ঠিক সুযোগ বা সাহস হয় নি। মনে করছিলাম কি করে দেখা করি। বেরিয়ে পড়লাম আবার সেই নর্ম্মদার দিকে। সেদিন সকালে কুয়াশা ছিল না, রোদেই রোদ উঠেছে, সেই দিনও আবার দেখা হল, সেই দিনও একলা ছবি আঁকছে, আমাকে দেখে খুব আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে এল ছবি-আঁকা ফেলে রেখে—

" 'আজ আর ছবি আঁকবেন না?'

" 'না, I am not in the mood; চলুন, ওই ওপরের পাহাড়টায় বেড়িয়ে আসি।'

" 'ওদিকে কিন্তু ভারি জঙ্গল—প্রথমে ওখানে উঠতে আপনার কষ্ট হবে, তা ছাড়া শুনেছি বুনো জানোয়ারেরও ভয় আছে।'

" 'ভয়! কিসের ভয়! আপনি জঙ্গলকে ভয় পান, কোন ভয় নেই—চলুন, ওখান থেকে যেখানে জলটা ঝির ঝির করে আসছে; আচ্ছা এর source কোথায়? সেখানে যাওয়া যায় না?'

" 'শুনেছি অমরকণ্টকের জঙ্গলে, এখান থেকে অনেক দূর…'

" 'আমার কেমন সব জিনিষের গোড়ার দিকে যেতে ইচ্ছে হয়। চলুন তাহলে ওই rock-টার ওপর গিয়ে বসিগে—ওই যে বন-পলাশের গাছটা…'

"অলক্ষ্যে কখন তার হাতে হাত দিলাম—পাহাড়ের ওপরে গিয়ে বেশ একটা চাতালের মত বড় পাথর—সেখানে দু'জনে হাত ধরাধরি করে বসলাম, চারিদিক নির্জ্জন, দূরে জল-প্রপাতের অশ্রান্ত বিফল নর্ত্তন, চারিদিকে যেন শিবের ডমরুর ধ্বনিতে ধ্বনিতে মাথার উপরে গাছের ডালে নীলকণ্ঠের তীব্র মধুর ডাক, দিনের আলোর মাঝেও বিরীষ অবিরাম ঝরা পান। পাশে নিষ্পন্ন তরুণীর কাঁপা-ঠোঁটের আধফোটা ভাষা—তার অস্ফুট আকুল দৃষ্টি। হঠাৎ তরুণী গান গেয়ে উঠল:

'এমনি করে জনম বুঝি
আমার পাখায় পরশ দিয়ে।'

"সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল। এ'কে তুই প্রেমের chaos-ও বলতে পারিস।"

"উর্দ্ধে মাথার ওপরে মাঝে মাঝে মেঘের ছায়া পড়ে, আবার রোদ কাঁ কাঁ করে। একটা শঙ্খচিল ডেকে উঠল—অতি তীব্র বাথার সুরে। আমাদের চমক ভাঙল।

" 'অনেক দেরী হয়ে গেছে, না?'

"That eternal feminine—চিরকালের মায়াবিনী রমণী! সে কি ঠোঁট-চাপা হাসির রেখা টানা, বিদ্যাপতি, মেঘদূত, উর্ব্বশীর সব লেখা ঠোঁটের রেখায় টেনে দিয়ে গেল! মনে হল Alexander মিথ্যেই time, space and deity-র ওপর মোটা মোটা বই লিখেছে। এই যে eternal feminine, এরা এক মুহূর্ত্তে time আর space নিশ্চিহ্ন করে দেয়, সেকেন্ডারী গডের বই না লিখলেও পারতেন তিনি।"

•

ইন্দু বলে উঠল, "ওই, আবার রসভঙ্গ করে।"

•

প্রদ্যোৎ বলে যেতে লাগল, "পাহাড় থেকে নেমে এলাম হাত ধরাধরি করে। যে পথ দিয়ে উঠেছিলাম, সে পথ দিয়ে নামি নি, ঠিক চিনতে পারি নি, অন্য দিক দিয়ে নামতে নামতে দেখলাম—বনমল্লিকা ফুলে পাহাড়ের গায়ে কে যেন সাদা ফুলের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে; নামতে নামতে সূর্য্যি পশ্চিমে ঢলে পড়ল—পথ অচেনা, সন্ধ্যে হয়ে এল, দ্রুত নেমে আসতে লাগলাম—তরুণী এক-একবার মুখ লাল করে ওঠে, এক একবার হাসে, সে কি হাসি! দেখতে দেখতে সন্ধ্যের ছায়া গাঢ় হতে লাগল, শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে ছুঁচের মত বিঁধতে লাগল। দেখলাম দূরে খানিকটা সমতল জায়গা—সেখানে ভুট্টার ক্ষেত, তার পাশে একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘর, জন-মনিষ্যি কোথাও নেই—আমার একটু একটু ভয় হতে লাগল। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অমনি পেটের জ্বালা জেগে দিলে। বেরিয়েছিলাম কোন ভোরে, সারাদিন বসে বসে দিনের আলোর স্বপ্নের মত কেটে গেছে।

"কুঁড়ের কাছে এসে দেখলাম—কেউ কোথাও নেই—অন্ধকার যেন বেশ ঘনিয়ে এসেছে। উপায়? তৃষ্ণাও পেয়েছে, ক্ষিদেও পেয়েছে।

" 'তোমার খুব রাগ হচ্ছে, না?' "

"তার মুখে 'তুমি' বলে কথা-কওয়া শুনে—মনে হ'ল, বড় বেশী কাছাকাছি হয়ে পড়েছি···

" 'কিন্তু রাত কাটান যায় কি করে!'

" 'দিন যদি কেটে থাকে, রাতও কাটবে—তার কি?'

" 'তা'ত কাটবে—তার পর?'

" 'তঃ কিম?—আমার bag-এর মধ্যে chocolate আছে—আর cream role আছে, খাও—Thermos-এ চা আছে।'

" 'Wonderful!—you are a jewel'···তার পর?

" 'তারাটা কি রকম জ্বল্ জ্বল্ করে তাকিয়ে রয়েছে আমাদের দিকে দেখেছ? আচ্ছা, তারাগুলো কি human destiny control করে?'

" 'তা ত' দেখছি, strange experience, হ্যাঁ destiny destiny!···'

"তরুণী আঁচল খুলে বিছিয়ে দিলে···

"তারপর গাঢ় আঁধার সব ঢেকে দিলে, শীতার্ত্ত তীক্ষ্ণ বাতাস, হিম-জর্জ্জর, ভুট্টার বেড়া দেওয়া ঘরের ফাঁক দিয়ে বাতাস ডাকে, আকাশের তারা হাতছানি দেয়—নিশাচর পাখীর ফুৎকার বাতাসের বুক চিরে ভেসে যায়—তারপর ভোর হ'লে ফিরে এলাম অনেক ঘুরে ডাক বাংলায়—তরুণী চলে গেল শহরে।"

হঠাৎ প্রদ্যোৎ আবার ঘণ্টা টিপলে: "বয়! ককটেল—"

আঙুল নেড়ে দেখালে, টু মোর।

আমার মন তখন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠছিল, বলতেও পারি নে যে। সে আবার পান করলে। ঘরটায় পাঞ্চায়ী করলে দু'বার, অত্যন্ত অস্থির হ'য়ে···

হঠাৎ আমার মনে হ'ল—যেন প্রদ্যোতের কঙ্কাল ঘুরে বেড়াচ্ছে—তার পাঁজরার হাড় ক'খানার মাঝে হৃদ্‌পিণ্ডটা আগুনের মত ধক্ ধক্ করে জ্বলছে আর শব্দ হচ্ছে।

"আমি তোকে বলছি, to play with a woman is a dangerous game। লক্ষ লক্ষ লোকের সঙ্গে একা জীবনের যুদ্ধে লড়াই করা যায়, কিন্তু একটা রমণীর সঙ্গে তার মোহিনী ফাঁসের জালকে রুদ্ধ করা বা ছেঁড়া impossible, I tell you, অসম্ভব···

"চার পাঁচ দিন আর তার দেখা হ'ল না। মন কিন্তু দেখার জন্য অস্থির হ'য়ে উঠল।

"দুপুর বেলায় ডাক-বাংলার বারান্দায় বসে আছি—একটা লোক একখানা চিঠি দিয়ে গেল, সে চিঠি আজও আমার

কাছে আছে, এই দেখ—তোকে দেখাব বলে বার করে রেখেছি। পড়—না, আমিই পড়ছি শোন, modern prose poem, বললেই হয় :

"বহুবার বহুবার, প্রিয়, প্রিয়তর, প্রিয়তম! জীবনের সব চেয়ে যা মধুর, যা রসের, যা আনন্দের তাই তুমি আমায় দিয়েছ, আজকের দিন পর্য্যন্ত তাই—তুমি আমায় সব দিয়েছ, দিয়েছ মোরে ভালবাসা, দিয়েছ আশা, দিয়েছ ভাষা, দিয়েছ তৃষা অবিনাশা! সেদিন পর্য্যন্ত জীবনটা আমার যেন দুঃস্বপ্নের ক্লান্তি ও অবসাদের গ্লানিতে ডুবে ছিল, সেটা ত' জীবন নয়। আজ থেকে জীবন আরম্ভ হ'ল—এই বাতায়নের কাছে দাঁড়িয়ে তোমায় জন্যে দু'হাত বাড়িয়ে রয়েছি, হে আমার প্রিয়তম, ওই যে তুমি, ওই যে তুমি! তুমিই কি? ইচ্ছা হচ্ছে, পাখীর মত উড়ে যাই, যাও যাও, চুপ, চুপ্—! Oh! the burning lava, অগ্নিস্রাবী বহ্নি জ্বালা, লিপ্ত কর স্নিগ্ধ কর, বলতে যাও, বলতে যাও, প্রশ্ন ক'র না, কিন্তু কিন্তু এ কি এ কি! Is it life? না, না, ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন, না না, আমার সর্ব্ব অঙ্গ দিয়ে পুলক জেগে উঠেছে, আমি আমার সেটা তোমারি পায়ের তলায় ফেলে দিলাম,—আর বহন করতে পারি না, তোমার কাঁধে মাথা রাখি—চুপ্ যাও প্রিয়তম, জান কি, জান কি নিষ্ঠুর! যে, এ অধর আর কার অধর কখন স্পর্শ করে নি, আঃ! কবে তোমায়-আমায় এক হ'ব! ওই রাত্রি আসবে, আজ নিশা—হবে শুধু আমার আদিম নিশা, eternal night—night eternal—কই বন্ধু, হাত ধর—হাত ধর, প্রিয়তম…"

*

প্রদ্যোৎ খানিকক্ষণ চুপ করে মাথায় হাত দিয়ে বসল। নিশ্বাস ফেলে আবার আরম্ভ করলে :

"কলকাতায় ফিরে এলাম—একটা ভাল বাড়ী সাজিয়ে দু'জনে বাস করতে লাগলাম। Love, Love and Love—My love, my dove, my spirit undefiled, সে যেন সুলেমাইট, আর আমি যেন রাজা সলোমন্—দিবারাত্র যেন Song of Songs চলেছে।

"এইবার প্রেমের cosmos তৈরী হ'তে শুরু হ'ল। কিছুদিন পরেই শুনলাম, তিনি সিনেমায় অভিনয় করেন, আমাকেও সেখানে নিয়ে গেলেন। কর্ত্তারা খুব খাতির করলেন—আমাকে প্রায় একরকম বড়কর্ত্তাই বানিয়ে নিলে, সমস্ত পাবলিসিটি, বই সিলেকশন ও তার সংলাপ লেখা—সবই আমি করি, প্রোডিউসার-ও আমার কোন কথায় না বলেন না। টাকার দরকার হ'লে আমিই দিই। আমার বাড়ীতে পার্টি বসে, beat drink and best food, তবে সংলাপও শেষ হয় না, ছবিও শেষ হয় না। কাটল বছর, ছয়শ টাকা, বাড়ী ভাড়া বাকী পড়ল—নালিশ হ'ল, ক্রোক হ'ল, আমার চেক ডিসঅনার্ড হ'ল—গাছ থেকে যেমন মানুষ পড়ে মরে, যেন তেমনি হ'ল। সিনেমা কোম্পানি লিকুইডেশনে গেল, আমি ত কেউ নই। বাড়ীওয়ালা পুলিস দিয়ে ঘর থেকে বার করে দিলে—গোবর্দ্ধন কাঁদতে কাঁদতে তার দেশে চলে গেল। আমি এক কাপড়ে রাস্তায়। তখন বুঝলাম, destinyর ইঙ্গিত কোথায়।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর তোর সেই তরুণী?'

"এখনো বুঝলি নি—

তবে ফেলে যাই, ফুল নাহি পাই
ফুল নাহি চাই
তবে ফেলে যাই আঁধারে।
এত রাগে আশা, শুধু আঁখিধারা
কোথা তুমি সখি:
হায়া রে!
তবে ফেলে যাই নাই আঁধারে!

"সাফ্ উধাও—কার সঙ্গে অবিশ্যি—সেটা জেনে লাভ কি?

"রাগ, ঘৃণা—রমণীর ওপর proprietory right—সব মিলিয়ে মাথাটায় আগুন জ্বলে উঠল, বুঝলাম, রেল ভাড়া করে নর্ম্মদার ছবি আঁকতে যাওয়ার পিছনে আরও ইতিহাস আছে। দুর্ভোগে দিব্যচক্ষু ফোটে তা জানিস। দশটা টাকা ছিল, চলে গেলাম এলাহাবাদে—হ'ল অসুখ, রইলাম হাসপাতালে, পড়েছিলাম তিন মাস—It was brain fever। মনে হ'ল আমাকে বাঁচতে হবে—বাঁচতে হবে!

"হাঁ, বাঁচতে হবে—বাঁচতে হ'লেই টাকা চাই, তোর টাকা এল। দেশে একতলা দু'খানা খোড়ো ঘর আর সামান্য একটু জমি ছিল গোবর্দ্ধনের—তার কাছেই গেলাম। কাকেও কিছু বললাম না, রইলাম সেখানে তিন মাস। তোর

টাকায় কোমরে ছিল বল। গোবর্দ্ধন খুব সেবা করত, আর আমি বই লিখতাম। বই শেষ হলে, আবার এলাম কলকাতায়—আবার বাড়ী ভাড়া করলাম, একখানা পুরাণ মোটর কিনলাম, hire purchase-এ ঘর সাজালাম। বিকাল বেলা রোজই চায়ের পার্টি, বন্ধু আবার জমতে লাগল, সিগারেট দু' টিন করে খরচ হতে লাগল। আমার মোটরই বন্ধুদের বাড়ী পৌঁছে দেয়। দল তৈরী হ'ল, বই ছাপা হ'ল—পাব্লিশার বাড়ীতে এসে খাতির করে বই নিয়ে গেল। কাগজের সমালোচকদের ডান-হাত বাঁ-হাত দুই দেখালাম। বিজ্ঞাপন আর প্ল্যাকার্ডে কাগজ আর রাস্তার দেয়াল ভরে গেল—উঠল নিখাদে জয়ধ্বনি, দলের লোকেরা নিখাদের সুরকে জয়ধ্বনির খাদে জোর গলায় পৌঁছে দিলে। তোর টাকা এইবার আমায় genius করে দিলে। দল আমাকে কলেজে নিয়ে গলায় ফুলের মালা দিলে, অধিবেশনে আমাকে সম্বর্দ্ধনা করে ধন্য হলেন—auto-graph নেবার জন্যে লোক আসতে লাগল। বড়-কর্ত্তার সার্টিফিকেট এল, 'সাহিত্যে চলার পথ তুমি নিজেই কেটে নিতে পারবে।' মনে মনে ভাবলাম, সাহিত্য কি করে বিক্রয় জানি, সার্টিফিকেট কি করে আদে তাও জানি, তবে—

'হাটে বিকায় না যুতো
কিনেছি বসন্তসেনার যুতো'

"পার্টিতে নেমন্তন্ন হতে লাগল, সাহিত্যের মিটিং-এ অভিভাষণ, ভাষণ ও বাণী দিই, শুনে বেণবাসী ধন্য হন। বাঙলা সাহিত্য দু'ফুট পাঁচ ইঞ্চির উপরে উঠে যায়। 'দোহার কি গোহার' আরম্ভ হয়ে গেল।

"খ্যাতির পালা যখন এল, তখন টাকা কিন্তু ফুরিয়ে আসতে লাগল, মোটরখানা আবার নতুন রঙ করিয়ে ছড়্ বদলে নিলাম। ভাবলাম, ভাগ্যদেবীর খেল বুঝি আবার ধরা পড়ে।

"আর হয়নি, হবে না—আগেও না, পরেও না। সাহিত্যের দরজায় টাকা দিয়ে দোহারের আড়কাঠী বসিয়ে দিলাম। খুঁজে দেখতে লাগলাম, কোথায় টাকাওয়ালা একলা মেয়ে। এমন সময় সুযোগ হ'ল, আভাময়ীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। আভাময়ী নাম কেন জানিস্, আমার শ্বশুর আভা-চিনির ব্যবসায়ে যে-দিন একদিনে চার লাখ টাকা লাভ করেন সেই-দিন উনি ভূমিষ্ঠ হন, তাই ওঁর নাম আভাময়ী।

"শ্বশুর বিয়ের পর ঘর-বরকা আরও ভাল করে আসবাব-পত্র দিয়ে ভরিয়ে দিলেন। আমার জন্যে নতুন লেখবার টেবিল সাজিয়ে দিলেন, খান দুই বাঁধান হিসাবের খাতা, এক-খানা A. B. C. Code-এর বই ইত্যাদি।

"রোজ সকালে আভাময়ী এসে জিজ্ঞাসা করে, 'নতুন বই কতখানি লিখলে?' আমি বলি, 'লিখি নি—এখন কল্পনায় কেনিয়ে উঠছে, আসে উপচে পড়ুক তবে তো সেটা হবে আর্ট।'

"নামজাদা লেখক-জামাই পেয়ে শ্বশুরের অবিশ্যি গর্ব্ব অনেকখানি বেড়ে গেল।

'তা হলে তোর শ্বশুর-শাশুড়ী তোকে খুব যত্ন···।'

"যত্ন বলে যত্ন? মরবার সময় শ্বশুর বললেন, 'বাবাজী, সবই তোমার। সাত লাখ টাকা ব্যাঙ্কে আছে, চিনির ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছি। যাতে বেশী লাভ হয়, সে ব্যবসা আর কিছু তারপর করতে নেই। বুঝলে, চীনে-বাজারের দোকান রইল, চালানোটা ভাল বুঝি না মনে কর বা না পার, সাগর পালকে বেচে দিও। কাকেও কখন ধার দিও না, কার কাছে কখন ধার কর' না।'

"এখন কেবল টাকার উপর টাকা জমেই যাচ্ছে।

'বেশ ত' সুখের কথা।'

প্রদ্যোৎ একটা বিকট হাসি হাসলে "হাহা হাহা—সুখ"।

"সুখ, সুখ? অতি বড় শত্রুরও যেন এ অবস্থা না হয়। আর দেখবি, আর দেখবি আয়।"

প্রদ্যোৎ আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল এক ঘরের দরজার গোড়ায়, তার শোবার ঘর।

"শুনেছিস নাক-ডাকা, ওই দেখ destiny; চার পাত্র ককটেল্, আর নাসিকাধ্বনি। ইংরিজী স্কুলে বাবা পড়িয়েছিল, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা কয়—the gutter। ইংরেজও সে ভাষা বলে না, আসলে একেবারে কালচারের symbol—হাহা হাহা।"

আঙুল দেখিয়ে বললে, "The destiny—

"সারারাত এই করি, আর ককটেল খাই, লোহার সিন্দুক খুলে গিনি-মোহর বাজাই, ঝন্-ঝন্-ঝন্, ঝন্-ঝন্-ঝন্,

ঝন্-ঝন্-ঝন্। টাকার উপর টাকা, মোহর জমেছে থানকে থান। আয় না দেখবি আয়, দেখবি আয়। আমি দেখাচ্ছি তোকে", বলে—নিয়ে গেল আর একটা ঘরে, তোড়া খুলে গিনি ঢাললে।

"উনি ককটেল খান আর ভাল ভাল ফিরিঙ্গী slang আওড়ান। আমি ককটেল খাই, আর গিনি-মোহরের বাজনা শুনি ঝন্-ঝন্-ঝন্, আওয়াজটা অনেকটা হেকলের মতন না? হেকল—হেকল, তা সোণারই হোক্ আর লোহারই হউক।"

হঠাৎ মুন্সী ডেকে উঠল। প্রহ্লাৎ চমকে উঠে সিন্দুক বন্ধ করে এল ড্রয়িং-রুমে ফিরে।

চারটে বেজে গেল। সে ভূতগ্রস্ত চেহারা আর তার নেই, মানুষটাও যেন সহজ হয়ে গেছে। শান্ত জড়তায় তার চোখ ভরে এসেছে।

"দেখ রোজই রাত্রে আমার এই রকম হয়, কেন হয় জানিস, হা-হা-হা-হা-হা-হা আমি, আমি সেই তরুণীকে··· একেবারে, একেবারে, একেবারে ভেবেছিলাম শোধ নেব।

"হ্যাঁ তা শোধই ত' নিচ্ছি—নিচ্ছি না? Got the experience, at the cost of blood—রক্ত দিয়ে দাম দিতে হয়েছে—এ।

"একটা জারি মজা হয়েছে জানিস?"

'কি?'

"আত্মকাহিনী—আমার প্রথম যে বইখানার নাম হয় 'মণির প্রেম' তুই ত' পড়েছিস, পড়িস্‌নি, আচ্ছা তোকে পাঠিয়ে দেব।—জানো কি বলে জানিস্, 'এই বইখানা তোমার অতি চমৎকার। সবাই কিন্তু বলে যে, ওটা আমাকে লক্ষ্য করে, আমারই বর্ণনা করেছ।' অথচ তুই পড়ে দেখিস্ তোকে পাঠিয়ে দেব, সে গল্পটা একেবারে নিছক তরুণীকে দেখে লেখা। তখন, আকা-চিনিকে চিনতামও না। Isn't it wonderful? তবে হ্যাঁ, তাতে অনেক মোরগা কথা আছে, সে কথাগুলো আমার স্ত্রীর ভারি মিষ্টি লাগে বোধ হয়। হয় ত', আমরা যা নই তা-ই অন্যে দেখতে চাই। এমনি করেই বোধ হয় illusion create করি।"

'তুই আর বই লিখিস নি?'

"না, Suggesting a Literary Declaration of Independence—বাঙলা দেশে···এইবার লিখব মনে করেছি।"

'কত দিন হল তোর বিয়ে হয়েছে?'

"সাত আট বছর হয়ে গেল।"

'কোন ছেলে-পুলে হল না?'

"না, পঞ্চাশ বছর ধরে বাঙলা দেশে আমার মত অনেক poetic imbecile জন্ম নিয়েছে। Arithmetical progression-এ আর তাদের বাড়িয়ে লাভ কি? Let there be an end of it—তামার শোধ হলেই ভাল হয়।"

ভোর হয়ে এল।

"বয়, কফি?"

বয় কফি দিয়ে গেল। এই রকম ককটেল্ আর কফি দিতে দেখলাম ওরা খুব অভ্যস্ত। এখন আর সে প্রহ্লাৎ নেই—সে ঘুম-অঘুমের বিভীষিকা আর নেই। সহজ মানুষ, গোঁফে একটা মোচড় দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে বললে:

"তোর কিন্তু বড় কষ্ট হল, না? কিছু মনে করিস নি ভাই।"

"না, মনে আর কি করব?"

সিন্দুক খুলে গিনি, মোহর টাকার কেবল ঝন্ ঝন্ শোনালে—রাত চারটে অবধি এই রকম জোগালে, টাকাটা ফেরৎ দেবার কথা কিন্তু একবারও বললে না। তাই ত'!

কফি খেয়ে বাড়ীতে ফিরলাম, তখন ছ'টা বেজে গেছে। গলির মোড়ে পাড়ার দু'জন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ মুখে।

তাঁরা আমায় দেখে বললেন, "যান ভিতরে, আর কি হবে, সারা রাত কোথায় ছিলেন। বেশ দেখুন গে।"

বাড়ীর ভিতরে গিয়ে দেখলাম, গৃহিণী দারিদ্র্যের হাত থেকে দিব্যি এড়িয়ে গেছেন। আজ চার পাঁচ দিন ঘরে খাবার ছিল না, রোগে একফোঁটা ঔষধ ছিল না। মাসখানেক আগে সতেরো বছরের ছেলেটাও অমনি করে গেছে।

মনের ভেতর থেকে কে যেন চীৎকার করে বলতে লাগল, "Ye are criminals: যারা নিজের স্ত্রীকে খেতে না দিতে পেরে মেয়ে ফেলে, ছেলে যাদের না খেয়ে মরে, তাদের দেশে কবিতাও লেখে, সাহিত্যও হয়।"

বুক-ফাটা হাহাকার চীৎকার দিয়ে উঠতে গেল। ভগবান! ভগবান! দেওয়ালের দিকে চেয়ে দেখলাম,—সদ্যোমৃত ধর্ম-পত্নী মরণ-নিঃশ্বাস দিয়ে লিখে দিয়েছে, অক্ষম! অক্ষম! অক্ষমের নাই ভগবান! প্রত্যেক অক্ষরগুলো যেন তার ক্ষুধা-কাতর কোটর-গত চক্ষুর শুকনো আগুনে জ্বলে জ্বলে উঠ্‌ছে। অক্ষমের নেই ভগবান! Poverty is the greatest crime in this world! Ye are criminals! গরীব হওয়ার চেয়ে বড় পাপ আর নেই সংসারে।

ইন্দু বল্‌লে: "কিন্তু এ কি গল্প?—এ ত ঠিক গল্প হল না।"

গল্প ত' এ নয়, এটা আমার 'শুষ্ক-শাকের ন-পড়ি'—

"তোমার এ শুষ্ক-শাকের ন-পড়ি রান্না কেউ মুখে দেবে না কিন্তু—"

তা দেবে না বোধ হয়, আগের দিনের রান্না, আজকের দিনে আস্বাদে রস পায় না, না?—কি করব বল ভাই, chicken stew ও' জানি নে, জানি এই ন-পড়ি। পরাধীন জগতের ছেলে, মনে পড়ে না কোন্ অনাদি কাল হ'তে রক্তের চলাচলের মাঝে ওই ন-পড়ি আছে, তাকে তোলা শক্ত কথা, আর দু'শ বছরের ছাব্বিশটা অক্ষরের কেরামতিতে আর না-ই বা ভুললাম, তোমাদের ভাল না লাগে খেয়ো না, আমার কাছে ওই ন-পড়িই ভালো।

"দেখ দাদু, তুমি ভুল করছ, যারা কাগজে এ ছাপবে, তারা গালাগালি খাবে, তোমায় গালাগালি দেবে, এতে লাভ কি হবে—"

'প্রাত বিদায় হলে এ-তত্ত্ব জানায়ে দিবি—
কি করিবে ভুলের কুকুরে।'

---

# বঙ্গদেশে মা কি এলো ছলি?

—শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রাবণ বর্ষণ-হীন গেল চলি অবসন্ন প্রায়,
ভাদ্রের অঝোর-ঝরা কোথা গেল শরতের বুকে?
বিশুষ্ক মরুতু যেন এলো নিজ দহন জ্বালায়
রিক্ততায় পূর্ণ করি মানবের পরিপূর্ণ সুখে।

কোথাও মাঠের বুকে ঝল্‌সিতেছে সোনার ফসল,
পাশে দেখি ধূ-ধূ করে শূন্যতায় অন্য এক গ্রাম।
কৃষাণের আঁখি কোণে ঝরিতেছে উষ্ণ আঁখি-জল,
অসহায় আগমনে ভাবিতেছে দুঃখ পরিণাম।

"কি হইবে ধান্যের? নাই ধান, মিলিবে না ধান,
কঠিনের তীব্র জ্বালা মিটাইবে অন্নহীন কিসে"?
অন্নহীন ভাবনায় নিষ্পেষিত কৃষকের প্রাণ,
মরমের দাবানলে তিলে তিলে হারাইছে দিশে।

শরতে বাঁশীর সুর মনে তার পড়ে গলি গলি—
জননীর আগমন—বঙ্গদেশে মা কি এলো ছলি'?

---

# হিমালয়ের পশ্চিমে

—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত

৭

পরদিন সকালে দশটার ভিতরে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা বাসে করে রওনা হলাম গুলমার্গ অভিমুখে। শ্রীনগর পাঁচ হাজার ফুট, আর গুলমার্গের উচ্চতা নয় হাজার ফুট, ভারতবর্ষের মধ্যে বোধ হয় সব চেয়ে উঁচু শৈলাবাস। শ্রীনগর থেকে গুলমার্গ উনত্রিশ মাইল। এর মধ্যে পঁচিশ মাইল টংমার্গ (সাত হাজার ফুট) পর্যন্ত বাস যাবে, বাকী চার মাইল যেতে হবে ঘোড়ায়। বাসে এক বাঙালী ভদ্রলোক, ন—বাবুর সঙ্গে আলাপ হল। তিনি একজন যথার্থ পর্যটক, একা সমস্ত ভারতবর্ষ পর্যটন করছেন। দক্ষিণ ভারত, পশ্চিম ভারত শেষ করে কাশ্মীর এসেছেন। আমাদেরই মত যাচ্ছেন একদিনের জন্য গুলমার্গ দেখতে। এ-রকম একজন সঙ্গী পেয়ে খুশিই হলাম।

দশটার একটু পরেই আমাদের বাস ছাড়ল। টংমার্গ পর্যন্ত যাতায়াতী বাস-ভাড়া (রিটার্ণ টিকিট) দু' টাকা। শহর ছাড়িয়ে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে আমাদের বাস ছুটে চলল। রাস্তার দু'দিকে পপ্‌লার গাছের সারি। আর মাঠের মধ্যে ছড়ান মাল্‌বেরি, উইলো প্রভৃতি গাছ। কাশ্মীর উপত্যকায় চার রকমের গাছ খুব বেশী চোখে পড়ে, পপ্‌লার, চেনার, মাল্‌বেরি ও উইলো। এই গাছগুলির প্রত্যেকের একটা বিশেষ রূপ আছে; এবং প্রধানতঃ এই গাছগুলির সৌন্দর্যই সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকাকে একটা অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত করেছে। পপ্‌লারের দীর্ঘ ঋজুতা, চেনারের মহান্ স্থৈর্য গড়ন, মাল্‌বেরির অদ্ভুত নৃত্য-ভঙ্গি ও উইলোর ঝুরু-ঝুরু অপূর্ব স্নিগ্ধ কমনীয়তা আশে-পাশের আবহাওয়ায় একটা মোহ বিস্তার করেছে। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি কাশ্মীর ফুলের রাজ্য; ফুল অবশ্য অনেক দেখলাম কিন্তু সবই বাগানে। বন্য ফুল, যা মাঠে-ঘাটে, ঝোপে-জঙ্গলে, অযত্নে অনাদরে, আপন আনন্দে স্বতঃই ফুটে থাকে, সে-রকম ফুল কোথাও চোখে পড়ল না। হয় তো আমরা যে সময়ে গিয়েছিলাম সেটা ফুলের সময় নয়।

এইখানে একটা কথা বলা দরকার। বাইরে কাশ্মীরের সৌন্দর্যের এত নাম যে, অনেকেরই ধারণা কাশ্মীর না জানি কী এক অধ্যাত্ম স্বপ্নময় দেশ। এ-রকম ধারণা নিয়ে যিনি কাশ্মীর আসবেন, তিনি নিঃসন্দেহে হতাশ হবেন। কারণ আর সব দেশের মত এ দেশটাও "মাটীর, সেটা সোনা-রূপার নয়।" এই রকম একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল শ্রীনগরে। আমরা যে হাউস-বোটে ছিলাম তারই পাশে আর একটী হাউস-বোটে চারজন বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরা এসেছেন চট্টগ্রাম থেকে, কাশ্মীর বেড়াতে। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন চট্টগ্রামের উকিল; আমার সঙ্গে তাঁর একটা সম্বন্ধও বেরিয়ে গেল,—তিনি না কি কোন এক বিশেষ রাজনৈতিক মামলায় আমার দাদার সহকর্মী ছিলেন। আলাপ জমে গেল। দেখলাম ভদ্রলোক ভয়ানক চটেছেন। পৃথিবী-শুদ্ধ লোক বড়্‌যন্ত্র করে তাঁকে ঠকিয়েছে, তাঁর ভাবটা এই রকম। তিনি ক'একটী মুখ ফুটেই মকেল হাত-ছাড়া করে এলেন শেষে কি এই দেখবার জন্য! আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি এত চটলেন কেন?" তিনি বিশেষ উত্তেজিত হয়ে বললেন, "কি দেখবার আছে বলুন ত এই কাশ্মীরে? খালি পাহাড় আর বরফ! তা পাহাড় আমাদের চাট্‌গাঁয়েও অনেক আছে। আর বরফ? তার উপর কিছু বরফ চাপিয়ে দিলেই হল। তার জন্যে এত কষ্ট করে এত দূরে আসবার কোন প্রয়োজন নেই।" কথাটা খুব্‌কি, এর উপর কথা চলে না। মনে পড়ল, পরশুরামের নকুড় মামাকে। ভদ্রলোককে সত্যিই ঠকিয়েছে। কাশ্মীরে এসে যাঁর খালি পাহাড় আর খানিকটা বরফ ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না, তাঁকে কাশ্মীরে টেনে এনে তাঁর বন্ধুরা সত্যিই তাঁর প্রতি অবিচার করেছেন।

গুলমার্গে উঠবার জন্যে টংমার্গে ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায়। বাস থেকে নামতেই ঘোড়া নিয়ে আমাদের সব ছেঁকে ধরল। অনেক দর-দস্তুরের পর ঘোড়া-প্রতি যাতায়াতী দু'আনা ভাড়া ঠিক করে আমরা তিন জন তিনটে ঘোড়ায়

ছেড়ে দেওয়া হলাম। সহিসেরা চলল পিছল পিছন, তারাই হল আমাদের 'গাইড'। প্রত্যেক ঘোড়ায় একটা করে নাম আছে। আমার ঘোড়াটার নাম 'টমি', ন—বাবু যে ঘোড়াটায় চাপলেন তার নাম 'রাজা', আর বন্ধুবরের ঘোড়ার নাম 'বুলবুল'।

সমতল ভূভাগ ছাড়িয়ে আমরা খাড়া পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। কিন্তু আমার হল মুস্‌কিল। রাস্তা খাড়া উঁচুতে উঠে গেলেও বেশ চওড়া। ডান দিকে পাহাড়ের প্রাচীর, বাঁ দিকে খাদ। আমার ঘোড়াটা সমস্ত রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকের খাদের একেবারে কোল ঘেঁসে চলতে লাগল। যতই তাকে ডান দিকে সরাতে যাই সে বাঁ দিক ঘেঁসে চলবেই। ঘোড়ার মনস্তত্ত্ব আমার জানা নেই। এতবড় চওড়া রাস্তাটা ছেড়ে একেবারে খাদের পাশ দিয়ে চলবার কি প্রয়োজন বুঝে পেলাম না। ঘোড়া হয় তো খাদে পড়বে না। কিন্তু খাদের গভীরতার দিকে তাকিয়ে আমি যে ঘোড়ার উপর থেকে মাথা ঘুরে পড়ব না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। না, আমারই ভুল হয়েছিল এ ঘোড়াটা নেওয়া; নাম থেকেই বোঝা উচিত ছিল। ন—বাবু একজন ওস্তাদ ঘোড়সওয়ার, অন্ততঃ আমার তুলনায়। তিনি আমার অবস্থা দেখে আমার সঙ্গে তাঁর ঘোড়া বদল করতে চাইলেন। আমি সানন্দে রাজি হলাম। বেঁচে গেলাম। 'রাজা' বেশ শান্ত ঘোড়া, যে ভাবে চালাও সেই ভাবেই চলবে।

গভীর ফার ও পাইন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আমরা খাড়া উপরে উঠতে লাগলাম। চারিদিকে কি নিস্তব্ধতা! জঙ্গলের ভিতরকার বহুদূরের ছোট ছোট শব্দগুলো পর্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে কাণে এসে পৌঁছচ্ছে। আর কি ঠাণ্ডা! যতই উপরে উঠছি বাতাস ততই যেন হিমশীতল বলে মনে হচ্ছে। মনে হল চারিপাশের অরণ্যের গভীর নিস্তব্ধতা যেন সজীব হয়ে আমাদিগকে তার অতলতার মধ্যে তলিয়ে নেবার জন্যে মৃদু-শীতল আলিঙ্গনে আমাদের জড়িয়ে ধরছে। সে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি।

গুলমার্গে যখন পৌঁছলাম তখন হাত, পা, মুখ যেন ঠাণ্ডায় হিম-অসাড় হয়ে গেছে বলে মনে হল। ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে প্রথমেই আরম্ভ করলাম ছুটোছুটি। শরীর বেশ একটু গরম হয়ে-সঙ্গে করে আনা খাদ্য-সম্ভারের মাঠের মধ্যে খুলে নিয়ে বসলাম। কিছু সিদ্ধ ডিম ও স্যাণ্ডুইচ সঙ্গে ছিল, আর ছিল ফ্লাস্কে চা। তাই তিনজনে ভাগ করে খাওয়া গেল। খেতে খেতে গুলমার্গের শোভা দেখতে লাগলাম। ছোট্ট শহর। সমস্তটা এক নজরে চোখে পড়ে। চারি দিকে পাহাড়ে ঘেরা বাটির মত ছোট একটী উপত্যকা—তাতেই ছড়ান কতকগুলি বাড়ী। ছবির মত ছোট ছোট সুন্দর ঝকঝকে বাড়ী—সবই সাহেবদের। চারিদিকের বিরাট পাহাড়ের প্রাচীর, নিবিড় ফারের জঙ্গলে আবৃত। কেবল মাথাগুলি ধবধবে সাদা তুষার-কিরীটে ঢাকা। হিমালয়ের নিভৃত কোলে নিরালা এই 'লোকনীড়'খানি আমাদের চোখে এক স্বপ্নময় দেশ বলে মনে হল। দার্জ্জিলিং আমি কখনও দেখিনি। কিন্তু আমার বন্ধুবর একাধিকবার সেখানে গিয়েছেন। তিনি দার্জ্জিলিং-এর একজন ভক্ত ভক্ত। যেখানে যা কিছু সুন্দর দৃশ্য দেখেন দার্জ্জিলিং-এর সৌন্দর্য্যের মাপকাঠীতে সব কিছুর বিচার করেন ও হতাশ হয়ে মনে মনে দার্জ্জিলিং-এর জন্য গর্ব্ব অনুভব করেন। কিন্তু গুলমার্গের সৌন্দর্য্যে অভিভূত হয়ে হঠাৎ তিনিও স্বীকার করে ফেললেন যে, দার্জ্জিলিং-এর সৌন্দর্য্য এর কাছে নিষ্প্রভ।

ফ্লাস্কের চা শেষ হয়ে গেল, কিন্তু এই দারুণ ঠাণ্ডায় তাতে সান্ত্বনা না। বেশ গরম গরম আর এক পেয়ালা করে চা পেলে বড় ভাল হয়। খোঁজ করতে লাগলাম, এখানে কোথাও একটু চা পাওয়া যায় কি না। কিন্তু দেখলাম, তার কোন সম্ভাবনা নেই। সমস্ত গুলমার্গ শহর খালি, জনশূন্য। শুনলাম, শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অধিবাসীরা সব শহর ছেড়ে নীচে চলে গেছে। ছোট শহর হলে কি হয়, এখানে গল্‌ফ্‌কোর্স, ক্লাব হাউস, সিনেমা হাউস সব আছে, কিন্তু সবই বন্ধ নিস্তব্ধ। মনে হল, একটা ঘুমের দেশে এসে হাজির হয়েছি। ঘোড়ায় চড়ে আমরা তিন রাজপুত্তুর—"সবাই দেখা অচল অচেতন, কোথাও জেগে নাই কো জনপ্রাণী"। মনে হল যেন—"ঘুমায়ে আছে বিপুল পুরীখানি।" ঘুমের দেশে রাজপুত্রের মিলেছিল রাজবালা, কিন্তু আমরা ত রাজবালা চাই নি, চেয়েছিলাম শুধু একটু করে চা। আমাদের বরাতে তাও জুটল না।

৮

মাঠের মধ্যে বসে সামনের ঐ বরফে ঢাকা পাহাড়ের মাথার দিকে তাকিয়ে বলাবলি করছিলাম, ঐখানে যাওয়া যেত, ঐ বরফের রাজ্যে। একজন সহিস বলে উঠল, "যাবেন? চলুন, নিয়ে যাব।" শুনলাম, ঐ পাহাড়ের মাথার উপরে বন-জঙ্গল যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে বরফে ঢাকা এক বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি আছে। জায়গাটার নাম খিলেন-মার্গ। সেখানে যাওয়া যেতে পারে। তবে আরও অনেকটা উঁচুতে উঠতে হবে। আরও অন্ততঃ তিন হাজার ফুট। ন হাজার ফুট উঁচুতে উঠেছি, আরও তিন হাজার ফুট উঠব। উৎসাহে মন ভরে উঠল। তখনই লাফিয়ে উঠে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলাম। তবে আর দেরী করা নয়, এখনই চল।

শহরের ভিতর দিয়ে গিয়ে উত্তর-পশ্চিম কোণ দিয়ে আমরা পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। কোন পথ নেই, ফার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সোজা উপরের দিকে চললাম। মনে অসম্ভব উৎসাহ—নিজেদের যেন দিগ্বিজয়ী বীর বলে মনে হতে লাগল। হাঁ, এ একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চার বটে! কিছু দূর উঠে এক জায়গায় একটা গাছের নীচে দেখলাম, খানিকটে সাদা কি, যেন খানিকটা ফেনা জমে আছে। শুনলাম ঐ বরফ। ঐ বরফ! কলকাতার চেলার মত বরফ অনেক কিনে খাওয়া গেছে। কিন্তু কার গাছের তলায় সমুদ্রের জমাট ফেনার মত সাদা সাদা ও-জিনিসটা—ওটাও সেই বরফ! যাঃ রে! তার পর যতই উপরে উঠতে লাগলাম এই প্রকারের বরফ চারিদিকে ততই চোখে পড়তে লাগল। শেষের দিকে দেখলাম জঙ্গলের তলদেশ সম্পূর্ণভাবে বরফে ছাওয়া; তারই উপর দিয়ে—নরম বরফের উপর ঘুরের চিহ্ন রেখে আস্তে আস্তে ঘোড়া উপরে উঠতে লাগল। শেষে যখন আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছলাম তখন বনানীর সীমারেখায় দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সম্মুখে উন্মুক্ত বিশাল তুষার-সমুদ্র, ঝকঝকে সাদা উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে ঝল্‌মল্ করছে। মনে হল, আমাদের ভ্রমণ সার্থক হয়েছে; বিদেশ ভ্রমণের যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা এতদিন মনের ভেতর গুমরে মরছিল আজ তা তৃপ্ত হল।

খিলেনমার্গে পৌঁছে আমাদের মুস্‌কিল হল, পা রাখি কোথায়! রৌদ্রে বরফের উপরিভাগ গলে নরম হয়েছে, ঘোড়া থেকে নামলে জুতো ভিজে যায়। দেখলাম, কিছু দূরে বরফের উপর একটা কাঠের স্তূপের মত কি রয়েছে। শুনলাম কয়েকজন সাহেব এসে এখানে ঘর বেঁধেছিল; সামনের ঐ যে বরফে-ঢাকা পাহাড়টা (সেটা প্রায় ছ'হাজার ফুট উঁচু), সেখান থেকে বরফ খসে পড়ায় (আভালাঞ্চ্) বাড়ীশুদ্ধ চাপা পড়ে বেচারাদের ইহলীলা সাঙ্গ হয়। সামনে সেই বাড়ীর ভগ্নস্তূপ। আমরা গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে সেই স্তূপের উপর দাঁড়ালাম। চারিদিকে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ। দূরে বহু নীচে ছোট গুলমার্গ শহর দেখা যাচ্ছে। তারও বহু নীচে ঐ যে বিস্তীর্ণ কাশ্মীর উপত্যকা! আর বাঙ্‌লা দেশ? কলকাতা শহর? সে কোথায়! কত দূরে! কত নীচে!

চারিদিকে তাকিয়ে আনন্দের আতিশয্যে আমার হাত দু'টো ঊর্দ্ধে তুলে উপনিষদের ঋষির মত চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল, —"শোন শোন বিশ্বজন সবে, দেখেছি, দেখেছি আমি।" বিভূতিবাবুকে মনে পড়ল, ইচ্ছে হল চীৎকার করে ডাকি, "বিভূতিবাবু!" আহা বেচারারা এখন গালুডিতে বসে কালাজ্বরের উই-এর ঢিপির সৌন্দর্য্য দেখে দুঃখের সাধ ঘোলে মেটাচ্ছে। ঘোলও নয়, তার চেয়েও নিকৃষ্ট কিছু।

একটা জিনিস লক্ষ্য করে আশ্চর্য্য হলাম, নয় হাজার ফুট উঁচুতে গুলমার্গে ঐ দুর্জ্জয় শীত, কিন্তু বার হাজার ফুট উচ্চে খিলেনমার্গে শীত নেই বললেই হয়। বোধ হয় শুভ্রতা থেকে সূর্য্যের তাপ ঠিকরে পড়ে জায়গাটাকে উষ্ণ করেছে।

ফিরতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু থাকবারও উপায় নেই। পাঁচটার ভেতর টংমার্গে ফিরতেই হবে। টংমার্গ থেকে শেষ বাস ছাড়ে পাঁচটার সময়। তাড়াতাড়ি আমরা কয়েকখানা ফটো তুলে নিয়ে রওনা হলাম। কিন্তু ফেরার পথে হল মুস্‌কিল; নীচে নামবার মুখে বরফে অনবরত ঘোড়ার পা পিছলতে আরম্ভ করল। এ তো বড় মুস্‌কিল! সহিসরা পেছন থেকে বলল, 'ঘাবড়াবেন না'। আরে তোমরা তো বলে খালাস; এ-দিকে আমাদের অবস্থাটা বোঝ। যে-কোন মুহূর্ত্তে ঘোড়া পা পিছলে মুখ থুবড়ে পড়বে, আর আমরা ছিটকে গিয়ে গড়াতে গড়াতে যাব, সে-সম্ভাবনার কথা মনে করে না, যাবতে থাকা যে বড় শক্ত। যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত সহিসরা এসে ঘোড়ার লাগাম ধরতে খানিকটা সুস্থ হওয়া গেল ও কোন রকমে বরফের রাজ্য ছাড়িয়ে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

শ্রীনগরে এসে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা হতে আর বেশী দেরী নেই। [ আগামী বারে সমাপ্য

# জ্যোতিঃহারা

—শ্রীঅনুরূপা দেবী

## তৃতীয় অঙ্ক

### তৃতীয় দৃশ্য

মিঃ দত্তের বাড়ীর বারান্দা

রমেন্দ্র ও মৃণালিনী

মৃণা। ইস্কুল নিয়ে ছুটোতেই মেতে রইলো, নিজেদের কথা ভাব্‌বার ওদের সময় কোথায়? এদিকে ঐ বয়েন্দ্র-ছেষ্টার সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠতা নিয়ে পাঁচজনে, পাঁচ নয়, পঞ্চাশ কথাই রটাচ্ছে! সেদিন নবীনবাবু উকিলের বাড়ী গেলুম, ঠারেঠোরে কত কথাই না শোনালেন গিন্নি। ইস্কুলে মেয়ে দিতে বলায় স্পষ্টই বল্লেন, 'ইস্কুলে পড়ে তো ওই রকম আক্কেল-বুদ্ধি হবে?' আমাদের বাড়ী একদিন বেড়াতে আসতে বলায় মুখের উপর বলে দিলেন, 'কি করে আর যাই ভাই! যামিনীবাবু না হয় ভদ্দর লোক, অত যে যায় আসে তাতেও তবটা দোষ ধরি নে। কিন্তু ওই বাই-নাচ-দেওয়া, বওয়াটে জমিদারের ছেলে যে তোমাদের বাড়ী অত আসা যাওয়া করে, এ'তে ভাই,—আমাদের কি-রউ-ওলাঘর—আমরা যেতে পারিনে। আমার সব বড় বড় কুটুম, শুনলে তারা বলবে কি?'

রমেন্দ্র। তোমার বোন কি বল্লেন?

মৃণা। ওকে কেউ ধরে দু'ঘা মারলেও কি ও একটা জবাব দিতে জানে? আমি অবিশ্যি চুপ করে থাকি নি, যা' বলবার তা' বলেছি, কিন্তু বুকে হাত দিয়ে তো কথা কইতে হবে? কথাটা ত' আর একেবারেই মিছে নয়? অনি'কে বলতে, সে জবাব দিলে, 'সে সবই তিনি আমায় বলেছেন। বলেছেন, তাঁর অতীত—গৌরবময় অতীত—গত হ'তে বসেছিল; কিন্তু তিনি নিজেকে আমায় জেনে বুঝে পড়তে চান। তাইতে আমাদের সহায়তা ভিক্ষা করছেন। কেন করবো না? মানুষ যখন জলে ডোবে, তা'কে তুলতে পারলে 'রয়াল হিউম্যানিটী'র প্রথম মেডাল পাওয়া যায়, তার চাইতে বড় সম্মান সভ্যজগতে আর নেই। অথচ, যে পাপে ডুবছে সে যদি তোলবার জন্যে হাত বাড়ায়, তাকে ডুবতে দিয়ে পালিয়ে যাবো? এ'কেই বলো তোমরা ধর্ম্ম?'

ওর জানই তো সবদিকে হাটিহাড়া! এই সেদিন নিতাই মুচির বাপ-মা-মরা ছেলেটাকেই বাড়ীতে বসে মানুষ করবার জন্যে এক কাঁড়ি টাকা দিয়ে কি রাখলে; বল্লে, 'আহা! নীচু ঘরে জন্মেছে বলে ও কি মানুষও নয়? ও কি বেড়াল কুকুরেরও অধম?'

রমেন্দ্র। সে থাকগে, দয়া ধর্ম্ম করতে তো মানা করা হচ্ছে না, করুক না। পতিতোদ্ধার করাও খুব ভাল, কিন্তু সকল সময় নিরাপদ তো নয়। টেনিসনের সেই লাইনটা মনে আছে? "And the grossness of his nature will have weight to drag thee down!"

মৃণা। দেখ, তুমি এক কাজ করো, যামিনী বাবুকে স্পষ্ট করেই বলো, তাঁর স্ত্রীর মরার এক বৎসর তো পূর্ণ হয়ে গেছে। তিনি তো এখন অনায়াসেই ওকে বিয়ে করতে পারেন। তা' কই, সে রকম কোন চেষ্টাও তো তাঁর দিক থেকে দেখতে পাইনে?

(যামিনী প্রবেশ করিল; রমেন্দ্র উঠিয়া চেয়ার ছাড়িয়া দিয়া) তোমার কথাই এতক্ষণ হচ্ছিল।

যামিনী (সহাস্যে)। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে, এ রকম ঘটনায় দীর্ঘজীবী করে থাকে।

উভয়ে। আহা, তাই হোক, তাই হোক।

রমেন। দেখ, আমরা বলছিলুম কি, অনিমার সঙ্গে তোমার বিয়ের এখন তো আর কোন বাধাই নেই, অনর্থক দেরি করে ফল কি? আমাকেও হয় ত মুন্সেফির জন্যে শীঘ্রই দরখাস্ত করতে হবে, এখান থেকে ওকে আমরা সংসারী করে দিয়ে যেতে চাই।

যামিনী (প্রথমে চমকিয়া উঠিল, ক্ষণকাল গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া থাকার পর গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক)। সে হয় না রমেন! আমার মেয়ে রয়েছে, তার

প্রতি অন্যায় করা হবে। মেয়েই হোক পুরুষই হোক, বিয়ে কারু দু'বার হয় না।

মৃণা। কিন্তু ধরতে গেলে অনিমা আপনার বাগ্‌দত্তা-স্ত্রী। সে যখন সেইটেকেই ধরে রেখেছে, তখন তার প্রতি তো আপনার একটা কর্ত্তব্য আছে। সে কি আপনাকে ধ্যান করেই তবে তার এ জন্মটা কাটিয়ে যাবে? আর, উপায় থাকতেও আপনি তাই নিশ্চিন্ত মনে চেয়ে চেয়ে দেখবেন?

যামিনী (স্বগতঃ)। পিসিমাও তো মহা পিড়াপিড়ি লাগিয়েছেন। বলছিলেন, 'ও যে তোকে কতখানি ভালবাসে সে ওর মুখ দেখলেই বোঝা যায়। এখানে আসে—কান থাকে, চোখ থাকে ওর ঠাম ধরণার দিকে। তোর সাড়া পেলেই কেন মুখে চোখে আলো জ্বলে ওঠে।' এ সব সত্যি তা হলে? কিন্তু বিশ্বাস হয় না,—আশা করতে ভরসা হয় না,—তা ছাড়া একটা লজ্জাও করে! নলিনী বড় হয়ে যদি মনে কষ্ট পায়? নাঃ, অণিমার কাছে সে হয় ত সে কথা ভাববার সুযোগও পাবে না। (প্রকাশ্যে) কিন্তু যদি তোমাদের অনুমান সত্য না হয়? যদি তিনি আমার এ স্পর্দ্ধা দেখে বিরক্ত হন? —না না,থাক রমেন! ওঁর কাছের শ্রদ্ধাটুকু হারালে···আমার সে সইবে না।

রমেন। তুমি পাগল যামিনী! আমার মুখে শোন নি কি, তোমার সঙ্গে বিয়ে ভেঙে যাবার পর আর শত চেষ্টাতেও তিনি ওকে বিয়ে করতে রাজী করাতে পারেন নি। এই দেখ, মিহিরকে আমি বিলেতে চিঠি দিয়েছিলুম, সে খুব খুসী হয়েই মত দিয়েছে (পত্রপ্রদান)।

যামিনী (মনে মনে পত্র পাঠান্তে প্রত্যাবর্ত্তন, স্বগতঃ)। ওঃ ভগবান! এত বড় সৌভাগ্য কি সত্যই আমার জন্য সঞ্চিত ছিল? কিন্তু যদি সে-ই দিলে, তবে কেন এত বড় একটা ধাপ্পা দিয়ে দিলে প্রভু? সুলতাকে ভাল আমি না বাসতে পারি, কিন্তু তার শোচনীয় পরিণাম তো কোন দিনই ভুলতে পারবার নয়। (প্রকাশ্যে কুণ্ঠাসহ) তুমিই তা'হলে ধরবার করো ভাই। আমার···

অনিমা (নেপথ্যে) মিলি! তুই কোথা ভাই?

যামিনী। (ত্রস্তে উঠিয়া) আমি একটু ঘুরে আসছি রমেন! এখুণি আমি দেখা করতে পারব না। (প্রস্থান)।

মৃণা। বেচারী! আনন্দে দিশাহারা হয়ে পড়েছে!

অনিমা। (প্রবেশ করিয়া) আজ্ঞা জামাইবাবু! হার্ম্মাট স্পেনসর যে তাঁর স্কুল প্রিন্সিপ্যালে বেঁধেছেন—

মৃণা। দোহাই তোর অণি! যোড়হাত করছি তোর কাছে, আজকের দিনে আর ও সব ভীষণ ভীষণ নাম মুখের গোড়ায়ও আসতে দিস্‌নে! শুনলে প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হয়, জীবন যেন দুর্ব্বহ হয়ে ওঠে! বে', আয়, বোস্ দেখি, দুটো অন্যের সুখ-দুঃখের কথা কই।

অনিমা। (আসন গ্রহণ করিয়া) জামাইবাবু কি তোকে হীরের দুল কিনে দিয়েছেন, আর মুক্তোর মালা দিতে রাজী হন নি?

মৃণা। সে কি রে? এমন আজ্‌গুবি খবর তোর কাছে কোন্ 'রয়টার' রটালে?

অনিমা। কেউ না, ওই যে, সুখ-দুঃখের কথা কই, না কি বলি কি না,—তাইতে ভাবলুম!

মৃণা। আহাগো! ও ছাড়া যেন আমার আর কোন সুখ দুঃখ থাকতে নেই? তুমি তো দুনিয়ার ভাবনা ভাবছো, নিজেরটি ছাড়া; কিন্তু তোমার একটা ব্যবস্থা না করে তো আর ইনি মুক্তিই নিতে পারবেন না।—সেই সম্বন্ধে কোন কথাই কি কইবার নেই? তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন কথা কইতে গেলেই তো তুমি তাড়া দিয়ে যাও।

অনিমা। তা' আমার ব্যবস্থাটা কি স্থির করেছ শুনি? চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেবে, না শ্বশুরবাড়ী?

মৃণা। আঁধারে! কি আমার চিড়িয়া! তবে, হাঁা, শ্বশুরবাড়ী নাই হোক, স্বামীর ঘরেই পাঠাতে চাই। সন্ন্যাস ত্যাগ করে তুমি এইবার গৃহিণী হও। ভগবান নিজে যখন তোমার ঘর বর তোমাকেই ফিরিয়ে দিলেন, তখন তাঁর সে দান প্রত্যাখ্যান করবার অধিকার তোমার নেই। যামিনীর সঙ্গেও আমাদের কথা হয়েছে, সে বেচারী ভয় করছিল যদি তুমি তাকে প্রত্যাখ্যান করো ত।

অনিমা। মিলি! মিলি! তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি দিন দিন লোপ পাচ্ছে। আমার সঙ্গে কথা না করে ওঁকে এ সব কথা তোমরা বলতে গেলে কেন?

মৃণা। এর আবার কথা কইবার কি আছে রে? যার জন্যে সর্ব্বত্যাগী হয়েছিস, তাকে পেয়ে জীবন ধন্য কর, মাতৃহীনার মা হ', নিজেরা সুখী হ' আমাদেরও সুখী কর।

অণিমা। (মাথা নাড়িয়া মৃদু হাসিল, মুখ অত্যন্ত ম্লান। বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে পত্র আনিয়া সম্মুখে ধরিল, বলিল, "আপনার ভেবে যে নেছি থা, বিলাইতকা ডাকসে এহি চিট্ঠি আয়া।" পত্র লইয়া খুলিয়া সাগ্রহে পড়িতে পড়িতে গম্ভীর মুখে)। মিসি! জামাইবাবু! পড়ে দেখ (পত্র মিসির গায়ে ফেলিয়া দিল)।

রমেন্দ্র। (পত্র লইয়া প্রথমাংশ মনে মনে, পরে উচ্চ-কণ্ঠে পাঠ)…"যামিনীপ্রকাশ বাবুর সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাবের সম্বন্ধে নূতন করে আমার মতামত দেবার তো কিছুই নেই! এ প্রশ্নের উত্তর তো বহু পূর্ব্বেই দেওয়া হয়ে গিয়েছিল! তার পর, অণি! ছোট্ট বোনটী আমার! আমরা দুজনে যে চির-কৌমার্য্য নিয়ে দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করবার প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, এখন অনেক ভেবে দেখলুম, সে আমাদের মহা ভুল। বিবাহ-বন্ধন জগতের একমাত্র পবিত্র-তম বন্ধন! এতে কত নরনারী তার ক্ষুদ্র স্বকে বিকাশ করবার অবসর লাভ করে। এই বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একত্রিত করে, অবিচ্ছিন্ন ও পরিপূর্ণ করে দেয়। বিবাহ ব্যতীত সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হতে পারে না। মানুষ মনুষ্যত্বে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না! বিবাহ মানব-সমাজের পক্ষে একান্ত কল্যাণকর, বিশেষতঃ এ রকম যোগ্যতম নর-নারীর সম্মিলন!"—কেন কি হয়েছে?

অণিমা। এর মানে কি আমি জানতে চাই! দাদা এ রকম চিঠি কেন লিখলে?

রমেন্দ্র। প্রথমতঃ, এর মানে কিছুই গূঢ় নয়! দ্বিতীয়তঃ, মিহির যা লিখেছে, তা' তার লেখা উচিত বলেই সে লিখেছে। এই দেখ না, আমাকে তো ঠিক ওই সব কথাই লিখেছে সে, এবং তার জন্যে অপেক্ষা না করে এই শুভ কার্য্যটী সুসম্পন্ন করবার অনুমতি পর্য্যন্ত সেই সঙ্গে দান করে ফেলেছে। (পত্র প্রদান করিল)।

অণিমা। (পত্র লইয়া পড়িল, তার বুক উঠিতে পড়িতে লাগিল, ক্ষণকাল নতমুখে থাকিল, তার পর মুখ তুলিয়া দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করিল) অসম্ভব!

রমেন্দ্র। কি ছেলেমানুষী করচো? ভাল কথা, জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি যামিনীকে পছন্দ করো না? সকল কাজেই তার সাহচর্য্য চাও, অত বন্ধুত্ব, তবে বিয়ে করবে না তাকে কেন শুনি?

অণিমা। (বহুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) আমি আপনাদের বুঝিয়ে বলতে পারবো না! আমায় মাপ করবেন, কিন্তু, কিন্তু জেনে রাখুন সে অসম্ভব! সে সম্ভব নয়—নয়—নয়!

(দ্রুত প্রস্থান)

রমেন্দ্র। (পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করিয়া) মিসি! কি ব্যাপার?—মূর্ছায় বজ্রপাত?

মৃণা। অ্যাঁ? না, না।

রমেন্দ্র। (গম্ভীর মুখে) না নয়, হাঁ—তা ছাড়া আর কি হতে পারে?

যামিনী। ('রমেন'! বলিয়া ডাকিয়া প্রবেশ করিল) এ রকম করে রয়েছ যে? কি—কি হয়েছে রমেন? মিসেস্ দাস! আপনাকেই বা এমন দেখাচ্ছে কেন? কোন কিছু—

রমেন। (গাঢ়স্বরে) প্রকাশ! নিজের অবিমৃষ্যকারিতায় অনর্থক তোমায় মনে দুঃখ দিলুম! তোমার সন্দেহই সত্য, আমারই ভুল! সে তোমায় ভাল বাসে না।

যামিনী। (আর্ত্তস্বরে) রমেন! আমার স্বপ্ন ভেঙে দিলে! (দুই হাতে মুখ ঢাকা দিয়া মুহ্যমান ভাবে বসিয়া পড়িল)।

(যবনিকা পতন)

## চতুর্থ অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

### ইন্দ্রনাথের বাটী

(অমলা ও জ্যোৎস্না, সেলাই-এর কল খোলা, কাটা কাপড় পড়িয়া আছে)

অমলা। আচ্ছা জ্যোৎস্না! তোর কি হয়েছে বল তো? রাতে ঘুম নেই, দিনে খাওয়া নেই, মুখে হাসি নেই, অত যে সেলাই মেশার ঝোঁক ছিল, সব চলে গেছে! মুখ দেখলে মনে হয় কাঁদছিলি, বিয়ের তো এখনও দেরী আছে, এখন থেকেই এই করছিস! রোগে পড়ে যাবি যে!

জ্যোৎস্না। (কাঁদিয়া) বলছি তো সমানেই,—আমার বিয়ে দিও না। দিলে, রোগ কি, আমি মরেই যাবো! (মুখ লুকাইয়া কান্না)।

অমলা। (সবিস্ময়ে) তোর হয়েছে কি? মরেই যা' যাবি কেন তবু তবু! অমন ভাল ঘর বরে পড়ছিল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, দেখতেও খাসা; স্বভাব-চরিত্র সবই ভাল। তোকে তার খুবই মনে ধরেছে। কেমন সুখে থাকবি বল্‌তো। তখন আবার হয়ত তাকে ছেড়ে আসতেও চাইবি নে'। নে', নে', এই ষ্ট্রাউজটায় বেশ ভাল করে একটা এমব্রয়ডারি কর্ দেখি।

জ্যোৎস্না। আমার ভাল লাগে না। দিদি। তোমার পায়ে পড়ি, যদি আমায় চাও, এখনও এ বিয়ে বন্ধ করো।

অমলা। (গম্ভীর স্বরে) কেন বল দেখি?

জ্যোৎস্না। জানিনে—আমি বলতে পারব না।

অমলা। (চিন্তিত থাকিয়া) কিন্তু তাও কি সম্ভব? জ্যোৎস্না! হয়ত আমি বুঝতে পেরেছি, হয়ত পারিনি; কিন্তু তাই যদি হয়, তুমি কি ভেবেছ, একে তুমি পাবে? তুমি হয়ত জানোও না, এক সময় ওর বাবা তোমার বউ করতে খুব আগ্রহের সঙ্গেই চেয়েছিলেন, আমিই মত করিনি। কেন করিনি জানো? ওর সমস্ত মন প্রাণ ওই মিস ঘতের,—ওই অণিমার। আমি জানতেম, ওর স্ত্রী যে-ই হবে, সে সুখী হ'তে পারবে না! সেই ভয়েই আমি আমার একমাত্র ছোট বোনকে অতবড় প্রার্থিত পাত্রেও দিতে চাইনি। আর আমার সে আশঙ্কা যে অমূলকও নয়, তার প্রমাণ স্পষ্টই হয়ে গেছে।

জ্যোৎস্না। কিন্তু তার জন্যে সুশো-বৌদি'ই সম্পূর্ণ দায়ী।

অমলা। সম্পূর্ণ নয়, তবে অনেকটাই। ভালবাসার মনের হিংস্র পশু বশ হয়, আর নিজের বিবাহিতা স্ত্রী একটুও হয় না? প্রকাশ তাকে ভালবাসে নি। প্রকৃত ভালবাসা পেলে সে হয়ত অতটা উদ্ধত হয়ে উঠতো না! শোন জ্যোতি! সে-দিন যা' তোমায় মঙ্গল ভেবে দিতে পারি নি, আজ আর হয়ত তা' দিতে পারবও না। আর দিলেও তুমি সুখী হ'তে পারবে না।

জ্যোৎস্না। (নত মুখে) দিদি! এ সংসারে সবাই কি সুখীই হয়? তুমি কি খুব সুখী?

অমলা। তার আর উপায় কি? ভগবানের মারে যে মরেচে, তা'কে তো তাও সইতেই হবে। কিন্তু তুমি জেনে শুনে এ'কি সোড়াকপাল ঘটাচ্ছো! একটা আশা তো লোকে রাখে? এমন দুর্ব্বুদ্ধি তোর কেন হলো?

জ্যোৎস্না। দিদি! কিছু মনে করো না, বিনয় বাবুকে তুমি কি ভুলে গেছ?

অমলা। ওঁকে ভুলে যাবো জ্যোতি! (রুদ্ধকণ্ঠে) সেদিন নিজেকেও ভুলে যাবো।

জ্যোৎস্না। দিদি! তা' হলে বলি, তুমি যদি ওঁর স্মৃতি নিয়ে জীবন কাটাতে পারো, আমিই বা না পারবো কেন? হয়ই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা আমরা পাই, তবু আদর্শ আমরা কি ফুটাতে পারি? এখনো আদর্শের জন্যে সতী স্ত্রী আগুনে প্রাণ দিত, সতীত্ব রক্ষার জন্যেও পুড়ে মরতো। তাছাড়া এই সেদিন পর্য্যন্ত কুলীনের মেয়েরা কি করেছে? কত দিনান্তরে স্বামীর দর্শন পেতো কি পেতো না, তবু সেই আশা করে, তাইই ধ্যান করে জীবন কাটাতো। আমায় তুমি যেমনটা ভাবতো, কিন্তু না হয়ে আমি করবো কি? বিয়ে আমি করতে পারবো না। কেন তোমরা ছোট থেকে আমার মনে ঢুকতে দিয়েছিলে যে উনিই— (নীরব)

অমলা (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে)। একথা তখন কেন বলিস্ নি? হতভাগি! আমিই যে তোর সর্ব্বনাশ করেছি! তাহলে এখন উপায়?

ইন্দ্রনাথ (নেপথ্যে)। অমলা মা! তুমি কি ওঘরে? (প্রবেশ করিলেন) দেখ মা! দিন তো আর বেশী নেই, যা' করতে হয় সব তুমিই মা, দেখে শুনে করে নিও। তোমার গর্ভধারিণীতো কিছুর মধ্যেই নেই! ছোট মা আবার কি করছেন? আমার জামাইএর জন্যে বেশ ভাল করে একখানি রুমাল সেলাই করিও তো মা, ওঁকে দিবে। জীবনের প্রথম দান, বেশ একটি ছোট আর পবিত্র দেখে লোক ওতে সেলাই করে দিও। কি দেওয়া যাবে বল দেখি? আচ্ছা, আমি একটুখানি ভেবে বলবো। আচ্ছা দেখে তোমরা কাজ কর্ম সারো, মনটা আবার বহু দিন পরে যেন একটু আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে! এইটুকুই তো আমাদের দুর্ব্বলতা মা! এইটুকুই আমাদের দীনতা! (চলিতে চলিতে) "দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ",—আঃ তা' আর হ'তে পারলাম কই?—কই আর তা' হতে পারলাম? (প্রস্থান)

অবলা। ( কাঁদিয়া ) ওরে অভাগি! এতবড় সাধে ওঁর এমন করে বাদ সাধলি তুই! ( মুখ চাকিয়া ) না, না, আমি পারবো না,—আমি বলতে পারবো না,—নিজে একবার বুকের এক দিকটা কেঁড়েছি, আর একটা দিকও যে আবার নতুনছিরে ভেঙে গুঁড়িয়ে দোব, তা পারব না! যা' ভাল বুঝিস তুই কর্‌গে যা'।

( প্রস্থান )

জ্যোৎস্না। দিদির স্নেহের অন্ত নেই! মার বাড়া দিদি আমার! সেই দিদিকে আজ কি দুঃখই না দিতে হল! তা' এও ওরই কর্ম্মফল! যাক এখন নিজেকেই নিজের পথ করে নিতে হবে। তা' ছাড়া আর উপায় কি?

( প্রস্থান )

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### বালিকা-বিদ্যালয়ের নূতন গৃহ

(প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ও অণিমা)

অণিমা। দেখুন, মেয়েদের বেশ করে বলে দেবেন যে-দিন মেম আসবেন, মেয়েরা যেন ওরকম সং সেজে না আসে। শুধু একটী সাদা সাড়ী ব্লাউজ পরে, চুলটী আঁচড়ে এলেই হবেই! আজ মেয়েরা সব কি অদ্ভুতভাবে সেজে এসেছিল, বলুন দেখি? যার যত অলঙ্কার ছিল ঘরে আছে, কিছুটী আর কেউ বাকি রেখে আসেনি! মায় বারোদের বিয়ের বেনারসী সাড়ীগুলি শুদ্ধ! মেম যখন হেসে বল্লেন, "মেয়েরা স্কুলে এসেছে না 'বলে' এসেছে?"—আমার এত লজ্জা করছিল।

প্র-শি-। কি করি বলুন তো? ওদের হাজার বলি, ওরা শোনে না। ওদেরই বা দোষ কি, মায়েরা বলেন, "ওমা সে কি, পাঁচজন আসবে, মেয়েরা একটু সেজে গুজে যাবে না?" এই দেখুন না, চরকা, তাঁত শেখানোর ব্যবস্থাতে মেয়েরা খুসী হয়েছে, কিন্তু মায়েরা ঘোর অসন্তুষ্ট। তাঁরা বলেন, স্কুলে মেয়ে দিলুম লেখা পড়া শিখতে, তা' না, ঘানর ঘানর করে চরকা কাটবে, এ' আবার কি ঢং?

অণিমা। একদিন সকলেই বুঝতে পারবেন, এই চরকা কাটার কি প্রয়োজনীয়তা! আচ্ছা, মিসেস্ গুহ! যে-মেয়ে দুটী তলোয়ার খেলা শিখছে, তাদের একবার ডাকুন তো, কি রকম হচ্ছে দেখি। অন্য সব মেয়েদের লাঠি খেলা দেখে মেম খুব খুসী হলেন, এদের একটু অসম্পূর্ণ আছে বলেছিলেন বলে আর ওঁর সামনে দেখাতে বললেম না।

(প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর প্রস্থান ও ক্ষণপরে দুইটী কিশোরীর সহিত পুনঃ প্রবেশ)

অণিমা। অনসূয়া! চপলা! তোমরা তলোয়ার খেলা কি রকম শিখলে, একটু দেখাও দেখি।

(উভয়ের শাণিত কুকরী হাতে পরস্পরকে আক্রমণ এবং নানাবিধ কৌশল প্রদর্শনান্তর চপলার পরাভব প্রাপ্তি)।

অণিমা। বাঃ! বাঃ! বেশ সুন্দর হচ্ছে! মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্যে এই সব শিক্ষা বিশেষ ভাবেই পাওয়া দরকার! মেয়েদের যে 'অবলা' বলা হয়, সে বলের চর্চ্চা তাঁরা করেন না বলেই, নইলে গরীবের ঘরের মেয়েরা বেশীর ভাগই বেশ সবলা সে সবাই দেখতে পায়। তা ছাড়া ইউ-পি, পাঞ্জাব, বেহার, দাক্ষিণাত্য, বার্ম্মা সর্ব্বত্রই নারী শক্তিমতী, কেবল আমাদের এই বাংলা দেশেই নারীশক্তি খর্ব্ব হয়ে পড়েছে! আর সে আমাদেরই একান্ত অবহেলার পাপে। আবার তাকে জাগাতে হবে, আবার মহাশক্তির আরাধনায়,—তন্ত্রোক্তম: যোগমায়াকে নিজ নিজ জীবনে জাগ্রত করে তুলতে হবে,—তবেই বাংলার ভবিষ্য পুরুষ সর্ব্বশক্তিমত্তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করবেন!

প্র-শি-। আপনার দৃষ্টান্ত যদি অন্যান্য স্কুল-কলেজ গ্রহণ করে, তাহলে কাজ শীঘ্রই এগিয়ে যাবে। আচ্ছা, এখন তা' হলে আমি বাকি হিসাবটা নিয়ে আসি। মেয়েরা! তোমাদের এখন ছুটী।—আপনি একবার এই খাতাপত্রগুলো ততক্ষণ দেখে রাখুন,—হিসাবটা তৈরী করেই আমি নিয়ে আসছি।

( নমস্কার করিয়া মেয়েদের সহিত প্রস্থান )

অণিমা। (টেবিলের সামনে চেয়ারে বসিয়া খাতা খুলিল) বুধাদের দশ হাজার, আমার দশ হাজার—এই বিশ হাজার টাকা নিয়ে, আশার অতিরিক্ত কাজ করতে পারা যাচ্ছে। ভাগ্যে ওঁকে সহায় পেয়েছিলুম! জমি, বাড়ী, গুখানা গুদ্নি-বাস, যা' কিছু দরকার সমস্তই তো জোগাচ্ছেন,—বড় লোকের ছেলে সব্বাই যেন অম্নি হয়! কি চমৎকার লোক!

( নেপথ্যে বরেন্দ্রকৃষ্ণ )। আমি আস্‌ছি। (প্রবেশ)

অণিমা। (উঠিয়া হাসিমুখে) আসুন, আর একটু আগে এলেই মেয়েদের ওরোয়াল খেলা দেখতে পেতেন। বেশ সুন্দর শিখেছে।

বরেন্দ্র। (উৎফুল্লকণ্ঠে) আপনার অধিষ্ঠান যেখানে, সেখানে কোন কিছুই কি অসুন্দর হ'তে পারে? সৌন্দর্য্য ও শোভনতা আপনা হতেই যে ঘরে পড়তে বাধ্য হবে!

অণিমা (সহসা এভাবের কথায় বিস্মিত এবং বিরক্ত ভাবে মুখ নত করিল ও মনে মনে বলিল)। লোকটি একটু বেশী রকম ভাবপ্রবণ! উচ্ছ্বাস এলে শিষ্টাচারের সীমা ঠিক রাখতে পারে না। গ্রাম্য সরলতা বোধ হয়!

বরেন্দ্র। (স্বগত) এই বেলা দিয়ে দিই, অনেক কষ্টে আজ একটুখানি একলা পেয়েছি। (প্রকাশ্যে) কল্‌কাতায় গেছলাম, আপনার জন্যে এই সামান্য একটা উপহার এনেছি। আপনি দয়া করে এটা গ্রহণ করুন! (একটি ভেলভেট কেস টেবিলে রাখিল)

অণিমা। (সকৌতূহলে উন্মোচন করিয়া সবিস্ময়ে) সামান্য! অন্ততঃ চার পাঁচ হাজার টাকা এর দাম! আপনি কি পাগল হয়েছেন, মুখার রাধাচরণ? এত দামী কমলহীরের নেকলেস! এ আমায় দিচ্ছেন কেন? আর আমিই বা তা' আপনার কাছ থেকে নেবো কেন?

বরেন্দ্র। (আরক্ত মুখে) দিয়ে যদি কৃতার্থ হই,—যদি জন্ম প্রাণ সব সার্থক মনে করি,—

অণিমা। পাগল! দিয়ে কৃতার্থ হতে চান? তবে কাচ নয়,—পাথর নয়,—অন্য কিছু,—বস্তু দিন্। ঐ পাঁচ হাজারে,—পাঁচ পাঁচটী ডোবা সংস্কার করুন, পঞ্চাশটি ছাত্রের শিক্ষার ভার নিন্। জীবন সত্যই সার্থকতায় পরিপূর্ণ হবে। ধনজন চরিতার্থ হবে। আমি কে?

বরেন্দ্র (উত্তেজিত কণ্ঠে)।—বরং বলতে পারেন,—যাদের কথা বল্‌লেন, তারা আমার কে'? এই যে অযাচিত হয়ে যার জন্যে যা' বলেছি, আপনার আদেশ পেলে এখনও সর্ব্বস্ব ঢেলে দিতে প্রস্তুত আছি, সে সব কা'র আনন্দের জন্যে? আমার? না, আমি তাদের কথা কোন দিনও ভাবি নি,—আজও ভাবছি না। আমি জানি, আপনি এসবে সুখী হবেন, আর সেইই আমার পরম সুখ, চরম প্রাপ্তি। তার বেশী আমি কিছুই চাইনি,—কিছুই চাইও না।

অণিমা (ক্ষণকাল স্তম্ভিত থাকার পর)। তা'হলে আপনাকে আমি যতদূর ভাল ভেবেছিলাম, ততটা আপনি নন? লোকে যা বলতো,—অর্থাৎ এই সততা-প্রকাশের মধ্যে আপনার অসৎ উদ্দেশ্য নিহিত আছে, সে কথাও তবে কি মিথ্যা নয়? থাক্, আপনি আজ যে সব কথা বল্লেন, এর পর আর আমাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ঘটতে পারে না,—(উঠিতে গেল)।

বরেন্দ্র। (সকাতরে) এতটা অবিচার করবেন না, আমায় দয়া—দয়া করুন।

অণিমা। (দাঁড়াইয়া) বিচার আমি আপনার নিজের কথা দিয়েই করেছি মাত্র! আপনাকে দয়ালু, বেশতক ভাল লোক ভেবেই কথা কই, সামনে বার হই। আজও যদি সে বিশ্বাস আমার সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যেত, তাহলে এতক্ষণ এখানে অপেক্ষা করতুম না। যাক, আমার ভুল হয়নি, আপনি নিজেকেই ভুল বুঝেছেন! মহৎ কার্য্যের উদ্দেশ্য কখনই অত ছোট হতে পারে না। কিন্তু যাক, এ সব আলোচনা আর না। ওটা নিয়ে যান, ওসব আমায় দেবেন না, যদি দিতে চান, দেবেন আপনার সহৃদয় সহায়তা, যা' দিয়ে আমরা আমাদের অভাগা দেশের মন্দভাগ্য ছেলেমেয়েদের সৌভাগ্য-রত্ন সংগ্রহ করতে পারবো! নমস্কার, আমি এখন আসি। (প্রস্থান)

বরেন্দ্র। "বৃথা চেষ্টা, বৃথা আকিঞ্চন।" না না, না, আশা ছাড়তে পারব না। সব ছেড়েছি, যখনকে ভালবাসতাম,—তাকে ছেড়ে দিয়েছি। মন যেতে সুরু করেছিলো। এক মুহূর্ত্তের ইচ্ছায় তা' ছেড়েছি,—কুসুমকেও প্রায় ছাড়ো-ছাড়ো। কিন্তু ওকে পাবার আশা আমি কিছুতেই ছাড়তে পারবো না। ( প্রস্থান )

[ ক্রমশঃ

# উৎসবে জাতীয়তা

—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আবার মহাপূজা আসিল। সকলেই বলিতেছেন, মা আনন্দময়ীর পূজা আসিল। এই মহাপূজায় একটা আনন্দ পাওয়া যায়। ভক্ত সাধক যে আনন্দ পূর্ণমাত্রায় লাভ করেন, অভক্ত সাধকও সে-আনন্দ কতকটা প্রাপ্ত হন। ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন যে, আনন্দ হইতেই জগতের উৎপত্তি। পরম ব্রহ্ম আনন্দময়। শ্রুতি বলেন, "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।" ব্রহ্ম আনন্দময়, সুতরাং সেই ব্রহ্মের শক্তিও আনন্দময়ী। তাই আমরা মা দুর্গাকে আনন্দময়ী বলি। লৌকিক হিসাবেও দুর্গার পূজা আনন্দময়ীর পূজা। এ-পূজা আনন্দদায়ক। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বজগণ সে-আনন্দ যে-ভাবে উপভোগ করিয়া গিয়াছেন, আমরা এখন সে-ভাবে সে-আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছি না। মূল-শিকার আমাদের মন অতিমাত্র সন্দেহপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের কোন বিষয়ে আস্থা নাই—আসক্তি নাই; সকলের এবং সর্ব্ববিষয়ে আমাদের মন বিষাক্ত। তাই আমরা আনন্দময়ীর পূজায় সে-আনন্দ সাকল্যে উপভোগ করিতে পারি না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের চিত্ত ছিল একনিষ্ঠ; ভক্তি ছিল অচলা। তাই আনন্দময়ী দুর্গার পূজায় তাঁহারা উহার পূর্ণ আনন্দ ভোগ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের সে নিষ্ঠা নাই, চিত্তের সে দৃঢ়তা নাই—কাজেই আমাদের আনন্দ খণ্ডিত এবং তরল হইয়া থাকে। তাই আমরা বিক্ষিপ্ত-চিত্তে চারিদিকে বায়ু-চালিত তূলার ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াই।

কিন্তু সংসারে আনন্দের একটা মূল্য আছে। আনন্দ মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করে, আনন্দ জাতীয়তা পোষণ করে, আনন্দ ইহকালের এবং পরকালের সম্পদ্ বৃদ্ধি করে। নিরানন্দ জীবের জীবন দীর্ঘ হয় না, নিরানন্দ জাতির জাতীয়তা-বোধ ক্ষীণ হইয়া পড়ে—নিরানন্দ লোক ঐহিক এবং পারলৌকিক কোন সাধনাতেই সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রত্যেক জাতি তাহাদের জাতীয় উৎসবের আনন্দের ভিতর দিয়া আপনাদের জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ইতিহাসের আলোক অতীতের দিকে যতদূর বিকীর্ণ হইয়া আছে, তাহাতে মনে হয় যেন মানব-সমাজে সকল লোক এবং সকল জাতির মধ্যে উৎসবের ( festival ) আনন্দ ভোগ করিবার ব্যবস্থা আছে। উৎসবহীন মনুষ্য-সমাজ কখনই ছিল না, এখনও নাই, পরেও বোধ হয় থাকিবে না। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমক সমাজে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট উৎসব ছিল। ইহুদি এবং খৃষ্টানদিগের মধ্যে অনেকগুলি উৎসব ছিল এবং রহিয়াছে, সেগুলি প্রায় ধর্ম্মসম্পর্কিত। যথা, খৃষ্টানদিগের Sabbath সপ্তমদিন বা বিশ্রাম দিন। ঐ দিন যা উৎসব এখনও অনুষ্ঠিত হয়, সেই জন্য খৃষ্টানরা প্রতি সপ্তম দিনে অর্থাৎ প্রতি রবিবার কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম লাভ করেন, এবং উপাসনার জন্য ভজনালয়ে যাইয়া ভগবানের আরাধনা প্রভৃতি করিয়া থাকেন। ঐদিন ভোজনানন্দও হইয়া থাকে। ইহুদীদিগের Passover উৎসব, অতীত যুগে মিশর হইতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রয়াণের স্মৃতি-জড়িত আনন্দোৎসব। ইহার সাত সপ্তাহ পরে হয় Penticost উৎসব। খৃষ্টানদিগের মধ্যে উহাই Whitsuntide উৎসব বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ঐ সময়ে পবিত্রাত্মা ( Holy Ghost ) দিয়াই শৈলে মূসার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া তাহার বিধানগুলি প্রকাশ করিয়াছিল। সেই জন্য ঐ দিন ইহুদী এবং খৃষ্টান উভয়ের পক্ষেই আনন্দের দিন। ইহুদীদিগের Feast of Tabernacle অষ্টাহ-ব্যাপী আনন্দোৎসব। এই সময়ে ইহুদীরা ধর্ম্মোৎসবের সহিত অনেক আনন্দোৎসব এবং ভোজনোৎসব করিয়া থাকে, দানাদি কার্য্যও করে। ইহা ইহুদীদিগের দুর্গোৎসব বলিলেও বলিতে পারা যায়। ইহুদীদিগের এইরূপ বহু উৎসব ছিল এবং আছে। খৃষ্টানদিগের ইস্টার পর্ব্বও ঐরূপ উৎসব। শুক্রবার দিন যীশুখৃষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হইয়াছিল; তাহার পর রবিবারে যীশুখৃষ্টের পুনরুত্থান ঘটে। ঐ দিনই হইল 'ইস্টার ডে'। অত্যন্ত প্রাচীন কাল হইতে এই উৎসবটী চলিয়া আসিতেছে। ইহা ইয়োরা ( Ostora ) বা ওস্তারা নামক স্যাক্সন দেবীর

উৎসব হইতে চলিয়া আসিতেছে এরূপ অনুমানও কেহ কেহ করিয়া থাকেন। এপ্রিল মাসে বসন্ত সমাগমে উদ্ভিদ্ সকল মুঞ্জরিত হয়। জীবকুল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। সেই জন্য প্রাচীন স্যাক্সনগণ এই উৎসব করিত। যে মাসে সেই উৎসব হইত, সেই মাসের নাম ছিল Ostermonath। তখন এই উপলক্ষে স্যাক্সন জাতি চ্যাপ্টির পিষ্টক এবং নানাপ্রকার পিঠা ( pudding ) করিয়া খাইত। তাহার পর এই উৎসব খৃষ্টানদিগের অভ্যুত্থান-উৎসবের সহিত মিলিত হইয়া আপনার বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছে। যাহা হউক, এই সকল উৎসবের পরিচয় প্রদান আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমি দেখাইতে চাহি যে, পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে ধর্ম্মানুষ্ঠানগত উৎসব চিরকালই বিদ্যমান রহিয়াছে। উৎসব জাতির জীবন-ধারাকে বিশেষ ভাবে নিয়মিত এবং নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

আমাদের হিন্দু সমাজে এই দুর্গাপূজা কতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা ঠিক করিয়া বলিবার কাহারও সাধ্য নাই। প্রাচীন ঋগ্বেদেও দুর্গা দেবীর উল্লেখ আছে। দেবী-সূক্ত দুর্গারই সূক্ত ইহা প্রাচীন-পন্থীদিগের মত। চণ্ডীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুরথ এবং সমাধি উভয়েই দুর্গার আরাধনাকালে দেবী-সূক্ত জপ করিয়াছিলেন। রাত্রি-সূক্তও দেবী দুর্গার স্তব বলিয়া শুনা যায়। রাত্রি-সূক্তে বলা হইয়াছে।

ত্বোষধি আয়তো দেবীং সংপাং হন্তু চতিরাম্
সংবৎসরস্যিবাং দুর্গাং আহ্যেবনে হুবেমহম্। ৫।

ভারতের অন্যান্য স্থানে এই সময় নবরাত্রির ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শরৎ কালে শুক্লা প্রতিপদ হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত নয় দিন ও নয় রাত্রি সাধক হিন্দুরা সংযতচিত্ত হইয়া দেবী-সূক্ত এবং রাত্রি-সূক্ত পাঠ করিয়া থাকেন; কেহ কেহ চণ্ডীপাঠও করিয়া থাকেন শুনিয়াছি। অর্গলা স্তোত্র প্রভৃতি এই সময়ে পঠিত হয়। ইহারা মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা করেন না। প্রতিষ্ঠিত দেবীমূর্ত্তির সান্নিধ্যে এবং পীঠস্থানে দেবীর স্তবাদি পাঠ করেন। ইহা দুর্গা পূজারই প্রকার-ভেদ বলিয়া আমার ধারণা। দেবীর মূর্ত্তি স্থানভেদে ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। যথা:—উড়িষ্যা, কলিঙ্গ, মধ্যদেশ, অযোধ্যা, সুরাট প্রভৃতি অঞ্চলে দেবী অষ্টভুজা; শ্রীহট্ট, কোশল, মহেন্দ্র ও হিমাচল প্রদেশে অষ্টাদশভুজা; গৌড়, মারহট্ট, হস্তিনাপুর এবং দক্ষিণ অঞ্চলে দেবী দশভুজা; মথুরা, কেদার এবং বিরাট প্রভৃতি দেশে দেবী ষোড়শভুজা। মেষশাবকের সান্নিধ্যে পূজিতা মূর্ত্তির ঠিকমত পরিচয় পাওয়া কঠিন। কিন্তু সে যে-মূর্ত্তিতেই হউক, দুর্গাপূজা অতি প্রাচীন।

এই পূজার দ্বারা ভক্ত তাঁহার ভক্তি-প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত করিয়া লয়েন, সাধক সাধনাপথেও অগ্রসর হইয়া থাকেন। আবার সাধারণ মানব ভক্তির সহিত নানাবিধ আনন্দ উপভোগ করিয়া সংসারপথে অগ্রসর হইয়া থাকেন। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের যেমন আনন্দ চাই, জাতীয় এবং সামাজিক জীবনে সেইরূপ ভাবে আনন্দ উপভোগ করা আবশ্যক। নতুবা জাতীয় জীবন সমাক্‌ভাবে স্ফূর্ত্তি পাইবে না। জাতীয় সমষ্টি ও উৎসবের ভিতর দিয়া মানুষ যদি সমজাতীয় আনন্দ উপভোগ করে, তাহা হইলে তাহাদের সকলেরই মনোবৃত্তি একই ধারায় প্রবাহিত হয়। জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে হইলে মনোবৃত্তিকে জাতীয় ভাব ঘন করিতে হয়। জাতির সর্ব্বজনীন মনোবৃত্তি (mass psychology) একমুখী হওয়া আবশ্যক। আবার সকল মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, বিচারশক্তি প্রভৃতি সমান হয় না; সমান হইবে যে, এরূপ আশা করিতে পারা যায় না। কিন্তু জাতির মনোবৃত্তির মধ্যে যদি একতানতা থাকে, যা পঠন করিয়া লইতে পারা যায়, তাহা হইলে জাতির জাতীয়তা দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আনন্দ ভোগের প্রতিষ্ঠান ও তাহার ব্যবস্থাগুলি যদি একমুখ হয়, তাহা হইলে সকলের হৃদয়মনের তন্ত্রী একই সুরে বাঁধা হইতে পারে। নানা যন্ত্রের ধ্বনি একরূপ হয় না। নানা লোকের মনও তেমনই সমান হয় না। মানসিক শক্তিতে কেহ উন্নত কেহ অবনত ইহা হইবেই। যাহার যতদূর শক্তি যে স্তরে অবস্থিত তাহার সেই মানস-যন্ত্র হইতে ধ্বনি সেইরূপই বাহির হইবে। কিন্তু ধ্বনি স্বতন্ত্র হইলেও সুরগ্রাম যদি একই পর্দ্দায় বাঁধা থাকে, তাহা হইলে তাহা হইতে জাতীয়তার একটা সুন্দর সুর বাহির হইবেই হইবে। নিবিড় বনে নানা প্রকার পক্ষী এক সঙ্গে ডাকিতে থাকে। তাহাদের সকলের কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনির বা আওয়াজের মধ্যে অনেকটা বৈষম্য আছে সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও সেই সমস্ত বিহঙ্গের ধ্বনি একই পর্দ্দায় বা গ্রামে বাঁধা বলিয়া

তাহাদের কণ্ঠের সেই ঐক্যতান-বাদন বেশ মিষ্ট বোধ হয়। সেইরূপ মানব-সমাজে নানা মানুষের মনোভাব, বুদ্ধিশক্তি, জীবনের লক্ষ্য প্রভৃতি বিভিন্ন হইলেই। কিন্তু তাহাদের উৎসব এবং আনন্দ চর্চ্চা যদি একই বা সমান হয়, তাহা হইলে তাহাদের মন এক সুরে বাঁধা পড়িবে। দুর্গা পূজায় কেহ মহাশক্তির ভক্তিতে বিভোর হইয়া পড়েন আবার কেহ বা ভোজনানন্দে মাতিয়া উঠেন। কাহারও চিত্ত পরোপকার করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ে, কেহ বা এই সময়ে কিছু লাভ করিয়া লইবে বলিয়া আনন্দিত হয়। কিন্তু তাহা হইলেও এই বিভিন্ন ভাবের ভাবুক লোকের মানস বৃত্তি একই অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া স্ফূর্ত্তি পায় বলিয়া তাহাদের ভাবের সুর যেন সমান পর্দ্দায় বাঁধা হইয়া পড়ে। তাহা পরস্পর-অসম হইলেও পরস্পর-বিরোধী হয় না। সেই জন্যই আমি গোড়ায় বলিয়াছি যে, জাতীয় উৎসব জাতীয়তারই পোষক। পাশ্চাত্য মতে feast এবং festival একই কথা। পরস্পর পরস্পরের অঙ্গ। আমাদের উৎসবে থাকে সম-আনন্দ-বিতরণের ব্যবস্থা। ভোজনাদি তো থাকেই। ফলে একই আনন্দজনক প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে সকলের মনের সুখ সমান হইয়া দাঁড়ায়। অন্ততঃ অধিকাংশের তাহাই দাঁড়ায়, দুই একজন তাহার মধ্যে ব্যতিক্রম যে হয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। সমাজের পনের আনা লোকের মনোবৃত্তি একই সুরে বাঁধিতে পারে বলিয়া জাতীয় উৎসবের এত সম্মান।

যাহারা জাতীয়তা বৃদ্ধির উন্মেষ করিতে চাহেন, তাঁহাদের জাতির বা দেশবাসী সকলের মন যাহাতে একই লক্ষ্য-সাধনের দিকে অগ্রসর হয় তাহার ব্যবস্থা করা অবশ্যকর্ত্তব্য। কারণ মনোবৃত্তির সমগ্রামই হইতেছে জাতীয়তার প্রাণ। ইংরাজী ভাষায় যাহাকে mass psychology বলে, যাহাতে সেইরূপ সমষ্টিভাবে জাতীয় মনোবৃত্তি গঠিত হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। তাহা করিবার জন্যই জাতীয় উৎসবগুলি পরিকল্পিত হইয়াছে। যাঁহারা ঐ উৎসবগুলির পরিকল্পনা করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের উহার লক্ষ্য সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল কি না, তাহা এ স্থলে বিচার্য্য বিষয় নহে। মানুষের বুদ্ধির স্বাধীনতা কিছু আছে সত্য, কিন্তু অনেক সময় তাহারা এমন কার্য্য করে যে, তাহারা স্পষ্ট ভাবে তাহাদের সেই কার্য্যের উদ্দেশ্য না বুঝিলেও কার্য্যতঃ তাহাদের হিতসাধনার্থই ঐ কার্য্য বা কার্য্যের ব্যবস্থা তাহারা করিয়া থাকে। তাহার কারণ মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃতি-প্রদত্ত বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়াই কার্য্য করে।* পশু যেমন কোন উদ্দেশ্য বুঝিয়া কাজ করে না, প্রকৃতি-প্রদত্ত প্রজ্ঞান (instinct)-বলে চালিত হইয়াই সকল কার্য্য করে—তাহারা সে কার্য্যের উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাবে না বুঝিলেও তাহাদের সে কার্য্য পরিণামে তাহাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়, সেইরূপ মানুষও প্রাকৃতিক প্রজ্ঞান বলে অনেক কাজ করিয়া বসে, যাহা তাহাদের পক্ষে হিতকর হয়। অতএব মানুষ যে তাহার জাতীয় উপকারের ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহা যে সে সম্যক্‌ভাবে ভাবিয়া চিন্তিয়া করিয়াছে ইহা না হইতেও পারে, কিন্তু তাই বলিয়া ঐ সব অনুষ্ঠান যে আদি যুগের মানব-মস্তিষ্কপ্রসূত, অতএব উহার কোন মূল্য নাই, ইহা মনে করা মস্ত ভুল। অতএব ঐ সকল জাতীয় অনুষ্ঠানকে অগ্রাহ্য না করিয়া উহার দ্বারা সমাজের কতটা উপকার হইয়াছে, তাহা বিবেচনাপূর্ব্বক তাহার অনুসন্ধান করা উচিত।

চিন্তার এবং ভাবের একতাই হইতেছে জাতীয়তার সর্ব্বস্ব। যেখানে প্রত্যেক লোক বিভিন্ন ভাবের ভাবুক, বিভিন্ন স্বার্থে স্বার্থবান্, অর্থাৎ তাহাদের স্বার্থ পরস্পর স্বতন্ত্র এবং বিরোধী বলিয়া মনে করে, সেখানে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। যেখানে কেহ ধর্ম্মেরই সেবা করে, অন্ত সেব্য বস্তুকে আমল দেয় না, আবার কেহ বা গোষ্ঠীগত স্বার্থেরই পোষণ করে, সেখানে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে সকলেই সাংসারিক ব্যাপারে দেশমাতৃকাই সর্ব্বপ্রধান সেবাযোগ্যা বলিয়া মনে করিতে শিখে, সেখানেই কেবল জাতীয়তা-বুদ্ধির উন্মেষ সম্ভবে। দেশমাতৃকার প্রতি টান বা অনুরক্তি মানুষের প্রকৃতি-প্রদত্ত সংস্কার। সে সংস্কার অতিশয় প্রবল। তাই মার্কিনের এক চিড়িয়াখানায় একটি বন্ধের স্বার্দ্দূল দেখিয়া

* Man is nine-tenth instinct and the higher animals have the glimmerings of an elementary power of reasoning, or, at least, they possess the faculties which have only to be developed a stage or two further to be recognised as undoubted evidences of reason.

—Adam Gowans Whyte

একজন বাঙ্গালী ধর্ম্মকের মন তাহাকে আত্মীয়-বোধে যেন আলিঙ্গন করিতে চাহিয়াছিল।

দুর্গাপূজা বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব। ইহাতে ধর্ম্ম-জ্ঞানের সহিত দেশাত্ম-বোধের উন্মেষ হয়। এ পূজাকে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকার পূজা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমি এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি না। ইহা মহাশক্তিরই পূজা। আমরা দুর্গা দেবীকে বিশ্বের বীজ এবং পরমা মায়া বলিয়া থাকি। সুতরাং তিনি দেশমাতৃকা হইতে পারেন না। তাঁহাকে দেশমাতৃকা বলিলে তাঁহাকে নিতান্তই খাটো করা হয়। তবে তাঁহার পূজায় আমরা দেশমাতৃকা-প্রেমের আভাস পাই। আমারই দেশের নদীর জলে তাঁহাকে স্নান করাইবার সময় বলি—

"আত্রেয়ী তাপত্রী পদ্মা যমুনা চ সরস্বতী।
সরযূঃ কৌশকী পুণ্যা বেত্রবতী চ কৌশিকী।"

নদীর জলে স্নান করিবার সময় বলি "ওঁ সিন্ধুস্তবর-পোণাস্তা যে নদা হ্রদি সংস্থিতাঃ।" পৃথিবীর যাবতীয় নদ-নদীর জলে তাহাকে স্নান করাইলেও আমাদের দেশের নদ-নদীগুলিরই নাম বিশেষ করিয়া করি। আমাদের দেশের কদলী ধাড়িম প্রীফল কচু হরিদ্রা প্রভৃতিতে মহামায়ার আহ্বান করি। আমার দেশের বস্তুই যে আমার প্রিয় এই বোধ উন্মেষিত করিবার জন্য মহাশক্তিকে আমার দেশের কচু হরিদ্রা প্রভৃতিতে আবাহন। এ কথা শুনিয়া অনেকেই হাসিবেন। কিন্তু যদি তাঁহাদের সেইরূপ দৃঢ়া ভক্তি থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই হাসিতেন না। তাহা হইলে বুঝিতে পারিতাম, যাহা আমার দেশের তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমার দেশের কচু ঘেঁচু অন্য দেশের আপেল কমলা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এখন সেই ভক্তির অভাব হইয়াছে, তাই আমরা এই মন্ত্রের অর্থ বুঝি না।

পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বেও লোকের মনে এই ভক্তি-ভাব কিরূপ প্রগাঢ় ছিল, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন। তখন জন্মাষ্টমীর পর হইতেই লোকের মুখে কেবল পূজার কথা শুনা যাইত। তখন প্রায় প্রতি গ্রামে প্রতি সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহে দুর্গা পূজা হইত। পূজার কার্য্যে অংশ পাইবার জন্য সকলেই পরম উৎসাহের সহিত পূজার প্রতীক্ষা করিত। ছোট ছোট ছেলেরা কোন্ বাড়ী পূজায় কি কি কাজ করিবে তাহা লইয়া জল্পনা কল্পনা করিত। প্রাপ্তবয়স্কগণ কি ভাবে পূজা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় তাহা ভাবিত এবং সেই ভাবে কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিত। কৃতী কাহাকেও আহ্বান করিতে হইত না, সকল কর্ম্মীই উহা তাহাদেরই পূজা মনে করিয়া কাজে যোগ দিত। কৃতিগণ অবশ্য ব্যয় এবং ব্যবস্থার ভার লইতেন, কিন্তু কাজ-কর্ম্ম-নির্ব্বাহের ভার কর্ম্মীরাই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতেন। কৃতী কেবল কি করিতে হইবে, তাহা সময়ে সময়ে বলিয়া দিতেন। কর্ম্মীরা কৃতীর অবস্থা বুঝিয়াই ব্যবস্থা করিত। কারণ পূজার ব্যয় এবং ব্যবস্থা কৃতিগণ করিলেও কর্ম্মীরা পূজা তাহাদের বলিয়াই মনে করিত। পূজায় যাহাতে ত্রুটি না হয়, গ্রামের দরিদ্র বাড়ীর পূজায় লোকাভাবে যাহাতে ত্রুটি না ঘটে, সকলের সে দিকে দৃষ্টি ছিল। এ সকল পূজায় কাহারও প্রাধান্য থাকিত না। কৃতীকে যাহাতে অপ্রস্তুত না হইতে হয়, কর্ম্মীরা সে দিকে সতত দৃষ্টি রাখিত। তখন যে সমাজে কুলোক ছিল না, তাহা নহে। তবে কুলোকেরা গ্রামের কাজে প্রায়ই দুষ্ট মনোভাব সংযত রাখিত। দুই চারি জন যদি তাহা না পারিত, তাহা হইলে তাহারা ধরা পড়িয়া কর্ম্মীদের হস্তেই লাঞ্ছিত হইত। পরের বার গ্রামের আর কোন বাড়িতে তাহারা কর্ম্মী হইতে পারিত না। সকলেই পূজার কাজ করিবার ভার পাওয়া একটা লাভের বিষয় মনে করিত। অনেকের—বোধ হয় প্রায় সকলেরই—মনে একটা সংস্কার ছিল-যে পূজার কাজ করিতে পারিলে তাহাদেরও পুণ্য হইবে, মা দুর্গা তুষ্টা হইবেন। সে জন্য সেকালে পূজার কাজে বিশেষ কোন অসুবিধা ঘটিত না।

এখন আর সে ভাব নাই। এখন লোকের মনোবৃত্তির সম-তানতা নষ্ট হইয়াছে। এখন লোকের ভক্তি-ভাব পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। অনেকে এখন পূজার সময় অন্য খরচে দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া যাইতেছেন। পল্লীগ্রামে আসিয়া মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি এবং বিল্বদল দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না। বহু গ্রামে এখন পূজা হয় না। পূজার সময় গ্রামে বিশেষ কোন বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন যাঁহারা গ্রামে পূজাটা

কোনরূপে সম্পন্ন করেন, তাঁহাদের মধ্যে আর সে অকাতরে অন্ন-বিতরণ নাই, তাঁহারা দুই এক জন আত্মীয়স্বজনকে লইয়া পূজার কার্য্য সমাধা করেন। মায়ের প্রসাদ এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি তাহার অন্যতম কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। বিলাস-বাসনে অর্থ ব্যয়ও উহার আর একটী কারণ হইতে পারে। কিন্তু উহার মুখ্য কারণ ভক্তি-হীনতা। এখন কেহ কষ্ট করিয়া শুদ্ধাচারে পূজা করিতে চাহে না, তাহার কারণ পূজার উপর তাহাদের পূর্ব্বের মত আস্থা নাই। এখন পূজায় সেই আনন্দ নাই, কাজেই জনসাধারণের মধ্যে মনের সে ঐক্যও নাই। এখন অনেক স্থানে বারোয়ারী পূজা হয় সত্য, কিন্তু উহাতে সে ভক্তি এবং নিষ্ঠার পরিবর্ত্তে আড়ম্বর ও বাহ্য জাঁক বৃদ্ধি পাইতেছে। কোথাও কোথাও কাঙ্গালী-ভোজন হয় সত্য—কিন্তু বহু স্থানে কোনরূপে উহা লোক-দেখান ব্যাপার মাত্র হয়। যাহা ঘটিতেছে তাহা দেখিয়া অনেক স্থলে সার্ব্বজনীন পূজার উপর আমার আস্থা হ্রাস পাইতেছে। তবে পূজা যত হউক আর না-ই হউক, সার্ব্বজনীন পূজার ফলে ছোট ছেলেমেয়েদের ঠাকুর দেখিবার একটা সুবিধা করিয়া দেওয়া হইতেছে এইটুকু যা লাভ। এইরূপ অবস্থায় আমাদের সমাজের একতানতা নষ্ট হইয়া যাইতেছে, দেশের উপর আকর্ষণ কমিতেছে, সমাজে নানা দিকে বিশৃঙ্খলা আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। মুখে জাতীয়তার কথা উচ্চ কণ্ঠে নিনাদিত হইতেছে বটে, কিন্তু অন্তরে জাতীয় বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় মিলিতেছে না। ফলে দেখা যাইতেছে যে, দেবী প্রত্যেক বার হয় ঘোড়ায়, নয় দোলায় আসিতেছেন—ফল হইতেছে ছত্রভঙ্গ না হয় গড়ক। এবার দেবী গজে আসিতেছেন, ফলে জল হইবে শস্যও হইবে। কিন্তু শস্য হইয়াছে পাট, তাহার খরিদদার নাই। স্থানে স্থানে পাটের মণ চারি টাকা মণ দিতে চাহিলেও তাহার খরিদদার নাই। এ দিকে আমন ধানের অবস্থাও আশাপ্রদ নহে। লোকের বিশেষ কষ্ট হইতেছে।

আজকাল অনেকে এই সকল পূজা-পার্ব্বণকে প্রচলিত প্রথা মাত্র বলিয়া গণ্য করেন এবং মনে করেন যে, জাতীয় জীবনের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহাদের সে ধারণা ভুল। প্রথা বা জাতীয় রীতিরও মানবজীবনে একটা বিশেষ মূল্য আছে। একথা বিশিষ্ট পাশ্চাত্য পণ্ডিতরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। সামাজিক জীব মাত্রেরই কতকগুলি রীতি বা প্রথা আছে। উহা তাহাদের সভ্যতা বিকাশের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।* অনেক সময় প্রথা বা রীতিকে অবলম্বন করিয়া মানুষের চরিত্র প্রভৃতি বিকাশ লাভ করে। কেবল মাত্র বুদ্ধির বা চরিত্রের সাহায্যে নীতি, কলাবিদ্যা, ধর্ম্ম, শাসন-ব্যবস্থা, আইন বা পারিবারিক জীবন রক্ষা করা সম্ভব নহে।† সেই জন্য এডমণ্ড্ বার্ক প্রচলিত আচারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। আমাদের অন্ন বিদ্যা ভয়ঙ্করী হইয়াছে বলিয়া আমরা জাতীয় উৎসবকে উপেক্ষা করি। উহা প্রথা বা রীতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু জাতীয় জীবনে উহার মূল্য অনন্যসাধারণ। সেই জন্য আমরা জাতীয় উৎসব বিলুপ্ত হইতে দিতে চাহি না। দুর্গোৎসব বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব। বৌদ্ধ বিপ্লবের সময় উহা কতকটা অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছিল, পরে বাঙ্গালার রাজা গণেশ নারায়ণ ভাদুড়ী (অথবা মহাত্মরে রাজা কংসনারায়ণ) উহার পুনঃ-প্রবর্ত্তনা করিয়া গিয়াছেন। আজ সেই পূজা সমাগত। ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব।

---

* All social animals, again, have customs; so that we naturally infer that our ancestors became human under the influence of customs and were from the first subdued to customs or the observance of that which to them seemed necessary.—'Natural and Social Morals'. Prof. Carveth Read p 130.

† It is the ground of the family, of Governments, of law, of religion, forms of art and morals....It moulds all our feelings and judgments about social affairs. This is why one people cannot adopt another's institutions without modifying them in accordance with their traditions, etc.—Ibid p. 131.

# ভীমপলশ্রী

—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

গান শুনিতে গিয়া কখনও এত নিগ্রহ ভোগ করি নাই।

আমাদের পাশের একটা শহরে সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা ছিল। নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছি। যখন নিমন্ত্রণ-পত্র পাইলাম সেই সময় বেচারাম আমার পাশে ছিল। পত্রটা খুলিয়া পড়িতেছি, জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে শৈল?"

পত্রখানা খামে পুরিয়া বলিলাম, "ওরা একটা মিউজিক্ কন্সিটশন করবে, তাই নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছে।"

আমার খবরের কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিলাম, বেচারাম চুপ করিয়া বসিয়া পা দোলাইতে লাগিল। একটু পরে প্রশ্ন করিল "একা, না সবান্ধবে?"

কথাটা যেন শুনিতে পাইলাম না, খবরের কাগজের উপর আরও ঝুঁকিয়া পড়িলাম। অবশ্য খবরের কাগজে একেবারেই মন নাই, মন আসলে তখন প্রমাদ গণিতেছে, বেচা যদি আবার ঘাড়ে চাপে তাহা হইলেই তো সর্ব্বনাশ!

বেচা খবরের কাগজের নীচে হাত দিয়া খামটা টানিয়া লইল। কতক যেন অবহেলার সঙ্গে চিঠিটা বাহির করিয়া পড়িয়া আবার রাখিয়া দিল। একটু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—"কি রকম মনে হচ্ছে, লড়াইয়ের ব্যাপারটা?—কে জিতবে?"

যে-ই জিতুক, আপাততঃ বেচারামই জিতিল। আর খবরের কাগজে অতি-মনোযোগিতার ভাণ করা চলিল না; মুখটা তুলিয়া বলিতেই হইল—"যে রকম দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে....."

বেচারাম বলিল—"সবান্ধবেই নেমন্তন্ন করেছে রে শৈল, ভাবছি তোর যদি আপত্তি না থাকে তো যেতুম, অবশ্য আপত্তি থাকে তো থাক্।"

বলিলাম, "বা, এ-তে আপত্তির কথা আর কি থাকতে পারে?"

ষ্টেজের উপর প্রতিযোগীদের স্থান হইয়াছে। একদিকটায় কয়েকজন বিচারক বসিয়া আছেন, প্রতিযোগীরা এক এক করিয়া আসিয়া গান করিতেছে। আমাদের বাইতে বেশ একটু দেরি হইয়া গেল, কেন না বেচারামকে ঠাঁই-নাড়া করা অল্প কথা নয়। যখন পহুঁছিলাম তখন বেশ একটু ভিড় হইয়া গিয়াছে; সামনের দিকে তো যেন চাপ বাঁধিয়া গিয়াছে। বেশ বড় অডিটোরিয়াম; আমাদের অনেক পিছনে, একেবারে শেষের দিকে, আসন গ্রহণ করিতে হইল।

বেচা বলিল, "বাক্ ভাল হল, আগে ব'সলে কান ঝালাপালা করে তুলত। এমনি সওয়া যায় না, তার ওপর আবার কন্সিটশন!"

পাশের একটি ভদ্রলোক এমন বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিলেন যে, আমায় তাড়াতাড়ি মুখটা ফিরাইয়া লইতে হইল,—পাছে টের পান যে, গানের আসরে আসিয়া যে এমন অদ্ভুত রকমের মন্তব্য করে, সে আমারই একজন সঙ্গী।

গান ও-দিকে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আমার পাশের ভদ্রলোকটিকে প্রশ্ন করিলাম, "ক জনের হয়েছে গান, মশাই?"

ভদ্রলোক বলিলেন, "সাত জনের হ'য়ে গেছে, শেষেরটি ছিল তেওয়াড়ীজীর মেয়ে একটি বাঙালী ছোকরা, এখন—"

বেচারাম অঞ্জলিতে মুখ ঢাকিয়া বিড়ি ধরাইতেছিল, ঝুঁকিয়া আমার সামনে দিয়া ভদ্রলোকের পানে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিল, "সাতটা গেছে, অনেকটা হালকা হয়েছে বলুন। আর-কটা—"

আমি কথাটা চাপা দিবার জন্য প্রশ্ন করিলাম, "ছোকরা কি গাইলে?"

"বৎ-এ একটা বেশ ধরেছিল। ধ্যাঁ শিখেছে বটে মশাই, বলিহারি, কি কাজ গলার। কি চেকনাই!"

বলিলাম, "বড় আপশোষ তো, মেয়ে হ'য়ে গেল, এ-ছোকরাও মন্দ চালাচ্ছে না।"

"তার কাছে শিশু মশাই, সে গমক এখনও কাণে লেগে রয়েছে।"

বেচারাম মুখ সরাইয়া লইয়া নির্ব্বিকার ভাবে বিড়ি টানিতেছে দেখিয়া কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া দিলাম।

কথা বন্ধ করিয়াছি দেখিয়া বেচারাম কথা শুরু করিল, "এ ছোঁড়াটাও বুঝি ভাল গাইছে? গানটার নাম কি রে ছৈল?"

মনোযোগের ভাণ করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

বেচারামের বিড়ি নিভিয়া গিয়াছিল, ধরাইয়া দেশলাইটা নীচে ফেলিয়া জুতা দিয়া ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "এ বেটারা কার আম-বাগানের দফা নিকেশ করেছে, লক্ষ্য করেছিস?"

একটু বিরক্তির সহিতই বলিলাম, "এখানে আম-বাগানের খবর পেলি কোথায় তুই?"

বেচারাম বলিল, "এখানে বসে বসেই খবর পেয়েছি। হাঁ করে চীৎকার শোনবার দিকে মন থাকলে পেতাম না। ছেলের মাথায় টাঙান ওগুলো কি, চোখ মেলে দেখ নিকিন।"

টাঙান রহিয়াছে আমের পাতা আর বউল দিয়া রচিত একটা মালা, এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত টাঙান, মাঝে মাঝে জরি আর সোলার ফুলের দোলক। কি লক্ষ্য করিয়া যে বেচারামের বক্তব্যটা, বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু কথা বাড়িয়া যাইবে এই ভয়ে চুপ করিয়া রহিলাম।

কিন্তু আমি চুপ করিয়া থাকিলেই যে বেচারাম চুপ করিয়া থাকিবে এমন কোন কথা নাই; বিড়ির ছাই ঝাড়িয়া দিয়া বলিল, "পাতা এক আধটা তুললে ক্ষতি নেই, কিন্তু বেটারা…"

বলিলাম, "চুপ কর। ও ভিন্ন ওগুলো মাঙ্গলিক!"

বেচারাম ক্ষেপিয়া উঠিল, বলিল, "মাঙ্গলিক! আমার বাগান থেকে যদি কেউ ও রকম মাঙ্গলিক পাড়তে যেত, তো তার ঠ্যাং দু'খানি সেইখানেই রেখে আসতে হোত, সঙ্গ সঙ্গ মঙ্গল করিয়ে দিতাম। যদি ল্যাংকার বউল হয় তো খুব কম ক'রে ধরলেও গেরস্তর গুটি পঞ্চাশেক টাকার মা দিয়েছে। গেল বছর অমন ফসল হ'য়েছিল তবু বিশ টাকার কম বয় হয় নি, আর এবার সে রকম ফসলের অবস্থা, যদি চল্লিশ টাকার এক পয়সা কম…।"

পাশের ভদ্রলোকটি হাতযোড় করিয়া বলিল, "মশায়, গাইতে দিন দয়া করে একটু; এই কি আপনার আমের হিসেব করবার সময় হ'ল! অমন চমৎকার ঠুংরিটা উঠিয়েছে।"

"ঠুংরিই শুনুন মশাই আপনারা" বলিয়া একটা বিষ-দৃষ্টি হানিয়া বেচারাম বাহিরে চলিয়া গেল। দুয়ারের কাছে গিয়া ঘুরিয়া আমায় প্রশ্ন করিল, "তুইও এখন ব'সে ব'সে ঠুংরি শুনবি না কি রে!"

"ঠুংরি" কথাটার উপর চাপ দিয়া এমন জোরে প্রশ্নটা করিল যে হলের প্রায় অর্দ্ধেক লোক ঘুরিয়া প্রথমে বেচারামের পানে এবং পরে উহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া আমার পানে চাহিয়া দেখিল। আমি যেন এতটুকু হইয়া গিয়া নির্লিপ্ত ভাবে নাকের সোলা চাহিয়া থাকিবার চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল ভাবে বসিয়া রহিলাম। কয়েকজন চটিয়া কিছু বক্তব্যও প্রকাশ করিতে যাইতেছিল, বেচারাম ততক্ষণে সরিয়া পড়িয়াছে।

প্রায় আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার নিরুপদ্রবে শোনা গেল গান। কম্পিটিশনটা মেয়েছেলে মিশাইয়া; বিচারের সময় কি ব্যবস্থা হইবে জানি না, তবে বৈচিত্র্যের খাতিরেই হোক বা যে কারণেই হোক, গান হইতেছে মেয়ে-পুরুষ মিশ্রিত করিয়া। ছেলেমেয়েদের সম্মিলনী, বোধ হয় বিশ বছরের বেশি কেহ নাই। মেয়েরা বোধ হয় আরও অল্প বয়সের, সংখ্যায়ও খুব অল্প। পিছনের দিকে কাহারও হাতেই প্রোগ্রাম নাই, বুঝা গেল না, তবে শুনিলাম উকিল-ব্যারিষ্টারদের বাড়ির তিন চারিটি মেয়ে নাকি যোগদান করিবে।

বেশ তৃপ্তির সহিত ঠুংরিটা শোনা গেল। তাহার পর একটি মেয়ে আসিয়া আড়াঠেকার একটা বাগেশ্রী ধরিল। গান শেষ হইয়া গেছে, করতালির পর মেয়েটি বিদায়ের পূর্ব্বে শ্রোতৃবৃন্দকে নমস্কার করিতেছে, এমন সময় বেচারাম আসিয়া উপস্থিত হইল। বাঁ হাতটা পাঞ্জাবীর মধ্যে, মুঠার মধ্যে করিয়া কি একটা লইয়া রহিয়াছে যেন। ছেলের দিকে চাহিয়া একটু নৈরাশ্য এবং অনুতাপের সঙ্গে রাগত-কণ্ঠে বলিল, "ডেকে নিলিনি কেন রে?"

অত্যন্ত রাগ হইল, গম্ভীর ভাবে ওর মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কেন বল্ তো?"

আমার ভাব দেখিয়া বেচা নিজেকে সংযত করিয়া লইল, আর একবার ছেলের পানে চাহিয়া লইয়া বলিল, "না, তাই বলছিলাম অমনি, অমন গানটা হল।"

দুইটা গানের মাঝখানে একটু গোলমাল হয়। একটি ভদ্রলোক উঠিয়া প্রত্যেক গানের পূর্ব্বে গায়ক আর গানের সামান্য একটু পরিচয় দিয়া দিতেছিলেন। মেয়েটি চলিয়া গেলে ভদ্রলোক উঠিয়া বলিলেন, "ওস্তাদ রহিমবক্সের সাকরেদ শ্রীমান বিভাস গাঙ্গুলী—এবার মালকোষ।"

একে গোলমাল, তাহার উপর দাড়ি-গোঁফের প্রাচুর্য্যে—এবং বোধ হয় দুই-চারিটি দাঁতেরও অভাববশতঃ—ভদ্রলোকের কথা স্পষ্ট করিয়া শোনা যায় না, শেষের কথা কয়টি একেবারেই শোনা গেল না আমার। বেচারাম একটু আশ্চর্য্য হইয়া আমার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "কেন রে শৈল?"

আমি বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলাম, "কি 'কেন'?"

বেচারাম পাশের লোকটির পানে একবার আড়চোখে চাহিয়া লইয়া, আমার দিকে মাথাটা আরও বাড়াইয়া, গলা খাট করিয়া বলিল, "মালকৌচা মারবে কেন?"

বলিলাম, "মালকৌচা নয়, মালকোষ—একটা রাগ অর্থাৎ সুর।" একটু গলাটা চাপিয়া বলিলাম, "একটু চুপ কর তুই। কি ভাববে সব?"

বেচারাম বলিল, "তাই বল। আমি বলি—এর-ওপর আবার মালকৌচা আঁটে কেন? একেই তো আমার সর্ব্বদাই মনে হচ্ছে, ওবলা বাড়িয়ের সঙ্গে এই হোল বুঝি হাতাহাতি।"

আবার সামনের, পিছনের, পাশের লোকেরা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ওদিকে চমৎকার তান উঠাইয়াছে ছোকরা। বলিলাম "চুপ কর্। তোর জামার মধ্যে কি রে ওটা, নড়ে যে!"

বেচারাম বাঁ চোখটা খুব জোরে চাপিয়া আমায় থামিতে ইসারা করিল। কিন্তু ঠিক সঙ্গে সঙ্গে জামার মধ্যে "কুঁই-কুঁই-কুঁই-কুঁই" করিয়া একটা করুণ আর্ত্তনাদ ওঠায় সঙ্কেতে আর কাজ হইল না। একটু 'কিন্তু' হইয়া বেচারাম বলিল, "ধরাতে কি করে ছুটকে এসে পড়েছে।"

বলিয়া জামার ভিতর হইতে একটা হাড়-জির-জিরে কদাকার কুকুরের ছানা টেনে নিজের পাশটাতে রাখিয়া বলিল, "গ্রে-হাউণ্ড, খাঁটি একেবারে। একটি রেঁধে দেখা গায়ে, কেমন পারিস।"

অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। এক সঙ্গে কতকগুলা ভদ্রলোক মারমুখো হইয়া উঠিল। বেচারাম কুকুরটার মুখটা চাপিয়া ধরিয়া জামার মধ্যে লুকাইয়া লইল। একটু থামিয়া বলিল, "চল্ শৈলেন, কি যে শুনছিস হাঁ করে।"

ওদিকে খুব জমিয়া উঠিয়াছে। গান ক্রমাগত জলদে উঠিতেছে। সবের চারিদিকে তাল দ্রুত থেকে দ্রুততর হইয়া উঠিতেছে—একটা তেহাইয়ের জন্য শ্রোতামাত্রেই প্রায় উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে—এমন সময় 'কাঁই-কাঁই-কাঁই' শব্দে সবাই চকিত হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই বেচারামকে কেন্দ্র করিয়া একটা কলরব উঠিল, "ফেলে আসুন মশাই···আপনিও বেরিয়ে যান···কি পাপ এসে ঢুকেছে, তখন থেকে শুধু—কোথাকার কাঠখোট্টা এসে জুটেছে! খালি জাঁবের, তেতুলের দর; সেটা গেল তো একটা কুকুর এনে ঢুকিয়ে করলে! আর খালি গজর গজর—বেরিয়ে যান মশাই! না বেরুতে চায়, ভলন্টিয়ার দিয়ে···"

বেচারাম কুকুরটা নীচে ফেলিয়া দিয়াছিল, কুড়াইয়া লইয়া কিন্তু জনতার মধ্য দিয়া কুণ্ঠা এবং দ্বিধাহীন পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল।

গান আবার একরকম শুরু হইতে আরম্ভ করিতে হইল ছোকরাকে। শেষ হইলে বেচারাম আবার ঠিক সেই রকমই নির্ব্বিকারভাবে প্রবেশ করিয়া দুয়ারের নিকট হইতে শিস্ দিয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রশ্ন করিল, "তুই থাকবি, না যাবি শৈল?"

পরবর্ত্তী গায়ক তখনও আসে নাই ষ্টেজে। আমি বলিলাম, "তুই যা।"

আশেপাশের সকলের বিদ্রূপ এবং আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া বেচারাম আমার পাশে আসিয়া বসিল। বিড়ি ধরাইতে ধরাইতে প্রশ্ন করিল, "শেষ পর্য্যন্ত থাকবি? তোরা মানুষ না কি রে!"

বলিলাম, "তুই বোস বাইরে গিয়ে, এখুনি আসছি।"

বেচারাম চুপ করিয়া রহিল। একজন গায়ক ষ্টেজে প্রবেশ করিল, পরিচয়াদি দেওয়া হইলে সে অনপুরায় সুর দিল, সঙ্গতের তবলায় ঘা পড়িল।

বেচারাম কামিজটা তুলিয়া বলিল, "নেমে শৈলেন।"

খুরিয়া দেখি পেটের কয়েক জায়গায় আঁচড়ান'র দাগ; অল্প অল্প রক্ত পড়িতেছে। ভীতভাবে বলিলাম, "শীগ্‌গির কোন ডিস্‌পেন্সারী চলে যা, টিংচার আইয়োডিন দিয়ে দে।"

গান উঠিল। বেচারাম বলিল, "শোন্ ওদিকে, এর পর সব বলব 'খন। কিন্তু এইটে শেষ।···ভয় নেই, আঠার নখ, ওপে দেখেছি।"

চারিদিকে সেই কলরবের কথা স্মরণ করিয়াই হোক বা যে কারণেই হোক বেচারাম অনেকক্ষণ নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর এক সময় হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আসল জাতের, কখনও সহ্য করে? চারি দিকে সবাই হুল্লে হ'য়ে উঠছে দেখে মুখ চেপে ধরেছিলাম—পেটের দফা নিকেশ করে দিয়েছে। কখনও সইতে পারে? নেড়ী কুত্তোর ছানা নয় তো···"

বলিলাম, "শোন, চুপ কর।"

বেচারাম চুপ করিল।

বোধ হয় আমার সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া একটু পরে পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"দিব্যি গাইছে ছোকরা।"

ভদ্রলোক ওর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "বরাবর পঙ্কজ ছুঁয়েই যাচ্ছে—কৃপালীতে পঙ্কজ!"

বেচারাম একটু অপ্রতিভ হইয়া সামনে চাহিয়া রহিল।

একটু পরে আমার দিকে ঝুঁকিয়া বলিল, "চল্ শৈল, কি আর শুন্‌বি?—কৃপালীতে পঙ্কজ ছোঁয়াচ্ছে; ওদিকে মুসুরটাকে কাপড়ের পাড়ে একটা থান ইটের সঙ্গে বেঁধে এসেছি—কে চক্ষুদান দেবে—ওঠ্।"

অসম্ভব! বলিলাম, "চল উঠছি, এইটুকু হয়ে যাক্।"

২

অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর এ-গানটা তেমন জমে নাই, শেষের দিকে বেশ একটু গোলমাল হইতে লাগিল। বেচারামের নিকট হইতে একজন বেসলাইটা চাহিয়া লইয়াছিল, হাতে হাতে চালান হইয়া সেটা একটু ঘুরে চলিয়া গিয়াছিল, আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলাম—"যাচ্ছি বেচু, তুই আয়, বাইরে দাঁড়াচ্ছি।"

গানটা শেষ হইল। সেই ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া উঠিয়া আবার পরিচয় দিলেন। সবটা শোনা গেল না গোলমালে। শুধু অস্পষ্ট ভাবে কানে গেল—"···এইবার 'ভীমপলশ্রী' গাইবেন।"

আমি প্রায় গায়কের কাছে আসিয়াছি; বেচারাম ডাক দিল—"শৈল, এইটে শুনে যে, তারপর—"

ফিরিয়া দেখি, বেসলাইটা হাতে করিয়া বেচারাম দাঁড়াইয়া আছে আমার দিকে কতকটা উৎগ্রীব হইয়াই চাহিয়া। অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল। শুধু আমারই নয়, দেখি আশে-পাশের আরও কয়েকজন লোকের দৃষ্টি বেচার পানে নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বেচারাম গান শুনিয়া যাইতে বলে!

আমি ফিরিলাম, ঠিক যে গানের টানে তাহা নয়, গান আর তেমন জমিতেছিল না। ব্যাপারটা বুঝিতেছি, উদ্যোক্তারা একটা ভুল করিয়াছেন, ভাল ভাল প্রতিযোগীদের প্রথমেই গাওয়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন বোধ হয়। আমি ফিরিলাম এইজন্য যে, গররাজি হইলে বেচা ওইখানে দাঁড়াইয়াই হাত-পা নাড়িয়া ডাকাডাকি করিয়া সভার মাঝ-খানে একটা বেখাপ্পা ব্যাপার করিয়া তুলিবে।

ভীমপলশ্রীটা একেবারে জমিল না, অবশ্য জমিবে বলিয়া সবাই প্রত্যাশাও করে নাই; কারণ গাহিল আসিয়া একটি দশ-এগার বৎসরের বালক। অধিকাংশ স্থলেই এই সব বালখিল্যদের আসরে নামান হয় বিস্ময় উৎপাদন করিবার জন্য; উচুদরের গান যে হইবেই এমন আশা করাই ভুল।

কিন্তু আশ্চর্য্য, বেচারাম একেবারে মুখটি বন্ধ করিয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল; কেমন একটা স্তম্ভিত প্রতীক্ষমান ভাব, এক একবার নিজের ঠোঁটটা কামড়াইতেছে, এক একবার ভ্রূ দুইটা কুঞ্চিত করিতেছে। একটা ধাঁধাঁর পড়িয়া গিয়াছি, আড়চোখে চাহিয়া চাহিয়া যতই দেখিতেছি সমস্যাটা ততই ঘোরাল হইয়া উঠিতেছে। ব্যাপারখানা কি? বেচা-রাম এ রকম টুৎকট-সমঝদার হইয়া উঠিল!

গানটা থামিলে পূর্ব্বের চেয়েও একটু বেশী গোলমাল হইতে লাগিল এবং তাহারই মাঝে সেই ভদ্রলোক উঠিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই বালক, গানটা রাখতে পারলে না—যদিও আরম্ভ যে চমৎকার করেছিল এটা আপনারা সকলেই স্বীকার করবেন নিশ্চয়। যা হোক আমাদের অনুরোধে এই সভার যিনি সবচেয়ে মাননীয় অতিথি, তিনি স্বয়ং ভীমপলশ্রী আলাপ করে আমাদের চিত্তবিনোদন করতে রাজি হয়েছেন।

অবশ্য এর গানটা ঠিক প্রোগ্রামের বাইরে, সুতরাং যদি আপনারা অনুমতি করেন—"

চারিদিকে একটা সমর্থনের কলরব হইল। বেচারাম একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "নিয়ে আসুন তাঁকে, নিশ্চয়—সসম্মানে নিয়ে আসুন।"

সকলে আবার বিমূঢ়ভাবে বেচারামের দিকে চাহিল, কেহ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আমার দিকে ঘাড়টা নীচু করিয়া চাপা গলায় প্রশ্ন করিল, "অতিথির স্ত্রী-লিঙ্গ কি রে বৈল?"

আমার কি নূতন পাগলামি! তাড়াতাড়ি বলিলাম, "অতিথিনী। তুই ওদিকে দেখ।"

ভদ্রলোক বলিতেছেন, "নিয়ে আসতে হবে না; তিনি এখানেই আছেন, যদিও অনাড়ম্বর ভাবের জন্যে তাঁকে চেনা যায় না।"

কথাগুলা বলিয়া একদিকে বিনীত করজোড়ে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেই একটি বৃদ্ধ সামান্য একটু উঠিয়া অডিটোরিয়ামের দিকে চাহিয়া সকলকে অভিবাদন করিলেন এবং আসরের মাঝখানে আগাইয়া গেলেন। বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি হইবে, মাথায় বেশ বড়বড় জুলফি, একটা আলখাল্লা পরা। ভদ্রলোক বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে পরিচয় আরম্ভ করিলেন—"এখানে বোধ হয় খুব কম লোকই আছেন, যিনি খাঁ সাহেবের……"

হঠাৎ বেচারাম দাঁড়াইয়া উঠিল। রাগে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। আমার বাম বাহুটা ধরিয়া বলিল—"ওঠ্, ওঠ্ বলছি, এখানে ভদ্দরলোকে গান শুনতে আসে!… ওই ওদের…"

মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না।

অত্যন্ত রাগ হইল। কাঁকানি দিয়া হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া বলিলাম—"যা তুই—যেতে ইচ্ছে হয়; আমি যাব না। তখন থেকে পাগলের মতন…আচ্ছা বে-রসিক এক…"

"থাক ঐ দাড়ি-গোঁফের রস নিয়ে"—বলিয়া বেচারাম কাহারও পা মাড়াইয়া, কাহাকেও প্রায় উল্টাইয়া দিয়া, কোথাও নিজেই টাল সামলাইয়া একটা উগ্র ষাঁড়ের মত বাহির হইয়া গেল। দরজার বাহিরে কুকুর-বাঁধা কাপড়ের পাড়টাতে পা আটকাইয়া যাইতে এমন একটা কিক্ মারিল যে পাড় ছিঁড়িয়া কুকুরটা একেবারে রাস্তার ওধারে গিয়া পড়িল।

* * *

ওস্তাদ কালে খাঁর গান, শুনিবার বড়ই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আর হইল না। উঠিতে হইল। অমন খিঁচড়ান মন লইয়া গান শোনা চলে না।

এটা জংশন ষ্টেশন, আমাদের গাড়িটা এইখান হইতেই ছাড়ে।

গিয়া দেখি বেচারাম গাড়ির জানালা দিয়া পা বাহির করিয়া দিয়া বিড়ি টানিতেছে। গাড়ি ছাড়িতে প্রায় এখনও ঘণ্টা দেড়েক বেরি, আর কেহই নাই গাড়িতে।

আমি আসিতে একবার দেখিয়া লইয়া আবার বিড়ি টানিতে আরম্ভ করিল। প্রশ্ন করিলাম, "চলে এলি যে অমন করে?"

বেচারাম ঘুরিয়া বসিয়া বলিল, "মেরে চলে আসি নি এই ওদের বাবার ভাগ্যি। ঘর-সব জোচ্চোর; ভদ্দর-লোকদের ডেকে বিদ্রূপ…"

আমি নিতান্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "বিদ্রূপ কি রে! আমি তো তোর কথা…"

বেচারাম বিড়িটা একটা কাঁকানি দিয়া ফেলিয়া দিল। গলাটা আমার দিকে বাড়াইয়া আনিয়া বলিল, "বিদ্রূপ নয়—নয় বিদ্রূপ? ঐ হ'ল ভীমপালে…"

অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছি; প্রশ্ন করিলাম—"ভীমপালের কি রে?—ভীমপালের?"

বেচারাম, গলাটা যেদিকে সেইদিকে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ যাটা হল ভীমপালের স্ত্রী! চাপ-দাড়ি, গায়ে আলখাল্লা। ভাবলাম তবুও মেয়েছেলে যদি একজন গায়, ওরই মধ্যে একরকম…বিদ্রূপ নয়? একবার হাজির করলে একটা ছোঁড়া—তার পরে একটা খাঁ সাহেব, এই করে করে ভাঁওতা দিয়ে সমস্ত রাত…"

কিছুমাত্র বিস্মিত হইলাম না।

শান্তকণ্ঠে বলিলাম—"ও বুঝেছি, থাক্ যেচু, যা হবার তা হ'য়ে গেছে। একটা বিড়ি আছে? তা'হলে দে।"

# মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিণতি

—শ্রীকালিদাস রায়

মাইকেলের সর্বপ্রধান কবিকীর্তি—অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন। এ ছন্দের যে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য তাহা সম্ভবতঃ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী ধাতুর পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়। সে জন্য তাহা বেশি দিন চলে নাই। কিন্তু মাইকেলের এই সৃষ্টি নিষ্ফল হয় নাই। এই ছন্দ বঙ্গকাব্য-সাহিত্যে নানা ভাবে রূপান্তর লাভ করিয়া বহু উৎকৃষ্ট রচনার বাহন হইয়া বর্তমান রহিয়াছে।

মাইকেলের কাব্যের অন্তঃপ্রকৃতির সহিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অন্তঃপ্রকৃতির তুলনা করিলে বিশেষ কোন সাম্য দৃষ্ট হয় না। মাইকেলের মত রবীন্দ্রনাথও যুগ-প্রবর্তক কবি, স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য লইয়া আবির্ভূত হইয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যে নব নব ধারার প্রবর্তন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যধারাকেই অনুসরণ করিয়া তাহাকে সুনিয়ন্ত্রিত, সমৃদ্ধ ও সুপরিচালিত করিয়াছেন—এ কথা বলিলে কবির প্রতি অবিচার করা হয়। বরং তিনি বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিদের ধারাকে আংশিকভাবে অনুসরণ করিয়াছেন বলা যাইতে পারে,—বলা যাইতে পারে, বাঙ্গলোর বাউল কবিদের কাছে ঋণস্বীকার রবীন্দ্রনাথ অনেকাংশে ঋণী।

তবে কি ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কাব্যে একেবারেই নাই? 'প্রভাব একেবারেই নাই' বলিলে অসঙ্গত হইবে। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের নিকটে আক্ষরিকভাবে দৃষ্টি-ভঙ্গির জন্য ঋণী—বিহারীলালের সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বহু চিত্রে ও বৈচিত্র্যে নব নব রূপ লাভ করিয়াছে। হেমচন্দ্রের প্রভাব তাঁহার প্রথম জীবনের রচনায় ছিল। নবীনচন্দ্রের কাব্যে রবির উদয়ের আগে শুকতারার আভাস পাওয়া যায়। নবীনচন্দ্রের "কীর্তিনাশা" নবীনচন্দ্রের রসভূমি হইতে রবীন্দ্রনাথের রসভূমিতে আসিবার পথেই পড়ে! রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ সকল ঋণ সামান্যই, পাঠশালার গুরুমহাশয়ের কাছে কৃতবিদ্য কৃতী ব্যক্তির ঋণের মত। অন্তঃপ্রকৃতি বা রস-সৃষ্টির দিক্ হইতে রবীন্দ্র-কাব্যের সহিত ইঁহাদের কাব্যের মিল বিশেষ কিছু নাই।

কেবল অন্তঃপ্রকৃতি ও রসসৃষ্টি লইয়াই কাব্য নয়। কাব্যগঠনের পক্ষে উপাদান, উপকরণ, বহিঃ-প্রকৃতি, আকৃতি, রচনা-ভঙ্গি ইত্যাদির মূল্য অল্প নয়। গঠন-কলার দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে রবীন্দ্রনাথ যে পূর্ববর্তী কবিদের অনেকের কাছে ঋণী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ-ঋণ এড়াইবার উপায় ছিল না।

ছন্দের দিক্ হইতে রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের নিকট কতটা ঋণী এ প্রবন্ধে কেবল তাহাই দেখানো হইবে। সেই সঙ্গে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ কি ভাবে পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যে রূপান্তর লাভ করিয়াছে তৎসম্বন্ধেও আলোচনা করা যাইবে।

'মেঘনাদ বধ' হইতে যদৃচ্ছাক্রমে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে:

> স্বর্ণের কনকদ্বারে উত্তরিলা যথা
> মহাদেবী। ঝনঝনে আপনি খুলিল
> হৈম দ্বার। বাহিরিলা বিশ্ব-বিমোহিনী
> কমল দেবীরে স্মরি' করিলা প্রস্থান।
> রাঙা পুথি লাগা যানে। ঘর্ঘর নিনাদে
> শিখরে সৌমিত্রি শূর। ঘুমিলা কেবল
> বলি শিরোদেশে অরি, রক্ষিত প্রহরী,
> এই কথা, ঐ কথা পোহাইল রাতি।
> লঙ্কার উত্তর দ্বারে বসতি যাহার
> সোমে সদা, কুলে তার চণ্ডীর বেটন
> কর্ষিয়া, স্নান করি সেই সরোবরে
> তুলিলা বিবিধ ফুল পূজা অভিলাষে
> গন্ধবহ-বহী যবে। তাঁহার প্রসাদে
> নিবাসিবে অনায়াসে দুর্গম সমরে।

মাইকেলের এই অমিত্রাক্ষর পদ-বিন্যাস আর রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'র পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পদ-বিন্যাসে প্রভেদ নাই:

পুরুষের রক্ত বেগে মাখিব সংগ্রাম
তার লাগে, বীরদের দিব পরিচয়,
হা রে ধিক্, কোথা চলিলা খেলা সেই
শর্মিষ্ঠা তোমা। যে ভূমিতে আছেন দাঁড়ায়ে
সে ভূমির তৃণদল হইতেন যদি
লজ্জিতায় ভূমি তাহা, সেই হীন
চরণের তলে। কি জানিতেছিনু, তবে
নাই। দেখিনু চাহিয়া, ধীরে চলি গেল
বীর বন অন্তরালে। উঠিনু চমকি
সেইক্ষণে অমিল চেতনা, আপনারে
ধিক্কার বিকার পরমাণু।

নবীনচন্দ্রও মাইকেলের ছন্দের বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে রক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন :

মুদ্রিত বিরাটপতি, স্তম্ভিত প্রাঙ্গণ
ভেদ্রস্থলে অবিরলা পড়ের পতাকা
নিস্তব্ধায় মহাশিত। কত অনেকের
রক্ত ধারা সমাবৃত। নিশিত যখন
মধ্যেহ্ন পশ্চিম অংশে ঢলিয়া হাসিত
সন্ধ্যাকালে যেন স্নিগ্ধ নক্ষত্র উজ্জ্বল
নিদ্রা যাইতেছে সুখে। অঙ্কে সুলোচনা
মূর্ছিতা, মূর্ছিতা সম্ভব পড়িয়া উত্তরা
সহকার-অঙ্কে ছিন্না ব্রততীর মত।

নীরব বিস্তৃত ক্ষেত্র। থাকিয়া থাকিয়া
কেবল কাঁদিয়া ধীরে মাতার অন্তর
গাহিতেছে কুরু নাম। মূর্ছিত অর্জুন
পড়িতে, ধরিলা কৃষ্ণ, বক্ষে প্রসারিয়া।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলা কৃষ্ণ "অর্জুন! অর্জুন!
আমরা যাহার তরে বীর-ধর্ম ত্যজি।
অবোধ্য এ শোক তব! এই বীর ক্ষেত্র
করিব না কলঙ্কিত করিয়া রোদন
একবিন্দু শোক-অশ্রু। বীরের ভূমি
বীরশোক অশ্রু নয়, অগ্নির অক্ষর।" (সুভদ্রা)

এই সকল অংশ হেমচন্দ্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশের মত মিলহীন পয়ার নয়।

হেথায় হৃদয়ে বৈশ্য ছাড়িয়া আসন
ইন্দ্রাসুর অধ্যাসিতে হইয়া সজ্জিত
চলিলা কৈলাস ধামে বিরতি আবেশে
নিদ্রা বিরাজিত যেথা উমা, উমাপতি,
উঠিতে নারিলা পুত্রে নিয়ে মহাসতী
জলধি পর্যন্তালো উঠিতে সক্ষিত
ফেলাইছে একেবারে আলেখ্য যেমন,
বিকুষিত বেল ফুলা চারু অধরে। (বৃত্রসংহার)

অথবা

কহিলা "হে দেবদূত হৃদয়েশ্বরে,
তোমার বারতা নিয়া বরুণ-বাহিনী,
শীঘ্র যাও যেখানে এখন দেবরাজ,
কহ যে তাহারে দূত এই শুভবার্তা।
কুমেরু পর্বতে ইন্দ্র পূজা দান করি,
যান তিনি এতদিনে হইল আসন্ন,
নিবৃতি প্রলয় তাহে হইল নিশ্চয়
করিল বিহিত দৈত্য-বিনাশ যেজনে।" (বৃত্রসংহার)

কবি 'শুভবার্তা' 'হৃদয়েশ্বরে' ইত্যাদি শব্দ-প্রয়োগে মাইকেলের অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য একেবারেই রক্ষা করিতে পারেন নাই। হেমচন্দ্রের হাতে মাইকেলের ছন্দ মিলহীন পয়ারের রূপ ধরিয়াছে। হেমচন্দ্র কোথাও যে মাইকেলের ছন্দের অনুসরণ করিতে পারেন নাই এ কথা বলিলে অসঙ্গত হইবে। নিম্নোদ্ধৃত অংশে তিনি অনেকটা মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় :

হেরিয়া বসুধাপতি কাতর হৃদয়
কহিলা কৈলাসে চাহি, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি
"হা পশু, তুমিও যাও।" রুদ্ধ হতাশনে
ছুটিলা ঈশ্বর প্রায় হুঙ্কারি ভীষণ
ত্রিনয়ন রাহু যেন। অগ্নি চক্রাকার
ঘুরিল ত্রিবেত্র ঘোর, রক্তে ভরা নাই।
প্রলয় ঘটিক গতি আসিয়া নিকটে
প্রসারি' বিপুল বুক ধরিলা সাপটি
ইন্দ্রত্বরে ভীম বজ্র। অঙ্গদেহে আলো
ঝলিতে লাগিলা ধকধক। সে বহ্নি
সহিতে না পারি সহিতে ফেলা ঘুরে
ছাড়ি' বজ্র ঘোর নাদে বিকট চীৎকারি,
লক্ষ লক্ষ মহাপুচ্ছ ভীম ঝুল তুলি
ছিঁড়িতে লাগিলা ক্রোধে বাসব আবাস,
আঘাতি বিশ্বাধারে চৌচেরা হয়।
ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধিল প্রায়। কাঁপিল জগৎ।
উগারে অগ্নির ঘন। কাঁপিতে লাগিলা

ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার যোগে বসে কেশব।
কাশিল বৈকুণ্ঠধাম।

এই অংশ পাঠ করিলে 'মেঘনাদ বধে'র কোন কোন অংশ স্বভাবতঃই মনে পড়িবে।

হেমচন্দ্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইতে পাইয়াছেন—মিল দেওয়ার দায় হইতে অব্যাহতি।

রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের ছন্দে পাইলেন, পদবিন্যাসের স্বাধীনতা, ছত্র হইতে ছত্রান্তরে ভাবধারার অবাধ গতি, প্রয়োজন-মত ছত্রের মধ্যে থামিবার অধিকার, ভাবানুযায়ী বাক্যসমূহে হ্রস্ব-দীর্ঘতা, যতির তুলনায় ছেদের প্রাধান্য ইত্যাদি। মাইকেল যে অনুপ্রাস ও যুক্তাক্ষরের যথাবিহিত প্রয়োগে আয়াস স্বীকার করিয়া একটা ছন্দহিল্লোলের (rhythm) সৃষ্টি করিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র দুই জনের কেহই তাহা অনুসরণ করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদের কাব্যের ছন্দহিল্লোলের অভাবটা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু মুহুর্মুহুঃ অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগে যুক্তাক্ষরের সাহায্যে ছন্দহিল্লোল সৃষ্টি তাঁহার কাছে বাঞ্ছনীয় হইল না। তিনি তাঁহার নিজস্ব সঙ্গীত-প্রবাহটি অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া এবং মিলের পুনঃ-প্রবর্তন করিয়া ছন্দহিল্লোলের ক্ষতিপূরণ করিতে চাহিয়াছেন। ফলে, তাঁহার হাতে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সজ্ঞান পয়ারের রূপ ধরিয়াছে। এই সজ্ঞান পয়ারে তিনি 'বিদায় অভিশাপ', 'মানসসুন্দরী', 'সুখ', 'স্বর্গ হইতে বিদায়' ইত্যাদি কবিতা রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দে মাইকেলের ছন্দের সমস্ত অঙ্গই গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল গ্রহণ করেন নাই মাইকেলের আয়াসসৃষ্ট ছন্দহিল্লোল (rhythm)। প্রকৃতপক্ষে এই ছন্দ মিল-দেওয়া মাইকেলী ছন্দ।

মাইকেলের যে অংশ আগে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে মিল দিলেই রবীন্দ্রনাথের সজ্ঞান পয়ার হইবে।

স্বর্গের কনকদ্বারে বসেছিল মায়া
মহাদেবী। সুবিনয়ে আপনি খুলিলা
সেই দ্বার। বাহিরিলা বিশ্ব-বিমোহিনী
কমল দেবীরে সম্ভাষি' কহিলা,—"নন্দিনি,
যাও তুমি মর্ত্যধামে, যথায় বিরাজে
শিরিষ কৌমারি পুত। সুমিত্রার সনে
বসি সিংহাসনে তার, করিও রক্ষিনি,

এই কথা, উচ্চ করি পোহাল যামিনী,
লভার উত্তর দ্বারে অমাত্যরা যবে
গেছে সবে চণ্ডীর মেউল কূলে রাজে
স্নানিয়া, পূজি সেই সরোবরে
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি করে
দানবদলনী মায়। তাঁর কৃপাবলে
বিরাজিবে অনায়াসে দুর্গম রাজ্যে।"

অমিত্রাক্ষর ছন্দের অন্যান্য সকল ধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কেবল ছত্রগুলিকে মিত্রাক্ষরী করা হইল। এই ভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত সজ্ঞান পয়ারের জন্ম।

রবীন্দ্রনাথ পরে লক্ষ্য করিলেন, ছত্র হইতে ছত্রান্তরে অবিরাম যাত্রার ফলে এ-ছন্দে অনেক মিলই কোন কাজে লাগে না। প্রত্যেক ছত্র চৌদ্দ অক্ষরে গঠিত হইলেই এই অসুবিধা ঘটে। প্রত্যেক ছত্রকে চৌদ্দ অক্ষরে রচনা করিতে হইবে, ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতির এমন কোন দাবী নাই। চৌদ্দ অক্ষরের পর ছত্রশেষে যখন বিরতি-সৃষ্টির প্রয়োজন নাই, তখন ভাব ও সঙ্গীতের সুরের অনুবর্তী করিয়া কাব্য-গুলিকে সাজাইলে অনায়াসে মিলের সহায়তা পরিপূর্ণ ভাবেই লাভ করা যায়। ইহা হইতেই রবীন্দ্রনাথের অসমমাত্রিক তালসহলী ছন্দের আবির্ভাব। মাইকেলের মেঘনাদ বধ হইতে উদ্ধৃত ঐ অংশগুলিকে সেই ভাবে সাজাইলেই রবীন্দ্রনাথের তালসহলী ছন্দের কাঠামোটি পাওয়া যাইবে।

স্বর্গের কনকদ্বারে বসেছিল মায়া উমিলা
সুবিনয়ে হৈমবতী আপনি খুলিলা।
বাহিরিলা বিশ্ব-বিমোহিনী
কমল দেবীরে সম্ভাষি' কহিলা "নন্দিনি,
যাও তুমি লঙ্কা ধামে
শিরিষের সৌমিত্রি পুত যথায় বিরাজে।
সুমিত্রার কোলে
বসি তার সিংহাসনে
এই কথা কহিও রক্ষিনি,
'উচ্চ করি, পোহালে যামিনী
লঙ্কার উত্তর দ্বারে সেতে সহ অমাত্যরা যবে,
কূলে তার চণ্ডীর মেউলবাসি রাজে
স্নান করি সেই সরোবরে
তুলিয়া বিবিধ ফুল পূজ ভক্তিভরে
দানব দলনী মায়,
বিরাজিবে অনায়াসে রাঘবের তাঁহার কৃপায়।'"

বলা বাহুল্য, ইহাতে কেবল ছন্দের কাঠামোটা (formal structure) দেখানো হইল।

বিপরীত পথে রবীন্দ্রনাথের মিত্রাক্ষর অসমমাত্রিক ছন্দের কবিতার অংশ-বিশেষের চরণগুলিকে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে পুনর্বিন্যস্ত করিলে কিরূপে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দেই পৌঁছানো যায়, তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিই :

এ কথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শাজাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন-যৌবন ধনমান
শুধু তব অন্তর-বেদনা
চিরন্তন হ'য়ে থাক—সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজশক্তি বজ্র-সুকঠিন
সম্রাটের কারা-সম লীন হয় মোছ মহাতলে। দীর্ঘশ্বাস একটি কেবল
নিত্য উচ্ছ্বসিত হ'য়ে করুক আকাশ সঞ্চরণ। এই তব আশা ছিল মনে।
ছায়া-ঘুম্না যমুনার তটে তের শুভ্র মর্মরে ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক, শুধু থাক
এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

*

আবার ফিরিয়া যাই, ফেরেস্তের
নিষ্কুঞ্জ ফুটায়ে তোলো নব কুসুমরাজি
সাজাইতে অন্তরতা আজি আনন্দের।
হায় রে হৃদয় ( হায় ) তোমার সকল
দিনান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে
যেতে হয়। নাই, নাই, নাই যে সময়।
যে সম্রাট তাই তব হৃদয় পণ্ডিত
ফেরেছিল অরিয়াতে হৃদয় হরণ
সময়ের, সৌন্দর্য্যে ভুলায়ে। কণ্ঠে তার
কী মালিকা দুলাইয়া করিলে দান
ক্ষণহীন মরণের ধ্রুবশূন্য মাঝে
অসীম। হবে না যে এই সুন্দরের
বিলাসের অবকাশ. হায়, বহুযুগ আগে,
অনাদি ক্রন্দনে তব তাই বেঁধে দিলে
চির যৌবনের দিয়ে কঠিন বন্ধনে।

এই অংশ দুটীকে অনায়াসে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দে সাজানো যায়। সামান্য দুই একটি কথায় এদিক্ ওদিক্ করিলেই চলিবে।

একথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর
শাজাহান। জীবন যৌবন ধন মান
ভেসে যায় কালস্রোতে। অন্তর বেদনা
শুধু তব থেকে চিরন্তন, ছিল তব
এ সাধনা। রাজশক্তি বজ্র-সুকঠিন
সম্রাটের কারা-সম লীন হয় মোছ
মহাতলে। দীর্ঘশ্বাস একটি কেবল
নিত্য উচ্ছ্বসিত হ'য়ে করুক আকাশ
সঞ্চরণ। এই তব আশা ছিল মনে।
ছায়া-ঘুম্না যমুনার তটে তের শুভ্র
মর্মরে ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক, শুধু থাক
কালের কপোল-তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
একবিন্দু অশ্রুজল, এ তাজমহল।

*

আবার ফিরিয়া যাই, ফেরেস্তের
নিষ্কুঞ্জ ফুটায়ে তোলো নব কুসুমরাজি
সাজাইতে অন্তরতা আজি আনন্দের।
হায় রে হৃদয় ( হায় ) তোমার সকল
দিনান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে
যেতে হয়। নাই, নাই, নাই যে সময়।
যে সম্রাট তাই তব হৃদয় পণ্ডিত
ফেরেছিল অরিয়াতে হৃদয় হরণ
সময়ের, সৌন্দর্য্যে ভুলায়ে। কণ্ঠে তার
কী মালিকা দুলাইয়া করিলে দান
ক্ষণহীন মরণের ধ্রুবশূন্য মাঝে
অসীম। হবে না যে এই সুন্দরের
বিলাসের অবকাশ. হায়, বহুযুগ আগে,
অনাদি ক্রন্দনে তব তাই বেঁধে দিলে
চির যৌবনের দিয়ে কঠিন বন্ধনে।

বলা বাহুল্য, ইহাতে মাইকেলের ছন্দের সহিত কেবল আকৃতিগত বৈষম্যই দেখানো হইল।

এই ভাবে মাইকেলের ছন্দ হইতেই রবীন্দ্রনাথের অসমমাত্রিক তাজমহলী ছন্দের ক্রমবিকাশ দেখান যাইতে পারে। অনেকে বলেন, ইতালির free verse হইতে রবীন্দ্রনাথের অসমমাত্রিক ছন্দের উৎপত্তি; এ কথার কোন সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উভয়ের মধ্যে আনুরূপ্য দেখান যাইতে পারে, কিন্তু গঠন-ভঙ্গী ও সুর কোথা হইতে আসিল?

আপনার দেশেই আপন ভাষাতেই তিনি নব নব ছন্দের প্রবর্তন করিয়াছেন, ইহাই স্বাভাবিক। আর যখন মধ্যবর্তী স্তরগুলি তাঁহার রচনাতেই পাওয়া যাইতেছে, তখন বিদেশ হইতে আমদানী এ কথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না।

মাইকেলের ছন্দ গিরিশচন্দ্রের নাটকে কি রূপান্তর লাভ করিয়াছে, সে বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলিয়া এই নিবন্ধের উপসংহার করি।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকে মাইকেল-প্রবর্তিত ছন্দের পংক্তিগুলিকে ছোট ছোট পংক্তিতে ভাঙিয়া নূতন ছন্দের রূপ দিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা নূতন নয়। গিরিশচন্দ্রের এ-ছন্দও অমিত্রাক্ষর, কিন্তু ইহাতে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর-তরঙ্গ ও প্রবাহ দুই-ই নাই।

মাইকেলের কয়েক পংক্তি প্রথমে উদ্ধৃত করিতেছি।

কৃতাঞ্জলিপুটে পুনঃ বাসব কহিলা
"পরম অধর্মচারী নিশাচরপতি
দেবদ্রোহী। আপনি হে মখেন্দ্রমর্দ্দিনি
দেব বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন
হরে যে দুর্ম্মতি, তব কৃপা তার প্রতি
কভু কি উচিত, মাতঃ? সুধীল রাঘব
পিতৃসত্য হেতু, দুখসাগর তাজি,
পশিল ভিখারী বেশে নিবিড় কাননে।
একটি রতন মাত্র তাহার আছিল
অমূল্য, তাহে কত করিত সে তারে
কি আর কহিব মাগ? সে রতন পাতি
বাজাকাল হয়ে দুষ্ট। হায় মা শুনিলে
কোশলে বধে মরু। ত্রিদুলীর জলে
জলী হয়ঃ, দুগ্ধজ্ঞান করে যেবজনে।

এই অংশকে গিরিশচন্দ্রের ছন্দে সাজাইতে পারা যায়—

বাসব ( কৃতাঞ্জলিপুটে )।
পরম অধর্মচারী নিশাচরপতি
দেবদ্রোহী
আপনি হে মখেন্দ্রমর্দ্দিনি
তব কৃপা তার প্রতি কভু কি উচিত?
মাতঃ সুধীল রাঘব
পিতৃসত্য হেতু দুখসাগর তাজি'
পশিল ভিখারী বেশে নিবিড় কাননে।
আছিল তাহার
একটি রতন মাত্র অমূল্য,
কত যত্ন করিত সে তারে
কি আর কহিব মাগ?
সে রতন পাতি' বালাকাল
সে রতন হয়ে দুষ্ট।
হায় মা! শুনিলে কোশলে বধে মরু!
ত্রিদুলীর জলে জলী হয়ঃ
দুগ্ধজ্ঞান করে যেবজনে।

আবার গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডব-গৌরবের' কিয়দংশ লইয়া যেখান হইতে পারে, ইহাকে চৌদ্দ অক্ষরের পংক্তির আকারে সাজাইলে কিরূপে মাইকেলী অমিত্রাক্ষর ছন্দের—প্রকৃতি না হোক—আকৃতিটা পাইতে পারি।

গিরিশচন্দ্রের—

রাঘব। হেরিলাম বিষ্ণুপদ দেখিতে হৈল সাধ
কেমনে কৈলাস ধামে;
হেরিলাম বিষ্ণুপদ, বিষ্ণুপদী সনে
আনন্দে করেন গান।
করিনু প্রণাম, তুলিলাম কত কথা
গাহিলাম দুখনি আখরে
তাহে মহামায়া ঈষৎ হাসিল
বসিল না কোমল দু'জনে।
যাও তুমি দুর্ব্বাসা সদনে
বহুদিন তব নাই তায়
দেখা হলে পাঠায়ো কৈলাসে।
বহুদিন করি অন্বেষণ
অবশেষে এসেছি এ বনে।
দুর্ব্বাসা। ভক্তের এতদিনে
পড়েছে কি মনে, দীনহীন দাসে তব?
যাই তবে ধরিবারে
কোটিতে কোলাহল। ( পাণ্ডব-গৌরব )

ইহাকে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দে রূপান্তরিত করিলে দাঁড়ায়—

"হৈল সাধ হরমৌলী-কোমল দেখিতে
কেমনে কৈলাস ধামে।" কহিলা রাঘব—
"হেরিলাম বিষ্ণুপদ বিষ্ণুপদী সনে
আনন্দে করেন গান। করিনু প্রণাম
তুলিলাম কত কথা, দুখনি আখরে
গাহিলাম, মহামায়া হাসিল ঈষৎ,
বসিল না কোমল দু'জনে। অবশেষে
কহিলা সদয়ে, যাও দুর্ব্বাসা সদনে,
বহুদিন তব নাই, পাঠায়ো কৈলাসে
দেখা হলে, বহুদিন করি অন্বেষণ
এ বনে এসেছি শেষে।" কহিলা দুর্ব্বাসা—
"ভক্তের এতদিনে পড়েছে কি মনে
দীনহীন দাসে তব?" কহিলা রাঘবে
"যাই তবে ধরিবারে কোটিতে কোলাহল।"

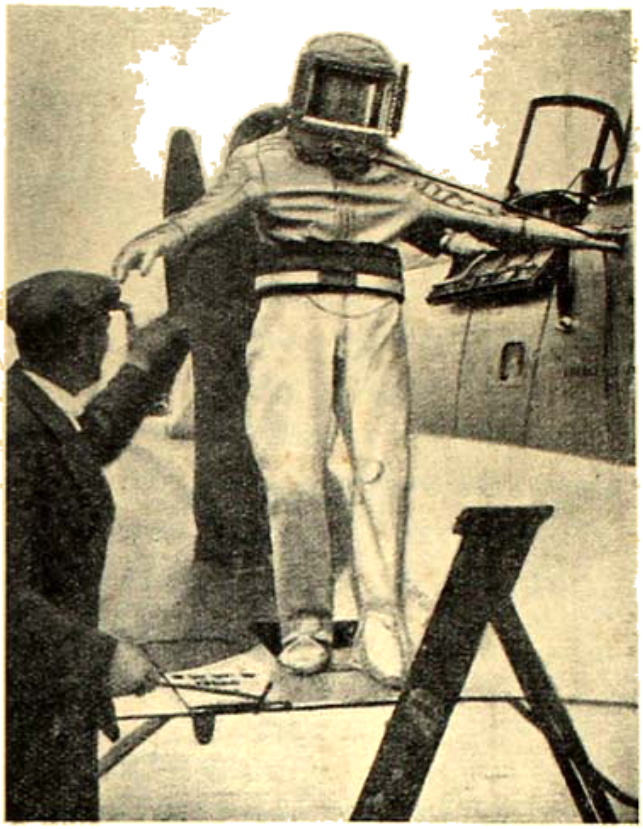

[illegible]

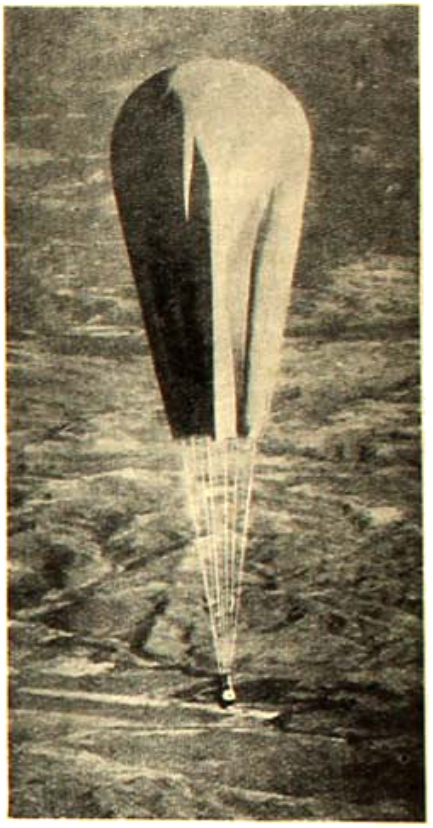

[illegible]

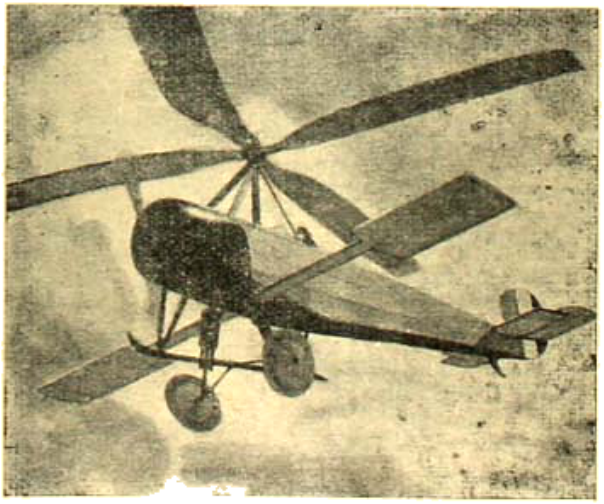

[illegible]

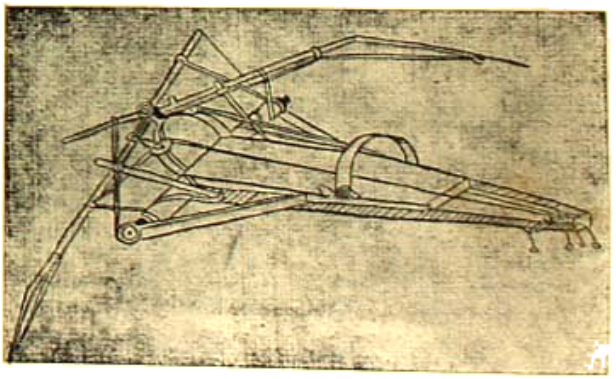

[illegible]

# বায়ুপথের যানবাহন

—শ্রীনীলরতন কর

পাখীরা আকাশে উড়ে যায়, তাই দেখে মানুষ চিরকাল উড়তে চেয়েছে কল্পনার জগতে। নানাদেশের ভাষা, রূপ-কথা ও পল্লীকথায় তার উল্লেখ পাওয়া যায়। দেবতা ও কিন্নরগণ উড়ে আসত ভূলোকে স্বর্গের সংবাদ দিতে, মাটির মানুষ বেগবান্ অশ্বের গায়ে ডানা লাগিয়ে চলে যেত অচিন্ দেশে। পক্ষীরাজ অপেক্ষা পুষ্পকরথ মানুষের ব্যবহারিক সভ্যতার উচ্চতর স্তরের পরিচয় দেয়। ভারতীয় মহাভারত ব্যতীত, প্রাচীন চীনের ধাতুময় অলঙ্করণ চিত্র এবং পারসীক শাস্ত্রগ্রন্থে বিমানরথের উল্লেখ আছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থায় ওড়ার সম্ভাবনা পরিকল্পনা করেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে। তাঁর নোট-বইতে পাখা ও প্রপেলারযুক্ত বহুপ্রকার বিমানযানের চিত্র আঁকা আছে; কিন্তু তা নিয়ে তিনি প্রকৃত পরীক্ষা কতদূর করেছিলেন জানা যায় না। তাঁর পরে অনেকদিন পর্যন্ত আর কেউ সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করেন নি। যদিও মাঝে মাঝে অনেকে কৃত্রিম ডানা গায়ে এঁটে উচ্চ গৃহের ছাদ, তোরণ ও পর্বতচূড়া হতে লাফিয়ে পড়ত। কাঠের কাঠামোতে কাপড়ের পাল তুলে বাতাসে ভাসার প্রয়াস প্রথমে ফলযুক্ত হয়নি; ওড়ার আগ্রহ চেষ্টা মানুষকে দিয়েছিল শুধু নির্মম আঘাত, অপঘাত মৃত্যু।

১৭৬৬ অব্দে ইংরেজ ক্যাভেণ্ডিশ্ হাইড্রোজেন আবিষ্কার করেন। হাইড্রোজেন বায়ু অপেক্ষা তের গুণ হাল্কা। এই গ্যাসপূর্ণ সাবানের বুদ্বুদ উর্দ্ধে উড়ে চলে। তা দেখে লোকে ভাবলে, হাল্কা আধার সাধারণ বায়ু অপেক্ষা লঘু পদার্থদ্বারা পূর্ণ হলে তা বাতাসে ভাসবে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ঘটনা লক্ষ্যে এসেছিল, আগুন জ্বাললে ধোঁয়া উপরের দিকে যায়; কারণ বাতাস গরম হলে হাল্কা হয়। ৮৮° সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী উত্তাপে বায়ু এতটা হাল্কা হয় যে, অল্প ওজনের আধার দ্বারা ঘনীভূত বায়ু আধারসমেত ঊর্দ্ধগামী হয়। ফরাসী দেশের জোসেফ্ ও এতিন্ মঁগলফিয়ে (Joseph and Etienne Montgolfier) এই ঘটনাকে কাজে লাগান। কাপড়ে কাগজ এঁটে তাঁরা এক প্রকাণ্ড বর্তুল বেলুন তৈরী করেন, তার ব্যাসের পরিমাণ ছিল ১১০ ফিট। নীচে আগুন জ্বালিয়ে তার মধ্যে গরম হাওয়া পোরা হয়। কৌতূহলী বহুজন সমক্ষে প্রথম বেলুন ভেসে যায় ৬,০০০ ফুট উর্দ্ধে, ১৭৮৩ অব্দে। বেলুনের নীচে একটি চুবড়ী ঝুলিয়ে তার মধ্যে হাঁস, মুরগী ও ভেড়া এই তিনটী জীব আকাশে ভেসেছিল।

মানুষের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম যিনি বেলুনে ওঠেন তাঁর নাম পিলাত্রে দ রোজিয়ে (Pilatre de Rozier)। পর-বৎসর মঁগলফিয়ে দুজনকে সঙ্গে নিয়ে বেলুন সাহায্যে বাতাসে ভাসেন। বেলুনটির আয়তন ছিল ২,৩০,০০০ ঘন-ফুট। উষ্ণবায়ুপূর্ণ এতবড় বেলুন আর কখনও তৈরী হয় নি। কিন্তু উষ্ণবায়ু-বেলুনের কতকগুলি অসুবিধা ছিল। বেলুন উত্তপ্ত রাখার জন্য তার সঙ্গে প্রচুর ইন্ধন নিয়ে যেতে হত; তার বোঝা বইতে গিয়ে বেলুনের ভাসবার ক্ষমতা হ্রাস পেত। তাছাড়া জলন্ত ইন্ধন হতে বেলুনে আগুন লাগা, এবং বেলুন হতে পতিত জলন্ত অঙ্গারে অরণ্যভূমি, শস্যক্ষেত্র ও পল্লী-অঞ্চলে গৃহাদিতে অগ্নিসংযোগ হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র ছিল না। এজন্য উষ্ণবায়ু-বেলুনের পরিবর্ত্তে হাইড্রোজেন-বেলুন ব্যবহারের দিকে বৈজ্ঞানিকদের আগ্রহ হয়। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর ইতালীয় বেলুনজ্ঞ ভিন্সেন্‌সো লুনার্দি (Vincenzo Lunardi) হাইড্রোজেন-বেলুন যোগে লণ্ডন হতে পঁচিশ মাইল পথ অতিক্রম করেন,—আড়াই ঘণ্টায়। এই সংবাদে বেলুনী হওয়ার জন্য নানাদেশে সাড়া পড়ে যায়। বেলুনকে ইচ্ছামত যে-কোন দিকে চালনা করবার জন্য অনেক কল্পনা-জল্পনা চলে। বাতাসের স্বল্প বেলুনের অগ্রসরের পথে বাধা হয়ে আছে দেখে দিগারের আকৃতি-বিশিষ্ট বেলুন তৈরী করা হয়। কেউ বা নৌকা-রোহীর মত দাঁড় টেনে বাতাসে বেলুন বেয়ে যাবার ধাপে ধাপে বেলুনের সঙ্গে দাঁড় সংযুক্ত করেন। কিন্তু সেকালের যান্ত্রিক-ক্ষমতা-প্রয়োগবল যথেষ্ট লঘুত্বসম্পন্ন না হওয়ায় বেলুনকে নির্দ্দিষ্ট দিগভিমুখে পরিচালন-চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে বিমানযান বলতে একমাত্র বেলুন ছাড়া উল্লেখযোগ্য অপর কিছু ছিল না। আমোদ-প্রমোদ ও দুঃসাহসিক অভিযানের অঙ্গ হিসাবে বেলুনের ব্যবহার ক্রমেই বিস্তার লাভ করছিল। হাইড্রোজেন অপেক্ষা আলো জ্বালানোর গ্যাস (illuminating gas) সুলভমূল্য ও সহজলভ্য হওয়ায় বেলুনের উদর পূর্ণ করতে তার প্রচলন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই উভয় গ্যাসই সহজদাহ্য হওয়াতে পরবর্তী কালে তাদের স্থান আংশিক ভাবে অধিকার করে হিলিয়ম্ গ্যাস।

একই প্রাকৃতিক অবস্থায় বিভিন্ন গ্যাসের বেলুন ভাসিয়ে রাখার ক্ষমতা বিভিন্ন প্রকার। বেলুনের আয়তন, গ্যাসের বিশুদ্ধতা এবং বায়ুমণ্ডলের ঘনত্বের উপর তার ভেসে থাকার ক্ষমতা নির্ভর করে। আবার বায়ু বা গ্যাসের ঘনত্ব তার তাপমাত্রা, চাপ ও আর্দ্রতার উপর নির্ভরশীল। সমুদ্র-পৃষ্ঠের উচ্চতায় স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলের চাপে ও শূন্য সেন্টিগ্রেড ডিগ্রীতে একহাজার ঘন ফুট বায়ুর ওজন প্রায় ৮০ পাউণ্ড। হাজার ঘন-ফুট বিশুদ্ধ হাইড্রোজেনের ওজন সেই অবস্থায় মাত্র পাঁচ পাউণ্ড এবং সেই আয়তনের হিলিয়মের ওজন তদ্রূপ অবস্থায় ১২ পাউণ্ড। কাজেই হাজার ঘন-ফুট আয়তনের হাইড্রোজেন-বেলুনের বস্তু-উত্তোলনক্ষমতা (৮০—৫)=৭৫ পাউণ্ড এবং সেই আকারের হিলিয়ম-বেলুনের বস্তু-উত্তোলন-ক্ষমতা (৮০-১২)=৬৮ পাউণ্ড। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গ্যাস সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ না হওয়ায় এই উত্তোলনের ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম হয়। উপরোক্ত হিসাব হতে বোঝা যায় যে, হাইড্রোজেনের উত্তোলন-ক্ষমতা হিলিয়মের চেয়ে বেশী; অথচ হিলিয়ম্ হাইড্রোজেন অপেক্ষা বহু গুণ মূল্যবান। হাজার ঘন-ফুট হিলিয়মের মূল্য প্রায় সত্তর টাকা, আর সেই আয়তনের হাইড্রোজেনের দাম প্রায় চার টাকা। হিলিয়মের একমাত্র সুবিধা এই যে তাতে আগুন লাগে না।

লঘু গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ভেসে যাওয়ার সুবিধা করে দেওয়ার পর থেকে বৈজ্ঞানিকগণ উর্দ্ধতন বায়ুস্তরের অবস্থা নির্ণয়ে কৌতূহলী হন। 'ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন' এই উদ্দেশ্যে যে বেলুন অভিযানের ব্যবস্থা করেন তার মুখপাত্ররূপে হেনরী-কক্স্‌ওয়েল (Henry Coxwell) ও জেম্‌স্ গ্লেশার (James Glaisher) ১৮৬২ অব্দে ত্রিশ হাজার ফুটের অধিক উচ্চে গমন করেন। সেখানকার অত্যন্ত ঠিকা ও ঠাণ্ডা বাতাসে তাঁদের শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত হয় এবং শরীর অবশ হয়ে আসে; গ্লেশার আধঘণ্টাকাল যাবৎ বেলুন মধ্যে অচৈতন্য অবস্থায় অবস্থান করেন। বিংশ শতকের পূর্বে গ্লেশারকে কেউ উর্দ্ধগমনে পরাস্ত করতে পারেন নি। ১৮৭৪ অব্দে গাস্তঁ তিসাঁদিয়ে (Gaston Tissandier) দুই জন সঙ্গী নিয়ে বেলুনে করে ২৭,৯০০ ফুট উচ্চে উঠেছিলেন, কিন্তু উভয় সঙ্গীই বায়ুপথে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যান। ১৯০১ অব্দে ডক্টর এ. বের্সারসন্ (Dr. A. Berson) এবং আর, জে, সুরিঙ্ (R. J. Suring) বায়ুমণ্ডলের ৩৪,৪০০ ফুট উর্দ্ধে ওঠেন। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অন্তরীক্ষের অবস্থা নির্ণয়ের জন্য স্বয়ং-লেখ যন্ত্রযুক্ত যাত্রীবিহীন বেলুন ওড়াবার প্রথম চলন করেন ফরাসী আবহবিদ্ লেঁও তেইসেরাঁক্ দ বোঅর্ (Leon Teisserenc de Bort), ১৮৯৮ অব্দে। পরীক্ষায় তিনি জানতে পারেন যে, ছয় সাত মাইল উচ্চের বায়ুর উত্তাপ শূন্য সেন্টিগ্রেড অপেক্ষা পঞ্চাশ ডিগ্রী কম। আজকাল আবহবিদ্‌গণ পৃথিবীর নানাদেশ হতে প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক বেলুন উড়িয়ে থাকেন।

সুইস্ বৈজ্ঞানিক ডক্টর পিকার (Dr. Piccard) কস্‌মিক্ রশ্মি সম্পর্কে গবেষণা করে বেলুনে চড়ে বায়ুমণ্ডলের শুরু স্তর বা ট্রপোস্ফিয়ারে গমন করেন। তাঁর অবস্থানের নিমিত্ত বেলুনের নীচে বায়ুপ্রবেশ-পথ-রুদ্ধ একটি প্রকোষ্ঠ সংযুক্ত ছিল; এ জন্য উপরের বায়ুর কম চাপজনিত শ্বাস কষ্ট তাঁকে ভোগ করতে হয় নি। পিকার ও তাঁর সহকর্মী ১৯৩১ অব্দে ১৯ মাইল উচ্চে এবং ১৯৩২ অব্দে ১০½ মাইল উচ্চে গমন করেন। ১৯৩৩ অব্দে রুশ সেনাদলের কম্যাণ্ডার ও অনেক রুশ বৈজ্ঞানিক এই প্রকার বেলুন সাহায্যে বারো মাইল উপরে ওঠেন। পর বৎসর সোভিয়েট গণ্ডোলা তিনজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে ১৩½ মাইল উচ্চতায় যায়, কিন্তু গণ্ডোলা ফেটে যাওয়াতে তিন জনেরই মৃত্যু ঘটে। ১৯৩৫ অব্দে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্-এর ষ্টিভেন্স্ ও অ্যাণ্ডারসন্ ট্রপোস্ফিয়ার বেলুনে চড়ে চৌদ্দ মাইল (৭৪,১৮৭ ফুট) পর্য্যন্ত উঠতে গিয়েছিলেন। তাঁদের বেলুনের গাত্রের ক্ষেত্রফল ২½ একর, আয়তন ৩৭,০০,০০০ ঘন-ফুট এবং গণ্ডোলার ব্যাস নয় ফিট ও ওজন সাত টন।

বেলুনকে স্বেচ্ছাচালনীয় করার চেষ্টায় প্রথম কৃতকার্য্য হন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার হেনরি গিফার্ড (Henri Giffard) খৃষ্টীয় ১৮৫২ অব্দে। তিনি তিন-অশ্ব-ক্ষমতার ষ্টীম-ইঞ্জিন সংযোগে একটি বেলুন প্রস্তুত করেন। দশ ফুট ব্যাসের প্রপেলার-ইঞ্জিন সাহায্যে প্রতি মিনিটে ১১০ বার ঘুরিয়ে বেলুনটিকে যে কোনও দিকে চালানো ফেরানো যেত। কিন্তু ঝড়ের গতিকে তুচ্ছ ক'রে তার বিরুদ্ধ পথে গমনের পক্ষে সেটি যথেষ্ট বেগসম্পন্ন ছিল না। গিফার্ড তাঁর বেলুনে চড়ে দুই হাজার ফুট উঁচুতে ওঠেন এবং অক্ষত দেহে ভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করতে সমর্থ হন। দুপুই দ লোম্ (Dupuy de Lome) ১৮৭২ অব্দে ষ্টীম-ইঞ্জিনের পরিবর্ত্তে একাধিক মানুষের দৈহিক ক্ষমতা ব্যবহার ক'রে বেলুনকে প্রপেলার সাহায্যে স্বেচ্ছাচালনীয় করার চেষ্টা করেন। ব্যাটারী সাহায্যে চালিত বৈদ্যুতিক মোটর, ষ্টীম-ইঞ্জিন অপেক্ষা হালকা হবে বেবে তিসাঁদিয়ে (Tissandier) বিদ্যুতচালিত বেলুন নির্ম্মাণ করেন। ১৮৮৪ অব্দে শার্ল রেনার (Charles Renard) ও আর্থার ক্রেবস্ (Aurthur Krebs) বৈদ্যুতিক মোটর ও ব্যাটারী সংযোগে চালিত বেলুনে ক'রে ঘণ্টায় পনেরো মাইল বেগে ভালো মানুষ হতে ফিল ফুলেতে গমন করেন এবং সেখান হতে পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁদের বৈদ্যুতিক মোটরটি আট-অশ্বক্ষমতা বিশিষ্ট ছিল। এবং ব্যাটারী ও মোটরের মোট ওজন ছিল মাত্র বারো মণ। পেট্রল-ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে ইচ্ছামত বেলুনকে চালিত করার খুব সুবিধা হয়ে যায়। কারণ ষ্টীম-ইঞ্জিনের তুলনায় পেট্রল ইঞ্জিন কম ভারী, তা' ছাড়া, যে পরিমাণ জ্বালানী পুড়িয়ে যতটুকু কাজ পাওয়া যায়, তার চেয়ে অনেক কম পেট্রলে সেই কাজ নিষ্পন্ন হতে পারে। ১৮৯৭ অব্দে শ্বুয়ার্ত্স্ (Schwartz) নামে এক জার্ম্মান পেট্রল-ইঞ্জিন-সংযুক্ত প্রথম বায়ুপোত (Airship) নির্ম্মাণ করেন। যাতায়াত আসার উপযোগী হাইড্রোজেন-পূর্ণ পাত্রটি অ্যালুমিনিয়মের পাত দিয়ে তৈরী হয় কিন্তু সেটি সম্পূর্ণরূপে গ্যাস-নিরোধক না হওয়ায় প্রথম উড্ডয়নেই অবয়ব্যথা লাভ করে। ১৮৯৭ হতে ১৯২০ অব্দের মধ্যে পৃথিবীর বহুস্থানে বায়ুপোতের চলন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ধাতু-নির্ম্মিত বৃহৎকায় বায়ুপোত কাউণ্ট জেপেলিনের হাতে তৈরী হয়ে জেপেলিন বা অধিক পরিচিত জেপেলিন নাম গ্রহণ করে। খৃষ্টীয় ১৯০০ অব্দে প্রথম যে জেপেলিন নির্ম্মিত হয় তার দৈর্ঘ্য ছিল ৪২০ ফুট, ব্যাস ৩৮ ফুট এবং আয়তন ৪,০০,০০০ ঘনফুট। ১৬ অশ্বক্ষমতার ইঞ্জিন দিয়ে তাকে ঘণ্টায় বিশ মাইল বেগে চালানো হত। তার পর শতাধিক জেপেলিন তৈরী হয়েছে। মহাযুদ্ধের পর যে সকল জেপেলিন নির্ম্মিত হয়, তার মধ্যে গ্রাফ জেপেলিনের নাম সুপ্রসিদ্ধ। জার্ম্মান জনসাধারণের প্রদত্ত অর্থে এই বায়ুপোত নির্ম্মিত হয়। জেপেলিনটি প্রস্তুত করতে খরচ হয়েছিল ৩৪,০০,০০০ টাকা। ৭৭০ ফুট দীর্ঘ, ৯৮ ফুট ব্যাস-বিশিষ্ট এই বিরাট বায়ুপোত ১৯২৮ অব্দে ফ্রিডরিশহাফেন্ (Friedrichshafen) হতে যাত্রা শুরু করে। মার্সাই, বার্সেলোনা, মাদ্রিদ্ ও বায়োনা হয়ে ১১২ ঘণ্টা বায়ুপথে গমনের পর আটলান্টিক অতিক্রম করে সেটি নিউ ইয়র্কের নিকটবর্ত্তী একটি শহরে পৌঁছয়। গ্রাফ জেপেলিনের পরিচালক ডক্টর একেনার (Dr. Eckener) ৬৮½ ঘণ্টার মধ্যে তাকে সেখান হতে জার্ম্মানিতে ফিরিয়ে আনেন। প্রথম আমেরিকা পরিভ্রমণের পর এই বায়ুপোত ২১ দিন ৭½ ঘণ্টায় সমস্ত পৃথিবী পরিক্রমণ করে। তার সাধারণ বেগ ছিল ঘণ্টায় ৬২ হতে ৭০ মাইল এবং ক্ষিপ্রতম বেগ ঘণ্টায় ৮০ মাইল। ১৯৩২ হতে গ্রাফ জেপেলিন নিয়মিত ভাবে যাত্রী বহনের কাজে নিযুক্ত হয়। জার্ম্মানি হতে অ্যাটলান্টিক অতিক্রম ক'রে ব্রাজিল্ পর্য্যন্ত তাকে যাতায়াত করতে হত। সেই সময় হতে ১৯৩৭-এর মধ্যে এই পথে সেটি চল্লিশ বার যাতায়াত করেছে। ১৯৩৭ অব্দেও তার যাত্রী পারাপারের কাজ বন্ধ হয় নি, কিন্তু একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদে তাকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করান হয়।

হিণ্ডেনবুর্গ নামে এক নূতন জেপেলিন ১৯৩৬-এর এপ্রিল হতে উত্তর আটলান্টিকের পথে যাত্রী পারাপারে নিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু বৎসর ঘেতে না ঘেতেই তাতে আগুন লাগে। ৩৯ জন যাত্রী ও ৭০ জন চালক নিয়ে বায়ুপথে যাবার সময় হঠাৎ কি ক'রে তার হাইড্রোজেনের মধ্যে আগুন ধ'রে যায়; ভীত সন্ত্রস্ত বহু লোকের চোখের সামনে হিণ্ডেনবুর্গ ভস্মীভূত হয়ে যায় মাত্র ৩২ সেকেণ্ডের মধ্যে। হিণ্ডেনবুর্গের এই দুর্ঘটনার সংবাদ পৃথিবীবাসীকে স্তম্ভিত করে, গ্রাফ

জেপেলিনের দ্বারা অবিলম্বে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। কিন্তু এই ঘটনার পরেও জার্মানি জেপেলিনের ভবিষ্যৎ কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে নিরাশ হয় নি। হিলিয়ম গ্যাস ব্যবহার করলে এই বিপদ ঘটত না; কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে হিলিয়ম গ্যাসের ব্যবসায়ে ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্-এর একচেটে অধিকার; জার্ম্মানিতে এ গ্যাস পাওয়া যায় না।

হিণ্ডেনবুর্গ নির্ম্মিত হবার পূর্ব্ব অবধি ১২৮টি এয়ারশিপ তৈরী হয়েছিল; তার মধ্যে ১৯৩৭ অব্দে মাত্র দুইটি বায়ুপোত অভগ্ন অবস্থায় ছিল। একটি 'গ্রাফ জেপেলিন', অপরটি 'লস্ এঞ্জেলস্'। লস্ এঞ্জেলস্ নামক বায়ুপোতটি এখন আমেরিকায় আছে। বিগত মহাযুদ্ধে ৩৮টি জেপেলিন ধ্বংস পায় এবং ১১টি মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করে। ব্রিটেন ও ইউনাইটেড ষ্টেটস্ বায়ু অপেক্ষা লঘু বায়ুপোত নির্ম্মাণ বিষয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রাণঘাতী অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। প্রথম ব্রিটিশ জেপেলিন এবং প্রথম আমেরিকান জেপেলিন উভয়েই যাত্রারম্ভের মুখেই ধ্বংস হয়েছে ও বহু লোকের মৃত্যু ঘটেছে। তার পর ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যত বায়ুপোত তৈরী হয়েছে একটিও টেঁকে নি। এ জন্য একমাত্র জার্ম্মানি ছাড়া আর কেউ জেপেলিনের ভবিষ্যৎ উৎকর্ষ সম্বন্ধে আশ্বাসবান্ নয়।

বায়ুপথের যান-বাহন প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর; যেগুলি বায়ুর চেয়ে হালকা তাদের প্রথম শ্রেণীতে এবং যারা বায়ুর চেয়ে ভারী তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য করা যেতে পারে। বেলুন ও এয়ারশিপ বা বায়ুপোত, বায়ু অপেক্ষা হালকা; ঘুড়ি, গ্লাইডার, এরোপ্লেন ও হেলিকপ্টার বায়ুর চেয়ে ভারী। ঘুড়ি ও গ্লাইডার একই কারণে বাতাসে ওড়ে; এদের চালনার জন্য কোনও ইঞ্জিন থাকে না; উত্তপ্ত বায়ু লঘু হয়ে নীচে থেকে উপরের দিকে যায় এ জন্য উত্তপ্ত প্রদেশ হতে শীতল-প্রদেশে বাতাসের যে স্বাভাবিক স্রোত বইছে তারই উপর নির্ভর করে এরা ভেসে থাকে। হাতপাখাকে হেলানো ভাবে ধ'রে বাতাসের মধ্যে টানলে তার উপর দুটি বিভিন্ন দিক্-অভিমুখী বল ক্রিয়া করে, পাখার অগ্রসরের বিপরীত দিকে পশ্চাদ্-অভিমুখী বল তাকে থামাতে চেষ্টা করে এবং ঊর্দ্ধগামী বল তাকে উপরের দিকে ঠেলে দিতে চায়; এ জন্য পাখা ধ'রে খুব জোরে হাওয়া করতে গেলে সেটা উপরের দিকে উঠে যায়। ঠিক একই কারণে ঘুড়ি ওড়াবার প্রারম্ভে ঘুড়ির সুতো ধরে টানলে সেটা উপরের দিকে ওঠে; তার পর বাতাসের স্বাভাবিক স্রোতের মুখে পড়লে সেটা আপনি ভাসতে থাকে। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে ঘুড়ি অথবা পাখার এই ঊর্দ্ধাভিমুখী গতি তার সমতল ক্ষেত্রের পরিসর এবং অগ্রগতির বেগের উপর নির্ভরশীল। পাখীরা যখন আকাশে ওড়ে, তার শরীরের নিকটবর্ত্তী ডানার অংশটি তাকে বায়ুমধ্যে ভাসিয়ে রাখে এবং দ্রুতবেগে সঞ্চালনশীল ডানার প্রান্তভাগ তাকে চালিত করার ক্ষমতা দেয়। যে সকল পাখী খুব উঁচুতে ওঠে, তারা বায়ুর স্বাভাবিক স্রোতের উপর গা ভাসিয়ে কোনরূপ পরিশ্রম না ক'রে স্বচ্ছন্দে উড়তে থাকে। এই জন্য চিল, শকুন প্রভৃতি পাখীকে উচ্চে উড্ডীয়মান অবস্থায় ডানা নাড়তে দেখা যায় না। কোন আয়তক্ষেত্রাকার বস্তুর সম্মুখভাগে একটি স্ক্রু-প্রপেলারযুক্ত ইঞ্জিন লাগিয়ে সম্মুখ দিকে চালনা করার সময় তার বেগ যদি অত্যন্ত ক্ষিপ্র হয়, তবে সেই বস্তুটি ইঞ্জিন-সমেত বাতাসে ওড়ে। এই মূল সূত্রের উপর নির্ভর ক'রে বায়ু অপেক্ষা ভারী বিমানযানসমূহ নির্ম্মিত হয়েছে। এরোপ্লেনের ডানা দ্বিবিধ আয়তক্ষেত্র মাত্র, তাকে ইংরেজীতে বলা হয় প্লেন। যার একটি ডানা তাকে বলে মনোপ্লেন; যার দুইটি ডানা তাকে বলে বাইপ্লেন, যার তিনটি অথবা ততোধিক ডানা আছে তাদের ট্রাইপ্লেন, মাল্টিপ্লেন ইত্যাদি বলা হয়। এরোপ্লেনের ডানা বা প্লেনগুলি বহুতল-বিশিষ্ট গৃহের ছাদের মতো উপরে উপরে সজ্জিত থাকে। এরোপ্লেন যেখান হতে ওড়বার অথবা যেখানে গিয়ে নামবার উপযোগী, তদনুসারে তাদের ল্যাণ্ডপ্লেন বা ভূমিবিমান, সিপ্লেন বা জলবিমান এবং অ্যাম্ফিবিয়ান্ বা উভচরবিমান বলা হয়।

বায়ু অপেক্ষা গুরুতর বিমানযানকে আকাশে তোলার চেষ্টা চলেছিল অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ হতে। ব্রিটিশ বিমানবিদ্গণের অগ্রনায়ক সার জর্জ্জ কেলি (Sir George Cayely) এই প্রসঙ্গে বহু গবেষণাপূর্ণ নিবন্ধ লিখেছিলেন। পাখীর উড্ডয়ন, তাঁজকরা ডানাযুক্ত উড়ন যন্ত্র এবং সরল পথে ঊর্দ্ধাবগামী বিমানযান তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল। কিন্তু তাঁর নিবন্ধগুলি বহুকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকায় পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণ তাকে কাজে লাগাতে পারেন নি। ১৮১০ অব্দে টমাস ওয়াকার এরোপ্লেন ডিজাইন সম্পর্কে

একটি পুস্তক প্রকাশিত করেন এবং উইলিয়ম স্যামুয়েল হেন্‌সন্ ও জন্ ষ্টিংফেলো লম্বুভার-পরিচালক যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রে বিমানযানের উপযুক্ত হালকা ষ্টিম-ইঞ্জিন তৈরী করতে কৃতকার্য্য হন। প্রথমে তারা মাইডার নিয়ে বহুপ্রকার পরীক্ষামূলক কার্য্য করেন। তাঁদের ইঞ্জিন-চালিত ক্ষুদ্র বিমানযান ভূমি ছেড়ে কয়েক ইঞ্চি উচ্চে উঠে। তাঁদের মনোপ্লেনটির ওজন ছিল মাত্র ৬½ পাউণ্ড। এর পর ষ্টিংফেলো একটি বড়েল্ টাইপের প্লেন প্রস্তুত করেন। ১৮৬৮ অব্দে ক্রষ্টাল প্যালেসে এরোনটিক্যাল সোসাইটির প্রদর্শনীতে তার জন্য তাঁকে একটি পুরস্কার দেওয়া হয়। কিন্তু হেন্‌সন ও ষ্টিংফেলোর বিমানযান কখনও মানুষের ভার বহনের উপযুক্ত হয় নি।

ইউনাইটেড ষ্টেটস্-এর অধ্যাপক এস. পি. ল্যাঙলে (S. P. Langley) ১৮৯৬—১৯০৩ অব্দ অবধি বিভিন্ন প্রকার প্লেন ও প্রপেলার নিয়ে পরীক্ষা ক'রে একটি এক-অশ্ব-ক্ষমতার ষ্টিম-ইঞ্জিনযুক্ত এরোপ্লেন তৈরী করতে কৃতকার্য্য হন। তাঁর ক্ষুদ্র বিমানযান পৌনে এক মাইল পর্য্যন্ত উড়ে উঠে। আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের নিকট হতে আর্থিক সাহায্য পেয়ে তিনি একটি মনুষ্যবাহী বিমানযান প্রস্তুত করেন। কিন্তু যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামান্য ত্রুটী থাকায় সেটা উড়তে সমর্থ হয় নি। এই বিমানযানটি স্মিথসোনিয়ান্ ইনষ্টিটিউটে সঞ্চিত রাখা হয়েছিল। ১৯১৪ অব্দে বিমানবিদ্ গ্লেন কার্টিস্ সেই যানটির সহিত একটি পঞ্চাশ-অশ্বশক্তির পেট্রল-ইঞ্জিন যুক্ত ক'রে তাকে বাতাসে ভাসাতে পেরেছিলেন; এতদ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, বিমানযান বিষয়ে ল্যাঙলের মতবাদ নির্ভুল ছিল।

পাখীর উড্ডয়ন, ওড়ার শিল্প-কৌশলের উন্নতি বিধানে কি ভাবে সাহায্যকারী হতে পারে, সে সম্বন্ধে অটো লিলিএনটাল্ নামে এক জার্ম্মান বিমানবিদ্, ১৮৯১ অব্দে পুস্তিকা প্রকাশিত করেন। তিনি তাঁর ভ্রাতা গুস্তাভের সহযোগিতায় ত্রিশ বৎসরের অধিককাল বিমানযান-সম্পর্কীয় পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। স্থির ডানাযুক্ত গ্লাইডার কোন প্রকার ইঞ্জিনসংযুক্ত না হয়েও কেবল বায়ুপ্রবাহের উপর নির্ভর ক'রে কেমন ভেসে থাকতে পারে, তাই নিয়ে তিনি বহুসংখ্যক পরীক্ষা করেন। ত্রিশ মিটার (প্রায় ১০০ ফুট) উপর হতে গ্লাইডার ছেড়ে দিয়ে তাতে চড়ে তিনি দুইশত তিনশত মিটার পথ ভেসে চলে যেতেন। এরোপ্লেনের নির্ম্মাণে কৃতকার্য্যতা লাভ করতে হলে বায়ুযন্ত্রে তার ভার-সাম্য রক্ষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা দরকার, এইজন্য তিনি গ্লাইডার নিয়ে পরীক্ষা করতে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। আজকাল বিমানযান চালনায় শিক্ষার্থীদের প্রথমে গ্লাইডারের সাহায্যে উড়তে শেখানো হয়। অটো লিলিএনটালের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে বহু বৈমানিক বিভিন্ন দেশে পরীক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইংলণ্ডের পিল্‌চার (Pilcher) ও আমেরিকার চান্‌ট্যে (Chante)-র নাম উল্লেখযোগ্য। এরা সকলেই ইঞ্জিন-চালিত মনুষ্যবাহী প্রথম এরোপ্লেনের আবিষ্কারক হতেন, কিন্তু সেই আবিষ্কার অর্দ্ধ-সমাপ্ত থাকা অবস্থায় একদা গ্লাইডারের ডানা ভেঙে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

খৃষ্টীয় ১৯০০ অব্দে ওহায়োর উইলবার ও অরভিল্ রাইট্ গ্লাইডার নিয়ে গবেষণা করে বৈমানিক সমাজে যুগান্তর আনয়ন করেন। রাইট-ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম বিমানবিদ্‌গণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত, কারণ চারি শত বৎসর যাবৎ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের প্রয়াস যে সমস্যার সমাধান করতে পারে নি তাঁরা তিন বৎসরেই তার মীমাংসা করতে পেরেছিলেন। গ্লাইডারের মধ্যে তাঁরা দুইটি নূতন অঙ্গ সংযুক্ত করেন। একটি অঙ্গের সাহায্যে গ্লাইডারকে ঊর্দ্ধাভিমুখে চালনা করা যায়; তাকে ইংরেজীতে elevator বা horizontal rudder বলে; তাঁরা প্রধান প্লেনটির সম্মুখে এই যন্ত্রাঙ্গটি সংযোগ করেছিলেন। আধুনিক বিমানযানে এটি পুচ্ছের নিকট যুক্ত থাকে। অপর যন্ত্রাঙ্গটি প্লেনের পশ্চাৎ-প্রান্তের বক্রতা সাধন করে উভয় দিকের উত্তোলনের ভার-সাম্য রক্ষা করে। ১৯০৩ অব্দে তাঁরা এই প্রকার অভিনব গ্লাইডারের সহিত পেট্রল-ইঞ্জিন যুক্ত ক'রে উড়তে সমর্থ হন। এর দুই বৎসর পরে তাঁদের বিমানযান পূর্ব্বাপেক্ষা নিখুঁত আকার গ্রহণ করে; তাতে চ'ড়ে তাঁরা সর্ব্বজনসমক্ষে পঁয়তাল্লিশ বার যাতায়াত করেন; আধ ঘণ্টায় এই যান ২৪½ মাইল পথ অতিক্রম করেছিল।

রাইট-ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্ভাবনার পরে বিমানযান নানা দিক্ দিয়ে উৎকর্ষ লাভ করেছে এবং পৃথিবীর সর্ব্ব দেশের

মধ্যে বিমান-পথে যানবাহনের যাতায়াত চলছে। ৭৫ টন ওজনের বিমানযান ১০,৮০০ ফুট দীর্ঘ ডানা সাহায্যে ঘণ্টায় শতাধিক মাইল বেগে উড়ে চলেছে। ১৯১৫ অব্দের মধ্যে ভূমি-বিমানের ( landplane ) ক্ষিপ্রতম বেগ উঠেছে ঘণ্টায় ৩৫০ মাইল এবং জলবিমানের ( seaplane ) ক্ষিপ্রতম বেগ ঘণ্টায় ৪৫০ মাইল। সাগর-পৃষ্ঠের উচ্চতায় বায়ু-মধ্যে শব্দের বেগ ঘণ্টায় ৭৪০ মাইল। বিমানবিদ্‌গণ আশা করেন বর্ত্তমান ধরণের ইঞ্জিন সাহায্যে এরোপ্লেন ঘণ্টায় পাঁচ শত মাইলের অধিক পথ অতিক্রম করতে সমর্থ হবে।

এরোপ্লেন কতদূর পর্য্যন্ত উচ্চে উঠতে পারে তা জানবার জন্য রয়াল্ এয়ারক্রাফ্টের ফ্লাইট্-লিউটেনাণ্ট এফ্. আর. ডি. সোয়েন (F. R. D. Swain), ব্রিটিশ্ এরোপ্লেন কোম্পানীর প্রস্তুত এক বিমানযানকে উর্দ্ধে চালনা করেন। বিশেষ ধরণের পোষাকে সজ্জিত হয়ে এবং অক্সিজেন্-সরবরাহের সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে ৫,৩১০ পাউণ্ড ওজনের বিমান-যানকে তিনি ৪২,৯০০ ফুট উচ্চে তোলেন। ১৯২১ অব্দে ইতালীয় কর্ণেল্ এম. পাৎসি ( Colonel M. Pazzi ) ৪১,৫৬০ ফুট উর্দ্ধে এরোপ্লেন উড়িয়ে সোয়েনের কৃতিত্বকে পরিম্লান করেন। কিন্তু ব্রিটেনের লেফ্‌টেন্যাণ্ট এম. জে. অ্যাডাম্ সোয়েনের বিমানযানে চড়ে ৪৩,২৫০ ফুট উচ্চে গিয়ে পাৎসিকে উর্দ্ধ গমনে পরাস্ত করেন। তাঁর এরোপ্লেনটির কেবিনের ছাদ একটি স্বচ্ছ দ্রব্যের আবরণে আবৃত ছিল; তাকে ইঞ্জিন হতে গরম হাওয়া চালিয়ে উত্তপ্ত রাখার ব্যবস্থা ছিল। পঞ্চাশ হাজার ফুট উপরে ওঠার পর প্রচণ্ড শৈত্যে সেই ছাদ ফেটে গিয়েছিল। তাঁর সঙ্গে উত্তাপ ও বায়ুচাপ পরিমাপের যন্ত্র ছিল। এই উচ্চতায় সেখানকার তাপমাত্রা ছিল শূন্য সেন্টিগ্রেডের ৪৮·৯ ডিগ্রী কম এবং বায়ু-চাপ ৭৭·৮ মিলিমিটর। এ সত্ত্বেও অ্যাডাম্ নির্ব্বিবাদে নীচে নেমে আসতে পেরেছিলেন। বর্ত্তমানের বৃদ্ধি দিয়ে বিমানযানের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা ভাবলে মনে হয় এরোপ্লেন-সাহায্যে মানুষের ঊর্দ্ধ-গমনের চরমসীমা সাগর-পৃষ্ঠ হতে ৬১,০০০ ফিট্। এরোপ্লেনের একটা অসুবিধা, বায়ু-মধ্যে সে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে কিছুক্ষণ অবস্থান করতে পারে না এবং সোজা পথে ঊর্দ্ধাধঃ ভাবে নামতে উঠতে পারে না। জাইরোপ্লেন বা অটো-জাইরো বিমানযান এই অসুবিধা দূরীকরণের চেষ্টা করছে; কিন্তু এখনও তা ত্রুটিহীন হয়নি।

---

# আগমনী

—শ্রীতরুলতা বসু

মাটির মলিন বুকে আজো শুনি বাজিছে বোধন,
ধূধার শ্মশান মাঝে আজো জাগে আনন্দ-লহর;
নিয়ত পীড়িত মোরা, হতভাগা দুঃসহ কাতর,—
প্রাণপণে অশ্রু দিয়ে তবু করি মার আরোজন।
মোরা আজো বেঁচে আছি কোনোরূপে প্রেতের মতন:
অত্যাচার অনাচারে জর্জ্জরিত বক্ষের পঞ্জর,
অন্যায়ের কশাঘাতে লাঞ্ছনায় বিবাক্ত অন্তর;
দিগন্তে বিক্ষোভি' ওঠে আমাদের করুণ ক্রন্দন।

কদর্য্য-কুৎসিত আজ অন্নহীন যারা উপবাসী,
যাদের প্রাণের প্রান্তে জমা আছে সর্ব্ব শোক-তাপ,
প্রেতের মূর্ত্তির মতো আজ যারা অস্থিচর্ম্মসার,
তাহাদের অশ্রুজল, মর্ম্মান্তিক ক্ষোভ গ্লানি রাশি
নিষ্ফল আক্রোশ আর উদ্বেলিত উষ্ণ অভিশাপ
আজিকার অর্চ্চনাতে রচিয়াছে পূত উপচার।

---

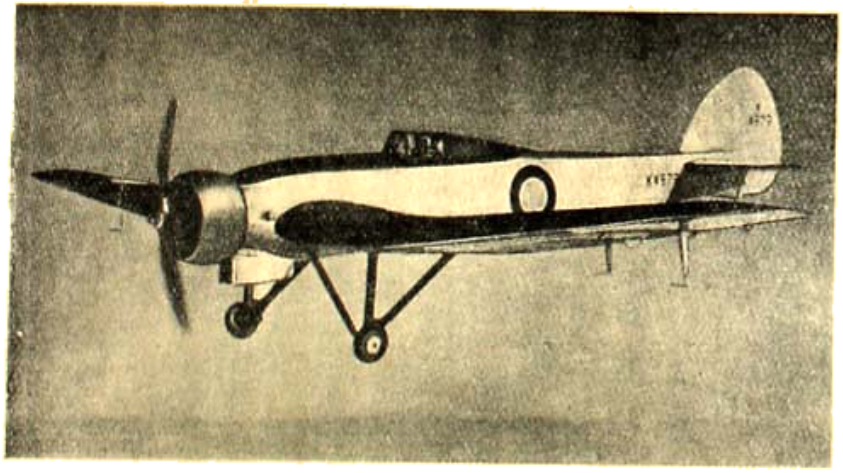

১৯৩৭ সালে এই বিমান ঘণ্টায় ১০১০ মাইল উড়েছে

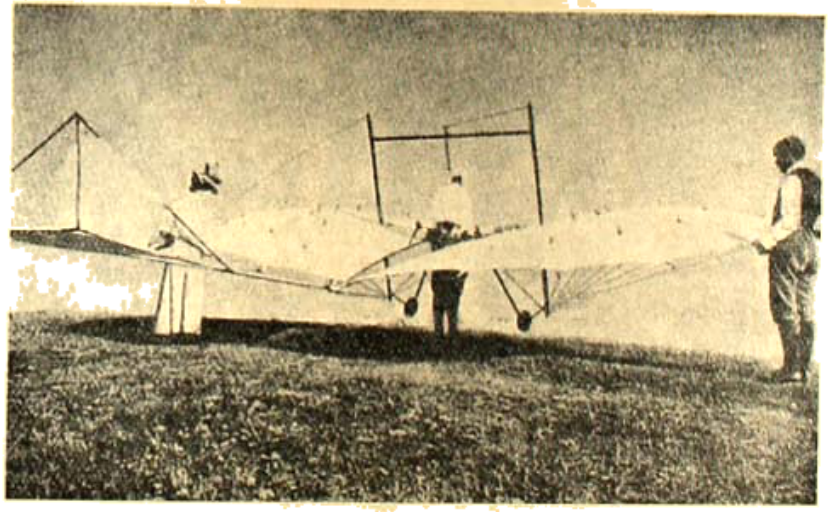

প্রথম উড়োজাহাজ

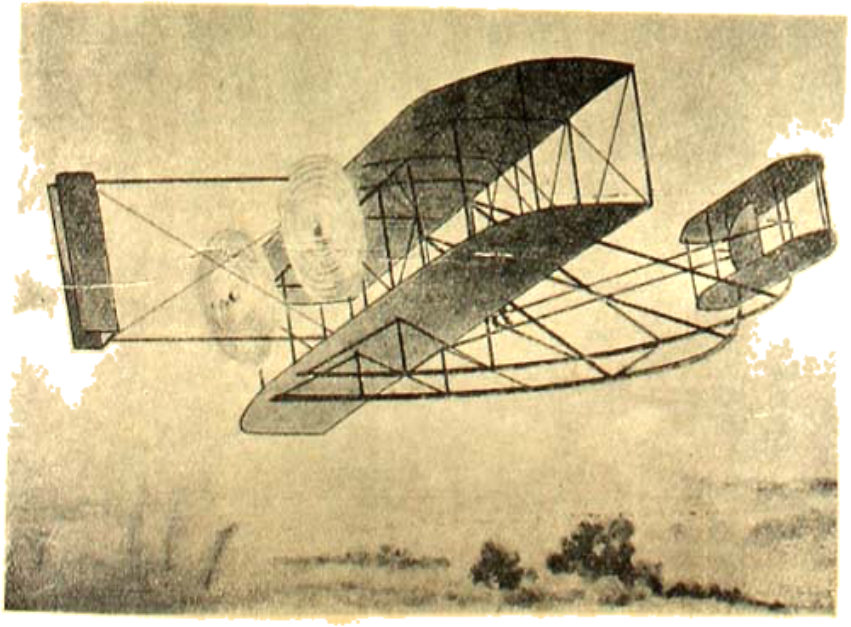

রাইট ব্রাদার্স : অরভিল রাইট ১৯০৩ সালে এই এরোপ্লেনে প্রথম উড়তে সমর্থ হন

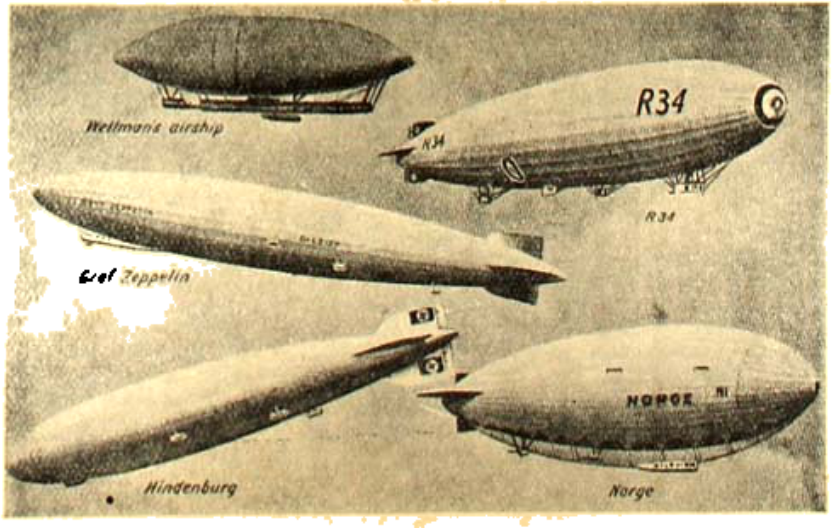


পাঁচটি বিখ্যাত বায়ুপোত

# অনীতার সাধ

—শ্রীকমলা দেবী

বিবাহের পর অনীতা সেই প্রথম শ্বশুর-বাড়ীর দেশে পা দিল। স্বামী সুরেন সমস্ত বাড়ী ঘুরাইয়া আনিয়া দোতলার একটী ঘরে একটি ছোট ফোটোর কাছে আসিয়া কহিল, "প্রণাম কর।" ফোটোটী একটী বিধবার—বয়স প্রায় ষাট, আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া আছেন, চুলগুলি পুরুষের মত করিয়া ছাঁটা, কান দুইটী ও মাথার সম্মুখভাগ বাদ দিয়া বাকী সব মাথাটী, পিঠ ও বুকের দুই পাশ একটী নামাবলী দিয়া ঢাকা, গলায় মোটা মালা, কপালে ও নগ্ন বক্ষদেশে তিলকমাটীর ছাপ। সম্মুখে সিংহাসনের উপর শালগ্রাম শিলা, চারিপাশে কয়েকটা ফুলগাছের টব, বিধবা শালগ্রামটীর পূজায় নিশ্চয়ই নিবিষ্টা, কিন্তু সামনের দিকে চটচট করিয়া তাকাইয়া আছেন।

প্রণাম করিয়া অনীতা মৃদুকণ্ঠে কহিল, "ইনিই?" সুরেন কহিল, "হাঁ ইনিই আমার পিসীমা—।" আর বলিতে হইল না, কারণ ইতিমধ্যে ইঁহার সম্বন্ধে অনেক দিন অনেক কথাই হইয়া গেছে। ভাল করিয়া জ্ঞান হইবার আগেই সুরেনের মা ও বাবা মারা যান। তখন হইতে পিসীমাই তাহাকে 'মানুষ' করিয়াছিলেন। বাবা-মা'এর অভাব কোনদিনই সুরেনকে বোধ করিতে হয় নাই। মেয়েমানুষ হইয়াও পিসীমা একলা সমস্ত সংসারের হাল ধরিয়া ছিলেন; তিনি না থাকিলে সে ও তাহার এই সংসার কোথায় ভাসিয়া যাইত তাহার ঠিকানা নাই।

অনীতা ফোটোটীর দিকে তাকাইয়া রহিল। সুরেনও কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "সেই বিয়ে করলাম, যদি দু'বছর আগে করতাম তো দেখে যেতে পারতেন।" অনীতার অধরোষ্ঠে মৃদু হাসির আভা ফুটিয়া উঠিয়া আবার মিলাইয়া গেল; সে কিছুই বলিল না, চুপ করিয়া রহিল। কারণ এ সম্বন্ধেও অনেক কথাবার্ত্তা আগে হইয়া গিয়াছে। পিসীমা তাঁহার এক দেবর-কন্যার সহিত সুরেনের বিবাহ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সুরেন কোনমতে রাজী হয় নাই। কারণ সে পাঠ্যাবস্থায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে আজীবন কুমার থাকিবে, বেলুড় মঠে যোগ দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, ফুস্তক, রেচক, প্রাণায়াম ইত্যাদি অভ্যাস করিবে, দেশের ও দশের সেবা করিবে; সারা ভারতবর্ষে—এবং প্রয়োজন হইলে আমেরিকায়—বক্তৃতা দিয়া বেড়াইবে এবং ভবিষ্যতে পাকা-পোক্ত স্বামীজী বনিয়া শিষ্য ও শিষ্যা বানাইবে। অবশ্য সে সব কিছুই হয় নাই। অনীতার একটী মিনের একটী মাত্র কটাক্ষের আঘাতে সুরেনের সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা-সৌধ ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

সুরেন বলিতে লাগিল, "জীবনে নিজের জন্যে কোনদিন কিছু চাননি—কেবল চেয়েছিলেন আমাকে সংসারী করতে। যে সংসারকে তাঁদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন আমার মত লক্ষীছাড়ার হাতে তা ফেলে যেতে তাঁর মন চাইছিল না। তাই চেয়েছিলেন—।"

এও পুরাতন কথা, কাজেই অনীতা কথার মোড় ফিরাইয়া দিবার জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ফোটোর সহিত কহিল, "আমারও ভারী সাধ ছিল শ্বশুর-শাশুড়ী নিয়ে ঘর করতে। যে'র সময়ে যখন শুনলুম তোমার আপনার বলতে কেউ নেই, সত্যি তখন আমার মন ভারী খারাপ হয়ে গিয়েছিল।"

সুরেন কহিল, "পিসীমা বেঁচে থাকলে শাশুড়ীর সাধ তোমার মিটত অনীতা! ছেলের সাধ আমাকে দেয়ে মিটেছিল—কিন্তু মেয়ের সাধ মেটে নি। তোমাকে তিনি নিজের মেয়ের মতই বুকে টেনে নিতেন।"

অনীতা কহিল, "আমিও মায়ের মত তাঁকে ভালবাসতুম, ভক্তি করতুম—আমি যে তাঁর নিজের মেয়ে নয়—একথা তাঁকে ভুলিয়ে দিতুম। তুমি বিদেশে থাকলেও তাঁর কাছ-ছাড়া হ'তুম না।"

দোতলার জানালা দিয়া গ্রামান্তের নদীটী দেখা যাইতেছিল—বৃহৎ নদী বিগত বর্ষার কূলে কূলে ভরিয়া, মন্থর-গতিতে বহিতেছিল। সেই দিকে তাকাইয়া সুরেন কহিল, "ঐ নদীর ধারে পিসীমাকে যেদিন রেখে এলাম, সেদিন আর

বাড়ী ঢুকতে ইচ্ছে হয় নি ; মনে হয়েছিল, ঐখান থেকেই সোজাসুজি মঠে চলে যাই।"

অনীতার ওষ্ঠে আবার মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল কিন্তু সুরেন তাহা লক্ষ্য না করিয়া কহিতে লাগিল, "সেই নূতন চাকরীতে ঢুকেছি কিন্তু মনে হয়, কি হবে চাকরী করে ?"

এমন সময়ে দরজায় একজন বৃদ্ধার আবির্ভাব ঘটিল। বয়স ষাটের কাছাকাছি, মাথার চুলগুলি পুরুষ মানুষের মত করিয়া ছাঁটা, গালে, কপালে ও চোখের কোলে কোঁচ পড়িয়াছে। দেখিতে লম্বা কিন্তু বয়সের ভারে কোমর হইতে মাথা পর্যন্ত দেহের সমস্ত উর্দ্ধাংশটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। চৌকাঠে পা দিয়াই বৃদ্ধা দুই বাহুতে হাত দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া পাকা ভ্রূর নীচে ঘোলাটে চোখের ক্ষীণ দৃষ্টি মেলিয়া কহিলেন, "সুরো এসেছিস ?"

"ওই যে এলাম সৎ-পিসী"—বলিয়া সুরেন কাছে গিয়া বৃদ্ধাকে প্রণাম করিল।

"থাক্ থাক্ বাছা !"—বলিয়া বৃদ্ধা কাদামাখা পা দুখানি বাড়াইয়া দিলেন, তারপর সুরেন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেই তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুমা খাইবার ভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "বেঁচে থাক্ বাবা ! চিরজীবী হয়ে, আমার মাথার যত চুল তত পরমায়ু হোক—বৌমা আসে নি ?"

অনীতা অদূরে দাঁড়াইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া দেখিতেছিল। দেখিতেছিল, ইনি সুরেনের আত্মীয়া না কি ! কিন্তুর মত চেহারা, তেমনই বেশ। এক পা কাদা লইয়া ঘোমার ঘরে ঢুকিতে ভরসা নাই। সৌদামিনীও তাহাকে আগেই দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে পায়ে মাখা ঠেকাইয়া এক পা' কাদা চাহিয়া মাথায় না তুলিয়াছে, ততক্ষণ বধূ বলিয়া তাহাকে গ্রাহ্য করিবেন কেন ?

সুরেনের ইঙ্গিতে অনীতা আগিয়া প্রণাম করিল এবং দুই আঙুল দিয়া পায়ের উপরিভাগ সন্তর্পণে ছুঁইয়া, আঙুল-দুটিকে মাথায় ঠেকাইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইতেই সৌদামিনী তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "বেশ বউ হয়েছে, খাসা বউ, লক্ষ্মী পিত্তিমের মত চেহারা। তা' হবে না কেন ? বড় লোকের মেয়ে, সব শুনেছি বাছা ! চোখে নাই বা দেখলাম"—বলিয়া ফ্যাঁচ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "মেয়ে যদি বেঁচে থাকত।"

কেষী অর্থাৎ কেষবতী সুরেনের পিসী, সৌদামিনীর সই। চোখে জল আসিয়া উঠিতে পারে নাই, কিন্তু নাসিকা সরস হইয়া উঠিয়াছিল। বৃদ্ধা হাত দিয়া নাসিকা-প্রান্ত মুছিয়া কান্নার সুরে কহিতে লাগিলেন, "হতভাগীর কত সাধ ! যখন তখন শুধু ঐ কথা, 'সুরো'র যেন বৌ মেখে যেতে পারি, সই !"

সুরেন বৃদ্ধার হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে আনিয়া একটা টুলের উপর বসাইয়া দিয়া কহিল "বোস পিসীমা।"

অনীতাও আসিয়া পাশে দাঁড়াইল। বৃদ্ধা বাষ্প-লেশহীন স্বাভাবিক কণ্ঠে কহিলেন, "আমাদের মত ঘাসুড়ীকে কি তোমার পছন্দ হবে বৌমা ! আমরা হলাম পাড়া গাঁয়ের লোক, অসভ্য, জংলী।"

অনীতা যে পায়ে ভাল করিয়া হাত দেয় নাই এ ত্রুটী পিসীমা ভুলিতে পারিতেছিলেন না।

অনীতা কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "ও কথা বলে অপরাধী করবেন না পিসীমা, আপনারা যেমনই হোন, আমাদের ভক্তির পাত্র—"

বৃদ্ধা ঠোঁট উল্টাইয়া কহিলেন, "পাত্র-টাত্র বুঝি নে বৌমা। যা' চোখে দেখেছি তাই বলছি। আমার বৌটীও তো তোমাদের সগোত্র কি না—"

সুরেন বাধা দিয়া প্রশ্ন করিল, "শশী কেমন আছে, পিসীমা ?"

শশী বৃদ্ধার একমাত্র পুত্র। বৃদ্ধা ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "খুব ভাল আছে, বাবা ! ভাল থাকবে না কেন ? এখন কি আর মায়ের হাতে খাওয়া-দাওয়া, এখন সব বৌএর হাতে"—চোক গিলিয়া কহিলেন, "এই দেখ না, মুড়ী খেতে ভালবাসে শশী, জানিস্ তো ? তা' আজকাল খায় না ; বৌ না কি মানা করেছে। সে দিন বৌ ঘরে ছিল না ; মুড়ী দেখে শশীকে ডেকে বললাম, এই সময়ে খেয়ে নে বাছা, বৌ নেই। তা' এমন অবেলে, ছেলে যেই খেতে বসেছে, অমনই বৌ এসে হাজির হল ! যেন মুকিয়েছিল বাছা। শশীকে খেতে দেখে মুখ যেন তোলো হাঁড়ি হয়ে গেল। কিছু বলল না, দুম্ দুম্ করে পা ফেলে ঘরে ঢুকে, কবে কোন্ ভুলে শশী পেট বেদনায় এক শিশি ওষুধ খেয়েছিল, সেই খালি শিশিটা এনে, শশীর সামনে নামিয়ে দিয়ে বলল, 'এখনও যায় নেওয়া হয় নি,

দাম দিয়ে এস গে।' ছেলে অমনি উঠল। কত বললাম, 'যাস্ নি বাবা! আজকার মত খেয়ে যা।' তা' কে কার কথা শোনে? বৌমাকে ডেকে বললাম, কিন্তু হুকুম হোল না, শশীও ঘুমে ভুলল না?"

সুরেন কহিল, "শশী কি করছে—"

বৃদ্ধা বিরক্তি-বিকৃত মুখে খাঁক্ করিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কে জানে বাছা। কি করে",—টানিয়া টানিয়া জোর দিয়া কহিলেন, "আমাকে কি কিছু বলে আর? আমি যে মা, সব পরামর্শ বৌএর সঙ্গে—"

সুরেন কহিল, "তবে যে শুনেছিলাম, গাঁয়ের স্কুলে মাষ্টারী করে—"

বৃদ্ধা ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "করে তো",—ডানহাতের তর্জ্জনী ও মধ্যাঙ্গুলি সুরেন ও অনীতার সম্মুখে প্রসারিত করিয়া কহিলেন, "দু-কুড়ি টাকা মাইনে।" তারপর ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "দুটো পয়সাও চোখে দেখতে পাই নে—"

হঠাৎ কণ্ঠস্বরে বাষ্প ঘনাইয়া আসিল। কহিলেন, "অনেক কষ্টে ছেলে মানুষ করলাম বাছা! ছোটলোকের মেয়ে এসে একেবারে পর করে দিলে—"

সুরেন বাধা দিয়া কহিল, "আজকাল নদীতে নাইতে যাও না পিসীমা?"

বৃদ্ধা ক্ষোভের সহিত কহিলেন, "হায়-হায়, বাছা! আর কি সে পত্তর আছে?"—পরে, অনীতা ও সুরেনের দিকে দুই চোখ মেলিয়া, ডানহাতের তর্জ্জনী দিয়া চোখ দুটাকে একে একে দেখাইয়া এবং তারপর প্রসারিত করতল ঘনঘন নাড়িয়া কহিলেন, "চোখে দেখতে পাই নে আজকাল, এই তো তোরা দাঁড়িয়ে আছিস, কিন্তু সব ঝাপসা—"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কি যেন চিন্তা করিয়া কহিলেন, "হাঁ, সিদ্ধলাম একদিন, বারুণীর মেলা বসেছিল, দেখে এলাম কেমীকে—বেশ আছে, কি বা ঘর করে দিয়েছিল, যেন শাল-গ্রামের মন্দির, অনেক পুণ্যির ফলে কেমী তোকে মানুষ করেছিল, বাছা! আর আমার কেমন—"

সুরেন কহিল, "কেঁদে-টেঁদে যায় নি তো?"

বৃদ্ধা ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "না, একটী টুকরো খসে নি, যেন পাথর"—পরক্ষণেই দুশ্চিন্তায় মুখ আঁধার করিয়া কহিলেন, "কিন্তু বাছা, পোড়ামুখো যে রকম আগিয়ে আসছে তাতে কিন্তু থাকবে বলে মনে হয় না: এতদিনের সম্পানই বা বুড়ি তুলে দিতে হয়।"

অনীতা বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "কে?"

সুরেন মৃদু হাসিয়া কহিল, "দামোদর নদী—ঐ যে দেখা যাচ্ছে।" বৃদ্ধাকে কহিল, "দামোদর বুঝি এপার ভাঙতে আরম্ভ করেছে?"

বৃদ্ধা দুই চোখ ডাগর করিয়া কহিলেন, "ভাঙতে আরম্ভ করেছে কি বাছা! আধেক খেয়ে দিয়েছে। মুখুজ্জেদের অমন এঁদোবুড়ীর মাঠ, ডাকলে সাড়া দিত, এখন এক-বাঁশ জল সেখানে।"

অনীতা প্রশ্ন করিল, "পিসীমার বুঝি স্মৃতি-মন্দির তৈরী করিয়েছ?"

সুরেন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হাঁ"

পিসীমা আকাশে কথাটা বুঝিয়া কহিলেন, "হাঁ-মা, কেমন ছেলে সুরো! গাঁয়ের সেরা ছেলে! আমার শশীও অমনই ছিল বাছা। তুই তো জানিস সুরো, মাকে কি ভক্তি! কি ভালবাসা! পত্রীক্ষের সময় পাশের খুসো চেয়ে পাঠাত। কি সুখণে শহরের মেয়ে ঘরে আনলাম, আমার সব ভেঙ্গে গেল।"

অনীতা হাসিয়া কহিল, "শহরের মেয়েরা কি সকলেই মন্দ পিসীমা!"

পিসীমা প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, "না বাছা! তা কেন? ঐ যে রায়েদের বৌ, খাস্ কলকাতার মেয়ে তো, যেমন দেখতে তেমনি ব্যাভার, মুখে মিষ্টি হাসিটী যেন লেগেই আছে, বুড়ো শাশুড়ীকে হাতের তেলোয় রেখেছে। ও কিছু না মা, যার যেমন অদেষ্ট।"

সুরেন কহিল, "শশী কি এখন বাড়ীতে আছে পিসীমা, থাকে তো—।"

পিসীমা বাধা দিয়া কহিলেন, "আছে বৈ কি বাবা, বয় তো রান্না-ঘরে মেয়েমানুষের মত কুটনো কুটছে কি উনুনে আল দিচ্ছে। বউ-এর বওটা সুসার হয়,"—একটু হাসিয়া কহিলেন, "মেয়াৎ স্কুল না পেলেই বয়, না হলে বউ-এর কাছ থেকে এক পা নড়তে চায় না। তা' তোর নাম শুনলে আদরে বোধ হয়, বলব যেয়ে। একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিস্ বাছা! হউই হোক্ মা তো, বশবাদ দশদিন আমিই গর্ভে ধরেছি, বৌ

করে নি।" বলিয়া অনীতা ও সুরেনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তার পর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আজ উঠি বাছা!" অনীতাকে কহিলেন, "দুঃখী মানুষ মনের দুঃখে অনেক কথা বলেছি বৌমা, কিছু মনে কোরো না, আমাদের বাড়ী যেও একদিন।"

অনীতা কহিল, "যাব বই কি পিসীমা।"

সুরেন কহিল, "আজ বিকালে পিসীমার স্মৃতি-মন্দির দেখতে যাব, ফিরতি পথে তোমাদের ওখানে যাব, শশীকে বোলো পিসী।"

পিসীমা যাইতেই সুরেন কহিল, "আমাদের পাড়া-গাঁয়ে শাশুড়ী-বৌ-এর সম্পর্ক অনেকটা সতীনের মত। রাত দিন হিংসা আর কলহ। কিন্তু আমার পিসীমা বেঁচে থাকলে কখনও এমন করতেন না। তিনি পাড়ার শাশুড়ীদের কত শেখাতেন, 'বৌ আর মেয়ে তফাৎ করিস্ নে, বরং বৌকে মেয়ের চেয়েও বেশী মায়া করিস। মেয়ে তো দু'দিন কাছে থাকে, আর বউ থাকে আমরণ।' সদু পিসীকেই কতদিন বলেছেন, 'শুনেছি বৌ-এর হাতে সংসার ছেড়ে দিয়ে হরিনাম কর্ না, অনেক দিন তো সংসার করে সাধ মিটিয়েছিস্ এবার সাধ মেটাতে দে।"

অনীতা বিস্মিতস্বরে কহিল, "বলতেন এই সব কথা?"

"হাঁ আমি নিজে শুনেছি, লেখা-পড়া জানতেন না বটে, কিন্তু খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি বেঁচে নাই কিন্তু বেঁচে থাকলে নিজের চোখেই দেখতে পেতে।"

২

খুব ভোরে উঠিয়া শয়নকক্ষের দরজা খুলিয়া, বাহিরে আসিয়া অনীতা দেখিল, বারান্দায় দাঁড়াইয়া পিসীমা, ফোটোতে যেমনটী আছে ঠিক তেমনই চেহারা, তেমনি বেশ, কেবল আসনপিঁড়ি হইয়া বসার বদলে খাড়া দাঁড়াইয়া আছেন। অনীতা ও পিসীমা পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল।

অনীতা বিস্ময়ের স্বরে কহিল, "পিসীমা, আপনি।"

পিসীমা কহিলেন, "হাঁ মা! আমি কোন্ সকালে এসে এতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুম! সংসারের কাজ-কর্ম্ম হয় কি করে? সুরো এখনও ঘুমুচ্ছে বুঝি! আগে তো এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমুতো না!"

অনীতা তখনও একদৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল—কহিল, "কিন্তু আপনি!"

বৃদ্ধা বিরক্তির সহিত কহিলেন, "কি আমি?"

"আমি শুনেছিলুম।"

"কি শুনেছিলে?"

"আপনি—আপনি…"

"মরে গেছি—না?" বিদ্রূপের স্বরে কহিলেন, "এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন মা? দু'দিন সুরোর সংসার করা দেখে চলে যাব, তোমার ভাবনা নাই।"

অনীতা লজ্জিতা হইয়া কহিল, "না, তা' তো বলি নি আপনারই তো সংসার।"

বৃদ্ধা নীরসকণ্ঠে কহিলেন, "থাক বাছা! ও-সব ছেঁদো কথায়—বেলা অনেক হয়েছে, গা-হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে রান্নাঘরে যাও, সুরোর আমার সকালে খাওয়া অভ্যেস।" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

রান্নাঘরে মেজের উপর উবু হইয়া বসিয়া অনীতা চা ছাঁকিতেছিল। হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল—ঠিক সাম্নে দাঁড়াইয়া পিসীমা তাহার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন। চোখে চোখ মিলিতেই পিসীমা কহিলেন, "চা করছ! কার জন্যে?"

অনীতা মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল—"ওঁর জন্যে"—বলিয়া ধূমায়মান চা-এর কাপ হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পিসীমা কহিলেন "কিন্তু সুরো তো চা খায় না।"

অনিতা কহিল "খান তো।"

পিসীমা দুই ঠোঁট চাপিয়া, দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "তা' বলে নতুন ধরেছে।" তারপর একটু হাসিয়া কহিলেন, "মুখ না ধুয়েই চা খাবে?"

"মুখ পরে ধোব"—বলিয়া অনীতা রান্নাঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কিন্তু বাহিরের বারান্দায় পা দিতেই শুনিতে পাইল, পিসীমা বলিতেছেন, "সৎ সঙ্গে কাশীবাস, অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ। আমার রামপাল চাল ঘরে মিশেছে দেখছি।" অনীতা পিছন দিকে না তাকাইয়া দ্রুতপদে চলিয়া আসিল।

কিছুক্ষণ পরে অনীতা রান্নাঘরে বসিয়া তরকারী কুটিতেছিল। উনুনের উপর এ্যালুমিনিয়মের হাঁড়িতে ভাত

হইতেছিল। কেন গড়াইয়া আগুনে পড়ার পোড়া গন্ধে ঘরের বাতাস ভরিয়া উঠিয়াছিল। এমন সময়ে পিসীমা আসিয়া কহিলেন, "আমার খাওয়ার কি হবে বৌমা ?"

অনীতা বিস্মিত স্বরে কহিল, "কেন! আপনারও তো রান্না হচ্ছে।"

পিসীমা কহিলেন, "তোমার হাতে তো আমার খাওয়া চলবে না বাছা।"

অনীতা তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল, "আমি মেথর না মুদ্দফরাস যে আমার হাতে খাবেন না ?"

পিসীমা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তা বলিনি বাছা। হলেই বা বামুনের মেয়ে, কিন্তু আচার আচরণ তো আর বামুনের মেয়ের মত নয়, মেলেচ্ছের মতন।"—প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন "না বাবু, যার তার হাতে খেয়ে জাত-ধর্ম খোয়াতে আমি পারব না, আমার অন্য ব্যবস্থা করে দাও।" বলিয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

অনীতা কিছুক্ষণ দরজার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার তরকারী কুটিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মনের মধ্যে চিন্তার জাল বোনা সুরু হইল। সুরেনের কাছে সে শুনিয়াছে, পিসীমা তাঁহার এক দেবর-কন্যাকে সুরেনের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুরেন রাজী হয় নাই। সেই আচার-পরায়ণা মেয়েটীকে নিজের সংসারে আনিতে না পারার দুঃখ বোধ হয় পিসীমা এখনও ভুলিতে পারেন নাই। তাই তাহাকে দেখিবামাত্র রণ-মূর্ত্তি ধরিয়াছেন। সুরেনের কথা মনে পড়িয়া অনীতার হাসি পাইল, "পিসীমা বেঁচে থাকলে তোমাকে মেয়ের মত বুকে টেনে নিতেন।" পিসীমাটী তো জলজ্যান্ত বাঁচিয়া আছেন দেখা যাইতেছে, যদিও সুরেন তাহাকে ভুল বুঝাইয়াছিল—কিন্তু বুকে টানাটানির পরিবর্ত্তে বাক্য-বাণ হানাহানি শুরু হইয়াছে। তাহার নিজের কথাও মনে পড়িল, "মায়ের মত ওঁকে ভালবাসতুম, ভক্তি করতুম," কিন্তু সম্প্রতি তাহার মনের মধ্যে পিসীমার প্রতি যে ভাবের উদ্রেক হইতেছে, তাহাকে, আর যা'ই হোক, ভালবাসা বা ভক্তি বলা চলে না।

হঠাৎ পিসীমার প্রবেশ ঘটিল। হাতে এক থালা মুড়ী, কহিলেন—"একটু তেল দাও তো বৌমা! আর গোটা দুই লঙ্কা।"

অনীতা বিস্ময়ের সহিত কহিল, "কে খাবে ?" পিসীমা বেপরোয়া ভাবে কহিলেন, "কেন ? সুরো খাবে! কই তোমার তেল ?"—বলিয়া নিজেই আগাইয়া আসিয়া মুড়ির উপরে পলা দুই তেল ঢালিয়া দিলেন—কতকটা নুন ছড়াইলেন, ও তরকারীর ঝাল হইতে দুটো লঙ্কা তুলিয়া লইতেই অনীতা কহিল, "ওঁর ও খাওয়া সহ্য হবে না।"

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া পিসীমা কহিলেন, "সহ্য হবে না। চিরটা কাল ঐ খাইয়েই মানুষ হলাম, আজ তুমি আমাকে নূতন শেখাতে এসেছ!" বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। অনীতা পাথরের মত স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে শয়ন-ঘরে ঢুকিয়া অনীতা দেখিল, তক্তপোষের উপর সুরেন বসিয়া আছে; সামনে এক থালা মুড়ি—পাশে উবু হইয়া বসিয়া পিসীমা সেই থালা হইতে মুঠো-ভর্ত্তি মুড়ি লইয়া সুরেনের মুখে ঠাসিয়া দিতেছেন। সুরেন পরম আনন্দিত মনে মুখ-ভর্ত্তি মুড়ি চিবাইতেছে। অনীতাকে দেখিয়া সুরেনের মুখে বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হইল না—হইলেও গাল দুটী ফুলিয়া থাকায় বুঝা গেল না। অনীতা কিছুক্ষণ দেখিয়া কহিল, "সে দিন না কলিক্ পেন থেকে উঠেছ ?"

সুরেন ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "হাঁ।"

"ডাক্তার ব' তা' খেতে মানা করেন নি ?"

সুরেন এবার কষ্টে গলায় কহিল, "হুঁ"।

ধারাল-স্বরে অনীতা কহিল, "হুঁ তো এ সব কি হচ্ছে ?"

সুরেনের মুখের মুড়ি ফুরাইয়া আসিয়াছিল বটে, কিন্তু কালের জন্য সে হু-হা করিতেছিল। কহিল, "পিসীমা বললেন যে—"

অনীতা তীব্র স্বরে কহিল, "পিসীমা বললেই খেতে হবে ?"

পিসীমা নির্ব্বিকার-মুখে আর এক মুঠা মুড়ি মুখে তুলিয়া দিতেই অনীতা কহিল, "খবরদার, খেয়ো না বলছি—"

পিসীমা হাসিয়া কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "কেন ? ক্ষেপেছ বৌমা! কিছু হবে না—আমি বলছি। তুমি নিজের কাজ কর গে।"

সুরেনকে বেপরোয়া ভাবে মুড়ি চিবাইতে দেখিয়া রাগে ও অভিমানে অনীতার চোখে জল আসিল। রুদ্ধ-কণ্ঠে কহিল,

"আমার কথা শুনলে না তো? বেশ, যা ইচ্ছে কর।"—বলিয়া গুম্‌গুম্ করিয়া পা ফেলিয়া চলিয়া আসিল।

রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিয়া অনীতা মুখ আঁধার করিয়া বসিয়া রহিল। কাল পর্য্যন্ত স্বামী তাহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছে, আজ পিসীমা দু'বও আসিতে না আসিতেই সে তাহাকে অবহেলা করিল! ওই মাস আগে রোগ-শয্যায় পড়িয়া সুরেন যখন ছট্‌ফট্ করিতেছিল, তখন কোথায় ছিলেন এই পিসীমা? তখন রাতের পর রাত জাগিতে, সেবা করিতে এই স্ত্রী ছাড়া তো আর কেহ ছিল না! তার পর কত সাবধানে, কত যত্নে যে স্বামীর পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিয়াছে, তা' তো সুরেন সব জানে। তবু, পিসীমার আদরে গলিয়া গিয়া সব ভুলিয়া গেল? যে খাদ্য তাহার পক্ষে বিষ, পিসীমার মন রাখিতে তাহা খাইতে তাহার বিধা হইল না? পিসীমাকে যত পারে সে ভালবাসুক, কিন্তু তাই ব'লয়া তাঁহাকে এমন করিয়া অবহেলা করিবে না কি! তাহার চোখের জল দেখিয়া একটু টলিবে না, নির্ব্বিকার ভুলিয়া ভুলিয়া গাল ফুলাইয়া মুড়ি গিলিতে থাকিবে! আর ঐ বুড়ী! তাহারও এতটুকু বিবেচনা নাই! তাহার সংসারে ঢুকিয়া তাহারই সর্ব্বনাশের চেষ্টা! ঢং করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া বলা হইল, "বৌমা তুমি কেপ্‌ছ কেন?" কেপেছি আমি? হঠাৎ রাগে অনীতার সর্ব্বাঙ্গ রি-রি করিয়া উঠিল; মনে মনে কহিল, "যদি ঐ মুড়ি শুদ্ধ থালা ঐ বুড়ীর গায়ে ছুঁড়িয়া দিতে পারিতাম আর সুরেনের কোলা কোলা গালে কিল মারিয়া মুড়িগুলা বাহির করিয়া দিতে পারিতাম।"

পিসীমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"জেগে জেগে ঘুমোচ্ছ না—কি বৌমা? ভাত পুড়ে আমার ঘরে ধোঁয়া যে।" হঠাৎ কাহারও ঘুষি খাইয়া দিলে, সে যেমন করিয়া তাকায়, অনীতা তেমনি ভাবে পিসীমার দিকে তাকাইল। পিসীমা কহিলেন, "চেয়ে রেখেছ কি, ও দিকে দেখ।"

অনীতা লজ্জিতা হইয়া উঠিয়া গিয়া ভাতে জল দিবার উপক্রম করিতেই পিসীমা কহিলেন, "থাক্, ও ভাত আর কেউ মুখে দিতে পারবে না। শরীর বোধ হয় ভাল নয় তোমার, ওটা নামিয়ে রেখে শুয়ে পড়গে যাও, আমি রান্না করব এখন।"

অনীতা—"বেশ! তাই করুন"—বলিয়া দুম্ করিয়া হাঁড়িটা নামাইয়া দিয়া রান্নাঘর হইতে চলিয়া আসিল।

শয়নকক্ষে একটা চেয়ারে বসিয়া সুরেন বই পড়িতেছিল; অনীতা ঘরে ঢুকিতেই কহিল, "রান্না হয়ে গেল এর মধ্যেই?"

অনীতা জবাব না দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। সুরেন কাছে আসিয়া কহিল, "কি হ'ল? শরীর খারাপ না কি?"

কোন জবাব মিলিল না, সুরেন গায়ে হাত দিতেই অনীতা তাহার হাত ঠেলিয়া কহিল, "থাক্।"

সুরেন কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া কহিল, "থাক্ কেন? কি হল বল না?"

অনীতা গম্ভীর কণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিল, "জুতো মেরে গরু দান করবার দরকার নেই।"

সুরেন অনীতার বক্তব্য বুঝিয়া লইয়া কহিল, "যা রে! কি করব! পিসীমা বললেন যে—"

"বেশ! পিসীমাই যখন সব, তখন তাঁর কাছেই যাও। কালই আমি চলে যাব, যতক্ষণ থাকি একটু নিরিবিলি থাকতে দাও।"

সুরেন হাসিয়া কহিল, "তুমি চলে যেতে চাইলেই যেতে দেব কেন? তোমার ঘর, তোমার সংসার—"

অনীতা কহিল, "যে সংসারে আমার কথা চলে না, যেখানে আমার হাতের রান্না অস্পৃশ্য—সে সংসার আমার কিসের? না—না আমার কিছু নয়, আমি কেউ নয়, পিসীমাই সব—পিসীমাই সব। পিসীমাকে নিয়েই থাক তুমি—আমার যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাব, যা আছে অদৃষ্টে হবে—"

বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর অশ্রুরুদ্ধ হইয়া আসিল। সুরেন সস্নেহে অনীতার কপালে হাত বুলাইয়া কহিল, "আরে! কাঁদছ কেন? হিন্দুঘরের বিধবা—তাও একালের নয়, সেকালের; ওঁদের গোঁড়ামি একটু সহ্য করে নিতেই হয়। তোমার হাতে খাবেন না বলেই কি তোমাকে ঘেন্না করেন! নিজের মেয়ে থাকলেও তার হাতে উনি খেতেন না।"

অনীতা বাধা দিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "খুব খেতেন। কেন? তুমিই তো বলেছ নারাণীর হাতে উনি খেয়েছেন, সেই আদরের মেওর-ঝিটি এ সংসারে না এলে আমি এসেছি কি না, তাই এত পিট্‌পিট্‌নি। খবরদার বলছি তুমি পিসীমার ঘরে—"

হঠাৎ পিসীমাকে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অনীতা পাশ ফিরিয়া শুইয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিল। পিসীমা

কাছে আসিয়া কহিলেন, "বৌমা ভাঁড়ার-ঘরের চাবিটা দাও দিকি, চাল-ডাল বের করে নি—" সুরেনকে কহিলেন, "বৌমার শরীর খারাপ—ওকে এখন বিরক্ত করিস্ নে, আমার কাছে রান্নাঘরে আয়।"

অনীতা অঞ্চল-প্রান্ত হইতে চাবির রিং খুলিয়া সুরেনের হাতে দিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল, "এখন যেয়ো না, বস একটু।"

পিসীমা কহিলেন, "কি বলছে বৌমা? যেতে মানা করছে?"

সুরেন তাঁহার হাতে চাবি দিয়া লজ্জিত ভাবে কহিল, "না—বলছে মাথা ধরেছে।"

পিসীমা বিদ্রূপের স্বরে কহিলেন, "তা হলে বসে বসে মাথাটা টিপে দে—"

পিসীমা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র অনীতা কহিল, "কথা তো নয়—কাঁটা, সহজ কথা সহজভাবে বলতে এরা কখনও দেখে নি—না?" সঙ্কোচে কহিল, "কি করে যে তুমি বলেছিলে, আমাকে উনি মায়ের মত ভালবাসবেন।"

সুরেন কহিল, "এখনও তো বলছি ওঁর মনের মত হলেই ভালবাসা পাবে।"

ঝঙ্কার দিয়া অনীতা কহিল, "ওঁর মনের মত হয়ে আমার কাজ নেই, সাধিও নেই। নারায়ণীকে আনো, সে-ই পৃথিবীতে ওঁর একমাত্র মনের মত মেয়ে—"

সুরেন চুপ করিয়া রহিল।

অনীতা খোঁচা দিয়া কহিল, "কি গো! নাম শুনেই ধ্যানস্থ হয়ে গেলে না কি? নারায়ণীকেই জানি, শশীবাবুর বাড়ীতে দেখলুম—চেহারা তো মন্দ নয়, বিধবা হলেও বাধায় বাধে নি। তা'ছাড়া শশীবাবুর স্ত্রীর মুখে অনেক কথা শুনলুম। কতদিন রেঁধে না কি খাইয়েছে, কত তোয়াজ করেছে।" তারপর মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "আরও কত কি করেছে।"

সুরেন ছাদের একটা কোণের দিকে নির্নিমেষে তাকাইয়া রহিল। অনীতা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আমাকে বিদায় করবার জন্যে বিধবা বিয়েতে পিসীমার আপত্তি হবে না দেখ।"

সুরেন কহিল, "থাক্ কথা বলো না অনীতা।"

—"থাকে কথা কিসের? খুব কাজের কথাই বলছি তো! ও বেচারার ভারী কষ্ট শুনলাম, ওর একটা হিল্লে হয়ে যাক্। আমি? আমি এক রকম করে চালিয়ে নেব এখন।"

সুরেন উল্টা খোঁচা দিয়া কহিল, "আমাকে ছাড়া যে তোমার চলবে তা' আমি জানি। কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না যে—"

অনীতা কহিল, "তাই না কি! ও-কথা শুয়ে শুয়ে শুনে সুখ হচ্ছে না যে—উঠে বসি।" উঠিয়া সুরেনের মুখোমুখী বসিয়া কহিল, "আর একবার বল তো শুনি।"

সুরেন হাসিয়া কহিল, "বলছি তো! তুমি যেখানে যাবে আমিও তোমার তল্পী কাঁধে করে পিছনে পিছনে চলব।"

চাপা হাসিতে মুখ ও চোখ উজ্জ্বল করিয়া অনীতা কহিল, "কি ভক্তি! হবে না কেন? শিষ্য যে!"

সুরেন কহিল, "শিষ্য আমার কে?"

অনীতা জবাব দিল, "তুমি গো তুমি, আমারই শিষ্য, জিজ্ঞাসা কর গে যাও তোমার পিসীমাটিকে। যত কিছু মন্ত্র অভ্যেসগুলি—যথা চা খাওয়া, বেড়াতে ওঠা, আরও কত কি—সব আমিই না কি হাতে ধরে ধরে তোমাকে শিখিয়েছি। তা' গুরুপত্নীকে যদি এতই ভক্তি, তখন কথা শুনলে না কেন?"

সুরেন গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "পিসীমা যতদিন থাকেন, ওঁর মন জুগিয়ে চলাই ভাল নয় কি? মিছামিছি মনে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?"

—"কিন্তু উনি যদি বরাবর থাকেন, তবে? এই বলেছিলে, মারা গেছেন। কিন্তু আসবামাত্র এসে জুটলেন, এর পর আমরা যাবার সময়ে যদি সঙ্গ নেন তা' হলে?"

সুরেন কহিল, "উনি তো নিজে হতে আসেন নি অনীতা! তুমিই ওকে ডেকে এনেছ। কাল বিকালে স্মৃতি-মন্দির দেখতে গিয়ে কি বলেছিলে মনে নেই?—'পিসিমা যদি দুদিনের জন্যেও ফিরে আসতেন তো আমার সাধ মিটত,' তুমি হয় তো তখন কবিত্ব করে বলেছিলে, কিন্তু পিসিমা তা' বুঝবেন কি করে।"

অনীতা পরম বিস্ময়ের সহিত কহিল, "আমার সেই কথা শুনেই পিসীমা চলে এলেন?"

সুরেন কহিল, "হাঁ—তাই তো!"

অনীতা কৌতূহলের সহিত কহিল, "তা' হলে আমি বললেই উনি চলে যাবেন?"

"হ্যাঁ, যে মুহূর্তে তুমি বলবে তোমার সাধ মিটেছে, তখনই তিনি চলে যাবেন; কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ও-কথা বলো না অনীতা। যতক্ষণ পার ওঁকে সহ্য কর—ওঁরও বড় সাধ ছিল তোমাকে নিয়ে ঘর করতে—সে সাধও ওঁর কতকটা মিটুক।"

"কিন্তু আমাকে বৌ বলে উনি নিতে পারছেন না যে! সারাক্ষণই খুঁৎখুঁৎ খুঁৎখুঁৎ করছেন!"

হঠাৎ চাহিয়া দেখিল, কাহাকে পিসীমা দাঁড়াইয়া! কখন নিঃশব্দে আসিয়া হাজির হইয়াছেন, দুজনের কেহই বুঝিতে পারে নাই। মুখে বাঁকা হাসি—সব কথা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিয়াছেন বুঝি? পাড়াগাঁয়ের শাশুড়ীদের বিশ্বাস নাই, পুত্র-পুত্রবধূর শয়ন-কক্ষেও আড়ি পাতিতে তাহাদের বাধে না।

অনীতা সরিয়া বসিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিল। পিসীমা কহিলেন, "বৌমার মাথা ছাড়ল? কি খাবে?"

মৃদুকণ্ঠে অনীতা জবাব দিল, "কিছু না।"

পিসীমা মৃদু হাসিয়া কণ্ঠস্বরে যতদূর সম্ভব স্নেহ মিশাইয়া কহিলেন, "আমার উপর রাগ করে উপোস দেবে বৌমা! সধবা মেয়ে মানুষের উপোস দিতে নেই।"

অনীতা জবাব দিল, "আমার হাতে আপনার খেতে নেই, আপনার হাতে আমি খাব কেন?"

এবার পিসীমা পুরাপুরি হাসিলেন, হাসিতেই মাড়ি সমেত হরিদ্রাভ দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িল। কহিলেন, "আমি তো রাঁধি নি বৌমা।"

সুরেন ও অনীতা দুই জনেই সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে পিসীমার মুখের দিকে তাকাইল। পিসীমা জবাব দিলেন, "নারাণীকে ডেকে এনেছি যে! বুড়ো মানুষ—সমস্ত সংসারের রান্না একা পারব কেন?"

অনীতা তেমনই চাহিয়া রহিল, পিসীমা বলিতে লাগিলেন "আমার হাতের রান্না খেয়ে লোকে বলি-বলি করত, নারাণীর হাতের রান্না আমার চেয়েও ভাল। খেলে আর ভুলতে পারবে না।" তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "এমন মেয়ে! যেমন রূপ, তেমনই গুণ! কিন্তু এমন অদেষ্ট—দুদিন সোয়ামীর ঘর করতে পেলে না। পা দিতে না দিতেই কপাল পুড়ল। দেওরের অদেষ্ট! এত বড় সংসার—তার উপর এই বিধবা মেয়ে, যেন পোদের উপর বিষ ফোড়া"—বলিয়া চিন্তাকুল মুখে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। সুরেন জবাব দিল না, দিল অনীতা। কহিল, "বাপের বাড়ীতে থাকবার কি দরকার? শ্বশুর-বাড়ীতে থাকলেই পারেন।"

পিসীমার মুখে ভ্রূকুটী ফুটিয়া উঠিল, বিদ্রূপের স্বরে কহিলেন, "তোমার তো বলবার আবদা নাই বৌমা! যাদের বিপদ তারাই জানে। আমাদের দেখে বিধবাদের ক'জনের শ্বশুর-বাড়ীতে ঠাঁই হয়? এই আমাকেই দেখ না; ক'দিন শ্বশুর-বাড়ীর ভাত খেয়েছি আঙুল গুণে বলে দিতে পারি।"

অনীতা বাধা দিয়া কহিল, "আপনাদের দেখে কি নিয়ম জানি নে, আমাদের কলকাতায় তো ঠাঁই পেতেই দেখেছি। এই যে আমার কাকীমা—কবে বিধবা হয়েছেন কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের সংসারে সকলের উপরে আছেন। বাবাও ওঁর কথা অমান্য করতে পারেন না।"

অগ্রাহ্যের স্বরে পিসীমা কহিলেন, "কে জানে বা! জানি না তোমাদের কলকাতার খবর। আমাদের এখানে যা' হয় তাই বলছি,"—বলিয়া ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া সারা মুখখানা কুঞ্চিত করিয়া ফেলিলেন। সকলে কিছুক্ষণ নীরব রহিল। হঠাৎ পিসীমা একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া অনীতার সমস্ত প্রতিবাদ যেন নিঃশেষে উড়াইয়া দিয়া, নিজের কথার সূত্র ধরিয়া ক্রন্দনের সুরে বলিতে লাগিলেন, "তাই এতক্ষণ ওকে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম—ভগবান কি ভাল'র ভাল দেখতে পারেন না! যাদের রূপ-গুণের তুলনা নাই, তাদের কপালেই যেন যত দুঃখ; আর যাদের রূপ গুণ কিছুই নাই, তাদের কপালেই ঢালেন সব সুখ।" বলিয়া অনীতার দিকে কটাক্ষ করিতেই অনীতা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ঐ শোকে কত আর বুক কাটিয়ে মরবেন পিসীমা! ভগবানের ঐ রীতি না হলে—"

সুরেন বাধা দিয়া কহিল, "থাম অনীতা, ওসব কথা যেতে দাও।" পিসীমাকে কহিল, "নারাণীর স্বামীর সম্পত্তি ছিল না?"

পিসীমা কোন মতে জবাব দিলেন, "ছিল।"—দিয়াই অনীতাকে উদ্দেশ করিয়া কোমল ও করুণ কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি রাগ করছ কেন বৌমা! তোমাকে আমি কিছুই বলিনি। তুমি আমার সুরোর বৌ, তোমাকে আমি এ কথা

বলতে পারি? ছি ছি, শেষে আমাকে ঐ কথা শুনতে হল?" বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বরে অশ্রু আবরানী করিয়া ফেলিলেন। অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া পিসীমা অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "আমার মেয়ের চেয়ে বেশী তুমি; তোমার সঙ্গে কারও তুলনা হয়? তোমার অমঙ্গল আমি চাইতে পারি? সুরোকে নিয়ে তুমি সুখে-ঘর কর, আশীর্ব্বাদ করছি; বুড়ীর কথা ভুল বুঝ না বাছা!"

সুরেনের ইঙ্গিতে অনীতা বিছানা হইতে নামিয়া আসিয়া পিসীমার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "আমাকে মাপ করুন পিসীমা! আমি ভুল বুঝেছি—"

পিসীমা তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া, চিবুক স্পর্শ করিয়া, চুম খাইয়া, অশ্রু-বিজড়িত কণ্ঠে কহিলেন, "মাপ আমি করেছি বাছা! কিন্তু অমন করে ভুল বুঝে কারও মনে কষ্ট দিতে নাই, নারাণী একা আছে, আমি যাই, তা' তুমি কি খাবে বল—"

অনীতার মন বৃদ্ধার প্রতি একটুখানি নরম হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কথার ভঙ্গী দেখিয়া আবার শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল। নীরস কণ্ঠে জবাব দিল, "আমার জন্যে আপনাদের চিন্তার দরকার নেই, আমার সংসার, যখন যে' হোক তা' আমি খাব—"

পিসীমা সুরেনকে কহিলেন, "দেখ বাছা! বুঝিয়ে শুঝিয়ে কিছু খাওয়াবার চেষ্টা কর, আমরা তো পর।"—বলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই মুখ আঁধার করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনীতা বোধ করি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, সুরেন নাই। কোথায় গেল? নিশ্চয়ই রান্নাঘরে গিয়াছে। উঠিয়া বসিয়া বিছানা হইতে নামিয়া অনীতা রান্নাঘরের দিকে চলিল।

পা টিপিয়া, রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া জানালার পাশে দাঁড়াইয়া অনীতা উঁকি মারিয়া দেখিল, সুরেন খাইতে বসিয়াছে, পিসীমা সামনে বসিয়া ভাত মাখিয়া দিতেছেন। একপাশে দাঁড়াইয়া নারায়ণী পাখা করিতেছে, এবং দুই চক্ষের দৃষ্টি সুরেনের দিকে একাগ্র করিয়া রাখিয়াছে। অনীতা মনে মনে কহিল, "ওরে বাবা! এ গিলে খাবে না কি। এখনও তোলে নি দেখছি। তবে আর চং করে খান পরে বিধবা সেজে থাকা কেন? চোখ তো নয়, যেন গনগনে আগুন! আমারই বুকের ভেতরটা কেমন করছে, পুরুষ মানুষের তো কথাই নেই—"

পিসীমা বলিতেছেন: "নারাণীর জন্যে, বাছা! আমার বড় ভাবনা, এই তো বয়েস, সারা জীবনটা এখনও অমনি পড়ে আছে। আমার চোখ বুঁজলে ও যে কোথায় মাথা গুঁজবে তার ঠিক নাই—"

নারায়ণী কহিল, "শুকো আর একটু দেব জ্যেঠিমা?"

পিসীমা স্নেহসিক্ত কণ্ঠে কহিলেন, "দে-মা, দে একটু—"

নারায়ণী পাখা রাখিয়া গায়ের কাপড় সামলাইয়া, শুকো আনিয়া পাতে দিতেই সুরেন কহিল, "থাক্ আর কেন, আমাকে সব দিলে তোমরা খাবে কি?" বলিয়া মুখ তুলিতেই বোধ হয় দুজনের চোখে চোখ মিলিল। সুরেনের চোখে কি ছিল অনীতা দেখিতে পাইল না, কিন্তু স্পষ্ট দেখিতে পাইল, লজ্জায় নারায়ণীর সারা মুখ লাল হইয়া উঠিল। আবদারের সহিত কহিল, "আপনি খেতে ভালবাসেন যে! আপনার জন্যেই তো করেছি—"

পিসীমা একগাল হাসিয়া কহিলেন, "নারাণী আমার কিছু ভোলে না, কত স্মরণশক্তি!"

নারায়ণী হাত ধুইয়া আসিয়া আবার পাখা করিতে শুরু করিল। পিসীমা মুখ পুনরায় চিন্তাকুল করিয়া তুলিয়া কহিতে লাগিলেন, "এক কাজ কর্ বাছা! নারাণীকে তোদের সঙ্গে বাসায় নিয়ে যা—রাঁধবে-বাড়বে, ঘর সংসার দেখবে, বৌমার একজন দোসর হবে, ছেলেপুলে মানুষ করবে। কিন্তু তুই অত ঘামছিস কেন? পাখা করছে, তবু।" নারায়ণীকে কহিলেন, "একটা গামছা নিয়ে পাটা মুছিয়ে দে তো মা! যা, লজ্জা কিসের? যাদা তো।"

রাগ ও ঈর্ষায় অনীতার সারা মনে বিদ্রূপের জ্বালা ধরিল। বুড়ী চোখ-কানের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি-বিবেচনারও মাথা খাইয়াছে নাকি? একজন যুবতী মেয়েকে দিয়া একজন পরপুরুষের গা' মুছাইয়া দেওয়া! যাদা তো তারী! সুরেন একটু মত করিলেই তো কোন দিন বিবাহ হইয়া যাইত! বুড়ী কি তাহাকে পথে বসাইবার চেষ্টা করিতেছে নাকি! এমনি ভাবে মাখামাখি করাইয়া সুরেনের মন

কাড়িয়া লইয়া তার পর তাহার সঙ্গে চুঁটীকে জুড়িয়া দিলেই তো অনীতার বাকী কিছু থাকিবে না।

নারায়ণী এদিকে ওদিকে গামছার চক্ষু খোঁজাখুঁজি করিয়া শেষে নিজের অঞ্চল দিয়া সুরেনের পিঠ মুছাইয়া দিল। অনীতা দেখিতে পাইল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

অনীতা মনে মনে কহিল, "তোমারও তো লজ্জা-সরম কিছু নাই বাপু! একজন বলিলেই অমনি ছুটিয়া একজন পুরুষের গায়ে পড়িতে হইবে নাকি! দাদা, তো এত কাঁপিতেছ কেন? কিন্তু তোমরা যতই কর এই মুখপুড়ী বাঁচিয়া থাকিতে তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না। আজই আমি তোমাদের বিদায় করিব।" আর সুরেন? বেশ তো চুপ করিয়া বসিয়া আছে! মুখ ফুটিয়া একবার মানা করিল না তো? ভাল লাগিতেছে বুঝি! তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার কথাতেও একবার 'না' বলিল না। মনে করে কি? অনীতা ভালবাসিতেও জানে, আবার বেচাল দেখিলে কড়া শাসন করিতেও জানে। কিন্তু ঐ বুড়ীই সর্ব্বনাশের মূল! এমন করিয়া আসিয়া জুটিবে জানিলে কে সেধে আনিবার নাম করিত?

সুরেনের খাওয়া শেষ হইতেই অনীতা ত্রস্তপদে প্রস্থান করিল।

নারায়ণী, পিসীমা ও সুরেনের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও অনীতা এক কণা অন্ন মুখে তুলিতে রাজী হইল না। কড়া গলায় তাহাদিগকে নিজের নিজের কাজে যাইতে বলিয়া সে বেলা তিনটার সময়ে স্নান করিতে গেল, সকলে রান্নাঘর হইতে চলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত স্নান করিল, তারপর এক গ্লাস শরবৎ খাইয়া শয়ন-কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল সে নাই। শুনিতে পাইল, পাশের ঘরে কে সুর করিয়া রামায়ণ পড়িতেছে, নারায়ণী নিশ্চয়ই! সুরেনও তাই ঐ ঘরে আড্ডা জমাইয়াছে। উহাদের প্রতি অনীতা যে সন্তুষ্ট নয়—ইহা ভাব, ভঙ্গীতে, কথায় ও কাজে প্রকাশ করিতে সে ত্রুটী করে নাই—তবুও সুরেন ঘেঁসিয়া ঘেঁসিয়া কেবল তাহাদেরই সঙ্গে মাখামাখি করিতেছে? এখন হইতে কড়া লাগাম না টানিলে 'চোখের বালি'র সেই ছেলে-মানুষ বৌটীর মত পথে বসিতে হইবে বোধ হয়!

অনীতা পাশের ঘরের দরজার কাছে আসিতেই দেখিতে পাইল, পিসীমা দুই পা মেলিয়া বসিয়া আছেন, তাহার কোলে মাথা দিয়া সুরেন শুইয়া আছে। অদূরে আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়া নারায়ণী রামায়ণ পড়িতেছে। পিসীমা পাখা করিতে করিতে ঢুলিতেছেন, সুরেনের দৃষ্টি নারায়ণীর মুখের পানে নিবদ্ধ হইয়া আছে।

আগাইয়া আসিয়া, দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনীতা রোষ-কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "এক বার শুনে যাও তো।" সুরেন মুখ ফিরাইয়া বেপরোয়া ভাবে কহিল "কেন?"

কেন? ছেলে মানুষ! বোকোনা কিছু! কেন। অনীতার রোষ-বহ্নি ইন্ধন-সংযোগে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, ইচ্ছা হইল শহরের বস্তির মেয়েদের মত উহাদের সকলকে কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করে, ঐ নারায়ণী যে নেহাৎ নির্দ্দোষীর মত ক্যাল ক্যাল করিয়া তাকাইয়া আছে, নখ দিয়া উহার চোখ দুইটা কানা করিয়া দেয়, আর ঐ বুড়ী যে দুই জন যুবক ও যুবতীকে কাছাকাছি মিলাইয়া দিয়া নির্ব্বিকার চুলিতেছে, উহার দুই গালে চড় কসাইয়া এখনই বাড়ীর বাহির করিয়া দেয়—কিন্তু ভদ্রতা-জ্ঞান অত্যন্ত সহজ আত্ম-প্রকাশে বাধা দিল। সে শুধু ঝঙ্কার দিয়া কহিল "পরে বলব, একটীবার এসই না দয়া করে,"—বলিয়া দুম্‌দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া শয়ন-কক্ষে ফিরিয়া আসিল।

সুরেন আসিতেই অনীতা কহিল, "তোমার কি-কি আছে বাক্স থেকে বের করে নাও, আর আমার এখনই চলে যাবার ব্যবস্থা করে দাও।"

সুরেন বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া রহিল।

অনীতা কহিল, "ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে দেখছ কি? এখনই ব্যবস্থা করে দাও, আর এক মিনিটও এ-বাড়ীতে আমি থাকতে পারব না।"

সুরেন কহিল, "তুমি পাগল হলে না কি?"

"পাগল হই নি এখনও, কিন্তু এ-বাড়ীতে থাকলে পাগল হতে দেরী হবে না।"

"কি হল?"

অনীতা রোষ-দীপ্ত কণ্ঠে কহিল, "কি হল জান না? ঐ বুড়ীটা সকাল থেকে কেবল আমাকে ছোবলাচ্ছে, আমার

কাছ থেকে তোমাকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে ঐ দুঁড়ীটাকে বার বার তোমার পিছনে লেলিয়ে দিচ্ছে, কিছু বোঝ না তুমি ?"

সুরেন প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "তুমি ভারী ভুল করছ অনীতা ! পিসীমার সঙ্গে অনেক দিনের দেখা, হয় তো অন্তরঙ্গের ভঙ্গে দেখা—তাই কাছে কাছে থাকছি। আর নারাণী ? ও তো বোন।"

অনীতা ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "বোন ? যৌ হবার ভঙ্গে যে ঘুলোঘুলি করেছিল গো ! বোন ! বোন তো তোমার মুখের দিকে চেয়ে মুখ লাল করা কেন ? গা ছুঁয়ে থর থর করে কাঁপা কেন ? কিছু দেখি নি মনে করেছ ?" চোখ গিলিয়া কহিল, "আর তুমিও কম নও।"

প্রতিবাদের সুরে সুরেন কহিল, "বা রে ! আমি কি করলাম ?"

ঘাড় নাড়িয়া অনীতা কহিল, "কিছু না ! যদি না দেখতুম ! হ্যাংলা কুকুরের মত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলে কি ? জেবে মানুষের মুখ দেখ নি কোন দিন ?"

সুরেন অপ্রতিভ কণ্ঠে কহিল, "বা রে ! বেশ পড়ছিল, চেয়ে চেয়ে শুনছিলাম।"

সক্রোধে মাথা ঝাঁকানি দিয়া অনীতা কহিল, "বেশ করছিলে। আমাকে বিদায় করে দিয়ে যত ইচ্ছে সারা-জীবন ধরে শোন গে যাও।"—বলিয়া একটা ট্রাঙ্কের সামনে গিয়া হাঁটু পাতিয়া বসিয়া খুলিতে উদ্যত হইল।

সুরেন কহিল, "তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছ অনীতা।"

অনীতা উদাস-গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "হয় তো করছি, কিন্তু স্বভাব তো বদলাতে পারি নে। রূপসী, সর্বগুণে গুণী মেয়ে নিয়ে সুখে ঘর-করনা করবে এর পর। বাবা-মাকে একটী বার চোখের দেখা দেখে আমি গলায় দড়ি দেব—" বলিতে বলিতে অশ্রুতে কণ্ঠস্বর ভাঙিয়া পড়িল।

সুরেন কাছে গিয়া, পাশে বসিয়া অনীতাকে কাছে টানিবার চেষ্টা করিতেই অনীতা হাত ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "থাক্, আদরে আর কাজ নাই !"

সুরেন চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কহিল, "কিন্তু তুমিই তো ওদের এনেছ অনীতা !"

"সে কথা আর কতবার বলবে ?" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "বুড়ীকে হয় তো ডেকেছি, দুঁড়ীকে তো ডাকি নি, ও এল কেন ?"

"পিসীমা যে ওকে ভাল বাসেন। পিসীমা থাকলেই ও আসবে !"

"বেশ !" বলিয়া অনীতা সুরেনের কাপড়-জামা ট্রাঙ্ক হইতে বাহির করিয়া মেজেতে রাখিতে লাগিল।

সুরেন কহিল, "ও কি হচ্ছে ?"

"দেখতেই তো পাচ্ছ !"

সুরেন হাত ধরিয়া কহিল, "পাগলামি ছাড় দেখি !"

হাত ছাড়াইয়া লইয়া অনীতা কহিল, "না, ওরা এ-বাড়ী থেকে দূর না হলে আমি এখানে থাকতে পারব না—এক মিনিট না—তুমি যদি কোন ব্যবস্থা না কর, আমি শশীবাবুকে ডেকে ব্যবস্থা করাব।"

সুরেন গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, "আমি তো 'দূর' হতে বলতে পারব না অনীতা ! তুমি পার বল গে যাও।"

"বলতে হবে না বাবা ! আমরা নিজেরাই যাচ্ছি।"

দুইজনেই চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, পিসীমা কখন্ আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়াছেন, নারায়ণীর কাছে দাঁড়াইয়া।

পিসীমা বলিতে লাগিলেন, "তোমারই সংসার বৌমা ! আমরা তো বাইরের লোক, চিরদিনের জন্যে থাকতে কেউ আসি নি আমরা। তুমিই আসতে বলেছিলে, এসেছিলাম ; নারাণীকে অনেক দিন দেখি নি, তাই ওকেও ডেকে এনে-ছিলাম। তুমি যখনই বলবে তখনই চলে যাব, তার জন্যে অত মন-কষাকষিরও দরকার নেই, অত দলা-পরামর্শেরও দরকার নেই।"

সুরেন উঠিয়া আসিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল, অনীতাও উঠিয়া দাঁড়াইল।

পিসীমা গম্ভীরকণ্ঠে অনীতাকে কহিলেন, "তুমি একবার মুখ ফুটে আমাকে যেতে না বললে যে আমি যেতে পারি নে বৌমা !"

অনীতা নতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

পিসীমা কহিলেন, "চুপ করে রইলে কেন ? বল, আমার সাধ মিটেছে, আপনি যান।"

অনীতা মুখ তুলিয়া একবার সুরেনের দিকে তাকাইল, একবার নারায়ণীর দিকে তাকাইল, তার পর পিসীমার দিকে সোজা তাকাইয়া যেন মনের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া দৃঢ়-কণ্ঠে কহিল, "যান"।

নারায়ণী বলিয়া উঠিল, "কিন্তু এখন কি করে যাবেন পিসীমা ? ঝড়-বৃষ্টি এল যে !"

সকলে জানালা দিয়া দেখিতে পাইল, সমস্ত আকাশ কাল মেঘে ছাইয়া গেছে। নদীর ও-পার হইতে প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি হু হু করিয়া এ পারের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে মাঠ-ঘাট-বন-বাদাড়, নদীর এপার-ওপার ছাইয়া বৃষ্টি নামিল, ঝড়ের কাপটায় বড় বড় গাছের মাথাগুলা মাটিতে ঠেকিতে লাগিল, নদীটা যেন লাফাইয়া উঠিয়া, দুই কূল ছাপাইয়া, সমস্ত তীরভূমি গ্রাস করিয়া, মাতালের মত নাচিতে শুরু করিল।

পিসীমা একবার জানালার ভিতর দিয়া এ দৃশ্য দেখিলেন। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে "তা' হোক বাছা!" বলিয়া এক মুহূর্ত্তে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন, নারায়ণীও তাঁহার পাছু পাছু বাহির হইয়া গেল।

সুরেন কহিল, "এই দুর্য্যোগে যেতে দিলে ওঁদের। এখনও ডাকা কর।"

অনীতা কহিল, "না।"

"পাগল হয়েছ না কি?"

"যাই, আমি ডেকে আনি" বলিয়া সুরেন যাইতে উদ্যত হইতেই—"যাও দেখি" বলিয়া অনীতা দরজা বন্ধ করিয়া তাহার উপর ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। জানলার ভিতর দিয়া দেখা গেল, নদীতীরের সমস্ত মাঠ ছাপাইয়া উন্মত্ত জলস্রোত তীব্র বেগে ছুটিয়া আসিতেছে।

সুরেন চীৎকার করিয়া কহিল, "দরজা খুলে দাও, ডেকে আনি ওঁকে, দরজা খুলে দাও।" বলিয়া অনীতাকে টানিতেই—

অনীতার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বাহিরে ঝড় ও বৃষ্টির ছাট জানালা দিয়া ঘরে ঢুকিতেছে। বাহিরের দরজার ধাক্কা দিতে দিতে কি চীৎকার করিতেছে—"দরজা খুলে দাও দরজা খুলে দাও।"

অদ্ভুত স্বপ্ন! যেন স্বপ্ন নয় সত্য! জানালায় দাঁড়াইলে বোধ হয় এখনও দেখিতে পাওয়া যাইবে, পিসীমা উন্মত্ত জলস্রোত ঠেলিয়া ঠেলিয়া তাঁহার নদী-তীরে নির্জ্জন মন্দিরটীর দিকে চলিয়াছেন।

সুরেনের বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে বিযুক্ত করিয়া অনীতা বিছানা হইতে নামিল। মুখ তুলিতেই পিসীমার ফোটোটীর দিকে দৃষ্টি পড়িল, দেখিল পিসীমা কটমট করিয়া তাকাইয়া আছেন।

---

# উৎসব নহে আজিকে মোর

—শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ

তোমরা বলিছ উৎসব এলো আজি বাঙ্‌লার প্রতিটী ঘরে
হর্ষ হাসির উৎস ছুটিছে থলে জলে আর নভের 'পরে;
সানাই বাজিছে বেহালা হাসিছে পল্লী-পথে
আকাশ-পরীরা নামিছে তোমার আলোক-রথে,
সজ্জিত করে গৃহ অঙ্গন পল্লীবালারা পুলকভরে
রোদে ঝিলিমিলি শরৎ উষায় আমারি কেবল নয়ন ঝরে!

আশ্বিনে ঝড় দিয়াছে উড়ায়ে মাটীর গৃহটী খেলার ছলে
দুখের পদ্ম নৃত্য করিছে মুক্ত আমার হৃদয় তলে;
কেঁদে কেঁদে ক্ষীণ দুখের শিশুরা আজিকে হায়
নয়নের নীরে অন্নের থালি ভাসিয়া যায়;
অশ্রুসিক্ত ছিল শুধু মিটে, তাও ত' গিয়াছে সেদিন চলে'
ঋণ-'বিশ্ববাস' অগ্নি ছড়ায় তবু হিয়াকোণে প্রতিটি পলে।

উজাড় করেছি মায়ের গহনা, কুণ্ঠা করিনি প্রিয়ার নিতে
সৈন্য নাশিনী বাধার গরল ঢালিছে নিত্য আমার চিতে;
মহা দুর্য্যোগে লক্ষ বিপদ এসেছে নাম্বি'
নিদ্‌হারা হায় ভাবি বসে' বসে' দিবসযামী
জানাচ্ছে প্রিয়া 'এসেছিল পুনঃ রাজার পার্বণ খাজনা নিতে'
ছোট মেয়েটার নূতন কাপড় পারি নি ক হায় কিনিয়া দিতে।

অনাহারে মরে ভ্রাতা ও ভগিনী, দেখি আর ফেলি নয়ন লোর
ছেলে দুটী লয়ে মৃত্যুর সাথে মিতালী করিছে গৃহিণী মোর;
বন্ধু স্বজন হারা আপনার গিয়াছে চলি'
'উৎসব এল আজিকে হেথায়' কেমনে বলি?
বোধনের দিন জননী কোথায়—মহাসঙ্কট বিপদ ঘোর
নহে উৎসব ওগো-ও বন্ধু, উৎসব নহে আজিকে মোর।

---

# রোদাঁ ও বুর্দেল-এর কর্ম্মশালা

—শ্রীচিন্তামণি কর

সপ্তাহের সব ক'টী বারের মধ্যে রবিবারের বৈশিষ্ট্য সব-দেশেই বেশ অনুভব করা যায়। বেলা এগারোটায় আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতার মোহকে দূর করে রাস্তায় বেরিয়ে মনে হোল, মধ্যাহ্ন-ভোজনটা একটু বিশেষ রকম করতে হবে, কারণ আজ—রবিবার। ভোজন-পর্ব্ব সেরে লুক্সেমবুর্গের বাগানে একটী বেঞ্চে সমধর্ম্মাভিলাষী কোন এক বন্ধুকে ধরবার চেষ্টায় বসে আছি। সামনে মাটীর উপর দুটি শিশু বালির কেল্লা গড়ে টিনের সিপাই, বন্দুক, কামান সাজিয়ে লড়াই-এর খেলা খেলছিল। যে দেশ, যে জাতির জীবনে রাজ-নৈতিক ও সামাজিক সংগ্রাম স্নানাহারের মত ঘটে থাকে তাদের শৈশবের খেলায় আমোদেও তার আভাস দেখতে পাওয়া যায়। হঠাৎ শিশু দুটী মারপিট আরম্ভ করে দিলে। ঝগড়ার কারণ, একজন আর একজনের পুতুল ভেঙে দিয়েছে। আমার জাতিগত সমাসক্তি সংস্কার-বশতঃ শিশু দুটীকে থামাতে গেলাম। কিন্তু তখনই তাদের বাপ-মা আমাকে নিরস্ত করে বল্লেন, "ওদের কিছু বলবার দরকার নেই, ওদের রাগ ও বৈরীভাবের এই খানেই পরিসমাপ্তি হোক। না হলে ওদের মনে অনেকটা বাসা বেঁধে থাকবে। মারপিট করে ক্লান্ত হলে আপনিই ওরা থেমে যাবে—তখনই ওদের ভুল বুঝবে। আমরা হাজার বক্তৃতা দিলেও ওরা বুঝবে না যে, এ অন্যায়। শিশুদের বিচার-বুদ্ধি স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে গড়ে ওঠা উচিত।" খানিক পরেই তাদের ঝগড়া থামতে তাদের বাপ-মা তাদের নিয়ে চলে গেলেন। আমি ভাবছিলাম এ ঘটনা যখন আমাদের দেশে ঘটে, তখন শিশুদের বাপ-মার মধ্যে লেগে যায় সংগ্রাম, তারপর হয়ত আইন ও আদালত। অদূরে ছাগলটানা গাড়ী ও খেলার নৌকাগুলির চারিপাশে শিশু ও মায়েদের ভিড় লেগে গেছে। রবিবারে শিশুদের কত আনন্দ, কত খেলা, তাদের বাপ-মায়েরও তাতে ভাগ আছে। তারাও অতীত ডিঙিয়ে যেন আজ ছোট হয়ে গেছে।

বসে ভাবছি নানা কথা, এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে কোটটিতে এক টান পড়ল। চেয়ে দেখি চেনা মুখ; বলল—"কি কর, বসে বসে দিবা-স্বপ্ন দেখছ? এমন উজ্জ্বল রবিবার, চল বেড়াবে?" বললাম, "বেড়াব বলেই তো সঙ্গীর অপেক্ষায় বসে আছি। এখন বাবে কোথায় স্থির কর।" সে বলল, "রোদাঁ মিউজিয়াম কখনও দেখি নি, চল না সেখানে একটু বুদ্ধিকে দেবে।"

সানন্দে রাজী হয়ে, ভূগর্ভস্থ ট্রেনে যাত্রা করে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই 'ভ ভ ভালেন'-এ পৌঁছলাম।

রোদাঁর কর্ম্মক্ষেত্র "ভেরেস রিয়" এখন রোদাঁ মিউ-জিয়ামে পরিণত হয়েছে। ফরাসীদের মত মার্জ্জিত সভ্য জাতিও তাদের জাতীয় গৌরব—জগৎশ্রেষ্ঠ ভাস্কর রোদাঁকে—প্রথমে বিশেষ সমাদর করে নি। এই "ওতেল" থেকে রোদাঁকে উঠে যেতে সরকার থেকে আদেশ এসেছিল। তিনি তখন কল্পনা করছিলেন, এই খানেই তাঁর সমস্ত শিল্প-সংগ্রহ দিয়ে একটি সংগ্রহ-শালার সৃষ্টি করে নিজের দেশ ও জাতিকে দান করে যাবেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী ভাস্কর্য্য—অর্দ্ধেক ঐতিহ্যের বহমান স্রোত, বাকী অর্দ্ধেক রোদাঁর নব ভাস্কর্য্য-প্রেরণার নূতন রচনা। রোদাঁর সৃষ্টি না হলে শুধু ফরাসী ভাস্কর্য্য কেন, বর্ত্তমান ভাস্কর্য্যের অগ্রগতি কিরূপ হ'ত বলা শক্ত। শুধু অক্ষম ভাস্কর-দের তুলনায় যে রোদাঁ বিরাট প্রতিভাশালী স্রষ্টা ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন সেরা ভাস্করদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। তাঁর জন্মের সময় গিয়োম, কেঁ. সয়র-এর মত ভাস্করগণ সৌভাগ্য ও প্রতিষ্ঠার উচ্চতম শিখরে উন্নীত ছিলেন। বারি, ব্যারে, পল ল্যাবোয়া, কারপো, ক্লেসিয়ো, এঁ্যা জালবেয়ার্, মাক্সেত্, ফাল্গুয়ের, দালু এবং বুশে-র মত ভাস্কর্য্য-রথীরা তাঁর সমসাময়িক। রক্ষণশীলতা মানুষের স্বভাব-ধর্ম্ম। তাই ভাস্কর্য্যের গতানুগতিক আড়ষ্ট জীবনে নূতন প্রাণ, নূতন ছন্দ ও স্পন্দন এনে রোদাঁ যে বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন তাকে সাধারণে তখনই গ্রহণ করতে পারে নি। প্রদর্শনীতে রোদাঁ-কৃত "লাঁজ রেঁজ" ও "তরসো"কে জীবিত দেহ থেকে ছাঁচ নিয়ে ঢালাই করা মূর্ত্তি বলে যে অন্যায় ঘৃণিত অপবাদ রটেছিল,

তা পরবর্তীকালে অপরাধী এই শিল্প-রসিকের সুনামে কালিমা লেপন করেছিল। রোদাঁ তাঁর কর্মচারী ও মডেলদের নিজের আত্মীয়ের মত দেখতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, তাঁর উইলে এদের জন্য কিছু দান করে যাবেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয় নি, মৃত্যুর আগের কয়েকদিন তাঁর বাক্‌রোধ ও অচৈতন্য অবস্থার সুযোগ নিয়ে সরকার-নিযুক্ত কর্মনির্বাহকেরা রোদাঁর পুরাতন ভৃত্য ও কর্মচারীদের কর্মচ্যুত করেছিল। তাঁর প্রিয় কুকুরটি পর্যন্ত আহার ও আশ্রয়ে বঞ্চিত এবং বিতাড়িত হয়েছিল। আজ শত-সহস্র শিল্পী, কলা-রসিক ও দর্শকেরা রোদাঁ মিউজিয়াম দেখে প্রত্যেকেই মস্তকে প্রশংসা জানায় ফরাসী সরকারের গুণগ্রাহিতায়। তারা অনেকেই জানে না, এ-দান সম্পূর্ণ শিল্পীর নিজের, ফরাসী জাতি ও দেশকে ভালবেসে দেওয়া। এ দেওয়ায় সরকারী প্রতিকূলতা ও প্রতারণা তাঁকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মনঃপীড়া দিয়েছে।

'ওতেল বিরঁ'র উদ্যানে প্রবেশ করেই ডানদিকে একটি গির্জা-বাড়ী দৃষ্টিগোচর হয়। এটিতে রোদাঁকর্তৃক শিল্প-সংগ্রহ ও তাঁর কৃত কয়েকটি ভাস্কর্যের অমূল্য রচনা রক্ষিত। সংগ্রহে কয়েকটি দাক্ষময় ভারতীয় ভাস্কর্যের নমুনা দেখে বান্ধবী বলেন, "রোদাঁর ভাস্কর্য-সৃষ্টির সঙ্গে এগুলির প্রকাশ-ধারার কত তফাৎ। তিনি বোধ হয় শিল্প হিসাবে নয়, প্রাচীন স্মৃতি সংগ্রহের কৌতূহল হিসাবে এগুলিকে সংগ্রহ করেছিলেন।" বললাম, "না মাদমোয়াজেল, এটা তোমার অত্যন্ত ভুল ধারণা। যে প্রেরণার উৎস থেকে রোদাঁর শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে, এগুলিও সেই একই উৎস থেকে সৃষ্ট। রোদাঁ যেমন গথিক ভাস্কর্যকে শ্রদ্ধা করেছেন এবং তা থেকে শিল্পসৃষ্টির অনুপ্রেরণা ও উপাদান পেয়েছেন, এগুলির মধ্যে তার কিছু তিনি অপ্রত্যক্ষ দেখেন নি। শিল্পের বিশ্বজনীনতা তাঁর ভাষার সার্বভৌমত্বে। এ ভাষাকে বুঝতে হলে দৃষ্টির প্রসারতা চাই, হৃদয় চাই। প্রকৃত শিল্পী ও শিল্প-রসিকের কাছে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের, ভাস্কর্যবাসী মানবকৃত রেখাচিত্র, মিশরের চিত্রলিপি ও ভাস্কর্য, গথিক গীর্জা ও ভারতীয় মন্দিরগাত্রা-লম্বিত ধর্মানুপ্রেরণাপ্রসূত চিত্রণ ও ভাস্কর্য, চীন জাপানের ছবির কবিতা, ইউরোপের ক্ল্যাসিক, রোম্যান্টিক, রিয়্যালিষ্ট, ইমপ্রেশনিষ্ট, ও ক্যুবিস্ প্রভৃতি শিল্পধারার রসোপলব্ধির আনন্দের ভেদ নাই।"

অদূরে রোদাঁকৃত বালজাকের বিখ্যাত বিরাট মূর্তিটি দেখা যাচ্ছিল। এই অদ্ভুত বিকটদর্শন মূর্তিটি সকলের মনে প্রথমে শিল্পীর মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগায়। প্রশ্ন এল, "এটা কি? বালজাককে এমন অদ্ভুত করে সৃষ্টি করবার কারণ কি!" বললাম, "ঠিক এই একই প্রশ্ন উঠাতে, যাঁরা এই মূর্তিটী শিল্পীকে করতে দিয়েছিলেন, তাঁরা প্রহণের অযোগ্য বলে এটী প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু রোদাঁ যে দৃষ্টিতে বালজাককে দেখেছেন তার সঙ্গে পরিচিত হ'লে মূর্তিটি আর এত অদ্ভুত লাগবে না। বালজাক রোদাঁর কাছে মস্তিষ্ক-সর্বস্ব লোক। তাঁর লেখার ওজস্বিতা এক বিরাট ব্যক্তিত্বকে রূপ দিয়েছে। মূর্তিটিকে একটি ড্রেসিং গাউন দিয়ে গলা পর্যন্ত আবৃত করে দেওয়ার লক্ষ্য পড়ে কেবল তাঁর মুখের উপর। যেন বিরাট একটি প্রস্তর-খণ্ডের উপর তাঁর মাথাটি মিশরীয় স্ফিংক্সের ন্যায় মহনীয় ভাবে উন্নত। চোখের সাধারণ আকৃতি না দিয়ে অদ্ভুত আলোছায়ার সমাবেশে যে দৃষ্টি আমরা দেখতে পাচ্ছি তা দৃশ্যমান জগৎকে সাধারণভাবে দেখার দৃষ্টি নয়, চিন্তাশীল দৃষ্টির প্রকাশ। রোদাঁর সৃষ্টিতে কোন একটি বিশেষ রীতির বৈশিষ্ট্য নেই। তিক্তর ইউগোর* মূর্তিতে তিনি যে বিরাটের সমন্বয় দেখিয়েছেন তা মিকেল আঞ্জেলোর ভাস্কর্যের সঙ্গে তুলনা করতে পারা যায়। তিক্তর ইউগোর সাধারণ আকৃতির চেয়ে শিল্পীকে—তাঁর প্রতিভার বিরাট সৃষ্টি বেশী আকৃষ্ট করেছে। তাই প্রসারিত ডান হাতে তাঁর কর্মক্ষমতা, দৃঢ়তা ও সৃষ্টির সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চয়তার প্রকাশ অপূর্বভাবে মূর্ত করেছেন। শিল্পীমন কলাকৌশলের যত প্রকার রীতি ও ভাবধারা প্রকাশ করেছেন, রোদাঁ তার অনেক-গুলিকে আরও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এর রচনার কতকগুলিতে তিনি পূর্ব-প্রকাশিত ধারাকে অতিক্রম করতে পারেন নি, কতকগুলি তাঁর সাফল্যের সূচনা ও পরিণত অবস্থা প্রকাশ করছে।

তাঁর কৃত কোন মূর্তি প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর ফিডিয়াসের যুগকে স্মরণ করিয়ে দেয়, কোন মূর্তিতে প্রাচীন মিশরীয় ভাস্কর্যে আধুনিক ব্যাখ্যা ফুটে উঠেছে, কোন মূর্তি বা

* ফরাসী U-এর উচ্চারণ ই ও ঊ-এর এযুগোপে লক্ষিত উচ্চারণের মত, H—ঘ।

মধ্যযুগের ধর্মোন্মাদনাপূর্ণ শিল্পের স্বরূপ প্রকাশ করেছে। 'ল বেজে' (চুম্বন) মূর্তি মিকেল আঞ্জেলোর সৃষ্টির সরল ব্যাখ্যা বলতে পারি—আবার ইতের মূর্তিতে তাঁকে অনুসরণ করবার আভাস দেখতে পাই। 'পোর্ত দাকেয়ার' (নরকের দ্বার) পরিণত করাসী রেনেসাঁসের রূপ ধারণ করেছে। 'লেআপেল ও জাম্' (দুঃখের ভার) মূর্তিটির বিস্তারিত লক্ষ্য, হস্তসঞ্চালন ও আহ্বানরত মুখের ভঙ্গির রূপ যেন রুদ্রকৃত ভাস্কর্যকে নব তাৎপর্য দিয়ে দেখবার প্রয়াস। 'সেল কি হু ওলমিয়ের' মূর্তিতে বৃদ্ধা বারাঙ্গনার শেষ পরিণতি শিল্পী দামিয়ের-এর ব্যঙ্গ-চিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। 'মুর্জোয়া দা ক্যালে'র মূর্তি গথিক মূর্তিকে সাধারণ মানুষের প্রাণ ও গতি দিয়ে দেখবার প্রয়াস।

গীর্জাবাড়ী ছেড়ে 'ওতেল বিয়ঁ'র প্রধান অট্টালিকার অভিমুখে যেতে উদ্যানের দক্ষিণে অবস্থিত 'ল পাসের'-এর চিত্তাকর্ষক বিরাট ব্রোঞ্জনির্মিত মূর্তিটি ও বামদিকে পোর্ত দাকেয়ারের নরকদৃশ্যের মূর্তি ও ঘটনা-সম্বলিত ব্রোঞ্জের বিরাট দরজাটি চোখে পড়ল। বিয়ঁ অট্টালিকার সামনের হলটিতে বিখ্যাত সেন্ট জনের মূর্তিটি রক্ষিত। সেন্ট জনকে সাধারণতঃ শিশু খৃষ্টের সখী শিশুরূপে অথবা কদাচিৎ প্রৌঢ় খৃষ্টেরই আর এক সংস্করণ রূপে চিত্রকর ও ভাস্করেরা ব্যক্ত করেছেন। রোঁা সেন্ট জনকে মূর্ত করেছেন, কঠোর তপে দৃঢ় মেদ-বর্জিত দেহ, দীপ্ত ধর্মমতে সরল ও স্থির বিশ্বাসের দৃষ্টি-সম্পন্ন, নশ্বর অভিমান ও পরপরিমাণমুক্ত, সাধারণ কৃষকের ন্যায় আড়ম্বরহীন অভিব্যক্তি-বিশিষ্ট। গথিক মূর্তির সকল গুণগুলি অব্যাহত রেখে গথিক দিয়ে জীবন ও গতি দিয়ে রোঁা ভাস্কর্যের এক নূতন ভাবধারার সূচনা করেছেন। পাশের একটি ঘরে রোঁা-কৃত কতকগুলি আবক্ষ মার্বেল প্রতিমূর্তি সজ্জিত ছিল। সেগুলির প্রত্যেকটীতে রচনা-বৈশিষ্ট্য থাকলেও রোঁার সম্পূর্ণ নিজস্ব রচনা-বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে তাঁর করা ব্রোঞ্জ ও প্লাষ্টারের মূর্তিগুলিতে। তাঁর নিযুক্ত তক্ষণ-বিশারদেরা (Stone carvers) মূর্তিগুলি প্রস্তরে নকল করবার সময় আসল প্লাষ্টারের মূর্তিকে কিছু পরিবর্তিত করে ফেলেছেন। কিন্তু প্লাষ্টার ও ব্রোঞ্জে তাঁর আঙুলের প্রত্যেকটী ছাপ অক্ষত রয়ে গিয়েছে। তাঁর কৃত 'মায়ের কোল,' 'সৃষ্টিকর্তার হাত', 'আর্তের মুখ', 'চিরাদরণীয় আদর্শ', 'আডনিসের মৃত্যু', 'স্বর্গীয় সঙ্গীত' প্রভৃতি মূর্তিগুলির রস ও সৌন্দর্য্য ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

ভাস্কর্যে আলো-ছায়ার সমাবেশে, বিভিন্ন বর্ণবিন্যাস ও স্পর্শের সজীবতার রূপ রোঁার অপূর্ব সৃষ্টি। কিন্তু স্থাপত্যের সহিত ভাস্কর্যের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধকে উপেক্ষা করায় রোঁার ভাস্কর্যের ত্রুটী থেকে গিয়েছে। তাঁর কৃত মূর্তিগুলির অধিকাংশই নির্দিষ্টস্থান থেকে স্থানান্তরিত করে মুক্ত উদ্যানে বা অন্তর প্রাঙ্গণে সকল সৌন্দর্য্য লুপ্ত হয়ে সেগুলি অর্থহীন প্লাষ্টার-স্তূপ বা প্রস্তর-খণ্ডের মত দেখায়ে। বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ডের উপর একটী মুখ খোদিত করে বাকীটা বন্ধুর অসমাপ্ত রেখে রোঁা বস্তুর স্বভাব-বৈশিষ্ট্য বিরাট পর্বতশৃঙ্গের ভাবকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করলেও প্রস্তরখণ্ডের আসল পরিমাণের ছেয়ে বিরাটের কল্পনা দর্শকের চোখে ভেসে উঠে না। তা হলেও রোঁা একটি নূতন শিল্পান্দোলনের জনক; তিনি ভাস্কর্যের গতানুগতিক ঐতিহ্যকে ভেঙ্গে নতুন রূপ, নতুন রস দিয়ে পরিবর্দ্ধিত ও জীবনময় রূপাভিব্যক্তির সৃষ্টি করেছেন। শিল্পী হিসাবে তাঁর স্থান, জগতের কয়েকজন মাত্র বিশ্ববিশ্রুত শিল্পীদের মধ্যেই। রোঁার সৃষ্ট ভাস্কর্যের নব আন্দোলন তাঁর রচনাতেই শেষ হয়নি। তারই নব নব বিকাশ ফুটেছে তাঁর পরবর্তী কয়েকজন অধুনা-বিখ্যাত ভাস্করদের ভাস্কর্যে। যে বিরাটের কল্পনা রোঁার সৃষ্টিতে অপূর্ণ রয়ে গিয়েছে তারই উচ্চতর বিকাশ দেখিয়েছেন তাঁরই সুযোগ্য ছাত্র এমিল আঁতোয়ঁ বুর্দেল। রোঁার অবজ্ঞাত ভাস্কর্য যখন চারিদিকে প্রশংসা-মুখর হয়েছে তখন তাঁর কর্মজীবনের সহচর বুর্দেল তাঁর কর্মশালায় নীরবে শিল্প-সাধনায় রত ছিলেন। লালসাদীপ্ত মুগ্ধ মূর্তির গঠনে রোঁা যে কামনা ও মোহের সৃষ্টি করেছিলেন, বুর্দেল তাকে মহান্ বিরাট করে প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্যের রূপ ও 'লেগান' আবেগের রস দিয়ে ভাস্কর্যের নব রূপাবতারণায় কলারসিকদের বিস্মিত করেছেন।

বুর্দেলের কর্মক্ষেত্র "লা গ্রাঁদ শমিয়ের" ও "আকাদেমি দ্য গ্রাঁদ শমিয়ের"-এর নির্জন আতলিয়েতে, আমেরিকা, গ্রেট-ব্রিটেন, সুইডেন, রাশিয়া, বেলজিয়াম, সুইটসারল্যাণ্ড প্রভৃতি নানা দেশ থেকে শিল্প-সংগ্রাহকেরা এসে চারিদিকে নূতন ভাস্কর্য সৃষ্টির বার্তা রটনা করছিলেন। স্পেন, জার্মানী, রুমানিয়া,

চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লোভিয়া, পোলাণ্ড থেকে আগত শিল্পী ছাত্রেরা কবি-ভাস্কর বুর্দেলের শিক্ষাবেদী-মূলে সমবেত হয়েছিল। গুরু বুর্দেল, তাদের শোনাতেন তাঁর ভাস্কর্য সৃষ্টির নূতন বাণী, তাদের উৎসাহ দিতেন, সহানুভূতি জানাতেন, উপদেশ দিতেন, তাঁর সরল নম্র ব্যবহারে মুগ্ধ করতেন।

১৮৬১ খৃঃ অব্দে বিখ্যাত চিত্রকর আঁগ্র-এর গ্রামে মঁতোবাঁ-তে বুর্দেল জন্মগ্রহণ করেন। স্বগ্রামে ও তুলুজ-এ শিল্পী লাফক-এর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা নেবার পরে তিনি এসে প্রথমে ভাস্কর ফাল্গুইয়েরে-এর ষ্টুডিয়োতে শিক্ষারম্ভ করেন। কিন্তু রোদাঁ ও দালুর কর্মশালার প্রেরণা ও শিক্ষাই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিষ্ঠার প্রকৃত সাহায্য করেছিল। বুর্দেলের প্রতিভা বহুমুখী। তিনি অভিনব আদর্শের পত্রের গঠন, কাষ্ঠ ও প্রস্তর তক্ষণ, স্থাপত্য, অঙ্কন, চিত্রণ ও ফ্রেস্কো-চিত্রণে কর্মরত থাকলেও, সরকারী "গোবলাঁ" চিত্র-রঞ্জনিকার নির্মাণাগারে অধ্যাপক ও শিল্পী নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর লিখিত কবিতা ও গ্রন্থাদি সাহিত্য-জগতে কম প্রশংসা পায় নি।

মিউজিয়াম দেখবার সময় অতিক্রম হওয়ায় বান্ধবীকে বুর্দেলের কর্মশালা দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

আবার রবিবার ঘুরে এসেছে। ৬ নম্বর 'আভেন্যু দ্য মেইন'-এ পূর্বনিরূপিত সাক্ষাৎ-সময়ে এসে শুনলাম মাদাম বুর্দেল আমার পৌঁছানর আগেই বুর্দেলের আতলিয়েতে চলে গেছেন। শিল্পী-জীবন আরম্ভ করে মৃত্যু-সময় (১৯২৯) পর্যন্ত বুর্দেল এই পাড়াটিতে ছিলেন বলে মাদাম বুর্দেল এই স্থানটির মায়া আজও কাটাতে পারেন নি। বুর্দেলের সমাদর বিদেশে যতটা হয়েছে, তাঁর স্বদেশে ততটা হয়নি বলা চলে। তাঁর কৃত অমূল্য ভাস্কর্য-সম্পদ্ তাঁর ষ্টুডিয়োর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। যদিও তাঁর কৃত বহু বিখ্যাত মূর্তি ফ্রান্সের ও পৃথিবীর অন্যান্য বিখ্যাত সংগ্রহশালায় রক্ষিত হয়ে সৌন্দর্য বর্দ্ধন করছে, তবুও তাঁর ষ্টুডিয়োতে আবদ্ধ অসংখ্য অপরূপ ভাস্কর্য-রচনার রসোপলব্ধির আনন্দ থেকে সাধারণে আজও বঞ্চিত। ফরাসী সরকার বুর্দেলের ষ্টুডিয়োতে যাবার রাস্তাটি তাঁর নামে উৎসর্গ করাতেই শিল্পীকে উপযুক্ত সম্মান দেখান হয়েছে মনে করতে পারি না।

ষ্টুডিয়ো উদ্যানের বিরাট দরজাটি ঠেলে আমরা প্রবেশ করামাত্র পিছন থেকে মাদাম বুর্দেল মেহালিঙ্গনে কাছে টেনে আমায় চমকিয়ে দিলেন। বললাম, "মাপ করুন, আপনি আমার পিছনে ছিলেন তা লক্ষ্য করি নি।" এই সপ্রতিভবর্ষিয়সী বৃদ্ধা আজও কেউ বুর্দেলের কর্মশালা দেখতে চাইলে পাঁচটি বিরাট আতলিয়ে ঘুরে দর্শকদের ভাস্কর্যের অসংখ্য প্রতিমূর্তি দেখাতে ও সমালোচনা করতে ক্লান্তি বোধ করেন না। এঁদের শিক্ষিকের ছাত্র এবং বিশেষ করে ভাস্কর্য-বিভাগের ছাত্র তাঁর কাছে যেন অতি আপন জন। তিনি বলতেন, "আমার স্বামী তাঁর কর্মশালা এঁদের শিক্ষিকেকে পুত্রাধিক স্নেহ দিয়ে বর্দ্ধিত করেছেন। তোমরা সেখানে তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ম্যাঁসির ছেলেমেয়ের ছায় হওয়ায় আমার পৌত্র-স্থানীয়।"

আমরা আতলিয়েতে প্রবেশ করলে তিনি প্রত্যেকটি কক্ষের দ্রষ্টব্যগুলি আমাদের দেখাতে এবং বোঝাতে লাগলেন। একটি ছোট ঘরে এসে বল্লেন, "এইখানে আমরা বিবাহের পর আমাদের ছোট সংসারটি পেতেছিলাম। আমি ছিলাম এমিলের কর্মশালার ভৃত্য আবার তার সংসারের কর্ত্রী।" বান্ধবী বললেন, "মাদাম, এইখানে এলে, সম্ভবতঃ আপনার স্বামীর কথা বেশী মনে পড়ে এবং হয় তো তাঁর বিরহে মনঃপীড়ারও উদ্ভব হয়।" তিনি বললেন "বল কি! সারাদিনের মধ্যে আমার মন পড়ে থাকে কখন এখানে আসব। এইখানে এলে আমি তাঁর বিচ্ছেদ-ব্যথাকে ভুলি। এইখানে এলে আমি তাঁর সঙ্গ অনুভব করি। এই মূর্তিগুলির মধ্যে আমার এমিল জীবিত রয়েছে এবং চির দিন জীবিত থাকবে।" বলে নিকটবর্ত্তী একটি মূর্তিকে দৃঢ়ালিঙ্গন করে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে মূর্তিটির সারা অঙ্গে সাদরে হাত বুলাতে লাগলেন। একটি অপূর্ব তৃপ্তির ভাব তাঁর মুখে ফুটে উঠল। সে দিন তিনি যেমন করে তাঁদের পারিবারিক ও শিল্পী-জীবনের কথা বলেছিলেন, তা পূর্বে কোন দিন শোনবার আমাদের সৌভাগ্য হয় নি। তাঁর কথাগুলি আজও মনে গাঁথা আছে কিন্তু তাঁর সেই আবেগ, সেই বর্ণনার রূপ দেওয়ার সামর্থ্য আমার নাই। একটি আতলিয়ের একপাশে 'সেণ্টরের মৃত্যু'র বিরাট মূর্তিটি ছিল। তার কাছে গিয়ে

মাদাম বললেন, "এমিল্ পেগান আঁকে ভালবাসতো, তার পরিসমাপ্তিকে 'সেন্টর-এর মৃত্যু'তে প্রকাশ করেছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক শিল্পে সেন্টরের আকৃতিতে মানুষের দেহাংশের চেয়ে পশুর আকৃতিটুকু বড় করে দেখান হ'ত। সর্ব বিষয়ে পারদর্শী সেন্টরকে আরো মানুষ করে দেখাতে মনুষ্যাকৃতির অংশকে এমিল পরিবর্ধিত করেছে। সেন্টরের চার পায়ের অবস্থানের সঙ্গে উপরের হাত, বীণা বা বেগান মাথা সবই মাটি থেকে একই লম্বের সমান্তরাল থাকায় মূর্তিটিকে একটি বন্ধনের মধ্যে বন্দনা করা যায়। আমার স্বামীর আদর্শ ছিল, স্থাপত্যের জন্য তার ভাস্কর্য এবং ভাস্কর্যের জন্য তার স্থাপত্য। তার মতে একটি বিরাট স্থাপত্যের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা ও নক্সা করার আগে স্থপতির ভাস্করের কাছে পরামর্শ নেওয়া উচিত। তাতে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের রচনা সুসমঞ্জস ও সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। স্থাপত্যের নির্মাণ শেষ হলে ভাস্করকে ডেকে কিছু কাজ দিয়ে সৌন্দর্য বর্ধন করতে বলা আর তৈরী পোষাক ছেঁড়ে তালি দিয়ে সৌন্দর্য-বর্ধন করা একই কথা।"

রোদাঁর 'নরকের দ্বার' ও বুর্দেলের 'সেন্টরের মৃত্যু' এ দু'টীই তাঁদের ভাস্কর্য রচনা-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। গতি ও ভাবের দিক্ দিয়ে এ দু'টী সহজে চিত্তাকর্ষক ও তাঁদের চিন্তাশীলতার বৈশিষ্ট্য-প্রকাশক। রোদাঁ 'নরকের দ্বার'-এ মানবের অতিমানুষী জীবন-সমস্যার সমাধান চেষ্টার সংগ্রামরত রূপ দিতে প্রয়াস পেলেও বিশেষ সাফল্য লাভ করেন নি। বুর্দেলের সেন্টর-এর আকাশিক স্থাপনাও বর্তমান কালের মানুষের পক্ষে মীমাংসা করা কঠিন। আধুনিক ফরাসী ভাস্করদের মধ্যে বুর্দেল ও মাইয়ল্-এর মত মৌলিক ও প্রচলিত রচনা-রীতিদোষমুক্ত আর কার নেই বলা চলে, এমন কি রোদাঁর রচনা অতীব গতিসম্পন্ন হলেও এত মৌলিক নয়।

এর পর আর একটি ঘরে আমরা প্রবেশ করলাম। এখানে বিভিন্ন অবস্থা ও ভঙ্গীতে একুশটি বেটোফেন্-এর মূর্তি ছিল। মাদামের কাছে শুনলাম বুর্দেল ফরাসীর কাজ দেয়ে যখনই অবসর পেতেন তখনই বেটোফেন্-এর মূর্তি বা প্রতিকৃতি রচনা করতেন। বেটোফেন্-এর প্রতি আন্তরিক অনুরাগ তাঁর শেষ জীবনে পর্যন্ত সঙ্গীত-নায়কের প্রতিমূর্তি রচনার নব উৎসাহ এনে দিত। বুর্দেলকৃত বিরাট ভাস্কর্য-সম্বলিত স্মারক স্তম্ভ ও মূর্তি ফ্রান্স, ইতালি, পোল্যাণ্ড ও অন্যান্য বিভিন্ন দেশের দিকে দিকে তাঁর বিরাটের পরিকল্পনার রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নানা কথার মাঝে আসন্ন যুদ্ধের কথা এসে পড়ল। মাদাম বললেন "আমার স্বামীর আতলিয়েকে বিমানাক্রমণ থেকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থাই হয় নি। ফরাসীর গভর্ণমেণ্টকে আমি এবং মেক্সুয়ানীর অনেকে মিলে কতবার এ বিষয়ে অনুরোধ করেছি, কিন্তু এই শিল্প-সংগ্রহকে একটি মিউজিয়ামে পরিণত করা বা রক্ষা করার কোন বন্দোবস্ত তাঁরা এখন করতে বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। এ যদি নষ্ট হয় সে ক্ষতি যে শুধু ফ্রান্সেরই হবে তা নয়, সমগ্র জগতের শিল্পের অপরিশোধনীয় ক্ষতি হবে। তবে আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন একে রক্ষা করবার আপ্রাণ চেষ্টা করব। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে এই আতলিয়ে বোমায় বিধ্বস্ত হয়, তবে লোকে ধ্বংসস্তূপ অপসারিত করলে ভাঙ্গা মূর্তির সঙ্গে আমার দেহের ছিন্নাংশও খুঁজে পাবে।" বহুবার তাঁর কাছে গেছি বহুবার বিদায় কালে ঐ কথাগুলি শুনেছি। আজ বহু দূরে থাকলেও, সে দিনগুলি অতীতে বিলীন হতে চাইলেও, এখনও তাঁর কথাগুলি আমার কাণে অনুরণিত হয়; চোখে ভাসে তাঁর সরল-নম্র বিশ্বাস ও অনুরাগ-দীপ্ত দৃষ্টি, যার রূপে মোহিত হয়ে বুর্দেল মাতৃমূর্তির মহনীয় কল্পনাকে রূপ দিয়েছেন লা ভিক্টোয়ার এ লাফা-য় (আজিন ও শিশু) বিরাট মূর্তিতে।

# বাস্ বদল

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতুলের বাবার যা কাণ্ড, তাঁর ব্যস্ততার অন্ত নেই সব ব্যাপারে। আজ তার রওনা না হলে এমন কিছু ক্ষতি হ'ত না। সবে কলেজ কাল খুলবে, পূজোর ছুটির পরে, সারা ট্রেনে মোটর-বাসে এই বলে লোক। প্রতুলের সে তাড়া নেই, তবে আজই এই ভীষণ ভিড় সহ্য করে জনতার চাপে উদ্ভ্রান্ত হয়ে না গেলে কি চলতো না?

হিলি টেশন তেইশ মাইল রাস্তা। লোকে মোট-ঘাট তুলছে বাসের ছাদে। বাক্স, সুটকেশ, বিছানা। হৈ চৈ গোলমাল। বেশীর ভাগ কলেজের ছাত্র, তারা আজ বর্ষা-বেলা এক্সপ্রেসে কলকাতা যাচ্ছে, প্রতুল যাবে আসাম মেলে বা তারও নথ-বেঙ্গলে।

বাস্ ছাড়ল, প্রতুলের দু'পাশে দু'টী দোকানদার, তারা তামাকের ব্যবসা করে, সেই বিষয়ে কথা-বার্ত্তা বলতে বলতে যাচ্ছে। সামনের বেঞ্চিতে একটী ভদ্রলোক স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে নিয়ে বসে। একখানা বেঞ্চি তাঁরা জুড়ে বসে আছেন। ছেলেমেয়ে তিন চারটী, তারা ভীষণ উৎপাত জুড়ে দিয়েছে বাসের মধ্যেই। তাদের চটপটি ও চেঁচামেচিতে প্রতুলের মাথা ধরে যাবার উপক্রম হয়েছে।

প্রতুল যেখানটীতে অতিকষ্টে একটু জায়গা করে নিয়েছে, ছোট ছেলেটা অনবরত সেখানে এসে প্রতুলের কোলের ওপর বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে চাইছে। এতে কষ্ট ও অসুবিধা যথেষ্ট হলেও ভদ্রতার খাতিরে বিরক্তি চেপে যেতে হচ্ছে প্রতুলের।

যুদ্ধের সুরু আরম্ভ। বাসের ওদিকে তিন চারটী ভদ্রলোক যুদ্ধ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনায় ব্যস্ত। তাঁদের কথা শুনে প্রতুলের মনে হল যুদ্ধ-সম্পর্কিত পরিস্থিতি তাঁদের নখদর্পণে, রিটলার বা চেম্বারলেন অপেক্ষাও তাঁরা জিনিষটা ভাল বোঝেন, কারণ তর্কের মধ্যে উভয় পক্ষের ভুল-ত্রান্তি তাঁরা বিশদভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করে পরস্পরকে দেখিয়ে দিচ্ছেন।

ড্রাইভারের ঠিক পিছনে বাসের সামনের দিকটাতে গোটাকতক রিজার্ভড্ সীট। ৬'টী মেয়ে সেখানে বসে, তাদের সঙ্গে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, সম্ভবতঃ মেয়ে দু'টীর অভিভাবক। মেয়ে দু'টীর মধ্যে একটির বয়স আঠার-উনিশ বছর, অন্য মেয়েটীর বয়স বাইশ-তেইশ হবে। বয়সে ছোট যে মেয়েটী, সে দেখতে বেশ সুন্দরী, অন্যটীর রঙ্ ভাষবর্ণ, মুখশ্রীও খুব ভাল বলা চলে না, তবুও তার সারা দেহে কেমন এক ধরণের লাবণ্য-মাখানো। প্রতুল দু' একবার অন্যমনস্কের ভাণে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

কয়েক মাইল পরে বালুরঘাট টাউনে এসে বাস দাঁড়াল। এখানে একটী মেয়ে উঠল, পুরুষ যাত্রীও অনেকগুলি। একেই বাসে নেই স্থান, তার ওপর এতগুলি যাত্রী কোথায় বসে? অনেক নবাগত যাত্রী অগত্যা দাঁড়িয়ে রইল, রিজার্ভ সিটে মেয়েটীর জায়গা হয়ে গেল।

এরই মধ্যে আবার এক কানা ভিখিরি ভিক্ষে করতে আরম্ভ করেছে। সে উঠল বালুরঘাট থেকে সাড়ে এগার মাইল চলে এসে সদরডিহি বলে গ্রামে; রাজ-কাছারী আছে বলে এখানে বাস দশ মিনিট দাঁড়ায়।

সামনের ভদ্রলোকটি ছোট ছেলেটীর হাতে একটি পয়সা দিয়ে বললেন, যে, যা ভিখিরির হাতে দে।

ছেলেটী এগিয়ে গিয়ে বললে, এই নাও ভিখিরি।

ভদ্রলোক ধমক দিয়ে বললেন, ও কি, অমন বলতে নেই, ভিখিরি বলতে নেই। ছিঃ।

কানা ভিখিরি পয়সাটা নিয়ে একগাল হেসে ওঁর দিকে চেয়ে বললে, পোলাপানের কথা, ওদের এখন জ্ঞান কি হয়েছে বাপু, খোকাবাবুর নাম কি খোকাবাবু?

বেলার ধূলো উড়ে গেছন দিকটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। প্রতুল ভাবছে, বাসের ছাদে তার বিছানার পুঁটুলিটার ওপর সাত পুরু ধূলো জমে গেল এতক্ষণ।

রাস্তাও যে ফুরোতে চায় না। বড় বড় মাঠের উপর রাস্তা, মাঝে মাঝে বিল আর ধানক্ষেত, আর দু'একটা চাষা-গাঁ।

কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি, তেমন গরম নেই তাই নিস্তার, নইলে বাসে যা ভিড়, গরমে ভীষণ কষ্ট হ'ত, চলন্ত বাসেও

সময় কাটতো না। প্রতুল একবার মুখ বাড়িয়ে দেখলে ষ্টেশন চোখে পড়ে কি না।

বালুঘাট থেকে যে মেয়েটী উঠেছে তার হাত থেকে একখানা বই হঠাৎ পড়ে গেল, বাসের ঝাঁকুনিতে। কোন্ একজনের পায়ের ঠোক্কর লেগে বইখানা বেঞ্চির তাঁক দিয়ে গলে একেবারে এসে পড়লো প্রতুলের বেঞ্চির পাশের কাছে। প্রতুল বইখানা নীচু হয়ে তুলে দেখলে, কলেজ-পাঠ্য ইংরেজি বই—'এট্ দিস্টোরিয়ান পোয়েট্স্'—ও সেখানা উঁচু করে তুলে ধরে মেয়েটীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে, "আপনার বইখানা পড়ে গিয়েছে, এই যে!" হাতে হাতে বইখানা মেয়েটীর হাতে গিয়ে পৌঁছলো।

প্রতুল এতক্ষণ ভাল করে লক্ষ্য করে নি, বাসে যে ক'টী মেয়ে আছে, সব চেয়ে এই মেয়েটী সুন্দরী, গায়ের রঙ ধপধপে ফরসা, বয়স বুড়ির বেশী নয়, এখনও বিয়ে হয় নি। কলেজের ছাত্রী তা তো বোঝাই গেল।

কোন কলেজে পড়ে? নাম কি মেয়েটীর? বালুঘাটে কার মেয়ে?

হিলি! হিলি!

বড় বড় টিনের চালা ও বিবিধ গাছের সারি বেধা দিয়েছে, হিলির বাজার! ষ্টেশনের সিগ্‌ন্যাল দেখা যাচ্ছে।

ওরে, নে জুতো পরে নে সব, হিলি এসেছে। হ্যাঁ গা, সে পানের কৌটোটা কোথায়? আথো আথো বেঞ্চির তলায় পড়ে গিয়েছে। বোস্ না চুপ করে, গাড়ী থেমুক তো ইষ্টিশান আসুক। কটা জিনিস গুণে নাও, এক, দুই, তিন, চার—গাড়ীর ছাদে আছে এক, দুই, তিন। আসাম মেলের ডাউন দিয়েছে।

হুড়মুড় করে যাত্রীরা সব নামতে আরম্ভ করেছে, বাসের ছাদ থেকে কণ্ডাক্টর মাল নামিয়ে কুলিদের মাথায় চাপাচ্ছে, গোলমাল সেখানটাতে যেমন, ভিড়ও তেমনি।

আরে, ওই লাল স্যুটকেসটা, ওই যে গামছা-বাঁধা, দাও নামিয়ে।

সামাল সামাল, এই ভাল করে ধর, কাঁচের জিনিস আছে ভেতরে।

ওটা না ওটা না, ওই টিনেরটা, নাম লেখা আছে আর. সি. ডি.—হ্যাঁ ওইটে—

আসাম মেল এসে দাঁড়াল। যাত্রীর দল মোটঘাট নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে, প্রতুলের মোটে একটা টিনের স্যুটকেস আর একটা বিছানা, তত ভারীও নয়,' নিজেই সেটা হাতে করে ছুটলো টিকিটঘরের দিকে—কুলীর হাতে দিলেই এখুনি আবার চারটে পয়সা।

আসাম মেলে তত ভিড় ছিল না, কিন্তু পার্ব্বতীপুর থেকে যে শিলং মেল ছাড়ল, সেটা আসছে লক্ষ্ণৌ বা কানপুর থেকে; হিন্দুস্থানী যাত্রীরা আসামের দিকে চলেছে শীতকালের প্রথমে বিভিন্ন চা-বাগানে কাজ করতে, তাদের ভিড়ে দাঁড়াবার জায়গা পর্য্যন্ত নেই ট্রেনে।

রঙ্গিয়া জংশনে ভোর বেলা ট্রেন পৌঁছল। এখান থেকে ষোল মাইল দূরে কাটিখালি চা-বাগান। প্রতুল ডাক্তারী করে, বছর-খানেক এই চাকুরীটাতে ঢুকেছে, ঠিক কোয়ার্টার দিয়েছে চা-বাগান থেকে, জিনিসপত্র শস্তা, এক রকম চলে যাচ্ছে।

রঙ্গিয়া মেমে আবার মোটর বাস, বাগানের দু' মাইল তফাৎ দিয়ে ঝাড়াপাড়া রোড্ দিয়ে বাস চলে গেল। এইটুকু পথ একজন কুলির মাথায় স্যুটকেসটা চাপিয়ে বেলা সাড়ে ন'টা আন্দাজ প্রতুল চা-বাগানের নিজের কোয়ার্টারে এসে উঠল।

বড় নির্জ্জন জায়গা। দূরে অস্পষ্ট নীল পাহাড় দেখের মত দেখা যায়, এক দিকে খুব বড় একটা জলা, নলখাগড়া বনে ঘেরা। হেমন্তের সকাল বেলা একটা আর্দ্র অপ্রীতিকর বাষ্প যেন উঠছে জলাটা থেকে। ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের ডিপো এই চা-বাগানগুলো। প্রতুল নিজেও কয়েকবার ম্যালেরিয়ায় পড়েছে এখানে এসে পর্য্যন্ত।

ডাক্তারখানায় আসামী কম্পাউণ্ডার শিবনাথ ভট্টাচার্য্য একাধারে ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডার ও প্রতুলের পাচক। নিজে প্রতুল রাঁধতে জানেও না, ও-কাজ তার পোষায়ও না, সুতরাং শিবনাথকে খোরাকি দিয়েও রাখতে হয়েছে। ডাক্তারখানার চাকর ছুটে এল ডাক্তারবাবুকে আসতে দেখে। প্রতুল তাকে জিজ্ঞেস করে জানলে, শিবনাথ তার বাড়ী গিয়েছে দু'দিনের ছুটি নিয়ে, পরশু আসবে। শুধু বাবার তাড়াতাড়িতে আজ আসতে হোল প্রতুলের, নয় তো পরশুই তো সে আসতো।

ডাক্তারখানার চাকরকে বললে, "ওরে নীচু, তুই জল তুলে দে আমার নাইবার আর রান্না করবার। যখন কষ্ট পেতে হবে দু'দিন, তাড়াতাড়ি যা—কোন কেস ছিল এ ক'দিন? ছিল না? চাবিটা নিয়ে গিয়ে ডাক্তারখানা কাঁট দিয়ে রাখ গে।"

স্নানের পূর্ব্বে সুটকেস খুলতে গিয়ে সে দেখলে সুটকেসের গায়ে অল্প কি একটা তালা লাগানো, তার চাবি নেই ওর কাছে। আঃ কি বিপদ, এ ঠিক তার বোন কমলার কাজ। সে-ই কাল আসবার সময়ে বাক্স গুছিয়ে দিয়েছিল, কিসের তালা কিসে লাগিয়ে বসে আছে!

অনেক কষ্ট করে লোহার সরু শিক দিয়ে চাড় দিতেই তালাটা খুলে গেল।

সুটকেসের তালাটা তুলে নিজের ধুতি গামছা বার করতে গিয়ে কিন্তু সে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সুটকেসের ভিতরটাতে চেয়ে। এ কার জিনিষপত্র? শাড়ী কিসের?

বাক্সের ওপরের দিকে থাকে থাকে সাজানো রঙ্ বেরঙের শাড়ী, তার নীচে ব্লাউজ গোটা ছ'সাত, সায়া দুটী; এ ছাড়া পাউডারের কৌটো, ক্রিম্, আরও লম্বা ও গোল আকারের ছোট বড় সুদৃশ্য কৌটো, শিশি—সাবানের কেস্, লেখার প্যাড্, ফাউন্টেন পেনের কালি—এক তাড়া চিঠি, আয়না চিরুনী, আরও কত কি। সর্ব্বনাশ!···কার বাক্স এটা?

প্রথমটা তার মনে হোল, তার বোন কমলার সুটকেসটা কি ভুলে গোলমাল হয়ে—কিন্তু না, তা নয়। এ রকম সৌখীন শাড়ী ও জিনিষপত্র কমলার নেই। তা ছাড়া এ তো কোন তারগায় যাওয়ার প্রাক্কালে গুছিয়ে নেওয়া বাক্স; কমলা বাড়ী বসে আছে, তার বাক্স এমন গোছান থাকবার কথা নয়। হতবুদ্ধি প্রফুল্ল বাক্সের জিনিসগুলো তুলে হাতে নিয়ে দেখতে লাগল। একটা মখমলের বড় কৌটোর মধ্যে লকেটওয়ালা একটা হার, একটী আংটি, দুটি বড় বড় কানের পাশা, সোনার বড় সেপ্টীপিন একটা, গাছ কয়েক সরু সোনার চুড়ি, নতুন-ওঠা কাঁচের চুড়িও দু'গাছা, খুব বড় বড়, ঝকঝকে কাঁচ বসান, কাজ-করা। একটা মানিব্যাগে চারখানা দশ টাকার নোট—কিছু খুচরো, সম্পূর্ণ মেয়েলি সুটকেস। পুরুষের নাম-গন্ধ নেই সুটকেসের কোন জিনিসে বা তার আবরণ-ওয়ায়।

প্রফুল্ল দশ হাত মাটির তলায় সেঁদিয়ে গেল সব ব্যাপারটা বুঝে নেবে। সুটকেস্ বদল হয়েছে, বেশ বোঝা গেল, কিন্তু কোথায় বদল হোল? ট্রেণে, না বালুরঘাট থেকে আসবার পথে মোটর বাসে? মোটর বাসেই হওয়া সম্ভব, কারণ ট্রেণে তার কামরায় কোনো মেয়ে তো ছিল না, পার্ব্বতীপুর থেকে সে ট্রেণের যে কামরায় উঠেছিল, তাতে হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারী যাত্রী বোঝাই ছিল; তাদের মধ্যে এ সুটকেস্ কারও নয়। এ বাঙালী মেয়ের সুটকেস্।

আচ্ছা, মোটর বাসে যদি বদল হয়ে থাকে, তবে কোন্ মেয়েটীর বাক্সের সঙ্গে হওয়া সম্ভব?···তা ভেবেই বা কি মীমাংসা হবে, কারণ যে কোনো মেয়ের সুটকেসের সঙ্গেই সম্ভব হতে পারে, যখন সকলের বাক্স ছিল মোটর বাসের ছাদে। থাক, সে কথা পরে ভাবা যাবে, তার যথেষ্ট সময় আছে। এখন মুস্কিল হয়েছে এই যে, যা পরণে আছে তা ছাড়া আর তার দ্বিতীয় ধুতি নেই, জামা নেই, গামছা নেই, সাবান নেই, ক্ষুর নেই, লুঙি নেই—কিচ্ছু নেই। আর এই বিজন চা-বাগানও যা, ফরাসী ইকোয়েটোরিয়াল আফ্রিকাও তাই—কিছু মেলে না এখানে। এখান থেকে সাত মাইল দূরে একটি ছোট বাজারে কেঁয়েদের দোকান আছে কাপড়ের, তবে সেখানে বাঙালী ভদ্রলোকের উপযুক্ত জামা-কাপড় পাওয়া যাবে না।

এখন আপাততঃ স্নান করে উঠে সে পরে কি, গায়ে দেয় কি? গামছা কোথায়? দাড়ি কামায় কিসে? নাপিত আছে বটে, কিন্তু তার সে কুলি-কামানো ক্ষুরে প্রফুল্ল কখনো কামাবে না, দাড়ি বেড়ে নারদ মুনির মত হয়ে গেলেও না।

এমন বিপদে সে জীবনে কখনও পড়ে নি। কি এখন সে করে?

নাঃ, উপায় নেই। অনেক ভেবে চিন্তে সে দেখলে এই সুটকেস যারই হ'ক, এর মধ্যের গামছাখানি আর একখানা শাড়ী আপাততঃ তাকে ব্যবহার করতেই হবে—নিরুপায়।

শাড়ী বার করতে গিয়ে আরও বিপদ। সাদা শাড়ী যা আছে, সব জরি-পাড় আর তাঁতের দামী শাড়ী, শান্তিপুরী কি ফরাসডাঙ্গা, মোটা আটপৌরে গোছের শাড়ী যা আছে,

তার সব রঙীন। দামী শাড়ী আছে এ ছাড়া। এখুনি একবার আপিসে যেতে হবে, কি পরে যাওয়া যায়? জরিপাড় শান্তিপুরী শাড়ী? আর সাদা ব্লাউজ?

না, তেবে এর কূল-কিনারা নেই। একটা যা হোক করতে হবে। রঙীন একখানা শাড়ী পরে স্নান সেরে রেলে যাবহৃত যে আধ-ময়লা জামা কাপড় বর্ত্তমানে গায়ে আছে তাই পরেই যেতে হবে আপিসে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে। ম্যানেজার সাহেবকে সব কথা খুলে বলে যে একটা পরামর্শ চাইতে হবে।

দাড়ি কামানো হলো না। রঙীন শাড়ী পরে স্নান সেরে সে রেলের জামা কাপড়ই অঙ্গে চাপিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

ম্যানেজার ইংরেজ, নাম সিম্‌সন্। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা-পোপের ছাঁটাই তদারক করছিল, প্রফুলকে দেখে পাইপ মুখ থেকে নামিয়ে বললে, হ্যালো ডক্টর, গুড্‌মর্ণিং, ইট আর হিয়ার অলরেডি! বট ইউ ওন্‌লি বি হিয়ার বিফোর টু-মরো।

প্রফুল বললে, এসেছি বটে, কিন্তু আমার বড় বিপদ স্যর্।

—ওহেল, হোয়াট ইজ এ্যাডিস্?

সব শুনে সাহেব হো হো করে হেসে উঠলো।

—সে, ডক্টর, ইউ আর এ ডগ্, আফটার উইমেন, হোয়াট্, দে ইট উইথ্ দি হোল! ইফ আই ওয়ার ইউ—

না স্যর, হাসি নয়, মুশ্‌কিলে পড়েছি; একখানা কাপড় নেই, জামা নেই, দাড়ি কামাবার ক্ষুর নেই।

সাহেব হাসতে হাসতে বললে, সে বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। আমার স্যুট একটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। শেভিং সেট্ বাড়তি আছে নিয়ে যাও, ইয়ং ম্যান্ তোমরা, তোমাদের রোমান্সে সাহায্য করব না এমন বে-রসিক নই আমি। তোমাদের বয়সে—

রোমান্স কোথায় স্যর, বিপদ খুব। সোণার গহনা, মানিব্যাগে টাকা—পুলিসে একটা খবর দেওয়া উচিত নয় কি? সেখকালে—

এখন থাক। আমায় বললে তো, এতেই হ'ল। তোমায় চোর বলে কেউ ধরতে পারবে না। আমার সামনে বাক্সের জিনিষের একটা লিষ্ট করা যাবে এখন ওবেলা। চল আমার বাংলোয়, জিনিসগুলো দিই তোমায়। মিথ্যে রোমান্স বাধিয়ে বসে আছ—

ধন্যবাদ স্যর। আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে আমি বড়ই—

কিছু বলবার আবশ্যক নেই। চল—

নিজের কোয়ার্টারে এসে খেয়ে দেয়ে সুস্থ হয়ে প্রফুল একটা সিগারেট ধরালে। তারপর শুয়ে পড়লো ঘুমিয়ে নেবার জন্যে বটে, কিন্তু ঘুম আসে না কিছুতেই। এই অদ্ভুত ঘটনার কথা ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠলো। প্রফুলের বয়স এই চব্বিশ। সবে ডাক্তারী পাশ করে চা-বাগানের চাকুরীটা পেয়েছে। বিবাহ হয়নি। বিশেষ ভাবে কোনো মেয়ের সম্পর্কে সে আসেনি। যাকে রোমান্স্ বলে, গল্পে উপন্যাসে যতই না সে পড়েছে, তার নিজের জীবনে—না কই, ঘটেনি। ডাক্তারী পড়বার সময় এক আধ জন নার্সের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বটে, কিন্তু সে কিছু নয়। মিশি নার্স, তাদের দিকে তাকান যায় না, তায় রোমান্স্।

কিন্তু তার জীবনে এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি। আচ্ছা, কোন্ মেয়েটীর সঙ্গে স্যুটকেস বদল হোল, বালুরঘাট থেকে যে মেয়েটী উঠলো তার সঙ্গে, না ওই যে দুটী মেয়ে আগে থেকে বসেছিল তাদের কার সঙ্গে?

বালুরঘাটের মেয়েটী বেশ সুন্দরী। কলেজের ছাত্রী বটে—ওর সেই বইখানা, 'এট হিজ্‌টোরিয়ান্ পোয়েটস' থেকে তা বোঝা গিয়েছে। কি নাম? কি জাত? ব্রাহ্মণ না কায়স্থ, না বৈদ্য?

হঠাৎ তার মনে পড়লো স্যুটকেসটার মধ্যে নীল ফিতে দিয়ে বাঁধা একতাড়া চিঠি ছিল বটে। মেয়েটীর নাম নিশ্চয়ই তাতে পাওয়া যাবে। এতক্ষণ এ কথা মনে হওয়া উচিত ছিল তার।

উঠে সে স্যুটকেসটা খুলে ফেললে। শাড়ীর নীচে একপাশে চিঠির তাড়াটা ছিল, সে সেটা হাতে করে বিছানার ওপর এসে বসলো।

চিঠি খান পনেরো। এক জনেরই হাতের, বেশ সৌখীন নীল লিনেন পেপারের খামের ওপর ঠিকানা লেখা—অমিয়া বসুমজুমদার, ৫ ও. সি. আর. পাল, ২২।৬ নীলমণি মল্লিকের লেন, বাগবাজার কলিকাতা।

থাক, বাঁচা গেল, এই তো দিব্যি ঠিকানা পাওয়া গেল! আর ভাবনা নেই। কালই একখানা চিঠি লিখে দেওয়া যাবে। মেয়েটারও নিশ্চয়ই ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। তার নিজের যত অবস্থা সে মেয়েটারও তো হয়েছে। বেচারীর একখানা শাড়ী নেই, ব্লাউজ নেই, কিছু নেই। তার ওপর টাকা, গহনা হারানোর দুশ্চিন্তা। মেয়েটী এতক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে।

তার ওপর যদি তারই স্যুটকেস মেয়েটী নিয়ে গিয়ে থাকে, তবে তো স্যুটকেস খুলে মেয়েটী মূর্চ্ছা যাবে! বেশ থেকে এখানে যাবার জন্যে সে কিছু ভালের পাটালি আর চিঁড়ে আনছিল, ওই স্যুটকেসের মধ্যে। তা ছাড়া একটা ছোট মানকচু আছে, আর আছে—এক জোড়া জুতো, নূতনও তেমন নয়। এ সব বাদে তার ধুতি, শার্ট, পাঞ্জাবী প্রভৃতি তো আছেই।

ওদের মধ্যেকার একটি জিনিসও মেয়েটীর কোনো উপকারে আসবে না।

মজুমদার? মজুমদার? মজুমদার কি জাত? কায়স্থ না বৈদ্য না ব্রাহ্মণ? না অন্য কিছু?

চিঠিগুলো পড়ে দেখবার ইচ্ছা হোল প্রতুলের, কে লিখেছে, মেয়ে না পুরুষ? শেষ পর্য্যন্ত সে ইচ্ছা সে দমন করলে। দরকার নেই পরের চিঠি পড়বার। ওটা অন্যায়।

সারা দিন রাত কেটে গেল বটে, কিন্তু প্রতুলের মন থেকে মেয়েটীর চিন্তা কিছুতেই যেতে চায় না। যত সে অন্যদিকে মন দেবার চেষ্টা করে, ততই সেই একই চিন্তা—সেই বালুরঘাটের মেয়ে, তার স্যুটকেস।

পরদিন সে মেয়েটীকে একখানা চিঠি দিলে। 'মাননীয়াসু' পাঠ ব্যবহার করে সে স্যুটকেস বদলের সব অবস্থা খুলে জানালে। স্যুটকেসের মধ্যে যা যা ছিল, গহনা, টাকা, বস্ত্রাদির একটা তালিকাও দিলে চিঠিতে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য মার্জ্জনাভিক্ষাও বাদ গেল না। সে যে কি ভীষণ লজ্জিত ও দুঃখিত হয়েছে এ জন্যে, অন্ততঃ তিনবার সে কথা লিখলে তিন জায়গায়। তার নিজের স্যুটকেসটী কি ওখানে আছে?

চিঠি ডাকে দিয়ে দু-তিন দিন দুরু দুরু বক্ষে উত্তরের প্রতীক্ষায় রইল প্রতুল। না জানি কি উত্তর আসে, খুব রাগ করে কি চিঠি লিখবে? পুলিসে খবর দেবার ভয় দেখিয়ে?

নয় দিনের দিন উত্তর এল।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

মহাশয়ের পত্রে অবগত হইলাম, দিল্লি ষ্টেশনে মোটর হইতে নামিবার সময় আমার ভাগিনেয়ী শ্রীমতী অমিয়ার স্যুটকেসটি ভ্রম ক্রমে আপনার সহিত বদল হইয়া গিয়াছে। আপনার স্যুটকেসটিও আমার ভাগিনেয়ীর সহিত আসিয়াছে। জিনিসপত্রাদির কথা যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, স্যুটকেসের মধ্যে উহার অতিরিক্ত কিছুই ছিল না। মহাশয় ভদ্রলোক, আপনাকে এই অসুবিধায় ফেলিবার নিমিত্ত আমার ভাগিনেয়ী যথেষ্ট লজ্জিতা, তাহার পক্ষ হইতে আমিও আপনার নিকট বার বার ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। বাক্সটী রেজিষ্টার্ড আনপেড্ রেলওয়ে পার্শেলে পাঠাইয়া দিবেন। আপনার স্যুটকেসটীও সেই ভাবে পাঠাইব। রেলের রসিদটা উপরের ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

বিনীত

শ্রীভবতারণ চক্রবর্ত্তী

পত্র পেয়ে প্রতুল যে কিছু আশা-ভঙ্গ হয়ে না পড়েছিল এমন নয়। প্রথম তো এ মেয়েটি যে কোনটি, তা কিছুই বোঝা গেল না। বালুরঘাটের সেই মেয়েটীই যে এই অমিয়া মজুমদার, তার কোন প্রমাণ নেই। চিঠি একখানা মেয়েটীর কাছ থেকে আসবে এমন আশা করা নিতান্ত অসঙ্গত ছিল না, কোথা থেকে আবার মেয়ের মামা শ্রীভবতারণ চক্রবর্ত্তী এসে জুটল মাঝখানে! তবে মামা থাকাতে একটা ব্যাপার খানিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল—মেয়েটী ব্রাহ্মণ। সেও ব্রাহ্মণ। তাতে অবিশ্যি এমন কিছু সুবিধে যে কি, প্রতুল ভাল করে যখন ভাবলে, তখন বুঝেই পেলে না।

পরদিন লোক পাঠিয়ে সে স্যুটকেসটি রেলে বুক্ করে দিলে এবং তার নিজের স্যুটকেসটিও সেই সপ্তাহের শেষে একদিন অক্ষত অবস্থায় কুলির মাথায় চেপে তার কোয়ার্টারে এসে পৌঁছাল। জিনিষপত্র নাড়াচাড়া হয়েছে বটে, কিন্তু ঠিক আছে, এমন কি চিঁড়ে ও ভালের পাটালি পর্য্যন্ত।

ব্যাপারটা বেমালুম মিটে গেল।

এর পর আর কি ঘটতে পারে? কিছুই না।

প্রফুল্ল কিন্তু কিছুতেই মেয়েটির কথা একেবারে ভুলতে পারলে না। তার তরুণ জীবনে এই প্রথম নারী-সংক্রান্ত ঘটনা, রোমাঞ্চ না হলেও রোমাঞ্চের কল্পনা মনে জাগে বই কি! বিশেষতঃ চা-বাগানের এই নির্জ্জন জীবনে। তা ছাড়া কোন্ মেয়ে ছিল এটি? সেই বালুরঘাটের?

মেয়েটির কাছ থেকে একখানা ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি আসবে, এ আশাও প্রফুল্লের ছিল। তা আসে নি।

•

পাঁচ মাস পরে প্রফুল্ল আবার ছুটি নিয়ে বাড়ী রওনা হল। অনেকদিন দেশে যায় নি, মনটা ব্যাকুল ছিল আত্মীয়-স্বজনকে দেখবার জন্যে। ওর বোন কমলাকে ও বড় ভালবাসে, কমলার বিবাহের কথাবার্ত্তা চলেছে, সামনের বৈশাখেই বোধ হয় বিয়ে হয়েও যাবে। তার আগে কমলাকে নিজেদের মধ্যে আপন ভাবে দিনকতক পেতে চায়। সেজন্যে আরও বিশেষ করে বাড়ী যাওয়া দরকার।

শিলি ষ্টেশনে নেমে বসে থাকতে হল। একখানি আপ ট্রেন এলে তারও যাত্রী নিয়ে তবে মোটর-বাস ছাড়বে।

প্ল্যাটফর্ম্মে কিছুক্ষণ পাইচারী করতে করতে কলকাতার ট্রেন এসে পৌঁছাল। যাত্রীর ভিড় তেমন ছিল না, কয়েকটি মাত্র লোক ট্রেন থেকে নামল।

হঠাৎ প্রফুল্ল থমকে দাঁড়াল—বালুরঘাটের সেই তরুণী কলেজের ছাত্রী একা ট্রেন থেকে নামছে। ওর হাতের দিকে চেয়ে কিন্তু সে চক্ষে অন্ধকার দেখলে কিছুক্ষণের জন্যে। ট্রেনের ঘরটা থেকে কুলি যে স্যুটকেশটা মাথায় চাপিয়ে নিলে মেয়েটি—সেটা তার অত্যন্ত পরিচিত সে স্যুটকেশটি নয়। সেটি ছিল টিনের, আর এটি চামড়ার বড় একটা স্যুটকেশ।

মোটর-বাস ছাড়বার সময় নেই বেশী। প্ল্যাটফর্ম্মে নেমে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে, যেন একটু হতাশ হয়ে পড়ল।

মোটর-বাসে উঠবার সময় প্রফুল্ল শুনলে মেয়েটী কণ্ডাক্টরকে বলছে—বালুরঘাটের সাবডেপুটি বাবুর বাড়ী থেকে কোন লোক আসে নি?

কণ্ডাক্টর বললে—ডিপুটি বাবু? নেই মাইজি। আপ উঠিয়ে, হরজ কেয়া, বালুরঘাট মে উতার দেগা।

বাস্ চলছে। মেয়েটির প্রতি ঔদাসীন্য এসে গিয়েছে প্রফুল্লের, সে অন্য দিকে চেয়ে আছে, অন্য কথা ভাবছে। বাক্সের অদল-বদল হয়েছিল বলেই তার মন বালুরঘাটের মেয়েটির প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিল, মেয়েটি সুশ্রী বলে নয়, সুশ্রী মেয়ে সে অনেক দেখেছে।

এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যে-মেয়ের সম্পর্কে, তার প্রতি মন আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। প্রফুল্ল জানে, সকলেরই হয়—আরও বেশী করে হয় এর ওপরেও যদি মেয়েটী সুশ্রীর পর্য্যায়ে পড়ে।

কিন্তু এ সময় সে-মেয়ে নয়, প্রফুল্ল ওর স্যুটকেস দেখেই তা যখন বুঝলে, সেই মুহূর্ত্তে প্রফুল্লের মন থেকে মেয়েটী একদম মুছে গিয়েছে। যাকে নিয়ে তার মন নিভৃতে কত স্বপ্নজাল বুনেছিল এক সময় চাটিখানি চা-বাগানের বনানী-বেষ্টিত নির্জ্জন বাংলোতে—এ সে মেয়ে নয়।

•

যাত্রীদের ভিড় নেই। ভদ্রলোকও নেই সে আর মেয়েটী ছাড়া। ড্রাইভারের ঠিক পিছনে, রেলিং দিয়ে অন্য যাত্রীদের বসবার জায়গা থেকে পৃথক্ করা রিজার্ভ সিটে, মেয়েটি বসে আছে। প্রফুল্ল তার ঠিক পিছনের লম্বালম্বি ভাবে পাতা বেঞ্চির প্রথমেই বসেছে, রিজার্ভ সিটের পিতলের গরাদে ঠেস দিয়ে।

একটা ছোট বাজারে বাস দাঁড়ালো। দু' একজন যাত্রী ওঠা-নামা করলো। প্রফুল্ল লক্ষ্য করলে মেয়েটী তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে, কি যেন বলবার আছে ওর, কিন্তু বলতে বাধ বাধ ঠেকছে, ভাবটা এই রকম। কি বলবার থাকতে পারে মেয়েটীর? সে কি এগিয়ে গিয়ে মেয়েটীর সঙ্গে কথা কইবে?

মোটরবাস ছাড়বার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে হঠাৎ মেয়েটী ওর দিকে ফিরে বললে, আপনি কি বালুরঘাট যাবেন?

প্রফুল্ল চমকে উঠে বললে, বালুরঘাট? হ্যাঁ—তা না—বালুরঘাট? কেন বলুন তো?

প্রফুল্লের উত্তর দেওয়ার ধরণ ও অবস্থা দেখে তরুণীর সুন্দর মুখে হাসির অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট রেখা ঈষৎ ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। সে বললে, যেখুন আমি বড় মুস্কিলে পড়েছি। রাত হয়ে গেল, বালুরঘাটে আমার বাবা গবর্ণমেণ্ট অফিসার। বাসা থেকে লোক আসবার কথা আছে

নর্থ-বেঙ্গলের সময়, আমি একটা ট্রেণ আগে এসে পড়েছি, কি করে বাসায় যাবো? তা' ছাড়া আপনি যদি আগে নেমে যান, তবে গাড়ীতে আর দ্বিতীয় ভদ্রলোক নেই, এই অন্ধকারে যাই—এ পথে ভয়ও তো আছে জানি।

মেয়েটী যেন অসহায়ভাবে ওর মুখের দিকে চাইলে।

প্রতুল লাফিয়ে উঠলো প্রায়। বলল, কোন ভয় নেই—আমি আপনাকে পৌঁছে দেবো বাড়ী, আমিও ওখানেই যাবো—চলুন।

মেয়েটী যেন সাহস ও আশ্বাস পেয়ে মনের বল ফিরিয়ে পেলে। কিন্তু মুখে বললে, আপনাকে সে বড় কষ্ট দেওয়া হবে। আপনি বালুরঘাট নেমে দয়া করে আমাকে একখানা গাড়ীতে তুলে—

কিছু না। আপনি সেজন্য কিছু মনে করবেন না—কার বাসায় যাবেন আপনি?

আমার কাকা ওখানকার সাব্‌ডেপুটি, সুধাংশুকুমার মজুমদার।

প্রতুলের বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন দুলে উঠলো—যে কথাটা ভুলে ছিল এতক্ষণ, সেটা আবার ওর মনে সাড়া জাগালো।

একটা কথা বলবো? যদি কিছু মনে না করেন, আপনার নামটি কি জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

—আজ্ঞে আমার নাম অমিয়া মজুমদার।

প্রতুলের মাথা ঘুরে উঠলো। বাস্, লোকজন, গাছপালা, পৃথিবী, আকাশ, বাতাস দুলে উঠলো। যেন বিরাট একটা ভূমিকম্প।...অমিয়া মজুমদার! অমিয়া মজুমদার!

অতি কষ্টে নিজেকে সামলে বল্লে—আর একটা কথা বলবো, কিছু যদি মনে না করেন। আপনার সঙ্গেই আমার সুটকেস বদল হয়েছিল গত পুজোর ছুটির সময়—আমারই নাম প্রতুল ভট্টাচার্য্য, আমিই আটিয়ালি চা-বাগানে থাকি—ডাক্তার—

মেয়েটীর ডাগর চোখে বিস্ময় ও কৌতূহলের দৃষ্টি ফুটে উঠলো। অল্পক্ষণ চুপ করে ওর দিকে চেয়ে থেকে বল্লে, ও! আপনি প্রতুলবাবু?...আপনাকে আমি চিনি।

আমাকে? আমাকে চেনেন কি ভাবে?

সেবার বাসে আমার একখানা বই পড়ে যাওয়াতে আপনি আমায় কুড়িয়ে দিয়েছিলেন—না?

প্রতুল হেসে বল্লে, হাঁ, ঠিক বটে। মনে পড়েছে। কিন্তু বাল্য বয়সের চেনাটা বড় বেশীরকম করে চেনা না কি? ওঃ কি কষ্ট দিয়েছিলুম আপনাকে, মনে থাকবে চিরকাল।

মেয়েটী প্রতিবাদের সুরে হাসিমুখে বল্লে—না, না, তা আর কি, অমন ভুল তো হয়েই থাকে। আমারই দোষ—

আপনার কি দোষ? আমার দোষ, বড়ই তাড়াতাড়ি হোক, নিজের জিনিষ দেখে নেওয়া উচিত ছিল। আপনি কোন্ কলেজে পড়েন?

স্কটিশ চার্চ্চ-এ।

এবার বোধ হয় বি. এ.?

থার্ড ইয়ার শেষ হবে এবার—সামনের বারে দেবো।

আপনার মামার নাম বুঝি ভবতারণ বাবু? মামার বাড়ী থাকেন বুঝি?

না, মামার বাড়ী ওটা নয়। মামা একা থাকেন, উনি জ্যোতিষী, কেউ নেই বাসায়, আমি রাঁধি, মামা আর আমি থাকি।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় বালুরঘাটে বাস্ এল। প্রতুল মেয়েটীকে বললে—আপনাদের বাসা কতদূর? একখানা গাড়ী করি?

মেয়েটী বললে, গাড়ী করতে হবে না। কুলির মাথায় দিয়ে চলুন যাই, ওই মোড় ঘুরলে, তিন মিনিটের পথ।

এরা বাসায় পৌঁছতেই একদল বালক-বালিকার উল্লাস-সূচক কলরবের মধ্যে ওদের অভ্যর্থনা হোল। মেয়েটীর কাকা সতীশবাবু প্রতুলকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করলেন। প্রতুল তখুনি চলে যেতে চাইলে—সে কথাতে তিনি কর্ণপাতও করলেন না; রাত্রে তিনি কোথাও তাকে যেতে দেবেন না, কাল সকালে সে পরামর্শ হবে কখন যাওয়া যায় না যায়। আপাততঃ হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম করে একটু চা খেলে তিনি কৃতার্থ হবেন।

ইতিমধ্যে বাড়ীর মধ্যে মেয়েটীর মারফৎ রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, এই সেই লোক, যার সঙ্গে তার বাক্স বদল হয়েছিল।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতুল ছিল মাত্র জনৈক সহৃদয় পথিক ভদ্রলোক, যিনি তাদের অমিয়াকে একা আসতে দেখে

ধরা করে তাকে বাসায় পৌঁছে দেবার কষ্ট স্বীকার করেছেন।

কিন্তু এ কথা প্রকাশ হবার পরে প্রতুল বাসাশুদ্ধ সকলের নতুনতর কৌতূহল ও প্রশংসার কেন্দ্র হয়ে উঠলো। মেয়েটীর কাকা বাড়ীর ভেতর থেকে এ কথা শুনে এসে তাকে বললেন, আপনার সম্বন্ধে যে কথা শুনলুম অমি'র মুখে, তাতে আপনাকে আর সাধারণ ভদ্রলোক বলে ভাবতে পারি নে তো, আপনি অতি মহৎ লোক। এ ভাবে যে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে যাবে এ ধারণার অতীত। বেশি কিছু আমি আপনার সামনে আপনার সম্বন্ধে বলবো না, তবে এইটুকু বলছি যে, আমরা বাসার সকলেই আপনাকে পরম আত্মীয় বলে গণ্য করি প্রতুল বাবু। অমি'ও বাড়ীর ভেতর ওর কাকীমার কাছে বলছিল, আপনার সম্বন্ধে ওর যথেষ্ট উঁচু ধারণা।

প্রতুলের মুখ লজ্জায় ও সঙ্কোচে লাল হয়ে উঠলো, বিশেষ করে সতীশবাবুর এই শেষের দিকের উক্তিতে।

একটু পরে চা ও খাবারের রেকাবি হাতে মেয়েটীই বাহিরের ঘরে ঢুকে প্রতুলের সামনে টেবিলের ওপর সেগুলো রেখে বলে, হাত মুখ ধুয়েছেন? একটু চা খেয়ে নিন্।

সতীশ বাবুর হঠাৎ কি একটা কাজের কথা মনে পড়ে যাওয়াতে তিনি বললেন—অমি, তুই এখানে বোস একটু, ওঁকে আর এক পেয়ালা চা এনে দিস, আসছি আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে।

সতীশ বাবুকে আর বাইরের ঘরে দেখা গেল না!

প্রতুল ইতিমধ্যে মেয়েটীর সম্বন্ধে অনেক কথা জেনে ফেলেছে। ওর বাবা মা নেই, অনেক দিন মারা গেছেন। কাকা মানুষ করছেন বহু দিন থেকে। আই. এ.-তে মেয়েটি কুড়ি টাকা স্কলারশিপ পেয়েছিল, কলেজে ও কাইন আর্টস্ সোসাইটির সেক্রেটারি। কলেজে গানের প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে মেডেল পেয়েছে এ বৎসর। কলেজ ম্যাগাজিনে ওর লেখা ছোট গল্প বেরিয়েছে। বি. এ. পাশ করে ও নিশ্চয়ই এম. এ. পড়বে ইত্যাদি ইত্যাদি।

মেয়েটী সরাসরি ভাবে এ সব সংবাদ প্রতুলকে বলে নি, প্রতুলের প্রশ্নে, কতকটা নিজে থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমন ভাবে বলেছিল যে প্রতুলের তথ্যগুলি অজ্ঞাত রইল না আধ ঘণ্টা সময় শেষ হবার পূর্বেই।

সতীশ বাবু পুনরায় বাইরের ঘরে ঢুকতেই অমিয়া উঠে চলে গেল। পরদিন সকালে উঠে প্রতুল বাবার উদ্যোগ করতেই সতীশ বাবু ওকে জানালেন—বাড়ীর মধ্যে বলেছে এ-বেলা যাওয়া হবে না তার। খেয়ে দেয়ে ও-বেলা ধীরে সুস্থে গেলেই চলবে।

প্রতুলের সম্বন্ধেও সতীশ বাবু অনেক কথা জানলেন কথায় কথায়। সে এম. বি. পাশ করেছে আর বছর, চা-বাগানে চাকরি করে, একশোটী টাকা মাইনে। চক্রবর্ত্তী ওরা, রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ, তার বাবা মা বেঁচে আছেন, দেশে জায়গা জমি আছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাঙালীর সংসারে, বাপ-মা-হারা বয়স্থা মেয়ে কাকার ঘাড়ে, পাত্র হিসাবে প্রতুল ভালোই, সম্মুখে শুভ বৈশাখ মাস; অতএব, এর পরে আর খুব বেশি কিছু বলবার নেই, থাকবার কথাও নয়।

ভাটিখালি চা-বাগানের সেই কোয়াটারে প্রতুল এক দিন তার তরুণী পত্নীকে ঠাট্টার সুরে বলেছিল—কি, আর বাক্স বদল করবে? অমিয়া রোষে ঘাড় বেঁকিয়ে উত্তর দিয়েছিল, বোলো না। কি কষ্ট সে দিন আমার। কলেজে যাব—বাক্স খুলে দেখি ধুতি, সেমিজ, সুতি, শার্ট—মাগো, আমার চোখে জল এল! কি পরি তখন বুঝিনে, বাড়ীতে দ্বিতীয় মেয়ে মানুষ নেই, নেয়ে উঠে কি পরি তার নেই ঠিক, কি বিপদ গিয়েছে সে দিন আমার! আর বাক্স বদল হোল না কি একজন গেঁয়ো লোকের সঙ্গে। বাক্সের মধ্যে আবার চিঁড়ে গুড়, পুরানো তালি-দেওয়া জুতো—উঃ মাগো!

প্রতুল বলে—হায় হায়, বাক্স বদল তো পরে আছে, সেই গেঁয়ো লোকটার সঙ্গে এক দিন মালা বদল হয়ে যাবে তা কি আর তখন জানতে?

# দুর্গাপূজায় বাল্যস্মৃতি

—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

আবার মা আসিতেছেন। বৎসর বৎসরই মা তাঁহার সন্তানগণকে অভয় দিতে আসিয়া থাকেন। শিশুকাল হইতেই মায়ের বরাভয় লাভ করি। কিন্তু কৈ মা, তোমার সন্তানদের দুঃখ ঘুচিল কৈ? তাহাদের দৈন্য দূর হইল না কেন? কেন মা, পিতার বর্ত্তমানে সন্তানের অকাল-মৃত্যু? কেন কেন ক্রমেই আমাদের আয়ুহ্রাস করিয়া আসিতেছে? কেন মা রোগ-যন্ত্রণায় আমরা ছট্‌ফট্‌ করি? আমাদের স্বাস্থ্য কেন নষ্ট হইতেছে? কেন মা তোমার সন্তানদের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভাদির পীড়নে এত আসুরিকতার সৃষ্টি হয়? কেন মা এত অসন্তোষ? মা, আবার কি আমরা তোমার যোগ্য সন্তান হইয়া উঠিব না? আজ বাঙ্গলার এই দুর্দ্দিনে মা তোমার সন্তানগণকে আবার তুমি বরাভয়করে আশীর্ব্বাদ কর, শক্তি দাও, তাঁহাদিগকে খাঁটি মানুষ কর। আবার তোমার বাঙ্গলায় ভাগ্যে সমগ্র জগৎ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হউক। আবার আমরা আপনা ভুলিয়া ভ্রাতৃবৎসল হই, মায়ের উপযুক্ত সন্তান হই।

মা, এ ক্ষুদ্র জীবনের বহুতম বৎসর তো অতীত হইল, তবু মা তোমারই অনুগ্রহে মনে হয় এখনও যৌবনের উৎসাহে আমি উদ্দীপিত। এখনও নিজের, দেশের, জগতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত আশাই করি; কিন্তু মা সেই সব স্বপ্ন কি সত্যে পরিণত হইবে?

আজ মা মনে পড়িতেছে সেই শিশুকালের কথা—অতি-প্রত্যুষে যখন মায়ের ক্রোড়ে উঠিয়া প্রথম তোমাকে দেখি। সব কথা এখন আর তত মনে নাই। মনে আছে শুধু তোমার করুণাময়ী মূর্ত্তি। তারপর তোমাকে কত দেখিয়াছি—বালো দেখিয়াছি, যৌবনে দেখিয়াছি, প্রৌঢ় বয়সেও কতবার দেখিয়াছি। কিন্তু মা, তুমি তো পুরাতন হওনি; তখনও তোমায় যে অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, আজও তোমার তাহাই আছে। ঐশ্বর্য্যশালিনী মা, তুমি তো চিরকালই নূতন—নিত্যই নব—আদি যে চিরকালই তোমার হাত-করুণ মূর্ত্তিতে বড়ই আপন ভুলিয়া যাই, শক্তি লাভ করি, তোমার আরাধনায়—কত তৃপ্তি আসে। আশীর্ব্বাদ কর মা!

আজ মা তোমার চিরনূতন মাতৃমূর্ত্তির প্রথম স্পষ্ট স্মৃতির কথাই আওড়াইয়া তৃপ্তিলাভ করিব। এবার মা সেই স্মৃতি-কথারই তোমার পূজা করিব। অক্ষম আমি, আর কি আছে মা!

সেবার মনে আছে, ১২৯৬ সালের কথা, যে বৎসর ঘূর্ণীবায়ুতে ঢাকার সহর লণ্ড-ভণ্ড হইয়াছিল, বুড়ীগঙ্গা ও হাসাইলের খালের পাড়ে যুদ্ধক্ষেত্রের ন্যায় কত লোকের মৃতদেহ দেখিয়াছি, কত লোকের কাতর ক্রন্দন শুনিয়াছি। কত হৃদয়বিদারক আখ্যান কর্ণগোচর হইয়াছে। তাহারই কয়েক-মাস পূর্ব্বেও মাকে দেখিয়াছিলাম, কই মা তখন তো তোমার সংহারমূর্ত্তি দেখি নাই। তুমি যে কখন কি রূপ ধর, কে বলিতে পারে মা? আজও যে জগৎসংসার সংহারের লীলাক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছে, তবু অসুর-নাশিনী আমার দুর্গা মায়ের করুণাময়ী মূর্ত্তিই হাসিতেছে। এ কি মা ধ্বংস না সৃষ্টি? কি আশ্চর্য্য লীলা তোমার!

সেই প্রথম স্মৃতির কথা—ঠিক মনে আছে। তখন সবে পাঠশালা ছাড়িয়া মধ্য-ইংরাজী স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করিয়া-ছিলাম। তখন গ্রামে অনেক বাড়ীতেই পূজা হইত। আমাদের পাড়ায়ও পূজা হইত, আর স্কুল-বাড়ীতেও পূজা হইত। পাড়ার যে বাড়ীর পূজার সঙ্গে আমরা বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম, সে বাড়ীতে অধিবাসের পূর্ব্বদিন কুম্ভকার-বাড়ী হইতে ঠাকুর নির্ম্মিত হইয়া নৌকা করিয়া আসিত, আর স্কুল-বাড়ীতেই ঠাকুর নির্ম্মিত হইত বলিয়া মূর্ত্তিগঠনের বিভিন্ন রূপ ও বিকাশ দেখিতাম। স্কুল-বাড়ীর মূর্ত্তি দেখিতে খুবই বড় ছিল। স্কুল-বাড়ীর মূর্ত্তি বলিয়া স্কুলের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। যে বাড়ীর বহির্ব্বাটীতে আটচালাগৃহে আমাদের স্কুলটী বসিত, তাহারই সংলগ্ন বাড়ীতে বারোয়ারী গ্রামের মাধবী মজুমদারের বাড়ীর মূর্ত্তিই এখনও হৃদয়ে চিরজাগরূক হইয়া রহিয়াছে। পুকুরপারের বাড়ীতে দুর্গামায়ের মূর্ত্তি তৈয়ার হইত, ভাদ্র মাস পড়িলেই কাঠামো হইত, একমেটে হইত। মুখ সংযোজিত হইত, চমেটে হইত। ক্রমে খড়ির রং হইত।

দিনে দিনে অন্যান্য রং-এর চিত্রাঙ্কণ হইত। গঙ্গন ( পালিশের মত রং ) পড়িত, চক্ষুদান হইত এবং ঠিক মায়ের খাটি মূর্ত্তি দেখিতাম। বিভিন্ন অবস্থার মূর্ত্তি দেখিতে কত আনন্দ হইত, কতবার ছুটিয়া মূর্ত্তি দেখিতে যাইতাম। কত মিথ্যা কথা বলিতে হইত। কিন্তু তখনকার কৌতূহল তো কিছুতেই নিবৃত্ত হইত না। বাড়ী হইতে সঙ্গীদের সঙ্গে একক্রোশ পথ নৌকা বাহিয়া স্কুলে যাইতাম, কিন্তু মূর্ত্তি দেখিবার লোভে কোনদিনই প্রায়শঃপক্ষে স্কুল বন্ধ করিতাম না। দেবী-পক্ষ পড়িলেই কত আশা ও আনন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠিত। আনন্দ হইত যিনি শারদীয়া চন্দ্রমা দেখিয়া, পদ্মানদীতে অপরাহ্নে বাহু খেলিতে গিয়া—আনন্দ হইত, স্কুল ছুটি হইবে বলিয়া, বিশেষতঃ গ্রামবাসীদিগকে দেখিব বলিয়া, পূজার সময় নিমন্ত্রণ খাইব বলিয়া, পূজার কয়দিনে বাড়ি পোড়াইব বলিয়া, এবং বিজয়ার দিনে আমাদের ঠাকুর বিসর্জ্জনের বিচ্ছেদের পর দশহরার মেলা দেখিব বলিয়া।

মহালয়ার পরেই নদী একটু শান্ত হইত, আর আমরাও বাহু খেলিতে যাইতাম।

পাঠক! শারদচন্দ্রিমা অনেকেই দেখিয়াছেন, কিন্তু বিশাল পদ্মানদীতে নৌকা বাহিতে বাহিতে কখনও চন্দ্রাস্ত দেখিয়াছেন কি? যিনি জ্যোৎস্না-পুলকিত আশ্বিন মাসে বন্ধুবান্ধব সহ অপরাহ্নে নৌকায় বেড়াইবার সেই সুখ আপনার জীবনে যদি কখনও না হইয়া থাকে, তবে আপনার জীবনের একটা প্রধান অভাব পূর্ণ হয় নাই। সৌভাগ্যবশে আমরা এমনি করিয়া বৎসর বৎসর বাল্য ও যৌবনের শেষকাল পর্য্যন্ত কত না সেই আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। তার পর ১৯২৩-এর বিধির প্রভাতে আপাত-প্রশান্ত-বদনা কিন্তু সময়ে অসময়ে ভীষণা নদী কীর্ত্তিনাশা একদিন সংহারমূর্ত্তিতে আসিয়া আমাদের জন্মভূমি কাড়িয়া নিলেন, আমাদিগকে গৃহহীন করিলেন, জ্ঞাতিবন্ধু সকলকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, ছন্নছাড়া করিলেন। মা, তোমার দশপ্রহরণধারিণী পদ্মার রোষে আমরা জন্মভূমিতে তোমাকে দেখিবার, তোমাকে পূজা করিবার আনন্দ উপভোগ করিবার সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত হইলাম! আমাদিগকে পদ্মামায়ী কত সুখ, কত শান্তি, কত স্বাস্থ্য দিত। কিন্তু সবই সংসারের ধের্ম। সংসার আমাদিগকে ছাড়িয়াছেন বটে, কিন্তু তুমি তো আমাদিগকে ছাড় নাই মা। কিন্তু আমরা অবোধ, তাই মা আক্ষেপ করি। এও তো তোমার সৃষ্টি। তোমার কাজনই মা পড়ন।

আমাদের গ্রামে একটি খাল ছিল, সেটি উত্তরে বানরী, কদমা প্রভৃতি গ্রাম পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছিল আর দক্ষিণে পদ্মায় আসিয়া মিশিয়াছিল। খালের পারেই ছিল পুরাতন বাজার (পরে ডিস্পেন্সারী), পোষ্টাফিস ও নূতন বাজার। পোষ্টাফিসে ও পুরাতন বাজারে তৃতীয়া ও চতুর্থী তিথিতে দেখিতাম কত নারিকেল, কুষ্মড়া, পাঁঠা ও যাত্রী-ভরা নৌকা আসিত। আমরা দেখিতাম দক্ষিণে বিশাল নদী, আর ক্রমে ক্রমে নূতন নূতন গৃহাগত নূতন মুখ দেখিয়া কত আনন্দ হইত। গল্প করিতাম, হাসিতাম, খেলিতাম আর গ্রামের লোক দেখিয়া হৃদয় পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিত। আহা! আজ সেই সব প্রিয় সঙ্গীরা কত দূরে। যতদূর মনে আছে সহচর শ্যামাপ্রসন্ন ও দুর্গাপ্রসন্নের সঙ্গেই বোধ মিলিত হইতাম। শ্যামাপ্রসন্ন এখন কটকের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল আর দুর্গাপ্রসন্ন ঢাকায় ওকালতি করিতেছে। বহুদিন দেখা হয় নাই। জানকী দাদাও আসিতেন, তিনি কলিকাতাই আছেন। সুরেশও থাকিত। আরও যে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা ছিলেন, নতু (নগেন্দ্র), পাঁচু (সুরেন্দ্র), হারাণ কাকা (রেবতী), মনা (সুরেন্দ্র), হরনাথ, সত্যনাথ (বন্দ্যোপাধ্যায়) ইত্যাদি তাঁহারা এখন কেহই নাই, সবাই আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। তারপর তারক দাদা, হারাণ দাদা, ভুবন দাদা, হেম, দীনবন্ধু, সুরেন্দ্র, বাড়ী আসিবে বলিয়া কত আগ্রহ হইত।

আমাদের পাড়ার পূজার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের বাড়ীর ঠিক দক্ষিণদিকেই ছিল সেই খালটী—একটী নাতিবৃহৎ প্রবাহিণী, আর উত্তর দিকে ছিল একটী বৃহদাকার পুষ্করিণী—ইহার চারিধারে আম্র, নারিকেল ও গাব-সুপারী বৃক্ষাদি বিরাজিত ছিল। উত্তর পারে ছিল সতুদের বাড়ী। সে-বাড়ীর উপেন্দ্রদাদা এখন আলিপুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উকীল। তারক দাদা কলিকাতায় বহু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা। পূর্ব্বে পাঁচুকাকার বাড়ী। পাঁচুকাকা (সুরেন্দ্র দাসগুপ্ত) যেমন ইংরাজী শিখিতেন, তেমনি লাইফ ইনসিওরেন্সের এজেন্সি করিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। পশ্চিমে রেবতীকাকা, অমনী ও কুঞ্জদের বাড়ীতে পূজা হইত। আমাদের ঠিক সংলগ্ন পূর্ব্বদিকের বাড়ীর

রাজেন্দ্রকাকা—(রাজেন্দ্র চক্রবর্তী) পরে ডাক্তার হইয়াছিলেন—আর জানকী চক্রবর্তী মহাশয় হাটখোলার ব্রহ্মের বনোয়ারীলালবাবুর কাজ করিয়া বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। তিনি এখনও আমাকে কনিষ্ঠের ন্যায় স্নেহ করেন। আমাদের ঠিক পশ্চিমের বাড়ীতে একঘর কায়স্থের বসতি ছিল। পূর্ব্বদিকের বাড়ীর উল্লেখে আমরা বলিতাম 'ঠাকুরবাড়ী'—আর এবাড়ীর নাম ছিল সূত্রবাড়ী। বাড়ীর মালিক স্বর্গীয়চরণ দে-কে আমরা জ্যাঠা বলিয়া ডাকিতাম। ইনিই পূজার মণ্ডপী ছিলেন, আমাদিগকে অভিভাবকের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তাঁহার ছেলেরা আজ কেহই জীবিত নাই। কিন্তু তখন লালমোহনদাদা, রাসুদাদা, পাখীদাদা বলিয়া ডাকিতাম। এই ছয়খানি বাড়ী যেন এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হইত। আমাদের পল্লীগ্রাম কলিকাতার সহরতলীর পল্লীগ্রামের মত নয়। আমাদের কোন বাড়ীই পাকা দেওয়ালে ঘেরা ছিল না। সবই ছিল খড়ের ঘর, ক্রমে টিনের ঘরে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু আজ সে সবের চিহ্ন নাই। পূজার সময় এই ছয়খানি বাড়ীর লোকের কোলাহলেই পূজার ঘর, নাটমন্দির, বৈঠকখানা মুখরিত হইয়া উঠিত। সকালে উঠিয়াই ঐ যে সঙ্গীদের সহিত মিলিয়া খেলিতাম, দ্বিপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বে আর বিচ্ছিন্ন হইতাম না। স্নান হইত পুকুরে একসঙ্গে, খেলিতাম একসঙ্গে, কেবল খাইবার সময় ভিন্ন ভিন্ন ঘরে খাইয়া আসিতাম। এই সঙ্গসুখই ছিল পূজার প্রধান আমোদ।

পূজার তিন দিন পূর্ব্বে স্কুল ছুটি হইত। আর ঐ দীর্ঘাকার অসুর-সিংহের মুণ্ড দেখিবার কোন সম্ভাবনাই রহিত না। কিন্তু অধিবাসের পূর্ব্বদিন বৈকালে কুম্ভকার-বাড়ী হইতে পাড়ার পূজার বাড়ীতে প্রতিমা আসিত। সকলে মিলিয়া প্রতিমা ধরাধরি করিয়া তুলিয়া মণ্ডপ-ঘরে উঠাইতাম। কিন্তু তখনও গর্জ্জন (পালিস) হয় নাই। সে রাত্রিতেই চক্ষুদান এবং গর্জ্জন হইয়া যাইত। দেখিতাম, মা যেন হাসিতে হাসিতে অসুরকুল ধ্বংস করিতেছেন আর রত্নমণ্ডিত বসনভূষার বসনভূষ যেন পঞ্চনিষ্পীড়নে নিযুক্ত থাকিত। তখন রাং দিয়া প্রতিমার চালা সাজানো হইত; কিন্তু এখন আর তাহা হয় না। এ-প্রথা এখন উঠিয়া গিয়াছে। বস্ত্র-অলঙ্কার পরে আর বিদেশী রাং-এর প্রচলন হয় না। স্বদেশী শিল্পের একটু উন্নতি হইয়াছে। কুম্ভকারের হাত খুলিয়া গিয়াছে। এখন পূজাদাদ অপেক্ষাও খুব সুন্দর দেখায়।

ষষ্ঠীর দিন অধিবাস। মায়ের বোধন। মায়ের কাপড়-চোপড় পরা সবই শেষ হইয়াছে। কার্ত্তিকের বাবে দেখিতাম একটী কলাগাছকে ঘোমটা পরাইয়া বৌ করা হইয়াছে। আমরা বলিতাম 'কলা-বৌ'। সপ্তমীর প্রাতে দেখিয়া বিস্মিত হইতাম আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, ভদ্র-ইতর, হিন্দু-মুসলমান সকলেই নূতন বস্ত্র পরিহিত হইয়া প্রতিমা দেখিতে আসিয়াছে। 'মুসলমান' কথাটীর একটু বৈশিষ্ট্য আছে। তখন মুসলমানগণ সমান উৎসাহে হিন্দুর বাড়ীতে পূজা দেখিতে আসিত এবং পূজা দেখিয়া আমোদ উপভোগ করিত। দ্বিপ্রহরে পূজা, পূজার বাজনা, ঢাকের বাদ্য এবং পাঁঠা বলি। বলি হইলে তীরবেগে রক্তের ধারা ছুটিত, অমনি আমরা সকলে সমস্বরে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতাম। দ্বিপ্রহরে সকলে একত্র হইয়া ভোজন করিতাম। অনেক জাতির বাড়ী পূজা হইত, তিন দিনই প্রায় নিমন্ত্রণ থাকিত। অষ্টমী দিন ও নবমী দিন প্রায়ই মাংস প্রসাদে মিলিত। তখন খাওয়াই হইত ভিন্ন রকমের। ভাত, তিতার ডাইল, শুক্তানির ঝোল, মাছের তরকারী, মুগের ডাইল, মাছ, মাংস, দধি এবং পায়সান্ন। গ্রামে রসগোল্লা সন্দেশের তখনও চলাচল হয় নাই। ক্বচিৎ কখনও বড়লোকের বাড়ীতে বৃহৎ ব্যাপারে বিদেশ হইতে কারিকর আনাইয়া সন্দেশ রসগোল্লা তৈয়ার হইত। কিন্তু পূজার সময়ে এরূপ ব্যাপার কখনও দেখি নাই।

বৈকালে দেশবিদেশ হইতে কত লোক আসিত, অতিথি অভ্যাগত আসিত। গ্রাম যেন নূতন মনে হইত। তখন প্রতি বাড়ীতেই দেখিতাম অসংখ্য লোক ভোজন করিত। চাউল সস্তা ছিল, মাছ সস্তা ছিল। পূজার দুর্ম্মূল্যের সময়েও টাকায় পাঁচটা বড় বড় ইলিশ মাছ পাওয়া যাইত। অনেকেই খাওয়াইত আর বাড়ীর কর্ত্তা খুব তৃপ্তির সহিত কত যত্ন করিয়া খাওয়াইতেন। রন্ধনাদিও বাড়ীর মহিলারাই করিতেন। পাড়ার যে গিন্নী বা দিদীমা খুব ভাল রান্না করিতেন, নিমন্ত্রণের সময় তাঁহারই আহ্বান হইত। তাঁহাকে বাড়ীর সকলে কত আপ্যায়িত করিত; আর এখন সে

দিন বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। এখন স্ত্রীলোকেরা রন্ধন করিতে আর অগ্রসর হন না। বেতনভোগী পাচকের হাতে সেই পবিত্র কার্য্যটীর ভার দিয়া তাঁহারা পুরুষের সহিত সমান পাল্লা দিয়া চলিয়াছেন।

কত পূজার বাড়ী হইতে তিনদিন করিয়া নৈবেদ্য আসিত। অষ্টমীর দিনে পাঁঠার বলি একটু বেশী রকম হইত। আর সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর রাত্রে আমাদের বন্দুক ও ক্যাপ্ খেলিবার কি আনন্দ হইত। বন্দুক ছিল পাঁচ ছয় আঙ্গুল লম্বা, আর তার ক্যাপ ছিল কাগজের। বারুদও পোড়ান হইত; তার মধ্যে নলের বারুদই বেশী। একটু আগুন ধরাইয়া পুকুরে ছাড়িয়া দিতাম। কি সুন্দর দেখাইত! অষ্টমীর ও নবমীর সন্ধি-পূজারও আবার কত ঘটা হইত। নবমী দিন পাঁঠা-বলি, চালকুমড়া বলি, ইক্ষু-বলি ইত্যাদি হওয়ার পরে বেলী কাটিয়া ফেলা হইত। তখন আমাদের মনে প্রবল বিষাদ জাগিত। যিনি বলি দিতেন, তাঁহাকে পবিত্র ভাবে থাকিতে হইত, যেন পাঁঠা বাজা না যায়। এক বার ৺লক্ষ্মী চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে নবমীতে মহিষ-বলি দেখিয়াছিলাম। হাত পা বাঁধিয়া মহিষটীকে প্রায় নির্জ্জীব করিয়া ফেলা হয়, তার পরে একজন বিশালকায় ব্যক্তি খড়্গ উত্তোলন করিয়া একবার বলি সাঙ্গ করিতেন, অমনি নমস্কার ও আনন্দের কোলাহল পড়িয়া যাইত। এখন আর সেরূপ বলিষ্ঠ ব্যক্তি বড় দেখিতে পাই না। লোকে খাইতেই পায় না, গায়ে বল থাকিবে কিরূপে!

ষষ্ঠী-সপ্তমী ও অষ্টমী-নবমীর মধ্যাহ্নে চণ্ডীপাঠে যে চণ্ডী-মণ্ডপ মুখরিত হইত, নবমীর অপরাহ্নে নবমীর গানে মা যেন যাইবেন যাইবেন মনে হইত। বাজিতে বাজা, কবির গানে হৃদয় আনন্দে কত আপ্লুত হইত। তারপর বিজয়ার প্রভাত আসিত, বিষণ্ণ মনে উঠিতাম। উঠিয়াই দর্পণে মুখ বিম্বিত দেখিতাম এবং মধ্যাহ্নে অন্যান্য মিষ্টিসহ পুঁটি মাছের ভাজা ও মঙ্গল-ঘটি দিয়া ভাত খাইতাম। কিন্তু মধ্যাহ্ন আসিবার পূর্ব্বেই মায়ের বিসর্জ্জন দেখিয়া বিষাদে নিমজ্জিত হইয়া আসিতাম। বেলা নয়টা দশটার সময় মাকে অন্নভোগ দেওয়া হইত এবং পরে মাকে দুর্গামণ্ডপ হইতে নাটমন্দিরে স্থাপিত করা হইত; আর মেয়েরা বরণ করিতে আরম্ভ করিতেন। সে বরণ বড় অদ্ভুত হইত। আর কখনও কখনও মনে হইত যেন মা চলিয়া যাইবেন বলিয়া কাঁদিতেছেন। কখনও মনে হইত, হাত পা নড়িতেছে। আর বৃষ্টি হইলে মনে হইত মা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। তার পর সকলে ধরিয়া পুকুরে ওঁকে বিসর্জ্জন দিতাম। মনে হইত যেন মা অনন্ত সাগরে ডুবিয়া গেলেন, আর উঠিবেন না। অতঃপর শান্তি-আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতাম। অনেকে এক সঙ্গে বসিতাম, পুরোহিত প্রত্যেকের কপালে ঠেকাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেন।

বহুদিন পরে ১৯০৭ সালে কোটালীপাড়া হরিণাহাটীতে এইরূপ শান্তি-আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল যেন আবার সেই বাল্যকালের বন্ধুগণ পরিবেষ্টিত হইয়া প্রৌঢ় বয়সেও পূজার আনন্দ উপভোগ করিতেছি। বসন্তকুমার, সুরেশচন্দ্র, বিপিনবিহারী, সুবোধচন্দ্র প্রভৃতি বন্ধুগণ সহ হিমস্নিগ্ধ প্রিয়তম ছায়ের বাড়ীতে সেবার পূজায় যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছি, জীবনে তাহা কখনও বিস্মৃত হইব না।

বিসর্জ্জনের পর বৈকালে পাড়ার সকলে মিলিয়া এক বৃহৎ ছাপি-নৌকায় আমরা নবগঙ্গা দেখিতে যাইতাম। গঙ্গা নদীর পারে বহর গ্রামে। এখানে একটী ছোট নদী আসিয়া গঙ্গায় মিশিয়াছে এবং এই ছোট নদীতেই অসংখ্য প্রতিমা একত্রিত হইত। তেলিহাগ, কলমা, বেলপাও, পাউদিয়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে অসংখ্য প্রতিমা আসিত। সেই নদীর তীরে মেলা বসিত। কত বাজনা বাজিত, কত গান হইত, কত ঢাল তলোয়ালের খেলা হইত। পাঠক, কখনও বিক্রম-পুরের দশমীর মেলা দেখিয়াছেন কি? দেখিলে দেখিতে পাইবেন, বাঙ্গলার সব প্রাণ সেইখানে। হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, বালক বৃদ্ধ মিলিয়া ঐ দিনে যে নিরবধি আনন্দের সৃষ্টি করিত, সে আনন্দের আর তুলনা নাই। বাঙ্গলার পূজা বাঙ্গলার বিজয়া-সম্মিলন এক অপূর্ব্ব আনন্দের উৎস। যে কখনও তাহা দেখে নাই, সে তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। এ আনন্দ বঙ্কিমচন্দ্র দেখিতেন, বিবেকানন্দ দেখিতেন, আর চিত্তরঞ্জনও দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেন। মা—অন্নবস্ত্রহীন বঙ্গবাসীর হৃদয়ের সেই নিরবধি আনন্দটুকু যেন কাড়িয়া লইও না।

বাড়ীতে ফিরিতাম গভীর রাত্রে—কিন্তু দেখিতাম আমার গর্ভধারিণী জাগিয়া রহিয়াছেন আশীর্ব্বাদ দেওয়ার জন্য।

মাতৃ-আশীর্ব্বাদ নিতাম, আর পরদিন প্রভাত হইতেই দেখিতাম কোলাকুলি ও নমস্কার—আশীর্ব্বাদের প্রবাহ ছুটিয়াছে। সে আলিঙ্গনে বালক-বৃদ্ধের ভেদ নাই, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের পার্থক্য নাই, হিন্দু-মুসলমানের বৈষম্য নাই। এইরূপ চলিত সমগ্র মাস ভরিয়া—কালীপূজা পর্য্যন্ত। ইতিমধ্যে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা আসিত, বাড়ীতে বাড়ীতে লক্ষ্মীর আলপনা পড়িত। রাত্রিতে ঠাকুরবাড়ীতে ( পূর্ব্বদিকের বাড়ী। লক্ষ্মীর প্রসাদ পাইতাম আর প্রায় সারারাত্রি পর্য্যন্ত পাড়ায় পাড়ায় চলিত বাড়ী বাড়ী লোকের যাতায়াত ও কোজাগরী লক্ষ্মীর প্রসাদগ্রহণ। তাহাতে থাকিত মুড়ী ও চিড়ার মোয়া, নারিকেলের লাড়ু, গজাজলি, রসকরা, চিকণ চিড়া, মোটা চিড়া ইত্যাদি। প্রতি বাড়ী খাইতে খাইতে পেট বোঝাই হইয়া যাইত। এই ভাবে বহুদিন চলিত কালীপূজা পর্য্যন্ত। দীপান্বিতার আনন্দও কম হইত না, অন্ধকার গ্রামগুলি আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিত।

একমাস ভরিয়া গ্রামের বিভিন্ন বাড়ীতে যাত্রা গান হইত। পালা হইত কর্ণবধ, প্রহ্লাদ চরিত্র, ঈশের শরশয্যা ইত্যাদি। এখন যাত্রার স্থান অধিকার করিয়াছে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় থিয়েটার। কবির লড়াই আজ উঠিয়া গিয়াছে। দুই দলে যখন কবিতা-যুদ্ধ হইত, আমাদের বড় ভাল লাগিত।

তার পর আসিত ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আনন্দ গৃহে গৃহে হইত। ইহা পারিবারিক আনন্দ মাত্র। সামাজিক আনন্দ কালীপূজার পরই প্রায় শেষ হইত, কারণ ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার পরে দেখিতাম বিদেশাগত গ্রামবাসীগণ সকলেই প্রায় গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

এই ভাবে বাল্যের দুর্গাপূজার কথা মনে পড়িল। কত শৈশব-স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, মায়ের কথা মনে পড়িল। গ্রামের কথা মনে পড়িল, বন্ধুদের কথা মনে জাগিল। কিন্তু সব গিয়াছে, মা নাই, পাড়া নাই, জন্মভূমি নাই, সবই এখন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

তার পর চাকা গেলাম, পাটনা গেলাম, কলিকাতা আসিলাম। প্রতি বৎসরই মাকে দেখি, কিন্তু বাল্যের সেই আনন্দ যাহা গিয়াছে, যাহা হারাইয়াছি, আর কি তাহা ফিরাইয়া পাইব?

আনন্দময়ী মা, আমার তো বার্দ্ধক্য প্রায় আগত, কিন্তু তোমার করুণা-সিঞ্চনে জীবদ্দশায়—না, তোমার কাছে আজ কোন বর চাহিব না—কেবল চাহি তোমার পদে যেন আমার ভক্তি অচলা থাকে মা!

---

# পূজার ব্যথা

—শ্রীমমতা ঘোষ

বাজনা বাজে শুনছি কানে ভোরের আলো ফোটার আগে,
আজ শরতের সোনালি রোদ আমার কাছে মলিন লাগে।
বাদ্‌লা দিনের থাম্‌ল কাঁদন,—সে অশ্রুতে স্নানটি সেরে
স্নিগ্ধ অমল রূপটি নিয়ে দুয়ারে আজ দাঁড়ায় কে রে?
শরৎ ও যে, শরৎ ও যে চিনি গায়ের রংটি দেখে,
মায়ের আমার বার্ত্তা বয়ে এসেছে ও পুলক মেখে।
শিউলিরা তাই লুটিয়ে ভুঁয়ে প্রণাম জানায় মায়ের পায়,
সবুজে মাঠের শোভা দেখে চামর দুলায় বিভোল বায়।

আমারি নেই মুক্তি শুধু, বন্দী আছি পরের ঘরে,
মায়ের কাছে যাবার লাগি মনটা যে আজ কেঁদে মরে।
কত দিন যে আছি হেথায় শ্বশুরবাড়ীর কারাগারে,
ধরতে ত্রুটি আছে সবাই—দরদী নেই একেবারে।
লুকিয়ে চোখের জল ফেলেছি, দিন গুণেছি একটি করে,
জগৎ-মাতা আসবে কবে—আনন্দ যাবে আপনি সরে।

হায় রে মন্দ কপাল আমার মিথ্যে হ'ল সকল সাধ,
মোর শিয়রেতে শিবানী তোর করল না আর আশীর্ব্বাদ।

বাবা এসে গেছেন ফিরে—কেউ শোনে নি আর্জ্জি তাঁর,
মায়ের কাতর লিখন পড়ে টলে নি কেউ একটিবার।
সেই এসেছি—মনেও তো নেই, অনেক দিবস হ'ল তা যে,
সাধ নেইক', আনন্দ নেই, থাকতে হবে কেবল কাজে।
আমার দুখের নেই যে রে শেষ, বুকের বেদন বল্‌ব কায়,
একটি প্রণাম পৌঁছে দেওয়া হ'ল না আর মায়ের পায়।

দেশ জুড়ে যে বাজনা বাজে; বাজ্‌না বাজে সবার মনে,
মনটা শুধু টন্‌টনিয়ে, লুকিয়ে কাঁদি ঘরের কোণে।
বন্ধুকারের তিনটি দিন যে এল আবার যাবে চলে,
পাথর-চাপা কপাল আমার, বিল্‌ল না ঠাঁই মায়ের কোলে।

ঋতুচক্র : শীত

# পূজার অন্তঃপুর

—শ্রীরেখা দেবী

সুন্দরী ধরণীর সোণার আলোয় আজ সর্ব্বত্র লেগেছে আনন্দের রঙ্। চারিদিকে উঠেছে উৎসবের কলরোল। শরতের সুনীল আকাশের বুকে হাল্কা সাদা মেঘের টুকরো সোণালী রৌদ্রের স্বর্ণাধারায় স্নান করে দেশ হতে দেশান্তরে ভেসে চলেছে। প্রতি বছরই এমনি মধুর বেশ ধারণ করে'—মায়ের আগমনের সময় যে এসেছে, প্রকৃতি দেবী সে কথা আমাদের জানিয়ে দেন। কিন্তু সে জানানোর আজ কোনই দাম নেই। "পূজো এসেছে" সেই কথাটা এই সব দেখে শুনে একবার হয় তো মনে পড়ে—কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই··· তার বেশী আর কিছুই করা হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ পূজার জন্য কিছুই করা হয়ে ওঠে না। নিজেদের কথা ভাবতেই আমাদের সময় যায় বেটে।

আজ "পূজো এসেছে" কথাটার অর্থ ঐটুকুই ধার্য্য করি। কিন্তু কয়েক বছর আগে, ঐ একই কথাটীর মূল্য ছিল এত বেশী যে সে আমরা বোধ হয় অনেকে এখন ধারণাও করতে পারবো না। আমাদের দিদিমা, ঠাকুরমা'দের সময় "মা আসছেন" কথাটা ছিল তাঁদের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসবের আগমন-বার্ত্তাবাহী দূত। আর সে সংবাদে তাঁদের মনে যে সাড়া জাগতো, যে আনন্দের হুল-লক্ষ্যা করতো, যে অফুরন্ত উৎসাহের সঙ্গে তাঁরা তার আয়োজন করতেন—সে সব থেকে আজ তাঁদের আধুনিকা-নাতনীরা একেবারেই বঞ্চিত। যে পূজো হতো সে সময় বিরাট উৎসব-আয়োজন ও আনন্দের মধ্যে দিয়ে—আজ সেই পূজো কখন এল, কখন গেল, সেই কথাই অনেকের মনে পড়ে না। আজ সপ্তমী, কি মহাষ্টমী তা জানতে হয় খবরের কাগজ কিম্বা পাঞ্জি খুলে। কারণ তিথি-ক্ষণ দেখা, মঙ্গল-অনুষ্ঠান পালন, এসব আধুনিক জীবনের খাতার পাতা থেকে একেবারেই মুছে গেছে। তার জায়গায় জুড়ে বসে আছে সর্ব্বগ্রাসী অভাব-পূরণের চিন্তা—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল কেমন করে "অচল-প্রায়" সংসার-চক্রকে সচল রাখা যায় সেই চিন্তা করাটাই হয়েছে বর্ত্তমানের মাতা, গৃহিণী ও কন্যাদের একমাত্র কাজ। আর সেই চেষ্টা ও চিন্তার আড়ালে তাঁদের জীবনের সব আশা, আকাঙ্ক্ষা, বৈচিত্র্য ও আনন্দ আজ হয়েছে সমাধিস্থ।

হারিয়ে-যাওয়া দুপুর জন্য দুঃখ করে কবি বলেছেন "বা রে কবে হারিয়ে গেছে কালিদাসের কাল।" কিন্তু বাংলার অন্তঃপুরিকারা যে তাঁর চেয়েও বেশি করে' 'হারিয়ে যাওয়া কালের' জন্য দুঃখ পাচ্ছেন। আমাদেরও মনে হয় যে দিদিমা ঠাকুরমা'দের জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই চিরতরে হারিয়ে গেছে দেশের আনন্দের দিনগুলি। আমাদের জীবনে নেই তাঁদের জীবনের মত শান্তি, তৃপ্তি বা সচ্ছলতা—সব দিক থেকেই আজ আমরা বঞ্চিত। এই পূজার দিন তাঁদের কত আনন্দের, এ সময় থাকতো তাঁদের কত কাজ, কত মঙ্গল-অনুষ্ঠানপালন—কত ব্রত, কত উপবাস। পূজার ক'দিন ছোয়া না হতেই সধবা ত্যাগ করে স্নান করে চওড়া-পাড় গরদের শাড়ী পরে' তাঁরা যেতেন পূজার দালানে। এলায়িত বিনে খোলা-চুলের উপর বিয়ে শাড়ীর আঁচলটী তুলে দিয়ে শুরু করতেন পূজার ফুল, চন্দন, নৈবেদ্য গোছাতে। তারপর চারিদিকে ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে দিয়ে পূজার সময় যখন তাঁরা গলবস্ত্রে অঞ্জলি দিতেন তখন সেই নিমীলিত-নেত্র, পবিত্র, সুন্দর, উপবাসে ঈষৎ-শুষ্ক মুখে যে আনন্দের, তৃপ্তির ও শান্তির নির্ম্মল জ্যোতিঃ ও ভক্তি-নত মনের যে পবিত্র ভাব ফুটতো, সে কি আর আজ কোথাও আমরা দেখতে পাই? তাঁদের দিকে চেয়ে মনে হতো যে সত্যই এঁরা ঐ আনন্দময়ীর মেয়ে—যাঁর সামনে তাঁরা নত-শিরে প্রণাম জানাচ্ছেন, সেই প্রতিমার মুখের শ্রী, দয়া, কোমলতায় ভরা ক্ষমাসুন্দর মুখের অপূর্ব্ব মধুর হাসিটির ছায়া পড়তো তাঁর সেই বয়-কন্যাদেরও সুন্দর মুখে। তাঁদের সঙ্গে আজকার আমাদের তুলনা করবো কেমন করে? মহাষ্টমীর দিন উপবাসের পর সন্ধ্যা-আরতি হলে তবে তাঁরা উপবাস ভঙ্গ করতেন, আর আজ আমরা সেই সন্ধ্যার পূজোর বাজনা শুনি সিনেমার হলে বসে। যেখানে সে সময় চোখে পড়তো তাঁদের পট্ট-বস্ত্র পরিহিত কর্ম্মরত সুন্দর শ্রী,

সেখানে আজ দেখা যায় পূজার দালানে নানারঙের 'জর্জেট'-পরিহিতা শীর্ণ-মলিন-বিষাদমাখা মুখ—আনন্দময়ীর আগমনেও সেখানে ফুটবার অবসর পায়নি একটু আনন্দের রেখা।

এই যে পরিবর্তন, এই যে অধঃপতন আজ দেশে এসেছে এর জন্য দায়ী কে? জগতের বর্তমান আর্থিক সমস্যাই নয় কি? যে গরদের শাড়ী ঠাকুরমাদের বরবপু ঘিরে থাকতো তার একখানার দামে আজ কেনা যাবে চারখানা 'জর্জেট' শাড়ী। তাই তাদের আশ্রয় নিতে আমরা বাধ্য হয়েছি—গরদের শাড়ীর কথা তহবিলের দিকে চেয়ে অনেক দিন আগেই আমাদের ভুলতে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কিছুই আমরা ভুলেছি। কিন্তু সেই জর্জেট-পরিহিতারা যদি তাঁদের ঠাকুরমাদের মত পূজার মঙ্গল-অনুষ্ঠানে যোগ দেবার অবসর না পেয়ে শিখতে না পারেন যে, পূজার সময় কি কি করা হয় বা মায়ের পূজায় কি কি লাগে, সে কি তাঁদের দোষ? না যে তাঁদের সে সব দেখবার, শেখবার সুযোগ অপহরণ করেছে সেই দুরদৃষ্টের দোষ? জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা দেখলেন প্রতিমাহীন পূজার দালান, সেখানে প্রতিমার সামনে কি আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয় তা তাঁদের না জানা থাকাটা কি এ ক্ষেত্রে আশ্চর্যের বিষয়? আর পূজায় তাঁদের কাছে নতুন কাপড় ও ছুটির আনন্দের বেশী আর কিছু অর্থ হওয়াও আশা করা ভুল। তখন আনন্দময়ীর প্রতিমা যে-গৃহে যে-আনন্দ বিতরণ করেছে, আজ শূন্য গৃহে সে ভাব, সে আনন্দ তাঁরা কোথায় খুঁজে পাবেন। কাজেই দূর থেকে ভেসে-আসা পূজার বাজনা তাঁদের কাণেই যাবে, মনে সাড়া জাগাতে পারে না। যা থেকে জন্মাবধি যে বঞ্চিত তার মূল্য সে কেমন করে দিতে শিখবে? দারিদ্র্যের বন্ধন আমাদের এমন করে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধেছে যে তার চাপে ভোগ-বিলাস তো দূরের কথা, মনের প্রসার পর্যন্ত হবার উপায় নেই, আর কবিন যে সেই বন্ধনের তলায় মনটাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারবো তাও জানি না—বোধ হয় যেন তার শেষ দিনও আসতে আর বেশী দেরী নেই। আর তার ফল ভেবে দেখলে দেখা যাবে হয়তো সে কতদূর ভয়ঙ্কর হবে। আশা করি, ভগবান্ আমাদের দেশকে সেই চরম দণ্ডে দণ্ডিত করবেন না; যে-দিন মনের মৃত্যু ঘটবে সেই দিনই আমরা হব একবারে নিঃস্ব।

অতীতের স্মৃতির ভাণ্ডার খুলে বসে আজ উৎসবের দিনে নিরানন্দপ্রায় বাঙলার অন্তঃপুরের বিষাদের ছায়া আরও ঘনিয়ে তোলা আমার অভিপ্রায় নয়। এখন যা করলে মন থেকে বিষয় ভাবটা কাটান যায় সেই চেষ্টাই দেখা যাক। একে তো আমাদের ভাগ্যে আনন্দের ভাগটা পড়ে নি বললেও চলে, যেটুকুও বা পূজা-পার্বণের দিনে পাওয়া যায় সেটুকু, আর যা পাই নি—তা হয়ে গেল আমাদের নাগালের বাইরে,—তার হিসাব মেলাতে গিয়ে নষ্ট করে লাভ কি? অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয়েও যেটুকু এখনও বাকি আছে, আমাদের জীবন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় সেটুকুও বাঙলার মেয়েরা হারাবে—পূজো আজ আমাদের বৈচিত্র্যহীন জীবনে যেটুকু বৈচিত্র্য আনে এর পর আর হয় তো সেটুকুও থাকবে না। তাই যা এখনও অবশিষ্ট আছে সেটুকুর সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করাই উচিত নয় কি? আমি আমার পাঠিকারা এ বিষয়ে আমার কথার সায় দেবেন এবং সেই জন্য মেয়েদের সব চেয়ে প্রিয় আলোচনার বস্তুটিই আজ আমি আলোচ্য হিসাবে বেছে নিয়েছি।

## প্রসাধন

চিরন্তন কাল হতে নারীর কাছে এ কাজটি আদর পেয়ে আসছে এবং যতদিন পৃথিবীতে নারীর অস্তিত্ব থাকবে ততদিন পাবেও। কাজেই ঠাকুরমাদের আমলের আর সব লোপ পেলেও এটাকে অন্ততঃ আমরা ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছি। অবশ্য সময়ের পরিবর্তনের স্রোতে পড়ে এতেও এসেছে অনেক পরিবর্তন; কিন্তু তবুও চেষ্টা করলে অন্ততঃ এর ভিতর দিয়ে আজও তাদের কোমলতা ও শ্রীর কিছুটা আমরা—আমার নিজেদের যে ছবিটি দেখি তার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারি। এখন যদি আমি বলি "আসুন, আজ তাঁরা যেমন করে পূজার প্রসাধন করতেন সেই ভাবে আমরাও প্রসাধন করি," তাহলে কথাটা হয় তো অনেকেরই মনোমত হবে না। ঠাকুরমার মত প্রসাধন তাঁদের কাছে সেকেলে, পুরণো বলেই মনে হয়, এবং সেই জন্যই তাকে বর্জন করা হয়েছে—কিন্তু আমি বলি সেই 'সেকেলে পুরণো'কেই আবার সাদরে ফিরিয়ে আনতে। কারণ তার ফল হবে কল্যাণময়, কেবল সৌন্দর্য-বর্ধনকারী নয়। মুখশ্রীতে সেই ঐতিহ্য-রক্ত

প্রসাধনের দ্বারা যে সাধনা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে, অতি-আধুনিক ভাবে 'ফুল লিপস্টিক' সহযোগে তা সহস্র চেষ্টাতেও সম্ভব হবে না। সেকালের প্রসাধন নারীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও কোমলতাকে কেবল ফুটিয়ে তুলতো না, তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবেদন ছিল কল্যাণবোধে। আমাদের দেশে তাই আজও নববধূর মধ্যে আমরা "লক্ষ্মীশ্রী" খুঁজি, কেবল "শ্রী" খুঁজি না। এ দেশের সৌন্দর্য্য সকল সময়েই "শিব"কে, কল্যাণকে সন্ধান করেছে। আর আধুনিক প্রণালীর প্রসাধন তা অপহরণ করে তাতে কোমলতার বদলে এনে দিয়েছে উগ্রতা—যা কেবল চোখেই ধাঁধাঁ লাগাবার উপযুক্ত; কিন্তু মনে তা কোন রেখাপাত করতে সমর্থ হয় না।

প্রসাধন নারীর কাছে চিরদিনই উৎসবের প্রধান অঙ্গ বলে পরিগণিত হয়। অবশ্য এটা তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজেরও একটি অংশ বটে, কিন্তু উৎসবের সময় এতে আসে অনেক পরিবর্ত্তন, অনেক উন্নতি। প্রতিদিন আর 'বিশেষ' দিনের প্রসাধনের মধ্যে থাকে অনেক পার্থক্য। পূজা-পার্ব্বণ বা অমনি কোন বিশেষ দিনে নতুন জামাকাপড় আমাদের নিজেদের বিষয়ে করে তোলে সচেতন—তাই সে সব পরবার আগে আমরা নিজেদেরও সুন্দর করে তোলবার দিকে একটু বেশী মনোযোগ দিই—যাতে আমাদের সংস্পর্শে এসে সে সবের সৌন্দর্য্য মলিন হয়ে না গিয়ে বরং আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অনেক সময় অতি যত্নে অতি সতর্ক ভাবে প্রসাধন করেও তৃপ্তি পাওয়া যায় না। মনে হয়, যেন অনেক কিছুই বাদ রয়ে গেল। কিন্তু কোথায় যে ত্রুটি ঘটলো তা বোঝা যায় না। আসলে কিন্তু প্রসাধনে কোন ত্রুটীই ঘটে না। আমরা আশা-অনুরূপ ফল না পেয়েই সে কথা ভাবি অর্থাৎ সাধনজ্ঞার পর যতটা সুন্দর দেখাবে আশা করি, ততটা না দেখালেই মনটা ভারি করে ভাবতে থাকি—বুঝি অনেক কিছুই বাদ রইল, তাই তেমন ভাল দেখাচ্ছে না। এটি হচ্ছে উৎসবের প্রসাধনের প্রথম সমস্যা যা সকলেই অনুভব করে থাকেন।

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, প্রসাধন-দ্রব্যের শত্রুতা—ঠিক দিন বুঝে যেন বেছে বেছে বিশেষ দিনটিতে চিরুণী, আলতা, সিন্দুর, চুল, পাউডার, ঘো, কাজল, সবাই মিলে শত্রুতা জুড়ে দেয়। কোনটাই মনের মত করে পরা বা কিছু করা যায় না। চুল বাঁধা ভাল হয় না, আলতা পরা ভাল ভাবে হয় না, টিপটা কিছুতেই আর ঠিক গোল করা যায় না। গোলের বদলে তা চৌকো হয়ে থাকে, কাজলটা মোটা হয়ে যায় বেশী রকম···ইত্যাদি আরও কত কি। এ ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তির ( অর্থাৎ আমার মত লোকের ) উপদেশ ও সাহায্য হয় তো কতকটা কাজে লাগতে পারে ভেবেই আজ তার বিশেষ রকম আয়োজন করেছি।

পূজার দিন সকলেরই ইচ্ছা করে হাবে ভাবে, কেশে বেশে, সর্ব্বত্র ফোটাতে সৌন্দর্য্য ও পারিপাট্য বা নতুনত্ব, যা নতুন জামা-কাপড় সহযোগে খাপ্ খাবে। এটা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু সেটা কাজে করতে গেলে হাতে থাকা চাই—কিছুটা সময় ও কতকগুলি প্রসাধন-দ্রব্য। আর তার আগে চাই সৌন্দর্য্য বিচারের জ্ঞান, যা না থাকলে কোন প্রসাধনই আশানুরূপ ফল দিতে পারবে না। এটির সাহায্যেই আমরা বুঝতে পারি কোন্ খানে কোন্ জিনিষটি বেশী মানাবে। সেই জন্যই সব প্রসাধনকারিণীর ভিতরই এটি থাকা আবশ্যক। রোগা, মোটা, ছোট, বড়, সুন্দর অসুন্দর, সবাই যদি একই ভাবে, একই কায়দায় প্রসাধন সেরে ভাবেন, তাতে তাঁদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাবে, তবে তার চেয়ে বেশী ভুল আর কিছু হতে পারে না। প্রত্যেক নারীর প্রসাধন হওয়া চাই অপরের থেকে ভিন্ন ও তাঁর নিজের অভাব পূরণ ও দোষ সংশোধনের উপযোগী। তা'ছাড়া তাঁদের নজর রাখতে হবে নিজেদের বিশেষত্বের উপর—যাকে প্রসাধনের ভিতর দিয়ে আরও বাড়িয়ে তোলা যাবে। যথা, যাঁর চোখ দুটি সুন্দর তাঁর উচিত প্রসাধনের মধ্য দিয়ে সেই চোখের সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়ে তোলা। যাতে সমালোচকের দৃষ্টি সেই আরও উজ্জ্বল চোখের দিকেই নিবদ্ধ হয়ে থাকে, যেন তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আর কোন দোষ-ত্রুটিই লক্ষ্য করতে না পারে। তা হলে সেই চোখের অধিকারিণী সুন্দরী না হলেও অনায়াসেই সুন্দরী বলে নাম কিনতে পারবেন। আবার যাঁর হয় তো আছে সুন্দর কালো কেশ-রাশি, তিনি সযত্নে নানা রকম কেশ-বিন্যাস করে সেই কেশের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের প্রতি মনোযোগ দেবেন। তা ছাড়া পোষাক-পরিচ্ছদও দেহের গঠন-সৌষ্ঠবের অনুপাতে পরা দরকার। যিনি কিঞ্চিৎ স্থূলকায়া তাঁকে যেমন কাপড়-জামা

মানাবে, যিনি 'সকারিনী লতা'র মত মেহলতার অধিকারিণী সে রকম কাপড়-জামায় তাঁর সৌন্দর্য্য খর্ব্ব করা হবে। যিনি লম্বা তাঁর যে ধরণের বেশ উপযুক্ত, ছোট খাটো গঠনের মেয়েদের পক্ষে তা একেবারেই অচল। এই পার্থক্যটা রেখে আমরা সাজ-সজ্জা করি না বলেই অনেক সময় তাল করতে গিয়ে প্রসাধনের ভিতর দিয়ে মন্দই করে বসি।

এমন কথা ভাবলে ভুল করা হবে যে, এ একেবারে নিষ্প্রয়োজন। অন্তঃপুরিকার পক্ষে নিশ্চয় বিলাস-বাহুল্য অশোভন। মোটের উপর, বিলাসের বোধ আর রুচি-বোধ পরস্পর-বিরোধী। নারীর যা শ্রেষ্ঠ ধন, সেই সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা করার মধ্যে তার পক্ষে অন্যায় কিছুই নেই। অবশ্য দৃষ্টি রাখতে হবে সংসারের কল্যাণের প্রতি, স্বামী বা পিতার সম্পত্তির উপর।

## কেশ-বিন্যাস

দেহের গঠন অনুযায়ী পোষাক পরার মতই মুখের গঠনের অনুপাতে চুল বাঁধার ধরণ বেছে নেওয়া উচিত। খোঁপা আমরা সকলেই বাঁধি কিন্তু একই রকমের খোঁপা সব মুখে মানানো একটু শক্ত কথা। কিন্তু এ বিষয়ে 'পুরণো ধরণ' আমাদের সব চেয়ে বেশী সাহায্য করবে। এক নম্বর ছবির মত পুরণো ফ্যাশানের 'এলো-খোঁপা' হচ্ছে একটি মাত্র ধরণ, যা সব মুখে মানাতে পারে, গোল করে এলো খোঁপা বেঁধে যদি তাতে ছবির মত করে কিছু টাট্‌কা ফুল বা খোঁপায় পরবার কোন গহনা দিয়ে তাকে সুন্দর করে সাজিয়ে নেন, তবে যে-কোন মুখের পক্ষে তা হবে উপযুক্ত। আর তাতে মুখশ্রীতে ফোটাবে রমণীর কোমলতা, বা নারী-সৌন্দর্য্যের সার বস্তু। কোমলতা-হীন কিছুই কখনও নারীকে মানায় না। উগ্র, কঠিন, ধারালো যা কিছু—তা থেকে বাঙলার মেয়েদের সর্ব্বদাই নিজেদের দূরে রাখা উচিত। অন্ততঃ আমি তো তাই বলি—কারণ বাঙলার মেয়েদের সৌন্দর্য্যের বিশেষত্বই হচ্ছে কমনীয়তা। সেই জন্যই বলি যে এটুকু বিশেষত্ব আর যাতে না হারায় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন! আজকাল আধুনিকতার হাওয়া লেগে অনেক কিছু কোমল নারীসুলভ ভাবই নারীর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু তার ফল যে প্রীতিপ্রদ নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। এখন আমরা চুল-বাঁধার ভিতর দিয়েও আধুনিকতার পরিচয় দিতেই ভালোবাসি। তাই ঘাড়ের কাছে সম্বা করে চুল বেঁধে বৈচিত্র্য করি লম্বা খোঁপা —নয় তো দু'পাশে দু'টো বিনুনী করে তাকে যথাক্রমে মাথার উপর দিয়ে দিই ঘুরিয়ে,—পিছনে আর খোঁপার বালাই থাকে না, অথবা ঘাড়ের কাছে দু'টো ছোট খোঁপা পাশাপাশি করে বাঁধি—এমনি সব। আরও নানা রকমে আজকাল মেয়েরা চুল বাঁধেন, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আধুনিকা হবার উগ্র নেশায় মেতে সে সব যাঁরা

চুল-বাঁধার নমুনা—১

বাঁধছেন, তাঁদের মানাচ্ছে কি না তা একবারও ভেবে দেখছেন না, অন্ধভাবে ফ্যাশন অনুসরণ করতে গিয়ে নিজেদের চেহারাকে কিম্ভূতকিমাকার করে তুলে মনে করছেন বুঝি বড় ভালো দেখাচ্ছে। কিন্তু জানেন কি যে এই সব নতুন রকম করে চুল বাঁধার আগে বিশেষ করে ভেবে এবং পরীক্ষা করে দেখা দরকার, কোন্ ধাঁচের খোঁপা আপনার মুখে মানাবে? জানেন কি যে বেমানান কেশ-বিন্যাস নারীর মুখশ্রী থেকে কতখানি সৌন্দর্য্য অপহরণ করতে পারে? জানলে কখনই 'সিনেমা' থেকে বাড়ী ফিরে চুল বাঁধার ধরণ বদলাতেন না—ছবির পর্দ্দায় দেখা চুলবাঁধা অনুকরণ করবার জন্য।

যাঁদের মুখের ও গলার গঠন লম্বা, সামনের চুল আর কাঁপিয়ে ঘাড়ের কাছে "লম্বা খোঁপা" করা একমাত্র তাঁদেরই মানায়। কারণ এ-ভাবে চুল বাঁধা মুখ ও গলার দৈর্ঘ্য কমাতে সাহায্য করে। কিন্তু গোল—পুরন্ত মুখে ও ছোট গলায় এ খোঁপা একেবারেই মানায় না। তাতে মুখ ও গলা বেশী

মোটা দেখায়। এ-সব মেয়েদের উচিত প্রথমে কপাল থেকে চুল সরিয়ে নিয়ে তারপর অল্প করে ফাঁপিয়ে দিয়ে মাথার পিছনে নীচু করে পরিষ্কার একটি গোল খোঁপা করা। এই সব গোল খোঁপায় ইচ্ছা করলেই আপনারা অনেক কিছু নতুন ধরণ আনতে পারেন বা লম্বা-খোঁপা 'ডবল খোঁপা'—ইত্যাদির চেয়ে অনেক সুন্দর দেখাবে। যথা—দুই নম্বর ছবির মত এলো খোঁপার দুই পাশ দিয়ে দু'টো কিংবা (বড় চুল হলে) একটি বিনুনী যদি তার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নেন দেখতে খুব সুন্দর হবে। এটি বাঁধতে গেলে প্রথমে এক পাশে এক

চুল বাঁধার নমুনা—৮

গোছা বা দুই পাশে দুই গোছা চুল ছেড়ে রেখে খোঁপা বাঁধতে হবে; পরে সেই চুল বিনিয়ে নিয়ে খোঁপার চার পাশ বেড়ে ঘুরিয়ে দিতে হবে। তা'ছাড়া আবার আর এক রকম করেও বাঁধতে পারেন। গোড়া বেঁধে নিয়ে চুলটা দুই ভাগ করে বেশ করে পাকিয়ে নিন, তার পর সেই পাকানো চুল একটা বাঁ পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে খোঁপা করে কাঁটা দুই-একটা দিয়ে আটকে রেখে তার পর আর একটা গোছা ডান পাশ দিয়ে তার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে দিলেও বেশ সুন্দর করে খোঁপা বাঁধা হবে।

মোট কথা, আর যা-ই করুন, ঐ যে সিনেমার পর্দায়—পিছনে খোঁপা নেই, দু'টো বিনুনী মাথার উপর দিয়ে ঘিরেঘু দেওয়া হচ্ছে—ওটা ছোট মেয়েদের পক্ষেই মানায় ভাল; কুড়ির ঊর্দ্ধে যাঁরা, ও ছোটটা তাঁদের না করাই ভাল। বাঙালী মেয়েদের মুখের এবং শাড়ীর ভাঁজের সঙ্গে ওটা একেবারেই খাপ খায় না, তার উপর মাথার পিছনে খোঁপা থাকে না বলে আরও বিশ্রী দেখায়—যাদের অনেক লম্বা চুল ও বয়েস নেহাৎ কম—পনের থেকে আঠার'র মধ্যে—তারা যদি দুই-এক দিন সখ করে ঐ ভাবে চুল বাঁধতে চান, তবে খোঁপা করে পরে দুই পাশের চুল বিনুনী করে মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে দিলে মন্দ দেখাবে না, কিন্তু মাথার পিছনে খোঁপাটা থাকা চাই-ই।

### মুখচন্দ্রিমা

আমাদের দেশে মুখের দিকে চেয়েই কন্যার রূপের ওজন করা হয় বলে নারীমাত্রেই যথাসাধ্য যত্ন নিয়ে মুখের লাবণ্য বর্দ্ধনের চেষ্টা করেন।

আগেকার দিনে চন্দনের গুঁড়ো লাগতো ঘুমের বর্ণের উজ্জ্বলতার সাহায্য করতে, কিন্তু এখন সে কাজ আমরা পাউডারের সাহায্যে করে থাকি—চন্দনের গুঁড়ো আর প্রসাধনের সময় ব্যবহার করবার মত কারো সামর্থ্য নেই বলেই এই উপায় অবলম্বিত হচ্ছে। পাউডার-স্নো ব্যবহার করা উচিত কি অনুচিত, সে আলোচনা আজ করব না; ব্যবহার যখন অল্প-বিস্তর প্রচলিত হয়ে গেছে, তখন এ সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা—বিশেষতঃ আজকের দিনে—বোধ হয় অসোজন হবে না। সাধারণতঃ মুখে একটু স্নো ও পাউডার দিয়েই আমরা বর্ণাহরণ শেষ করি। কিন্তু ঐ দু'টি কাজের ভিতরই অধিকাংশ সময় থেকে যায় অনেক গলদ। স্নো মাখবার আগে মুখের ত্বক্ পরীক্ষা করে দেখা দরকার তা তৈলাক্ত না শুষ্ক। তৈলাক্ত ত্বকের উপর স্নো পাউডার দিলে অল্প পরেই মুখে চোখে এমন তেলাভাব ফোটে যে দেখলে বিশ্বাস হয় না, আধঘণ্টা আগে প্রসাধন সম্পন্ন করা হয়েছে। আর শুষ্ক ত্বকে স্নো বা পাউডার একটিও সমান ভাবে লাগে না—অসমান হয়ে থাকে। কাজেই আগে এ দু'টির প্রতিকার করা দরকার। যাঁদের ত্বক তৈলাক্ত তাঁরা প্রথমে একটি পাত্রে অল্প জল ও সমপরিমাণ 'ওডি-কোলোন' নিয়ে তাতে কর্পা কমাল একখানি ভিজিয়ে নিয়ে মুখ মুছে নিয়ে প্রসাধন শুরু করেন, তবে অনেক উপকার

হবে। মুখের তেলাভাব অনেকটা চলে যাবে। যাঁদের ত্বক শুষ্ক তাঁদের উচিত মো দেবার আগে মুখে কোল্ডক্রিম মেখে নিয়ে সেটি পাতলা কাপড়ের টুকরো দিয়ে মুছে ফেলে তবে মো ও পাউডার মেওয়া। এই বার ঐ মো ও পাউডারের বিষয় কিছু বলা দরকার। মুখে মাখবার মো যেন ভাল জানা 'মেকের' হয়। না হলে বাজারের নতুন নতুন যাতে কিনিষ মেখে মুখে দাগ, ব্রণ ইত্যাদি অনেক কিছু হতে পারে। সেই জন্য এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন—আর পাউডারটীর বিষয় আরও বেশী করে সতর্ক হওয়া দরকার। প্রথমতঃ, এটী ভালো জানা মেকের তো হওয়া দরকারই উপরন্তু সাদা হলে চলবে না। বিভিন্ন পাউডারের অনেকগুলি শেড বা রঙের স্তর আছে তার ভিতর Rachel shade ( র‍্যাশেল শেড ) বাঙ্গালী মেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। এটি তাঁদের গায়ের রঙের সঙ্গে খুব ভালো ভাবে মিশে যাবে। সাদা পাউডারে মুখের স্বাভাবিক রঙ নষ্ট হয়ে গিয়ে অস্বাভাবিক রকম সাদা দেখায়। আর যে রঙই দিন না কেন তা লোকের চোখে পড়বেই। কিন্তু ঐ অল্প রঙীন পাউডারে আর তা হবে না, ঢাকাই যাবে না যে পাউডার মাখা হয়েছে; অথচ মুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বাড়িয়ে তুলে তাতে আনবে পরিচ্ছন্নতা ও লাবণ্য।

মৃগ-নয়ন

এ নারীমাত্রেরই আকাঙ্ক্ষার বস্তু। কিন্তু অনেক সৌভাগ্যশালিনী তা পেয়েও পরিচর্য্যা না করে তার সৌন্দর্য্য নষ্ট করে বসেন। যাঁদের চোখ বড় তাঁরা মনে করেন সে নিয়ে আর তাঁদের কিছুই করবার দরকার নেই। কেবল যাঁদের চোখ ছোট তাঁদেরই এর পরিচর্য্যা করা দরকার—এ কথা ভাবা ভুল। অবশ্য এটা ঠিক যে ছোট চোখের ক্ষুদ্রতা নাশ করতে যথেষ্ট পরিচর্য্যা দরকার; কিন্তু তাই বলে বড় চোখকে অবহেলার কোন মানে হয় না। কি ছোট কি বড় সব চোখেরই পরিচর্য্যা দরকার। বিশেষ করে নজর দেওয়া দরকার পাতাগুলির দিকে। মুখে পাউডার মাখবার সময় পাউডারের গুঁড়ো চোখের পাতায় জমে তাদের দৈর্ঘ্য ও কৃষ্ণতা সব ঢেকে ফেলে সেগুলিকে বিশ্রী সাদা করে তোলে। কাজেই সেগুলি ভালো ভাবে ঝেড়ে ফেলা দরকার। কিন্তু অমনি আঙ্গুলে করে মুছে দিলেও সম্পূর্ণরূপে তা পরিষ্কার হয় না। তাই যদি আঙ্গুলে একটু 'ভ্যাসেলিন' মাখিয়ে নিয়ে চোখের পাতাগুলি মুছে নেন, তা হলে আর পাউডারের চিহ্নও থাকবে না। উপরন্তু সেগুলি সুন্দর, কালো ও চক্‌চকে দেখাবে। ঐ চক্‌চকে ভাবটী ছোট পাতাকে বড় দেখাতে সাহায্য করে বলে আঁখি-পরিচর্য্যার এটি একটি অবশ্যকর্ত্তব্য কাজ বলে ধরে নেওয়া উচিত। কাজল পরার রীতি এদেশে সনাতন কাল থেকে চলে আসছে। সেটি আমি সযত্নে বাঁচিয়ে রাখতে বলি। কাজল চোখের পক্ষে সব দিক দিয়েই ভাল। সরু করে একটী কাজলের রেখা এঁকে চোখের সৌন্দর্য্য অনেক বাড়ানো যায়।

"রক্ত-বরণ ওষ্ঠ-অধর, পক্ক রাঙা বিম্ব যেন"। কবি কালিদাসের অমর কাব্যে নারীর রক্তিম ওষ্ঠের সৌন্দর্য্যের এমনি বর্ণনা দেখতে পাই—কিন্তু সেই কালিদাসের কাল যে আজ নিঃশেষেই হারিয়ে গেছে তাই সে-যুগের সৌন্দর্য্যের ঐ আদর্শ, যা তাঁর কাব্যে দেখি, তা এ যুগের নারীদের বর্ণনার সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। এখন সেই রক্ত রাঙা ওষ্ঠ অধরের স্থান খুঁজতে গিয়ে চোখে পড়ে রক্তহীন পাণ্ডুর অধর, যার সঙ্গে "পক্ক রাঙা বিম্বের" কোন সাদৃশ্যই নেই। অবশ্য প্রগতিশালিনী আধুনিকারা লিপ্‌ষ্টিক ব্যবহারে সে-দোষ সংশোধনের চেষ্টায় আছেন। কিন্তু আমার কথা তাঁদের নিয়ে নয়, অন্তঃপুরিকাদের নিয়েই আমার কথা। এঁদের ভিতর আবার অনেকে "আধা-আধুনিকা" হয়ে উঠেই যত সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা লিপষ্টিক ব্যবহার করেন না বটে, কিন্তু ঠাকুরমা'দের অনুকরণে 'পানের' রসেও ঠোঁট দু'টিকে রাঙিয়ে তোলা ছেড়ে দিয়েই এই গোলমালের সূত্রপাত করেছেন। বর্ণানুরঞ্জনের সময় চোখের পাতায় যতই ঠোঁটেও পাউডার মো লেপে তার স্বাভাবিক রক্তিমাভা ( যেটুকু এখনও অবশিষ্ট আছে ) নষ্ট করে ফেলে বলে তা অস্বাভাবিক ও বিশ্রী সাদা দেখায়। প্রসাধন শেষে ভিজে রুমালের কোণে ঠোঁট দু'টি ভালো করে মুছে ফেলে দু'একটি পান—অন্ততঃ সৌন্দর্য্যের খাতিরেও—খাওয়া উচিত। রক্তাভ অধর মুখের শ্রী অনেকখানি বাড়িয়ে তোলে। অনেক সুন্দর মুখেও অনেক খানি ফাঁক থেকে যায় যদি না সেখানে দেখা যায় 'রাঙা ঠোঁটের কোণে মধুর হাসি।'

### মরাল-গ্রীবা

গ্রীবা এমন একটী জিনিষ, যার পরিচর্য্যার কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। মুখের লাবণ্য-বৃদ্ধি নিয়েই আমরা এত ব্যস্ত থাকি যে, ঠিক তারই নীচে যে 'গলা' বলে একটা বস্তু আছে তা কিছুতেই মনে থাকে না—আর যাঁদের তা কখনও কখনও মনে পড়ে তাঁরা হয় তো বড় জোর শুকনো গলায় একবার পাউডারের তুলিটা বুলিয়েই কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেন। এই কারণেই আমরা দেখি বহু মেয়েরই মুখ ও গলার মধ্যে থাকে অনেক পার্থক্য—মুখের তুলনায় গলা অনেক কালো। এ দৃশ্য যারা দেখে তাদের পক্ষে মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়, এবং প্রসাধন-কারিণীর পক্ষেও তা মোটেই ভাল 'সার্টিফিকেট' দেয় না। এতে তার অমনোযোগিতাই প্রকাশ পায়, মুখে স্নো মাখবার সময় গলায় ও ঘাড়েও তা উত্তমরূপে সর্ব্বদা মেখে নেওয়া উচিত এবং তার পর ঠিক মুখের মতই যত্ন নিয়ে পাউডার দেওয়া দরকার। না হলে মুখের সৌন্দর্য্য চোখে পড়বার আগেই লোকের চোখে পড়ে অযত্ন-রক্ষিত গ্রীবা। যা নারী-সৌন্দর্য্যের একটি প্রধান অংশ হতে পারত, অযত্নে তাকেই করে তোলা হয় লজ্জা পাবার বস্তু। সুন্দর, মসৃণ, সুগঠিত গ্রীবা নারীর গর্ব্বের বস্তু, রাজহংসের দুগ্ধফেননিভ অপূর্ব্ব সুন্দর গলার সঙ্গে তুলনা করে নারীর সুন্দর গ্রীবাকে কবিরা বলেছেন মরাল-গ্রীবা। কিন্তু আজকাল ক'জন সুরূপা রমণী নিজেদের গ্রীবার বিষয়ে গর্ব্ব অনুভব করেন—ক'জনের মরাল-গ্রীবাই বা আমরা দেখতে পাই?

## বিজয়ার মিষ্টি-মুখ

পূজার সময় রান্নাগুলির সঙ্গে একটা কিছু নতুন খাবার না দিতে পারলে গৃহিণীদের মন ওঠে না—অন্ততঃ সুগৃহিণীদের ওঠে না—আর সেটা হওয়াই স্বাভাবিক, সারা বছরই যা রাঁধা হয় পূজার দিনেও যদি তেমনি সাধারণ রান্নাই হল তাহলে "পূজার দিন" আর "সাধারণ দিনের" মধ্যে তফাৎ হইল কোথায়? এটি যে আমাদের বিশেষ আনন্দের দিন। সব কিছুই এ সময় হওয়া উচিত 'বিশেষ রকম', 'নতুন রকম'—তবে তো মনে হবে যে সেটা আনন্দের দিন। কাজেই এবার বিজয়ার রাত্রে একটা নতুন রকম খাবার যাতে বাড়ীর লোকেরা খাওয়াতে পারেন সেই চেষ্টা করা যাক। তা ছাড়া তার পর দিন অর্থাৎ একাদশীর দিন থেকে সাত দিন পর্য্যন্ত যে সব অভ্যাগতদের বাড়ীতে আগমন হবে তাদের তো মিষ্টি-মুখ না করিয়ে যেতে দেওয়া হবে না, কাজেই তারও একটা বিশেষ ব্যবস্থা করতে পারলে মন্দ হয় না।

সাধারণতঃ উৎসবের সময় আমাদের মেয়ে মৈ, ক্ষীর ইত্যাদি দিয়ে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করা হয়। এবার বিজয়ার দিন—অল্প বছরের মতই চালের বা চিঁড়ের পায়েস, না হয় তো রাবড়ি না দিয়ে—একটা নতুন রকম ক্ষীর তৈরী করুন—আতার ক্ষীর, যা খেয়ে বাড়ীর লোকেরা ও নিমন্ত্রিত অতিথি কেউ থাকলে তাঁরা শত মুখে তার জয়গান করতে সুরু করে দেবেন। শুনে হয় তো মনে হবে, করতে অনেক গোলমাল, হাঙ্গামা পোহাতে হবে। আসলে কিন্তু মোটেও তা নয়, ব্যাপারটা অত্যন্ত সোজা।

### আতার ক্ষীর

উপকরণ :—দুধ দুই সের, চিনি আধ পোয়া, একপোয়া দুধের ছানা, ছয়টি বেশ বড় মিষ্টি আতা, কিছু কিস্‌মিস্।

প্রণালী :—প্রথমে আতাগুলি একে একে ছাড়িয়ে খোসা থেকে শাঁসগুলি আলাদা করে একটি পাত্রে রাখুন, তারপর হাতে করে টিপে টিপে আতার বিচিগুলি সব বের করে ফেলুন। ফেলে 'কোয়া'গুলি সেই পাত্রেই রেখে সরিয়ে রাখুন। এইবার দুধটি কড়ায় করে উনুনে চড়িয়ে দিন, মিনিট কুড়ি পরে বেশ খানিকটা ফোটবার পর দুধটা যখন ঘন হয়ে আসবে তখন চিনি দিন, দিয়ে নাড়তে থাকুন—দুধটা আরও খানিকক্ষণ পরে যখন বেশ ঘন ক্ষীরে পরিণত হয়েছে দেখবেন, কিম্বা যখন বুঝবেন যে দুই সের দুধ প্রায় পাঁচ পোয়ার চেয়েও কমে দাঁড়িয়েছে তখন দুধটা নামিয়ে ফেলে একটি পাত্রে ঢেলে ফেলুন। তারপর আর কিছু না করে সেটাকে ঠাণ্ডা হতে দিন। যখন দেখবেন একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তখন ঐ যে ছাড়ানো আতাগুলি আছে সেগুলি ঘন দুধে ঢেলে দিয়ে বেশ করে চামচে করে নেড়ে নেড়ে মিশিয়ে দিন। তার উপর কিস্‌মিস্‌গুলি ছড়িয়ে দিলেই ক্ষীর তৈরী করা শেষ হল। এখানে আমি ক্ষীরের দুধ-চিনির শুধু একটা সাধারণ মাপ ধরে নিয়ে বলে দিয়েছি, আপনারা দরকার মত অর্থাৎ লোক হিসাবে সে সব ওজন দু' তিনগুণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে নেবেন

অবশ্য বাড়ালে সেই সঙ্গে সঙ্গে আতার সংখ্যাও বাড়াতে ভুলবেন না।

ক্ষীরটা তো হল 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'-এর ব্যবস্থা; কিন্তু তা দিয়ে তো আর—তার তিন চার দিন পরেও যে সব অভ্যাগতের আগমন হবে বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ, প্রণাম, বা শুভ ইচ্ছা জানাতে তাঁদের—মিষ্টি-মুখ করানো যাবে না। কাজেই সে কাজের জন্য আর একটা এমন জিনিষ তৈরী করতে হবে যা তিন চার দিন অনায়াসে রাখা চলে, এবং যা কেবল আহারান্তেই দেওয়া চলবে না, কারণ সেইটাই হবে আমাদের এবারের মিষ্টি-মুখের বিশেষত্ব।

এ-জিনিষটা আতার ক্ষীরের মত অতো সহজে তৈরী হবে না। কিন্তু তৈরী হবার পর সেটি যারা খাবেন তাদের কাছ থেকে এত সুখ্যাতি পাবেন, যে তাই শুনে আপনাদের সব কষ্ট করা সার্থক হয়েছে বলে তো মনে হবেই—তা ছাড়া খেয়ে লোকে আপনাদের "রন্ধনে-দ্রৌপদী" বলে প্রশংসা পত্র যদি দিতে চান তাহলেও আশ্চর্য্য হব না। মোহনভোগ ঘরে আপনারা সবাই তৈরী করেন, কিন্তু সেটা হয় সুজির। আজ আমিও একটি মোহনভোগই তৈরী করবার প্রণালী বলে দেব, কিন্তু সেটি সুজির না হয়ে হবে 'গাজরের'। পাঠিকাদের সুবিধার জন্য আগেই বলে রাখছি যে, ঠিক এমনি করেই গাজর কোন দিন না পেলে 'কাল-কুমড়ার'ও 'মোহনভোগ করতে পারেন—খেয়ে বোঝাও যাবে না যে সেটি গাজরের নয়—যদি ঠিক মত তৈরী করতে পারেন।

গাজরের মোহনভোগ

উপকরণ:—গাজর আধসের, খোয়া ক্ষীর আধপোয়া, চিনি এক পোয়া, ঘি তিন ছটাক, জল এক সের, দু'টি তেজপাতা, কিছু কিস্‌মিস্ ও বাদাম।

প্রণালী:—গাজরগুলি ছাড়িয়ে পাতলা চাকা চাকা করে কেটে নিন—(যেমন করে আলুভাজার আলু কোটা হয় ঠিক তেমনি করে) তার পর প্রায় এক সের জলে সেগুলি ছেড়ে দিয়ে সিদ্ধ হতে দিন। সিদ্ধ হয়ে গেলে জল থেকে গাজরগুলি ছেঁকে তুলে নিয়ে একটি বারকোষে বা বড় থালায় সেগুলি বিছিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা হতে দিন। এইবার একটী শীল ভালো করে পরিষ্কার করে তাতেই ঐ সিদ্ধ গাজরগুলি বেটে ফেলতে হবে। যদি এমন শীল ব্যবহার করতে পারেন যেটি রোজকার বাটনা বাটার জন্য ব্যবহার হয় না তাহলে আরও ভালো হয়। আর তা না হলে ঐ শীলটাই খুব সাবধানে এমন করে একবার ধুয়ে নেবেন যেন গাজরগুলি বাটবার পর তাতে কোন মশলার স্বাদ বা গন্ধ না হয়। তা হলে মোহনভোগের স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে। মিহি করে গাজরগুলি শীলে বেটে একটী পাত্রে রেখে দিন—দিয়ে তার পর যা ঘি রেখেছেন তার অর্দ্ধেক কড়ায় ঢেলে উনুনে চড়িয়ে দিন। ঘি গরম হলে তাতে ঐ যে আধসের খোয়াক্ষীর রেখেছেন সেটি ভেঙ্গে দিয়ে, ছেড়ে দিন—দিয়ে ক্ষীরটী বেশ লাল করে ভেজে নিন। ক্ষীরের রঙ যখন দেখবেন বেশ খয়েরি হয়ে এসেছে তখন তুলে ফেলবেন। এইবার কিস্‌মিস্ ও বাদামগুলি ঐ ঘিয়ে একটু ভেজে রাখুন। তাতে হ'লে কড়ায় যেটুকু ঘি আছে তাতে আর বাকি অর্দ্ধেক ঘি ঢেলে দিয়ে আবার কড়া চাপিয়ে দিন। ঘি গরম হলে তাতে তেজপাতা দুটি ফেলে দিয়ে তারপর গাজর-বাটাটা ঢেলে দিয়ে নাড়তে থাকুন। এই সময় গাজরের একটু জল বেরুবে, সেই জল আবার যখন সবটুকু মরে গিয়ে কড়ায় কেবল ঘি-টাই থাকবে অর্থাৎ যখন দেখবেন কড়ায় মিশ্রনটা বেশ ঘি-কাটা-কাটা দেখাচ্ছে তখন তাতে যে খোয়া ক্ষীর ভেজে রেখেছেন তা দিন। কিস্‌মিস্ বাদামও সেই সঙ্গে দিন, আর সঙ্গে সঙ্গে তাতে আধপোয়াটাক জলও দেবেন। তাহলে ক্ষীর, গাজর, সব বেশ নরম হয়ে মিশে যেতে পারবে।

এইবার আর কিছু না করে কেবল নাড়তে থাকুন, বেশ মাখা মাখা হয়ে এলে তাতে চিনিটা দেবেন। দিয়ে, আবার নাড়বেন, যখন দেখবেন সুজির মোহনভোগের মতই ঘন হয়ে গেছে তখন নাড়িয়ে নিয়ে একটা পাত্রে ঢেলে ঠাণ্ডা হতে দেবেন। বেশী পাতলা থাকতে নাবালে দুই দিনও রাখা যাবে না, জল কেটে নষ্ট হয়ে যাবে; কিন্তু ঠিক মত পাক হলে তিন-চার দিনেও নষ্ট হবে না।

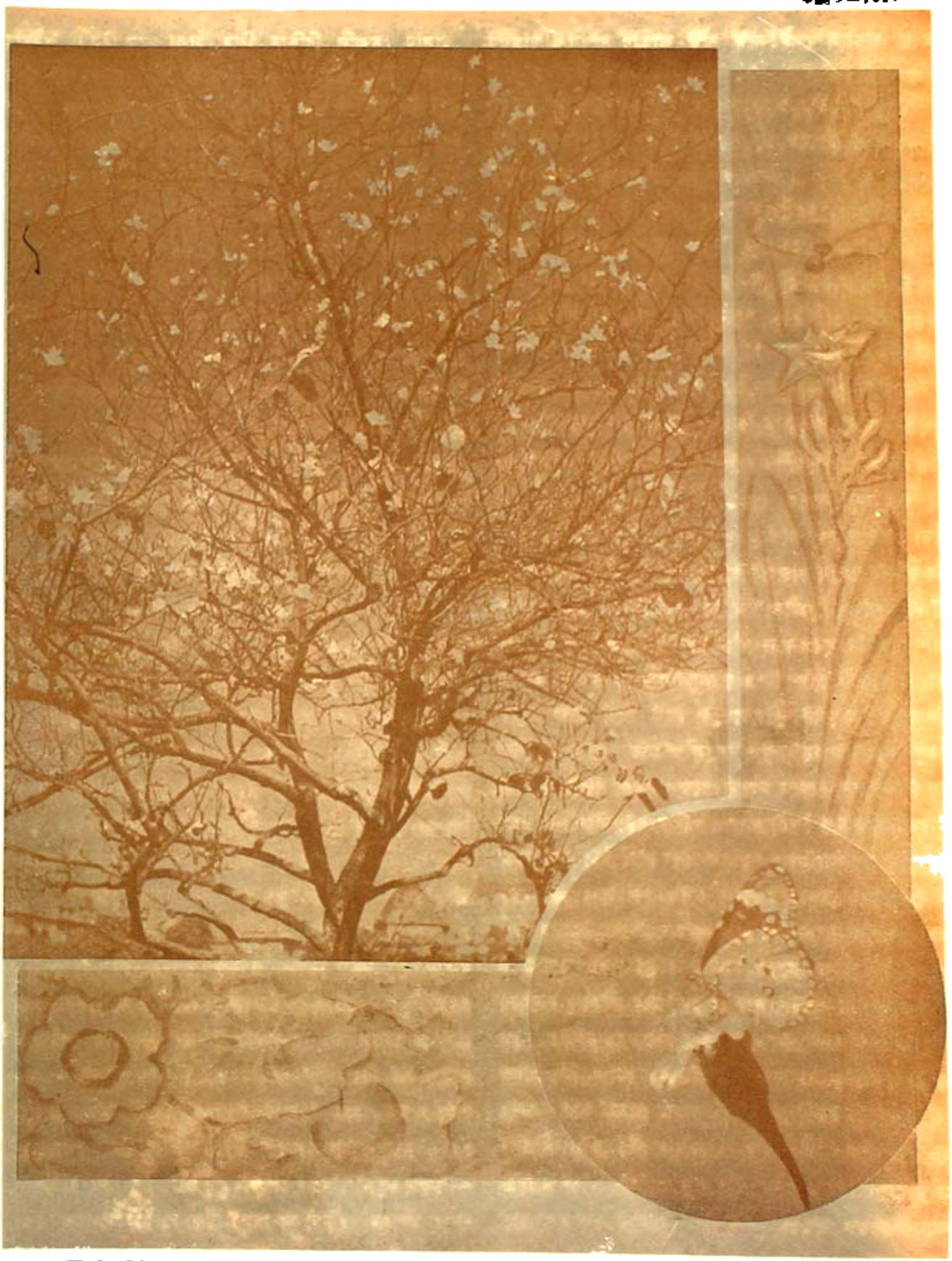

# বঙ্গ-সাহিত্যে ও প্রাচীন বাঙ্গালা সংবাদপত্রে বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব

—শ্রীশম্ভুচন্দ্র চৌধুরী

বঙ্গদেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ উৎসব শরৎকালীন দুর্গাপূজা। এই দিন তিনটি বাঙ্গালী—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর—জীবনে এক নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়া থাকে। শক্তিরূপী মহাদেবী দুর্গার অর্চ্চনা অনাবিল্প সর্ব্বজনীন উৎসব—সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু শারদীয়া দুর্গোৎসব বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীর পর্ব্ব। দশপ্রহরণধারিণী কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ময়ূর, ইঁদুর, পেচক ও হংস, বলীবর্দ্দ উপরি নিম্ন প্রভৃতি সম্বলিত যে মৃন্ময়ী প্রতিমা শরৎকালে একরূপ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পূজিত হয় এবং তাহার নিকট নবতন আনন্দের নূতন বারতা বহন করিয়া আনে, তাহার কল্পনা সম্পূর্ণ বাঙ্গালীর নিজস্ব। এইরূপ মৃন্ময়ী মূর্ত্তি ভারতের অন্য কোন অঞ্চলে প্রচলিত নাই। নবদ্বীপীয় মহাদেবীও বিভিন্ন।

অপেক্ষাকৃত ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী তাহার ভাবরাজ্যে দুর্গাদেবীর এক মধুর অথচ তন্ময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে। হিমালয়-দুহিতা উমার ত্রি-রাত্রির নিমিত্ত পিত্রালয়ে আগমন এবং তৎপর তাঁহার বিষাদপূর্ণ বিদায়গ্রহণ বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের সহিতও যেন মিশিয়া রহিয়াছে। এই উৎসব বাঙ্গালীর জীবনে যতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এমন আর কিছুতে সম্ভব হয় নাই। ইহার প্রচুর পরিচয় বাঙ্গালীর সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে। সাহিত্য জীবনেরই অভিব্যক্তি মাত্র—বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় দুর্গাপূজা কতখানি ব্যাপক অধিকার বিস্তার করিয়া আছে তাহা তাহার সাহিত্যে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালীর সাহিত্যে কোনও একটি বিশেষ ঘটনা বোধ হয় এতখানি ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া নাই।

সর্ব্বপ্রথম কাহার কল্পনায় বাঙ্গালীর মহাপূজার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা আজ আর সঠিকভাবে নির্ণয়ের কোনও উপায় নাই। এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের দুলচেরা তর্কের অন্ত অবধি রচিত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান নিবন্ধে দুর্গাপূজা-পদ্ধতি ও তাহার ইতিহাস আলোচনা করিব না। এ বিষয়ে "বাদানুবাদের গহন অরণ্যে" প্রবেশ না করিয়া বাঙ্গালীর সাহিত্যে শারদীয়া দুর্গোৎসব প্রসঙ্গ কিরূপে প্রকাশিত হইয়াছে এবং সাহিত্যে এই প্রকাশের ধারাটি মূলতঃ কোন্ ভাব অবলম্বন করিয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তাহারই একটি অকিঞ্চিৎকর সন্ধান 'বঙ্গশ্রী'র পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব ইচ্ছা করিয়াছি।

প্রথম এই প্রসঙ্গ সাহিত্যে কোন্ সময়ে প্রবেশ করে ও আলোচিত হয় তাহার ইতিহাস অত্যন্ত অস্পষ্ট। আমাদের মধ্যে যে প্রচলিত ধারণা আছে যে কৃত্তিবাসই প্রথম "অকাল-বোধন" ও শারদীয়া দুর্গোৎসব বাঙ্গালীর সাহিত্যে আলোচনা করিয়াছেন—ইহার মূলে কতখানি সত্য আছে তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। অনেকে বলেন,—তাঁহার মতানুযায়ী অনুসারে প্রধানতঃ বাঙ্গালীর ধর্ম্ম ও সমাজ-জীবন চালিত হয় বাঙ্গালার সেই স্মার্ত্ত রঘুনন্দনই সর্ব্বপ্রথম দুর্গোৎসব বাঙ্গালায় সর্ব্বসাধারণে প্রচার করেন এবং ইহার ফলে দেশব্যাপী এ বিষয়ে একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। রঘুনন্দনের নামের সহিত সম্পর্ক থাকায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অতি স্বাভাবিক কারণেই দুর্গোৎসব বাঙ্গালীর জীবনে ব্যাপক প্রভাব আনয়ন করে। তৎপর "নানা মুনির" কল্পনায় ইহার নবজীবন লাভ হইয়াছে। সে যাহা হউক, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত কৃত্তিবাসের রামায়ণে 'অকাল-বোধন' ও 'দুর্গোৎসব' প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল কি না তাহা আজ আর সঠিক নির্ণীত হইতে পারিবে না। কৃত্তিবাসের যে রামায়ণ বাঙ্গালায় প্রচলিত উহার কতখানি সঠিক কৃত্তিবাসের রচনা, সে বিষয়ে পণ্ডিতমহলে ঘোর সন্দেহ বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাচীন পুঁথি লইয়া বঙ্গদেশে যাঁহারা ঘাটাঘাটি করিয়াছেন সেই সম্প্রদায়ের বরেণ্য পরলোকগত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' বলিয়াছেন, "আমরা কৃত্তিবাস সম্বন্ধে লিখিয়াছি, তাঁহার রামায়ণ সম্ভবতঃ অনেকটা মূলের অনুরূপ ছিল।

আমরা খুব প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিগুলিতে তরণীসেন বধ, বীরবাহু বধ, শ্রীরামের দুর্গাপূজা প্রভৃতি মূল বিষয়-বহির্ভূত [illegible] পাই নাই (পৃঃ ৬২০)।" রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থের ৮৪ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, "শ্রীরামচন্দ্রের ভগবতী পূজা ও রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন প্রভৃতি প্রস্তাব শ্রীরামপুরে মুদ্রিত পুস্তকে কিছুমাত্র নাই।" কৃত্তিবাসের রামায়ণের যে সমস্ত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে প্রাচীনতম হইল ১৪০২ শকাব্দে (১৪৮০-৮১ খৃষ্টাব্দে) লিখিত একখানি পুঁথি। [বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—সুকুমার সেন পৃঃ ৮৮]। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় পুঁথিখানিতে কেবল উত্তরাকাণ্ড রহিয়াছে। যাহা হউক যিনি যে সময়েই দুর্গাপূজা প্রসঙ্গ বাঙ্গালা সাহিত্যের সামগ্রী করিয়া লউন না কেন কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত যে রামায়ণ সাধারণতঃ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে তাহার লঙ্কাকাণ্ডে যে কাহিনী অবলম্বন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের 'অকাল বোধন' ও নীলপদ্মদ্বারা মহামায়া অর্চ্চনা লিপিবদ্ধ আছে, প্রধানতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহারই মূলাধারের উপর শারদীয়া দুর্গোৎসব কাহিনী বাঙ্গালা সাহিত্যে বিকাশ ও প্রসার লাভ করিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে (১৭১৪ শক ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে) এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (১২২০ সাল, ১৮১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে) রচিত ভবানীপ্রসাদ ঘোষালের "দুর্গোৎসব লীলা" স্থান পাইয়াছে। যে সমস্ত গ্রন্থে দুর্গালীলা বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—অবশ্য প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের কাহিনীর অনুরূপ কাহিনী অবলম্বনে—তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল রঘুনন্দন গোস্বামী-রচিত 'রামরসায়ন'। আনুমানিক ১২৩৮ সালে (১৮৩১ খ্রীঃ) এই মহামূল্যবান্ গ্রন্থখানি রচিত হয়। "রামরসায়নের" পুঁথি কৃত্তিবাসের পুঁথির ন্যায় "সাত নকলে আসল খাস্তা" অবস্থায় আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং গ্রন্থখানির প্রামাণিকতার সম্বন্ধে কিছু বলিবার তেমন কোনও হেতু নাই। ইহাতে কৃত্তিবাসের রামায়ণের অনুরূপ কাহিনী অবলম্বনে শারদীয়া দুর্গোৎসব-কাহিনী বাঙ্গালীর নিজস্ব কল্পনায় মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কৃত্তিবাসের রামায়ণে এই প্রসঙ্গে যে ভাব ও যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়, "রামরসায়নে" ও অবিকল সেইরূপ, কোথাও কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। মনে হয় একটা আর একটার অবিকল নকল। পরবর্ত্তীকালে কৃত্তিবাসের পুঁথিতে এই কাহিনীর পরিস্রবণ একেবারে আশ্চর্য্য নাও হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে খুব প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথিতে এই কাহিনী দৃষ্ট হয় না। তবে এ বিষয়ে বর্ত্তমানে কিছু স্থির সিদ্ধান্ত করিবার মত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। রঘুনন্দনের কাব্যে দুর্গাপূজা প্রসঙ্গে "রাবণ কর্ত্তৃক অভয়াকে স্মরণ", "রাবণের স্তবে তুষ্টা ভগবতীর অভয় দান", "রাবণ বধের নিমিত্ত ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অকালবোধন ও কল্পারম্ভ", "ইন্দ্রের প্রতি ব্রহ্মার দুর্গোৎসবের আদেশ ও ইন্দ্রকর্ত্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে আদেশ জ্ঞাপন", "শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব" "নীলপদ্ম আখ্যায়িকা" প্রভৃতি হুবহু প্রচলিত কৃত্তিবাসের ভাষায় সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায়।

অবশ্য "চণ্ডীমঙ্গল", "দেবীমাহাত্ম্য" প্রভৃতি বাঙ্গালা সাহিত্যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদ হইতেই দৃষ্ট হয়; ষোড়শ শতাব্দীর অষ্টম দশকে রচিত মাধবাচার্য্যের "চণ্ডীমঙ্গল" এই জাতীয় কাব্যের প্রাচীনতম উদাহরণ বলা যাইতে পারে [বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন পৃঃ ৬৪]। ইহাতে কিন্তু দুর্গোৎসব প্রসঙ্গের কোনপ্রকার কল্পনা নাই। এই জাতীয় চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল। ইহাতেও এ প্রসঙ্গ আলোচিত হয় নাই। তবে এই গ্রন্থে চণ্ডীর মহিষমর্দ্দিনী রূপ দশভুজা মূর্ত্তি-ধারণের উল্লেখ আছে। দেবীমাহাত্ম্যজ্ঞাপক এইরূপ কাব্য বাঙ্গালাসাহিত্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দুর্গাসপ্তশতী অবলম্বনে রচিত হইতে আরম্ভ হয়। এই জাতীয় কাহিনীর মধ্যে মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল ও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। উত্তরবঙ্গের কবি দ্বিজ কমললোচনের "চণ্ডিকাবিজয়" এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত (সাহিত্যপরিষৎ গ্রন্থাবলী—সং ৪৪) ভবানীপ্রসাদ রায়-বিরচিত "দুর্গামঙ্গল" [সম্ভবতঃ ১৬৬৯—৬৫ খ্রীষ্টাব্দ, ১০৭১ সাল] কাব্য দুইখানি বর্ত্তমান প্রসঙ্গের পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয়। চণ্ডিকাবিজয় [রংপুর সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত] কাত্যায়নী স্তুতি আছে এবং সুরথ সমাধির দুর্গা-পূজা ও বরপ্রাপ্তি সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর শারদীয়া দুর্গোৎসবকাহিনী ইহাতে নাই। তবে কবি সুরথ

ও সমাধির যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে স্বতঃই আমাদের মানসনয়নে বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবের চিত্র অনেকাংশে ফুটিয়া উঠে। অপর কাব্য "দুর্গামঙ্গল"খানি অতিশয় উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে কাব্যখানি রচিত হয় [ ১৬৫৫-৬৫। ] অপরাপর দুর্গামাহাত্ম্য-প্রকাশক কাব্যের মতমার্কণ্ডের পুরাণান্তর্গত সপ্তশতী চণ্ডীতে বর্ণিত দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনাই কাব্যখানির মুখ্যবিষয়। চণ্ডীর প্রায় সকল বিষয় এই গ্রন্থে আছে। কিন্তু সাধারণ চণ্ডীমঙ্গলের বহির্ভূত একটি বিষয়ের অবতারণা আমরা সর্ব্বপ্রথম দুর্গামঙ্গলে পাইলাম। বাঙ্গালী কবি ভবানীপ্রসাদ বাঙ্গালার প্রচলিত দুর্গোৎসবের প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে বর্ণনা করিলেন। প্রথমতঃ কবি কাব্যের অবতরণিকায় শারদীয়া দুর্গোৎসবের ইঙ্গিত সুকৌশলে করিয়াছেন; তৎপর সুযোগমত শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজার বর্ণনাও সবিস্তারে করিয়াছেন। ষষ্ঠীতে বোধন, বিল্ববরণ, অধিবাস, সপ্তমীতে পত্রিকাপ্রবেশ, মাষভক্ত, বলির বিধান, সুরম্যস্থানে কল্পিতা প্রতিমা বেষ্টন, সামাজার্ঘ্য স্থাপন ও তৎপর রীতিমত সাড়ম্বরে বাঙ্গালীর দুর্গাপূজা। যদি কৃত্তিবাসের রামায়ণকে অপ্রামাণ্য বলিয়া সন্দেহের চোখে দেখা যায়, তাহা হইলে আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, মনে হয় ইহার পূর্ব্বে এমন সবিস্তারে বাঙ্গালীর মন লইয়া বাঙ্গালীর বিশেষ সংস্কৃতির পরিচয় বহন করিয়া বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবের বর্ণনা অন্য কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত অদ্ভুত আচার্য্যের রামায়ণে [ বংপুর সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ] দুর্গোৎসব-কাহিনী স্থান পায় নাই।

এই সমস্ত গ্রন্থের পর আমাদিগকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে একেবারে কবি, হাফ আখড়াই, পাঁচালী প্রভৃতির রচয়িতাগণের দ্বারস্থ হইতে হয়। ইঁহাদের রচিত "আগমনী"-সঙ্গীত এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আগমনী-সঙ্গীতে বাঙ্গালীর জীবনের স্বকীয় সুরটি শুনিতে পাই। 'উমা' যেন বাঙ্গালীর নিজের ঘরের শান্তসুন্দর আদরের প্রতিমা। উমাবিষয়ক সঙ্গীতগুলিতে বাঙ্গালীর কন্যা-বিচ্ছেদ-ক্রন্দনের বিষাদধ্বনিই লক্ষিত হইয়া উঠে। এই শ্রেণীর রচয়িতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্য কবি রামপ্রসাদ রায়ের (১৮০৩—১৮৫৬)। ইনি বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবের বর্ণনায় যে সহজ প্রাঞ্জলতা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অতিশয় মনোরম হইয়াছে। 'রাবণবধ' পালায় তিনি এই প্রসঙ্গ অবতারিত করিয়াছেন। 'হর-পার্ব্বতী সংবাদ', 'শ্রীরামের ধনুকে রাবণের মৃত্যুশর সংযোজন', 'শ্রীরামচন্দ্রের অকালে দুর্গোৎসব ও দুর্গাস্তব', 'রামের স্তবে শ্রীরামের প্রতি কৃপা', 'রাবণের যজ্ঞে ছলা সরস্বতীর আবির্ভাব' প্রভৃতি প্রসঙ্গের সহজ স্বাভাবিকতা ও মধুরপূর্ণ আলোচনায় রামপ্রসাদ কল্পনায় দুর্গোৎসব নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। অন্যান্য শ্যামা কবির আগমনী-সঙ্গীতও সরলতায় মাধুর্য্যে সমৃদ্ধ। আমাদের শৈশবের অতি পরিচিত শয়ন-কালে মাতৃমুখে শ্রুত,

শরৎকালে হবে বলে বিদায় করেছি।
আজ শুনেছি গিরিরাজ বিদায় দেবে না।

আজও আমাদের অতি প্রিয় হইয়া রহিয়াছে।

ইহার পর বাঙ্গালীর জীবনে ও সাহিত্যে এক মহা পরিবর্ত্তন-বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল। বাঙ্গালীর দ্বারে ইউরোপ, বিশেষ করিয়া ইংরাজ, আসিয়া সজোর আঘাত করিল। আস্তে আস্তে বাঙ্গালার জীবন ও সাহিত্য এক মহাপরিবর্ত্তনের সম্মুখীন হইল। এই যুগে নবলব্ধ চেতনায় যাঁহারা বাঙ্গালীর সমাজ ও জীবন সম্পর্কে গঠনমূলক চিন্তা ও কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদের কল্পনায় ও কার্য্যক্রমে বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব আর এক ধারা বহন করিয়া আনিল। ইঁহাদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যে বহুস্থলেই যে সমস্ত দুর্গাপূজা-প্রসঙ্গ পাওয়া যায় তাহা অনেকটা প্রাচীন শাক্ত ও মাধুর্য্যগুণের বিকাশস্থল বলা যাইতে পারে। মধুসূদনের বিদেশীয় শিক্ষা, আচারব্যবহার পদ্ধতি, এমন কি খ্রীষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ সত্ত্বেও বাঙ্গালীর জীবনের মূল অভিব্যক্তিই তাঁহার জীবনে ও কাব্যে মূর্ত্ত হইয়া রহিয়াছে। নবলব্ধ চেতনা আত্মসাৎ করার মধুসূদনের কৃতিত্ব এইখানে। বাঙ্গালীর জীবনে 'উমা' এবং দুর্গোৎসব যে কত ওতপ্রোত ভাবে সংলগ্ন হইয়া আছে তাহা এই নবযুগের কবি মধুসূদনের সাহিত্যে প্রায় সর্ব্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে। দুর্গাপূজার কত চিত্র যে মধুসূদন তাঁহার সাহিত্যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার

"কিম্বা প্রতিমা যেন দশমী দিবসে,
সহ বিষাদিনি লক্ষ্মী কাঁদিল বিষাদে"

যে শান্ত সুগম্ভীর বৈরাগ্যপূর্ণ বিষাদ মূর্ত্তি আঁকিয়াছে তাহা পাঠ করিলে মনে অনুরূপ ভাবনা না আসিয়াই পারে না।

যাঁহারা গদ্যে দুর্গোৎসব-প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিপিনচন্দ্র পাল। কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় দুর্গোৎসবের সামাজিক দিক ও এই উপলক্ষ্যে রুচি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত' দুর্গোৎসবের নূতন উদ্ভাবনা জাগাইয়াছে। বিপিনচন্দ্র পালের 'কল্পনায়' দুর্গোৎসব শক্তির উদ্বোধন।

রবীন্দ্র-সাহিত্যেরও বহুস্থানেই দুর্গোৎসব-প্রসঙ্গ লক্ষ্য করিতে পারা যায়। তাঁহার 'কাঙ্গালিনী মেয়ে'র চিত্র অনবদ্য। ইহা ছাড়া বাঙ্গালীর বহু বহু সাহিত্যিক বাঙ্গালীর পরম আদরের এই দুর্গাপূজা হইতে তাঁহাদের কল্পনার খোরাক পাত করিয়াছেন।

বাঙ্গালার প্রাচীন সংবাদপত্রাদিতে এ বিষয়ে যে সমস্ত আলোচনার বিবরণ পড়ি তাহা এবং এই যুগের বাঙ্গালীর রুচি দুর্গাপূজা অবলম্বন করিয়া কোন্ দিকে মোড় ফিরিতেছিল তাহা লক্ষ্য করার বিষয়।

আমি মোটামুটি বাঙ্গালা সাহিত্যে বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব-প্রসঙ্গ আলোচনা করিলাম। এরূপ সংগ্রহকার্য্য কখনও একটি স্বল্পায়তন মাসিকের একটি প্রবন্ধে সম্পূর্ণ করা অসম্ভব। বিভিন্ন সময়ের সাহিত্যে দুর্গোৎসব প্রসঙ্গের যে উল্লেখ উপরে আমি করিলাম তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা উদ্ধৃত করিয়া আমার সাধারণ অনুসন্ধান ও তত্তোধিক সাধারণ অভিজ্ঞতার এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধটির উপসংহার টানিব।*

রাবণের অম্বিকাস্মরণ, অম্বিকাস্তব

পূর্ণচন্দ্র সে উদ্ভটসাগর—কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

এইরূপ স্তব যদি করিল রাবণ
আর্দ্র হৈল হৈমবতী, দয় উচাটন।
অসিবাবল কালী, কোলে কপাল
গলে হাড়ের মাল ত্রিনিয়ন-বাল।
অলকা তিলকা উচ্চ কাদম্বিনী কেশ
তাহে গলা জলে নীল-সৌদামিনী বেশ।

কপালমণ্ডলে পূর্ণ অমল প্রকাশে
বিমলশশিও অধঃ মলিন আভাসে

৯

এ সময়ে হৈমবতী কি করিলা আর
দেবাজ্ঞী বিনাশে রাবণ চণ্ডিকা॥
বিস্তারে করিলে সংস্র লোচন
উপায় করহ বিধি যা হয় এখন।
বিধি বলে বিধি আছে চণ্ডী আরাধনে
হইবে রাবণ অকাল মোদনে॥
ইন্দ্র বলে তবে ভাই বিলম্ব না সয়
ইন্দ্রের আদেশে ব্রহ্মা করিলেন যায়। ৩১৫।
রাবণ অবধ বধ বিধাতা তখন
আর শ্রীরামের অনুগ্রহের কারণ।
এই দুই কর্ম্ম ব্রহ্মা করিতে সাধন
অকালে পূজিতে কৈলা চণ্ডীর বোধন।
দেবগণ সহিতে পূজিলে মহামায়া
এখানে চিন্তিত রাম কি করি উপায়। ৩১৮।
শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী ক'ন কমলযুগানি ( ব্রহ্ম )
উপায় কেবল দেবীপূজা।
তুমি পূজি' যে চাল নিশিতে অসুরগণ
যোগিয়া পূজহ দশভুজা
রাম কৈলে পূজা তায় হবে রাবণ-ক্ষয়॥
শুন সাধু সহস্রলোচন
শুনি কহে পুরন্দর আজ তুমি শীঘ্রগতি
জানাও শ্রীরামে বিবরণ।
শ্রীরাম বলেন তবে কিরূপে পূজিতে হবে
অনুক্রম কহ তুমি তার
শ্রীরাম আপনি কর কতক্ষণ সময়
পাবে অকাল এ পূজার।
বিধি আছে নিরূপণ বিল্ব তোলিতে যোবন
কৃষ্ণা নবমীর দিনে তার
সে দিন হয়েছে গত প্রতিপদে আছে যত
কলাবধে সুফল তাহার॥
সেদিন নাহিক আর পূজা হবে কি প্রকার
শুক্লাদশমী মিলিবে প্রকাশে।
কলাবধি যান ঘটে কিন্তু পূজা নাই ঘটে
অকালযোগে ( অভাব ) সব হৈল তাতে॥
বিধাতা বলেন সার শুন বিধি দিই তার
কর অকালবোধনে যোবন
আবাহ না হবে তায় বিধি যতি পূজায়
কর তাতে সুফল গ্রহণ।

* এই প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের মুদ্রণকাল নির্দ্দেশ আমি 'বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে' সন্নিবেশিত ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মত প্রামাণ্য বলিয়া লইয়াছি।

এই উপদেশ কথা  শুনে রাম গুণধাম
বিদায় দেলেন নিজ ধাম
প্রভাত হইল নিশা  প্রকাশ পাইল দিশা
স্নান দান করিলা শ্রীরাম। ৫১৬।
ঘটপূর্ণ জলমূলে  দিয়া সাগরের কূলে
বল্ল কৈলা বিবিধ বিধান
পূজা দুর্গা রঘুপতি  করিলেন স্তুতিনতি,
বিরচিল চণ্ডী পূজা সার।
লাহাকালেতে রাম করিল যোধন
আমন্ত্রণ অকালে দিবাবিবোধন
আপনি গড়িলা রাম মূর্ত্তি দুর্গাদেবী
হইতে সংগ্রামে ছুট-রাবণ-বিজয়ী
আবাহনে আনন্দিত করিলা অধিবাস
বান্ধিলা পরিত্রা বল দুঃখের বিনাশ।
এইরূপ উদ্যোগ করি রঘু বীর
পরাতি প্রসাদে আছে নিজ দেবীর
অন্যত্র সুগ্রীব আছে নাহি হনুমান
ত্রিভুবন ভ্রমিয়া আনিলা হনুমান।
স্নান করি অগ্নি প্রভু পূজা আরম্ভিলা
বোধিবি মতে পূজা সমাপ্ত করিলা।
ষষ্ঠ-সপ্ত-অষ্টে পূজা নবমিকী আখান
শীত-বাটিকাপাঠে বিল্ব অধিষ্ঠান।
সপ্তমী হইল সাঙ্গ অষ্টমী আইল
পুষ্পাঞ্জলি রঘুনাথ অর্চ্চনা করিল
নিশাকালে সন্ধিপূজা কৈলা রঘুনাথ
বৃহস্পতিতে বিজয়ী হইল প্রভাত। ৫১৭।
অষ্টমী অপরাজিতা  ঘটে দুর্গা হরষিত
ফলক চলক নাগেশ্বর।
কাঞ্চনিকা দুপাটি  ঘাটি দুর্গা অষ্টি কাঁটি
জোণপুষ্প ঘাবরী টগর।

রাবণপক্ষ আনয়নের মন্ত্রণা।

অর্চ্চনা করিল যবে দেব ভগবান
থাকিতে নারিলা দেবী হয়ে অন্তর্দ্ধান
কপটে কমলাবতী রহিলা গোপন
অন্যায় রামের পূজা করিলা গ্রহণ। ৫১৮।

"সকলি আমার ভাগ্যে বিধান দুষ্কর" (রামের উক্তিতে দ্বিতীয়ত বিনি নীলপদ্ম আনিতে মন্ত্রণা দিলেন।)

দেবীদেহে নীলপদ্ম আছে।

শ্রীরামের স্তব।

দুর্গে দুঃখহরা তারা দুর্গতিনাশিনী
দুর্গমে সরণি বিদ্যাদিবিবাসিনী
দুরাচারা দারুণারা পঙ্কি সন্তাপনী
সনাতনী সরস্বা প্রকৃতি পুরাতনী
নীলকণ্ঠপ্রিয়া নারায়ণী নিরাকারা
সারাৎসারা কুলশক্তি সর্ব্বদা সন্মারা
মহিষমর্দ্দিনী মহামায়া অম্বিকারী
সিংহবাহিনী শ্যামা সর্ব্বাণী পরমা
ভবানী ভবানী দীন দুঃখ হেমন্তরী
কালী কাদম্বরী কালোকালে কর পার
দুর্গম্ভবনিনী কর কাতরে বিস্তার।

দেবীর উদ্দেশ্যে শ্রীরামের অষ্টোত্তর শত নীলপদ্ম দানসঙ্কল্প ও দেবী কর্ত্তৃক একটী পদ্ম হরণ—

সঙ্কল্প করিয়া  বিধান রচিয়া
পড়িছে আছে সংসারে
এক পদ্ম তার  পাওয়া নাহি যায়
ঠেকিলায় ঘোর দায়।
ভাবিতে ভাবিতে রাম করিলেন মনে
'নীলকমলাক্ষ' মোরে বলে সর্ব্বজনে
নয়নযুগল মোর দুই নীলোৎপল
সঙ্কল্প করিব পূর্ণ বুঝিবে সকল
এক চক্ষু দিব আমি দেবীর চরণে
এত বলি করে রাম ধনুক গ্রহণে।

এত বলি তূণ হৈতে লইলেন বাণ
উপাড়িতে যান চক্ষু করিতে প্রদান
কাঁপিতে কাঁপিতে রাম করেন গমন
দেবীর হৈল দুঃখ দেখিয়া যোদন
চক্ষু উপাড়িতে রাম বসিলা সাথাতে
হেনকালে কাত্যায়নী ধরিলেন হাতে।
কি কর কি কর প্রভু জগত গোঁসাই
পূর্ণ ছিল চক্ষু উপাড়িয়া কায় নাই।
"রাবণে ছাড়িনু আমি  বিধান করহ তুমি"
সংগ্রামে চলিলা রঘুপতি
আনিল পাইয়া বার  সিদ্ধ কৈল অনায়াস
চণ্ডীলীলা মধুর ভারতী।

রাবণের পাত্রিকাসবাস বৃহস্পতির চণ্ডীপাঠ ও হনুমান কর্ত্তৃক চণ্ডীর শ্লোক হরণ।

অম্বিকার রূপ ধরে  চলিলেক বিদ্যাধরে
দেখিতে না পায় বৃহস্পতি।

## দুর্গামঙ্গল : ভবানীপ্রসাদ রায় বিরচিত

গৌরী-কর্ত্তৃক শিবের নিকট প্রার্থনা :—

আজ্ঞা কর যাই নাথ বাপের ভবন
তিন দিবসের পরে হবে দরশন।
আমা নাশি জনক জননী অজ্ঞান।
কেবল আছয়ে মাত্র কণ্ঠাগত প্রাণ।
মৈনাকেরে পাঠাইল চরণে তোমার।
'হর' আজ্ঞা যাইতে শক্তি আছে কার।

...

তব প্রভু করি নিবেদন, পূজা লহবারে যাব পিতার ভুবন।

... ...

এহি মতে মাঘে গৌরী বাপের নিবাস
ফুরুতি চলন কৈল গৌরী অধিবাস।
পূজা প্রকাশিতে টঙ্কা করিলা পার্ব্বতী
দশভুজা মূর্ত্তি হবে কৈলা ভগবতী
দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী রূপ ধরি
খণ্ড খণ্ড পাঠালে চলিলা অম্বেষরী।

... ... ...

করিলেন রামচন্দ্র পূজার আয়োজন
পুরোহিত হইয়া ব্রহ্মা আসিল তখন।
কৃত্তিবাস বচনীয় পরশপ দিবে।
পূজা আরম্ভিল রাম অকাল বোধনে।

...

দেবী বর দিতে চাহিলে রাম বলিলেন ;—

তোমার চরণে এহি মাগি পরিহার
রাবণ মারিয়া করি সীতার উদ্ধার।
দেবী বলে শোন রাম বচন আমার
প্রিয় পুত্র দুই দেখ রাবণ তোমার।
তপস্যা করিয়া আমা আরাধিল।
আমার বরেতে দিগ্বিজয়ী হইল।
এমত দেবক দুই রাজা লঙ্কেশ্বর।
তাহাকে জিনিতে আমি কি বটে দিব বর।

যাহা হউক শেষ পর্য্যন্ত বর দিতে হইল, রাম প্রার্থনা করিলেন—

এহি যে করিলাম পূজা অকালে আশ্বিনে
অকালপূজা এহি পূজা করিবে যেহি জন
ধন যেহি যাহা সিদ্ধি হইবে তখন।

দুর্গা বর দিলেন ;—

তোমার পূজনে প্রীতি হইল আমার
তুষ্ট হইয়া দিলাম বর লহ জিনিবার।

সপ্তমী অষ্টমী আর নবমীর দিন
তিন দিন দিলা দেবী বাপের ভুবন।
দশমী মহিষী যদি কৈল অবসান।
কৈলাসেতে উমাটান পরমেশ প্রাণ।

তারপর সাড়ম্বরে বিজয়ার বর্ণনা

যৌরী নিতে আইল শিব বুঝিলা তখন।
প্রেতগণ ডাকিলা ঘণ্টী করিতে বাদন।
যৌরী বিনে ঘর যে মহিষ কেমন।

"বৎসর অন্তীত পরে আসিব আরবার" এই আশ্বাস দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৌরী বিদায় হইলেন॥

চণ্ডীকাবিজয়—স্থির কমললোচন। কাত্যায়নী স্তুতি।

স্বপ্ন ও সমাধির দুর্গাপূজা ও বরপ্রাপ্তি।

মহারাজ পালা রাজা বৈসে মহাজন
নানারূপে ভবানীরে করিছে পূজন
কৃত্তিবাস দুর্গা স্থির করিয়া নির্ণয়
ঝোলাস করিলা করায় প্রাণময়।

মেটালি পরিধানে পরম্পর ভাবে ধানে
কনক কদলি লাগে চুড়ে
তাহাতে পতাকা যেতে কৃষ্ণবর্ণ বাস তাতে
পবন সঘনে তাহা উড়ে
নানারূপ বেড়া কৈল তাহাতে দর্পণ দিল
হীরা মতি কাঞ্চন সহিতে।

বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক দেবীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ।

দেখিতে সুন্দর তার নানারূপে নিরমায়
শিলদা লয়া সাবধিতে
দেউলের চারিধার রূপে যেন অন্ধকার
কনক কপাট চারি ধারে।
তাতে দিল বহুতর যেন সুর্য্য কিরণ
সন্তোষ করিতে অধিকার॥
দেউলের মধ্যভাগে নানা বর্ণে শিলা লাগে
প্রতিমা স্থাপিতে দেবী কৈল
তাহার সম্মুখে কৈল মণ্ডলির দেবী হৈল
বহুধন তাতে লাগাইল।
বসিবেক দিল বর সঙ্গে লয়া শিলধর
নাটশালা করয়ে নির্ম্মাণ
বন্দিতে সকলজন কৈল দিয়া স্তম্ভন
নানাবর্ণে পাথরে নির্ম্মিল।

●

মহিষমর্দ্দিনী রূপ দুহাতে ভগিকা
আর দিগে লোভা করে আর নায়িকা
সিংহ পৃষ্ঠে আরোহণ বন্দিল চরণ
মহিষের পৃষ্ঠে রাম পদ আরোপণ
সব্য করে মহিষের ধরিয়াছে চুল
দক্ষিণ হস্তেত কুকে তার আরোপিছে শূল
দক্ষিণে গণেশ রাজে বামে মহাবল
দক্ষিণে জয়বিজয়া বামে লক্ষ্মীসতী
সিদ্ধি সিদ্ধি মুনিগণ দেখে করে স্তুতি।
মাথায় উপরে শিব কৃষ্ণবাহন
দক্ষিণে বিরিঞ্চি বামে দেব নারায়ণ
বিচিত্র করিয়া মাধব প্রতিমা স্থাপিলা।

দাশু রায়

বিনয় জানিয়া বিধি ঈষাণে কহেন বিধি
জগতে হইলা শক্তি আরাধন।

ভক্তি সখে ভয় দিয়া  এর পূজা পাবেনা।
শুনিয়া করেন বারণ।

যেথা বিদ্যারত্ন ভাল  পারেতে নিজে পরশ
অকালে তাঁর যা হয় যদি বসা।

যিনি কর হবে সাধন  ঘটিতে করি যোজন
পূজিলে অভয় দিবেন অভয়া।

নির্ম্মাইলা কলুয়া  নির্ম্মল মাঘের পুলা
করেন দেবীরে বারাণ।

মহা অলৌকিক চিত্ত  রঘুনাথ পুত্রে শক্তি
মহাস্থরে আছে রামায়ণ।

## মধুসূদন দত্ত

বিজয়া দশমী

ফেরো না, রজনী, আজি লয়ে তারাদলে!
ফেলে তুমি, বরাঙ্গনি, এ পরাণ রাখে!
টানিলে নিশির ছবি উষার অঞ্চলে
নবরঙ্গে রবি মোর নয়ন হারাবে!
বারমাস তিতি নিতি, নিতা অশ্রুজলে
পেয়েছি উমায় আমি! কি যাদুমন্ত্র-বলে—
তিনটি দিবসে, কহ, লো তারা তুমলে
এ দীর্ঘ বিরহজ্বালা এবার জুড়াবে?
তিন দিন স্বর্ণ দীপ জ্বলিবেক ঘরে
দূর কবি অন্ধকার: শুনিতেছি বাঁশী
দীর্ঘতর এ দুইটে এ কর্ণকুহরে!
বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি হাসি
নিবাও প্রদীপ শশি। কহিলা কাতরে
মহিষী বিশাদে পিতিলেন রাণী।

## কালীপ্রসন্ন সিংহ—হুতোম প্যাঁচার নক্সা

"দুর্গোৎসব বাঙ্গালাদেশের পরব, উহার পশ্চিম প্রদেশে এর নাম পর্য্যন্ত নাই; কেবল এই দ্বারা কৃষ্ণনগরের আগমন হইয়াই বাঙ্গালায় দুর্গোৎসবের প্রাদুর্ভাব আছে। পূর্ব্বে রাজারাজড়া জমীদার ও বড়-মানুষের বাটীতেই কেবল দুর্গোৎসব হতো, কিন্তু আজকাল অনেক পুঁটে জেলীকেও প্রতিমা আনতে দেখা যায়; পূর্ব্বকার দুর্গোৎসব ও এখনকার দুর্গোৎসব অনেক ভিন্ন।

"ক্রমে দুর্গোৎসবের দিন সংক্ষেপ হয়ে পড়লো। কৃষ্ণনগরের কারিগরেরা কুমারটুলি ও সিমুরেতলা জুড়ে বসে গেল। তারায় তারায় রং-করা পাটের চুল, তরলতীর মালা, টিন ও পেতলের অস্ত্রের চাল তলওয়ার নানা রঙের ঝোলপ প্রতিমার কাপড় বুনতে লাগলো।"

"বেলেড়াঙ্গা ঘাট দেখতে থাকুন, বাবুরা বজরাবিদ ও নাল ঝেড়ে নানা উপায় দেখুন—গাইকর্ণা এবার সহরটায় লোভা দেখুন—প্রায় সকল বাড়ীতেই বাবাসকলের রং-তামাসা আরম্ভ হয়েছে।"

"এইরকম নবমী, অষ্টমী ও সন্ধিপূজা কেটে গেল আজ বলিদান, আজ পূজোর শেষ দিন।"

"কিছাও হও মা জগদম্বিকে এ সময়ে এসো না কো আর।
দিনে দিনে কলিকাতায় বর্ষা দেখি চমৎকার।
ওদিকেতে বর্ষণারম্ভ, কাদায়তে কাদময় সংসার।
এদিকে ঘুণের ঠেলে রাজপথেতে টেঁকিকে টেকে চলা ভার।

*

অক্ষয় হৃদয়ে রাখো। অন্যায় যাচ্ঞা করা আর
ভীরুতা এই তো আমা মাগো! জলেও শক্তি পাবে না
দুর্গাদ্বির ধরাধরা কলেতে করবে সংহার
হুতোমবাদল তাই সহর ছেড়ে আসবারে করে বিচার।

## সংবাদপত্রে

২০ সেপ্টেম্বর ১৮১০।৫ই আশ্বিন ১২১৭

দেবীপূজা—হিন্দুস্থানের মধ্যে শারদীয়া দেবীপূজা অনেক স্থানে এত বিশেষরূপ সমারোহে হয় যদি কোন ভাষাজ্ঞান লোক এ পূজা না করে তবে প্রতি বছরে যে রাত্রিকালে প্রতিমা আনিয়া লোকেরা সমোপনে রাখে। ষষ্ঠীবরণে আনিয়া যান পরে পূজার অষ্টমী আনিয়া বর্ষারম্ভে কিম্বা লোকান্তরে যেরূপে হয় তাহার পূজা করে।

২৬ অক্টোবর ১৮২২।১১ কার্ত্তিক ১২২৯

দুর্গার দুর্গোৎসব—কলিকাতায় পশ্চিম নিবাসী এরূপ একটি এক দুর্গা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজার তাবদ্‌ব্য আয়োজন করিয়া ঐ প্রতিমাতে দুর্গা দিয়াছে প্রত্যেক টিকিট একটাকা করিয়া আড়াই শত টিকিট বিক্রয়ের নামে প্রাইজ উঠিবে সেই বাড়ির নামে লটরি হইয়া ঐ প্রতিমা পূজা হইবেক।

১০ই অক্টোবর ১৮৩১। ২৯, আশ্বিন ১২৩৮।

শ্রীশ্রী৺ শারদীয় পূজা সুসম্পন্নরূপে সুসম্পন্ন। এই পূজোপলক্ষে নগর মধ্যে নৃত্যগীতাদির বাহুল্য তিন চারি মাস হইয়াছিল, অর্থাৎ শোভাবাজারের মহারাজা রাজকৃষ্ণের উদর বাটীতে যাবদধিক লোকের নবমী অর্থাৎ মহানবমী পর্য্যন্ত বড় আমোদ হইয়াছে তদ্দর্শনে এতদ্দেশীয় ও নানা দিগ্‌ দেশীয় এবং উচ্চপদাভিষিক্ত লোক গমন করিয়াছিলেন।

আশ্চর্য্যজ্ঞ বিষয়: সাহিবলোকেরা ইত্যাদিতে অপূর্ব্বরূপে প্রতিমানির্ম্মাণপূর্ব্বক এবং নানাপ্রকারবিধানে দুর্গোৎসবাদি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং প্রবাদির আতিশয্যের সীমা কি!

১৯ অক্টোবর ১৮৩৩। ৪ কার্ত্তিক ১২৪০।

দুর্গোৎসবের নিকট হওয়াতে আমাদের দেশস্থ লোকের মন পুলকিত হইতেছে এবং তাহারা যা যথীয় বাটীতে তাহারা যেমতে দুর্গার শুভযোগ করেন তাহাও অতিসমূহরূপে নিষ্পাদন করিতেছেন দুর্গোৎসবের দেখিন করে আসিবে তার স্থানে স্থানে পূজার তাবৎ প্রস্তুত হওয়াতে চতুর্দ্দিকে ঢাক ঢিমের শব্দই শুনা যাইতেছে। এবং কলকাতা দেবতার আগমনার্থ যাঁহারা এই রাজধানীতে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও নানাদ্রব্য সহিত দুর্গার আগমনার্থ স্বদেশ গমন করিতেছেন, অতএব এই সময়ে আহ্লাদপূর্ব্বক আহারাদি সুখেই কএক দিবস কাটাইবেন। * * অতএব আমাদিগের এক পত্রের দ্বারা প্রেরক মহাশয় আমাদিগের আছে বিদিত লিখিয়াছেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরা যাঁর পরিশ্রমের এবং নিজ পিতামহদের সঞ্চিত ধনসম্পত্তি বাজনাদেতে ব্যয় করিতেছেন অতএব করিতেছ এমতো বিষয়ে আমরা কোন ব্যক্তির

* সংবাদপত্রের প্রবন্ধগুলি আমি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সাহিত্যপরিষৎ গ্রন্থাবলীর ৮২ সংখ্যক গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। প্রথম সংস্করণের সংখ্যার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ব্যবহার করিয়াছি।

চক্ষুকর্ণের সুখের বিষয় বটে, কিন্তু আবশ্যক বিষয়ে শৈথিল্য করিয়া অনাবশ্যক বিষয়ে অধিক যত্ন দেখিলে যে বিষয়ে লোক হেয়জ্ঞান আবশ্যক নিবারণের চেষ্টা করাই আমাদিগের উচিত।

আমাদের

২৬ অক্টোবর ১৮৭১।১০ই কার্ত্তিক ১২৭৮।

বর্ত্তমান বর্ষীয় পাঠকগণসমীপে নূতন সংবৎসরার্থ ইষ্টাশীর্ব্বচনের মধ্যে অনেক নূতন আগমন করিয়াছিলেন এতদ্দর্শনে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি আর যখন সর্ব্বসাধারণে একবাক্যে এতদ্বিষয়ে উৎসাহ প্রদর্শন করিবেন তখন আমরা আরো অধিক সন্তুষ্ট হইব। কারণ তাহাতে তাঁহাদিগের জ্ঞান ও সুনীতি এবং অন্যান্য বিদ্যার বাহুল্য হইবে। আমরা অনুমান করি যে এতদ্দেশীয় অতি বিশিষ্ট মহৎ ব্যক্তিরা নূতন বিষয়ে উৎসাহ করিলেন তাঁহারা এইক্ষণে ঐ নূতন বর্ষপত্রে ও বর্ষসভায় বিশিষ্ট যে আধিপত্য এই বোধ করিয়া পরিত্যাগ করিবেন সম্ভাবনা তাঁহারা উৎসবোপলক্ষে উৎসাহই করেন তবে তাঁহারা ঐ রূপ মর্য্যাদা করেন। পরিশেষে এক কোন উৎসাহ করেন যেন না হয়ে যে আমরা তখন ধর্ম্ম করণে সমর্থ হইব।

- আমাদের

২২ অক্টোবর ১৮৭১।৭ই কার্ত্তিক ১২৭৮।

এক্ষণে কুল কুল বালিকাদিগকে আমরা এই কহি যে তাহারা ইং শিখিতে শিক্ষা করিয়া থাকে যে ইংরেজী জ্ঞান জন্মিলে সে ব্যক্তি পুতলা অর্থাৎ বেশ্যা প্রতিপালন করে না কিন্তু কয়েকজন ঠোঁটা উদ বাবু হইতে ইংরেজী বিদ্যা অধিক শিক্ষিতদের ইহা বোধ সাধ্যমত করুক।

আর অনেকেই জানিবেন শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি বসুর পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু চন্দন বসু যে প্রকার ইংরেজী বিদ্যায় পারগ আমরা অনুমান করি তাঁহার তুল্য অল্পবয়স্ক বাঙ্গালি ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পাশে পাওয়া যায়। তিনি কি দুর্গোৎসবাদি করেন না। নাস্তিক মতাবলম্বীরা তাঁহার বাটিতে গিয়া দেখিয়া আসুক শ্রীশ্রী৺অম্বিকাচরণের কি পারিপাটী ও ভক্তিপ্রকাশপূর্ব্বক ঐ অম্বাপূজা সম্পন্ন হইতেছে।

•

অতএব ইঙ্গরেজী বিদ্যা ভালরূপে শিখাইলেই ধৈর্য্যকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় এমত নয়। যদি বল শ্রীযুত রামমোহন রায়ের সহিত যাঁহারদিগের বিশেষ আত্মীয়তা আছে তাঁহারা তদ্রূপদোষে দোষ বর্ত্তিয়াছেন। ইহাও সত্য নহে কেবল শ্রীযুত কালীনাথ মুন্সী তাঁহার পরমাত্মীয় এবং তাঁহার স্থাপিত ব্রহ্মসভায় এবং সর্ব্বদা গমনাগমন আছে তথাপি যে প্রকার আলোচনা হয় তাহা কি তিনি জানেন না জানেন তাহাতে কিরূপ অনুরাগ আছে। অতএব তাঁহার বাটিতে শ্রীশ্রী৺দুর্গোৎসবাদি তাবৎ কর্ম্ম হইয়া থাকে—

চন্দ্রিকা

## ১২ই অক্টোবর ১৮৭১—২৮ কার্ত্তিক ১২৭৮

শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর—সংপ্রতি কএক সম্বাদপত্রাদি ইতিহাস জ্ঞানার্ণব ইতিহাসসেতু নাশক সম্বাদচন্দ্রিকা ও সম্বাদভাস্কর প্রভৃতি পত্রে সম্পাদক মহাশয়েরা প্রসন্নকুমার বাবুর দেবীপূজাকাল বিষয় লইয়া মহাকোলাহল করিতেছেন তাঁহারদিগের বোধে এ কর্ম্ম অত্যাশ্চর্য্য হইয়াছে। তাহাতে কি জ্ঞান করিয়াছেন নিশা অন্তে তারিয়াছে কি দিবসে নক্ষত্র সকল দেখীগমনে হইয়াছে কিম্বা সূর্য্যের পশ্চাদ্গমন করে যেন অথবা পশ্চিমদিগে সূর্য্যোদয় হইল কিম্বা যদি শীতল হইলেন বা পক্ষতে পদ্মবিকশিত দেখিয়াছেন ইত্যাদি অসম্ভব বর্ণন যে প্রকার লোক ভয়ভীত হইয়া থাকে উক্ত সম্পাদকেরা প্রায় সেই রূপ আশ্চর্য্য বোধ করিয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন।

অবোধ অনেক কএকজন বাঙ্গালা কিঞ্চিৎ ইঙ্গরাজী পড়িয়া সৈরভ যে ধর্ম্ম দেবদেবীপূজা পিতৃশ্রাদ্ধাদি হাস্য করিয়াছে যা করিতে চাহে তাহারদিগের প্রবোধার্থ প্রসন্নকুমারবাবু প্রভৃতি কএক জনের নাম দৃষ্টান্তার্থে লিখিয়াছিলাম।

— সম্বাদ চন্দ্রিকা

## বঙ্গদর্শন—ভাদ্র ১২৭৮

স্বর্গে মর্ত্যে এলো যাও এ বাঙ্গালাদেশে
কে তুমি মোহিনী কন্যা ভুবনমোহিনী?
চিনিলাম চেয়ে দুর্গা, তুমি নাকি অন্নপূর্ণা
দুর্গতির একমাত্র সংহারকারিণী।

•

কি লাগে সেবেছো মাতা রাজভার সাথে
এদেশে যে রাজই নাদে কে তোমে নিখাবে?

•

কপালেতে কপালেতে কেন মাতা ধর?
কেন মাতা চালিয়াত সিংহটার ঘাড়ে?
তুমি দেখে ভয় পাই চাল খাঁড়া কাদ নাই
ওসব রাখুক খিয়ে রাজপুত পাঁড়ে।

•

এসেছ মা কিসেরে কিসের কারণে?
বিষয় এ বাঙ্গালা তা কি আছে মনে?
মোকদ্দমে আদালতে মাতি বড় খুনাখুনি
যার যেথি খুনাখুনি সবারের হবে
তোমার মহিমা মাতা বুঝিতে নারিনু
কিসের লাগিয়া আন কাল-বিষধরে
ওরে পরে বিষধর কিবে বড় অজগর
আমার এ অন্নদার দেখাও কিবরে?

•

যাহাকার বলেন, টাকায় আনায়
তুমি এলে তাহারি। বাড়ে আয়ও যায়।
কেন এলো কেন যাও কেন ঢাক-ঢোল যাও
তোমায় প্রণামে যদি টাকা না মুলায়।
তুমি ধর্ম্ম তুমি অর্থ আর যুক্তি এই অর্থ
তুমি মা টাকারূপিণী, বাস টাকায়
টাকা কাম, টাকা মোক্ষ হয় যায় হয় হয়
টাকা যাও লক্ষ লক্ষ মৈলে প্রাণ যায়।
টাকা ভক্তি টাকা মুক্তি টাকা স্তুতি টাকা গতি
না জানি স্তবস্তুতি নমামি টাকায়।
যা টাকা যে টাকা দেবি, যদি দেন টাকা দেবি
অন্তিম কালে পাই যেন চরণে টাকায়।

[ অং কমলাকান্তস্য ব্রাহ্মণস্যেশ্বরচন্দ্রশর্ম্মণঃ কৃতিঃ। ]

# দৈব ঘটনা

—শ্রীপরিমল গোস্বামী

গোয়ালন্দঘাট ষ্টেশনে ঢাকা মেলে ভীড় দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িলাম। সংবাদপত্রের রিপোর্টার আমি, মফঃস্বল হইতে নানারূপ সংবাদ পাঠাইয়া একখানি কাগজ বিনামূল্যে পাই, কিন্তু অল্পদিন হইল মোহ কাটিয়া গিয়াছে। আর কাগজ নহে, টাকা চাই। সেই উদ্দেশ্যেই কলিকাতা যাইতেছি।

বসিবার জায়গার জন্য এ গাড়ি সে গাড়ি অনুসন্ধান করিতেছি; কিন্তু কোথাও সুবিধা হয় না। আমাকে বার-বার ঘোরাঘুরি করিতে দেখিয়া প্রথম শ্রেণীর রিজার্ভ কামরা হইতে এক নগ্নগাত্র সন্ন্যাসী আমাকে ডাকিয়া তাঁহার গাড়িতে আমাকে বসিতে দিলেন। পরিচয় লইয়া জানিলাম ইনি দেবাদিদেব মহাদেব, পার্ব্বতীসহ কলিকাতা যাইতেছেন। হিমালয় হইতে ইঁহারা একেবারে সিলেট ঘুরিয়া গোয়ালন্দের পথে আসিয়া পড়িয়াছেন। আমার মনে সামান্য একটু সন্দেহ হইয়াছিল কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে ষাঁড় এবং সিংহকে দেখিয়া আর কোনো সন্দেহ করিল না। দেব এবং দেবীকে সভক্তি প্রণাম করিলাম। ভক্তির মাত্রা বোধ করি একটু বেশিই হইয়াছিল সেজন্য সিংহ এবং ষাঁড়ের দিকেও অগ্রসর হইলাম। কিন্তু আমার বাসনা পূর্ণ হইল না। সিংহ ঈষৎ হাসিয়া গা সরাইয়া লইল এবং ষাঁড় এমন ভাবে শিং বাঁকাইয়া রহিল যে তাহার পা পর্য্যন্ত পৌঁছান আমার পক্ষে দুরূহ হইল, কাজেই ফিরিয়া আসিয়া দেবাদিদেবের পাশে বসিলাম।

দেখিলাম বাংলাদেশে বহুদিন হইতে প্রবল করা অভ্যাস থাকা সত্ত্বেও মহাদেবের আচার-ব্যবহার ধরণ-ধারণ সেকালের মতই রহিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেও হয়তো তাঁহাকে দেখিয়া থাকিব কিন্তু পরিচয় ছিল না, এইবার কাছে পাইয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিলাম। আমার পরিচয় দিলাম। মহাদেব প্রথমেই বলিলেন বাংলাদেশের লোকে আমাকে লইয়া নানারূপ ব্যঙ্গ করিয়া সংবাদপত্রে রিপোর্ট লিখিয়াছে, তুমিও হয় তো লিখিবে, কিন্তু তোমরা কি নূতন কিছু করিতে পার না? একজন যাহা করে তাহারই অনুকরণ তোমরা সকলে করিবে?

বুঝিলাম মহাদেব তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ঔদাসীন্য ত্যাগ করিয়া আমাদের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাংলাদেশের দেবতারা যদি আমাদের প্রতি এইভাবে মনোযোগী হইয়া ওঠেন তাহা হইলে আমাদের দুঃখও হয় তো ঘুচিয়া যাইতে পারে। হয় তো মহাদেবের কৃপায় আমার একটি চাকুরী জুটিয়া যাওয়াও অসম্ভব নয়। মহাদেবকে দেখিলে সবারই মনে কেন যেন আপনা হইতেই কৌতুক জাগে। আমারও জাগিয়াছিল কিন্তু এই কথাগুলি মনের মধ্যে হঠাৎ দীপ্ত হইয়া ওঠাতে আমার উদ্ধত বিদ্রূপের অভিজাত ঔদ্ধত্য সংযত করিয়া অত্যন্ত বিনয়ী হইয়া উঠিলাম। তাহা ছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে আমি অতি নগণ্য এবং সেজন্য সকল দিকেই বিকারগ্রস্ত। কিন্তু এই কথাটা মনের মধ্যে চাপিয়া রাখি বলিয়াই আমার তারুণ্য অত্যন্ত উগ্র হইয়া পাশের লোককে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। তাই বিনয়ের মাত্রা একটু অতি মাত্রাতেই চড়াইয়া দিয়া বলিলাম, দেবাদিদেব, আমি আমার রিপোর্টের খাতা সংবরণ করিলাম, কিছুই আমি লিখিব না, এমন কি অটোগ্রাফ চাহিয়াও আপনাকে বিরক্ত করিব না, কিন্তু দেব, একটি কথা শুধু আমার বলিবার ছিল।

এই কথাটি বলিয়া মহাদেবের দিকে চাহিয়া দেখি তাঁহার তিনটি নেত্রই উদাস ভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। গাড়ি তখন চলিতেছে, গাড়ির আলোয় রেল লাইনের পাশের পাটের ক্ষেতগুলি আলোকিত হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহার দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ।

আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি সেই দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না লক্ষ্য করিয়া পার্ব্বতী সস্নেহে আমাকে বলিলেন, বল বাবা বল, তোমার যাহা বলিবার আছে বল, উঁহার দৃষ্টি বাহিরে গেলেও একটি কান কিন্তু তোমার দিকেই পাতিয়া রাখিয়াছেন।

আমি আমার ভুল বুঝিতে পারিয়া বলিলাম, হে ত্রিকালজ্ঞ, আপনার বিষয়ে আমি কোনো রিপোর্টই কোথাও ছাপিতে দিব না, কিন্তু আপনি একটি বিষয়ে আপনার নিজের প্রতি উদাসীন হইয়াছেন।

পার্ব্বতী পুনরায় বলিলেন, বেশি বাজে কথা না বলিয়া আসল কথাটা বল।

আমি আমার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য কথা চাপিয়া বলিতে লাগিলাম, আপনি উহার প্রপাগাণ্ডার দিকটা মোটেই ভাবিতেছেন না। যদি আপনার সম্বন্ধে কোন বিদ্রূপাত্মক

...একটি ধান কিন্তু তোমার নিজেই পাঠিয়া যাইয়াছেন...

সংবাদও ছাপা হয় তাহা হইলেও আপনার অনেকখানি বিজ্ঞাপন প্রচার হয়। বাংলাদেশে আসিয়া বিনা বিজ্ঞাপনে অখ্যাতভাবে কোথাও থাকিয়া সুখ পাইবেন না। বাড়িওয়ালা বাড়িভাড়ার তাগাদায় অস্থির করিবে, মুদী নগদ পয়সা ছাড়া এক কণা জিনিষও ধারে দিবে না এবং প্রতিদিন নগদ পয়সা জোটানর হাঙ্গামা আপনাকে সহিতে হইবে। অথচ আপনি অনায়াসে এই সব বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারেন যদি আপনার সম্বন্ধে কিছু প্রপাগাণ্ডা হয়। এই প্রপাগাণ্ডা হইতে নিজেকে কেন বঞ্চিত করিতেছেন?

মহাদেব এইবার একটিবার চক্ষু আমার দিকে ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, বাধা আছে ভোকরা, বাধা আছে। সংসারের দায়িত্ব বোধ করি তোমার ঘাড়ে পড়ে নাই এবং সেই জন্যই এই রকম কথা বলিতেছ। জান, আমার ছেলেরা কলিকাতার হোটেলে থাকে এবং তাহারা আমার প্রাচীন চেহারার জন্য লজ্জিত? জান, আমাকে লইয়া বিদ্রূপ করিলে তাহাদের প্রতিষ্ঠার হানি হয়?

এ বিষয়ে কিছুই জানিতাম না, তাই বিনীতভাবে বলিলাম, তাহারা কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে আমি একেবারেই অজ্ঞ। অতএব আমার এই অজ্ঞতার অন্ধকারে একটু আলোকপাত করুন।

পার্ব্বতী মহাদেবের দিকে চাহিলেন, আমিও চাহিলাম, দেখিলাম তাঁহার তিনটি চোখই ঈষৎ লাল হইয়া উঠিয়াছে। ইহা দেখিয়া পার্ব্বতী নিজেই আমার কথার উত্তরে বলিলেন, ছেলেদের কথায় উনি বড়ই দুঃখ পান। তারা এরূপ দুর্বিনীত হইয়া উঠিয়াছে যে কলিকাতার প্রকাশ্য থিয়েটারে তারা দক্ষযজ্ঞ অভিনয় করিতেছে এবং কার্ত্তিক তো স্বয়ং দেবাদিদেবের ভূমিকাতেই নামিতেছে। পুত্র হইয়া পিতার চরিত্র অভিনয় করা, এ কি সহ্য করা যায়?

আমি বলিলাম, বিংশ শতাব্দীর ছেলেদের মনে কোন সংস্কার নাই। সুতরাং সেজন্য বৃথা দুঃখ করিয়া লাভ কি?

শিব এ কথায় হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, হাঁ তা জানি, কিন্তু সংস্কার তোমাদের যে শুধু মনে নাই তাই নয়, সংস্কার তোমাদের কোথাও নাই। কলিকাতা সহরের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া দেখিয়াছি পথে পথে ব্রাণীকৃত আবর্জ্জনা! অন্তরে বাহিরে তোমাদের সংস্কারের অভাব। অন্তরের সংস্কারহীনতার দায়িত্ব তোমরা চাপাইতেছ বিংশ শতাব্দীর উপর আর বাহিরেরটা চাপাইতেছ কর্পোরেশনের উপর। অভাব দেখিতেছি শুধু—কিসের অভাব পার্ব্বতী বলিয়া দাও তো, তোমাদের ঐ যন্ত্রটির নাম আমি আবার বার বার ভুলিয়া যাই।

পার্ব্বতী কিঞ্চিৎ হাসিয়া বলিলেন সম্মার্জ্জনীর।

দেবাদিদেব বলিলেন, হাঁ ঐ সম্মার্জ্জনীর অভাব। কিন্তু এ বিষয়ে আমি নিরুপায়। ছেলেদের খাতিরে আমাকেও বিংশ শতাব্দীর বাহির হইতে হইয়াছে। ছেলেরা পিতার জন্য অপমান বোধ করে, এইখানেই আমি হার মানিয়াছি।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মহাদেবের দিকে চাহিলাম।

পার্বতী বলিলেন, তা বুঝি জান না? উনি আধুনিক হইবার চেষ্টায় বাড়ি বসিয়া তোমাদের বিজ্ঞান লইয়া গবেষণা করিতেছেন। হিমালয়ে একটি ল্যাবরেটরিও স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, অ্যাস্ট্রনমি প্রভৃতি লইয়া গবেষণা করিতেছেন। গৌরীশঙ্করের মাথায় একটি দূরবীণও বসান হইয়াছে।

কথাটা শুনিয়া আমি এরূপ কৌতুক অনুভব করিলাম যে, বেয়াদপি হওয়া সত্ত্বেও, দেবাদিদেবের মুখের উপর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

মহাদেব একটি চোখ আমার দিকে ফিরাইয়া আমার অসঙ্গত হাসির কৈফিয়ৎ তলব করিয়া বসিলেন। বুঝিলাম পুনরায় অন্যায় করিয়াছি।

ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু দেব ছাড়িলেন না, হাসিবার কারণ বলিতেই হইল। বলিলাম, গৌরী এবং শঙ্কর তো আপনারাই, এবং আপনারা উভয়েই দূরদৃষ্টির জন্য বিখ্যাত। কাজেই দূরে দৃষ্টিপাত করিবার জন্য আপনাদের শিরোদেশে দূরবীক্ষণ স্থাপনের কিছু আবশ্যকতা আছে কি?

মহাদেব অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া বলিলেন, তাই বল! কিন্তু ঐ সব না করিলে তোমাদের বিংশ শতাব্দীতে কদর পাইব কেন?

আমি বলিলাম, আপনারা প্রধানতঃ বাংলা দেশেই আসিয়া থাকেন, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় বাংলা দেশের উপর বিংশ শতাব্দীর প্রভাব কিছুই লক্ষ্য করেন নাই।

শঙ্কর বলিলেন, অভার্থঃ?

আমি বলিলাম, শুধু তাই নয়, বাংলা দেশই বিংশ শতাব্দীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

শঙ্কর আরও বিস্মিত হইলেন।

আমি বলিলাম, এ দেশের গতির সঙ্গে যদি তাল রাখিয়া চলিতে চান তাহা হইলে আধুনিক কবিতা নামক আমরা যে জিনিষটি সৃষ্টি করিয়াছি তাহাতে আপনার কিঞ্চিন্মাত্র অধিকার হইলেই চলিবে। আধুনিক হইবার জন্য আপনি যে সব প্ল্যান করিয়াছেন তাহা বাংলা দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, ঐ সব প্ল্যান লইয়া আপনি বাংলায় না আসিয়া বাঙ্গালোরে গেলে ভাল করিতেন। বাংলা দেশে আধুনিক কবিতাই যথেষ্ট। উদ্ভেদ সিদ্ধির এই সহজ পন্থাটা আপনার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে।

সিদ্ধির কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মহাদেবের চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি জোর গলায় সিদ্ধিদাতাকে ডাকিতে লাগিলেন। ভাবিলাম গণপতিকে ডাকিতেছেন। কিন্তু আমার অনুমান মিথ্যা প্রমাণ করিয়া ভৃত্যের কামরা হইতে নন্দী একতাল বাটা সিদ্ধি লইয়া উপস্থিত হইল এবং তাহা নীলকণ্ঠের হাতে দিল। তিনি সেটুকু গলাধঃকরণ করিয়া মিনিটখানেক পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে বাহিরে চাহিয়া রহিলেন। তারপর নীলকণ্ঠ স্থিরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, আধুনিক কবিতা কি তাহা বুঝাইয়া দাও, ঠিক এই মুহূর্তে আমার মনে বেশ একটা কাব্যের 'মুড' আসিয়াছে।

...আমার অনুমান মিথ্যা প্রমাণ করিয়া ভৃত্যের কামরা হইতে...

আমি সুযোগ বুঝিয়া রিপোর্টের খাতা বাহির করিলাম। আমি তাহাতেই কবিতা লিখি। আমার এই পরিচয় পূর্বে অনাবশ্যক বোধেই দেই নাই।

একটি কবিতা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু যাহা চার পাঁচ লাইন পড়িয়াছি এমন সময় চন্দ্রচূড় হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করিও না, করিলে হয় তো তোমারই অনিষ্ট হইবে। আমার মাথায় খুন চাপিয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম। আমার সমস্ত উৎসাহ নিবিয়া গেল। অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ করিতে গেলাম

কেন? ভাবিতে ভাবিতে আমার চোখে জল আসিল। খাতাখানা চোখের সম্মুখে খোলা রহিয়াছে—তাহারই দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। কবিতার লাইনগুলি চোখের জলে সিক্ত হইতে লাগিল। আবার কবিতাটি পড়িলাম :—

| | |
|---|---|
| নীল আকাশ | সমুদ্র গোলাপ |
| সোনালীর পাখী | রাঙা সন্ধ্যা |
| গোট | নরম |
| ডানাহীন | তুলতুলে |
| ঠিক যেন | ধানের বিনানী |
| আকাশের মরুভূমিতে | হাস যেমন। |
| উট। | একটি |
| চরিত্রের | দুইটি |
| ওয়েসিস্ | পাখী। |
| আর পিরামিড | ইরান, আবিসীনিয়া, |
| ঈগল | ডোরকা, কিউট— |
| বিষাদ | টলটল, বৃষ্টির ফোঁটা |
| কালকূট। | কাবুলি ঘোড়ার মতো। |

এই কবিতা মহাদেবকে টলাইতে পারিল না!

আমার দুঃখ দেখিয়া পার্বতীর মাতৃহৃদয় বোধ করি দ্রবীভূত হইল, তিনি সোটাকত কলা আমাকে খাইতে দিলেন এবং বলিলেন, গণপতির জন্য এক কাঁদি লইয়া যাইতেছি, কিন্তু তোমার মন যেরূপ বিচলিত হইয়াছে তুমিও দুটি খাও, আরাম পাইবে।

বিনা দ্বিধায় দেবীপ্রদত্ত দুইটি কলা উদরস্থ করিবার পর সত্যই মনটা বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, মহাদেবকে আর বিরক্ত করিব না, করিলে হয় তো একটা কিছু প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া কাবা যাবার প্রাণে সাড়া জাগায় না তাঁহার অপরাধ কিছুই নাই, তাই সোজাসুজি কাজের কথা পাড়িলাম। বলিলাম, হে ত্রিপুরী, আমার অনিষ্ট করিবার জন্য এই ট্রেনে আপনি দৈব শক্তির কোনও মহিমা ফুটাইয়া তুলিবেন সে জন্য আমি প্রস্তুত হইয়া আসি নাই। আমার শুধু প্রার্থনা—আপনার দৈবশক্তি যদি কিছু থাকে তবে তাহাই আমার উপর প্রয়োগ করুন।

এ কথার উত্তর দিলেন ত্রিভুবনবিজয়িনী। তিনি বলিলেন, দেবাদিদেব তো কাহাকেও মাতুলি দেন না।

আমি বলিলাম, আমি মাদুলি চাই না, একটি চাকরি চাই। এবং এই চাকরি দৈব-শক্তি ভিন্ন অন্য কোনও শক্তিতে লাভ হয় না। বাংলার সমস্ত দৈবশক্তি এখন ইহারই দিকে তাকাইয়া আছে।

আমার কথা শুনিয়া মহাদেব আমার আরও কাছে সরিয়া বসিলেন এবং আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন, আমাকে কি দিবে?

এই প্রশ্ন শুনিয়া আমি সত্যই বিস্মিত হইলাম। বিস্ময়টা আনন্দমিশ্রিত। মন হইতে সকল বৈরাগ্য একমুহূর্তে দূর হইয়া গেল। ঘুষ দিয়া কার্য্যোদ্ধারের জন্য নহে, দেবাদিদেব মহাদেবকে সম্পূর্ণ বাঙালী হইতে দেখিয়া। আর আমার

...চাকরি দৈবশক্তি ভিন্ন লাভ হয় না...

কোন ভয় নাই। এতক্ষণ পরে বাঙালী দেবতার হাতে আসিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইলাম। আমি বলিলাম, আপনি যাহা চান তাহাই আপনাকে দিব।

মহাদেব বলিলেন, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব।

আমিও তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলাম।

চন্দ্রশেখর আমার দিকে ভালভাবে ঘুরিয়া বসিয়া বলিতে লাগিলেন, কথাটা যখন উঠিল তখন আমার সমস্ত প্ল্যানটাই তোমাকে বলি। আমি এবারে কলিকাতা যাইতেছি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া। কিন্তু তার আগে মাত্র একটি প্রশ্ন তোমাকে করিব। আমার যে পোষাক দেখিতেছ তাহাতে আমি কোন্ কাজের উপযুক্ত বলিয়া তোমার মনে হয়?

সসঙ্কোচে বলিলাম, ঘাঁড়েটিকে যদি বেকার না রাখিতে চাহেন তাহা হইলে বোধ হয় আপনার পক্ষে কৃষিকার্য্যই উত্তম।

ত্রিশূলী বলিলেন, মোটেই তাহা নহে। আমি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হইতে চাই। হইলে তোমাকে আমি আমার সেক্রেটারি করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তোমার ঐ তিন ইঞ্চি জুলফি কামাইয়া ফেলিতে হইবে।

এই অপ্রত্যাশিত কথাটিতে বিস্ময় বোধ করিলাম। কিন্তু সহসা বুদ্ধিও আমার খুলিয়া গেল। বলিলাম, জুলফি রাখিব না। কিন্তু আপনি প্রেসিডেন্ট হইলেও বহুর খানেকের জন্য হইবেন, তাহার পর আমি কি করিব?

দেবতা ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন। বলিলেন, বর্ত্তমানকে ছাড়িয়া তোমাদের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে একটুও অগ্রসর হইতে পারে না, কিন্তু আমি ক্ষণকাল মানব হইয়াই বুঝিতে পারিয়াছি— আমি অন্ততঃ আগামী আড়াই হাজার বৎসরের জন্য প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিব।

কথাটায় হাসি পাইল কিন্তু হাসি সংবরণ করিলাম। বুঝিলাম দেবতা সিদ্ধির প্রভাব হইতে এখনও মুক্ত হইতে পারেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, কেমন করিয়া তাহা সম্ভব হইবে? আপনি জানেন যুদ্ধের পরেই ভারতবর্ষের ডমিনিয়ন ষ্টেটাস্ পাইবার সম্ভাবনা আছে। তাহা যদি হয় তাহা হইলে তখন সম্রাটের প্রতিনিধি হইবেন রাষ্ট্রপতি, কংগ্রেসের লোক হইয়া আপনি কি করিবেন? তাহা ছাড়া হয় তো কংগ্রেসও তখন ডমিনিয়ন ষ্টেটাস মানিয়া লইবে, তাহা হইলেই বা পৃথক্ রাষ্ট্রপতি থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? তবে যদি ডমিনিয়ন ষ্টেটাস হইতে কংগ্রেস সরিয়া থাকে তাহা হইলে হয় তো থাকিতে পারে। কিন্তু তখন দেশের সকল লোকও ডিমিনিয়ন ষ্টেটাসের ভক্ত হইয়াছে—কংগ্রেস সে অবস্থায় জনপ্রিয় হইবে কি করিয়া? এই সব প্রশ্নের উত্তর দিন্।

মহাদেব বলিলেন, তোমাকে কথা বলিবার সুযোগ দিয়া অন্যায় করিয়াছি। সুতরাং তুমি একটু থাম, আমি ভবিষ্যৎটা কি ভাবে দেখিয়াছি তাহা তোমাকে জানাইতেছি। তুমি জান কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এবং বড়লাটের মধ্যে বহুবার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে এবং বহু পত্র-বিনিময় ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহার ফল কি হইয়াছে? একটি বিষয়ে আসিয়া সব আটকাইয়া যাইতেছে। বড়লাটের কাউন্সিলে কংগ্রেস ঢুকিবে কি না তাহা ঐ বিষয়ের উপর নির্ভর করিতেছে। বড়লাট যদি কংগ্রেসের একটি দাবী মানিয়া লন, তাহা হইলে কংগ্রেস বড়লাটের কাউন্সিলে ঢুকিতে পারে।

প্রত্যেকটি সাক্ষাতের পূর্ব্বে বহু তোড়-জোড় হয়, সাক্ষাতের বন্দোবস্ত হয়, কিন্তু ঐ ভারসায় আসিয়া সব পণ্ড হইয়া যায়। উভয় পক্ষের মধ্যে যতবার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে ততবারই ইহা হইয়াছে। এবং আরও বহুকাল এইরূপ ঘটিবে। বহুকাল মানে আরও আড়াই হাজার বৎসর। আমি স্পষ্ট দেখিয়াছি ভারতবর্ষ ডমিনিয়ন ষ্টেটাস পাইয়াছে কিন্তু কংগ্রেস তাহার মধ্যে নাই। বড়লাটের সঙ্গে পূর্ব্বের মতোই সাক্ষাৎ হইয়াছিল কিন্তু একটি বিষয়ে মতভেদ থাকাতে কংগ্রেস নূতন গবর্ণমেণ্টে যোগ দিতে পারে নাই।

বহুযুগ কাটিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে বড়লাটের আলোচনা তখনও চলিতেছে। কি করিয়া তাহা সম্ভব তাহা বলিতেছি। ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মধ্যে একটি সর্ত্ত হইয়াছে। তাহা এই যে, কংগ্রেসকে বাদ দেওয়া যাইবে না, সুতরাং কংগ্রেস যতদিন না ঐ দুর্লঙ্ঘ্য দ্বিধাটি সম্বন্ধে কোনো মীমাংসা না করিবে ততদিন বড়লাটের পৃথক্ একটি পদ পূর্ণস্বাধীন ভারতবর্ষেও রাখিতে হইবে। এবং সেই জন্যই কংগ্রেসের স্থান ভারত গবর্ণমেণ্টে না থাকিলেও কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট থাকিবেন, এবং পূর্ণস্বাধীন ভারতবর্ষে বড়লাটের পদ না থাকিলেও বড়লাট থাকিবেন। ১৯৯০ সালে কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট এবং বড়লাটের মধ্যে পত্রবিনিময় চলিতেছে—কিন্তু মীমাংসা হইতেছে না। ২৫০০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এবং বড়লাটের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে। কংগ্রেস প্রায় রাজি হইয়াছিল কিন্তু একটি বিষয়ে উভয়ের মতভেদ হইয়াছে। ৩০০০ খৃষ্টাব্দেরও ঐ একই সংবাদ। ভারতবর্ষের চেহারা সম্পূর্ণ অন্যরকম হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের ইতিহাসেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সমস্ত পৃথিবী হইতে যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে। হিটলার ধ্বংস হইয়াছে। কেহ কাহারও উপর আক্রমণ চালাইতেছে না—কোনো দেশের সঙ্গে কোনো দেশের শত্রুতা নাই। পৃথিবীর সকল দেশ গভীর সখ্যসূত্রে

আবহ—সমস্ত পৃথিবী সম্পূর্ণ নূতন প্রাণে চলিতেছে। আধুনিক গণতন্ত্রবাদ, ধনতন্ত্রবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ এ সব কিছুই নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীন আদর্শে পৃথিবী পুনর্গঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর অপূর্ণ খাদ্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে। ৪০০০ সালে সকল দিক দিয়াই পৃথিবীর রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু তবু ভারতবর্ষের এক নিভৃত

...দাঁড়টি শুদ্ধা মাজিয়া আমাকে নীচে ফেলিয়া দিল...

অঞ্চলে কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট এবং বড়লাট বাস করিতেছেন। তাঁহারা এখন আর পৃথক জায়গায় থাকিয়া মাঝে মাঝে দেখা করেন না। একই বাড়িতে থাকেন এবং প্রতিদিন আলোচনা করেন। সকাল হইতে আলোচনা বেশ জমিয়া ওঠে। মত প্রায় মিলিয়া যায় কিন্তু সন্ধ্যার দিকে একটি বিষয় উভয়ের মতভেদ ঘটে এবং রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পরে আলোচনা এমন আটকাইয়া যায় যে, আর একটি কথাও বলা চলে না। তখন উভয়েই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে নিজ নিজ বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়েন।

ডমিনিয়ান ষ্টেটাস্ পাইবার পর প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যেই কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হইবার আগ্রহ কংগ্রেসী লোকের কমিয়া গিয়াছে। কাজেই আমাকেই সেই পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অমানুষিক দুঃখ সহ্য করিবার ক্ষমতা সাধারণ লোকের থাকিতে পারে না, কিন্তু আমার আছে, তুমি জান আমি নীলকণ্ঠ। সুতরাং এই দুঃখ সহ্য করিয়া কংগ্রেসকে আগামী আড়াই হাজার বৎসর বাঁচাইয়া রাখা আমি ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য নাই। আমার যে বাঘছালের পোষাক দেখিতেছ ইহাতে আমার আধুনিক যুগের পুত্রেরা লজ্জিত হইতে পারে কিন্তু কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের পক্ষে এই পোষাক আদৌ লজ্জাকর নহে।

এই কথাগুলি মহাদেব একটা অপার্থিব দৃষ্টি লইয়া অত্যন্ত আবেগভরে আমাকে শুনাইলেন। শুনিয়া অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমার শুধু মনে হইল আমাকে তাঁহার সেক্রেটারির পদটি দিয়া আমারই বেতনের অংশ তুমি চাহিতেছেন কেন!

শিব অন্তর্ধানের অবস্থায় ছিলেন, সেই জন্য বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, সর্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা প্রেসিডেন্টের। তুমি জান পদটি অবৈতনিক, কিন্তু সেক্রেটারির পদ অবৈতনিক নহে। ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে তোমাকে বেতন দেওয়া হইবে। আমারই সম্মুখে আমারই হাত দিয়া তুমি তাহা লইয়া ফূর্তিতে দিন কাটাইবে আর আমি সপরিবারে অনাহারে অর্দ্ধাহারে কাটাইব?

...ষাঁড়ের অবস্থা তো এমনি...

আমি বলিলাম, কিন্তু এইটেই তো আপনার ট্র্যাডিশন। আপনি পার্থিব ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন বলিয়াই লোকে আপনাকে শ্রদ্ধা করে।

মহাদেব আমার কথায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় পুনরায় রক্তবর্ণ ধারণ করিল। এমন সময়

হইল যেন আমাকে খুন করিয়া ফেলিলে সন্তুষ্ট হন। তাহা দেখিয়া পার্শ্বস্থ অন্তর্নিহিত ষাঁড়টি উঠিয়া আমাকে প্রচণ্ড জোরে একটি গুঁতা মারিয়া আসন হইতে আমাকে নীচে ফেলিয়া দিল। ষাঁড় আমাকে দেখিয়া সিং বাঁকাইয়া ছিল কেন এতক্ষণে বুঝিলাম। পার্ব্বতী কিন্তু ইহাতে মহাদেবের উপর খুব চটিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, তুমি ইহাকে কত বেতন দিবে তাহা আগে না জানাইয়া অংশ দাবী করিয়াছ এ তোমার কি রকম আক্কেল? দিন দিন তোমার মাথা খারাপ হইয়া যাইতেছে।

এইভাবে দেবীর কণ্ঠস্বর চড়িতে চড়িতে ক্রমে তারার সপ্তকে পৌঁছিল। সঙ্গে সঙ্গে আসনের নীচে হইতে দেবীর সিংহটি বাহির হইয়া আসিয়া ষাঁড়ের মুখে ভীষণ এক থাবা মারিয়া নীরবে পুনরায় স্বস্থানে গিয়া শুইয়া পড়িল।

মহাদেব ইহা দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। সিংহ আসিয়া ষাঁড়কে অপমান করিয়া গেল। এবং এই অপমান সে আজ নূতন করে নাই! কিছুদিন হইতেই সিংহ বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে। মহাদেব আর সহ্য করিবেন না, এখনই ইহার প্রতিকার করিবেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্বর মেঘের মতই হইয়া উঠিল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন:—

আমি আমার অপমান সহিতে পারি
ষাঁড়ের সহে না যো অপমান।

মহাদেবের গর্জ্জনে গাড়ি ভয়ানক কাঁপিতে লাগিল। মনে হইল যেন এখনই প্রলয় বাধিয়া আসিবে। আমিও কাঁপিতে লাগিলাম। আমারই জন্য দেবতাদের মধ্যে এই কলহ, আমার কি দুর্দ্দশা হইবে তাহা অনুমান করিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। এবং ঠিক এই মুহূর্ত্তেই আকাশ বিদীর্ণ করিয়া যেন গাড়ির উপর বজ্রপাত হইল। গাড়ি লাইন ছাড়িয়া নীচে পড়িয়া গেল। তাহার পর কি হইল মনে নাই।

সাত দিন পরে জ্ঞান লাভ করিয়া শুনিতে পাইলাম চাকা যেন দুর্ঘটনায় বহু লোক হতাহত হইয়াছে। আরও শোনা গেল, রিকার্ড প্রথম শ্রেণীর সন্ন্যাসী-পরিবার নিখোঁজ হইয়াছেন—সিংহ এবং ষাঁড়টিকেও পাওয়া যায় নাই, শুধু তাহাদের গলায় দেবেল দুইটি পড়িয়া আছে!

---

# শেষ অপমান

—শ্রীসত্যেন গুপ্ত

দিকে দিকে অগ্ন্যুৎপাত, সভয়ে টলিছে
পৃথ্বী, রথ-রথ, মহারথ, লোকক্ষয়,
ভূমিকম্প, বন্যা, মারিভয়, জলে স্থলে
অন্তরীক্ষে ছিল নাহি চকিত শান্তির
আশা। তারি মাঝে কার জয়োল্লাস ধ্বনি
বিদারি আকাশ-বক্ষ কাঁপাইছে এ দেশের
প্রাণ!

সিংহের সদন হতে কৃষ্ণ নত
মেরুদণ্ড ঠেলি, শ্যামলী করিয়া ত্যাগ
পদবী-সম্মান নিতে বাহিরায় কবি
সিংহ বৃষ-ভানু! যজ্ঞের, বিশ্বের যিনি
সর্ব্বভূমিচর।

মরি হায়, শুনে হাসি
পায়, অষ্টতি বর্ষের গলে সিনী-গাঁথা
মালা। সম্মানের ছালা তাঁর এতদিনে
ভরিল সে ভবে। ভাল ভাল, আরো ভাল
রহিল সে বাকি···কালের কপোলতলে
আঁকিবে যে আঁকি—সেই দিন হবে শোধ···
আজি এই বঙ্গের দুর্দ্দিনে, ঘরে ঘরে
রোদনের রোল—দুর্গতরা সর্ব্বহারা
হয়ে পথে লুটাইছে শির, সারাটা ভারত-
ব্যাপী এই লৌহ-কারাগারে শৃঙ্খল আরত
দেহ ঘুনিবার তাগোদ তাড়নে, শত
দুঃখ, কত তাপ ভুঞ্জিছে শতেক প্রাণ,
মরিছে শতেক আশা, নিভিছে শতেক
দীপ, জ্বলিবে না আর—আর তুমি গাও
শান্তির ওঁকার···নব বিবেকের বাণী
গাও সমস্বরে···

এই পুরস্কার—ধিক্ ধিক্
কি কব অধিক, এই পুরস্কার নিতে তব
হল না একটু লজ্জা, ঘিধা নাহি এল
মনে, কণ্ঠ নাহি হ'ল রোধ, ভাবিলে না
একবার কার মত পড়ে কার জিয়ে?

* * *

উৎকণ্ঠনীর তীর হতে এল যে সম্মান
নহে—নহে·· এ নহে সম্মান যেন তার
বিধাতার রুদ্র হস্তে বজ্র-লজ্জা—দান
পরাধীন বাঙালীর শেষ অপমান!

# বিজয়ী

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

অনুর নহে

রাত্রি প্রায় বারটা, কৈকেয়ী নিজের বিছানায় শুইয়া, কৌশল্যা কাছে বসিয়া আছেন। চিরকাল তাঁহার কাটিয়াছে শাশুড়ীর পাঁচলের তলে নির্ভাবনায়। আজ সকল দায়িত্বভার মাথায় লইয়া একা বিদেশে যাইতে তাঁহার প্রাণ কাঁদিতেছে, কৈকেয়ী সেটা বুঝিয়াছেন।

জানকী কেশবের কাছে ছিল এতক্ষণ, এবার সে শুইতে আসিল। কৈকেয়ী বলিলেন, "বৌমা শোওগে, একটু ঘুমিয়ে নাও।"

"উঠে যেতে না মা, প্রণাম করি, শেষ রাত্তিরে আর বিরক্ত করবো না ডেকে।"

"কেন? নিশ্চয় ডাকবে, দরজা খোলাই রাখবো।"

কৌশল্যা উঠিয়া গেলেন। সুদেষ্ণা কৈকেয়ীর অপর পাশে বসিয়া ছিল, কৈকেয়ী বলিলেন, "তুইও যা; শুয়ে পড়গে।"

"না, আমি এইখানেই শোব—না হলে যার যাবার সময় দেখতে পাব না। যে আমার ঘুম, কে ডেকে তুলবে তখন ও ঘরে গিয়ে?" বলিয়াই উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া শুইয়া পড়িল।

কৈকেয়ীর মনের অবস্থা বেশী কথা বলিবার নয়। চুপ করিয়া রহিলেন। মনে কত চিন্তা, এক সন্তান কেশব অসুস্থ হইয়া চলিয়াছে বিদেশে, ভবিষ্যতের অন্ধকারে কি ফল নিহিত আছে কে বলিবে!

সুদেষ্ণা শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার মাথাটি বালিশে তুলিয়া দিয়া কৈকেয়ী পাশ ফিরিলেন।

ভোর রাত্রের গাড়ী। শেষ রাত্রির দিকে কৈকেয়ীর সবে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে কৌশল্যার মৃদু স্বর তাঁর কানে পশিল, "মা"—

কৈকেয়ী উঠিলেন, জানালা দুয়ার খুলিয়া দিলেন। ধপ্ ধপ্ করিয়া বারান্দায় আলোটা জ্বলিতেছে। কৌশল্যা দাঁড়াইয়া আছেন বিবাহ-বেশে সজ্জিতা। পূজার দিনে যেগুলি রঙের বেনারসীটি পরা। তাহাড়া গায়ের গহনা কৈকেয়ী জানিতে পারিয়া আবার একটা হার গড়াইয়া দিয়াছিলেন—সেই হার গলায়। এই শাড়ী, এই হার, পূজার মধ্যেও পরেন নাই। চিরদিনই তাঁহার সাধারণ বসনে কৈকেয়ী বিরক্ত। তাই আজ দারুণ চিন্তাভার লইয়াও যাইবার সময় কৌশল্যা শাশুড়ীর মনোরঞ্জনের জন্য সাজিয়াছেন। মুখ বিষণ্ণ, সজল আনত চক্ষু, তবুও কৈকেয়ীকে সন্তুষ্ট করিবার এই প্রয়াস দেখিয়া সহসা কৈকেয়ীর চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

কেশবও ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, পিছনে জানকী। সকলে নামিয়া গেলেন নীচে। মন্দির-দ্বার রুদ্ধ, বিশাল মন্দির-আঙ্গিনায় একটা বড় আলো জ্বলিতেছে, সমস্ত রাত্রিই জ্বলে। শেষ রাত্রির জ্যোৎস্নাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে বিদ্যুতের আলো। নীরবে মন্দিরের সামনে প্রণাম করিয়া কেশব মাকে প্রণাম করিলেন, তার পরে ফিরিয়া গাড়ীতে উঠিতে গেলেন।

কৈকেয়ী কেশবের দীর্ঘ দেহের দিকে চাহিয়া রহিলেন, যতক্ষণ দেখা যায়। তারপর চোখ ফিরাইয়া কৌশল্যার দিকে চাহিলেন, আপনা হইতে হঠাৎ তাঁহার মনে হইল যে কেশবের জন্য কোন আশঙ্কা নাই।

কৌশল্যা কৈকেয়ীকে প্রণাম করিলেন, কৈকেয়ী তাঁহার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন, "বৌমা আমার কেশবকে ভাল করে নিয়ে এসো।"

সহসা কৈকেয়ীর মুখে এই কথা শুনিয়া কৌশল্যার মুখ আরও ম্লান হইয়া গেল, চোখের জল প্রাণপণে চাপিয়া আবার নীচু হইয়া শাশুড়ীর পায়ের ধুলা লইলেন, রুদ্ধস্বরে অস্ফুট কথা শোনা গেল, "তুমি আশীর্বাদ কর।"

ভোর বেলা উঠিয়া সুদেষ্ণা কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিল। দুঃখে অভিমানে কৈকেয়ীর কোন কথা মানিল না, "কেন আমায় ডাকলে না? কেন ডাকলে না? আমি যাবার সময় দেখতে পেলাম না মা বাবাকে। যাও, আমার সঙ্গে কারো কোন সম্পর্ক নেই, কউ আমার দু'চক্ষে দেখতে

পারে না। আমি খাব না। উঠব না, কিছু করব না" বলিতে বলিতে কৈকেয়ীর হাত ছাড়াইয়া আবার গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

খানিক পরে মাথা তুলিয়া দেখে কৈকেয়ী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া কৈকেয়ীর গলা জড়াইয়া ধরিল; বলিল "আমি দিন দিন বড্ড খারাপ হয়ে যাচ্ছি, না? শুধু শুধু তোমায় কষ্ট দি।"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া কৈকেয়ী তাহাকে কোলে টানিয়া লইলেন।

বিকাল বেলা আনন্দের টেলিগ্রাম পাওয়া গেল। কলিকাতা পৌঁছিয়াই টেলিগ্রাম করিয়াছে, কেশব ভাল আছেন।

কৈকেয়ী বলিলেন, "এবার তুই হরিতলা যা—কবে যাবি? আজই—না কাল সকালে?"

মাস দুই তিন পর-পর দিন কয়েকের জন্য সুদেষ্ণা বাপের বাড়ী যায়। এবার বাসুদেবপুর হইতে আসিয়া আর যাওয়া হয় নাই। কেশবের অসুখের জন্য সর্বদা ব্যস্ততায় মধ্যে সময় কাটিয়া গিয়াছে।

সুদেষ্ণা বলিল, "তুমি খালি বাড়ীতে একা থাকবে কি করে?"

"আমার ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না—তার মাস যায় নি, ঘুরে আয় একবার।"

সুদেষ্ণা রাজী হইল না। "তোমায় ফেলে আমার যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না, বাবা মা আসুন না, তার পরে যাব।"

"তারা কবে আসবে ঠিক কি? তোর মন ভাল নেই, দু'দিন থেকে আয়। কাল বৈকালে যাস।"

সুখদা বলিল, "এবার আমি বৌমার সঙ্গে যাব, বেড়িয়ে আসব।"

## পত্র-পত্রি

করুণা নিত্যই আশা করিয়া থাকে, আজ বুঝি সুদেষ্ণা আসিবে। কেশবের অসুখ, কিছু লিখিতেও পারে না। তা ছাড়া লিখিবেই বা কি? আনন্দ যখন তখন আসে, তাহারই কাছে খবর পায়। সুদেষ্ণা ঘুরে সরিয়া গিয়াছে, আনন্দ নিকটবর্তী হইতেছে। বাড়ীতে ঢুকিয়াই 'বৌদি' বলিয়া সোজা রান্না-ঘরে উপস্থিত হয়। খবর জানাইয়া সে আসে না, সুতরাং করুণা খাবার তৈয়ারী করিতে বসে, আনন্দ গল্প জুড়িয়া দেয়। ছেলে-মেয়ে পিসেমশাইকে পাইলে আর কিছু চায় না। যাইবার দিনও আনন্দ সকালে দেখা করিতে আসিয়াছিল। এই রকম দেখা-সাক্ষাতের জন্য ও একটা কাছাকাছি বলিয়া চিঠি-পত্রের ব্যবহার দুই পক্ষেই খুব কম।

ঘরে আলো দিতে আসিয়া করুণা দেখিল, বিনোদ জুতা পরিতেছে, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আজও বোধ হয় এল না।"

বিনোদ জবাব দিল, "খুব সম্ভব।"

"একটু খোঁজ নেবে? তাঁরা পরশু চলে গেছেন, এখন একবার আসুক না।"

বিনোদ জুতা পরিয়া ডিবা খুলিয়া একটা পান লইয়া বলিল, "পরীবের মেয়ে ধনীর ঘরে পড়লে বাপের বাড়ী আসা একরম নিষেধ, সে কি জান না? সেই রেকর্ড বেজেছে সম্ভবত, সে ওঁরা একে খুব ভালবাসেন বলে। ওঁদের বৌ যদি ওঁরা না পাঠান, কি জোর আছে আমাদের? আমি যাব খোঁজ নিতে? অন্যরে খবর পাঠিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবো, তার পরে খুশী মত আমায় ডেকে পাঠাবে? সে আমার যাবা হবে না—"

বিনোদ বাহির হইয়া গেল।

সেই খানে করুণা দাঁড়াইয়া রহিল। হায় নিরুপায়! মনে কত ব্যথা, কত স্নেহ—তবু শক্তিহীনা। কতটুকু মূল্য সে স্নেহের, সে ব্যথার?

এমন সময় পরিচিত ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ এবং শিঞ্জনে মোটরের হর্ণ শোনা গেল। দুই মিনিট পরেই সুদেষ্ণা ঘরে ঢুকিয়া করুণাকে প্রণাম করিল।

সুখদা নামিয়া আসিয়াছে, সুদেষ্ণার জিনিষ-পত্র বারান্দায় রাখিয়া সহিস গোচমান বাহির হইয়া গেলে করুণা ঘর হইতে বাহির হইল, সুখদাকে বলিল, "এসো বসবে এসো।"

সুখদা বলিল, "না গো, বসবো না, দেখে গেলাম এই ঢের।"

"সে কি? বহরকার দিন একটু বিশ্রাম করে যেতেই হবে—তুমি বাইরে ওদের বল, একটু খানি থাকতে—"

সুদেষ্ণা যখনই আসে করুণা তার সঙ্গের লোকজনকে যথাসাধ্য আদর করে। যথাযথ বিধি আছে, ঘরের মেয়ের

মত সে করুণাকে সান্ত্বনা করে। এবং করুণার কথামত যতক্ষণ দরকার অপেক্ষা করে। কিন্তু সুধদা সে স্বভাবের নয়। হাত নাড়িয়া হাসিয়া সে জবাব দিল, "তুমি কি জানতে যাচ্ছ আমরা আসবো? খাবার-টাবার তৈরী করে রেখেছ? না এখন করতে বলবে? ওসব দরকার নাই, পুজো-বাড়ীর খাবার খেয়ে অরুচি ধরে গেছে সকলের, নতুন আর কি খাওয়াবে বল?" বলিয়াই অনন্ত-পরা হাত দুলাইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

সুধদার কথা করুণার মনে বিঁধিল কাঁটার মত, স্পষ্ট উপেক্ষা, দারিদ্র্যের প্রতি ইঙ্গিত! করুণা যে আজও বড়-লোকের বৌকে আপন ভাবিয়া কাছে টানিতে যায় সেই স্পর্দ্ধার যোগ্য শাস্তিই সে বাড়ীর দাসী ভাল করিয়া দিয়া গেল।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া করুণা চোখ মুছিতে লাগিল। একটু আগে বিনোদের কথায় আহত তাহার মন এখনও মিলায় নাই। তার উপরে সুধদার কথা যোগাইল যেন ইন্ধন। কত ভালবাসে বিনোদ সুধেষ্ণাকে, সেই বোনটিকে ইচ্ছামত চোখের দেখাও দেখিতে পায় না। মনের ব্যথা তাহার তীব্র কথায় আত্মপ্রকাশ করে।

একটু পরে করুণা নিজেই শান্ত হইল। বালতির জলে চোখ-মুখ ধুইয়া ঘরে আসিল। সুধেষ্ণা ঘুমন্ত ছেলেটিকে তুলিয়া জাগাইয়াছে; নীলা তাহার পুতুলের বাসন, খেলনা প্রভৃতি সমস্ত সম্পদ্ পিসীমার কাছে উজাড় করিয়া দিয়াছে, তাহাদের লইয়া সুধেষ্ণা একেবারে তন্ময়। করুণাকে দেখিয়া বলিল, "ছেলে কোথা বৌদি? দেখ সুশীল আমার একটুও কোলে নি, ঘুম থেকে টেনে তুললাম, অমনি কোলে এলো। মা সব সময় ওর কথা বলেন, বলেন, 'অমন সুন্দর ছেলে আমি দেখিনি।"

"নিজে যে তিনি ভাল—সবাইকে ভাল বলবেন বই কি, সেই হারটার জন্যে তোর দাদা আমায় কত বকলে, ফেরৎ পাঠাতে বললে। সে আমি ওঁর টিপ্ রেখে দিয়েছি, বার করে দেখি, অমনি মনে পড়ে সেই চৈত্রমাস—কি মিষ্টি কথা—মা বলে ডাকতে সাধ হয়।"

"মা তো তোমার খুব সুখ্যাতি করেন,—বলেন 'করুণার মতন লক্ষ্মী মেয়ে হয় না'।"

বাহিরে জুতার শব্দ হইল, বিনোদ ঘরে ঢুকিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"কখন এলি?"

"এই আধ ঘণ্টা হবে।"

"এবার এত দিন দেরী—তোর বৌদি তোর খোঁজে আমায় পাঠাচ্ছিল।"

জুতা খুলিয়া বিনোদ বিছানায় বসিল—"ইস্, বৌদি পাঠালেই তুমি যেতে কি না?"

ওদিকে নীলা পিসীকে অন্য দিকে মন দিতে দিবে না—হাত ধরিয়া টানিতেছে। সুধদাও ঘরে ঢুকিয়া পিসীকে দখল করিল।

পিসীমা তাহাদের খেলার সাথী, এখনও পুতুল খেলে। দুই দিক্‌কার আদরে মানুষ হইয়া আজও শৈশব-স্বভাবটি অক্ষুণ্ণ আছে।

পরদিন রবিবার—দুপুরবেলা বিনোদ ঘরে শুইয়া আছে, সুধেষ্ণা কাছে বসিয়া নীলার পুতুলের পোষাক তৈরী করিতেছে, নিজের একটা ব্লাউজপীস্ কাটিয়া। করুণা পান সাজা সারিয়া ডিবাটি ভরিয়া উঠিল, এবং সেটা বিনোদের কাছে রাখিয়া বালিশটা টানিয়া একটু শুইল। বলিল, "একটা দিন গেল—ন'টা দিন আছে, দেখতে দেখতে যাবে। আশায় আশায় থাকি সে বরং ভাল। তাই কি বিশ্বাস আছে? কবে কোন্‌দিন গাড়ী এসে পড়বে। খালি বাড়ী—ওকে যে পাঠিয়েছেন তাই ঢের।"

"তোমার কি ইচ্ছে যে ও তোমার কাছেই থাকে?"

ডিবা হইতে একটা পান লইয়া বিনোদ বলিল, "আমি কিন্তু একটুও আশায় থাকি নে—"

"আমায় একটা পান দাও তো দাদা। নিজে বুঝি ভালটা বেছে নিলে? বৌদির পান সাজার সুখ্যাতি মা খুব করেন—বলেন, 'অমন পান আমরা কেউ সাজতে পারি নে'।"

বিনোদ বলিল, "তিনিই বুঝি ও বাড়ীর মধ্যে একমাত্র ভাল লোক?"

করুণা বলিল, "আর সবাই বুঝি খারাপ? আনন্দও?"

বিনোদ হাসিয়া বলিল, "আনন্দের কথা বাদ—"

"তবে লক্ষ্মীর শ্বশুর।"

বিনোদ বলিল, "না, তিনি আমাদের মত লোকের আলোচনার অনেক উপরে, ওঁর কথা এর মধ্যে ধরি নি।"

কল্পনা হাসিল, "লোক তো মোটে পাঁচটি—তার একটি তো আমাদেরই, আর তিন জনও তাল রয়ে গেল। মন্দ যে কে তাই বুঝতে পারছি নে।"

বিনোদ বলিল, "তুমি বুঝবে না—লক্ষ্মণ বুঝেছে।"

সুরেক্ষা চোখ তুলিয়া একটু হাসিল, "দিদির কথা বলছো?"

"যা বুঝিস।"

"দিদিকে অনেকে ভুল বোঝে দাদা, বড্ড শক্ত মানুষ। একজন ঘাঁধুনী বামুন এক মণ আলু চুরি করেছিল—উনান তৈরি করে রেখে ছিল; তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন—কত কান্না-কাটি—কিন্তু স্বীকার করলে না বলে তাকে ছাড়ালেন। মিথ্যে কথা মোটে সইতে পারেন না।"

কল্পনা বলিল, "সেই যে মামলাটা হলো—স্বরূপ সাহানের ছেলে হলো—কি কষ্ট তাদের মা বউয়ের। উনি মাপ করলে তো এমনটা হ'তো না!"

বিনোদ বলিল, "সেটা ঠিক হয়েছে, লোক দু'টি ভয়ানক পাজি ছিল।"

সুরেক্ষা বলিল, "মা তাদের খুব সাহায্য করেন। দিদি নবীনের বৌকে বাড়ীতে রেখেছেন—মেয়েটির বিয়ে দিয়েছেন বাসুদেবপুর কাছারীর এক মুহুরীর সঙ্গে। গরীবের ওপর খুব দয়া আছে। কিন্তু কেউ যদি মিথ্যা বলল, তো ক্ষেপে উঠলেন। এই সবের জন্যে বাইরে অনেক নিন্দা হয়। কিন্তু আমার মনে হয় এগুলো ভাল, লোকের কথায় কান দিলে কি কাজ হয়? অন্যায়ের সাজা না পেলে লোকে কেবলি অন্যায় করবে না?"

বিনোদ বলিল, "সে সত্যি কথা।"

"দিদিকে সবাই ভয় করে, যেন বাঘ! অমন না হলে হয়? যাকে কেউ মানেই না, মা রাগ করতেই জানে না, মানবে কি?"

"ওঃ, তুই যে তোর দিদির বড্ড ভক্ত! আচ্ছা, ওর নিন্দেটা মিত্তির-বাড়ী থেকেই বেশী ওঠে না?"

সুরেক্ষা হাসিয়া বলিল, "এখন খেপেছে।"

"আচ্ছা, তোর শ্বশুর কি কিছুই দেখেন না?"

"নাঃ, বাবা বলেন, 'মা যা পারেন, আমি তার সিকিও পারব না'।"

"আর ছেলের কাজ যে মার পছন্দ হবে না তাও তিনি ভাল জানেন।"

সুরেক্ষা হাসিল, "হাঁ তা জানেন।"

কল্পনা বলিল, "অমন ছেলে-নাতি থাকতেও যে এত বড় বিষয়-সম্পত্তির কাজ নিজে করেন, সে তো সোজা কথা নয়।"

বিনোদ বলিল, "খুব বেশী রকম ক্ষমতাশালিনী, তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

"তবে তুমি কেন অমনধারা কর ভাই বল?"

"কি রকম করি?"

"এই নিজে যাও না, আমায় যেতে দাও না—কেমন একটু বিরক্ত-বিরক্ত ভাব।"

ঠিক কি কারণে বিরক্তি—বিনোদ নিজেও বোধ হয় জানে না। এক—নিজের দারিদ্র্যের উপর অভিমান; দুই—জন্মিয়া অবধি কৈকেয়ীর দর্প অহঙ্কার শক্তিমত্তার কথা শুনিয়া শুনিয়া অকারণ মনে একটা বিদ্বেষভাব বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান কালের নূতন আবহাওয়ায় বিশ্ব-সংসারের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে; ঘটে নাই শুধু চৌধুরী-বাড়ীতে,—সেকালের আব-হাওয়া বজায় রাখিয়া একালে এমন প্রবল প্রতাপে দিন কাটান খুব কম অভিজাত পরিবারেই দেখা যায়। বিদ্বেষের নেশা লাগিল না, হাওয়া বদল করিতে পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটাছুটি নাই। এই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার যুগে কোন্ ধনী-বংশ এমন করিয়া দেশের মাটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া শুধু প্রজা-জমিদার সম্পর্কটা লইয়া জীবন যাপন করে? তাও যেটুকু বাকী ছিল, আইন পাশকরা ছেলে আনন্দ দিল পূর্ণাহুতি। সর্ব্বেসর্ব্বা মালিক যে, সে কি না নিজে কুঠির মধ্যে ঢুকিয়া দপ্তরকার চাষা হইয়া গেল। ইউরোপ বেড়াইতে তো গেলই না—কলিকাতায় একটা চমক-দাগান বাড়ী ও চোখ-ঝলসানো গাড়ী করিয়া যে কিঞ্চিৎ মান রাখিবে সমসর্য্যাদাযুক্ত বন্ধুর কাছে—তাও না।

কিন্তু বিনোদের মনে কৈকেয়ীর উপরে বিদ্বেষ থাকিলেও আনন্দের উপর খুব টান। তার উপর আনন্দের নূতন কর্ম্ম-পদ্ধতিতে সে আরও মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া গিয়াছে। এক একবার বিনোদ ভাবে আনন্দের দলে ভিড়িয়া পড়ে। কিন্তু পড়ার নেশা বিনোদের খুব প্রবল। মাষ্টারির অবসরে বই লইয়া বসে। মনে ইচ্ছা থাকিলেও জীবনযাত্রাটা যেন ঘড়ির কাঁটার মত নিয়মাধীন হইয়া গিয়াছে, ইচ্ছাটা কার্য্যে পরিণত হয় না। আর একটা কথা; কৈকেয়ীর আক্রোশের দান সে দুইবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সেই দানের প্রস্তাবই

বিনোদের মনে তীব্র আঘাত দিয়াছিল, কাজেই সেদিককার কোন সম্বন্ধই বিনোদ মনে মনেও রাখিতে চায় না একমাত্র বোনটি ছাড়া।

সুদেষ্ণা মুখ টিপিয়া হাসিতেছে, সে দাদাকে চেনে। করুণা উত্তরের অপেক্ষায় আছে। বিনোদ দুই জনের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া সুদেষ্ণার এলোচুলের একটা গোছা আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে বলিল, "আমি গরীব, গরীবের মতই থাকা ভাল, কেমন রে লক্ষ্মী? বেশী যাওয়া আসা করলে কোন দিন করুণা বলে বসবে ঐরকম রূপোর বাসন চাই। তখন?"

তিন জনেই হাসিয়া উঠিল। বিনোদ বলিল, "ঠাট্টা নয়, করুণা গেলে ছেলে-পিলেরাও যাবে, তাদের পিসীর বাড়ী। দেখে দেখে মায়ের সঙ্গে পিসীর তুলনা আপনিই তাদের মনে উঠবে, তখন ওরা হবে অসুখী, দুরাকাঙ্ক্ষী। কে জানে লোভও হতে পারে! তাহলে দেখ কষ্টটা অনিষ্ট?"

সুদেষ্ণা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আমি তোমার বোন নই? ওরা তোমারই ছেলে-মেয়ে নয়? কাকেও তুমি চেন না—না? কি যে বল দাদা?"

"ঠিকই বলি রে, ভেবে দেখ, চটিস্‌নে। তুই আমারই বোন, তোকে আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু ছোট ছেলেদের সামনে লোভের জাল খুলে ধরতে নেই—চোরের ছেলে হয় সাধু, সাধুর ছেলে হয় চোর। কে কি হবে কে জানে? তাই যতটা সম্ভব সাবধান থাকতে হয়, তার পরে অদৃষ্ট।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুদেষ্ণা বলিল, "সে তুমি যা ভাল বোঝ করো; কিন্তু দিদি তোমায় খুব ভাল বলে জানেন।"

বিনোদ হাসিয়া বলিল, "ঐ যে সেরেছে! দূরে আছি তাই ভাল, কাছে গেলেই উল্টো হবে। আসল কথাটা কি জানিস, ধনীতে-গরীবে মেশে না, তেলে-জলের মতন।"

সুদেষ্ণা হাসিয়া বলিল, "যাও, ওসব কোন কাজের কথা নয়, আমি গরীব নই? আমি কি মিশি নি?"

"না, তুই মিশিসনি—পদ্মপাতার মতন ভেসে আছিস। মিশে যাস এখানে এসে।"

অবাক্ হইয়া সুদেষ্ণা বলিল, "কই আমি কিছু বুঝতে পারি নে?"

"দরকার হলে বুঝতে পারবি। মনে করিস দিদি দেখেছিল, হয় তো কিছুই মনে হয় না, এমনি সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু গোড়ায় ঠিক আছে, সে আমি বুঝি।"

সেলাই ভুলিয়া মুখ তুলিয়া, পুঁতি-জরি ফেলিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুদেষ্ণা বিষম ভাবনায় পড়িয়া গিয়াছে—সে আবার কি ব্যাপার? পদ্মপাতার মতন ভাসিয়া আছে না কি?

করুণা অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, "তোমার ওসব হেঁয়ালী কথা রাখ—এবার লক্ষ্মণের শ্বশুর-শাশুড়ী এলে আমি কিন্তু নিশ্চয় একদিন যাব।"

"তা যেয়ো" বলিয়া বিনোদ সুদেষ্ণার দিকে চাহিল। করুণা বলিল, "তুমি কি সব মাথামুণ্ডু বলে ওর ভাবনা ধরিয়ে দিলে।"

বিনোদ হাসিয়া বাঁ হাত বাড়াইয়া সুদেষ্ণাকে নিজের কাছে টানিয়া লইল, বলিল, "ও ছেলেবেলা থেকেই অমনি; ভাবতে বসলে ওর পাত্তা পাওয়া মুস্‌কিল। নে, অত ভাবনার কিছু নেই।"

তার পরে তার মাথার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল, "পাগলীটা চির কালই পাগলী রয়ে গেল, এই রকম করে তুই শ্বশুর-ঘর করিস না কি?"

সুদেষ্ণার চোখ মুখ হইতে ঘন চিন্তার ছায়া সরিয়া গেল। বিনোদের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি বললে?"

"বললাম এই রকম করে শ্বশুর-ঘর করিস? তোকে বুঝি কেউই ভালবাসে না?"

করুণা বলিল, "বাসে না বই কি, এমন পাগলা বৌকে কে ভালবাসবে? সুসীমার কথা শুনিস্ নি? ছিরে হতে না হতে নিজের পয়সাকড়ি সব বুঝে নিয়েছে।"

সুদেষ্ণা বিস্মিত হইয়া বলিল, "সত্যি?"

"হাঁ, খাঁটি মেম-সাহেব হয়ে উঠেছে শুনলাম—মিস্তির-বাড়ীর মেয়েদের মতন! বিয়ের পরে ঢাকার স্কুলে পড়ে ম্যাট্রিক দিয়েছিল তা ফেল করেছে।"

সাগ্রহে সুদেষ্ণা বলিল, "আসে না এখানে? বড্ড দেখতে ইচ্ছে হয় দাদা।"

"সে তোর মতন নয়, বেশ বুদ্ধিমতী। শ্বশুর-বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদন করে ফেলেছে।"

সুদেষ্ণা হাসিয়া বলিল, "সেইটে বুঝি খুব বুদ্ধির কাজ?"

"এ কালে তাই। করুণাটা বোকা। ও খুড়ীমার জন্যে অস্থির; বলে, 'তিনি থাকতে কেন আমি একা থাকব'?"

করুণা বলিল, "সুসীমা সেই বিয়ের আগে গেছে আর আসে নি। বড়দিরা ঐখানেই রয়ে গেলেন দেশের বাস তুলে দিয়ে।" [ ক্রমশঃ

# মেরামৎ

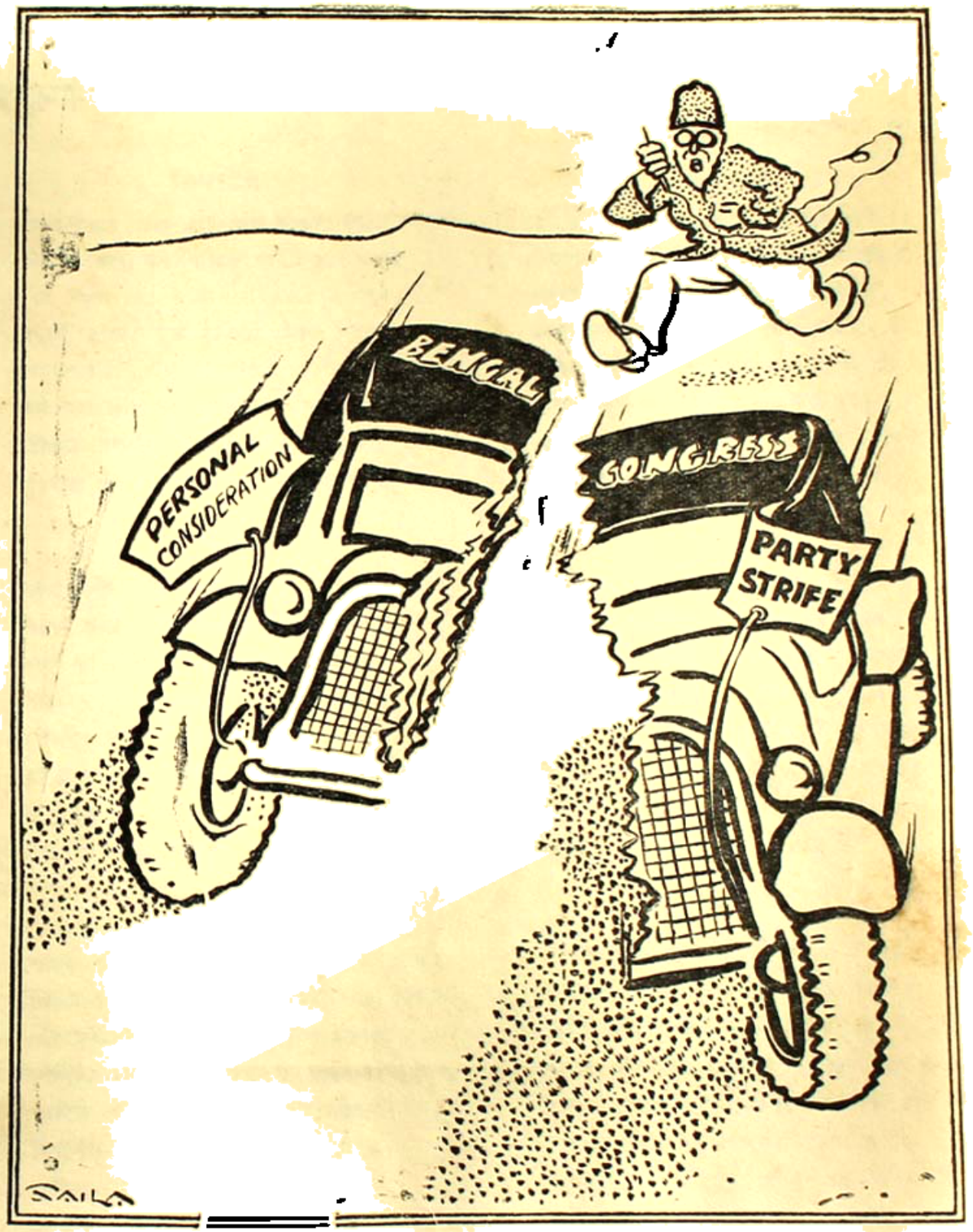


কিছুদিন আগে কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আজাদ ঘোষণা করেন যে, বাঙ্গালা দেশের কংগ্রেসের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য দায়ী ব্যক্তিগত রেষারেষি ( personal consideration ) ও দলাদলি ( party strifes ), তিনি এই অবস্থা মেরামত করিতে চাহেন।

# ঋতুচক্র

—শ্রীমণীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ

## নিদাঘে

রাতুল চরণে মাঃ নমে কবি বহুরূপা বঙ্গ।
মেখালি বৈচিত্র্যী রূপ গৈরিকে আবরি শ্যাম অঙ্গ॥
যুগল নয়নে জ্যোতি দীপ্যমান রৌদ্র হুতাশন।
মুখে হোমের কুণ্ড নাউঘাট উজল তপন॥
বেদাম্বেষে দিষ্ট শান্ত সান্ধ্যানিলে এলায়ে কুন্তল।
অল অল শ্যাম তনু চন্দ্রালোকে করে ঝলমল॥
দিবসের তপ্তদেহ অবগাহি শুভ্র জ্যোছনায়।
পুতধারা ঝর্ ঝর্ ঝরে অঙ্গে লাবণ্য প্রভায়॥

## বর্ষায়

বর্ষায় নবীনা শ্যামা রূপে রসে দিলে দরশন।
তনুর মালক ঘিরে যৌবনের নব জাগরণ॥
বরষি শান্তির ধারা স্বপ্নে বাঁধ মিলনের ডোর।
নীরব অস্ফুট ভাষা ফুটে উঠে পরশনে তোর॥
যৌবনের উন্মাদনা রোমাঞ্চিত কদম্ব কেশর।
মদির যৌবনরাগে ভরে গেল বক্ষে সরোবর॥
হেরি তোর রূপ কান্তি আত্মহারা মোর শুপ্ত কবি।
স্বরূপের সুষমায় নিরালায় আঁকে রূপ ছবি॥

## শরতে

শরতে শারদ-লক্ষ্মী পুষ্পে পুষ্পে হাসিলে মা হাসি।
কিরীট বাসর-চাপ-কক্ষে কাঁশি-ভরা ধান্য রাশি॥
আলোকিলে দশদিক্ বালারুণ লাবণ্য প্রভায়।
শেফালির মালা গলে দাঁড়ালি মা কানন-সভায়॥
পূজিতে রাতুল পদ সরসীর বাসনা-মুকুল।
বিকশিত মন্দবায়ু ছড়াইছে পরাগ বুকুল॥
শালিক, দোয়েল, টিয়া গায় তব বন্দনার গান।
ধৌত করি রাঙা পদ ছুটে নদী গেয়ে কলতান॥

## হেমন্তে

হেমন্তে মা অন্নপূর্ণা খুলে দিয়ে অন্নের ভাণ্ডার।
বিশ্বের সম্পদ নিয়ে বিশ্বরাণী দাঁড়ালি আমার॥
অঙ্গগন্ধ দেশে দেশে ভরে দিলে পবনে পবনে।
করুণা বরুণা দিয়ে উথলিছে যুগল নয়নে॥
আত্মপর ভেদ নাই খুলে দিলে ভাণ্ডারের দ্বার।
বিশ্বের প্রসন্ন মনে অফুরন্ত অন্ন-ভরা ভাঁড়॥
প্রদেশে প্রদেশে তব বাজে বীণ আহ্বান রাগিণী
অনাহারী দক্ষ শিব দোরে রহে জুড়ি দুই পাণি॥

## শীতে

শীতে যেন বাগেশ্বরী যোগাসনে রত তপস্যায়।
কৈলাসের তমোমাঝে নিরালায় শান্ত তন্দ্রিমায়॥
নিশির শিশির-স্নাতা হিমকণা পীবর উরসে।
মার কত রূপছটি অরুণের করুণ পরশে॥
তামস আরতি লয়ে ঘিরে ঘিরে করে প্রদক্ষিণ।
উগারিছে কৃষ্ণ-ধূম চারুমুখ হয়েছে মলিন॥
বঙ্গেশ্বরী রূপ রসে আপনারে দেখিবার তরে।
বহুরূপে সেজেছ মা রূপময়ী প্রকৃতির ঘরে॥

## বসন্তে

বসন্তে সেজেছ শ্যামা রূপরাণী বিশ্বের কিশোরী।
অশোক কিংশুক বলে বিকশিয়া হাসের লহরী॥
কূজিত কোকিল কণ্ঠে অফুরন্ত অমিয় বরষ।
দক্ষিণ মলয়ানিলে রোমাঞ্চিত আকুল পরশ॥
পল্লব হিন্দোলে দোলে ফলে ফুলে কত নর্ম্ম দোলা।
বৃন্দাবনে কিশোরীর রূপরসে যেন মর্ম্মভোলা॥
মধুপ গুঞ্জনে বাজে ছন্দে ছন্দে বসন্তের বীণ্।
রহস্যের ভাবাবেশে আত্মহারা রয়েছ বিলীন॥

# শিবপুরের কথা

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

এদিকের পাঠ শেষ করিয়া ওদিকের পাঠ আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে যখন আমরা সেকালের শিবপুর কলেজে প্রবেশ করিলাম, তখন তত্রত্য ডাক্তার সাহেব আমাদের প্রশ্ন করিলেন যে, বোর্ডিং-এর খাতায় কোন্ পর্য্যায়ে আমরা নাম লেখাইতে ইচ্ছা করি। প্রশ্ন সম্যক্ বোধগম্য না হওয়ায় আমাদের নিকট পর্য্যায় কয়টির উল্লেখ করা হইল। পর্য্যায় হইতেছে প্রধানতঃ দুইটি: আমিষ ও নিরামিষ। ইহার প্রত্যেকটির মধ্যে দুইটি করিয়া উপপর্য্যায় আছে। যথা আমিষ হইতেছে দ্বিবিধ:—meat without onion ও meat with onion। আর নিরামিষও দুই প্রকার: total-নিরামিষ এবং fish-নিরামিষ! Fish-'নিরামিষ' শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, কিন্তু ক্রমে তাহাও বুঝিতে পারিলাম! সপ্তাহে একদিন (বৃহস্পতিবার) মাংস দেওয়া হয়, সেই মাংসকে কেন্দ্র করিয়া এই পর্য্যায়-দুইটির প্রচলিত হইয়াছে। Meat-dayতে যাহারা মাংস না খাইয়া একবাটি মাছের কালিয়া খাইবে, তাহারাও নিরামিষ এবং তাহারাই fish-নিরামিষ, আর যাহারা সে দিন মাংসও খাইবে না, মাছের কালিয়াও খাইবে না, তাহারাই হইতেছে 'total'! প্রত্যহ বোধহয় এক টুকরা মাছ খাইবে, অথচ সেই দিন একবাটি মাছের কালিয়া খাইবে না এমন মূর্খ কে আছে? অনেক আছে, কারণ total হইলে একবাটি রাবড়ি পাওয়া যাইবে, রাবড়ি অতি সুখাদ্য। নাম লিখাইতে গিয়া বড়ই বিপদে পড়িয়া গেলাম, কোনটাই বাদ দিতে ইচ্ছা করে না। তখন শুনিলাম ব্যবস্থা চিরদিনের জন্য নহে, মাত্র একমাসের জন্য। অর্থাৎ প্রতিমাসে আমরা একবার করিয়া পর্য্যায় নির্ব্বাচনের অধিকার পাইব। বোর্ডিংএর পর্য্যায়ের সহিত আন্তরিক বিশ্বাস বা সামাজিক মতামতের কোন সম্পর্ক নাই। এ মাসের total অন্য মাসে fish-নিরামিষ কেন, meat with onion হইবার পক্ষেও কোন বাধা বা লজ্জা নাই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া খেয়ালমত যে যাহাতে ইচ্ছা নাম লিখাইলাম।

এই গুরুতর প্রশ্ন সমাধান করিতে না করিতে অপর এক প্রশ্ন সমুত্থাপিত হইল—'আমরা কে কে একাদশী করিব?' যাহারা বিশ্বকর্ম্মার চেলা হইবার জন্য শিকালাভ করিতে গিয়াছে, তাহারা বিধবাও নহে বা কীর্ণজীবী রোগীও নহে, তবে একাদশী করিবে কে? করিল অনেকে; কারণ একাদশীর দিন মধ্যাহ্নে উপবাস করিলে চাহিতে লুচি ইত্যাদি পাওয়া যায়, আর আহার্য্য-পর্য্যায়ে লুচির স্থান যে ভাতের অনেক উর্দ্ধে তাহাতে সন্দেহ নাই। একাদশী সমস্যার প্রশ্ন দাঁড়াইল এই—দুইবার ভাত, না একবার লুচি। অনেকে স্থির করিল, একবার লুচিই শ্রেয়ঃ; সুতরাং একাদশীও অনেকে করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য এই নির্ব্বাচনও ভোক্তার ইচ্ছানুসারে মাসে মাসে পরিবর্ত্তন-সাপেক্ষ।

আমিষ-নিরামিষ সম্পর্কে দেখিলাম যে, বাস্তবক্ষেত্রে কপি, মটরশুটি ও মৎস্য-মাংস লইয়া মোটেই বিরোধ নাই, কিন্তু onion লইয়া মারামারি পর্য্যন্ত হইতে পারে। যাহারা with onion তাহাদের অনেকে withoutকে একেবারেই সহ্য করিতে পারিত না, আর প্রকৃত withoutরা যে withএর গন্ধ বরদাস্ত করিতে পারিবে না ইহা স্বতঃসিদ্ধ। একবার জরীপ শিক্ষা করিবার জন্য সুদূর মফস্বলে আমাদের কয়েক-জনকে তাঁবুর মধ্যে থাকিতে হইয়াছিল। সেখানে অধিকাংশ লোকই without onion হওয়ায় এবং উভয়বিধ মাংস পাক করিবার সময় ও পাত্রের অভাব ঘটায় সে দিনের মাংস 'without onion' হইবে ইহাই স্থির হয়। With onion-এর দলপতি মনের দুঃখে সেদিন আর জরীপ করিতে মাঠে গেল না। অপরাহ্ণে ক্যাম্পে ফিরিয়া দেখিলাম যে, অদূরবর্ত্তী অর্জ্জুনবৃক্ষতলে বসিয়া ক্ষুব্ধ দলপতি বধ্য মেষটিকে একটি একটি করিয়া পলাণ্ডু খাওয়াইতেছে। সবিস্ময় প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল যে, প্রাতঃকাল হইতে এই প্রক্রিয়া চলিতেছে এবং আশা করা হইতেছে ইহার কিছু ফল রন্ধনের পরও পাওয়া যাইতে পারে। Without onion-এর দলপতি রুষ্ট হইয়া উঠিলেন; কিন্তু মাংসে পলাণ্ডু দেওয়া হইবে না বলিয়া জেদার পেয়াজ

খাইতে পাইবে না—এ যুক্তি টিঁকিল না। সেই with onion-এর দলপতি সর্ব্বশেষ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া কর্ণকেত্রে এ যাবৎ নিজের ও আমাদের মুখোজ্জ্বল করিয়া আসিতেছেন। এখন কিন্তু তিনি total.

দেখা গেল 'একাদশী' লইয়া প্রতি একাদশীতেই কিছু গোলমালের সৃষ্টি হয়। অনেকাদেশীর মধ্যে মধ্যাহ্ন-ভোজনে যাহাদের অপেক্ষাকৃত বেশী ক্ষুধা হইত, তাহারা ভোজনাগারে গিয়া প্রায়ই খাইতে পাইত না, পাচক বলিত—"'একাদশী'তে খানা খাইয়াছে।" পাঁচ শত শিক্ষার্থীর মধ্যে কে 'একাদশী', কে 'একাদশী' নয় তাহা খাতায় লেখা থাকে, যাহারও গায়ে লেখা থাকে না। সুতরাং আটটা বাজিবামাত্র নির্দ্দিষ্টসংখ্যক থালার বরাদ্দ যাহারা আহার সমাধা করিয়া আসিত তাহাদের মধ্যে 'একাদশী' যদি খাইয়া আসে, তবে তাহা নিবারণের কোন উপায় বা চেষ্টা ছিল না। ফলে কেহ কেহ সকাল বেলা উপবাস না করিয়াই রাত্রিতে লুচি-রাবড়ী খাইত, এবং অপরে এ বেলা উপবাস করিয়াও রাত্রিতে ভাত-চচ্চড়ি খাইতে পাইত। যে সব 'একাদশী'তে খানা খাইত, তাহারা নিশ্চয়ই বিশ্বকর্ম্মার কর্ণকেত্রে প্রচুর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

এ সমস্তই সে কালের কথা। তোন্ বিধি অনুযায়ী fish যে নিরামিষ হইতে পারে, সে প্রশ্ন ইতিমধ্যে আর মনে উদিতও হয় নাই। এখন শুনিতেছি এই প্রশ্ন সমাধানের উপর ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে এবং পুনরায় 'একাদশী'তে খানা খাইবার উপক্রম করিতেছে।

ইউরোপ খণ্ডের খৃষ্টান জাতিবৃন্দ চিরদিন মাংসাশী, আর ভারতবর্ষে অনেকে মাছ-মাংস স্পর্শ করে না ইহা সর্ব্বজন-বিদিত। পশ্চিমের দৃষ্টান্তে ভারতেও মাংসাশীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। বাঙ্গালী চিরকাল মাছের ভক্ত, তাহারা মাছের সহিত মাংসের বরাদ্দ বাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কারণ মাংসের প্রতি অবজ্ঞা বশতঃ নাকি ভারত পরাধীন। জার্ম্মানি, ইতালী প্রভৃতি যেন যখন বলিতেছে, মাংস 'with onion' হওয়া চাই, তখন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ঘোষণা করিতে লাগিল 'meat without onion' হইতেছে আমাদের আদর্শ। এমন সময় গান্ধীজী বলিলেন, "total" নিরামিষ না হইলে ভারতের, তথা সমগ্র জগতের, উদ্ধার নাই। 'Total'-এর আদর্শ ভারতীয় কংগ্রেস স্বীকার করিয়া লইল এবং চোখ-কান বুঁজিয়া তাহারই সাধনায় প্রবৃত্ত হইল, যাহাতে meat-day উপস্থিত হইলে নিশাযোগে রাবড়ী মিলিয়া যায়। ক্রমে meat-day সমুপস্থিত হইল, অর্থাৎ ইউরোপে মহাযুদ্ধ বাধিয়া গেল। এই খণ্ডপ্রলয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া গান্ধীজী ঘোষণা করিলেন সমগ্র জগৎকে ভারতের ন্যায় total হইতে হইবে। কংগ্রেসও বলিল, মহাত্মাই আমাদের সেনাপতি, আমরা তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া total-এর জন্য প্রাণপণ করিলাম। সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলাম।

কিন্তু ওদিকে with onion ও without onion-এর মহাসমর ঘনঘোর হইয়া উঠিলে দেখা গেল, পলাণ্ডুর ফাঁকে সমগ্র ইউরোপ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। সমগ্র ইংরাজ জাতিকে সম্বোধন করিয়া 'মহাত্মা' উপদেশ দিলেন, with onion ও without onion-এ যুদ্ধ হইতে থাকিলে যে-পক্ষেরই জয়লাভ হউক পাইবে সেই মাংসেরই জয়; সুতরাং তোমরা total হও, পলাণ্ডু মাংসের অভাবে আপন কৃতিত্ব প্রদর্শনের সুযোগ পাইবে না এবং নিজের অজ্ঞাতে উপলব্ধি করিয়া total হইয়া পড়িবে, কারণ পলাণ্ডু আসলে total। ইংরাজ দ্বীপপ্রধান দেশের অধিবাসী, মাংস ছাড়িতে পারে না। এদিকে 'মহাত্মা'র total শিষ্যসমূহও রাবড়ী না পাইয়া সন্দেহাকুল হইয়াছে। Without onion-এর সহিত মিত্রতার অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু with onion হিটলার বা মুসোলিনী যদি পলাণ্ডু বর্ষণ করিতে করিতে ভারতাভিমুখে অগ্রসর হয় তখনও কি total তাহার আক্রিকা করিতে পারিবে? 'মহাত্মা' বলিলেন, নিশ্চয়ই—সেই মহাপরীক্ষার দিনই তো total-এর পূর্ণ-পরিচয় দিবার মহাসুযোগ উপস্থিত হইবে। শিষ্যপ্রবর রাজাজী বলিলেন, সম্ভব মনে হয় না এবং সে পরীক্ষাও অনাবশ্যক; আমরা আমাদের এতাবৎ-অনুসৃত পথ হইতে ইঞ্চিমাত্র বিচ্যুত না হইয়াই অন্য পথ অবলম্বন করিব। 'মহাত্মা' বলিলেন, তবে কি তোমরা আর দশ বৎসর নিরামিষের সাধনা করিয়া অবশেষে ভারতকে মাংসভোজনে প্রবৃত্তি দিবে? রাজাজী হাসিয়া উত্তর দিলেন, মোটেই নয়, আমরা ঘরে পূর্ব্বের ন্যায় নিরামিষই খাইব, কেবল বহিঃশত্রু আসিলে, বাহিরে fish হইবে; এখন হইতে ভারতকে fish-নিরামিষ মন্ত্রে দীক্ষিত করিব। আপনি একান্ত বুদ্ধ ও অহিংসাবিকৃতবুদ্ধি হইয়াছেন—fish যে নিরামিষ সে কথাটি উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।

'মহাত্মা' না বুঝিলেও আমরা সকলেই বুঝিলাম with onion ও without onion-এর মহাসমরের উপস্থিত অবস্থায় fish-নিরামিষ হইয়া থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য্য, সুতরাং আমরা এখন 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' বকের ন্যায় fish-নিরামিষ হইয়া বসিয়া আছি। আশা এই—মহাসিন্ধুর ওপারের নানা গোলযোগে নানা রঙের স্বাধীনতা নরিয়া এপারে ভাসিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, খাঁটি সাদা-রঙের জীবিত স্বাধীনতা যখনই আমাদের অধিগত হইবে অমনি আমরা অনায়াসে চঞ্চুপুটে ধরিয়া তাহাকে উদরস্থ করিব। ধরিবার সময় ধরিব fish, ছাড়ন করিয়া তাহাকে করিব নিরামিষ। সুতরাং জয়, fish-নিরামিষের জয়!

কেবল আশঙ্কার কথা এই—সেই শুভদিন সমাগত হইবার পূর্ব্বেই যদি 'একাদশী'তে খানা খাইয়া বসি, তবে সন্ধ্যাবেলায় লুচ্চালুচ্চের একটা গৃহবিবাদ বাধিয়া যাইতে পারে। আমাদের শিবপুর বোর্ডিং-এ একবার এই প্রকার গৃহবিবাদ ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে পড়ে।

---

## মাতোয়ালী মীরা !!

এই ছবিখানি এ সপ্তাহে একযে কলিকাতা, ম্যাজেষ্টিক টকীতে, বালীগঞ্জ, আলেয়া সিনেমায় ও পাটনা, এলফিনষ্টোন সিক্সটার প্যালেসে দেখানর ব্যবস্থা হইয়াছে দেখিয়া আমরা উক্ত ছবির পরিবেশক মেসার্স এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটার্সকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এ ছবির বিশেষত্ব—মুক্তার বেগমের প্রাণঢালা মনমাতান কীর্ত্তন! শুধু এই গানগুলি শোনার জন্য ছবিখানি বারবার দেখতে ইচ্ছে হয়! সত্যিকার আনন্দ এ ছবিতে আছে !!


# বাঙ্গালার মিলই বাঙ্গালীর বস্ত্র যোগাইবে—

মিল—বেলঘরিয়া

হেড অফিস—৭৪।৫, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

মিলের নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে।
সমস্ত প্রয়োজনীয় মেশিনারী মিলে
পৌঁছিয়াছে এবং মেশিনারী বসাইবার কার্য্য
দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

শীঘ্রই
বস্ত্র বয়ন
আরম্ভ হইবে।

# হিন্দুস্থান কটন মিলস্ লিমিটেড্

অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য উচ্চ কমিশনে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক।
বিস্তারিত বিবরণের জন্য সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করুন।

[ শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

"লক্ষ্মীরূপং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

# নবশক্তি

অগ্রহায়ণ ১৩৪৭
৮ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—৫ম সংখ্যা

## সম্পাদকীয়

— শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

# বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা ও আধুনিক বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা (৬)

### কোন্ বিজ্ঞানে জাতীয় জীবনের সমস্যার সমাধান সর্ব্বতোভাবে সম্ভবযোগ্য ?

যৌবনগত সমস্যার সমাধান করিতে হইলে 'যৌবনগত সমস্যা' কাহাকে বলে তাহা আগে বুঝিয়া লইতে হইবে। যৌবনগত সমস্যা কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে হইলে যৌবনের বৈশিষ্ট্য কি কি তাহার একটা ধারণা থাকা দরকার।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে পাঁচটী কাল-বিভাগ আছে, যথা—(১) বাল্য, (২) কৈশোর, (৩) যৌবন, (৪) প্রৌঢ়ত্ব ও (৫) বার্দ্ধক্য। মানুষের জীবনের এই পাঁচটী কালের মধ্যে যৌবনের কি কি বৈশিষ্ট্য তাহা লক্ষ্য করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও শরীরের প্রত্যেক অংশের কার্য্য-শক্তির প্রখরতা, রসের আধিক্য ও ভাব-প্রবণতার প্রবলতা প্রত্যেক ব্যক্তির যৌবনের বৈশিষ্ট্য। সমস্ত ব্যক্তির অথবা কোন দুইটী ব্যক্তির কর্ম্ম-শক্তি অথবা রসের পরিমাণ অথবা ভাব-প্রবণতার প্রবলতা কখনও একরূপ হয় না বটে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্ব স্ব জীবনের বাল্য, কৈশোর, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্যের তুলনায় যৌবনেই যে কর্ম্ম-শক্তি, রস ও ভাব-প্রবণতা

আতিশয্য লাভ করে তাহা একটু লক্ষ্য করিলেই অনুভব করা যাইবে।

কর্ম্ম-শক্তি, রস ও ভাব-প্রবণতার আতিশয্য মানুষের জীবনের সাফল্য পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। উহারা (অর্থাৎ কর্ম্ম-শক্তি, রস ও ভাব-প্রবণতার আতিশয্য) মানুষের জীবনের সাফল্য পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু ঐ আতিশয্যকে সংযত করিয়া মানুষের কাযে লাগাইতে না পারিলে ঐ আতিশয্যই মানুষকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তোলে এবং মানুষের যৌবন অতি দ্রুতবেগে নষ্ট হইয়া মানুষ অকালে বার্দ্ধক্য লাভ করে। কাযেই বলিতে হইবে যে, মানুষের যৌবনগত সমস্যা দুইটী, যথা :—

(১) মানুষের কর্ম্ম-শক্তি, রস ও ভাবপ্রবণতা যাহাতে অসংযতভা ও উচ্ছৃঙ্খলতা লাভ না করে তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করা।

(২) মানুষ যাহাতে অকালে বার্দ্ধক্য লাভ না করে তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করা।

মানুষের যৌবনগত সমস্যার সমাধান মনুষ্যসমাজকে সুশৃঙ্খলিত ও সুচারুভাবে পরিচালনা পক্ষে যে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ মানুষ যাহাতে অকালবার্দ্ধক্যে নিপতিত না হয় তাহা না করিতে পারিলে সমাজ-মধ্যে বহুদর্শী মানুষের উদ্ভব হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। এবং বহুদর্শী মানুষের উদ্ভব না হইলে—কি করিলে সমাজের হিত হইতে পারে, অথবা কি করিলে সমাজের অধিকাংশের অহিত হয় তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান কালে যৌবনগত সমস্যার সমাধান প্রায়শঃ হয় না বলিয়া সমগ্র মনুষ্যসমাজে বহুদর্শী ও দূরদর্শী মানুষের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে এবং মানুষ নানাবিধ দুঃখে কাতর হইতেছে।

কি করিলে মানুষের যৌবনগত সমস্যা দুইটী তিরোহিত হইতে পারে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, যৌবনগত সমস্যা দুইটীর সমাধান করিবার উপায় চারিটী, যথা :—

(১) অর্থগত সমস্যার সমাধান ;

(২) স্বাস্থ্যগত সমস্যার সমাধান ;

(৩) মন-গত সমস্যার সমাধান ;

(৪) যে শিক্ষা ও সাধনায় মানুষের কর্ম্ম-শক্তি, রস ও ভাবপ্রবণতা কোথা হইতে আইসে এবং কিরূপে উহা বিকৃত হয় তাহা উপলব্ধি করা যায় সেই শিক্ষা ও সাধনার আশ্রয় লওয়া।

অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে অর্থ-গত সমস্যা, স্বাস্থ্য-গত সমস্যা ও মন-গত সমস্যার সমাধান হইলে আপনা হইতেই যৌবন-গত সমস্যার সমাধান হইয়া যাইতে পারে। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে এই ধারণা ভ্রমাত্মক নহে। অর্থ-গত সমস্যার সমাধান না হইলে যেরূপ স্বাস্থ্য-গত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় না, অথচ অর্থ-গত সমস্যার সমাধান হইলেই যেরূপ স্বাস্থ্য-গত সমস্যার সমাধান হয় না, পরন্তু স্বাস্থ্য-গত সমস্যার সমাধান করিতে হইলে অর্থ-গত সমস্যার সমাধান করিবার পরেও অন্য কিছু সাধনার প্রয়োজন হয়, অর্থ-গত ও স্বাস্থ্য-গত সমস্যার সমাধান না হইলে যেরূপ কোন ক্রমেই মন-গত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় না, অথচ অর্থ-গত ও স্বাস্থ্য-গত সমস্যার সমাধান হইলেই যেরূপ মন-গত সমস্যার সমাধান হয় না, পরন্তু মন-গত সমস্যার সমাধান করিতে হইলে স্বাস্থ্য-গত সমস্যার সমাধান করিবার পরেও যেরূপ অন্য কিছু সাধনার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ অর্থ-গত, স্বাস্থ্য-গত ও মন-গত সমস্যার সমাধান না হইলে যৌবন-গত সমস্যার সমাধান করা কখনও সম্ভব হয় না, অথচ অর্থ-গত অথবা স্বাস্থ্য-গত অথবা মন-গত সমস্যার সমাধান হইলেই যৌবন-গত সমস্যার সমাধান করা হয় না, পরন্তু যৌবন-গত সমস্যার সমাধান করিতে হইলে যথাক্রমে অর্থ-গত, স্বাস্থ্য-গত ও মন-গত সমস্যা সমাধান করিবার পর শিক্ষা ও সাধনাবিশেষের আশ্রয় লইতে হয়। আগেই বলিয়াছি যে, যে-শিক্ষা ও সাধনায় মানুষের কর্ম্ম-শক্তি, রস ও ভাবপ্রবণতা কোথা হইতে আইসে এবং কিরূপে উহা বিকৃত হয় তাহা উপলব্ধি করা যায় সেই শিক্ষা ও সাধনার আশ্রয় লইলে যৌবন-গত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইতে পারে।

এক্ষণে দুইটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, যথা :—

(১) মানুষের কর্ম্ম-শক্তি, রস-ভাণ্ডার ও ভাবপ্রবণতা কোথা হইতে আইসে ?

(২) কোন্ শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা যেখান হইতে ও যেরূপে মানুষের কর্ম-শক্তি, রস-ভাণ্ডার ও ভাব-প্রবণতা আসিয়া থাকে সেইখানের ও সেই রূপের উপলব্ধি করা সম্ভব হইতে পারে?

মানুষের মন-গত সমস্যার সমাধান করিতে হইলে অর্থাৎ মনের অশান্তি সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে হইলে যেরূপ প্রথমতঃ মনটী কি বস্তু, তাহা শাস্ত্র-অনুশীলনের দ্বারা অনুমান করিতে হয় এবং তাহার পর দ্বিতীয়তঃ যে শিক্ষা ও সাধনায় উহা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় সেই শিক্ষা ও সাধনার আশ্রয় লইতে হয়, সেইরূপ যৌবন-গত সমস্যার সমাধান করিতে হইলে অর্থাৎ যাহাতে যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা না আইসে এবং যাহাতে অকাল-বার্দ্ধক্যে নিপেষিত না হইতে হয় তাহা সর্ব্বতোভাবে করিতে হইলে প্রথমতঃ যথাক্রমে অর্থ-গত সমস্যা, স্বাস্থ্য-গত সমস্যা ও মন-গত সমস্যার সমাধান করিয়া লইতে হয়; তাহার পর দ্বিতীয়তঃ মানুষের কর্ম-শক্তি, রস-ভাণ্ডার ও ভাব-প্রবণতা যেখান হইতে ও যেরূপে আইসে শাস্ত্রালোচনার দ্বারা সেইখানের ও সেইরূপের অনুমান করিতে হয় এবং সর্ব্বশেষে যে শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা ঐ স্থান ও ঐ রূপের উপলব্ধি করা সম্ভব হয় সেই শিক্ষা ও সাধনার আশ্রয় লইতে হয়।

মানুষ তাহার কর্ম-শক্তি, রস ও ভাবপ্রবণতা কোথা হইতে লাভ করে তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে উহাদের (অর্থাৎ মানুষের কর্ম-শক্তি, রস ও ভাব-প্রবণতার) অবস্থান মূলতঃ তিনটী, যথা :—

(১) মানুষের শরীর-মণ্ডলস্থ (অর্থাৎ মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্ম মধ্যস্থিত) বায়ু, তেজ ও রস।

(২) মানুষের অবয়ব মধ্যস্থিত আকাশ-মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও রস।

(৩) বহিঃস্থিত আকাশ-মণ্ডলের বায়ু তেজ ও রস।

শরীর-মণ্ডল, অবয়ব মধ্যস্থিত আকাশ-মণ্ডল এবং বহিঃস্থিত আকাশ-মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও রসই যে মানুষের কর্ম-শক্তি, রস ও ভাবপ্রবণতার মূল কারণ—তাহা একটু চিন্তা করিলেই অনুমান করা যাইবে। শরীর-মণ্ডল, অবয়ব-মধ্যস্থিত আকাশ-মণ্ডল এবং বহিঃস্থিত আকাশ-মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও রস যাহাতে কুপিত অথবা অবসন্নতা প্রাপ্ত না হয় তাহা করিতে পারিলেই যৌবনগত সমস্যা সর্ব্বতোভাবে বিরোহিত হইতে পারে অর্থাৎ যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অকালবার্দ্ধক্যের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।

শরীর-মণ্ডল, অবয়ব মধ্যস্থিত আকাশ-মণ্ডল এবং বহিঃস্থিত আকাশ-মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও রস যাহাতে কুপিত অথবা অবসন্নতা প্রাপ্ত না হয় তাহা করিতে হইলে ঐ বায়ু, তেজ ও রস কেন অথবা কোন্ অবস্থায় কুপিত অথবা অবসন্নতা প্রাপ্ত হয় তাহা জানিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, শরীর-মণ্ডলস্থ ও অবয়ব মধ্যস্থিত আকাশ-মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও রসের কুপিত ও অবসন্নতা প্রাপ্ত হইবার কারণ—সাধারণতঃ একটী মাত্র, আর বহিঃস্থিত আকাশ-মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও রসের কুপিত এবং অবসন্নতা প্রাপ্ত হইবার কারণ বহু।

শরীর-মণ্ডলস্থ ও অবয়ব মধ্যস্থিত আকাশ-মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও রসের কুপিত ও অবসন্নতা প্রাপ্ত হইবার কারণ :—

মানুষের স্বকীয় আচার ব্যবহার। উত্তেজক অথবা অবসন্নতা-আনয়ক খাদ্য, পানীয়, গন্ধ, সঙ্গীত ও দৃশ্য এবং দ্বন্দ্ব, কলহ, রাগ ও দ্বেষের প্রবৃত্তি মানুষের শরীর-মণ্ডলস্থ ও অবয়ব মধ্যস্থিত আকাশ-মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও রসকে কুপিত ও অবসন্ন করিয়া থাকে। উপরোক্ত খাদ্য, পানীয়, গন্ধ, সঙ্গীত ও দৃশ্য এবং দ্বন্দ্ব, কলহ, রাগ ও দ্বেষের প্রবৃত্তি সংযত করিতে পারিলেই মানুষের শরীর-মণ্ডলস্থ ও অবয়ব মধ্যস্থিত আকাশ-মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও রসের সমতা সাধন করা সম্ভব হয় এবং তখন মানুষ তাহার যৌবনের স্বাভাবিক উচ্ছৃঙ্খলতার হাত এড়াইতে পারে।

বর্ত্তমানকালে মানুষ তথাকথিত বিজ্ঞান অথবা কু-বিজ্ঞানের প্ররোচনায় খাদ্য, পানীয়, গন্ধ, সঙ্গীত ও দৃশ্য বিষয়ে এবং দ্বন্দ্ব, কলহ, রাগ ও দ্বেষের প্রবৃত্তি বিষয়ে প্রায় সর্ব্বদাই বিপরীত আচরণ করিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে মানুষ সর্ব্বত্রই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে।

খাদ্য ও প্রবৃত্তিমূলক আচার-ব্যবহারে সংযত হইতে পারিলেই শরীর-মণ্ডলস্থ ও অবয়বস্থিত আকাশ-মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও রসের সমতা সাধন করা সম্ভব হয় বটে, এবং শরীর-

মণ্ডলস্থ ও অন্তরস্থ-স্থিত আকাশ-মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও রসের সমতা সাধন করিতে পারিলেই যৌবনের স্বাভাবিক উচ্ছৃঙ্খলতার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বহিঃস্থিত আকাশ-মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও রস যাহাতে অধিক কুপিত অথবা অবসন্নতা প্রাপ্ত না হয় অথবা উহা কুপিত অথবা অবসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া যাহাতে শরীর-মণ্ডলস্থ ও অন্তরস্থ-স্থিত আকাশ মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও রসের সমতা আনয়ন করিতে না পারে তাহা না করিতে পারিলে অকালবার্দ্ধক্যের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয় না।

বহিঃস্থিত আকাশ-মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও রস কেন কুপিত অথবা অবসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার কারণ দুই শ্রেণীর; যথা :—

(১) কু-বিজ্ঞানের কু-সংস্কারে মানুষ নানা রকমের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া থাকে এবং তাহার ফলে বহিঃস্থিত আকাশ-মণ্ডল নানাকেম ভাবে দূষিত হয় এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে উহার (অর্থাৎ বহিঃস্থিত আকাশ-মণ্ডলের) বায়ু, তেজ ও রস কুপিত অথবা অবসন্নতা-প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(২) বহিঃস্থিত আকাশ-মণ্ডলে যে বায়ু, তেজ ও রস বিদ্যমান আছে সেই বায়ু, তেজ ও রসের বায়ুত্ব, তেজত্ব ও রসত্বের মূল কারণ—সূর্য্য ও চন্দ্র প্রভৃতি নয়টী গ্রহ; মেষ, বৃষ প্রভৃতি বারটী রাশি এবং অশ্বিনী-ভরণী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র। উপরোক্ত নয়টী গ্রহ, বারটী রাশি এবং সপ্তবিংশতি নক্ষত্র কখনও স্থিতিশীল নহে। উহাদের প্রত্যেকটী সর্ব্বদাই চলনশীল। প্রতি মুহূর্ত্তে উহাদিগের প্রত্যেকের অবস্থান পরিবর্ত্তন লাভ করিতেছে। নয়টী গ্রহ, বারটী রাশি এবং সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অবস্থানের পরিবর্ত্তনের ফলে বহিঃস্থিত আকাশ-মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও রসের স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন আপনা হইতেই প্রতিনিয়ত সংঘটিত হইতেছে। ঐ বায়ু, তেজ ও রস আপনা হইতেই কখনও বা সমতা, কখনও বা কোপনতা আবার কখনও বা অবসন্নতা লাভ করিতেছে।

নয়টী গ্রহ, বারটী রাশি এবং সাতাশটী নক্ষত্রের অবস্থানের পরিবর্ত্তনের ফলে বহিঃস্থিত আকাশ-মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও রসের যে পরিবর্ত্তন অহরহ সাধিত হয় তাহার অন্যথা করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। যদিও ঐ পরিবর্ত্তনের অন্যথা করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে তথাপি মানুষ বহিঃস্থিত আকাশ-মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও রসের কোপনতা ও অবসন্নতা হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া অকালবার্দ্ধক্যের হাত এড়াইতে পারে। যে নয়টী গ্রহ, বারটী রাশি এবং সাতাশটী নক্ষত্রের অবস্থানের পরিবর্ত্তনের ফলে বহিঃস্থিত আকাশ-মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও রস অহরহ বিভিন্ন স্বভাব লাভ করিয়া থাকে, সেই নয়টী গ্রহ, বারটী রাশি এবং সাতাশটী নক্ষত্রের অবস্থানের পরিবর্ত্তন কখনও স্বেচ্ছাচারমূলক হয় না। উহাদিগের প্রত্যেকটীর অবস্থানের পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই সর্ব্বব্যাপী একটা কঠোর নিয়মানুসারে চলিয়া থাকে। ঐ কঠোর নিয়মটী কি তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিলে, বহিঃস্থিত আকাশ-মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও রস কখন সমতা লাভ করিবে, কখন কোপনতা লাভ করিবে এবং কখন অবসন্নতা লাভ করিবে তাহাও নির্ভুল ভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। বহিঃস্থিত আকাশ-মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও রস প্রাকৃতিক নিয়মে কখন সমতা অথবা কোপনতা অথবা অবসন্নতা লাভ করিবে তাহা নির্ভুল ভাবে জানা থাকিলে তদনুযায়ী মানুষ তাহার শরীর-মণ্ডলস্থ ও অন্তরস্থিত আকাশ-মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও রসের কোপনতা ও অবসন্নতা সংঘটিত করিয়া স্বকীয় কর্ম্মশক্তি, রসভাণ্ডার ও ভাবপ্রবাহের সমতা রক্ষা করিতে পারে। ইহা যে অত্যন্ত দুরূহ তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ইহা দুরূহ হইলেও অসম্ভব নহে।

উপরোক্ত তথ্যগুলিকে ভিত্তি করিয়া ঋষিগণের "জ্যোতীষাং অয়নং" অথবা জ্যোতীষ-শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। ঋষি-প্রণীত এই জ্যোতীষ-শাস্ত্র বহু সহস্র বৎসর হইতে মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে। উহা বহু সহস্র বৎসর হইতে বিস্মৃতির গর্ভে নিপতিত হইলেও উহা যে একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার একটা সংস্কার মোগলদিগের কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল। মোগলসম্রাট বাবর, হুমায়ুন ও আকবর ঋষি-প্রণীত জ্যোতীষ-শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার করিবার জন্য কিরূপ সচেষ্ট ছিলেন এবং কোন্ শ্রেণীর চেষ্টা

করিয়াছিলেন তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে আমাদিগের কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে।

ঋষি-প্রণীত জ্যোতীষ শাস্ত্র যে কোন্ শ্রেণীর তথা পরিপূর্ণ তাহা জানা তো দূরের কথা, উহা যে একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার সংস্কার পর্য্যন্ত আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদগণের নাই। টীকিধারীই হউন আর কোটপেন্টুলান পরিহিতই হউন, ঋষিগণ "গ্রহ", "রাশি" ও "নক্ষত্র" বলিতে যাহা বুঝিতেন তাহা এখন আর কোন জ্যোতির্ব্বিদই বুঝিতে পারেন না।

মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, যৌবন-গত সমস্যা-সমূহের সর্ব্বতোভাবে সমাধান করিবার উপায় দুইটী, যথা—

১। অর্থগত সমস্যার সমাধান।

২। স্বাস্থ্যগত সমস্যার সমাধান।

৩। মন-গত সমস্যার সমাধান।

৪। খাদ্য ও প্রবৃত্তিমূলক আচার-ব্যবহারে সংযত হওয়া এবং শরীর-মণ্ডলস্থ ও অন্তরস্থ আকাশ-মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও রস যাহাতে কুপিত অথবা অবসন্নতা প্রাপ্ত না হয়, পরন্তু সর্ব্বদা সমতা বজায় রাখিতে পারে তদনুরূপ চাল-চলনে অভ্যস্ত হওয়া।

৫। বহিঃস্থিত আকাশ-মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও রস যাহাতে কোনরূপে মানুষের দ্বারা দূষিত না হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

৬। প্রাকৃতিক নিয়মে বহিঃস্থিত আকাশ-মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও রস কখন কুপিত অথবা অবসন্নতা-প্রাপ্ত হইবে তাহা পূর্ব্বাহ্নে পরিজ্ঞাত হওয়া, এবং যখন উহা কুপিত অথবা অবসন্নতা প্রাপ্ত হইবে তখন কি করিলে মানুষ তাহার শরীর-মণ্ডলস্থ অথবা অন্তরস্থিত আকাশ-মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও রসের সমতা বজায় রাখিতে পারিবে তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া এবং তদনুরূপ কার্য্য করা।

উপরোক্ত দুইটী ব্যবস্থার মধ্যে যেটি পঞ্চমোক্ত সেইটীকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভারতীয় ঋষিগণ নৈসর্গিক তেজ-চালিত বেতার ব্যবহার, বাষ্প-ব্যবহার, বৈদ্যুতিক ব্যবহার, এবং স্থল-যান ও আকাশ-যানের ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনে করিয়া থাকেন যে, বেতার, বাষ্প ও বিদ্যুতের ব্যবহার মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডারে তাঁহাদিগের নূতন আবিষ্কার। কিন্তু এই ধারণা তাঁহাদিগের অজ্ঞতা-প্রসূত। দুইটী মীমাংসার সহিত সর্ব্বতোভাবে পরিচিত হইয়া বেদে অভ্যস্ত হইতে পারিলে এবং তাহার পর সংহিতাসমূহের উপদেশ উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঋষি-প্রণীত গ্রন্থে বেতার, বাষ্প ও বিদ্যুৎ সম্বন্ধে যত কথা আছে তাহার সহস্রাংশের একাংশও বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ জানিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ ঐ সমস্ত কথা সম্যক্‌ভাবে জানিতে পারেন নাই বলিয়াই, বেতার, বাষ্প ও বিদ্যুতের অবাধ ব্যবহার মানুষের পক্ষে হিতকারী অথবা অহিতকারী তাহা তাঁহারা সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে পারেন না। ঋষি-প্রণীত গ্রন্থে বেতার, বাষ্প ও বিদ্যুতের জন্ম, সংরক্ষণ, বৃদ্ধি ও ক্ষয় সম্বন্ধে কি কি কথা আছে তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের ঐ ঐ সম্বন্ধীয় কথা আলোচনা করিলে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের কথাগুলি কতকগুলি অজ্ঞ বালকের প্রলাপ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। এবং তখন দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান সভ্যতা ও বিজ্ঞানের নামে যাহা কিছু নূতনাকারে প্রচারিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটী মূলতঃ মানুষের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। শরীর সর্ব্বতোভাবে বিষাক্ত হইলে যেরূপ বিষ-প্রয়োগের দ্বারা বিষের ক্ষয় সাধন করিতে হয় সেইরূপ বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলার অবস্থায় সাময়িকভাবে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের কোন কোন ব্যবহার মানুষের সাময়িক উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় হইয়াছে বটে, কিন্তু স্থায়ীভাবে যাহাতে মানুষের হিত সাধিত হয় তদনুরূপ সমাজের রচনা করিতে হইলে বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও বর্ত্তমান সভ্যতার যাহা কিছু নূতন তাহার প্রত্যেকটী বর্জ্জন করিতে হইবে।

মনে রাখিতে হইবে যে, ঋষি-প্রণীত বিজ্ঞানের বিস্মৃতির জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়ী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত ঋষিগণের অজ্ঞান সন্তানগণ। ইঁহারা বহু সহস্র বৎসর হইতে মনুষ্যসমাজে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছেন এবং ইঁহারা ঋষি-লিখিত গ্রন্থ সমূহ ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া যে যে কথা বলিয়াছেন সেই সমস্ত কথা ঋষিগণের কথা বলিয়া মানুষ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ঋষিগণের গ্রন্থসমূহের ভাষার সহিত পরিচিত হইয়া

মৌলিকভাবে উহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে ভট্ট, আচার্য্য ও মিশ্র প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ প্রকৃতিক পক্ষে ঋষিগণের ভাষার সহিত সম্যক্‌ভাবে পরিচিত ছিলেন না এবং তাঁহাদিগের কেহই ঋষিগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান নির্ভুলভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই।

ঋষিগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান একদিন সমগ্র মানবসমাজ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছিল এবং সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববিধ দুঃখের হাত এড়াইতে পারিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে ঋষিগণের অজ্ঞ ও তথাকথিত ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্থলে কতকগুলি গোঁড়ামী বিলাইয়া গিয়াছেন এবং মনুষ্যসমাজ আর সর্ব্ববিধ দুঃখের হাত হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা পাইবার পন্থার সন্ধান পায় নাই। ইহারই ফলে মনুষ্যসমাজকে বাধ্য হইয়া নূতন নূতন পন্থার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে এবং নূতন নূতন তথাকথিত বিজ্ঞানের আবিষ্কার হইয়াছে। এই নূতন বিজ্ঞান বস্তুতঃ পক্ষে কু-বিজ্ঞান হইলেও ইহার কুফলের জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণকে মূলতঃ দায়ী করা চলে না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের দোষ এই মাত্র যে, ইঁহারা পরম্পরাগ্রাহী ও একদেশদর্শী এবং তদনুসারে ইঁহাদের বিজ্ঞানের কোন ব্যবহার যে মানুষের সর্ব্বতোভাবের হিতপক্ষে নির্ভরযোগ্য নহে তাহা ইঁহারা বুঝিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে মূলতঃ দায়ী ভারতের ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত ঋষিগণের কু-সন্তানগণ—অর্থাৎ যাঁহারা সন্ন্যাসী, তান্ত্রিক, যজ্ঞযাজক, গুরু ও পণ্ডিত নামে এখনও হিন্দু সমাজের শ্রদ্ধা লাভ করিয়া থাকেন তাহাদিগের স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকগণ। মনুষ্য-সমাজের এই ভুল অর্থাৎ এই অন্ধ শ্রদ্ধা যত দিন সর্ব্বতোভাবে বিলুপ্ত না হইবে ততদিন আবার সর্ব্বতোভাবে দুঃখমুক্ত হইবার মত সমাজ সংগঠিত হইবে কি না তদ্বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ আছে।

যৌবনগত সমস্যাসমূহের সর্ব্বতোভাবে সমাধান করিবার জন্য যে ছয়টী পন্থার কথা বলা হইয়াছে তাহার ষষ্ঠোক্ত পন্থাটীকে দৃঢ়মূল করিবার জন্য ঋষিগণ দেব ও দেবীর পূজা সমাজমধ্যে প্রচলন করিয়াছিলেন। প্রাচীন ইতিহাসে যথাযথ ভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, এক দিন সমগ্র মানব-সমাজ দেব-দেবীর পূজা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিল এবং তদ্দ্বারা বহু মানুষেরই শরীর-মণ্ডলস্থ ও অন্তরস্থিত আকাশ-মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও রসের সমতা এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য-শক্তি, রস-ভাণ্ডার ও ভাব-প্রবাহের পূর্ণতাসূচক প্রাচুর্য্য রক্ষা হইত। ফলে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের অনেকেই বহুবিধ দুঃখের হাত এড়াইতে পারিত। যে দেব-দেবীর পূজা এক দিন মনুষ্য-সমাজের এবম্বিধ হিতসাধন করিতে পারিত সেই দেব-দেবীর পূজার আসল বৈজ্ঞানিকতা ও রহস্য বিস্মৃতির গর্ভে লুক্কায়িত হওয়ায় বহু সহস্র বৎসর হইতে মানুষ আর উহার দ্বারা কোন সুফল লাভ করিতে পারে নাই ও পারে না। ইহার ফলে দেব-দেবীর পূজা কতকগুলি গোঁড়ামী-পূর্ণ পুতুল-পূজায় পরিণত হইয়াছে এবং মনুষ্য-সমাজে উহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঢেউয়ের উপর ঢেউ জাগিয়া উঠিয়াছে।

ইহার জন্য কে দায়ী তাহা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, যাঁহারা দেব-দেবীর পূজার বিদ্রোহী, তাঁহারা মূলতঃ ইহার জন্য দায়ী নহেন। পরন্তু ঋষিগণের যে সন্তানগণ ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইয়াও দেব-দেবী পূজার আসল বৈজ্ঞানিকতা ও রহস্য উপলব্ধি করিতে ও তদনুযায়ী লোক-সমাজকে শিক্ষা দিতে অসমর্থ তাঁহারাই এই বিপত্তির জন্য মূলতঃ দায়ী। ইহার কারণ—দেব-দেবী পূজার আসল বৈজ্ঞানিকতা ও রহস্য সমাজমধ্যে প্রচারিত থাকিলে ইহার দ্বারা মনুষ্য-সমাজের অনেকেই কার্য্যতঃ উপকার লাভ করিতে পারিত এবং তখন ইহার সম্বন্ধে কাহারও বিরক্তি অথবা ঔদাসীন্য অথবা বিদ্রোহ উপস্থিত হইতে পারিত না।

ইহার পর আমরা মরণ-গত সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

# কংগ্রেস এবং হিন্দুমহাসভার নেতৃবৃন্দের শিক্ষণীয় বিষয়

উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সাধারণতঃ মনে করিয়া থাকেন, সম্প্রদায় হিসাবেই মুসলমানগণ এমন নিকৃষ্ট যে, তাহাদের সহিত একযোগে মিলিয়া-মিশিয়া কার্য করা সম্ভব নহে; তাহারা নিকৃষ্ট, কেন না নিজেদের ধর্মমত বিষয়ে তাহারা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং গোঁড়া; তাহারা অত্যন্ত কর্মঠ-স্বভাব-বিশিষ্ট, কেন না তাহারা অনাচারী এবং যথোচিত 'আলোকপ্রাপ্ত' নহে; তাহারা অযৌক্তিক, কেন না হিন্দুদিগের তুলনায় অর্দ্ধাংশ 'আলোকপ্রাপ্ত' না হইয়াও হিন্দুদিগের সমান রাজনৈতিক অধিকার তাহারা দাবী করিতেছে; তাহারা অত্যন্ত স্বার্থপর, কেন না রাষ্ট্র এবং বাণিজ্যক্ষেত্রে তাহারা অধিকাংশ চাকুরীর জন্য দাবী উপস্থিত করিতেছে; তাহাদের সহিত বনি-বনা হইতে পারে না, কেন না তাহারা পাকিস্তান-পরিকল্পনার কলরব উত্থাপন করিয়াছে।

আমরা কিন্তু বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করি এবং তাহা প্রকাশে আমাদের দ্বিধা নাই। আমাদিগের মতে মুসলমান-গণকে হিন্দুরা যেরূপ মনে করিয়া থাকেন—তাহার অর্দ্ধাংশ ত্রুটিও তাঁহাদের নাই। এমন কি, আমাদের মতে—তাঁহাদের যদি কোন দোষত্রুটী বর্ত্তমান থাকে, তবে তজ্জন্য তাঁহারা দায়ী নহেন, তজ্জন্য প্রধানতঃ দায়ী সকল বাধা-বিপত্তি রহস্যের উচ্চবর্ণের হিন্দুনেতারা বিদ্যমান, তাঁহারাই।

আমাদিগের এই নির্দ্ধারণের বিষয় সুস্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে মনুষ্য-সমাজের প্রকৃতিসঙ্গত সুশৃঙ্খলা বলিতে কি বুঝা যায়, তাহার আলোচনা করিতে হইবে। মনুষ্য-সমাজের প্রকৃতিসঙ্গত শৃঙ্খলার বিষয়ে আমাদের এই আলোচনা-কালীন আমরা পাঠকদিগকে লক্ষ্য করিতে বলিতেছি যে, প্রকৃতি-বিরোধী অথবা বিকৃত যে ব্যবস্থা—তদ্বিষয়ে কোন আলোচনা আমরা এখানে করিব না। মনুষ্য-সমাজের প্রকৃতিসঙ্গত শৃঙ্খলার বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে, বিকৃত ব্যবস্থা হইতে পৃথক্ এই যে শৃঙ্খলার বিষয় আমরা আলোচনা করিতে যাইতেছি, আমাদিগকে প্রথমতঃ তাহার অর্থ পরিজ্ঞাত হইতে হইবে। "মনুষ্য-সমাজের প্রকৃতিসঙ্গত শৃঙ্খলা" বলিতে,—যে-শৃঙ্খলা সমাজভুক্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তির স্বাভাবিক সামর্থ্যের (অর্থাৎ স্বাভাবিক গুণের) সহিত সামঞ্জস্য-বিশিষ্ট, আমরা তাহারই কথা বুঝাইতে চাহিতেছি। যে-সমাজের সংগঠন তদন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের স্বাভাবিক সামর্থ্যের সহিত সামঞ্জস্য-বিশিষ্ট নহে, তাহাকেই আমরা প্রকৃতিবিরোধী ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করিতেছি। আমাদিগের বক্তব্য অধিকতর সুস্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইলে মনুষ্য-সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি-বৃন্দের স্বাভাবিক সামর্থ্যের শ্রেণীবিভাগ কি, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। মনুষ্য-সমাজের ব্যক্তিবৃন্দ যে-সকল বিভিন্ন সামর্থ্যের অধিকারী, তৎসমূহের পর্য্যালোচনায় আমরা দেখি যে, তন্মধ্যে কেহ কেহ শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্য-সামর্থ্য অপেক্ষা বুদ্ধিসাধ্য কার্য্য-সামর্থ্য লইয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, আবার কেহ কেহ বুদ্ধিসাধ্য কার্য্য অপেক্ষা শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্যে অধিকতর নিপুণ। সুতরাং আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, মনুষ্য সমাজভুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের স্বাভাবিক সামর্থ্য বিবিধ মাত্র: প্রথম শ্রমসাধ্য, দ্বিতীয় বুদ্ধিসাধ্য। বিদ্যালয়ের পাঠার্থীদিগের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলেও তাহাদের কেহ কেহ যে অধিকতর বুদ্ধিসামর্থ্য এবং কেহ কেহ আবার অধিকতর শারীরিক শ্রম-সামর্থ্য লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে। যথোচিত বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দ্বারা এই পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, পাঠার্থীদিগের অনেকে বিভিন্ন ক্রীড়া ইত্যাদিতে স্বাভাবিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছে, কিন্তু কিঞ্চিৎ অধিকক্ষণ পুস্তকপাঠে তাহাদিগকে নিযুক্ত হইবার কথা বলিলে দেখা যাইবে, তাহাতে তাহারা অসমর্থ। অনেক পাঠার্থীর সম্বন্ধে যেরূপ এই কথা খাটে, তেমনই আবার পুস্তকপাঠ নিযুক্ত থাকিবার বিষয়ে অপর অনেককে বিস্ময়কর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে দেখা গেলেও, সকল প্রকার ক্রীড়াতেই তাহারা সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

মূলতঃ বুদ্ধিসাধ্য কর্ম্মে নিপুণ এবং শ্রমসাধ্য কর্ম্মে নিপুণ, এই দ্বিবিধ শ্রেণীতে যেমন মনুষ্যসমাজভুক্ত ব্যক্তিবৃন্দকে স্বভাব-অনুযায়ী বিভাগ করা চলে, তেমনই আবার মনুষ্য-সমাজের সকল প্রকার আর্থিক প্রয়োজন এবং শারীরিক অক্ষমতা প্রভৃতি হইতে রক্ষা করিবার উপযোগী কার্য্যসমূহকেও বুদ্ধিসাধ্য এবং শ্রমসাধ্য, এই দুই ভাগে ভাগ করিতে হইবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃষিকার্য্যকে ধরা যাউক। আমরা সকলেই জানি যে, কৃষিকার্য্যকে সার্থক করিতে হইলে, একদিকে যেরূপ জমীচাষ, নিড়ানো, ফসল কর্ত্তন ইত্যাদির প্রয়োজন, তেমনই অপর দিকে আবার আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন-শীলতা, বিভিন্ন প্রকার শস্যোৎপাদন পক্ষে কোন্ জমী কিংবা কোন্ আবহাওয়া সমধিক উপযোগী, ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞানেরও প্রয়োজন। বলাই বাহুল্য যে, উপরিনির্দ্দিষ্ট কার্য্যসমূহের একাংশ শ্রমজীবীদিগের উপযোগী এবং পরবর্ত্তী অংশ কেবল প্রকৃত বুদ্ধিজীবী কর্ম্মীদিগের দ্বারাই সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে।

কেবল কৃষিকার্য্যেই যে এইরূপ বুদ্ধিজীবী কর্ম্মী এবং শ্রমজীবী কর্ম্মী, এই উভয়ের প্রয়োজন হয় তাহা নহে, শিল্প এবং বাণিজ্যেও এই উভয়েরই প্রয়োজন।

আমরা উপরে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি, উহা একত্র করিয়া বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে, মনুষ্য-সমাজের প্রকৃতিসঙ্গত শৃঙ্খলা পক্ষে সমাজ-সংগঠনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অপরিহার্য্য :—

(১) শিশুদিগের মধ্যে কে বুদ্ধিসাধ্য সামর্থ্য এবং কে শ্রমসাধ্য সামর্থ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, নির্দ্দোষভাবে ইহা বিচারের ব্যবস্থা।

(২) স্বভাবতঃ যাহারা বুদ্ধিসাধ্য সামর্থ্যের অধিকারী, তাহাদিগকে সমাজের বুদ্ধিসাধ্য কার্য্যের উপযোগী, এবং স্বভাবতঃ যাহারা শ্রমসাধ্য কার্য্যের উপযোগী তাহাদিগকে সমাজের শ্রমসাধ্য কার্য্যের উপযোগী শিক্ষাদান ব্যবস্থা।

(৩) যাহারা বুদ্ধিসাধ্য কার্য্যের অধিকার লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে—সুতরাং যাহারা তদুপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছে—কেবল তাহাদিগের উপরই সমাজের বুদ্ধিসাধ্য কার্য্যের দায়িত্ব অর্পণের ব্যবস্থা; এবং যাহারা প্রধানতঃ শ্রমসাধ্য কার্য্যের অধিকার লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে—সুতরাং যাহারা বুদ্ধি-সাধ্য কার্য্যের উপযোগী যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত হয় নাই—তাহাদিগের উপর যাহাতে কখনও ঐ কার্য্যের দায়িত্ব অর্পিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা।

(৪) যাহারা শ্রমসাধ্য কার্য্যের অধিকার লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সুতরাং যাহারা তদুপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছে, কেবল তাহাদিগের উপরই সমাজের শ্রমসাধ্য কার্য্যের দায়িত্ব অর্পণের ব্যবস্থা এবং যাহারা প্রধানতঃ বুদ্ধিসাধ্য কার্য্যের অধিকার লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সুতরাং যাহারা শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্যের উপযোগী যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত হয় নাই, তাহাদের উপর যাহাতে শ্রমসাধ্য কার্য্যের দায়িত্ব কখনও অর্পিত না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

এই সকল মূলনীতির ভিত্তিতে সমাজ-সংগঠন যদি ব্যবস্থিত না থাকে এবং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বিভিন্ন দায়িত্ব যখন তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের স্বাভাবিক সামর্থ্য-অসামর্থ্যনির্ব্বিশেষে অর্পিত হয়, তখনই সমাজ-ব্যবস্থা প্রকৃতিবিরোধী অর্থাৎ কৃত্রিম শৃঙ্খলার অধীন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া আখ্যাত করিতে হইবে।

সমাজ-ব্যবস্থার প্রকৃতিসঙ্গত এবং প্রকৃতিবিরোধী, এই উভয় শৃঙ্খলার তাৎপর্য্য যথাযথভাবে অনুধাবন করিতে পারিলে অতি সহজেই অনুমান করা যাইবে যে, প্রকৃতিসঙ্গত শৃঙ্খলা-ধীন সমাজে সাধারণতঃ তদন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তির কোন প্রকার দুঃখ-দুর্দ্দশা থাকে না। অন্যপক্ষে, প্রকৃতি-সঙ্গত এই শৃঙ্খলা তিরোহিত হইয়া যখন তৎস্থলে প্রকৃতি-বিরোধী শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তিত হয়, তখন সমাজান্তর্ভুক্ত প্রায় প্রত্যেকটি ব্যক্তির বিবিধ দুঃখ-দুর্দ্দশায় অর্জ্জরিত হওয়া সুনিশ্চিত।

সমাজ-সংগঠনের প্রকৃতিসঙ্গত শৃঙ্খলার বিজ্ঞানে সম্যক্ প্রকার প্রবিষ্ট হইতে পারিলে অনায়াসেই ধারণা করা যায় যে, প্রকৃতিসঙ্গত শৃঙ্খলাধীন সমাজে বুদ্ধিজীবী কর্ম্মিগণ স্বকীয় স্বার্থের দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রলুব্ধ না হইয়াই কেবল শ্রমজীবিগণের হিতার্থে কৃষি এবং শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনোৎকর্ষে নিবিষ্ট থাকে। ফলতঃ শ্রমজীবিগণেরই উপর কৃষিজাত এবং শিল্পজাত দ্রব্যের মালিকানা বর্ত্তায় এবং এই সকল দ্রব্যই তাহারা প্রচুর পরিমাণে—কখনও কখনও তাহাদের পরিবার প্রতিপালনপক্ষে যাহা প্রয়োজন, তাহার চারি পাঁচ গুণ অধিক পর্য্যন্ত লাভ করে। বুদ্ধিজীবী কর্ম্মিগণের সাহায্যে লব্ধ উৎপন্ন দ্রব্যের এই প্রাচুর্য্য হেতু শ্রমজীবী কর্ম্মিগণ বুদ্ধিজীবী কর্ম্মিগণের সহিত এইরূপ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হয় যে, তাহারা সেই আন্তরিক

কৃতজ্ঞতাবশতঃ স্বেচ্ছায় বুদ্ধিজীবী কর্ম্মিগণের স্বচ্ছন্দে পরিবার প্রতিপালনপক্ষে যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা প্রদান করিয়া থাকে।

অর্থাৎ, সমাজ-ব্যবস্থার প্রকৃতিসঙ্গত শৃঙ্খলাধীন অবস্থায় বুদ্ধিজীবী কর্ম্মিগণ প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিগত উপার্জ্জনের লোভে কার্য্য না করিলেও, শ্রমজীবী কর্ম্মিগণের কল্যাণকল্পে তাহারা যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে ব্রতী থাকে, তাহাতে তাহারাই সমাজের মধ্যে শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আর্থিক অভাব সম্বন্ধীয় দুশ্চিন্তা হইতেও তাহারা সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি লাভ করে। কেবল ইহাই নহে, সমগ্র সমাজও সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ব-কলহ হইতে মুক্ত হয়, কেন না সমাজ-সংগঠনের ত্রুটিহীনতা সাধন করিতে শ্রমজীবী এবং বুদ্ধিজীবী, উভয় কর্ম্মীই আন্তরিক ভাবে মিলিত হইয়া কার্য্যশীল থাকে। এই স্থলে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, সমাজ-সংগঠনের প্রকৃতিসঙ্গত শৃঙ্খলার কৃতকার্য্যতা দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যথা :—(১) বুদ্ধিজীবিগণের, স্বকীয় স্বার্থ বিষয়ে কিছুমাত্র লুব্ধ না হইয়া কেবল শ্রমজীবী কর্ম্মীগণের কল্যাণকল্পে নিয়োজিত থাকিয়া, জীবনাতিপাত করিবার মনোভাব, এবং (২) কৃষিজাত, তথা শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনে কি ভাবে উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, এবং কি করিয়া উহা শ্রমজীবী কর্ম্মিগণের প্রত্যেকের পক্ষে লাভজনক হইতে পারে, বুদ্ধিজীবী কর্ম্মিগণের তদ্বিষয়ক নিশ্চিত জ্ঞান।

প্রকৃতিসঙ্গত শৃঙ্খলাধীন ব্যবস্থায় সমাজের মধ্যে যে এই প্রকার অবস্থা বিরাজ করিবে ইহা যেমন অবশ্যম্ভাবী, তেমনই কৃত্রিম ব্যবস্থায় ঠিক ইহার বিপরীতটি ঘটিয়া থাকে, ইহাও একপ্রকার অবশ্যম্ভাবী। কৃত্রিম ব্যবস্থাধীন অবস্থায় যথাযথ যোগ্যতার বিচার না করিয়াই সমাজ-পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হইয়া থাকে, সুতরাং অযোগ্য ব্যক্তিদের উপর সুকঠিন দায়িত্বসমূহ অর্পিত হয়। প্রথমতঃ, কৃষিজাত এবং শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনে উৎকর্ষ-সাধনের জ্ঞান লুপ্ত হয় বলিয়া শ্রমজীবী কর্ম্মিগণের বুদ্ধিজীবী কর্ম্মিগণ সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতাবোধ করিবার কারণ থাকে না। শ্রমজীবী কর্ম্মিগণ বুদ্ধিজীবী কর্ম্মিগণের প্রয়োজনপূরণকল্পে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ভাবে কোন কিছু প্রদান করিবার বিষয় যেমন চিন্তা করিতে পারে না, তেমনই উহা করিবার সম্ভাবিত তাহাদের থাকে না, কেন না উৎপন্ন দ্রব্য এরূপ ভাবে হ্রাস-সম্পন্ন হয় যে, তদ্দ্বারা তাহাদেরই সঙ্কুলান সম্ভব হয় না সুতরাং স্বভাবতঃই, বুদ্ধিজীবী কর্ম্মিগণ স্বকীয় উপার্জ্জনের উদ্দেশ্যেই মূলতঃ কার্য্য করিতে বাধ্য হয় এবং শ্রমজীবী কর্ম্মিগণের হিতসাধনকল্পে কার্য্যনিযুক্ত থাকিয়া জীবনাতিপাত করিবার মনোভাব তাহাদের মধ্যে আর দেখা যায় না। কার্য্যক্ষেত্রের এই অবস্থা এবং এইরূপ মনোভাব হেতু সমাজের প্রত্যেকটি অধিবাসী সঙ্কীর্ণ স্বার্থের গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং দ্বন্দ্ব-কলহের ইচ্ছা দ্বারা বিরত সুতীব্র ভাবে পীড়িত হইয়া থাকে। এবং সমগ্র সমাজ সকল-প্রকার দুঃখ দুর্দ্দশার দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইতে থাকে। বর্ত্তমান সমাজ গত কয়েক সহস্র বৎসর হইতে যে-অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে ঠিক অনুরূপ অবস্থা বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজে যে কুত্রাপি প্রকৃতিসঙ্গত শৃঙ্খলা বিদ্যমান নাই এবং ইহার সর্ব্বত্র যে সম্পূর্ণরূপে সমাজ-সংগঠনের কৃত্রিম ব্যবস্থার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা চলে না। সমাজের বর্ত্তমান ব্যবস্থায়, সমাজ-সংগঠনের কোন প্রকৃতিসঙ্গত শৃঙ্খলা সম্ভব হইতে পারে, তাহা অনুমান পর্য্যন্ত করা কঠিন। কিন্তু বিগত দ্বাদশ সহস্র বৎসরের সমাজ-সংগঠনের ইতিহাস যথাযথভাবে পর্য্যালোচিত করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এমন একটি সময় ছিল, যখন পৃথিবীর প্রত্যেক অঞ্চলে প্রত্যেক সমাজে সমাজ-সংগঠনের একমাত্র এই প্রকৃতিসঙ্গত শৃঙ্খলাই বিদ্যমান ছিল।

প্রয়োজন হইলে ভারতীয় ঋষিগণের রচিত গ্রন্থাদি হইতে আমরা ইহা প্রমাণ করিতে পারি। বর্ত্তমানে ইহা হইতে নিবৃত্ত থাকিলাম। কেন না পাঠকগণের ধৈর্য্যের পক্ষে তাহা পীড়াদায়ক হইতে পারে।

বিগত দ্বাদশ সহস্র বৎসরের মনুষ্যজাতির সমাজ-সংগঠন প্রধানতঃ তিনটি পর্ব্বের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

প্রথমতঃ, এমন একটি সময় ছিল, যখন পৃথিবীর প্রত্যেক অঞ্চলের প্রত্যেক সমাজে সমাজ-সংগঠনের প্রকৃতিসঙ্গত শৃঙ্খলার সম্পূর্ণ প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল। এই কালে বুদ্ধিজীবি-গণ—ইহাদের সংখ্যা কোনকালেই সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে শতকরা দশ জনের অধিক অতিক্রম করে না—স্বকীয় স্বার্থ

যারা বিন্দুমাত্র সুখ না পাইয়া, শ্রমজীবিগণের—ইহাদের সংখ্যা সর্বদা সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে শতকরা আশি নব্বই হইয়া থাকে—কল্যাণকল্পে জীবন অতিবাহিত করিত। এই কালে কোন দেশেই নৃপতি দুই হইত না। সকল রাষ্ট্রসমূহ সম্পূর্ণরূপে সমাজ-পরিচালিত ছিল। কুত্রাপি ধর্মমত হিসাবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট কিংবা মুসলমান ধর্মের উল্লেখ দেখা যাইত না; সর্বত্র কেবল "মানব ধর্ম"-অভিহিত একটি মাত্র ধর্ম বিদ্যমান ছিল। এই কালে প্রত্যেক রাষ্ট্রে প্রধানতঃ ত্রিবিধ বুদ্ধিজীবী পরিদৃষ্ট হইত।

প্রথম শ্রেণীর উপর প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিন প্রকার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল :

(১) শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের পক্ষে কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য সর্বনিম্ন পরিশ্রম এবং ব্যয়ে কি করিয়া লাভজনক হইতে পারে, গবেষণার দ্বারা তাহার পন্থা উদ্ভাবন।

(২) সকল প্রকার অস্বাস্থ্য কি করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইতে পারে তদ্বিষয়ক পন্থার গবেষণা।

(৩) সর্বপ্রকার অস্বাস্থ্য সর্বনিম্ন ব্যয়ে এবং প্রয়াসে কিরূপে সর্বাধিক সার্থকতার সহিত আরোগ্য হইতে পারে, তদ্বিষয়ক পন্থার গবেষণা।

(৪) সমাজের প্রত্যেকটী অধিবাসী যাহাতে সকল প্রকার মানসিক অশান্তি ও চিন্তা হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ক পন্থার গবেষণা।

(৫) এই সকল গবেষণালব্ধ ফলের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সমাজ এবং ব্যক্তিগত চরিত্রের সংগঠনকল্পে এইরূপ ভাবে বিধি-নিষেধ প্রণয়ন, যাহা সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির অর্থগত, স্বাস্থ্যগত, মনোগত এবং আধ্যাত্মিক ইত্যাদি সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দশা হইতে মুক্তিলাভের সহায়ক হইতে পারে।

(৬) সমাজ এবং ব্যক্তিগত চরিত্র সংগঠনের এই প্রকার বিধি-নিষেধে শ্রমজীবী সম্প্রদায় কি ভাবে শিক্ষিত হইতে পারে এবং সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দশা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহার প্রণালী নির্ধারণ।

(৭) কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের যে-পন্থা সর্বনিম্ন ব্যয়ে এবং চেষ্টায় শ্রমজীবী শ্রেণীর পক্ষে সর্বাধিক লাভজনক হইতে পারে, তাহাদিগকে তদ্বিষয়ক শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার প্রণালী নির্ধারণ।

(৮) অপর দুই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা যাহাতে উপরি-নির্দিষ্ট গবেষণার ফল, তথা শ্রমজীবিগণের শিক্ষা-দান প্রণালী এবং বিধি-নিষেধসমূহে শিক্ষিত এবং অভ্যস্ত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী কর্মিগণের উপর নিম্নলিখিত দায়িত্বসমূহ ন্যস্ত ছিল :—

(১) প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিগণ-উদ্ভাবিত গবেষণার ফলসমূহের শিক্ষা।

(২) প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিগণকর্তৃক লিখিত সমাজ এবং ব্যক্তিগত চরিত্র সংগঠনার্থ বিধি-নিষেধ আয়ত্ত করা।

(৩) শ্রমজীবী শ্রেণীর শিক্ষার্থ যে-সকল প্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহার পদ্ধতি পরিজ্ঞাত হওয়া।

(৪) জন-সাধারণের হিতার্থ এবং রাজস্ব-সংগ্রহার্থ সমাজে যে-সকল বিধি-নিষেধ এবং প্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহার রক্ষা।

তৃতীয় শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিগণের দায়িত্ব প্রায় দ্বিতীয় শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিগণের দায়িত্বের অনুরূপ ছিল, কেবল তাহাদিগকে—উপরে যেরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে—বিধি-নিষেধ রক্ষার কার্য করিতে হইত না, কিন্তু কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রণালী, তথা বিধি-নিষেধ সমূহে শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে শিক্ষিত করিতে হইত। তাহাদিগকে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে যথাসম্ভব সাহায্যও করিতে হইত।

ত্রিবিধ বুদ্ধিজীবীদিগের মধ্যে দায়িত্ব বিতরণের সম্বন্ধে উপরে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহা সম্যক্‌রূপে অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, কোন রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ ভাবে সুপরিচালিত করিবার নিমিত্ত যাহা যাহা দরকার, তাহার সমগ্রাংশই ইহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এই জন্য এই কালের রাষ্ট্রসমূহ, বস্তুতঃ পক্ষে সরকারী কর্মচারী কাহাকেও বেতন দান না করিয়াই, এই ত্রিবিধ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিগণের দ্বারা পরিচালিত হইতে পারিত। দায়িত্বসমূহ এই ভাবে বিতরিত

ওয়ায় যে-বিজ্ঞান কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের সর্বাধিক উৎকর্ষ-সাধনের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন, তাহার উন্নতিসাধন সম্ভব হইত। পরার্থে কার্যনিযুক্ত থাকিয়া জীবনাতিবাহিত করিবার স্পৃহা জাগরণেও ইহাই সহায়ক হইয়াছিল। সমাজের প্রায় প্রত্যেকে বস্তুতঃ আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি হইতে মুক্ত ছিল। কোন সম্প্রদায় নিজদিগকে উচ্চ স্তরের কিংবা কোন সম্প্রদায় নিজদিগকে নিম্নস্তরের বলিয়া বিবেচনা করিত না। বুদ্ধিজীবিগণই কার্যতঃ রাষ্ট্র পরিচালনা করিত, কিন্তু তথাপি তাহারা নিজদিগকে শ্রমজীবী কর্মী অপেক্ষা কোন প্রকার উচ্চতরান্বিত অথবা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে করিতে পারিত না; কেন না সমাজের সম্পূর্ণ এবং কল্যাণজনক পরিচালনার নিমিত্ত শ্রমজীবীর কার্য ও বুদ্ধিজীবীর কার্যের তুল্য মূল্যের বলিয়া ধার্য ছিল। স্বন্দ-কলহের কোন মনোভাব দূরে থাকুক, সর্বত্র সর্বশ্রেণীর মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য এবং শ্রদ্ধা বিরাজ করিত।

প্রাচীন কালের কবিগণ যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, বিগত যাবদ্‌ সপ্ত সহস্র বৎসরের প্রথম ছয় সহস্র বৎসর সমাজ-সংগঠনের প্রকৃতি-সঙ্গত এই শৃঙ্খলার প্রাধান্য সর্বত্র বিদ্যমান ছিল।

উপরিনির্দিষ্ট ভাবে ত্রিবিধ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর মধ্যে দায়িত্বসমূহ বণ্টিত থাকিবার ব্যবস্থা প্রায় ছয় সহস্র বৎসর ধরিয়া বলবতী থাকিবার পর এমন একটি সময় আসিল, যখন শ্রমজীবিগণের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা বুদ্ধিজীবিগণের কোন সাহায্য গ্রহণ না করিয়াই তাহাদের কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য পরিচালনা করিয়া শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি রক্ষা করিতে পারিতেছে। ফলতঃ, এই কালে বুদ্ধিজীবিগণ অলস হইয়া পড়ে এবং অবসর-কাল বিলাস-ব্যসনে এবং নানা প্রকার অনাচারে অতিবাহিত করিতে থাকে।

এইরূপে মনুষ্য-জাতির সমাজ-সংগঠনে দ্বিতীয় পর্যায়ের অভ্যুদয়। এই পর্বে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসা এবং মানসিক শান্তিবিধানের বিজ্ঞান আলোচনার সুযোগ সুবিধা হইতে বুদ্ধিজীবিগণ দূরে থাকে। এবং কালক্রমে এই সকল বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিস্মৃতি ঘটে, এমন কি যে ভাষায় এই বিজ্ঞান লিপিবদ্ধ ছিল, বুদ্ধিজীবিগণের মন হইতে ক্রমশঃ তাহার বিষয়ও দূরীভূত হইয়া যায়। ইতিমধ্যে দ্রব্যোৎপাদনের তথা শিল্প-বাণিজ্যের অবনতি সূচিত হইতে থাকে এবং শ্রমজীবিগণ বিপন্ন হইয়া বুদ্ধিজীবিগণের নিকট হইতে সাহায্য যাচ্ঞা করে। কিন্তু বুদ্ধিজীবিগণ প্রকৃত বিজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া নিজেরাও তখন অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং দ্রব্যোৎপাদনের উৎকর্ষসাধন বিষয়ে শ্রমজীবিগণকে কোন কার্যকরী নির্দেশ দানে তাহারা অসমর্থ হয়। বিবিধ বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাহাদের যে বিস্মৃতি ঘটিয়াছে, তাহা সততার সহিত স্বীকার করিয়া এই সময়ে যদি বুদ্ধিজীবিগণ পুনরায় তাহাদের গবেষণায় নিযুক্ত হইত, তবে সমাজের অবস্থা সম্ভবতঃ অন্যরূপ দাঁড়াইত, কিন্তু তাহারা ইহা করিল না। তৎপরিবর্তে বুদ্ধিজীবিগণ শ্রমজীবিগণকে ভ্রান্ত নির্দেশ দান করিয়া তাহাদিগকে প্রতারিত করিতে থাকিল এবং ফলে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনের কোন প্রকার উৎকর্ষই সাধিত হইল না। ইহার ফলে বুদ্ধিজীবিগণের বিরুদ্ধে শ্রমজীবিগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিল এবং সমাজের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রের পতন হইয়া মনুষ্য-সমাজে রাজতন্ত্র দেখা দিল।

সমাজ-সংগঠনের এই দ্বিতীয় পর্বে প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের প্রকৃত তিরোধান ঘটে এবং তৎপরিবর্তে তাহাদের বংশধরগণ পূর্বপুরুষদিগের যোগ্যতার বিন্দুমাত্র অধিকারী না হইয়াই তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিগণ শাসক হইয়া তখন রাজতন্ত্রের অনুষ্ঠান করে, কিন্তু তাহাদিগেরও ঐ কার্যের প্রকৃত যোগ্যতার অভাব ঘটে। তৃতীয় শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিগণ এবং শ্রমজীবিগণ গতানুগতিক ব্যবস্থার অধীন হইয়া দিন কাটাইতে থাকে, সুতরাং তাহাদের মধ্যেও সর্বতোভাবের সদ্বৃদ্ধি ক্রমশঃ অসদ্বৃদ্ধিতে রূপান্তরিত হয়। এই পর্বেই প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদিগের বংশধরেরা অত্যাচারী হইয়া পড়ে এবং তাহাদিগের অত্যাচারের ফলে সর্বত্র বিবিধ দুঃখ-দুর্দশা বিস্তার লাভ করে।

রাজতন্ত্রের এই ব্যবস্থা-কালেও সমাজ-সংগঠনের প্রকৃতি-সঙ্গত যে-শৃঙ্খলা একদা মনুষ্যজাতিকে সর্বথা সুখী করিয়াছিল, তাহার বিজ্ঞান পুনরাবিষ্কার করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই।

তৎপরিবর্ত্তে গোঁড়া এবং অধৌক্তিক মতবাদ প্রচার করিয়া শ্রমজীবীদিগকে, তথা তৃতীয় শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী কর্ম্মিগণের বংশধরদিগকে, তদনুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য করা হয়। এই পন্থা প্রায় তিন সহস্র বৎসর কাল বিদ্যমান থাকিয়া শেষ পর্য্যন্ত মনুষ্যজাতিকে চরম দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যে নিক্ষেপ করে।

এই প্রকার অবস্থার প্রকৃতিগত পরিণতি হিসাবে মনুষ্য-সমাজে প্রায় পাঁচশত বৎসরের মধ্যে পর পর তিন জন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া এমন ধর্ম্মমত প্রচার করেন, যাহা অস্থায়ীভাবে হইলেও মনুষ্যজাতিকে সান্ত্বনা দান করে। কিন্তু এই সকল মহাপুরুষের জীবনকাল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁহারা কেহই স্থায়ী ভাবের সমাজ সংগঠনের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন নাই। প্রধানতঃ শ্রমজীবিগণের এবং তৃতীয় শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিগণের বংশধরেরাই এই সকল মহাপুরুষের মতাবলম্বী হন, অবশ্য অপরাপর বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বংশধরদিগের মধ্যেও কাহাকেও কাহাকেও তাঁহাদিগের মতাবলম্বী করিতে তাঁহারা সমর্থ হন।

সত আড়াই হাজার বৎসর কাল হইল, এই সময় সূচিত হইয়াছে। এই কালে প্রথম শ্রেণীর এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিগণের বংশধরদিগকে এই তিন মহাপুরুষেরই মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। ইহার কারণ এই যে, প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিগণের বর্ত্তমান বংশধরগণ,—তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ সমাজ-সংগঠনের যে প্রকৃতি-সঙ্গত শৃঙ্খলার বিজ্ঞান সহায়তায় সমগ্র মনুষ্যসমাজের কল্যাণসাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন,—সেই বিজ্ঞানের সহিত যোগসূত্র হারাইয়া ফেলিয়াছে। এমন কি, তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ যে-ভাষায় সেই বিজ্ঞান এবং সমাজ সংগঠনের প্রকৃতিসঙ্গত বিধান লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই ভাষার জ্ঞান পর্য্যন্ত তাহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু যে-ভাবেই হউক, মহাপুরুষদিগের অনুবর্ত্তিগণই পুনরায় প্রথমতঃ বিজ্ঞানের, তথা সমাজ-সংগঠনের একটি শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়াছে। মনের এই বাসনা হইতে তাহারা বিজ্ঞান এবং সমাজ-ব্যবস্থার আবিষ্কারার্থ প্রয়াসী হইয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মহাপুরুষগণের অনুবর্ত্তীদিগের এই বিজ্ঞান এবং সমাজ-ব্যবস্থা মনুষ্যজাতির পক্ষে কোন দিক্ হইতেই কল্যাণজনক হয় নাই। মনুষ্যজাতির সমাজ সংগঠনের বর্ত্তমান ব্যবস্থা সম্পূর্ণ মিথ্যা বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তজ্জন্যই ইহা সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে।

নবী মহম্মদের অনুচরগণের বিরুদ্ধে বর্ত্তমানে যে-বিদ্বেষ দেখা যিয়াছে, তাহার জন্য মূলতঃ দায়ী ইউরোপীয়গণের অবিষ্টকারিতা, তথা সমাজ-সংগঠনের প্রকৃতিসঙ্গত শৃঙ্খলার যুগের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিগণের বংশধরগণের নির্ব্বুদ্ধিতা এবং অজ্ঞতা। আধুনিক ইতিহাসেই এমন একটি সময় আসিয়াছিল, যখন নবী মহম্মদের অনুচরগণ ইউরোপের অধিকাংশ জয় করিয়া অনেক ইউরোপীয়দিগের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। এই জন্যই কতিপয় ইউরোপীয় মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারিলে গর্ব্ব বোধ করিয়া থাকেন। যে-যুগে সমাজ সংগঠনের প্রকৃতিসঙ্গত শৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল, সেই যুগের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিগণের কতিপয় নির্ব্বোধ বংশধর, যাহারা বর্ত্তমান যুগে হিন্দু-সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে পরিচিত,—শ্রমজীবী এবং তৃতীয় শ্রেণীর যে-বুদ্ধিজীবিগণ একদা ঐ প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিগণকে দেবতা-জ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত, কিন্তু শেষতঃ তাহাদিগেরই অধোগতা হেতু বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং নবী মহম্মদের পন্থানুসরণ করে—গত ছয় সহস্র বৎসর কালের মধ্যে তাহারাও শ্রমজীবী এবং তৃতীয় শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিগণের বংশধরদিগের বিরুদ্ধে বহু বিদ্বেষ সূচনা করিয়াছে।

মানবধর্ম্ম এবং সমাজ-সংগঠনের প্রকৃতিসঙ্গত শৃঙ্খলার বিজ্ঞান যদি রক্ষিত থাকিত, তবে যে, কোন ক্রমেই বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম এবং মুসলমান ধর্ম্মের উদ্ভব হইত না ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য, এবং সেই বিজ্ঞান ও সমাজ-সংগঠনের প্রকৃতিসঙ্গত শৃঙ্খলা যে রক্ষিত হয় নাই, তাহার জন্য সম্পূর্ণ রূপে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিগণের বংশধরগণের অকৃতকার্য্যতাই দায়ী।

এই জন্যই আমরা বলিয়া থাকি যে, মুসলমানগণের যদি কোন ত্রুটিবিচ্যুতিই থাকে, তথাপি তাহার জন্য দায়ী তাহারা নহে, উচ্চবর্ণের যে হিন্দু-নেতারা সকল কপাটের মূলে বর্ত্তমান, তজ্জন্য তাহারাই দায়ী।

এই নেতৃবৃন্দ যদি তাহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আন্তরিক মনোভাবসম্পন্ন হন, অর্থাৎ তাহাদের যদি হিন্দুসমাজ, তথা

মনুষ্যজাতির, হিতসাধনের উদ্দেশ্যই থাকে, তবে তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে এবং তাঁহাদের শক্তিতে যতদূর সম্ভব,—আমরা সমাজ-বিধানের প্রকৃতি-সঙ্গত শৃঙ্খলা বলিতে যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছি,—তাহা বুঝিয়া তাহার পুনরুদ্ধার করে তাঁহাদিগকে চেষ্টিত হইতে হইবে।

আমাদের এই সৎ পরামর্শে তাঁহারা কি এখনও কর্ণপাত করিবেন না?*

## মিঃ গান্ধীর পক্ষে শিক্ষণীয় বিষয়

"কংগ্রেস ও হিন্দু-মহাসভার নেতৃবৃন্দের শিক্ষণীয় বিষয়" শীর্ষক সম্পর্কের প্রতি আমরা মিঃ গান্ধীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বিশেষ করিয়া ইহার যে-অংশে সমাজ-বিধানের "প্রকৃতি-সঙ্গত শৃঙ্খলা" বলিতে কি বুঝিতে হইবে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং যে-অংশে "সামাজিক রাষ্ট্র (Social State)" সম্পূর্ণ কল্যাণজনক ভাবে পরিচালনার জন্য বুদ্ধিজীবী কর্ম্মিগণের মধ্যে কি ভাবে দায়িত্বসমূহ বণ্টন করিতে হইবে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে, আমরা মিঃ গান্ধীর দৃষ্টি তৎ-প্রতি আকর্ষণ করিতেছি। এতদিন ধরিয়া মিঃ গান্ধী যে-পাপ করিয়া আসিয়াছেন, অনতিবিলম্বে তাঁহার তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করা উচিত—ইহাই আমরা মনে করি। বর্ত্তমান যুগের পাপপূর্ণ সমাজে যাহাই বিবেচিত হউক, সমাজের যে তিনি কোন কল্যাণই সাধন করিতে পারেন নাই, ইহা অতি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহাই যদি না হইত, ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাঁহার এই বিগত বিশ বৎসরের নেতৃত্বের ফলে তাঁহার রাষ্ট্রীয় অনুচরগণ অন্ততঃ সামান্য পরিমাণেও উপকৃত হইতেন। মিঃ গান্ধীর মতবাদ এবং কার্য্যসমূহে পৃথিবীর কোন একটি জীবেরও যে আর্থিক কিংবা নৈতিক উপকার সাধিত হয় নাই—ইহা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। অনেকে তর্ক উত্থাপন করিতে পারেন যে, মিঃ গান্ধীর আন্দোলন ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের পথ সুগম করিয়াছে। এ বিষয়ে আমরা বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করি। এমন কি তর্কের খাতিরেও যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, মিঃ গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের সম্ভাবনা বর্ত্তমান,—তথাপি যে-কার্য্যপন্থা সমাজের প্রত্যেককে সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে মুক্তিদান না করিতে পারিবে সঙ্গে সঙ্গে তদনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ না হইলে যে, ভারতের জন-সাধারণের পক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কোনরূপ হিতসাধক হইবে না, —তৎ-সম্বন্ধেও সর্ব্বথা সজাগ থাকা আবশ্যক। বর্ত্তমান জগতে যে-সংস্করণের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রচলিত, তাহা জন-সাধারণের যদি কোন প্রকার প্রকৃত হিতসাধকই হইত, তবে ইউরোপের জন-সাধারণকে যুদ্ধে পশুর ন্যায় বলি যাইতে হইত না; এবং তাহাদের অধিকাংশকেই আজীবন আর্থিক অভাব এবং শারীরিক অস্বাস্থ্য ভোগ করিতে হইত না। এই সকল ঘটনা আনুপোপান্ত যথাযথভাবে অনুধাবন করিতে পারিলে ভারতের জন-সাধারণের জন্য যে একমাত্র রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই লক্ষ্য হওয়া উচিত, ইহা অস্বীকার না করিয়া গত্যন্তর থাকে না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের পন্থার উপরেও, যে-পন্থা সমাজের প্রত্যেককে সর্ব্ববিধ দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে মুক্তি দান করিতে পারিবে, সেই কার্য্যসূচীর প্রয়োজন। উপরন্তু যদি এমন কোন কার্য্যসূচীর সন্ধানলাভে সক্ষম হওয়া যায়, যাহা অনুসরণ করিলে মানবসমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির সর্ব্ববিধ দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব, তবে ভারতবাসী জন-সাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা নিবারণার্থ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকল্পে যে কোন সংঘর্ষেরই প্রয়োজন নাই, কেবল ঐ কার্য্যসূচী অনুসরণ করিলেই তাহাদের সকল প্রয়োজনের পূরণ হইবে—তাহা বুঝা যাইতে পারে।

ভারতীয় ঋষিগণ মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকের সর্ব্ববিধ দুঃখ নিবারণার্থ যে-কার্য্যপন্থার প্রবর্ত্তন করেন, আমরা পাঠকবৃন্দের সমক্ষে তাহাই উপস্থাপিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। এই কার্য্যপন্থা সুবিস্তৃত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ, কোন সাময়িক পত্রিকার মর্য্যাদায় ইহার সর্ব্ববিধ বিষয় বর্ণনা সম্ভব নহে। তজ্জন্য কোন স্বতন্ত্র পুস্তক রচনারও প্রয়োজন নাই, কেন না ভারতীয় ঋষিগণ রচিত

*দি টাইম্‌স্ কলকাতা'র এই অংশের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরেজী সম্পর্ক হইত।

গ্রন্থাদিতে ইহা আনুপূর্বিক লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমরা কেবল এতদ্‌সংশ্লিষ্ট মোটামুটি বক্তব্যসমূহ উপস্থাপিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

চরম লক্ষ্য থাকিবে সমাজ-বিধানের প্রকৃতিসঙ্গত শৃঙ্খলা এবং বুদ্ধিজীবী কর্মিগণের মধ্যে দায়িত্বসমূহের সুষ্ঠু বিভাগ-ব্যবস্থা। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় ইহা অনতিবিলম্বে সাধিত হওয়া সম্ভব নহে। ইহা সম্ভব না হইলেও, চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে নেতার সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা উচিত। দেশের আইন-কানুন রূপপরিবর্তন করিবার জন্য অনতিবিলম্বে একপ চেষ্টা হওয়া উচিত, যাহাতে অনিষ্টজনক আইন-কানুন তাহাদের আশু অনিষ্ট সাধন না করে এবং দেশবাসী সুষ্ঠুরূপে চলিবার সুযোগ লাভ করে। গত সংখ্যার সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত "ভারতীয় জাতীয় মহাসভার কার্যক্রম নির্দেশ" শীর্ষক সন্দর্ভে কি ভাবে এই আইন-কানুন পরিবর্তন করিতে হইবে, তাহা আলোচিত হইয়াছে। রাষ্ট্র কর্তৃক সংগঠনমূলক এমন একটি কার্যপন্থা গৃহীত হওয়া উচিত, যাহাতে এই আইন-কানুনের যে-সকল পরিবর্তনের প্রয়োজন, তাহা সুসাধ্য হয়। গত আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত "মিঃ গান্ধীর সংগঠনমূলক কার্যসূচী"-শীর্ষক সন্দর্ভে এবং গত সংখ্যায় প্রকাশিত "বর্তমান অবস্থায় ভারতীয় জাতীয় মহাসভার কর্তব্যনির্দেশ"-শীর্ষক সন্দর্ভে এই সংগঠনমূলক কার্য-সূচী কিরূপ হইবে, তাহা লিপিবদ্ধ এবং আলোচিত হইয়াছে।

সরকার হইতে ঐ কার্যপন্থা এবং তাহা কার্যকরী করিবার নির্দেশসমূহ যাহাতে গৃহীত হয়, তজ্জন্য মিঃ গান্ধী কর্তৃক তিন প্রকার কার্যক্রম অতি অবশ্য গৃহীত হওয়া উচিত —প্রথমতঃ, মিঃ গান্ধীকে তজ্জন্য বড়লাটের উপর তাঁহার যে প্রভাব আছে, সেই ব্যক্তিগত প্রভাবের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাঁহার মধ্যস্থতায় ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা কর্তৃক যাহাতে ঐ সম্বন্ধে কমন্সে যেরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে তদনুযায়ী রাষ্ট্র-পরিকল্পনার নির্দেশসমূহ অবলম্বিত হয় এবং ঐ সংগঠনমূলক কার্যসূচী গৃহীত হয়, তাহার চেষ্টা তাঁহাকে করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাদেশিক সরকারসমূহের প্রতি ঐ সংগঠন-মূলক কার্যসূচী এবং কার্যপরিচালনার বিধি অবলম্বনার্থ যাহাতে যতদূর সম্ভব চাপ প্রযুক্ত হয়, তজ্জন্য মিঃ গান্ধীকে অনতিবিলম্বে প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী সদস্যদিগের পুনরায় প্রবেশের অনুমতি দান করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, কংগ্রেস-সংগঠনের মধ্য দিয়া দেশবাসী জন-সাধারণ যাহাতে সমাজ-বিধানের প্রকৃতিসঙ্গত শৃঙ্খলা এবং ঐ-সংগঠনমূলক কার্যসূচী, তথা রাষ্ট্রপরিচালনার বিধি-সমূহের উপকারিতা বুঝিতে পারে, মিঃ গান্ধীকে তাহাও দেখিতে হইবে।

"অহিংসা" এবং "অসহযোগ" লইয়া তিনি যে বাগাড়ম্বর প্রদর্শন করিয়া থাকেন, যে দিক্ দিয়াই দেখা যাউক, তাহা অনতিবিলম্বে বর্জনীয়। সাধারণভাবে মনুষ্যের পক্ষে যাহা কার্যতঃ সম্ভব নহে, তাহা লইয়া সময়াতিপাত করা রাষ্ট্রনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক নহে। তথাকথিত আত্ম-মর্যাদা-জ্ঞান এবং ক্ষুণ্ণ করিয়া তাহা স্বীকার না করিবার একগুঁয়েমী দেখাইবার মনোভাব, দেশ-কর্মী, কিংবা দেশনেতা কাহারও পক্ষেই শোভন নহে।

সর্বনিয়ন্তা মিঃ গান্ধীর চৈতন্যোদয়ের সাহায্য করুন।*

## বড়লাট এবং ভারত-সচিব পর্য্যায়ের ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতাগণের পক্ষে শিক্ষণীয় বিষয়

কিছুদিন পূর্বে (২৫ সে সেপ্টেম্বর) মিঃ অ্যামেরি যে বক্তৃতা দান করেন, তাহাতে তিনি মন্তব্য করেন, ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা এমনই জটিলতা-সঙ্কুল যে, কোন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দ্বারা তাহা সমাধান করা চলে না। আমাদের মতে, এতদ্দ্বারা প্রকারান্তরে ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতাগণের অযোগ্যতা স্বীকার করা হইয়াছে। তাঁহারা যদি বিবেচনাই করেন, ভারতীয় সমাজে জটিলতার এমন বাহুল্য যে, তাঁহারা উহা সমাধান করিতে অসমর্থ, তবে তাঁহারা উহার চেষ্টা

* "দি টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া" এই অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী হইতে।

পরিহারই বা করেন না কেন? এবং, যাঁহারা ঐ সকল জটিলতা সত্ত্বেও সকলের সন্তোষজনক ভাবে ভারতীয় রাষ্ট্র-পরিচালনায় সমর্থ, তাঁহাদিগকে ঐ কার্যগ্রহণে অনুরোধই বা করেন না কেন? শতাধীর অধিক কাল ধরিয়া ভারতের ব্রিটিশ শাসনের পর আজ ভারতীয় সমাজের এই জটিলতার উল্লেখ ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতাগণের পক্ষে লজ্জার বিষয়, ইহাই আমরা মনে করি।

বর্তমান যুদ্ধ যে সুদীর্ঘ কাল স্থায়ী হইতে পারে, ইহার প্রকৃত বোধ তাঁহাদের হওয়া উচিত। এই সময়েও যদি ভারতের জন্মী হইতে কি ভাবে সুপ্রচুর কৃষিজাত দ্রব্য এবং তথায় কি করিয়া প্রয়োজনীয় শিল্প-দ্রব্যের ব্যবস্থা এবং সকলের সন্তোষ-জনক ভাবে তাহার বিতরণ সম্ভব, তাহার জ্ঞান তাঁহারা লাভ না করিতে পারেন, তবে তাঁহারা কেবল নিজেদেরই যে সর্বনাশ সাধন করিবেন তাহা নহে, ভারত-বাসীদেরও সর্বনাশ সাধন করিবেন।

অতি-বিলম্ব হইয়া যাইবার পূর্বেই তাঁহারা সতর্ক হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।*

## যুদ্ধে কাহারা জয়ী হইবে?

এ দেশে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা মনে করিতেছেন, যুদ্ধে ব্রিটিশগণ পরাজিত হইবে এবং জার্মানগণ জয়ী হইবে। আমাদের মতে, জার্মানগণ সাময়িক ভাবে যুদ্ধে জয়ী হইলেও, তাহাদের মনোভাবের যদি কোন পরিবর্তন না ঘটে এবং তাহারা এই মনুষ্যপ্রাণ-হত্যামূলক অস্ত্রাদির আশ্রয় পরিহার করিয়া যদি যুদ্ধ-পরিচালনার "যুক্তিমূলক পদ্ধতি" গ্রহণে প্রস্তুত না হয়, তবে এই ভাবে তাহারা শেষতঃ কখনও জয়ী হইতে পারে না। আমাদের এই মতবাদের কারণ আছে। আমরা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করি যে, পাপাচার দ্বারা কখনও শেষতঃ জয় লাভ করা যায় না এবং পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা পুণ্যাচরণের ফললাভে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে। বর্তমান যুগে যাঁহারা বুদ্ধিজীবী বলিয়া চলিতেছেন, তাঁহারা যে পাপ-পুণ্যের তত্ত্ব অপেক্ষা তথাকথিত বিজ্ঞানের তত্ত্বে অধিক বিশ্বাসী, তাহা আমরা জানি। কিন্তু তাঁহারা যাহাই বিশ্বাস করুন না কেন, পাপাচার দ্বারা যে শেষতঃ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না এবং পুণ্যাচরণের ফললাভে যে কখনও শেষ পর্যন্ত বিঘ্ন উপস্থিত করা যায় না—ইহা অবার্থ সত্য। স্বকীয় ব্যক্তিগত জীবনে আত্মবিশ্লেষণে যিনি অবহিত হইবেন, উপরিনির্দিষ্ট এই তত্ত্বের সত্যতা সমর্থনে তিনি কখনও পরাঙ্মুখ হইবেন না। পাপাচরণ সহায়ে কোন ব্যক্তি কিংবা জাতি লক্ষ লক্ষ মুদ্রা সঞ্চয়ে কৃতকার্য হইতে পারে এবং সমগ্র জগতের উপরও সাময়িক ভাবে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি কিংবা জাতি যদি পাপের পথ পরিহার করিয়া পুণ্যের পথে চলিতে প্রস্তুত না হয়, তবে স্থায়ী ভাবে উহা রক্ষা করিতে পারে না, কিংবা সর্ববিধ দুঃখ হইতে অব্যাহতিও লাভ করিতে পারে না। আমাদিগের মতে যাহা কিছু মনুষ্যজাতির ধ্বংস-সাধক কিংবা তাহাদের সর্ববিধ দুঃখ-দুর্দশা হইতে মুক্তিলাভের পথে উন্নতি-সাধনের প্রতিবন্ধক, তাহাই পাপাচরণ, অপর পক্ষে যাহা কিছু ঐ উন্নতি-সাধনের সহায়ক, তাহা পুণ্যাচরণ। পাপ-পুণ্যের এই ধারণানুসারে জার্মানদিগের যুদ্ধ-চালনার পদ্ধতিকে কখনও পুণ্যকার্য বলিয়া স্বীকার করা চলে না, কেন না এই পদ্ধতিতে মনুষ্য-প্রাণ সংহারে, তথা মনুষ্যাধিকৃত সম্পদের ধ্বংস-সাধনে ইতস্ততঃ বোধ পর্যন্ত করা হয় না। দেশে বিদেশে যাঁহাদের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছে, এমন অনেক ব্যক্তিই হয়তো আমাদের সহিত এ বিষয়ে একমত হইবেন না, কিন্তু চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া মনুষ্য-জাতির প্রকৃত ইতিহাস পাঠে তাঁহারা যদি স্বীকৃত হন, তাহা হইলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, জার্মান পদ্ধতির এই যুদ্ধ-পরিচালনায় বিশ্বাসী কোন জাতি শেষ পর্যন্ত কৃতকার্যতা প্রদর্শন করিতে পারে নাই।

জার্মানগণ তাহাদের যুদ্ধ-পরিচালনার এই পদ্ধতির দ্বারা শেষ পর্যন্ত জয়ী হইতে পারিবে না, আমরা এমন কথা বলিতেছি বলিয়া ইহা মনে করা চলিবে না যে, ব্রিটিশ জাতি জার্মান জাতির যুদ্ধ-চালনার পদ্ধতির অনুকরণ পরিহারে

* পণ্ডিত উইন্‌স্টন চার্চিলের এই অক্টোবর সংখ্যার প্রকাশিত মূল ইংরাজী প্রবন্ধ হইতে।

হইয়া যুদ্ধ-জয়ের পৃথিবীনক পদ্ধতি আশ্রয়ে অভিনব কোন পন্থার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে, তাঁহারাই জাতি হিসাবে যুদ্ধে জয়ী হইতে সমর্থ হইবেন। যুদ্ধজয়ে ব্রিটিশগণের সর্ব্বাধিক সম্ভাবনা ইহাতে সন্দেহ করা যায় না, কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে এমন কতকগুলি কারণ দেখা যাইতেছে, যাহাতে এই সম্ভাবনার পরিণাম কি দাঁড়াইবে তৎসম্বন্ধে আশঙ্কা উপস্থিত হয়। কেন না, ব্রিটিশ জাতির নেতৃত্ব এমন কতিপয় বিবেকহীন এবং অভিজ্ঞ রাষ্ট্রীয় নেতার উপর ন্যস্ত হইয়াছে, যাহারা পাপ ও পুণ্যের ফলাফল যে অবার্থ, ইহা উল্লেখযোগ্য ভাবে বিশ্বাস করেন বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ, কিছু কাল হইতে মনুষ্য-সমাজের যে অবস্থা চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস এই যে, পৃথিবীর বর্ত্তমান জাতিসমূহের যেরূপ চাল-চলন, তাহাতে ইহাদের কেহই বর্ত্তমান যুদ্ধে শেষতঃ বিজয়-লাভে সমর্থ হইবে না। সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে—'বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিণাম কি দাঁড়াইবে?'

বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিণাম কি দাঁড়াইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে "বর্ত্তমান যুদ্ধের কারণ কি?" বর্ত্তমান যুদ্ধের কারণ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে যে, এই যুদ্ধের সূচনা ঠিক কখন এবং মনুষ্য-সমাজের এমন কোন ইতিহাস পাওয়া যায় কি না, যখন কার্য্যতঃ যুদ্ধ অনিবার্য্য ছিল তাহা স্থির করিতে হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

সকলেই জানেন যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের কার্য্যতঃ সূচনা ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের কোন একটি তারিখে, সুতরাং "এই যুদ্ধের কার্য্যতঃ সূচনা কখন?" এইরূপ কোন প্রশ্ন দুরূহ বা কষ্টকর মনে হইতে পারে।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের কোন একটি তারিখে যদিও আপাতদৃষ্টিতে এই যুদ্ধের সূচনা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু হিটলার যে তাঁহার প্রাধান্য-লাভের প্রথমাবধিই যুদ্ধ সুরু করিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা চলে না। পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে কেবল অনুসৃত পদ্ধতিতে। প্রথমে হিটলার ভূমকি দেখাইবার পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে তাহাই এই সমগ্র যুদ্ধ-পরিচালনার পদ্ধতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

এই ভাবে মনুষ্যজাতির ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, গত চারি সহস্র বৎসর ধরিয়া মনুষ্যজাতি সুদীর্ঘ সংঘর্ষে নিযুক্ত রহিয়াছে। লিখিত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অবশ্য এমন উল্লেখ পাওয়া যায় না, যাহাতে গত চারি সহস্র বৎসর ধরিয়া কোন সুদীর্ঘ সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে, তাহা প্রমাণিত হইবে—ইহা সত্য, কিন্তু পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাস কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলায় মিলাইয়া পাঠ করিতে পারিলে, আমরা যাহা বলিতেছি, তৎসম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দিগ্ধ হইবেন।

পরিতাপের বিষয়: বর্ত্তমান জগতে - গ্রহগণের প্রকৃতি, তাহাদের গতির প্রকৃতি, বৎসর হইতে বৎসরে স্থান-পরিবর্ত্তনে পৃথিবীর সম্পর্কে তাহারা কিরূপ প্রাকৃতিক অবস্থিতিতে অধিষ্ঠিত হইতেছে, এবং গ্রহগণের এই প্রাকৃতিক অবস্থিতি-বশতঃ যে পরিবর্ত্তন, তাহাতে পৃথিবীর উপর অবশ্যম্ভাবী-রূপে কি ফলাফল ফলিতেছে এবং তাহার কি পরিণাম, —তাহার কোন জ্ঞান নাই। এই সকল বিষয়ের যথাযথ জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় থাকিত না, যে, প্রত্যেক বার হাজার বৎসরে পৃথিবীতে তিন প্রকার রূপান্তর ঘটিবে, ইহা সুনিশ্চিত।

ইহার প্রথম চারি হাজার বৎসরে পৃথিবীর সম্পর্কে গ্রহগণের যে-সম্বন্ধ ঘটে, তাহাতে জীব-জীবনে শারীরিক এবং বুদ্ধির উৎকর্ষের পক্ষে যে সকল উপাদানের অতি অবশ্য প্রয়োজন, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল তদ্দ্বারা পরিপূর্ণ হয়।

পরবর্ত্তী চারি হাজার বৎসরে এই সকল উপাদানের অনু-পস্থিতি ঘটে।

তৎপরবর্ত্তী চারি হাজার বৎসরে ঐ সকল উপাদানের পুনরাবির্ভাব ঘটিতে আরম্ভ করে।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান, অর্থাৎ পৃথিবীর মূল কাল-বিষয়ক বিজ্ঞান এবং অঙ্কশাস্ত্র যথাযথ ভাবে এবং অভ্রান্তরূপে অধিগত করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, পৃথিবীর জীব-জীবনের এই তিনটি ক্রমের নিরোধ কিংবা পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। এই জন্যই ভারতীয় ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন, কালের প্রভাব দুরতিক্রম্য।

জীব-জীবনের এই তিনটি ক্রমের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া অতঃপর গত বার হাজার বৎসরের মনুষ্যজাতির ইতিহাস শৃঙ্খলিত করিতে চেষ্টিত হইলে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পরিদৃষ্ট হয়:

প্রথমতঃ, প্রায় চারি হাজার বৎসর ব্যাপী এমন একটি সময় ছিল যখন সমাজ-বিধানের প্রকৃতিসঙ্গত শৃঙ্খলা পৃথিবীর প্রত্যেক সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই কালে সর্বত্র সম্পূর্ণভাবে প্রকৃত সমাজতন্ত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল এবং প্রত্যেক সমাজে, তদন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকের সর্ববিধ দুঃখ-দুর্দশা হইতে মুক্তিলাভের পন্থা সুনিশ্চিত করিবার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা সাধন করিবার নিমিত্ত মূলতঃ দুই শ্রেণীর কর্মী বিদ্যমান ছিল। এই দুই শ্রেণীর এক ভাগ, (ক) বুদ্ধিজীবী, এবং অপর এক ভাগ (খ) শ্রমজীবী। সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে শতকরা মাত্র দশ জন ছিল বুদ্ধিজীবী। অবশিষ্ট নব্বইজন শ্রমজীবী। জন্মাবধি যাহাদের বুদ্ধিসামর্থ্য পরিলক্ষিত হইত, কেবল তাহারাই সমাজের বুদ্ধিজীবী কর্মী হইবার জন্য বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতে পারিত এবং তাহারা ব্যতীত আর কাহারও উপর সমাজের বুদ্ধিমূলক কার্যের দায়িত্ব ন্যস্ত হইত না। এই কালের সামাজিক বিধি-নিষেধের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, শ্রমজীবীদিগের কল্যাণসাধনার্থ বুদ্ধিজীবীদিগকে সম্পূর্ণভাবে কার্যনিযুক্ত থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইত এবং তাহাদের কেহই ব্যক্তিগত উপার্জনের জন্য কার্য করিতে পাইত না। শ্রমজীবীদিগের কল্যাণসাধন ব্যতীত বুদ্ধিজীবীদিগের কার্য না করিয়া উপায় ছিল না বলিয়া শ্রমজীবীরা যাহাতে সুপ্রচুর দ্রব্যের এবং মানসিক সুখের অধিকারী হয়, বুদ্ধিজীবীদিগকে সেই বিজ্ঞান এবং সমাজ-ব্যবস্থা গবেষণা দ্বারা আবিষ্কার করিতে হইত। এই জন্য স্বকীয় পরিবার স্বচ্ছন্দে প্রতিপালনের পক্ষে যাহা প্রয়োজনীয়, শ্রমজীবীরা তদপেক্ষা চারি কি পাঁচগুণ অধিক উপার্জন করিতে পারিত এবং বুদ্ধিজীবীদিগের আচরণের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ তাহাদিগের পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিপালনার্থ যাবতীয় দ্রব্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই উপঢৌকন দিত। শ্রমজীবীদিগের দ্রব্যোৎপাদন এবং মানসিক শান্তির উৎকর্ষ সাধনার্থ যাহা যাহা নিতান্ত প্রয়োজন, তাহার বিজ্ঞান এবং সংগঠনের শিক্ষা (তথাকথিত লিখন-পঠন সাহায্যে নহে) মুখে মুখে দান এই কালে সমাজ-ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হইত।

দ্বিতীয়তঃ, প্রথম চারি হাজার বৎসরের পর-পরই পুনরায় চারি হাজার বৎসর ব্যাপী আর একটি সময় আসে, যখন বুদ্ধিজীবীদিগের দায়িত্ব সম্পাদনে অবহেলার ফলে সমাজ-বিধানের "প্রকৃতি-সঙ্গত শৃঙ্খলা" আর কার্যকরী থাকে নাই। প্রথম চারি হাজার বৎসরের শেষদিকে দ্রব্যোৎপাদনে এবং মানসিক শান্তির উৎকর্ষসাধনের জন্য যে-বিজ্ঞান এবং ব্যবস্থার প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে শ্রমজীবীরা যথেষ্ট অভ্যস্ত হয়। এই জন্যই তখন সমাজ-কল্যাণে বুদ্ধিজীবীদিগের সাহায্যের প্রয়োজন হয় নাই, কেন না শ্রমজীবীরা নিজেরাই কর্তব্যপালনে সমর্থ হয়। ফলে, ক্রমশঃ বুদ্ধিজীবীরা সমাজের সর্বতোভাবে হিত সাধন-কল্পে যে-বিজ্ঞান এবং ব্যবস্থার চর্চার প্রয়োজন, তৎপ্রতি উদাসীন হইয়া পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত ঐ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থার বিষয় ভুলিয়া যায়। এমন কি যে ভাষায় এই বিজ্ঞান এবং ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহার বহুসহস্র ব্যাপী এই সকল বিষয়ের আলোচনার অভাবে, তাহাতেও বিস্মৃতি ঘটে। বুদ্ধিজীবীদিগের স্বীয় কার্যে অবহেলা সত্ত্বেও এই সময়ের প্রথম হাজার বৎসরে তাহাদের পরিবার প্রতিপালনের স্বচ্ছন্দতার কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই, কেন না তখনও শ্রমজীবীদিগের উপার্জন এত সুপ্রচুর যে, বুদ্ধিজীবীদিগকে তাহাদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত উপঢৌকন দানে কোন বাধা উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু অতঃপর একটি সময় আসিল, যখন প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে দ্রব্যোৎপাদন-ক্ষেত্রে চিরাচরিত প্রথানুযায়ী শ্রমজীবীরা আর সুপ্রচুর উপার্জনে সমর্থ হইল না। এই সময়ে শ্রমজীবীদিগের পক্ষে পুনরায় বুদ্ধিজীবীদিগের সহায়তার প্রয়োজন উপস্থিত হয়, কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা কর্তব্য-কর্মে অবহেলাক্রমে দ্রব্যোৎপাদন-বিজ্ঞান বিস্মৃত হওয়ায় কার্যকরী ভাবে আর শ্রমজীবীদের সহায়তা দান করিতে পারিল না। এমন কি শ্রমজীবীদিগকে তাহারা প্রতারণা পর্যন্ত করিতে থাকিল—ফলে দ্রব্যোৎপাদনের প্রাচুর্য সংরক্ষিত থাকিল না এবং শ্রমজীবী কর্তৃক বুদ্ধিজীবী-দিগের পরিবারের স্বচ্ছন্দ প্রতিপালন পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আর স্বেচ্ছায় উপঢৌকন হিসাবে দান সম্ভব রহিল না। এই নিমিত্তই বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করিয়া সমাজের ভিত্তিতে রাষ্ট্র-পরিচালনার স্থলে রাজতন্ত্র সূচিত করিল, প্রাচীন কালের দ্রব্যোৎপাদনের এবং মানসিক শান্তির প্রাচুর্য ঘুণ ধরিল এবং সর্বত্র বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। এই কালের শেষের দিক হইতেই সমগ্র মনুষ্যজাতি সর্ববিধ দুঃখ-দুর্দশা পীড়িত হইতে থাকিল এবং তাহাদের অতীত সৌভাগ্য

ফিরাইয়া আনিবার জন্য কি করা যায়, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না।

তৃতীয়তঃ, চারি হাজার বৎসরের তিন পর্ব্বের সর্ব্বশেষ পর্ব্ব—এই বর্ত্তমান কাল। এই কালের প্রথম হাজার বৎসরে মনুষ্য-সমাজের অবস্থার উন্নতিবিধানের কোন চেষ্টা হয় নাই—বুদ্ধিজীবীদিগের সকল প্রকার চাল-চলন সম্বন্ধে শ্রমজীবীরা সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়ে এবং স্বাস্থ্যপ্রদ দ্রব্যোৎপাদনের ঘাটতি সমস্যা সমাধানার্থ বুদ্ধিজীবীরা প্রকৃত বিজ্ঞান এবং সংগঠনের পুনরুদ্ধারমূলক তাহাদের দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য কি করিতেছে, তদ্বিষয়ে শ্রমজীবীরা সম্পূর্ণ অনবহিত থাকে। এই পর্ব্বের প্রথম হাজার বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেলে মনুষ্য-সমাজের ধ্বংস যখন অনিবার্য্য হইল, তখন শাক্যসিংহ, যীশুখৃষ্ট এবং নবী মহম্মদ এই তিনজন মহাপুরুষ পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে পর পর আবির্ভূত হইলেন এবং সর্ব্বক্ষেত্রে শান্তি ও সুখের তত্ত্ব প্রচার করিয়া মনুষ্যজাতিকে সান্ত্বনা দান করিলেন। এই সকল মহাপুরুষের বাণী যে অন্ততঃ সাময়িকভাবেও মনুষ্য-জাতির পক্ষে মহৌষধ স্বরূপ কার্য্য করে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রমজীবীরা প্রাচীন কালের ন্যায় দ্রব্যোৎপাদনের প্রাচুর্য্য-সাধন পন্থা শিক্ষা করিতে পারে নাই, কিংবা সেকালের প্রাচীন বুদ্ধিজীবিত্বের আদর্শও পুনরায় সঞ্জীবিত হয় নাই।

বুদ্ধিজীবিত্বের প্রকৃত যে আদর্শ—তদনুসারে বুদ্ধিজীবীরা সম্পূর্ণতঃ শ্রমজীবীদের কল্যাণকল্পে কার্য্যনিযুক্ত থাকিবে এবং দ্রব্যোৎপাদন ও মানসিক সুখলাভের বিজ্ঞান আবিষ্কার করিবে,—তৎস্থলে বুদ্ধিজীবিত্বের একটি বিকৃত আদর্শ এই কালে সর্ব্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছে। বুদ্ধিজীবিত্বের এই বিকৃত আদর্শের পীড়নে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের মধ্যে ঘন্দ্বযুদ্ধ করিয়া বর্ত্তমানে সর্ব্বত্র নিজেদের স্বার্থসাধনার্থ শ্রমজীবীদিগকে শোষণ করিতেছে। প্রকৃত দ্রব্যোৎপাদন এবং মানসিক সুখলাভের বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে এই যুগের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা একটি তথাকথিত বিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছে এবং সে-বিজ্ঞান শ্রমজীবীদিগের কল্যাণসাধন অপেক্ষা বুদ্ধিজীবী কর্ত্তৃক তাহাদের শোষণের অধিক সহায়তা করিতেছে।

এই যুগের সূচনা হইতেই এইভাবে বিকৃত বুদ্ধিজীবী এবং শ্রমজীবীদের মধ্যে অক্লান্ত সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে। সত্য বটে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী চারি হাজার বৎসরের তুলনায় এই যুগের মানুষ অধিকতর কর্ম্মঠ, কিন্তু তাহার এই কর্ম্মঠতা এ পর্য্যন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে ফলবতী হয় নাই, কেন না তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদিগের স্বার্থবুদ্ধিপ্রসূত সংগঠন এবং কু-বিজ্ঞান ইহার ভিত্তি।

মনুষ্যজাতির বিগত বার হাজার বৎসরের এই ইতিহাস পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে বুঝা যায় যে, এই বার হাজার বৎসরের প্রথম আট হাজার বৎসরে মনুষ্যসমাজে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই, কিন্তু শেষ চারি হাজার বৎসর ধরিয়া একপ্রকার বিরামহীন যুদ্ধই চলিয়া আসিয়াছে। এবং এই যুদ্ধের মূলে রহিয়াছে আভিজাত্য-নামধারী বিকৃত বুদ্ধিজীবিত্বের বর্ত্তমান আদর্শ।

এই দিক্ হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধকে দেখিলে বুঝা যায় যে, আপাতদৃষ্টিতে ইহা জার্ম্মানী এবং ইংলণ্ডের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ, কিন্তু বস্তুতঃ উহা শ্রমজীবী ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, অথবা অভিজাত সম্প্রদায়ের পরস্পর যুদ্ধ। এই যুদ্ধে শ্রমজীবীরা—হিটলার, মুসোলিনী, ষ্টালিন প্রভৃতি ইহাদেরই পুরোধা—মেসার্স চার্চ্চিল এণ্ড কোম্পানী প্রমুখ তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের সমক্ষে প্রমাণিত করিবে যে, তাঁহাদের (অর্থাৎ বিকৃত বুদ্ধিজীবীদের) সৃষ্ট কু-বিজ্ঞান জনসাধারণের মানসিক শান্তিলাভ অথবা দ্রব্যোৎপাদনের উৎকর্ষ সাধনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।

ইংলণ্ড কিংবা জার্ম্মানী, উভয়ের কেহই যে এই যুদ্ধে চরম ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না, এই প্রত্যাশা করিবার আমাদের সর্ব্ববিধ যুক্তি বর্ত্তমান, কিন্তু সর্ব্বত্রই শ্রমজীবীরা বুদ্ধিজীবিত্বের বিভিন্ন বিকৃত আদর্শের, তথা বিগত চারি হাজার বৎসর ধরিয়া মনুষ্যজাতির মধ্যে যে কু-বিজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহার সংহার সাধন করিবে।

এই যুদ্ধ উপসংহারের একটি মাত্র পন্থা বিদ্যমান :— বার হাজার বৎসরের কালচক্রের প্রথম চারি হাজার বৎসরের পর্ব্বে দ্রব্যোৎপাদন এবং মানসিক সুখ-বিধানের যে-বিজ্ঞান প্রচলিত ছিল, সেই প্রাচীন বিজ্ঞানের পুনরুদ্ধার সাধন এবং সমাজ-বিধানের "প্রকৃতিসঙ্গত শৃঙ্খলা"র ভিত্তিতে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সংগঠন।

মনুষ্য-সমাজকে এই আদর্শের সন্ধান যদি আর কেহ দান না করিতে পারেন, তবে আমরা উহা করিতে প্রতিশ্রুত থাকিলাম।

আমাদের সুচতুর রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং প্রধান মন্ত্রীবৃন্দ নিজদিগকে আজ মিথ্যা ও ধাপ্পিকতার পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন, মনুষ্যত্বের পিপাসায় তাঁহারা আজ পশুবৎ—তাঁহারা কি এখনও আমাদিগের কথায় কর্ণপাত করিবেন না?

---

*এই উইল্‌সি বক্তৃতা'র ১৩শে অক্টোবরের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

# নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের ছোট গল্প

( ১২৯৭ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩০৬ বঙ্গাব্দ )

—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

১২৯৭ বঙ্গাব্দের "সাহিত্য" মাসিক পত্রিকায় নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের "জানী কে" ছোট-গল্প প্রকাশিত হয়।

যে সমস্ত মাসিক পত্রিকা হইতে এই প্রবন্ধের জন্য সংগ্রহ-কার্য্য করা হইয়াছে, সে সমস্ত তৎকালীন সম্ভ্রান্ত ও প্রচলিত মাসিকপত্র। সেইগুলিতে যে সকল ছোট-গল্প ১২৯৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাদের উল্লেখ করা হইল :

১২৯৭ বঙ্গাব্দ—দীনেন্দ্রকুমার রায়—যে পাড়ায় মেলা—ভারতী ও বালক ;

১২৯৭ বঙ্গাব্দ—নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়—জানী কে—সাহিত্য ;

১২৯৭ বঙ্গাব্দ—নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়—তীর্থযাত্রী—সাহিত্য ;

১২৯৭ বঙ্গাব্দ—নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়—স্লোরেন্সে দুই রাত্রি—সাহিত্য।

মাত্র দুইজন লেখক উক্ত ১২৯৭ বঙ্গাব্দে মাত্র চারিটি ছোট-গল্প বাংলা সাহিত্যে লিখিয়াছিলেন। ইহা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে লক্ষণীয়।

নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের রচনা পড়িয়া মনে করিতে ইচ্ছা হয় না যে, ইহা তাঁহার রচনা ; ইহা যেন হুবহু সুরেশচন্দ্র সমাজপতির। সে জন্য সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে তুলনা করা চলিতে পারে। তাঁহারা এক-জাতীয় ছোট গল্প-লেখক ছিলেন।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি* সম্পর্কে বলা হইয়াছে, তাঁহার লেখার প্রধান গুণ সংক্ষিপ্ততা বা গুছাইয়া বলিবার অভ্যাস যা যাহে বকিয়া ছোট গল্প না-বাড়াইবার প্রবৃত্তি। নলিনী-কান্ত মুখোপাধ্যায়ও তেমন নিছক ঘটনাটি সহজে বলিতে পারিতেন, এজন্য তাঁহাকে গলদঘর্ম হইতে হইত না।

"জানী কে", তাঁহার প্রথম ছোট গল্প "সাহিত্যে"র জন্ম-সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল। ইহাকে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির "বড় কে" নামক গল্পটির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অবশ্য "বড় কে" প্রকাশিত হইয়াছিল উহার এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৯৮ বঙ্গাব্দের "সাহিত্যে"। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়কে অনুকরণ করিয়াছিলেন, না নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে অনুকরণ করিয়াছিলেন।

"জানী কে" দুইটি খেলার সঙ্গিনী মেয়ের দ্বন্দ্বের কথা। খেলার ছলে মেয়েদের ঝগড়া হয়, আবার মিটিয়া যায়। ঝগড়া করিবার পূর্ব্বে তাহারা একত্র খেলিতেছিল, ঝগড়া মিটিবার পরেও তাহারা একত্র খেলা করে ; কিন্তু ঐ মেয়ে দুইটির ঝগড়ার সূত্র ধরিয়া তাহাদের অভিভাবিকারা যে ঝগড়া বাধায়, তাহা আর মিটিতে চায় না :

> "সকলের দৃষ্টি বালিকা দুইটির উপর নিপতিত হইল। লজ্জায় সকলের মাথা হেঁট হইয়া আসিল। কেহ কেহ বা গোপনে চোখের জল মুছিতে লাগিল, শেষে হাসিয়া সকলে বাড়ী ফিরিয়া গেল।—যিনি বলিয়াছেন যে, বালকের ন্যায় হৃদয় না থাকিলে স্বর্গে যাওয়া যায় না, তিনি বুঝি একজন কবি, তিনি বুঝি বা দেবতা হইবেন।"

এই একই বর্ষে নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের "তীর্থ-যাত্রী" এই একই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির "তীর্থের পথে" ছোট গল্পটি "তীর্থ যাত্রী" ছোট গল্পের ন্যায়, কিন্তু এই দুইটি ছোট গল্প বিভিন্ন বিষয় লইয়া রচিত।

"তীর্থ-যাত্রী" ঘটনামূলক ছোট গল্প এবং "তীর্থের পথে" প্রবন্ধমূলক। একে দেখাইতেছে—তীর্থ করা তীর্থস্থানে না গিয়াও চলিতে পারে, তীর্থের দেবতা ঘরেই আছেন ; অন্যে দেখাইতেছে—গৃহ তীর্থ পাপনাশন, তীর্থস্থানে না গেলে ধর্ম্ম হয় না।

"তীর্থ-যাত্রী"তে নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন, শ্যামলাল ঘোষের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি জাগরূক ছিল, তাই তাহাকে পুরীধামে শ্রীক্ষেত্রে গিয়া জগন্নাথ দেবের দর্শনলাভ করিতে হয় নাই।

* ৭৫ সংখ্যক প্রকাশিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তার পর আর একটি কথা লেখক এখানে ইঙ্গিত করিতেছেন, তাহা সর্ব ধর্মের উপরে। কর্মই ধর্ম। কর্ম দ্বারা ধর্ম প্রাপ্তি হয়। কর্ম করিলে ভগবান তুষ্ট হন। কর্ম অর্থই ভগবদ্-কর্ম। কর্ম যোগ।

মানুষ নিষ্কর্মা থাকিয়া আলস্যে কাল কাটাইলে ভগবান তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। ইংরাজীতে যাহাকে বলে duty, task of God, বাঙ্গালায় কর্তব্য বলিলে যাহা বোঝা যায়, তাহা সম্পাদন করিলে ভগবানের কার্যই করা হয়। বিশ্বস্রষ্টা মানুষকে হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মস্তিষ্ক দ্বারা এ জগতে কাজ করিতে পাঠাইয়াছেন, মানুষ উহাদের চালনা করিয়া নিজের কাজে জগতের উপকার সাধন করিবেন, ইহাই বিশ্বনিয়ন্তার অভিলাষ।

নিষ্ক্রিয়ভাবে ভগবানকে ডাকিলে, ভগবান সন্তুষ্ট হইবেন না। কার্যদ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই তিনি মহা সন্তোষ লাভ করিবেন।

এই ছোট গল্পের আর একটা দিক্ আছে। সেবাই ধর্ম। পরের সেবা করা, দরিদ্রের দুঃখ মোচন করা ও পরের দুঃখে কাঁদিতে শেখা ধর্মের অন্তর্নিহিত গূঢ় কথা।

ভগবান দরিদ্রনারায়ণরূপী। দরিদ্রের দুঃখ নাশ করিলেই ভগবানের কার্য করা হয়। ইহাতে ভগবানের আনন্দ। এখানে শ্যামলাল পুরী যাইবার পথে মেদিনীপুরের নিকটস্থ এক গ্রামে গিয়া ক্ষুধাতুর, মুমূর্ষু পরিবারের মুখে ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, আতপ-বৃষ্টিতে ছায়াদানের ব্যবস্থা করায় শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথদেব শ্যামলালের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া নিজেই শ্যামলালের মূর্তি ধারণ করিয়া শ্রীমন্দিরে রজনীর দর্শনের জন্য আবির্ভূত হইলেন। রজনীর তাহাতে পরম শিক্ষা হইল। পায়ে চলিয়া জগন্নাথদেব দর্শনে তাহার যে ফললাভ হইল, তাহা অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী হইয়াছিল মেদিনীপুরের গ্রামে দরিদ্র পরিবারের সেবা করিয়া। রজনী তাই বিস্মিত হইল, শ্যামলালকে সে নিজের চোখে দেখিতে পাইয়াও কাছে পায় না।

এই ঐশী মূর্তি লাভ শ্যামলালের পক্ষে হইল তাহার দরিদ্রসেবার পরম পুরস্কার। ইহাই এই ছোট গল্পের নৈতিক উদ্দেশ্য। ইহাতেই ইহাকে উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

তারপর এই ছোট গল্পটির করুণভাব দিক্। শ্যামলালের সেই পল্লীর দরিদ্র পরিবার হইতে যে বিদায়ের দৃশ্য দেখানো হইয়াছে, তাহা বাস্তবিক করুণ।

শ্যামলাল উক্ত দরিদ্র পরিবারে গিয়া যাদামশায় হইয়া পড়িয়াছিল। ছেলেমেয়েরা তাহাকে এই যাদামশায়ের নিকট অল্প পাইয়া ইহাকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহে নাই। ক্ষণকালের জন্য সে কোথাও বেড়াইতে গেলে এই সন্তান-সন্ততিগণ তাহার অনুপস্থিতি সহ্য করিতে পারিত না। একে অন্যকে নানা প্রশ্ন করিত, তাহারা তাহাদের মায়ের নিকট, ঠাকুরমার নিকট তাহার খোঁজ করিত।

এই শিশুগণ কিন্তু ঐ বাড়ীর পরিণতবয়স্কেরা শ্যামলালকে একটু সময়ের জন্য কোথাও যাইতে দিতে চাহিত না। তাহারা মনে করিত শ্যামলালের গৃহ আছে, পরিবার-পরিজন আছে এবং পৃথক্ একটা সংসার আছে, সে কি করিয়া অধিক দিন সেখানে অবস্থান করে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহার অমায়িকতার ও মিষ্ট ব্যবহারের সঙ্গ তাহারা ত্যাগ করিতে চাহিত না।

তাই শ্যামলাল যখন একরূপ ফাঁকি দিয়া চলিয়া আসিল, তখন সব চেয়ে বেশী দুঃখ হইয়াছিল এই দুঃস্থ পরিবারের ছেলে-মেয়েদের। বড়রা তাই বলিত: "তোদের যাদামশায় ঐ আকাশের তারা—উল্কা; হঠাৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া এই মাটিতে পড়িয়াছিল, আবার ঊর্ধ্বে ঐ নক্ষত্রমণ্ডলীতে ও গ্রহরাজির ভিতরে দেখতা হইয়া মিলিয়া গিয়াছে।"

শ্যামলালেরও এই গরীব পরিবারের বিরহ, সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া নিজের ছেলে মেয়েদের পাইয়াও যায় নাই।

> "তাদের আর শ্রীক্ষেত্রে যাওয়া হইয়াছিল কি না, সে খবর আমরা বলিতে পারি না। তবে এক এক দিন সন্ধ্যার সময় মাঠে গাছ তলায় বসিয়া ঝিকি-মিকি আলো দেখিতে দেখিতে শ্যামের মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিত। কে জানে দেব-দর্শন কামনার সহিত আর একবার সেই ছেলে মেয়ে দুটিকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা আসিয়া শ্যামের হৃদয়কে আকুল করিত কি না।"

এখানেই ছোট গল্পের সাফল্য। এই করুণ উপসংহার পাঠক-পাঠিকার মনকে সহসা দ্রবীভূত করে এবং স্বতঃই ছোট গল্পের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া ফেলে।

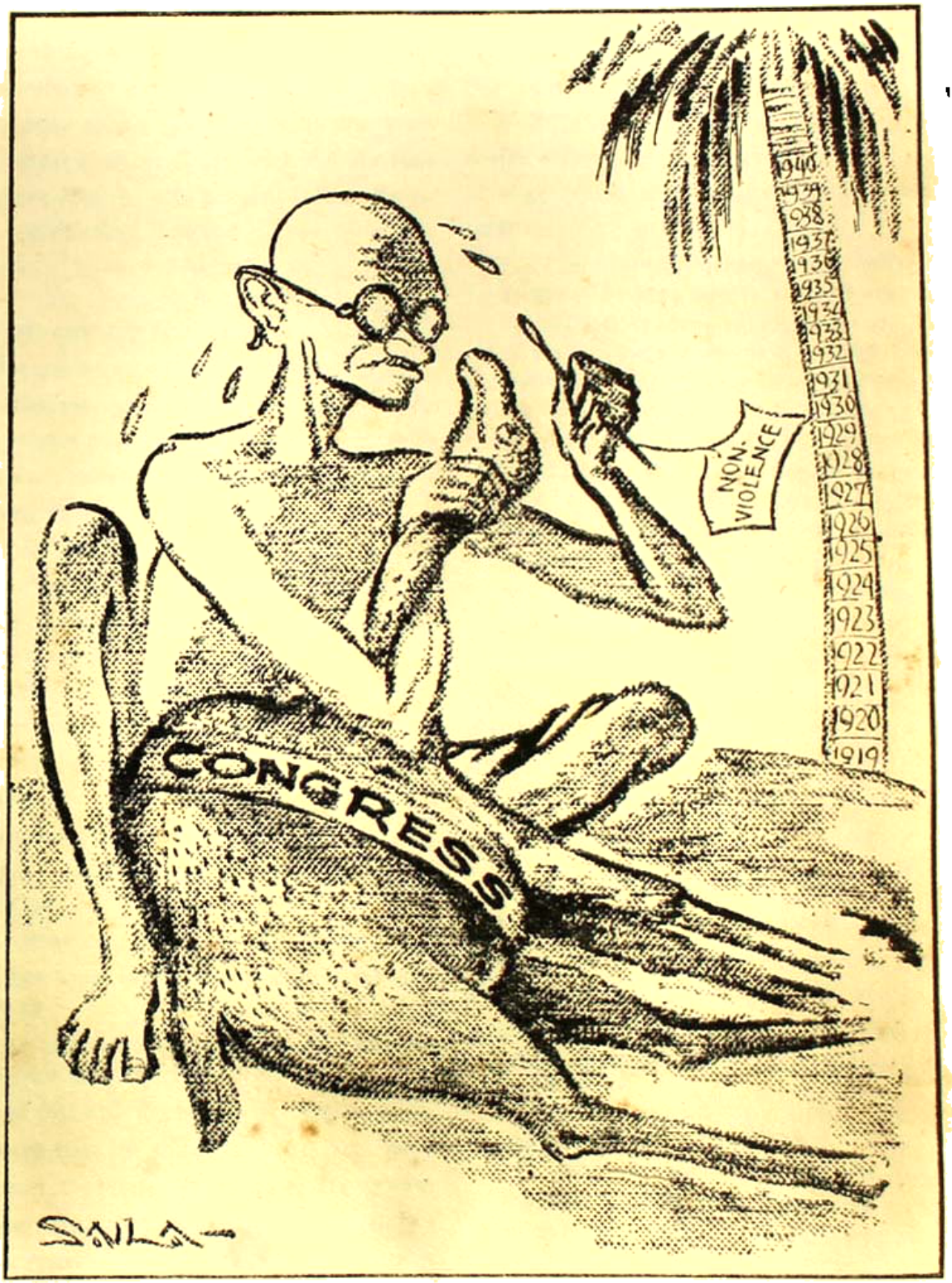
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
NON-VIOLENCE
CONGRESS
SALA

বৃথা চেষ্টা

নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় লৌকিক ধর্ম সাধনের পন্থা বাহির করিয়া এই ছোট গল্প লিখিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, লোকে জানুক ও বুঝুক এইরূপে পরের সেবা করিতে হয়, সেবা-ধর্ম সকলের উপরের ধর্ম, শুধু ভক্তি-নিষ্ঠায় ধর্ম সাধন হয় না, ইহা ধর্মের practical বা ক্রিয়ার দিক্।

ভক্তকবি চণ্ডীদাস বলিয়াছেন :

"সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই"

এই মহার্ঘ বাণী বিশেষ লক্ষণীয়। মানুষকে সেবা করিলে শ্রেষ্ঠ উপাসনা করা হয়। মানুষ নরক্রপী নারায়ণ।

নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় শ্যামলালের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া জনসাধারণকে চোখে আঙুল দিয়া বুঝাইতে চাহেন যে, লোকে ইহা করুক, তাহাতে এই সেবাকার্য দ্বারা সমাজের, দেশের ও দশের বহু উপকার সাধিত হইবে।

"তীর্থ-যাত্রী" গল্পের "দিদি! ছুটে আয়, দাদামশায় এসেছে," এই যে পংক্তি লেখক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বার বার উল্লেখ করাইয়াছেন, ইহাতে ছোট গল্পের মাধুর্য শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

সেই মেদিনীপুরের পল্লীগ্রামের দুঃস্থ পরিবারের ছেলে-মেয়ের মুখে শ্যামলালের পলায়নের জন্য হতাশ ভাব—"কোথায় দাদা মশায়। এই এল বুঝি," যাহাকে তাহারা আসিতে দেখে "ওই দাদামশায় এসেছে" বলিয়া চীৎকার—প্রকৃতির অভিনয় অতি সুন্দরভাবে এই ছোট গল্পে প্রবেশ করাইয়া লেখক তীর্থ-যাত্রীকে স্বর্গীয় মহিমায় পূর্ণ করিয়াছেন।

"ক্লোরেন্সে দুই রাত্রি" ছোট গল্পটি নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের ১২৯৭ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য' পত্রিকায় আর একটি ছোট গল্প।

উহা হেনরি হারেনের রচনার অনুবাদ বলিয়া নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় স্বীকার করিয়াছেন।

এই ছোট গল্পটি আরব্যোপন্যাসের হেমৌরা ও কামরা-আবাসের রাত্রির পর রাত্রির গল্পের ন্যায়। তবে সেখানে হত্যাকাণ্ড রোধ করিবার জন্য রাত্রির পর রাত্রি গল্প বলিয়া জীবনের রাত্রিকে বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল, এখানে তাহা নহে। এখানে ক্লোরেন্স শহরে গিয়া দুইটি রাত্রি যাপন কালে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহারই দৃষ্টান্ত।

"ঈশার পুনরাবির্ভাব" ছোট গল্পটি ১২৯৮ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যার "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইয়াছিল।

নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ইহাকে "রূপক" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং ইহা আরম্ভ করিবার পূর্বে তিনি যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে ইহা দর্পণের ন্যায় সুস্পষ্ট বোঝা যায় :

"যাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতায় একান্ত পক্ষপাতী, তাঁহাদের শিক্ষার নিমিত্ত আমেরিকার একখানি পত্রিকায় উক্ত গল্পটি প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণগুলি যে একেবারে দেখিতে পাই না, তাহা নহে; কিন্তু যাঁহারা পাশ্চাত্য সমাজের অবথা অন্ধ অনুকরণে সর্বদাই ব্যস্ত তাঁহাদের সহিত আমাদের তত সহানুভূতি নাই। পূর্ণ মাত্রায় মিষ্টভাষী ও শুভ্রবস্ত্র-পরিহিত আধুনিক শিক্ষিত ভদ্রলোক হওয়া ব্যতীত যে জীবনের আরও গভীর উদ্দেশ্য আছে, হয় তো তাহা বুঝাইবার জন্যই এই রূপকের অবতারণা। ধর্মটাকে কেবল নিতান্ত আর্টিষ্টিক (artistic) ও সুন্দর করিতে গেলে ধর্মটা কি রকম অদ্ভুত পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা লেখক বেশ দেখাইয়াছেন। গল্পটির সারাংশ এই।"

এই ভূমিকা-লিপি হইতে জানিতে পারা যায় "ঈশার পুনরাবির্ভাব" ছোট-গল্পটি আমেরিকার একখানি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। মূলগল্পটি ইংরাজী ভাষায় না কোন্ ভাষায় তাহা লেখক প্রকাশ করেন নাই এবং উহা সেই ভাষান্তরের ছোট গল্পের মূল পৃষ্ঠে অনুবাদ, না ভাষান্তরের অনুবাদ তাহাও তিনি জানান নাই।

অনুবাদ ছোট-গল্প সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ অধিকার-বহির্ভূত, কিন্তু এই "ঈশার পুনরাবির্ভাবে"র একটি স্থান পাঠক-পাঠিকাদের জন্য উদ্ধৃত না করিয়া পারা গেল না, কারণ ইহার ধর্মভাবের যে বিশ্লেষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা মহা-মূল্যবান এবং লেখকের মূল হইতে অনুবাদকের অনুবাদের কৃতিত্ব উদ্ধৃতাংশ হইতে কিছু বুঝিয়া লইতে পারা যাইবে।

"আগন্তুক যুবক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমার জন্য কি করিলে তুমি সুখী হও?'

"রোগীর শীর্ণ মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি সাগ্রহে বলিলেন, 'নীচে একজন দরিদ্র স্ত্রীলোকের বাস ভাড়িয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিবার কোন লোক নাই। আমি দু একদিন তাহার সেবা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার অসুখ হইয়া পড়িল, আমি আর যাইতে

পারিলাম না। আপনি তাহার একটু ভার লউন, আমার আর কিছু প্রার্থনা নাই।'

যুবক বৃদ্ধার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'দেখ বাছা! তোমার ছেলেটি প্রলাপ বকিতেছে। উহাকে একজন ডাক্তার দেখাও বা হাসপাতালে পাঠাইয়া দাও। আমি কিছু বলিলে ও তো কিছুই বুঝিতে পারিবে না।'

'এই বলিয়া যুবকটি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার মা নিজের কাটখই ধর্মপুস্তকখানি বাহির করিয়া দু এক স্থল পড়িতে লাগিলেন। মহাত্মা ঈশার জীবন-বৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে রোগীর মুখ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। যখন তাঁহার মা পড়িলেন, 'তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী-দিগকে সন্তোষের সহিত ভালবাস', তখন তিনি অস্থির হইয়া বিছানায় উঠিয়া বলিলেন। বলিলেন, 'বোধ হয় আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, কবে কোন্ দূর দেশে, পথের ধারে, বৃক্ষচ্ছায়ায় দাঁড়াইয়া এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন' ……তাঁহার মা তাঁহার মুখ দেখিয়া ও কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি পুত্রের পা ধরিয়া বলিলেন, 'প্রভো, গুরো, তুমি কে?'

'তাঁহার মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি মার হাত টানিয়া লইয়া বলিলেন, 'ও কি মা! আমাকে প্রভু বলিলে ঈশ্বরের অপমান করা হয়। তুমিও যে ক্ষুদ্র আমিও তাহাই'।"

লেখক নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের "জননী" ছোট গল্প ১২৯৯ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যার "সাহিত্যে" প্রকাশিত হয়। ইহা বিখ্যাত ফরাসী লেখক মোপাসাঁর (Guy de Maupassant) গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনূদিত বলিয়া তিনি ইহার শিরোনামের নিম্নে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ইহাও অনুবাদ বলিয়া ইহার সমালোচনা করা হইল না।

১২৯৯ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যার "সাহিত্যে" নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের "দেবধান" ছোট-গল্প প্রকাশিত হয়।

ইহার শেষে পাদমন্তব্যে লিখিত আছে "Andre Theuriet." অবশ্য লেখক সেই মূল ফরাসী গল্প হইতে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন নাই, উহা ইংরাজী অনুবাদ হইতে বাংলায় পুনরনূদিত।

নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের "বুড়ো কয়েদীর দুঃখ"-নামক ছোট গল্প ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যার "সাহিত্যে" প্রকাশিত হয়। ইহা ফরাসী ছোট-গল্পের (Pierre Lotti) অনুবাদ বলিয়া লেখক স্বীকার করিয়াছেন।

"সৈনিক যুগল" ছোট গল্পটি ১২৯৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের "সাহিত্যে" প্রকাশিত হয়। ইহা বিখ্যাত ফরাসী লেখক মোপাসাঁর (Guy deMaupassant) গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনূদিত বলিয়া লেখক এই ছোট গল্পের প্রারম্ভেই উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং "দেবধান", "বুড়ো কয়েদীর দুঃখ", "সৈনিক যুগল" এই তিনটি অনুবাদগল্পেরও আলোচনা করা হইল না।

১৩০২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যার "সাহিত্যে" নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের "সাধনা" প্রকাশিত হয়।

ইহা অনুবাদ নহে, নিজস্ব ছোট গল্প। "সাধনাকে" পাইয়া লেখকের ছোট গল্প লেখার প্রশংসা করা যায়। "তীর্থ-যাত্রী" ছোট গল্পেও তাঁহার ছোট গল্প রচনাশক্তির প্রশংসা করা হইয়াছে।

"তীর্থ-যাত্রী" ছোট গল্প, নিখুঁত ছোট গল্প। ছোট গল্প লিখিতে হইলে যে সমস্ত বিধি-নিষেধের বশবর্ত্তী হইয়া লিখিতে হয়, লেখক সে সমস্ত বিধি-নিয়ম উহাতে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছেন।

বাইবেলের parable-গুলি যেরূপ পূর্ণাবয়ব ছোট গল্প, তাহাতে যেমন নীতিশিক্ষা-প্রদানের ছলে ছোট ছোট গল্প সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, "তীর্থ-যাত্রী" ছোট গল্পেও পাঠক-পাঠিকাকে সদ্গতী নীতিশিক্ষা দিবার জন্য নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাকে খাঁটি ছোট গল্পও যেমন বলিতে পারা যায়, ইংরাজীতে যাহাকে বলে didactic tales তাহাও বলা যায়।

"তীর্থ-যাত্রী"কে parable-জাতীয় গল্প বা didactic গল্প বলিয়া ইহার সম্মান, প্রকৃষ্টতা ও সত্যতা বিন্দুমাত্রও খর্ব্ব করা হইতেছে না।

কেহ কেহ বলেন যে, প্রেমের গল্প বা প্রণয়-কাহিনী না হইলে ছোট গল্প হয় না; যথা, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন "ছোট গল্পের জন্ম প্রণয়ী-প্রণয়িনীর প্রেমের অভিব্যক্তির চিঠি পত্র হইতে।" তাহা হইলে পৃথিবীর সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব সাহিত্যের অসংখ্য প্রসিদ্ধ ছোট গল্প ছোট গল্পের সীমা হইতে বাদ পড়িয়া যায়।

অবশ্য ইহাতে শরৎচন্দ্রের মন্তব্যের বিরুদ্ধে শেষ করা হইতেছে না, বা তাঁহার অভিমতকে ভ্রমাত্মক বলা হইতেছে না; তবে ইহা মন্তব্য করা হইতেছে যে, এই উক্তি একদেশদর্শী বা পক্ষপাতমূলক। সেই উক্তির সম্বন্ধেও ইহা বলিবার আছে যে তিনি ছোট গল্পের সংজ্ঞা-প্রদান উদ্দেশ্যে এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন নাই; তিনি সাহিত্যের শাখা বিভাগের সময় ছোট গল্পের দৃষ্টান্ত-মূলক সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন মাত্র।

এই সম্পর্কে এত বিস্তৃত প্রশ্ন উত্থাপনের উদ্দেশ্য এই যে, আধুনিক সাহিত্য-ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রণয়ী-প্রণয়িনীর মেলন না দেখাইতে পারিলে, অন্ততঃ একটা ছেলে ও একটা মেয়ের নাম উল্লেখ না থাকিলে তরুণ-তরুণী পাঠক-পাঠিকারা উহা ছোট গল্প বলিয়াই স্বীকার করিতে চাহেন না।

ফরাসী-দেশীয় ছোট গল্পের ভিতরও এরূপ বৈষাচার প্রত্যক্ষ করা যায় এবং তাহাতে নায়ক-নায়িকার নগ্ন বাস্তব মেলনের নিদারুণ বর্ণজ্বালা-পূর্ণ প্রহসন রচিত।

বিরহপূর্ণ ফরাসী ছোট গল্পই প্রকৃত ছোট গল্প, তরুণ-তরুণী মনের ইহা রুচি-সম্মত হইলেও নায়িকা বাদ দিয়া অথবা নায়ক বাদ দিয়া ছোট গল্প লেখা চলিতে পারে। "তৃতীয়-ব্যক্তি" এই জাতীয় গল্পের মধ্যে উচ্চ আসন লাভ করিতে পারে, ইহাতে সংশয় নাই।

নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের অনুরাগ গল্প বাদ দিয়া যে একটি ছোট গল্প পাওয়া যাইতেছে, তাহা আধুনিক প্রায়শঃ দুই নায়ক-নায়িকাযুক্ত প্রণয়মূলক কাহিনী।

"সারদা" এক উড়েনীর গল্প। সারদা বাইজী ছিল: "সারদা কৃষ্ণপুরের ধনিবাসন মেলের মন্দিরের নর্ত্তকী। দশ পনের দিন নিকর দেবত্র ভূমি সে ভোগ করিয়া থাকে। পর্ব্ব উপলক্ষে তাহাকে দেবতার সম্মুখে বিদ্যাপতি ঠাকুর ও কেন্দুবিল্ব-কবির কোমল কান্ত পদাবলী গাহিতে হয়।"

নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় সারদার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। সেই এই গল্পের নায়িকা এবং নায়ক বলিয় একটি পুলিস সাব-ইন্সপেক্টারকে। সে জাতিতে বাঙ্গালী। তাহার নাম বসন্তকুমার, বাড়ী বরিশালে।

এক দিন সারদা ও তাহার ভ্রাতৃবধূ সুন্দরা নূনা নদীতে সন্ধ্যা স্নান করিতে করিতে অলিত-বসনা হইয়া রঙ্গকেলি করিতেছিল, এমন সময়ে দারোগা বসন্তকুমারের প্রাদুর্ভাব হইল। বসন্তকুমার তৃষিত নয়নে এই দুইটি যুবতীর নগ্নযৌবন-সুধা কিছুক্ষণ ধরিয়া পান করিতেছিল, তখনও সারদা বা সুন্দরা তাহাকে দেখে নাই। দেখে যখন তাহারা তাহাকে দেখিল, তখন নায়ক বসন্তকুমার অপ্রস্তুত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ধনিবাসন দেবের মন্দির কোন্ দিকে?"

তখনকার দিনে অর্থাৎ ১৩০২ বঙ্গাব্দে, এরূপ ভ্রষ্ট-রুচির আবির্ভাব, পুরুষকে দিয়া নারীর যৌবন রূপের উপভোগ করানো এই লেখকের হাতে দেখা গেল।

সেদিনকার সন্ধ্যার ব্যাপার গেল। শেষে ধনিবাসন দেবের মন্দিরের সম্মুখে বাঈজির নাচ। তাহাতেও অনেক শিরঃপীড়া দেওয়া, কুসুম ছোড়া প্রভৃতির বৃত্ত—নায়ক দারোগা বসন্তকুমারকে দিয়া নায়িকা সারদার উপর—লেখক চিত্রিত করিয়াছেন।

তৃতীয় দিনে আসিল নৌকা-খণ্ড। সারদা এক সন্ধ্যার নৃত্য প্রদর্শনের পর নৌকায় উঠিয়াছিল:

"সারদা জলের উপর পা দুখানি ভাসাইয়া নৌকায় বসিয়াছিল। তাহার সতৃষ্ণ নয়ন মন্দির-প্রাঙ্গণাভিমুখী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা পাদমূল হইতে অলক্তক-রাগ দৌত করিয়া লইয়া যাইতেছিল।

"ঘাটে আর লোক নাই। সমস্ত লোক প্রাঙ্গণে আরতির সহিত যাত্রা শুনিতেছে। বসন্তকুমার ধীরে ধীরে নৌকার কাছে আসিয়া সারদাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'আমাকে নৌকায় লবে কি?'

"সারদা একটু মধুর হাসিয়া বলিল, 'যদি নৌকা ডুবিয়া যায়।'

"'নৌকার দাম দিব।'

"'যদি আমি ডুবিয়া যাই?'

"'সঙ্গে সঙ্গে ডুবিব।'

"'এ কথা অনেকেই বলিয়া থাকে।'

"'আচ্ছা, না হয় আমার কথা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ।'

"'তবে উঠিয়া আইস, কিন্তু দেখিও যেন তরাডুবি না হই।'"

এ যেন একেবারে প্রতাপ-শৈবলিনীর চিত্র।

"শৈ। শৈ। আজ মরা গাঙ্গে চাঁদের আলো কেন!"

"এ চাঁদের আলো নয়, সূর্য্য উঠিয়াছে।"

এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখরে"র দৃশ্য উল্লেখযোগ্য। উপযোক্ত অংশের কথাগুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন, কারণ বসন্তকুমারকে দিয়া সারদার এই স্বীকারোক্তি করাইয়া লওয়া বসন্তকুমারের চরিত্র-বিশ্লেষণের পক্ষে বিশেষ কার্যকরী।

তারপর আসিল সারদার ভ্রাতা সুবলের কব্জির উপর চুড়ি চুরি করিবার দৃশ্য। সুবল এই বসন্তকুমার ঘোষালের হাতে ধরা পড়িল এবং সুবলের মত এই বসন্তকুমার ঘোষালই বিধান করিল। তখন সারদার অনেক আকুতি মিনতি বসন্তকুমারের কাছে ব্যর্থ হইল :

"বসন্ত এনট্রেন্স ফেল করিয়া পুলিশের কর্ম গ্রহণ করিয়াছে। পুলিসের উচ্চ কর্মচারী হইবার আকাঙ্ক্ষায় তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ। ...একজন রমণীর সুন্দর মুখ দেখিয়া ভুলিয়া এরূপ স্বার্থত্যাগ বসন্তের বিবেচনায় নিতান্ত মূর্খতা। এই সমস্ত ভাবিয়া বসন্ত অতি কর্কশস্বরে বলিল, 'বৃথা কেন আলাতন করিতেছ, আমি তোমার ভাইকে ছাড়িয়া দিতে পারি না।'

সারদা অশ্রুজলে পরিপূর্ণ বিস্ফারিত লোচনে বসন্তকুমারের দিকে চাহিয়া বলিল, 'আমার ভালবাসারও কি কোন শক্তি নাই!' সারদা কুলপ্রথানুযায়ী চিরকুমারী ছিল।

"সারদার সূর্যকিরণোজ্জ্বল অশ্রুবিন্দু মুক্তার ন্যায় নদী-তটস্থ হরিৎ শস্যের উপর পড়িতেছিল বসন্তকুমার হাসিয়া বলিল, 'বেশ্যার ভালবাসা'!"

বসন্তকুমার যে খাঁটি পুলিসের লোক, নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় তাহা বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

"পরদিন ৺বিশ্বেশ্বর দেবের মন্দির নিম্নে সারদার মৃতদেহ দৃষ্ট হইল। এখনও যেন সে পুষ্পমালাশোভিত আলোকাকীর্ণ দেবমন্দির-সংলগ্ন নৃত্যশালার কথা ভুলিতে পারে নাই।"

এই খানেই ছোট গল্পটি লেখক শেষ করিয়াছেন এবং ছোট গল্পের নিত্য আবশ্যকীয় জিনিষ "শেষ-করুণ" দ্বারা ধ্বনিকাপাত করিয়াছেন। ইহাই "সারদা"কে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

'সারদা' ঘটনা-মূলক ছোট গল্প। নারীর মন ভালবাসা চায়। পুরুষের মন যেরূপ চায়, তাহা অপেক্ষা বোধ হয় বেশীই চায়।

সারদা তাই চিরকুমারী থাকিয়াও পাষণ্ড বসন্তকুমারকে দেখিয়া প্রাণটা ঢালিয়া দিয়াছিল। নিষ্ঠুর বসন্ত তাহার অপবাদ করিল, কারণ সে পুলিস। যে মুখে প্রথমতঃ সে বলিল, "তোমার সঙ্গে জলে ডুবিয়া মরিব," সেই মুখেই শেষে বলিল, "বেশ্যার ভালবাসা!" অকপটা সরল-বিশ্বাসিনী সারদা তাই নারীজাতির সর্বনিকৃষ্ট তিরস্কার 'বেশ্যা হওয়া,' হৃদয়ে সহিতে পারিল না, তাই সে আত্মহত্যা করিল। যে দেবতার সে পূজা করিত, সেই দেবতার সম্মুখেই আত্ম-বিসর্জন দিল।

নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের "সুরভি" গল্প ১৩০৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "সাহিত্যে" প্রকাশিত হয়। লেখক এই ছোট গল্পের শেষে পাদমন্তব্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, "সুরভি" ইংরাজী হইতে অনূদিত।

"বন্যা" ছোট গল্পটি ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইয়াছিল। নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় এই ছোট গল্পেরও পাদমন্তব্যে জানাইয়াছেন যে, ইহা "কিপলিং" হইতে ভাষান্তরিত। সুতরাং এই দুইটি অনুবাদ গল্পের বিষয় আলোচনা করা হইল না।

নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের "তুলনায় সমালোচনা" ছোট গল্পটি ১৩০৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই ছোট গল্পের নামটি পড়িলে অনেকেই হয় তো মনে করিবে, ইহা ছোট গল্প নহে। প্রকৃত পক্ষে ইহা ছোট গল্প।

১৩০৬ বঙ্গাব্দ বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্পের স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর হইতে ছোট গল্পে "রবীন্দ্র-যুগ" আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া মন্তব্য করা গেল, অর্থাৎ, বাংলার প্রাচীন-পন্থী বা সংস্কার-বিরোধী দল তখন হইতে আর রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া প্রসার লাভ করিতে পারেন নাই।

এই ১৩০৬-১৩০৭ বঙ্গাব্দে, খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর নব প্রারম্ভে নব নব পন্থার অভিনব সুন্দর লেখা বাহির হইতে আরম্ভ হইল। উচ্ছৃঙ্খলতা, উদ্দামতা ও স্বেচ্ছাচারিতা ছোট-গল্পে চলিল না। সেই নিয়মতান্ত্রিকতার জন্যই তখন হইল সাহসের উৎস। তাই তখনকার নলিনীকান্ত, নগেন্দ্র গুপ্ত, স্বর্ণকুমারী, যোগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র রায়, সুরেশ সমাজপতি, প্রমথ চৌধুরী, হৈমেন মজুমদার, প্রভাত মুখোপাধ্যায় আর আগেকার লেখক থাকিলেন না। সকলেই

স্বতন্ত্র, সংবৃত, সংবহিত হইয়া কলম চালাইতে লাগিলেন। সে জন্য ঐ সময়ে যে সমস্ত ছোট গল্প লিখিত হইতে লাগিল, সে সমস্ত উচ্চ শ্রেণীর হইল। ইহা বলিলে নিশ্চয়ই অতিরঞ্জনা হইবে না, সেই সময়ের এমন অনেক ছোট গল্প আছে, যেগুলি আধুনিক কালের অনেক ছোট গল্প হইতে উৎকৃষ্ট।

নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের "তুলনায় সমালোচনা" ছোট গল্পটির ন্যায় এত চমৎকার ছোট গল্প আধুনিক কালেও কদাচিৎ দেখা যায়। ইহা শিক্ষা-বিষয়ক, সে শিক্ষা নৈতিক ও সামাজিক।

এই ছোট গল্পটির আর একটা চমৎকারিত্ব এই যে, নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ইহাকে নিজে না বলিয়া তাঁহার গৃহিণীর দ্বারা বলাইয়া উহার নাটকীয় প্রভাব বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এ ধরণের ছোট গল্প বড় চমৎকার। ইহার প্রবর্ত্তক ও প্রচারক রবীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁহার ছোট গল্প "ক্ষুধিত পাষাণ" এই নাটকীয় প্রথায় সম্পাদন করিয়াছেন। লেখক যাহারও মুখে সে বিষয়টি যেরূপ শুনিয়াছিলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছেন।

লেখক নলিনীকান্তের একটি নৈতিক ও সামাজিক চিত্র উপস্থাপিত করার আবশ্যকতা ছিল, তাহার নিমিত্ত হইল তাঁহার গৃহিণী বা গৃহিণীর পত্র :

> "প্রাতঃকালে বাতায়নপথে বসিয়া সম্মুখে বহুদূর বিস্তৃত কোমল শস্যশ্যামল ভূমিখণ্ড দেখিতেছিলাম। আকাশ সুনীল ও সম্পূর্ণ মেঘশূন্য। দ্বারের নিকট উচ্চ হাস্যধ্বনি শুনিয়া ফিরিয়া চাহিলাম—গৃহিণী একখণ্ড পত্র হস্তে হাসিতে হাসিতে আসিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যাপার কি ?'"

নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় সে যুগের বাঙ্গালী মেয়েদের অল্প বিদ্যালাভ যে একমাত্র স্বামীর নিকট দু'কথায় চিঠি লিখিতে পারার উদ্দেশ্যে, তাহা এখানে চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আবার ভবিষ্যৎ যুগের স্ত্রী-শিক্ষা ও নারী-জাগরণ পুরুষ জাতির অবমাননাকর হইবে, কারণ হিন্দু শাস্ত্রে আছে :

> "পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
> রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।"

সে সময়ের প্রতিও তিনি কটাক্ষপাত করিয়াছেন। এই দুই অবস্থা সম্পূর্ণ রূপে প্রকটিত করিবার জন্য নিম্নে দুইটি বিভিন্ন স্থলের বর্ণনা উদ্ধৃত করা গেল :

> "পত্রখানি মেয়ে হাতের। বাঙ্গালীর মেয়ের চিরপরিচিত সেই বাঁকা বাঁকা পাকা অক্ষর। হাতে খড়ি দিয়াই পাকা লেখক হইবার আশা বাঙ্গালীর মেয়ের হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠে। দুরু দুরু হিয়ায় বালিকা যখন স্বামীর প্রথম পত্র খোলে তখনই একটু ধরিয়া ধরিয়া ভাল করিয়া একখানি জবাব লিখিবার ইচ্ছা হয়। ভ্রাতাদের সাহায্য-সাধনা করিয়া একটা যেমন তেমন রোখাড় কলম সংগ্রহ হইলে, বৈকালে ছাদের এক কোণে, অলিন্দের ছায়ায় বা নিশীথে নির্জ্জন গৃহে প্রদীপ সম্মুখে, বিকাশোন্মুখ ক্ষুদ্র হৃদয়ের গোটা কতক কথা বালিকা কাগজের উপর প্রতিফলিত করে। দুই চারিটা কথাতেই দুই পৃষ্ঠা কাগজ পূরিয়া যায়। দক্ষিণ হস্তের চম্পক-অঙ্গুলি মসীকৃষ্ণ হইয়া উঠে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মের সহিত অলকগুচ্ছ জড়াইয়া যায়। অনেক পরিশ্রমে একবার কাটিয়া, একবার পুঁছিয়া, একটু কালি ফেলিয়া অবশেষে ব্লটিংয়ের ন্যায় অঞ্চল দিয়া ছাপিয়া পত্র সমাপ্ত হয়। তাহার পর স্বামী আসিয়া আদর করিয়া যখন বলেন—লেখা বড় ভাল হইয়াছে, বিশেষতঃ গানটা—তখন বালিকার আহ্লাদে হৃদয় পূরিয়া উঠে, হস্তাক্ষরের প্রতি মনোযোগ দিবার অবসর থাকে না।"

"সহধর্ম্মিণী কাগজ টুকরা খণ্ড খণ্ড করিয়া বলিলেন, তোমাদের সুখ কোথাও স্থানেই নাই। আমরা যদি নিরক্ষর হই, তোমাদের গল্পনাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির প্রহারে আমরা যেন ভেড়ের মত হইয়া যাই। আবার লেখাপড়া শিখিলেও দেখিতেছি নিস্তার নাই। বাঙ্গালীর ছেলেরা শুধু খেয়ালের উপর চলে, কিন্তুতেই ধ্রুব বিশ্বাস নাই।"

স্ত্রী-শিক্ষার উপকারিতা বা অপকারিতা, উহা শ্রেয়ঃ কিংবা অশ্রেয়ঃ, ইহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে লেখক একখানি চিঠি দ্বারা কিরূপ অপূর্ব্বভাবে এই ছোট গল্পটির অবতারণা করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী তেমন শিক্ষিতা, সুরুচিসম্পন্না, প্রগতিশীলা ছিল না। তাহার স্বামী পূর্ব্বে তাহাকে বেশ স্নেহের চোখেই দেখিত, কিন্তু তাহার স্বামী ছুটি উপলক্ষে রেলে বাটী ফিরিবার সময় একটি আধুনিকাকে (লেখক ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহার স্ত্রী) দেখিয়া তাহার রুচিতে মুগ্ধ হয় এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রেলে ভ্রমণকালে সেই আধুনিকার ও তাহার সহযাত্রী পিতার অনেক সাহায্য করে।

ট্রেনে অবস্থান কালে তরুণীর পিতার সহিত স্বামীর সে যুগের কবি ও কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়। যুবকেরা যেমন সাধারণতঃ হয়, স্বামী তেমনই ছিল, বেশ আদর-কায়দার জ্ঞান, কবি গোছের, আর্টিষ্ট ইত্যাদি। তাই বাড়ী পৌঁছিয়া সে তাহার স্ত্রী হেমাঙ্গিনীকে পছন্দ করিল না।

হেমাঙ্গিনী এই পত্রে তাহার মনের ক্ষোভ গৃহিণীকে জানাইতেছে। ইহাই এই ছোট গল্পটির ঘটনাংশ। কিন্তু লেখক তাহা ছাড়াও এক, যেমন নারীশিক্ষার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা দেখাইয়াছে (উহার বিষয় উপরে বলা হইয়াছে) আর তেমন তৎকালীন কবি ও কাব্যের সমালোচনা করিয়াছেন।

কে বড় কবি—মাইকেল মধুসূদন না রবীন্দ্রনাথ? যখন রবীন্দ্র কাব্যের প্রারম্ভ, তখন বাংলাদেশের একটি সাহিত্যিক-গোষ্ঠী ( school of thought ) রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিত, কারণ বাংলা কাব্যজগতে যে একটা গতানুগতিক ধারা সেই আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল এবং তাহা আসিয়া পৌঁছিয়াছিল মধুসূদন, হেম, নবীন, রঙ্গলাল প্রভৃতিতে (প্রাচীন ও মধ্য যুগের) সেই ধারাকে আঘাত করিল রবীন্দ্র-কাব্য ও সাহিত্য। তাহা তখনকার অনেকের পছন্দানুযায়ী হয় নাই।

এই প্রাচীনপন্থী বা প্রগতিবিরোধী দল রবীন্দ্রনাথের কবিতা, সাহিত্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে নানা শ্লেষাত্মক কবিতা ছড়া প্রভৃতি রচনা করিতেন।

নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় সুরেশচন্দ্র সমাজপতির দলভুক্ত অর্থাৎ "সাহিত্য"-দলভুক্ত ছিলেন। এই "তুলনায় সমালোচনা" ছোট গল্পে তাই তিনি বাংলা ভাষার কাব্য-ধারারও সমালোচনা করিয়াছেন এবং রবীন্দ্রকাব্য যে বকবকানি ফোঁস-ফোঁসানি—সদৃশ, সে মতও প্রকাশিত করিয়াছেন। সেজন্য এখানে হেমাঙ্গিনীর পিতা রবীন্দ্র-কাব্য-বিরোধী এবং মধুসূদন-কাব্য-পক্ষাবলম্বী। সে স্বামীর সহিত তর্কে প্রবৃত্ত :

"ছেলেটির হাতে একখানি কবিতা গ্রন্থ ছিল। বাবা সেইখানি অনেকক্ষণ পড়িয়া বলিলেন, ভাল লাগিল না। সুপ্ত সিংহের মত যুবক জাগিয়া উঠিয়া বলিল, এই সমালোচনা নূতন শুনিলাম। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ কবির এমন সুন্দর লেখা আপনার ভাল লাগিল না? আমি ভাবিলাম, এইবার বাবার উপযুক্ত শিকার মিলিয়াছে। বাবা ঘুরিয়া বসিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন, সকলেরই কি এক জিনিষ ভাল লাগিতে হয়। পঠকরা পঁচিশ জন লোকের একখানি ছবি দেখিতে ভাল লাগে, সেইজন্যই কি আমারও সেই ছবিখানি দেখিতে ভাল লাগিবে। ইহার কি কোনও একটা অখণ্ড নিয়ম আছে, তোমাদের শ্রেষ্ঠ কবির কবিতা যদি আমার ভাল না লাগে সে কি আমার অপরাধ! রুচি ভিন্ন হইতে পারে। বয়সের সহিত রুচিরও অনেক পরিবর্তন হয়। প্রথম বয়সে জয়দেবের ললিত পদাবলীর কোমল ঝঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। কিছু বেশী বয়সে কবিগুরু বাল্মীকির অনুষ্টুভের গুরু গম্ভীর ধ্বনিই ভাল লাগে। তিনি আরও বলিতে যাইতেছিলেন, সমস্ত বলিতে না বলিতে যুবকের কাব্যস্রোতে সমস্ত ভাসিয়া চলিল। বাবার কথা দু-একটা উপলখণ্ডের ন্যায় স্রোতের মুখে আসিয়া পড়িতেছিল মাত্র। কিন্তু সে স্রোত অবিরাম ছুটিয়াছিল। শুধু তর্কের স্রোত নহে, মধ্যে মধ্যে কবিতার আবৃত্তিও হইতেছিল। যুবকের মত কবিতার আবৃত্তি শুনিয়া আমার বেশ আমোদ হইতেছিল। আমি অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিয়াছিলাম।

"হঠাৎ যুবকের দৃষ্টি আমার উপর পড়িল। একটা কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে সে মাঝখানে থামিয়া গেল...'...আপনার কাহার কবিতা ভাল লাগে?'

বাবা বলিলেন, 'মধুসূদনের কবিতা। মধুসূদনের কবিতা মৃতের সমাধিপূর্ণ, শুধু কথার তাজমহল নয়। মধুসূদন-নির্ম্মিত সেই সৌধের স্থানে স্থানে ইষ্টক বাহির হইয়াছে। কিন্তু তেমন করিয়া হয় তো বটবৃক্ষ উঠিয়াছে, কিন্তু প্রাণহীন চইতে জীবন্ত মানবের কোলাহল-ধ্বনি আইসে। মধুসূদন প্রাণহীন মর্ম্মর প্রতিমা গড়েন নাই, গড়িয়াছেন যৌবন-বিকশিতা সুন্দরী মানবী। মধু'র কবিতা কোটি জনের সুখ দুঃখের বারতা বহিয়া আনে, মধু'র কবিতা মধুর, মধুর হৃদয়ের প্রতিবিম্ব।'"

নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় এই "তুলনায় সমালোচনা" ছোট গল্পে যুবকেরা যুবতীকে দেখিলে কিরূপ শ্রদ্ধাবিহীন হয় এবং অসংযত দৃষ্টিতে তাহার প্রতি তাকায় তাহার একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। নিম্নের পংক্তি হইতে উহা প্রতিবিম্বিত হয় :

"তুমি আমার গাড়ীতে এস। আমি তাঁহার গাড়ীতেই উঠিলাম। ক্ষুধার্ত্ত মক্ষিকার ন্যায় এক শত দৃষ্টি আপনার উপর পড়িল। দেখিয়া বোধ হইল, যেন আপনাদের জাতি তাহাদের নয়ন-পথে কখনও পড়ে নাই।"

নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় গৃহিণীকে যে পত্রখানির খসড়া করিয়া দিয়াছিলেন তাহা বাস্তব জগতের একটি অতি খাঁটি কথা এবং ইহা হইতেই মনে হয়, তিনি "রিয়ালিষ্টিক"—বস্তু-তন্ত্রতার-মূলক ছোট-গল্প-লেখক ছিলেন :

"আমার খসড়া বোধ হয় তোমার পছন্দ হইবে না, কিন্তু হেমাঙ্গিনীর স্বামীকে আমার এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে। এক টুকরো কাগজে লিখিলাম, তাই দে। দূর হইতে সমস্তই সুন্দর দেখায়, কিন্তু কাছে পাকিলে অনেক সময় মোহ অপসৃত হয়। আমাদের বিদুষী ভার্য্যা লইয়া অনেক সময়ে অস্থির হইয়া পড়িতে হয়। মনে হয়, বরং তোমরা আছ ভাল।"

# ভারতের ব্যাঙ্কব্যবসায় ও দেশীয় ব্যাঙ্কিং

—শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়

ইউরোপীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় ভারতে প্রবর্তিত হইবার পূর্ব হইতেই এদেশের একটি নিজস্ব ব্যাঙ্কিং প্রথা প্রচলিত ছিল। ইহা ভারতের দেশীয় ব্যাঙ্কিং (indigenous banking of India) নামে পরিচিত। ভারতের বহু প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেশীয় ব্যাঙ্কের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে খৃষ্টপূর্ব প্রায় ২০০০ অব্দেও, এদেশে ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল ইহার প্রমাণ রহিয়াছে, কিন্তু সে যুগে ব্যবসায় হিসাবে ব্যাঙ্কিং কার্য চলিত কি না এবং সেরূপ চলিলে ব্যাঙ্ক কর্তৃক গৃহীত সুদের হার কিরূপ ছিল সে বিষয়ে কোনরূপ তথ্যাদি মিলে না।

বৌদ্ধযুগে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে দেশীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের বিবরণাদি একাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে চতুর্থ শতাব্দী—এই একশত বৎসরের মধ্যে টাকা লেনদেন, বিল বা নগদ টাকা একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরণ প্রভৃতির বহু উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয়। যে সকল গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে বৌদ্ধজাতকসমূহ, কয়েকখানি বৌদ্ধ অবদান, ললিতবিস্তর, বৌদ্ধ ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত কয়েকখানি গ্রন্থ ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

বৌদ্ধযুগের গ্রন্থগুলিতে আমরা কতকগুলি সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহাদের 'শ্রেণী (guild)' বলা হইত। এই শ্রেণীগুলি ব্যবসায়, বাণিজ্য ও শিল্প-সংক্রান্ত কার্যে লিপ্ত থাকিত। শ্রেষ্ঠীরাই ছিল শ্রেণীর অধ্যক্ষ। কাম্পিল্য, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, অবন্তী প্রভৃতি বৌদ্ধযুগের প্রধান প্রধান শিল্পকেন্দ্রগুলিতে বহু ধনী প্রতিপত্তিশালী শ্রেষ্ঠীর বাস ছিল এবং ইহাদের প্রধান কার্য ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যে বণিকদের অর্থ দাদন দেওয়া। যে সকল দুঃসাহসিক বণিক বাণিজ্যব্যপদেশে সমুদ্রযাত্রা করিত ও যে সকল আবিষ্কর্তার দল মূল্যবান ধাতুর সন্ধানে অরণ্যপ্রদেশে জীবন বিপন্ন করিতে যাইত তাহারা, এবং যুদ্ধ ও অর্থসঙ্কটের সময় রাজারা, শ্রেষ্ঠীদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতেন। এই শ্রেষ্ঠীদের প্রত্যেকেই প্রচুর ধনৈশ্বর্যের মালিক ছিলেন। রাজকোষ যে-শ্রেষ্ঠীর পরিচালনাধীনে থাকিত তাঁহার ঐশ্বর্য অন্য সকল শ্রেষ্ঠীর ঐশ্বর্যকে ছাড়াইয়া যাইত। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও বাণিজ্য-বিষয়ক ব্যাপারে শ্রেষ্ঠীরাই ছিলেন প্রায় সর্বেসর্বা। সে যুগে প্রদত্ত ধনের উপর কোন সুদ গ্রহণ করা হইত কি না তাহার উত্তরে মহাভারতের সভাপর্বে একস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাষ্ট্র কৃষকদের শতকরা বারো টাকা হারে ঋণ দিতেছে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। শ্রেষ্ঠীদের নামানুসারেই মাদ্রাজে আজিও দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের 'শ্রেষ্ঠী' আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

মুসলমানযুগের ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে আবুল ফজলের বিখ্যাত "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, রাজকোষ হইতে রাষ্ট্রের কর্মচারীদের একটা নির্দিষ্ট সুদের হারে ঋণ দেওয়া হইত। এই নির্দিষ্ট সুদের হার ছিল এইরূপ :

| | | |
|---|---|---|
| প্রথম বৎসরের জন্য | শতকরা | ৬¼ |
| দ্বিতীয় | ,, | ১২½ |
| তৃতীয় | ,, | ২৫ |

এই ভাবে……সুদ বাড়িয়া চলিত। রাষ্ট্র হইতে সুদের হার এইরূপ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল সুদলোভীদের অতিরিক্ত চড়া হারে সুদ গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করা।

প্রত্যেক দেশের এবং প্রত্যেক যুগেই ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রধান কার্য হইতেছে রাজা ও রাষ্ট্রকে অর্থ সরবরাহ করা। ভারতীয় নৃপতিরাও অর্থসঙ্কটের সময় এই দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন। তারিখ-ই-ফিরোজশাহ্-তে প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, সুলতান ফিরোজশাহ্ এক সময়ে যুদ্ধযাত্রা করিয়া যখন সারস্বতী পৌঁছেন, ঐ স্থানের ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ব্যবসায়ীর দল একত্রে সম্মেলিত হইয়া সুলতানকে কয়েক লক্ষ টাকা আনিয়া দেয়। দিল্লী পৌঁছিয়া ঐ অর্থ পরিশোধ করিবেন এই অঙ্গীকারে সুলতান উহা গ্রহণ

হিসাবে গ্রহণ করেন এবং সৈন্যদের খরচ বাবদ উহা ব্যয় করা হয়।

লাঙ্গাল সাহেব তাঁহার Asiatic Studies নামক গ্রন্থে একস্থানে লিখিয়াছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে একদল ধনী ব্যবসায়ী ছিল, উহারা সমগ্র ভারতের বিনিময়-কার্য্য পরিচালনা করিত। ঐ সময়ে যাহার বিল উত্তর ভারতের প্রদেশগুলিতে প্রত্যেক শিবির ও রাজসভাতে ভাঙ্গানো চলিত তাহাকে প্রায়ই একস্থান হইতে অন্যস্থানে অর্থাদি প্রেরণ করিতে হইত। মোটা তহবিল স্থানান্তরে পাঠাইবার সময় রাজপুতনার সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ অসিচালনা-কারীর দল উহার পাহারায় নিযুক্ত হইয়া যাইত। লাঙ্গাল ও গ্রাণ্ট ডাফের History of the Marhattas নামক গ্রন্থে জানা যায়, প্রাচীন ভারতে বহু ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাঙ্কিং কার্য্য করিত। যে সকল সৈন্যাধ্যক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইত এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের প্রয়োজনীয় ধন সরবরাহ করিত। ইহাদের প্রত্যেকেরই দ্রুতগামী সংবাদ সরবরাহকারী নিযুক্ত থাকিত; উহারা যুদ্ধের সংবাদ একস্থান হইতে অন্যস্থানে বহন করিত এবং কোথাও কাহাকেও ধন সরবরাহ করা প্রয়োজন হইলে আবশ্যকীয় নির্দ্দেশাদিও উহাদের মারফত প্রেরিত হইত। বাঙ্গীরাও তাঁহার বিরাট সেনাবাহিনীর খরচ চালাইতে এতদূর ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন যে, মাহাজন ও শেঠেরা কেহই তাঁহাকে ধন সরবরাহ করিতে রাজী হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার বল্লাল সেনের অবস্থাও অনুরূপ হইয়াছিল। মণিপুরের রাজার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাকালে রাজা বল্লাল সেন ভীষণভাবে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। সে সময়ে বাংলার সুবর্ণবণিকেরাই ব্যাঙ্কিং কার্য্য করিত। সুবর্ণবণিকদের মধ্যে তৎকালীন সর্ব্বাপেক্ষা ধনী মহাজন বল্লভানন্দ আঢ্যের নিকট হইতে রাজা একদফে এক কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দফে ঋণ গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করায় বল্লভানন্দ রাজার অভিসন্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন ও ঋণদানে অস্বীকৃত হন। ফলে রাজার কোপ তাঁহার উপরে পড়ে এবং বহু প্রকারে তিনি উৎপীড়িত হন। রাজারা বা সৈন্যাধ্যক্ষেরা অনেক সময় গৃহীত ঋণ পরিশোধ করিতে অস্বীকৃত হইতেন, অনেক সময় তাঁহারা ব্যাঙ্কের তহবিলও লুঠ করিতেন। গ্রাণ্ট ডাফ একস্থানে লিখিয়াছেন, ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে মারহাট্টাদের সৈন্যাধ্যক্ষ মীর হবিব জগৎশেঠের ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া বহু ধনরত্ন হস্তগত করেন।

হ্যামিলটন সাহেব-প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায়, ভারতের বাণিজ্যের জন্য অধিকাংশ প্রয়োজনীয় ঋণই সরবরাহ করিত সদাগরেরা ও মহাজনেরা। মিনাপুরে এক ঘর খুব ধনী সদাগরের বাস ছিল। এই বংশেই বিখ্যাত ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী সৈন্যনাথ মণ্ডলের জন্ম হয়। ইহাঁর ব্যাঙ্কিং কার্য্য চলিত: একটি পাটনার অন্তর্গত তোপসুরের তোমরাজ, অপরটি বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কাশনার ঠাকুরদাস নন্দী। মুর্শিদাবাদে সাতটি ধনী ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীর বাস ছিল, ইঁহাদের কুঠিওয়ালা বলা হইত। বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্রে এই কুঠি-ওয়ালাদের এজেন্ট নিযুক্ত থাকিত।

এই দেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলি বিল অব এক্সচেঞ্জ মঞ্জুর করিত। লাটের টাকা জমা দিতে অপারগ জমিদারদের প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করাও ইহাদের অন্যতম প্রধান কার্য্য ছিল। কুঠিওয়ালাদের মধ্যে একমাত্র জগৎশেঠই বিল ভাঙ্গানির কার্য্য করিতেন। জগৎশেঠই কেবল ভারতের যে কোন প্রদেশের জন্য বিল মঞ্জুর করিতেন। অন্যান্য কুঠিওয়ালারা কেবলমাত্র কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও পাটনার বিল ছাড়িতেন। ব্যাঙ্ক-বাটার হার ছিল—নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের জন্য শত করা আট আনা হইতে দেড় টাকা পর্য্যন্ত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে একদল ধনী প্রতিপত্তিশালী ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ব্রক্স নামে পরিচিত। ভারতীয় মুদ্রার প্রচলন যাহাতে টাকার বাজারে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই উদ্দেশ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এই ব্রক্সদের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ব্রক্সদের প্রধান কার্য্য ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার ভাঙ্গানি সরবরাহ করা। ছোটখাটো ব্রক্সদের পোদ্দার বলা হইত। ভারতীয় মুদ্রার সহিত বৃটিশ মুদ্রার বিনিময়-হার নির্দ্ধারণ করার ভার ছিল এই ব্রক্সদের উপরেই।

সংক্ষেপে ইহাই হইল ভারতীয় দেশীয় ব্যাঙ্কের ইতিহাস। এই দেশীয় ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ম-কানুন ও

কার্যপদ্ধতির প্রশংসা করিয়া এবং ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইহাদের উপযোগিতা যে কতখানি তাহার উল্লেখ করিয়া বহু অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ যে সকল উক্তি করিয়াছেন নিম্নে তাঁহাদের কয়েকটির মর্ম দেওয়া হইল :

বিশিষ্ট ব্যাঙ্কিং-বিশেষজ্ঞ চার্টার্ড ব্যাঙ্কের প্রধান ম্যানেজার ও ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের রাজকীয় কারেন্সি ও ফিন্যান্স কমিশনের সদস্য ডব্লিউ. ই. প্রোটন সাহেব দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্কিং কার্যের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, ভারতের দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহ প্রশংসার সহিত তাহাদের কর্তব্য পালন করিয়াছে। ইহারা সমগ্র দেশের অশেষ মঙ্গলসাধন করিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ভারতের কৃষিবাণিজ্যের ইহারাই প্রকৃত পরিপোষক।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কুক সাহেব লিখিয়াছেন, ভারতের দেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির সততা ও নীতিজ্ঞান ছিল সত্যই প্রশংসা করিবার মত। হুণ্ডি কদাচিৎ অগ্রাহ্য হইত।

গাব্বে (Gubbay) সাহেব তাঁহার Indigenous Banking in India-শীর্ষক প্রবন্ধে একস্থানে বলিয়াছেন—ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে ভারতীয়দের আর্থিক জীবনে দেশীয় ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনায় পাশ্চাত্য ব্যাঙ্কগুলির প্রভাব কত তুচ্ছ। এ দেশের প্রতি গ্রাম, শহর ও শিল্প-কেন্দ্রে দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি প্রতি বৎসর বহু টাকার ব্যাঙ্কিং কার্য করিয়া থাকে।

বর্তমান যুগে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত বহু ব্যাঙ্ক এদেশে ব্যাঙ্কিং কার্যে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও এদেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উপর দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের প্রভাব বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ভারতের মোট ২,৫০০ শহরের মধ্যে আজিও মাত্র ৪০০টি শহরে যৌথ ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব রহিয়াছে। বাকি স্থানগুলিতে চাষী, ব্যবসায়ী, সওদাগর ও ছোটখাটো শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকদের জন্য সহবরাহ করে দেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহ। এমন কি, যেখানে যৌথ ব্যাঙ্ক আছে সেখানেও এই দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি অন্তর্বাণিজ্যে ও ছোটখাটো শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে অর্থ ধারন দেয় ও এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অর্থাদি প্রেরণ করা বিষয়ে প্রভূত সহায়তা করিয়া থাকে।

বর্তমান কালের দেশীয় ব্যাঙ্কব্যবসায়ীদের মধ্যে চেট্টি, মুলতানী, মাড়োয়ারী, শ্রফ, পোদ্দার প্রভৃতির নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির কম্পানি-বিষয়ক আইনানুযায়ী রেজিস্ট্রেশনের দরকার হয় না। সে জন্য যৌথ ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সহিত ইহাদের সংযোগ রক্ষিত হয় শ্রফদের মধ্যস্থতায়। ব্যবসায়ীদের বিল ব্যাঙ্কের নিকট গ্রাহ্য হয় তখনই, যখন তাহা ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত কোন শ্রফের সহিযুক্ত হয়। দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি হুণ্ডির সাহায্যে ব্যাঙ্কিং কার্য করিয়া থাকে। হুণ্ডি-রেট সাধারণত ব্যাঙ্ক-রেট অপেক্ষা একটু চড়া হয়। ব্যাঙ্ক-রেট ও হুণ্ডি রেটের পার্থক্যটুকুই দেশীয় ব্যাঙ্কদের লাভ। হুণ্ডি-রেট নির্দ্ধারিত হয় শ্রফদের নিজেদের দ্বারা, সুতরাং ব্যাঙ্ক-রেটের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধই নাই। দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির বিল আজিও বহু ব্যাঙ্কে গ্রাহ্য হয় নাই। ইহার জন্য দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। অথচ ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে, পল্লী-অঞ্চলের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতির আশা ও ভরসা বলিতে ইহারাই। যৌথ ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ যতই উজ্জ্বল হউক না কেন, পল্লী-অঞ্চলে উহাদের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা এখনও সুদূরপরাহত। ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় এদেশে এখনও শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নাই, কতকগুলি শহরে কয়েকটি ব্যাঙ্কের কার্যাবলীর বিচার করিয়া এ দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া সম্ভব নহে। পল্লীর অন্তর্দেশে পাশ্চাত্য ব্যাঙ্কগুলি আজিও কোন সাড়া জাগাইতে পারে নাই। সেখানে আজিও শ্রফ, চেট্টি, বণিক, শেঠ প্রভৃতি মহাজনেরা টাকার বাজারে একচেটিয়া প্রভুত্ব করিতেছে। সুতরাং এই সব দেশীয় ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলিকে কোন মতেই উপেক্ষা করা চলে না। ইহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে এবং ক্রমোন্নতির পথে আগাইয়া লইয়া চলিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে "রয়্যাল কমিশন্ অন্ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স এণ্ড মনিটারি পলিসি"র প্রস্তাব বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—প্রত্যেক কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের, এমন কি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কেরও উচিত দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির বিল-সকল অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত ভাঙাইয়া দেওয়া। যেখানে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কোন শাখা নাই, গভর্ণমেণ্টের উচিত দেশীয় ব্যাঙ্কগুলিকে সেখানে ব্যাঙ্কিং মর্য্যাদা দান করিয়া গভর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া ও গভর্ণমেণ্টের অর্থ সেখানেই মজুত রাখা।

"ভারতীয় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারি কমিটি"ও প্রস্তাব করিয়াছেন—দেশীয় ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যাঙ্কিং মর্য্যাদা বৃদ্ধি করা হউক। সমস্ত ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীদের লইয়া একটি সমিতি গঠন করা হউক। যে সমস্ত দেশীয় ব্যাঙ্কের বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট গ্রাহ্য হইবে তাহারা হইবে এই সমিতির full members ( পূর্ণ সদস্য ) এবং যে সকল দেশীয় ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের আওতার বাহিরে থাকিবে তাহারা হইবে associate member ( সহযোগী

সদস্য )। এই সমিতির সদস্যদের বলা হইবে Member of the Central Bankers' Association ( কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কার সমিতির সদস্য )। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারি কমিটির এই প্রস্তাব কার্যকরী হইলে সমগ্র ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিলের ৪৫ক ধারা অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার তিন বৎসরের মধ্যেই উহাকে—শেডিউলভুক্ত নয় এইরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যের সমালোচনা করিয়া সপরিষদ গভর্ণর-জেনারেলের নিকট একটি রিপোর্ট পেশ করিতে হইয়াছিল। সেই সঙ্গে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম-নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্যে একটি খসড়া বীলও প্রেরিত হয়। এই বীলের পোড়াতেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্কিং কার্যের উপযোগিতার উল্লেখ করিয়া বলেন, ব্যাঙ্কিং-জগতে যৌথ ব্যাঙ্কগুলি এখনও খুবই সামান্য অংশ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। মফঃস্বল শহর ও গ্রামাঞ্চলে যৌথ ব্যাঙ্কের কোন অস্তিত্ব নাই বলিলেও হয়। দেশীয় ব্যাঙ্কগুলিই সেখানে প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্কিং কার্য করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সমগ্র ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের পূর্ণ প্রসার সম্ভব হইবে তখনই, যখন এই সব দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহ সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া আইন বিধিবদ্ধ করা হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই স্কীমে দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি পক্ষে শুদ্ধমাত্র ব্যাঙ্কিং কার্য ছাড়া অন্য কোন কার্যে নিযুক্ত থাকা নিষিদ্ধ হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতে আমানত গ্রহণই ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য, সুতরাং দেশীয় ব্যাঙ্কারের পক্ষে আমানতগ্রহণই ব্যাঙ্কিং মর্যাদালাভের প্রধান মাপকাঠি হইবে। কেবলমাত্র যে সব দেশীয় ব্যাঙ্ক আমানত গ্রহণ করিবে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিবে। অবশ্য ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি সর্ত আছে, কিন্তু আমানত গ্রহণের এই সর্তই প্রধান। এই স্কীম পাঁচ বৎসরের জন্য কার্যকরী হইবে। ইতিমধ্যে এই সব দেশীয় ব্যাঙ্কগুলিকে নিজ আওতায় আরও বেশী করিয়া টানিয়া লইবার উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আবার নূতন করিয়া স্কীম তৈয়ারী করিতে পারে। শেডিউল-ভুক্ত ব্যাঙ্কের মত দেশীয় ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কোন বাধ্যতা-মূলক আমানত রাখিতে হইবে না, তবে প্রত্যেক দেশীয় ব্যাঙ্কের স্থায়ী ও চলতি দায়িত্ব ( liabilities ) যাহাতে তাহার ব্যবসায়ের মূলধনের পাঁচগুণের বেশী না হয় সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে।

দেশীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীরা এই স্কীম ভাল চক্ষে দেখে নাই। বোম্বাই-এর ব্রক এসোসিয়েশনের সভাপতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণরের নিকট পত্রে—আমানতগ্রহণই ব্যাঙ্কিং মর্যাদার প্রধান মাপকাঠি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই অভিমতের—প্রতিবাদ করেন। আমানত গ্রহণ ছাড়াও ব্যাঙ্কের অন্য দাদন দেওয়া প্রভৃতি অন্যান্য কার্য আছে এবং সেগুলি উপেক্ষা করিবার নয়। দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ কৃষির বীজ বাবদ চাষীকে ঋণ দিয়া থাকে, পরে উৎপন্ন ফসলের কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া সেই ঋণের টাকা পরিশোধ করিয়া লয়। দেশীয় ব্যাঙ্কের এই কার্য কি ব্যাঙ্কিং-এর নিয়মবহির্ভূত? কম্পানি আইনে নির্দেশ আছে, ব্যাঙ্কের প্রদত্ত টাকা ঋণগ্রহীতার স্থাবর অস্থাবর কোন সম্পত্তি বেনামায় হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে যদি ব্যাঙ্কের হস্তে অর্পিত হয়, ব্যাঙ্ক উহা বিক্রয় করিয়া নিজ প্রাপ্য গণ্ডা সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে। কোম্পানী আইনের ২৭৭( খ )-ধারায় ব্যাঙ্কিং-এর যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে, দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের অধিকাংশ কার্যই তাহার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাঁহাদের রচিত স্কীমে ব্যাঙ্কিং মর্যাদালাভে আমানত গ্রহণের সর্তের উপরই অত্যধিক জোর দিয়া দেশীয় ব্যাঙ্কিং-স্বার্থের প্রতি অবিচার করেন নাই কি? ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়া আছে যে দেশীয় ব্যাঙ্কিং, তাহাদের নিয়ন্ত্রিত করিয়া আইন বিধিবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে, আইনের ধারাগুলি যেন এমন না হয় যে দেশীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ীদের কারবার গুটাইতে হয়। এই প্রসঙ্গে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারি কমিটির এই উক্তি মনে রাখিতে হইবে

"We are not in favour of any compulsory measures with a view to reform or help the indigenous bankers, nor do we think that any such measures will be welcomed by the indigenous bankers themselves. On the other hand, from the evidences that we have received we gather that any such compulsion would only accelerate the process of driving out these bankers from banking proper to other spheres of business. This would create a large gap in the banking system of the country which would be detrimental to national interests."

সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আর একটি খসড়া প্রণয়ন করিয়া ভারত সরকারের নিকট তাহা উপস্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, উহাতে দেশীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীদের বিষয় কোন উল্লেখই করা হয় নাই

# গ্রাম্য সংস্কৃতি

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস

বাংলার গ্রামগুলি আজ মরিতে বসিয়াছে। আজ গ্রামের স্বাস্থ্য, আর্থিক অবস্থা অতীব শোচনীয়। শিক্ষায় গ্রাম এখনও বহু পিছনে পড়িয়া গিয়াছে। গ্রামের আনন্দোৎসবগুলিও মরণোন্মুখ। গ্রাম আজ শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী, সহযোগিতা ও সহানুভূতি একান্ত ভাবেই চাহে। কিন্তু শিক্ষিত সমাজ গ্রামকে কোন্ দিক্ হইতে সাহায্য করিতে পারে? আর্থিক দুরবস্থা তাহারও কিছু গ্রাম হইতে কম নহে—স্বাস্থ্যের কথাও অনুরূপ। সে-দিক্ হইতে তাহার কিছু করিবার নাই, কিন্তু গ্রাম্য সংস্কৃতির সংরক্ষণে তাহার সাহায্য কার্য্যকরী হইতে পারে।

বাংলার গ্রাম্য সংস্কৃতি বলিতে আমরা কি বুঝি? গ্রাম্য গীতি, গ্রাম্য উৎসব, গ্রাম্য নৃত্য প্রভৃতি অতীত সংস্কৃতির ধারার সমষ্টিকে এক কথায় বলিতে পারি গ্রাম্য সংস্কৃতি।

এক সময়ে আমাদের গ্রামের উৎসবগুলি ছিল বড় বড় প্রদর্শনীর মত। এ-গুলিকে উপলক্ষ করিয়া সাহিত্য, শিল্প, স্বাস্থ্যের রীতিমত আলোচনা চলিত। হিন্দু-মুসলমান জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই এ-গুলিতে যোগদান করিত। ইহার ফলে তাহারা প্রচুর আনন্দ তো পাইতই, উপরন্তু বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইবার সুযোগও পাইত। সেকালে গ্রামগুলি ছিল আনন্দের ভাণ্ডার। বাউল, কীর্ত্তন গান, বারমাসী, যাত্রা, কথকতা, চণ্ডীমণ্ডপের আসর পল্লীবাসীদের অন্তরে অফুরন্ত আনন্দের খোরাক জোগাইত। 'বার মাসে তের পার্ব্বণ' লাগিয়াই থাকিত, আনন্দের ধারা থাকিত জীবন্ত। মা-বোনেরাও ব্রতপার্ব্বণের ভিতর দিয়া অফুরন্ত আনন্দ পাইতেন। তাঁহাদের হাতের আলিপনায় অনবদ্য সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিত আঙ্গিনায় ও দেওয়ালের গায়ে।

ভাটিয়ালী গান নদীমাতৃক বাংলার নিজস্ব সম্পদ্। যত প্রকার রাগ-রাগিণীর প্রচলন আছে, তাহাদের মধ্যে কোনটীর সহিতই এই ভাটিয়ালী সুরের সম্বন্ধ নাই। ইহা পল্লীহৃদয়ের নিছক করুণ রসের পরিচায়ক। বাংলার মাঝি গঙ্গা, পদ্মা, যমুনা, ভৈরব, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র নদীতে এই সুর গাহিয়া আত্মহারা হইয়া যায়। বাংলার পল্লী-সঙ্গীতগুলির মধ্যে কীর্ত্তন গানই শ্রেষ্ঠ। বিশ্ব-সঙ্গীতের কলা ও বিজ্ঞানে এ-গানগুলি বাংলার অপূর্ব্ব অবদান।

বাংলার গভীর ভাবদ্যোতক কীর্ত্তন-নৃত্য সার্ব্বজনীন। বাউল ও কীর্ত্তন-নৃত্যের ভিতর ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনা রূপায়িত হইয়া রহিয়াছে। গ্রাম্য নৃত্যগুলির মধ্যে রায়বেঁশে, চাষি ও গম্ভীরা নৃত্যগুলি বাংলার প্রাচীন রণনৃত্য। রায়বেঁশে নৃত্য পশ্চিম বাংলার বীরভূম, বর্দ্ধমান, মুরশিদাবাদ জেলার বাউরী, ডোম প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যে এখনও জীবন্ত রহিয়াছে। চাষিনৃত্য যশোহর-খুলনা অঞ্চলে নমঃশূদ্র ও মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আছে। গম্ভীরা নৃত্য মালদহ, রাজসাহী, বগুড়া, দিনাজপুর জেলা-গুলির ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য প্রভৃতি হিন্দুদের মধ্যে এখনও প্রচুর পরিমাণেই জীবন্ত রহিয়াছে। চড়ক উপলক্ষে ফরিদপুর জেলায় গুণ ও অবতার নৃত্যের অনুষ্ঠানে মহাসমারোহে হইয়া থাকে। দক্ষিণ বাংলার গাজন নৃত্যও যথেষ্ট আনন্দ দায়ক এবং বীর্য্যাত্মক।

গ্রাম্য সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও মূল্যের দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাই, গ্রাম্য সংস্কৃতির আদর জাতি ও দেশের পক্ষে অপরিহার্য্য। গ্রাম্য সাহিত্য, পল্লীনৃত্য, পল্লী-শিল্পের ভিতর জাতির অতীত গৌরব-কাহিনী, অতীত শিক্ষা ও সভ্যতার ধারাগুলি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এক দিকে গ্রাম্য গীতির মধ্যে প্রাচীন ভাষার ধারা, প্রাচীন ভাবপ্রকাশ-ভঙ্গীর ধারা, প্রাচীন রচনাকৌশল-প্রণালীর ধারা অন্তর্নিহিত আছে। সেই জন্য কোন দেশের ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস গ্রাম্য সঙ্গীতের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। অন্য দিকে জাতীয় নৃত্য, জাতীয় সঙ্গীত-গুলির মধ্যে এমন সরল, সহজ আনন্দের ধ্বনি আছে, যাহা হইতে জাতি নব-জীবনের প্রেরণা, সরলতা ও শুচির শিক্ষা লাভ করিতে পারে। গ্রাম্য সংস্কৃতি-ধারার গভীর সৌন্দর্য্য, কলাশ্রী ও আধ্যাত্মিক সম্পদ্ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

দেশে গণ-আন্দোলনের প্রচারের জন্য এ-ধরণের প্রাণবান সম্পদ্‌গুলির মূল্য অসীম। জাতির আত্মা ও দেহের আরাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ হয় জাতির সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া। জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় নৃত্য ও জাতীয় শিল্প দেশকে এমন অমূল্য সম্পত্তি দিতে পারে, যাহার ফলে স্বদেশের প্রতি একটা গভীর প্রেমের অনুভূতি আসিবে, স্বজাতির প্রতি একটা গৌরববোধের অনুপ্রেরণা লাভ হইবে। জাতির গভীর আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাষা—জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় নৃত্যগুলিকে অবজ্ঞা—করিলে জাতির বিবেক-বুদ্ধি শিথিল হইয়া যাইবে, অন্তর্দৃষ্টি নিষ্প্রভ হইবে। দেশের লোকশিক্ষার উন্নতি, সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নে নৃপ্যাবশেষ জাতীয় গ্রাম্য সংস্কৃতি-ধারাকে বাঁচাইয়া রাখা একান্ত আবশ্যক।

গ্রাম্য নৃত্যগুলি যে শুধু স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম বা আমোদ-প্রমোদ-হিসাবে মূল্যবান, তাহা নহে—এ-গুলি জাতির নৈতিক, ধার্মিক ও সৌন্দর্যশক্তির স্বরূপ। এ-গুলির মধ্যে জাতি ও দেশের পুরুষানুক্রমিক ভাবধারার নিবিড় যোগসূত্র রহিয়াছে। এ-গুলি জাতির বহু যুগের পুরাতন জীবন-দর্শনের মূল স্বরূপ। এই মূলগুলির সাহায্যেই দেশের বর্তমান মানুষ তাহার যুগযুগান্তের ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যায়ের বা কাহিনীর, তাহার দীর্ঘবত্তার সঙ্গে পরিচয় লাভ করে। এ-গুলি বহু শতাব্দী ধরিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাতির জীবনের সঙ্গে এ-গুলি ওতপ্রোতভাবে মিলিত হইয়া জাতির আত্মার ছাঁচে গড়িয়া উঠিয়াছে। এ-গুলি একদিকে যেমন জাতির জীবনের অভিব্যক্তিস্বরূপ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তেমনই আবার জাতির জীবনকে অনুপ্রাণিত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। গ্রাম্য নৃত্যগুলির চর্চা করিলে দেশের আত্মার যথার্থ পুনরুজ্জীবন হয়, জাতির আত্মসম্মান-বোধ জাগ্রত হয়। ইহাদের অনুশীলনের ফলে জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির মনে একটা ঐক্যের ভাবের সৃষ্টি হয়, সে অতীতকে শ্রদ্ধা করিতে শেখে, জাতির যে একটা নিজস্ব অবদান আছে, তাহাও সে বুঝিতে পারে।

হইতে পারে যে, আর্থিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধিত না হইলে এইদিকে কোন প্রকৃত কার্য্য সম্ভব নহে। কিন্তু তথাপি গ্রাম্য সংস্কৃতি যাহাতে রক্ষায় থাকে, সে চেষ্টা আমরা এখন করিতে পারি। আসলে সেই মনোভাব হইতেই আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। ঠিক এইখানেই দেশের চরম পরাধীনতার পরিচয়।

---

# সঙ্গিনী

—শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

অনাদৃতা শৈলের শ্রেণী, পার্শ্বে শোভে দারুদণ্ড মরু
কর্কশ কঠোর বেশ রূপহীন ঊষর ধূসর—
মরণের নৃত্যছন্দে চলে তারা বাজায়ে ডমরু
মুখে কথা, চল্ চল্ মরণের নাহি অবসর।

তমিস্রার অন্ধকারে সাথে সাথ চলেছে সৈনিক
প্রমত্ত রণের নেশা যেন সবে করিল মাতাল—
পথের সন্ধান তারা নাহি জানে যাবে কোন দিক্
তবু সব চলে পথ হাতে লয়ে জীবন মশাল।

ডাকিলো কে ওরে আয় প্রলয়ের বাজিল বিষাণ
সাধের স্বজন ঘর ফেলে আয় ওরে গৃহহীন—
উন্মাদ মরণ রণ চাই শুধু প্রাণ-বলিদান,
মৃত্যুর তোরণ-দ্বারে, হে সৈনিক, উঠাও সঙ্গীন।

গর্জ্জিল ফণিনীসম বীরাঙ্গনা যোদ্ধৃ ওয়ারিয়ো
"হে রাজন্, নারী আমি আহবের হইব সঙ্গিনী—
দুর্জ্জয় যেদের লাগি অস্ত্র দাও মোরা আছি আরো
আপন স্বজন পাশে বাজাইব মরণ-কিঙ্কিণী।

যোদ্ধের নয়ন আগে তারা হ'লে মরিয়া অমর
আমরাও ধরণীরে দেখাইব মৃত্যু-বরাভয়—
ক্যাসিষ্ট্, কামান গোলা হাবসীরে দেখাইছে ডর?
রণের বিষাণ বাজে—চল্ চল্, আর ঘরে নয়।"

---

# বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অবস্থা

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

আজ এই উৎসব উপলক্ষে আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হইবার যে প্রযোগ আমাকে দিয়াছেন, সে জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। নূতন কিছু বলিবার দুরাশায় আমি এখানে আসি নাই। নূতন স্থান, নূতন লোক দেখিবার আশায় আসিয়াছি। এই বার্ণপুর লোহার দেশ, কোন অতি-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এখানকার লোহার সামান্য অংশও যদি আপনারা বাঙালীর জীবনে আর বাংলা সাহিত্যে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারেন, তবে বাংলা দেশ আপনাদের কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিবে। বাংলা সাহিত্য ধাতু-বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে ইহাতে সোনা আর রূপার অংশই বেশি, সেইজন্য এ সাহিত্য বড় বেশি কোমল, বড় স্পর্শকাতর; মূল্যবান্ স্বর্ণ অলঙ্কারের মত ইহাকে রক্ষা করিতে বড় বেশি সতর্কতার প্রয়োজন—এ সম্বন্ধে বাঙালীর সাহিত্যিকরা আজ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম আমলে মাইকেল মধুসূদন মোটা মোটা সংস্কৃত শব্দের বাষ্পচালিত হাতুড়ির ঘায়ে ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া ইহাকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু যে-আঘাত লোহার উপরে পড়া উচিত ছিল তাহা পড়িয়াছিল সোনা আর রূপার উপরে; যতটা ভাঙিয়াছে ততটা গড়ে নাই, তাই মাইকেলের মানবিক শক্তির আশানুরূপ ফল হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ লোহার ঘুম ভাঙাইবার জন্য গান বাঁধিয়াছেন :

কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন
ও তার ঘুম ভাঙাই রে
লক্ষ যুগের অন্ধকারে ছিল নজোপন
লোহা আজ জাগাই রে
পোষ মেনেছে হাতের তলে
যা বলাই সে অমনি বলে
বীর্য দিনের যৌন তাহার—
আজ জাগাই রে।

এ তো কেবল আকাঙ্ক্ষা মাত্র। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে যে আন্দোলন চলিতেছে, যাহা অতিনিন্দিত, অতি-প্রশংসিত, নানা নামে যাহা পরিচিত, তার মূল প্রয়াসটা এই লোহাকে জাগাইবার প্রয়াস; এই প্রয়াসকে রবীন্দ্রোত্তর বলিলে অবিচার করা হইবে—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই এক হিসাবে ইহার কর্তা। শেষ বয়সে তিনি স্বর্ণকারের লঘু হাতুড়ি ত্যাগ করিয়া—যে হাতুড়িতে ললিত ছন্দ পুঞ্জিত করিয়া তোলা যায়,—গুরু ছন্দের লোহা পেটানো হাতুড়ি গ্রহণ করিয়াছেন। আজ সবাসাচী বাঙালী সাহিত্যিকদের এক হাতে সূক্ষ্ম-কারুকার্যের স্বর্ণঘাতী হাতুড়ি, আর এক হাতে লোহঘাতী বিশাল হাতুড়ি; কিন্তু হাত চঞ্চল, চিত্ত অনবস্থান্ত, জীবনেও লোহার অংশ নামে মাত্র; কাজেই এক গড়িতে আর এক গঠিত হইতেছে, ফলে কেবল সব ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে; জীবন-রসায়নে আমরা সোনাকে অবজ্ঞা করিয়াছি, তার পরিবর্তে লোহার এই অভিশাপ—ইহাকে ইচ্ছা করিলে বলিতে পারেন—Iron-এর Irony. এত যে বলিলাম তার কারণ আমি ভৌগোলিকের বাস্তবতা লইয়া দেখিতে আসিয়াছি আপনাদের হাতের স্পর্শে লোহা জাগিয়া উঠিবে কি না! যাহা লোহা তো জাগিয়াছে দেখিতেছি কিন্তু আমার অনুসন্ধিৎসা মানব লোহার জন্য—আশা করি, সফল হইয়া ফিরিতে পারিব।

কিন্তু এখনো আমি অভিভাষণ আরম্ভ করি নাই; সেই চির-পরিচিত বিনয়ের করুণ মন্ত্রোক্তি কোথায়? এতক্ষণে আপনারাও নিশ্চয় তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। আপনারা আমার যোগ্যতার বিচার করেন নাই; হয় তো আমাকে জানেন না বলিয়াই করেন নাই; হয় তো প্রতি বছর আপনাদের নূতন লোক চাই, যোগ্যতার সত্যানুসন্ধানের মাপ-কাঠি খুলিয়া বসিলে সত্যপতি পাওয়া দুষ্কর, হয় তো সেই জন্যই করেন নাই। আর আপনারা যখন সে বিচার করেন নাই, আমিও বৃথা সে বিচারে বসিব না, কারণ তার পরিণাম, আমার কাছে অন্ততঃ, অত্যন্ত স্পষ্ট। অযোগ্যতার জন্য কারো

কাছে যদি আমার একবারটিই থাকে তো সে আমার নিজের কাছে ; সব জানিয়া শুনিয়াই যখন আসিতেছি তখন বিচারের আত্ম-বিলাপ নাই-বা করিলাম।

কিন্তু আমাকে নির্বাচন করিয়া একটি বিষয়ে আপনারা ভুল করিয়াছেন—আমি ঘোরতর নৈরাশ্যবাদী, ইংরিজিতে যাহাকে বলে পেসিমিষ্ট, আমি যার নামকরণ করিয়াছি—'অমাবস্যাবাদ।' আপনারা হয় তো আশার কথা, উৎসাহের কথা শুনিতে চান, তাই যোগ্যতর ব্যক্তি থাকিতেও অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের অযোগ্যকে আহ্বান করিয়াছেন, কারণ আপনাদের জানা আছে অল্প বয়সের অনভিজ্ঞ মস্তিষ্ক আশা এবং অজ্ঞতার আশ্রয়। অজ্ঞতার অভিযোগ অস্বীকার করি না, ছত্রে ছত্রে তার পরিচয় পাইবেন—কিন্তু আশা ?—যে জন্ম-নৈরাশ্যবাদী যাদুকরের খুলির ভিতরকার কালো পর্দাখানার মত আমার মাথার খুলির মধ্যে আছে নৈরাশ্যের নিকষ কালো যবনিকা—আমার অভিভাষণ সেই যবনিকার সম্প্রসারণ মাত্র। আপনারা হয়তো দুঃখ পাইবেন—আমি তাতে খুশী হইব, বুঝিব বাঙালীর চিত্ত অসাড় হইয়া যায় নাই, দুঃখানুভূতির শক্তিটুকু অন্ততঃ আছে ; আপনারা হয় তো রুষ্ট হইবেন—কিন্তু নিশ্চয় জানি ক্রোধে আপনাদের আতিথেয়তাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না এবং আপনাদের সভাপতি স্বচ্ছন্দে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিতে সমর্থ হইবে।

আমি বাঙালী সাহিত্যিক, আমার পক্ষে বাংলা সাহিত্যের কথা বলাই স্বাভাবিক, কিন্তু সে ভার যোগ্যতর ব্যক্তির উপরে দিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন ; আমাকে অন্য কথা বলিবার অবকাশ দিয়াছেন,—সাহিত্যের ভিত্তি যে জীবন, সেই জীবনের কথা, বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি যে বাঙালীর জীবন, সেই বাঙালীর জীবনের কথা বলিব ; আজ আমি বাঙালীর জীবনে সমালোচনার যে বেড়াজাল নিক্ষেপ করিব তাহাতে প্রসঙ্গতঃ ধর্ম, রাষ্ট্র, সাহিত্য, সমাজ এরা তো সবই ধরা পড়িবে। আজ আমার মূল বক্তব্য বিষয় বাঙালীর বর্তমান অবস্থা। অকারণ আত্মপ্রসাদের চেয়ে সকারণ আত্মনিন্দা—যার অপর নাম আত্মসমালোচনা—অনেক শ্রেয়।

একথা আজ আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্রমে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, ত্রিশ বৎসর আগে ভারতবর্ষে বাঙালীর যে মর্যাদা ছিল—আজ আর তা নাই। সেদিন যে ছিল ভারতবর্ষের ব্রহ্মমস্তকের প্রধান নায়ক, আজ সে বিন্দুবিসর্গে পরিণত ; সকলে তাকে ঘৃণার পাত্র মনে করে, ছোট মনে করে। এখনো এই নির্মম সত্যটাকে সে কূটতর্কের বাধা দিয়া ঠেকাইয়া রাখিয়াছে ; পুরাপুরি স্বীকার করে নাই—কিন্তু নিষ্ঠুর বাস্তবের সম্মুখে সুস্থযুক্তির বাঁধ অত্যন্ত অপটায়ী। বিভ্রান্ত নৈরাশ্যের মুহূর্তে, যখন বাঙালীর চুলচেরা বুদ্ধিও আর তাকে মোহগ্রস্ত করিয়া রাখিতে পারে না, তখন সে মহামতি গোখলের সেই বহু-উদ্ধৃত, বহু-উচ্চারিত প্রশংসোক্তি মনে মনে স্মরণ করে—"বাঙালী আজ যা চিন্তা করিতেছে, সমগ্র ভারতবর্ষ আগামী কাল তা চিন্তা করিবে।" তখনি ক্ষণিক আত্মবিভ্রম দূর হয়, নষ্টমর্যাদা উদ্ধার হয়—নিজের হীনতা অন্যান্য প্রদেশের ঈর্ষ্যা-সন্তাত হের ষড়যন্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয় ; অমনি চিত্তের আরামকেদারাশ্রয়ী শ্লেষাতুর প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসে ;—মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করি—আমরা বাঙালী।

গোখলে আমাদের বড় ক্ষতি করিয়াছেন, এমন আর কেহ নয়!

কিন্তু এদিকে যে বাঙালীর আসন সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল, দেশে এবং বিদেশে। বাংলাদেশে বাঙালীর স্থান আর সুখের নয়—বাংলাদেশের বাইরে বাঙালীর স্থান আর সম্মানের নয়—আর আপনাদের মত যাঁরা বাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশের অধিবাসী, তাঁদের স্থান কি রকম, তাঁরাই জানেন।

লোকে হয় তো বলিবে—তুমি অকারণে নৈরাশ্যবাদী ; এমন কি আশঙ্কাবাদীও বলিতে পারে। জিজ্ঞাসা করিতে পারে, বাঙালীর যে এমন মরণ দশা, তার প্রমাণ কোথায় ? আমি বলিব,তোমার ওই প্রশ্নই সবচেয়ে বড় প্রমাণ ; প্রলয় পয়োধির জল বাড়িতে বাড়িতে নাকের ডগায় আসিয়া ঠেকিলেও যে প্রমাণের অপেক্ষায় থাকে, তার মৃত্যুর আর বাকি কোথায় ? যে-চুলচেরা বুদ্ধির বড়াই আমরা এতদিন করিতে অভ্যস্ত, সেই বুদ্ধিই আমাদের কাল হইয়াছে। ভাগ্যের যত বড় মারগুলাকে এখনো আমরা গাণিতিক equation-এ পরিণত করিতে পারি নাই, বুদ্ধিমান্ জাতি তো এমন অবৈজ্ঞানিক সত্যকে স্বীকার করিতে সম্মত নয়। বাঙালী মরিতে দুঃখিত নয়—কিন্তু তার আগে মৃত্যুর equation-টা সমাধান করিয়া মরিবে। এ সেই গ্রীক ম্যাথিমেটিকের কথা স্মরণ

করাইয়া দেয়—উদ্ধত ঘাতকের লক্ষ্য করিয়া যে বলিয়াছিল 'মারো, কিন্তু মুক্তটি নষ্ট করিও না'! ইতিহাসের আঘাতগুলা ইতিহাসের নিজের আসে, পূর্বিত শাস্ত্রের সূত্র পড়ি দিয়া আসে না—একথা বুঝিতে এখনও আমাদের আরও দুঃখ পাইতে হইবে। বাঙালীর অধঃপাতের প্রমাণ আজ উপস্থিত করিব—খুব বেশী চুল-চেরা ভাবে করিতে পারিব না; প্রলয়ের বন্যা যখন শিয়রে তাড়া করিয়া আসিতেছে, তখন সূক্ষ্ম বিচারের এবং স্থির সত্যাবধারণের সময়াভাব।

যে-বাংলা সাহিত্যের গৌরব আমরা করিয়া থাকি, হতভাগ্য অবাঙালীর নাকের উপরে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি তুলিয়া ধরিয়া তাকে একেবারে নির্বাক করিয়া দিই, ভালো করিয়া চিন্তা করিয়া দেখি না যে, সে গৌরবে আমাদের অংশ বেশি নাই! রবীন্দ্রনাথ যে-সময়ের লোক, সে-সময় বিগত; যে-সব বাক্তির সমবয়সী তিনি তাঁদের অধিকাংশই গত। কাজেই, তাঁর কৃতিত্বের গৌরব আমাদের নয়; এই অপরাহ্ণবীর দেশে সৌভাগ্যক্রমে তিনি জীবিত আছেন বলিয়াই কি তাঁহাকে আমাদের সমসাময়িক বলিতে হইবে? কাল হিসাবে আমরা দু'তিন পুরুষ পরের লোক। এই সময়ে এমন কোন্ সাহিত্যরথী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাকে লইয়া আমরা গৌরব করিতে পারি? রবীন্দ্রনাথকে লইয়া বাংলা সাহিত্য চিরকাল গৌরব করিবে। কিন্তু সে গৌরব আমাদের সমসাময়িক গৌরব নয়—নিতান্তই ঐতিহাসিক। ইতি-মধ্যেই বাংলা সাহিত্যে ভাঙনের লক্ষণ দেখা দিয়াছে এবং যে সাহিত্য একশত বৎসরের চেষ্টায় বাঙালী জাতির সার্ব-জনীন বাণীর প্রতীক হইয়া উঠিয়াছিল—অতিরকালের মধ্যে তাহা কতকগুলি উপভাষীয় সাহিত্যক্ষেত্রে পরিণত হইবে এমন আশঙ্কা আছে।

রাজনীতিতে বাঙালী একসময়ে ভারতবর্ষের গুরুর পদ পাইয়াছিল। কিন্তু আজ আর সে গৌরব তার নাই। স্থির বুদ্ধিতে এই দুর্ভাগ্যের মূলানুসন্ধান না করিয়া আমরা অবাঙালীর প্রতি ষড়যন্ত্রের দোষারোপ করি, তাতে হয় তো ক্ষণিক সান্ত্বনা মেলে—কিন্তু শান্তি মেলে কি? বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি, রাজনীতিতে যতদিন হৃদয়াবেগের প্রাধান্য ছিল, ততদিন বাঙালী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতা ছিল, কিন্তু হৃদয়াবেগের স্তর পার হইয়া রাজনীতি যখনি তথ্যের বাস্তব স্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে বাঙালীর হাত হইতে নেতৃত্ব অন্য প্রদেশের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। বাঙালীর ত্যাগ ও দুঃখ বরণকে কে অস্বীকার করিবে। কিন্তু বিচার করিলে দেখিতে পাইবেন, আমাদের ত্যাগের মূলেও প্রচণ্ড ভাবালুতা, দুঃখ-বরণের মূলেও অসহ্য হৃদয়াবেগ।

ব্যবসা বাণিজ্যেও বাঙালী পিছাইয়া পড়িয়াছে; অবাঙালীরা তার অন্নে ভাগ বসাইতে আরম্ভ করিয়াছে এ ব্যাপার তো চোখের উপরেই প্রতিনিয়ত দেখিতেছি। ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার পক্ষে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা সম্ভব নয়, কিন্তু আমি যতদূর জানি, এবিষয়ে বাঙালীর কোন কালেই খুব বেশি কৃতিত্ব ছিল বলিয়া মনে হয় না; আজ না হয় যাতায়াতের সুবিধা সুযোগ হওয়াতে অবাঙালী আসিয়া বাঙালীর ব্যবসায়ের আধিপত্য করিতেছে, কিন্তু রেল টেলিগ্রাফের যুগের অনেক আগে, ইংরেজ আগমনের অনেক আগে, নবাবদের আমলে বাংলা দেশের সব চেয়ে বড় ব্যবসায়ী ছিল, বাঙালী নয়—অবাঙালী জগৎ শেঠ।

ভাবালু জাতির লক্ষণ এই যে ভাগ্যবিপর্যয়ে সে নিজেকে ছাড়া আর সকলকেই দোষী করে—আমাদেরও সেই দশা; আত্ম-অপরাধ ক্ষালনের জন্য আজ আমরা পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টায় নিযুক্ত; কেমন সূক্ষ্ম কৌশলে নিজেদের অক্ষমতা অন্যের প্রদেশের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতেছি। নিজেদের বুদ্ধিতে নিজেরাই চমৎকৃত হইয়া উঠিতেছি; এমন কি প্রশংসা করিবার লোকেরও অভাব হইতেছে না; বাঙালী খুব বুদ্ধিমান্ জাতি স্বীকার করি—কিন্তু বোধ করি বিধাতাপুরুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান্ নয়।

বাঙালীর এই অবসাদের মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে এক শতাব্দী পূর্বে যাইতে হইবে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশে পাকাপাকিভাবে ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ হয়; তার কিছুকাল আগে হইতেই ইউরোপীয় মনের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটিতেছিল। ইউরোপীয় মনের সঙ্গে সংঘাতে বাঙালীর জড় চিত্তলিপি জাগিয়া উঠিল; সেই জাগরণই বাংলার প্রকৃত রেনেসাঁস, সেই আলোতেই বাঙালী নিজেকে আবিষ্কার করিল। সেই প্রথম প্রভাতের উৎসাহ

বাঙালীর জীবনে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। সেই প্রাতাতিক লগ্নের উৎসাহ-উদ্দীপনা পাই মধুসূদনের কাব্যে; কিন্তু প্রভাতেরও পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত; মধুসূদনেরও আগে রাম-মোহন; রামমোহন বাঙালীর জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের বিরাট পুরুষ!

বাঙালীর সেদিন আত্মবিশ্বাস ছিল বলিয়াই সে ভবিষ্যতেও বিশ্বাস করিত; আর ভবিষ্যতে বিশ্বাস করিত বলিয়াই বাঙালী দলে দলে সংস্কার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল। যে ভালোতে বিশ্বাসী, কেবল সে-ই 'আরও ভালোর' জন্য চেষ্টা করিতে পারে। ইংরেজি সরস্বতীর সোনার কাঠির অসাধ্য কিছু আছে, বাঙালী তাহা স্বীকার করিত না। এই আলাদীনের প্রদীপের সাহায্যে হৃদয়কে নব করা এবং নরকে হয় তুলার স্বপ্ন সে দেখিতেছিল। আর সব চেয়ে বড় কথা এই যে, বাঙালী সেদিন আশা করিতে সাহস করিয়াছিল। আশা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে; ভবিষ্যতকে সুন্দর করিবার জন্য, কল্যাণময় করিবার জন্য, সংস্কার করা প্রয়োজন—তাই সেদিনকার বাঙালী সংস্কারশীল হইয়া উঠিয়াছিল—সমাজে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে—সর্ব্বত্র।

১৮০৫ সাল হইতে স্বদেশী আন্দোলনের শেষ পর্যন্ত, ধরা যাক ১৯১২—কারণ ঐ সময়ে বঙ্গ-বিভাগ রদ হইয়াছিল, বাঙালীর সংস্কৃতির আশার যুগ; জীবনের সর্ব্বাঙীণ সংস্কার সাধন ইহার প্রধান লক্ষণ। এই সময়ের যাঁহারা প্রধান পুরুষ, তাঁহারা এক এক দিকে আশার বাণী বহন করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের কেহ বিদ্যাসাগর, কেহ কেশবচন্দ্র, কেহ দেবেন্দ্রনাথ, কেহ বঙ্কিমচন্দ্র, কেহ মধুসূদন; তাঁহারা রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ; সুরেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। এই সব আশা-প্রবাহিনী জন্মলগ্ন হইতে যে সাগরসঙ্গমের দিকে ধাবিত হইতেছিল, যে পরম মুহূর্ত্তকে লক্ষ্য করিয়া যাহা করিয়াছিল, অভ্রান্ত নামের অভাবে তাহাকে বলিতেছি—স্বদেশী আন্দোলন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই বলিয়াই ইহাকে আমরা রাজনৈতিক আন্দোলন বলিয়া মনে করি। যে দিন ইহার প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইবে, সে দিন বুঝিতে পারা যাইবে, এমন আমূল পরিবর্ত্তনকারী জীবনের এমন সর্ব্বাঙ্গব্যাপক আন্দোলন বাংলাদেশে ইতিপূর্ব্বে আর আসে নাই। রাজনীতি ইহার এক অংশ মাত্র; ইহার মধ্যে সাহিত্য, ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি সবেরই স্থান ছিল;—তাই ইহার প্রসর ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, ভগবান, আশুতোষ চৌধুরী, ব্রহ্মবান্ধব, সতীশচন্দ্র (মুখোপাধ্যায়)-এর মত বিচিত্র প্রকৃতির লোকের স্থানাভাব হয় নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহার রাজনৈতিক রূপটাই বড় হইয়া উঠিয়া সর্ব্বাঙীণস্বরূপ যে ইহার ধর্ম্ম, তাহাকে নষ্ট করিয়া দিল, আর ধর্ম্ম-চ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার শক্তিও হ্রাস হইয়া পড়িল। কিন্তু সেদিনকার বাঙালী এই আন্দোলনকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল, তাহা Wordsworth-এর ভাষায় বলিতে গেলে—

Bliss was it in that dawn to be alive,
But to be young was very heaven! Oh! times,
In which the meagre, stale, forbidding ways
Of custom, law and statute, took at once
The attraction of a country in Romance!

কিন্তু রোমান্স চিরস্থায়ী হইল না, না ওয়ার্ডস্বার্থের ভাগ্যে, না বাঙালীর ভাগ্যে। দুদিন বাদেই বাস্তব আসিয়া রোমান্সকে আঘাত করিল। ফরাসী বিপ্লবের উপকালে Wordsworth তরুণ ছিলেন, কিন্তু উপকালের উৎসাহ তাঁহার মনে চিরন্তন হয় নাই—বাকি জীবনটা তিনি ফরাসী বিপ্লবকে অভিশাপ দিয়া কাটাইয়াছিলেন। আধুনিক বাঙালীও তাহাই করিতেছে।

স্বদেশী আন্দোলন একাধারে বাঙালীর নব-জীবনের আগমনী ও বিজয়া, একাধারে আশা ও আশাভঙ্গের হাসি-অশ্রুতে জড়িত। ইংরাজী শিক্ষার প্রারম্ভ হইতে বাঙালীর জীবন পঞ্চমুখী ধারায় এই তীর্থের দিকে ছুটিতেছিল—লক্ষ্যে আসিয়া যখন পৌঁছিল, দেখা গেল যাহাকে সমুদ্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল তাহা মরুভূমি মাত্র; সে রাজ্যের বালুকা-রাশি বাঙালীর জীবন-তাহ্নীকে গ্রাস করিল—মহতী আশার মহতী ব্যর্থতা! বাঙালী থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার সংশয়িত চিত্তে প্রশ্ন জাগিল—যে প্রশ্নের উত্তর সে আজও পায় নাই। যে-পথে সে এতদিন নির্ভয় উল্লাসে চলিয়াছিল, সে পথের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—সম্মুখভাগ রুদ্ধ করিয়া বিশাল প্রাচীর; সেই পাষাণ বাধায় মাথা ঠুকিয়া

# প্রতিযোগিতা

সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বাংলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক মুসলমানদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন যে, এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিদের সহিত দৌড়ে তাহাদিগকে পাল্লা দিতে হইবে।

সে মাঝে মাঝে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে—আধুনিক বাঙালীর ইতিহাস সেই আর্ত্তনাদে পূর্ণ।

রাত্রির আকাশে উল্কাপিণ্ড বায়ুস্তরের সংঘর্ষে আসিয়া জ্বলিয়া ওঠে, অবশিষ্ট কতকগুলি পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে, অনেকগুলিই আকাশপথে ভস্ম হইয়া যায়। পশ্চিমের সভ্যতার সংঘর্ষে বাঙালীর অসাড় চিত্ত একদিন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার নীলাভ দীপ্তিতে পরিপার্শ্বের অন্ধকারের কোন সূচনা ছিল না; সেই জন্য উল্কাপিণ্ডের প্রথমটি রাজা রামমোহন এবং মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি। ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে ইঁহারা জ্বলিয়া দীপ্তি দিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের অপেক্ষা যাঁহাদের শক্তি কম—যাঁহাদের বলিতে পারি ক্ষুদ্রতর উল্কাপিণ্ড—তাঁহারা জ্বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু কোন চিহ্ন রাখিবার পূর্ব্বেই আকাশপথে ভস্মীকৃত হইয়া বিলীন হইয়া গেলেন। বাঙালী জাতির দীপিদানের সময় চলিয়া গিয়াছে; এখন বাঙালী জাতি এই সংঘাতে টিঁকিয়া থাকিবে, না এই প্রক্রিয়ায় ভস্মসাৎ হইবে—তাহারই পরীক্ষা চলিতেছে!

বাঙালীর মানসিক জগতে স্বদেশী আন্দোলন প্রকাণ্ড একটি চিহ্ন; ইহাকে আমি বলি বাঙালীর সংস্কৃতির water-shed—ইহার দুইদিকে সংস্কৃতির দুই বিভিন্ন মূর্ত্তি; একদিকে আশা, অন্যদিকে আশাভঙ্গ; একদিকে উদ্যম, অন্যদিকে অবসাদ; একদিকে আত্মপ্রত্যয়, অপর দিকে আত্ম-অনাস্থা, যেন বাঙালী নিজের প্রতি নিজে vote of no confidence পাস করিয়া বসিয়া আছে; একদিকে আত্ম প্রতিষ্ঠা, অপর দিকে ধৃতিহীনতা, ঘটনার মুখে খড়কুটার মত ভাসিয়া চলা; একদিকে creation, অন্যদিকে criticism। এই লক্ষণগুলি বাঙালীর সাহিত্যে যেমন ধরা পড়িয়াছে এমন আর কিছুতে নয়—বরঞ্চ সাহিত্যেই কিছু উগ্র আকারে ধরা পড়িয়াছে, কারণ দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙালীর কাছে জীবনের চেয়ে সাহিত্য বড়। বঙ্কিমচন্দ্র এই water-shed-এর একদিকে, আর শরৎচন্দ্র আর-একদিকে, রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবন ইহার দুইদিক অধিকার করিয়া বিরাজমান। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়কদের কথা স্মরণ করুন, আবার শরৎচন্দ্রের নায়কদের কথা স্মরণ করুন; আমার বক্তব্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। প্রতাপ, জীবানন্দ, গবেন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক তাহারা সেই সময়ের লোক, যখন বাঙালীর আত্মবিশ্বাস ছিল। শরৎচন্দ্রের জীবানন্দ, সতীশ, দেবদাস, শ্রীকান্ত, যে-গুণের অভাবে সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেছে না, তাহার নাম আত্মপ্রত্যয়; অন্যায়ের মুখে, প্রতিকূলতার মুখে নিজেকে স্থাপিত করিবার শক্তির অভাব, ঘটনার স্রোতে খড়কুটার মত ভাসিয়া চলিয়াছে; এই ধৃতিহীন হতভাগ্যের দল আধুনিক বাঙালীদের প্রতীক। শরৎচন্দ্র যে বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াই সমাদর ও আত্মীয়তা লাভ করিলেন, তার কারণ বাঙালী তাঁহার সাহিত্যের দর্পণে নিজেদের যথাযথভাবে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া নিজেদের মধ্যে নিজেকে চিনিল এবং সেই সঙ্গে শরৎচন্দ্রকে চিনিল পরমাত্মীয় জ্ঞানে।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' স্বদেশী আন্দোলনের মাঝের যুগের বাঙালী—যে প্রতিপক্ষের মাঝের উপরে নিজের ধর্ম্ম ও জাতীয়তাকে সবলে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে; আর তাঁহার অমিত রায় পরবর্ত্তী যুগের বাঙালী, যে কলিকাতা হইতে শিলং, শিলং হইতে নৈনিতালে ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে; সে আত্মপ্রতিষ্ঠার বদলে পরের প্রতিষ্ঠাকে ভাঙিয়া ফেলিতে অভ্যস্ত; সে নিজে কাজ করিতে পারে না—অন্যের কাজে ভুল ধরিতে পারে—বাক্ বিলাসই তার আত্মপ্রকাশের একমাত্র উপায়; এমন কি একমাত্র যে কাজে এখনো বাঙালীর কিয়ৎপরিমাণে কৃতিত্ব আছে সেই বিবাহ কার্য্যেও অমিত রায়ের অসীম অপটুত্ব। সে লাবণ্যকে বিবাহ করে নাই, এবং আমার বিশ্বাস শেষ পর্য্যন্ত কেতকীকেও বিবাহ না করিয়া ফিরিয়া পড়িবে।

বাংলা মৈমিকের একটা স্তম্ভ ঘর-পালানো ছেলের সংবাদে পরিপূর্ণ। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ নায়কের বিষয়েই এই জাতীয় বিজ্ঞাপন বাহির হইতে পারিত। মহৎ কাজের উদ্দেশ্যে যাহারা ঘর ছাড়ে—বাঙালীর ঘর-ছাড়া সে রকম নয়, সাংসারিক ব্যর্থতায় বাঙালী ঘর ছাড়িতেছে—এই সব বাঙালীর অভিজ্ঞতাই শরৎচন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

আত্মশক্তিতে আস্থা করিয়া আসিলে একটা জাতির মধ্যে যে সব লক্ষণ দেখা যায়, তাহার প্রায় সবগুলিই বাঙালী চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। একদিকে মান-অপমানের

অস্বাভাবিক উগ্র সুস্থতাবোধ, অপরদিকে মানসিক অসাড়তা।

বাঙালী এখন সর্ব্বদা সন্দেহ করে অন্যান্য প্রদেশ বুঝি অগ্রসর হইয়া গেল; বুঝি সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করিতেছে। এই সন্দেহকে অমূলক প্রমাণ করিবার জন্য সে নিজেকে সংখ্যার দ্বারা চাকিতেছে; মস্তিষ্কের অভাব মস্তক গণনার দ্বারা অপ্রমাণ করিতেছে; আত্মশক্তির দুর্ব্বলতাকে বাহুবলের সংলগ্নতায় চাপিয়া রাখিতেছে। আমরা বহুত্বের কবরে মনুষ্যত্বকে সমাহিত করিয়া ফেলিয়াছি। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক,—হিন্দি-ভাষীরা আবার ধরিয়াছে হিন্দিকে রাষ্ট্র ভাষা করিতে হইবে; কংগ্রেসিরা বলেন, হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্র ভাষা করিতে হইবে; এতদিন এ বিষয়ে বাঙালীর মনে কোন প্রশ্ন ছিল না—কারণ মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের জন্মের দ্বারাই বাংলা ভাষা ভারতবর্ষে অধিতীয়ত্ব লাভ করিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের দিনে বেয়াদবির ভাবটা কিছু প্রবল হয়—বাঙালী প্রতিযোগিতার কণ্ঠে বলিতে সুরু করিয়াছে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে হইবে। দু'চার জন মুষ্টিমেয় লেখক যে ভাষাকে বরণীয় করে—এ-কথা আর মনে করে না! কত সংখ্যক লোক ভাষাকে ব্যবহার করে—আজ তাহাই একমাত্র দ্রষ্টব্য। অথচ ভাগ্যের পরিহাস এই যে, আমরা যখন বঙ্গের বাহিরে বাংলা ভাষা প্রচারের স্বপ্ন দেখিতেছি, সেই সময়েই বঙ্গদেশে বাংলাভাষার প্রসার সঙ্কীর্ণতর হইয়া আসিতেছে: ট্রামে, বাসে, রেলে, ষ্টীমারে হিন্দি না হইলে চলে না; হিন্দুস্থানী-অলা হিন্দি বলে, কুলি হিন্দি বলে; সিনেমার হিন্দি সংস্করণ চলিতেছে; এমন কি বাঙালীরা, বাঙালী নেতারা জয়ধ্বনি করিতে হিন্দি ব্যবহার করে। বঙ্গদেশে অবাঙালীরা হিন্দি শেখে না—বঙ্গদেশে বাঙালীর হিন্দি না হইলে অচল। বাস্তববোধ থাকিলে বাঙালী আগে ঘর সামলাইয়া পরে বাহিরে প্রচারের উদ্যোগ করিত। এহেন অবস্থায় বাঙালী লেখকগণ স্বপ্ন দেখিতেছে গ্রন্থ হু হু করিয়া সংস্করণের পর সংস্করণ নিঃশেষিত হইতেছে; গ্রন্থ-প্রকাশকগণ স্বপ্ন দেখিতেছে—সেই মোটা মুনাফার অংশ হইতে কেমন সুকৌশলে তাহারা গ্রন্থকারদের বঞ্চনা করিতেছে! কিন্তু পাঁচ কোটি লোকের ভাষা পঁয়ত্রিশ কোটি লোক প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বলিলে ও লিখিলে সেই ভাষার কি বিকার ঘটিতে পারে—তাহা কি আমরা ভাবিয়াছি? বাংলা ভাষার উন্নতির ভার দু'চার জন মস্তিষ্কবান ব্যক্তির উপরে নির্ভরশীল, মস্তক গণনার উপরে নয়; যে যতই বলুন, ভারতের রাষ্ট্রভাষা ইংরাজী হইয়া রহিয়া আছে—হিন্দিও হইবে না, হিন্দুস্থানীও হইবে না—এমন কি আধুনিক এশিয়ার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য যে ভাষাতে রচিত হইয়াছে—সেই বাংলাও হইবে না।

আমাদের দুর্ব্বলতার লক্ষণ স্বরূপ এই সংখ্যাবাদ প্রচারে সংবাদপত্র সব চেয়ে বেশী উদ্যোগী। সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে আমার বেশি বলিবার সাহস নাই—কারণ সে যে এক প্রকার রাজদ্রোহ! আধুনিক গণতন্ত্রের রাজা সংবাদপত্র, কিন্তু সংবাদপত্র পরিচালকদের কাছে বিনীত অনুরোধ এই যে তাঁহারা যদি সত্য প্রচার না করিয়া যাহা ঘটে মাত্র তাহাই প্রচার করিতেন, তবে আমরা অধিকতর উপকৃত হইতাম! সংবাদপত্রকে লইয়া পরিহাস করিবার সাহস থাকিলে কবির ভাষাকে কিঞ্চিৎ বদলাইয়া বলিতাম—

"সেই সত্য, যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা, তা সত্য নহে। সম্পাদক, তব মনোভূমি
তথ্যের জনস্থান বাস্তবের চেয়ে সত্য জেনো।"

জাতিগত inferiority complex-এর আর একটা লক্ষণ সাম্প্রতিক প্রগতিবাদে। বিজ্ঞানের কৃপায় প্রচণ্ড গতিশক্তি দেখিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে গতিই বুঝি নিয়ম—অতএব বিশ্বের সঙ্গে তাল রাখিবার জন্য আমরা প্রগতিবাদী সাজিয়াছি—কিন্তু একটু ভাবিলেই দেখা যাইবে প্রগতিবাদ মানে পলায়নবাদ। মোটর গাড়ীর রেকর্ড-গতি ঘণ্টায় শুধু মাইলের উপর; এরোপ্লেনের বহু তো চারশো মাইলের উপর। এই যে মানুষ গতির প্রচণ্ডতায় মাত্রা ক্রমে চড়াইয়া দিতেছে—ইহার আসল অর্থ, মানুষ আজ পলাইতে চেষ্টা করিতেছে, নিজের নিকট হইতে নিজের পলায়নের চেষ্টা; নিজের মানমুখী লোভলোলুপ বিজ্ঞান-বিকৃত বীভৎস অস্তিত্বের কাছ হইতে সে প্রাণপণে ছুটে যাইতে চায়—তাহারই চিহ্ন ওই উৎকট আকাশচেষী গতিতে। ইউরোপ ও আমেরিকা দুই-ই যদি সমান বিকৃত হয়, তবে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে, পাঁচ ঘণ্টার বদলে তিন ঘণ্টায়, পৌঁছিয়া কি এমন লাভ! বাঙালী এত বোঝে না—সে রেকর্ড স্থাপন করিতে উঠিয়া পড়িয়া

পাশিয়াছে; দৌড়াইতেছে, লাফাইতেছে, নাচিতেছে, চলে পড়িয়া আসিতেছে। শেষোক্তটাই বাঙালীর সব চেয়ে প্রিয়—বাঙালী যে চলে পড়িয়াছে—বোধ হয় তাহারই প্রতীক।

এ যেমন একদিকের কথা বলিলাম—অপর দিকে যেমন চিত্তের অসাড়তা ঢাকিবার জন্য কত না উদ্যম। সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও, হরেক রকমের খেলা। একটা মরা জন্তুর চামড়ায় বাতাস-ভরা বলিকে উপলক্ষ করিয়া বাইশ জন প্রতিপক্ষ পরস্পরকে মারিবার চেষ্টা করিতেছে—আর বাইশ হাজার লোক বসিয়া কি আগ্রহে দেখিতেছে। ইহার চেয়ে রোমান যুগের সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করাতে অধিকতর বীরত্ব ছিল—কারণ জন্তুটা ছিল অত্যন্ত সজীব।

জীবনে খেলার স্থান আছে, বিনোদনের স্থান আছে, কিন্তু বাঙালীর কাছে কাজের চেয়ে খেলা বড়—কিংবা খেলাটাই একমাত্র কাজ হইয়া পড়িয়াছে; বিকাল বেলা খেলা, তার পরেই সিনেমা, সিনেমার পরেই রেডিও, তার পরে বিস্মৃতিময়ী করুণ নিদ্রা। নিজের দিকে আমাদের তাকাইবার অবসর নাই—ইচ্ছা নাই, তাহলোচন যেমন নিজেকে দর্পণে দেখিয়া নিজেই মারা গিয়াছিল—নিজের প্রকৃত স্বরূপ দেখিলে আমাদেরও তেমনি মৃত্যু ঘটিবে—যদি না ইতিমধ্যেই জাতিগত ভাবে মরিয়া গিয়া থাকি। নিজেকে ভুলাইবার জন্য তাই এই সব উপলক্ষ! মাতাল যেমন সোজা হইয়া চলিতে পারে না—একবার এ দিকের দেয়াল ধরিয়া, একবার ওদিকের ল্যাম্প-পোষ্ট ধরিয়া চলে—আধুনিক বাঙালীও তেমনি জীবনপথে একবার সিনেমা আশ্রয় করিয়া, একবার রেডিও আশ্রয় করিয়া, অথবা খেলা, থিয়েটার আশ্রয় করিয়া টলিতে টলিতে চলিয়াছে।

ইহার প্রতিকার কি? জানি না—বোধ করি কেহই জানে না। শুধু এই মাত্র জানি যে, যেমন করিয়াই হোক এই দুর্যোগের কালরাত্রি বাঙালীকে অতিক্রম করিতেই হইবে। এই দুর্ভাগ্যের প্রহরে প্রহরে বিপদের বিভীষিকা আসিবে—প্রলোভনের ছলনামূর্ত্তি আসিবে—কিন্তু ধ্যানভঙ্গ করিলে চলিবে না। শুধু এই মাত্র জানি—মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তি প্রাণপণ করিয়া মনুষ্যত্বের আদর্শকে ধরিয়া থাকিবেন—জনতার কোলাহলকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা বলিবেন, সংখ্যাতে সত্য নাই, বহুকণ্ঠগণনায় মুক্তি নাই, বাহুপ্রদর্শনের কোটে উদ্ধার নাই; তাঁহারা বলিবেন—অনেকের অপেক্ষা এক বড়, কারণ সত্য পরিমাণ নয়, সত্য গুণ বিশেষ। তাঁহারা বলিবেন, উদ্বেগশূন্য, বিক্ষিপ্ত চিন্তায়, শুদ্ধাশ্রয়ী থাকো, খণ্ডিত লক্ষ্যে, উদ্দেশ্যহীন গতিতে পরিত্রাণ নাই; তাঁহারা তথ্যের জগৎ হইতে idea-র মধ্যে আমাদিগকে ফিরিতে আহ্বান করিবেন। সেই মুষ্টিমেয় আদর্শবাদী যদি জাতির মধ্যে উদ্ভূত হইয়া থাকেন, তবেই জাতির বাঁচিবার আশা আছে; এই উপায়েই ইতিহাসের সব জাতি বাঁচিয়াছে, ইহারই অভাবে ইতিহাসে জাতির পতন হয়। অন্ধবাসের প্রসাদে আমরা গৃহহীন, নূতন কল্পবিজ্ঞান যুগে আমরা দেশাত্মবোধহীন—এই গৃহহীন, দেশহীন, রাষ্ট্রিকবোধহীন অধিকারবাদী আমরা, ঘাসাবরের মত ছায়াপুষ্ট, বারিপুষ্ট মানসিক মরুভূমির মধ্য দিয়া কোথায় চলিয়াছি। এই মরুভূমির মরীচিকার বিশ্বব্যাপী জালনিক্ষেপকে ব্যর্থ করিয়া যিনি আমাদিগকে promised land-এর অভিমুখে চালিত করিবেন—কোথায় সেই মহাপুরুষ?

বাঙালীকে বাঁচিতেই হইবে। শুধু নিজের জন্য নয়—ভারতবর্ষের জন্য; কারণ তাহার সমগ্রতাকে উপেক্ষা করিয়া যেমন বাঙালী বাঁচিতে পারিবে না—তেমনি বাঙালীর সত্তাকে উপেক্ষা করিলেও ভারতবর্ষের কল্যাণ নাই। ইতিহাসের অমোঘ বিধানে বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষ চিরদিনের জন্য একাত্ম হইয়া গিয়াছে।

বহুক্ষণ বাঙালীর নিন্দা করিলাম, বাঙালীর বহু গুণের অভাবের কথা বলিলাম, কিন্তু বাঙালীর যে ধৈর্য্য নাই একথা আমার মত অধৈর্য্যবাদীও বলিতে পারিবে না; ধৈর্য্য না থাকিলে আমার এই দীর্ঘ নীরস কটূক্তিভাষণ আপনারা সহ্য করিলেন কেমন করিয়া! ধৈর্য্যাভাবের বিপদ এই যে তাহা স্বভাবতই সীমা লঙ্ঘন করিয়া যায়—ঘর তো বাঙালীর অবশ্য তত নষ্টচন্দ্রনক নয়—যত আমি বলিলাম। যদি আমার কথা অমূলক হয়, আমার আশঙ্কা বৃথা হয়—তবে আমার চেয়ে বেশী আনন্দিত কেহ হইবে না; আমি সকলের আগে আমার ভ্রান্তি স্বীকার করিয়া শান্তি অনুভব করিব। আপনাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ—একবার এই আত্মসমালোচনা করিবার সুযোগ দিবার জন্য, আর একবার এই আত্মসমালোচনা নীরবে সহ্য করিবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ

মানুষের ইতিহাসের কালরাত্রি স্মরণ করিয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, বাঙালীর জীবনের কালরাত্রি উপলক্ষে তাহার অংশবিশেষ উচ্চারণ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।—

"মৃত্যু যেন করি
ভুলিয়া চলেছে তরী।
কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার,
নাহি তো যাহার ওপারের।
এই শুধু জানিয়াছি সার
হৃদয়ের সাথে লড়ি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
জাগাতে হইবে হালে—
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।...
তবু কেহ তরী
সব ফেলে হ'তে হবে পার
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার,
শিরে লয়ে উল্কার দুর্দ্দিন,
চিত্তে নিয়ে আশা অহর্নিশ,
হে নির্ভীক, দুরে-অন্বিষ্টের।
ওরে ভাই, তার নিশা কর তুমি? আশা কর মত।
এ আশার, এ তোমার পাপ।—
যার বিশ্বাসী, যার আপন সাদৃশ্য-অভিমান,
শুধু এক মনে হবে পার
এ প্রলয় পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয় ধ্বজা তুলে।

---

# হয় তো প্রভাত আসিবে না আর

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আগুন জেগেছে মনে মনে আজ বনে বনে তার শিখা,
বিশ্ববীণায় কেঁপে ওঠে সুর দীপকের ঝঙ্কারে।
হৃদয়-গ্রন্থে কি হবে রাখিয়া জীবনের পাদটীকা,
ভবিষ্যতের কাঁদে নীহারিকা,—বাঁচাবে কেমনে তারে!
নগরে নগরে বন্দরে জাগে ধ্বংসের ভয়-গান,
গগনে পবনে খ-পোতের দল রুদ্রলীলায় রত,
মঞ্জরী সব ঝরিয়া পড়িছে নবীন আশার প্রাণ
কে আছে বন্ধু! আমাদের মত এমনি ভাগ্যাহত।
এমন দিনেও দলাদলি আজ দিশাহারাদের দলে,—
মরিতে বসেছে,—যায় না স্বভাব মরিবে এমনি করে।
পরের ছিদ্র খুঁজিতে খুঁজিতে ওরা সব পথ চলে,
আপন রক্তে পড়িছে যজ্ঞ ভাবিবে কি অন্তরে?
প্রাণের পাখীরা উড়িতেছে ভয়ে তীব্র ঝঞ্ঝা-বায়ে,
শেষ চরে আসে এই ধরণীর বাকীটুকু যাহা পুঁজি।
বেজে পড়ে সব পরশুরামের রুদ্রকুঠার ঘায়ে,
ধরিণীবাহাস হাহারে শিরাছে,—পাবে না তাহারে খুঁজি।
স্বপনের ভাষা বিবাগী মনের রেখো না ক' আবরণে,
কল্পনাপটে মসী ঢেলে দাও কি হবে কাব্য লিখে।
ঘরছাড়া হয়ে পথে পথে তব শর্ব্বরী যাপনায়
নয়নের বারি করে নিষ্ফল যা কিছু দিয়া শিখে।
যে ফুল ফোটাতে চেয়েছিনু মোরা ধরণীর মরু-পথে,
তাহারি বীজের ভস্ম মাখিয়া সুরু হোলো পথ চলা।
বহুদিন যাবে এই ধরণীর রাত্রি প্রভাত হতে,
হয় তো প্রভাত আসিবে না আর—সে কথা বৃথাই বলা।

---

# অনির্বাণ

—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

১১

"ফিরে তবে এলে যে, এলে যে সেই পুরা ঘরে!"

গিরিন্দ্র সমস্ত দিন ধ'রে বাড়ীটার চারিপাশ ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়া'তে লাগলেন। বাংলার বাইরে এই তাঁর প্রথম আসা। যা'দের দেখবার জন্যে আসা, তা'দের সঙ্গে দেখা হ'ল। সাত্যকি, যা'র জন্য এত কাণ্ড, সে-ই যখন সেরে উঠেছে, তখন কোনো চিন্তাই আর নেই। তাছাড়া, অনেক দিন পরে জয়ন্তীকে দেখে তাঁর মনটা বেশ খুশি হ'য়ে উঠেছে। জয়ন্তীর অত সুন্দর স্বাস্থ্য অনেক দিন তাঁর চোখে পড়েনি। যাই হোক্, বেশ খুশি মনে গিরিন্দ্র ফুলগাছগুলির মধ্যে, বাড়ীর পাঁচিলের পাশে পাশে সুরকির রাস্তার উপরে অনেকক্ষণ ধ'রে ঘুরে বেড়া'তে লাগলেন। পার্থসারথি হাসতে লাগল, বলল, 'গিরিন্দ্র যেন কি খুঁজছেন মনে হচ্ছে।'

সাত্যকি মধ্যাহ্নের আহার সেরে তাঁর চিরপ্রিয় আরাম-কেদারায় শুয়ে শুয়ে দৈনিক সংবাদপত্রের পাতা ওলটাচ্ছিল। প্রথমেই কার্টুন ছবিগুলি দেখে; আজও তা' দেখছিল। পার্থসারথির দিকে তাকিয়ে সে বলল, "কিছু হারিয়েছে হয় তো দেখ!" দেবকুমার, সারথি আর গিরিন্দ্রের এখনও খাওয়া হয় নি। দেবকুমার সদ্য স্নান সেরে তাঁর লম্বা চুলগুলির উপরে ব্রাশ বুলোচ্ছে। একটু হেসে সে বলল, "হারামণি বোধ হয়!" তার পর চুল আঁচড়া'তে আঁচড়া'তে সে একটু চেঁচিয়েই জিজ্ঞাসা করল "কি খুঁজ্‌ছেন জামাই-বাবু?"

একটু হেসে গিরিন্দ্র বললেন, "বেশ লাগছে হে পশ্চিমে এসে। এ যে দেখছি ছোটখাট একটা উপোবন!"

"আর রোদ্দুরে বেশী ঘুরতে হ'বে না। আসুন খেতে বসা যাক।" ব'লে দেবকুমার তাঁর চুল আঁচড়ানো শেষ করল।

• • •

জয়ন্তী প্রয়োজন মত বাড়ীটিকে বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। সাত্যকির সঙ্গে সেদিনের সেই কথাবার্ত্তার পর থেকে এখন সে নিজেই সংসারের ভারকর্ম্ম করে। তা'তে সে আনন্দ যে পেয়েছে, এটা তা'র স্বচ্ছন্দ চলাফেরা, কথাবার্ত্তার মধ্যেই বেশ বুঝতে পারা যায়।

গিরিন্দ্র ঘুরছেন ফিরছেন, জয়ন্তীর স্বচ্ছন্দ সাবলীল কাজকর্ম্মের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছেন। বৈ, জয়ন্তীর এতটা তৃপ্তি, উজ্জ্বলতা, সদাহাস্যময় যুবজ্যোতি গিরিন্দ্র তো তাঁর মাঠের বাড়ীতে দেখেন নি। গিরিন্দ্র আপন মনেই তা' ভেবে নিলেন, তাঁর মনে হ'ল, দারিদ্র্যই এর কারণ। প্রতি পদে তা'র নিষ্করুণ আঘাত, আজ এটা নেই, কাল সেটা নেই—এত স্বাচ্ছন্দ্য আসে কি ক'রে?

খেতে বসল তিনজন - দেবকুমার, সারথি আর গিরিন্দ্র। পরিবেশন করতে লাগল জয়ন্তী। অতি নিপুণ হাত। তাঁর চেয়েও নিপুণ গৃহকর্ত্রী। গিরিন্দ্র জয়ন্তীকে এভাবে কোনো দিন দেখেন নি। জয়ন্তীর যে নিঃস্বত্ব, করুণ বধূরূপ মাঠের বাড়ীতে তিনি দেখেছেন, তা'র মধ্যে বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। তা' নিত্য দেখা যায়। কিন্তু জয়ন্তীর সুডৌল স্বাস্থ্য, হাসি হাসি মুখ, আর লঘুগতি, ক্ষিপ্র তৎপরতা—এ সবের পশ্চাতে তাঁর মনে হতে লাগল নিশ্চয়ই আরও কিছু আছে। শুধু দেওঘরের মুক্ত হাওয়া, অবাধ স্বাধীনতা, সাত্যকির রোগ-মুক্তি—শুধু এই কি? এর পিছনে হয়ত আরও কোনো মানসিক স্বাস্থ্যের হেতু আছে। গিরিন্দ্রের মনে হ'তে লাগল, সুবোধ লোকটি কেমন? তাঁরই বাড়ী, কি ক'রে হঠাৎ এঁদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হ'ল, বাড়ীটা তিনি এমনই এঁদের থাকতে দিয়েছেন, না ভাড়া নিচ্ছেন, তিনি এখানে মাঝে মাঝে আসেন কি না—এই সব নানা প্রশ্ন তাঁর মনে একে একে আসতে লাগল। তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'লে বেশ হয়। ···জয়ন্তীকে নিশ্চয়ই তিনি দেখেছেন, আলাপও নিশ্চয়ই হ'য়েছে।···গিরিন্দ্র কলকাতার বাসায় ডাক্তারের সঙ্গে তা'র সম্মুখে জয়ন্তীর খোলাখুলি কথাবার্ত্তা পছন্দ করেন নি। কলকাতা থেকে অনেক দূরে দেওঘর। সুবোধের সঙ্গে আলাপ জয়ন্তীর হ'য়ে থাকে (হ'য়েছে বিনা গিরিন্দ্র

জানেন না ), হ'লে কতটা আলাপ হ'য়েছে এই সব নানা-পাঁচ ভাবনায় দিগিন্দ্র মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ছিলেন।

"ও কি জামাই বাবু, মাছটা একেবারেই ছুঁলেন না যে! খান খান—" দেবকুমার বলল।

"এই যে খাই"—বলে' দিগিন্দ্র মাছের বাটীতে হাত দিলেন।

"কি, ভাবছেন কি অত অন্যমনস্ক হ'য়ে?"

"কিছু না,—ভাবছি, সাত্যকি তো সেরে উঠেছে। এইবার এঁকে নিয়ে যাই, কি বলো? নইলে সংসার যে একেবারে অচল। একা পিসীমা আর কতদিন ইস্কুলের ভার ব'ইবেন।"

সারথি একটু মৃদু আপত্তি জানিয়ে বলল, "এই মধ্যে কি—শীতটা চ'লে যাক, ফাল্গুনে নিয়ে যা'বেন এখন।"

দেবকুমার সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠল, "আপনিও কিছুদিন ছুটি নিন। একসঙ্গে দেওঘরে কিছুদিন হৈ-হৈ করে বেড়ানো যাক।"

"হৈ-হৈ ক'রে বেড়াবার কি বয়েস আছে হে? তোমরা ছেলেমানুষ, তোমরা হৈ-হৈ করো গে। আমার কথা অর্থাৎ আমার অসুবিধার কথা, আমার সংসারের কথা কি ভেবে দেখেছ তোমরা? সংসার সত্যিই অচল।"

"কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে গেল? আর ক'টা মাস বৈ তো নয়, লোকে ছেলেও তো যায়!"

একটু হেসে দিগিন্দ্র বললেন, "আমাদের কি ছেলে যাওয়ার মত অবস্থা ভাই? এ যে বাঘে প'ড়ে আসা। একটু ভেবে দেখ, সাত্যকির অসুখ না হ'লে তোমরা কি ছেড়ে আসতে? কখনও কল্পনাও ক'রেছিলে?"

"আচ্ছা, সে পরে ভাবা যা'বে। এখন খেয়ে নিন তো—" ব'লে দেবকুমার সশব্দে খেতে লাগল। অতঃপর দিগিন্দ্র আর কোনো কথা না ব'লে মাথা নীচু ক'রে খেতে লাগলেন। সারথি এরই মধ্যে আরও মৃদুস্বরে বলল, "আচ্ছা, জয়ন্তীকে নিয়েই যান, বারবার আপনি এসে ফিরে ফিরে যাচ্ছেন, এটাও শোভন নয়।"

দিগিন্দ্র অন্যমনস্কই রইলেন।

জয়ন্তী পরিবেশন করতে করতে এঁদের সব কথাবার্তাই শুনতে পেয়েছিল। ঘোমটার আড়াল থেকে অল্প অল্প হাসি দেখা যাচ্ছিল তা'র মুখে। যেন কিছুই হয় নি এমনই ভাব। শ্বশুরবাড়ী তা'কে যেতে হ'বে তা সে জানে। অল্প যে কয়দিনে সাত্যকি সেরে উঠেছে, সেই ক'দিনের একটা মোহ যেন জড়িয়ে রইল তা'র জীবনে। মোহটা এল সুবোধের সঙ্গে পরিচয়ে, এল তা'র বিশাল কর্মময় জীবনের সংস্পর্শে—এ মোহ যে শুধু জয়ন্তীর, তা' নয়, এ মোহ তিন ভাইয়েরই হয়েছে। কি আর হ'ত তা না হ'লে? সেই বহরমপুর কলেজ, মাঝে মাঝে ছুটি-ছাটায় বাড়ী আসা, স্রোত ছেলে, না হয় মধুকে বিরক্ত ক'রে, খাওয়া-খাওয়া—আর মাঝে মাঝে জয়ন্তীকে চিঠি লেখা। সাত্যকির অসুস্থতা এদের তিনজনের কিশোর জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে এল। সুবোধ যেন এক দেবতা এদের সম্মুখে। জয়ন্তীরও যেমন, সাত্যকি, সারথি, দেবকুমারেরও ঠিক তেমনি ধারণা সুবোধ সম্বন্ধে।

রাত্রের খাওয়া-দাওয়া হ'ল শেষ। জয়ন্তী ক্লান্ত হ'য়ে দালানে এসে দাঁড়াল। সবাই যে যা'র ঘরে বিশ্রাম করছে লেপ মুড়ি দিয়ে। ঘু-ঘু মাঠে শীতের রহস্যময় চন্দ্রালোকের দিকে চেয়ে জয়ন্তীর মন কেমন করতে লাগল। কা'র জন্য তা' সে জানে না. হয় তো মনের এক নিভৃত কোণে বাপের এত শীঘ্র ছেড়ে যা'বার তা'র ইচ্ছা নেই। হয় তো এই মায়াময় রাত আর দেওঘরের নক্তোরত মাঠের উদাস নৈঃশব্দ্য, হয়ত সুবোধ কিংবা একটা অকারণ মন হু-হু করা—ঠিক যা'র অর্থ সব সময়ে হয় না, জয়ন্তীর সেই রকমটা হ'তে লাগল।

দিগিন্দ্র পাশের একটা ঘরে শুয়ে পড়েছেন। পাওয়ার বাড়ীতে তাঁর স্যুটকেসটা প'ড়ে আছে, এটা শোবার আগে একবার তাঁর মনে হ'ল। তারপর ক্লান্ত চোখে কখন যে এসেছে ঘুম—একেবারে অতলস্পর্শী।

জয়ন্তী দালানে ঘুরে বেড়া'তে লাগল। দিগিন্দ্রকে বড় রোগা মনে হ'ল তা'র।...যদি কিছু দিন দেওঘরে থাকেন, তো মন্দ হয় না। ঘুরে বেড়ায় জয়ন্তী আর ভাবে। কেন, ছুটিও তো নিতে পারেন ইচ্ছা করলে!...মধু যা' কত টাকাই বা দিয়েছে আসবার সময়ে। আর অতি অল্পই আছে। যদি বাড়ী ভাড়া দিতে হ'ত! সুবোধের প্রতি তা'র মন কৃতজ্ঞতায় ভ'রে উঠল। সাত্যকির অসুখ যদি ঘুরে আবার আসে, তা হ'লে! ভগবান করুন, যেন তা'

না হয়।···কি অদ্ভুত জায়গা এই দেওঘর! দু' দিনে গেল বৃষ্টি বন্ধলে। মনে এল স্বাস্থ্যের আনন্দ। প্রাণে এল প্রাচুর্য্যের স্বপ্ন। তারপর জয়ন্তী ভাবল, দিগিন্দ্রকে সে অনুরোধ করবে—বলবে, বড় রোগা হ'য়ে গেছ তুমি সংসারের জন্য ভেবে ভেবে, খেটে খেটে—দু' দিন এখন জিরোও। বিশ্রাম কি কেউ পায়? বিশ্রাম তৈরী ক'রে নিতে হয়, তুলে নিতে হ'বে দুটি—বড়ো দাম খানেক। তারপর, এখানে খাকি এলো—এই মাঠ, ঐ পাহাড় ঘন সবুজ শালবীথি, তারপরে সুবোধ বাবুর সঙ্গে তোমার যদি আলাপ হয়, দেখবে তিনি কেমন লোক! গাঁয়ের স্কুলের চাকরী তুমি না-ই করলে! সুবোধ বাবুর এত আলাপ, এত দয়াদাক্ষিণ্য—এক আধটা ভালো চাকরী তিনি হয় তো তোমাকে দিতে পারেন।···'তুমি'ই বলবে আজ দিগিন্দ্রকে সব সঙ্কোচ কাটিয়ে।

সম্মুখে কা'র দীর্ঘ ছায়া পড়ল। মুখ তুলে জয়ন্তী দেখল, বড় দাদা পার্থসারথি—বারান্দের সম্মুখের দরজা দিয়ে খুব গম্ভীর ভাবে তা'র সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। "দেখ জয়ন্তী, দিগিন্দ্র যদি তোকে নিয়ে যেতে চায়, আপত্তি করিস নে।" ব'লে পার্থসারথি গম্ভীর মুখে জয়ন্তীর সম্মুখেই দাঁড়িয়ে রইল।

একটু হেসে জয়ন্তী বলল, "আচ্ছা!"

১২

"ভোর এলো রে, অন্ধ-পাখার দিন-পাখারা গাইবে"

দেবকুমার খুব ভোরে উঠে মুখ হাত পা ধুয়ে সাত্যকিকে ঠেলতে লাগল। "মেজ দা' চলো বেড়িয়ে আসি। শীতের দিনের সকালে ঘরে ব'সে থেকে কি হ'বে?"

ঘুম-চোখে সাত্যকি লেপ থেকে মুখ বা'র করে বলল, "এখুনি?"

"হাঁা, এখুনি!"

"তা হ'লে ছোট্ট জেলে চা করো—চা খেয়ে চলো বেরিয়ে পড়ি।" "আচ্ছা, করি"—ব'লে দেবকুমার ছোট্ট জেলে চা করতে গেল। পাশের একটি ছোট ঘর থেকে ছোটের শাঁ শাঁ শব্দ আসতে লাগল। সেই ঘর থেকে চেঁচিয়ে দেবকুমার বলল, "মেজ দা, দুই-একটা ডিম খাবে, হাফ বয়েল্ড?" "খাব, কর" ব'লে সাত্যকি লেপ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর সে গুন্ গুন্ ক'রে গাইতে লাগল,—

"আজিকে মরম এল অন্তরিবে।
আমার কাঁ কথা সে যায় পাসরিবে?"

ঘরেতে—

ঘরের এককোণে ছিল সারথি গুটিসুটি হ'য়ে বিছানার সঙ্গে লেপ জড়িয়ে। সে লেপ থেকে মুখ বা'র ক'রে বলল, "তা হ'লে সাত্যকি, তুই সেরে উঠলি এবার! আমাদের বোধ হয় পাড়ি জমাতে হ'বে যে। পরীক্ষা তো এসে গেল, পার্সেন্টেজ্ থাকে কি না সন্দেহ! তা' এত সকালে যাচ্ছিস কোথায়?" গায়ে চাদরটা মুড়ি দিয়ে সাত্যকি বলল, "একটু বেড়িয়ে আসি!"

সারথি লেপ থেকে না উঠেই বলল, "যা!"

তখন খুব শীত। ভোরের কন্‌কনে উত্তরে হাওয়া। দেবকুমার আর সাত্যকি দারোয়ার ধার দিয়ে উত্তর দিকে এগিয়ে চলল। অত শীতেও এক সাধু দারোয়ার ধারে এক বেদীর উপর ব'সে বম্ বম্ শব্দে ভজন করছেন। সর্ব্বাঙ্গে মাটিমাখা কৌপীন-পরা এক সাধু। বেদীটি সুন্দর নিকানো, পাশে কয়েকটি গাঁদা ফুলের গাছ। সাধু এদের দিকে দৃক্‌পাতও করলেন না।

দারোয়ার বালির পাশ দিয়ে ক্ষীণ জলধারা ব'য়ে যাচ্ছে। দারোয়ার বুকের উপর দিয়ে ধাঁশড়ি যাওয়ার রাস্তা। চারি পাশে শীর্ণ কঙ্কালসার পলাশের গাছ দু'-একটা, পাথরের ঢিবি এখানে ওখানে। তারি মধ্যে কোথায় দিক্ থেকে ব'য়ে এসেছে দারোয়া এঁকে বেঁকে—চ'লে গেছে ঘাঁশড়ির রেল লাইনের দিকে। খানিকটা উজানে হেঁটে দেবকুমার বলল, "মেজ দা চল, নন্দন পাহাড়ের দিকে যাওয়া যাক।"

"চলো, কিন্তু আমি কি অত হাঁটতে পারব?"—সাত্যকি ক্ষীণ প্রতিবাদ জানাল। তারপর দু' জনে হাঁটতে হাঁটতে নন্দন পাহাড়ের কাছাকাছি এসে পড়ল। তখন ভোরের আকাশ লাল। সূর্য্য উঠল বলে।

দেবকুমার বলল, "মেজদাদা, এই সময়টাকে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত বলে! বেশ, না?"

"হাঁা, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত!" সাত্যকি জবাব দিল।

দেবকুমার বলল, "মেজ দা, আর হেঁটে কি হ'বে, এসো এখানে বসি।" ব'লে তা'রা দু' জনে একটা উঁচু পাথরের চিবির উপর বসল।

"মেজ দা, এখানে না এলে তুমি সাহতে না। আর, সুবোধবাবুর সঙ্গে দেখা না হ'লে কি হ'ত বলা যায় না।"

"তা তো বটেই। দেখে গেলাম খুব। আর কিছু দিন থাকলে বেশ হয়—নয় রে?"

"আরও কিছু দিন থাকতে তো হ'বেই। জয়ন্তীকে আবার নিতে এসেছে দিগিন্দ্র। চ'লে যাক জয়ন্তী, কি বলো?"

"বুঝছি না, জয়ন্তীর হয় তো যাওয়াই দরকার। তবু, মনটা কেমন করে। যদি ও থাকে কিছু দিন, ঘনটনগুলো ভালো থাকে—এই আর কি! তাছাড়া সেবার কাজটা মেয়েরা যেমন পারে, তেমন কি আর বহু বা উড়ে ঠাকুর পারবে?"

একটু চুপ ক'রে থেকে দেবকুমার বলল, "দিগিন্দ্র যেন কেমন! জয়ন্তী না হ'লে ওর চলেই না দেখতে পাচ্ছি। দিগিন্দ্রকে কের একবার অনুরোধ করব ভেবেছি তোমার জন্যে। সর্ব্বদাই খুঁত খুঁত করছে। না বাপু, ওর চ'লে যাওয়াই ভালো।"

"দেখ, ভেবে চিন্তে যা' হয়—" ব'লে সাত্যকি পাথরের চিবি-ভরা দেওদারের মাঠের দিকে চেয়ে রইল।

"কি শুকনো জায়গাটা! বাঙালী এসে না বসলে, কোথাও এর মহিমা ফুটত ব'লে আমার মনে হয় না।"

"তার কি মানে আছে? থাকত সাঁওতাল আর পলাশের বন আর পাতা আর মন্দির! কি না হ'লে যে কি হ'ত বলা বড় কঠিন রে।"

"না মেজ দা' এ কথা মানতে একেবারেই আমি প্রস্তুত নই! বাঙালীরা এসেছে ব'লেই এখানে দেখতে পাই নানান্ ধরণের ফুল গাছ, নানান্ ধরণের বাড়ী, সভ্যতার কিছুটা পরিচয়। সেই জন্যেই লোকজনের সমাগম—আর এরা না এলে কি হ'ত?"

"এক কথা আর একশোবার বলতে পারি নে বাপু—নাই বা রইল সভ্যতা। সভ্যতা একটা ব্যাধির মত। সুস্থ, সবল সাঁওতাল ঘুরে বেড়া'ত; হরিণ শিকার করত তারা; বন যেত বেড়ে, বৃষ্টি হ'ত বেশী, ফসল হ'ত বেশী। কি আর হ'য়েছে সভ্যতায়? বেড়েছে মানুষ, বেড়েছে রোগ—তা'তে শান্তি কোথায়?"

"কিন্তু তা'তো হয় নি মেজ দা'—সভ্যতাই এসেছে। হয় তো আরো দেখা দেবে, আরো আসবে। চলো, আরো একটু বেড়িয়ে আসি।" ব'লে দেবকুমার সাত্যকিকে নিয়ে নন্দন পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল। লাল কাঁকরে মাটির রঙ। পাথরের কালো কালো স্তূপ—কোনোটা ছোট, কোনোটা বড়, কাঁকর মাটি ঠেলে মাথা জাগিয়ে আছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, ঐ রকম ছোট বড় পাথরের চিবি, জমি কোথাও বা নীচু, কোথাও বর্ষার জলধারা পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নেমে ঐ রকম ছোট ছোট নদীর সৃষ্টি করেছে। সেগুলো খুঁড়লে জল পাওয়া যাবে না। আশে পাশে এক আধটা শুকনো পাহাড়ে কাঁটা গাছ, মাঝে মাঝে পত্রবিরল পলাশ গাছের অস্থিসার মূর্ত্তি, শুধু এই দৃশ্য চোখে পড়ে। দেখলে মনে হয়, একটা শস্যহীন, রসহীন ক্ষুধাতুর ভাব যেন পাথরে মাটিতে কাঁকরে স্থির হ'য়ে, অচল হ'য়ে বিরাজ করছে। দেবকুমার আর সাত্যকি সেই শুষ্ক শীতের মাঠের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে বালির উপর আর লাল কাঁকরের উপর কি যেন চিক্ চিক্ ক'রে উঠছে।

দেবকুমার সেগুলো হাতে নিয়ে বলল, "মেজ দা' এগুলো কি?"

সাত্যকি বলল, "বোধ হয় অভ্র। এখানে অভ্র দেখতে পাওয়া যায় সর্ব্বত্রই। গিরিডির কাছাকাছি গেলে ত অভ্রের মাইনই আছে।"

"তাই না কি?" দেবকুমার সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল।

"হাঁ, তাই। দারোয়ার জল তো সেদিন খেলে, একটা কেমন যেন আস্বাদ, নয়? এখানকার মাটিতে নাকি লোহা আছে খুব। সেই জন্যেই তো স্বাস্থ্য ভালো থাকে।"

"ও, তাই বটে, এ কথা তো জানিনি কোনো দিন।" এই রকম কথার বার্ত্তায় এ চিবি থেকে ও চিবিতে লাফাতে লাফাতে তা'রা এসে পড়ল প্রায় নন্দন পাহাড়ের কাছাকাছি।···কালো কালো পাথরের বড় বড় স্তূপ; পাহাড় তা'কে বলা চলে না। তবে আশে পাশে অনেক

দূর পর্য্যন্ত আর পাহাড় নেই। একটা পথ এঁকে বেঁকে উপরের দিকে চ'লে গেছে। উপরে আছে একটি মন্দির। অত সকালেও ভিড় কম নয় সেখানে। আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে অনেকেই উঠেছেন উপরে, পুজার্থী আর বায়ু-সেবনার্থীর দল। সাত্যকি আর দেবকুমার পাহাড়ের নীচেকার ধান কেটে নিয়ে যাওয়া ছোট ছোট জমির উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছে।

"এখানে আমার ধান হয় বেশ না, দেখেছ?"

"কেন, তা'তে কি? ধান হয়, এতে আশ্চর্য্য হ'বার কি আছে? আমার মনে হয়, এই সব জায়গায় বর্ষায় জল দাঁড়ায়, কিন্তু আমি আর হাঁটতে পারছিনে ভাই, বসি এখানে একটু, আয়।" ব'লে সাত্যকি সেখানে সেই জমির উপরে বসে পড়ল।

"ওরে কি বেজ না,' এখানে ভয়ানক ছোট ছোট সাপ আছে, আমি দেখেছি সেদিন একলা বেড়াতে এসে। ব'সো না এখন, চলো যাই।" বলে সাত্যকিকে সে একরকম জোর ক'রে টেনে নিয়ে চল্‌ল।

পাহাড়ে উঠবার পথ যেন সিঁড়ির ধাপের মত গিয়েছে উপরের দিকে। আশে পাশে যতদূর চাওয়া যায়, একটা ধূ-ধূ রুক্ষ শূন্যতা। শুধু উপরে যা'রা উঠেছে, তাদের গায়ের নানা রঙের আলোয়ান কালো পাহাড়ের গায়ে তবু এনেছে একটু বৈচিত্র্য। সেই দিকে দুই ভাই কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। এমন সময়ে পিছনে উঠল একটা উচ্চ লঘু হাসির ধ্বনি।

"বললাম মামাকে আমি পরব না জুতো। জুতো পরিয়ে, গায়ে ক্যাশন ক'রে আলোয়ান জড়িয়ে নিয়ে এলেন আমাকে। এখন হাঁটি কি ক'রে? পায়ে ফোস্‌কা পড়বার উপক্রম হ'ল।" কথাগুলো এলো ললিত কণ্ঠের লঘু হাসির সঙ্গে সঙ্গে। পিছন ফিরে সাত্যকি আর দেবকুমার দেখে এক ভদ্রলোক সাদা শার্ট প'রে, আর একটি কিশোরী মেয়ে জুতো খস্‌খস্ করতে করতে আসছেন। সাত্যকি আর দেবকুমার একটু সরে দাঁড়াল। এঁরা এদের দিকে চেয়ে কিছু মাত্র অপ্রতিভ না হ'য়ে বললেন, বললেন মেয়েটির মামা, "আপনারা কি উপরে উঠবেন?"

দেবকুমার হেসে ফেলল, বলল, "হাই তো ভাবছি।"

"আসুন তবে একসঙ্গে ওঠা যাক।"

"আপনারা উঠুন আগে, আমরা পেছিয়ে যাই।"

"বেশ, তাই হবে, আসুন; ওরে মহালক্ষ্মী, তুই আগে আগে যা।"

মহালক্ষ্মী বলল, "না, আমি পারব না মামা, জুতো খুলে ফেলি দাঁড়াও আগে।"

"হবে খোস্ জুতো, তখনি আমি তোকে জুতো খুলতে বলব না, জুতো জোড়া আমাকেই যে নিয়ে যাই।"

মহালক্ষ্মী নত হ'য়ে জুতো খুলতে লাগল।

•

সকালে সারথি উঠে আবার ষ্টোভ্ জ্বাল্‌ল। তখন বেশ রোদ উঠেছে। অত আস্তা, ভরন্তী আর দিগিন্দ্রের দেখা নেই। মৃদু ঠেলে সারথি ষ্টোভের উপর কেট্‌লি দিল চাপিয়ে। ষ্টোভ ঁা ঁা ক'রে জ্বলে। সেই শব্দ সারথির বেশ ভালো লাগে। একটা ছোট মোড়ায় ব'সে সারথি একখানা নূতন মাসিক পত্রের পাতা ওলটাতে লাগল।

এমন সময় দিগিন্দ্র এলেন ঘুম ঘুমে। "ওহে সারথি, আমার জন্যও তাই একটু চা করো। যদিও অভ্যস্ত নই, তবু শীতের দিনে লাগবে মন্দ নয়। এরা দু'জন গেল কোথায়?"

"বোধ হয় বেড়াতে গেছে। আসবে হয়ত এখনি। দি চায়ের জল আপনার জন্যে। ভরন্তী গেল কোথা?" ব'লে সারথি মোড়া থেকে মাসিক পত্রখানা চৌকীর উপর ফেলে রেখে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ডাকল, "ভরন্তী, ভরন্তী উঠেছিস?"

"এই যে যাই," ব'লে ভরন্তী রান্না-ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ঘরে এসে বলল, "ষ্টোভ জেলেছ, উনুন ধরিয়েছি আমি, ষ্টোভ্ না জ্বাল্‌লেই হ'ত।"

"বে, চা ক'রে দে! দিগিন্দ্র চা খেতে চেয়েছে," ব'লে সারথি বাইরে চৌকীতে গিয়ে বস্‌ল। দিগিন্দ্র চেয়ারে বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে ব'সে।

সারথি এসে বলল, "কেমন লাগছে বেওয়র আপনার?"

"মন্দ না, হচ্ছ ঘুমিয়েছ ভাই তোমরা! পাওার বাড়ীতে রইল প'ড়ে আমার স্যুটকেস্! সেটা চা-টা খেয়ে নিয়ে আসতে হ'বে।"

মাথা নীচু ক'রে সারথি বল্‌ল: "পণ্ডিত মানুষ, চা খাবেন?"

"যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ"—ব'লে দিগিন্দ্র একটু হাসলেন। "তা ছাড়া শীতও এখানে খুব। দেশের শীতও কম নয়, তবে এখানে অনেক বেশী শীত!"

ঈষৎ হেসে সারথি বলল, "দেশে চাষ-আবাদ কেমন হ'ল! তবু তো ইস্কুলের কাজে চলে না।"

"মন্দ নয়, বৃষ্টিও হ'য়েছে খুব। চাষ-আবাদ হ'য়েছে ভালোই। তবে দেখতে পারিনি নিজে। ও-সব নিজে দেখে শুনে নিতে পারলে তবে সুবিধে হয়।"

"হাঁ, তা তো বটেই! আপনি নিজেই বা কি ক'রে দেখবেন? তাইরা বোধ হয় দেখাশুনা করে?"

"না, না, তা'রা তো পড়ে। মুনিষ-টুনিষ করতে হয়। হাঙ্গামা খুব। মধ্যে মধ্যে নিজেও দেখি। তবে কি জানো, সব সময়ে হয় না, পেরে উঠি নে।"

"খুবই মুশ্‌কিলের কথা। আমাদের তো আছে কিছু জানেন, সে সব কিছু দেখি নে আমরা—যা করে ঐ মধু দা। অবশ্য মধুবাবুকে বলবার কিছু নেই। চমৎকার লোক—অমন বিশ্বাসী, বিচক্ষণ লোক বড় দেখা যায় না। তবে, এক এক সময় মনে হয়, নিজেই দেখাশুনা করব। চাকরী কি আর মিলবে এর পরে? আপনি কি বলেন?"

চা-খাবার ক'রে অন্তরী বন্ধুকে বাইরে পাঠিয়ে দিল এঁদের ডেকে আনতে। বন্ধু উঠানের এক কোণে কল্পনা বাহুছিল। কালি-ঝুল-মাখা হাতে এসে উপস্থিত। অন্তরী ইসারায় বুঝিয়ে দিল হাত টাত ধুয়ে আসতে।

বাইরে থেকে হাঁক এলো, "হ'লো রে চা?"

ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে অন্তরী বলল, "পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"কাকে পাঠিয়ে দিচ্ছিস? তুই নিজে নিয়ে আয়!" সারথি কিছুতেই শুনবে না। অন্তরী নিজে হাতে ক'রে না দিলে তা'র খেয়ে সুখ নেই।

মাথায় অল্প একটু ঘোমটা টেনে অন্তরী লজ্জিত মুখে চা-খাবার বাইরে টেবিলের উপরে দিয়ে গেল। গরম হালুয়া আর চা।

হালুয়া মুখে পুরে দিয়ে দিগিন্দ্র পরম আরামে বললেন, "এ সব কি দেশে মিলবার যো আছে? যি আছে তো দুধি নেই—দুধি থাকলেও আনতে যেতে হবে তিন মাইল দূর থেকে—এই অবস্থা।"

"খান" ব'লে স্মিত মুখে সারথি চা খেতে লাগল। "এখানে কিছুদিন থাকুন এখন, কেমন? ছুটি নিন কিছু দিন।"

"কেন বলো তো। তোমরা সবাই একথা বলছ। ছুটি কি মিলবার যো আছে? তাল তোমার ভগ্নীও বলছিলেন সে কথা"—ব'লে চা খেতে লাগলেন দিগিন্দ্র।

"মন্দ নয়, বাড়ীটা পাওয়া গেছে—এর ভাড়া দিতে হবে না। সুবোধ বাবু চমৎকার লোক"—এই কথা সারথির মুখ থেকে বেরতে না বেরতে বেজে উঠল মোটরের হর্ণ বাইরে। সুবোধের গম্ভীর গলা শোনা গেল, "দেবকুমার, সারথি, সাত্যকি—তোমরা আছ নাকি?"

"ঐ সুবোধবাবু"—ব'লে একলাফে সারথি বাইরে এসে উপস্থিত।

"তার পর, আপনি যান নি? বলে না কোথায় যা'বেন বলেছিলেন।"

"না ভাই, যাওয়া হয় নি। টেলিগ্রাম এলো সেখান থেকে—এখন না গেলেও চলে।"

"এদিকে জামাইবাবু এসেছেন, আসুন আলাপ করিয়ে দি—"

"না না, আমি আর নামব না গাড়ী থেকে, আবার আসব আর একদিন"—ব'লে সুবোধ গাড়ী চালিয়ে দেন আর কি!

"না না সে কি হয়?"—ব'লে সারথি এক রকম জোর ক'রেই নিয়ে এলো সুবোধবাবুকে বাড়ীতে।

দিগিন্দ্র ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। চা আধ-খাওয়া হ'য়ে রইল প'ড়ে। তাঁর এমনি একটা তীব্র, ত্রস্ত সঙ্কুচিত ভাব, হঠাৎ দেখলে মনে হয়, বুঝি ইস্কুলের ইন্‌স্পেক্টরের সামনে গেছেন প'ড়ে—অথবা আধ ঘুমের ঘোরে টিকিট-চেকার যেন সামনে দাঁড়িয়ে।

সুবোধ কোথাও কখনো অপ্রতিভ হ'ন না। অতিপ্রবল তাঁর কণ্ঠস্বর, কুণ্ঠাহীন তাঁর আচরণ। বললেন, "ব্যস্ত হ'বার কিছু নেই। বসুন আপনি, চা খা'ন। আমাকে এঁদেরই একজন মনে করুন। ধরুন, আমি সারথির বড় ভাই।" বলে তিনি দিগিন্দ্রের পাশেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে একরকম জোর ক'রেই দিগিন্দ্রকে চেয়ারে বসালেন। সারথি আর একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে পাশেই বসল।

সুবোধ আর একটু হেসে আরম্ভ করলেন, "ট্রেনেই আলাপ এঁদের সঙ্গে—কোথাও জানাশুনো নেই, বড় ভালো লাগল এঁদের। নিজেরই ভাইবোন বলে মনে হ'ল"—ব'লে তিনি সারথির কাঁধে হাত রাখলেন। তারপর বলে যেতে লাগলেন, "একে বলে মায়া। আমারও দুনিয়ায় কেউ নেই। জিজ্ঞাসা করলাম, যেওঘরে যাওয়া হ'বে, বাসা ঠিক করা হ'য়েছে? শুনলাম যখন ঘর নি, তখন ব্যবস্থা করলাম থাকার এই বাড়ীতে!"—ব'লে বিশিষ্টের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "কেমন, ভালো করি নি কি? হয় তো, সাত্যকির তাতে উপকারই হ'য়েছে। হাঁ, এরা গেল কোথায়, সাত্যকি আর দেবদুয়ারকে দেখছি নে তো!" ব'লে কারও উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে সুবোধ সোজা হন্ হন্ ক'রে চলে গেলেন বাড়ীর মধ্যে।

বিশিষ্ট চা খাওয়া শেষ ক'রে কাপটি নামিয়ে রেখে বললেন, "ঐতের দিবে লাগল মন্দ নয় হে সারথি! বেশ লোক তোমাদের এই সুবোধবাবু। তোমাদের ভাগ্য ভালো। এর সঙ্গে পরিচয় না হ'লে কোথায় গিয়ে উঠতে তোমরা?"

এক পেয়ালা চা হাতে ক'রে নিয়ে হাসতে হাসতে সুবোধ আবার এলেন। "জীবন আমার এমনিই বুঝলেন বিশিনবাবু, আপনাদের জীবনে সব রসেরই সমাবেশ অর্থাৎ আপনারা সব দিক থেকেই টেনে নিচ্ছেন পৃথিবীকে, আমাকে ঠেলে বেড়াতে হয়, আজ এখানে, কাল সেখানে। শেকড় গাড়ার উপকরণ হইল, অথচ তেমন মাটি পেলাম না, যেখানে শেকড় গাড়ি। সেইজন্যে ব'লের একটু ভালো লাগে, ভালের বেশী ভালো লাগাই, মোটেই বেশ পেতে হয় না তা'তে। এমনি ক'রে চলছে।" ব'লে চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "শুনেছি আপনি পণ্ডিত মানুষ, সংস্কৃতজ্ঞ, ঠিক এই রকমটি চাই। গজদিকায় ভালো যারা, তা'দের চেয়ে সম্মান আপনাকেই বেশী করব। অমাদৃত দেবভাষার চর্চ্চা করেছেন আপনি! বেশ ভালো।" ব'লে আবার একটু চা খেয়ে বললেন, "এখন কিছুদিন থাকা হ'বে? সাত্যকি বেশ সেরে উঠেছে। তাকে নিশ্চয়ই দেখেছেন। অনেক উন্নতি হ'য়েছে তা'র—আর কিছুদিন থাকলে একেবারে সম্পূর্ণ সেরে যা'বে। কিন্তু মনে করবেন না, জয়ন্তী না থাকলে এদের অনেক অসুবিধে হ'ত। সেবা শুশ্রূষাটা মেয়েরা যেমন পারে, এমন আর কা'রা পারে? আপনাকেও হয় তো অনেক অসুবিধা সহ্য করতে হ'ল।" ব'লে চা আবার একটু খেয়ে বললেন, "তা কি করবেন বলুন? আপনিই প্রকৃতপক্ষে এদের অভিভাবক, আপনি যদি এদের সুবিধা অসুবিধায় একটু sacrifice না করেন, তাহ'লে কি ক'রেই বা চলে? আপনাকেই তো দেখতে হ'বে, অন্ততঃ যতদিন না এঁরা পড়াশুনো শেষ করছেন! সে হিসেবে এদের মঙ্গলের জন্যে আপনি কিছুদিন ছুটি নিয়ে এখানে থাকুন, বেশ লাগবে আপনার। দেখেছি, সকলের বেশ suit করেছে জায়গাটা। আপনারও নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে না।" ব'লে চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, "জানি ত ইস্কুল-পণ্ডিতী বড় ঝঞ্ঝাটের, কান হয় ঝালাপালা, প্রাণ করে পালাই পালাই। বিরক্তির একশেষ। ছুটিটা তাঁর মাঝে যেন স্বর্গ। বিশেষ ক'রে যেওঘরে আপনার বেশ ভালোই লাগবে। আসুন না একটু বেড়িয়ে আসি! ওহে সারথি, জামা গায়ে দিয়ে নাও, নিয়ে চ'লে এসো। আমার আবার অসম্ভব কাজ পড়েছে। কৈ এরা ত এলো না এখনো। কৈ আসুন, আসুন, চমৎকার লাগবে এখন।" বলে তিনি একরকম জোর ক'রেই বিশিষ্টকে মোটরে নিয়ে এসে তুললেন। সারথি কিছু পরে পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে এসে হাজির।

তারপরে হর্ণ দিয়ে সুবোধের বিশাল গাড়ী যেওঘরের কাঁকর-বিছানো রাস্তার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ওরফে ঘর থেকে তা' দেখল। তারপর বন্ধুকে বারান্দার বাঁশের পরদা দিয়ে বলল, "মাছ বেশী করে আনিস। এখানে মাছ অত্যন্ত আক্রা। যাই হোক নিয়ে আসিস বেশী ক'রে।" তার পর ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, "আর দেখ, যদি মেজ দা' ছোট দা'র সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়, তাড়াতাড়ি আসতে বলিস। বাড়ীতে একা থাকা, বুঝলি রে?"

"যে আজ্ঞে"—ব'লে বন্ধু বাজারের থলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বড় বড় পেঁপে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রান্নাঘরের ধোঁয়া অল্প অল্প করে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উপরে উঠছে। পৌষের রুক্ষ রৌদ্র, আর রান্না দিয়ে চলেছে অনন্তিত সাঁওতাল মাথায় এক-একটা কাঠের বুড়ি নিয়ে। জয়ন্তী সেইদিক পানে তাকিয়ে কি ভেবে বাইরের ঘরটা বন্ধ ক'রে ভিতরে চলে গেল। [ ক্রমশঃ

# হিমালয়ের পশ্চিমে

—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত

৯

হাউস-বোটে ফিরে মুখ হাত ধুয়ে, চা খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম বাস ঠিক করতে। ছুটী শেষ হয়েছে; কাল রওনা হতেই হবে, না হলে উপায় নেই। কাশ্মীরে অনেক কিছু দেখা বাকী থেকে গেল, কিন্তু তার জন্যে মনে যে খুব বেশী খেদ ছিল তা নয়। কারণ যা দেখেছি তাতেই মন ভরে আছে; বিশেষতঃ আজ যা দেখেছি তার পর আর কিছু যে চোখে লাগবে না সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না।

শ্রীনগরে আসার দুটো পথ আছে, একটা রওয়ালপিণ্ডি থেকে শ্রীনগর—১৩৬ মাইল। আর একটা জম্মু থেকে শ্রীনগর—২০২ মাইল। আমরা আসার সময় এসেছিলাম রওয়ালপিণ্ডি দিয়ে, ফিরব জম্মু দিয়ে এই ঠিক ছিল। আমাদের রেল-কাম-বাস টিকিট—তাই প্রথমেই গেলাম রেল কোম্পানীর বাসের আড্ডায়। আমাদের বাস, অর্থাৎ ৮ই তারিখ, সকালে রওনা হয়ে পরদিন ৯ই তারিখ দুপুরে জম্মুতে ট্রেণ ধরতেই হবে, না হলে যথাসময়ে কর্মস্থানে পৌঁছতে পারব না। কিন্তু রেল কোম্পানী বসলে ৯ই তারিখ দুপুরে জম্মুতে ট্রেণ ধরিয়ে দেবে এ গ্যারান্টি তারা দিতে পারে না। তাই বাধ্য হয়ে আমাদের প্রাইভেট কোম্পানীর বাস ঠিক করতে হল এবং তার জন্যে আমাদের অতিরিক্ত ৫৲ টাকা করে লাগল। প্রাইভেট কোম্পানী স্বচ্ছন্দে যে গ্যারান্টি দিতে প্রস্তুত, রেল কোম্পানী তাতে রাজী নয়—একে যাত্রী ঠকান ছাড়া আর কি বলব?

৮ই তারিখ সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া শেষ করে, হাউস বোটের বিল শোধ করে, বোটের মাঝি সিদ্দিকাকে একখানা সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে আমরা রওনা হলাম। বাস ছাড়ল বেলা সাড়ে দশটার সময়। প্রথম ৩৮ মাইল কাশ্মীর উপত্যকার মধ্য দিয়ে পথ—তার পর পাহাড়ের রাজ্য আরম্ভ। বারো মাইল থেকে 'ভেরীনাগ' পর্যন্ত একটা পথ বেরিয়ে গেছে। 'ভেরীনাগ' ঝেলাম নদীর উৎপত্তি-স্থল, এখান থেকে মাত্র ৪' মাইল। বাস-ড্রাইভারকে কিছু বখ্‌শীস কবুল করায় সে আমাদের 'ভেরীনাগ' দেখিয়ে আনতে রাজি হল। কয়েক জন যাত্রী মিলে চাঁদা করে তাকে বখ্‌শীস দেওয়া ঠিক হল। কিন্তু ভেরী নাগ দেখে বিশেষ ভাবে হতাশ হলাম। ঝেলাম নদীর উৎপত্তি-স্থল—ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই সে এক অরণ্যসঙ্কুল নিবিড় ভাবের মনোরম পার্শ্বতা স্থান হবে। নিশ্চয়ই এক কালে তাই ছিল, কিন্তু মানুষের হাতে পড়ে তার সর্বনাশ হয়েছে। যেখানেই মানুষের হাত পড়েছে দেখা গেছে অধিকাংশ স্থলেই সে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মূলে কুঠারাঘাত করেছে, এ ক্ষেত্রেও তাই। একটী পাহাড়ের পাদদেশ থেকে একটী জলের উৎস উঠেছে, সেইটেই ঝেলামের উৎপত্তি-স্থল। কিন্তু তার চারি দিক বাঁধিয়ে মস্ত পাঁচিল দিয়ে একটা প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা তৈরী করা হয়েছে। তাতে আবার অসংখ্য মাছ ছাড়া হয়েছে, সাধারণ যাত্রী সেই মাছ দেখেই মহা খুশি। পাশেই একটা মস্ত বাগান। চৌবাচ্চা থেকে জল বেরিয়ে বাগানের ঠিক মাঝখান দিয়ে একটা চওড়া বাঁধান নর্দমা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। বাগান ছাড়িয়েই নয়। সমস্ত জিনিসটার কৃত্রিমতা চোখকে রীতিমত পীড়া দেয়। এ সমস্তই না কি সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের তৈরী। বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। সৌন্দর্য্যের উপাসক হিসাবে যিনি জগৎ-বিখ্যাত, তাঁর এই কাজ?

ভেরীনাগ থেকে ফিরে এসে আমাদের বাস ক্রমে উপরে উঠতে লাগল। সামনে পড়েছে এক বিরাট পর্ব্বতশ্রেণী, অন্ততঃ দশ বার হাজার ফুট উঁচু। এই পাহাড় পার হয়ে আমাদের ওপারে যেতে হবে। বাস ঘুরে ঘুরে উপরে উঠতে লাগল। আমরাও আনন্দের উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠলাম। সে বড় মজা। দশ মিনিট আগে যে পথ দিয়ে এসেছি দশ মিনিট পরে দেখছি সে রাস্তা কোথায় কত নীচে পড়ে আছে। সরু রাস্তা, যদি কোন রকমে বাসের চাকে পিছলে পড়ে, তবে হাজার

হাজার ফুট নীচে পড়ে আমাদের অবস্থা কি হবে সে কথা না ভাবাই ভাল। ভাবতে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে। কিন্তু যে দৃশ্য সব চেয়ে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করল, সে হচ্ছে হিমালয়ের তুষার-ধবল রূপ। যতই উপরে উঠতে লাগলাম ঘুরে হিমালয়ের বিরাট গম্ভীর শুভ্র মূর্তি ততই সুস্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল। পূর্ব-পশ্চিমে সুদূর প্রসারিত, পাহাড়ের পর পাহাড়, তার পেছনে আরও পাহাড়—সবটাই ধবধবে সাদা, যেন এক বিরাট পাহাড়ের সমুদ্র থই থই করছে—স্নিগ্ধ, শান্ত, গম্ভীর, বুদ্ধের আনন্দময় প্রশান্ত মূর্তির মত। ভূগোলে লেখে ভারতের উত্তরে হিমালয় পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় বেড় হাজার মাইল বিস্তৃত। এই বিরাট পাহাড়ের সবটাই যেন এক নজরে দেখা যাচ্ছে বলে মনে হল। এভাবে হিমালয়ের রূপ আর কোথাও থেকে দেখা যায় কিনা আমার জানা নেই। মুগ্ধ হলাম। মনে হল এর কাছে আর সব তুচ্ছ। শ্রেষ্ঠ কবির শ্রেষ্ঠ রচনা মনে মনে চিন্তা করতে চেষ্টা করলাম, মনে হল সব ছেলেখেলা। শিশুর অর্থহীন খেলা দেখে মায়ের মুখে যেমন প্রশান্ত হাসি ফুটে ওঠে মানুষের শ্রেষ্ঠ কীর্তির কথা চিন্তা করে হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে বোধ হল হিমালয়ের মুখেও তেমনি হাসি ফোটে।

প্রায় নয় হাজার ফুট উঠতে উঠে এক সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে গিয়ে আমাদের বাস পাহাড়ের ওপারে পৌঁছল। এই সুড়ঙ্গ-পথটী বিখ্যাত, নাম বেনিহাল টানেল। এই সুড়ঙ্গ-পথে ঢোকবার মুখে মোটর-চালককে অনেক খোসামোদ করে মিনিট দুয়েকের জন্যে মোটরটা দাঁড় করিয়ে একখানা ফোটো নেওয়া গেল। ওপারে গিয়ে বাস আবার নামতে শুরু করল। নামতে নামতে সর্বনিম্ন স্থান যেখানে এল সে স্থানের উচ্চতা ২,২০০ ফুট। এইখান থেকে চেনাব নদী আমাদের সঙ্গ নিল, অনেক দূর পর্যন্ত—রওয়ালপিণ্ডি থেকে আসবার সময় যেমন ঝেলাম আমাদের সঙ্গে চলেছিল। দৃশ্যও অনেকটা সেই রকম। একস্থানে বাসের চাকা বদলাবার প্রয়োজন হল। আমি সেই সুযোগে পায়ে পায়ে খানিকটা দূর গিয়ে একটা নির্জন স্থান বেছে বসলাম। বড় ভাল লাগছিল। দ্বিপ্রহরের পার্বত্য প্রদেশের গাঢ় নির্জনতার মধ্যে খাদের ভিতর থেকে চেনাব নদীর অবিশ্রাম গর্জন কানে আসছে,—নির্জনতার মর্মভেদী আর্তনাদের মত। তন্ময় হয়ে বসেছিলাম, হঠাৎ শুনলাম আমার জন্যে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম। বন্ধুবর তো চটিতং। শুনলাম আমাকে ফেলে যেখেই বাস চলে যাবার সঙ্কল্প করছিল, তা হলে কবিত্ব করা বেরিয়ে যেত। অতি সত্য কথা।

ক্রমে বেলা পড়ে গেল। পাহাড়ের মাথার উপরকার রোদটুকুও মুহূর্তের হাসির মত ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে এল। আমরা এখন পুনরায় যথেষ্ট উপরে উঠে এসেছি। ৬,৬০০ ফুট উচ্চে এক গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে তখন আমাদের বাস চলেছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পেলাম পূব আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। তারই অস্পষ্ট আলোয় সমস্ত অরণ্যটা একটা অজানা গভীর রহস্যের মত মনে হচ্ছিল। খুদে এসে যখন পৌঁছলাম তখন রীতিমত রাত হয়েছে। এইখানে আমাদের রাত্রি যাপন করতে হবে।

খুদ একটা চটি, শ্রীনগর থেকে ১৫৮ মাইল দূরে, ৫,৬৪০ ফুট উচ্চ। এখানে থাকার জন্যে ঘর ভাড়া পাওয়া যায়, শোবার জন্যে খাটিয়া ভাড়া পাওয়া যায়। দোকানে খাবার মেলে। আমরা একটা কাঠের বাড়ীর দোতালায় একটা ঘর ভাড়া নিলাম; মুখ হাত ধোবার জন্যে ছুটো পয়সা দিয়ে গু বালতি জল আনিয়ে নিলাম, দোকান থেকে মাংস ভাত আনিয়ে খাওয়া গেল।

এই সব করতে রাত হয়ে গেল অনেক। খাওয়া শেষ করে চুরুট ধরিয়ে একবার দোতালার সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম; পূর্ণিমার চাঁদ তখন পাহাড়ের মাথার উপরে অনেকটা উঠতে উঠেছে। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় সমগ্র পার্বত্য প্রদেশটা স্বপ্নময় অথচ কেমন ভয়াবহ বলে মনে হচ্ছিল। মনে পড়ল আজ কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা; বাংলার ঘরে ঘরে আলপনা আঁকা আঙিনায় এই চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়েছে অন্য মূর্তিতে, নির্মল হাসি নিয়ে। কিন্তু এই পার্বত্য রাজ্যে সেই চাঁদের আলোর এ কেমন ভয়াবহ রূপ। বন্ধুবরকে বললাম, "একবার বাইরে এস না।" তিনি বললেন, "তুমি কবিত্ব কর, আমি এ শীতে বাইরে যেতে পারি না।" সত্যিই

দুর্জ্জয় শীত, বেশীক্ষণ বাইরে থাকা যায় না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও লেপের তলায় গিয়ে ঢুকতে হল।

১০

পরদিন ভোর ন' ন'টায় ঘুম থেকে আমাদের বাস ছাড়ল। বলতে গেলে আমাদের ভ্রমণকাহিনী এইখানেই শেষ। জম্মু পৌঁছলাম বেলা দশটার সময়। জম্মুর কাছাকাছি পার্ব্বত্য-প্রদেশের দৃশ্য সম্পূর্ণ অন্য রকম। পর্ব্বতের সে মহান্ গাম্ভীর্য্য যেন আর নেই; তার বদলে কেমন একটা রুক্ষ উগ্রভাব—ইংরাজীতে যাকে বলে rugged। জম্মু সহর পার্ব্বত্যরাজ্যের একেবারে শেষ সীমায়, তাই নদীর উপরে। জম্মুর পর থেকেই আর্য্যাবর্ত্তের সমতল ভূভাগ আরম্ভ। দূর থেকে ও তাই নদীর উপর যে পুল আছে তার উপর থেকে জম্মু শহরের দৃশ্য বড় সুন্দর। তার চেয়েও সুন্দর জম্মু শহর থেকে আর্য্যাবর্ত্তের সমতল ভূভাগের দৃশ্য। দেখা যায় খানিকটা নীচুতে দূর, বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সবুজ সমতল ক্ষেত্র, দিগন্তবিস্তৃত একখানা সবুজ পাতের মত পড়ে আছে। বেশ লাগে দেখতে, যেন একটা নিশ্চল সবুজ সমুদ্র।

ট্রেণের দেরী আছে জেনে আমরা একখানা টাঙ্গা ভাড়া করে শহরের মধ্যে গেলাম কিছু খাবার সন্ধানে। এক খালসা হোটেলে মাংস ভাত জুটে গেল। খেতেও মন্দ নয়, নূতন ধরণের রান্না।

বেলা সাড়ে বারটার সময় জম্মু থেকে ট্রেণ ছাড়ল; দু'দিকে ঊষর মাঠ, তাতে ছড়ান সব বাবলা গাছ। অসহ্য গরম, বাইরে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে। গরম হাওয়ায় দুজনেই কেমন উদাস অন্যমনস্ক ভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে-ছিলাম। মনে পড়ে গেল গুলমার্গে যাওয়ার পথে বাতাসের হিমশীতল স্পর্শ, অরণ্যের গভীর নির্জ্জনতা, মনে পড়ল পাহাড়-ঘেরা বিশাল ডাল হ্রদের স্নিগ্ধ প্রশান্ত মূর্ত্তি, বিলেন-মার্গের সেই জ্যোতির্ম্ময় তুষারসমুদ্র, খুদের সেই রহস্যময় অপরূপ জ্যোৎস্না। মনে হল সব স্বপ্ন। একটী মধুর স্বপ্ন থেকে যেন সদ্য জেগে উঠেছি। স্বপ্ন তো বটেই; বাস্তব তো আমার সামনে,—সেই দুর্গন্ধময় জনবহুল বর্দ্ধমান সহর। সেই দৈনন্দিন নীরস শুষ্ক সংসারী কাজ, যার বাস্তবতা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে পিষতে থাকবে। শুধু মাঝে মাঝে আচম্বিতে এই স্বপ্নের মধুর স্মৃতি বিদ্যুতের মত সেই বাস্তবতার অন্ধকার ভেদ করে যাবে। [ সমাপ্ত

---

# জীবন-সঙ্গিনী

—শ্রীমমতা ঘোষ

জীবন-প্রাতে চলেছিলেম সমুখ পানে লক্ষ্য করি,
বিপুল আশা স্বপ্নরাশি হৃদয়খানি ছিল ভরি'।
মিষ্টি হেসে কখন তুমি সামনে আমার দেখা দিলে,
শুরু হ'ল যাত্রা এবার তোমায় আমায় চজন মিলে।
আলতো পায়ে প্রভাত আমার মাখা গগনে মিশল ধীরে,
জীবন-রবি কলমলিয়ে উঠ্‌ল তখন আমায় ঘিরে।
যে সব আশা কল্পনা গুপ্ত ছিল অঙ্কুরেতে—
তারাই সবে বিকাশ লভি খিরল মোরে গৌরবেতে।
কর্ম্ম আমার ডাক দিয়েছে, পরাণ যে তাই উঠল কাঁপি',
অসাধ্য যা করব সাধন—বাঁচির চলেম তাহার লাগি।
সফল হ'ল শ্রম আমারি, জয়লক্ষ্মীরে নিলেম জিনি',
সম্পদেরে সঙ্গে ক'রে আমার ঘরে এলেন তিনি।
পুত্র-কন্যা মিল দেখা ধীরে ধীরে তোমার কোলে,
তাদের নিয়ে সংসারেতে নামান কাজে ব্যস্ত হ'লে।
জীবন-প্রাতের সঙ্গিনী মোর, ছিলে কোথায় অন্তঃপুরে,
আর আমি যে ছুটেছিলেম কাজের নেশায় অনেক দূরে।
দুপুর বেলার প্রখর আলো আজকে গেছে মলিন হ'য়ে,
জীবনে মোর সন্ধ্যা নামে নিবিড় কালো ছায়া ল'য়ে।
কোথায় আজি সে গরিমা, কোথায় বা সে বিভব রাশি?
আর করে না উজল এ ঘর নারায়ণীর প্রসাদ হাসি।
তোমারো নেই সে ব্যস্ততা; ছেদ পড়েছে তোমার কাজে,
মেয়েরা সব যে যার ঘরে গেছে চ'লে লক্ষ্মী সাজে।
পুত্র তোমার কাজের লাগি বিদেশেতে বসত করে,
ন' সন্তানের জননী আজ আছ আপি শূন্য ঘরে।
মাতৃখানেতে যা কিছু সব দাঁড়িয়েছিল দৌহার মাঝে,
তারা তো আজ নাইকো হেথায়, গেছে স'রে জীবন-সাঁঝে।
নাইকো সে বর, নাই সে বধূ, তরুণ বয়স—তাও যে গত,
বার্দ্ধক্যের পরশে আজ চিত্ত দেহ মূর্চ্ছাহত।
প্রথম তোমায় পেয়েছিলেম প্রভাত বেলার সহচরী,
সেদিন ছিলে পাশে পাশে জীবন আমার পূর্ণ করি।
দীর্ঘকালের পরে আবার সেই তোমারে পেলাম কাছে,
সে প্রেম আরো গভীর হ'য়ে দেখি তোমার চিত্তে আছে।

পাহাড়ের পাদদেশে মহারাজের নবনির্মিত প্রাসাদ

বিলেসবাগের দুইটি দৃশ্য

# সিষ্টার

হেনরী সেটন মেরিম্যান্

কোথায় হ'য়েছিল তা জেনে কোন লাভ নেই। যারা আমাদের চারি পাশে আছে, তারা আমাকে বা সিষ্টারকে চিনে নেয়,—তা'ও আমার ইচ্ছা নয়। সম্ভবতঃ সিষ্টারও এই লেখাটা দেখতে পাবে না। তবে আমি ঠিক জানি না, আমার নামটা সে জানে কি না! অবশ্য কেউ তাকে এই কাগজটা দেখাতে পারে এবং তারও মনে প'ড়ে যেতে পারে, কারণ আমরা দুজনে একখানা দলিলে অর্থাৎ একখানা মৃত্যুর সার্টিফিকেটে একসঙ্গে দস্তখত করেছিলাম। সেই দলিলে তার আর আমার নাম লেখা আছে, হয়ত আজও সমরবিভাগের কোনো অজ্ঞাত কোণে কাগজের গাদার মধ্যে প'ড়ে আছে সেই দলিল।

তবু আমি চাই সে যেন না দেখে এই লেখাটা। কারণ তাহ'লে সে ভাববে যে আমি ব্যবসাদারের ভদ্রতাও জানি না। আর এই মেয়েটার কৃতজ্ঞতার উপর আমি জোর দিই, যদিও তাকে আমার জীবনে আমি দ্বিতীয়বার দেখিনি। তা'ছাড়া, সে আমার অধীনে কাজ ক'রতো, চাকরের মতোই প্রায় সে কাজ।

এ কথা না বললেও চলে যে, সেটা ছিল যুদ্ধের সময় আর আমাদের কাজ ছিল, যাকে খবরের কাগজে বলে—তাড়াতাড়ি করার কাজ। এই যুদ্ধ অনেকদিন আগে হ'য়ে গিয়েছে ব'লে, তার বৃত্তান্ত বুড়োদের চেয়ে যুবকদেরই ভালো মনে আছে। সেকালের যুদ্ধের কাহিনী বুড়োদের বেশী মনে পড়ে, যখন তাদের রক্ত ছিল গরম তখন যে সব লড়াই হ'য়েছিল, তারই গল্প তারা বলতে পারে।

আমার প্রথম যুদ্ধে যাওয়া সেবার, যদিও রক্তের ব্যবসা আমার কাছে নূতন নয়। কারণ আমি সৈন্য নই,—আমি ডাক্তার। আমার একটি মাত্র পোষাক, যাকে প্যারেডের কুর্তিও বলা যায়,—হচ্ছে এক নীল সার্জ্জের জ্যাকেট, হাতে রেড-ক্রশ আঁকা। কিন্তু সেটা এত পুরাতন যে জায়গায় জায়গায় রঙ ফ্যাকাসে হ'য়ে গিয়েছে, কেন তার কারণ না জানাই ভালো।

যারা যুদ্ধে এসেছিল, তা সে ক্ষতি করতেই হোক, বা ক্ষতিপূরণ করতেই হোক্, তারা ভাল ক'রে জানতো যে, ফাঁকা আওয়াজের সঙ্গে গুলীর তফাৎ আছে। ফাঁকা কার্ত্তুজ আর গুলীর কার্ত্তুজের কাজ এক নয়। সংবাদদাতাদের সংবাদে দেখা যায় যে, সৈন্যদল যেন প্যারেডে যাচ্ছে এমনি ভাবে রণক্ষেত্রে যাচ্ছিল, এ ধরণের সংবাদ তারা তাদের কল্পনায় দেখে। সত্যিকার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে প্যারেড বলেই মনে হয়, কারণ তখন এক জায়গা থেকে রণক্ষেত্রে কুচকাওয়াজ করে যাওয়া হয়। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেলে আমাদের কাজও আরম্ভ হয়, তখন আর লোক-দেখানো প্যারেডের সঙ্গে তার মিল হয় না।

আমাদের অনেক সরকারী কাগজ থাকে, যা আমরা কখনও পূর্ণ করি না। যুদ্ধ লেগে গেলে তখন মানুষের জীবনের প্রশ্নটাই বড় হয়ে উঠে। আমাদের সব ফরমাতি কাজে অকাজে ব্যবহার করি। কারণ, কাজের সময় দেখা যায় যে, দরকারী ফরম হেড কোয়ার্টারে প'ড়ে আছে, কিম্বা সমুদ্রের ধারের আস্তানায় ফেলে এসেছি। কাজেই এমন অনেক কাজ আমরা করি, যা না করাই ছিল ভালো এবং সরকারী ভাবে যে কাজ করা উচিত, তা একেবারেই বাদ দিয়ে দিই।

কোনও কারণে, হয়ত আরও ভালো লোক পাওয়া যায় নি বলে, তিনদিন কাজ করতে না করতে আমাকে সীমান্তে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যুযমান সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে দু'জন সরকারী আর কিছিপত্র নিয়ে এক নদীর ধারে আমাদের সাময়িক হাসপাতাল বসানো গেল।

যুদ্ধের মধ্যেই আমাদের এই ছোট্ট হাসপাতাল ক্রমে বড় হয়ে উঠে। হেডকোয়ার্টার থেকে আমরা কাছেই ছিলাম। তবুও এখানে আমাকে স্বাধীন ভাবে কাজ ক'রতে দেওয়া হ'য়েছিল। কাজেই ক্রমে ক্রমে মরুভূমির মধ্যে আমাদের আস্তানা জাঁকিয়ে উঠলো এবং শেষকালে হেড-কোয়ার্টারের হাসপাতালের চেয়েও বড় হয়ে গেল।

সর্ব্বদা আমাদের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, কারণ বাহিনী অগ্রগামী দলের সঙ্গে মিলে মাত্র চল্লিশ মাইল দূরের শত্রু-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রছে। কয়েক দিন পরে শত্রুদের অপসৃত করতে কর্তৃপক্ষ মারাত্ম হলেন এবং আমাদের হাসপাতাল সুরক্ষিত করা প্রয়োজন মনে ক'রলেন। তার সঙ্গে আরও দু'জন সহকারী বাড়িয়ে দিলেন। তা ছাড়া আমাকে তিন জন নার্স গভর্ণমেণ্ট থেকে পাঠিয়ে দিলে। এই শেষের সংবাদ পেয়ে খুসী হওয়া উচিত ছিল, আমি তা' হ'তে পারিনি। কারণ, রণক্ষেত্রের কাছে মেয়েদের টেনে আনা আমি সমর্থন করি না। তাদের জন্যে এবং আর সকলের মানসিক শান্তির জন্যে, তাদের পিছনে রাখাই ভালো। কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স যদি তারা পার হ'য়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে তারা খাটতে পারে না এবং রণক্ষেত্রের কাজ করতে গেলে পড়ে। তখন তাদের নিয়ে হয় বিপদ। অনেক হাঙ্গামা ক'রে তাদের পাঠাতে হয়, পাহারা দিয়ে এম্বুলেন্সের গাড়ীতে করে; আবার যুদ্ধের সীমান্তে গাড়ীও অনেক থাকে না। আবার যদি তাদের বয়স কম হয়,—যদি খুব অল্প করেক বছর কমও হয়, তারা আর এক রকমের বিপদ টেনে আনে এবং আহতদের সেবার ব্যাঘাত ঘটে। কারণ মানুষের হৃদয়ের আর কোন বৃত্তিই প্রেমের মত নির্দ্দয় বা স্বার্থপর নয়।

"কথাটা শুনে দুঃখিত হ'লাম।"—রাত্রাল ব্রিগেডের তৃতীয়ার ছোট্ট অফিসার ভ্যাসি কিট্‌স্‌ওয়ারেনার আমাকে খবরটা দিলে তাকে আমি এই কথাই ব'লেছিলাম।

"শুনে দুঃখিত হ'লে? ভালো কথা! আমি কিন্তু হই নি। এখানে যখন দু'চারটে মেয়েমানুষ আসবে, দেখবে জায়গাটার চেহারা বদলে গেছে। তাদের কাছে তারা এত চালাক যে, তোমার দলের রেডক্রশওয়ালা দশজন শুদ্ধার চেয়েও ভালো।"

"হ'তে পারে—" ভ্যাসি তার মেসিন গানের গাড়ীতে আমার জন্যে যে হুইস্কির বাক্স এনেছে, সেটা খুলতে খুলতে উত্তর দিলাম।

এই মেসিন গান সে যুদ্ধের জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে, আর তার জন্যে তার অহঙ্কার কত!

"খুব ভালো কামান, সর্ব্বশক্তিমান্ কামান।"—সে বলে।

সে কামানের পাশে পাশে ঘোড়ায় চেপে এসেছে, কোথাও না থেমে সত্তর মাইল মরুভূমির উপর দিয়ে এসেছে। আসতে আসতে লক্ষ্য রেখেছে, মায়ের মত সে মেসিন-গানটাকে রেখেছে, যত্ন ক'রেছে।

"ভালো। ডাক্তার!" পা টুকে সে চেঁচিয়ে বলে। আর্শি-নেত্রি ব্রৌর্সে কেনা তার হলদে রঙের বুট জোড়ার দিকে চোখ রেখে হ'লে চলে—"দেখবে ডাক্তার, যুদ্ধে কেমন কাজ করে কামানটা। ট্রাই-সাইকেলের মত আলগা এর চলার কায়দা। আর যখন কথা বলতে সুরু করে,—আরে আমার কপাল! ক্লিক্-ক্লিক্-ক্লিক্। টাইলফের ইঞ্জিনের মত, দারুণ সব মজে দিয়ে যায়। তোমার কোন কাজ সেখানে চলবে না, করবারও নাই। সেখানে তুমি আর তোমার এই উপগ্রহের দল বুলেটের খোঁজে ছুরি ধ'রে কোনও আরাম পাবে না। ওদিকে দেখ, চেয়ে দেখ ওই এসে প'ড়েছে সোনার চাঁদ।"

তার কথায় কান না দিয়ে বলি, "সোডা চাই, না এম্‌নি?"

"সোডা দাও। মরা উটের গন্ধ আমার সয় না। একটু ঢ'লে দিও, দয়া ক'রে। শরীর যেন কে শিরীষ-কাগজ দিয়ে ঘসে দিয়েছে।"

এই ছোট্ট কুঁড়ে—মাটি আর খেজুর পাতায় ছাওয়া,—যার নাম প্রধান ডাক্তারের কোয়ার্টার, সেখানেই সে রাত্রের মত শুয়ে থাকে। তার মানে আমার পক্ষে যতখানি দেওয়া সম্ভব, ততখানি আতিথ্য সে আমায় ক'রে নেয়।

ভ্যাসি আমার অনেক দিনের বন্ধু, সে নৌসেনাদলে তখনও ঢোকে নি, আমিও তখন ছুরি ধরি নি,—এমনি অনেক দিনের আমাদের পরিচয়। একই জায়গায় আমাদের বাড়ী—ডিভনসায়ারে—এবং আমরা পরস্পরের মনোভাব কিছু কিছু বুঝি,—এই ছোট্ট কথাটির প্রকাণ্ড মানে হয় যখন বিরাট জনসমাবেশের মধ্যে কথাটি উঠে।

খুব সকালে সকালেই আমরা শুয়ে পড়ি, সে আমার বিছানাতে, আর আমি এক হাসপাতালের গদির উপর। সে হাত দুটো মাথার উপর রেখে শুয়ে থাকে,—ঘুম আসলে এমন ক'রে থাকা সম্ভব নয়—এবং সেই চিরস্থায়ী কামানের গল্প সুরু করে।

ঠোঁট বাহির করার কায়দার কথা শুনতে শুনতে ঘুম আসে, আবার গুলী ছোড়ার কথাতে চম্‌কে কেঁপে উঠি।

বাড়ীর কথা আমরা বলি না, তাঁরা জায়গায় বিশেষ বিঁধুঁরে বই হাতে লোকে যেমন বলে থাকে। হয়ত আমাদের না বলার কারণ পারিপার্শ্বিক যুদ্ধের আবহাওয়া, সৈন্যের জীবনের বৈচিত্র্যহীনতা। সেই বেদিনগানের কথাই আমাদের হয় বেশী; এবং ঘুম আসার আগে একবার তুমি নার্সদের কথা তুলেছিল।

সে বলে, "হ্যাঁ, তোমাদের বড় কর্ত্তা আমাকে ব'লতে বলেছেন যে, তিনটি নার্স তোমার এখানে পাঠানোর আদেশ তিনি দেবেছেন। আমার মোহাই, আঙ্‌, তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো। আর যত্ন তাদের প্রাণ। তারা আসলে ভালোই হবে।"

তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ে। কী দেখে সে এই কথাগুলো বললো, আমি তাই ভাবি।

এই লোকটার জীবনের কাহিনী কিছুই আমি জানতাম না। কিন্তু তাকে দেখে খুব সুখী ব'লে মনে হোতো, সেই ধরণের সুখ, যাতে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পশ্চাৎপট ছাড়া আর কিছুই নয়। থেকে থেকে সে এমন ভাবে মেয়েদের কথা বলতো, যেন সে একটী মেয়ের জন্যে সমস্ত মেয়েকেই ভালোবাসে। কিন্তু আমার মনের অবস্থা তার মত নয় ব'লে, সে ঘুমিয়ে প'ড়েছে দেখে আমি খুসী হ'লাম।

ভোরবেলায় চায়ে বাওতে না বাওতে কেল্লার চাকলা দেখা গেল। রিউপ্‌লার খবর করে আমাদের খোলা জানালায় এসে তার কসরৎ দেখিয়ে আমাদের নিঃসন্দেহ ক'রে গেল।

এর মানে, ভোমরা বাঁধো সকলে। "বহুৎ আচ্ছা!"—তুমি বলে। সকাল বেলাতে খালি পেটেও তার রসিকতা করার মত ক্ষমতা আছে!

হ'টা বাজতেই সে বেরিয়ে প'ড়তে প্রস্তুত হ'য়ে এলো। কত ফুর্ত্তিবাজ এই অফিসার, তা তার দলের লোকদের কাজ দেখলেই বুঝা যেতো।

যখন বেসিনগান তার দলের লোকে ঠিক ক'রে দিচ্ছিল, তখন তুমি আমার কোয়ার্টারে এসে প্রাতরাশ ক'রে নেয়।

হেসে হেসে তুমি বলে, "সকাল বেলায় যেন একটু বাড়ে পেছি। কিন্তু না—ওটা অভিজ্ঞতা এমনি। তার পেয়েছি বলতে চাইনে। সে তোমাদের মত লোকের কাছেই ভালো,…বাদের বারণা, বেঁচে থাকার মত এমন কিছু নাই পৃথিবীতে। যারা লড়াই করার জন্যেই ল'ড়তে চায় না। আমি কোনো একজন মানুষের সঙ্গে লড়তে চাইনে, তাদের সকলের সঙ্গে ল'ড়তে আমি খুব ভালোবাসি।"

প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে যাই। তাকে ঘোড়ায় চড়তে সাহায্য করি। মাহিতের মতই সে ঘোড়ার পেটে বসে, লাগাম ধরে—হাতের দড়ির মত ক'রে। আর হলদে বুটজোড়ার দিকে চেয়ে আর একবার হেসে নেয়।

বিদায় হলে হাত নেড়ে সে বলে, "এ সব কাজে বিশেষ পোক নই। ঘোড়াটা যখন অসাধারণ কিছু করতে যায়, কিম্বা খুব লাফালাফি আরম্ভ করে,—আমি তখন নাই।"

তার প্রিয় আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে সে খুব গম্ভীর ভাবে আদেশ করে।

সারাদিন আমার কেটে যায় নার্সদের কোয়ার্টার ঠিক ক'রতে। এর জন্যে আমাদের অনেক মূল্যবান্ মালপত্র বাহিরে খোলা জায়গায় রাখতে হ'য়েছিল। এক মস্ত বড় ত্রিপল চাপা দিয়ে সেগুলো রাখতে রাখতে আমার কেবলই মনে হ'চ্ছিল—নার্সদের পাঠিয়ে বড় কর্ত্তা কী ঝুলই ক'রেছেন!

রাত্রি ন'টার সময় নার্স তিন জন এসে পৌঁছালো, আমারই একজন সহকারী তাদের এগিয়ে আনতে গাড়ী নিয়ে ঘোড়ায় চেপে গিয়েছিল। তারা একেবারে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে ব'লে সে আমার কাছে রিপোর্ট পাঠায় এবং তার জন্যে নার্সদের সোজা বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিতে সে ব'লে দিয়েছে, তা'ও জানায়। ব্যক্তিগত বা সরকারীভাবে তার যতখানি মনোযোগ দেওয়া উচিত, তার চেয়ে ঢের বেশী মনোযোগী তাকে আমি দেখতে পাই।

হেডকোয়ার্টার থেকে বড়কর্ত্তা যে পেন্সিলে লেখা নোট দিয়েছেন, সেখানিও সে আমাকে দেয়। বড়কর্ত্তা লিখেছেন যে খবরটা পেন্সিলেই লিখতে তাঁকে বাধ্য হ'তে হ'য়েছে, কারণ একটী নিব ছাড়া আর কিছু তাঁর কাছে তখন ছিল না, যার সাহায্যে পঠনযোগ্য চিঠি লেখা যায়।

দেখে মনে হ'লো, সাহায্যকারীর তাঁর অভাব নেই এবং তিনি অনাবশ্যক সাহায্যের হাত থেকে রেহাই পেতে চান্।

আমার সেই উৎসাহী সহকারীকে নার্সদের কাছে পাঠিয়ে খবর দিই যে তাদের রাত্রের মত বিশ্রাম নেওয়াতে আমার আপত্তি নেই, কাল তারা আমার কাছে রিপোর্ট দাখিল ক'রবে। তারপর আমি শুতে যাই।

মাঝ-রাতে আমার আর্দালী খবর দেয় যে সেনাধ্যক্ষ তাঁর তাঁবুতে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সেনাধ্যক্ষের মুখ দেখি যেন তাঁর পোষাকের চেয়েও সাদা ফ্যাকাসে! তিনি তাঁর সহকারীর সঙ্গে কোনও বিষয়ে পরামর্শ করছিলেন। সহকারী যুবকের বয়স মাত্র বিশ-বাইশ বছর হবে।

একজন সৈন্য রক্তাক্ত ধূলি-ধূসরিত দেহে পাশে ব'সে গ্লাস থেকে কিছু খাচ্ছিল আর থেকে থেকে চোখ মুছছিল।

"রণক্ষেত্রের খবর বুঝি?"—সোজাভাবে প্রশ্ন করি। কায়দা-দুরস্ত কথা বলা আমরা অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছি।

"হাঁ, কিন্তু দুঃসংবাদ!"

শুনে কথাটা ভালো লাগে নি। কে যেন বলে,—"দুঃসংবাদ নয় শুধু, ভয়ঙ্কর বিপত্তি!" আমরা পরস্পরের দিকে আগ্রহে চেয়ে থাকি। আমি মেয়ে ক'টীর কথা ভেবে নিই এবং প্রায় ঠিক ক'রে ফেলি যে তাদের পাঠিয়ে দেব এখান থেকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই একজন লোককে সেই চাঁদনী রাতে হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেনাধ্যক্ষ যেন আবার নিজেকে সাম্‌লে নেন্। বোধ করি ডেস্‌প্যাচ আরোহীর গ্লাস তাঁকে সাহায্য করে। মোটের উপর এসব কিছুর জন্যে তিনি বিশেষ দায়ী নন্। দুইজন সুবিখ্যাত মানুষের মাঝে তিনি একটা শক্তিবিশেষ, তা ছাড়া আর কিছুই নন্।

আমার লোকজনের তখুনি কাজে লাগার দরকার ব'লে যথাযথ আদেশ দিই। কিন্তু নার্সদের না জাগাতে বিশেষ ক'রে ব'লে দিই। রণক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর বিপত্তির ফলে পিছনের লোকদের খাটুনীর শেষ থাকে না। আমাদের তা ভালো ক'রে জানা আছে। তাই আহত সৈন্যদের আগমন প্রতীক্ষায় আমরা প্রস্তুত হ'য়ে থাকি।

দিনের আলো আসার আগেই আহতদের ভিড় জমে যায়। তাদের আঘাত দেখে, ব্যাণ্ডেজ ক'রে তাদের ঘেঁসা-ঘেঁসি ক'রে শুইয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ভিড় কমে না। তাদের আমারও কমতি নেই। তাদের জন্যে এক মুহূর্তে বিশ্রাম পাইনে।

সকাল ছটার সময় নার্সদের উঠিয়ে দিতে বলি এবং আহতদের সেবার জন্যে যত শীঘ্র পারে তাদের এখানে প্রস্তুত হ'য়ে আসতে আদেশ করি। আর ঘণ্টা পরে এক জন লোক আমাদের ওয়ার্ডে আসেন।

"আরী খারাপ কেস্, স্যার! একবার আসবেন। অফিসার। কামান ফেটে গিয়েছে, স্যার!"

তাঁর অনুসরণ করি। যেতে যেতে বলি: "আমার কোয়ার্টারে নিয়ে যাও।"

কয়েক মিনিট পরেই সেখানে যাই এবং ঘরে ঢুকতেই প্রথম চোখে পড়ে,—এক জোড়া হল্‌দে বুট।

সেই বুট জোড়া আর সাদা ট্রাউজার দেখেই নিঃসন্দেহ হই। মুখ দেখতে না পেলেও, বুঝতে পারি যে, স্যাণ্ডি কিটস্ ওয়ারেনার আবার ফিরে এসেছে।"

একটী মেয়ে—যাদের জন্যে সে ওকালতি ক'রেছিল সেই নার্সদের একজন—বিছানার ওপর উপুড় হ'য়ে ব'সে স্যার আর এক পাত্র গরম জল নিয়ে পরিষ্কার ক'রছে। আমি ঘরে ঢুকতেই মেয়েটী আমার দিকে ফিরে তাকায়, তার চোখে ভয় পরিস্ফুট।

অর্থপূর্ণ ভাবে সে খুব আস্তে বলে,—"উঃ!" আমাকে এগিয়ে দিয়ে নিজে সে সরে দাঁড়ায়। সে যে সেই স্বাস্থ্যবতীদের একজন, তা দেখার তখন আমার সময় ছিল না; সেই আইরীশ মেয়ে—যাদের স্বাস্থ্য ভালো, সুন্দর গায়ের রঙ, আর সুদৃশ্য চুলের গুচ্ছ,—একেবারে প্রাচীন ইংলণ্ডের সুন্দরীদের মনে করিয়ে দেয়।

"জানলা থেকে মাদুরটা সরিয়ে দাও দয়া ক'রে।"—সাময়িক ভাবে যে জানালায় খড়খড়ি দিয়েছিলাম, সেটা দেখিয়ে বলি।

খুবই তাড়াতাড়ি সে কাজটা করে এবং বিছানার পাশে এসে আমার আদেশের অপেক্ষায় বসে।

বিছানার উপর উপুড় হ'য়ে যা দেখি, তাতে ভয় পেয়ে যাই। কতদিন বেঁচে থাকবো, এই ভয়ঙ্কর ছবি কখনও ভুলতে পারবো না।

ইসারাতে নার্সকে তার কাজ ক'রে যেতে বলি। তার ক্ষত থেকে কাদা, বিশেষ করে বালুর কণা, মুছে নিতে তাকে নির্দেশ দিই।

খুব মৃদুস্বরে সে বলে, "দুটো চোখই নষ্ট হ'য়ে গেছে!"

"খুলির উপরে তুমি হাত দিও না" আমি বলি,—"ওটা বোধ করি একেবারে ভাঙে নি।" আমরা বেশ বুঝতে পারি, একে বাঁচাবার কোন আশা নেই।

আমি বলেছি, কিট্‌জ্‌ওগারেনারের সেনের সোকদের আমি জানি। যেখানে কোন ভালোর আশা নেই সেখানে প'ড়ে থাকতে আমি পারি না, বিশেষ যখন জানি যে অন্য দিকে আমাকে যেতে হবে।

হঠাৎ স্যামির ঠোঁট কেঁপে ওঠে এবং সিষ্টার মাথা নীচু করে তার মুখের কাছে কাণ নিয়ে যায়।

সে যে কি বলে, আমি শুনতে পাই না। সে কিন্তু শুনতে পায়, কারণ তার মুখ থেকে "হুঁ" কথাটা শোনা যায় এবং তার মুখ দেখতে পাই। সিষ্টারের মুখে হঠাৎ যেন কমনীয়তা ফিরে আসে।

একটু থেমে সে উঠে আমার কাছে আসে।

"এ কে?" সিষ্টার শুধায়।

"স্যাক্সন্ ব্রিগেডের কিট্‌জ্‌ওগারেনার। চেন না কি?"

"না, কোনও কালে নামও শুনি নি। অবিজি—এর কোন আশা নেই!"

"সত্যি, একেবারেই নেই।"

সিষ্টার স্যামির বিছানার পাশে ব'সে একখানা হাত তার বুকের উপর রেখে। সেও তখনই মৃদুস্বরে কি ব'লতে থাকে; মাঝে মাঝে সিষ্টার উত্তর দেয়।

আমার মনে হয়, অজ্ঞান অবস্থায় স্যামি সিষ্টারকে আর-কোন মেয়ে ভেবেছে এবং নার্সটীও ইচ্ছে ক'রে তাকে ঠকাচ্ছে, যার কারণ মেয়েরাই ভালো বুঝতে পারে।

কয়েক মিনিট পরেই আমি ঠিক বুঝতে পারি।

না দেখতে চেষ্টা করি, কিন্তু সবই দেখতে পাই। দেখি যে অন্ধ স্যামি তার হাত দিয়ে সিষ্টারের মাথা-ঘসা-চুল অনুভব ক'রছে।

সে বেশ পরিষ্কার ভাবে বলে,—যেমন ভাবে অজ্ঞান লোক হঠাৎ জ্ঞান পেয়েই বলে, তেমনি ভাবে। "এটা আবার কি, টুপী? এটা আমার কেন?"

নার্সের মাথার তুষার-শুভ্র কাপড়টা সে হাত দিয়ে রেখে। হঠাৎ তার ঘড়িতে স্যামির হাত পড়ে।

ভদ্রলোক ব'লে পরিচয় দিতে চাই, তাই সেখান থেকে সরে যেতে ইচ্ছে করি। অনেক ডাক্তারই এমন অবস্থায় তাই করতে চায়। কিন্তু ডাক্তার বলেই আমাকে থাকতে হয়।

তার হাত ঘড়িতে আটকে যায়। সিষ্টার তবু তো বসে থাকে। হয়ত আরও একটু মাথা নীচু করে। নার্সের একখানি হাত সেই চূর্ণ-বিচূর্ণ মাথাটা রক্ষা করতে স্যামির ঘাড়ের নীচে থাকে।

ধীরে ধীরে নার্সের টুপিটা খুলে যেয় এবং তার আঙুল-গুলি সিষ্টারের সুন্দর চুলের ফাঁকে ঢুকিয়ে বেশ স্পষ্ট ভাবেই সে বলে, "মার্সি, চুল বেঁধেছ? কিন্তু তুমি এখনও তেমনি ছোট্ট মেয়ে ছাড়া আর কিছুই নও! জানো তো—ছোট্ট মেয়ে তুমি!"

তার আঙুলগুলো আমি দেখতে পাই না। আমার মনে হয় যেন একটা লোক পবিত্র জিনিসের অপব্যবহার করছে।

সেই বৃদ্ধিহীন কণ্ঠ বকে যায়: "যেদিন তোমাকে ছেড়ে আসি, সেদিন এই চুল তোমার পিঠে পড়তো। খুব ছোট্ট মেয়ে তুমি তখন—এখনও তেমনি ছোটই আছ, মার্সি।"

তার মাথার একটা কাঁটা সে খুলে ফেলে।

নার্সের লম্বা চুল তার কাঁধে পড়ে। সে দেখেও না মুখ তুলে, আমার দিকেও লক্ষ্য করে না। স্যামির পাশে স্বর্গের দূতের মত হাঁটু গেড়ে বসে থাকে। যে মেয়েটীকে আমরা কোনও দিন দেখিনি, সেই মার্সির বদলেই সে যেন বসে থাকে।

"আমার প্রিয়া"—মৃদু হেসে সে বলে এবং আরও একটী মাথার কাঁটা খুলে নেয়।

দেখতে দেখতে তার চুল ঘাড়ের উপর ছড়িয়ে পড়ে। আমি ভাবতে পারি নি যে এত সৌন্দর্য্য এই নার্সের টুপীটার নীচে লুকানো ছিল।

"এই বেশ! এই বেশ!"—স্তামি বলে। তার হাতের সমস্ত মাথার কাঁটা নীচে ফেলে দেয়। মৃদু স্বরে বলে, "এইবার তুমি আমার মামি, আমার প্রিয়া হয়েছ। কি বল?"

এক মিনিট নার্স চুপ করে। তার পর ধীরে ধীরে বলে, "হ্যাঁ, প্রিয়তম। আমি তোমারই মামি!"

খোলা হাতে স্তামি নার্সের শুভ্র গালে আস্তে আস্তে আঘাত করে। সিষ্টারের এক কামনা ছিল, সে যেন এ ধরণের অনেক ব্যাপার দেখেছে। ধূর-মলিন স্তামির আঙুল-গুলি তার মাথার চুলে সিঁথি কাটে, মুক্ত চুল বসিয়ে দেয়। তারপর তার সাহস বেড়ে যায়। সিষ্টারের চোখ, নরম গাল, কঠিন ঠোঁট সব সে হাত বুলিয়ে অনুভব করে। তার মাথা সিষ্টারের কাঁধের কালো পোষাকের মধ্যে লুকিয়ে যায়। নার্সিং এপ্রণ দেখে বলে, "বাগানে কাজ করছিলে এতক্ষণ?"

আঘাতের ফলে তার বিনু বেরিয়ে গিয়েছিল প্রায়। আমি বুঝতে পারি নি আজও, তা সত্ত্বেও কি করে তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল, আর একটী বিষয় নিয়ে এতক্ষণ সে কথা বলে যাচ্ছিল!

"হ্যাঁ—প্রিয়তম।"

"তোমার পুরাণো এপ্রণটা যে ছিঁড়ে গেছে!" তার বুকের কাছে হাত দিয়ে স্তামি যেন রক্ত দেখতে চায়। সে দেখতে পায় না, যে তারই বুকের রক্তে সিষ্টারের এপ্রণ ভিজে গিয়েছে,—রক্ত রাঙা কাপড়টার রক্ত শুকিয়ে আসছিল।

স্তামির হাত তার গায়ে লেগে থাকে, সিষ্টারের চোখ জলে ভরে আসে। তার জীবনের পবিত্রতম অংশটুকুই যেন আমার চোখের সামনে প্রকাশ পায়। আমি দেখতে পাই, তার জীবনের একটা গোপন দিক। চলে যেতে ইচ্ছে হয়, পারি না। সেও যেন সরে যেতে চায়, কিন্তু চুপচাপ বসে থাকে। নতুন এক অকথ্য যন্ত্রণায় তার চোখ কাপসা হয়ে ওঠে। আমি বুঝি না,—বুঝতেও পারি নি আজ পর্যন্ত যে সেই হতভাগ্য জ্ঞানহীন পুরুষের স্পর্শ পেয়ে এই মেয়েটীর প্রাণে কিসের সুখ উথলে উঠেছিল।

"মার্নি।" স্তামি আবার ডাকে। "মার্নি, আমার অপেক্ষায় বসে থাকতে তোমার খুব দুঃখ হত?"

"না, প্রিয়তম!"

"আর ভাবনা নেই, মার্নি। সব ঠিক হয়ে যাবে এখন! আমাদের দুর্দিন কেটে গেছে!"

"হ্যাঁ।"

"মার্নি, সেই রাত—যে রাতে আমি বিদায় নি, তোমার মনে আছে? মার্নি, কাছে এস—না, মুখ নিয়ে এস, আমার কাছে, একটা চুমু দাও!"

তার পাশে হঠাৎ বসে পড়ি। হাতখানা তার সার্টের ভেতর ঢুকিয়ে দেখি তার হৃৎস্পন্দন। কারণ তখনই তার মুখে এক বিশেষ পরিবর্তন দেখেছিলাম।

সিষ্টারের ঠোঁটে তার ঠোঁট মিলতেই বুঝতে পারি তার হৃৎস্পন্দন হঠাৎ যেন লাফিয়ে উঠে বুকের মধ্যে,—তার পর আবার তেমনি হঠাৎ থেমে যায়।

নার্স মুখ তুলতে দেখি, তার মুখ স্তামির মুখের চেয়েও সাদা।

বলতে আমার লজ্জা নেই যে সব দেখে আমার চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে হয়েছিল। বিশ বছরের মধ্যে আমার এমন কখনও হয় নি। কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে মৃত লোকটাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আমার কাজ শেষ করে দেখি, সিষ্টার কতকগুলি কাগজপত্র গুছিয়ে রাখছে, তার সোনালী চুল তার সাদা টুপীর নীচে পরিষ্কার ভাবে অদৃশ্য হয়েছে।

সার্টিফিকেটের নীচে দস্তখত করি, আমার উপরে তার নাম লেখা আছে।

এক মুহূর্ত দু'জনে দাঁড়িয়ে থাকি। আমাদের চোখে চোখে মিল হয়, কিন্তু কেউ কোনও কথা বলি না। সিষ্টার দরজার দিকে এগিয়ে যায়, আমি দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকি, সে বাইরে চলে যায়।

চব্বিশ ঘণ্টা পরে হেড কোয়ার্টারে নার্সদের পাঠিয়ে দেওয়ার আদেশ আসে। তখন আমাদের সৈন্যদল শত্রুর আক্রমণে পিছু হটছে।

[ অনুবাদ—শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মেঘ ও পাহাড়

[ শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

# হিন্দু-ধর্ম্ম এবং হিন্দু-সমাজ

—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সভ্যতা কাহাকে বলে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। জীবের দৈহিক বিকাশ বন্ধ হইয়া যে-সময় তাহার মানস বিকাশ ( psychological development ) আরম্ভ হয়, তাহা হইতে যে-সভ্যতার আরম্ভ, আর যে-সময় উহার শেষ হইয়া প্রকৃতির অভিপ্রেত পরিণতি লাভ করিবে তাহাই মানব সভ্যতার শেষ এই কথা বলিয়াছি। য়ুরোপীয় বুধমণ্ডলী জীবের দৈহিক বা আকারগত (physiological) পরিবর্ত্তনটা বেশ ভালভাবেই লক্ষ্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু মানসিক (psychological) বিকাশটা তত ভাল করিয়া লক্ষ্য করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হিন্দুর সভ্যতা খরস্রোতা নদীর ন্যায় ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া যাইতেছে। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন সাহিত্যই হিন্দুর ঘরে আছে। তাহা ধর্ম্মগ্রন্থ। ধর্ম্মভাবের ভিতর দিয়া সেই সভ্যতা কি ভাবে বিকশিত হইয়াছিল তাহার পরিচয় ঐ সকল গ্রন্থে মিলে। সে-সভ্যতা যে নিতান্ত নিম্নস্তরের ছিল না, তাহা ঋগ্বেদ সংহিতা প্রভৃতির আলোচনা করিলে বুঝা যায়। ঋগ্বেদের সময়ে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ বিকশিত হইয়াছিল। এই অতি প্রাচীন ঋগ্বেদ সংহিতাতে ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই।* সুতরাং সে-সভ্যতা নিতান্ত আদিম অবস্থার সভ্যতা নহে। উহা প্রগতির পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। পক্ষান্তরে গ্রীক সভ্যতা সৌষ্ঠবের এবং সুন্দরের (aesthetic faculties) প্রতি আকর্ষণের প্রভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। এই কথায় কেহ যেন মনে না করেন যে, গ্রীক সভ্যতা বিকাশে ধর্ম্মের প্রেরণা একেবারেই ছিল না, এই কথা আমি বলিতেছি। প্রাচীন গ্রীকরা যতটা সৌন্দর্য্যের সাধনা করিত, সৌন্দর্য্য দর্শনে বিশ্বয়ে যতটা আপ্লুত হইত, ভক্তিতে ততটা আপ্লুত হইত না। হিন্দুরা ভক্তির প্রেরণায় আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। সেইজন্য গ্রীক শিল্পকলা (art) বস্তুতন্ত্রের দিক্ দিয়া অনেকটা উন্নত হইয়াছিল। ভারতীয় শিল্পকলায় ভাবতন্ত্রের দিকটা অধিক বিকশিত হইয়া উঠে।

সেই জন্য বাহ্য ব্যাপারের দিকটা দেখিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা সকল বিষয়ের বিচার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহারা অন্তরের দিকটা ততো বিচক্ষণতার সহিত বিচার করিয়া দেখেন না। সভ্যতার বিকাশ-ধারার বিচার করিতে যাইয়াও কোন্ জাতি কোন্ সময়ে কি ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করিত, কোন্ জাতি বৃক্ষ, শিলা প্রভৃতি উপকরণ হইতে সর্ব্ব-প্রথম অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিল, ইহা ধরিয়াই তাঁহারা সভ্যতার ধারা লইয়া বিচার করিয়া থাকেন; কিন্তু কিরূপ মনোবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কিরূপ ভাবের আবেগে চালিত হইয়া কোন্ জাতি কিরূপ অবস্থায় সভ্যতার পথে প্রথমে পদবিক্ষেপ পূর্ব্বক ধাবিত হইয়াছিল, তাহা সেরূপ নিপুণ ভাবে আলোচনা করেন না। প্রাচীন কোন্ জাতির কোন্ নিম্ন অস্ত্র-শস্ত্র না পাইয়া ইঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাহারা গ্রীকদিগের নিকট হইতে তাহাদের সভ্যতা ধার করিয়া লইয়াছিল। এইরূপ বাহ্য ব্যাপারের উপর নির্ভর করিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা অনেক বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু যে মানস ভাবের প্রভাবে তাহারা সভ্যতার পথে প্রগতি লাভ করিয়াছিল, পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী তাহার কথা আলোচনা করেন না। তাহা না করিবার একটা বলবৎ কারণ এই যে, সাক্ষাৎভাবে সে-বিষয়ের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে-টুকু প্রমাণ মিলে, তাহা হইতে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও সম্ভবে না।

গ্রীক জাতি তাহাদের আনন্দি বৃত্তির ( aesthetic faculties ) পরিপোষণ হেতু এই বিশ্বের বাহ্য সৌন্দর্য্যের দিকে আকৃষ্ট হইয়া সভ্যতার পথে ধাবিত হইয়াছিল। যাহা কিছু সুন্দর তাহাই তাহাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করিত। সেই আকর্ষণের প্রভাবে তাহারা তাহাদের সভ্যতার পথে নীত হইয়াছিল। তাহার মূলে ছিল একটা নবোন্মেষিত হ্লাদিনী মনোবৃত্তি। এই বৃত্তির রসসেবনেই তাহাদের বুদ্ধি-

* দেবীসূক্ত, পুরুষসূক্ত প্রভৃতি

বৃত্তি পজাইয়া উঠিয়াছিল। ভারতীয় সভ্যতার প্রেরণা আসিয়াছিল ভক্তির দিক্ হইতে। ইহাও একটা মনোবৃত্তি। ইহাও আনন্দদায়িনী বৃত্তি। তবে এই বৃত্তির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা সুন্দর দেখিয়া সুন্দরের স্রষ্টার প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়া আসিয়াছে। হিন্দু বলেন, আনন্দ হইতেই এই বিশ্বের উদ্ভব। সুন্দরের স্রষ্টাই আনন্দময়। সুতরাং উহার সভ্যতার উৎপত্তির মূলে ছিল আনন্দজননী মনোবৃত্তি। তবে তাহার মধ্যে কিছু পার্থক্য ছিল। সে পার্থক্য উহার সভ্যতার চিত্রকলা দেখিলে বুঝা যায়। গ্রীক চিত্রশিল্প বস্তুতান্ত্রিক—উহা আলেখিত বস্তুর বহিরঙ্গের হুবহু নকল। কিন্তু ভারতীয় চিত্রশিল্প ঠিক সেইরূপ নহে। উহাতে বাহিরের অঙ্গসৌষ্ঠবের দিকে লক্ষ্য নাই, অন্তরের বা মনের ভাব পরিস্ফুট করিবার দিকেই উহার সমস্ত যত্ন নিহিত। রাধা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে অঙ্গ চালিয়া দিয়া ভাবাকুলচিত্তা হইয়া নিমীলিত নেত্রে উপবিষ্ট—শ্রীকৃষ্ণও রাধিকার দেহে যেন দেহ মিলাইয়া রাধাগত প্রাণ হইয়া অবস্থিত। এই চিত্রটি যদি একজন গ্রীক শিল্পী আঁকে, তাহা হইলে সে রাধা এবং কৃষ্ণের নরদেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেন, নখ পর্যন্ত, নিখুঁত ভাবে আঁকিবে। অন্তরের ভাবটি মোটামুটি তাহার আলেখ্যে প্রতিবিম্বিত হইবে; একজন হিন্দু চিত্রকর যদি ঠিক ঐ চিত্রখানি আঁকেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার নরবপু হুবহু আঁকিবেন না, কিন্তু তিনি তাঁহাদের সেই অমানুষ দেহ এমন ভাবে আঁকিবেন, যেন সেই চিত্রখানি দর্শকের মনে আলেখ্য-লিখিত ব্যক্তির বা ব্যক্তিগণের অন্তরের ভাব প্রতিফলিত হয়। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, ভারতীয় চিত্রকরের চিত্র অঙ্কনের প্রয়াস সফল হইয়াছে। অন্যথা সেই আলেখ্য কেবল ছেলেখেলা মাত্র হইয়াছে। অমূর্ত মনোভাবকে ষোল আনা বুঝাইয়া দিতে পারিলেই ভারতীয় শিল্পীর শিল্পসাধনার সার্থকতা। আর য়ুরোপীয় চিত্র-শিল্পীর কাজই হইতেছে আলেখিত বিষয়টির বাহ্যরূপ নিখুঁতভাবে চিত্রে সন্নিবিষ্ট করা। উভয়ই গিরিগাত্রস্থ প্রাচীনযুগের চিত্রে এই বিভিন্ন ভাব লক্ষিত হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, হিন্দু সকল ব্যাপারেই ভিতরের দিকটা দেখিতে চেষ্টা করে, তাহার দৃষ্টি বাহিরের দিকে নিবদ্ধ নহে। পক্ষান্তরে য়ুরোপীয়রা বাহ্য ব্যাপার লইয়াই অধিকতর নিবিষ্ট। ফলে য়ুরোপীয়দিগের দৃষ্টি বহির্মুখী, ভারতীয়দিগের দৃষ্টি অন্তর্মুখী।

সমাজ-গঠন ব্যাপারেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই সমাজের গতি, স্থিতি ও পরিণতির বিচার করিয়া থাকেন। অর্থাৎ সামাজিক ব্যাপার সম্পর্কে তাঁহাদের মত ( theory ) ঐ বাহ্য ব্যাপার সম্পর্কিত তথ্যের উপর নির্ভরশীল। তাঁহারা বলেন যে, মানুষ আদৌ একাকী ও নিঃসঙ্গ ছিল। পরে তাহার সঙ্গিনী জুটিল তাহার নারী বা স্ত্রী। যৌন প্রয়োজনে প্রকৃতির তাড়নায় স্ত্রী-সঙ্গিনীর সঙ্গ তাহার কাম্য হইল। তাহার পর মানুষ বনে বনে সঙ্গিনী-পরিবৃত হইয়া বেড়াইত। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাহাই? প্রকৃতি তাহাকে কত দূর পথ অগ্রসর করিয়া দিয়াছে এবং সে কোথা হইতে নিজ বুদ্ধি-বলে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার সীমা নির্দ্ধারণ মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে কতকগুলি প্রাণী সংহতিবদ্ধ হইয়া চলে। যথা—পিপীলিকা, পুত্তিকা, মধুমক্ষিকা, উৎকুণ প্রভৃতি। হস্তী, মহিষ, বানর, গোরিলা প্রভৃতিও সংঘবদ্ধ হইয়া চলে। এমন কি কোন কোন প্রাণীর দলের মধ্যে শ্রমবিভাগও আছে, শ্রেণীবিভাগও আছে। অমরকোষ বলেন, পশুর সংহতিকে সমজ এবং মানুষের সংহতিকে সমাজ বলা হয়। "পশূনাং সমজঃ অন্যেষাং সমাজঃ।" পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বলেন যে, 'সমজ' প্রকৃতি-প্রদত্ত সহজাত বুদ্ধি ( instinct )-প্রসূত, আর সমাজ মানুষের বুদ্ধি-কল্পিত। সমজ স্বাভাবিক, সমাজ কৃত্রিম। তাহার জন্যই তাঁহারা বলেন সমাজ অস্বাভাবিক। পশুদিগের সমজ তাহাদের স্বভাবসত্ত প্রেরণাবলে গঠিত, তাই তাহার বিকাশ নাই, ভেদ নাই। সবই একধারায় চলিয়াছে।

মানুষ স্বাধীন বুদ্ধিবলে সমাজ গঠিত করিয়াছে বলিয়া উহা দেশভেদে বিভিন্নরূপ হইয়াছে। মানুষের বুদ্ধির কিছু স্বাধীনতা আছে সত্য, কিন্তু মানুষ এখন তাহার বুদ্ধির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পায় নাই, মানুষ এখনও অনেকটা প্রকৃতিনির্দিষ্ট পথেই তাহার বুদ্ধি চালিত করিয়া থাকে। আমরা মনে করি সত্য যে, আমরা সকল সময় স্বাধীন বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা বহু সময়েই প্রকৃতিপ্রদত্ত বুদ্ধির ( instinct ) এবং সংস্কারদ্বারা

চালিত হইয়া থাকি।* এই সহজ বুদ্ধি এবং সংস্কার হইতেই প্রকৃতির নির্দেশ পাওয়া যায়। সুতরাং মানব সভ্যতার বিকাশ ধারা যে-খাত বহিয়াই প্রবাহিত হউক না কেন, উহা যে, প্রকৃতি-কর্তৃক নিয়মিত এবং নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকিত হইতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ কথা সত্য যে, প্রকৃতির কার্যে বৈষম্যের ভিতরেও সাম্য আছে। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমক সভ্যতা সৌষ্ঠবের এবং সৌন্দর্যের উপাসক ছিল সত্য, কিন্তু তাহার ভিতর যে-ধর্মভাব পরিত ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। তবে উভয় ধর্মভাবের মধ্যে কিছু পার্থক্য ছিল। সে পার্থক্যের বিষয় পরে বলা যাইবে। বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকরাও বলিয়া থাকেন যে, ধর্মবিশ্বাস মানুষের সহজাত। সকল যুগে সকল মানবসমাজে জাতিতে এবং গোষ্ঠিতে ধর্মের প্রভাব লক্ষিত হয়। ধর্মবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নাই, এমন মানব-সমাজ বা সম্প্রদায় ধরাতলে দেখা যায় নাই। ইহাই নৃতত্ত্ববিদ্ যুগণের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, মানব জাতি যে-সময় পশুভাব পরিহার করিয়া, মোড় ফিরিয়া, মনুষ্যত্বের দিকে গতি করিয়াছে, সে-সময়ে তাহাদের ধর্ম আমাদের বিচার-বুদ্ধির নিকট কিম্ভূতকিমাকার, বর্বরতাপূর্ণ, বীভৎস এবং দুর্নীতি-দুষ্ট মনে হইতে পারে, কিন্তু উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা সম্ভব নহে। তাহার পর মানুষ যতই সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, ততই তাহার ধর্মমতও নানা-জলস্থ শতদলের মত ক্রমে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সভ্যতার বিকাশপথেই নানা অবস্থায় মানুষই নানাভাবে নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস প্রাপ্ত হয়। খণ্ডিতভাবে প্রাকৃতিক বস্তুর উপাসনা (naturism), সচেতন বোধে জড়ের আরাধনা, প্রেতোপাসনা, বহুদেবতাবাদ, totemism, fetishism প্রভৃতি নানা রূপ ধরিয়া ধর্মসিদ্ধান্ত ক্রমশঃ অগ্রসর হয়। ইহা কেবল পরিবর্তনের অবস্থা। প্রগতির মুখে সকল জিনিষেরই পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তন ঘটে বলিয়া যে উহা মিথ্যা, তাহা কোন ক্রমেই বলা যায় না। মাতৃগর্ভে অবস্থিত মানবের ভ্রূণ নানা আকারের ভিতর দিয়া মানবের আকার পাইয়া থাকে; তাই বলিয়া মনুষ্যাকার মিথ্যা নহে, ভ্রূণ যে-সকল আকারের ভিতর দিয়া মানবের আকার ধরিয়াছে, তাহাও মিথ্যা নহে। প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক আরিস্টটল বলিয়াছেন যে—The true nature of a thing is that which it is when its becoming is complete—অর্থাৎ পরিণতির পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটিলে তাহার পরে সেই জিনিষের স্বরূপ প্রকাশ পায়। বস্তু যখন নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া পরিণতি প্রাপ্তির পথে যাইতেছে, তখন তাহার অবস্থা দেখিয়া মধ্যপথে তাহার বিচার করিলে চলিবে না। তাহা করিতে গেলে সে-সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হইবেই। মানুষের যাহা সামাজিকতা বা সমাজ গঠনের প্রেরণা আছে—উহা প্রকৃতি-প্রদত্ত। তাই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়। কিন্তু সেই প্রেরণার লক্ষ্য এবং সংবেদন সেই প্রকৃতি-চালিত জীবের মত নিকটবর্তী, প্রকৃতির লক্ষ্য তত নিকটবর্তী নহে। অর্থাৎ সে-প্রেরণা মানুষ অনুভব করে একটা উপস্থিত অভাব মিটাইবার জন্য, কিন্তু তদপেক্ষা সুদূরতর অভিপ্রায়-সাধনই হইতেছে প্রকৃতির উদ্দেশ্য। যে সংবেদনফলে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়, অথবা হইবার প্রয়োজন মনে করে, সেই প্রয়োজনই যে চূড়ান্ত তাহা নহে। একটা উদাহরণ দিয়া বিষয়টা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। ভ্রমর ফুলে ফুলে মধুর লোভে প্রাকৃতিক প্রেরণায়। সেই প্রেরণা মধুর লোভ রূপে তাহার ভিতর জাগিয়া উঠে। সেই জন্য সে মধুলোভে ফুলে ফুলে যায়। মধু পাইলেই তাহার সেই প্রেরণার চরিতার্থতা ঘটে। কিন্তু প্রকৃতির প্রয়োজন স্বতন্ত্র এবং সুদূরতর। প্রকৃতির প্রয়োজন ফলোৎপত্তি তো ঘটেই, অধিকন্তু আর কিছু বিপ্রকৃষ্টতর উদ্দেশ্য আছে কি না, তাহা জানা যায় না। সেই জন্য অর্ধপথে অর্থাৎ পরিণতি ঘটিবার পূর্বে মধ্যপথে, উহার উদ্দেশ্যের বিচার করা চলে না। মানুষ যখন বন্যভাব পরিহার করিয়া সভ্যতার পথে ধাবিত হইতে থাকে, তখন সে হয় তো আপনার উপস্থিত একটা প্রয়োজনের অনুভূতি-হেতু তাহারই চরিতার্থতা সাধনের জন্য পরস্পর অধিকতর নিবিড় ভাবে সম্মিলিত হয়, কিন্তু তাহার সেই প্রয়োজনের অনুভূতিই মনুষ্য-সমাজের চরম প্রয়োজন, তাহা চরিতার্থ হইলেই যে, মানব-সমাজের

* The investigation of human behaviour on scientific lines makes it clear that most of our actions and in particular most of our moral choices, are rigidly determined.

T. B. S. Haldane, 'Fact and Faith' p. 54.

সর্ব্ব প্রয়োজন চরিতার্থ হইল, ইহা মনে করা ভুল। সে যতই অগ্রসর হইবে, ততই তাহার নূতন নূতন প্রয়োজন দেখা দিবে। নিবিড় অন্ধকারের মধ্য দিয়া পথিক যাইতেছে; তাহার হাতে একটি উজ্জ্বল আলোক; সেই আলোকে সে কতকটা দূর বেশ স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইতেছে। তাহার পর সে যতই অগ্রসর হইবে ততই নূতন নূতন দৃশ্য সে দেখিতে থাকিবে। সেইরূপ মানুষ সভ্যতার পথে আরূঢ় হইয়া প্রকৃতি-কর্ত্তৃক অদৃশ্যভাবে চালিত হইয়া নিজ বুদ্ধির বর্ত্তিকা লইয়া যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই প্রতি পদক্ষেপে নূতন প্রয়োজনের সংবেদন তাহার মনে জাগিতেছে। যতক্ষণ তাহার গন্তব্য পথের শেষ না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার নূতন নূতন প্রয়োজনাকৃতির বিরাম ঘটিবে না। য়ুরোপীয়েরা মনে করেন যে, মানুষ জন্মিয়াই সমাজবদ্ধ হয় নাই বা হইবার চেষ্টা করে নাই।* বহুকাল একাকী এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকিয়া পরে সে প্রয়োজনবোধে সমাজবদ্ধ হইয়াছে। এ ধারণাটি ভুল। যে-মুহূর্ত্তে জীব মনুষ্যদেহ ধারণের অধিকার পাইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই প্রকৃতির প্রেরণায় সে সমাজবদ্ধ হইবার বাসনা করিয়াছে। কীট-পতঙ্গ হইতে বহু জীব দলবদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাদের সেই দলবদ্ধ হইয়া থাকিবার সংবেদন তাহাদের সহজাত (instinctive)। তবে মানুষের পক্ষে এই প্রকৃতি-প্রদত্ত প্রেরণা অস্বীকার করা হইবে কেন? তবে প্রাথমিক অবস্থায় সমাজের বিভিন্ন অঙ্গের সংযোগ তেমন নিবিড় হইয়া উঠে নাই, কাল সহকারে সামাজিক প্রগতির সহিত ধীরে ধীরে উহার নিবিড়তা বৃদ্ধি পাইতেছে। ডিউক অব আর্গাইল বোধ হয় মানব সমাজ যে দেহধর্ম্মী এই কথা সর্ব্বপ্রথম বলিয়াছিলেন।* হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁহার পূর্ব্বে সমাজ-তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি মানব-সমাজকে পূর্ণ মাত্রায় শরীর-ধর্ম্মী এ কথা স্বীকার করিতে যেন কেমন একটু 'কিন্তু' করিয়া গিয়াছেন।†

যাহা হউক, মানুষ যে প্রথম হইতে সামাজিক জীবভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে, সে-কথা অস্বীকার করা যায় না। পৃথিবীর কুত্রাপি কেহ একেবারে নিঃসঙ্গ মানুষ দেখে নাই। অরণ্যচর মানুষও দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। সেই আদিম সমাজ দেহের বাঁধুনি তেমন দৃঢ় না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে একটা নির্দ্দিষ্ট গঠন থাকে। প্রকৃতি বৈষম্যপ্রিয়া—তিনি দুইটি বস্তু ঠিক একভাবে সৃষ্টি করেন না। একই গাছের দুইটি পত্র সর্ব্বাংশে সমান হয় না। একই পিতামাতার দুইটি যমজ সন্তানও ঠিক একরূপ আকার এবং প্রকৃতিবিশিষ্ট হয় না। তাহাদের সাদৃশ্যের মধ্যে কিছু বৈষম্য থাকিবেই থাকিবে। এরূপ অবস্থায় প্রকৃতির গড়া বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বিকশিত বিভিন্ন মানবসমাজের ভিতর কোন কোন বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য থাকিবেই। সেই জন্য আদি হিন্দু সমাজ এবং আদি গ্রীক বা খ্রিষ্টীয় সমাজ ঠিক একরূপ হয় নাই। গোড়া হইতে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা মজ্জাগত ভেদ রহিয়া গিয়াছে। সে-ভেদ দূর করিবার সাধ্য মানুষের নাই। কৌলিক শক্তির এবং বৈশিক শক্তির প্রভাবে মানুষ তাহার সেই বিশিষ্ট সমাজের সহিত সমরসীভূত হইয়া চলিবার শক্তি পায়। এক সমাজের ছাঁচ ভাঙ্গিয়া অন্য সমাজের ছাঁচে চালিয়া গড়িবার চেষ্টা করিলে রক্ষাধারিণী মহাপ্রকৃতি তাহা কিছুতেই সহ্য করিবেন না। ঐরূপ প্রয়াস হইলে সমাজের অধোগতি অবধারিত। প্রাচীন গ্রীসের পরম পণ্ডিত প্লেটো বলিয়া গিয়াছেন যে, মানুষের রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় সমাজ হয়,—যেমন মানুষ তাহারই মত। সামাজিকদিগের বৈশিষ্ট্য অনুসারেই তাহার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়।† একজন খাঁটিয়া নারী তোমার আমার দৃষ্টিতে কুৎসিতা মনে হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের এমন সাধ্য নাই, কোন প্রকারে

---

* Human society is indeed in the nature of an organism in which all the several active parts have a definite function to discharge, and that the healthful condition of the whole depends on the faithful condition and working of the separate and constituent structure.

* There exist no analogies between be body politic and a living body save those necessitated by that mutual dependence of parts which they display in common.

—Principles of Sociology, Vol. I p. 580.

† The States are as men are: they grow out of human character.

মালিয়া ঘষিয়া আমরা সেই খাদিয়া নারীকে কাশ্মীরী নারীর মত করিতে পারি। তাহা আমাদের প্রকৃতিপ্রদত্ত ক্ষমতার বাহিরে। সেইরূপ আপাতদৃষ্টিতে কোন পাশ্চাত্ত্য সমাজ আমাদের দৃষ্টিতে আমাদের সমাজ অপেক্ষা অনেক ভাল মনে হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সেই সমাজের আদর্শে আমাদের সমাজ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে সে-চেষ্টা পণ্ড তো হইবেই, অধিকন্তু এই চেষ্টার ফলে আমাদের সমাজ সংস্কৃত না হইয়া বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সেই জন্য আমরা বৈদেশিক সংস্কৃতি ভারতের স্কন্ধে চাপাইয়া ভারতের প্রগতি সাধন করিতে দেখিলে ভীত হই এবং তাহাতে বাধা দেই। এ পর্য্যন্ত এ চেষ্টার একটিও সফল হয় নাই। এমন কি, বৈদেশিক ভাবে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টাও পণ্ড হইয়া যাইতেছে। যাহারা মুখে খুব দেশাত্মবোধের কথা বলে, দেশাত্মবোধের পরিচয় দিবার জন্য কিছু ত্যাগ স্বীকারও করে, কিন্তু একটু বড় রকমের প্রলোভনের সম্মুখে পড়িলে তাহাদের মধ্যে অনেকেই আর আত্মরক্ষা করিতে পারে না, প্রলোভনের বন্যায় উধাও হইয়া ভাসিয়া যায় এবং নিজ আত্মসার মৃত্তিই প্রকটিত করিয়া ফেলে। অতএব সকলে এই বিষয়টি একটু ধীরভাবে বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করুন।

ধর্ম্মই—ভাবমূলক বা ভক্তিমূলক ধর্ম্মই—আমাদের সভ্যতার প্রধান সংগঠনীশক্তি হইয়াছিল। সেইজন্য ভারত-বাসীরা অতি প্রাচীনকালে সভ্যতার সমুন্নত শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ধর্ম্ম যে মানুষের একটা অতি প্রবল প্রগতিসাধক শক্তি তাহা বহু য়ুরোপীয়ই এখন স্বীকার করিয়া থাকেন। টিয়েলা (Tiela) বলিয়াছেন যে ধর্ম্ম—is one of the mightiest motors in the history of mankind —অর্থাৎ ধর্ম্ম মনুষ্যজাতির ইতিহাসে পরিচালনাশক্তির একটা অতি প্রবল উৎস। ধর্ম্মের কথা তুলিয়া আর একজন বিশিষ্ট য়ুরোপীয় বলিয়াছেন যে, "মনুষ্য-জাতির ইতিহাসে ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকরাই বিশিষ্ট ব্যক্তি। ধর্ম্মের আন্দোলনই জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী আন্দোলন। ধর্ম্মসঙ্ঘগুলিই সঙ্ঘসমিতিগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী। ধর্ম্ম-যুদ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক যুদ্ধ"।* আমাদের দেশেও দেখা গিয়াছে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া মৃতভর্তৃকা নারী পতির অনন্ত চিতানলে হাসিতে হাসিতে জীবন দিয়াছে। তাহার দেহ সেই অনন্ত অগ্নিমধ্যে পতিত হইয়া একবারও কাঁপে নাই। রাজপুতানার রাজপুতনারীরা অনলকুণ্ডে হাসিতে হাসিতে ঝাঁপ দিয়াছে। এখন গঙ্গাস্নানে দরিদ্র লোক কত কষ্ট করিয়া হাঁটিয়া যায় তাহার বিন্দুমাত্র জ্ঞানও যদি আমাদের শিক্ষিত "মডার্নিষ্ট" বাবুদের থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন, এদেশে এখনও—এই নাস্তিকা প্লাবিত সমাজেও—ধর্ম্মের প্রভাব কত অধিক।

যদি হিন্দু-সমাজকে রাখিতে হয়, যদি জাতিকে বাঁচাইতে হয়, তাহা হইলে এই ভারতীয় সমাজকে ধর্ম্মের ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে হইবে। এখন এই সমাজ কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল, সে কথা পরে বলা যাইবে। এবার এই পর্য্যন্ত। ধর্ম্ম কুসংস্কার নহে, অচলায়তন নহে, গোঁড়ামি মাত্র সম্বল নহে। সে কথা সময়ান্তরে বলা যাইবে।

* The greatest figures in human history are the founders of religions. The most influential movements, the most enduring organisations are religious organisations, and the most ruthless of wars have been religious wars.

H. D. A. Major.

---

## ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠত্ব

– কালের আবর্ত্তনে ভারতবাসিগণের মধ্যে যাঁহারা বেতনভোগী নফর, তাঁহারাই আজকে প্রভু, ব্যাভিটেট ও মনু প্রভৃতিরূপে অন্যান্য ভারত-বাসিগণের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া সম্মানিত হইতে পারিতেছেন বটে, কিন্তু এখনও ভারতবর্ষে নফরের সংখ্যা মোট অধিবাসীর সংখ্যার তুলনায় শতকরা দুই জনের বেশী হইতে পারে নাই এবং ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মানী প্রভৃতি যেসব জায়গে শতকরী আশী জন নফর হইয়া পড়িয়াছেন। এই আধিক বৈষম্যের ফলে, ভারতবাসী কৃষকগণের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে বটে, কিন্তু এখনও তাঁহারা বেতনভোগী নফর হইয়া পড়েন নাই, অথচ আমেরিকা প্রভৃতি দেশের কৃষকগণের অধিকাংশই বেতনভোগী নফরীরূপে পরিণতি হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছেন।...

# বিজয়ী

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

## ঐমান ষষ্ঠী

প্রথম বর্ষার ঘন নীল মেঘস্তূপ হইতে যে দিন প্রথম জলধারা নামিল, সেই দিন সকাল বেলা সুমেধার কোলে একটি শিশু জন্মিল। শিশু চোখ মেলিয়া চাহিল এবং অস্ফুট কান্নার শব্দে নিজের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া দিল।

কৈকেয়ীর দিন দারুণ উৎকণ্ঠায় কাটে—অতটুকু শিশুকে কি বিশ্বাস আছে? কে জানে কখন কি হয়!—যে দিন শিশুটি একটু বেশী কাঁদে সে দিনও দুশ্চিন্তা—না জানি কি হইল, যে দিন কম কাঁদে সে দিনও তেমনি।

এক মাস পরে শিশু-প্রসূতি সূতিকাগৃহ-গ্রাহ্য মুক্ত হইল এবং যাত্রীর কোল হইতে কৈকেয়ীর কোলে নিজের স্থায়ী আসনটি পাতিয়া বেশ কায়েমী হইয়া বসিল।

কেশব ও রুক্মিণী কেহই নাই। আনন্দ বার দুই আসিয়া কেশবের দরকারী জিনিসপত্র কিছু কিছু লইয়া গিয়াছে, নিজের কাজ-কর্ম্মও দেখিয়া গিয়াছে। বিদেশে থাকিয়া কেশবের স্বভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সকাল বিকাল নিয়মমত সুবর্ণরেখার তীরে বহু দূর অবধি বেড়াইয়া বেড়ান, ঘরকুনো স্বভাবটা যে নাই, এইটি শুনিয়াই কৈকেয়ী সন্তুষ্ট। তবু মায়ের মন—সেই যে মানুষটি ঘর ছাড়িয়া বাহির হইত না, তার অভাবে মায়ের সব শূন্য। আবার ভাবেন আসিলেই তো ঘরে ঢুকিয়া বসিবে, তার চেয়ে কিছু দিন ঘুরিয়া বেড়ায় সেই ভাল।

এক দিন বলিলেন, "এবার চিঠি লেখ তাই, বৌমা এসে তার নাতিকে কোলে নিক; এক মাস না হলে কাউকে জানাব না ভেবেছিলাম, এখন জানাতে হবে।"

সুমেধা কোন কথা বলিল না। কৈকেয়ী বুঝিলেন, সে লিখিবে না। তখন নিজেই লিখিলেন আনন্দকে। আলাদা করিয়া এক চিঠি দিলেন, সে যেন খুব শীঘ্রই মা-বাবাকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া আসে।

দিন কয়েক পরে চিঠির জবাব আসিল। রুক্মিণী অদেখা নাতিটির জন্য বিষম ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু আনন্দ আসিতে রাজী হয় না।

আনন্দ লিখিয়াছে, "একটা ক্ষুদ্র প্রাণীর আগমন এমন কি গুরুতর ব্যাপার যে, অবিলম্বে দেশে ফিরিতে হইবে? বাবা ভাল আছেন, আমি তাঁকে আরও কিছুদিন বাড়ী যাইতে দিব না। অমন কত শত প্রাণী নিত্য সংসারে জন্মগ্রহণ করে—কি তাহাতে আসে যায়?"

কৈকেয়ী বলিলেন, "আনন্দটা ইচ্ছে করে আমার সঙ্গে চালাকি করছে! এখন ওদের আসতেই হবে; না হয় পুজোর পর আবার যাবে। পৌত্রের মুখ দেখা ভাগ্যের কথা—দেখবে না?"

সুমেধা মুখে আঁচল চাপা দিয়া হাসিতে লাগিল। কৈকেয়ী বলিলেন, "হাসছিস যে?"

"তোমার কথা শুনে! ঐ এক কোঁটা মানুষকে দেখা ভাগ্যের কথা? কেন? উনি কি কোন অবতার না কি?"

"অবতার কি না তুই তার কি জানবি?"

শিশুর নাম কৈকেয়ী রাখিলেন বঙ্কিমলাল। নাম শুনিয়া সুমেধা আবার হাসিল। বলিল, "দুশো বছর আগেকার পুরোনো নাম।"

কৈকেয়ী বলিলেন, "সেই আমার ভাল।"

একরত্তি শিশু সবে হাত পা নাড়িয়া খেলা শিখিতেছে। চোখের দৃষ্টি অর্থহীন—অবাক্ হইয়া কি দেখে সে-ই জানে। একমাত্র সম্বল কান্না। এই তো সম্পদ, অথচ ইহাই দিয়া সে কৈকেয়ীকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কৈকেয়ীর সমস্ত মন হরণ করিয়া লইয়া নির্ভয়ে সে দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল।

কৈকেয়ী বলেন, "এবার ষষ্ঠীর জামা-টামা সেলাই কর।"

চোখ দুটি টান করিয়া সুমেধা বলে, "থাক, থাক, আমি কি মাইনে-করা দর্জ্জি?"

ছেলের সঙ্গে সুমেধার কোন সম্বন্ধ নাই—ছেলের সীমানায় সে ঘেঁসে না।

সেদিন অনেক দিন পরে সুমেধা বৈকালের প্রসাধনটা ভাল করিয়া করিল। অহর্নিশি কৈকেয়ীর চোখ থাকিত তাহার উপরে, সুতরাং অহর্নিশিই সে সাজিয়া থাকিত।

এখন কৈকেয়ী বন্ধীকে লইয়া থাকেন, সুবেলাও নিজের খেয়ালের বল্গা ছাড়িয়া দিয়াছে—এলো চুলে এলোমেলো বেশে থাকে। বেশীর ভাগ বই পড়ে, কেশবের বইগুলি তাহার নাম কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে এই সময়ের মধ্যে। শেষ যে বইখানা কেশব লিখিয়া গিয়াছেন—সেখানা ছাপা হইয়া আসিয়াছে। উৎসর্গ করিয়াছেন তাহাকেই,—"আমার পাগলী ছোটমাকে।" কৈ কৈকেয়ী তো একবারও বলিলেন না, "আমায় পড়ে শোনা!" সব চেয়ে কি বন্ধীই তাঁর প্রিয় হইয়া উঠিল না কি?

এই সব ভাবিয়া কিম্বা নিজের ইচ্ছাতেই সুবেলা আজ আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া বহু করিয়া লাল ফিতা দিয়া চুল বাঁধিল। আলমারী খুলিয়া একখানা নতুন শাড়ী বাহির করিল।

এই রঙের শাড়ী পড়িলে কৈকেয়ী তাহাকে 'পাতা ঝরা ফুল,' 'ফুলের তোড়া' বলিয়া আদর করিতেন। কিন্তু আজ তিনি চাহিয়াও দেখিলেন না। বন্ধীকে কাজল পরাইতে পরাইতে বলিলেন, "মাসী পিসীর পুরোণো কাপড়ের জামা, কাঁথা কচি ছেলেকে আগে দিতে হয়—শ্রীতির কাপড় আছে, তাই কেটে বন্ধীর জামা সেলাই কর।"

অমনি অনাদৃতা তীব্র ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "ছাই করবেন! দিন হাত একটা শালিকের ছানা নিয়ে আজাব। আর কারও দিকে চেয়েও দেখা হয় না। আমরা যেন কেউ নই।" অভিমানিনী ফিরিয়া চলিল।

"শোন শোন, রাগ করিসনে লক্ষ্মী, আসলের চেয়ে সুদ যে বেশী মিষ্টি।"

"বেশ, বেশ, থাকো তোমার সুদ নিয়ে, আসল চললো," সুবেলার চোখে জল আসিয়া গিয়াছে।

সে যাব ভাঙাইতে যাওয়া কৈকেয়ীর হইয়া উঠিল না। বন্ধীর ঘুম পাইয়াছে, কোল হইতে তাহাকে নাবাইবেন কিরূপে? রাত্রে খাইবার সময় সুবেলার খোঁজ পড়িল। কৈকেয়ী বলিলেন, "যাঃ, নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে, বৌমা তুলিয়ে তালিয়ে জাগিয়ে আনতো, আমার মনেও নেই। নাঃ বৌমা না এলে হচ্ছে না"—বলিয়া নিজেই সন্ধানে গেলেন। অন্ধকার ঘরে বিছানায় সাজসজ্জা শুদ্ধ সুবেলা ঘুমাইয়া রহিয়াছে। আলো আলিলেন, মুখের ভাব তেমনি অভিমানে ভারী। বড় মায়া হইল—এমন আদরের পুতুল যে, অনাদর কি তার সয়?

চোখে জল দিয়া অনেক করিয়া ঘুম ভাঙাইয়া খাইতে পাঠাইয়া দিয়া কৈকেয়ী বসিবার ঘরে ফিরিলেন। জানকী আলিয়া ঘরের মেঝের পাতা কম্বলে বই লইয়া বসিয়াছে। বলিল, "মা, দাদার নতুন বইখানা শুনবে না?"

"শুনব, পড়।"

"লক্ষ্মণ আসুক, সে পড়ে শোনাবে। এটা কবিতার বই যা—দাদা আবার কবিতা লিখতে পারে জানতাম না।"

বিছানার আধখানা জুড়িয়া ছোট্ট বগলীর ভিতরে বন্ধী ঘুমাইয়া আছে, একবার তাহাকে দেখিয়া কৈকেয়ী বলিলেন, "ঐ সব নিয়েই তো দিন কাটাচ্ছে—যেমন ছিলেন তিনি, তেমনি ছেলে!"

একটু পরে সুবেলা আসিল। একটা লম্বা ঘুম দিয়া রাগ রোষ মিটিয়া গিয়াছে। জানকী বলিল, "বৌকে পড়ে শোনাও।" অমনি শিষ্ট বালিকার মত বইটি লইয়া বসিল।

একটা একটা করিয়া তিন চারটা কবিতা পড়া হইল। কবিতাগুলি ছোট কিন্তু প্রত্যেকটা কবিতার মধ্যে একই ভাব—একটা সন্দেহ, একটা আবেগ, একটা উদ্বেগ ফুটিয়া উঠিয়াছে ছত্রে ছত্রে। একটা কবিতার প্রথম দিকে লেখা—

আষাঢ় আকাশ
রবি শিখা ম্লান হয়ে আসে,
ঈষৎ ঘুমের ছায়া ভাসে নদী নীরে
ধীরে ধীরে—
দিবসের মুহূর্তের আলোকের রেখা
মিলাইয়া গেল,—
কিছু নাহি যায় দেখা।

অপর একটার শেষের দিকে—

ওরে মাঝি ওরে
নদীটিকা আসে কেন কিসে অনুমান?
ও-যে আলোর আলো—দূর হতে লাগে ভালো
পরশিলে মন কেঁদে ফেরিবে জীবন।
—
জ্বলিছে দক্ষিণ দীপ সমুখে তোমার
বেয়ারীরে তীরে থাক সেই দিকে মন রাখ—
নিমেষে মুহূর্ত-দরী হয়ে যাবে পার।

কৈকেয়ী বলিলেন, "এ আবার কি কবিতা? কেশব তো হেঁয়ালীর মানুষ নয়?"

জানকী বলিল, "কবিতার আবার মানে কি মা? যখন যা মনে হয়েছে লিখেছে। আর একটা পড়,—"

সুধেষ্ণা পড়িতে লাগিল—

সময় উড়িয়া চলে পক্ষ প্রসারিয়া
শঙ্কিত তীরে দিয়া তীরে দাঁড়াইয়া,
কৈশব তরণীময় তীর পারাবার
কে আমারে করে দেবে পার?

কৈকেয়ী চুপ করিয়া আছেন—একটা ঘন চিন্তার ছায়া পড়িয়াছে তাঁহার কপালে; কি এ কবিতা? অর্থ কি? কি মনে করিয়া কেশব লিখিয়াছে! এ সব দুরূহ প্রশ্ন কাহাকে?

## ষষ্ঠীতলায় ষষ্ঠীদাস

তিথি ষষ্ঠী। কৈকেয়ীর মানসিক পূজা শোধের দিন। সদলবলে তিনি ষষ্ঠীতলায় পৌঁছিলেন।

হেমন্তের ভোর—সবে মাত্র তরুণ সৌম্য শিশির মাখা গাছের মাথায় পড়িয়াছে—তখনও মাটীতে নামে নাই। ঝোপে ঝাড়ে নানা রঙের বনফুল ফুটিয়া রহিয়াছে; এক অপূর্ব্ব মিগ্ধ বন্য সুবাসে বাতাস ভরা।

সুধেষ্ণা ইচ্ছা করিয়া গাড়ীখানা ঘেঁসিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—গাড়ীর শিশির তাহার স্পর্শে ঝর ঝর করিয়া ঝরে—কাপড় ভিজিয়া যায়, ষষ্ঠীতলায় আসিলে সে যেন হারানো শৈশব ফিরিয়া পায়, মনে এক বিচিত্র উল্লাস জাগে।

এ দিকে শঙ্খ-ঘণ্টার শব্দে আশ-পাশের দরিদ্র পল্লীর লোকেরা ছুটিতে লাগিল। ধূপের ঘন পুঞ্জ ধূম্ররাশি পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিয়া, বায়ুমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িতেছে। বিপুল পূজার আয়োজন—বড় বড় রূপার থালায় বেনারসী শাড়ী, সোনার হার, নথ, বালা—সিন্দুর, শাঁখা, আলতা, নৈবেদ্য, ফুল-চন্দন—অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া আর তিল ধরিবার স্থান নাই। ফুলে ফুলে ঘট বেদী ঢাকিয়া গিয়াছে।

পূজা ও আরতি শেষ হইলে পুরোহিত বলিলেন, "মা শিশুকে এখানে রাখুন।"

কৈকেয়ী বল্লীকে আস্তে আস্তে বেদীতলে নামাইয়া দিলেন—হঠাৎ ঠাণ্ডা ও শক্ত সিহাসন পাইয়া বল্লী চমকিয়া উঠিয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিল—তার পর হাত পা নাড়িয়া খেলিতে আরম্ভ করিল।

পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন, "আহা, মায়ের মাস কি না, তাই কাঁদলে না।"

প্রসাদী ফুল নির্ম্মাল্য বল্লীর কপালে ছোঁয়াইয়া শান্তি-জলের ছিটা দিয়া বলিলেন, "এবার তুলে নিন।"

কৈকেয়ী বল্লীকে তুলিয়া লইলেন। সঙ্গের পাড়াপড়শী মেয়েরা জিনিস পত্র গুছাইয়া দিলে ঝিয়েরা তাহা গাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিল। সব শেষে কৈকেয়ী নিজের গাড়ীতে উঠিলেন।

সেই সময় টিনের ঘরটির পিছন হইতে করুণাকে আসিতে দেখা গেল। সুধেষ্ণা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "দিদি, বৌদি এসেছে—"

"যা, দেখা করে' আয়।"

কৈকেয়ী পূজা দেন খুব সকালে, সেটা সকলেই জানে। সেই জন্য ষষ্ঠীতলার মেয়েরা একটু দেরী করিয়াই আসে। আজ হঠাৎ দেখা হইয়া গেল।

বড়-গিন্নী, মেজ-গিন্নী ও করুণা, আর কেহ তখনও আসে নাই। সুধেষ্ণাকে দেখিয়া করুণা টিনের ঘরে হাতের থালা রাখিয়া আসিল, সুধেষ্ণার পিছনেই কৈকেয়ী বিমুর কোলে বল্লীকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া করুণার আর সুধেষ্ণাকে কোন কথা বলা হইল না, হাত বাড়াইয়া বল্লীকে টানিয়া লইল।

সুধেষ্ণা বলিল, "কই? খুকুমণি কই? আন নি?"

মাস দেড়েক হইল করুণার একটি মেয়ে হইয়াছে।

"নাঃ, উনি ওদের নিয়ে রইলেন। ও মা কি খুশি ছেলে, কি হাসি!" দেখিতে যে সুন্দর সে কথা করুণা মুখে উচ্চারণ করে না, কি জানি কার নজর লাগিবে! তাহার নিজের চোখেই যখন এত ভাল লাগিল।

"হ্যাঁ রে, তোর শাশুড়ী আসবেন না? আহা, দেখলে কি খুশি হবেন। কবে আসবি লক্ষ্মী? তোর দাদাকে না দেখাতে পেলে আমার সুখ নেই।"

সুধেষ্ণা মুখ ভারী করিয়া বলিল, "অন্নপ্রাশন না হলে পাঠাবেন না।"

মেজগিন্নী আদর করিয়া বল্লীকে কোলে লইলেন, "কেমন চুল হয়েছে মাথা ভরা, মার মতনই। চাঁদের টুকরো, তোর দিদি বুঝি চোখে হারাণ না রে?"

বড়গিন্নী শুধু চাহিয়া দেখিলেন, কোলে আর লইলেন না। বলিলেন, "তেমন মোটা হয় নি, বেশী বয়সের ছেলে দিব্যি মোটা-সোটা হবে। আমার সুশীর ছেলে মেয়ে, বলতে নেই—ঠিক যেন সাহেবদের মতন।"

বড়গিন্নী দিন কয়েকের জন্য দেখে আসিয়াছেন।

করুণা আবার বন্ধীকে লইল, "মনে হচ্ছে ওঁকে দেখিয়ে আনি।"

"থাক, থাক, তিনি দেখেই ওকে বেশী ভালবেসে ফেলবেন। দিদি তো আমার দিকে চেয়েও দেখে না—দিন রাত বুকে নিয়ে আছে; তুমিও যেই দেখলে অমনি পর হয়ে গেলে, ভাল করে কথাই কইছ না আমার সঙ্গে।"

করুণা হাসিয়া সুরেকার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল, "হাঁারে বুড়ো খুকী, এত দিন মা সরস্বার আদরের ঢেঁকী হয়ে ছিলি—তাতেও সাধ মেটেনি? আবার ওর হিংসে করছিস? এখন যে ওরই রাজত্ব।"

সুরেকা বলিল, "ইস্, আমি তা মনে করি না।"

"এত দিন যেমনি ছিলাম এক রকম, এখন তো দিন-রাত বন্ধীর মুখ মনে পড়বে! কবে অন্নপ্রাশন?"

"কি জানি, ঠিক হয়নি এখনও, বোধ হয় মাঘ মাসে।"

বিন্দু বলিল "এবার চল বৌদি, দিদিমার আজ অনেক কাজ।"

"চল যাই বৌদি, তোমার জন্যে আজ গাড়ী পাঠালেন, দিদি বলছিলেন। আসবে তো?"

"সুবলের জ্বর, গাড়ী পাঠাতে বারণ করিস।"

"তা হলে আমি যাই বৌদি? মা নেই, দিদি একা, সব ওঁকে দেখতে শুনতে হয়, আজ তো কত কাজ।

"তুই কিছু সাহায্য করিস নে না কি?

সুরেকা হাসিয়া বলিল, "করতে দিলে তো? সন্ধ্যার আগে আমায় বাইরে যেতেন, সন্ধ্যে হলে আর ঘর থেকে বেরুনো নেই, বন্ধীর ঠাণ্ডা লাগবে, বন্ধীর অসুখ করবে, দিন-রাত বন্ধী আর বন্ধী। তা যদি পার বৌদি একবার এসো, গাড়ী না হয় বৈকালে পাঠাবো।"

করুণা বলিল, "না রে, তোর শাশুড়ী এলে একবার যাব—এখন না।"

"তবে আমি যাই,"—ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে সুরেকা চলিয়া গেল। বিন্দুও গেল। করুণার একবার মনে হইল সঙ্গে গিয়া বৈকেয়ীর সঙ্গে সেবা করিয়া আসে। পা বাড়াইতে গিয়া থামিল, বৈকেয়ীর সামনে যাইতেই ভয় করে—কল্পিনীর আড়াল থাকিলে সহজ হইত।

বড়গিন্নী একটু উঁকিঝুঁকি দিয়া দেখিলেন, এখান হইতে পথ দেখা যায় না। বলিলেন, "নাঃ লক্ষ্মণ ছেলেকে তেমন যত্ন-আত্তি করে না। আমার সুশীর তো মায়ের যত্নায় এই তিনটি—দিনরাত তাদের নিয়ে অজ্ঞান।"

করুণা মলিন মুখে বলিল, "লক্ষ্মণের মন যে বড্ড কাঁচা দিদি—ও একটু বয়লায় নি, ছোলের ছেলের মতন আদর কেড়ে নেয়। ওকেই যে দেখতে হয় এখনও। ও আবার ছেলেকে দেখবে কি?"

"তোর যেমন কথা! আঠারো উনিশ বয়েস, এখনো ছেলেমানুষী করলে মানায়, না, ভাল দেখায়?"

করুণা বলিল, "সবার খেলার পুতুল হয়ে রয়েছে।"

"তা বলে কি খুকীটি হয়ে থাকলে চলে! সুশী কিই বা বড়—কেমন ঘরকন্না বুঝে নিয়েছে, কত বুদ্ধি বিবেচনা। নাও ওঠ এখন। বড় লোকের বাড়ীর প্রসাদের ভরসা তো রোজ নয়, ও দু'-একদিন হলেই কি, না হ'লেই কি।"

বন্ধীদাসের মানসিক পূজা শোধ উপলক্ষে গ্রামে চৌধুরী বাড়ীতে বন্ধীতলার সমস্ত পুরুষদের নিমন্ত্রণ এবং এ বেলা বাড়ী বাড়ী মেয়েদের জন্য প্রসাদের ডালা পাঠান হইবে, খুব ভোর বেলাই নিমন্ত্রণ হইয়া গিয়াছে।

মেজগিন্নী বলিলেন, "সুশীর ছেলের অন্নপ্রাশন হবে কবে?"

"অঘ্রাণেই খুব ঘটা করে হবে, দু' মেয়ের পর ছেলে, তাই না আবার ফেরবার এত তাড়া? আমায় আসতেই দিতে চায় না, এলাম বলে নিজের ঘর-বাড়ীটা দেখব বই কি একবার।"

"তবে চল, বড়লোকের প্রসাদ আমরা চাই বা না চাই, নিজেদের নিশ্চয়ই চাই—তোমার নাতির অন্ন ঘটা করে অন্নপ্রাশন হবে, আমাদের সবাইকে নিয়ে যাচ্ছ তো? দেখ, ফাঁকি দিও না যেন, আমায় বলিলাম"—বলিয়া একগুণ কথার দ্বিগুণ শোধ দিয়া মেজগিন্নী বড়গিন্নীর মুখের দিকে চাহিয়া জয়ের হাসি হাসিয়া লইলেন।

অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ

অনেকদিন পরে প্রতিমা আসিল।

সংসারে যে যত ভাল, দুর্গতি তাহাই তত বেশী। প্রতিমার স্বামী সুরেশরা দুই ভাই। সুরেশের যেমন মাতৃভক্তি তেমনি ভ্রাতৃস্নেহ। সামান্য আয়ের চাকুরী করে, ভাইকে পড়ায়। ভাই রমেশও মাদার অসুস্থ বলিয়াই জানা ছিল, কিন্তু বছর সাতেক আগে চাকায় এক বন্ধুর বাড়ী বেড়াইতে গিয়া এক পরমা সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে। বিবাহ-বার্তাটা ছিল গোপন। তার পরে রমেশ চাকায় ডাক্তারী করিতে বসিল, এদিকে সুরেশ তাহার বিবাহের উদ্যোগে লাগিল। তখন রমেশকে বাধ্য হইয়া সব প্রকাশ করিতে হইল। সুরেশ মনে কষ্ট পাইলেও ভাই-বৌকে বাড়ীতে আনিবার যোগাড় করিয়াছিল, কিন্তু বউটি তখন অত পাড়াগাঁয়ে আসিতে কিছুতেই রাজী হইল না। বিবাহের আগেই সে চাকার স্কুলে পড়িত। বিয়ের পরেও স্কুল ছাড়িল না। এদিকে সুন্দরী বউয়ের পাল্লায় পড়িয়া রমেশের প্র্যাকটিস মাটী হইয়া গিয়াছে। অগত্যা কলপাইগুড়িতে এক চা-বাগানের ডাক্তার হইয়া গিয়া এখন সেখানেই আছে। বউটিও ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়া স্বামীর কাছে গিয়াছে। কোলে তিনটি ছেলেমেয়ে। সতীন সংসার হইতে মেডিক্যাল কলেজের খরচ যোগাইতে সুরেশের অনেক টাকা দেনা হইয়াছিল। সেই দেনা শোধ করিতে এখন সুরেশের মাথার ঘাম পায়ে পড়িতেছে।

বাপের বাড়ীতে ঢুকিয়া মেয়েরা সমস্ত দুঃখ চিন্তা ভুলিয়া যায়। তা ছাড়া প্রতিমার বয়সও খুব বেশী নয়, এ বয়সে দুর্ভাবনার ভারে দমিয়া পড়ে না। গাড়ী হইতে নামিয়াই প্রতিমা উর্দ্ধশ্বাসে উপরে ছুটিল—ছেলেটি ছিল পিছনে পড়িয়া; খুকীকে কোলে করিয়া কৈকেয়ী বসিয়া আছেন, প্রতিমা একেবারে খুকীর উপরে ঝুঁকিয়া পড়িল।

"থাম থাম, এত দেরী হলো কেন? গাড়ী পাঠিয়েছি কোন্ ভোরে, ছেলে কই?

"আসছে,—কি সুন্দর খোকা হয়েছে মিদি, কি চমৎকার গড়ন—"

কৈকেয়ী বলিলেন, "ওর মা'র গড়ন পেয়েছে।"

"ছেলেটি কিন্তু বৌদির চেয়ে ঢের ফরসা, না? এতটা ফরসা থাকবে না, আর একটু ময়লা হবে। দাদা বাবী কবে আসবেন মিদি?"

"বৌমা তো আসবার জন্যে পাগল। আসতে চাইছে না, তবে অন্নপ্রাশনের আগে আসবেই।"

"কবে অন্নপ্রাশন হবে?"

"মাঘ মাসে যেদো ভেবেছি—এখন আসেন মা ষষ্ঠী। তখন কিন্তু নিশ্চয় আসবি।"

প্রতিমা হাসিয়া বলিল, "সে আর বলতে, অন্নপ্রাশনের পর একবার নিশিন্দা যেতে হবে মিদি, আমার শাশুড়ী দেখবেন।"

"তা যাব। তোর দেওর বা আসবেন বেশে?"

"জানিনে তো, চিঠি লিখে জবাব দেয় না।"

"নিয়ম মত নেমন্তন্ন করবো, খরচ পাঠাবো, আসা না আসা তাদের খুশি"—বলিয়া কৈকেয়ী ঘুমন্ত খুকীকে লইয়া উঠিয়া ঘরে গেলেন। পিছন হইতে তাকাইয়া প্রতিমার চোখ টিপিয়া ধরিল।

"আঃ বুঝেছি বুঝেছি, ছাড় বৌদি।"

সুরেখা হাসিয়া সামনে আসিল। প্রতিমা বলিল, "এই যে, সাজ-পোষাকের ঘটা তেমন নেই। ও হবেই, ক'দিন না কোলে একটি আসে ততদিনই মা'দের বাহাদুরি।"

"সেইজন্যে বুঝি? আজ আমি রাগ করে সব খুলে ফেলেছি। মিদি দিনরাত বাচ্চাটাকে নিয়ে ব্যস্ত, আমার কথা জানেই নেই। বিশ্বাস করে' আমার কাছে যেন না, বলেন ফেলে যেয়ো।"

"আহা, হবেনা? কত সাধের জিনিস যে, তুই কি বুঝবি বল। তোর যখন নাতি হবে, তখন বুঝবি।'

"থাক, থাক, তোমার আর গিন্নীপনার দরকার নেই, এত দেরী করলে কেন তাই বল—আমি ওবেলা থেকে পথ চেয়ে আছি।"

"সব সেরে তবে তো আসবো। ওকে দেখবার জন্যে মন ছটফট করছিলাম এতদিন? কি নাম হয়েছে রে?"

"যজ্ঞদাস, অন্নপ্রাশনে একটা ভাল নাম রাখবেন মিদি।"

শশী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মিদিমণির বিছানা কি মিদিমণির ঘরেই করবো?"

প্রতিমা বলিল, "বৌদি কোথায় থাকিস ?"

"দিদির কাছে।"

"তবে আমি একা গিয়ে ও ঘরে কিছুতেই শোব না।"

"তা হলে সুরেশ বাবুকে কেন সঙ্গে করে আনলে না ?"

"তবা কেমন কথা শিখেছিস। তা তোর আমার একই দশা, কাজেই একই বিছানায় শোব।"

"আমার দশা টশা নেই—আমার যার দায় সমায়, ও দশা তোমাদেরই রয়।" বলিয়া সুরেজা শশীকে বলিল, "দিদির ঘরের মেঝেয় বড় করে বিছানা কর।"

"বসবার ঘরের মেঝেয় ?"

"না না, সেখানে আমরা একা থাকবো না কি ? দিদির শোবার ঘরের মেঝেয়—চল দেখিয়ে দিচ্ছি।"

তিন জনে কৈকেয়ীর শুইবার ঘরে আসিয়া ঢুকিল। সুরেজা বলিল—"মেঝেয় পেতে বিছানা কোরো।"

ঘরের একদিকে প্রকাণ্ড খাট, চারিদিকে রেলিং-ঘেরা, প্রায় দেড় হাত উঁচু রেলিং, বিছানার ঠিক মাঝখানে প্রায় আধ হাত উঁচু একটি রঙীন ছোট বিছানা, শিয়রে এক থাক ওঁজ করা কাঁথা। দুইদিকে বড় বড় মাথার বালিশ ও পাশ বালিশ। পায়ের দিকে ওঁজ করা কম্বল। ছোট বিছানাটির পায়ের কাছেও একটি ছোট জয়াড় পরানো কম্বল।

প্রতিমা বলিল—"ওরে বাসরে, বাবুর বিছানার কি ঘটা ! এ খাট হলো কবে ?"

"বঙ্গী হবার পরে।"

"গদীর উপর গদী ! কেন, অতটুকু ছেলের আবার গদী কেন ?"

শশী বলিল, "ও দিদি, তুমি তো জানবা, বৌদির যে ঘুম—ছেলেকে চাপা দেবে না ? ঘুমোলো তো অজ্ঞান—এক দেশ থেকে আর এক দেশে টেনে নিয়ে গেলেও জাগে না। তাই না বিছানা উঁচু। তাতেও দিদিমণির বিশ্বাস হয় না, দুদিকে পাশ বালিশ দিয়ে আড়াল করেছে।"

"নীল রঙের বালিশ, বাসন্তী রঙের বিছানা, একেবারে রাজযোটক। তা রাজাটি গেলেন কোথা ?"

"দিদির বসবার ঘরের বিছানায় ঘুমোচ্ছে। সেখানে আর একটা বিছানা আছে। দিনের বেলা তো এ ঘরে আমরা আসিনে।"

"তা এখন যাবা আসুক, ছেলে দেখবে না ? তুই তাগাদা দিয়ে নেখ না।"

"যা আমার ঘরে নেই। চল, কাপড় কেচে ফেলি, এরপর দিদি বসবেন বঙ্গীর ঠাণ্ডা লাগলো।"

"দিদি বড্ড সাবধানী, দেখবা কি উঁচু রেলিং, আমরা তো চৌকিতে ছেলে কোলেই ঘুমিয়েছি, শাশুড়ী কিছু বলেন নি।"

"শুধু কি রেলিং ? রাত্তিরে বঙ্গী কেঁদে উঠলে আমায় উঠে বসে তবে তাকে নিতে হবে, দিদিও জেগে থাকবেন, শেষে ও ঘুমোলে তবে তাকে নিয়ে ঘুমোবেন।"

প্রতিমা হাসিয়া বলিল, "এর পরে মামা-মামী এলে আরো মজা হবে।"

"তুই এখন আসিস ভাই, নইলে সে মজা আমার একা দেখে সুখ হবে না। যে আর, এখন বেলা গেল।"

"চুল বাঁধ আগে।"

"রোজ রোজ চুল বাঁধা ভাল লাগে না আমার, খোঁচড়ে গুঁজিয়ে রেখে দি।"

"তা সহি, মাথা নেই কারে, নিয়া নতুন খোঁপা বেঁধে কাকে দেখাবে বল।"

"তোমার দাদার জন্যে খোঁপা বাঁধতে হবে নেছে আমায়, সধাইকে নিজের মত ভেবো না। আসবে তো এসো, আমি চললাম। উঠতে বসতে এক কৌটা ছেলের জন্যে রকমি খাবার সাধ নেই আমার।"

## বন্ধন-মুক্ত

পর দিন সকালবেলাকার কাজকর্ম সারিয়া কৈকেয়ী রান্নাঘরে বঙ্গীকে তেল মাখাইতে বসিয়াছেন। রান্নাঘর-করা রোদ, এক গামলা জল রোদে দেওয়া, তাহাতে সোটা কয়েক সজনে ডুমুর ভাসমান, সেই জলে বঙ্গীর স্নান হইবে।

সুরেজা কাছে বসিয়া চুলের জট ছাড়াইতেছে, কৈকেয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রতি কই।"

"উষার সঙ্গে খেলা করতে গেছে, ওকে একলাটি রাখতে যায়।"

"তুই আজ গায় জল দিস নে, বঙ্গী আজ রাত্তিরে ছ'বার কেঁদেছিল।"

"খুকী নাইবে, আর আমি নাইবো না? ভারী মজা তো!"

"তোকেও নাইয়ে কাজ নেই, গরম তেলটা হাতে পায়ের তলায় মালিশ করে দিই।"

সুদেষ্ণা গামলার জলে হাত ডুবাইয়া বলিল, "চোদ্দে থেকে থেকে জল দিয়ে গরম হয়ে গেছে, এ জলে নাইলে কি হবে?"

"অসুখ করবে।"

সুদেষ্ণা নিরাশ হইল, প্রতিমার সঙ্গে সাঁতার কাটিয়া স্নান করিবার সাধটা সুদ্ধেই মিলাইয়া গেল। একবার ছেলের দিকে বিরক্তি-ভরা চাহনি হানিয়া খোলা চুল আঁটিয়া জড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

বিন্দু দু'খানা চিঠি আনিয়া সুদেষ্ণার হাতে দিল। দু'খানাই সেকাকা। কৈকেয়ী চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "বৌমার চিঠি, কি লিখেছে পড় শুনি।"

অন্য চিঠিখানার উপরে আনন্দের হাতের লেখা ইংরাজীতে—শ্রীমতী সুদেষ্ণা চৌধুরাণী। বারেক সে খানার দিকে বক্র কটাক্ষপাত করিয়া সুদেষ্ণা রুক্মিণীর চিঠিখানি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল:

শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ ভরসা।

"শ্রীচরণে প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন মা, কাল তোমার চিঠিখানা পেয়েছি, কাল সময় করে উঠতে পারিনি বলে উত্তর লেখা হয়নি, আজ সকালে উঠেই লিখতে বসেছি।

"আজ পর্য্যন্ত আমি তোমায় কিছুই লিখিনি মা,—লিখতে পারিনি। লিখতে হাত ওঠে না, সেই ভয়ে লিখিনি, কেমন করে লিখবো মা? তুমি যে আমাদের পথের দিকে চেয়ে রয়েছ।

"ভয় লিখতে হবে, পৃথিবী-মা সমস্ত অন্যায়-অত্যাচার সহ্য করেই সকলকে কোলে নিয়ে রয়েছেন, তুমিও যে মা সেই পৃথিবীরই মতো,—কিন্তু তোমার অসীমধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙবে কি না তাই ভয় হচ্ছে। আমার অপরাধ নিয়ো না, আজ যা কিছু সব তোমায় জানাব—"

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া সুদেষ্ণা মুখ তুলিল, একটু উদ্বেগের সঙ্গে বলিল, "মা এসব কি লিখেছে, দিদি? পড়ে যেন ভয় হচ্ছে—"

কৈকেয়ীরও হাতের কাজ থামিয়া গিয়াছে। চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "দে দেখি আমার চিঠি।"

সুদেষ্ণা চিঠিখানা তাঁহাকে দিল। সেখানা বাঁ হাতে লইয়া নিজের অপর পাশে রাখিয়া দিয়া তিনি খুকীর তেল মাখানো শেষ করিলেন। নরম কাপড়ে তাহার গা মুছাইয়া জামা পরাইলেন। দুই চক্ষে কাজল এবং কপালের বাঁ দিকে একটি কাজলের টিপ দিয়া বলিলেন, "যে, ঘরে নিয়ে গিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আয়—"

সুদেষ্ণার মন রহিয়াছে রুক্মিণীর চিঠির উপর; অনিচ্ছার সঙ্গে বলিল, "এখন কি ঘুমোবে? চেয়ে রয়েছে যে?"

"তা থাক, ওর খিদে পেয়েছে, সকালের পর আর দুঁস নি তো?"

"আর চিঠিটা—"

"চিঠি পালিয়ে যাচ্ছে না, আমি পড়ে তোকে দিয়ে আসবো—তোর নিজের চিঠি নিয়ে যা—"

অগত্যা নিজ পত্র ও পুত্র লইয়া সুদেষ্ণা উঠিয়া ঘরে গেল। কৈকেয়ী বলিলেন, "ছেলে কোলে নেবার ছিরি দেখ, দেখিস পড়ে না যায়, সাধে কি তোর কাছে দিই না!"

সুদেষ্ণা জবাব দিল, "কেই বা নিতে যায়।"

কৈকেয়ী রুক্মিণীর চিঠি লইয়া উঠিলেন, নিজের পূজার ঘরে গিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া চিঠির বাকী অংশটা পড়িতে বসিলেন:

"প্রায় মাস তিনেক আগে একদিন সকালবেলা আমরা বেড়াচ্ছিলাম। আরও দু'চারজন ভদ্রলোক ছিলেন একটু দূরে, এমন সময় দেখি একটা গাছের নীচে একজন লোক দাঁড়িয়ে জলের দিকে চেয়ে আছেন। তাঁকে দেখা মাত্র ভদ্রলোকরা সরে দাঁড়ালেন, তার মধ্যে দু'একজন এগিয়ে গিয়ে দূরে থেকেই প্রণাম করলেন, কিন্তু তিনি চেয়েও দেখলেন না। তখন তাঁরা ফিরে এলেন। তাঁদের ভয় ভয় ভাবটা দেখে আমরা একটু আশ্চর্য্য হলাম। বাড়ী ফেরবার পথে তোমার ছেলে তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, কে উনি?

"তাঁরা বললেন, উনি একজন মহাযোগী সিদ্ধ পুরুষ। আশ্রম কোথায় কেউ জানে না। কেউ বলে, কোন গুহায়, কেউ বলে কোন বরফ-ঢাকা পাহাড়ে। কিন্তু অনেক জায়গায়

ওঁকে দেখতে পাওয়া যায়। কথা তিনি কারও সঙ্গেই কন না, নেহাৎ যার অদৃষ্টের জোর তারই কথার জবাব দেন। ওঁর দিকে চেয়ে কথা বলতে তারো সাহস হয় না।

"পরের দিন আমরা আবার নদীর ধারে বেড়াতে গেলাম—আমারও মনে সাধ ছিল আর একবার দেখবো। আগে তো জানিনে, নইলে একবার সামনে যেতাম। কিন্তু পাঁচ-ছ' দিন আর দেখা পেলাম না। এ দিকে তোমার চিঠি পেয়ে বাড়ীতে ফেরবার জন্যে তৈরি হতে লাগলাম, ওঁর কথাটা এক রকম ভুলেই গেলাম।

"সাত দিনের দিন বৈকালে নদীর ধারে বেড়াতে গেছি, তার পর দিনই ফিরবো, সব ঠিকঠাক। এখানকার পথ বড় সুন্দর মা, আমলকী হরিতকী অর্জুন গাছের তলা দিয়ে পথ বেড়াতে বেড়াতে কতদূর চলে যাই, তবু ক্লান্তি আসে না। এই পথে সকাল-সন্ধ্যে বেড়িয়ে বেড়িয়েই তোমার ছেলে এত শীগগীর সেরে উঠতে পেরেছেন।

"সেদিনও বসতি ছেড়ে অনেক দূর চলে গেছি—দুধারে ঢালু, নদীর জলে রাঙা আলো পড়ে সুবর্ণরেখা নাম সার্থক করেছে, গাছপালার ছায়া উঠেছে ঘন হয়ে। হঠাৎ দেখি একটা গাছের নীচে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে।

"কাছাকাছি গিয়ে ঠিক সামনে দিয়ে না গিয়ে একটু পিছন দিক দিয়ে ঘুরে তোমার ছেলে তাঁর কাছে এলেন। তার পরে প্রণাম করে দাঁড়ালেন। আমিও ওরে ওরে পিছন পিছন গিয়ে প্রণাম করলাম।

"সূর্য্যের দিক্ থেকে চোখ ফিরিয়ে তিনি চাইলেন তোমার ছেলের মুখের দিকে, তার পরে চাইলেন আমার দিকে। সে কি চাউনি মা, কি আছে সে চোখে বলে বোঝানো যায় না। আমার সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো; আমরা কে, আমরা কি, চোখের পলকে সব যেন ভুলে গেলাম। ঠিক সে সময়ের মনের ভাবটা লিখতে গিয়েও লিখতে পারলাম না মা। লেখা আসে না।

"তার পরে তিনি আবার তোমার ছেলের দিকে চাইলেন। একটু হেসে বললেন, 'কি চাও?'

"তোমার ছেলে ধীরে সহজ ভাবে তাঁর দিকে চেয়ে ছিলেন, আমার মতন ভয় হয় নি তাঁর। কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন—যখন তখন বাড়ীতে যেমন হতেন। যেন স্বপন দেখছেন, এই রকম ভাবে যেন নিজের অজান্তেই আস্তে আস্তে বললেন, 'কি চাই, আমি কি জানি? আপনি আমার মন খুঁজে দেখুন, কি চাই তাই দিন।'

"তিনি একটু চেয়ে রইলেন। তার পরে হেসে বললেন, 'যাও, বাড়ী যাও।'

"তোমার ছেলে অমনি ফিরলেন। কে যেন জোর করে আমাদের ঠেলে ফিরিয়ে দিলে, একটা কথাও বলতে দিলে না। মনেও হলো না আর কোন কিছু বলবার কথা।

"সমস্ত পথ তোমার ছেলে আর কথা বললেন না, যেন ঘুমের ঝোঁকে পথ চলছেন। বাড়ী এসে ঘরে ঢুকেই চমকে উঠে চারদিকে চাইলেন—ঝোঁকটা যেন ভাঙলো। সেদিন লেখাপড়ায় হাত দিলেন না। টেবিলে গিয়ে বসলেন। একবার এসে দেখি ঠিক তেমনি ঘুমের ঘোরে কলমটা দিয়ে কপালের মাঝখানটা চেপে ধরে চেয়ারে হেলে পড়ে চুপ করে বসে আছেন।

"পরদিন আর আমাদের যাওয়া হওয়া হলো না। ওঁর ভাবগতিক দেখে কিছু বলতে সাহস পেলাম না। সব যেন ভুলে গেছেন, সামনে দাঁড়ালেও কথা কন না, সমস্তটা দিন আমার কি ভাবে কাটলো মা, সে আর কি লিখবো। আনন্দ ভয় পেয়ে ডাক্তার আনলে। ডাক্তার দেখলে, অনেক জিজ্ঞাসা করলে—কিছু জবাব দিলেন না। একবার শুধু একটু চমকে উঠে বললেন, 'কেন?' আবার বললেন, 'না।'

"ডাক্তার বলে গেল, 'বেশ ভালই আছেন, কিছু ভয় নেই।'

"বৈকালে খুব ব্যস্ত হয়ে বেড়াতে বেরলেন, সেই সময়টা যেন সজাগ হয়ে উঠলেন। সেদিন ওঁর দেখা পেলাম না, পরদিনও না। তার পরের দিন ফিরে আসছি, দেখি গাছতলায় পাথরের উপর তিনি বসে আছেন।

"তোমার ছেলে কোন কথা না বলে সোজা কাছে গিয়ে পায়ের কাছে আর একটা পাথরের উপর বসলেন, কিছু বললেন না। আমি পিছনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

"তিনি আমার দিকে না চেয়েই বললেন, 'দাঁড়িয়ে কেন মা, বোসো।'

"চেহারার তো কিছু নেই, মিষ্টি মুখ, খুব শান্ত ধীরে কথা কন। পেরণে কাপড় নয়, গয়না নেই, লোকে বলে অনেক বয়েস হয়েছে, মুখ তো কচি ছেলেদের মত। একখানা মোটা কাপড় পরা, তারি অর্দ্ধেকটা গায়ে জড়ান। মাথায় চুল বড় বড়, একটু এলোমেলো, কিন্তু কটা নয়। সদা একধারা চেহারা। পায়ে ধুলো মাখা। এই কি ভক্তের মোসা মানুষ? শুধু চোখের দিকে চাইতে প্রাণ কাঁপে। সেই ভদ্রলোকেরা বলছিলেন সেদিন, তাঁদের কার কার বাপ ঠাকুর্দা ছেলেবেলা থেকে ওঁর এমনি চেহারা দেখে আসছেন। পঞ্চাশ বছর আগেও যেমন, পঞ্চাশ বছর পরেও ঠিক তেমনই—কিছু বদল নেই। দেখে কিন্তু আমার তা মনেও হোল না।

"সেই যে আমরা বসে রইলাম, কোন কথা নেই, আমাদের দিকে চানও নি। নদীর দিকেই চেয়ে আছেন। যখন সন্ধ্যে হলো, উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'আচ্ছা যাও।'

"ফিরে এলাম।

"পরদিন সকালবেলা বেরিয়েছি, পথেই দেখা পেলাম, বললেন, 'এসো।'

"তাঁর সঙ্গে অনেক দূর অবধি গেলাম। দু'জনে ওঁরা মধ্যে মধ্যে দু'একটা কথা বলছিলেন। সে এত আস্তে যে, আমি কিছু বুঝতে পারি নি।

"সেইদিন থেকে রোজই তাঁর সঙ্গে অনেক জায়গায় যাই, অনেক জঙ্গল, অনেক পাহাড় বেড়িয়েছি, কোথাও কোথাও দু'একদিন থেকেছি। সে সব আর বিস্তারিত কি লিখবো মা।

"আনন্দ দু'-এক জায়গায় আমাদের সঙ্গে গেছে, সব জায়গায় প্রভু আনন্দকে সঙ্গে নেন না। বলেন, 'ও গৃহী, ওর অধিকার নেই—' আমরাও তো গৃহী, কিন্তু প্রভু বলেন, আমাদের গৃহের বন্ধন কেটে গেছে।

"মা, তোমার ছেলের মনে এমন তীব্র বৈরাগ্য কোথায় লুকিয়েছিল, আমিও তো তার খোঁজ পাইনি কোন দিন। এই ন'মাস আর সাধের বই খাতা কলম চেয়েও দেখেন নি। একবারও বাড়ীর কথা, বাবার কথা বলেন নি। কালগুরু বললেন, তোমায় সব জানিয়ে চিঠি দিতে। আনন্দ বড় অসুখ হয়েছিল, অনেক কষ্টে তাকে ঠিক করেছি। প্রভু শীঘ্রই উত্তরাপথে যাবেন, আমরাও যাব। তার আগে আমরা তোমার সঙ্গে দেখা করে আসবো, কবে আসবো তিনি বলে দেবেন। নিজেদের বাসগৃহে ঢুকবার অধিকার আর নেই, শুধু মাতৃদর্শনে অনুমতি পেয়েছি।

"দাসীকে আশীর্বাদ কোরো যেন কখনো পথভ্রষ্টা না হই। তোমারি পুণ্যের জোর তোমার ছেলেকে সত্যিকার পথে আলো দেখিয়েছে, তুমি মনে দুঃখ কোরো না মা—নিঃশ্বাস ফেলো না, সুখী হয়ে বিদায় দাও।

"আর দু'-একদিন আমরা এখানে আছি। তার পরে যেতে হবে, কোথায় যেতে হবে আমি জানি নে; প্রভু যেখানে নিয়ে যাবেন যাব। তার পরে বাড়ী, বাড়ী থেকে উত্তরাপথে।

"মা, দাসীর প্রণাম নাও, তোমার ছেলের প্রণাম নাও, তোমার কোল ছেড়ে তোমায় নিমাই যাঁর উদ্দেশে বেরিয়েছেন তিনিই তোমায় দেখবেন—শান্তি দেবেন।

তোমার দাসী রুক্মিণী।"

[ ক্রমশঃ

---

## তাণ্ডবনৃত্য

...পৃথিবী যখন চন্দ্র ও সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরত্ব লইয়া পরিভ্রমণ করিতে থাকে, তখন কাল পৃথিবীর চরাচর জীবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টকারী হইয়া পড়ে। তখন মানুষ ক্রমশঃ তাহার পূর্ব্ববুদ্ধি, জ্ঞান এবং কর্ম্মশক্তি সমস্তে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হইয়া পড়ে এবং তাহার জীবন আদ্যন্ত অন্ধকারময় হইয়া থাকে। ইহারই নাম মহাকালের তাণ্ডবনৃত্য। ইহার পর আবার যখন পৃথিবী ক্রমশঃ চন্দ্র ও সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করে, তখন আবার কাল পৃথিবীর সমস্ত চরাচর জীবের পক্ষে ক্রমশঃ মঙ্গলময় হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু তখন মানুষ তাহার অজ্ঞানতাবশতঃ গরলকে অমৃত মনে করে এবং অমৃতকে গরল মনে করে। তাহার ফলে, তখন মানুষের ভাগ্যাকাশে আঁধারই থাকিয়া যায়। ইহারই নাম মানুষের তাণ্ডবনৃত্য। এই সময় মানুষ যদি প্রকৃত বুদ্ধি, জ্ঞান এবং কর্ম্মের আশ্রয় লইয়া সতর্ক হইতে পারে, তাহা হইলে অবশ্যম্ভাবী আঘাত তাহার হাতির দিন চলিয়া যায়। মানুষে মানুষে ভেদ, দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ এবং রক্তপাত অনিবার্য্য হইয়া পড়ে এবং ঐক্যপাতসহকারে প্রলয়বুদ্ধির উদয় আসায় মানুষের দুঃখের দিন উপস্থিত হয়। আমাদের মনে হয়, পৃথিবী আবার ক্রমশঃই চন্দ্র ও সূর্য্যের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হইতেছেন।

---

## গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ ও তার অদ্ভুত জীবজন্তু

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাণিবিদ্যার ক্ষেত্রে গ্যালাপাগোস দ্বীপের নাম অতি প্রসিদ্ধ।

১৮৩৫ সালে তরুণ চার্লস ডারউইন 'বিগল্' নামক জাহাজে এই দ্বীপ পরিদর্শন করেন, সেই সময় থেকেই গ্যালাপাগোস দ্বীপের নাম ক্রমবিবর্তনবাদের উৎপত্তির সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে।

গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ প্রশান্ত মহাসমুদ্রে অবস্থিত, দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল থেকে খুব বেশী দূরেও নয়। নয়টি বড় বড় দ্বীপ ও অনেকটি ছোট দ্বীপের সমবায়ে এই প্রসিদ্ধ দ্বীপপুঞ্জ গঠিত।

চার্লস ডারউইন যে সময়ে এ দ্বীপে পদার্পণ করেন, তার অন্ততঃ তিন শো বছর পূর্ব থেকে স্পেনীয় ও ইংরেজ বোম্বেটে জাহাজের এটা একটি নোঙর করবার আড্ডা ছিল।

১৪০৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পানামার বিশপ মহোদয় কর্তৃক এই দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কৃত হয়।

পেরু-বিজয়ী বীর ফ্রান্সিসকো পিজারোর ক্ষমতা হ্রাস করবার উদ্দেশ্যে পেরুতে যাত্রা করবার সময়ে বিশপ মহোদয়ের জাহাজ 'হুমবোল্ট' দক্ষিণ মেরু প্রবেশীয় স্রোতের দ্বারা এই দ্বীপের উপকূলে নীত হয়। বিশপ দ্বীপে অবতরণ করে দেখলেন দ্বীপটী সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যবাসশূন্য। জল পাওয়া যায় না, মহা বিপদ, কয়েকটী নাবিক জলাভাবে প্রাণত্যাগ করবার পরে অনেক কষ্টে পানীয় জলের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এর পরে বিশপ যখন স্পেনের রাজার কাছে পত্র লেখেন, তাতে তিনি এই দ্বীপ এবং দ্বীপস্থ বড় বড় কচ্ছপের উল্লেখ করেন। এমন পক্ষিকুলের উল্লেখ করেন, যারা মানুষ দেখে ভয়ে পালিয়ে যায় না।

স্পেনীয় ভাষায় স্থলচর বড় কচ্ছপের নাম 'গ্যালাপাগোস' —দ্বীপবাসী সুবৃহৎ কচ্ছপকুলের নামেই দ্বীপেরও নামকরণ হল 'গ্যালাপাগোস'।

বিশপ মহোদয় যে জাহাজে ছিলেন, তার ক্যাপ্টেন এই দ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থানবিন্দু নির্ণয় করেন ও তাঁর ডায়েরীতে সেটা লিপিবদ্ধ করেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মানচিত্র-প্রস্তুতকারক এব্রাহাম অর্টেলিয়াসের হাতে এই ডায়েরী পড়ে—এবং ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন পেরুর মানচিত্র তৈরী করেন—তখন গ্যালাপাগোস দ্বীপ উক্ত মানচিত্রে সন্নিবিষ্ট হয়।

তিনি তাঁর মানচিত্রে এই দ্বীপকে 'আইসোলাস ডি গ্যালাপাগোস' অর্থাৎ 'বৃহৎ কচ্ছপের দ্বীপ' বলে উল্লেখ করেন এবং সেই থেকে এর নামই হয়ে দাঁড়াল গ্যালাপাগোস।

বিশপ মহোদয়ের আগমনের বহু পূর্বে পেরুর একদল ইঙ্কা টুপাক উপাধি প্রশান্ত মহাসমুদ্রে কয়েকটী আগ্নেয় দ্বীপ পরিদর্শন করেছিলেন এবং সেখানকার কৃষ্ণবর্ণ-অধিবাসীদের বন্দী করে স্বদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন—এমন প্রবাদ পেরুতে প্রচলিত ছিল। ইঙ্কা এই দ্বীপগুলির নামকরণ করেন 'নিনাচুচি' ও 'হাহুয়া চুচি'।

কেউ কেউ বলেন সম্ভবতঃ ইঙ্কা বর্তমান গ্যালাপাগোস দ্বীপই পরিদর্শন করে থাকবেন হয়তো। কিন্তু পণ্ডিতেরা একথা স্বীকার করেন না; তাঁরা বলেন এ দ্বীপে মনুষ্যবাসের কোন চিহ্ন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নি। যাই হোক,

গ্যালাপাগোস দ্বীপ ও তার বৃহৎ কচ্ছপকুলের কাহিনী চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয় এবং তার ফলে ষোড়শ শতাব্দীতে অনেক স্পেনীয় নাবিক এই দ্বীপে জাহাজ নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন; এদের মধ্যে অনেকেরই উদ্ভব শোচনীয় দুর্ঘটনার মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করে।

অবশেষে ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ইংরেজ নাবিক সার রিচার্ড হকিন্স্ এই দ্বীপ পরিদর্শন করেন, কিন্তু তিনি সম্ভবতঃ দ্বীপবাসী বিখ্যাত কচ্ছপকুল দেখে হতাশ হন, কারণ তাঁর বর্ণনার মধ্যে কচ্ছপকুলের কথা অতি সংক্ষিপ্তভাবে এক ছত্রেই তিনি শেষ করেছেন দেখা যায়।

প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বিভীষিকাস্বরূপ সে-যুগের কয়েকটী দুর্দ্দান্ত ইংরেজ বোম্বেটে, যেমন ডেভিস, জন ইটন, ডাম্পিয়ার, শার্প, কাটলে প্রভৃতি—এরাই গ্যালাপাগোস দ্বীপকে এদের জাহাজের আড্ডায় পরিণত করে। ১৬৪০ থেকে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে বোম্বেটেদের একটা বড় আড্ডা ছিল।

এই শেষোক্ত বোম্বেটে, উইলিয়ম আমব্রোজ কাউলে, গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের অনেকগুলির ইংরাজি নামকরণ করে। যাদের নামে নামকরণ হয়, তারা প্রায় সকলেই কাউলের সহচর অনুচর। কেবল দুটী বড় বড় দ্বীপের নামকরণ হয় আলবিমার্ল ও নরফোকের ডিউকের নামানুসারে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাপ্তেন কলনেট প্রশান্ত মহাসমুদ্রে তিমি শিকারে এসে বার দুই এই দ্বীপে জাহাজ নোঙর করেন। কাউলের দেওয়া নাম বদলে দিয়ে কয়েকটি দ্বীপের তিনি নতুন নাম দেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ইকোয়েডর গবর্ণমেণ্ট এই দ্বীপপুঞ্জকে তাঁদের রাজ্যভুক্ত করেন এবং ইংরেজি নাম উঠিয়ে দিয়ে অনেকগুলি দ্বীপের স্পেনীয় নাম দেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে মাত্র দুটী দ্বীপে মানুষ বাস করতে আরম্ভ করে—সুতরাং ১৮৩৫ সালে চার্লস ডারউইন যখন এখানে আসেন, তখন বেশীর ভাগ দ্বীপগুলিই মনুষ্যবাস-শূন্য ছিল।

ডারউইনের মতে এই দ্বীপ অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ আগ্নেয় বিপর্য্যয়ের ফলে উদ্ভূত হয়। তা ছাড়া বহু পূর্ব্বে, যখন পৃথিবীর বড় বড় আগ্নেয়গিরিগুলির উৎপত্তি হয়েছিল এবং সমুদ্রতল সেই আগ্নেয় উপদ্রবের ফলে দ্বীপ ও সমুদ্রগর্ভস্থ মহাশৈলাদিতে পরিণত হয়।

ডারউইন দ্বীপের সর্ব্বত্র ছোট বড় অগ্নিকটাহ ও জমাট এবং ঠাণ্ডা লাভাস্রোত প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর এ ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হয় যে, ভূতত্ত্বের দিক্ থেকে এই দ্বীপপুঞ্জ অত্যন্ত প্রাচীন নয়, দ্বীপস্থ গাছপালা ও অন্যান্য জীবজন্তু নিশ্চয়ই বায়ু, ঢেউ ও সমুদ্রের স্রোতের দ্বারা দূরবর্ত্তী আমেরিকা মহাদেশ থেকে আনীত হয়েছে। বিশেষ করে এই অঞ্চলের সমুদ্রে প্রসিদ্ধ 'হুমবোল্ট দক্ষিণ মেরু স্রোত' নামে সমুদ্রস্রোত বর্ত্তমান—বহু যুগে এ স্রোতের উৎপত্তি।

এই স্রোতে বাহিত হয়ে দূরের দেশ থেকে নানা রকমের গাছপালার বীজ একদিন এই দ্বীপে পৌঁছে থাকবে। আধুনিক যুগে আমরা এ সত্যকে গ্রহণ করতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করি না বটে, কিন্তু ডারউইনকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল এই সত্যকে নিজের মনে প্রতিষ্ঠা করতে। কারণ জীবের ক্রমবিবর্ত্তন ব্যতিরেকেও তৎকাল-প্রচলিত আধিদৈবিক সৃষ্টিবাদের সঙ্গে তাঁকে দ্বন্দ্ব করতে হয়েছিল মনে মনে।

জীববিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থার কথা নয়, ডারউইনের পূর্ব্বে এই আধিদৈবিক সৃষ্টিবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল, বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত থাকার ফলে তখনকার চিন্তাশীল লোকও এই মতের বিরুদ্ধে কিছু ভাবতে সাহস পেতেন না।

ভগবান যেখানে যেসব জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, তা একেবারে তাঁর নিজের হাতের খাস সৃষ্টি; একই শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে আকৃতিগত যে সমুদয় পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়, সে-সবও ভগবান নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন—এই ছিল সেকালে প্রচলিত আধিদৈবিক সৃষ্টিবাদ।

গ্যালাপাগোস দ্বীপ ও সেখানকার অদ্ভুতদর্শন গিরগিটি, গোধিকা, কচ্ছপ ও গাছপালা ডারউইনের মনে এই চিন্তার সৃষ্টি করলে যে এগুলি পৃথিবীর অন্যত্র দৃষ্ট সাধারণ-শ্রেণীর ঐ ঐ পর্য্যায়ভুক্ত জীব—তার অতিরিক্ত কিছু নয়। কোনো সৃষ্টিকর্ত্তা এদের নির্জ্জনে বসে তৈরি করেন নি। এদের প্রাণবীজ বায়ু ও সমুদ্রস্রোত দ্বারা বাহিত হয়ে অন্য দেশ বা দ্বীপ থেকে এই সমুদ্রমধ্যস্থ আগ্নেয় দ্বীপপুঞ্জে এসে পড়েছিল বহু কাল পূর্ব্বে, এবং স্থানীয় আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ধারায় লালিত ও বর্দ্ধিত হয়েছে বলে এদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য আজ এতটা বেশী হয়ে পড়েছে।

এ থেকে কালক্রমে নতুনতর জীবের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে।

যেমন ডারউইন লক্ষ্য করলেন, সরীসৃপ শ্রেণীর জীবগুলি বিশেষ করে এই দ্বীপেরই একচেটে সম্পত্তি, এই দ্বীপেই তাদের উৎপত্তি, এই দ্বীপেই ওদের জীবনও শেষ হেটে। অন্য কোথাও ঠিক এই শ্রেণীর সরীসৃপ নেই। এমন কি, অত বড় যে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ অত কাছে অবস্থিত, সেখানেও এ-রকমের কোনো সরীসৃপ বাস করে না—কেবল খুব ছোট এক ধরণের সর্প ছাড়া।

গ্যালাপাগোস দ্বীপে যে সমুদ্রতর গোধিকা দেখা যায়, কোথাও এ-ধরণের প্রাণী নেই। আর এক ধরণের স্থলচর গোধিকা আছে এখানে, যারা কণ্টিবনসা গাছের কণ্টকময় পুরু শাঁসওয়ালা পাতা খেয়ে জীবনধারণ করে। এর জুড়ি কোথাও নেই—তবে এর নিকটতম আত্মীয় হচ্ছে আমেরিকার উষ্ণমণ্ডলের ম্যানগ্রোভ অরণ্যবাসী সাধারণ শ্রেণীর গোধিকা।

এদের একটা জিনিষ একেবারেই অদ্ভুত ও নতুন ধরণের বলে তাঁর ধারণা হয়। সে হচ্ছে এই দ্বীপের স্থলচর বৃহৎকায় কচ্ছপকুল। যাদের নামে এই দ্বীপের নামকরণ।

এ-ধরণের কচ্ছপ কোথাও নেই, তবে প্যাটাগোনিয়া দেশে প্রস্তরীভূত জীবাশ্ম এই জাতীয় কচ্ছপের চিহ্ন বহন করে বটে। দ্বীপগুলি যদিও উষ্ণকটিবন্ধে অবস্থিত, কিন্তু খুব গরম নেই এখানে। হুম্‌বোল্ট্ মেরুপ্রদেশীয় স্রোত দক্ষিণ মেরুর হিমশীতল অঞ্চল থেকে শীতল জলস্রোত বহন করে আনে এবং প্রায় ৪০° ডিগ্রী উত্তাপের জলধারায় এই দ্বীপের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করে, কাজেই এখানে গরম খুব কম।

নিম্ন অংশের কোনো কোনো স্থানে মরুভূমিতে দুই গাছপালা আছে, যেমন কাঁটাওয়ালা ও কাঁটাহীন কণ্টিবনসা, বাবুলজাতীয় বৃক্ষ, মেসকিট ইত্যাদি। উপকূলের নিকটে যেখানে যেখানে বহু সমুদ্রস্রোত দ্বারা জলাভূমির সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে মাঞ্চানিলো নামে এক প্রকার গাছ দেখা যায়—এ গাছের পাতায় বিষ আছে, বিষাক্ত আইভিলতার ন্যায় এর ক্রিয়া। দ্বীপের উচ্চতর অংশে সিসালয় মালভূমির ওপরে চিরহরিৎ জাতীয় বৃক্ষাদি, বহুবিধ ফার্ণ, পরগাছা, বড় বড় লতা ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। চিলি ও পেরুর মরুভূমি-সদৃশ অকল পরিদর্শনের পরে এই বৃক্ষলতাসমাকুল দ্বীপের ভ্রমণ অবশ্যে এসে ডারউইন অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছিলেন—একথা তিনি ডায়েরিতে লিখে গিয়েছেন।

এই দ্বীপের বিশেষ আকৃতির জীবগুলির উৎপত্তি কি ভাবে সম্ভব হোল, এসম্বন্ধে ডারউইন মাত্র দুটী কারণ খুঁজে পান। তার প্রথমটী তিনি মনে মনে অস্বীকার করেন। সেটী হচ্ছে পূর্ব্বোক্ত আদিবৈদিক জীবসৃষ্টিবাদসংক্রান্ত মত। অর্থাৎ এই দ্বীপের প্রাণীগুলি বিশেষ করে এই দ্বীপের জন্যেই তৈরী হয়েছে।

কিন্তু আসলে প্রাণীগুলি আমেরিকা মহাদেশের অন্যান্য ঐ জাতীয় প্রাণীর মতই। পার্থক্য যা কিছু দৃষ্ট হয়, তা শুধু নির্জ্জন দ্বীপের বিশিষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বহুদিন বাস করার ফলে। এই থেকে ডারউইন সর্ব্বপ্রথম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে প্রাণিকুলের বৈশিষ্ট্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারাও পরিবর্ত্তিত হতে পারে।

এই ভাবে আধুনিক প্রাণিবিজ্ঞানের এক নতুন যুগের এবং নব দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা।

আমি ডারউইনের ঠিক একশত বৎসর পরে এই দ্বীপে উপস্থিত হই এবং চ্যাথাম নামে যে ক্ষুদ্র দ্বীপটিতে ডারউইন সর্ব্বপ্রথম অবতরণ করেন, সেখানে তাঁর উদ্দেশ্যে একটি ক্ষুদ্র স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করি। ৯'মাস কাল এই দ্বীপপুঞ্জে অবস্থান করবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। এই ৯'মাসের মধ্যে আমি প্রায় সমস্ত বড় বড় দ্বীপগুলি পরিদর্শন করি।

ডারউইনের সময়েও যা, এখনও তাই, এই একশত বৎসরেও দ্বীপগুলির অবস্থা অপরিবর্ত্তিতই আছে। চার্লস দ্বীপে সে সময় ইকোয়েডর গবর্ণমেণ্টের চালানী শুরুতর অপরাধীদের নির্ব্বাসিত করা হোত, ডারউইন একথা তাঁর পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। উক্ত দ্বীপে এখনও নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণই বাস করে, তবে বর্ত্তমানে তাদের 'কলিউনিষ্ট' বলা হয়।

ঐ দ্বীপের মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ পর্ব্বত আছে, তার স্পেনীয় নাম 'সেরো ডি পাজা'—এই পর্ব্বতের পাদদেশে লাভা স্রোতের বুদ্বুদ দ্বারা উৎপন্ন কয়েকটি অদ্ভুত গুহা ডারউইন দেখতে পেয়েছিলেন।

প্রত্যেক গুহাতে একজন করে রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তি বাস করত। এখনও ঐসব গুহাতে ঐ অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিরাই বাস করে।

একটি ব্রিটিশ মনোহারী জাহাজের নাম অনুযায়ী মাঝের বড় দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে ইন্‌ডিফেটিগেব্‌ল দ্বীপ (Indefatigable Island); এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে আমরা তাঁবু ফেললাম। এদের মধ্যে দিনেমার, নরওয়ে-বাসী, সুইডিশ, জার্মান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোক আছে।

এই দলটী এখানে এসেছিল কৃষিকার্য্য করে জীবিকা নির্ব্বাহ করবার উদ্দেশ্যে, কিন্তু সাধারণতঃ যেমন হয়ে থাকে এক্ষেত্রেও তাই, কৃষি-উপনিবেশের মতলব মাঠে মারা গেল। উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার নেই; তাছাড়া এই পাথরের দেশে জিনিষপত্রও উৎপন্ন হয় কম।

এখন তারা যা জিনিষ উৎপাদন করে, নিজেদের খাওয়ার জন্যেই। সুইডিশ অধিবাসীরা সাধারণতঃ তামাক, কাফি, আলু ও অল্প কয়েকটি ফসল উৎপন্ন করে।

আমরা কয়েকদিন এখানে ছিলাম বলে দ্বীপস্থ অদ্ভুতদর্শন সরীসৃপ ও পক্ষিকুলের আকৃতি-প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করবার অনেক সুযোগ পেয়েছিলাম। এই দ্বীপের ইতিহাসে এইসব জীবজন্তুর, বিশেষ করে এখানকার স্থলচর কচ্ছপকুলের, উল্লেখ থাকবেই।

সেভালের জলযন্ত্রযানের এই দ্বীপে অবতরণ করবার মূলে হয়েছে কিন্তু এখানকার এই বৃহৎকায় কচ্ছপকুল। জল এখানে অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য বটে কিন্তু কচ্ছপের মাংস যথেষ্ট পাওয়া যায়। জাহাজে কচ্ছপ ধরে নিয়ে গিয়েও বহুদিন জীবিতাবস্থায় তাদের রাখা যায়।

কচ্ছপের মাংসের লোভে পূর্ব্বকালে বহুতর জাহাজ এই দ্বীপে নোঙর ফেলত এবং হাজারে হাজারে, লাখে লাখে (জলযন্ত্রযানের লিখিত বিবরণে ঠিক এই সংখ্যারই উল্লেখ আছে) কচ্ছপ নিহত হত নাবিকদের মাংস সরবরাহ করতে। এখনও যে এদের বংশ নির্ম্মূল হয়ে যায় নি, এ নিতান্তই আশ্চর্য্য। এই জাতীয় কচ্ছপ পৃথিবীর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না—কেবল গেলেপ দ্বীপের প্রাণিশালার বেড়ার মধ্যে আবদ্ধ কয়েকটি অতিকায় কচ্ছপ ছাড়া। এই দ্বীপ থেকে বহু বৎসর পূর্ব্বে লর্ড হুডউইল্ড একটি বিরাটকায় কচ্ছপ সংগ্রহ করেন; তার ওজন ছিল দু'শো পাউণ্ড (প্রায় আট মণ)। এদের ডিমগুলি দেখতে ফিলিয়ার্ড বলের মত। তা থেকে যখন প্রথম কচ্ছপের ছানা বার হয়ে দিনের আলোর মুখ দেখে, তখন খোলাশুদ্ধ তাদের ওজন দু'তিন ঔন্স, ওজনে তিন আউন্সের বেশি নয়।

প্রথম পাঁচ বৎসরের পরে এদের বৃদ্ধির পরিমাণ বছরে এক ইঞ্চি মাত্র, সুতরাং দু'শো পাউণ্ড ওজনের একটা কচ্ছপের বয়স দাঁড়াবে ১৭০ থেকে ২০০ বছর। তারপর তো সে কচ্ছপ আরও পাকাপোক্ত ষাট বছর কোন্ না বাঁচবে! দীর্ঘায়ু প্রাণী বটে এরা। গ্যালাপাগোস দ্বীপের এই অতিকায় কচ্ছপ নিরামিষাশী। ক্যাকটাস গাছের শালালো পাতা খেয়েই বহু অবস্থায় এরা প্রাণধারণ করে, যদিও বন্যা অবস্থায় এরা যা পায় তাই খায়, যেমন ঘাস, পেঁপে, কলা ইত্যাদি।

বন্য অবস্থায় কফিমনসার পাতা ছাড়া এরা অল্প দু-এক প্রকার গাছের সবুজ পাতাও খায়।

এদের অভ্যেস হল খুব ভোরে বাসা থেকে বেরুনো, বেরিয়েই এরা গাছের পাতা খেতে শুরু করে দেয়।

কফিমনসার পাতার শতকরা আশি ভাগ জল, তা বাদে চিনি ও শ্বেতসার থাকায় এদের পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য।

কফিমনসা গাছের বন জঙ্গলও এই দ্বীপে যেন এজন্য তৈরী হয়েছে। দ্বীপের অনেক স্থানে উপকূলের সমতল অংশে বড় বড় গাছের ছায়ায় ঘন কফিমনসার বন। কচ্ছপের দলও এই বনে ভিড় করে থাকে। তবে সব দ্বীপে কিন্তু সমুদ্রের ধারে কফিমনসার বন নেই। যেমন ডানকান দ্বীপে—যেখানে হাজার ফুট পাহাড়ের মাথায় এই গাছ জন্মায়।

সে দ্বীপে কচ্ছপকুলও বাস করে পাহাড়ের মাথায়।

দুপুরের খর রৌদ্র বেচারীদের সহ্য হয় না। রৌদ্র চড়লেই ওরা খাওয়া ছেড়ে গাছের ছায়ায় এসে আশ্রয় নেয়, ছায়া পড়লে আবার বেরিয়ে পড়ে খাদ্যের সন্ধানে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে কচ্ছপগুলি খাওয়া বন্ধ করে এবং রাত্রির বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়। যদি কেউ তাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত না ঘটায়, তবে তারা যে যেখানে থাকে, সেখানেই মড়ার মত অসাড় হয়ে শুয়ে পড়ে

গলপাগোস ইগুয়ানা ( গোধিকা ) শক্তিশালী চোয়াল দিয়ে ক্যাক্টাস ছিঁড়ে খায়, কিন্তু হিংস্রতায় অভ্যস্ত নয়

গ্যালাপাগোস' বৃহৎ—৭০ ইঞ্চি লম্বা ও ওজনে ১০০ পাউন্ড

গ্যালাপাগোসের নামুদ্রিক জন্তু 'সি ইগুয়ানা' ; লম্বায় প্রায় ৫ ফুট, ভীষণদর্শন হলেও নিরীহ জীব

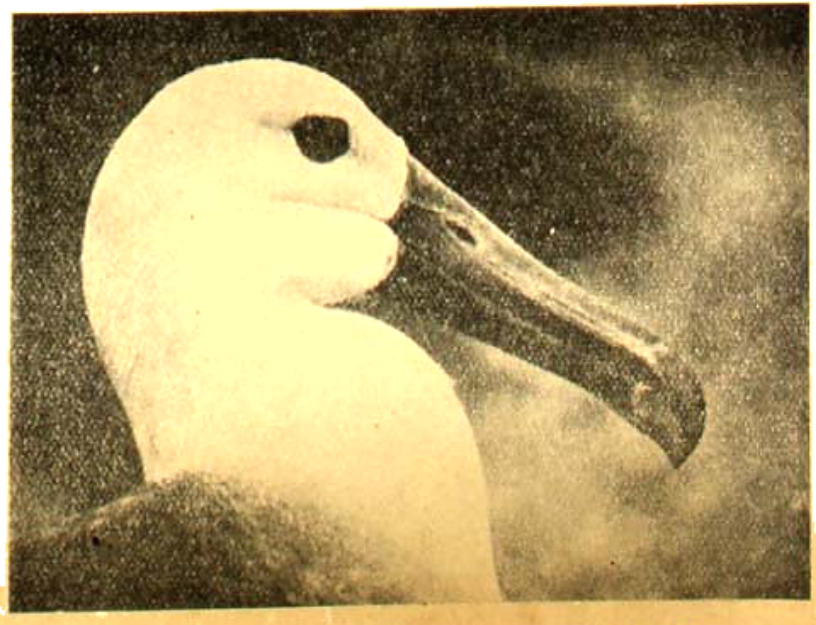

একটি বিশেষ শ্রেণীর অ্যালবেট্রস 'ডায়োমিডিয়া ইরোরাটা' মাত্র গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জেই দেখা যায়।

সাধারণ লোকের বিশ্বাস আছে যে, কচ্ছপেরা নিদ্রার সময় খোলার মধ্যে মুখ ও পা গুটিয়ে শোয়। কিন্তু আসলে এ ধারণা ভুল। ওরা মাথা মাটিতে রেখে হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোয়। এই নির্জ্জন দ্বীপে কচ্ছপদের জীবন অত্যন্ত একঘেয়ে। খাদ্য অন্বেষণ ও ভক্ষণ কার্য্যেই তাদের জাগ্রতাবস্থা অতিবাহিত হয়, বাকি সময়টুকু কাটে ঘুমিয়ে।

কেবল এক সময়ে বছরের মধ্যে এদের জীবনের সে একঘেয়েমি কাটে: জানুয়ারী থেকে মার্চ্চ মাসে, এদের ডিম পাড়ার সময়।

আমি ওদের ডিমপাড়ার ব্যবস্থা এবং তা দেওয়ার পূর্ব্বে ডিমগুলি রক্ষণ করার কৌশল বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করার অবকাশ পাইনি। তবে যতটুকু পেয়েছি, এই কথাই আমার মনে হয়েছে, ওরা নরম আর্দ্র মাটিতে ডিম পাড়ে এবং গর্ত্ত খুঁড়ে ডিমগুলি গর্ত্তের মধ্যে মাটি চাপা দিয়ে রাখে।

ডিম ফুটলে বাচ্চাগুলি আপনা-আপনি মাটী ফুঁড়ে বার হয়ে আসে, যদিও আমার বিশ্বাস বেশীর ভাগ ছানাই মাটীর মধ্যের আঁকাবাঁকা গর্ত্তের মধ্যে থেকে বার হতে পারে না।

মানুষ এ-দ্বীপে পদার্পণ করবার পূর্ব্বে নানা গালাপাগোস দ্বীপে কচ্ছপকুলের কোন শত্রু বর্ত্তমান ছিল না। কিন্তু আজ আর সে কথা বলা যায় না।

মানুষ তো আছেই, তা ছাড়া আছে বন্য শূকর, বন্য কুকুর ও বাঁদর। কচ্ছপের বাচ্চা যে নির্ব্বিবাদে গর্ত্তের মধ্যে বর্দ্ধিত হবে তার আশা খুবই কম।

এ রকম অবস্থা বেশি দিন ধরে যদি চলে, তবে গালাপাগোস দ্বীপের অতিকায় কচ্ছপের কাহিনী অচিরাৎ রূপ-কথায় পরিণত হবে।

কচ্ছপ ব্যতীত গালাপাগোস দ্বীপে আর এক জাতীয় প্রাণী আছে, যাদের সর্ব্বত্র দেখা যায়। এই জন্তুই প্রথমে চোখে পড়ে যখন কেউ এখানে প্রথম পদার্পণ করে। এক প্রকারের কালো বৃহদাকারের গোসাপ জাতীয় জীব—সমুদ্রের ধারের লাভা পাথরের ওপর সব সময় দেখা যাবে এরা শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে।

এরা স্থলচর গোধিকা থেকে পৃথক্ জাতি—সমুদ্রচর গোধিকা—বৈজ্ঞানিক নাম Amblyrhynchus cristatus, এরা দেখতে মোটাসোটা ভীষণদর্শন জানোয়ার। তবে যে ভয়ের ভীষণ দেখতে, প্রকৃতি এদের সে রকম নয়, অনেক শান্ত ও নিরুপদ্রব প্রাণী এরা।

তবুও গালাপাগোস দ্বীপের সমুদ্রবেলার লাভাপ্রস্তর-শায়ী এই ভীষণদর্শন সরীসৃপ মনে করিয়ে দেয় অতীত যুগের পৃথিবীকে, যখন এদেরই বৃহৎ সংস্করণ ডাইনোসর, প্টীরিডোদস প্রভৃতি অতিকায় সরীসৃপকুল ভূপৃষ্ঠে অবাধে বিচরণ করতো।

যখন ছোট থাকে তখন এদের দেহবর্ণ থাকে মিশ কালো। যে লাভাপ্রস্তরে ওরা দিনরাত শুয়ে থাকে, সেই পাথরের মতই রঙের গায়ের রঙ হওয়ায় শত্রুর আক্রমণ থেকে ওরা অনেক সময় উদ্ধার পায়। এমন ভাবে পাথরের সঙ্গে ওরা মিশে থাকে যে প্রথমে ওদের টেরই পাওয়া যায় না—কেবল মাত্র যখন ছুটে পালায়, তখন ছাড়া।

এই সব গোধিকা খুব বড় জাতেরও আছে, আবার ছোটও আছে। ছোট গোসাপগুলি ছ' ইঞ্চি থেকে চৌদ্দ ইঞ্চি পর্য্যন্ত সাধারণতঃ হয়ে থাকে।

বড় জাতের গোধিকাগুলি তীরবর্ত্তী ঝোপ ঝাড়ের বনে লুকিয়ে থাকে। এই সব ঝাড়ের বনে বেড়াবার সময় অতর্কিতে দু একটা গোসাপের ঘাড়ে পা দেওয়াও বিচিত্র নয়। পুরুষ জাতীয় গোসাপগুলি চল্লিশ থেকে ষাট ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়, এদের দেখতে অত্যন্ত বিশ্রী।

এদের গায়ের রঙ হলদে, তার ওপর কমলালেবুর ও কালো বর্ণের ছিট ছিট দাগ। এই দাগগুলিই এদের দেখতে এত ভয়ানক করে তুলেছে।

মানুষ কাছে এলে এরা মাথা নেড়ে ও লাল লম্বা জিব বার করে ভয় দেখায়। এদের মুখের অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, ধারালো দাঁতের সারি তখন বার হয়ে পড়ে।

এদের পিছনের পা ছোড়া, কিন্তু এরা সাঁতারে অত্যন্ত নয়। জলে প্রবেশ করেই এরা চার পা এমনভাবে গুটিয়ে ফেলে যে জলস্রোত এদের কোন বাধা দান করে না। সে অবস্থায় লেজ সঞ্চালন দ্বারা এরা জলের মধ্যে দ্রুত অগ্রসর হয়।

এদের লেজ দেহের চেয়েও লম্বা এবং মেরুদণ্ডের হাড়ের সবটা জুড়ে বড় বড় কাঁটা এদের গায়ে বর্ত্তমান। মনে হয় সামুদ্রিক হিংস্র মাছ এদের কোন ক্ষতি করতে পারে না,

কারণ সমুদ্রের জলে বহুদূর পর্যন্ত এদের নির্ভয়ে সাঁতার দিতে দেখেছি।

জোয়ার নেমে গেলে জলমগ্ন পাথরের গায়ে লাগা শেওলা এদের প্রধান খাদ্য হয়ে দাঁড়ায়। সামনের দুখানা পা দিয়ে পাথরখানা জোর করে আঁকড়ে ধরে এরা ধারালো দাঁত দিয়ে পাথরের গা থেকে শেওলা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।

অ্যাকাডেমি উপসাগরের বেলাভূমিতে জলচর গোধিকার এ কোলনমূক্ত প্রায় রোজই আমার চোখে পড়তো। মাদী গোসাপ শীতকালে বালির মধ্যে আধ ডজন থেকে ডিম পাড়ে। এদের ডিমের ওপরটা একটা পুরু ছালে ঢাকা। ডিম থেকে খুব তাড়াতাড়ি বাচ্চা বার হয়, শীতের শেষের দিকে লাল পাথরের ওপর দেখা যায় গোসাপের বাচ্চার ভিড় জমে গিয়েছে।

আকৃতি ও গঠনে গ্যালাপাগোস দ্বীপের জলচর গোধিকা জলচর হইতে পৃথক্।

জলচর গোধিকার লেজ ছোট, জলচর শ্রেণীকে সমুদ্রে সাঁতার দিতে হয়, কাজেই লেজ তাদের জীবন ধারণের প্রধান সহায়ক—স্থলচরের ক্ষেত্রে সে কথা আদৌ খাটে না। এদের মাথা বড় ও বেশী চওড়া, মুখের ছুঁচলো অংশ আরও লম্বা, শরীরও বেশী ভারি।

মাটীর মধ্যে এরা চালু ধরণের গর্ত্ত করে, এবং সন্ধ্যা হবার পরেই গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করে। এরা সম্পূর্ণরূপে নিরামিষাশী—পূর্ব্বোক্ত ফণিমনসার পাতা, ঘাস, অন্যান্য গাছের পাতা, ফুল ও ফল খেয়ে এরা জীবন ধারণ করে।

কিন্তু নিরামিষাশী হোলেও এরা হিংস্র। অনেক সময় মানুষকে তাড়া করে পর্য্যন্ত কামড়াবে। মিউজিয়মের জন্যে গোধিকা সংগ্রহ করবার সময় অনেকেই এদের কামড় খেয়েছে। খুব সাবধানে ও সতর্কতার সঙ্গে এদের নিয়ে কাজ করা দরকার।

এ-দ্বীপে জীবজন্তু, বিশেষ করে কচ্ছপ ও গোসাপ ধরা আমার ব্যবসায়, ছপয়সা আছে এতে। বিভিন্ন প্রাণিশালা ও মিউজিয়ম থেকে প্রায়ই লোকে আসছে নমুনা সংগ্রহ করতে।

আমাদের একজন চাকর, টাভিনো, এই দ্বীপেরই অধিবাসী। গোসাপ ধরতে সে ছিল ওস্তাদ।

টাভিনো গোসাপের পেছনে তাড়া করতো। গোসাপও পরিত্রাহি ছুট দিত। কিন্তু অনেক দূর ছুটে গিয়েও কোন গর্ত্তে ঢুকবার সময় পেত না, অবশেষে পিছন ফিরে তেড়ে তাকে দেখানোর চেষ্টা করতো। এই সময়ে গোসাপের দুচোখ সত্যিই রক্তবর্ণ হয়ে উঠত—এমন রক্তবর্ণ যে মনে হবার কথা, আপোকোলার শিংওয়ালা গিরগিটির মত এর চোখ দিয়ে এখুনি রক্ত ঠিকরে পড়ে বুঝি।

এই মূর্ত্তি দেখে আনাড়ি লোকের ভয় পাবার কথা, কিন্তু টাভিনো আনাড়ি লোক নয়, মিউজিয়মের জন্যে গোসাপ বিক্রয় করা তার একটা ব্যবসা। সে পেছনে গিয়ে গোসাপের লেজ ধরে তাকে মাটি থেকে তুলে ফেলতো, গোসাপের ধারালো দাঁতওয়ালা মুখ সামনের বাতাসকে কামড়াবার চেষ্টা করতো মাত্র। তার পরেই টাভিনো সেটাকে নিয়ে গিয়ে থলের ভেতর পুরে ফেলত।

আমরা গোসাপদের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্যে কয়েকটীকে একটি খাঁচার মধ্যে রেখেছিলাম। তারা সেখানে ডিম পাড়ত, এ পর্য্যন্ত আমরা দেখেছি এবং তাদের ফোটোগ্রাফও নিয়েছি।

যদিও গ্যালাপাগোস দ্বীপ ইকোয়েডরের ভীষণ অরণ্যানী থেকে মাত্র ৪৬০ মাইল দূরে অবস্থিত, তবুও এখানকার পক্ষিকুল উষ্ণমণ্ডলের অরণ্যবাসী পক্ষীর সমান নয়। এখানে সামুদ্রিক জলচর পক্ষী বেশী, যেমন অ্যালবেট্রস, পেনগুইন, মানোয়ারী পাখী, ফ্রিগেট, ও সিন্ধু শকুন। হুড্ দ্বীপে অঢেল অ্যালবেট্রস দেখা যায়। সাধারণতঃ তিনের ডেল ডুজোগের উত্তরে যে পাখী চোখে পড়ে না তাদের পক্ষে এত উত্তরে বাস করা আশ্চর্য্যজনক সন্দেহ নেই। পেনগুইন থাকা খুব আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। হুমবোল্ট দক্ষিণ মেরু প্রদেশীয় সমুদ্রস্রোতে মেরু অঞ্চল থেকে পেনগুইনের খাদ্য নানা প্রকার মাছ ও জলজ কীট ভাসিয়ে নিয়ে আসে দ্বীপের উপকূলে। সুতরাং পেনগুইন এখানে সহজেই জীবন ধারণ করতে পারে।

এক ধরণের করমোরাণ্ট্ পাখী আছে, যারা উড়তে পারে না। এদের ডানা আছে, কিন্তু পেনগুইনের মত ডানা-শূন্য পাখী নয় এরা।

আলবিমার্ল দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জলের ধারে করমোরাণ্ট্ কুল বাস করে। সামুদ্রিক পাখী

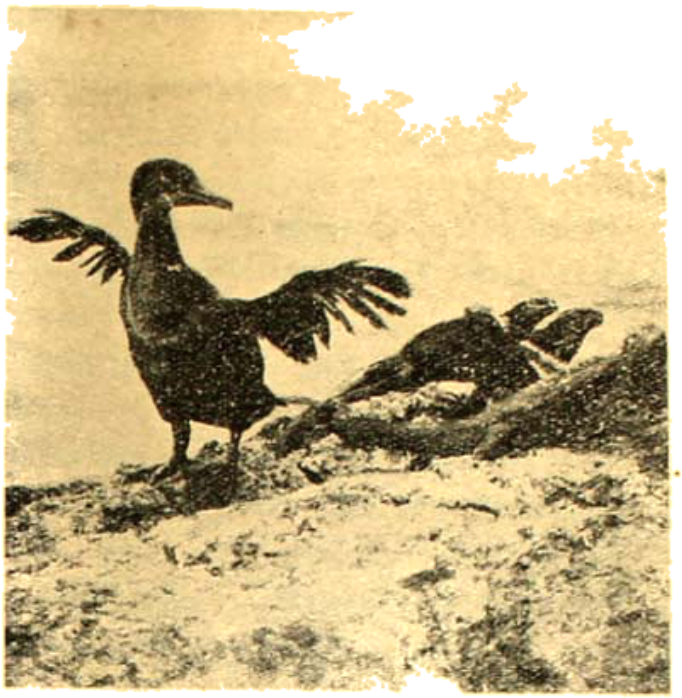

কসোয়ারী পাখী—উড়তে পারে না, কেবলমাত্র ধাবিয়াই এরা বাসবরো দ্বীপে পাওয়া যায়

রাইনোসেরাস পাখী—এরা পায়ের সাহায্যে মাটি খোঁড়ে

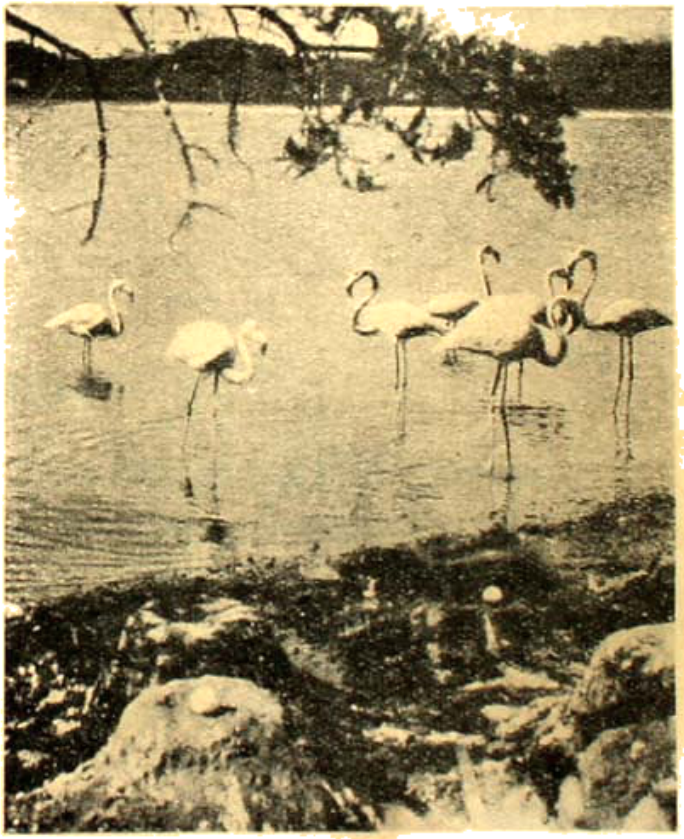

ফ্লামিংগোর বাসা : বাসাগুলোর উপর ডিম দেখা যাচ্ছে—বাসাগুলো সমুদ্রতীরে মাটির ঢিবি

পুরুষ ব্রাইপেট-বার্ড : কসোয়ারীর ডিম—এর বাসা পাওয়া যায়, আমাদের কাকাতুয়া যেমন বেতের, ঠিক তেমনি বাসা এরা করে

সঙ্গেই বোধ হয় জলচর গোসাপের সঙ্গে এদের খুব বন্ধুত্ব, প্রায়ই দেখা যায়, পাশাপাশি রোদে পোয়াচ্ছে এরা। জল ও ডাঙ্গির দ্বীপে যথেষ্ট ফ্লেমিঙ্গো পাখী দেখা যায়। এই একমাত্র পাখী গ্যালাপাগোস দ্বীপে, যাদের গায়ে রং দেখা যায়, নয় তো অধিকাংশ পাখীই একঘেয়ে ধূসর রংয়ের, নয় তো খালি সাদা।

আমরা একদিন একটা ছোট ডিঙ্গিতে করে ডাঙ্গির দ্বীপে রওনা হই। এই দ্বীপটীর ঘের কোথাও তিন মাইলের বেশি নয়। মনে হয় গোটা দ্বীপটী অ্যালবিমার্ল দ্বীপের ফেটারের মধ্যে ঢুকে যাবে। সূর্য্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছিল, ডাঙ্গির দ্বীপের পর্ব্বত থেকে কুয়াশার মেঘ রঙীন অস্ত-আকাশে উঠছে। আমরা ডাঙ্গির দ্বীপে নেমে একটা ঘন বনের আড়ালে ক্ষুদ্র জলায় অনেক ফ্লেমিঙ্গো পাখী দেখতে পাই। জলাভূমির সৌন্দর্য্য ছিল অতুলনীয়, তার পেছনে কিছু দূরে হাজার ফুট উঁচু ডাঙ্গির পর্ব্বত, ওর ধারে ধারে অতিকায় কলিমবনার গাছ, রঙিন্ ফ্লেমিঙ্গো পাখীর ঝাঁক জলের ধারে, জলের ওপর। তীরে মোচাকৃতি মাটীর ঢিবির অপেক্ষাকৃত সমতল মাথায় একটি করে ডিম। এখানেই যে ফ্লেমিঙ্গো পাখীর ডিম পাড়বার ও তা দেওয়ার জায়গা বেশ বোঝা গেল। আমরা জায়গাটার ফোটোগ্রাফ নিয়ে-ছিলাম। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে গ্যালাপাগোস দ্বীপের অদ্ভুতদর্শন জীবজন্তু মানুষের অত্যাচারে নির্ম্মূল হতে বসেছে। স্থলচর অতিকায় কচ্ছপের বংশ নির্ব্বংশ হয়েছে পাঁচটী দ্বীপে। স্থলচর গোসাপের অবস্থা এ থেকে ভাল নয়। স্থানীয় অধিবাসীরা উচ্চয়নহীন অসহায় করমোরাণ্ট পাখীদের মেরে মাংস খায় বা সৌখীন ধনীরা বেড়াতে এসে প্রমোদ-তরীতে তুলে নিয়ে যায়।

সুখের বিষয় Galapagos Committee for the Advancement of Science এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছেন। এই কমিটিতে লর্ড মর্লে, সার এডওয়ার্ড পুলটন, ডক্টর জুলিয়ান হাক্সলি, প্রোফেসর হলসবেরি প্রভৃতি বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ আছেন। তাঁহাদের উদ্যোগে ১৯৩৬ সালে ইকোয়েডর গবর্ণমেণ্ট এক আইন পাশ করেছেন এই দ্বীপের জীবকুলকে রক্ষা করবার জন্যে। কারণ গ্যালাপাগোস দ্বীপের এ জীবকুল নির্ব্বংশ হয়ে গেলে প্রাণিবিজ্ঞানের দিক্ থেকে যে প্রভূত ক্ষতি হবে, তা কিছুতেই পূর্ণ হবার নয়, প্রত্যেক প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতই তা মনে প্রাণে অনুভব করেন।*

* ইলাস্ট্রেটেড লণ্ডন নিউজের বিবরণ হইতে

---

# অমৃতস্য পুত্রাঃ

—শ্রীশুভ্রসত্ত্ব বসু

আমি আজ চেয়ে দেখি চারিদিকে অমৃতসন্তান
সভ্যতার যজ্ঞপুরে অবসন্ন মুহুর্মুহু কাতর,
নগরের ক্লিন্নমুখে শ্বাসরুদ্ধ নিয়ত গর্জ্জন,
হৃদয়ের শুষ্কস্তরে থেমে গেছে সাগরের গান!
প্রলাপিত কুঞ্জতলে বহে নাকো বসন্ত বাতাস,
রোমাঞ্চিত স্বপ্ন নাই, এতটুকু প্রাণের সরস,
তাহাদের ধ্বংসে লাগি নাই কোন অস্ত্র অপচয়,
কণ্টক-শুষ্কর বুকে শুকায়েছে পুষ্পের প্রকাশ!
তাহাদের প্রাণ-পুষ্পে নামে নাই বাসন্তী উচ্ছ্বাস,
পড়ে নাই কোনো দিন বিধাতার শুভ্র আশীর্ব্বাদ
অবলুপ্ত তাহাদের আজন্মের কাঙ্ক্ষিত সাধ,
নিষ্প্রভ মলিন দেখি জীবনের প্রদীপ্ত প্রকাশ!
অসুর কলস ভরি করেছে কি কোনো সুধা পান—
জানি না, এরা কি সেই অভিশপ্ত অমৃতসন্তান?

# জ্যোতিঃহারা

শ্রীঅনুরূপা দেবী

## চতুর্থ অঙ্ক

### ১ম দৃশ্য

(বরেন্দ্রের বাটীর সম্মুখস্থ রাজপথ, যামিনীর প্রবেশ)

যামিনী। মিসেস রায় ডেকে পাঠিয়েছেন, কি উদ্দেশ্যে জানি না। রমেন বলছিল, আমার না কি নিজের মুখেই বলা উচিত ছিল। কারণ সেবারে আমাদের পক্ষ থেকেই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল,—কিন্তু আমার সাহস হচ্ছে না। এতদিনেও যদি আমার মনের কথা তাঁর কাছে অব্যক্ত থেকে থাকে, তাহলে আজ চারটে বাঁধা গৎ দিয়ে কি তা' ব্যক্ত করতে পেরে উঠবো? নাঃ, সে আমি পারবো না! নাই বা পেলুম? দেবতাকে ক'জন প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে? আমি তো তবু সর্ব্বদাই দেখতে পাই। সকল কার্য্যে সহায়তা করতে পারি। ভয় হয়, যদি এই দুঃসাহস করতে গিয়ে সেটুকু পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলি? কিন্তু সে আমি সইবো কি ক'রে?

( ইন্দুভূষণের প্রবেশ ) আরে কে'ও ইন্দু না? হঠাৎ যে?

ইন্দু। যামিনীদা! আমি তোমার কাছেই এসেছিলুম। এই চিঠিখানা পড়ো ত। ( পত্র প্রদান। )

যামিনী। ( পত্র খুলিতে খুলিতে ) চিঠি? কি, ব্যাপার কি? (পাঠ করিতে করিতে) এ কি! এ নিশ্চয় কোন গুপ্ত-শত্রুরকাজ! না, না,—কখনও না,—ওঁদের বাড়ীটী একটি আদর্শ বাড়ী। মেয়েটিকে আমি ছোট্ট থেকেই জানি। অতি শান্ত নম্র পবিত্র চরিত্র তার! এমন শত্রু তাঁদেরও আছে! তাও তো বুঝতে পারছিনে! ( চিন্তিত )

ইন্দু। ( ক্ষণকাল যামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া ) আমার কিন্তু সন্দেহ হয় চিঠি লিখেছেন উনি নিজেই। আর যা' লিখেছেন,—অর্থাৎ এখানটায় এই যে কথা কয়টী রয়েছে—"ঐ অভাগী মেয়েটী, তার আশৈশব থেকে, আর একজনকে তার সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিল, আজও বাসে, যদিও তাঁকে সে এ জন্মে আর পাবে না জানে; কিন্তু না-ই বা পেলে! সূর্য্যমুখী সূর্য্যকে পাবে না জেনেও কি তার সমর্পিত মনপ্রাণ ফিরিয়ে নিয়েছে? একলব্যের মতই তাঁর এই নীরবভক্ত সারা জন্ম ধরে, নীরবেই তাঁর পূজা সমাধা করে যাবে, হয় ত তার মতন গুরুদক্ষিণা দিয়ে ধন্য হ'বারও তার অবসর ঘটবে না। না-ই ঘটুক, তাতেও কোন দুঃখ নেই, কিন্তু সে মহাদুঃখেই পড়বে, যদি আপনি এ খবর পাবার পরেও তাকে, তার অভীষ্ট পথ থেকে ভ্রষ্ট কর্ত্তার উদ্দেশ্য ত্যাগ না করেন! আপনি শিক্ষিত, সুচরিত্র, ভদ্রলোক, অন্যানুরাগিণী কন্যাগ্রহণ আপনার উপযুক্ত হবে না। তা'ছাড়া আপনি তাকে পাবেনও না।"—যামিনীদা! আমার আর বিয়ে করে কাজ নেই, দাদা! আপনিই তাঁদের বাড়ীতে বলে দেবেন, হঠাৎ আমার পুরিসি হয়েছে, কে' জানে তাই থেকে থাইসিসের সম্ভাবনায় দাঁড়াবে কি না! আমি বিবাহে অপারগ। নমস্কার যামিনীদা! চিয়ার আপ ওল্ড্ বয়! ওরকম ভীষণ গম্ভীর মুখ করবেন না। ভ্রোণাচার্য্যও হঠাৎ একলব্যের সম্বন্ধে হয়ত ওই প্রকারেই হতবুদ্ধি হয়েছিলেন! তাই যখন হয়ে গেল, তখন পাঁচটা-পঁচিশের ট্রেণটাই বা মিশ করি কেন? যাচ্ছুই। ( দ্রুত প্রস্থান )

যামিনী। এ আবার কি? এর অর্থ কি? কে জ্যোৎস্নার সম্বন্ধে এরকম অনাদা চিঠি লিখে ওর এমন ভাল সম্বন্ধটা ভাঙিয়ে দিলে? কাকাবাবু ও অমলাদি'র অনুরোধে আমিই ইন্দু ছোকরাকে আনিয়ে, মেয়ে দেখিয়ে, রাজী করে-ছিলুম। সব দিকে বেশ ভালই হতো, কিন্তু হঠাৎ এ কি ব্যাপার? ইন্দু যা বলে গেল সেও কি সম্ভব? না না, জ্যোৎস্না বড় শান্ত মেয়ে, ছোট থেকে ত চিরদিনই ওকে দেখছি, কখনও ওর পাঁচটা কথা একসঙ্গে শুনি নি। সেই জ্যোৎস্না—নাঃ, কিছুই যেন ভাল করে বোঝা যায় না! চিঠিখানা থাক, ( পকেটে রাখিল )—কুমার বাহাদুর, ভাল আছেন?

বরেন্দ্র। ( প্রবেশ করিয়া যামিনীকে দেখিয়া স্বগতঃ) কাল কৃষ্ণকে বলেছি যদি পারে এটাকে লেঠেল দিয়ে ঠেঙিয়ে

মারলেও আপত্তি নেই! ইংরেজ মারল না হলে এতকাল আর এঁকে মাটিতে হেঁটে বেড়াতে হতো না। এরই জন্যে, আমার সমস্ত অবদান অগ্রাহ্য হয়ে যাচ্ছে; সে শুধু এরই জন্যে! (প্রকাশ্যে) হুঁ, আপনি?

যামিনী। (হাসিয়া) ভালই আছি। কিন্তু আপনার মুখ দেখে তো বেশ ভাল আছেন বলে মনে হচ্ছে না? যে ম্যালেরিয়া এর আরম্ভ হয়েছে, দেখবেন, খুব সাবধান হবেন। এই সময় আমাদের পুরো কাজের সময়, এখন কোন মতেই আপনাকে আমরা জ্বরে পড়তে দিতে পারিনে! হিতসাধিনী সভা থেকে এবার গ্রামে গ্রামে, ওষুধ পথ্যের সাহায্য দিয়ে, লোক পাঠাবার যে প্রস্তাব হচ্ছে, আপনার সঙ্গে সে বিষয়ে আমার একটু কথা কইবার ছিল। যেদিন আপনার সময় হবে, আমি আসব, কি বলেন!

নরেন্দ্র। কোথায় আসবেন?

যামিনী। কেন, আপনার বাড়ী?

নরেন্দ্র। আমার বাড়ী আপনি আসবেন?

যামিনী। কেন ভাই? আপনার তা'তে কোন আপত্তি আছে না কি? তা থাক, তবু, আমি আপনার দাদা হ'বার বয়সী তো, আপনি না ডাকলেও আমি যেতে বাধ্য হবো।

নরেন্দ্র। (চমৎকৃত ভাবে স্বগতঃ) এই লোকের উপর হিংসে করি! অত বড় বিদ্বান, কোর্টে পশারও আজকাল সোজা নয়, জেলায় একটা মাথা বল্লেও হয়, অথচ কি রকম অমায়িক! নাঃ, আমার মনই ছোট,—এঁর কাছে আমি! ভূষণকে বলতে হবে, রাগের মাথায় যা' বলি কই, সে একটা মস্ত গোঁয়ার, সে আবার তাকে সত্যি করেই যেন ধরে না বসে! আমার বরাতে যাই থাক, এ লোকের কোন ক্ষতি আমার দ্বারা হবে তার নেই। (প্রকাশ্যে) আসুন না এখনই, আবার আবার সময়ের অভাব কি?

যামিনী। (সহাস্যে) আসুন তা হলে, আপনার বাড়ী একটু দেখেই যাই। আপনার সেই অন্ধ ওস্তাদজী কই—আর গান গান না?

নরেন্দ্র। শুনবেন তার একখানা গান? চলুন, শোনাই গে'। (উভয়ে ভিতরে চলিয়া গেল, ক্ষণ পরে গান শোনা গেল)।

(নেপথ্য হইতে ওস্তাদজীর গীত)

ওরে পথিক! পথ চলার শেষে পথ খুঁজে নে', এই বেলা,
আঁধার ক্রমেই ঘনিয়ে আসে, ভোর, শেষ করে যে পথ চলা।
ওরে পথিক, পথভোলা, বেলা যেন,—শেষ বেলা,—
তোর সঙ্গী সাথী কিসলো ওরে, শেষ করে যে যায় বেলা,
ফিরে সবে ঘরে, আপন ঘরে, ফিরিস্ নে'কো' আর ভেলা।

(ভূষণ এবং সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ)

ভূষণ। দেশের লোক, আমি আপনাদের চিরদিনের অনুগত, আমার বাপ ঠাকুর্দ্দা আপনাদেরই নিমক খেয়ে গেছেন, আমিই দুদিন এই ছোট তরফের কাছে অস্থায়ী ভাবে খেকেছিলুম, আবার আপনাদেরই দয়ায় সেই হাত পেতে দাঁড়াতেই যেতুম। এঁনার তো ধকা নিকেশ হয়ে এসেছে, অন্তর্জ্জলে পড়ে খাবি খেতেই সুরু করেছেন, বেশী কাল আর তো নয়।

সর্ব্ব। কেন, নরেনের কি হয়েছে? খুবতো ঘানটান করে নাম কিনছে শুনলুম, বিষয়-আশয় সব গেছে না কি? কই না, মহাল-টহাল কই বাঁধা টাঁধা পড়ে নিতো! বরঞ্চ বাবার এই মকদ্দমায় হাইকোর্ট, প্রিভিকাউন্সিল করতে আমাকেই তো ক'টা মহাল বাঁধা দিতে হ'ল, ওর ম্যানেজার সেগুলো কিনে রাখলে।

ভূষণ। নাঃ সে ঠিক আছে, এঁনার ধরেছে অন্য রোগে! এই পাশের বাড়ীর এক হিসাব কেরতের, আধা বয়সী একটা বুড়ো মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে গেছে। মেয়েটা বয়েসে ওর ঝিঝিমায়ের বয়সী হবে। ওরই মন পাবার জন্যেই অত দান হচ্ছে, ধ্যান হচ্ছে! আগেকার রাজারা যেমন ছেলের জন্যে পুত্রেষ্টি যাগ করতো না? এবার তেম্‌নিধারা বউ-ইষ্টি যাগ হচ্ছে! চব্বিশঘণ্টাই ওই ইষ্টিমন্তর জপ করছেন! আবার মজাটা এম্‌নি, সেই ইষ্টিদেবীটী আবার ওনাকে কলা দেখিয়ে দেখিয়ে, একটা ছোঁড়া উকিল,—হঠাৎ খুব ক্ষেপে উঠ্‌ছে—তারই সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা ইয়ারকি মারছেন!

সর্ব্ব। (বাধা দিয়া) ভূষণ! ওই যামিনী ব্যাটাই আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে! যে উইল নিয়ে মকদ্দমা, সেটাকে ভাল বলে প্রমাণ করে ওই যামিনীই। ছোটখুড়ির তো হাতে পয়সা ছিল না, ও যামিনীর পিসির সম্পর্কে বেওরিস না' কে' হয়। ঠাকুর্দ্দার উইল নিয়ে যখন গোল বাধে,

ছোটখুড়ি তার ছেলেটাকে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে যায়। বাপতো ছিল না, মায়েরও খুব দুর্দশা, যামিনীর পিসি সব খবর শুনে ওকে এখানে আনিয়ে আশ্রয় দেয়।

ভূষণ। আস্পর্দ্ধা তো কম নয়! বলে, আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে! তারপর?

সর্ব্ব। এখানে আমার পর, যামিনীরই পরামর্শে আর সাহায্যে ও বাবার নামে একটা নালিশ রুজু করে দেয়, যে, ঠাকুর্দ্দার যে উইল দেখানো হচ্ছে, সেটা জাল উইল, আসল উইল নষ্ট করা হয়েছে। এ উইলে ছোটখুড়ি আর তার ছেলে, বাবার কাছে অনুগত হয়ে থাকলে, যাবজ্জীবন খোরপোষ পাবে; এই রকমটা ছিল কি না! ছোটখুড়ি বলে, ওর শ্বশুর মরবার আগের রাত্রে ওকে বলেছিল যে, হরিদয়ালের সঙ্গে তোমার স্বামীর (ওঁর ছেলের) সমান অংশ দিয়ে গেলুম, ওকে ভাল করে মানুষ করো—

ভূষণ। তা' জাল উইল বলে প্রমাণ হ'ল কিসে?

সর্ব্ব। ঐ যামিনী সয়তানটার জন্যে! এ উইলে ঠাকুর্দ্দার যে সই আছে, সেটা প্রথমে ব্লাড স্পেসিলে কপি করে নিয়ে, তার ওপরে কালি দিয়ে লেখা! এই ওর প্রমাণ। যাক্ সেতো যা' হ'বার খুবই হ'ল! এখন বাবা জেলে যাবার সময় আমায় প্রতিজ্ঞা করিয়ে গেছেন, ঐ যামিনীর উপর আর ছোটখুড়ির উপর ওঁর এই কঠোর শাস্তির প্রতিশোধ নিতে হবে। তাই ভাবছি, ভূষণ! কি করে যে—

ভূষণ। তার জন্যে আবার ভাবনাটা কি? কত খরচা করবেন?

সর্ব্ব। জানো ত সবই? জনসন ব্রাদার্স, মেসার্স-বার্ড ও মাল্লাদের থেকে আরম্ভ করে, চুপো পুঁটি সবার পেছনেই টাকার বৃষ্টি করতে হয়েছে। মহাল সমস্তই প্রায় বাঁধা, দু' একটা বেচতেও হয়েছে! তা যাই হোকগে' —পিতৃ শঙ্কর জন্যে যদি বাঁচি তবেও খরচা করতেই হবে। হাজার দুই তো—

ভূষণ। দেখুন এসব কাজ নিয়ে ঘর-কথাকষি করা চলে না! এক কথায় বলে দিলুম;—আপনার সময় মন্দ বলেই অত অল্পে রাজী হচ্ছি,—পাঁচটী হাজার দিতে পার্ব্বেন ত বলুন, চেষ্টা করে দেখি যা হয় একহাত।

সর্ব্ব। বেশ, তাই হবে। কত ছোট খুড়ি?

ভূষণ। আজ্ঞে মশাই! ও'তে আমি নেই। ও আপনারা বুঝুন গিয়ে।

সর্ব্ব। ঐ তারা যেন আসছে। আচ্ছা এখন আমি চল্লুম, বরেনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, আমি চাই নে।

(প্রস্থান)

ভূষণ। একটি ঢিলে দুটী পাখী—নাঃ দুটী ঢিলে একটী পাখী, মারতে পারলেই, ভূষণ চন্দর পনের হাজারের মালিক! টাকাটা দুবেটার কাছেই আদায় নিতে হবে, নৈলে হয়ত, বিয়ে হলেই ছানাদার লাখি' করবে! (প্রস্থান)

(বরেন্দ্র ও যামিনীর ভিতর হইতে নিষ্ক্রমণ)

বরেন্দ্র। আমি আপনাকে দাদা বলে ডাকবো, আপনি আমায় নতুন করে গড়ে তুলুন! (পদধূলি লইল)

যামিনী। (মাথায় হাত দিয়া) এস ভাই, এসো, কাল আবার দেখা হবে। (প্রস্থান)

বরেন্দ্র। দেবতা বল্লেই হয়! এখন যদি ওঁকে পাই, জীবনের সমস্ত অভাবই পূর্ণ হ'য়ে যায়; অনায়াসেই বল্লেন, 'উনি যদি তোমায় চান, আমার কোনই অমত নেই!' অথচ কে' না জানে, যামিনীবাবু মিস বসুকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। মানুষ কত উঁচু হয়, আর আমি কোথায় নেমে যাচ্ছিলুম! মাষ্টার মশাই! তোমার আশীর্ব্বাদে,—এতদূর তোমার আশীর্ব্বাদে! নাঃ আজই আমি তাঁকে মিনতি জানিয়ে চিঠি দিই,—তিনি আসুন,—তাঁর কথা আমার চব্বিশ ঘণ্টাই মনে পড়ছে! লজ্জায় ওঁকে ডাকতেও পারি নি; তা' এখন আমি তাঁর কাছে আমার মুখ তুলে চাইতে পারবো! (প্রস্থান)

## চতুর্থ দৃশ্য

অনিমার বসিবার ঘর।

(জানলা ধরিয়া অনিমা দাঁড়াইয়া ছিল, মিলি প্রবেশ করিল)

মিলি। উঃ কি কঠিন প্রাণ তোর রে অনি! আজ সাত দিন ধরে গেল, একটা কথাও ভাল করে কোস্‌নে, আমি তো হাঁপিয়ে মরে গেলুম!

অনিমা। (মৃদু হাসিয়া) তাই বটে! তোমরা কর্ত্তা-গিন্নিতেই তো আমায় বরকট করেছ।

কৃপা। সে যাহোক, ইনি বলছিলেন, যামিনীবাবু বেচারা বড্ডই মুস্‌ড়িয়ে পড়েছেন, তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া উচিত! ওঁকে আমি ডাকিয়েছি। ওরে, যামিনীবাবুকে ডেকে দে' তো।

( জানলার ওপাশে গঙ্গাবক্ষ, সেখান হইতে নৌকারোহী ছেলের দল চীৎকার করিয়া উঠিল, "থ্রি-চিয়ার্স ফর কাঁচড়া-পাড়া ইউনিয়ন ক্লাব্, হিপ্ হিপ্ হুরুরে! হিপ্ হিপ্ হুরুরে, হিপ্ হিপ্ হুরুরে"। অণিমা চমকিয়া উঠিল। ধীর শান্ত চরণে প্রবেশ করিল যামিনী। )

কৃপা। বসুন যামিনীবাবু! মিহিরদা' এ মেলেও এঁকে আবার চিঠি দিয়েছেন। তা'তে লিখেছেন, বিয়ের দিন স্থির করে ওঁকে তার দিতে। তা' যাহোক আপনারা একটা কিছু স্থির করে ফেলুন, না হলে আমরা যে মাঝে পড়ে বিব্রত হই। ঐ যাঃ! ভাঁড়ারটা খুলে ফেলে রেখে এসেছি! যা' না' রান্নাঘরের চাকরটা, চোরের একটা সর্দার! চাবিটা দিয়ে আসি। ( দ্রুত প্রস্থান )

( দুজনে বহুক্ষণ নীরবেই রহিল, যা'দের কথা ফুরাইত না, তা'দের মুখে আজ একটীও কথা নাই। অণিমা সলজ্জ নতমুখ, যথাস্থানেই দণ্ডায়মান, যামিনী বিপন্ন ক্লিষ্ট অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্লান্ত ও বিষণ্ণ গম্ভীর। গঙ্গাবক্ষে তরণী হইতে হার্মোনিয়াম সহিত গান শোনা যাইতেছিল,—

"তোর আসন তবে ছাড়বে তোর, তা'হলে ভাবনা করা চলবে না।
তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে, হয়ত যে, ফল ফলবে না
তা'হলে ভাবনা করা চলবে না।
ওলো তোমার মুখের বাণী, আসবে ছুটে সকল প্রাণী,
হয়ত তোমার আসন ঘরে তোমার বাণী ফলবে না তা বলে—"

যামিনী। ( সচেষ্ট মৃদুকণ্ঠে ) মিহির আমাকেও চিঠি দিয়েছেন।

অণিমা। ( যথাপূর্ব্ব থাকিয়া ) আমিও পেয়েছি।

যামিনী। (ইতস্ততঃ) আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেবের বিশ্বাসের বলেই আমি এতদূর ধৃষ্টতা করতে সাহসী হয়েছি, তা'তে আপনাকে হয়ত বিরক্তই করে ফেলেছি; তা' যদি করে থাকি, তার জন্য আপনার কাছে সহস্রবার ক্ষমা চাইছি।

অণিমা। না।

যামিনী। তা'হলে কি রমেনের কথাই ঠিক? আমাদের মধ্যে শুধু একটুখানি বোঝবার ভুল হয়েছে?

অণিমা। (ঈষৎ অগ্রসর হইয়া ) আমায় ক্ষমা করুন। রমেনবাবু যা' বলেছেন তা' অসম্ভব!

যামিনী। ( আর্ত্তবৎ চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর আবার বসিয়া পড়িল, তার মুখ হইতে অস্ফুটে নির্গত হইল ) "অসম্ভব!" ( তারপর সে কম্পিত পদে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তেমনই কম্পিত কণ্ঠে কহিল ), রাত হয়ে যাচ্ছে, আমি যাই।

(অগ্রসর হইল )

অণিমা। (অগ্রসর হইয়া ) একটু বসুন, আমারও কিছু বলবার আছে,—

যামিনী। (ফিরিয়া আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়া স্বগতঃ ) আর কেন? এ অভিনয় যে আর আমি করতে পারছিনে! রমেন মিথ্যে আবার আজ এ জঞ্জালে জড়ালে।

অণিমা। ( যথাসাধ্য সহজ ভাবে ) পাঁচ বৎসর আগের কথা ভেবে দেখুন! ( কণ্ঠরোধ )

যামিনী। ( আশ্চর্য্যভাবে ) বাবার কথা? তিনি নিজে হ'তে সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেন, সেই কথা বলছেন? কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্ত কি আমার আজও সম্পূর্ণ হয়নি?

অণিমা। তা' নয়, তা' নয়, ওঃ আপনি আমায় কেবলই ভুল বুঝছেন। তখন বাধা ওঠে, আপনি ব্রাহ্ম, আর আমরা এষ্টিষ্ট! আজ কোন্ ধর্ম্মমতে আপনি আমায়,—আমি আমার পৈতৃক মত বিশ্বাস নিজের কোন সুখ-সুবিধার জন্যই তো ত্যাগ করতে পার্বোনা। তা ছাড়া—তা ছাড়া—আমি সত্যের শপথ নিয়ে,—না, আমি যে আপনাকে ভাল করে বোঝাতেই পারছিনে। আপনি আমার জন্যে যথেষ্ট করেছেন, কিন্তু এম্‌নি অকৃতজ্ঞ আমি,—আমায় আপনি ক্ষমা করুন! ( দ্রুত চলিয়া গেল )

যামিনী। ( দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ) তাই হোক,—তোমায় ক্ষমাই করলুম! আমার ধর্ম্মই বা আমি ছাড়বো কেন? তোমার স্ব-ধর্ম্ম তুমি যদি না ছাড়ো। জীবন তো আমার শ্মশান হয়েই গ্যাছে, দুঃখ করবার আমার নূতন করে কিছুই নেই!—এ শুধু 'বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি'র একটী ক্ষুদ্র উদাহরণ। ( প্রস্থান )

অণিমা। ( ফিরিয়া আসিয়া ) এমন পোড়া কপাল নিয়ে কেউ কখন জগতে জন্মায় নি!

বয়। ( প্রবেশ করিয়া কুমার সাহেবের কার্ড প্রদান )।

অনিমা। এমন সময়! যাক্‌গে, নাঃ—এলেইবা! দে'আও।

( বয়ের প্রস্থান ও বরেন্দ্রর প্রবেশ। উঠিয়া নমস্কার-পূর্ব্বক চেয়ার সরাইয়া দিল ) বসুন।

বরেন্দ্র। ( স্বগতঃ ) ক'দিন দেখিনি, কোন অসুখ-বিসুখ করেছিল না কি? গলার স্বরটাও তো ভাঙা ভাঙা কেমন যেন। ( প্রকাশ্যে ) আপনাকে তো ভাল দেখছিনে! শরীর কি ভাল নেই?

অনিমা। ( মৃদু স্বরে ) ভালই তো আছি। আপনি 'হিতসাধিনী' সভায় দাত হাজার টাকার ওষুধ-কাপড় প্রভৃতি দান করলেন শুনলুম, তার জন্য অনেক ধন্যবাদ!

বরেন্দ্র। ( দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে ) ও আর বেশী কি? খুব সামান্যই! কিন্তু আজ আমার একটী বিশেষ নিবেদন আছে। কথা দিন যে, একটুখানি সময়ের জন্যও আজ আপনি আমার যা' কিছু বলবার আছে, অন্ততঃ সেটুকু বলতে অবসর দেবেন? রাগ কর্ব্বেন না?

অনি। ( মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া, প্রকাশ্যে শান্ত ভাবে ) বেশত, বলুন না।

বরেন্দ্র। আমি আপনার অভিভাবক,—অর্থাৎ যামিনী বাবুর—অনুমতি নিয়ে এসেছি, আপনার দয়া ভিক্ষা কর্ব্বার অধিকার আমি পেয়েছি। তিনি মহৎ, তিনি মহাত্মা, তিনি দেবতা! তিনি বলেছেন, আপনার সম্মতি থাকলে, তিনি এ'তে সুখীই হবেন।

অনিমা। ( গম্ভীর স্বরে ) সে 'অধিকার' দে'বার অধিকার তাঁর আছে? তিনি নিজে বলেছেন, যে, তিনি আমার অভি-ভাবক? আমার সকল বিষয়ে ব্যবস্থা দে'বার অধিকার তাঁর আছে? ( স্বগতঃ ) উঃ, আর পারিনে! আর আমি পারিনে! লোকে বলে, "মরার বাড়া গালি নেই," আমার ভাগ্যে দেখ্‌ছি তা'ও আছে!

বরেন্দ্র। (অপ্রতিভ হইয়া) না, না,—তা' তিনি বলেন নি, বরং বলেছেন, তাঁর আপনার সম্বন্ধে কোন অধিকারই নেই।—তবে কি না, তিনি আমায় এখন আর অ-স্নেহ করেন না, আর এইটুকুই আমার পক্ষে ঢের! এখন আপনার কৃপার উপরেই আমার সমস্ত জীবন মরণ নির্ভর করে রয়েছে। আমার অন্তর বাহির সব আমি নূতন করে গড়ে তুল্‌ছি, তার গতি আপনার হাতেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলবে। আপনি যদি আদেশ করেন, আমার যা' কিছু আছে, সমস্তই আমি দলের কাজে দান করে দিয়ে, নিঃস্ব ভিখারীর বেশে আপনার কাছে এসে দাঁড়াবো। গরীবকে তো আপনি দয়া করে থাকেন! দুঃখী তো আপনার কাছ থেকে ফেরে না! আমি দারিদ্র্য দিয়েই আপনার দয়া আকর্ষণ করবো। ঐশ্বর্য্য ভোগে আমার রুচি নেই, দারিদ্র্যে যদি স্বর্গ পাই, তবে কি হবে অনর্থক এ অশান্তির বোঝা বয়ে? বলুন একবার, আমার জীবনের নিয়ন্ত্রীর পদ গ্রহণ কর্ব্বেন কি না?

অনিমা। (অল্পকাল নত মুখে থাকিয়া সহসা মুখ তুলিয়া) কয়লো।

বরেন্দ্র। ( লাফাইয়া উঠিয়া ) এ'কি সত্যি, না আমার শোনবার ভুল? অনিমা! অনিমা! জীবনের আরাধ্য দেবী আমার! এই নাও আমার দেহ, মন, প্রাণ সমস্তই তোমার হাতে তুলে দিলুম। ( নতজানু হইল )

অনিমা। ( উঠিয়া আসিয়া হাত বাড়াইয়া দিল ) এস ভাই এস! আজ থেকে তুমি আমার সহোদর তুল্য বড় ভাই, আর আমি তোমার স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী ছোট বোন। ভাই বোনের স্নেহ জগতে তুচ্ছ ভেবো না। সংসারের মধ্যে অতি পবিত্রতম উচ্চতম এ বন্ধন! মার গর্ভের ভাই বোন—কি অতুলনীয় স্নেহ সম্বন্ধ! দেশমাতা আমাদের গুরুনকারই মা, তাঁর সেবা আমাদের গুরুনকারই জীবনের একমাত্র পুণ্য উদ্দেশ্য হোক। দুঃখিত হয়ো না দাদা! অন্য কোন দান দে'বার সাধ্য থাকলে আমি অসঙ্কোচে তোমায় দিতুম। উপায় নেই!

বরেন্দ্র। ( কণকাল স্তম্ভিত থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, পরে অনিমার প্রসারিত হাত ধরিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ) তাই হোক,—তাই হোক,—আজ থেকে তুমি আমার বোন, আমি তোমার ভাই—মার নামে শপথ।

অনিমা। ( সানন্দ হাস্যে নত হইয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল )।

বরেন্দ্র। ( নিঃশ্বাস ফেলিয়া ) আমার যে ঘুরে ফেলে না ফেলে, কাছে টেনে নিলে, এত কাছে নিলে, এ'ও আমার পরম ভাগ্য! আমি যা' জানি নে', দেবতা চিনিনি—তুমিই

আমার জীবনের ধ্রুবতারা',—আমায় তুমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যেও। আমি আসি,—আমি আজ এখন তবে আসি। ( অর্দ্ধ বিহ্বলভাবে চলিয়া গেল। )

( অণিমা সেই দিকে চাহিয়া থাকিল, তার চোখ দিয়া জল ঝরিতে লাগিল, তার পর সে দুই হাতে মুখ ঢাকা দিয়া আর্ত্তভাবে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। জানলা দিয়া জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছিল। একটা গানের সুর নেপথ্য হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল। )

গীত

যাবে যাও,—যাবে যাও,—বাধা দেবো না,—
না,—যেও না,—যেও না ফিরে।
আমার এই,—পাগল করা, প্রাণের বেদন,
না শুনেই- যেও না ফিরে।
ঝড়ের রাতের মাতামাতি, যাবল ঘন দিনীথ রাতি,
আগুন জ্বালা দিবস বেলা, এ জীবন আছে ঘিরে।
দুকের মাঝে ঝড় বিষাদ, চৈত্রবাতে কেঁদেছে হায়,
দু দু জ্বালা চিতায় আগুন, নিবিয়ে যে যাও,—নয়ন নীরে।

## পঞ্চম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

[ একটী নির্জ্জন বাগান-বাড়ীর একটী কক্ষ, ঘরে অনেকগুলি আলমারি ভরা ভরা নানা ভাষার পুস্তক, মধ্যে একখানি গালিচাস্তৃত, তদুপরি কম্বল ও অজিনাসন। একটী মোটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়া, বয়স্ক, অথচ বয়োধর্ম্মে পলিত নহেন, এমন একটী প্রৌঢ়াকৃতি লোক, গায়ের রং তাঁর উজ্জ্বল গৌর, মাথার চুল একটু বড় বড় অথচ ঠিক জটাও নহে, গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, সাদা গরদের কোঁচ পরা, চশমার মধ্য দিয়া একখানি মোটা বাঁধানো বই পড়িতেছিলেন, অণিমা হরেন্দ্র ও কৃপালিনী প্রবেশ করিয়া পায়ের কাছে প্রণত হইল। ইনিই তাদের পূর্ব্বতন গুরুবংশীয় দাদামশাই। ]

দাদা। ( চাহিয়া দেখিয়া অণিমাকে ) স্বয়ম্বরা-কুমারী কি আজ প্রত্যক্ষরূপে আমার সম্মুখীন হলেন? "আমাহি বরমে দেবী, ত্রাক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি!" কে' মা তুমি?

অণিমা। ( সলজ্জ নতমুখে ) স্বর্গীয় অচলকৃষ্ণ গুপ্তের মেয়ে, আমি অণিমা।

দাদা। এস, এস, দিদি এস! ইনি বুঝি আমার নাতজামাই? আর এটি?

অণিমা। ( লজ্জাস্থিত মুখে ) এঁরা পিসিমার মেয়ে জামাই, কৃপালিনী আর হরেন বসু।

দাদা। বেশ, বেশ, দেখে খুব খুসী হলেম। আর তোমার বয়টী কই ভাই?

অণিমা। ( সলজ্জে নীরব )

কৃপালিনী। আপনি প্রথমেই যে ওকে কুমারী বলে ছিলেন, আপনার দৃষ্টি কি ভুল করতে পারে? ও ঠিক তাই। পোড়ারমুখী, এই এঁর চাইতেও সুন্দর, বিধান বরকে দু' দু'বার দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে!

অণিমা। ( সরোষে ) মিলি!

কৃপা। তোর কি! তুই চুপ করে থাক্! সত্যি কথা বলবো, দাদামশাই-এর কাছে, তোকে ভয় করবো না কি? তোর একলার দাদামশাই? না?

দাদা। ( হাত বাড়াইয়া ) না দিদি! আমি তোদের সকলের দাদামশাই! আয়, তোরা আমার কাছে আয়! ( সরিয়া আসিলে দুজনকারই মাথায় কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে ) ভগবান তোমাদের সমস্ত অমঙ্গল দূর করে দিন, সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলে রাখুন!

অণিমা। ( মুগ্ধ চিত্তে, পায়ে পড়িয়া ) এতদিন আমায় কাছে ডাক নি কেন, দাদামশাই! এত বড় স্নেহময় স্বর্গের বাইরে ফেলে রেখে কি বঞ্চিতই করেছিলে?

দাদা। ( সস্নেহে তুলিয়া বসাইয়া বাহু বেষ্টিত করিলেন ) দিদি! সময় না এলে তো কিছুই হয় না ভাই! এই তো তোর আসবার ঠিক সময় এসেছে। রাত পোহালেই তো উষার উদয় হয়।

অণিমা। দাদার টেলিগ্রামে যেদিন খবর পেলুম, সে সেইখানেই, মিস ক্লার্টন বলে একটী ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করেছে, আমার মনে হ'ল আমি আর বাঁচতে পারব না। বিজাতি, বিধর্ম্মী, বিদেশী মেয়ে বিয়ে করে, সে তার দেশ, সমাজ, পিতৃবংশ সকলকার সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার উপর আজীবন কৌমার্য্যের শপথ ভেঙ্গে, সে সতীকে অপমান করেছে। সে দেশের শত্রু, বংশের শত্রু, আমার ঘোরতর শত্রু! যত তাকে ভালবাসতুম, ঠিক ততখানি

তাকে আজ আমি ঘৃণা করি! মনে করেছিলুম, এর পর আমি আর বাঁচব না, কিন্তু ঠিক এই সময়েই আপনার কাছ থেকে, ওই স্নেহপূর্ণ আহ্বানপত্র এল। মনে হ'ল, যেন চির পরিচিত পরমাত্মীয়ের সে ডাক! মিলি! তোরা ফিরে যা, আমি আজ আর যাব না। আমায় থাকতে দেবেন তো দাদামশাই! আপনার পায়ের তলায়?

দাদা। তোর যদি কষ্ট না হয় তো, থাক না ভাই!

মৃণালিনী ও রমেন্দ্র। (উঠিয়া) বেশ ভাই দুদিন থাক্,—বাড়ীতে তো টিঁকতেও পারছে না। আচ্ছা আমরা তা' হলে আজ আসি, দাদামশাই, দিন দুই পরে এসে ওকে নিয়ে যাব। (প্রস্থান)

অণিমা। দাদামশাই! আমার অনেক কথা কইবার আছে, অনেক কিছু জানবার আছে, আমি কিছুই জানিনে, আমায় আপনি শেখান—

(যামিনীর প্রবেশ) এ কি! আপনি কি করে এলেন?

যামিনী। (প্রণাম করিয়া উঠিয়া মৃদুহাস্যে) যাঃ, আপনারাই শুধু ফাঁকি দিয়ে, দাদামশাই-এর স্নেহ উপভোগ করবেন বুঝি? আপনার বাড়ীতে গিয়ে খবর পেলুম, পাওয়া মাত্র ঠিকানা জেনে নিয়ে এই ছুটে আসছি।

দাদা। না না, ওখানে কেন, ওখানে কেন, আমার কাছে এসে বস।

যামিনী। (সলজ্জভাবে) আপনার বিছানায় বসবো? আমি কিন্তু ব্রাহ্ম।

দাদা। ওঃ, তা হলে তো তুমি খুব মস্তলোক! আমি তো এখনও ব্রহ্ম জ্ঞানের ধারেও ঘেঁষতে পারি নি।

যামিনী। (লজ্জিত হইয়া) আজ্ঞে, আমি ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত, তাই বলছিলুম, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবো এত বড় সৌভাগ্যবান আর কই হ'তে পেরেছি? (পদতলে গিয়া বসিল)

দাদা। (মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন) তা' বটে, ব্রহ্মকে নিয়ে তোমরা একটী সমাজ তৈরী করেছ বটে! তখন সেটার হয় তো দরকারও ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। অত বড় একটা নাম নিয়ে, বৃহৎ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন না থেকে, হিরণ্যগর্ভোপাসক হিন্দু অথবা ব্রহ্মোপাসক হিন্দু, নাম নিয়ে, বিশাল হিন্দু-সমাজের মধ্যেই তোমাদের বিলীন হয়ে যাবার কাল এসেছে। তাঁদের যা' কাজ ছিল, তা' এক রকম হয়ে গেছে, সে সময়ে, চাপা পড়ে যাওয়া উপনিষদ প্রভৃতির প্রচার করা, সময়োচিত কতকগুলি কর্ম্ম সংস্কার দ্বারা ইংরেজী-শিক্ষিতদের খৃষ্টান হওয়া থেকে রক্ষা করা,—এরই জন্য তাঁদের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা, সে সময়ে নিশ্চয়ই ছিল। চির যুগ যুগান্তর ধরেই এই রকম হয়ে এসেছে। ঋষিদের কামধেনুর পুচ্ছ থেকে সৈন্য সৃষ্টি হয়ে, কামধেনুরূপ হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা পূর্ব্বক, পুনশ্চ সেই ধেনুর মধ্যেই বিলীন হওয়া—এই আর কি!

যামিনী। (সবিনয়ে) আমারও কিছু জানবার আছে, যদি দর্শন পেয়েছি, তবে—

দাদা। (হাসিয়া) ওরে, তোরা ছুটো বিদ্বান্-বিদুষীতে দুদিক থেকে যদি এমন করে আমার কান ধরে মোচড় লাগাস, তাহলে আমি যে খেই-হারা হয়ে পড়বো!

যামিনী। আপনি যতই বলুন, আর ছাড়ান পাচ্ছেন না। আজ আমি যাচ্ছি; কিন্তু রবিবার এসে সারাদিন বসে থাকবো, যখনই আপনার সময় হবে, আপনার অমূল্য উপদেশ শুনে ধন্য হবো! আপনার দর্শনেই যেন মোর মন পবিত্র হলো!

দাদা। দেখ্ তোরা অত করে আমায় নাই দিস্‌নে রে, দিস্ নে। ওই করে শেষে কি মাথায় তুল্‌বি?

যামিনী। (প্রণাম করিয়া) আপনি যে মাথায় রাখারই যোগ্য। আজ তবে যাচ্ছি, আবার আসবো। (প্রস্থান)

দাদা। এস, দাদা এস। খাসা ছেলে,—চাঁদের মত ছেলে,—বুকে রাখলে, বুক জুড়োয়! অণিমা।

অণিমা। (মুখ তুলিয়া) দাদামশাই!

দাদা। ইনিই মনে হলো, সেই, 'রমেনের চেয়েও সুন্দর, আর বিদ্বান্ বর', যাঁকে তুমি বার বার প্রত্যাখ্যান করে দুঃখ দিচ্ছো, আর নিজেও পাচ্ছো! কিন্তু কেন দিদি! তুমি কি বলতে চাও, তুমি ওঁকে ভালবাস না? তা' যদি ভেবে থাক, সে তোমার আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র। নিজেকে নিজের দ্বারায় ঠকিও না, দিদিমণি! তোমাদের দুজনকার 'পরেই, দুজনকার অপরিসীম ভালবাসায় যে বুক ভরা হয়ে রয়েছে, সে আমি এইটুকুর মধ্যেই তো সুস্পষ্টরূপে দেখতে পেলুম,—

অণিমা। (আর্ত্ত কণ্ঠে) দাদামশাই! দাদামশাই! আপনি শুদ্ধ, আর আমায় অমন গম্ভীর মুখ করে বকবেন

না। আপনারা তো জানেন না, এ পর্যন্ত আমি কতই না সহ্য করছি! জীবনের সেই প্রথম আঘাতে বুক আমার ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছলো - ( ইঁকাইতে লাগিল )

দাদা। তবে আজকের এ সুযোগ কেন ছেড়ে দিচ্ছো, দিদি? দেশের কাজে, দেশের সেবায়, তোমার একার হাত তো সম্পূর্ণ সবল নয়, কেন ওই প্রসারিত সবল বাহুকে প্রতিঘাত করে তবে ঠেলে দিচ্ছো? প্রকৃতি যখন ক্রিয়মাণা, তখন চৈতন্যরূপী পুরুষ বাঞ্ছীত তো তাঁর সে ক্রিয়া সম্পন্ন হ'তে পারবে না! তুমি তো নির্ব্বাণপথের পথিক নও, তাই! কর্ম্মযোগের সাধনাই যে তোমার প্রকৃতিসিদ্ধ!

অপিমা। ( কান্নাধরা কাতর কণ্ঠে ) তোমার ব্রহ্মকে চিনি নি, দাদামশাই! চিনেছিলুম একমাত্র সত্যকে! যে অপরাধে মিহিরকে ক্ষমা করতে পারি নি, সে অপরাধের দণ্ড, নিজে কেমন করে না নোব? বাবার ইচ্ছায় যে দিন এ জন্মের সুখসাধে বলি দিলুম, সে দিন রক্ষাবীজরূপেই এই ত্যাগের মন্ত্র নিয়েছিলুম। তখন তো স্বপ্নেও জানতুম না যে, সেই মুক্তিমন্ত্রই একদিন আমার উত্তরের রজ্জু হয়ে দাঁড়াবে! থাক্, দাদামশাই! থাক্, যা হ'বার নয়, তা' শেষ হয়েই থাক্। দুটো ভাল কথা বলুন, আমি প্রাণ ভরে শুনি, আর আপনাকে পাবার সুখে, সকল ক্ষতিকে নিমগ্ন করে দিই।

দাদা। ( সস্নেহে মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া ) আচ্ছা দিদি। আচ্ছা, তাই হবে, তাই হবে। তা' বলে এক কাজ করা যাক, আজ, ঐ দক্ষিণহস্তের ব্যাপারগুলো চুকিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে, তোমায় নিয়ে শাস্ত্রালোচনা করা যাক্, কি বলিস্ ভাই? তোর হার্ব্বার্ট-স্পেনসারেরা কত যে অসার, তাই নিয়ে তোকে তর্কে হারাবোই হারাবো, এই তোকে আমিও কিন্তু বাজী রেখে, বলে রাখলুম!

অপিমা। তাই হোক, হোক তাই, হারতেই যে আমি চাইছি, দাদামশাই! কোথাও, কারু কাছে, কোনখানে, হারতে পারলেই আমি যেন বেঁচে যাই, বাঁচি আমি।

( উভয়ের প্রস্থান )

[ ক্রমশঃ

---

# দূরে একফালি মাঠ

—বন্দে আলি মিঞা

চুপ করি একা সারাদিন ভরি
বসে থাকি জানালায়
চারা আম আর বাঁশঝাড় ফাঁকে
দূরে মাঠ দেখা যায়।
আগাছা ও ধানে জড়াজড়ি করি
সারা ক্ষেত গেছে ভরি
দিন আর রাতে নাচিছে উহারা
বাতাসের হাত ধরি।
এ পাশের ওই পাটক্ষেত আজ
হলো সারা দুলে দুলে
ক্ষেতের কিনারে সোণারির গাছ
ছেয়ে গেছে ফুলে ফুলে,
তারি পাশ দিয়ে আলপথ গেছে
ও গাঁয়ের পানে চলি
সেই পথে যায় কত লোকজন
দেখি তাহা কেবলি।

মাঠের এ পাশে পাকদল দীঘি
টলমল জল তার
গাঙকুলা হতে কৃষাণী মেয়েরা
আসে চান করিবার।
কাক হাতে কাঁথা—বগলে মাদুর
ঘড়া নিয়ে কেহ যায়
তাহাদের সনে ছোটো ছেলেপুলে
আগে পাছে দৌড়ায়।
দূর গাঁও হতে ভিন্‌দেশী লোক
ছাতি মাথে যায় আসে
রোদ লাগে যার বসে গাছতলে
হোথায় ভিটের পাশে;
ছোটো ছাগশিশু ঝাড়িয়ের ঘিরে
লাফাইয়া করে খেলা
উহাদের পানে চাহিয়া চাহিয়া
কেটে যায় মোর বেলা।

## বিচিত্র এশিয়া

—শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তী

খ্রীষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীর কথা। মনের ভাব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার উপায় মানুষ তখনও উদ্ভাবন করিতে পারে নাই; কিন্তু তবুও অন্তরের কথা প্রকাশ করিবার ও স্থায়ী ভাবে রক্ষা করিবার জন্য সে সচেষ্ট হইয়াছে। এই সময়ের জনৈক রাজা তাঁহার কর্ম্মচারীকে লিখিতেছেন—তাঁহার নিকট হইতে কেহ কোন প্রস্তর-ফলক লইতে পারিবে না; এবং এমন কোন প্রস্তর-ফলক যদি থাকে যাহার উল্লেখ তিনি করিতে পারেন নাই, উক্ত কর্ম্মচারী যেন সেগুলিও সংগ্রহ করে, রাজপ্রাসাদের জন্য সেগুলিরও প্রয়োজন। এই রাজা যে-যুগে নানা স্থান হইতে প্রস্তর-ফলক সংগ্রহ করিয়া বিরাট একটি গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলিয়াছেন সে-যুগের ইতিহাসে আমাদের প্রাচীন ও বিচিত্র এশিয়াই প্রাচীনতম স্থান অধিকার করিয়াছে।

মাটির তলদেশ হইতে এই রাজার প্রাসাদ ও সেই সঙ্গে তাঁহার স্মরণীয় গ্রন্থাগারটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রন্থাগারটির পরিচয় দিবার আগে উক্ত রাজা ও তাঁহার রাজধানীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব অষ্টম ও সপ্তম শতাব্দীতে এসিরিয়গণ সমগ্র এশিয়ার মধ্যে বিরাট ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিল। টাইগ্রিস্ নদীর বাম তীরে তাহাদের রাজধানী নিনেভে সে-যুগের মানুষের কীর্ত্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই রাজধানীকে বেষ্টন করিয়া যে-প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার দৈর্ঘ্য আট মাইল। মহানগরীটির দুই দিকে দুইটি বিরাট ও মনোরম স্তূপ, তাহাদেরই উপর রাজপ্রাসাদ ও মন্দির। প্রাসাদের ছাদ হইতে রাজা মহানগরীর সকল স্থান দেখিতে পাইতেন। আরও দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করিলে পূর্ব্ব ও উত্তরের পর্ব্বতশ্রেণী নজরে পড়িত। শীতের সময় পর্ব্বতের চূড়াগুলি তুষারাবৃত থাকিত। পশ্চিমে দেখা যাইত পাকা ফসলের উঁচু-নীচু ক্ষেত দূরে আকাশে মিশিয়াছে। মহানগরীর এক প্রান্ত ধৌত করিয়া টাইগ্রিস্ নদী প্রবাহিত। উদার প্রকৃতির বুকে মানুষের এই কীর্ত্তি অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছিল।

উত্তরের স্তূপের উপর নাবুর মন্দিরের গা ঘেঁসিয়া রাজা অসুরবানিপালের প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এসিরিয়-গণের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য প্রভৃতি সে-যুগে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। মহানগরীটি যাহাতে সকল দিক্ দিয়া উপভোগ্য হয়, তাহার বিরাট ও নিখুঁত ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল রাস্তাঘাট ঘরবাড়ী নহে, নানা জাতীয় ফুল ও ফলের গাছও বিশেষ যত্নসহকারে লাগান হইত। যে জিনিষটি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী করিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করে তাহা হইতেছে নিনেভের অদ্ভুত একটি সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল ভাব। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিভিন্ন পরাজিত দেশ হইতে নানা শ্রেণীর শিল্পী আনিয়া মহানগরীটি নির্ম্মাণ করা হয়; তাহাদের শিক্ষা, দীক্ষা ও কর্ম্মকুশলতার মধ্যে অসংখ্য পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক, কিন্তু এই মহানগরীটি দেখিলে মনে হয় একজন শিল্পী যেন ইহার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। এবং এক হাতেই ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। কালের প্রবাহে এসিরিয়গণ ক্রমশ নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িল এবং তাহাদের গৌরবও ধীরে ধীরে লুপ্ত হইল। নিনেভের পরে বাবিলন বিচিত্র সম্পদে মণ্ডিত হয়, কিন্তু সৌন্দর্য্যের দিক্ দিয়া বাবিলন নিনেভের সমকক্ষ হইতে পারে নাই।

ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের প্রতি অসুরবানিপালের বিশেষ আকর্ষণ ছিল তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু এই আকর্ষণ অপেক্ষাও তাঁহার বড় আকর্ষণ ছিল মানসিক

উপরে :
বামে :—এসিরিয় লিপিচিত্রণের
নিদর্শন : রাজা উপর অসুর-
বানিপাল
দক্ষিণে :—অতি প্রাচীন যুগে
মিশরে মৃৎপাত্রের বহুল

নীচে :
বামে :—এসিরিয় লিপিচিত্রণের
নিদর্শন : অসুরবানিপালের
শিকার
দক্ষিণে :—এসিরিয় লিপিচিত্রণের
নিদর্শন : অসুরবানিপাল কর্তৃক
আহত সিংহ

সম্পদের প্রতি। তাঁহার গ্রন্থাগারের যতটুকু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। তাঁহার রাজ-ঐশ্বর্য্য ও রাজ-ক্ষমতার সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু যে-প্রেরণা তাঁহাকে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারই মারফৎ শতাব্দীর পর শতাব্দীর পরও তাঁহার সহিত গভীর আত্মীয়তা বোধ না করিয়া পারি না।

অসুরবানিপাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত প্রস্তর-ফলকগুলিতে কেবল মাত্র ত্রিকোণ ও চতুষ্কোণ চিহ্ন দেখা যায়। ইহার সহজ কারণ অনুমিত হয় এই যে, সে-সময়ে বর্ণমালা আবিষ্কৃত হয় নাই; সুতরাং নানা প্রকার চিহ্নের সাহায্যে মনের কথা ভবিষ্যতের জন্য রক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। বর্ণমালার ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা করিলে দেখা যায় বর্ণমালা আবিষ্কারের অব্যবহিত পূর্ব্বে এইরূপ চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। ইহার আগে পশু-পক্ষীর ছবির সাহায্যে মনের কথা পরবর্ত্তী যুগের জন্য রক্ষা করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল।

মাটির তলদেশ হইতে অসুরবানিপালের গ্রন্থাগারের প্রায় দশ বার হাজার প্রস্তর-ফলক পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত হইতেছে। প্রস্তর-ফলকগুলির পাঠ উদ্ধার করা হইয়াছে। এই প্রস্তর ফলক-গুলি হইতে বহু বিষয়ের সন্ধান জানা যায়। অভিধান, স্তবস্তুতি, ভূত-প্রেত ও দানবের হাত হইতে আত্মরক্ষার মন্ত্র, পুরোহিতবর্গের কর্ত্তব্যবিষয়ক নিয়মাবলী, মহাকাব্য, রঙিন কাঁচ তৈয়ারীর রাসায়নিক সূত্র, চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র, জ্যোতিষ সম্পর্কিত নানা তথ্য, লোকসংখ্যার হিসাব এবং সর্ব্বোপরি নানা জাতীয় অসংখ্য পত্র। এক কথায় প্রেমের কবিতা ও নাটক ব্যতীত সকল বিষয়ই সেই গ্রন্থাগারে স্থান লাভ করিয়াছিল। প্রেমের কবিতা ও নাটক হয় তো তখন রচিত হয় নাই বলিয়াই উক্ত গ্রন্থাগারে উহাদের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

প্রস্তর-ফলক সংগ্রহ করা অসুরবানিপালের প্রবল নেশা ছিল। সাহিত্যের নিগূঢ় রস উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া তিনি বিশেষ গর্ব্ব করিতেন। তাঁহার পক্ষে এরূপ গর্ব্ব করিবার সত্যই কোন কারণ ছিল কি না তাহা আমরা জানি না, তবে তিনি যে সংস্কৃতির বড় একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

আজ পৃথিবীতে গ্রন্থাগারের কোন অভাব নাই, কিন্তু যে-যুগে বর্ণমালা আবিষ্কৃত হয় নাই, সে-যুগেও যে, মানুষ এত বড় ও বিচিত্র গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, রাজা হয় ও ভোগ বিলাস ছাড়াও যে সে-যুগের রাজা মানসিক সম্পদের প্রতি আপনার অন্তরের গভীরতা অনুরাগ দেখাইতে পারে, বহু শতাব্দীর বিস্মৃতির আবরণ উন্মোচন করিয়া নিনেভে তাহারই পরিচয় এ-যুগের 'সভ্য' মানুষের কাছে লইয়া আসিয়াছে।

## জীবনী

পৃথিবীতে মাঝে মাঝে এক এক জন যুগাবতারের আবির্ভাব হয়, যাঁহাদের স্পর্শে মানুষ যেন নূতন করিয়া জন্ম লাভ করে। সীমাবদ্ধ ও স্বার্থময় জীবন ছাড়াও যে আর একটি বৃহত্তর ও অনির্ব্বচনীয় জীবন রহিয়াছে তাহারই সন্ধান তাঁহারা আর্ত্ত মানুষকে আনিয়া দেন। তাঁহারা এক দিক্ দিয়া মানুষকে যেমন আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে লইয়া যান তেমনি আর এক দিক দিয়া তাঁহারা সাহিত্য শিল্পকলা প্রভৃতিরও উৎকর্ষের সহায়তা করেন। আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত সাহিত্য শিল্পকলা প্রভৃতির সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ; আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি না হইলে ইহাদের উন্নতি আশা করা যায় না। মানুষের প্রথম গান বা সাহিত্য রচিত হইয়াছিল তাহার দেব-দেবতার বন্দনার জন্য, তাহা সে ইন্দ্র-বরুণই হউক বা অন্য কোন দেবতাই হউক। এমনি এক এক জন যুগাবতারকে কেন্দ্র করিয়া মানুষ কত বিচিত্র সাহিত্য রচনা করিয়াছে, পাথর কাটিয়া কত অপরূপ মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছে, কত সুন্দর দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছে, কত অবর্ণনীয় ছবি আঁকিয়াছে, তাহার হিসাব নাই। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ধারা ভারতবাসীর মনে আজ হয় তো ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু বৌদ্ধ যুগের সাহিত্য, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, চিত্রকলা ইত্যাদি আজও ভারতবর্ষের গর্ব্বের বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

এরূপ যুগাবতারের গর্ব্ব প্রায় সকল দেশই করিতে পারে; বাংলা দেশও এমনি একজনের গৌরবে গৌরবান্বিত। তাঁহারই প্রভাবে এক দিন এই বাংলা দেশে যে বিরাট্ প্রেমের বন্যা আসিয়াছিল, তাহা বাংলা ছাড়াও আরও

অনেক স্থান প্লাবিত করিয়াছিল। তাঁহারই স্পর্শে বাংলা সাহিত্য অভিনব সম্পদে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সে-যুগের বাংলার কথা মনে করিলে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

তাঁহার আবির্ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া তিরোভাব পর্যন্ত সবই যেন অদ্ভুত রহস্যমণ্ডিত। বাঙালী তাঁহাকে দেবতার অংশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। তিনি বাঙালী, তথা ভারতবাসীর মনে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আজও সে বিস্ময়ের ঘোর আমাদের কাটে নাই। তাঁহার লীলার আদি ক্ষেত্র নবদ্বীপের যে কোন স্থানে দাঁড়াইলেই একটির পর একটি করিয়া তাঁহার কত ছবিই না আমাদের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে! বাংলার বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর কণ্ঠে রাধাকৃষ্ণের নাম শুনিলে মনে হয় তাঁহারই সুললিত কণ্ঠের প্রতিধ্বনি যেন আজও বাংলার আকাশে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বাংলা সাহিত্যের পাতা উল্টাইতে বসিলে দেখা যায়, বাংলার সাহিত্যরসের প্রধানতম উৎস-স্বরূপ তিনি আজও বিরাজমান।

নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণের ঘরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচী দেবী। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাল্যবয়সে সন্ন্যাসী হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিলেন তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, তাই কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রতি তাঁহাদের স্নেহের সীমা ছিল না। চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যভাগবত এবং চৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহার বাল্য লীলার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়।

অতি অল্প বয়সেই তিনি অলৌকিক পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন এবং এই সময় হইতেই তিনি অধ্যাপনা সুরু করেন। এই সময় তিনি নিমাই পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কোন্ পণ্ডিতের নিকট তিনি বিদ্যা অর্জন করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে কিছু জানা যায় নাই।

শিশুকাল হইতেই নাম-সঙ্কীর্তনের প্রতি তাঁহার অসীম অনুরাগ ছিল। কীর্তন করিতে করিতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান প্রায়ই লুপ্ত হইত। শ্রীগৌরাঙ্গদেব সর্বপ্রথম মুসলমান রাজ-প্রতিনিধির নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া তাঁহারই সম্মুখে নগর-কীর্তন করেন, এই কীর্তনে আবালবৃদ্ধবনিতা যোগ দিয়াছিল। ইহার পর হইতে নগর-কীর্তন প্রচলিত হয়।

উক্ত নগর-কীর্তনের কিছু দিন পরে শ্রীগৌরাঙ্গদেব একবার পূর্ববঙ্গে ভ্রমণে বাহির হন। নবদ্বীপে তাঁহার অনুপস্থিতি কালে তাঁহার প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। ফিরিয়া আসিয়া শচীদেবীর বিশেষ অনুরোধে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন-কাহিনীও অদ্ভুত। শচীদেবী গৌরাঙ্গদেবকে ঘরে আটকাইয়া রাখিবার জন্য দ্বিতীয়বার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহার মন প্রাণ ভগবৎ-প্রেমে ভরিয়া উঠিয়াছে তাঁহাকে ঘরে আবদ্ধ রাখিবে কে!

ক্রমশঃ তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া ভক্তবৃন্দ জুটিতে থাকে। তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয় হয় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর; তাহার পরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের ও তাঁহার পত্নী সীতা দেবীর। ইঁহাদের প্রত্যেকের চরিত্রই অসামান্য, ইঁহাদের জীবনও বৈচিত্র্যময়। বস্তুতঃ ইঁহাদিগকে বাদ দিয়া মহাপ্রভুকে উপলব্ধি করা কঠিন। ইঁহাদের স্থানও মহাপ্রভুর পাশাপাশি।

কীর্তন করিবার সময় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইত দেখিয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজন মনে করিলেন তিনি বায়ু-রোগাক্রান্ত হইয়াছেন; তদনুসারে তাঁহারা মহাপ্রভুর চিকিৎসার ব্যবস্থা পর্যন্ত করিয়াছিলেন। এত দিন পরে যাঁহাকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহাকে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহাদেরই মত সাধারণ মানুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা আশ্চর্যের বিষয় হইলেও খুবই স্বাভাবিক।

এই সময়ে তিনি কি ভাবে দিন কাটাইতেন তাহার একখানি ছবি যেন আমরা দেখিতে পাই। সকালে ভক্তবৃন্দ-সহ তিনি গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছেন, জলে নামিয়া ঠিক বালকের মত খেলা করিতেছেন; তাঁহার আনন্দ-কোলাহলে চারি দিক্ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পরে দেখিতেছি তিনি বাড়ী ফিরিয়াছেন, শচীদেবী তাঁহার প্রতীক্ষায় এতক্ষণ বসিয়াছিলেন, এইবার গৃহ-দেবতার প্রসাদ নানা জাতীয় আহার্য সমেত কাছে বসিয়া খাওয়াইতেছেন। বিকালে গঙ্গার ধারে তিনি বেড়াইতেছেন; গঙ্গার সে কি অপরূপ সৌন্দর্য, মহাপ্রভু যেন এই সৌন্দর্যের মাঝে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছেন। ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকার

ঘনাইয়া আসিতেছে, তিনি সান্ধ্য বন্দনা শেষ করিয়া শ্রীবাসের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কীর্তন বা ভগবান-বিষয়ক আলোচনা হইতেছে। এক এক দিন শ্রীকৃষ্ণের লীলা লইয়া রচিত নাটকের অভিনয়ও হইত। প্রত্যেক ভক্তই এক একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। অভিনয় দেখিতে দেখিতে দর্শকের ভুল হয়—এ যেন ঠিক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই লীলা!

তাহার পরের কথা। পিতার পিণ্ডদান উপলক্ষে মহাপ্রভু যখন গয়ায় যান সেই সময় ঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতের পর হইতে তাঁহার বিশেষ পরিবর্তন দেখা যাইতে লাগিল। নবদ্বীপে তিনি ফিরিয়া আসিলেন সত্য, কিন্তু এখানে আসিয়া পূর্বের মত জীবন যাপন করা তাঁহার পক্ষে খুব কঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

গৃহ ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভু কাটোয়ায় আসিলেন; এখানে পূর্বের ব্যবস্থা মত কয়েক জন ভক্ত আগে হইতেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু কেশব ভারতীর নিকট উপস্থিত হইলেন। কেশব ভারতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাতের চিত্রটি অবর্ণনীয়। যথা-সময়ে কেশব ভারতী তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন। গুরু তাঁহার নাম রাখিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ইহার পরে আঠার বৎসরের প্রতিটি দিনের কাহিনী যে কি অপূর্ব্ব তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

তাঁহার লীলার যতগুলি স্থান আছে নীলাচল তাহাদের অন্যতম। এইখানেই তাঁহার তিরোভাব হয়। কি ভাবে তাঁহার তিরোভাব হইল তাহা আজ পর্য্যন্তও রহস্যাবৃত রহিয়াছে। কিন্তু তবুও একটি সন্দেহ অনেকের মনে বারে বারে জাগিয়া উঠে—মহাপ্রভুর অকাল তিরোভাবের মূলে কি কোন মানুষের হাত ছিল?

## বিশ্ব-পরিচয়

সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরে যে গ্রহ আপনার কক্ষপথে ঘুরিতেছে তাহার নাম প্লুটো বা যম। মাত্র ১৯৩০ সনে এই গ্রহটির সহিত আমাদের পরিচয় ঘটিয়াছে। ইহা খুব আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আমরা বিরাট বিশ্বের সহিত পরিচিত হইবার জন্য নানা প্রচেষ্টা করিতেছি, কতকটা হয় তো কৃত-কার্য্যও হইয়াছি; অথচ আমাদের পৃথিবীর প্রতিবেশীর সহিতও আজ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ পরিচিত হইতে পারি নাই। বিরাট বিশ্বের মাঝে সূর্য্য ও তাহার পরিবারবর্গের কতটুকুই বা স্থান, কিন্তু ক্ষুদ্র মানুষের কাছে তাহারা কত বড় ও কি বিরাট রহস্যাবৃত!

যাহাই হউক পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র প্রতিটি যখন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তখন কোনমতেই আমরা ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারি না। ইহার সম্বন্ধে আমরা বেশী কিছু জানিতে পারি নাই; খানিকটা জানা গিয়াছে আর বাকিটুকু অনুমান করিয়া লইতে হইয়াছে। প্লুটো সম্বন্ধে অন্য কথা বলিবার আগে এই গ্রহটি কি ভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছে সে সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

হিসাব মত ইউরেনস ও নেপচুনের যে যে স্থানে অবস্থান করা দরকার, জ্যোতির্ব্বিদেরা দেখিলেন তাহারা ঠিক সেই-সকল স্থানে অবস্থান করিতেছে না। তখন তাঁহাদের মনে হইল হয় তো কোন অপরিচিত গ্রহ এই দুইটি গ্রহকে আকর্ষণ করিতেছে যাহার ফলে ইহারা আপন আপন স্থান হইতে খানিকটা করিয়া সরিয়া যাইতেছে। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া জ্যোতির্ব্বিদেরা নানা রকম পরীক্ষা শুরু করেন। এখানে বলা দরকার যে নেপচুন ১৮৪৬ সনে আবিষ্কৃত হয়, সুতরাং নূতন একটি গ্রহের অস্তিত্ব সম্পর্কিত প্রশ্ন নেপচুন আবিষ্কারের পরেই জাগে।

১৯১৪ সনে গণিতের সাহায্যে জ্যোতির্ব্বিদেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, নূতন গ্রহটির ওজন পৃথিবীর ওজন অপেক্ষা সাড়ে ছয় গুণ বেশী। ইহার পরে দূরবীক্ষণের সাহায্যে এই গ্রহটিকে দেখিবার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। আকাশের কোন্ দিকে ইহার সন্ধান মিলিবে তাহা হিসাব-অনুযায়ী জানা ছিল, কাজেই ইহাকে অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতে হয় নাই। কিন্তু ১৯৩০ সনে যখন সত্য সত্যই এই গ্রহটির সাক্ষাৎ মিলিল তখন দেখা গেল ইহা পৃথিবী অপেক্ষা বড় নহে, বরং ইহার ওজন পৃথিবীর ওজন অপেক্ষা দশভাগের এক ভাগেরও কম।

এখন ভাবিবার বিষয় এই যে, এত ক্ষুদ্র গ্রহের প্রভাব নেপচুন ও ইউরেনসের উপর কি করিয়া এতটা বেশী হইতে পারে, যাহার বলে উক্ত দুইটি গ্রহ নিজেদের নির্দ্দিষ্ট কক্ষ হইতে

নহিয়া গিয়াছে। প্লুটোর আকর্ষণ নেপচুন ও ইউরেনসের উপর রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে আকর্ষণ এত কম যে, তাহার ফলে নেপচুন ও ইউরেনসের স্থানের পরিবর্ত্তন খুব সামান্যই ঘটিতে পারে—এত সামান্য যে তাহা আমাদের নজরে কখনই পড়িতে পারে না। কাজেই নেপচুন ও ইউরেনসের নির্দ্দিষ্ট স্থানের সহিত পরিদৃষ্ট স্থানের যে-পার্থক্য দেখা যাইতেছে তাহার মূলে হয় তো এক বা ততোধিক গ্রহ রহিয়াছে যাহাদের পরিচয় আমরা আজও লাভ করিতে পারি নাই।

যতটুকু জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় প্লুটো চন্দ্রের অপেক্ষাও আয়তনে ক্ষুদ্র। সুতরাং এই গ্রহটিতে বায়ুমণ্ডল না থাকাই স্বাভাবিক। ইহার তাপ এত কম যে, সেখানে উদ্ভিদ্ বা প্রাণী-জগতের স্থিতির কোন প্রশ্নই জাগিতে পারে না, যে-কোন গ্যাসও সেখানে জমাট বাঁধিয়া যায়। সূর্য্য হইতে ইহার দূরত্ব মোটামুটি ৩৬৭ কোটী ৫০ মাইল; ২৪৮ বৎসরে ইহা একবার করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে; ইহার গতি সেকেণ্ডে তিন মাইল।

বৃহস্পতি যখন পৃথিবীর অত্যন্ত নিকটে আসে তখন তাহাকে যতটুকু দেখায় প্লুটো হইতে সূর্য্যকে তাহার অপেক্ষা ছোট দেখায়। বুধ, মঙ্গল, ইউরেনস ও নেপচুন এই কয়টি গ্রহের কোনটিকেই প্লুটো হইতে খালি চোখে দেখা যায় না। সূর্য্য না থাকিলে শুক্র এবং পৃথিবীকে দেখা যাইত, এই দুইটি গ্রহ সূর্য্যের এত কাছাকাছি থাকে যে, প্লুটো হইতে ইহাদিগকে কোনমতেই দেখা যায় না। বৃহস্পতি ও শনিকে সূর্য্যোদয়ের অল্প কিছুক্ষণ আগে ও সূর্য্যাস্তের অল্প কিছুক্ষণ পর পর্য্যন্ত দেখা যায়, কিন্তু প্লুটোর আকাশে ইহাদিগকেও অস্বাভাবিক ক্ষুদ্র দেখায়। সুতরাং প্লুটো হইতে সৌরজগতের খবর জানা খুব কঠিন। এই গ্রহে আমাদের মত মানুষ থাকিলে তাহার প্রতি আমাদের করুণা হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু এতগুলি গ্রহ আমাদের দৃষ্টিপথে থাকা সত্ত্বেও আমরাই কি সৌরজগতের সকল খবর জানিতে পারিয়াছি?

## জীবজন্তুর সঙ্গীত-প্রীতি

কেবল যে মানুষই গান-বাজনা শুনিয়া মুগ্ধ হয় তাহা নহে, জীবজন্তুর ভিতরেও সঙ্গীত-প্রীতি নজরে পড়ে। ব্যাপারটি খুব মজার সন্দেহ নাই।

সমুদ্রে যে সকল জীব চলা ফেরা করে, তাহাদের মধ্যে সীল মাছের সঙ্গীত-অনুরাগ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। যে-কোন সঙ্গীতই হউক না কেন, তাহারা জলের উপর মুখ তুলিয়া চোখ বুজিয়া স্থির হইয়া শুনিবে। তাই শিকারীগণ সঙ্গীতের সাহায্যে সীল মাছ শিকার করে। নেকড়ে, শৃগাল প্রভৃতিরও সঙ্গীতের প্রতি বেশ টান আছে। গরুর সঙ্গীত-প্রীতি অদ্ভুত, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে গরু রেডিও বা গ্রামোফোন শুনিতে খুব ভালবাসে। গরু দোহন করিবার সময় বাজনা বাজাইলে না কি বেশী পরিমাণে দুধ পাওয়া যায়। সাপের সঙ্গীত-প্রীতির কথা আমরা প্রায়ই শুনি, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা বলেন সঙ্গীতের প্রভাব না কি সাপের উপর আদৌ নাই। অবশ্য এ-বিষয়ে মতভেদ আছে। সাপের কাণ আছে তাহা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু সঙ্গীত শুনিতে পায় কি না সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় নাই।

কীটপতঙ্গেরও সঙ্গীত-প্রীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। মাকড়সা সঙ্গীতের টানে অনেক সময় তাহার সযত্নে আশ্রয় ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া আসে। ঝিঁঝিরও সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ আছে। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন পুরুষ-ঝিঁঝি স্ত্রী-ঝিঁঝির মন আকর্ষণের জন্য কখনও একসঙ্গে ডাকে না। প্রথমে এক জন, তাহার পরে আর এক জন, এমনি করিয়া তাহারা পর পর ডাকিতে থাকে, দেখিলে মনে হইবে এ যেন ঠিক সঙ্গীতের প্রতিযোগিতা চলিতেছে।

## সভ্যতার ইতিহাস

সভ্যতার ইতিহাসকে এক দিক্ দিয়া প্রকৃতির সহিত মানুষের দাঁড়িয়াপনের চেষ্টা বলা যায়। মানুষের উদ্দেশ্য হইতেছে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করা। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে জীবন ধারণের প্রতিকূল শক্তিগুলি নষ্ট করিয়া এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যাহার ভিতরে মানুষ অল্প পরিশ্রমে ও বিনা বাধায় দিন কাটাইতে পারে। তাই দেখা যায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত মানুষ তাহার দৈনন্দিন জীবনকে অভাব-মুক্ত ও নানা সুখে পরিপূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এই প্রচেষ্টাই তাহার জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্পদ্ বাড়াইয়া সভ্যতাকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে।

মানুষ যখন প্রথম প্রস্তর হইতে অস্ত্র নির্মাণ করিল তখনই সে আপনার অজ্ঞাতসারে বর্বর অবস্থা হইতে সভ্যতার প্রথম ধাপে আরোহণ করিল। বলা বাহুল্য শিকার এবং আত্মরক্ষার জন্যই সে প্রথম অস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিল। ক্রমে দেখা গেল দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পক্ষে কেবল মাত্র প্রস্তর-নির্মিত অস্ত্রই যথেষ্ট নয়; আহার্য সংগ্রহের জন্য ও নিজেকে নিরাপদ রাখিবার জন্যও যন্ত্রের একান্ত প্রয়োজন। তখন কে জানিত এই যন্ত্রই তাহাকে নিত্য নূতন পথে চালিত করিবে?

যন্ত্র উদ্ভাবনের মূলে রহিয়াছে আগুনের ব্যবহার। দাবাগ্নি দেখিয়া মানুষ প্রথমে ভয় পাইয়াছিল; কেবল দাবাগ্নিই নহে যে কোন প্রকার আগুন বা দূর হইতে আগুনের শিখা দেখিলেও সে প্রাণভয়ে পলায়ন করিত। অথচ এই আগুনই পরবর্তী কালে তাহার সকল কাজের প্রধানতম সহায় হইয়া উঠিল। মানুষ আগুনকে ভগবানের বিশেষ একটি দান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে; কোন কোন জাতির কাছে আগুন দেবতা। বস্তুতঃ আগুন যে ভাবে আমাদের সকল কর্ম সার্থক করিয়া তুলিয়াছে, তাহা মনে করিলে আগুনকে দেবতা ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। মানব-সভ্যতা আগুনের কাছে যত ঋণী, বোধ হয় আর কোনও জিনিষের কাছে তত নহে।

প্রথমে আগুন যে কেবল শীতের কবল হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত তাহাই নহে, খাদ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণের জন্যও ইহা ব্যবহৃত হইত। কিন্তু আগুন মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় উপকার সাধন করিল তাহার অস্ত্র ও যন্ত্র-নির্মাণের সহায়তা করিয়া। ধাতু আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ব্যবহার বাড়িতে থাকে। মানুষ ক্রমশঃ লোহা, তাম্র, ব্রঞ্জ প্রভৃতি হইতে নানা জাতীয় অস্ত্র ও যন্ত্র নির্মাণ শুরু করে। প্রস্তর ও কাষ্ঠ-নির্মিত যন্ত্রের পরিবর্তে ধীরে ধীরে ধাতব যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হইতে থাকে। প্রায় এক লক্ষ বৎসর আগেও প্রস্তর-নির্মিত যন্ত্রের প্রচলন ছিল। এই সময় হইতে ধাতব যন্ত্রের প্রচলনের মধ্যে কত শতাব্দী যে কাটিয়া গিয়াছে তাহার হিসাব নাই।

এই বিবর্তনের ভিতরে মানুষ হাড় এবং প্রস্তরের সাহায্যে বাঁশ, ছুরি, বর্শা, হাতুড়ি, ছোরা ইত্যাদি প্রস্তুত করা শিখিয়াছিল। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় তাহার এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুকরণে এই সকল অস্ত্র প্রথম উদ্ভাবিত হয়,—দাঁতের অনুকরণে করাত, মুষ্টিবদ্ধ হাতের অনুকরণে হাতুড়ি, বাহুর অনুকরণে বর্শা, নখের অনুকরণে ছুরি তৈয়ারী হইয়াছিল।

অস্ত্র ও যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে নানা জাতীয় বাসনপত্রও উদ্ভাবিত হয়। গন্ধ মহিষের শিং হইতে পাত্র, কাঠ হইতে থালা, লাউ-এর খোল হইতে বড় আধার প্রথমে প্রস্তুত হয়। ইহার পরে মানুষ ক্রমশঃ ধাতুর সাহায্যে থালা, ঘটি, বাটি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে থাকে। আফ্রিকার অসভ্য জাতিদের ভিতর আদিযুগের বাসনপত্রের ব্যবহার এখনও দেখা যায়। সভ্য জাতিগুলির মধ্যেও ইহাদের কিছু কিছু নিদর্শন এখনও নজরে পড়ে।

কিন্তু উক্ত বাসনপত্রের অপেক্ষাও বিস্ময়কর সৃষ্টি হইতেছে মাটির সাহায্যে নানা প্রকার প্রয়োজনীয় জিনিষ সৃষ্টি করা। নিছক প্রয়োজন ছাড়াও যে সৌন্দর্য-সৃষ্টির একটি প্রচ্ছন্ন প্রেরণা মৃৎপাত্র সৃষ্টির মূলে ছিল তাহা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। যে কুম্ভকার আজ তাহার ঘরে বসিয়া মাটি হইতে হাঁড়ি, থালা, গ্লাস ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেছে, যাহার দিকে ফিরিয়া চাহিবারও আমাদের অবকাশ নাই, তাহারই কোন অজ্ঞাত পূর্বপুরুষ একদিন মানব সভ্যতার ইতিহাসের যুগান্তর আনিয়াছিল এ কথা ভাবিলে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। দেখা যাইতেছে, এই আবিষ্কার ও নির্মাণের নেশা মানুষকে এমন একটি অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে যে, আজ তাহারই নির্মিত যন্ত্রপাতি এবং আবিষ্কৃত ধাতুদ্রব্যাদি তাহার প্রাণসংহারে উদ্যত। সুতরাং একটি শৃঙ্খলা-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বোধ করা হইতেছে। মানুষের জ্ঞানের যে-অবস্থা তাহার প্রয়োজনের সঠিক পরিমাপ করিয়া তদনুযায়ী আবিষ্কার এবং নির্মাণ নির্দিষ্ট করিতে পারিবে—সভ্যতার এই সন্ধিক্ষণে তাহাই মানুষের কাম্য হইয়াছে। মানুষের এই কামনা কি অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে?

# মাৎ

—শ্রীরাঘবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

গিরীনদা' ব'ললেন, "বীরু, তোমার কি হয়েছে বল তো? সেদিন তিন পেয়ালা চা খেয়ে নগদ পাঁচ দিয়ে দিলে। কাল সেখলাম টাইম-টেবল দেখে কাশ্মীর যাবার তাড়া কত খোঁজ ক'রছ। ব্যাপারখানা কি তারা?"

বীরু সংক্ষেপে ব'লল, "আমি প্রেমে প'ড়েছি।"

গিরীনদা' অর্থপূর্ণভাবে "হুঁ" ব'লে দেশলাই জ্বালতে লাগলেন। ছোট গদা খুশি হ'য়ে বলল, "তাই না কি? বেশ বেশ! কার সঙ্গে হে? শ্যামাঙ্গিনী বঙ্গললনা না কোন ফিরিঙ্গকন্যা?"

"ধরিত্রী মীরবহর, তুমি চিনতে পারবে না। জানি না কি হবে।"

গিরীনদা' একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ব'ললেন, "নাম শুনে বেশ কড়া মেয়ে ব'লে মনে হ'চ্ছে। তা' বি. এ. পাশ ক'রেছেন তো?"

বীরু অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, "ব'লতে পারি নে। গিরীনদা' আপনি বিজ্ঞ লোক, যা হোক একটা উপদেশ দিন কি করা যায়।"

ছোট গদা ব'লল, "আরে দূর! গিরীনদা' প্রেমের কি জানেন। ওদের যুগে ও-সব ছিল না। বীরু, তুমি আমার গোটাকতক কথার উত্তর দাও। তুমি প্রেমে প'ড়েছ—একেবারে নিশ্চিত—বেশ। তোমার কোন সন্দেহ নেই? তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দন তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, তুমি ভালবেসেছ। কিন্তু তবু এ সংশয় কেন? তোমার কি মনে হয় কুমারী ধরিত্রী তোমাকে ভালবাসেন না?"

"একটুও না।"

ছোট গদা উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে ব'লল, "তুমি অন্যায় ভাবছ ভাই। কিন্তু কে জানে তার মনপ্রাণ হয় তো তোমাকে পাবার জন্যেই ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। পৃথিবীতে অসম্ভব কিছু আছে কি? কে একজন বড়লোক ব'লেছেন না—আচ্ছা থাক সে কথা। গত শ্রাবণ মাসের বিয়ের হিড়িকে কখনও হাওড়ার বাসের প্রসেশন দেখেছ? মযূর, প্রজাপতি, হাঁস নানা রকম ভাবে ফুল দিয়ে সাজান গাড়ী ক'রে পাশে লাল চেলী পরা করে নিয়ে কত বর এই রাস্তায় ঘোড় দিয়ে গিয়েছে—তা' লক্ষ্য ক'রেছিলে? ক'রলে দেখতে, মোটা, রোগা, কালো, বেঁটে, টাঁারা কত লোকেরই বিয়ে হয়ে গেল। তোমার মনের কথা আমি বুঝেছি। আয়নায় নিজের মুখ দেখে তুমি ভাবছ, এই তো আমার চেহারা, বাঙলা পাঁচের মত মুখ, নলা বেয় করা গলা, মাথার চুলগুলো ঝাঁটার কাঠির মত সোজা হ'য়ে থাকে—আমাকে কুমারী ধরিত্রীর মত মেয়ে কেন ভালবাসবে? আমার সামনের দাঁত কিছুতেই ঢাকা পড়ে না, না সে আমায় দেখেই হেসে ফেলবে—এই তোমার মনে হয়—নিশ্চয়ই হয়। কিন্তু বীরু, এই মনের ভাবকেই বৈজ্ঞানিকেরা বলে থাকেন, ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স, এ তোমায় ছাড়তে হবে। কে জানে, হয় তো তোমার ঐ বিরাট গোঁফ জোড়াই তাঁর হৃদয়-যমুনায় বান ডাকিয়ে দেবে।"

বীরু কি ব'লতে যাচ্ছিল, ছোট গদা বাধা দিয়ে ব'লল, "আমি সব বুঝেছি, তোমায় ব'লতে হবে না। মনে রেখ বীরু, তুমি অকুতের পুত্র। মাথা নীচু করবে না। তোমার গোঁফে তা' দিয়ে বুক চিতিয়ে বলবে—আমি চাই—এই হ'ল পাওয়ার মূলমন্ত্র। অভিমান রেখে কুড়ি পঁচিশটা আদরের ডাক লিখে নাও—বল, তোমায় আমি চাই—তুমি আমার ঘরে লক্ষ্মী হ'য়ে এস। তার পর কুমারী ধরিত্রী কিছু বলবার আগেই তাঁর হাত ধরে ব'লবে, 'আমি একা নিজের ভার আর বইতে পারছি নে—ক্লান্ত আমি, তুমি আমার ভার নাও।' এতেও যদি কুমারী ধরিত্রী রাজী না হন, তা হলে তুমি—"

বীরু চ'টে গিয়ে ব'লল, "বোঝ না কিছু না শুধু বাজে কথা বল। ঐ তোমার বড় দোষ। অনেক ফ্যাসাদ আছে।"

ছোট গদা ব'লল, "সে আবার কি?"

বীরু ধরা গলায় উত্তর দিল, "তা'র তারী বাবা খেলবার সখ।"

দাবা? আমরা সবাই কেমন—ভ'ড়কে গেলাম। একটু চুপ ক'রে থেকে গিরীনদা' আশ্বাস দিয়ে ব'ললেন, "তা'তে আর কি হয়েছে। অ্যাকেডিন খেলিয়ে-এর যে সখ নেই তাও নয়।"

বীরু ব'লল, "তার বাবা ত্রিলোচন বীরবহুর সুবিখ্যাত দাবা খেলোয়াড়। তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েই প্রথম দিন ধরিত্রীকে দেখি। সে দিন বুঝলাম, দাবা মেয়েদেরও খেলা। বাইরের ঘরে তার বাবার সঙ্গে দাবা খেলছে, আঙ্গুলে ভুরু কোঁচকান—চাপার মত আঙ্গুল দিয়ে একটা গজ নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রছে।"

ছোট গদা ব'লল, "বীরু ভাই কাবাটা একটু কম কর।"

"আমি বসে খেলা দেখতে লাগলাম। খানিকক্ষণ পরে খেলা শেষ হ'য়ে গেল। আমি তাকিয়েই ছিলাম, দাবার ছক দেখতে দেখতে ঠিক বুঝতে পারলাম যে, ঐ সুন্দর চোখ দুটি আমার মুখের দিকে তুলে ধরিত্রী যদি 'মাৎ' না বলে তা' হ'লে আমার এ জীবন বৃথা।"

বীরু অনেকক্ষণ ধ'রে এই ধরণের আবোল-তাবোল ব'কে গেল। মিনিট দশেক বক্তৃতার পর আসল ব্যাপারটা খানিকটা বোধগম্য হ'ল। বীরু দাবা খেলে বটে, তবে অতি কাঁচা খেলোয়াড়। একে তার দাবার জ্ঞান—ঘোড়া আড়াই ঘা, আর গজ কোণাকুণি চলে—এই পর্যন্ত। তার ওপরে কুমারী ধরিত্রীর অঙ্গুলির খেলা দেখতে দেখতে সব চাল গুলিয়ে যায়। কুমারী ধরিত্রীর সঙ্গে এক বাজী খেল ভালো রকম খেলতে বীরুর অনেক কাল লাগবে। বীরুর খেলা দেখে যে তিনি অবাক হয়ে ভাববেন—কি চমৎকার—পরের ওর কিস্তিতে দাবা মেরে নিল, কিংবা তার বড়ে'র চাল দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যাবেন—এ প্রায় অসম্ভব। বীরু রীতিমত চেষ্টা করলেও চলনসই খেলা শিখতে তার বছর কেটে যাবে। তা' ছাড়া আর এক বিপদ হয়েছে। ধনঞ্জয় বলে আর একজন ও বাড়ীতে যাতায়াত করে, লোকটা বীরুর মতে মিটমিটে শয়তান। তার খেলা না কি এত উঁচু দরের যে স্বয়ং ত্রিলোচন বাবুও তাকে খাতির করেন।

গিরীনদা' উৎসাহিত হয়ে বললেন, "তাই না কি? তা হলে বীরু তোমারই চান্স—বারে বারে খেলায় হেরে গেলে কোন মেয়েই তা' সহ্য করতে পারে না। তুমি দেখে নিও তাই বুড়ো মানুষের কথাটা। আজীবন শুধু মাৎ হবে। হুঁ, মেয়েরা শক্তি, তা' জান?"

বীরু সগর্বে ঘাড় নেড়ে বলল, "ধনঞ্জয়টা কি ক্লাসের সয়তান তা বুঝছেন না দাদা। ইচ্ছে করে, একেবারে স্রেফ ইচ্ছে করে, বাজীর পর বাজী ধরিত্রীর কাছে হেরে যায়। তাও বোঝবার জো নেই। বেশ খেলা চলছে—ধরিত্রীর রাজার হয় তো দু'টো ঘরের বেশি চাল নেই—হঠাৎ ধনঞ্জয়ের দাবা এসে পড়ল ধরিত্রীর ঘোড়ার মুখে। গোটা চারেক চালের পর দেখা গেল ধনঞ্জয়ের অবস্থা কাহিল। শেষ পর্যন্ত ধনঞ্জয়কে মাৎ করে দিয়ে ধরিত্রী যখন হাসি মুখে বলে, 'আসুন, আর এক বাজী হয়ে যাক', তখন যে আমার মনে কি হয় তা' আর কি ব'লব।"

গিরীনদা চিন্তিত স্বরে ব'ললেন, "তাই তো বড়ই হ্যাঙ্গামের কথা—আর লোকটাও দেখছি আচ্ছা ধড়িবাজ।"

কান্নার সুরে বীরু ব'লল, "ধরিত্রী এখন বুঝছে না—কি আমি ব'লে রাখছি ছোনমি নারায়ণ সাক্ষী ক'রে যখন বিয়েটা হ'য়ে যাবে তখন দেখবেন ধনঞ্জয় কি করে। রোজ খেলায় ধরিত্রীকে অন্যমনস্ক ক'রবে। একটার পর একটা বল নির্মম ভাবে মেরে দিয়ে ধরিত্রীর রাজাকে কোণ ঠাসা করে বড়ের কিস্তিতে মাৎ ক'রবে। কিস্তির পর কিস্তিতে ধরিত্রীর জীবন একেবারে দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।"

ছোট গদা গম্ভীর হ'য়ে ব'সে শুনছিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "বীরু, তুমি আমায় ত্রিলোচন বাবুর এখানে নিয়ে চল। কুরুক্ষেত্রে যা হয়নি আজ সেই ধনঞ্জয়-বধ হবে।"

• • • •

সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটা। ত্রিলোচন বাবুর বৈঠকখানায় ধরিত্রী আর ধনঞ্জয়ের খেলা চ'লছে। বীরু আর ছোট গদা দু'জনে পাশাপাশি দু'খানা চেয়ারে অতিশয় মনোযোগের সঙ্গে খেলা দেখছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে ধরিত্রীর আর প্রায় খেলা নেই। ব'ড়ে অর্দ্ধেকের উপর সাবাড় হয়ে গিয়েছে, রাজা যে দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন তার আশ পাশের বলগুলো সব চাপা পড়ে রয়েছে। একটা ঘোড়া একেবারে গজের মুখে অথচ পেছনে ফেরবার ঘর নেই। ধনঞ্জয় শীগ্‌গির কিছু একটা না করলে ধরিত্রীর খেলা আর বাঁচে না।

ছোট গদা মুরুব্বি চালে বলল, "ধরিত্রী দেবী, ধনঞ্জয় বাবুর খেলা প্রায় হয়ে এল দেখছি। উঁ হুঁ, আর বড় জোর গোটা চারেক চাল।"

ধরিত্রী কিছু ব'লল না। ধনঞ্জয় একবার ছোট গদার মুখের দিকে তাকিয়ে কি বলতে গিয়ে চুপ করে নিল।

বীরু ব'লল, "না, না, দেখছ না, ধরিত্রী দেবীর ওই ঘোড়াটা তো গেল।" ছোট গদা ব'লল, "আরে তা' হলে ধনঞ্জয় বাবুর গজটাও যে যাবে।"

"গজ নিতে গেলে ধরিত্রী দেবীর দাবাটা যায় তা' দেখেছ?"

"দাবা গেলে জানই তো। সেই জন্যই তো পাতা হ'য়েছে।"

বীরু জেবে ব'লল, "হাঁ হাঁ, ঠিক কথা। আমার ওটা চোখে পড়ে নি।"

ছোট গদা ধরিত্রীকে ব'লল, "আমাদের অবশ্য ওপর চাল দেখে এসব বলাটা ভাল হ'চ্ছে না। কিন্তু ধনঞ্জয় বাবুর এত নাম শুনেছি অথচ একেবারে কাঁচা খেলোয়াড়ের মত চাল দিচ্ছেন, আশ্চর্য।"

বীরু ব'লল, "না, না, দেখ না এখনই ঠিক সামলে নেবেন।"

ছোট গদা মাথা চুলকে ব'লল, "তা' পেরে উঠবেন কি? এক্‌কিউজ মি ধনঞ্জয় বাবু, আমার মনে হয় দাবাটা দি—"

ধনঞ্জয় নীরস সুরে ব'লল, "থাক আপনাকে আর চাল ব'লে দিতে হবে না।"

বীরু একটু চুপ ক'রে থেকে ব'লল, "আর খেলে লাভ কি ধনঞ্জয় বাবু। বরং আর এক বাজী ফিরে বসুন।"

ধনঞ্জয় ঘোড়া তুলে নৌকো চেপে কিস্তি দিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, "ফিরে ব'সব কোন্‌খানে?"

ধরিত্রী ঠোঁট কামড়ে রাজা সরিয়ে নিতেই ধনঞ্জয় নৌকো তুলে নিয়ে ছোট গদার দিকে তাকিয়ে বলল, "কাঁদে পড়লাম নাকি ম'শায়?"

ধরিত্রী কোন কথা না ব'লে একটা ব'ড়ে চালল।

ছোট গদা বীরুকে চোখের ইসারায় জানিয়ে দিল—তাড়িয়ে যাও—দেখ যেন সব কেঁচে না যায়।

ঠিক এই সময় ধনঞ্জয়ের একটা গজ মারা যেতেই বীরু বলে উঠল, "আহা হা, দেখলে—কি মারাত্মক ভুল।"

ছোট গদা ঠাট্টার সুরে উত্তর দিল, "হবে না—বড় খেলোয়াড় যে।"

ধনঞ্জয় মুখের চেহারা ভীষণ ক'রে একখানা নৌকো টেনে বলে উঠল, "কিস্তি।"

ধরিত্রী ঘোড়া দিয়ে চেপে দিতেই সেটা তুলে নিয়ে ধনঞ্জয় ব'লল, "হুঁ কিস্তি।"

ধরিত্রী রাজা সরিয়ে নিল—বেচারীর হাত কাঁপছিল। বেশ বোঝা গেল চোখেও প্রায় জল এসে গিয়েছে। লোকের সামনে এরকম দুরবস্থা বোধ হয় আর তার কখনও হয় নি।

দু' চাল পরে ধনঞ্জয় দাবাটা মেরে নিয়ে হেসে ছোট গদাকে বলল, "খুব কাঁচা খেলোয়াড়ের মত চালটা দিয়েছি, কি বলেন?"

ছোট গদা মৃদুস্বরে বলল, "আমার তো তাই মনে হচ্ছে। আপনি বরং ধরিত্রীদেবীকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখুন। চল বীরু, এবার যাওয়া যাক।"

দুজনে বাইরে বেরুনোর আগেই দাবার ছক্‌ উলটে দেবার শব্দ পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকণ্ঠে চাপা-গলায় আওয়াজ শোনা গেল, "ছোটলোক।"

বীরুকে চলে আসতে দেখে ছোট গদা ব'লল, "বীরু তোমার কি এ জন্মে বুদ্ধি হবে না? আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছ কেন? যাও, গিয়ে এক বাজী মাৎ হয়ে এস।"

# দক্ষিণ আমেরিকায় নাৎসী প্রভাব

—মিহির

শত বৎসর পূর্ব্বের কথা ; য়ুরোপের Holy Alliance নামক তৎকালীন রাষ্ট্রসঙ্ঘের পাণ্ডারা স্পেনের প্রভাব-মুক্ত দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন রাষ্ট্রকে পুনরায় পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মনরোর দৃঢ়তায় তাঁহারা এই দুরভি-সন্ধি ত্যাগে বাধ্য হন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট মনরো কংগ্রেসে এক বাণী প্রেরণ করিয়া জানান যে, য়ুরোপের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না, কিন্তু পশ্চিম গোলার্দ্ধের বিষয়ে সে উদাসীন নহে ; ঐ গোলার্দ্ধের ব্যাপারে যদি য়ুরোপীয় শক্তিবর্গ হস্তক্ষেপ করিতে প্রয়াস পায়, তাহা হইলে উহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক বিবেচিত হইবে। এই সম্পর্কে কংগ্রেসের আইন প্রণয়ন প্রয়োজন হয় নাই ; প্রেসিডেন্ট মনরোর এই দৃঢ়তাব্যঞ্জক বাণীতেই (Monroe Doctrine) য়ুরোপের সেই Holy Alliance-এর চক্রান্তের অবসান হয়।

আজ শতাব্দীকাল পরে য়ুরোপে যে 'Alliance' সঙ্ঘটিত হইয়াছে, তাহার পাণ্ডারাও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাজনীতিক, অর্থনীতিক ও আদর্শ-গত প্রভাব বিস্তারে ঐকান্তিক প্রয়াসী। বর্ত্তমান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও দক্ষিণ আমেরিকার ব্যাপারে উদাসীন নহে ; সে ঐ অঞ্চলকে য়ুরোপের অসাধু সঙ্ঘের প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে সচেষ্ট। বিগত এক শত বৎসরে জগতের অবস্থার বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে ; কূটনীতিক চক্রান্তের নব নব পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। শত বৎসর পূর্ব্বে Holy Alliance যে উপায়ে দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণে সচেষ্ট হইয়াছিল, আজ ঐ অঞ্চলে অপর Alliance-এর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা তাহা হইতে পৃথক্। কাজেই, শতাব্দীকাল পূর্ব্বে প্রেসিডেন্ট মনরোর পক্ষে যাহা সম্ভব হইয়াছিল, আজ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। বিংশ শতাব্দীর নাৎসী-ফাশিস্ত সঙ্ঘ গোপনে ও কৌশলে দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জনসাধারণের প্রতি প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট। সংস্কৃতিগত ঐক্যের কথা শুনাইয়া তাহারা দক্ষিণ আমেরিকার জার্ম্মান ও ইতালীয় অধিবাসীদিগকে বিভ্রান্ত করিতে প্রয়াসী ; বিভিন্ন রাষ্ট্রকে অর্থনীতিক সুবিধার প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিতে উদ্যোগী। স্ব স্ব আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে তাহারা প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছে, নিজ দেশ হইতে সুদক্ষ প্রচারক পাঠাইয়াছে, নিজ ব্যয়ে সুপরিচালিত সংবাদপত্র প্রচার করিতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহুদিন হইতে উৎকণ্ঠার সহিত দক্ষিণ আমেরিকার এই নাৎসী-ফাশিস্ত চক্রান্ত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। এই চক্রান্তের ফলে এক দিন সমগ্র পশ্চিম গোলার্দ্ধের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বিপন্ন হইতে পারে, ইহা জানিয়া মার্কিন সরকার নানা উপায়ে এই চক্রান্তজাল ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

গত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে ব্রাজিলে যখন ভার্গাসের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী স্বরাষ্ট্র-সচিব মিষ্টার সাম্‌নার ওয়েলস্ এক বক্তৃতায় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন : "ব্রাজিলের শাসন-ব্যবস্থা তাহার নিজস্ব ব্যাপার সন্দেহ নাই ; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে।" তাহার পর ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে লিমার সর্ব্ব-আমেরিকা সম্মিলনীতে দক্ষিণ আমেরিকায় নাৎসী-ফাশিস্ত-বাদ পরিব্যাপ্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কিন্তু এই আলোচনার ফল আশানুরূপ হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে মিষ্টার কর্ডেল্ হাল্ লিমা সম্মিলনীতে নাৎসী-বিরোধী প্রস্তাব গ্রহণ করাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ; তাঁহার এই চেষ্টা সফল হয় নাই। এই সম্মিলনীর অধিবেশনের বহু পূর্ব্বে দক্ষিণ আমেরিকায় নাৎসী-ফাশিস্তবাদ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাহার ফলে এই সম্মিলনীতে আর্জ্জেন্টিনার প্রতিনিধি কর্ত্তৃক উত্থাপিত আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির সংহতি-সংক্রান্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় ; এই প্রস্তাবে নাৎসী-ফাশিস্ত শক্তি সম্পর্কে কোন গোপন

ইঙ্গিত স্থান পায় নাই। গত বৎসর পানামা সম্মিলনীতেও দক্ষিণ আমেরিকায় নাৎসী-ফাসিস্তবাদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবের বিষয় আলোচিত হয়। গত জুলাই মাসে হাভানায় সর্ব্ব-আমেরিকা সম্মিলনীতে এই মর্ম্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, য়ুরোপের রাজনীতিক বিপর্য্যয়ের ফলে বিভিন্ন য়ুরোপীয় শক্তির পশ্চিম গোলার্দ্ধের অধিকৃত অঞ্চলগুলি হস্তান্তরিত হইতে পারিবে না। জার্ম্মানী ও ইতালী যাহাতে বিজয়ীর অধিকারে পশ্চিম গোলার্দ্ধের ফরাসী ও ওলন্দাজ অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমর্থ না হয়, হাভানা সম্মিলনীর এই প্রস্তাবের তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঐ রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য যে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার সহিত দক্ষিণ আমেরিকার নাৎসী-ফাসিস্ত চক্রান্ত সম্বন্ধ-বিবর্জ্জিত নহে। সম্প্রতি য়ুরোপে তথাকথিত "পঞ্চম-বাহিনী" অর্থাৎ সাধনের যে বিরাট শক্তি প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাতে দক্ষিণ আমেরিকার নাৎসী-ফাসিস্ত ষড়যন্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে আরও আশঙ্কার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। মার্কিন সরকার এই বিপদের আশঙ্কা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন; তাঁহারা সংযোগকরণ বৃদ্ধি করিয়া এবং বিভিন্ন স্থানে নৌ ও বিমানঘাঁটি নির্ম্মাণ করিয়া বিশাল "রক্ষা-প্রাচীর" নির্ম্মাণে মনোযোগী হইয়াছেন। সমুদ্র অতিক্রম করিয়া প্রাচী ও প্রতীচীর শত্রু গৃহদ্বারে উপনীত হইবে অথবা তাহারা সমুদ্রপারের মার্কিনী স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিবে, ইহাই তাঁহাদিগের একমাত্র আশঙ্কা নহে; প্রতিবেশী যাহাতে শত্রুকে আহ্বান করিয়া তাহার মার্কিন সীমান্তে পৌঁছিবার পথ উন্মুক্ত করিতে না পারে, তজ্জন্যও তাঁহারা সামরিক সাবধানতা অবলম্বন করিতেছেন।

## ব্রাজিলে জার্ম্মান প্রভাব

নাৎসী-ফাসিস্তবাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ব্রাজিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য। ব্রাজিলে ২০ লক্ষ জার্ম্মানের বাস, ইতালীয় অধিবাসীর সংখ্যা ৩০ লক্ষ। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট ভার্গাস্ নাৎসী-ফাসিস্তবাদের প্রতি প্রকাশ্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। গত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট ভার্গাস্ ব্রাজিলে স্বীয় এক-নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্ট পুনর্নির্ব্বাচনের কথা ছিল; শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে ভার্গাস্ পুনরায় নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইতে পারিতেছিলেন না, তাঁহার কোন ক্রীড়নককে নির্ব্বাচনপ্রার্থীরূপে উপস্থাপিত করাও সম্ভব হয় নাই। কাজেই, গণতান্ত্রিক দলের প্রার্থীর নির্ব্বাচন নিশ্চিত বুঝিয়া প্রেসিডেন্ট ভার্গাস্ তখন কৌশলে স্বীয় প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ১০ই নভেম্বর তিনি অকস্মাৎ শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া আপনাকে ব্রাজিলের একনায়ক ঘোষণা করেন।

কৌশলে শাসন-ব্যবস্থা হস্তগত করিলেই নিষ্কণ্টক হওয়া যায় না। ভার্গাসের এক-নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলেও ব্রাজিলে গণবিপ্লবের আশঙ্কা ছিল। এই জন্য তখন হইতে তিনি নাৎসী-ফাসিস্ত শক্তিবর্গের প্রতি অধিকতর নির্ভরশীল হন। অবশ্য, ব্রাজিলে জার্ম্মানীর প্রভাব ইহার পূর্ব্বেই বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তথায় জাতীয়তাবাদী-দিগের চেষ্টায় কমিনটার্ন ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। এই বিদ্রোহ দমন করিবার পরই ভার্গাস্ নিরঙ্কুশ এক-নায়ক হইয়াছিলেন, অবশ্য তখন শাসনতন্ত্র বাতিল করিবার প্রয়োজন হয় নাই। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এক-নায়কত্ব প্রতিষ্ঠার শেষ অনুষ্ঠানরূপে শাসন-তন্ত্র বাতিল করেন।

সে যাহা হউক, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর হইতেই জার্ম্মান সরকারের সোৎসাহতায় ব্রাজিলে ফাসিস্ত প্রচারকার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা হয়। অল্প কালের মধ্যে এই প্রচার-ব্যবস্থা ব্যাপক রূপ ধারণ করে। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ব্রাজিলে ১৫টি সংবাদপত্র জার্ম্মান ভাষায় প্রকাশিত হইতেছিল, রিও-দে-জানেইরো এবং অন্যান্য প্রধান শহরের অধিকাংশ সংবাদপত্র-প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী ছিলেন জার্ম্মান। চারিটি বেতারঘাঁটি হইতে প্রত্যহ ফাসিস্ত মতবাদ প্রচারিত হইত। সরকারের নির্দ্দেশে বিভিন্ন স্থানের বেতারঘাঁটিগুলিকে প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটি প্রচার-তালিকা অনুসারে কার্য্য করিতে হইত। শিক্ষা-ক্ষেত্রেও নাৎসী আদর্শ প্রবিষ্ট হইয়াছিল; ব্রাজিলের চারি শত বিদ্যালয় নাৎসী আদর্শে পরিচালিত হইতেছিল। তথায় হিটলার-পন্থী যুব-সঙ্ঘও প্রতিষ্ঠিত হয়; এই সঙ্ঘের যুবকগণ প্রত্যহ হিট্‌লারের প্রতি আনুগত্যের শপথ

গ্রহণ করিত, নাৎসী বন্দরে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করিয়া অভিনন্দন জানাইত।

ব্রাজিলের রাজনীতিক ও সামাজিক জীবনে এইরূপ প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অর্থনীতিক্ষেত্রেও জার্মানীর বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। বস্তুতঃ জার্মানী যদি ব্রাজিলের অর্থনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে সমর্থ না হইত, তাহা হইলে তথায় এত ব্যাপক প্রচারকার্য্য পরিচালন করত তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না। ব্রাজিলের বিখ্যাত কাফি, রবার ও কোকো ব্যতীতও খনিজ সম্পদে এই দেশটি সমৃদ্ধ। কাজেই, বর্ত্তমান অর্থনীতিক সাম্রাজ্যবাদের যুগে ব্রাজিলের অর্থনীতিক্ষেত্র অত্যন্ত লোভনীয়।

পূর্ব্বে ব্রাজিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। কিন্তু গত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে এই দেশের ব্যবসায়ে জার্মানী শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। গত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় ব্রাজিলের ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রাধান্য স্থাপন করিতে সচেষ্ট হয়। এই সময় প্রেসিডেন্ট ভার্গাসের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই মর্ম্মে চুক্তি হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারী ব্রাজিল্ সরকারকে ছয় কোটী ডলার ঋণ দান করিবে; ইহার পরিবর্ত্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথায় ব্যবসায়ের অধিকতর সুবিধা লাভ করিবে। এই চুক্তি কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ভার্গাস্ ওয়াশিংটনের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন; কিন্তু তিনি জার্মানীকেই ব্যবসায়ের অধিকতর সুবিধা দান করেন। এই সুবিধা লাভের সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীর বিপুল মূলধন ব্রাজিলে লগ্নী হয়। বহু তাম্র, নিকেল ও লৌহের খনি এবং তৈলকূপ-পরিপূর্ণ একটি বিরাট অঞ্চল জার্মানীর হস্তগত হয়।

ব্রাজিল্ দক্ষিণ আমেরিকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রাষ্ট্র। ইহার লোক-সংখ্যা বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীর সংখ্যার অধিক না হইলেও ইহা আয়তনে সমগ্র য়ুরোপের এক-চতুর্থাংশের সমান। এই একটি মাত্র রাষ্ট্রের সর্ব্বক্ষেত্রে জার্মানীর বিরাট প্রভাব সমগ্র পশ্চিম গোলার্দ্ধের পক্ষে আশঙ্কার বিষয়। অথচ, তাহার প্রভাব এই রাজ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। জার্মানী অথবা তাহার ঘনিষ্ঠ সহচর ইতালী, অথবা তাহার 'কমিন্টার্ণ-বিরোধী' প্রাচ্য মিত্র জাপানের প্রভাব দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রে বিস্তৃত।

## অর্থনীতিক্ষেত্রে নাৎসী-প্রসার

সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা কৃষিপ্রধান, খনিজ সম্পদেও অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। এই অঞ্চল হইতে প্রচুর গম, মাংস, তুলা, কাফি এবং বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য সমগ্র বিশ্বে রপ্তানী হয়। কাজেই, দক্ষিণ আমেরিকার ব্যবসাক্ষেত্র প্রমশিল্পে উন্নত প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয়। বিশেষতঃ যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় এই অঞ্চলের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। গত য়ুরোপীয় মহাসমরের সময় চিলির নাইট্রেট্ এবং আর্জ্জেন্টিনার শস্য ও মাংস মিত্রশক্তিকে সুদীর্ঘকাল সংগ্রাম চালাইবার শক্তি যোগাইয়াছিল। কাজেই, প্রাচী ও প্রতীচীর যে তিনটি শক্তি অস্ত্রবলে স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তারের স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহারা দক্ষিণ আমেরিকার অর্থনীতিক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারে প্রয়াস পাইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। জার্মানী ও ইতালী রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে অভিনব মতবাদ আমদানী করিয়াছে, বলিবার বেশে দক্ষিণ আমেরিকার গমনের সময় তাহারা উহা ফেলিয়া যায় নাই। তাহারা একই সময় অর্থনীতিক্ষেত্রে ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হইয়াছিল।

দক্ষিণ আমেরিকার ব্যবসাক্ষেত্রে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ আমেরিকায় মোট বৈদেশিক মূলধনের দুই-তৃতীয়াংশ মূলধন বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের। জার্মানী, ইতালী ও জাপান দক্ষিণ আমেরিকায় অর্থনীতিক প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হইয়া প্রধানতঃ এই দুইটি শক্তির সম্মুখীন হয়। এই তিনটি মিত্র, বিশেষতঃ জার্মানী ও ইতালী, রাজনীতিক চক্রান্ত-জাল বিস্তারে দক্ষ। তাহারা নানারূপ কূটনীতিক কৌশল অবলম্বন করিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার রাজনীতিক দলগুলির পারস্পরিক বিরোধে হস্তক্ষেপ করিয়া এবং বিভিন্ন এক-নায়ককে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়া ক্রমে ঐ অঞ্চলে অর্থনীতিক সুবিধা লাভ করে। অল্প কালের মধ্যেই তথায় বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পায়। গত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জার্মানী, ইতালী ও জাপান দক্ষিণ আমেরিকার মোট আমদানীর শতকরা ৬৫ ভাগ মাল রপ্তানী করিয়াছিল। এই আমদানীর শতকরা ৮৩ ভাগ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন রপ্তানী করে, অবশিষ্ট ১৭ ভাগ রপ্তানী করিয়াছিল জার্মানী, ইতালী ও জাপান।

হইবার পর, দশ বৎসরের মধ্যেই ইঙ্গ-মার্কিন রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা ৭০ ভাগ এবং জার্মানী, ইতালী ও জাপানের রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ হয়। জাপান প্রধানতঃ দক্ষিণ আমেরিকার জন্য রণপোত ও বাণিজ্যপোত নির্মাণ করে, সে ব্রাজিল এবং চিলিকে কয়েকখানি পোত সরবরাহ করিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির নিকট জার্মানী প্রধানতঃ সমরোপকরণ বিক্রয় করিয়াছিল। সে বেনেজুয়েলার জন্য দুইখানি ডেষ্ট্রয়ার নির্মাণ করে, চিলির নিকট বোমাবর্ষী বিমান বিক্রয় করে। ইতালী শুধু দক্ষিণ আমেরিকায় বিমান এবং অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রয় করে নাই, সে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে একটি বোমাবর্ষী বিমানের কারখানাও স্থাপন করিয়াছিল। ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার নিকট সে যুদ্ধ জাহাজ ও অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রয় করে।

নাৎসী-ফাশিস্ত শক্তিগুলি দক্ষিণ আমেরিকায় সমরোপকরণ বিক্রয় করিয়া এক দিকে যেমন প্রচুর কাঁচা মাল লাভে উপকৃত হয়, তেমনই অন্য দিকে ঐ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির উপর তাহার অধিকার বিস্তৃত হয়। জার্মানী ও ইতালী এই সুযোগে তাহাদিগের মতবাদ প্রচারে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকায় ইতালীয় অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৭০ লক্ষ। ইতালীর সংবাদপত্রগুলি প্রতি দিন এই সকল ইতালীয়দিগের নিকট রোমক সভ্যতার মহিমা কীর্তন করিতে থাকে, সমগ্র বিশ্বের 'লাটিন' জাতির মধ্যে সংস্কৃতিগত ঐক্য স্থাপনের আবশ্যকতা প্রচার করে। দক্ষিণ আমেরিকার সংবাদপত্রগুলিতেও জার্মানী ও ইতালীর পক্ষে প্রচারকার্য্য চলিতে থাকে এবং হিটলার ও মুসোলিনীর চিত্র মুদ্রিত হয়। স্পেনের অন্তর্বিপ্লবের সময় ক্যাথলিক চার্চের কৌশলী প্রচারকার্য্যের ফলে দক্ষিণ আমেরিকাবাসী স্পেনের সরকারপক্ষের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়। তখন জেনারেল ফ্রাঙ্কোর প্রতি দক্ষিণ আমেরিকাবাসীর যে সহানুভূতির সৃষ্টি করা হয়, পরবর্ত্তী কালে ফাশিস্ত স্পেনের পক্ষে তাহা কল্যাণকর হইয়াছে।

প্রবল নাৎসী-ফাশিস্ত প্রচারকার্য্যের ফলে কেবল ব্রাজিলে নহে, চিলি, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও নাৎসী-ফাশিস্ত প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। পেরুর ডিক্টেটর বেনাভিডস্ মুসোলিনীর অত্যন্ত অনুরক্ত। এই একনায়কটি সর্ব্বদা সম্ভব বিপ্লবের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত; কাজেই স্বীয় প্রভুত্ব রক্ষার জন্য তিনি ইতালীর শরণাপন্ন হন। ইকুয়েডর সরকার স্বদেশের সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে শিক্ষালাভের জন্য জার্মানীতে প্রেরণ করিতে সম্মত হন।

দক্ষিণ আমেরিকায় এই ব্যাপক নাৎসী-ফাশিস্ত চক্রান্ত পশ্চিম গোলার্দ্ধের পক্ষে কতদূর অনিষ্টকর, তাহা সুস্পষ্ট। য়ুরোপে বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে মিত্রশক্তির অবরোধের ফলে জার্মানী ও ইতালীর সহিত এই অঞ্চলের স্বাভাবিক বাণিজ্য বন্ধ হইয়াছে। পরে প্রায় সমগ্র য়ুরোপে জার্মানীর প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃটেনের অবরোধপ্রচেষ্টাও বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইহার ফলে বর্ত্তমানে দক্ষিণ আমেরিকার পক্ষে প্রায় সমগ্র য়ুরোপের বাজার বন্ধ। এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকায় অধিকতর অর্থনীতিক প্রভাব বিস্তারে উদ্যোগী হইয়াছে। বর্ত্তমানে দক্ষিণ আমেরিকার বহির্ব্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সর্ব্ব-আমেরিকা শুল্কগত ঐক্য (All-American Customs Union) স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। ইহা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে ক্রমে সর্ব্ব-আমেরিকা সামরিক ও নৌচুক্তি সম্পাদনেরও চেষ্টা হইবে। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই চেষ্টা বিফল করিবার জন্য নাৎসী-ফাশিস্ত রাষ্ট্রগুলি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। বর্ত্তমানে দক্ষিণ আমেরিকায় নাৎসী-ফাশিস্ত ষড়্‌যন্ত্রকারিগণ গোপনে কার্য্য করিতেছে বলিয়া মনে হয়। সর্ব্ব-আমেরিকা সামরিক ও নৌচুক্তি যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি তাহাদিগের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবে। কাজেই উহা বিফল করিবার জন্য ইতালী ও জার্মান চক্রীদিগের প্রাণপণ চেষ্টা করাই স্বাভাবিক। য়ুরোপে বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর দক্ষিণ আমেরিকায় নাৎসী-ফাশিস্ত চক্রান্ত যে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা সম্প্রতি উরুগুয়া-তে একটি ফাশিস্ত ষড়্‌যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে। ঐ ষড়্‌যন্ত্রকারীরা তথায় ফাশিস্ত প্রাধান্য স্থাপন করিয়া ঐ রাষ্ট্রটিকে জার্মানীর উপনিবেশে পরিণত করিতে চাহিয়াছিল।

## মেক্সিকোর তৈল-ব্যবসায়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণস্থ মেক্সিকো রাষ্ট্রটিকে জনৈক বৈদেশিক সাংবাদিক 'danger spot' আখ্যা দিয়াছেন। এই রাষ্ট্রটির উপর নাৎসী ও ফাশিস্ত রাষ্ট্রদ্বয়ের রাজনীতিক প্রভাব নাই; তবে তাহারা এইখানে অর্থনীতিক সুবিধা লাভ করিয়া থাকে।

গত ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ও মার্কিন ব্যবসায়িগণ মেক্সিকোর তৈল-ব্যবসায় হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন। এই বৎসর মার্চ্চ মাসে মেক্সিকো সরকার মার্কিন ও বৃটিশ তৈল-ব্যবসায়ীদিগের ৯ কোটি পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। এতদ্‌সংক্রান্ত কাহিনীটি নিম্নলিখিতরূপ: গত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে লাজারো কার্ডেনাস্ মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইবার পর হইতে তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীকে বৈদেশিক ব্যবসায়ীদিগের কবল হইতে উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হন। এই সময় হইতে তৈল-ব্যবসায়ে নিযুক্ত শ্রমিকগণ অধিক মজুরী এবং কার্য্যের অধিকতর সুবিধার দাবী করিতেছিল। তাহাদিগের এই দাবী বৈদেশিক ব্যবসায়িগণ কিছুতেই পূরণ করেন না। অতঃপর শ্রমিকগণ অনন্যোপায় হইয়া গত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ধর্ম্মঘট ঘোষণা করে। এই ধর্ম্মঘটে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তৈল-ব্যবসায়িগণ শ্রমিকদিগের কতকগুলি দাবী মানিয়া লইতে সম্মত হয়। শ্রমিকগণ আশ্বাস লাভ করিয়া জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কার্য্যে যোগদান করে। এই সময় মেক্সিকো সরকারের শ্রমিক বিভাগ হইতে বৈদেশিক ব্যবসায়ীদিগকে অনুরোধ জানান হয় যে, তাহাদিগের ব্যবসায়ে নিযুক্ত মেক্সিকান্ শ্রমিকদিগের বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তাহারা যেন ১৩ লক্ষ পাউণ্ড প্রদান করে। মেক্সিকো সরকারের নিকট হইতে এই অনুরোধ-লিপি প্রাপ্ত হইয়া বৈদেশিক ব্যবসায়িগণ ক্রোধে অধীর হয়; তাহারা শ্রমিকদিগের যে সকল দাবী পূরণ করিবে বলিয়া তৎপূর্ব্বে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তাহা পূরণ করিতে অস্বীকার করে। কিছুকাল ধরিয়া নানা প্রকার তর্ক-বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনা চলিতে থাকে। এই সময় মেক্সিকোর সুপ্রীম কোর্ট দাবীর সমস্ত অর্থ মেক্সিকো সরকারকে প্রদান করিবার জন্য বৈদেশিক ব্যবসায়ীদিগের প্রতি আদেশ দেন। ধূর্ত্ত ব্যবসায়িগণ আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকিবার সময় তাহাদিগের সমস্ত অর্থ অন্যত্র স্থানান্তরিত করিয়াছিল। প্রেসিডেন্ট কার্ডেনাস্ বৈদেশিক ব্যবসায়ীদিগের এই প্রতারণায় অত্যন্ত বিরক্ত হন। তিনি তখন ঘোষণা করেন যে, সুপ্রীম কোর্টের চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে তৈল-ব্যবসায়িগণ তাহাদিগের অর্থ স্থানান্তরিত করিয়াছে, এই কার্য্যের দ্বারা তাহারা আপনাদিগকে দেউলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। অতএব, তাহাদের সম্পত্তি মেক্সিকো সরকার বাজেয়াপ্ত করিলেন।

প্রেসিডেন্ট কার্ডেনাস্ এই সময় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন: "তৈলব্যবসায়ীদিগের উপর কোনরূপ কর ধার্য্য হইলে, তাঁহাদিগকে কোন অন্যায় সুবিধা লাভে বঞ্চিত করিলে, অথবা তাঁহাদিগের কোন অন্যায় ক্ষমতার বিলোপ হইলে তাঁহারা কিরূপে বর্ত্তমান সরকারের বিরুদ্ধে দারুণ অসন্তোষের বিষ ছড়াইয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বিদ্রোহ সৃষ্টির জন্য তাঁহাদিগের নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ ও অস্ত্র শস্ত্র আছে। যে সকল দেশদ্রোহী সংবাদপত্র তাঁহাদিগকে সমর্থন করে, তাহাদিগকে ইঁহারা অর্থ সাহায্য করেন। কিন্তু দেশহিতকর কার্য্যে ইঁহারা এক কপর্দ্দকও ব্যয় করেন না। শত অনুরোধেও ইঁহাদিগের লভ্যাংশের এক কপর্দ্দক পাইবার উপায় নাই। এই সকল ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে দেশীয় ও বৈদেশিকদিগের মধ্যে যে শুভাবহনক বৈষম্য বিদ্যমান, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। তথায় বৈদেশিক কর্ম্মচারীদিগের জন্য সকল প্রকার আরামের ব্যবস্থা আছে; পক্ষান্তরে, দেশীয় মেক্সিকান্ কর্ম্মচারিগণ অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করে এবং নানারূপ কষ্ট ভোগ করে। উক্ত দেশের নানারূপ ব্যাধি নিবারণের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক কর্ম্মচারীদিগের জন্যস্থানে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, দেশীয় শ্রমিকগণের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থাও নাই, তাহারা নিয়মিতভাবে ঔষধ-পত্রও পায় না। তাহাদিগের বেতন কম, পরিশ্রম কঠোর।"

বৈদেশিক ব্যবসায়ীদিগের তৈল-ব্যবসায় বাজেয়াপ্ত হইবার পর বহু সংবাদপত্র মেক্সিকো সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইয়াছে। এই জন্যই এতদ্‌সংক্রান্ত কাহিনী বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইল। মেক্সিকো সরকারের এই কার্য্যের সহিত নাৎসী-কার্য্যিত ষড়যন্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই; বৃটিশ ও মার্কিন ব্যবসায়িগণ তাহাদিগের নিজেদের অপরাধেই এই স্বার্থ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। অবশ্য মেক্সিকোর তৈলব্যবসায়ে সরকারী কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তৈল-পিপাসু নাৎসী-কার্য্যিত শক্তিগুলি তথায় ভিড় করিয়াছে; তথায় তাহারা ঘাঁটিও লাভ করিয়াছে। নাৎসী-কার্য্যিত শক্তিগুলি যখন বণিকবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করে, তখনও তাহারা রাজনীতিক ছুরিকাখানি গোপনে বহন করে। এই জন্য অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন যে, নাৎসী-কার্য্যিত শক্তিগুলি গোপন ষড়যন্ত্রের সাহায্যে মেক্সিকোতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া দক্ষিণ আমেরিকার সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থলপথের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে সচেষ্ট হইতে পারে। এই জন্যই মেক্সিকোকে "danger spot" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সম্ভাবিত বিপদ সম্বন্ধে উদাসীন নহেন। সম্প্রতি মার্কিন সরকার বৃটেনের নিকট হইতে যে কয়েকটি নৌঘাঁটি লাভ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে জামাইকা মেক্সিকোর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

# বিজ্ঞান জগৎ

## নক্ষত্রের অবস্থা

—শ্রীদেবেশচন্দ্র রায়

আমরা সৌরমণ্ডলের অধিবাসী। সূর্য্যের আলো এবং উত্তাপ ভিন্ন আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না—কাজেই সূর্য্য সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষের অনুসন্ধিৎসা কোন সীমায় থামিয়া থাকিতে পারে না—ইহা অসীমের দিকে ধাবিত হয়। সূর্য্য ছাড়াও যে অসংখ্য সমধর্ম্মী জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সমস্ত আকাশে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞাত তথ্যাদি সম্বন্ধে এখন কিছু আলোচনা করা যাক।

রাত্রিকালে নির্ম্মল স্বচ্ছ আকাশের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত বৃত্তাকারে বিস্তৃত আলোক-বেষ্টনী—ইহা দেখিয়া মনে হয় অসংখ্য স্বয়ংপ্রভ আলোকবিন্দু পুঞ্জীভূত হইয়া দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই আলোক-বেষ্টনীকেই ছায়াপথ বলা হয়। এক একটি আলোকবিন্দু সূর্য্যেরই সমধর্ম্মী এক একটী বস্তুপিণ্ড—অর্থাৎ নক্ষত্র।

এখন এই নক্ষত্রপুঞ্জ কি, কি তাহার ধর্ম্ম, সূর্য্যের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধই বা কোথায়, ইহাদের কলেবর, ভর (mass) উত্তাপ, আলোক, ঘনত্ব ও দূরত্ব কিরূপ তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ সূর্য্যে যেরূপ কোন প্রকার জীবের বাস সম্ভব নয়, সেইরূপ উহাদেরও উত্তাপ এত অধিক যে, কোন প্রকার প্রাণী তথায় বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু সূর্য্যের গ্রহ-উপগ্রহ আছে এবং সূর্য্যেরই একটী গ্রহে আমরা বিচরণ করিতেছি।

এখন ছায়াপথে যে অসংখ্য নক্ষত্রমণ্ডলী রহিয়াছে, তাহাদের কোন গ্রহ-উপগ্রহ আছে কি না, এবং তাহাতে কোন প্রকারের জীবের বসবাস সম্ভব কি না, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য।

গ্রহের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই যে, প্রায় দুইশত কোটী বৎসর পূর্ব্বে আকাশে ইতস্ততঃ ঘূর্ণ্যমান কোন বৃহদাকারের নক্ষত্র সূর্য্যের খুব নিকট দিয়া ছুটিয়া চলিয়া যায়; ইহারই ফলে সূর্য্যের গায়ালীয় বহিরাবরণের যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, তাহাতে কিয়ৎ বস্তুপিণ্ড মূল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই বিচ্ছিন্ন বস্তুপিণ্ড কালক্রমে শীতল হইয়া ঘনীভূত কঠিন পদার্থের আকার ধারণ করে। ইহাই গ্রহের উৎপত্তির কারণ।

অনুরূপ প্রক্রিয়া অন্যান্য নক্ষত্রে ঘটা যে অসম্ভব তাহা নয়। কিন্তু গাণিতিক হিসাব হইতে দেখা যায় এক একটী নক্ষত্রের সমগ্র জীবনে এইরূপ আকস্মিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা এতই অল্প যে, ছায়াপথের নক্ষত্রগুলির মধ্যে গ্রহ-উপগ্রহাদি থাকা অসম্ভব না হইলেও তাহাদের সংখ্যা অতীব নগণ্য। এক সময় এইরূপ ধারণা বৈজ্ঞানিকদের ছিল যে, সৌরমণ্ডলের ন্যায় প্রত্যেকটী নক্ষত্রেরও এক একটী নক্ষত্রমণ্ডল আছে। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ নক্ষত্রগুলির একত্ব সম্বন্ধে প্রায় একমত।

বৈজ্ঞানিকদের অনুমান, ছায়াপথের নক্ষত্রের সংখ্যা হাজার-কোটী হইতে দশহাজার কোটীর মধ্যে। আমরা ইহার বিরাট বেষ্টনীর ভিতর আছি বলিয়া উহাকে একটী বৃত্তার্দ্ধের ন্যায় দেখি। অনন্ত বিশ্বের সুদূর কোন প্রান্ত হইতে তাকাইলে ছায়াপথ আকাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অন্যান্য বস্তুপিণ্ডের ন্যায় একটী ক্ষুদ্র বস্তুপিণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

চিত্রে অনুরূপ একটী বস্তুপিণ্ড বেষ্টনীর বহির্ভাগ হইতে কিরূপ দেখায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ছায়াপথের এই অসংখ্য নক্ষত্রের ভিতর আমরা অগণিত বৈচিত্র্য দেখিতে পাই। কোন কোনটী অত্যন্ত উজ্জ্বল, আবার কোন কোনটীর আলোক অত্যন্ত ক্ষীণ; কতক নক্ষত্র হইতে বিকীর্ণ আলোক অনবরত কাঁপিতেছে, ক্ষীণ আলোক ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া আবার মিলাইয়া যাইতেছে। ইহাদের ব্যবধান বিভিন্ন বলিয়া যে এইরূপ ঘটিতেছে তাহা নয়, বিকীর্ণ আলোর প্রাকৃতিক ধর্মাই পৃথক্।

ইহাদের আকার এবং আয়তনেও ঐরূপ পার্থক্য দেখা যায়। কোন কোনটী আকারে অত্যন্ত বড়, আবার একদল খুবই ছোট। কোনটী বা ক্রমাগত ফুলিয়া উঠিতেছে, কোনটী ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতেছে। সেই সঙ্গে বিকীর্ণ আলোর তারতম্য ঘটিতেছে।

সূর্য্যের বহিঃস্তরের উষ্ণতা প্রায় ৬,০০০ ডিগ্রি এবং এই তাপের পরিমাণ প্রায় স্থির আছে; কিন্তু এই নক্ষত্রগুলিতে দুই হাজার ডিগ্রি হইতে আরম্ভ করিয়া কুড়ি হাজার ডিগ্রি পরিমিত বাহ্যিক উষ্ণতাও দেখা যায়।

কিন্তু এই অগণিত বৈচিত্র্যের মধ্যেও নক্ষত্রগুলির মধ্যে এক বিষয়ে ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য ধর্ম্মের তুলনায় তাহাদের ভরে (mass)—অর্থাৎ এক একটী নক্ষত্রে মোট পদার্থের পরিমাণে—খুব একটা তারতম্য দৃষ্ট হয় না। আকারে কোন কোন নক্ষত্র খুব বড় দেখায়, আবার কোনটী বা অত্যন্ত ছোট দেখায়। ইহার কারণ বৃহদাকার নক্ষত্রে পদার্থ তনুকৃত অবস্থায় আছে, অর্থাৎ অত্যধিক তাপে নক্ষত্রগুলি বেলুনের ন্যায় ফুলিয়া আছে। অপরপক্ষে কোন নক্ষত্র ছোট দেখাইলে বুঝিতে হইবে, ইহাতে পদার্থ ঘনীভূত অবস্থায় আছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, একই ওজনের পদার্থপিণ্ড অবস্থা-বিশেষে ছোট কিম্বা বড় দেখাইতে পারে। অত্যধিক তাপের ফলে কোন কোন নক্ষত্রে পদার্থ সর্ব্বদাই বায়বীয় অবস্থায় থাকে। উহারা আকারে স্বভাবতঃই বড় হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ক্যাপেলা (Capella) নামক নক্ষত্রটীর উল্লেখ করা যাইতে পারে; উহাতে পদার্থের ঘনত্ব বাতাসের ন্যায়, কঠিন পদার্থের লেশ-মাত্র নাই। প্রকৃতপক্ষে উহা পুঞ্জীভূত জলন্ত গ্যাস মাত্র। এই বিষয়ে বেটেলগস্ নামক নক্ষত্রে পদার্থের চরম অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা পরীক্ষাগারে পাম্পের সাহায্যে কোন বায়ুরুদ্ধ পাত্র হইতে বায়ু নিষ্কাশন করিয়া লইতে পারি। এইরূপে বায়ুনিষ্কাশিত পাত্রকে শূন্য পাত্র বলা যায়। অবশ্য পাত্র সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য কখনও করা যায় না, অবশিষ্ট কতক বায়ুকণা পাত্রে থাকিয়াই যায়, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে পাত্রের ভিতর শূন্যতা (vacuum) সৃষ্টি হইয়াছে বলা হয়। এখন বেটেলগসে (Betelgeuse) পদার্থের স্বাভাবিক ঘনত্ব 'শূন্যস্থানে'র ন্যায়, কাজেই উহার আয়তন কত বড় তাহা অনুমান করা কঠিন। উক্ত নক্ষত্রের গড় ঘনত্ব পরীক্ষাগারে বহুকালের চেষ্টায় লব্ধ 'শূন্যস্থানে'র সমান, কাজেই উহার বহিরাবরণের ঘনত্ব আরও কত না কম হইবে।

কাজেই দেখা যাইতেছে, কোন কোন নক্ষত্রে পদার্থের এইরূপ অবস্থা আছে, পরীক্ষাগারে যাহার অনুকরণ করা মানুষের সাধ্যাতীত। পদার্থবিজ্ঞানের লক্ষ্য পদার্থের গুণাগুণ নির্ণয় করা; সেই জন্য বিভিন্ন অবস্থায় পদার্থের পর্য্যবেক্ষণ প্রয়োজন হয়। অথচ সূর্য্যের আভ্যন্তরীণ প্রদেশের অনুরূপ তাপ অথবা বেটেলগস্ নক্ষত্রস্থিত পদার্থের অনুরূপ ঘনত্ব পরীক্ষাগারে সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নাই। সেই জন্যই পদার্থবিজ্ঞানবিদ্‌গণের মনোযোগ ক্রমে ক্রমে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষা যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান শুরু হইয়াছে। জ্যোতিষ্কমণ্ডলী একটী প্রাকৃতিক পরীক্ষাগার—উহাতে পদার্থের বিভিন্ন চরম অবস্থায় অনবরত প্রাকৃতিক পরীক্ষা চলিতেছে। ইহা হইতে তথ্য সংগ্রহ করিতে হইলে প্রয়োজন শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টির।

তনুকৃত অবস্থায় পদার্থের রূপ আমরা আলোচনা করিলাম। এখন নক্ষত্রগুলির ঘনীভূত অবস্থা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। কোন কোন নক্ষত্রে পদার্থ এত ঘনীভূত অবস্থায় আছে, যাহা সাধারণ ভাবে আমরা কল্পনাও করিতে পারি না।

গড়ে সূর্য্যের ঘনত্ব জল হইতে সামান্য বেশী। কিন্তু সূর্য্যের বহিরাবরণ গ্যাসীয়, কাজেই সহজেই বুঝা যায় ভিতরের পদার্থ জল অপেক্ষা অনেকগুণ ভারী। এই প্রসঙ্গে জানিয়া রাখা উচিত যে, সূর্য্যের গ্যাসীয় আবরণের উষ্ণতা

প্রায় ৬,০০০ ডিগ্রী। অপর পক্ষে সূর্যের অভ্যন্তরে উষ্ণতা এক কোটী চল্লিশ লক্ষ ডিগ্রিরও উপরে। এক কোটী চল্লিশ লক্ষ ডিগ্রী উত্তাপ যে কি তাহা আমরা কল্পনায়ও আনিতে পারি না।

কিন্তু যদিক এক হাজার ডিগ্রির তাপে তামা, সোনা ইত্যাদি গলিয়া তরল আকার ধারণ করে। এক কোটী চল্লিশ লক্ষ ডিগ্রী তাপে পদার্থ কি অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। অন্ততঃ আমরা পদার্থের যে রূপ দেখি নিশ্চয়ই তাহা সেই রূপে থাকে না। স্যার আর্থার এডিংটন কঠিন গণনা করিয়া গ্যাসীয় পদার্থপুঞ্জ হইতে বিকীর্ণ আলোর দ্যুতির সঙ্গে উক্ত পদার্থপিণ্ডের ভর ( mass ) কিম্বা আয়তনের ( volume ) সম্বন্ধ নির্ণয় করেন। তাঁহার নির্ণীত সূত্র অনুসারে আলোর দ্যুতি মুখ্যতঃ ভরের উপর নির্ভর করে, আয়তনের উপরে নহে।

উক্ত গাণিতিক সূত্র কার্যক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না তাহা পরীক্ষা করিতে যাইয়া দেখা গেল, উহা কেবল যে গ্যাসীয় নক্ষত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহা নহে—অন্যান্য সমস্ত নক্ষত্রের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। কাজেই নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইল। তবে কি মূলতঃ গ্যাসীয় নক্ষত্রগুলির সঙ্গে অধিকতর ঘন নক্ষত্রগুলির কোন পার্থক্য নাই? ব্যাপার একটু তলাইয়া দেখা যাক।

চাপ প্রয়োগে আয়তনে সঙ্কুচিত হওয়া গ্যাসীয় পদার্থের একটী মুখ্য গুণ। কারণ গ্যাসে পদার্থের অণুগুলি পরস্পর হইতে বেশ দূরে থাকে; চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা পরস্পর নিকটে আসিতে শুরু করে। কিন্তু কঠিন কিম্বা তরল পদার্থে অণুগুলি পরস্পর সংলগ্ন থাকে, কাজেই চাপে সঙ্কুচিত হয় না।

পদার্থে অণুগুলির মোটামুটী গঠন এইরূপ: কেন্দ্রস্থলে একটী ভারী ক্ষুদ্র ঘনবিদ্যুৎ-সম্পন্ন কেন্দ্রক ( nucleus ) এবং চতুর্দিকে সূর্যের গ্রহসমূহের অনুরূপ কক্ষে প্রদক্ষিণ করিতেছে কতকগুলি ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-কণা (electron); এই দুইয়ের মাঝে প্রচুর শূন্যস্থান রহিয়াছে। কেন্দ্রকের বিদ্যুৎশক্তিই এই সকল ইলেক্ট্রনগুলিকে সংযত রাখে। অণুগুলির ভার মূলতঃ মধ্যস্থিত কেন্দ্রকের জন্য। ইলেক্ট্রনগুলি উহাদের আয়তন বৃদ্ধি করে মাত্র। কোন প্রকারে যদি ইলেক্ট্রনগুলিকে সরাইয়া দেওয়া যায়, তবে এক একটী অণুর আয়তনের বহু ভাগ কমিয়া যায়। নক্ষত্রগুলির অভ্যন্তরে তাপ ভয়ানক বেশী হওয়ার ফলে মূল দেহ হইতে ইলেক্ট্রনগুলি ছিন্ন হইয়া যায়; কাজেই পদার্থের ভিতর প্রচুর স্থান শূন্য হয় এবং কঠিন পদার্থ গ্যাসের ধর্ম পালন করে অর্থাৎ চাপে সঙ্কুচিত ও চাপের অভাবে প্রসারিত হয়।

এতও উত্তাপে এইরূপ ইলেক্ট্রনমুক্ত ( আয়নিত ) অণু আমাদের কল্পনাতীত ঘনতা সৃষ্টি করিতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সিরিয়স (Sirius লুব্ধক) নক্ষত্রটীকে ধরা যাইতে পারে। সিরিয়স্ ( Sirius ) নক্ষত্রটী বেশ উজ্জ্বল; উহার একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সোদর আছে। উহা হইতে বিকীর্ণ আলোও অত্যন্ত ক্ষীণ। এই ক্ষুদ্র নক্ষত্রটীতে পদার্থের আপেক্ষিক ঘনত্ব জল হইতে প্রায় ৪,০০০ গুণ। উহার এক ঘনসেঃ পরিমিত পদার্থের ওজন প্রায় এক টনের সমান। এইরূপ ঘনত্ব পৃথিবীতে নাই, থাকাও সম্ভব নয়; তবে উল্লিখিত মতবাদ অনুসারে গ্রহের অভ্যন্তরে এইরূপ ঘনবস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব নয় বলিয়া অনুমিত হয়।

স্যার আর্থার এডিংটনের এই সূত্রটীর সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক নিয়মে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ববাদের উপর ভিত্তি করিয়া উহার ঘনত্ব নির্ণয় করিয়া একই ফল পাওয়া যায়। কাজেই জ্যোতির্বিদদিগের মধ্যে এই বিষয়ে বিরোধের কারণ আপাততঃ নাই।

## ট্যাঙ্কযুদ্ধ

বর্তমান য়ুরোপীয় সমরে ট্যাঙ্কের ব্যাপক প্রয়োগের খবর আমরা পাইতেছি। জার্মানদের ফরাসী রণক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রধান অস্ত্রই ছিল ট্যাঙ্ক। বোমারু বিমান হইতে বোমাবর্ষণের অনতিবিলম্বেই মোটর-সাইকেলবাহিনী অগ্রসর হইতে থাকে এবং তাহার পিছনে থাকে ট্যাঙ্কবাহিনী। ট্যাঙ্কের পশ্চাতে পদাতিকবাহিনী অগ্রসর হইতে থাকে।

ট্যাঙ্ক আবিষ্কার এবং উহার প্রয়োগের কৃতিত্ব সবটুকুই ইংরাজদের প্রাপ্য। ১৯১৪-১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের মহাযুদ্ধে যখন উভয় পক্ষ পরিখা খনন করিয়া উহার ভিতর হইতে যুদ্ধ চালাইতে শুরু করিল, তখন অচল অবস্থার অবসান ঘটাইবার চেষ্টা উভয় পক্ষ হইতেই চলিতে লাগিল।

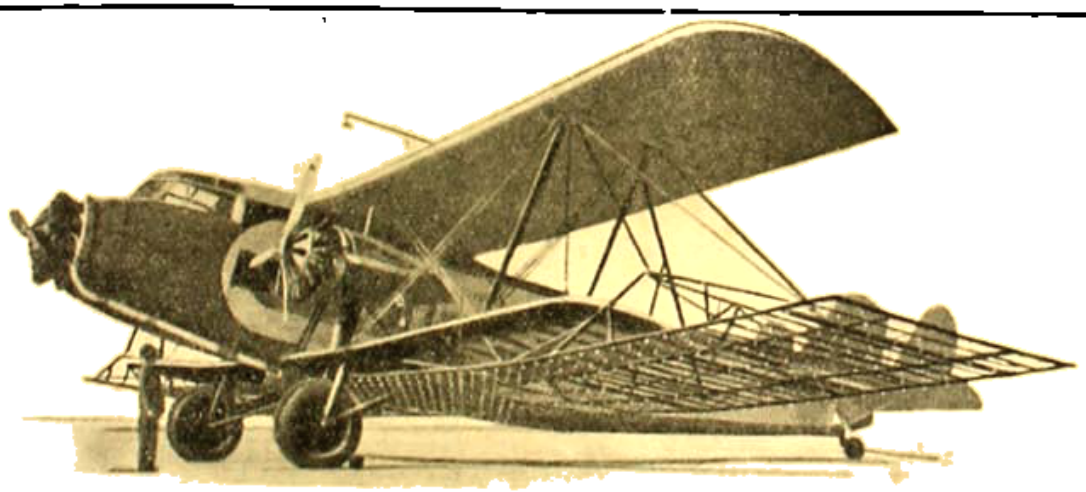

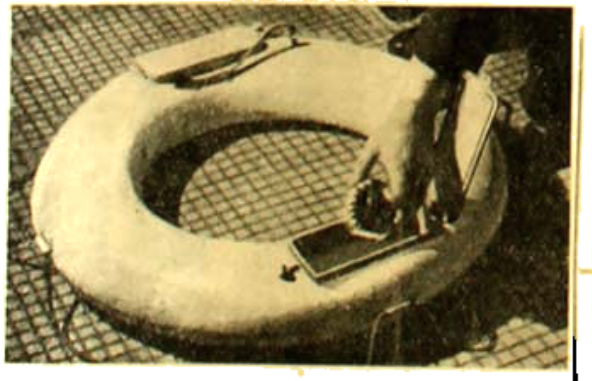

উপরে : বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ব্যবহৃত আলোকসজ্জিত বিমান

বামে : নূতন জীবন-চর্যার বাস্তব লাইফ-বেল্ট

দক্ষিণে : চিত্রে পৃথিবীর ইতিহাস

বোমের অনুরীক্ষণিক চিত্র : বামে লঘু-বেদনাদৃশ্য এবং দক্ষিণে গুরু-বেদনাদৃশ্য

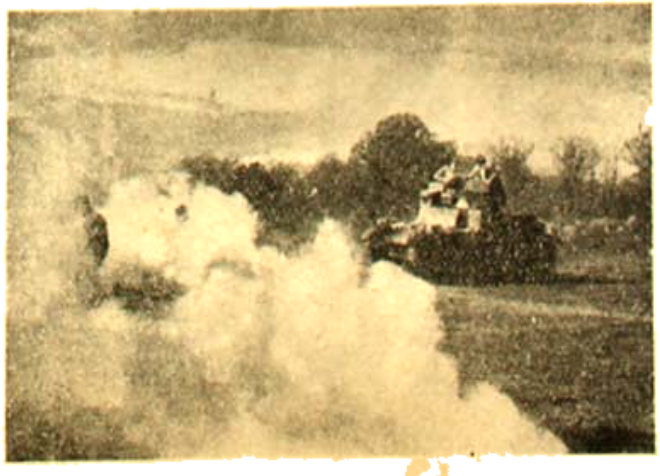

যুদ্ধজাহাজের অভ্যন্তরে চাষ

জার্মানেরা শুরু করিল গ্যাস আক্রমণ, কিন্তু উহার বীভৎসতার দরুণ অধিক কাল উহা স্থায়ী হয় নাই। মিত্রপক্ষ যথাসময় ট্যাঙ্কের ব্যবহার আরম্ভ করিয়া জার্মানদিগকে হতবুদ্ধি করিয়া ফেলিল। জার্মানদের সমস্ত কৌশল উহার নিকট হার মানিল। শীঘ্রই ট্যাঙ্কের কার্যকারিতা সর্বত্র অনুভূত হইতে শুরু হইল। আজকাল এমন কোন দেশ নাই যেখানে ট্যাঙ্কবাহিনী সমরোপকরণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নহে। তবে বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে ট্যাঙ্কের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আজকাল উদ্দেশ্যবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ট্যাঙ্ক ব্যবহৃত হয়। মাঝারি রকমের একটী ট্যাঙ্কের ওজন প্রায় দশ টনের কাছাকাছি। ট্যাঙ্কে চারটী করিয়া মেশিন-গান থাকে, তাহা ছাড়া মেড় হইতে দুই ইঞ্চি কামান। কাজেই স্থলযান হিসাবে উহার শক্তি কম নয়। আধুনিক ট্যাঙ্কের বিশেষত্ব এই, উহা খুব দ্রুত ছুটিতে পারে—কাজেই ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামানের গোলার আহত হওয়ার সম্ভাবনা ইহার কম।

চারি পাঁচজন সৈনিকের বসিবার মত স্থান উহাতে থাকে এবং উহা ঘেরা থাকে প্রায় মেড় ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের পাতে। কাজেই সাধারণ মেশিন-গানের গুলী উহাকে কিছু করিতে পারে না।

বিপক্ষের গুলীর আঘাতে ট্যাঙ্কের বর্ম অত্যন্ত গরম হইয়া যায়, কিন্তু যাহারা যুদ্ধাপণ করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে তাহাদের নিকট এই সামান্য অসুবিধা এমন কিছু মারাত্মক নহে। সমতল রাস্তার উপর উহা প্রায় ত্রিশ মাইল বেগে ছুটিতে পারে এবং উঁচু-নীচু মাঠে পরিখা এবং কৃত্রিম বাধা অতিক্রম করিয়া অন্যূন পনর বিশ মাইল বেগে ছুটিয়া যায়। কাজেই দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া কোন স্থান অধিকার করিতে হইলে ট্যাঙ্ক অপরিহার্য।

মেশিন-গানের গুলীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে হইলে ট্যাঙ্ক ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ট্যাঙ্ক পর্যুদস্ত করার প্রকৃষ্ট উপায় ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী কামান, উহা প্রায় একমাইল দূর হইতে উহার ইস্পাতের বর্ম ভেদ করিতে পারে। এই মারাত্মক এক মাইল পথ যত দ্রুত অতিক্রম করা যায় ইহার বিপদ-সম্ভাবনা ততই কম থাকে।

কোন ট্যাঙ্ক বিপক্ষের কামানে বিধ্বস্ত হইলে চালক মেশিন-গান হাতে করিয়া নামিয়া পড়ে এবং চতুর্দিকে ঘুঁষা ছুড়াইয়া উহার আড়ালে আত্মরক্ষা করে।

## ঘুমপাড়ানো গান

শিশুদের জন্য ঘুমপাড়ানো গানের চলতি সব যেমনই ছিল, এখনও আছে। কিন্তু অনিদ্রা-রোগগ্রস্ত রোগীদের জন্যও ঘুমপাড়ানো ছড়ার বন্দোবস্ত হইয়াছে। তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না; ঘুমপাড়ানো গানের গ্রামোফোন রেকর্ড বাজারে বাহির হইয়াছে। একখানি বার ইঞ্চি রেকর্ড আছে—মনোবিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞ দ্বারা বাছাই করা কতকগুলি শব্দসমষ্টি। এই শব্দগুলি মানুষের স্নায়ুমণ্ডলীর উপর যাদুমন্ত্রের মত কাজ করে। বেতারবার্তা প্রেরক-কেন্দ্র হইতে এই রেকর্ডটী রাত্রিবেলা ঘুমের সময় প্রেরণ করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু পাছে রেডিও-সংযুক্ত মোটরের চালকগণ এই গান শুনিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়া বিপদ ঘটায় সেই জন্য এই প্রস্তাব ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

মজে আবার রহিয়াছে ঘুমপাড়ানো ছড়া। একটী রেডিও কনোগ্রাফে ঠিক সময় আপনা হইতেই একটী রেকর্ড বাজিতে শুরু করে। প্রথমে বেশ মোলায়েম ভাষায় শয্যা-ত্যাগ করিতে অনুরোধ করে, পরে ক্রমে সুর কঠোর হইতে আরম্ভ হয় এবং শেষ পর্যন্ত ঘুম না ভাঙ্গিলে 'উঠ, উঠ' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। তাহাড়া শিক্ষাপ্রদ অনেক রেকর্ড বাহির হইয়াছে—বিদেশী ভাষা অল্প সময়ে শিক্ষা দিবার জন্যও রেকর্ডে রহিয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে একপ্রকার ব্যায়াম-কারক রেকর্ডে। ইহার উদ্দেশ্য শ্রোতার কর্ণের মাংসপেশী এবং স্নায়ুমণ্ডলীকে ব্যায়াম দ্বারা উদ্দীপিত করা।

শেষোক্ত রেকর্ডটীতে আছে পরস্পর বিভিন্ন তানের নানা রকম সুর। এই রেকর্ড কানের পেশীগুলিকে সঞ্জীবিত করিয়া বধিরতা দোষ দূর করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

## পেরিস্কোপের নূতন ব্যবহার

প্রত্যেক সাবমেরিনে পেরিস্কোপ নামক একপ্রকার যন্ত্র থাকে, উহার সাহায্যে জলের নীচ হইতে আরিকগণ অনায়াসে উপরে জাহাজের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া থাকে। আয়তাকার পরিখার ভিতর হইতেও শত্রুপক্ষের কার্যাবলী

নিরীক্ষণ করার জন্য পেরিস্কোপ ব্যবহৃত হয়। চিত্রে দেখা যাইতেছে জনৈক ইংরেজ সৈন্য কয়াসীর সংকেতে ভূগর্ভস্থ কোটর হইতে নিরাপদে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

### পেট্রলের পরিবর্ত্তে কয়লা গ্যাস

অনেক দেশেই আজকাল পেট্রোলের পরিবর্ত্তে গ্যাস দিয়া যানবাহন চলাচল হইয়া থাকে। গ্যাস স্বভাবতঃ লঘু এবং অনেকটা স্থান জুড়িয়া থাকে। তাই গ্যাস জমাইয়া রাখার জন্য প্রকাণ্ড বড় আধারের প্রয়োজন হয়। খুব পাতলা ধিক জাতীয় জিনিষে তৈয়ারী বেলুনাকৃতি গ্যাসের আধার গাড়ীর ছাদের উপর বসাইয়া দেওয়া হয়।

চিত্রে এইরূপ একটী বাসের ছাদে বেলুনাকৃতি আধারে পাইপের সাহায্যে কয়লার গ্যাস ( কয়লা পোড়াইয়া যে গ্যাস পাওয়া যায় সেই গ্যাস ) বোঝাই করা হইতেছে।

### অনাবৃষ্টি নিবারণ

দুই জন হাঙ্গেরীয় বৈজ্ঞানিকের পরিকল্পনানুযায়ী মনে হয়, এমন দিন অদূরভবিষ্যতে আসিবে যখন অনাবৃষ্টির দুর্ভাবনা আর না কি ভাবিতে হইবে না। ঠিক পরীক্ষাগার হইতে বৃষ্টি হইবে না, তবে পরীক্ষাগারে তৈয়ারী দাহশীল তরল, গ্যাসীয় অথবা কঠিন পদার্থ কোন বৃহৎ জলাশয়ের ধারে রাখিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ সংযোগে তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইবে। সেই অগ্নিসংযোগে প্রচুর গরম বাতাস এবং সেই সঙ্গে জলীয় বাষ্প উপরে উঠিতে থাকিবে এবং তাহাই বৃষ্টির আকারে চতুর্দ্দিক ধৌত করিবে।

### অভিনব জীবন-তরী

বৃটীশ নৌবাহিনীর জন্য এক প্রকার অভিনব জীবন-তরী নির্ম্মিত হইয়াছে উহা দ্বারা জন নিমজ্জমান নাবিককে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ভাসাইয়া রাখিতে পারে। এই জীবন-তরীতে ছোট ছোট জলরুদ্ধ কক্ষ আছে, তাহাতে কিছু দিন চলার মত খাদ্য এবং পানীয় জল আছে। তদ্ভিন্ন ইহাতে বিপদ সঙ্কেত দিবার জন্য রাত্রিকালে আগুন জ্বালাইবার এবং দিবাভাগে ধোঁয়া ছাড়িবার স্বয়ংচালিত কৌশল আছে। এই জীবন-তরী ধাতুনির্ম্মিত।

### চিত্রে পৃথিবীর ইতিহাস

লস এঞ্জেলসে একটী যাদব সামগ্রী প্রদর্শনীতে একটী খুবই শিক্ষাপ্রদ এবং চিত্তাকর্ষক বস্তু প্রদর্শিত হইয়াছিল। ইহা একটী অতিকায় চিত্র। পৃথিবীর ইতিহাস, জন্ম হইতে অদ্যাবধি, একটী প্রকাণ্ড বড় ক্যানভাসে অঙ্কিত হইয়াছিল। শিল্পী জ্যামিতিক গণনানুসারে চিত্রটীর পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। একটী ফুট স্কয়ার প্যানেলে ১৯৩৯ সালের ইতিহাস অঙ্কিত হইয়াছিল; পরবর্ত্তী দশ ফুটে পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরের, তারপর দশ ফুট বৎসপূর্ব্ববর্ত্তী চার বৎসরের ইত্যাদি। শেষ প্যানেলে প্রথম দশলক্ষ বৎসরের ইতিহাস অঙ্কিত ছিল।

### বিমানে বেতার

এতকাল বিমানে চড়িয়া রেডিও প্রোগ্রাম শোনার সুবিধা ছিল না। ক্রমে ক্রমে মানুষের সেই আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। আমেরিকার আন্তর্মহাদেশিক ( trans-continental) অতিকায় বিমানগুলিতে আজকাল রেডিও প্রোগ্রাম শোনার সুবিধা হইয়াছে। প্রকাণ্ড একটি গ্রাহক যন্ত্রে বেতার সঙ্গীত গৃহীত হয় এবং উহা হইতে প্রত্যেক যাত্রীর আসনের পিছনে যুক্ত একটা ছোট লাউড-স্পীকারে প্রেরিত হয়। যাত্রী ইচ্ছা করিলেই লাউড-স্পীকারটি চালাইয়া বেতার সূচী শ্রবণ করিতে পারে।

### দেহে ফস্‌ফরাসের স্থায়িত্ব

আমরা খাদ্যের সঙ্গে যাহা গ্রহণ করি তাহা শরীরে জমিয়া থাকে না, দেহের রক্তের সহিত সঞ্চালিত হইয়া তারপর স্বাভাবিক নিয়মে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নিঃসৃত হইয়া যায়। ফস্‌ফরাস্ দেহরক্ষায়, তথা স্নায়ুমণ্ডলীর জন্য, একটি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ। আমরা খাদ্যের সহিত উহা গ্রহণ করিয়া থাকি। জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক হান এবং লুওস্-গার্ত পরীক্ষাগারে দেহে ফস্‌ফরাসের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

একবার জল খাইলে সেই জলের অণুগুলি দেহে কতদিন সঞ্চালিত হয় এই বিষয় হেভেসি এবং হোফার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন—খাওয়ার এক পক্ষকালের ভিতর জলের অণুগুলি দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া যায়। ফস্‌ফরাস লইয়া পরীক্ষা খরগোসের উপর চলে—পক্ষক হইতে নিউট্রন বিস্ফোরণে তৈয়ারী স্বতঃবিচ্ছুরণশীল ফস্‌ফরাস্ একটি খরগোসের চামড়ার ভিতর ইন্‌জেক্‌শন্ করিয়া দেওয়া হয়। সাতাশ দিন ধরিয়া

উহার দেহ হইতে নির্গত মল-মূত্রাদি পরীক্ষা করা হয় এবং উহাতে কল্‌করাসের পরিমাণ নির্ণীত হয়। সাতাশ দিন পরে জন্তুটিকে হত্যা করিয়া উহার দেহযন্ত্রের বিভিন্ন অংশের কল্‌করাস্-পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়। তাঁহাদের পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, সাধারণতঃ কল্‌করাস্ দেহে গড়ে তিন দিন থাকে, সাতাশ দিনের ভিতরই মলমূত্রাদির সঙ্গে শতকরা প্রায় ৫৬ ভাগ কল্‌করাস্ নির্গত হইয়া যায়। জলীয় অণু দীর্ঘ একপক্ষকাল দেহে সঞ্চালিত হওয়ার কারণ উহা দেহস্থিত প্রচুর জলের সহিত মিশিয়া যায়। কল্‌করাসও একই কারণে মাসাধিককাল দেহে সঞ্চালিত হয়।

## লোমজাত পোষাকের তাপরক্ষা

মানুষ বুদ্ধিমান জীব, কাজেই পশুর লোমের তৈয়ারী শীত-বস্ত্র ব্যবহার করে। তাহার নিজের চুলের একমাত্র প্রয়োজন টাক ঢাকার জন্য। অন্যান্য প্রাণীর লোমের প্রয়োজন শীত গ্রীষ্মাদি হইতে আত্মরক্ষা করা। এখন আমরা কেশ ও লোম জিনিষটা কি এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে উহাকে কি প্রকার দেখায় এবং বিভিন্ন বিভিন্ন প্রাণীর লোমের ভিতর পার্থক্য কি, তাহা দেখিতে চেষ্টা করিব।

নমুনার অভাব হইবে না। নিজের মাথার চুল, কুকুর বিড়ালের লোম, এমন কি কম্বল হইতে কয়টা লোম ছিঁড়িয়া লইলেই চলিবে। জীবজন্তুর দেহ হইতে লোম ছিঁড়িয়া লওয়ার পর উহা তৈলাক্ত থাকে। কাজেই অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করিতে হইলে উহাকে এলকোহল এবং ইথর সংমিশ্রণে ডুবাইয়া লইতে হয়। চুলের অভ্যন্তরীণ অংশ পরীক্ষা করিতে হইলে উহাকে ধারালো ক্ষুরের সাহায্যে টেরছা করিয়া কাটিয়া লইতে হয়, তার পর অণুবীক্ষণের নীচে ফেলিলে দেখা যায়, চুলের গায় আগাগোড়া ঢেউ-খেলানো কতকগুলি পাঁচ রহিয়াছে। এই পাঁচগুলির ধারে করাতের দাঁতের ন্যায় দাঁত রহিয়াছে। দাঁতগুলির মুখ থাকে মাথার দিকে, গোড়ার দিকে নয়। এই ঢেউ-খেলানো দাগগুলি কতকগুলি পাতলা খোসা পর পর সাজান রহিয়াছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে অধিকাংশ জানোয়ারের লোমই বেশ স্বচ্ছ দেখায়। কাজেই স্বচ্ছন্দে উহার ভিতর পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়। চুলের মধ্যভাগে নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহার শাঁস একপ্রকার শুষ্ক কুঞ্চিত পদার্থের তৈয়ারী এবং উহার অঙ্গে স্থানে স্থানে ছোট ছোট বায়ুপূর্ণ গহ্বর আছে। এই শাঁসকে medulla বলা হয়। এই শাঁস-মধ্যবর্ত্তী স্থানে দেখা খুব সরু গোছার মত কোষ বা 'সেল' আছে। ইহাদিগকে cortex বলে। চুল রঞ্জিত করিতে হইলে এই cortex এর উপর রঙ্ ছড়াইয়া দিতে হয়।

চুলের বাহিরের খোসাগুলি একদেশী আলোতে (polarised light) খুব ভাল দেখা যায়। তাছাড়া কালিতে ডুবাইয়া হাতে কালি মুছিয়া লইলেই খোসার ফাঁকগুলিতে কালি আটকাইয়া থাকে, কাজেই বাহিরের দাগগুলি পরিষ্কার দেখা যায়।

ভেড়ার লোমের একটি বিশিষ্ট ধর্ম্ম এই যে, উহার খোসাগুলি খুব খসখসে। এই জন্যই ভেড়ার লোম শীত-বস্ত্রাদি তৈয়ারীর জন্য এত আদৃত হয়। জলসংস্পর্শে ভেড়ার লোমের সেই করাতের ন্যায় দাঁতগুলি একে অন্যের সহিত জড়াইয়া যায়—কাজেই জলে ভিজাইলে শীতবস্ত্র সঙ্কুচিত হয়। শীতবস্ত্র তৈয়ারীর জন্য লোমের চারভাগের সর্ব্বনিম্ন অংশটুকু ব্যবহৃত হয়, বাকী অংশটুকুতে পরদা, কার্পেট ইত্যাদি তৈয়ারী হয়।

## গ্যাস-নিরোধ

বিষাক্ত গ্যাস ভূমি হইতে তিন ফুটের উচ্চে উঠে না। এই তথ্যটীর সুযোগ লইয়া জনৈক ইংরেজ উদ্ভাবক একটী অভিনব কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। এই উদ্ভাবনের সাহায্যে গ্যাস-নিরোধক বক্ষে অনায়াসে টাট্‌কা বায়ুর সঞ্চালনের সুবিধা হইবে। একটী হাতে-চলা পাম্পে প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু হইতে একটী নলের ভিতর দিয়া বায়ু চুষিয়া লওয়া হয়। এই সহজ যন্ত্রটীর সাহায্যে প্রতি মিনিটে প্রায় চারি শত ঘন ফুট পরিমাণ বায়ু চুষিয়া লওয়া যাইতে পারে।

## নিশানা অভ্যাস

বিনা খরচে—গুলি কিম্বা বারুদ প্রয়োজন হয় না—বন্দুকের নিশানা অভ্যাস করিবার নূতন এক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক জন সার্জ্জেণ্ট চোখের সম্মুখে ছোট একটী লক্ষ্যবস্তু ধরিয়া বসিয়া থাকে, অপর দিক হইতে সৈনিক সেই লক্ষ্যের দিকে টীপ করিয়া বন্দুক চালায়। সার্জ্জেণ্ট সেই লক্ষ্য বস্তুর মধ্য স্থলে অবস্থিত একটী ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে তাকাইয়া বুঝিতে পারে লক্ষ্য ঠিক হইল কি না।

## বিজ্ঞাপনের নূতন উপায়

ব্যবসায়-জগতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার নূতন নূতন পন্থা প্রতি দিন আবিষ্কৃত হইতেছে। বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে নানা প্রকার বিজ্ঞাপন দেওয়ার বহুল পন্থা বহু দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ইদানীং বিমানে এইরূপ বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া শুরু হইয়াছে। প্রকাণ্ড এক একটী বিমানের নীচে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাইয়া নিবাইয়া নানা প্রকার বিজ্ঞপ্তি রচিত হইতে থাকে। অক্ষরগুলি এত বড় হয় যে তিন হাজার ফুট উঁচুতে থাকিলেও স্পষ্ট দেখা যায়। সাড়ে চারি হাজার ওয়াটের বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র হইতে শক্তি সরবরাহ করা হয়।

# আমরা ও বলরামবাবুরা

—শ্রীপ্রভাত দেব সরকার

পূজার পক্ষকাল পূর্ব্বের সময়টিকে বাঙ্গালাদেশের কিশোরী অবস্থা বলিয়া মনে হয় না কি? তার আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে অমন লঘু-চপল হাস্য-লাস্যের তরল তরঙ্গে তোমার চমক লাগে না কি? হঠাৎ মনে পড়ে না কি, তোমারই গাঁয়ের শ্যামলা, চপলা একটি মেয়ে সহসা তোমার মুখের উপর সকৌতুক আয়ত চক্ষু দুইটি মেলিয়া ধরিয়া খলিত আঁচলটিকে কটিদেশে বেষ্টন করিতে করিতে ক্ষিপ্রপদে তাড়াতাড়ি কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল? খিল্-খিল হাসির শব্দ তোমার কানে আসিয়া তোমাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল? আর অমনি চমকাইয়া দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখ নাই কি? অথচ এমনি আশ্চর্য্য যে, সেই হাস্যময়ী কিশোরীটির মুখ তুমি সর্ব্বত্র দেখিতে পাইয়াছ: আকাশের গায়ে, দীঘির পাড়ে, কোপের আড়ে, তোমার পথের বাঁকে-বাঁকে সে যেন কেবলি উঁকি মারিয়াছে, সকৌতুক ভ্রূভঙ্গি করিয়া কটিদেশ অঞ্চল-বেষ্টিত করিতে মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। চপলা মেয়েটিকে তুমি চিনি-চিনি করিয়াও চিনিতে পার নাই—তাহার হাসি, তাহার ভ্রূভঙ্গি তোমাকে বার বার স্মৃতি-প্রকোষ্ঠের দ্বার হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে, অথচ তুমি কিছুতেই কৃষ্ট হইতে পার নাই!

•

দেবী গজে আগমন করিতেছেন: শঙ্খপূর্ণা বসুন্ধরা। শরতের নির্ম্মল আকাশে ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত শুভ্র মেঘপুঞ্জের ফাঁকে-ফাঁকে হস্তীর পদচিহ্ন পড়িয়াছে। গাঢ় নীলের ছায়া পড়িয়াছে সরল মাটির বুকে। একটি অতীন্দ্রিয় বাঁশী যেন গীত গাইয়া গাইয়া বাজিয়া উঠিতেছে—বাতাসে সহজ মিষ্টি একটি সুর ক্ষণে ক্ষণে ঝরিয়া উঠিতেছে।

কাল রাত্রে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আজ কলিকাতা মহানগরীকে সদ্যপ্রোথিত রবিকরোজ্জ্বল দীপের মত মনে হইতেছে—চারি পাশে তাহার কোথা হইতে এত মায়াজাল জড় হইল, কে জানে!

এবার শারদীয়া পূজায় বিশেষ ধূম। বিজ্ঞাপনী-আকীর্ণ প্রাচীর-গাত্রগুলি তাহারই আকাশি দিতেছে। 'সস্তায় চূড়ান্তের' ব্যবস্থা হইয়াছে সর্ব্বত্রই, কোনরূপ যাচাই করিতে হইবে না, প্রত্যেকেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী—সুতরাং দেখিবার শুনিবার আবশ্যকতা নাই, নিশ্চিন্তে শুভ পদার্পণ করিলেই হইল!

গত কয়েক দিন যাবৎ ভবানীপুর অঞ্চলে ডজন খানেক 'বিজ্ঞাপনী বালক'কে শহর প্রদক্ষিণ করিতে দেখা গেল। তাহাদের সম্মুখ এবং পশ্চাদ্দেশ দেবীর শুভাগমন বার্ত্তাদহ আরও একটি বাড়তি সংবাদ প্রচারিত হইল:

বিরাট আয়োজন! বিপুল সমারোহ!
সুট—সুট! ওভার সুট! আসুন, আসুন!
কিনলে হতাশ হইবেন না...তোফাজী—
খাটি হয়—টাকায় টাকা লাভ!!

বিজ্ঞপ্তির বিশেষত্বে কৌতূহলী জনতা যখন বিস্ফারিত-বদন, তখন হস্তস্থিত 'হ্যাণ্ডবিল' নিক্ষিপ্ত হয়। 'বিজ্ঞাপনী বালক'দল সগর্ব্বে শহর পরিক্রম করিতে থাকে।

শুভসংবাদ জানিতে কাহারো বিলম্ব থাকে না: কিরীণ লাল ভাণ্ডড় নামধেয় কোন ব্যক্তি, ভবানীপুরে কোন একটি বিশিষ্ট বস্ত্রালয় সম্প্রতি লাল-বত্তিকা প্রজ্বলিত করায় উক্ত বস্ত্রালয়ের যাবতীয় 'মাল' সে শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে খালাস করিয়া দিয়া 'মুদুক' যাইতে চায়। সেই হেতু ক্রেতাকে সে প্রতি ধরিয়া সুতী-বস্ত্রে টাকা-প্রতি তিন আনা এবং সিল্ক বস্ত্রে ছ' আনা কমিশন হাতাহাতি দিতে চায়—চাই কি, বাড়ী বহিয়া দিয়া আসিতে প্রস্তুত।

হৈ হৈ ব্যাপার! বস্ত্রলীলে বস্ত্র দিতে কলিতে বুঝি বা ছদ্মবেশে শ্রীযুক্ত ভাণ্ডড় অবতীর্ণ হইলেন। কাক-পক্ষীর মুখে সংবাদ ছুটিল—অভূতপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা, চোখে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না।

কিন্তু বৌদিদি ঠাকুরুণ চোখে না দেখিয়াও বিশ্বাস করিয়া ফেলিয়াছেন, এখন আমাদের বিশ্বাস উদ্রেক করিবার নিমিত্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। বোধ হয় দাদার

নিকট হইতে কোনরূপ উৎসাহ না পাইয়া আমাকে লইয়া পড়িলেন। কহিলেন, "আচ্ছা, পুজোটা এবার ক' তারিখে পড়লো?"

কহিলাম, "বোধ হয় বিশ তারিখ, কি তারও আগে। কেন, আপনারা বুঝি ছুটিতে বাইরে যাবেন?"

জানালার বাহিরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বৌদি কহিলেন, "না। তা হ'লে তো আর দেরীও নেই। আজ মাসের আটই, বার দিনও তো নেই।"

কহিলাম, "তাতে কি? কল্‌কাতা যখন ছাড়বো না, তখন বার দিনও যা, বার মাসও তা।"

"নাঃ, তাই বলছি।---আচ্ছা, তোমাদের ছুটী কবে?"

কহিলাম, "দু'চার দিনের মধ্যে হ'বে আর কী!"

সহসা মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, ভাণ্ডড়ের দোকানটা কোথায় বলতে পার?"

আমার ছুটী এবং আগামী পূজার নির্দ্দিষ্ট তারিখের সহিত শ্রীযুক্ত ভাণ্ডড়ের দোকানের অবস্থিতি-স্থানের সম্বন্ধ যে কি, বুঝিতে পারিলাম না। তাহার উপর, বহুকাল কলিকাতায় বাসিন্দা হইয়াও উক্ত ভাণ্ডড়ের দোকানের অবস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। কিন্তু বৌঠাকুরুণের প্রশ্নের ধরণে মনে হইল ঐটুকু লৌকিক জ্ঞান আমার থাকা উচিত ছিল।

নিজ বুদ্ধিপ্রভাবে উত্তর করিলাম, "বোধ হয় বড়বাজারে।"

বৌদি কাছে সরিয়া আসিয়া আঁচল হইতে ভাঁজ-করা একটি বিজ্ঞাপনী খুলিয়া সামনে মেলিয়া ধরিলেন। আবিষ্কারের চমক তখন তাঁহার চোখে মুখে।

চক্ষুপ্লব ঘূর্ণিত করিয়া ভ্রূযুগল বর্ত্তন সহকারে তিনি কহিলেন, "দেখলে তো, দোকানটা একেবারে আমাদের ঘোর গোড়ায়—আর তোমরা কি না খবর রাখ না।"

নীরবে অজ্ঞতা স্বীকার করিলাম। তাগো 'ভাইফোঁটা নিতে আসি নাই, নতুবা আমার দফা রফা হইয়াছিল আর কি। মনে মনে আমাকে ফাঁকি দিয়া বৌদির জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করায় উক্ত ভাণ্ডড়-নামধেয় ব্যক্তিটির মস্তক চর্ব্বণ করিতে লাগিলাম।

বৌদি কহিলেন, "পুজোর বাজারগুলো কিন্তু এখন থেকে সেরে রাখলে হয়—এবার বা ভিড়।"

কিন্তু এতগুলকে ভিড় যে কবে হয় নাই, তাহা পাইলাম না। অকস্মাৎ বৎসরগুলিও সে সাক্ষ্য দেয় না। কহিলাম, "তা' এত তাড়া করবার কি দরকার? কল্‌কাতার দোকানগুলো তো আর এরি মধ্যেই অন্তঃপুর-শূন্য হ'য়ে পড়ছে না!"

বৌদি আপন মনেই বলিয়া চলিলেন, "এক টাকায় তিন আনা গেলে, থাকে তের আনা, আর দু' আনা গেলে থাকে দশ আনা। তা' হ'লে ঐ দশ আনার জিনিষ নেওয়াই ভাল, কি বল?"

অঙ্কশাস্ত্রের উপর তর্ক টিঁকে না। সুতরাং নির্ব্বিবাদে সায় দিলাম। উৎসাহিত হইয়া বৌদি কহিলেন, "তা হ'লেই দেখ, সিল্কের জিনিষেই লাভ বেশী—সব দিক থেকে।"

শুনিয়াছি লাভ লোকসান সম্বন্ধে মহিলাদিগের অন্তর্দৃষ্টি সমধিক প্রবলা। তর্ক করিয়া লাভ নাই। আরও খানিকটা কাছে সরিয়া আসিয়া আমার চেয়ারের হাতলে হাত রাখিয়া বৌদি কহিলেন, "আর পুজোর সময় সিল্কের জিনিষ কেনাই উচিত—বছরে ঐ ক'টা দিন বই ত না। কেন পরবে নাই বা শুনি, তার যখন এত সস্তা!"

ইহাও জানি, উচিত অনুচিত উঁহারা যত বোঝেন আমরা তাহার সিকিও বুঝি না। মাথা নাড়িয়া সায় দিলাম। হঠাৎ তাঁহার খেয়াল হইল, আমি তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া যাইতেছি। ধমকের সুরে কহিলেন, "কৈ, তুমি তো কিছু বললে না? সবেতেই 'হুঁ' মানে কি?"

"মানে, আপনি যা বলছেন, সবই ঠিক। প্রতিবাদ চলে না।" গম্ভীর হইয়া বৌদি কহিলেন, "ঠাট্টাকির কথা নয়। লোকটা কিন্তু খুব সুবিধে করে' দিয়েছে—এ মানতেই হ'বে।"

ইহাতে মানামানির কথা কোথা হইতে আসিল বুঝিতে পারিলাম না। কহিলাম, "সস্তার ভিন্ন অবস্থা, তা জানেন তো!"

তুলক্রমে একেবারে মোক্ষম স্থানে হাত দিয়াছি। তিনি ফোঁস করিয়া উঠিলেন—"কখ্‌খনো না। সস্তা হ'লেই

খারাপ হ'বে, কে তোমায় বললে? জাপানী জিনিষগুলো তা হ'লে কেউ কিনতো বলতে?"

কোথায় 'মুসুক'-অনুগামী ভাঙড়, আর কোথায় বিশ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাতঃসূর্য্য জাপান: আর 'প্রেফারেন্স' যখন তাহারা আমাদের অন্তরমহলে পাইয়াছে, তখন বৃথাই তাহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, তাহার উপর মূলত বস্তু মাত্রই অপকৃষ্ট, একথাও আমাকে কেহ বলে নাই। চুপ করিয়া রহিলাম।

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বৌদির করুণার উদ্রেক হইল, আপোষের কণ্ঠে কহিলেন, "চল না, দেখেই আসা যাক, না-পছন্দ হয়, না নিলেই হল, ক্ষতিটা কি?"

ক্ষতির কথা স্বতন্ত্র। একতরফা ডিক্রী, সুতরাং রাজী না হইয়া উপায় নাই। কিন্তু আইনের ছাত্র বলিয়াই বোধ হয় উক্ত ভাঙড়ের সমস্ত কুটিল চক্রান্ত এবং বৌদির তাহাতে নির্ব্বোধের মত নিমজ্জন মনে মনে খোঁচাইতে লাগিল। অনেকবার মুখে আসিয়া বাধিয়া গেল—বলি: পূর্ব্বাহ্নে এক টাকা মূল্যের জিনিষে বাড়তি তিন আনা দাম ফেলিয়া রাখিয়া পরে সেই তিন আনা খরিদ্দারের সম্মুখে দান দিয়া দিলে, বিজ্ঞাপনের উক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন হয় এবং স্বয়ং শিবের পিতাঠাকুরও টের পান না, আপনারা তো কোন ছার।

কিন্তু বাক্ সংযমের ফল অন্যরূপ হইল—মনটা খিঁচড়াইয়া রহিল।

* * *

বৌদির কথাই ঠিক। বিলম্বে হতাশ হইবার আশঙ্কা ইতিমধ্যে অনেকেই করিয়াছেন। সদর রাস্তায় তাহার প্রমাণ পাইলাম। সবে মাত্র গলিপথটার বাঁক ফিরিয়াছি, বৌদি চুপি চুপি কহিলেন, "দেখচো না, ওঁরাও সবাই যাচ্ছেন!"

ওঁরা সবাই অর্থাৎ আমাদের প্রতিবেশী। চোখ তুলিয়া দেখি কর্ত্তা-গৃহিণী দুই কন্যা এবং পুত্র সপরিবারে চলিয়াছেন। ষোড়শী এবং অষ্টাদশী কন্যা দুইটি কিঞ্চিৎ পশ্চাতে পড়িয়াছেন। তাহাদের টুকরা আলাপ কানে আসিয়া পৌঁছিল:

ষোড়শীটি বলিতেছে, "আমি কিন্তু এবার ওসব জর্জ্জেট

জর্জ্জেট নোব না। কি ছাই পছন্দ বাবার, আমার পরতে লজ্জা করে—ঠিক মেথরানী মেথরানী দেখতে লাগে।"

অষ্টাদশীটি কহিল, "কেন, জর্জ্জেট খারাপ কিসে?"

ষোড়শীটি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "জানি তোমারও ঐ রকম পছন্দ! কি যে তোমরা এক জর্জ্জেট লিখে রেখেছো! পনের-ষোল টাকার কাপড় আবার কেউ পরে না কি? অক্ষণাদি ঠিকই বলে, নেহাৎ পাড়াগেঁয়ে না হলে ও-জিনিষ কেউ কেনে না।"

অষ্টাদশীটি কহিল, "তবু পরলেই তো আর হ'লো না! যাদের ওর বেশী সামর্থ্য নেই তা'রা কি করে পরবে তুমি?"

বেণী দুলাইয়া ষোড়শীটি কহিল, "পরবে না! মোটা কাপড় পরবে। পয়সা না থাকে নাই বা সখ ক'রলে।"

অষ্টাদশীটি কহিল, "সেটা তোমার আগে ভাবা উচিত।"

ষোড়শীটি ললিতিকা নাড়িয়া কহিল, "কেন, আমি বুঝতে যাব কেন? ভারি তো, পূজোর সময় একটা ভাল কাপড় দেবে, তার এত কথা! সবাই যদি তোমার মত হ'তে না পারে!"

রাগ করিয়া ষোড়শীটি আগাইয়া গেল। সহসা অষ্টাদশীটি পিছন ফিরিতেই আমার সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে আমার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলতা থাকায় ব্রীড়াবনতার ন্যায় মাঝ পথেই থমকাইয়া গেল। বৌদি মুচকি হাসিয়া আগাইয়া গিয়া তাহার হাত ধরিলেন। আমার পদদ্বয় তখনও গতিমান কি না ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। ওদিকে ষোড়শীটি পিতাকে শাসাইতে শাসাইতে চলিয়াছে। দেখিলাম তিনিও নির্ব্বিবাদে মাথা নাড়িয়া চলিয়াছেন।

* * *

সুযোগ একবারই আসে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই তাহা গ্রহণ করিতে রূপসিকের হইয়া উঠেন। উচিতও তাই। মনে হইল, ভাঙড়ের দোকানে মধু-চক্রে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, সকলে যেন ক্রুদ্ধ ভাবে চতুষ্পার্শ্বে ঘুরাফিরা করিতেছে—পিছনের জনতা ঊর্দ্ধমুখে অপেক্ষা করিতেছে। হঠাৎ এক সময় পিছন হইতে ঠেলা খাইয়া

একেবারে ভিতরে ঢুকিয়া গেলাম। চোখ ফিরাইতে দেখি আমাদের প্রতিবেশীরা কোথায় তলাইয়া গেছেন।

সামনে বাঁ দিকের উচ্চাসনে গদির উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া শ্রীযুক্ত ভাঙড় হাত জোড় করিয়া সকলকে সহাস্যে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছেন: "আইয়ে মহারাজ, ই-তো সব আপ্‌কে আস্‌তে ভাল্ দিয়া।" বৃহৎ একটী 'পাঁচ' অত্যন্ত কুঁজোভাবে ভাঙড়ের মুখে লাগিয়া আছে—ফতুয়ার বর্ণাঙ্কিত স্ফীতোদরের কিঞ্চিৎ অংশ ভাসমান 'বয়া'র মত উঁকি মারিতেছে—বিশাল বপুটি কেবলি বামপার্শ্বে কাৎ হইয়া পড়িতেছে। কণ্ঠস্বরটি বাঁশ চেলা করার ন্যায় আওয়াজ করিতেছে। গলদেশে সর্ভাজ বাংসল্যের নিদর্শন ক্ষুদ্র যন্ত্রটি বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। বৈকল্যের বিনয় বহু দেখিয়াছি, কিন্তু এমনটি দেখিলাম এই প্রথম।···

মাথার উপর শতাধিক পাখা পক্ষচালনা করিতেছে, কিন্তু তবুও যেন শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। অথচ এমন জায়গাটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি যে, নড়িবার চড়িবার উপায় নাই। মহিলাদিগের সম্মানার্থ যতই আড়ষ্ট হইয়া নিজেকে সঙ্কুচিত করিবার প্রয়াস পাইতেছি, ততই তাঁহারা পুঙ্খতাড়নে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। বৌদি কিন্তু ঠিকই আছেন, কিছুতেই তাঁহার হেলদোল নাই। মনে হইল, কিসের যেন সন্ধানে আছেন। এক সময় তো বুদ্ধিয়া ফাঁক কাটিয়া আমাকে লইয়া একেবারে দোকানটির ডান কোণে হাজির হইলেন।

চাহিয়া দেখি, এই দিকটা কিঞ্চিৎ নিরিবিলি। যে কয়জন ক্রেতা এখানে উপস্থিত আছেন সকলেই বেশ সংযত। বুঝিলাম ইহাই 'সিল্ক-ডিপার্টমেন্ট'! আমাদের তলাইয়া-যাওয়া প্রতিবেশীদেরও এখানে দেখিলাম। ষোড়শীটি একখানি জাফরান রঙের শাড়ি লইয়া বিক্রেতার সহিত অনর্গল বকিয়া যাইতেছে। তাহার আশে-পাশে পিতামাতা, ভ্রাতা এবং অষ্টাদশী নিবিটি নীরব দর্শকের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। পাছে অষ্টাদশীটির দুর্বলতা আমার প্রকাশ হইয়া পড়ে বৌদিকে সামনে ঠেলিয়া দিয়া এক কোণে গিয়া দাঁড়াইলাম। বৌদি অনর্থক মুচ্‌কি হাসিয়া উঁহাদের সহিত যোগ দিলেন।

উপস্থিত যে স্থানটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি সেখান হইতে দোকানটির খুঁটিনাটি সব কিছুই লক্ষ্য করা যায়, মনে হইল আমি যেন সহসা অন্তরীক্ষের কোন একটি বিশেষ স্থানে উঠিয়া নিম্নের এই সকল মানব-শিশুর অকিঞ্চিৎকর কার্যা-কলাপ লক্ষ্য করিতেছি।

পূজার আমোদ পূজার বাজারেই সীমাবদ্ধ। আগামী কাল বাঙ্গালী চিত্তে আনন্দের যে হিল্লোল উঠিবে তাহার প্রথম সূচনা যেন ভাঙড়ের দোকানে সপ্তাহকাল পূর্বেই আরম্ভ হইয়া গেছে···সাগর হইতে প্রকৃত রসায়কের ব্যবধান কিন্তু অনেকখানি।

মমকোণের বিপরীত বাহুর পরিমাপ, আর আর দুই বাহুর প্রত্যেকের অপেক্ষা বৃহত্তর প্রমাণ করিতে হিমসিম খাইয়া উঠিয়াছি, কাণের দুই পাশ দিয়া আগুন ছুটিতেছে। কাল বোর্ডের উপর সারা জ্যামিতিক ছবিটি তখন কোন্ ফাঁকে উঠিয়া গিয়া শূন্যে দুলিতেছে—কিছুতেই তাহাকে ধরিয়া আর বোর্ডে গাঁথিতে পারিতেছি না—চোখের উপর হইতে কেবলি সরিয়া সরিয়া যায়। হঠাৎ পিঠের উপর সজোরে দুই ঘা বেল পড়িল—চোখে অন্ধকার দেখিলাম। জ্যামিতিক ছবিটিও তাহার সমস্ত প্রমাণ লইয়া কোথায় অন্তর্হিত হইল। স্তম্ভিত-বিমূঢ় ক্লাসের মাঝখানটিতে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতেছি।

বলরামবাবু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "এত সোজা জিনিষটা প্রমাণ ক'রতে পার না, আবার কান্না হ'চ্ছে—গাধা কোথাকার, লজ্জা করে না?"

লজ্জা সেদিন সত্যই করিয়াছিল এবং সেই লজ্জায় সেদিন মনে মনে বলরামবাবুর সু-উচ্চ পদটি পাইবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম! আমার শিশুমনের সমস্ত আকুতি দিয়া ভগবানকে সেদিন আক্ষেপ জানাইয়াছিলাম।

দেখি বলরামবাবুও আসিয়াছেন—সঙ্গে একটি ষোড়শী মেয়ে আছে। তাঁহারা 'মিলবস্ত্র বিভাগের' কোণটিতে উৎসুক ভাবে অপেক্ষা করিতেছেন। সম্মুখে ক্রেতার ভিড়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। প্রথম দর্শনেই বলরাম বাবুকে চিনিয়াছিলাম,—গায়ে ময়লা ঘর্ম্মসিক্ত লাল্‌চে একখানি পাঞ্জাবী, পিঠের উপর অনেকখানি তালি দেওয়া,

ধা কাঁধের উপর হইতে একখানি নক্সা এবং ধূলি-মলিন 'ওমড়ান' উত্তরীয় লম্বমান। পরণের কোরা কাপড়টি কোন মতে হাঁটুর নীচে নামিয়াছে, কোঁচার প্রান্তদেশ বাম-সংকারে কোমরে গোঁজা।

তাঁহার পার্শ্বের ষোড়শীটির বেশবাসও অপূর্ব্ব : পরিহিত শাড়ীটী যথেচ্ছভাবে দেহ বেষ্টন করিয়া অবশেষে বক্ষঃস্থল ঘুরিয়া পিঠে আসিয়া শেষ হইয়াছে—তাহার প্রান্তদেশে প্রকাণ্ড একগুচ্ছ চাবি ঝুলিতেছে। দুই কানকে একেবারে নজর করিয়া দিয়া কেশবাস কবিয়া টানিয়া আনিয়া পিছনে খোঁপার আকারে জড় করা হইয়াছে—নিশ্ছিদ্র সিঁথির নীচে গৌর মুখখানি বেড়া-বেড়া দেখাইতেছে। বৈদ্যুতিক অত্যুগ্র আলোর প্রভায় তৈলাক্ত মুখমণ্ডল চক্‌চক্ করিতেছে। মেয়েটী জড়সড় হইয়া নির্ব্বোধ চোখ দুটি মেলিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বলরামবাবু সামনে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। মেয়েটি তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া দিয়া কহিল, "ওদের আগে হ'ক না বাবা। আমরা না হয় পরে যাব!"

বলরামবাবু প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, "হুঁ, কত আর দাঁড়াবি তুই? না এগুলে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকতে হ'বে, তা জানিস!"

মেয়েটি চুপ করিয়া গেল। বলরামবাবু চাদরটিকে মাথা ঘুরাইয়া দুই কাঁধের উপর ফেলিয়া কহিলেন, "চল বরং ওদিকে যাই, ওখানে দেখছি ভিড়ও কম!"

মেয়েটী নিরুত্তরে কহিল, "ওদিকে যে বেশী দাম বাবা!"

বলরামবাবু হতাশভাবে কহিলেন, "নাঃ, এরেরও দেখছি আর শেষ হবে না।"

পিছন হইতে বৌদি ঠেলা দিলেন, "ও কি, ঐ জঙ্গলী মেয়েটাকে হাঁ করে কি দেখছো—গিলে ফেলবে না কি?"

চোখের উপর আবার তখন লাল-নীল কত বিচিত্র রঙের ফানুস ভাসিতেছে : সমকোণী ত্রিভুজের বিষমবাহুটিও যেন অস্পষ্ট রেখায় ঘুরে ঘুরে সরিয়া যাইতেছে।

বৌদি পুনঃ কহিলেন, "ওঁরা যে কখন থেকে তোমায় ডাকছেন, ছি, ছি যেখে ফেললে কি কেলেঙ্কারী বল তো। লিলি যে ওদিকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে॥"

লিলি অর্থাৎ অষ্টাদশীটি আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। মনে পড়িল, অধুনা আমার পছন্দের উপর লিলির অভিভাবকদিগের কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং বিলম্ব না করিয়া ভদ্রমহিলাদিগের যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পিছন ফিরিলাম। তাহার উপর আমার পছন্দের প্রতি লিলিরও যখন সজাগ দৃষ্টি আছে!

একসময় চাহিয়া দেখি, বলরামবাবু ঠেলা খাইয়া একেবারে কোণে সরিয়া গেছেন। তাঁহার ষোড়শী মেয়েটি তখনও তৈলাক্তমুখে নির্ব্বোধ দৃষ্টি মেলিয়া সামনে চাহিয়া আছে।

•

দেবী পক্ষে আগমন করিতেছেন : শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা।

বিরাট আয়োজন। বিপুল সমারোহ।

লুট! লুট!! তবাদ লুট!!!

বিলম্বে হুজুগ হইবেন।...

---

## ভারতবাসীর মিলন

...আমাদের কংগ্রেসের বয়স হইয়াছে উনপঞ্চাশ বৎসর। আমরা আমাদের গবর্ণমেণ্ট অথবা জগতের সামনে ভারতবাসীর অন্যায়ের জন্য নানারূপ নালীর কথা উপস্থিত করিয়াছি; কিন্তু আজ পর্য্যন্তও আমাদের দেশীয় ভাষায় সমস্ত ভারতবাসীর জাতিবাচক কোন একটি শব্দের বহুল প্রচলন হয় নাই। ইংরেজে ইংরাজ জাতি, জার্ম্মানীতে জার্ম্মান জাতি, ফ্রান্সে ফরাসী জাতি প্রভৃতি জাতিবাচক শব্দের যেরূপ প্রচলন আছে, ভারতবর্ষে ভারতবাসী জাতি—এইরূপ কোন শব্দের প্রচলন হয় নাই।

জাতীয়তার প্রধান উপকরণ 'মিলন'। 'ভারতবাসী জাতি' শব্দ সার্থক করিতে হইলে সমস্ত ভারতবাসীর পরস্পর পরস্পরের মিলনের চেষ্টা অপরিহার্য্য—এই অভাব সত্য আমাদের মনে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইলে প্রথমেই মিলন করিবার প্রয়োজন হয়, আমাদের 'মিলন' হয় না কেন, অথবা আমরা মিলনের অভাব দূর করিতে উদ্যোগী হই কেন।

সমস্ত দেশকে মিলিত করিয়া একটা জাতি গড়িবার চিন্তায় ও কর্ম্মে এমন কিছু থাকার প্রয়োজন, যাহাতে কেহ কোনরূপে আঘাতপ্রাপ্ত না হন এবং প্রত্যেকে পরিপূর্ণ অনুভব করেন। সংক্ষেপে তাহা এই :—(১) প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্ন-সংস্থানের চেষ্টা; (২) ভদ্রতার প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ দেওয়া এবং মিলনপন্থা আবিষ্কার; (৩) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এতদনুরূপ কথা...

## আধুনিক সমস্যার বিশ্লেষণ

—শ্রীনির্ম্মলকুমার ঘোষ

আধুনিককালে দেখা যাইতেছে, রাজনীতিক সমস্যা আর স্বতন্ত্র নহে এবং অধিকন্তু, এককও রহিতেছে না। অর্থনীতিক ঘটন-অঘটনের মধ্যেই রাজনীতিক সমস্যা জন্মলাভ করিতেছে। আপাততঃ কোনও সমস্যাকে যাহাতঃ নিছক রাজনীতিক বলিয়া প্রতীত হইলেও, সর্ব্বদাই উহা অর্থনীতিক আন্তর্জ্জাতিক সমস্যায় পরিণত হইয়া থাকে। বিগত পাঁচ শতাব্দীর পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করিলে উপরোক্ত মন্তব্যই সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে।

প্রকৃতপক্ষে, বিগত পাঁচ শতাব্দীকাল ব্যাপিয়া অর্থ-নীতিক সমস্যাসমূহই রাষ্ট্রসমূহের কর্ত্তৃপক্ষের প্রভূত চিন্তার কারণ ঘটাইয়াছে। বাষ্পীয় পোতের উদ্ভাবন ও বৈজ্ঞানিক নানাপ্রকার আবিষ্কারের ফলে সমস্যার জটিলতাসমূহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইল; এবং রাষ্ট্রকর্ত্তৃপক্ষকে হাত করিয়া এক এক দেশে একচেটিয়া বাণিজ্যের সনদ লাভ করিতে লাগিল। অন্য রাষ্ট্রের প্রতিযোগী ব্যবসায়ীকে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সমূলে বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় দেশের রাষ্ট্র-কর্ত্তৃপক্ষ, তথা সামরিক কর্ত্তৃপক্ষকেও, নিয়োজিত করিতে লাগিল। স্পেনীয় আর্ম্মাডাকে পরাভূত করিয়া সমুদ্রে বৃটেনের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া নেল্‌সন্ বৃটিশ জাতির নিকট পরমেশ্বর সদৃশ পূজা পাইতেছেন। এই নেল্‌সন্ আসলে বৃটিশ বণিকদেরই ইষ্টদেবতা। কারণ, বৃটেনের নিকট পরাজিত হইবার পূর্ব্বে স্পেনীয় অপরাজেয় নৌ-শক্তি কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়াই স্পেনীয় বাণিজ্যবহর পৃথিবীর সর্ব্বত্র চলাচল করিতে সমর্থ হইত। স্পেনীয় আর্ম্মাডার পতনের ফলে ঐ পরিরক্ষণের অবসান ঘটে; এবং বৃটিশ বাণিজ্যবহরও অবাধে ইতস্ততঃ চলাচল করিতে আরম্ভ করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্পেনকে নৌ যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বৃটিশ রাষ্ট্রশক্তি সাম্রাজ্যবিস্তার করে নাই, পরন্তু নিরঙ্কুশ বাণিজ্যবিস্তারের পথই করিয়া লইয়াছে।

এইরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিগত পাঁচশত বৎসর ধরিয়া বণিক্‌সমাজই পরোক্ষে রাষ্ট্র-শক্তি পরিচালনা করিয়া আসিতেছে।

আগেকার দিনে রাজা ও রাষ্ট্রনায়করা রাজ্যবিস্তার করিতেন নিছক সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য; অর্থনৈতিক লাভ-লোকসানটা তাঁহাদের সমর-নিপুণার মূলে বিশেষ ছায়া-পাত করিত না। চেঙ্গিজ খাঁ, তৈমুর লঙ্, হানিবল্, সিকান্দার প্রভৃতি সমরনায়করা দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন পৃথিবীর আধিপত্যে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই। সংস্কৃত কাব্য ও রাজপুরাণ দৃষ্টে প্রতিভাত হইবে, হিন্দু রাজারাও এক একটি বিশেষ সময়ে দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন; তাঁহাদের দেশবিজয়ের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল বৃহত্তর রাজ্যের নায়কত্ব করা। মুসলীম রাজত্বের সময়ও—যেমন আওরংজেবের কালে, কিম্বা পাঠানদের সময়ে, মোঘলদের ভোগলকের সময়ে—রাজ্য বিস্তার দুই কারণে হইত: নিছক রাজ্য বিস্তার এবং রাজ-আচরিত ধর্ম্মমতের বিস্তার। অশোকের রাজ্য বিস্তারের তিন উদ্দেশ্য ছিল: ধর্ম্ম, বাণিজ্য ও রাজ্যবিস্তার।

অবশ্য, রাজ্যবিস্তারের অবশ্যম্ভাবী ফলের প্রতি, অর্থাৎ রাজস্ববৃদ্ধির প্রতি দিগ্বিজয়ীদের দৃষ্টি পড়িত না, এমন নহে। কিন্তু তাহা গৌণ লক্ষ্য ছিল।

আধুনিক কালে, প্রজাসংখ্যার বৃদ্ধি হেতু, এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে দলগত স্বার্থসাধনোদ্দেশ্যে নিয়োজিত করার ফলে, জনসাধারণের দুর্দ্দশার কাল আরম্ভ হইয়াছে। অথচ,

ক্ষত্রিয় ও প্রাক্-ক্ষত্রিয় যুগের রাষ্ট্রনীতি পাঠে আমরা তৎকালে যে-সকল অনুষ্ঠানের পরিচয় পাই, বর্তমান কালে তাহার সামান্য অংশও কোন দেশে দেখিতে পাই না। বর্তমানকালে রাষ্ট্রিক কর্তৃত্বে বৈশ্যশক্তির প্রাধান্যের ফলে, এবং প্রজাসাধারণের মধ্যে বৈশ্যমনোভাবের প্রাদুর্ভাব হেতু রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আসিয়াছে।

বিগত পাঁচ শতাব্দী কাল হইতে, এবং বিশেষতঃ বাষ্পীয় পোতের আবিষ্কারের পর হইতে, পাশ্চাত্য বণিক্-সম্প্রদায় রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িল। পূর্বকালে ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ই পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র-শক্তির অধিনায়ক ছিলেন; ক্রমে রাষ্ট্রশক্তি ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধৃ-সম্প্রদায়ের হাতে গিয়া পড়ে। কিন্তু গত পাঁচ শতাব্দী কালের ইতিহাস অনুধাবন করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, রাষ্ট্রশক্তি সর্বদেশেই ক্ষত্রিয়দের হাত হইতে সরিয়া ক্রমশঃ বৈশ্য বা বণিক্ সম্প্রদায়ের হাতে গিয়া পড়িতেছে। ইয়োরোপীয় বৈশ্যশক্তিই, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রক্ষমতাকে আপনার ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থসাধনোদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিয়াছে। এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় বৃটিশ, পর্তুগীস, স্পেনীয়, ওলন্দাজ ও ফরাসী জাতি-সমূহের বণিকরা স্ব-স্ব দেশের রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য লাভ করিয়া পৃথিবীময় আপনাপন প্রভুত্ব ও প্রতিষ্ঠা বিস্তার করিতে অধিকতর সুযোগ সুবিধা পাইয়াছে। এই সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়া তাহারা স্বকীয় ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যকেও বাড়াইয়াছে অভূতপূর্ব প্রাচুর্যে। ফলে, এই ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য তাহাদিগকে, অর্থাৎ প্রত্যেক দেশের বৈশ্যসম্প্রদায়কে, অন্ততঃ পাশ্চাত্য দেশসমূহের বৈশ্যসম্প্রদায়কে, ক্রমশঃই রাষ্ট্রিক ক্ষমতাকে মুঠার ভিতরে পাইতে সাহায্য করিয়াছে। গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে এই বৈশ্যশ্রেষ্ঠীই সভাসমিতি ও আইনসভাগুলিতে নিজেদের স্বার্থানুযায়ী অনুরাগী মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা অধিকৃত করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির এবং বিদেশীয় অধিকৃত দেশ ও জাতি সমূহের ভাগ্য-নিয়ন্তা হইয়াছে।

শুধু যে ইংলণ্ডেই এইরূপ সম্ভবপর হইয়াছে তাহা নহে; পরন্তু, ফ্রান্স, ইতালী, স্পেন, পর্তুগাল, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম্ এবং জার্মানীতেও বৈশ্যশ্রেষ্ঠীই রাষ্ট্রের পরোক্ষ কর্ণধার হইয়াছে। ব্রাহ্মণসম্প্রদায় যখন রাষ্ট্রের নিয়ামক ছিলেন, তখন তাঁহাদের স্বাভাবিক জ্ঞান ও বুদ্ধির ফলে দেশ-শাসন ও প্রজাপালনের ব্যবস্থা কতকগুলি কল্যাণকর নিয়ম-আদর্শেই পরিচালিত হইত। ক্ষত্রিয়দের হাতে যখন রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব আসে, তখন যদিও প্রাচীন রীতি-নীতির অনেকাংশই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি ভূমির স্বাভাবিক উৎপাদনী-ক্ষমতা যথেষ্ট হ্রাস না পাওয়াতে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য তখনকার কাল অবধি যথেষ্ট প্রতিযোগিতা-সঙ্কুল না হওয়াতে, দেশের—তথা পৃথিবীর—অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এবং ব্রাহ্মণ্য রীতি-নীতি তখন অবধি অনেকটা অবিকল প্রচলিত থাকাতে জনসাধারণ এবং শাসক-পালক-সম্প্রদায় সামান্যই চরিত্রহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু বৈশ্যশক্তির আবির্ভাবের কাল হইতেই পৃথিবীর অবস্থাও অবনত হইতে থাকে। রাষ্ট্র-কর্তৃপক্ষ আর শাসক-পালক রহিল না, তাহারা শাসক-শোষক শ্রেণীতে পর্যবসিত হইল এবং স্বদেশের সাধারণ মঙ্গল সাধন অপেক্ষা তাহারা আত্মমঙ্গল সাধনেই অধিকতর তৎপর রহিল। বৈদেশিক বাণিজ্যে একাধিপত্য অর্জনের জন্য তাহারা নানারূপ অনাচারী উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল। নিজ দেশীয় প্রতিযোগী বণিক্‌দিগকে বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে হটাইয়া দিবার জন্য বাণিজ্য-ক্ষেত্রের রাষ্ট্রিক আধিপত্য অর্জনে মনোনিবেশ করিল। অপরদেশের কথা ঘুরে থাকুক, আমাদের নিজদেশে খৃষ্টীয় বণিক্‌জাতিসমূহের সাম্রাজ্যপত্তনের ইতিহাস যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারাই উপরোক্ত বাক্যের অর্থ অনুধাবন করিতে পারিবেন। মগ-পর্তুগীজ 'দস্যু'দিগের বিরুদ্ধে 'সুশাসন' ফরাসী ও ইংরেজ বণিকরা বাংলার এবং দিল্লীর তদানীন্তন নবাবদের নিকট অজস্র অভিযোগ উত্থাপন করিয়া 'আত্ম-রক্ষার' নিমিত্ত 'সামান্য' অস্ত্রশস্ত্র ও সেনাবাহিনী রাখিবার প্রস্তাব করিতেন; এবং নানারূপ উপায়ে নবাবদের এবং প্রতিপত্তিশালী রাজকর্মচারীদের বিশ্বাস এবং অনুকম্পা অর্জন করিয়া জমির মালিকানা লাভ করিতেন।

চীন, মিশর, আফ্রিকা, শ্যাম, কাম্বোজ, ভারত, বলি,—সর্বত্রই ঐ একই পন্থা, একই পরিণতি। "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ড রূপে।"

কিন্তু এই বৈশ্যমনোবৃত্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের সর্বাপেক্ষা বড় অভিযোগ এই জন্য যে,

রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় বৈশ্য-নীতি প্রচলনের ফলে পৃথিবীতে অনাচার, চরিত্রহীনতা, অস্বাস্থ্য প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব যত হইয়াছে,—কস্মিন্‌কালেও পৃথিবীতে সেইরূপ হয় নাই। তদুপরি, বৈজ্ঞানিক নানাপ্রকার আবিষ্কার ও উদ্ভাবন,—যাহা মনুষ্য-জাতির সভ্যতার উপকারে লাগানো যাইত, সেইগুলিকে মনুষ্যহত্যার ও মনুষ্যবহত্যার উপায়স্বরূপ নিয়োজিত করা হইতেছে। ফলে, পৃথিবীময় ঘোর অরাজক ও বিশৃঙ্খল ভাব দেখা দিয়াছে।

আধুনিক পৃথিবীর ব্যবহারিক দিকটার যথার্থ মূল্য বুঝিতে হইলে, গত পাঁচশত বৎসরের ইতিহাস আমাদিগকে জানিতে হইবে। বৈশ্যশক্তির আবির্ভাব এবং প্রতিপত্তি-প্রসার এই পাঁচ শতাব্দীকাল ধরিয়াই হইয়াছে। বিভ্রান্ত না হইলে এখন সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্তমান পার্থিব ব্যবস্থা মানুষের স্বাভাবিক জীবনে অকল্যাণকর হইয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা পৃথিবীতে কতকাল ধরিয়া প্রচলিত ছিল, আজ তাহা জানিবার উপায় নাই। অন্যূন তিন হাজার বৎসর পূর্বে তাহার সমাপ্তি ঘটিয়াছে। তাহার পর আসিয়াছিল ক্ষাত্র-সভ্যতা; তাহাও প্রায় আড়াই হাজার বৎসর বলবৎ থাকিয়া সমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু নিজস্ব দুর্বলতার জন্যই, বৈশ্য-সভ্যতা মাত্র পাঁচশত বৎসরের মধ্যেই লোপ পাইতে বসিয়াছে। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের চিন্তাশীল নরনারীই এই সভ্যতাধ্বংসের ভাবিবত্তা সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত এবং সজাগ রহিয়াছেন। অন্যান্য সভ্যতার সমাপ্তি যেমন অনেকটা নিঃশব্দেই ঘটিয়াছিল, বৃহত্তর জনসাধারণের দীর্ঘকালস্থায়ী ক্ষতিসাধন করিয়া সেগুলির সমাপ্তি ঘটে নাই, বর্তমান সভ্যতা অর্থাৎ বৈশ্য-সভ্যতার ধ্বংস কিন্তু তেমন সহজ ও স্বাভাবিক হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। আশঙ্কা হইতেছে, স্বকীয় বিনাশের সঙ্গে ইহা সমগ্র মনুষ্যজাতিকেও ধ্বংস করিয়া দিবে।

এই আশঙ্কা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাসপ্রবণ হইয়াই বিভিন্ন দেশের একাধিক চিন্তাশীল ব্যক্তি ইহার প্রতিকার চিন্তা করিয়া আসিতেছেন। শত বর্ষ পূর্বে কার্ল্ মার্ক্স্ ও ফ্রীডরিশ্ এঙ্গেল্স্ নামক দুই জার্মান ভদ্রলোক বর্তমান পৃথিবীব্যাপী অনাচার ইত্যাদির প্রতিকার স্বরূপ রাষ্ট্রে শূদ্র-শক্তির প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়াছেন। ইঁহাদের কর্মপদ্ধতি লইয়া লেনিন-প্রমুখ বিপ্লববাদীরা রাশিয়ার রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করিয়া পরীক্ষা চালাইতে লাগিলেন। ইঁহাদের ধারণা এই যে, ব্রাহ্মণ্য-শক্তিই হৌক বা ক্ষাত্রশক্তিই হৌক, সকলেই রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সৃষ্টিমূলে বিশেষ এক সামাজিক শ্রেণীরই প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহাতে বৃহত্তম জনগণের প্রকৃত কল্যাণসাধনের উদ্যোগ বা উৎসাহ ছিল না। এবং লোক-সংখ্যার স্বল্পতা-হেতু পৃথিবীতে অন্নকষ্ট বা আনুষঙ্গিক নানাবিধ উপসর্গও পূর্বকালে বিশেষ ছিল না। আধুনিক কালে নানাবিধ কারণে মানুষের জীবনযাত্রা-নির্বাহে প্রচুর জটিলতা দেখা দিয়াছে, যাহার সম্ভাবনা পূর্বকালের রাষ্ট্র-নিয়ামকদের আসিতে হয় নাই। তদুপরি ইঁহারা মনে করিতেন, যেহেতু প্রাচীনকালের অনুসৃত নীতিগুলি আজন্ম দুর্বলতার ফলেই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, এবং ক্রমেই অধিকতর অনাচারী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সম্ভবপর করিয়াছে, এবং বৃহত্তম জনগণও ক্রমশঃই অধিকতর দুর্দশায় পতিত হইয়াছে, সেই হেতু পুরাতন ব্যবস্থা গুলির কোনটিই অবিকল—এমন কি আধুনিককালের প্রয়োজনানুযায়ী করিয়া সংস্কৃত বা রূপান্তর করিয়াও—গ্রহণ করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। তাঁহারা যে নূতন জীবন-প্রণালী রচনা করিলেন, তাহাই বর্তমান কালে কম্যুনিজ্‌ম্ বা সাম্যবাদ নামে লোক-পরিচিতি পাইয়াছে।

সুতরাং বর্তমানকালে আমরা পৃথিবী ব্যাপিয়া কয়েকটি পৃথক্ এবং পরস্পর-বিরোধী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রিক মতবাদ লক্ষ্য করিতেছি। আধুনিক কালের সমস্যাগুলি সর্বথাই এই সব বিভিন্ন রাষ্ট্র—তথা সমাজ-ব্যবস্থা—হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

পূর্বেই আমরা বিনষ্ট ব্রাহ্মণ্য এবং ক্ষাত্র ব্যবস্থার কথা বলিয়াছি। ব্রাহ্মণ্য বা ক্ষাত্র ব্যবস্থা 'বিনষ্ট' বা সমাপ্ত হইয়াছে বলিলেই যে একেবারেই তাহারা পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। একটি ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া অন্য ব্যবস্থার পত্তন ঘটিতে কাল-সম্ভাবনা দরকার। পুরাতন ব্যবস্থার আধিপত্য কমিয়া গেলেও নিঃশেষিত হইয়া যায় না; নানা অবস্থা-বৈগুণ্যের মধ্য দিয়া তাহা আপনাকে টিঁকাইয়া রাখিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা খ্রীষ্টীয় পোপ,

আগ্রা ও, দক্ষিণ ভারতের শহর মাঠ এবং পুরীর জগন্নাথ মন্দির, এবং হিন্দুস্তের সামান্য উল্লেখ করিতে পারি। এক-কালে ইহারা দেশের শাসন-পালন ব্যবস্থার সর্ব্বনিয়ামক ছিলেন, ক্ষাত্র-শক্তির অভ্যুদয়ের ফলে ইঁহাদের পতন ঘটে; কিন্তু বর্ত্তমানকাল অবধি তো ইঁহারা টিঁকিয়াও আছে! ক্ষাত্র-শক্তিও বৈশ্য-প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; তথাপি, বিদেশের কথা ছাড়িয়া দিই, আমাদের দেশেও সামন্তপ্রথা (বা feudalism) অন্তর্হিত, যে অবস্থায়ই হৌক, রহিয়াছে তো! বর্ত্তমানকালে, বৈশ্য-শক্তির চরম পতনের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। সুতরাং তাহাকেও বাঁচিয়া থাকিবার জন্য চরম প্রয়াস করিতে হইবে। অতএব, আমরা একই সময়ে, ব্রাহ্মণ্য, ক্ষাত্র ও বৈশ্যশক্তির আপনাপন অস্তিত্ব রক্ষার চরম প্রয়াস লক্ষ্য করিতেছি। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে, আবার কোথাও বা সমবেত ভাবে, আমরা ক্ষাত্র-বৈশ্য, ক্ষাত্র-ব্রাহ্মণ্য, এই ভাবে যুক্ত হইয়া আত্মরক্ষা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলিতেছে। বৃটিশ ও ফরাসীদের বহু-নিন্দিত ডিমোক্রেসী বা গণতন্ত্র আসলে বৈশ্য-প্রতিষ্ঠারই চরম নিদর্শন। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে যে Bill of Rights বা অধিকার-নির্দ্দেশের আইন পাশ হইয়াছিল তাহা এবং Habeas Corpus বা ব্যক্তি-মর্য্যাদার আইন আদতে বৈশ্য-শক্তিরই অভ্যুদয়কালের কাহিনী। রাষ্ট্র-শক্তিতে তদানীন্তন প্রধান কর্ত্তৃত্ব করিত রাজা অর্থাৎ ক্ষাত্রশক্তি; উপরোক্ত দুই আইনের ফলে রাজার ক্ষমতা-সঙ্কোচ সাধন করা হয়। বর্ত্তমানকালে ডিমোক্রেসীর 'বিরুদ্ধে' নাৎসী ও ফাশীবাদের শিরোত্তোলন সম্পর্কে অনেকেরই পরিষ্কার ধারণা নাই। নাৎসীবাদ ও ফাশীবাদ আসলে ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্র-শক্তির সঙ্গে রফা না করিয়া আপনার দেশবাসীর মধ্যে বৈশ্য-মনোভাবের প্রবাহ আনিয়া দেশান্তরের সম্পর্কে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেই, এবং পরোক্ষে ছদ্মবেশে সঞ্চিত বিক্রমের ফলে আত্মপ্রাধান্য নিরঙ্কুশ রাখিতেই, স্থিরসঙ্কল্প।

বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেকটি ক্ষমতাই নব-অভ্যুদিত এবং সম্ভাবিত-অভ্যুদয় শূদ্র-শক্তি সম্বন্ধে সচেতন। মার্কস্-লেনিন-মণ্ডলীর প্রকাশ্য ঘোষণাই এই যে, নির্ব্বিচারে প্রাচীন রীতি-নীতি, এমন কি মানবতার ও মনুষ্যত্ববোধের আদর্শও ত্যাগ করিয়া, প্রয়োজন হইলে ধ্বংস করিয়া, নূতন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন করিতে হইবে। জীবনাদর্শের কতকগুলি মূল-নীতি সম্পর্কেও ইহারা অমনযোগ মনোভাব পোষণ করিয়া থাকে। রাশিয়াতে এই নব-ব্যবস্থার পরীক্ষা চলিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই ব্যবস্থার প্রচলন করিবার উদ্দেশ্যে একদল বিপ্লবী নরনারী তদুপযোগী কার্য্য করিতেছে।

মার্কস্-লেনিন-পরিকল্পিত রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার কতকগুলি হিতকারী দিকের জন্য, এবং রাশিয়াতে এই ব্যবস্থার আংশিক সাফল্য আপামর জনগণের পক্ষে অত্যন্ত হিতকারী হওয়ার ফলে, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই মার্কস্-লেনিনের অনুরাগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

কি ডিমোক্রেসীবাদী কি ফাশীবাদী,—সকলেই, যেমন একদিকে আত্মপ্রতিষ্ঠা রক্ষার্থে বা পুনরর্জ্জনের অভিপ্রায়ে চরম প্রয়াস করিতেছে, তেমনি আবার অন্যদিকে ইহারা প্রত্যেকেই সাধারণ শত্রু শূদ্র-শক্তির প্রতিষ্ঠার বিরোধী।

পূর্ব্বোক্ত বক্তব্যসমূহ হইতে ইহাই প্রতিভাত হইবে যে, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রিক কর্ণধারগণ, কি ক্ষাত্র-শক্তি, কি বৈশ্য-শক্তি, কোথাও একক, কোথাও বা পরস্পর যুক্ত হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা রক্ষার্থে প্রয়াস পাইতেছেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনীতিক ও কূটনীতিক আলোচনা ও কার্য্যকারণ এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি সমূহের মূল কারণও ঐ সকল আলোচনা ও কার্য্যকারণের ফল।

একথা ভুলিলে চলিবে না যে, ব্রাহ্মণ্য, ক্ষাত্র বা বৈশ্য শক্তিসমূহ পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত মনোভাব পোষণ করে না। স্বার্থ সম্বন্ধে সদাজাগ্রত বৈশ্যশক্তিও বিভিন্ন দেশে বন্ধুত্বপূর্ণ নহে। ইংলণ্ডের বা জাপানের ক্ষাত্র ও বৈশ্যশক্তি জার্ম্মানী বা ইতালীর বৈশ্যশক্তিকে বিশ্বাস করে না। জার্ম্মানীর বৈশ্যশক্তি যে ইতালীর বৈশ্যশক্তির সমর্থন পাইয়াছে তাহা আত্মরক্ষার সমতার ফলেই, অন্য কোন প্রকার নীতিবোধকে আশ্রয় করিয়া সেই বন্ধুত্ব সঞ্জাত হয় নাই। পরস্পরের প্রতি সন্দিহান হইয়া ইহারা একমাত্র আত্মরক্ষার নিমিত্তই পরস্পরের সখ্য অর্জ্জন করে। যদি এই সখ্য সত্যকার প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে ইহা এত অপভঙ্গুর হইত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা উদাহরণ দিই :

খুব বেশী দিনের কথা নয়; মুসোলিনী জার্মানীর ক্রম-বর্দ্ধমান নাৎসীশক্তির ভয়ে ব্রেনার গিরিবর্ত্মে (অষ্ট্রীয়া-ইতালীর সীমান্তের গিরিপথে) অষ্টম সৈন্য স্থাপনা করিয়াছিলেন। সেই সময়কার সংবাদপত্র যাঁহারা পাঠ করিতেন, তাঁহারা যে কোনও মুহূর্ত্তে জার্মানী-ইতালীর মধ্যে যুদ্ধ ঘটিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তাহার পর ছয় মাস যাইতে না যাইতেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।

আর একটি ঘটনা বলি: ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস অবধি বৃটেনের রাষ্ট্রনায়কেরা নাৎসীদের সঙ্গে পরম সৌহার্দ্য-প্রয়াস করিয়াছিলেন; এবং তাহার জন্য বিপুল অর্থও ব্যয় করিয়াছিলেন। আশা ছিল, নাৎসীরা বৃটেনের এই সখ্য ও অর্থের প্রতিদানে রাশিয়ার কম্যুনিষ্টদের ঠেকাইয়া আসিবে।...এক বৎসরও ঘুরিল না, বৃটেনের রাষ্ট্রিক প্রতিনিধির মারফৎ বৃটিশ মন্ত্রিসভা রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র-কর্ত্তাদের স্নেহেরবাণী পাইবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিয়া-ছিলেন, এবং আদাজল খাইয়া এখনও লাগিয়া রহিয়াছেন।

রাশিয়ার কম্যুনিষ্টরা আন্তর্জ্জাতিক এই রাজনীতিক ঘটন-অঘটন সম্পর্কে সজাগ। তাহারাও আত্মরক্ষার্থে এবং এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে লিখিত শূদ্রশক্তির অস্তিত্ব রক্ষার্থে নাৎসীদের সঙ্গে অনাক্রমণ (সখ্যও বলা যাইতে পারে) চুক্তি করিয়াছে। কি করিয়া এবং কেন ইহা ঘটিতে পারিয়াছে তাহার কারণনির্দ্দেশ আমরা গত আশ্বিন সংখ্যায় করিয়াছিলাম। রাশিয়ার পক্ষে এই চুক্তি যতটা সহজ হইয়াছে, নাৎসীদের পক্ষে ততটা সহজ (natural) হয় নাই। ক্ষাত্র ও ব্রাহ্মণ্য শক্তির আমূল ধ্বংস সাধন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া নাৎসী বৈশ্যশক্তি—যে শত্রু 'গোকুলে বাড়িতেছে' সেই কম্যুনিষ্টদের সঙ্গেই—সখ্য করিল; এবং দেখিল না যে তাহার ফলে সত্যকার শত্রুকে 'গোকুলে বাড়িবার' অধিকতর সুযোগ দেওয়া হইল।

•

আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, উপরোক্ত কারণেই খণ্ড খণ্ড করিয়া বুঝিবার সুযোগ নাই। আজ দক্ষিণ আমেরিকা, কাল ইন্দোচীন, পরশু প্রশান্ত মহাসাগর,—সমস্যাগুলি অকস্মাৎ কেন যে এমন ভাবে এমন সব জায়গায় আত্মপ্রকাশ করে, তাহা জানিতে হইলে সমস্যা গুলিকে আরও গোড়া ধরিয়া বুঝিতে হয়। প্রতিদিনের সংবাদ তো শুধু ঘটনার প্রবাহ। প্রবাহ দেখিয়া তো তাহার কারণ-নির্দ্দেশ করা যায় না।

পূর্ব্বোল্লিখিত বিভিন্ন শ্রেণীগুলির মধ্যকার দ্বন্দ্ব, অচিরেই মিটিবে বলিয়া যাহারা আশান্বিত, তাঁহারা মিথ্যা আশা পোষণ করিতেছেন। পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ্যশক্তির পতনের পর হইতে অদ্যাবধি এমন কোনও মহৎ চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্ম হয় নাই, যাঁহার পরিকল্পিত রাষ্ট্র-সমাজ-ব্যবস্থা পূর্ব্বকালের তুলনায় অধিকতর সুফল দিয়াছে। মার্ক্স-পরিকল্পিত ব্যবস্থা এখনও পরীক্ষাধীন; হয় তো তাহা জনগণের কল্যাণ দিতে সক্ষম হইবে; কিন্তু যে-সব মানব-অবদানকে জলাঞ্জলি দিয়া তাহা সম্ভাবিত হইবে, তাহাদের অভাবে মানুষ সত্যই উন্নত হইবে, না অবনত হইবে, তাহা কে বলিয়া দিবে? কে বলিয়া দিবে মহামানবের প্রকৃত কল্যাণ কোন্ পথে?

বহুতর পার্থিব ক্ষমতা আয়ত্তাধীনে আনিয়া পৃথিবীর ক্ষাত্র-বৈশ্য-শক্তি আজ মহাসমরে অবতীর্ণ হইয়াছে। একের নিধন ব্যতীত এই সমর থামিবার নহে। হয় তো সাময়িক সন্ধির ফলে যুদ্ধ-বিরতি ঘটিবে, কিন্তু সমস্যা সেখানেই শেষ হইবে না। বর্ত্তমান যুদ্ধ, বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী অধিক-ক্ষমতাশালী শক্তিসমূহের বাঁচিয়া থাকিবার যুদ্ধ। এককালে পৃথিবীতে অতিকায় জানোয়ারেরা আত্মরক্ষার জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে; তাহার পরে পৃথিবীতে আসিয়াছে তাহাদের তুলনায় মহত্তর এক জাতি—মানুষ। বর্ত্তমান কালে আবার সেইরূপ প্রলয়ঙ্কর এক মহাসমর বাধিয়াছে, মানুষে মানুষে; এই মহাসমরের ফলে কি এমন কোন নূতন জীবের দেখা মিলিবে—মনুষ্যোত্তর কোন মহত্তর জীব, পৃথিবীর সম্পদ্ ও ঐশ্বর্য্যকে যাহারা নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে পারিবে?

# মুখরা

—শ্রীসুকৃতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমার পরিবার মানুষটি চিরকাল একটু শুচিবাইগ্রস্তা। মেজাজটাও ঠিক মিলিটারী ধরণের। সে হিসাবে তার স্বামী ভদ্রলোক অত্যন্ত ঠাণ্ডা এবং নম্র প্রকৃতির। অবশ্য তার কাছে যেন এ-কথা বলিবেন না। বলিলেই শুনিতে হইবে:

"হাঁ, তুমি যে কত ভাল মানুষ তা' আমার জানতে বাকী নেই। সে ক' বছরেই বুঝেছি।"

জবাবটা তার বরাবরই এমনি। অতএব তৈরারীই ছিলাম। আঠার বছর বয়সে পালাইয়া আসি এই এটোয়াতে। বারো বছর কাটিয়া গেল এখানে একই ভাবে। মাঝখানে, পিতামাতার পিণ্ডদানের অধিকার সৃষ্টি করিবার জন্য একবার দেশে গিয়াছিলাম। তৌর্থা ব্রত ভঙ্গ করিয়া চলিয়া আসি। ছুটিও ফুরাইয়া আসিয়াছিল। মাসে এক আধবার যাতায়াত, মাসে দু'খানা করিয়া চিঠি দিয়াই এক রকম ছিলাম ভাল।

মাঝে মাঝে রাধারাণীকে আনিবার কথা উঠিয়াছে, শেষ অবধি অনেক ভাবিয়া আর আনি নাই। কিন্তু এবার আর না আনিলেই নয়। বন্ধুরা সবাই এক সুর ধরিয়াছেন:

"গজেনবাবু, দু'দিন বৌদির হাতে খান দেখি। ও-সব রোগ-টোগ সব উবে যাবে। ঘরখানাতেও একটা লক্ষ্মীর ছিরি আসবে।"

লক্ষ্মীছাড়া মানুষ আমি, লক্ষ্মীর ছায়ার জন্য আমার তেমন আগ্রহ নেই। কাজেই কথাটা এক রকম প্রায় উড়াইয়া দিলাম। বলিলাম, "দাদা, সাইকোলজির একটু আধটু আমিও বুঝি। আমার উপর এত দরদ কেন, তা'কি আর বুঝি নে?"

"ছিঃ, যা' তা' বলবেন না গজেন বাবু, শাস্ত্রেই আছে, পরস্ত্রী মাতৃবৎ..."

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তোমাদের ঘোরাঘুরি আর নীরদ দেওয়ার ঠেলাতেই হরকিষণবাবু একেবারে পাড়া ছেড়ে দিলেন। কি বল?"

এ সমস্ত কথার নিষ্পত্তি কোন দিন হয় না, আজও হইল না। তাঁহারা ছোটখাটো একটা উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলে ভাবিতে লাগিলাম, সামান্য সুখের জন্য আনিব কিন্তু রাধারাণীর উপদ্রবটা বড় কম হইবে না।

এ দেশের হাবভাব সে কিছুই বোঝে না। তার উপর চিরদিন একা-থাকিয়া থাকিয়া স্বভাবটা আমার অন্য রকম দাঁড়াইয়াছে। আনিব, কি আনিব না,—এই প্রশ্নটা মাথার ভিতরে বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। ভাবিলাম, না, এই বেশ আছি। থাক গে।

কিন্তু প্রতিবেশী প্যারেলালবাবু যখন একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষীর মত বলিলেন, "গজন্ বাবু, সাদি কিয়া কিসুকে লিয়ে? বাঙ্গলা মুল্লুক মে বেচারী রহ তা হায়, কৌন্ দিন কেয়া শুনিয়ে গা। আপনে পাস লিয়াকর রাখিয়ে। খানা-পিনা-শোনা, সবমে সুবিস্তা হোগা। সমঝা।"

তখন আর ঠেলিতে পারিলাম না। পনের দিনের ফড়ারে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু, ভাবনা কিছুতেই গেল না। কি করিয়া কি যে হইবে!

•

বাঙলা দেশের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া গাড়ী বিহারের একটা ছোট রেলওয়ে ষ্টেশনে লাগিল। রাধারাণী এক বছরের ছেলেটিকে হাঁটুর উপর রাখিয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। কথা বলিবার জন্য মনটা উশখুশ করিতেছিল। বলিলাম, "শ্রীমতীর এর আগে এ-দিকে কোন্ পর্যন্ত আসা হয়েছে, শুনতে পারি?"

জবাব আসিল, "বছর দশেক আগে একবার শেওড়াফুলি এসেছিলাম। দাদামশায়ের একজন কোয়রেজ বন্ধু ছিলেন, তাঁর মেয়ের বিয়েতে।"

কাশী না, দিল্লী নয়, একেবারে শেওড়াফুলি। মনে মনে না হাসিয়া পারিলাম না।

পরিহাস-তরল সুরে কহিলাম, "তবে তো অনেক দূর এসেছ দেখছি। তা' হোলে পশ্চিম ভারতটাই তোমার শেষ হয়ে গেছে, কি বল?"

বেকার

"মিটা ক'রছো?" বলিয়া রাধারাণী ঘুরিয়া বসিয়া ঠোঁট উলটাইয়া কহিল, "এই তো সবে কলির সন্ধ্যে, এখন থেকেই পেছনে লাগা? এ আমি জানতাম!"

"তুমি জানতে? কি?"

"কপালে আমার অনেক দুঃখ আছে।"

বলিলাম, "তা একটু আছে। এ ভদ্রলোকের হাতে যখন পড়েছ তখন কী সহজেই মুক্তি পাবে?"

রাধারাণী তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিল, "হাঁ, ভদ্রলোক যে কত তা' আর আমার জানতে বাকী নেই। তাই বিয়ে ক'রে ফেলে রাখলে বাপের বাড়িতে, পাছে কিছু খরচ হয় আমার জন্যে, কেমন? হাড় বেরুল কোথাকার। ক'খানা চিঠি দিয়েছ? ক'বার গেছ শুনি? সেবার খোকার অন্নপ্রাশনের সময় মাথার দিব্যি দিয়ে যেতে লিখলাম, বাবুর যাওয়া হ'ল না। কি, না ছুটি মিলে না। হাঁ, মিলে না বৈ কি! যারা ছেলের অন্নপ্রাশনে, বাপের শ্রাদ্ধে, বৌ-এর অসুখে ছুটি দেয় না, তাদের কাছে চাকরিই বা করা কেন? তোমাদের আপিসের সাহেবদের ও সব পাট নেই বুঝি?"

রাধারাণী আমার পানে চাহিয়া গালে হাত দিয়া কহিয়া উঠিল, "ও, মা! কি ঘেন্নার কথা গো! ছিঃ! ও সব লোকের কাছে আবার কাজ করে?"

হাসিয়া বলিলাম, "এবার কাজ ছেড়ে দেব।"

রাধারাণী চমকিয়া উঠিল, কহিল, "সে কি গো, চাকরি ছাড়বে কেন? তা হ'লে উপায়?"

"উপায় আছে। এবার কিছুদিন তোমার কাছে কাজ ক'রবো। সারাদিন তোমার পাশে পাশে থাকব, তোমার হুকুম খাটবো। চাকরি-বাকরি আর ভাল লাগছে না ছাই। এবার দিনকতক কবিত্ব ক'রতে ইচ্ছে হ'চ্ছে। তুমি কি বল?"

রাধারাণী ঘুরিয়া বসিয়া বক্রকটাক্ষে কহিল, "আমিথো তা দেখে বাঁচি নে আমি। দিন দিন যেন ছেলেমানুষ হ'চ্ছেন। সব বয়াতে করায়, তোমার দোষ দেব কি, বল? সব আমার বরাত—"

কথাটা এর বেশী আর গড়াইল না। চট করিয়া পা' দুটা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, "ও সব বক্তিমে এখন রেখে শুয়ে পড় দেখি, নইলে সারা পথটাই এমনি ব'সে যেতে হবে।"

তথাস্তু। ইতিমধ্যে পাশে আসিয়া বসিয়াছিল একটি হিন্দুস্থানী মেয়ে কখন মুড়ি দিয়া। রাধারাণী তার পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "মাগীর গায়ে কি গন্ধ, বাপ্ রে! এই, দেখতে পাচ্ছ নেহি, আমি এখানে শুয়ে আছি। একেবারে গায়ের উপর চড়ে বসলি যে বড়? আ-মর! হট্ যোস্।"

রাধারাণীর ভাষা তাহার নিকট বোধগম্য না হওয়াতে আমাকেই বলিতে হইল, "মাজী খুব খারাব বিমারি হ্যায়। হুঁয়াসে হট্ কে বৈঠো।"

মেয়েটি চট করিয়া সরিয়া গেল। এবং তার মুখ দিয়া অস্ফুটস্বরে বাহির হইয়া আসিল, "আরে মরি যাইয়া রে!"

রাধারাণীর পানে চাহিতেই দেখি, সে মেয়েটির হাবভাব দেখিয়া হাসিতেছে। এবং চোখাচোখি হইলেই গম্ভীর হইয়া কাতরাইতেছে: "ওরে বাবা রে···"

অবশেষে নির্বিঘ্নে আসিয়া এটোয়াতে পৌঁছাইলাম। নতুন জায়গা। নতুন ঘর-দোর—সব বুঝাইয়া দিয়া কহিলাম, "এটা বিদেশ বিভুঁই—পাখার মত চেঁচিয়ো না,—আর যখন-তখন দোর খুলে যেন হাঁ ক'রে চেয়ে থেক না। সামনের বাড়িতে প্যারেলালবাবু থাকেন। কোন দিন তোমায় দেখলে কবিতা লিখতে শুরু ক'রবেন আবার। কবি মানুষ। এটা জাওড়াকুলিও নয়, বস্তিবাটিও নয়, বুঝেছ? এটা এটোয়া আর পাড়াটার নাম কি জান তো? দখিয়াসরাই।"

রাধারাণী জবাব দিল, "জানি। অত ক'রে আমাকে বোঝাতে হবে না। এক ছেলের মা আমি, কচি খুকিটি নই। আমি সব বুঝি, আমি আসাতে তোমার যে খুব অসুবিধে হ'চ্ছে তা' বুঝতে পেরেছি। বিয়ে ক'রে দাও না, এখুনি চলে যাচ্ছি। আমি এ-সব দেখতে পারবো না। ওখানে ওগুলো কি? ও' মা, এ যে মুরগীর ডিম, হ্যাঁ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ, তুমি বাবুদের ছেলে না?"

"তোমার কী মনে হয়?"

"আমার মনে আবার কি হবে। আমি এ জেনেই বসেছিলাম। কি ঘেন্নার কথা! এই অবেলায়ই যাই আবার চান করি গে। পোড়া কপাল যখন নিয়ে এসেছি, ভুগতে হবে তো?"

বলিতে বলিতে রাধারাণী কলঘরের দোরে যাইয়া খোঁপা হইতে কিতে-কাঁটা খুলিতে লাগিল।

শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলাম, "অবেলায় চান ক'রলে অসুখ ক'রবে। চুল শুকোবে না। এখানকার জল-হাওয়া তোমার এখনও সহ্য হয় নি। শুচিতা রাখতে গিয়ে যেন আমাকে চিতায় তোলবার ব্যবস্থা ক'রো না। এই তিন সত্যি করছি, আনবো না, আনবো না, আনবো না, আর কখনও না। বাবা! কি সাংঘাতিক লোক তুমি!"

রাধারাণী সে-কথার কর্ণপাতও করিল না। ঘণ্টাখানেক ধরিয়া জলের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করিয়া যখন বাহির হইয়া আসিল দেখি, পায়ের আঙুলের ফাঁকগুলো তার সাদা হইয়া গিয়াছে, হাজায় ভর্ত্তি। নেহাৎ বিরক্তভাবে চলিয়া আসিতেছিলাম। ডাকিল, "শুনছো?"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, "আদেশ হউক মহারাণীর।"

"মরি, কথার কি ছিরি রে! কি এমন রাজ-সিংহাসনে বসিয়ে রেখেছেন! কেবল কথাই শিখেছ! কাজের বেলা এই অষ্টরম্ভা। আজ ক'দিন থেকে যে একটা চাকর এনে দেবার কথা বলছি, সে কথা কাণে যাচ্ছে না, না? একলা মানুষ সারাদিন থাকতে গা কেমন ছম্‌ছম্ করে।"

বলিলাম, "লাইনের ধারে একটা বাড়ী খালি আছে, কাল দেখে আসবো।"

"হ্যাঁ, তা দেখে আসতে না। উঠানটাতে দুটো কচু-গাছ পুতেছি। এখনই তো বাড়ী ছাড়ার তোমার যত দরকার পড়ল কি না। তবু একটা চাকর এনে দেবে না।"

"তবে তাটা কিসের শুনি? ভূতের না প্রেতের?"

"তারা তবু ভাল। কিন্তু তোমার ঐ প্যারেলালবাবু তাদের চেয়েও ওস্তর। যে রকম হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে, যেন গিলতে আসছে। হ্যাঁ গা লোকটা বুঝি বে'থা করে নি? নিশ্চয় কিছু নেশা-টেশা করে বাপু। বেরুচ্ছো না কি? একটা চাকর যদি না নিয়ে এস দেখবে তখন। তাই ব'লে যেন, বুড়ো-ধাড়ী দেখে এনো না।"

হাসিয়া বলিলাম "না না, আমি তো বুড়ো আনবো কেন? ছোঁড়া দেখেই আনবো নইলে···!

রাধারাণী ক্যাঁকিয়া উঠিল, "কি ইতরের মত যা-না তাই বলছো! তা' তোমারই বা দোষ দেব কি, পুরুষ মানুষ জাতটাই অমনি।"

বলিতে বলিতে রাধারাণী কপাটে ভেজাইয়া দিল।

না একটা চাকর না আনিয়া দিলেই নয়। বিপদ আপদ আছে। খোকাটাও আবার দুরন্ত, তাকে দেখিবার জন্যও একজন লোক অন্ততঃ দরকার। কাছেই একটা মাড়োয়ারি মুদির দোকান ছিল। তাকে বলা ছিল। সে অনেক কষ্টে একটা চাকর যোগাড় করিয়া দিল। বছর পনের বয়স। কালো একহারা পাতলা গড়ন, মাথায় বড় বড় চুল। পরণের কাপড় যে সে কোন্ কালে পরিয়াছে তাহা বোঝা যায়। পশ্চিমের কোন একটা অখ্যাত জেলায় তার বাড়ি। যাক—পাওয়া তো গেল!

অতি সন্তর্পণে অঙ্গনে ঢুকিতেই রাধারাণী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "ও হনুমানটাকে আবার কোত্থেকে আনলে?"

"তুমি একটা চাকরের কথা বলছিলে যে?"

"ওমা! ঐ তোমার চাকর? মরে যাই, কি রূপের ছিরি রে! একেবারে ছুঁকোর খোলে ছুগ্‌গা নাম লেখা। এই ছোঁড়া, এদিকে আসিস নে। কি-না কি জাত তার ঠিক কি! কাপড় দিয়ে তেল গড়াচ্ছে। সরে দাঁড়া, সরে দাঁড়া—"

সে রাধারাণীর ভাষা বুঝিল কি না সন্দেহ। অবাক্ হইয়া তার পানে চাহিয়া রহিল।

রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিল, "তোর নাম কি রে, এই ছোঁড়া?"

বলিলাম, "ও তো তোমার সব কথাই বুঝল আর উত্তরও দিল। বাজী তুমারা নাম পুছতা হায়।"

সে আস্তে আস্তে জবাব দিল, "হামারা নাম গিরিধারী।"

রাধারাণী ঠিক বুঝিতে পারিল না, বলিল, "কি বললে নাম, মুখপোড়া?"

"গিরিধারী গো।"

রাধারাণী হাসিয়া উঠিল, কহিল, "মরে যাই, নামের কি ঘটা রে! তোমার ও গিরিধারী টিরিধারীতে আমার কাজ নেই। দূর কর ওটাকে।"

"কেষ্ট বিষ্টু এখানে কোথায় পাবে? থাক্ না বাপু, মাইনে কড়ি দিতে হবে না। দু' বেলা দু' মুঠো ভাত বৈ তো কিছু নয়।"

"যাইনে যেবে না? ও, তবে থাক। কিন্তু আগে বাপু ওর চুলগুলো নাপতে ডেকে কাটাও। নইলে ঐ চুল থেকে উকুন ঝরে তাতে ব্যঞ্জনে পড়ে একাকার ক'রে দেবে। একটু গোবর জল গুলে দিচ্ছি পা দুটো ডুবিয়ে নিতে বল। সাত রাজ্যি তো খালি পায়ে চ'ষে আসছে, কত নোংরা রাস্তাঘাটে!" বলিয়া রাধারাণী উঠিয়া গোবরের খোঁজে গেল।

যাই হোক এ যাত্রা গিরিধারী রহিয়া গেল। কিন্তু রাধারাণীর সকাল দুষ্টি তার পিছু পিছু অনবরত ঘুরিতে লাগিল। সে স্নান করে কি, করে না। পায়খানায় যাইয়া জল লয় কি, লয় না; এ-সব বিষয়ে রাধারাণী কড়া নজর রাখিতে লাগিল।

মাস দু'য়েক কাটিয়া গিয়াছে। সেদিন হঠাৎ রাধারাণী কল-ঘরে ঢুকিয়া আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, গিরিধারীর পায়খানার মগের জল ঠিক তেমনি ভর্তি আছে। আর যাইবে কোথায়!

"হ্যাঁ রে, এই মুখপোড়া বাঁদর, তুই বুঝি পায়খানায় গিয়ে জল নিস নে?"

গিরিধারী ঘোর চার হাবে ভাবে রাধারাণীর কথাটুকু বুঝিয়া লইল। পাংশুকণ্ঠে কহিল, "আজি তো আটা মলনে পড়ে গা মাজী, ফুট-মুট হাত ধোকর কিয়া করেগা?"

রাধারাণী যেন আকাশ হইতে পড়িল! চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিয়া উঠিল, "ও মা, যাব কোথায় এ হনুমানের আলায়? বেরো বেরো লক্ষ্মীছাড়া! আটা মাখায় নাম ক'রে হাত ধোব না। বেমালুম আটা মাখছে, কি ঘেন্নার কথা! ছিঃ ছিঃ, হাঁড়ি-কুঁড়ি সব একাকার ক'রে দিলে আমার। এই বুঝি তোদের জাতের ধর্ম? হ্যাঁ রে এই পোড়া কাঠ!"

সবে মাত্র অফিস হইতে ফিরিয়া দরজাতে পা দিয়াছি। স্ত্রীর এই চামুণ্ডা মূর্তি দেখিয়া বিস্ময়ে ও ভয়ে দু' পা পিছাইয়া সরিয়া পড়িলাম। রাধারাণী হাঁড়ি-কুঁড়ি সব একে একে টানিয়া বাহির করিতে লাগিল দেখিয়া প্রমাদ গণিলাম। না, আজ অন্তত একাদশীর উপবাস হইতে আর কিছুতেই রক্ষা নাই। সুখের অপেক্ষা শান্তিই ভাল, অতএব পা টিপিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। ভিতর হইতে রাধারাণীর গলা পাওয়া গেল। আমাকে লক্ষ্য করিয়াই সে কহিল, "চোরের মত অমন পালাচ্ছ কেন? তোমার গুণের চাকরের কাণ্ড-কারখানাটা একবার দেখে যাও।"

কোন জবাব দিলাম না। মনে মনে ভাবিলাম, আর দেখিয়া কাজ নাই। দেখিতে যাইয়া শেষে এক-আধ ঘা আমারই পিঠে পড়ুক আর কি! সোলা বাবা চুপি গণেশের দোরে মানত দিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। সা' পাঁচ আনার পুজো চড়াইয়া যখন বাড়ী ফিরিলাম আকাশের মেঘ তখন খানিকটা কাটিয়াছে। প্রকৃতির আবহাওয়াও কিছুটা শান্ত।

গিরিধারী এক পাশে বসিয়া ভুট্টা খাইতেছে ও তার গুণাগুণ সম্বন্ধে তাহার মাজীকে বুঝাইতেছে।

সকালে বাহির হইব বলিয়া জামাটা গলায় চড়াইতেছি, রাধারাণী ঘোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বলি, আজ ক'দিন ধ'রে খানিকটা কাঁটা-তার এনে দিতে বলছি যে, তা কি শুনতে পাচ্ছ না? সাধ ক'রে ছুঁচো-গাছ ক'টা উঠনে বুনেছি তোমার প্যারেলালবাবুর ছাগলে এসে কবে সেধও মুড়িয়ে খাবে। দেব কোন্ দিন বঁটিটার এক ঘা বসিয়ে তখন বুঝবে।"

জুতা-জোড়ার ফিতে আঁটিতে আঁটিতে বলিলাম, "থাক, আর দশপ্রহরণধারিণীর মূর্তি ধ'রে কাজ নেই। কাঁটা-তার আমি আজই এনে দেব।"

ঐ পর্যন্ত।

সন্ধ্যা বেলা আমাকে দেখিয়াই রাধারাণী বলিয়া উঠিল, "কৈ গো কাঁটা তার আমার? ও আমি জানি। মোল্লার দৌড় মস্‌জিদ অবধি। শুধু মুখেন মারিতং জগৎ। তোমার ভরসায় আমি আছি কি না! আমি গিরিধারীকে পাঠিয়েছি। রামকিঙ্করবাবুর শাশুড়ি বললে, এখানকার নাউ ভাল। নাউ-এর ঘন্ট অনেক দিন খাই নে। একটা টাকা দিয়ে পাঠিয়েছি বাজারে। কাঁটা তার আর একটা কচি নাউ আনতে। বুঝেছ?"

"বেশ ক'রেছ।" বলিয়া ধড়াচূড়ো ছাড়িবার জন্য ঘরে আসিতেই শুনি রাধারাণী বলিতেছে, "হ্যাঁ, রে কাঁঠাল কে দিল?"

বাহিরে আসিয়া দেখি গিরিধারীর মাথায় এক প্রকাণ্ড কাঁঠাল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোউন দিয়া ?"

গিরিধারী জবাব দিল, "কোই নেহি বাবু। মালী একঠো রুপিয়া দে'কর কহা, কি এক নাউ আউর এক কাটাহর লে আও।"

রাধারাণী কহিল, "নাউ কই রে ?"

"খোলা লে আই মালী ? উ, বাহার খাড়া হায়।"

রাধারাণী তার নির্বুদ্ধিতা দেখিয়া হাসিয়া কহিল, "হাঁ রে এই গাধা, নাউ আবার কে কোন্ কালে বাইরে রেখে আসে। সে 'খাড়াই' বা থাকে কি ক'রে ?"

গিরিধারী ঠিক বুঝিল না, কহিল, "হিঁয়াকা মাইসা কানুন হায় মালী।"

ব্যাপারটা বুঝিতে আমার দেরী হইল না। মজা দেখিবার জন্ম হাসি চাপিয়া কহিলাম, "উনকো ভিতর লে আও।"

তখনি সে বাহির হইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল সে একটা নারিকেল টানিতে টানিতে ভিতরে আনিয়া হাজির করিয়াছে। রাধারাণী একহাত ঘোমটা টানিয়া ছুটিয়া কপাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া তর্জনী হেলাইয়া কহিল, "দূর কর লক্ষ্মীছাড়াটাকে। নাউ আনতে বললুম, আনলে নারিকেল ডেকে। বললুম কাঁটা-তার আনতে, এনে হাজির ক'রলে এক আধখণ্ড কাঁটাল। কি হিজিবিজি চাকর বাবা! পটোলকে বলে 'পড়োরা', পেয়ারাকে বলে 'আমার উরু'—ভূত না ভূত। দূর কর ওটাকে। ছিঃ ছিঃ। ভাগ্যিস তুমি ছিলে নইলে আজ কি যে হ'তো। অমন চাকরে আমার কাজ নেই বাপু! চের হ'য়েছে। মানে মানে বিদেয় কর ওটাকে। হাসছ যে বড় কোকলা দাঁত বার ক'রে ? আমাকে জব্দ করবার জন্তে বুঝি ঐ ভূতটাকে এনেছ ? আচ্ছা দেখ, আমি ওটাকে দূর করতে পারি কি না।"

বলিলাম, "তা' হ'লে তোমার ঐ লক্ষ্মীমন্ত ছেলেটিকে কে আগলাবে ?"

"তার থাকলে আবার কাকের অভাব। অমন চাকর লাখো লাখো পাওয়া যাবে। সে তয় আমাকে দেখিও না।" বলিতে বলিতে সে গরগর করিতে করিতে গিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিল।

দিন কয়েক পরে আসিয়া শুনি রাধারাণী চাকরটাকে দূর করিয়া দিয়াছে। বড় কষ্ট হইল। বিদেশী হিন্দুস্থানীর ছেলে। চেনা-শোনা নাই তবু, কেন যে এই প্রকৃতির নির্দোষগুলোর উপর মানুষের অকারণ মমতা জন্মে বুঝি না। চা দিতে আসিলে রাধারাণীকে বলিলাম, "তোমার ছেলেই যদি একটা অমন হ'ত। পারতে তাড়াতে ?"

ঠোঁট উলটাইয়া পরিবারটি আমায় বলিয়া উঠিল, "উঃ! খুব যে দরদ দেখছি। ছেলে আর চাকর, আকাশ আর পাতাল সমান ? এই বুঝি নিয়ে তুমি চাকরি কর ?"

বুঝলাম জবাব দিয়া কোন লাভ নাই। কিন্তু খোকা শুনিল না। সে ছোট হাতখানি নাড়িয়া "গি-গি" করিয়া ডাকিতে লাগিল এবং বাহিরে যাইবার জন্ত কান্না শুরু করিয়া দিল।

রাধারাণী কলঘরে ছিল। ইতিমধ্যে গিরিধারী আসিয়া খোকাকে লইয়া গেল। রাধারাণী আসিয়াই দেখে খোকা নাই।

"হ্যাঁ গো, খোকা কোথায় গেল ?"

বলিলাম, "আমি কি জানি, আমি তো ঘরে ছিলাম।"

"ভাল রে ভাল। চোখের সামনে থেকে ছেলেটাকে নিয়ে গেল দেখতে পেলে না ? চোখ বুজে আফিঙের নেশায় ঢুলছিলে বুঝি ?"

"না, তোমার ধ্যান করছিলাম।"

রাধারাণী ফিরিয়া দাঁড়াইল। চুলে একটা গিঁট দিতে দিতে দরজার কাছে গেল। চোখে তার জল।

অনেক কিছুই পৃথিবীতে অস্বাভাবিক দেখিয়াছি তাহাতে কখনও আশ্চর্য্য হই নাই। কিন্তু আজ রাধারাণীর চোখে জল দেখিয়া বিস্ময়ে ভাঙ্গিয়া পড়িলাম। একবার আমার একটা ফোড়া হয়। অসহ্য যন্ত্রণায় কেমন ভুগিয়াছিলাম তাই দু'টো মৌখিক সহানুভূতি পাইবার জন্ত রাধারাণীকে বলিতেছিলাম। রাধারাণী চটু করিয়া নিজের কথা পাড়িয়া বলিল, হায়, "হায় ও আর এমন কি। আমার কথা যদি জানতে! ছোট বেলায় গরম ভাত প'ড়ে গিয়েছিল এই হাতের ওপর। ও, সে কি যন্ত্রণা। তোমরা হ'লে…"

বলিলাম, "সত্যিই তো, আহা! আমার মাথাটা তখন ক'রলে না কেন? সব ব্যথা সেরে যেত।"

"শোন কথা। যেন ওঁর সঙ্গে আমার চেনা ছিল।"

"আহা আমি নাই বা হ'লাম। সেখে তো আরও ঢলঢলী ছেলে ছিল, ছোট বেলায় তাদের দীর্ঘশ্বাসেই তো হ'য়েছ মানুষ। তাদের উড়ো চিঠি পড়েই তো শিখেছ তাষা।"

"তুমি আমায় তেমনি মেয়েই ঠাউরেছ কি, না। আমি অত ছেলে-ঘেঁষা মেয়ে নই। সে কথা মনে ঠাঁইও দিও না। সে ছিল আমার ছোট দাসীর মেয়ে। ছেলে দেখলেই যেন গিলতে যেত।"

"আর তুমি?"

"নিজেই ভেবে দেখ। নিজের বুকেই হাত দিয়ে দেখ ঠিক জানতে পারবে।"

"তাই দেখি" বলিয়া বুকে হাত দিয়া সেই অতকালের ছোট্ট ঘটনাটুকু ভাবিতে চেষ্টা করিতেছি। রাধারাণীর চেঁচামেচিতে সব গুলাইয়া গেল। একবার 'খোকা', একবার 'নেপু' বলিয়া এদিক ওদিক ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। আপাততঃ থামাইবার জন্য বলিলাম, "অমন গাঁ গাঁ ক'রে চেঁচিও না। এ তোমার হালিশহরও নয় বাঁশবেড়েও নয়। এ এটোয়া শহর। ছেলে যেন একা তোমারই এই প্রথম হারিয়েছে!"

"বটে? কি আমার বরদী বাবারে। ব'লো না, ব'লো না, লোকে গায়ে থুথু দেবে। খোকা—নেপেন—"

"দোহাই তোমার চেঁচিও না। খোকাকে তোমার কেউ চুরি করেও নি। যা-না তার রূপের ছিরি। কেউ ছোঁবেও না। প্যারেলালবাবুর বৌ নিয়ে গেছে।"

"সেই আঁটকুড়ি? ও-ই খাবে আমার ছেলেটাকে। নিজের ছেলেপিলে হয় না তো দিগে না বাবা তারকেশ্বরে ধর্ণা, পরের ছেলে নিয়ে এত টানাটানি কেন?" বলিতে বলিতে রাধারাণী রান্নাঘরে উঠানে নামিয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলা ফিরিতেই দেখি উঠানের এক পাশে দাঁড়াইয়া গিন্নিবারী। একটা ভাঙ্গা তালপাতার চেঁপু এক পাশে পড়িয়া।

রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে ব'লে তুই খোকাকে ওদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলি? কে তোকে এই পয়সা খরচ ক'রতে বললে, হাঁ? নিয়ে যা তোর বাঁশী। খবরদার যদি আর কখনও দেখেছি যে কিনু খোকাকে কিনে দিয়েছিস তো, তোর একদিন কি আমার একদিন। তাড়িয়ে তো দিয়েছিলাম, এসেছিস কোন্ সাহসে আবার? তোদের জাতের লজ্জা ব'লে কিছু নেই বুঝি? যা বলছি।"

একটা কিছু কঠিন প্রতিবাদ করিব মনস্থ করিতেছি, এমন সময় রাধারাণী আমাকে লক্ষ্য করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, মিথ্যে কথা বলতে গিয়ে তোমার আটকায় না, না? প্যারেলালবাবুর বউ খোকাকে নিয়ে গেছে, কেমন? আমি ভাবলাম, যাক্, বাড়ীর গরুর টাট্‌কা দুধটা সেদিনকার মত খাইয়ে দেবে। তাই ভেবে সোয়ালা-টাকে আমি ফিরিয়ে দিলাম। এখন উপায়? ছেলে খায় কি? ডাক তোমার গিন্নিবারীকে একবার। সাত্না এটোয়া শহর পায়ে হেঁটে হেঁটে সেটোয়া কড়াই ক'রে ফেললে তবু একটা ভাল চাকর খুঁজে আনতে পারলে না।"

দ্বিরুক্তি না করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। গেলাম সেই মুদিটার কাছে। গেলাম তার পুরাতন আড্ডায়, কেউ তার সন্ধান দিতে পারলে না; কোথায় গেল ছোঁড়াটা? ভাবিতে ভাবিতে ফিরিতেছি রামকিঙ্করবাবুর চাকরটার সঙ্গে দেখা। বলিল, "আপনার চাকরটার খবর জানেন?"

তার চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন আঁকা।

বলিলাম, "কেন বল তো? না, তাকে খুঁজতেই তো বেরিয়েছি।"

বিশ্বনাথ বলিল, "একটা মাতাল সাহেব মোটর চালিয়ে বাজারের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। গিন্নিবারীকে চাপা দিয়ে গেছে তার গাড়ী।"

"হাঁ্যা? বলিস কি বিশ্বনাথ?"

"হাঁ বাবু। আমি ফিরছিলাম, দেখে তার সঙ্গে সঙ্গে হাঁসপাতালে গেলাম।"

তাড়াতাড়ি ছুটিলাম হাঁসপাতালে। রাত ন'টার সময় সার্জেন বললেন, "কোনো ভয় নেই। বাঁচবে। পায়ের হাড়টা জোড়া লাগতে একটু সময় নেবে, এই যা।"

রাধারাণীর উপর রাগে সমস্ত অন্তরাত্মা আমার রি রি করিতে লাগিল।

বাড়ী আসিতেই রাধারাণী কহিল, "একবার থার্মোমিটার দিয়ে খোকার জ্বরটা দেখ তো, গা-টা যেন পুড়ে যাচ্ছে।"

জ্বরটা এমন কিছুই নতুন নয়। ছেলে আমার চিররুগ্ন। মাসের কিছু বিশ দিন সে ভোগে। তবু তার সুস্থতপনায় দু'টি প্রাণীতে হিমশিম খাইয়া গেছি।

দিন সাতেক গেল।

গিরিবালী ভালই আছে। খোকার জ্বরটা কিন্তু কিছুতেই কমিতেছে না। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "টাইফয়েড। একুশ দিন না গেলে কিছু বলা যাচ্ছে না।"

রাধারাণীর চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

বলিলাম, "কর ক'রবার কিছু নেই। বুক বাঁধ। যা হ'লে অনেক আঘাত আর যন্ত্রণা সইতে হয়।"

অধীর প্রতীক্ষায় একুশ দিন উত্তীর্ণ হইয়া গেল। মানুষের উপর যেন একখানা কফাল নেমেছে। ওদিকে অনেক দিন যাই নাই, ভাবিলাম গিরিবালীর খোঁকাটা একবার দেখিয়া আসি। গিয়া শুনি, সে দিন কয়েক আগে ছুটি লইয়া কে একজন দেশের লোকের গরি হইতে টাকা ধার করিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে।

রাধারাণীর বিশ্বাস তার ছেলে নিশ্চয় বাঁচিবে। ছেলে কারও কখনও মরে না। তারা বাইরে হারাইয়া যায় শুধু, কিন্তু মনের নিভৃত কোণে তারা অমর হইয়া থাকে।

যমে-মানুষে টানাটানি করিয়া শেষে পরাজয় হইল মানুষের। এইটাই না কি আদিম প্রকৃতি। এটোয়ার শ্মশানে খোকার চিহ্ন এ-জীবনের মত নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। চব্বিশ দিন সে ভুগিয়াছিল। দুঃখ আর দারিদ্র্য না কি হাসিমুখেই মাথা পাতিয়া লইতে হয়। কিন্তু আজ তা' পারিলাম কই? ও-ঘরে রাধারাণী কাঁদিয়া কাঁদিয়া খোকাকে তার সুপ্ত গৃহের প্রতিটি রন্ধ্রে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। তিন দিন সে জল-স্পর্শও করিল না। প্যারেলালবাবুর বউ আসিয়া তাকে সান্ত্বনা দিয়া উঠাইল।

চার দিন পরে রাধারাণী আবার কাজকর্ম করিতে লাগিল। কিন্তু সব সময়ে তার চোখে জল। হাল্কা গতি। আমার আর সে বিপ্রতা নাই।

গিরিবালী গেল, খোকা গেল, রহিলাম শুধু আমরা দুইটি নবীন সংসারী, আর চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিল অনন্ত আকাশ ও গিরিবালীর অনাহত তপ্ত পাতার কেঁপুটা।

একদিন রাধারাণী কহিল, "তোমার প্যারেলালবাবু তো শুনেছি কবি। ওকে দিয়ে একটা কবিতা লিখিয়ে আমায় দেবে? সেই কবিতার প্রতি লাইনে থাকবে আমার খোকার নাম, আমার গিরিবালীর নাম আর ঐ তাদা বাঁশীটার কথা। যখন কিছু ভাল লাগবে না তখন বসে বসে পড়ব। এ গীতা-টীতা আর ভাল লাগে না ছাই।"

বলিলাম, "পারবে কি সে লিখতে? তোমার ছেলে মারা গেছে, চাকর গেছে না ব'লে, সে দুঃখ কি তারা বুঝবে? শুনে হয় তো পরিহাস ক'রবে। তোমার ব্যথা তোমারই থাক। ওরা পাবে না।"

রাধারাণী কহিল, "পারে তবে কি? কিসের তরে কবি? যদি না সে দেখতে পেল অবলা আর অবলের নীচে ভালবাসা তোলা লুকিয়ে থাকে। যদি না জানে মায়ের ব্যথাটা কি! তবে সে কবি কিসের? শুধু কি ঐ সব মোরা কথা লেখার জন্যে? কুমারী মেয়ে দেখলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলা, আর হা-হুতাশ করাতেই বুঝি ওদের ভুবনজোড়া খ্যাতি?"

রাধারাণীর পানে চাহিয়া আমি ম' হইয়া গেলাম। মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। শুধু কাণে আসিল রাধারাণী যেন অস্পষ্টস্বরে আমাকে লক্ষ্য করিয়াই কহিল, "সারাদিন ঘরে ব'সে থেক না। মনটা খারাপ, একটু বার থেকে ঘুরে এস। ভেবে ভেবে কি ক'রবে বল? সব আমাদের অদৃষ্ট। নইলে সে ছেঁাড়াটাই বা না না ব'লে চ'লে যাবে কেন? না হয় বকেইছিলাম তাকে, না হয় বলেইছিলাম—বেরিয়ে যা। বকে না তার মা? বকে না তার বোনেরা? তবে?"

বলিতে বলিতে তার দু' চোখ বহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

# উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা শিশুপত্রিকার ইতিহাস

—শ্রীবিনোদবিহারী মজুমদার

অনেকদিন পূর্ব্ব হইতেই এদেশে সাময়িক পত্রের সাহায্যে আংশিকরূপে শিশুসাহিত্য প্রচারের চেষ্টা আরম্ভ হয়, এবং সম্ভবতঃ তাহারই ফলে কালক্রমে নিয়মিত শিশুপত্রিকার প্রচলন হয়। সেও আজ প্রায় ষাট বৎসরের কথা। সময়ের অগ্রগতির সহিত শিশুপত্রিকাগুলির সংখ্যা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি এখন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং উহাদের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ অংশ সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্রভাবে এই শ্রেণীর প্রচলিত ও অধুনা-লুপ্ত পত্রিকাগুলির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া সুবিন্যস্ত করিতে পারিলে ছোট-খাট রকমের সুন্দর একখানি ইতিহাস সংকলিত হইতে পারে। এই বিষয়ে সুধীবৃন্দ যাহাতে অবহিত হন এবং তাঁহাদের চেষ্টায় ও আগ্রহে বাংলা সাহিত্যের এই অভাব মোচন হয়, দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি-মাত্রেরই তাহা কাম্য। শিশুপত্রিকার একখানি সম্পূর্ণ ও খাঁটি ইতিহাস সংকলন করা কঠিন ও শ্রমসাধ্য কাজ সন্দেহ নাই। কিন্তু কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সুযোগ্য লেখক বাংলা সংবাদসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা ও এতদ্‌সম্পর্কিত প্রাচীন দলিল-পত্রাদির অনুসন্ধান ও পাঠের দ্বারা যে-আনন্দ লাভ করিবেন, শিক্ষানুরাগিগণের নিকট নিপুণ হস্তে সে-রস পরিবেশন করিতে পারিলে ইতিহাসামোদী, সাহিত্যিক ও পাঠকের দৃষ্টিতে তাহার মূল্য নিতান্ত কম হইবে না। সে যাহা হউক, আপাততঃ আমরা এ স্থলে মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা শিশুপত্রিকার ইতিহাস সম্বন্ধেই সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব। মনে রাখিতে হইবে যে, এ-দেশীয় শিশুপত্রিকার ইতিহাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেরই অঙ্গীভূত। সুতরাং শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশের সহিত শিশু-পত্রিকার সৃষ্টি ও প্রসারের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের সহিত উহার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে, প্রথমতঃ সে সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দী বাংলার পক্ষে এক স্মরণীয় কাল। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এই উনবিংশ শতাব্দীরই ইতিহাস। দেশে ইংরাজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সংমিশ্রণে বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে; উনবিংশ শতকের প্রারম্ভ হইতেই বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের নবজীবনের সূত্রপাত হয়। এই সময়ে মিশনারীগণ শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং দেশীয় পণ্ডিতগণের সাহায্যে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান ও রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি অনুবাদ-গ্রন্থ ও অপরাপর কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা ও প্রচারের পথ অনেকটা সুগম করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধভাগেই রাজা রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ বাংলার সন্তানগণ বাঙালীর শিক্ষায়, সাহিত্য ও সমাজজীবনে এক নূতন পথের সন্ধান দেন। এই কালে বাংলা ভাষায় দর্শন ও বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনায়, সংবাদপত্র ও পত্রিকার প্রচারে ও নানাবিধ পুস্তকরচনায় বাংলা সাহিত্য উত্তরোত্তর উৎকর্ষলাভ করিতে থাকে। আবার এই কালের মধ্যেই মদনমোহন তর্কালঙ্কার, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি পরবর্ত্তী সাহিত্যসেবিগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও কিছু রচনা উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধভাগেই প্রকাশিত হয়। এই যুগই বাংলা সংবাদ ও

সাময়িকপত্রের প্রথম আবির্ভাব কালে যে সকল পণ্ডিত ও মনীষী এই কালে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে সংবাদপত্রের আরাধনা করিয়া বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়ভুক্ত জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান, রাজা রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিমোহন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও অক্ষয়কুমার দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "সমাচারদর্পণ", "সংবাদ-কৌমুদী", "সংবাদচন্দ্রিকা", "সংবাদ প্রভাকর", "তত্ত্ব-বোধিনী" প্রভৃতি সেকালের পত্রিকাগুলি আজিও অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণারত পণ্ডিতগণের পরম আদরের বস্তু। তৎকালীন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির মূলে এই সকল সংবাদপত্রের দান অপরিমেয়।

এই সময়ে বাংলা সাহিত্যের বহুবিধ উন্নতি হইলেও, কিছু-কাল পূর্ব্বে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে, উপযুক্ত-রূপ শিশুপাঠ্য পুস্তকাদির—বিশেষতঃ মুদ্রিত গ্রন্থের—অভাবে, শিশুশিক্ষার অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ ছিল না। জাতির ও তাহার সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিতে হইলে দেশের ভবিষ্যৎ আশাভরসার স্থল বালকবালিকাগণের যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন, এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই উক্ত মনস্বী পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ শিশুশিক্ষা প্রচার-মানসে পুস্তকাদি রচনায় প্রবৃত্ত হন। সুখের বিষয়, পূর্ব্ব হইতেই খৃষ্টান মিশনারীগণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তাঁহারা নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও দেশীয় বালকবালিকাদিগের জন্য পুস্তকাদি রচনা করিয়া নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। এই ভাবে তাঁহা-দের ও দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের চেষ্টায় দেশে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি আরম্ভ হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল মার্কুইস্ অব হেষ্টিংসের পত্নী ও মহামতি ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে "কলিকাতা স্কুলবুক

* প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর মিশন হইতে মার্শম্যান মাসিক "দিগ্‌দর্শন" এবং ঐ বৎসরই মে মাসে সাপ্তাহিক "সমাচার দর্পণ" প্রকাশ করেন। "দিগ্‌দর্শন"কে প্রথম সাময়িক পত্রের গৌরব দান করিলেও Dr. S. K. De তাঁহার "Bengali Literature in the Nineteenth Century" নামক গ্রন্থে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের প্রকাশিত "বেঙ্গল গেজেট"কেই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। Long সাহেবের Catalogue ও Return-এও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় ( অবশ্য তিনি এই Return ও Catalogue তৈয়ারী করিবার পূর্ব্বে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে Calcutta Review—Vol. XIII-এ এক প্রবন্ধে মার্শম্যানের "সমাচারদর্পণ"কেই প্রথম বাংলা সংবাদপত্ররূপে উল্লেখ করিয়াছিলেন। ) "A Hundred Years of the Bengali Press"-এর লেখক P. N. Bose ও H. W. B. Moreno-সাহেবও Long-সাহেবের Calcutta Review-র প্রবন্ধের উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া "বেঙ্গল গেজেট"কে শুধু প্রথম বাংলা সংবাদপত্র নয়, ভারতীয় ভাষারও সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই "বেঙ্গল গেজেট"র প্রকাশের তারিখ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ ও "সমাচারদর্পণ" প্রকাশের তারিখ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তবে Long এবং P. N. Bose ও Moreno সাহেবের মতে "বেঙ্গল গেজেট"র আনুকূল্য মাত্র এক বৎসর। পক্ষান্তরে, Dr. De উহার স্থিতিকাল দুই বৎসর ( ১৮১৮-১৮১৯ ) বলিয়াছেন এবং এই প্রবন্ধে ব্রজেন্দ্রবাবুও উল্লেখ করিয়াছেন। এ সকল মত সত্ত্বেও, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন পূর্ব্বে মাসিক 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, "বাঙ্গাল গেজেট" যে "সমাচারদর্পণে"র কয়েকদিন পরে প্রকাশিত হয়, নানা কারণে এই বিশ্বাস তাঁহার হইয়াছে। কিন্তু ঐ ছলে তিনি কোন কারণেরই উল্লেখ করেন নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার "দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস"-নামক পুস্তকে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। উপরন্তু, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পুস্তকে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধটিতে "বাঙ্গাল গেজেট"র সম্পর্কে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের নাম উল্লেখ করিয়া তিনি কোন্ শ্রেণীর লোক ছিলেন সে-সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত করেন নাই। Long সাহেবের Return-এ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে Anglo Bengali Grammar-প্রণেতা এক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের উল্লেখ থাকিলেও, "বেঙ্গল গেজেট"র সম্পাদকরূপে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যেরই নাম পাওয়া যায় এবং Dr. S. K. De ও A Hundred Years of the Bengali Press-এর লেখকদ্বয়ও ঐ নামই উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত Dr. De এই মতের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করায় তাহাও সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি "সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা"য় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ( সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ৪৩শ ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১২৮ ) ব্রজেন্দ্র বাবুই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া "বাঙ্গাল গেজেট"র প্রকাশ কাল ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথানুপ্রতিকভাবে আরও কেহ কেহ এই মতের অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু এই মত অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণের, বিশেষতঃ Dr. De-র উক্তির, যুক্তিযুক্ত-ভাবে প্রতিবাদ করা দরকার।

সোসাইটি"র প্রতিষ্ঠা হয়, এবং উহার এক বৎসর পর "স্কুল সোসাইটির"ও পত্তন হয়। শেষোক্ত সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন বিদ্যালয়গুলির অবস্থার উন্নতি সাধন এবং দেশীয়গণের মধ্যে সাধারণ ভাবে জ্ঞানবিস্তারের জন্য প্রয়োজন মত আরও অধিক সংখ্যায় বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা। পক্ষান্তরে, বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী পুস্তক প্রণয়ন করা এবং শিক্ষার্থিগণ যাহাতে ঐ সকল মুদ্রিত পুস্তক অল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া শিক্ষার সুযোগ লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই ছিল "স্কুলবুক সোসাইটির" উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ইয়ার্ট, ডে, পিয়ার্সন-প্রমুখ ইংরাজ মিশনারী ও রামকমল সেন, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি দেশীয় বিদ্বজ্জনের সহযোগিতায় সোসাইটি হইতে অভিধান, গণিত, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ, নীতিশিক্ষা, নানারূপ গল্প ও বানানশিক্ষা-বিষয়ক বহু পুস্তক প্রকাশিত হয়। সোসাইটির এই কার্য্যের দ্বারা শ্রীরামপুরের কেরী, মার্শম্যান-প্রমুখ মিশনারীগণ, এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষ কয়েকবৎসর পূর্ব্ব হইতেই আংশিকরূপে যে কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন তাহা পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকে। এবং দেশীয় শিক্ষার্থীগণই প্রধানতঃ উহার ফলভাগী হয়।

"স্কুলবুক সোসাইটি"র পূর্ব্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষ অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীদিগের মনোরঞ্জন ও উপকারের জন্য সংস্কৃত ও বিদেশীয় ভাষার কিছু কিছু উপযুক্ত গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিয়া শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে ঐগুলির বাংলা অনুবাদ-সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সকল অনুবাদগ্রন্থের মধ্যে "হিতোপদেশে"র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত গোলোকনাথ শর্ম্মা বিষ্ণুশর্ম্মার মূল সংস্কৃত গ্রন্থের প্রথম বাংলা অনুবাদ রচনা করেন। ইহার পর ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার ও রামকিশোর তর্কালঙ্কার কর্তৃক অনুদিত হইয়া আরও দুইখানি সংস্করণ বাহির হয় ও পরে বিভিন্ন সময়ে ঐ গ্রন্থের আরও দুইটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদকগণের একজন ছিলেন হেতাতেও ইয়েটস্ সাহেব ও অপরের নাম লক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মা; এ ছাড়া, গল্পের বইগুলির মধ্যে তারিণীচরণ মিত্রের অনূদিত "ঈশপের গল্পে"র নাম করা যাইতে পারে।

এ দেশে শিশুসাহিত্যপ্রচারে এই সকল পুস্তকই ছিল তখন প্রথম পথপ্রদর্শক। পূর্ব্বোক্ত প্রতিষ্ঠান-সমূহ ও গভর্ণমেণ্টের সমবেত চেষ্টায় সেই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার অনেকটা সুব্যবস্থা হইলেও বর্ত্তমান কালের তুলনায় শিশুসাহিত্যের তখনও শৈশব মাত্র। বাংলা সংবাদসাহিত্যও তখন সবেমাত্র গড়িয়া উঠিতেছে। এই অবস্থায় দেশে শিশু-পত্রিকার প্রচলন করিয়া শিশুসাহিত্যকে সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তোলা স্বাভাবিক কারণেই সম্ভব হয় নাই। তবে উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধ-কালের মধ্যেই যে অন্ততঃ আংশিক ভাবেও এই প্রকারের চেষ্টা আরম্ভ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্ব্বপ্রথম যে সাময়িক পত্রখানিতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত বালকবালিকাগণের পাঠোপযোগী রচনাও কিছু কিছু প্রকাশিত হয়, তাহার আবির্ভাবকাল ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ। কাগজখানি খৃষ্টানদিগের পরিচালিত, নাম "সত্যার্ণব"। "সত্যার্ণব" আংশিক শিশুপত্রিকা। ইহার পূর্ব্বে আর একখানিকেও কোনরূপে শিশুপত্রিকা আখ্যা দেওয়া চলে না।

### সত্যার্ণব ( ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ )*

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি এই সচিত্র মাসিক পত্রখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার প্রথমে সম্পাদক ছিলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার সম্পাদনায় প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ( Vols. 1 & 2 ) প্রকাশিত হয় ও পরে রেভারেণ্ড ডবলিউ. ই. শিল নামক জনৈক ইংরাজ মিশনারীর উপর ঐ ভার ন্যস্ত হয়। যীশু-খৃষ্টের মহিমা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানবিস্তারই ছিল এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পুরাবৃত্ত, ইতিহাস, নানা জীবজন্তুর কাহিনীতে মাসিকের বার খানি পৃষ্ঠা পূর্ণ থাকিত এবং ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বিষয় প্রধানতঃ শিশুদের এবং অতি সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের উদ্দেশ্যেই রচিত হইত। পত্রিকাখানি একাধিক্রমে কয়েক

* Rev. J. Long সাহেবের Return ও Catalogue দ্রষ্টব্য। Dr. S. K. Dey মতে এই পত্রিকাখানি ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন, "The Satyarnaba, edited by the missionaries of the Church of England, was begun in 1849; five volumes appear to have been published." (History of Bengali Literature in the Nineteenth Century—Appendix IV. page 492 )

বৎসর চলে এবং বিভিন্ন সময়ে উহার মূল্য ছয় পয়সা হইতে দুই আনা ধার্য্য ছিল।*

অতঃপর পরবর্ত্তী পঞ্চাশ বৎসরের শিশুপত্রিকার ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বপ্রথমেই মনে পড়ে, এই কালের অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা। খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষানীতিবিদ্, সমাজ-সংস্কারক ও ধর্ম্মাচার্য্যগণের প্রতিভার অবদানে এই যুগের ইতিহাস সমুজ্জ্বল। এই কালে শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে উন্নতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী তাহার মাতৃভাষার সেবায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘাতে আদিতে যে ভাবার ও সাহিত্যের মহা সম্ভাবনার বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে অনুকূল আবহাওয়ায় সম্যক্ পরিপুষ্ট হইয়া এই কালে ফল-পুষ্প-সুশোভিত এক মহা মহীরুহে পরিণত হয়। বস্তুতঃ এই যুগে সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র, কবিবর হেমচন্দ্র ও মাইকেলের অমর অবদানে বাংলা সাহিত্য যথোপযুক্ত পুষ্টি লাভ করিয়া উন্নতির সমুজ্জ্বল শিখরে আরোহণ করে। সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার বিস্তৃতি বিদ্যা ও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও এই যুগে বহু দিন পর্য্যন্ত শিশু-সাহিত্যের আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই, এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে অর্থাৎ ষাট বৎসরের কিছু পূর্ব্বেও এদেশে পৃথক্ ভাবে শিশুসাহিত্যের প্রচারকল্পে কোন সাময়িক পত্রিকার সৃষ্টি হয় নাই। এই কালে শিশুসাহিত্যের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, দেশীয় অধিবাসিবৃন্দের অবস্থার উন্নতির জন্য এই যুগের প্রথম হইতেই ব্যাপক ও কার্য্যকরীভাবে মাতৃভাষার শিক্ষা প্রবর্ত্তনের নানারূপ চেষ্টা হইয়াছিল এবং বিদ্যালয়ে পাঠকালে শিক্ষার্থিগণ যাহাতে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে প্রাথমিক ও পরবর্ত্তী পর্য্যায়ের পাঠ্য অনেক পুস্তকও রচিত হয়। মদনমোহনের "শিশুশিক্ষা", অক্ষয়কুমারের "চারুপাঠ", বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বর্ণপরিচয়", "বোধোদয়", "কথামালা", "আখ্যানমঞ্জরী", "চরিতাবলী" প্রভৃতি পুস্তক এদেশের তৎকালীন বালক-বালিকা ও কিশোর-কিশোরীগণের উপযোগী শিক্ষাদানের মানদণ্ডেই রচিত হয়। তৎকালে এদেশে মাতৃভাষার উপযুক্তরূপ শিক্ষাদানের যে পরিকল্পনা করা হয় এবং তাহা কার্য্যকরী করিবার জন্য যে সকল চেষ্টা হয় তাহার অনেক বিবরণ সেই সময়ের সরকারী "এডুকেশনাল ডেস্‌প্যাচ" ও পদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের চিঠিপত্র এবং "কাউন্সিল অব্ এডুকেশনের সভ্যগণের মিনিট" হইতে অবগত হওয়া যায়।† বাংলা গভর্ণমেণ্টের তৎকালীন আণ্ডার-সেক্রেটারী-কর্ত্তৃক ভারত গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের আণ্ডার-সেক্রেটারীকে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নবেম্বর লিখিত এইরূপ একখানি পত্রের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঐ বৎসরে ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের লিখিত একটি মন্তব্যলিপি উদ্ধৃত হইয়াছে। লিপিটিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় এ দেশে ব্যাপকভাবে মাতৃভাষার শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের জন্য একটি সুন্দর পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন এবং বিদ্যালয়ের অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক জ্ঞানবিস্তারকল্পে তৎকালে যে-সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল তাহারও কিছু কিছু বিবরণ দিয়াছেন।† এই লিপিখানি দেশের শিক্ষা ও শিশুসাহিত্যের তৎকালীন অবস্থা পর্য্যালোচনায় কিয়ৎ পরিমাণে আলোকপাত করিয়াছে। এইরূপ অনুসন্ধানের দ্বারা জানা যায় যে, দেশের কৃতবিদ্য

* এই পত্রিকার সংখ্যাগুলি অধুনা অতি দুষ্প্রাপ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ্ গ্রন্থাগারে ইহার কোন সংখ্যা এ যাবৎ সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। আমরা Imperial Libraryতে উহার দ্বিতীয় বর্ষের সব কয়খানি সংখ্যাই দেখিতে পাইয়াছি। সংখ্যাগুলি একত্রে বাঁধান আছে, কোন সংখ্যারই মলাট নাই। প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা আছে—"এই কাগজ, ডাকমাশুল সমেত ৵১০ আনা মাত্র, ১ম সংখ্যা।" আমাদের বিশ্বাস, পুস্তকাকারে Long সাহেবের Return ও Catalogueও এবং Dr. S. K. De-র পুস্তকে এই পত্রিকার বিষয় উল্লিখিত হইলেও পরবর্ত্তী সময়ে প্রকাশিত P. N. Bose ও H. W. B. Moreno সাহেবের গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখই নাই।

† এই বিষয়ে মোটামুটিভাবে সমস্ত বিবরণ জানিতে হইলে H. A. Stark-এর "Vernacular Education in Bengal, 1813-1912 অবশ্যই সাহায্য করিতে পারে। ইহা প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ের উপর লিখিত পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে।

† Bengal Government Selections No. XXII—Correspondence relating to Vernacular Education in the Lower Provinces of Bengal, 1855-56. Edited by Rev. J. Long. ( Page 65 ).

ক্ষমতাশালী লেখকগণ শিশুশিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য তখন প্রধানতঃ নানাশ্রেণীর স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনায়ই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের আওতার বাহিরে পৃথক্‌ভাবে শিশু-সাহিত্যকে গড়িয়া তোলার জন্য পুস্তকাদি রচনায় তাঁহারা অগ্রসর হন নাই। কিন্তু উনবিংশ শতকের পঞ্চম দশকের মধ্যেই যে সাময়িক পত্রিকার সাহায্যে আংশিকরূপে শিশুসাহিত্য প্রচারের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল তাহা বলা হইয়াছে। এই প্রচেষ্টারই অনুসরণক্রমে আমরা ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "বিবিধার্থসংগ্রহে"র দেখা পাই।

## বিবিধার্থসংগ্রহ ( ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ )*

"সত্যার্ণব" প্রকাশিত হওয়ার প্রায় এক বৎসর পর ১৭৭৩ শকাব্দের কার্ত্তিকমাসে এশিয়াটিক সোসাইটির তৎকালীন লাইব্রেরীয়ান ( পরে সভাপতি ) বহুভাষাবিদ্ ডক্টর রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই প্রসিদ্ধ সচিত্র মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন। পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা আছে "বিবিধার্থসংগ্রহ অর্থাৎ পুরাবৃত্তেতিহাস প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদিদ্যোতক মাসিকপত্র। ১ম খণ্ড শকাব্দা ১৭৭৩, কার্ত্তিক। ১ম সংখ্যা।" পত্রিকাখানির আলোচ্যবিষয়, উহার লক্ষ্য, লিখনপ্রণালী ও ভাষা এবং কোন্ শ্রেণীর পাঠকের জন্য উহা উদ্দিষ্ট ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া প্রথম সংখ্যায়ই যে প্রস্তাবনাটি লেখা হইয়াছে তাহা হইতে কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। ইহা হইতেই পত্রিকাখানির সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যাইতে পারিবে, আশা করি।

"আমরা যে কেবল জ্যোতির্বিদ্যার এবং জীবসংস্থার বর্ণনায় নিযুক্ত থাকিব এমত নহে। পদার্থবিদ্যা, ভূগোল বিদ্যা, পুরাবৃত্ত, ইতিহাস, সাহিত্যালঙ্কারাদি সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম আমাদিগের সমক্ষপে উদ্ঘোষ্য; এই সকল বিষয়েই আমরা যথাসাধ্য মনোনিবেশ করিব; এবং যাহাতে স্বদেশস্থ জনগণ অনায়াসে তত্তদ্‌বিষয়ের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন তাহা সম্যগ্‌রূপে চেষ্টা করিব। যে কেহ দুই আনা পয়সা দিয়া বিবিধার্থসংগ্রহকে সমাদর করিবেন তাঁহার ও তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে অনেকের নিকট ঐ পত্র পারিষদের ন্যায় বহুকালাবধি উপস্থিত থাকিয়া শুদ্ধ জ্ঞান ও প্রয়োজনক সদালাপ দ্বারা তাঁহাদের তুষ্টি জন্মাইবে; ফলতঃ পাঠক মহাশয়দিগের সন্তোষার্থে একবৎসরকাল আমরা যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে সংকল্প করিলাম, পরে তাঁহাদের উৎসাহানুসারে এই পত্রের পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট হইবে।"

"আমাদিগের লিখিবার প্রণালীবিষয়ে পণ্ডিতমহাশয়দিগের অসন্তুষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু তরসা করি তদ্‌বিষয়ে তাঁহারা এতৎপত্রের লক্ষ্য স্মরণ করতঃ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। যাহাতে সাধারণ জনগণে অনায়াসে বিদ্যা লাভ করে, যাহাতে বালক ও বালিকাগণ পরমবোধে ক্রীড়াচ্ছলে এই পত্র পাঠ করিয়া আপন আপন জ্ঞানবিস্তার করে, যাহাতে মূর্খগণ ইন্দ্রিয়োদ্দীপক গ্রন্থসকল পরিহারপূর্ব্বক উপকারক বিষয়ের চর্চা করে, যাহাতে বৃদ্ধ ব্যক্তি তুষ্টিজনক সদালাপ করিতে সমর্থ হয়েন, এমত উপায় প্রদান করা এই পত্রের লক্ষ্য, এবং ঐ মানসসিদ্ধার্থে যাহাতে এই পত্র সকলেই অনায়াসে পাঠ করিতে পারেন ইহা আমাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য। পণ্ডিত মহাশয়েরা অপভ্রংশ ও অপর ভাষা অনায়াসে বুঝিতে পারেন, কিন্তু সুকঠিন সাধুভাষা উপদেশবিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তির কদাপি বোধগম্য হইতে পারে না; অতএব অপভ্রংশ মিশ্রিত প্রচলিত ভাষা যাহা ভদ্রসমাজের কথোপকথনে সর্ব্বদা ব্যবহার হইয়া থাকে তাহাই এই পত্রের উপযুক্ত পরিচ্ছদ।"

পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যায়ই প্রথমে ১৬খানি করিয়া পৃষ্ঠা থাকিত এবং কিঞ্চিৎ বড় অক্ষরেই ছাপা হইত। বস্তুতঃ সাধারণ জ্ঞান বিস্তার ও রচনাপ্রণালীর দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে সে যুগে "সত্যার্ণবে"র পর "বিবিধার্থসংগ্রহ"কেও

* এই পত্রিকার প্রকাশের তারিখ Rev. James Long-এর Catalogue-এ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উহা ঠিক নহে। আমরা Imperial Library-তে এক বৎসরের "বিবিধার্থসংগ্রহ" সম্পূর্ণই দেখিতে পাইয়াছি। ইহার প্রথম সংখ্যায় লিখিত তারিখ দৃষ্টে জানা যায় যে, কাগজখানি ১৭৭৩ শকাব্দের কার্ত্তিক মাসে অর্থাৎ ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের October– November-এর মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল।

* প্রস্তাবনায় পত্রিকার মূল্য দুই আনা উল্লেখ করা হইলেও পরে উহা বৃদ্ধি হইয়া প্রতি সংখ্যা তিন আনা হয়।

আংশিকরূপে শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ১৭৭৩ হইতে ১৭৭৬ শকাব্দ পর্য্যন্ত নিয়মিত-ভাবে তিন বৎসর চলিবার পর দুই বৎসর পত্রিকা বন্ধ থাকে ও ১৭৭৯ শকাব্দে পুনরায় প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ ১৭৮২ শকাব্দের পর আর উহার পুনরাবির্ভাব ঘটে নাই।*

"বিবিধার্থসংগ্রহ" প্রকাশের পর সুদীর্ঘ ২৭ বৎসর কাল যাবৎ কলিকাতা ও ঢাকা, ময়মনসিংহ ইত্যাদি মফঃস্বল অঞ্চল হইতে বহু সংবাদপত্র ও পত্রিকার সৃষ্টি হয়।† কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, মাত্র একজন ছাড়া ঐ সকল পত্রিকার প্রকাশক ও পরিচালকবৃন্দের মধ্যে অপর কেহই এই সময়ে প্রধানতঃ শিশুদের উদ্দেশ্যেই লিখিত কোন সাময়িক পত্র প্রকাশের চেষ্টা করেন নাই। বস্তুতঃ এই শ্রেণীর পত্রিকার অভাবে, অধিকন্তু অবসর বিনোদন ও জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক বিদ্যালয়ের পাঠ্যাতিরিক্ত কোন পুস্তকাদি না থাকায়, তৎকালে সাধারণ সাহিত্যের অঙ্গীকৃত হইয়াই শিশুসাহিত্য একরূপ গড়িয়া উঠিতেছিল এবং অনুসন্ধানী শিশুমন কখনও বা রামায়ণ-মহাভারত শ্রেণীর অনুবাদ-গ্রন্থাদি হইতে, কখনও বা খ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দের সহজবোধ্য মনোহর রচনাবলী হইতে রসগ্রহণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিত। শিশুসাহিত্যের এই দৈন্য লক্ষ্য করিয়া এদেশের বালকবালিকাগণের উপযুক্তরূপ মানসিক উৎকর্ষসাধন ও তাহাদের প্রাণে আনন্দদানের জন্য যিনি সর্ব্বপ্রথমে শিশুপত্রিকা প্রচারের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন সেই মহাপুরুষের পবিত্র নাম আজ তাঁহার মহাপ্রয়াণের অর্দ্ধশতাব্দী পরে শিশুপত্রিকার ইতিহাস লিখিতে বসিয়া একান্ত শ্রদ্ধাবনত শিরে স্মরণ করি। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন এবং তাঁহার অতিপ্রিয় শিশুপত্রিকা-খানির নাম "বালকবন্ধু"। "বালকবন্ধু"প্রকাশের পূর্ব্বে কেশব-চন্দ্র সুবিখ্যাত ইংরাজী দৈনিক "ইণ্ডিয়ান মিরর", বাংলা সাপ্তাহিক "সুলভ সমাচার" ও "পরিচারিকা"-নামক মাসিক পত্রিকা প্রচার এবং জীবনে আরও অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা ও অতুল কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে বড়ই ভালবাসিতেন এবং যাহাতে তাহারা শৈশব হইতেই উপযুক্তরূপ শিক্ষালাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে "শিশু-বিদ্যালয়ের" ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

---

* বিবকোষে দ্রাঃ ব্রাহ্মসমাজের বিবরণ-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ দেখা গেলে মনে হয় যে, পত্রিকাখানি ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। আমরা অনুসন্ধানে কিন্তু ঠিক তাহার পরিচয় প্রথম প্রকাশ কাল ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ লিখিত হইয়াছে। ( বিবকোষ, ষোড়শ ভাগ, পৃষ্ঠা ৪১০-৪১১ )। ইহা খুবই সম্ভব যে, বিবকোষের লেখক ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের পাক্ষিক "বিবিধার্থ সংগ্রহের" কোন সংখ্যা দেখিবার সুযোগ পান নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তালিকা হইতে জানা যায়, উক্ত গ্রন্থাগারে ১৭৮২ শকাব্দ পর্য্যন্ত এই পত্রিকার কয়েকখানি সংখ্যা সংগৃহীত হইয়াছে, এবং ঐ তালিকায় পত্রিকার সংখ্যাগুলির যে নম্বর উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইতেই অনুমান হয় যে, ১৭৭৭ ও ১৭৭৮ শকাব্দে উহার কোন সংখ্যা ছাপা হয় নাই।

† "বিবিধার্থসংগ্রহ" প্রকাশের পর "বালকবন্ধু"র আবির্ভাবের পূর্ব্ব, অর্থাৎ ১৮৫১ হইতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই সাতাশ বৎসরের মধ্যে, এ দেশে প্রায়শিক কাগজ-পত্র হইতে বর্ত্তমানে প্রকৃত লিখিবার সময় পর্য্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে, ৭৭ খানি সংবাদপত্র ও পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত Long সাহেবের Return-এ আরও ছয়খানি পত্রিকার নাম পাওয়া যায়, ঐগুলি ১৮৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দে ( বাংলা ১২৬০ সালে ) প্রচারিত ছিল, কিন্তু কখন প্রথম প্রকাশিত হয় জানা যায় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তালিকায় উহাদের নাম নাই। "A Hundred Years of the Bengali Press"-নামক পুস্তকেও ঐ পত্রিকা কয়খানির কোন উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। পূর্ব্বোক্ত ৭৭ খানি পত্রিকার মধ্যে অধিকাংশই কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইলেও, চার খানি যে মফঃস্বল অঞ্চল হইতে প্রচারিত হয় তাহা বিশেষভাবেই জানা যায়। ইহার মধ্যে দুই খানি, "অবলা" ও "বিজ্ঞানতরঙ্গিণী" ( মাসিক ) ময়মনসিংহ হইতে যথাক্রমে ১২৭৩ ও ১২৭৭ সালে এবং "অরুণ" ( মাসিক ) ঢাকা হইতে ১২৮১ সালে প্রকাশিত হয়। "অনুসন্ধান পত্রিকা" প্রধানতঃ বাংলা ভাষার সাপ্তাহিক পত্রসমূহে সময়ের মধ্যে মাসিক অনুসন্ধানের নামক গ্রন্থ হইতে ১২৭৭ সালে ( ১৮৭০ খৃঃ অঃ ) প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, এদেশে সংবাদ-সাহিত্য তখন কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহা দেখাইবার জন্যই আমরা এস্থলে পত্রিকাগুলির মোট সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছি, সম্পূর্ণ তালিকাটি উদ্ধৃত করি নাই। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা, আজকাল সংবাদপত্রাদির আলোচনায় কোন কোন লেখক ভুলবশতঃ উহাদের প্রতিষ্ঠা ও শক্তি বিশেষভাবে করিয়াছেন এবং প্রধানতঃ তাঁহাদেরই চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে আমরা এখন সেকালের অনেক লুপ্ত ও অজ্ঞাত পত্রিকাদির সন্ধান পাইতেছি। সুতরাং কালক্রমে নূতন আবিষ্কারের ফলে আমাদের পূর্ব্বোক্ত সংখ্যাটির হয়ত কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। তাহাই কেহ কেহ আমাদের প্রদত্ত হিসাবকেই চূড়ান্ত বলিয়া মনে না করেন।

### বালকবন্ধু ( ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ )

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে "বালকবন্ধু" প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন এবং সেখানে অবস্থান কালে লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, সে দেশের বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য বহু সুন্দর সুন্দর সচিত্র মাসিক পত্রিকা আছে, কিন্তু বাংলা দেশে তাহার নিতান্তই অভাব। দেশীয় শিশু-সাহিত্যের এই দৈন্য তাঁহার মত প্রতিভাশালী ব্যক্তি কখনও অবহেলা করিতে পারেন নাই। স্বদেশের বালক-বালিকাগণের হিতচিন্তা তাঁহাকে এরূপ ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল যে, তিনি শত কার্য্যের মধ্যেও অল্প সময়ে এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন। কেশবচন্দ্রের অসুস্থতার জন্যই হউক, বা সাধারণের উৎসাহের অভাবেই হউক, পত্রিকাখানি নিয়মিত প্রকাশিত হইতে পারে নাই; কিছু দিন পরে উহা বন্ধ হইয়া যায়। আবার দশ বৎসর পর ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ( কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পর ) কেশবচন্দ্রের অনুরাগিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও চেষ্টায় উহার "নূতন প্রকরণ" প্রকাশিত হয়। শিশুসাহিত্যের সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে "বালকবন্ধু"ই যে সর্ব্বপ্রথম খাঁটি শিশু-পত্রিকা এবং ইহার পূর্ব্বে যে এদেশে বালক-বালিকাগণের উপযোগী একখানিও কাগজ ছিল না এ বিষয়ে প্রমাণ আছে।*

"বালকবন্ধু" অতি অল্পকাল জীবিত থাকিলেও, ইহার আবির্ভাবে শিশুসাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তন হয় এবং এই সময় হইতেই দেশীয় শিশুপত্রিকার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। দেশের কতিপয় শিক্ষিত শিশু-দরদী মহাপ্রাণ ব্যক্তির চেষ্টায় কয়েক বৎসরের মধ্যে পর পর "সখা" (১৮৮০), "বালক" ( ১৮৮৫ ), "সাথী" ( ১৮৯০ ) ও "মুকুল" ( ১৮৯৫ ) এই কয়খানি শিশু-পত্রিকা আত্ম-প্রকাশ

* "সন্ধানে"র মত এই পত্রিকার সংখ্যাগুলিও আজকাল পাওয়া কঠিন। কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, বেঙ্গল লাইব্রেরী ও রামমোহন লাইব্রেরীর মত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারগুলিতেও অনুসন্ধানে ইহার কোন সংখ্যা মিলে নাই। শ্রীযুক্ত বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ গ্রন্থাগারে কয়েকখানি সংখ্যা রক্ষিত আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহা ছাড়া কাহারও পারিবারিক গ্রন্থাগারে ইহার কোন সংখ্যা আছে কি না বলিতে পারি না। পত্রিকাখানির সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁহার "মুদ্রণ সমাচার ও কেশবচন্দ্রের লাইব্রেরী" নামক পুস্তকে ও তৎসম্পাদিত "কৈশোরক" পত্রিকায় ( অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩ সাল ) কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। মূল পত্রিকার সংখ্যাগুলির অভাবে এক্ষেত্রে আমাদের যোগেন্দ্রবাবুর আলোচনার উপর কতকটা নির্ভর করিতে হইয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয়, এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া পত্রিকাখানির মূল সংখ্যাগুলি দেখিবার জন্য প্রায় তিন মাস যাবৎ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে হাঁটাহাঁটি করিয়া বহু চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু প্রতিবারই গ্রন্থশালার কর্ম্মচারীগণের নানারূপ ওজর আপত্তিতে আমাদিগকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। অগত্যা নকল মূলে উক্ত গ্রন্থাগারের বাংলা সাময়িক পত্রের একখানি তালিকা সংগ্রহ করিয়াই আমাদের কাজ আরম্ভ করিতে হইয়াছে। যোগেন্দ্রবাবু "বালকবন্ধু"র প্রথম প্রকাশ কাল ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ ও উহার "নূতন প্রকরণ" প্রকাশের সময় ১৮১১ শকাব্দ ( ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং একথাও বলিয়াছেন যে, দুইবারই কাগজখানি মাসিকপত্রাকারে আবির্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু সাহিত্য পরিষদের তালিকানুযায়ী জানা যায় যে, প্রথমবারের "বালকবন্ধু" পাক্ষিকপত্র ও উহার প্রকাশ কাল ১৮০০ শকাব্দ এবং নূতন প্রকরণ প্রকাশের সময় ১৮১২ শকাব্দ। সুতরাং এ স্থলে প্রথমবারের "বালকবন্ধু"র সংস্করণ সম্বন্ধে যোগেন্দ্র বাবুর সহিত পরিষৎ তালিকাকারের স্পষ্ট মতভেদ হইয়াছে। আর, এই কাগজখানির সম্পর্কে যোগেন্দ্র বাবুর ও পরিষৎ তালিকার দুই সময়ের মধ্যে সামঞ্জস্য চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, পত্রিকাখানি পৌষসংক্রান্তির আশেপাশি হইতে চৈত্রসংক্রান্তির মধ্যে যে কোনও সময় প্রকাশিত হইয়াছিল। "নূতন প্রকরণ" সম্বন্ধে যোগেন্দ্রবাবু কিছু বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন, এবং উহার প্রথম সংখ্যা হইতে কিছু কিছু অংশও উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই কারণে নামকরণ সম্বন্ধে যোগেন্দ্রবাবুর ও পরিষৎ-তালিকাকারের মতৈক্য দেখা গেলেও, যোগেন্দ্রবাবু ঐ উদ্ধৃত অংশের একটি স্থল হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পরিষৎ-তালিকা যে প্রথমবার ও দ্বিতীয়বারের "বালকবন্ধু"র সময় নির্দ্দেশে ১২ বৎসরের ব্যবধান করা হইয়াছে তাহা ঠিক হয় নাই। ঐ উদ্ধৃত অংশটি হইতে এই প্রমাণও পাওয়া যায় যে, "বালকবন্ধু"ই এ দেশের প্রথম শিশুপত্রিকা। যোগেন্দ্রবাবুর নিজের উক্তিসহ আমরা এ স্থলে প্রয়োজনমত উক্ত উদ্ধৃত অংশটি পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

"আবার দশ বৎসর পরে ১৮১১ শকে ( ১৮৮৯ খৃঃ অঃ ) উহা কলিকাতা হইতে 'নূতন প্রকরণে' প্রকাশিত হয়। সেই নূতন প্রকরণ 'বালকবন্ধু'র

কয়েক বৎসর প্রকাশিত হয়। বড়ই দুঃখের বিষয়, বাংলা-দেশের অনেক পত্রিকার ভাগ্যেই যাহা ঘটে, এই পত্রিকা-গুলির ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই; ইহার মধ্যে একখানিও আজ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া স্বীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হয় নাই। অথচ "মুকুল" পত্রিকাখানি এখন চতুর্দ্দশ বৎসর যাবৎ নব পর্য্যায়ে বাহির হইতেছে এবং ইহারই মধ্যে পর পর তিন ব্যক্তি উহার সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্তা বাসন্তী চক্রবর্ত্তীর সুযোগ্য সম্পাদনায় কিছুদিন যাবৎ পত্রিকাখানি নিয়মিত-রূপে প্রকাশিত হইতেছে। এই পত্রিকাগুলির সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিলেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শিশু-পত্রিকার ইতিহাস সম্পূর্ণ হইবে। আজ এই পর্য্যন্ত বলি-লেই যথেষ্ট হইবে যে, সেকালে এই পত্রিকাগুলি নিপুণ হস্তে পরিচালিত হইয়া উপযুক্তরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। "সখা"র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বর্গত প্রমদাচরণ সেন। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র, বাংলা গভর্ণমেণ্টের তৎকালীন অনুবাদক সুপণ্ডিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর এ. ডব্লিউ. ক্রফ্‌ট সাহেব "সখা"র যেরূপ উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন তাহা হইতেই কাগজখানির সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। * ইহার লেখকবর্গের মধ্যে ছিলেন "সন্দেশে"র প্রতিষ্ঠাতা ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, ৺কাদম্বিনী রায় (তৎকালে সেন), ৺নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ খ্যাতনামা শিশু-সাহিত্যিকগণ। "সখা" এক সঙ্গে পিতামাতার উপদেশ ও শিক্ষকের শিক্ষা দুই-ই প্রদান করিত। বালকবালিকাগণকে যথার্থ মানুষ করিয়া তোলাই ছিল ইহার লক্ষ্য। "বালক" বিদেহরূপে কলিকাতার ঠাকুরবাড়ীর পারিবারিক কাগজরূপেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, সরলা দেবী ও দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনায় এবং যুবক রবীন্দ্রনাথের নাটক ও কবিতাসম্ভারে উহার কলেবর পুষ্ট হইত। "বালক" অবশ্য তখন নামে মাত্র বালক, বস্তুতঃ ইহা প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকগণেরই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল। আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন "মুকুলে"র সম্পাদক। উহার লেখকশ্রেণীর মধ্যেও রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর, ৺নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৺যোগীন্দ্রনাথ সরকার, ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ৺জগদীশচন্দ্র বসু, ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রভৃতিদের নাম পাওয়া যায়। এক্ষণে এই পত্রিকাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়ই মাত্র দেওয়া হইল, বারান্তরে আমরা এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

---

প্রথম সংখ্যার সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন, ( যোগেন্দ্রবাবুর উক্তি ) :—"অনেক দিনের পর আমরা আবার "বালকবন্ধু" বাহির করিলাম, এদেশে বালকবালিকাদিগের উপযোগী একখানিও কাগজ ছিল না; সেই অভাব-মোচনের জন্য বালকবন্ধু প্রকাশিত হয়।.....বরাবর চলিলে বালকবন্ধুর এতদিনে প্রায় দশ বৎসর পূর্ণ হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাঝে মাঝে বন্ধ হওয়ায় বালকবন্ধু আপনার কর্ত্তব্য করিতে পারে নাই।" ( উদ্ধৃত অংশ )। যোগেন্দ্রবাবুর নির্দ্ধারণ, 'নূতন প্রকরণে' সম্পাদকের এই মন্তব্য ও পত্রিকা-তালিকার লেখায় যে বিরোধ দেখা যাইতেছে আমরা আপাততঃ তাহার মীমাংসা করিতে অসমর্থ। বলা বাহুল্য, সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত সাময়িকপত্রে অধীকৃতি জ্ঞাপনই আমাদের এই অসমর্থতার কারণ। আশা করি, পরিষৎ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে আলোকসম্পাত করিয়া ইতিহাসসেবিক সাহিত্যিকগণের কৌতূহল নিবৃত্ত করিবেন।

* "সখা"—১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

---

৭

## জীবিকা-সমস্যা

...মোটের উপর যাহাতে সমাজের যাহারাও কোন অনিষ্ট না হইতে পারে, যাহাতে এমন কোন শারীরিক অথবা মানসিক পরিশ্রম না করিয়া কেহ যাহাতে অর্থোপার্জ্জন না করিতে পারে অনুরূপ ব্যবস্থা যে বর্ত্তমান সমাজদেহে প্রচলিত নাই এবং তাহারই ফলে ধনিক ও মধ্যবিত্তশ্রেণী যে সর্ব্বনাশকরে উৎসন্ন যাইতেছে, তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে।...

# গ্রীক ট্র্যাজেডি

—শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজিক সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই তার অবতরণিকাটা করতে হয় বড় বড়। কেন না, এতগুলি সহস্রাব্দীর এপিঠে আর ওপিঠে আমাদের এবং প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজিক কাব্যের যুগ যে, গ্রীকদের সমসাময়িক ইতিহাস এবং দর্শন, নীতি এবং ধর্মসংক্রান্ত আদর্শগুলির সঙ্গে আমাদের অন্ততঃপক্ষে খানিকটা পরিচয় না থাকলে এই প্রাচীন সাহিত্যের মর্মের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। অনেকগুলি জিনিষই মনে রাখা প্রয়োজন এই সাহিত্য বুঝতে গেলে; তার মধ্যে যেমন ধরুন, প্রথমেই একটা জিনিষ মনে রাখা প্রয়োজন যে, গ্রীক ট্র্যাজিক-সাহিত্য, খৃষ্টান সাহিত্য নয়—'পেগান' সাহিত্য।

বহু ঈশ্বরবাদ প্রাচীন গ্রীকদের আধ্যাত্মিক ধারণার মজ্জাগত ছিল, সুতরাং এই ট্র্যাজিক সাহিত্যেরও নৈতিক এবং ধর্মসংক্রান্ত আদর্শ সেই 'পেগানিজম্'-এর কাঠামোর তৈরী। গ্রীক ট্র্যাজিক সাহিত্যের বিলোপেরও প্রায় চারশ' বছর পরে খৃষ্ট ধর্মের গোড়াপত্তন হয়। খৃষ্ট ধর্মের যে আধ্যাত্মিক আদর্শ আজ পর্যন্ত ইয়োরোপীয় সাহিত্যে চলে এসেছে—গ্রীক সাহিত্যের উত্থান ও পতন সেই ধর্মবাদ এবং সেই আদর্শবাদের বহু পূর্বেকার। সুতরাং খৃষ্টীয় আদর্শ এবং চিন্তাধারার ছাপ এই সাহিত্যে একদম নেই—যে ছাপের সঙ্গে আমরা, ভারতবাসীরা, জাতিগত ভাবে খৃষ্টান না হয়েও যথেষ্ট ঘরোয়া রকম ভাবে পরিচিত হয়ে আছি ইয়োরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধে। সুতরাং এ সাহিত্য বুঝবার আগে আমাদের পেরিয়ে যেতে হবে খৃষ্টধর্মের গণ্ডী, খৃষ্টান আদর্শের গণ্ডী,—পেরিয়ে যেতে হবে রেনেসাঁস-রেনেসাঁস, এমন কি অন্ধকার 'মধ্যযুগ।' আমাদের গিয়ে পৌঁছতে হবে সেই 'পেগান' যুগে, যার ধর্মন ভেঙে ফেলে দিয়ে জন্ম হয়েছে খৃষ্টধর্মের। বিশ্ব-প্রকৃতি, ইহকাল ও পরকাল, এবং মানব-প্রকৃতির সেই 'পেগান' ধারণাগুলির সম্যক্ পরিচয় ছোলো প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের আঙিনায় পৌঁছবার চৌকাঠ।

'ট্র্যাজেডি' শব্দটা বিদেশী হলেও আমাদের কাছে নিতান্ত অপরিচিত নয়। ট্র্যাজেডি এবং কমেডি, এই দুই 'জেনেরে'-এর কোন্‌টি আপনি কোন্ নাটকের পিঠে মেরে দেবেন, তার একমাত্র উপায় আমরা ধরে থাকি যে, নাটকের শেষ মৃত্যু বা বিয়োগান্ত ব্যাপার কি না। অর্থাৎ 'অন্ত'-জিনিষটুকুই ট্র্যাজেডি বা কমেডি নির্দেশ করে দেয়—'অন্ত' বাদ দিলে দুটো জিনিষই আসলে প্রায় একরকম, কিন্তু গ্রীক ট্র্যাজেডি এবং কমেডির মূল সুর এরকম একেবারেই নয়। গোড়ীয়ত সাদৃশ্যই নেই এদের ভেতর। ট্র্যাজেডি এসেছে ধর্মোৎসবের উপলক্ষ থেকে—ট্র্যাজেডির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন সুন্দরবসনপরা পেশাদারী অভিনেতারা! আর কমেডির উৎপত্তি হয়েছে ফসল তুলবার উৎসব ইত্যাদি উপলক্ষে গ্রামবাসীদের মুখোস পরা সঙের হৈ-হল্লা থেকে।

আরিস্টটল্ বলেছেন, ট্র্যাজেডি এসেছে 'ডিথাইরাম্ব' (Dithyramb=কোরাস্ সঙ্গীত) থেকে—আর কমেডি এসেছে 'ফ্যালিক্' (Phallic) উৎসব থেকে। সুতরাং গ্রীক ট্র্যাজেডি এবং কমেডির মূল সুরই স্বতন্ত্র।

মৃত্যু না থাকলেও গ্রীক নাটক 'ট্র্যাজিক্' বলে পরিগণিত হতে পারে। ঈস্‌খাইলাসের (Æschylus) 'ইউমেনেডিস্' বা 'The Furies'-নাটককে উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। ওরেস্‌টেসের মাতৃহত্যার ন্যায়-অন্যায় বিচার এবং তার নিষ্পত্তির ভেতর দিয়েই এই ট্র্যাজেডির সমাপ্তি; সমস্ত নাটকে কোন মৃত্যুই নাই, এবং বংশানুক্রমিক পাপ থেকে Itreus পরিবারের মুক্তি ঘোষণ এই নাটকের মধ্যে। এতে বিশেষ লক্ষণীয় বস্তু এই যে বংশানুক্রমিক পাপ থেকে মুক্তি ঘোষণার ফলে নাটকের শেষ বিষাদ-পূর্ণ নয়, বরং বিষাদময় আবহাওয়া বিতাড়িত হয়ে যায়। তবুও এই নাটক 'ট্র্যাজেডি; কেন না, নাটকের সঙ্কটাপন্ন অবস্থাটা নিঃসন্দেহে ট্র্যাজিক্। ট্র্যাজেডির আরিস্টটল্-নির্দ্ধারিত সংজ্ঞাও এ নাটক সম্পূর্ণভাবে পূরণ করছে,—সুতরাং সর্বতোভাবে এ নাটক 'ট্র্যাজেডি'-পদবাচ্য।

'কমেডি'—আরিস্টটল্ বলেছেন (Poetics-এ), "সাধারণ মানুষের চেয়ে নিম্ন-ধরণের মানুষের চিত্র অনুকরণ করে। 'নিম্ন-ধরণের' অর্থ সব রকম দোষ-সংক্রান্ত নয়,—হাস্যাস্পদ, যেটা কুৎসিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, শুধুমাত্র সেই বিশেষ প্রকার-সংক্রান্ত। হাস্যাস্পদকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে: সেটা একটা ভুল বা অঙ্গহীনতা এবং অন্যের কষ্ট বা ক্ষতিকারক নয়; যেমন মুখোস দেখলে হাসি আসে—সেটা একটা কুৎসিত এবং অপ্রকাশিত জিনিষ, কিন্তু কষ্টদায়ক কিছু নয়।"

ট্র্যাজেডি সম্পর্কে আরিস্টটল্ বলেছেন, "ট্র্যাজেডি কোন ঘটনাকে অনুকরণ করে, যেটা গুরুত্বপূর্ণ এবং মহত্ত্ব থাকায় সম্পূর্ণ। ভাষার দিকে ট্র্যাজেডি রম্য আনুষঙ্গিকে সমন্বিত—যা'র প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ভাবে যোজনা করা হয়েছে;—গঠনের দিকে নাটকীয়—বিবরণীর মত নয়। এবং সেই ধরণের ঘটনা ট্র্যাজেডিতে থাকে যা বেদনা এবং ভয়ের সৃষ্টি করে' তাদের 'ক্যাথার্সিস্ (Catharsis)' সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়।" 'রম্য আনুষঙ্গিক' বলতে ছন্দ এবং সঙ্গীতের আবহাওয়াটাকে মনে করেছেন, এভাবে আরিস্টটল্ নিজেই নির্দেশ দিয়ে গেছেন। আর 'ক্যাথার্সিস্' বলতে ঠিক কি মনে করা হয় এ নিয়ে পণ্ডিতবর্গের ভেতর অসংখ্য বাদানুবাদ হয়ে গেছে। মোটামুটি ভাবে আমরা ধরে নিতে পারি 'ক্যাথার্সিস্' মানে হচ্ছে—Purification বা Purgation, অর্থাৎ শুদ্ধিকরণ বা পাপমোচন জাতীয় ব্যাপার। গ্রীক ট্র্যাজেডির প্রাথমিক উদ্দেশ্যই হচ্ছে চিত্তশুদ্ধি। জীবনের সুউচ্চ স্থানে অবস্থিত যারা—যাঁদের সব মানুষ শ্রদ্ধা করে এসেছে, যেমন অ্যাগামেম্ন বা আগামেমনন্-এর মত প্রসিদ্ধ বীর—জনগণের নায়ক যাঁরা এবং যাঁদের তুলনায় আমরা কিছুই নই, তাঁদের মত লোকেরও কি ভীষণ ভাগ্যবিপর্যয় আসতে পারে সেটা আমাদের চোখের সামনে অভিনয় করে দেখিয়ে হৃদয়ে বেদনা এবং ভয়ের সৃষ্টি ক'রে আমাদের চিত্তশুদ্ধি করানো হয়। ঐ রকম ঘটনার অভিনয় দেখবার পর থেকে নিজেদের মনের পাপকে যাতে খুব করে ঘেন্না করতে পারি এবং দেবতাদের চিরন্তন নিয়ম সর্বাংশে মেনে চলতে পারি—যা'তে অতিরিক্ত কিছু করতে না যাই এবং প্রাচীন উপদেশ অনুসারে নিজেদের জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তদনুযায়ী চিত্তশুদ্ধির ব্যবস্থা হয়। এই যে গণ্ডীর ভেতর থাকা, কোনও বিষয়েই অতিরিক্ত কিছু না করা, এবং সমস্ত মনোবৃত্তিগুলি সর্বদা সংযত রাখা, যাতে বহিঃপ্রকৃতির নিয়ম এবং দেবতাদের বিধিনিষেধ কখনও ক্ষুণ্ণ না হয়,—এইগুলিই প্রাচীন গ্রীকদের এবং গ্রীক ট্র্যাজেডির বিশেষ অনুশাসন।

তা' হলে দেখা যাচ্ছে ট্র্যাজেডির উৎপত্তি হচ্ছে কোনও একটা 'Hubris'—অর্থাৎ কোনও একটা অতি দৃঢ় অভিলাষের স্বেচ্ছাচারিতা থেকে—যে অভিলাষ, বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়েই হোক বা হৃদয়াবেগের দিক থেকেই হোক, তা'র অপেক্ষা দৃঢ়তর—বহিঃশক্তি, পারিপার্শ্বিকতা কিংবা চিরন্তন নিয়ম বা দেবতাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছে। এরকম অভিলাষ বা Hubris-ই ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করে; সেই জন্যই ট্র্যাজিক নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে 'ক্যাথার্সিস'-সম্পন্ন করা। অর্থাৎ ভয় ও বেদনার সৃষ্টি করে' আমাদের হৃদয় শাসন করা এবং হৃদয় থেকে পাপমোচন ক'রে আমাদিগকে নিয়মানুগ করে তোলা। আরিসটটল্-এর মতে ট্র্যাজেডির কাজই হচ্ছে শুধু ঘটনাচক্র এবং জীবন, সুখ এবং দুঃখ,—এইগুলিকে বিচিত্র করে যাওয়া, কেন না, তাঁর মতে মানুষের সবরকম সুখ এবং চরিত্র-অঙ্কন ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য নয়—চরিত্র সৃষ্টি করা হয় শুধু ঘটনাকে দেখাবার জন্য।

প্রাচীন গ্রীকদের ধারণাই হচ্ছে এই যে, অতিরিক্ততা সব সময়েই দেবতাদের ক্ষুণ্ণ করে; সুতরাং তাঁরা পাঠিয়ে থাকেন শাস্তিস্বরূপ 'নেমেসিস' বা পরিণতিকে। যত বড় ব্যক্তিই তিনি হন, 'নেমেসিস'-এর ফলে ভাগ্যবিপর্যয় তাঁকে সহ্য করতেই হবে। কেন না, তা' দেবতাদের অভিপ্রেত এবং তাঁর নিজের কৃত অতিরিক্ততারই ফল।

এই যে পাপমোচন করার উদ্দেশ্য গ্রীক ট্র্যাজেডিতে চলে এসেছে, সেটা অনেকটা ঐতিহাসিক কারণে। ট্র্যাজেডির উৎপত্তি যে ধর্মানুষ্ঠানে তা'র প্রাথমিক উদ্দেশ্য হেরোডোটাসের নির্দেশমতে গ্রীক-দেবতা ডাইনিসাস-এর কষ্টভোগ এবং হৃদয়াবেগ দেখাবার জন্য। এই কষ্টভোগগুলি কি তা' আমরা ঠিক মত জানতে পারি না। কিন্তু হেরোডোটাস্ বলছেন, অবিকল অনুরূপ অনুষ্ঠান তিনি ইজিপ্টে দেখেছেন। সেটা ইজিপ্টের দেবতা ওসিরিস্-এর অনুষ্ঠান। এই

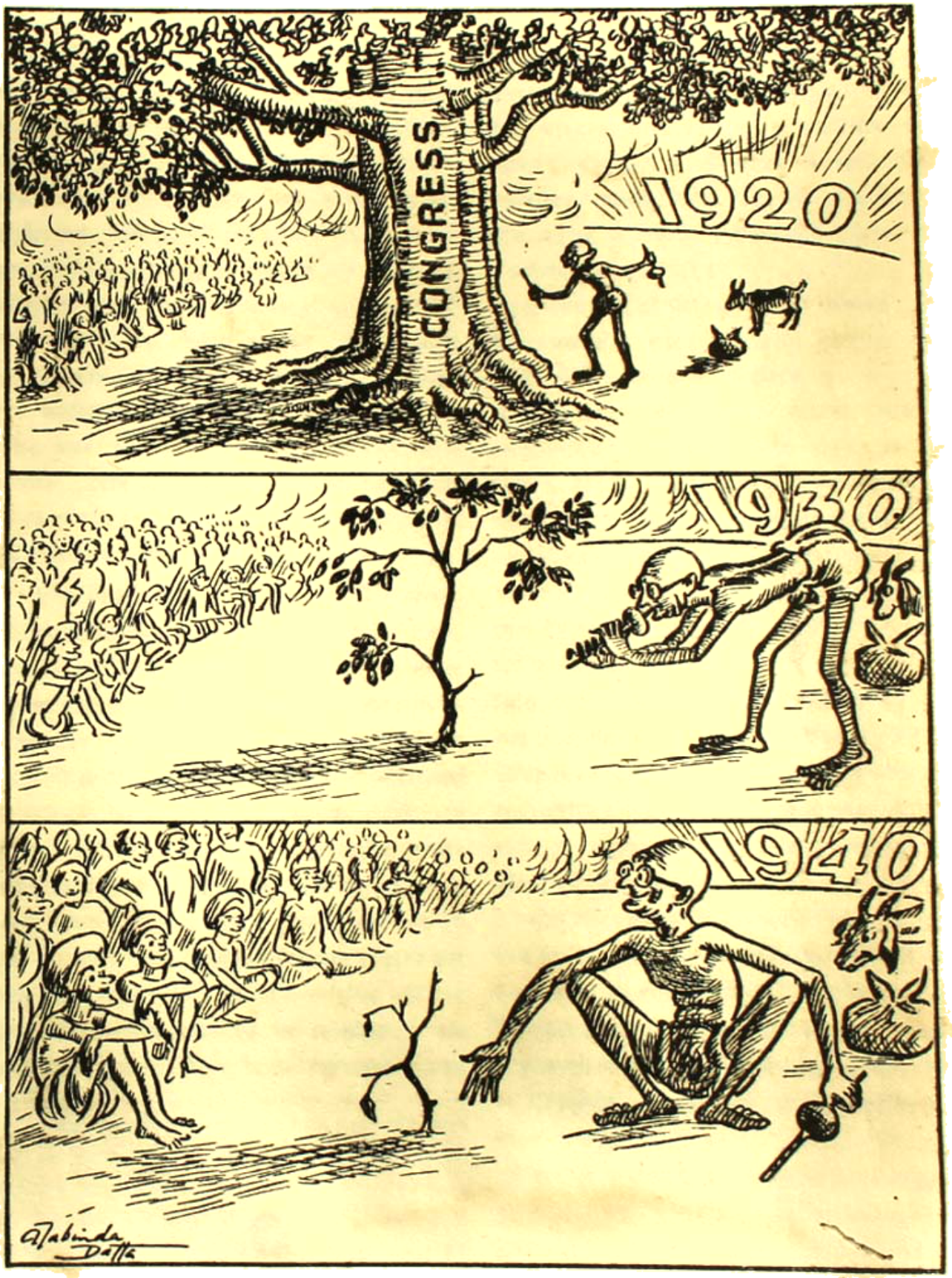


বাঙ্গীকর

ধর্মানুষ্ঠানে যেখানে হোত ওসিরিস্‌কে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলা হয়েছে, তাঁর জন্য শোক করা হচ্ছে, তাঁকে খোঁজা হচ্ছে, তাঁকে পাওয়া গেল এবং সকলে তাঁকে পেয়ে চিহ্নিত পাইল।* অর্থাৎ এতক্ষণের শোক প্রকাশ অকস্মাৎ আনন্দোচ্ছ্বাসে পরিণত হয়ে গেল। এই খুঁজে পাওয়া এবং বিপর্য্যয় থেকে আরিস্‌টট্‌ল্‌-নির্দ্দিষ্ট দুটি শব্দ—Anagnorisis এবং Peripeteia আসছে। অধ্যাপক বাইওয়াটার এই দুটি শব্দের অনুবাদ করছেন, 'Discovery' এবং 'Peripety' এবং অধ্যাপক বুচার অনুবাদ করেছেন, 'Recognition' এবং 'Reversal of Fortune'। এই দুটি শব্দের মোটামুটি অর্থ ওসিরিস্‌-এর উপরোক্ত বিবরণ থেকেই ধারণা করা যায়; প্রথম শব্দ 'খুঁজে পাওয়া' এবং দ্বিতীয় শব্দ 'ভাগ্য-বিপর্য্যয়' (যেমন উপরোক্ত ক্ষেত্রে শোকের পর অকস্মাৎ আনন্দ আসছে)। আরিস্‌টট্‌ল্‌-এর নির্দ্দেশ অনুসারে এই দুটি জিনিষই ট্র্যাজেডির প্লট গঠনে অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ।

ট্র্যাজেডির প্লটে বিশেষ লক্ষণ হিসাবে তিনটি সামঞ্জস্য বা Unity নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। এইগুলি হ'চ্ছে Unity of Hero, Action এবং Time,—অর্থাৎ নায়ক, ঘটনা এবং সময়ের সামঞ্জস্য থাকা চাই। আমাদের আধুনিক নাটকের অভিনয় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অনেক সময় হয়তো বহুবর্ষব্যাপী ঘটনাবলী দেখানো হয়। গ্রীক নাটকে এ প্রথা বিধিবহির্ভূত ছিল। তাঁদের নিয়মানুসারে অভিনয় হতে যতক্ষণ সময়ের দরকার হয়—নাটকের বর্ণিত ঘটনা ঘটবার স্বাভাবিক সময়ও ঠিক ততক্ষণের ভেতর হওয়া চাই। এর ফলে আমাদের আধুনিক নাটকে যেমন অনেক সময়ে দুটি দৃশ্য বা অঙ্কের মধ্যে অনেকগুলি দিন, মাস বা বৎসর চলে যায়, গ্রীক নাটকে তেমন হয় না। আধুনিক নাটকে এ রকম ব্যাপার মোটেই অস্বাভাবিক নয় যে নাটকের গোড়ায় যাকে খোকা দেখলাম তাকেই আবার খোকাখুকী পরিবৃত বয়স্ক সাংসারিক দেখি। এক দৃশ্যে বিয়ের কথাবার্ত্তা ঠিক হোল, পরবর্ত্তী দৃশ্যেই দেখা গেল সুখী স্বামী-স্ত্রী হিসাবে তাঁরা আমাদের সামনে ঘর-সংসারের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। গ্রীক্ নাটকে ঘটনা-চক্রেই এ রকমের আবর্ত্তন অস্বাভাবিক, অতএব নিষিদ্ধ, বলে গণ্য হোত। তাঁদের রীতি অনুযায়ী অভিনয়কাল এবং অভিনীত ঘটনার কাল ঠিক সমান সমান হওয়া চাই।

নাটকের উপর এই রীতির ফল বিশেষ লক্ষণীয়। এই রীতির জন্য গ্রীক্ নাটকে অবান্তর বা ঘর-সংসার দৃশ্য না দেখিয়ে ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে আসা হয়। এই দ্রুতগতির জন্য নাটকের আবহাওয়া হোত ঘনীভূত এবং নাটকের ভিতর থাকত একটা শক্ত বাঁধুনী। আধুনিক মনকেও এই রীতি আকর্ষণ করেছে, এবং অনেক আধুনিক লেখক—যাঁদের সাহিত্যেই অবশ্য বেশীর ভাগ—তাঁদের উপন্যাসের এবং নাটকেও ঘটনার সময়-কালকে খুব ছোট ক'রে ফেলেছেন। এর জন্য ও ধরণের লেখা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে মনের উপর একটা আকস্মিকতার চাপ পড়ে। গ্রাৎসিয়া ডেলেদ্দার "না", বা ফিকি বাউম-এর "গ্রাণ্ড হোটেল্‌" উপন্যাস দুটিকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। সব রকম কথা-সাহিত্যই অবশ্য এই রীতির ভিতর আনা চলে না, এবং উচিতও নয় একঘেয়েমীর হাত এড়ানোর জন্য। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি যে ঘটনাকে আরও ঘনাট—মনকে আরও অভিভূত ক'রে তোলে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গ্রীক নাটকের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, উপরোক্ত রীতি সম্পর্কে ঈস্‌খাইলাস্‌-এর "আগামেম্‌নন্‌" নাটকের সমতা এবং ভণ্ডার ফেরবার বিরোধীর কথা তাঁদের হয়ত মনে পড়বে। কিন্তু সেই একটা বিশেষ সমতার কথা বাদ দিয়ে আমরা আরিস্‌টট্‌ল্‌-নির্দ্দিষ্ট উপরোক্ত তিনটি সামঞ্জস্য বা Unity-কে গ্রীক্ ট্র্যাজেডির বিশেষ লক্ষণগুলির ভিতর পরিগণিত ক'রে নিতে পারি।

তবে এই সূত্রে একটা কথা মনে রাখা বিশেষ দরকার যে, আরিস্‌টট্‌ল্‌-এর "পোয়েটিক্‌স্‌" বা কাব্য-ব্যাকরণ দেখে গ্রীক্ ট্র্যাজেডি-লেখকরা নাটক লেখেন নাই; বরং ট্র্যাজেডি-লেখকদের রচনাগুলি পর্য্যালোচনা করেই

---

* ওসিরিস্‌-এর উপরোক্ত অনুষ্ঠান থেকে মূল নিয়ে গ্রীসের ডায়োনিসাস্‌ দেবতা এবং তাঁহাদের শোকসভক্ত পরিবার বা অনুচরবর্গের আচরণের কথা তুলনামূলক ভাবে সহজেই মনে আসে। গ্রীক্ দেবতা ডায়োনিসাস্‌-এর নাম শোকপ্রকাশের সঙ্গে বিশেষ ভাবে চর্চ্চিত। অনেকে অবশ্য পূর্ব্বপুরুষ বা প্রাচীন বীরদের জন্য শোকপ্রকাশ বা hero-worship থেকেই গ্রীক ট্র্যাজেডির উৎপত্তি।

অ্যারিস্টট্‌ল্ তাঁর কাব্য-ব্যাকরণের সূত্রগুলি সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। গ্রীক্ ট্র্যাজেডির শ্রেষ্ঠত্ব পার হয়ে যাবার বহুকাল পর তাঁর "পোয়েটিক্‌স্" লিখিত হয়, এবং পূর্ব্বেকার যুগে যে ভাষার চলন ছিল তা'র ব্যবহার তাঁকে করতে হয়েছিল। "পোয়েটিক্‌স্" রচনার সময় যদি খৃঃ পূঃ ৩৩০ অব্দের কাছাকাছি হয়, তা হলে তার মানে হচ্ছে যে, "পোয়েটিক্‌স্" লেখা হয়েছে থেস্‌পিস্-এর প্রথম নাটক এথেন্সে অভিনীত হওয়ার সময় থেকে দু'শ বৎসরেরও বেশী পরে; এবং ট্র্যাজিক্ নাট্য-সাহিত্যের শেষ শ্রেষ্ঠ রচয়িতাদের মৃত্যুর সত্তর বৎসরেরও পরে। "পোয়েটিক্‌স্"-এর নির্দ্দেশগুলি সেই জন্যে সব সময়েই যে সঠিক না-ও হতে পারে তা বলা বাহুল্য। তবে গ্রীক্ সাহিত্য সম্বন্ধে যত রকম তথ্যের আধার হচ্ছে এই প্রাচীন পুস্তকখানি এবং গ্রীক্ ট্র্যাজেডির সম্যক্ আলোচনার দিক দিয়ে এটি সকলেরই বিশেষ সহায়ক। এর কতকগুলি নির্দ্দেশ সেই জন্যেই বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হোল।

গ্রীক্ ট্র্যাজেডির ক্রমবিকাশ এখন পর্য্যালোচনা করলে আমাদের ধারণা আরও পরিস্ফুট হবে। এই নাট্য সাহিত্যের সূত্রপাত হোল খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে থেস্‌পিস্-এর হাতে। ইংরাজী নাটকের আরম্ভের মতই এই নাট্য-সাহিত্যেরও গোড়াপত্তন ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে। ধর্ম্মোৎসব উপলক্ষে গ্রীক দেবতা ডায়োনিসাস বা বেক্‌হাস্-এর সামনে এক রকম ঐকা-সঙ্গীত বা choral odes পাঠ করা হোত। থেস্‌পিস্ এই সঙ্গীতোৎসবে একজন অভিনেতার সৃষ্টি করলেন। এই ভাবে নিছক সঙ্গীতোৎসবের ওপর নাটকীয় রূপ এসে পড়ল। অভিনেতাটি একটি ঘুমোস পরে দর্শকদের সামনে উপস্থিত হতেন, এবং মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে কথা বলতেন। প্রাচীন ভারতীয় নাটকের সূত্রধারের মত 'প্রলোগ্' এবং 'এপিলোগ্' জিনিষটাই তাঁর প্রধান বক্তব্য বস্তু হোত।

থেস্‌পিস্-এর হাতে গ্রীক নাট্য সাহিত্যের এই ভাবে প্রথম সূচনা হলেও গ্রীক নাট্য সাহিত্য তার সত্যকার রূপ এবং মহত্ত্ব বিকাশ পেল পরবর্ত্তী কালের তিন জন নাট্যকারের হাতে। এঁরা হচ্ছেন ঈস্‌খাইলাস্, সফোক্লেস এবং ইউরিপিডেস্। একই গার্হস্থ্য কাহিনীর উপর যেমন তুলসীদাস ও কৃত্তিবাস, এবং আমাদের আরও অনেক প্রাচীন কবি তাঁদের সৃজনী প্রতিভা নিয়োজিত করে গেছেন, গ্রীক্ ট্র্যাজেডির লেখকরাও তেমনই প্রাচীন এবং প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী (Myth) পরিগ্রহণ করে তাঁদের ট্র্যাজিক কাব্য সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু যেমন তুলসীদাসের সৃষ্টি থেকে কৃত্তিবাসের সৃষ্টি সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তেমনই ঈস্‌খাইলাসের সৃষ্টি থেকে সোফোক্লেস বা ইউরিপিডেস্-এর সৃষ্টি অন্য লক্ষণবিশিষ্ট। সেই জন্যই এবার আমরা এই লেখকদের রচনা নিয়ে আলোচনা করছি যাতে এই নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশকে আরো ভাল করে বোঝা যায়।

থেস্‌পিস্ এবং ফ্রাইনিকাস্-এর পুরনো ট্র্যাজেডিতে অভিনেতা থাকতেন মাত্র একজন, ফলে বিরোধী শক্তিদের মুখোমুখী সংঘাত দেখান সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। নাটকীয় সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় চরম মুহূর্ত্ত (crisis) দর্শকের সামনে সোজাসুজি না দেখিয়ে শোনানো হোত বিবরণী দিয়ে বা কোরাস্-গায়কদের কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়ে। ঈস্‌খাইলাস্ই প্রথম ধারণা করেন যে নাটকীয় গল্পের মূল ঘটনাটি দর্শকদের সামনেই দেখানো চলে, যদি আর একজন অভিনেতা খাড়া করানো যায়। এই ভাবে ঈস্‌খাইলাস্ দ্বিতীয় অভিনেতার সৃষ্টি করে যান। এর ফলে নাটকের মূল বিরোধী শক্তিদের মুখোমুখী আনতে এবং তাঁদের সংঘাতকে চোখের সামনে দেখাতে তিনিই প্রথম সক্ষম হন। টেক্‌নিক্ বা নাটকের গঠন-রীতিতে এটা একটা বিরাট পরিবর্ত্তন। কেন না, এর ফলে গ্রীক ট্র্যাজেডিতে সেই নাটকীয় শক্তি ও রূপ সৃষ্ট হোল যা ঈস্‌খাইলাস্-এর পূর্ব্ববর্ত্তী ট্র্যাজেডি-লেখকদের নাটকে অনুপস্থিত ছিল।

এই পরিবর্ত্তনের ফল আর এক দিক দিয়েও প্রকাশ পেল। পূর্ব্বেকার ট্র্যাজেডি গঠিত হোত, হয় দীর্ঘ বিবরণী দিয়ে, না হয় কোরাস্ এবং একমাত্র অভিনেতাটির কথাবার্ত্তা দিয়ে। সমস্ত অভিনয়টির মধ্যে কোরাস-গায়কদলই হোত প্রধান এবং মুখ্য। কিন্তু এই ধরণের নাটকের গঠন—যাতে নাটকীয়ত্বের চাইতে 'এপিক্' এবং 'লিরিকাল্' অর্থাৎ কাব্যভাবের প্রাধান্য বেশী—তা' এখন স্থান দিতে আরম্ভ করল নবসিযুক্ত দ্বিতীয় এবং পূর্ব্বেকার প্রথম অভিনেতার কথোপকথনকে। গানের চেয়ে অভিনয় দর্শকদের মনোযোগ বেশী আকর্ষণ করতে লাগল। কাজেই, কোরাস দল ক্রমশঃ নেমে এল তাদের

উচ্চ স্থান থেকে। নাটকের গল্প এগিয়ে যাবার পক্ষে তাদের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ হয়ে এলো ছোট। গান বা ode-গুলির বৈধ্য সংক্ষিপ্ততর হতে আরম্ভ করল, এবং নাটকের গল্পের কেন্দ্রীয় স্থান থেকে সরে হয়ে এদের (কোরাসের) স্থান হয়ে দাঁড়ালো সাধারণ দর্শকের সমতুল্য। এদের সামনে অভিনেতারা অভিনয় করে যেতেন এবং এরা অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে গানের ভিতর দিয়ে মন্তব্য এবং কখোপকথন করে দর্শকদের মনোভাবই প্রকাশ করে যেত।

তা হলে দেখা যাচ্ছে ঈস্‌খাইলাস্-এর সাহিত্য থেকে গ্রীক্ ট্র্যাজেডির সঙ্গীতাংশের লয় সুরু হোল। এই নিয়মটি ঈস্‌খাইলাস্-এর সঙ্গেই শেষ হয় নি। সফোক্লেস্-এর শেষ নাটকগুলি পর্যন্ত সঙ্গীতাংশ ক্রমাগত খাটো হয়ে এসেছে। আবার ইউরিপিডেস্-এর প্রথম দিককার নাটকগুলি পর্যন্ত সঙ্গীতাংশ ক্রমশঃ প্রবলতর হয়ে উঠেছে; অবশ্য এই সঙ্গীতের রূপ ছিল স্বতন্ত্র প্রকারের। গ্রীক ট্র্যাজেডির তিন জন শ্রেষ্ঠ রচয়িতাদের মধ্যে সঙ্গীতের এই পতন এবং উত্থান মনে রাখবার মত।

আধুনিক অর্থে প্লট বা ঘটনা বলতে আমরা যা বুঝি, ঈস্‌খাইলাস্-এ প্রায় তার কিছুই নাই। তাঁর নাটকের ঘটনাচক্র অত্যন্ত সরল—কোথাও জটিলতা নাই। তাঁর নাটকের ঘটনা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এবং কি ভাবে এই ঘটনার আবর্তন হবে, তা প্রথম থেকেই দর্শকদের কতকটা জানা থাকে। দীর্ঘ কোরাস গান দিয়ে সমস্ত ঘটনারই গুরুত্ব ফুটিয়ে দেওয়া হয়। এই সুদীর্ঘ গান-গুলির মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত কিন্তু উত্তেজিত কথোপকথনের সৃষ্টি হয়। নাটকীয় চরিত্রগুলি এই ভাবে ক্রমশঃ তাদের অদৃষ্টের দিকে এগিয়ে চলে, এবং দেবতাদের অবধারিত বিচার প্রতিফলিত হয়।

জটিলতার অভাব থাকলেও ঈস্‌খাইলাস্-এর নাটকে নাটকীয় দৃশ্যের অভাব নাই। এঁর অনেক দৃশ্যই বোধ হয় আধুনিক রঙ্গমঞ্চেও যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি করত। ক্লাই-টেম্‌নেস্ট্রার মৃত আত্মার গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর অতি পরিচিত 'ফিউরি'দের ধীরে ধীরে জাগিয়ে তোলা, এথেন্সের জনসাধারণ কর্তৃক মশাল জ্বালিয়ে উচ্চ চীৎকারের সঙ্গে 'ফিউরি'দের তাদের নিজেদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া,—এই সব ধরণের দৃশ্য আধুনিক রঙ্গমঞ্চের উত্তেজক দৃশ্যের সমতুল্য। 'আগামেম্‌নন্' নাটকের সেই দৃশ্যটি ভুলবার নয়, যে দৃশ্যে অমঙ্গল-সূচক দীর্ঘ ভবিষ্যদ্বাণীর পর আসল্লা এলো এক নিঃশ্বাস-বিহীন নীরবতা,—তারপর রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুর থেকে অকস্মাৎ শোনা গেল গুপ্তঘাতকের আঘাতে আহত আগামেম্‌নন্-এর বীভৎস মৃত্যু-চীৎকার!

অবশ্য এটাও স্বীকার্য যে এক এক সময়ে ঈস্‌খাইলাস্ অতিরিক্ত সরলতা দেখিয়েছেন তাঁর ঘটনা-সংগঠনে। এর ফলে তাঁর ট্র্যাজেডির চরম-মুহূর্ত হয়েছে নরম রকমের—ট্র্যাজেডি যে বেদনা এবং ভয় দর্শকের মনে জাগিয়ে তোলে তা' অনেকটা গলে গিয়ে দাঁড়িয়েছে শিল্পীর বিলাসে।

বস্তুতঃ ঘটনাচক্রের চাইতে ঈস্‌খাইলাস্-এর মন আকৃষ্ট হোত যা' কিছু রহস্যময়, অতি-মানবীয় এবং ভীতিপ্রদ,—তাদের দিকে; এই ধরণের জিনিষই তাঁর কাছে প্রিয় এবং স্বাভাবিক ছিল। তিনি এমন নাটকেরও সৃষ্টি করেছেন যাতে প্লট বলতে বিশেষ কিছু নেই,—যেমন "Suppliants" এবং "Persae"। তিনি শুধু একটা সঙ্কটমুহূর্ত সৃষ্টি করেই সুখী, তারপর তাঁর কবিতার সৌন্দর্য্য সেই মুহূর্তকে করে তোলে গরিমাময়।

চরিত্র গঠনের দিক দিয়ে ঈস্‌খাইলাস্ সেই ধরণের চরিত্রাঙ্কন করতে ভালবাসতেন, যা আদর্শ-স্থানীয়। শেক্সপীয়রের মত তিনি 'প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি' আঁকতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি সৃষ্টি করেছেন সেই সব দেবতা ও মানব-চরিত্র যাদের শক্তি এবং সাহস অতি-মানবীয়, যাঁদের ইচ্ছা এবং ধৈর্য্য অনমনীয়, মৃদু মনোভাবের স্থান নেই যাঁদের কাছে। জীয়ুস্-এর (Zeus) কাছে পরাজয় স্বীকার করার অপেক্ষা প্রমিথিউস্ একাধিক্রমে তিন হাজার বৎসর কষ্ট স্বীকার করা বরণীয় মনে করেন। ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রা চরিত্রে ব্যভিচারিণী সুলভ দুর্ব্বলচিত্ততা নাই—আছে সীমাহীন ঘৃণা এবং সুচিন্তিত ওদ্ধত্য। যখন তিনি মৃত্যুর সম্মুখীন, তখন তিনি প্রথমেই শত্রুর সাম্‌নাসাম্‌নি ছুটে যেতে চান কুঠার হাতে—পুত্রের নিধনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু যখন দেখা গেল সে পথ রুদ্ধ, তখন কোনও করুণ রোদন নাই 'ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রা'র। স্বামী-পুত্রের সঙ্গে সামান্য কয়েকটি কথা হয়—কঠোর এবং রূঢ়,—তারপর নির্ব্বিকার

ছিল নিজের পাপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অদ্ভুত গাম্ভীর্য্য ঈস্‌খাইলাস্‌-এর সৃষ্ট চরিত্রদের।

মানুষের জীবনে দুটি সমস্যা তাঁর মনকে বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল। প্রথম,—পাপ ( crime ) ও তার প্রতিফল; দ্বিতীয়,—বংশ-পরম্পরায় পাপের ( evil ) সংক্রমণ। এই দুটি সমস্যাই সমসাময়িক গ্রীক চিন্তার বিশেষ ধারা ছিল। পাপের পরিণামের অবধারিতার উপর ঈস্‌খাইলাস-এর দৃঢ় বিশ্বাস ঠিক ভাগ্যবাদের ( fatalism ) কোঠায় পড়ে না। মানুষ যে পাপ-পুণ্য-নির্ব্বিচারী, অন্ধ এবং খামখেয়ালী ভাগ্যের ক্রীড়নক, এ রকম ধারণার বিরুদ্ধে তিনি আমাদের সাবধান করে গেছেন। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা তিনি ক্ষুণ্ণ করেন নাই। পাপ থেকে দূরে থাকলেই মানুষ দুঃখ বিপত্তিকে এড়াতে পারে,—এই ধারণা তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন।

পাপের বংশানুক্রমিক সংক্রমণ সম্বন্ধেও সমসাময়িক গ্রীকদের মত ঈস্‌খাইলাস্‌ও বিশ্বাস-পরায়ণ ছিলেন। কিন্তু এখানেও এই সংক্রমণ যে, কারও নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছাকে বিনাশ করতে পারে না, সেই ধারণাই তাঁর ছিল। পারিবারিক সংক্রমণ সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীকদের মত আমাদের আধুনিক মনও অনেকটা আচ্ছন্নবাদিত। টমাস মান-এর উপন্যাস এবং গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দির 'ফরসাইথ সাগা'র কথা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে পড়বে।

থেস্‌পিস এবং ঈস্‌খাইলাস-এর হাতে যে গ্রীক নাট্য-সাহিত্যের উদ্ভব হোল, সফোক্লেস-এর হাতে এসে তার হোল পরিপূর্ণ শিল্পোচিত বিকাশ। পূর্ব্ববর্ত্তী ট্র্যাজেডি-লেখকদের অনুসৃত ধারাকে সংস্কৃত এবং সুসজ্জিত ক'রে—প্রত্যেক অংশের সঙ্গে প্রত্যেক অংশকে খাপ খাইয়ে মেজে ঘষে তিনি সুসজ্জিত নাটকের সৃষ্টি করলেন। নূতন পদ্ধতি বা 'form' আবিষ্কার তাঁর প্রতিভার কাজ ছিল না,—পুরাতনকেই পরিস্ফুটতর ক'রে তুলতে তাঁর শক্তি নিয়োজিত হয়েছে। মিল্‌টন এবং আর্ভিন্‌-এর মত সাধারণ অর্থে তিনিই ঠিক 'ক্লাসিকাল'। এর জন্য সৃজনীশক্তির দিক দিয়ে অনেকে হয়ত তাঁকে ঈস্‌খাইলাস-এর চেয়ে ছোট বলে মনে করবেন; কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, সফোক্লেস-এর সংস্কারগুলির সমষ্টিগত ফল নিতান্ত কম নয়,—বরং এতদূর যে তা গ্রীক ট্র্যাজেডিকে নূতন রূপ দান করেছে।

থেস্‌পিস্‌ একজন এবং ঈস্‌খাইলাস্‌ দুইজন অভিনেতার সৃষ্টি করেছিলেন,—সে কথা আগেই বলা হয়েছে। সফোক্লেস তৃতীয় অভিনেতার সংযোজনা ক'রে এই পদ্ধতির সমাপ্তি করলেন। তৃতীয় অভিনেতার আবির্ভাবের সাথে সাথেই কোরাস্‌-এর প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী রকম কমে গেল। কোরাস্‌ গানগুলি ক্রমশঃ দাঁড়াতে লাগল যেন ঘটনা-গতির মাঝে মাঝে বিরামের মত। ওদিক দিয়ে কথোপকথন ক্রমশঃ জমাট হয়ে গড়ে উঠতে লাগল। অর্থাৎ নাটক এতদিন পরে নাটক-ধর্ম্মী হয়ে দাঁড়াল।

নাটকের অন্তর্নিহিত মূল সুর এবং গূঢ়তত্ত্বের ( spirit and significance ) রূপও সফোক্লেস-এর কাছে বদলে গেছে। ঈস্‌খাইলাস-এর নাটকে আমরা পেয়েছি অতি-মানবীয় আবহাওয়া এবং সমসাময়িক ধর্ম্মবোধের গুরু-গাম্ভীর্য্য। মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক কমনীয়তা চাপা পড়ে গেছে ধর্ম্ম এবং নৈতিক দৃঢ়তার দুঃসহ ভারের অন্তরালে। কিন্তু সফোক্লেস ফেরেছেন এই আধ্যাত্মিক গাম্ভীর্য্য। তিনিই প্রথম মানুষের সত্যকার এবং চিরন্তন প্রকৃতিকে আঁকবার প্রয়াস পেলেন—মানুষের সহজাত আবেগ এবং সংগ্রামেচ্ছা তাঁর সাহিত্যেই প্রথম ছায়াপাত করল।

চরিত্রাঙ্কণের দিক দিয়ে অঙ্কনের নিপুণ সূক্ষ্মতা ও সুকুমারত্বের সম্বন্ধে তাঁর জুড়ি মেলা দুষ্কর। মানুষের মন বুঝবার অসীম ক্ষমতার ফলেই পাওয়া যায় তাঁর সাহিত্যে অসংখ্য চরিত্রের সমবেশ। চরিত্র আঁকবার এই অসাধারণ নৈপুণ্য সম্পর্কে একটা কথা মনে রাখা দরকার। যদিও মানব-প্রকৃতি আঁকাই সফোক্লেস্‌-এর উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সেই প্রকৃতি তিনি আঁকতেন পরিচ্ছন্নভাবে এবং আদর্শবাদীর দৃষ্টিতে। এবিষয়ে সফোক্লেস্‌-এর সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক প্রাচীন গ্রীক ভাস্করদের যথেষ্ট মিল আছে। প্রাচীন ভাস্করদের মত তিনিও মানুষের অবিকল প্রতিচ্ছবিই আঁকবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু স্বাভাবিকের চেয়ে আরও সুন্দর ক'রে। তাঁর সমস্ত চরিত্রগুলিকে গড়া হোতো প্রকৃতির দিকে নজর রেখে, কিন্তু যেন রোমান্স এবং কবিতার আবরণের ভিতর দিয়ে,—যাতে মানব-প্রকৃতির সুন্দর জিনিষটুকুই শুধু বেরিয়ে

আসে সুস্পষ্টতর হয়ে এবং যা কিছু নীচ ও জঘন্য তাকে লুপ্ত ক'রে দিয়ে। 'ওডিপাস্ রেক্সে' নাটকের 'জোকাস্টা' চরিত্র ছাড়া তাঁর সাহিত্যে আর দ্বিতীয় চরিত্র নাই যা' নীচাশয়তা-দোষের। এই আদর্শবাদী তন্ময়ীর ফলে তাঁর 'খারাপ' চরিত্রগুলির নীচতাও (vices) খোলাখুলি হৃদয়ের নীচতা ;—যেমন প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি, উচ্চাভিলাষ বা ক্রোধ। ক্ষীণ বা কুটিল মনোবৃত্তি তাঁর সাহিত্যে স্থান পায় নাই। বস্তুতঃ তিনি কোন্ মনোভাব নিয়ে চরিত্র অঙ্কন করতেন তা'র সবচেয়ে ভাল প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নিজের সম্বন্ধে নিজের সমালোচনায়। তিনি বলছেন তিনি চরিত্র এঁকেছেন, "মানুষের যা' হওয়া উচিত ; আর ইউরিপিডেস্ এঁকেছেন মানুষ যা' তাই।"

সমসাময়িক ধর্ম এবং নৈতিক আদর্শের প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে সফোক্লেস্-এর মতামত সব সময়ে সঠিক প্রকাশ পায় নাই। তবে এ বিষয়ে সন্দিহান হওয়া যায় না যে, ধর্মবিশ্বাসের ইতিহাসে সফোক্লেস্-এর স্থান ঈস্‌খাইলাস্-এর পরবর্তী কালের। পৌরাণিক কাহিনীগুলির তিনি যে ভাবে রূপ দিয়েছেন তাতে মনে হয় যেন তিনি দেশবাসীর সহজ বিশ্বাসের ঊর্দ্ধে চলে গেছেন বটে, কিন্তু জাতীয় জীবনের পক্ষে ঐ কাহিনীগুলির প্রয়োজনীয়তা সব সময়েই অনুভব করে গেছেন, এবং সব সময়েই সেগুলিকে শ্রদ্ধা ভক্তির সঙ্গে বর্ণনা করে গেছেন।

ঈস্‌খাইলাস্-এর তুলনায় মানুষের কর্মফল সম্বন্ধে সফোক্লেস্-এর বিশ্বাস কম ছিল বলে মনে হয়। পৃথিবীতে পাপের প্রতিফল সব সময়েই ফলে থাকলেও পুণ্যের জয় যে সব সময়ে হয় না, বা যিনি নিষ্পাপ তাঁকেও যে দুঃখ এবং দুর্ভাগ্য সহ্য করতে হয় এ রকম ধারণা তাঁর ছিল।

সফোক্লেস্ এবং ইউরিপেডেস্-এর মধ্যে মাত্র কয়েক বৎসরের ব্যবধান হলেও ইউরিপিডেস্ যেন সম্পূর্ণ পৃথক যুগের লেখক। তাঁর সাহিত্যের আধ্যাত্মিক আবহাওয়াই অন্যরকম। সফোক্লেস্-এর সুসঙ্গতি এবং নৈতিক সমগ্রতার খাঁটি ধাতুনীতে তৈরী ট্র্যাজেডিগুলির ভিতর দিয়ে পেরিক্লেস্-এর যুগ তার শ্রেষ্ঠ বিকাশ পেয়েছে। আর ইউরিপিডেস্-এর ভিতর দিয়ে বিকাশ পেয়েছে সেই পরবর্তী এবং পরিবর্তনশীল যুগ যখন পুরাতন এবং আত্মসমর্পিত হেলেনিক কৃষ্টি ক্রমশঃ মরতে আরম্ভ করেছে জীবনের প্রশস্ততর এবং বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিকে জায়গা ছেড়ে দেবার জন্য। আলোড়ন এবং পরিবর্তন-পরায়ণ যুগের সঠিক ছাপ আছে তাঁর সাহিত্যে।

ধর্ম এবং নৈতিক বিশ্বাসের দিক দিয়ে ইউরিপিডেস্-এর মতবাদ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়ায় ঈস্‌খাইলাস্ এবং সফোক্লেস্-এর আধ্যাত্মিক গাম্ভীর্য্য ছেড়ে তিনি আনলেন বাস্তববাদ। বস্তুতঃ, সমসাময়িক ধর্মচিন্তার ক্রমবিকাশের একপ্রান্তে ঈস্‌খাইলাস্-এর এবং অন্যপ্রান্তে ইউরিপিডেস্-এর স্থান। ঐতিহ্যগত ঈশ্বরবাদকে ( traditional theology ) যখনও পর্য্যন্ত নীতি এবং বিচারবুদ্ধির সঙ্গে খাপ খাওয়ান চলতে পারে, সেইরকম যুগে ছিলেন ঈস্‌খাইলাস্। কিন্তু ইউরিপিডেস্ আছেন এই ধর্মচিন্তারই শেষ অস্তাচলে, যখন ঐতিহ্যকে আর বিচারবুদ্ধির সঙ্গে খাপ খাওয়ান যায় না। এর স্বাভাবিক ফল হচ্ছে—জীবন এবং ভাগ্য সম্বন্ধে যে কঠোর ভঙ্গী ছিল ঈস্‌খাইলাস্-এর, তা ইউরিপিডেস্-এর ছিল না।

যদিও সমসাময়িক বিশ্বাসের অতিরিক্ত অন্ধবিশ্বাস-গুলির বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রূপবাণিতা তিনি স্পষ্টতঃ প্রকাশ করে গেছেন, তবুও অনেক সমালোচক তাঁকে যে ভাবে গ্রীসীয় ধর্মের চরম শত্রু হিসাবে বর্ণনা করেন তার সমর্থন করা যায় না। তিনি প্রচলিত ধর্মপ্রথার মূল ভাল ভাবেই উপলব্ধি করে গিয়েছেন ; কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী পিণ্ডার এবং তাঁর পরবর্তী প্লেটোর মত তিনিও পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে পরিশোধিত করবার চেষ্টা করে গেছেন মাত্র।

বাস্তববাদিতার জন্য কোমলতা এবং ভাবালুতাও তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। গার্হস্থ্য, প্রেম, শিশুকালের নিষ্পাপ সুখী জীবন, পারিবারিক সম্বন্ধ-বন্ধন এবং আকর্ষণ সবই তাঁর লেখনীর মুখে পরিস্ফুট হয়েছে। নরনারীর প্রেমকে আশ্রয় করে নাটক তৈরী করতে তিনিই প্রথম সাহসী হলেন।

গ্রীক ট্র্যাজিক নাটকের কাল-সমীকরণের (Secularisation) ধারায় ইউরিপিডেস্-ই উপযুক্ত শেষ নাট্যকার। প্রাচীন নাটকের বিশুদ্ধ আবহাওয়া ঈস্‌খাইলাস্ শুধু রক্ষা করে যান নাই, পরন্তু পরিবর্দ্ধিতই করে গেছেন। তাঁর পরবর্তী কালের মনোভাবের অনুযায়ী করে সফোক্লেস্ নাটককে

কাল-সমীক্ষণের পথে টেনে নিয়ে গেছেন। ইউরিপিডেস্ আরও এগিয়ে গিয়ে কাল-সমীক্ষণের শেষ সীমায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। নীতিবাদকে ছুঁইয়ে তোলবার উদ্দেশ্যেই শুধু নাটক তাঁর হাতে ব্যবহৃত হয় নাই। ঈস্‌খাইলাস্ এবং সফোক্লেস্ মানুষকে দেখেছেন শুধু বিশ্ববিধাতার নিয়মানুবর্তিতার পরিমাপে। ইউরিপিডেস্ এই ধারার আমূল পরিবর্তন করে' —তাদের সঙ্গে নয়, নিজের মনোগত পাপ ইচ্ছার সঙ্গেই কঠোর দ্বন্দ্ব—এই দিক দিয়ে মানবাত্মার চিরন্তন বিরোধকে এঁকেছেন। গ্রীক ট্র্যাজেডি এর ফলে তাঁর হাতে সম্পূর্ণ নূতন রূপ পরিগ্রহ করল।

গ্রীসের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন যে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে সুদীর্ঘ পেলোপনিসীয়ান্ যুদ্ধের ফলে প্রাচীন গ্রীসের গরিমাময় রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক জীবনের সমাপ্তি ঘটে। এর সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক ট্র্যাজিক কাব্যের যুগও শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর উঠেছে বাইজান্টাইন্ এবং রোমক সভ্যতা। কিন্তু গ্রীক ট্র্যাজিক কাব্যের প্রাণবস্তু হয়ে নি। স্বাভাবিক কারণে স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করলেও রোমক রঙ্গমঞ্চের জন্মদাতাও গ্রীস। রোমক গণতন্ত্রের বিশিষ্ট এবং প্রথম কালের ট্র্যাজেডি লেখকদের উপর গ্রীক ট্র্যাজেডি লেখকদের শ্রেষ্ঠ প্রতিভার প্রভাব সুস্পষ্ট।

এ-কথা অবশ্য মনে ওঠা স্বাভাবিক যে, এতদিনের ব্যবধান থেকেও প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজিক নাটকগুলি আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে কেন? প্রাচীন গ্রীকদের নৈতিক বিচার এবং ধর্মবিশ্বাস আমাদের নাই; তবুও যখনই এই নাট্য সাহিত্য আমরা আলোচনা করি, তখনই এর আত্মান্তরীণ রসসম্পদে মুগ্ধ হই। সমসাময়িক পারিপার্শ্বিকতা আমাদের জীবনকে ব্যাপৃত এবং অনেকাংশেই হয়ত ব্যাহত করেছে তবুও এই ক্লেশকর আবহাওয়া গ্রীক ট্র্যাজেডি আমাদের অন্তরে একটা শাশ্বত কালের সুরকে ধ্বনিত করে তুলতে সক্ষম। এই কারণেই গ্রীক নাট্য-সাহিত্যের মূল্যকে রসবিদগ্ধ ব্যক্তিরা সর্বত্র স্বীকার করেছেন, এবং ভবিষ্যতেও করবেন। মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারে এর স্থান চিরন্তন কালের জন্য সুনির্দিষ্ট।

---

# মুস্কিল-আসান

—শ্রীসুশীল রায়

দুঃসংবাদ অবশ্যই : ইথে নাহি ভুল—
ভাঁড়ার উজাড় আর বাড়ন্ত তণ্ডুল।
অন্বয়ের বৈকিরৎ : অতএব ধরেনি উনান।
প্রতিবেশী পরাঙ্মুখ, সুতরাং অক্ষম শ্রীমান্।
সারা বাড়ি খুঁজে আর কাপবাস্ক ঘেঁটে
অবশেষে পাওয়া গেলো কোটের পকেটে
মাসান্ত সম্বল এক চকচকে আনকোরা সিকি।
সামান্য কথায় আর কেনা যায় কি কি?
অন্বয়ে অগ্নির হাল, সম্মুখে টেবিল
আসামীর মতো মুখে ভাবি মুহু—ভীষণ মুস্কিল।
আচমকা নৌকোটা যেন ঠেকেছে চড়ায়,—
ভেবে ভেবে বেলা যায়, বিকাল গড়ায়—
সারাদিনে সনেটের শুধু মাত্র লিখেছি অক্টেভ
সামান্য বিরক্ত হলে চতুর্থপ চটি অতএব।
বলি, 'ও যে যৎসামান্য—খেতে চাও কেন গালাগালি,
ওতে শুধু ঘোমটা দিতে পিঠ হবে খালি।'
ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে অন্ধকার এলো জানালায়
ধূসর আলোর আভা দেখা দিল তারায় তারায়।
অন্বয়ে পড়িল খিল, শোনা গেল কণ্ঠের ঝঙ্কার
টেবিলে কলম হাতে ব'সে আছি আমি নির্বিকার।
এমন সময় দ্বারে আলো হাতে এলো ভাগ্যবান্
প্রত্যহের পরিচিত অবাঞ্ছিত মুস্কিল-আসান।
সিকিটা দিলেম তা'কে, আজ তার হ'লো মাসকাবার
অর্ধশেষ কবিতায় মনোযোগ দিলেম আবার।

# পরিহাস

—শ্রীঅমূল্য গুপ্ত

কমলা প্রদীপ জ্বালাইয়া ডাকিল, "রবি, পড়তে আয়।"

রবি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সে যে মায়ের ডাক শুনিতে পাইয়াছে, তার কোন ইঙ্গিত মিলিল না। রবি পায়ের নখ খুঁটিতেছে, কমলা নখ খোঁটা পছন্দ করে না। ছেলেকে বার বার এ বিষয় সতর্ক করিয়াছে। অন্যদিন হইলে কমলা রাগ করিত। হয় তো গালে চড় বসাইয়া দিত। কিন্তু আজ কমলা দেখিয়াও দেখিল না। নির্নিমেষ বিস্ময়ে পুত্রের মুখের দিকে তাকায়, জগতের এমন কি বিপর্যয় ঘটিল? রবির পড়ায় মন নাই। মায়ের সন্ধানী চোখ বার বার ব্যর্থ হয়। কারণ নির্ণয় করিতে পারে না কমলা।

রবিকে সে কোনদিন পড়াশুনায় অবহেলা করিতে দেখে নাই। সন্ধ্যার সময় রবি মাকে বার বার জ্বালাতন করিত। অহিঠ করিয়া তুলিত: "আলো জ্বালাও।" গরীবের সংসার, নিত্য তেল থাকাই বিচিত্র। কত কষ্টে সংসার চালায়, জানে কমলা। রবি অবুঝ। এটা রবির বয়সের দোষ। সবে সে তেরতে পা দিয়াছে। মাঝে মাঝে রবির অসুবিধা হইত, কাঁদিত, রাগারাগি করিত। অতটুকু ছেলের উত্তেজনায় কমলার কোন কোন দিন ধৈর্যচ্যুতি ঘটিত, মারিত নির্দয় ভাবে। কখনও বলিত, "কাল থেকে তোকে আর স্কুলে যেতে হবে না। মায়ের মুখের উপর কথা কাটাকাটি করতে বুঝি তোদের মাষ্টার শেখায়? পড়ে' আর বিদ্যার জাহাজ তারী করতে হবে না।"

রবি ছাড়িবার পাত্র নয়। মায়ের কথায় তার রাগ আরও বাড়িয়া যাইত। কি এমন অন্যায় বলিল? মা কি জানে না, পড়া না করিয়া স্কুলে ঢোকা যায় না। সে কতবার মাকে শুনাইয়া বলিয়াছে, অমুক ছেলেকে ক্লাস হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে অঙ্কের মাষ্টার। কোন্ দিন কে কত ঘন্টা বেঞ্চিতে দাঁড়াইয়া থাকে, স্কুলের শেষে পড়া করিয়া ছুটী পায়। বিদ্যার জাহাজ! রবির রাগ আর এক ধাপ চড়িয়া যায়। সে কি পরীক্ষায় প্রথম হয় না? কখানাই বা তার বই আছে? তবু সে নম্বর বেশী পায়। রবির কান লাল হইত। মুখ বাথায় থর্ থর্ করিত। কোনদিন সে মায়ের ভয়ে চুপ করিয়া থাকিত। কোনদিন মাকে শুনাইয়া দিত সে: "বেশ, নাই বা গেলাম্ ইস্কুল! ওদিকে পরীক্ষায় ফাষ্ট-সেকেণ্ড হতেই হবে? একদিন পড়া না পারলে নিবারণবাবু কি আমায় আস্ত রাখবে? তাকে জানলে বলতে হ'ত না। তেল থাকে না কেন? বাজার থেকে আনলেই পার?"

কমলার অসহ্য যন্ত্রণা হইত রবির কথায়। কিন্তু ছেলেকে বলিবার মত ভাষা খুঁজিয়া পাইত না। তেল যে কেন থাকে না অনেকবার বলিয়াছে, কিন্তু রবির তা মনে থাকে না; সংসারের যে কি অবস্থা ছেলে তা বুঝিত না, আর কাকেই বা জানাইবে? রবির এমন বয়স হয় নাই। বিধবা কমলা। শুধু তাই নয়—সে গরীব, বয়স অল্প। চাকুরী তার মেলে না। সবাই করে অবিশ্বাস তার বয়সকে। বয়স বাড়াইবার অনেক চেষ্টা সে করিয়াছে। চুলে জট বাঁধিতে দিয়াছে। অনিদ্রায় থাকিয়া বয়সকে টানিয়াছে আরও পাঁচ বছর।

কমলা কাঁদিত। রবিকে আরও কয়েকটা চড়চাপড় দিবার বাসনা যে জাগিত না, তা নয়। কিন্তু লজ্জা করিত কমলার। রবি এমন কি-ই বা অন্যায় বলিয়াছে? সে কি নিবারণবাবুর চটা মেজাজের খবর রাখে না? রবি যে প্রত্যহ তার নিকট স্কুলের গল্প বলিত মুড়ি খাইতে বসিয়া, কমলা তাতে আরাম পাইত। যেদিন রবি রাগ করিয়া কথা বন্ধ করিত, সেদিন কমলার কি অস্বস্তি! লেখা-পড়া সম্বন্ধীয় কথা যে তার ভাল লাগিত, তা নয়। এটা তার অভ্যাসগত —পনের বছরের অভ্যাস।

স্বামী ছিলেন একজন স্কুল মাষ্টার। স্কুল-ফেরত স্বামী তার কাছে স্কুলের গল্প বলিত। এটা ছিল তাদের নিত্য-কর্মের একটা দরকারী অংশ। দীর্ঘ পাঁচ বছর বাদে পুনরায় রবির মুখে স্কুলের গল্প শুনিয়া কমলা আনন্দ পাইতেছে। তার কাছে রবির 'আড়ি'—মরা-বাঁচার সন্ধিক্ষণে থাকার

যাইল। স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রকে কোলে লইয়া আদর করিত, বলিত, ছেলে তার এক দিন মানুষ হইবে, কুলে দাঁড়াবে। ছেলের মুখে সে জগতের উত্থান পতন দেখিবে। পাড়া-প্রতিবেশীরা হাসিত, পাগল বলিত কমলাকে। কমলা শুনিয়াও কান দিত না তাদের কথায়। সে গভীর আগ্রহে পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত। বৈধব্য-যন্ত্রণার কথা সে ভুলিয়া গিয়াছিল—যদিও সে স্বামীকে ভালবাসিত। কিন্তু গরীবের ভালবাসার মাপকাঠি থাকে না। তাদের প্রেম নিবেদন হইত অর্থের কথায়। অর্থের জন্য স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিত। অভুক্ত স্বামী টাকার খোঁজে দুপুর রোদে বাহির হইত। তার জন্য সে কোন দিন অন্তরে শান্তির ছোঁয়াচ পায় নাই। ঘরে বসিয়া কাঁদিত। কোন কোন দিন রান্না করিতে কমলার ইচ্ছা করিত না। স্বামীর যাওয়া-আসা নিত্য-নৈমিত্তিক ছিল। কমলাও পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিত না। বিপদের কথা মনে আসিত না। কিন্তু অদৃষ্ট এক দিন বিপত্তি আনিল। স্বামী তার মোটরগাড়ী চাপা পড়িয়া হাসপাতালে জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে খবর পাইল কমলা।

হাসপাতালের মলিন শয্যায় শুইয়া স্বামী কমলার হাত ধরিয়া বলিয়াছিল, "কমলা আবার দেখা হবে পরকালে"—কমলা নিরুত্তর ছিল, সামান্য আশ্বাস পর্যন্ত সে দেয় নাই মৃত্যুপথের যাত্রীকে; সে তখন ভাবিতেছিল টাকার কথা। স্বামীকে আজ মনে পড়ে, নিজের উপর রাগ হয়, কেন সে সামান্য একটা কথাও সেদিন বলিয়া স্বামীকে সান্ত্বনা দেয় নাই? কিন্তু সে রাগ তার স্থায়ী হয় না, স্বামী তার উপর অবিচার করিয়াছে, একটী পুত্র রাখিয়া গিয়াছে, কিন্তু রাখে নাই এক মুঠা খুদও। দু'টাকা ভাড়ায় একখানা খোলার ঘর, আসবাব-পত্র কিছুই ছিল না, স্বামীর সৎকারের জন্য পিতলের শেষ বাসনখানাও বাঁধা দিতে হইয়াছিল।

কি অনটনের মধ্যে পড়িয়াছিল কমলা!

দুনিয়াতে আপন বলিতে তার কেহ নাই। বাপ-মাকে সে মনে করিতে পারে না, শুনিয়াছে তারা এক সঙ্গেই মৃত্যুর পথ বাহিয়া লইয়াছিলেন। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে, অনাত্মীয় এক ভদ্রলোকের আশ্রয়ে সে লালিত হইয়াছিল, দয়া করিয়া একজন স্কুল মাষ্টারের হাতে তিনি কমলাকে সঁপিয়া দিয়াছিলেন—যদিও অনেকটা দায়ে পড়িয়া, কারণ কমলা সুন্দরী, গৃহে বেশী দিন রাখিলে নিজের কুৎসিত রোগকে পার করা অসম্ভব হইত। কিন্তু কমলা সুখী হইল—দুনিয়াতে আপন জন এতদিন বাদে মিলিল।

দুজনে নিরিবিলি একটী ছোট্ট সংসার পাতিয়াছিল, গরীবের সংসার, অনটন আছেই, অসোয়াস্তি সে কোনদিন ছিল না। স্বামী-স্ত্রীতে আরামে কয়েকটী বছর কাটাইয়াছিল, পুরুষকারবাদী স্বামীকেও অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস অনুভব করিতে হইয়াছিল, যেদিন পঁচিশ টাকার চাকুরীটী গেল। সংসারের চিন্তায় তারা পরস্পরের কাছে বিব্রত হইয়া পড়িল, ফলে কলহ নিত্যই হইত। স্বামী-স্ত্রীর কথা বার্ত্তা কমিয়া আসিয়াছিল, তার পর—

বিস্মৃত কথা জট পাকাইয়া কমলার অন্তরে ধ্বনিত হইতে লাগিল। জট সে কিছুতেই ছাড়াইতে পারে না, আরও বিব্রত হইয়া পড়ে পুত্রের কথা মনে করিয়া।

সে কত পরিশ্রম করিত- এখনও সে করিতেছে আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়া। সামান্য জীবিকার্জ্জনের জন্য পরিশ্রম করিতে লজ্জা করে। আত্মহত্যা হয়তো করিত, যদি রবি না আসিত। রবির আশায় এখন সে সুখের স্বপ্ন মাঝে মাঝে দেখে। আনন্দে আত্মহারা হয় কমলা। ভুলিয়া যায় শিক্ষা-সংস্কৃতির কথা। ভুলিয়া যায় যে সামান্য দাসীবৃত্তি করে সে অপরের বাড়ী, ভুলিয়া যায় যে সে খাবার চাহিয়া আনে, না দিলে কাকুতি-মিনতি করে।

রবির ডাকে তাকায় কমলা, চোখে তার জল।

"মা, আমি আর প'ড়ব না।"

"কেন? এর মধ্যেই বুঝি বিদ্বান্ হ'য়েছিস্? কি করবি?"

"সে যাই করি, তুমি আর রায়েদের বাড়ী যেওনা।"

ক্ষুব্ধস্বরে কমলা কহিল, "সিদ্ধি কি? এদিকে তোর হ'লেই যে খাওয়া চাই, কাজ ছেড়ে দিলে আসবে কোত্থেকে?"

"সে জানি না, কিন্তু বল তুমি আর সেখানে যাবে না? আর মেলেও তেল ঢেলে আনবে না।" ব্যথায় রবির গলা ধরে। কমলা অন্তরে শিহরিয়া উঠে, আজ না জানি কত বড় অপমান সহিয়াছে।

রবি অন্য দিকে মুখ ফিরায়। ক্লাসের ছেলেরা শুনিয়াছে তার মা চোর। সামান্য তেল চুরি করিয়াছে। না, সে কিছুতেই স্কুলে যাইবে না—মনে মনে রবি আওড়াইতে লাগিল।

"কে বলল আমি তেল চেয়ে আনি?" কমলা অতি কষ্টে প্রশ্ন করে।

"কানু। ছেলেদের কাছে আরও অনেক কথা বলেছে। মা, সত্যিই তুমি চুরী ক'রেছ?" গভীর আগ্রহে মায়ের মুখের দিকে তাকায় রবি।

কমলা আরও শিহরিয়া উঠিল। কি বলিবে? সে কি শুধু তেল চুরি করিয়াছে? সে যে এখনও এটা ওটা না বলিয়া লইয়া আসে। সামান্য তিন টাকা তার মাহিনা। সংসারের খরচ আছে, ছেলের পড়ার খরচার আছে, আরও কত কি। এ রকম সে আগেও আনিয়াছে, এখনও আনে।

কমলা রীতিমত কাঁপিতে লাগিল। সত্য-মিথ্যার জোটানোয় সে দোল খাইতে লাগিল। লজ্জায় তার মাথা অনেক নীচু হইয়া পড়ে। রবিকে সে কিরূপে বলে, সেদিন তেল ছিল না। মাঝে মাঝে মনিব-বাড়ী হইতে এটা ওটা চাহিয়াও আনিত। বড় বৌ স্বেচ্ছায় তাকে সাহায্য করিত। তিনিও সেদিন বাড়ী ছিলেন না। অপূর্ব্ব সুযোগ মিলিয়াছিল, ভাঁড়ার ঘর খোলা। কমলা আস্তে আস্তে ভাঁড়ারে ঢুকিয়া খানিকটা তেল শিশিতে করিয়া বাহির হওয়া মাত্র দেখা ছোট বৌয়ের সাথে। কাপড়ের নীচে লুকাইবার অবসর পর্য্যন্ত সে পায় নাই। তাতে কমলা লজ্জা পায় নাই, পাইয়াছিল ভয়—চাকুরী হারাইবার।

ছোট বৌ বলিয়াছিল, "ওরে মোক্ষদা, এদিকে আয়। দেখ বড়দির ভালমন্দ ঘরের মেয়ের কীর্ত্তি। আমি ভাবতাম, তাইতো এটা ওটা যায় কোথায়?"

মোক্ষদা কি বাঙ্গোক্তি করিয়াছিল, "ওমা, কি ঘেন্নার কথা। চাইলেই তো পেতে?"

ছোট বৌ প্রতিবাদ করিয়াছিল, "চাইলেই বা তোরা আমরা দেব কেন?"

কমলার ইচ্ছা হইতেছিল বলে, সে কোনদিন তার কাছ হইতে একটা জিনিষও লয় নাই। কিন্তু সে প্রতিবাদ করিবার মত সাহস পায় নাই। লজ্জায় সে কাঁপিতেছিল। লজ্জার হাত হইতে বড় গিন্নি তাকে সেদিন বাঁচাইয়াছিল, এবং বরাদ্দ করিয়া দিয়াছিল এক পোয়া তেল।

কমলা পুত্রের কথা ভাবিয়া অপমান ভুলিয়া গিয়াছিল। এমন দিন আসিবে, ছেলে মানুষ হইবে—তার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিবে। সেদিনের আশায় কমলা অন্তরের ঔৎসুক্য লইয়া দিন গুণিতেছিল।

কিন্তু বিধাতা এ কি বাদ সাধিল!

পুত্রের কথায় কমলা নির্ব্বাক! কি সে উত্তর দিবে? রবির রাগ পড়িয়া যায়। অতটুকু ছেলের দৃষ্টি এড়ায় না—মা যে কাঁদিতেছে। সে-ও যেন লজ্জা পায়। আর কোন কথা না বলিয়া সে পড়িতে বসে। কিন্তু পড়ায় তার মন বসে না, বারংবার কানুর কথা মনে পড়ে। রবি বইএর কাছে বসিয়া মায়ের দিকে বার বার লজ্জাতুর চোখে তাকায়।

কমলা ভাবে, কি শিক্ষাই দিল পুত্রকে!

রবি ভাবে, তারই তো দোষ। তেলের জন্য মাকে প্রত্যহ আলাতন করিত, কাঁদিত।

ঘরের আবহাওয়া বিচিত্র রূপ লইল, মাতা-পুত্রের দৃষ্টি বিনিময়ে।

রবি সম্বিৎ ফিরিয়া পায়।

"না, কাল থেকে আর পড়তে যাব না।"

কমলা ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, "কেন? যেতে হবে তোমায়, না গেলে খাবে কি?"

রবি যেন বয়সের চাইতে অনেক বড়। যেন সে সত্যই বড় হইয়াছে।

নির্ভীক উত্তর করিল, "চাকুরী করব।"

কিন্তু সে জানে না যে, চাকুরী করা বলা সহজ, কাজ জোটানো যে কি শক্ত জানে কমলা।

স্বামীর চাকুরী যাওয়ার পর কি চেষ্টাই না তিনি করিয়াছেন। স্নান নাই, খাওয়া নাই, এ-দোর ও-দোর করিয়া পরিশ্রান্ত দেহটা টানিয়া বাড়ী আনিতেন। কমলারও মায়া করিত; বলিত, কাজ নাই খোঁজ ক'রে, ওরা তোমায় কাজ দেবে না।

স্বামী বলিত, যে কয়দিন বাঁচব তার মর্য্যাদা তো যোগাতে হবে। খাবে কি? আমরা তো একা নই—তিনটী প্রাণীর আহার জোটাতে হবে।"

কমলার হাসি পাইত, স্বামীর কথা শুনিয়া।

বিয়ের কয়েক বছর যাইতে না যাইতে স্বামী বুলিয়াছিল, জীবনটা শুধু প্রেম করা নয়—আরও কিছু আছে প্রেমের বাইরে। এই চিরন্তন সমস্যাটাই মানুষকে কষ্ট দেয়। অনুশোচনা আনে বিবাহিত জীবনের। সে কথা স্বামীর মনে প্রথমে দেখা দেয় নাই। অসোছাল ছিল সব ব্যাপারে। নির্মম উপহাস করিত, যদি কমলা সফরী হইতে চাহিত। জীবনটাকে সে মনে করিত স্বপ্ন। তার ধারণা ছিল, হাসিয়াই সে কাটাইয়া দিতে পারিবে।

জগতের এই বিচিত্র খেলায় মানুষ ক্রীড়নক মাত্র। তারা জানে অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস অলক্ষিত গতি নির্ণয় করে, কিন্তু তবু এ কথাটা চিরন্তন। স্বামীও সে ভুল করিয়াছিল। না করাই হইত অভিনব।

রবির কথায় কমলার মুখে ভয়ার্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল।

রবি মায়ের হাসি সহ্য করিতে পারে না।

"তুমি হাসছ যে বড় ?"

কমলার কোন পরিবর্তন হয় না। স্থির নেত্রে পুত্রের দিকে তাকায়। একবার ভাবে, বলে, "ওরে হাসি যে কেন তা যদি জানতিস, একথা কখনও বলতিস না। তোর বয়সই বা কত? জগতকে চিনবার, জানবার সময় এখনও আসে নি। আমি কিসের আশায় তেল চুরি ক'রেছিলাম বুঝতে পারবি তখন, যখন শিক্ষিত হবি। আমার এ-চুরিও আমাকে বাধা দিবে না, যদি দেখি মানুষ হ'য়েছিস। কিন্তু তুই যদি অশিক্ষিত থাকিস, আমি এর চেয়ে শত গুণ নিধ্যাতন ভোগ করব অন্তরে। সামান্য তেল চুরি করার জন্য অনেকে যদত ঘৃণা করবে, কিন্তু তাও হবে সহনীয়।" কিন্তু সে কিছুই বলিতে পারিল না, চিত্রাপিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

রবির কথায় বাধা পড়ে কমলার চিন্তাস্রোত।

"মা, আমি আর পড়ব না।"

"বেশ।" বলিয়া কমলা রান্নাঘরের বাড়ীর উদ্দেশ্যে চলিয়া যায়।

•

সুখ দুঃখের আরও দশটা বছর কাটিয়া গিয়াছে কমলার। রবি সেই যে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল, আর স্কুলে যায় নাই। অমন মেধাবী ছেলে পড়িবে না শুনিয়া পাড়া-প্রতিবেশী দুঃখ করিয়াছে, অনুনয় করিয়াছে। কিন্তু রবিকে রাজী করান যায় নাই। কমলা একবারও পুত্রকে সাধে নাই স্কুলে যাইতে।

কমলার শরীর ইদানীং ভাল নয়। আর রবিও মাকে দাসীগিরি করিতে দেয় না। দু'পয়সা এখন সে রোজগার করে। দিনরাত বাড়ীর বাহিরেই কাটায়। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, চাকুরী করিতেছে।

নির্লিপ্ত স্বরে কমলা উত্তর করে, "হ্যাঁ।"

"যাক বাঁচা গেল। মা এই টাকা ক'টা রাখ, আমি কদিন পা ঢাকা দিব। কি জানি ব্যাটারা একবার পিছু নিয়েছে, কদিনে যে ছাড়বে ঠিক নেই। হাঁ, এ সর্দারকে ধরা অত সোজা নয়! আমি কি পাতি চোর, যে ওরে ঘুস দিব? কেমন ফাঁকি দিলাম বল তো?"

পুত্রের কথায় কমলা ভুলিয়া যায় পৃথিবীর সজীবতা, চোখের পর্দায় ভাসিয়া উঠে কাল আস্তরণের ঘন ছায়া। কখনও সে শিহরিয়া উঠে। কখন সে কাঁপিতে থাকে রাগে, অপমানে। নিজের প্রতি ধিক্কার আসে। এই কি তার অদৃষ্টে ছিল? একমাত্র পুত্র চোর। এত হেয়, এত অধম মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেছে রবি? না এ কি সম্ভব? সে হয় তো ভুল স্বপ্ন দেখিতেছে। যে ছেলে মায়ের সামান্য অপরাধের জন্য সব চেয়ে বড় আকর্ষণ ছাড়িয়াছিল, সে অপকর্ম করিবে, কিন্তু লজ্জা করিবে না?

'পুলিস! পুলিস!' বলিয়া কমলা চীৎকার করিয়া ডাকিল। নিজের স্বরে নিজেই চমকিয়া যায়। এ কি সে করিতেছে? স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কমলা: না পুলিস নাই। সে সহ্য করিতে পারে, কিন্তু পারে না মানুষের অবমাননা করিতে। কেন সে মরে নাই? কত লোক তো অহরহ মরিতেছে, তাকে এত অবহেলা করে কেন? স্বামীর শোক নূতন করিয়া কমলার অন্তরে আসে। সে সত্যই সুখী। আজ বাঁচিয়া থাকিলে সে কি পারিত পুত্রের অন্যায় কাজ সহ্য করিতে? হিংসা হয় স্বামীর উপরে। কেমন সে সুখী মরণকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। সেও যদি

হরিত, বাঁচিয়া যাইত: পুত্রের চোর নাম শুনিতে হইত না। পুত্রের মুখের দিকে চাহিতে কমলার লজ্জা করে।

ভোরের পাখীর কলতানে কমলার চিন্তা কাটিয়া যায়। চারিদিকে তাকায়, না, রবি চলিয়া গিয়াছে। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কমলা সূর্যদেবকে নতি জানায় পুত্রের মঙ্গলের জন্য—সে যেন ধরা না পড়ে। কমলার চোখ দিয়া কোঁটা কোঁটা অশ্রু পড়িতে লাগিল। মেঝের উপর পুত্রের রাখা টাকা কয়টী ফট্ ফট্ করিয়া তাকায়। কমলা যন্ত্রচালিতের ন্যায় তাহা আঁচলে বাঁধিতে থাকে।

কি চাকুরী, কত মাহিনা, কোন কথাই বলে না সে। মাসের শেষে যখন যা দরকার আনিয়া দেয় কমলাকে। কমলা তাতেই সুখী। মূর্খ সন্তানের কাছ হইতে বেশী সে আশা করে না। এটাই তো আশাতিরিক্ত—বা দুর্দিন!

কিন্তু মাঝে মাঝে কমলা ভাবিত, রবি তো অশিক্ষিত, এমন চাকুরী জোটাইল কি করিয়া? কিন্তু গোপন করিয়া যাইত, কিছু বলিতে সাহস করিত না। যা রুক্ষ মেজাজ! কখনও ভাবিত, থাক অর্থাভাব তো নাই, পুত্র মানুষ হইয়াছে। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিত কমলা। স্বামীর কথা ভাবিয়া অশ্রু মোচন করিত, বাঁচিয়া থাকিলে আজ সে-ও সুখী হইত।

অনেক দিন হইতে কমলা পুত্রের একটা স্থিতি কায়েমী করিতে চেষ্টা করিতেছে।

রবি শুনিয়া হাসে, বলে, "না মা, আমি বিয়ে করব না।"

কমলা বলিত, "কেন বল তো? চাকরী করছিস, ভয় কি?"

ভয় যে কি, সে কথা মায়ের নিকট বলিতে রবি দ্বিধা করে। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরিয়া মায়ের সহিত কি নির্মম প্রতারণা করিতেছে, বা ব্যক্ত করিতে রবির সাহস হয় না। ভাবিতে ভাবিতে রবি শিহরিয়া উঠে। কার্য্যান্তরের ছুতা করিয়া রবি মায়ের কাছ হইতে নিজেকে অপসারিত করে।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। রবির এখনও দেখা নাই। এরকম রাত প্রায়ই হয়। কমলা চিন্তা করিত না। কারণ সে ভাবিত, ছেলে বলে কাজ করে, রাত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আজ কেন যেন কমলা পুত্রের চিন্তায় বিচলিত হইতেছে। হয় তো সে অন্যায় করিতেছে। রবিকে কেন সে জিজ্ঞাসা করে না, বিলম্ব কেন হইল? কমলার মনে ভয় আছে—পুত্র যদি এ বয়সে তার ভরণপোষণ না দেয়, সে কোথায় যাইবে? শরীরে তার সামর্থ্য নাই। মুখ বুজিয়া পুত্রের কথা শুনিত, যা যখন চায় তাই সে করে—ছেলের মনোরঞ্জনের জন্য। এটা কি কমলার দোষ? সে তো চাহিয়াছিল ছেলে মানুষ হইয়া তার মুখ উজ্জ্বল করিবে। আজ যদি কোন অমঙ্গল হয় রবির, কে দায়ী? অমঙ্গলের কথায় কমলার মনে শঙ্কা জাগে। এ কি সে ভাবিতেছে! অমন সোমত্থ ছেলে, তার অমঙ্গল হওয়া কি এতই সহজ! কিন্তু তবুও কমলার সংশয় কাটে না। যদি এমন কিছু ঘটে, সে কোথায় খোঁজ করিবে? কোন দিনে, কটায় রবির ডিউটি? মায়ের কি উচিত নয়, পুত্রের হিতাহিত দেখা? কমলা কি দেখিতেছে? রবি যে রোগা হইয়া যাইতেছে, তার কারণ কি সে জানে? সমস্ত রাত রবি কোথায় থাকে, কি করে, এর কোন খবরই কমলা রাখে না। সে আছে নিজের কাজে। দাঁতে মাজন দিয়া পাড়ায় ঘুরিয়া কাটায়। পুত্রের জন্য বাসি ভাত ঢাকিয়া রাখে। আজ প্রথম কমলার মনে সংশয় জাগে পুত্রের অমঙ্গলের। লজ্জায় তার মাথা নত হয়। সে মাতৃত্বের অবমাননা করিতেছে। তার মা হওয়া কি উচিত হইয়াছে? মা-ই যদি সে হইল, কেন সে পুত্রকে অবহেলা করিতেছে? ব্যথায় কমলার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আস্তে আস্তে রাত বাড়িতে লাগিল। গির্জার ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া তিনটা বাজিল। রবি অনুপস্থিত। কমলা ভয়-ভাবনায় জর্জ্জরিত হইতেছে। উৎকণ্ঠা জাগে রবির অমঙ্গল আশঙ্কায়। তার চোখের সামনে বীভৎস ভয় আসিয়া জড় হয়। রাজ্যের যত বিপদের ছবি। না, সে আর কাল রবিকে ইচ্ছামত ঘুরিতে দিবে না। সে কি শুনিবে না? এতদিন যাকে কোলে করিয়া বড় করিয়াছে, আবার খোসাইয়াছে, সে কি পারে মাকে অবহেলা করিতে?

দরজায় ঘন ঘন কড়া নাড়ার শব্দে কমলার সম্বিৎ ফিরিয়া আসে। তাড়াতাড়ি সে দরজা খুলিয়া দিল।

"একি! তুই কেন" অস্ফুট স্বর কমলার বাহির হয়।

"কি হে বুকি, ফেলে ফোলায় ?" কর্কশ স্বরে সাহেব বলিল।

কমলা ভয়ার্ত্ত স্বরে উত্তর দেয়, "কাছে গেছে।"

"কাছে !" বিকট হাতে হাতটা মুখরিত হয়। "সিঁদ্-কাটি নিয়ে কখন বেরিয়েছে ?"

কমলার চেতনা থাকে না। বেত্রাহত প্রাণীর মত কাঁপিতে থাকে। শিহরিয়া উঠে : সিঁদ্-কাটি ? পুত্র কি তার চোর ?

পুলিস চলিয়া যায়। বাঁশের একটী খোঁটা ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

ধরণী বড় করিবার মত খেয়াল থাকে না কমলার। আস্তে আস্তে সে ভিতরে চলিয়া আসে অবসন্ন পদক্ষেপে। পা তার টলিতেছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছে। বিশ্বাস করিতে পারে না পুলিসের কথা। তার পুত্র চোর হইতে পারে না।

কমলার সম্বিৎ ফিরিয়া আসে পুত্রের ডাকে। "মা, পুলিস চ'লে গেছে ?"

---

# শহুরে বন্ধুর প্রতি

—শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার

বন্ধু।

ফিরিয়া এসেছ এতদিন পরে দেখে যাও চোখে কি সুখে আছি
অবাক হইয়া ভাবিতেছ বুঝি কি করে পরাণে রয়েছি বাঁচি।
কেটেছে দুইটি বছর, বন্ধু ভালোবেসে নিয়েছে সব,
চলেছে শুধুই মনপ্রাণদের ধ্বংসলীলার মহোৎসব।
ছেলেমেয়েদের মুখেতে তুলিয়া দিতে পারিনি ক মুদের কণা,
কল্পনা দিয়া যায় না ক বুঝা সে যে কি দুঃখ, কি যন্ত্রণা।
ছোট মেয়েটার বালি দিতেও পয়সা জোটেনি এমনি হল,
জগতের আলো চোখের সমুখে ক্ষণিকের তরে নিভিয়া গেল।
দেখেছিনু এই অভিশাপ-ভরা জীবনের শেষ পরদাখানি,
কি ঘোর দুইলে এক লহমায় আপনার হাতে সইলে টানি।

নরকের কত অনেকেই সব আমাদের তরে রচনা করি',
কত বীভৎস ছবি-যে তাহারা চোখের সমুখে রেখেছে ধরি'।
এর চেয়ে কি গো নরকের জ্বালা বেশী যন্ত্রণা পারিবে দিতে
দুটি ছেলে দিয়ে ব্যঙ্গ-প্রতিমা পারি যে বন্ধু বলিয়া নিতে।

নামিল বর্ষা পাওনের ধারে কত উৎসব শহরে হ'ল
ভাবিল না কেহ পল্লীবাসীর কত গৃহদ্বারা ভাসিয়া গেল।
ভাঙা ঘর দিয়ে জল পড়ে নিতি, সারারাতি সবে বসিয়া থাকি,
ভাবি ভগবান আমাদের প্রতি তোমার করুণা নাহিবে না কি !
অন্ত করুণা চাহিনি ত মোরা চেয়েছি সকলে একটি সাথে,
সকল দুখের করি অবসান মরি না কেন যে বজ্রপাতে।
সোনার পুতুলি—স্নেহের দুলাল তাদেরও মরণ কামনা করি,
শিহরিয়া কেন উঠিছ বন্ধু ! ভাবিছ কেমনে জীবন ধরি ?
প্রতি দিবসের প্রতি পলে পলে মরণের জ্বালা সহিয়া বুকে,
দুইটি বছর জীবন রয়েছে বুঝিতে পারি না কোন্ সে সুখে।
বুঝেছি অসহ হয়েছে বন্ধু ! চোখ দু'টি তব ছলছে আজি,
থাক, আর নয় জীবনের জ্বালা ভাষা দিয়ে আমি বুঝাতে নারি ;
বিধাতার কাছে আমাদের তরে শুধু এই বর লইতে যাচি,—
যেন একদিনে, এক নিমেষেতে আমরা সকলে মরিয়া বাঁচি।

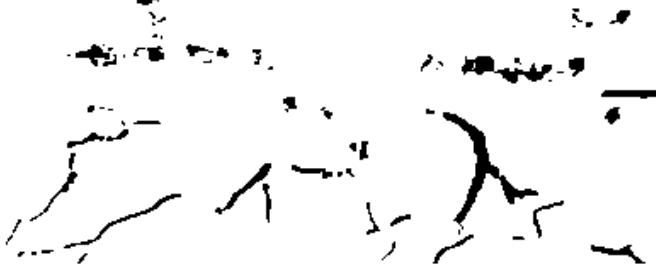

পার্ব্বত্য-দৃশ্য ( বন্যা বন্দীশিবির হইতে ) [ শ্রীঅমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

# সাধনা

পৌষ—১৩৪৭
৮ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা

## সম্পাদকীয়

— শ্রীসচ্চিদানন্দ চট্টোপাধ্যায়

### "হিন্দুধর্ম্ম (?)" ও সাধনা

আমরা আজকালকার হিন্দুগণকে "তথাকথিত হিন্দু" নামে অভিহিত করিয়া থাকি বলিয়া কলিকাতার কৈলাস বোস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত 'হিন্দু' নামক কাগজের সম্পাদক মহাশয় তাঁহার ১৬ই কার্ত্তিকের সংখ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ইহাতে বিস্মিত হই নাই। যে সাধনা অথবা আত্ম-পরীক্ষার সক্ষমতা থাকিলে আমি অথবা আমরা বস্তুতঃ কি হইয়াছি অথবা হইয়া পড়িতেছি তাহা বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয়, সেই সাধনা অথবা আত্ম-পরীক্ষার সক্ষমতা উপরোক্ত হিন্দু-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের নাই—ইহাই আমরা তাঁহার ১৬ই তারিখের সাময়িক প্রসঙ্গের লেখা হইতে বুঝিয়া লইয়াছি।

আমরা যে আজকালকার 'হিন্দু' নামের মানুষগুলিকে 'তথাকথিত হিন্দু' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি তাহার প্রধান কারণ যে আমাদিগের মতে এখন আর সারা জগতে একটীও প্রকৃত হিন্দু বিদ্যমান নাই—ইহা বলাই বাহুল্য। যাঁহারা 'হিন্দু' নামে বিকাইতেছেন তাঁহারা যে আমাদিগের উপরোক্ত মতবাদে ক্ষুব্ধ হইবেন ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। রোগে, শোকে এবং নানা রকমের দুঃখে মানুষ যদি জর্জ্জরিত না হইত, মনুষ্য-সমাজের প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে যদি কোন না কোন রকমের হা-হুতাশ প্রজ্বলিত হইয়া না উঠিত তাহা হইলে হয়ত লোকে মনে অথবা বেদনা দেওয়ায় আমরা ঘাট স্বীকার করিতাম। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, মানুষের দুর্দ্দশা ঘোরাল হইতে ক্রমশঃ অধিকতর

ঘোরাল হইয়া পড়িতেছে—তখন এই পতনের মূলে কোন না কোন কারণ যে বিদ্যমান আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। অনেকে হয়ত বলিবেন যে এই কারণ "ভগবানে"র দেওয়া, উহাতে মানুষের কোন ত্রুটী অথবা বিচ্যুতি বিদ্যমান নাই। যাঁহারা এই মতাবলম্বী আমরা তাঁহাদিগের বিরোধী।

আমরা আমাদিগের জীবনের অতীত ঘটনাসমূহ এবং ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র হইতে যে শিক্ষা পাইবার সুযোগ পাইয়াছি তাহাতে বিশ্ব-কারণের মঙ্গলময়ত্ব সম্বন্ধে আমাদিগের দৃঢ়-প্রতীতি হইয়াছে। আমাদিগের ধারণা যে, বিশ্ব-কারণের দ্বারা কোন ব্যক্তিগত মানুষের অথবা কোন মনুষ্যসঙ্ঘের কোনরূপ দুর্দশার উৎপত্তি হয় না; ভগবানের মঙ্গলময় নাম অহেতুক নহে। মানুষের যত কিছু দুর্দশার উৎপত্তি হয় তাহার প্রত্যেকটীর জন্য মানুষ নিজেই দায়ী। যাহা যাহা লইয়া মানুষের অবয়ব অর্থাৎ মানুষের মেদ, অস্থি, মজ্জা, রসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম উজ্জৃম্ভিত ভাবে ব্যবহৃত হয় বলিয়াই মানুষ দুঃখ পাইয়া থাকে। আমাদিগের উপরোক্ত ধারণা যে সর্বতোভাবে যুক্তি-সঙ্গত তাহা দেখাইতে হইলে আমাদিগকে অনেক কথা বলিতে হইবে এবং বর্তমান প্রসঙ্গের আলোচ্য বিষয় হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িতে হইবে। কাজেই, আমরা ঐ সম্বন্ধে (অর্থাৎ প্রত্যেক মনুষ্য ও মনুষ্য-সমাজের দুঃখের কারণ যে বিশ্ব-কারণ নহে এবং উহার কারণ যে মানুষের নিজ নিজ উজ্জৃম্ভণ কার্য তদ্বিষয়ে) এখানে আর অধিক আলোচনা করিব না।

মোটের উপর ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও সভ্যতার আদর্শে যে নানা রকমের ভুল-ভ্রান্তি আসিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং এই বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার আদর্শানুসারে মানুষ যদি অপ্রতিহত ভাবে চলিতে থাকে তাহা হইলে যে মানুষের দুর্দশা ঘোরাল হইতে অধিকতর ঘোরাল হইতে থাকিবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। খুব সম্ভব "হিন্দু"-নামক পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দেরও আমাদিগের উপরোক্ত নির্ণয়ে মত-পার্থক্য ঘটিবে না।

এক্ষণে প্রশ্ন, মনুষ্য-সমাজের কোথাও প্রকৃত হিন্দুত্ব বিদ্যমান থাকিলে—তাহার জন্য কোথাও বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার আদর্শের মত কোনরূপ ভ্রান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিকৃত সভ্যতার আদর্শ স্থান লাভ করিতে পারে কি না। আমাদিগের ধারণা, তাহা পারে না। আমাদিগের মতে যেমন সূর্যোদয় হইলে রাত্রির অন্ধকার আপনা হইতেই তিরোহিত হইয়া যায়, সেইরূপ সারাজগতের মধ্যে যদি একজন মানুষের হৃদয়েও প্রকৃত হিন্দুত্ব বিকশিত হয় এবং যদি একজন মানুষও প্রকৃত হিন্দুত্বের সহিত সর্বতোভাবে তাল রাখিয়া চলিতে পারে, তাহা হইলে মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেককেই "হিন্দু" হইয়া উঠিতে হইবে। আমাদিগের এই মতবাদ অর্থাৎ সারাজগতের একজন মানুষের হৃদয়েও যদি প্রকৃত হিন্দুত্ব বিকাশ লাভ করে তাহা হইলে মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেককেই হিন্দু হইয়া পড়িতে হইবে, এই ধারণা সর্বতোভাবে যুক্তিসহ কি না তাহা আমরা এক্ষণে আলোচনা করিব। যদি দেখা যায় যে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের একজন মানুষের হৃদয়েও প্রকৃত হিন্দুত্ব বিকাশ লাভ করিলে সমস্ত মনুষ্য-সমাজের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে ধর্ম-সাধনা লইয়া দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি দূরীভূত হওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং যদি আরও দেখা যায় যে কোন মানুষ যদি একবার প্রকৃত হিন্দুত্বের দিকে আগুয়ান হয় তাহা হইলে তাহার দুঃখ-দুর্দশা তিরোহিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী—তাহা হইলে বর্তমান মনুষ্য-সমাজে যে প্রকৃত হিন্দু একটীও নাই তাহা যাহারা যুক্তি-জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য।

সমগ্র মনুষ্য-সমাজের একজন মানুষের হৃদয়েও প্রকৃত হিন্দুত্ব বিকাশ লাভ করিলে সমস্ত মনুষ্য-সমাজের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে ধর্ম ও সাধনা লইয়া দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তির অবসান হওয়া অবশ্যম্ভাবী কি না এবং যাঁহার হৃদয়ে হিন্দুত্ব সর্বতোভাবে বিকশিত হয়, তাঁহার সর্ববিধ দুঃখ-দুর্দশা তিরোহিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী কি না আমরা এক্ষণে তাহার বিচার করিব। ঐ বিচারে প্রবৃত্ত হইলে সর্বপ্রথমে "হিন্দু" শব্দে কি বুঝায় তাহা আমাদিগকে ধারণা করিয়া লইতে হইবে।

"হিন্দু"-শব্দটী আরবী ভাষার একটি শব্দ, ইহা বলাই বাহুল্য। যাঁহারা প্রাচীন আরবী ভাষার সহিত সম্যক্‌রূপে পরিচিত তাঁহারা ঐ শব্দটীর মৌলিক অর্থ সর্বতোভাবে ধারণা করিতে পারিবেন। প্রাচীন আরবী ভাষা সর্বতোভাবে না জানা থাকিলেও যাঁহারা ভারতীয় ঋষি-প্রণীত "পূর্বমীমাংসার" মূল সূত্রের সহিত সর্বতোভাবে নির্ভুল রকমে পরিচিত হইতে

পারিয়াছেন তাঁহাদিগের পক্ষে ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত, প্রাচীন হিব্রু ও প্রাচীন আরব্য ভাষার যে কোন শব্দের সহিত পরিচিত হওয়া সহজ-সাধ্য হইয়া থাকে। "ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্য অর্থেন সম্বন্ধঃ তস্য জ্ঞানং উপদেশঃ অব্যতিরেকঃ চ অর্থে অনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদ্যবাদিনঃ অনপেক্ষত্বাৎ", পূর্ব্বমীমাংসার এই সূত্রটী আমাদিগের উপরোক্ত কথার প্রমাণ। এই সূত্রটী সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বুঝা সম্ভব নহে। ইহা সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে হইলে মানুষের বুদ্ধির উৎপত্তি হয় কি করিয়া এবং মানুষের অবয়বের মধ্যে বুদ্ধি কখন কি অবস্থায় কিরূপ ভাবে কার্য্য করে তাহা প্রথমতঃ জানিয়া লইতে হয়, তাহার পর উহা কার্য্যতঃ উপলব্ধি করিতে হয়। পূর্ব্বমীমাংসার "ঔৎপত্তিকঃ" ইত্যাদি সূত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্র—"সং সংপ্রয়োগে পুরুষস্য ইন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধি জন্ম তৎপ্রত্যক্ষং অনিমিত্তং বিদ্যমানোপলম্ভনত্বাৎ"। "সং-সংপ্রয়োগে" ইত্যাদি সূত্রটী যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলে "ঔৎপত্তিকস্তু" ইত্যাদি সূত্রটী সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে হইলে কি কি জ্ঞান ও অভ্যাসের প্রয়োজন হয় তাহা বুঝিয়া উঠা সম্ভব হইয়া থাকে এবং তখন আমাদিগের কথার সত্যতা উপলব্ধি করা বুদ্ধি-যোগ্য হয়।

সর্ব্বসাধারণ ত' দূরের কথা, আজকাল যাঁহারা টিকি ও নামাবলীর প্রভাবে "পণ্ডিত" বলিয়া বিকাইতেছেন তাঁহাদিগের মধ্যেও কাহারও পূর্ব্বমীমাংসার "ঔৎপত্তিকস্তু" ইত্যাদি সূত্র যথাযথভাবে বুঝিবার যোগ্যতা নাই, তদ্বিষয়ে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ। পূর্ব্বমীমাংসার উপরোক্ত সূত্র বুঝা ত' দূরের কথা, টিকি ও নামাবলীধারী তথাকথিত পণ্ডিতগণের যদি সাধারণ বুদ্ধি বিদ্যমান থাকিত তাহা হইলে যাঁহারা একদিন সমাজের সকলের শ্রদ্ধেয় হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কখন অন্ন-সংস্থানের জন্য কোনরূপে বিব্রত হইতে হয় নাই, তাঁহাদিগের সন্তান-সন্ততিকে আজ চাকুরী প্রভৃতি শূদ্রবৃত্তি, বিদ্যা ও পুস্তক বিক্রয় প্রভৃতি গর্হিত বৈশ্যবৃত্তি ও নানারকমের ভিক্ষাবৃত্তি কেন গ্রহণ করিতে হইতেছে তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেন এবং নিজদিগকে হিন্দু অথবা পণ্ডিত বলিয়া মনে করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন। ঋষিদিগের উপদেশানুসারে বুদ্ধি কাহাকে বলে তাহা একবার উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে এখন আর মানুষ বাস্তবিকপক্ষে "বুদ্ধি" ও "মনে"র মধ্যে যে কি পার্থক্য তাহা বুঝিতে পারে না। যাঁহারা সমাজমধ্যে বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত তাঁহারা প্রায়শঃ স্থূলকথায় "মন"কে "বুদ্ধি" বলিয়া ধরিয়া লয়। কাজেই পূর্ব্বমীমাংসার "ঔৎপত্তিকস্তু" ইত্যাদি সূত্রের ব্যাখ্যা করিবার সময় এখন আসত হয় নাই বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে এবং আমাদিগকে উহার সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যাখ্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকিতে হইবে।

পূর্ব্বমীমাংসার "ঔৎপত্তিকস্তু" ইত্যাদি সূত্র যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে ঐ সূত্রে মানুষের তিনটী অতীব প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ঐ তিনটী প্রয়োজনীয় তথ্যের নাম। (১) শব্দ-গ্রহণ ও শব্দ-প্রকাশ শক্তির উৎপত্তির কারণ কি কি অথবা তৎসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান; (২) স্বভাবতঃ শব্দের জ্ঞান হয় কি করিয়া; (৩) শব্দের উচ্চারণে পার্থক্য হয় কেন। এই তিনটী তথ্যের কোন তথ্যটীই সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করা কোন লৌকিকভাষার সামর্থ্যাধীন নহে। উহা একমাত্র অভ্যাস বিশেষের দ্বারা নিজে নিজে উপলব্ধি করা যায় এবং তখন ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষার সহিত আনুলভাবে পরিচিত হওয়া সম্ভব হয়। এবং তখন ঐ তথ্য তিনটী সংস্কৃত ভাষায় অথবা সংস্কৃত ভাষার অনুবর্ত্তী যে প্রাচীন হিব্রু ও আরব্য ভাষা একদিন বিদ্যমান ছিল, সেই প্রাচীন হিব্রু ও আরব্য ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হইয়া থাকে।

এই তিনটী তথ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বমীমাংসার পরবর্ত্তীভাগে অতি বিস্তৃতভাবে অকাট্য আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। "ঔৎপত্তিকস্তু" ইত্যাদি সূত্র যেরূপ সর্ব্বসাধারণের অথবা আজকালকার টিকি ও নামাবলীধারী পণ্ডিতগণের পক্ষে বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে, সেইরূপ পূর্ব্বমীমাংসার অন্যান্য ভাগেও তাঁহাদিগের পক্ষে প্রবেশ করা সম্ভবযোগ্য নহে উহাতে প্রবিষ্ট হইতে হইলে সর্ব্বতোভাবে বহির্ম্মুখীনতা সংযত করিয়া অন্তর্ম্মুখীন হইবার অভ্যাসে অভ্যস্ত হইতে হয়। যাঁহারা রাগ-দ্বেষ অথবা দ্বন্দ্ব-কলহ অথবা অভিমানে অত্যধিক উত্তপ্ত হইয়া বিশাখারা হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে কখনও অন্তর্ম্মুখীন হওয়া অথবা কোন ঋষি-প্রণীত সূত্র অথবা মন্ত্র-গ্রন্থে প্রবেশ লাভ করা সম্ভব-যোগ্য হয় না।

স্বভাবতঃ শব্দের জ্ঞান হয় কি করিয়া তৎসম্বন্ধে পূর্ব-মীমাংসায় যে যে কথা আছে তাহা নির্ভুলভাবে বিদিত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, পদের মিলনে যেরূপ বাক্য হইয়া থাকে সেইরূপ বর্ণের মিলনে পদ-মূলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পদের অর্থ বিদিত না হইতে পারিলে যেরূপ বাক্যের অর্থ বিদিত হওয়া সম্ভব হয় না, সেইরূপ বর্ণের অর্থ বিদিত হইতে না পারিলে সংস্কৃত ভাষার, অথবা প্রাচীন হিব্রু ও প্রাচীন আরবী ভাষার কোন পদ-মূলের অর্থ সম্যক-ভাবে বিদিত হইতে পারা যায় না।

পূর্ব-মীমাংসার এই তথ্য আজ মনুষ্য-সমাজের বিস্মৃতির গর্ভে লুক্কায়িত রহিয়াছে বলিয়াই এখন আর কেহ প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন হিব্রু অথবা প্রাচীন আরবী ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থ যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন না। এবং ইহারই জন্য মনুষ্য-সমাজের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান যে কতদূর সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল তাহা এখন আর কোন মানুষই অনুমান পর্যন্ত করিতে পারেন না।

আধুনিক পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারুন আর না-ই পারুন, তাঁহারা স্বীকার করুন আর না-ই করুন—প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন হিব্রু ও প্রাচীন আরবী ভাষার কোন পদের অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে যে ঐ পদ-নিহিত বর্ণের অর্থের সাহায্য লইতে হইবে তৎসম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ। মানুষের শব্দ-গ্রহণ ও শব্দ-প্রকাশ শক্তির উৎপত্তি হয় কি করিয়া তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে পূর্বমীমাংসার উপরোক্ত কথা যে অকাট্য তৎসম্বন্ধে দৃঢ় প্রতীতি হইয়া থাকে। মানুষের শব্দ-গ্রহণ ও শব্দ-প্রকাশ শক্তির উৎপত্তি হয় কি করিয়া তাহা বুঝাইতে যাইয়া পূর্বমীমাংসাকার আকাশ, বায়ু, তেজ ও রস সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিয়াছেন। ঐ কথাগুলি বিদিত হইতে পারিলে পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতিষ ও জীব-বিজ্ঞানের সমস্ত মূল কথা জানিতে পারা যায় এবং তখন আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানাদি যে কত অসম্পূর্ণ ও অসত্য তাহা পূর্ণভাবে ধরিতে পারা যায়। আমাদিগের প্রাণে অনেক কথা আসিয়াছে এবং অনেক কথা পাঠকবর্গকে শুনাইবার লোভ হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত কথা বলিতে বসিলে এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িব। কাজেই ঐ লোভ সংবরণ করিতে হইল।

আমাদিগের পাঠকগণের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত মনে করিবেন যে আমরা অবান্তরভাবে পূর্বমীমাংসার কথা উঠাইয়াছি এবং ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিতেছি। কিন্তু উহা সত্য নহে। পূর্বমীমাংসার কথা উঠাইবার উদ্দেশ্য দুইটী, যথা :—

(১) 'হিন্দু' শব্দের অর্থ সর্বতোভাবে জানিতে হইলে হিন্দু শব্দের মধ্যে যে যে বর্ণ আছে তাহার অর্থের সাহায্য লইতে হইবে ইহা পূর্বমীমাংসার মত।

(২) পূর্বমীমাংসার কোন সূত্র আধুনিক পণ্ডিতগণ যথাযথ ভাবে বুঝিতে অক্ষম। পূর্বমীমাংসার জ্ঞান-সম্পন্ন কোন পণ্ডিত মনুষ্য-সমাজে বিদ্যমান থাকিলে আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়নাদি মনুষ্য-সমাজে কোন স্থান লাভ করিতে পারিত না।

পদ-নিহিত বর্ণের সাহায্যে প্রাচীন সংস্কৃত, হিব্রু ও আরবী ভাষার পদ-মূলের অর্থ করিবার নির্দেশ যে কেবল-মাত্র পূর্বমীমাংসায় লিপিবদ্ধ আছে তাহা নহে, নিরুক্তকারেরও উহাই নির্দেশ। "সম্-আম্নাঃ সম্ আম্নাতঃ"—নিরুক্তের এই সূত্রটী "সমী-ভাব" ও "আম্নায়" কাহাকে বলে তাহা বুঝিয়া লইয়া উপলব্ধি করিতে পারিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। উদাহরণ স্বরূপ নিরুক্তের মধ্যে যে যে পদমূলের অর্থ বিচার করা হইয়াছে সেই সমস্ত বিচারে প্রবিষ্ট হইতে পারিলেও আমাদিগের কথার সত্যতা বুঝা যাইবে।

শুধু ঋষি-প্রণীত পূর্বমীমাংসা ও নিরুক্ত কেন, পরবর্তী প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে ভর্তৃহরি, প্রকাশাত্ম-জ্যোতি, ভট্টোজী ভট্ট, নাগেশ ভট্ট, কৌণ্ড ভট্ট প্রভৃতি মহাত্মাগণ পদ-মূলের অর্থোদ্ধার-পদ্ধতি বিবৃত করিতে বসিয়া যে যে কথা বলিয়াছেন তাহার মধ্যেও আমাদিগের এতদ্বিষয়ক সিদ্ধান্তের সত্যতা পাওয়া যাইবে। 'অক্ষর-তন্ত্র' এখনও বিদ্যমান আছে। কিন্তু আধুনিক তথাকথিত পণ্ডিতগণ উহাতে আদৌ প্রবেশ করিতে পারেন না।

আমরা বর্ণের সাহায্যে পদ-মূলের অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকি বলিয়া 'হিন্দু' নামক পত্রিকার বিদ্বজ্জন পণ্ডিতগণ আমা-দিগকে অহরহ বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। যাঁহারা 'হিন্দু'-নামক

পত্রিকার মুখপত্রকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে কোন নূতন কথা শুনান অথবা বুঝানে আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। আমরা পণ্ডিত নহি। আমরা অতীব নিকৃষ্ট শ্রেণীর দুঃখ-তপ্ত সাধারণ মানুষ। 'হিন্দু' নামক পত্রিকার পণ্ডিতগণ যদি মানুষ হন তাহা হইলে আমরা মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে লজ্জা বোধ করি, কারণ আমরা উঁহাদিগের সম-শ্রেণীর যে নহি, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া থাকি। আমাদিগের মতে ঐ পণ্ডিতগণ বধিরতার দ্বারা পরিচালিত অসার মস্তিষ্ক-সম্পন্ন। তাহা না হইলে তাঁহারা ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন। ঋষি-প্রণীত ভাষানুসারে তাঁহারা গণ্ড-মূর্খ, নতুবা তাঁহারা আগুন লইয়া খেলা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন। ইঁহারা জানেন না যে, ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রের কু-ব্যাখ্যা প্রচার করিলে—হয় নির্ব্বংশ নতুবা নির্ঘৃণ নতুবা উচ্ছৃঙ্খল বংশভুক্ত হইতে হয়। ইঁহারা হইতেছেনও তাহাই। তথাপি ইঁহাদিগের চৈতন্য নাই। ইঁহারা ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া পাণ্ডিত্য দেখাইবার প্রয়াসী হইয়া থাকেন, অথচ অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, ঋষি-প্রণীত ভাষা বুঝিতে হইলে ঋষি-প্রণীত যে যে গ্রন্থ আছে তাহার সমস্ত গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত 'হিন্দু' নামক পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট কোন পণ্ডিত লিখিত নহেন। ইঁহাদিগের যদি সাহস থাকে তাহা হইলে ইঁহারা ইঁহাদিগের পত্রিকায় ঐ গ্রন্থগুলির নাম প্রচার করুন। আমরা সাধারণের সমক্ষে আমাদিগের আক্রমণের সত্যতা প্রমাণ করিব। ইঁহারা বালকোচিত বর্ব্বর। তাই ঋষি- রচিত পূর্ব্বমীমাংসা ও নিরুক্তের কথায় বিদ্রূপ করিতে সাহসী হন।

এখনও যাঁহারা ইঁহাদিগের তুলনায় ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রের খবর অধিক পরিমাণে রাখিয়া থাকেন তাঁহারা এতাদৃশ বর্ব্বরোচিত আচরণ পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করিবেন ইহা আমাদিগের বিশ্বাস। 'হিন্দু'-পত্রিকার সংশ্লিষ্ট তথাকথিত পণ্ডিতগণ ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রে কতদূর গণ্ডমূর্খ তাহা তাঁহাদিগের লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধ হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করা যাইতে পারে বলিয়াই আমরা এতাদৃশভাবে আক্রমণ করিতে সাহসী হইয়াছি।

ব্যর্থের সহায়তায় পদ-মূলের অর্থগ্রহণ করিবার পদ্ধতি অনুসারে "হিন্দু" এই হ্রস্ব-উকারান্ত শব্দের অর্থ হয় "সেই কার্য্য অথবা সাধনা, যে কার্য্যে অথবা সাধনায় আকাশ হইতে ভূতের (অর্থাৎ সমস্ত চরাচর বস্তুর) বিকাশ, চৈতন্য ও বাক্-শক্তির উৎপত্তি হয় কি করিয়া তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়।" "হিন্দু" এই শব্দটী যখন দীর্ঘ ঊকারান্ত হইয়া থাকে তখন উহার অর্থ হয়, "সেই মানুষ, যে মানুষ আকাশ হইতে ভূতের বিকাশ, চৈতন্য ও বাক্‌শক্তি উৎপন্ন হয় কি করিয়া তাহা উপলব্ধি করিবার সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারেন।"

"হিন্দু" ও "হিন্দূ" শব্দের এই যে অর্থ—ইহা হয়ত অনেকেই তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিবেন না এবং না বুঝিয়াই উহার সম্বন্ধে নানাবিধ মন্তব্য প্রকাশ করিবেন। যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা হয়, তিনি তাহাই করুন তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই এবং আপত্তি করিয়াও কোন ফলোদয় হইবে না। তবে একথা মনে রাখিতে হইবে যে 'হিন্দুত্বে'র মধ্যে একটা বড় ও মহান্ কিছু নিশ্চয়ই ছিল। নতুবা হিন্দুত্বের নামে কোন বড়ত্বের দাবী করা চলে না। ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, যে সাধনায় ভূতের বিকাশ, চৈতন্য ও বাক্-শক্তির উৎপত্তি হয় কি করিয়া তাহা উপলব্ধি করা যায় সেই সাধনা খুবই বড় এবং জ্ঞান ও কর্ম্মরাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধনা; কারণ তদ্দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা সাধন করা সম্ভব হয়। যারা 'হিন্দুত্ব' তাহা একটা খুব বড়ত্বের নিদর্শন—এই সংস্কার থাকিলে এবং যে সাধনায় আকাশ হইতে ভূতের বিকাশ, চৈতন্য ও বাক্-শক্তির উৎপত্তি হয় কি করিয়া তাহা উপলব্ধি করা যায় সেই সাধনাও জ্ঞান এবং কর্ম্মরাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ইহা বুঝিতে পারিলে হিন্দুত্বে যে ঐরূপ একটা কিছু সাধনার প্রয়োজন হইতে পারে তাহা সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাও অনুধাবন করা যাইতে পারে। এবং তখন যাহারা আমাদিগকে পাগল অথবা প্রলাপ বলিয়া মনে করেন তাঁহারাও আমাদিগের কথায় কিছু সারবত্তার গন্ধ পাইতে পারিবেন।

বেদে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে ঋক্, যজু ও সাম এই তিনটি বেদের সাধনাভাগে মুখ্যতঃ ঐ তিনটী সাধনার কথাই আলোচিত হইয়াছে।

সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, চরাচর সমস্ত জীবের বিকাশ ও বৃদ্ধি এবং চৈতন্য ও বাক্-শক্তি মূলতঃ আকাশ হইতেই উৎপন্ন হইতেছে, নতুবা

আকাশ অথবা তন্নিহিত বায়ু, তেজ এবং রস ছাড়াও উহা ( অর্থাৎ জীবের বিকাশ ও বৃদ্ধি, চৈতন্য ও বাক্-শক্তি ) সম্ভব-যোগ্য হইত। কিন্তু উহার কোনটীই আকাশ অথবা তন্নিহিত বায়ু,তেজ এবং রস ছাড়া সম্ভবযোগ্য হয় না। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে আকাশ হইতে চরাচর সমস্ত জীবের বিকাশ ও বৃদ্ধি, চৈতন্য ও বাক্-শক্তি কিরূপভাবে বিকশিত হইতেছে তাহা জানিতে না পারিলে, মানুষের যাহাতে শরীরগত অথবা মন-গত ব্যাধির আক্রমণ না হয় অথবা ঐ রূপ কোন ব্যাধির আক্রমণ হইলে তাহা যাহাতে আমূলভাবে তিরোহিত হয় তাহার কোন পন্থা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। ঐ বিষয়ক চিন্তায় আরও অগ্রসর হইলে আরও দেখা যাইবে যে ঐ বিজ্ঞান না জানা থাকিলে কৃষিকার্য্য, শিল্প ও বাণিজ্য অথবা মনুষ্য-সেবা যে, কোন্ পন্থায় সর্ব্বতোভাবে মানুষের হিতকর হইতে পারে তাহা নির্ণয় করাও সম্ভব হয় না।

যে দিক্ দিয়াই দেখা যাউক না কেন, চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, যে-সাধনায় আকাশ হইতে চরাচর সমস্ত জীবের বিকাশ ও বৃদ্ধি হয় কি করিয়া, চৈতন্য ও বাক্-শক্তির উদয় হয় কি করিয়া তাহা উপলব্ধি করা যায়, সেই সাধনা মানুষের একান্ত প্রয়োজন এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এবং হিন্দুত্বকে কোন বড়ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে উহার মধ্যে যে ঐ শ্রেণীর কোন না কোন একটা সাধনা থাকিতে বাধ্য তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

হিন্দু-শব্দের অর্থ যে উপরোক্ত রকমের একটা কিছু বড়ত্বসূচক তাহা একবার বুঝিতে পারিলে হিন্দু শব্দটী যে কোন না কোন সাধনা-প্রকাশক তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ মানুষ জন্মিয়াই উপরোক্ত উপলব্ধির সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে পারে না। তাহাকে প্রযত্নের দ্বারা স্তরে স্তরে ঐ সাধনার অভ্যাসে উপনীত হইতে হয়।

হিন্দু-শব্দটী যে কোন না কোন সাধনা-প্রকাশক তাহা বুঝিতে পারিলে এবং ভারতীয় ঋষি 'ধর্ম্ম' শব্দে কি বুঝিতেন তাহা জানা থাকিলে হিন্দুত্বকে কোন ক্রমেই কোন ধর্ম্ম-প্রকাশক বলিয়া গ্রহণ করা চলে না এবং "হিন্দু-ধর্ম্ম" এইরূপ কোন শব্দ ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত হয় না।

"চোদনা লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" এবং "যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ সধর্ম্মঃ"। এই দুইটী সূত্রের অর্থে যথাযথভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ভারতীয় ঋষির ভাষানুসারে "ধর্ম্ম" কোন সাধনামূলক কার্য্য নহে। পরন্তু, ভারতীয় ঋষি বুঝাইয়াছেন যে সর্ব্ববিধ মানুষের সর্ব্ববিধ বৃত্তির মূলে একটী প্রাকৃতিক কর্ম্ম-বীজ নিহিত আছে। ঐ প্রাকৃতিক কর্ম্ম-বীজ আছে বলিয়াই মানুষের দশবিধ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার অর্থাৎ ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞানের উৎপত্তি হইতেছে। ঐ প্রাকৃতিক কর্ম্ম-বীজকে ভারতীয় ঋষি "ধর্ম্ম" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। ভারতীয় ঋষির কথায় যথাযথভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদিগের মতে মানুষ যত রকমেরই হউক না কেন সর্ব্ববিধ মানুষের ধর্ম্ম এক এবং উহা সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক প্রকৃতি-প্রদত্ত। উহা উপলব্ধি করিতে হইলে ক্ষেত্র ও অবস্থানুসারে বিভিন্ন সাধনার ( অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর প্রযত্নের ) প্রয়োজন হয় বটে কিন্তু মানুষের ধর্ম্ম কখনও একাধিক হয় না। সমগ্র ঋষি-প্রণীত মূল গ্রন্থের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে ঋষিগণ কুত্রাপি একমাত্র মানব-ধর্ম্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম্মের কথা বলেন নাই।

আজকালকার পণ্ডিতগণ, হিন্দু-ধর্ম্ম, সনাতন-ধর্ম্ম, শাক্ত-ধর্ম্ম, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, শৈব-ধর্ম্ম প্রভৃতি বহুবিধ ধর্ম্মের কথা বলিয়া থাকেন বটে, এবং ঋষি-প্রণীত মূল শাস্ত্রে হিন্দু-সাধনা, "ধর্ম্মঃ সনাতনঃ," শাক্ত-সাধনা, বৈষ্ণব-সাধনা, শৈব-সাধনা প্রভৃতি সাধনার কথা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ঋষি-প্রণীত মূল শাস্ত্রের কোথাও মানব-ধর্ম্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম্মের কথা পাওয়া যায় না। ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রের কথা বলিতে হইলে বলিতে হয় যে মানুষ ধর্ম্ম মানুক আর না-ই মানুক, ধর্ম্ম ছাড়া মানুষের জন্ম ও বৃদ্ধি হইতে পারে না, এবং মানুষের অবয়ব লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেই তাহার মধ্যে মানুষের ধর্ম্ম অথবা মানব-ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে। এই মানব-ধর্ম্মের একটী স্বাভাবিক গতি আছে। যাঁহারা ধর্ম্মের ঐ স্বাভাবিক গতি অনুসারে—তাহার ব্যভিচার না করিয়া—দৈনন্দিন জীবন যাপন করেন—তাঁহাদিগের কখনও পতন হয় না। অন্যপক্ষে ধর্ম্মের ঐ স্বাভাবিক গতির ব্যভিচার করিলে পতন অনিবার্য্য হইয়া থাকে। ধর্ম্মের ঐ স্বাভাবিক গতির ব্যভিচার যাহাতে না হয় তাহা করিতে হইলে মানব-ধর্ম্ম যে কি তাহা নিজ অবয়ব-মধ্যে উপলব্ধি

করিবার প্রয়োজন হয়। এই উপলব্ধি বহুবিধ সাধনা-সাপেক্ষ। এই উপলব্ধির সহায়তার জন্য ঋষিগণ বিবিধ পূজা, যজ্ঞ, জপ ও হোমের রচনা করিয়াছিলেন। ঋষি-প্রণীত পূজা, যজ্ঞ, জপ ও হোম একদিন সারাজগতের মানুষ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছিল এবং বহুদিন পর্য্যন্ত উহা ঋষি-প্রদর্শিত পথে ব্যবহৃত হইত। যতদিন পর্য্যন্ত উহা ঋষি-প্রদর্শিত পথে নিখুঁতভাবে ব্যবহৃত হইত ততদিন পর্য্যন্ত কেহই উহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সক্ষম হন নাই এবং মনুষ্য-সমাজের কেহই কোন উল্লেখযোগ্য দুঃখে জর্জ্জরিত হন নাই।

ঋষি-প্রণীত মূলগ্রন্থ ও নিবন্ধকারগণের কথার প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যাঁহারা আজ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া প্রচারিত তাঁহাদিগের সমাজের তথাকথিত ব্রাহ্মণগণই না বুঝিতে পারিয়া ঋষি-প্রণীত পূজা, যজ্ঞ, জপ ও হোম ঋষি-প্রদর্শিত পথের বিরুদ্ধ পথে পরিচালিত করিয়াছেন এবং তাহার ফলে তাঁহারা নিজেরা নিঃস্ব ও শ্রী-হীন ত' হইয়াছেনই, অধিকন্তু সমগ্র মানব-সমাজের দুঃখ-দারিদ্র্য উপস্থিত হইয়াছে। ঋষি-প্রদর্শিত পথের বিরুদ্ধতাবশতঃ যে-পূজা, যজ্ঞ, জপ ও হোম প্রত্যেকেরই স্বর্গোপলব্ধি করিবার সহায়তা করিত তাহা তদবধি আর কাহারও ঐ সহায়তা করে নাই এবং সমাজের অধিকাংশ মানুষই উহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া পড়িয়াছে।

সমস্ত মানুষের "ধর্ম্ম" যে এক, তাহা জানা থাকিলে মানুষের ধর্ম্ম লইয়া কোন দ্বন্দ্ব-কলহের কথা যে উঠিতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য। ঋষি-প্রণীত মূল শাস্ত্রে ও তৎপরবর্ত্তী নিবন্ধকারগণের কথায় প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে ঋষি-গণ একই মানব-ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নিবন্ধকারগণ ঋষিগণের কথা না বুঝিতে পারিয়া একাধিক ধর্ম্মের কথা উত্থাপিত করিয়াছেন এবং মানব-সমাজকে বিভ্রান্ত করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন।

কেহ কেহ হয়ত মনে করেন যে যাঁহারা মানব-ধর্ম্মের স্থলে হিন্দু-ধর্ম্মের কথা উত্থাপিত করিয়াছেন তাঁহারা যেরূপ মনুষ্য-সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন, সেইরূপ যাঁহারা খৃষ্টান ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম প্রভৃতির কথা উত্থাপিত করিয়াছেন তাঁহারাও মানুষের সর্ব্বনাশের অন্যতম কারণ। ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে এই কথাও যুক্তিসহ নহে। একমাত্র তথাকথিত হিন্দুধর্ম্মই ঋষি-প্রণীত মানব-ধর্ম্মের বাস্তিচারী ও বিদ্রোহী। বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্মাদি ঋষি-প্রণীত মানব-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিদ্রোহী নহে। উহার প্রত্যেকটি তথাকথিত হিন্দু-ধর্ম্মের বিদ্রোহী। মানুষের ধর্ম্ম যে এক মানব-ধর্ম্ম ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে, তাহা তথাকথিত হিন্দু নেতাগণ প্রচার না করিলে হয়ত বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, খৃষ্টান-ধর্ম্ম অথবা মুসলমান-ধর্ম্মের কোন কথা মানব-সমাজকে শুনিতেই হইত না।

সমগ্র ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র আলোড়িত করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে উহার কোথাও হিন্দু-শব্দটী ব্যবহৃত হয় নাই এবং কোথাও হিন্দু-ধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত বিদ্যমান নাই। একমাত্র মেরু-তন্ত্রে "হিন্দু" শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে এবং উহাতে হিন্দু-সাধনার কথা বিবৃত হইয়াছে।

কাজেই বলিতে হইলে যে যাঁহারা ঋষির সন্তানত্ব দাবী করিয়াও নিজদিগকে হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না তাঁহারা নিতান্ত নির্লজ্জ এবং ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

প্রকৃত হিন্দু-সাধনার সাধক যে এখন আর একজনও বিদ্যমান নাই এবং যাঁহারা হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামী করিয়া থাকেন তাঁহারা প্রত্যেকেই যে তথাকথিত হিন্দু, তাহাও একমাত্র উপরোক্ত দিক্ দিয়া দেখিলেই বলা যাইতে পারে। তথাপি আমরা আরও দেখাইব যে, প্রকৃত হিন্দু-সাধনা সমাজে একজনের মধ্যে বিদ্যমান থাকিলে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের কাহারও কোন দুঃখ-কষ্ট থাকিতে পারে না। এবং যখন মানুষের মধ্যে এত দুঃখ-কষ্ট বিদ্যমান আছে তখন প্রকৃত হিন্দুয়ানী কাহারও মধ্যে বিদ্যমান নাই তাহা যুক্তি-সঙ্গতভাবে স্বীকার করিতেই হইবে।

আমাদিগের বক্তব্য বিষয় ও কথা না বুঝিয়া হয়ত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সাংখ্যতীর্থ ও কৃষ্ণকিশোর চট্টোপাধ্যায়ের মত "হিন্দু"র লেখকগণ অনেক রকমের বৃথা আস্ফালন করিতে থাকিবেন।

আমরা ইঁহাদিগকে পরিষ্কারভাবে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা বুঝাইতে চাই :—(১) ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রে একমাত্র মানব-ধর্ম্মের কথা ছাড়া অন্য কোন ধর্ম্মের কথা নাই। (২) ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মের কোন সাধক পক্ষে কাহাকেও

মুসলমান অথবা খৃষ্টান বলিয়া অবজ্ঞা করা অথবা নিন্দা করা কঠোর দণ্ডের যোগ্য। (৩) হিন্দু-ধর্ম্ম অথবা সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া কোন ধর্ম্ম ঋষিগণ স্বীকার করেন নাই। যাঁহারা নিজদিগকে হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া প্রচারিত করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না তাঁহারা সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রের বিদ্রোহী। (৪) যাঁহারা ঋষির উপদিষ্ট ধর্ম্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম্মের কথা লইয়া আন্দোলন করেন তাঁহারা চিরন্তন সমাজের পদাঘাতের যোগ্য এবং অস্পৃশ্য।

আমাদিগের উপরোক্ত কথা চারিটীর কোন কথাটি ভুল তাহা যদি ঋষি-প্রণীত কোন মূল শাস্ত্রের সহায়তায় 'হিন্দু'-পত্রিকার মারফৎ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সাংখ্যতীর্থ ও কৃষ্ণকিশোর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকের মত কোন লেখক প্রতিপন্ন করিতে পারেন তাহা হইলে আমরা ঐ লেখকের শিষ্যত্ব লইতে প্রস্তুত আছি এবং দক্ষিণা-স্বরূপ দুই সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে বাধ্য আছি। অন্য পক্ষে ঐ লেখকগণ—যদি ঋষি-প্রণীত মূল শাস্ত্রের সহায়তায় উহার কোন কথায় অসত্য প্রতিপন্ন না করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা যে সমাজকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য দণ্ড-স্বরূপ সমাজের কাশফলা ও জুতা খাইবার উপযুক্ত তাহা বুঝুন এবং অনন্তর সেবা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হউন ইহাই তাঁহাদিগের নিকট আমাদিগের অনুরোধ। আলোচ্য বিষয়ের অপরাংশ পরবর্ত্তী সংখ্যায় গ্রহণ করা হইবে।

## বৈদেশিক বন্ধন সত্ত্বেও ভারতবাসী জন-সাধারণ কি পন্থায় দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ?

বর্ত্তমানে ভারতের সর্ব্বত্র বিবিধ চিন্তা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বলিয়া দেখা যায় : ইহাদের প্রথম "ব্যক্তিগত আইন অমান্য" এবং দ্বিতীয়টি "এক্সিস্-রাষ্ট্রসমূহের বিপক্ষে যুদ্ধ-সজ্জা।" ব্যক্তিগত আইন অমান্য পরিকল্পনা সুস্থির হইলে ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ পলায়িত হইবেন এবং ভারতবাসিগণের বাঞ্ছিত স্বাধীনতা তাহাদের করতলগত হইবে এবং ঐ স্বাধীনতা করতলগত হইলেই ভারতবাসিগণ স্বতঃই দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে—মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার অনুচরেরা এইরূপ বিবেচনা করিতেছেন। এইরূপ বিবেচনা নির্ব্বোধোচিত এবং কাপুরুষোচিত উভয়ই। কোন জাতি কেবল রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বাধীন হইতে পারিলেই সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে মুক্তিলাভ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইতে পারে, এইরূপ বিবেচনা অসমীচীন, সুতরাং ইহাকে আমরা নির্ব্বোধোচিত বলিতেছি। আমরা বারংবার বলিয়াছি এবং পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা যদি দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে কোন জাতির মুক্তিলাভ সুনিশ্চিত করিতে পারিত, তাহা হইলে জার্ম্মানী, ইতালী এবং ইংলণ্ড, তথা পৃথিবীর অপরাপর স্বাধীন দেশের যুগপৎ দুঃখ-দুর্দ্দশা পরিলক্ষিত হইত না। বর্ত্তমান পৃথিবীর প্রত্যেকটি স্বাধীন দেশবাসীর মধ্যেই দুঃখ-দুর্দ্দশা বর্ত্তমান, ইহা অস্বীকার করা চলে না; সম্ভবতঃ ঐ দুঃখ-দুর্দ্দশার পরিমাণ ভারতের তুলনায় অনেক অধিক। সুতরাং কেবল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সাহায্যেই কোন জাতি তাহার দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না, ইহা অবশ্যগ্রাহ্য। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই কোন জাতিকে তাহার দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে মুক্তি দান করিতে পারে না, কেবল যে ইহাই সত্য তাহা নহে, বৃটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ যদি একদল গর্দ্দভে রূপান্তরিত হইয়া না যান, তবে মিঃ গান্ধীর আইন অমান্য এবং অসহযোগের পন্থাদ্বারা ভারত যে কখনও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারিবে না, ইহাও সত্য।

ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন বিষয়ে মিঃ গান্ধীর চিন্তা কাপুরুষোচিত, কেন না বর্ত্তমানে ব্রিটিশ জাতি যখন তাঁহাদের অস্তিত্ব-রক্ষার্থ যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছেন, তখন ইহার সূচনা করা হইয়াছে। ইহা কেবল কাপুরুষোচিত নহে, এই আন্দোলন অকৃতজ্ঞতা-প্রসূতও বটে, কেন না ব্রিটিশ জাতির প্রতি ভারতবাসীদিগের কৃতজ্ঞতা বোধ করিবার সর্ব্বপ্রকার কারণ বর্ত্তমান। আধুনিক ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ অজ্ঞতা-শূন্য না হইলে ব্রিটিশ জাতিই যে ১৬০০ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ কালে ভারতের সর্ব্বাবিস্ত হিন্দু জাতিকে ধ্বংস হইতে

বাঁচাইয়াছিলেন, ইহা প্রমাণ করিতে সমর্থ ঐতিহাসিক তাঁহাদের নিকট প্রস্তুত হইত না।

এতদ্বিষয়ক সত্য কথা এই যে, এই প্রকার নির্বুদ্ধিতা, কাপুরুষতা এবং অকৃতজ্ঞতা কোন প্রকৃত-ভারতীয়ের পক্ষেই সুশোভন নহে। মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার অনুচর-বৃন্দের পক্ষেই এই প্রকার নির্বুদ্ধিতা, কাপুরুষতা এবং অকৃতজ্ঞতা সম্ভব, কেন না তাঁহারা প্রকৃত-ভারতীয় নহেন। তাঁহারা ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের চিন্তাধারা প্রকৃত পক্ষে ভারতীয় নহে এবং এই দিক্ হইতে তাঁহারা বস্তুতঃ এক প্রকার বর্ণ-সঙ্কর। ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত ভারতীয়ত্ব বলিতে যাহা বুঝিতে হয়, তাহা এক প্রকার লোপ পাইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করিয়া থাকি। অন্যথায় মেসার্স গান্ধী এণ্ড কোম্পানীর এই প্রকার নির্বোধোচিত, কাপুরুষোচিত এবং অকৃতজ্ঞতা-প্রসূত ভাবরাশির বিরুদ্ধে অন্ততঃ একজন ভারতীয়ের নিকট হইতেও সবল প্রতিবাদ উত্থাপিত হইত।

উপরিনির্দিষ্ট কারণে মেসার্স গান্ধী এণ্ড কোম্পানীর চিন্তাধারা যেরূপ নির্ব্বাহ, তেমনই ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ-কর্তৃক জার্মান প্রণালীর যুদ্ধ-চালনা পদ্ধতি-অনুসারে এক্সিস্-রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার পরিকল্পনাও সমান নির্ব্বাহ। ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ যদি যথোচিত গুণসম্পন্ন হইতেন, তাহা হইলে অবিলম্বে বুঝিতে পারিতেন যে, প্রতিপক্ষগণ যদি জার্মাণদিগেরই অনুসৃত পন্থার অনুসরণ করেন অর্থাৎ তাহাদের ন্যায় পাশবিক উপায় অবলম্বন করিয়া মনুষ্যপ্রাণ সংহার করেন এবং নিতান্ত অমানুষোচিত ভাবে সম্পত্তি বিনষ্ট করেন, তবে ঐ প্রতিপক্ষ কর্তৃক জার্মানদিগকে কখনও সম্পূর্ণ পরাজিত করা সম্ভব নহে। সাধারণ বোধশক্তি হইতেই বুঝা যাইবে যে, ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক জার্মানদিগের যুদ্ধ-প্রণালী অনুসৃত হইলে, জার্মানদিগের পক্ষে তাহাই এক প্রকার জয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়ার সমগ্র মনুষ্য-সমাজের নিকট ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দের যে-দায়িত্ব বিদ্যমান, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা অচেতন না হইলে বুঝিতে পারিতেন যে, একটি মাত্র মনুষ্য-প্রাণ সংহার না করিয়া কিংবা সম্পত্তির সামান্য মাত্র ক্ষতি সাধন না করিয়াও কি ভাবে প্রতিপক্ষের পরাজয় সাধন সম্ভাবিত হইতে পারে, তদুপযোগী কোন মৌলিক পন্থার আবিষ্কার করিয়া বিশ্ব সমক্ষে তাহা উপস্থাপিত করা তাঁহাদের অবশ্যকর্ত্তব্য। তাঁহারা সম্ভবতঃ মনে করিবেন যে, যুদ্ধ-পরিচালনার উক্ত পদ্ধতি বাস্তবতঃ কার্য্যকরী হইতে পারে না, কেবল কল্পনাতেই উহা সম্ভব, কিন্তু আমাদিগের নিকট আসিলে আমরা তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিতে পারি যে, ভারতের উপর ব্রিটিশ জাতির আধিপত্য বর্ত্তমান বলিয়া উহা কার্য্যতঃই সম্পূর্ণ সম্ভব।

ভারত এবং ভারতবাসীর পক্ষে উক্ত উভয়বিধ মতবাদের প্রাধান্যই যে ক্ষতিজনক হইবার সম্ভাবনা, তাহা বলাই বাহুল্য।

সুতরাং প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে যে, "বৈদেশিক শাসন-সত্ত্বেও ভারতবাসী জনসাধারণ কি পরার দুঃখ-দুর্দশা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে?"

ভারতবাসিগণের দুঃখ-দুর্দশা হইতে মুক্তিলাভ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে ভারতবাসী জন-সাধারণের শতকরা নিরানব্বই জন তাহাদের প্রায় প্রত্যেক দিনের জীবন-যাত্রায় যে-সকল দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে, প্রধানতঃ তাহাদিগের শ্রেণীবিভাগ কি, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইবে। ভারতবাসী জনসাধারণের এই সকল দুঃখ-দুর্দশা ভোগের কারণ কি, আমাদিগকে তাহাও পরিজ্ঞাত হইতে হইবে।

প্রধানঃ দৈনন্দিন জীবন-যাপনে অধিকাংশ ভারতবাসীকে যে-সকল দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করিতে হয়, তাহাদিগকে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত করা যাইতে পারে :

(১) বৈদেশিকদিগের শোষণ-বৃত্তি এবং সংঘর্ষ-প্রবৃত্তি।

(২) পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহ, তথা নিজদিগের মধ্যে দেওয়ানী কিংবা ফৌজদারী মামলা-মোকর্দ্দমা।

(৩) অর্থাভাব।

(৪) শারীরিক অস্বাস্থ্য।

(৫) মানসিক অসন্তুষ্টি এবং অশান্তি।

(৬) অকালবার্দ্ধক্য।

(৭) অকালমৃত্যু।

ভারত এবং ভারতবাসীর বিরুদ্ধে বৈদেশিকগণ প্রধানতঃ কি কারণে শোষণ-বৃত্তি এবং সংঘর্ষ-প্রবৃত্তি পোষণ করিয়া থাকেন, তাহা অনুসন্ধানার্থ অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে যে, এই কারণ দ্বিবিধ :—

(১) জনব্যাপী অর্থকৃচ্ছ্রতা।

(২) যেরূপ-শিক্ষা বিবিধ রিপু-দমন-সহায়ক হইতে পারে, প্রায় সকল বৈদেশিকগণেরই মধ্যে অনুরূপ শিক্ষার অভাব।

আমরা যে বলিতেছি ইংলণ্ড, জার্মানী, আমেরিকা, রুশিয়া প্রমুখ সকল বৈদেশিক জাতিরই প্রত্যেকটি ব্যক্তি অল্পাধিক অর্থকৃচ্ছ্রতা ভোগ করিতেছে, আধুনিক অর্থনীতি-শাস্ত্রের কতিপয় পাঠক সম্ভবতঃ ইহার প্রতিবাদ করিবেন, তাহা আমরা পরিজ্ঞাত আছি, কিন্তু এই সকল দেশের অধিকাংশ জনসাধারণই যে অর্থকৃচ্ছ্রতা ভোগ করিয়া থাকে এবং বিগত কিছুকাল হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে অনাহার যন্ত্রণাও যে তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে, ইহাও বাস্তব সত্য। মনুষ্যশরীরের দিক্ হইতে যে-খাদ্যসমূহকে স্বাস্থ্যপ্রদ আখ্যাত করা যায়, ঐ সকল দেশের প্রত্যেকটিতে তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণকে যদি ঐ দেশের সমগ্র জন-সংখ্যার পরিমাণ দ্বারা ভাগ করা যায়, তাহা হইলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধ হইবে। তখন দেখা যাইবে যে এই সকল দেশের কোনটিতেই, সমগ্র দেশের জন-সংখ্যার সুস্থ জীবনযাপন পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যকরূপে প্রয়োজন, শতকরা তাহার পঞ্চাশ ভাগও উৎপন্ন হইতেছে না। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সুস্থ জীবন-যাপন পক্ষে যাহা যাহা প্রয়োজন, শতকরা তাহার পঞ্চাশ ভাগও এই সকল দেশে উৎপাদন করিতে পারে না বলিয়া, নিজেদের অজ্ঞাতসারেই ঐ-সকল দেশের অধিবাসিগণ স্বাস্থ্যপ্রদ আহার-বিহার সম্বন্ধেও ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে —এবং অস্বাস্থ্যকর আহার-বিহারকেই স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া বিবেচনা করিতেছে।

অর্থনীতিঘটিত জটিল সংখ্যাবিজ্ঞানের কথা বাদ দিয়া যদি এই তথাকথিত সমৃদ্ধিশালী দেশ-সমূহের ইতিহাস যথাযথভাবে পর্য্যালোচনা করা যায়, তাহা হইলেও আমাদের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। সেই-সকল ইতিহাস হইতেই প্রমাণিত হইবে যে, এমন একদিন ছিল, যেদিন এই সকল দেশের প্রত্যেকটি অধিবাসীই বিদেশে যাইবার কথা না ভাবিয়া স্বদেশে থাকিয়াই নিজেদের জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারিত।

অতঃপর এমন একটী সময় আসে যখন ইউরোপের এই তথাকথিত সমৃদ্ধিশালী দেশসমূহের প্রত্যেকটিকে ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কারার্থ বদ্ধপরিকর হইতে দেখা যায়।

এক্ষণে যদি কেহ নিজেকে নিজে প্রশ্ন করেন : "এই সকল দেশের প্রত্যেকটিতেই এমন একটি সময় ছিল, যখন তাহাদের অধিবাসীদিগের সকলকেই বিদেশে না গিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে দেখা যাইত, ইহার কি কারণ হইতে পারে, আবার পরবর্ত্তী কালে তাহাদের প্রত্যেকটির অধিবাসীদিগকেই ভারতবর্ষে আগমনের পথ আবিষ্কারে যে উদ্যম দেখা যায়, ইহারই বা কারণ কি", তবে একটি মাত্র সদুত্তরই তিনি লাভ করিবেন যে, অনাদি কাল হইতে এই সকল দেশবাসীর মধ্যে ধারণা প্রচলিত ছিল যে, পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ সমৃদ্ধতম দেশ এবং পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটি সময় ছিল যখন ইহাদের প্রত্যেকটি দেশই স্বাবলম্বী ছিল, সুতরাং তখন ঐ সকল দেশবাসীর জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ বহির্জ্জিগতে যাইবার কোনই প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু এই স্বাবলম্বনের যুগের পরে এমন একটি সময় আসে যখন তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অপ্রাচুর্য্য ঘটে এবং সেই সময় এই সকল দেশের অধিবাসী-দিগের স্বদেশে বসিয়া জীবিকার্জ্জন আর সম্ভব হয় নাই এবং তখন তাহাদের প্রত্যেককেই ভারতবর্ষে আসিবার জন্য উৎকৃষ্ট পথের সন্ধান বিষয়ে চিন্তা করিতে হয়।

ইউরোপীয় দেশসমূহের প্রত্যেকটিতেই যে উল্লিখিত প্রকার শিক্ষার অভাবও বিদ্যমান, ঐ সকল দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা-সংক্রান্ত তথ্যসমূহ হইতে তাহা সহজেই নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

উপরিলিখিত উপায়ে, ভারত এবং ভারতবাসীর বিরুদ্ধে কি নিমিত্ত বিদেশবাসীদিগের শোষণ এবং সংঘর্ষ-প্রবৃত্তি পোষণ করিতে হয়, যথাযথভাবে তাহার প্রধান কারণসমূহ পর্য্যা-লোচনা করিয়া লইলে দেখা যাইবে যে, যদি ভারত এই সকল দেশকে আর্থিক কৃচ্ছ্রতা হইতে মুক্তি দান করিতে পারে, এবং উহাদের রিপুদমন-সহায়ক শিক্ষা ব্যবস্থিত করিতে পারে, তবে

ভারতের বিরুদ্ধে বৈদেশিকদিগের এই শোষণ এবং সংঘর্ষ-প্রবৃত্তি পুরাতত্ত্বে পর্যবসিত হইয়া যাইবে।

অপর যে-সকল দুঃখ-দুর্দশা, যথা আভ্যন্তরীণ কলহ, অর্থাভাব, অস্বাস্থ্য, মানসিক অসন্তুষ্টি এবং অশান্তি, অকাল-বার্দ্ধক্য তথা অকাল-মৃত্যু—ইহাদের কারণসমূহও যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাদের মূলেও উক্ত বিবিধ কারণ বর্তমান, যথা :—

১। ভারতের অর্থাভাব।

২। ভারতবাসীদিগকে রিপু-দমনে সহায়তা করিতে পারে ভারতে এইরূপ শিক্ষার অভাব।

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ভারতবাসিগণ যদি, যাহাতে তাহারা নিজেরা, তথা বৈদেশিকগণ, অর্থাভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে—এবং রিপুদমনে উভয়েরই সহায়ক হয়, এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে,—তবে সর্ববিধ দুঃখ-দুর্দশা হইতেই তাহারা নিষ্কৃতি পাইতে পারে।

সুতরাং স্বভাবতঃ প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে : ভারতবাসী তথা বৈদেশিকগণের প্রত্যেকে যাহাতে অর্থাভাব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে এবং তাহারা যাহাতে রিপু-দমনের শিক্ষায় অভ্যস্ত হয়, এই উভয়বিধ ব্যবস্থা করা কি ভারতের পক্ষে সম্ভব?

আমরা একাধিক সন্দর্ভে ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি যে, সূর্য এবং চন্দ্রের সহিত ভারতবর্ষ যে ভৌগোলিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট, তাহাতে ইহা সম্পূর্ণরূপেই সম্ভব—এবং একমাত্র ভারতের পক্ষেই এরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব, যাহাতে ভারতবাসী এবং বৈদেশিকগণের সকলেই অর্থাভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে এবং তাহারা রিপুদমনের শিক্ষায় অভ্যস্ত হইতে পারে।

পরবর্তী আলোচ্য এখন হইতেছে, ভারতবাসী, তথা বৈদেশিকগণের সকলে, যাহাতে সর্ববিধ আর্থিক অভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে এবং তাহারা রিপুদমনের শিক্ষায় অভ্যস্ত হয়, তজ্জন্য কিরূপ ব্যবস্থার আশ্রয় লইতে হইবে?

এই প্রশ্ন আলোচনা করিবার পূর্বে, ঐ ব্যবস্থা কার্যকরী করিবার দায়িত্ব কাহাদের তৎ-সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইতে হইবে। ভারতীয় সরকারের দায়িত্ব যে-ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের উপর ন্যস্ত, তাঁহারা ইহা কার্যকরী করিবেন, না ভারতবাসীদের নিজদিগকে ইহা করিতে হইবে? এই প্রশ্ন এই জন্য উঠে যে, ভারতের বর্তমান অবস্থায় কোন ব্যবস্থা কার্যকরী করিবার সুযোগ ভারতবাসী নিজদিগের অপেক্ষা ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের অধিক। এতদ্দ্বারা আমরা বুঝাইতে চাহিতেছি যে, ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ যদি স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে ইহার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন, তবে তদ্দ্বারা তাঁহাদের যে কার্য-প্রণালী হইত, ভারতবাসিগণকে অর্থাভাব প্রভৃতি হইতে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা নিজেদের হস্তে লইতে হইলে, সেই কার্য-প্রণালী হইতে উহা বিভিন্ন প্রকারের হইত।

কিন্তু ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষে এই প্রকৃত পন্থানুসরণ করিবার সম্ভাবনা আছে কি না, তাহার অনুসন্ধান-প্রয়াসী হইলে হতাশ হইতে হয়। কেন না, বর্তমান যুগের ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণের অযোগ্য বংশধর। পানাগার, নৃত্য, ক্রীড়া এবং কাপট্যে অত্যধিক মাত্রায় অনুরক্ত হইবার ফলে তাঁহাদের অধিকাংশেরই বুদ্ধি পঙ্গুত্বাপ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অভাবই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমান কালের ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের নির্বুদ্ধিতা এবং ঔদ্ধত্যের ফলে পূর্বতন ইংলণ্ডের মহামতি সন্তানগণের কঠিন পরিশ্রম-লব্ধ এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনার কথা মনে করিতেও আমাদের কষ্ট হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যব্যাপী পরস্পর-শৃঙ্খলা শৈথিল্য-প্রাপ্ত হইলে, মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকের পক্ষে তাহা দুর্ভাগ্য-স্বরূপ হইবে ইহা সত্য; কিন্তু ব্রিটেনের বর্তমান সন্তানগণের মধ্যে এমন কেহই আমাদের দৃষ্টিতে পড়িতেছেন না, যিনি বর্তমান বিপত্তি হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার যোগ্যতার অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন।

সুতরাং ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া ভারতবাসীদিগকেই অগ্রবর্তী হইতে হইবে। অর্থাৎ, ভারতবাসীদিগকে যদি তাহাদের, তথা বৈদেশিকগণের সকলের, অর্থাভাব হইতে মুক্তিলাভে এবং রিপুদমন-সহায়ক শিক্ষালাভে সাহায্য বিধান করিতে হয়, তবে বর্তমান অবস্থায় ভারতবাসিগণকে তজ্জন্য কি পদ্ধতিতে অগ্রসর হইতে হইবে, আমাদিগকে এক্ষণে তৎ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে।

ভারতবাসী, তথা বৈদেশিকগণের সকলে, তাহাদের অর্থাভাব হইতে যাহাতে মুক্তিলাভ করিতে পারে এবং রিপু-দমনের শিক্ষায় যাহাতে তাহারা অভ্যস্ত হয়, ইহার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা কি, ইহা যতক্ষণ না জানিতে পারা যাইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভারতবাসিগণকে কি উপায়ে উহা কার্য্যকরী করিতে হইবে, তাহা যে সুনির্দ্ধারিত ভাবে বুঝা যাইবে না—ইহা বলাই বাহুল্য।

এক্ষণে আমরা এই বিষয়টির আলোচনা করিতেছি।

কোন জাতি অন্তর্গত সকল ব্যক্তির সুস্থ জীবন-যাপন-পক্ষে সর্ব্বদিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন এবং বিতরণ কিরূপে সুনিশ্চিতভাবে ব্যবস্থিত করিতে পারে, কৃষিকার্য্য-হিসাবে তাহার আলোচনা করিয়া লইলে এই বিষয়টি অধিকতর বিশদ হইবে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে একাধিক সংখ্যায় ইহার আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু পুনর্ব্বার উহা এখানে লিপিবদ্ধ করিব।

কি করিয়া কোন জাতি অন্তর্গত সকল ব্যক্তির সুস্থ জীবনযাপন-কল্পে সর্ব্বদিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন এবং বিতরণ বিষয়ে সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করিতে পারে, অর্থনীতি-শাস্ত্রের ইহা একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আডাম্ স্মিথ্ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণের কেহই এই পর্য্যন্ত এতদালোচনার সার্থকতা দেখাইতে পারেন নাই। আপাতদৃষ্টে মনে হইতে পারে বটে যে, আধুনিক অর্থনীতি-বিদ্‌গণের প্রত্যেকেই এতদ্বিষয়ক আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের রচনাসমূহ সামান্য মনোযোগপূর্ব্বক বিশ্লেষণ করিলে প্রমাণিত হইবে যে, জাতির অন্তর্গত প্রত্যেকটি ব্যক্তির আর্থিক সমস্যার সমাধান-পন্থা অপেক্ষা তাঁহারা কেবল অন্তর্গত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিষয়েই অধিক অবহিত হইয়াছেন। এমন কি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমস্যারও কোন সার্থক সমাধান-দানে আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ কৃতকার্য্য হন নাই। প্রত্যেক জাতির মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অধিকাংশকেই বেতনভোগী চাকুরী-প্রত্যাশী থাকিতে হয়, এই বাস্তব তথ্য লক্ষ্য করিলে যে কোন প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তি আধুনিক পন্থার আর্থিক পরিকল্পনার এতদ্বিষয়ক ব্যর্থতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারিবেন। আধুনিক আর্থিক পরিকল্পনাসমূহকে আমরা যেরূপ ব্যর্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছি, ইহা যদি তদনুরূপ ব্যর্থই না হইত, তবে বর্ত্তমান কালের ইউরোপীয় জাতি-সমূহকে তাঁহাদের অধিকৃত অঞ্চল বিস্তারার্থ মনুষ্যরক্তপাতে প্রবৃত্ত দেখা যাইত না—ইহা সাধারণ বোধশক্তিতেও ধরা পড়িবে। সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় অর্থনীতিবিদ্‌গণের মতে, জাতির অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে হইলে জাতীয় বস্ত্রশিল্প, বাণিজ্য এবং ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে এবং তাঁহারা বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কোন জাতির কারেন্সি এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা সুদৃঢ়-ভিত্তিতে গঠিত না হইলে ঐ জাতির বস্ত্রশিল্প, বাণিজ্য এবং ব্যবসায় যথোচিত প্রসার লাভ করিতে পারে না। মনুষ্যের জ্ঞান-ভাণ্ডারে এই কারেন্সি এবং ব্যাঙ্কিং-এর বিষয়টি বস্তুতঃ আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণের দান এবং ইহার স্বপক্ষে অনেক কিছু বলা যাইতে পারে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, বস্ত্রশিল্প, বাণিজ্য এবং ব্যবসায়, তথা কারেন্সি ও ব্যাঙ্কিং প্রথা আর্থিক সমস্যা-সমূহের অভিপ্রায়ানুরূপ সমাধানে সমর্থ হয় নাই। এই সকল প্রথায় কতিপয় ব্যক্তি লক্ষপতি কিংবা ক্রোরপতি হইতে যে সমর্থ হইয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু প্রত্যেক দেশের সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে এই লক্ষপতি এবং ক্রোরপতিগণ সংখ্যায় নগণ্য মাত্র। সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে শতকরা ইঁহাদের সংখ্যা একজনও দাঁড়ায় না। প্রত্যেক দেশের জনসংখ্যার শতকরা নিরানব্বইটি ব্যক্তিই দারিদ্র্যক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদিগকে হয় সম্পূর্ণ, নয় অন্ততঃ আংশিক ভাবেও, অনাহার-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে।

ইহার কারণ-বিশ্লেষণে প্রয়াসী হইলে দেখা যায় যে, কোন দেশের কৃষি লাভজনক না হইলে সে দেশে আহার্য্য এবং কাঁচামালের সুপ্রাচুর্য্য সম্ভব নহে, এবং কড়ি প্রকৃতির ন্যায় কোন প্রকৃতিজাত বস্তুর মুদ্রারূপের মধ্যস্থতায় ঐ দেশের আভ্যন্তরীণ এবং বহির্দ্দেশিকের দ্রব্য-বিনিময়ের ব্যবস্থা সাধিত না হইলে, দেশমধ্যে দ্রব্যসমূহের নিরপেক্ষ বিতরণ কখনও সম্ভাবিত হইতে পারে না। কোন দেশে কাঁচামাল এবং আহার্য্যের অপ্রাচুর্য্য সংঘটিত হইলে ঐ দেশের পক্ষে অপর দেশের মুখাপেক্ষী হওয়া সুনিশ্চিত, এবং কৃত্রিম ব্যবস্থায়

কাগজী ও ধাতুমুদ্রা প্রচলিত থাকিলে দেশের মধ্যে দ্রব্য-বিতরণের বৈষম্য সংঘটনও সুনিশ্চিত।

বিংশ শতাব্দীর কতিপয় ইউরোপীয় অর্থনীতিবিদ্ তাঁহাদের আর্থিক ব্যবস্থায় যে কোন ত্রুটি বর্তমান, ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু ঐ ত্রুটি কোথায়, তাহা তাঁহারা নির্ধারণ করিতে পারিয়াছেন ইহা প্রতীয়মান হয় না। সমাজের সুস্থ জীবন-যাপন পক্ষে কৃষির যে প্রয়োজনীয়তা বর্তমান ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু এই কৃষির প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি, কিংবা নিজ কৃষকের পক্ষে এই কৃষি ব্যবসায়কে কি উপায়ে লাভজনক করা যাইতে পারে, এই উভয়ই তাঁহারা এযাবৎ সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

জাতির অন্তর্গত প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে সুস্থভাবে জীবন যাপন করিতে হইলে তন্নিমিত্ত যে ন্যূনতম দ্রব্যাদির প্রয়োজন, তাহার উৎপাদন ও বিতরণ বিষয়ে কোন জাতি কিরূপে সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করিতে পারে, এই বিষয়ের আলোচনা একমাত্র ভারতীয় ঋষিগণ তাঁহাদের অথর্ববেদ ও বিভিন্ন সংহিতায় বিশদ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন দেখা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আধুনিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভারতীয় ঋষিগণ যে-ভাষার সাহায্যে তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই ভাষা বুঝিবার প্রণালী পরিজ্ঞাত নহেন বলিয়া ঐ সকল গ্রন্থ অনুসরণ করিতে পারেন না। কোন জাতিকে যাহাতে অপর কোন জাতিরই কোনরূপ মুখাপেক্ষী না থাকিতে হয়, এবং কি করিয়া ঐ জাতির অন্তর্গত সকল ব্যক্তির সুস্থ জীবন যাপন পক্ষে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও সরবরাহ সুনিশ্চিত ভাবে সাধিত হইতে পারে, তদুদ্দেশে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহের প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন :—

প্রথমতঃ, দেশের সর্বত্র জমীর স্বাভাবিক উর্বরাশক্তির প্রাচুর্যের প্রয়োজন, অর্থাৎ কোনরূপ ব্যয়-বহুল সেচ-কার্যের, তথা সার-দান বিষয়ে কোনরূপ ব্যয়ের অধীন না হইয়া ঐ দেশের জমীতে বিঘা-প্রতি সর্বোচ্চ পরিমাণের ফসল উৎপন্ন হওয়া প্রয়োজন। যদি সর্বত্র নদী-স্রোতের স্বাভাবিক গতি অব্যাহত রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে ইহা অনায়াস-সাধ্য হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, মনুষ্যজাতির আহার্য এবং ব্যবহার্য পক্ষে যাহা স্বাস্থ্যকর, কেবল এমন ফসলের বীজ যাহাতে সর্বাধিক সম্ভব অধিক পরিমাণের জমীতে চাষ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জনসাধারণের স্বাস্থ্যের পক্ষে যাহা কোন ভাবে ক্ষতিজনক তাহার চাষ কিংবা উৎপাদন করা চলিবে না। তৃতীয়তঃ, শ্রমিক সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যের পক্ষে কোনরূপে ক্ষতিজনক হইতে পারে এমন কোন প্রকার শিল্পকার্য্য গৃহীত হইবে না। যন্ত্র-পরিচালিত এমন কোনরূপ শিল্প-ব্যবস্থা করিত হইতে পারে না, শ্রমিকদিগের পক্ষে যাহা অস্বাস্থ্যকর নহে—সুতরাং উহা সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ করিতে হইবে। কুটীর-শিল্প তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের স্বাস্থ্যের পক্ষে সাধারণতঃ হানিকর নহে। কৃষির যদি এমন কোনরূপ ব্যবস্থা সাধিত হয়, যাহাতে কৃষকগণ জমীতে বৎসরের পাঁচ মাস মাত্র পরিশ্রম করিয়া তাহাদের সাম্বাৎসরিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে এবং অবশিষ্ট কয়েক মাস যদি তাহাদিগকে শিল্প-কার্যে নিযুক্ত রাখা যায়, তবে যন্ত্র-শিল্পের পক্ষে কুটীর-শিল্পের প্রতিযোগিতায় অস্তিত্ব-রক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। এই উপায়ে কুটীর-শিল্পকে সম্পূর্ণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং সাফল্য-মণ্ডিত করা চলে।

চতুর্থতঃ, ক্রেতাদিগের স্বার্থহানি করিয়া যে-প্রকার ব্যবসায় ব্যবসায়ীর পক্ষে অতিরিক্ত লাভজনক হইতে পারে, কিম্বা ব্যবসায়ীর পক্ষে যে-প্রকার ব্যবসায়ে কোনরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে, এরূপ কোন ব্যবসায় গৃহীত হইলে চলিবে না। জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর কোন দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়-রূপ যে-ব্যবসায়ে ব্যবসায়ী যুক্তিযুক্ত পরিমাণ লাভ করিতে পারেন, কেবল সেই প্রকার ব্যবসায় গৃহীত হইতে পারিবে।

পঞ্চমতঃ, বেতনভোগী চাকুরীজীবীদিগকে কখনও মোটা বেতন দেওয়া চলিবে না। এই শ্রেণীর চাকুরীর ব্যবস্থা এমন থাকিবে, যাহাতে প্রকৃত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তৎপ্রতি আকৃষ্ট না হয়। চাকুরী করিয়া যাঁহাদিগকে জীবিকার্জন করিতে না হয়, এই শ্রেণীর চরিত্রবান্ ব্যক্তিদিগকেই কেবল রাষ্ট্র এবং সমাজের কার্যে যোগদান করিতে দেওয়া হইবে। এই সকল কার্য সকল সময়েই অবৈতনিক হইবে।

উপরে যে পাঁচটি ব্যবস্থার বিষয় লিখিত হইল, কেহ যদি তৎসমূহের মর্ম উপলব্ধি করিতে সচেষ্ট হন, তবে তাঁহার

## এই ব্যক্তিগত আইন-অমান্য আন্দোলনের সার্থকতা কোথায় ?

পাঠকবৃন্দ অবগত আছেন যে, মিঃ গান্ধী ব্যক্তিগত আইন-অমান্য আন্দোলন ঘোষণা করিয়াছেন এবং তাঁহার পরোয়ানা অনুযায়ী ভারতের উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ ভারত-রক্ষার নিমিত্ত যে-সকল আইন-কানুন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তৎসমুদয় কোন না কোন ভাবে লঙ্ঘন করিয়া কারাবরণ করিতেছেন।

ভারত তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ যে-সকল আইন-কানুন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎসমুদয় এই উদ্দেশ্যের রক্ষা-সাধন করা অপেক্ষা যে সর্ব্বনাশ-সাধনের অধিক সহায়তা করিতেছে এবং তদ্ভিন্ন এই সকল আইন-কানুনের বিরুদ্ধে বলিবার এবং করিবার অনেক কিছু আছে, ইহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমাদের মতে, তদ্ভিন্ন কারাবরণ করিবার কোন যুক্তির যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না। ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ ভারত তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যে-সকল আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎসমুদয় যে ভারত তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষা-সাধন অপেক্ষা সর্ব্বনাশ-সাধনের অধিকতর সহায়তা করিতেছে, ইহা যুদ্ধে জার্ম্মান পক্ষের তুলনায় ব্রিটিশ পক্ষ যে-অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছেন, তদ্দৃষ্টেই সুস্পষ্ট হয়।

সত্যের উদ্দেশ্যে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বর্ত্তমান থাকিলে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, যুদ্ধে জার্ম্মান পক্ষের তুলনায় ব্রিটিশ পক্ষের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়, কিন্তু ভারত তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যে-সকল আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তদনুযায়ী সম্ভবতঃ আমাদিগকে বিপরীত কথা বলিতে হইবে। আমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি হইতেছে এই যে, ভারত তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যে-সকল আইন-কানুন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহারা যদি তাহাদের উদ্দেশ্যই সাধিত করিতে পারিত, তবে ভারত এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবস্থা কোন ক্রমেই শোচনীয়তর হইত না এবং যুদ্ধে আমাদিগের অবস্থা জার্ম্মানদিগের অপেক্ষা শোচনীয়তর হইয়াছে, এই বাস্তব তথ্য হইতেই প্রমাণিত হয় যে, ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ যুদ্ধ-প্রচেষ্টা দ্বারা কিছু করিয়াছেন, এতাবৎ তাহা সফল হয় নাই এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা নির্ব্বুদ্ধিতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ব্রিটিশ পক্ষের রাজনৈতিক চাল যদি ভ্রান্ত হইত, তবে ভারতবর্ষের অধিপতি হইবার ফলে যে-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংস্থান-সামর্থ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তদ্বিরুদ্ধে পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সাহসী হইত না, আমরা এই সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ বলিয়াই এমন সুতীব্র ভাষা ব্যবহার করিতেছি ; এবং যদি বা জার্ম্মানীর ন্যায় কোন রাষ্ট্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার দুঃসাহস দেখাইত, তবে ছয় মাসের মধ্যেই উহার বিনাশ সাধিত হইত।

ইহার উপর যুক্তির দ্বারাও সহজেই ইহা প্রমাণিত হইতে পারে যে, ভারত তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত যে-সকল আইন-কানুন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, যুদ্ধজয়ের মূলনীতির দিক্ হইতে বিচার করিলে, তাহাদের অধিকাংশই নির্ব্বুদ্ধিতামূলক হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা মনুষ্য-প্রাণের বিনাশ, তথা মনুষ্য-সম্পত্তির অপব্যয় সাধিত না হইয়া পারে না, সুতরাং ভারত, তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তাহারা সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। ভারত, তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার এই সকল আইন-কানুনের নির্ব্বুদ্ধিতা প্রদর্শন এই সন্দর্ভের উদ্দেশ্য নহে। উপরে আমরা যেরূপ লিখিয়াছি, সেইরূপে ইহার বিরুদ্ধে সত্য ভাবে অনেক কিছু বলিবার এবং করিবার আছে, আমরা কেবল তাহাই দেখাইতে চাহি। ভারত, তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যে-সকল আইন-কানুন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা লঙ্ঘন করিয়া কারাবরণ করিবার মধ্যে কোন সুযৌক্তিক উদ্দেশ্য যে নিহিত থাকিতে পারে না, তাহা প্রদর্শন করাই বর্ত্তমান সন্দর্ভের প্রধান উদ্দেশ্য।

আমরা সকলেই বিদিত আছি যে, মিঃ গান্ধী দেশবাসীর এবং কংগ্রেসের জন্য যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচারের স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন এবং ইহার অনুমতি লাভে ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়াই তিনি ব্যক্তিগত আইন-অমান্য আন্দোলন ঘোষণা করিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচারের স্বাধীনতা লাভই মিঃ গান্ধীর যদি প্রকৃত উদ্দেশ্য

ছিল, তবে এসেম্বলী সমূহে উপস্থিত থাকিয়া আইন-তান্ত্রিক প্রণালীতে অগ্রসর হইয়া তিনি কি অনেক অল্প সময়ের মধ্যে এবং শোভনতর রূপে তাহা সাধিত করিতে পারিতেন না? আমরা সকলেই বিদিত আছি যে, যুক্তিবলে সর্ব্বত্র জয়লাভ করে ইহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য অন্যতম বিধান এবং যুক্তি-সঙ্গত সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে, কংগ্রেসের দিক্ হইতে যদি প্রকৃত রাজনৈতিক বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করা হইত, তবে ভারত, তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বিধিবদ্ধ এই সকল আইন-কানুনের তো বটেই, দেশের মধ্যে প্রচলিত অপর সকল প্রকার নিছক আইন-কানুনের ও প্রতিবিধানের পথে যে-সকল প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, কংগ্রেস তৎসমস্তই জয় করিবার উপায়ের সন্ধান লাভ করিত। আমরা বলিতে চাই যে, কংগ্রেসের দিক্ হইতে প্রকৃত রাজনৈতিক বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করা হয় নাই, এবং কংগ্রেস দেশবাসীকে প্রকৃত পথে চালনা না করিয়া ভ্রান্ত পথে চালনা করিয়া দেশের মধ্যে ক্রমশঃ অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

"ব্যক্তিগত আইন-অমান্যে"র সপক্ষে যে-সকল যুক্তিই বর্ত্তমানে অবতারণা করা হউক্ না কেন, ভবিষ্যৎ নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ উপস্থিত করিবে যে, রাষ্ট্রের আইন-কানুন যেরূপ নিকৃষ্টই হউক না কেন, তৎসমূহ লঙ্ঘন করিয়া এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া যথাযথ ভাবের কোন কল্যাণ সাধন করা যায় না। এই সার্ব্বজনীন বিধানের অব্যর্থতা প্রমাণকল্পে লিখিত ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে কয়েকটি নিদর্শন উদ্ধার করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যথাযথ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিনা তাহার আইন-কানুন লঙ্ঘন বস্তুতঃ কুত্রাপি জনসাধারণের পক্ষে যথার্থ শুভফলপ্রদ হয় নাই।

ব্যক্তিগত আইন-অমান্য দ্বারা প্রকৃত স্বাধীনতা আসিতে পারে কি না, এই সম্বন্ধে কেহ চিন্তা করিবার কষ্ট স্বীকারে প্রস্তুত থাকিলে তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, মিঃ গান্ধীর দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া কংগ্রেস যে-পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, ঐ পন্থায় বাহ্যানুষ্ঠান সাফল্যলাভের একেবারে সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। আইন-অমান্যের এই পন্থা যথাযথ-ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা রাষ্ট্রকে ভীতি প্রদর্শন করিবার প্রণালী ব্যতীত আর কিছুই নহে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনরূপ ভীতি-প্রদর্শনের পন্থার দ্বারা কোন ক্রমেই জনসাধারণের পক্ষে প্রকৃত সুফল লাভের সম্ভাবনা হইতে পারে না, এবং রাষ্ট্রের শাসনকার্য্য এবং শাসন-পদ্ধতি পরিচালনার দায়িত্ব যাঁহাদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহারা যদি স্বেচ্ছাচারী কিংবা ভীরু না হন, তাহা হইলে যে তদ্দ্বারা রাষ্ট্রনীতিরও কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে না,—ইহা সকল প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন। ব্যক্তিগত আইন-অমান্যের নীতি যে রাষ্ট্রকে ভীতি প্রদর্শন করিবার প্রণালী ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং রাষ্ট্রকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া জনসাধারণের পক্ষে প্রকৃত কোন কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না, এই দুইটি বিষয় একত্র বিচারপূর্ব্বক বিচার করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতে ব্রিটিশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আইন-অমান্যের নীতি ভারত এবং ভারতবাসীর পক্ষে প্রকৃত প্রস্তাবে সুফলপ্রসূ হইতে পারে না। ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ যদি স্বেচ্ছাচারী এবং ভীরু না হইয়া পড়েন, তবে ইহার দ্বারা ভারতে রাষ্ট্রনীতিরও কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে না।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—ভারতের শাসনব্যবস্থার নীতি যাঁহারা পরিচালনা করেন, সেই বর্ত্তমান ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ স্বেচ্ছাচারী কিংবা ভীরু কি না?

ভারত-শাসনের বিভিন্ন বিভাগ, যে-সকল আইন অনুযায়ী চালিত হয়, তৎসমূহ যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করিলে স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর থাকে না যে, ভারতের বিভিন্ন আইন-সচিবগণের বৈশিষ্ট্যই হইতেছে দূরদর্শিতার অভাব এবং ভারতের শাসন-নীতি বিধিবদ্ধ করিবার মূলে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহারা প্রায়শঃই স্বেচ্ছাচারী। বস্তুতঃ সরকারের আইনসমূহ যদি অধিকাংশতঃ স্বেচ্ছাচারমূলক না হইত এবং এই সকল স্বেচ্ছাচারমূলক আইন-কানুন যদি আইন-সচিবরূপে সংস্থাপিত কতিপয় 'ধন-কড়া' ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইত, তবে যে-ব্রিটিশ জাতি ভারতে একদিন অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন, তাঁহারা বর্ত্তমানে যেরূপ অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইতে পারিতেন না। যে ঘটনা-পরম্পরায় আইনতন্ত্রের ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তৎসমূহ যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করিলে ভারত সরকারের দায়িত্ব যাঁহাদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে যুক্তিযুক্ত ভাবে যে ভীরুতার

অভিযোগও আনয়ন করা যায়—ইহা অস্বীকার করা চলে না।

সুতরাং আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, যদিও ভারত এবং ভারতবাসীর পক্ষে ব্যক্তিগত আইন-অমান্য কোন প্রকার সুফলপ্রসূ নহে, তথাপি যে-ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের উপর ভারতের শাসনকার্য্য এবং শাসন-নীতি পরিচালনার নিয়ন্ত্রণ-দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী এবং ভীরু বলিয়া এতদ্দ্বারা ভারতের শাসন-নীতির এবং আইনতন্ত্রের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হইলেও হইতে পারে।

অতঃপর প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে,—মিঃ গান্ধী কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট কংগ্রেসের এই ব্যক্তিগত আইন-অমান্য দ্বারা ভারত কি শ্রেণীর পরিবর্ত্তন লাভ করিতে পারে?

এই প্রশ্নের প্রতি গভীর ভাবে অবহিত হইলে দেখা যাইবে যে, মিঃ গান্ধীর এই আন্দোলন দ্বারা সর্ব্বাধিক সম্ভব পরিবর্ত্তন যাহা সাধিত হইতে পারে, তাহা হইতেছে ভারতের আইন-গঠন এবং শাসন ব্যাপারে মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দের পক্ষে অধিকতর কর্ত্তৃত্ব-লাভ মাত্র। যদি ধরা যায় যে, দেশের আইন-গঠন বিষয়ে এবং শাসন-ব্যাপারে দেশবাসীর কর্ত্তৃত্ব যত অধিক হইবে, ততই উহা প্রকৃত স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইবে, তবে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্যক্তিগত আইন-অমান্য আন্দোলনের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা বর্ত্তমান এবং তাহা হইলে আমাদিগের আর কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু যদি স্বীকার করা হয় যে, জনসাধারণের অধিকাংশ কোন প্রকার বেতনভোগী চাকুরীর অধীন না হইয়া দুশ্চিন্তা এবং দুর্ভাবনার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভপূর্ব্বক সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য অর্জ্জন করিয়া স্বাবলম্বী জীবনযাপনের সুযোগ লাভ না করিলে—স্বাধীনতার কোন অর্থ-ই হয় না, তবে মিঃ গান্ধীর আন্দোলন যে, ভারতের আইন-গঠন এবং শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে কোন হিতজনক পরিবর্ত্তন সাধিত করিতে পারিবে না, ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য। পাঠকবৃন্দ সামান্য মাত্র দূরদর্শিতার সাহায্যেই নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বুঝিতে পারিবেন যে, মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দকে বর্ত্তমানে যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে—ভারতের আইন গঠন এবং শাসনকার্য্যে তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব অধিক হইলেও, ভারতবাসী কোন সম্প্রদায়ের পক্ষেই বেতনভোগী চাকুরীর অধীন না হইয়া দুশ্চিন্তা এবং দুর্ভাবনা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য অর্জ্জনপূর্ব্বক স্বাবলম্বী জীবনযাপনের কোন সুযোগ দানে তাঁহারা সাহায্য করিতে পারিবেন না। বেতন-ভোগী চাকুরীর অধীন না হইয়া দুশ্চিন্তা এবং দুর্ভাবনা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সুস্থ ভাবে জীবনযাপনের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা সকলের পক্ষে সুনিশ্চিত করিয়া কোন শ্রেণীর লোককে এই প্রকার স্বাধীন জীবন যাপনে সাহায্য করিতে হইলে কি করিতে হইবে, তাহা অনুধাবনে কেহ সচেষ্ট হইলে দেখিবেন যে, তদুদ্দেশ্যে কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের হিতজনক সুসংগঠন অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজন। কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের বিজ্ঞান এবং তাহাদের প্রয়োগ বিষয়ে মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা থাকিলে ভরসা পোষণ করা যাইত যে, দেশের আইন-গঠন এবং শাসন-ব্যাপারে তাঁহাদের অধিকতর কর্ত্তৃত্বলাভহেতু জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হইবে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হইতেছে এই যে, কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের বিজ্ঞানে এবং প্রয়োগে কোন অভিজ্ঞতা দূরে থাকুক, মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দের অধিকাংশই কল্যাণজনক কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের অ-আ-ক-খ-ও পরিজ্ঞাত নহেন। কেবল মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দই যে এই সকল বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ তাহা নহেন, দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি-বৃন্দের যিনি যাহা করিতেছেন এবং বলিতেছেন, তৎসমূহ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিলে প্রকৃত চিন্তাশীল যে-কোন ব্যক্তি এই সত্য সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইবেন যে, জনসাধারণকে তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে অব্যাহতি লাভের উপায়-নির্দ্দেশের সামর্থ্য-সম্পন্ন একজন ব্যক্তিও বর্ত্তমান ভারতে নাই।

সুতরাং শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেই হয় যে, ভারত সরকারের শাসন বিষয়ে কিংবা আইন-তন্ত্রের যদি এমন কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, যাহাতে হয় মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দ,—নয়, ভারতীয় অপরাপর রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ অধিকতর কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন, তবে তদ্দ্বারা কোনমতেই ভারতবাসী জন-সাধারণের কোন সাহায্যই সাধিত হইবে না।

ভারতীয় এই নেতৃবৃন্দ এবং ব্রিটিশ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব লাভ করিয়া বর্ত্তমানে যাঁহারা বরেণ্য হইয়াছেন, এই উভয় দলের তুলনায় প্রমাণ হইবে যে, যদিও ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা জন-সাধারণকে তাহাদের বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে অব্যাহতি দানের পক্ষে যেরূপ প্রয়োজন তদনুপাতে কিছুই নহে, কিন্তু ভারতীয় নেতৃবৃন্দ অপেক্ষা তাঁহাদের জ্ঞান যে অধিক, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

আধুনিক অর্থনীতি-শাস্ত্রের নীতিসমূহ সম্বন্ধে অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, মূলতঃ তাহাদের প্রয়াস হইতেছে —প্রত্যেক দেশের শতকরা ৯৫ জন অধিবাসী যে দরিদ্র জনসাধারণ, তাহাদের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্দ্দশার নিবারণ। ইহাও দেখা যাইবে যে, আধুনিক অর্থনীতি-শাস্ত্র পাশ্চাত্যের অধিবাসীদিগেরই মস্তিষ্ক প্রসূত এবং আধুনিক অর্থনীতি সম্বন্ধে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের যে-কাহারও অপেক্ষা পাশ্চাত্যের অধিবাসীদিগের জ্ঞান অধিক।

ভারতীয় ঋষিগণের লেখনী-নিঃসৃত অর্থশাস্ত্রের মূলনীতি-সমূহ তাঁহাদের দ্বারা যে-ভাষায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা আধুনিক সংস্কৃত-বিদ্‌গণ জানেন না, সুতরাং উহা তাঁহাদের অবোধ্য রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ সকল মূলনীতি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতীয় ঋষিগণের অর্থ-শাস্ত্রের নীতিসমূহের মূল উদ্দেশ্য—জন-সংখ্যা যত অধিকই হউক না কেন, সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে অব্যাহতি দান। ইহাও দেখা যাইবে যে, আধুনিক ভারতীয়, তথা পাশ্চাত্য দেশবাসী কাহারও ভারতীয় ঋষিগণ রচিত অর্থশাস্ত্রের সহিত পরিচয় নাই।

এই সকল বাস্তব ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইংলণ্ডের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দ অন্ততঃ আধুনিক অর্থশাস্ত্র, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিবিধ দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে অব্যাহতি দানের বিজ্ঞান, সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত আছেন, কিন্তু ভারতীয়গণ, আধুনিক অর্থশাস্ত্র অথবা ভারতীয় ঋষিগণের লেখনীনিঃসৃত অর্থশাস্ত্র এই উভয়ের কোনটিই পরিজ্ঞাত নহেন।

সুতরাং আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইতেছে যে,ভারতীয় জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা সম্বন্ধে যাঁহার সমপ্রাপ্তা বর্ত্তমান, মিঃ গান্ধীর এই ব্যক্তিগত আইন-অমান্যকে তাঁহার কোন প্রকার উৎসাহ-দান কর্ত্তব্য নহে। ভারতে ব্রিটিশ-শাসন বহুবিধ ত্রুটিপূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু যতদিন ভারতের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় পাশ্চাত্য দেশ হইতে তাঁহারা যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছেন, তাহা ভুলিতে এবং তাহার উচ্ছেদ সাধনে প্রস্তুত না হন, এবং যতদিন না তাঁহারা ভারতীয় ঋষিগণ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা শিক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হন, ততদিন পর্য্যন্ত এই অযোগ্য ভারতীয়দিগের পরিচালিত শাসনের তুলনায় ব্রিটিশ শাসন পছন্দ করিবার সকল প্রকার কারণ বর্ত্তমান।*

## আইন-অমান্য আন্দোলন দমনে সরকারের কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ

আইন-অমান্য আন্দোলন দমনে সরকারের কি কর্ত্তব্য, তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে কোন সরকারের পক্ষে কোন প্রকার আইন-অমান্য আন্দোলন দমন করিবার বিষয় চিন্তা করা উচিত কি না, আমরা প্রথমতঃ তাহা দেখিবার চেষ্টা করিব। যদি দেখা যায় যে, দেশবাসী অধিকাংশ জন-সাধারণের কোন প্রকার সমস্যার সমাধান আইন-অমান্যের দ্বারা সম্ভব, কিংবা যদি দেখা যায় যে, জন-সাধারণের প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের সাহায্য এতদ্দ্বারা সম্ভব, তবে কোন সরকারেরই যে কোন প্রকার আইন-অমান্য আন্দোলন দমনের বিষয় চিন্তা করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ থাকিতে পারে না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। উপরন্তু ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই আন্দোলন সমর্থনের যোগ্য।

আমরা ইতিপূর্ব্বে একাধিক সন্দর্ভে প্রমাণ দেখাইয়াছি যে, যে-সকল দুঃখ-দুর্দ্দশা দেশের অধিকাংশ অধিবাসীকে ক্লিষ্ট করিতেছে, কোন প্রকার আইন-অমান্য কিংবা মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দ-আনীত কোন আন্দোলনের দ্বারা তাহার

* ৩০শে ডিসেম্বরের 'দি ইষ্টার্ণ ওয়ার্ল্ড'তে প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

কোন একটির সমাধানের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। কেন না তাঁহারা (মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দ) জনসাধারণের এই সকল দুঃখ-দুর্দ্দশার যথার্থ সমাধানের জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহার বিন্দু-বিসর্গও অবগত নহেন। এমন কি, মিঃ গান্ধীর কোন আন্দোলন দ্বারা প্রকৃত স্বাধীনতা লাভেরও সম্ভাবনা নাই। কেন না কোন দেশেই আর্থিক স্বাধীনতা ব্যতীত কোন প্রকার প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা সম্ভব হইতে পারে না এবং কোন দেশের আর্থিক স্বাধীনতার জন্য যাহা প্রয়োজন মিঃ গান্ধী ও তাঁহার অনুচরবৃন্দ তৎসম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও পরিজ্ঞাত নহেন। মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দের কোন আন্দোলন দ্বারা যদি কিছু লাভ হইতে পারে, তাহা দেশের শাসন-ব্যবস্থার সামান্য পরিবর্ত্তন মাত্র,—অর্থাৎ আন্দোলন-কারিগণের উহাতে সামান্য অধিক কর্তৃত্বলাভ, কিন্তু তদ্দ্বারা দেশের দরিদ্র জন-সাধারণের কাহারও কোন প্রকৃত হিত সাধিত হইবে না, আমার ভারতের আইন-গঠন ও শাসন-কার্য্যের নীতি-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব যে সব ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহাদিগকে যেরূপ ভীরু এবং স্বেচ্ছাচারী বলিয়া দেখা যায়, তাঁহারা যদি তাহা না হন, তবে মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দের পক্ষে এই কর্তৃত্ব-লাভেরও কোন সম্ভাবনা নাই। এই সব বিবেচনার বিষয় বাদ দিলেও দেখা যায়, আইন-অমান্য দেশের মধ্যে কেবল অধিকতর অনৈক্যই সৃষ্টি করিবে, কেন না, এই শ্রেণীর আন্দোলনের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে উভয় শ্রেণীর লোকই দেশের মধ্যে বিদ্যমান।

সুতরাং যুক্তিযুক্ত ভাবে স্বীকার করিতে হয় যে, দেশবাসী জন-সাধারণের অধিকাংশের পক্ষে আইন-অমান্য আন্দোলনের কোন প্রকারে হিতসাধক হইবার সম্ভাবনা নাই, উপরন্তু পারস্পরিক দ্বন্দ্বকলহে দেশের সর্ব্বাংশে ক্ষতবিক্ষত হইবার সর্ব্ব-প্রকার সম্ভাবনা উহাতে বর্ত্তমান—সুতরাং কোন প্রকৃত চিন্তা-শীল ব্যক্তি অথবা কোন সরকারেরই ইহাকে কোন ক্রমে প্রশ্রয় দান উচিত নহে, বরং এইরূপ ক্ষতিকর এবং নির্ব্বোধ আন্দোলন দমন করার বিষয়ে অবহিত হওয়ার সর্ব্বপ্রকার কারণ প্রত্যেক সরকারেরই রহিয়াছে।

আইন-অমান্য আন্দোলন নির্ব্বোধোচিত এবং ক্ষতিকর, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে ইহা যখন সুস্পষ্ট, তখন আইন-অমান্য আন্দোলন দমনে সরকারের কি কর্ত্তব্য হওয়া উচিত তাহার সন্ধানকে স্বকীয় কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করা প্রত্যেক প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তিরই উচিত।

সর্ব্ববিধ আইন-অমান্য আন্দোলন দমনে সরকারের কি কর্ত্তব্য, তাহার সন্ধান লাভ করিতে হইলে, এই আন্দোলন দমনে বর্ত্তমানে যে-সকল প্রণালীতে কার্য্য করা হইতেছে, তাহার ত্রুটি কোথায়, তাহা জানিবার প্রয়োজন। জন-সাধারণের তথাকথিত নেতৃবৃন্দের বিবিধ অবাঞ্ছনীয় আন্দোলন দমনে বর্ত্তমানে যে-সকল প্রণালীতে কার্য্য করা হয়, তৎসমূহের ত্রুটি কি, তাহা জানিতে হইলে, প্রথমতঃ ঐ সকল প্রণালী কি তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইবে।

আইন অমান্য আন্দোলনের বর্ত্তমান প্রণালী অনুসারে—কোন ব্যক্তি যখন কোন প্রকার আইন অমান্যের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়, তখন প্রথমতঃ তাহাকে গ্রেফ্‌তার করা হয়, দ্বিতীয়তঃ তাহার বিচার হয়, তৃতীয়তঃ তাহার জেল হয় এবং চতুর্থতঃ রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে জেলের মধ্যে সে বিশেষ ব্যবহার লাভ করিয়া থাকে, অর্থাৎ জেলের বাহিরে থাকিলে ঐ ব্যক্তি যাহা উপার্জ্জন করিতে পারিত, তাহার পরিবারের ভাতা হিসাবে সে তদপেক্ষা অধিক পাইয়া থাকে এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও অধিক লাভ করিয়া থাকে।

এক্ষণে আমরা বিচার করিব, আইন-অমান্য আন্দোলন কল্পে এই সকল প্রণালী অনুসারে যেরূপে কার্য্য করা হয়, সেই কার্য্যের কি প্রতিক্রিয়া দাঁড়ায়।

প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ব্যবস্থায় কোন ব্যক্তি যখন—আইন-অমান্যের অপরাধে গ্রেফ্‌তার হয়, তাহার বিচার হয় এবং সে জেলে যায়,—তখন সরকার হইতে আইন-অমান্যের অপরাধে অপরাধী এই ব্যক্তির তথা জন-সাধারণের মনে, এই প্রকার আইন-অমান্যের কার্য্য দ্বারা রাষ্ট্র এবং জন-সাধারণের বিরুদ্ধে যে ভীষণ অপরাধে সে অপরাধী হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন রেখাপাত পর্য্যন্ত করিবার চেষ্টা করা হয় না। অপর পক্ষে রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের প্রচার-হেতু যে-বিশ্বাস প্রচলিত হইয়াছে, তৎ হেতু অপরাধী এবং জন-সাধারণ উভয়েই মনে করে যে, আইন-অমান্য এক প্রকার দেশপ্রেমমূলক কার্য্য এবং সরকার তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে, ঐ আচরণ স্বেচ্ছাচারপ্রসূত এবং অত্যাচারসূচক বলিয়া বিবেচনা করা হয়। ফল দাঁড়ায় এই যে,

অপরাধীরা উত্তরোত্তর অধিক বিদ্রোহী হইতে থাকে, সুতরাং জন-সাধারণের মধ্যে অসন্তোষের প্রকোপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

চতুর্থ ব্যবস্থায়, অর্থাৎ যাহাতে ঐ ব্যক্তি রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে বিশেষ ব্যবহার লাভ করিয়া থাকে, তাহাতে সে জেলের বাহিরে থাকা অপেক্ষা জেলের ভিতরে থাকাই অধিকতর আরামদায়ক এবং শান্তিজনক মনে করিয়া থাকে।

এক্ষণে আমরা পাঠকবৃন্দকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলি যে, এই মারাত্মক আন্দোলনের দমন উদ্দেশ্যে যে-সকল প্রণালী অবলম্বন করা হয় বলিয়া উল্লিখিত হইল, তদ্দ্বারা উহা সম্ভব কি না।

প্রথমতঃই দেখা যায় যে, সরকারের অপ্রিয়ভাজনতা এবং এই ভ্রান্ত আন্দোলন দমনে অসামর্থ্যের উল্লেখ করিয়া এই দেশস্থ শাসকবৃন্দের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ করা হইতেছে।

কিন্তু ভারতের এই অবস্থার জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে কাহারা দায়ী, তাহা জানিবার জন্য সচেষ্ট হইলে দেখা যাইবে যে, ভারতে যে সকল ব্রিটিশ শাসক বিদ্যমান, ইহার দায় তাঁহাদের নহে, পরন্তু ভারতের বাহিরে যে-সব ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ বিরাজমান তাঁহারাই এই সকল অনিষ্টপাতের মূল। শাসন, আইন-সংগঠন এবং বিচার-সংক্রান্ত যে-সকল নীতি তাঁহারা বিবৃত করেন, ঐ সকল নীতিই নির্দ্বোষোচিত এবং ত্রুটিপূর্ণ।

এইবারে, আইন-অমান্য আন্দোলনের দমনে প্রকৃত কি প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, আমরা তাহার আলোচনা করিতেছি। যখন কোন ব্যক্তি আইন-অমান্যের অপরাধে গ্রেফ্‌তার হয় এবং তাহার বিচার হয়, তখন যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, সাধারণের এবং ব্যক্তিগত কোন্ উপকার সাধনার্থ সে রাষ্ট্রের আইন-লঙ্ঘনে প্রয়োচিত হইয়াছে, সে তাহা বুঝাইয়া বলুক—দেখা যাইবে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার কোন সুযৌক্তিক ব্যাখ্যা দান করিতে পারিতেছে না। এবং এইরূপ ভাবে জিজ্ঞাসার পর, সরকার পক্ষের যদি এমন কোন বন্দোবস্ত থাকে, যদ্দ্বারা রাষ্ট্রের কোন আইন—যত নিকৃষ্টই তাহা হউক না কেন—লঙ্ঘন করিলে তাহা যে ব্যক্তিগত ভাবে কিম্বা জন-সাধারণের পক্ষে কোনরূপ কল্যাণজনক হইতে পারে না, ইহা ঐ অপরাধীকে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহা জন-সাধারণ, তথা অপরাধী, এই উভয়ের মনোভাবের উপর সুনিশ্চিত রূপে প্রভাব সৃষ্টি করিবে এবং ইহার ফল দাঁড়াইবে যে, অপরাধী ব্যক্তিও যেরূপ, জন-সাধারণও সেইরূপ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে এবং কোন প্রকার বে-আইনী কার্য্য করিতে ইতস্ততঃ বোধ করিবে।

তৃতীয়তঃ, অপরাধীর অপরাধ সম্বন্ধে এই ভাবে বুঝাইয়া বলিবার পর তাহাকে যদি বলা হয় যে, সরকার ইতিপূর্ব্বে প্রত্যক্ষ ভাবে অপরাধীকে তাহার অপরাধের গুরুত্ব কি পরিমাণ, তাহা জানাইবার সুযোগ লাভ করেন নাই বলিয়া, তাহাকে এই বারের জন্য মুক্তি দান করা হইল, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ইহাও বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, ভবিষ্যতে সে পুনর্ব্বার এইরূপ অপরাধে অপরাধী হইলে, তাহার জেল তো হইবেই, উপরন্তু জেলে তাহাকে শারীরিক তথা আর্থিক অনেক কষ্ট পাইতে হইবে, তবে যে, জন-সাধারণ সরকারের সহানুভূতিমূলক মনোভাবের পরিচয় লাভ করিবে এবং অপরাধীরা তাহাদের নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক কি পরিমাণে বিভ্রান্ত হইয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিবে, ইহা এক প্রকার সুনিশ্চিত।

শেষতঃ, যদি এমন নির্দ্দেশ থাকে যে, শয়ন কিংবা উপবেশনের পক্ষে ঠিক যতখানি স্থান প্রয়োজন, কোন রাজনৈতিক বন্দীকেই জেলে তদপেক্ষা অধিকতর স্থান দান করা হইবে না, এবং তাহার সোজা হইয়া দাঁড়াইবার পক্ষে যতখানি স্থান প্রয়োজন, তদনুরূপ স্থানও তাহাকে দেওয়া হইবে না, তদুপরি জীবন-ধারণের উপযোগী যে-পরিমাণ আহার্য্য প্রয়োজন, কোন রাজনৈতিক বন্দীকেই তাহার অর্দ্ধেকের বেশী আহার দেওয়া হইবে না এবং কোন রাজনৈতিক বন্দীই আহার্য্য, ব্যবহার্য্য এবং শয়নের পক্ষে বিলাস-সজ্জা লাভ করিবে না, তবে রাজনৈতিক অপরাধীর জন্য কারাবাস যে ভয়ের কারণ হইয়া উঠিবে এবং কারাবরণ প্রবৃত্তি যে হ্রাস পাইবে, তাহাও এক প্রকার সুনিশ্চিত।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম সংক্ষেপতঃ তাহা বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে, আইন-অমান্য আন্দোলনের দমনার্থ সরকারকে নিম্নানুযায়ী চারিটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে :—

প্রথমতঃ, যে-ব্যক্তি কোন প্রকার আইন-অমান্যের অপরাধে অপরাধী হইবে, সে সাধারণের এবং ব্যক্তিগত কি উপকার বাস্তবতঃ সাধন করিবার আশায় আইন-অমান্য করিয়াছে, তাহাকে ইহা বুঝাইয়া বলিবার সুযোগ দান করিতে হইবে এবং তাহাকে সমঝাইয়া দিতে হইবে যে, নেতৃবৃন্দের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হইয়া সে অন্যায় কার্য্য করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, সরকার হইতে অপরাধীকে খুব সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, রাষ্ট্রের কোন আইন, যত নিষ্ঠুরই তাহা হউক না কেন, লঙ্ঘন দ্বারা জন-সাধারণের, তথা ব্যক্তিগত কোন স্থায়ী হিত সাধিত হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, কোন ব্যক্তি যখন প্রথমবার এইরূপ অপরাধে অভিযুক্ত হইবে, তাহাকে তাহার অপরাধের গুরুত্ব কি পরিমাণ, ইতিপূর্ব্বে তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া বলা হয় নাই বলিয়া মুক্তি দান করিতে হইবে। পুনর্ব্বার যদি সে এই অপরাধে অপরাধী হয়, তবে যে জেলে যাইতে হইবে, তাহাকে এতদ্বিষয়েও সতর্ক করিয়া দিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, জেলের জীবন বস্তুতঃ, প্রাণ-হানিকর কিংবা ধীরে ধীরে তাহার শরীর-ক্ষয়কর হইয়া তাহার প্রাণ যাহাতে সংহার করে, এমন কোন ব্যবস্থা বাদ দিয়া, আর সকল প্রকারে তাহার উন্নয়ন করিয়া তুলিতে হইবে। কোন রাজনৈতিক বন্দীকেই কোনক্রমে আহার্য্য, পরিধান এবং শয়ন-ব্যবস্থায় বিলাসিতা ভোগ করিতে দেওয়া হইবে না।

এই প্রণালীতে আমরা আইন-অমান্য আন্দোলন দমনের প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে আমরা ইহাও স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমাদের প্রস্তাবিত পন্থাসমূহ প্রতিষেধক মাত্র। সাময়িকভাবে তাহারা ব্যাধির প্রতিকার সাধন করিবে, ইহা নিশ্চিত হইলেও, স্থায়ী ভাবের আরোগ্য সাধন অথবা রোগের নিশ্চিত ও সম্পূর্ণ নিরাকরণ পক্ষে ইহা কার্য্যকরী হইবে না।

সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহসূচক সকল প্রকার ভাবের চিরতরে উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলে, সরকারের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহসূচক মনোভাবের কারণসমূহ সাধারণতঃ কি, তাহা বুঝিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহসূচক মনোভাবের কারণসমূহ কি, তাহা বুঝিতে হইলে সরকারের পক্ষে অবশ্যপালনীয় দায়িত্বসমূহ কি, আমাদিগকে তাহা জানিতে হইবে।

আমরা যদি বলি যে, রাষ্ট্রান্তর্গত সকল ব্যক্তির আর্থিক দুর্দ্দশা, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অসন্তুষ্টি দূর করা সরকারের পক্ষে অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য, তবে চিন্তাশীল বলিয়া আখ্যাত হইতে পারেন এমন কোন ব্যক্তিই আমাদের সহিত দ্বিমত হইবেন না, আমরা জোর করিয়াই ইহা বলিতে পারি।

অস্বীকার করা যায় না যে, অধীনস্থ প্রজাসমূহ যাহাতে আর্থিক দুর্দ্দশা, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তির কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, বর্ত্তমান জগতের প্রত্যেক সরকারেরই তদুদ্দেশ্যকল্পে স্বকীয় একপ্রকার ব্যবস্থা বর্ত্তমান। কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক সরকারের প্রায় প্রত্যেক প্রকার ব্যবস্থাই ত্রুটীপূর্ণ এবং তাহারই ফলে সকল দেশের অধিকাংশে অধিবাসীকে অদ্যুনা উত্তরোত্তর অধিকতর পরিমাণে আর্থিক দুর্দ্দশা, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তিতে ভুগিতে হইতেছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহসূচক মনোভাব এবং অসন্তুষ্টির কারণ ইহাই।

যদি কেহ বিষয়টিতে গভীরতর ভাবে প্রবিষ্ট হইতে চাহেন, তিনি দেখিবেন যে, স্ব স্ব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রজাদের এইরূপ বিদ্রোহসূচক মনোভাব এবং অসন্তুষ্টি বস্তুতঃই এই সকল রাষ্ট্রকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। বিশদতর ভাবে এই বিষয়ের অনুধাবন করিলে আরও দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই রাষ্ট্রসমূহ তাহাদের প্রজাদিগের আর্থিক দুর্দ্দশা হইতে মুক্তিদানের সাধ্য করিতে না পারিয়া, পণ্য-বিক্রয়ার্থ বাজারের বিস্তৃতি-সাধনের জন্য অপরাপর দেশের উপর আধিপত্য স্থাপন না করিতে পারিলে যে, জন-সাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশার সমতায় সমাধান হইতে পারে না—এইরূপ প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই ভাবেই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়া দেশের পর দেশ যুদ্ধে তাহা পরিপতি লাভ করিয়া থাকে।

সাধারণ জ্ঞানবান থাকিলে যে-কেহ নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারিবেন যে, ইহার একমাত্র প্রতীকার হইতেছে প্রত্যেক দেশকে তদন্তর্গত সকল অধিবাসীর বিভিন্ন সমস্যার সমাধান

বিষয়ে স্থায়ী করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন। আমরা ইতি-পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই ব্যবস্থা যে সাধিত হয় নাই, তন্নিমিত্ত দেশবাসী জন-সাধারণের সমস্যাসমূহের সমাধানে আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ যে-সকল পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাদের ভ্রমাত্মকতাই দায়ী। সুতরাং যুক্তিসঙ্গত ভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, বর্ত্তমানে প্রত্যেক রাষ্ট্র যে-সব ব্যবস্থাসম্ভারে তদন্তর্গত প্রজাবৃন্দের আর্থিক দুর্দ্দশা, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি হইতে অব্যাহতি দানের সাধ্য করেন, তাহার মূলে যে-বিজ্ঞান এবং সভ্যতার আদর্শ বর্ত্তমান, তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। আমরা একাধিকবার আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি, কিরূপে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের এবং সভ্যতার এই পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। সম্বর্ত্তের ফলেরও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া এখানে ইহার পুনরাবৃত্তি করিব না।

আমরা দেখাইয়াছি যে, জন-সাধারণের আর্থিক দুর্দ্দশার, তথা শারীরিক অস্বাস্থ্যের সমাধান না করিলে তাহাদের মানসিক অশান্তি এবং অসন্তুষ্টির সমস্যা সাধিত হইতে পারে না, আবার প্রথমতঃ আর্থিক সমস্যার সমাধান না করিলে, শারীরিক অস্বাস্থ্যের সমস্যার সমাধান হইতে পারে না।

সুতরাং সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, ভারতে আইন-অমান্যের মনোভাবের সূচনা পর্য্যন্ত নিবারণ করিতে যদি সচেষ্ট হইতে হয়, তবে ভারত সরকারকে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টভাবে আইন-অমান্য আন্দোলন দমনের পন্থা অবলম্বনের উপরও এমন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে তাহার আর্থিক দুর্দ্দশা হইতে মুক্তিলাভ করিবার সহায়ক হয়। আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত সম্বর্ত্তে বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়া একাধিকবার দেখাইয়াছি কি ভাবে ইহা করিতে হইবে এবং দেখাইয়াছি যে, আধুনিক বিজ্ঞানের এবং সভ্যতার আদর্শের কোন একটিই ঐ পন্থা অবলম্বনের সহায়ক নহে। সহায়ক তো নহেই, উপরন্তু আধুনিক বিজ্ঞান এবং বর্ত্তমান সভ্যতার আদর্শসমূহের দ্বারা জন-সাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য।

চিরতরে এই আইন-অমান্যের মনোভাবের উচ্ছেদ সাধন করিবার মানস ভারত সরকারের থাকিলে, তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ, এমন ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, যাহাতে দেশের সর্ব্বত্র নদীস্রোতের গতি অব্যাহত ভাবে প্রবাহিত থাকিতে পারে এবং জমীর বালুকাস্তর পর্য্যন্ত উহা প্রবিষ্ট হইয়া জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধি সাধন করিতে পারে। ইহাতে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই দেশের সর্ব্বত্র বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয়তঃ, দেশের মধ্যে বর্ত্তমানে কাগজের এবং ধাতুমুদ্রার মধ্যস্থতায় যে-বিনিময়-ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে, ভারত সরকারকে তাহার পরিবর্ত্তন সাধিত করিতে হইবে। ইহা না করিলে ধন-বিতরণের সাম্য কুত্রাপি সম্ভাবিত হইবে না। যদি এইরূপে ব্যবসায়ের ব্যয়ে উর্ব্বরাশক্তি এবং উৎপাদনের পরিমাণের বৃদ্ধি সাধিত করা যায় এবং যদি দেশের আভ্যন্তরীন ধন-বিতরণ ব্যবস্থায় সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহা হইলে জন-সাধারণের আর্থিক অভাবসমূহ নিশ্চয়ই দূরীভূত হইবে। কিন্তু তখনও জন-সাধারণের রিপুদমনবশতা বশতঃ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-মূলক মনোভাব বর্ত্তমান থাকিতে পারে। সুতরাং তৃতীয় ব্যবস্থা হিসাবে, যদি ভারত সরকার তাঁহাদের শিক্ষানীতির এইরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত করিতে পারেন, যাহাতে ছাত্রগণ সকল প্রকার রিপুদমনের শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারে, তবে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সকল প্রকার বিদ্রোহসূচক মনোভাব পুরাতত্ত্বে বিলীন হইয়া যাইবে।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তৎপ্রতি লর্ড লিনলিথগোর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ভারতবাসীর যে-অংশ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, কোন ক্রমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধিত হইলে কেবল ভারতে নহে, সমগ্র পৃথিবীতে অরাজকতার সৃষ্টি হইবে, এবং ফলতঃ সমগ্র মনুষ্য-সমাজ বিপন্ন হইবে—আমরা তাঁহাদের অন্তর্গত। আমাদিগের মতে, নাৎসিবাদ, বলশেভিক-বাদ, ফ্যাসিস্তবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতি সকল কিছুর স্বপক্ষেই অনেক কিছু বলিবার আছে, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোন প্রকার হানি সাধন করিয়া ঐ সকল মতবাদের কোন একটির প্রবর্ত্তন দ্বারা মনুষ্য-সমাজের কাহারও কোন হিত সাধিত হইতে পারে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ যে অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন মানিয়া চলেন, তদ্বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলিবার থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধিত হইলে কি করিয়া সর্ব্বব্যাপক

অরাজকতার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ প্রকৃত প্রস্তাবে এবং প্রকৃতভাবে রাজনৈতিক বিচক্ষণতা রক্ষা করিতে পারিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধিত হইতে পারে না, আমাদের ইহাই অভিমত। কিন্তু ব্রিটিশ পক্ষকে অপরাজেয় করিবার উপযোগী প্রকৃত প্রস্তাবের যে রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, মিঃ চার্চ্চিল এবং তাঁর ন্যায় আতাতরূপ শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দের তাহা নাই অনুভব করিয়া আমরা দুঃখ বোধ করি। আমাদের ইংরাজ ভ্রাতা ও ভগ্নীদিগকে সীমাহীন দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ না করিয়া যুদ্ধ-জয়ের কোন উপায় না থাকিলে আমাদের নীরব থাকা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না, কিন্তু আমরা মনে করি যে, মনুষ্য-সমাজের কাহাকেও কোন প্রকার দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ না করিয়া চিরকালের জন্য যুদ্ধজয়ী হইয়া সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সকল ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বতোভাবের শান্তি প্রতিষ্ঠার বাস্তব উপায় বিদ্যমান।

এই জন্যই মিঃ চার্চ্চিল এবং তাঁর ন্যায় আতাতরূপ শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দকে আমরা নিন্দনীয় বলিয়া থাকি এবং এই জন্যই আমরা যাহা বলিতেছি, তৎপ্রতি আমাদের বড়লাট বাহাদুরের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি।*

## এই করভারের কোন সার্থকতা আছে কি?

পাঠকবৃন্দ অবগত আছেন যে, যুদ্ধের জন্য ভারত এবং ইংলণ্ড উভয় দেশের অধিবাসীদিগকেই নূতন কতিপয় ট্যাক্সের অধীন হইতে হইয়াছে। ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, ব্রিটিশ সরকার যে-কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা চালাইবার সাহায্য করা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যান্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। হইতে পারে, অন্যায় পন্থা পরিহার করিয়া যাহা ন্যায়, তাহা গ্রহণে সরকারকে প্রেরণা-দানও সাধারণের কর্ত্তব্য, কিন্তু সরকারের কার্য্যকলাপের কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ সমর্থনের কোনপ্রকার যুক্তিযুক্ততা থাকিতে পারে না। সুতরাং যত দিন যুদ্ধ চলিবে, তত দিন যুদ্ধ-পরিচালনার ব্যয় সংগ্রহে সরকারকে সাহায্য করা প্রজাবৃন্দের পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দকে আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, জন-সাধারণকে বিবিধ করভার দ্বারা প্রপীড়িত না করিয়া যুদ্ধ-পরিচালনার ব্যয় সংগ্রহ কি অসম্ভব?

আমাদের মতে, ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ যে-বিবিধ করভার জন-সাধারণের স্কন্ধে চাপাইয়াছেন, তাহা ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের রাষ্ট্রীয় বিচক্ষণতার অভাবের অন্যতম সাক্ষ্য মাত্র। এতদ্বারা দরিদ্র জন-সাধারণের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইবে, সরকার অপ্রিয় হইবেন এবং রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ দেশবাসীর বিষদৃষ্টিতে পড়িবেন।

যুদ্ধ-পরিচালনায় এই করভার কি করিয়া বাস্তব সহায়তা সাধন করিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

আমরা সকলেই জানি যে, যুদ্ধ-পরিচালনার্থ যে সকল দ্রব্য প্রয়োজন, তাহার অধিকাংশই সাম্রাজ্যের অন্য হইতে সরবরাহ হয়। অবশিষ্ট যাহা তাহা যুক্তরাজ্য প্রভৃতি বৈদেশিক রাষ্ট্রের নিকট হইতে ক্রয় করা হইয়া থাকে।

যুক্তরাজ্যের ব্রিটিশ রাজদূত কিছুদিন পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে সুস্পষ্ট হয় যে, যে-সকল দ্রব্য যুক্তরাজ্য প্রভৃতি বৈদেশিক রাষ্ট্রের নিকট হইতে সরবরাহ হয়, সেই সমস্ত দ্রব্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন-সাধারণের নিকট হইতে কর দ্বারা যে-অর্থ সংগৃহীত হইতেছে, তদ্দ্বারা ক্রয় করা সম্ভব হয় না। ইহার কারণ এই যে, সাম্রাজ্যের অধিবাসিগণের নিকট হইতে কর দ্বারা প্রধানতঃ কাগজের মুদ্রাই সংগৃহীত হইয়া থাকে, এবং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ব্রিটিশ সরকারের কাগজ-মুদ্রার বিনিময়ে তাহার নিকট বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহ কোন দ্রব্য বিক্রয়ে অনিচ্ছুক।

তাহা হইলে, যুদ্ধ-পরিচালনার উদ্দেশ্যে কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের নিকট হইতে যে-সকল দ্রব্য ক্রয় করিতে হইবে,

* "দি টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া"র এই তিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সম্পাদকীয় হইতে।

তৎক্ষেত্রে এই সকল কথের কোন কার্যকারিতাই নাই—ইহা সুস্পষ্ট।

অতঃপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, কর দ্বারা যে-অর্থ সংগৃহীত হয় তৎসাহায্যে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন হইতে যে-সকল দ্রব্য সরবরাহ হয় তাহা ক্রয় করা যায় কি না। ইহার উত্তরে বলিতে হইবে "হাঁ," কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ইহাও নির্দিষ্ট করিতে হইবে যে, সাম্রাজ্যের দরিদ্র জন-সাধারণের উপর কর চাপাইয়া, তাহাদিগকে কষ্টে ফেলিয়া যাহা সংগ্রহ করা হইতেছে, সামান্য অধিক পরিমাণে কাগজের মুদ্রার প্রচলন করিলেই তাহা সংগৃহীত হইতে পারে।

জন-সাধারণের উপর করভার না চাপাইয়া সামান্য অধিক পরিমাণে কাগজের মুদ্রার প্রচলন করিলে জন-সাধারণের কষ্ট হ্রাস পাইবে এবং ব্রিটিশ সরকারের যাঁহারা কর্ণধার স্বরূপ, তাঁহারা প্রশংসাভাজন হইবেন। ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ ইহার উত্তরে যদি বলিতে চাহেন যে, কাগজের মুদ্রার প্রচলন নির্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করিলে আন্তর্জাতিক মর্যাদা ( international credit ) হ্রাস, তথা সংরক্ষিত মজুদ তহবিলের (contra-reserves) মর্যাদারও হ্রাস ঘটিবে, তবে তাঁহাদের উক্তির যাথার্থ্য আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু তৎসঙ্গে আমাদিগকে ইহাও নির্দিষ্ট করিতে হইবে যে, আন্তর্জাতিক মর্যাদা ইতিমধ্যেই অধিকাংশতঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং তজ্জন্য জন-সাধারণকে কষ্ট দান অনর্থক। আন্তর্জাতিক মর্যাদা অধিকাংশতঃ হ্রাসপ্রাপ্ত না হইলে যুক্তরাজ্যের সরকার ব্রিটিশদিগের কাগজ-মুদ্রার বিনিময়ে তাঁহাদের দ্রব্য বিক্রয়ে অস্বীকার পাইতেন না এবং তদ্বিনিময়ে স্বর্ণ দাবী করিতেন না।

যুক্তরাজ্যের ব্রিটিশ রাজদূত তাঁহার বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে আরও সু-প্রকাশ যে, ব্রিটিশদিগের সরকারী ধন-ভাণ্ডারে ( Exchequer ) প্রচলিত কাগজের মুদ্রার অনুপাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণের মজুদ স্বর্ণ তহবিলে রক্ষিত নাই। রক্ষিত স্বর্ণ-তহবিল যদি যথেষ্ট হইত, তবে ব্রিটিশ সরকার তাঁহাদের মজুদ স্বর্ণের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছেন এবং মার্কিন কর্তৃক সরবরাহ দ্রব্যের বিনিময়ে আর স্বর্ণের যোগান দিতে পারিতেছেন না—তাঁহাকে এই ঘোষণা করিতে হইত না।

পুনরায় করভার বৃদ্ধি বিষয়ে অগ্রসর হইবার পূর্বে ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দকে আমরা চারিদিক্ হইতে ভাবিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। এইরূপ করভার কেবল নিষ্প্রয়োজনীয় নহে—অবিবেচনাপ্রসূতও বটে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দকে আমরা স্মরণ রাখিতে বলি যে, প্রলাবুন্দের উপর এই ভাবে দুঃসহ করভারাপণ দ্বারা শত্রু-বিজয়ে যে ব্রিটানের অন্যতম প্রধান-অস্ত্র যে পক্ষপাতিনী, তাহারই সাহায্য করা হইতেছে।*

* "দি ইকনমিস্ট" এই নিবন্ধের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী পড়িতে হইবে।

## ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের "ভগবান"

...ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আজ বিশ্বে পড়িয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিতেছেন। মুখে 'ভগবান' 'ভগবান' করিলে ভগবানকে প্রকৃতভাবে স্মরণ করা হয় না। ভগবানকে প্রকৃতভাবে স্মরণ করিতে হইলে অন্তরের, মনে পড়িলে পরে, পুরাণ পুরুষ বিশ্বাস অপরিহার্য। পাপের শাস্তি দিতে হইলে পাপিষ্ঠদিগকেই এই শাস্তি-পরিচালনা যে সর্বাপেক্ষা কঠোর শাস্তি পাইবার উপযুক্তই তাহা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিতেছেন কি? সমাজের ভারসাম্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইলে একদিকে যেমন প্রভূত সংখ্যক ভাষার মূলোচ্ছেদ করিয়া এক সঙ্গেই হইতে হইবে, অন্য দিকে আবার আরবী ফার্সী, সংস্কৃত এবং টোলে সংস্কৃত ভাষার নামে যে লৌকিক ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে হইবে। এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত লৌকিক ভাষায় পাঠ্যের কোন গ্রন্থ লিখিত না হয় এবং ঐ ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি যাহাতে সমাদৃত না হয় তাহার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। ভারতীয় সমাজ পাপ-পুণ্যের উপরোক্ত মোড়ার কথা অবতারণা করিবার পরিণামই সোজা ভাষায় আজ আমাদের ভারতের রাষ্ট্রীয় বেলিলাসে। ভারতীয় সমাজ পাপ-পুণ্যের যে কথা অবতারণা করিয়া আসিতেছে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট, তাহারই প্রশ্রয় দিতেছেন। আমরা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে এখনও সতর্কতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছি।...

# কোটরেশ্বর

—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়

মুক্তপা আমার গল্প শুনিতেছিল। যে সময়ের কথা বলিতেছিলাম, আমার বয়স তখন পনেরো। অনুমান করিয়া তোমরা কিন্তু বলিতে পারিবে না রাঙাদিদির বয়স তখন কত; পঁয়ত্রিশও হইতে পারে, হইতে পারে পঁচিশের দুই এক বৎসর কমও। বয়সের তোয়াক্কা যেন উহার দিন দিন উজান বহিয়াই চলিয়াছে।

রাঙাদিদিকে ভাল লাগিত আমার। নারীদেহের সৌন্দর্যের মধ্যে মধুর বলিয়া যদি কিছু থাকে, কণ্ঠস্বরের মধুরতার আকর্ষণীয় যদি কিছু থাকে, তবে যে কোন কিশোরের কাছেই রাঙাদিদি ছিল চিরসুন্দর। কিশোর-হৃদয়ের মুগ্ধ বিস্ময়ে তাহার মূর্তি আজও রহিয়া গেল অবিস্মরণীয়।

আরও আগের কথা; সবে মাত্র নয় পার হইয়া সেই বৈশাখে মনে পড়িয়াছি। তখন হইতেই পরিচয় আমার রাঙাদিদির সঙ্গে। আশ্বিন মাস; পূজার সময় মামার বাড়ীতে আসিয়াছিলাম মায়ের সঙ্গে। টুনী তখন সবে মাত্র সাত বছরের, আমার চেয়েও তিন বছরের ছোট। মামার বাড়ীতেই পূজা; ঠাকুরবাড়ীতে প্রতিমার উপর রাঙ-তেল মাখানো হইয়া গিয়াছে, সোলার উপর নানা রঙের কাগজ, জরি এবং অভ্র বসাইয়া ঠাকুরের সাজ গড়া হইতেছিল। সোলার একটা মযূর লইবার জন্য ঠাকুরের সামনে মামার কোলের কাছে আমি এবং টুনি বসিয়াছিলাম। বেলা তখন চারটে হইবে প্রায়; পাশের পথ দিয়া গ্রাম্য বধূরা কাপড় কাচিয়া কলসী-ভরা জল লইয়া ফিরিতেছিল, মা, মাসীমা এবং তাঁহাদের পিছনে ছিলেন টকটকে রাঙা শাড়ী পরা এই গ্রামেরই কে একজন বধূ। ঠাকুরঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন ওঁরা; পিছন হইতে মাসীমা ডাকিলেন, "ও কমল, তোর রাঙাদিদিকে দেখিস নি? ডাকছেন যে রে তোকে।"

যাইতে ইতস্তত: করিতেছিলাম; টুনির মযূরটা তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে; আমার মযূরটায় শেষ লাগানো হয় নি তখনও; মামা বলিলেন, "তুই যা রে কমল, আমি নিয়ে যাবো' খন।"

একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলিলাম। রাঙাদিদিকে পূর্বেও হয় তো দেখিয়াছি, কিন্তু দেখিয়াছিলাম যখন তখনও হয় তো চিনিবার মত বয়স হয় নাই। সে যাহাই হোক, রাঙা-দিদির সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য ইহাদের এত ঔৎসুক্য কেন; রামভারণ মালাকার আমার অসাক্ষাতে তাড়াতাড়ি করিয়া আমার ময়ূরটা হয় তো টুনিটার চেয়ে খারাপ করিয়া দিবে।

চিবুকটা ঈষৎ স্পর্শ করিয়া মুখটা আমার নিজের মুখের দিকে তুলিয়া ধরিয়া রাঙাদিদি বলিল, "কি হে নতুন মানুষ, চিনতে পারছো? এঁ্যা?"

রাঙাদিদির কণ্ঠে কেমন যেন ছড়া-কাটার মত সুর।

চিনিতে যে পারি নাই, আর কেমন করিয়া তাহা বলিতে হইবে! মাসীমা মুখখানা আমার নিজের দিকে ফিরাইয়া লইলেন, এবং একবার নিজের বুকের উপর ও আর একবার আমার বুকের উপর আঙুল রাখিয়া বলিলেন, "এই বলি শোন খোকা, এই আমি যেমন তোর মাসীমা না, তেমনি তোর মায়েরও উনি মাসীমা হন, বুঝলি?"

বুঝিলাম সবই; কিন্তু দেখিলাম ওই রাঙাদিদির দৃষ্টির মধ্যে নবীনতার একটা অপূর্ব মোহ, সে দৃষ্টি মায়ের দৃষ্টির মত অমন স্বচ্ছ নয়, টুনীর মত ছয়রঙপনা-ভরা অনেকটা।

"চলো দাদু, আমাদের বাড়ী যাবে? চলো" বলিয়াই রাঙাদিদি আপনার ডান হাতের মধ্যে আমার বাঁ-হাতটা ধরিল। বুড়ো কোটরেশ্বর শিবের তলা যেখানে, তাহারই ওই পাশ দিয়া রাঙাদিদিদের বাড়ী যাইবার পথ। শিব-তলায় আসিয়া রাঙাদিদি মুহূর্তের জন্য আমার হাতটা ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "পেন্নাম কর দাদু, নমো করতে হয় ঠাকুরের কাছে।"

প্রণাম করিলাম; রাঙাদিদি আবার হাত ধরিয়া বলিল, "বড্ড জাগবেন্ত ঠাকুর।" রাঙাদিদি মুহূর্তের জন্য থামিয়া কানের কাছে মুখ নামাইয়া নীচু গলায় বলিল, "আমার ওই দেখছো, ওই যে বড় বড় ডাঁটা নেমেছে গাছের?"

চাহিয়া দেখিলাম শিবের জটার মত প্রকাণ্ড বটের জটা বাহিয়া কতকগুলা বড় বড় সাপ নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছে।

বুকের ভিতরটা হাঁৎ করিয়া উঠিল ভয়ে; রাঙাদিদি বুঝিতে পারিয়াছিল বোধ হয়; একটু হাসিয়া বলিল, "ওরা কিছু করে না; ঠাকুরের কাছে ফিরে যাচ্ছে সব, বিকাল হলো কি না—"

ওই যে জীর্ণপ্রায় কোটরে ওই যে বৃদ্ধ দেবতাটি, কে জানে অজ্ঞাত কত বর্ষ ধরিয়া অমনি করিয়া বসিয়া আছেন এই-খানে; আর ওই যে সম্মুখের বালুকাময় অগভীর পুষ্করিণী, অজয়ের গর্ভ ছিল যাহা একদিন, ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলাতরঙ্গে সে অজয় সরিয়া গিয়াছে আজ, অনেক অনেকদূরে—

রাঙাদিদি আপনার মনেই বলিয়া যায়। রাঙাদিদিদের বাড়ি, দু-তলা কোঠা ঘর; উপরের ঘরের এক কোণে একটা মোড়ার উপর আমাকে বসাইয়া দিয়া রাঙাদিদি বাহির হইয়া গেল, বোধ হয় ভিজা কাপড়খানা ছাড়িতেই গিয়াছিল। জানালার ভিতর দিয়া দেখা যায় রাঙাদিদিদের উঠান; এক কোণে একটা রক্তকরবীর গাছ আর এক কোণে জবাফুল—সমস্ত উঠানটা সোপাটীফুলে রাঙা টক্‌টকে হইয়া উঠিয়াছে।

ঘরের ভিতরটায় চাহিয়া দেখিলাম, একদিকে একখানা খাট, বিছানাটাও একটা রাঙা টক্‌টকে চাদরে ঢাকা, বালিশগুলাও লাল। বিছানার একদিকে বিশাল দাড়ি-গোঁফ লইয়া একটা লোক আমার দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে; গলায় এক গোছা পদ্মবীজের মালা, পরণে একখানা রাঙা চেলী। বুকের ঠিক মাঝখানটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

—"একে চিনতে পারো?" রাঙাদিদি ইতিমধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিল—লোকটার দিকে চাহিয়া বলিল। লোকটা কেমন যেন বিকট গম্ভীর।

"কে?"—গলাটা তাহার বিশ্রী কর্কশ।

রাঙাদিদি আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিয়া এবার বলিল, "আমাদের কমল গো, কমল, পুঁটু-বোনঝির ছেলে।"

তবুও সেই ভয়ঙ্কর লোকটা তেমনি গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। রাঙাদিদি এতক্ষণে আমার পাশে আসিয়া বসিয়াছিল, কোলের কাছে আমাকে টানিয়া লইয়া বলিল, "চিনতে পারলে না? আমার বর, এইবার চিনতে পেরেছো তো?"

বলিয়াই রাঙাদিদি আবার হাসিয়া উঠিল খিল খিল করিয়া।

বিশাল দাড়ি-গোঁফের ভিতর দিয়া লোকটার মুখখানা কেমন যেন অত্যন্ত রকমের বিকৃত হইয়া উঠিল, খাট হইতে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, হঠাৎ সজোরে মাটিতে বাঁ-পাটা ঠুকিয়া গর্জিয়া উঠিল। যে-কথাটা বলিয়াছিল তাহার মর্ম বুঝিবার তখনও বয়স হয় নাই, পরে বুঝিয়াছিলাম, আমোদার প্রবল-প্রতিদ্বন্দ্বী ওসমানের গর্জন জগৎসিংহের উপর।

রাঙাদিদির বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়াছিলাম। মনে হইল, রাঙাদিদি লোকটাকে সজোরে ঠেলিয়া দিল এবং কণ্ঠস্বর একটু চড়াইয়া বলিল, "যাও, সরে যাও—"

লোকটা বিহ্বলের মত দাঁড়াইয়া রহিল। রাঙাদিদি একরূপ তাহাকে জোর করিয়া বিছানার উপর শোয়াইয়া দিয়া বলিল, "ঘুমোও দেখি, আমি বসছি।"

রাঙাদিদি তাহার মাথার কাছে গিয়া বসিল; লোকটা চোখ বুজিল, মনে হইল রাঙাদিদির চোখের পাতা দুইটাও যেন আপনা আপনি নামিয়া আসিল, তার পর তাহার সমস্ত দেহ-মন নিংড়াইয়া একটা করুণ সুর সমস্ত ঘরটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রাঙাদিদির এ সুর তাহার সৃষ্টিরই মত মোহময়।

লোকটা আস্তে আস্তে ঘুমাইয়া পড়িল। রাঙাদিদি একবার উহাকে নাড়া দিয়া দেখিল ঘুমাইয়াছে কি না; তার পর আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল, "এসো ভাই, আমরা নেমে যাই এসো।"

অল্প-পরিসর রান্নাঘর; চৌকাঠের কাছে একখানা রঙ্গ কম্বলাসন পাতিয়া দিয়া রাঙাদিদি বলিল, "বোস ভাই বোস, দু'টি খেয়ে নি আমি, তার পর বাড়ি দিয়ে আসবো, বেশ?"

রান্নাঘরের ভিতরটা চাহিয়া দেখিলাম, একখানা থালা পড়িয়া আছে এক কোণে, অনেকক্ষণ আগে কে যেন ভাত খাইয়া গিয়াছে। আর এক কোণে ভাতের হাঁড়িটা ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে, একরাশ ভাত চারিদিকে

ছড়াইয়া পড়িয়া আছে, ডালের বাটিটা উপুড় হইয়া পড়িয়াছে আর এক কোণে।

রাঙাদিদি একখানা মুড়ি লইয়া চিবাইতে বসিয়াছিল, পরিচয়ের প্রথম লজ্জাটা কাটিয়া গিয়াছে তখন, খানিকটা উসখুস্ করিয়া বলিলাম, "আজ ভাত খাবে না রাঙাদি'?"

রাঙাদিদি আর এক মুঠো মুড়ি মুখের ভিতর পুরিতে যাইতেছিল, কেমন একটা ম্লান হাসি দুই ঠোঁটের উপর টানিয়া বলিল, "এত অবেলায় আর ভাত খাবো না, সহ্য হয় না।"

কিন্তু একরাশ ভাত যে ওই কোণে পড়িয়া রহিয়াছে, রাঙাদিদি দুপুরবেলা খাইলেই তো পারিত।

"হাঁড়িটা বেরালে বুঝি ফেলে দিয়েছে?"

রাঙাদিদির হাসি আর একটু স্পষ্ট হইয়া উঠিল, একটা নাড়ু চিবাইয়া জল খাইতে খাইতে বলিল, "না রে দাদা না, ফেলতে কাউকেই হয় না, চাল যেদিন অদৃষ্টে মাপা না থাকে, সে দিন আপনা আপনিই হাঁড়ি ফেটে যায়।"

রাঙাদিদির কথাগুলা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

পঞ্চমীর আসন্ন সন্ধ্যা, মামার বাড়ীর প্রকাণ্ড উঠানের এক ধারে বসিয়া মামাদের পুরোহিত ত্রৈলোক্য ভট্চায্ পঞ্জিকা বাঁধিতেছিল; টুনী এক দিকে মামার কোলে বসিয়া কালো পাঠাটাকে দুই একটা করিয়া কাঁঠাল-পাতা খাওয়াইতেছিল এবং এক এক বার করিয়া হাতের পাতাটাকে বেড়া অঙ্গ-শিশুর নাগালের বাহিরে তুলিয়া ধরিয়া উহাকে অনর্থক লোভ দেখাইতেছিল। অবলা জীবকে কষ্ট দিয়া টুনী এত আনন্দও পায়!

মাসীমা আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "বিরে খোকা, রাঙাদিদির সঙ্গে ভাব হোল তোর, আর একজনকে দেখলি—তোর জামাইবাবাজীকে?"

দেখিয়াছি, এবং বেশ ভাল করিয়াই দেখিয়াছি।

মাসীমা পঞ্জিকা তৈয়ারী করিতেছিলেন, মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওসব ঘরে ছেলে-পিলে পাঠিও না দিদি, পাগল উন্মাদের ঘর।"

মাসীমার মুখের দিকে চাহিয়া কি জানি কেন মাসীমা হঠাৎ সুরটা বদলাইয়া বলিলেন, "ওকথা ওঁরা মাথায় থাকুন। কিন্তু ওঁরই বা কি দোষ দিই বলো, জ্ঞান তো নেই, যখন হ' বেহাল চাপে।"

বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। লোকটা কি পাগল হবে? সেই ভয়ঙ্করদর্শন লোকটা?

মাসীমা বলিয়া চলিলেন, "যাই বলো ঠাকুরঝি, মাসীমা যতই বলুন, এক এক দিন আমরাও তো শুনেছি; গায়ের কাপড়টা খুলে দেখো দেখি একবার, বড় বড় কোড়ার দাগ, সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত একেবারে—চাকাছুরি দিয়ে থাকেন তাই।"

পাগল তো আমাদের সেখানেও দেখিয়াছি, হাতে কড়া, পায়ে বেড়ি দেওয়া, একটা প্রকাণ্ড লোহা, শিকল দিয়া পায়ের সঙ্গে বাঁধা।

"এইত সে দিন ঠাকুরঝি, তুমিও ত ছিলে", মাসীমা বলিয়া চলিলেন, "ভরা দুপুর বেলায় কাপড়ের খুঁট দিয়ে কপালটা টিপে ধরে এলেন, রক্তগঙ্গা বইছে—বললেন, 'বৌমা তোদের সেই সাদাগুঁড়ি দুটো দে ত' মা, সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে মাথাটা কেমন ঘুরে গেল বৌ করে, বেরালের কোণে লেগে কেটে গেল একটু।' আমরা তো আর ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না ঠাকুরঝি, তোমার হয় তো রাগ হবে বললে।"

রাঙাদিদির হেঁয়ালি-দেওয়া কথাগুলা শিশুমনের কাছে ঈষৎ স্বচ্ছ হইয়া আসিতে লাগিল।

মামার বাড়ীতে যে কয়টা দিন ছিলাম, একদিনও আর ওদিক মাড়াই নাই।

২

ইহার পর প্রায় পাঁচ বৎসর আর মামার বাড়ী যাই নাই; মা আরও বার-দুই গিয়াছিলেন, আমরা গিয়াছিলাম বাবার সঙ্গে দেশ-বিদেশে বেড়াইতে। কিন্তু রাঙাদিদিকে ভুলিতে পারি নাই। অনেক দিন অনেক স্ত্রীলোককে টক্‌টকে রাঙা শাড়ি পরিয়া পথ দিয়া চলিতে দেখিয়াছি, মনে পড়িয়া গিয়াছে রাঙাদিদিকে। একরকমভাবে রাঙাদিদিকে কল্পনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে সেই বিকটদর্শন পাগল আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার পাশে আপনার অধিকার দাবী করিয়া; এক একদিন স্বপ্ন দেখিয়াছি, একান্ত নির্জনে রাঙা-দিদির কাছে বসিয়া আছি, কোথা হইতে পাগল আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সদর্পে মাটিতে বাঁ পা-টা ঠুকিতে ঠুকিতে চোখ দুইটা পাকাইয়া বলিতেছে, "এ পৃথিবীতে আমোদ প্রমোদ-কাঙ্কী দু'জন থাকতে পারে না, অস্ত্র ধর, যুদ্ধ দাও।"

# একাত্মা

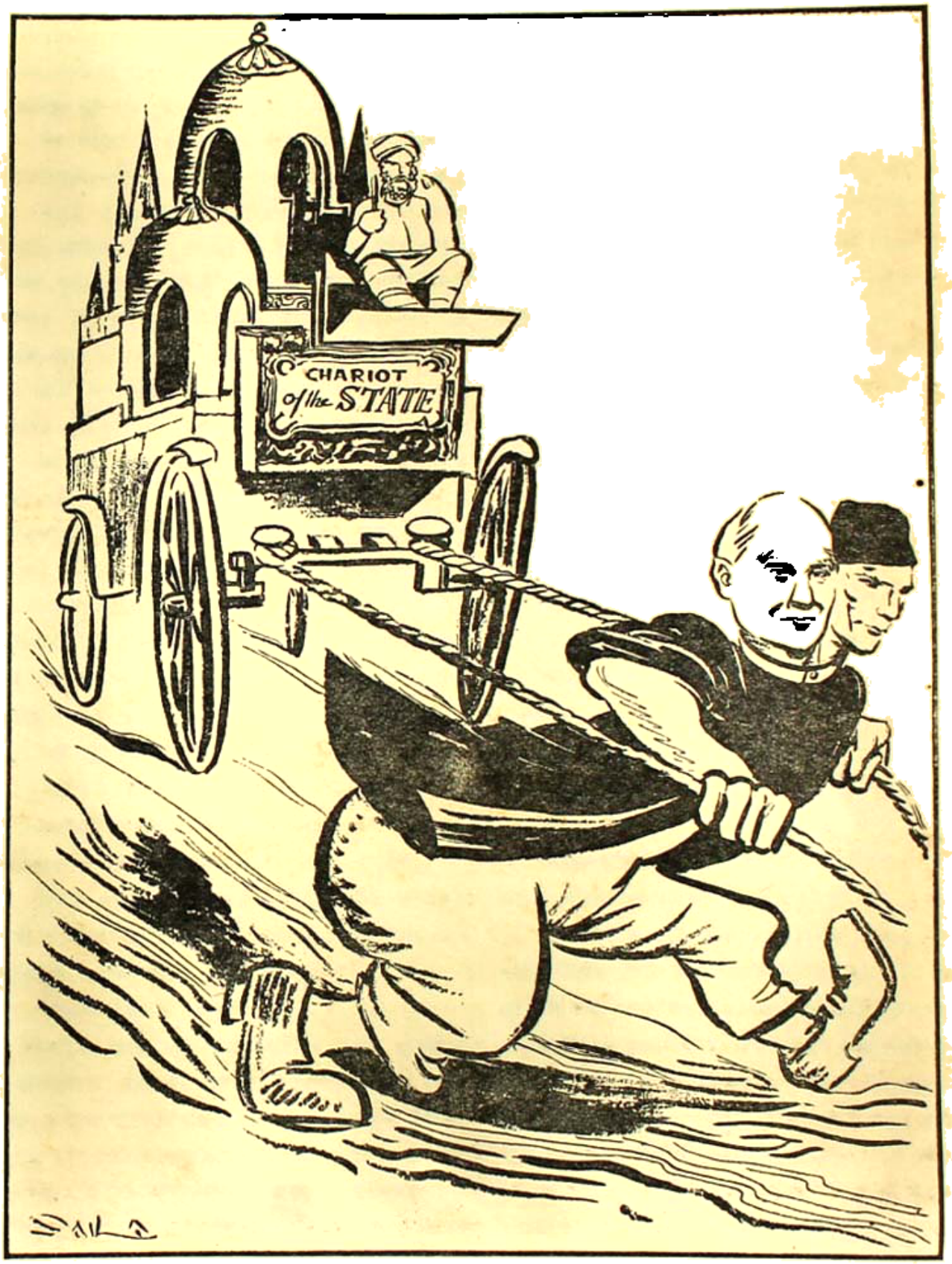


কেন্দ্রীয় আইনসভায় গত অধিবেশনে একটি বৈঠকে পাকাধে। সরকার পক্ষের সভ্য সিং বলেন : "...যে মুহূর্তে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভারতবাসীর উপর ন্যস্ত হইবে সেই মুহূর্তেই মাউ-মাউ বাহিনী জুলাভাই দেশাই এবং মোহনলাল ত্রিবেদী এক হইয়া যাইবেন।..."

হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে ; শীত-রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া নিশীথের করুণ ক্রন্দন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল, যেন প্রলয়ের পূর্বে কুয়াশায় ম্লান হইয়া গিয়াছে।

পাঁচ বছর পরে রাঙাদিদির সঙ্গে দেখা হইল এবার ; গ্রীষ্মের ছুটি, মাত্র দিন দুই হইল এখানে আসিয়াছি।

"কমল, ও-কমল !" বিকাল বেলায় বেড়াইতে যাইতেছিলাম ষ্টেশনের দিকে, পদ্মপুকুরের ধারে দেখা হইল রাঙাদিদির সঙ্গে, একা একাই কাপড় কাচিতে আসিয়াছিল আজ। একগলা জলে দাঁড়াইয়া রাঙাদিদি ডাকিল, "ও কমল, দাঁড়া না রে একটু, যাচ্ছিস কোথায় ?"

ঘাটে গিয়া দাঁড়াইলাম। "হ্যাঁ রে, থাকবি তো এখন, পঞ্চমের ছুটি বুঝি ?"

দিন সাতেক পরেই ফিরিয়া যাইব আমরা ; বাবার সহিত পুরী যাইবার কথা। রাঙাদিদি পদ্মফুলের ফাঁকে ফাঁকে অনেকদূর চলিয়া গিয়াছিল ; ফুলের ভিতর দিয়া ঈষৎ মুখ তুলিয়া বলিল, "এখানে কতটা জল দেখবি কমল ?"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই রাঙাদিদি ডুব দিল জলে। ডুবিয়া গেল রাঙাদিদি, দুই হাত উঁচু করিয়া ধরিল, মর্মরশুভ্র দুই বাহু, কনিষ্ঠ, আস্তে আস্তে নখের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ডুবিয়া গেল শেষে।

"এই অবেলায় নাইলে যে, অসুখ করবে না ?"

"উঁহুঁ।" সাঁতার-জলে মুখ তুলিয়া রাঙাদিদি বলে।

একটা আধ-ফুটন্ত পদ্মফুলের চারিদিকে বারকয়েক সাঁতার দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া রাঙাদিদি উঠিয়া আসিল।

অসংবৃত বাস ভাল করিয়া না নিঙড়াইয়াই রাঙাদিদি সর্বাঙ্গে টানিয়া লইতেছিল, হঠাৎ আমার চোখের উপর চোখ পড়িতেই খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"এমনলে যে বড় ?"

পরদিন দুপুর বেলায় রাঙাদিদিদের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলাম। দালানের একধারে রাঙাদিদির সামনে একটা মোড়ার উপর বসিয়াছিলাম। লালরঙের একখানা কম্বলের আসনের চারিদিকে লাল পাড় বসাইয়া সেলাই করিতেছিল রাঙাদিদি, রাঙাদিদির মুখখানা যেন ফুলিয়া উঠিয়াছে।

রাঙাদিদি মুখ না তুলিয়াই বলিল, "হ্যাঁ রে কমল, কি বই পড়িস তোরা ? সংস্কৃত পড়িস ?"

মাথা নাড়াইয়া জানাইলাম, "হুঁ।"

"খুব ভাল লাগে পড়তে, না ?"

সংস্কৃত আমার একেবারেই ভাল লাগিত না, একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "হুঁ।"

"জানিস কমল, বাবা বলতেন, অত রস অন্য আর কোন ভাষাতেই নাই। তোদের অত তো ইস্কুলে পড়ি নি ভাই, তেরো বছর পর্যন্ত বাবার কাছে একটু একটু সংস্কৃত আর বাংলা, আর বাকি যা কিছু শিক্ষা তোর এই রাঙামশায়ের কাছে,—পড়িস, খুব ভাল ভাষা।"

উদ্‌গ্র মন কয়েকদিন হইতেই অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। উমাশ হরিহর রাঙামশায় পাশের ঘরেই ঘুমাইতেছিল অঘোরে, বুঝিবার যো নাই, মানুষ আছে কি নাই। উঠানে একগাছ তরিয়া রক্তজবা ও করবী ফুটিয়াছে, দালানের চারি দেওয়ালে দশমহাবিদ্যার পট টাঙানো।

খানিকটা এদিক-ওদিক চাহিয়া একটু আস্তে আস্তে বলিলাম, "একটা কথা বলবে রাঙাদি' ?"

রাঙাদিদি মুখ তুলিল না, ঈষৎ আবৃত বাহুর উপর কাপড়টা ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া বলিল, "কি বল না।"

"আচ্ছা রাঙাদি,' তুমি লাগে না তোমার এমনি করে থাকতে ?"

রাঙাদিদি এবারেও মুখ তুলিল না ; ঈষৎ স্ফীত ওষ্ঠাধরে অদ্ভুত একটা হাসি খেলিয়া গেল।

"কার ? উঁহু।"

"আচ্ছা রাঙাদি, যেখানে পাগলদের রাখবার ব্যবস্থা আছে, সেইখানে পাঠিয়ে দাও না কেন ?"

রাঙাদিদির মুখখানা লাল হইয়া উঠিল এবার ; কথা কয়টার উত্তরে শতগুণ বিষ মিশাইয়া বলিল, "কমল, অনেকেই সে কথা বলে, তারা কি চায় তা কি আমি জানি না কমল ?"

কথাটা খুব সরল ভাবেই বলিয়াছিলাম ; এ উত্তর পাইব আশা করি নাই। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম। রাঙাদিদি আমার মুখের উপর চোখ দুইটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে রাখিয়া বলিল, "হ্যাঁ রে কমল, রাগ করলি ?" বলিয়াই রাঙাদিদি আপনার স্বাভাবিক রহস্যময় হাসি হাসিয়া উঠিল।

রাঙাদিদির রহস্যময় জীবনের ইতিহাস, সেইটা শুনিবার জন্যই আজ বড় ইচ্ছা হইতেছিল ; কথাটা একটু ঘুরাইয়া

লইয়া বলিলাম, "আচ্ছা রাঙাদি, কদ্দিন থেকে ওঁর এমনি হয়েছে ?"

রাঙাদিদি ঘাড় ফিরাইয়া পিছনের দিকে চাহিয়া দেখিল, ঘাড়ের উপর হইতে পিঠ পর্য্যন্ত পুড়িয়া যাওয়ার দাগ।

"ঠিক তোরই মত তখন আমার বয়স, পনেরো কি ষোল হবে", রাঙাদিদি মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া আবার বলিল, "ঠিক দশ বছর আগে, বয়স তখন আমার পনেরো।"

রাঙাদিদি আবার খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া কি যেন ভাবিয়া লইল। "শাশুড়ী ঠাকরুণ তখন বেঁচে আছেন আমার; কোটেশ্বর তলা দেখেছিস তো, প্রতিবছর ওইখানে লাগন হয় শিবের, অনেক সাধু আসেন সেই সময়। একদিন সকালে সঙ্গে নিয়ে এলেন এক মস্ত সাধু, তাদিন্ কমল, মাকে এসে বললেন, মা, আমি কালী-সাধনা করব।"

"মা অনেক বুঝিয়ে বললেন, আমি অনেক পায়ে ধরে কাঁদলুম—কিন্তু শুনলেন কই কমল, বললেন, এমন সিদ্ধ পুরুষ আর পাওয়া যাবে না, হিমালয়ে আশ্রম, বশমহাবিদ্যায় সিদ্ধ।

"সবই মিলে গেল কমল, সবই—অমাবস্যে, রবিবার, চতুর্দ্দশের মড়া—সবই। সেইদিন সকাল থেকেই শাশুড়ী-বউ দু'জনেই উপোস করে পড়ে রইলুম আমরা, মায়ের পট তারই সামনে বুক দিয়ে। প্রথম প্রহর কাটলো, দ্বিতীয় প্রহর কাটলো, তৃতীয় প্রহরও কাটলো, শাশুড়ীঠাকরুণ বললেন, '৬ঠ মা, এইবারে ৬ঠ, ঝাড়া এবার কেটে গেছে।' উঠলুম, জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ মনে হলো, কোটেশ্বর তলার পাশ দিয়ে কে যেন ছুটে আসছে ঊর্দ্ধশ্বাসে, দুয়ারে এসে চীৎকার করে ডাকলে, 'মা, মা—ওমা!'

"উলঙ্গ দেহ, কমল, চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে—চোখ যেন রক্তজবা। তাড়াতাড়ি বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, মাথায় জল দিলুম, পাখা করতে লাগলুম দু'জনে; মা বললেন, জ্ঞান পেয়েছে।

"জানিস কমল, ঠোঁট দু'টো শুধু কাঁপছে, কি যেন বলতে চাইছেন, পারছেন না বলতে।"

রাঙাদিদি থামিয়া গেল, ঠোঁট দুইটা তাহার থর থর করিয়া কাঁপিতেছে; বাহুর কাপড়টা সরিয়া গিয়াছিল কখন, এতটুকুও জানিতে পারে নাই।

"হাউই ওঠে দেখেছিস কমল? ঠিক তেমনি করে চোখে-মুখে আগুন ছুটতে লাগলো ওঁর, একবার আমার হাতটা ধরেন, একবার ধরেন মায়ের হাত, মুখে কি সব অদ্ভুত সর্ব্বনাশা মন্ত্র—

"মা কত চেষ্টা করলেন, লজ্জার মাথা-খেয়ে আমিও সেদিন শাশুড়ীর সামনে কথা কইলুম—কিন্তু কে আর শুনছে কমল, ওঁতে কি আর উনি আছেন তখন—কেবল মায়ের গলাটা জড়িয়ে ধরে ভয়ার্ত্ত শিশুর মত বলেন, "মা, মা, মা, উঃ, দেখছো? দেখছো?—বাসুকীর কি প্রকাণ্ড ফণা—নাগ-নাগিনীতে সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেল—দেখছো, দেখছো মা?'

"আর জানিস কমল, মুখে সেই এক মন্ত্র।"

রাঙাদিদির চোখদুইটা স্থির হইয়া আসিল।

"রাঙাদি!"

"কিছুক্ষণ পরে চোখ দু'টো ওঁর বুজে এলো, ভাবলুম ঘুমিয়ে পড়লেন বুঝি। মিনিট পাঁচ পরে আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ও রাঙা-বৌ, রাঙা-বৌ—পালাও পালাও, বাঘ আসছে দেখতে পাচ্ছো না, উঃ অভয়ের ধারে এতও কি বাঘ ছিল, মা, মা, ও মা'।"

রাঙাদিদির কপালটা ঘামিয়া উঠিয়াছিল।

"তার পর জানিস কমল, আবার সব কিছুক্ষণের জন্যে চুপচাপ। মা বললেন, তুই একটু শুয়ে পড় মা ওইখানে, মাথাটা একটু গরম হয়ে উঠেছে কি না, একটু ঘুমিয়ে পড়লেই সব সেরে যাবে। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম আমি কমল, অনেকক্ষণ প্রায়, ওই যে ঘাটখানা দেখছিস ওইটার ওপর শুয়েছিলেন উনি; হঠাৎ কখন বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে চীৎকার করছেন, 'মা, মা, দেখছো, ওই দেখছো—কবন্ধ, কঙ্কাল। রাঙা-বৌ, ও রাঙা-বৌ—রক্তাম্বর পরিধানা অর্দ্ধ-দেহ অনাবৃতা, দেখছো? দেখছো? কটিদেশ বেষ্টনকারী রক্তাম্বর তনুপুর ঈষৎ আন্দোলন করে, ওই আকাশে উড়ে গেল—রাঙা-বৌ, আগুন লাগলো সূর্য্যে, চন্দ্রে আগুন লাগলো—'

আবার অচৈতন্য হয়ে পড়লেন কমল,"

রাঙাদিদির সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিয়াছিল। চোখের দুই কোণে ফোঁটা অশ্রু মুক্তার মত টলমল করিয়া উঠিল।

"রাঙাদি!"

"উঁ", রাঙাদিদি খসিতবাসটাকে মাথার উপর টানিয়া দিল।

"জানিস কমল, লোকে বলে পাগল, কিন্তু আমার মন তো নেয় না; সেই থেকে কেমন ওঁর রাঙা জিনিষের উপর ঝোঁক, রক্তকরবী খাও, রক্তজবা খাও, খুব খুশি, কিন্তু অন্য রঙ দেখলেই অগ্নিশর্মা।"

ঘরের ভিতর হইতে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন আসিল, "রাঙা-বৌ" উত্তর গেল, "এই যে।"

তেমনি গম্ভীর গলায় আবার প্রশ্ন আসিল, "ও কে?"

"কেউ না।"

হরিহর দাদামশায় জাগিয়া উঠিয়াছে; তাড়াতাড়ি উঠিবার চেষ্টা করিতেই রাঙাদিদি ইঙ্গিত করিয়া জানাইল বসিতে। আবার চুপচাপ।

"ঘুমিয়ে পড়েছে, বস না তুই," রাঙাদিদি বলিল।

চোখের সামনে আজ একটা নূতন জগৎ জাগিয়া উঠিল। রাঙাদিদি আসনটার শেষ ধার তিন বার মুড়িয়া তিন বার খুলিয়া ফেলিল।

"তোর সঙ্গে কথা কইতে কইতে এই ধারটা ছোট-বড় হয়ে গেল, অভ্যেস নেই কি না।"

রাঙাদিদি অদ্ভুত মুখভঙ্গীতে ছুঁচ ও আসনটাকে আবার ধরিয়া সেলাই করিতে আরম্ভ করিল।

চোখের সামনে আস্তে আস্তে মুছিয়া গেল ওর যৌবন-মূর্তি, মনে হইল, পনের বৎসর আগের সেই কুমারী বালিকা আজ যেন তেমনি করিয়া অক্লান্ত মনোযোগে আসন সেলাই করিতেছে।

হঠাৎ আমার মুখের দিকে চাহিয়া একটু নীচু গলায় বলিল, "হাঁরে কমল, এর আগে তোরা না সুলতানগঞ্জে ছিলি?"

ছিলাম অনেক দিন ধরিয়াই।

"বেশ চমৎকার জায়গাটা, না? গৈরীনাথ দেখেছিস? গঙ্গার ভেতর থেকে পাহাড় উঠেছে, তার ওপর?"

"হুঁ—"

"তখন কতটুকু জানিস? ন' বছরের, তোদের টুনীর চেয়েও ছোট অনেক, বাবার সঙ্গে গিয়েছিলুম একদিন, সকালে আমরা উঠলুম পাহাড়ে—চারিদিকে চেয়ে দেখলে মনে হয়, পৃথিবী ছেড়ে কোথায় যেন উঠেছি, আর একটু উঠলেই আকাশ। একটা কি মজা হয়েছিল জানিস কমল, সেখানে?" রাঙাদিদির চোখ দুইটা দুষ্টামি-ভরা হইয়া উঠিল, ঠিক টুনীর মত।

আর একটু কাছে আসিয়া, ছেলেমানুষের মত অত্যন্ত যেন গোপনের কথা শুনাইবার জন্য বলিল—"জানিস্ ভাই, বাবা তখন বসেছিলেন পাণ্ডা ঠাকুরের কাছে, চুপি চুপি বাবাকে বললুম, 'ঠাকুর দেখতে যাচ্ছি' বলেই দে চম্পট্" বলিয়াই রাঙাদিদি ছেলেমানুষের মত খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"তারপর?"

"তারপর আর কি, একেবারে মন্দিরের পিছু দিকে, সেই যেখানে আম গাছটা নুইয়ে পড়েছে, জানিস তো? আসবার সময় ওই পথ দিয়েই এসেছিলুম, বাবা ছিলেন আগে আগে—পিছু থেকে উঁকি মেরে দেখলুম, পাহাড়ের গায়ে একটা ফাটল্ থেকে অনেকগুলো পাখী বেরিয়ে গেল আমাদের শব্দ পেয়ে। আস্তে আস্তে কোমর বেঁধে, একটা ডাল ঝুল্‌ছিল সেইটা ধরে পাহাড়ের সেই দিকটায় ঝুলে পড়লুম; মনে মনে হাস্‌ছিস? সত্যি, মাইরি, খপ করে ফাটলের মুখটা এক হাতে কাপড় দিয়ে চেপে ধরলুম। পাখীগুলো সব উড়ে পালালো, ধরা পড়লো শুধু একটা বাচ্চা গাং-শালিক।"

রাঙাদিদি আত্ম-প্রশংসা-মাখানো দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল। "খুব ডান্‌পিটে ছিলুম না রে? আচ্ছা, কমল, আর একবার আমায় নিয়ে যাবি সেখানে?" রাঙাদিদির কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ মুহ্যমান হইয়া উঠিল; আপনার মনেই বলিয়া চলিল—"আর কি তিনি আছেন রে, অনেক দিনের কথা—তখনই তো তাঁর অনেক বয়েস।

"আসবার সময় ঠাকুরকে প্রণাম করছি, তখন সেই পাণ্ডাঠাকুর কি বললেন জানিস? বাবাকে বললেন—'পণ্ডিতজি, আপকা এ কন্যা বহুৎ লক্ষ্মীমন্তী হ্যায়'; আমার দিকে চেয়ে বললেন—'এ বেটি, ই'রে গৈরীনাথকা মাফিক্ তেরা পতি মিলেগা।'

"জানিস্ কমল, পাণ্ডাঠাকুরের দেখা পেলে একবার প্রণাম করে বলে আসতুম—ঠাকুর, তোমার-দা বর, অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে।"

ইচ্ছা হইল সেদিন, বড় হইয়া যদি কোন দিন লেখক হইতে পারি, এই রাঙাদিদিকে লইয়া একটা গল্প লিখিব। মাঝে মাঝে এখনও সেই অতৃপ্ত-কামনা মনের মধ্যে নড়িয়া নড়িয়া ওঠে।

৩

সুরূপার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে তখনও গল্প শুনিতেছে। হয়তো, এক সঙ্গে এতক্ষণ বকিয়া হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম।

কল্পলোকের সেই দেশ, মধ্যাহ্নসূর্য্য যেখানে অস্তাচলে হেলিয়া পড়ে না, অসংখ্য অতৃপ্ত কামনা যেখানে অমৃতলোকের সুধা-সিঞ্চনে চিরদিনের জন্য তৃপ্ত হইয়া যাইবে, সেই দেশ—কৈশোরের সেই স্বপ্নময় লোকে—অনতিক্রান্ত যৌবনেই ধীরে ধীরে যেন ম্লান হইয়া আসিতেছে।

"থামলে কেন?" সুরূপা বলে—"তাড়াতাড়ি করে শেষ করে ফেল না? আমার আরও কাজকর্ম আছে তো।"

মাস দুই হইল শয্যাশায়ী হইয়া ছিলাম, অনেক দিন আগে ভাত খাইয়াছি; কলেজের চাকরী বজায় আছে এখনও, বড় দিনের ছুটীর পর কার্য্যে যোগ দিতে হইবে। ভাত খাইয়া পাছে ঘুমাইয়া পড়ি, সুরূপা তাই নিত্য নূতন অছিলায় গল্প শুনিতে বসে; আজ সে রাঙাদিদির গল্প শুনিবার জন্য ধরিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু কণ্ঠ-স্বরটা তাহার ভাল ঠেকাইল না।

বলিলাম, "শুনতে ভালো না লাগে, না-ই বা শুনলে।"

সুরূপা জামা সেলাই করিতেছিল; এবারে মুখ তুলিয়া চাহিল, এক হাত জিব কাটিয়া বলিল, "রামোঃ, সে কথা বলতে পারি? পতি পরম গুরু"—বলিয়াই সুরূপা হাসিয়া উঠিল; অস্পষ্ট অন্ধকারে হিল্লোলিত সাগর-সৈকতের মত সুরূপা যেন রহস্য-ঘাখানো বলিয়া মনে হয়।

"বলো না তারপর, বলবে না?" সুরূপা বলে।

"না।"

"একটকা তাঁহলে খুনটা বেশ হয়, না? তার পর আবার ডাক্তার ডাকো, বরফ ডাকো, উঃ হাতের তলাটায় একপুরু ছাপই উঠে গেল—"

সুরূপা শেষপর্য্যন্ত না শুনিয়া কিছুতেই ছাড়িল না।

৪

সে আজ প্রায় বুড়ি বছর আগের কথা; সেও সেই পূজার সময়। কলেজে তখন পড়ি, ছুটি হইয়া গিয়াছে, মামার মেয়ে কল্টুর বিবাহে যাওয়া হয় নাই, মা বলিলেন, "চল্ একবার ওদের সঙ্গে দেখা করে আসি।"

ষ্টেশনে মামা আসিয়াছিলেন, পূজার সময় ছোট মাসীমাও আসিয়াছেন, এ বারের পূজা বেশ ধুমধাম করিয়া হইবে; প্রকাণ্ড নহবৎ বসিয়াছে।

নতুন সাজ-পরা ওই যে শিশুর দল, কাপড় পরিতে শেখে নাই এখনও, মালকোঁচা করিয়া পরাইয়া দেওয়া কাপড় তখন যে হাঁটুর উপর উঠিয়া গিয়াছে খেয়াল নাই, উহাদের দেখিলে হিংসা হয় মনে। সেই দিন, যেদিন শরতের সোনালি রৌদ্রে, সানাইয়ের ইমন্ সুরে শিশিরসিক্ত সবুজ ঘাসে শিশু-চক্রের সম্মুখে কল্পপুরীর সমস্ত রহস্য খুলিয়া পড়িত, সেই দিনের জন্য দুঃখ হয় বড়। দাদামহাশয়ের আমলের রামতারণ বাসাকার স্বচ্ছন্দগতিতে তেমন করিয়া আর হাতিয়ার চালাইতে পারে না, কল্প সৃষ্টি তেমন করিয়া সানাই বাজাইতে পারে না আর, মাঝে মাঝে বেসুরা হইয়া যায়, উহারা তো আমাকে চিনিতেই পারিল না।

কোটরেশ্বর তলায় রাঙাদিদির সঙ্গে দেখা হইল এবার; রাঙাদিদি এই পাঁচ বৎসরের মধ্যেই বুলিয়া গিয়াছিল বোধ হয় আমাকে, এক গলা ঘোমটা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিতেছিল, হঠাৎ চিনিতে পারিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল "সত্যি, তোকে চিন্‌তে পারি নি ভাইরি; কবে এলি রে কমল? যাস না একবার সন্ধ্যে বেলায় ওদিকে।"

যাইতে ভয় হয়; কিন্তু রাঙাদিদি বলিল, "পাগল আর সে পাগল নেই, শ্যামচন্দ্রপুরের কালীর বালা এসে পড়িয়ে যেওয়াতে অনেকটা সেরে গেছে। অনেকটা কেন, পনেরো আনা প্রায়। কি জানিস্ কমল, ওই বালা পরে অনেক দিনই তো কিছু হয় নি ভাই, কিন্তু কপাল আর কাকে বলে বল, রায়েদের ছোট ছেলেটাকে ছটি করবী ফুল এনে দিতে বললুম, কিন্তু কে জানে সাপা করবীই নিয়ে আসবে—কলার পাতায় মোড়া, আমিও দেখলুম না অতটা, সবসুদ্ধ বাঁধিয়ে

দিয়েছিলুম ওঁর কাছে। অনেক দিন কিছু হয় নেই কি না, সে দিন একটু বেশী বেশীই হয়ে গেল।"

"একটু একটু করেই সামলে" বলিলাম।

"তাই বল ভাই, তাই বল।" রাঙাদিদির চোখ দুইটা ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিয়াছিল; সামনের দাঁত আধখানা করিয়া ভাঙিয়া গিয়াছে।

রাঙাদিদি চলিয়া গেল। বালা এবং কৈশোরের রাঙাদিদির চারিদিকে যে মোহের সন্ধান পাইতাম, আস্তে আস্তে তাহা যেন কাটিয়া যাইতেছে। মনে হয়, রাঙাদিদির এই যে জীবনব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধন, ইহা নূতন কিছু নয় এ দেশে। উন্মাদ স্বামীর খেয়ালের বেদীতে উৎসর্গ-দেওয়া এই দেশের নারী, হয় তো ইহাই একদিন বাল্মীকি-কল্পনায় জন্ম দিয়াছিল জন্মদুঃখিনী সীতার।

কয়েক দিন হইতেই শুনিতেছিলাম, ঘরে বাহিরে চারিদিকেই বেশ একটা কাণাকাণি চলিয়াছে, রাঙাদিদির স্বামী বদ্ধ উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন। ত্রিলোচন রায়, রাঙাদিদিদের পাশেই তাহাদের বাড়ি, সেদিন সে মামার কাছে আসিয়া বলিল, পাগলের উৎপাতে সারারাত্রে চোখ বুঁজবার জো নাই; যত রাজ্যের কাপড় ছিঁড়িয়া, উঠানটা উহাদের ভর্তি করিয়া দিয়াছে; টিনের চাল, তাহার উপর ইটের বুচি, হাঁড়ি-কলসী ···সে ত' অনবরতই পড়িতেছে।

রাঙাদিদির সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম সেদিন সকালে। বেশীদূর যাইতে হইল না। রাঙাদিদি রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া কাঠের আলে মুড়ি ভাজিতেছিল, ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাঙাদিদি আঁচলটাকে মাথার উপর তুলিয়া দিল একটু, মুড়িখোলা উনান হইতে মাথাইয়া একটু হাসিয়া বলিল, "একটু দাঁড়া তো ভাই, মোড়াটা এনে দি।" বলিতে যাইতেছিলাম, মোড়া আর আনিতে হইবে না, যাইতেই বসিব, রাঙাদিদি ততক্ষণে উঠিয়া গিয়াছে।

উপর হইতে রঙীন একটা মোড়া নামাইয়া আনিল রাঙাদিদি; সিঁড়ির দুয়ারে শিকল তুলিয়া দিতে দিতে বলিল, "আনমনে কখন দুধ তো খাকবো, বেড়ালে গিয়ে দুধটা সব খেয়ে দিয়ে আসবে।"

রাঙাদিদির এই মিথ্যা ছলনাটুকু চোখের সামনে আজ বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ডানপায়ের গোড়ালির উপর একখানি কাপড় বাঁধা, বাঁ-পাটা একটু টানিয়া টানিয়া চলা, কোন্‌টারই ইতিহাস আজ গোপন করিতে পারিল না সে।

"হাঁ রে কমল, তোরা তো কোল্‌কাতায় মুড়ি খাস না, খাবি দুটি গরম মুড়ি?" রাঙাদিদি কি আমাকে ছোট ছেলে পাইয়াছে, হাসি পায় যত সব কাণ্ডকারখানা দেখিয়া।

একবাটি মুড়ি না খাওয়াইয়া রাঙাদিদি ছাড়িল না।

"আচ্ছা কমল, তোদের কোল্‌কাতায় অনেক সব সুন্দর সুন্দর জিনিষ আছে, না রে? তোরা সব দেখিস তো! আমাকে একবার নিয়ে যাবি?"

"চলো না এই যাবেই।"

রাঙাদিদির মুখখানা এবার শুকাইয়া গেল।

"ওঁকে ছেড়ে কি করে যাই বল ভাই; এক মুহূর্ত্তও যে ওঁকে সহ্য করতে পারে এমন শক্তি কারো নেই, তাই তো পারি না কোথাও যেতে। আচ্ছা কমল, কোল্‌কাতায় তোদের ছোটোখাটো একখানা বাড়ি পাওয়া যায় না, আমরা দু'জনেই গিয়ে থাকতুম তা' হলে; এখানে আর এক দণ্ডও থাকতে ইচ্ছে যায় না আমার। এখানকার লোক, এরা সব কি চায় জানিস্?"

রাঙাদিদি চোখ দুইটা ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিয়াছিল, "না থাক, ও সব এখন বুঝতে পারবি না তোরা।"

রাঙাদিদির আপনার মনেই বলিয়া চলে—"সবাই তো আর বোঝে না কমল, লোকে বলে বদ্ধ-পাগল, আমি জানি আর হাসি মনে মনে। তা' নইলে, হাঁরে কমল, যে মানুষ এত ভাল বাসতেন ওই করবী গাছটাকে, সেইটাকেই তিনি কেটে ফেললেন নিজের হাতে; বারণ করতে গেলুম, কি বললেন জানিস্? বললেন—'রাঙাবৌ, সুন্দরকে বাঁচতে নেই বেশী দিন।' হাঁরে, কমল, সে মানুষ কি কখনও পাগল হতে পারে?

"কিন্তু সব সময় তো আর জ্ঞান থাকে না ওঁর; আচ্ছা রাঙাদি, কিছু দিনের জন্যে কোথাও, যেখানে ওঁর চিকিৎসা হয়, পাঠিয়ে দাও না—"

ইহার উত্তরে রাঙাদিদি যে পূর্ব্বেই যত শতগুণ বিষ মিশাইয়া আঘাত দিবে, তাহা জানিয়াও একথা বলিয়া-

ছিলাম। রাঙাদিদি কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল এবার। নিবন্ত উনানে সজোরে ফুঁ দিতে দিতে বলিল, "তা হয় না কমল, সারাজীবন যার বোঝা বয়ে এলাম, আজ তাকে অসহায় করে ঠেলে দিতে পারবো না।"

রাঙাদিদি আমার হাত দুইটা সজোরে মুঠির মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "লক্ষ্মী ভাইটি আমার, একখানা ঘর তুই দেখিস্ তোদের ওখানে। তুই একটু দেখলেই হবে।"

এ গ্রাম রাঙাদিদির কাছে ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল; কেন, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম না।

"আচ্ছা রাঙাদি, এবার গিয়ে তোমায় চিঠি লিখবো 'খন।"

সপ্তমীর রাত্রি। ঠাকুর-ঘরের ঘড়িটায় রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল। ঘরে ফিরিবার পথে ইচ্ছা হইল, রাঙাদিদির সঙ্গে একবার দেখা করিয়া যাই। কোটরেশ্বর তলায় আসিয়া চোখে পড়িল, রাঙাদিদির উপরের ঘর হইতে প্রদীপের একটা ম্লান ছটা জানালার ফাঁক দিয়া আসিয়া পড়িয়াছে ওই রাই-পুকুরের জলে। অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে মনে হইল একটা করুণ সুর নানা স্তরে লীলায়িত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে সেইখানে; রাঙাদিদির বাড়ির কাছাকাছি সুরটা বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল; মাঝে মাঝে চাপা ভর্ৎসনার শব্দ, রাঙাদিদি ঘুম পাড়াইতেছে অবাধ্য উন্মাদ স্বামীকে। রাঙাদিদিকে ডাকিতে আর ইচ্ছা হইল না।

ইহার পর দিন-দুই হইল রাঙাদিদির সঙ্গে দেখা হয় নাই আর, দেখা করিতে ইচ্ছাও ছিল না বড়। মুহূর্তের উত্তেজনায় রাঙাদিদিকে যে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছিলাম তাহা যে কতদূর বৃথা, সেই কথাটাই আজ বার বার করিয়া মনকে আঘাত দিতে লাগিল। রাঙাদিদি এদেশ ছাড়িয়া যাইতে চায়, এ গ্রাম তাহার সঙ্গে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে যাইবে কোথায়? সে যদি একা হইত, তাহা হইলে তো উপায়ের অভাব ছিল না, কিন্তু ওই উন্মাদ স্বামী, ট্রেনের পথ, সহায়হীন বিদেশ—কে তাহাদের খোঁজ করিবে সেখানে।

মা বলিলেন, "ওরে খোকা, ওসব ঝঞ্ঝাট আর বাড়াস নে বাবা।"

উন্মাদের উৎপাত দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে; নিত্যনূতন সংবাদ, সত্যমিথ্যায় রঞ্জিত হইয়া কান ভরিয়া উঠিল। এ উন্মাদকে লইয়া রাঙাদিদি যাইবে কেমন করিয়া? ভাবিলাম, রাঙাদিদির সঙ্গে আর দেখা না করিয়াই কলিকাতা চলিয়া যাইবে।

একাদশীর দিন। কাল রাত্রিতে প্রতিমা বিসর্জন করিয়া ফিরিয়া আসিতে দেরী হইয়া গিয়াছিল অনেকখানি। রাঙাদিদিকে বিজয়ার প্রণাম করিতে যাওয়া হয় নাই। মামীমা এবং মা সকালে ফিরিয়া আসিতেছিলেন রাঙাদিদির বাড়ী হইতে। সুনু ঠাকুরঘর, তাহারই সামনে সুস্বজনে পদচারণা করিতেছিলাম; শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে, ঠাকুরদালানের কোণে কোণে, উৎসবের সুর তখনও যেন জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে, এখান হইতে দেখা যায় অজয়ের তীরে তীরে ওই কাশবন, তাহারও ওদিকে লুপ্ত-চিহ্ন কোন গ্রামের বিজীর্ণ-প্রায় মন্দির—সন্ধ্যার তারার প্রদীপতলে নতজানু প্রকৃতি সন্ধ্যাতারার প্রথম দীপশিখাটি আজও জ্বালিয়া দেয়।

সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাল লাগিতেছিল আজ এই পল্লী-প্রকৃতিকে; কলিকাতা ফিরিবার দিন যখন ঘনাইয়া আসিয়াছে, তখনই কি ইহার রূপ আমাকে একান্তভাবে পাইয়া বসিল?

মামীমা বলিলেন, "ও কমল, রাঙামাসী যে তোকে কি জন্যে ডাকছিলো রে।"

রাঙাদিদির সঙ্গে ইচ্ছা করিয়াই দেখা করিতে যাই নাই। বিকাল বেলায় ষ্টেশন হইতে ফিরিতেছিলাম, একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভাবিলাম, রাঙাদিদিকে প্রণাম করিয়া যাই এই পথে একবার।

কোটরেশ্বর-তলায় আসিয়া হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, রাঙাদিদি যদি আমাদের সঙ্গেই কলিকাতা যাইতে চায়; যদি বলে, দিন কয়েক আমাদের বাড়িতেই থাকিয়া অজয় ঘাসা দেখিয়া চলিয়া যাইবে। সাহস করিয়া মাকে হয়ত সকল কথা বলিতে পারে নাই।

মুহূর্তের জন্য মনটাকে সোজা করিয়া লইলাম; রাঙাদিদিকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিব আজ, উন্মাদকে সঙ্গে লইয়া এক পাও তাহার বাহিরে যাওয়া চলিতে পারে না।

রাঙাদিদি হয় তো মনে কিছু করিবে, কিন্তু তাহাতেই বা উপায় কি? এই ক দে দিনের ঘটনা—উন্মাদ হরিহর এমন করিয়া কমণ্ডলুটা রাধেরের বিস্তর দিকে ছুড়িয়া দিয়াছিল

যে, রাঙাদিদি বুকের মধ্যে তাহাকে আড়াল করিয়া না রাখিলে, তার চোখটা একেবারে কানা হইয়া যাইত ছেলেটার, ছেলেটা নিজের মুখেই বলিয়া গেল সেদিন মায়ের কাছে।

রাঙাদিদির বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া দেখিলাম, উন্মাদ হরিহর কি একটা কাণ্ড ঘটাইয়া বসিয়াছে; আবার ঘরের চারিদিকটা লোকে লোকারণ্য।

হরিহরকে অন্যত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে আজ; রাঙাদিদি হয় তো যাইতে পারে, কিন্তু দিনের পর দিন উন্মাদের অত্যাচার অন্য লোকে সহিবে কেন? উন্মাদ হরিহরকে অন্যত্র পাঠাইয়া তাহার পর রাঙাদিদি চলিয়া যাইতে পারে আমাদের সঙ্গে কলিকাতায়।

নির্বাক জনস্রোত সিঁড়ি বাহিয়া অবিশ্রাম চলিয়াছে। রান্নাঘরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম রাঙাদিদি নাই সেখানে; উপরের দালানে মামা দাঁড়াইয়াছিলেন, সেখানেও রাঙাদিদিকে দেখিতে পাইলাম না। অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। ঘরের ভিতরে উঁকি দিয়া দেখিলাম—সমস্ত মেঝেটা ভাসিয়া গিয়াছে রক্তে, এক ধারে পড়িয়াছিল একখানা কাতের থালা, একরাশ ভাত ছড়াইয়া পড়িয়াছে চারিদিকে, প্রকাণ্ড একটা কাঁসার ঘটি, তাহিয়া চুরিয়া হাতার মত হইয়া গিয়াছে দাওয়ায় পড়িয়া আছে রাঙাদিদির নিষ্প্রাণদেহ।

উন্মাদ হরিহর এক মুখ দাড়ি গোঁফ লইয়া বিহ্বলের মত বসিয়াছিল রাঙাদিদির মাথার গোড়ায়, প্রাণহীন দেহটায় আস্তে আস্তে নাড়া দিয়া তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিতেছিল, 'ও রাঙাবৌ, রাঙাবৌ।'

•

চাহিয়া দেখি সুরূপা মাথার কাছে বসিয়া প্রাণপণে পাখায় বাতাস করিতেছে।

"রোগা মানুষ, অত করে বকুলে মাথা আবার গরম না হয়," সুরূপা শাসাইয়া বলে; চোখে তাহার বড় বড় দুই ফোঁটা অশ্রু।

---

# ছবিঘর

—শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

বেদনায় স্তব্ধ গ্রাম; হাহাকারে বহন-অক্ষম
চাষীর মনের মেঘে নিতি নব অশ্রুর উৎসব—
জীবির পল্লব মেরি ঘোলে দেখি ব্যথার সাগর
প্রাণহীন প্রাণ সব মাঝে মাঝে করে কলরব।

ঘিরু ওরা হাহাকার পল্লী-ভূমে নাই—কিছু নাই
দিগন্তবিস্তৃত মাঠ শূন্যতায় শুষ্ক শস্যহীন
উত্তপ্ত দুঃখের মাঝে আমি কবি একা কাঁদি তাই
প্রান্তরের প্রান্তে বসি সন্তর্পণে শুনি শুধু বীণ।

ঘনের অন্ধকারে কল্পনায় কোথায় মাধুরী
কঙ্কাল মলিন বেশ; বঙ্গদেশ করিলো আঁধার—
প্রাণ-ভরা হাসি গান সে হৃদয় করিলো কে চুরি?
ভগ্নীর যাত্রার ক্ষণ চাহে মন পরশ তাহার।

শহরে করিছ সবে ছবিঘরে ক্লান্তি বিনোদন
আমি দেখি ছিন্ন-প্রাণ মানবের মেলে না বসন।

## পৃথিবীর বয়স

—শ্রীসুশীল রায়

পৃথিবীর গঠন, পৃথিবী কি কি পদার্থ দিয়ে নির্মিত, কি ভাবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে,—এক কথায়, পৃথিবীর ইতিহাস রচনা কি ভাবে সম্ভব, আজ আমরা এই আলোচনা করবো। পৃথিবী কি ভাবে স্তরে স্তরে গ'ড়ে উঠেছে—আজ আমরা এই বিষয় জানবো।

আধুনিক জ্যোতির্বিদেরা গ্রহ-উপগ্রহের ইতিবৃত্ত জানার জন্যে চেষ্টা করছেন। ফলে তো কোনো তারকা সম্বন্ধে অনেক গবেষণা ও চেষ্টার ফলে যৎকিঞ্চিৎ খবর পাওয়া গেলো, সেই সামান্য খবরটির ওপর নির্ভর ক'রে আমরা সূর্য সম্বন্ধে কিছু জানার চেষ্টা আরম্ভ করলাম। কিন্তু তারকা সম্বন্ধে যেটুকু জেনেছি তাই যে অভ্রান্ত তারও কোনো প্রমাণ নাই। কেন না, চন্দ্র সম্বন্ধে খোঁজ-খবর ক'রে এর আগে বৈজ্ঞানিকরা মত প্রকাশ করেছিলেন যে, সেখানে বিস্তর আগ্নেয়গিরি বর্তমান। কিন্তু সম্প্রতি বুদ্ধিমান বৈজ্ঞানিকরা বলেন, আসলেই ওগুলো আগ্নেয়গিরি নয়, চন্দ্রগ্রহের ওপর বিরাটকায় উল্কাপাতের ফলে তার গায়ে যে ঘা হয়েছে, ওগুলো তারই দাগ। যে প্রমাণের ওপর নির্ভর ক'রে অন্য বিষয় প্রমাণিত হবে, তা-ই নিয়েই যদি মতভেদ থাকে—তাহ'লে অন্য বিষয় প্রমাণ ক'রতে যাওয়াই তো সমস্যা। পৃথিবীর পূর্ণ ইতিহাস জানার জন্যে পৃথিবীর প্রতিবেশী জ্যোতিষ্ক চন্দ্রের ইতিবৃত্তের উপর নির্ভর করতে হয়, কিন্তু নিঃসংকোচে নির্ভর করতে আমরা পারি নে। কারণ, চন্দ্রের ইতিবৃত্তথা যেনেছি তা যে সম্পূর্ণ ঠিক, বুক ফুলিয়ে সে-কথা বলা চলে না। কিন্তু আমাদের পায়ের নীচে পৃথিবীর কথা জানতে গিয়ে মাথার উপরের চাঁদের সাহায্য নিতেই হবে, তার কি মানে আছে? অনায়াসে আমরা পৃথিবী খুঁড়ে যেতে পারি—যেমন খনি খুঁড়েছি; দরকার হ'লে গর্ত আরো গভীর করাও যেতে পারে। অথবা পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠে যেতে পারি। এই ভাবে মাটির তলায় ও পাহাড়ের বুকে যে-সব স্মৃতিচিহ্ন পাবো, সেথা থাক তা থেকে আমরা কতটুকু ইতিহাস জানতে পারি। এই ভাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করার কাজকে বলে ভূতত্ত্ব। ভূতত্ত্ব থেকে আমরা অনেক বিষয় জানতে পারি, যা অন্যভাবে জানা সম্ভব নয়।

আমাদের অনেকেরই হয়তো ধারণা এই যে, পৃথিবীতে মাঝে মাঝে যে প্রবল ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড় ইত্যাদি হয়, পৃথিবীর ইতিহাস রচিত হয় তাই থেকে। কেন না, আকস্মিক এই সব উৎপাত ছাড়া পৃথিবীর ওপর কোনো ঘটনার কথা আমরা ভাবতে পারি নে। হঠাৎ একটা নাড়া পেলে তা আমাদের মনে থাকে, কিন্তু ধীরে ধীরে কোনো কাজ চুপে চুপে পৃথিবীর গহ্বরে চ'লেছে—এমন ধারণা আমরা সাধারণতঃ করি না। অথচ, চুপেচুপে যা হ'চ্ছে সেইটেই আসল কাজ। যেমন, গভীর বনের মধ্যে বিরাট এক বট গাছ কত হাজার হাজার বছর ধ'রে নীরবে বেড়ে উঠেছে আমরা তা খেয়ালই করলাম না; কিন্তু হঠাৎ এক দিন দারুণ একটি বাজের আঘাতে সেই গাছটির যখন পতন ঘটলো, তখন আমরা এই বিরাট ঘটনাটির কথা সন-তারিখ সমেত নোটবুকে টুকে রাখলাম। গাছটির অস্তিত্বের কথাই কেউ জানতো না, কিন্তু পরদিন খবরের কাগজে এই দুর্ঘটনার সংবাদ বের হ'লো। কত বছর ধ'রে

কত রূপ কত ভাবে গড়ে, কত ইতিহাস রচনা ক'রে ক'রে এর বিরাট শরীর পুষ্ট হ'লো—আমরা সে-খবরই রাখলাম না, কিন্তু একটি মুহূর্ত্তের ঘটনাকেই কত মূল্যবান ভাবে গ্রহণ করলাম। পৃথিবীর ওপরের ভূমিকম্প বা ঝড়-ঝঞ্ঝা বা বন্যা এমনি মুহূর্ত্তের ঘটনা ছাড়া কিছু নয়, এর মেপথ্যে হাজার হাজার বছরের সঞ্চিত ইতিহাস জমা আছে। ভূতত্ত্ববিদেরা সেই ইতিহাস উদ্ধার করতে পারেন। কেমন ক'রে, তা আমরা একটু পরেই জানবো।

একটা মূর্ত্তি তৈরী করার জন্যে ভাস্কর যেমন নানা রকমের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন, পৃথিবী নির্ম্মাণ করছেন যে অদৃশ্যী ভাস্কর তিনিও তেমনি নির্ম্মাণ-কার্য্যের জন্য কিছু কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন। তবে এঁর যন্ত্র হাতুড়ি-বাটালী নয়, এঁর যন্ত্র হচ্ছে বৃষ্টিধারা, বর্ষা, জোয়ার, সমুদ্রের ঢেউ, পৃথিবীর ওপরের ও অভ্যন্তরের নদী, ভূমিকম্প ইত্যাদি। এই সব যন্ত্রের ঘাত-প্রতিঘাতে পৃথিবীর অবয়ব নতুন নতুন ভাবে গঠিত হ'চ্ছে। যদি আমাদের তেমন চোখ থাকতো তাহ'লে দেখতে পেতাম মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কি ভাবে এই ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে পৃথিবী নতুন নতুন রূপ নিচ্ছে। কিন্তু তেমন দৃষ্টিশক্তি আমাদের নেই। আমরা ঘড়ির কাঁটা নড়াই দেখতে পাই নে। পৃথিবীর পরিবর্ত্তনশীল গতি তো ঘড়ির কাঁটার চেয়েও ধীর। কিন্তু ধীরে ধীরে নিঃশব্দে চলার পর ঘড়িতে যেই ঘণ্টার শব্দ হয়, তখন আমাদের চমক লাগে, বহু পরিবর্ত্তনের পর হঠাৎ ভূমিকম্পের ধাক্কায় বা ঝড়ের ঝাপটায় তেমনি আমরা চমকে উঠি। আমাদের দৃষ্টি ও চেতনা আকর্ষণ করে সেই জিনিষ, যা দ্রুতগতি, শব্দময় ও ভীষণ। অথচ, এই দ্রুতগতি, শব্দময় বা ভীষণ জিনিষটি জলের বুদ্বুদ মাত্র, কোনো সাময়িক কারণে সেই বুদ্বুদের জন্মে সে কাণ্ড বাধায়। এর আড়ালে যে ক্রিয়াটি নিরিবিলি নীরবে চ'লেছে, পৃথিবীর পরিবর্ত্তনের ভিত্তি তারই ওপর স্থাপিত। এইমাত্র আমি বললাম যে, আমাদের পৃথিবী-নির্ম্মাতা কতকগুলি নৈসর্গিক প্রক্রিয়াকে তাঁর যন্ত্রপাতি রূপে ব্যবহার ক'রে তাঁর কাজ ক্রমাগত ক'রে চ'লেছেন। আমাদের মনে মনে ধারণা ছিলো যে, ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরিই পাহাড়-পর্ব্বত তৈরী করছে। কিন্তু অতি অল্প দিন আগে আমরা বিজ্ঞানবিদদের কৃপায় জানতে পেরেছি যে, রেডিয়াম নামক অসীম ক্ষমতাবান্ পদার্থটি পাহাড়-পর্ব্বত নির্ম্মাণ-কর্ত্তা। এ সংবাদ আমরা জানতে পেরেছি পৃথিবীর আবরণের ভেতরে ঢুকে, অর্থাৎ ভূতত্ত্ব অনুসন্ধান ক'রে: কেন না, পৃথিবীর আবরণের নীচেই রেডিয়ামের বাসা।

ভূমিকম্প জাতীয় যে-সব ঘটনা আমরা জানি, তার দ্বারাই তা বলে বিরাট শিলার আবির্ভাব ঘটে না। যদিও এ-সব খুব শক্তিশালী ও রোমাঞ্চকর ঘটনা, তবুও নির্ম্মাণ বা গঠন-ক্রিয়ায় এরা বিশেষ কার্য্যকর নয়। রেডিয়ামের উপস্থিতির দরুণ পৃথিবীর ভেতর-ভেতর অতি মন্থর গতিতে যে-ক্রিয়া চলেছে, তার দ্বারাই শিলার বিরাট স্তূপের উদ্ভব। রেডিয়াম অনবরত ভাবে উত্তাপ প্রজনন ক'রে চ'লেছে, তার পরিণামে এই সব পাহাড়-পর্ব্বতের আবির্ভাব ঘটছে। আর, এই পাহাড়-পর্ব্বতের গহ্বর থেকেই আমরা পৃথিবীর পুরাতন কালের কথা জানতে পারি। এই সব পাহাড়ের ভিতর আদিম কালের অনেক স্মৃতিচিহ্ন লুকানো আছে।

এখন আমরা দেখবো, কি-ভাবে পাহাড়ের ভিতর থেকে পৃথিবীর পুরানো কথা জানা যায়। ভূতত্ত্বানুসন্ধানীরা পাহাড়ের স্তর ভেদ ক'রে যতই নীচে নেমে গেছেন, পৃথিবীর পুরাতন থেকে পুরাতনতর কালের জীবনের কথা ততই আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েছে। হাজার হাজার বছর আগের থেকে পৃথিবীর ইতিহাস পাহাড়ের বুকে লেখা হয়ে আছে। এর থেকে আমরা ধারাবাহিক ভাবে সেই দীর্ঘ ইতিহাস পাঠ করে নিতে পারি। এবার দেখা যাক, কি ভাবে সে ইতিহাস লেখা আরম্ভ হলো। লক্ষ বছর আগে হয় তো একটা ছোট্ট হাল্কা নদী পাহাড় থেকে বিস্তর বালু ও পাথর বহন ক'রে ক'রে ঝিরঝির ক'রে মাটিতে নেমে আসতে আরম্ভ করে—এবং মাটি ডিঙিয়ে এক সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সেই সমুদ্রে ইক্থিওসৌরাস নামক মৎস্যজাতীয় বিরাট সিরসিটি বাস করতো। এই জীবটির মস্ত বড় মাথা, বিরাট চোয়াল, ভীষণ দাঁত ও চারটি পা ছিল—যার সাহায্যে সে সাঁতার কাটতো। একদিন এই জীবটি মারা গেলো, অথবা ধরা যাক, অন্য একটা ভীষণ জাতীয় জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই ক'রে প্রাণ হারালো। তখন তার মৃতদেহ-গিয়ে সমুদ্রের তলায় পড়লো। নদী-বাহিত বালুকা ও পাথর ক্রমাগত

সমুদ্রের গর্ভে ক্রমেই চলেছে। তা ছাড়া, ক্ষুদ্র নদী থেকে অনেকগুলি শাখা-প্রশাখা বেরিয়ে পাহাড়টিকে ক্ষয় করে করে সমস্ত পাথরের গুঁড়ো সমুদ্রে ঢালছে: তাতে সেই বিরাট মাছ-গিরিগিটির মৃতদেহ চাপা পড়ে যাচ্ছে। এতে সমুদ্র-গর্ভও ধীরে ধীরে উঁচু হ'য়ে উঠছে। আর তার নীচের দিকটা হচ্ছে ধীরে ধীরে পাথরের মতো শক্ত। বহু সহস্র বৎসর কেটে গেছে। তার পর একটি হাতী তার একটা লম্বা দাঁত যেন কেঁদে ফেললো, দাঁতটি পড়লো নদীতে। নদী সেটাকে গড়িয়ে এনে সমুদ্র-গর্ভে ছেড়ে দিলো। তার পর একটা পাখী যেন জলে ডুবলো ও সমুদ্র-গর্ভে পড়লো। এ ছাড়া, সামুদ্রিক মাছ, শামুক ইত্যাদি ম'রে গিয়ে সমুদ্রে পড়ছে। এ দিকে নদী কিন্তু তার শাখা-প্রশাখা সমেত বিস্তর বালু ও পাথর সমুদ্রে ফেলেই চলেছে। সেগুলো ধীরে ধীরে এই সব নানাপ্রকারের মৃতদেহের উপর জমছেই। তার পর কত হাজার বছর কেটে গেলো। কত বৃষ্টি পাহাড়কে ক্ষয় করে সমুদ্রে গড়িয়ে পড়লো। অনেকদিন বাদে একজন জেলে এক নৌকো চেপে মাছ ধরতে বেরুলো। বর্শা দিয়ে মাছ বিঁধতে গিয়ে হঠাৎ তার বর্শার মাথাটা খুলে গিয়ে জলে প'ড়ে গেলো। অনেক গভীর জলে চ'লে যাওয়ায় সেটা আর উদ্ধার করা গেল না। সেটাও ক্রমে বালু ও পাথর চাপা পড়লো। এই ভাবে স্তরে স্তরে বালু ও পাথরগুলি জমা হতে হতে একদিন সমুদ্র-গর্ভে জলের ভিতর থেকে মাথা তুলে তাকালো। তখন মানুষে আরম্ভ করলো খনন-কার্য। প্রথমেই পেলো বর্শার মাথাটি, তার পর হাতীর দাঁত, শামুক, পাখীর কঙ্কাল ইত্যাদি, অবশেষে অনেক নীচে পাওয়া গেলো সেই বিরাট মাছ-গিরগিটির কঙ্কাল—এটা এতদিনে পাথরে রূপান্তরিত হ'য়েছে। একে ইংরিজিতে বলে ফসিল (fossil)। কথাটার অর্থ হ'চ্ছে কোনো-একটা খুঁড়ে-পাওয়া পদার্থ। এবার আমরা দেখলাম কি-ভাবে পুরানো ইতিহাস জানা সম্ভব। এ-ধরণের বিরাট জলের জানোয়ার বর্তমান কালে আর নেই। পৃথিবী খুঁড়ে জানা গেলো, বহু বহুর আগে এরকি জীব জন্মতে ছিলো। বিজ্ঞানবিদরা কত গভীর স্তরে পাওয়া গেছে, সেই হিসেব থেকে ও হাজার বছরে কতটা মাটি জ'মে উঠতে পারে হিসেব ক'রে বলতে পারেন এই জীবটি পৃথিবীর কত সহস্র বছর আগের বাসিন্দা।

এইভাবে পাহাড় খুঁড়ে আমাদের বিস্তর জিনিষ জানা সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা যতটা জানতে পারি ব'লে আশা করি, তার সবটা জানা যায় নি। তার কারণ, যে ফসিল থেকে আমরা পুরাতন পৃথিবীর নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করবো, সেই ফসিল-ই সব সময় সব জায়গায় পাওয়া যায় না। কেন পাওয়া যায় না, তার কারণও বেশ স্পষ্ট। জল, কুয়াশা, সমুদ্র, বায়ুর চাপ, আগ্নেয়গিরি-নিঃসৃত লাভার তাপ ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ের উপর ফসিল-এর অস্তিত্ব নির্ভর করে। লক্ষ লক্ষ ফসিল এই সব তাপে বা চাপে নষ্ট হয়ে যায়, মাটি বা পাহাড় খুঁড়ে আমরা সেগুলো আর খুঁজে পাই নে। তা ছাড়া, প্রত্যেক জীবের কঙ্কালই ফসিল হবার উপযুক্ত নয়, কিছু দিন মাটির নীচে থাকার পর আপনা আপনি তারা গ'লে প'চে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। এখন অনেক লোক আছেন যাঁরা অনুযোগ ক'রে বলেন যে, পাহাড় আমাদের পুরাতন পৃথিবীর ইতিহাস খুব বেশী জানাতে পারে নি। তাঁদের অনুযোগের উত্তরে এই কথা কেবল বলা যায় যে, সমস্ত পৃথিবী-জোড়া এত অভ্রভেদী পাহাড়ের মধ্যে মাত্র কয়টিকে আমরা অনুসন্ধানের চোখ দিয়ে দেখেছি? সমস্ত পৃথিবীর মাত্র সাত ভাগের দুই ভাগ তো জলের ওপরে বিদ্যমান, এই যৎসামান্য অংশ এক কালে নিশ্চয়ই জলতলে ছিলো, আর যে শুষ্ক অংশ এখন সমুদ্রগর্ভে, তা এক কালে ছিলো জলের উপরে। তা হ'লেই বোঝা যাচ্ছে যে পৃথিবীর প্রাণীরা এক দিন যে স্থলে জীবন-যাপন করতো সে-স্থল এখন অদৃশ্য। তাছাড়া, আমরা বর্তমানে যে স্থলভাগটুকু এখন পাচ্ছি, তার মধ্যেও বলতে গেলে, মাত্র ক্ষুদ্র কয়েকটি বিন্দু নিয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা আপাততঃ হয়েছে। পাহাড় আমাদের বিশেষ কিছু সংবাদ দিতে পারে না ব'লে অভিযোগ করা তা' হলে ভুল। আমরা পৃথিবীর সহস্রাংশের একাংশও নিখুঁতভাবে আজ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করতে পারে নি। এই সামান্য অংশ থেকে তা'হলে কতটুকু সংবাদই বা আমরা পেতে পারি। কিন্তু বিস্ময়কর জিনিষ হচ্ছে এই যে এইটুকু অনুসন্ধানের থেকেই আমরা কি বিপুল তথ্য আবিষ্কার করতে পেরেছি। শুধু যে প্রাণীর বা জীবজন্তুর সম্বন্ধেও আমরা ফসিল থেকে জানতে পারি, তা নয়। নানাবিধ উদ্ভিদের কথাও এর থেকে জানা গেছে। গত শতকের মধ্যে লক্ষ

লক্ষ বিভিন্ন জাতীয় ফসিল আধুনিক ভূতত্ত্ববিদেরা উদ্ধার করেছেন।

ফসিল জিনিষটা কি, কি ভাবে এই পদার্থটি গঠিত হয় ইত্যাদি আমরা বুঝলাম। এখন দেখা যাক, এর থেকে আমরা কি জানতে পারি। বর্ত্তমান কালে যে-সব জীব-জন্তু আছে, তাদের থেকে পুরাকালের জীব-জন্তুর বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়—যদিও উভয়ের আকৃতি প্রায় এক। এ-কালের হাতীর কঙ্কাল আর সে-কালের ( মনে করা যাক্ কুড়ি লাখ বছর আগেকার ) হাতীর কঙ্কাল দেখে আমরা দু'টি কঙ্কালকেই হাতীর কাঠামো ব'লে চিনতে পারলেও তাদের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ দেখতে পাব। তা ছাড়া, সরীসৃপ জাতীয় কতকগুলি জীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল (ফসিল) দেখা যায়, কিন্তু বর্ত্তমান কালে সে-জাতীয় জীবের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। এই সব জীবের কঙ্কাল দেখেই বোঝা যায় তারা কীদৃশাকৃতি ছিল ও কীর্তিপ্রদ ছিল। আমেরিকার নিউ ইয়র্কে অবস্থিত ন্যাচরাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে এই সব অদ্ভুত জীবের নমুনা জমা করা আছে। এই সব সে-কালের জীবদের নমুনা দেখে মনে হয়, তারা যেন পাল্লা দিয়ে কেবল তাদের শারীরিক বিশালতাই বাড়িয়ে তুলতো। সে আমলের একমাত্র উদ্দেশ্যই যেন ছিল আকারে ভয়ঙ্কর হওয়া। শরীরের তুলনায় আবার তাদের মস্তিষ্ককোষ ছিলো অতি ক্ষুদ্র। এই সব জীবদের চেহারা ছিলো এক একখানা বিরাট দালানের সমান। কিন্তু জীবনময় পৃথিবীর নিয়ম হ'চ্ছে—মনই দেহের প্রভু। তাদের আকার তা হ'লে তাদের মস্তিষ্কবৃদ্ধির ক্ষতিপূরণ করতে পারেনি। অনেক বৈজ্ঞানিক এখন এই সব পুরাকালীন কঙ্কাল থেকে তাদের মাংসপেশী সম্বন্ধেই গবেষণা ক'রে চলেছেন, তাঁরা তাঁদের মনকে খুঁচিয়ে দেখতে ভুলে যাচ্ছেন। কিন্তু মস্তিষ্কের মাপ থেকে তাদের মন সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত ক'রে নেওয়া দরকার।

কিন্তু আগে আমি তোমাদের মনে ধারণা জন্মাবার জন্যে কি ভাবে মাটি ও পাহাড় খুঁড়ে একে একে বিভিন্ন জিনিষ পাওয়া যায় তা ব'লেছি। এখন আমি তোমাদের একটা সত্য ঘটনার কথা ব'লবো।

লণ্ডন একটা বড় শহর—আমরা জানি। কত বড় বড় রাস্তা আর বড় বড় বাড়ীতে এই শহর ঠাসা। এই শহরের ট্রাফালগার স্কোয়ার খুঁড়তে আরম্ভ করলে কি কি পাওয়া সম্ভব, বলি :

প্রথমেই আমরা পাবো একটু কাঁকর-ভরা জমি, এখানকার মাটির ভেতর বড় বড় জন্তুর হাড় পাওয়া যাবে—সেই আকারের, যে সব জন্তুর খোঁজ এখন আর মেলে না। যেমন, হাতী, গণ্ডার, গুহাবাসী ভালুক ইত্যাদি। বেশী দিন আগের কথা নয়, লণ্ডনের বিখ্যাত ফ্লিট্ ষ্ট্রীটের ঘরের কাজের আপিস ভেঙ্গে বড় করার সময় রাজমিস্ত্রীরা যখন মাটি অনেকটা গভীর ক'রে খুঁড়ে ফেলেছে, তখন এমনি সব বিবিধ জানোয়ারের কঙ্কাল আর তার সঙ্গে অতি অপূর্ব্ব একটি মাথার খুলী পায়। মাটির এই স্তরের নীচে যে স্তর পাওয়া যায় তাকে বলে লণ্ডন-পঙ্ক ( London clay ); এই পঙ্কে অদ্ভুত গো-মহিষাদির কঙ্কাল ও নানাবিধ উদ্ভিদের ফলের চিহ্ন পাওয়া যায়, তার সঙ্গে পাওয়া যায় এমন সব মাছের কঙ্কাল, যে সব মাছ একালে কেবল গরম দেশেই জন্মে। এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, যখন মাটির এই স্তরটি ওপরে গ'ড়ে উঠ্‌ছিলো তখন ও দেশের আবহাওয়া ছিলো গরমদেশের মতো। তা না হ'লে ও জাতীয় জীব ওখানে সে সময় যাবে কি করে? লণ্ডন-পঙ্কের নীচের স্তরের নাম ক্রেটেসাস স্তর, অর্থাৎ চক্-স্তর ; চক্ বা খড়িমাটির ল্যাটিন নাম creta, যার থেকে এই স্তরটির নামকরণ হ'য়েছে। ওই স্তরে পাওয়া যায় সাপ-বংশীয় বিপুল শরীরবিশিষ্ট জীবের কঙ্কাল, তা ছাড়া এমন সব সরীসৃপ, যারা সেকালে আকাশে উড়তো। এ-সব অদ্ভুত কথা শুনে তোমাদের হয় তো বেশ মজা লাগছে। কিন্তু রূপকথার মতো বা আষাঢ়ে গল্পের মতো এ-গুলো কিন্তু এতটুকু অবিশ্বাস্য নয়, এ-সব কিন্তু অতি সত্য সংবাদ। এই ভাবে যতই আমরা স্তর ভেদ ক'রে ক'রে ক্রমশই নীচের দিকে নেমে যেতে থাকবো ততই বিভিন্ন প্রকারের প্রাণীর নমুনা দেখতে পাবো। যত বেশী নীচে যাব, তত বেশী সে-আমলের জীবের সঙ্গে এ কালের জীবের পার্থক্য বেশী ব'লে দেখা যাবে। আরো নামলে দেখা যাবে, জীবের চিহ্ন ক'মে আসবে। এই ভাবে আমরা এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁছবো, যেখানে কোনো জীবের চিহ্নই পাওয়া যাবে না। তার কারণ, সে-কালে জীবের অস্তিত্বই ছিল না—কেন না, তখন

পৃথিবীর নিজেরই নতুন জন্ম হ'য়েছে—আর পৃথিবী তখন সূর্য্যের মতো ধাউ ধাউ ক'রে জ্বলছে—সে আগুনের মধ্যে প্রাণীর বাস করা সম্ভব নয়। পৃথিবী ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হ'চ্ছে তাইতেই না এর ওপর জীব-জন্তুর বাস করা সহজ হ'য়ে উঠতে পেরেছে।

পৃথিবীর সামান্য কয়েকটি জায়গা অনুসন্ধান ক'রেই যদি আমরা লক্ষ বছর আগেকার পৃথিবীর জীবন-যাপন-প্রণালীর কিছু আভাস ও সে-আমলের আবহাওয়ার সংবাদ খানিকটা জানতে পারি তা হ'লে আপ্রাণ পরিশ্রম ক'রে সকলে মিল বেঁধে যদি অতীতের সুদূর কালের ইতিহাস উদ্ধার করার চেষ্টা করি—তবে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সে-ইতিহাসের সব কথানা পাতা খুঁজে বের ক'রতে বেশী সময় লাগবে ব'লে মনে হয় না। আমাদের ভারতবর্ষের রাজপুতেরা যেখানে জয় ক'রে বিজয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করতেন, সেখানে এই ধরণের বিজয়স্তম্ভ আছে। স্তম্ভের গায়ে খোদাই করে বিজয়ী বীর সব ঘটনা লিখে রেখে গেছেন—যার থেকে আমরা রাজপুত ইতিহাসের খুঁটিনাটি খবর পাই। তেমনি, প্রতি স্তরে স্তরে বিভিন্ন সময়ের ঘোড়ারা ( বিপুল শরীরের জীবেরা ) নিজেদের শরীর দিয়ে যে-সব পুঁথি খোদাই ক'রে রেখে গেছেন, তার থেকে লক্ষ বছর কেন, কোটি বা পরার্দ্ধ বছর আগের ইতিহাস আমরা জানতে পারি। সময় কিছুই সঙ্গে নিয়ে পালায় না, সবই আমাদের জন্যে রেখে যায়, কিন্তু সে নিজে থাকে না। সময় বড় চালাক।

---

# রংয়ের খেলা

—শ্রীনকুলেশ্বর পাল

কাকন আজি পড়িছে গলিয়া
এ কি অপরূপ সাজ ;
আকাশের গায়ে এত রূপ বল
কে দিল আঁকিয়া আজ।
রংয়ে রংয়ে আজি ভুবন ভুলান ;
হিমগিরি বুকে অরুণ লুকান ;
পরাণ আমার লইছে কাড়িয়া
নবল-নৃপ আজ ;
রংয়ের তুলিতে কে দিল বুলায়ে
ভুবন-ভুলান সাজ।

পূরব গগনে ভুবার পুঞ্জে
সোণার বরণ ঢালা ;
পশ্চিমে আজি গৌরীর ভাল
সিন্দূরে হ'ল আলা।
নীল নভোতলে অমিয় মাখান,
জলদ সুবাসে পরাণ জাগানো ;
পাহাড়ের গায়ে অর্ঘ্য রচিছে
সাজায়ে বরণ-ডালা ;
কার গলে দোলে শিশির-সিক্ত
করা বন-ফুল মালা।

নিয়ে শোভিছে কাশের চামর
ভুবার শৈল শিরে ;
সাদা কাল মেঘ রংয়ের খেলায়
খেলিছে বক ঘিরে।
ঝুঁসিছে অদূরে নাগিনীর ফণা,
বরণায় ধারা ঝরে ঝরঝর ;
যার রূপে হেরি এত অপরূপ
সে রূপ-সাগর তীরে ;
নীল লোহিতের রংয়ের খেলায়
বিশ্ব ডুবিল কী রে ?*

* 'টাইগার হিলে' সূর্য্যোদয় দর্শনে।

# বিজয়ী

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

মা ও মেয়ে—দুঃখে সুখ

ঘরে ঘরে সন্ধ্যা নামিল—চারি দিক আঁধারে ঢাকা পড়িল। ঘরে ঘরে আলো জ্বলিল ঘরে ঘরে—সব ঘরে নয়, নেহাৎ যেখানে না জ্বালিলে নয় সেই সব যাতায়াতের পথে।

সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ, পিঁজরায় পোষা পাখীরা চুপ-চাপ; বিড়ালগুলি নীচে ঘোরাফেরা করিত, আজ তাহারাও কোন্ কোণে লুকাইয়াছে।

আকাশের এক কোণে কালো মেঘ জমিয়া বার বার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছিল। ঠাণ্ডা বাতাসের জন্য বেশীর ভাগ জানালা বন্ধ। লোক-জন কোথাও কাহাকে দেখা যায় না—নিতান্ত দরকারে যাহারা চলা ফেরা করিতেছে তাহাদের গতি চোরের মত ভয়-কুণ্ঠিত।

কৈকেয়ী বিছানায় শুইয়া আছেন। কাছে ঘড়ী। ঘর অন্ধকার, বারান্দার আলোতে ঘরটার অস্পষ্ট আলো। ঘরে আর কেহ নাই।

সকাল বেলায় সেই নিষ্ঠুর চিঠিখানা পড়িবার পর হইতে কৈকেয়ী একেবারে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন।

সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা করিয়া রাত্রি আটটা বাজিল—মন্থরা হইতে জানকী ফিরিল। কৈকেয়ীর কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে দুই হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল—"মা"।

কৈকেয়ী একই ভাবে শুইয়া রহিলেন।

"কেন মা তুমি অমন করে রয়েছ, তোমায় কি আমি বোঝাব? তোমার মত মায়ের ছেলে যে এই রকমই হয়—আনন্দ না করে তুমি কি না বিছানা নিলে!"

"আনন্দ করবো? আমি আনন্দ করবো জানকী!"—বলিতে বলিতে কৈকেয়ী চুপ করিলেন।

"হ্যাঁ—তুমি আনন্দ করবে, আজ তোমার সব চেয়ে সুখের দিন, অমন করে থেকোনা মা, ওঠ', কথা কও। যে পথে গেছে দাদা সে পথ তার ঠিক থাক—সেই আশীর্বাদ কর, বৌদি যে আশীর্বাদ চেয়েছে!"

"আমি জানি, আমি জানি জানকী," কৈকেয়ী ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া জানকীর কোলে হাত রাখিলেন। "আভাস সে আমায় দিয়েছিল। সেই যে থিয়েটার করলে, পুথুরাজ সেজে এক কথায় জেগে উঠে সব ছেড়ে এক কাপড়ে বেরিয়ে গেল, আর ফিরে এলো না, সেই তো তার আভাস! নিজের জীবনে যা সে করবে সেই দিনই তো সবাইকে জানিয়ে ছিল, আমি বুঝি নি জানকী—আমি বুঝতে পারি নি।"

কত ধীর, কত অস্পষ্ট সুর কৈকেয়ীর—হঠাৎ শুনিলে মনে হয় আর কেহ কথা বলিতেছে!

"না বুঝেছ তো কি হয়েছে? এখন বোঝ। দাদা যদি দুঃখে-কষ্টে পড়ে' সংসার ছাড়তো, সে ছিল আলাদা কথা। এমন সুখ ছেড়ে, সবে নাতিটি হয়েছে তাকে চোখের দেখা না দেখে এমনি করে যে সংসার ছাড়ে সে-ই তো ত্যাগী। সেই তো সত্যিকার বৈরাগ্য মা। মূঢ় বৈরাগ্য নয়, কষ্ট-বৈরাগ্য নয়, এ বিজ্ঞানের চৈতন্য বৈরাগী, আর তার জন্যে দুঃখ করবে তুমি? আমার সমস্তটা দিন যে কি আনন্দে কেটেছে সে আমিই জানি।"

"আনন্দ হচ্ছে তোর?"

"হ্যাঁ—মা, সত্যিকার আনন্দ সংসারে থাকলে কি তুমি তাকে দিতে না? শুধু ভোগসুখ। এই জীবনটাই কি সব? এর পরেরটা কে ভাবে মা? যে জেনেছে সে মানুষ নয়। দাদাকেও আমরা আর আমাদের সমান মানুষ বলে ভাবতে পারবো না, আমাদের কত ওপরে সে—তোমার এই ধনসম্পত্তি ছুঁড়ে ফেলে সে বেরিয়ে গেল, ফিরে চেয়ে দেখলে না, এখন ভগবানের দরবারে আসন পেতেছে, তুচ্ছ মানুষের তুচ্ছ সম্পত্তি তার কাছে কি?"

"জানকী, তবু কেশব—কেশব না এলে যে বাড়ী আমার অন্ধকার। সে যেতে চায়নি ঘর ছেড়ে, আমিই জোর করে পাঠালাম! না পাঠাতাম যদি!"

এবার জানকী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, বলিল, "তোমায় আমি একটি দুঃখের কথা বলতে, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে কেন

না। ওঠো মা—ওঠো, উঠে বোসো, মা, জানকীকে নিজের হাতে গড়েছ, আজ কি সে-ই তোমায় বোঝাবে?"

কৈকেয়ী হাত বাড়াইয়া জানকীকে টানিয়া লইয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন—তাহার রুক্ষ চুলের উপরে নিজের মুখ রাখিলেন, মুহূর্ত অতীতে তাঁহার মন পিছাইয়া গেল। জানকীকে তিনি গড়েন নাই—এক ছোটো মেয়ে নিজের স্বাধীন তেজস্বী স্বভাবগুণে আপনি বাড়িয়া উঠিয়াছে। মায়ের কোল লইয়া কেশবের সঙ্গে জানকীর অনুক্ষণ বিবাদ চলিত—নির্বিরোধী কেশব বোনটিকে নিঃশব্দে সমস্ত অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আজ কেশব কত দূরে! সেই অনাথা মেয়েটি মায়ের মত স্নেহে কৈকেয়ীকে সান্ত্বনা দিতেছে!

ষষ্ঠীর বহু অভ্যাস হইয়াছে কোলের মধ্যে ঘুমানো। সেটার ব্যতিক্রম হইলেই ঘুমের মধ্যেই দুষ্ট ছেলেটা জানিতে পারে বোধ হয়।—নড়িয়া চড়িয়া জাগিয়া কান্না সুরু করিল এবং চোখ মেলিয়া অন্ধকার ঘর দেখিয়া কান্নার জোর বাড়াইল।

জানকী বলিল, "আলো জ্বালি মা? ওকে তুলে নাও।"

কৈকেয়ী বলিলেন, "জ্বাল্।"

সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া জানকী মৃৎ-প্রদীপটা দেখিয়া লইল, তার পর সেটা জ্বালিয়া বিদ্যুতের আলো নিভাইয়া দিল। কৈকেয়ী উঠিয়া বসিয়া ষষ্ঠীকে কোলে লইলেন—কৈকেয়ীর মুখের দিকে চাহিয়া দুই হাত নাড়িয়া ষষ্ঠী হাসিতে লাগিল, আলো দেখিয়া কান্না ভুলিয়াছে। কিন্তু বিদ্যুতের আলোটা নিভিবামাত্র চকল হইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

"লাইটটা জ্বালি মা? দেখবার জন্যে কি রকম করছে দেখছ না?"

"জ্বাল্ না হয়;—এটার আবার বড্ড বেশী পাওয়ার, কচি ছেলের চোখের পক্ষে খারাপ—কাল একটা কম-পাওয়ারের বাল্‌ব্ কিনে আনো।"

আবার বিদ্যুৎ-বাতি জ্বলিল। ষষ্ঠী অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। সন্ধ্যার পরে তাহাকে ঘরের বাহির করা হয় না, সুতরাং বিদ্যুতের সঙ্গে ষষ্ঠীর পরিচয় একরকম নাই। কৈকেয়ীর দুই ঘরেই মেটে বাতি এবং এই দুইখানি ঘরেই ষষ্ঠীর রাজত্ব। কালে ভদ্রে দৈবাৎ ইলেক্‌ট্রিক আলো দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া যায়। মাঝে মাঝে সুযোগ বার বার বিদ্যুৎ আলো জ্বালিয়া ও নিভাইয়া ষষ্ঠীকে তাক্ লাগাইয়া দিয়া মজা দেখে, শেষে কৈকেয়ীর বকুনি খাইয়া ক্ষান্ত হয়।

জানকী আজ বিছানাতে আসিয়া বসিল কৈকেয়ীর কাছে, গা ঘেঁসিয়া। কৈকেয়ী ষষ্ঠীর মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। জানকী বলিল, "ষষ্ঠী কিন্তু ঠিক বাবার মত হয়েছে দেখতে, না মা?"

"তেমন লম্বা চওড়া কি হবে?"

"ঠিক্ হবে—বড় হোক না, এ বংশে ছোট্ট বেঁটে কেউ হয় নি। যেমনি ঠাকুর্দা, তেমনি বাবা, তেমনি দাদা, তেমনি আনন্দ, এও হবে।"

"হাঁ সত্যি, বাবার কাছে শুনেছি, আগে আগে তাঁদের চেহারা দেখে কেউ বাঙালী বলতো না—বলতো পশ্চিম থেকে এসে জমিদারী কিনলে।"

"তোমার বাবা কি জানতেন তাঁর বংশে এমন মহাপুরুষ হবে? জমিদারী কিনতে অনেকেই পারে, চেষ্টা করলেই পারে। পুরুষের চেষ্টাই জাগা—দৈব তখন তেমন প্রবল হয় না। কিন্তু সমস্ত বংশ উদ্ধার হয় এক মহাপুরুষের গুণে। আমি তো এ বংশের কেউ নই। দাদা কি আমার কথা মনে করবেন না মা?"

"কে বললে জানকী, তুই কেউ নস্, তুই আমার—"

কৈকেয়ী চুপ করিয়া গেলেন, মনের কথা প্রকাশ করা তাঁর নিয়ম নয়। আজ বড় দুর্বল, ক্লান্ত দেহ-মন—জানকীর মত সবল দৃঢ় আশ্রয়ই প্রয়োজন।

দুয়ারের বাহিরে বিন্দুর সশঙ্ক গলা শোনা গেল "পিসীমা—"

"কেন রে?"

"ষষ্ঠীর জামাগুলো—"

তখন বিন্দু মাথা হেঁট করিয়া ঘরে ঢুকিল। ঘর অন্ধকার দেখিয়া এতক্ষণ সাহস পায় নাই আসিতে, বার বার দুয়ার হইতে ফিরিয়া গিয়াছে।

কৈকেয়ী মৃদু স্বরে বলিলেন, "ষষ্ঠীর কপাল কি ভাল, না জানকী? কেশবের, বৌমার কোল পাবে না?"

ষষ্ঠী সাধ মিটাইয়া আলো দেখিয়াছে, এখন একবার কৈকেয়ীর ও একবার জানকীর মুখের দিকে চাহিয়া হাত পা

ছুঁড়িয়া হাসিতে লাগিল। কৈকেয়ী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সেই যদি এলিই এক বছর আগে কেন এলিনে—তোর মুখ দেখলে তারা মায়া কাটাতে পারতো না।"

বলিতে বলিতে কৈকেয়ীর চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

জানকী বলিল, "ও কি মা! অমন হচ্ছো কেন? তোমার চেয়েও কি এইটুকু ছেলের জোর বেশী যে তাদের ধরে রাখবে! ও সব কি কথা?"

বলিতে বলিতে জানকী নিজের আঁচল দিয়া কৈকেয়ীর চোখ মুছাইয়া দিল। "বাবা, কি গুষ্টু মেয়ে তুমি, বোকালে বোঝো না!—আজ আমি তোমার কাছে শোব।"

"মন যে বুঝতে চায় না মা?"

জানকী বলিল—

"রাজা করে রাজা বশ, ঘোড়া করে রাউত
আপন মনকা বশ করে যো, সদ্‌কা সেয়া ওই।

কেন মন বুঝবে না মা? অন্যে যা খুশী বলুক, তোমার মুখে এ কথা মানায় না।—

অন্যে হি কো? যো বিষয়ানুরাগঃ
কা ত বিমুক্তিঃ? বিষয়ে বিরক্তিঃ।

তোমার মন যে বিষয় ভাবছে না, কেশব ভোগ করলে না, কেশব ভোগ করলে না, এই তো তোমার দুঃখ? আর দাদা দেখ যেমি?"

কৈকেয়ী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। জানকী বিছানায় হেলিয়া হাতে মাথা রাখিয়া কৈকেয়ীর কোলে বক্ষীর দিকে একটু কুঁকিয়া পড়িয়া একটা হিন্দি ভজন গাহিতে লাগিল গুন্ গুন্ করিয়া।

গান শুনিয়া বক্ষী এ দিকে চাহিল, হাত বাড়াইয়া জানকীর চুলের গোছা ধরিতে চায়। বক্ষীর খেলা-ধূলা কৈকেয়ীর কত প্রিয়। কিন্তু আজ বক্ষীর কিছুই তাঁহার মন টানে না, কোলে করিয়া আছেন বটে, মন চলিয়া গিয়াছে বহু দূরে, কোন এক নদীতীরে সন্ধ্যার শ্যাম ছায়াঘন নির্জন বৃক্ষতলে উদাসীন সন্ন্যাসের কাছে।

অনেকক্ষণ পরে জানকী বলিল, "কাকা বলছিলেন মা, এক দিন তো দাদারা দেখা করতে আসবে, তুমি তাদের আটকে রেখো। কাকাও তোমার মত বিছানা নিয়েছেন কি না! বলছেন, কেশবের মনে এই ছিল!"

কে জানিত কেশবের মনে এই ছিল? লোকে তাঁহাকে ভালবাসিত। প্রসন্ন স্বভাব, উদার মন একজন সুসাধিতিক বলিয়া লোকে জানিত, তাই শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত, ভাল বাসিত।

আর কক্ষিণী যার চোখ দুটি শুধু পরের দুঃখেই জলে ভরিয়া উঠিত, 'মা' বলিয়া কাছে দাঁড়াইলে রিক্ত হাতে কাহাকেও ফিরিতে হয় নাই, হাতের কাজ কাড়িয়া লইয়া বাড়ীর লোকজনকে তিনি বিশ্রাম দিয়াছেন।

সেই কেশব, সেই রুক্মিণীর মনে এই ছিল? মানব-চরিত্র কি এত দুর্জ্ঞেয়?

কৈকেয়ী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মন যখন ছুটেছে আর কি ফেরে? যদি তাদের মার কথা, ছেলের কথা, এই বংশের দুলালের কথা একেবারেই ভুলে যেতে পেরে থাকে—নিশ্চয়ই পেরেছে—তা হলে আমি, আমি কেন, কিসের জোরে তাদের বাঁধতে যাব?"

বলিতে বলিতে কৈকেয়ী থামিয়া গেলেন, শেষের কথা কয়টি ভাল করিয়া শোনা গেল না।

হায়! এ-কি পরাজয়, এ-কি মনস্তাপ? কোথায় গেল কৈকেয়ীর সেই সুস্পষ্ট ও সতেজ কণ্ঠস্বর, এত কি অধঃপতন ঘটিয়াছে যে তাঁহাকেও সান্ত্বনা দিবার দরকার হয়? বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ, উজ্জ্বল চক্ষে সরল রেখা, এই কি সেই দর্পিতা তেজস্বিনী কৈকেয়ী চৌধুরাণী?

রাত্রি প্রায় একটা। ঘরে মাটীর প্রদীপের অনুজ্জ্বল আলো। নীচের বিছানায় সুদেষ্ণা ও প্রতিমা ঘুমন্ত, প্রতিমার কোলের কাছে তার ছেলেটী। খাটের উপরে রঙীন বিছানাটিতে বক্ষী দুই দিকে হাত ছড়াইয়া দিয়া আরামে ঘুমাইতেছে, ঘন নীল ভুরু দুটি স্থির, ছোট্ট মুখখানি ফুলের মত ফুটিয়া আছে। কৈকেয়ী সোজা হইয়া শুইয়া আছেন। মুখ শান্ত ততটা বিষণ্ণ নয়, ঘুমের মধ্যে নিজেকে সঁপিয়া দিয়া বুঝি তো মনের জ্বালা অনেকটা জুড়াইয়া থাকিবে। এ-পাশে জানকী শুইয়া। নিজের কম্বল-বিছানা আজ ত্যাগ করিয়াছে, বালিশে মাথা, কৈকেয়ীর দিকে পাশ ফেরা—তাহার রুক্ষ চুলের খোঁপাটা খুলিয়া গিয়াছে। একটি কম্বল মা ও মেয়ের গায়ে। যেমন ভাবে শুইয়াছিল

কৈকেয়ীকে জড়াইয়া ধরিয়া, মুখের মধ্যে তাহার হাত তেমনি কৈকেয়ীর বুকের উপর আছে,—সংসার-ত্যাগিনী সংসার-বাধিতাকে সান্ত্বনা দিতেছে। সবাই ঘুমন্ত, বিশ্রামরত, শুধু নিস্তব্ধ ঘরে ঘড়িটা চলিতেছে টিক্-টিক্ টিক্।

## অভিমানিনী

সময়ের গতির সহিত মানুষের মনের গতির অখণ্ড যোগ। ধীরে ধীরে দিনপ্রবাহের সঙ্গে মানুষেরও আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখের তার মিলাইয়া বহিয়া চলে, নহিলে এমত সৃষ্টি অচল হইত।

নিয়মমত কৈকেয়ী কাগজ লইয়া বসিয়াছেন, টেবিলে বাঁ-দিকে ভাগে ভাগে কাগজপত্র, একটা একটা করিয়া সেগুলি দেখিয়া নাম সই করিয়া ডান দিকে রাখিতেছেন।

টং টং করিয়া ঘণ্টা বাজিল, ভিতর হইতে বঙ্গীর কান্নার শব্দ শোনা গেল, কলম রাখিয়া কৈকেয়ী চেয়ারে সোজা হইয়া বসিলেন, চোখ পড়িল সামনের দেওয়ালের ছবির দিকে,—প্রতাপ চৌধুরীর ছবি।

বঙ্গীর কান্না থামিয়া গেল, কিন্তু কৈকেয়ী আর কাজে হাত দিলেন না।

ঘরের চারি দেওয়ালেই ছবির সারি, বড় বড় ছবি, রঙ্গনের পিঠে প্রতাপ শিকারে চলিয়াছেন, ডান দিকে কৈকেয়ী। ভবানী শিকার পছন্দ করিতেন না, শিকারে পিতার সঙ্গীও হন নাই কোন দিন। কিন্তু প্রতাপ নিজে কৈকেয়ীকে বন্দুক পিস্তল ছুঁড়িতে শিখাইয়াছিলেন। হাতী ছিল তাঁহার প্রিয় বাহন। তখনকার দিনে জমিদারদের মধ্যে হাতীর আদর ছিল। একটা ছবিতে মফঃস্বল-যাত্রার দৃশ্য, রঙ্গনের পিঠে বালক কেশব ও প্রতাপ, পিলার পিঠে ভবানী ও কৈকেয়ী। রূপার সাজ, গদী, হাওদা-ঝাঁটা হাতী দুটি ছিল চৌধুরীদের গর্ব্বের জিনিষ। এখন তাহাদের আরোহী নাই, মোটর গাড়ীর কল্যাণে সর্ব্ব রকম যান-বাহন অচল। কাজেই রঙ্গন ও পিলা শাবকটিকে লইয়া বানপ্রস্থ লইয়াছে। ছবিতে তাহাদের নব-ঘন-মেষকান্তি পর্ব্বতবৎ বিপুল দেহে, নব যৌবন অটুট, বাস্তব দেহে জরা স্পর্শ করিয়াছে।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া কৈকেয়ী ডান দিকের দেওয়ালে চাহিলেন, একটা ছবিতে ভবানীর পাশে মহারাণীর মত কৈকেয়ী বসিয়া, আকাশ-ঢাকা মেঘের মত খোলা চুল। আজ যেমন কৈকেয়ী সুদেষ্ণার জন্য বসন-ভূষণ সংগ্রহ করেন, এমনি করিতেন প্রতাপ, পুত্রবধূর জন্য তাঁহার উজাড় করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইত না। ছবিতে কৈকেয়ীর সর্ব্বাঙ্গে সেই অনন্ত স্নেহের নিদর্শন।

পরের ছবিটিতে শিশু কেশবকে লইয়া স্বামী-স্ত্রী বসিয়া। কেশবের নানা বয়সের নানা ভাবের ছবি তিন-চারিখানা। বিবাহের ছবিটিতে সলজ্জমুখী বধূ কৈকেয়ী, চাহিয়া থাকিতে থাকিতে কৈকেয়ীর চোখ জলে ভরিয়া গেল।

অতীত সাগরে মন ডুবিয়া গিয়াছে। সামান্য ছবি কতকাল ধরিয়া একই রকম আছে! মানুষের এত পরিবর্ত্তন? দিন যায়, ফেরে না, মনটা যদি সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া যাইত, দুঃখ থাকিত না। হায় রে, অদৃষ্ট-লেখা চির অদৃশ্য!—

দরজায় দাঁড়াইয়া শশী বলিল, "মল্লিক জানতে চাইলেন কাগজ কি এখন পাবেন?"

কৈকেয়ী নিঃশ্বাস ফেলিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, জানালা দিয়া রোদ আসিয়া টেবিলে পড়িয়াছে, ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন প্রায় বারটা। ডান দিকের ফিতা বাঁধা এক তাড়া কাগজ তুলিয়া শশীকে দিয়া বলিলেন, "দিয়ে দে।"

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া কৈকেয়ী ভবানীর ছবির কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিতে দেখিতে অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "তুমি বুঝেছিলে, তুমি জেনেছিলে, আমি বুঝিনি তাই কি আমায় সইতে হবে।"

সুদেষ্ণা জানালায় বসিয়া। বিছানায় বঙ্গী শুইয়া। ঘরে আর কেহই নাই, ভানকী কৈকেয়ীকে লইয়া মন্দিরে রহিয়াছে।

তখনও ভাল করিয়া জোৎস্না ফোটে নাই, কৃষ্ণা-দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ পূর্ব্বাকাশ ছাড়িয়া ঈষৎ উপরে ভাসমান। গাছে গাছে ঘন পাতার রাশির মধ্যে নিভৃত কুলায় হইতে পাখীরা কলরব করিয়া প্রথম প্রহর ঘোষণা করিল।

বাহিরের দৃশ্য ক্রমেই স্পষ্ট হইতে লাগিল। দক্ষিণ দিকে খানিক দূর পর্য্যন্ত মাঠ সবুজ ঘাসে ঢাকা। তার পরে পল্লী-বাসীদের খড়ের ছাওয়া ঘর-বাড়ী। ছেলেদের কোলাহল শোনা যায়। কোথাও বা প্রদীপ হাতে বাড়ীর গৃহিণীরা

# ঝঞ্ঝাহত

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির কয়েক সদস্য মিঃ গান্ধীর নিকট গিয়া করিয়া সম্প্রতি মিঃ শরৎচন্দ্র বসু, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু এবং মিঃ কলিমী রঞ্জন সরকারের টানা হইতে কংগ্রেসের নিয়েধ-নির্দ্দেশ টানিয়া লইবার জন্য বলেন। মিঃ গান্ধী ইহাতে রাজী হন নাই।

এদিক ওদিক যাতায়াত করিতেছে। কোন ঘরের আলোক-রেখা বাহিরের অন্ধকার পথে রেখাকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কোন ঘর অন্ধকার, বোধ হয় তাহারা দিনের কাজ মিটাইয়া বিশ্রাম লইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে সুদেষ্ণা ভাবিল, আমার মত কেউ বোধ হয় জানলায় বসে নেই, সবাই তো কাজ করছে, ছেলে-মেয়েরা অবধি। সত্যি আমি বড্ড আলসে হয়ে যাচ্ছি দিন দিন। কি বা করবো, বাবা মা গিয়ে অবধি কোন কাজই তো নেই—

একটা বাড়ীর বাহিরের উঠানে হঠাৎ আগুন জ্বলিয়া উঠিল, ছেলেমেয়েরা দল চারি দিকে ঘিরিয়া কড়াই সুটি পুড়াইয়া খাইবার যোগাড় করিয়াছে। ঐ বাড়ীটার সামনের পথটি দিয়া পূর্ব্বমুখে খানিক দূর গেলেই তো বঙ্কিমদার প্রিয় বরখানিতে গিয়া ওঠা যায়। কল্পনা এখন কি করিতেছে? বিনোদ হয়ত শুইয়া আছে, কিম্বা সকলে মুশীলকে লইয়া আমোদে মত্ত।

সুদেষ্ণা একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। বঙ্কির অন্নপ্রাশন না হইলে তাহাকে বাড়ীর বাহির করা হইবে না। সে নিজে অবশ্য ঘণ্টা কয়েকের জন্য বেড়াইয়া আসিতে পারে, কিন্তু তাহাতে কি তৃপ্তি? বঙ্কিকে না লইয়া গেলে তাহারা বলিবে কি? বিনোদ অবশ্য মুখে কিছু বলিবে না, কিন্তু তাহার গম্ভীর মুখের ভাব সুদেষ্ণার মত কে বোঝে?

তার পরে এ দিকে কেশব ও রুক্মিণী কখন যে আসিয়া পড়িবেন, ঠিকানা নাই, সেই অতর্কিত মুহূর্ত্তটির জন্য প্রত্যেকে উন্মুখ হইয়া অপেক্ষায় আছে। প্রত্যহ সেই আশায় ঘুম ভাঙে, রাত্রে সেই আশা বুকে করিয়া ঘুমাইতে যায়। এ সুযোগ হারাইলে জীবনে কি আর ওঁদের সঙ্গে দেখা হইবে?

"এত ভালবাসতো বাবা, কি করে ভুলে গেল? মা যে এক মিনিট না দেখে থাকতে পারে নি, দু'জনেই কি সমান?"

কে দিবে এ প্রশ্নের উত্তর? কেশব-রুক্মিণীর পাশে পাশে ঘোরা ছিল সুদেষ্ণার অভ্যাস, শিশু বয়সে বধূ হইয়া এ ঘরে আসিবার পর হইতে রুক্মিণীর কোলে তাহার কত অভিমানাশ্রু, কত আনন্দের হাসি, কত ইতিহাস। সে সব কি ভুলিবার কথা?

অত্যন্ত আদর ও ভালবাসার মধ্যে পালিত হইয়া সুদেষ্ণা যেমন অভিমানিনী তেমনি অসহিষ্ণু হইয়াছে। কৈকেয়ী বঙ্কিকে লইয়া ব্যস্ত, অন্য দিকে দেখিবার অবসর হয় না। তাই সুদেষ্ণার নিঃসঙ্গ দিন রাত্রি ভারসহ হইয়া উঠিয়াছে। এখন আনন্দকে মনে পড়ে, তাহার সঙ্গে ঝগড়া করিতে সাধ হয়, তাহার হাসিমুখের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও সুদেষ্ণার কাম্য।

বঙ্কি খুব কাঁদিয়া কান্না সুরু করিয়াছে। কৈকেয়ী ঘরে ঢুকিয়াই বঙ্কিকে কোলে তুলিলেন, তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া দেখেন জানালায় মাথা হেলাইয়া ছেলের মা বসিয়া আছে। বাপের বাড়ী যাইবার পথটি দেখা যায় বলিয়া জানালাটা সুদেষ্ণার বড় প্রিয়, দিনে অনেকবার এখানে দাঁড়াইয়া দেখে।

কৈকেয়ীর মনে কষ্ট হইল, নিজের পীড়িত মনে সুদেষ্ণার ব্যথা বেশী করিয়া বাজিল, ডাকিলেন, "সুদেষ্ণা, আয় এখানে আয়, ঠাণ্ডা লাগাচ্ছিস কি বলে? জানালা বন্ধ করে দে।"

ধীরে ধীরে উঠিয়া সুদেষ্ণা কাছে আসিল, কৈকেয়ী বলিলেন, "বাপের বাড়ীর জন্য মন খারাপ হচ্ছে? তা কি করবি বল—ওঁড়োটুকু যখন হয়েছে, ভাল-মন্দটা দেখতে হয় বৈ কি—অন্নপ্রাশন হয়ে গেলেই যাবি, যদ্দিন ইচ্ছে থাকিস।"

মুখ একটু ফিরাইয়া সুদেষ্ণা বলিল, "যদ্দিন ইচ্ছে? তিন দিন না যেতেই লোক পাঠাবে, বঙ্কিকে ছেড়ে তুমি থাকতে?"

কৈকেয়ী একটু হাসিয়া বলিলেন, "না রে না, তুই নিতে থেকে যখন আসতে চাইবি তখন আনবো, বর দেখি একে একটু, বিছানাটা ঠিক করে নি।"

বঙ্কিকে লইয়া সুদেষ্ণা বিছানার এক ধারে বসিল—কৈকেয়ী বলিলেন, "কে বেড়েছে বিছানা আজ?"

সুদেষ্ণা বলিল, "পদ্মী দি।"

কৈকেয়ী বালিশগুলি ঠিক করিয়া সাজাইতে সাজাইতে বলিলেন, "সে বুঝতে পেরেছি।"

সুদেষ্ণা বলিল, "হয়েছে? নাও এবার।"

"দেরি সইছে না তোর?"—কৈকেয়ী ফিরিয়া দেখেন মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বঙ্কি হাত পা ছুঁড়িয়া হাসিতেছে। কৈকেয়ীর কথার সুর শুনিবামাত্র বঙ্কির চোখ তাঁহার দিকে ফিরিল এবং সে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সুরেকা বলিল, "যা দেখি কেমন করে খেতে পারিস!"

কৈকেয়ী বলিলেন, "আহা, থাক না একটু তোর কোলে।"

তৎক্ষণ সুরেকা ষষ্ঠীকে কৈকেয়ীর কাছে বসাইয়া দিয়াছে।

"দূর হ! বানরের গলায় কি মুক্তোমালা মানায়?"

"না মানাল! তুই দিনরাত মুক্তোমালা পরে থাক।"

তাহার মুখের বিষণ্ণ ভাবটি কাটিয়া গিয়াছে দেখিয়া কৈকেয়ী আরাম পাইলেন, হাত বাড়াইয়া কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "আজ একটা গল্প বল্, তোর ছেলেবেলার গল্প, অনেকদিন শুনি নি।"

সুরেকার অভিমান দুর্জয়—বলিল, "দরকার কি? ষষ্ঠীকে নিয়ে থাক।"

কৈকেয়ী হাসিয়া তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কপালে চুম্বন করিলেন—বলিলেন, "ক্ষেপী, আগে তুই, তবে না ষষ্ঠী। বড্ড হিংসুটে তুই, দেখ দেখি কেমন চেয়ে রয়েছে। ওর তোর মায়ের প্রাণ, কখনো কোলাম না নিজে থেকে একবার কোলে নিতে।"

দুইজনের সন্ধি-মিলনের মাঝখানে জানকীর সুর-ঝঙ্কার আসিয়া পৌঁছিল।

—ওই যবির যবনিকা তুলিয়া দোরে প্রভু
দেখাও তব চির আলোক-লোক।

ন যে কেয়ায়ৌ ন যে লোভেনোয়ৌ
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং
অযোধ্যুদ্ধরাচেষ্টাদি নাহং
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং

গভীর রাত্রি। কৈকেয়ীর ঘরের দুয়ারে করাঘাত হইল,—একটি অতি মৃদুস্বর—'মা—'

সে ডাক বোধ হয় ঘরের ভিতর পৌঁছিল না। দ্বিতীয় বারে একটু জোরে ধাক্কা পড়িল এবং একটি সরল উচ্চস্বর 'দিদি—'

কৈকেয়ীর সজাগ ঘুম ভাঙিয়া গেল, একবার বহু ও শিশুর পানে চাহিলেন। কে ডাকিল, ভাল বুঝিতে পারেন নাই, সংশয়ের সঙ্গে বলিলেন "কে?"

উত্তর হইল, "আমরা, দোর খোল।"

কৈকেয়ীর পাশ হইতে জানকী উঠিয়া নামিয়া পড়িল এবং দুয়ার খুলিয়া দিয়া বিদ্যুৎ বাতির চাবিটি টিপিয়া দিল।

ঘর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, দেখা গেল কৈকেয়ী স্তব্ধ ভাবে ঘরের মেঝেয় দাঁড়াইয়া আছেন।

আগে আনন্দ, পরে রুক্মিণী, শেষে কেশব—একে একে ঘরে ঢুকিলেন। জানকী কম্বল পাতিয়া দিল, যাকে প্রণাম করিয়া কেশব বসিলেন, রুক্মিণী মুখ নীচু করিয়া কৈকেয়ীর কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। কৈকেয়ীর সাহস হইল না, ছেলের দিকে চাহিবার, কি জানি কি বেশে দেখিবেন! সর্বাঙ্গ তাঁহার কাঁপিয়া উঠিল, ধীরে ধীরে কম্বলের এক দিকে বসিয়া পড়িলেন।

জানকী সুরেকার চোখে-মুখে জলের ছিটা দিয়া টানিয়া তুলিল, বলিল, "ওঠ চেয়ে দেখ।"

"কি পিসীমা?" চোখ মুছিয়া চাহিয়াই রুক্মিণীকে দেখিয়া সুরেকার তন্দ্রাঘোর ছুটিয়া গেল, বিছানা হইতে নামিয়া আসিয়া শিহন দিকে রুক্মিণীর গলা জড়াইয়া ধরিল। তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া রুক্মিণী বসিয়া পড়িলেন, একটিও কথা বলিলেন না।

সমস্ত ঘর জুড়িয়া এক অসম্ভব নীরবতা থম্ থম্ করিতে লাগিল। আনন্দ খাটের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, জানকী দুয়ার ভেজাইয়া দিয়া সেই দুয়ারে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া—তাহার তীব্র গভীর চাহনি সার্চ লাইটের মত সকলের মুখের উপর ঘুরিতে লাগিল!

কৈকেয়ী মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বেশভূষার কোন পরিবর্তন নাই কেশবের, সেই চির সাধারণ বেশ, তপস্বীর প্রতিচ্ছবি। রুক্মিণীরও যে বেশে বিদায় লইয়াছিলেন ঠিক সেই বেশ।

কৈকেয়ী বলিলেন, "কেশব!"

মায়ের দিকে চাহিয়া কেশব বলিলেন, "কি মা?"

"সত্যিই কি তুই সব ছেড়েছিস? আর ঘরবাসী হবি নে?"

কেশব স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন, "অত বড় কথা কি বলতে পারি মা? তবে ইচ্ছে আছে তীর্থবাসী হবো"—

"এই কি তোর তীর্থবাসের বয়স? আর আমি থাকবো সংসারে জড়িয়ে, এই বিচার তোরা করলি এত দিনে?"

কেশব ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোমার আশীর্ব্বাদই আমার ভরসা মা—"

"সেই জন্যে থাকে একেবারে ছেড়ে যাচ্ছিস? গৃহস্থের পক্ষে সংসারধর্ম্মই তো বড়। সব সাধনাই সংসারে থেকে হতে পারে। সন্ন্যাসধর্ম্ম নিজের জন্যে, আত্মার উন্নতি, আত্মার তৃপ্তির জন্যে, সংসারধর্ম্ম পরের জন্যে। তবে কেন তুই সংসার ছেড়ে সন্ন্যাস নিচ্ছিস?"

কেশব বলিলেন, "মা, সংসার-ধর্ম্ম বড় স্বীকার করি। কিন্তু তেমন ভাবে সে ধর্ম্ম পালন করি কই? সংসারে থেকে লোকে পরের চেয়ে নিজের সুখ-সুবিধাই যে দেখে বেশী, তার পরে ঘোর স্বার্থপর হয়ে যায়।"

"কেন, তুমি তো কোন দিনই সংসারে ডুবে যাও নি—আলাদা হয়েই থেকেছ, সেই ভাবে থেকে তোমার ইচ্ছে-মত সাধনা করলে কোন অসুবিধে হবে না তোমার। তাই কর না কেন?"

মৃদু স্বরে কেশব বলিলেন, "আর সে ভাল লাগবে না মা।"

জানকী ঘুমন্ত বল্লীকে তুলিয়া আনিয়া কেশবের কোলে তুলিয়া দিল; বলিল, "নাতি দর্শন কর।"

কেশব বল্লীর দিকে চাহিলেন, নাড়া-চাড়ায় বল্লীর ঘুম গিয়াছে ভাঙিয়া। ফুলকলির মতন চোখ দুটি খুলিয়া গেল, চোখের অর্থহীন ও লক্ষ্যহীন চাহনি, একবার চারিদিক ঘুরিয়া কেশবের মুখের উপর বন্ধ হইল। অচেনা মুখ দেখিয়া একটু চকিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া গেল—তার পরেই হাত পা নাড়িয়া হাসিয়া খেলা করিতে আরম্ভ করিল।

কেশব চোখ নীচু করিয়া বল্লীকে দেখিতেছেন, কৈকেয়ীর মনে নূতন এক আশার সঞ্চার হইল, বাঁধিতে পারে যদি বল্লীই পারিবে। জানকী একাগ্র চক্ষে কেশবের দিকে চাহিয়া আছে, রুক্মিণীর ব্যগ্র চাহনী বল্লীর উপর—শুধু আনন্দ রেখায় হেলিয়া গভীর চিন্তায় নিশ্চল নিস্পন্দ।

একটু হাসিয়া কেশব মুখ তুলিলেন, কৈকেয়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি নিশ্চয় খুব খুসী হয়েছ, না মা?"—বলিয়া দুই হাতে নিজের কোল হইতে বল্লীকে তুলিয়া রুক্মিণীর কোলে দিলেন। কৈকেয়ী চোখ ফিরাইয়া লইলেন, জানকী একটু হাসিল। আবার ঘর নীরব হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে কেশব বলিলেন, "মনে কোন দুঃখ রেখো না মা, যেখানেই থাকি আমরা তোমারই। এই তো এক বছরের বেশী বিদেশে থেকে এলাম—সেই রকম মনে ভাব না কেন?"

"তাই কেবে থাকা যায় কেশব? এতদিন আশায় ছিলাম, একদিন আসবি—সে আশা তো রইল না। কি করে শূন্য পুরীতে থাকবো? কি নিয়ে?"

"তুমিও তো ইচ্ছে করলে তীর্থে বাস করতে পারো মা।"

"সেই ইচ্ছা ছিল বরাবর—তোরা সংসার বুঝে নিবি, আমি ছুটি নোব, কিন্তু তোরা আমায় ত্যাগ করলি।"

"না না! আমরা তোমারই হাতের তৈরী—তোমায় আর কি বোঝাব? যাঁর স্মরণ নিলে সব চিন্তা-ভাবনা দূরে যায় তাঁরই শরণ নাও মা—কোন অভাবই তোমায় কষ্ট দিতে পারবে না। তিনিই তোমার সব পূর্ণ করে থাকবেন।"

কেশবের মুখে একটা উজ্জ্বল আভা দেখা দিল, তাঁহার মৃদু ও অনাসক্ত কণ্ঠস্বর সবের মধ্যে সকলের কানে যেন সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

কৈকেয়ী বলিলেন, "কেশব বাবা, বল্লীকে দেখেও কি তোর মায়া হচ্ছে না? ও যে তোকে চেনেও না!"

"কি দরকার মা? তুমি আছ। সংসারে সবই তো অনিত্য। আর এই দুঃখ-কষ্ট? এর স্থায়িত্ব বড় অল্প-কাল—দু'দিন পরেই সব ঠিক হয়ে যায়। জগৎ যে নিয়মে চলছে, তার গতিরোধ কেউ তো করতে পারে না মা।"

কৈকেয়ীর সযত্ন-রুদ্ধ ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙিয়া যায়! স্পষ্টই বুঝিলেন, কেশব অন্তরে বাহিরে সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। অনন্ত স্নেহের মোহে পড়িয়া আজ কৈকেয়ী দীনা, আর কেশব অবহেলায় মায়ার পাশ ছিঁড়িয়া কৈকেয়ীর উপরেও জয়ী।

একদিকে মহিমময়ী মা পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া, তাঁর কাছে বল্লীকে কোলে করিয়া রুক্মিণী নিঃশব্দে কাঁদিতেছেন, সুদেষ্ণা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া আছে। অদূরে দাঁড়াইয়া আনন্দ চোখ মুছিতেছেন—তার পাশে স্তব্ধ-গম্ভীর-মূর্ত্তি উদাসিনী জানকী—চারিদিকের এই নীরব বিলাপের মধ্যে, ঘোর বিপদের বাষ্পচ্ছায়ার মধ্যে সংসার-বিরাগী দিবা

শান্তভাবে বসিয়া রহিলেন। প্রসন্ন মুখ, প্রশান্ত কপাল কোথাও নাই,—উদাস চাহনি দেওয়ালের একটি ছবির উপরে, যেন তিনি পৃথিবীর কেহ নন—তুচ্ছ শোক-দুঃখের বন্যায় তাঁহাকে স্পর্শ করে সাধ্য কি? চিত্ত শুধু পরমচিন্তায় পরমধ্যানে নিমগ্ন।

**জয়যাত্রা**

চং চং চং তিনটা বাজিল।

নিমেষে একজন ছাড়া সকলেই কাঁপিয়া উঠিল। সময় তো কাহারও জন্য দাঁড়ায় না। ঘণ্টা-ধ্বনি তো নয়, যেন কাল-প্রহরীর আগমন। শীতের দীর্ঘ রাত্রি কাটিতে চায় না। আজ কি এত শীঘ্র গতি!

দেওয়ালে মহাসাধক রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবি, নির্নিমেষ হাসিমুখে চাহিয়া আছেন। একদিকে সমুদ্র-তরঙ্গের উপর শতদল পদ্মে দাঁড়াইয়া অরুণ-বসনা পদ্মালয়া, ঐরাবত পারিজাত মালা শুঁড়ে ধরিয়া আছে—সেদিকে না যাইয়া দক্ষিণ হাত তুলিয়া মৃদু মধুর হাসিতেছেন। যোগাপুত্র আনন্দ সামনে দাঁড়াইয়া, একটুও তো বাধা দিতেছে না, কাহার মুখে কাহার কথাতে একটুও বিরুদ্ধ ভাব নাই—তবে একা কৈকেয়ী কেন বাধা দিবেন? যে বাঁধ স্রোতের বেগ রোধ করিতে পারিবে না, তেমন বাঁধ বাঁধিয়া কি লাভ?

ঝড়ের সমুদ্রের মত কৈকেয়ীর বিক্ষুব্ধ মন, তেমনি দৃঢ় হইয়া তিনি সে বেগ রোধ করিলেন—তাঁহার দারুণ দুঃখের সঙ্গে দুর্জ্জয় অভিমান আসিয়া মিশিল।

আনন্দ মুখ তুলিয়া বলিল, "এবার বাবাকে যেতে হবে।"

কৈকেয়ী চমকিয়া বলিলেন, "যেতে হবে? কখন যে?"

আনন্দ বলিল, "এখুনি ভোরের ট্রেন ধরতে হবে, বারটায় কলকাতা পৌঁছান চাই।"

কৈকেয়ী কেশবের দিকে গিয়া বলিলেন, "আজই? এখুনি? হ্যাঁ কেশব? একটা দিনও কি থাকবি নে?"

কেশব মাথা নীচু করিয়াই বলিলেন, "না মা।"

এক মুহূর্ত্ত নিশ্চল হইয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে উঠিয়া কৈকেয়ী পাশের ঘরে গেলেন। তাঁহার পিছনে রুক্মিণীও গেলেন, দেখেন কৈকেয়ী একটা দেওয়াল-আলমারীর কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। রুক্মিণীকে দেখিয়া বলিলেন, "আজই যেতে হবে কেন বৌমা?"

অপরাধিনীর মত সঙ্কোচে সুষ্ঠায় রুক্মিণী জবাব দিলেন, "গুরুদেব কলকাতা রয়েছেন, দেখা করবার জন্যে···তোমায় দেখতে, বারটার গাড়ীতে কলকাতা পৌঁছবো, পৌঁছলেই আমাদের নিয়ে চলে যাবেন।"

রুক্মিণীর ছাড়া ছাড়া অস্পষ্ট কথার মর্ম্ম হইতে অর্থটা বুঝিতে কৈকেয়ীর দেরি হইল না।

গৃহবাসের অনুমতি আর নাই, সেটা পূর্ব্বেই রুক্মিণী লিখিয়াছিলেন। মায়ের মন, ভুলিয়া গিয়াছিল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কৈকেয়ী বলিলেন, "কোথা যাবেন তোমাদের নিয়ে?"

"সে তো আমরা জানিনে মা, তিনিই জানেন।" একটু থামিয়া বলিলেন, "আনন্দ আমাদের কলকাতা পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে।"

কৈকেয়ী মুখ ফিরাইয়া আলমারী খুলিয়া দু'খানা থালায় খাবার সাজাইলেন, একখানা থালা রুক্মিণীর সামনে রাখিয়া বলিলেন, "বসো।"

আদেশ মাত্র রুক্মিণী বসিলেন, বাঁ হাতে যষ্টিকে জড়াইয়া ধরা—ডান হাতে কেবলি চোখের জল মুছিতে লাগিলেন, নিতান্ত নিঃশব্দে।

কৈকেয়ী বলিলেন, "খেয়ে যাও, আর তোমাদের সামনে কিছু দেওয়া বোধ হয় আমার কপালে হবে না। যাবার সময় তো তোমাদের নয়, আমারই, তবে নারায়ণ যখন এই উল্টো বিধান আমার জন্যে করলেন, তখন তাই মেনে নিলাম।"

কৈকেয়ী অন্য থালাটি আনিয়া কেশবকে দিলেন। সুষেকা শ্বশুর-শাশুড়ীকে জল দিল।

কেশব বলিলেন—"এত রাত্রে।"

জানকী বলিল—"দিনে থাকছো কই?"

কেশব আর প্রতিবাদ করিলেন না।

জানকী বলিল—"তোমরা আসবে আসবে বলে মা রোজ নিজের হাতে খাবার করে তুলে রাখেন, নিত্যি নতুন তৈরি করেন। বলেন, কেশব এই সব ভালবাসে, যখন যা এসে পড়বে, তখন কি তৈরি করতে বসবো?"

ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া কৈকেয়ীর চোখের জল উছলিয়া উঠিতে লাগিল। বেহুলা লখীন্দরের মত পুত্র ও পুত্রবধূ মায়ের হাতে শেষ পান্ত গ্রহণ করিতেছে।

কোন্ মা এ অবস্থায় আত্ম-সম্বরণ করিতে পারেন? কৈকেয়ীর কিন্তু বড় কঠিন প্রাণ, তাই তাঁর মনের বিপ্লব কিছুই প্রকাশ নাই।

কেশব থালা হইতে সন্দেশ তুলিয়া সুবেফাকে বলিলেন, "এই নে মা।"

সুবেফা চির দিনই কেশবের প্রসাদ পাইয়াছে আজও হাত পাতিল।

জানকী পাশের ঘরে গেল, রুক্মিণী চুপ করিয়া বসিয়া আছেন সেই আলমারীটির দিকে চাহিয়া, দুই চোখে জল ভরা।

জানকী শান্ত কোমল স্বরে বলিল, "বৌদি, মন ঠিক করতে পার নি?"

রুক্মিণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, জানকী বলিল, "যদি মন ঠিক করতে না পার তবে দাদার সঙ্গে থাকা তোমার বিড়ম্বনা! এসো ও ঘরে যাই।"

রুক্মিণী জানকীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাঁধে মুখ রাখিলেন, দুই জনের চোখের জল একত্র মিশিল। সমস্ত জীবনের মধুর সম্পর্ক ভুলিতে চাহিলেই কি ভোলা যায়? মানুষ নিজের মনকে প্রতারণা করিতে চায়, কিন্তু মনের কাছেই প্রতারিত হয় বেশী।

সুবেফা শ্বশুর শাশুড়ীকে পান দিয়াছে, বিষণ্ণ প্রতিমার মত কেশবের পিছনে বসিয়া মাথাটি রাখিয়াছে কেশবের পিঠে। আবার ঘর নিস্তব্ধ, শুধু টিক্ টিক্ শব্দে ঘড়ি চলিয়াছে।

চং চং শব্দে চারিটা বাজিল।

খাটের রেলিং ছাড়িয়া আনন্দ সরিয়া আসিল, বলিল, "এবার ওঠো বাবা।"

কৈকেয়ী বাঁ-হাতের উপর মাথা রাখিয়া নিশ্চল হইয়া আছেন। নিঃশব্দে পিছন হইতে সুবেফা দুই হাতে কেশবকে জড়াইয়া ধরিল।

আনন্দ বলিল, "বাবাকে এ রকম বিব্রত করা কেন? এতে লাভ কি আছে? আর দেরী করলে ট্রেণ ধরতে পারা যাবে না", বলিয়া আনন্দ দরজার দিকে চলিল, বলিল, "মা ওঠো, এসো আর দেরি করোনা।"

বাহিরে তীক্ষ্ণ হিম বাতাস, জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া গিয়াছে। আকাশের লক্ষ কোটী তারা বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া নীরবে এই বিদায়-দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

কেশব সুবেফার মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিলেন। জানকীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দিদি।"

"মনে রেখো দাদা।"

সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া কেশব মাকে প্রণাম করিলেন। বলিলেন, "তবে যাই মা।"

তখন সেই কঠিন শ্বেত পাথরের মূর্ত্তিতে যেন প্রাণ সঞ্চার হইল।

"বাবা"—কৈকেয়ী কেশবকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

আনন্দ একটু ফিরিয়া চোখ দুটি মুছিয়া লইল; তার পরে বলিল, "ছেড়ে দাও দিদি, আর কেন?"

কৈকেয়ী ধীরে ধীরে কেশবকে ছাড়িয়া দিলেন। আনন্দ বাপের হাত ধরিয়া নীচে নামিতে লাগিল।

বল্টী তখনো রুক্মিণীর কোলে। আর একবার দেখিয়া লইয়া রুক্মিণী তাহার ঘুমন্ত মুখে চুম্বন দিলেন, নীচে হইতে আনন্দ ডাকিল, "মা।"

"কেন মা অমন করে রইলি? এই ঘরের লক্ষ্মী হয়ে থাক্, বলিয়া বল্টীকে সুবেফার কোলে দিয়া রুক্মিণী ফিরিয়া কৈকেয়ীকে প্রণাম করিলেন।

"মা"—বলিয়া কৈকেয়ী রুক্মিণীকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইলেন, "তোকে আমি আদর করিনি কোন দিন, তাই তুই চলে যাচ্ছিস।"

ব্যাকুল হইয়া রুক্মিণী বাধা দিলেন, "ওকি কথা মা? এতটুকু থেকে মানুষ করেছ, প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবেসেছ, আজ কেন এ কথা বলছে মা!"

কৈকেয়ী বলিলেন, "আমার যে তাই মনে হয়, আমি চিনি নি কিন্তু তুই-ই আমার লক্ষ্মী ছিলি মা।"

"এই তোমার লক্ষ্মী রইল, যখন যেখানে থাকি তোমায় লিখে জানাব"—বলিতে বলিতে রুক্মিণীর চোখের জল ঝর ঝর করিয়া কৈকেয়ীর কাপড়ে পড়িতে লাগিল। কৈকেয়ীর চোখের জলে রুক্মিণীর মাথার চুল ভিজিতেছে।

জানকী কেশবের সঙ্গে নীচে নামিয়া গিয়াছে। সুবেফা বল্টীকে কোলে করিয়া বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কক্ষ-দুয়ার মন্দিরের সম্মুখ হইতে কেশব-জননীকে বিদায় দিয়া বৈকেয়ী ফিরিয়া আসিয়া শয়ন ঘরের একটা জানালায় দাঁড়াইয়া আছেন। এই জানালা হইতে বাড়ীর সামনের পথটি দেখা যায়—একটু আগে সেই পথে কেশবের গাড়ীটি —ষ্টেশন হইতে তাড়া করিয়া আনা গাড়ীটি চলিয়া গিয়াছে।

ভোর হইল—পশ্চিমে নিষ্প্রভ চাঁদ, পূর্ব্বদিকে উজ্জ্বল লাল রং ঢালিয়া তরুণ সূর্য্যোদয় হইল, মলিন বিবর্ণ তারাগুলি আকাশের গায়ে মিশিয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ, একটা তারা মিট্ মিট্ করিতেছিল সেটাও অস্পষ্ট হইয়া গেল।

ভোরের হিম ঠাণ্ডা হাওয়া ছাড়িয়াছে, পাখীরা উড়িয়া চলিল দিনের মত, কর্ম্ম-চঞ্চল পৃথিবীর জাগরণ উষার সঙ্গে সঙ্গে।

জানালার নীচে একটু তফাতে উষাদের বাড়ী, ছোট ফুলের বাগানটির মধ্যে নামাবলী গায়ে জড়ানো উষার ঠাকুর-দাদা সাজি হাতে ফুল তুলিতে তুলিতে স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছেন। তাঁহার ধীর গম্ভীর স্বর জানালায় আসিয়া আসিতে লাগিল।

য শ্চিত্তি বিদধতে নাথ ভবেষু সন্তঃ সন্ত
পাদ-পদ্ম বিন্যাসার্হাস্ত্রি ভাগি যাং মধুসূদন।
মোহিয়েমাহে জালেন পুরুষাধমবান্ধিনু
তুলসা পীতমাদোহসি ত্রাহি মাং মধুসূদন।

[ ক্রমশঃ

---

# পৌষের ক্ষেত

—শ্রীগৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

ক্ষেতে ক্ষেতে ছিল মহা উৎসব, চারিদিক হ'তে আসা ;
শতে শতে থাকিত কাহার প্রাণের আবেশ ঢালা।
চোতেলির শিশু দোলায় দুলিত উতলা হিমেল বায়,
রাখাল বাজাত বাঁশের বাঁশরী নেড়া সে বটের ছায়।
সোনালি সে ধান কাটা হয়ে গেছে, কোথাও অড়র বাড়া—
পড়ে আছে ঐ, প্রকৃতির বুকে নেই হায় কোন সাড়া।
রাখাল ছেলেরা কিছু খড় নিয়ে একখানে জড় করি ;
আগুন ধরায়ে পোহাইছে তনু, শীতে ওঠে থরথরি।
গোরুর গাড়ীর চাকার চিহ্ন কোথাও রয়েছে পড়ে,
নিয়ে গেছে যত কাটা ধানরাশি পিঠেতে বোঝাই করে।

মটরশুটির মধুর গন্ধ চারিদিকে পড়ে লুটে ;
মধুর ছন্দে পরাগ-আকুল অলিদল আসে ছুটে।
কলায়ের ক্ষেত শ্যামল আঁচল উড়ায়ে গাত্রে তার,
নব অনুরাগে সুমধুর গানে ডাকে কারে বার বার।
চিনে ধান আর ছোলার ক্ষেতে গো জাগিত কাহার হাসি ?
ধনে চাল আর মৌরীর ক্ষেত তাহাদের পাশাপাশি।
শ্যামলিমা গাত্রে মিশ খেয়ে যেত নতুন গমের শিষ ;
যবক্ষেত পাশে তাদা আলে বসি ঘোমটা দিত যে মিশ।
ঘোরো ধান ক্ষেতে আকুলিত হাওয়া ছন্দ জাগাত ধীরে ;
সরিষা ফুলের মধুমাখা হাসি বিজন নদীর তীরে।

পৌষের সেই ক্ষেত মনোহর আজি নাহি বাঙ্গালায়।
যুগ যুগ তবু বাংলামায়ের-জয়-বন্দনা গায়।

---

# আবার ভুল

—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী যে সময় হইতে কংগ্রেসের কর্ণধার হইয়াছেন, সেই সময় হইতে এ-পর্য্যন্ত তিনি কংগ্রেসের কার্য্য-পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া কতই ভুল করিয়াছেন, তাহা অঙ্গুলির কড়ায় গণা যায় না। তাঁহার প্রবর্ত্তিত অহিংস নীতি সফল হইয়াছে কি ?

তিনি যে-সকল কার্য্যসূচী অবলম্বন করিয়াছেন তাহার সমস্তগুলিতেই তিনি অসাফল্যকে বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু তিনি মুখে তাহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলন কোন রূপে কোন দিকে কিছু সাফল্য প্রদান করিয়াছে, ইহার দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাইতেছি না। প্রথমে ব্যবস্থা পরিষদ গঠনের সময় কংগ্রেসের সমর্থকগণ ব্যবস্থাপক সভা গঠন করিতে কিছুমাত্র সাহায্য করেন নাই। তাঁহারা ভোটও দেন নাই, সদস্য পদ প্রার্থীও হন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সকল প্রদেশেই ব্যবস্থাপক সভার জন্য সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কোন একটি প্রদেশ হইতে বা নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে সদস্য নির্ব্বাচিত হয় নাই এমন সংবাদ আমরা শুনি নাই। তবে সেবার সকল নির্ব্বাচক মণ্ডলীর কেন্দ্র হইতে যোগ্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন কি না সে কথা আমি এখন বলিব না। সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিল এবং সরকারের শাসনযন্ত্র বেশ চলিয়াছিল, অহিংস অসহযোগীরা নিষ্ফল আক্রোশে তাহা দেখিয়াছিলেন। আমেদাবাদ কংগ্রেসে যেরূপ আগ্রহের সহিত অসহযোগ নীতি সমর্থিত হইয়াছিল গয়া কংগ্রেসে তাহা হয় নাই দেখিয়া কংগ্রেস কর্ম্মীদিগের উৎসাহে ভাঁটা পড়িয়াছিল। বাঙ্গালার কংগ্রেসের কাণ্ডারী সুধী চিত্তরঞ্জন দাশ অসহযোগ বজায় রাখিয়া দেশের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবার প্রস্তাব করেন। গয়া কংগ্রেসে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয় সত্য কিন্তু তাহার পর আর এক বৎসরও বিলম্ব সহিল না। সেপ্টেম্বর মাসেই দিল্লীতে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের এক অতিরিক্ত অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে ব্যাখ্যা হয় যে, "ব্যবস্থাপরিষদে প্রবেশ করিতে যে-সকল কংগ্রেস কর্ম্মীদিগের ধর্ম্মগত এবং বিবেকগত বাধা নাই, তাঁহারা আগামী সমস্ত নির্ব্বাচনে ভোট দিতে এবং সদস্যপদের প্রার্থী হইতে পারিবেন।"

ঐরূপ ধর্ম্মগত এবং বিবেকগত আন্তরিক বাধা যে বেশী লোকের ছিল না তাহা পরবর্ত্তী ঘটনাতেই প্রকাশ। প্রথমবার স্বর্গীয় ভামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর ন্যায় জনকয়েক 'নো-চেঞ্জার' ছিলেন, এখন ত আর এক জনকেও দেখিতে পাই না। তবে এই অসহযোগ আন্দোলনের ফলে শাসক জাতির যত সুবিধা ঘটিয়াছে, অন্যের তাহাই অসুবিধা ঘটিয়াছে। আমরা না ভাবিয়া চিন্তিয়া সাইমন কমিশনকে বর্জ্জন করিলাম। বিলাতি রাজনীতিকরা তাহাতে বিস্মিত হইলেন না। আমাদের গান্ধী প্রমুখ নেতার দল বলিলেন, গণতন্ত্রের মূলনীতি অনুসারে আমরাই আমাদের শাসন ব্যবস্থা করিবার ন্যায্য অধিকারী। কোথা হইতে এক বিদেশী কমিশন উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল কেন? অতএব বৈদেশিক কেতায়, পুরাদস্তুর বিলাতী প্রথায় অনুকরণে, আমাদের যুবকগণ কৃষ্ণপতাকা হস্তে লইয়া, "সাইমন কমিশন ফিরিয়া যাও—কমিশন চাই না, চাই না, চাই না" প্রভৃতি বাঁকা বলিয়া নানা বাটুকে ভঙ্গীতে কমিশনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল।

এই ব্যাপারে কমিশন বিস্মিত হইলেন, বিলাতী রাজনীতিক দল বিস্মিত হইলেন, পৃথিবীর লোক বিস্মিত হইল। একটা অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের বাস্তব দিকটা না দেখিয়া কেবল কল্পনা-চালিত আদর্শবাদের পশ্চাতে ছুটিলে—আসল বস্তু ছাড়িয়া ছায়া ধরিতে গেলে, মানুষের যে দুর্গতি হয় আমাদের তাহাই হইল। বৃটিশ জাতির প্রায় সকল মতাবলম্বী লোকেরা মনে করিল,—ইহা ত সত্য যে ভারতবর্ষ গ্রেট বৃটেনের অধীন। গ্রেটবৃটেনের পার্লামেণ্টই ভারতবাসীর দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা, সেই পার্লামেণ্ট ভারতবাসীর

রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্তিত কিরূপ তাহা বুঝিবার জন্য, তাঁহাদের বিশ্বাসভাজন এক কমিশন গঠন করিয়া ভারতে পাঠাইলেন। ভিখারী ভিক্ষা চাহিলে কপালকুণ্ডলা তাহাকে একখানি বহু মূল্য অলঙ্কার দিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা ছিলেন সংসারের বাস্তব-জ্ঞানশূন্য বা বাস্তব জ্ঞান বর্জ্জিত। অলঙ্কার পাইলে ভিখারীকে দৌড়িয়া পলাইতে দেখিলে কপালকুণ্ডলা যেমন বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছিল, "ভিখারী দৌড়াইয়া পালায় কেন!" বিলাতের বাস্তব ব্যাপার বুঝিতে নিপুণ রাজনীতিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা ভাবিলেন, অনুসন্ধান কমিশনের উপর ভারতবাসীর এত বিরাগ কেন? ভারত-শাসন ব্যাপারে বিলাতী পার্লামেন্টই দায়ী একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। Ethical Religion-এর সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজনীতি, বিশেষতঃ সাম্রাজ্যবাদীদিগের রাজনীতি, কস্মিন্ কালেই চালিত হয় না। ইহা বাস্তব ব্যাপার। বিষয়-নিরপেক্ষভাবে কেবল নৈতিক দিক দিয়া স্বার্থপূর্ণ রাজ-নীতিক বিষয় চিন্তা করিতে গেলেই প্রমাদ ঘটে। বড়ই বিস্ময়ের বিষয় এই মডারেট দলের মস্তিষ্কেও একথাটা উদিত হয় নাই। পার্লামেন্টের কমিশন পার্লামেন্টের সদস্য লইয়াই গঠিত হইয়াছিল। অথচ কর্তৃপক্ষ লর্ড সিংহকে ঐ কমিশনের মধ্যে স্থান দিলে ভাল করিতেন। তাহা তাঁহারা করেন নাই, হয়ত ইচ্ছা করিয়া। কিন্তু পরাধীন আমরা—আমাদের দুর্ভাগ্যই মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইল। ফলে কংগ্রেসের ঐ ব্যবস্থার দর্শনে বিলাতের জনসাধারণ বুঝিয়া লইল ভারত-বাসীরা বাস্তবজ্ঞান-বর্জ্জিত কল্পনাপ্রবণ জাতি। ভারতের অবতার-প্রাপ্ত ইংরাজ লিবিলিয়ান এবং সওদাগরগণ সেই কথাই বিলাতের অধিবাসীদিগকে উচ্চ রবে বুঝাইতে লাগিলেন। এদিকে ভারতে কতকগুলি বেসরকারী ইংরাজ ও হুচ বণিক ব্যবসিকার অন্তরালে থাকিয়া মুসলমানদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন, "ইহাই সুসময়—এই সময়ে তোমরা তোমাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দাও।" কতকগুলি মুসলমান স্বাধীনভাবে অর্থাৎ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াও সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। নিম্নশ্রেণীর স্বার্থান্বিত কয়েকজন নেতাও নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে অতিরঞ্জিত ভাবে রক্ষা করিবার জন্যই মাত্র যোগ দিয়াছিল। কমিশন রাজনীতিক বুদ্ধিসম্পন্ন ভারতবাসীর মত সরাসরি জানিতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল কয়েকজন মডারেটের সহিত ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করিয়া এবং স্বরাজীদিগের মনোভাব নেহেরু-রিপোর্ট দেখিয়া মোটামুটি বুঝিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা যে রিপোর্টখানি দাখিল করিয়াছিলেন, তাহা মোটের উপর মন্দ হয় নাই। উহাতে যে দোষ এবং ত্রুটি হইয়াছিল, তাহা আমাদের, কারণ আমরা তাঁহাদিগকে রীতিমত সাহায্য করি নাই। বিলাতী পার্লামেন্টারী কমিশনকে অবজ্ঞা করাতে বিলাতের জনসাধারণ, এমন কি শ্রমিক দলেরও অনেকে হিন্দুদিগের উপর ঘোর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহাতে ক্ষতি হইয়াছে কাহাদের?

কমিশনে ভারতবাসী ছিল না বলিয়া ত কংগ্রেসের এত আপত্তি, কিন্তু পুণাচুক্তি (Poona pact) করিবার সময় বাঙ্গলা সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহাতে 'মহাত্মা' গান্ধী কোন বাঙ্গালীকে ডাকিয়াছিলেন কি? সুতরাং যে জন্য কংগ্রেসওয়ালারা বৃটিশ শাসকদিগকে দোষ দিয়া থাকেন, সে দোষ ও তাঁহারাও করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যখন বাঙ্গালায় গান্ধীজীর হরিজনদিগের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠন করিবার কথা আইনে ছিল না, তখনও বাঙ্গালীরা প্রকৃত অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকদিগকে প্রতিনিধি করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাইয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। মিষ্টার ম্যাকডো-নাল্ড্ কি জন্য অনুন্নত সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠিত করিবার অধিকার দিয়াছিলেন তাহা ভুবনবিদিত। কিন্তু কর্ত্তারা যেখানে বাঙ্গালার অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য দশটি মাত্র সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার দিয়াছিলেন, মিষ্টার গান্ধী সেখানে উপবাসের এক ধ্বজা তুলিয়া এবং তাঁহার ভাবকদল 'সেল, সেল' রব তুলিয়া বাঙ্গালার কোন রাজনীতিক প্রতিনিধিকে না ডাকিয়া, নয় শতের মধ্যে নবাব সারিয়া লইবার মত তাড়াতাড়ি সেই দশজনের স্থানে ৩০ জন অনুন্নত সম্প্রদায়ের সদস্য করিবার ব্যবস্থা করিলেন কেন? যাহার প্রকৃত রাজনীতিক জ্ঞান আছে, সে কোন্ কাজের ফল কি হইবে তাহা প্রথম ভাবিয়া লয়। করিয়া বসিয়া তাহার পর ভাবে না।

ডিমোক্রেসী! ডিমোক্রেসী!! ডিমোক্রেসী!!! কংগ্রেসের সকল সভার মুখে ঐ একই 'হুজ্জুতি' ধ্বনি। কিন্তু 'ডিমোক্রেসী' শব্দের অর্থ তাঁহারা বুঝেন কি? তাঁহাদের মত

# সখের ঝাড়ুদার

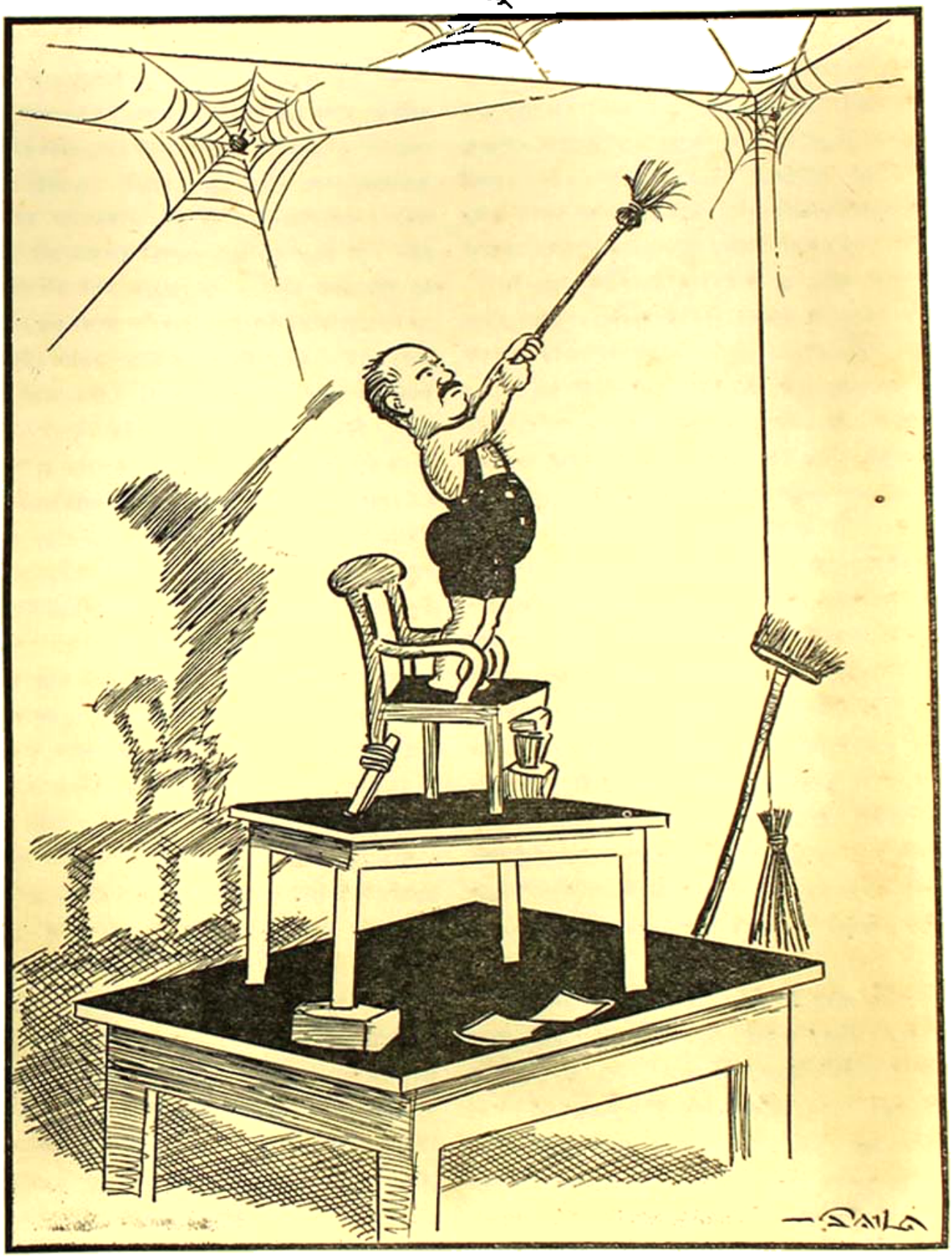

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন-বক্তৃতায় চট্টগ্রামের ভাষাপ্রসঙ্গে মুখোপাধ্যায়ের উক্তি : "...অধিবাসের উপলক্ষে আমরা 'কাড়ু বাজিয়ে' বিবাহিত করিব।"

দেখিয়া ও তাহা মনে হয় না। ডিমোক্রেসীর গোড়ার কথা—কোন সম্প্রদায়কে কেবল আপন আপন কৃষ্টি বজায় রাখিবার জন্য কিম্বা অপর কোন বিষয়ে, বিশেষ অধিকার (privilego) দেওয়া হইবে না। বিশেষ কারণ ব্যতীত কোন সম্প্রদায়কে তাহাদের সংখ্যালঘুতার জন্য ধরাট্ ( weightage ) ধরিয়া দেওয়া ডিমোক্রেসীর নিয়মসঙ্গত হইতে পারে না। কিন্তু গান্ধীজী-পরিচালিত কংগ্রেস কোন কোন সম্প্রদায়কে তুষ্ট করিবার জন্য বিশেষ অধিকার দানে আপত্তি করিতেছেন না, বরং যৌন থাকিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন। ইহা কোন্ দেশী ডিমোক্রেসী? ডিমোক্রেসীর মতে সকল নাগরিকই তুল্য অধিকার পাইবে। ইহার অর্থ—কেহই বিশেষ অধিকারের দাবী করিতে পারিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া যোগ্যতানির্ব্বিশেষে সকলকে সকল পদ দেওয়া হইবে ইহা বুঝিতে হইবে না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে যাহাকে তাহাকে ধরিয়া, অথবা সভ্যগণের নামের আদি বর্ণানুক্রম সূচী দেখিয়া, যথাক্রমে এক একজনকে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট করিতে চলিত। গণতন্ত্র মতে সকল নাগরিকের তুল্যাধিকার বলিয়া গুণের বিচার যে বর্জ্জন করিতে হইবে এরূপ মনে করা অত্যন্ত ভুল। অথচ কার্য্যক্ষেত্রে ভারতে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, সরকারী কার্য্যে গুণের বিচার না করিয়া সম্প্রদায় হিসাবে লোক লওয়া হইতেছে। ইহাতে শিক্ষাবিভাগ প্রভৃতিতে যে ক্ষতি হইতেছে না, তাহা মনে হয় না। কিন্তু কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ সে সকল কথা বলিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন। ইহার পরিণাম যে সর্ব্বনাশজনক তাহা তাঁহারা বুঝিতেছেন না। মিঃ গান্ধীর কুহকে পড়িয়া কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠনের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিতেছেন না। কিন্তু উহা যে গণতন্ত্রের মূলনীতির বিরোধী তাহা মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টে বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে এবং সাইমন কমিশনের রিপোর্টে তথা জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির রিপোর্টে স্পষ্ট অক্ষরে বলা হইয়াছে। উহা থাকিতে গণতান্ত্রিক পথে উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই (জয়েন্ট কমিটীর রিপোর্ট ১১ পৃষ্ঠা এবং এবং মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট ২৩১ প্যারা এবং সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ১৪৯প্যারা)। পার্লামেন্টারী জয়েন্ট কমিটীর এই সিদ্ধান্ত সাইমন কমিশনের রিপোর্টের উপর প্রতিষ্ঠিত ইহা বলাই বাহুল্য। তোমরা যদি কমিশনকে তোমাদের এবং দেশের সকলের পক্ষের কথা বুঝাইয়া বলিতে এবং ইতিকর্ত্তব্যতার একটা পথ দেখাইতে পারিতে, তাহা হইলে কমিশনের সিদ্ধান্ত কতকটা ভিন্নরূপ হইত। কিন্তু তোমরা নির্ব্বোধের মত চক্ষু মুদিয়া থাকিয়া আপনারাও মজিয়াছ দেশটাকেও মজাইয়াছ। সুতরাং তোমাদের গণতন্ত্র-ভক্তি কেবল মৌখিক।

অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ প্রমাণিত হইলে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন জুড়িয়া দিলেন। কংগ্রেসের মনে কতই না আশার সঞ্চার হইয়াছিল। ডাণ্ডিতে আইনভঙ্গ করিবার জন্য যাত্রাকালে তাঁহার এত সহায় জুটিয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া মনে হইয়াছিল, দ্রোণাচার্য্যের আদেশে দ্রুপদ রাজাকে ধরিবার জন্য সেনাসনাথ অর্জ্জুন অভিযান করিতেছেন। সংবাদপত্রে খুব আড়ম্বরের সহিত সেই শোভা-যাত্রার ছবি ছাপা হইয়াছিল। তখন আমাদের সকলের মনে কত আশার সঞ্চার হইয়াছিল! কত লোক গান্ধীর প্রস্তুত লবণ এক তোলা এক টাকা দিয়া কিনিল। কিন্তু তাহার পরিণাম কি হইল? তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছে। কংগ্রেসের ভাঁওতায় পড়িয়া অনেক যুবক অসহযোগ আন্দোলন এবং আইন ভঙ্গ করিতে যাইয়া কত প্রহার খাইয়াছে, কত কারাক্লেশ ভোগ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এত কষ্টের ফল হইল অইরম্ভা। শেষ কালে কংগ্রেসের মহাত্মাজীটি কর্ম্মীদিগের উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া ব্যাপক ভাবে আইন অমান্য আন্দোলন উঠাইয়া দিলেন। আইন ভঙ্গের সহিত অহিংস মনোবৃত্তি খাপ খায় কি না সে বিচার এখানে করিব না।

তাহার পর কংগ্রেস গান্ধীজীর পরামর্শ লইয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিল এবং শেষে মন্ত্রিত্বও লইল। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের সে কাজ অসহযোগ-আন্দোলন-সঙ্গত হইয়াছিল কি না, সে বিচার আমি এখানে করিব না। এক মাত্র মাদ্রাজ ভিন্ন কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীর শাসনকার্য্য মোটের উপর ভাল হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। তাহার পর যুদ্ধ বাধিল। কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা-প্রাপ্তির দাবী এই সময় উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা তখন তৎক্ষণাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা চাহেন নাই—উহা যে শাসকজাতি ভারতবাসীকে দিবেন এই

প্রতিশ্রুতি মাত্র তাঁহারা চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা আমায় বলিলেন, বৃটিশ জাতি কি ডিমক্রেসী রক্ষার জন্য এই সংগ্রামে নামিয়াছেন, এই প্রশ্নের উত্তর দিন। বৃটিশ সরকার সে প্রশ্নের উত্তর এখন দিতে চাহিলেন না। কিন্তু এই প্রশ্নটির উত্তর পাইবার জন্য এই বিষয়ে বৃটিশ সরকারকে প্রশ্ন করিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। বৃটিশ সরকার ডিমোক্রেসীর জন্য কত দূর ভক্ত, তাহা তাঁহাদের কার্য্য দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। ডিমোক্রেসীর সহিত সাম্রাজ্যবাদ খাপ খায় কি না, তাহা সিদ্ধান্ত করিবার জন্য বেশী মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতে হয় না। সুতরাং প্রবল শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত গ্রেট বৃটেনকে এখন সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন ছিল না।

বৃটিশ সরকার উত্তর দিলেন না। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী সে জন্য পদত্যাগ করিলেন। সরকার তখন ঐ কয়টি প্রদেশের শাসন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ইহাতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের প্রগতি কতখানি হইল? কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ বলেন, তাঁহারা সাম্রাজ্যবাদমূলক যুদ্ধের সমর্থন করেন না। কিন্তু তাঁহাদের বুঝা উচিত যে তাঁহারা পরাধীন। তাঁহাদের পরাধীনতা কাল্পনিক নহে—একেবারে প্রত্যক্ষ সত্য। সে পরাধীনতা যত দিন অপগত না হইবে, তত দিন তাঁহারা সরকারের বিরুদ্ধ মত মনে মনে পোষণ করিতে পারেন, কিন্তু প্রচার করিতে পারেন না। শাসকবর্গ তাহাদিগকে সরকারের কার্য্য-বিরোধী মত প্রকাশে বাধা দিবেন। কংগ্রেসওয়ালারা যদি সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা পাইয়া দেশ শাসনে নিযুক্ত থাকিতেন, তাহা হইলেও তাঁহারা ঐরূপ কার্য্যে বাধা দিতেন এরূপ মনোভাবের পরিচয় তাঁহারা দিয়া ফেলিয়াছেন। আমরা যখন পরাধীন তখন আমাদের অধিক সংযত হইয়া কাজ করা উচিত। অহিংস আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য সাত্ত্বিক ব্যবহার দ্বারা শাসকদিগের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক স্বীয় ন্যায্য অধিকার আদায় করা। তাহা করিতে হইলে সরকারী কাজে বিরোধিতা করা কর্ত্তব্য নহে। যাহার হৃদয়ের পরিবর্ত্তন করিয়া নিজের প্রাপ্য অধিকার কিনাইয়া পাইতে হইবে, তাহার মনকে ভিজ করা বাতুলের কার্য্য। রাজনীতির সহিত ধর্ম্মনীতির সম্বন্ধ নাই। রাজনীতি খুঁজে উপস্থিত সুবিধা (expedience), ধর্ম্মনীতির লক্ষ্য শাশ্বত কল্যাণ সাধন। রাজনীতি প্রায় পূর্ণমাত্রায় রাজসিক, ধর্ম্মনীতি প্রায় ষোল আনা সাত্ত্বিক। তুমি যখন অহিংস ভাব বা পূর্ণ সাত্ত্বিক নীতি ধরিয়া শাসকদিগের মনের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া নিজ ন্যায়সঙ্গত অধিকার পাইতে চাও, তখন শাসকদিগের যাবতীয় যুক্তিতর্কের সমর্থন তোমার—সমষ্টিগত ভাবেই হউক আর ব্যষ্টিগত ভাবেই হউক—আইন ভঙ্গ করিবার হুজুক তোলা ভাল হয় নাই—বিবেচনা-সিদ্ধও হয় নাই। যদি সাত্ত্বিক ভাব দ্বারা রাজনীতিক জাতির মনের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হয়,—তাহা হইলে সে সাত্ত্বিক ভাব অত্যন্ত প্রবল হওয়া আবশ্যক। রাজনীতিতে প্রবঞ্চনার স্থান আছে,—ধর্ম্মনীতিতে তাহা নাই।* আমাদের পক্ষে রাজনীতিক চাতুরী অবলম্বন উচিত হয় না।

এদিকে মিঃ গান্ধী কংগ্রেসের পরিচালনার ভার লইলেন। ভার গ্রহণের সময় তিনি বলিয়াছেন যে, অতঃপর কংগ্রেসকে কি করিতে হইবে তাহা তিনি বুঝিয়া পাইতেছেন না। তিনি অন্ধকারে পথ খুঁজিতেছেন, পথ পান নাই। শেষটা অনেক বুদ্ধি খাটাইয়া স্থির করিয়াছেন, ব্যাপক ভাবে আইন-ভঙ্গ আন্দোলন করিয়া আর বহুলোকের সর্ব্বনাশ করিবেন না,—দুই এক জন বাছা বাছা লোক দিয়া আইনভঙ্গ করাইবেন। তাহাই হইল। শ্রীযুত ভিনোবা ভাবে নামক একটি লোক যুদ্ধের বিরুদ্ধে কয়েকদিন বক্তৃতা করিয়া শেষটা জেলে গেলেন। ইহার পর কি কি ঘটিয়াছে, সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। অতঃপর মিঃ গান্ধী কি করিবেন তাহা তিনি জানেন! কিন্তু ইহাতে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা আদায় করিতে পারিবে কি? কখনই না। ইহার ফলে হয়ত আরও কয়েকজন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে এইমাত্র।

মিঃ গান্ধী যে মত-প্রকাশ সম্বন্ধে স্বাধীনতা লইয়া একটা কোন খেলা খেলিবেন তাহা পূর্ব্বেই বুঝা গিয়াছিল। বোম্বাইয়ে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা যে কথা বলিতে চাও সেকথা বলিবার অধিকার তোমাদের নিশ্চয়ই থাকা চাই। যেখানে কথা

* "Diplomacy therefore, must often be embarrassing and the popular belief is that, as an art, it consists entirely in skilful deception and can be no further truthful than may seem necessary to make falsehood credible."

বলিবার স্বাধীনতা নাই, সেখানে মানুষ সহজে বৃদ্ধি পায় না।" কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কংগ্রেস যদি দেশের শাসনভার প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারা কি ঐরূপ বাক্য বলিবার অথবা কংগ্রেস-বিরোধী মতবাদ প্রকাশ করিবার অধিকার তাঁহাদের প্রতিপক্ষদিগকে দিবেন? কখনই না। আপদ্-কাল ও দূরের কথা, অনেক সময় কংগ্রেসের চাইরা তাঁহাদের সহিত কিছু-মতের লোকদিগকে সভা করিয়া মত প্রকাশ করিতে দেন নাই, ইহা 'বিদিত ভুবনে'। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরুর চক্ষের সম্মুখে কলিকাতা টাউন হলে স্বর্গীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে সনাতনীদের যে সভা হইয়াছিল, তাহা ভাঙিয়া দিয়াছিল কাহারা? কলিকাতা এলবার্ট হলে স্বর্গীয় বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে সনাতনীদের যে সভা হইয়াছিল, তাহা অত্যন্ত বর্বরোচিত ভাবে ভাঙিয়া দিয়াছিল কাহারা তাহা কাহারও বুঝিতে বাকি নাই। মাদ্রাজে হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার আন্দোলনের বিরোধীদিগকে কি নির্বিবাদে মনোভাব ব্যক্ত করিতে দেওয়া হইয়াছিল?

তোমরা যতই উচ্চকণ্ঠে যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা কর না কেন, দেশের চৌদ্দ আনা লোক তাহা শুনিবে না। কারণ তাহারা নাজীবাদ অপেক্ষা সাম্রাজ্যবাদকে ভাল মনে করে। ইহুদিদিগের সহিত হিটলারের ব্যবহারের কথা ভারতবাসী শুনিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ নাজীবাদের তুলনায় অনেক ভাল। সাম্রাজ্যবাদ নাজীবাদের ন্যায় অকারণ কঠোর হয় না। সাম্রাজ্যবাদী শাসকজাতি স্বকীয় স্বার্থসাধনের জন্য তাঁহাদের সাম্রাজ্য হইতে আত্মপোষণ করেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা বিনা হেতুতে শাসিত প্রজার মনে অসন্তোষের সঞ্চার করিতে চাহেন না। বরং তাঁহারা তাঁহাদের অধীন সাম্রাজ্যের প্রজা-দিগকে যথাসম্ভব সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করেন। নাজীবাদ শাসিত সম্প্রদায়কে অসন্তুষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী জাতিরাই পরাধীন প্রজার পক্ষে বরণীয় বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। সেই জন্য অধিকাংশ ভারতবাসীই এই যুদ্ধে বৃটিশ জাতির জয় কামনা করে। অথচ স্বাধীনতা-লাভ সকল মানুষেরই কাম্য। কিন্তু আজ যদি রোমকদিগের বৃটেন পরিত্যাগের ন্যায় ইংরাজ জাতি আচম্বিতে ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে ভারতবাসীরা বর্তমান অবস্থায় তাহাদের সেই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইবে কি না তাহাই হইতেছে সমীচীন সমস্যা। বিজ্ঞানবলে বলীয়ান জার্মানী কয়দিনের মধ্যে য়ুরোপের কতগুলি শক্তিশালী দেশকে মথিত করিয়া ফেলিল, তাহা দেখিয়া—স্বাধীনতা পাইলেই আমরা স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিব কি না,—সে বিষয়ে পূর্বাপেক্ষা লোকে অধিক সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ অবস্থায় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীটা কমাইয়া ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন-প্রাপ্তির জন্য দাবী করাই উচিত। সুতরাং মিষ্টার গান্ধীর চেলা চামুণ্ডারা এখন যুদ্ধ-বিরোধী বক্তৃতা করিয়া বেড়াইলেও ভারতবাসীরা সাধারণতঃ ইংরাজেরই জয় কামনা করিবে, এবং ইংরাজকে সংগ্রামের জন্য যথাসাধ্য সাহায্যও করিবে। লাভের মধ্যে জনকয়েক রস-কেপা লোক জেলে যাইবে। পরন্তু রাজনীতিক আন্দোলনের ফলে যে সকল বেসরকারী ইংরাজের এদেশে স্বার্থহানি ঘটিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রতিহিংসাপরায়ণ লোক ইংলণ্ড-বাসী জনসাধারণকে বুঝাইবেন যে কংগ্রেসের অহিংসা কেবল মৌখিক—উহার ভিতর আন্তরিকতা কিছুই নাই। ইহাতে ভোটের উপর কুফল ফলিবেই। অহিংস আন্দোলনের প্রভাবে যে শাসকজাতির মনের ভাব পরিবর্তন করিবার কল্পনা গান্ধী করিয়াছিলেন তাহা একেবারেই নিষ্ফল হইয়া যাইবে। সকলেই শুকদেব গোস্বামীর ন্যায়, মানুষ যতদূর সাত্ত্বিক হইতে পারে, ততদূর নহে। সুতরাং যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা যতই সাবধানে করা হউক না কেন তাহা প্রায় সকল মানুষের মনকে পূর্ণভাবে সাত্ত্বিক রাখিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

গান্ধীজী বলিয়াছিলেন যে, তিনি অন্ধকারে পথ হাতড়াইতেছেন—কিন্তু তিনি প্রকৃত পথ খুঁজিয়া পান নাই। তিনি অন্যান্য বারের ন্যায় এবারেও ভুল পথ ধরিয়া বসিয়াছেন। তিনি ক্ষান্ত হউন এবং যুদ্ধ ক্ষান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। নতুবা পুনরায় বিফলতাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। তিনি স্বয়ং ভারতীয় অহিংস ধর্মের মর্ম কতখানি বুঝেন, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ। কারণ সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাবে ভাবিত না হইলে, সম্পূর্ণ অহিংস হওয়া যায় না। ভারতীয় ভাবে ভাবিত হইলেও কঠোর সাধনার দ্বারা সাত্ত্বিক ভাব জাগাইয়া তুলিতে হয়। নতুবা তাহা হয় না। আমি সাধারণের হিতার্থেই এই কথাগুলি বলিলাম। সকলে একবার এই বিষয়টি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন।

# অনির্বাণ

—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

১০

"চলল মেয়ে বিয়ে জীবন হায়ত"

একদিন কথাপ্রসঙ্গে অতীন্দ্র বললেন, "সেদিন নবদন পাহাড়ে যে ছেলে দু'টিকে দেখা গেল, তা'রা বেশ, নয় রে ?"

মহালয়া কি যেন একটা কাজ ক'রছিল ; মামার দিকে অকস্মাৎ মুখ ফিরিয়ে সে বলল, "মামা, অনেক দিন তুমি কাজে যেরোও নি। কেবল বাড়ীতে ব'সে ব'সে ঘুর ঘুর ক'রছ।"

ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে অতীন্দ্র বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ—বেরুতে হবে ঠিক বলেছিস তুই ! আজই যাব।"

কথাটা হঠাৎ থেমে গেল ; কিন্তু মহালয়ার মনের মধ্যে কথাটি থেমে রইল না। পাহাড়ের পিছল দিকের পাথরে পা ফস্‌কে সে সেদিন প'ড়ে যায় আর কি ! হঠাৎ তা'কে কে একজন ধ'রে ফেলল। সে না এসে কি যে হ'ত, মহালয়া তা' ভেবে ঠিক ক'রতে পারে না। মহালয়া সে-রাত্রে স্বপ্ন দেখল : পাথরে পা পিছলে সে প'ড়ে যাচ্ছে, হঠাৎ কে তা'কে ধ'রে ফেলল। যেখানে তা'কে ধ'রে ফেলল, সেখানে প'ড়ে যাওয়ার আর কোন ভয় নেই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, তা'কে যে বাঁচালো তা'র মুখ তো সে-দিনের দেখা সেই ছেলেটির মত নয়।

মহালয়ার নির্জ্জন জীবনে স্বপ্নে-দেখা সেই মুখ বারে বারে আসে। কাজ ক'রতে ক'রতে মহালয়া বলল, "হ্যাঁ মামা, আজই যেরোও। চুপচাপ বাড়ীতে ব'সে থাকা কোনো কাজের কথা নয়। ব'সে খেলে রাজভাণ্ডারও ফুরিয়ে যায়।"

ঈষৎ হেসে অতীন্দ্র বললেন, "তুই এত কথা কোথায় শিখলি ? রইলি আমার কাছে চিরদিন, কিন্তু কথা শিখলি কি ক'রে ?"

একটা চিল না কাক উঠোনের উপর দিয়ে উড়ে গেল। মহালয়া সে-দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "ওরা কি ক'রে শেখে ?"

অতীন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, "তোর কি এত বুদ্ধি ! তোকে আমি পায় করি কি ক'রে—সেই ভাবনায় আমার খেয়ে সুখ নেই, দু'দণ্ড কথা ক'য়ে সুখ নেই।"

মহালয়া খি-খি ক'রে হেসে উঠল। বলল, "তখন তোমায় কে রান্না ক'রে খেতে দেবে মামা ?"

"ঠিক, ঠিক বটে ! আচ্ছা, আজই যেরুব, বুঝলি রে !" ব'লে অতীন্দ্র চুপ ক'রে গেলেন। ভাগ্নীর সঙ্গে কথায় এঁটে ওঠা শক্ত।

খানিক পরে ঘুরে এসে অতীন্দ্র বললেন, "হ'য়েছে, হ'য়েছে, সেই ছেলে দু'টির নাম মনে পড়েছে। একজনের নাম দেবকুমার, আর একজনের নাম দাতাকি।"

মহালয়া তা'র পাগল মামাকে নিয়ে কি করে আর ! বলল, "তোমার যত সব অনাসৃষ্টি ! কে না কে তা'র নেই ঠিক !"

"তা'র মানে ? দেবকুমার না থাকলে সে-দিন কি হ'ত বল্ দেখি !"

হাসতে হাসতে মহালয়া বলে, "কি আর হ'ত ? যেতাম রসাতলে।"

অতীন্দ্র বাধ ক'রে বললেন, "যেতাম রসাতলে। কেন রসাতলে কেন ? একেবারে হাড়গোড় চুরমার হ'য়ে যেত যে। ছেলেটি যদি না থাকত, তা হ'লে কি যে হ'ত তাবাই যায় না।"

মহালয়া মামার উপর বিরক্ত হ'য়েই বলল, "আচ্ছা যাও, বেশ ছেলে। খুব ভালো ছেলে ! হ'য়েছে তো। এইবার যাও, বেশী বিরক্ত ক'রো না আর। আমার এখন অনেক কাজ !"

অতীন্দ্র স্নেহ কৌতুকে তা'র দিকে চেয়ে বললেন, "তোকে কি পারবার যো আছে ?"—ব'লে তিনি চ'লে গেলেন।

অতীন্দ্র ধীরে ধীরে বাইরে এলেন। নিজে তামাক সাজলেন, তার পর বাইরের ঘরে পাতা ফরাসের উপর ব'সে

তামাক খেতে খেতে ভাবতে লাগলেন: মহালয়ার বয়স হ'ল চৌদ্দ কি পনের। বিধবা মা ওর গেল মারা—যাবার সময় কিছু দেনা আর তিন বছরের অসহায় মেয়েটিকে দিয়ে গেল আমার কাছে। নিজের বোন, কি কষ্টই না পেয়ে গেছে বেচারী! দেনা শোধ হ'ল, অনেক দিনে, অনেক বৈর্য্যে, অনেক পরিশ্রমে। মেয়েও মানুষ হ'য়ে উঠেছে। হঠাৎ তা'র দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে মনে হয়, কল্যাণী বুঝি! (কল্যাণী মহালয়ার মা'র নাম) তা'রই মত হ'য়ে উঠেছে মেয়ে। তেমনি খরদৃষ্টি সংসারের উপর, তেমনি অক্লান্ত পরিশ্রম। চাকর রেখেছি—ঠাকুরটাকে দিলে তাড়িয়ে। নিজেই রাঁধবে, কিছুতেই শুনবে না। পড়াশুনো যা' শিখল, তা'তেই ওর হবে। পড়াতে কি আমি চাই নি! প'ড়তে ব'সলে বলে, 'কি হবে পড়াশুনো ক'রে? আমাদের কাজ তো পড়াশুনো নয়।' এই হ'ল মহালয়া। আমার তো মনের মত হ'ল। পরের মনের মত ও কি ক'রে হবে? পর ব'লে পর। কোথায় কত ঘরে খুঁজতে হবে ওর পাত্তর! কত অচেনা মানুষ! কত অদেখা ঘর! ভাবতেও কষ্ট।—এই রকম ভাবতে ভাবতে তামাক খাওয়া শেষ ক'রেই জামা গায় দিয়ে অতীন্দ্র রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

•

সন্ধ্যা। অন্তরীরা ঠিক ক'রল, আজ তা'রা খুব বেড়াবে। কারণ সাত্যকির খুব বেড়ানো দরকার। তাই সাত্যকি, সারথি, দেবকুমার আর অন্তরী ডানু কাঁকরে বোষ্টাই পথ বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে প'ড়ল পথচিহ্নহীন মাঠে। দিগিন্দ্র বললেন, "তোমরা এগিয়ে যাও। আমি একটু পরে যাচ্ছি।"

দু'পাশে চমৎকার গাছের সার। ঘন পল্লব। কত রকম পাখীর কিচির মিচির। সম্মুখে কোথাও লোকজন দেখা যায় না। মাঝে মাঝে উঁচু উঁচু পাথরের কালো কালো মূর্ত্তি; তা'রই একটার কাছাকাছি ঘাস-বিছানো কাঁকুরে জমিতে চার ভাইবোনে এসে ব'সল। অনেক দূরে গাছ-পালার মধ্যে কা'রা যেন গান গাইছে:

"ওরে দারুণী পথিক, বারেক পথ ভুলে ঘর।করে!"

চার ভাইবোনে সেই গান চুপ ক'রে শুনতে লাগল। নির্জ্জন মাঠে গানের সুর ঘুরতে লাগল—প্রচ্ছন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে, গাছের ঘন পল্লবের মধ্যে, মাঠের দূর প্রসারে। কেমন অদ্ভুত লাগল অন্তরীর। সে ব'লল, "আমার চমৎকার লাগছে এই বেওয়ন।" অন্তরী একখানা সাদা শালে পিঠ ঢেকে ব'সে আছে। মাথার চুলগুলি কোনো রকমে জড়িয়ে রেখেছে। এরা সব কেউ বা শুয়ে পড়েছে, কেউ বা পাথরের চিবির উপরে স্থির হ'য়ে ব'সে আছে। একটু স্থির থেকে অন্তরী বলল, "এইবার বোধ হয় আমাদের যেতে দিতে হয়, কি বল মেওদা'!"

মেওদা' সাত্যকি ঘাস আর কাঁকরের উপর শুয়ে ছিল। অন্তরীর কথায় মাথাটি তুলে অন্তরীর কোলের উপর রেখে চুপ ক'রেই রইল। অন্তরী নিঃশব্দে তা'র মাথার চুলগুলির মধ্যে আঙুল দিয়ে চুলগুলি টেনে টেনে দিতে লাগল।

সারথি ছিল পাথরের চিবির উপর। অন্তরী তা'র দিকে চেয়ে বলল, "তোমার কি মত বড়দা?"

সারথি হাঁ কি না কিছুই বলল না। অন্তরী জিজ্ঞাসা ক'রবার আগেই দেবকুমার বলল, "আমি বলি, আরও কিছু-দিন থাকো। একেবারে বড়দিন শেষ ক'রে তবে বাড়ী যাব।"

দূরে গাছগুলির মধ্য থেকে আগেকার গানের আর একটি চরণ ভেসে এল। প্রথম চরণটি যে গেয়েছে, এ তা'রই গলা। এবার যেন সে আরও এগিয়ে এসেছে, গান শুনলে তাই মনে হয়।

"খোলা আঁখি মুদো বন্ধ ক'রে যে আকুল আঁখির নীরে।"

দেবকুমার অকস্মাৎ সচকিত হ'য়ে বলল, "বেশ গাইছে তো! মেয়ের গলা না ছেলের গলা?"

"ঠিক বোঝা যাচ্ছে না,"—সাত্যকির মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে অন্তরী বলল।

সন্ধ্যা ঘনতর হ'য়েছে। শীতের হি হি কাঁপুনি হ'য়ল। উত্তরে হাওয়া ব'য়ে চলেছে। তবু এরা সেখানে ব'সে রইল। দেওঘরের উদাস-করা মাঠে তা'দের চোখে আর মনে ধরেছে নেশা। অনেকদূর থেকে এমন সময় দিগিন্দ্রের গলা শোনা গেল, "তোমরা আছ কি? সারথি আছ?"

"এই যে এ-দিকে," ব'লে সারথি সাড়া দিল।

অন্তরী মাথার তুলে দিল ঘোমটা। সাত্যকি তা'র কোলে থেকেই বলল, "ঘোমটা দিতেই হবে? আগে আসুক ও, তার পর তো ঘোমটা দিবি।"

জয়ন্তী একটু হাসল।

কিছু পরেই দিগিন্দ্র এলেন। "উঃ কি ভীষণ রাস্তা। এ আমাদের গাঁকেও হার মানায়!"

"তা' তো হবেই, এ অবশ্য আপনার গাঁ নয়!"

"তা' নয় বটে!"—ব'লে দিগিন্দ্র পাথরের চিবির উপরেই ব'সে পড়লেন সারথির পাশে। সেই কণ্ঠস্বর এল আবার ভেসে:

"সে তোলা পথের প্রান্তে মেঘের হারানো হিয়ার কূল!"

বীর সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। পুনরাবৃত্তি হ'ল শেষ শব্দ কয়েকটির:

"হারানো হিয়ার কূল!"

দেবকুমার হাসতে হাসতে বলল, "যা বে এ তো মন্দ নয়!"

দিগিন্দ্র বললেন, "বেশ সুন্দর বটে!"

"আপনার কেমন লাগছে জামাইবাবু, দেওঘর!"

"মন্দ নয়, বড্ড শীত! শেষ অবধি আমাকে ছুটির দরখাস্তই ক'রতে হ'ল।"

"আমরা ভেবেছি কাটিয়ে যাব বড়দিন!"

"তাই না কি! তা হ'লে তো বড্ড দেরী হবে!"—ব'লে দিগিন্দ্র একটু অন্যমনস্ক হ'লেন।

রাস্তার উপর থেকে শোনা গেল মোটরের হর্ণ। "নিশ্চয়ই সুবোধবাবু,"—ব'লে সারথি উঠে প'ল।

"আপনারা বসুন জামাইবাবু, আমি দেখি সুবোধ-বাবুর গাড়ী কি না!"—ব'লে সারথি টিবি থেকে নেমে এগিয়ে গেল। "চলো, আমিও যাই,"—ব'লে দেবকুমারও সারথির সঙ্গ নিল। রইলো শুধু সাত্যকি, দিগিন্দ্র আর জয়ন্তী।

প্রতিদিনের জীবন থেকে এরা আজ মুক্তি পেয়েছে। স্নিগ্ধ, নীল রাত আর একটু পরেই নামবে দেওঘরের মাঠে। মাঝে মাঝে এক আধখানা মোটর হুস্ ক'রে পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে বেরিয়ে। শীতের সন্ধ্যা—মাঠ, পথ নির্জ্জন বললেই চলে। শুধু সেই গানের সুর মাঝে মাঝে সচকিত ক'রে তুলছে মাঠের নির্জ্জনতা। কা'রা যেন মাঠের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে হেঁটে হেঁটে। এদেরই মত হয় তো তারাও বেড়াতে বেরিয়েছে। ক্লান্তিহীন বন্ধনীকে একটু বৈচিত্র্যময় ক'রে তুলবার জন্যে। বোধ হয় গান গাইছে তা'দের মধ্যে কেউ, বোধ হয় মেয়েই গান গাইছে। মেয়ের কণ্ঠস্বর:

"সে তোলা পথের প্রান্তে মেঘের হারানো হিয়ার কূল;
ঘ'রে প'ড়ে আছে কাঁটাবনতলে এক বুনফুল:
সেথা ছইলো আলোছড়া খেলা অকূল সিন্ধুতীরে।
ওরে সাবধানী পথিক বারেক পথ ভুলে ঘর ফিরে।"

তার পরে শুধু উত্তরে হাওয়ার হু-হু স্বর ভেসে আসে। শুকনো পাতা যায় উড়ে। ঝরঝরে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে কা'র কালো চুলের মত নিবিড় অন্ধকার। পাথরের স্তূপের পাশে পাশে শুনতে পাওয়া যায় কা'দের কণ্ঠস্বর। মনে হয়, তা'রা যেন নিবেদন ক'রছে প্রেম—স্বপ্নাতুর প্রেম, সব-ভুলিয়ে-দেওয়া প্রেম। নীলাভ রাত্রির মদির গুঞ্জনের মত তা'দের কণ্ঠস্বর—সেখানে হয় তো বাইরের জগৎ নেই; দু'টি নত আঁখি আর দুর্বলকের পাশে পাশে নূতন জগৎ যা'রা রচনা ক'রবে, তা'দের মন-ভ্রমর হ'য়েছে চঞ্চল। উন্মত্ত ছন্নছাড়া প্রেম—শীত নেই, সময় নেই, পাশে লোক হেঁটে গেলে হয় তো তা'রা টের পায় না কিম্বা হয় তো একটু উঠে আর একটা স্তূপের পাশে গিয়ে বসে: তার পরে আবার সেই চলন্ত সুর ভেসে আসে:

"অনেক দিনের সঞ্চয় মোর আজিও আছিল বাঁধা।
কত্তুর রাতের ফুলের মতন ঝরুক পড়ুক ঝ'রে।
আর যে এবার সব হারাবার জয়মালা পরা শিরে—
ওরে সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভুলে ঘর ফিরে।"

শেষের চরণ যেখানে পথে এসে বারে বারে ঘোরে, সেটা যেন ঘুরে বেড়ায়—শিশু আর দেওদারের পাতার মধ্য দিয়ে, চালু রাস্তা বেয়ে, মাঠ বন পার হ'য়ে, বহুদূরে পার হ'য়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। 'ওরে সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভুলে ঘর ফিরে'—সেই অলৌকিক কণ্ঠ যেন সব হারাবার, সব ভুলিয়ে দেবার জন্যে মাঠে মাঠে ঘুরছে, আলেয়ার আলোর মত ধপ্ ক'রে জ্ব'লে ওঠে সুরজ্যোতি, মিলে যায় মানুষের মনে মনে।

•

সাত্যকি জয়ন্তীর কোলে সেই যে রেখেছে মাথা, আর তোলে নি। দিগিন্দ্র পাথরের স্তূপের উপরেই উদাসীনের মতন আছেন ব'সে। একটু থেমে থেমে মাঝে মাঝে

বলছেন, "ছুটি নিলে হয় তো চলবে না। কি জানি, কিছুই বুঝতে পারছি নে। তুমি কি বড়দিন শেষ ক'রে যেতে চাও?" জয়ন্তী সাতাকির মাথার চুলগুলিতে হাত বুলোতে লাগল। কোন উত্তর দিল না।

"তবু তো ইস্কুল নয়! কত কাজ, সংসার, জমিজমা, পিসিমা, ভাইরা—ছুটি নি-ই বা কি ক'রে?" জয়ন্তী তখনো কিছু বলল না। উত্তর দিল সাতাকি, "থাকুন না কিছু দিন, বড়দিন শেষ ক'রেই যাওয়া যাবে। অত দিন না পারেন, দিন পনেরো তো পারবেন।"

মাথা নেড়ে দিগিন্দ্র বললেন, "না ভাই, বোধ হয় তা' হয় না। ইনি ইচ্ছা ক'রলে থাকতে পারেন, আমি যাই, আমায় যেতে হবেই।"

"বেশ, যা' ভালো বোঝেন, করুন। আমরা আর কি বলবো? এত ক'রে ব'লছি—বাড়ীতে ভাইদের চিঠি দিন, ইস্কুলে ছয়খানা দিন। আমরা সবাই ক'রছি অনুরোধ, আর আপনি তা' শুনবেন না। বেশ, যা' ভালো বোঝেন, করুন।" ব'লেই সাতাকি জয়ন্তীর কোলেই পাশ ফিরে শুলো।

এমন সময় একটা উঁচু স্তূপের পাশ থেকে সুবোধের প্রবল কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "দিগিন্দ্র ওখানে আছেন তো?"

সারথি বলল, "হ্যাঁ, আছেন।"

দিগিন্দ্র স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "এই যে এ-দিকে!"

দেবকুমার বলল, "ঐ যে জামাইবাবু—আসুন এটা ঘুরে যাই।"

জয়ন্তী মৃদু-নিম্নকণ্ঠে ব'লল, "যাও যদি, আমাকে নিয়ে যেও।" জয়ন্তী সেই রাতেই 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে পড়েছে।

দিগিন্দ্র কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে সুবোধ, দেবকুমার আর সারথি তিনজনে একই সঙ্গে এসে উপস্থিত। দিগিন্দ্র সশব্যস্তে, "আরে আসুন, আসুন," ব'লে পাথরের স্তূপ ছেড়ে নীচে নেমে দাঁড়ালেন।

সুবোধ বললে, "আরে করেন কি, আপনি ঐখানেই থাকুন, উচ্চাসন আপনাকেই মানায়। আমরা নীচে বসি।"—ব'লে সুবোধরা নীচে কাঁকর আর পাথরের উপর বসলেন। জয়ন্তী অনেক আগেই দিয়েছে ঘোমটা, সব রূপ তাতে ঢাকা পড়ে নি। ঘোমটার নীচ থেকে তা'র কালো চুলের গুচ্ছ দেখা যাচ্ছিল। দিগিন্দ্র সে-দিকে একবার তাকালেন। তার পর একটু লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, "আমিও নীচেই বসি।" ব'লে কারো উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে নীচে নেমে বসলেন তাদেরই পাশে। অনেকটা কেটে গেছে তাঁর সঙ্কোচ। মনে একটা প্রসন্নতা এসেছে।

আরম্ভ করলেন সুবোধ। বললেন, "এখানে এতক্ষণ ব'সে আছেন কি ক'রে? এত খেঁকশেয়ালী, ছোট ছোট সাপ, বিছে এত—"

আর বেশী বলতে হ'ল না। জয়ন্তী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "হ্যাঁ, রাতও হ'য়েছে, এস আমরা যাই।"

সবাই উঠে দাঁড়াল। এমন সময় দেখা গেল ঘুরে দু'টি প্রাণী। অন্ধকার; প্রাণী দু'টি যেন তাঁদেরই দিকে আসছে। সুবোধ ভারি গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কে?"

পুরুষ কণ্ঠে উত্তর এল, "চিনবেন না।"

দিগিন্দ্র চিনলেন সে গলা। অতীন্দ্র। দিগিন্দ্র চেঁচিয়ে বললেন, "অতীন না!"

"হ্যাঁ ভাই, এত রাতে মাঠে যে! সঙ্গে কারা? দাঁড়াও, যাই আগে।"

তার পরে, পরস্পরের দেখাশুনা, আলাপ-পরিচয়। অতীন্দ্রের সঙ্গে ছিল মহালয়া।

দিগিন্দ্র তা'র সঙ্গে জয়ন্তীর আলাপ করিয়ে দিলেন। সুবোধ বললেন, "আর হাঁটতে হবে না আপনাদের, গাড়ী রয়েছে রাস্তায়। এইটুকু হেঁটে আসুন। গাড়ী ক'রে আপনাদের বাড়ী পৌঁছে দিচ্ছি।"

গাড়ীর আলোতে দেবকুমার আর সাতাকি চিনতে পারল মহালয়াকে। হাত দু'টি তুলে দেবকুমার বলল, "নমস্কার, সেই যে দেখা নন্দন পাহাড়ে।"

"হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে।"—ব'লে মহালয়া একটু হাসল।

গাড়ী তখন ছেড়ে দিয়েছে। জয়ন্তীর পাশেই রইল মহালয়া।

১৪

"—কোন্ ঘাটে যাবে তুমি, কোন্ দেশে হে বন্ধুবন্ধিনী,
ওগো উদাসিনী !"

পাওয়ার বাড়ী থেকে দিগিন্দ্র তাঁর সুটকেস নিয়ে এসেছেন। বাড়ী যাওয়ার সম্বন্ধে একটু ইতস্ততঃ ভাব তাঁর দুইনই। রত্নাবলী বলল, "একটা কাজ আমার বাকী আছে।"

"কি ?"

"একবার অতীন বাবুর বাড়ীতে আমাকে নিয়ে চলো। দয়ালয়াকে একবার দেখব।"

"কেমন লাগল মেয়েটিকে ?"

"বেশ ভালো।"

"তা হ'লে চলো, আজ বিকেলেই যাওয়া যাক অতীনের বাড়ী। অতীন আমার ছেলেবেলার বন্ধু। হঠাৎ দেখা এখানে !"

"হাঁ, শুনেছি তোমার মুখে।"

"তা তো হ'ল, হঠাৎ তাঁকে দেখবার ইচ্ছা কেন তোমার ?"

"আমার খুশী, অনেক দিন বাঙালী মেয়ের মুখ দেখি নি, সেই জন্যে।"

"ও, আচ্ছা চলো আজ বিকেলে।"

♣

বিকেলের দিকে সুবোধ আবার গাড়ী নিয়ে এসে হাজির। রত্নাবলী তাঁকে নমস্কার জানিয়ে বলল, "বেশ ভালই হ'ল। আজ মাদারা একটু বেড়াতে যান। আমি আর ইনি (দিগিন্দ্রকে দেখিয়ে) আমরা যাব এক জায়গায় আপনার গাড়ীতে। আপনার সময় হবে তো ?"

সুবোধ তাঁর স্বাভাবিক হাসি হেসে বললেন, "কি আর ;" তার পর একটু থেমে বললেন, "সময় ? সময় হবে মানে ?" তার পর সুর নামিয়ে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হ'য়েই যেন বললেন, "আপনার এখনো সঙ্কোচ র'য়ে গেল দেখছি।"

লজ্জিত হ'য়ে রত্নাবলী বলল, "না সঙ্কোচ আর কি ?"

"আর সঙ্কোচ। আপনিও যেমন। আসুন, আসুন—কোথায় যাবেন, কোথায় ?"

দিগিন্দ্র খুব সন্তর্পণে আগেই গাড়ীতে উঠে বসেছেন। রত্নাবলী উঠছে গাড়ীতে—এমন সময়ে দিগিন্দ্রই বললেন, "ঐ যে, সেই আমার বন্ধু অতীন্দ্র। কাল ধাবের মাঠ থেকে গাড়ীতে করে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিলেন।"

"হাঁ হাঁ বুঝতে পেরেছি—ইনজিনীয়র অতীন্দ্র। চলুন, চলুন।"—ব'লে সুবোধ গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলেন। থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল গাড়ী।

অবাক্ হয়ে দিগিন্দ্র বললেন, "অতীন্দ্র ইনজিনীয়রিং করেন ? কৈ, তা' তো শুনি নি।"

"কেন, আপনি শোনেন নি ? আপনারই তো বন্ধু !" গাড়ী চলতে আরম্ভ করেছে।

"বন্ধু তো বটে। অনেকদিন পরে এখানে দেখা। সেদিন জিজ্ঞাসাও করলাম, কিন্তু চেপে গেল কথাটা।"

"কেন তিনি বললেন না ? আশ্চর্য্য বটে। কেউ কেউ নিজের প্রফেসন্ কি, বলতে ইতস্ততঃ করেন, অতীন্দ্র দেখছি সেই দলের। আমি তো বুঝি না কিসের সঙ্কোচ।"

"হাঁ, আমিও বুঝি না। তা' হ'লে তো আমারই সঙ্কোচ বেশী হওয়া উচিত। ইস্কুলের পণ্ডিতী করি—এ কথা তো মুখ ফুটে কারও কাছে বলাই চলে না।"

"কেন তা' হবে ?" সুবোধ গাড়ী খুব জোরে চালাচ্ছেন। "কেন বলাই চলে না ? এ সঙ্কোচের কোন মানে নেই। শিক্ষাদান, বিদ্যাদান—এটা তো ব্রাহ্মণোচিত কাজ, যথার্থ ব্রাহ্মণ অবশ্য। 'অধ্যয়ন, অধ্যাপন' জানেন তো ? অতি গোপনে, অতি সন্তর্পণে আপনাদের মহৎ কাজ চলেছে। আধী দিনের যারা মানুষ, তাদের আপনারা গড়ে তুলবেন, তুলছেন, এতে আর সঙ্কোচ কি থাকতে পারে ?" একটু থেমে সুবোধ বললেন, "তবে বর্ত্তমান যুগে কৌলীন্য যে অর্থের। আপনি বোধ হয় সেই দিক্ দেখেই কথাটা বলেছেন। সেটা অবশ্য সত্যি। কিন্তু, তা হ'লে বলব, আপনারা যথার্থ শিক্ষক নন।"—বলে সুবোধ একটু হাসলেন।

দিগিন্দ্র কথাটা ঠিক মেনে নিতে পারলেন না। এটা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যেত। একটা ক্ষুণ্ণ আপত্তি তুলতে যাচ্ছেন তিনি, এমন সময় সুবোধ গাড়ী থামিয়ে বললেন, "ঐ যে অতীন্দ্রের বাড়ী। আপনারা নামুন তা হ'লে—আমি এখুনি আসছি।"—বলতেই রত্নাবলী বাধা দিয়ে বলল, "সে হয় না, আপনিও আসুন এ বাড়ীতে।"

একটু হেসে সুবোধ বললেন, "আমি আসছি এখুনি—এই ধরুন ঘণ্টাখানেক !"

"না, তা' হবে না। আপনাকে আসতে হবেই।"—ব'লে জয়ন্তী মুখ গম্ভীর ক'রেই রইল। জয়ন্তীর অপ্রসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে সুবোধ স্বাভাবিক হাসি হেসে বললেন, "আচ্ছা, রইলাম এখানে।"

মহালয়া বেরিয়ে এসে এঁদের অভ্যর্থনা করল। বলল, "বাবা বাড়ী নেই। আসতে একটু দেরী হ'তে পারে। আপনারা বসুন।"

জয়ন্তী তার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "চল, তোমার সঙ্গে যাই ভেতরে।" তার পর দিগিন্দ্র আর সুবোধের দিকে চেয়ে বলল, "আপনারা বসুন বাইরের ঘরে। অন্ততঃ অতীন বাবু যতক্ষণ না আসেন।"

সুবোধ মহালয়াকে গত রাত্রের প্রায়ান্ধকারে ভাল ক'রে দেখেন নি। আজ তাকে দিবালোকের আলোয় বারান্দায় দেখে হঠাৎ তাঁর ভাল লেগে গেল। হয় তো সেইজন্যে, কিংবা অন্য কি কারণে, সুবোধ হঠাৎ বললেন, "কেন আমরা বাইরে ব'সে থাকব ? আমরাও যাব ভেতরে।"

জয়ন্তী আর মহালয়া দু'জনেই হেসে ফেলল। দিগিন্দ্রও অল্প অল্প হাসতে লাগলেন। "তা হ'লে আসুন।"—ব'লে মহালয়া বাড়ীর ভেতরে চলতে লাগল। সুবোধ আর দিগিন্দ্র হাসতে হাসতে চললেন ভেতরে।

জয়ন্তী এ-ঘর ও-ঘর ক'রে চলতে চলতে বলল, "তুমি থাক এখানে একলাটি ?" ঘাড় নেড়ে মহালয়া বলল, "হাঁ।"

•

বিকেলের দিকে সারথি বলল, "তোরা যা নক্সন পাহাড়ে কিংবা কাছাকাছি কোথাও। আমি বাড়ীতে থাকি, কেউ যদি আসে। তা' ছাড়া শীতের দিনে আমার একেবারেই বেরুতে ইচ্ছা করে না। এখুনি চৌক আনার, ডিমের অমলেট ভাজবার ইচ্ছে আছে।"

সাত্যকি বলল, "এরা গেল কোথায় ? জয়ন্তী দিগিন্দ্র ? সুবোধবাবুর মোটর এসেছিল, না ?"

সারথি বলল, "হাঁ। সুবোধ, দিগিন্দ্র আর জয়ন্তী গেছেন অতীনের বাড়ী।"

দেবকুমার বলল, "কেন হঠাৎ ?"

সারথি বলল, "জানি নে।"—ব'লে সে সত্যিই চৌক আনল। চৌক জেলে বলল, "তোরা চা খেয়ে যাবি, না, না খেয়েই যাবি, কি করবি ?"

দেবকুমার বলল, "করো বড়দা', চা আর অমলেট খাওয়া যাক।"

সারথি চা করতে লাগল। ডিম দুটো ক'রে ডিমের ফুসুমটা একটা কাপের মধ্যে ঢেলে বড়ুর দাহাযো লঙ্কা আর পেঁয়াজ তার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে একটা অ্যালুমিনিয়াম প্যানে ভাজতে লাগল অমলেট। একটা মোড়ায় ব'সে সারথি এই সব করতে লাগল। আর বলল—এদের দিকে চেয়ে, "বেশ লাগে আমার এই সব করতে।"

তার পর চা আর অমলেট খেয়ে এরা দুই ভাই, সাত্যকি আর দেবকুমার, বেরিয়ে পড়ল দারোয়ার দিকে। বিকেল হ'য়ে এসেছে। লোক-জনের ভিড় কিন্তু তত নেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দারোয়ার বালি খুঁড়ে খুঁড়ে জল বার করছে। সেই জল তারা অঞ্জলি ভ'রে ভ'রে খাচ্ছে। দেবকুমার বলল, "এসো মেজদা' আমরাও খুঁড়ি বালি। খুব আয়রন্ না কি সব আছে ঐ জলে।"

সাত্যকি বলল, "তার চেয়ে চল সেই সন্ন্যাসীর কাছে যাই—সেই নিকানো গোবরাকুল দেওয়া বেদী।"

"তাই চলো মেজ দা"—বলে দেবকুমার এগিয়ে চলল।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখে সন্ন্যাসী বিকেলের ম্লান আলোয় ক'াকা বেদীর উপরে ব'সে আছেন। তাঁর সম্মুখে একটা কাদি কাঠ, তার উপরে আর একখানা লম্বা কাঠ বসানো—তার উপরে আর একখানা কাঠ আড়াআড়ি ভাবে রয়েছে প'ড়ে। সেটাও ঐ লম্বা কাঠের সঙ্গে জোড় মিলানো। আড়াআড়ি কাঠখানার উপরে হাত দু'খানা রেখে সন্ন্যাসী ক্রমাগত মাথা নাড়ছেন : আর বলছেন, "বম্ বম্ বম্ বম্।" আর কোন দিকে তাঁর দৃক্‌পাত নেই। সম্মুখের রাস্তা দিয়ে চলেছে কত লোক—তাদের দিকে দৃক্‌পাত নেই। তাঁরা কৌতূহলী হ'য়ে বারে বারে সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে দেখছে। তার পর, কেউ বলছে ভণ্ড, কেউ বলছে, তুমি কি ক'রে জানলে ভণ্ড কি না ! যেমন হয় সাধারণতঃ, গৃহ যা'রা ত্যাগ করেছে, তাদের দিকে চাই

যেমন সংসারী লোক—এ ক্ষেত্রেও তা'র কোন ব্যতিক্রম হয় নি।

দেবুসুধার আর সাতাকি সন্ন্যাসীর কাছাকাছি এসে প'ল। সম্মুখে অসংখ্য গাঁদাফুল ফুটে রয়েছে। সাতাকি সেখানে দাঁড়িয়ে বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে বলল, "দেবু, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? উনি কি আমাদের সঙ্গে কথা কইবেন?"

"এস দেখা যাক্ মেজদা",—ব'লে দেবু আরও এগিয়ে গেল।

সন্ন্যাসী সেই পাতা কাঠখানার উপরে হাত রেখে ক্রমাগত করছেন, "বম্ ববম্ বম্, বম্ ববম্ বম্!"

"চল দেখি",—ব'লে সাতাকিও এগিয়ে গেল। এগিয়ে গেল কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। খানিকক্ষণ তা'র সেই ভস্মবিভূতিমাখা দেহখানার দিকে চেয়ে বেদীর কাছেই ব'সে পড়ল।

সন্ন্যাসীর দৃক্‌পাত নেই।

সাতাকি নিম্নকণ্ঠে বলল, "দেখ দেবু, কেউ বা মালা ঘুরিয়ে করেন জপ, আর এঁদের জপ অন্য রকম। আমার মনে হয়—ব'য়ে চলেছে যে সময়, সেই সময়টিকে জপের মধ্য দিয়ে ধ'রে দিচ্ছেন ইনি।"

"বেশ ভাল 'আইডিয়া' মেজদা',—রবিবাবুর কবিতায় যেন একটা পড়েছি। কবিতা নয় হয় তো, প্রবন্ধ। নিশীথিনী যেন তাঁ'র জপের মন্ত্রটি ফিরে পেয়েছেন। এই রকম 'আইডিয়া'টি।"

"হাঁ হাঁ আমারও মনে পড়েছে বটে। 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা' বোধ হয় সেই প্রবন্ধের নাম।"

"চমৎকার। আচ্ছা মেজদা' এস আমরা ডাকি এঁকে—বলি, আমরা এসেছি, আমি শ্রীদেবসুধার আর তুমি শ্রীসাতাকি—আমরাই বা কম কিসে?"

আরও নিম্নকণ্ঠে সাতাকি বলল, "না, তা' হয় না দেবু। উনি এতে বিরক্ত হ'য়ে যদি অভিশাপ দিয়ে ফেলেন।"

মুখ গম্ভীর ক'রে দেবু বলল, "অভিশাপে বিশ্বাস নেই, ডেকেই দেখা যাক্।"

এই রকম কথাবার্ত্তা, এমন সময় সন্ন্যাসী অকস্মাৎ মুখ তুলে চেয়ে বললেন, "তোমরা কি চাও?"

চমকে উঠে দেবু বলল, "কিছু না, আমরা এমনি বেড়াতে এসেছি।"

একটু হেসে সন্ন্যাসী বললেন, "তা' আমার কাছে কেন?"

নিঃসঙ্কোচে দেবু বলল, "গাঁদা ফুল, নিকানো বেদী আর আপনার বম্ বম্ আমাদের আকৃষ্ট করেছে।"

"বেশ ভাল, আমার কাছে এমন কিছুই নেই যে, তোমাদের খেতে দিতে পারি, এমন কোন ভাল কথা আমার জানা নেই, যা' তোমাদের বলতে পারি।"

সাতাকি নিম্নকণ্ঠে বলল, "তা'তে কি? সাধুসঙ্গ সকল সময়েই ভাল।"

"কথাটা সত্যি, তবে এত অল্প বয়সে সাধুসঙ্গ?"—ব'লে সন্ন্যাসী চোখ তুললেন। দেবুর নিঃসঙ্কোচ কণ্ঠ শোনা গেল, "সাধুসঙ্গ যদি বাঞ্ছনীয় হয়, তা' হ'লে আর বয়সের কথাই আসে না।"

"ঠিক বলেছ, তবে আমাকে অনেকে ভণ্ড মনে করেন। অবশ্য তা'তে আমার কিছু আসে যায় না। আমার কাজটা এখানে ঠিকমত হয়। হয় তো আরো নির্জ্জনে ভালো হ'ত, কিন্তু একটু লোকসান্নিধ্য আমি চাই।" ব'লে সন্ন্যাসী একটু থামলেন। তার পর আবার বললেন, "তোমাদের বয়স কম, কিন্তু তোমাদের বুদ্ধি আছে। তোমাদের মঙ্গল হ'ক।"—ব'লে তিনি আবার সেই আড়াআড়িভাবে পাতা কাঠের উপর হাত তুললেন, তার পর ঘনায়মান সন্ধ্যার অর্দ্ধ অন্ধকারে তাঁ'র প্রশান্ত-গম্ভীর কণ্ঠের বম্ ববম্ বম্ শব্দ উঠতে লাগল।

মৃদু নিম্নকণ্ঠে সাতাকি বলল, "বেশ লাগল এঁদের সঙ্গ।" ব'লে দু'জনে উঠে পড়ল।

তার পর তা'রা দারোয়ার ব্রিজের উপর দিয়ে হাঁটবে ব'লে উঁচু বাঁধের উপর উঠে পড়ল। তা'দের পায়ের চাপে পাথর খ'সে খ'সে পড়তে লাগল বাঁধের গা বেয়ে বেয়ে। সন্ধ্যা তখন হ'য়ে এসেছে। সন্ধ্যার ট্রেণ পার হ'য়ে চ'লে গেছে। একটি দু'টি ক'রে ফুটে উঠছে তারা। সেই স্নিগ্ধ সময়ে তা'রা দু'জন ব'সে রইল সেই বাঁধের উপর। প্রায় ঘণ্টা-খানেক গেল।

এমন সময় এক শার্ট পরা বাঙ্গালী ভদ্রলোক বাইক থেকে নেমে রাস্তার উপর থেকেই তাদের দিকে চেয়ে ডাকলেন, "ওহে শোনো শোনো!"

প্রথমটায় ওরা শুনতে পায় নি। কাকে না কাকে ডাকছেন ভদ্রলোক। তার পর, যখন তা'রা দেখল যে, তাদেরই দিকে তাকিয়ে তিনি ডাকছেন, তখন তা'রা বলল, "কি চাই, কেন ?"

"শোনো হে, একটু নেমে এস বাঁধ থ'রে !"

"যাই", ব'লে দেবুই এগিয়ে গেল। সাত্যকিও পিছু পিছু গেল।

"ওহে, তোমরা কতক্ষণ এখানে ব'সে আছ ?" ভদ্রলোকের যেন বিশেষ ব্যস্ততা, এমনি ভাব।

"কেন বলুন তো, এই ঘণ্টা দুয়েক !"—দেবু উত্তর দিল। "তোমাদের দু'জনের নাম কি বলো ?"—ব'লে ভদ্রলোক মোট বই আর পেন্সিল বার করলেন। সর্ব্বনাশ, নাম কেন জিজ্ঞাসা করে ? দেবু বলল, "কেন, নাম নিয়ে কি হবে আপনার ?"

"দরকার আছে।"

"বলব না নাম।"

"ও আচ্ছা।" পেন্সিল আর মোট বই পকেটে রেখে ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, "আচ্ছা, দু'ঘণ্টা যখন, তখন তোমরা নিশ্চয়ই এখানে একজন সাধুকে দেখেছ !"

"কোন্ সাধু ? কি বৃত্তান্ত ! জানি নে মশায়।"—ব'লে দেবকুমার একটু রূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কে আগে বলুন, তার পর আমাদের কথা।"

"হুহে, এইখানে যে সাধু বম্ বম্ করেন, তাঁরই কথা জিজ্ঞাসা করছি। তাঁকে দেখ নি কি ?"

সাত্যকি ব'লে ফেলল, "ও হাঁ, হাঁ, দেখেছি ঘণ্টাখানেক আগে, এখানেই তো !"

দেবু বলল, "ঐ তো আপনার সামনেই"—ব'লে সাধুর আস্তানার দিকে তাকিয়ে দেবু একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেল। কোথায় সাধু ? কেউ নেই—শূন্য বেদী প'ড়ে। কাঠও নেই, সাধুও নেই। তবে কি তা'রা স্বপ্ন দেখছিল ?

"কি ব্যাপার হে—দেখ নি কি ?" ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

সাত্যকি বলল, "দেখেছি তো, কিন্তু কোথায় গেলেন তিনি ?"

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে তা'দের মুখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "তোমরা তা হ'লে জানো না। না, তোমরা জানোই না মনে হচ্ছে।"—ব'লে তিনি বাইকে উঠে ধীরে ধীরে দেওঘরের দিকে চলতে লাগলেন।

"আশ্চর্য্য মেরদা', কি ব্যাপার কিছুই বুঝলাম না। সাধু গেল কোথায় ?"

ঈষৎ গম্ভীর ভাবে সাত্যকি বলল, "আর এখানে থাকা নয় There are more things in heaven and earth—জানো তো। চলো, তাড়াতাড়ি রেলের লাইন ধ'রে ধ'রে প'রে পড়া যাক। রাস্তাতেই নামব না আর।"—ব'লে সাত্যকি আর দেবকুমার রেলের লাইন ধ'রে ধ'রে চলতে লাগল। [ ক্রমশঃ

---

## দেব-দেবীর পূজার রহস্য

...প্রাচীন ইতিহাসে যেখানেই প্রথমে দৃষ্টি হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, একদিন সমগ্র মানব-সমাজ দেব-দেবীর পূজা অর্চ্চনা সহিত গ্রহণ করিয়াছিল এবং তদ্দ্বারা যে মানুষেরই পার্থিব-মঙ্গলের ও অন্তর্হিত আকাশ-মণ্ডলের বায়ু, তেজ ও জলের সমতা এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে কার্ত্তি-পুষ্টি, ফল-ভোগের ও ভাব-প্রবাহের পূর্ণমাত্রায় প্রাচুর্য্য লক্ষ্য হইত। ফলে, সমগ্র মনুষ্য-সমাজের অনেকেই অধিক দুঃখের হাত এড়াইতে পারিত। যে দেব-দেবীর পূজা একদিন মনুষ্য-সমাজের এতখানি হিত সাধন করিতে পারিত, সেই দেব-দেবীর পূজার আসল বৈজ্ঞানিকতা ও রহস্য বিস্মৃতির গর্ভে লুপ্তায়িত হওয়ায় বহু সহস্র বৎসর হইতে মানুষ আর উহার দ্বারা কোন সুফল লাভ করিতে পারে নাই ও পারে না।...

# আর্য্যশাস্ত্র ও বিবাহ-বিধি

—শ্রীবরদী ভট্টাচার্য্য

সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন প্রচলিত পুস্তকে এত বিভিন্ন মতবাদের প্রতিবাদে কিংবা সমর্থনে এত বহু উক্তি পাওয়া যায় যে, অনেক ক্ষেত্রেই তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া কোন বিশেষ মতবাদ অভ্রান্ত, তাহা প্রচার করা কঠিন হইয়া পড়ে। হয় তো প্রামাণ্যস্বরূপ যে-উক্তির উদ্ধার করা হইল, তাহার অর্থ কালক্রমে এবং অপটু টীকাকারের হস্তে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে, নয় তো মূল গ্রন্থে যে-ভাবে উহার পাঠ দেওয়া আছে, তাহা আদৌ শুদ্ধভাবে পরবর্ত্তী কালে লিপিবদ্ধ থাকে নাই, কিংবা উচ্চারিত হয় নাই। এইরূপ আরও অনেক প্রকার বিপর্য্যয় এতদিনের প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থসমূহের বাপে ঘটিবার সম্ভাবনা। তথাপি বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে যদি মোটামুটি একই অর্থদ্যোতক কতকগুলি নির্দ্দেশ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে সুধিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান সম্বন্ধে এমন একটি বিষয়ের সমর্থনসূচক কতিপয় শ্লোকের উল্লেখ করা হইল—যাহা লইয়া মতভেদ থাকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু এইরূপ মতানৈক্যের মধ্য দিয়াই তো প্রাচীন শাস্ত্রবাক্য সম্বন্ধে প্রকৃত সত্যে উপনীত হইতে হইবে।

বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়টি জটিল—বিবাহ সংক্রান্ত।

আর্য্যশাস্ত্রে দুই প্রকার বিবাহের কথা বর্ণিত হইয়াছে, অনুলোম ও প্রতিলোম। উচ্চ-জাতীয় পুরুষ ও নিম্ন-জাতীয়া স্ত্রীলোকে যে বিবাহ তাহাকে অনুলোম বিবাহ বলে। প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু অনুলোম বিবাহের বিধি ছিল। প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই প্রতিলোমজ রোমহর্ষণ বেদব্যাসের শিষ্য ছিলেন। যখন নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ সৌনকের দ্বাদশ-বার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তখন বেদব্যাস-শিষ্য রোমহর্ষণ বিপ্রগণ মধ্যে উচ্চ আসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৭৮।১৩, ১৪)

পূর্ব্বে ভারতসমাজে অসবর্ণ বিবাহ অবাধে প্রচলিত ছিল। আমরা এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ নানা শাস্ত্র হইতে ক্রমশঃ প্রদর্শন করিয়া আমাদের বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব :

> বিপ্রস্য ত্রীণি বিহিতা যে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য তু ॥৩
> একৎ ভার্য্যা বৈশ্যস্য তথা পুত্রস্য কীর্ত্তিতা।
> ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৭
> ক্ষত্রিয়া চৈব বৈশ্যা চ ক্ষত্রিয়স্য বিধীয়তে।
> বৈশ্যৈব ভার্য্যা বৈশ্যস্য পুত্রা পুত্রস্য কীর্ত্তিতা ॥৮
>
> *
>
> পাণিগ্রাহ্যঃ সবর্ণাসু গৃহ্যোক্তং ক্ষত্রিয়া পশু।
> বৈশ্যা প্রতোদমাদায়োদ্বহেদ্বস্ত্রমেব তু বিধানতঃ ॥১৪
>
> মনুসংহিতা, চতুর্থ অধ্যায়

"ব্রাহ্মণের তিন জাতি কন্যা ভার্য্যা, ক্ষত্রিয়ের দুই জাতি কন্যা ও বৈশ্যের এক জাতীয় কন্যা ভার্য্যা হইবে। শূদ্রের এক জাতীয়া কন্যা ভার্য্যা হইবে।

"ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা; ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা এই দুই জাতীয়া; বৈশ্যগণের বৈশ্যকন্যা মাত্র এবং শূদ্রগণের শূদ্রকন্যা মাত্র।"

মহর্ষি ব্যাসও ঐ কথা সমর্থন করিয়া বলিতেছেন :

> উদ্বাহো হি সবর্ণাসু ন কামাদ্বিধিবৎ।
> অন্যাসূৎপাদিতঃ পুত্রো ন সবর্ণাসু হীয়তে ॥১০
> উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়া বিপ্রো বৈশ্যাং ক্ষত্রিয়ো বিশাম্।

( দ্বিতীয় অধ্যায়, আদিপর্ব্বিকা )

"সবর্ণা বিবাহ করিয়া ইচ্ছা হইলে অন্যবর্ণাকেও বিবাহ করিতে পারে। তাহা হইলে, পূর্ব্ব-পরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভ-সম্ভূত পুত্র অসবর্ণ হইবে না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিতে পারেন, ক্ষত্রিয়ও বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিতে পারে এবং বৈশ্যও শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করিতে পারে।"

ভগবান বিষ্ণু পুনরায় বলিতেছেন :

> সবর্ণাসু অনূঢ়াসু বিধিবদ্দারান্
> লক্ষণা সহ ধর্ম্মকার্য্যং যুঞ্জীত ॥১
> বিধানং চ বক্ষ্যামি সমানবর্ণা ॥২
> সমানবর্ণাসু অনূঢ়াসু ধনগ্রহণোপযোগি চ ॥৩

সবর্ণা বহু পত্নী বিদ্যমান থাকিলে জ্যেষ্ঠা (অর্থাৎ তন্মধ্যে প্রথম পরিণীতা) ভার্য্যার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবে। মিশ্রা (অর্থাৎ সবর্ণা অসবর্ণা) বহুবিধা থাকিলে, সবর্ণা পত্নী কনিষ্ঠা হইলেও তাহার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবে। সমানবর্ণা পত্নীর অভাবে অব্যবহিত পরবর্ণার সহিত ঐ কার্য্য করিবে। (যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি)।

পূর্ব্বে অসবর্ণ বিবাহ যে অবাধে প্রচলিত ছিল তাহা বহু প্রকারেই দেখান যাইতে পারে। অসবর্ণা ও হীনবর্ণা গুরুপত্নীকে কিরূপভাবে সম্বর্দ্ধনাদি করিতে হইবে শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে।

বিষ্ণুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে :

হীনবর্ণাসু গুরুপত্নীষু দূরাভিবাদনং ন পাদোপসংগ্রহণম্ ॥

(ষাত্রিংশোঽধ্যায়)।

"হীনবর্ণা গুরুপত্নীদিগকে দূর হইতে অভিবাদন করিবে। পাদস্পর্শ করিবে না।"

বাহযোগ সম্বন্ধে বিষ্ণুসংহিতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। পাঠকবর্গকে আমরা সেই অধ্যায়টি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তবে প্রমাণ স্বরূপ আমরা উহা হইতে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি :

ব্রাহ্মণস্য চতস্রো বর্ণাসু তিস্রো ভবন্তি
দ্বে ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োরেকা বিজ্ঞেয়া ॥১
তত্র ব্রাহ্মণীপুত্রশ্চতুরোঽংশান্ হরেৎ ॥২
ক্ষত্রিয়াপুত্রস্ত্রীন্ ॥৩।
বায়ংশৌ বৈশ্যাপুত্রঃ ॥৪।
শূদ্রাপুত্রস্ত্বেকম্ ॥৫
দ্বিজাতীনাং পুত্রাভাবে পুত্রোঽর্দ্ধহরঃ ॥৬

ব্রাহ্মণের যদি চতুর্ব্বর্ণীয়া স্ত্রীতেই পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহারা (যথাকালে) পৈত্রিক ধন দশধা বিভক্ত করিবে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণীপুত্র চারি অংশ, ক্ষত্রিয়াপুত্র তিন অংশ, বৈশ্যাপুত্র দুই অংশ এবং শূদ্রাপুত্র একাংশ গ্রহণ করিবে। দ্বিজাতিগণের একমাত্র পুত্র শূদ্র হইলে সে অর্দ্ধাংশের অধিকারী হইবে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :

চতুর্ভিরেকজাতাঃ স্যুর্বর্ণশো ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
ক্ষত্রধর্ম্মিণ্যেকজাতা বিড়্জাস্তু যোনিজাসিতু।

(দ্বিতীয় অধ্যায়, ব্যবহার প্রকরণ)

"চারিজন (ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই চতুর্ব্বর্ণীয়া পত্নীর গর্ভজাত, ব্রাহ্মণপুত্র বর্ণানুক্রমে সমস্ত পৈত্রিক ধনের চারিভাগ, তিন ভাগ, দুই ভাগ এবং এক ভাগ; তিন জন (ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা এবং শূদ্রা—এই ত্রিবর্ণীয়া পত্নীর গর্ভজাত) ক্ষত্রিয়পুত্র বর্ণানুক্রমে তিন ভাগ, দুই ভাগ, এক ভাগ; এইরূপ দুইজন (বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভজাত) বৈশ্যপুত্র দুই ভাগ এবং শূদ্রপুত্র এক ভাগ প্রাপ্ত হইবে।"

অতঃপর দাহাদির কথা উল্লিখিত হইয়াছে :

পিতরং মাতরঞ্চ পুত্রা নির্হরেয়ুঃ ॥১
ন দ্বিজঃ পিতরমপি শূদ্রঃ ॥২

(একোনবিংশ অধ্যায়, বিষ্ণুসংহিতা)

"পুত্রগণ পিতামাতার নির্হরণ (শববহন দাহনাদি) করিবে। কিন্তু পিতা দ্বিজ হইলে শূদ্রপুত্র তাহা (নির্হরণ) করিবে না।" অর্থাৎ শাস্ত্রকার ক্ষত্রিয় বৈশ্য পুত্র দ্বারা মৃত ব্রাহ্মণ পিতার শববহন দাহনাদি করিতে পারিবে, শুধু শূদ্রপুত্র দ্বারা এ কাজ চলিবে না, এইরূপে নিষেধ বিধি করিয়া দিলেন। ইহা দ্বারাও অসবর্ণ বিবাহ প্রতিপন্ন হইতেছে।

এক্ষণে আমরা জাতকর্ম্মাদি সংস্কারের কথা উভয় শাস্ত্রকারগণ কি বলিয়াছেন তাহাও পাঠকবর্গের গোচরীভূত করিতে চাহি।

তাঁহারা বলেন :

"বিপ্রবিপ্রবিবাহাসু ক্ষত্রিয়াসু দ্বিজন্মনঃ।
জাতকর্ম্মাদি কুর্ব্বীত তন্ত্রঃ পুত্রেষু পুত্রবৎ ॥১
বৈশ্যাসু বিপ্রক্ষত্রাসু তন্ত্রঃ পুত্রেষু পুত্রবৎ।"

(প্রথম অধ্যায়, ব্যাসসংহিতা)

"ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা যে ব্রাহ্মণকন্যা, তাহাকে বিপ্রবিদ্যা কহে। বিপ্রবিদ্যা পত্নীতে সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ব্রাহ্মণের মত করিবে। ক্ষত্রবিদ্যা পত্নীতে (ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্র কন্যাকে ক্ষত্রবিদ্যা বলে) জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ক্ষত্রিয়জাতির ন্যায় করিবে। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্রাকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার শূদ্রের ন্যায় করিবে। ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বিবাহিতা বৈশ্যকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার বৈশ্যজাতির মত করিবে এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য কর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্রাকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার শূদ্রজাতির ন্যায় করিবে।"

সর্ব্বশেষে অসবর্ণ বিবাহের প্রমাণ স্বরূপ আর একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আমরা এ আলোচনা শেষ করিব।

কাত্যায়নসংহিতা বলিতেছেন :

কর্ম্মণোরুভয়োর্হোমে সবর্ণাগ্নিস্তু লক্ষয়েৎ।
কামতস্তুদ্বহেদ্যদি সবর্ণৈবন্তু পূর্ব্বতঃ ॥ আদ্যঃ খণ্ডঃ।

"ব্রাহ্মণের সবর্ণা অসবর্ণা বহুপত্নী থাকিলে, বর্ণজ্যেষ্ঠতা-প্রযুক্ত সবর্ণা সাধ্বীপত্নিগণও অগ্নি সংস্করণ ঔদ্ধেদ্যে হবন করিবে। তন্মধ্যে অতি নিপুণা একজন বা ইহাদিগের মধ্যে

যে কোন একজন পত্নী গ্রহণ করিবে। তদভাবে দ্বিজাতি জাতীয়া অসবর্ণা যে কোন পত্নীও বিশেষরূপে অগ্নিগ্রহণ করিতে পারিবে।"

অনুলোম বিবাহ সম্বন্ধে মনুসংহিতায় ত্রয়োদশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে :

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥১৩॥
( ৩য় অঃ মনু )

শূদ্রাই কেবল শূদ্রের ভার্য্যা হইবে, শূদ্রা এবং বৈশ্যা বৈশ্যের বিবাহযোগ্যা। শূদ্রা, বৈশ্যা এবং ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয়-বর্ণের বিবাহযোগ্যা এবং শূদ্রা, বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের বিবাহযোগ্যা হইবে।"

অনুলোম বিবাহ সম্বন্ধে মনুসংহিতায় অন্যত্র লিখিত হইয়াছে :

পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাসূপদিশ্যতে।
অসবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্মণি ॥৪॥
শূদ্রা ক্ষত্রিয়য়া প্রোক্তঃ প্রতিলোমা স্বয়া ন চ।
ন চৈবাত্মানুলোম্যেন দ্বয়োরাপদ্গতাপি সা ॥৫॥
( মনু—তৃতীয় অধ্যায় )

"শাস্ত্রে সবর্ণা স্ত্রীতেই পাণিগ্রহণ সংস্কারের বিধি আছে। অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহকালে পাণিগ্রহণের পরিবর্ত্তে বক্ষ্যমান বিধিই প্রশস্ত। শূদ্রাদি নিকৃষ্ট বর্ণের অন্তর্গত বংশসমূহ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবংশের সহিত বৈবাহিক সূত্রে বদ্ধ হইয়া উচ্চবংশত্ব প্রাপ্ত হইত।"

এ সম্বন্ধে মনু বলিতেছেন :

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যুদ্বহনাদধঃ ॥৬॥
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈব চ ॥৭॥
( মনুসংহিতা, দশম অধ্যায় )

"স্বপত্নী শূদ্রাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতা পারশব-নাম্নীকন্যা যদি অন্য ব্রাহ্মণ বিবাহ করে এবং তাহার কন্যাকে যদি অপর ব্রাহ্মণে বিবাহ করে এবং এইরূপ ব্রাহ্মণ সংসর্গ যদি ধারা-বাহিক সাত পুরুষ পর্য্যন্ত হয়, তবে সপ্তম জন্মে ঐ পারশবাখ্য বর্ণ, বীজের উৎকর্ষের জন্য ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং জন্মে যেমন শূদ্র ব্রাহ্মণ হয় তদ্রূপ ব্রাহ্মণেরও শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ জানিবে।"

এ সম্বন্ধে আর অধিক শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। আমরা আর একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই আলোচনা এইখানেই শেষ করিব। অনুলোম বিবাহ ( অসবর্ণ বিবাহ ) তৎকালে যে কোনরূপ দোষাবহ ছিল না, এরূপ অনুমান করা অন্যায় হইবে না। বস্তুতঃ পূর্ব্বযুগে বিবাহ ব্যাপার এ কালের ন্যায় বাঁধাবাঁধি রীতিতে নিবদ্ধ ছিল না।

মনু নবম অধ্যায়ে বলিতেছেন :

অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাধমযোনিজা।
শার্ঙ্গী মন্দপালেন জগ্মাভ্যুদয়নীয়তাম্ ॥২৩॥
এতাশ্চান্যাশ্চ লোকেঽস্মিন্নপকৃষ্টপ্রসূতয়ঃ।
উৎকর্ষং যোষিতঃ প্রাপ্তাঃ স্বৈঃ স্বৈর্ভর্তৃগুণৈঃ শুভৈঃ ॥২৪॥
( মনুসংহিতা, নবম অধ্যায় )

"নিকৃষ্ট কুলসম্ভূতা অক্ষমালা এবং পক্ষিণী শার্ঙ্গী ক্রমান্বয়ে ঋষি বশিষ্ঠ ও মন্দপালের সহিত উদ্বাহসূত্রে মিলিত হইয়া পরমসাধ্বী হইয়াছিলেন। উক্ত রমণীদ্বয় এবং সত্যবতী প্রভৃতি আরও কতিপয় রমণী অপকৃষ্ট বংশীয়া বা অপকৃষ্ট যোনিজা হইলেও স্বকীয় গুণে সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন।"

মনু অন্যত্র বলিয়াছেন :

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥২৩৮॥
বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যমমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্।
নীচাদপ্যুত্তমা বিদ্যা স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥২৩৯॥
বিদ্যাধনং সুমহদ্যদ্গুরুরাহ সতোঽবরাদপি।
যদ্ধি কস্যচিদাদত্তে তত্তস্মিন্ বয়সাত্যয়ে ॥২৪০॥
( মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায় )

"শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইতর লোকের নিকট হইতেও শ্রেয়স্করী বিদ্যা গ্রহণ করিবে। অতি অন্ত্যজ চণ্ডালাদির নিকট হইতেও পরম ধর্ম্ম লাভ করিবে এবং স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলজাত হইলেও গ্রহণ করিবে ।২৩৮॥ স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ, হিত কথা এবং বিবিধ শিল্পকার্য্য সকলের নিকট হইতে সকলে লাভ বা শিক্ষা করিতে পারে। ২৪০॥"

এ বিষয়ে আরও বিভিন্ন স্থানে এই বিষয়ের সমর্থনসূচক শ্লোকাদি দৃষ্ট হইবে। এই সকল দৃষ্টে মনে হয়,—হয়, যে-সময়ের কথা ইহাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখনকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের অংশবিভাগ বর্ত্তমান কালে আর দেখা যায় না, নয়, বর্ত্তমান কালের সংস্কার দ্বারা সে-যুগের কোন বিষয়ের বিচার করিতে যাওয়া অনুচিত। উভয়তঃই যুক্তির এবং এই উভয়েরই স্বপক্ষে কিংবা বিপক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে।

লেখক এ বিষয়ে শেষ মত দানে অসমর্থ। সুতরাং স্বপক্ষ কিংবা বিপক্ষ কোন দলের কাহারও মধ্যেই না গিয়া এই স্থানেই ইহার উপসংহার করিতেছি। বিষয়টি যদি সুধীবৃন্দের আলোচ্য হয়, তাহা হইলেই যথেষ্ট।

# অতিদীর্ঘে জীবিতে

—শ্রীবিনয় চৌধুরী

সইয়ের বাড়ীটা ও পাড়ার ঠিক-ই, কিন্তু সেটা ছুতা। আসল পাড়া-বেড়ানিয়া মেয়ে পুঁটি। তিন চার বছর পরে সে বাপের বাড়ী আসিয়াছে, এই তিন চার বছর সে বড় ঘরের মধ্যে ফাটাইয়াছে, সেই কাঁচা-মুরুক মৌলমীনে; একটু বাহির হইতে পায় নাই, আবার সেই ঘরের মেয়ে ফিরিয়া যাইতে হইবে মাস খানেক পরে!

দুটি ভাত মুখে দিয়াই পুঁটি বাহির হইয়াছিল। ছোট ভাইটী একবার ডাকিয়া গিয়াছে, তার ছেলে কাঁদিতেছে। কিন্তু কতক্ষণই বা সে আসিয়াছে, কটা কথাই বা বলিয়াছে, শীতের বেলা, কোন্ দিক দিয়া যে কাটিল, পুঁটি টেরই পায় নাই।

সুন্দরী মেয়ে পুঁটি। রূপের জোরেই তার বড় ঘরে বিবাহ হইয়াছে; বিরাট কাঠের ব্যবসা তার শ্বশুরের বর্তমান, প্রকাণ্ড বাড়ী, প্রচুর লোকজন, অজস্র আদর যত্ন, স্নেহ-প্রবণ শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রেমময় স্বামী, গা-ভরা সোনা ও জড়োয়া। রূপে, আহ্লাদে আর পূর্ণতার তৃপ্তিতে আলো প্রতিফলিত হীরার টুকরার মত পুঁটি ঝলমল করে।

বেশ শীত পড়িয়াছে, দুই হাত বুকের উপর জড় করিয়া পুঁটি চক্রোত্তি বাড়ীর পিছন খিড়কীর সুঁড়ি পথটী দিয়া হন হন করিয়া আসিতেছিল।

ঠিক পথের উপরেই ঘরাবুড়ী পড়িয়া ছিল।

খেজুর পাতার পাটি, ছেঁড়া চট, মরলা চিটকুট কাঁথা আর তেমনি দুর্গন্ধ, ছেঁড়া লেপের টুকরা—সমস্ত আওতে আর আচ্ছাদন। কাঁথা খানা বুড়ীর গায়ে, লেপের টুকরা গুলা পড়িয়া পায়ের গোড়ায়। ঠাণ্ডা, কনকনে শীতে বুড়ীর হাড় পর্যন্ত কাঁপিতেছিল, অন্তরীন বাড়িতে বাড়িতে ঠুকিয়া শব্দ হইতেছিল ঠক্‌ঠক্। ঘরাবুড়ী সুদূরসুওলী পাকাইয়া—স্খলিত কণ্ঠে একটানা ছড়া কাটার মত বিড়্‌বিড়্‌ করিতেছিল—"ওরে আমি গিচি, গিচি!"

সে দিনের মত লেপ কাঁথা জড়াইয়া বৈকালে বুড়ী বেশ ঘুত করিয়া শুইয়াছিল, কিন্তু খানিক আগে বিপিনের ছেলে নাড়া আসিয়াছিল এবং মজা করিতে খানেকা চেঁচাইয়া উঠিল—"সাপ সাপ!" বুড়ীর মরণ, তাই সর্বাঙ্গের বেদনা ভুলিয়া ছাড়ার কথায় লেপ কম্বল ফেলিয়া বড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়াছিল। হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে ছাড়া আগাইয়া আসিয়া বলিল, "কি হয়েছে ঠাকুমা?"

"কি হয়েছে, অপদার্থের ডাকরা কোথাকার!" বুড়ী বিড়্‌ বিড়্‌ করিতে করিতে শুইয়া পড়ে এবং ছাড়াকে গায়ে লেপ কাঁথাগুলা তুলিয়া দিতে বলে। শীতে, জরায় এবং বিপিনের ঠাট্টাদির চোটে বুড়ীর সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে, নড়িতে পারে না। ছাড়া বিছানার পাশে উঁচু হইয়া বসিয়া বলে, "বুড়ী মরবে কবে? এমন শীতকালটা যাচ্ছে, একদিন—না, না সত্যিই বলছি, কাঁধে করে নিয়ে যাবো তোমাকে···!"

বুড়ী মরিতে চায় না। কে-ই বা চায়? রাগিয়া বলে, "তুই মর পোড়ার-মুখো তোর ছেরাদ্দের চাল চড়াই আমি।"

'সে ত অনেক দেরি, তখন কি আর বাঁচবে তুমি?'—ছাড়ার হাসি থামে না, ঘরাবুড়ীর বেদনাতুর আড়ষ্ট গা জ্বলিয়া যায়, চুপ করিয়া থাকিয়া বলে, 'দে না মাগা গায়ে—ঐ গুলো তুলে দে, দে লক্ষ্মী সোনা!" কিন্তু ছাড়া ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে। বুড়ী অতিকষ্টে কাঁথা খানা তুলিয়া লইয়াছে অনেক চেষ্টায়।

অন্যমনস্ক পুঁটি প্রথমটা লক্ষ্য করে নাই, পাশ কাটাইয়া চলিয়াই গিয়াছিল প্রায়, বুড়ীর কথা শুনিয়া সে দাঁড়াইল।

"কেডা তুমি, কেডা যাচ্ছ তুমি?" ছানি-পড়া ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি মেলিয়া বুড়ী বার বার প্রশ্ন করে। "ওগো আমার গায়ে এ গুলো তুলে দিয়ে যাও দিনি, তাও দিনি এট্টু তাও, শীতি মলাম যে···!"

গ্রামের মেয়ে পুঁটি, তবু কেমন হতভম্ব হইয়া যায়, তিন চার বছর পরে আজ সকালেই মাত্র সে এ দেশে আসিয়াছে, ইতিমধ্যে তার অজ্ঞাতে এখানে কতকিছু ঘটিয়াছে! কোথাকার লোক, কি বৃত্তান্ত, পুঁটি তার বিন্দু-বিসর্গ জানে

না, কোন দিন জীবনে দেখেও নাই বুড়ীকে, সারা গ্রামে কোন বাড়ীতে আশ্রয় দিবার মত যার কেহ নাই, পথে পড়িয়া যার দীর্ঘ শীতের রাত্রি কাটে, সেই জাতি-ভ্রষ্ট-অজানা বুড়ীর কর্দ্দম দুর্গন্ধ অসাড়-যাত্রীর বিছানা স্পর্শ করিবার আগে পুঁটি মুহূর্ত্ত কাল ইতস্ততঃ না করিয়া পারিল না।

"কেন, তুমি নিজেই নাও না।"

"ওরে পারছি নে রে, পারছি নে! পারবার জো রাখেনি বিপুনে, মেরে ফেলেছে আমারে, একেবারে মেরে ফেলেছে।" —বলিয়া বুড়ী কাঁদিয়া ফেলে, "দে মা আমার গায়ে ওগুলো তুলে, তুই আমার শতজন্মের মা, দে না!"

"কে ও, পুঁটি নাকি রে? কবে এলি?" খড়ম খট্ খট্ করিয়া ভট্টাচার্য্য মশাই বাগানের বেড়ার ছড়কার কাছে আগাইয়া আসিলেন। বয়স ষাটের কাছাকাছি, খান পরনে, গায়ে রীলাপোষ, মাথায় টাক, দাড়ি গোঁফ কামানো দিব্য—বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক চেহারা।

"বলি, পাঁচটায় পুরে রেখেছিলো না কি রে সে তোকে? একেবারে যে তিন চার বছর কাবার করে এলি? আহা, আহা, এদিকে আর দেখি।"

পুঁটি সলজ্জ হাসিয়া বলে, "যাই ঠাকুরদা।"

"ওরে দিয়ে যা, দিয়ে যা ওগুলো আমার গায়ে তুলে। ওরে আমার কেউ নেই রে, আমার কেউ নেই। ওরে আমার কঠিন প্রাণ কিছুতে বের হয় না রে, কিছুতে হয় না!" একটানা ছড়া-কাটার মত বুড়ী বলিয়া যায়।

পুঁটি বুড়ীর গায়ে লেপ-কাঁথাগুলা তুলিয়া দিয়া ভট্টাচার্য্যির দিকে আগাইয়া গেল, কিন্তু ভট্টাচার্য্যি ত্রাসে শিহরিয়া উঠিল: "ছুঁলি, ছুঁলি তুই ঐ সব এই সন্ধ্যেবেলায়! যাও, চান করগে এখন।"

বুড়ী কেংচাইয়া বলে, "ছুঁলি! ছুঁলি! কেন ছোঁবে না কেন শুনি? আমি মুচি না মেথোরাণী? তারী আমার ভট্টপাড়ার ঠাকুর এলেন!"

বিস্মিত পুঁটি বলে, "তা না হয় করছি গিয়ে, কিন্তু হল কি?"

"হল কি? বলি, একেবারে কি খৃষ্টান ক'রে ছেড়েছে না কি সে ছোঁড়া? ঐ নোংরা, অপবিত্র সাত্ত্বিক কাজের ছোঁয়া-লেপ বালিশ-বিছানা মলান বসনে ছুঁয়ে বলি, 'কি হল?' না বাপু না, এখন আর সোমান করতে যাবে না তোমাকে, তোমাদের রক্তের তেজ আছে, তোমাদের সহ্য হবে। বুড়ো মানুষ, রাত্রে চান আমার সইবে না।"

"শুনিস নে মা তুই ওর কথা, শুনিস নে, মরার আগে বুড়ো বামুনের ভীমরতি ধরেছে, দে মা দে পিঠের নীচে গুঁজে দে, হাঁ ঐ যেনটা হয়েছে, এই দেখ, কানের পাশটা দিলি নে? হাঁ হাঁ, হয়েছে এইবার হয়েছে, বেঁচে থাক আহা বেঁচে থাক। কি নাম তোর বললে যেন? ওরে তোর নাম কি, তুই কার মেয়ে রে, কার মেয়ে তুই?"

পুঁটির জবাব দেওয়ার প্রয়োজন হইল না, বুড়ী পরম আরামে জড়সড় হইয়া চোখ বুজিল এবং এতক্ষণের এত কাণ্ডের পর তার মনে কোন উদ্বেগ রচিয়াছে মনে হইল না। পুঁটি বিস্মিত হইয়া নিস্তব্ধ হইল। বোকার মত মিনিট খানেক দাঁড়াইয়া পুঁটি বাড়ী চলিয়া গেল।

অনেক বছর আগে, এখন যাদের বয়স পঞ্চাশ, তাঁদের জন্মেরও বহু পূর্ব্বে, সেই পুরাকালে মাত্র আট ন বছর বয়সে ভট্টাচার্য্যি মশাই-এর বড় ভাই অভিলাষের চাদরের গাঁটছড়া ধরিয়া দয়াময়ী প্রথম এই গ্রামে আসিয়াছিল। কখনও কাঁদিয়াছিল, ঘোমটার ফাঁকে কৌতূহলী-দৃষ্টি মেলিয়া নতুন জায়গা, নতুন লোকজনের মাঝখানে কখনও কাঁদিতে ভুলিয়াছিল। সংসারের বড় বউ, কোমরে সৈঁছা ঝুলাইয়া, মল বাজাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। শ্বশুর-শাশুড়ীর আনন্দ আর ধরিত না, কিন্তু দয়াময়ীর সন্তান-ধারণের বয়স হইবার আগেই একদিন সাপের কামড়ে অভিলাষের মৃত্যু হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনের চাকাও ঘুরিয়া গেল। বিধবা হইয়া দয়াময়ী খেয়ার নৌকার মত একবার বাপের বাড়ী, একবার শ্বশুর-বাড়ী করিতে লাগিল। কতদিন কাটিল, নিঃসন্তান বিধবা বামনী সকলেরই প্রয়োজনে লাগে, যেখানেই যায়, যত্ন পায়। তরা বয়সে শরীর যেমন মজবুত, শক্তির যেন তেমনি সীমা ছিল না, ক্রিয়া-কর্ম্মের বাড়ীতে দয়াময়ীর ডাক আছেই। কোলা কোলা জল তুলিতেছে, বড় বড় ডাবের ডেকচি একলা নামাইতেছে, হাসিতেছে, নাচিতেছে, পরিশ্রমের যেমন বিরাম নাই, স্ফূর্ত্তির তেমনি ঘাটতি নাই।

তারপর আরও কতদিন কাটিল, বাপ মা মরিল, ভাই-এর সংসারে ধন্যাময়ীর তেমন বনিল না, সে শ্বশুরবাড়ী আস্তানা লইল। শ্বশুর আগেই মরিয়াছিল, কিছুদিন পরে শাশুড়ীও মরিল, বছর খানেকের মধ্যে সংসার ভাঙিল, ভাই-এ ভাই-এ ভিন্ন-ভাত হইল এবং প্রয়োজন অনুসারে ইহার উহার সংসারে ধন্যাময়ীর দিন কাটিতে লাগিল। এইভাবেও কতদিন কাটিল, তারপর একদিন সকলের অজ্ঞাতে ধন্যাময়ী গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কেহ বলিল, মরিয়াছে, কেহ বলিল, মজিয়াছে, কেহ বলিল, কাশী গিয়াছে। সে আজ ত্রিশ বছরের কথা।

বছর খানেক আগে একদিন ধন্যাময়ী আসিয়া হাজির হইল, সঙ্গে একটী পেটরা, গায়ে একখানা নামাবলী। একেবারে থুরথুরে বুড়ী—কীণদৃষ্টি, লোলচর্ম, বস্তুহীন, পাকাচুল। কুঁকিয়া-পড়া শরীর কোন রকমে চালাইয়া লইয়া বেড়ায়। বলিল, কাশীতে ছিল, কিন্তু আর চলিল না, তাই আপনার লোকের আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিয়াছে।

কেহ অভ্যর্থনা করিল না, বসিতেও বলিল না, তবু ধন্যাময়ী দেবর কটুচোখো মশাই-এর বাড়ীতেই গিয়া উঠিল। কিন্তু তিনটি মাস গেল না, বাহির হইতে হইল। তারপর নীলকণ্ঠ, তারপর হাজরা বাগ, মসমথ—অবশেষে বিপিন আশ্রয় দিল।

বিপিন লোকটা একটু বেয়াড়া গোছের, যেমন নির্বোধ, তেমনি একরোখা। আবার ভাল মানুষও বটে, হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিলে বিপিন তার জন্য প্রাণপাত করিতে পারে, তখন আর নিজের স্ত্রী-পুত্রেরও খাতির রাখে না। বুড়ীর দুর্ভাগ্য দেখিয়া তার মন গলিয়াছিল, স্ত্রীর হাজার ওজোড় আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়াও সে ধন্যাময়ীকে স্থান দিল। কেন, তার যদি বুড়ী মা থাকিত, বউ কি ছেলে মেয়ের হাত ধরিয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইত? যুক্তি অকাট্য, বউ হার মানিল, কিন্তু প্রসন্ন হইল না এবং আধো ঘায় উপর খুসী হওয়া গেল না, তার সামান্য ত্রুটিও বৃহৎ হইয়া দাঁড়াইল এবং তাকে হাজারো রকমে তাচ্ছিল্য করিতেও বাধিল না।

অনেকগুলা ছেলেমেয়ে বিপিনের, তাদের লালনপালনে এবং সংসার ঠেলিতে ঠেলিতে বউ-এর হাত কালি হইল। মুখের তার বিশ্রাম নাই, না হাতেরও। মনের কালি সে ছোট ছোট ছেলে মেয়ের পিঠে ঝাড়ে, আকাশ ফাটাইয়া তারা যখন কাঁদিতে থাকে, বুড়ী ডাকিয়া বলে, "কেন বউমা মার? বালক, ওদের কি কোন জ্ঞান আছে?"

বউ মুখ সিঁটকাইয়া বলে, "হাঁ, যারা বালক নয়, তাদেরই ভারী আছে, ওরা তো বালক! কথা শুনলে গা জ্বলে যায়।"

বুড়ী চুপ করিত, কি এমন গা জ্বলিবার মত কথা বলিল, ভাবিয়া পায় না। ছেলেমেয়েগুলাও দুরন্ত, শাসন মানে না, কদিনের মধ্যেই বুড়ীর প্যাটরাটীর উপর চড়িয়া, বসিয়া, লাফাইয়া সেটী ভাঙিয়া রাখিয়াছে, নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমও জপ করিবার জো নাই বুড়ীর। ছুঁইয়া, লেপিয়া, গায়ের উপর পড়িয়া, বিছানা মাদুর টানিয়া অনর্থ বাধাইয়া দেয়। জরাজীর্ণ শরীরে ধন্যাময়ীর এ সকল সহ্য করিতে ক্ষমতায় কুলায় না। মিষ্ট কথায় না শুনিলে বুড়ী রাগিয়া উঠিয়া বলে, "বেরো বেরো, দূর হ' অবাঃপেতে ছেলে-পিলে।" তারা মুখ ভেংচাইয়া মুখের কাছে তুড়ি মারিয়া বলে, ইস্নি? বুড়ী দিশেহারা হইয়া বলে, "মর, মর বাঁদরমুখো ছেলে।"

বউ-এর তাহা গায়ে বাজে, সে ছুটিয়া আসিয়া ছেলে-মেয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া বাহির করে, তারপর পিটিতে থাকে হাতের সুখ করিয়া।

"খাবি আর হারামজাদা? খাবি? সোহাগ করার জায়গা পাও না আর?" বুড়ী ম' হইয়া যায়। তবু বলে, "কথা বললেই যদি এত তাত-তত্ত্ব লাগে ত না আসতে দিলেই পার ছেলে মেয়ে! ডাকতে ত যাইনে, আসে কেন তারা?"

বউ বলে, "ভাল রে ভাল, নিজেদের বাড়ী-ঘরে ছেলে-পিলে বেড়াবে না ত কি যাবে ঐ মোকামতলার হাটে? কথা শুনলে গা জ্বলে যায়! কথায় বলে—উড়ে এলো চিল, জুড়ে বসল বিল—এ যে আমার তাই হলো।"

সময় মত সকল কথাই বিপিনের কানে ওঠে, কিন্তু প্রথম প্রথম বিপিন কোন কথাই কানে তুলিত না, উলটিয়া বুড়ীকে নানা রকমে বুঝাইত বউ-এর কান বাঁচাইয়া। কিন্তু জীবনের শেষ সীমান্তে পৌঁছিয়া ধন্যাময়ীর যেন ভাল-মন্দের আর কোন পরোয়া ছিল না, তার একান্ত অসহায় অবস্থাটা তাকে ভিতরে ভিতরে পাগল করিয়া তোলে। সামান্য ছুতা-নাতায় বউ-এর সঙ্গে তার তুমুল ঝগড়া বাধিয়া যায়, এবং তার মুখেরও কোন বাঁধ থাকে না।

এমনি কপড়ার সময়ে সে যেন পাড়া আসিয়া বলিল, "ও বুড়ী অত চেঁচাচ্ছ কেন! যম রাজার বাড়ী পর্য্যন্ত খবর চলে গেল যে। এখুনি আসছে তারা!"

বুড়ী চেঁচাইতে পারে না, টানিয়া টানিয়া ছড়া কাটার মত করিয়া কথা বলে। পাড়ার কথা শুনিয়া খানিকক্ষণের জন্য চুপ করে।

পাড়া আবার বলে, "ও বুড়ী ও তুমি মরবে কবে? বল হরি হরি বোল।"

বুড়ী আর স্থির থাকিতে পারিল না, নিষ্কৃতি যেন তাকে ঠেলিয়া লইয়া যায়। হাতের কাছে ছিল একটা ঘটি, সে পাগলের মত অন্ধ আবেগে সেটা ছুঁড়িয়া মারিল পাড়াকে। পাড়া প্রস্তুত ছিল, সে চট করিয়া সরিয়া গিয়া বাঁচিল, কিন্তু প্রস্তুত ছিল না বিপিন, সে সেই মাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ঘটিটা আসিয়া তার হাঁটুতে আঘাত করিল। আঘাত সামান্যই, তবু বয়স্কাগী বিপিনের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট, সে দয়াময়ীর কাছে গিয়া বলিল, "যাও বাপু চের হয়েছে। যাও, আমার বাড়ী থেকে বেরোও।"

কিন্তু বিপিন বলিলেই দয়াময়ী চলিল আর কি! সে তার চরম অস্ত্র ছাড়িল—কেন, তার অংশ নাই জমিজমায়! ওর দরিকে তারা খাইতেছে না এ যাবৎ তার অংশের আয়! ধিক তার ষোল আনা বুঝাইয়া, তবে সে নড়িবে এখান থেকে!

বটে এত বড় কথা—বিপিন ছুটিয়া গিয়া বুড়ীর কাঁথা মাদুর টান মারিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল উঠানে এবং বুড়ীকে দিল সজোরে এক ধাক্কা। দাওয়ার খুঁটি আঁকড়িয়া ধরিয়া ছিল দয়াময়ী, ধাক্কার বেগে হাত ফসকাইয়া নীচে গিয়া মুখ থুবড়াইয়া পড়িল, এবং আরও দুই তিন ধাক্কায় সে ভিটার বাহিরে গিয়া পৌঁছিল। বাপের কথায় পাড়া বুড়ীর বিছানা-মাদুরগুলা বহিয়া দিয়া আসিল।

বউ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। তবু বলিল, "গায়ে হাওয়া না লাগলেই পারতে, বুড়ো মানুষ—আহা!"

বিপিন কথা বলিল না, গুম হইয়া রহিল।

সারারাত্রির উপবাসে, গায়ের বেদনায় বুড়ী আর বেশী দূর যাইতে পারিল না। সমস্ত গ্রামের গৃহস্থ জীবনযাত্রার প্রতি নিষ্ঠুর বাঙ্গের মত সারা রাত্রি পথেই পড়িয়া রহিল।

দিন দশেক পরে।

চক্রোত্তিদের পোড়ো বাড়ীর শেষ ঘরখানা পড়িয়া গিয়া সামনের দেয়ালটা মাত্র খাড়া ছিল। তারই মাথায় কাৎ হইয়া দাওয়ার চাল আটকানো ছিল, দয়াময়ী হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে সেই দাওয়ায় আসিয়া উঠিয়াছে, এবং কয়দিন তার কাটিয়াছেও সেখানে। দুপুর বেলা ঐ দাওয়ায় বসিয়া সে যথাসম্ভব গলা চড়াইয়া হাঁকিতে থাকে, "ওরে তোরা আমাকে দুটো খেতে দে, দুটো খেতে দে।" যেদিন যে বাড়ীর দয়া হয়, তারা বুড়ীকে দুটো ভাত দিয়া যায়। সেদিন কেহ খেয়াল করে না, সেদিন বুড়ীর উপবাসে কাটে। পুঁটি ওপাড়া হইতে আসিয়া দু'তিন দিন ভাত দিয়া গিয়াছে, লেবু বেদানা আঙুর আনাইয়া এবং একখানা নতুন কাপড় কিনিয়া বুড়ীকে দিয়াছে। তারী আহ্লাদ বুড়ীর কাপড় খানা পাইয়া! অবিকল ছেলেমানুষের মত, কতবার দেখিল, কতজনকে ডাকিয়া দেখাইল, পুঁটিকে আশীর্বাদ করিল, "বেঁচে থাক মা, বেঁচে থাক।"

পুঁটির ইচ্ছা ছিল বুড়ীকে তাদের বাড়ী লইয়া আসে। টাকা সে দিবে, কেবল একটু দেখাশোনা করা—কিন্তু তার মা এই গ্রামেরই বউ, আপনার জনে যাকে ঠাঁই দিল না, যাচিয়া সেই ছেঁড়া কন্থাটা গায়ে জড়াইতে আদৌ রাজী নয়। অগত্যা পুঁটি এ পাড়া ও পাড়া করিবার ফাঁকে দিনান্তে একবার বুড়ীকে দেখিয়া যায়।

বুড়ী কিন্তু পুঁটিকে চিনিতে পারে না। রোজই জিজ্ঞাসা করে, এবং পুঁটি পরিচয় দিলে বলে, "ও কুখনের মেয়ে, কার্ত্তিক-ঠাকুরপোর ছেলে কুখন, তার মেয়ে তুমি? আহা, লক্ষ্মী পিরতিমে যেন, বেঁচে থাক!" কিন্তু পরক্ষণেই ভুলিয়া যায়। নতুন করিয়া কোন কিছু জানিবার, মনে রাখিবার, ক্ষমতা যেন দয়াময়ীর লোপ পাইয়াছে, গ্রাম ছাড়িয়া যাইবার আগে যাদের সে চিনিত, গ্রামে ফিরিয়া দু-চারজন যাদের সে চিনিয়াছে, তারা ছাড়া নতুন অস্তিত্বের চেতনাই তার আর নাই। যে অবশ্যম্ভাবী পরিণামের মুখে শনৈঃ শনৈঃ দয়াবুড়ী পা বাড়াইতেছিল, এই কয় দিনে আশ্চর্য্য রকম দ্রুত গতিতে তার অনেকখানি পথ সে আগাইয়া গিয়াছে। কোনরের ব্যথে, সারারাতের অবাধিত হিমে, হাড় পর্য্যন্ত জমিয়া গিয়া সকালে আর বুড়ীর উত্থান-শক্তি থাকে না,

অনেক বেলায় চড়চড়ে রোদ গায়ে পড়িলে তবে তার আড়ষ্টতা কাটে।

বেলা নটা দশটা হইবে, বুড়ী দাওয়ায় বসিয়া ছিল, পুঁটির দেওয়া নতুন কাপড়খানা পরনে, হাতে তামাক-পোড়া কাঠি একটা লাম্বুকের খোলা, তথায়ে বিছানা পাতা—একখানা আধময়লা খান বালিশের পাশে জড় করা। বুড়ী খুঁটিতে ঠেস দিয়া রৌদ্রের দিকে চাহিয়া ছিল, তার অতীত জীবনের দিকেও হইতে পারে। পুঁটি আসিল—এই জরাগ্রস্ত বিকলাঙ্গ জীবন-মরণের মধ্যস্থিত নিতান্ত অসহায় মানুষটি যেন পরম সুখী পুঁটিকে একটা অনির্দ্দিষ্ট আকর্ষণে টানিয়া আনে। সে বিশেষ কোন কথা কয় না, কেবল বিহ্বলের মত খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকে, তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যায়। এমনি নিদারুণ বিনষ্টির মধ্যে সব মানুষের এমন কি তারও চরম পরিণতি, পুঁটির অবচেতন মনে এই অস্পষ্ট ধারণা কি আঘাত করে?

সাড়া পাইয়া বুড়ী বলে, "কেডা রে, কেডা? ও পুঁটি? কোথায় যাচ্ছিস? ও পাড়ায়? কেন? বেড়ান, রাতদিন বেড়ান, কেবল বেড়ান! তুই ভুবনের মেয়ে পুঁটি না? ভাল কথা—একটা কাজ করে দিবি আমার? ও-পাড়ার উমেশ রায়কে ডেকে দিবি একবার?"

ও নামের কাহাকেও পুঁটি জানে না এ গ্রামে, বলে, "কেন? উমেশ রায়কে কেন?"

"দেখি এর একটা বিহিত করে কি না? আরত-ছাড়া ব্যাপার, ওরে তোর নিজের জ্যেঠি না আমি—মেয়ে তাড়ালি বাড়ী থেকে? অ্যাঁ, ওরে তুই কে—যে না একবার ডেকে।"

পুঁটি জবাব দেয়, "চিনিনে বাপু কে তোমার উমেশ রায়, এ গ্রামে।"

বুড়ী তার একটানা ছড়া-কাটার সুরে বলে, "উমেশ রায় রে, উমেশ রায়, ঐ যেওখান বাড়ীর কর্ত্তা, তার ছেলে মহেশ্বর, যোগীশ্বর।"

পুঁটি আকাশ হইতে পড়ে—মহেশ্বর জ্যেঠারই মরিবার বয়স হইল, বুড়ী এখন তারও বাপের খোঁজ লইতেছে! উমেশ রায় তো কবে মরিয়া ভূত হইয়াছে...

বুড়ী যেমন বিস্মিত তেমনি হতাশ হইল, তার ক্ষীণ আশাটুকুও যেন নির্ম্মূল হইল।

ইতিমধ্যে পাড়া আসিয়া হাজির, বুড়ীর কথায় হাসিয়া বলে, "যেয়ো ডেকে ঠাকুমা, যেয়ো, না তুমি যাবে তার কাছে?"

বুড়ী পাড়ার কথার জবাব তার না—বিড় বিড় করিয়া বলে, "এলো অলক্ষেণে, এলো আবার জ্বালাতে"—তারপর হঠাৎ কাঁদিয়া ওঠে, "ওরে আমার কেউ নেই, কেউ নেই··· তোরা সবাই মিলে আমারে এমন করিস কেন? ওরে আমার মরণ হয় না কেন?"

হঠাৎ পাড়ার নজর পড়িল নতুন কাপড়খানার উপর, মনে মনে কি কষি আঁটিয়া বলিল, "দাঁড়াও পুঁটিদি একটু, একটা রগড় করি দেখো···ফিরিয়ে দেবো'খন আবার কাপড়-খানা—এখন তবু কিছু বল না।"

পুঁটি কিছু না বুঝিয়া কেবল কৌতূহলের বশেই সায় দিল, পাড়া চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই পাড়া কাঁপাইয়া হাঁক শোনা গেল, "দাঁতের পোকা ভাল—মা-ভা খেয়ো না তা-পো—কোমরের বাত ভাল।"

একবার, দুইবার, তিনবার, বারবার ঐ একই জায়গায় বেধে হাঁক পাড়িতে লাগিল। বুড়ী ডাকিয়া বলে, "ও পাড়া, বেদেরা এসেছে না কি? ও পাড়া।"

পুঁটি বলে, "পাড়া তো নেই এখানে।"

"তবে তুই কে? জানিস না কি রে বেদেরা এসেছে কি না? দেখনা রে বাপু, দেখ না একবার ডেকে, কোমরটা একবার ঝাড়িয়ে নিই—ওরে ও মাতা বেদনা জ্বালো।"

পাড়া হাঁক প্রতীক্ষায় ছিল, বলিল, "কি বুড়ি? ডাকছিস কেনে—বলিয়া অত্যন্ত অদ্ভুত বেশে আবির্ভূত হইল।"

পাড়া চুলের উপর দড়ি জড়াইয়া তাহাতে একখানা চিরুণী ও অনেকটি পাখীর পালক গুঁজিয়াছে, হাতে পায় জাকড়া বাঁধা, ভটাইয়া কাপড় পরিয়া তাহার উপর একখানা ময়লা গামছা পরা, সর্ব্বাঙ্গে ধূলা ও ছাই মাখিয়া বাত্রাদলের গোঁফ লাগাইয়াছে মুখে, কাঁধে তীর ধনুক, আর পিঠে প্রকাণ্ড একটা বোঁচকা।

"কি বুড়ী, তুমার কি হোইয়েসে—বুলো—চুল পাকিয়েছে, না, দাঁতের পোকা হইয়েসে—কি করতে হোবে বুল।" টানিয়া টানিয়া বিকৃত উচ্চারণে নকল-বেদে পাড়া উঠানে বসিয়া ঝুলিটা মাটিতে নামাইয়া এটা সেটা নাড়া-চাড়া করিতে

থাকে। বুড়ী কোমরে হাঁটিয়া আগাইয়া আসে—একদল ছেলে মেয়ে ততক্ষণে ন্যাড়াকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বুড়ী ধমক দিয়া বলে, "ঘিরে দাঁড়াল দেখ? বলি দেখ না সব্?"

ন্যাড়া তার কথার পুনরাবৃত্তি করে, "কি হয়েছে, চুল পাকিয়েছে না—"

"মরণ আর কি?" বুড়ী খিঁচাইয়া ওঠে, "চুল পেকেছে না তোর মুণ্ডু হয়েছে, বলি মাথা ব্যথা ভাল করতে পারিস?"

"কেন পারবো না, ঠকর পারবো, তুমি একবারে ভাল হয়ে যাবি বুড়ি।"

"বুড়ি বুড়ি করিস নে হাড়পেকে পাজুন, পারিস ত আমার কোমরটা ছাড়িয়ে দে দিকি।"

"ছাড়িয়ে ত দেব, কেনন পয়সা ত লাগবে।"

"পয়সা?" এক নিমিষে বুড়ীর সব আগ্রহ নিবিয়া যায়, সে মিনতি করিয়া বলে, "দে বাবা ছাড়িয়ে দে, বলাম আমি বহুপার, তোর ভাল হবে, আমি বলছি তোর অনেক পয়সা হবে।"

"ওসব বাত আমি শুনছিনে বুড়ি, পয়সা দিতে হবে।" ন্যাড়া তার ঝোলাঝুলি গুটাইতে সুরু করে। বুড়ী নিরাশ ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। ছেলের দল চলিয়া যুর হয়।

ন্যাড়া পুনরায় বলে, "কি বুড়ি, পয়সা হবে? না হবে ত একটা কাপড়া দেও, এমন দাওয়া দেব যে একদম সোজা চলবি বুড়ি।"

কাপড়, পুরাণ কাপড় ত বুড়ীর আছে একখানা। বুড়ী অধীর আগ্রহে সেখানা দেখাইয়া বলে, "হাঁ দেব।"

কিন্তু পুরাণ কাপড় লইবে না ন্যাড়া, নতুন কাপড় দিলে সে ঝাড়-ফুঁক করিয়া দিবে।

বুড়ী কতক্ষণ বসিয়া কি ভাবিল, তার পর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা, তাহাই সে দিবে।"

তখন ন্যাড়া উঠিয়া গিয়া বুড়ীর কাছে বসিল, এবং যেমন দের অনুকরণে ফুঁ দিয়া, হাত বুলাইয়া, বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িয়া কতক্ষণ ধরিয়া নানা ক্রিয়া করিল। হাসিতে হাসিতে এক-উঠান ছেলেমেয়ের পেটে খিল ধরিয়া গেল, বুড়ীর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই, পরম গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিল এবং ন্যাড়া যা যা করিতে বলিল পালন করিয়া গেল।

কতক্ষণ পরে ন্যাড়া বলিল, "ব্যস, বল নেই।"

বুড়ী কোমরে হাত দিয়া দেখে, একবার সকলের মুখে তাকায়, একবার পিঠটা টান করিয়া বসে, তারপর আস্তে আস্তে বলে, "নেই।"

ন্যাড়া প্রতিশ্রুতি মতে কাপড় চাহিল।

বুড়ী আবার কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিল, একবার ন্যাড়ার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া চাহিয়া দেখিল, বলিল, "তুই ঠিক যেবে ত?"

"ঠিক না ত কি ঝুটা আছে?" সকলে আবার হাসিয়া উঠিল।

"জলদি যাও, নইলে এমন মন্ত্র দেব যে বেয়না বেড়ে যাবে।"

বুড়ী আস্তে আস্তে কাপড়খানা ছাড়িয়া ফেলে। কোলের কাছে জড় করিয়া লইয়া ফের খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল, তারপর ন্যাড়ার তাগাবার সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সেখানা ন্যাড়ার দিকে আগাইয়া দিয়া বলে, নাও।

ছেলের দলের সাথে ঝোলা-ঝুলি ঘাড়ে কাপড়খানা লইয়া হাসিতে হাসিতে ন্যাড়া চলিয়া যায়—"হাতের পোকা ভাল—মাজা বেয়না ভালো।"

পুঁটি একলাই ছিল।

বয়াবুড়ী বহুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, তারপর নিজের মনে বলিল, "বিপ্লবের সেই দামড়া ছেলেটা ঠকিয়ে গেল না তো? তার মতই যেন তাখলাম বলতি পারিস—ওরে ও তুই ন্যাড়িয়ে কেডা? কেডা তুই? ন্যাড়া কি না বলতি পারিস—বোধ হয় না, ব্যাথাটা যেন নরম পড়েছে এটু।"

"দুখনের মেয়েডা দিইল কাপড়খানা, খাসা মেয়েডা, আর কি যেবে—যেবা হলি বলে তাখবানে··।"

বুড়ী কোমরে হাঁটিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল এবং পিটপিট করা ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি মেলিয়া, সমস্ত জগতের প্রতি ঐকান্তিক উদাসীনতায় এমনি চাহিয়া রহিল।

পুঁটি বাড়ী ফিরিয়া গেল।

## ক্রেটার হ্রদ ও য়োসেমাইট

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্লামেথ্ ইণ্ডিয়ানেরা দক্ষিণ ওরিগনের কাসকেড্ পর্ব্বতে বাস করে। তাদের বিশ্বাস, ক্রেটার হ্রদ ও তার পর্ব্বতময় তীরে দেবতাদের বাস। দেবতারা নীল জলে কেলি করেন এবং ক্রেটার হ্রদের তীরে বহুকাল ধরে তাঁরা যুদ্ধে ব্যাপৃত আছেন। সাধারণতঃ তারা জলে এই হ্রদের দিকেও যেঁসে না।

দেবতাদের অনর্থক ঘাঁটিয়ে লাভ কি?

ওরিগন অঞ্চলে শ্বেতকায় খনিওয়ালারা যখন গিয়ে পৌঁছলো, তখন তাদের কানে গেল পর্ব্বত মধ্যে লুকায়িত একটি নীল হ্রদের গল্প। কেউ বিশ্বাস করলে, কেউ বিশ্বাস করলে না।

এই হ্রদের প্রকৃত অবস্থান কিন্তু ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুনের পূর্ব্বে কেউ জানতো না। ওই দিনে জন হিলম্যান একদল খনির কর্ম্মী নিয়ে সর্ব্বপ্রথম ক্রেটার হ্রদের তীরে উপস্থিত হন।

বিদ্যুদ্বেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো এই আবিষ্কারের অদ্ভুত কাহিনী। কিন্তু বিগত শতাব্দীর শেষ দশক পর্য্যন্তও খুব কম সংখ্যক ভ্রমণকারী দুর্গম ও দুরারোহ ক্রেটার হ্রদের তীরবর্ত্তী পর্ব্বতমালায় আরোহণ করে হ্রদের নীল জলরাশি স্বচক্ষে সন্দর্শন করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

১৯০২ সালে আইন দ্বারা হ্রদ ও তীরবর্ত্তী বনানী সর্ব্বসাধারণের বিচরণভূমি বলে ঘোষণা করা হয়। বড় বড় রাস্তা তৈরি হয় পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে। ছোট বড় হোটেল ও সৌখীন বাসস্থান স্থাপিত হয়—যাওয়ার কষ্ট সম্পূর্ণরূপে দূর হওয়ার ফলে আজকাল প্রতিবৎসর গ্রীষ্ম-কালে হাজার হাজার লোক নিজেদের বা ভাড়াটে মোটরে এই অপূর্ব্ব রমণীয় হ্রদ ও বনানী-অঞ্চল দেখবার জন্যে যায়।

আমিও অন্যান্য দর্শকদের মত ক্রেটার হ্রদের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হই। যেমন সৌন্দর্য্য হ্রদের নীল জলের, তেমনি সৌন্দর্য্য তার তীরবর্ত্তী শৈল-প্রাচীরের। আজও আমার মনে হয় পৃথিবীর মধ্যে এমন সুন্দর স্থান বেশি নেই।

কিন্তু সৌন্দর্য্য ছাড়াও যে জিনিষটা আমার মনকে একান্ত আকৃষ্ট করেছিল, সে হচ্ছে এই হ্রদের প্রাচীন ভূতত্ত্ব-ঘটিত ইতিহাস।

পাহাড়ের মাঝখানে এমন একটী হ্রদের সৃষ্টি হোল কি প্রকারে? মার্কিন গবর্ণমেণ্টের ভূ-তত্ত্ববিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও সুপরিচিত ভূ-তত্ত্ববিদ্ জোসেফ ডিলার এ-প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন বহু বৎসর পূর্ব্বে। তিনি বলেন, অতীত যুগে ভূপৃষ্ঠের আগ্নেয় বিপর্য্যয়ের ফলে আগ্নেয়গিরির চূড়া ও অগ্নি-কটাহ ধ্বসে গিয়ে চার হাজার ফুট গভীর এই হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে।

কে বলবে ডিলার যে উক্তি করেছেন তা সত্য না মিথ্যা? ক্রাটরলেক পার্কের বিজ্ঞান বিভাগের কর্ম্মচারী হিসাবে আমার একটা কর্ত্তব্য এই হ্রদের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে আরও গভীর ভাবে অনুসন্ধান করা। হ্রদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পাথরের দেওয়ালে তার ইতিহাস লুকানো আছে বলেই আমার ধারণা। তীরবর্ত্তী হেমলক্ গাছের বিস্তৃত শাখা-প্রশাখার নীচে আমার ছোট্ট তাঁবু। তাঁবুতে বসে আমার অনেক নীচে ক্রেটার হ্রদের নীল জল আমার চোখে পড়ছে।

প্রত্যেক বায়ুপ্রবাহ হ্রদের বুকের জলে নতুন ধরণের নীল রং সৃষ্টি করছে, তীরের শ্যামল বনানী ও আকাশের

---

* ওয়ালড্ এ্যাটউডের বিবরণ থেকে।

ভাসমান লঘু মেঘখণ্ড ছায়া ফেলেছে জলের উপর। এই অহরহ-পরিবর্তনশীল ছবি মনে এমন এক অদ্ভুত ভাবের সৃষ্টি করে, যার বর্ণনা ভাষায় দেওয়া চলে না।

ক্রমে অন্ধকার এসে নামলো হ্রদের জলে, চারিদিকের পাহাড়ে বাজপাখীর দূর-শ্রুত ডাক ছাড়া অন্য কোন দিকে কোন শব্দই নেই।

পরদিন সকালবেলা আমি হ্রদের তীরবর্তী বনের মধ্য দিয়ে হেঁটে রেঞ্জার ষ্টেশন (Ranger Station)-এ পৌঁছলাম। সেখানে পা দিতেই একটি অতি-পরিচিত কণ্ঠে কে আমায় সম্বোধন করে বললে—এ কি, ডাক্তার, তুমি এলে কখন?

কণ্ঠস্বর যাঁর, তিনি আমার প্রিয় বন্ধু ও বহুদিনের সহকর্মী জর্জ প্রাণ্ট্, ন্যাশনাল পার্ক বিভাগের ফটোগ্রাফার।

বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম—আজ আমার সঙ্গে বেরুবে?

বন্ধু বললেন—শুধু বেরুনো কেন, ফটোগ্রাফও তুলতে পারি।

আমি শুনে খুব খুশি হলাম, তা বলাই বাহুল্য। আমরা বনের মধ্যে ভ্রমণে বার হয়ে কিছুদূর যেতে না যেতেই একটী অত্যন্ত কৌতূহলজনক ভূ-বিজ্ঞান-ঘটিত ব্যাপারের সম্মুখীন হ'লাম। পাহাড়ের লাভা প্রাচীরের পাশে এক জায়গায় যেন ধূসর বর্ণের স্লেট পাথরের মত কোন জিনিষ, তার মধ্যে ছোট বড় প্রস্তরখণ্ড আটকে আছে।

এই জিনিষটা নিউ ইংলণ্ড বা অন্য কোন স্থানে দেখলে, আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হোতো না, কারণ সমতলভূমিতে স্লেট পাথরের অবস্থান কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। কিন্তু ক্রেটার হ্রদের তীরবর্তী আগ্নেয় প্রস্তরের মধ্যে এই দৃশ্য আমাকে ভাবিয়ে তুললে।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

তার পর হাঁটু গেড়ে বসে জিনিষটা পরীক্ষা করে দেখতে দেখতে আমার বেশ মনে হোল শিলাখণ্ডের ওপরে অনেক স্থানে লম্বা লম্বা আঁচড়ের দাগ—বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যে দাগের নাম "ষ্ট্রিয়া" (striae) এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরগুলি প্রায় সবই চকচকে পালিশ করা।

এই চিহ্নগুলি একটী মাত্র ভূ-তত্ত্বঘটিত ব্যাপারের নির্দ্দেশ করে। সেটি এই যে, বহু প্রাচীনযুগের তুষারযুগের তুষার-স্রোত এই স্থান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এতদূর এসে কোনো কারণে এখানে আটকে গিয়েছে।

আমি সত্যি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে না গেলে থমকে দাঁড়াই নি।

জিনিষটা পরীক্ষা করে বোঝা গেল, এ জাতীয় কর্দ্দম-প্রস্তর তুষার-নদীর প্রবাহ দ্বারা বাহিত হয়ে ছাড়া অন্য উপায়ে আসে না। এর নাম 'টিল', আসলে এটা পাথর, সাদা বালি ও কর্দ্দমের সংমিশ্রণে উৎপন্ন।

আমার বন্ধু তখনও হ্রদের তীরবর্তী পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি তাঁকে নীচে নামতে বললাম। ক্যামেরা নিয়ে তিনি অতি কষ্টে নেমে এলেন। তার পর আমি তাঁকে জিনিষটার ফটোগ্রাফ নিতে অনুরোধ করাতে তিনি তাঁর অন্যান্য কাজে ব্যাপৃত হোলেন।

আমার বন্ধুও লক্ষ্য করলেন, তুষারযুগের 'টিল' স্তূপ লাভাস্তরের মাঝখানে চেপটা ভাবে অবস্থিত। 'টিল'-এর ঠিক নীচে যে স্তর, তার ওপর লম্বা লম্বা আঁচড়ের দাগ লাভা-প্রস্তরের গায়ে। এতে মনে হয়, তুষার-নদীর দ্বারা বাহিত তীক্ষ্ণ প্রস্তরখণ্ডের আঁচড় লাভার গায়ে লেগে ঐ দাগের সৃষ্টি করেছে। আমাকে ভূতত্ত্ব-ঘটিত একটী কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হোতে হোল।

একটি বিশাল অগ্নেয়গিরির অগ্নিকটাহের মধ্যেকার তুষারপ্রবাহ কি করে এল, এবং সেই তুষার-প্রবাহ দ্বারা আনীত বস্তুর ওপরে পুনরায় লাভাপ্রস্তর জমা হোল কি ভাবে? আমার বেশ মনে হোল, এই প্রশ্নের সমাধান করতে পারলেই ক্রেটার হ্রদের উৎপত্তি-রহস্যেরও একটা সুমীমাংসা হয়ে যায়।

ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমরা পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ক্রেটার হ্রদের তীরের প্রস্তর-প্রাচীর ওপর থেকে নিম্ন-স্তর পর্য্যন্ত ভাল করে পরীক্ষা করলাম। তীক্ষ্ণাগ্র লাভার শিখরদেশে ওঠানামা করা এক ভীষণ দুঃসাধ্য কাজ। কোমরে দড়ি বেঁধে ও গোড়ালিতে পেরেক-বসান বুটের সাহায্যে এ কঠিন কার্য্য আমরা সমাধা করে তুললাম।

আমাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হয় নি। শুধু একটা নয়, আমরা আরও অনেকগুলি তুষার-প্রবাহের সুস্পষ্ট নিদর্শন পেলাম আমাদের অনুসন্ধানের ফলে। কোনো কোনো তুষার-

মোসোয়াটুনিয়ার এই পর্বতচূড়া দুই-দুইবার কটিকা এবং তুষারঝঞ্ঝার পাত

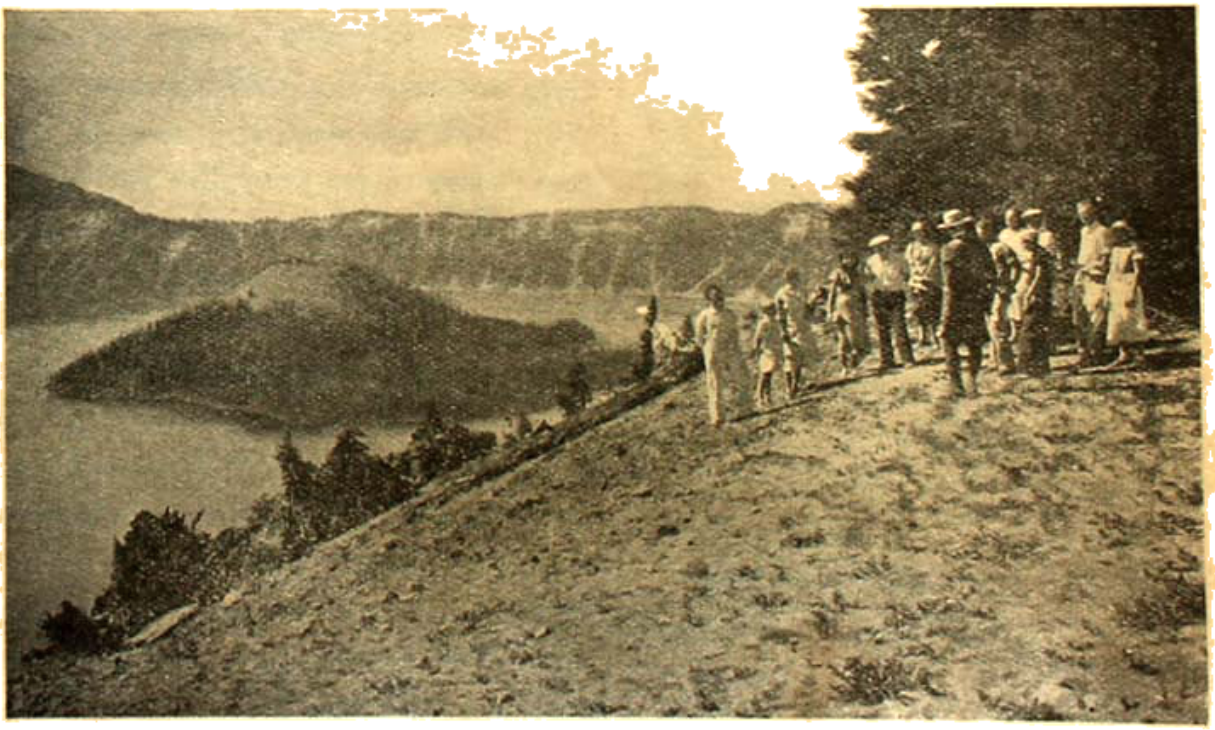

সম্মুখে ক্রেটার হ্রদ : অগ্নিগর্ভের নিম্নে ভূকম্পের ফলে কিরূপ ভূবিপ্লবের চিহ্ন

প্রবাহ তার চিহ্ন রেখে গেছে হাজার ফুট গভীর আগ্নেয় প্রস্তর ও লাভাস্রোতের তলদেশে।

ক্রেটার হ্রদের অতীত ইতিহাস এই সব লাভা-প্রস্তর ও তুষার-প্রবাহ দ্বারা বাহিত কর্দমস্তরের পাতায় পাতায় লেখা আছে—ঠিক একখানা বইয়ের মতই। এই অঞ্চলে বহু প্রাচীন যুগে বহুবার আগ্নেয়গিরির অগ্নিপ্রবাহের পরেই তুষার-নদীর প্রবাহ দেখা দিয়েছে। অবশ্য এদের প্রত্যেকটি ঘটনার মধ্যে এক এক বিরাট যুগের ব্যবধান। ভূ-বিজ্ঞান যাকে যুগ বলে থাকে, ইতিহাসের যুগ তার কাছে শিশু মাত্র।

দু'এক স্থানে আমরা লাভাপাথরের মধ্যে আটকানো অবস্থায় পোড়া কাঠের গুঁড়ি দেখতে পেয়েছিলাম। এক-স্থানে আমরা একটি কাঠের গুঁড়িকে সোজা খাড়া ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি লাভাপ্রস্তরের মধ্যে। এই সব অলিখিত দলিল থেকে জানা যায় ঘোলেমাইট উপত্যকার ইতিহাসে কতবার সুন্দর বনানীর শ্যামল ছায়া ও কুসুমরাজি উপত্যকাকে সৌন্দর্যশালী করে তুলেছে—আবার এসেছে আগ্নেয় উপদ্রব, উষ্ণ লাভা-প্রবাহ। ফলস্বরূপে বনানীর সৌন্দর্য নীচে চাপা পড়ে গিয়েছে।

আজও লাভাস্তরের তলদেশে প্রাচীন যুগের সেই সব অরণ্যানীর চিহ্ন বর্তমান। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করলে এ অঞ্চলের অতি প্রাচীন যুগের উদ্ভিদসমূহের প্রকৃতি ও শ্রেণী নির্ণয় করতে পারেন সেগুলি থেকে।

আমরা আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করছিলাম। লাভা-প্রবাহের গতি হ্রদের তীরবর্তী প্রস্তর-প্রাচীরের বাইরের ঢালুর দিকে। এথেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়ে যায়, যে-আগ্নেয়গিরির অগ্নিপ্রবাহ এই লাভা, তা একদা অবস্থিত ছিল ক্রেটার হ্রদের ওপরে। অর্থাৎ আজ যেখানে ক্রেটার হ্রদের নিস্তরঙ্গ বক্ষে আমোদপ্রিয় তরুণ-তরুণীরা নৌকাবিহারে ব্যস্ত, একদিন ওখানেই ছিল প্রাচীন আগ্নেয়গিরির চূড়া, তার মাথায় ছিল অগ্নিকটাহ। ভূ-তত্ত্ববিদ্ ডিলারের কল্পনা যে কতদূর খাঁটি, এ থেকে তা বোঝা যায়। ডিলার প্রাচীন যুগের সেই আগ্নেয়গিরির নাম দিয়েছিলেন, 'মাজামা'। কি করে মাজামা আগ্নেয়গিরির চূড়া উড়ে গেল? যখন পর্বতের সানুদেশে শ্যামল বনানী বিরাজ করতো, তখনও কি মাজামা আগ্নেয়গিরির অগ্নি-কটাহ থেকে উষ্ণ লাভাস্রোত গড়িয়ে পড়তো? তুষার-প্রবাহমণ্ডিত মাজামা গিরির দৃশ্য কি অদ্ভুত ছিল!

এ ইতিহাস উদ্ধার করা নিতান্ত অসম্ভব নয়। কারণ পুরোনো আমলের অলিখিত সব দলিল এই পাহাড়ের গায়ে রয়েছে। যে পড়তে জানে, সে-ই ওসব দলিলের পাঠোদ্ধার করে ক্রেটার হ্রদের পুরাতন ইতিহাস রচনা করতে পারে। সে এক বিরাট ভূ-বিপর্যয়ের কাহিনী। সংক্ষেপে তার প্রথম থেকে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত বলে যাচ্ছি।

এই নাটকের প্রথম অঙ্কে দেখতে পাই তরুণ-বয়স্ক মাউন্ট মাজামাকে। নতুন আগ্নেয়গিরি, মহোৎসাহে এবং যথেষ্ট শক্তির সঙ্গে অগ্নি উদ্গিরণ করছে। বাধা দেবার জন্য তখন লাভাপ্রবাহের দেওয়াল বা তুষার-প্রবাহের সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু অনবরত অগ্ন্যুৎপাতের ফলে লাভার স্তর পুরু হয়ে জমে উঠছে পাহাড়ের ঢালুতে। একটা কথা মনে রাখতে হবে এই সঙ্গে। আজকাল যেখানে কাস্কেড্ মালভূমি অবস্থিত, ওখানটাতে তখন ছিল এক বিশাল সমতল প্রান্তর। পর্বত বা মাল-ভূমির তখনও সৃষ্টি হয় নি। ছিল কেবল অমুক্ত কাস্কেড্ পর্বতমালা—তখন সেই পর্বতমালার মধ্যে মাঝে মাঝে অনেকগুলি আগ্নেয়গিরি অনবরত ধূম ও অগ্নি উদ্গিরণ করছে। ওরা প্রকৃতির কামারশালা—চতুষ্পার্শ্বস্থ মালভূমি তৈরীর কাজে তখন ওরা ব্যস্ত। বহুকাল ধরে লাভার স্তর ক্রমশঃ জমতে জমতে মাজামা পর্বত উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে লাগলো। কালে পশ্চিম বাতাসকে পাহাড়ে ধরতে এবং প্রশান্ত মহাসমুদ্র থেকে সংগৃহীত সমস্ত জলকণাকে তার নিজের শিখরদেশে বৃষ্টিতে পরিণত করতে বাধ্য করলে। বৃষ্টির জল ও শৈত্য থেকে উৎপত্তি হোল তুষারের। যে সময় আগ্নেয়গিরি নির্জ্বালিত থাকতো, সারা শীত ও গ্রীষ্মকাল ধরে তুষার জমা হয়ে থাকতো ওখানে। সে সময়ে যদি কেউ পাহাড়ে উঠতো, সে ভাবতেই পারতো না যে, সে আগ্নেয়-গিরিতে আরোহণ করছে। সে ভাবতো সে হয়ত বা রেনিয়ার পর্বতে উঠছে।

আগ্নেয়গিরিই তখন হয়ে পড়লো নীরন্ধ্র তুষার-প্রবাহের উৎপত্তিস্থল। এই তুষার-নদী চারি পাশের লাভা প্রস্তরে চিরকাল ওদের চিহ্ন রেখে গিয়েছে।

কেউ কেউ এখানে প্রশ্ন করতে পারেন, মাজামা খুব উঁচু পাহাড় কি করে জানা গেল? এর উত্তর হোল,

মাতামা পর্ব্বতের গায়ে ভূবার-প্রবাহের চিহ্ন। বিশেষ ভাবে বিচার করে বুকে ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা মত দিয়েছেন যে, উত্তর আমেরিকার এ অংশে আট হাজার ফুটের নীচে ভূবার প্রবাহ গড়ে ওঠে না। এ কথা যদি আমরা সত্য বলে মেনে নিই, তা হোলে এইটুকু বুঝি যে মাতামা পর্ব্বতে ভূবারনদী দেখা দেবার পূর্ব্বে অতখানি উঁচু হয়ে উঠেছিল মাতামা পর্ব্বত। তারপর আরও বহু কাল ধরে লাভা-প্রবাহ জমতে লাগলো পর্ব্বতের গায়ে, পর্ব্বত আরও উঁচু হতে লাগলো।

আমরা অনুমান করতে পারি, শেষ পর্য্যন্ত এই পর্ব্বত দশ হাজার ফুট উঁচু হয়েছিল। এতে বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই। পৃথিবীর সমগ্র আগ্নেয়গিরি এই ভাবে বহু-যুগব্যাপী অগ্ন্যুৎপাত ও লাভা-বমণের দ্বারা নিজের উচ্চতা বাড়িয়ে তুলছে।

কালে মাতামা পর্ব্বতের অগ্নিকুণ্ডটা থেকে উষ্ণ লাভা-প্রবাহ নেমে আসা বন্ধ হয়ে গেল, তখন ক্রমশঃ ভূবার বেশী করে জমতে লাগলো পাহাড়ের চালুতে। এরা ক্রমে পাহাড়ের উচ্চ শিখরদেশ সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে ফেললে।

মাতামা পর্ব্বত তখন আরও উঁচু হয়ে গিয়েছে। সুতরাং বরফ জমতে লাগলো আরও বেশী, ভূবার-নদীর প্রবাহ পাহাড়ের চালু গা বেয়ে সমতলভূমিতে নেমে পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত গিয়েছিল, এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

মালভূমি ও কার্পেথেড পর্ব্বতমালার উপত্যকাগুলির মধ্যে মধ্যে মাতামা আগ্নেয়গিরির নিকটবর্ত্তী যেগুলি, তাদের গঠন ও খোদাই-কাজ হয় এই ভূবারনদীর প্রবাহ দ্বারা। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখা যায় ভূবার-প্রবাহ ভূপৃষ্ঠের গঠনের বহু সাহায্য করেছে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

মাতামা আগ্নেয়গিরির ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে যে, এর লাভাপ্রবাহ দুটী পৃথক্ পৃথক্ মোচাকৃতি চূড়া থেকে নির্গত হয়। বর্ত্তমান প্রস্তরগাত্রের ভূবার-নদীবাহিত তীক্ষ্ণাগ্র শিলা দ্বারা যে আঁচড়ের সৃষ্টি, তা থেকে বিশেষজ্ঞগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

ওই দুটী চূড়ার মধ্যে যেটি বড়, সেটি বর্ত্তমান হ্রদের কেন্দ্রের উপর অবস্থিত ছিল, অপরটির অবস্থান ছিল তার মাইল দুই পশ্চিমে।

এই হ্রদের পশ্চিম কোণে বর্ত্তমানে উইলার্ড দ্বীপ নামে যে অদ্ভুত-দর্শন দ্বীপটী দেখা যায়, ক্ষুদ্রতর চূড়াটী ঐ স্থানে ছিল বলে আমি মনে করি। এরূপ মনে করবার একটী বিশেষ কারণ এই যে, এই দ্বীপটীও আগ্নেয় উপদ্রব-সম্ভূত এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে এর উৎপত্তি।

ক্ষুদ্রতর চূড়া থেকে নির্গত লাভা-প্রবাহ দ্বারা যে উইলার্ড দ্বীপ জন্মলাভ করেছে, এর আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে উক্ত দ্বীপটীর প্রস্তরের প্রকৃতি অনুসন্ধান করলে। এর অনুরূপ একটী ভূতত্ত্ব-সংক্রান্ত ঘটনা ঘটেছিল আলাস্কার "টেন থাউজ্যাণ্ড স্মোক্স (Ten Thousand Smokes)" নামক বিখ্যাত আগ্নেয় গিরিমালার ক্ষেত্রে।

নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরি যখন ভূবারমণ্ডিত হয়ে বড় বড় ভূবার-প্রবাহের সৃষ্টি করেছে সে সময় সমগ্র পর্ব্বতটী একদা এক ভীষণ আগ্নেয় বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হয়। অবশ্য বহু শতাব্দী-ব্যাপী ভূবারযুগের পরে এ ঘটনা ঘটেছিল। সমস্ত চূড়াটী (বা দুটী চূড়াই) এক ভীষণ বিস্ফোরণের ফলে উড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

হেরো ঘন-নাইল পরিমাণ বস্তুপুঞ্জ এই আগ্নেয় বিপর্য্যয়ের ফলে সহসা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে পড়েছিল। কি ভাবে এই ঘটনা ঘটেছে সে সম্বন্ধে এখনও মতভেদ আছে। কেউ বলেন এটি ঘটেছিল বিস্ফোরণের ফলে, কেউ অনুমান করেন, আগ্নেয়গিরির মোচাকৃতি চূড়াটি হঠাৎ ধসে পড়ে ভেতরের দিকে ঢুকে যায়। অর্থাৎ আগ্নেয়গিরি যেন নিজের মাথা নিজেই গিলে ফেলেছিল।

এই অদ্ভুত আগ্নেয় বিপর্য্যয় কোনো মানুষ কোন দিন প্রত্যক্ষ করে নি বলেই ঘটনাটি বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু এরই অনুরূপ একটী আগ্নেয় বিপর্য্যয় ঘটেছিল আলাস্কায়, মাত্র ১৯১২ সালে গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে। মাউণ্ট কাটমাই ঐ বিপর্য্যয়ের ফলে একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।

এখনও পর্ব্বতটীর ধ্বংসস্তূপ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। এই প্রকার ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত বিশাল বস্তুপুঞ্জ থেকে প্রমাণ হয় যে, বিস্ফোরণের ফলেই এক দিন পাহাড়টী ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু এই প্রকার বস্তুপুঞ্জ হ্রদের জলতলে পাওয়া উচিত—তা যদি না পাওয়া যায়, তবে বিস্ফোরণের সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হবার কারণ ঘটে।

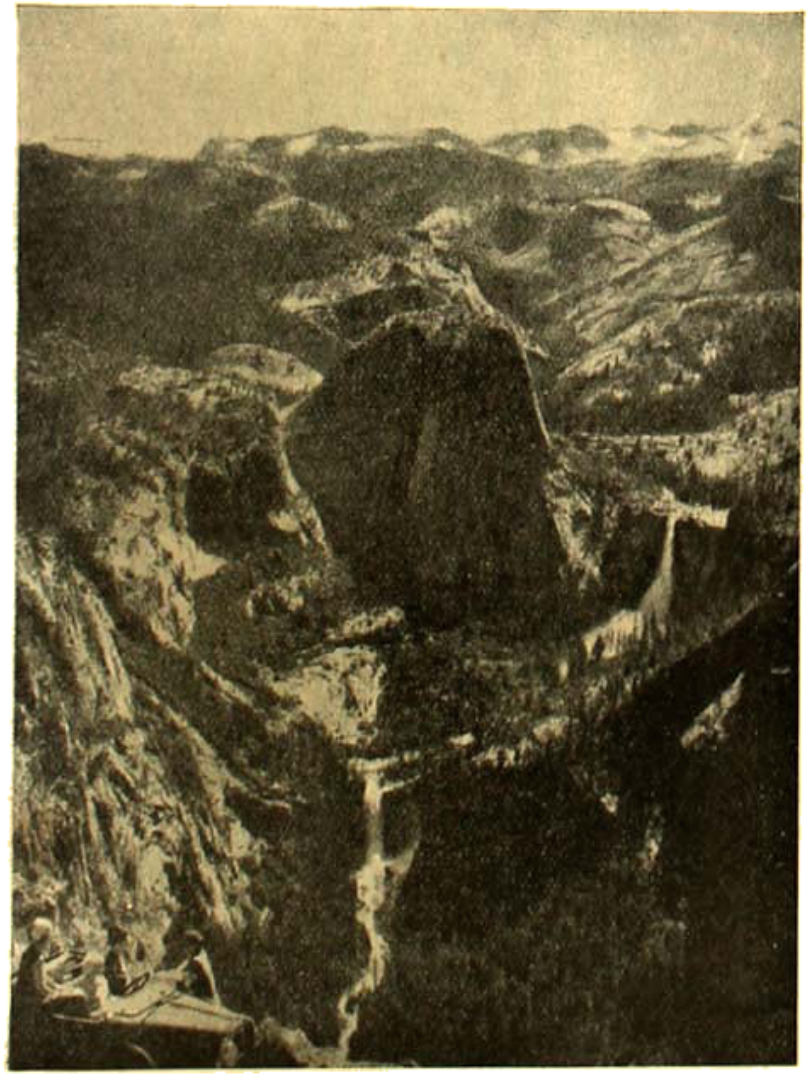

মার্সের নদী : ভূষারপুঞ্জ হইতে উত্থিত হইয়া প্রথমে আঁকাবাঁকা পথে বহিয়া মেসেমাইট উপত্যকায় আসিয়া পড়িয়াছে

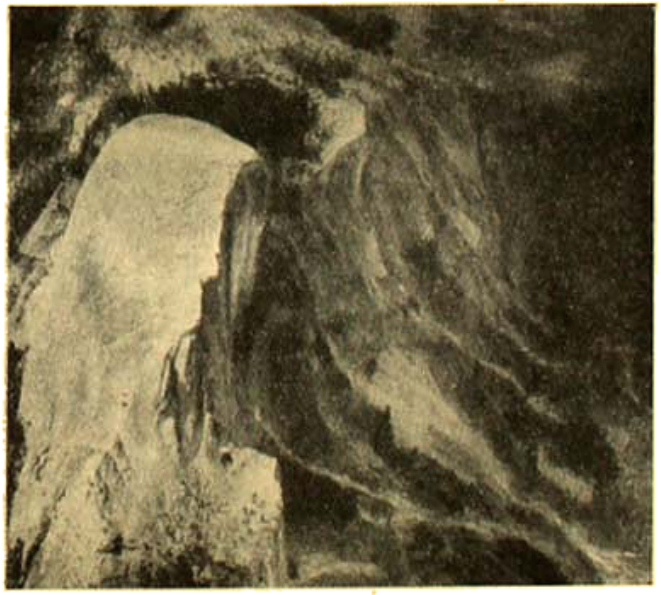

এলাবের হইতে মেসেমাইট উপত্যকার দৃশ্য

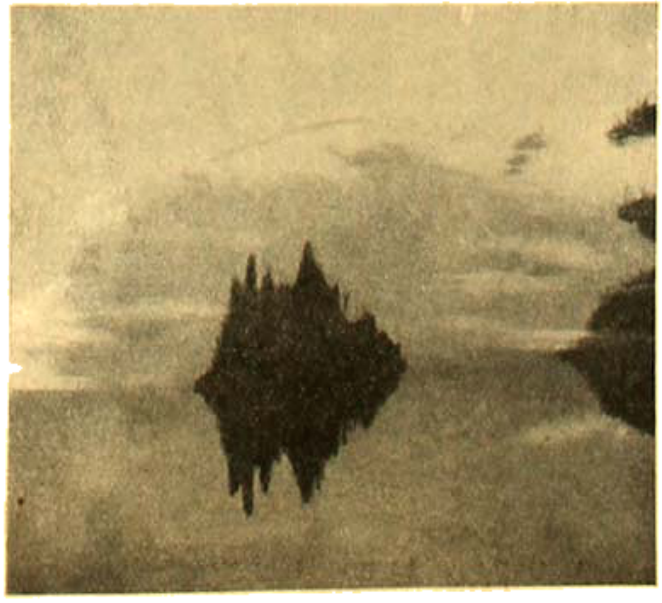

ফেইরি ফলস হতে

এ সম্বন্ধে আর একটী কারণ নির্দ্দেশ করা যায়। ধরে নেওয়া যাক, বিস্ফোরণ ঘটে নি। তবে ক্রেটার হ্রদের উৎপত্তির হেতু কি? এর উত্তর দেবে আর একটী আগ্নেয়গিরি—মাউন্ট কিলাউয়া। হাওয়াই দ্বীপে মাউন্ট কিলাউয়ার বিরাট অগ্নিকটাহ যাঁরা দেখেছেন এবং তার ভূতত্ত্বঘটিত কারণ পর্য্যালোচনা করেছেন, তাঁরা জানেন, মাউন্ট কিলাউয়া তার অগ্নিকটাহ এক দিনে তৈরী করেনি, ক্রমে ক্রমে বাড়িয়েছে।

এই অগ্নিকটাহ বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন হয় নি, কেন্দ্রস্থের দিকের দেওয়াল ক্রমশঃ ধ্বসে ধ্বসে পড়ে গিয়ে অগ্নিকটাহের ব্যাস বাড়িয়ে তুলেছিল, তারই ফলে অগ্নি-কটাহটির বর্ত্তমান বিস্তৃতি ও গভীরত্ব।

আমার মনে হয়, যেখানেই এ ধরণের ঘটনা ঘটে, সেখানেই সব সময় দুই কারণই থাকে তার পেছনে—ধ্বসেও পড়ে, আবার বিস্ফোরণও হয়।

যে কারণই ঘটুক, এ ক্ষেত্রে মাউন্ট মাজামা আগ্নেয়গিরির অন্তর্দ্ধান যে সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত, সে বিষয়ে কোনই ভুল নেই।

শুধু তাই নয়, এই আগ্নেয়গিরির ইতিহাস দ্বারা এই অনুমান করা যায় যে, কাস্‌কেড পর্ব্বতমালার অন্য সব আগ্নেয়গিরি—মাউন্ট রেনিয়ার, মাউন্ট হুড প্রভৃতির—ক্ষেত্রেও এই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে মাত্র। মাউন্ট রেনিয়ারের ক্ষেত্রেই ধরা যাক। এই পর্ব্বত আজকাল সুপ্ত অবস্থায় আছে বহু দিন এবং মাউন্ট মাজামার মতই এর শিখরদেশ ও বৃহৎ সানুদেশ তুষার-প্রবাহ দ্বারা ঢাকা। মাউন্ট রেনিয়ার থেকে উদ্ভূত তুষারনদী উচ্চ শিখরদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে সমতলভূমিতে এসে পৌঁচেছে। কিন্তু যদি আজ মাউন্ট রেনিয়ার পুনরায় জাগ্রত হয়, তবে তুষার-প্রবাহ নিশ্চিহ্ন হয়ে ধুয়ে মুছে যাবে, এক দিন বিস্ফোরণ হওয়াই আশ্চর্য্য নয়, যার ফলে তার মাথাতেও ক্রেটার হ্রদের মত একটী সুবৃহৎ হ্রদের সৃষ্টি হবে।

আমার মনে হয় কাস্‌কেড্ পর্ব্বতমালার অনেকগুলি পর্ব্বতেই এই ইতিহাসের অনেক বার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ক্রেটার হ্রদের কয়েক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত 'ইউনিয়ন পিক্' নামক পর্ব্বতচূড়া থেকে চারি পাশের ভূমিশ্রী দেখতে দেখতে বহু শতাব্দী পূর্ব্বেকার সেই আগ্নেয়গিরিটির ছবি কতবার মনে আনবার চেষ্টা করেছি, যে সব উপত্যকা এক দিন মাজামা পর্ব্বতের তুষার-প্রবাহ দ্বারা সারা বছর তুষার-স্তূপে ভর্ত্তি হয়ে থাকতো তাদের চিহ্ন আজও অতি সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যায়।

ভাল করে এ ধরণের ঘটনা আলোচনা করতে হোলে আলাস্কায় যেতে হবে। সেখানে দুটী আগ্নেয়গিরি ভূ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের সম্যক্ পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে। এদের মধ্যে একটি আগ্নেয় পর্ব্বত 'অনিমা চকে'র অগ্নিকটাহের ব্যাস সাত মাইল এবং বিরাট গর্ত্তের মাঝখানে ক্রেটার হ্রদের উইণ্ডার দ্বীপের মত একটি ক্ষুদ্রতর মোচাকৃতি শিখর দৃষ্ট হয়। আসলে এটী আগ্নেয় গিরির ধূম ও তপ্ত নির্গমনের অপর একটি ছিদ্রপথ। অপর আগ্নেয়গিরি কেনিয়ামিনকের অবস্থাও ঠিক এমনই। কেনিয়ামিনকের অগ্নিকটাহের ব্যাস প্রায় ছ' মাইল, তার গর্ত্তের মধ্যে বিস্তৃত তুষার ক্ষেত্র অবস্থিত।

আলাস্কার আগ্নেয়গিরি ও মাউন্ট মাজামার বিপর্য্যয়ের ইতিহাসের অনুরূপত্ব বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। উভয় অঞ্চলের আগ্নেয়গিরিগুলি কি একই অবস্থার মধ্য দিয়ে তাদের প্রাথমিক জীবন অতিবাহিত করেছে!

কেবল একটি বিষয়ে আলাস্কার অগ্নেয়গিরি ও মাজামার মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, সেটি এই যে মাজামার অগ্নি-কটাহের গর্ত্তে কালক্রমে একটী হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে, আলাস্কায় তা হয় নি। ক্রেটার হ্রদের জল বাড়েও না, কমেও না, সব সময় একই ভাবে আছে, যদিও এই হ্রদের মধ্যে কোনো পার্ব্বত্য নদী এসে মেশে নি, বা কোনো নদী এ থেকে নির্গতও হয় নি।

মাজামা হ্রদ সম্বন্ধে আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটি এই হ্রদের জলের অদ্ভুত নীল রং। এমন নীল রং মহাসমুদ্রের জলেও দৃষ্ট হয় না। অনেকে মত প্রকাশ করেছেন যে, হ্রদের জলের সঙ্গে খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণের জন্যে এই অদ্ভুত নীল রংয়ের সৃষ্টি—কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষার সাহায্যে দেখা গিয়েছে, এই জল সম্পূর্ণরূপে খনিজ পদার্থ বর্জ্জিত।

আকাশের প্রতিবিম্বও এ নয়, কারণ দেখা গিয়েছে, হ্রদের জল সব সময়েই নীল, আকাশে মেঘ করলেও সেই একই

অবস্থা। অনেকে বলেন, সূর্যালোকের বর্ণচ্ছটার মধ্যে নীলবর্ণ জলকণিকার দ্বারা কোনো বিশেষ উপায়ে এখানে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আসলে যাতায়া আগ্নেয়গিরির অন্তর্ধান যেমন, ক্রেটার হ্রদের জলের নীল রং-এর কারণও তেমন—উভয়ই সমান রহস্যপূর্ণ।

এইবার যোসেমাইট উপত্যকার কথা বলবো।

ক্রেটার হ্রদের অনেক মাইল দক্ষিণে, কালিফোর্নিয়ার সিয়েরা নেভাডা মালভূমি অবস্থিত। সেখানে আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাত-প্রসূত বস্তুপুঞ্জ দ্বারা গড়ে ওঠে নি, ব্যাপারটা হয়েছে উল্টো—অর্থাৎ পর্বতজাত তুষারপ্রবাহ দ্বারা উপত্যকার বর্তমান আকারকে খুঁড়ে বার করা হয়েছে। যোসেমাইট উপত্যকার সৌন্দর্য অবর্ণনীয়—গবর্মেণ্ট একে ন্যাশনাল পার্ক বলে ঘোষণা করেছেন। প্রতি বৎসর অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ দর্শক প্রকৃতির শোভা উপভোগ করবার জন্যে এখানে আসে।

আমি কয়েক সপ্তাহ ভারবাহী পশুর পিঠে বোঝা চাপিয়ে এবং পায়ে হেঁটে—'জনমুর' নামে যে পথ তৈরি হয়েছে, ঐ পথ দিয়ে এই পার্কে প্রবেশ করি। উচ্চ মালভূমি দিয়ে আসবার সময় আমি দূর থেকে নদীখাতের উঁচু গ্রাণাইট প্রাচীর দেখতে পাই। এর অদ্ভুত বিরাট রূপ দূর থেকে দেখে আমার যেন তৃপ্তি হোল না, মনে ভাবলাম আপাদোড়া গ্রাণাইট পাথরে গভীরভাবে খোদাই-করা এই নদীখাত (canyon) আমায় ভাল করেই দেখতে হবে।

পাহাড়ের একটা উচ্চস্থানে বসে আমি প্রকৃতির এই অপূর্ব স্থাপত্যের নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করতে থাকি। আমার মনে হয়, এর উৎপত্তির ইতিহাসও চারিপাশের পাথরের গায়ে লেখা আছে। ক্ষুদ্র মার্সেড নদী বয়ে যাচ্ছে আমার বসবার জায়গার তিন হাজার ফুট নিম্নে—এরই কি ওই ক্ষুদ্র পার্বত্য নদীর খেলা? গ্রাণাইট পাথর কেটে তিন হাজার ফুট গভীর খাদের সৃষ্টি করা—এও কি ওরই কাজ?

কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলেছেন, পুরাকালে সমগ্র যোসেমাইট উপত্যকা একটী বিরাট তুষার-প্রবাহ দ্বারা আবৃত ও আচ্ছন্ন ছিল—এই উপত্যকার খোদাই কাজ যা কিছু, সবই সেই বিরাট তুষারনদীর কাজ। কিন্তু সে ষোল পনের অবস্থার কথা। বরফ জমবার অনেক পূর্বেই পার্বত্য নদী নিম্নের গ্রাণাইট পাথর বিদীর্ণ করে নিজের পথ তৈরীর অনেক কাজ আরম্ভ করে দেলেছে।

যোসেমাইট উপত্যকায় দর্শকেরা প্রবেশ করে পশ্চিম দিক দিয়ে—'এল কাপ্তেন' ও 'ক্যাথিড্রাল রক্' নামক দুটী উচ্চ পর্বতচূড়ার মাঝখান দিয়ে। এই চূড়া দুটী যথাক্রমে তিন হাজার ও ছাব্বিশ শ' ফুট উঁচু। এই দুটী পর্বতচূড়ার মধ্যবর্তী পথ পার হয়ে এলেই দর্শকেরা গ্রাণাইট পাথরে খোদাই এক বিশাল, সুগভীর নদীখাতের সামনে এসে পড়বে। বাঁ দিকে যোসেমাইট জলপ্রপাতের রুপোর পাতের মত জলধারা সু-উচ্চ পর্বতশিখর থেকে নিম্নের অধিত্যকায় পড়ছে।

যোসেমাইট উপত্যকা আসলে এই বিরাট নদীখাত ছাড়া আর কিছু নয়। মার্সেড নদী এই খাদটির সৃষ্টি করেছে বহুযুগ পরিশ্রম করে। যুক্তরাজ্যের ভূতত্ত্ব-বিভাগের কর্মচারী ম্যাথিস্ এ সম্বন্ধে যথেষ্ট অনুসন্ধান ও গবেষণা করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তাতে এই কথাই মনে হয়।

আমরা কল্পনা করবার চেষ্টা করি, আমরা আজ থেকে ঠিক এক কোটি বৎসর আগে ফিরে গিয়েছি এবং এই যোসেমাইট উপত্যকাতেই বসে আছি। আমরা কি দেখবো? দেখবো যে, বর্তমান মার্সেড্ নদী তখন একটি অনুচ্চ শৈলমালাপূর্ণ উপত্যকার মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে। উচ্চ কটিবন্ধের অরণ্যে উপত্যকা আবৃত।

তারপর কোনো প্রকারে আগ্নেয় বিপর্যয়ের ফলে উপত্যকার তলদেশ ওপরের দিকে ঠেলে উঠলো। ফলে আবহাওয়া শীতল হয়ে পড়লো। উচ্চমণ্ডলের অধ্যায়ী অদৃশ্য হোল। শীতকালে উচ্চ পর্বতচূড়ায় তুষারপাতের ফলে কালে তুষার-প্রবাহের সৃষ্টি হোল। এরই মধ্যে একটি বিরাট তুষার-প্রবাহ সমগ্র উপত্যকাটি আবৃত করে রেখেছিল, এর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

মার্সেড্ নদীর গতি বদলে গেল এই তুষার-প্রবাহের দীর্ঘদিন স্থায়ী অবস্থানের ফলে। তুষার-প্রবাহ যখন পর্বতগাত্র বেয়ে নামতে লাগল, সে সময়ে পাহাড়ের গা কেটে ধাক্, ডোম চূড়া ও পশ্চিম দিকের খাড়া পাথরের দেওয়ালগুলো তৈরী করলে।

এর পর আরও দুবার যোসেমাইট উপত্যকায় তুষার-প্রবাহ দেখা দিয়েছে। বর্ত্তমান 'এল কাপ্তেন' পর্ব্বতচূড়ার ঠিক পশ্চিমে শেষবারের তুষারপ্রবাহ চিহ্ন রেখে গিয়েছে। উপত্যকার তলদেশ এই তুষারপ্রবাহ দ্বারা মার্জ্জিত হয়, উঁচু নীচু জায়গাগুলি অদৃশ্য হয়। এ হোল প্রায় বিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন বর্ত্তমান কালের ঝরণা দেখা দিয়েছে—তখন থেকেই এ অঞ্চলে পাইন, ফার ও সিকোয়া বৃক্ষের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব।

তারপর তুষারনদ গলে গিয়ে কালক্রমে এক বিরাট হ্রদের সৃষ্টি হোল এখানে। কিন্তু উঁচু বাঁধ কোনো দিকে না থাকায় হ্রদের জল সটান মার্সেড্ নদীখাত দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। সেও প্রায় পনেরো হাজার বছর পূর্ব্বের কথা।

পূর্ব্বে বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছিল যোসেমাইট উপত্যকার বর্ত্তমান রূপ আগ্নেয়-বিপর্য্যয়ের ফল, সে ধারণা আজকাল আর কেউ পোষণ করেন না। একটি বিরাট তুষার-প্রবাহের বহুযুগ ব্যাপী পরিশ্রমের ফলে বর্ত্তমান যোসেমাইট উপত্যকার সৃষ্টি।

নদীখাতের দুপাশে যে খাড়া উঁচু পাথরের দেওয়াল, তাদের গায়ে তুষার-প্রবাহ দ্বারা বাহিত তীক্ষ্ণাগ্র প্রস্তরের আঁচড়ের দাগ এখনও সুস্পষ্ট বিদ্যমান। তবে সকলে এ আঁচড়ের দাগ পড়তে পারে না। যোসেমাইট উপত্যকায় প্রতি বৎসর যে পাঁচ লক্ষ দর্শক আসে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই আসে সিক্‌নিক্ করতে ও হৈ চৈ করতে। ভূ-তত্ত্ব আলোচনা করতে আসে না।

---

# পল্লীর বুকে

—শ্রীনকুলেশ্বর পাল

কত দিন পরে ফিরিতেছি ঘরে গ্রামের শীতল ছায়,
মিনতি জানায় নব কিশলয় বুকেতে ধরিতে চায়।
তৃণদল যার চরণে জড়ায়ে কত কাল যেন চেনা;
দীঘিতে হাসিছে রক্ত-কমল—গন্ধ ছড়ায় হেনা।
চারিদিকে হেরি শ্যামল বুকের সলাজ সম্ভাষণ;
সুখ-স্মৃতি-মাখা অন্তরময় প্রেমের প্রস্রবণ।
সবুজ ক্ষেতের 'আল' দিয়ে দিয়ে আঁকা-বাঁকা পথ ধরি;
চলিতেছি আর বাল্যের স্মৃতি বক্ষে উঠিছে ভরি'।
গ্রামে যেথায় আম্রশাখায় কতই ক'রেছি খেলা;
ভরা ভাদরের বিলের বুকেতে ভাসিয়ে দিয়েছি ভেলা।
ভুলি নাই আজও গ্রীষ্মের ছুটী আম কুড়াবার ধুম;
সাথীদের সাথে কতই খেলেছি নয়নে নাহিকো ঘুম।
করা বকুলের মালা গাঁথি মোরা পরিয়াছি কত গলে;
শেফালী তলায় মন যে ভুলায়—তাই গেছি কত ছলে।
কেতকী-কদম-কুন্দের হাসি অবনী যে মুখরায়।
প্রভাতের আলো চুমু দিয়ে চ'খে ঘুমটী ভাঙ্গায়ে যায়।
বেণুদল চরে গোচারণ মাঠে—রাখালেরা বেণুবনে;
মনের সুখেতে বংশী বাজায়—ফেরে গোধূলির সনে।
পাতার কুটীরে শান্তির ক্রোড়ে সকলে করিছে বাস;
অভাবের মাঝে হাসি মুখে তারা কাটাইছে বার মাস।
বন-বীথিকার ছায়া-ঘেরা কোলে সন্ধ্যাপ্রদীপখানি;
আজিও তাহারা জ্বালায়ে রেখেছে সহিয়া কতই গ্লানি।
নাই কো যেথায় কালকূটভরা সভ্যতা নাগপাশ;
অন্তর-ভরা অমৃতের ধারা বাহিরে নয় বাস।
পল্লীর বুকে নাহি জননীর স্নেহমাখা অঞ্চল;
আজি তাই জাগে বাল্যের স্মৃতি চ'খে ভ'রে আসে জল।
প্রতি তরুলতা স্নেহবন্ধনে বাঁধিতে চাহিছে মোরে;
শ্যামল ছায়ায় কাজল মায়ায় বাঁধার অশ্রু-ডোরে।

---

# জ্যোতিঃহারা

শ্রীঅনুরূপা দেবী

## ৫ম অঙ্ক

### দ্বিতীয় দৃশ্য

যামিনীর বাড়ী, যামিনীর (সুসজ্জিত) শয়ন গৃহ।

[ খাট বিছানা আছে, গৃহ-সজ্জা সবই আছে, আলনাটায় কাপড় নাই, ড্রেসিং-টেবিলটা এলোমেলো, ছোট টিপয়ে যামিনীর একটি বাঁধানো ফটো আছে, একটা ফুলশুদ্ধ ফুলদানী ধূলামাখা হইয়া আছে, মেঝেতে মাদুর পাতা—নলিনীর বই শ্লেট পড়িয়া আছে। জ্যোৎস্না আসিয়া সেই সব গুছাইতে লাগিল ও আপন মনে গান গাহিতে লাগিল। ]

গীত

সখে ভরেছে নিশি রজনীগন্ধা
শান্ত পবন ভরে ধীরে বহে সন্ধ্যা,
পবন করিছে বর্ষণ কি, পরাণপুতুলে হৃদয়ের কেতকী,
ফুলেরা গোপনে কহিছে কত কি ; গাহিছে বিহগী মধুর সুছন্দা
কুটির কুসুমে অর্ঘটি ভরিয়া, ধীর এলিকেশ মহর্ষি বসিয়া,
ব'সে কি এখনি ? ব'সে কি যামিনী ? জোছনার এলো কবে কি
আসিয়া ?
ব'সে কি তখনো, জোৎস্না এখনো ? ব'সে কি পবন সুরভি সুগন্ধা ?

( ঘরগোছান' শেষ করিয়া নিজের আঁচলে জড়ান পাতার মোড়া খুলিয়া কয়েকটী ফুল ফুলদানীতে রাখিল। একটী ফুলের মালা লইয়া ফটোখানি আঁচলে মুছিয়া তার চারিদিকে জড়াইয়া দিল, তার পর সেইখানে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ফটোর পায়ের তলায় প্রণাম করিয়া ফটোখানি তুলিয়া লইয়া গভীর আগ্রহে চুম্বন করিল, বারবার করিয়া তার দুটি চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। )

জ্যোৎস্না। ( অর্দ্ধস্ফুটস্বরে ) তুমি তো আমারই, তুমি আমারই, কেন আমি তোমায় আমার বলে আদর করব না ? কেন ? কেন ? এ-অধিকার আমার আছে, আমার আছে—( যামিনীর প্রবেশ ) আমার থাকবে, চিরদিনই আমার থাকবে। কেউ কেড়ে নিতে পারবে না, তুমি আমার, তুমি আমার। ( সহসা যামিনীকে দেখিতে পাইয়া গভীর লজ্জায় চমকিয়া ছবি ফেলিয়া দিয়া নতমুখে বসিয়া পড়িল। যামিনী মন্ত্রমুগ্ধবৎ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। তখন জ্যোৎস্না উঠিয়া আরক্তমুখে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া অন্য দ্বার দিয়া চলিয়া গেল। )

( যামিনী ও পিসিমার প্রবেশ )

পিসিমা। তোকে ডাকলুম বাবা ! বিয়ের তা'হলে একটা দিনক্ষণ স্থির করা হোক। রমেন আর 'মেজদো' ক'দিন তো কই আসচে না, নৈলে তাদেরই তো বলতুম্। মিথ্যে আর দেরি কেন ? শুভকর্ম্ম শিগ্‌গির শিগ্‌গিরই সেরে ফেলা ভাল।

যামিনী। বিয়ে ? বিয়ে তো হবে না পিসিমা ! ওভাবনা তুমি মন থেকে ছেড়ে দাও। তোমারই ভুল, তাঁর মত নেই।

পিসিমা। অ্যাঁ, বলিস্ কি রে ? তাঁর মত নেই ? অথচ একদিন তুই ওদের বাড়ী না গেলে তখুনি ছুটীতে এখানে ছুটে আসে। নলিনীকে কত যত্ন করে, আমায় কত ভক্তি শ্রদ্ধা ! এ'রে হেঁয়ালি ? তা মত নাই বিয়ের জন্যে শুনি ? বলেন কি তিনি ? চান কি ?

যামিনী। সেই পুরনো আপত্তি, আমরা ব্রাহ্ম—

পিসিমা। তা' উনিই কোন ভাটপাড়ার ভট্টচায্যির মেয়ে, কিংবা খড়দার মা-গোঁসাই ! না না, ও-সব বাজনা শুনতে হবে না, হয় পাগলাখানায় যাক্, না হয় যেমন পাঁচজনে করচে, বে'থা করে ঘরকন্না করুক। দায়-দায়িত্ব ঘাড়ে নেই তাই ! ও চাপ পড়লেই বাপ বলতে পথ পাবেন না। হাঁ:, ঠাকুর নয়, দেবতা নয়—আবার কথা শোন একবার। ভগবান মানেন না ; আপার বেটী ক্ষেপী।

যামিনী। ( চিন্তিত ও বিস্মিতভাবেই রহিয়াছে, সেই ভাবেই উত্তর দিল ) বাস্তবে পিসিমা ! আমি মন স্থির করে ফেলেছি। হয় তো এ ভালই হয়েছে। তুমি এ নিয়ে আর কোন কথা আমায় বলো না, একেবারে ওসব মন থেকেই ছেড়ে দাও। এ আমরা তিন মাসে গোছে বিয়ে বেশ আছি, সুখে আছি।

পিসিমা। (দীর্ঘশ্বাসসহকারে) পোড়া মন সুস্থির হয় কই বাবা? এই বয়সে বৈরাগী হয়েই বেড়াচি, এ যে প্রাণে সইতে পারছিনে। ভাল হোক, মন্দ হোক ঘরণী গৃহিণী বৌ ছিল, ঘর যে আমার শূন্য করে দিয়ে গিয়েছে! তা'ছাড়া আমি কি বাপ চিরদিনই বেঁচে থাকব? মরণ কি আমার হবেই না? তখন তোকে দেখবে কে বল ত? সংসারে থাকতে গেলে কি উদাসী হয়ে থাকলে চলে ধন?

যামিনী। (স্নানহাস্যে) তখন নলিনী বড় হবে পিসিমা! থাকগে ওসব কথা, নলিনীকে দেখছি না যে?

পিসিমা। ইশ্বর নাথের মেয়েরা এলে সে কি আর কোথাও নড়তে চায়, না তারাই তাকে নড়তে দেয়? ওই ছোট মেয়েটা, আহা জোচ্ছনা তো জোচ্ছনা! কি রূপ-গুণেরই মেয়ে বাপু! মনে হয় যেন বুকে রাখি কি কোলে রাখি। কি যত্ন! কি আত্তি! যেজই তো প্রায় দুপুর বেলায় দুটী নোনে আসে, সারাদিন নলিনীকে খাওয়ানো, পড়ানো, মাখানো—বলতে নেই, মেয়েটার ক'দিনে ছিরি পর্য্যন্ত যেন বদলে গিয়েছে! ও যে অত সব শিখেছে, সে কি তার মাষ্টার শিখিয়েছে না কি? সব ওই জোচ্ছনা! তাই ভাবি বাবা! অমন মেয়ে ঘরে আনা কত তপস্যে থাকলে তবেই হয়। হতে হতেও যে হলো না।

(নেপথ্যে নলিনী) ঠামু! তোমায় বড় মাসীমা ডাকছেন।

পিসিমা। অমলা ডাকছে, শুনে আসি কি বলে।

(প্রস্থান)

যামিনী। আমার দেখারই কি ভুল! কিন্তু আমি তো স্পষ্টই দেখলুম। তা ছাড়া আপন মনে যা বলছিল, (অন্যমনস্কভাবে কাছে আসিয়া ফটোটা টেবিলের উপর পড়িয়া আছে দেখিল, খামটী জড়ানোই আছে) আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! কেউ কোন দিন এ সন্দেহ করে নি। না, নিশ্চয়ই করে নি, তা করলে সবই অন্য রকম হতে পার্ত্তো। সুরমতার বদলে ওই-ই তো সেবারে,—আচ্ছা, তখন কেন অমলাদিকে ও বলে নি? হুবোনে অত ভালবাসা। না, বোধ হয় ও সব কিছু নয়। বোধ হয় আমার দেখারই ভুল! বোধ হয়—কিন্তু সেই চিঠিখানা, সেই ইন্দুভূষণকে লেখা। আচ্ছা, সে চিঠিখানা কার লেখা? লেখানায় যে লেখা ছিল (পকেট হইতে পত্র বাহির করিয়া পাঠ) 'ঐ অভাগী মেয়েটী আশৈশব থেকে তার সমস্ত অন্তর দিয়ে আর একজনকে ভালবাসে'—এ কথাটার সঙ্গে আজকের ঘটনাটা তো ঠিকই যেন খাপ খেয়ে যাচ্ছে! তবে কি ইন্দুর সন্দেহই ঠিক? এ চিঠি জ্যোৎস্না নিজেই যেনাথাতে লিখেছে? লেখাটা মিলিয়ে দেখতে হবে তো!

নলিনী। (নলিনীর ছুটিয়া প্রবেশ) বাবা! বাবা! জ্যোতি মাসী আমার মা হবেন, নতুন মা! ঠামু বড় মাসীমাকে বলছিলেন, আমার বড় মাসীমাও তাই বললেন। তাঁদের খুব ইচ্ছে, আর জ্যোতি মাসী না কি তোমায় খুব ভালবাসে। সে বেশ হবে, বাবা! বেশ হবে। জ্যোতি মাসীকে আমি খুব ভালবাসি, ওকে আমি মাসী বলবো না, মা বলবো! খুব মজা হবে।

(ছুটিয়া প্রস্থান)

যামিনী। এ কি আমার পিসিমার কাণ্ড! না না, এ আর সম্ভব নয়! এ বুক ভেঙ্গে গেছে, এ প্রাণ শুকিয়ে গেছে। অমিয়া! অমিয়া! তোমরা আমার এ জীবনটা শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত করে দিয়েছিলে, প্রথম জীবনের সকল আনন্দস্বপ্নই আমার আকস্মিক হতাশার হাহাকারে মিলিয়ে গিয়েছিল। আজ আবার সেই মেঘাচ্ছন্ন ছায়াচ্ছন্ন অন্তর থেকে এই চকিতের ক্ষণিকের এতটুকু গুরাশার বিদ্যুৎ স্ফুরিত হতে চাচ্ছিল মাত্র, তাও তো শেষ হয়েই গেছে; নিঃশেষ!—আর কেন? আর কেন? এই শুষ্ক নীরস পাষাণের সঙ্গে সঙ্গেই নবীন যাযাবরীলতা কিসের লোভে মিলতে চাইবে? না, ভুলে যাবে। দুদিন পরে ভুলে যাবে। এ প্রেম দেওয়ার জিনিষ নয়, খেলা করবার বিষয় নয়। ছেলে-মানুষ ভুলে যাবে, কিন্তু আমি তো পারবো না! না, একবার তো সে পরীক্ষা হয়েই গেছে। আমি পারি নি, সুরমতাকে ভাল বাসতে পারি নি।

অমলা। (প্রবেশ করিল) ভাল আছ প্রকাশ! ক'দিন না কি শরীরটা ভাল ছিল না শুনলেম?

যামিনী। (অগ্রসর হইয়া পদধূলি লইল) আসুন দিদি! ভালই আছি, কাকাবাবুর শরীর ভাল? আপনারা ভাল আছেন ত? বসুন না (চেয়ার দিল)।

অমলা। ( বসিয়া ) তুমিও বসো না ভাই, এই যে একটা চেয়ার রয়েছে। আচ্ছা প্রকাশ! সিসিমা বলছেন, মিস্ দত্তর না কি বিয়েতে মত হলো না? কারণ কি, সেই একই? নাস্তিকতা? আচ্ছা ভাই! এদিকে অত ভাল মেয়ে; ধর্ম, সত্য, জ্ঞান সবই প্রচুরতর ভাবেই আছে, ঈশ্বরবিশ্বাসটার বেলাই যা নাই কেন? তা হলে সত্যি-সত্যিই তোমাদের বিয়ে বন্ধ হলো? ওঁর মতে—অর্থাৎ সিসিমা মানেছেন—কি তুমি সম্মত নও?

যামিনী। না।

অমলা। ( ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ) সিসিমার খুব বেশী রকম ইচ্ছা, তোমার বউ এনে সংসারের ভার, তোমার ও নলিনীর ভার দিয়ে সংসার থেকে অবসর নিয়ে ঈশ্বর-চিন্তায় দিন কাটান। তা কিছু অন্যায় ইচ্ছাও তো বলতে পারি নে। কিন্তু মিস দত্ত যদি ও রকম মুহূর্তের পণ ধরেই বসে থাকেন, তা'হলে উপায়!

যামিনী। দিদি! তোমার ছোট ভাইটিকে তুমি কি এতটাই অসহায় দুর্বল মনে করো? বেশ তো আছি। সিসিমা যদি ঈশ্বরচিন্তার অবসরই চান, তাই পাবেন, তার জন্যে আমার একটা বিয়েই বা করতে হবে কেন? বিয়ে আমি সেবার শুধু বাবার জন্যেই করেছিলেম, সে তো তুমি ভাল করেই জানো, দিদি! আর তার ফলও যা হয়েছিল, তাও যে জানো না তা নয়। নলিনীর মা যাই থাক, সেও আমার কাছ থেকে তার যথার্থ যা প্রাপ্য তা' যে পায় নি, তা আমি নিজেই অস্বীকার করতে পারি নে। সে দোষ সম্পূর্ণ আমার। আমি ওর সঙ্গে নিলিপ্ত ব্যবহার না করলে ও হয় ত' অতটা মন্দ ব্যবহার করতো না।

অমলা। ( ম্লানভাবে ) সে যদি নিতে জানতো, নিশ্চয়ই পেতো। সে দোষ তোমার চাইতে তারই বেশী আমার মনে হয় প্রকাশ। যে মেয়ে তোমায় যথেষ্ট ভক্তি করবে, ভাল বাসবে, তেমন মেয়ে যদি আমরা পাই, তোমার তাকেই বিয়ে করা উচিত। তোমার হাতে ওটা কি প্রকাশ? জোৎস্নার হাতের লেখা না? কি লিখেছে সে? ( সন্দিগ্ধ ভাবে ) চিঠি?

যামিনী। ( নীরবে পত্রখানি অমলার হাতে দিল )

অমলা। ( মনে মনে পত্র পাঠ করিয়া সনিশ্বাসে ) পোড়া মেয়ে এই করেছে বুঝি? আমরা ভাবি হঠাৎ ছেলেটা ডুব মারলো কেন? যাক্ এক রকম ভালই হয়েছে প্রকাশ। তোমায় কি আরও স্পষ্ট করে বলতে হবে? তুমি কি—

যামিনী। ( কাতর ভাবে ) দিদি! দিদি! আজ আমায় মাপ করুন, আজ আমি আর কোন নতুন কথা শুনতে পারবো না। মনে হচ্ছে,—নাঃ থাক, যদি কিছু বলবার থাকে, আর একদিন বলবো। আজ শরীর মন-দুই-ই যেন কেবল চাচ্ছে বিশ্রাম, বিরতি, আর কিছু না, আর কিছু না।

অমলা। ( উঠিয়া সস্নেহে ) তবে থাক ভাই! তুমি একটু শুয়ে থাকো। মাথা ধরেছে কি? একটু টিপে দোব? হাওয়া করি? কি ক্লান্ত তোমায় দেখাচ্ছে প্রকাশ!

যামিনী। না না, কিছু না, ব্যস্ত হবেন না; একটু চুপ করে পড়ে থাকি, সেরে যাবে। ( খাটে গিয়া শুইয়া চোখ মুদিল )

অমলা। ( ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল ) ঘুমিয়ে পড়লো কি? থাক, সইতে পারছে না। একদিকে প্রত্যাখ্যানের ব্যথা, আর একদিক থেকে প্রাপ্তির বিস্ময়; দুটোতে মিলে ওকে বিশেহারা করে দিয়েছে। দেখি, যদি পারি, যদি জ্যোতি পোড়াকপালীর কপালে থাকে! হায় হায়, তখন ওকে যেচে নিচ্ছিল, কি ভেবেই যে ফিরলো না! আর আজ হয়তো ভিক্ষে করেও পাবো না। যে সুযোগ হাতের কাছে এসে ফিরে চলে গেছে, সে আর কি ফিরবে। কিন্তু তা না হলেই বা মেয়েটার দশা হবে কি? আর এ শুধু আমারই জন্যে, আমারই বুদ্ধির ভুলে। ছেলে-বয়েসের ভাবপ্রবণতা। ঔপন্যাসিকত্ব! ( ধীরে ধীরে প্রস্থান )

## তৃতীয় দৃশ্য

( যামিনীর বাটীর সম্মুখস্থ উদ্যান )

[ জ্যোৎস্না ও নলিনী বেড়াইয়া বেড়াইয়া ফুল তুলিতেছিল ]

জ্যোৎস্না। আয় নলিনী! এই ফুলগুলিতে একগাছা মালা গাঁথি।

নলিনী। কা'কে দেবে? বাবাকে, না আমাকে?

জ্যোৎস্না। (সলজ্জে) ওঁকে কেন, তোকেই বোধ। (মনে মনে) দিদিমা একে কি সব বলেছেন, সেই থেকে দুষ্টু মেয়েটা যা না' তা' বলতে আরম্ভ করেছে। আমার কি না সৌভাগ্য। অত বড় সুন্দরী, অত বড় বিদুষী যাঁর ভালবাসার পাত্রী, তিনি কিসের দুঃখে ফিরে চাইবেন, এই তুচ্ছ জ্যোৎস্নার দিকে। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল)

নলিনী। কবে তুমি আমাদের বাড়ী থাকবে? কবে তুমি আমার মা হবে? সেদিন কি মজা হবে রে! (হাততালি)

জ্যোৎস্না। চুপ কর নলিনী, কেউ হাত শুনতে পাবে। এস তোমায় সাজিয়ে দিই। (ফুল দিয়া সাজানো) বাঃ আমার নেলুকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে! সেই গানটা গেয়ে নাচতো নলিনী।

(নাচের তালে উভয়ের গীত।)

ফাগুন মাসের জোছনাজলে ডুবলো ধরা,
কোন্ অতিথ পুরের বাঁশীর সুরে উদাস করা।
ফুটেছে মাধবীফুল, আমের মুকুল ডালে ডালে
(মোর ঐ) গাছে কোকেল, শ্যামা দোয়েল, নাচে রে তারাই তালে তালে,
নীরব হলো আজকে মাঠে মর্ম্মে মরা।

যামিনী। (সবেগে করিয়া) কি সুন্দর দেখাচ্ছে নলিনীকে! জ্যোৎস্না, তোমার ওর 'পরে এই স্নেহ ভালবাসা দেখে বাস্তবিক আমি মুগ্ধ হয়েছি! আমি নিঃস্ব ভিখারী বললেই হয়, নৈলে, যদি আমার কিছুমাত্র সঙ্গতি থাকতো, আমি বোধ করি আজন্ম তোমার কাছে কেনা হয়ে থাকতে পারতুম। আমার যে সহোদরা ভগ্নী ছিল না, সে দুঃখ মেটাবেন বলেই হয়ত পরমকারুণিক ভগবান দিদিকে আর তোমাকে আমার জীবনের মধ্যে এনে দিয়েছেন। জগতে যদি আর কিছুই না পাই, তবু এই ছোট বড় দুটী বোনের ভালবাসা, স্নেহ ও সহানুভূতি পাওয়ার জন্যে নিজেকে আমি পরম সৌভাগ্যবান বলেই মনে করবো।

জ্যোৎস্না। (স্বগতঃ) ভাল, সেদিনের সেই আবিষ্কারের এই উত্তর পেলুম বোধ হয়? তা'ছাড়া আর কিই বা পেতে পারতুম? আর কিই বা আশা করি?

নলিনী। বাবা! বাবা! জ্যোতিমাসীকে আমি মা, নতুন মা বলে ডাকি। জ্যোতিমাসী রাগ করে। বলে, তোমার বাবা রাগ করবেন। হাঁ বাবা, তুমি রাগ করবে? কেন বাবা! আমায় যে বলতে ভাল লাগে।

জ্যোৎস্না। (উঠিয়া) নলিনী! আমি যাই, তুমি যাবে তো এসো (গমনোদ্যতা)।

যামিনী। (স্থির নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া স্বগতঃ) মুখে চোখে গভীর অভিমান ভরা। হায়, জগতের এ কি অপূর্ব্ব বিধান! বঞ্চিত হওয়াই কি এর ধর্ম্ম? কিন্তু এ'ও কি সম্ভব? এমন একটি পুষ্পদলের মতই কোমল সুন্দর, একে এই শ্মশান-সৈকতের মত শূন্যতার হাহাকারে-ভরা রুদ্ধ চিত্তের সংস্পর্শে এনে কোন্ সার্থকতা দিতে পারবে? না, কিন্তু যদি এর বিপরীতে—(প্রকাশ্যে) জ্যোৎস্না!

জ্যোৎস্না (দাঁড়াইল)

যামিনী (সেই পত্র বাহির করিয়া) এ চিঠি কি ইন্দুকে তুমি লিখেছিলে?

জ্যোৎস্না। (বারেক চাহিয়া দেখিয়া মাথা হেলাইয়া জানাইল) হাঁ।

যামিনী। (কাছে আসিয়া) এতে লেখা আছে 'আপৈশব আর এক জনকে সে ভালবাসে'—যদি আমায় বিশ্বাস করে বলো কে সেই 'আর একজন,' আমি চেষ্টা করে দেখি যদি—(সহসা নীরব)

জ্যোৎস্না। (চকিত নেত্রে যামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া নত মুখ)

যামিনী। লজ্জা কি, বল, কে' সে?

অমলা। (সহসা দেখা দিয়া) আমি বলতে পারি, প্রকাশ! শুধু বিধায় পড়ে নীরব ছিলুম। সে ওর আপৈশবের পরিচিত স্নেহমমপ্রাণ যামিনী প্রকাশ রায়, যার সঙ্গে একবার মিলিত হতে হতে ও আমারই জন্যে, আমার অতিস্নেহের সন্দিগ্ধ সাবধানতার জন্যেই বঞ্চিত হয়েছিল—

জ্যোৎস্না। (দ্রুতপদে আসিয়া অমলার মুখ চাপিয়া ধরিল) দিদি! আমার জন্যে ব্যস্ত হয়োনা, শুধু নলিনীর ভার আমি যদি পাই, আমার পক্ষে সেই চের হবে।

যামিনী। (চিন্তিত থাকিয়া স্বগতঃ) এই নিঃস্বার্থ নিষ্কলুষ অন্তরের অম্লান ভালবাসা, এ কি এমন করে প্রত্যাখ্যান করবার যোগ্য? কিন্তু অমিয়া! অমিয়া! তোমায় তো এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আমি কোন দিনই ভুলতে পারি নি, আজও তা' পারছি নে? নিরুপায়! নিরুপায়! কেমন করে আবার আমি—

অমলা। যামিনী! কথা কও। আমার মেয়ের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কি আমায় করতে দেবে না? আজন্ম এই মেয়ের প্রতিমা বুকে নিয়ে আমি অনুতাপের হুতাশনে পুড়ে পুড়ে ছাই হবো?

জ্যোৎস্না। দিদি! তোমার পায়ে পড়ি, আমার জন্যে—

যামিনী। শুনুন দিদি! (সহসা ক্রম্ করিয়া একটা ভীষণ আওয়াজ হইল, সাঁ করিয়া একটা গুলি যামিনীর পাশ দিয়া ছুটিয়া গেল, পরক্ষণেই, অথবা সঙ্গে সঙ্গেই, জ্যোৎস্না একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া যামিনীকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুলি দুইটা আসিয়াই জ্যোৎস্নার পিঠে ও ঘাড়ে বিদ্ধ হইল। একটা মৃদু আর্তধ্বনির সহিত সে যামিনীর পদতলে লুটাইয়া পড়িল। এদিক ওদিক হইতে মালি চাকর সোফার ছুটিয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে রাস্তার লোক ও একটা কমেইবলও দেখা দিল। কণিক নিস্তব্ধতার পরিশেষে যামিনী জ্যোৎস্নাকে উঠাইয়া ঘাসের উপর শোয়াইয়া দিল)

যামিনী। ডাক্তার! ডাক্তার, ডাক্তারকে কেউ ডাকতে দোটো। ড্রাইভার, মোটর বার কর—

অমলা। (মুখের উপর পড়িয়া) দিদি যে আমার, এমনি করেই তুই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ করে গেলি। সব সমস্যা মিটিয়ে দিলি?

যামিনী। (আর্তস্বরে) জ্যোৎস্না! জ্যোতি, এ কি করলে? আমার বেঁচে থাকা পর্যন্ত ভার করে দিয়ে গেলে! উঃ! উঃ!

জ্যোৎস্না। আঃ, কি আনন্দ! (হাস্যবিভাসিত স্মিত মুখে যামিনীর পানে চাহিল। ডাক্তার, যতেন্দ্র, ইন্দ্রনাথ আরও কয়েকজন ছুটিয়া প্রবেশ করিলেন)

যতেন্দ্র। রাস্তায় খবর পেয়েই আমার গাড়িতে ডাক্তারকে তুলে নিয়ে আসছি। উঃ কি রক্ত!

ইন্দ্র। (মাথায় হাত দিয়া) মা আমার! তোমার জন্যে শোক করবার কিছুই নেই, গৌরব বোধ করবার যথেষ্ট আছে। নিজে বন্ধ হয়ে তুমি তোমার বাপ মাকে মুক্ত করেছ! শান্তিময়ী ছিলে, সেই শান্তি তোমার শাশ্বত জীবনে অবিনশ্বর হোক।

ডাক্তার। (পরীক্ষা করিতে করিতে) সব শেষ হয়ে গেছে! (ছাড়িয়া দিল)।

(দু'জন কনষ্টেবল ভূষণকে ধরিয়া প্রবেশ করিল)

ভূষণ। যাক্ বাবুকে যে সন্তানমুক্ত করেছি, আমার অন্নের হন্তারকের ওপোর প্রতিশোধ নিতে পেরেছি এই ঢের! এঃ, এতো মেরেছি একটা মেয়ে! সব বৃথা হলো? (স্বগতঃ) নাগের পাঁচটি ছানার তো মেরে দিলুম, এখন যে-ই মরুক। ফাঁসি গেলেও বউ বেটি তো বলে খাবে।

## চতুর্থ দৃশ্য

(সাধামশাই-এর গৃহোদ্যান)

[একটী শান-বাঁধানো চাতালে আসন পাতিয়া সাধামহাশয় বসিয়া আছেন, সামনে দীঘিতে পদ্মফুল ফুটিয়া আছে, গাছে গাছে ফুল, ভোরের আলো আকাশে ও জলে বর্ণবিন্যাস করিতেছে।]

সাধামশাই। (পত্র পড়িতে পড়িতে) "তুমি লিখেছ, আমি বরাবরই তাঁকে পেয়েছিলুম, শুধু আত্মবিস্মৃতির বশে সেটা জানতে পারি নি। এই জন্যই আমাদের একজন গুরুর প্রয়োজন, যিনি জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দিয়ে চোখ খুলে দেবেন। তুমি যা বলেছ সবই সত্য। তিনিও এ সব কথা কতবার বলেছেন, তাঁকে আমার জীবনে না পেলে তোমায় আমি চিন্‌তেই হয়ত পারতুম না। ধরতে গেলে তিনিই আমার গুরু। আর তুমি যে আমার কি, তা ত বলতে পারি নে। সমস্ত যুক্তি-তর্ক দু হাত দিয়ে ঠেলে ফেলে তোমার মুখের দিকে চাইলেই সকল দ্বিধা এক হয়ে যায়। জড় প্রকৃতি যে ঐ জ্ঞান ও আনন্দ তোমায় দিতে পারে নি, আর ওই তোমার মুখের পরমানন্দের বিশোকা জ্যোতি যে পরমাণুপুঞ্জের লীলাসংস্থান মাত্র নয়, যুগযুগান্তরের সাধনা-লব্ধ তপঃফল তা' আর কারুর বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না।" (আত্মগত) মেয়েটা একেবারেই ভাবপ্রবণ। এরা খাবার এদিকে পড়ে, না হয় ওদিকে পড়ে, সোজা রাস্তায় চলে না। শেষটায় কি লিখেছে:

(পুনঃ পত্রপাঠ) 'দাদা তার মেম বউ নিয়ে দেশে আসছে, আমি তার সঙ্গে দেখা করবো না, এ বাড়ী বাবা আমায় দিয়ে গেছলেন, আমি তাঁর নামে একটা পাবলিক

লাইব্রেরী করে দিয়েছি, তুমার ঘরেরগুরু এ সব দেখা শোনা করবেন, উনিও। এখন আমার জন্যে বাকি রৈলো শুধু তোমার স্নেহের কোল।'

অণিমা। ( ছুটিয়া আসিয়া ) দাদা মশাই।

দাদা। ( প্রসারিতবাহু ) দিদিমণি!

অণিমা। ( আপনাকে বাহুমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ) আমায় নাও আমায় নাও তুমি, আর আমি পারছি নে, চল আমরা কোথাও অনেক দূরে—অনেক দূরে চলে যাই।

দাদা। ( স্নিগ্ধ হাস্যে ) কর্ত্তব্যকে বড় না ভেবে তাকে আনন্দের স্থান মনে করে নাও না ভাই। আনন্দের বজ্রহুতে সকল অশান্তি গুলোকে আহুতি দিয়ে দে' না, পালাবি কার ভয়ে রে?

অণিমা। ( অবরুদ্ধ কণ্ঠে ) কাকুকে ভয় করি নে দাদা-মশাই। ভয় শুধু নিজেকেই। তোমার আর কি লুকবো, সবই তো জানো তুমি। নিজের দুঃখ আমি সইতে পারি, কিন্তু উনি যে আমার জন্যেই আবার এই একটী অত্যন্ত শোকের স্মৃতির মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন, এ আমার সহ্য হচ্ছে না। চল, চল, আমরা দুজনে এদেশ ছেড়ে চলে যাই। আমার এই জ্যোতিঃহারা জীবনের উপর তোমার ওই আনন্দের ছাপ যখন দৃঢ় হয়ে ছেপে যাবে, তখনই আবার ঘরকার মনে চলে ফিরে আসবো, তার আগে নয়।

দাদা মশাই। তবে তাই চল্ দিদি! চল্।

[ সমাপ্ত ]

---

# পুরোহিত

—শ্রীহরিপদ ঠাকুর

নামাবলি আর টিকি ফোঁটা যদি
সঙ্গে মোদের থাকে;
খাওয়া ত' সবেই ছাঁদাও বাঁধিব,
দক্ষিণা খোব টাঁকে।

পৈতায় গোছা গলে যদি থাকে,
আর নাড়ি যদি মোরা টিপি,
কাটা পাবে কত দু'রে পড়ে গিয়ে
টাঁকে বাঁধা পড়ে লিপি।

যন্ত্র-তন্ত্র যাহা জানি মোরা
তা জানে জগৎগুরু,
ঘণ্টাতে করি ঘাটখানি পূজা—
একখানি ক'রে সুরু।

গৃহিণীর কাছে ঘরেতে যাথাই
আমি বড় পুরোহিত,
ব্রহ্ম-তেজেতে ছুটিয়া বেড়াই
নাই রোদ কিবা শীত।

বাহিরে আমরা যা' করি তা' করি
জানে তা বিশ্বকর্ম্মা,
ঘরমান বাড়ী ফোঁটা কেটে গেলে
অমনি পুরুত শর্ম্মা।

ছেলেরা মোদের প্রায়ই থাকে সবে
ভোজনেতে খালি বাত,
পূজা-পার্ব্বণে ফল-মূল' এনে
গিলে ফেলে তাহা আস্ত।

গৃহিণী মোদের প্রায়ই দুবরা
সদাই ক্রোধেতে তর্জ্জা,
আদ'চাল কলা শুছাতে শুছাতে
জাঁখিতে বরাষ বর্ষা।

( মোরা ) ছেলেবেলা থেকে প্রায়ই শিখাই
ছেলেকে খুটে মন্ত্র,
মিনিটেতে সারে দশখানি পূজা—
চলে যেন এক যন্ত্র।

( তবু ) নিত্য পুটুলি বেঁধে না আনিলে
ঘরে নাহি হাঁড়ি জ্বলে,
লক্ষ্মীর মোরা সহীন পুত্র,
পুরোহিত ইহ কালে।

# পরলোক-রহস্য

—শ্রীনিখিলেশ রুদ্রনারায়ণ সিংহ

পৃথিবীর এক দিক আঁতুড়-ঘর, আর এক দিক প্রেত-ভূমি—তার পর ?

এখানে সকলেই একেবারে নিশ্চেষ্ট—নিশ্চুপ। এরই উত্তর পাবার আশায় তীব্র অনুসন্ধিৎসু ও অশেষ কৌতূহলী শিশু নচিকেতা যমরাজের নিকষ-কালো দ্বারে ধরনা দিয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল :

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং,—"

অনুবাদ : "কেউ বলে, মৃত আত্মার পরলোক-গমন-করতা হয়েছে—আবার কেউ কেউ বলেন, না, নেই। এই সর্বজনবিদিত অনুশীলিত অদ্ভুত সংশয়—এই পরলোক-তত্ত্ব, হে যম! আমি তোমার কাছে জানতে চাই।" এটা বৈদিক যুগের কথা।

দেখা যাচ্ছে, মৃত্যুর পর কি হয়, কিছু রয়েছে অথবা মোটেই কিছু নেই—এই চিরিবার কৌতূহল মানব-সভ্যতার প্রথম সময় হ'তে আজ পর্যন্ত সকল দেশের ও সকল মহাদেশের সকল শ্রেণীর নর-নারীকে প্রায় সকল সময়েই সমানভাবে বিচলিত করে তুলেছে। এই তীব্র অনুসন্ধিৎসা ধর্ম ও দর্শনগুলির মূল উৎস হ'য়ে বর্তমান রয়েছে।

হিন্দু দর্শন আত্মার—মৃত্যুর পরেও জীবাত্মার অস্তিত্ব আর কর্মফলানুসারে তার পরজীবনের-প্রাপ্তি স্বীকার করে। এ-সম্বন্ধে বৌদ্ধ দর্শনও প্রায় একমত।

খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম জীবের মৃত্যুর পর কর্মফলানুসারে যখন তার স্বর্গ ও নরক স্বীকার করে, তখন পরলোক সম্বন্ধে তারাও অবিশ্বাসী নয়। প্রাচীন বৈদিক যুগে ঋষি-মহাপুরুষগণ ধ্যান-মৌনে সমাধিস্থ হ'য়ে যা' দেখে বিশ্বাস করতেন, পূর্ণ সংশয়বাদী বর্তমান কালের শিক্ষিত মানুষ সে সবই পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে চান।

মানুষের মন বর্তমানের কর্কশ ক্যাক্টরীর বাঁশি আর তার ধোঁয়াটে আর ঘোলাটে ধোঁয়ার ঘুরপাক খেতে খেতে এমন এক অদ্ভুত অবস্থায় এসে পড়েছে যে, নিজের মন ও চক্ষু কর্ণকেও সে যেন পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করতে পারছে না। সুতরাং কি করে সে অন্যের কথায় পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারবে ?

সব চাইতে আশ্চর্য হচ্ছে, পরলোকের নিগূঢ় রহস্য জানবার জন্যে বর্তমান সময়ে table tilting (টেবল ঠক্‌ঠক্), automatic writing (স্বতঃ-প্রণোদিত লিখন), trance (বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থা), clairvoyance (দিব্যদৃষ্টি) প্রভৃতি যে-সব আধুনিক প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়, তাতেও অনেকের মনে নানা ধরণের ছোট-বড় সন্দেহের অবকাশ থাকে। সন্দেহ থাকলেও—মনেতে সময় সময় কোনো উৎকট প্রশ্ন জাগলেও table-tilting আর automatic writing দেখে সকলের মনে আরও জানবার ইচ্ছা, আরও জিজ্ঞাসার প্রাদুর্ভাব হয়। এমনতরো জিজ্ঞাসার পরম আন্তরিকতার উপরেই মহান্ পারত সত্য আবিষ্কারের পূর্ণ সাফল্য নির্ভর করে।

## টেবল ঠক্‌ঠক্ : Table-tilting

তিনপেয়ে টেবলের চারপাশে গোল হ'য়ে বসে একে অন্যের হাত একত্রে যুক্ত করে একাগ্রচিত্তে কোনো নির্দিষ্ট মৃত ব্যক্তির চিন্তা করলে কিছুক্ষণ পরে টেবল আপনা থেকেই নড়তে আরম্ভ করে। এমনভাবে দোলন আরম্ভ হ'তে কখনও এক ঘণ্টাও অতীত হ'য়ে যায়—আবার কখনও পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগে না। কারণ অভ্যাস আর একাগ্রতার ওপরেই সময়ের তারতম্য নির্ভর করে। টেবল নড়তে আরম্ভ করলেই বুঝতে হয়, কোনো মৃতব্যক্তির আত্মা এসে পৌঁছেছে, তখন তাঁকে প্রশ্ন করলে টেবলের যে কোনো একটা পায়া প্রশ্নকারীর নির্দেশমত ঠুকে' আর শব্দ করে তিনি প্রশ্নের উত্তর দেন।

## স্বতঃ-প্রণোদিত লিখন : Automatic writing

(ক) আবির্ভূত কোনো কোনো আত্মা টেবলে শব্দ না করে তার কোনো একটা পায়া অবলম্বনে মেজের ওপর

স্পষ্টাক্ষরে লিখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে থাকেন। মেজের ওপর তক্তা হালকা বালু অথবা গুঁড়ো খড়িমাটি ছড়িয়ে রাখলে তাতে গভীর দাগ পড়ে লেখার লেখাগুলো পড়বার সময় কষ্ট-সাধ্য না হয়ে সহজ-সাধ্য হয়।

(খ) টেবল আন্দোলিত হ'য়ে যখন আত্মার আবির্ভাব জানিয়ে দেয়, তখন চক্রের যে-কোনো ব্যক্তি কাগজের ওপর পেন্সিল ধরলেই মুহূর্তে হাত সম্পূর্ণ অবশ হ'য়ে ক্ষিপ্রগতিতে লিখতে আরম্ভ করে। বেশ অনুভূত হয়, কে যেন তার হাত ধরে ক্রমাগত এ-ধার ও-ধার করে বেঁকেচেরে লিখে চলেছে। এই প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ এই রকম লেখার সাহায্যে প্রশ্নের উত্তর অথবা প্রশ্ন-বহির্ভূত অনেক কিছু কথাই প্রকাশ হ'য়ে পড়ে।

(গ) টেবলের চক্রে না বসে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে একা একা চিন্তা করলেও স্বতঃ-প্রণোদিত লিখন আরম্ভ হয়, পরলোকের বার্তা পাবার জন্যে মৃত-তত্ত্ববিদেরা (spiritualists) এই তিন রকমের উপায়ই প্রধানতঃ গ্রহণ করে থাকেন।

## বাহ্য-জ্ঞান লোপ : Mesmeric Trance

উপরোক্ত উপায় ভিন্ন আরও দু' একটা উপায় রয়েছে যা অধিকতর কঠিন ও শক্তিসাপেক্ষ। তাতেও আগের প্রক্রিয়ার মত চক্রে ( circle ) বসতে হয় একত্রে।

যিনি মৃত ব্যক্তিকে আহ্বান করেন, তিনি থাকেন অবশ্য চক্রের বাইরে। চক্রের বাইরে থেকে গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণের সঙ্গীত গেয়ে অথবা উদাত্ত স্বরে প্রণবধ্বনি করে টেবলের চার পাশের environment-কে ( আবহাওয়াকে ) গাম্ভীর্যপূর্ণ করে তোলেন এবং মাঝে মাঝে উপস্থিত সকলের মাথায় হাত বুলিয়ে তাদের ভেতরে শক্তি সঞ্চার করেন।

এই ভাবে কিছুটা সময় কেটে গেলে পর যখন দেখা যায়, চক্রের কোন ব্যক্তি নিবাত নিষ্কম্প আলোর মত ধীর স্থির হ'য়ে পড়েছে এবং রুক্ষ বাস্তবজগতের স্থূল অনুভূতিও তার লোপ পেয়ে গেছে, চক্রাধিপতি ( যিনি মৃত ব্যক্তিকে আহ্বান করেন ) তখন অন্তর্নিহিত তীব্র শক্তি বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মত তার মধ্যে প্রবল বেগে সংক্রমণ করেন। এতে ঐ ব্যক্তির একাগ্রতা আরও বেশী করে ঘনীভূত হয়, আর ইহলোকের স্থূল অনুভূতি কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না।

এরই নাম trance অর্থাৎ গভীর আবেশাচ্ছন্ন অবস্থা।

এমন অবস্থা হ'লে তাকে ধীরে ধীরে চিৎ ক'রে শুইয়ে দিয়ে চেপে ধরতে হয়, কারণ দেখা গেছে উপুড় হ'লেই একাগ্রতা চলে যায় এবং বাহ্যজগতের জ্ঞান ক্রমশঃ ফিরে আসতে থাকে। তার পর ঐ ব্যক্তির নাম ধাম জিজ্ঞেস করলে তিনি নিজ নামধাম না বলে যে ব্যক্তির আত্মার আবির্ভাব হয়েছে তাঁর পরিচয় দিয়ে থাকেন এবং সাধ্যমত সকল প্রশ্নের সহজ সরল সোজা উত্তর দেন।

আবিষ্ট ব্যক্তির আঙুলে পেন্সিল গুঁজে দিলে লিখেও তিনি উত্তর দিতে পারেন। বক্তব্য শেষ হবার পর উপুড় ক'রে দিলেই আবিষ্ট ব্যক্তির বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসে। তবে মাঝে মাঝে এও দেখা গেছে যে, অভিভূত ব্যক্তির বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলেও কেউ কেউ বার বার অজ্ঞান হ'য়ে পড়েন।

নানা কারণে এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হ'য়ে থাকে :—

(অ) ধর তো অভিভূত ব্যক্তির স্নায়ু অত্যন্ত দুর্বল ;

(আ) অথবা তার দেহে যে মৃতব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁর বক্তব্য শেষ হয় নি। তিনি ঐ ব্যক্তির উপর আবার আবির্ভূত হ'য়ে তাঁর সকল কথা ব'লে যেতে চান ;

(ই) অথবা ঐ অভিভূত ব্যক্তির শরীর ও মন অবলম্বনে মৃত আত্মার জগতের অপূর্ণ ভোগরাশি উপভোগ করবার অভিলাষী।

চক্রাধিপতি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও শক্তিমান হ'লে কোন রকমের বিপদ না ঘটতেও পারে, নতুবা অভিভূত ব্যক্তির যথেষ্ট ক্ষতি হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

প্রায় বছর পাঁচেক পূর্বে চক্রে উপবিষ্ট বয়সে ছোট এক মিডিয়াম( medium )-এর উপর তার কোন মৃত আত্মীয়ের আবির্ভাব হয়। আবশ্যক প্রশ্নোত্তর শেষ হবার পর মিডিয়ামকে উপুড় ক'রে দিয়ে, মৃত আত্মাকে চলে যেতে বলা হ'ল, তথাপি মিডিয়ামের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল না। অনেক চেষ্টার পর অর্দ্ধবাহ্যদশায় তার মনকে টেনে আনলেও অল্প সময়ের মধ্যেই তা আবার সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় চলে গেল।

বার বার এমনই হ'তে লাগল। মিডিয়ামের মা নিকটেই দাঁড়িয়ে সমস্ত কিছু দেখছিলেন এবং শুনছিলেন,

তিনি কাঁদতে আরম্ভ করলেন। তার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনও অত্যন্ত বিমর্ষমুখে চারদিক ঘিরে রইল। তাদের প্রত্যেকেই সাহস ও সান্ত্বনা দিয়ে, মিডিয়ামের উপর আবির্ভূত মৃত আত্মাকে বহিষ্কৃত করবার জন্যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হ'ল।

বেশ কিছুটা সময়ের পর তার বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরে এলেও বুঝতে পারা গেল, মিডিয়ামের সুষুপ্তির ঘোর তখনও সুষ্ঠুভাবে কাটে নি।

প্রশ্ন করতেই সে বললে, তার উপর যিনি ভর করেছিলেন, চোখ মেলে থাকলেও তাঁকে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে, আর দেখতে দেখতে আবার বাহ্যজ্ঞানশূন্য অদৃশ্য লোকে চলে যাবার জন্যে তার অত্যন্ত ইচ্ছা হচ্ছে। বুঝতে বিলম্ব হ'ল না, মৃত আত্মা তাকে অবলম্বন ক'রে কিছুটা সময় ধূলি-ধূসর পৃথিবীতে থাকতে চান।

আশঙ্কা হ'ল, মিডিয়াম বিনা চেষ্টায় আবার অভিভূত হ'তে পারে। ঘণ্টা কয়েক পরে সত্য সত্যই তাই ঘটলো। অনেক চেষ্টায় বাহ্য জগতে তার মনকে ফিরিয়ে আনলেও কিছুক্ষণ পরে আবার তা অন্য জগতে চলে গেলো। সম্ভবতঃ ছেলেটা—বেতুয়াদী ( খুব ভালো মিডিয়াম ) হেতু করলে তার মুখ দিয়ে হয় তো পরলোকের অনেক গূঢ় আশ্চর্য্য রহস্যই প্রকাশ হত, কিন্তু তার মা ও আত্মীয়-স্বজনের গভীর বিষাদাচ্ছন্ন মুখ দেখে তা করা আর সম্ভব হলো না।

শুধু তাই নয়, বেশীক্ষণ মিডিয়ামকে অভিভূত রাখলে, মৃত আত্মা তাকে বেশী করেই তার নিজের আয়ত্তে এনে ফেললেও ফেলতে পারে, এ আশঙ্কাতেও অমন করা সম্ভব হয় নি। মিডিয়ামকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, মৃত আত্মাকে চিন্তা করতে তার খুব ভালো লাগে, চিন্তা না করে সে থাকতে পারে না এবং কয়েক মুহূর্ত্ত এক মনে চিন্তা করলেই তার বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায়।

মৃত আত্মা কেন্দ্রে বসে অদৃশ্যরূপে যে-মন সম্পূর্ণ অধিকার করে রয়েছে, সেখান থেকে তাঁকে সরানো অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং বাধ্য হ'য়ে সকলের সকল চেষ্টা বিফল করে তিনি ইচ্ছামত বেতুয়াদীকে নিয়ে খেলতে লাগলেন। পরিশেষে নিরুপায় হ'য়ে শারীরিক কঠোর শাস্তির ভয় দেখাতেই মিডিয়াম মৃত আত্মার চিন্তা ত্যাগ করলে এবং দিন কয়েকের মধ্যেই সম্পূর্ণ সহজ ও সুস্থ অবস্থায় ফিরে এলো। যাঁরা টেবলে table-tilting অথবা স্বতঃ-প্রণোদিত লিখন প্রণালীতে ( automatic writing ) মৃত আত্মাকে আহ্বান করেন, সময়ে সময়ে তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ ঐ অভিভূত অবস্থায় ( trance ) চলে যান। ভালো মিডিয়াম থাকলে, আর আবির্ভূত আত্মা শক্তিমান হ'লে, তিনি মিডিয়ামকে অভিভূত করে ইহলোকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চান।

জানবার কিছু থাকলে সামনের মানুষের সঙ্গে কথা বলে যে তৃপ্তি পাওয়া যায়, লিখে তা সম্ভব হয় না, তাই কোনো কোনো সময় পরলোকের বার্ত্তা লিখতে লিখতে আচম্বিতে মিডিয়ামের হাত বন্ধ হ'য়ে যায় এবং বাহ্য-জ্ঞানশূন্য অবস্থায় মুখ দিয়ে অনর্গল অর্থপূর্ণ কথা বার হ'তে থাকে।

## আকর্ষণ : Magnetism

চক্রে বসে কোনো মৃত ব্যক্তিকে গভীর ভাবে চিন্তা করলে ইহলোকে আবার তাঁর আবির্ভাব হয় কেন? এর উত্তরে মৃতত্ত্ববিদেরা (spiritualist) বলেন : ঐ রকম চিন্তার দ্বারা আকাশে এক রকম কম্পন হয় এবং মিডিয়মের আধার ও শক্তি অনুসারে কম্পন পরলোকের বিভিন্ন sphere (স্তর) ভেদ করে যায়। তাতে আকৃষ্ট হ'য়ে মৃত আত্মা মিডিয়মের ওপর আবির্ভূত হন।

অনেক সময় দেখা গেছে, জীবিত অবস্থায় কোন উন্নত ব্যক্তির আত্মাকে আহ্বান করা হ'ল, কিন্তু তিনি না এসে অন্য কোনো নিম্ন শ্রেণীর আত্মা এসে পড়ে। এর কারণ, পূর্ব্বোক্ত মৃত ব্যক্তি যে উচ্চস্তরে অবস্থান করছেন, মিডিয়মের চিন্তা-তরঙ্গ সেখানে পৌঁছুতে পারে নি, কাজেই তাঁকে আকর্ষণ করে আনতে পারে নি। অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তর পর্য্যন্ত ঐ তরঙ্গ গেছে এবং নিম্নস্তরের আত্মাকে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে।

তাই প্রায়ই দেখা যায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মানবাত্মারাই সচরাচর এসে থাকেন। কারণ, ঐ তিন স্তরই সাধারণ মৃত আত্মাদের আবাসভূমি। উন্নত আত্মাকে আহ্বান ক'রে পরলোকের গুহ্যতম রহস্য উদ্ঘাটন অথবা ইহ-

লোকের কোনো উঁচু কাজ সম্পন্ন করতে হ'লে যান-ধারণার অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের এবং স্নায়ুসম্পন্ন শক্তিমান মিডিয়াম আবশ্যক।

প্রবল মানসিক ও শারীরিক শক্তিসম্পন্ন মিডিয়াম ব্যতীত উঁচু শ্রেণীর মৃত আত্মার গতিবেগ অল্প কেউ সহ্য করতে সমর্থ হয় না। নারীসুলভ দুর্বলচিত্ত ও ভাবপ্রবণ মিডিয়ামই সর্বোৎকৃষ্ট—এমনতর যে, বহুল-প্রচলিত ধারণা মৃত-তত্ত্বান্বেষিদের অনেকের মধ্যেই দৃষ্ট হয়, তা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক আর তেমন মিডিয়াম নিয়ে চক্র রচনা (circle) করা অতীব বিপদসঙ্কুল।

## দিব্য দৃষ্টি : Clairvoyance

এ সমস্ত কৃত্রিম উপায় ভিন্ন, কোনো কোনো ব্যক্তি বেশ সহজ স্বাভাবিক দৃষ্টিতেও মৃত ব্যক্তিকে দেখে থাকেন, তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ এমন কি তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করেন, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। মৃত-তত্ত্ববিদেরা বলেন : তাঁরা অন্তর্বিস্তর দিব্য-দৃষ্টি সম্পন্ন, কেউ কেউ একে সূক্ষ্ম-দৃষ্টিও বলে থাকেন। এ-রকম দিব্য বা সূক্ষ্ম-দৃষ্টি আর মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার জন্যে যে-সমস্ত প্রক্রিয়া ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, তার কোনটিই কিন্তু বিনা বিচারে গ্রহণ করা চলে না।

## মনস্তত্ত্ব ও বস্তু বিচার

যে মনের সাহায্যে আমরা সকল বিষয় ভাবি ও সমস্ত কাজ সম্পন্ন করি, তার অনেকখানি অংশই মনেতে লুকোনো থাকে। তা সুপ্ত নয়, তবে গুপ্ত বলা চলে বা বলা যেতে পারে। আমাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ছোট-বড় যা কিছু আমরা করি, এই মন গুপ্তভাবে তা সমস্তই দেখে থাকে। অপরীয় ধ্যানাবস্থায় এবং সচরাচর স্বপ্নাবস্থায়, এই মন অপেক্ষাকৃত বাইরের স্তরে এসে অনেক অলৌকিক রহস্য প্রকাশ করে দেয়। যেমন, কোনো ব্যক্তির পকেট থেকে একখানা নোট পড়ে গেল। বাইরের মন তা দেখতে পেলে না, কিন্তু গুপ্ত-মন সেটা লক্ষ্য করলে।

তার পর অনেক অনুসন্ধান করেও নোট মিললো না। স্বপ্নে দেখা গেল, নোটখানা বাগানের কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় একটা শুকনো রজনীগন্ধার পাতা আর ঘুঁটে কয়েক গোলাপ আর একটা জবার পাতার নীচে চাপা পড়ে রয়েছে। পরদিন ভোরে ঐ জায়গা সন্ধান করে সত্য সত্যই নোটখানা পাওয়া গেল।

এটা কোনো দৈব ব্যাপার নয় মোটেই, স্বপ্নাবস্থায় সাধারণ মনের চাঞ্চল্য লোপ হ'লে গুপ্ত-মন বাইরের স্তরে এসে ঐ জায়গা দেখিয়ে দিয়েছে। দূরবর্তী মানুষের কার্যকলাপ অথবা গুহ্য বিষয় ধ্যানাবস্থায় এই ক'রেই অবগত হওয়া যায়। পার্থক্য এই মাত্র, স্বপ্নে গুপ্ত-মন স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয়, তার ওপর কারও কর্তৃত্ব থাকে না, কিন্তু ধ্যানাবস্থায় মনকে বাহ্য বিষয়হীন করে যে কোনো জ্ঞাতব্য বিষয়ে নিবিষ্ট করা চলে।

অতএব সত্যই মিডিয়ামের ওপর মৃত ব্যক্তির আবির্ভাব না হ'লেও গুপ্ত-মনের সাহায্যে এই ক'রে অনেক সময় অনেক গুহ্য বিষয় অবগত হওয়া যায়। কারণ অপরীয় মৃত আত্মার আবির্ভাবে যাকে আমরা অভিভূত অবস্থা ( trance ) বলে মনে করি, তা হয় তো মোটেই অভিভূত নয়।

চক্রে উপবিষ্ট ব্যক্তি যখন একাগ্র মনে চিন্তা করতে থাকেন, তখন তাঁর জাগ্রত-মন অজ্ঞাতসারে স্বপ্নাবস্থায় চলে যায় এবং বাইরের স্তরে এসে অনেক আশ্চর্য বিষয় প্রকাশ করে দেয়। গভীর mesmeric trance অবস্থায়, অথবা অর্ধবাহ্যদশায় কেউ স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে লিখলে অনেক সময় তা subjective mind-এর কাজ বলেও মনে হয়।

অভিভূত ব্যক্তি যা কোনো দিন কোনো এক বিশেষ মুহূর্তের জন্য দেখেছেন, অথবা ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় ক্ষণিকের জন্যেও শুনেছেন, যা তিনি রীতিমতো একেবারে বিস্মৃত হয়েছিলেন, তাই অভিভূত অবস্থায় প্রশ্নের উত্তররূপে তাঁর মুখ দিয়ে বার হ'তে থাকে। অথবা স্বতঃ-প্রণোদিত লিখনে প্রকাশিত হয়, এমন কি মনোজগতের বিভিন্নস্তরের রহস্যভার উদ্ঘাটন করে অনেক আশ্চর্য তত্ত্বও মানুষকে জানিয়ে দেয়।

সুতরাং অতীত ও ভবিষ্যতের, অথবা দূর ও নিকটের অজ্ঞাত বস্তুনিচয়ের যথাযথ বর্ণনা থেকেই ব্যক্তি-বিশেষের ওপর মৃত আত্মার আবির্ভাব প্রমাণিত হয় না।

এগুলি গেল সব সূক্ষ্ম অবস্থার কথা, এখন স্থূল অবস্থার বিষয় আলোচনা করা যাক। পূর্বেই বলা হয়েছে, কোনো কোনো ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থায় স্বাভাবিক

চোখেও মৃত আত্মাকে দেখে থাকেন। কিন্তু এমন দর্শনও ভ্রমাত্মক হওয়া অসম্ভব নয়। লেখকের জীবনে তাও ঘটেছে, একবার দিবালোকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত প্রান্তরে এবং আর একবার বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত গৃহাভ্যন্তরে।

অত্যন্ত কাছাকাছিতে আমার দুই বন্ধু ও এক পরমাত্মীয়াকে আমি বিভিন্ন সময়ে স্থূল শরীরে দেখেছিলাম। আচম্বিতে হুড়মুড়িয়ে আমার চোখের সামনে অদৃশ্য না হ'য়ে গেলে এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ হ'ত না।

নিরতিশয় সুখের ও পরম আনন্দের বিষয়, বন্ধু দু'জন ও আমার আত্মীয়া কন্যা এখনও জীবিত। সুতরাং ঐ রকম দেখা পাওয়াটা নিঃসন্দেহে ভ্রমাত্মক।

কি করে এটা সম্ভব হয়, তার বিচার মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা করবেন। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে, জীবিত ব্যক্তিকে ঐ রকম দেখা যদি ভ্রমাত্মক হয়, তা হ'লে মৃত ব্যক্তিকে দেখলেও ভ্রমাত্মক হ'তে পারে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এর সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিচারশীল মানুষের মন কখনই সন্তুষ্ট হ'তে পারে না।

যখন মৃত আত্মা চক্রে উপবিষ্ট কোনো ব্যক্তির শরীর-মনে আবির্ভূত হ'য়ে, অথবা চক্রের বাইরে যেখানে সেখানে কোনো যন্ত্র অথবা কারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনো রকম সাহায্য ব্যতিরেকে, সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে অত্যন্ত স্থূল কাজ করতে সমর্থ হবেন, তখন অনেকটা নিঃসন্দেহ হওয়া যেতে পারে।

কলিকাতায় পার্ক সার্কাসের শেষ-প্রান্তে ও আমির আলি অ্যাভেন্যু-এর উপকণ্ঠে তারক দত্ত রোডে কোনো ভদ্র লোকের বাড়ীতে বহুকাল পূর্ব্বে মৃত ব্যক্তি স্থূল শরীরে আবির্ভূত হ'য়ে, আমার পরিচিত একজন বন্ধুর সামনে মিনিট কয়েক দাঁড়িয়ে থেকে, সুইচ টিপে আলো বন্ধ ক'রে ঘর অন্ধকার করে দিয়েছিল।

স্থূল থেকেই মূর্ত্তির আবির্ভাব, স্থূল মনে হ'লেও প্রকৃত পক্ষে তা স্থূল নয়। সুতরাং স্থূল কাজের অনুষ্ঠানও তার দ্বারা সম্ভব হয় না। অতএব মৃত আত্মা স্থূল শরীর ধারণ করে স্বাধীনভাবে স্থূল কাজ করলে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘরিয়ে দেওয়া চলে না। যে বিষয়ে ভুল হওয়া স্বাভাবিক, সে বিষয়ে আমাদের অধিকতর সাবধান ও বিচারশীল হ'তে হবে।

কোন কিছুর কোন কিছুকে বিশ্বাস করা দোষাবহ নয়, কিন্তু বিশ্বাস-প্রবণ হ'য়ে নির্ব্বিচারে সমস্তই গ্রহণ করা অত্যন্ত গর্হিত ও দোষাবহ। ঐ রকম বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই। মৃত-তত্ত্ব নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন, দেখা যায়, তাঁরা অনেকেই অত্যন্ত বিশ্বাস-প্রবণ। সত্য নির্ণয়ের জন্য তাঁদের বিচার ও অনুসন্ধান অনেক সময় বিচার ও অনুসন্ধানের ভাণ মাত্র হয়।

কোন বিষয় অপ্রমাণিত হবে এমন চিন্তাও যেন তাঁদের অন্তরকে যথেষ্ট পীড়া দিয়ে থাকে, তাই মৃত-তত্ত্ব বহু শিক্ষিত জনের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় না। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যার অলিভার লজ অথবা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্তের কথা বলছি নে। তাঁদের কথা স্বতন্ত্র, ( Palgrave, Francis Turner-এর ভাষায় এঁরা হচ্ছেন, Always excepted কারণ, always exceptional)।

কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এমন অনেক নর-নারী আছেন পরলোক-তত্ত্বানুসন্ধানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, যাঁদের বিশ্বাস-প্রবণতা অন্যের ধারণাতীত করে। এবং এই জন্যে দর্শন বা বিজ্ঞান শাস্ত্রে যাঁরা খ্যাতি লাভ করে থাকেন, এ সব বিষয়ে নিজেদের জড়িয়ে তাঁরা নাম খারাপ করতে চান না।

মানুষ যা বিশ্বাস করে এবং যে বিষয় সর্ব্বত্র প্রচার করে বেড়ায়, তা যদি কোন রকমে অপ্রমাণিত হ'য়ে যায়, এই ভয়ই মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতার বশবর্ত্তী হ'য়ে মৃত-তত্ত্ব প্রচারকেরা অনেক সময় ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অথবা demonstration সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে বাধ্য হ'য়ে সময় সময় অসত্য অভিনয়ও করে থাকেন—আমার তা জানা আছে।

এ সব ভীষণ অন্যায়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে যে মৃত-তত্ত্ববিদেরা মৃত্যু-রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সত্যই আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের পক্ষে এ-সব অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং এ-সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা রাখাও মূর্খতা।

## হিসাবের খাতা

—শ্রীরেখা দেবী

সংসার অচল নয়, বেশ সচ্ছল ভাবেই চলছে—এমন মধ্যবিত্ত সংসার আজকাল দুষ্প্রাপ্য। পঞ্চাশ টাকা আয়ের সংসার আর পাঁচশ' টাকা আয়ের সংসার—দুইই সমান অচল। বরং দেখা যায়, পাঁচশ' টাকা আয়ের সংসার পঞ্চাশ টাকা আয়ের সংসারের চাইতে বেশী অচল। সমস্যাটা তা হ'লে আয়ের যেমন নয়, যেমন ব্যয়ের। অর্থাৎ আয়ের সামর্থ্য যাই হোক, ব্যয়ের পরিমাণের উপরই সংসারের সচল-অচলতার ব্যাপারটা নির্ভর করে।

আয়-ব্যাপারটা সমাজ, রাষ্ট্র, পারিপার্শ্বিক অনেক কিছুর উপর নির্ভরশীল। সেগুলির সংস্কার-সাধন আমাদের হাতে-ধরা নয়। বিশেষ করে নারীদের তো নয়ই। হয় তো পুরুষদেরও নয়—অন্ততঃ অধিকাংশ পুরুষের নয়। যাঁরা ঘটনাচক্রে কিংবা ক্ষমতার বলে, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের ভার লাভ করেন—তাঁদের হাতে এর ভার। কিন্তু এমন যে ক্ষমতাশালী পুরুষ, তাঁরও সংসার খরচের দায়িত্ব তাঁর নয়, তাঁর সহধর্মিণীর। সুতরাং একটী স্থানে অন্তঃপুর সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের কর্ণধার।

আমরা কি এই কর্ণধারের কাজ সুচারুরূপে করি? এ কালের মেয়েদের অধিকাংশই বোধ হয়, খুব জোর গলায় বলতে পারেন না, "হাঁ।" যিনি বলতে পারেন, তিনি অনন্য সাধারণ। এখানে সাধারণকে নিয়েই আলোচনা। কিন্তু চিরদিন অবস্থা সাধারণ মেয়েদেরও এমন ছিল না। বহুদিন আগেও মধ্যবিত্ত বাঙালীর সংসারের মেয়েরা—যাঁদের আজকাল অশিক্ষিত বলা হয়—অনায়াসেই অতি পরিপাটি ভাবে এ কাজটি করতেন। কেমন করে? তার একটি দিক্ এখানে বলবার চেষ্টা করব।

আগেকার দিনে প্রায় প্রতি গৃহিণীরই দুটী জিনিষ থাকতো। তাঁদের সংসার-চক্রকে সচল রাখতে সাহায্য করতো বলে এ দুটীকে তাঁরা অতি ধরে সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। দুটীর একটী হচ্ছে হিসাবের খাতা, আর একটী সংসার খরচ রাখার থলি। কিন্তু আজ আর "সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই," পরিবর্তনের বন্যায় অনেক কিছুর মতই এ দুটী সামান্য ক্ষুদ্র বস্তুও অনেক দিন হ'ল ভেসে গেছে। আজ সংসার খরচের টাকা আশ্রয় পেয়েছে "ব্যাঙ্ক-ব্যাগে" অর্থাৎ গৃহিণীর "ব্যানিটি-ব্যাগে"—আর হিসাবের খাতা হয়েছে চরম্বরে বন্ধ। ফলে সংসার চালানো হয়ে উঠেছে দিন দিন আরও বেশী কষ্টকর।

এখন খোঁজ নিতে গেলে দেখা যাবে যে একশ' জনের মধ্যে পঁচাত্তর, কি তারও বেশী গৃহিণীদের হিসাবের খাতার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। আরও একটা আশ্চর্য্য জিনিষ চোখে পড়বে। ঐ যে পঁচিশ জন হিসাব রাখছেন তাঁদের অবস্থা বাকি পঁচাত্তর জনের চেয়ে মোটামুটি এক হিসাবে ভালো। এঁরা সকলেই ধনী না হলেও অবস্থা তাঁদের সচ্ছল বলা চলে। প্রথমে এ কথাটী শুনে হয় তো খুবই আশ্চর্য্য লাগবে, এমন কি হয় তো সহজে বিশ্বাস করতেও ইচ্ছা যাবে না কিন্তু তবুও কথাটী সত্য। আর আমার মনে হয় যে, যে-সব গৃহিণীরা নিয়মিতরূপে সংসারের জমা-খরচের হিসাব রাখেন, তাঁদের ঐ হিসাব রাখাটাই সে সংসারের সচ্ছলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

আমার এ কথা মনে হওয়ার কারণটুকুও আমি আপনাদের বুঝিয়ে দেব। তা হ'লেই সবাই বুঝতে পারবেন যে আমার কথা কত দূর ঠিক। প্রথমেই ধরা যাক,

যাদের সংসারে সচ্ছলতার অভাব তাঁদের কথা। অধিকাংশ টানাটানির সংসারের গৃহিণীরাই হিসাব রাখার ধারাধার ধারেন না। তার কারণ, তাঁরা মনে করেন, "আমার এই দুই পয়সার আর হিসাব রাখবো কি? ও তো এ হাত থেকে ও হাতে যেতে যেতেই ফুরিয়ে যাবে—সারা মাস চালানোই প্রায় অসম্ভব, বাঁচানো তো দূরের কথা। সংসারের সব খরচ তো জানাই আছে—তার থেকে আর কিছু কম করবারও উপায় নেই, আর বেশী হবার তো উপায় আরও নেই। তবে আর শুধু শুধু সময় নষ্ট ক'রে, দু' পয়সা কমা আর ৪' পয়সাই খরচ—এ কথা লেখার দরকার কি।" কিন্তু বুঝতে চেষ্টা করলে বুঝা যাবে যে, এইখানে তাঁরা মস্ত একটা ভুল করছেন। যে সংসারের যত কম আয়, যাদের হিসাব রাখার সেখানে ততই বেশী প্রয়োজন। কারণ এমন সংসারে বিলাসিতার বায় করা বা অন্য কোন রকমে অপব্যয় করা একেবারেই চলতে পারে না। কিন্তু অপব্যয় হচ্ছে কি না তা জানবার পথটী হিসাব না রেখে গৃহিণীরা বন্ধ করে রাখেন বলে তাঁদের অজ্ঞাতেই ঐ পথ আর থেকেও আবার অপব্যয় হয়ে থাকে। এই যে দরীদ্রের সংসারে অজ্ঞাতে অপব্যয় হয়, এর পথ রোধ করতে পারে এক মাত্র হিসাবের খাতা। এ ছাড়া আর কোন উপায়েই তা বন্ধ করা সম্ভব নয়। আর সেই জন্যই আমি বলি, প্রতি সংসারের গৃহ-লক্ষ্মীদেরই দৈনিক ব্যয়ের হিসাব লেখার একটী ক'রে খাতা থাকা উচিত।

আমি জানি, যাঁরা এত দিন এ বস্তুটীর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখেন নি, তাঁদের এত কালের অভ্যাস ছেড়ে হঠাৎ আজ আবার কথাবস্তু হিসাব লেখা শুরু করতে বেশ একটু অসুবিধা হবে। কিন্তু আমি এও জানি যে, যদি এর উপকারিতা কি, তা তাঁদের বোঝাতে পারি তা হ'লে গৃহিণী মাত্রেই এটী সাগ্রহে গ্রহণ করবেন। তাঁরা নিজ নিজ সংসারের ব্যয়-সংক্ষেপের বা অপব্যয়ের পথ-রোধের এমন সুযোগ যে হেলায় হারাবেন না, এ বিশ্বাস আমার আছে।

এ বিষয়ে অনেক কথাই মনে আসছে কিন্তু সবটা লেখবার মত ধৈর্য্য আমার থাকলেও অনেকেরই তা পড়বার ধৈর্য্য থাকবে না—তা জানি বলেই আমি সংক্ষেপে সারতে চেষ্টা করবো। অনেক সময় কোন একটা জিনিষ দরকার হ'লে, মাসের প্রথমে যখন হাতে সংসার-খরচের টাকা থাকে তখন সে জিনিষটা ঝোঁকের মাথায় বেশী দাম দিয়েও কিনতে বাধে না। হয় তো এক টাকা কি দেড় টাকা খরচ করে এক দিন কিছু একটা কেনা হ'ল, গৃহিণী ভাবলেন, "এ ক'টা টাকা বৈ তো নয়। ও আর বেশী কি? আর মোট তো কিছু কিনছি না।" তার পর সংসারের কাজের ধারাধারে হয় তো সে খরচের কথা একেবারে ভুলেই গেলেন, কয়েক দিন বাদে ঐ খরচটীর কথা হয় তো মনেও রইলো না। কিন্তু ঐ যে খরচটী হ'ল সেটা, যে-সংসারের এক টাকায় সারা দিনের খাবার খরচ চলে তার পক্ষে যথেষ্ট বেশী—এবং সেটী যে কত বেশী তা গৃহিণী আরও বেশী করে বুঝতে পারেন যদি হিসাবের খাতায় সে দিনের খরচের হিসাব লেখা থাকে। আর সব ব্যয়ের সংখ্যার ভিতর ঐটীই যখন সব চেয়ে বড় ও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে থেকে দেখিয়ে দেবে যে, ঐ একটী খরচ ঐ দিনের প্রায় আর সব খরচের সমষ্টির সমান, তখন গৃহিণী বুঝতে পারবেন যে, তিনি সে দিন না বুঝে কিঞ্চিৎ অপব্যয় করেছেন। এবং ভবিষ্যতে আর কখনও মাসের প্রথমে বেশী হাতে কিছু কিনতে যাবেন না। কিন্তু যদি এ কথাটী লেখা না থাকে তা হ'লে ভুলে গিয়ে যে আবার একদিন ঠিক ঐ ভাবেই এক টাকা কি দেড় টাকা অপব্যয় করে ফেলবেন না, সে কথা মোটেও জোর করে বলা যায় না।

তাই হিসাবের প্রয়োজন। হিসাবের জোরেই বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। হিসাবী বুদ্ধির অভাবেই বোধ হয় আমাদের এই সোনার দেশ আজ ছারেখারে যেতে বসেছে। হিসাবী বুদ্ধির জোরেই "বণিক জাতি"র "মানদণ্ড" এ দেশে আজ "রাজদণ্ড"।

সুগৃহিণীর পক্ষে হিসাবী বুদ্ধির যত প্রয়োজন, এত প্রয়োজন বোধ হয় আর কিছুরই নয়। মুস্কিল হয়েছে এই যে, এ যুগের সমগ্র শিক্ষাটাই এই হিসাবী বুদ্ধিকে নষ্ট করে ফেলে। এক যুগ ধরে পুরুষরা এই শিক্ষা পেয়ে 'মাটি' হয়েছেন, বাকী ছিলেন মেয়েরা, তাঁদেরও 'মাটি' হ'তে বাকী নেই।

হিসাব রাখা অভ্যাস করলে গৃহিণীদের আর একটী মস্ত বড় সুবিধা হবে। কিসের কত দাম, রোজ লিখতে লিখতে

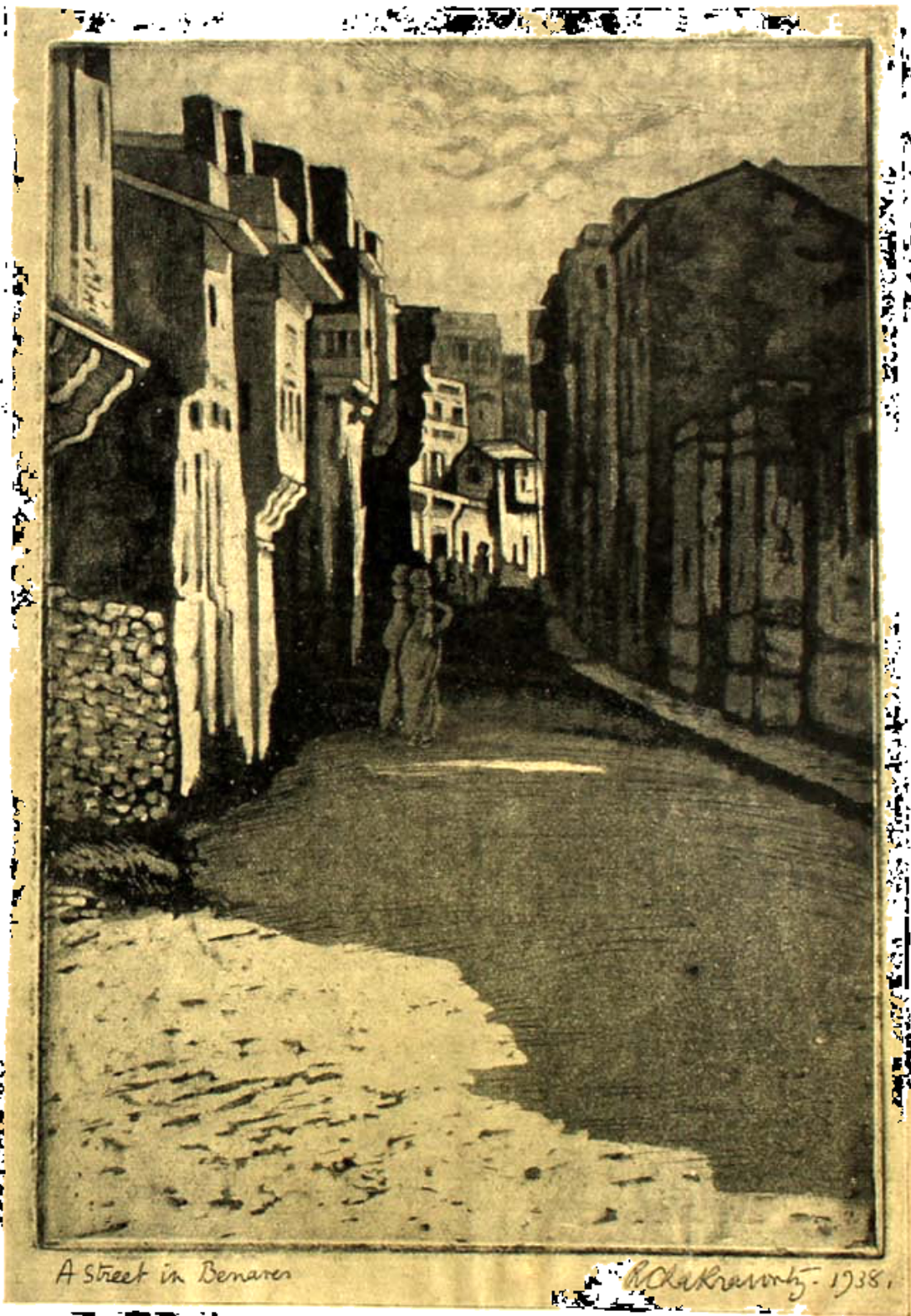


কাশীর পথ (অ্যাকোয়াটিন্ট) [ শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ওঁদের খুব ভাল করেই সব কিছু জানা হয়ে যাবে। তাহলেই নিজেরা কোন জিনিষ কিনতে চাকর-বাকরকে পাঠালে আর ঠকতে হবে না—ঠিক দামটী বলতে পারবেন, তা ছাড়া যে জিনিষটী কেনা হচ্ছে তা দামের অনুপাতে ভালো কি মন্দ, তা অন্যান্য দোকানের কেনা জিনিষের দামের সঙ্গে তুলনা করে দেখে শুনে কিনতে পারবেন, দাম না জানার দরুণ আর বেশী দিয়ে ফেলতে হবে না। বাজার-দর না জানা থাকলে যে কত অসুবিধায় পড়তে হয়, এবং কত সময়েই যে দোকানী, চাকর ও ফেরিওয়ালারা ঠকিয়ে নিতে পারে তা অবশ্য সব গৃহিণীরই অল্প-বিস্তর জানা আছে, তাই বলছি যে হিসাবের খাতা রাখার দরুণ লাভবান হবার এবং অনেক রকমে বেশী খরচের পথ বন্ধ করবে।

আর শুধু তাই নয়, এই খাতায় লেখা থাকলে সহজেই দেখা যাবে যে, সংসারের কোন্ জিনিষটী কবে এসেছে এবং সেটী কত দিন চললো—সময়ের আগেই শেষ হ'ল কি না। আর তা ছাড়া কোন জিনিষ "ফুরিয়ে গেছে কেনা" —এতে আমি বোঝাতে চাইছি, কোন একটী জিনিষ কিনে রাখা সম্বন্ধে ভুলে গিয়ে আবার সেটী কেনা—তা বন্ধ হবে। প্রতি সংসারেই এই ভাবে করে কেনা কোন না কোন সময়ে ঘটে থাকে। এই ধরুন হয় তো আপনি আপনার সংসারের দায়িত্ব নিয়ে বলে এক দিন সন্তায় এক বাক্স সাবান পেয়ে কিনে রাখলেন, ভাবলেন সাবান শেষ হ'লে ঐ বাক্সটী খুলবেন, সাধারণতঃ যে ভাবে কেনা হয় তার থেকে সন্তায় কিনেছেন বলে আশা করলেন এবার মাসের শেষে হয় তো আর তত বেশী টানাটানি হবে না, কারণ ঐ এক বাক্স সাবানে প্রায় এক দিনের বাজার খরচ বাঁচিয়েছেন, ইত্যাদি। নানা কথা ভাবতে ভাবতে বাক্সটী সময়ে তুলে রাখলেন, উপস্থিত যে সাবানটী ব্যবহার হচ্ছে তা না ফুরানো পর্যন্ত সেটী খোলা হবে না। তার পর পাঁচ দিন কি সাত দিন বাদে সাবান ফুরালো। আর আপনিও, যেমন প্রত্যেক বারেই করেন তেমনি ভাবে, যে বাজারে যাচ্ছে তার হাতে আর সব জিনিষ কেনবার দামের সঙ্গে এক বাক্স কি দু' বাক্স সাবান কেনবার দামও দিয়ে দিলেন! ঐ যে আর একটী বাক্স "সন্তায়" কেনা আছে ( বাক্সে কি আলমারীতে কিম্বা অথবা কোন তাকায়, যেখানে সচরাচর চোখ পড়ে না ) তার কথা হয় তো মনেও রইলো না। এটী আশ্চর্য্যের কথা নয়, মনে না থাকাই স্বাভাবিক, কারণ গৃহিণীদের সংসারের হাজার রকম কথা ভাবতে হয়, তার মধ্যে যদি কোন এক তাঁকে তাঁরা ছোট্ট সাবানের বাক্সটির কথা ভুলে যান তা হ'লে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু এই ভুল কেনার দরুণ যে মাসের সংসার খরচের তহবিলটীকে ফরে তোলা হবে বেশ একটু "ফাঁকা" —যা হো খুব স্বাধীন ভাবে সাবান জিনিষটীর অনেক অংশই গৃহলক্ষ্মীর খরচের থলিটী হ'তে যাবে একেবারে মুক্ত। তখন গৃহিণী ভাববেন, এত কম্মে সংসার চালিয়েও কেন ফুলোতে পারি না। তাঁদের এ সমস্যার আর পড়তে হবে না যদি হিসাবের খাতায় তবে কোন জিনিষ কেনা হ'ল তা লেখা হয়—কোন জিনিষ ফুরলে কেনবার আগেই একবার যদি খাতা খুলে দেখে নেন তবে সেটী কেনা হয়েছিল, তা হ'লেই মনে পড়বে, আর তখন করে সেটা কিনতে হবে না।

হিসাব লেখা কেবল যে এই ভাবেই সাহায্য করবে তাই নয়। যে সংসারের যতটুকু আয় দাসী কি চাকর বা ঠাকুরের উপর আছে তারা সেই দিন থেকেই চেষ্টা করবে গৃহলক্ষ্মীর 'ফুলে যাওয়ার' সুযোগ নেবার। হয় তো তাদের কাছে সাত দিনের উপযুক্ত কোন জিনিষ কেনা হ'ল (ধরা, কি কয়লা, কিংবা কেরোসীন তেল)—পাঁচ দিন যেতেই তারা এসে বলবে তা আবার আনবার সময় হয়েছে। তবে আনানো হয়েছিল জিজ্ঞেস করলে বলবে, "আজ সাত দিন হ'ল।" গৃহিণীরা সন্দেহ করলে আমার মনে বলবে, "আপনার মনে নেই—সে—ই—ক—বে এসে জিনিষের আর এখনও সাত দিন হয় নি? হয়েছে বৈ কি।" তাহলেই গৃহিণীও—"হয় তো বা তাই হবে আমারই মনে নেই,"—ভেবে পাঁচ দিন যাবেই আবার সে-সব জিনিষ আনিয়ে নেবেন। কিন্তু যদি খাতায় পাতায় জিনিষ-পত্র আনার দিনটী লেখা থাকে, তা হ'লে আর চাকরদের গৃহিণীর ফুলে যাওয়ার সুযোগ নেওয়া চলবে না, খাতা খুললেই তবে কি এলো তা জানতে পারা যাবে।

আর এমনি সব হালার রকমের ছোট-খাটো বেশী খরচের পথ বন্ধ করে আপনাদের হিসাবের খাতা যে টাকা খরচের বহিঃ অমিয়ে তুলবে, তাতে গৃহিণীরা অনায়াসেই মাসের

শেষে সংসারের খরচ থেকে কিছু বাঁচাতে পারবেন। আর যে সংসারে হয় তো অভাব এতই বেশী যে মাসের শেষ দিনটী পর্য্যন্ত সংসার-চক্রকে 'সচল' রাখা সম্ভব হয় না—সে পরিবারে এটী আরও বেশী উপকার দেবে, অর্থাৎ মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত অচল-প্রায় সংসার-চক্রকে সচল রাখবে। সেই জন্যই বলি যে, যাঁদের হিসাবের খাতার সঙ্গে 'মিতালী' নেই তাঁরা আর একটুও দেরী না করে আজ থেকেই শুরু করুন তার সঙ্গে 'বন্ধুত্ব' পাতাতে। তা হ'লে অনেক দুর্ভাবনা ও অশান্তির হাত থেকে উদ্ধার পাবেন, আর আসন্ন বছর এর গৌরবে পূজার বাজারটা এবারের চেয়েও ভালভাবে করতে পারবেন।

এ তো গেল শুধু আপনার ব্যক্তিগত কথা। কিন্তু এই ব্যক্তিগত বিষয়টী যদি সমাজ, কিংবা রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা যায়, তা হ'লে বুঝা যাবে যে, এমনি ভাবে ব্যক্তিগত উন্নতিই সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের গতি পরিবর্ত্তনে সমর্থ হয়।

আমরা যে-সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি, সকল দিক্ দিয়েই এটা যুগ-সন্ধিক্ষণ। স্বাধীন ভাবে নিজস্ব বিষয় নিজের মতে করে নেবার তা হ'তে মুক্ত হবার সময় আজ এসেছে। কবে, ঘটনাচক্রে অবস্থা কোথায়—তা ভেবে বসে থাকার সময় আর নেই। এই সময়ে ব্যক্তিগত ভাবেই আমাদের চেষ্টা করতে হবে—সকল রকম কর্ত্তব্য পালন করার। নিজেকে নিজে সাহায্য করলেই সর্ব্বনিয়ন্তা তাঁর সাহায্য করেন। হিসাবের খাতা ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু শুধু ব্যক্তিগতই নয় —এ কথা মনে রাখলে কাজটা আরও মূল্যবান্ মনে হবে।

## শীতের জামা

ঘোর বেলার জোর ঠাণ্ডা হাওয়া, সন্ধ্যার ধোঁয়ায় ভরা অন্ধকার, রাত্রির দৈর্ঘ্য এবং বাজারের নতুন আলু, কপি, কড়াইশুঁটি ইত্যাদি আজকাল ক্রমে ক্রমে আমাদের একটী বিষয়ে সচেতন করে তুলছে—"শীত আসছে!" আমাদের অন্তঃপুরিকা মা-বোনদের কাছে এই শীতের আগমন-সংবাদের প্রধানতঃ অর্থ হয় দুটী—প্রথম, নতুন তরকারীর সাহায্যে নতুন রকম রান্না করতে হবে, আর দ্বিতীয়, শীতের কাপড়ের যোগাড় করতে হবে অর্থাৎ ছেলে-মেয়ে, গৃহস্বামী সকলের পুরণো গরম কাপড়গুলিকে ধোয়ে শুকিয়ে পরবার উপযুক্ত করে তুলতে হবে এবং দরকার মত নতুন সব তৈরী করতে হবে। কাজেই এখন ঘরে ঘরে সব মেয়েরা ছুঁচ-সুতো রেখে 'উল-কাঁটা' নিয়ে বসেছেন—কি ছোট, কি বড় সবারই চাই গরম কাপড়। গৃহস্বামীর গরম সোয়েটার থেকে ছোট খোকাটীর গায়ের চাকা ও পায়ের মোজা পর্য্যন্ত সব কিনিষের যোগাড় রাখতে হবে একা গৃহিণীকে। কাজেই এখন থেকে কাজ শুরু না করলে চলবে কেন? সময় মত সব হবেই বা কি করে? এই যে সব অন্তঃপুরিকারা উল-কাঁটা নিয়ে শীতের অভ্যর্থনার আয়োজন করছেন তাঁদের কাজ কিছু হাল্কা করবার উদ্দেশ্য নিয়েই আমার এই আলোচনা। আমি

ছোটদের কাটিলাম ( নমুনা ) : লেখিকা অঙ্কিত।

জানি যে বড়দের এবং একেবারে ছোটদের অর্থাৎ নবজাত শিশুর জন্য উলের কিনিষ বোনা তেমন শক্ত নয়, আর এদের জন্য বোনার বইয়ে প্যাটার্নও থাকে রাশি রাশি—কাজেই কি প্যাটার্ন করা হবে তা নিয়ে বেশী মাথা খাটাতে হয় না; কিন্তু মুস্কিলে পড়তে হয় তিন চার বছরের শিশুদের জন্য কিছু সহজ ও সুন্দর প্যাটার্ন করতে চাইলে। তাই এই বয়সের শিশুদের জামা কি করে বুনতে হলেই মায়েদের সব চেয়ে বেশী ভাবনায় পড়তে হয়, কারণ বোনার বই দেখেও সব সময় এ বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য সুন্দর কিনিষ বড় একটা কিছু পাওয়া যায় না।

এবার আমি তাই এখানে একটী তিন চার বছরের শিশুদের জন্য সুন্দর ও সহজ 'কার্ডিগ্যান'-এর প্যাটার্ণ দিলাম —এটী মায়েদের বুনতেও কষ্ট হবে না, অথচ জিনিষটী দেখতে বেশ সুন্দর হবে, আর যে শিশুটী এই কার্ডিগ্যানটী পাবে সেও এই সুন্দর জামাটী পেয়ে আনন্দিত হবে। বোনা হ'লে যে এই কার্ডিগ্যানটি কেমন দেখতে হবে তা আপনাদের দেখাবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে একটী ছবিও এঁকে দিচ্ছি,—ছবিতে শিশুটীর গায়ের জামা দেখলেই বুঝতে পারবেন আপনার এ-বয়সের ছেলেমেয়েদের গায়ে সেটী কেমন দেখাবে।

এই কার্ডিগ্যানটীর পাঁচটী বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন করে বুনতে হবে, তার পর সেগুলি জুড়ে দিতে হবে—দুইটী হাত, ও বুকের দুই দিক ও পিঠ—পিঠ, বুক, ও হাতের বোনার গঠন মাপের ছবিও এই সঙ্গে দেওয়া হল। দেখে বুঝতে পারবেন, অংশগুলির কি রকম গঠন ও মাপ হবে।

## ছোটদের কার্ডিগ্যান (ফ্যান্সি ষ্টিচ)

উপকরণ :—তিন আউন্স উল, এক জোড়া দশ নম্বর, এবং এক জোড়া এগার নম্বর কাঁটা, পাঁচটী রঙীন বোতাম।

জামার পিঠ :—এগার নম্বর কাঁটায় ৮১টী ঘর নিয়ে কাজ আরম্ভ করুন—এক লাইন সোজা বুনে গিয়ে ঘরগুলিকে কাজ করবার উপযুক্ত করে নিন, তা ছাড়া এতে জামার তলাটী সোজাও হবে। এইবার জামাটী "রিবিং" করুন।

প্রথম লাইন :—এক ঘর সোজা, এক ঘর উল্‌টো,—এই ভাবে করে গিয়ে শেষ ঘর হবে সোজা।

দ্বিতীয় লাইন :—এক ঘর উল্‌টো, এক ঘর সোজা—শেষ ঘর উল্‌টো।

এই দুই লাইন বারো বার বুনুন, তা হলেই 'রিবিং' করা শেষ হবে। তার পর কাঁটা বদলে দশ নম্বর কাঁটায় বোনাটী তুলে নিয়ে প্যাটার্ণ বোনবার জন্য প্রস্তুত হোন :

প্রথম লাইন :—তিন ঘর উল্‌টো, তিন ঘর সোজা,—এই ভাবে হ'য়ে গিয়ে শেষের তিন ঘর উল্‌টো হবে।

দ্বিতীয় লাইন :—সব ঘর উল্‌টো বুনুন।

তৃতীয় লাইন :—তিন ঘর সোজা তিন ঘর উল্‌টো—এই ভাবে চলে শেষের তিন ঘর হবে সোজা।

চতুর্থ লাইন :—সব ঘর উল্‌টো।

এই চার লাইনেরই প্যাটার্ণ এটী, এইক্ষণে একটী সম্পূর্ণ প্যাটার্ণ বোনা হল। এখন এগারটী সম্পূর্ণ প্যাটার্ণ করতে হবে, অর্থাৎ এগার বার এই চার লাইন বুনুন—(৪৪ লাইন) তারপর (arm-hole) 'বাহুমূলের' জন্য ঘর কমাতে হবে। এগার বার এই চার লাইন বোনার পর যে লাইনটী বুনবেন তার প্রথম পাঁচটী ঘর, ঘর-বন্ধ করে কমিয়ে বাকী ঘরগুলি বুনে যান। দ্বিতীয় লাইনেও ঐ ভাবে পাঁচটী ঘর কমান, তাহলেই পিঠের দুধিকে ঘর কমিয়ে নেওয়া হ'ল। এইবার প্রতি লাইনের প্রথমে ও শেষে একটী করে ঘর কমিয়ে আরও চার লাইন বুনুন—কাঁটাতে থাকবে ৬৩টী ঘর। আর ঘর না কমিয়ে এবার ৪২ লাইন প্যাটার্ণ রেখে বুনে যান—তার পর মুখ বন্ধ করে রেখে দিন—এই হ'ল জামার পিঠ।

জামার বুক :—( ডান দিক )। এগার নম্বর কাঁটায় এক ঘর সোজা, এক ঘর উল্‌টো—এই ভাবে 'রিবিং' বুনে যান ছয় লাইন—সপ্তম লাইনে ( বোতামের ঘরের জন্য ) বুনুন—চার বার রিবিং—সাথের সুতো দিয়ে এক জোড়া ঘর উল্‌টো, তার পর বাকি ঘরগুলি আবার রিবিং বুনে যান ( অর্থাৎ একটী সোজা একটী উল্‌টো এই ভাবে ), এরপর এগার লাইন আর কিছু না করে প্লেন রিবিং বুনে যান—বারো লাইনে আর একটী বোতামের ঘর করুন—( চার ঘর রিবিং সমান সুতো দিয়ে এক জোড়া উল্‌টো দুটী ঘর এক সঙ্গে বুনে একটী উল্‌টো বুনোন দিন)। তারপর আবার সাত লাইন প্লেন রিবিং বুনে গিয়ে শেষ লাইনের শেষ ঘরে একটী ঘর বাড়িয়ে নিন—তা হ'লেই কাঁটায় ৫১টী ঘর হল। এবার দশ নম্বরের কাঁটায় বোনাটী তুলে নিয়ে প্যাটার্ণ শুরু করুন।

প্রথম লাইন :—(বোতাম ঘরের পাটির জন্য) রিবিং নয় ঘর, তার পর উল্‌টো তিন ঘর, সোজা তিন ঘর এই ভাবে শেষ ঘর পর্য্যন্ত বুনুন।

দ্বিতীয় লাইন :—সব ঘর উল্‌টো, শেষের নয় ঘর রিবিং।

তৃতীয় লাইন :—রিবিং নয় ঘর, তারপর তিন ঘর সোজা, তিন ঘর উল্‌টো··· এই ভাবে শেষ পর্য্যন্ত।

চতুর্থ লাইন :—শেষের নয় ঘর ছাড়া সব ঘর উল্‌টো, শেষের নয়টী রিবিং।

এর পর এমনি ভাবে প্যাটার্ণ বুনে যান আরও ২৬ লাইন—আর এই ২৬ লাইনের প্রথম, তেরো এবং ২৬ লাইনে

একটী করে বোতামের পটির উপর বোতামের ঘর করে যাবেন (চার ঘর রিবিং সামনে সুতো দু'টী ঘর এক সঙ্গে উল্‌টো) তা হলেই সব সমেত পাঁচটি বোতাম ঘর তৈরী হয়ে যাবে।

এবার গলার 'চেউ'-এর জন্য প্রস্তুত হন: (২৬ লাইন বোনার পর) এবার যে লাইনটী বুনবেন তার প্রথম নয় ঘর যেমন রিবিং বুনছেন তেমনি বুনে তার পর এগার এবং এগার ঘর দুটী এক সঙ্গে বুনুন অর্থাৎ রিবিং বোনার পর প্রথম দুটী জোড়া করে বুনুন, আবার পাঁচ লাইন প্লেন প্যাটার্ণ বোনার পর ষষ্ঠ লাইনে ঐ ভাবে একটি ঘর কমান—এমনি ভাবে প্রতি ষষ্ঠ লাইনে একটী করে ঘর কমাতে থাকুন যতক্ষণ না কাঠিতে ৪৭টি ঘর থাকে।

বাহুমূল বা "আর্মহোলে"র গঠন: (কাঠিতে ৪৭টী ঘর আছে) এবার প্রথমে ছয়টী ঘর "ঘর-বন্ধ" করে কমিয়ে নিন, (এই ঘরগুলি কমবে গলার পটির ঠিক উল্‌টো দিকে); আর গলার দিকে যেমন প্রতি ষষ্ঠ ঘর কমাচ্ছেন সেটী ঠিক রেখে বাহুমূলের দিকে এই ছয় ঘরের পর প্রতি লাইনে একটী করে কমিয়ে আরও তিন লাইন বুনুন। তার পর এক লাইন বাদে দ্বিতীয় লাইনে একটী করে কমিয়ে আরও তিন লাইন বুনুন; তা হলেই কাঠিতে থাকবে ৩৪টী ঘর। কারণ হাতের দিকে সব সমেত বারো ও গলার দিকে একটী ঘর কমেছে। এবার আর হাতের দিকে না কমিয়ে কেবল গলার দিকে প্রতি ষষ্ঠ লাইনে একটী করে কমিয়ে আরও ৩৮ লাইন বুনুন। ৩৮ লাইনের শেষে কাঠিতে থাকবে ২৭টী ঘর—এবার আবার হাতের দিকে আঠারোটী ঘর কমান। বাকি থাকবে রিবিং-এর নয় ঘর, এই নয় ঘরে আরও আঠারো লাইন রিবিং বুনে যান। তার পর মুখ বন্ধ করে রেখে দিয়ে, বাঁ দিকে বুক বোনা শুরু করুন। এই যে আঠারো লাইন রিবিং বুনে গলার পটিটী বাড়ানো হ'ল, এইটীর পিঠের অংশের আধখানা পটির পটি তৈরী হ'ল, বাঁ দিকের বুকে আরও আধখানা তৈরী হবে।

বাঁ দিকের বুক: ডান দিকের মতই এগার নম্বর কাঁটায় ৪০টী ঘর নিয়ে ২০ লাইন রিবিং বোনবার পর শেষ লাইনের শেষ ঘরে একটী ঘর বাড়িয়ে নিয়ে ৪১টী ঘর করে দশ নম্বর কাঁটায় বদলে প্যাটার্ণ শুরু করুন।

প্রথম লাইন: - তিনটী সোজা তিনটী উল্‌টো—এই ভাবে চলবে। কেবল শেষের নয় ঘর রিবিং প্যাটার্ণ হবে( বোতামের পটির জন্য)।

দ্বিতীয় লাইন:—রিবিং নয় ঘর—বাকি সব ঘর উল্‌টো।

তৃতীয় লাইন:—তিন ঘর উল্‌টো তিন ঘর সোজা··· শেষের নয় ঘর রিবিং।

চতুর্থ লাইন:—রিবিং নয় ঘর, বাকি সব ঘর উল্‌টো।

এই চার লাইন হয়ে যাক বুনুন, তার পরের লাইনে প্যাটার্ণ রেখে সব ঘরগুলি বুনে যান—কেবল যখন দেখবেন কাঠিতে এগারটী ঘর আছে তখন দু'টী ঘর একসঙ্গে বুনুন, আর শেষের নয় ঘর রিবিং বুনুন—এইবার পাঁচ লাইন আবার সমান বোনা হবে। তার পর ষষ্ঠ লাইনে আবার ঐ ভাবে একটী ঘর কমান—এমনি করে প্রতি ষষ্ঠ লাইনে একটী করে ঘর কমাতে কমাতে যখন কাঠিতে ৪১টী ঘর থাকবে,—তখন থেকে অবিকল ডান দিকের বুকের মত করে বুনে যান ( ডান দিকের বোনার নির্দ্দেশ দেখুন )।

ডান হাত: এবার নম্বরের কাঁটায় ৪৪টী ঘর নিয়ে ২৮ লাইন রিবিং বুনুন—শেষের লাইনের শেষ ঘরে একটী ঘর বাড়িয়ে ৪৫টী ঘর করে দশ নম্বরে বদল করে নিয়ে প্যাটার্ণ শুরু করুন। চার লাইন প্যাটার্ণ বোনবার পরে পঞ্চম লাইনের প্রথমে একটী ও শেষে একটী ঘর বাড়ান, তার পর পাঁচ লাইন আবার প্লেন প্যাটার্ণ বুনে যান। ষষ্ঠ লাইনের প্রথমে ও শেষে একটী করে ঘর বাড়ান—এমনি করে প্রতি ষষ্ঠ লাইনের প্রথমে একটী ও শেষে একটী করে ঘর বাড়িয়ে বুনে যান যতক্ষণ না কাঠিতে ৬৩টী ঘর হয়। প্রতিটী ঘর বাড়াবার পর একটু সাবধানে দেখে বুনবেন যে প্যাটার্ণ ঠিক পড়ছে কি না।

এই ৬৩টী ঘর নিয়ে আর ঘর না বাড়িয়ে সতেরো লাইন প্যাটার্ণ বুনে যান। তার পর প্রতি লাইনের প্রথমে একটী ও শেষে একটী ঘর কমাতে থাকুন, এই ভাবে ঘর কমিয়ে বুনে যান যতক্ষণ না কাঠিতে সতেরোটী ঘর থাকে—তখন মুখ বন্ধ করে দিন। এই ভাবে আর একটী হাতও বুনুন।

এইবার পিঠের ও বুকের তিনটী অংশ ঐ উল দিয়েই বেশ করে সেলাই করে দিন, তার পর হাত দুটী গোল করে মুড়ে নিয়ে যথাস্থানে বসিয়ে সেলাই করে দিন—আর বাঁ দিকের

বুকের অংশের বোতামের পটির উপর বোতাম-ঘরের সঙ্গে সমান রেখে বোতাম পাঁচটী বসিয়ে দিলেই ছবির মত একটী ছোটদের কার্ডিগ্যান তৈরী হ'য়ে যাবে।

পরিশ্রম করতে হবে, কিন্তু পরিশ্রমের ফলে নিজের ছেলে-মেয়ের মুখে যে-হাসি ফুটে উঠবে, তা দেখে এই পরিশ্রম কে না স্বেচ্ছায় করবেন? আমার নির্দ্দেশ পড়ে যতখানি পরিশ্রমের ব্যাপার বলে এটীকে মনে হচ্ছে, বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। বিশ্বাস না হয়, কাজ আরম্ভ করেই দেখুন।

রান্না-ঘরে :

আমি জানি যে কেবল শীতের কাপড়ের কথা বলেই ছুটী নেওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত নয়, কারণ এই সব নতুন তরকারীর সময় একটা কিছু নতুন রান্নার কথা না বললে মেয়েদের মন উঠবে না। তাই অন্তঃপুর থেকে বিদায় নেবার আগে একটী রান্নার কথা বলে হবে আজ যাব।

আলু, ফুল-কপি ও কড়াইশুঁটীর কারী :—

উপকরণ :—ফুল-কপি আধখানা, ( বড় হলে ) আলু ছয় সাতটী, কড়াইশুঁটী এক পোয়া, হলুদ ড' গিরা, সরিষা আধ তোলা, ধনে আধ তোলা, শুক্ন-লঙ্কা চারটী, পেঁয়াজ তিনটী, আদা এক তোলা, শুধ অল্প, ঘি আধ পোয়া, তেল আধ সের ও নুণ পোণ তোলা।

প্রণালী :—ফুল কপি প্রতি ডালে বানিয়ে নিন, কড়াইশুঁটীগুলি ছাড়ান ও আলু আধ পানা করে কাটুন, সবগুলি বেশ করে ধুয়ে নিন।

হলুদ, সরষে, ধনে, শুক্ন-লঙ্কা চারটী, যাঁদের আপত্তি নেই তাঁরা পেঁয়াজ অর্দ্ধেকগুলি, এবং আদা বেঁটে রাখুন। তবে পেঁয়াজ না দিলেও স্বাদ মন্দ হবে না। অন্য কিছু মশলা দেবার অবশ্য তা হ'লে দরকার।

এই বার ঘি চড়ান—হয়ে গেলে তাতে আলু ও কপি কষে তুলে নিন, এই ঘিয়ে আদা-কুচি ছাড়ুন। আদা লাল হলে তাতে পেষা মশলাগুলি দিন—বেশ লাল করে কষে নিন তার পর জল দিন; এইবার আলু কপি ও কড়াইশুঁটী ফেলে দিন এবং নুন দিন—আলু সিদ্ধ হ'য়ে যাবার পর গুড়টুকু ছেড়ে দিন, জল বেশ মরে এলে যখন ঘি কাটা-কাটা হবে তখন নাবিয়ে নেবেন। তা হলেই কপির কারী রাঁধা শেষ হ'ল। এবার আর বেশী কিছু বলবার স্থান নেই বলে আজকের মত এই খানেই বিদায় নেব। আসছে বারে "রান্নাঘরে" আরও একটু বেশীক্ষণ কাটাবার ইচ্ছা রইল।

---

# দীর্ঘিকার দীর্ঘশ্বাস

—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

এই দীর্ঘ দীর্ঘিকার, গৈরিক শৈবাল তার, বৈরাগ্যের মূর্ত্তি উদাস,
নিদ্রাহীন আঁখি দুটী, রক্ত কোকনদ ফুটি, দেখে ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ।
আজি চিত্ত তার-তার, ইচ্ছা হয় বলিবার যাহা কিছু বলিবার নয়,
সকলের করে ধরি সকলি নিঃশেষ করি অন্তরের করি পরিচয়।
আজি মোর কৌতূহলী মন,
পরের হৃদয় মাঝে, কি চাহে সে শুনিবারে, কান পাতি রহে অনুক্ষণ।
প্রাচীনের ভাঙা গান, তা'রি ক্ষীণ শেষ তান, অন্তরে কাঁদিছে বেদনায়,
অতীতের যাহা কিছু, শুনিবারে চাই পিছু, বলিবারে চাই সমুদায়।
দূরগত অতীতের স্রোত মাঝে পতিতের নিষ্ফলের ব্যর্থ হাহাকার,
সোপানের তল বক্ষে এখনো ভাসিছে চক্ষে সে কাহিনী গূঢ় বেদনার।

এই তব হর্ম্মমালা প্রাসাদ প্রমোদ-শালা বিলাসের ব্যর্থ আয়োজন
নিশীথের নীলাকাশে অসীম রহস্য ভাসে তারকার অপাঙ্গ নর্ত্তন।
ধরিত্রীর দুঃখ ভুলি নূপুরে নিক্কণ তুলি পরিতৃপ্ত মুহূর্ত্তের তরে
যবে সন্নিবিষ্ট পা'য় উতরে মিলিয়া যায় ছায়াখানি পড়ে সরোবরে।
পদচিহ্ন রক্তরাগ অলক্তের লাগে দাগ যে মর্ম্মর নিশ্চিত সোপানে
সে আজি পাষাণ স্তূপ, নিরাশ নিতান্ত চুপ, মোরে শুধু কয় কানে কানে।
নূপুর নাচে না আর সঙ্গীতের পারাবার শুখাইল দুঃখ দাবদাহে,
নাহি কুহু নাহি কেকা কোটরেতে একা একা ঘুঘু ডাকে পেচকেরা গাহে।
কুটিল কালের গতি কোথায় বা বহুপতি কোথায় বা রঘুপতি রাম,
প্রদীপের তৈলধারা শিখা-রক্ত কলিকারা ঊর্দ্ধমুখে ছুটে অবিরাম।

# শিল্প-বাণিজ্য-পরিস্থিতি

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

এক বৎসরেরও উপর য়ুরোপে যুদ্ধ চলিতেছে। এই মহা-বিপ্লবের ফলে সর্বদেশের শিল্প-বাণিজ্যের স্বাভাবিক পরিস্থিতির ন্যূনাধিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কোথাও কোন শিল্প ও তৎসম্পর্কিত বাণিজ্য, যুদ্ধের প্রয়োজনের তাগিদে দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছে; আবার কোথাও বা যুদ্ধের দুর্বিপাকের ফলে মাল-মসলা, কল-কব্জা অথবা আদান-প্রদানের সুবিধাজনকতার উৎপাদন কিংবা আমদানী রপ্তানীর অভাবে অবনতি অধোগতি লাভ করিয়াছে।

যুধ্যমান দেশগুলির মধ্যে যে কয়েকটি এক-নায়কত্বের অধীনে সেখানকার শিল্প-বাণিজ্য যুদ্ধারম্ভের বহু পূর্ব হইতেই রাষ্ট্র দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত হইতেছিল; সুতরাং সে-সকল স্থানের স্বাভাবিক পরিস্থিতির পরিবর্তন উদ্যোগপর্বেই সূচিত হইয়াছিল। যুদ্ধে লিপ্ত অন্যান্য দেশগুলির শিল্প-বাণিজ্যেও, বিপ্লবের ঘনঘটারম্ভেই, সমাজতন্ত্রে প্রয়োজনানুযায়ী যুদ্ধ পরিচালন-সৌকর্যার্থে শৃঙ্খলিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতে-ছিল। সুতরাং ঐ উভয় শ্রেণীর দেশসমূহের শিল্প-বাণিজ্য স্বাভাবিক গতিপথবিচ্যুত হইয়া নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল।

যুদ্ধে নির্লিপ্ত, এবং যুদ্ধ-পরিবেষ্টন হইতে বহু দূরে অবস্থিত দেশসমূহও এই আকস্মিক পরিবর্তনের প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল না। ভারতবর্ষে এই সংঘাতের প্রাথমিক ফল হইয়াছিল মূল্য-বৃদ্ধি ও উৎপাদন-বৃদ্ধি। কিন্তু এ অবস্থা দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয় নাই। স্বল্পস্থায়ী তেজীর ( boom ) পশ্চাতে বর্তমান বর্ষের প্রারম্ভেই মন্দা ( depression ) শুরু হইয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রে তেজীর মুখে যে লাভ হইয়াছিল তদপেক্ষা অনেক অধিক ক্ষতি হইয়াছিল মন্দার প্রভাবে।

ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ, সুতরাং ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি অবনতি সহজেই পরিলক্ষিত হয়, কৃষিজাত দ্রব্যাদির মূল্যানুক্রমে। কি খাদ্য-শস্য কি খাদ্য-সামগ্রী, কি কাঁচা পাট, কি কাঁচা কার্পাস, কি তৈল-বীজ—সর্ব ক্ষেত্রেই মূল্যানুক্রম নিম্নগামী হইয়াছিল। এমন কি, কাঁচা ও পাকা, অর্থাৎ পরিণত ও অপরিণত, সর্ব প্রকার পণ্য-দ্রব্যের পাইকারী মূল্য-মান ( index of wholesale prices) যুদ্ধারম্ভে ১০১ হইতে গত ডিসেম্বর মাসে ১০৭ পর্যন্ত উঠিয়াছিল; পরে নিম্নাভিমুখী হইয়া গত মার্চ মাসে ১২১ এবং গত মে মাসে ১১৭ সংখ্যায় উপনীত হইয়াছিল।

অবশ্য এই পতনের মূলে ছিল আতঙ্ক। পণ্য এবং যৌথ অংশের (shares) মূল্য-হ্রাস, ধনশালী ( banks ) হইতে চলতি ও সঞ্চয়-আমানতি টাকা উঠাইয়া লওয়া এবং বহু শীঘ্র এবং বহুদূর সম্ভব স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা ও পাট সংগ্রহ—এ সকলই ঘটিয়াছিল গত মে ও জুন মাসে, বেলজিয়াম এবং হল্যাণ্ডের পতন ও ফ্রান্সের আত্ম-সমর্পণের পর। এই মূল্য কারণ ব্যতীত বর্তমান মন্দার আরও কয়েকটি গুরুতর ও সহীয়তর গৌণ কারণ আছে।

কৃষি-প্রধান ভারতের জাতীয় অর্থ-নৈতিক অবস্থা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয় আমাদের কাঁচা মালের বহির্বাণিজ্যের অবস্থানুযায়ী। যুদ্ধের পরিস্থিতির নিমিত্ত ভারতের বহির্বাণিজ্যের সাময়িক সংখ্যা-তালিকার প্রকাশ বন্ধ হইয়াছে, সুতরাং তাহার সঠিক হিসাব দেওয়া অসম্ভব। তথাপি, নিতান্ত নিশ্চিত ভাবে এ কথা বলা যায় যে, আমাদের নিয়মানুযায়িক রপ্তানী-ব্যবসায় বিষম ভাবে প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে, মে ও জুন মাসে যুদ্ধের ঘোরাল অবস্থায় একমাত্র গ্রেট ব্রিটেন ব্যতীত প্রায় সকল বিদেশী বাজার ভারতের পক্ষে রুদ্ধ হইয়াছিল। ফলে, প্রধান প্রধান রপ্তানী পণ্যের মূল্য অতিরিক্ত নিম্নগামী হইয়াছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যুদ্ধ-পূর্ব সীমারেখায় পর্যবসিত হইয়াছিল। ফলতঃ, বর্তমান খৃষ্টাব্দের প্রথমার্ধে পণ্য-মূল্য এরূপ হ্রাস পাইয়াছিল যে, আমাদের আর্থিক অবস্থায় বিষম বিপর্যয় ঘটাইয়াছিল। যুদ্ধের পূর্বে গ্রেট ব্রিটেন ব্যতীত য়ুরোপের অন্যান্য দেশের সহিত আমাদের যে রপ্তানী-ব্যবসায় ছিল তাহাতে আমরা যে অর্থ লাভ করিতাম, তাহা হইতে

আমরা বার্ষিক ৩২ কোটী টাকা হারাইয়াছি। এ বড় কম লোকসান নয়!

যুদ্ধের পরিস্থিতি-হেতু জাহাজের চলাচল দুর্গম হইয়াছে। মাল চালান দিবার নিমিত্ত মালবাহী জাহাজের সংখ্যা অতি মাত্রায় হ্রাস পাইয়াছে। অধিকাংশ জাহাজই যুদ্ধ-সম্ভার বহন কার্য্যে ব্যাপৃত, সুতরাং যুদ্ধোপকরণ ব্যতীত, কোন ব্যবসায়ীর পক্ষে অন্য কোন মাল কোথাও পাঠান অতি দুর্ঘট। লণ্ডন, গ্লাসগো, লিভারপুল এবং ডাণ্ডী প্রভৃতি বন্দরের নিমিত্ত মাল, রপ্তানীর এক মাত্র উপায়-স্বরূপ হইয়া আগষ্ট পর্য্যন্ত আটক ছিল—এমন কি, ব্রিটেনের খাদ্য-মন্ত্রীর বিভাগের নিমিত্ত স্বকীয় প্রেরিত এক লক্ষ টন্ তৈল-বীজ ও বইল বোম্বাই বন্দরে আগষ্টের শেষ পর্য্যন্ত আটক ছিল।

মালবাহী জাহাজ ও তাহাতে উপযুক্ত স্থানাভাব ব্যতীত, অন্যান্য অসুবিধাও ঘটিয়াছে অনেক। ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন-তন্ত্র সম্প্রতি পূর্ব্ব-প্রেরিত হিসাব (quota) অনুযায়ী কাগজের রপ্তানী খর্ব্ব করিয়াছেন। ইহাতে একটি নব-অনুধাবনশীল ব্যবসায়ের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে এবং এই ব্যাঘাত বিদেশী-পরিচালিত কলের তুলনায় স্বদেশী-পরিচালিত নব-প্রতিষ্ঠিত কলগুলির বিষম ক্ষতি করিবে। অন্যান্য কয়েকটি শিল্পেও অনুরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে।

যুদ্ধকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অবস্থা সর্ব্বথা স্বভাবতঃই সঙ্কীর্ণ হয়। এরূপ ক্ষেত্রে যদি উপস্থিত কোন সুযোগের সুবিধা লইয়া রপ্তানী-ব্যবসায়ী রাষ্ট্রসমূহ বাণিজ্যের নিমিত্ত মাল চালান না দিতে পারে, তাহা হইলে সমূহ ক্ষতি ঘটে এবং সে ক্ষতি পরেও পূরণ করিবার কোন উপায় থাকে না।

যুদ্ধের পরিস্থিতির জন্য বহু বিদেশীয় বাজার আমাদের পক্ষে রুদ্ধ হইয়াছে, এ ক্ষেত্রে নূতন নূতন বাজারের অনুসন্ধান ও আবিষ্কার যেমন অত্যাবশ্যক, তদ্রূপ যে সকল বাজারের পথ এখনও আমাদের পক্ষে উন্মুক্ত, সেই সকল স্থানে যাহাতে আমাদের মাল যথাসম্ভব সত্বর ও নিরাপদে পৌঁছিতে পারে, তৎপ্রতি সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সতর্ক প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে স্বতঃই যুক্তরাষ্ট্রে যৌথ-প্রেরণী অভিযানের কথা মনে হয়। বাণিজ্যবার্ত্তা বিভাগের পরিচালক ডাঃ যৌথ ও কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা আচার্য্য প্রেরণী সরকার কর্ত্তৃক যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত হইয়াছিলেন, ঐ মহাদেশের সহিত ব্যবসায়-ক্ষেত্রে আমাদের আদান-প্রদান বর্দ্ধিত ও বিস্তৃত করিবার উপায় নির্দ্ধারণ হেতু। শত্রু পক্ষীয় দেশসমূহের সহিত ব্যবসায় বন্ধ হইয়া আমাদের যে সকল পণ্যের চালান একেবারে রুদ্ধ হইয়াছে, যুদ্ধে নিরপেক্ষ দেশ-সমূহের মধ্যে কোন্ কোন্ দেশের সহিত ঐ সকল দ্রব্যের চালানী কারবার সম্ভব, তাহা আমাদিগকে অবিলম্বে নির্দ্ধারিত করিয়া ঐ সকল দেশের সহিত যোগসূত্র সংস্থাপন অতি প্রয়োজন।

সরকারী প্রতিনিধি যৌথ ও প্রেরণীর সহিত দুই এক জন বে-সরকারী ব্যবসায়-অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে পাঠাইলে সুবিবেচনার কার্য্য হইত। যুক্তরাষ্ট্রে যে একটি খুব বড় পরিদর্শক, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই; সুতরাং সরকারী বে-সরকারী যুক্ত অভিযান এখানে অধিকতর ফলোপধায়ক হইত, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

অধুনা সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহের সহিত যাহাতে আমরা অধিকতর কায়-কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পারি তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ ব্যবস্থা পরিচালন-কল্পে দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে আমাদের বাণিজ্য তত্ত্বিরকারক আমীন (Trade Commissioners) নিয়োগের ব্যবস্থা শীঘ্র প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু যেরূপ উদ্যম ও উৎসাহের সহিত এই ব্যবস্থা বাস্তবে পরিণত করা প্রয়োজন, যুদ্ধের সঙ্কটময় পরিস্থিতিহেতু তাহা সম্ভবপর হইতেছে না। এই সকল প্রতিভূ ভারতবাসী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ কার্য্যে এ পর্য্যন্ত যে কয়জন ভারতবাসীকে নিয়োগ করা হইয়াছে তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন।

রপ্তানী-ব্যবসায় সম্পর্কে আমাদের আরও একটি গুরুতর অভিযোগ আছে। ভারতীয় অর্থাৎ স্বদেশী, অর্ণব-পোত-ব্যবসায়িগণ এখনও বিদেশে পণ্য-রপ্তানী-কার্য্যে অধিকার লাভ করেন নাই। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র ভারতীয় জাহাজ তালিকাভুক্ত কয়েকখানি পোত সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। ফলে, পশ্চিম উপকূলে ও অন্যত্র যাত্রী ও মাল

বহুল কার্যের বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। উপযুক্ত ব্যবসায়-ক্ষেত্রে স্বদেশীর অর্ণবপোতগুলির কর্ম-ক্ষেত্র যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তৎপ্রতি বণিক-সঙ্ঘ ও রাষ্ট্রপরিষদগণের তীব্র ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রয়োজন।

ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট স্বদেশীয় পোতগুলির ব্যবসায়-ক্ষেত্রে পোতের অভাব হেতু যাহাতে বাণিজ্যের ক্ষতি না হয়, তৎসম্বন্ধে সক্রিয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন; কারণ জাতীয় পোতপুঞ্জ জাতীয় বৈভব। ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের কর্তব্য এই সম্পর্কে আরও গুরুতর। কারণ, ভারতে স্বদেশী পোত-ব্যবসায় স্বাবলম্বন প্রচেষ্টায়, সরকারী সাহায্য বাতিরেকে, মাত্র যৎকিঞ্চিৎ অধিকার স্থাপন করিয়াছে। সুতরাং সেই স্বল্পপরিসর কর্মক্ষেত্রে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা প্রতিহত হইলে, জাতীয় অভ্যুদয়ের অন্তরায় ঘটিবে। অতএব বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে জাতীয় পোত-প্রতিষ্ঠানগুলির কোন স্থায়ী ক্ষতি না ঘটে, তৎপ্রতি রাষ্ট্র-হিতৈষী এবং দেশ-হিতৈষী মাত্রেরই একান্ত মনোযোগ প্রয়োজন। বিগত মহাযুদ্ধ এবং বর্তমান মহা বিপ্লবের ফলে আমরা বুঝিয়াছি যে, জাতীয় বাণিজ্য-তরী-বহর কত বড় জাতীয় সম্পদ্—শান্তি এবং আপদ্ উভয় কালেই স্বদেশী ও বিদেশী উভয়বিধ বাণিজ্য-পরিচালনে তাহাদের প্রয়োজন কত অধিক।

অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য উভয়ই নির্ভর করে প্রচুর শিল্প সম্ভারের প্রগতিশীল উৎপাদনের উপর। সুতরাং আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য শিল্প-সমুন্নয়ন। আমাদের দেশে অনায়াস ও অল্পায়াস-লভ্য কাঁচামালের অভাব নাই। এই কাঁচামালের অধিকাংশই এতাবৎকাল অতি সুলভ মূল্যে বিদেশে রপ্তানী হইয়া তদুৎপন্ন দ্রব্যাদি দ্বারুণ দুর্মূল্যে ও আমাদের নিকট বিক্রীত হইয়া বিদেশী ধনিক ও বণিকের উদর স্ফীত করিত। বঙ্গভঙ্গের পর, স্বদেশী আন্দোলনের সৃষ্টি ও বিস্তার হইতে আমরা কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিয়াছি; কিন্তু অতি সহজ ও সুগম প্রচেষ্টার প্রকৃষ্ট বৈদেশিক দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও, আমরা যৌথ কারবারে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতে পারি নাই। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য।

যাহা হউক, বিগত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার ফলে আমরা গত পঞ্চবিংশতি বৎসরে কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছি। এখন পুরাতনের প্রসার এবং নূতনের প্রতিষ্ঠা দ্বারা আমাদিগকে শিল্পোৎসাহী ও শিল্পাশ্রয়ী হইতে হইবে,—যাহাতে আমরা আমাদের দেশজাত কাঁচামালের অধিকাংশই পাকা অর্থাৎ পরিণত পণ্যে পরিবর্তিত করিয়া, ধন ও অন্ন উভয়ের সংস্থান করিতে পারি। সমবায় এবং সমবেত প্রচেষ্টা ব্যতীত এ কার্যে কৃতকার্য হওয়া সম্ভব নয়। শান্তিকালে এরূপ প্রচেষ্টা একান্ত আবশ্যক—সুতরাং যুদ্ধকালে ইহার প্রয়োজন যে কত অধিক তাহা সহজেই বোধগম্য।

বিগত মহাযুদ্ধের পর যে ক্ষণস্থায়ী শিল্পানুরাগ প্রকট হইয়াছিল, যদি আমাদের রাষ্ট্র-নায়ক ও শিল্প-নায়কগণ তদ্বিষয়ে শৈথিল্য প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে বর্তমান মহাবিপ্লবে যুদ্ধ-সম্ভারের জন্য যে অসুবিধা অনুভব করিতে হইতেছে তাহার শতাংশের একাংশও ভোগ করিতে হইত না। যেমন বহির্বাণিজ্য-ক্ষেত্রে, তেমনি শিল্প-সংবর্ধন ব্যাপারে, শাসন-তন্ত্র এখন বিলম্বিত, তথাপি প্রশংসাই প্রচেষ্টা প্রবর্তন করিয়াছেন, যথাকালে তাহার সূচনা অনুষ্ঠিত হইলে, আজ ভারতের শক্তি, সামর্থ্য ও সম্পদ-সহায়তায় আমাদের রাজ-শক্তিকে দুর্যোগে দুর্ভোগ-ভোগ করিতে হইত না। স্বল্পসময়ে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় মালমসলা, কল-কব্জা, শিল্পী ও কারিকর অভাবে, বিপুল প্রচেষ্টায় দ্রুত পরিপতি সম্ভব নহে। ফলে, যতটুকু আমাদের সহজসাধ্য হওয়া উচিত ছিল, তাহা আজ—দুঃসাধ্য না হইলেও—আয়াসসাধ্য হইয়াছে। ইহা পরিতাপের বিষয়।

বর্তমান মহাবিপ্লবের ফলে আমাদের অর্থনৈতিক শৃঙ্খলায় কয়েকটি গুরুতর ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়িয়াছে। জাতি ও রাষ্ট্রকে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল করিবার নিমিত্ত যে সকল মূলগত ও যৌলিক শিল্পের (key industries) প্রতিষ্ঠা সর্বাগ্রে ও সর্বপ্রযত্নে প্রয়োজন, তাহাতে আমরা অতি শোচনীয় ভাবে অভাবগ্রস্ত। যুদ্ধার্থে অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলা-বারুদ, ব্যোমযান, অর্ণবযান, রাসায়নিক এবং রং প্রভৃতি শিল্পে আমরা যথেষ্ট পশ্চাৎপদ। অর্ণবযান ও ব্যোমযান প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা, পরিকল্পনার পট-ভূমি অতিক্রম করিয়া, বাস্তবের রঙ্গভূমিতে মাত্র পদার্পণ করিয়াছে। ভারতবাসীর পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা, শ্রমিক ও শিল্পী, অর্থ ও অধ্যক্ষতার সমবায়ে এই দুইটি যৌলিক ও মূল্যবান্ শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার যত শীঘ্র সম্ভব সংঘটিত হওয়া জাতীয় কল্যাণের নিমিত্ত নিতান্ত প্রয়োজন।

অর্ণবযান-শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ভারতবাসী বহুদিন হইতেই করিতেছে। এ শিল্প ভারতের পক্ষে নূতন নহে। এমন একদিন ছিল, যখন ভারতীয় বণিক, ভারতীয় পোতে, ভারতীয় পণ্য দেশ বিদেশে বিতরণ করিত। ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভ হইতে এই শিল্প, অন্যান্য শিল্পের ন্যায় সক্রিয় সহানুভূতির অভাব ও নিখিল-প্রবণতা হেতু ক্রমে লুপ্ত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এই শিল্পের পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন ভারতবাসীর হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সংবাদপত্রে, সভাসমিতিতে এবং ব্যবস্থা-পরিষদে ভারতবাসী এ বিষয়ে বহু বার সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছে। অবশেষে প্রায় পনের বৎসর পূর্ব্বে ভারতের বাণিজ্য-নৌবিষয়ক সমিতি (Indian Mercantile Marine Committee) যে নীতির নির্দ্দেশ দেন তাহাও সম্যক্ অনুসৃত হয় নাই। সরকারের শৈথিল্য দেশের দারুণ দুর্ভাগ্য; কারণ এরূপ শিল্পের প্রতিষ্ঠা সরকারের সক্রিয় সহানুভূতি ও সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয়। অন্যান্য দেশে পোতনির্ম্মাণ-শিল্প সরকারের উদার সাহায্যে পুষ্ট। আমাদের দেশে স্বদেশী যুগ হইতে যে ক্ষীণ জাতীয় প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার পরিপোষণোপযোগী অর্থ ও সামর্থ্য আমাদের নাই, সুতরাং সরকারী সাহায্যের অভাবে এই শিল্পে-বদ্ধপরিকর ভারতবাসী তাহার যৎকিঞ্চিৎ শক্তি-সামর্থ্য লইয়া অতি অল্প দূরই অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। এমন কি দেশের আভ্যন্তরীণ নদি-সাগরেরও তাহারা কায়-ক্লেশে কিয়দংশ মাত্র আয়ত্ত করিয়াছে। বন্দর পরিচালক-দিগের (Port Commissioners) নিকটেও সাহায্য দূরের কথা, সহানুভূতি মাত্রও মিলে নাই। সুখের বিষয়, বর্ত্তমান বিপ্লবের পরিস্থিতির ফলে, ভারত সরকার এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ উদ্যোগী হইয়াছেন। আজ যদি ভারতে এই শিল্পের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠান থাকিত, তাহা হইলে ব্রিটিশ রাজশক্তির যথেষ্ট সুবিধা হইত।

বর্ত্তমান বিপ্লবের পূর্ব্বে এবং প্রারম্ভ হইতেই বিমান-বহরের প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। সুতরাং উপযুক্ত পোত-শিল্পের ন্যায় উত্তম বিমান-শিল্পের প্রতিষ্ঠা শীঘ্র প্রয়োজন। সম্প্রতি সরকার ভারতে বিমান-বহরের জন্য বিমান-চালক শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুধু বিমান-চালকের প্রয়োজন নয়, বিমানেরও প্রয়োজন। ব্রিটিশ-রাজ আমেরিকা হইতে বিমান সংগ্রহ করিতেছেন। এমন কি যুক্তরাষ্ট্রে নূতন বিমান-কারখানা নির্ম্মাণের ব্যবস্থারও তাঁহারা বরন করিতে স্বীকৃত। কানাডা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশেও এই শিল্পের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সাম্রাজ্যের কল্যাণ-কল্পে ভারতেও এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা সত্বর প্রয়োজন। প্রভুত্বশালী ওয়াকি-বহাল কর্ত্তৃপক্ষের মতে সুয়েজ বন্দরের পূর্ব্বে অবস্থিত ভারত একটি যুদ্ধক্ষেত্ররূপে পরিগণিত; সুতরাং ভারতে শুধু বিমান-ঘাঁটি নয়—বিমান-শিল্পের সুপ্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। বোম্বাই সহরের এক সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী এই শিল্পের উদ্যোগপর্ব্বে লিপ্ত আছেন।

এই সকল বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে সরকারী সহানুভূতি ও সাহায্য যেমন অপরিহার্য্য ও অতি প্রয়োজন, তেমনই সাম্রাজ্যান্তর্গত বিভিন্ন দেশসমূহের পরস্পরের প্রচেষ্টার প্রতি আন্তরিক আগ্রহপূর্ণ সহানুভূতি ও উৎসাহবর্দ্ধক সাহায্য-প্রবণতা অত্যাবশ্যক। এই নিমিত্ত সম্প্রতি দিল্লী সহরে সুয়েজ বন্দরের পূর্ব্বস্থিত দেশসমূহের প্রতিনিধিদের বিরাট বৈঠক বসিয়াছে; সেই বৈঠকের প্রতি আমরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি। কেবলমাত্র যুদ্ধের সাময়িক প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত নয়, যুদ্ধাবসানের পরেও, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প-সমুন্নয়ন-কল্পে, যাহাতে আমরা সমবায় ও সমবেত শক্তি-সম্পদের পারস্পরিক সুযোগ ও সাহায্য লইয়া স্বাবলম্বনের সৌধ-শিখরে আরোহণ করিতে পারি তাহার স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেবল মাত্র যুদ্ধের প্রয়োজন সাধন করিয়া নিরস্ত হইলে, এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

ভারতের সুদর্শন সূর্য্য-স্বভাব-সম্পন্ন—অনিয়ন্ত্রিত-আনন্দায় সর্ব্বথা সঙ্কুচিত, নির্দ্দিষ্ট ও নিরাপদ গণ্ডীর বাহিরে অভিযান চালাইতে সতত বিমুখ। সুতরাং নূতন নূতন বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠান এবং মৃত, মুমূর্ষু অথবা পুরাতনের পুনরুদ্ধার হেতু ভারতীয় মূলধন যাহাতে যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করিয়া সহিষ্ণু ও কর্ম্মী হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার এক-মাত্র উপায় সরকারের অভয়-বাণী।

অন্যান্য সমর্থ দেশের তুলনায় আমাদের এই দুর্ব্বলতা লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু অন্যের আশ্রয়ে সুদীর্ঘকাল

লালিত-পালিত হইয়া আমরা যে বহুল পরিমাণে ভীরু ও অকর্মণ্য হইয়াছি তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। যুদ্ধাবসানের পরেও নব-প্রতিষ্ঠিত শিল্প সরকারী সহানুভূতি এবং প্রয়োজনানুযায়ী সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে না—এইরূপ একটি প্রতিশ্রুতিও আমরা পাইয়াছি। বর্ত্তমান বর্ষের প্রারম্ভে ভারতের বাণিজ্য-সচিব ঘোষণা করিয়াছিলেন যে যুদ্ধার্থে প্রতিষ্ঠিত কোন কোন শিল্প যুদ্ধাবসানে যাহাতে বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় অন্যায় ও অসঙ্গত ভাবে হটিয়া না যায় তদুপযোগী সাহায্য সরকার যুদ্ধের পরেও করিতে প্রস্তুত। তিনি আরও ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, শিল্প-প্রতিষ্ঠা ও শিল্পসংরক্ষণের জন্য ভারতীয় রাজস্ব-সমিতি (Indian Fiscal Commission) যে-সকল বিধি-ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন তাহারও কিছু কিছু উপায় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে। সরকার উভয় বিষয়েই অবহিত হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় সম্প্রতি এই ঘোষণা পুনরুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু এই সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত ও ব্যাপক এবং নির্দ্দিষ্ট ও নির্দ্ধারিত এবং প্রমাদ ও সমস্যা-শূন্য বিধানের প্রয়োজন। নিতান্ত নিরপেক্ষ ভাবে ভারতের স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্য-প্রচেষ্টার প্রতি সরকার অকৃত্রিম প্রীতিপূর্ণ ও অকুণ্ঠিত সহানুভূতিশীল—এই দৃঢ় বিশ্বাস জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এই সাধু সঙ্কল্প সুনিশ্চিত করিবার নিমিত্ত সরকার কিরূপ নীতি ও রীতি এবং কিরূপ উপায় ও কৌশল এবং কিরূপ বিধি ও বিধান অবলম্বন করিবেন তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রয়োজন। যুদ্ধাবসানে ভারতীয় ধনিক, বণিক ও শ্রমিক যে অসহায় ভাবে অন্যায় ও অসাধু প্রতিযোগিতার পীড়নে অতিষ্ঠ হইবে না এবং তাহাদের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত সরকার সর্ব্বপ্রকার উপায় অকপট ও অকুণ্ঠিতভাবে প্রয়োগ করিবেন এই অন্তর বাণীই শিল্পবাণিজ্যে-নিযুক্ত ভারতবাসী সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করে। ভারতবাসীর অর্থ ও সামর্থ্য এবং শক্তি ও সাহস এখন অতি সামান্য—সে জোর যে কাহার, তাহা সুধীজনের বিবেচ্য।*

* আধুনিক প্রণালীর কলাকৌশল-কুশলী শিল্প-চক্রের দোষ-ত্রুটি সম্পাদকীয় স্তম্ভে সম্বন্ধে একাধিকবার আলোচনা করিয়া দেখানো হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য বলা যাইতে পারে। তথাপি, দেশবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশের মত হিসাবেই এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল।

---

# বঙ্গশ্রী

—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ

পর্ণ-বর্ণা রূপের কণা! চরণ চুমি তোর,
অরুণ-কিরণে রূপে গোপনে নিশির শিশির-লোর।
ভাবল বনানী ভাবশোভা টানি বসন রচিল তায়
মাঠের বুকেতে ধান-ভরা ক্ষেতে আঁচল লুটায়ে যায়।
অমল কমল কুন্দ-ধবল কুসুমের মালা গলে
শীতল সমীর কির্ কির্ কির্ ঝুরায় শরীর ছলে।

অলক্তময় কচি কিশলয় আঁকিল অধরখানি
তাহে শ্বেত কাশ তোলে শুচি হাস মরি কি মধুর, রাণি!
চন্দ্রতপন যুগল লোচন রজনী চিকুর ভাল
দূর নীলিমায় যুকি রেখায় ভুরু যে চন্দ্রবাল।
নদী পয়োধর ভাল অম্বর তারার কিরীট শিরে
যে মহিমাময়ি বঙ্গজননি! আমিতে আসি যে নীরে।

# চোর

—শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

পাড়ার লোকে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। কাহারও গাছের কোন ফল থাকিবার উপায় নাই। দিন-রাত আমরা সশঙ্কচিত্তে বাস করিতেছি। গাছের আম-কাঁঠাল-কলা-ডাব, কিছুই রাখিবার উপায় নাই। কে যে চুরি করিতেছে, আজও পর্য্যন্ত তাহার সন্ধান হইল না। এই আছে—এই নাই অবস্থা। ক্ষেত হইতে পাকা ফসল পর্য্যন্ত চুরি যাইতেছে। ছোটখাট চুরি ছাড়া বড় বড় দু'একটী চুরিও যে হইতেছে না, তাহাও নয়। কান্ত পিসি ইহার-উহার বাড়ী মুড়ি-কড়াই ভাজিয়া, বা কাহাকে জল দিয়া কোন রূপে পেটের ভাত করে। লোকে অবশ্য নানা কথা বলে। কান্ত পিসির হাতে না কি কিছু টাকাকড়ি আছে। হইলেও হইতে পারে—অবিশ্বাসের অবশ্য কোন কারণ নাই। কিন্তু সে-দিন সে বেচারীও সর্ব্বস্বান্ত হইল। তাহার ঘর খুঁড়িয়া, বাক্স ভাঙ্গিয়া, দিন দুপুরে কে বা কাহারা যাবতীয় টাকা-পয়সা লইয়া গিয়াছে। কান্ত পিসি ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চোরের সপ্তপুরুষের উদ্দেশ্যে নানা অভিশাপ বর্ষণ করিতে লাগিল। বুক চাপড়াইয়া, চুল ছিঁড়িয়া, আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া, ভগবান আর ধর্ম্মকে সাক্ষী মানিয়া, চোরের উদ্দেশ্যে নানা শ্রাব্য, অশ্রাব্য গালি দিল। কিন্তু গহনা, বা টাকাকড়ির, অথবা চোরের কোন সন্ধান হইল না। শুধু আমরা চোরের ভয়ে আরও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম।

ইহার মধ্যে আরও দু'এক জায়গায় চুরি হইয়া গেল। রাত্রে গাঁয়ের ছেলের দল, দল বাঁধিয়া পাহারা দিতে লাগিল। গ্রাম্য চৌকিদার অবশ্য আমাদের দেয় টাকা হইতে বেতন খাইলেও, যথাসময়ে তাহার সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। প্রেসিডেন্টবাবুর বাড়ী পাহারা দিয়া, অবশিষ্ট সময়টুকু নাক ডাকাইয়া নিদ্রা দেওয়াই সে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভাবিয়া রাখিয়াছে। আমরা নিজের নিজের ঘর দুয়ারে সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্বে, ভালভাবে খিল দিয়া, নিরতিশয় শঙ্কচিত্তে বসবাস করিতে থাকি।

আমাদের গ্রামকে লোকালয় বলিলে ভুল হইবে, বরং বনবাস বলাই ঠিক। দুই চারি ঘর লোক ছাড়া, বাকি পতিত জমিগুলি নিবিড় বন-রাজিতে পরিপূর্ণ। বড় বড় গাছ—নানা আগাছা, লতা-পাতার জোপ এত ঘন হইয়া উঠিয়াছে যে, দিবসেই সন্ধ্যা বলিয়া ভ্রম হয়। বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যের আলোক এখানে প্রবেশ করিতে পারে না। যে-দিকে তাকান যায়, সেই দিকেই বন—বন, আর বন। দুই পাশের গাছ আসিয়া সব রাস্তাগুলির উপর ঝুঁপাইয়া পড়িয়াছে। পথ চলিতে হইলে এক হাতে কাপড় তুলিয়া, অপর হাতে বন ঠেলিতে ঠেলিতে চলিতে হয়। ভাবি, আর দু'খানি হাত পিঠ হইতে গজাইলে ভাল হইত। বর্ষার সময়, এক হাতে ছাতি ও অস্ত্র আর এক হাতে মশা-তাড়ানোর সুবিধা হইত। কিন্তু নিতান্তই আমরা মানুষ, তাই উপরোক্ত সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। কোন শহরবাসী অথবা কোন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামবাসী আমাদের চতুষ্পদ জাতীয় কোন জীবের সহিত তুলনা করিলে, রাগিবার কোন কারণ নাই। কারণ, এই বনের দেশে মানুষ অপেক্ষা কোন চতুষ্পদ জীব বসবাস করিলেই উচিত কাজ হইত।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা, ঘরের দরজা ভাল ভাবে বন্ধ করিয়া একখানি পুরাতন মাসিক কাগজ পড়িতেছিলাম। হঠাৎ "চোর চোর", চীৎকারে চিন্তাবর্ত্তে বাধা পড়িল। ত্বরিৎপদে, ভয়-ব্যাকুলিত চিত্তে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিয়া দেখি, পাড়ার আশু চক্রবর্ত্তী, চোরের বুকের উপর বসিয়া সজোরে তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়া হুঙ্কার দিতেছে। রাগিলে আশু চক্রবর্ত্তীর মুখ দিয়া শুধু হিন্দী কথা বাহির হয়।

"—শালা চোর, এক ডাণ্ডামে তোমরা হাড্ডি চুর চুর কর দে গা। শালা সন্ধ্যে বেলামে, বাগানমে ডাব, কাঁঠাল চোরি করতা হ্যায়। এক দুফা নাক পর মারেঙ্গা, বর বর করকে রক্ত বাহার কর দেগা।"—আশু চক্রবর্ত্তীর হিন্দী

কথা শুনিয়া, সমস্ত গাম্ভীর্য্য প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলাম আর কি! কোনরূপে দাঁতে দাঁত চাপিয়া, গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "দেখি, একবার চোরকে।"—ভাল করিয়া চোরকে দেখিলাম। নিতান্ত জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার একটি লোক। মাথায় বড় বড় চুল, সারা অঙ্গে কাপড়ের একরূপ কোন বালাই নাই। দেখিলে মনে হয়, বহুদিন হইতে নিদারুণ ক্ষুধায়, ভিতরে ভিতরে পুড়িয়া, এইরূপ শুষ্ক কঙ্কালসার হইয়া গিয়াছে।

আশু চক্রবর্ত্তীর চোখ দু'টি লাল। লাল হইবার যথেষ্ট কারণ অবশ্য আছে। সন্ধ্যাবেলায়, ছোট কলিকার দু'-এক ছিলিম চড়ানোর কাজ, ইহার মধ্যেই শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর, চোর ধরিয়া এই হুঙ্কার ও উত্তেজনায়, দেহের রক্ত মাথায় চড়িয়া গিয়াছে। আশু চক্রবর্ত্তী কি ভাবে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া, অসম-সাহসে ক্ষিপ্র গতিতে চোর ধরিয়াছে, তাহারই বিস্তৃত বিবরণ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল।

একে একে আলো হাতে করিয়া পাড়ার যে কটি লোক ছিলেন, সকলেই হাজির হইলেন।

চোরকে ঘেরা করিতে লাগিলাম, "বাপু, বাগানে কি চুরি করছিলে?" অতি ক্ষীণ ও করুণস্বরে চোর বলিতে লাগিল, "আজ চার দিন থেকে খেতে পাই নি বাবু। কেউ ভিক্ষেও দেয় না। ক্ষিধের জ্বালায় হাঁটতে পারছিলাম না বাবু, তাই ঐ পুকুরের ধারে ঐ গাছটায় একটা কাঁঠাল পেকেছিল পেড়ে খাচ্ছিলাম।" এই বলিয়া চোর করুণ নয়নে আমার দিকে তাকাইয়া রহিল।

"আপনার পায়ে পড়ি বাবু, দুটো খেতে দিন।" চোরের এই ঔদ্ধত্য, আশু চক্রবর্ত্তীর সহ্য হইল না। দেহের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া সশব্দে চপেটাঘাত করিতেই, চোর মাটিতে পড়িয়া গেল। লণ্ঠনের আলোয় দেখিলাম, রাস্তায় ইঁটে লাগিয়া মাথা হইতে বড় বড় করিয়া রক্ত পড়িতেছে।

সকলে বলিতে লাগিল, "বেটা চোর, বেশ হয়েছে। এখন নিয়ে চল প্রেসিডেন্টবাবুর আফিসে। বেটাকে চালান হোক। এতদিনে বেটা ধরা পড়েছে। বাবা, দশ বার চুরির একবার সাজা পেতেই হবে। কিন্তু এ হ'ল কি, ওর সঙ্গে বেলায় চুরি করতে লাগল। বলি, এটা মগের মুলুক পেয়েছ চাঁদ। চক্রবদন তোল একবার চাঁদ, শ্বশুর-বাড়ী ঘুরে এস।"

আশু চক্রবর্ত্তী চোরকে ঠেলিতে ঠেলিতে প্রেসিডেন্ট-বাবুর বাড়ীর দিকে লইয়া চলিল। আমরাও পিছনে পিছনে হাঁটিতে লাগিলাম।

প্রেসিডেন্টবাবু আর নিমাই ঘোষ, চুপি চুপি বোধ করি পরামর্শ করিতেছিল। আমরা আসিতেই তাহাদের গুপ্ত-মন্ত্রণা বন্ধ হইল। নিমাই ঘোষ অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে তাকাইয়া রহিল। তাহার বিস্তৃত টাক, আর মিটমিটে দুই চোখের দিকে তাকাইয়া, আমার সারা মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। আশু চক্রবর্ত্তী সগৌরবে চোর ধরার ইতিহাস বর্ণনা করিতেই প্রেসিডেন্টবাবু হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, "বেটা বদমায়েস, চুরি করবার আর জায়গা পাও নি। বুঝলেন কমলেশবাবু, এই ক'মাস থেকে আমরা বহু চেষ্টা করছি। কিন্তু কোন শালাকে ধরতে পারি নি। কম নাজেহাল হয়েছি, কত রাত অন্ধকারে অন্ধকারে ঘুরে বেড়িয়েছি। দফাদার, চৌকিদার, ওরাও ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হয়ে গিয়েছে। আরে সত্য, বেটাকে খা কতক লাগা।"

চোর হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া প্রেসিডেন্টবাবুর পা জড়াইয়া ধরিল। অসীম কাতরতায় বলিল, "আমায় মারবেন না বাবু। জেলে দিন। সেখানে তবু দু'বেলা খেতে পাব।"

নিমাই ঘোষ তাহার বড় বড় দুলোর মত একরাশি দাঁত বাহির করিয়া ক্যা ক্যা করিয়া হাসিয়া বলিল, "বেটা চোর, আবার কান্না হচ্ছে। হুজুরের পা ছেড়ে দে। আরে কান্না কিসের—জেলে যাবার আগে, দু'এক ঘা খেতেই হয়। হাতের সুখটা আগে হোক।"

প্রেসিডেন্টবাবু, খস্ খস্ করিয়া কাগজে কিছু লিখিয়া সত্য চৌকিদারের হাতে দিয়া বলিলেন, "যা, বেটাকে থানায় নিয়ে যা। যেন পালায় না, আচ্ছা করে দড়া দিয়ে বেঁধে নিয়ে যা—আর এই চিঠিখানা, বড়বাবুর হাতে দিবি, বুঝলি? বড়বাবু মানে থানার বড় দারোগাবাবুর হাতে, যা নিয়ে যা। বুঝলেন কমলেশবাবু, এই সব লোকই সমাজের কলঙ্ক। এদের দয়া করতে আছে? এদের একবিন্দু দয়া দেখাতে নেই। বেটারা ছোট লোক—নচ্ছার চোর।"

সত্য চৌকিদার চোরকে দড়া দিয়া বাঁধিয়া, হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে থানার দিকে লইয়া চলিল।

কয়দিন বাড়ী ছিলাম না। বাড়ী আসিয়া গ্রামের অনেক খবর পাইলাম। মজুমদার-গিন্নী প্রপুর হাতে তাঁহার উঠানে মরিয়া পড়িয়া ছিল। আমার ছোট মেয়েটি নিজের দাঁত বাহির করিয়া বলিল, "বাবা, মজুমদার-গিন্নী এই এমি ক'রে, দাঁত বের ক'রে মরে পড়েছিল। ও বাড়ীর দাদু কি বলেছে জান বাবা। দাদু বলেছে, মজুমদার-গিন্নী বাড়ীতে ভূত হ'য়ে আছে।" ঘর হইতে গৃহিণী ধমক দিতেই, কন্যার পর বলিবার আগ্রহ থামিয়া গেল। ইহার পর জানিলাম, চুরি বন্ধ হয় নাই। কয়দিন হইল, ও-পাড়ার ঘোষাল কাকার কিছু ঘটি-বাটী চুরি হইয়া গিয়াছে।

আমার বড় ভাইপোটী বলিল, "জান কাকাবাবু, বোষ্টম-পাড়ার চন্দ্র বোষ্টম মর-মর। শোনা যায়, ওর অনেক পয়সা, কিন্তু এই মরণ কালে ডাক্তারও ডাকে নি, এক ফোঁটা ওষুধও খায় নি। পাড়ার লোকে কিছু ফল আর দুধ আনতে চেয়েছিল, কিন্তু চন্দ্র বোষ্টম বলছে—আমার পয়সা কোথায়? গরীব মানুষ, কোথায় পয়সা পাব?"

চন্দ্র বোষ্টম নিজের পয়সা নাই বলিলেও অবশ্য কেহ বিশ্বাস করিবে না। সংসারে যাহার স্ত্রী-পুত্র কেহ নাই, সে কিসের জন্য, এই মরণকালেও একটি পয়সা বাহির করিতে কৃপণতা করিতেছে, তাহা বুঝিয়া উঠিলাম না। আমার জ্ঞান হওয়া অবধি, চন্দ্র বোষ্টমকে এক ভাবেই দেখিয়া আসিতেছি। পরণে পাঁচহাতি খেরুয়া কাপড়। কবে হয় তো, এক পয়সার গিন্নী মাটি আনিয়া কাপড় ছুপিয়াছিল, তাহার পর সেই রং বহু কাল উঠিয়া যাইয়া ধূসা-কালিতে আর এক রূপ গ্রহণ করিয়াছে। মাথায় এক-মাথা চুল—মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। এইরূপে তাহার সুদীর্ঘ জীবনে, খোপা-নাপিতের পয়সা বহু জমা হইয়া আসিতেছে। আহার এক বেলা, তাও সেই সন্ধ্যাবেলায় চাল ডাল সিদ্ধ করিয়া খাইয়া, রাত্রের আহার বাহুল্য বলিয়া খরচের খাতা হইতে ছাঁটিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ, আজ দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল, এক প্রকার না খাইয়া, না পরিয়া, হাটে মেলায় নিজের বনিহারী দোকান খুলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। কিংবদন্তী, এই চন্দ্র বোষ্টম এখানে ওখানে ঘুরিতে ঘুরিতে, নানা সৎ অসৎ উপায়ে দু'এক হাজার টাকা জমাইয়া ফেলিয়াছে। অবশ্য টাকার সম্বন্ধে তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে।

লোকমুখে শুনিতে লাগিলাম, চন্দ্র বোষ্টম এ-যাত্রা আর উদ্ধার পাইবে না। রাখালবাবু বলিলেন, "ক্রমশঃ বাড়ী ক্ষীণ হ'য়ে আসছে, কিন্তু এরকম হাড়-কিপুটে মানুষ দু-তারতে আর দেখলাম না। মরণকালে এক ফোঁটা ওষুধ বা দুটো ফল,—এই ডালিম-বেদানা, তাও মুখে দিলে না। টাকা বুকে ক'রে কি ও যমের বাড়ী যাবে?"

গগনবাবু বলিলেন, "বাপু, ও কি খাওয়ার কপাল ক'রে এসেছে যে খাবে!"

মনে মনে অনেক চিন্তা করিলাম। যাহার সংসারে কেহই নাই, অথচ একজনের পক্ষে অতিরিক্ত টাকার যে মালিক, সে কেন খরচ করিতে কৃপণতা করে? অথচ, যে লোক মরিতে বসিয়াছে, আজও টাকার উপর এত দুর্নিবার লোভ কেন? কিন্তু বহু চিন্তা করিয়াও এই জটিল প্রশ্ন ও সমস্যার কোন মীমাংসা করিতে পারিলাম না।

শুনিলাম, সেই চোরকে চালান দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহার বিচারের দিন অতি সন্নিকট। পাড়ার আমাদের কয়জনকে সাক্ষী মানা হইয়াছে। কিন্তু কবে, কোন্ তারিখে মকর্দ্দমার দিন, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। ভাবিলাম, প্রেসিডেন্টবাবু হয় তো জানিতে পারেন। তাই, বৈকালবেলা তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য আফিসের দিকে চলিলাম।

পাছে সন্ধ্যা হইয়া যায়, এই ভয়ে একটু দ্রুত হাঁটিয়া তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দূর হইতে শুনিলাম, প্রেসিডেন্টবাবুর সহিত কে যেন কথা বলিতেছে। ধীরে ধীরে হাঁটিয়া ঘরে ঢুকিতে যাইব, হঠাৎ কানে আসিল, চন্দ্র বোষ্টমের কথা।

মনে হইল, নিমাই ঘোষ যেন কথা বলিতেছে।

"কে জানবে বাবু, মনে হয়, চন্দর রাত নাগাদ বাছাটা একটায় শেষ হবে। আর তা যদি না হয়, ভোর রাত্রে একেবারে নির্ঘাৎ। কোন ভয় পাবেন না বাবু, বেটার সোনা রূপো অনেক আছে, আর নগদ টাকা হাজার দুই তো বটেই।"—পায়ের একটু শব্দ হইতেই সচকিত হইয়া গলার

ঢুকিয়া পড়িলাম। প্রেসিডেন্টবাবু আর নিমাই ঘোষ হঠাৎ থতমত খাইয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

"আরে এই যে কমলেশবাবু, আসুন—আসুন, তার পর কি মনে ক'রে?"

"এই এলাম বেড়াতে বেড়াতে—। কাল কলকাতা যাব, কিন্তু সেই চোর ধরার মকর্দ্দমার দিনটা কবে? আমার ফিরতে একটু দেরী হবে কি না।"

প্রেসিডেন্টবাবু বলিলেন, "সে এখনও দেরী আছে। খবর এলেই জানাবো। আর তা ছাড়া, আপনারা সাক্ষীর সমন পাবেন। তা কলকাতা হ'তে ঘুরে আসুন, সময় অনেক আছে।"

নিমাই ঘোষের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, তাহার মুখ যেন অপ্রসন্ন। উহাদের গুরুতর কথার মাঝে আসিয়া পড়িয়াছি, তাহাতে রাগ হইবারই কথা। আর দু' চারিটি কথা বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

সারা রাস্তা নিমাই ঘোষের কথাগুলি মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে চলিলাম। মনের মধ্যে একটা সন্দেহ বারংবার উঁকি দিতে লাগিল,—তবে কি উহারা চন্দ্র বোষ্টমের টাকা-পয়সা চুরি করিবার মতলব করিয়াছে?

প্রেসিডেন্ট হরিচরণবাবু, তিনি ভদ্রলোক হইয়া এমন হীন কাজ করিবেন এ কথা ভাবিতেও আশ্চর্য্য লাগে। কিন্তু নিমাই ঘোষের সহিত তাঁহার এত গোপন পরামর্শই বা কিসের? তা ছাড়া, নিজের কানে যাহা শুনিয়াছি, তাহা তো কিছু মাত্র ভ্রম নয়। মনটা কি জানি কেন অপ্রসন্ন ও চিন্তাযুক্ত হইয়া রহিল।

কোয়ের ট্রেণ ধরিবার জন্য একটু রাত থাকিতেই রওনা হইলাম। প্রায় নিঃশব্দ, ভোর হইতে তখনও এক ঘণ্টা বাকী। কিন্তু কিছু আগে না গেলে ট্রেণ ধরা শক্ত কথা। কারণ, বাড়ী হইতে ষ্টেশন প্রায় একক্রোশ পথ। রেল লাইনের পাশ দিয়া সরু পায়ে-হাঁটা পথ ধরিয়া চলিতেছি। আমার আগে নীলকণ্ঠ বাক্স বিছানা লইয়া হাঁটিতেছে।

চন্দ্র বোষ্টমের বাড়ী আমাদের রাস্তা হইতে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। চলিতে চলিতে থমকাইয়া দাঁড়াইলাম। অস্ফুটস্বরে নীলকণ্ঠকে থামিতে বলিয়া নিজে দাঁড়াইলাম।

"এই একটু দাঁড়া, চন্দ্র বোষ্টমের উঠানে লোক মনে হচ্ছে।" বিদ্যুতের মত নিমাই ঘোষের কথা মনের মাঝে খেলিয়া গেল। তবে কি সত্যই?

আবছা অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া নীলকণ্ঠ রুদ্ধস্বরে বলিল, "লোকই তো—নিশ্চয়ই চোর।"

"চুপ চেঁচাস নে, দাড়া টর্চ্চ জ্বালি।"

টর্চ্চের সুতীব্র আলো জ্বলিয়া উঠিতেই, লোক দু'টি আলোর দিকে তাকাইয়া টপ করিয়া লাফাইয়া বেড়া পার হইয়া গেল।

আলো নিভাইয়া বলিলাম, "চল রে।"

নীলকণ্ঠ বলিল, "চোরে যে সব চুরি ক'রে নিয়ে গেল।"

"যাক্ গে, তুই চল। নইলে ট্রেণ পাব না।"

টর্চ্চের আলোতে যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার সমস্ত সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল।

প্রেসিডেন্ট হরিচরণবাবু আর নিমাই ঘোষ, চন্দ্র বোষ্টমের বহুদিনের বহুকষ্টের সঞ্চিত অর্থরাশি লইয়া উধাও হইল।

বুঝিলাম, চন্দ্র বোষ্টম মরিয়াছে।

---

## যৌবন-সমস্যা

—শরীরতত্ত্ব, অন্তর-মথনিত আকাশতত্ত্ব এবং মস্তিষ্কস্থিত আকাশতত্ত্বের বায়ু, তেজ ও জল যে মানুষের কর্ম্মশক্তি, জ্ঞান ও ভাবপ্রবণতার মূল ধারা—তাহা একটু চিন্তা করিলেই অনুমান করা যাইবে। শরীরতত্ত্ব, অন্তর-মথনিত আকাশতত্ত্ব এবং মস্তিষ্কস্থিত আকাশতত্ত্বের বায়ু, তেজ ও জল যাহাতে দূষিত অথবা অকর্মণ্য প্রাপ্ত না হয় তাহা করিতে পারিলেই যৌবনের-সমস্যা সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত হইতে পারে অর্থাৎ যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অকালবার্দ্ধক্যের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।...

# বঙ্গে নুন চাষ

—শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

বহু আশা করিয়াই লিখিয়া থাকি যে লবণ প্রস্তুত সম্বন্ধে বঙ্গবাসী পুনরায় স্বাবলম্বী হইবে, যেমন সে শত বৎসর পূর্ব্বে ছিল এবং আর খুব বেশীদিন করাচি, বোম্বাই, এডেন, লিভারপুল, হাম্বুর্গ, রুমানিয়া বা পোর্ট সৈয়দ প্রভৃতি বৈদেশিক লবণের মুখাপেক্ষী হইয়া সে বসিয়া থাকিবে না।

কিন্তু দুঃখের বিষয় নুনের চাষ সম্বন্ধে প্রথম প্রথম যে উৎসাহ দেখিয়াছি এখন আর সেরূপ দেখি না। হয় ত যুদ্ধের হিড়িকে নুনের চালান আসা কিছু কম হওয়াতে কয়েকটি নূতন কোম্পানী স্থাপিত হইতেছে, কিন্তু আহারা লবণের চাষ কার্য্যকরী ভাবে চালু করিতে কাহারও উৎসাহ নাই। তাহার কারণ, প্রথমতঃ ভারত সরকার কি বাংলা সরকার, কোন পক্ষ হইতেই এই শ্রুতিপ্রিয় পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে রাষ্ট্র হইয়া যতটা সাহায্য আশা করা গিয়াছিল তাহার বিশেষ কিছুই হয় নাই। যাহা হইয়াছে তাহা আইন পরিষদের বক্তৃতায় এবং কাগজে কলমে। লবণ-তত্ত্ববিদ্‌গণের রিপোর্ট এবং অনুসন্ধান পথায় আসিয়া ঠেকিয়াছে—পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ, যে কয়টি প্রতিষ্ঠান কয়েক বৎসর যাবৎ কাজ আরম্ভ করিয়াছিল তাহারা আজ পর্য্যন্ত বিশেষ পরিমাণ লবণ বাজারে আমদানী করিতে পারে নাই। তৃতীয় কারণ বঙ্গ-প্রদেশের সমুদ্রতীর মাদ্রাজ, বোম্বাই, করাচি বা বর্ম্মার ন্যায় আগাগোড়া সুগম ও বাণিজ্যিক সুবিধাসম্পন্ন নহে। সুন্দরবনে নদনদী এবং জঙ্গলের মাঝে লবণ-শিল্পকে প্রতিষ্ঠা করিতে সময় লাগিবে। একমাত্র কাঁথি ও চট্টগ্রামের উপকূল তবু তুলনায় সহজগম্য, কিন্তু বঙ্গোপসাগর এই দুই দিকে বড়ই অগভীর, তীরের নিকট ষ্টীমার চলাচলের সুবিধা সেরূপ হয় না।

সুন্দরবনে রেলপথ নাই বটে, কিন্তু নৌকা বা মোটর-বোটে সকল সময় যাতায়াত সম্ভব। সে জন্য সুন্দরবনে লোকবসতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের গোসাবা লক্ষ্মীকান্ত হইয়াছে। কাঁথির সমুদ্রতীর (sea board) হইতে রেলপথ দূরে—যদি ভবিষ্যতে ইহার নিকট লাইন খোলা হয়, তাহা হইলেও বর্ত্তমানের হার অনুযায়ী যা মাশুল লাগিবে তাহাতে কলিকাতার বাজারে লবণ পাঠানো মোটেই ব্যয়সাপেক্ষ হইবে না। সেই জন্য সুদূর করাচি ওখা, বোম্বাই বা টিউটীকরিন হইতে জলপথেই লবণ আসে নিয়মিত ভাবে। বঙ্গের দক্ষিণ উপকূলে চট্টগ্রামের কক্সবাজার অঞ্চলই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক স্থান,যেখানে লবণ বিস্তৃতভাবে প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু উপস্থিত একটীমাত্র কোম্পানী এই অঞ্চলে কারখানা খুলিয়া কাজ করিতেছে।* ইহারা সর্ব্বাগ্রে বাংলা সরকারের নিকট কিছু সাহায্য পাইয়াছে এবং তাহাতে কারখানার আয়তন বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সুন্দরবনে একটী সুবিধা আছে এই যে, কয়লার পরিবর্ত্তে জঙ্গলের কাঠ ইন্ধনের জন্য হাতের কাছে পাওয়া যায়। কাঁথিতে প্রাচীন কালের সেই জলপাই এবং অন্যান্য বৃক্ষের ঘন বনের অস্তিত্ব একেবারেই নাই, তিজলীর মিলকরহাসে তৎকালীন মলঙ্গীদের লবণ প্রস্তুতিতে সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন ওদিকে কয়লা ভিন্ন উপায় নাই। সুখের বিষয় সুন্দরবনে বাংলা সরকার লবণ-প্রস্তুত-কারকদের নিকট কাঠের 'রয়েল্টী' কন্‌সেসন রেটে আদায় করেন।

সমগ্র ভারতবর্ষে এখন প্রতি বৎসর খনিজ ও সমুদ্রজ লবণ মিলিয়া মোট পনের লক্ষ টন বা সাড়ে চারি কোটী মণ নুন প্রস্তুত হয়। ভারতবাসীর সর্ব্বশুদ্ধ চাহিদা কুড়ি লক্ষ টন—বাড়্‌তি পাঁচ লক্ষ টন বা এক কোটী মণের কিছু বেশী লবণ এখনও বাহির হইতে আসে। এই পাঁচ লক্ষ টনের অধিক ভাগ আসে এডেন হইতে এবং তাহাও কলিকাতা এবং চট্টগ্রামের বন্দরে যতটা আমদানী হয় ততটা আর কোথাও নহে। বঙ্গের ইহা অতিশয় দুর্ভাগ্য যে, যেখানে প্রায় বেশীর ভাগ প্রদেশ তাহাদের স্বদেশী লবণ ব্যবহার করে সেখানে বঙ্গবাসী বৎসরে প্রায় দুই কোটী টাকা দেশের বাহির করিয়া দেয় লবণ-ক্রয়ের নিমিত্ত। নিম্নের তালিকায়

* Chittagong Trading Union.

দেখা যাইবে বৎসরে কি ভীষণ পরিমাণ লবণ আমরা ক্রয় করি।

কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরে লবণের আমদানী : *

| | ১৯৩৬-৩৭ মণ | ১৯৩৭-৩৮ মণ | শতকরা মণ |
|---|---|---|---|
| লিভারপুল (ইংলণ্ডের খনির লবণ) | ৪১,৭০০ | ২২ | |
| হামুর্গ (জার্মানী খনির) | ১১,৫৩,৩১৭ | ১১,১৩,৪৮০ | ৭ |
| এডেন | ৬৩,৭৩,১৩৩ | ৮৩,৭৮,৪১০ | ৫৩ |
| করাচি | ৩২,১৫,৪৩৪ | ২৩,৭০,৭৪১ | ১৯ |
| ওখা (গুজরাট) | ১১,৮৮,৮৯০ | ১২,৬৩,১৩০ | ৮ |
| বোম্বাই— | | | |
| বান্দ্রা (সাষ্টসমূহ) | ৮,১২,৬৯০ | ৮,৮৩,০৩০ | ষড়ে |
| বোম্বাই | ৩,৭৭,৮১২ | ৪,৭৫,১৬৪ | দশ লক্ষ |
| কলম্বি | ৮,৩১,৩১৩ | ৮,৩১,৩৭৮ | |
| ইংরেজি (বাজার) | ২৫,৩০০ | ৮১,৮৭২ | |
| | ১,৪৪,৭৭,০৩৯ | ১,৫৭,২৯,০০১ | |

ওখা বন্দরের চালানীকে বোম্বাই-এর মধ্যে ফেলা যাইতে পারে। তাহা হইলে বোম্বাই প্রদেশের মোট আমদানী পড়ে ৩২।৩৩ লক্ষ মণ দাঁড়াইতেছে। উপরিলিখিত গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে দেখা যাইতেছে ১৯৩৭-৩৮ সালে আমরা এক কোটী সাতাশ লক্ষ মণ লবণ অন্যদেশ হইতে বঙ্গদেশে আমদানী হইতে দিয়াছি এবং তাহার জন্য মণ-পিছু ১৷৵০ এক টাকা বার আনা নেটীয় গবর্ণমেণ্টকে ডিউটী দেওয়ায় হাজ-ভাণ্ডারে আড়াই কোটী টাকা প্রবেশ করিয়াছে, তাহা ছাড়া বিলাতী এগার লক্ষ মণ লবণের জন্য ছয় পয়সা বাড়তি শুল্ক দেওয়া হইয়াছে।†

বাঙ্গলার বন্দরে প্রতি বৎসর পড়ে যে সেড় কোটী মণ বিদেশী লবণ আমদানী হয়, তাহার মধ্যে শুধুমাত্র বঙ্গদেশের জন্য আশী লক্ষ মণ হইলেই চলে। এডেন একাই কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরে বৎসরে ৮০।৮২ লক্ষ মণ ডাম্পিং বরে অতি সুলভ মূল্যে। তাহা হইলে শুধুমাত্র এডেন হইতে লবণের চালান বন্ধ করিলেই বঙ্গের ভবিষ্যৎ কারখানাগুলির মার্কেট পাওয়া যাইতে পারে। এডেন বোম্বাই প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অধীন ছিল বলিয়া অতিরিক্ত আমদানী-শুল্ক (Additional Import Duty) বাড়তি শুল্কের হাত হইতে বাঁচিয়া আমাদের প্রদেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। সুলভতম মূল্যের জন্য লবণের সাধারণ দর কমাইয়া এডেন যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে আমাদের বঙ্গদেশের। এক্ষণে এই এডেনের আমদানীর উপর যদি বাড়তি শুল্ক বসাইয়া দেওয়া যাইত এবং সেই বাড়তি টাকাগুলি স্বদেশের লবণ-শিল্পের উন্নতি-কল্পে ব্যয় করা যাইত, তাহা হইলে দেশের শুধু যে অর্থ বাঁচিত তাহা নহে, সহস্র সহস্র বেকার যুবকের কার্য্য জুটিত। বিহার, নেপাল, আসাম প্রভৃতি দেশ বাদ দিলেও মূল বাংলার মোট চাহিদা ৮০।৮৫ লক্ষ মণ লবণ স্বদেশে বিস্তৃত সাগরকূলে মাত্র ৪০।৫০টি বৃহদায়তন কারখানা উৎপাদন করিতে পারে, যদি তাহারা পূরাদমে কাজ চালায়। বৎসরের ৩৬৫ দিনের বর্ষা-বাদল বাদ দিয়া অন্ততঃ ২০০ দিন কারখানা চালান বেশ সম্ভব। এই দুইশত দিনের প্রতিদিন যদি প্রত্যেকটী কারখানায় দুই হাজার মণ লবণ প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীকে বিদেশী লবণ ক্রয় করিতে হয় না, কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে এক শতটী কোম্পানীও যদি আটশত হইতে হাজার মণ লবণ এই দুইশত দিনের প্রতি দিন প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেও অবস্থা উন্নত হইতে পারে। ইহা অসম্ভব নহে; কারণ, মাত্র একশত বৎসর পূর্ব্বে ১৮৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ৪০,৭০,০০০ মণ স্বদেশী লবণ বিক্রয় হইয়াছিল—অফিসিয়াল রেকর্ডে পাওয়া গিয়াছে।

গত বৎসর কলিকাতা একসাইজ ও লবণ বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিষ্টার ডি, এন, মুখার্জ্জী এবং খুলনার বন-বিভাগের মিঃ ডি, এস্, রাও বঙ্গ-সরকারের আদেশানুযায়ী সুন্দরবনে লবণ-শিল্প সফল হইতে পারে কি না সে সম্বন্ধে একটী রিপোর্ট দিয়া * একস্থলে বলিয়াছেন, "We have selected a compact area of about 5,600 acres in the Reserved forest at the junction of Terobanki Khal and Haribhanga river on the steamer route, as suitable site where a group of factories may be established in course of time, capable of producing about 40 lakhs of maunds of salt."

* Report of the Government Salt Dept. 1937-38.

† গত বৎসর Additional Import Duty উঠিয়া গিয়াছে।

* Possiblity of Salt Industry in Sunderbans.—D. G. Publications. পৃ-৫০।

কতেপোরে—লাফের জলকে ঘনীভূত করা হইতেছে

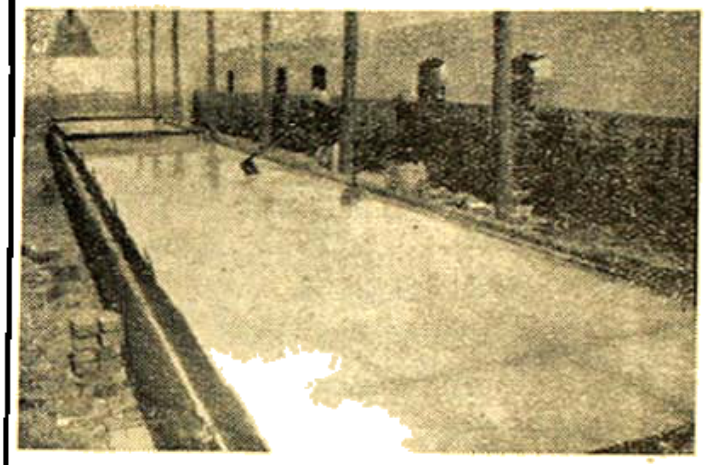

মোমা জল চুল্লীর উপর আল ঢেওয়া হইতেছে

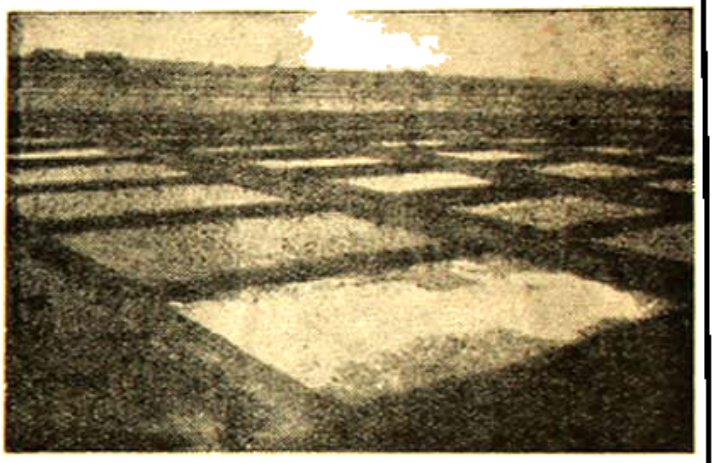

বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর ঘন করিবার চাত,

আড়ি—সমুদ্রের মোমা মাটি হইতে পরিষ্কার করা

"আমরা ভেরবাকি খাল এবং হরিণভাঙ্গা নদীর সঙ্গমে টীমার ঘাটের উপর যে রিজার্ভড্ ফরেষ্ট আছে তার মধ্যে প্রায় ৫,৮০০ একার স্থান দেখেছি, যা লবণ-প্রস্তুতের উপযুক্ত স্থান এবং কালে সেখানে বহু কারখানা হ'তে পারে এবং শুধু এইখান থেকেই ৪০ লক্ষ মণ নুন তৈরী হতে পারে।"

তাহা হইলে সমুদ্রতীর এবং সুন্দরবনের মধ্য দিকেও নোনা জলের অভাব হইবে না এবং একশটী কোম্পানীর স্থান আদৌ অনুমান হইবে না। সুন্দরবনে লবণ-শিল্প সম্বন্ধে একটী কথা সম্প্রতি ভাবিতে হইতেছে এই যে, ওই অঞ্চলের জলবায়ু এবং স্বাস্থ্য সেরূপ সুবিধাজনক নহে—যদিও বহু লোক উপনিবেশ করিয়াছে এবং চাষবাসও করিতেছে। যে কয়টি কোম্পানী সুন্দরবনে কার্য্য করিতেছে তাহাদের সহিত আলাপে যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার মনে হয় চাকরবাকরদের অসুখ-বিসুখে প্রায়ই তাঁহাদের ভুগিতে হয়। বর্ষার সময় চার পাঁচ মাস জল-কাদা, বান, কোটাল, বাঁধভাঙ্গা এসবের কথা ছাড়িয়া দিলেও কারখানার অস্বাস্থ্যকর অবস্থানের কথা ভাবিতে হইবে। প্রতি কারখানার কর্তৃপক্ষের সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। নোনা জলে মিষ্টি জল মিশিয়া অ্যানোফিলিস মশার জন্মের সহায় হয়, যাহার জন্য ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রায় সকলকেই ভুগিতে হয়। কুইনাইন বিতরণ করিতে হইবে এবং বাঁধ দেওয়ার জন্য মাটি খননে যাহাতে কোনরূপ ডোবার সৃষ্টি না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হইবে।

বাঙ্গলার আর্দ্রতা ( humidity ) এবং আবহাওয়া লবণ-প্রস্তুতে কোন্ পদ্ধতির অধিকতর উপযোগী তাহা এক প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছে, এখানে ব্রহ্মদেশ এবং মাদ্রাজের কোরমাণ্ডল-এর রৌদ্রতাপ ( solar evaporation ) এবং ফুটান ( boiling ) মিলিত পদ্ধতি ( combined process ) সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও আয়োপ্য। যে কয়টী প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমানে লবণ প্রস্তুত করিতেছে তাহারা সকলেই সেই পদ্ধতিতে কার্য্য করিতেছে। নোনাজল (brine)-কে রৌদ্র সাহায্যে অন্ততঃ খানিকটা (saturation point) পর্য্যন্ত ঘন করিয়া শেষে জ্বাল দিয়া লবণ নিষ্কাশন করার ইন্ধনের জন্য কাঠ কিংবা কয়লা যথেষ্ট প্রয়োজন এবং এইটাই এই শিল্পে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ব্যয়। এই খরচ বাঁচাইয়া অন্ততঃ শীতকালে, যে সময়ে বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকে, শুধুমাত্র রৌদ্রতেজে কতক লবণ প্রস্তুত করা যায় তাহা গত জানুয়ারীতে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। শুষ্ক শীতের দিনে, নভেম্বর হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত, প্রত্যহ সকালে কন্‌ডেন্সারে ঘনীভূত (saturated) নোনাজল পাতলা করিয়া চালিয়া দিলে সমুদ্রতীরের জোড়ো বাতাসে এবং রৌদ্রে জলভাগ দূর হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে কেমন চমৎকার গুঁড়া লবণ পড়িয়া থাকে। ১৯৩৮-৩৯ সালে কাঁথির একটি নুনের কারখানায় এক হাজার মণ লবণ এই উপায়ে প্রস্তুত হইয়াছে, এ বৎসর বোধ হয় হাজার দুই মণ হইবে।

উড়িষ্যার গঞ্জাম্ জেলায় নৌপদা সাগরতটে নুনকারেরা এই এডেন-করাচি-পদ্ধতিতে যথেষ্ট পরিমাণ লবণ পাইয়া থাকে। এখন বেশ জোরের সহিত বলা যায় যে, কাঁথি অঞ্চলে সারা সমুদ্রতীরটীতে শীতকালে অতি অল্প খরচায় এইভাবে লবণ প্রস্তুত হওয়া সম্ভব। অবসর সময়ে কাজ করিলে, অন্ততঃ এই কয় মাস, স্থানীয় কৃষকদের দ্বারা এই উপায়ে লবণ কিছু কম তৈয়ারী হইবে না। মাদ্রাজের লবণ-শিল্প গত কয় বৎসর এইভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

ব্রহ্মদেশ ও মাদ্রাজ-পদ্ধতি সম্বন্ধে বলিতে গেলে এই দুই দেশের লবণ-শিল্পের উন্নতির কথা কিছু বলিতে হয়।

ব্রহ্মদেশে বহুদিন হইতে কুটীর-শিল্পে লবণ প্রস্তুতি দেখিতে পাওয়া যাইত এবং এখনও দেখা যায়।* উত্তর-ব্রহ্মে লবণাক্ত অঞ্চলে কূপ খনন করিয়া নোনা জল তুলিয়া প্রথমে রৌদ্রে ঘন করিয়া জ্বাল দেওয়া হয়। নিম্ন ব্রহ্মেও বিস্তৃত সমুদ্রতটে বিক্ষিপ্ত ভাবে লবণ প্রস্তুত হইত। ইহাদের এই শিল্প আমাদের দেশের মত একেবারে নষ্ট হয় নাই,—এই হেতু যে, ও দেশে সরকার দমননীতি অনুসরণ না করিয়া বরঞ্চ কিছু সাহায্য করিয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মে স্বদেশী লবণের উপর শুল্ক ছিল না, তাহার পরিবর্ত্তে প্রস্তুতির উপর ট্যাক্স্ ছিল—বিদেশী লবণের আমদানীতে এই স্বদেশজাত লবণকে রক্ষা করিবার জন্য এই ট্যাক্স্ কমান হয়, তাহা ছাড়া সমুদ্রতীরের বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে একত্র করিয়া গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি

* Salt Industry of India—Agarwal, pp. 15.

কারখানা নির্মাণ করেন এবং সেগুলি সম্পূর্ণ নিজেদের তত্ত্বাবধানে রাখেন। ১৮৩২ সালের পূর্ব্বে কখন কখন বর্ষার লবণ চট্টগ্রামের বন্দরে আসিয়া বিক্রয় হইত। বঙ্গদেশের আবহাওয়া ব্রহ্মদেশ হইতে বরফ কোন অংশে ভাল, কিন্তু বোধ করি দেশের সরকার-নীতি প্রতিকূল—সেই জন্য আজ পরের দোরে আমরা লবণ ভিক্ষা করিতেছি। মাদ্রাজ প্রদেশের বিস্তৃত সাগরতীরে বৎসরে এক কোটী দেড় কোটী মণ লবণ প্রস্তুত হয়। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৪৪টী ফ্যাক্টরী অনুমান ২৪ শত একর জমিতে লবণের চাষ করে।* পূর্ব্ব-দক্ষিণ ভারতের সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়া ও মাদ্রাজ (টিউটিকরিণ) হইতে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরে লবণ আসে। তবে সাধারণতঃ মাদ্রাজের লবণ ময়লা এবং লালচে গোছের; এক মাত্র টিউটিকরিণের লবণ পরিষ্কার। মাদ্রাজের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দমননীতি অনুসরণ করে নাই, বরঞ্চ নিজেদের কর্তৃত্বে আমিনা শিল্পটীকে বাঁচাইয়া রাখে—বঙ্গদেশের মত ধ্বংসের পথে চালিত করে নাই। তাহা ছাড়া মাদ্রাজে লবণ ধারে রৌদ্রতাপের উপর এবং বাতাসের উপর করসা করিয়া লবণ প্রস্তুত হইত, কিন্তু তিমলী সুন্দরবন ও চট্টগ্রামে যে জাল দেওয়া নলকী-পদ্ধতি চলিত ছিল, তাহা মোটেই ব্যয়সাপেক্ষ ছিল না বলিয়া বিলাতী লবণ প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইয়া গেল এবং সৌভাগ্যবশতঃ কোম্পানীর সাহায্য পাইল।

মাদ্রাজে ১৮৭৬ সালে মহারাণীর গবর্ণমেণ্ট একচেটে ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে শুল্ক দিয়া লবণ প্রস্তুত করিতে অনুমতি দিল। ফলে মাদ্রাজের লবণ শিল্পের পুনরায় উন্নতি হইতে থাকে। বায়ুও অধিক রহে এবং যে সময়ে ধান হয় না, সে সময়ে চাষীরা মলঙ্গীদের মত লবণ প্রস্তুত করে। তাহাও শুধু রৌদ্রতাপে—ইন্ধনের জন্য ভাবিতে হয় নাই।†

উৎকর্ষতায় এবং পরিমাণে বোম্বাই ও করাচি বাংলার বাজারে মাদ্রাজকে হারাইয়া দিয়াছে। সিন্ধী চতুর ব্যবসায়ীদের বুদ্ধিতে আজ এডেন, বোম্বাই এবং করাচি শুধুমাত্র বম্বে,বিহার ও আসামকে করতলগত করিবার জন্য অধিক পরিমাণ লবণ প্রস্তুত করে। তাহাদের নিজ প্রদেশে ব্যবহারের জন্য খনিজ এবং সমুদ্র-ভূমজাত লবণ যথেষ্ট। সমুদ্রজ লবণ করাচীর মৌরীপুরে, ঘারকায় ওখায়, পোরবন্দরে, নবলক্ষিতে এবং বোম্বাই সহরের আশে পাশে যাহা প্রস্তুত হয় তাহার প্রায় সমস্তই কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরে চালানি হয়।

বোম্বাই সহরের নিকটবর্ত্তী সমুদ্র-কিনারে সুন্দর লবণ প্রস্তুত হয়। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, যে আর্দ্রতা সম্বন্ধে বড় বড় ইংরাজ বা অবাঙ্গালী অনুসন্ধানকারিগণ বঙ্গদেশকে লবণ-প্রস্তুতির উপযুক্ত নহে বলিয়াছিলেন, বঙ্গদেশের সেই আর্দ্রতা বোম্বাই অপেক্ষা কম। সমগ্র বোম্বাই প্রদেশে ১৯২৯-৩০ সালে ১১৫ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হয়। বর্ত্তমানে চারিশত কারখানা কাজ করিয়া গড়ে কোটি মণ শুল্ক উৎপাদন করে। প্রস্তুত করিতে মণ প্রতি ২।৩ আনার বেশী খরচ হয় না। কোনরূপ ইন্ধন প্রয়োজন হয় না—রৌদ্রতাপে মাদ্রাজের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লবণ প্রস্তুত হয়। গড়ে বোম্বাই-এর ৩০।৩২ লক্ষ লবণ প্রতি বৎসর বাংলার বাজারে আসিয়া থাকে।‡

করাচির আবহাওয়া লবণ-প্রস্তুতির পক্ষে এডেনের মতই অতি উপযোগী। এখানে বৃষ্টি হয় অল্প—তাহাও জুলাই আগষ্ট মাসে। বৎসরে তিন শত দিন কারখানা চলে। রৌদ্রতেজও যেমন প্রখর, বাতাসও তেমন শুষ্ক, দ্রুতগতিপূর্ণ সমুদ্রের জলও বেশী লবণাক্ত। দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্র উপকূলে নদ-নদী ও তাহাদের শাখা-নদীর সংখ্যা এত অধিক যে, উপরদিকের সাদা জল ক্রমাগত সাগরে পড়িয়া তীরস্থ সাগর-জলের লবণাংশকে বহু পরিমাণে হ্রাস করিয়াছে। শতকরা ছই কিংবা আড়াই ভাগের অধিক লবণ পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু করাচি, বোম্বাই বা ওখার আরবসাগরকূলস্থ লোনা জলের গাঢ়ত্ব সময় সময় শতকরা ৫।৬ ভাগের বেশীও পাওয়া যায়। সে জন্য ওইদিকে নোনা জলকে শতকরা ২৩ (23° B. saturation point.)-এ আনিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না।

করাচি সহরের বাহিরে মৌরীপুর কারখানাগুলিতে বহু পরিমাণ লবণ প্রস্তুত হয়। ইহার কতকগুলি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের অধীন ছিল, এখন সেগুলি বন্দোবস্ত দেওয়া আছে।

* Ratton's "Common Salt".

† Madras Reports.

‡ Representation of Indian Salt Association, to the Govt. of India, 1933

কোম্পানী মাত্র পাঁচটী, কিন্তু কারখানার সংখ্যা অনেক বলিয়া বৎসরে ৩০ লক্ষ মণ নুন তৈয়ারী হয়, যাহার সর্ব্বাংশই বাংলার বাজারে চালানি আসে। এই চতুর পাঁচটী কোম্পানী এডেনের কলওয়ালাদের সহিত যুক্ত হইয়া বহুদিন ধরিয়া আমাদের দেশের চাহিদার তিন-চতুর্থাংশ অতি কৌশলে মিটাইয়া আসিতেছে এবং যখনই বঙ্গের লোক লবণ-প্রস্তুতির প্রয়াস পাইয়াছে, তাহারা কেবলই বলিয়াছে এদেশে এই শিল্প সফলকাম হইতে পারে না।*

বাংলায় বর্ত্তমানে ১৪ টী কোম্পানী এবং সাত জন উদ্যোগী ব্যক্তি লবণ-প্রস্তুতের জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত অবস্থায় আছেন। গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে দেখা যাইতেছে যে, ইহার মধ্যে মাত্র পাঁচটী প্রতিষ্ঠান পূর্ব্বের মত কারখানা স্থাপনা করিয়া কাজ চালাইতেছে।† কাঁথিতে দুইটি মাত্র কোম্পানী—(প্রিমিয়ার ও বেঙ্গল সল্ট) কাজ করিতেছে, চব্বিশ-পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে দুইটী (লোকমান্য ও ছাপানালা) এবং চট্টগ্রামে একটি (ট্রেডিং ইউনিয়ান) কারখানা আছে। সকলেই অল্পবিস্তর লবণ বাজারে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে।

১৯৩২-৩৩ সালে তিন ব্যক্তিকে লাইসেন্স দেওয়া হয়, তার মধ্যে একজন ব্যক্তি সফলকাম হইতে পারেন নাই। ১৯৩৩-৩৪ সালে তিনটি নূতন কোম্পানী লাইসেন্স গ্রহণ করে—তাহাদের নাম বলিলাম না—তাহারা কেহই বাজারে লবণ ছাড়িতে সক্ষম হয় নাই। ১৯৩৪-৩৫ সালে চট্টগ্রাম ট্রেডিং ইউনিয়ান, পাইওনীয়ার এবং সাতটি প্রাইভেট লিমিটেড্ কোম্পানী লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়; ইহার মধ্যে প্রথম দুইটি মাত্র কাজ করিতেছে। ১৯৩৫-৩৬ সালে ইণ্ডিয়ান সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারার্স এবং লোকমান্য সল্ট কোম্পানী এই দুইটিমাত্র লিমিটেড্ প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স গ্রহণ করিয়া কাজ আরম্ভ করে।

কাজে নামিয়া বাকি পনেরটি লাইসেন্স-গ্রহণকারী পশ্চাৎপদ হইতেছে কেন? ইহার তিনটি মূল কারণ। প্রথমতঃ, সাধারণ বাঙালীর ব্যবসায়ে বুদ্ধি ও ভরসা বড় কম—সুলভ মূল্যের এডেন করাচির লবণের মুখে কেহ ভরসা করিয়া লবণ প্রস্তুত করিতে সাহস করিতেছে না পাছে খরচ বেশী পড়িয়া যায়।

দ্বিতীয় কারণ, যে কয়টি কোম্পানী কারখানা চালাইতেছে তাহারা খুব বেশী পরিমাণ লবণ বাজারে ছাড়িতে পারিতেছে না। তাহারা বিশেষ কিছু লাভ করিতেছে কি না তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

তৃতীয় কারণ, দেশীয় ধনীব্যক্তি ও সরকার পক্ষ ইহাদিগকে বিশেষ সাহায্য করে নাই। তাঁহাদের পক্ষ হইতে অনুকূল মনোভাব না লক্ষিত হইলে বঙ্গবাসীর সাহস আসিবে কোথা হইতে?

আর চতুর্থ কারণ, বর্ত্তমান বৃটিশ-জার্ম্মান যুদ্ধে আমাদের বাজারের দশা। যে সমস্ত কোম্পানী একপ্রকার দাঁড়াইয়া গিয়াছে তাহারা উত্তরোত্তর উন্নতি করিবেই। কিন্তু নূতন কোম্পানীগুলির কি দশা হইবে ভাবিতেছি। দেশের বিক্রয় হওয়া শুদ্ধর অথচ অর্থ না হইলে কার্য্য আরম্ভ করাই মুস্কিল: প্রথমতঃ অন্ততঃ তিন-চার হাজার টাকা প্রয়োজন—শুধু নুন চাষের জমি লইতে। তারপর আছে তাকে চাষের উপযোগী করিবার ব্যয়। আফিস, গুদাম, কন্ডেন্সার, আবাস-গৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে দেখাইতে হইবে যে আমরা সত্যই লবণ প্রস্তুত করিব, আমাদের অনুমতি দাও। সরকার পক্ষ সন্তুষ্ট হইলে ১৬৲ টাকা রসুনগ্রহণে লাইসেন্স দিবে তবে কোম্পানী কার্য্য করিতে পারিবে। আরও গোটা দশেক কোম্পানী ইতিমধ্যে রেজেষ্ট্রী হইয়াছে কিন্তু অর্থাভাবে কিছুই অগ্রসর হইতে পারে নাই।

---

* Protection to Salt Industry—Karachi Salt Association.

† Bengal Government, Report of the Salt Dept. 1937-38.

# হিন্দু-মুসলমান মিলন-সমস্যা

—শ্রীসুশীলকুমার বসু

আমাদের রাজনীতিক অথবা সামাজিক জীবন, যে দিক্ দিয়াই বিচার করা যাক, দেখা যাইবে যে, দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহের মধ্যে গুরুত্বে ও জটিলতায় সাম্প্রদায়িক—বিশেষ করিয়া হিন্দু-মুসলমান সমস্যা শীর্ষস্থানীয়। সামাজ প্রাথোন্নতি হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত আমাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রচেষ্টা সাম্প্রদায়িকতার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিকল হইয়া যাইতেছে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বহুবিধ সমস্যার নিত্য আবির্ভাব ঘটিতেছে। ফলে, এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের যে স্বাভাবিক আগ্রহাতিশয্য আছে তাহা স্থগিত মীমাংসার দিকে আমাদিগকে আকৃষ্ট করিয়া অনেক সময়ই সমস্যাকে জটিলতর করিয়া ফেলিতেছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমস্যাটির ভিত্তি কোথায়—কোথা হইতে ইহার উদ্ভব হইল—কিসের আশ্রয়েই বা ইহা বাঁচিয়া আছে? আমরা যদি জনসাধারণের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, সেখানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে স্বার্থের কোন সংঘাত নাই। একই কারণ হইতে উদ্ভূত দারিদ্র্যে উভয়েই নিষ্পেষিত হইতেছে, একই শোষণ-ব্যবস্থার ফলে উভয়েই নিঃস্ব ও সর্বহারা হইতেছে এবং একই প্রকার পরিবর্তনের দ্বারা উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণ সমভাবে লাভবান হইবে।

আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে কৃষকের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা বেশী। ইহাদের কথা যদি ধরা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকেরই দুঃখদুর্দশা এক প্রকারের এবং ইহাদের স্বার্থের মধ্যেও কোন পার্থক্য নাই। অন্যায় ভূমি-ব্যবস্থার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের কৃষক সমানভাবে নিরন্ন ও ভূমিহীন হইয়া পড়িতেছে—উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই ক্ষেতমজুরের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে। জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকই আংশিকভাবে বেকার হইয়া পড়িয়াছে এবং উভয়ের স্কন্ধেই করভার সমভাবে চাপিয়াছে। দারিদ্র্য-জনিত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অভাব, ভূমির বর্ত্তমান অনুর্ব্বরতা ও জনসংখ্যার চাপ, শোষণের সহস্রবিধ কৌশল, কাঁচামালের মূল্যহ্রাস, শ্রমশিল্পের ধ্বংসের ফলে কৃষকের সংখ্যা-বৃদ্ধি প্রভৃতির কুফল উভয়কেই সমভাবে ভোগ করিতে হইতেছে। অপর দিকে, ভূমি-ব্যবস্থার যদি পরিবর্তন হয়, অন্যায় শোষণ হইতে কৃষককুল মুক্তি পায়, জমিদারী ও মহাজনী প্রথা যদি লুপ্ত হয়, শ্রমশিল্পের প্রসারের জন্য ভূমির উপর চাপ কমিয়া গিয়া কর্ম্মাভাব দূরীভূত হয়, ইহাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা হয় এবং কারখানাজাত পণ্যের মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয় তবে হিন্দু ও মুসলমান কৃষক সমভাবেই লাভবান হইবে। এই ভাবে যেদিক্ দিয়াই বিচার করা যাক, দেখা যাইবে যে, ইহাদের মধ্যে স্বার্থের কোন প্রতিযোগিতা অথবা দ্বন্দ্ব নাই এবং দেশের স্বাধীনতালাভের সহিত ইহাদের অদৃষ্ট পরিবর্ত্তনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে।

শ্রমিকদের সম্পর্কেও এই কথা সম্পূর্ণ সত্য। বৈদেশিক শাসন বিদেশী কারখানার মালিক ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থের ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়। কাজেই এখানে কারখানা-শিল্পের প্রসার নিতান্তই সীমাবদ্ধ। এই কারণে শ্রমিকদের মধ্যে বেকার সমস্যা, কর্ম্মের অনিশ্চয়তা, স্বল্প বেতন, কাজের দীর্ঘতর সময়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অভাব, জীবনযাত্রার অতিশয় নিম্ন মান প্রভৃতি দুর্গতি রহিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শ্রমিকই এই দুর্গতির সমভাগী। যদি ইহাদের কর্ম্মের ক্ষেত্র প্রসারিত হয় ও কর্ম্মের স্থায়িত্ব বর্দ্ধিত হয়, কার্য্যের সময় কমিয়া যায় ও বেতন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা হয় এবং সর্ব্বোপরি শ্রমশিল্পের প্রসার এবং নিয়ন্ত্রণে শ্রমিকদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শ্রমিকেরাই সেই সুবিধার অংশভাগী হইবে।

যাহাদের কৃষিযোগ্য ভূমি নাই, অথচ যাহারা কারখানার শ্রমিক নহে, এমন বহু লোককেও জীবিকার জন্য কায়িক শ্রমের উপর নির্ভর করিতে হয়। যদি শ্রমশিল্পের অধিকতর

প্রসার হয়, ও অকৃষকদের হস্তে কৃষির অতিসঞ্চয় বন্ধ হইয়া কৃষিহীন কৃষকদিগের মধ্যে কৃষির পুনর্বণ্টন হয়—কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর আর্থিক অবস্থার উন্নতির ফলে তাঁহাদের ক্রয়-ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয় এবং জীবনযাত্রার মান উন্নততর হয় এবং তাহার ফলে বর্ত্তমানের কর্ম্মহীনদিগের পক্ষে নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক সমভাবে লাভবান হইবে।

ইহারা সকলে হইতেছে, জনসংখ্যার অধিকাংশ লোক। পূর্ব্বোক্তরূপে ইহাদের মধ্যে স্বার্থের বিরোধ বা প্রতিযোগিতা না থাকে, যদি জাতীয় অথবা অর্থনীতিক শ্রেণীগত স্বার্থে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের লাভই সমান হয়, তবে জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার কি ভাবে হয়—কি ভাবে সমস্ত মঙ্গল প্রচেষ্টা সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা খণ্ডিত হয় তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যার যে অত্যল্প অংশ বৈদেশিক শাসনের অধীনে সুবিধা ভোগ করিতেছে এবং যাহাদের সাহায্যে ও সহযোগিতায় বৈদেশিক শাসন এদেশে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাদের মধ্যেই স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ। আমাদের শাসকবর্গ তাঁহাদের প্রদত্ত সুবিধাকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দান করায় ইহার উদ্ভব হইয়াছে। এই সুবিধাভোগীদের কৌশলেই সাম্প্রদায়িকতা জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

প্রথমেই আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির সৃষ্টির মূল ঐতিহাসিক ও ইহা রক্ষার মূলে আংশিকভাবে আর্থিক কারণ রহিয়াছে। ভারতবর্ষে যখন মুসলমান আক্রমণ হয় তখন আসলে তাহা বৈদেশিক আক্রমণ হইলেও, আক্রমণ-কারীরা ধর্ম্মে মুসলমান ছিলেন এবং এদেশের অধিবাসীরা সকলেই হিন্দু ছিলেন। ফলে ইহা হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানের আক্রমণ বলিয়া লোকে ইহাকে গ্রহণ করিয়াছে। সে সময়ে লোকের মনে সাধারণতঃ ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন দলের স্পষ্ট আদর্শ ছিল না—ধর্ম্মের বিধান অনুযায়ীই লোকের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হইত। এইরূপ অবস্থায় আক্রমণকারীরা ও আক্রান্ত জাতি দুই ভিন্ন ধর্ম্মের লোক হওয়ায় ইহা ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব বলিয়াই লোকের নিকট প্রতীয়মান হইয়াছে। পরে যখন আক্রমণকারীরা এদেশের অধিবাসী হইলেন, তখনও ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াই জনসাধারণের মধ্যে দলগত বিভাগের সীমারেখা চলিতে লাগিল। আমাদের দেশের জনসাধারণ নিজেদের অন্য কোন দলের অন্তর্গত না ভাবিয়া একদল নিজেদের হিন্দু ও অপর দল নিজেদের মুসলমান ভাবিতে লাগিলেন। সাম্প্রদায়িক ভেদের এই আদর্শ বরাবর চলিয়া আসিলেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য বিশেষ কিছু ছিল না। সম্প্রদায়গতভাবে কোন অবিশ্বাসও ছিল না।

কিন্তু, আমাদের নিজেদের এই ঐক্যবোধটা আমাদের শাসকবর্গের দৃষ্টি এড়ায় নাই এবং নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে তাঁহারা ইহাকে ব্যবহার করিবারও সুযোগ পাইয়াছেন। এদেশের শাসনকার্য্য চালাইবার জন্য লোকসংগ্রহের জন্য এখানে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন করিতে হইয়াছিল। এই শিক্ষার সুযোগ প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে শিক্ষা, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতির দিক্ দিয়া সম্প্রদায়গতভাবে ইঁহারাই সুবিধাভোগী শ্রেণী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরিচালনায় ও স্থায়িত্বে সহায়তা করিয়া ইঁহারা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালালের কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ইঁহাদের এই সুবিধা-ভোগকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিয়াছেন এবং ইঁহাদের মধ্যে যতই শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে ততই এই ঈর্ষার ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুবিধাগুলি প্রায় সম্প্রদায়গতভাবে এক শ্রেণীর লোকের হাতে থাকায় স্বভাবতঃই অন্যান্য শ্রেণীর লোকের মনে হইয়াছে, সম্প্রদায়হিসাবে তাঁহারা তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সমস্ত লক্ষ্য এই সকল সুবিধার দিকে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এবং ইহা লাভ করিবার জন্য তাঁহারা ব্যগ্র হইয়াছেন। সুবিধাভোগী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আছে, শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, এবং ফলে তাঁহারাই যে সমাজের অভিজাত শ্রেণী বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, ইহাতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেদের মনে হইতে মনে হইয়াছে যে, তাঁহারা এই সকল সুবিধার ভাগ পাইলে, তাঁহাদের মধ্যেও এই প্রকার উন্নতি দেখা দিবে। এ কথা তাঁহাদের ভাবিবার অবসর হয় নাই যে, সুবিধাগুলির পরিমাণ ও সংখ্যা এত কম যে, একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে যতদিন ইহা সীমাবদ্ধ থাকে, ততদিন সেই সম্প্রদায়ের উন্নতি

বিধানে কোন কোন দিক্ দিয়া ইহা সহায়তা করিতে পারিলেও দেশের সমগ্র অধিবাসীদের উন্নতিসাধনে ইহা সমভাবে সহায়তা করিতে পারিবে না। সর্ব্ব সময়েই এই সকল সুবিধা অল্প কতকগুলি লোকের হস্তে থাকিবে—তাঁহারা এক সম্প্রদায়ের লোকও হইতে পারেন অথবা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেও সংগৃহীত হইতে পারেন; ইহার সহিত বৃহৎ জনসঙ্ঘের স্বার্থের কোন সম্বন্ধ নাই।

সব জিনিসেরই দুইটি বিপরীত দিক আছে। এক দিকে যেমন এই সুবিধাভোগীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমর্থক ও পরিপোষক হইয়াছেন, তেমনই এই সুবিধা-দানের ব্যবস্থাই সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষের বীজ উপ্ত করিয়াছে। এদেশের শাসনকার্য্যের পরিচালনার জন্য ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রচলন হইয়াছিল। কিন্তু শিক্ষা শুধু এই প্রয়োজনের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই। শিক্ষার বিস্তৃতির সঙ্গে যখন বহু লোক শিক্ষা পাইতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের সকলের পক্ষে সরকারি কার্য্য অথবা পদমর্য্যাদা লাভ সম্ভব হইল না। শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ক্রমে ব্যাপক ভাবে বেকার সমস্যার উদ্ভব হইল, এবং ইহা রাজনৈতিক অসন্তোষের আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া জাতীয় জাগরণের প্রেরণা যোগাইয়া দিল। বহু লোক স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং রাজনৈতিক পরাধীনতাই যে ব্যাপক দুঃখ-দারিদ্র্যের কারণ এইরূপ মত পোষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে জন-সাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সকল কারণের সমবায়ে দেশে স্বাধীনতা-আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে এবং বর্ত্তমান পরিস্থিতে তাহা শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে।

ব্রিটিশ কূটনীতিকগণ তাঁহাদের বিপদের কথা বুঝিতে পারিলেন এবং জাগ্রত গণশক্তিকে বিধাবিভক্ত রাখিবার জন্য আমাদের মধ্যে পূর্ব্বেই যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ছিল তাহাকে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করিলেন। একদিকে সুবিধার ভাগ লইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অসন্তোষের ভাব দেখা দিয়াছে এবং সুবিধাভোগীদের প্রতি অন্যেরা যে সাম্প্রদায়িক ভাবে ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন তাহা ইংরেজের দৃষ্টি এড়ায় নাই। ইহাকেই তাঁহারা পুরাপুরি ও কতকটা সাফল্যের সহিত কাজে লাগাইয়াছেন। এই সকল সুবিধা ও পদমর্য্যাদাকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বণ্টনের ফলে সাম্প্রদায়িক সীমারেখাগুলি স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। পূর্ব্বেই আমাদের দেশের লোকেরা নিজেদের বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া মনে করিতেন—এই ভাব এখন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আকার গ্রহণ করিল। প্রত্যেক লোকেই এই কথা মনে করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার নিজের সুবিধা লাভের আশা একমাত্র নির্ভর করিতেছে, তাঁহার নিজ সম্প্রদায় সুবিধার কতটা ভাগ পাইবে তাহার উপর। সকলের একমাত্র চেষ্টা হইল, তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায় যাহাতে অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর সুবিধা পায় তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা। লোকের দৃষ্টি মাত্র সাম্প্রদায়িক সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া গেল এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত হইল। এই কোলাহলে লোকে একথা ভুলিয়া গেল—চাকরি এবং পদমর্য্যাদার পদের সংখ্যা খুবই অল্প এবং সব সম্প্রদায়েরই অত্যল্পসংখ্যক লোকে মাত্র তাহা লাভ করিতে পারিবেন। বেশীর ভাগ লোকেরই ইহাতে দুঃখের কোন অবসান হইবে না বরং যে জাতীয় ও অর্থনীতিক আন্দোলনের দ্বারা সকলের দুঃখ দূর হইতে পারিত সেই সকল আন্দোলনের শক্তি ইহার দ্বারা ব্যাহত হইবে।

ইহাতে আরও একটা অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে সুবিধাগুলি প্রধানতঃ একটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই সুবিধালাভের মূল্যে তাঁহারা আত্মবিক্রয় ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের নিকট জাতীয় স্বার্থ বিকাইয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই সুবিধাভোগীদের দল দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বের লোকেরা জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশের লোককে প্রভাবিত করিতে পারিতেন না। কিন্তু বর্ত্তমানে সকল সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে লোক সংগৃহীত হওয়ায় এই সকল লোকের জাতীয়তা ও প্রগতিবিরোধী প্রভাব সমাজের সর্ব্বস্তরে ব্যাপ্ত হইতেছে। চাকরি অথবা ক্ষমতার যে সকল পদের জন্য লোক সংগৃহীত হয় তাহার জন্য প্রত্যেকেই চেষ্টা করেন। এইরূপ চেষ্টা করিবার প্রথম কারণ হইতেছে, যাহাতে এই আসন বা আসনগুলি, সম্পূর্ণ অথবা ইহার অধিকাংশ, চেষ্টাকারীর নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বণ্টিত হয় এবং অন্য

সম্প্রদায়ের অংশে গিয়া না পড়ে তাহার জন্য সরকারের উপর নিজ সম্প্রদায়ের জনমতের চাপ দেওয়া। জনমতের চাপ কথাটার ব্যবহার হয় তো ঠিক যথাযোগ্য হইবে না। কারণ, চাপের দ্বারা সরকারের অনুগ্রহ লাভ করা যায় না—তাহার জন্য আবেদন-নিবেদন ও প্রার্থনা করিতে হয়। নিজ সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে ইঁহারা তাহাই করিতেছেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা যাহাতে তাঁহাদের কথার প্রতিধ্বনি করেন তাহার জন্য নিরলসভাবে সর্বদা চেষ্টা করিতেছেন। যাহাতে তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা সংঘবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের জন্য এই সকল পদের প্রার্থনা জানান এবং এই সাম্প্রদায়িক সীমারেখা ভাঙিয়া যাইতে পারে, এমন কোন আন্দোলনের মধ্যে যোগদান না করেন তাহার জন্যও তাঁহাদের চেষ্টার বিরাম নাই। তাঁহারা জানেন যে, জনসাধারণ যদি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসাধারণের স্বার্থ এক ও অখণ্ড এবং সে স্বার্থ কয়েক জন লোকে চাকরি বা পদমর্যাদা পাইলেই সিদ্ধ হইবে না। তাহারা তখন এ কথাও বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের স্বার্থ যাহারা অপহরণ করিয়া বসিয়া আছে, তাহাদেরই অনুগ্রহভুক্ত এই সকল সুবিধাসেবী লোকেরা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের নামে চালাইতেছেন এবং সকল সম্প্রদায়েরই জনসাধারণের কল্যাণের পথ রোধ করিয়া বসিয়া আছেন। এই জন্য অনেক সম্প্রদায়ের সুবিধাভোগীরাই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের এই কথা বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে, এত দিন তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা কোন সুযোগ সুবিধা পাইতেন না, বর্তমানে সরকারের অনুগ্রহে তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। সরকার রুষ্ট হইতে পারেন এমন কোন আন্দোলনে তাঁহারা সকলকে জড়িত হইতে নিষেধ করেন। আপাতদৃষ্টিতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরাই মনে করিতেছেন যে, তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে দুই চারিজন লোকের চাকরি বা পদমর্যাদা লাভের দ্বারা তাঁহাদের সমগ্র সম্প্রদায় লাভবান হইতেছেন। কোন সম্প্রদায়েরই সাধারণ লোকেরা যে ইহার দ্বারা লাভবান হইতেছেন না, যে পথে যাত্রা করিলে সকলে লাভবান হইতে পারিতেন, প্রতি সম্প্রদায়ের সুবিধা-ভোগীরা যে জনসাধারণকে সে পথ হইতে নিরস্ত করিতেছেন, সুবিধাভোগীদের স্বার্থ-প্রণোদিত মিথ্যা প্রচারের ফলে সে কথা লোকে বুঝিতে পারিতেছে না এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতায় নিজেদের অবনতির পথ প্রশস্ততর করিতেছে।

বর্তমান রাষ্ট্রতন্ত্রের আওতায় যাঁহাদের উদ্ভব হইয়াছে—বর্তমান রাষ্ট্রতন্ত্রের নিকট হইতে যাঁহারা সুবিধার প্রত্যাশী—জনসাধারণের সহিত তাঁহাদের স্বার্থের বিরোধ অপরিহার্য। কারণ, বর্তমান রাষ্ট্রতন্ত্রের অনুকূল পরিবর্তনেই জনসাধারণের স্বার্থ এবং সেই প্রচেষ্টা হইতে তাঁহাদিগকে বিরত রাখাতেই সুবিধাভোগীদের স্বার্থ। এই স্বার্থের সংঘাতই সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতার আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং সুবিধাভোগীরাই তাহা বাঁচাইয়া রাখিতেছে।

জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যাও নাই, তাহা সমাধানের প্রশ্নও নাই। সমস্যাটির কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি হইয়াছে এবং ভুল পথে তাহার সমাধানের চেষ্টা করিয়াই তাহাকে আমরা অনর্থক জটিল করিয়া তুলিয়াছি। যেমন কৃত্রিম উপায়ে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে তেমনই ভুল পথে আমরা ইহার সমাধানের চেষ্টা করিতেছি এবং ভুলিয়া যাইতেছি যে, সমগ্র হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠা অসম্ভব বলিয়াই আমাদের প্রতিপক্ষ আমাদের উপর এই সর্ত চাপাইতেছেন। হিন্দু সুবিধাভোগীদের সহিত হিন্দু জনসাধারণের সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে মিলন সম্ভব নহে এবং মুসলমান সুবিধাভোগীদের সহিত মুসলমান জনসাধারণের মিলন সম্ভব নহে—আবার উভয় সম্প্রদায়ের সুবিধাভোগীদের মধ্যেও মিলন প্রায় অসম্ভব। কাজেই, হিন্দু মুসলমানের মিলন সাধারণতঃ যে অর্থে আমরা বুঝিয়া থাকি, সে অর্থে সম্ভব নহে। তবুও সমাধানের প্রশ্নটাও আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

# বিজ্ঞান জগৎ

## দুইজন বৃটিশ বৈজ্ঞানিক

—শ্রীনীলরতন কর

এ বৎসর দুইজন খ্যাতনামা বৃটিশ পদার্থবিদ লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁদের একজন সার জোসেফ্ জন্ টমসন্, অপর জন সার অলিভার জোসেফ লজ। জে. জে. টমসন ১৮৫৬ অব্দের ১৮ই ডিসেম্বর ম্যাঞ্চেষ্টারের নিকটবর্ত্তী চিথাম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ষোল বৎসর বয়সে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাশিক্ষার্থে ম্যাঞ্চেষ্টারের ওয়েবস্ কলেজে ভর্ত্তি হন। তাঁর অসামান্য বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পেয়ে সেখানকার গণিতের অধ্যাপক তাঁকে গণিতশাস্ত্রে অধিকতর বুৎপত্তি লাভের নিমিত্ত কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে অধ্যয়নের পরামর্শ দেন। ১৮৮০ অব্দে জে. জে. টমসন, ম্যাথমেটিক্যাল ট্রাইপস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দ্বিতীয় র‍্যাঙ্গলারের স্থান অধিকার করেন ও বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ২৭ বৎসর বয়সে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের লেক্চারার নিযুক্ত হন ও পর বৎসর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেণ্ডিশ প্রফেসরের পদ গ্রহণ করেন। ১৯০৫ হতে ১৯১৮ সন অবধি তিনি লণ্ডনের রয়াল ইন্‌স্টিটিউশনে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনা করেন এবং ১৯১৮ অব্দে ট্রিনিটি কলেজের অধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হন। তাঁর প্রচেষ্টায় কেম্ব্রিজে যে প্রভূত গবেষণার কেন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে ইয়োরোপ, আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় হতে মেধাবী বৈজ্ঞানিক ছাত্রগণ যোগদান করেন। তার মধ্যে লর্ড র‍্যালে, এফ্. এ. উইল্‌সন্, বার্কলা, ডব্লু. ডব্লু. রিচার্ডসন্, জে. সি. ম্যাকলিনান, এফ্. ডব্লু. অ্যাষ্টন্, ই. ভি. অ্যাপলটন্, জি. পি. টমসন্, পি. লাড্‌গেক্কিন্, মাক্স্ বর্ণ, ফ্রিংস্‌হাইম, বাদ্‌ফ্রেড, কে. প্রেজিব্রাম্, মোলুচৌব্বি ও ডেগার্ডের নাম উল্লেখযোগ্য।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিক থেকে জে. জে. টমসনের তিনটি কার্য্য প্রধান :

(১) গ্যাসের ভিতর দিয়ে বিদ্যুতের পরিবহন ( conduction ) ;

(২) ইলেক্ট্রনের ভরত্ব ( mass ) ও বৈদ্যুতিক সঞ্চার ( charge ) নির্ণয় ;

(৩) পজিটিভ্ রশ্মি সাহায্যে বিশ্লেষণ।

১৮৮৪ অব্দে তিনি রয়াল সোসাইটীর সদস্য (F. R. S.) হন এবং ১৯১৫ অব্দে সেখানকার প্রেসিডেন্টের পদ প্রাপ্ত হন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগে পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেন।

কোনও একটি মাত্র গবেষণার প্রসঙ্গের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ থেকে তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যালোচনায় নিময় থাকার পরিবর্ত্তে নূতন নূতন প্রাকৃতিক ঘটনার আবিষ্কারে তাঁর অধিকতর আগ্রহ ছিল। কর্ম্মজীবন হতে অবসর-গ্রহণের পর ১৯২০ অব্দে তিনি আমেরিকায় যান ও সেখানে রসায়নশাস্ত্রে ইলেকট্রনের সম্পর্ক বিষয়ে ধারাবাহিক কয়েকটি বক্তৃতা দেন। ১৯২৬ অব্দে তিনি তাঁর জীবনস্মৃতি ( Recollection and Reflections ) প্রকাশিত করেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড র‍্যাদারফোর্ড, জে. জে. টমসনের ছাত্র ছিলেন। জে. জে. টমসনের সুযোগ্য পুত্র জি. পি. টমসন্-ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন।

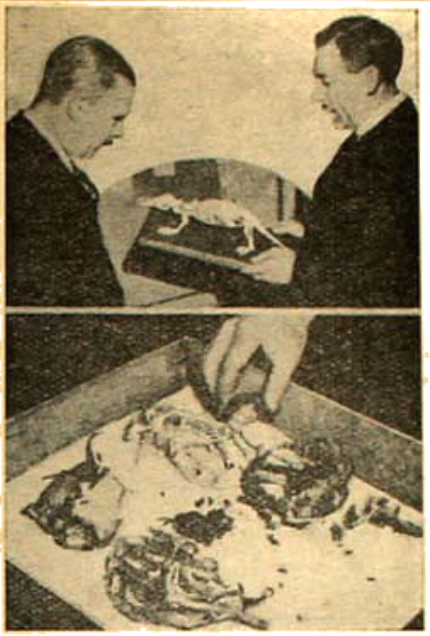

উপরে : পাঁচজন খুন হওয়ার ; নীচে : কাটা দাগগুলো কখন পরিষ্কার করা হয়েছে

গুলি করলেও গুঁড়ো এই নিরাপদ মুখোস ভেদ করতে পারে না

আলোকিত পুলিস-প্রহরী

কোন সমস্যা সম্বন্ধে একাগ্রভাবে চিন্তা করিলে মস্তিষ্ক-স্পন্দনের গতি পরিবর্তিত হয়

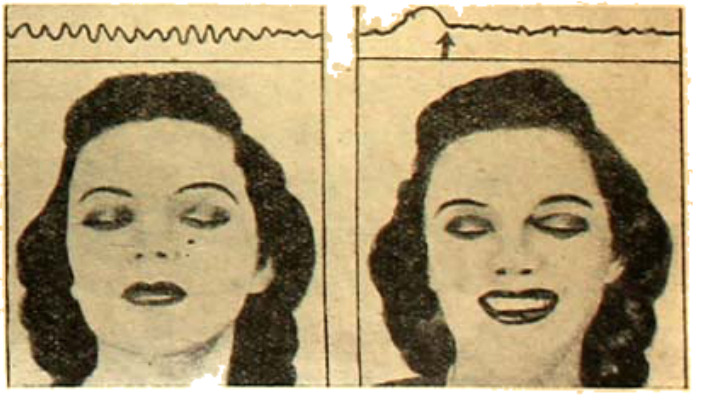

বামে : মস্তিষ্ক যখন নিষ্ক্রিয় থাকে তখনকার সময়ে স্পন্দন

দক্ষিণে : চিন্তা বন্ধ করিলে স্পন্দন পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা গ্রহণ করে

ষ্টাফোর্ডশায়ারের পেঙ্কহাল্ নামক স্থানে সার অলিভার লজের জন্ম হয় খৃঃ ১৮৫১-র ১২ই জুন। বিদ্যালয়ের পঠদ্দশা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পিতার ব্যবসায়-সংক্রান্ত কাজে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু বৈদ্যুতিকত্ব সম্পর্কে কয়েকটি পুস্তক পাঠের পর বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি তাঁর এতদূর আগ্রহ হয় যে, ব্যবসায় কর্ম পরিত্যাগ করে একুশ বৎসর বয়সে তিনি লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে প্রবেশ করেন ও ১৮৮১ অব্দে সেখানকার ডি. এস-সি. উপাধি লাভ করেন। ইতিমধ্যে তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিতের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এর দুই বৎসর পরে তিনি লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন। খৃঃ ১৯০০ অব্দ অবধি তিনি সেখানে অধ্যাপনা করেছিলেন। অতঃপর তিনি বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মনোনীত হন। ১৯০২ অব্দে তাঁকে নাইট উপাধি দেওয়া হয়।

সার অলিভার লজ প্রধানতঃ বিদ্যুৎ বিষয়েই গবেষণা করেছিলেন; পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলস্থ মেঘাবৃগর্ত বিদ্যুৎচালক-বলের ( electromotive force ) অবস্থান-ক্ষেত্র, বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ ( electrolysis ) ও আয়নদিগের বেগ, বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ, বেতার টেলিগ্রাফ-তত্ত্ব, পৃথিবীর নিকট ইথরের গতি, কুয়াশা ও ঘূর্ণ-বিতাড়নে বিদ্যুতের প্রয়োগ প্রভৃতি তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণাপূর্ণ মৌলিক নিবন্ধ ব্যতীত তিনি বিদ্যুতের চালন ও অবরোধ, বেতার-বার্তা প্রেরণ, বিদ্যুতের আধুনিক সিদ্ধান্ত, ইলেকট্রন ও আকাশীয় ইথর সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করেন।

১৯১০ অব্দ হতে সার অলিভার লজ পরলোকতাত্ত্বিক গবেষণার অগ্রনায়ক হিসাবে সুপরিচিত হন; পরলোকগত আত্মার সহিত সংবাদ আদান-প্রদান সম্ভব বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। বিজ্ঞানের সহিত ধর্মের সমন্বয়-সাধনের জন্য তিনি গভীর ভাবে সচেষ্ট ছিলেন। ধর্ম ও পরলোকতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলির নাম যথাক্রমে:

(১) মানবের অমরত্ব ( The Survival of Man ) ( ১৯০৯ )।

( ২ ) যুক্তি ও বিশ্বাস ( Reason and Belief ) ( ১৯১১ )।

(৩) মহাযুদ্ধের পরে (The war and After) (১৯১৫)।

( ৪ ) আমার পুত্র রেমণ্ড্—জীবন ও মৃত্যু ( My Son Raymond : Life and Death ) ( ১৯১৬ )। এই পুস্তকটি মহাযুদ্ধে নিহত তাঁর পরলোকগত পুত্রের সহিত সংবাদ আদান-প্রদানের বিবরণী।

(৫) ক্রিস্টোফার—মানবের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা ( Christopher—A Study in Human Personality) ( ১৯১৮ )।

বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ব্যতীত লেখক হিসাবেও সার অলিভার লজ যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৯০২ অব্দে বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে অবসর গ্রহণের পর তিনি ইউনাইটেড ষ্টেটস-এ নানা স্থানে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি সাধারণ পাঠকের সুবোধ্য অনেকগুলি বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনা করেন; তার মধ্যে The Making of Man ( ১৯২৯ ); ইথর ও আপেক্ষিকবাদ ( Ether and Relativity ) ( ১৯১৫ ); আপেক্ষিকবাদ ( Relativity ) ( ১৯২৫ ) ও বেতারের কথা ( Talks about Wireless) (১৯২৫) সুপরিচিত। বেতার টেলিগ্রাফ বিষয়ে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গবেষণার জন্য রয়াল সোসাইটি অব আর্টস তাঁকে ১৯১৯ অব্দে আলবার্ট মেডাল দ্বারা সম্মানিত করেন। ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন, ফিজিক্যাল সোসাইটী, সোসাইটি ফর্ সাইকিক্যাল রিসার্চ, রেডিও সোসাইটি ও রাষ্ট্রগেন্ সোসাইটি তাঁকে সভাপতির আসনে বরণ করে-ছিল। ১৯০২ অব্দে তিনি রয়াল সোসাইটির ফেলো ( F. R. S ) পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

## মস্তিষ্কস্থিত বিদ্যুতের স্পন্দন

অল্পকাল হতে মৃত্যু অবধি মানুষের মস্তিষ্ক অবিরাম ক্রিয়াশীল। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নবিহীন গভীর সুষুপ্তিতেও মস্তিষ্ক সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম করে না। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর যখন পেশীসমূহ অবসন্ন হয়ে পড়ে, মন পরিশ্রান্ত হয়, তখন মানুষ শয্যাশ্রয় গ্রহণের অল্পকাল পরেই নিদ্রাভিভূত হয়। কিন্তু তার মস্তিষ্ক-যন্ত্র তখনও স্থিরতা লাভ করে না। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের মতো মস্তিষ্কের প্রত্যেকটি কোষ ক্রমাগত স্পন্দিত হয়। মানুষের মস্তিষ্ক কি ভাবে অবিরাম ক্রিয়াশীল থাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ তা আবিষ্কার করেছেন। পরীক্ষা দ্বারা তাঁরা দেখিয়েছেন যে নিদ্রায়, জাগরণে

জীবনের সর্ব্বাবস্থায় মস্তিষ্ক হতে সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক স্পন্দন উৎসারিত হচ্ছে। মস্তিষ্কের একটা অংশকে সারাজীবন প্রতি মুহূর্ত্তে কাজ করে যেতে হয়—অল্পকালের জন্যও তার সক্রিয়তা বন্ধ হলে জীবনান্ত হয়। মস্তিষ্কের এই অংশটির নাম medulla oblongata বা সুষুম্না শীর্ষক। সমগ্র মস্তিষ্কের তুলনায় এই অংশটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র কিন্তু এরই উপর প্রাণীর জীবন-মরণ নির্ভর করছে। মাথার পিছন দিকে মেরুদণ্ড যেখানে মস্তিষ্কে গিয়ে মিলিত হয়েছে সেখানে জীবনের এই ক্ষুদ্র ডায়নামো-যন্ত্রটি স্থাপিত রয়েছে এবং আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করছে। এর কার্য্য বন্ধ হলে শরীরে অক্সিজেন্-সরবরাহ বন্ধ হয়, মৃত্যু অনিবার্য্য হয়। কেবল সুষুম্নাশীর্ষক নয়, মস্তিষ্কের চিন্তাশীল অংশ cerebral cortex-ও জীবিত অবস্থায় কখনও সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয় না। অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক স্পন্দন পরীক্ষার জন্য মাথার সঙ্গে দুইটি ধাতুপাত সংলগ্ন করে সেখান হতে তার লাগিয়ে বৈদ্যুতিক উত্তেজনা পরিবর্দ্ধাত্মক যন্ত্রে (electric amplifier) যুক্ত করে দেখেছেন, সেই বিদ্যুৎ দ্বারা পরিচালিত লেখনী চলমান কাগজের উপর মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ স্পন্দনের বিশেষত্ব-জ্ঞাপক তরঙ্গায়িত রেখা লিপিবদ্ধ করে।

এই যন্ত্রের নাম electro-encephalograph; মানুষ যখন অলস ভাবে বসে থাকে, নির্দ্দিষ্ট কিছু চিন্তা করে না, অথবা সামনে বিশেষ কোনও লক্ষ্য বস্তু থাকে না, তখন তার মস্তিষ্কের স্পন্দন এই যন্ত্রে নিয়মিত ছন্দোবদ্ধ রেখা অঙ্কিত করে। অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে এই স্পন্দনের সংখ্যা সেকেণ্ডে দশ। মস্তিষ্কের স্পন্দন হৃদ্‌পিণ্ডের মতো শব্দকারী নয়—বৈদ্যুতিক প্রবাহের বিশেষ স্পন্দন মাত্র।

সাধারণ মানুষের মস্তিষ্ক-স্পন্দনের বৈদ্যুতিক চাপ এক ভোল্টের প্রায় পাঁচ কোটী ভাগের এক ভাগ। গণিতের হিসাবে বলতে গেলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ-প্রবাহের সমষ্টি একটি বল্ব ওয়াট বিজলীবাতি জ্বালাতে পারে।

অলস অবস্থায় স্থির মন যদি অকস্মাৎ কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে অথবা সমস্যা সমাধান করতে নিয়োজিত হয় তাহ মস্তিষ্ক স্পন্দন তখন বিভিন্ন আকার গ্রহণ করে। সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক স্পন্দনের ছন্দ দ্রুত হয়। কিন্তু মন যেই নির্দ্দিষ্ট চিন্তা হতে বিরত হয় তার স্বাভাবিক ছন্দ, সেকেণ্ডে দশমাত্রার স্পন্দন ফিরে আসে। সেকেণ্ডে এই দশ বার স্পন্দনকে বলা হয়েছে আলফা স্পন্দন (alpha rhythm)। কোন কোন ব্যক্তির অলস মস্তিষ্কের স্পন্দন সংখ্যা ২৫ হতে ৩৫ এর মধ্যে। মানসিক উত্তেজনাপ্রবণ অথবা মানসিক উদ্বেগপূর্ণ ব্যক্তির মস্তিষ্কে এইরূপ স্পন্দন বিদ্যমান থাকে; এর নাম বিটা স্পন্দন।

নিদ্রিত অবস্থায় মানুষের মস্তিষ্ক-স্পন্দন পরিবর্ত্তিত হয়; কোনও সমস্যা নিয়ে চিন্তামগ্ন অবস্থায় মস্তিষ্কে যে স্পন্দন ওঠে তা হতে এ ভিন্নরূপ। বিশ্রামকালে মস্তিষ্কে যে আলফা-স্পন্দন তরঙ্গায়িত হয়, তন্দ্রাবস্থায় সেটি ক্রমশঃ মন্থরতর তরঙ্গের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায়। প্রায় আধ ঘণ্টা কাল এই ভাবে চলার পর যখন ঘুম কতকটা গাঢ় হয়ে আসে, তরঙ্গ তখন এলোমেলো ভাবে চলে—সেকেণ্ডে দুই একটি মাত্র স্পন্দন হয়। কিন্তু তার সঙ্গে একটা নির্দ্দিষ্ট কাল ব্যবধানে দুই এক সেকেণ্ডের জন্য সেকেণ্ডে ১৩-১৪ বার কম্পমান বিদ্যুৎ স্পন্দন প্রকাশিত হতে থাকে—এর নাম ঘূর্ণি বা spindle। দুই হতে চার ঘণ্টা কাল এইরূপ অবস্থা স্থায়ী হয়। গভীর সুষুপ্তিকালে এই অবস্থা বিরাজ করে। রাত্রির অবশিষ্ট কালে অনিয়মিত দুর্ব্বল স্পন্দনের সঙ্গে সাময়িক ঘূর্ণি প্রকাশ পায়। জাগ্রত হলে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক স্পন্দন পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হয়।

মস্তিষ্ক-মধ্যে সর্ব্বদা তরঙ্গায়িত এই সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক স্পন্দনের প্রকৃত কারণ বৈজ্ঞানিকগণ এখনও নির্ণয় করতে পারেন নি। বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ-সমূহের প্রত্যেকটির বৈদ্যুতিক স্পন্দন পরস্পর মিলিত হয়ে কোথাও দ্রুত হয় কোথাও তীব্র হয়, সেই সম্মিলিত বৈদ্যুতিক স্পন্দন মস্তিষ্কের তরঙ্গরূপে যন্ত্রের লেখনীমুখে ধরা পড়ে। মস্তিষ্কের যে অংশ স্মরণ করে, কল্পনা করে, সেইটিই নিদ্রিতাবস্থায় মস্তিষ্কতরঙ্গের পরিবর্ত্তন ঘটায়।

### জনসমষ্টির বয়স

বয়স অনুযায়ী মানুষের জীবনকালকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। জন্মকাল হতে চৌদ্দ বৎসর অবধি

বালা, পনেরো হতে উনপঞ্চাশ পর্য্যন্ত যৌবন এবং পঞ্চাশ ও তদূর্দ্ধ বয়সকাল প্রৌঢ় অবস্থা। সমগ্র জনসষ্টির অর্দ্ধেক লোক পনেরো হতে উনপঞ্চাশ বয়সের মধ্যবর্ত্তী; কিন্তু বালক ও প্রৌঢ়ের অনুপাত বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপ। ১৯০১ অব্দে ভারতবর্ষে শতকরা ৩৯·৯ জন বালক, ৫০·৪ জন যুবক ও ৯·৭ জন প্রৌঢ় ছিল কিন্তু সেই বৎসর ফ্রান্সে শতকরা ২২·১ জন বালক, ৫১·৪ জন যুবক, ও ২৫·৭ জন প্রৌঢ়ের অস্তিত্ব ছিল।

পনেরো হতে উনপঞ্চাশ বয়সের অন্তর্গত ব্যক্তিদের অধিকাংশে উপার্জ্জনক্ষম এবং অবশিষ্ট জনসমষ্টি তাদের উপর নির্ভরশীল। যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে এদেরই উপর জাতির খাদ্য ও রসদ সরবরাহ এবং সৈন্যদল-পুষ্টির ক্ষমতা নির্ভর করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯১০-১১ অব্দে জার্ম্মানী ও অষ্ট্রীয়ার ছয় কোটী চল্লিশ লক্ষ ব্যক্তির মধ্যে শতকরা ৩৩·৪ জন বালক, ৪০·৮ জন যুবক এবং ১৫·৭ জন প্রৌঢ় ছিল। মিত্রপক্ষীয়গণের অর্থাৎ ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের মোট আট কোটী পঁয়ত্রিশ লক্ষ জনের শতকরা ৫২·২ জন ছিল কর্ম্মী ও যোদ্ধা, শতকরা ২৮·৪ জন পনেরোর নীচে, ও শতকরা ১৯·৩ জন পঞ্চাশোর্দ্ধ-বয়স্ক। বর্ত্তমানের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ১৯৩৯ অব্দে মিত্রশক্তির আট কোটী সত্তর লক্ষ লোকের শতকরা ২৫ এর অধিকসংখ্যক ব্যক্তি প্রৌঢ় কিন্তু ১৯১৪ অব্দে তাদের মধ্যে শতকরা ১৯ জন প্রৌঢ় ছিল। এখন তাঁদের যোদ্ধা ও কর্ম্মীর সংখ্যা শতকরা ৫২·২ হতে ৫১·৩-এ দাঁড়িয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে মিত্রপক্ষের ২৮·৫ জন পনেরোর নিম্নবয়স্ক ছিল। বর্ত্তমানে তারাই যুবক কিন্তু শতকরা হিসাবে এখন তারা ২৫·৬ জন। জার্ম্মানীর নয় কোটী লোকের মধ্যে এখনে শতকরা ৫৩·৭ জন যোদ্ধা ও কর্ম্মীর পর্য্যায়ে পড়ে; ১৯১৪ অব্দে এদের সংখ্যা বর্ত্তমানের চেয়ে কম ছিল। সাম্প্রতিক জার্ম্মানীতে শতকরা ২০·৮ জন বালক ও শতকরা ২২·৪ জন প্রৌঢ়। আমেরিকান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের শত-বার্ষিকী অনুষ্ঠানে অধ্যাপক রেমণ্ড পার্ল দেখিয়েছেন যে, ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্-এ ১৮৪০ অব্দে প্রতি হাজার জন উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির অনুপাতে ১,১৮৪ জন বালক ও প্রৌঢ় ছিল, কিন্তু ১৯৩০ অব্দে তাদের প্রতি হাজার জন ব্যক্তির উপর মাত্র ৮৮০ জন বালক ও প্রৌঢ় নির্ভরশীল। কৃত্রিম উপায়ে জন্মহার নিয়ন্ত্রণের ফলে অধিকাংশে খেতকায় জাতির মধ্যে নির্ভরশীল ব্যক্তির সংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং অধিকবয়স্কদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে জীবনের বোঝা বর্ত্তমানে হাল্কা হয়ে আসছে; কিন্তু এই ভাবে চললে ভবিষ্যতে তাদের কেউ বেঁচে থাকবে না অধ্যাপক পার্ল এইরূপ আশঙ্কা করছেন।

## ভারতীয় খাদ্য জরীপ

ভারতবর্ষের পঞ্চাশটী বিভিন্ন স্থানের ব্যক্তিদের খাদ্য জরীপ ক'রে দাক্ষিণাত্যের তোলুবের নিউট্রিশন রিসার্চ্চ ল্যাবরেটরীর ডিরেক্টর এক বিবরণী প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন প্রদেশের পঞ্চাশটী স্থানের অধিবাসীদের ঘুড়িটী পরিবারের দৈনন্দিন খাদ্যসম্ভার দশ হতে বিশ দিন যাবৎ ওজন ক'রে দেখা হয়েছে প্রত্যেক প্রমাণ মানুষ গড়ে কি পরিমাণ কিটোদিন, প্রোটীন, স্নেহজ দ্রব্য ও তাপ-উৎপাদক খাদ্য গ্রহণ করে। অধিকাংশ স্থানে দরিদ্রতর শ্রেণীদের খাদ্যই জরীপ করা হয়েছে। নিম্নের তালিকায় সেই পরিমাণের ফল এবং সেই সঙ্গে কিরূপ খাদ্য কি পরিমাণে তাদের প্রত্যেকের খাওয়া উচিত উল্লেখ করা গেল। তালিকার সংখ্যাগুলি একজন ব্যক্তির দৈনিক খাদ্যের হিসাবে আউন্স্ হিসাবে লেখা হয়েছে:

| খাদ্য | যা গ্রহণ করা হয় (আউন্স্) | যা গ্রহণ করা উচিত (আউন্স্) |
|---|---|---|
| চাউল | ১৫·২৫ | ১৫ |
| ডাল | ০·৫—১·৫ | ৩ |
| দুধ | কিছুমাত্র নয় অথবা অতি সামান্য | ৮ |
| পাতাযুক্ত শবজী | ০·৫—১·০ | ৩·৫ |
| পাতাবিহীন শবজী | ২·০—৪·০ | ৬ |
| ফল | নগণ্য | ২ |
| তৈল ঘৃতাদি | ১·০-এর কম | ২ |
| মাছ, মাংস, ডিম | ০·৫—১·০ | ৩ |

## বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইঁদুর

ইঁদুর মনুষ্যত্বের অনিমন্ত্রিত অতিথি। আহার-রুচির দিক্ থেকে সে প্রায় মানুষের সমতুল্য। এ জন্য মানুষের খাদ্য ও ঔষধ পরীক্ষায় জীবন্ত 'টেস্ট্ টিউব' হিসাবে বৈজ্ঞানিকগণ তাদের কাজে লাগান। বিষ পরীক্ষায়, এবং

জীববিদ্যা-বিষয়ক ও চিকিৎসা-বিষয়ক পরীক্ষাতে ইঁদুর বৈজ্ঞানিকদের বন্ধু। ইঁদুর ব্যতীত গিনিপিগ, খরগোস ও কুকুরকেও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ব্যবহার করা হয়। কিন্তু অপরাপর প্রাণীদের তুলনায় ইঁদুরের সাহায্য গ্রহণ বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে সুবিধাজনক। কারণ ইঁদুরে খায় কম, অল্প স্থানের মধ্যে থাকে এবং তাদের আয়ুষ্কাল অল্প হওয়ায় তাদের জীবনের বংশানুক্রমিক ধারা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করার সুবিধা পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রাণীর পোষণে বাৎসরিক কিরূপ ব্যয় হয় ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্-এর কৃষি-বিভাগ হতে তার একটি তুলনামূলক বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে। সেই হিসাব অনুসারে বৎসরে প্রতি ইঁদুরের জন্য দেড় টাকা, খরগোসের জন্য ১৩৲, কুকুরের জন্য ৪৫৲, দুগ্ধদানকারী গাভীর জন্য ২২৫৲ এবং ঘোড়ার জন্য ১২০০৲ টাকা পাওয়া খরচ লাগে।

## মানুষের শত্রু কীট

উত্তর আমেরিকায় ৮০,০০০ প্রকারের কীট পতঙ্গ আছে, তার মধ্যে দশ হাজার রকমের কীট মানুষের শত্রু। এরা প্রতি বৎসর আমেরিকার একশত, দেড় শত কোটী ডলার মূল্যের শস্যসম্পদ নষ্ট করে। এ ছাড়া ইঁদুর ও মূষিকবর্গও কম ক্ষতি করে না। উত্তর আমেরিকায় ইঁদুরের সংখ্যা সেখানকার জনসমষ্টির প্রায় দ্বিগুণ; তারা প্রত্যেকে বৎসরে অন্ততঃ দুই ডলার মূল্যের জিনিষ নষ্ট করে। কীট ও ইঁদুরের জন্য আমেরিকার বৎসরে প্রায় দুইশত কোটি ডলার মূল্যের শস্যাদি নষ্ট হয়। এর প্রতিবিধানের জন্য সেখানকার গবর্ণমেণ্ট বৎসরে বিশ লক্ষ ডলার বরাদ্দ করেছেন; তা ছাড়া সে দেশের কৃষকেরা কীট-নাশক ঔষধাদির জন্য বৎসরে বিশ কোটী ডলার ব্যয় করে।

## অস্থি-পরিষ্কারক কীট

মিউজিয়মে প্রদর্শনীর জন্য যে সকল ক্ষুদ্র প্রাণীর কঙ্কাল রাখা হয়, তাদের অস্থিসমূহ প্রথমে মাংসাদি পচনশীল দ্রব্য হতে পরিষ্কার করে নিতে হয়। আমেরিকান মিউজিয়মের প্রাণী-বিভাগে যে সকল কঙ্কাল চালান যায়, তার শুষ্ক মাংসের টুকরা পরিষ্কারের জন্য সম্প্রতি আফ্রিকা ও এশিয়া হতে এক প্রকার কীট ব্যবহার করা হচ্ছে। দেখা গিয়েছে যে, অস্থি-পরিষ্কারের কাজে কীটেরা মানুষের চেয়ে অধিক দক্ষ। মানুষ যে অস্থি পরিষ্কার করতে অনেক দিন ধাবৎ পরিশ্রম করেও কৃতকার্য্য হত না, কীট অল্পকালের মধ্যেই তা সুচারু রূপে সম্পন্ন করে। চিত্রে একটি পাত্রে অবস্থিত কঙ্কালের উপর কীট কি ভাবে কাজ করছে দেখানো হয়েছে।

## ধূলি-নিবারক মুখোস

ধূলি, পরাগ ও জীবাণু-মিশ্রিত বায়ু শ্বাসযন্ত্রের পক্ষে অপকারী। ধূলিকণাসমূহ ক্ষুদ্র টর্পেডোর মতো প্রতিনিয়ত শ্বাসযন্ত্রকে আক্রমণ করে নানারূপ ব্যাধি উৎপাদনের চেষ্টা করছে। বৈজ্ঞানিক পরিমাপকার্য্য দ্বারা দেখা গিয়েছে যে, এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের একভাগ আয়তনের ক্ষুদ্র বালুকণাসমূহ শ্বাসযন্ত্রের অপকার করে; যে সকল উদ্ভিদের পরাগ সর্দ্দিজ্বর ও হাঁপানি রোগ উৎপাদন করে তাদের আকার এই এক ইঞ্চির দশ লক্ষ ভাগের একাংশ এবং সাধারণ জীবাণুর আকার এক ইঞ্চির প্রায় পঁচিশ হাজার ভাগের একভাগ। এই সকল ক্ষুদ্র কণিকাদের পক্ষে দুর্ভেদ্য একরূপ মুখোস তৈরী করা হয়েছে; সেটি নাসিকা ও মুখবিবরকে আবৃত রাখবে। মুখোসটির ওজন মাত্র দেড় আউন্স্। এই মুখোস ধারণে কোনও অসুবিধা বোধ হয় না। চিত্রে যে মুখোসধারীর প্রতিকৃতি দেখা যাচ্ছে তিনি কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন করবার শুঁড়োর ঝড়ের ভিতর দিয়ে চলে আসবার পর এই ছবিটি তুলিয়েছেন। চিকিৎসক, শুশ্রূষাকারী, রোগী, সর্দ্দিজ্বর ও হাঁপানিগ্রস্তদের পক্ষে এই মুখোস উপকারে লাগবে।

## আলোকিত পুলিস

ইংলণ্ডের কোন কোন শহরে অগ্রগীপের সময় যানবাহন নিয়ন্ত্রণের এক অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। ক্ষুদ্র ব্যাটারীর সাহায্যে পুলিশের টুপীর উপর Police লেখাটি আলোকিত হয়ে উঠে এবং তার দুই হাতে লাল ও সবুজ আলোর নিশানা পথচারীদের যাতায়াতের ইঙ্গিত জানায়।

# কোলাকুলি

—শ্রীসুধীরচন্দ্র ধর

বীণার বিয়ের সম্বন্ধ আসছে অনেক দিন থেকে, কিন্তু আজও তার বিয়ের ফুল ফুটল না। বর মেলে তো বর মেলে না, আবার বর মেলে তো কোষ্ঠী মেলে না, সব মেলে তো দেনা-পাওনা মেটে না। এদিকে বয়স বিশের কোঠায় এসে পা দিল, কিন্তু আপদের আর অন্ত নাই। ঘটক হরিধন ভট্টাচার্য্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাজেহাল হইয়াছে কিন্তু আজও হাল ছাড়ে নাই, কেন না এই ব্যাপারে বোস মহাশয়ের দেনা-পাওনা জাল—আজ বাস-ভাড়াটা, কাল ধারে আংটিটা, সিকিটা,—অবশ্য ধার মানে আজও ধার, কালও ধার। তার পর মেয়ে দেখানর সময় সন্দেশটা, রসগোল্লাটা, চায়ের কাপ ইত্যাদি এ সবও তো আর গরীব ব্রাহ্মণের পক্ষে নেহাৎ কম পাওনা নয়! কাজেই হরিধন ভট্টাচার্য্য কখনই বোস মহাশয়কে নিরাশ করে না। "মিলবে বৈ কি বোস মশায়, এমন লক্ষ্মী প্রতিমা, ওর বর মিলবে না তো বর মিলবে কি আমার মেয়ে পেঁচীর? তবে কি না ফুল কোটা চাই।"

"জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে—এ তিন ভগবান নিয়ে"—কবিতের টুকরা-টুকুর আবৃত্তি শেষ করিয়াই হরিধন নিজে নিজেই দু'এক ফোঁটা খুব হাসিলেন। নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে সেই হাসি চারি দেওয়ালে ধাক্কা খাইয়া প্রেতের অট্টহাসির মত শুনাইল। বোস মহাশয় থামিয়া থামিয়া গম্ভীর মুখে তামাক টানিতে লাগিলেন, কোনই উত্তর দিলেন না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটুখানি ব্যবসাদারি কাশি কাশিয়া আবার শুরু করিলেন, —"কিন্তু টাকার অঙ্কটা আর একটু বাড়ানো চাই বোস মশাই। একটি তো মেয়ে, আর ভগবানের দয়ায় আপনার টাকারই বা অভাব কি? কথায় বলে, 'সাগরের জল কি ঘট ডোবালে ফুরোয়?'" কথা শেষ করিয়া ভট্টাচার্য্য আপন মনে একটুখানি হাসিল। এদিকে 'টাকার অঙ্ক বাড়াতে হবে' কথাটা শুনিয়া বোস মহাশয়ের মাথায় যেন বজ্রপাত হইল, দুই চক্ষু ঊর্দ্ধে তুলিয়া বলিলেন, "বল কি ভট্টায্, আরও টাকা! তবে কি এ সম্বন্ধও শেষকালে ফেঁসে যাবে? দত্ত বংশ মৌলিক কায়েত, অতো টাকা চাইলে চলবে কেন হরিধন? হাঁ—তবে এক কথা, ছেলেটি খাসা।"

হরিধন আবার বলিবার মত যেন কিছু পাইয়াছে, সগর্ব্বে মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে কথা আর কইতে, অমন ছেলে লাখে একটা মেলে না, এম্. এ. পাশ, অমন ভাল চাকুরী করে, দেখতে যেন রাজপুত্তুর বল্লেই হয়।" উজ্জ্বল আশায় হরিধন চোখ তুলিয়া তাকাইল। বোস মহাশয় একটি দীর্ঘ হাই তুলিয়া হাতে তুড়ি দিতে দিতে বলিলেন, "চাকুরীর কথাটা আপাততঃ ছেড়েই যাও ভট্টায্, হাতে না এলে বিশ্বাস নেই, যে বাজার। হাঁ, তবে ছেলেটা ভাল, এই পর্য্যন্ত। তাও আবার কলকাতায় ঘর নেই, বাড়ী নেই, ভাড়াটে বাড়ীতে থাকে, তবে ঐ এক কথা যা ছেলেটা দেখতে শুনতে ভাল তাই।" হরিধন বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল, "না না বোস মশায়, ছেলে ভাল। পরীক্ষা যখন দিয়েছে চাকুরী ওর মিলবে, চাকুরীর বাজারে মাথা খুড়োর ব্যাপার, তা সে দিকে ওর জোর তো আর কম নয়, ওর বড় মামাই তো রাইটার্স বিল্ডিংয়ের বড়বাবু না কি বলে তাই। চাকরী ওর হবেই আছে, আজ না হয় কাল, তার পর বাপও তো ওর একজন কম নন। বাড়ী করবেন, গাড়ী করবেনও শুনছি, তবে ছেলেটার একটা চাকুরী কি প্রফেসরী না হলে হাতের টাকাটা খরচ করতে রাজী নন, তবে জায়গা জমি দেখা-শুনা হচ্ছে, পছন্দ হলেই এক সময় খপ করে কিনে ফেলবেন।" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই হরিধন আপাততঃ থামিলেন। বোস মশায় একটুখানি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হাসিতে মুখ ভরিয়া বলিলেন, "যাও ভট্টায্, কাজটা করে যাও গিয়ে, দশ বিশ টাকা না হয় তুমিই পাবে। পণের কড়ি কখনও ঘরে থাকে না ভট্টায্, তারপর মেয়ে-জামাই তো আমারই হবে—একদিন সবই পাবে ওরা।" হরিধন মাথা নাড়িল—কথাটা যুক্তিসঙ্গত। তারপর বলিল,

"তা বটে, ও কথা সবে মানবে, আর আপনিই তো একদিন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, জানেন তো সবই।" ঘোষ মশায় গর্ব-মিশ্রিত একটুখানি হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আর লজ্জা দাও কেন ভট্টাচায্যি, সে দিন যদি আর থাকতো দু'দশ হাজার টাকার জন্য কি মেয়ের বিয়ে আটকে যেতো? বোঝো তো সবই—সা দিনকাল।"

এমন সময় দেওয়ালে ঘড়িতে চং চং করিয়া দশটা বাজিল, হরিধন আড়া মোড়া দিয়া আলস্য ভাঙিয়া উঠিয়া বলিল, "যাই এখন ঘোষ মশায়, ওদিকে আবার গিন্নি বাজারের অপেক্ষায় হাঁ করে বসে আছেন।" হরিধন দু'একবার ঘোষ মশায়ের মুখের পকেটের মধ্যে হাত চালাইল; তার পর ইয়ং বাটুকে চং-এ মুখ বিমর্ষ করিয়া বলিল, "এই যাঃ!"

ঘোষ মশায় বলিলেন, "কি হল হরিধন?" হরিধন এক অদ্ভুত রকমের হাসিতে মুখ ভরিয়া তুলিল, আবার তখনি মুখ ভ্যাকাসে করিয়া বলিল, "আমাকে একটা টাকা ধার দিতে হবে, বাজারটা নিয়েই বাড়ী যাব, তারপর আবার সন্ধ্যায় দত্ত মশায়ের ওখানেও যেতে হবে।" ভট্টাচায্যের মুখের দিকে তাকাইলে তখন এ কথা স্পষ্টই মনে হইত যেন তার মত সত্য ঘোর পক্ষের পত্নী বিয়োগ ঘটিয়াছে। কিন্তু সে ভয় নাই, কেন না পত্নী তার বেশ সুস্থ ও সবল দেহে আছেন। ঘোষ মশায় একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "মোটে একটা টাকা?"

হরিধন কৃতজ্ঞতায় হাসিতে মুখ তুলিয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁা।" ঘোষমশায় এবার বলিলেন, "বোধ হয় হবে না ভট্টাচায্যি, চেক ভাঙাতে পাঠিয়েছি, ফিরে না এলে আর হচ্ছে না।" হরিধনের মুখ আবার বিমর্ষ হইল কিন্তু আর কি হইবে, অগত্যা ভট্টাচার্য্য এই কথা মনে মনে ভাবিতে ভাবিতেই ফিরিল—"এই কৃপণটার মুখ দেখা হল ভোর না হতেই, আজ আর হয় তো খাওয়াই জুটবে না।"

ভট্টাচার্য্য চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই পিয়ন একখানা চিঠি দিয়া গেল। উকিলের চিঠি।

ঘোষ মশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চিঠি পড়া শেষ করিলেন, তার পর মনে মনে ভাবিলেন—এই ফাঁকে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দিতে পারলে হয়, তখন মাসে সব নিয়ে আমাকেই হয় তো তাড়াটে বাড়ীতে যেতে হবে। ঘোষ-মশায় একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া চিঠিখানা হাতে লইয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

যতন দত্ত দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ভারত সরকারের পেনশন ডিপার্টমেণ্টের চাকরী করিয়া কিছু টাকা আর করিয়াছিলেন। কথাটা খুব সত্য, কিন্তু বাইরের চাল অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া, আর একটা একটা করিয়া ছয়টি কন্যার সু-পাত্রস্থা করিতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। মেয়ে ছয়টি সু-পাত্রস্থা হইয়াছে, পুত্র অনিতকুমারও এম. এ. পাশ করিয়াছে, কিন্তু চাল ও বাহ্যিক আড়ম্বর তিনি এখনও বিদায় দিতে পারেন নাই। গিন্নি মোটর ছাড়িয়া দিতে কত অনুরোধ করেন, ঠাকুর-চাকর ছাড়াইতে পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু দত্ত মশায় স্মিত হাসিয়া উত্তর করেন—"সবই বুঝি গিন্নি, এ-সব ছাড়লে কিন্তু ব্যাঙ্কে ওভারড্রাফ্‌ট মিলবে না, কেউ এক পয়সাও ধার দেবে না, দু'দিন বাদেই কলকাতা ছেড়ে পালাতে হবে।" গিন্নি তবুও উত্তর করেন—"কি কাজ আর আমাদের ধার করে? তুমি যে পেনশনের টাকা ক'টি পাও তাতেই আমাদের সংসার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।" দত্ত মশায় আবার হাসিয়া উঠিলেন, তারপর রহস্যপূর্ণ দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সবই সত্যি গিন্নি, কিন্তু এই বুড়ো বয়সে আমাকে জেল খাটতে হবে যে—তাতে রাজী আছ কি? বারটা হাজার টাকা বাজারে দেনা, তবুও লোকে সেলাম দেয়, দত্ত মশায় বলে সম্মান করে, সভা-সমিতিতে প্রেসিডেণ্ট করে, সে কি আমাকে গিন্নি? সে আমার মটর-গাড়ী আর বামুন চাকরকে।"

দত্তপত্নী বালিগঞ্জে তাদের এই বাটুকে জীবন-যাত্রার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাসিতে হয়, টী পার্টি দিতে হয়, মজলিসে যোগ দিতে হয়, সাজিয়া গুজিয়া রায়বাহাদুরের ছেলের নিন্দা করিতে হয়, মেয়ে মহলে সুন্দরী মেয়ের মায়ের কাছে নিজের ছেলের চাপা প্রশংসা করিতে হয়, হাসিতে হয়, হাসাইতে হয়। অভিনয়, সবই অভিনয়।

সন্ধ্যে করার দিকেই যার দৃষ্টি, নিজের সংস্কার তার কোথায়? দত্ত পত্নী এমনি জীবনযাত্রায় হাঁপাইয়া উঠিয়াছেন; তাই স্বামীর দিকে চাহিয়া একটু বিদ্রূপের

ভঙ্গিতেই কহিলেন, "আমাদের না কি আবার বাড়ী কিনছো ?"

দত্ত মশায় একটুখানি চাপা হাসি হাসিয়া উত্তর করলেন "লোকে অন্ততঃ শুনেছে তাই, কথাটি প্রচার হওয়া আরও প্রয়োজন। তুমি কিনতে বারণ করো না কি ?"

গিন্নি উত্তর করে "না না বারণ করবো কেন ? অমতে অরুচি কার ? তবে ঘোরাই ঘুরা গাও কি না, তাই বলি, বাড়ী কেনার টাকা আসবে কোত্থেকে ?"

দত্ত মশায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"চোরের সিঁধ-কাটীর পুঁজি চাই গিন্নি, উইদাউট ক্যাপিটাল বিজনেস্ হয় না। বাড়ী কিনতে আবার টাকা লাগে নাকি—তুমি হাসালে, কিছু টাকা বাবদা লাগে।"

রতন দত্তের সবই রহস্য, গিন্নি এত সব বোঝে না, কিছুরই সাতে পাঁচে থাকে না, কাজেই স্বামীর কথায় কিছু উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। দত্ত মহাশয় আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "দেখ, খোকার সম্বন্ধটি প্রায় পাকা হয়ে এসেছে, তবে গোলমাল বেধেছে কেবল নগদ টাকা নিয়ে। ওদের বড় আপত্তি কি জান ?"

গিন্নি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকাইল। দত্ত মহাশয় বলিয়া চলিলেন, "ওদের সব চেয়ে বড় আপত্তি কোলকাতায় ছেলের নিজের বাড়ী নেই। তা'হলে ওরা নগদ পাঁচ হাজার আর তদনুসারে গহনা-পত্র দিতে রাজি হতো। কাজেই বাড়ী কেনা দরকার গিন্নি, বাড়ী কেনা দরকার, অন্ততঃ বায়না দেনায় কিছু টাকা শোধ হবে।"

গিন্নি বুঝিতে পারিল না, পাঁচ সাত হাজার টাকা পাওয়ার জন্য এত বড় বাড়ী কেনায় কি লাভ হইতে পারে ? দত্ত মহাশয় মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। সে হাসিতে অদ্ভুত রকমের রহস্য ভরা।

সপ্তাহ না ঘুরিতেই বালিগঞ্জ মহলে প্রচার হইয়া গেল, দত্ত মশায় বাড়ী কিনিয়াছেন। খুব খানিয়া গেলেই পুত্র অনিলকুমার জার্মানীতে যাইবে একটা কিছু শিখিতে।

পরদিন ভোর না হইতেই লখোদর মাড়োয়ারী বণিক-নন্দন দত্তভবনে আসিয়া দর্শন দিল।

মোটর হইতে নামিয়া ড্রয়িংরুমের দিকে অগ্রসর হইতেই দত্ত সাহেব হাসিমুখেই ডাকিলেন, "আইয়ে লোহিয়া সাব, আইয়ে।" তার পর বয় বেল বাজাইলেন। বয় আসিল, চা আসিল, খাবার আসিল।

ভোজন কথায় কথায় শেষ হইল। এবার মিঃ দত্ত কাজের কথা পাড়িলেন,—"রেজেষ্ট্রী আপার আজই হোনে চাহি।"

লোহিয়া দীর্ঘাকৃতি টিকিসহ মাথা নাড়িয়া বিরাট গুরুত্বের হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"জরুর কাহে নেহি জী ? ওভর শীঘ্রম্।" মিঃ দত্তও একবার মাথা নাড়িল, চাতুর্য্যপূর্ণ হাসি হাসিল, তারপর আবার আসিল সিগারেট, আবার আসিল চা, সঙ্গে সঙ্গে কালি-কলমের ব্যাপারও শেষ হইল। লোহিয়া হাসিমুখে কাগজ ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিল।

মাস শেষ হইতে দু'দিন বাকি, গিন্নি দত্তকে বলিল, "তা হলে আসছে সোমবারেই আমাদের উঠে যাওয়া ঠিক হল কি বল ? জিনিষপত্র যা সব গুছিয়ে ফেলি, আর কি ? ঠাকুর মশায় এসেছিলেন। বললেন, 'ঐ দিনই দিন্ ভাল' "—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই গৃহিণী স্বামীর মুখের দিকে সম্মতির আশায় তাকাইল।

দত্ত মশায় অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটটি দুই আঙুলের ফাঁকে বাজীকরের ভঙ্গিতে চালিয়া ধরিয়া বলিলেন, "যাওয়া ঐ দিনই ঠিক, তবে জিনিষ পত্র আপাততঃ সবই এখানে থাক, কিছু কিছু বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষ নিলেই চলবে, ঐ রাজপ্রাসাদে কি ও সব খেলো জিনিষ-পত্র শোভা পায় ? সব জিনিষেরই একটা মানান সই হওয়া চাই তো।"

গিন্নি অগত্যা চুপ করিয়াই রহিলেন, কেন না স্বামীর বিরুদ্ধে নিজের মতকে কোন দিনই বড় বাহাল করিতে পারেন নাই, আজও যে পারিবেন না একথাও নিঃসন্দেহ। দুদিন সময় খুব বেশী নয়, কাটিয়া যায়। দত্ত সাহেব আসিলেন বিবেকানন্দ রোডের বিরাট বাড়ীতে। সবই নূতন, আবহাওয়া নূতন, কায়দা নূতন, সবই নূতন, সবই সাহেবী, সবই আধুনিক, এই অতি-আধুনিকতার হাপরে পড়িয়া হাঁপাইয়া উঠিলেন দত্ত-গিন্নী। আর সবারই এক রকম লাগিল ভালো।

ষটক হরিধন বার ইঞ্চি বুকের ছাতি বাহাত্তর ইঞ্চি করিয়া হাসিতে হাসিতে আসিল বোস মশায়ের বাড়ী। বোস মশায়ের কানে এটা আগে থাকিতে আসিয়া গিয়াছে যে, মিঃ দত্ত বিবেকানন্দ রোডের উপর বিরাট বাড়ী কিনিয়াছেন, ষটক ভট্টাচার্য্য মশায়ের আদর যে বাড়িবে একথা না বলিলেও চলে।

বোস মশায় আনন্দে দুই হাত তুলিয়া ডাকিলেন, "এসো এসো, ভট্টচায্—আমি ভট্টচায্ চিরকালই কাজের মানুষ।" ভট্টাচার্য্য শুধু মৃদু হাসিল, কোনও কথাই বলিল না; ভট্টাচার্য্য আজ আর হরিধন রায়ধন নয়; বোস মশায়ই আবার বলিলেন, "প্রভাতেই ব্রাহ্মণ দর্শন, এ কি কম সৌভাগ্যের কথা ভট্টচায্।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিজ্ঞের ভঙ্গিতে দুই একবার সংস্কৃত সুরে আবৃত্তি করিল, "গো ব্রাহ্মণ, গো ব্রাহ্মণ, কথায় বলে দর্শনে পুণ্য, পরশনে মুক্তি!" তারপর কাজের কথা পাড়িল, "আমি জানতাম বোস মশায়, মা লক্ষ্মীর আমার লক্ষ্মীর মতই বরাত, কথাটা এখন একদিন শুভদিনে পাকা হয়ে যাওয়াই দরকার।"

ভট্টাচার্য্যের মাথায় একটি নূতন বুদ্ধি জোগাইল; মনে মনে স্থির করিল, 'একটু চাপ দেলেই বেথা যাক না।' ভট্টাচার্য্য অগ্রসর হইয়া চুপি চুপি বোস মশায়ের কানের আগায় বলিল, "আর ঐ দেনাটার কথাটাও হয় তো চাপা থাকবে না, কাজটা তাড়াতাড়ি হ'য়ে যাওয়াই ভাল, কথায় বলে শুভস্য শীঘ্রম্।"

ভট্টাচার্য্যের এক চালেই বোস মশায়ের মুখখানা ফ্যাকাশে হইয়া গেল। একটু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, "ভট্টচায্, ও কি আবার একটা দোষ? ও কিছু নয়।"

দোষ যে কি, তা ভট্টাচার্য্য মশায় আদৌ জানে না, কিন্তু বোস মশায়ের শুষ্ক মুখ দেখিয়াই বুঝিলেন তার চাল কার্য্যকরী হইয়াছে। হরিধন যে চাণক্য কৌটিল্যের বংশধর একথা মনে মনে স্মরণ করিয়াও যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। হরিধন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "দোষ যখন একটি আছে এই জন্যই বলেছিলাম কথাটা পাকাপাকি হ'য়ে যাওয়া দরকার।" দোষের কথাটা যে কি তা উল্লেখই হইল না, কিন্তু পরদিনই কথাটা হইয়া গেল, হরিধন খাতা-কলমে অঙ্ক কষিয়া দেখিল তার ষটকালি শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে তিনশত টাকা হইয়াছে।

শুভদিনে বিবাহটাও সম্পন্ন হইয়া গেল। দত্ত মশায় মনে মনে স্থির করিলেন, বোস মশায়ের মাথায় মস্ত বড় একটা টাক দেখিয়াছেন, বোস মশাইও পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন, 'মেয়েটা যে আলোয় আলোয় পার হয়েছে এই না কত। যে বাড়ি ওর নাম শুনলে বাংলাদেশে নীরেট ভিখারীর ছেলেও বোধ হয় ও মেয়ে বিয়ে করত না'।

আগুন চাপা থাকে না, একদিন সব পুড়াইয়া ছাই করিয়া দেয়। একদিন চাকে ঢোলে বাজিয়া উঠিল মিঃ দত্ত বিবেকানন্দ রোডের বাড়ীর উপর শুভ টাইটেল পান নাই, কেন না মর্টগেজ প্রপার্টি, বালীগঞ্জের ক্লাবে, মজলিশে সর্ব্বত্রই কথাটা রটিয়া গেল। দত্ত-গিন্নি বোস গিন্নিকে বুঝাইলেন—"না বেয়ান, লোকটা চিরকাল এমনি বেহ'স। কেন বাপু, বাড়ী কিনতে হবে, সব দিক্ দেখে শুনে কেনাই কি ভাল নয়?"

বোস-গিন্নি মাথা নাড়িয়া বলিলেন "বল কেন বেয়ান, মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে এলোপাথাড়ী ধার করলে, কাজেই না বাড়ীটাও পড়লো মর্টগেজ, নইলে এই পূজার শুত্ত, জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব দিতে বোসেদের কি হাত তা পাড়ার লোকে কে না জানে?"

দত্ত-গিন্নিও সহানুভূতির হাসি হাসিলেন। দশমীর পরদিন সকালে সংবাদের লোহিয়া আবার আসিল মিঃ দত্তের বাড়ীতে। এবার কিন্তু চা-ও আসিল না, বেলও বাজিল না। এক কথায় যাকে বলে, কোল্ড রিসেপশন। হইলও তাই, লোহিয়া ম্লানমুখে বলিলেন, "মিঃ দত্ত, আই এ্যাম ভেরী সরী।" দত্তও গম্ভীর মুখে বলিলেন,—"ভেরী সরী মিঃ লোহিয়া। আমার ছেলেটার একটা ব্যবস্থা করে যাও দিকিনি, ও সেবটা যা হোক পূরণ হয়ে যাবে। তোমার ফারমে ম্যানেজারী ধরণের একটা কিছু".....এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মিঃ দত্ত চায়ের অর্ডার দিলেন।

লোহিয়া হাসিয়া বলিল, "আপনার ছেলের প্রোভিশনের ভার আমি নিলুম।"

এমন সময় ঘরে ঢুকিল মিঃ বোস। দত্ত ডাকিলেন, "আসুন, আসুন বেয়াই মশাই! গরীবের বাড়ী যে ভুলে এসেছেন এতে খুবই সুখী।" বোসমশায়ের হাসি পাইল; বোধ হয় তখন তাহার মনে হইতেছিল, অন্ধকার, অচল টাকার বিনিময়ে কাপাবেওন কেনার সেই ছেলেবেলার পাঠশালার পড়া পদটী।

দশমীর পর আসিয়াছেন বেয়াই—দুই বেয়াইয়েতে ভাই হইল "কোলাকুলি।"

# শুভেচ্ছা

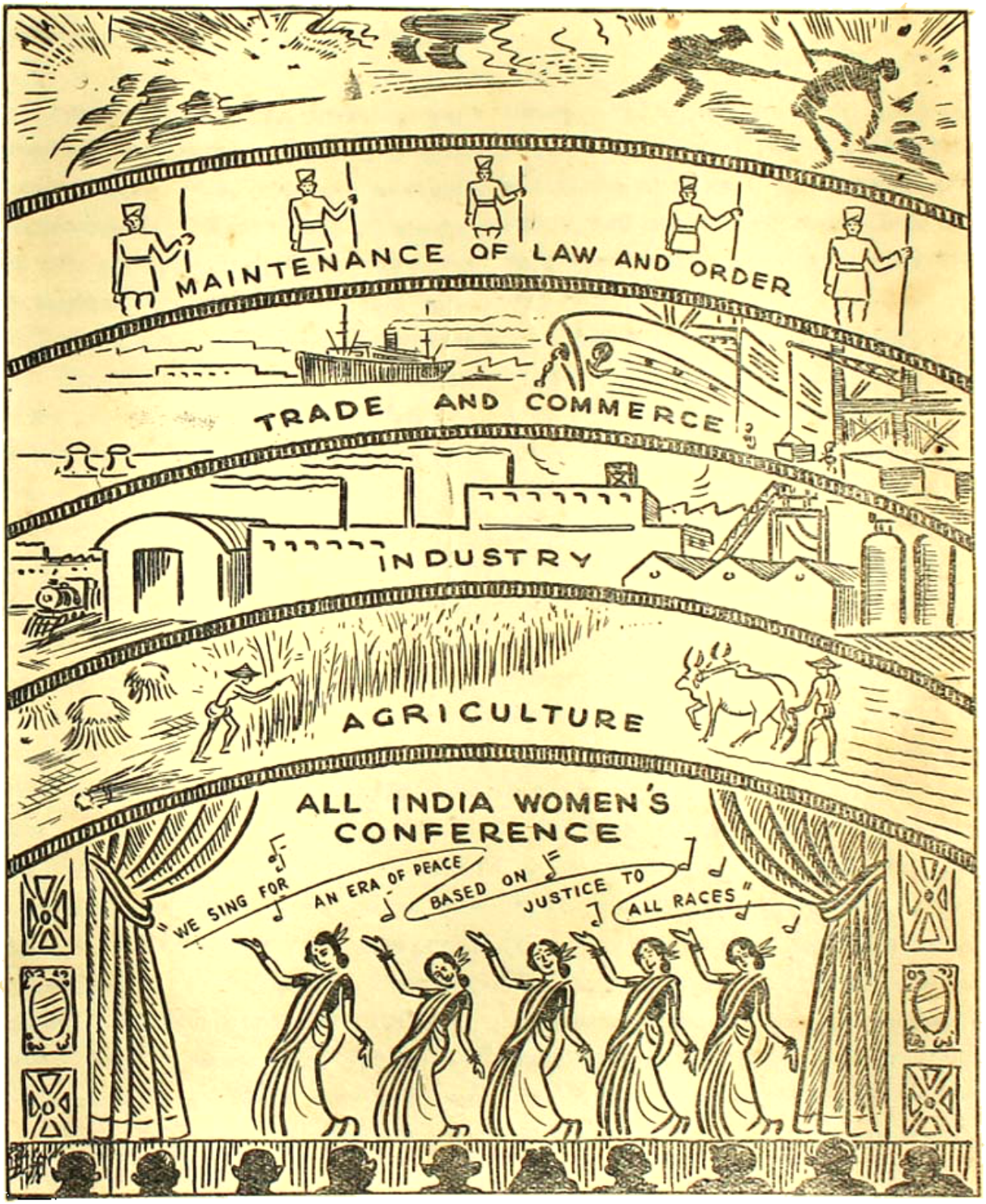


নিখিল-ভারত মহিলা-সম্মেলনের গত কলিকাতা বৈঠকে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, ভারতীয়
নারীগণ সর্বসাধারণ মিলন ও শান্তি প্রয়াস করিবে।...

# শিক্ষার প্রসারে গ্রন্থাগারের স্থান

—শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে নানা বিচিত্র অথচ ধারাবাহিক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া মানুষ আজ তাহার বর্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। এক দেশের মানুষ অপর দেশের মানুষদের অপেক্ষা উন্নত এবং সভ্য বলিয়া যে দাবী করিতেছে, সেই দাবীর মূলে রহিয়াছে তাহার শিক্ষা এবং কৃষ্টি। সেই আদিমের যুগে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়ার পর হইতেই আদিম মানব উন্মুখ হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে দিক্ হইতে দিগন্তরে তাহার জ্ঞানের প্রসারকল্পে এবং নানা বহুমুখী শিক্ষা ও বৈদগ্ধ্যের মধ্য দিয়া সে আজ বর্তমান অবস্থা পরিগ্রহ করিয়াছে। এই শিক্ষাই আজ তাহাকে তাহার অবস্থায় উপনীত করিয়া দিয়াছে। প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তি লইয়াই জাতি গঠিত, এবং প্রত্যেক মানুষের শিক্ষার অনুপাতেই এক একটি জাতি সভ্যতার সদর্পে সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ। শিক্ষা যেরূপ জাতির মেরুদণ্ড, প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তির পক্ষেও শিক্ষা সেইরূপ অবশ্য প্রয়োজনীয়। শিক্ষাই আমাদের মনকে উন্নত করে, মহৎ করে—সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী হইতে আমাদের সীমাহীন বিস্তৃতির মধ্যে টানিয়া আনে।

শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা যেমন অধিক, তাহার উপায়ও সেইরূপ অনেক আছে। জনসাধারণের মধ্যে সুলভে এবং সহজ উপায়ে শিক্ষাবিস্তারের যে কয়টি পন্থা আছে, বর্তমান পাঠাগার বা লাইব্রেরী তাহাদের অন্যতম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ-দিকে আমাদের এখনও সেরূপ দৃষ্টি পড়ে নাই। ইহার অন্যতম কারণ বোধ হয় আমাদের নির্লিপ্ত স্বভাব। আমাদের দেশে শিক্ষার অবস্থা যে কিরূপ, সে খবরটুকু আমরা রাখি কেবল আদম-সুমারীর হিসাবে। আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা সাত জন—অর্থাৎ প্রত্যেক একশত ব্যক্তির মধ্যে মাত্র সাত জন নাম সহি করিতে বা চিঠিপত্রাদি পড়িতে এবং লিখিতে জানে, আর বাকি শতকরা তিরানব্বই জনের অদৃষ্টে এটুকুও জুটে নাই, বিনা প্রতিবাদে আমাদের অন্ধ উপেক্ষার মধ্য দিয়া দিনের পর দিন তাহারা বঞ্চিত হইয়া চলিয়াছে। ইহা আমাদের দুঃখ বিলাসে মাত্র দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অন্যান্য দেশ যে শিক্ষা-বিস্তারে বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তাহার অন্যতম কারণ গ্রন্থাগার। শিক্ষা-বিস্তারের একটি প্রধান উপায় এবং সহায়ক হিসাবে এখানে অন্যান্য দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে সামান্য আভাষ বিবৃত হইতেছে।

আমাদের দেশে পাঠাগার আন্দোলন প্রবর্তিত হইয়াছে মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে—১৯২৫ সালে। কিন্তু এখনও আমরা ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। ইহার কারণ বোধ হয়, আমাদের দেশে অনুরাগী ব্যক্তির অভাব। আমাদের নিলিপ্ত স্বভাব—সাধারণ ভাবে অলসতা—লইয়া আমরা নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া আছি বজ্রপের ন্যায় কঠিন আবরণের মধ্যে, শমুকের ন্যায় আমাদের গতি। অসুখ, সমস্যা যেখানে গুরুতর, সমাধান যেখানে অতি প্রয়োজনীয়, পনের বৎসরেও সেখানে একটা আন্দোলন জনসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা ও প্রসারলাভের জন্য প্রার্থীর মত দ্বারদেশে করযোড়ে দাঁড়াইয়া থাকে কেন? চৌষট্টি বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার পাঠাগার আন্দোলন শুরু হইয়া গিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৭৮টির অধিক গ্রন্থাগার একমাত্র কার্নেগীর দানেই পুষ্ট। ডাবলিন, ম্যাঞ্চেষ্টার, বার্মিংহাম প্রভৃতি স্থানের লোক-সংখ্যার সহিত পাঠাগারের সংখ্যার অনুপাত দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। পনের বৎসর পূর্বে এদিক্ দিয়া রুশিয়ার অবস্থা ছিল ভারত অপেক্ষাও মন্দ। আমরা যখন সংবাদপত্রে আন্দোলন করি—Dominion Status, franchise, হরিজন অথবা অসহযোগ আন্দোলন লইয়া, রুশিয়ার সংবাদপত্রে তখন প্রকাশিত হয়—বস্ত্র পরিষ্কার রাখিবার প্রণালী, অপরিষ্কার পরিচ্ছদ পরিধান করিতে নাই কেন। আমেরিকার একজন সাংবাদিক গিয়াছিলেন কর্মোপলক্ষে রুশিয়াতে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভদ্রলোকের সম্মুখের একটি দাঁত ছিল সোনা দিয়া বাঁধান। ফলে তাঁহাকে জনসাধারণের দর্শনীয় বস্তুতে

পরিণত হইতে হইয়াছিল। স্বর্ণের ন্যায় মূল্যবান ধাতু যে কেহ বস্তে ধারণ করে, ইহা তাহাদের কল্পনাতীত। প্রথমে চা পান কালে গৃহস্বামী দিলেন বাধা—উত্তপ্ত পানীয়ের সংস্পর্শে নাকি স্বর্ণ গলিয়া যাইবে! গ্রামের অধিবাসীরা আসিয়া টেবিলের চারিধারে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, সোনা যে গলিবে না তাহাদেই চাক্ষুষ প্রমাণ লাভ করিবার জন্য। ইহাই ছিল পঁচিশ বৎসর পূর্বেও রুশিয়ার অবস্থা! রুশিয়ার "অশিক্ষা দূরীকরণ সমিতি" (Society for Combating Illiteracy)" প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৪ সালে এবং ১৯২৭ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়। বর্তমানে—১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মাত্র পনের-ষোল বৎসরের ব্যবধানে—রুশিয়ার স্থান এবিষয়ে কোথায়, সেকথা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না।

সেদিনও বাঙ্গালী কবি "চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আজ আমরা বিস্মিত হইয়া ভাবি, এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপানের অবস্থা এমন হইল কি করিয়া! কিন্তু জাপান পাঠাগার ও পাঠাগার আন্দোলনের প্রতি কিরূপ মনঃসংযোগ করিয়াছে যদি আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখি, তাহা হইলেই আমাদের বিস্ময়ের কারণ দূরীভূত হইবে। ১৯২৬-২৭ সালে ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপ জাপানে পাঠাগারের সংখ্যা ছিল ৪,৩১৭ এবং পুস্তক সংখ্যা ৭৬,২০,-৩১১। জাপানের পাঠাগার সঙ্ঘ ("Library Association) যদিও মাত্র ১৯১২ সালে সংস্থাপিত হইয়াছে, তৎসত্ত্বেও উহা আজ এত দূর প্রসার লাভ করিতে পারিয়াছে এক মাত্র দেশবাসীর উদ্যম এবং উৎসাহে, আগ্রহ এবং আকাঙ্ক্ষায়। তাহারা শিক্ষা-বিস্তার কার্যকে সরকার কার্য বলিয়া মনে করে নাই, ব্রত বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছে এবং নবীন উদ্যমে আন্দোলন চালাইয়া সমস্ত দ্বীপময় একটা জাগরণের সাড়া আনিয়া দিয়াছে। আমাদের যাহাই "অদ্যত্ব" বিশেষণে সম্মানিত জাপান যখন "পাঠাগার সপ্তাহ" পালন করে, আমরা তখন পালন করি "বাদি সপ্তাহ"!

জনশিক্ষা বিস্তারে পাঠাগারের একটি বিশিষ্ট আসন আছে। পাঠাগারের উদ্দেশ্য শুধু পুস্তক সংগ্রহ করা নয়, তাহার প্রচার এবং তথা শিক্ষার বিস্তার। অতএব, গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে তাহার প্রচারকার্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। অথচ আমাদের দেশে পাঠাগার সম্বন্ধে প্রচারকার্য খুবই কম, একরূপ নাই বলিলেই হয়।

পাঠাগারের প্রচারকার্যকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—সাধারণ এবং স্বতন্ত্র। পুস্তক পাঠের উপকারিতা, লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয় সাধারণের গোচরীভূত করাকে পাঠাগারের সাধারণ প্রচার-কার্য বলা যাইতে পারে। এবং কোন বিশেষ পাঠাগারের উদ্দেশ্য, তাহার পুস্তকসংখ্যা, কার্যাবলী প্রভৃতির প্রচারকে স্বতন্ত্র প্রচারকার্য বলা হয়।

পাঠাগারের প্রচার-কার্যের কারণ এবং প্রয়োজনীয়তা আমরা পূর্বেই স্বীকার করিয়া লইয়াছি, বর্তমানে ইহার প্রচারকার্যের বিভিন্ন উপায়সকল আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করিব।

১। স্থানীয় সংবাদপত্র (Local newspapers)—লাইব্রেরী সম্বন্ধে প্রচারকার্যের যে কয়টি উপায় আছে, তাহার মধ্যে ইহাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা সহজ এবং সুলভ। পাঠাগারের নূতন বর্ধিত পুস্তক সংখ্যা ও তাহাদের নাম, অধিবেশনের দিন এবং কার্যতালিকা, তাহার ফলাফল, কোন বিশেষ কার্যের বিবরণী প্রভৃতি প্রয়োজন এবং সুযোগমত স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিলে বহু ব্যক্তি তাহা পড়িতে পারে এবং পাঠাগারের উদ্দেশ্য, কার্যবিবরণী, এবং সর্বোপরি তাহার অস্তিত্বের কথাও অন্ততঃ অনেকে জানিতে পারে।

২। মুদ্রিত ইস্তাহার (Printed handbills)—সংবাদ-পত্রের পরেই মুদ্রিত ইস্তাহারের সাহায্যে প্রচার-কার্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। নূতন ক্রীত এবং সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের নাম, কার্যধারার কোন পরিবর্তন, সাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত দান, পরিচালকমণ্ডলীর বা তাহার কোন সদস্যের অথবা কোন সাধারণ সভ্যের গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য স্বেচ্ছাকৃত সাহায্যদান প্রভৃতি ছোট ছোট পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া তাহা পাঠাগারের সভ্য এবং সর্বসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিলে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে অনেকের দৃষ্টি এবং মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতে পারে।

৩। প্রাচীরে লাগাইবার বিজ্ঞাপন-পত্র (Poster)—বিভিন্ন দেশের অনেক পাঠাগারের প্রচারকার্যের নানাবিধ

উপায়ের মধ্যে ইহাও একটি। পাঠাগারের কোন বিশেষ অধিবেশন কালে অথবা কোন বিশেষ কার্য্যের অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে এই ভাবে উহা প্রচারিত করা চলে। এই ভাবে প্রচারকার্য্যের একটি সুফল আছে। পথে গমনাগমন কালে বারম্বার বিভিন্ন স্থানে দৃষ্টিগোচর হইলে দর্শকের অজ্ঞাতসারেই উহা তাহার মনের মধ্যে একটি ছাপ রাখিয়া যায়।

৩। আকর্ষণীয় বিজ্ঞপ্তি (Novelty advertising)—বর্ত্তমানে প্রচারকার্য্যে ইহার উপযোগিতা সকল প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই স্বীকৃত হইয়াছে। পাঠাগার যে স্থানে অবস্থিত, তাহার চতুর্দ্দিকে একটি নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে যাঁহারা পাঠাগারের সভ্য এবং যাঁহারা সভ্য হন নাই, বিশেষ ভাবে তাহাদিগের নিকট, মনোযোগ-আকর্ষক ও গ্রন্থাগারের বিশেষত্ব সহ মুদ্রিত প্রচারবার্ত্তা সম্বলিত দেওয়াল-পঞ্জী, পকেট-বহি প্রভৃতি প্রেরণ করা যাইতে পারে।

৪। পত্র (Letters and circulars)—দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহ, পুরাতন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন অথবা পাঠকদিগের সুবিধার জন্য সুব্যবস্থা প্রভৃতি হইলে স্থানীয় শিক্ষিত এবং বিশিষ্ট অধিবাসীদিগের নিকট মাঝে মাঝে উক্ত সংবাদপত্র-যোগে প্রেরণ করিলে গ্রন্থাগারের প্রচার, প্রসার ও সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে উহা বিশেষ সাহায্য করে।

৫। সাময়িক পত্র (Periodicals) বা মুখপত্র (House organs)—বিদেশে বিভিন্ন পাঠাগারের প্রচার-কার্য্যের উদ্দেশ্যে সাময়িক পত্র প্রকাশিত করা হয়। দেশ-বিদেশের পাঠাগারের এবং তাহাদের খবরাখবর, তাহাদের পুস্তক-সংখ্যা, কার্য্যপ্রণালী, বৈজ্ঞানিক উপায়ে পুস্তকতালিকা প্রণয়ন সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রণালী, পাঠাগারের উপকারিতা, শিক্ষার সুফল, প্রভৃতি এই সকল পত্রিকায় মিশ্রিত ভাবে প্রকাশিত করা যায়। তবে আমাদের দেশের ছোট ছোট পাঠাগারের পক্ষে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা কঠিন, কারণ ইহা কিঞ্চিৎ ব্যয়সাধ্য। তবে বড় বড় পাঠাগারগুলি অনায়াসে এই উপায় অবলম্বন করিতে পারে, এবং ইহার সাহায্যে অন্যান্য পাঠাগারগুলির বিবরণ প্রকাশিত হইলে ইহার দ্বারাই ছোট ছোট পাঠাগারগুলির প্রচার-কার্য্য একতানে সম্ভব হয়। New York Public Library-তে *The Bulletin* নামে এক সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়, Croydon-এ *The Readers' Index* নামে সাময়িক পত্র আছে, Harvard University Library-র সাময়িক পত্রের নাম *The Harvard Library Notes*; এবং এইরূপ আরও অনেক গ্রন্থাগারের বিভিন্ন নামে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

৭। প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা (Arrangement for competitions)—পাঠাগারের প্রচারকল্পে মাঝে মাঝে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা উচিত। ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণের জন্য বিশেষ বিশেষ বিষয়ে প্রবন্ধ প্রভৃতির প্রতি-যোগিতা আহ্বান এবং তদুপলক্ষে পুরস্কার ঘোষণা করিলে বহু ব্যক্তির দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইবে, এবং ফলে পাঠাগারও যথেষ্ট পরিমাণে প্রচার ও প্রতিপত্তি লাভ করিবে।

৮। সাহিত্য-সভা (Literary conference)—মাঝে মাঝে সাহিত্য-সভার আহ্বানও পাঠাগারের প্রচারকার্য্যের একটি অঙ্গ। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকদের আহ্বান করিয়া সর্ব্ব-সাধারণের সভা পাঠাগার-কক্ষে বসাইলে বহু সাধারণ এবং সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি তথায় যোগদান করিবে। ফলে পাঠাগারের অস্তিত্ব বহু লোক জানিতে পারিবে এবং পাঠাগারের আধুনিক রুচিসঙ্গত সজ্জা, পাঠকক্ষের সুব্যবস্থা প্রভৃতি বহু ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করিবে।

৯। বক্তৃতা (Lectures)—প্রচারকার্য্যের বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে ইহা একটি অত্যন্ত সহজ এবং সুলভ উপায়। বক্তৃতার দ্বারা পাঠাগারের অবস্থা, অতীতের কার্য্যাবলী, ভবিষ্যতের কার্য্যপদ্ধতি, পাঠাগারের উপকারিতা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনার ফলে পাঠকদের মনে সেই পাঠাগার সম্বন্ধে একটা অনুরাগ জন্মে, ফলে সভ্যসংখ্যা ও পুস্তকের চাহিদা বাড়ে।

১০। প্রদর্শনী (Exhibitions)—বিদেশের কতকগুলি পাঠাগারের প্রচারকার্য্যপদ্ধতির মধ্যে এই পদ্ধতিকেও স্থান দেওয়া হইয়াছে। নানাবিধ সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য পুস্তক এবং হস্তলিখিত পুঁথি সকল, গ্রন্থাগারের নূতন পুস্তক-তালিকা-প্রণয়ন প্রণালী, বিভিন্ন পাঠাগারের উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব সকল প্রদর্শনীর দর্শনীয় দ্রব্য করিলে পাঠাগারের প্রচার-কার্য্যও হইবে এবং অল্প ব্যয়সাধ্য, অথচ দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্যবান পুস্তকগুলির পাঠকও অনেক পাওয়া যাইবে।

১১। ছায়াচিত্রে বক্তৃতা (Lantern lecture)—পাঠাগারের প্রচারকার্য্য চালাইবার আর একটি উপায় ছায়াচিত্রে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা। বিভিন্ন দেশের পাঠাগার সম্বন্ধে, মহাপুরুষদের জীবনী সম্বন্ধে, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে মাঝে মাঝে গ্রন্থাগারে ছায়াচিত্র যোগে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করিলে প্রচারকার্য্য প্রভূত সাহায্য লাভ করিবে। বিশেষতঃ, এই উপায়টি শিশুপাঠাগার (Juvenile library) সম্বন্ধে বিশেষ কার্য্যকরী এবং ফলপ্রসূ হইবে।

১২। বিবিধ (Miscellaneous)।

পাঠাগার সম্বন্ধে প্রচারকার্য্যের বিবিধ উপায়ের মধ্যে বেতার একটি। নূতন প্রকাশিত পুস্তক, কোন্ কোন্ পাঠাগারে কি কি নবপ্রকাশিত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে, কোন্ সাময়িক পত্রিকা কোন্ পাঠাগার সম্বন্ধে কি বলিয়াছে—এই সকল অনায়াসেই বেতার সাহায্যে সাধারণকে জানান যায়। ইহার একটি ফল এই যে, বহুদূরে অবস্থিত বিভিন্ন পাঠাগার মিলিত হইয়া মিলিত শক্তির সাহায্যে প্রত্যেক পাঠাগারের পাঠকে প্রার্থিত পুস্তক সরবরাহ করিয়া থাকে।

ছায়াচিত্রের সাহায্যে প্রচার—সেক্কাগৃহে সাধারণতঃ বিভিন্ন রুচির বহু জনসমাগম হয়। পাঠাগারের সন্নিকটবর্ত্তী সেক্কাগৃহে বিজ্ঞাপন দিলে তাহা বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অনুরাগী ব্যক্তিগণ অবহিত হইতে পারেন। তবে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যয়সাধ্য বলিয়া ছোট ছোট পাঠাগারগুলির পক্ষে কষ্টকর এবং দুঃসাধ্য হইলেও বিশিষ্ট পাঠাগারসকল এই উপায় অতি সহজেই গ্রহণ করিতে পারে।

রঙ্গালয়ের নৃত্যতালিকায় বিজ্ঞাপন (theatrical programme)—ছায়াচিত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ন্যায় রঙ্গালয়ের প্রোগ্রামে জ্ঞাতব্য বা বক্তব্য বিষয় প্রচার করিলেও যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়।

তবে 'বিবিধ' শীর্ষক সংখ্যায় লিখিত বিষয়ের অসারতার প্রচার কালে বিষয়ের সন্নিবেশের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কোন্ বিষয়টুকু বলিলে এবং কি ভাবে সাজাইয়া বলিলে তবে তাহা মনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিবে, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক না হইলে প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা অত্যধিক।

এই প্রবন্ধ পাঠ কালে মনে রাখিতে হইবে যে, হুবহু অনুকরণের অনুকরণে আমাদের মধ্যে কোন আন্দোলনই গড়িয়া উঠিতে পারে না—গ্রন্থাগার আন্দোলন তো নহেই। অন্ধ না হইলে, যে কোন ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন যে, বিভিন্ন দেশসমূহে যে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহা সর্ব্বত্রই সুফলপ্রসূ হয় নাই। কিন্তু কেন ইহা সুফলপ্রসূ হয় নাই, কি করিলে ইহা সুফলপ্রসূ হইতে পারে, কি ভাবে গ্রন্থ-সন্নিবিষ্ট বিষয়সমূহ রচিত হওয়ার প্রয়োজন, তাহা আন্দোলনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অগ্রে নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে পারেন।

আমাদের দেশে একদিন লোকশিক্ষার বহুতর বাহন ছিল—কথকতা, যাত্রা, পাঁচালী ইত্যাদি—সমস্তই লোকশিক্ষার সাহায্য করিত। তুলনামূলক বিচার দ্বারা বর্ত্তমান পন্থা অপেক্ষা সেই পন্থা বোধ করি উৎকৃষ্টতর ছিল। কিন্তু, যতদিন সেই উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার সাধন করা সম্ভব হইবে না, অন্ততঃ ততদিন পাঠাগার-সংশ্লিষ্ট আন্দোলন যাহাতে দেশের পক্ষে যথাসম্ভব কল্যাণকর হইতে পারে, দেশবাসীর হিতেচ্ছু ব্যক্তি-মাত্রেরই দৃষ্টি সেদিকে পতিত হওয়া উচিত বিবেচনায় এই সন্দর্ভ রচিত হইল।

---

## সাহিত্য ও সমাজ

...'সাহিত্য' যে একটা ভাল জিনিষ এবং উহা যে মানুষের মঙ্গলপ্রদ, একথা আজ স্বীকার করিয়া লইলেই, বর্ত্তমান বঙ্গ-সমাজের মুক্তাপি যে প্রকৃত সাহিত্যের অনুশীলন হয় নাই, ইহা অস্বীকার করা যায় না। ইহা অস্বীকার করিতে হইলে অন্ততঃপক্ষে বঙ্গ সমাজে যে শান্তি ও সুখ সৃষ্টি পাইতেছে, তাহা প্রমাণিত করিতে হয়।...

# ইহাই নিয়ম

—শ্রীবাণীনাথ চন্দ্র

রেল-লাইনের পার্শ্বে দিগ্‌বিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ দূর হইতে দূরান্তরে গিয়া যেন দিক্‌চক্রবালের সীমানার সহিত কোলাকুলি করিতেছে। আর সেই মাঠের বক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে আঁকা-বাঁকা পায়ে চলার পথ লক্ষ লক্ষ পথিকের পায়ে দলিত পদ্ধতিতে। সেই পথের সীমানায় দাঁড়াইয়া তার সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না। কারণ, সে পথের শেষ যে কোথায়, তাহা সঠিক দেখা যায় না। নিকটে পথটাকে হয় তো বেশ প্রশস্ত বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু যতই দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, ততই মনে হয় পথটা ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং অবশেষে কোথায় যেন হারাইয়া গিয়াছে।

এই পথের পার্শ্বে রেল-লাইনের অতি নিকটে রেল-ষ্টেশন। ভূপতি যখন স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যাকে লইয়া এই ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল, তখন বেলা বারটা বাজিয়া গিয়াছে। ষ্টেশনটার প্ল্যাটফর্ম নাই, সুতরাং সকলকে কলসার গুঁড়া বিছানো মাটির উপরেই নামিতে হইল। সাবিত্রী তাহার ঘোমটার ফাঁক দিয়া অদূরবর্ত্তী একতলা রেলওয়ে কোয়ার্টারটাকে দেখিতে লাগিল। নূতন বাসগায় আসিল, ঘরগুলি কেমন হইবে তা' কে জানে। না, একতলা হইলে কি হয়, ঘরগুলি ভাল বলিয়াই মনে হইতেছে, কেমন নূতনের মত চক্‌চক্ করিতেছে। আর দোতলা বাড়ীতে সে আর কবে বাস করিয়াছে? চিরকালই তো দেখিতেছে একতলা। কোন এখানে আসিবার পূর্ব্বে যেখানে ছিল, সেইখানেই শুধু দোতলায় বাস করিয়াছে। তাও রেলওয়ে কোয়ার্টারে অনুমান হইয়াছিল বলিয়া। তাই, ভূপতি ও বুকিং ক্লার্ক পরস্পরে এই দুইজনে মিলিয়া মাসিক পনের টাকা ভাড়ায় একখানি দোতলা বাড়ী ভাড়া করিয়াছিল। তা' হউক বাপু দোতলা—একটা বাড়ীতে ছেলে মেয়ে লইয়া দুইটা পরিবারের বাস করিতে গেলে অসুবিধার একশেষ···শেষ পর্য্যন্ত এমন হইয়া দাঁড়ায় যে দুইটা পরিবারের মধ্যে সম্ভাব রাখা যায় হইয়া উঠে···তাহার অপেক্ষা একতলা ঢের ভাল।

সাদা মেঘের কোল ঘেঁষিয়া বলাকাশ্রেণী উড়িয়া যাইতেছিল। সাত বছরের মেয়ে উমা তাহাদের দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "মা-মা দেখ-দেখ, কত বক," এবং পর মুহূর্ত্তে মাঠের আইলের পাশে সাদা সাদা কাশ ফুলের গুচ্ছ দেখিয়া সাশ্চর্য্যে প্রশ্ন করিল, "ওগুলো কি মা, ওই যে সাদা সাদা?"

সাবিত্রী ঘোমটার ভিতর হইতে মৃদুস্বরে কন্যাকে বলিল, "ওগুলো কাশ ফুল, কেমন সুন্দর দেখতে, না!"

ছেলে বীপুর বোধ হয় আর সহ্য হইতেছিল, না, সে ভূপতির লম্বা কোঁচাটা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া বলিল, "বাবা, বাড়ী চল"—ওদিক হইতে ট্রেনখানাও হুইস্‌ল্ বাজাইয়া মন্থর গতিতে ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া গেল।

মুস্‌কিল হইল ভূপতির, সে বহু দূর হইতে আসিতেছে, এখানকার কাহাকেও চেনে না। অবশ্য ষ্টেশন-মাষ্টারকে খবর দেওয়া আছে যে সে আসিতেছে। কিন্তু লোকটা কেমন তা' কে জানে? কোন খোঁজ-খবর লইতেও পারে, নাও লইতে পারে। আর সে আসিয়াছেও আজ্ঞা সময়ে; একেবারে বেলা বারটা কাবার করিয়া—যে সময়ে গৃহস্থ হাঁড়িকুড়ি তুলিয়া দিয়া দিবানিদ্রা দিবার ব্যবস্থা করে। আটটার ট্রেণটা 'ফেল' করিয়া কি অন্যায় কাজই হইয়াছে। সে ও সাবিত্রী না হয় একবেলা উপবাস করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু উমা আর বীপু? তাহাদের তো যা হয় কিছু দিয়া একমুঠা করিয়া খাওয়াইতে চাই-ই।

সে বৃথা চিন্তিতভাবে নিজের খোঁচা খোঁচা দাড়ীযুক্ত মুখখানায় হাত বুলাইতে লাগিল।

এমন সময় তাহাকে সে বিপদ হইতে রক্ষা করিল সাবিত্রী। একজন হিন্দুস্থানী রেলের ইউনিফর্ম গায়ে দিয়া কোথায় যাইতেছিল, তাহাকে দেখাইয়া সাবিত্রী ভূপতিকে বলিল, "এই লোকটার কাছে খবর নাও না।"

ভূপতি যেন অকূল সমুদ্রে কূল পাইল এমনি ভাবে লোকটার দিকে আগাইয়া গিয়া বলিল, "হাঁ হে, মাষ্টার মহাশয় আছেন ?"

লোকটা মাথা নাড়িয়া জানাইল যে আছেন। আশ্বাসিত হইয়া ভূপতি বলিল, "তা হলে তাঁকে গিয়ে একবার বল না যে ভূপতিবাবু এসেছেন।"

লোকটা সম্মতি জানাইয়া চলিয়া গেল এবং সে চলিয়া যাইবার পর মিনিট পাঁচেক অতিবাহিত হইতে না হইতে ভূপতি শুনিতে পাইল, ষ্টেশন-মাষ্টার চীৎকার করিতে করিতে আসিতেছেন, "সেই সকাল থেকে তোদের বলছি যে, ভদ্রলোক আসবেন নিশ্চয় আসবেন—তাঁর যখন চাকরী, তখন···তা তোরা একেবারে—" বলিতে বলিতে একেবারে ভূপতির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ভূপতিকে দেখিয়া লজ্জিত হাস্যে বলিলেন, "আরে! ভদ্রলোক বলছি কাকে! এ যে দেখছি নেহাতই ছেলেমানুষ, হা-হা-হা,"—ভদ্রলোক প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া উঠিলেন।

ভদ্রলোককে ভূপতির বেশ ভালই লাগিল। বছর পঞ্চাশ বয়স, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ী, চোখে একটা চশমা, মুখে যেন সর্ব্বদাই একটু প্রচ্ছন্ন হাসি, মনে যেন বেশ একটু সদা-প্রসন্নতার ভাব।

"তার পর, তারার কি এই গাড়ীতে আসা হল ?"

ভূপতি শুনিয়াছিল, ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ, তাহার উপর বয়সেও ভূপতির অপেক্ষা সতের আঠার বৎসরের বড়, তাই সে অগ্রসর হইয়া ভদ্রলোককে প্রণাম করিয়া বলিল, "হাঁ দাদা, এই গাড়ীতেই এলাম।"

ভূপতি নত হইতেই ভদ্রলোক ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন, বলিলেন, "আহা, থাক থাক—তা এই বারোটায় এলে কেন, সকাল আটটায় এলেই তো বেশ সুবিধা হত ?"

ভূপতি নত মুখে উত্তর দিল, "সে গাড়ীটা ফেল করেছিলাম দাদা—সেই ভোর চারটের সময় বেরুতে হয়, ছেলে-পিলে নিয়ে—"

ভূপতির কথা অর্দ্ধপথেই থামিয়া গেল। ষ্টেশন মাষ্টার তারাপদবাবু যেন কতকটা ভূপতির উপর রাগ করিয়াই বলিলেন, "দেখ দেখি যত সব ছেলেমানুষী কাণ্ড, আসতে সব কত কষ্ট হল। এই ভাদুরে দুপুরের রোদ, তুমি সকালের ট্রেনে এসে না দেখে আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি আজ আর এলেই না। তা' তোমায় বৌঠান বললে, 'তাই কি হয় ? তার চাকরী, চাকরী ফেলে সে যাবে কোথায় ? যে চাকরীর বাজার আজ কাল। বলে, প্রাণ গেলে প্রাণ পাওয়া যায়, কিন্তু চাকরী গেলে চাকরী পাওয়া যায় না। তা'ছাড়া সে যখন আসবে বলে খবর দিয়েছে তখন সে আসবেই। আমি বাপু বারটার গাড়ী না দেখে আর জল দিচ্ছি নে—হা-হা-হা।"

আবার সেই প্রাণ-খোলা হাসি। ভূপতি খুশি হইল; গাছটা শুধু বড় হইলেই হয় না, তাহার মাথাটা কাপড় হওয়াও দরকার। তাহা না হইলে, তাহাতে না আটকায় রৌদ্র, না আটকায় বৃষ্টি। নারিকেল গাছও তো প্রকাণ্ড গাছ, কিন্তু তাহাতে রৌদ্র-বৃষ্টি কিছুই আটকায় না। এমন লোকের অধীনে কাজ করিয়া সুখ আছে।

হঠাৎ সাবিত্রীর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তারাপদ বাবু বলিয়া উঠিলেন "ওই দেখ, কি ভুলো মন আমার, নিজের কথাতেই পাঁচ কাহন। বৌমা যে সেই থেকে ঠায় রোদে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সে দিকে খেয়ালই নেই। এস মা, এস···এস জ্যাঠা বাবু।"

বলিয়া তারাপদ বাবু সঙ্গের লোক দুটিকে মালপত্র সমস্ত ছোট বাবুর কোয়ার্টারে তুলিবার আদেশ দিয়া, স্বয়ং দীপুকে কোলে তুলিয়া লইলেন। দীপুকে কোলে লইতে দেখিয়া ভূপতি ব্যস্ত ভাবে বলিল, "করেন কি দাদা—ওকে নামিয়ে দিন। দেখুন দেখি, ওর পা আপনার গায়ে লাগছে।"

তারাপদ বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "দেখ তারা, আমি তোমার ওপরওয়ালা—ওপরওয়ালার কাজে বাধা দিলে চাকরী যাবে।" বলিয়া আবার শিশুর মত সরল হাসিতে দিক্ ভরাইয়া দিলেন। তাঁহার গাম্ভীর্য্য কোথায় মিলাইয়া গেল।

বাসার উঠানে পা দিতে না দিতে একজন মহিলা, "ওমা এই যে সব"—বলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং দীপুকে তারাপদ বাবুর কোল হইতে একেবারে নিজের কোলে তুলিয়া লইয়া সাবিত্রীর হাত ধরিয়া "এস ভাই এস"—বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। যেন কত দিনকার

পরিচয়, কত দিনকার আত্মীয়তা। প্রবাসী আত্মীয়-স্বজন বহু দিন পরে গৃহে ফিরিয়া আসিলে আমরা যেমন ভাবে তাহাকে আদর-যত্ন করিয়া ঘরে তুলিয়া লই, এও যেন ঠিক সেই রকম। এতটুকু সঙ্কোচ নাই, দ্বিধা নাই, বিচার নাই। সাবিত্রী তাঁহাকে নত হইয়া প্রণাম করিতেই তিনি সস্নেহে সাবিত্রীর চিবুক ধরিয়া, অঙ্গে তুড়িতে না পার এমনি ভাবে আশীর্ব্বাদ করিলেন "বর খুব ভালবাসুক।" তারপর সাবিত্রীর হাত ধরিয়া ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন "বাবা! এই বার কথা কয়ে বাঁচব, আজ তিন বছর এখানে রয়েছি, এই জনশূন্য নিরালা মাঠ, একটা কথা বলবার লোক নেই। প্রাণ যেন একেবারে খাঁচার পাখীর মত হাঁপিয়ে উঠেছিল। কোথাকার এক অলবড়ে অলক্ষেয়ে এসেছিল, না আছে তার ছেলেপিলে, না আছে বউ। সে এখান থেকে গিয়েছে না, আমি বেঁচেছি।" তার পর স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "তুমি যেন আলসেমি করে বসে থেক না। একটু জিরিয়ে স্নান করে নাও, খেতে দিই, বাছাদের মুখ সব শুকিয়ে গেছে।"

খাওয়া-দাওয়া সারিতে বেলা একটা পার হইয়া যায়।

ভূপতি একখানা ইজি চেয়ারে শুইয়া কি একখানা মাসিকের পাতা উল্টাইতেছিল এবং তারাপদ বাবু নিকটেই একখানা চৌকিতে শুইয়া তামাক খাইতেছিলেন। অন্দর-মহলে তারাপদ বাবুর স্ত্রী ও সাবিত্রী খাইতে বসিয়াছে। তারাপদ বাবু ভূপতিকে বলিলেন "সামনেই পুজো, এখন কাজের ভিড় কত, এ সময়ে তামাকে বরণী করে দেওয়া কি আর কর্ত্তাদের উচিত হচ্ছে তারা?"

তাম আসেকার অ্যাসিস্টাণ্ট ষ্টেশন-মাষ্টারটির নাম।

তারাপদ বাবু বলিলেন "এই দেখ না, আজ তিন দিন ধরে ডে-ডিউটি নাইট-ডিউটি করে আসছি, এ কি আর আমার মত কুড়ো মানুষে পারে রে দাদা? অবশ্য তাম গিয়েছে বলে যে আমার কোন রকম দুঃখ হয়েছে তা নয়। না দা, মোটেই না, বরং আমি খুসিই হয়েছি।"

তারাপদ বাবুর কণ্ঠস্বরে একটা ব্যস্ততার আভাস ফুটিয়া উঠিল। তারাপদ বাবু বলিলেন "সে দা ছেলে, তাতে তার মত ছেলে যত দূরে থাকে ততই ভাল। কথায় বলে 'কুঁড়ে বলদের চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল'।"

ভূপতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তারাপদ বাবুর দিকে চাহিল। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া তারাপদ বাবু বলিলেন "আরে কাঁটা মার, কাঁটা মার, সেটা কি একটা মানুষ, জানোয়ার জানোয়ার। একটা লক্ষীছাড়া ভবঘুরে, না আছে চাল, না আছে চুলো —জানে কেবল গোতল গোতল মদ গিলতে। বললাম 'তাম, এই বার একটা বিয়ে থাওয়া কর, আর কত কাল 'বাউণ্ডুলে' সেজে বেড়াবে?' তার উত্তর দিল কি না 'বেশ আছি।' বেশ আছিস তো থাক, মরগে যা, আমার কি।"

ভূপতি ভাবিতে থাকে। কথাগুলি নিছক রাগের বশে বলা হইল না। ইহার ভিতর বেশ একটু অভিমান, বেশ একটু দুঃখ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

ভূপতিকে নীরব দেখিয়া তারাপদ বাবু মুহূর্ত্তের জন্য অন্দর মহলের আলোচনার দিকে কাণ পাতিয়া বলিলেন, "ও আর কি শুনচ ভায়া, ও হচ্ছে মেয়েদের "অন্নপ্রাশন অধিকার"—ভূপতিও সে দিকে মনঃসংযোগ করিয়া শুনিল, তারাপদ বাবুর স্ত্রী সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কৈবাই সাবিত্রীর আর সন্তানাদি হইবে কি না। ভূপতি লজ্জিত হইল। তারাপদ বাবু বলিলেন "ছেলে পুলে হওয়ার তো ভারী সুখ। ছিল দুটো মেয়ে, বিয়েছি বিয়ে করে, একটা ছেলে নলু তাও শহরে বোর্ডিংএ থেকে পড়ে। বাস, বাড়া হাত-পা।"

ষ্টেশন-মাষ্টারের বাসার গায়েই অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ষ্টেশন-মাষ্টারের বাসা। ষ্টেশনের দুই জন লোক, তারাপদ বাবুর স্ত্রী, সাবিত্রী ও ভূপতি মিলিয়া বাসাটাকে সত্বার মধ্যে বাস করিবার উপযোগী করিয়া গুছাইয়া লইল। তারপর ভূপতি একবার ষ্টেশনের দিকে গেল। যদিও তারাপদ বাবু ট্রেনের কই, বাসা গুছাইবার হাঙ্গামা প্রভৃতি অজুহাত দেখাইয়া আজিকার মত তাহাকে ছুটি দিয়াছেন, তথাপি একেবারে ষ্টেশনের দিকে না যাওয়াটা অভদ্রতা-বিজড়িত। তাহারা আসিবার পর হইতে ভদ্রলোক তাহাদের একেবারে পরমাত্মীয়ের মত আদর-যত্ন করিতেছেন। তা ছাড়া সকলের সহিত আলাপ পরিচয়েরও সুবিধা হইবে। সুতরাং একবার যাওয়াটা নিতান্ত প্রয়োজন। যদিও সে জানে যে, তারাপদ বাবু আর তাহাকে কিছুতেই কাজে হাত দিতে দিবেন না। জোর করিয়া কাজ হাত দিতে গেলে হয় তো

বলিয়া বলিবেন "জানো, আমি তোমার 'ওপরওয়ালা', আমার কাজে বাধা দিলে তোমার চাকরী যাবে", বলিতে বলিতে হয়ত আবার শিশুর মত সরল হাসিতে দিক ভরাইয়া দিবেন। এই আত্মভোলা, সদানন্দ, স্নেহপ্রবণ লোকটিকে ভূপতি এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বেশ চিনিয়াছে।

সুতরাং পুত্র-কন্যাকে লইয়া পথ-শ্রান্তা সাবিত্রী শুইয়া পড়িল। দূরে মাঠের কোণের অন্তরালে শিয়ালগুলি মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে, মাঝে মাঝে ঝিঁঝি পোকার ঝিল্লীরবও শোনা যাইতেছে, সমস্ত আকাশটায় যেন রূপকথার নৈঃশব্দ্য আবির্ভাব হইয়াছে। অন্ধকারের মাঝে ভাল করিয়া কিছু দেখা যায় না, কেবল মাঝে মাঝে এক একটা মেশা কানের কাছে আসিয়া পি পি করিয়া সুরের ঝঙ্কার তোলে। দীপু ও উমা উত্তেজেই ভয় পায়। পাইবারই কথা, কারণ এখানে আসিবার পূর্ব্বে তাহারা যে জায়গায় ছিল, সেটা পুরাপুরি শহর। শিয়ালের চীৎকারও নাই, এমন বিরাট অন্ধকারও নাই। সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের আবহাওয়ার সহিত দীপু বা উমা কেহই পরিচিত নহে। তবে সাবিত্রীর এ সমস্ত সহিয়া গিয়াছে। সে তো আর বড় কম দিন স্বামীর সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে না। আজ বার বৎসর, সেই তের বৎসরের বেলে স্বামীর সহিত বিদেশে বাহির হইয়াছে।

প্রথম প্রথম তাহারও ভয় করিত। ভয় পাইয়া সে ভূপতির বুকে মুখ লুকাইত, আর ভূপতি 'ওই ছুঁছু' বলিয়া তাহাকে ভয় দেখাইত। সে দীপু ও উমাকে সযত্নে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বাহিরের নিরন্ধ্র অন্ধকারের পানে চাহিয়া রহিল।

প্রায় মাসখানেক পরে পূজার ছুটি পাইয়া শহর হইতে সলিল, তরফে সনু, আসিয়া হাজির হইল। আসিয়াই তাহার কাজ হইল সাবিত্রীর সহিত দেখা করিতে যাওয়া। তারাপদবাবুর স্ত্রী ছেলেকে সঙ্গে করিয়া সাবিত্রীদের বাসায় আসিলেন, বলিলেন, "এই যে ভাই তোর ভাসুর-পো, কথায় বলে না, আড় কাড় উচ্ছের আড়, এই হয়েছে ভাই। যেমন মানুষ তার তেমনই ছেলে। এদেই 'বায়না' ধরেছে—কাকীমের বাসায় চল। তা-সেলি কোথায়, ও দীপর—এই যে তোর কাকী—"

সলিল ততক্ষণে তাহার মায়ের কথা বলিবার ধরণ দেখিয়া লজ্জায় দরজার পাশে গিয়া আত্মগোপন করিয়াছে। ছেলেটা বড় লাজুক···নয় তো ছেলেটার আর সব ভাল। সলিলকে সাবিত্রীর ভালই লাগিল। বছর পনের বয়স···কিন্তু মুখে যেন তখনও শিশুর সারলা ও চাপলা দুই-ই লাগিয়া আছে।

তারাপদবাবুর স্ত্রী ছেলের হাত ধরিয়া ভিতরে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "এই বুঝি তোর কাকীর সঙ্গে দেখা করতে আসা?"—বলিয়াই কিন্তু হাসিয়া ফেলিলেন। সাবিত্রীও হাসিল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তে ঘরের ভিতর হইতে একটা বেতের মোড়া আনিয়া সলিলকে বসিতে দিল। সলিল কিছু না বলিয়া কোন গতিকে মাথা নত করিয়া মোড়ার উপর গিয়া বসিল। তারাপদ বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "তোর পোড়ারমুখে আর বাঁচিনে সাবিত্রী, একটা এইটুকুনি ছেলে এসেছে, তাকে আবার আদর-অভ্যর্থনা করে বসাচ্ছে দেখ না! যেন একেবারে নতুন জামাই এল—"

সাবিত্রী হাসিয়া বলিল, "সে বরাত কি আর করে এসেচি দিদি, নইলে মেয়েও তো আমার রয়েছে—"

তারাপদ বাবুর স্ত্রী কৃত্রিম ক্রোধে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আ মরণ, তোর আক্কেল জ্ঞান কি লা, ভাসুর-পোর শাশুড়ী হতে চাস?"

সাবিত্রী হাসিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে তারাপদবাবুর স্ত্রী বলিলেন "এখন প্রথম প্রথম, তাই অমন মাথা হেঁট করে বসে রয়েছে, যেন কতই লাজ। নইলে বাবাজীবন আমার—দাঁড়া না, দুটো দিন যাক, ভাল করে একটু আলাপ পরিচয় হ'ক, তখন এত যে লজ্জা দেখছিস, কোথায় চুলোর দুয়োরে ঘুম দিয়ে যাবে—তখন ধরি ঠাসা সামলাতে পারিস তো বলব হাঁ।"

সাবিত্রী হাসিয়া বলিল, "জলের তারে কি আর গাছ হেলে যায় দিদি?"

তারাপদবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "তা দেখা যাবে—"

এমন সময় সেখানে দীপু ও উমা আসিয়া উপস্থিত হইল। দীপু তারাপদ বাবুর স্ত্রীকে দেখিয়া জ্যাঠাইমা বলিয়া কাঁপাইয়া তাঁহার কোল দখল করিয়া বসিল, কিন্তু উমা তাহা পারিল না। অনেকদিন হইতে অবশ্য জ্যাঠাইমার কোলের অংশ লইয়া দুই ভাই-বোনে কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া

দিত, কিন্তু আজ নেহাত একজন অপরিচিতকে মোড়ার উপর বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, উমা সরল উৎসাহ হৃদয়ে এখনকার মত সমস্ত অংশটা দীপুকেই ছাড়িয়া দিল এবং স্বয়ং মায়ের কোলে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও কে মা?" তারাপদবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "ও তোর বর, বিয়ে করবি উমা?"

উমা বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে, তাহার উপর তাহার বয়স সাত বৎসর হইয়াছে, সুতরাং সে "বর" কথাটার অর্থ বোঝে। তাই সে লজ্জিত ভাবে বলিল, 'ধেৎ—"

"ধেৎ কিসা—অমন খাসা বর, তাকে তোর পছন্দ হল না, তবে তোর জন্যে কোন রাজপুত্তুর পক্ষীরাজে চেপে আসবে শুনি?"

উমা সে কথায় কান না দিয়া মা'কে বলিল, "বল না মা—"

সাবিত্রী বলিল, "ওরে তোদের ধর্ম্মি হয় রে"—

ধর্ম্মি! এমন সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত কথাটা তাহারা বোধ হয় এই প্রথম শুনিল। বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তাহারা সলিলের পানে চাহিয়া রহিল।

"আমি চল্লুম ভাই"—বলিয়া, তারাপদ বাবুর স্ত্রী চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে সলিলও দীপু ও উমাকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

এখানে আসিয়া সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা হইয়াছে বোধ হয় ভূপতির। ষ্টেশনটা ছোট, তাও আবার ব্রাঞ্চ লাইনে। সেই জন্য দিনে রাতে মোট ছয় খানি ট্রেন যাতায়াত করে। সন্ধ্যা সাতটায় ট্রেনখানি চলিয়া গেলেই নাইট ডিউটি এক-রকম শেষ হইয়া যায়। রাত বারটায় একখানা ট্রেন আছে, তবে সেখানা এখানে থামে না। সেখানা চলিয়া গেলেই একেবারে নিশ্চিন্ত। আবার কার্য্য আরম্ভ হয় তার পরদিন বেলা সাতটায়। তারাপদবাবু বলিয়াছেন, "দেখ ভায়া, এখন আমার ডিউটি, তখন তোমার ডিউটি, ও আমি বুঝিও না, ওরকম করে কাজও করতে পারব না। লোক তো আছি এখানে দুলো তুমি আর আমি মোট দু'জন, তার আর ভাগাভাগি কি করব। যে যখন পাবে সে তখন করব, কি বল?"

কথাটা সত্য এবং ভাগাভাগি করিয়া কাজ করিতে ভূপতিও রাজী নহে। সুতরাং প্রতিদিন সাতটার গাড়ীর সময়ে ভূপতিকেই টিকিট বিক্রয় করিতে দেখা যায় এবং তারাপদ বাবুকে সেই সময়টায় গড়গড়ায় নল মুখে দিয়া খোস-মেজাজে ষ্টেশনের বারান্দাটুকুতে পায়চারী করিতে দেখা যায়। আবার সন্ধ্যাবেলা বারান্দায় মাদুর পাতিয়া দুই জনে দাবা খেলিতেছেন ইহাও দেখা যায়।

এই মেলামেশা, আত্মীয়তা, ভূপতির ভালই লাগে। রাত বারটার পর ভূপতি বলে, "এইবার তা হলে চলুন দাদা, আর কি।"

"এই যে ভায়া"—বলিয়া, তারাপদবাবু গড়গড়াটার শেষ বারের মত সুখটান দিয়া সেটাকে হাতে লইয়াই উঠিয়া পড়েন। ভূপতি দরজায় তালা দিয়া আসিয়া দেখে, বাহিরে কয়লা-ঢাকা, কালো জমিটুকুর উপর তারাপদবাবু তখনও পায়চারী করিতেছেন। সামান্য এইটুকু পথ, তথাপি একা চলিয়া যান নাই, ভূপতির জন্য দাঁড়াইয়া আছেন। ভূপতি আসিয়া পৌঁছিলে, দুইজনে একসঙ্গে বাসার দিকে অগ্রসর হন।

সাবিত্রী ঘর দোর গুছাইতে থাকে, ভূপতির ডাকাডাকিতে উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দেয়। কোন কোন দিন দুইজনে ভিতরে চলিয়া যায়, আবার কোন কোন দিন সাবিত্রী বলে, "আজ যে বড় ন'টার সময় খেতে এলে না?"—উত্তরে ভূপতি কোন দিন কিছু না বলিয়া গম্ভীরভাবে ভিতরে প্রবেশ করে, আর তাহার পিছনে পিছনে সাবিত্রী আপন মনে বকিতে বকিতে যায়, "এই রাত দুপুর, এখন কতকগুলো ঠাণ্ডা-কড়কড়ে ভাত খেয়ে একটা অসুখ বিসুখ বাধাও আর কি।" আবার কোন কোন দিন ভূপতি হাসিয়া বলে, "আজ ও-বাড়ীতে খেয়ে এসেছি।"

ও-বাড়ীতে অর্থাৎ তারাপদ বাবুর বাসায়।

তাহা হইলেই গোলমাল বাধে। সাবিত্রী চোখ মুখ পাকাইয়া বলে, "এঃ! রোজ রোজ উনি ও-বাড়ীতে খেয়ে আসবেন, আর আমার ভাতের কাঁড়ি নষ্ট হ'বে···দাঁড়া তো রে, দেখাচ্ছি মজা! যে খেয়েছে, আর যে খাইয়েছে—দুজনকেই মজা দেখাচ্ছি।"

ভূপতি হাসিতে হাসিতে ভিতরে প্রবেশ করে।

বাসা দুইটা পাশাপাশি, একেবারে গায়ে গায়ে। এ বাসা হইতে কথা বলিলে ও-বাসায় শোনা যায়। সাবিত্রী বুঝিতে পারে যে, ভূপতি যখন বাসায় ফিরিয়াছে, তখন তারাপদবাবুও নিশ্চয় ফিরিয়াছেন এবং তাঁহাকে দরজা খুলিয়া দিতে তাঁহার স্ত্রীও উঠিয়াছেন। তাই সে চীৎকার করিয়া ডাকে, "দিদি—অ দিদি!"

তারাপদ বাবুর স্ত্রী বোধ হয় সাবিত্রীর ডাকিবার কারণটা বুঝিতে পারেন না, তাই কতকটা অবহেলার সুরেই উত্তর দেন, "কি রে! রাত দুপুরে আবার চেঁচামেচি করছিস কেন?"

"ভাত আবার খাইয়ে দিয়েছ তো?"

সাবিত্রী হাসিয়াছে বুঝিয়া তারাপদ বাবুর স্ত্রী মনে মনে বেশ একটু হাসিয়া বলেন, "বেশ করেছি—তোর হিংসে হচ্ছে না কি?"

"হচ্ছেই তো", সাবিত্রী বলে, "তারপর এখন আমার এই ভাতের কাঁড়ি কি করি বল দেখি?"

ওদিক্ হইতে উত্তর আসে, "কেন, তুই খা।"

সাবিত্রী ধড়াম করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া বলে, "বয়ে গেছে; এই রইল ভাতে জল দেওয়া। কাল সকালে যদি তোমার দেওর ওই পাড়া ভাত না খায়, তাহলে দেওর-ভাত দুজনারই মরা মেখিয়ে দেব।"

ওদিক হইতে উত্তর আসে, "তাই দিস, এখন তো ঘুমো গে যা।"

সলিল সম্বন্ধে তারাপদবাবুর স্ত্রী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই সত্য; প্রথম সাক্ষাতের সময় সলিলকে যতখানি শান্তশিষ্ট বলিয়া মনে হইয়াছিল, সে যে আদৌ তাহা নহে তাহার পরিচয় সাবিত্রী দু-একদিনের মধ্যেই পাইল। তথাপি ছেলেটাকে সাবিত্রীর ভাল লাগে। কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুলের রাশি। সে যখন তখন আসিয়া বলে, "কাকীমা, তোমার কি আছে শীগ্‌গির বার কর, ভয়ানক খিদে পেয়েছে, উঃ!" বলিয়া সে এমন মুখের ভাব করে যে সাবিত্রী না হাসিয়া থাকিতে পারে না। তবে বড় বিশেষ কিছু সংগ্রহ হয় না। পাড়া-গাঁ যায়গা, সেখানে খাবার বলিতে মুড়ি, মুড়ির চাক, ছোলার ছাতু, কখনো, ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। এতটুকু ভাল খাবার দরকার হইলে সেখানে—হয় পার্শ্বের স্থান হইতে আনাইয়া লইতে হয়, অথবা নিজেদের পঁচিশ মাইল দূরবর্তী শহরে গিয়া তবে আনিতে হয়। সুতরাং সলিল সাবিত্রীর ভাণ্ডার হইতে বড়-জোর এক মুঠা মুড়ি অথবা দু-একটা নারিকেল নাড়ু সংগ্রহ করিতে পারে, এবং সংগৃহীত হইলেই তাহা মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া বলে, "নম শিবায়।"

সাবিত্রী হাসিয়া ফেলে। বলে, "বাবা, তুই কি হনুমান যে তোর পেট ভরাবার জন্যে 'নম শিবায়' বলতে হয়?"

সলিল চোখ মুখ পাকাইয়া বলে, "নই কেন, দেখবে, দেখবে কাকীমা, একলাফে সাগর লঙ্ঘন করব। আমি কি আর লাল-মুখো বর্কট, আমি বীর হনুমান।"

সাবিত্রী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেও সাগর লঙ্ঘন করিবার কথা শুনিয়া মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠে, এখনই হয়ত প্রলয় তাণ্ডব সুরু হইবে! তাই সে মিনতির সুরে বলে, "রক্ষে কর বাবা, আর তোমাকে সাগর লঙ্ঘন করতে হবে না; আমি এমনিতেই বেশ বুঝতে পারছি, তুমি বীর হনুমান।" আর দীপু ও উমা তো সলিলের সর্ব্বদা সঙ্গের সাথী। এক দণ্ডও তিন জন তিন জনকে ছাড়িয়া থাকা চলে না। অবশ্য ইহার জন্যও সলিলই কতকটা দায়ী। সে-ই দীপু ও উমাকে লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের নিকটতম আত্মীয় হইয়াছে। অবশ্য সাবিত্রী অথবা ভূপতি কেহই তাহাতে বাধা দেয় নাই। এই দুইটি অবোধ বালক-বালিকার উপর সলিলের আদর ও অত্যাচার দুই-ই চলে। পূজার সময় এদিকে কোথাও প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা হয় না বলিয়া সলিলই উদ্যোগী হইয়া দীপু ও উমাকে ঠাকুর দেখাইয়া আনে। আবার কাশ-ফুলের চামর প্রস্তুত করিতে গিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিলে সে-ই দীপু ও উমাকে ঠাস ঠাস করিয়া চেঁড়াইয়া দেয়; আবার প্রহারের আতিশয্যে বালক-বালিকা দুইটি কাঁদিয়া ফেলিলে সে-ই কোলে তুলিয়া লইয়া আদর করে।

রক্তের সম্বন্ধ না থাকিলেও ক্রমে ক্রমে দুইটি অনাত্মীয় পরিবার বিদেশে আসিয়া ধীরে ধীরে পরমাত্মীয় হইয়া পড়ে। হয় তো একেবারেই আপন হইয়া যাইত, কিন্তু বাদ সাধিলেন স্বয়ং ভগবান। হঠাৎ এক দিন সংবাদ আসিল, রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ ভূপতির কাজে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ষ্টেশন-মাষ্টারের পদে উন্নীত করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি ছোট ষ্টেশনে বদলী করিয়াছেন। চাকুরীতে উন্নতি লাভ, ইহা

অপেক্ষা বাঙালীর বাস্তব জীবনে আর কিছু কাম্য নাই, সুতরাং এ সংবাদে খুশি হওয়া উচিত; কিন্তু এই ক্ষুদ্র পরিবারটি খুশি হইল না, বরং আসন্ন বিচ্ছেদের কথা কল্পনা করিয়া মুহূর্তে অভিভূত হইয়া পড়িল। তারাপদ বাবুর স্ত্রী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "বেশ ছিলাম সাবিত্রী তোকে নিয়ে, আবার কোথা থেকে কোন হতভাগা-হতভাগী আসবে তা কে জানে!"

সে ভয়টা উভয়তঃ; এখানে যে স্নেহ-ছায়ায় সাবিত্রী ছিল, তাহা সে মুখে কোন দিন স্বীকার না করিলেও মনে মনে বেশ জানে যে, যত ভাল মানুষই হউক না কেন, এমনটি আর পাওয়া যাইবে না। ভূপতিও একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "বেশ ছিলাম, এখন বরাতে কি আছে তা কে জানে।"

কিন্তু সময় তো কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না, সে নিজের গতিতে ছুটিয়া চলে, পৃথিবীতে কাহারও জন্য তিলার্দ্ধও অপেক্ষা করে না। সুতরাং এক দিন বিদায়ের দিন আসিল।

দুইটি পরিবারের মধ্যে বিচ্ছেদের ব্যথা ঘনীভূত হইয়া দেখা দেয়। তারাপদ বাবুর কাজ ভুল হইয়া যায়, বার বার ভূপতির কাছে আসিয়া বলেন "দেখ তো ভায়া। আমার মাথা খারাপ হল নাকি, না আমি সেভিং রিসিভিং ভুলে গেলাম—যত সব হচ্ছে"—ভূপতি ছুটিয়া যায় এবং ঠিক মত সংবাদ গ্রহণ করিয়া তাহার জবাবও দেয়। না, তারাপদ বাবুর মাথাও খারাপ হয় নাই এবং তিনি টেলিগ্রাফও ভুলিয়া যান নাই। তবে কি যে হইয়াছে তাহা বুঝিতে ভূপতির বিলম্ব হয় না। সে এই স্নেহপ্রবণ, উদারহৃদয় বৃদ্ধের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠে।

বিদায়ের সময় চোখে জল আসে, তাহা আপনা হইতেই হারাইয়া যায়। শুধু সূর্য্য-তপ্ত মত উজ্জ্বল অশ্রুবিন্দু চোখের কোণে টল টল করিতে থাকে।

দীপুকে নিজের কাছে টানিয়া বসাইয়া, ট্রেনের জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া সাবিত্রী সলিলকে বলিল, "ছুটি-ছাটা পেলেই আমাদের ওদিকে যেয়ো বাবা—"

সলিল অস্ফুটস্বরে কি বলিল, তাহা ঠিক বোঝা গেল না।

তারাপদ বাবু ভূপতিকে বলিলেন, "গিয়ে একখানা পৌঁছানো সংবাদ দিতে যেন ভুলে যেও না ভায়া—"

তারাপদ বাবুর স্ত্রী সাবিত্রীকে বলিলেন, "সাবিত্রী, এই দিদিটাকে যেন ভুলে যাস নে ভাই—"

অশ্রুসজল দৃষ্টি মেলিয়া সাবিত্রী বলিল, "ভুলতে যে পারব না দিদি।"

বলে বটে "ভুলতে পারব না," কিন্তু একদিন ভুলিয়া যায়-ই। সংসারে চলার পথে মানুষের কত মানুষের সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটে, মানুষ সে কথা মনে করিয়া রাখিতে পারে না। মানুষ শুধু মানুষই, দার্শনিক নহে। তাই যাহা কিছু অতীত, যাহা কিছু গত, তাহা সহজেই ভুলিয়া যায়। যাহা বর্ত্তমান তাহাকে অবলম্বন করিয়া বিপুল পৃথিবীর পথ বাহিয়া আগাইয়া চলে। হয় তো প্রথম প্রথম দু' একবার পিছন পানে চাহিয়া দেখে—পিছনে ফেলিয়া আসা লোক কয়টির সহিত হয় তো প্রথম প্রথম কিছুদিন পত্র-লেখালেখি চলে, কিন্তু ক্রমেই সব লুপ্ত হয়। তাই সাবিত্রী ভুলিয়া যায় তাহার দিদিকে—দীপু, উমা ভুলিয়া যায় সলিলকে,—ভূপতি ভুলিয়া যায় তারাপদ বাবুকে। নূতন লোকের সহিত আবার নূতন করিয়া আত্মীয়তা স্থাপন করে। প্রথম প্রথম হয় তো একটু বাধে, তার পর সব ঠিক হইয়া যায়, এবং ইহাই নিয়ম।

---

## সমাজের উপকার

...যাঁহারা জন্ম করেন যে, হিটলার, মুসোলিনী, ষ্টালিন, লেনিন, মার্ক্স প্রভৃতি মানুষ সমগ্র মনুষ্য-সমাজের জন্য অথবা অন্ততঃ তাঁহাদিগের নিজেদের দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য ভাবিয়া থাকেন অথবা ভাবিয়াছেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। পাপ পুণ্যের সংজ্ঞানুসারে ইঁহারা প্রত্যেকেই আত্মবিক পরিমাণে অতি-পাতকী ও মহাপাতকী। ইঁহাদিগের দ্বারা দেশের কোন মানুষের যথার্থ হিত সাধিত হইতে পারে না। যত যত ভাবে দেখিলে আপাতদৃষ্টিতে ইঁহারা কাহারও কাহারও উপকার করিতেছেন বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু আমূল বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ইঁহারা কাহারও যথার্থ পক্ষে কোন উপকার সাধন করিতে পারিতেছেন না।...

# ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস

— শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

(৫)

গত শীতের মাসে আমরা ১৮৮৫ সালের প্রথম ভাগে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। এই বৎসরই কংগ্রেসের জন্ম-বৎসর। আমরা পূর্ব্বাপর দেখিয়াছি, প্রজাশক্তির উন্মেষণেই জাতীয়তার পরিপুষ্টি হইয়া থাকে। এই ঘটনা-বৈচিত্র্যেই কংগ্রেসের উৎপত্তি। দেখিয়াছি, যখনই প্রজাশক্তি আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় শির উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতে চায়, রাজশক্তি তখনই উহা নিষ্পেষণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। এই সংঘর্ষণের পরিণামেই আমাদের শক্তির বৃদ্ধি ও পুষ্টি। পূর্ব্বাপর ঘটনা-বৈচিত্র্য দেখিলেও সেই ধারণাই প্রমাণিত হয়। এবং অতঃপর আপামর সাধারণের অভাব এবং দারিদ্র্যকে কেন্দ্র করিয়া যে অদূরভবিষ্যতে একটী জগদ্ব্যাপী ভীষণ আন্দোলন উত্থিত হইবে—নিশ্চয়ই হইবে—তাহাও গভর্ণমেণ্ট এবং দেশের নেতৃবৃন্দের ঔদাসীন্যের ফলেই ক্রমে ক্রমে অপরিসীম শক্তিসঞ্চয় করিয়া একদিন দুর্দ্ধার হইয়া উঠিবে।

এই সংঘর্ষ ও ঔদাসীন্যের ফলেই ১৮৫০ সালে ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রথম উন্মেষণ সম্ভব হয়। এই জন্যই ১৮৭৫ সালে ইণ্ডিয়ান লিগের উৎপত্তি।* ইহার জন্যই আবার ভারত সভারও ( Indian Association ) ১৮৭৬ সালে সংগঠন। আবার যখন ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড লীটন নানাকারণে প্রজার অসন্তোষ বিধান করেন, পুনরায় প্রজাশক্তি মাথাচাড়া দিয়া উঠে। ১৮৮০,১৮৮৪ সালেও আবার লর্ড রীপনের সৎ উদ্দেশ্য যখন পণ্ড হইয়া যায়, সমস্ত অনাচার নিবারণের জন্য জাতীয় কংগ্রেস আপনার গৌরবে আপনিই অপূর্ব্ব কলেবর ধারণ করিতে সমর্থ হয়। এই সম্বন্ধে সেই সময়কার একখানি প্রতাপশালী মাসিক পত্রও জনসাধারণের প্রাণের কথা এবং "কংগ্রেসের" উদ্ভবের কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন। উহা উক্ত পত্রিকার সম্পাদকের কথায়ই বিবৃত করিতেছি :—

"ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের রাজনীতি, কিয়ৎ পরিমাণে অজ্ঞতার ফলে আর কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার ফলে বিষম দূষিত। এই মল-প্রক্ষাল দূরীকরণ জন্য ভারতবর্ষে প্রজানীতি সংগঠন ও সংস্থাপন করা একান্ত আবশ্যক। য়ুরোপীয় রাজনীতি সংস্করণের এমন কার্য্যকর যন্ত্র, এরূপ কার্য্যকরী মসলা আর নাই।"

"লর্ড লীটন হঠাৎ অস্ত্রের আইন ও সংবাদ-পত্রের আইন দেশ মধ্যে প্রচলিত করাতে প্রজার মধ্যে যাহারা ইউরোপীয় রাজনীতির যৎকিঞ্চিৎ শিখিয়াছিল তাহারা বুঝিল, রাজার কাছে ভারতীয় প্রজা একেবারে নগণ্য নহে। লর্ড রীপনের সময় ইলবার্ট বিলের ঘোরতর আন্দোলনের অবসরে আবার বুঝিবার প্রজারা বুঝিল যে ইংরাজ জাতি সহজে ভারতবর্ষের প্রজাবৃন্দকে আপনাদের সঙ্গে সমান স্বত্ব বা অধিকার প্রদান করিবেন এমন আশা করাই ভুল। রাজনীতির সহিত প্রজানীতির রীতিমত নিয়ত সংঘর্ষণ আবশ্যক। সেই জন্য সুচারুরূপে প্রজানীতির সংগঠন ও সংস্থাপন আবশ্যক।

"লর্ড রীপনের বিদায় কালে ভারতীয় সমগ্র প্রজা কৃতজ্ঞতা-ভরে এক হৃদয়ে অভ্যুত্থান করেন; রীপনের শত্রুপক্ষ অনুদার ইংরাজদল চমকিয়া গেল। সমঝদার লোকে সেই চমকে বুঝিতে পারিল ইউরোপীয় প্রথায় ভারত ও প্রজানীতি সংগঠন করা সম্ভব।"

তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে কংগ্রেসই ভারতের আদি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হয়। একটা প্রকাণ্ড শক্তি-শালী সংঘ গড়িয়া উঠিবে বলিয়াই বোধ হয় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ও অবস্থার আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমবায়ী জাতীয় প্রতিষ্ঠানে

---

* শিশিরকুমার ঘোষ এবং অন্যান্য বন্ধুবর্গ ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। শিশিরবাবু লিগের সম্পাদক হন। অক্টোবর মাসে বেঙ্গল ফিজিয়োলজিক্যাল সভা হইতে লীগ পরিচালিত হয়। সভাপতি ডিলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার।

* নব জীবন ৪র্থ ভাগ, কার্ত্তিক ১২৯১, ৪র্থ সংখ্যা।

উহার অনুপাতা সূচিত হইতেছিল ("Coming events cast their shadows before")। বস্তুতঃ বাঙ্গলা দেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশেই অন্যান্য জনশক্তির উদ্ভব হইতেছিল। বাঙ্গলায় স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি যে অনুষ্ঠানের সহিত বিশিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন, সেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রথম হইতেই কম কাজ করে নাই। 'কালা আইনে Black Acts'-এ ইহার উদ্ভব, আর নীলবিদ্রোহে উহার খ্যাতি বাড়ে। বস্তুতঃ নীলকর-অত্যাচার নিবারণে এই সভার কার্য্য ও আয়োজন খুবই লোকহিতকর ও প্রশংসনীয় হইয়াছিল। সময়ের স্রোতে ক্রমে যখন উহা জমিদার-সভায় পরিণত হইল, সাধারণ ব্যক্তির প্রবেশের সম্ভাবনা রহিল না, ক্রমে রাজভক্তির মাত্রাও একটু বৃদ্ধি পাইল, তখনই ইণ্ডিয়ান লীগ ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উদ্ভব হইল। প্রথমটী জলবুদ্বুদের ন্যায় স্বল্পকাল-স্থায়ী হয়। আর দ্বিতীয়টী অনেকদিন পর্য্যন্ত সভা-সমিতির সহায়তার ও একটী জাতীয় মতের সৃষ্টি করিয়া স্থানে স্থানে ভারতীয়-গণের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইয়াছিল। প্রথমটীর অনুষ্ঠাতা ছিলেন শম্ভু মুখার্জ্জি (সভাপতি), কালী-মোহন দাস (সম্পাদক) ও শিশিরকুমার ঘোষ (সহকারী সম্পাদক)। অবশ্য শেষোক্ত ব্যক্তির নামের সহিতই ইহার ঘনিষ্ঠ সংস্রব সূচিত হইয়াছিল। আর দ্বিতীয়টীর অনুষ্ঠাতা ছিলেন আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ সরকার প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের ন্যায় পশ্চিম ভারতেও বোম্বাই এসোসিয়েশন (The Bombay Association) জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ ও দাদাভাই নৌরজী-কর্ত্তৃক কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসো-সিয়েশনের কিছু পরে স্থাপিত হইয়া কাজ করিতে অগ্রসর হয়। জগন্নাথ শেঠ মহাশয় ওকালতি করিতেন ও ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই আইন-সংসদের (Bombay Legislative Council) সভ্য ছিলেন। ভারতের বৃদ্ধ প্রবীণ নেতা দাদাভাই নৌরজীর নাম কে না শুনিয়াছে? ক্রমে তিনিই ভারতীয় কংগ্রেসের প্রধান স্তম্ভ হইয়া উঠেন। অতঃপরে মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, নৌরজী ফারদুনজী প্রভৃতি এই সমিতির প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করেন। বাঙ্গলায় যেমন রামগোপাল ঘোষ ও কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি বিশেষ লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়া-ছিলেন, ইঁহারাও বোম্বাইতে সেইরূপ ছিলেন।

"পুণা সার্ব্বজনীন সভা"ও অপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

"পুণা সার্ব্বজনীন সভা"ও সাধারণের জাগরণে বিশেষ সহায়তা করে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে গণেশ বেও যোশী কর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। যোশীজী যে ১৮৭৭ সালে দিল্লী দর-বারের সময় ও পর বৎসরে কলিকাতায় বিশেষ কাজ করেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার সেই প্রযত্নের ফলেই স্বল্পকালমধ্যে কংগ্রেস অঙ্কুরিত হয়। পরে রাও বাহাদুর কৃষ্ণজী লক্ষ্মণ নূলকর (K. L. Nulkar) ও নীতারামহরি চিপলাঙ্কার প্রভৃতিও ইহাতে বেশ কাজ করেন।

মাদ্রাজেও প্রথমে রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে একটী সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কিন্তু পরে 'হিন্দু' পত্রিকার প্রতিষ্ঠায়, ১৮৭৮ সাল হইতে জাতীয়তার প্রচার আরম্ভ হয়। প্রসিদ্ধ আনন্দ চার্লু, এম, বীররাঘবাচারী, রবিন্দ্র নাইডু, জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার, এম সুবারাও পান্তলু প্রভৃতি ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তাঁহারাই উক্ত পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

মাদ্রাজ মহাজন সভা ১৮৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা একবার প্রাদেশিক সম্মিলনীও হইয়াছিল।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েশন ১৮৮৫, ৩১ জানুয়ারী, কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গ, বদরুদ্দিন তায়েবজী (পরে উভয়েই বোম্বাই হাইকোর্টের জজ্) এবং স্যার ফেরোজ শা মেটা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আর একটী রাজনৈতিক অনুষ্ঠান।

সমস্ত ভারতে প্রায় একই সময়েই যেন একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। তবে একথা ঠিক যে বঙ্গদেশের ঘটনা-স্রোতই বিশেষ ভাবে সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহায়তা করে।

এতদ্ব্যতীত বিলাতে পার্লামেণ্টের সভ্যগণের মধ্যে জন ব্রাইট, হেনরী ফসেট, চার্লস্ ব্রাড্‌ল প্রভৃতি ভারতবন্ধু মনীষিগণ ভারতীয়গণের ন্যায্যাধিকার—তাহাদের প্রতি প্রাপ্তানুমোদিত সমদর্শিতা ও তাহাদিগকে বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য-ভার প্রদান করিবার বড়ই পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইলবার্ট বিলের পক্ষে ছিলেন,

আর প্রধান মন্ত্রী লর্ড সলসবেরী যে তুরস্কের সুলতানকে ইংরেজ বলিয়া 'বল (Bull)' পাটিতে আহ্বান করিয়াছিলেন ও সেই সমস্ত ব্যাপার ভারতের স্কন্ধেই চাপাইয়া দেন, তাহাতেও ইঁহারা সেই ঘোর অন্যায়ের যথেষ্ট প্রতিবাদ করেন। আর যে যে মহানুভব ইংরাজ স্বদেশে থাকিয়া ভারতীয়গণের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার প্রদর্শনে একান্ত অনুরাগী ছিলেন, তন্মধ্যে জেমস্ ক্যাকিল (James Cavill), স্যার উইলিয়াম হাণ্টার, লর্ড ডাফরীণ, আর. টি. রীড, ও মিঃ ব্লাণ্ট প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এদেশের সিভিলিয়ানগণের মধ্যে স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন, স্যার হেনরী কটন ও মিঃ আর্থার অক্টেভিয়াস হিউম প্রভৃতিও সর্ব্বদাই মনে করিতেন যে, ভারতের স্বার্থের সহিত তাঁহাদের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত। হিউম সাহেবকেই কংগ্রেসের জনক বলা যাইতে পারে। ভারতীয়গণের হিতসাধনের জন্য তিনি লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের পদ পর্য্যন্ত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতীয়গণ পুনরায় কোন আন্দোলনের চক্রে আকৃষ্ট হইয়া আবার সিপাহী-বিদ্রোহের ন্যায় জাতির অমঙ্গল-জনক কোন আন্দোলন বা বিদ্রোহরূপ ব্যাপারে জড়িত হইতে পারে। তাই তাহাদিগকে সুসঙ্গত আন্দোলনের গণ্ডীর মধ্যে রাখিবার উদ্দেশ্যেই তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে খুবই হিতকর ও সুবিধাজনক কার্য্য যে হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতীয়গণের পক্ষেও ইহা কম হিতকর হয় নাই। যে সময়ে ভারতবাসিগণের আন্দোলনমাত্রই রাজদ্রোহ-জনিত আশঙ্কায় ভীতি সঞ্চার করিত, সেই নব উদ্যমের প্রারম্ভে হিউম সাহেবের ন্যায় একজন প্রকৃত ভারত-হিতৈষী শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানের সহায়তা ভিন্ন ভারতীয়গণের কোন চেষ্টাই ফলপ্রসূ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। গভর্ণমেণ্ট এবং ভারতবাসী এতদুভয়ের হিতার্থই হিউম সাহেব নিজে বিলাত গিয়া লর্ড ডাফরিণ প্রভৃতি ইংরাজগণের সম্মতি লইয়া আসিয়াছিলেন। লর্ড ডাফরিণও অনুষ্ঠাতাগণকে সহযোগিতায় বঞ্চিত না করিয়া খুবই বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছিলেন। এইজন্যই লর্ড ক্যানিংয়ের 'মানব-হস্ত-পরিমিত মেঘখণ্ড' দেখিয়াও আর তাঁহাকে ভয় পাইতে হয় নাই। কিন্তু হিউম সাহেব গভর্ণমেণ্টের পরম বন্ধুর কার্য্য করিলেও এদেশবাসিগণকে যে প্রকৃতই আপনার দেশবাসী মনে করিতেন এবং তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শনে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই, প্রথম অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে দেশীয় গ্র্যাজুয়েটগণকে উদ্দেশ করিয়া যে একান্ত কাতর ও আকিঞ্চনের ভাবে আবেদন করেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইতেছে। একদিন যেমন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বালগঙ্গাধর তিলক বা মহাত্মা গান্ধী ছাত্রগণকে স্বার্থত্যাগে জাতির উন্নতি সাধন করিতে উৎসাহিত করিতেন, হিউম সাহেবও কংগ্রেস উদ্বোধনের সময়ে সেইরূপ সংসারে প্রবেশোন্মুখ প্রবীণ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন :

"তোমরা শিক্ষিত, প্রাপ্তবয়স্ক ও পরিণতমস্তিষ্ক। আজ হউক কাল হউক, তোমাদের উপরেই ভবিষ্যতি বালকগণের মস্তিষ্ক পরিচালনা করিবার ভার ন্যস্ত হইবে। ভাবিয়া দেখ, তোমাদের দায়িত্ব কত মহৎ। তোমরাই যদি এখন নির্ব্বুদ্ধিতা ও জড়তার প্রতিমূর্ত্তি হও, যদি নিজ নিজ ব্যাপারে এত স্বার্থান্ধ হইয়া উঠ যে, দেশের হিতকল্পে অঙ্গুলি সঞ্চালনেও ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়, তবে ইংরাজ যে তোমাদিগকে দাসের ন্যায় পদদলিত রাখিয়াছে, তাহা তাহার খুব সুবুদ্ধির কার্য্য বলিতে হইবে।

"ইহাতে সভ্যই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তোমাদের ন্যায় অসার ও জড়-প্রকৃতি ব্যক্তিগণের প্রতি ইহা অপেক্ষা অধিকতর সদ্ব্যবহার শোভা পায় না। সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক জাতি স্ব স্ব শক্তি-অনুযায়ী শাসন-ক্ষমতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। তোমরাই তোমাদের জাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষা ও দীক্ষায় শ্রেষ্ঠ। তোমরা যথেষ্ট জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমরাই জাতির শিরোদেশ অধিকার করিয়াছ। তোমরাই যদি সুখলিপ্সা ও স্বার্থানুযায়ী ব্যাপারে লোক পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের নিজেদের শাসন-ব্যাপারে অধিকতর স্বাধীনতা ও জাতিনিষ্ঠ শাসন পাইবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ না হইতে পার, তাহা হইলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তোমাদের হিতৈষী ইংরাজগণ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তোমাদের জন্য পণ্ডশ্রম করিতেছেন, লর্ড রীপনের মহৎ উদ্দেশ্য এবং আকাঙ্ক্ষা নিষ্ফল ও আকাশ-কুসুমের ন্যায় অসম্ভব হইয়াই পড়িবে, আর ভারতের

পক্ষগণের কথাই ঠিক হইবে—যে, এরূপ অসার জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার আর কোন সম্ভাবনা নাই, তাহার জন্য কোন প্রকৃষ্টতর শাসনের কোন প্রয়োজনও নাই আর তাহাতে তাহাদের বিন্দুমাত্র যোগ্যতাও নাই। তোমরা যদি এইরূপ নির্জ্জীব থাকিতেই অভিলাষী হইয়া থাক, তবে তোমাদের প্রতি অসদ্ব্যবহার বা অন্যায় ব্যবহারের জন্য তোমাদের অভিযোগ বা নিষ্ফল ক্রন্দন করিবার তোমাদের আর কোন অধিকার নাই। যদি দেশের জন্য তোমরা ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগও করিতে না পার, যদি লোভ পরিত্যাগ করা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়, যদি বিলাস বর্জ্জন করিতে তোমরা কাতর হও, তবে আমি নিশ্চিত বলিতেছি যে পরাধীনতার দণ্ডই যেন আজন্ম তোমাদিগকে নিষ্পেষিত করিয়া রাখে। আর যে স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতি-বাৎসল্য ইংরাজের প্রধান ভূষণ, যাহার অভাবে প্রতিযোগিতায় তোমরা নিয়ত চাকুরী হইতে বঞ্চিত হইতেছ, সেইরূপ স্বদেশ-প্রেম ও দেশবাৎসল্য না থাকায় তোমাদের বৃথা অভিযোগ করিবার কোন অধিকার নাই। আর সাবধান করিয়া দিতেছি যে, আমাদিগকে যেন সেরূপ অভিযোগ আর কখনও আমাদের কর্ণগোচর করিতে না হয়।"*

যাহা হউক পুণার সার্ব্বজনীন সভার উদ্যোগে কংগ্রেসের অধিবেশনের কার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইলে, মণ্ডপ ও থাকিবার ব্যবস্থা প্রভৃতি শেষ হইয়া গেলে, পুণায় ভীষণ কলেরার প্রকোপ হয়। অমনি ফার্গুসন কলেজের অধিবেশনের উদ্যোগে এবং গোখলেদের ডেকান সংস্কৃত কলেজের কর্তৃপক্ষের উদারতায় সেখানেই কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সমস্ত ব্যবস্থা হইয়া গেল। সমুদ্রতীরে, অলীকের আবহাওয়ার মধ্যে, ভারতীয় মহাসম্মেলনের প্রথম অভ্যুদয়। সভা হয় গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোডের (Gowalia Tank Road) উপরে। প্রতিনিধিগণ কলেজের বোর্ডিং-গৃহে সেই কয়দিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

সাতাশে ডিসেম্বর সকালের মধ্যে সবই প্রস্তুত হইয়া যায় এবং বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রায় শতাধিক ব্যক্তি উপস্থিত হন। গবর্ণমেণ্টের অনেক উচ্চ-কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সম্মেলনের কার্য্যে যোগদান করেন নাই। তবে এই প্রথম বৎসরেই ৭২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হন। ঐ দিন অপরাহ্নে স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ, জাষ্টিস জার্ডিন, কর্ণেল কেল্‌পস্, প্রফেসার ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ † প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আসিয়া প্রতিনিধিবর্গকে অভ্যর্থনা ও সম্প্রীতি জ্ঞাপন করেন।

* And even if the leaders of thought are all either such poor creatures or so selfishly wedded to personal concerns that they dare not strike a blow for their country's sake, then justly and rightly are they kept down and trampled on, for they deserve nothing better. Every nation secures precisely as good a Government as it merits. If you, the picked men, the most highly educated of the nation, cannot—scorning personal ease and selfish objects—make a resolute struggle to secure greater freedom for yourselves and your country, a more impartial administration and a larger share in the management of your own affairs, then we your friends are wrong and your adversaries right, then all Lord Ripon's noble aspirations for your good are fruitless and visionary; then, at present at any rate, all hopes of progress are at an end; and India truly neither looks nor deserves any better Government than she enjoys. Only, if this be so, let us hear no more factions, peevish complaints—complaints that you are kept in leading strings and treated like children, for you will have proved yourself such. Men know how to act; let there be no more complaints of Englishmen being preferred to you in all important offices: for, if you lack that public spirit, that highest form of altruistic devotion that leads man to subordinate private ease to the public weal, that patriotism that has made Englishmen what they are,—then rightly are these preferred to you, rightly and inevitably have they become your rulers. And rulers and task-masters they must continue; let the yoke gall your shoulders never so sorely until you realise and stand prepared to act upon the eternal truth that self-sacrifice and unselfishness are the only unfailing guides to freedom and happiness.

† ইনি বোম্বাই এলফিন্‌ষ্টোন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য :

বাঙ্গালা—ডব্লিউ. সি. বোনার্জি, নরেন্দ্রনাথ সেন, জানকীনাথ ঘোষাল, মনোমোহন ঘোষ ও তাঁহার পত্নী* প্রভৃতি। জানকী বাবু এলাহাবাদ হইতে প্রতিনিধি হইয়া আসেন।

সিন্ধ—মিঃ হিউম্।

পুণা—ডব্লিউ এস্. আপ্তে ও জি. জি. আগরকার।

লাক্ষ্ণৌ—গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা।

বোম্বাই—দাদাভাই নৌরজী, কাশীনাথ ত্রাম্বক তেলাঙ্গ, ফেরোজ শা মেটা, ডি. ই. ওয়াচা, বি. এম. মালাবারি, এন্. জি. চন্দ্রভারকর।

মাদ্রাজ—পি. আর. নাইডু ( মহাজন-সভার সভাপতি ; এস্. সুব্রাহ্মণ্য আয়ার , এম্. বীররাঘবাচারিয়া।

অনন্তপুর—পি. কেশব পিলে।

এতদ্ব্যতীত সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহানুভূতি দেখাইবার জন্য উপস্থিত হন :

মাদ্রাজের ডেপুটী কালেক্টর সংস্কারক দেওয়ান বাহাদুর আর. রঘুনাথ রাও, অনারেবল মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, ( পুণার ছোট আদালতের জজ, পরে বোম্বাই হাইকোর্টের জজ ), আগ্রার লালা বৈজনাথ, প্রেসিডেন্সি কে. সুব্বর রমণ এবং আর. জি. ভাণ্ডারকর।

পুণার সার্ব্বজনীন সভার সাপ্তাহিক মুখপত্র জ্ঞানপ্রকাশ, বাম্বহাট্, কেশরী, নববিভাকর, ইণ্ডিয়ান মিরার, দি নেসিন, দি হিন্দুস্থান, দি ট্রিবিউন, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন, স্পেকটেটর, ইন্দুপ্রকাশ, দি হিন্দু, দি ক্রেসেন্ট্ প্রভৃতি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন নিম্নলিখিত ভাবে :

বাঙ্গলা ৩, বোম্বাই ১৮, মাদ্রাজ ৮, করাচী ১, বীরসিংও ১, সুরাট ৬, পুণা ৮, আগরা ২, কাশী ১, সিন্ধ ১, লক্ষ্ণৌ ৩, এলাহাবাদ ১, লাহোর ১, আম্বালা ১, আলোয়াল ১, বারহামপুর (মাদ্রাজ) ১, মছলীপত্তন ১, তিনেভেলি ১, তাঞ্জোর ১, মুক্তকনদ ১, মাদুরা ১, তিনেভেলি ১, কোইম্বাটোর ১, সালেম ১, কাডাপুর ১।

* পত্নী দর্শক ছিলেন।

মিঃ হিউম বাঙ্গলা দেশকে সত্যই ভালবাসিতেন। কারণ তিনি সিমলা হইতে আসিয়াও বাঙ্গলার ডেলিগেট (প্রতিনিধি) রূপে যোগদান করেন।

১৮৮৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং সেই ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সম্মেলনীতে বাঙ্গালী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ই সভার নেতৃত্ব করেন। প্রথমে হিউম সাহেবের ইচ্ছা ছিল যে, বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণর বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, কিন্তু লর্ড ডাফরিণ কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে নিষেধ করেন, এমন কি তাঁহার যে ব্যক্তিগত সহানুভূতি আছে তাহাও অপ্রকাশ রাখিতে অনুরোধ করেন। অতঃপরে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব প্রখ্যাতনামা ব্যারিষ্টার কৌন্সিলি মিঃ ডব্লিউ. সি. বানার্জীকে সভাপতি করা স্থির হয়। সকলেই জানেন বোধ হয় যে, উমেশচন্দ্র প্রথমে বড় জবরদস্ত সাহেব ছিলেন। কিন্তু ইলবার্টের সময় তাঁহার দিব্যচক্ষু প্রথমে উন্মীলিত হয়। ক্রমে তিনি শক্তিশালী জননায়ক হইয়া উঠেন। ১৮৮৪ সালে লর্ড রীপনকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা দেওয়ার সময়ে তিনিই নেতৃত্ব করেন ; সেই সময় তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অধিবেশনে হিউম সাহেবের প্রস্তাবে, মাদ্রাজের সুব্রাহ্মণ্য আয়ারের সমর্থনে ও মিঃ তেলাঙ্গের অনুমোদনে বাঙ্গলার নেতা মিঃ উমেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি সভাপতিপদে বৃত হন।

সভাপতি মহাশয় সমাগত জনমণ্ডলীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া এবং প্রতিনিধিবর্গ, সরকারী কর্ম্মচারী এবং সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া এমন ওজস্বিনী ভাষায় তাঁহার কথাগুলি বলেন যে, এখনও তাহা কর্ণকুহরে ঝঙ্কৃত হয় :

"আমার মনে হয় ইতিহাসের স্মরণাতীত কালের মধ্যে এত বড় বিশিষ্ট ও গুরুতর জনসংঘ ভারতে একত্রিত হয় নাই। ভারতের সমস্ত প্রদেশ ও স্থান হইতেই—যত সুদূরবর্ত্তীই হউক না কেন—প্রতিনিধিবর্গ সমাগত হইয়াছেন। ইহা তো পার্লামেন্টের কমন্স সভার সভ্যগণ যেমন নির্ব্বাচিত হইয়া আলোচনায় যোগদান করেন, সেই নির্ব্বাচন হিসাবে আমরা প্রতিনিধি-পদ-বাচ্য না হইতে পারি, কিন্তু আমাদের

ভাবের ঐক্য, অভাব অভিযোগের সর্বসাধারণত্ব এবং দুঃখ-বেদনার ঐক্য আমাদিগকে এখানে যে একত্রীভূত করিয়াছে, নির্বাচন প্রথার তুলনায় সেই ঐক্য উপেক্ষণীয় নয়। কেহ কি বলিতে পারে আমরা আত্মনির্বাচনের ফলে এখানে উপস্থিত হইয়াছি? কখনও নয়।

"কংগ্রেসের অধিবেশন যে আজ হইতেছে, তাহা তো বৎসরাবধিই প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। সমস্ত সমাজের জনগণই নানাবিধ অনুষ্ঠানাদিতে এই সম্মেলনের কথা জ্ঞাত হইয়াছে এবং সানন্দে তাহারা তাঁহাদের প্রতিভূস্বরূপ ব্যক্তি-গণের উপস্থিতি ও প্রতিনিধিত্বই কামনা করিয়াছে। আজ সেই মনোনীত ব্যক্তিরাই এখানে আসিয়া সমুপস্থিত হইয়াছেন। নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তিত না হইলেও এই সমস্ত জনপ্রতিনিধিগণের সহযোগিতার ফল নির্বাচিত ব্যক্তিগণের উপস্থিতি অপেক্ষা কম কার্যকরী নয়। তবে কেবল আমাদের গভীর দুঃখ যে নানারূপ বাধাবিঘ্নে প্রতিহত হইয়া আমাদের বহু সহকর্মী যোগদান করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সহযোগিতায় বঞ্চিত হইয়াছি।"*

অতঃপর তিনি কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া বলেন, "আমি শুটিকতক উদ্দেশ্য বিবৃত করিতেছি—তবে এগুলিই সব নয়, কারণ প্রস্তাবাদিতে আমাদের লক্ষ্য স্থিরীকৃত হইবে।"

কংগ্রেসের উদ্দেশ্য :

(১) ভারত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের দেশকর্মি-গণের মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠতা, বন্ধুত্ব ও প্রেমবর্ধন।*

(২) উক্ত সম্প্রীতির ফলে দেশপ্রেমিকগণের মধ্যে যাহাতে কিছু জাতি, ধর্ম অথবা বিভিন্ন প্রদেশের লোক বলিয়া কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা না থাকে, তাহা যথাসম্ভব দূরীকরণ এবং জনপ্রিয় গবর্ণর-জেনারেল লর্ড রীপনের চিরস্মরণীয় শাসন কালে জাতীয় ঐক্যঘটিত যে সমস্ত ভাবধারা গড়িয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছে তাহার পরিপুষ্টিসাধন ও দৃঢ়ীকরণ।†

(৩) প্রয়োজনীয় ও অবশ্য-করণীয় সমাজ সম্বন্ধীয় সমস্যায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সুচিন্তিত মত নির্ধারণ আলোচনার বিষয় করণ।‡

(৪) দেশীয় নেতৃবৃন্দ পরবর্তী বৎসরে কিরূপভাবে কার্যে অগ্রসর হইবে তাহা স্থিরীকরণ §

---

* "Surely never had so important and comprehensive an assemblage occurred within historical times on the soil of India. He claimed for it an entirely representative character. It was true that judged from the standard of the House of Commons they were not the representatives of the people of India in the sense the members of the House were representatives of the constituencies. But if community of sentiments, community of feelings and community of wants enabled any one to speak on behalf of others, then assuredly they might justly claim to be the representatives of the people of India. It might be said that they were self-elected but that was not so. The news that this Congress would be held, had been known throughout the year in the different provinces of India and they all knew that everywhere the news had been received with great satisfaction by the people at large and though no formal elections had been held, the representatives had been selected by all the different associations and bodies and he only wished that all thus selected had been able to attend, instead of their having now to lament the absence of many valued co-adjutors whose attendance had been unhappily barred by various unfortunate circumstances—"

* The promotion of personal intimacy and friendship amongst all the more earnest workers in our country's cause in all parts of the Empire.

† The eradiction by direct friendly intercourse of all possible race, creed, or provincial prejudices amongst all lovers of our country, and the fuller development and consolidation of those sentiments of national unity that had their origin in their beloved Lord Ripon's ever memorable reign.

‡ The authoritative record after this has been carefully elicited by the fullest discussion of the matured opinions of the educated classes in India on some of the more important and pressing of the social questions of the day.

§ The determination of the lines upon and methods by which during the next twelve months it is desirable for native politicians to labour in the public interests.

মিঃ ব্যানার্জি অতঃপর আরও বলেন :

"আমাদের উদ্দেশ্য যতই মহৎ এবং ত্রুটিবিহীন হউক না কেন, বড়ই দুঃখের বিষয় দায়িত্ব-বিহীন একদল লোক কংগ্রেসকে রাজদ্রোহী ও ষড়যন্ত্রকারিগণের ক্রীড়াভূমি বলিয়া আখ্যা দিতে দ্বিধা করে না। এখানে আসিয়া আমি সকলের সহিত কথাবার্তা বলিয়াছি, দেশের হিত সম্বন্ধে সকলেই আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়াছেন এবং আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, আমাদের বন্ধুগণ ও আমরা রাজভক্তি ও ইংরাজ-শাসনের শুভকামনায় কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহি। আমরা এই জনসভায় শান্তিপূর্ণ ও সঙ্গতভাবে দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে যে ভাবেই আলোচনা করি না কেন, ইংলণ্ডের শাসন-প্রথানুযায়ী উপায়ে শাসনকর্তাদের নিকট আমাদের অভাব-অভিযোগ উপস্থাপিত করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ইংরাজ আমাদের অনেক হিত-সাধন করিয়াছেন, আমরা সেজন্য যথেষ্ট কৃতজ্ঞও হইয়াছি। ইংরাজ-শাসন আমাদিগকে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা দিয়াছে, রেলওয়ের সহায়তায় আমাদের যাতায়াতের সুবিধা করিয়া ঐক্য-বন্ধনে সহায় হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার অমূল্য সম্পদও আমরা তাহাদের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু এখনও তাহাদের অনেক কার্য্য বাকী রহিয়াছে, এখনও তাহাদের করণীয় অনেক কিছু আছে। আমরা যত শিক্ষালোক পাইব, যত আমাদিগকে সুখ সুবিধা প্রদান করা হইবে, যত আমরা উচ্চ বিষয়ে আলোচনার সুযোগ পাইব—ততই আমরা রাজনৈতিক অধিকার লাভেও আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিব। ইউরোপে যে শাসন-প্রথা প্রচলিত, যদি আমরা সেই শাসন লাভ করিতে ইচ্ছুক হই, তবে তাহা কি আমাদের রাজভক্তির বিরোধী? আমি তাহা স্বীকার করিব না, কোন বুদ্ধিমান ও দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিই তাহা কখনও স্বীকার করিবে না। আমরা তো এই চাই যে, গবর্ণমেণ্টের ভিত্তির আরও প্রসার হইবে আর আমাদের জন-গণের ন্যায্য কর্তৃত্বও তাহাতে থাকিবে। ইহাই তো আমাদের কাম্য। জিজ্ঞাসা করি, ইহা কি অসঙ্গত কামনা? না ইহাতে রাজভক্তির কোন অভাব আছে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমাদের আলোচনায় যেমন দেশের লোকের উপকার হইবে, গবর্ণমেণ্টেরও তাহাতে প্রকৃত মঙ্গল সাধনই হইবে।"*

যদিচ প্রথমে সভাপতি ও প্রতিনিধিগণের বক্তৃতায় রাজভক্তির মাত্রা খুব বেশী ছিল—তখন উহা খুব থাকিতও—তথাপি প্রথম সভাপতির মুখ-নিঃসৃত কথাগুলিতে তাঁহাদের মনোভাব বেশ বুঝা যায়। তাঁহারা স্পষ্টই বলেন, "আমরা

---

could possibly take exception and yet on more than one occasion remarks had been made by gentlemen who should have been wiser, condemning the proposed Congress as if it were a nest of conspirators and disloyalists. Let him say once for all and in this he knew well after the long informal discussions that they all had amongst themselves on the previous day, that he was only expressing the sentiments of every gentleman present, that there were no more thoroughly loyal and consistent well wishers of the British Government than were himself and the friends around him. In meeting to discuss in an orderly and peaceful manner questions of vital importance affecting their well-being, they were following the only course by which the constitution of England enabled them to represent their views to the ruling authority. Much had been done by Great Britain for the benefit of India, and the whole country was truly grateful to her for it. She had given them order, she had given them railways and above all, she had given them the inestimable blessings of western education. But a great deal still remained to be done. The more progress the people made in education and material prosperity, the greater would be the insight into political matters and the keener their desire for political advancement. He thought that their desire to be governed according to the ideas of Government prevalent in Europe, was in no way incompatible with their thorough loyalty to the British Government. All that they desired was that the basis of the Government should be widened and the people should have their proper and legitimate share in it. The discussions that would take place in this Congress would, he believed, be as advantageous to the ruling authorities as he was sure it would be to the people at large."

* "Surely there was nothing in these objects to which any sensible and unprejudiced man

রাজতন্ত্র বটে, কিন্তু ইউরোপে যেরূপ শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত আমরাও সেইরূপ শাসনাধীনে থাকিতে চাই। এরূপ অভিপ্রায় আমাদের রাজভক্তির পরিপন্থী নহে।"

তারপরে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(১) ভারতীয় শাসনতন্ত্র অনুসন্ধান জন্য রয়াল কমিশন নিযুক্ত হউক এবং তাহাতে ভারতবাসীকেও সভ্য করিতে হইবে এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ ইংলণ্ড ও ভারত এতদুভয় স্থান হইতেই লওয়া চাই।*

প্রস্তাবক—জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার (সম্পাদক, 'হিন্দু'); সমর্থক—মিঃ কেরোজ শা মেটা; অনুমোদক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন।

(২) ভারত সচিবের বর্ত্তমান আকারে গঠিত পরামর্শ পরিষদের উচ্ছেদ আবশ্যক।

প্রস্তাবক—এস্. এইচ্. চিপলাঙ্কার।

সমর্থক—পি আনন্দ চার্লু।

জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয় বড়ই হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় প্রস্তাবটী অনুমোদন করেন।

(৩) এই প্রস্তাবে শাসন সংস্কারের কথা হয়। ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় যেন নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং পঞ্জাব প্রদেশেও যেন ব্যবস্থাপক সভা হয়। সব সভারই বজেট (আয় ব্যয় হিসাবের খসড়া) সম্বন্ধে, সভ্যগণ কর্ম্মকর্ত্তা (executive) পক্ষকে যেন প্রশ্ন করিতে পারে। পার্লামেণ্টের কমন্স্ সভায় একটী ষ্টাণ্ডিং কমিটী গঠিত হয় এবং উপরোক্ত ব্যবস্থাপক সভায় অধিক সংখ্যক সভ্যের মত যদি কর্ম্মকর্ত্তাগণ কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হয়, তবে এই কমিটী যেন সেই অধিকাংশের মত বিবেচনা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন।†

এই প্রস্তাব উত্থাপন কালে মিঃ তেলাঙ্গ বলেন: "আমরা মনোনয়ন চাই না, নির্ব্বাচন চাই। লর্ড রীপন যে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাতে মিউনিসিপ্যালিটী ও ডিষ্ট্রিক্ট এবং লোকাল বোর্ডে—আমাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি পাইবার অধিকার জন্মিয়াছে। অতএব ক্রমে এই নীতির প্রসার করিয়া আমরা যেন প্রত্যেক প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভায়ও নির্ব্বাচিত সভ্য লাভ করিতে পারি। আপাততঃ অন্ততঃ অর্দ্ধেকসংখ্যক সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেই চলিতে পারে। এবং ক্রমে প্রাদান প্রধান শহরের কর্পোরেশন, বিশ্ববিদ্যালয়, সুগঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটী ও বোর্ড সমূহ যেন নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা লাভ করে।"

অনারেবল এস. সুব্রহ্মণ্য আয়ারও বলেন: "নির্ব্বাচন প্রথার অস্তিত্ব নাই বলিয়া কাউন্সিলের যে-সরকারী সভ্যের কোন ক্ষমতা নাই বলিলেই চলে, কারণ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি যে, গভর্ণমেণ্ট ছোট খাটো বিষয়ে এক আধটু মতামত গ্রহণ করিলেও, কোন নীতি সম্বন্ধে আপনাদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত হইতে একটুও (এক চুলও) নড়ে না।"

দাদাভাই নৌরজী বলেন: "আমরা যে যে সংস্কার চাহিতেছি গভর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করিলে এবং আমাদের প্রশ্নাদি করিতে দিলে গভর্ণমেণ্টের প্রতি অবিশ্বাস বা ঘৃণা অনেকটা তিরোহিত হইয়া যাইবে।"‡

লালা মুরলীধর বলেন: "Real and direct representation must be had to minimise the influence of men who are not true representatives of the country."

---

* That this Congress earnestly recommends—the promised enquiry into the working of the Indian administration here and in England should be entrusted to a Royal Commission, the people of India being adequately represented thereon and evidence taken both in India and England.

† That this Congress considers the reform and expansion of the supreme and existing legislative Councils, by the admission of a considerable proportion of elected members (and the creation of similar councils for the North-West Provinces and Oudh and also for the Punjab) essential and holds that all budgets should be referred to these councils for consideration, their members being moreover empowered to interpellate the Executive in regard to all branches of the administration; and that a Standing Committee of the House of Commons should be constituted to receive and consider any formal protests that may be recorded by majorities of such councils against the exercise by the Executive of the power which would be vested in it, of overruling the decisions of such majorities.

‡ If the Government granted the reforms and the right of interpellation prayed for, much of the misunderstandings and odium the Government had to suffer would be removed.

লালাজী খুব সুন্দর বক্তৃতা দিলেন আর বড় হাসির উদ্রেক করিতে পারিলেন।

মহাদেও গোবিন্দ রানাডে মত প্রকাশ করেন যে, ভারতসচিবের সভায় নির্ব্বাচিত এবং মনোনীত উভয় প্রকারের লোক থাকাই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়। মিঃ হিউম—pointed out that a substitute for the Secretary of State's Council as regards extravagant expenditure was provided for in the scheme proposed by the resolution in the power of interpellation and in the financial power.

মেডহাম বাহাদুর রঘুনাথ রাও প্রভৃতি কয়েকজন পার্লামেন্টারী কমিটী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।*

(৩) বিলাতের মত ভারতেও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হউক।

(Simultaneous examination for Civil Service.)

মিঃ ডি. এম. হোয়াইট, মিঃ গিরিজা ভূষণ মুখার্জ্জি ও মিঃ মৌরজী সাহেব এই প্রস্তাবে যোগদান করেন।

(৪) সামরিক বিভাগের বর্ত্তমান ব্যয়-বাহুল্য অনাবশ্যক এবং রাজস্বের সহিত তুলনায় ইহা খুব অতিরিক্ত। (The reduction of military expenditure.)

(৫) যদি সামরিক বিভাগের ব্যয় হ্রাস করা অসম্ভব হয় তবে অতিরিক্ত ব্যয় কাষ্টমস শুল্ক ও পরে লাইসেন্স করের দ্বারা নির্ব্বাহিত হউক।

(The re-imposition of the Import cotton duties and extension of the License Tax, together with one Imperial guarantee to the Indian debt.)

(৭) কংগ্রেসের মতে ব্রহ্ম দেশ ( Upper Burma ) অধিকার অনাবশ্যক। কিন্তু সরকার যদি তাহা অধিকার করাই স্থির করেন; তবে সমগ্র ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সিংহলের মত উপনিবেশ গঠিত করাই সঙ্গত।

(Separation of Burma from the Indian Viceroyalty.)

মান্দালয়ের ( উত্তর বর্ম্মা ) রাজা থিবো কয়ালী রাজ্ঞীর সহিত গুপ্ত সন্ধি করিয়াছিলেন সন্দেহে লর্ড ডাফরিন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৮৮৫ সালের ২৭ নবেম্বর থিবো আত্মসমর্পণ করেন ও তৎপর দিবস মান্দালয় অধিকৃত হয়। ১৮৮৬ জানুয়ারীতে সমগ্র ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়।

(৮) কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবাবলী দেশীয় সমস্ত রাজনৈতিক সমিতির গোচর করা হউক।

(Resolutions be forwarded to all political associations in the country with a request to adopt such measures as may be calculated to advance the sentiment of the various questions dealt with in the resolutions).

মিঃ হিউমের প্রস্তাব মতে ও সুব্রহ্মণ্য আয়ারের সমর্থনে পরবর্ত্তী বৎসরে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন স্থিরীকৃত হয়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, কলিকাতায় যথাসাধ্য অতিথি সৎকারে ত্রুটি করিবে না। তিন দিন বৈঠক হওয়ার পরে যখন অধিবেশন শেষ হয়, সভাপতি মহাশয় বিশেষ প্রশংসাবাদ লাভ করেন। এবং পরে হিউম সাহেবকে তিনবার "Three cheers for Mr. Hume, the father of the Congress." বলিয়া অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। হিউম সাহেবও মহারাণীর জয়—"Three cheers for Her Majesty the Queen Empress." বলিতে বলিতে প্রত্যভিবাদন করেন।

প্রথম অধিবেশনের প্রস্তাবগুলি বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। কারণ, বহুদিন পর্য্যন্ত এই পরিমাপেই কংগ্রেসের কার্য্যাবলী পরিচালিত হয়।

'Three cheers' অনেক দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল—এখন না, পাশ্চাত্যভাবের অনুকরণে কংগ্রেসের সূত্রপাত হয়। কবে এই ধ্বনি বিতাড়িত হইয়া 'বন্দেমাতরম্'-এর পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়, পাঠক বিশেষ ভাবে তাহা লক্ষ্য করিবেন। অধিবেশন শেষ হইয়া গেলে প্রতিনিধিবর্গকে সমাদর করিয়া এলিফেন্টা গুহা প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করান হয়। [ ক্রমশঃ

---

* D. Raghunath Rao thought that reference to a Parliamentary Committee would expose India to the risk of Government by English political parties.

Mr. P. M. Mehta thought that a substitute for the India Council was unnecessary. A Parliamentary Committee would be of great advantage by giving publicity to the discussions of the Committee.

Mr. Narendra Nath Sen thought that a standing Committee of the House of Commons would be good if it contained their own representatives.

† ইনি অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক। কলিকাতা হাইকোর্টের পাশীর উকীল। ইনি ও আলিপুরের একজন নামজাদা উকিল ছিলেন। হাইকোর্টের প্রবেশ করেন কিন্তু অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন।